

Barcode - 4990010208711

Title - Sachitra Masik Basumati (Year 19, vol. 2)

Subject - LITERATURE

Author - Mukhopadhyay, Satishchandra, ed.

Language - bengali

Pages - 1054

Publication Year - 1940

Creator - Fast DLI Downloader

<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>

Barcode EAN.UCC-13



4 990010 208711



১৩৪৭ সালের কার্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত

[২য় খণ্ড]

বিষয়ানুক্রেমিক সূচী

লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক	বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
ইতিহাসের অনুসরণ :-				
শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন	১	১। প্রাচীন ভারতের নৌবল শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়		১৯
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু	১১৬, ২৫২, ৬৯১, ৯২১	২। হায়দার আলির নৌ-বাহিনী " "		৩০৪
শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী	১৬৯	৩। আফগান রাজ্যের অতীত কথা " "		৩৯৫
শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৩৩	৪। সহমরণ-প্রথার প্রবর্তন ও প্রচার শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়		৬০৯
শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী	৩২৯, ৬৬৫, ৮২৫	৫। পূর্ব উপদ্বীপে হিন্দু প্রভাব শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়		৬১৬
শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী	৩৭৯, ৫৩০	৬। সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের সূচনা শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়		৬৯৬
শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী	৮৪৯	৭। ইন্দো-চীনে ভারতীয় প্রভাব শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়		৭০১
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য :-				
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৪২	৮। সহমরণ প্রথার বিলোপসাধন শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়		৯১১
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৫	৯। গুরুগোবিন্দের জীবনধারা শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়		৯১৬
শ্রীহারাগচন্দ্র শাস্ত্রী	৪৯৭	১। অবসাদ জড়তার		৮২
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৩৫	২। জানিয়া রাখুন		৮৪
শ্রীকৃষ্ণ মিত্র	৫৬	৩। ঘুমপাড়ানিয়া		২৯৬
শ্রীহারাগচন্দ্র শাস্ত্রী	৩৫৩	৪। সাজ-সজ্জা		২৯৮
শ্রীগঙ্গাপদ বসু	৪১১	৫। দড়ি লাফ		৪১৬
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু	৪৫৩	৬। সুখের সন্ধানে		৪১৮
		৭। দেহে মনে জোর		৫৫২
		৮। এক ঘরে ঘর করা		৫৯২
		৯। কাঁধ-গলা-বাড়		৭১২
		১০। মেয়েরা কি চায়		৭১৪
		১১। মা হওয়া		৯০১
		১২। আহা		৯০৩

সচিত্র মাসিক বসুমতী

১৯শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৪৭ সাল—কার্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত)

সম্পাদক
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুভাজার ষ্ট্রীট “বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেশিনে”

শ্রীশশিভূষণ, দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক	বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
কবিতা :-			৪৪।	মাটির প্রেম	শ্রীনিভা দেবী ৫৪৬
১।	নিয়তি: কেন বাধ্যতে	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ১৩	৪৫।	পরিচয়	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ৫৮৩
১।	প্রক্ষিপ্ত "	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮	৩৬।	পুতুল ও প্রতিমা	শ্রীরামেন্দু দত্ত ৫৮৮
৩।	কালোর আলো	অপরিচিতা ২৪	৪৭।	ভিকার অপরাধ	শ্রীকালীকঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় ৫৯৪
৪।	যমুনা	শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ৫৫	৪৮।	বিবেকানন্দ	শ্রীকমলারাণী মিত্র ৬০৮
৫।	শাস্তি	শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত ৬১	৪৯।	নবরূপিনী	শ্রীচরণদাস ঘোষ ৬২৫
৬।	জীবন-সন্ধ্যা	কাদের নওয়াজ ৬৭	৫০।	সঙ্কটের আশ্রয়	শ্রীকালিদাস রায় ৬২৭
৭।	বস্ত্র আনো	শ্রীঅমরেশ, দত্ত ৮১	৫১।	কল্যা-কুমারী	শ্রীরূপগুপ্ত বর্মা ৬৪৭
৮।	সৈপরীত্য	শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৫	৫২।	সাহিত্যের সংজ্ঞা ৬৫৪
৯।	পায়ের মায়া	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১০০	৫৩।	ফাল্গুন বেদনা	শ্রীমতী নিভা দেবী ৬৭১
১০।	তোমার পূজা	শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী ১১৫	৫৪।	পাখী ও বড় ৬৭৮
১১।	নারী-প্রশস্তি	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৮	৫৫।	বসন্ত-প্রয়াণ	শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্মা ৬৭৯
১২।	স্মৃতিপথে	শ্রীযামিনীমোহন কব ১৪৪	৫৬।	এস পুনঃ চিত্ত-বৃন্দাবনে	শ্রীনীলরতন দাশ ৬৯০
১৩।	ব্যথার পূরনী	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ১৭৮	৫৭।	মঞ্জুবানী	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৭০৯
১৪।	পতিতার বিচার	শ্রীনীলরতন দাশ ২০৮	৫৮।	স্ববেব বীণা	শ্রীউমানাথ সিংহ ৭২০
১৫।	কুফল	শ্রীকমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৯	৫৯।	থকীব নাড়ু	শ্রীইলাবানী মুখোপাধ্যায় ৭৪৫
১৬।	প্রথম চূষন	শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার ২২৭	৬০।	ফাল্গুন	কাদের নওয়াজ ৭৫৬
১৭।	রাতের কথা	শ্রীরবিদাস সাত্তা রায় ২৩৭	৬১।	প্রেম ও পূজা	শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৭৬১
১৮।	মৌন	শ্রীকালী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য ২৫১	৬২।	উন্মুগ	শ্রীসত্যনাথায়ণ দাশ ৭৬৬
১৯।	রাজকল্যা ও দবিত্তকল্যা	শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত ২৬৫	৬৩।	ফাল্গুন	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ৭৭৬
২০।	পূর্ণকাম	শ্রীমতী কণকলতা ঘোষ ২৯১	৬৪।	উত্তম ও মধ্যম	শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত ৭৯১
২১।	বসুমতীর বস্ত্রধারা	শ্রীকালিদাস রায় ২৯৫	৬৫।	ইতিহ আমাব	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ৮০৬
২২।	উজ্জ্বল	শ্রীলক্ষ্মী বিশ্বাস ৩০৩	৬৬।	টিলার দেশের লীলাবতী	শ্রীরামেন্দু দত্ত ৮২৯
২৩।	শীত আসে	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ৩০৯	৬৭।	চিত্তবিকাশ	শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত ৮৪৮
২৪।	আবলুতন	শ্রীকালী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৩৪১	৬৮।	বাতায়াত	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৮৫৩
২৫।	আবছায়া	শ্রীসত্যনাথায়ণ দাশ ৩৪৪	৬৯।	হৃদয় ও স্মৃতি ৮৬৩
২৬।	শতাব্দী	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ৩৭৪	৭০।	গোক-বাছুব	উপগুপ্ত ৮৬৮
২৭।	অদূরবর্তিনী	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৩৬০	৭১।	বাসনা ৮৭৪
২৮।	গোধূলি	শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল ৩৬৯	৭২।	কুহুধনি	শ্রীকালিদাস রায় ৮৯১
২৯।	রাজা ও সাধু	শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত ৩৭৮	৭৩।	বসুমতী	শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০৪
৩০।	যাত্রা	শ্রীকৃষ্ণ মিত্র ৩৮৩	৭৪।	প্রগতিশীলা	রাণু গঙ্গোপাধ্যায় ৯২০
৩১।	চির-ভাষ্য	শ্রীকালিদাস রায় ৪০৪	৭৫।	কেরানী-জগৎ	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ৯২৬
৩২।	চাষী	শ্রীনীলরতন দাশ ৪১৫	৭৬।	নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়	শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল ৯৪৬
৩৩।	ঝরা পাতার গান	শ্রীদুর্গাদান চক্রবর্তী ৪২০	৭৮।	চৈত্র	শ্রীগোপাললাল দে ৯৭৫
৩৪।	এবারও রহিলু ঋণী	শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার ৪২৯	৭৮।	মাধুরী ও আনন্দ	শ্রীকালিদাস রায় ৯৮১
৩৫।	ফুল ও ছেলে	শ্রীরামেন্দু দত্ত ৪৪২	নারী-মন্দির :-		
৩৬।	অদৃষ্ট ও কণ্ঠফল	শ্রীনন্দ সেনগুপ্ত ৪৫৭	১।	নন্দাকাটা জাদি স্ট	৫৯
৩৭।	পাতা ঝরার ডাক	শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত ৪৬০	২।	বম্পার	৩০১
৩৮।	ধন্যবাদ	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ৪৭৬	৩।	মনের চাষী	শ্রীফুলবাল রায় ৪০৫
৩৯।	আমি আর ওরা	শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৪৮৩	৪।	উলের ব্লাউস	৪০৯
৪০।	সুখের ঘর	শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ ৫১২	৫।	শিল্প-লেস পুল্‌ওভার	৫১৭
৪১।	স্বর্গ ও মর্ত	শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী ব্রহ্মচারী (মহারাজকুমারী) ৫২০	৬।	ক্রশ্‌টীচ	৮০৩
৪২।	প্রিয়া	ডক্টর কাঁধরাজ ৫২৯	৭।	সাজি ও টুকুদী	৯০৯
৪৩।	জীর্ণবাস	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৫৩৭	৮।	প্রজাপতি ট্র	৯১১

বিষয়	লেখকগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
গল্প ৪—		
১। বিনা পণের মর্ধ্যাদা	শ্রীমতী আশালতা সিংহ	১৪
২। ভ্রম-সংশোধন	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২৫
৩। মানতের পূজা	শ্রীশিশুভূষণ ভট্টাচার্য্য	৩৯
৪। পুষ্পমোহিতা	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	৪৯
৫। মাহুঘের মন	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৮৫
৬। অদৃষ্টের অভিশাপ	শ্রীমায়াদেবী বসু	২০৯
৭। পরাজয়	শ্রীপ্রেমলতা দেবী	২৩৮
৮। মিসেস্ ব্যানার্জি	শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ	২৬০
৯। অতিথি-সম্বন্ধনা	শ্রীযামিনীমোহন কর	৩৬৮
১০। দম্পতি	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল	৩৭০
১১। পরিচালিকা	শ্রীইসারাণী মুখোপাধ্যায়	৪২১
১২। ডাক্তার	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৫৮
১৩। অঞ্জন দেবী	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৫১৩
১৪। আশাপথের শেষে	শ্রীমায়াদেবী বসু	৫২১
১৫। শীতের তরু	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৩৮
১৬। সেকৌ পথ	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৫৭৩
১৭। সম্মোহিত	জ্যোৎস্না ঘোষ	৬৮১
১৮। অবাঞ্ছিত অতিথি	শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়	৭১০
১৯। অন্ধ ভিখারী	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৭২৭
২০। পুনর্মিলন	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মিত্র	৮৩০
২১। মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮৪০
২২। অপচয়	শ্রীপৃথীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৮৬৯
২৩। বান্ধবী	শ্রীমতী আশালতা সিংহ	৯০৫
২৪। প্রগতি	শ্রীগিরিবালা দেবী	৯০২

উপন্যাস ৪—

১। 'ইউ'-বোটের বোধে	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৭২, ১২৩, ৩৮৪, ৫৫৭, ৬৭২, ৮৫৭
২। বংশ-গৌরব	শ্রীমতী নীলিমা দেবী	১০১, ১৭৯, ৩৪৮, ৫০৪, ৭৪৬, ৯৫৭
৩। পারাবার	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩৯, ৩১০, ৩৩৩, ৬৩৮, ৭৯৬, ৮৯২

সচিত্র প্রবন্ধ :—

১। ফার্ণ	১২১
২। আইস্ল্যান্ড	২৬৬
৩। বেথলিহাম	৪৫০
৪। বন্দা রোড	৫৫৫
৫। মোটর অভিযান	৭২১
৬। হাইমান	৯২৭

শৌর্যগতিক-কাহিনী ৪—

১। এক টিলে চার পাখী	শ্রীস্বয়ংরাজ কবিরত্ন	২৪৬
২। অজিত প্রতিভা	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৩৩১

ছোটদের আসন্ন :—

১। গল্পদাহুর বৈঠক	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯
২। প্রকৃতির পরিচয়	"	৯৪
৩। আতস-বাজি	"	৯৭
৪। নির্বাসিতা রাজকন্যা গল্পদাহ	২৬৮, ৪৬১, ৬৩৩, ৭৭৮, ৯৬৯	
৫। হঠাৎ যদি	"	২৮৪
৬। শক্তি পরীক্ষা	"	২৮৭
৭। বই পড়ার নিয়ম	"	২৯০
৮। কাজের হৃদিশ	"	৪৬৬
৯। পলকে প্রলয়	"	৪৬৯
১০। চিত্র-চতুর্ভুজ	"	৪৭২
১১। মাহুঘ হওয়া	"	৩৭৪
১২। শিশুর খেলার সাথী ডিও	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৬২৬
১৩। বাঁচা চালা	"	৬৩০
১৪। মনুস্কটভ সাকাস পাটি	শ্রীযামিনীমোহন কর	৭৭৪
১৫। সাত খুন মাপ	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৭৭৫
১৬। স্বর্গের সিঁড়ি	"	৭৮৪
১৭। সন্ধি-সাগা	"	৭৮৬
১৮। সিনেমার দৃষ্টি	"	৭৮৮
১৯। মেক-আপ	"	৯৬৩
২০। ফুলের ফল	"	৯৬৬
২১। টাইপ বাইটারের খেলা	"	৯৬৮

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য :—

১। কয়লা-শিল্পের সঙ্কট	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬
২। ওলন্দাজ উপনিবেশের শিল্প-বাণিজ্য	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	২২০
৩। পাটের কথা	শ্রীশিশুভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৫৬
৪। বঙ্গদেশে কৃষিকলক শিল্প	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	৩৯৯
৫। ভারতের বর্তমান শিল্প পরিস্থিতি	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯৫
৬। ম্যালেরিয়া ও সিকোনা উৎপাদন	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	৫৯৯
৭। যুদ্ধ ও ভারতীয় খনিজ সম্পদ	শ্রীশিশুভূষণ মুখোপাধ্যায়	৬০৪
৮। ভারতে ঔষধ-শিল্প	"	৭৪০
৯। জীৱন্ত মৎস্য	"	৮৮৫

রাজনীতিক-প্রসঙ্গ ৪—

১। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি	শ্রীঅতুল দত্ত	১৪৫, ৩১৬, ৪৭৭, ৬৪৮, ৮০৭, ৯৭৬
২। সংগ্রাম ও আর্থিক পরিস্থিতি	শ্রীশিশুভূষণ মুখোপাধ্যায়	৭৫৭

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
সাময়িক-প্রবন্ধ :- (বর্ণানুক্রমিক)—		
১। আয়ুর্বেদ চিকিৎসক-সম্মিলন		৬৫৬
২। আদমসুমারী প্রহেলিকা		৮২৬
৩। আদমসুমারীর হিসাব		৯৯৬
৪। ইংরেজী ভাষা সমিতি		৪৮৫
৫। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ		৪৮৪
৬। উদারনৈতিক-সংজ্ঞার অধিবেশন		৪৯০
৭। উজীরী বৃদ্ধি		৮২৮
৮। উষারাগী দেবীর কারাবরণ		৪৯৪
৯। কংগ্রেস সদস্যগণের মুক্তির দাবী		৩২৪
১০। কৃষ্ণনগরে হিন্দুসভার অধিবেশন		৩২৭
১১। কাপড়-কলেব অস্ত্রবিদ্যা		৫৫৯
১২। কর্তব্যের নিবেদন		৫৬০
১৩। কলিকাতায় মুসলমান জনতার দাঙ্গা		৮২১
১৪। কর বৃদ্ধি		৯৯৬
১৫। কুঠিনাট্টন ও মনোবল		৯৯৮
১৬। কেন্দ্র-পরিষদে নতুন করের বিল		১৫৮
১৭। কেন্দ্রী পরিষদে স্বতন্ত্রাচন্দ্র		১৬১
১৮। গোরাব অত্যাচার		১৫৬
১৯। গান্ধীজীব তৃতীয় পন্থা		১৬০
২০। চাকুবীতে সাম্প্রদায়িকতা		৫২৫
২১। চিকিৎসা শিক্ষার সম্বন্ধে		৩২৮
২২। জগদ্বন্দ্বিতার কাব্যদণ্ড		১৬১
২৩। টাউনহলে বিবাহ সভা		৮২৩
২৪। জুটিতে আপাত্ত		৬৬০
২৫। দৈনিক বসন্তমতীর কণ্ঠবোধ		৯৮২
২৬। নিখিল ভারতীয় মহিলা সমিতি		৫২৬
২৭। নিখিল ব্রহ্ম-সাহিত্য সম্মেলন		৫৮৮
২৮। নিয়োগে আপত্তি		৬৬১
২৯। নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক অনাচার		৮২০
৩০। প্রাচ্যগুচ্ছের পঞ্চমশ পরিষদ		১৫৫
৩১। পাকিস্তান সংগঠন		১৫৬
৩২। পাকিস্তানের প্রস্তাব কাহাব আবিষ্কার		৩২৪
৩৩। পাটসমস্যা		৫৮৬
৩৪। প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন		৯৯১
৩৫। পাকিস্তানের পরাভাষ ও কংগ্রেস		৬৬১
৩৬। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন		৯৯৭
৩৭। বিসর্জনে জ্ঞানার্জন		১৫৫
৩৮। বসু-কংগ্রেস বিরোধ		১৫৮
৩৯। বিমান-যুদ্ধ শিক্ষার আগ্রহ		৩২৪
৪০। বরপণ নিষেধক আইন		৩২৬
৪১। ব্যক্তিগত আইন অমাত্য		৩২৭
৪২। বড়লাটের পুনরুক্তি		৪৮৮
৪৩। বিজ্ঞান কংগ্রেস		৪৯৩
৪৪। বড়লাটের ঘোষণা		৬৫৯

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
৪৫। বজেটের সময়		৬৬২
৪৬। বাঙ্গালা সরকারের বাজেট		৮১২
৪৭। বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি		৯৯০
৪৮। বাঙ্গালায় আবগারীর আয়		৯৯৮
৪৯। বিনাটিকিটে রেলওয়ে ভ্রমণ		৫
৫০। বাঙ্গালায় ক্ষয় রোগ		৯৯৯
৫১। ভারতে সমরায়োজনের ব্যবস্থা		১৫৯
৫২। ভারত-সচিবের বক্তৃতায় অসন্তোষ		৫১১
৫৩। ভাওয়াল মামলার আপীল		৩২২
৫৪। ভারতে মুসলমান সংখ্যা		৩২৮
৫৫। ভারত-সচিবের উক্তি		৬৫৮
৫৬। ভারত সরকারের বাজেট		৮১৫
৫৭। ভারত-সচিবের বক্তৃতা		৫১২
৫৮। ভারত সরকার ও সাময়িক বাজেট		৯৯৫
৫৯। ভারতের নৈতিক বিদ্রোহ		৯৯৯
৬০। মানচিত্রে আতঙ্ক		৩২৬
৬১। মাদ্রাসায় হিন্দুসভা		৪৮৬
৬২। মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ		৪৮৬
৬৩। মজিসতীর সংস্কার		৬৫৭
৬৪। মূল্যবৃদ্ধি ও যুদ্ধ		৬৬১
৬৫। মাক্গ্রেগরী রিপোর্ট		৫৬২
৬৬। মাধ্যমিক শিক্ষাবিল		৫৬২
৬৭। যুদ্ধের উদ্দেশ্য		১৫৩
৬৮। যুদ্ধে ভারত		১৫৯
৬৯। যুদ্ধের ব্যয়		৩২৮
৭০। যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি		৬৬৯
৭১। বেলগুয়ে কনফারেন্স		১৫৭
৭২। কংগ্রেসে পুনর্নির্বাচিত		৫৬১
৭৩। রাজস্ব-বিল তুলিবাব অগ্রাহ		৩২৩
৭৪। রণক্ষেত্রে খন্দরের আদর		৬৫৯
৭৫। বেলগুয়ে বাজেট		৮১৪
৭৬। লোক-গণনায় ভুল		১৫৩
৭৭। সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুদলন		১৫৪
৭৮। স.গ্রাম ও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট		৩২২
৭৯। সিন্ধু প্রদেশে অবাঞ্ছিততা		৩২৪
৮০। সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগ		৪৮৫
৮১। সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগ		৬৫৫
৮২। সিংহলে ভারতবাসী		৮১৯
৮৩। স্মৃষ্টি উক্তি		৫২০

বৈজ্ঞানিক-প্রবন্ধ :-

১। তারকার কথা	শ্রীনীলরতন কর	৪৪৩
২। সচক শনিগ্রহ	শ্রীকানাইলাল মণ্ডল	৮৭৫

প্রাণিতত্ত্ব :-

১। ভীষণ-দর্শন সাময়িক		২৯২
-----------------------	--	-----

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক	বিষয়	লেখকগণের নাম	পত্রাঙ্ক
অশ্রুত-অর্থ্য :-			দপ্তর :-		
১। পঞ্চানন তর্করত্ন		১৬৩	১। গ্রন্থ-সমালোচনা	শ্যামাচরণ কবিরত্ন	১১১
২। বরদা প্রসন্ন দাশগুপ্ত		১৬৪	২। ছগলী জেলার ইতিহাস	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০, ৫৮৪, ৮৮১
৩। ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়		ঐ	৩। মধ্যযুগে বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-শিক্ষা	শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ	২০৪
৪। তর্করত্ন মহাশয়ের মহা প্রয়াণে	শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ	১৬৫	৪। কেনোপনিষদ্	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৮৭
৫। " "	শ্রীবৈষ্ণবনাথ ভট্টাচার্য	১৬৬	৫। গুণবিহুর ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্য	শ্রীহুর্গামোহন ভট্টাচার্য	৭০৫, ৮৭৮
৬। পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালবা		৪৯৪	বিজ্ঞান জগৎ :-		
৭। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত		৪৯৫	১। কান্তিক		৬৮
৮। বারীন্দ্রনাথ সেন		৪৯৬	২। অগ্রহাষণ		২২৮
৯। অম্বলাচরণ মুখোপাধ্যায়		৬৬৪	৩। পৌষ		৬৯১
১০। ভূমিকুমার দত্ত		৮২৪	৪। মাঘ		৬২১
১১। রাজা জানকীনাথ রায়		ঐ	৫। ফাল্গুন		৭৬২
১২। শ্যামাচরণ কবিরত্ন		১০০০	৬। চৈত্র		৮৬৪
১৩। ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ		ঐ			
শিক্ষান্ন-কাহিনী :-					
১। হিংস্র প্রতিবেশী	শ্রীভবানীচরণ বাবু	২২৩			

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক	লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক	লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীঅমরেশ দত্ত			শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল			শ্রীউমানাথ সিংহ		
১। বন্যা আনো (কবিতা)		৮১	১। গোধূলি (কবিতা)		৩৬৯	১। স্বরের বাণা (কবিতা)		৭২০
শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়			২। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় "		৯৪৬	শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ		
১। বৈপরীতা (কবিতা)		৮৫	শ্রীমতী আশালতা সিংহ			১। পূর্ণকাম (কবিতা)		২৯১
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য			১। বিনাপনের মর্যাদা (গল্প)		১৪	শ্রীকমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		
১। পারেব মায়া (কবিতা)		১০০	২। বাঙ্গবী "		৯০৫	১। কুঙ্কল (কবিতা)		২১৯
শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী			শ্রীআন্তোয় শাস্ত্রী			শ্রীকমলরাণী মিত্র		
১। তোমার পূজা (কবিতা)		১১৫	১। গীতার দার্শনিক বহুশ্র (ধর্মপ্রবন্ধ)		১৬৯	১। বিবেকানন্দ (কবিতা)		৬০৮
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়			২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অদ্বৈতবেদান্ত (ধর্মপ্রবন্ধ)		৩৭৯, ৫৩০	শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্ণ		
১। বাথাব পরনী (কবিতা)		১৭৮	৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-বহুশ্র		৮৪৯	১। স্বথের ঘর (কবিতা)		৫১২
২। সোজা পথ (গল্প)		৫৭৩	শ্রীইসারাণী মুখোপাধ্যায়			কাদের নওয়াজ		
শ্রীঅতুল দত্ত			১। পরিচালিকা (গল্প)		৪২১	১। জীবন-সন্ধ্যা (কবিতা)		৬৭
১। আন্তর্জাতিক পরিষ্কৃত (রাজনীতিক)		১৪৫, ৩১৬, ৪৭৭, ৬৪৮, ৮০৭, ৯৭৬	২। খুকার মাতৃ (কবিতা)		৭৪৫	২। ফাল্গুন "		৭৫৬
শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী			শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়			শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত		
১। পর্ল-মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর (প্রবন্ধ)		৩২৯, ৬৬৫, ৮২৫	১। ছগলী জেলার ইতিহাস		২০০, ৫৮৪, ৮৮১	১। শাশ্বতী (কবিতা)		৬১
স্মরণচিত্রা			উপগুপ্ত			২। ভিকার অপরাধ "		৫৯৪
১। কালোর আলো (কবিতা)		২৪	১। গোক-বাহুর (কবিতা)		৮৬৮	৩। উত্তম ও মধ্যম "		৭৯১
						৪। চিত্তবিকাশ "		৮৪৮
						শ্রীকালীকঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়		
						১। ভিখারীর অপরাধ (কবিতা)		৫১৪

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

৭১

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক	লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক	লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীকালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য			শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার			শ্রীনীলরতন গুপ্ত		
১। মৌন (কবিতা)	২৫১		১। প্রথম চূষন (কবিতা)	২২৭		১। পাতা ঝঝাঝ ডাক	(কবিতা)	৪৬০
২। আবর্তন "	৩৪১		জ্যোৎস্না ঘোষ					
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ			১। সম্মোহিত (গল্প)	৬৮১		শ্রীনিভা দেবী		
১। মিসেস্ ব্যানার্জী (গল্প)	২৬০		ডক্টর কবিরাজ			১। মাটির প্রেম (কবিতা)	৫৪৬	
শ্রীকালিদাস রায়			১। প্রিয়া (কবিতা)	৫২৯		২। ফাগুন-বেদনা "	৬৭১	
১। বসুমতীর বসুমধা (কবিতা)	২৯৫		শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়			শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ		
২। চিব ভাস্বর "	৪০৪		১। 'ইউ'বোটের বোম্বটে (উপন্যাস)	৭২, ১৯৩, ৩৮৪, ৫৪৭, ৬৭২, ৮৫৭		১। তর্কবন্ধ মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে	(অশ্রু-অর্থ)	১৬৫
৩। সফটের আশ্রয় "	৬৩৭		২। অদ্ভুত প্রতিশ্রুতি	(হত্যারহস্য)	৩৬১			
৪। কুহুধনি "	৮৯১		৩। শিশুর খেলার সাথী ডিও	৬১৬		শ্রীপ্রমলতা দেবী		
৫। মাধুরী ও আনন্দ "	৯৮১		৪। সাত খুন মাপ	(ভগ্নমীর প্রতিফল)	৭৭৫	১। পরাজয় (গল্প)	২৩৮	
শ্রীকান্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়			শ্রীহুর্গাদাস চক্রবর্তী			শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল		
১। আমি আর ওয়া (কবিতা)	৪৮৩		১। ঝঝা পাতার গান	(কবিতা)	৪২০	১। দম্পতি (গল্প)	২৩১	
২। প্রেম ও পূজা "	৭৬১		শ্রীহুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য			শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী ব্রহ্মচারী		
শ্রীকানাইলাল মণ্ডল			১। গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষা	(সমালোচনা)	৭০৫, ৮৭৮	১। স্বর্গ ও মর্ত্য (কবিতা)	৫২০	
১। সচক্র শনিগ্রহ	(বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)	৮৭৫	শ্রীনিশিভূষণ ভট্টাচার্য্য			শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক			১। মানতের পূজা (গল্প)	৩৯		১। অপচয় (গল্প)	৮৬৯	
১। প্রক্ষিপ্ত (কবিতা)	১৮		শ্রীনীলিমা দেবী			শ্রীফুলবালা রায়		
২। অদূরবর্তিনী "	৩৬০		১। বংশগৌরব (উপন্যাস)	১০১, ১৭৯, ৩৪৮, ৫০৪, ৭৪৬, ৯৪৭		১। মনের চাবী	৪০৫	
৩। জীর্ণবাস "	৫৩৭		শ্রীনীলরতন দাশ			শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়		
৪। মঞ্জুরাণী "	৭০৯		১। পতিতার বিচার	(কবিতা)	২০৮	১। নারী-প্রশস্তি (কবিতা)	১১০	
৫। যাতায়াত "	৮৫৬		২। চাষী "	৪১৫		২। শতাব্দী "	৩৪৭	
শ্রীকৃষ্ণ মিত্র			৩। এস পুনঃ চিত্ত	বন্দাবনে (কবিতা)	৬৯০	৩। পরিচয় "	৫৮৩	
১। পদকর্তা গোবিন্দদাস (প্রবন্ধ)	৫৬		শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত			৪। ইতিহ আমার "	৮০৬	
২। যাত্রা (কবিতা)	৩৮৩		১। ওলন্দাজ উপনিবেশের শিল্প-বাণিজ্য	২২০		শ্রীবৈহনাথ ভট্টাচার্য্য		
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র			২। বঙ্গদেশে কৃষিমূলক শিল্প	৩৯৯		১। তর্কবন্ধ মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে	(অশ্রু-অর্থ)	১৬৬
১। ডাক্তার (গল্প)	৪৫৮		৩। মালেরিয়া ও সিল্কোনা	উৎপাদন	৫৯৯			
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী			৪। ভারতে ঔষধ-শিল্প	(প্রবন্ধ)	৭৪০	শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত		
১। পুষ্পমাহিতা (গল্প)	৪৯		৫। জীবন্ত মন্ত্র	৮৮৫	১। বাজকতা ও দরিদ্র-কতা	(কবিতা)	২৬৫	
২। প্রগতি "	৯৪২		শ্রীনীলরতন কর			২। বাজা ও সাধু "	৩৭৮	
গল্পদাহ			১। তারকার কথা (প্রবন্ধ)	৪৪৩		শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়		
১। নির্বাসিতা রাজকতা (প্রবন্ধ)	২৬৮, ৪৬১, ৬৩৩, ৭৭৮, ৯৬৯		শ্রীনন্দ সেনগুপ্ত			১। কোনোপনিষদ্	(সমালোচনা)	৫৮৭
শ্রীগঙ্গাপদ বসু			১। অদৃষ্ট ও কর্মফল	(কবিতা)	৪৭৭	শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্মা		
১। সংবাদপত্রের জন্ম-কথা	(প্রবন্ধ)	৪১১				১। বসন্ত প্রয়াণ (কবিতা)	৬৭৯	
শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়						শ্রীভবানীচরণ বাবু		
১। বসুমতী (কবিতা)	৯০৪					১। হিংস্র-প্রতিবেশী (শিকার)	২২৩	
শ্রীগোপাললাল-দে						শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়		
১। চৈত্র (কবিতা)	৯৭৫					১। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে	(কবিতা)	১৩
শ্রীচরণদাস ঘোষ						২। শীত আসে "	৩০	
১। নবরূপিনী (কবিতা)	৬২৫					৩। ধর্মবাদ "	৪৭	
শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়						৪। ফাগুন "	৭৭৩	
১। স্বপ্ননা (কবিতা)	৫৫					১। কেবাণী-জগৎ "	৯২৬	

লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক	লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক	লেখকগণের নাম	বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১। গল্পদাহুব বৈঠক (রূপকথা)	৮৯	শ্রীলক্ষ্মী বিশ্বাস	১। উক্তি (কবিতা)	৩০৩	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	১। সহমরণ প্রথার প্রবর্তন ও প্রচার (আলোচনা)	৬০৯
শ্রীমায়াদেবী বসু	১। আশাপথের শেষে (গল্প)	৫২১	শ্রীমাচরণ কবিরত্ন	১। রাসঘাতা		২। সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের সূচনা (আলোচনা)	৬৯৬	
	২। অদৃষ্টের অভিশাপ "	২০৯		(ধর্ম প্রবন্ধ)	১	৩। সহমরণ প্রথার বিলোপ সাধন (আলোচনা)	৯১১	
শ্রীযতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১। কয়লা শিল্পের সঙ্কট	৮৬	২। গ্রন্থসমালোচনা	১১১	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু	১। বৈষ্ণবমত-বিবেক (প্রবন্ধ)	১১৬, ২৫২, ৬৯১, ৯২১	
	২। বাহিরকাণ্ডেব বিপর্যয়	৩৪৫	৩। এক টিলে চার পাখী	২৪৬		২। প্রস্তাবিত বিক্রয় কব (প্রবন্ধ)	৪৫৩	
	৩। ভারতের বর্তমান শিল্প-পরিবর্তিত	৫৯৫	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১। প্রাচীন ভারতের নৌবল	১৯	শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১। পাবাবার (উপগাস)	১৩৯, ৩১০, ৩৩৩, ৬৩৮, ৭৯৬, ৮৯২
	৪। ভারতের পোত-শিল্প	৮৩৫	২। পাটের কথা			২। মানুষের মন (গল্প)	১৮৫	
শ্রীয়ামিনীমোহন কর	১। স্মৃতিপথে (কবিতা)	১৪৪		(কৃষিশিল্প)	২৫৬	৩। অঞ্জনা দেবী	৫১৩	
	২। অতিথি সম্বন্ধনা (ছোটগল্প)	৩৬৮	৩। হায়দার আলির নৌবাহিনী (প্রবন্ধ)	৩০৪	৪। অন্ধ ভিখারী	৭৬৭		
	৩। মধুকোটের সাকাস পাটি (নক্সা)	৭৭৫	৪। প্রাচ্যপুঞ্জের পবামশ পরিষদ	৩৪২	শ্রীসুদীপকুমার ঘোষ	১। মধ্যযুগে বাঙ্গালীর বিদ্যালয় (আলোচনা)	২০৪	
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	১। শীতের তত্ত্ব (গল্প)	৫৩৮	৫। আফগান রাজ্যের অতীত কথা	৩৯৫	শ্রীসত্যনাথায়ণ দাশ	১। আবছায়া (কবিতা)	৩৪৪	
	২। মানসিক বাধিব চিকিৎসা (গল্প)	৮৪০	৬। পূর্ব উপদ্বীপে হিন্দু প্রভাব	৩১৬	২। উন্মুগ	৭৬৬		
শ্রীবিদ্যাস সাত্তা বায়	১। রাতের কথা (কবিতা)	২৩৭	৭। ইন্দোচীনে ভারতীয় প্রভাব	৭০১	শ্রীহরেন্দ্রনাথ বায়	১। অবাঞ্ছিত অতিথি (গল্প)	৭১০	
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মিত্র	১। পুনর্জন্ম (গল্প)	৮৩০	৮। সংগ্রাম ও আর্থিক পরিস্থিতি	৭৫৭	শ্রীহরানন্দ শাস্ত্রী	১। পতঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণ-মহাভাষ্য	৩৫৩	
শ্রীরামেন্দ্র দত্ত	১। ফুল ও ছেলে (কবিতা)	১৪২	৯। গুরুগোবিন্দের জীবনপাত্রা	৯১৬	২। আচার্য্য ভর্তৃহরি (প্রবন্ধ)	৪৯৭		
	২। পুতুল ও প্রতিমা	৫৮৮	১০। যুদ্ধ ও ভারতীয় গনিজ সম্পদ	৬০৪	শ্রীহরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১। ভ্রম-সংশোধন (গল্প)	২৫	
	৩। টিলার সেশেব লালাবতী (কবিতা)	৮২৯	শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১। সজীব দর্শন বা প্রত্যক্ষ দর্শন (প্রবন্ধ)	২৩৩			
শ্রীরাধু গঙ্গোপাধ্যায়	১। প্রগতিশীলা (কবিতা)	৯২০	শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার	১। এবারও রত্নু ঋণী (কবিতা)	৪২৯			
শ্রীরপগুপ্ত বর্মা	১। কঙ্কাকুমারী (কবিতা)	৬৪৭						

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্র	শিল্পী	পত্রাঙ্ক	চিত্র	শিল্পী	পত্রাঙ্ক	চিত্র	শিল্পী	পত্রাঙ্ক
সুসজ্জিত চিত্র—			৬। র্যাটল্ স্নেক ফার্ন		১২৪	১২। ধ্রুব—শ্রীহরেন্দ্র সাত্তা		২৩৭
১। রাসলীলা—চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত		১	৭। ক্রীশমাস্ ফার্ন		১২৫	১৩। প্রভাতী সওগাত		
২। "স্বপ্ন এ তনু"—মিষ্টার টমাস		৫৩	৮। লজ্জাবতী		১২৬	—শ্রীবিভূতি গুপ্ত		৩০৯
৩। কিশোরীর কেশ গুচ্ছ		১২১	৯। চলন্ত ফার্ন		১২৭	১৪। "পর" শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ		
৪। সর্পজিহ্বা		১২২	১০। ইন্টারপটেড্ ফার্ন		১২৮	—মিষ্টার টমাস		৩২৯
৫। কমন উড		১২৩	১১। শীতগমে—মিষ্টার টমাস		১৩৯	১৫। প্রেমবন্ধ শ্রীহরেন্দ্রনাথ আচার্য্য		৩৮৯

চিত্রসূচী—বিয়ানুক্রমিক

চিত্র	শিল্পী	পত্রাঙ্ক
স্মরণীয় চিত্র :-		
১৬।	“অপর কি সুবাদানে রত্নিবে উম্মুখ” —মিষ্টার টমাস	৪৫৩
১৭।	বনবালা—শ্রীবিজয়	ঐ
১৮।	“হেলায়ে বন্ধিম প্রীবা বৃন্ত নিরুপম” —মিষ্টার টমাস	৪২৭
১৯।	ভোবেব আলো—বদূরাণী শ্রীমতী ইন্দিবা দেবী চৌধুরাণী	৫৪৯
২০।	দরদী—শ্রীসুমুগনাথ মিত্র	৬১৩
২১।	বসন্তের আনন্দমঞ্জরী —মিষ্টার টমাস	৬৬৫
২২।	শ্রীগোবিন্দ—শ্রীহবেকুফ সাঙ্গ	৭১৭
২৩।	কৌদল—শ্রী—	৭৭৩
২৪।	বর্ণাধারায়—মিষ্টার টমাস	৮২৫
২৫।	প্রভাতী বন্দনা —শ্রীব্রজেননাথ আচার্য্য	৮৯৩
২৬।	প্রলয় ধুমকেতু—এম্ মজুমদার	৯৪৯

মঠ ও মন্দির চিত্র :-

১।	শ্রীশ্রীমেবা মূর্তি	৪৩২
২।	পেঙ্গ-মন্দিরে শয়ান বৃদ্ধ মূর্তি	৫৫৬
৩।	বামিয়ানে বৃদ্ধ মূর্তি	৭২৮
৪।	শুকগোবিন্দ সিং	৯১৭
৫।	গোপালজী বা শ্রীনাথজী	৯২৪
৬।	বল্লভাচার্য্য	৯২৫

প্রাণি-চিত্র :-

১।	হেরিং মাছের মরশুম	২৭০
২।	ঘোড়ার পিঠে-নদী পার	২৭২
৩।	কড় মাছের আড়ং	২৭৬
৪।	সামুদ্রিক রাফুসে রাই মংস্ত	২৯২
৫।	সামুদ্রিক গোলোজা রাই মংস্ত	২৯৪
৬।	পাহাড়ের পাশে বৃহৎ ডিও	৬২৯
৭।	এ্যাড্রিয়াটিকের মাছ	৭২৩
৮।	বাগদাদে মাছির ভয়ে আত্মরক্ষা	৭৩১
৯।	মাগুর মাছ	৮৮৭
১০।	কই মাছ	ঐ
১১।	লেঠা মাছ	৮৮৮
১২।	কঁচু মাছ	ঐ
১৩।	মাগুর মাছের মাথা	ঐ
১৪।	কই মাছের বায়ু-গহ্বর	ঐ
১৫।	শিজিমাছের বায়ু-নলা	ঐ
১৬।	শোল মাছ	ঐ
১৭।	মহিবে ক্ষেত চষে	৯৩২

শক্তিসাধনার চিত্র :-

১।	চিং হইয়া শোওয়া	৮৩
২।	গাটু ধরুন	ঐ
৩।	হু' হাতে মুঠি	ঐ
৪।	হুই হাত এক করিয়া	৮৪
৫।	গাটু হুমড়াইয়া	ঐ
৬।	গাটুর গুঁতায় বিপত্তি মোচন	২৮৪
৭।	ছাতান খোঁচা	২৮৫
৮।	শপাং বেন্ট	ঐ
৯।	খোঁচার আর এক ধারা	ঐ
১০।	গলায় লাঠি	ঐ
১১।	ছাতার রকম ফের	ঐ
১২।	পায়ে লাঠির হাতল	ঐ
১৩।	তলপেটে গুঁতা	২৮৬
১৪।	ছোট বাস্কে ঘুৰি বাঁচে	ঐ
১৫।	এমনি ভাবে কাঁড়াইয়া হাত হুলান	২৯৭
১৬।	হামা দিন	২৯৮
১৭।	তোয়ালে ভাঁজ করা	ঐ
১৮।	কাস্ত চরণের উপাধান	ঐ
১৯।	ঘাড়ের নীচে তোয়ালে	২৯৯
২০।	হাত ডগা	ঐ
২১।	পায়ের পরিচর্যা	ঐ
২২।	হাটু মুড়িয়া	১৪৬
২৩।	বাঁদিকে হেলা	ঐ
২৪।	দড়ি পায়ে ডান পা তোলা	৪১৭
২৫।	হু' হাত পিছনে	ঐ
২৬।	দড়ি ডিঙ্গাইয়া লাফ	ঐ
২৭।	এবার জোরে জোরে	ঐ
২৮।	পায়ে চাপিয়া হু'হাতে দড়ি ধরিয়া	৪১৮
২৯।	পা তুলিয়া	ঐ
৩০।	বাক্স ধরিয়া টানাটানি	৪৬৭
৩১।	হু' হাতে তুলিয়া	ঐ
৩২।	পিঠের উপর	ঐ
৩৩।	এক হাতে একটি	৪৬৮
৩৪।	হু' হাতে ভাগাভাগি	ঐ
৩৫।	ঠিক ধরা	ঐ
৩৬।	ভুল গাতুড়ী ধরা	ঐ
৩৭।	এমন নয়	৪৬৯
৩৮।	এমনি	ঐ
৩৯।	হাতের রক্ত বন্ধ করা	৪৭০
৪০।	টুর্নিকেট রীতি	ঐ
৪১।	খবরের কাগজ দিয়া বাড় বাঁধা	৪১৭
৪২।	এমনি করিয়া চেয়ারে বসাইয়া	ঐ

চিত্র	পত্রাঙ্ক	
৪৩।	লাঠিটি কাঁধের উপর	৫৯০
৪৪।	লাঠির পানে চাহিয়া	ঐ
৪৫।	লাঠি উর্কে	৫৯১
৪৬।	চেয়ারে বসিয়া লাঠির প্রান্ত	ঐ
৪৭।	পায়ের কাছে লাঠি বাধুন	ঐ
৪৮।	দেহ বাঁকাইয়া	৫৯২
৪৯।	মাথার পিছনে হাত	৫৯৩
৫০।	সামনে অঞ্জলিবদ্ধ হুই হাত	ঐ
৫১।	হুই হাত এক পায়ে ভর	ঐ
৫২।	এমনি ভাবে হাত রেখে	৭৯৪
৫৩।	এক হাত বুকে আর এক হাত তুলে	ঐ
৫৪।	হু' হাত পেছনে	ঐ
৫৫।	হু' পায়ের গোড়ালি	৯০২
৫৬।	হু'হাত এক এক পায়ের উপর	ঐ
৫৭।	হু' পায়ের আঙ্গুল ও হুই হাত	৯০৩
৫৮।	বাঁকিয়া পা হোঁওয়া	ঐ

বিশিষ্টগণের চিত্র :-

১।	পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন	১৬৭
২।	ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৬
৩।	বি, ডি, সাভারকর	৪৮
৪।	আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৪৮৯
৫।	মিঃ ডিঃ এন্ চন্দ্রবরকর	৪৯১
৬।	লর্ড সিংহ	ঐ
৭।	শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত	৪৯৩
৮।	টাটার ম্যানেজার মিঃ জে, জে গান্ধী	ঐ
৯।	পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালবা	৪৯৪
১০।	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৯৫
১১।	সুভাষচন্দ্র বসু	৬৫৫
১২।	অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়	৬৬৪
১৩।	রামমোহন রায়	৬৯৮
১৪।	রাধাকান্ত দেব	৬৯৯
১৫।	দ্বারকানাথ ঠাকুর	৭০৫
১৬।	সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার	৮২৬
১৭।	ভূমিকুমার দত্ত	৮২৫
১৮।	রাজা জানকীনাথ রায়	ঐ
১৯।	শ্রীযুত শব্দচন্দ্র বসু	৯৮৫
২০।	শ্রীযুত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৮৭
২১।	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৯৮৮
২২।	ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ	৯০০

রাজ-পরিজনগণের চিত্র

১।	মাণ্ডালের রাজকণা	৫৬
২।	ইরাণের বালক রাজা ফয়জল	৭২৫

চিত্র	পত্রাঙ্ক	চিত্র	পত্রাঙ্ক	চিত্র	পত্রাঙ্ক
বৈজ্ঞানিক চিত্র :-					
১। আগে দেখুন, কে আসিয়াছে	৬৮	৪৫। মাটির টবেস মাটি ঢাকা	৩৯১	৮৯। লোশনে মুখের চাঁচ বদল	৭৬৬
২। জলে কাপ	ঐ	৪৬। কাচের নলে কঁ,	৩৯৩	৯০। আরকে আগাছা ছাপ	ঐ
৩। টাই ফিতা কাটা	৬৯	৪৭। গলা কাচে হবিণের গ্রীবা ও শিং	ঐ	৯১। সত্যকার জাহাজের বৃকে	ঐ
৪। গাছের আসব	ঐ	৪৮। এবাবে আস্ত হরিণ	ঐ	শীল তৈরী	৭৮৯
৫। দড়া হাব	ঐ	৪৯। কঁয়ের জোনে কাণ ও শিং	ঐ	৯২। নকল খাদে নকল জাহাজ	ঐ
৬। পেন্ সাফ করা	ঐ	৫০। ওগো আমাব প্রিয়	ঐ	৯৩। পাখা চালাইয়া বড়-বৃষ্টি	৭৯০
৭। প্যারাসুট ছাড়িয়া মাটিতে নানা	৭০	৫১। কোট	৩৯৪	৯৪। পিচকারী করিয়া ঘাম তেল	ঐ
৮। প্যারাসুট শিক্ষা	ঐ	৫২। কোটগায়ে সাতার	ঐ	ছিটানো ঐ	
৯। ঔষধাদি সমেত	ঐ	৫৩। তিন ফালি ফল	ঐ	৯৫। হোজ পাইপ দিয়া নকল বরফ	ঐ
১০। বেলুনে গলা সাধা	ঐ	৫৪। বাইকবিহারিণীর স্তবসমুহ	৩৯৪	লাগানো ৭৯১	
১১। স্বাস্থ্য-মুখোস	৭১	৫৫। চোখে কালো চশমা	৬২১	৯৬। নকল বৃষ্টিধারা	ঐ
১২। লোহার খাঁস-মুখ	ঐ	৫৬। রবার টায়ার বোলার	ঐ	৯৭। বেকডে সাহিত্য ও ইতিহাসশিক্ষা	৮৬৪
১৩। শিকড়ের গায়ে মিহি রেখা	৯৫	৫৭। দুর্ভেদ্য গাড়ী	৬২২	৯৮। বেকডে ঘুম ভাঙ্গানো	ঐ
১৪। লাল রস	ঐ	৫৮। এক চাকার স্ট্রেকার	ঐ	৯৯। বর-কণ্ডা ও প্রফেসার	৮৬৫
১৫। গাছের পাতা	৯৬	৫৯। নাকে ঠুলি	ঐ	১০০। চাকা বদল	ঐ
১৬। চিনির স্ফটিকদানা	ঐ	৬০। টায়ারের চেন	৬১৩	১০১। স্ট্রিপনি ঢাকিয়া বাখুন	ঐ
১৭। ভ্যানিলা দানা	ঐ	৬১। কাতনাব আলো	ঐ	১০২। সোলা ও তাবের কোশল	৮৬৬
১৮। ডিম ফাটিয়া শিশু-শিশু	ঐ	৬২। শব্দভেদী রকেট	ঐ	১০৩। এই মুখোস	ঐ
১৯। ট্রাউট শিশুর আবির্ভাব	৯৭	৬৩। শূণ্যে বাতাস লওয়া	৬২৪	১০৪। কাগজী স্ততার জাল	৮৬৭
২০। বারুদবাহী বাজিকর	ঐ	৬৪। এনামেল পেইন্ট	ঐ	১০৫। বুককেশে শয্যা	ঐ
২১। রকমারী ফুলঝুবি	৯৮	৬৫। ফেণ্ট সাফ করা	ঐ	১০৬। কেশকুঞ্চন	ঐ
২২। জাহাজবাজির বারুদ মশাল	ঐ	৬৬। জুতা রাখা	ঐ	১০৭। মরীচা তোলা	৮৬৮
২৩। ফুলকাটা রকেট	ঐ	৬৭। বোতলে গরম বালী	৬২৫	১০৮। পায়ে রোলার সাবান মাখান	ঐ
২৪। বাজির আলোকে মূর্তির কাঠামো	৯৯	৬৮। পকেট-পিয়ানো	ঐ	১০৯। লাইফ বেন্ট	ঐ
২৫। কাঠামো রচনা	ঐ	৬৯। হেড্ লাইটে ফলের টব	ঐ	১১০। সচক্ শনিগ্রহ	৮৭৬
২৬। রকমারী বাজি	১০০	৭০। ইটের তৈয়ারী দোকান বাড়ী	ঐ	১১১। শনির উপরের কলঙ্ক	ঐ
২৭। রোমান কাগজ	ঐ	চালাইবার আয়োজন	৬৩০		
২৮। কাগজের ঠোঙ্গায় জল গরম	২২৮	৭১। বাড়ী তোলা	ঐ		
২৯। চুম্বক আণ্ডন	ঐ	৭২। জ্যাকের চাড়া দিয়া বাড়ী তোলা	৬৩১		
৩০। কার্ড বোর্ডে কেরামতি	২২৯	৭৩। জ্যাক	ঐ		
৩১। এ-সব এক-পীশ কার্ডে তৈয়ারী	ঐ	৭৪। ট্রাকে চড়িয়া বাড়ী চলে	ঐ		
৩২। অক্ষের দৃষ্টি	ঐ	৭৫। পুলের উপর দিয়া বাড়ী চালা	৬৩২		
৩৩। বাতসারানো যন্ত্র	২৩০	৭৬। নৌকাবক্ষে ১২০ বৎসরের গৃহ	ঐ		
৩৪। নূতন বর্ষাতি	ঐ	৭৭। ষ্টীমার দিয়া বাড়ীবাহী বোট টানা	৬৩৩		
৩৫। বৈজ্ঞানিক ত্রাস	২৩১	৭৮। মায়ের কোলে শিশু	৭৬১		
৩৬। বোমা বিস্ফোরণ প্রাকটিক্যাল ক্লাস	ঐ	৭৯। লেন্সের পোষাক	ঐ		
৩৭। টেলিফোন টেলিভিসন	২৩২	৮০। ভেসে চলো রঙ্গ	৭৬৩		
৩৮। চেয়ার গাড়ী	ঐ	৮১। জল-গুণ্ড কাটা বোট	ঐ		
৩৯। পর্দা ফুলদানী	ঐ	৮২। চাকতি খুলে বসুন	ঐ		
৪০। নেগেটিভের প্রাণ	ঐ	৮৩। ডাইরেক্টর যন্ত্র	৭৬৪		
৪১। বর্ষাবরণ আঁটা	৩৩১	৮৪। বালুকার নীচে উর্কর জমি	ঐ		
৪২। ঢাকনির নীচে প্যারাসুট	ঐ	৮৫। সুদর্শনা	ঐ		
৪৩। প্যারাসুট হইতে বাতাস বরানো	৩৩২	৮৬। প্যাডল নাই	ঐ		
৪৪। জালি চশমা	ঐ	৮৭। এ ফ্যান সর্বত্র চলে	৭৬৫		
		৮৮। এমনি ভাবে চাদর বিছান	ঐ		
				বিভিন্ন দেশের নরনারী	
				চিত্র :-	
				১। মুসলমান ব্যবসায়ী	৪৩৫
				২। মুসলমান রমণী	৪৩৯
				৩। কুমারী চুণী, রূপসী ফ্রাইডে	৫৬৩
				৪। যুগোশ্লাভিয়া রূপসী	৭২৩
				৫। সোফিয়ার নৃত্যশীলা বালিকা	৭২৬
				৬। নারীবেশে পুরুষের নৃত্যশীলা	৭৩৬
				৭। ইরণ নারী	ঐ
				৮। চাষাণ মেয়ে	৭৩৭
				৯। টিয়া জা হড্	৯৩০
				১০। মিয়ায়ো সর্দার	৯৩৫
				বৈদেশিক রাষ্ট্রনায়ক	
				চিত্র :-	
				১। গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী	
				জন মেটাক্সাস	৪৭৮
				২। গ্রীসের রাজা জর্জ	৮০৮
				৩। মিঃ ইডেন	৮০৯

চিত্র	পত্রাঙ্ক	চিত্র	পত্রাঙ্ক	চিত্র	পত্রাঙ্ক
দৃশ্য চিত্র :-					
১। তলোয়ার ফার্ন ফ্রোবিণ	১১৯	৪৭। চার্ট অফ দি নোটিচি	৪৩৭	৯০। দামাশ্কাশে আঁকিয়া	৭২০
২। 'নিহঙ্গ-নৌড়' ফার্ন	ত্রি	৪৮। এ উপাসনা গ্রন্থ	ত্রি	৯১। বেইকথ	ত্রি
৩। যেন মিহি রেশম	১৩০	৪৭। গৃহস্থবাড়ী	৪২৮	৯২। হাতাই গ্রামে বিবাহ-উৎসব	৭৩১
৪। রয়েল ফার্ন	ত্রি	৪৮। দোতল' পথ	ত্রি	৯৩। বাগদাদ	৭২২
৫। ফার্ন-কুঞ্জ	১৩১	৪৯। খানা ঘর	৪৩৯	৯৪। বুলগেরিয়া পথ	৭৩৩
৬। সিনামস ফার্ন	ত্রি	৫০। ক্ষেতের ফসল	৪৪০	৯৫। এলবুর্জের বৃকে পথ	ত্রি
৭। মরুর বৃকে ফার্ন	১৩২	৫১। আঙ্গুর ক্ষেতের ফৌজ	ত্রি	৯৬। আফগানিস্তান	৭৩৪
৮। কিশোরী-কেশ ফার্ন	ত্রি	৫২। ক্ষেতের ফসল	৪৪১	৯৭। মেশেদ হইতে মোটরের পাকা পথ	ত্রি
৯। ফার্ন গাছ—যবদ্বীপ	১৩৩	৫৩। বড় দিনের অধিবাস	৪৪২	৯৮। জামরুদ ফোর্টি	৭৩৫
১০। 'কৃষ্ণিত তপ' ফার্ন	ত্রি	৫৪। বর্ষা বোর্ড	৫৫৫	৯৯। গজ্জনী মহর	৭৩৭
১১। উষর প্রান্তবের ফার্ন	১৩৪	৫৫। বেঙ্গলের বাজার	৫৫৭	১০০। চালাশ	৭৩৮
১২। মুগজিহ্বা ফার্ন	ত্রি	৫৬। বেঙ্গলের পথ	৫৫৮	১০১। চালাশ রোডে টানেল	ত্রি
১৩। লেডি ফার্ন	১৩৫	৫৭। মেমিয়ার কাছে নির্মল ধারা	৫৫৯	১০২। বুলগেরিয়া নৃত্যলীলা	৭৩৯
১৪। লতানে ফার্ন	ত্রি	৫৮। গকটেক গর্জের বৃকে	৫৬০	১০৩। সর্পগতিতে পথ	৭৪৫
১৫। গাছ ফার্ন	১৩৬	৫৯। পাহাড়-পথে বিপত্তি	৫৬১	১০৪। পাহাড়-পথে মোটর নামে	৭৪৬
১৬। কানন-পথে সাধারণ ফার্ন	১৩৭	৬০। ট্রাক মেরামত	৫৬২	১০৫। সদরে নোটিশ আঁটা	৭৪৭
১৭। তেকলাব বৃকে পাছনিবাস	২৬৬	৬১। পথের উপর সাকো	ত্রি	১০৬। এই সব থেকে ছোয়াচুলাগে	ত্রি
১৮। তেকলাযাত্রীর বিশ্রাম	২৬৭	৬২। পথের পাশে পল্লী	৫৬৩	১০৭। এক বায়গায় ডাই টথ ব্রাশ	ত্রি
১৯। থিং ভেলাব উপত্যকা	২৬৮	৬৩। লাও, লিড	৫৬৪	১০৮। মুখে আঙুল দেকেনা	ত্রি
২০। পাহাড়ের কোলে লোকালয়	ত্রি	৬৪। কানমিস	ত্রি	১০৯। এত খেলে সর্দি হবেই	৭৪৮
২১। কাপড় কাটা	২৬৯	৬৫। কুং কাই	৫৬৫	১১০। উন্টাডাকার মেছো ঘাট	৮৮৯
২২। হালফাশনে	ত্রি	৬৬। টালি—দ' পাশে কবর	ত্রি	১১১। হাইনান	৯২৭
২৩। সাবেকী বেষে আধুনিক	ত্রি	৬৭। পাওশানের পথে	৫৬৬	১১২। হোইহো বন্দর	৯২৮
২৪। চিরন্তনী বেষ-ভূমায়	ত্রি	৬৮। দূর দেশের কুলি মজুর	৫৬৭	১১৩। দোভায়ী উয়োগ	৯২৯
২৫। গরম জলে নানা কাজ	২৭০	৬৯। ধ্বশা পথ মেরামত	ত্রি	১১৪। কুমারীর খোঁপায় কাঁটা	৯৩০
২৬। মাছের নৌকা	২৭১	৭০। পাওশান	৫৬৮	১১৫। সর্দারের মাথায় খুঁটি	৯৩১
২৭। পাহাড়-পথ	ত্রি	৭১। কানমিস হইতে রেলপথ	ত্রি	১১৬। পাহাড়ী লোই	ত্রি
২৮। কান্দ্রে চলে	২৭২	৭২। শিয়াকওয়ানের পথে	৫৬৯	১১৭। বসতবাড়ী	৯৩৩
২৯। রেইক জাবিক মহর	২৭৩	৭৩। শালউইনেব তীবে গ্রাম	ত্রি	১১৮। বড়ঘরের মেয়ে	ত্রি
৩০। বৈজ্ঞানিক শক্তির বোধন	ত্রি	৭৪। গ্রন্থ বিগ্রন্থ	৫৭০	১১৯। গালে ঘাড়ে নক্সা আঁকিয়া	৯৩৪
৩১। কৃষ্ণজাবীরা	২৭৪	৭৫। লুফেড়ে লবণবাহী দল	৫৭১	১২০। মিয়ায়ো মাকড়ীর ভারী আঁকুড়ি	ত্রি
৩২। তরুণী তরঙ্গে	২৭৫	৭৬। শালউইন নদী	ত্রি	১২১। বর্ণাধারা	৯৩৬
৩৩। গলফ প্রপাত	২৭৬	৭৭। শালউইনেব বৃকে পুল	৫৭২	১২২। কাচেক নদী	৯৩৭
৩৪। দুর্গম পথে মোটর লরী	২৭৭	৭৮। এক চিতায় স্বামিসহ চার সতী	৬১৩	১২৩। মাথায় পাগড়ী	ত্রি
৩৫। ক্ষেতের কাজে মেয়ে-পুরুষ	ত্রি	৭৯। পারিস হইতে যাত্রা	৭২১	১২৪। এ টাঙ্গী সাথের সাথী	৯৩৮
৩৬। টে'টারি রজ্জু কাটিতেছে	২৯৩	৮০। পারিস হইতে তিহিরান	৭২২	১২৫। ঘরে তাঁত বোনা	ত্রি
৩৭। বেথলিহামের বাড়ী ঘর	৪৩০	৮১। তিহিরান হইতে মেশেদ কাবুল	ত্রি	১২৬। এ নক্সায় রূপ সজ্জা	৯৩৯
৩৮। চারণ ভূমি	৪৩১	৮২। বুডাপেস্ট	৭২৪	১২৭। বা-সা-ডাও জাতের শীকারী	ত্রি
৩৯। গহনার কর্মসিগর	৪৩৩	৮৩। আলোপো	ত্রি	১২৮। জল বহিনার বাঁশের বাসতি	৯৪০
৪০। নকল মুক্তা বোতাম তৈরী	ত্রি	৮৪। গালাটা পুলের উপরে	৭২৫	১২৯। জলেব ভারী	ত্রি
৪১। বেথলিহামের পথে	৪৩৪	৮৫। বাগদাদের মুখে মরুপথ	ত্রি	১৩০। মেয়ে নয় পুরুষ	৯৪১
৪২। গাগরী ভরণে	ত্রি	৮৬। বাগদাদের কাছে	৭২৬	সমাধি চিত্র :-	
৪৩। তরুণী জননী	৪৩৫	৮৭। জেরুজালেমের পথে	৭২৭	১। বাচেলের সমাধি	৪৩৬
৪৪। কুয়াতলা	৪৩৬	৮৮। ইরাণ—এলবুর্জের বৃকে	ত্রি	২। মেশেদ—ইরাণী-মসজিদ	৭৩২
		৮৯। ইরাণ পুলিশ	৭২৯	৩। শায়া মসজিদ	৭৩৫

চিত্র	পত্রাঙ্ক	চিত্র	পত্রাঙ্ক	চিত্র	পত্রাঙ্ক
শিল্প চিত্র :-		৩০। হাত কাটা পুল-ওভার	৫৮১	শুক চিত্র :-	
১। পুরা স্মার্ট	৬৩	৩১। বোনা ছাঁদ	৫৮২	১। বোমাবর্ষণে বিরাট অগ্নিকাণ্ড	১৪৫
২। উটের নক্সা	৬৪	৩২। তৈবী পুলওভার	ঐ	২। সেন্ট গাইনে বোমাবর্ষণের পর	ঐ
৩। স্মার্টের ছক	ঐ	৩৩। নানা রঙের টেবল ঢাকা	৮০৩	৩। বিমান হইতে মেসিন গান চালান	১৪৬
৪। বোনার সাইজ	৬৫	৩৪। বিছানা ঢাকা	ঐ	৪। শত্রুপক্ষের বিমান	১৪৭
৫। বাড়ী গাড়ী গানবেজ	২৮৮	৩৫। নক্সাদার পর্দা ও কুশন	৮০৪	৫। স্বরক্ষিত পন্যাবেক্ষণ কক্ষ	১৪৮
৬। একটি ছাঁদ	ঐ	৩৬। পর্দার প্যাটার্নের ব্যাখ্যা	৮০৫	৬। নিজ্জন উপকূলে শত্রুর জগা প্রতীক্ষা	ঐ
৭। আর একটি ছাঁদ	ঐ	৩৭। ফুল পাতাব প্যাটার্ন	ঐ	৭। বৃটিশ সৈন্যের বহির্গমন	১৪৯
৮। আর একটি	ঐ	৩৮। কাঠের চোকলাব টকরা	৯৬০	৮। জার্মান বাহিনী	ঐ
৯। আনাড়ির হাত	২৮৯	৩৯। এমনি কবে বুনন	ঐ	৯। অগ্নিবর্ষী ইটালীয় ট্যাঙ্ক	১৫০
১০। বাঁদিকে পটুতার নিদর্শন	ঐ	৪০। শিরীষের আঠায় খাড়াই আঁটা	৯৬১	১০। কামানযুক্ত বেল শকট	১৫১
১১। আঙ্গুরা ও ডাঁটি	ঐ	৪১। ধারি বোনা	ঐ	১১। জার্মান বিমান ভূপতিত	৩১৭
১২। ছবিতে গল্প	ঐ	৪২। কাঠের খোলে বুনন ভাল হয়	ঐ	১২। ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থল	৩১৮
১৩। রম্পাধি	৩০২	৪৩। কাঁচি দিয়ে উগা কাটা	ঐ	১৩। ফরাসী উপকূলের জার্মান কামান	৩১৯
১৪। মকিং	ঐ	৪৪। ছবিতে প্রজ্ঞাপতি	৯৬২	১৪। বার্লিনের বেসামরিক অধিবাসী	৪৭৯
১৫। ব্লাউস গায়ে	৪০৯	৪৫। প্রজ্ঞাপতির পাখা মেলান	ঐ	১৫। বার্লিনে বোমাবর্ষণের পর	৪৮০
১৬। লেশ ষ্টাচ	৪১০	৪৬। নকল দাড়ি	৯৬৩	১৬। বৃটিশ কামান	৪৮১
১৭। অবস্থার নির্দেশ	৪৭২	৪৭। আসল দাড়ি	ঐ	১৭। কামানসজ্জিত রণপোত	৪৮২
১৮। সিগুয়েট	ঐ	৪৮। ঝুড়িওর সাজঘর	৯৬৪	১৮। শত্রুর প্রতীক্ষায় আবব সৈন্য	৬৪৮
১৯। আর একখানি সিগুয়েট	ঐ	৪৯। বুড়া সাজানো	ঐ	১৯। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য	৬৪৯
২০। আঁকিয়া লও	৪৭৩	৫০। অভিনেতার আসল মূর্তি	৯৬৫	২০। ইটালীয় ডেপুটয়ার	৬৫০
২১। আজব ছবি	ঐ	৫১। জানালার ধারে	৯৬৬	২১। ইটালীয় নৌবাহিনী	৬৫১
২২। ছবি লইয়া বসা	ঐ	৫২। টবের মধ্যে টব	৯৬৭	২২। জার্মান বিমানের প্রতীক্ষায়	৬৫২
২৩। নাগরিকের চেয়ে জুত বড়	৪৭৪	৫৩। টবের গায়ে রঙ দাও	ঐ	২৩। জার্মানীর যান্ত্রিক বাহিনী	৮০৭
২৪। কমন মুখ	ঐ	৫৪। স্পঞ্জ দিয়া পাতা মাফ	ঐ	২৪। ইটালীয় মর্ধ্যাদা ভুলুষ্ঠিত	৮০৮
২৫। কলা পা রাখিয়া ছবি তোলা	ঐ	৫৫। ঘরের মধ্যে গাছ রাখ	৯৬৮	২৫। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ রণপোত	৮০৯
২৬। কত বড় মাছ	ঐ	৫৬। সাহেবের মুখ	ঐ	২৬। গ্রীক সৈন্যের রণক্ষেত্রে গমন	৯৭৮
২৭। বোতলের মধ্যে মেয়ে	৪৭৫	৫৭। পালতোলা জাহাজ	ঐ	২৭। অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যের অগ্রসর	৯৭৯
২৮। মুখের রকম ফের	ঐ	৫৮। কুকুর	ঐ	২৮। ভারতীয় সৈন্য	ঐ
২৯। মাছের ছবি তোলা	ঐ	৫৯। মেম সাহেবদের চা পান	ঐ	২৯। সুদান সীমান্তে উদ্ভবাহী সৈন্য	৯৮০
		৬০। রেলগাড়ী	৯৬৯		

শিল্পীগণের নামানুক্রমিক চিত্রসূচী

শিল্পী	চিত্র	পৃষ্ঠার পূর্বে	শিল্পী	চিত্র	পৃষ্ঠার পূর্বে	শিল্পী	চিত্র	পৃষ্ঠার পূর্বে
বধূরাণী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী			৪। 'অধর কি সুখাদানে রহিবে উম্মুখ'	৪৫৩	শ্রীবিজয়—১। বনবালা		৪৫৩	
১। ভোরের আলো	৫৪৯		৫। 'হেলায়ে বক্ষিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম'	৯৯৭	এম্ মজুমদার			
শ্রীচক্রচন্দ্র সেনগুপ্ত			৬। বসন্তের আনন্দমঞ্জরী	৬৬৫	১। প্রলয় ধূমকেতু		৯৪৯	
১। রাসদীপা	১		৭। বর্ণাধারায়	৮২৫	শ্রী—			
মিষ্টার টমাস			শ্রীবিভূতি গুপ্ত		১। কোদল		৭৭৩	
১। 'আহা এ তুমু—'	৫৩		১। প্রভাতী সওগাত	৩০৯	শ্রীসুমুখনাথ মিত্র—১। দরদী		৩১৩	
২। শীতাগমে	১৬৯		শ্রীত্রৈলোক্যনাথ আচার্য		শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা			
৩। 'পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন			১। প্রেমস্বপ্ন	৩৮৯	১। জীব		২৩৭	
আবরণ	৩২৯		২। প্রভাতী বন্দনা	৮৯৩	২। শ্রীগৌরাজ		৭১৭	



। विहारा-श्रीकान्त २०७७



১৯শ বর্ষ]

কার্তিক, ১৩৪৭

[১ম সংখ্যা]



রাসযাত্রা

শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, তাহা শ্রাবণ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে লিখিত হইয়াছে। শক্তি বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ" তিনি রসময়। রস দশ প্রকার। যথা—

শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র হাশ্ব-ভয়ানকঃ।

করণাঙ্কুত-শাস্তাশ্চ বাৎসল্যঞ্চ রসা দশ ॥



১ শৃঙ্গার, ২ বীর, ৩ বীভৎস, ৪ রৌদ্র, ৫ হাশ্ব, ৬ ভয়ানক, ৭ করুণ, ৮ অঙ্কুত, ৯ শাস্তা ও ১০ বাৎসল্য।

শৃঙ্গার রস মাধুর্যাময় ও সকলের সমধিক প্রিয় বলিয়া সকলোকেই উহাকে সকল রসের আদিতে ধরা হইয়াছে; এই হেতু উহাকে আদিরসও বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের রসময়ত্বের পরিচয়ে একটি সুন্দর শ্লোক আছে। যথা—

বহুনাং নশনির্নাং নরবরঃ স্ত্রীনাং স্বরো মূর্তিমান্
গোপীনাং স্বজনোহসতাং ক্ষিত্তিভূজাং শাস্তা
স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

মৃত্যুর্ভেজপতেবিরাড়বিহুবাং তস্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো বঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

(১০।৪৩।১৭)

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরামের সহিত কংসের ধর্মঘর্ষণে

নিমগ্নিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া মল্লেরা জানিল ইনি বজ্র—৪ রৌদ্ররস। সাধারণ মনুষ্যেরা জানিল নরবর—৮ অঙ্কুত রস। স্ত্রীলোকেরা জানিল মূর্তিমান্ কন্দর্প—১ শৃঙ্গার রস। গোপেরা জানিল স্বজন (সজাতীয়)—৫ হাশ্ব রস। দুর্বৃত্ত রাজারা জানিল শাসনকর্তা—২ বীর রস। দেবকী ও বসুদেব জানিলেন সন্তান—১০ বাৎসল্য রস। কংস জানিল মৃত্যু—৬ ভয়ানক রস। অঙ্গ লোকেরা জানিল—বিরাট (বিকৃত অর্থাৎ ত্রিভঙ্গমূর্তি; বিকলং যথা স্মাৎ তথা রাজতে)—৩ বীভৎস রস। যোগীরা জানিলেন পরব্রহ্ম—৯ শাস্তা রস। যাদবেরা জানিলেন—পরম দেবতা—৭ করুণ রস (এখানে ইহার অর্থ—করুণা; অর্শ-আদিহাৎ অন্ত্যর্থে অচ্ দয়াশীল)।

শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্বপ্রধান পরম উপাদেয় গ্রন্থ হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবত। উহাতে আপাত-দৃষ্টিতে অশ্লীলতাপূর্ণ ছইটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে—গোপীদিগের বঙ্গহরণ ও

তাহাদিগের সহিত রাসক্রীড়া। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ ঐ দুইটি লীলার—বিশেষতঃ রাসলীলার—মাধুর্য স্বয়ং উপভোগ করিবার জন্ত এবং সর্বসাধারণকে উপভোগ করাইবার জন্ত এত অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ভাবাবেশে মত্ত হইয়া উহাদের অতিরঞ্জিত স্বকপোলকল্পিত কলঙ্কভঞ্জন, নৌকাবিলাস প্রভৃতি এত নূতন লীলার অবতারণা করিয়াছেন যে, শুনিলে লোকের মন-প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠে। তদবলম্বনে যাত্রায়, খিয়েটারে, কবির ছড়ায়, কথকতায়, কীর্তনে ও চিত্রাঙ্কনে আরও বাড়াবাড়ি কাণ হইয়াছে। ঐ সকলে রাধিকাকে পরকীয়া রূপের অধিক করিয়া বর্ণনা করিতে কেহ কুষ্ঠা ও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।—তিনি বৃন্দা, ললিতা, বিশাখাদি নিজ সখীগণের সনে কুঞ্জবনে গিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে অহোরাত্র বিহারেই মত্ত থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে যেন কেহ অভিভাবক ছিল না, তিনি যেন গুরুজনদিগকে গ্রাহ্যই করিতেন না, কাহারও শাসনের এবং লোকনিন্দার ভয়ও রাখিতেন না। তাঁহাদের সঙ্গে আবার এক বৃদ্ধা পূর্ণমাসী (পৌর্ণমাসী) জুটিয়া কত রঙ্গ-ভঙ্গই করিত। ইহাতে ভক্তগণের ভাব, ভক্তি ও আনন্দ বর্ধিত হইলেও রাস, দোল প্রভৃতি কৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীরাধাকে দেখিতে না পাইলে ও বৃগল-মিলনে রাধার পরিবর্তে কৃষ্ণিণী বা সত্যভামা থাকিলে তাঁহাদের তৃপ্তি না ঘটিলেও, ভগবানের নিন্দাই প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিধর্মীরা তাঁহাকে মহা-লম্পট বলিয়া ঘোষণা করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মের মানি ও হিন্দু-বিষেষের বৃদ্ধিই করিতেছে। যে বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া কত উর্দ্ধে তুলিয়াছেন, তিনি যে তাঁহাকে এত হেয় ও অধঃপাতিত করিবার জন্ত ঐ দুইটি লীলা গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব? যে রাধাকে লইয়া এত মাতামাতি, শ্রীমদ্ভাগবতে সে রাধার নাম-গন্ধও নাই।

বৈষ্ণব-পণ্ডিতরা বলেন—ইষ্টদেবতা বলিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই; কিন্তু গূঢ় ভাবে এক স্থানে করিয়াছেন। রাসলীলার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ একটি গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে, অত্র গোপীরা তাঁহার অশ্বেষণ করিতে করিতে জ্যোৎস্নালোকে এক স্থানে

তাঁহার পদচিহ্নের সহিত রমণীর পদচিহ্ন দেগিয়া বলিয়াছিল—

অনয়া রাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

এই গোপী নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়াছিল, তাই তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে নির্জনে লইয়া গিয়াছেন।

সে গোপী কে? যে কৃষ্ণকে রাধনা (আরাধনা) করিয়াছে। যে রমণী কাহাকেও আরাধনা করে, তাহাকে রাধা বলা যায়—রাধ্ + গিচ্ + অচ্ + আপ = রাধা।

ইহাতে জিজ্ঞাস্য—রাধা কাহার ইষ্টদেবতা ছিলেন? গ্রন্থবক্তা শুকদেবের? না, গ্রন্থকর্তা বেদব্যাসের? শুকদেব ত মাতৃগর্ভে থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া-ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে যাবজ্জীবন তাঁহার সে জ্ঞান অবিচ্যুতই ছিল। স্মৃতরাং তাঁহার রাধামহে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজনই ছিল না। তিনি পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।

অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতৃর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ।

তদহং তেহভিধাশ্চামি মহাপৌরুষিকো ভবান্ ॥

(ভাগ, ২।১৮, ১০)

দ্বাপরের শেষে (শ্রীধর—দ্বাপরাদৌ দ্বাপর আদির্গন্থ কালশ্চ তস্মিন্ দ্বাপরাস্তে ইত্যর্থঃ) পিতা দ্বৈপায়নের নিকটে এই বেদোপম ভাগবত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছি। হে রাজর্ষে, তুমি মহাভাগবত বলিয়া, তাহাতে একাগ্রচিত্তে যে আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিব।

বেদব্যাস লোকহিতার্থ বেদবিভাগ, ব্রহ্মসূত্র, ব্যাস-সংহিতা, (ভাগবত ভিন্ন) ১০খানি মহাপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনা করিয়াও মনে শাস্তি না পাইয়া বদরিকাশ্রমে বিষম্বদনে বসিয়াছিলেন। নারদ আসিয়া বলিলেন—

যথা ধর্মান্দয়শ্চার্থা মুনিবর্ধ্যামুকীর্তিতাঃ ।

ন তথা বাসুদেবশ্চ মহিমা হনুকীর্তিতাঃ ॥

তুমি ধর্মান্দি বিষয় যেরূপ সবিস্তর কীর্তন করিয়াছ,

বাসুদেবের মহিমা সেরূপ ভাবে কীর্তন কর নাই (তাই তোমার মনে অশান্তি) ।

বেদব্যাস নারীদের এই কথায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্যক অবগত হইবার জন্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । সেই তপস্যার ফলে—

ভক্তিব্যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াক্ষু তদপাশ্রয়াম্ ॥

(ভাগবত, ১।৪।৭)

ভক্তিব্যোগ দ্বারা মন সম্পূর্ণ নিশ্চল ও নিশ্চল হওয়ায় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার মায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন ।

এখানে মায়ার বলিতে যদি রাধাকেই ধরা যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়েই তাঁহার ইষ্টদেবতা । কিন্তু গ্রন্থমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রকাশ্যভাবে অসংখ্যবার বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না ; রাধার নাম বলিতেই এত সঙ্কোচ ও অপরাধ বোধ হইল কেন ?

এক্ষণে বঙ্গহরণ ও রাসলীলার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক । ঐ দুইটি লীলাকে অশ্লীলতা-দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্ত বহু পণ্ডিত উহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । অনেকে গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া মূল ঘটনাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন । ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর, নীলকণ্ঠ, রামানুজ প্রভৃতি কুশা-গ্রায়বুদ্ধি মনীষিগণ গীতার ভাষ্য ও টীকা করিয়াছেন ; তাঁহাদের কাহারও বুদ্ধিতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রবেশ করে নাই কেন, বুঝিতে পারিলাম না । আমার তাদৃশ বিজ্ঞাবুদ্ধি না থাকায়, সে দুর্গম পথ পরিত্যাগ করিয়া স্মৃগম পথেই চলিব—কেবল মূল শ্লোকেরই ব্যাখ্যা করিব । শ্রীধরস্বামীও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না করিয়াই বলিয়াছেন— কামরিপু চরিতার্থ করিবার জন্ত রাসলীলা নহে, কাম জয় করিবার জন্তই ঐ লীলা । ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্ত রাসলীলার মধ্যে কয়েক স্থলে বেদব্যাসোক্ত শ্রীকৃষ্ণের কতিপয় বিশেষণ পদ প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা— আশ্চার্য্যম (যিনি আপনাতেই রত, স্ত্রীলোকে নহেন), আশ্চর্য্যত আশ্চর্য্যতি (ঐ অর্থ), সাক্ষাৎ মন্থমন্থম্ (মদনমোহন), আশ্চর্য্যবরুদ্রসৌরতঃ (যিনি কামভাবকে

মনোমধ্যে সংযত রাখিয়াছিলেন—প্রকাশ্য পাইতে দেন নাই) ।

বঙ্গহরণ লীলা

রাসলীলারই উপোদ্যাত হইতেছে বঙ্গহরণ । শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে বঙ্গহরণ বর্ণিত হইয়াছে ।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ ।

চেকুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম ॥

(ইত্যাদি)

ব্রজকুমারীরা অগ্রহায়ণ মাসে হবিষ্য ভোজন করত কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিল ।

তাহারা প্রত্যুষে উঠিয়া, পরস্পর সমবয়স্ক কুমারীদিগকে ডাকিয়া (রাত্রিবাস ছাড়িয়া) পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যাদি উপচার লইয়া, কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনার ঘাটে যাইত । তীরে উপচারগুলি রাখিয়া, তীরের উপরে পরিধেয় বস্ত্রগুলি স্থাপন করিয়া, উলঙ্গ হইয়া স্নান সমাপনান্তে বস্ত্র পরিয়া, বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকায় কাত্যায়নী দেবীর ক্ষুদ্র মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিত । তাহাদের প্রত্যেকেরই পূজার মন্ত্র ছিল—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিণীশ্বরী ।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥

হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিণি, হে ঈশ্বরী, হে দেবি, তুমি কৃষ্ণকে আমার পতি করিয়া দাও, অর্থাৎ তাহারা এতৎ পাদ্যং—নমঃ কাত্যায়নি...তে নমঃ—নমঃ শ্রীকাত্যায়ন্ত্রে নমঃ ইত্যাদিক্রমে সমস্ত উপচার নিবেদন করিয়া, ঐ মন্ত্রেই প্রণাম করিত ।

এক মাস পূর্ণ হইলে কুমারীরা যখন পূর্বোক্তরূপে স্নান করিতেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় সখার সহিত অলক্ষিতে সেখানে উপস্থিত হইয়া বস্ত্রগুলি লইয়া নিকটস্থ কদম্ববৃক্ষে উঠিলেন । হাসিতে হাসিতে বলিলেন— “তোমাদের বস্ত্র তীরে নাই, আমার কাছে এই গাছের উপরে আছে । তোমরা স্নান করিয়া উঠিয়া একে একে বা সকলে মিলিয়া আসিয়া বাহার যে বস্ত্র, আমার নিকট হইতে চাহিয়া লও ।” তাহারা এই কথা শুনিয়া, উপরে চাহিয়া দেখিয়া, সন্মিত বদনে পরস্পর মুখ-চাহাচাহি

করিয়। লজ্জায় সেই শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া কহিল—

শ্রামসুন্দর তে দাস্তঃ করবাম ভবোদিতম্ ।

দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নো চেদ্ রাজ্ঞে ক্রবাম হে ॥

হে শ্রামসুন্দর, তুমি ধর্মজ্ঞ, (জ্ঞীলোকের বঙ্গহরণ করিলে অধর্ম হয় ; ইহা জান) ; আমরা তোমার দাসী ; তুমি যাহা বলিবে, আমরা তাহাই করিব ; আমাদের বঙ্গগুলি দাও ; নহিলে রাজাকে (গোপরাজ নন্দকে) বলিয়া দিব ।

শ্রীধরস্বামীর মতে ঐ দলে ত্রিবিধ গোপী ছিল— কুমারী, যুবতী ও প্রৌঢ়া । কুমারীরা বলিয়াছিল—আমরা তোমার দাসী । যুবতীরা বলিয়াছিল—তুমি যা বলিবে, তাই করিব । প্রৌঢ়ারা বলিয়াছিল, (বঙ্গ না দিলে) রাজাকে বলিয়া দিব । তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পাঁচ বছরের বালিকারা (পরে প্রতিপন্ন হইবে) ভোরে উঠিয়া যমুনায় স্নান করিতে যাইত বলিয়া, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত কতিপয় প্রৌঢ়া ও যুবতী তাহাদের সঙ্গে যাইত । তাহারা ব্রত করে নাই । যেহেতু, পূজার মন্ত্রে আছে, ‘কৃষ্ণকে আমার পতি করিয়া দাও’ । এখনকার মত সেকালে যুবতী ও প্রৌঢ়া-বিবাহ প্রচলিত ছিল না । তাহাতে শাস্ত্রমতে মহাপাপ হয় এবং লোকনিন্দাও ঘটয়া থাকে ।

যাহারা ব্রত করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদেরই বঙ্গহরণ করিতে আসিয়াছিলেন, প্রৌঢ়া ও যুবতীদিগের বঙ্গহরণ তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না । তবে সকলেই একত্র বঙ্গ রাখিয়াছিল বলিয়া গোপনে ও তাড়াতাড়িতে ছোট-বড় কাপড় বাছিবার অবসর পান নাই । চোরা-গাইএর সঙ্গে কপিল-গাইএর বাধা-পড়ার জায় কুমারীদিগের বস্ত্রের সহিত যুবতী ও প্রৌঢ়াদিগের বস্ত্রও অপহৃত হইয়াছিল । তিনি ভাবিয়াছিলেন—কুমারীদিগকে বঙ্গ ফিরাইয়া দিয়া অবশিষ্ট বস্ত্র তীরে রাখিয়া যাইবেন ; তিনি চলিয়া গেলে প্রৌঢ়া ও যুবতীরা আপন আপন বঙ্গ লইবে ।

শ্রীকৃষ্ণ কুমারীদিগকেই (প্রৌঢ়া ও যুবতীদিগকে নহে) বলিয়াছিলেন—“তোমরা যদি আমার দাসী, আমি যা বোলব তাই যদি কোরবে, তা হোলে আমি বোলছি,

তোমরা উঠে এসে বঙ্গ নাও, নহিলে আমি কিছুতেই বঙ্গ দিব না । দাওগে রাজাকে বোলে, আমি রাজাকে ভয় করি না ; তিনি আমার কি কোরবেন ?” কুমারীরা অগত্যা দুই হস্তে লজ্জাস্থান ঢাকিয়া বৃকতলে গেল । কৃষ্ণ বলিলেন—“উলঙ্গ হোয়ে স্নান কোরলে পাপ হয় । তার উপর তোমরা ব্রত কোরছ । এই অপরাধে কাত্যায়নী দেবী তোমাদের উপর অপ্রসন্ন হয়েছেন । এক্ষণে মাথার উপর দুই হাত ষোড় কোরে তাঁকে প্রণাম কোরে প্রসন্ন কর, ক্ষমা চাও ।” কাত্যায়নী অপ্রসন্ন হইয়াছেন শুনিয়া কুমারীরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া অবশ্য ভাবেই ঐরূপে প্রণাম করিল । শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদের বঙ্গ ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংশুথ ক্ষপাঃ ।

তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ—কাত্যায়নী-ব্রতের ফল পাইয়াছ । এক্ষণে ব্রজে ফিরিয়া যাও । (তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছেন, উহার গোপকণ্ঠা ; সুতরাং ধর্মরক্ষার্থ অবতীর্ণ ভগবান্ উহাদিগকে বিবাহ করিতে পারেন না ভাবিয়া) বলিলেন—আমাকে পতিরূপে পাইবে না, তবে) এইরূপে রাত্রিসমূহে (অর্থাৎ আগামী বৎসরে কার্তিকী পূর্ণিমা হইতে কয়েক রাত্রি) আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে ।

কুমারীরা কৃষ্ণকে পতি পাইবার জন্ত কৃষ্ণের আরাধনা না করিয়া কাত্যায়নীর আরাধনা করিল কেন ? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে যে, যে কোনও কার্য করিতে প্রবৃত্ত হউক, তাহার তদুপযুক্ত শক্তি না থাকিলে সে তাহা সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না । যাহার তদুপযুক্ত শক্তি নাই, সে মহাশক্তির আরাধনা করিলে তদুপযুক্ত শক্তি লাভ করিতে পারে । এই জন্ত সুরথ রাজা প্রবল শত্রুদিগকে জয় করিয়া হতরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্ত মেধা মুনির উপদেশে মহাশক্তি দুর্গার আরাধনা করিয়াছিলেন । সমাধি বৈশ্বাণ্ড জ্ঞানলাভের জন্ত তদুপদেশেই মহাশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । অর্জুন ভীষণ ভারতযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে মহাশক্তি দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন । বৃষ্ণিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসে গমন করিবার পূর্বে ধৌম্যের উপদেশে দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন ।

শ্রমস্বক মণি-হরণের অপকলঙ্ক দূর করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ বনে গিয়া জাহবানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তদধিষ্ঠিত পর্বতের গুহায় একাকী প্রবিষ্ট হইয়া দ্বাদশ দিনেও বহির্গত না হওয়ায় বহিঃস্থ সৈন্তগণ প্রত্যাশ্বত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিলে বনুদেব, দেবকী, কুন্সিনী প্রভৃতি তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত মহামায়া দুর্গার উপাসনা করিয়াছিলেন। এই জন্তই ব্রজকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতি পাইবার জন্ত কাঁতায়নী-ব্রত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মহাশক্তি অপর কেহ নহেন, তিনি ভগবানেরই অসাধারণী শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন; সুতরাং ভগবানের আরাধনায় ভগবতীরও আরাধনা হয় ও ভগবতীর আরাধনায় ভগবানেরও আরাধনা হইয়া থাকে এবং একের প্রতি বিদ্বেষে অত্রের প্রতিও বিদ্বেষ ঘটে। কিন্তু দেখা যায়, শাক্তেরা বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্বেষ না করিলেও বৈষ্ণবেরা প্রায়ই শাক্তদিগের প্রতি মহাবিদ্বেষ করিয়া থাকেন; এমন কি, শক্তিমূর্ত্তির নাম ও তদীয় পূজোপকরণের নামও মুখে আনেন না—দোয়াতের কালিকে ‘সেহাই’ বলেন, বিশ্বপত্রকে ‘তে-ফ্যাড়্কা পাতা’ বলেন। বলিদানে ও ভোগে পাঁঠা কাটা ও কোটা হয় বলিয়া ঐ শব্দ দুইটা মুখে আনা মহাপাপ মনে করেন; তাই তরকারী প্রভৃতি স্থলেও ‘বনানো’ বলেন, ইত্যাদি। কিন্তু যে ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব গ্রন্থ বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গদেব তাহাকে কণ্ঠহার করিয়াছিলেন, সেই ভাগবতেই ভগবান্ বলিয়াছেন—দেবতা প্রভৃতি সকল পদার্থই যখন আমার বিভূতি, তখন যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া আমায় পূজা করে, তাহার মন শান্তি পায় না। যথা—

দ্বিষতঃ পরকায়ং মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।

ভূতেষু বহুবৈরন্ত ন মনঃ শান্তিমুচ্ছতি ॥

(৩২৯২৩)

তজ্জসারেও দেখা যায়, কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা। প্রমাণ দিয়াছেন—সর্কেবাং বিষ্ণুমজ্জাণাং দুর্গাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। ইত্যাদি।

এখন বঙ্গহরণ ও রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজ-কুমারীদিগের বয়স কত, তাহাই আলোচ্য।

অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গহরণের পর ভাদ্র মাসের শুরু দ্বাদশীতে শক্রোখান (ইন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ) হয়। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ—দেবতাদিগের দিন। শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ন—দেবতাদিগের রাত্রি। ইন্দ্র রাজা বলিয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিবার জন্ত তাঁহাদের রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরেই জাগরিত হইলেন। গোপেরা ঐ দিন হইতে সপ্তাহকাল ইন্দ্রযজ্ঞ করিত। ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ করিয়া ইন্দ্র গর্ভিত হইয়াছিলেন। সেই গর্ভ ধর্ম করিবার জন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে গোপেরা ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া গোবর্ধনযজ্ঞ করিয়াছিল। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পবন ও মেঘগণকে আদেশ করিয়া বৃন্দাবনে প্রবল বড় ও মুম্বলধারে বৃষ্টিপাত করাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শিলা-বৃষ্টিও হইয়াছিল। ঐ বৃষ্টির জলে এবং নদীসমূহের বগ্নার জলে বৃন্দাবন নিমগ্ন হইল। গোপেরা ভীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমা-দিগকে রক্ষা করিতেছি।” এই বলিয়া দুই হস্তে গোবর্ধন পর্বত উৎপাটিত করিয়া, বাম হস্তে উহা ছত্রাকারে ধরিয়া বলিলেন—“তোমরা সকলে স্ত্রীপুত্রাদি ও গোধনাদি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া পর্বতের তলস্থ গর্ভে প্রবেশ কর। আমার হস্ত হইতে পর্বত পড়িয়া যাইবে, এ আশঙ্কা করিও না।” তাহারা সেইরূপই করিল। সপ্তাহান্তে বড়-বৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে, এবং নদীসমূহের জলও কমিয়া যাইলে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাহারা গর্ভ হইতে বাহির হইলে তিনি গর্ভমধ্যে পর্বত স্থাপন করিলেন।—একটা বড় গাছ ঝড়ে উপড়াইয়া পড়িলে তাহার গর্ভের চতুর্দিকে মৃত্তিকা কত উচ্চ হয়, সকলেই দেখিয়াছেন। একটা পাহাড় উপড়াইলে তাহার গর্ভের চতুর্দিকে মৃত্তিকা কত উচ্চ হইয়াছিল, অনুমান করুন। এই জন্তই গর্ভ-মধ্যে জল-ঝড়-শিলাবৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে নাই।

প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গব্য—গোবর্ধন ধারণের প্রচলিত ছবি দেখিয়া অনেকের ধারণা, গোপেরা গোধনাদি লইয়া পর্বতের বহু গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পর্বত তুলিয়া ধরিবার পরে ঐরূপ আদেশ করিলে তাহারা কিরূপে পর্বতে উঠিল ও দ্রব্যসামগ্রী তুলিল? জ্ঞানসংকটে আছে—

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেহ্ন তাত ব্রজৌকসঃ ।
 যথোপজোষং জুষত গিরিগর্ভং সগোধনাঃ ॥
 তথা নিবিবিশুর্গর্ভং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ ।
 যথাবকাশং সধনাঃ সপ্রজাঃ সোপজীবিনঃ ॥
 নির্ধাত তাজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ ।
 উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়শ্চ নিম্নগাঃ ॥

গোবর্দ্ধন-ধারণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গোপেরা
 বলিয়াছিল—

ক সপ্তহায়নো বালঃ ক মহাদ্রিবিধারণম্ ।

কোথায় সাত বছরের বালক, আর কোথায় অত বড়
 পর্বত ধারণ!

গৌণ ভাদ্রের (মুখ্য শ্রাবণের) কৃষ্ণাষ্টমীতে তাঁহার
 জন্ম। গোবর্দ্ধন ধারণের সময় তাঁহার বয়স ৭ বৎসর
 ২০ দিন। রাসের সময় ৭ বৎসর ২৥ মাস। তৎপূর্বে
 অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৬ বৎসর
 প্রায় ৩ মাস। কুমারীরা তাঁহাকে পতি পাইবার
 কামনায় কাত্যায়নীব্রত গ্রহণ করিয়াছিল; স্মৃতরাং
 তাহাদের বয়স তাঁহার অপেক্ষা অল্প। “কৌমারং
 পঞ্চমাদাস্তং” পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক ও
 বালিকাকে কুমার ও কুমারী বলে। অতএব তাহাদের
 বয়স তখন পাঁচ বৎসরের অধিক ছিল না।
 কুমারের অর্থাৎ—কার্ত্তিকেয়, রাজপুত্র, কোমল,
 অবিবাহিত। কার্ত্তিকেয়ের নাম কুমার বলিয়া প্রাচীনরা
 বলেন—কার্ত্তিক বিয়ে করেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রে
 কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রীর নাম যষ্ণী; এই জন্ত তাহাদের সম্ভান
 হয় না, তাহারা কার্ত্তিকেয়ব্রত করিয়া থাকে।

৬ বৎসরের বালক ৫ বৎসরের বালিকাদিগের—
 বিশেষতঃ যাহারা তাঁহাকে পতি পাইবার কামনায় ব্রত
 করিতেছিল তাহাদিগের—সহিত পরিহাস করিয়া বঙ্গ-
 হরণ করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহার পক্ষে দোষাবহ?
 লম্পটবাদীদিগকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

রাসলীলা.

দশম স্কন্ধের ২৯ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত ৫ অধ্যায়ে
 রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রথম শ্লোক—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ।

বীক্ষ্য রক্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুমারীদিগের নিকটে প্রতিশ্রুত সেই
 সকল রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, যোগমায়াকে আশ্রয়
 করিয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।—রম ধাতুর
 প্রধান অর্থ ক্রীড়া (রমু ক্রীড়ায়াম্—ধাতুপাঠ)। যোগ-
 মায়াকে আশ্রয় করিবার উদ্দেশ্য—সর্ব ধাতুর ফুল ফুটান,
 তজ্জন্ত প্রথমেই শরৎকালেও মল্লিকা ফুল ফুটিয়াছিল;
 গন্ধমাল্যাদির আয়োজন; গোপীরা সারা রাত্রি বনে
 থাকিলেও তাহাদের পতিদের তাহা জানিতে না পারা;
 ইত্যাদি।

দৃষ্ট্বা কুমুদন্তমখণ্ডমণ্ডলং

রমাননাভং নবকুকুমারুণম্ ।

বনঞ্চ তৎকোমলগোভি-রঞ্জিতং

জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥

নবোদিত রক্তবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া নিজ পত্নী লক্ষ্মী
 দেবীর কুমুদচূর্ণ-রঞ্জিত রক্তবর্ণ মুখখানি তাঁহার মনে
 পড়িয়াছিল; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ মনকে সংযত
 করিয়া বনভূমিকে কোমল চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত দেখিয়া
 (বাঁশী বাজাইয়া) কুটিলনয়নাদিগের মন হরণ করিবার
 জন্ত মধুর স্বরে গান করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—তিনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুমারীদিগকে লইয়া
 রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহারা পঞ্চবর্ষ
 বালিকা, ক্রতঙ্গী ও নয়ন-কোটিল্য করা তখনও শিক্ষা
 করে নাই। যুবতীরাই ঐ সব করিতে জানে; তাহা-
 দিগের মন হরণ করিতে গেলেন কেন?

উত্তর—তিনি জানিতেন, যুবতী গোপীরা তাঁহার
 ত্রিভুবনসুন্দর রূপ দেখিয়া তাঁহাকে কামভাবে ভজনা
 করিতে অভিলাষিণী ছিল। একসঙ্গে রথ-দেখা ও কলা-
 বেচা ছই কাজই হইবে, এই অভিপ্রায়ে রাসে তাহা-
 দিগের কামভাব বৃদ্ধি করিবার জন্তই একটি মন্ত্র গান
 করিয়াছিলেন। “অত্যাচ্চঃ পতনায়তে”* অতি ‘বাড়’
 হইলে তাহাকে পড়িতেই হয়।

* এইরূপ পাঠই চিরপ্রচলিত। কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন,
 ‘পতনায়তে’ ব্যাকরণ-গুহ্য নহে। কেন নহে, তাহা বৃষ্টিলাঘ না।

মন্ত্র গুহ্যতীক্ষ্ণ বলিয়া ঐ শ্লোকের মধ্যে তাহা প্রকাশ্য ভাবে না বলিয়া গূঢ় ভাবেই রাখিয়াছেন—“কলং জগৌ বামদৃশাং মনোহরম্।” কল (অকার উচ্চারণার্থ) ক্ লু এই দুইটি বর্ণ। তাহারা কিরূপ ? বামদৃশা (সহার্ধে তৃতীয়া), বামনেন্দ্রবৃক্ত, মাতৃকাশ্রাসে ‘ইং নমো দক্ষিণ-নেত্রে, ঙং নমো বামনেন্দ্রে’ থাকায় দীর্ঘ-ঙকারবৃক্ত, তাহাতে ক্লী হইল। আর কিরূপ ? অংমনোহরং ; অং বলিতে বিন্দু (অমুস্বার), “চন্দ্রমা মনসো জাতঃ” এই শ্রুতিতে পরমেশ্বরের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি থাকায় কার্ষ্য ও কারণের অভেদ উপচারে মন বলিতে চন্দ্র, তদ্বিশিষ্ট, তাহা হইলে ক্লী হইল। উহা কামবীজ। দেবতাদিগের দুই প্রকার মন্ত্র আছে—বীজমন্ত্র ও মূলমন্ত্র। যেমন বীজ হইতে অক্ষুরাদি উৎপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ বৃক্ষ হয়, সেইরূপ বীজমন্ত্র দ্বারা হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হওয়ায় হৃৎপদ্মে পরিপূর্ণ মূর্তিতে ভগবান্ বিরাজিত হইলেন। মূলমন্ত্র দ্বারা সেই মূর্তি হৃদয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং

ব্রজস্তিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।

আজগ্মুরন্যোত্তমলক্ষিতোদ্যমাঃ

স যত্র কাস্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥

(ইত্যাদি)

সেই কানোদীপক গীত শ্রবণ করায় ব্রজবাসিনী যুবতী-দিগের চিত্ত কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যে স্থানে তাহাদের বাঞ্ছিত স্ত্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সেই স্থানে তাহারা উপস্থিত হইল। কে কিরূপ সাজে যাইতেছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। এত বেগে তাহারা গিয়াছিল যে, তাহাদের কর্ণের কুণ্ডল দোহুল্যমান হইতে লাগিল।

তাহাদের গমন কিরূপ ? যাহারা গাভী দোহন করিতেছিল, তাহারা তাহা সমাপ্ত না করিয়াই চলিল। যাহারা উম্মুনে দুধ ও হালুয়া চাপাইয়াছিল, তাহারা কড়া না নামাইয়াই ছুটিল। যাহারা পরিবেষণ করিতেছিল, তাহারা পাতে ডাল দিয়া ভাজা আনিতে গিয়াই চলিয়া

গেল। যাহারা শিশুদিগকে দুধ খাওয়ানিতেছিল, তাহারা ছেলেকে মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়াই প্রস্থান করিল। যাহারা স্বামীর পা-হাত টিপিয়া দিতেছিল, তাহারা সে কাজ ফেলিয়া রাখিয়াই পলাইল। যাহারা খাইতে বসিয়াছিল, তাহাদের আর খাওয়া হইল না। ইত্যাদি। ইহাতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়, ভগবান্কে পাইতে হইলে অথবা মন্দিরে তাঁহার বিগ্রহ দেখিতে যাইতে হইলে, সংসারের কাজে আর মন রাখিবে না, নিজের সাজ-সজ্জার দিকেও চাহিবে না। প্রবাদ আছে—এক বৃদ্ধা জগন্নাথ দর্শনার্থ পুরীযাত্রা করিয়া তাহার রোপিত পুঁই গাছের দশা কি হইবে ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছিল ; সেখানে গিয়া সে মন্দিরমধ্যে জগন্নাথ দেখিতে পায় নাই, কেবল পুঁই গাছই দেখিয়াছিল।

গোপীরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই রাত্রে এমন করিয়া ছুটিয়া আসিলে কেন ? ব্রজে কি কোনও অমঙ্গল ঘটিয়াছে ?” মুখে কোনও কথা নাই। “রাত্রে বনে কত হিংস্র জন্তু বিচরণ করে, স্ত্রীলোকদিগের এমন সময়ে এখানে থাকা উচিত নহে, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।” নড়ন-চড়ন নাই। “তোমাদের পতি, পিতা প্রভৃতি কত খুঁজিতেছেন, তাঁহাদের উদ্বেগ বৃদ্ধি করিও না।” এ কথায় কাণ নাহি। “জ্যোৎস্নায় বনের শোভা দেখিতে কি আসিয়াছ ?” নিরুত্তর। “ভালবাস বলিয়া আমাকে কি দেখিতে আসিয়াছ ? দেখা ত হইল, এখন ফিরিয়া যাও।” সকলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। “অকপটে পতি-সেবা এবং বহু ও সম্মানদিগের প্রতিপালনই স্ত্রীলোকদিগের পরম ধর্ম। পতি হৃৎচরিত্র, হতভাগ্য, বৃদ্ধ, মূর্খ, কৃষ্ণ ও দরিদ্র হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত নহে। ব্যভিচারিণী হইলে অযশ, কলঙ্ক ও ভীষণ নরক ভোগ হয়।” ইত্যাদি।

ভগবানের এই সমস্ত অমৃতময়ী বাণী তাহাদের কর্ণ-কুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকাশ করিলে তাহাদের আত্মজ্ঞান স্মৃতি পাইলে, তাহারা বলিল—

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুভূতিরঙ্গ

স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা স্বয়োক্রম।

অস্ত্যেবমেতদুপদেশপদে স্বয়ীশে

প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভূতাং কিল বহুরাত্না ॥

পততি ইতি পতনঃ, “কৃত্যলুটো বহুলম্” (পাণিনি ৩।৩।১১৩) বলিয়া পত্ ধাতুর উত্তর কত্‌বাচ্যে লুট্ (অনট্), উহার অর্থ পতনপ্রবণ। পতন ইব আচরতি এই বাক্যে ক্যঙ্ প্রত্যয়ে পতনায়তে। পতনপ্রবণের শ্রায় আচরণ করে অর্থাৎ পড়িয়া যায়।

তুমি শশ্বজ বালিয়া পতি, পুত্র ও বন্ধুদিগের সেবাকে যে স্ত্রীলোকের স্বধর্ম বলিলে, আমরা বুঝিতেছি যে, তুমিই আমাদের সেই পতি, পুত্র ও বন্ধু। যেহেতু, তুমি সকল প্রাণীর যখন অত্যন্ত প্রিয়, তখন তুমি আত্মা—আত্মা—রূপে তাদের শরীরেও বিরাজ করিতেছ।

গোপীদিগের ইহা মুগ্ধ কপটবাক্য নহে : বাস্তবিকই অস্তুরস্ব শ্রব সত্য বাক্য। যে হেতু, তাহারা বেগ্যা ছিল না ; তাহারা কুলবধু, কুলকণ্ঠা ও কুলকুমারী। কপট-বাক্য বলিলে তাহারা ত জানিত যে, তাহারা কাহারও অমুমতি লইয়া আসে নাই, কাহাকেও জানায়ও নাই। স্মরণ্য তাহাদের পতি, পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন এই রাত্রি অবগ্ৰহই তাহাদিগকে খুঁজিতে আসিবে। আসিয়া এই সব রঙ্গ দেখিলে ক্রোধে মারিতে মারিতে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঘরে লইয়া যাইবে। সে ভয় তাহারা একবারও ত ভাবিল না।

লোকে আত্মাকে যত ভালবাসে, এত ভালবাসা আর কাহারও উপর পড়ে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার প্রথমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়য়াঃ কামায় জয়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জয়া প্রিয়া ভবন্তে। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।” ইত্যাদি।

পত্নী পতিকে যে ভালবাসে, তাহা পতির সুখ-কামনার জন্ত নহে, আত্মার সুখ-কামনার জন্ত—পতির সেবা করিলে নিজে আনন্দ পায় বালিয়া ; পতির সুখ-কামনার জন্ত হইলে, তাহার দুশ্চরিত্র পতি কুক্রিয়ায় আনন্দ অমুভব করে, তাহাকেও ভালবাসিত। পতি পত্নীকে যে ভালবাসে, তাহা পত্নীর সুখ-কামনার জন্ত নহে, আত্মার সুখ-কামনার জন্ত—পত্নীকে বসন-ভূষণে সজ্জিত দেখিলে নিজে আনন্দ পায় বালিয়া ; পত্নীর সুখ-কামনার জন্ত হইলে দ্বিচারিণী পত্নীকেও সে ভালবাসিত। মাতাপিতা পুত্রদিগকে যে ভালবাসে, তাহা পুত্রদিগের সুখ-কামনার জন্ত নহে, আত্মার সুখ-কামনার জন্ত—পুত্রদিগকে আদর-যত্ন করিলে

নিজে আনন্দ পায় বালিয়া ; পুত্রদিগের সুখ-কামনার জন্ত হইলে দুশ্চরিত্র পুত্রদিগকেও তাঁহারা ভালবাসিতেন।

গোপীদিগের এই সব কথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি সকলের অলঙ্কিতে একটি গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সকল লীলাই লোক-শিক্ষার্থ। পুরুষ কামুক হইলে তাহাকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় এবং ‘নাই’ পাইলে স্ত্রীলোক কিরূপ মাথায় উঠে, তাহাই দেখাইবার জন্ত তিনি তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাহাকে সাজাইবার জন্ত কোথায়ও পুষ্পচয়ন করিয়াছিলেন, পায়ে কুশাকুর বিধিবে বালিয়া কোথায়ও তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সে ভাবিল—আমি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বালিয়াই আমাকে অধিক ভালবাসেন, তাই নির্জনে আনিয়াছেন। এই ভাবিয়া আদরে গলিয়া গিয়া বলিল—“আরও কত দূর নিয়ে যাবে ? আমি আর চোলুতে পারছি না, আমাকে কাঁধে কোরে নিয়ে চল।” কৃষ্ণ উবু হইয়া বসিয়া বলিলেন—“তবে ওঠ।” সে যেমন উঠিতে গেল, অমনি তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সে সেইখানে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল।

রস ধাতু হইতে রাস শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। রস ধাতুর অর্থ শব্দ করা অর্থাৎ চীৎকার করা, গান করা ইত্যাদি। গান করিতে হইলে নৃত্যও তাহার আনুসঙ্গিক। স্মরণ্য রাসে কেবল নৃত্য ও গীতই হইয়াছিল। ভাগবতের বর্ণনাও সেইরূপ। যথা—

পাদগ্ৰাসৈর্ভূজবিধুতিভিঃ সন্মিতৈর্কবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্যধৈশ্চলকুচপটেঃ কুণ্ডলৈর্গলোলৈঃ।
স্বিগ্নগুণ্যঃ কবররশনাগ্রস্থয়ঃ কৃষ্ণবধো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥

মেঘমণ্ডলে যেমন বিদ্যুৎ খেলে, সেইরূপ কৃষ্ণবধুরা অর্থাৎ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিল। নৃত্যকালে তাহাদের তালে-তালে পা ফেলা, হস্তসঞ্চালন, মূছ হাত, ক্রভঙ্গী, কটিদেশ ভগ্নবৎ, কুচেষ্টা ও তদাবরক বসন চঞ্চল, কর্ণের কুণ্ডল গণ্ডদেশে ঝুঁট, মুখে শ্বেদবিন্দু, কবরী ও কটিভূষণ দৃঢ়-গ্রহিযুক্ত দেখা

গিয়াছিল।—কৃষ্ণবধু বলিতে কৃষ্ণের স্ত্রী নহে, যেহেতু, তিনি কোনও গোপীকেই বিবাহ করেন নাই। মেদিনীকোষে বধু শব্দের অর্থ—“বধুঃ স্ত্রী সারিবোধো। স্মৃতা-শটী-নবোঢ়াস্ত্ ভাৰ্য্যা প্ৰক্ৰান্তাস্ত্ চ ॥” এখানে অঙ্গনা, কৃষ্ণসম্বন্ধিনী অঙ্গনা—যে সকল রমণী কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা বাল্যকাল হইতেই নৃত্য-গীত শিক্ষা করিয়া থাকে, ঘাটে-বাটে ও গৃহে পুরুষদিগের সমক্ষে অশ্লীল গান করিতেও লজ্জা বোধ করে না, দেশচলন বলিয়া পুরুষরাও তাহাদিগকে নিন্দা করে না। কিন্তু গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে অশ্লীল গানও করে নাই, তাঁহারা লীলাগানই করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে যত বয়সের যত গোপী, তত বয়সের তত মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদিগের সহিত নৃত্য-গাত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যে সকল গোপীর কাছেই আছেন, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই; সকলেই মনে করিয়াছিল, কেবল আমারই কাছে আছেন;—ইহাও যোগমায়ার প্রভাবে।

কৃষ্ণের সহিত নৃত্য-গাত করিতে করিতে তাহারা মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের গলা ধরিয়া, কোমর জড়াইয়া, বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া মুখে চন্দ্রিত তাম্বুল দিয়াছিলেন, একরূপ বর্ণনাও ভাগবতে আছে। তাহাতেও দোষ ধরা যায় না। যেহেতু, গোপীরা তাঁহাকে আত্মা বলিয়াই ধারণা করিয়াছিল; স্ত্রীরাজ্যে তাঁহার দেহকে আত্মদেহই ভাবিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণও আত্মা-রূপে তাহাদের দেহে অধিষ্ঠিত থাকায় তাহাদের দেহ আত্মদেহই ভাবিয়াছিলেন। আপনি আপনার দেহের সর্বস্থানই স্পর্শ করা যাইতে পারে।

পরন্তু রাসে কোনরূপ অশ্লীল কার্য্য হয় নাই—হইতে পারে নাই। যেহেতু, প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন ৭ বৎসর ২৥ মাস মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, (ভাগবতেরই বর্ণনা) পঞ্চম বৎসর বয়সে তিনি বৎস-চারণের ভার পাইয়া সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত উহাদিগকে চরাইতে যাইতেন। এক দিন তাঁহারা যখন বৎস-গুলিকে ছাড়িয়া দিয়া যমুনাতীরে ফলার করিতে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মা তাঁহার নূতন মহিমা দেখিবার ইচ্ছায় দূরগত বৎসগুলিকে হরণ করিয়া

পর্বতের গুহায় নিদ্রাভিত্ত করিয়া রাখিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণের অন্বেষণ করিতে যাইলে বালকগুলিকেও হরণ করিয়া সেই গুহায় তদবস্থায় রাখিয়াছিলেন। ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত বালক ও সমস্ত বৎসগণের রূপ ধরিয়া এক বৎসর কাল বৎসচারণ করিয়াছিলেন এবং পুত্রবতী সমস্ত যুবতী ও প্রৌঢ়া গোপীদিগকে ‘মা’ বলিয়া ডাকিয়া তাহাদের স্তন পান করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ,—

.....নভস্তাবদ্ধিমানশতসঙ্কুলম্।

দিবোকসাং সদারাণামোৎসুক্যাপজ্জ্বায়াণাম ॥

ততো হৃন্দুভয়ো নেহুনিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয় ॥

জগুর্গর্ভবপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোহমলম্ ॥

তৎকালে শত শত বিমানে আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শনে উৎসুক হইয়া দেবতারা ও গন্ধর্বেরা সম্মীক ঐ সকল বিমানে অবস্থিত ছিলেন। দেবতারা হৃন্দুভি বাজাইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে-ছিলেন, গন্ধর্বেগণ অঙ্গরাদিগের সহিত তাঁহার অকলঙ্ক যশ গান করিতেছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণের মধ্যে অগ্রে কাহাকে অর্ঘ্য দেওয়া হইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে, ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই দিতে বলায়, শিশুপাল ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের যথোচিত তিরস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যত নিন্দা হইতে পারে সমস্তই করিয়াছিল; যাহা নিন্দনীয় নহে, তাহাকেও নিন্দায় পরিণত করিয়াছিল; কিন্তু বস্তুহরণ ও রাসলীলা দৃশ্যীয় হইলে উহাদের উল্লেখ করিল না কেন? (মহা, সভা, ৩৭ অঃ)।

প্রশ্ন—বস্তুহরণে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা সম্বন্ধে কুমারীদিগকে বলিয়াছিলেন, “কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হইতে ঐক্যে রাত্রি” এবং রাসের প্রথম শ্লোকেও আছে “সেই সকল প্রতিশ্রুত রাত্রি” অর্থাৎ এক রাত্রেই উহা শেষ করিলেন কেন?

উত্তর—ঐ এক রাত্রির মধ্যেই অপর ৪ দিন, ৪ রাত্রি নিশ্চিষ্ট ছিল। তাহার কারণ—

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য যুমুভঃ খেচরস্নিগঃ।

কামাৰ্দ্ধিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোহ্ৰুবৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া দেখিয়া দেব ও গন্ধর্বেগণের

স্ট্রীরা কামাতুর হইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং চক্র ও তারাগণের সহিত বিস্থিত হইয়াছিল।

বিস্ময় বশতঃ তাহারা আপন আপন গতি ভুলিয়া গিয়াছিল। যে যেখানে থাকিয়া দেখিতেছিল, ৪ দিন ও ৫ রাত্রি সেইখানেই ছিল। সে দিনকার রাত্রি যে এত বাড়িয়াছিল, যোগমায়ার প্রভাবে কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই।

নাস্বয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তশ্চ মায়য়া।

মত্তমানাঃ স্বপাশ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার কর্তৃক মোহিত হইয়া আপন আপন পত্নীদিগকে স্ব-স্ব পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া তাঁহার প্রতি কেহ অস্বীয়া করে নাই।

ঋষিপুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিত্বে শাপ দিয়াছিলেন—অত্যাধি সপ্তম দিনে তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিবে। রাজা ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়া সঙ্গতি পাইবার জন্ত ঐ সাত দিন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র শুকদেবের নিকটে ভাগবত শুনিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণাদি হইতে জানা যায়, তিনি প্রথম দিনে হিরণ্যাক্ষ বধ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় দিনে ভরত রাজার চরিত্র পর্য্যন্ত, তৃতীয় দিনে সমুদ্রমন্ডন পর্য্যন্ত, চতুর্থ দিনে শ্রীকৃষ্ণজন্ম পর্য্যন্ত, পঞ্চম দিনে রুক্মিণী-হরণ পর্য্যন্ত, ষষ্ঠ দিনে উদ্ধবসংবাদ পর্য্যন্ত এবং সপ্তম দিনে গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। (ঐরূপে ৭ দিনে সমগ্র ভাগবত শ্রবণকে পারায়ণ বলে)। স্মতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, তদ্বিময়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তথাপি অজ্ঞজনগণের সংশয়-ভঞ্জনার্থ নিজে অজ্ঞ সাজিয়া শুকদেবকে প্রণয় করিয়াছিলেন, “ভগবান্ ধর্ম্মরক্ষার্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পরস্ত্রী লইয়া একরূপ বিহাররূপ অধর্ম্ম কার্য্য কেন করিয়াছিলেন? তাঁহার অমুকরণে সকলেই ত ঐরূপ করিতে পারে?” তদুত্তরে শুকদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই— “শক্তিমান্ পুরুষেরা কদাচিৎ কোনও অধর্ম্ম কার্য্য করিলে তাহাতে তাঁহাদের দোষস্পর্শ হয় না; যেমন অগ্নি সর্ব্ব-ভক্ষ হইলেও সদাই পবিত্র থাকে। যাহারা তাঁহাদের অমুকরণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাদের অগ্রে তাদৃশ শক্তি অর্জন করা আবশ্যিক। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দমন

করিয়াছিলেন, দাবানল পান করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন; মহাদেব কালকূট বিঘ পান করিয়াছিলেন। যাহারা হেলে দেখিয়া দশ হাত পিছাইয়া যায়, এক কণা আশ্রন গায়ে পড়িলে বাতর হয়, এক মণ জিনিস তুলিতে যাহাদের চক্ষু কপালে উঠে, এক ভরি আফিং খাইলে যাহাদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, তাহারা ঐ সকল কার্য্য করিতে অপারগ হইয়া কেবল যদি পরস্ত্রীর সহিত বিহার করিতে সাহস করে, তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যু ও দুর্গতি অবশ্যস্তাবী।

শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন। ব্রহ্মার উক্তি—

যদ্বংশেহবর্তীর্ণশ্চ ভবতঃ পুরুষোত্তম।

শরচ্ছ তং ব্যর্তীয়ায় পঞ্চবিংশাদিকং বিপো ॥

(ভাগ, :১৬২৫)

তন্মধ্যে জন্মাবধি :১ বৎসর মাত্র বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শুকদেবের উক্তি—

ততো নন্দব্রহ্মমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্রাতা।

একাদশ সমাস্তত্র গৃঢ়াচ্চিঃ সবলোহবসৎ ॥

(৩২২৬)

পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত কোনার, ষষ্ঠ হইতে দশম বৎসর পর্য্যন্ত পৌণ্ড্র, একাদশ হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর। অতএব কৈশোরের এক বৎসর মাত্র বৃন্দাবনে ছিলেন। তৎপরে কংসের ধনুর্মুখে নিমন্ত্রিত হইয়া মথুরায় গিয়াছিলেন, আর বৃন্দাবনে ফিরেন নাই। কংসের প্রেরণায় রাম ও কৃষ্ণ যখন চাগর ও মৃষ্টিকের সহিত মল্ল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন উপস্থিত রমণীগণ বলিয়াছিল—

ক ব্রহ্মসারসর্কারো মল্লো শৈলেঙ্গসম্নিভো।

ক চাতিশুকুমারাজো কিশোরো নাপ্তযৌবনো ॥

ব্রহ্মসারের গায় কঠিনাঙ্গ ও পার্বতাকৃতি মল্লদ্বয়ের সহিত এই দুইটি কিশোরবয়স্ক অপ্ৰাপ্তযৌবন বালককে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত করা এবং একরূপ অধর্ম্ম-বুদ্ধ দর্শন করাও উচিত নহে। (ক্ষত্রিয়দিগের দ্বাদশ বৎসর উপনয়নের মুখ্য কাল।) কংসবধের পরে যুগ্যকালেই তাঁহাদের উপনয়ন হইয়াছিল। যথা—

অথ শরস্বতৌ রাজন্ পুণয়োঃ সমকারয়ৎ ।

পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্বিজসংক্রতিম্ ॥

কংসবধের পূর্ব বসুদেব পুরোচিত গর্গ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ছুই পুত্রের যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কার করাইয়াছিলেন।

সুতরাং একাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার পরম্পীগমন ও রাধিকার মানভঙ্গনাদি নিতান্তই অসম্ভব। লম্পটবাদী-দিগকে জিজ্ঞাসা করি, ভাগবতে রাসলীলার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লাম্পটা-দোষের কোনও গন্ধ পাইলেন কি? শাস্ত্রগ্রন্থ না দেখিয়া, কেবল বাজে বই পড়িয়া, কীর্ত্তন ও কবির হুড়া শুনিয়া একটা অপসিদ্ধান্ত করাই কি সাধুভার, সংপ্রবৃত্তির ও উদারতার পরিচায়ক?

শ্রীরাম

ক্রমোপনিবনে “শেষনাপোহুবদ্রামঃ ক্রমো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্” বলিয়া বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, নন্দ, যশোদা, চাণুর, মুষ্টিক, কুবলয়াপৌত্রেরও নাম কথিত আছে; কিন্তু রাধার নাম নাই। মহাভারতে রাধার নাম নাই, তন্ত্রেও রাধার নাম নাই; থাকিলে তৎসময়ে কৃষ্ণপূজায় রাধার পূজাও প্রতীত। এতদ্বারা রাধাতত্ত্বকে আধুনিক বলিয়াই মনে হয়।

মহাপুরাণের মধ্যে কেবল পদ্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে রাধার নাম আছে। দেবীভাগবতে রাধার নাম আছে, এবং গর্গসংহিতাতেও রাধার নাম আছে।

পাঁচুতমাত্রেই জানেন, প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তে বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক স্থান পাইয়াছে। পদ্মপুরাণে যখন শ্রীগৌরান্দ্র অবতারের কথাও আছে, তখন উহাতেও বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের আবিভাব সুনিশ্চিত। যথা—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাজ্জোহসৌ মহীতলে ।

ভাগীরথীতটে ভ্রূয়ি ভবিষ্যতি সনাতনঃ ॥

ইত্যাদি।

দেবীভাগবত যে নিতান্ত অর্ধাচীন, তাহা “ভাগবত-পুরাণে” আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে রাধা রায়ণ ধোষের (আয়ণ ধোষের) পত্নী— শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানী। গর্গসংহিতার মতে রাধা শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা। যথা—

এক দিন অপরাহ্নে নন্দ স্বয়ং যমুনা তীরে গোচারণ করিতে গিয়াছিলেন। শিশু শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে মহাতুর্যোগ উপস্থিত হইল। তখন তিনি কৃষ্ণকে সামলাইবেন, কি গাভীদিগকে সামলাইবেন ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে রাধাকে যমুনার ঘাটে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, “মেঘসমূহে আকাশ আবৃত হইয়াছে, তমালতরুসমূহের আভায় বনভূমিও অন্ধকারময়, রাত্রিও উপস্থিত, ছেলে বড় ভীক; অতএব তুমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া আমাদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দাও।”

(রাধা কৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে বড়; কৃষ্ণ যখন কুমার, রাধা তখন কিশোরী)। নন্দের আদেশে কৃষ্ণকে লইয়া রাধা (সুগম পথ ধরিয়া যাইলে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া) বনের মধ্য দিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটা বৃক্ষের নিকটে কুঞ্জমধ্যে আলো জ্বলিতেছে এবং বিবাহের আয়োজন করা রহিয়াছে। দেখিয়া বলিলেন, “এমন সময়ে কে এখানে একরূপ আয়োজন করিয়া গেল?” কৃষ্ণ বলিলেন, “আমার সহিত তোমার বিবাহ হইবে বলিয়া ব্রহ্মা এ-সব করিয়া গিয়াছেন; এখনই তিনি আসিয়া আমাদের বিবাহকার্য সম্পাদন করিবেন। এস, ঐ আসনে আমরা দু’জনে বসি।” তখনই ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিয়া স্তুতিনতি করিয়া প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ মাল্যচন্দন দ্বারা রাধাকে সাজাইতে বসিলেন। তার পদ রাধাও কৃষ্ণকে সাজাইতে উদ্যত হইলে, দৈববাণী হইল, “এখন তোমাদের বিবাহমাত্র হইয়া রছিল, বিহারাদি কার্য এখন হইবে না, পরে অর্থাৎ গোলোকে যাইয়া হইবে, বিবাহবার্তা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।” গোবর্দ্ধন ধারণের পর গোপেরা নন্দের নিকটে গিয়া বলিল, “কৃষ্ণ আপনার পুত্র নহে, অতএব পুত্র আনিয়া আপন পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কারণ, আপনি ও যশোদা উভয়েই গৌরবর্ণ, আপনাদের পুত্র এত কালো হইল কেন? আপনি একখানা ভারী পাথর ছ’ হাতে ধরিয়া এক দণ্ডও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু কৃষ্ণ সাত বৎসরের বালক হইয়া অত বড় গোবর্দ্ধন পর্বত উপড়াইয়া বাঁ হাতে ধরিয়া সপ্তাহ কাল দাঁড়াইয়া রছিল; ইহাতে আমরা বিস্মিত

হইয়াছি। সত্য করিয়া বলুন, কৃষ্ণ কাহার পুত্র ?” নন্দ বলিলেন, “কৃষ্ণ আমারই পুত্র বটে। উহার জন্মের পর গর্গ মুনি আসিলে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি রাম ও কৃষ্ণের নামকরণ করেন এবং বলেন, তোমার এই পুত্র নারায়ণের অংশে উৎপন্ন হইয়াছে, অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইও না। তজ্জন্ত আমি গোবর্দ্ধন ধারণে বিস্ময় বোধ করি নাই।” গোপেরা বলিল, “আপনার বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হইল, গোপনে ‘নামকরণ’ করাইলেন, আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন না— গাওয়াইলেন না ; আমরা আপনাকে ‘এক-ঘরে’ করিব।” এই বলিয়া তাঁহারা ব্রহ্মভানুর নিকটে গিয়া বলিল, “নন্দকে ‘এক-ঘরে’ করিতে হইবে।”

“কি অপরাধে ?”

“তাঁহার পুত্রের নামকরণে আমাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই।”

“সে জন্ত ‘এক-ঘরে’ করা যায় না, তাঁর যদি সকলকে খাওয়াইতে সম্মতি না থাকে।”

“তবে আপনাকে আমরা ‘এক-ঘরে’ করিব।”

“আমার কি অপরাধ ?”

“আপনার কন্যা বারো বছরের হইয়াছে, তথাপি আপনি তার বিবাহ দিচ্ছেন না।”

“আমি কেন বিবাহ দিই নাই শুন। রাধার বাল্যকালে গর্গ মুনি আসিয়াছিলেন। রাধার বিবাহের সম্বন্ধে তাঁকে গণিতে বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার কন্যা গোলোকেশ্বরী; অত্বের সহিত উহার বিবাহ হইবে না। নন্দের পুত্র কৃষ্ণ গোলোকেশ্বর; তাহার সহিত বিবাহ হইবে। কিন্তু তুমি বিবাহ দিতে পারিবে না, জানিতেও পারিবে না। ব্রহ্মা আসিয়া গোপনে বিবাহ দিয়া যাইবেন। এই জন্তই আমি উহার বিবাহের চেষ্টা করি নাই।”

“আপনার কন্যা যে গোলোকেশ্বরী, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। কেন না, আপনি পূর্বে গরীব ছিলেন। ঐ কন্যার জন্ম হইবার পর হইতেই আপনি বৃদ্ধ-মানুষ হইয়াছেন। কৃষ্ণ যে গোলোকেশ্বর, তার প্রমাণ কি ?”

“গর্গ মুনির গণনাই আমার প্রমাণ। তোমরা যদি

প্রমাণ জানিতে চাও, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, এখনই প্রমাণ দেখাইতেছি।”

এই বলিয়া ব্রহ্মভানু একশ’টা মুক্তায় গাথা একশ’ ছড়া মুক্তার মালা একটা বুড়িতে গাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “এই মুক্তার মালা লইয়া নন্দের কাছে যাও। আমার নাম করিয়া তাঁহাকে বলিবে, আমাদের কুলপ্রথা এই যে, কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে হইলে অগ্রে বরকে যথাশক্তি উপহার পাঠাইতে হয়। বরকর্তার সম্মতি হইলে তাহার দ্বিগুণ উপহার তখনই প্রেরিত লোকের দ্বারা কন্যার জন্ত পাঠাইতে হয়। এখন আপনার বাহা কর্তব্য, তাহাই করুন।” ভৃত্য মালা লইয়া গিয়া একশ’ ছড়া গণিয়া নন্দকে বুঝাইয়া দিল এবং ব্রহ্মভানুর কথা শুনাইয়া বাহির-বাটীতে গিয়া বসিল। নন্দ পরামর্শ করিবার জন্ত যশোদাকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, “আমার ঘনে একটা মুক্তাও নাই, দু’শ’ ছড়া মুক্তার মালা কোথায় পাঠিব ? কি করি ?” যশোদা বলিলেন “তুমি ওকে বলিয়া দাও, কৃষ্ণ এখন ছেলে-মানুষ, এখন উহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিব না। বিবাহযোগ্য বয়স হইলে তখন যা হয় কণা যাইবে। এখন এ মালা ফেরৎ দিতেছি। সেইরূপ বলিয়া ভৃত্যকে মালা বুঝাইয়া দিবার জন্ত গণিতে গিয়া দেখেন, এক ছড়া মালা নাই। “এরই মধ্যে কি হইল ! ইহা ছেলেদের কস্ম। তাদের মধ্যে কেহ আসিয়া লইয়া গিয়াছে।” বলরামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমি খেলাইতে ছিলাম, বাড়ীতে ত আমি নাই।” কৃষ্ণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই এক ছড়া মালা লইয়াছিস ?”

“হাঁ বাবা, লইয়াছি।”

“কেন লইলি ? কি করিলি ?”

“বাবা, আমরা ত বৈশ্য। বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি ও গোপালন। কিন্তু আমরা গোপালনই করিয়া থাকি, কৃষি করি না। তাই কৃষি করিবার ইচ্ছায় এক ছড়া মালা লইয়া উত্তর দিকের ঐ মাঠে ছড়াইয়া দিয়াছি।”

“ওরে বোকা ছেলে ! কোরেছিস কি ? মুক্তার কি গাছ হয় ? মুক্তা কি গাছে ফলে রে ! শীঘ্র চল, কোথায় ফেলেছিস দেখাবি।” কৃষ্ণ নন্দকে সেই মাঠে

লইয়া গেলেন। নন্দ দেখিলেন, একশ'টা মুক্তার গাছ হইয়াছে, প্রত্যেক গাছে গোড়া-গোড়া মুক্তা ঝুলিতেছে। তখন তিনি এক-শত এক ছড়া মালার উপযুক্ত মুক্তা আনিয়া ভৃত্যকে গণিয়া বুঝাইয়া দিলেন (তৎপরেই সেই জমী হুদে পরিণত হইয়া মুক্তাসরোবব নামে অত্য়পি বর্তমান আছে)। ভৃত্য বসভানুর নিকটে আসিয়া গোপেদের মাফাতে সকল কথা বলিলে, তাহারা বলিল, “এখন বিশ্বাস হইল, কুম্ৰ গোলাকেশ্বরই বটেন।”

এ অবস্থায় বসভানু অরণ ঘোমের সহিত কেন রাধার বিবাহ দিবেন ?

জয়দেব গোস্বামী গর্গসংহিতা অনুসারেই গীত-গোবিন্দের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। যথা—

মৈদৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্রামাস্তমালক্রমে-
নক্তং তীকরয়ং অমেন তদিনং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইথং নন্দনিদেশতচ্চলিতয়োঃ প্রতাপকুঞ্জদমং
বাধামাধবয়োজয়ন্তি যমুনাকলে রভঃকেলয়ঃ ॥

কিন্তু অত্য়ান্ত বৈষ্ণব কবিদিগের ত্য় বাধাক্ষেত্র বিহার ও রাধার মানভঞ্জন লিগিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।

‘ব্রাহ্মণসমাজ’ পত্রিকায় আনি গর্গসংহিতার মতে

রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী লিগিয়াছিলাম বলিয়া বৈষ্ণবেরা আমার উপর খড়াহস্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের পরকীর্য প্রতিই একান্ত আসক্তি বুঝিলাম।

পাঠক-পাঠিকাদিগের আরও বিরক্তি বর্জন না করিয়া এইখানেই প্রবন্ধের শেষ করিলাম। শেষে একটি প্রাচীন উদ্ভট শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

যেমাং শ্রীমদ্যশোদাসু তপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নাগাং ।
যেমাভীরকত্য়প্রিয়গুণকথনে নামুরক্তা রসজ্ঞা ।
যেমাং শ্রীকৃষ্ণলীলাললিত গুণকথাসাদরৌ নৈব কর্ণে।
ধিক্ তান্—ধিক্ তান্—ধিগেতান্ কথয়তি নিতরাঃ
কীর্তনস্থে মৃদঙ্গঃ ॥

হরিসঙ্কীর্ণনে মৃদঙ্গ সর্দক্ষণ “ধিক্ তান্—ধিক্ তান্—ধিগেতান্” এইরূপ শব্দ করিয়া থাকে। এইরূপ শব্দ করিয় সে কি বলে ? বলে যে, যে-সকল মনুষ্যের শ্রীযশোদা নন্দনের পাদপদ্মে ভক্তি নাই, ধিক্ তান্—তাদিগে ধিক্ যাহাদের জিহ্বা শ্রীগোপীবল্লভের গুণকথাকথনে অমুরত্ব নহে, ধিক্ তান্—তাদিগে ধিক্, যাহাদের কর্ণদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ ললিত লীলাকথা শুনিতে আদর করে না, ধিগ্ এতান্—এদিগেও ধিক্ !

শ্রীগোমাচরণ কবিরত্ন।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে

কার যে বরাতে কখন কি আছে কে পারে বন্ধু বলতে ?
সহসা হয় তো মাথায় পড়িল ইট এক—পথে চলতে !

হয় তো সহসা কলার ছোপায়—

পিছলে পড়িয়া টাক ফেটে যায় ;

হঠাৎ হয় তো পড়িল আগুন—লাগিল কাপড় জলতে !
কার যে বরাতে কখন কি আছে কে পারে বন্ধু বলতে ?

মাগরেতে নায় হাজারো ব্যক্তি—সেথায় কুমীর মস্ত
হয় তো সহসা ধরিল একেরে—পাতালে সে হ'ল গুস্ত !

নিরীহ ব্যক্তি ট্রেনে চেপে যায়,

সহসা লাগিল ঠোকাঠুকি হায়,

ভাগ্যের জোরে প্রাণ পেল যদি—হারালো হু'খানি হস্ত !

মাগরেতে নায় হাজারো ব্যক্তি—সেথায় কুমীর মস্ত !

খারাপ যেমন হতেছে তেমনি ভালোও দেখি তো চক্ষে ;
তঙ্করও বুঝি সাধু ব'নে গেছে না জানি কবে অলক্ষ্যে !

কালকে যে ছিল পথের নকির,

আজ সে শিখেছে হাজার ফিকির,

গাড়ীতে ভর্তি টাকা ও খেতাব আসিছে তাহার কক্ষে ।
খারাপ যেমন হতেছে তেমনি ভালোও দেখি তো চক্ষে !

কৌতুকময়—টার লীলা জয় করা সে কাহার সাধ্য ?

নিয়তির কাছে নল-নিগুস্ত—সবাই যে ভাই বাধ্য !

কথা ছিল বার রাজা হইবার,

নিমেষে হইল ভণ্ড তাহার,

কেহ ওঠে আর কেহ পড়ে সবই তারি তো হাতের সল্কে

কার যে বরাতে কখন কি আছে কে পারে বন্ধু বলতে ?

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



বিনাপণের মর্যাদা !

১

বৈশাখের সন্ধ্যা, মারা-দিন অসহ্য গুমোট গিয়াছে, এখন দক্ষিণ দিক হইতে স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। চামেলী দোতালার ছন্দ মাহুর পাতিয়া নতুন গানটি অভ্যাস করিতেছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি কলি পুনঃ পুনঃ গায়িতেছিল,—

“জীবনে জেগেছিল মধুমা

রঙে-রাঙা হ'য়েছিল সকল আকাশ।”

তাহার মা ছাদের সংলগ্ন টিনের শেড-দেওয়া ছোট রান্নাঘরে রুটি বেগিতে-বেগিতে মেয়ের গান শুনিতে-ছিলেন ! চামেলী কহিল,—মা, ঠিক হচ্ছে তো ? কোথাও ভুল হয়নি ?—মা কহিলেন, না, ভুল হয়নি, স্মরণটা ঠিকই, তবে আর একটু মিষ্টি ক'রে ভাবের আর একটু উজ্জ্বল দিয়ে গাইবার চেষ্টা কর। প্রাণ চলে গাইতে না পারলে গানের অনেকখানিই ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

চামেলী মায়ের কথা শুনিয়া আরও ভাল দিয়া গাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার বাবা আফিস-ফেরতা এক বাণ্ডুল কাগজ বগলে তথায় উপস্থিত ! চামেলী বাজনা এবং গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার হাত হইতে কাগজের তাড়াটি ঘরে লইয়া যাইবার জন্ত গ্রহণ করিল। বাবা সাবধান করিয়া দিলেন,—দেখো মা, আফিসের জরুরী কাগজপত্র ! হারায় না যেন এক-খানিও। আমার টেবিলের দেরাজে রাখোগে।

চামেলী যথানির্দিষ্ট স্থানে কাগজ রাখিতে গেল। তাহার মা রুটিবেলা বাখিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন,—কেন আমার আজ ফিরতে এত রাত হ'লো কেন গো ? সেই কোন্ সকালে ছুটি ভাত তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে গুঁজে আফিসে ছুটেছো ! আমি তখন থেকেই ভাবছি।

এই ছাদেই ঠাণ্ডায় একটুখানি বোসো। এক পেয়লা চা ক'রে দেব কি ?

দাও।—শিবনাথ ক্রান্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মাহুরে বসিলেন। দরিদ্র-ঘরের স্বল্প কিছু সময়ে সংরক্ষিত জলখাবারের রেকাবি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল ; চামেলী তাহা আনিয়া তাঁহার সামনে ধরিল।

চা ও খাবার পাইয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ কহিলেন,—আজ নতুন গান কি শিখিলি চামেলী ? আমাকে শোনাবিনে ?

কমলাদেবী কণ্ঠকে কহিলেন—তুই ততক্ষণ গুঁকে একটু গান-টান শোনা, তার মধ্যেই আমার রান্না শেষ হ'য়ে যাবে।

রাত্রির সমস্ত গৃহকর্ম শেষ হইলে, শয়ন-কক্ষে বসিয়া শিবনাথের স্ত্রী কমলা নিজের জন্ত মস্ত বড় করিয়া একটা পাণ সাজিতেছিল—সাজিতে সাজিতে কহিল,—আজ যেখানে খাবার কথা ছিল, সেখানে গিয়েছিলে না কি ?

শিবনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—“না যাইনি, আজ আফিসের কাজের ভাঁড়ে আর সময় হ'য়ে ওঠেনি কিছু গিয়ে যে কি লাভ হবে তা বুঝতে পারচিনে ! আজ ছ'মাস ধ'রে কত জায়গাতেই ঘুরলাম, বিনা-টাকায় কোথাও হয় না। তা-ও আবার সোজা টাকা নয়, কম ক'রেও অন্ততঃ চার-পাঁচ হাজার ! কোথায় পাব অত টাকা ? জানো তো সবই।

কমলা একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল,—কেন, টাকাই কি সব ? আমার অমন মেয়ে, যেখান-সেখান থেকে একটা খুঁজে বার করুক দিকি ? দেখতে সুন্দরী, তা'ছাড়া গান বাজনা, সেলাই, লেখাপড়া সব দিকেই সমান।

স্বামি-স্ত্রীতে কথাবার্তা হইতেছিল—তাহাদের একমাত্র কন্তু চামেলীর বিবাহের বিষয়ে। শিবনাথ অল্প বেতনে

কলিকাতায় কেরালীগিরি করেনী ভদ্রভাবে থাকিয়া এই স্বল্প আয় হইতে কিছুই জমান যায় না; তবু এই কয়েক বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় পোষ্টাপিসের খাতায় হাজারখানেক টাকা জমািয়াছে। এদিকে শিবনাথের স্ত্রী কমলা দরিদ্রের ঘরণী হইলেও রীতিমত বিহুণী। আই-এ পাশ করিয়া বিবাহ হইয়াছিল; বিবাহের পর স্বামীর কাছে পড়িয়া প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়া বি-এ পাশ করিয়াছে। বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে সে গান, এস্রাজ শিখিয়াছিল; এখনও তাহার চর্চা ভোলে নাই, মেয়েটাকে সবত্রে তাহা শিখাইতেছে। চামেলী এ বছর প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়া পাশ করিয়াছে; ব'ড়ীতে এখনও পড়িতেছে। আই-এ দিবে ইহাই তাহার আন্তরিক আশা।

অন্ধকারাঙ্কন জানালা দিয়া শিবনাথ ততোধিক অন্ধকারাত আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন; একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—আমিও আগে ভাবতুম, আমার এমন মেয়ে, তার বিয়ের জন্তে আবার টাকার ভাবনা কেন? কিন্তু ঘা খেয়ে-খেয়ে সে কথা আর এখন ভাবতে পারি কি? আজ অবনীবাবু এক জায়গা থেকে একটি সম্বন্ধ এনেছেন। ছেলেটির অবস্থা মোটামুটি ভালো; পাড়াগায়ে চাষ-বাস আছে। এখানকার কলেজে বি-এ পড়ে। এবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে ল' পড়বে। তেমন কিছু চায় না, মেয়ে পছন্দ হ'লেই হ'লো।

কমলা নাসিকা ঈর্ষ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—পাড়াগায়ে বাড়ী! না না, সেখানে আমি মেয়ে দোব না। ম্যালেরিয়া আছে, তা' ছাড়া যত অশিক্ষিত লোকের বাস! অমার্জিত বুনো জায়গা!

শিবনাথ কহিলেন,—কেন ছেলেটির জমিজমা আছে। নিজের বাড়ী আছে,—নিজের গোটা একটা বাড়ী; আর তোমার কি আছে কমল? ভাড়া-বাড়ী,—তা-ও তেতালার উপরে একটুকুরো ফ্ল্যাট!

স্বামীর এ কথার উত্তরে কমলার শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। পুরান দিনের অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল! প্রথম জীবনে তার কতই আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ছিল! শিবনাথের যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি কলেজে এম-এ পড়েন। সামনে ছিল কত উচ্চ আশা! রমণীয় সুদীর্ঘ পথ কল্পনালোকে কেমন সুরঞ্জিত ছিল! আর আজ—?

তবু নিজেদের সেই সমস্ত ব্যর্থ আশা এবং বিফল স্বপ্ন একেবারে নিরর্থক হয় নাই, চামেলীর মধ্যে তাহা যেন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে; নব ভাবে পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া। তাই কমলা তাহার এই মেয়েটিকে লইয়া কত স্বপ্ন দেখে; আপন-মনে কতই ভাঙ্গাগড়া করে! নিজের জীবনে যে সাধ মেটে নাই, যত আশা নিবিয়া গেছে, তাহাদের সমস্তগুলি দিয়া এক একটি করিয়া দীপ জালিয়া মুগ্ধ মানস-চক্ষে চামেলীর ভবিষ্যৎ জীবনকে দীপান্বিত করিয়া তোলে।

ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া উঠিল। কমলা আলো নিবাইয়া দিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতে করিতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় বলিল,—হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা ঝুলতে ভুলে গিয়েছিলাম। গায়ত্রীদি' বিশেষ-ক'রে ব'লে গেছেন—কাল সকালের দিকে তাঁর বাড়ী একবার যেতে। তাঁর মেয়ে সিপ্রাকে কাল পাকা-দেখতে আসবে। কাল গুঁর ওখানেই আমাদের নিমন্ত্রণ। তুমি তখন ছিলে না, আফিসে ছিলে, তোমাকে শুদ্ধ বাব বার ক'রে যেতে ব'লে গেছেন।

শিবনাথ পাশ ফিরিয়া শুইয়া কহিলেন,—বেশ তো, যেয়ো তুমি; আর চামেলীও যাবে। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? গরীব মানুষ, অত 'হাইসার্কলে' মেশবার অভ্যাস তো নেই।—তা' ছাড়া আফিসও আছে।

কমলা অন্বয়োগের সুরে কহিল,—ওরা বড়লোক আছে তা থাকুক না; তাই ব'লে আমাদের তো আর ধ'রে গিলে খাচ্ছে না! বরঞ্চ নিজে বাড়ী ব'য়ে-এসে হাতে ধ'রে কত ক'রে যেতে ব'লে গেল। অবশু না যাও, সে তোমার ইচ্ছে; কিন্তু তাই ব'লে কাল রবিবারের দিনটাতে আর আফিসের তাড়ার অজুহাত দেখিয়ে না! গায়ত্রীদি' ব'লছিলেন, রবিবার ব'লেই কাল সে পাকা-দেখার দিন ক'রেচেন। রবিবার ব'লে সকলেই আসতে পারবে; আফিস সবারই বন্ধ।

গায়ত্রী কমলের খুড়তুতো বোন। এই কলিকাতা অঞ্চলেই সে প্রকাণ্ড সুরম্য অট্টালিকায় বাস করে। স্বামী এক জন নামকরা বড়লোক। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা আবার কহিল,—যাদের অদৃষ্ট ভালো তাদের কি সবই ভালো? গায়ত্রীদি' বলছিলেন, মেয়ের বিয়েতে

একটি পয়সা পণ লাগছে না ; অথচ এমন ভাল পাত্রও সচরাচর মেলে না ! বিধি সদয় হ'লে সব দিকেই সুবিধে হয় ।

শিবনাথ ঔৎসুক্যেরে কহিলেন,—কি বললে, এক-পয়সাও পণ লাগবে না ? কমলা সায় দিল, হ্যাঁ, মেয়ের মা ভাই তো বার বার ক'রে বলে গেলেন । চল না কাল । তুমি কুনো স্বভাবের লোক, কোথাও বেরোতে চাও না, কারও সঙ্গে মিশতে চাও না । অমন ক'রে থাকলে কি আর মেয়ের জন্তে ভাল পাত্র জোটানো যায় ?

বিনাপণের ব্যাপার শুনিয়া শিবনাথ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; সন্নতি জানাইয়া বলিলেন—বেশ, গায়ত্রীদি'র নিমন্ত্রণ রাখিতে তিনিও যাইবেন ।—আর তিনি আপত্তি করিলেন না ।

২

কলিকাতার যে অঞ্চলে অভিজাত-সম্প্রদায়ের বাস, সেই অঞ্চলেই গায়ত্রী দেবীর স্বামী বিজয়নাথের প্রাসাদোপম অট্টালিকা । সকাল হইতে মোটরের ভীড় লাগিয়াছে, ঘরের কাছে দেশীয় প্রথায় নহবত বাজিতেছে । গায়ত্রীদি' মূহু হাসিয়া কমলার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—ওটা ওরিয়েণ্টাল ব্যাপার ! আমাদের আর্টিষ্ট নকুল বাবুর মাথাতেই প্রথমে এই নহবতের মৌলিক পরিকল্পনাটির উদয় হয়, সে ক্ষুণ্ণ তাঁকে অগণ্য ধন্তবাদ ।

নকুল বাবু কাছাকাছি ঘুরিতেছিলেন ; শুনিতে পাইয়া ওরিয়েণ্টাল ধরণে হেঁ-হেঁ করিয়া প্রাণখোলা মৌলিক হাসি হাসিলেন । কমলা সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছিল । চামেলী সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে কেহ বড়-একটা আমোল দিল না । এ সভায় সে নিজেকে ঠিক মানাইয়া লইতে পারিতেছিল না । এক জায়গায় গুটি-তিন-চার তরুণী একত্র বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিল । তাহাদের নিকটস্থ হইয়াছিল বলিয়া কথাবার্তার যে দুই-একটা প্রক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ তাহার কাণে আসিতেছিল, তাহাতেই চামেলী সঙ্কচিত হইয়া উঠিতেছিল । প্রচুর হাসি এবং অতুরতর কটাক্ষ, অপরিমিত ক্রভঙ্গী, এবং অজস্র মুখভঙ্গী করিয়া তাহারা যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিল, তাহা চামেলীর কাছে বিশেষ মার্জিত বা মধুর হৃদয়ের

বার্তা বহন করিয়া আনিল না । এত দিন এই উচ্চ সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষিতা নরনারীর সহিত মিশিবার কোন সুযোগই সে পায় নাই । পায় নাই বলিয়া যে কোন ক্ষতি হইয়াছে, আজ তাহাদের খুব নিকটে দাঁড়াইয়া সে কথা তাহার মনে হইল না ।

সিপ্ৰা একবার ভদ্রতা করিয়া কহিল,—বোসো না ভাই ! দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন ?

চামেলী সঙ্কচিত হইয়া নিকটস্থ একখানা কোঁচে বসিল । সবুজ কাপড়পরা একটি তরুণী হাতের সূচিক্রিত জাপানী হাক্কা হাত-পাখাখানা দিয়া তাহার পার্শ্ববর্তিনীর গায়ে একটা ঠোকর দিয়া কহিল,—মণির আজকাল কপাল ভালো, অশোক বাবুর ঘন-ঘন দেখা পাওয়া যাবে তার বাড়ীতে গেলে ।

মণি শ্লেষ করিয়া কহিল,—কেউ তো আর ধ'রে রাখে না তাকে । যেখানে তার ভালো লাগে সেইখানেই যায় ।

সিপ্ৰা মূহু হাসিয়া কহিল,—ভালো লাগাবার আর্ট জানা চাই ; শিথিয়ে দাও না ভাই আমাদের ।

বেলা বলিল,—সে আর্ট শিখতে বেশ-খানিক সময় লাগে । অত সোজা নয় সিপ্ৰাদি ! মণির টয়লেট-টেবিলের সামনে কখনো দাঁড়িয়েছেন ? তা'হলেই বুঝতে পারবেন আমার কথাটা ।

প্রত্যুত্তরে হাতের পাখাটা দিয়া মণি বেলাকে কৃত্রিম কোপের সহিত ঠোকর মারিল, এবং তাহার সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও এ কথা শুনিয়া চামেলী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল ।

চিত্রা এই দলের মধ্যে রাশভাগি এবং বিচুর্ষী । কি একটা নারী-প্রগতিমূলক কাগজের সে সম্পাদিকা । সে রুমাল দিয়া চশমাটা একবার মুছিয়া-লইয়া কহিল,—কি সিপ্ৰা, এ মাসে তোমার যে একটা প্রবন্ধ দেবার কথা ছিল, তার কত দূর ?

মণি ঠাট্টা করিয়া বলিল,—হ্যাঁ, ও আর প্রবন্ধ লিখেছে ! বিয়ের আনন্দেই একেবারে মশগুন্ ! এবারে পুরুষদের চরণের দাসী হ'তে চ'ললো, এখন ওর লেখার সে ধার, ঠাইলের সেই তেজস্বিতা আর থাকবে না কি ?

সিপ্ৰা ফৌস করিয়া বলিল,—সবাইকে নিজের মত ভেবো না । আমাদের বিয়ে মানে বাঁদীগিরি নয়,

পার্টনারশীপ। সমান অধিকার, সমান দাবী। আর বিয়ে ক'রেচি বলেই যে, ভবিষ্যতে পুরুষদের অন্তায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু লিখবো না— তা-ও সত্য নয়। আপনার প্রবন্ধ ঠিক সময়েই পাবেন চিত্রাদি! এই ক'দিন 'এনগেজড' থাকতে হ'য়ে ওঠেনি।

গৃহের অপরাংশে কমলা তখন মুগ্ধ বিষয়ে বলিতেছিল, —তোমার কিছুই তো পণ লাগেনি ভাই গায়ত্রীদি', নয়? আজকালকার দিনে এমনটি কিন্তু আর দেখা যায় না।

গায়ত্রী তখন আর এক জন মহিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল,—গয়নাগুলো সব হীরেরই দিলুম। ওঁরা বলে পাঠিয়েছিলেন কি না, যা দেবেন কম ক'রেই দেবেন, কিন্তু হীরেরই যেন হয় সব ক'টা।

কমলা বোকার মত প্রশ্ন করিল,—তবে যে তুমি ব'ললে, গায়ত্রীদি', ওঁরা কিছুই নেননি?

উপস্থিত মহিলাটি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিসেস ভৌমিক বলিলেন,—নেননি তো সত্যই কিছু। ওঁদের যেমন ছেলে, ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা গুণে নিতে পারতেন যে! কিন্তু তাই ব'লে সমাজে নিজেদের একটা মান-সম্মান আছে তো? ওঁদের বাড়ীর বোঁ যে হ'য়েচে, সে হীরে-ছাড়া কিছু পরেনি কখনো। সেটুকু বজায় রাখতে হবে তো।

গায়ত্রী সগর্বে কহিলেন,—সে কথা একশো বার! আমারও শুধু ঐ হীরের স্টুটাতেই হাজার-পঁচিশেক লেগে গেল! তা'ছাড়া এখনও ফার্ণিচার, রূপোর টি-সেট, সোমার গোলাপ-পাশ, আর ফ্লাওয়ার-ভাস, আংটি, ঘড়ি—সমস্তই বাকী। মেয়েদের কাপড়-কেনা—রং ম্যাচ ক'রে—সে-ও এক বিরাট পর্ক! তা' এতে মিসেস মল্লিক আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। তাঁর 'টেবু' অলুসারে 'সিলেক্ট' না করলে এত সুন্দর জিনিষ নিজের চেষ্টায় বোধ হয় আমি জোগাড় ক'রে উঠতে পারতুম না।

সমাগত মেয়েরা কেহ কেহ কাপড় দেখিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল। কমলা অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল! তাহার গায়ত্রীদি'র কথা শুনিয়া প্রথমে মনের অতি সঙ্কোপনে আশার যে ক্ষীণ রশ্মিটি প্রভা বিকাশ করিয়াছিল,

মুহূর্ত্তেই তাহা নির্বাপিত হইল। প্রথমে সে মনে মনে এইরূপই আশা করিতেছিল যে, বিলাপে যদি গায়ত্রীদের সমাজে বিবাহ হয়, তবে সেখানে যাওয়া-আসা মেলা-মেশা করিতে করিতে চামেলীরও হয় তো এক দিন..... কিন্তু আশার সেই নব কিশলয় দেখিতে-দেখিতে শুকাইয়া গেল—গায়ত্রীর মুখে বিরাট ফর্দ শুনিয়া।

গায়ত্রী মিসেস ভৌমিকের হাতে আলমারির চাবি দিয়া বলিলেন,—আপনি দয়া ক'রে কাপড়-চোপড়গুলো দেখান এঁদের। সে এক বিরাট ব্যাপার! ভালো ক'রে দেখাতে অন্ততঃ একটি ঘণ্টা সময় লাগবে। আমার আবার ওদিকের সমস্ত কাজই বাকী এখনও। আশীর্বাদের সময় হয়ে এলো, বেশী দেরী নেইও আর।

ছয়ারের কাছে গায়ত্রীর স্বামী ডাকিলেন,—তুনে যাও একবার। ওঁরা ফার্ণিচার-ডিলারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই কোম্পানীই চিরকাল ধ'রে ওঁদের জিনিষপত্র দিয়ে আসছে, সবই জানে-শোনে ওরা। কিছু আর নতুন ক'রে বোঝাতে হবে না।

গায়ত্রী মস্ত একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—যাক, বাচলাম। ফার্ণিচারগুলোর একটা কিনারা হওয়ায় এতক্ষণে স্বস্তি পাওয়া গেল।

গায়ত্রীর স্বামী বলিলেন,—ওরা ক্যাটালগ নিয়ে এসেচে। তোমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তার পরে যথাসময়ে ঠিক জিনিষ নিজেরাই প্যাক ক'রে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবে। একটা ড্রইংরুম আর বেড-রুমের সরঞ্জাম,—পিয়ানো-শুধু প্রায় হাজার-তিন সাড়ে তিন পড়বে আর কি!

গায়ত্রী তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন,—টাকার জন্তে কিছু যায়-আসে না। ভালো জিনিষ দিতে বোলো।

গায়ত্রীর স্বামী বলিলেন,—বেয়াই পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাঁদেরই বাড়ীতে ফার্ণিচার সরবরাহ করে যারা বরাবর—তাঁদেরই; সুতরাং জিনিষ যে ভালো হবেই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থেকে।

মিসেস ভৌমিক প্রকাণ্ড আলমারি খুলিয়া কাপড়ের একটি দোকান সাজাইয়া বসিয়াছিলেন! মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া নানারূপ মন্তব্য করিতেছিল।—যোগিয়া রংয়ের জর্জেটটা বেশ নূতন ধরণের হইয়াছে।—

মুর্শিদাবাদী ও হাক্কা বেনারসীর রং এবং জমিও চমৎকার !
অন্যান্য শ'-খানেক কাপড়-জামার স্তূপে পরিবেষ্টিত হইয়া
মেয়েরা এইভাবে বিরাট সমালোচনা জুড়িয়া দিয়াছিল ।

গায়ত্রী কহিলেন,—বেয়াই যে যে কাপড়ের ফর্দ
দিয়েছিলেন ও তাঁদের বরাবর কেনা হয় যে সব
দোকানে—তাদের নাম বলে দিয়েছিলেন, সেই হিসাবেই
কেনা হ'য়েচে । হ'লে হবে কি, সায়েবি দোকানগুলোতে
বাপু—জিনিবের বেজায় দাম নেয় ! তবে ওদের একটা
নাম-জাক আছে কি না, সেই অনুসারে বাধা দোকানও
আছে ।

অনেক বেলায় নিমন্ত্রণ সারিয়া কমলা শিবনাথ ও
চামেলী সহ ফিরিয়া আসিতেছিল । কমলা ভাবিতেছিল,

বেয়াই গয়নার দোকান, কাপড়ের দোকান, এবং ফার্ণিচারের
দোকান বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া কেমন বিনাপণে ছেলের
বিয়ে দিতেছেন—এ এক অদ্ভুত সমস্যা ! অথচ লোকের
মুখে-মুখে ঐ একই কথা ! আহা, এমন হীরের টুকরো
ছেলে, বিনাপণে বিয়ে হচ্ছে ! গায়ত্রীর কপাল-জোর !
শিবনাথ ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন, বিনাপণের
বিয়ে কেমন দেখে এলে ?

কমলা অগ্গমনক হইয়া কি ভাবিতেছিল, চমকিত হইয়া
কহিল,—হ্যাঁ, দেখে এলাম । চমৎকার ! দেখ, কাল তুমি
ঐ যে ছেলেটির কথা বলছিলে, বি-এ পড়ে, গ্রামে সঙ্গতি
আছে, বাড়ী আছে—তাদেরই সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়ের
ঠিক-ঠাক ক'রে ফেল ।

শ্রী আশালতা সিংহ ।

প্রক্লিষ্ট

রামায়ণ মহাভারতে পুরাণে আমরা লভেছি ঠাই,
গা চলেছি মোরা মহাসাগরেতে কোমই কামনা নাই ।
ভাস, ভবভূতি, কবি কালিদাস,
বান্ধীকি ব্যাস সাথে করি বাস,
আমরা হা'ঘরে মহতের দ্বারে পড়িয়া থাকিতে চাই ।

আমরা লোষ্ট্রে পাড়িবারে চাই কল্পতরুর ফল,
পথহারা ক্ষীণ মরালেরা পাই মানসসরের জল ।
করি আনন্দে আমরা ক'জন,
দেবতার সাথে পংক্তি-ভোজন,
কুরু পাণ্ডব সভায় আমরা স্মৃত-পুল্লের দল ।
সাগর-ঝিলুক অমৃতের কণা লেগেছে মোদের গায়,
বালীর পিণ্ড রাজা দশরথ হাত পেতে নিতে চায় ।
মোরা উদ্ভট, মোরা অদ্ভুত,
অমৃতের সরে দীন বুদ্ধদ,
পারিজাত-হারে নীহারবিন্দু জমাট বাঁধিয়া যায় ।

হয় ত আমরা হুণ কি তাতার অথবা আমরা গ্রীক,
আর্যের সাথে মিশিয়া গিয়াছি গোত্রের নাহি ঠিক ।
মোরা বিক্রম, চন্দ্রশুভ
বিরাতের মাঝে হ'য়েছি লুপ্ত,
অক্ষয় বটে বনমল্লিকা আমোদিত করি দিক ।
দেব-বালিকার ভাসানো প্রদীপ কাল-সাগরের জলে,
জয়া বিজয়ার ছুড়ে-দেওয়া ফুল নোড়শীর কুন্তলে,
কৌস্তভ গায়ে মোরা চন্দন,
একই দেবতা, এক বন্দন,
কনকের সাথে কনক ধাতু কমলার অঞ্চলে ।
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ।

ইতিহাসের অনুসরণ

প্রাচীন ভারতের নৌ-বল

যত দিন যাইতেছে এবং যতই অনুসন্ধানলব্ধ বস্তুর আলোক দিকে দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, ততই পৃথিবীর বহু স্থানে প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কি ভাবে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহার স্ফুটতর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতেছে। মানুষমাত্রই যেমন ব্রহ্ম-প্রমাদের অধীন, সেইরূপ সে কোন না কোন সূত্রে কুসংস্কারের অধীন। মানুষ সেই নিয়তি পরিহার করিতে পারে না। এডমণ্ড বার্ক যথার্থই বলিয়াছেন যে, কুসংস্কারের প্রভাব পরিহার করিতে পারিব—এই ধারণাই মানুষের একটা কুসংস্কার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন যে, ছয় হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর কৃত্রাপি সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হয় নাই। সেই জন্ত তাঁহারা হিন্দু-দিগের সভ্যতা যে কত প্রাচীন, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ঐতিহাসিক টেলর (Taylor) “প্রাচীন ইতিহাস” নামক গ্রন্থে মিশরের সভ্যতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “প্রাচীন মিশরের অধিবাসীবর্গের বর্ণ ছিল পিঙ্গল বা বাদামী। কিন্তু তাহাদের পুরোচিত এবং যোদ্ধাজাতির বর্ণ ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক শুভ্র। তাঁহাদের বর্ণের এই বিমলতা তাঁহাদিগকে ভিন্ন গোষ্ঠীয় লোক বলিয়া চিহ্নিত করিত। ঐ শাসক জাতিরা মেরো (Mero) অঞ্চল হইতে নীল নদ বহিয়া আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা মিশরীয় জাতিকে একটা স্বতন্ত্র ধর্ম এবং শাসন-পদ্ধতি দিয়াছিলেন। সেই সভ্যতাই অতি প্রাচীন কালে নীল নদের তীরবর্তী ভূভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই এখন নিশ্চিত-রূপে বলা যায় না। অনেকেরই অনুমান এইরূপ যে, প্রাচীন মিশরীয় জাতি সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুদিগের নিকট হইতে সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। উভয় জাতির প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য ও বিশ্বয়কর ঐক্য ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে কখন নৌ-বহর ছিল না, সুতরাং ঐ দেশ হইতে অধিক লোক কি করিয়া মিশরে আসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।”

—ইত্যাদি (১)। মিষ্টার টেলর যেকোন এই সিদ্ধান্ত করিলেন তাহা বুঝা যায় না। কারণ, প্রকৃতই হিন্দুস্থানের বহু জাতির বিশাল নৌ-বহর ছিল। যে সময় হিন্দুজাতির ইতিহাসের আলোকের ক্ষীণ জ্যোতি লক্ষিত হয়, সেই সময়ে তাহাদের যে নৌ-বহর ছিল, ইদানীং তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মিলিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে, পুরা-বস্তুতে, চিত্রে এবং প্রাচীন মুদ্রায় তাহার বহু প্রমাণ বর্তমান; এবং এখন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আফ্রিকার পূর্বস্থিত সোকোট্রা (Socotra) দ্বীপে অতি প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের উপনিবেশ ছিল সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই। মিশরের পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন রক্তিত-শবের সহিত ঢাকাই মসলিন নীল দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র, এবং তেতুল কাষ্ঠ সংরক্ষিত ছিল ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে কি মনে হয় না যে, ভারতের সহিত মিশরের স্মরণাতীত কাল হইতে বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল? স্থলপথে যে ঐরূপ দূর-দেশে ঐ সকল বস্তু প্রচুর পরিমাণে নীত হইত, ইহা সম্ভবপর নহে। সমগ্র আফগান রাজ্য, পারস্য, ইরাক, এবং উত্তর-আরব দেশ অতিক্রম করিয়া স্থলপথে মিশরে পণ্য লইয়া যাওয়া সহজ ছিল না; এবং ঐ সকল দেশে তখন নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নও ছিল। বিপ্লব ও বিদ্রোহ তখন লাগিয়াই থাকিত; পথ-ঘাটও ভাল ছিল না। সুতরাং অধিক পরিমাণে পণ্য ভারত হইতে তথায় প্রেরিত হইবার উপায় ছিল না; অথচ ঐ সকল ভারতীয় পণ্য মিশরে যে প্রচুর পরিমাণে যাইত, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

ঋগ্বেদ হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রন্থ। ইহার ঞ্চয় প্রাচীন সাহিত্য পৃথিবীর অত্র কোন দেশে নাই। যুরোপীয়রা অনুমান করেন, উহা প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বে বিরচিত; কিন্তু স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদ অস্ত্রতঃ

(১) Taylor's Ancient History—Egypt Sec. I

সাত হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে; এবং ঋগ্বেদের বহু স্থানেই হিন্দুদিগের সমুদ্রপথে বাণিজ্য-যাত্রার উল্লেখ আছে। এই ঋগ্বেদেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজর্ষি তুগ্র তাঁহার পুত্র ভূজ্যকে দূরবর্তী সাগর-মধ্যস্থ একটি দ্বীপ জয় করিবার জন্ত নৌকাযোগে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রমধ্যে ভূজ্যের নৌবহর নিমজ্জিত হইলে অর্ন্ত সকলে ডুবিয়া মরে। ভূজ্য জলে ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছিলেন; এমন সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের শত দাঁড়যুক্ত তরণীতে তুলিয়া লইয়াছিলেন (২)। ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত লিখিত আছে যে, বণিকরা লোভাক্ষুণ্ট হইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিবার জন্ত নৌকাযোগে পণ্য পাঠায় (৩)। আর এক স্থানে লিখিত আছে যে, বণিকগণ লোভাধিক্য বশতঃ সমুদ্রের সর্বত্র পণ্যবাহী জাহাজ পাঠাইত (৪)। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ এবং বরুণের সমুদ্র-বিহারের কাহিনীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে (৫)। ঋগ্বেদে এইরূপ বহু স্থানেই সমুদ্রযাত্রার কথা উল্লেখ দেখা যায়।

মহাভারতে সভা-পর্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব সাগর-পথে যাইয়া সমুদ্র-মধ্যস্থ অনেক দ্বীপ জয় করিয়া স্থানীয় প্লেচ্ছদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন (৬)। যতুগৃহ-দাহের পর পাণ্ডবগণ এক-খানি সর্ক-বাতসহ, যজ্ঞযুক্ত, এবং পতাকিনী নৌকারোহণে স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। রামায়ণেও সুগ্রীব সীতার অশ্বেষণে বানরদিগকে যবন দ্বীপে, সুবর্ণ দ্বীপে ও রজত দ্বীপে যাইতে বলিয়াছিলেন। এই যবন দ্বীপ এবং সুবর্ণ দ্বীপ কোথায়? আধুনিক কালে অনেকের অনুমান যবন দ্বীপ যব দ্বীপ বা জাভা, এবং সুবর্ণ দ্বীপ সুমাত্রা (৭)। উহা মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। রজত দ্বীপ সেলিবীজ। রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায়, নিবাদরাজ গুহক তদ্রতকে বাধা-দানের জন্ত পাঁচ শত নৌকায় শত শত কৈবর্ত যুবককে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছিলেন (৮)। এইরূপ নৌবাহিনী লইয়াই পুরাকালে

বাঙ্গালার অধিবাসীরা অসীম বীরত্বের সহিত দিগ্বিজয় করিবার জন্ত আগত রঘুরাজকে বাধা দিয়াছিলেন।

কেবলমাত্র বেদে, মহাভারতে, রামায়ণেই যে প্রাচীন ভারতবাসীর নৌ-বহরের এবং সমুদ্র-যাত্রার কাহিনী দেখা যায়, ইহাই নহে, প্রাচীন ভারতের পালি এবং দ্রাবিড় সাহিত্যেও উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সিলভান লেভী শঙ্খ-জাতক হইতে বুদ্ধদেবের যে সকল পূর্বজন্মের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে অতি প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা সমুদ্র-পথে যাতায়াত করিতেন—তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বলিতেছেন যে, অতি পুরাকালে বারাগসী ধামের নাম ছিল মল্লিনী। যে সময়ে ব্রহ্মদত্ত মল্লিনীর রাজা ছিলেন, সেই সময়ে সেই মহানগরীতে শঙ্খ নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ব্রাহ্মণ পরম ধার্মিক ছিলেন। ইনিই ছিলেন বুদ্ধদেব—বোধিসত্ত্বরূপে। অতএব উহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালের বহু পূর্বের কথা। এই শঙ্খ নামধেয় ব্রাহ্মণের তরী সমুদ্রমধ্যে বিদীর্ণ হওয়াম তিনি অকূল সাগরে পতিত হইয়াছিলেন। সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মণিমেখলা তাঁহাকে সেই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। এই শঙ্খই কয়েক জন্ম পরে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন। মহাজনক-জাতকে কথিত আছে, মহাজনক বিদেহ (মিথিলা) দেশের রাজা ছিলেন। তিনি পরবর্তী জন্মে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন। জনক (জানকীর পালক পিতা) অতি প্রাচীন যুগের লোক। তিনিও জাহাজ লইয়া সাগরে গমন করিলে তাঁহার তরী ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাঁহাকে সাত দিন ধরিয়া অকূল সাগরে ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল। পরে সমুদ্রের রাণী তাঁহাকে সাধু-পুরুষ জানিতে পারিয়া মিথিলায় লইয়া আসিয়াছিলেন। এই সকল জাতক-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐহারা সমুদ্র-বন্ধে তরী ভগ্ন হওয়াম বিপন্ন হইতেন, তাঁহারা মাখন এবং চিনি খাইয়া, এবং এক প্রকার তৈলসিক্ত আঁট-পরিচ্ছদ পরিয়া সাগরে কাঁপ দিতেন। ঐ পরিচ্ছদের গুণে তাঁহাদের দেহে জল বসিত না, এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের দেহ জলে ডুবিয়াও যাইত না। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে সমুদ্রযাত্রার জন্ত বহু উন্নত ব্যবস্থার প্রচলন

(২) ঋগ্বেদ ১।১১২।৬ এবং ১।১১৬।৩৭ ঐ ১।১৭।১৪-১৫ ইত্যাদি—

(৩) ঐ ২।৪৮।৩ (৬) মহাভারত সভাপর্বে ৩১ অধ্যায়
(৪) ঐ ১।৫৬।২ (৭) রামায়ণ কিঙ্কিণ্যা কাণ্ড ৪৫।৩০
(৫) ঐ ৭।৮৮।৩ (৮) অযোধ্যা কাণ্ড ৮৪।৭৮

ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যেও সুদূর সাগরে ভ্রমণের কথার উল্লেখ আছে। সরস্বতীর বরপুত্র আপুত্র সাগর-বন্দিত সুদূর সারকম অর্থাৎ জাভা দ্বীপে দুর্ভিক হইয়াছে শুনিয়া তথায় অন্ন-বিতরণের জন্ত অর্ণবপোতে যাত্রা করেন। তাঁহার গমনকালে সমুদ্র-বক্ষে ঝড় উঠিলে জাহাজখানি মণিপল্লবম নামক দ্বীপে (সুমাত্রা) এক দিনের জন্ত আশ্রয় লইয়াছিল। তামিল সাহিত্যে এইরূপ অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু গল্পগুলি ঐতিহাসিক হিসাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কারণ, তাহাতে কতকগুলি অতিপ্রাকৃত ঘটনার বর্ণনা আছে। কিন্তু ভারতবাসীরা যে বৌদ্ধ-যুগের বহু পূর্বেও সমুদ্র-যাত্রা করিতেন, এবং ভারতের যে নৌ-বহর ছিল— তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ঐ সকল কাহিনী হইতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বেও এ দেশের পণ্য সুদূর পশ্চিম দেশে নীত হইত—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর সাইস (Dr. Sayce) এসিরিয়া (অসুরীয়?) দেশের প্রত্নতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি এবং এই সম্বন্ধে অগ্রাণ্ড বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যে সময়ে সম্মিলিত ব্যাবিলো-নীয়ার রাজা উর বাগাস (Ur Bagas) চাল্ডিয়ার উর নগরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতের সহিত জলপথে ব্যাবিলনের বাণিজ্য চলিত। উর নগরীর ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে অতি বৃহৎ ভারতীয় সেগুন কাঠ পাওয়া গিয়াছে। নেবু কাডনেজারের (Nebu Chadnezzar) রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে এক জাতীয় ভারতীয় দেবদারু প্রকাণ্ড কড়িকাঠ পাওয়া গিয়াছে,—ঐ দেবদারু ভারত ভিন্ন অত্র জন্মে না। এরূপ বিশাল কড়িকাঠ শকট-যোগে স্থলপথে লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। উর নগর (Ur)-স্থিত সোম-মন্দিরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে টেলর (Taylor) এরূপ দুইটি ভারতীয় শালকাঠের কড়ি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যে মন্দিরে ঐ কড়িকাঠ ছিল, সেই মন্দির. নেবু কাডনেজার এবং নাবোনিডাস (Nabonidus) রাজা প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে পুনঃসংস্কৃত করিয়াছিলেন। যদি সংস্কার-কালেও

তথায় ঐ কড়ি স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই প্রায় ৬ শতাব্দী-পূর্ব খৃষ্টাব্দে ঐ কাঠ ভারত হইতে জলপথে তথায় নীত হইয়াছিল। অনেকের ইহাই অনুমান যে, ঐ বিশেষ জাতীয় শালকাঠের কড়ি মালাবার উপকূল হইতে তথায় নীত হইয়াছিল। তাঁহাদের এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, ভারতের আর-কুত্রাপি সাগর-তীরে এরূপ কড়ি পাওয়া যায় না। ডক্টর সাইস এবং মিষ্টার হিউইট বলেন, অতি পূর্বকাল হইতেই জলপথে ভারতের সহিত ব্যাবিলনের বাণিজ্য চলিত। প্রথমোক্ত পণ্ডিতের মতে খৃষ্ট-জন্মের ৩ হাজার বৎসর পূর্ব হইতে ভারতের সহিত ব্যাবিলোনিয়ায় বাণিজ্য চলিয়া আসিয়াছিল। মিষ্টার জে, কেনেডি (J. Kennedy) বলেন, ৭ শতাব্দী-পূর্ব খৃষ্টাব্দে ব্যাবিলনের সহিত ভারতের জলপথে বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মিষ্টার কেনেডির এ ধারণা বিচারসহ নহে। অবশ্য, তুল বলিতে যাওয়া অত্যন্ত অহমিকা ও স্পর্কার পরিচায়ক। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে ভারতীয় বণিকেরা অর্থলোভে সাগর-পথে বাণিজ্য করিতে যায় এ কথার স্পষ্টই উল্লেখ আছে (৭)। এখন বেদের বয়স লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সহিত ভারতীয় পণ্ডিতদিগের মতের প্রায় মিল হয় না। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক নাস্ত্রিক গণনার দ্বারা উহার যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে ৭ শতাব্দী-পূর্ব খৃষ্টাব্দে ভারতের সহিত ব্যাবিলো নিয়ার বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল,—ইহার নির্ভরযোগ্য-প্রমাণ বর্তমান। ঐ সকল স্থানে প্রাপ্ত ভারতীয় বস্তুই উহার অকাট্য প্রমাণ বলা যাইতে পারে। বাণিজ্যার্থ সমুদ্র-যাত্রার কথা পুরাণেও বহু স্থলেই আছে। বরাহ-পুরাণে সাগরপথে বাণিজ্যকারী গোকর্ণ নামক কোন বণিকের কথা আছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে “আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্গবে”—ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে পোতভগ্ন হইয়া মহার্গবে নিমগ্ন কোন বণিকের উল্লেখ আছে; তবে এই সকল পুরাণের এবং কালিদাসের

ফাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ‘যুক্তিকল্পতরু’ নামক গ্রন্থে বিবিধ প্রকার জলযান বা নৌকা-গঠনের বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু এই গ্রন্থখানি কোন্ সময়ে বিরচিত, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না। গ্রন্থখানির রচয়িতা মহারাজ শ্রীভোজ। এই ভোজ রাজা কোন্ ভোজ রাজা? কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ‘যুক্তিকল্পতরু’র যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ধর-রাজ্যাধিপতি প্রমারবংশীয় ভোজরাজ কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অনেকটা আনুমানিক। ঋগ্বেদের কাল হইতে ভোজ নামক অনেক নৃপতি ভারতের নানা স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার মধ্যে ইনি যে কোন্ ভোজরাজ—তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থ অনেকটা আধুনিক—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু গ্রন্থখানির রচনা-ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের মনে হয়, উহা প্রাচীন। উহাতে যে নৌকা-নির্মাণের কথা আছে, তাহাও প্রাচীন কালের। উহাতে ‘অগ্রমন্দিরা’ নামক একপ্রকার নৌকার কথা বলা হইয়াছে। উহা দীর্ঘ প্রবাসের জন্ত, দূরদেশে যাত্রার জন্ত, যুদ্ধের জন্ত, আর ঘনাত্মক কালে ব্যবহারের জন্তই নির্মিত হইত। “চির প্রবাস যাত্রায়াং রণকালে ঘনাত্ময়ে।” ইহাতে কতকটা সপ্রমাণ হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্ত স্বতন্ত্র শ্রেণীর নৌকা নির্মিত হইত।

অতি প্রাচীন মনুসংহিতাতে জলাকীর্ণ স্থানে নৌযুদ্ধ করিবার কথা আছে (৭।১২২)। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় কথিত আছে যে, লোক অধিক লাভের নিমিত্ত প্রাণধন-বিনাশ-শঙ্কাসঙ্কুল সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে। প্রাচীন বৌদ্ধায়নধর্মগ্রন্থে ব্রাহ্মণের পক্ষে ধনলোভে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল (বোধ সূ ২।২।২)। অধ্যাপক বুল্‌হার বলেন, অতি প্রাচীন দুইখানি ধর্মগ্রন্থে সমুদ্রযাত্রার কথা স্পষ্ট ভাষাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধায়ন-এ কথায় বুল্‌হার বলেন যে, উত্তর অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ পশম বিক্রয়, মগুপান, অস্ত্রের ব্যবসায় এবং সমুদ্র-যাত্রা প্রভৃতি অপকর্ম করিয়া থাকে (বৌদ্ধায়ন ১।২।৪—বুল্‌হারের

অনুবাদ)। মনুতে সমুদ্র-যাত্রা এবং সমুদ্রগামী নৌকার উপর কর ধাৰ্য্য করিবার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

ইহার পর ঐতিহাসিক যুগ অর্থাৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সময়ের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া থাকেন, সেই যুগে ভারতে নৌবাহিনী এবং বাণিজ্যবহর কিরূপ ছিল, এখন তাহারই বিচার করা আবশ্যিক। নেবু কাড্‌নে-জার এবং নাবোনিডাস বুদ্ধদেবের একটু পরবর্তীকালের লোক। ইহাদের আমলে ভারতে যে প্রবল বাণিজ্য-জাহাজ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ ছিল, তাহার প্রমাণ গ্রীকরাই দিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার যে বড় নৌ-বহর ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোটিল্য বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক লোক। সেই কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার বিবিধ সমর বিভাগের মধ্যে রণতরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এক জন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে নাবধ্যক্ষ বলা হইত। মেগাস্থিনিস্‌ও বলিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের সামরিক কার্য্য ছয়টি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হইত। তন্মধ্যে নৌ-বিভাগের কার্য্য গুরু। ‘হিংস্রিকা’ বা জলদগ্ধ্যাদিগের জাহাজ ধরিয়া তাহা বিধ্বস্ত করা এবং পত্তনে (port town) গুল্ক আদায় করা নৌ-বিভাগের কার্য্য ছিল (অর্থশাস্ত্র ২।২৮ অধ্যায়)। নাবধ্যক্ষের কার্য্য অত্যন্ত গুরু ছিল, সেই জন্ত তাঁহার আরও পাঁচ জন সহকারী থাকিতেন। যে সকল জাহাজ শত্রুর রাজ্যে যাইত এবং যে সকল জাহাজ পণ্য-পত্তনের নিয়ম লঙ্ঘন করিত, তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিবার নিয়ম ছিল। স্মৃতরাং চন্দ্রগুপ্তের তরী যে অনেক ছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। চন্দ্রগুপ্তের বিশাল নৌ-বাহিনী সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অশোকের প্রথম শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তাম্রপর্ণীর (সিংহল) সহিত এবং মিশর, সিরিয়া, সাইরেণ (সাইরেণ-সিয়ার রাজধানী) ম্যাসিডোনিয়া, এবং এপিয়াসের রাজগণের সহিত অশোকের রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিল। ডক্টর তিন্‌সেট স্থিথ বলিয়াছেন, এত দূরদেশের সহিত

রাজনীতিক সম্বন্ধের অস্তিত্ব সমুদ্রগামী জাহাজের এবং সেনা-দলের অস্তিত্বই স্থচনা করে (১০)।

মৌর্য সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা উপস্থিত হইবার পর হইতেই মৌর্যরাজগণের রণতরী-বাহিনীরও অবনতি ঘটিতে থাকে; কিন্তু তাহা হইলেও ভারতীয় রণতরীর বিলোপ হয় নাই। অন্ধ্ররাজ্যের কতকগুলি পুরাতন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দুই মাস্তুলবদ্ধ জাহাজের চিত্র মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুদ্রা কাহার আমলের তাহা লইয়া মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ বলেন, উহা পল্লবের রাজত্বকালের; আবার তিন-সেন্ট স্মিথ প্রভৃতি বলেন যে, উহা যজ্ঞশ্রী রাজার আমলের। অধ্যাপক রাপসন (Rapson) অন্ধ্রদেশীয় মুদ্রা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত। তাঁহার মতে উহা রাজা পল্লবের মুদ্রা। রাজা পল্লবের কর্তৃক টোণ্ডামণ্ডল বিজয়ের পরই ঐ মুদ্রা প্রস্তুত হয়। তিনি রণতরী লইয়া ঐ অঞ্চল জয় করিতে গিয়াছিলেন। এলাহাবাদের প্রশস্তি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সিংহলে এবং অন্যান্য বহু দ্বীপে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণের আমলে যে তাঁহাদের বিপুল রণতরী-বাহিনী ছিল, তাহা অধুনাপ্রাপ্ত অনেক পুরাতন লেখমালা হইতেই সপ্রমাণ হয়। ইহার পরবর্তী কালেও ভারতে বিপুল নৌ-বাহিনী ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

বঙ্গদেশেও অতি পুরাকাল হইতে নৌ-বাহিনী ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় সাড়ে ৫ শত, ৬ শত বৎসর পূর্বে বিজয় সিংহ নামক বাঙ্গালার এক জন রাজপুত্র ৭ শত অশ্বচরসহ সিংহল দ্বীপে গমন করিয়া ঐ দ্বীপটি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ৭ শত সৈন্য, গজ, অশ্ব এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যাইবার জন্ত যে রণতরীর প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐ সময়েও বঙ্গদেশে যে আর্য্য জাতির বাস ছিল,— ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ, বিজয়বাহু নামটি আর্য্য নাম। শুনা যায়, বিজয়বাহুর পিতার নাম সিংহবাহু। এ নামটিও আর্য্য নাম। সিংহলের প্রাচীন

ইতিহাস “মহাবংশ” এবং অন্যান্য ইতিহাসে বিজয়বাহু কর্তৃক সিংহল-বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। বাঙ্গালার ঐ সময়ের ইতিহাস পাওয়া যায় না। বিজয়বাহুর কৌলিক উপাধি ছিল সিংহ। সেই হেতু বিজয়বাহু লঙ্কা-দ্বীপ জয় করিয়া উহার নাম রাখিয়াছিলেন সিংহল। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, সকল পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তাঁহাদের মতামতবর্তীরা যে বলেন,—বাঙ্গালা অল্পদিন পূর্বে আর্য্য জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল, সেই মত ভ্রান্ত। বাঙ্গালাবাসী আর্য্য জাতি নৌ-বলেই বলবান ছিলেন,—ইহা কবি কালিদাস প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে বঙ্গ রাজার দিগ্বিজয় উপলক্ষে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নৌ-বলে বাঙ্গালী জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবল ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ৫১৩ বৎসর পরেও বাঙ্গালায় যে পোতাশ্রয় এবং জাহাজখানা বা জাহাজ-নির্মাণের স্থান (harbour এবং dock yard) ছিল, অধুনাপ্রাপ্ত ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসনে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। উহাতে যে ‘নাবাতা’, ‘ক্ষেনী’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ—পোতাশ্রয় এবং পোতনির্মাণের স্থান (নৌ+আতা=নাবাতা। ক্ষেনী শব্দ ক্ষয়ণ=পোতাশ্রয় বুঝায়; ইহা উক্তের হর্গেলের ব্যাখ্যা) পাল-রাজগণের আমলের যে সকল তাম্রশাসন এবং শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও বাঙ্গালায় নৌ-বাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। •

বাঙ্গালার প্রতিবেশী কামরূপ এবং আসামবাসীরাও নৌ-যুদ্ধে বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। কত কাল হইতে ইহারা নৌশক্তির পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে নৌ-বল গঠন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহা বিখ্যাত চীনা-পর্য্যটক হুয়েন সাং কর্তৃক বর্ণিত বিবরণ হইতেই বুঝা যায়। এই চীনা-পরিব্রাজক বলিয়াছেন, ভারত বর্ষের জাহাজের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। বৈষ্ণবদেব আসামের ত্রিঙ্গদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি কামরূপের রণতরীর বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশের অনেক রণতরী

ছিল। তিনি নিয়ারকসের নেতৃত্বে যে সকল নৌযোগে তাঁহার সৈন্তগণকে স্বদেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ভারত হইতে সংগৃহীত, এবং ভারতেই নির্মিত হইয়াছিল। আলেকজান্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্বে সিহুদেশের তীরভূক্ত অধিবাসীদের দলের বহু লোক সমুদ্রগামী তরীর সাহায্যে সাগরমধ্যে জলদস্যুগিরি করিত। উহারা সাগর-পারস্থিত অত্র দেশে নামিয়া লুণ্ঠ-পাট করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। পারশ্ব সম্রাটদিগের সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহাদের উপদ্রব কিছু অধিক ছিল। ষ্ট্রাবো (Strabo) এবং এরিয়ান (Arrian)-লিখিত বিবরণ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, উহাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া পারসিকরা টাইগ্রিস নদীতে যাহাতে অধিক দূর পর্যন্ত নৌকা লইয়া যাইতে না পারা যায়, সেজন্ত নদীগর্ভে পাথর ফেলিয়া রাখিয়াছিল (১১)। রবার্টসন বলেন,

(১১) Strabo, Geography xvi 7; Arrian vii 7. Elliot History of India vol. 1. p. 512 foot note, and Robertson's Disquisition p. 160.

ধর্মবিশ্বাসের জন্মই টাইগ্রিস নদীগর্ভে পারসিকরা পাথর ফেলিয়াছিল। তাঁহারা সাগরতীরে কোন প্রসিদ্ধ সহরের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সে কথা সত্য নহে। অত্রাণ ঐতিহাসিকদিগের মতে ভারতীয় জলদস্যুদিগের ভয়ে তাঁহারা ঐ কার্য করেন নাই। সিহুদেশের জলদস্যুদিগের উৎপাত-কালে অল হাজাজ কর্তৃক সিহুদেশ আক্রান্ত হইয়াছিল। উহাই ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ। দাহিরের পুত্র হুশিশা হাট আলি শর্কিতে মুসলমানদিগের সহিত নৌ-যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রণতরীগুলি বিপথে চালিত হওয়ায় তিনি যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দী হইয়াছিলেন।

এই সকল দেখিয়া বিশেষভাবে বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে বহু রাজ্যে নৌবাহিনী ছিল। এত প্রমাণ সত্ত্বেও যাহারা এই সত্য অস্বীকার করেন, তাঁহাদের ঐরূপ অস্বীকৃতির অত্র কোন কারণ থাকিতে পারে। সে কারণ নিশ্চিতই ঐতিহাসিক কারণ নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

কালোর আলো

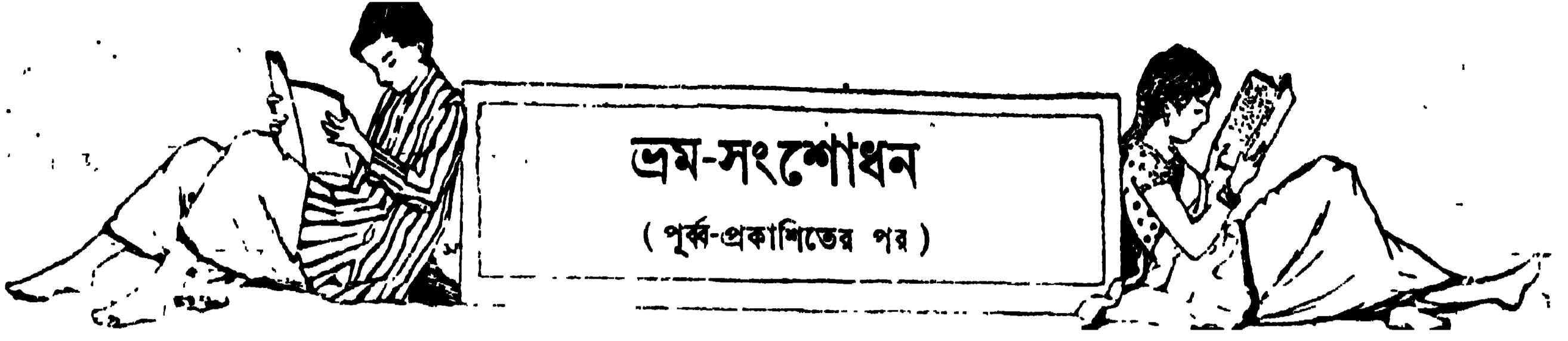
কালো বলে দূরে ঠেলেছি ব'লে,
অভিমাণে তাই আছ কি স'রে ?
য্যাকুল এ হিয়া আকুলিয়া খুঁজি—
ফিরে আসে পুম চিত্তপুরে।

বিরাত গগন নীল দিয়ে ঢাকা,
বিশ্বজননী আমার কালো।
শ্রাম নটবর চতুর, চটুল,
সে যে গোপিকার হৃদয়-আলো ;

অস্ত্র যাহার নাহি পায় নর,
জ্ঞানের গরিমা না পায় দেখা।
ত্রিভুগ সায়রে গভীর যা কিছু,
কালোর আঁধারে রহে যে ঢাকা।

ধাক' দূরে তাহে কোনো কতি নাই,
দীনার অর্থ্য রাখিয়ে বুক ;
জননীর স্নেহ রূপে নহে বাধা
অস্ত্র:সলিলা বহে যে চুপে।

অপরিচিতা।



ভ্রম-সংশোধন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৯

সাধারণতঃ রাত্রিতে মহেশচন্দ্র জামাতাকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসিতেন। সেই সময় তথায় পারিবারিক সম্মিলন হইত, বলা যায়—নারায়ণী, সুমতি, সরমা সকলেই তথায় সমবেত হইতেন। যে দিন সুধীর চলিয়া গেল, সেই দিন যথাকালে ভৃত্য আসিয়া মহেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, জামাই বাবু বাড়ীতে নাই, সে কি তাঁহার আহারের আয়োজন করিবে? স্নান, আহার, কাষ সম্বন্ধে মহেশচন্দ্র নির্দিষ্ট সময় রন্ধার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিলেন—“সব ঠিক কর। সুধীর এখনই এসে পড়বে।” পনের মিনিট পরে ভৃত্য আসিয়া বলিল, জামাই বাবু আইসেন নাই। তাঁহার আহাৰ্য্য দিতে বলিয়া মহেশচন্দ্র ভাবিলেন, সুধীর কোথায় গেল? বায়স্কোপ, থিয়েটার—এ সকল সুধীব দেখিতে বাইত না; সে কেবল মাতা, ভ্রাতাকে বা ভগিনী-ভগিনীপতিকে দেখিতে বাইত—কিন্তু বাইবার পূর্বে না বলিয়া বাইত না এবং কখন ফিরিতে এত বিলম্ব করিত না।

আহার করিতে বসিয়া মহেশচন্দ্র মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুধীর কোথায় গেল?”

নারায়ণী বলিলেন, “তা' কেহ বলতে পারে না।”

“গাড়ী ফিরে এসেছে?”

“না। সে গাড়ী নিয়ে যায়নি।”

“তবে নিশ্চয় প্রভানাথ এসেছিল, তা'র সঙ্গে গেছে। মা, তুমি যে সাড়ায় এঞ্জিনিয়ার বাবুর ছেলের আমাদের বাসায় এলে বাড়ী ফিরতে আগ্রহ দেখে বলতে—‘খাট-দাট ভুলি না—তত্ত্বকথা ছাড়ি না,’ সুধীরেরও তেমনই, যত কাষই কেন থাকুক না, তা'র মধ্যে অবসর ক'রে মা'কে দেখতে যা'বেই। আজ যে কাষ করেছে, তা' আর কেহ হ'লে তিন দিনে শেষ করতে পারত না। কি ছেলে!”

“তুমি ত জান, মা ছেলেমেয়ে-অন্ত প্রাণ। বাপেরও তা'ই ছিল। ছেলেমেয়ে ডাকলে বাবা বা মা কেহ ‘বাবা!’ আর ‘মা!’ ছাড়া উত্তর দিতে কখন শুনে নাই।”

“আমার বোধ হয়, প্রভানাথ এসেছিলেন—তা'র সঙ্গে গেছে।”

“কিন্তু না ব'লে ত যায় না। আসতে যেতে প্রণাম করে—বারণ করলেও শুনে না।”

“হয়ত সময় পায়নি। এখনই এসে পড়বে।”

আলোচনা যতই অগ্রসর হইতেছিল, এক জনের পক্ষে তাহা তত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছিল। যে আশঙ্ক্য কাহারও কল্পনায় স্থান পায় নাই, তাহাই সরমার মনে উদ্ভিত হইয়াছিল। তাহার বিশ্বাস—সুধীর বাগ করিয়া গিয়াছে। যদি সে ফিরিয়া না

নারায়ণী ও সুমতি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন—তাহার পর মনে করিলেন—সুধীর সে দিন আর আসিবে না। তথাপি তাঁহারা তাহাব জন্ত আহাৰ্য্য গুছাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন।

যদি কখন সুধীর কোন কাষে মাতার নিকট থাকিত, তবে নারায়ণী রাত্রিকালে সরমার কাছে থাকিতেন। আজও তাহাই হইল। তিনি শয়ন করিয়া সরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুধীর কি তোকেও ব'লে যাবার সময় পায়নি—কোথায় গেল?”

সরমা বিরক্তভাবে বলিল, “না।”

নারায়ণী যেন কতকটা আপনার মনে আপনি বলিলেন, “তাই ত—এখন তোরা কিছু মানিস না, আজ সংক্রান্তি, মুখের খাবার প'ড়ে রইল। আমি মহেশকে মনে ক'রে দিই নি, শুনে ওর মন খারাপ হ'ত।”

সরমা কোন কথা বলিল না, কিন্তু অঙ্গে সহসা কোন তপ্ত জ্বরের স্পর্শে যেমন হয়, তাহার মনে তেমনই হইল—“সংক্রান্তি!” সে জানিত, সংক্রান্তির দিন পিতামহী কোন ভৃত্যকেও বাড়ী বাইতে দিতেন না—“পক্ষান্তে নিফলা যাত্রা মাসান্তে মরণং ধ্রুবম্।” “মুখের ভাত প'ড়ে রইল”—পিতামহীর এই কথায় তাহার মনে পড়িয়া গেল, সুধীর যখন চলিয়া যায় তখন ভৃত্য (নিশ্চয়ই তাহার আদেশে) তাহার পানের জন্য জল আনিয়াছিল, সে তাহাও পান করে নাই।

মধ্যরাত্রিতে পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া নারায়ণীকে শয্যায় দেখিয়া বলিল, “বড়মা, বাবা কই?”

নারায়ণী বলিলেন, “তোমার ঠাকমা'র কাছে গেছেন।”

“কেন?”

“কাল আসবেন।”

তাহার পর শিশু নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল—শিশু যখন প্রশ্ন করে, তখন তাহার শেষ হইতে চাহে না।

মহেশচন্দ্র একাধিক বার বসু মহাশয়ের গৃহে টেলিফোন দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুধীরই সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। আজ নারায়ণীর মনে হইল, তথায় টেলিফোন না থাকায় কি অসুবিধাই হইল। সে রাত্রিতে তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না—নানা হুশিঙ্কা তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি যখন স্নান করিতে গমন করিলেন, তখন তাঁহার দাসী বামা আসিয়া বলিল, “মা, একটা কথা বলব?” বামা অপ্রয়োজনে এত অধিক কথা কহিত যে, আজ সে একটা কথা বলিবার জন্ত অসুস্থ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, “বল।”

বামা বলিল, “জামাই বাবু দিদিমণির সঙ্গে কথা-কাটা-কাটির পর চ'লে গেছেন।”

“তোকে কে বললে ?”

তখন সে বাহা বলিল, তাগাতে প্রকাশ পাইল, যে ভৃত্য সুধীরের আদেশে তাহার জন্ম শীতল জল লইয়া গিয়াছিল, সে ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল; সুধীর হাতমুখ ধুইতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া তৃষ্ণার সময় জল পান পর্য্যন্ত না করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভৃত্য রাত্রিতে বৃদ্ধ ভৃত্যকে—কি হইয়াছিল, তাগা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পূর্ববর্তী ঘটনা জানিয়াছে; ভৃত্য মহলের আলোচনাফল দাসী-মহলে আসিলে দাসীরা তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছে; আর দুই বা ততোধিক স্ত্রীলোক যখন কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন কে তাহাদিগের রসনার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে ?

তিনি নারায়ণীর দুর্ভাবনার অস্তর বহিল না। তিনি কি করিলেন, তাগাই ভাবিতে ভাবিতে স্থান কবিত্তে গমন করিলেন। স্নানান্তে তিনি—অভ্যাস মত পূজার সব আয়োজন করিয়া—ফুল সাজাইয়া, চন্দন ঘষিয়া লইয়া পূজায় বসিলেন। পূজা শেষ করিয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম-কালে, তিনি বিশেষ ভাবে সুধীরের ও সরসার মঙ্গল-প্রার্থনা জানাইলেন।

পূজার পর তিনি পূজাবধিকে সকল কথা জানাইলেন। তাহার মাথায় যেন আশাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কাতর ভাবে বলিলেন, “মা, কি হ’বে ?” এমনই একটা ঘটনার আশঙ্কা উভয়েবই ছিল।

আজ উভয়ই প্রথম ভাবনা হইল—মহেশচন্দ্রকে কিরূপে এ কথা জানাইবেন ? তিনি রুট্ট হইলেন, তাগাই আশঙ্কায় একমাত্র কাণ্য নহে; তিনি কিরূপ ব্যথিত হইবেন, তাগাই আতঙ্কের কারণ।

নারায়ণী বৃদ্ধ ভৃত্যকে ডাকাইয়া পূর্বদিন কি ঘটয়াছিল, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেন। সে প্রথমে স্বীয় দোষ গোপন করিবার চেষ্টাই করিল বটে, কিন্তু সেই সময় সত্যত্রয় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সে-ই বলিয়া দিল, ভৃত্য তাগাকে বলিয়াছিল, সে বড় হইলে চুড়ট “খাইবে।” নারায়ণী রুট্ট হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন, “তোমার এত বড় সাহস যে মিথ্যা কথা বল—আবার জামাই বাবুর নামে দিদিমণির কাছে নালিশ করিতে যাও। এ বাড়ীতে তোমার অন্নমল শেষ হয়েছে !”

ভৃত্য চলিয়া গেল।

সুস্মিত বলিলেন, “মা, ওকে বকলে কি হ’বে ? বা’র ব্যবসারে ওর সুধীরের কথায় আবার নালিশ করবার সাহস হয়েছে, দোষ জা’র। কি শিক্ষাই হয়েছে।” তিনি কান্দিয়া ফেলিলেন।

সত্যত্রয় নারায়ণীর ক্রোধ-বিকাশে ও পিতামহীর ক্রন্দনে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল; তাহার পর ধীরে ধীরে নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বড়মা, বাবা কোথায় ?”

নারায়ণী সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি সরকারকে ডাকাইয়া বঙ্গ মহাশয়ের গৃহে বাইতে নির্দেশ দিলেন।

সরকার ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সুধীর গতকল্য বাড়ীতেই গিয়াছিল, কিন্তু প্রাতে চলিয়া গিয়াছে, খলিয়া গিয়াছে, সে যে স্থানে বাইতেছে—তথায় বাইয়া সংবাদ দিবে।

ততক্ষণে মহেশচন্দ্র বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি প্রাতে স্থান করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন—বেড়াইতে বাইয়া

তিনি যে যে স্থানে কাষ হইতেছে, সে সব পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেন।

গৃহে ফিরিয়া যান হইতে অবতরণ করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“সুধীর কি আসিয়াছেন ?”

স্বাধীন বলিল, “না।” সঙ্গে সঙ্গে সে রোলটপ টেবলের চাবী দিয়া বলিল, সুধীর পূর্বদিন বাইনার সময় আজ তাঁহাকে দিবার জন্ম তাগাকে চাবীটি দিয়া গিয়াছিল।

চাবী লইয়া মহেশচন্দ্র তাহার আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন—চাবী ঘুরাইয়া টেবলের ডালটি তুলিয়া দিলেন। এই টেবল তিনিই ব্যবহার করিতেন; কিন্তু দুই বৎসরের অধিক কাল সুধীর কাষ বুলিয়া লইবার পর ইহা তাগাকে ব্যবহার করিতে দিয়া—অর্থাৎ ইহার ব্যবহারভার তাগাকে দিয়া তিনি কতকটা অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি লক্ষ্য রাখিতেন—পাছে সুধীরের অনভিজ্ঞতায় কোন ভুল হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বুলিয়া ছিলেন, সুধীর কাষ এমন আয়ত্ত করিয়াছে যে, তাহার আর লক্ষ্য রাখিবারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে তাঁহাকে সব কাষের বিষয় জানাইত এবং সব হিসাব দেখাইত।

তিনি টেবল খুলিয়া দেখিলেন, সুধীর সে দিনের ও পরবর্তী দুই দিনের কাষের তালিকা ও টাকার হিসাব লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ইহাই তাহার কাষের রীতি ছিল।

মহেশচন্দ্র ভাবিলেন, সুধীরের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হয়, তবুও কাষের কোন ক্ষতি হইবে না।

তিনি ভাবিলেন, সে আসিল না কেন ?

এই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, নারায়ণী তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

তিনি বাইতেছেন বলিয়া যে সব কাগজে স্বাক্ষর দান করিবার ছিল, সেগুলির কতকগুলিতে স্বাক্ষর দিয়া আফিস-ঘর ত্যাগ করিলেন। ততক্ষণে ওভারসিয়ার, কেবাণী প্রভৃতি আসিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে কাষ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

১০

সুধীর যখন তাহার গৃহে আসিতেছিল, তখনই সে বুলিয়াছিল, তাহার তথায় থাকিবার সৌভাগ্য হইবে না। তাহার কারণ, প্রথম—মহেশচন্দ্র আসিয়া তাগাকে সঙ্গে বাইতে বলিলে সে রুট্ট-ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না, দ্বিতীয়—দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহার গৃহে স্থিতি পন্নোতে কৌতূহলতীক্ষ্ণ আলোচনার বিষয় হইবে।

সে ট্যাক্সীতে আসিয়াছিল; সেই জন্ম তাহার মোটরের হর্পে অভ্যস্ত ভ্রাতৃপুত্র তাহার আগমন বুলিতে পারে নাই। কিন্তু সে ট্যাক্সীর ভাড়া মিটাইবার সময়—কত ভাড়া জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার কণ্ঠস্থর পাইয়া তাহার পালিত কুকুরটি সানন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে আসিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিয়া আনন্দব্যঞ্জক ডাক ডাকিলে তাগা শুনিয়া তাহার ভ্রাতৃপুত্রও ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর সে আবার ছুটিয়া বাইয়া পিতামহীকে সংবাদ দিয়াছিল, ফাকাবাবু আসিয়াছেন।

শুনিয়া মা যখন আসিলেন, ততক্ষণে সুধীর সুধীরের বসিবার

অন্য দানার পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়াছে। মা আসিলেই সুধীর উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজই কি বা’বি?”

সুধীর বলিল, “না, মা, আর বা’ব না।”

পুত্রের কথা অপেক্ষা তাহার কণ্ঠস্বরে কাতরতার অভিব্যক্তিতে মা অধিক বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে, বাবা?”

“মা, যদি কিছুই না হয়ে থাকে, তবুও কি মা’র কোলে ফিরে এসে আমি সেখানে স্থান পাব না?”

“তোমার কি সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ হয়েছে, সুধীর?”

“না, মা, তা’ হয়নি। তুমি তৃপ্ত করেছ, বাবা আমাদের তোমার কাছে রেখে চলে বাবার পর হ’তে তোমার ছেলেমেয়ে কেহ কখন তোমার কাছে কোন আশ্রয় করেনি। আজ মনে কর, আমি একটা অন্তায় আশ্রয়ই করছি। তোমাকে তা’ও পূর্ণ করতে হ’বে।”

মা কান্দিতে কান্দিতে পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। মা’র কাছে সন্তান শিশু।

সুধীরের মনে হইল, মাথার মধ্যে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহা নির্ঝাঁপিত হইতেছে। সে মুখ তুলিয়া মা’কে বলিল, “মা, আমি জানি, তুমি আমার অপবাদও ক্ষমা করবে। কিন্তু, মা, যিনি বেঁচে থাকলে মহেশ বাবুর অন্ত্রবোধ কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না, তোমরা এই কথা বলানেই আমি মহেশ বাবুর প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিনি, তাঁ’র কাছে সে ক্ষমা চাহিতে পারলাম না—এই আমার বড় ত্রুটি।” তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল। দীর্ঘ দিনের সংযমদমিত বেদনা আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

মা তখনও কান্দিতেছিলেন। তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা দিলেন, “বাবা, তোরা ত জানিস, আমিও তোদের তাঁ’র মত ভালবাসতে পারিনি। তিনি তোমার কোন কাষে রুগ্ন হ’তে পারেন না।”

সুধীর একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল, “মা, মহেশ বাবু বলেছিলেন, বাবার পৌত্র—তাঁ’র দেহিজে বাবার সাহায্যে তাঁ’র সংগৃহীত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ’বে—এই তাঁ’র বিশেষ ইচ্ছা। সে তাঁ’র সে ইচ্ছা পূর্ণ করুক—আমি—তাঁ’র বাবা—এই আশীর্বাদ তাঁ’কে করছি। তুমিও আশীর্বাদ কর, সে সং ও সুস্থ থেকে তাঁ’র সে ইচ্ছা পূর্ণ করুক। আমি গরিবের ছেলে, আমার সম্পত্তির লোভ যেন না হয়। যদি কখন তাঁ’র কোন প্রয়োজন হয়, তাঁ’র বাবা, তাঁ’র জ্যেষ্ঠা বৃকের রক্ত দিয়ে তাঁ’র কল্যাণ সাধন করবে।”

কিরূপ অবস্থায় সুধীর এইরূপ চঞ্চল হইতে পারে—কিরূপ ঘটনার পর্কিত আন্দোলিত হয় তাহা মা-ও বুঝিলেন—সুধীরও বুঝিল। তাহার সুধীরকে সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিলেন না।

সে রাত্রিতে মা ঘুমাইতে পারিলেন না—নানা অস্পষ্ট আশঙ্কায় তাঁহার মন চঞ্চল হইতে লাগিল। তিনি স্বামী’র কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন—তিনি জীবিত থাকিলে আজ এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নিশ্চয়ই করিতে পারিতেন। তিনি যে স্থানেই কেন থাকুক না, যে সন্তানদিগকে প্রাণাধিক মনে করিতেন, আশীর্বাদে’র দ্বারা কি তাহাদিগের সকল অমঙ্গল দূর করিবেন না?

তিনি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এ বিপদ যেন বালার্কিরণে অন্ধকারের মত দূর হইয়া যায়।

প্রত্যুষে তিনি স্নান শেষ করিয়া আসিয়াই শুনিলেন, সুধীর তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রকে ডাকিতেছে, সে কি তাহার সহিত বেড়াইতে যাইবে?

মা যখন তাহার নিকটে আসিলেন, তখন ছায়াও তথাক্ আসিয়াছে।

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরপো, একটু দেবী করুন, আমি ওর মুখ-হাত-পা ধুইয়ে দিচ্ছি।”

সুধীর হাসিয়া বলিল, “সে হ’বে না। তুমি কি মনে কর, ওর আর কেহ নাই যে, ওর মুখ-হাত-পা ধুইয়ে দিতে পারে?”

মা বলিলেন, “কোথায় যাবি, বাবা?”

সুধীরও আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে যে দুই কারণে তখন বাড়ীতে থাকিবে না স্থির করিয়াছিল, তাহা বলিল; তাহার পর বলিল, সে প্রভানাথের কাছে যাইবে; চিত্রাকে দেখিয়া প্রভানাথের সহিত গোটাকতক কথা বলিয়া সেই দিনই বাহিরে যাইবে—কোথায় যাইবে তাহা প্রভানাথকে বলিয়া যাইবে।

সে যাহা বলিল, তাহাই করিল। মা’কে ও দাদাকে প্রণাম করিয়া—কুকুরটাকে আদর করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

প্রভানাথকে সে তাহার সঙ্কল্পের কথা বলিয়া বলিল, “তোমার সঙ্গে আমার স্থির হয়ে পরামর্শ করবার আছে। আমি আজই পলাব—যদি দার্কিলিং যাই, তুমি দুই তিন দিনের মধ্যে যেতে পারবে?”

চিত্রা শুনিয়া বলিল, “পারতেই হ’বে।”

প্রভানাথ বলিল, “এখনও সময় আছে, আমি সব কাবের ব্যবস্থা ক’রে আজ তোমার সঙ্গেই যাব। কারণ, দিন পাঁচেক পরে কতকগুলো কাষ পড়বে।”

সে চিত্রাকে বলিল, “আমার জিনিস সব গুছিয়ে দাও। সব দু’ দফা দিও—কাপড়, জামা, কঞ্চল সব—সুধীর ত কিছুই আনে নাই।”

সুধীর ভগিনীকে বলিল, “দিদি, মা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছেন; তুই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আজ এক বার তাঁ’র কাছে বাস।”

স্থির হইল, প্রভানাথ তখনই বাহির হইয়া যাইয়া সব কাবের ব্যবস্থা করিয়া আসিবে; আহা’র করিয়া সব জিনিস লইয়া সুধীর যাইয়া ট্রেশনে “ওয়েটিক্রমে” তাহার অল্প অপেক্ষা করিবে, উভয়েই দার্কিলিং যাইবে।

প্রভানাথ চিত্রাকে বলিল, যদিও সুধীরের ধৈর্য ও ঠৈর্য অসাধারণ, তবুও আঘাতের ফল একটু দূর না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে একক ছাড়িয়া না দেওয়াই ভাল। সে তাহার সঙ্গেই যাইবে। সে আরও বলিল, চিত্রা যেন পিত্রালয়ে যাইয়া এ সংবাদ দেয় এক সুধীরকে শনিবারে যাইতে বলে—তিন জন পরামর্শ করিবে; ইতোমধ্যে কলিকাতায় যাহা হয়, সে সংবাদও তাহার সুধীরের নিকট পাইবে এবং তাহাও জানা প্রয়োজন।

সুধীর মনে করিল, মহেশচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া যাওয়া তাহার কর্তব্য। সে প্রভানাথের গৃহ হইতে পত্র লিখিয়া প্রভানাথের কর্মচারীকে তাহা মধ্যাহ্নের পর যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতে বলিল।

আহারের পরই সুধীর বাহির হইল ; ভয়—পাছে বিলম্ব হইলে মহেশচন্দ্র আসিয়া পড়েন।

সুধীর

১১

নারায়ণীর আহ্বানে মহেশচন্দ্র তাঁহার নিকট আসিলেন এবং আঁসিয়াই বলিলেন, “সুধীর কাল যাবার সময় টেবলের চাবী ঝারবানের কাছে রেখে—আমাকে দিতে ব’লে গেছেন। ব্যাগারটা কি হ’ল, বঁকতে পারছি না।”

“সেই কথা বলবার জন্তই তোমাকে ডেকেছি।”

তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া মহেশচন্দ্রের বসিবার জন্ত একখানি চেয়ার দিতে বলিলেন এবং সে চেয়ার লইয়া আসিলে তাহাকে যাইতে বলিলেন। তাহার পর তিনি পূর্কদিনের ঘটনার বিবরণ ষতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, জানাইলেন। মহেশচন্দ্র যেন প্রস্তর-মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া সেই অপ্রত্যাশিত বিবরণ শুনিলেন—নারায়ণীর কথা শেষ হইলেও কয় মিনিট তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না, তাহার পর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া পাড়াইলেন।

পার্শ্ব কক্ষ হইতে সুমতি ও সরমা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে-ছিলেন।

মহেশচন্দ্র উঠিয়া পাড়াইবার পর ভৃত্য আসিয়া বলিল, তাঁহার আহ্বাণ প্রস্তুত।

মহেশচন্দ্র যে কক্ষে আহার করিতেন, সেট কক্ষে গমন করিলেন। নারায়ণী সঙ্গে গমন করিলেন।

মহেশচন্দ্র আহার করিতে বসিলেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ যে আহ্বাণ গ্রহণ করিতেন, তাহার অর্ধাংশও আহার করিতে পারিলেন না। নারায়ণী পুত্রকে কখন এত চিন্তাকুল—এত চঞ্চল দেখেন নাই।

সত্যতঃ নিদ্রা-ভঙ্গের পর হইতে বহু বার পিতার সন্ধান করিয়াছে ; সে আসিয়া নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বড়মা, বাবা কই ?”

মহেশচন্দ্র বলিলেন, “চল, দাছ, আমরা তা’কে আনতে যা’ব।”

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি এখনই যা’বে ?”

“প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হ’বে। কতকগুলো স্বাক্ষর করবার—চিঠিগুলো দেখে উত্তর দেবার আছে। সুধীর কাষটা যে অনেক বাড়িয়েছেন। তুমি যা’বে ?”

“হাঁ।”

“তবে তাড়াতাড়ি শেষ ক’রে লও।”

নারায়ণী তাড়াতাড়িই শেষ করিয়া লইলেন। তিনি পুত্রবধূর ও সরমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং দাসী আসিয়া যখন জানাইল, তাঁহার রন্ধনশালার উনানে অগ্নি জ্বলিত হইয়াছে, তখন তাহাকে বলিলেন, “অঁচ নামিয়ে দাও, আমি আজ রাঁধব না।”

সুমতি বলিলেন, “খা’বেন না ?”

নারায়ণী বলিলেন, “না, মা। আজ আর রাঁধতে পারব না।” তাহার পর যেন অন্তমনস্কভাবেই তিনি চিন্তাকুলভাবে বলিলেন, “মহেশ খেতে পারলে না। ওকে এমন চিন্তিত আমি কখন দেখি নাই।”

সুমতি তাড়াতাড়ি যাইয়া গরদের কাপড় পরিধান করিয়া—গল্লাজল স্পর্শ করিয়া শান্তুড়ীর জন্ত ফল ছাড়াইয়া—ফল, মিষ্ট ও দুগ্ধ দিলেন।

নারায়ণী বলিলেন, “এত আয়োজন কেন ?” তিনি অধিকাংশ আহ্বাণ্য পাত্রান্তরে রাখিয়া কিছু আহার করিলেন।

বেলা একটার সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মহেশচন্দ্র বাহিরে যাইবেন—মা’কে আর খোকা বাবুকে যাইতে বলিয়াছেন।

নারায়ণী সত্যতঃ সঙ্গ লইয়া দেবতা স্মরণ করিয়া পুত্রের সহিত বসু মহাশয়ের গৃগতিমুখগামী হইলেন।

মহেশচন্দ্রের মুখে দ্রাক্ষণ উষ্মের বিকাশ। তিনি জীবনে কোন কাষে পরাজয় লাভ করেন নাই—এ বার কি তাঁহার পরাজয় হইবে ? এ পরাজয় যে সর্বনাশ !

গাড়ী গৃহস্থারে উপনীত হইলে ভৃত্য যাইয়া মা’কে সংবাদ দিল—ছোটদাদা বাবুর স্বস্তর, তাঁহার মাতা ও ছোটদাদা বাবুর পুত্র আসিয়াছেন।

নারায়ণীর পূর্কই ছায়া আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সত্যতঃ ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

সত্যতঃ জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা কোথায় ?”

ছায়া বলিল, “বেড়াতে গেছেন।”

“আসবেন ?”

“হাঁ।”

ছায়া তাহাকে অল্প কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুধীরের মাতা আসিয়া নারায়ণীকে প্রণাম করিলে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৌমা, সুধীর কোথায় ?”

মা বলিলেন, “কাল সন্ধ্যার সময় হঠাৎ এসেছিল। আজ সকালেই চলে গেছে।”

“কোথায় গেল ?”

“তা’ বললে না।”

“তুমি জিজ্ঞাসা কর নাই ?”

“না, মা। তা’র ভাব দেখে আমি যেমন কি হয়েছে, তা’ও জিজ্ঞাসা করি নাই, তেমনই আজ সকালে যখন সে বলল, কোথায় যা’বে তাহা আমরাদিগকে এখন বলবে না, তখন আমিও আর জানতে জিদ করি নাই।”

“নিজের কথা কিছুই বলে নাই ?”

“না।”

সুধীরের আগমন হইতে তাহার গমন পর্য্যন্ত সে যাহা বলিয়াছিল, মা যথাসম্ভব সে সবই বলিলেন—বলিতে বলিতে কান্দিতে লাগিলেন।

নারায়ণীও কান্দিতে লাগিলেন।

সত্যতঃ ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, “সকলেই কাঁদে কেন ?”

ছায়া সে প্রশ্নের কি উত্তর দিবে ?

মা যে পুত্রকে তাহার কার্যের কারণও জিজ্ঞাসা করেন নাই, তাহাতে মহেশচন্দ্রের মনে তাঁহার প্রতি যেমন শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, তেমনই তাঁহার কথা শুনিয়া সুধীরের সম্বন্ধে তাঁহার প্রশংসা আরও বর্দ্ধিত হইল। সে অনিচ্ছায় হইলেও কি ভাবে কণ্ঠব্যনিষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

নারায়ণী সুধীরের মাতাকে বলিলেন, “বৌমা, কি হয়েছে ;

তা' ঠিক আমরাও বুঝতে পারি নাই—সেই জন্তই কি করব তা'ও বুঝতে পারছি না। তুমি সুধীরকে বলবে—যদি সরমা কোন অপরাধ করে থাকে, তবে আমি তা'র হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি—সে আমাকে ক্ষমা না করে পারবে না।”

মা বলিলেন, “মা, ও কথা আপনি বলবেন না। আপনি ক্ষমা চাইলে সুধীরের অকল্যাণ হবে। সে গুরুজনের কথার অবাধ্য হয় না। এ বিবাহে সে প্রথমে একরূপ আপত্তিই করেছিল; কিন্তু যিনি থাকলে আজ হয়ত এমন হ'ত না, তিনি বেঁচে থাকলে ঠাকুরপোর কথায় অসম্মত হ'তে পারতেন না—এই কথাতেই সে আর আপত্তি করেনি।”

“তোমার ছেলেদের মত ছেলে লাখে একটি দেখা যায় না, মা। সুধীর এলেই তুমি আমাকে সংবাদ দিও।”

“তা' দেব।”

মহেশচন্দ্র এত ক্ষণ কোন কথা বলেন নাই, এইবার বলিলেন, “সুধীর যদি পারে কাল যেন এক বার আমার সঙ্গে দেখা করে।”

তাহার পর তাঁহারা গমনের উদ্যোগ করিলেন।

নারায়ণী ছায়ায় বলিলেন, “মা, সতুকে একটু মিষ্টি এনে দাও।”

সুধীরের পুত্রকল্পা সত্যত্রয়ের জন্ত আপনাদিগের খেলানার সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ আনিয়া দিল। মা তাহাকে লইয়া তাহার মুখ-চন্দন করিয়া বলিলেন, “আবার কবে আসবে?”

সত্যত্রয় বলিল, “বাবার সঙ্গে আসব।”

বাইবার পথে মহেশচন্দ্র প্রভানাথের গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় যখন গুলিলেন, প্রভানাথ সুধীরের সঙ্গে গিয়াছে, তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। মনের বর্তমান অবস্থায় সুধীর একা যাইলে তাহাতে যে আশঙ্কার কারণ ছিল—তাহাই তিনি এত ক্ষণ মনে করিতেছিলেন।

মহেশচন্দ্র প্রভানাথের গৃহ হইতে আসিয়া গাড়ীতে বসিলেন নারায়ণী যেন অল্পমনস্কভাবে বলিলেন, “সবই আমাদের অদৃষ্ট!” বলিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ভাগ করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া মহেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। অদৃষ্ট! তিনি কোন দিন পুরুষকার ব্যতীত কিছু স্বীকার করেন নাই। আজ তাঁহার মনে হইল, তিনি স্বীকার না করিলেও যে অনেক ব্যাপার ঘটিতে পারে—তাহার প্রমাণ তিনি আজই পাইয়াছেন—তেমনই কি অদৃষ্ট আছে? তাহার পর—যদি অদৃষ্ট থাকে, তবে এত দিন সে তাঁহাকে অল্পগ্রহ করিয়া এই বার কি সে অল্পগ্রহে তাঁহাকে বঞ্চিত করিল?

গৃহে আসিয়া তিনি সুধীরের পত্র পাঠিলেন :—

প্রণামান্তে নিবেদন,

আপনি আমাকে যে কাষের ভার দিয়া অল্পগ্রহীত করিয়াছিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম, আমি তাহার উপযুক্ত নহি। তাহা বুঝিবার পর আর সে কাষের ভার লইয়া থাকা যেমন আত্মপ্রবন্ধনা—তেমনই আপনার মত স্নেহশীল অভিভাবকের সহিত অস্তায় ব্যবহার—সুতরাং অপরাধ। তাই আমি সে কাষের ভার ত্যাগ করিলাম। সে জন্য আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমরা দুই ভ্রাতা পিতৃহীন হইবার পর হইতে আপনি যে স্নেহে আর্থা-দিগের অভিভাবক করিয়াছেন, সেই স্নেহে নির্ভর করিয়া আশা

করিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনাকে অসুবিধায় ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম, সে জন্য এবং আসিবার সময় যে আপনাদিগকে প্রণাম করিয়া আসি নাই, সে জন্য আমার অপরাধও ক্ষমা করিবেন। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করিয়া বাঞ্চিত করিবেন। কাষের হিসাব ও অন্যান্য কাগজ যথাস্থানে আছে।

প্রণত

সুধীর

মহেশচন্দ্র পত্রখানি পাঠ করিলেন। যে অবসাদ তাঁহাকে অভিভূত করিল, তাঁহার মনে হইল, তিনি আর কখন তাহা অনুভব করেন নাই। তিনি কাষ সঙ্ক্ষেপে আপনার তুল বুঝিলেন। কাষের জন্ত কাষে যে আনন্দ থাকে, তাহা স্থায়ী হয় না। কোন চিত্রকর আপনার চিত্র দেখিয়া আনন্দ লাভের জন্তই চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না; কোন স্থপতি তাহার কৃত মন্দির দর্শন-ভূপ্তির জন্ত কাষ করিতে পারে না; তাহাদিগের কার্যের প্রেরণা—তাহাদিগের ভাবে ভাবিত কোন বা কোন কোন দর্শক সে সকল দেখিয়া তাহারা ঐ কাষে যে আনন্দ লাভ করিয়াছে, সেই আনন্দই পাইবে। তিনি দরিদ্রের সম্মান, প্রথমে যে কাষেই অথচ মনোযোগ দিয়াছিলেন, তাহা দারিদ্র্য জয় করিয়া অভাব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত। তাহার পর তাঁহার উদ্দেশ্যের বিস্তার সাধিত হইয়াছিল—অভাব আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না জানিয়াও যে তিনি কাষ করিয়া গিয়াছেন—অথচ কাষকে ভার বলিয়া মনে করেন নাই, সে কেবল কাষের অভ্যাসে ও আনন্দেই নহে। আজও যে তিনি কাষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই তাহার যে কারণ এত দিন তিনিও, তাহার অস্পষ্টতা হেতু, বুঝিতে পারেন নাই, তাহা সুধীরের মাতাকে তিনি ষাধা বলিয়াছিলেন, সেই কথায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—তাঁহার দৌহিত্র তাঁহার অজ্ঞিত ও সম্ভূত সম্পত্তি লাভ করিবে—এই আশা ও কল্পনা তাঁহার পক্ষে আনন্দের কারণ ছিল। সে কল্পনা কার্যে পরিণত হইতেছিল—সে আশা ফলবতী হইতেছিল। সেই সময় এই অতকিত ঘটনার সংঘটন। মানুষের সকল কার্যের পূর্ণতার উপর যে বজ্রগর্ভ মেঘ যে কোন মুহূর্তে বজ্রাঘাত করিয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিতে পারে, তাহা তিনি এত দিন ভাবেন নাই—কিন্তু আজ তাহাই অনুভব করিলেন। সেই অনুভূতিও তাঁহাকে দারুণ অবসাদগ্রস্ত করিল। যিনি জীবনে কখন কোন কাষে বিফল-প্রয়ত্ন করেন নাই, তাঁহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্যে হতাশ হওয়া যে কিরূপ বেদনার কারণ, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না।

১২

চিত্রার নিকট প্রভানাথের প্রেরিত সংবাদ পাইয়া সুধীর আর শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিল না। কারণ, সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। সে কলেজে ছুটি লইয়া পরদিনই যাত্রা করিল। তাহারা কোথায় উঠিবে, তাহা প্রভানাথ বলিয়া গিয়াছিল।

দার্কিলিং-এ তিন জন পরামর্শ করিল। সুধীর বলিল; ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে চিন্তা করিয়া স্থির করা যাইবে, আপাততঃ বর্তমানের ব্যবস্থা করা যাউক। সে বলিল, সে হুগলী কলেজে ছয় মাসের জন্য অধ্যাপকের পদ পাঠিতে পারে;

তাহার প্রস্তাব, সে সেই পদ গ্রহণ করুক এবং তাহারা সকলে তথায় গমন করুক।

সুধীর বলিল, “দাদা, সরকারী কলেজে চাকরী তুমি পূর্বেও পেতে পারতে—লও নাই; কারণ, সরকারী চাকরীর বিধিনিষেধ আমাদের রাজনীতিক মতের পক্ষে বাধা হ’তে পারে। আজ তুমি আমার জন্যই সে চাকরী নেবে?”

সুধীর দৃঢ়ভাবে বলিল, “হাঁ। তুমি আমার ছোট ভাই—তোমার স্বপ্নে আমার কি কোন কর্তব্য নাই? আমি স্থায়ী চাকরী নিচ্ছি না। বর্তমানে দেশে এমন কোন রাজনীতিক অবস্থা দেখা যাচ্ছে না যে, সে জন্য কোন অসুবিধা হ’তে পারে।”

“কিন্তু তোমার সরকারী চাকরী না নেবার কি আর একটা কারণ ছিল না?”

“ছিল। বাবা যে বাড়ী করেছিলেন—আর যে বাড়ীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সে বাড়ী ছাড়তে মা’র কষ্ট হ’বে, তিনি না বললেও আমরা এই অনুমান ক’রেছিলাম। কিন্তু সে কথা যখন হয়েছিল, তখন আজ যে কথা উঠছে, সে কথা উঠেনি। তখন কলিকাতা হইতে দূরে গেলে, তুমিও দূরে পড়তে! সদাসর্বদা—ইচ্ছামত আসতে পারতে না। এখন আমরা হ’জনেই তাঁর কাছে থাকব। প্রথম দিনকয়েক চিত্রাও যাবে।”

প্রভানাথ হাসিয়া বলিল, “এ যে ‘বাঁড়ে বাঁড়ে যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়!’ আমাকে আবার হুগলী আর ঘর করা’বে কেন?”

তিন জন আলোচনা করিয়া আপাততঃ সুধীরের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা করাই স্থির করিল। সুধীর ও প্রভানাথ উভয়েই বিশ্বাস হইল—ব্যবস্থা অস্থায়ী হইবে। যে কয় মাস এই ব্যবস্থা থাকিবে, সে কয় মাস বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য ও দ্বারবান বাড়ীতে থাকিবে।

অন্যোপায় হইয়া সুধীর এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিল এবং আবশ্যিক আয়োজন করিবার জন্ত সুধীর কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

সুধীর চলিয়া যাইবার পর প্রভানাথ সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কি করবে—ভেবেছ?”

সুধীর বলিল, “ভাবছি, আবার আইন পড়ব।”

“আবার কেঁচে গজু ক’বে? ক’ বৎসর এত পরিশ্রম ক’রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলে, তা’ ব্যর্থ হ’বে?”

“কিন্তু উপায় কি?”

“আমি ডাবছি, তুমি যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও, তবে কেমন হয়?”

সুধীর ভাবিতে লাগিল। সুধীর বলিল, “আমার দাদা-মহাশয় বলতেন, একালে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রায়েব পাঁচালী গান হ’ত—দ্বন্দ্বযুদ্ধে বলতেন, ‘আমি যদি ছড়া বাঁধি, তিহু যদি গাহে, আর সন্ন্যাসী যদি বাজায়—তবে কে আঁচলে পয়সা নিয়ে যাব দেখি।’ তিহু তাঁর ভাই, আর সন্ন্যাসী বেগলা বাজাতেন। তখন স্ত্রীলোকরা আঁচলে পয়সা বেঁধে গান গুন্তে আসতেন, গান ভাল লাগলে—পয়সা ‘পেলা’ দিতেন। তেমনই আমরা শালা-ভগিনীপতি এক সঙ্গে জুটলে পুকুর পর্যন্ত চুরী হয়ে যাবে।”

সুধীর তাহার পর বলিল, “দাদা কলিকাতায় ফিরে আসবেন—আমার সে ইচ্ছা নাই।”

“কেন? তুমি কি ভাব, মেঘ হ’লে আর সর্ব্বোৎসর্গ করণ তখন

দেখা যাবে না? স্বপ্নেও মনে ক’র না, সরমার মনে অল্পতাপ তাঁর প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করবে না। আশুনে মা পুড়ালে সোণার ময়লা দূর হয় না—মানুষেরও তেমনই মথো মথো অল্পিতাপীকার প্রয়োজন হয়। মহেশ বাবুর ঐ কাষ তোমাকেই করতে হ’বে—আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি।”

সুধীর হাসিয়া বলিল, “ব্যবসায় বহর বাড়ছে না কি? দৈবজ্ঞ হ’লে কবে?”

“তোমার জন্ত—এই ক’ দিন হ’ল, তা’ হয়েছি। আমার মত দৈবজ্ঞরা ‘ভৃগুর’ নাগাল পান না—বর্তমান দেখে আন্দাজে ভবিষ্যৎবাণী করেন।”

“বর্তমানে কি দেখলে?”

“জান না—ইংরেজীতে একটা কথা আছে; সস্তানই মা’র নোঙ্গর—সে নোঙ্গর থাকতে মা’র পক্ষে ‘নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু।’ ছেলের জন্তই সরমার পরিবর্তন হ’বে—গর্ভ চূর্ণ হ’বে। তুমি কি মনে কর, তোমার ছেলে তুমি বিলিয়ে দিতে পার? সতুই উপর মা’র, বড় বাবুর, চিত্রার—সকলেরই অধিকার আছে—আমাদের অধিকার আমরা ছাড়ব না। আমরা তোমার মত কাপুরুষ নহি। ও বানের জলে ভেসে আসিনি—ও মহেশ বাবুর দৌড়িই নহে—ও বসু মগশয়ের পৌত্র।”

দেহের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্বল ও কোমল সেই অংশে আঘাত যেমন অত্যধিক বেদনাদায়ক হয়, তেমনই মনের যে স্থানে দৌর্বল্য অধিক সেই স্থানে আঘাত মানুষকে চঞ্চল করে। প্রভানাথের কথায় সুধীরের তাগাই হইল। পুস্তকের প্রতি তাহার স্নেহ অধিকই ছিল এবং সে মহেশচন্দ্রের গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার পর পুস্তকের কথা সর্ব্বদাই তাহার মনে হইত। পিতার অপরিণীম স্নেহে বঞ্চিত—সুধীর তাহার অপত্যস্নেহ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল এবং পুস্তকে সে কত যত্নে “মানুষ ক’রে” চেষ্টা করিত, তাহা তাহার মহেশচন্দ্রের গৃহত্যাগের কারণেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল।

সুধীর আর কিছু বলিল না—সে ভাবিতে লাগিল।

কাষের জন্ত সুধীরের গমনের দুই দিন পরেই প্রভানাথকে দাৰ্জিলিং হইতে বাইতে হইল।

প্রভানাথ বাইবার পর সুধীরের ভাবিবার অবসর আরও বৃদ্ধি পাইল। সে ভাবিতে লাগিল, সে আপনি সুখী হইতে পারিল না—সে জন্ত সে কাতর নহে; কিন্তু তাহার জন্ত যে মা গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাইবেন, ভ্রাতা আপনার ইচ্ছায় বিকৃত কাষ করিতেছেন—এই সব তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল।

তিন দিন পরে সুধীর লিখিল, সে হুগলী কলেজে অধ্যাপকের কাষ লইয়াছে—কর্মস্থানে গঙ্গার তীরে একটি গৃহও ভাড়া করা হইয়াছে—আবশ্যিক দ্রব্যাদি তথায় পাঠান হইতেছে; সে আসিয়া সেই দিনই তথায় বাইতে পারে।

পত্র পাইয়া সুধীর যাত্রা করিল।

এ দিকে প্রভানাথ ও সুধীর বাটরা মহেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহারা যে ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা বলিল। সুধীর বলিল, “মা আপনাকে এ সব জানাতে বললেন।”

মহেশচন্দ্র বলিলেন, “সুধীর এলে আমাকে সংবাদ দিও।”

প্রভানাথ বলিল, “আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি একটা কথা বলব।”

বল।”

“আমার মনে হয়, এখন সুধীরকে কোন কথা না বলাই ভাল। যে স্বভাবতঃ স্থির ও ধীর, সে যদি বিফল হয়, তবে আবার স্থির হ’তে বিলম্ব হয়। কাগেই সে বিকোভ দূর হয়। অবশ্য আপনার কাছে আমরা ছেলেমানুষ। আপনি যদি বলেন, আমরা আপনাকে সংবাদ দেব। সে আপনার কথা অবহেলা করবে না; কিন্তু যদি করে, আমাদের সে হুংখ রাখবার আর স্থান থাকবে না।”

মহেশচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “তা’ই হ’বে।”

সুধীর বলিল, “মা, প্রভানাথ, আমি—আমরা সুধীরকে বুঝাব, তা’র যে ভুল হ’তে পারে না এমন নহে। আপনি ঠাকুরমা’কে বলবেন, তিনি যেন স্বেচ্ছা ও অবসর বুঝে সরমাকে বুঝান—সে যদি ভুল করে থাকে, স্বামীর কাছে তা’ স্বীকার করার কোন বাধা থাক’তে পারে না; আর সুধীর যদি ভুল ক’রে থাকে, তবে তাঁ’কেই তা’কে ক্ষমা করতে হ’বে—তা’তে তাঁ’রই অধিকার।”

সুধীর সত্যব্রতের জন্ত খেলানা প্রভৃতি আনিয়াছিল; তাহাকে আনাইতে বলিল।

ভৃত্য ষাটয়া যখন বলিল, সুধীর ও প্রভানাথ আসিয়াছেন এবং সত্যব্রতকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন, তখন নারায়ণী তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তাহারা যাটয়া তাঁগাকে প্রণাম করিলে তিনি সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য সত্যব্রতকে লইয়া আসিলে সুধীর তাগাকে আপনার অঙ্কে বসাইয়া আদর করিল—তাহার জন্ত আনীত দ্রব্যগুলি তাগাকে দিল।

সরমা পার্শ্বের কক্ষে ছিল। সত্যব্রত তথায় যাটয়া তাগাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, জেঠাবাবু অনেক জিনিষ দিচ্ছেন। নেব?”

সরমা, “নাও,” বলিলে সে সেগুলি আনিতে গেল।

সুধীর তাহাদিগের যাটবার ব্যবস্থার কথা বলিল; তাহার পর সে আসিবার পূর্বে মহেশচন্দ্রকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই নিবেদন করিল।

পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে সরমা সে সব কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিла। সে আরও শুনিла, প্রণাম করিয়া যাটবার সময় প্রভানাথ নারায়ণীকে বলিয়া গেল, “আপনি ভাল ক’রে বুঝাবেন—যত দিন যা’বে তত ব্যবধান পড়বে—জিনিষটা জটিল হ’বে। নদীতে চড়া এক বার পড়লে, তা’ বেড়েই যায়।”

সুধীর সত্যব্রতকে ডাকিল এবং সে আসিলে তাগাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া যাটয়া মহেশচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তাহাকে তাহার কাছে দিল।

সুধীর ও প্রভানাথ চলিয়া গেল।

১৩

সুধীর চলিয়া যাটবার পর প্রথমে সরমার বড় রাগ হইল—সে রাগ সে আপনি ব্যতীত আর সকলের উপর। প্রথম রাগ সুধীরের উপর—এমন কি হইয়াছে, যে তাহার জন্ত এত “ঢলাঢলি” করা? সে আপনার কোন অপরাধ দেখিতে পাইল না—সব অপরাধ সুধীরের। সামান্য একটা চাকরের ব্যবহার লইয়া কথাস্বর, তাহা লইয়া তিলে তাল করা কি শিক্ষিত মানুষের শিক্ষার উপযোগী কাণ্ড? তাহার পর রাগ পিতামহীর উপর—এত “কান্দাকাটি” কিসের

জন্ত? যেন মাথার আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে! তিনিই ও ব্যাপারটাকে—পরকলার মধ্য দিয়া দৃষ্ট জিনিষের মত বড় ভাবিয়া এত কাণ্ড করিলেন! বুদ্ধ হইলে বুঝি এমনই হয়! তাহার পর তাহার রাগ মাতার উপর—তিনি ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত না করিয়া যেন দেখিতেই জানেন না! আর তিনি উঠিতে বসিতে তাগাকে যে বাক্যবহুলা দিচ্ছেন, অন্য সময় হইলে সে তাগা কখনই সন্তুষ্ট করিত না—প্রতীকার করিত। কিন্তু যাহাকে বলিলেই প্রতীকার হইত, তিনিও সকলের প্রভাবে প্রভাবিত হইলেন! সেই অন্য তাহার রাগ পিতার উপর। তবে সে ক্ষেত্রে ক্রোধের সঙ্গে অভিমান মিশ্রিত ছিল। তিনি সর্বদাই বিমর্ষ—আহারে যেন রুচি নাই, কোন কাষে যেন মনোযোগ নাই! যিনি ঘারে বা জানালার এতটুকু ধূলা সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না, তিনি এখন যেকের মর্ষের প্রস্তরে দাগও যেন দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না! আর তাহার রাগ পুত্রের উপর—সে যেন আর সে ছেলে নাই! দারুণ বসন্ত-রোগে যেমন সন্তানের আকৃতি এমনই পরিবর্তিত হয় যে, মাতাও সন্তানকে দেখিলে চিন্তিতে পাবেন না, তেমনই মানসিক পরিবর্তনের ফলে সত্যব্রত যেন আর সে সত্যব্রত ছিল না, যে বয়সে প্রফুল্লভাব ও চাঞ্চল্য স্বাভাবিক, সেই বয়সে বিমর্ষভাবের ও গাঙ্গারীর অস্বাভাবিক সমাবেশ তাগাকে একেবারে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। সরমা ভাবিত, ঐটুকু ছেলে—উত্তার অত বাড়াবাড়ি!

অল্প দিনেই সরমার ভাবের পরিবর্তন আরম্ভ হইল—যেন “সারানী ভাঁটার” নদীর জল সবিয়া যাইতে লাগিল। পুত্রকে উপলক্ষ করিয়াই সে পরিবর্তন আরম্ভ হইল।

এক দিন সে শুনিла, নারায়ণী মহেশচন্দ্রকে বলিতেছেন, “মহেশ, ছেলেটাকে লক্ষ্য করছ?”

মহেশচন্দ্র বলিলেন, “হাঁ।”

“দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে—মুখে জ্বাসি নাই, চূপ ক’লে বসে থাকতেই যেন ভালবাসে। বাপের মত ‘চাপা’ হয়েছ—কোন কথা ‘ফুটে’ না। তুমি এক বার ডাক্তারকে আসতে বল। যে রকম হচ্ছে, তা’তে একটু অসুখ হ’লে বিপদ ঘটবে।”

মহেশচন্দ্র বলিলেন, “আচ্ছা।”

নারায়ণী বলিলেন, “মেয়েকে কোন কথা বলা বুঝা—যেন কিছুতেই চৈতন্য নাই। লোক বলে, ছেলেকে আদর দিতে নাই, তা’কে খেটে খা’বার মত করতে হয়। আমি বলি, ছেলে ও নিজের কাষ নিজে বেছে নেবে—মেয়েকে আদর দিলেই বেশী বিপদ—তা’র ভাগ্য পরের হাতে। যৌমা’কে কিছু বললে তিনি কেবল কাঁদেন—বাচ্চা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।”

ডাক্তার আসিলেন; বলিলেন, কোন রোগ নাই, কিন্তু তর্কল। তিনি দীর্ঘ প্রশক্রিপর্শন লিখিলেন এবং খাবারের একটা ততোহধিক দীর্ঘ “চার্ট” করিয়া দিলেন। নারায়ণী ও স্মৃতি পণামর্শ করিয়া ঔষধ ও পথা প্রদানের ভার সরমাকে দিলেন।

পিতামহীর কথায় ও ডাক্তারের ঔষধ-পথ্যের ফর্দে, সরমার মনে শঙ্কার উদয় হইল। অথচ ঔষধে ও পথ্যে পুত্রের অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইল না; তাহার কারণ, অসুখ দেখে নহে—মনে।

চিন্তার গতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরমার মনের কঠোর ভাব

কোমল হইয়া আসিল। যে কর্তব্যে—মা'র কর্তব্যে সে প্রকৃতরূপে করে নাই, এখন সে তাহার গুরুত্ব অনুভব করিল—নারীর বৈশিষ্ট্য সে আর উপেক্ষা করিতে পারিল না।

পিতার ব্যবহারের স্বরূপ সে তখন উপলব্ধি করিল—তিনি কখন বিচলিত হয়েন নাই, কিন্তু এ বার তিনিই বিচলিত হইয়াছেন। যে তাহার ভ্রাতৃ এবং তাঁহার সেই ভাবেই তাহার অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সে পিতার ভ্রাতৃও চিন্তিত হইল। সে-ই তাঁহার পীড়ার কারণ।

ইহার পর পিতামহীর ও মাতার উপর তাহার ক্রোধ দূর হইতে বিলম্ব হইল না। তাঁহারা তাহার ভ্রাতৃই ব্যাকুল হইয়াছেন—সে-ই তাঁহাদিগের স্নেহের একমাত্র অবলম্বন।

নারায়ণী সরমার সহিত এক শস্যায় শয়ন করিতেন। এক দিন শেষ রাত্ৰিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি শুনিলেন, সরমা মুহূর্ত্তে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ঘুম হচ্ছে না, সতু?" সত্যত বলিল, "হবে, মা।" তাহার পর সে বলিল, "মা, বাবা কি নাই?" যে দিন সে তাহার পিতৃগৃহে নারায়ণী, তাহার পিতামহী, ছায়া—সকলকে কান্দিতে দেখিয়াছিল, সেই দিন হইতে যেন কোন অভাব, আশঙ্কা ও সন্দেহ তাহার শিশু-মন পীড়িত করিতেছিল। তাহার কথায় তাহাই বিকাশ পাইল। সরমা বলিল, "ও কথা বলতে নাই, সতু।—" সত্যত জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার কথা বলতে নাই?" সরমা সে কথার কোন উত্তর দিল না—পুত্রকে বুকে টানিয়া লইল। নারায়ণীর মনে হইল, সে কান্দিতেছিল। তিনি কোন কথা বলিলেন না। পরদিন তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সরমার উপাধানে অশ্রুর চিহ্ন। তিনি মনে করিলেন, স্নানকরণ।

সেই অশ্রুতে সূদীর প্রতি সরমার রাগ নির্বাপিত হইল; কিন্তু তখনও অভিমানের তাপ দূর হইল না। সে সূদীর কথা শ্রবণ করিল, "সূদীর যদি ভুল ক'রে থাকে, তবে তাঁকেই তাঁকে ক্ষমা করতে হ'বে—তাঁতে তাঁরই অধিকার।" কিন্তু সে যদি ভুল করিয়া থাকে, তবে তাহাকে ক্ষমা করা—তাহাকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দেওয়াই কি সূদীর অধিকার নহে। সে অধিকার সূদীর কেন ত্যাগ করিল? সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, সে কি তাহার কায়ে কখন সূদীরকে মনে করিবার অবকাশ দিয়াছে—সে তাহার সেই অধিকার স্বীকার করিবে? তবুও সে অভিমান হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত না। সে মনে করিত, সে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে—সত্যত ত কোন অপরাধ করে নাই! বাস্তবিক ভালবাসা যখন পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা অভিমান-মুক্ত হয় না। সে অনুমানও করিতে পারিত না—পুত্রের ভ্রাতৃ সূদীর মনে কত উৎকণ্ঠা, কত স্নেহ, কত ভাবনা ছিল।

যখন সরমা এই সকল ভাবিত, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাইবার সময় প্রভানাথের কথা তাহার মনে পড়িত—"যত দিন যা'বে, তত ব্যবধান বাড়বে—জিনিষটা জটিল হ'বে। নদীতে চড়া এক বার পড়লে তা' বেড়েই যায়।" তাহা আশঙ্কার কারণ। কিন্তু সে কি করিবে—কি করিতে পারে?

মাসান্তে এক দিন সূদীর মহেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত—নারায়ণীকে ও স্মৃতিকেও প্রণাম করিয়া বাইত; যখনই অধিষ্ঠিত, সত্যতের ভ্রাতৃ নানা দ্রব্য লইয়া আসিত। সে

সত্যতকে জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা, আমার সঙ্গে যা'বে?" সে কি বলিলেন, না জানার, সত্যতকে কোন উত্তর দিতে পারিত না। কিন্তু সরমার মনে হইত, সূদীর তাহাকে এক বার লইয়া বাইলে ব্যবধান দূর হইবার উপায় হয়ত হইত।

প্রভানাথ সূদীরের তুলনার অধিক আসিত এবং তাহার নিকট সকলে সব সংবাদ পাইতেন।

এইরূপে চারি মাস কাটিয়া গেল—হৃদয় ও আশঙ্কার কাটিল। নারায়ণী মহেশচন্দ্রকে বলিলেন, তিনি কি এক বার হৃদয়লীতে বাইবেন? মহেশচন্দ্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, প্রভানাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিবেন। নারায়ণী বলিলেন, "সামনে জামাই-যষ্ঠী—তোমাতে আর আমাতে সূদীরকে আসতে ব'লে আসব, সে কখন 'না' বলতে পারবে না। সে তেমন ছেলে নহে।"

১৪

অমঙ্গলের প্রতীক শকুন যখন আকাশে উড়িতে থাকে, তখন তাহার বিস্তারিত পক্ষের ছায়া যেমন ভূমিতে পতিত হয়, তেমনই যে রোগের ছায়া—গঙ্গার কূলে যে গৃহে সূদীর ছিল সেই গৃহের উপর পতিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে নিবিড় হইয়া যেন যুত্বার ছায়ার রূপ ধারণ করিতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ—চিত্রার শাওড়ী আসিয়া সূদীরের পুত্রকণ্ঠাদিগকে লইয়া গিয়াছেন—গৃহে কেহ উচ্চ কণ্ঠে কথা বলেন না—চিত্রা আসিয়া রহিয়াছে, প্রভানাথও কখন কখন অল্প সময়ের জন্য সে গৃহ ত্যাগ করে—তুই জন ডাক্তার পর্যায়ক্রমে রোগীর নিকট থাকেন—পরামর্শের জন্য অল্প ডাক্তার আনা হইতেছে।

পক্ষকাল পূর্বে সূদীরের জ্বর হইয়াছিল—তখন কেহই সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগদান করেন নাই। সেই জ্বর হইতে ক্রমে উগ্র মেনিনজাইটিশ প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বদিন মস্তক-সঞ্চালন অত্যন্ত অধিক হয় ও রোগীর চেতনালোপ হয়। মেরুদণ্ডে চিত্র করিয়া সঞ্চিত তরল পদার্থ বাহির করিয়া দিবার পর জ্ঞান আর ফিরে নাই বটে, কিন্তু চাকলা হ্রাস পাইয়াছে—রোগীও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তাররা কোন আশাই দিতে পারিতেছেন না। কলিকাতা হইতে পরামর্শ দিবার জন্য যে ডাক্তার আসিয়াছেন, তিনি রোগীর কক্ষে গিয়াছেন।

গঙ্গার দিকে বাড়ীর যে বারান্দা তাহাতে দাঁড়াইয়া ছায়া ও চিত্রা একটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল।

ছায়া বলিল, "তুমি মত দাও—আমি সরমাকে পত্র লিখে পাঠাই।"

চিত্রা ভাবিতে লাগিল।

ছায়া বলিল, "যা'ই কেন হয়ে থাকুক না—আমরা এ সময় তাঁকে সংবাদ না দিয়ে কেমন ক'রে থাকব? তাঁর কর্তব্য সে বিবেচনা করবে।"

চিত্রা বলিল, "আমি বারণ করতে পারি না, ছায়া।"

ছায়া তখন প্রভানাথকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, সে সরমাকে এক বার সংবাদ দিবে। শুনিয়া প্রভানাথ মনে করিল, এই ত স্ত্রীলোকের মনোভাব। সে বলিল, "তুমি পত্র লিখে রাখ, আমি ডাক্তারের মোটরেই লোক পাঠাব।" সে ডাক্তারের কাছে রোগীর সব্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে গেল।

'ডাক্তার বলিলেন, তাঁহার বলিবার আর কিছুই নাই—কোন লক্ষণই ভাল নহে, কেবল "নাড়ী"তে এখনও কোনরূপ বিকৃতি দেখা যাইতেছে না—স্বল্পস্থ যথারীতি কাষ করিতেছে।

ডাক্তারের মোটরে প্রভানাথের এক জন দ্বারবান ছায়ার পত্র লইয়া কলিকাতায় গেল।

প্রভানাথের দ্বারবান যখন মহেশচন্দ্রের গৃহে উপনীত হইল, তখন মহেশচন্দ্র আহার করিতে বসিয়াছেন।

এক জন ভৃত্য পত্র লইয়া যাইয়া বলিল, এক জন দ্বারবান দ্বিদিগির জন্য পত্র লইয়া আসিয়াছে। সে বলিতেছে, পত্র এখনই তাঁহাকে দিতে হইবে। শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন, সবমার পত্র! তাহার কোন পত্র আসিত না—কে লিখিবে? সরমা পত্রখানি লইয়া দেখিল, ঋষের উপর কেবল তাহার নাম লিখিত "সরমা"; হস্তাক্ষর তাহার অপরিচিত। সে খাম ছিঁড়িয়া পত্র পাঠ করিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—হস্ত হইতে পত্র হঠাৎপলে পড়িয়া গেল।

সকলেই তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। নারায়ণী যাইয়া পত্রখানি কুড়াইয়া লইলেন এবং তাহা মহেশচন্দ্রকে দিলেন। পত্রে লিখিত :—

সরমা,—

আজ পনের দিন ঠাকুরপোর ছর—মেনিনজাইটিশ; চৈতন্য নাই। ডাক্তার আর কোন আশা দিতে পারিতেছেন না। ত্বরিত ভূমি এক বার দেখিতে চাহিবে মনে করিয়া তোমাকে সংবাদ দিতেছি। যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, পত্র পাঠ হুগলীতে আসিবে—আর যদি আসা না হয়, দ্বারবানকে ছাড়িয়া দিবে—সে চলিয়া আসিবে।

আমার আর লিখিবার সময় নাই; দেখিতে চাহিলে তোমারও বিলম্ব করিবার সময় নাই।

ছায়া

পত্র পাঠ করিয়া মহেশচন্দ্র উঠিলেন এবং হস্ত ও মুখ প্রক্ষালিত করিতে যাইবার সময় ভৃত্যকে বলিলেন, সে দ্বারবানকে অপেক্ষা করিতে ও ড্রাইভারকে বড় গাড়ী বাহির করিতে বলুক।

নারায়ণী বলিলেন, "আমি যা'ব।"

সুমতি বলিলেন, "আমিও যা'ব।"

মহেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরমা?"

নারায়ণী বলিলেন, "যা'বে।"

"তবে সব চল"—বলিয়া মহেশচন্দ্র আপনার শয়ন কক্ষে যাইয়া লৌহের আলমারী খুলিয়া এক গুচ্ছ কারেন্সী নোট লইয়া নামিয়া আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চরণ কম্পিত হইতেছিল। দ্বারবানের নিকট সুধীরের বাসায় যাইবার পথ জানিয়া লইয়া—কাগজে তাহা অঙ্কিত করিয়া তিনি তাঁহার এক জন কর্মচারীকে তাহা দিয়া তিন জন ডাক্তারের নাম করিয়া বলিলেন, "টেলিফোন ক'রে যা'কে যা'কে পাও—নিয়ে তুমি একখানা বা দু'খানা গাড়ী নিয়ে এই স্থানে যা'বে—দেয়ী করবে না। সুধীরের মেনিনজাইটিশ। আমরা সকলে চণ্ডাম।"

সকলকে লইয়া মোটর-বান যাত্রা করিল। সকলেরই মনে দাক্ষণ আশঙ্কা—না জানি যাইয়া কি দেখিবেন! সকলেরই মনে হইতে লাগিল, পথ কি এত দীর্ঘ! সরমার মনে হইতে লাগিল,

পথ যেন শেষ হয় না! সে পুস্তকে বন্ধে চাপিয়া ধরিল—তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া নারায়ণী তাহাকে সাহসনা দিবার জন্ম বলিলেন, "বিপদে ধৈর্য্য ভাৱাতে নাই; ভগবানকে ডাক—তিনিই বিপদ-বারণ।"

সরমা তাহাই করিল। যে পিতামহীর ও মাতার পূজার্চনার কখন শ্রদ্ধানত হয় নাই, আজ আসন্ন বিপদের সঙ্ঘাবনা তাহার মস্তক নত করিয়াছিল। কিন্তু অভ্যাসের ও অমুশীলনের অভাব হেতু সে মনঃসংযোগ কবিত্তে পারিল না—তাহার চেষ্টা ব্যর্থতার পরিণত হইতে লাগিল।

যে পথ দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহার শেষ হইল; যান সুধীরের অধিকৃত গৃহের সম্মুখে আদিয়া উপনীত হইল।

১৩

ছায়া সরমার আগমন-প্রতীক্ষায় পুনঃ পুনঃ বাহিরের দিকে চাহিতেছিল; যান আসিলেই সে ই অগ্রসর হইয়া গেল।

সকলে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুধীরের মাতা পুস্তকের শযাপার্শ্বে ছিলেন—সংজ্ঞাশূন্য পুস্তকের মুখে বিন্দু বিন্দু দেবতার চরণামৃত দিতেছিলেন। গৃহে আর সকলের তুলনায় তিনিই স্থির—দেবতার উপর নির্ভর করিয়া আছেন। চিত্রা যাইয়া তাঁহাকে সরমা প্রভৃতির আগমন-সংবাদ দিল। তিনি তাহাকে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে বলিলেন; তাহার পর, কি ভাবিয়া, চিত্রাকে তাঁহার আসনে বসিতে বলিয়া এক বার স্বয়ং তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন। তিনি নারায়ণীকে প্রণাম করিলেন এবং সরমা তাঁহাকে প্রণাম করিলে বলিলেন, "মা, তুমি এলে কিন্তু যে সময় এলে সে সময় তোমাকে 'এস' বলবার অবকাশও আমার নাই!" নারায়ণী কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "বৌমা, তুমি আজ ওর সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আশীর্বাদ কর—ওর সর্বস্ব সম্ভোগ করার সৌভাগ্য যেন ওর হয়।"

মা বলিলেন, "সে ছাড়া আর কোন আশীর্বাদ ত আজ আমার করবার নাই, মা।" তিনি সরমাকে বলিলেন, "তুমি আসবে আশা করিতে পারি নাই—নহিলে পূর্বেই তোমাকে আসতে বলতাম।"

"আমি যাই, মা"—বলিয়া তিনি পুস্তকের নিকটে যাইয়া বসিলেন।

মহেশচন্দ্র ও নারায়ণী দ্বারের নিকট হইতে চাহিয়া সুধীরকে দেখিলেন। ডাক্তাররা কক্ষে অধিক লোক গত্যাত নিষেধ করিয়াছেন। নারায়ণী পুস্তকের মস্তকের নিকটে বসিয়া আছেন। এক পার্শ্বে এক জন চিকিৎসক, আর এক পার্শ্বে সুধীর—ডাক্তার দুই জন পর্যায়ক্রমে এবং সুধীর ও প্রভানাথ পর্যায়ক্রমে থাকেন। ঘরের এক পার্শ্বে সুধীরের পালিত কুকুরটি শুইয়া—প্রভুর দিকে চাহিয়া আছে—তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে; আজ দুই দিন কেহ তাহাকে সে কক্ষের বাহিরে লইতে বা আহার করাইতে পারে নাই।

কক্ষান্তরে মহেশচন্দ্র, নারায়ণী, সুমতি ও সরমা প্রভানাথের নিকট রোগের ও রোগীর অবস্থার বিষয় শুনিতে লাগিলেন। ছায়া

সত্যত্রতকে বারান্দার লইয়া গিয়াছিল; ডাক্তাররা বালকবালিকা-দিগকে সে গৃহে না রাখিতেই উপদেশ দিয়াছেন।

সুমতি প্রভানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ডাক্তাররা কি কোন আশাই দেন না?”

প্রভানাথ উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “তু’ দিন পূর্বেও আশা দিতে পেরেছিলেন।”

কাহারও মুখে আর বাক্যস্করণ হইল না।

সেই সময়—সত্যত্রতকে চিত্রার নিকট রাখিয়া ছায়া সেই কক্ষে আসিল এবং নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরমা, আপনাদের খাওয়া হয় নাই?” নারায়ণী বড়ই কান্দিতেছিলেন; সুমতি বলিলেন, “সে অন্য ব্যক্তি হইও না, মা। ভগবান যদি সময় আর মুখ দেন, তবে সে কথা।”

ছায়া তাঁহাদিগের আহার সম্বন্ধে কি কর্তব্য চিত্রার সহিত তাহা পরামর্শ করিতে বাইতেছিল—পশ্চাদ্ধিকে কাহার স্পর্শে ফিরিয়া দেখিল—সরমা। সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি, সরমা?”

সরমা অপরাধী যেমন কুণ্ঠিতভাবে অনুগ্রহ চাহে, তেমনই ভাবে বলিল, “আপনিই সকলের আগে আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন, তাই সাহস করে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমি কি এক বার দেখতে পাব না?”

ছায়ার হৃদয় সরমার প্রতি দয়ায় পূর্ণ হইয়া গেল; সে বলিল, “তুমি দেখবে বলেই ত আমি দিদির সঙ্গে পরামর্শ করে তোমাকে সংবাদ দিয়েছি। চল—কিন্তু মন দৃঢ় কর, রোগীর কাছে ধৈর্য হারিও না। মা’কে দেখে ধৈর্য ধরতে শিখ। আজ তু’ দিন তাঁর আহার-নিত্রা কিছুই নাই।”

ছায়া শাওড়ীর আর একটি সংস্কারগত বিশ্বাসের কথা জানিত না—মা’র কাছে থাকিলে যমও সম্ভানকে স্পর্শ করিতে পারেন না।

ছায়া সরমাকে রোগীর কক্ষে লইয়া গেল। কক্ষের এক পার্শ্ব হইতে এক বার কুকুরটির বিরক্তিজনক মুহূ রব শুনা গেল—কিন্তু ছায়া তাহার দিকে চাহিতেই সে আর কোন শব্দ করিল না।

সরমা রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিল—এই কি তাহার স্বামীর অবশেষ? মুখে মৃত্যুর কালিমা, নয়ন মুদিত, চৈতন্য নাই—রোগ-লক্ষণ মস্তক-কম্পনেই কেবল জীবনের পরিচয় পাওয়া বাইতেছে। সে যে স্থানে সুবীর চেয়ারে বসিয়া ছিল, তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল—সেই স্থানেই হর্ষাতলে বসিয়া পড়িল।

তুই তিন মিনিট অপেক্ষা করিয়া ছায়া নত হইয়া মুহূষ্মে সরমাকে বলিল, “চল।”

সরমা কাতরভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “আমি একটু এখানে থাকি।”

ছায়া “না” বলিতে পারিল না। সে একখানি চেয়ার আনিয়া দিল—কিন্তু সরমা যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই রহিল—এক দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রাম-ক্ষেত্র সুধীরকে দেখিতে লাগিল।

নারায়ণী প্রভৃতির আহারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিত্রার সহিত পরামর্শ করিতে ছায়া চলিয়া গেল।

মহেশচন্দ্র অস্থির হইয়া কলিকাতা হইতে যে সব ডাক্তার আসিবেন, তাঁহাদিগের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময় একখানি মোটর আসিল। বসু মহাশয়ের গৃহ-পুরোহিত তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। কয় দিম মা কালীর

মন্দিরে চণ্ডীপাঠের ও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পূজা করিয়া পুরোহিত চরণামৃত ও প্রসাদী নির্মালা লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রোগীর কক্ষে বাইলে মা উঠিয়া প্রণাম করিয়া প্রথমে নির্মালা গ্রহণ করিলেন, পুস্তকের মস্তকে তাহা স্পর্শ করাইয়া—সাবধানে উপাধানতলে রাখা করিলেন—অতি সন্তর্পণে তাহা রাখিলেন, যেন উপাধান কম্পিতও না হয়। তাহার পর তিনি চরণামৃত লইয়া সুধীরের মুণ্ডিত মস্তকে, মুদিত চক্ষুর পলকে ও ললাটে দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া মুখে দিলেন। চিত্রা আসিয়া পুরোহিত মহাশয়কে লইয়া গেল—তাঁহার রক্তনের সব ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছিল।

সরমা লক্ষ্য করিল, মা কিরূপ বিশ্বাস সহকারে সুধীরের শুশ্রূষা করিতেছেন। সে লক্ষ্য করিল, সুবীর কি ভাবে রোগশয্যা-পার্শ্বে বসিয়া আছে। সে ছায়ার ও চিত্রার মুখে উৎকণ্ঠার বিকাশ শ্রবণ করিল। আপনার প্রতি তাহার মনে দিকার জন্মিতে লাগিল। সে কি সুধীরের কেহই নহে যে, তাহার রোগে সেবার অধিকারও পায় নাই—এখনও সে অধিকার গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সে সেই অধিকার গ্রহণ করিবার অবসর পাইবে কি? সে সৌভাগ্য তাহার হইবে কি? তাহার মনে পুঞ্জীভূত বেদনা আশঙ্কার তাড়নায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যেন আর আপনার বেদনার বিকাশ বোধ করিতে পারিতেছিল না। ছায়ার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সে অতি কষ্টে মন দৃঢ় করিল। কিন্তু তাহাতে বেদনা আরও বর্ধিত হইল।

অল্প-সময়-মধ্যে কলিকাতা হইতে তুই জন ডাক্তার আসিলেন।

১৬

আগন্তুক ডাক্তার তুই জন যথারীতি রোগীকে পরীক্ষা করিলেন এবং রোগীর অবস্থার বিবরণ পাঠ করিলেন। তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন, চিকিৎসা যেরূপ হইতেছে, তাহাতে পরিবর্তন করিবার কিছুই নাই।

মহেশচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগীর অব্যাহতি লাভের কোন আশাই কি নাই?—তখন তাঁহারা বলিলেন, আশার একমাত্র কারণ, নাড়ীর গতি; এই অবস্থায়ও যে নাড়ীর গতি স্বাভাবিক—অতি দ্রুতও নহে, আবার অনির্ঘমিতও নহে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু নাড়ীর এই ভাব যদি পরিবর্তিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, যে কোন মুহূর্ত্তে হৃদয়শ্রেণীর ক্রিয়া বন্ধ হইবে।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর ছায়া ও চিত্রা যখন নারায়ণী প্রভৃতির আহারের জন্ত জিদ করিতে লাগিল এবং ছায়া সরমাকে আনিবার জন্ত রোগীর কক্ষে গেল, তখন পরিচর্য্যারত ডাক্তার শঙ্কিতভাবে বলিলেন, শুটের গুঁড়া আর গরম জলপূর্ণ বোতল অবিলম্বে আনিতে হইবে—দেহের তাপ অতি দ্রুত কমিয়া বাইতেছে। ডাক্তাররা এই সম্ভাবনার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন। চিত্রা দ্রুত বাইয়া ছায়াকে বোতলে জল পূরিবার কথা বলিয়া শুটের গুঁড়া লইয়া আসিল এবং বোতলগুলি আনিতে আবার চলিয়া গেল। তাহার বাইবার সময় সুবীর তাহাকে বলিল, “তোমরা এক জন এস—পায়ের তলার শুটের গুঁড়া ঘসতে হবে।”

চিত্রা ও ছায়া বোতলগুলি লইয়া আসিয়া দেখিল, সরমা উঠিয়া রোগীর পদতলে চেয়ার লইয়া বাইয়া বসিয়া—সুবীর ও ডাক্তার যেমন তাহার তুই হাতে গুঁড়া ঘসিয়া দিতেছেন তেমনই—সুধীরের

উলে গুঁড়ো ঘসিয়া দিতেছে। তাহার রোগীর শয্যা বখানানে বোতলগুলি রক্ষা করিয়া শঙ্কাচক্ষুস্বয়ং দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল কাটিল—তাহার মধ্যে দ্বিতীয় ডাক্তার কয় বার রোগীর দেহের তাপ পরীক্ষা করিলেন—অর্ধ ঘণ্টা পরে সরমাও বুকিল, যে পদতল শীতল ও বেন সিক্ত বোধ হইয়াছিল, তাহার সিক্তভাব দূর হইয়াছে, তাহা আর সেরূপ শীতল নহে।

“টাল” কাটিল।

এই সময়েও মা স্থির ভাবে পুস্তকের ললাটে চরণামৃত মাখাইয়া দিতেছিলেন। বাহিরের কোন বাপার বেন তাঁহার মন স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না।

রোগীর এই অতিরিক্ত শঙ্কাজনক অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া বাইবার পর ছায়ার ও চিত্রার জ্বিদে সরমাকে উঠিতে হইল। সে আহার করিতে বসিল বটে, কিন্তু খাইতে পারিল না বলিলেও হয়। উঠিয়া সে—আর কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, রোগীর কক্ষে বাইয়া পূর্বেরই মত বসিল। যে অর্ধ ঘণ্টা কাল সুধীরের জীবনের ক্ষীণ আশা ক্ষীণতর হইয়া—যেন নিঃশেষ হইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, সেই অর্ধ ঘণ্টায় তাহার মনে অননুভূতপূর্ব পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল—কখন সে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং কখনই বা তাহা শেষ হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সুধীরের চরণে আর গুটের গুঁড়া মালিস করিবার প্রয়োজন ছিল না—গরম জলের বোতলগুলিও শয্যা হইতে সরান হইয়াছিল। সরমা রোগীর পদতলে হাত বুলাইতে লাগিল। রোগীর অনুভূতি ছিল না; কিন্তু তাহার অনুভূতি তৃপ্তপ্রদ।

যখন প্রভানাথ আসিয়া রোগীর পার্শ্বে সুধীরের স্থান গ্রহণ করিল, তখন সুধীর বাইয়া হস্ত প্রক্ষালিত করিয়া মহেশচন্দ্রের নিকটে গেল। সে মহেশচন্দ্রকে বলিল, ডাক্তাররা তাহার পুস্তকাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে বলায় প্রভানাথের মাতা তাহা-দিগকে লইয়া গিয়াছেন—সত্যতরকৈও লইয়া বাইলে ভাল হয়।

সে কথা শুনিয়া নারায়ণী স্মৃতিকে এবং স্মৃতি নারায়ণীকে তাহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া বাইতে বলিতে লাগিলেন। কাহারও এই অবস্থায় স্থান ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না।

যখন কে বাইবেন সেই বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল, সেই সময় ছায়া আসিয়া চিত্রাকে সংবাদ দিল কয় দিন পরে আজ কুকুরটি একটু দুগ্ধ পান করিয়াছে। এ কয় দিন তাহার প্রতিদিন কয় বার তাহাকে আহার করাইবার জন্ত আহাৰ্ধা ও দুগ্ধ দিত, সে তাহাতে মুগ্ধ দিত না। চিত্রার মুখে একটু আনন্দ-দীপ্তি দেখা দিল। তাহার শাশুড়ী বলিয়াছিলেন, পালিত পশুবা বিপদ বুঝিতে পারে। তবে কি সে বুঝিয়াছে, বিপদের অবসান হইতেছে? মামুষ কত সামান্ত ভিত্তির উপর আশার হৃদয় রচনা করে!

সত্যতর চিত্রাকে বলিল, “পিসীমা, এক বার মা'র কাছে যা'ব।”

চিত্রা তাহাকে সরমার নিকট লইয়া বাইলে সে সরমাকে কি বলিল। সরমা বলিল, “আচ্ছা—পিসীমা'কে বল।”

চিত্রা তাহাকে সে কি বলিবে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তাহার জ্যেষ্ঠাবাবু তাহাকে কলিকাতায় বাইতে বলিতেছেন—সে বাইবে না। সে চিত্রার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “আমি থাকব; পিসীমা।”

চিত্রা তাহাকে লইয়া কক্ষ ত্যাগ করিল এবং বাইয়া বলিল, সে বাইতে চাহিতেছে না।

সে দিন কাহারও যাওয়া হইল না—রোগীর অবস্থা-বিবেচনার কাহারও বাইতে মন সরিল না।

দীর্ঘ রাত্রি কাটিল। রোগীর সাধারণ অবস্থার কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইল না।

প্রভাতে সকলে সবিগ্নয়ে লক্ষ্য করিলেন, কয় দিন পরে সুধীরের কুকুর এক বার তাহার কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া—গৃহবেষ্টন উজ্জানে ঘুরিয়া আবার কক্ষে ফিরিয়া গেল।

১৭

প্রভাতে জয় অস্ত্র দিনের তুলনায় কম দেখা গেল—শিরঃকম্পনও প্রায় অন্তর্হিত হইল। বড় আশায় সুধীর ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—অবস্থার কোনরূপ উন্নতি কি লক্ষিত হইতেছে না? তাঁহার বলিলেন, জ্বর কমিয়াছে, তাহাই সুলক্ষণ; কিন্তু মস্তকের কম্পন-নিবৃত্তি যদি দৌর্ভাগ্য-বৃদ্ধির পরিচায়ক হয়, তবে তাহা সুলক্ষণ বলা যায় না; কিন্তু তাহা সাধারণ উন্নতির পরিচায়কও হইতে পারে।

মহেশচন্দ্র এক বার কলিকাতায় বাইয়া কাষের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আবার আসিলেন। ডাক্তার দুই জনও আসিলেন। তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন—মস্তকের ভাল। নারায়ণী মনে করিলেন, সে-ও ভাল।

সে দিন নারায়ণীই সুধীরের মাতাকে এক বার উঠিয়া মুখে জল দিতে বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, “মা, আপনি ও আজ্ঞা করবেন না। আজ তিন দিন আমি আফ্রিকও করি নি—ঠাকুরকে মনে মনেই ডেকেছি। তিনি যদি কৃপা করেন, তবেই আমি উঠব; সুধীরের জ্বর ত্যাগ না হ'লে তা' পারব না।”

নারায়ণীও আর কিছু বলিলেন না।

সে দিন সেই ভাবেই কাটিল—কেবল জ্বর কম হইল; রোগী কিছুক্ষণ স্নানিচ্ছা সঙ্কোচ করিল। পরদিন প্রভুবে খাণ্ডমিটারে তাপ দেখিয়া সুধীর ও ডাক্তার কেহই বেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, সেই জন্ত ডাক্তার আবার তাপ লইলেন এবং স্বয়ং দেখিয়া সুধীরের খাণ্ডমিটার গ্রহণ জন্ত প্রসারিত হস্তে তাহা দিলেন। সুধীর ভাল করিয়া দেখিল—তাহার পর ডাক্তারের দিকে চাহিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, বেন আকাশে যে পুঞ্জীভূত মেঘ ছিল, তাহা সহসা সরিয়া গেল—আবার আকাশ বোধে আলোকিত হইল। সে অপ্রত্যাশিত আনন্দে কম্পিত কণ্ঠে মা'কে বলিল, “মা, জ্বর ছেড়ে গেছে।” মা শুনিলেন—তাহার পর দুই কর যুক্ত করিয়া উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করিয়া সুধীরের উপাধানতল হইতে দেবতার নির্দাল্য বাহির করিয়া পুস্তকের রক্ষা করিয়া তাহা আবার উপাধানতলে রাখিলেন।

সরমাও যুক্ত কর ললাটে রক্ষা করিয়া প্রণাম করিল। এ বার সে মনের মধ্যে শ্রদ্ধাবুদ্ধির বিকাশ অনুভব করিল। তাহার পর সে আবার পূর্ববৎ সুধীরের পদতলে হাত বুলাইতে লাগিল।

সুধীর আজ দ্রুতপদে সকলকে সংবাদ দিতে গেল। সুধীরের কুকুরটি লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাহার সঙ্গে গেল।

প্রভানাথ নারায়ণীকে বলিল, “ঠাকুরমা, আপনি এ বার মা'কে

এক বার তুলে নিয়ে আসুন। ক'দিন অনাহারে—অনিদ্রায় কেটেছে। তপস্বাই বটে!”

সে দ্বিতীয় ডাক্তারকে বলিল, “আপনি গিয়ে একটু বসুন।”

ছায়া সরমাকে আনিতে গেল—সে-ও গত রাত্রি হইতে আর উঠে নাই।

প্রভানাথ রোগীর কক্ষে—সুধীরের স্থানে—যাইতেছে, এমন সময় ছায়া সরমাকে লইয়া আসিল। সত্যত্রত চিত্রার কাছে ছিল। সে এক দিন যেমন সকলের ক্রন্দনের কারণ বৃত্তিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, আজ তেমনই গৃহে সকলের ব্যবহারে অতর্কিত পরিবর্তনে বিস্মিত হইল। মা'কে দেখিয়া সে পিসীমা'র নিকট হইতে মা'র কাছে গেল। সরমা তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল—সুখের আতিশয্যকালে যেমন দুঃখের আতিশয্যকালে তেমনি মা সন্তানকে বক্ষে লইতে চাহে—তাহাতে সুখের সময় যেমন সুখের পূর্ণতাবৃত্তি পায়; দুঃখের সময় তেমনই সান্ত্বনা ঘটে।

প্রভানাথ সত্যত্রতকে আদর করিয়া সুধীরকে বলিল, “দেখ, ছোটগিন্নী এসেছেন—এই শালার ছেলেও এসেছে—এর পরেও কি বিপদ থাকতে পারে।”

সুধীর বলিল, “এখন উত্তরোত্তর অবস্থার উন্নতি হয়—তবেই নিশ্চিত হওয়া যায়।”

প্রভানাথ বলিল, “তুমি কিছু ভেব না। সুধীরের কুকুরের ব্যবহার দেখে আমি নিশ্চিত হচ্ছি।”

কুকুরটি তখন সুধীরের গায়ে দুই পদ তুলিয়া দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল।

সুধীর চিত্রাকে বলিল, “চিত্রা, ওকে এখনই কিছু খেতে দাও। ক'দিন খায় নি—ঘর হতে নড়ে নি। কি রোগাই হয়েছে!”

প্রভানাথ রোগীর কক্ষে চলিয়া গেল। তখন সত্যত্রত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, পিসে-মশাই গালাগালি দিলেন কেন?”

সরমা বলিল, “গালাগালি দেন নি, সতু—আদর করেছেন।”

নারায়ণী শুনিয়া বলিলেন, “কেবল আদর নয়; ও আশীর্বাদ মনে কর।”

তিনি সুধীরের মাতাকে এক বার রোগীর কক্ষ হইতে আনিবার জন্ত চেষ্টা করিতে তথায় গমন করিলেন।

মহেশচন্দ্র সকল বিষয় বাস্তব অবস্থার দিক হইতে বিবেচনা করিতেন। তিনি সুধীরকে বলিলেন, “তোমরা সকলে এ পর্য্যন্ত যে পরিশ্রম করেছ, তা' অসাধারণ। আশঙ্কার উত্তেজনাতাই তা' সম্ভব হয়েছে। এইবার—সে উত্তেজনার কারণ দূর হয়ে যাওয়ায়—সে পরিশ্রম আর করতে পারবে না, সে চেষ্টা যদি কর, তবে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হ'বে। আমি সেই জন্ত বলি, দু' তিন জন শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্ত করলে হয়।”

সুধীর বলিল, “আপনি যা' বললেন তা' খুবই ঠিক—কারণ, এখনও অসুস্থতঃ এক পক্ষকাল সমভাবে সেবা শুশ্রূষা না করলে—তা'তে কোন ক্রটি হ'লে আবার বিপদ ঘটবে। কিন্তু ও ত হবে না।”

“কেন?”

“মা কিছুতেই ও প্রস্তাবে সম্মত হ'বেন না; আর—বলতেও কি—আমরাও “নাশের” হাতে কায়ের ভার দিয়া নিশ্চিত থাকতে পারব না—হয়ত কোন ক্রটি হবে; কারণ, তা'দের সেবা

শুশ্রূষা যত নিপুণই কেন হ'ক না, তা' অর্ধের বিনিময়ে পেতে হয়।”

মহেশচন্দ্র বলিলেন, “কিন্তু তোমাদের শরীরে সহিবে?”

“কি করব, বলুন।”

“তবে ডাক্তার দু'জন যেমন আছেন, তেমনই থাকুন—আর বাড়ীর লোক এক জন ক'রে থাকলেই হ'বে।”

“মা থাকবেনই—আর এক জন থাকতে হ'বে।”

চিত্রা বলিল, “আমরাই ত সরমাকে লয়ে তিন জন—লোকের অভাব হ'বে না, কাকাবাবু।”

সুধীর বলিল, “প্রভানাথকে ছেড়ে দিতে হ'বে—নিজের কাষ ত নামমাত্র দেখছে।”

মহেশচন্দ্র বলিলেন, “তোমার কাকীমা ত থাকতে চাহিতেছেন।”

“আপনি যেমন ব্যবস্থা করবেন, তেমনই হ'বে।”

“ছেলেদের এ বার আনলে হয় না?”

“তা' হয়।”

পরদিন হইতে মহেশচন্দ্র ও নারায়ণী সকালে চলিয়া যাইতেন এবং মহেশচন্দ্র আবার যাইয়া অপরাহ্নে আসিয়া মাতাকে লইয়া যাইতেন—সুমতিও এক এক দিন যাইতেন।

প্রভানাথ বলিয়াছিল, “পাড়া-গায় যা'রা যাত্রাগানের খুব ভক্ত তা'রা যেমন আগরে চাটাই পাতার সময় আসে, আর চাটাই তুলে যায়—আমরাও তা'ই, অসুখ বাঙলে এসেছি—ডাক্তাররা যখন বিদায় নেবেন, তখন যা'ব।” সে মধ্যাহ্নে পূর্বাংকো অধিক সময় কলিকাতায় থাকিত।

সুধীরের পুত্রকঙ্কারা এবং চিত্রার ছোট ছেলেটি আসিল। গৃহ আবার আনন্দে ও কলরবে প্রীতিসমুজ্জ্বল হইল। সত্যত্রত তাহা-দিগের সহিত মিশিল।

চারি দিন পরে মনে হইল, সুধীরের বাহুসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে—কিন্তু তাহার লক্ষণ তত সুস্পষ্ট নহে।

পঞ্চম দিন মধ্যাহ্নে—সুধীর যখন তাহাকে ঔষধ পান করাইয়া আসিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিল, তখন সে দেখিল, কক্ষচার হইতে সত্যত্রত ঘরে কি দেখিতেছে। সুধীর তাগকে আসিতে ইঙ্গিত করিল এবং সে আসিলে তাহাকে ক্রোড়ে বসাইল। সুধীরের করতলে বহিরাবরণ উঠিয়া আসিতেছিল—সুধীর তাহার করতলে সুগন্ধ প্রলেপ মাখাইতেছিল। তাহা দেখিয়া সত্যত্রতও তাহাই করিতে লাগিল।

সুধীরের সংজ্ঞা সেই সময় ফিরিয়া আসিতেছিল। সে তাহার করতলে শিশুর কোমল ও ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর স্পর্শ অনুভব করিল; এক বার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ডাকিল, “মা!”

নিরুদ্ধিষ্ট পুত্র দীর্ঘকাল পরে গৃহে প্রবেশ করিয়া যদি মাতাকে ডাকে “মা!”—তবে তাহার জন্ত উৎকণ্ঠিতা জননী যেমন আনন্দে চমকিয়া উঠেন, মা'র তেমনই হইল। তিনি আনন্দ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “কি, বাবা?”

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, “কে?”

“সতু।”

সুধীর এক বার পুত্রের দিকে চাহিল; তাহার পর নয়ন মুদ্রিত করিয়া হাতখানি তুলিবার চেষ্টা করিল; দৌর্ভাগ্যহেতু হাত কাঁপিতে লাগিল। ছেলেদের মাখায় হাত দিয়া আদর করা

সুধীর অভিলাষ ছিল। সুধীর তাহার হাতখানি তুলিয়া সত্যত্রতের মস্তকে স্থাপিত করিল। সত্যত্রত শয্যায় মুখ গুঁজিল—কত দিন সে পিতার নিকট আদর-বিকাশ লাভ করে নাই। সে কান্দিতেছিল।

আজ—এত দিন পরে মা'র চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল। সে অশ্রু আনন্দের।

সুধীর সত্যত্রতের কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল, “সতু—বাবা, কঁাদতে নাই।”

সে সুধীরের হাতখানি তুলিয়া শয্যায় স্থাপিত করিল।

মুখ তুলিয়া সত্যত্রত সর্বাগ্রে সরমার দিকে চাহিল।

সরমার হুই চক্ষু ছাপাইয়া তখন অশ্রু ঝরিতেছিল। তাহা আনন্দের, না হঃখের ?

সত্যত্রত জ্যেষ্ঠাবাবুর কাছ হইতে যাইয়া সরমার কাছে গেল। সে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলে সে মাতার সহিত সুধীরের পদতলে হস্ত বুলাইতে লাগিল।

সুধীর আর এক বার চাহিয়া দেখিল—এ বার তাহার দৃষ্টি পদতলে উপবিষ্টার উপর পতিত হইল। সে কি বুঝিতে পারিল—উপবিষ্টা কে ?

১৮

সাত দিন অতিবাহিত হইল। ভাঁটার পর জোয়ারের জল যেমন নদীতে প্রবেশ করে, সুধীরের রোগহর্ষল দেহে স্বাস্থ্যবল তেমনই প্রবেশ করিতেছে। অষ্টম দিন যাইবার সময় নারায়ণী সুধীরের মাতাকে বলিলেন, “বৌমা, কাল বগী—কাল আর আসব না। বাড়ীঘরও ‘এক হাঁটু হয়ে’ আছে।”

মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “সরমাকে কি নিয়ে যা'বেন ? ওরও কষ্ট হচ্ছে—বিশ্রাম প্রয়োজন; আর সতুকে ত দেখতেই পারি না।”

নারায়ণী সরমার সম্বন্ধীয় কথায় যেন মনোযোগই দিলেন না; বলিলেন, “সতুকে দেখবার কোন ক্রটি হয়নি, মা—তোমার বড়বৌ আর মেয়ে—কি কাষেরই হয়েছে—কি পাকা গৃহিণী হয়েছে! শিক্ষা দিয়েছ বটে! তা'র পর ভাইবোনরা এসেছে—এখন ত আর কোন কথাই নাই। সরমাকেও শিক্ষা দিও।”

সরমা তথায় ছিল।

ছায়া ও চিত্রা যখন তাঁহাকে গাড়ীতে “তুলিয়া দিয়া” প্রণাম করিল, তখন তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “সরমাকে ছোট বোন ভেবে পা'র ধুলা দিও—যেন তোমাদের মত শিক্ষা পায়।”

সেই দিন অপরাহ্নে সরমা ছায়াকে বলিল, “দিদি, আমি কি এখানে থাকতে পা'ব না ?”

ছায়া বিস্মিতভাবে বলিল, “কেন ? কি হয়েছে ?”

“মা ঠাকুরমা'কে বললেন—তিনি আমাকে নিয়ে যান; আমার কষ্ট হচ্ছে—সতুকে দেখা হচ্ছে না।” বলিতে বলিতে সরমার গলাটা “ধরিয়া আসিল”।

ছায়া বলিল, “তুমি কি মনে করছ, মা রাগ কবেছেন ? ওঁর কি রাগ আছে ? কল্পন ত দেখিনি। উনি সত্যই মনে করেছেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে—মামুষের অনেক কষ্টই অভ্যাসের জন্ত।”

“আমি কিন্তু যা'ব, না।”

এই সময় চিত্রা তথায় আসিল। সে বলিল, “হু' জনে কি বড়বড় হচ্ছে ?”

ছায়া বলিল, “তা'তে তোমাকে দিয়ে কোন কাষ হ'বে না, দিদি। ঠাকুরজামাই বাবুকে দরকার।”

চিত্রা কপট কোপ প্রকাশ করিয়াছিল, “আমি বাড়ীর মেয়ে আমাকে দরকার নাই—দরকার তোমাদের ঠাকুরজামাই বাবুকে ? আমাকে অপমান করা ?”

তখন ছায়া সরমা যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিল। তাহা শুনিয়া চিত্রা বলিল, “তুমি ঠিকই বলেছ, ছায়া—এ সব পরামর্শে তোমাদের ঠাকুরজামাই বাবুই পাকা লোক।”

সরমা বলিল, “কি চমৎকার লোক !”

চিত্রা বলিল, “‘ফণ্ডিনটি’ করতে অমন দ্বিতীয়টি নাই। ছেলেদের সম্মুখেও ঐভাব। আর আমার শান্তাও তেমনই—তিনি সমানে হাসেন।”

ছায়া বলিল, “তা'র মত মামুষ সচরাচর দেখা যায় না। এই ত অসুখ শুনেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলেন—সব ঝকি খাড়ে ক'রে নিলেন।”

“তবে দেখবে, খানিকটা গালাগালি খেতে হ'বে।”

“ঠাকুরজামাই বাবুর গালাগালি না খেলে পেট ভরে না।”

সকলেই হাসিতে লাগিল।

অপরাহ্নে প্রভানাথ কলিকাতা হইতে আসিয়াই শুনিল, ছায়া তাহাকে ডাকিয়াছে।

সে আসিয়া দেখিল, ছায়া, চিত্রা ও সরমা তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। সে বলিল, “এ যে একেবারে ত্র্যাহম্পর্শ! আমাকে তলব কেন ?”

ছায়া তাহাকে সরমার কথা বলিলে সে বলিল, “ছোটগিন্নী যদি এ বাড়ী নিজের মনে ক'রে এ বাড়ী থেকে যেতে না চান—তবে কে ওঁকে তাড়াতে পারে ?”

চিত্রা বলিল, “বিশেষ তুমি যদি সহায় হও।”

প্রভানাথ ছায়াকে বলিল, “আমার একটা কথার উত্তর দাও—এ বাড়ীতে বিয়ে ক'রে আমি কি চোরদায়ে ধরা পড়েছি ?”

ছায়া বলিল, “কেন ?”

“এই দেখ না—ছোটবাবু জ্বর উপর রাগ ক'রে—দেশত্যাগী হ'বেন, আমাকে ঘর-সংসার—গিন্নী পর্যন্ত ছেড়ে সঙ্গে দৌড়তে হ'বে! ছোটগিন্নী তাঁ'র স্বামীর বাড়ী হু' দিন বেশী থাকবেন—আমাকে তাঁ'র জন্ত সুপারিশ করতে হ'বে!”

ছায়া হাসিয়া বলিল, “আপনি হচ্ছেন আমাদের—মুখিল-আসান।”

“হাঁ—কাষের সময় বেঁড়েকে চমরা বলতে হয়।”

সরমা ছায়াকে কি বলিল। ছায়া প্রভানাথকে বলিল, “সরমা বলছে, ‘আপনি হু' দিন বেশী থাকবার কথা বলছেন কেন’ ?”

“সেই বুদ্ধি যদি ওঁর থাকবে, তবে আর আজ আমাকে ধ'রে বৈতরণী পার হ'তে হ'বে কেন ? এ বাড়ীও ওঁর বাড়ী—বাগের-বাড়ীও ওঁর বাড়ী। সেখানে ঠাকুরমা, বাপ, মা—তা'দের বুঝি দেখতে হ'বে না ? যে রা'ধে সে বুঝি আর চুল বাঁধে না ? আর মহেশ বাবুর অত বড় কাষ ওটা বুঝি ভাসিয়ে দিতে হ'বে ? ছোট বাবু এত দিন যা শিখলেন—সে সবই ভয়ে ঘৃত ঢালা হ'তে দেওয়া

হ'বে না। ভাঙ্গা কঠিন নহে—গড়াই কঠিন কাষ। সে সব ব্যবস্থা হ'বে।”

চিত্রা বলিল, “পরের ব্যবস্থা পরে হ'বে—এখন সরমা বা' বলছে, তা'র কি করবে।”

“সে ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু তুমি কবে বাড়ী যা'বে বল ত ?”

“মা কি কিছু বলে দিয়েছেন ?”

“মা .. কেন বলবেন—আমি, মা'র ছেলে, আমিই বলছি। এ বাড়ীতে মানুষ থাকে ?”

চিত্রা হাসিতে হাসিতে বলিল, “বাড়ীর আবার কি অপরাধ হ'ল ?”

“দেখ না—এ বাড়ীর ছেলে বো' সব সমান। ছোটবাবু এক জন—ভাত দেবার কেউ নন, কিল মারবার গোসাই,—কি বল গো ছোটগিন্নী ?”

সরমা দৃষ্টি নত করিল।

চিত্রা বলিল, “শুধু শুধু আমার ভাইয়ের দুর্গাম করছ কেন ?”

“শুধু শুধু! নাক এমনি করে ছেঁচে দিয়েছেন যে, নাকে খৎ দিতে বলতে পারছি না। গুণ ত কত! জান ত, উমার কাছে মহাদেবের সেই বর্ণনা—‘বপুর্বিরূপাক্ষম’—চোখ দু'টা নয় তিনটা। আর ধনসম্পদ ? ‘দিগম্বরভেন নিবেদিতং বস্ত’—পরবার একখানা কাপড়ও নাই।”

চিত্রা রাগের ভাণ করিয়া বলিল, “অনেক জগ্ন তপস্বী করেছিল, তা'ই আমার ভাইয়ের গলায় মালা দিয়েছে।”

“ভাইটি একেবারে শিব! জটায় যে সাপ আছে তা'র পরিচয় ছোটগিন্নী খুবই পেয়েছেন—তবে বিষ নাই কেবল কুলাপানা চক্ষ। ভাজ ত মহাদেবের গলায় মালা দিয়েছেন; আর তুমি ? অনেক লোক শিব গড়তে যা' গড়ে তা'ই ?”

“কি ঝগড়াটে মানুষ !”

“এখনও শেষ হয়নি। বাঁশের চেয়ে কঞ্চী দড়—ছেলেটি আবার বলেছেন, আমি কেন গালাগালি দিয়েছি।”

সরমা বলিল, “ঠাকুরমা ত বলেছেন, সে গালাগালি নহে—আশীর্বাদ।”

“তা'র বুদ্ধির অভাব নাই। তোমার মত নহে। তিনি, বোধ হয়, দাদামশায়কে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রেখেছিলেন।”

ছায়া বলিল, “আর বোঁদের অপরাধ ?”

প্রভানাথ বলিল, “হু'টি বো' আছেন—অথচ আমি এক কাপ চা এখনও পেলাম না !”

প্রভানাথ আসিলেই বাড়ীর ছেলেরা সব তাহার কাছে আসিত। সুধীরের বড় ছেলে বলিল, “পিসে-মশায়, আমি এখনি চা আনিছি।”

প্রভানাথ স্নিগ্ধভাবে বলিল, “তোকে যেতে হবে না, বাবা। তুই যে বলেছিস, তা'তেই আমার তৃপ্তি হয়েছে। মা তোদের জন্ত আজ খাবার পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, ক'দিন কাছে থেকে ছেলেগুলো আমাকে মায়ায় এমন জড়িয়েছে! কবে যা'বি ?”

ছায়া রঙ্গ করিয়া আপনার নাক আর কাণ মলিয়া বলিল, “আমার অপরাধ হয়েছে। আমি চা এনে তবে অস্ত্র কথা বলব।”

“আবার কথা কি ? কথা ত সব হয়েই গেল। আমি মা'কে বলব—রোগীর সেবার ভার ছোটগিন্নীর হাতে দিন। এখন ছোটগিন্নীকে নাক আর কাণ মলতে হ'বে,—আর এমন ভুল করবেন না। এমনভাবে যেন রোগীর সেবা করেন যে, সুধীরের মনে যদি এখনও একটু অস্বকার থাকে, তবে তা' দূর হয়ে যা'বে। তাহ'লে সে-ই তার ব্যবহারের জন্ত লজ্জিত হ'বে; বুঝবে—ভুল সে-ও কম করে নাই। সর্বদা যেন মনে রাখেন—রোগী অল্পে অসন্তুষ্ট হয়—রাগ করে।”

ছায়া বাইয়া প্রভানাথের জন্ত চা ও খাবার আনিল—খাবার প্রভানাথের মাতাই পাঠাইয়াছিলেন। চা ও খাবার দিয়া সে প্রভানাথকে বলিল, “এই জন্তই ত বলি, আপনি আমাদের মুন্সিল-আসান।”

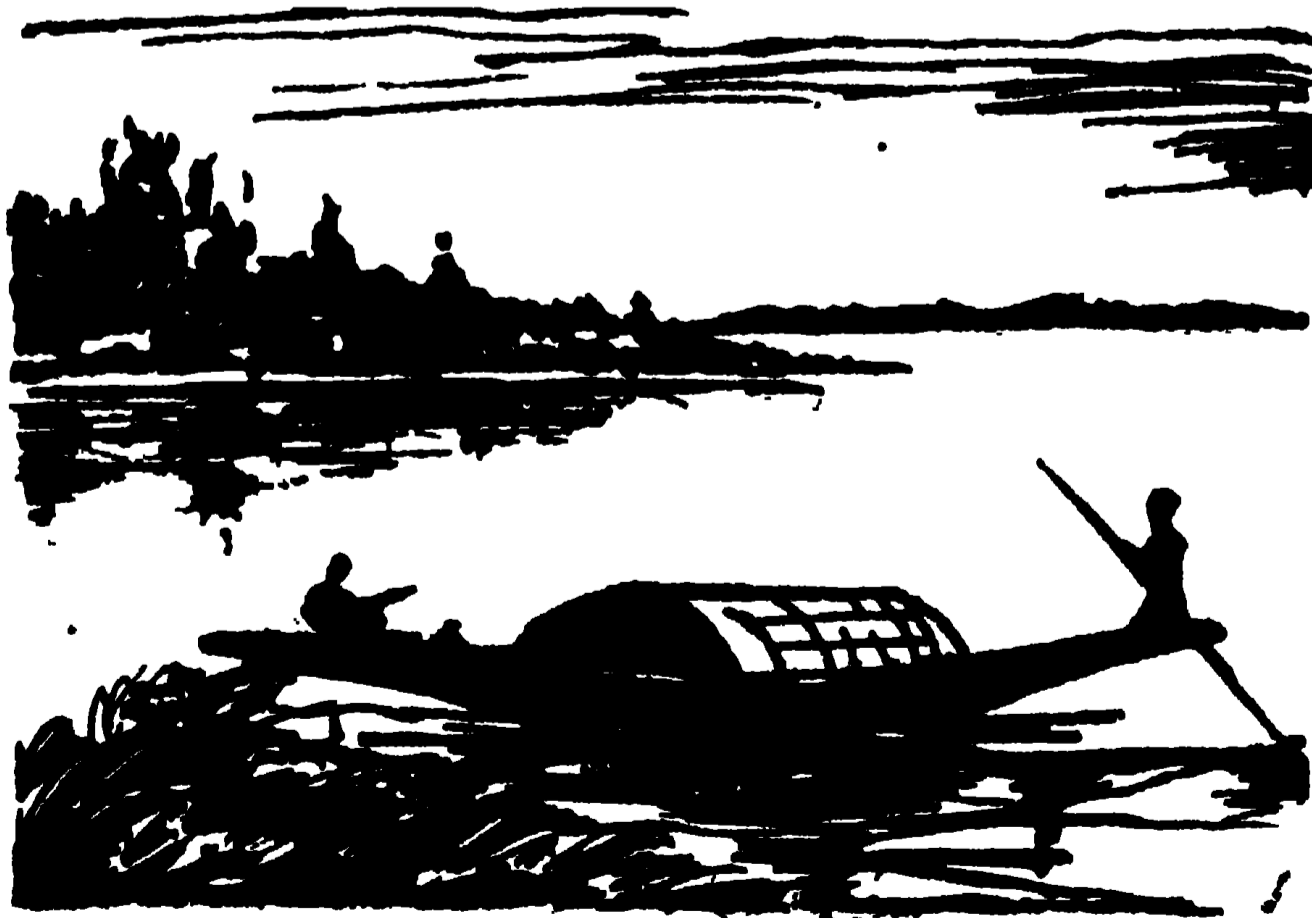
প্রভানাথ চিত্রাকে বলিল, “তোমার বড় ভাজটির নাম এ বার পরিবর্তন করতে হ'বে।”

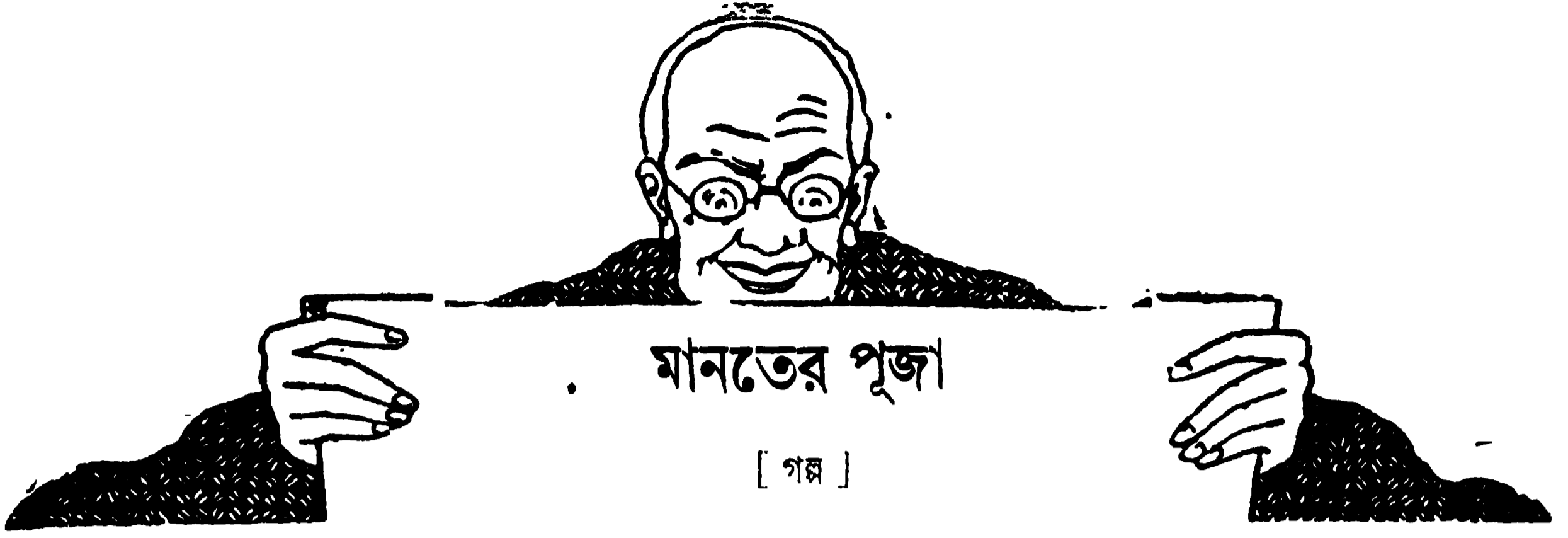
ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?”

“ছোটগিন্নীর ব্যাপারে তুমি যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছ, তা'তে তোমাকে আর ছায়া বলা চলবে না—তুমি কায়া। তুমি মা'র নাম রাখতে পারবে।”

ছায়া লজ্জায় মুখ নত করিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ :





মানতের পূজা

[গল্প]

১

ধীরে ধীরে মধুর বাতাস বহিতেছিল ; জ্যোৎস্না-প্লাবিত দাওয়ায় বসিয়া সৃষ্টিধর নিশ্চিন্তভাবে ছঁকা টানিতেছিল। সেই সময় সংসারের কাজ সারিয়া, সোণামণি পাণ চিবাঁইতে চিবাঁইতে তাহার মস্তক আসিয়া, হাত নাড়িয়া বলিল, “পাসা নিব্ভাবনায় ব’শ্চা ব’শ্চা তামুক ফঁকতে নেগেচো, যতে! জ্বালা আমার !”

তামাকেব ধোঁয়াটে নেশায় সৃষ্টিধরের একটু ঝিমুনি আসিয়াছিল। স্ত্রীর কর্ণস্বরে উত্তাপের আঁচ পাইয়া একবার সে মুখ তুলিয়া চক্ষু মেলিল ; স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল বটে, কিন্তু কিছুই বলিল না। দাওয়ার কিনারায় সারিয়া-গিয়া সোণামণি তখন মুখ বাড়াইয়া উঠানে এক ধ্যাবড়া পাণের পিক ফেলিল, এবং ভাতের ফিঁচায় তাঙ্গুলরস-রঞ্জিত মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, “বড়-যে কিছু ধ’ল্ভিত্ভো না ! কও তো, তোমার মতলোবড়া কি—তাই শুনি !”

তামাক টানিতে টানিতেই সৃষ্টিধর বলিল, “কিসির মতলোব শুন্তি চাইচো ?”

ঘরের একটা খুঁটীতে ঠেস দিয়া মাটীতেই চাপিয়া-বসিয়া সোণামণি বলিল, “কিসির মতলোব ? যানো আকাশ থেকে পোড়লে ! ব’ল্ভিত্ভি—বসন্তোপুরি মার ঠাই পূজো দেওনের কতা ! পূজোডা কি দিতি হবে ?—না সে মতলোব নেই ?”

খুব জোরে ছঁকায় একটা টান দিয়া, এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া সৃষ্টিধর বলিল, “পূজো দিতি হবে মা,—বোলতেছে কেডা ? মার ঠাই মানোসা ক’রেছো—পূজো না দিয়ে কি পার আছে ? এ কি তুশ্চু কতা ?”

সোণামণি বলিল, “তবে চট্ কর্যা দিয়ে ফ্যালো। মানোসা কর্যা পূজো ফেলে রাকা,—মা না ক’রুন, কিসি

কি হ’য় কে জানে ? ছপূরির স্বপোনের কতা মনে পোড়লে ঝ্যান্ও বুকির মধ্য টিপ্-টিপ্ ক’ত্তে নাগে !”

ছঁকা হইতে মুখ তুলিয়া সৃষ্টিধর আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করিল, ছপূরির স্বপোনের কতা ! সে আবার কি ? সব কতা থল্যা কও তো শুনি !”

আঙ্গুলের মাথায় যে চূণ ছিল, তাহার খানিকটা দাঁতের আগায় টাঁচিয়া লইয়া, বাকি চূণটুকু খুঁটীর গায়ে মুছিতে মুছিতে সোণামণি বলিল, “দিনোগানের স্বপোন—বলে, প্রেকাশ ক’রতি নাই। তবে তুমি হোচ্ছ স্বোয়ামী, আর কতা হচ্ছ ঠাকুর-আবতার, না ব’ল্ভি তো তোমার হুঁস হবে না,—তাই বোল্ভি হচ্ছ, বলি শোন। খাওয়া-দাওয়ার পাট্ চুকিয়ে-বুকিয়ে ছপূর ব্যালা এট্টু গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম্, শুয়ে মায়ের বাড়ী যাবার কতা ভাব্ভি-ভাব্ভি কখনো ঘুমিয়ে পডিচি,—ঘুমের ঘোরে স্বপোন দেখ্যা চট্-কর্যা ঘুমড়া গ্যালো ভেঙে ! জেগে উটে দেখি—সক্সোগায় কাঁটা দিয়ে উটেচে। ঘামে পনের কাপোড় ভিজ্জ জন্-জব্ ক’ত্তেছে !”

সৃষ্টিধর এ কথা শুনিয়া কোন প্রশ্ন করিল না। চূপ-চাপ্ বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে ছঁকা টানিতে লাগিল। মায়ের উদ্দেশে ভক্তিভরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া সোণামণি বলিতে লাগিল, “স্বপোনে দেখা দিয়ে মা পূজো দিতি আদেশ কল্লেন। তা’র পর মনডা বড্ই পারাপ হোলো, তাই চোললাম বামুনদির ঠাই। সব কতা শুন্না, তিনি গা’ল্-মন্ডো যা দেবার সবই তো দিলেন ; শেষে ব’ল্লেন, দেবধণ ফেলে-রা’কতি নেই রে, সোণা ! তোর ওপোর মায়ের কিরপা বড্ জিয়াদা কি না, তাই তোকে স্বপোনে দেখা দিয়ে মা পূজো চেয়েছন্।”—তোমার নাম ক’রে বল্লেন, ‘ওরে ব’লে-ক’য়ে তাড়া’তাড়ি’ মায়ের

পূজোডা দিয়ে ফ্যাল। দেবী ক'রলে শেষটা ভালো-মন্দ কিছু যদি হ'য়ে পড়ে—এ কথা শেষ হলি বোললেন, শা-পাডার কেডা মানোসা ক'রে না কি পূজো দেই-নি, তাই মায়ের কোপে পোড়ে তারা নিরুংশো হ'য়ে গেছে, —ঝাড়ে-বংশে সাবাড়!—কতাডা শুন্না অব্দি ভয়ে কেঁপে মবতেছি!”

তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল, সৃষ্টিধর হঁকাটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিল, কিন্তু সোণামণির স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

সোণামণি বলিল, “বামুন্দির কথা শুন্না এস্তোক্ কিছু ভালো-লাগতিছি না। পূজোডা দিতি না পারলি আর নিশ্চিন্তি হ'তি পা'ত্তিছি-নে। এই ফাগুনির মদিয়াই দিয়ে ফেল্টি হবে।”

সৃষ্টিধর বলিল, “এ মাসে আর দিন কুতায় কওতো! আজ হোলো গিয়ে মাসের তেইশে। চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, উন্তিরিশ,—এ মাস আবার য়াক্‌দিন ক'মেছে; আছে তো মোটে এই ছ'টা দিন। এর মধ্য কি ক'রে হয় বলো তো!”

হিসাব করিয়া সোণামণি বলিল, “ক্যানো হবে না? আজ গে হ'লো রোব্বার। কাল্ সোম, পরশু মোঙ্গোল, ও-দিন তো বারের পূজো। তাপরে হোলো বুদ, বিম্বাৎ, শুকুর, শ'ন। শ'ন্বারে হোলো গিয়ে সংকেরান্টি।”

সৃষ্টিধর বলিল, “শ'ন্ব মোঙ্গোল বার আছে তো বটে, কিন্তু পূজো ব'ল্লিই তো পূজো হয় না। খরচ-পত্তোরের টাকা তো যোগাড় করা চাই! হাতে এদিকে য়াট্টাও পয়সা নেই!”

গলার সুর এক পর্দা চড়াইয়া সোণামণি বলিল, “পূজো দেবার কথা ব্লিই, দেখিচি খরচার কথা তুলে তাতে বাগ্‌ড়া দ্যাও! খোকোর ব্যারাম হয়েলো গিয়ে ও-বচ্ছোর মাঘ মাসে; দেক্‌তি দেক্‌তি দু'টি বছোর পেরিয়ে গ্যালো! দু'বছর ধ'রে তাগাদা দিচ্ছি, ক্যাবোলই বলো—পয়সা নেই! দু'বছোরের মদিয়া তোমার পয়সার যোগাড় হ'লো না—এ য়াট্টা কথা?—পূজোর পাঁটা ঘ'রে মজুত, ভোগের ষোলো আনা তো তুলাই আছে। তবে আর খরচাডা কি?”

সৃষ্টিধর বলিল, “পাঁটা আর ভোগ হলিই পূজো হ'য়ে

গ্যালো বুঝি? শরোতের ওজোন-মাপিক দাতোসা লুট মানোত নেই?”

সোণামণি বলিল, “হ'লোই বা! তার দাম আর কতো পড়'বা? ঐ তো য়াক্-রত্তি ছেলে!”

সৃষ্টিধর বলিল, “আধমোণ তো হবেই, ওজোন হ'লিই দেক্‌তে পাবা, য়াক্-আধ সের জ্যায়দাই হবে! তা যদি আধমোণই ধরো—তো পিরায় ন'টাকার বাতোসা নাগবি। সাত আনা কর্যা বাতোসার স্মার। তার ওপোর ধরো পূজোর দক্ষিণে, ঢাকীর মুজরো, যাওয়া-আসার খরচা,—কুড়ি টাকা না হোক, পনোরডা টাকার কম এ ধাক্কা সামলানো যাবে না!”

মুখ বাড়াইয়া পানের ছিবড়াগুলা উঠানে নিক্ষেপ করিয়া সোণামণি বলিল, “তোমার যতো বাজে কথা; মায়ের পূজো দিতি নাকি পনোরো-কুড়ি টাকা নাগে! অতো টাকা নাগলি নোকে পূজো দিতি যেতো? এই তো গ্যালো-মোঙ্গলবারে পেঁচোর পিসী পূজো দিয়ে এলো। তার কতো খরচ প'ড়েছে? চা'টে টাকাও নাগেনি। তোমার কেবল ছুতো বৈ তো নয়! তা আমি তোমাকে খোলাপুলি ব'লে দিচ্ছি, কাল বাদ পরশু হোলো গিয়ে বারের পূজো। পরশুই পূজো দিতি যাতি হবে। কা'ল পুরো য়াট্টা দিন আছে তো, যোগাড়-যাগাড় যা কত্তি হয়—কালই কো'রে ফ্যালো।”

সৃষ্টিধর বলিল, “তুমি তো ব'লে খালাস! একদিন অতো টাকার যোগাড় করা বুজি সোজা কথা?”

সোণামণি বলিল, “সোজা কি শক্তো, সে তুমি বোজোগে, ধার-কজ্জা যা হয় ক'রো; পূজো আমি ঐ দিন দেবই।”

সৃষ্টিধর বলিল, “য়াক্ আধ্ টাকা হ'লি হাওলাৎ-বরাতের চেষ্ঠা ক'রে ঞাক্তাম। অতো টাকা—!

সোণামণি বলিল, “আশু মিত্তিরির কাছে কাগোজ নিকে ঞাওগে—নয় তো ধান ব্যাচো।”

সৃষ্টিধর বলিল, “ধান না হয় ব্যাচ'লাম,—তার পর?”

সোণামণি বলিল, “তার পর আবার কি? পোরাকী কুলোবে না? না কুলোয় তকোন্ ঞাকা যাবে। পরশু গিয়ে পূজোডা তো দিয়ে আসি।”

সৃষ্টিধরকে নির্ঝাক দেখিয়া সোণামণি বলিল, “কতা শুনতেছো না যে! শুনতেছো কি?”

সৃষ্টিধর বলিল, “চট করা ধানগুলো ব্যাচনো,—তাই শুনতেছি। দেগে-শুনে টাকার জোগাড় করা আসচে শন্বারে পূজো দিলি হয়! মন্দির কড়া দিন বৈ তো নয়।”

ঘাড নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া, সোণামণি বলিল, “না, শন্বারে হবে না; শন্বারে হ’লো সংকেরাস্তি। শন্বারের কথা শুনে বামুন্দি বলে, সে হোলো সংকেরাস্তি—দোমেসে দিন; সে দিনে পূজো দেওয়া ঠিক নয়।—শন্বারে-টন্বারে হ’বে না, পরশুই দেওয়া ঠিক। ঠাকুর-দেবতার ধার কি না—তা ফেলে বেকে শেষটা কি হ’তি কি হ’বে!”

মানভের পূজা ফেলিয়া-রাখায় দেবতার কোপে পড়িয়া শা’-পাড়ার কে এক জন নির্ভংশ হইয়াছিল, গ্রামের অনেকেরই মুখে সৃষ্টিধর সে কথা বলবার শুনিয়াছে; তাই সোণামণির মত তাহারও মনে হইল—দেবতার কাছে পূজা মানত করিয়া দীর্ঘকাল তাহা ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। সোণামণির প্রস্তাব অনুসারে মঙ্গলবারেই পূজা দিতে খাইবার জন্ত অবশেষে তাহাকে রাজী হইতে হইল।

নোকানির্মাণে স্বেচ্ছা বলিয়া গ্রামে সৃষ্টিধরের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল—পসারও ছিল বিলক্ষণ। তাই সকালে উঠিয়াই অনেকখানি আশা লইয়া সৃষ্টিধর জেলেপাড়ায় গিয়াছিল—যদি নোকা-নির্মাণের ভার লইয়া কাহারও নিকট হইতে অগ্রিম দান হিসাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। কেহই তাহাকে আগাম টাকা দিতে সম্মত হইল না। টাকা-সংগ্রহের জন্ত অগত্যা সে ধান বিক্রয় করাই কর্তব্য মনে করিল, এবং জেলেপাড়া হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় ধানের ক্রেতা আবহুল ব্যাপারীকে ডাকিয়া আনিল।

২

বসন্তপূরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কালী বড় ‘জাগ্রত দেবতা’, কেবল বসন্তপূরের ও আশ-পাশের ক’খানি গ্রামের নয়, দূর-দূরান্তরের লোকেরও ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। এ জন্ত বিপদে পড়িলে এ অধ

করে, এবং বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলে বসন্তপূরে আসিয়া মায়ের পূজা দিয়া যায়। স্ততরাং মায়ের রূপায় তাহার সেবাইতগণের সুখের সীমা নাই, তাহার নিশ্চিত মনে বারো মাস ‘ধি খায় হুধে আঁচায়!’

শনি এবং মঙ্গলবার, বারের পূজার দিনই সাধারণতঃ পূজার্থীর সমাগম হয়; তবে, ফাল্গুন, চৈত্র এই দুই মাসেই জনসমারোহ অধিক হইয়া থাকে। কারণ, এ সময়ে আবহাওয়া ভাল থাকে, এবং পল্লীবাসীদের ঘরে রবিশস্ত সঞ্চিত হওয়ায় পূজার ব্যয়ের জন্ত তাহাদিগকে ভাবিতে হয় না।

ফাল্গুন মাসের শেষ মঙ্গলবারে নানা গ্রাম হইতে বহু লোক পূজা দিতে আসিয়াছিল। কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণ, আশ-পাশ, সম্মুখস্থ হাটতলা জনসমাগমে গম-গম করিতেছিল।

স্ত্রী-পুত্রের সহিত সৃষ্টিধরও পূজা দিতে আসিয়াছিল। সোণামণির আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রতিবেশিনী বামুন্দিদিও তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কালীবাড়ী হইতে রশি-দুই দূরে ‘পদ্মপুকুরের’ পাড়ে কয়েক দল পূজার্থী বিশ্রাম করিতেছিল। সেই স্থানে সকলকে বসাইয়া রাখিয়া সন্ধান লইবার জন্ত সৃষ্টিধর একবার কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইল।

হাটতলায় চাব-পাচখানি ময়রার দোকান। বারের দিন মায়ের পূজার জন্ত সকল দোকানে স্বদেশ প্রভৃতি ভালই বিক্রয় হয়। এই সকল দোকানের মধ্যে তিনকড়ি নাপিতের দোকানখানিই সবচেয়ে বড়। তাহার বিক্রয়ও অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক।

তিনকড়ি পাকা ব্যবসাদার। সে জানে যে, বেশ-ভূমায় ও আড়ম্বরে ধর্মের ভাণ করিতে পারিলে পূজার্থীরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। এই জন্ত বারের পূজার দিন সে গেকিয়া বসন পরিয়া গলায় রুদ্রাক্ষের মোটা মালা বুলায়, —কপালে খুব মোটা করিয়া সিঁদূরের ফোঁটা ধারণ করে, এবং মা-কালীর পটখানি টাটকা কুলের মালায় সজ্জিত করিয়া ধূপ-ধূনার গন্ধে পূজার্থীগণকে তাহার দোকানে আকর্ষণ করে।

খরিদারদের বসিবার জন্ত দোকানের সম্মুখে গুঁটা

করিয়া দিয়াছিল। রৌদ্রনিবারণের উদ্দেশ্যে 'বারের' দিন একখানি চট্টা দোয়ার মত খাটাইয়া দিত। খরিদার আসিলে মিষ্টকথায় অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে বসিতে বলিত। তামাক সাজিয়া দিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিত।

ভোগ বিক্রয় আরম্ভ হইবার পূর্বে পর্যন্ত তিনকড়ি মায়ের চরণে প্রণাম করিবার অছিলায়, ঘন ঘন কালীবাড়ী ঘুরিয়া আসিত। অপরিচিত নূতন পূজার্থীর সহিত যাচিয়া আলাপ করিত, এবং মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তাহার কাছে ভোগের মিষ্টান্ন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিত।

অভ্যাসমত নূতন খরিদারের সন্মানে কালীবাড়ী গিয়া তিনকড়ি সৃষ্টিধরকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সহস্র মিষ্ট আলাপে মুগ্ধ করিয়া, তাহাকে দোকানে লইয়া আসিল। পূর্বে ডাকিয়া সাগ্রহে বলিল, "নিতাই! এনারে ব'লুতি ছাও; তামাক সাজো।"

অসম্ভব ভীড়। বাহিরের বাঁশের বেঞ্চে গাদাগাদি—ঠাসাঠাসি করিয়া বহু লোক বসিয়াছিল। চৌকী, পিঁড়ি, মাহুর, চেটাই ইত্যাদি যাহা কিছু তাহার ঘরে ছিল, পূজার্থীরা আসিয়া পূর্বেই সব দখল করিয়া লইয়াছিল। স্মরণ্য কোন আসন খালি না থাকায় নিতাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখানি কাঠের বারকোশ বাহির করিয়া, তাহাই উঁপুড় করিয়া সৃষ্টিধরকে বসিতে দিল।

সৃষ্টিধরকে বসাইয়া তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—
"আপনার লিবেস?"

সৃষ্টিধর বলিল, "শাপুর, কালিগঞ্জোর—"

তিনকড়ি বলিল, "আর ব'লুতি হবে না; মোহনপুর, বাগবাড়ী. কাউগাছি, বেলতলা, শাপুর—"

সায় দিয়া সৃষ্টিধর বলিল, "হ্যাঁ,—ঐ শাপুর।"

তিনকড়ি বলিল, "সাতপোতা, বেঙ্গোড্যাঙ্গা, গাওনে, তাল-পুকুর,—বলুন না, ওদিককার কোন্ গাঁ না চিনি? শাপুরির কোন্ পাড়ায় বাড়ী?"

সৃষ্টিধর বলিল, "শা-পাড়ায়।"

তিনকড়ি বলিল, "বেজো শা, বৈকুণ্ঠো শা—"

সৃষ্টিধর বলিল, "আমাদের জাতগুণ্ঠি, বৈকুণ্ঠো শা সম্পর্কে আমারই পুড়ো।"

ঘরে যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের দলের এক জন

বলিল, "দোকানীর দেক্তিছি, সারা ছনিয়ার লোকের সাথে চেনা পর্চায়!"

কালীর পটের দিকে তাকাইয়া জোড়-হাত কপালে ছোঁয়াইয়া গদগদ স্বরে তিনকড়ি বলিল, "মায়ের কির্পা! ছিচরোণ আছুর ক'রে প'ড়ে আছি, তাই তোমাদের পাঁচজোনের সাথে জানাশুনো, আলাপ পর্চায় হয়।"

নিতাই তামাক সাজিয়া কলিকাটি সৃষ্টিধরের হাতে দিতে যাইতেছিল, দেখিয়া গলার সুর বদলাইয়া তিনকড়ি বলিল, "এটু কলার পাতা ছিঁড়ে এনে ছাও নিতাই! শা-মশায় নল ক'রে নিন্—হ্যাঁ, লুটির বাতোসা কতোডা নাগ্‌বি ব'লুতিছিলে? একুশ সের—আর কতো?"

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে সৃষ্টিধর বলিল, "একুশ সের আড়াই ছটাক।"

নিতাই কলার পাতা আনিয়া সৃষ্টিধরের হাতে দিল। তিনকড়ি বলিল, "মেটেডা ছাকোতো নিতাই! শা-মশায়নি একুশ সের আড়াই ছটাক বাতোসা দিতি হবে। আরো খন্দের আছে। কুলোবে তো? নয়তো খোলা চাপিয়ে ছাও।"

কলাব পাতার নল পাকাইতে পাকাইতে সৃষ্টিধর বলিল, "আমার আর মোলো আনার ভোগ লাগ্‌বি।"

ঘাড় কাৎ করিয়া তিনকড়ি বলিল, "তা হবে ওখোন্। মায়ের ভোগ! সেরেশ সন্দেহই তৈয়েরী আছে।"

মেঘনাদ কানার দোকানের সামনে আসিয়া হাঁকিয়া বলিল, "পূজো দেবা কারা? যাও, নাম নিকিয়ে এসো।"

দোকানের ভিতর হইতে তিনকড়ি প্রশ্ন করিল, "আজ আদায় কার হাতে মেঘনাদ! সেজ বাবুর না?"

"সেজ বাবুর" বলিয়া মেঘনাদ চলিয়া যাইতেছিল; হঠাৎ ঘরের ভিতর নজর পড়ায়, ছড়-মুড় করিয়া ঢুকিয়া—সৃষ্টিধরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "দেকি কন্ধেডা, চট্ট ক'রে য়্যাক-টান দিয়ে যাই।"—সে কলিকার পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

খুব জোরে একটা দম মারিয়া এক দমেই কলকের আগুন দপ্ করিয়া জ্বলাইয়া নাক-মুখ দিয়া বিস্ময়সের মত ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মেঘনাদ বলিল, "লোক সব ছড়িয়ে র'য়েছে। ডেকে জড়ো ক'রে গিয়ে যাই।"

দ্বিতীয় দম কষিয়া 'গজভুক্ত কপিথবৎ' অসার

বলিকাটি সৃষ্টিধরকে ফিরাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। তিনকড়ি বলিল, “তাছ’লি, তোমাক খেয়ে যান্ শা-মশায়, নাম নিকিয়ে আস্বন্।”

সৃষ্টিধর বলিল, “পূজো দিতি গেলি নাম নিখতি হবে নাকি ?”

মাথা নাড়িয়া, মুখভঙ্গি করিয়া তিনকড়ি বলিল, “হঁ্যা, নিজের নাম, গেরামের নাম নিকিয়ে আগাম দক্ষিণে জমা দিতি হবে।”

সৃষ্টিধর বলিল, “দক্ষিণের কোনো বাধা নিয়োম-টিয়োম আছে নাকি ? না—”

উত্তরে লম্বা একটা “ত” দিয়া তিনকড়ি বলিল, “ভোগের সিকি দক্ষিণে, আপনার মোলো আনা ভোগ তো ? আপনার দক্ষিণে লাগবে গিয়ে চা’র আনা।—পাঁটা আছে ?”

সৃষ্টিধর বলিল, “হঁ্যা, আছে।”

তিনকড়ি বলিল, “পাঁটার দক্ষিণে সাড়ে আট আনা। চুল নোগ্ দিলি য্যাক আনা। ধনো-পোড়ানো ছ’ আনা, বুকির রক্তো—”

সৃষ্টিধর বলিল, “আব কিছু নেই। ভোগ আর পাঁটা।”

তিনকড়ি বলিল, “আর এই লুট ! তা লুটির কোনো বাধাধরা দক্ষিণে নেই। চা’র আনা, ছ’ আনা, টাকা, পাঁচসিকে, যাব য্যামোন ক্ষ্যামোতা—দ্যায়। তবে বাতোসার আদেক ভাগ অদিক্রি বাবুদের।”

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সৃষ্টিধর বলিল, “আদেক্ ভাগ !”

তিনকড়ি বলিল, “হঁ্যা, তাই ঞান তেনারা, তাঁদের খেয়াল !”

কলিকায় কিছু ছিল না ; দম দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কলিকাটি অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া, সৃষ্টিধর উঠিয়া বলিল, “ভোগ, বাতোসা ঠিক থাকে য্যানো !”

পাশে মাথা হেলাইয়া তিনকড়ি বলিল, “আচ্ছা !” তাহার পর খুব মোলায়েম সুরে খামিয়া খামিয়া বলিল, “কিছু দিয়ে যাবেন না শা-মশায় ! —ছ’-য়্যাক টাকা যা হয় !”

সৃষ্টিধর বলিল, “বায়না ?”

জিত কাটিয়া তিনকড়ি বলিল, “বায়না-ফায়না নয়, চিনিত্তি বোধ হচ্ছে অকুলোন পড়বে তাই—”

কোচার খুঁটি খুলিয়া দেখিয়া সৃষ্টিধর বলিল, “ভাঙ্গা-ভাঙ্গটো কই ! এই য্যাটা টাকা, আর রেজ্গি-পয়সায় টাকাটেক কি আঠারো আনা হ’তি পারে। এ দেবো না ; দক্ষিণে জমা দিতে হবে ত, যদি লোটের টাকা সেখানে না পাই ?”

তিনকড়ি বলিল, “ক’টাকার লোট,—দশ টাকার ?”

সৃষ্টিধর বলিল, “না, পাঁচ টাকার।”

তিনকড়ি বলিল, “পাঁচটা টাকাই দিন না ; দশ টাকার কাছাকাছিই তো মাল হবে।”

অল্পমাত্র সময়ের পরিচয়। আগাম টাকা দিতে সৃষ্টিধর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহার ভাব বুঝিয়া, ঠোঁট বাঁকাইয়া য়ুহু হাসিয়া তিনকড়ি বলিল, “টাকা দিতি শা-মশায় ভরসা পাচ্ছেন না : ভাবতিছেন হয় তো মেরে দেবো !—তিরিশ বছেহারের ওপোর দোকান। কেউ ব’লুতি পারে, য্যাটা আদলা কারোর্ মেরিছি ! ছেলেদের তাই বলি, ‘ভিক্ষে ক’রে খাও, সেও ভালো, য্যাটা কাণা কড়ি কারুরি ঠকায়ো না,’—যাক্, শা-মশায় যকোন্ সন্দো হচ্ছে—”

তিনকড়ির মন্তব্যে অপ্রতিভ হইয়া সৃষ্টিধর বলিল, “না, তা নয়, আমি ভাবতেছিলাম্, য্যাক্-সঙ্গেই সব দিয়ে দেবো। তা চিনি কিন্তি হবে ব’লুতেছেন—”

গলা খাদে নামাইয়া, মিষ্ট করিয়া তিনকড়ি বলিল, “তাইতিই তো চাচ্ছি।—নিতাই ! খাচার কানিত্তি শা-মশায় নামে পাঁচ টাকা জমা ক’রে ঞাও।—শা-মশায় নামডা কি ?”

“সৃষ্টিধর শা” বলিয়া একখানি পাঁচ টাকার নোট সৃষ্টিধর তিনকড়ির হাতে দিল। খাতা খুলিয়া নিতাই লিখিতে শুরু করিলে সৃষ্টিধর বলিল, “দরের নিয়ম কিছু বিবেচনা ক’ত্তি হবে, এতোডা মাল নিচ্ছি !”

তিনকড়ি বলিল, “দরের কতা তো ব’ল্লাম্, পনোরো টাকা চোদ আনা দরে চিনি কিনে, সেস সাত আনার কমে কেউ দিতি পার্কা না। আমার বস্তা বস্তা চিনি আসে, তাই মোণকরা আট আনা কমে দিচ্ছি, সতেরো টাকা—”

সৃষ্টিধর বলিল, “সতোরো টাকা হলি একুশ সের

আড়াই ছটাকের দামডা কতো হচ্ছে ?”

তিনকড়ি বলিল, “পাঁচ টাকা আপনার জমা বৈলো,

আপনি যান, নাম নিকিয়ে আসুন, মাল মাপানো হোক।
হিসেব হবে তখন।”

আধ ঘণ্টা পরে দোকানের পাশে রাস্তার উপর গোল-
মাল শুনিয়া ও ভীড় জমিতে দেখিয়া, ব্যাপার কি
জানিবার জন্ত দোকানের কাঁপের বেড়ার কাঁকে তিনকড়ি
মুখ বাড়াইল। তাহার দিকে নজর পড়িতেই ভীড়
ঠেলিয়া, সৃষ্টিধর আগাইয়া আসিয়া বলিল, “দেকুনদিনি
ব্যাপার! চাকে-ঢোলে পূজো দেবো এই আমার
মানোসা। আমার ঢাকী-ঢুলী সাথে রয়েছে। তা এ
লোকটা তাদের বাজাতি দেবে না! বলে, ‘আমি
বাজাবো’—এ কি রকোম কতা ছা?”

মুহু হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটাইয়া তিনকড়ি তাহাকে
বলিল, “একেকার এই নিয়াম শা-মশায়! কেনা হচ্ছে
মায়ের বাড়ীর ঢাকী। বাজানোর দরকার হ’লি ওই বাজায়।
বাইরির ঢাকী মায়ের বাড়ীর সীমেনার মদি বাজাতি
পায় না।”

তিনকড়ির পোষকতার কেনারাম ঢাকী অগ্রসর হইয়া
বলিল, “কৈলাম মায়ের বাড়ী বাজানো আমার জেমা।
তা শুনেও উনি জেদ ক’ত্তিছেন।”

সৃষ্টিধর বলিল, “ঢাকী না নিয়ে আস্তাম তো কতা
ছিলো না; ঢাকী-ঢুলী এনে ফেলিচি। তারা বাজাতি
পাঁটা না, এ কি রকোম কতা!”

মুকুন্দার মত গম্ভীর ভাবে তিনকড়ি বলিল, “আপনি
ঢাকী নিয়ে-আলি কি হবে শা-মশায়! মায়ের বাড়ীর
নিয়াম, যার যা কাজ ধরা আছে, তারে দিয়ে তাই
করাতি হবে। মার পূজো করেন হালদার মশায়, আপনি
পুরুত আনলি, তেনারে পূজো কত্তি দিতো? মেঘনাদ
পাঁটা কাটে, আপনি যদি বলেন, ‘আমার নোক
দিয়ে কোপ করাবো’, তাকি ওরা কত্তি দেবে?”

তিনকড়ির বৃষ্টি শুনিয়া তাহার উক্তির প্রতিবাদ
করিতে না পারিয়া সৃষ্টিধর চুপ করিয়া রহিল। তাড়া
দিয়া কেনা বলিল, “চট্ ক’রে চলেন, পূজোর সোময়
হ’লো। আমাকে গিয়ে বাজাতি হবে।”

সৃষ্টিধর বলিল, “তোমারে আবার দিতি হবে কতো?”

কেনা বলিল, “যা ধরা আছে, আপনার কাচতে

জিয়াদা নেবো? ছ’ আনা রেট।”

অসংখ্যের সতি সৃষ্টিধর বলিল, “তাই তো,
দোকোর ক’রে ঢাকীর খুচা!”

শুনিয়া তিনকড়ি বলিল, “তা আর কর্কেন কি?
ছ’ আনা পয়সা লাগবে। মায়ের পূজো দিতি এয়েছেন।
সামান্যের জন্তি খুঁতখুঁত কর্কেন না। এ তো আর
অসোৎ কাজে যাচ্ছে না!”

মন্দিরে ধণ্টা বাজিয়া উঠিল। সত্তর অগ্রসর হইবার
জন্ত সৃষ্টিধরকে তাড়া দিয়া কেনা চাকে ঘা দিল।

মন্দির-প্রাঙ্গণের একধারে পূজার্থীদিগের বিশ্রামের
জন্ত চারি দিক খোলা একখানি মস্ত চালাঘর ছিল।
বলির জন্ত মন করানোর পর পাঁঠাগুলি এই চালারই
কয়েকটি খুঁটাতে বাধা ছিল। সেজ বাবুকে সঙ্গে লইয়া
মেঘনাদ ছাগলগুলি গণিয়া খাতায় লিপিত সংখ্যার সহিত
মিলাইতেছিল। কবে কে নাকি দক্ষিণা জমা না
দিয়া, কাঁকি দিয়া পাঁঠা বলি দেওয়াইয়াছিল! সেই
হইতে কাঁকি দিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে বলির পূর্বে
পাঁঠাগুলি গণিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গণিতে গণিতে থামিয়া সৃষ্টিধরের আনীত পাঁঠাটি
দেখাইয়া মেঘনাদ হাঁকিল, “এ পাঁটা কাব?”

সৃষ্টিধর নিকটেই ছিল। তাহাকে অগ্রসর হইতে
দেখিয়া মেঘনাদ বলিল, “তোমার পাঁটা?”

উপর নীচে মাথা ঠুকিয়া সৃষ্টিধর বলিল, “হাঁ—”

মেঘনাদ গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিল, “নাম, গ্রাম?”

সৃষ্টিধর বলিল, “ছিষ্টিধর শা, গ্রাম শাপুর।”

সেজ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া মেঘনাদ বলিল, “খাতা
দেখেন তো—শাপুরির ছিষ্টিধর শা পাঁটার দক্ষিণে কতো
জমা দেছে!”

খাতা দেখিয়া সৃষ্টিধরের নাম খুঁজিয়া বাহির করিয়া
সেজ বাবু বলিলেন, “তেরো নম্বর, সৃষ্টিধর শাহা, শাহাপুর,
ভোগের দক্ষিণে চার আনা, পাঁটা একটা,—দক্ষিণে সাড়ে
আট আনা।”

সৃষ্টিধরের দিকে গিরিয়া মেঘনাদ বলিল, “জিয়াদা
নাগবে শা-জী!”

সৃষ্টিধর বলিল, “ক্যানো?” সাড়ে আট আনা দিছি,
যা নিয়াম,—আবার জায়দা নাগবে ক্যানো?”

মাতকরি চালে হাত-মুগ নাড়িয়া মেঘনাদ বলিল,

“নাগবে জ্যায়দা,—তারি পাটা! পাতার হাড়িকাটে হবে না, ভেড়ার হাড়িকাটে কোপ ক’ত্তি হবে!”

সৃষ্টিধর বলিল, “তার জন্তি জ্যায়দা দিতে হবে?”

মেঘনাদ বলিল, “হ্যাঁ, ভেড়ার দক্ষিণে লাগবে, চোদ্দ সিকে।”

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে সৃষ্টিধর বলিল, “অগ্রায় কতা।”

মেঘনাদ বলিল, “অায়-অগ্রায় বুঝিনে, যা নাগবে বল্লাম্। নয় তো বলি হবে না, খোলসা কতা।”

সৃষ্টিধরকে খোলসা কথা শুনাইয়া দিয়া বাকী পাঠা-গুলির গণনা শেষ করিয়া সেজ বাবুর সছিত মেঘনাদ প্রস্থান করিল।

কি করিবে, সৃষ্টিধর দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। এই ব্যাপার লইয়া পূজার্থীদিগের মধ্যে আলোচনা শুরু হইল। এক জন বলিল, “তারি বলে তার পাটা তো আর ভেড়া নয়, তবে জ্যায়দা লাগবে কানো?”

উত্তরে অপর এক জন বলিল, “তা বলে কেডা? আমার জোড়া পাটা মানোসা; সাড়ে আট আনা ক’রে সতোরো আনা দক্ষিণে দেলাম। তা জোড়া-বলি দিতি দেলে না। য্যাটা সেজেবাবু বাড়ী পাঠালেন্। দেব বলাবলি কল্লাম্। শোনলেন্ না। তা কর্কা কি!—ভাবনা ক’রে কি কর্কা? তোমার চোদ্দসিকে লাগবে।”

প্রবীণ গোছেব এক জন লোক পরামর্শ দিয়া বলিল, “ও কোনো কাজের কতা নয় সেজেবাবুরি ধরো গে।”

শ্যালকের শুভাগমন সংবাদ জানাইয়া, অন্ততঃ চারটি পাঠার মুড়ি দেওয়া হয়, এবিনয়ে রোকায় অনুরোধ জানাইয়া থানার দারোগা বাবু এক জন কনষ্টেবল পাঠাইয়া-ছিলেন। প্রাক্কণের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেজ বাবু তাহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন। প্রবীণের বৃদ্ধিমত সৃষ্টিধর গিয়া তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু বৃথা ধরা! নিয়মের দোহাই পাড়িয়া তিনি বলিলেন, “পাটার হাড়িকাটে যদি বলি দেওয়া চলে, তবে সাড়ে আট আনা—যা জমা দেছো তাতেই হবে, আর তা না হ’লে, চোদ্দসিকে লাগবে।”

সৃষ্টিধরের মুখে সেজ বাবুর রায় শুনিয়া ভরসা দিয়া সোণামণি বলিল, “জ্যাদা লাগবে না। পাটার হাড়িকাটে কোপ হবে না ক্যানো, খুব হবে। দেড়-ব’ছুরে বাচ্চা!”

কিন্তু বলির সময় চার পাচ জনে মিলিয়া, ঠাসিয়া

কুসিয়া, মজোর চাপিখা-চূপিয়াও হাড়িকাটের ফাঁকে সোণামণির ‘দেড়-বছুরে বাচ্চার’ গলা কিছুতেই পাইতে পারিল না। ঠেলা-চুলিতে হাড়িকাটের অপরিসর বেষ্টনীর চাপে, দম আটকাইয়া পাঠা মরে আর কি! দেগিয়া পুরোহিত হালদার-মহাশয় ছুটিয়া আসিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, “মায়ের সামনে নিশংসো জীব-হত্যা! মহাপাতকের ভয় নেই, য্যা! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, হাড়িকাট থেকে তোল আগে।”

কথার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাটাকে মুক্তি দিবার জন্ত নিজেই তিনি কাঁপাইয়া পড়িলেন।

সমবেত সকলেই প্রায় এই ব্যাপারে সৃষ্টিধরের নিন্দা করিতে লাগিল। পূজা দিতে আসিয়া একরূপ মহাপাতকের কার্য্য করা, ডি ডি! অধিকারী বাবুদের ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া এক জন বলিল, “হাড়িকাট ক’রে রেকেছে দেকোচো—মুণ্ড গলে না। জ্যায়দা পয়সা নেবার মতলোব্ বুঝলে কি না—!”

আর এক জন বলিল, “অগ্রায় জুলুম, সাতসিকের পাটা নয়, তার চোদ্দসিকে দক্ষিণে!”

আগের লোকটি সৃষ্টিধরকে বৃক্তি দিল, “তুমি য্যাক কাজ করো দাদা! বলি না দিয়ে মায়ের নামে পাটা ছেড়ে দ্যাও।”

ঘটনাচক্রে পড়িয়া প্রায় সকলের কাছেই তিরস্কৃত হইয়া, অপ্রতিভ সৃষ্টিধর ক’র্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিল না, দু’চার আনা বেশী হইলেও যাহা হয় করা যাইত। কিন্তু সাড়ে আট আনার স্থলে একেবারে সাড়ে তিন টাকা! অগ্রায় অসঙ্গত দাবী, এত বেশী দিতে তাহার মন সরিতে-ছিল না। তাই লোকটি যখন তাহাকে, বলি না দিয়া পাঠাটি মায়ের নামে ডাডিয়া দিতে বলিল, তখন সমস্তা সমাপানের সূত্র পাঠিয়া অনেক উৎসাহের সঙ্গেই সে প্রশ্ন করিল, “তা চ’লবে?”

পূর্ব-কথার সমর্থনে বেশ জোর করিয়া তাহার পরামর্শদাতা বলিল, “চ’লবে না ক্যানো? খুব চ’লবে। গলায় খাঁড়া ছোঁয়ায়ে ছেড়ে দ্যাও।”

অধিকতর উৎসাহে সৃষ্টিধর বলিল, “তা যদি হয়, সেই ভালো।”

কিন্তু তাহার উৎসাহ অচিরেই গুচিয়া গেল। পাঠাটি

ছাড়িয়া দেওয়া প্রস্তাব সোণামণি অমুমোদন করিল না, বামুনদিদিও সমর্থন করিলেন না।

পাঁঠার দক্ষিণা ছুঁটাকা সাড়ে পনের আনা অতিরিক্ত লাগায় তিনকড়ির দোকানে বাতাসার দাম মিটাইবার সময় সৃষ্টিধরের পোনে আট আনা অকুলান পড়িল। তিনকড়ির ভক্তজনোচিত বেশভূষা এবং হাবভাব দেখিয়া, তাহার হাসির ঝিলিক গিশানো মিষ্ট-মধুর মোলায়েম কথা শুনিয়া, প্রথম হইতেই তাহাকে বেশ ভাল লোক বলিয়াই সৃষ্টিধরের ধারণা হইয়াছিল। সামান্য কিছু বাকীর জগ্ন অমুরোধ করিলে উহা সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে—এ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পায় নাই; কিন্তু বাকির জগ্ন বলিতেই ঘাড় নাড়িয়া তিনকড়ি অসম্মতি জানাইয়া বলিল, “না শা-মশায়! বাকি-বকেয়ায় কাজ নেই, পনি আট আনার পয়সা আপনার পরিবারের কাছে দেখুন না।”

সৃষ্টিধর বলিল, “তার কাছে কিছুই নেই।”

গম্ভীর হইয়া তিনকড়ি বলিল, “তাহ’লি কম ক’রে নিতি হয়,—নিতাই, পনি আট আনার বাতাসা তুলে গ্ৰাও।—গ্যাকসের, আর হবে আধপো—আটারো ছটাক।”

সৃষ্টিধর দেখিল, মহা বিপদ! সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “রও দেখি! কাটলি হচ্ছে কি ক’রে! শরোতের ওজোন্ একশ সের আড়াই ছটাক। তার কম হলি হবে না।”

তাড়া দিয়া নিতাই বলিল, “কি কর্কেন্, ব’লে ফেলুন্ চট ক’রে। আপনাকে নিয়ে তামাম দিন আমার পড়ে থাকলি চ’লবে?”

তিনকড়ি পুত্রকে বলিল, “তোমারে যা বল্লাম্, তাই করো নিতাই। আটারো ছটাক বাতাসা কেটে গ্ৰাও। খদ্দের সব দাঁড়িয়ে—ওই ছেঁড়া ভেজালু নিয়ে এই কি মাথা-ঘামানোর সোময়!”

নিতাইকে পিতার আদেশ পালনে উত্তত দেখিয়া সৃষ্টিধর তাহার গায়ের চাদরখানি খুলিয়া নিতাইয়ের হাতে দিয়া তিনকড়িকে বলিল, “বাকি খখোন্ রাখবেন না, তখোন, এই চাদরখানাই জামিন রেকে দিন। ক’ গণ্ডাই বা পয়সা?”

ক্রুঁক্কাইয়া তিনকড়ি বলিল, “পুরোনো—জোলায় তাঁতের বস্তাপচা চাদোর! ওর আর দাম কি?”

প্রতিবাদ করিয়া সৃষ্টিধর বলিল, “পুরোনো? মাখ-ফাগুন মাস্তোর দু’টো মাস মাঝে মিশেলে গায়ে দোওয়া হ’য়েছে। দাম নিয়েলো একটাকা ছ’ আনা।”

তিনকড়ি বলিল, “ঐ আদময়লা চাদোর ছাড়া আর কিছু কাছে নেই? সোণার আংটি, কি সোণার মাহুলী?”

তিনকড়ির রুক্ষ কথায়, ও রুঢ ব্যবহারে সৃষ্টিধর তাহার উপর হাড়ে চটিয়া গেল। রুদ্ধ রোমে, ব্যথা-ভরা ফুঙ্ক কণ্ঠে সে বলিল, “পুজো দিতি এইচি, সঙ্গে কোরে কি হীরে-মুক্তার গয়না আনবো? চাদোরখানা দোছোট ক’বে এইচি। এখান রেকে দিতি হয় দিন, নয় তো আব কি কর্কে! নেহাৎ কারে প’ড়িচি, তাই পোনে-আট গোণ্ডা পয়সার জগ্নি গায়ের চাদোর খলে দিতি হ’লো—একি কম দুখার ক’তা?”

তিনকড়িকে অগত্যা সৃষ্টিধরের প্রস্তাবেই রাজী হইতে হইল।

ধামা চেঙ্গারি পুরিয়া সৃষ্টিধরকে বাতাসা আনিতে দেখিয়া সেজ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওকি লুট হবে?”

মন্দিরের রকে মোট নামাইয়া সৃষ্টিধর বলিল, “আজ্ঞে।”

সেজ বাবু প্রশ্ন করিলেন, “কতোখানি বাতাসা?”

হাতবোড করিয়া, সৃষ্টিধর বিনীত ভাবে বলিল, “আজ্ঞে, একুশ সের আড়াই ছটাক। ছেলের ওজনে লুট মানোসা—”

খাতা বাহির করিয়া খুলিতে খুলিতে সেজ বাবু বলিলেন, “তোমার নাম হ’লো গিয়ে—?”

সৃষ্টিধর বলিল, “সৃষ্টিধর শা। গ্রাম—”

খাতা দেখিয়া সেজ বাবু বলিলেন, “হ্যা, তেরো নম্বোর, তা কই; লুটের দক্ষিণে জমা নেই তো?”

দক্ষিণার কথা শুনিয়া সৃষ্টিধরের বুক কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে ভয়ে সে বলিল, “আজ্ঞে লুটির দক্ষিণে তো ধরা-বাঁধা নেই, যার যা ক্ষ্যামোতা—”

তাড়া দিয়া সেজ বাবু বলিলেন, “তা জমা দাওনি কেন?”

আমতা আমতা করিয়া সৃষ্টিধর বলিল, “তকোন্ অতো খ্যালু হয়নি। আপনারা—”

বাধা দিয়া সেজ বাবু বলিলেন, “যাক্ যাক্, কি দেবে দাও, জমা ক’রে নিই।”

লিখিবার জন্ত সেজ বাবু পেন্সিল বাগাইয়া ধরিলেন। দেখিয়া সৃষ্টিধর শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলেও তো নিস্তার নাই! কাজেই নিজের নিঃসম্বল অবস্থার কথা জানাইয়া, কাতরভাবে দায় হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিল।

সেজ বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, “তুমি তো দেখিছো ভারী ফ্যাসাদে লোক হে! পাটার দক্ষিণে নিয়ে একবারে দোকানদারী জুড়েছিলে, আবার এখন—”

হালদার মহাশয় এতক্ষণ নীরব থাকিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতেন। সেজ বাবুর কথার মাঝেই সৃষ্টিধরকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশের ভঙ্গীতে বলিলেন, “ধর্ম-কার্যে ব্যয় ক’রে কুণ্ঠিত হ’চ্ছে! বোঝ না বাবু! এই হ’চ্ছে সার্থক ব্যয়। দক্ষিণা দিতে অমত ক’চ্ছে কেন? দক্ষিণা ব্যতীত যে সর্বকর্মেই অসিদ্ধ!”

রকের উপর দরজার ধার ঘেসিয়া-বসিয়া বামুনদিদি মালা ঘুরাইতেছিলেন। হাত তুলিয়া মালাটি কপালে ছোয়াইয়া হালদার মহাশয়ের কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, “ঠাকুর মশায় যতাত্তো কতাই ব’লেছেন ছিটি! দক্ষিণে না দিলি কাম্যোসিদ্ধি হয় না; যা হয় কিছু দে।”

“ম্যাট্রা পয়সা নেই বামুনদি! থাকলি কি আর গায়ের চাদোর বাঁদা দিয়ে লুটির বাতাসা আনতি হয়?”—বলিতে বলিতে দুঃখে-কষ্টে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। চোখে জল ঝরিতে লাগিল। বামুনদিদি সহানুভূতি করে বলিলেন, “দুখ্য ক’রে কি ক’রিস ছিটি! ম্যাক্‌দিন এসে চাদোর-খানা খালাস ক’রে নিস। এখন তো লুটির দক্ষিণে কিছু—”

কথা বলিতে গিয়া কান্না ঠেলিয়া আসিতেছিল: অতি কষ্টে সামলাইয়া সৃষ্টিধর বলিল, “ব’লেতেছেন বামুনদি! কিন্তু দেবো কোৎ থেকে? এটা কাণাকড়িও কাছে নেই!

বামুনদিদি সব কথা শুনিয়া বলিলেন, “চাটে পয়সা আমার কাছে আছে, তাই দিয়ে এ ধাক্কা সামলানো যাক।”

পয়সা চারিটি সেজ বাবুর সামনে রকের উপর রাখিয়া

বামুনদিদি বাবুটিকে বলিলেন, “বুড়ো মানুষ, বামুনের মেয়ে আমি, আমার কতাত্তা রাকো বাবা, এই নিয়েই সন্তোষ হও!”

চাপ্ দিয়া আর বেশী স্বেবিধা হইবে না বুঝিয়া—সেজ বাবু অগত্যা নিরস্ত হইলেন, পয়সা চারিটি তুলিয়া-লইয়া বলিলেন, “বামুনের মেয়ের কথা তো ঠ্যালা যায় না, না হ’লে—যাক্,—এক কাজ ক’রো হালদার! দক্ষিণে বাবদ্‌ ওর ভাগ থেকে টাকাটাকের বাতাসা চেলে নিও। নগদে তো পাওনাটা আদায় হ’ল না।”

লুটির অবশেষের সের আড়াই বাতাসা ও যৎকিঞ্চিৎ ভোগের প্রসাদ ধামার ভিতর রাখিয়া, গামছা-ঢাকা দিয়া, এবং ঝুলাইয়া লইবার জন্ত মুণ্ডহীন পাটার চা’র পা রজ্জ্ববদ্ধ করিয়া তাহারই পাশে রাখিয়া, সৃষ্টিধর বামুনদিদি ও সোণামণির সহিত—মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এক পাক ঘুরিয়া হঠাৎ সে থামিয়া বলিল, “ধাক্‌গে বামুনদি! পদক্ষিণিতে আর কাজ নেই, যাওয়া যাক!”

বামুনদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, “ক্যানো রে! মাস্তোর ম্যাক পাক হ’লো। সাতবার পদক্ষিণ করাই নিয়োম্। অভাবে তিনবার,—না হ’লি ফল হয় না।”

করণকণ্ঠে সৃষ্টিধর বলিল, “না হোক্‌ গে। একুনি আবার দক্ষিণের দাবী কোরে চাপ দেবে! দেবো কোথা থেকে?”

শুনিয়া মূহু হাসিয়া, অণ্ড দিয়া বামুনদিদি বলিলেন, “দক্ষিণে লাগবে না রে! তুই আয়।”

সৃষ্টিধর কোন রকমে প্রদক্ষিণ-পর্ক শেষ করিয়া, বামুনদিদি ও সোণামণিকে অনুসরণ করিতে বলিয়া কালী-বাড়ী ত্যাগ করিল। ধামাটি ঘাড়ে তুলিয়া-লইয়া, পাটার ধড়টি হাতে ঝুলাইয়া, লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া সে চলিতে ছিল, হঠাৎ পিছনে বামুনদিদির ডাক শুনিয়া তাহাকে ধামিতে হইল। ফিরিয়া চাহিতেই তাহার নজরে পড়িল বামুনদিদি ও সোণামণিকে ঘিরিয়া একটা ছোট-খাট ভীড় জমিয়াছে! তবে কি সে যাহা সন্দেহ করিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে? প্রদক্ষিণের দক্ষিণার জন্ত তাঁহাদের উপর জুলুম আরম্ভ হইয়াছে?—এখন উপায়! সে যে একেবারেই রিক্তহস্ত!

বামুনদিদি ডাকের উপর ডাক দিতেছিলেন, ভীড়ও ক্রমেই বাড়িতেছিল—দেখিয়া সৃষ্টিধরকে ফিরিতে হইল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া বামুনদিদি ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন, “এইছিঁস্ ছিষ্টি ! ঠাক, শরোতের মা কি কাণ্ডো বাধিয়ে ব’সেছে ! কার মুখি বুঝি শুনেছে, হাঁড়িকাটের গোড়ার মাটি ধরে রাকুলি আপোদ্-বিপদ ঘটে না, তাই য়াক্-দলা মাটি নিয়েছে। আর যাবা কুতায় ? ঐ মিন্বে ব’লছে, ‘পয়সা ঠাও।—একেবারে নাছোড় !’ য়াক্ ছিটে মাটি নিয়েছে তার জনিও পয়সা,—অবাক্ কাণ্ডো !”

ব্যথাভরা ধরা-গলায় সৃষ্টিধর বলিল, “একেন্কার কুটোগাছটারও দান চোন্দসিকে ! আজগের য়াটাদিনি কম ভোগটা ভোগলাম ! ঢাকী নিয়ে আলাম, তা তারে বাজাতি দেলে না, ছ’ আনা পয়সা জলে গালে। পাটাডা মোটা ব’লে দাপ্পা দিয়ে তিন-তিনটে টাকা খাড ধ’রে আদায় ক’রলে !”

সৃষ্টিধরের কথা শুনিয়া জনতার ভিতর হইতে এক জন বলিল, “ব’ল্বো কি ! পাঁচ সিকে ফুল-কাড়ানোর দক্ষিণে দিলাম। পয়লা দফায় ফল প’লে! না ; ঠাকুরম’শায় বল্লেন, ‘খুঁত হ’য়েছে, জরিমানা লাগ’বি !’ দিলাম আর পাঁচ সিকে, কর্কো কি ?”

ভীড়ের ভিতর হইতে মেধনাদ বীরদপে হুঙ্কার দিল।

কলহের সূচনা দেখিয়া সৃষ্টিধরকে খামাইয়া সাঙ্ঘনা দিয়া বামুনদিদি বলিলেন, “মার পূজায় জ্যায়দা গেছে ব’লে হুখ্য করিস্নে ছিষ্টি ! মা যদি মুখ তুলে চান্,—বিশ্ণু পাইয়ে দেবেন্।”

বামুনদিদি খামিতেই, ভীড়ের পিছন হইতে হুমমনের মতো চেহারার এক বাঙ্গারাম সৃষ্টিধরের সামনে আসিয়া বাজুখাঁই আওয়াজে বলিল, “চা’র গোণ্ডা পয়সা বের করো এখুনি। বলির থানের মাটি নিলি ওর চা’র আনা ক’রে দক্ষিণে ধরা আছে। মায়ের বাড়ী যে ঝাঁটু ঠায়, বলির যায়গায় জল-গোবোর ঠায়,—এ তারই পাওনা।”

বামুনদিদি বলিলেন, “তোর্ কাছে তো পয়সা নেই ; তা হ’লি কি কর্কি ছিষ্টি ?”

সৃষ্টিধর বলিল, “কর্কো আর কি ? যেকেন্কার মাটি সেকেনে—”

সৃষ্টিধর কথা শেষ না করিলেও তাহার মর্শ্ব বুঝিয়া সোণামণি অকল্যাণের ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। বামুনদিদি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “ও-রকোম্ কতা ব’ল্টি নেই ছিষ্টি ! মা অসন্তোষ হন্।”

ব্যথা-ব্যাকুল কণ্ঠে সৃষ্টিধর বলিল, “ব’ল্তেছেন্ তো বামুন্দি ! কিন্তু তা’ ছাড়া উপায় কি ? কাছে তো কিচ্ছু নেই, তা হ’লি গাম্ছা প’রে, কাপোড়খানা খলে দিয়ে বাড়ী যাতি হয় !”

বাঙ্গা বলিল, “চা’র গোণ্ডা পয়সা কাছে নেই, এ কি এটা কতা !”

বামুনদিদি বলিলেন, “সত্যিই নেই, থা’কুলি সামান্তোর জন্টি কি মার থানে দাডিয়ে ভাঁডায় ?”

এক জন মুরুন্দি বলিল, “তবে সেরখানিক্ বাতোসা আদায় কো’রে নে বাঙ্গা।”

গাম্ছা পাতিয়া বাঙ্গা বলিল, “তাই দাও গো মশায় !”

“বাড়ীর জন্টি সামান্তো পেসাদ নিয়ে যাবো, তা-ও তোমরা দেবা না।”—বলিয়া ক্ষোভে-হুঃখে ধামা উপুড় করিয়া বাভাসা, প্রেসাদ সবই বাঙ্গার গাম্ছায় ঢালিয়া দিয়া বাঙ্গাকল্লতরু সৃষ্টিধর হন্-হন্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে বামুনদিদি বলিলেন, “ছিষ্টি রাগ ক’রে সব চেলে দিলে ; বাড়ীর জন্টি য়াক্-কুচিও রাক্লে না !”

সোণামণি বলিল, “রাগ হ’লো গিয়ে আমার পরে। ঐ যে আমি-হাতে ক’রে মাটি তুলে নিছি।—তা হোক্-গে রাগ ; আমার মানোত তো দেওয়া হ’লো।”

কিন্তু সৃষ্টিধর তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, সে তখন মা-কালীর নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছিল,— “মা, যারা তোমার সেবার ভার নিয়ে এমনই ক’রে তোমার ভক্তদের সর্কস্বি লুট ক’ছে, তাদের এ অত্যাচার দেখেও তুমি দেখ্ছো না ? এর প্রতিকার করো মা, করুণাময়ী !”

শ্রীনিশিভূষণ ভট্টাচার্য্য।



পুষ্প-মোহিতা

(গল্প)

তাহার মালতীমালা নাম রাখা ভুল হইয়াছিল। সে মালা না হইয়া মালিনী হইল। নিজেদের শয়নগৃহ-সংলগ্ন এক-টুকরা পতিত জমিতে মালতীর স্বহস্ত-রচিত পুষ্পোদ্যান। চারিদিকে ফণি-মনসার কণ্টকাকীর্ণ দুর্ভেদ্য বেড়া; মাঝখানে সারি সারি পুষ্পিত কুমুম-তরু। উদ্যানের জমি উর্বর, প্রস্ফুটিত পুষ্পদামে সুশোভিত তরুগুলি সতেজ, তাহাদের শাখা-পল্লবে শ্যামল-শ্রী উদ্ভাসিত।

বাগানের একপ্রান্তে শৈবালাচ্ছন্ন জলাশয়। মালতী কলসী ভরিয়া জল আনিয়া বৃক্ষমূলে সিঞ্চন করিতেছিল। এমন সময় অরু আসিয়া বলিল, “বৌদিদি, দাদা এসেছেন। তুমি তাঁকে জল খেতে দাও-গে, তোমার বাকি গাছগুলোতে আমিই জল দিয়ে দিচ্ছি।”

মালতী ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, “আজ এরই মধ্যে ফিরলেন? এখনো তো সন্ধ্যা হয়-নি। সবগুলো গাছে জল দেওয়া হ'লো না। তুমি এত-বড় কলসী ভ'রে জল আনতে পারবে না অরু! ছেলে-মানুষ কি না!”

বারো বছরের ছেলে ছেলেমানুষ!—এই অপবাদে লজ্জিত হইয়া অরু উত্তর দিল, “আমি এখন তো অনেক বড় হ'য়েছি বৌদিদি, তাহ'লে জগার মাকে তুমি জল দিতে পাঠিয়ে দিও। বাড়ীতে কি থাকতে তুমি এত জল ঢালো কেন? তোমার কি কম কষ্ট হয়?”

“কষ্ট! না ভাই, এতে আমার কষ্ট হয় না, আনন্দই হয়। যাদের এত ভালবাসি, তাদের কাজ নিজের হাতে না করলে আমার ভাল লাগে না। এখন থাক, তোমাকে আর জল দিতে হবে না। রাতে ফিরে এসে আমিই দেব।”

“না বৌদিদি, রাতে তুমি বাগানে ঢুকো না। হান্না-হান্নার ফুলে গাছ ভ'রে গেছে। ও-বাড়ীর শঙ্কুদা বলে—হেনার গন্ধে সাপ আসে।”

“সাপ এলেও ফুলের গন্ধে বিভোর হ'য়ে থাকে; কারকে ছোবল দিতে মাথা তোলে না। তুমি তো জানো না অরু, সকলে ঘুমুলে আমি রোজ রাতে বাগানে আসি। না এলে আমার ঘুম হয় না; থাকতে পারি না।”

“আচ্ছা বৌদি, তুমি গাছ এত ভালবাসো কেন? সব চেয়ে তোমার বেশী আদরের পাত্র ঐ গন্ধরাজ!”

“যে ফুলের রাজা, গন্ধের রাজা, তাকে ভাল না বেলে বাসবো কাকে? তুমিও তো কত কি ভালবাস অরু, কেন বাস জিজ্ঞাসা করলে কি বলতে পার? আমিও তেমনি গাছ ভালবাসি,—কেন বাসি, জানি না।”

“না জানলে; এখন চল। দাদা রাগ করবেন। কই, এখনো তো তুমি খোঁপায় গন্ধরাজ প'রোনি? চট-পট প'রে নাও, আমি তুলে দেই!”

মালতী ব্যস্তভাবে বলিল, “না ভাই, তুমি পারবে না, কি তুলতে কি তুলে ফেলবে! যে ফুল সকাল বেলা ঝরে যাবে, আমি বেছে বেছে সেইগুলো তুলি; তাজা ফুল তুলতে বড় মায়ী হয়।”

বলিতে বলিতে মালতী ফুলভারে অবনত গন্ধরাজ গাছের তলায় অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার অলকে কুমুম দেওয়া শেষ হইল না। অকস্মাৎ স্বামী হিরণের অতর্কিত আবিভাবে মালতীর হস্ত হইতে ফুল খসিয়া পড়িল।

হিরণ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, “তোমার মালিনীগিরি এখনো শেষ হয়নি? এক ঘণ্টার ওপর এসেছি, না পাই এক গেলাস জল, না পাই দু'টো পান। লতু শ্বশুরবাড়ী যাবার পরে আমার হ'য়েছে জ্বালা! মা বসেছেন জপে, ইনি বসেছেন ফুলের ধ্যানে! গাছ-পালা-গুলো হ'য়েছে আপদ, ইচ্ছা হয়, একটানে সব উপড়িয়ে ফেলে আপদের শাস্তি করি।”

রাগে দিশাহারা হইয়া হিরণ সত্য সত্যই সামনের

দোলায়মান গন্ধরাজের ছোট একটি কুমুদিত শাখা মড়-মড় করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল।

যে গাছের ফুল অরু তুলিতে চাহিয়াও পারে নাই, যাহা মালতীর প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর, সেই গাছের অজহানিতে মালতী ভগ্নশাখাটি বক্ষে চাপিয়া-ধরিয়া, শরবিদ্ধা বিহঙ্গীর মত ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

* * * *

রাগে, হুঃখে হঠাৎ অধীর হইলেও রাগী বলিয়া হিরণের হুর্নাম ছিল না। সে রূপবান ও বিদ্বান। তাহাদের বাস-গ্রাম হইতে মাইল-সাতেক দূরবর্তী কোনও গ্রামের ক্ষুদ্র জমিদারের সম্পত্তির ম্যানেজারী করিয়া সে জীবিকার্জন করিত, কিন্তু সংসারে তাহার শাস্তি ছিল না। তাহার পিতা হরিদাস গোস্বামী সংসারের প্রতি অনাসক্ত—উদাসীন ছিলেন; তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বৈরাগী-বৈষ্ণবের আধড়ায় কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়াছেন; বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহার আসক্তি নাই। বিভিন্ন গ্রামের কীর্ত্তনের আড্ডায় তাঁহার সময় কাটে। পক্ষান্তে, মাসান্তে হঠাৎ কোন দিন গৃহে উপস্থিত হইলেও অধিক কাল সেখানে থাকিতে পারেন না। হরিনামের আকর্ষণে আবার তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হয়।

হিরণের মা শ্রামমোহিনী স্বামীর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন না করিলেও তাঁহাকে প্রকৃত সংসারী বলা চলে না। তিনি গৃহে থাকিয়াই সাধন-ভজনে রত আছেন। হাতে জপের মালা এবং মুখে—“নাম পূজ, নাম ভজ, নাম কর সার, কলিযুগে নাম বিনা গতি নাই আর”—এই ধ্বনি। একমাত্র কন্যা ললিতা বিবাহিতা, সে স্বামিগৃহে থাকে। ছোট ছেলে অরুণ দিন কাটে শিক্ষালয়ে ও বন্ধুদের মজলিসে।

বেচারি হিরণ কন্দ্রশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া শ্রান্তি দূর করিবে, এমন একটু সুযোগ পায় না। ওরুণী পত্নীর মিত্য অবহেলায় তাহার তরুণ হৃদয় বেদনায় টন্-টন্ করে; সেই বেদনার তীব্রতা সে ভুলিতে পারে না।

মাত্র বছর-দুই হইল মালতীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। নববধূর স্নিগ্ধ কমনীয় মূর্ত্তি, ভাবে বিহ্বল আঁধি-দুটি নিরীক্ষণ করিয়া হিরণের হৃদয় আশায়, আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার হৃদয়তরা আশার

আকাশ-কুণ্ডম আকাশে বিলীন হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। দেখিতে দেখিতে দুইটি তরুণ-হৃদয়ের মাঝখানে গাছের পর গাছের সারি গজাইয়া উঠিল, এবং শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া দুর্লভ্য ব্যবধান রচনা করিল। হিরণ স্ত্রীকে পাইয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইতে পারিল না।

মালতী শৈশবে মাতৃহীনা। তাহার পিতা উত্তানের তত্ত্বাবধান কার্যে জীবিকার্জন করিতেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন—পেশাদার উত্তানপালক। তাই বাল্যকাল হইতেই মালতীর হৃদয়ের প্রতি-পর্দায় যে বৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহার শুল্করালয়ে আসিবার পর তাহা যেন অক্ষুরিত হইয়া শাখা-পল্লবরাশি বিস্তার করিয়াছিল; তাই বৃক্ষের মোহ সে কাটাইতে পারে নাই।

এরূপ প্রবৃত্তির সহিত হিরণের পরিচয় ছিল না। সে সাধারণ মানুষ; সাধারণ লোকের মতই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া আসিতেছে। ভোরের পাখী ডাকিতে না ডাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহাকে সাত মাইল পথ পাড়ি-দিয়া জমিদারের কাছারীতে হাজিরা দিতে হইত। সেইখানেই তাহার মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা ছিল। দৈনন্দিন কার্য শেষ করিয়া সন্ধ্যায় সে গৃহে ফিরিত। কোন কোন দিন কাজের চাপে তাহার গৃহে ফিরিতে রাত্রি হইয়া যাইত; কিন্তু কি কৃষ্ণপক্ষের নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর বিভীষিকা, কি ঘনঘোর বর্ষার অশ্রান্ত বর্ষণ, কোন বাধাবিলেই তাহার গতিরোধ হইত না।

হিরণ মালতীর জন্ত ব্যাকুল; স্ত্রীর সুকোমল স্তন্যর মুখখানি দেখিবার লোভে তাহার চিন্ত লুক্ক-ভ্রমরের মত তাহাকে বেষ্টন করিয়া গুঞ্জন করিত। কিন্তু সে-দিকে মালতীর লক্ষ্য ছিল না। তাহার প্রাণ-মন আকুল, উন্মুখ হইয়া পড়িয়া থাকিত পত্রে-পুষ্পে,—কখনও বা তৃষিতা চাতকিনীর মত মেঘের সন্ধানে সুদূর নীলাশ্বর-প্রান্তে।

স্বামীর আগমনে মালতী প্রফুল্ল হয় না। স্বামীর আদরে-সোহাগে তাহার অধরে হাসির বিজলীচ্ছটা বিকশিত হয় না। স্বামীর রহস্যলাপে তাহার পাথরের মত সুদৃঢ় মুখের একটি রেখা পর্য্যন্ত পরিবর্তন হয় না! কেবল এক সময় তাহাকে পুলকিত দেখা যায়—সে বর্ষার মেঘমেহুর দিনে রিমিঝিমি বর্ষণে। ঝরিধোতা লতিকার মত সে ভিজিয়া-ভিজিয়া, আনন্দে অধীর হইয়া বিভিন্ন

তরুণলে ছুটাছুট করিয়া গুন্-গুন্ স্বরে গান গায়—
“ও মালতি, ও মল্লিকা, তুই ফুটবি সখী কবে?”

বৃষ্টি থামিয়া গেলে কাস্তবর্ষণ আকাশের মত মালতী
আবার শাস্ত গাঙ্গীর্যের আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া
রাখে। না থাকে তাহার উল্লাস, না থাকে তাহার
উচ্ছ্বাস!

হিরণ নীরবে লক্ষ্য করে, নীরবে গুমরিয়া মরে।
তাহার বহু দিনের চাপা আগুন আজ সহসা মৃদু বায়ু-স্পর্শে
জলিয়া উঠিয়াছিল। নতুবা হিরণ ভ্রমেও স্ত্রীকে অপ্রিয়
কথা কহে না, তাহার প্রতি রূঢ় আচরণ করে না।

যাহা হইয়া গেল, সে জন্ম অমৃতপ্ত হইয়া হিরণ
চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—কেহ কোথাও নাই। তাহার
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অরু পলায়ন করিয়াছে। সন্ধ্যার
অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হিরণ সরিয়া-গিয়া মালতীর একখানা হাত নিজের
হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল, “মালা, গাছ-
তলায় প’ড়ে এমন ক’রে আর কেঁদো না। সত্যি, আমার
অত্মায় হ’য়েছে, আর কখনো তোমার গাছে হাত দেব
না। এবারের মত তুমি আমাকে মাফ কর। দুঃখ
কোরো না লক্ষ্মি! ক’দিনের ভেতরেই আবার তোমার
গাছে নতুন ডাল গজাবে। তাতেও যদি তোমার মনের
আক্ষেপ থাকে, তাহ’লে আমি তোমাকে কালকেই আর
একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ এনে দেব।”

হিরণের বৃথা আশ্বাস, বৃথা চেষ্টা! মালতী তাহার
হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া তেমনই কাঁদিতে লাগিল।

মালতীর অবিরল অশ্রুজলে হিরণের হৃদয় আর্দ্র হইল।
সে যথার্থ তাহাকে ভালবাসিত। ভালবাসার গভীরতায়
অনেক আঘাত সহিয়াছে। কিন্তু আজ প্রিয় সঙ্ঘোধনে
অম্মনয়-বিনয়ে কোনই ফল হইল না। মালতী না কহিল
একটি কথা, না তুলিল চক্ষু।

জপ-তপ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই শ্রামমোহিনী তখনই পুত্র
ও বধুর সন্ধান বাগানে উপস্থিত হইলেন। অরুর নিকটে
তিনি সমস্তই শুনিয়াছিলেন। সন্ধ্যার ঘোর কাটিয়া
চন্দ্রালোকে তখন মুক্ত প্রকৃতি হাসিতেছে। প্রস্ফুট
জ্যোৎস্নালোকে ধূরশয্যায় বধু ও তাহার পাশে অপরাধী
পুত্রকে নির্দীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনোমন্দিরে চির-কিশোর

কিশোরীর মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের চিরমধুর চিত্র
ফুটিয়া উঠিল।

তিনি সকৌতুকে ডাকিলেন, “হিরণ, তোরা এত রাত
অবধি এখানে কি করছিস? ওমা, এ কি কাণ্ড! বোমা
মাটিতে প’ড়ে কেন? রাগ ক’রতে হয়, ঘরে ফিরে
বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সেটা করলেই হ’তো? এ সময়
সন্ধ্যার পর বাইরে থাকতে নেই। দু’দিন পরে ছেলের মা
হবে, এখনও কি এত অবুঝ হ’লে চলে?”

হিরণ জানিত না। আজ মায়ের মুখে প্রথম গুনিল।
মা জপপরায়ণা হইলেও এ-সব দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

হিরণের চিন্তদাহ নিমেষে জুড়াইয়া গেল। জয়ের
আনন্দে, গর্বে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে ভাবিল, এই-
বার তাহার প্রিয়র পুষ্পপ্রীতি, তরুপালন কোথায় থাকে,
দেখা যাইবে। বনবিহঙ্গিনীর পায়ে শিকল পড়িবে—
অরণ্যের হরিণী মায়াজালে আবদ্ধ হইবে! যে নারীর
মধ্যে পতিপ্রেম বিকশিত না হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে,
সন্তান-স্নেহ তাহার সৃষ্টি-ঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে
পূর্ণতায় টানিয়া আনিবে।

কথাটা মালতীর হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হইল না।
চমকিয়া সে উঠিয়া বসিল। তাহার মাথায় চন্দ্রতারকা-
ভূষিত আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল! এ সম্ভাবনা সে স্বপ্নেও
কামনা করে নাই। তাহার বাল্যজীবন যে পরিবেষ্টনের
মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার বাহিরে পা.দিয়া আজও
সে হৃদয়কে শাস্ত করিতে পারে নাই। পিতার আদেশে
তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে, সংসারধর্ম পালন করিতে
হইতেছে; কিন্তু ইহার মধ্যে হৃদয়ের প্রেরণা নাই।

বাপ মেয়ের প্রকৃতি জানিতেন। তাই মেয়ের সহিত
তিনি এক রাশি ফুলগাছ দিয়াছিলেন। সেই গাছগুলি
অবলম্বন করিয়া মালতী কোনরূপে জীবন যাপন
করিতেছে। এ অবস্থায় এ আবার কি অভাবনীয় পরি-
বর্তনের সূচনা?—সে আর ভাবিতে পারিল না। আশ্বে
আশ্বে বাগান হইতে বাহির হইয়া গেল।

অরুকে স্কুলের পড়া বলিয়া দিয়া হিরণ শয়ন-কক্ষে
প্রবেশ করিয়া বিশ্রিত হইল। মালতী মেঝেয় পৃথক
বিছানা পাতিয়া ইহারই মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছে! অন্তি-
মানিনীর দুর্জয় অভিমানে হিরণ মনে মনে কোতুক

অনুভব করিতে লাগিল। স্নেহে প্রেমে বিগলিত হৃদয়ে হিরণ পত্নীর মুখের নিকটে মুখ নত করিয়া কহিল, “মালা, মালিনী, এখনো শাস্ত হ’তে পারেন না? লঘু পাপে আর কত গুরু দণ্ড দেবে? চল, উঠে আমার বিছানায় চল, সেখানে যে শাস্তি দিতে চাও, আমি মাথা পেতে নেব।”

মালতী স্বামীকে একটা ধাক্কা দিয়া অকস্মাৎ গর্জিয়া উঠিল, “তুমি সরে যাও, আমার কাছে এস না। আমাকে ছুঁয়ো না। কথা না শুনলে, আমি এখানে থাকবো না। বাবার কাছে চ’লে যাব। এত দিন ত যেতাম; কেবল আমার গাছের জন্তে পারিনি।”

হিরণ তাহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। এই কি তাহার বড় আদরের—বড় স্নেহের মালা? বিধাতা তাহা-দিগকে যে বাঁধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার অপেক্ষাও কি ঐ সকল বৃক্ষের বন্ধন দৃঢ়তর? হিরণের পৌরুষগর্বে আঘাত লাগিল। সে ধীর, গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, “তোমাকে চ’লে যেতে হবে না মালা! আমি কথা দিচ্ছি—আর কখনো তোমার অনিচ্ছায় তোমাকে স্পর্শ করবো না—বিরক্ত করবো না। আমার চেয়ে—পৃথিবীর সকলের চেয়ে ঐ সব গাছের প্রতি তোমার প্রীতি অক্ষয় হোক। তুমি নিশ্চিত মনে ঘুমোও।”

বলিতে বলিতে হিরণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শয্যায় আশ্রয় লইল। কিন্তু সর্বসম্ভাপহারিণী নিদ্রাদেবী তাহার কোমল করপদাথানি একবারও হিরণের চক্ষুপল্লবে বুলাইলেন না।

চিন্তার পর চিন্তাতরঙ্গে হিরণ ভাসিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল—মহলে যাইবার কথা। মালতীকে ছাড়িয়া তাহার দূরে যাওয়া কষ্টকর বলিয়াই সে নানারূপ ওজর-আপত্তি করিয়া দিনটা পিছাইয়া দিয়াছে। হিরণ স্থির করিল, আর বিলম্ব না করিয়া এই স্নযোগে সে মহলের কাজ সারিয়া আসিবে। মালতীকে একটু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বিচ্ছেদ ভিন্ন অবিচ্ছিন্ন মিলনের মূল্য বুঝিতে পারা যায় না।

* * * *

পরের দিন ভোর হইতে না হইতে হিরণের যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। শ্রামমোহিনী সবিস্ময়ে কহিলেন, “কৈ, মহলে যাবার কথা তো এত দিন একবারও বলিসনি? কর্তা থাকেন বাইরে বাইরে। তুই কাছে না থাকলে

আমার জপ-তপ ঠিকমত হয় না। অকুটা হ’য়েছে বার-মুখো। বৌমা গাছ-পালা নিয়েই পাগল। এ সময় যে সাবধানে থাকা দরকার তা ও শুনবে না। তুই কবে ফিরবি হিরণ?”

হিরণ কার্যরতা মালতীর পানে আড়চোখে চাহিয়া উত্তর করিল, “ফেরার কথা এখনি তো ব’লতে পারি নে মা! কাজ বুঝে ফেরা না ফেরা! তোমার অসুবিধা হ’লে ললিতাকে আনিয়ে নিয়ো।”

“পরে তাকে আনতেই হবে। এত আগে থেকে সে কি এসে থাকতে পারবে? বৌমার এই তিন মাস যায়। এখনো দেরী আছে। তুই চট ক’রে কাজ সেরেই চলে আসিস। বেশী দেরী করিস নে।”

“কাজের জন্তে যাচ্ছি মা! কাজ সারতে দু’চার মাসও কেটে যেতে পারে। আমার জন্তে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ঠিক সময়ে টাকা পাঠিয়ে দেব। তোমার জপ-তপের, আর এক জনের গাছপালার সেবা-যত্নের কোনই ক্রটি হবে না।”—বলিয়া হিরণ আশা-পূর্ণনেত্রে মালতীর মুখের দিকে তাকাইল; কিন্তু স্থির সমুদ্রে না আছে চাঞ্চল্য, না আছে তরঙ্গ-ভঙ্গ।

মায়ের পদধূলি মাথায় লইয়া হিরণ ক্লম্মমনে গৃহত্যাগ করিল।

* * * *

দুই চারি মাস ত দূরের কথা, মালতীকে মাত্র এক সপ্তাহ দেখিতে না পাইয়াই হিরণ অস্থির হইল! কোথায় গেল রাগ, কোথায় গেল তাহার সেই প্রচণ্ড অভিমান! বিচ্ছেদের অনলে পুড়িয়া তাহার তেজটুকু পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইল। হিরণ ভুলিয়া গেল মালতীকে কি বলিয়া আসিয়াছিল, মালতী তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল।

এক মাসের কাজ তাড়াতাড়ি সাত দিনেই শেষ করিয়া নীড়াভিমুখী বিহঙ্গের মত হিরণ গৃহে ফিরিল। মালতীকে চমকিত—পুলকিত করিবার প্রত্যাশায় তাহার আগমন-সংবাদ বাড়ীর কাহাকেও পূর্বে জানাইল না।

সে-দিন তিথিটা ছিল বুলন-পূর্ণিমা। সন্ধ্যায় মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিয়াছিল। স্থানীয় রথতলায় শ্রাম-মোহিনী বুলন দেখিতে গিয়াছিলেন। পাড়ার কয়েকটি সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া অক্ল মহানন্দে লুর্ডা খেলিতেছিল।



কালিদাস, ১৩৪৭ |

অতঃ পরে
এ নতুন-আবরণে
প্রাচীন জ্ঞান
বলে ত বাঁধে যাক শুকায়ে,
হৃদয়মানে মর্ম দেবতা মনোরম

। শিল্পী—মিষ্টার টমাস

হিরণ নিঃশব্দে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

মালতী বাতায়নে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জানালার নীচে সত্ত্ব-বিকশিত কুম্ভমরাশির কি সমারোহ! মালতীর অবগুষ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে। কাল কেশে এক থোকা গন্ধরাজ হাসিতেছে! কর্ণমূলে তুলিতেছে চম্পক-কলি। গলায় কুন্দফুলের মালা। নীল শাড়ীখানি তাহার গৌর তনু বেষ্ঠন করিয়া সেই রূপরাশি ঢাকিবার রুখা চেষ্টায় যেন শ্লথ, চঞ্চল!

হিরণের সমগ্র শ্রাণ-মন মগ্নমুগ্ধবৎ মালতীর দিকে ধাবিত হইল। তাহার মনে হইল, জগতে কোথাও বাধা নাই; বন্ধন নাই। তাহার চিরস্বনী কিশোরী প্রিয়া অভিসারের বেশে সাজিয়া আজ যেন তাহার বাহু-বন্ধনে ধরা দিতে আসিয়াছে।

হিরণ বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিল, “মালা, তোমাকে আর আমার পথ চেয়ে থাকতে হবে না। আমি এসেছি।”

মালতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, হিরণ তাহার পাশে। সে তৎক্ষণাৎ অবগুষ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

হিরণের অন্তর হইতে পলকে অদৃশ্য হইল—ঝুলন-রজনীর মদির-বিহ্বলতা, বর্ষা-বায়ুর সজল আমন্ত্রণ, মিলনের স্নমধুর গুঞ্জনধ্বনি।

রাত্রি অধিক হইলে শ্যামমোহিনী ঘরে ফিরিয়া ছেলেকে আহ্বারের জন্ত ডাকিতে আসিলেন। ছেলে অসুখের ছুতায় বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। এক বার উঠিল না, কাহারো সহিত কথাও কহিল না। অনাহারে, অনিদ্রায় হিরণের দুঃখের রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল।

প্রভাতে দুঃসহ হৃদয়-ভার লইয়া, পরাজয়ের ক্ষোভ, লজ্জা বহন করিয়া হিরণ গন্ধরাজ ফুলগাছের নিকট উপনীত হইল। বর্ষার বারিধারায় স্নাত বাগানটি তখন শ্রামল শোভায় হাসিতেছে। সবুজ পাতার কোলে শুভ্র, স্নন্দর ফুলগুলি হর্ষে কল-মলু করিতেছে।

চারি দিকে চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে হিরণের দৃষ্টিপথে পড়িল—গন্ধরাজের ঘন পল্লবে লুকায়িত কেশে-জড়ানো, একখণ্ড কাগজ।

কৌতূহলী হিরণ চুলের বন্ধন মুক্ত করিয়া কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা ছিল—
“হৃদয়ের রাজা আমার!

তোমার আঘাত আজও আমি সহিতে পারিতেছি না, আমার বুকে কাঁটা হইয়া যেন বিধিয়া আছে। আমার ভালবাসা তোমাকে কেমন করিয়া জানাইব? ইচ্ছা হয় লতা হইয়া তোমাতে জড়াইয়া থাকি, ফুল হইয়া তোমার পূজা করি, বৃষ্টিধারারূপে তোমাকে অভিসিক্ত করি। কিন্তু মনের সাধ মনেই থাকে, পূর্ণ হয় না। তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে, রাত্রে বলিব; এখন সে সব কথা বলিবার সময় নয়। ইতি—

আত্মনিবেদিতা
লতিকা”

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হিরণের হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। প্রভাতের আলোকে জ্যোতির্দয় বিশ্ব ঝাপসা হইয়া গেল। এ হস্তাক্ষর মালতীর। মালতী প্রেম-নিবেদন করিয়াছে কাহাকে? হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার সে কাহাকে খুলিয়া দিয়াছে? যাহার জন্ত তাহার এই ব্যাকুলতা—সে কে? সে কোথা হইতে আসিল? হিরণ মূর্খ, মহামূর্খ! তাই এত দিন সে সন্দেহ করে নাই, সন্ধান লয় নাই। পূর্বরজনীতে তাহার অভিসারের বেশ দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারে নাই।

হিরণ স্তব্ধ হইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। ঘরে যাইতে ইচ্ছা হইল না; স্ত্রীকে চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহা প্রবৃত্তি হইল না। দুঃখে, স্বণায়, অপমানে তাহার মন বৈরাগ্যে পূর্ণ হইল।

শ্যামমোহিনী সাজি-হস্তে পূজার ফুল তুলিতে আসিয়া শঙ্কিত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হিরণ, তোর কি হইয়াছে? এখানে এমন ক’রে বসে আছিস কেন? চোখ-মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন? অসুখ ক’রেছে? চল, বিছানায় শুতে চল। অরু এখনই ডাক্তার ডেকে আনুক?”

হিরণ আত্মসংবরণ করিয়া বিবাদের হাসি হাসিল, বলিল, “না মা, অসুখ করেনি; তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমাকে এক্ষণি আবার মহলে যেতে হবে। কাজ ফেলে রেখে তোমাদের এক বার দেখতে এসেছিলাম।”

মা উৎকণ্ঠিত চিন্তে বলিলেন, “তুই কি বলছিস হিরণ?

তোমার যে অসুখ ক'রেছে,—ভয়ানক অসুখ, তা আমি বুঝতে পেরেছি। ক'দিন পরে ফিরে এসে রাতে কিছু খেলি-নে, প'ড়ে রইলি। এখন ব'লছিস, মহলে যাবি। তা হবে না বাবা, আমি তোকে যেতে দেব না।”

“কি যে বল মা, তার ঠিক নেই। আমার কিছু হয়নি, বেশ আছি। আমার জন্তে তুমি ভেব না। একুণি আমাকে রওনা হ'তেই হ'বে। আজ যাব ব'লে আমার জিনিষপত্র সবই কাড়ারীতে রেখে এসেছি। আমার দেয়ী করবার যো নেই, এখনি চল্লাম।”

বলিতে বলিতে হিরণ ঝড়ের মত বেগে বাহিরে চলিয়া গেল।

* * * *

দুই মাস অতীতের গভে বিলীন হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিরণ আর বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই। মাঝে মাঝে অরুর পত্রে সে বাড়ীর সংবাদ জানিতে পারে। ললিতা আসিয়াছে, সকলে ভাল আছে। ইহার বেশী হিরণ জানিতে চাহে না; জানিবার আগ্রহও নাই। নিজের অশান্ত চিন্তকে সর্কষণ নানা কার্যে ব্যাপৃত রাখিয়া সে স্ত্রীকে ভুলিয়া থাকিবারই চেষ্টা করে। স্ত্রীর বিষময় স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে চাহে, কিন্তু পারে না। মালতীর সরল, স্নন্দর মুখছবি, ভাব-বিহ্বল করুণ আঁখি সর্কষণ তাহার মানস-চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে উন্নত করে। মালতীকে বিপথগামিনী ভাবিতে হিরণ মনে ব্যথা পায়। আজকাল তাহার মনে এই সংশয় জাগিয়াছে যে, কাগজে নামহীন কয়েক ছত্র লেখা দেখিয়া তাহার এ ভাবে গৃহত্যাগ করা হয় ত সম্ভব হয় নাই। বিনা প্রমাণে কেবল সন্দেহে নির্ভর করা নিতান্ত ছেলেমানুষের কাজ! হিরণের মনে হয়—এ সম্বন্ধে মালতীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাপুরুষের মত পলাইয়া আসা অন্তায় হইয়াছে। সত্যই যদি মালতী তাহাকে না চাহে, ভালবাসিতে না পারে, তবে তাহা লইয়া হিরণের আক্ষেপ করিবার কি আছে?

এইরূপ নানা চিন্তায় ধীর-মহুর গতিতে হিরণের নিরানন্দ, ব্যর্থ-জীবনের দিনগুলি কাটিতেছিল। এমন সময়, বিনামেষে বজ্রাঘাতের মত অরুর চিঠি আসিল—মালতী ঝাঁচিয়া নাই! সকলের নিবেদনসম্বন্ধেও গাছের জন্ত

গোপনে ঘাট হইতে জল আনিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া সে জ্ঞান হারাইয়াছিল; লুপ্ত জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে নাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার জীবনদীপ নির্ঝাপিত হইয়াছে!

হিরণ অভিভূত হইয়া পড়িল। একরূপ অসময়ে মালতী কি যাইতে পারে? সে নিকটে ছিল না বলিয়াই কি তাহার মালতীমালাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই? মুহূর্ত্তন হিরণ অনুচ্চ স্বরে ডাকিতে লাগিল, “মালা, মালতি, মালিনি!”

সেই দিনই হিরণ প্রবাসের পালা সাজ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

ছেলের সাড়া পাইয়া মা আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, “তুই ফিরে এলি হিরণ! আমার বোমা কোথা? তাকে ফিরিয়ে আন বাবা? মা আমার গাছ-গাছ ক'রেই প্রাণ দিলে! আর কেউ গাছের যত্ন ক'রলে তার মন উঠতো না, লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজেই গাছের সেবা না করলে তার তৃপ্তি হতো না। গাছগুলোই বাহার কাল হ'য়েছিল। গাছের জন্তেই সংসারে মন দিতে পারেনি, কাউকে ভালবাসতেও পারেনি।”

ললিতা হিরণের হাত ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অরু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে সরিয়া গেল। হিরণ নির্ঝাক, পাথর হইয়া বসিয়া রহিল। চারিদিকে মালতীর শত চিহ্ন দেদীপ্যমান। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এত আয়োজন, এত আড়ম্বর, সে-ই কেবল নাই! যে যাইবার, সে হঠাৎ চলিয়া যায়, তাহার স্মৃতির সকল অবলম্বনই পড়িয়া থাকে।

হিরণ ঘরে স্থির থাকিতে পারিল না। ললিতাকে লইয়া বাগানে উপনীত হইল। এই কয় দিনেই আগাছা ও জঙ্গল বাড়িয়া বাগান যেন একান্ত শ্রীহীন হইয়াছে। বৃক্ষমূল শুক, ঝরাপাতা বায়ু-প্রবাহে সর্ব-সর্ব শব্দ করিতেছে।

হিরণ গন্ধরাজ গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। সেই ভগ্ন-কাণ্ডের গায়ে ছোট একটি শাখা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহারই কোলে কয়েকটি কচি সবুজ পাতা বায়ুহিল্লোলে কাঁপিতেছে, ছলিতেছে।

হিরণ নীরবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা

তাহার স্বতির দ্বার খুলিয়া গেল। মনে পড়িল সেই কাল সন্ধ্যা। কণিকের ক্রোধ, ক্রোধের পরিণাম! কি হইতে কি যেন হইয়া গেল; অমৃতের গরল উঠিল!

ক্লমকাল মৌন থাকিয়া ললিতা ধীরে ধীরে ডাকিল, “দাদা, তুমি অমন চুপটি ক’রে প’ড়ে থেকে না। তোমার হুঃখে আমার বুক ফেটে যায়! যে থাকার নয়, তাকে বেঁধে রাখলেও রাখা যায় না। দিনরাত আগলে রেখেও ত রাখতে পারলাম না। বৌদি আসলে আনাদের ছিল না; ছিল গাছের। গাছের জন্তাই প্রাণ দিয়েছে। সানাত্ত ফুলগাছকে মানুষ যে এত ভালবাসতে পারে, তা জানতাম না। ওর গাছের ভালবাসায় সকলে হেসেছে। উনিই (স্বামী) শুধু হাসেননি। ব’লেছিলেন, ও একটা ব্যারাম— ‘পারুভারসন’। ছেলেবেলা থেকে একা একা মানুষ হ’য়েছিল। মা ছিলেন না, বাপও থাকতেন গাছপালা নিয়ে মত্ত হ’য়ে। তাই বৌদির গাছ-পালাই হ’য়েছিল বন্ধু। গাছের সাথে গল্প হ’তো, মান-অভিমান হ’তো। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক পাগলামী ধীরে ধীরে

বৌদির ভেতরে বেড়ে উঠেছিল। উনি ব’লেছিলেন, “ছেলে হ’লে এ রোগ বোধ হয় থাকবে না, সেরে যাবে।”

ললিতার স্বামী বড় ডাক্তার। ডাক্তারের অভিমত শুনিয়া হিরণ চকিত হইয়া কহিল, “গাছের সাথে মান-অভিমান হ’তো, গল্প হ’তো, আমি ত তা জানতাম না লতু? ভাবতাম, ও বুঝি বাগানের নেশা, এমনি একটা খেয়াল!”

“না দাদা এমনি নয়, ওইটাই হ’য়েছিল বৌদির পাগলামী! আশ্চর্য্য, তুমি কি টের পাওনি? গন্ধরাজ গাছের সঙ্গে ও ‘প্রিয়তম’ সঙ্ক পাতিয়েছিল। রোজ রাতে একখানা ক’রে চিঠি লিখে গাছের ডালের মধ্যে গুঁজে রাখতো। সকালবেলা ঘরে নিয়ে-গিয়ে সে চিঠি পুড়িয়ে ফেলতো। এই গাছের জন্তাই তোমাকেও সে তেমন ভালবাসতে পারেনি দাদা!”

“না পারুক লতু, তবু সে যে শুধু ফুলই ভালবেসে ফুলের জীবন নিয়ে গেছে, এই আমার এত হুঃখের ভেতরেও সাস্বনা।”

বলিতে বলিতে হিরণের চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

যমুনা

হৃদয়-যমুনা উজানে বহিয়া যায়
সাথে নিয়ে যায় কত অতীতের বাণী
কত কথা নাহি জানি।
কত ছায়া দেখি তার নিরমল জলে
পুলকে উছলি ঢেউ চলে ছল ছলে,
মৃদু মৃদু স্বরে কত কথা যায় বলে,
শুধু করে কাণাকাণি।

আশার সাগর উথলিয়া উঠে মনে
পুলকের দ্বারে কে আঘাত ক’রে যায়,
প্রিয়জন-ছবি ভাসে মনে ক্লমে ক্লমে
উৎসুক আঁখি স্নদূরের পানে চায়।
স্নেহের পরশে দুয়ার খুলিয়া যায়
নাহি রয় মনে কোন বাধা-ব্যবধান,
সকলেরে ডেকে আপনার ক’রে লয়
দু’দিনের তরে সার্থক করি প্রাণ।
কোন্ অমা-রাতি জলেতে শিহর জাগে
মনের যমুনা ভয়েতে আপনহারা—
কোন্ শ্রাম পরশে আকুলি অভয় মাগে
আশার আকাশে নাহি পায় শুকতারা।

বিষাদের মেঘ গুমরি গরজে গগনে
নিবিড় আঁধারে চমকে বিজলী সধনে,
নিঃশেষ করি সব ক্রোধানল শেষে—
ধরণীতে নামে স্নেহের করুণা-ধারা।
কতু দ্বার খুলি প্রিয়জন-পথ চায়,
বিফলতে যায় পূর্ণিমা তিথি কত,
কেহ আসে নাকো, ডাক দিয়ে নাহি যায়,
বলে না তো কেহ সানুতন-বাণী যত!
শুধু একা বসে আশ্বাস নাহি পায়
কৈদে কৈদে হয় সারা,
তবু আকাশেতে একা চাঁদ জেগে রয়,
গাছে পাখি সাথী-হারা।

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়।

পদকর্তা গোবিন্দদাস

ঐচ্ছৈতদ্ভেদেবের পরবর্তী যুগের বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের গৌরব-স্বরূপ পদকর্তা গোবিন্দদাসের রচিত পদমাধুর্য ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনার্থে পূর্বে তাঁহার জীবনীপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন মনে করি। ঐচ্ছৈতদ্ভেদেবের পরবর্তী যুগে গোবিন্দ-নামধারী কোনও ব্যক্তির যে বাঙ্গালা বা মিথিলায় থাকা অসম্ভব ছিল, বা অল্প কেহ পদাবলী রচনা করিতে সক্ষম ছিলেন না, এরূপ অল্পমানের কোন কারণ নাই। ঐচ্ছৈতদ্ভেদেবের অল্পচর নবদ্বীপবাসী গোবিন্দানন্দ চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির কথা জানিতে পারা গিয়াছে। এতদ্বিত্ত কুলীন গ্রামনিবাসী গোবিন্দ ঘোষ নামক আর এক গোবিন্দেরও সন্ধান মিলিয়াছে। দীনেশবাবু (স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন) গোবিন্দ কর্মকার নামক এক গোবিন্দের সন্ধান দিয়াছেন, জীনিবাস আচার্যের পুত্র গোবিন্দ আচার্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; উৎকলনিবাসী আর এক গোবিন্দও দেখা দিয়াছেন; এবং সুলেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কেবলমাত্র যে মৈথিল কবি গোবিন্দদাসেরই উদ্ধারসাধন করিয়াছেন এরূপ নহে, শেষ-পর্যন্ত গবেষণার শীলমোহর দিয়া বাঙ্গালার সর্বজনপ্রিয় পদকর্তা বুদ্ধরীনিবাসী গোবিন্দদাস কবিরাজকেও মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, রসের পূজারী গোবিন্দদাস প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য অসম্ভব বোধে বঙ্গজননীর শ্যামাঙ্কলচ্ছায়ার পুনর্বার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস বলিতে নরোত্তম-বিলাস, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহে বাঁহাকে বুঝাইয়াছে, আমরাও এখানে তাঁহাকেই মানিয়া লইব। তবে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের যুক্তিসমূহের উত্তরে পদকর্তার স্ববোধ্য সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যে সকল প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, সক্ষেপে তাহা আলোচনার যোগ্য। নগেন্দ্রবাবু বলেন—

১। ইনি (গোবিন্দদাস) বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী—কারণ মিথিলার কুলজীতে ইহার নাম আছে। ইনি গোবিন্দঠাকুর, জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহার নাম গোবিন্দ দাস বা বা ওঝা, ইহার উপাধি “কবিরাজ।”

২। ইহার পদে গৌরচন্দ্রিকা মাই, রামের বন্দনা আছে।

৩। ইহার ভাষা বিভাপতির ভাষা অপেক্ষা ভটীল এবং বাঙ্গালার পদকর্তা গোবিন্দদাসের ভাষা হইতে ইহার ভাষার অনেক প্রভেদ দেখা যায়।

৪। মিথিলায় সর্বশুদ্ধ তাঁহার কুড়ি-বাইশটি শুদ্ধ পদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিসুদ্ধ পদগুলি নগেন্দ্রবাবু মিথিলায় কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে পাইয়াছেন, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। বাঙ্গালার গোবিন্দের পদ কোন ছাত্রকর্তৃক মিথিলায় নীত হইয়া পরে সেখানে মৈথিল ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, এই অল্পমান সত্য হইতে পারে, এবং ইহা অসঙ্গত মনে করিবার কারণ নাই। যদি মৈথিল কবি বিভাপতির পদগুলি আমাদের এ দেশে আসিয়া

বাঙ্গালীর কাব্যোক্তানে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে ব্রজবুলিতে রচিত গোবিন্দ কবিরাজের পদগুলির কুড়ি-বাইশটি মিথিলায় বিরাজিত থাকিয়া কবিৎ-সৌরভে মৈথিলী সাহিত্য-উপবন আমোদিত করিলে তাহাতে বিশ্বাসের কি কারণ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ মূলতঃ যখন ঐ পদগুলির ভাষার (ব্রজবুলির) সহিত মৈথিলি ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; আমরা বাঙ্গালার গোবিন্দদাসের প্রায় তিন-চারি শত পদ পাইয়াছি, এবং এই পদগুলি ও তাহাদের পদকর্তার উল্লেখ খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই বর্তমান আছে। অধুনা আবিষ্কৃত কুড়ি-বাইশটি মৈথিল পদ পাইয়াই কি গোবিন্দদাস বা মিথিলায় কবি এই সিদ্ধান্ত অকাট্য বলিয়া কৃতনিশ্চয় হওয়া সঙ্গত? মিথিলায় গোবিন্দ নামক এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন সত্য, তবে তিনি সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করিতেন, এবং তাঁহার নামের শেষে তিনি “দাস” বা “কবিরাজ” পদবী কোথাও ব্যবহার করেন নাই।

যেমন—“কহ গোবিন্দকরজোনি

বিনয় প্রভু মানিয়...” ইত্যাদি।

‘পদকর্তার’তে সতীশবাবু বলেন—“আমরা শিবসিংহ সরোজ, Maithili Cherotomy প্রভৃতি মিথিলায় ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে কোনো গোবিন্দের উল্লেখ পাই না। মিথিলায় কেহ নামের শেষে “দাস” ভনিতাযুক্ত করিতেন না। গোবিন্দদাস তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ছিল এরূপ তর্কও করা চলে না, কারণ তাহা হইলে কোথাও নিশ্চয় ঐরূপ পাওয়া যাইত।”

নগেন্দ্রবাবু যে “ঠাকুরের” প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে আমাদের বক্তব্য এই যে, একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অল্প কেহই যে “ঠাকুর” লিখিতেন না, এরূপ হইতে পারে না। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-দিগের রচনা লক্ষ্য করিলেই নগেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইতেন যে, বহু ব্রাহ্মণের পদকর্তা “ঠাকুর” শব্দ ব্যবহার করিতেন। কার্য-কুলোত্তর নরোত্তমকে আমরা সর্বস্থানে “নরোত্তম ঠাকুর” নামে অভিহিত হইতে দেখিয়া আসিতেছি, “ঠাকুর” নরহরির “ঠাকুর” আখ্যা পাইয়াছি; তাঁহারা ব্রাহ্মণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা কি সঙ্গত হইবে? বৈষ্ণব পদকর্তারা যে শ্রীরামের বন্দনা লিখিতে পারিবেন না, বা তাঁহাদের শ্রীরামকে অবজ্ঞার চোখেই দেখিতে হইবে, এরূপ অল্পমানের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। বরং ইহাই ত আমাদের ধারণা যে, বৈষ্ণবগণের মতে রাম কেবলমাত্র নরদেহধারী নৃপতি নহেন, তিনি অংশ অবতার। রামের বন্দনা লিখিয়াছেন বলিয়া যে বাঙ্গালী গোবিন্দদাসকে মিথিলা গিয়া বসবাস করিতে হইবে, এবং গোবিন্দদাসের পদে “নরসিংহ” আছে বলিয়াই যে তাঁহাকে পরদেশীয় পূর্ববর্তী রাজার গুণকীর্তন করিতে হইবে, এই অভিমতের মূলে আমরা কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। নৃসিংহ নামে যে বাঙ্গালার এক জন পদকর্তা থাকিতে পারেন, এ কথা নগেন্দ্রবাবুর অবশ্য স্বরণ না-ও থাকিতে পারে। নগেন্দ্রবাবু ১৩০১ সালের চৈত্র সংখ্যার ‘বসুমতী’তে “বাঙ্গালার গীতিকাব্য—

বৈষ্ণবকাব্য" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহাতে পদকর্তা গোবিন্দদাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বেই বলিতেছেন— "মিথিলার কবি গোবিন্দদাস ঝাকে বাদ দিয়া ঐ নামে কয়েক জন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। * * * * কোন্ গোবিন্দদাস তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে উৎকৃষ্ট পদের অনেকগুলি যে গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। গৌরচন্দ্রিকায় গোবিন্দদাসের ভণিতায়ুক্ত যত পদ আছে, কোনটিরই ভাষা 'মিথিলার কবি গোবিন্দদাস ঝার অনুরূপ বা তুল্য নহে।" অল্প স্থলে আবার লিখিতেছেন— "এখচ এক জন বাঙ্গালী গোবিন্দদাস যে বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট পদসমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক প্রমাণ পদাবলীতেই রহিয়াছে।"

উপরোক্ত উক্তিগুলি হইতে নগেন্দ্রবাবু নিজেই প্রমাণ করিলেন, গোবিন্দদাস গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনা করিয়াছেন এবং তাহার ভাষা বিজাপতির ভাষা অপেক্ষা জটিল নহে। গৌরচন্দ্রিকার রচনা যে সহজগম্য, সরল ও সাধারণের উপযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক, ইহা ভাষা ও ছন্দের বরপুঞ্জ গোবিন্দদাস জানিতেন, এবং অসাধারণ ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সরল ও অনাড়ম্বর রচনার পাশে চন্দ্রকান্ত ও শব্দবিজ্ঞানিত বিচিত্র রচনা দেখিয়া আমাদের সন্দেহ জাগিতে পারে, তবে শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, বীরচন্দ্র প্রভৃ প্রভৃতি কবিকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, এবং পদকর্তা গোকুলদাস, শ্রীদাস প্রভৃতি সুকৃতি কীৰ্ত্তনীয়গণ কর্তৃক সর্বদা বৈষ্ণবসমাজে গোবিন্দের পদাবলী গীত হইত। ষেতুরীর মহোৎসবেও গোবিন্দদাস তাঁহার অপূর্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদাবলীও উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

জীবনী

কয়েক জন বৈষ্ণব ঐতিহাসিকের মতে গোবিন্দদাস ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন, গোবিন্দদাস ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে" লিখিয়াছেন, গোবিন্দদাস খুব সম্ভবতঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন— "আমরা কর্ণানন্দে দেখিতে পাই, যখন শ্রীনিবাসাচার্য্য রাজা বীরহাঙ্গীরকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া জাজিগ্রামে প্রত্যাগমন করেন, তখন গোবিন্দদাস এক জন যুবকমাত্র। এই ঘটনা যদি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গোবিন্দদাসের জন্মকাল ১৫১০ খৃষ্টাব্দের পরেই ধরিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত। বৈষ্ণবদিগের মতে গোবিন্দদাস ১৬১২ খৃষ্টাব্দে দেহলীলা সম্বরণ করেন। দীনেশবাবুর মতে এ বিষয়েও সন্দেহ করিবার ষথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ষাণ্ড হইক, গোবিন্দদাস কুমারনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ডনিবাসী দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করেন। চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যভক্ত ছিলেন ইনি এক জন চিকিৎসক ছিলেন। গোবিন্দদাসের ভ্রাতা রামচন্দ্র এক জন সুচিকিৎসক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। "ভক্তমালে আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

গোবিন্দদাসের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণের অলৌকিক ঘটনাটি সত্যই সুন্দর। কঠিন গ্রহণী রোগ হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্যের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া নিজের শাস্ত্রধর্ম পরিচ্যাগ করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং ভাবাবেশে

"ভক্ত" রে মন, শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দে রে"

লোকটি পাঠ করিলেন। গুরু নিকট অসামান্য জ্ঞানী পণ্ডিত গোবিন্দদাস ভক্তরসামৃতসিন্ধু, উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পদরচনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। তখন শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিয়াছিলেন— "মহাপ্রভুর শ্রয়পার্বদ যেরূপ চৈতন্যদেবের জীবনী লইয়া বহু মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ রানা-কৃষ্ণের অপূর্ব লীলা-বিষয়ক পদ রচনা কর।" গোবিন্দদাস সংগৃহে 'সঙ্গীতমাবব' নামক নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামক কাব্য রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণবিষয়ে পদরচনার যে ভাষার আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিলেন বা গাড়িয়া তুলিলেন, উহা সত্যই তাহার প্রতিভার অনুরূপ। ব্রজবুলির স্রষ্টা না হইলেও ব্রজবুলি রচনা যে গোবিন্দদাসের সৃষ্টিপূর্ণ রসতুলিকায় সর্বোচ্চ মহিমা লাভ করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ-মন মাতাইতে সক্ষম হইয়াছিল, আজ তিন-চারি শতাব্দী অতীত হইলেও বাঙ্গালী তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিজাপতির রচনাভঙ্গী গোবিন্দদাসকে মুগ্ধ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা তাঁহার কবিত্বশক্তির ক্ষুরণের পথে অন্তরায় হয় নাই। বিজাপতির শ্রেষ্ঠত্ব তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি যে মৈথিল কবির নিকট ঋণী, এ কথাও স্বীকার করিতে কুঠা বোধ করেন নাই। গোবিন্দদাস সম্বন্ধে বল্লভদাসের একটি মাত্র পদ হইতে আমরা গোবিন্দের প্রতিভা ও জীবনীর বহু বিষয় জানিতে পারি;—

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিজাপতি ।
তাহা হইতে নচে নান গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিজাপতি ।
অসম্পূর্ণ পদ বহু বাধি বিজাপতি পছ
পরলোকে করিলা গমন ।
গুরুর আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিলা পূরণ ॥
এমন সুন্দর তাহা আচার্য্যের শুনি যাহা
চমৎকার ভাবে মনে মনে ।
তাই গুরু মহানন্দে 'কবিরাজ' শ্রীগোবিন্দে
উপাধিটি করিলা প্রদানে ॥

"ভক্তরসাকরে"র প্রথম তরঙ্গেও আমরা দেখিতে পাই,—

"শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে ।
পরমানন্দিত গাঁর গীতামৃত পানে ॥

“সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনাময়স্বীয়গীতানি প্রস্তাপিতামি পূর্ব-
মপি যানি, তৈরমুর্তৈরিব তৃপ্তাবভামহে, পুনরপি নূতন তত্তদাশয়া
মুহুরতৃপ্তিঞ্চ লভামহে।”

মহাপ্রভু-পরবর্তী যুগে গোবিন্দদাসকে “কবিরাজশ্রেষ্ঠ”
উপাধিতে নিঃসন্দেহে ভূষিত করা যাইতে পারে। গোবিন্দ
কবিরাজের গৌরীলা-বিষয়ক পদগুলি অপেক্ষা, ব্রজলীলার পদ-
গুলিতে কবি-প্রতিভার অধিক সুরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষ বরসে যখন গোবিন্দদাস ও রামচন্দ্র-কবিরাজ পৈত্রিক গ্রাম
'কুমারনগরে' ফিরিয়া যান, তখন তথাকার বৈষ্ণবধেয়ী শাক্তগণ
তাঁহাদের প্রতি অসদাচরণ করেন। ইহাতে দুঃখিত অন্তরে
গোবিন্দদাস পদ্মাপারস্থিত 'তেলীয়া-বুধুরী' গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ
করিয়া শেষ-জীবন তথায় অতিবাহিত করেন।

এইবার আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে
আলোচনা করিয়া বিচার করিতে চেষ্টা করিব—উহা বাঙ্গালার
চিরপরিচিত ব্রজবুলির পদকর্তা গোবিন্দদাসের কি না। নগেননাথ
গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—“গোবিন্দদাসের ভাষা বিদ্যাপতির ভাষা
অপেক্ষা জটিল।” অপর স্থলে ব্রজবুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে অভিমত
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—“মিথিলা ও বাঙ্গালার ভাষা মিলাইয়া
ব্রজবুলির সৃষ্টি, এ কথা অপ্রামাণ্য। যে ভাষার নাম বিদ্যাপতি
“অবহঠা” দিয়াছিলেন, তাহাই পদাবলীর ভাষা, আমরা যাহাকে
ব্রজবুলি বলি তাহা অবিমিশ্র মিথিলা ভাষা।” অপর স্থলে বলিয়া-
ছেন—“বাঙালী বৈষ্ণবমাত্রী ব্রজপুরীতে গিয়া ব্রজবুলি শিখিয়া
আসিয়া থাকিবেন এ কথা অমূলক কল্পনা।” (বসুমতী, ভাদ্র,
১৩৩০)। নগেনবাবু যাহাই বলুন না কেন, অধ্যাপক ডাঃ
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ সুকুমার সেন ব্রজবুলির উৎপত্তির
যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য।

ভাষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিদ্যাপতির অবিকৃত পদগুলির
ভাষা মৈথিলী রীতিসিদ্ধ। কিন্তু গোবিন্দদাসের ভাষা দীর্ঘ সমাদ-
যুক্ত হইলেও, উহাতে তাহার স্বকল্পিত বহু ‘উদ্ভট’ শব্দ দেখিতে
পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া নগেনবাবু গোবিন্দদাসের ভাষাকে
জটিল বলিলে আমাদের আপত্তি করিবার কারণ নাই সত্য, কিন্তু
গোবিন্দদাসের পদাবলীতে গৃহীত মিশ্রিত স্তমধুর, সৃষ্ট-ব্যাকরণ-
দৃষ্ট, কৃত্রিম ভাষাকে মৈথিলী ভাষা বলিয়া চালাইবার প্রয়াসকে
আমরা সমর্থন করিতে পারি না, গোবিন্দদাস যদি মিথিলারই কবি
হইবেন এবং বিদ্যাপতির অনুকরণে পদাবলী রচনা করিবেন, তাহা
হইলে শুদ্ধমৈথিলী ভাষায় পদরচনা না করিয়া ব্রজবুলির আশ্রয়
গ্রহণ করিলেন কেন? গোবিন্দদাসের বহু পদে আমরা রূপ-
গোষ্ঠামিকৃত সংস্কৃত শ্লোকের তাৎপর্যের অনুবাদ দেখিতে পাই।
তাঁহার পদাবলীর দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলে বেশ
স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, উহাতে ‘সখী ও সেবার’ ভাব প্রাধান্য
লাভ করিয়াছে।

কবিত্ব ও কৃতিত্ব

গোবিন্দদাস যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন, এ কথা বেরূপ সত্য, তাহার যুগটিও যে কাব্যপ্রতিভা-
বিকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, সে কথাও তরূপ স্বীকার্য।
মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমভক্তিবর্ষের প্রাবনে যখন বাঙ্গালার

ভাবপ্রবণ জনসময় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, কবি গোবিন্দদাস
তখন তাঁহার অপূর্ব পদাবলী সৃষ্টি করিতে সুরু করিয়াছেন।
বিরহোন্মাদ প্রেমতন্ময় ভাববিমুক্ত মহাপ্রভুর ছবিখানি গোবিন্দ-
দাসের কাব্যে শ্রীরাধার আলোখোর ভিতর দিয়া যেন মূর্ত হইয়া
উঠিয়াছে। মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী যুগের দুই জন কবিকে গোবিন্দ-
দাস আদর্শ হিসাবে ধরিয়া লইয়াছেন। মনোবাজের পরিদর্শক
ভাবুক চণ্ডীদাস, বহির্জগতের চিত্রকর বিদ্যাপতি উভয়েই
আসিয়া গোবিন্দদাসের মাঝে আপন আপন বৈশিষ্ট্য বিলাইয়া
দিয়াছেন। এক দিকে বিদ্যাপতির প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য,
প্রেমের চাক্ষু্য মিলনের সুখ ও বিরহের দুঃখ; অত্র দিকে চণ্ডী-
দাসের প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক, প্রেমের ধ্যানস্তবতা
গোবিন্দদাসের কবিতায় স্থান পাইয়াছে। গোবিন্দদাসের
ভাবরাজ্যে—একাধারে সৌন্দর্যের তরঙ্গলীলা ও প্রেমের বিহ্বলতা
প্রেমের অশ্রুতেই নিঃশেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দ-
দাসের দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যাপতির অনুকরণে কেবলমাত্র শ্রীমতীর
বাহিরের রূপটিকে ফুটাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিরহিণী রাধিকার
অন্তরের চির অতৃপ্ত মিলনাকাঙ্ক্ষারও রূপ দিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশ এক দিন গোবিন্দদাসের মধুর পদাবলীর ঝঙ্কারে
মাতিয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে
মহাপ্রভু বেরূপ রস সংগ্রহ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া
নাচিতেন, পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব ভক্তগণও সেইরূপ গোবিন্দদাসের
পদাবলীর রসে ডুবিয়া আত্মভোলা হইয়া যাইতেন। বাঙ্গালী
কবি রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব রসলীলা যে ভাষায়, যে ছন্দে, যে ঝঙ্কারে
ঝঙ্কত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাণীর মন্দিরে কালের বিচিত্র
প্রবাহের তালে তালে নিত্য নিয়ত পনিত হইতে থাকিবে।

বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও ব্রজবুলির
স্বমধুর শব্দঝঙ্কারে, অনুপ্রাস শ্লেষাদি বিভিন্ন অলঙ্কার প্রয়োগ-
নৈপুণ্যে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব অতুলনীয়।

‘গোবিন্দদাসের পদাবলী’ নামক যে সকল পুরাতন পুঁথি
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বহু স্থলে পদ-সঙ্কায় রস বৈষম্য দৃষ্ট হয়।
গোবিন্দদাসের পদে অলঙ্কার জটিলতার জন্ত উহার অর্থ ও পাঠ-
নির্ধারণে বেরূপ গোলযোগ ঘটে, তাহা সাধারণ পদকর্তাদের
কাহারও পদে বড় একটা ঘটে না। স্বর্গীয় কালিদাস নাথ মহা-
শয়ের সংগৃহীত ‘গোবিন্দদাসের পদাবলী’—(পূর্বভাগ) তাঁহার
(নাথ মহাশয়ের) বৈষ্ণবসাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

গোবিন্দদাস যে কেবল বিদ্যাপতির পদপূরণ করিয়াছেন তাহাই
নহে, গোবিন্দদাসের পদগুলি একটু মনোনিবেশ সহকারে দেখিলে
আমরা দেখিতে পাই, বহু স্থলে বিদ্যাপতির অনুকরণেও পদরচনা
করিয়াছেন। বিদ্যাপতির—

“যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।

তাঁহা তাঁহা সরসুহ ভরই।”

এই পদটির অনুকরণে গোবিন্দদাস “যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে
তমু তমু জ্যোতি” পদটি রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির
“কামিনী করই সিনানে” পদটির অনুকরণে গোবিন্দদাস
তাঁহার “সহচরী মেলি চলল বর-রঙ্গিণী কালিন্দী করই সিনান”
পদটি খুব সম্ভবতঃ রচনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আপন
বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া গোবিন্দদাস বহু স্থলে বিদ্যাপতির ভাব, ভাষা

ও ছন্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু অনুকরণ বলিলে গোবিন্দদাসের উপর অবিচারই করা হইবে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রভাবও যে গোবিন্দদাসের রচনায় রহিয়া গিয়াছে, এ কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে! চণ্ডীদাস উচ্চাঙ্গের ভাবতন্ত্র কবি। রাধা বিরহের মাঝেও যেমন মিলনের আনন্দ পাইতেছেন, মিলনের মাঝেও তেমনি বিরহের বেদনা অনুভব করিতেছেন। চণ্ডীদাসের একটি পদে আমরা দেখিতে পাই, বিরহিনী শ্রীমতী স্বপ্নে ভিতর প্রিয়তমের মিলন-সুখ অনুভব করিতেছেন। অপর পদে আমরা দেখিতে পাই—সই প্রাণকান্তের বাহুবেষ্টনের ভিতর রহিয়াও বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মিলনে বিরহানুভব করিতেছেন—“হুঁ কোড়ে হুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।” গোবিন্দদাসের পদাবলীতে আমরা অসংখ্য একটি পদ পাইতেছি—

“কোড়ে রহিতে হুঁ মানহ দূর
ভিন ভিন অর হুঁ হুঁ মনধর।”

অপর একটি পদে আমরা চণ্ডীদাসের “মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব” ও “জনমে জনমে জীবনে মরণে, প্রাণনাথ হয়ো তুমি” এই দুইটি প্রসিদ্ধ পদের ভাব-ত্রিক্য দেখিতে পাই। এখানেও গোবিন্দদাসের রাধা সখীগণকে বলিতেছেন—

“মাধব মাধব মরি নিচয়ে মরিব
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার
বিধি পায়ে মাজ মুই এই বর সার ॥”

চণ্ডীদাসের ভাবসম্মিলনের পদের সহিত আমরা গোবিন্দদাসের অনেক স্থলেই মিল দেখিতে পাই।

অভিসার

যে শ্রেণীর পদ রচনা করিয়া গোবিন্দদাস পদকর্তা সমাজে অমর হইয়া রহিয়াছেন, বিভিন্ন রসপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে দেখা যায়, ইহার অধিকাংশই অভিসারের।

অভিসার আবার দুই প্রকার হইতে পারে। এক হইতেছে নায়িকার নিদেশিত স্থানে নায়কের গমন, অপরটি ইহার বিপরীত। প্রচলিত অভিসারের পদাবলীর অধিকাংশগুলিতেই নায়ক-নিদেশিত স্থানে নায়িকার গমনই দেখা যায়। উজ্জ্বলনীলমণিতে জ্যোৎস্নাভি-সারিকা ও তমোভিসারিকা উভয় প্রকার অভিসারিকার উল্লেখ আছে। জ্যোৎস্নাভিসার বর্ণনায় দেখিতে পাই—বিশাখা শ্রীরাধাকে কহিতেছেন—“অজ পূর্ণশশধর উদিত, বৃন্দা-বিপিনে সান্দ্রাকৌমুদী বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া ব্রজপতিনন্দন উচ্চ স্থানে আরোহণপূর্বক তদীয় অভিসারবস্ত্র নিরীক্ষণ করিতেছেন, অতএব তুমি স্বীয় অঙ্গে সকপূর চন্দন স্লেপন ও শুভ্রবর্ণ পটবসন পরিধানপূর্বক তদীয় পথে চাকচর্যগারবিন্দ সঙ্কান অর্থাৎ অভিসার-পথে গমন করিতেছ না কেন ?” ইত্যাদি। এই প্রকার তমোভিসার, দিবাভিসার প্রভৃতি বিভিন্ন অভিসারের উল্লেখ রহিয়াছে। গোবিন্দদাসের কবিতায় এই অভিসারের ব্যাকুলতা যাহা অমুরাগের অনিবার্য পরিণাম,— অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দ নিজের সখীভাবে আজীবন রসময়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাই অভিসারোৎকর্ষের প্রতিটি পদের মাঝ দিয়া হৃস্তর পথের অভিসারিকা শ্রীমতীর

কম্পিত হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীমতীর নিরোধ সখীদের পার্থিব বাধাবিঘ্নকে প্রেমের বজ্রায় ভাসাইয়া দিয়া বিরহিনী শ্রীমতীর অন্তরের কথা উপলব্ধি করিয়া দরদী কবি বলিতে পারিয়াছিলেন,—

“সখী মঝ, পরিখন কর দূর।

কৈছে হৃদয় কবি পশু হেরত হরি,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুব।

ব্রজগোপীদের অভিসার, পার্থিব জগতকে অপার্থিব লোকে, রূপলোককে অরূপলোকের আকর্ষণের প্রকাশ অভিসারেরই কথা। এ রূপের প্রতি রূপের অনুরাগ নয়—রূপাতীতের হৃৎস্বয় আকর্ষণ, তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘অভিসারে’র পদগুলির রসমর্যাদাও অনেক উচ্চ।

গোবিন্দদাস বিভিন্ন কালোচিত অভিসারের যে সমস্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমতীর রূপসজ্জার চিত্রটি তাহার বর্ণনা-চাতুর্ঘ্যের মাঝ দিয়া মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

শুক্লপঙ্কের জ্যোৎস্নাকরোজ্জ্বল নিশিতে শ্রীমতী শ্রামাভিসারে গমন করিতেছেন—কুন্দফুলে কালো কবরী আবৃত করিয়াছেন, গলদেশে মোতির হার দোলাইয়াছেন, সমগ্র দেহে শ্বেত চন্দন বিলেপন করিয়াছেন—

“ধবল বিভূষণ অম্বর ধবই
ধবালম কৌমুদী মিলি তহু চলই।”

শুক্লজনের দৃষ্টি এড়াইয়া শ্রীমতী গিয়া তাহার প্রাণবল্লভের সাথে মিলিতা হইলেন।

কৃষ্ণপক্ষে শ্রীমতী চলিয়াছেন,— বর অঙ্গে সুনীল শাড়ী পরিধান করিয়াছেন, নীল মৃগমদে তহু আবরিত করিয়াছেন, নীলকান্ত মণির হার উচ্চ বক্ষে দোলাইয়াছেন—শেষ পর্যন্ত শ্রাম-অমুরাগে কবি শ্রীরাধার গৌরবর্ণকে পর্যন্ত শ্রাম করিয়া তুলিলেন।

“হরি সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি’

নব অমুরাগে গৌরী ভেলি, শ্রামরী
কুহু-যামিনী ভয় ভাগি।

নীল অলকাকুল অলিকোই লোলিত
নীল ভিমিরে চলু গেই।

নীল নলিনী জহু শ্রাম সিন্ধু রসে
লখই না পারই কোই।”

অপর স্থানে আমরা শ্রীমতীর বর্ণাভিসারের যে রূপটি পাই, তাহাও অপূর্ব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে—সেখানে শ্রীমতী যেন বর্ষার ছন্দে ছন্দে, প্রেমের নূপুরনিকণে, চরণের একটি একটি পদবিক্ষেপ করিয়াছেন—

“মেঘ যামিনী চললি কামিনী
পহিরহি নীল নিচোলরে।

সঙ্গে নায়ক কুসুম সায়ক
ছোড়ি মঞ্জীর লোলরে।”

অপর স্থলে দেখিতেছি, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে শ্রীমতী সখীদের সকল আপত্তি, সকল পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া পরমবাহিতের দর্শন আশায় বুক বাঁধিয়া ছুটিয়াছেন—

“ঝলকই দামিনী দহন সমান ।
ঝন ঝন শব্দ কুলিশ ঝন ঝন ।
যর মাগা রহইতে রহই না পার ।
কি করব এ সব বিধিন বিধার ।
চড়ব মনোরথে সারথি কাম ।
ভুরিতে মিলায়ব নাগর ধাম ॥”

গোবিন্দদাসের অভিসারের একটি পদের ভুলনা কি বাঙ্গালা সাহিত্য, কি ভারতীয় সাহিত্য, অথবা যে কোন সাহিত্যেও যে ছন্দ, ইহা বলা নিঃসন্দেহ । প্রিয়তমের তীব্র আকর্ষণে বিরহিনীর উদ্বেল স্বদয়ের ব্যাকুলতা গোবিন্দদাস প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন ।

গোবিন্দদাসের অভিসারের পদগুলি বাদ দিয়া—অন্ত পদাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাই, রসে লেখনী ডুবাইয়া তিনি চিত্রের উপর যে কয়টি টান দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই যেন শত শত রূপকমল ফুটিয়া উঠিয়াছে । রাধার রূপবর্ণনা করিতে গিয়া যেখানে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

“মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে ।
চলে বা না চলে ধনী রস অবলম্বে ।
তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে ।
কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে ।
তহি শ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দু বিন্দু ।
মুকুতাভূষিতা জহু পুনমিক ইন্দু ॥”

সেখানে মাত্র এই দুইটি পদ পাঠ করিয়াই আমাদের মানস-নয়নে নব অমুরাগিনী নিখিল সোহাগিনী পঞ্চম রাগিনী রূপিনী শ্রীমতীর একটি অভিনব অপরূপ দীপ্তোজ্জ্বল মূর্তি প্রতিভাত হয় ।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায়ও আমরা গোবিন্দদাসের কবিত্ব-শক্তির, রচনা-চাতুর্যের ও প্রকাশভঙ্গীর একটি বিশেষ রূপ দেখিতে পাই ।

গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদে আমরা উচ্চাঙ্গের ভাবধারার বিকাশ দেখিতে পাই না সত্য, তবে সেগুলির যে আপন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাও অস্বীকার করা চলে না ।

গোবিন্দদাস মিলনের ছবিগুলিও যথেষ্ট বিবেচনা, অস্তদৃষ্টি ও নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন । গোবিন্দদাস কৃষ্ণের শ্রীরাধিকার প্রতি একান্ত অমুরাগ যে একটি মাত্র পদেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাহা এই পদটি হইতেই পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন—

“হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মুছই
কুঙ্কমে তহু পুণ মাজি ।
অলকা তিলকা দেই সীথি বনারই
চিকুরে কবরী পুন সাজি ॥”

গোবিন্দদাসের বহু পদে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীরাধাকে পাইবার জন্তও কাহুর সাধনা চলিয়াছে । দ্বিপ্রহরে সিনানের পথের বালুকা উত্তপ্ত হইবে, চলিতে শ্রীমতীর শ্রীচরণে ব্যথা বাজিবে, তাই নাগর—“তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানী” । তা ল ভঙ্গ্য করিয়া

শ্রীমতী দাঁড়াইয়াছেন, কাহু গিয়া হাত পাতিলেন, লজ্জায় শ্রীমতী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন পদচিহ্নতলে শ্রীকৃষ্ণ লুটাইয়া পড়িলেন । অপর একটি পদে দেখিতে পাই, যমুনার বাইবার পথে শ্রীমতী কতক অঙ্কিত পদচিহ্নগুলি রসরাজ গভীর আশ্রয়ের সহিত চুপন করিতেছেন । গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমকে যে কত উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মাত্র একটি পদ হইতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়—

“হৃদয় মন্দিরে, কাহু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহ জাগি ।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল
দূরেহঁ দূরে রহ ভাগি ॥”

পরিশিষ্ট

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর প্রমুখতা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদের পদরসসার, পদরত্নাকর, প্রাচীন পুঁথি, বাঁকুড়ার হস্ত-লিখিত পুঁথি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে ৬৮টি অপ্রকাশিত পদ প্রকাশিত করিয়াছেন । ইহাতে আমরা গোবিন্দদাসের বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদ দেখিতে পাই । ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে, প্রচলিত গোবিন্দদাসের পদাবলীর মধ্যে মহাপ্রভুর পার্শ্বদ গোবিন্দ চক্রবর্তীর দুই-চারিটি পদ মিশিয়া গিয়াছে । তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থে গোবিন্দদাস ভণিতার বহু সন্দেহজনক পদের স্থান দেন নাই । সেগুলি ভাষা ও কবিত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে কোন বিষয়েই গোবিন্দদাসের পদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না । যাহা হউক, অভিসারের পদগুলি লইয়া যখন প্রবন্ধে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি, তখন সতীশ বাবু কতক প্রকাশিত দ্বিবা অভিসারের ও নিশা-অভিসারের পদ দুইটি হইতে এখানে কিয়দংশ উল্লেখ করিব—

(তুড়ী)

“দিনমণি কিরণ মলিন মুখমণ্ডল
ঘামে তিলক বহি গেল ।
কোমল চরণ তপত পথ বালুক
আতপ দহন সম ভেল ।
হেরইতে শ্যামর চন্দ ।
কোরে ত গোরি গোরি-মুখ-মোছও
বসন চুলায়ত মন্দ ॥”

পদটির ভণিতায় রহিয়াছে—“গোরি শ্যাম ছহঁ করত কুতূহলি কহতহি গোবিন্দদাস ॥”—(অঃ পঃ রত্নাবলী, পৃঃ—২৪)

পদটির রচনাভঙ্গী, ভাষার লালিত্য যে গোবিন্দদাসের তাহা একবার পাঠেই অভিজ্ঞ পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না । অপর পদটি নিশাভিসারের বলিয়া সতীশ বাবু তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন । নায়িকা নিশার আঁধারে অভিসারে বহির্গত হন বলিয়াই, বোধ হয়, পদটিকে নিশাভিসারের পদ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন । পদটি ‘পদরসসার’ হইতে গৃহীত । আমরা কিন্তু এই পদে নিশার কোনরূপ সন্ধান বা বর্ণনা পাই না ।

(কামোদ)

"শ্যাম অভিসারে চলি সুন্দরি ধনি
নব নব রঞ্জিণী সাথে ।
বাম শ্রবণমূলে শতদল পঙ্কজ
কাম জয় ফুলধনু তাথে ।
ভালহি সিন্দুর ভায়ু কিরণ জয়
উঁহিঁ চাক্র চন্দন বিন্দু
মুখ হেরি লাভসেঁ সাযরে লুকায়ল
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেস ইন্দু ।"—ইত্যাদি ।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সমস্ত পদ্যটি আর এখানে উদ্ধৃত
করলাম না। ভণিতায় দেখিতে পাই—

"দৌহে দৌহা হেরইতে দুহুঁ চিত্র পুলকিত
বলিহারি গোবিন্দদাসে ।"

পদটির ভাষা, ছন্দ, বাক্য ও অমুপ্রাসাদি অলঙ্কারের উপর দৃষ্টিপাত
করিলে পদটি কোন্ গোবিন্দদাসের, তাহা আর ভাবিয়া দেখিতে
হয় না। ইহা ভিন্ন সাধারণ অভিসারের ৪টি পদ সতীশবাবু এই
গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদগুলি সত্যই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর
হইয়াছে।

(১)

"অলস তেজি উঠত যত রায় ।
আগত ভায়ু রজনী চলি যায় ।
প্রাতহি দোহন করত যত চান্দ ।
তুরিতহি দেয়ল দোহন ছান্দ ।

হে শাশ্বতী, হে চির সাঙ্গনা,
পৃথ্বার প্রয়াণ-পথে চিরন্তন অঘা-বিরচনা
এখনো হ'ল না সারা
কখনো হবে না জানি
যত শেষ তত হবে সুর
পথিকের বক্ষ দুকু-দুকু
তুমিই জুড়াবে জানি
এ অভিনন্দন-বাণী
বিরচিয়া গাঁথিলু বন্দনা ।
অজেয় বিজয় করি
চির পরিচয়ে শৃঙ্খলিয়া—
গোধূলি-মিলন-লগ্নে
বিভাবরীরূপে এস প্রিয়া
তিমিরের কৃষ্ণ-রেখা
গৌর তনু ঢেঁল মাটি-তটে
হৈম কান্তি লাভগ্যের
আপনারে সসঙ্কোচে রটে ।

সজন উপেখি চলল বরকাণ ।
নুপুরের নাদে জাগয়ে পাঁচ বাণ ।
নিকটই গোষ্ঠ মিলল যত রায় ।
গোবিন্দদাস মটকি লই বায় ।"

(২)

(বেলাবরি)

"প্রাতহি কুঞ্জে কয়ল পয়াণ ।
গোধন দোহন করতহি কান ।
সুন্দর অরুণ শ্যামক চন্দ ।
দোহন ধেমু করত বহু ছন্দ ।
দোহন গরজত শব্দ গভীর ।
ঘন ঘন দোহন করত যতবীর ।
গোরস ধার চুষায়ত অঙ্গ ।
তমালে বেঢ়ল যেন মোতিম রঙ্গ ।
মটকি মটকি ভরি রাখত টারি ।
গোবিন্দদাস কহে যাও বলিহারি ।"

পদ দুইটির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বেশ অনুভব
করিতে পারি, কবি কেবল রূপ-বর্ণনায়, বিরহ-বর্ণনায়, মিলন বা
অভিসার বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন না; গোবিন্দদাস ধেমু দোহন
বর্ণনায় বা গোষ্ঠ-বর্ণনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মাত্র এই দুইটি
পদের ভিতর দিয়া শ্যামসুকোমল নন্দকুলালের গোদোহনের যে
চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সত্যই উপভোগ্য। গোদোহন-
কালীন যে গভীর নিনাদটি দুঃখপাত্র হইতে উৎপিত হয়, তাহাও
যেন পদটি পাঠের পর পাঠকের কাণে বাজিতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র ।

শাশ্বতী

শঙ্কর নিখর হল সুনিশ্চল তারক'র তারা
নিম্পলক চেয়ে রয় মীনাঙ্কীর মত পক্ষহারী ;
দৃষ্টি নাই,—নাহিক বিদ্যুৎ
নিভেছে চক্ষের প্রাণ
অন্তর্গত চেতনা অদ্ভুত !
হানো প্রাণ,
দানো স্পর্শ-সাড়া
মরণের প্রেতাধ্যাস
দূর কর অঙ্গে দিয়া নাড়া ;
স্মৃতি দিয়া—প্ৰীতি দিয়া
জীবনের অঙ্গে অঙ্গে বুলাইয়া করুণার কণা
সঞ্চারিয়া কর দান
অবিচ্ছেদ অনির্বাণ
মানবের প্রাণ নীরাজনা
হে শাশ্বতী,
অরুন্ধতী

চিরন্তন প্রাণের সাঙ্গনা ।
শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত (এম-এ, বি-এস-সি, এম-বি, ডি-টি-এম)



নক্সা-কাটা জার্সি-শ্যুট

শীত পড়তে আর বেশী দেরী নেই, যারা স্নগৃহিণী ছেলে-মেয়েদের শীতবস্ত্রের সমাধান তাঁরা এখন থেকেই করে রাখেন। তাঁদের সুবিধা হবে ভেবে এ-মাসে এই উট-চিত্রিত জার্সি-শ্যুট-এর নির্দেশ দেওয়া হলো।

এটা তৈরী করতে আট আউন্স উল লাগবে। ৭ আউন্স সাদা উল (৪-প্লাই); ১ আউন্স, যে-কোন রঙের (৪-প্লাই) উল; ১০ নং এক জোড়া ষ্টীলের কাঁটা; ছোট একটা ক্রুশের কাঁটা; ৩ গজ সরু ইলাস্টিক; আর পাতলা দুটো বিলুকের কিম্বা সেলুলয়েডের বোতাম।

আগের বছরের মতো কতকগুলো সংক্ষেপোক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সাঃ=সোজা; উঃ=উর্ন্তো; সাঃ ভাবে দুটো ঘর তোলা=কাঁটার মুখ সোজা ঘর তোলার মতো রেখে সামনে উল দিয়ে একটা ঘর থেকে দুটো ঘর তুলে নেবেন। উঃ ভাবে দুটো ঘর তোলা=কাঁটার মুখ উর্ন্তো ঘর তোলার সময়ের মতো রেখে উলটাকে ডানদিকে দিয়ে, তার পর কাঁটার ওপর দিয়ে খুরিয়ে নিয়ে ঘর তুললেই একটা ঘরে দুটো ঘর হবে। এছাড়া সাঃ উঃ=সাদা উল; রঃ উঃ=রঙীন উল। ঘঃ বঃ=ঘর বন্ধ করুন।

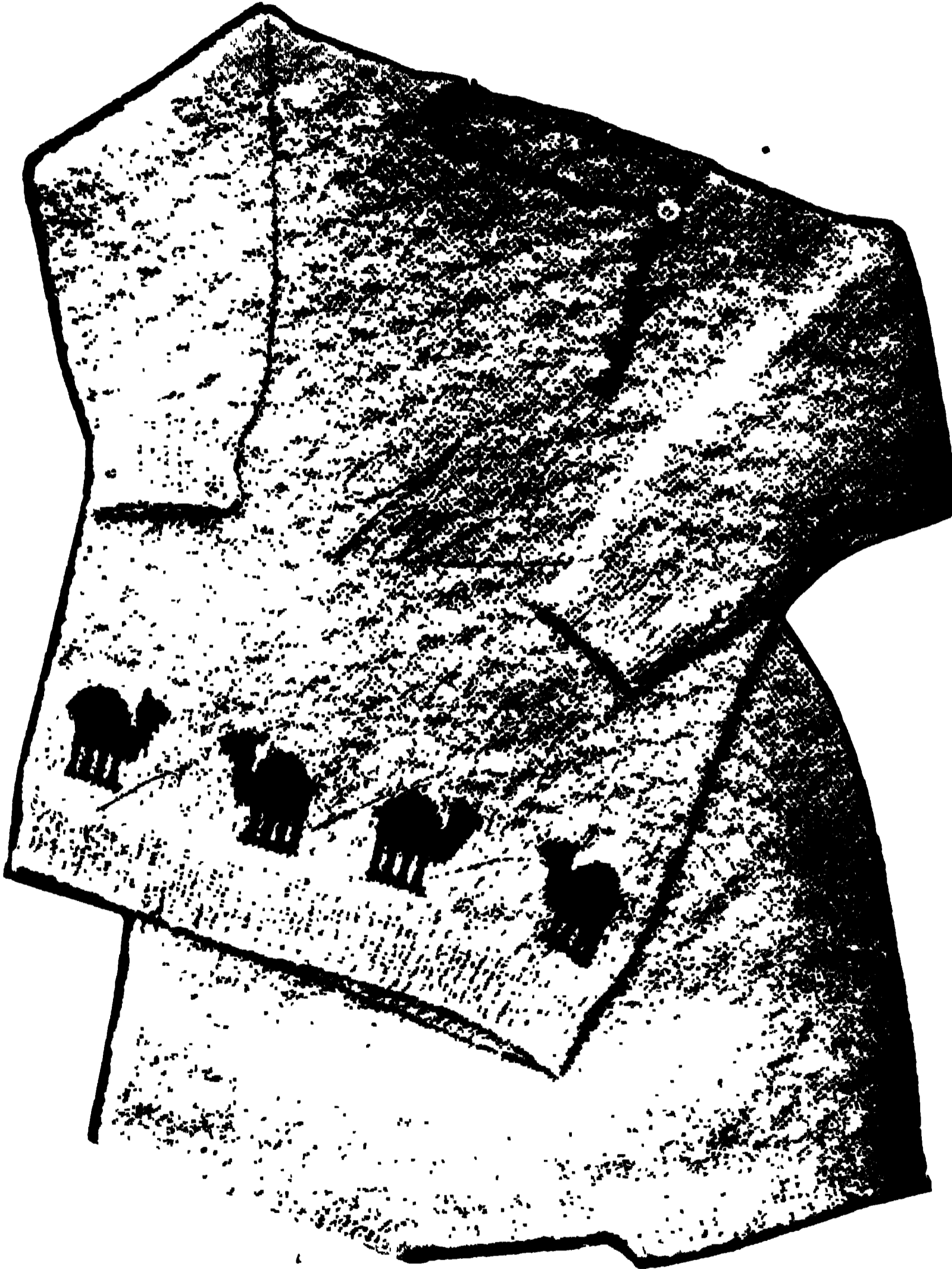
ওপরের এবং নীচের নির্দেশ-অনুযায়ী করলে শ্যুটটির মাপ হবে—জার্সির বুল (কাঁধ থেকে কোমরের তলা পর্যন্ত) ১৪ ইঞ্চি; ছাতি ২২ ইঞ্চি; পুট হাতা ৮ ইঞ্চি। প্যাণ্টের বুল=৮; পায়ের ঘের=১০ ইঞ্চি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, কাঁটা এবং উলের (প্লাই অথবা গেই-এর) তারতম্য-অনুসারে মাপের তারতম্য ঘটবে। এইবার বোনা আরম্ভ করুন:—

সমস্ত জার্সিটা নি-জোড ভাবে তৈরী হয় (৪ নং ছবির নক্সা দেখুন)। তাই (পিছন-দিককার) কোমর থেকে কাজ আরম্ভ করুন। প্রথমে ৮৪টি ঘর তুলে, ১টা সাঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে ১৪ লাইন বুনে যান। তার পর চার লাইন ষ্টকিং-ওয়েব (stocking-web) প্যাটার্ণে, অর্থাৎ মোজা-বোনার প্যাটার্ণে বুনুন। [মোজা বোনার প্যাটার্ণ বোধ হয় সকলেই জানেন! এক লাইন সোজা, এক লাইন উর্ন্তো এইভাবে বুনে যেতে হয়; তবে একটা বিনয়ে খেয়াল রাখতে হবে, দুটো দিক যেন ছ'রকম হয়, আর সেই দুটো-দিকের সোজা দিকটা (বিলুনি-ধরণের লম্বা টানা টানা বোনাটা, যেমন মোজায় দেখতে পাওয়া যায়) যেন সামনের দিকে থাকে।]

এইবার যে রঙীন গোলাটা আছে, সেটা জুড়তে হবে এবং নির্দেশ-অনুযায়ী একই লাইনে কতকগুলি ঘর সাদা উলে বুনেতে হবে, আবার কতকগুলি বা রঙীন উলে। ১৯শ লাইন—আগাগোড়া সোজা বোনা দিতে হবে। তবে *৫ ঘর সাঃ উঃ, ৮ ঘর রঃ উঃ, ১৬ ঘর সাঃ উঃ, ৮ ঘর রঃ উঃ, ৫ ঘর সাঃ উঃ; * থেকে রিপিট করবেন একবার। ২০ লাইন—আগাগোড়া উর্ন্তো। * ৫টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ৫টা সাঃ উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। ২১ লাইন—আগাগোড়া সোজা বুনেবেন। * ৫টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ, ১টা সাঃ উঃ, ১টা রঃ উঃ,

১টা সা: উঃ, ১টা র: উঃ, ১৮টা সা: উঃ, ১টা র: উঃ,
১টা সা: উঃ, ১টা র: উঃ, ১টা সা: উঃ, ১টা র: উঃ,
১টা সা: উঃ, ১টা র: উঃ, ৫টা সা: উঃ, * থেকে একবার
রিপিট করুন। ২২ লাইন ২০ লাইনের মতো।
২৩ লাইন—২১ লাইনের মতো। ২৪ লাইন—আগা-
গোড়া উল্টো বোনা। * ৫টা সা: উঃ, ৯টা র: উঃ,

বদলানোর নির্দেশ ২৬ লাইন-অমুযায়ী। ২৮ লাইন—
আগাগোড়া উল্টো বোনা দেবেন; * ৪টে সা:
উঃ, ৮টা র: উঃ, ১টা সা: উঃ, ২টো র: উঃ, ১২টা
সা: উঃ, ২টো র: উঃ, ১টা সা: উঃ, ৮টা র: উঃ,
৪টে সা: উঃ, * থেকে একবার রিপিট করুন। ২৯
লাইন—আগাগোড়া সোজা বোনা। * ৫টা সা: উঃ,



পুরা স্যুট

৭টা র: উঃ, ১টা সা: উঃ, ৩টে র:
উঃ, ১০টা সা: উঃ, ৩টে র: উঃ, ১টা
সা: উঃ, ৭টা র: উঃ, ৫টা সা: উঃ,
* থেকে একবার রিপিট করুন।
৩০ লাইন—আগা- গোড়া উল্টো
বুনবেন; * ৬টা সা: উঃ, ৫টা র:
উঃ, ২টো সা: উঃ, ৪টে র: উঃ, ৮টা
সা: উঃ, ৪টে র: উঃ, ২টো সা:
উঃ, ৫টা র: উঃ, ৬টা সা: উঃ,
* থেকে একবার রিপিট করুন। ৩১
লাইন—আগাগোড়া সোজা। * ৭টা
সা: উঃ, ৩টে র: উঃ, ৩টে সা: উঃ,
১টা র: উঃ, ১টা সা: উঃ, ২টো র:
উঃ, ৮টা সা: উঃ, ২টো র: উঃ,
১টা সা: উঃ, ১টা র: উঃ, ৩টে সা:
উঃ, ৩টে র: উঃ ৭টা সা: উঃ, *
থেকে একবার রিপিট করুন। ৩২,
লাইন—সব উল্টো বোনা। * ১৩টা
সা: উঃ, ২টো র: উঃ, ১২টা সা: উঃ,
২টো র: উঃ, ১৩টা সা: উঃ, *
থেকে একবার রিপিট করুন। এই-
বার থেকে রঙীন উলটা আর ব্যবহার
করতে হবে না, কেন না আমাদের
উট তো তৈরী হয়ে গেছে। সাদা

১৪টা সা: উঃ, ৯টা র: উঃ, ৫টা সা: উঃ, * থেকে একবার
রিপিট করুন। ২৫ লাইন—আগাগোড়া সোজা বুনবেন
২৪ লাইনের-নির্দেশ অমুযায়ী, কিন্তু উল বদলাবেন।
২৬ লাইন—আগাগোড়া উল্টো বোনা; * ৫টা সা: উঃ,
১০টা র: উঃ, ১২টা সা: উঃ, ১০টা র: উঃ, ৫টা সা: উঃ।
২৭ লাইন—আগাগোড়া সোজা বোনা, তবে উল

উলে ৪ লাইন ষ্ট্রিকিং-ওয়েব প্যাটার্ণে বুনুন। * *
৩৭ লাইন—৪টে সা:, তার পর ৪টে উঃ, ৪টে সোজা
প্যাটার্ণে লাইনের শেষ অবধি করে যান। ৩৮ লাইন—
৪টে উঃ, তার পর ৪টে সা:, ৪টে উঃ প্যাটার্ণে লাইন
শেষ করুন। ৩৯ লাইন—৩৭ লাইনের মতো।
৪০ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ৪১ লাইন—৩৮ ল

মতো। ৪২ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ৪৩ লাইন—৪১ লাইনের মতো। ৪৪ লাইন—৪২ লাইনের মতো। * * ১৫৯ লাইন—১৫৭ লাইনের মতো। ১৬০ লাইন—

এইবার * * (অর্থাৎ ৩৭ লাইন) থেকে * * থেকে * * (অর্থাৎ ৪৪ লাইন) অবধি পুরো আট লাইন ৪৪ লাইন অবধি পুরো আট লাইন সাতবার রিপিট তিনবার ক্রমান্বয়ে রিপিট করুন। এইবার বাঁ-দিকের

করুন। তারপর

৩৭ লাইন আর

৩৮ লাইনটি ক্রমা-

ন্বয়ে ছ'বার রিপিট

করুন। ১০৫

লাইন—৪৮টে ঘর

বন্ধ করে ফেলুন,

তারপর ৪৮টে

সোঃ, ৪৮টে উঃ

প্যাটার্ণে লাইনের

শেষ অবধি বুনে যান। ১০৬ লাইন—৪৮টে ঘঃ বঃ

তারপর ৪৮টে সোঃ, ৪৮টে উঃ প্যাটার্ণে শেষ অবধি

করুন (৭৬ ঘর রইলো কাঠিতে)। ১০৭ লাইন—৩৭

লাইনের মতো। ১০৮ লাইন—৩৮ লাইনের মতো।

১০৯ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১১০ লাইন—৩৭

লাইনের মতো। ১১১ লাইন—১০৯ লাইনের মতো।

১১২ লাইন—১১০ লাইনের মতো। * * অর্থাৎ

৩৭ লাইন থেকে ৪৪ লাইন অবধি পুরো আট

লাইনের প্যাটার্ণটি ক্রমান্বয়ে ৪বার রিপিট করুন।

১৪৫ লাইন—৪৮টে সোঃ, ৪৮টে উঃ প্যাটার্ণে ২৪টি ঘর

বুনে অথ একটি কাঁটায় রেখে দিন ডানদিককার কাঁধ

বোনবার জন্ত; তারপর গলার ফাঁদ তৈরী করুন

২৮টি ঘর ফেলে দিয়ে বাকী ২৪টি ঘর ৪৮টে উঃ, ৪৮টে সোঃ,

প্যাটার্ণে করুন। এর পরের তিন লাইন করে যান,

৩৮টে উঃ, ৪৮টে সোঃ প্যাটার্ণে। তার পরের চার লাইন

—৪৮টে সোঃ, ৪৮টে উঃ প্যাটার্ণে করবেন। ১৫৩ লাইন—

৩৮টে ঘর তুলে নিন। সেই চারটে ঘর সোজা বুনে,

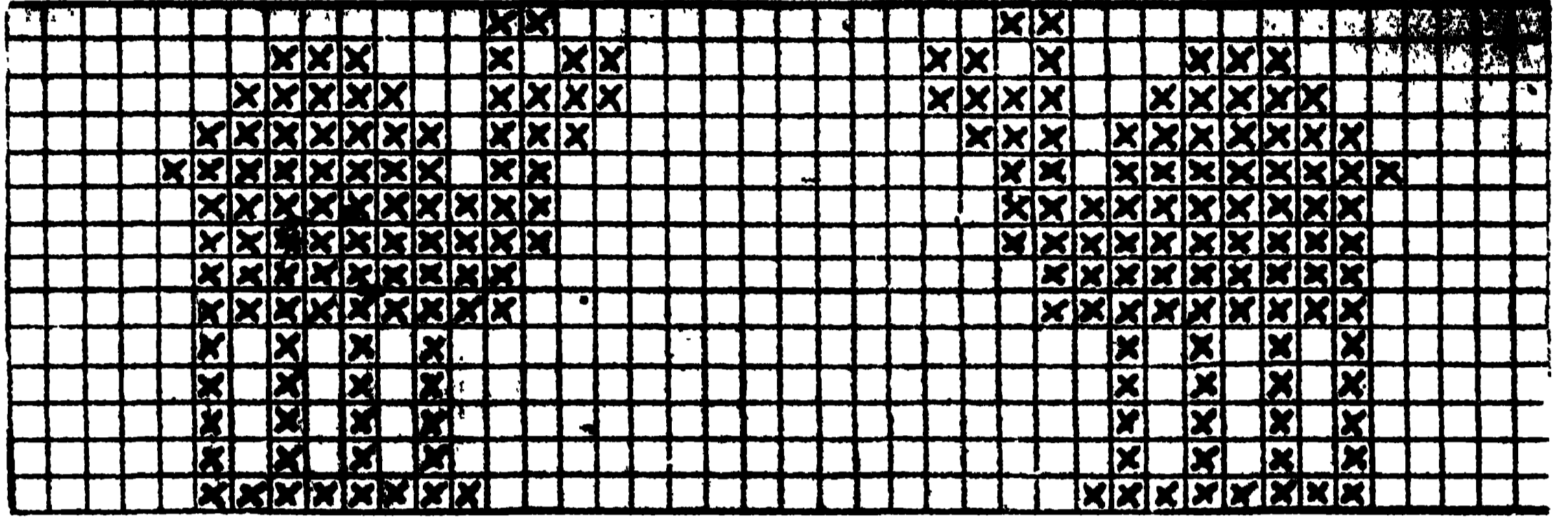
৪৮টে উঃ, ৪৮টে সোঃ প্যাটার্ণে বুনে যান শেষ অবধি

(২৮টি ঘর হুলো কাঠিতে)। ১৫৪ লাইন—৩৮

লাইনের মতো। ১৫৫ লাইন—৩৭ লাইনের মতো।

১৫৬ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১৫৭ লাইন—৩৮

লাইনের মতো। ১৫৮ লাইন—৩৭ লাইনের মতো।



উটের নক্সা

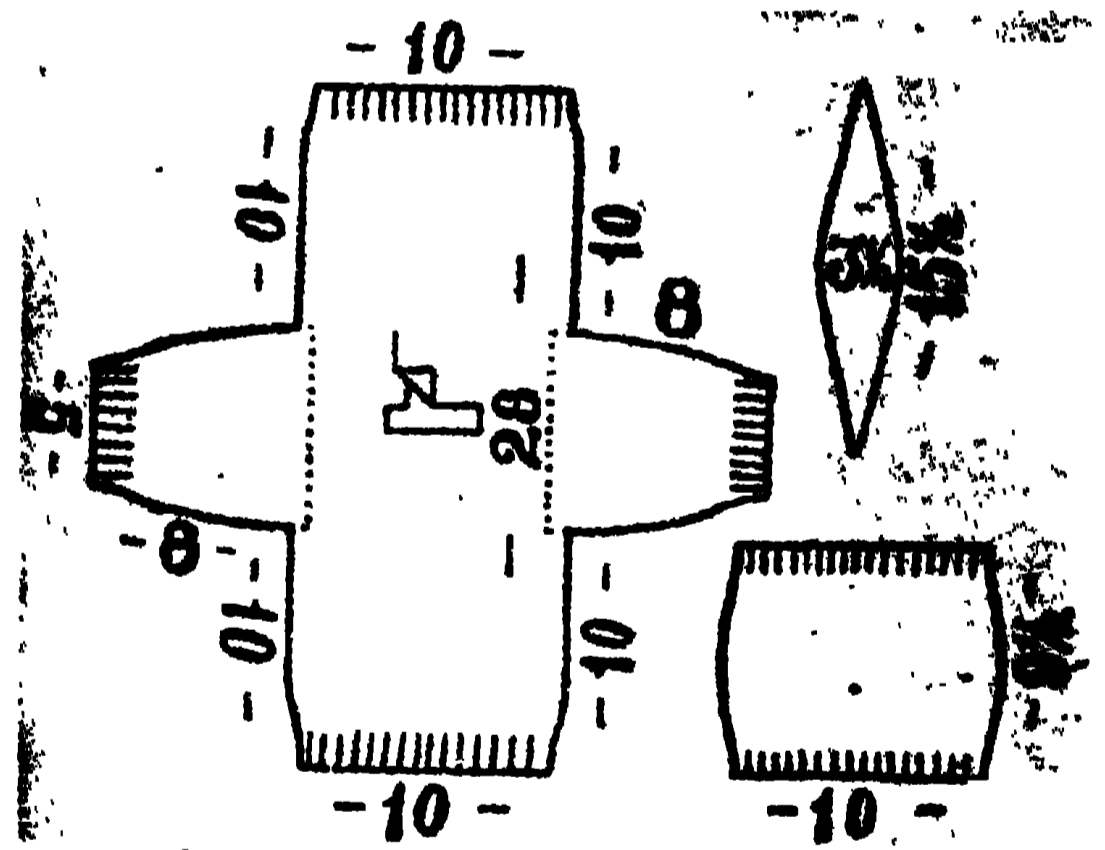
ঘরগুলো অথ একটি কাঁটায় তুলে রেখে, ডান কাঁধের

জন্ত আলাদা-করে-রাখা ঘরগুলো কাঁটায় তুলে নিয়ে,

গলার দিক থেকে উল জুড়ে কাজ আরম্ভ করুন।

প্রথম তিন লাইন—৪৮টে সোঃ, ৪৮টে উঃ প্যাটার্ণে করে

যান। তার পরের চার লাইন—৪৮টে উঃ, ৪৮টে সোঃ



শ্যটের ছক্

প্যাটার্ণে ক্রমান্বয়ে করে যান। ১৫৩ লাইন—৪৮টে সোঃ,

৪৮টে উঃ ক্রমান্বয়ে বুনে যান। ১৫৪ লাইন—২৮টি ঘর

তুলে নিন, তাদের প্রথম চারটি ঘর উল্টো বুনে, ৪৮টে

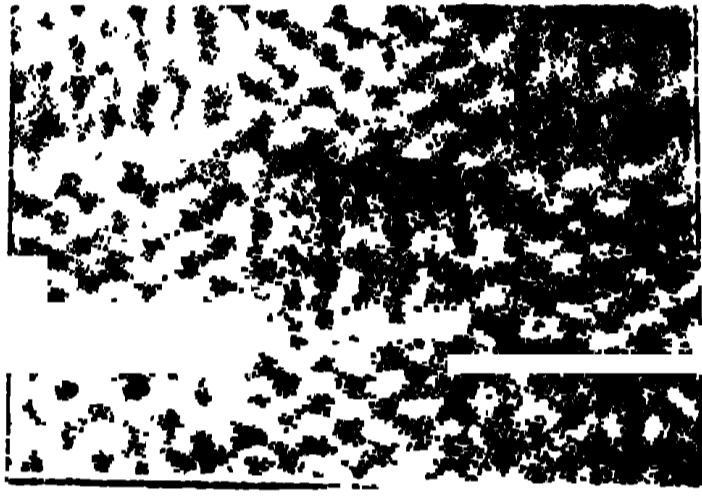
সোঃ, ৪৮টে উঃ প্যাটার্ণে শেষ অবধি করে যান। (৫২টি ঘর

হুলো)। ১৫৫ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ১৫৬ লাইন

—৩৮ লাইনের মতো। ১৫৭ লাইন—৩৮ লাইনের

মতো। ১৫৮ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। ১৫৯ লাইন—১৫৭ লাইনের মতো। ১৬০ লাইন—১৫৮ লাইনের মতো। এবার * * (অর্থাৎ ৩৭ লাইন) থেকে * * (৪৪ লাইন) অবধি পুরো আট লাইন ক্রমান্বয়ে তিনবার রিপিট করুন। ১৬৫ লাইন—৪টে ঘর তুলুন, তার পর ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ প্যাটার্ণে ৬ বার (অর্থাৎ ৪৮টি ঘর বুনে যান), ৪টে উঃ ; এইবার বাকী চারটে ঘর একটা সেফ্টি-পিনে তুলে রাখুন ; বাঁ-দিকের ঘরগুলো বাড়তি-কাটা থেকে খালি-কাটায় তুলে নিন, সেফ্টি-পিনের মুখ খুলে সেটি বাঁ-দিকের কাটার মুখোমুখি ভাবে ধরুন। এখন সেফ্টি-পিনের একটা ঘর আর কাটার

একটা ঘর এই দুটো ঘর একসঙ্গে নিয়ে একটা ঘর তুলুন (অর্থাৎ একটা করে ঘর ফেলে দিন)। সেফ্টি-পিনের



বোনার সাইজ.

চারটে ঘর বোনা হয়ে গেলে বাকী ২৪টা ঘর ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ প্যাটার্ণে বুনুন। এখন কাটায় ৮০টি ঘর হলো। ১৬৬ লাইন—৪টে ঘর তুলে সেই চারটে ঘর সোজা বুনুন তার পর ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ প্যাটার্ণে বাকী ঘরগুলো বুনে যান। ১৬৭ লাইন—৩৮ লাইনের মতো। ১৬৮ লাইন—৩৭ লাইনের মতো। * * (৩৭ লাইন) থেকে * * (৪৪ লাইন) অবধি পুরো আট লাইন—আটবার রিপিট করুন, ক্রমান্বয়ে। চার লাইন বুনুন ষ্টিকিং-ওয়েব প্যাটার্ণে। এইবার ৩২ লাইন থেকে ১৯ লাইন অবধি রঙীন উল জুড়ে বুনে যান। কেন না, এবারেও তো আবার উটের সার তৈরী করা চাই। তবে এবার বোনবার সময় ৩২, ৩১, ৩০, ২৯, ২৮ ইত্যাদি ভাবে ১৯ লাইন অবধি নির্দেশোক্তি মেনে যেতে হবে। কেন না, এবার উটের মাথা থেকে নক্সা আরম্ভ করতে হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, প্রথম বারে যে লাইনগুলো আগাগোড়া সোজা বুনেছেন, সেগুলো এবারে আগাগোড়া উণ্টো বুনবেন ; এবং যে লাইনগুলো আগাগোড়া উণ্টো বুনেছেন, সেগুলো এবারে

আগাগোড়া সোজা বুনেতে হবে ; অর্থাৎ উণ্টো নিয়মে। কিন্তু এ নির্দেশ কেবলমাত্র ৩২ লাইন থেকে ১৯ লাইন বোনবার জন্ত। উটগুলো তৈরী হয়ে গেলে রঙীন উলটি আলাদা করে রাখুন (অবশ্য যদি আর কিছু অনিশ্চিত থাকে)। তার পর চার লাইন ষ্টিকিং-ওয়েব প্যাটার্ণে, এবং বাকী চৌদ্দ লাইন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে। এইবার ঘর বন্ধ করুন। জার্সির গায়ের অংশ এবারে তৈরী হলো। এখন হাত তৈরী করতে হবে।

হাত

(দুটোই এক নির্দেশে বুনতে হবে)

উল জুড়ে হাতের ফাঁদ থেকে বোনাটার সোজা দিকে ৬৮টা ঘর তুলে নিন। ২য় লাইন—৪টে উণ্টো, তার পর * ৪টে সোজা, ৪টে উণ্টো—এই ভাবে * (তারা) থেকে রিপিট করে যান শেষ অবধি। ৩য় লাইন—সোজা ৪টে *, উঃ ৪টে, সোঃ ৪টে—* থেকে শেষ অবধি রিপিট করে যান। চতুর্থ লাইন—২য় লাইনের মতো। ৫ম লাইন—উণ্টো করে ২টা ঘর একসঙ্গে বুনে নিন, উণ্টো ২টা, * সোঃ ৪টে, উঃ ৪টে, * থেকে রিপিট করুন। তবে শেষের ৮টা ঘর এই নিয়মে করুন, ৪টে সোজা, ২টা উণ্টো, উণ্টো করে দুটো ঘর এক সঙ্গে। ৬ষ্ঠ লাইন—৩টে সোঃ ; * উণ্টো ৪টে, সোজা ৪টে * থেকে রিপিট করুন, তবে সাতটা ঘর বাকী রাখবেন, সে সাতটা ঘর বুনুন—উঃ ৪টে, সোঃ ৩টে। ৭ম লাইন—উঃ ৩টে, * সোঃ ৪টে, উঃ ৪টে ; * থেকে রিপিট করুন ; তবে শেষের সাতটা ঘর বুনবেন—সোঃ ৪টে, উঃ ৩টে। ৮ম লাইন—৬ষ্ঠ লাইনের মতো। ৯ম লাইন—৭ম লাইনের মতো। ১০ম লাইন—৬ষ্ঠ লাইনের মতো। ১১শ লাইন—সোজা করে দুটো ঘর এক সঙ্গে ; ১টা সোঃ * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ ; * থেকে রিপিট করুন। তবে শেষ সাতটা ঘর বুনুন—৪টে উঃ, ১টা সোঃ, সোজা করে দুটো ঘর এক সঙ্গে। ১২শ লাইন—২টা উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ * থেকে রিপিট করুন, শেষ ছ'টা ঘর বাকী থাকতে বুনুন—৪টা সো, ২টা উঃ। ১৩শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ১৪শ লাইন—২টা সোঃ, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ, * থেকে রিপিট করুন, শেষের ছ'টা

বুন্ন—৪টে উঃ, ২টা সোঃ। ১৫শ লাইন—১৩শ লাইনের মতো। ১৬শ লাইন—১৪শ লাইনের মতো। ১৭শ লাইন—২টা ঘর (সোজাভাবে) একসঙ্গে, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ, * থেকে রিপিট করুন; তবে শেষের ৬টা ঘর বুন্ন—৪টে উঃ, সোজা ভাবে দুটা ঘর একসঙ্গে। ১৮শ লাইন ১টা উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ, * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৫টা ঘর করুন—৪টা সোঃ, ১টা উঃ। ১৯ লাইন—১টা সোঃ, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ, * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৫টা ঘর করুন—৪টে উঃ, ১টা সোঃ। ২০শ ও ২১শ লাইন—১৮শ লাইনের মতো। ২২শ লাইন—১৯শ লাইনের মতো। ২৩শ লাইন—সোজা ভাবে দুটা একসঙ্গে, ৩টে সোঃ, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৯টা ঘর বুন্ন—৪টে উঃ, ৩টে সোঃ, সোজা ভাবে দুটা ঘর একসঙ্গে। ২৪শ লাইন—২য় লাইনের মতো। ২৫শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ২৬শ লাইন—২য় লাইনের মতো। ২৭শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ২৮শ লাইন—২য় লাইনের মতো। ২৯শ লাইন—২টা ঘর সোজা ভাবে একসঙ্গে, ২টা সোঃ, * ৪টে উঃ, ৪টে সোঃ, * থেকে রিপিট করুন; তবে শেষের ৮টা ঘর বুন্ন—৪টে উঃ, ২টা সোঃ, ২টা সোজাভাবে একসঙ্গে। ৩০শ লাইন—৭ম লাইনের মতো। ৩১শ লাইন—৬ষ্ঠ লাইনের মতো। ৩২শ লাইন—৭ম লাইনের মতো। ৩৩শ লাইন—৭ম লাইনের মতো। ৩৪শ লাইন—৬ষ্ঠ লাইনের মতো। ৩৫শ লাইন—দুটা ঘর উর্টো ভাবে একসঙ্গে, ১টা উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ, * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৭টা ঘর বুন্ন—৪টে সোঃ, ১টা উঃ, ২টা ঘর উর্টো ভাবে একসঙ্গে। ৩৬শ লাইন—১৪শ লাইনের মতো। ৩৭শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ৩৮শ লাইন—১৪শ লাইনের মতো। ৩৯শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ৪০শ লাইন—১৪শ লাইনের মতো। ৪১শ লাইন—দুটা ঘর উর্টো ভাবে একসঙ্গে, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ; * থেকে রিপিট করুন, তবে শেষের ৬টা ঘর বুন্ন এই ভাবে—৪টে সোঃ, ২টা উর্টোভাবে একসঙ্গে। ৪২শ লাইন—১৯শ লাইনের মতো। ৪৩শ লাইন—১৮শ লাইনের মতো। ৪৪শ

লাইন—১৯শ লাইনের মতো। ৪৫শ লাইন—১৯শ লাইনের মতো। ৪৬শ লাইন—১৮শ লাইনের মতো। ৪৭শ লাইন—উর্টোভাবে দুটা ঘর একসঙ্গে, ৩টে উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ, * থেকে রিপিট করে যান, তবে শেষে ৯টা ঘর বুন্ন ৪টা সোঃ, ৩টে উঃ, ২টা ঘর উর্টো ভাবে একসঙ্গে। ৪৮শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ৪৯শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ৫০শ লাইন—২য় লাইনের মতো। ৫১শ লাইন—৩য় লাইনের মতো। ৫২শ লাইন—২য় লাইনের মতো। এইবারে ৫ম লাইন থেকে ২৪শ লাইনের শেষ অবধি রিপিট করে যান। ৪৪টা ঘর বাকী রইলো। তাদের নিয়ে ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে ১৪ লাইন বুন্ন। এইবার ঘর বন্ধ করুন।

প্যাটার্ণ

(দুটা পা এক-নির্দেশে বুনতে হবে)

কোমর থেকে আরম্ভ করুন। প্রথমে ৮৪টা ঘর তুলে দু'লাইন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে করুন। তারপর ৩য় লাইন—* ১টা সোঃ, ১টা উঃ, ১টা সোঃ, ১টা উঃ, ১টা সোঃ, সোজা ভাবে দুটা একসঙ্গে। * থেকে রিপিট করে যান শেষ অবধি। এর পরের ৭ লাইন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুন্ন। * * ১১শ লাইন—৪টে সোঃ, * ৪টে উঃ, ১টে সোঃ; * থেকে রিপিট করে যান। ১২শ লাইন—৪টে উঃ, * ৪টে সোঃ, ৪টে উঃ, * থেকে রিপিট করে যান। ১৩শ লাইন—১১শ লাইনের মতো। ১৪শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ১৫শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ১৬শ লাইন—১১শ লাইনের মতো। ১৭শ লাইন—১২শ লাইনের মতো। ১৮শ লাইন—১১শ লাইনের মতো। * * (অর্থাৎ ১১শ লাইন) থেকে * * ১৮শ লাইনের শেষ অবধি পুরো ৮ লাইন ৮ বার রিপিট করুন।

তার পর ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে আট লাইন বুন্ন। এইবার সব ঘর বন্ধ করুন। এতক্ষণে যে টুকরোটা তৈরী হলো, এটা একটা দিকের পা। ঠিক এমনি একটি টুকরো তৈরী করতে হবে আর একটি পা-এর জুড়ে। দুটি পা জোড়া হবে। এর পরে যে তিনকোণা প্যাটার্ণটি (গাসেট—gusset) তৈরী করবেন, সেটির দু'পাশে দু'পা জুড়তে হবে।

গাসেট

দুটো ঘর তুলুন। ১ম লাইন—২টো সোঃ। ২য় লাইন—২টো উঃ। ৩য় লাইন—১টা ঘরে (উল সামনে দিয়ে) দুটো ঘর তুলুন। এইভাবে ৪টে ঘর হলো। ৪র্থ লাইন—৪টে উলটো। ৫ম লাইন—১টা সোঃ, তার পরের দুটো ঘরে চারটে ঘর তুলুন, ১টা সোঃ। ৬ষ্ঠ লাইন—৬টা উলটো। * এর পরের ছ' লাইন সোজা বোনার প্যাটার্ণে (ষ্টকিং-ওয়েব) অর্থাৎ এক লাইন সোজা, এক লাইন উলটো প্যাটার্ণে করুন। তবে সোজা দিকটা যেন সামনে থাকে।

১৩শ লাইন—১টা সোঃ, ১টা ঘরে দুটো ঘর তুলুন, তারপরে সব সোজা করে যান; শেষে দুটো ঘর থাকতে ১টা ঘরে দুটো ঘর তুলুন, বাকী ঘরটা সোজা বুলুন।

১৪শ লাইন—সব উলটো। তারপর * (৭ম

লাইন থেকে) * ১৪শ লাইন অবধি পুরো ছ' লাইন আটবার রিপিট করুন। ২৪টা ঘর হলো। আবার চার লাইন ষ্টকিং-ওয়েব (মোজা বোনার প্যাটার্ণে) বুলুন। * * ৮৩ লাইন—১টা সোঃ, ২টো একসঙ্গে সোজাভাবে; তারপর সব সোজা বুলুন। শেষের তিনটে ঘর কিন্তু এইভাবে বুলুন—দুটো ঘর একসঙ্গে, ১টা সোঃ। ৮৪ লাইন—সব উলটো। তারপর ছ লাইন ষ্টকিং-ওয়েবে বুলুন। * *

* * (৮৩শ লাইন) থেকে * * (৯০ লাইন) অবধি আটবার রিপিট করুন (৬টা ঘর বাকী রইলো)। ১৫৫ লাইন—১টা সোঃ, দুটো সোজা ভাবে একসঙ্গে, দুটো সোজা ভাবে একসঙ্গে, ১টা সোঃ। ১৫৬ লাইন—৪টে উঃ। ১৫৭ লাইন—দুটো সোজাভাবে একসঙ্গে, দুটো সোজা ভাবে একসঙ্গে। ১৫৮ লাইন—দুটো উঃ। ১৫৯ লাইন—২টো সোঃ। ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

জীবন-সন্ধ্যা

চোখ ফেটে মোর অশ্রু আসে,
ঘনায় পথে আঁধার-রাশি
বাজলো বেলা-শেষের বাঁশী।
ডাহক-ডাকা নিরালা-সাঁঝ,
হাত-ছানিতে ডাকছে যে আজ,
ডাকছে মোরে অস্তাচলের
ধূসর বন-বীধি।

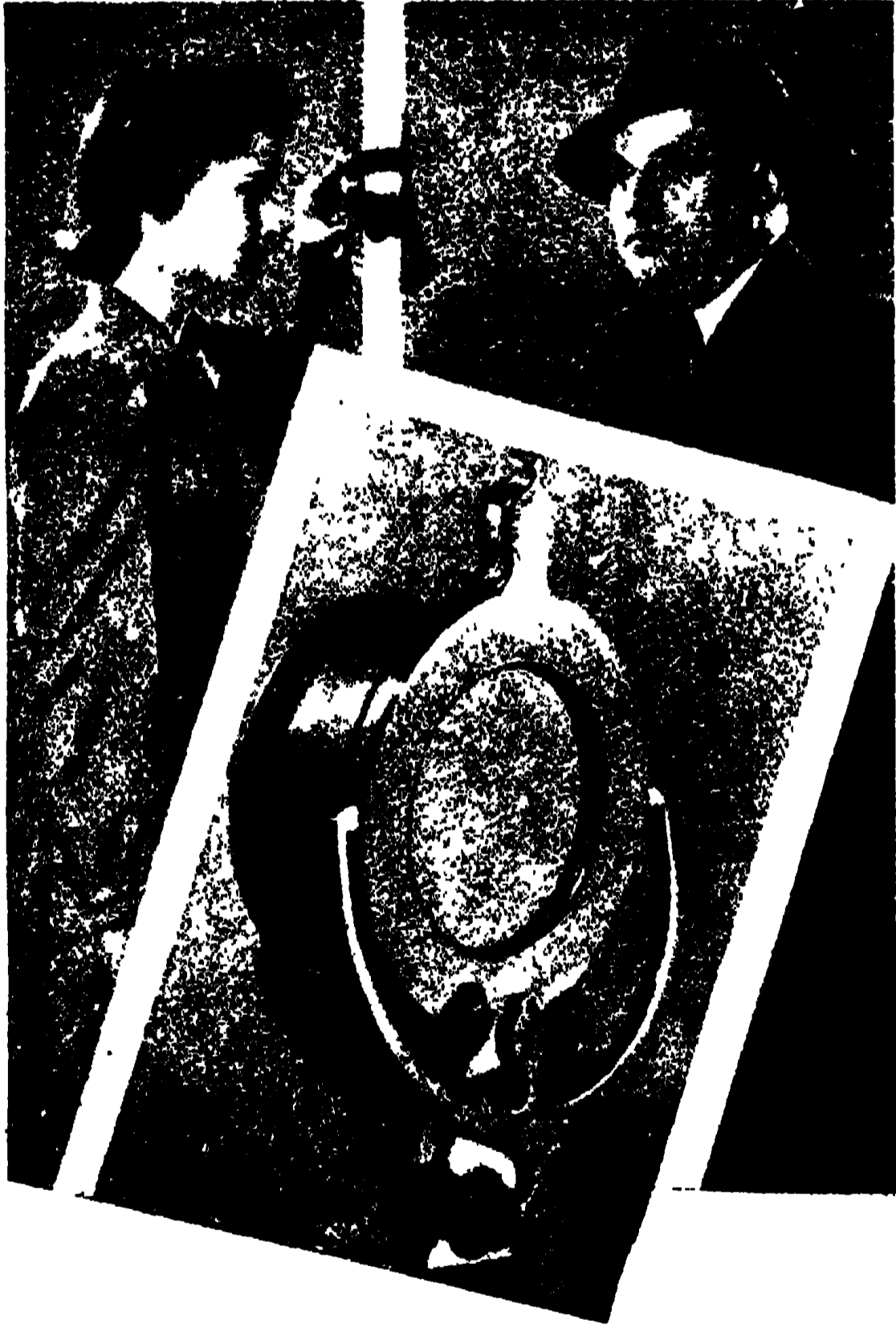
যৌবনেরি মথুরা কই কোথায় হাসি-গান?
'ভাঙীর' বন নাই রে আমার নাই সে ব্রজধাম।
কোথায় গেল সঙ্গীরা সব,
মনের বেণু আজকে নীরব,
একে একেই নিব্ছে যে দীপ, হয় কি কালের রীতি?
সন্ধ্যা আসে, হিমেলু হাওয়ায় কাঁপছে বাঁধের জল,
আলো-ছায়ার ছল্ছে ছ'কুল, নিখর তমাল-তল।
নামছে . জীবন-বিভাবরী,
নাই রে, আমার পারের কড়ি,
আসবে কখন খেয়ার তরী তাই ভাবি যে নিতি।

আমার 'কুমুদ' আমার 'কমল' আমার প্রাণের ভাই,
মন বলে হয় তাদের কাছেই আজকে বিদায় চাই,
ইন্ন ত জীবন-সন্ধ্যা আমার,—
সফল হবে মিলবে আবার,
প্রেমের রাজার পীযুষধারা অসীম প্রাণের প্রীতি
হয় ত আবার আমার ক্ষেতেই ফলবে ফুলের-ফসল,
হেথায় কাঁটা বিধূল বটে, সেথায় সোনার কমল,—
তুলুব আমি আপন-হাতে,
নন্দনেরি বাগিচাতে—
ফুটেই রবে ফুল হ'য়ে মোর এই জীবনের স্মৃতি।
কাদের নওয়াজ।

বিজ্ঞান-জগৎ

দ্বার-পথের রন্ধু

কে আসিয়া ঘারে কখন কখন কথিত করিল—হয় তো তার সঙ্গে দেখা করিতে চাহি না! অথচ কখন কখন ঘার খুলিলেই সে আসিয়া উদয় হইবে, চক্ষুস্বয়ং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাকে ঘরে বসাইতে হইবে—এমন দুঃসহ ব্যাপার কার জীবনে না ঘটে? এ দুঃসহ



আগে দেখুন, কে আসিয়াছে!

বিপত্তি-নাশের উপায় মিলিয়াছে। একটি বিশেষ রন্ধু-যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। বাড়ীর ঘারে যেমন দ্বার ঘটা বা door-bell রাখা হয়, তেমনি ভাবে ঘারে এ রন্ধু-যন্ত্র সংলগ্ন করা যায়। এ দ্বার-রন্ধু-যন্ত্রযোগে ভিতর হইতে দেখিয়া লইবেন, ঘারে কে আসিয়াছে এবং সে লোকটি কাম্য জন, না, বর্জনীয়? দেখিয়া নিশ্চয়ই যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

চকিত-চিত্র

আমেরিকার এক স্পোর্টস-প্রতিযোগিতায় মাসাচুসেট্‌সের টেকনলজি ইনষ্টিটিউটের প্রোফেসর হ্যারল্ড এজার্টন সাঁতার-প্রতিযোগিনীদের



জলে ঝাঁপ

সাঁতার-উত্তোগের ছবি তুলিয়াছেন। এক সেকেন্ডের লক্ষতম-অংশ মাত্র সময়ের এক্সপোজারে তিনি যে-ছবি তুলিয়াছেন, তার প্রতিলিপি দেখুন।

ফিতা কাটুন! টাই কাটুন!

মেয়েদের মাথার ফিতা, বাবুদের গলার টাই, মোজা, ক্রমাল প্রভৃতি কাচিবার এক সহজ উপায়ের কথা বলিতেছি। খুব-চওড়া একটি বড় বোতলের মধ্যে সাবান-জল বা অল্পরূপ পরিষ্কার করার উপযোগী দ্রাবক ভরিয়া সেই বোতলের মধ্যে ফিতা, টাই, ক্রমাল, মোজা প্রভৃতি পুরিয়া দিন; দিয়া বোতলটি বন্ধ করুন। বন্ধ করিয়া সবলে বোতলটিকে নানা ভাবে ঝাঁকানি

দিন; তার পর টাই প্রভৃতি বাহির করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া শুকাইবার জন্য বাতাসে মেলিয়া দিন। অল্প-পরিশ্রমে ফিতা, টাই

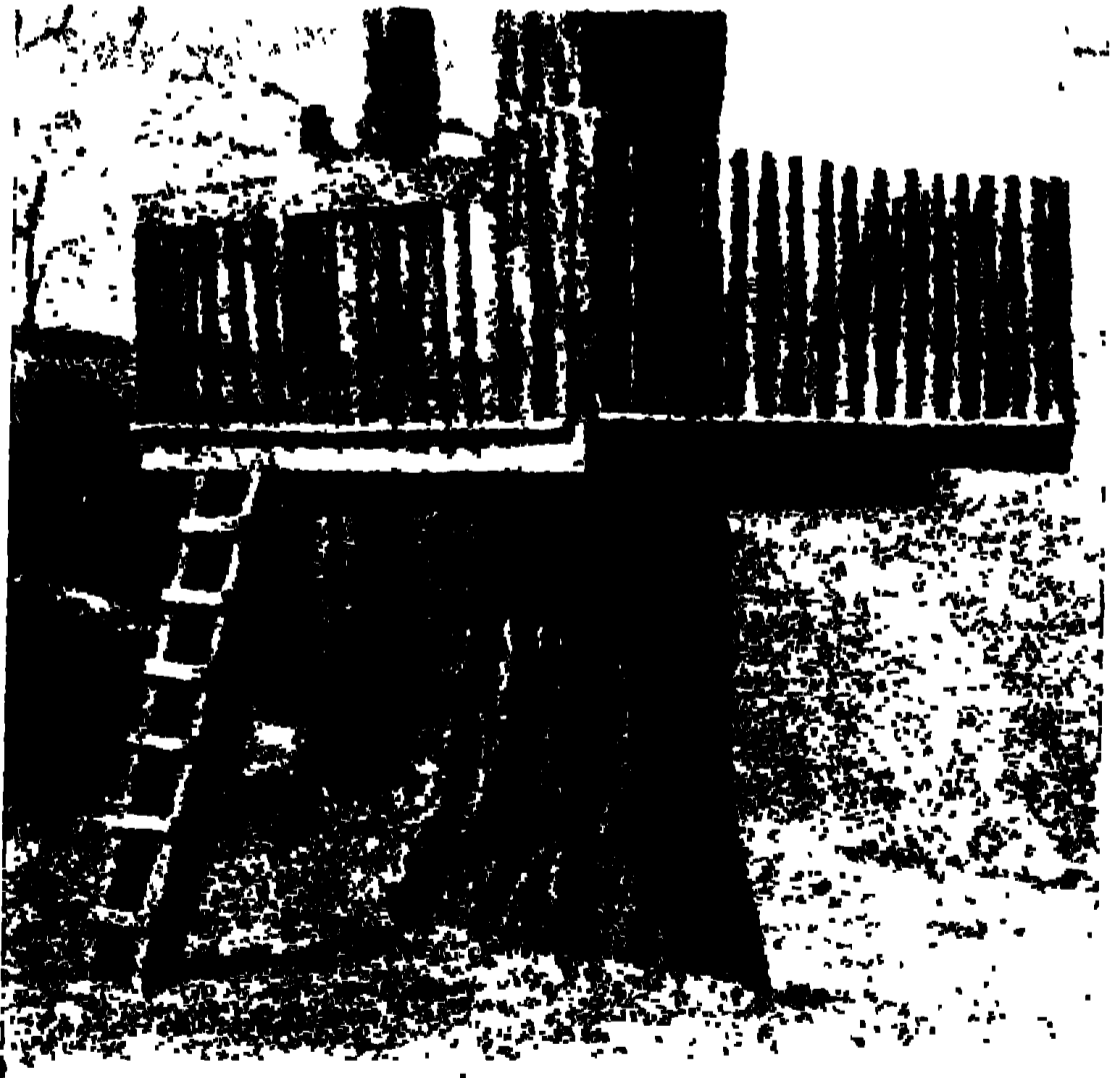


টাই ফিতা কাটা

মোজা, কমাল কাটা হইবে; আছাড দিবার প্রয়োজন হইবে না। শুকাইয়া গেলে স্রবৎ নরম-আচে ইষ্টী করিয়া লইলেই খাশা হইবে।

গাছের আসর

যে-গাছের কাণ্ডের দিকে পত্র-পল্লবের জঞ্জাল নাই, সে-গাছের কাণ্ড চিরিয়া কেমন আসর রচনা করা হইয়াছে, নীচের ছবিতে



গাছের আসর

দেখুন। তক্তার প্রাট্‌কর্ম, চারিধারে মজবুত রেলিং এক উঠিবার জন্য কাঠের সিঁড়ি—খোলা বাতাসে এ আসর সব দিক দিয়া জমিবে ভালো!

পুঁতির উপর সোনালি পালিশ

নীচে এই যে রূপসীর ছবি দেখিতেছেন, রূপসীর কণ্ঠে ঐ যে কণ্ঠমাল্য—ও-কণ্ঠমাল্য পুঁতির তৈয়ারী। পুঁতিতে সোনালি পালিশ-করা। গলায় দিলে মনে হইবে, সোনার দড়ি-হার গলায়



দড়া-হার.

দিয়াছেন! রাসায়নিক বিশেষ দ্রাবক-সাহায্যে পুঁতি, বিম্বুক, কাচ, মায় কাঠের মালাকেও এমনি সোনালি বর্ণে রঞ্জিত করা যায়। এ সোনালি ছোপ ঘামে-জলে মুছিবে না।

ফাউন্টেন-পেন্

হংসপুচ্ছের পেন্ বা নিব্-ওয়াল ষ্টীল-পেনের রেওয়াজ এ যুগে



পেন্ সাফ করা

পেন ভিজাইয়া সাফ করিতে হইবে। এ কম্পাউণ্ডে মাসে দু'বার পেন পরিষ্কার করিয়া লইলে একটি ফাউন্টেন-পেন লইয়া জিশ-চলিশ

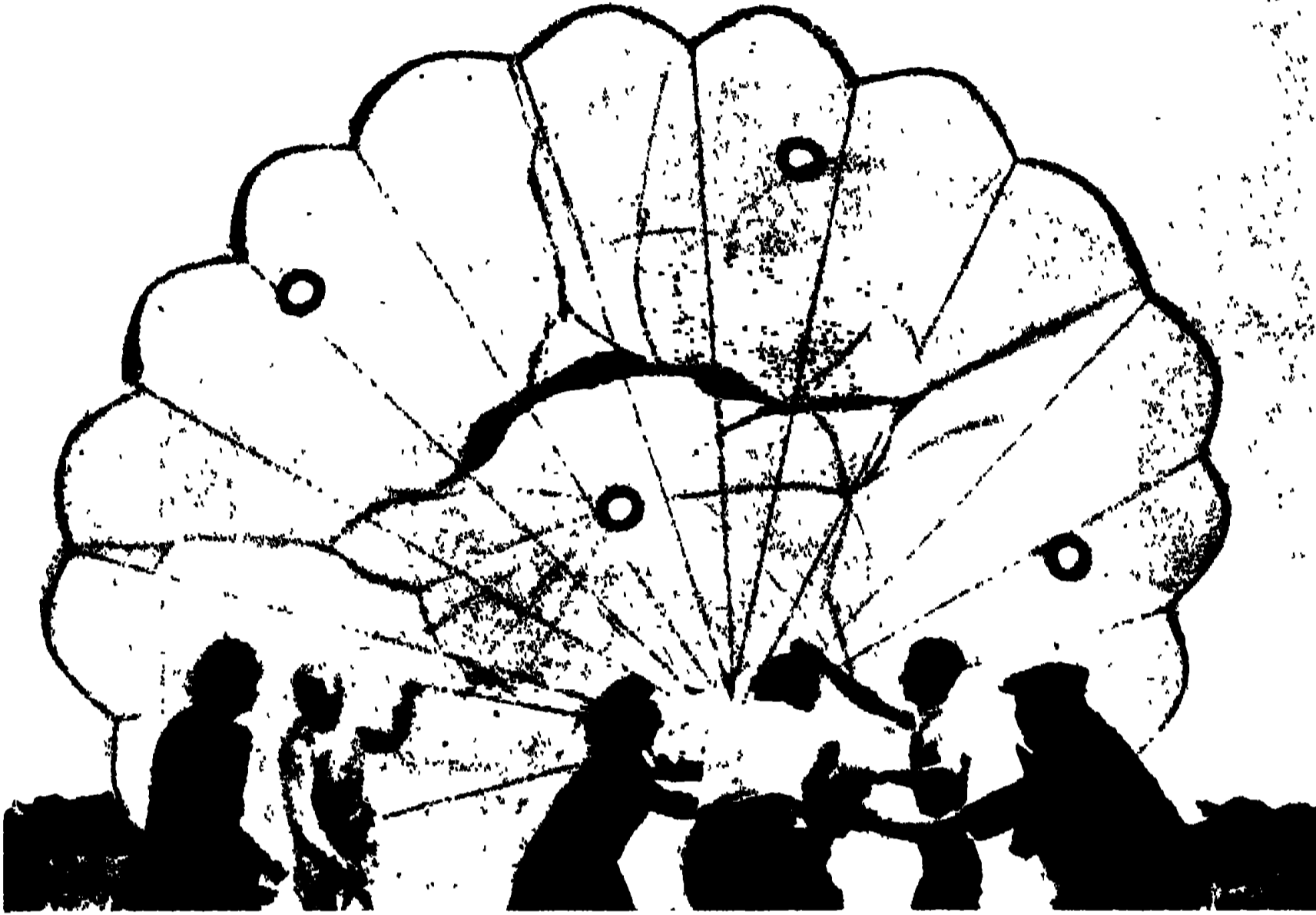
আর দেখা যায় না। সকলেই এখন ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করিতেছেন। ব্যবহার করিলেও এ-পেনের যত জাণি না বলিয়া পেন বড় শীঘ্র ধারাপ হয়। ফাউন্টেন-পেনের বিভিন্ন অংশ মায় কালির রবার-খলিটি পর্যন্ত মাসে দু'বার সাফ করিয়া লওয়া উচিত। শুধু-জলে সাফ করিলে চলিবে না। সম্ভ্রতি এক-রকম রাসায়নিক কম্পাউণ্ড বাহির হইয়াছে; ঐ-বহু-জলে সেই কম্পাউণ্ড মিশাইয়া যে-দ্রাবক তৈয়ারী হইবে, সেই দ্রাবকে ফাউন্টেন-

বৎসব অনায়াসে কাটাইতে পারিবেন। এ ড্রাবক-কম্পাউণ্ড এ দেশে এখনো বোধ হয় আসে নাই।

ওড়া-পথে ধাত্রী

এ-যুদ্ধে কোথায় কি বিপত্তি ঘটবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। কোথায় কে চোট খাইয়া কোন দুর্গম গিরি বনে

করিয়া তোলা হইয়াছে। প্যারাসুট ধরিয়া শূন্যপথে কাঁপ দিবার পূর্বে এ কাজে কতখানি পটুতা লাভ হইল, শিক্ষা-মন্দিরে তার বিশেষ পরীক্ষা লওয়া হয়। এই সঙ্গে তিনখানি ছবি দেওয়া হইল। একখানি ছবিতে দেখিবেন, প্যারাসুট-যোগে নার্শ ভূমিতে নামিয়া কি করিয়া নিজেকে মুক্ত করিবেন, তাহা দেখানো হইতেছে; অপর দু'খানি ছবিতে দেখিবেন নার্শ যন্ত্র-ওষুধাদি-সমেত ওঠা-নামা অভ্যাস করিতেছেন।



প্যারাসুট ছাড়িয়া মাটাতে নামা



ওষুধাদি-সমেত

কণ্ঠ-সাধনা

কণ্ঠ সাধনা করিতে হইলে ফুশফুশকে শব্দ-সমর্থ করিতে হয়



প্যারাসুট-শিক্ষা

পড়িয়া রহিল, তার সেবা পরিচর্যা কি করিয়া হয়? একজন বিমানপোতের প্যারাসুট-সাহায্যে সর্বত্র যাহাতে নামিতে পারেন, তাই নার্শদিগকে প্যারাসুট-অবরোধ-বিভাগে সর্বমত পটু



বেলুনে গলা-সাধা

ফুশফুশ শক্ত-সমর্থ হইলে গান গাতিবার সময় দম বন্ধ হইবে না, ঠাং ধরিবে না ; যেমন খুশী কণ্ঠকে উচ্চ গ্রামে চড়াইতে ও নিম্ন গ্রামে নামাইতে পারিবেন। ফুশফুশের এই ব্যায়াম-সাধনের জন্ত নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী হিল্ডা বার্ক কি কবেন, জানেন ? চারটি, ছ'টি, আটটি খেলার-বেলুন ফুংকারে কাঁপাইয়া খাস-সাধনা করেন। এ ব্যায়ামে ফুশফুশ শুধু শক্ত সমর্থ হয় না—কণ্ঠের মিষ্ট এবং সমৃদ্ধ হয়। এ ব্যায়ামে তিনি প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছেন।

স্বাস্থ্য-মুখোশ

খনিতে, কল-কারখানায় বা পাটের গুদামে যাদের কাজ করিতে হয়, কাজ করিবার সময় নিশ্বাসের সঙ্গে নাসা-পথ দিয়া তাঁদের দেহমধ্যে



স্বাস্থ্য-মুখোশ

ধূলা, পাটের আঁশ প্রভৃতি প্রবেশ করে। ইহার ফলে হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের উৎপত্তি ঘটে। বাতাসে বহু রোগের বীজাণু উড়িতেছে। নানা ভাবে এ সব বীজাণু আমাদের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহকে অসুস্থ, বিকল ও বিনষ্ট করিয়া দেয়। ইহার প্রতিকার-কল্পে মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা এক-রকম প্রতিরোধ-মুখোশ তৈয়ারী করিয়াছেন। এ মুখোশ মুখে আঁটিয়া কাজ করিতে

কোনোরূপ অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হয় না; অথচ ধূলা, আবর্জনা ও রোগ-বীজাণুর হাত হইতে পরিষ্কার লাভ করিয়া দেহ স্বচ্ছটিকে সর্বতোভাবে সুস্থ রাখা যাইবে।

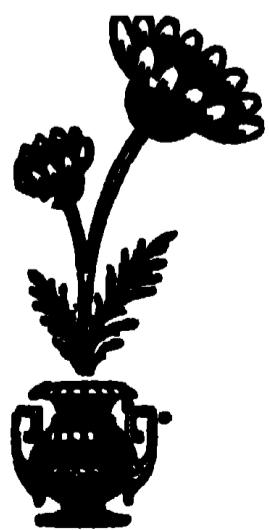
লোহার ফুশফুশ-যন্ত্র

ইনফ্যানটাইল পক্ষাঘাত (paralysis) রোগের জন্ত অনেকে আজীবন খাস কষ্ট ভোগ করেন। সে-কষ্ট এমন যে, থাকিয়া থাকিয়া শ্রাণ-সংশয় ঘটে। সম্প্রতি লৌহ-নির্মিত হালকা এক-রকম ফুশফুশ-যন্ত্র



লোহার খাস-যন্ত্র

(iron-lung) তৈয়ারী হইয়াছে। যন্ত্রটি দেখিতে ফায়ার ব্রিগে-ডিয়ানের বর্ণাবরণের মতো। কোমরে ও বগলের কাছে রবারের ব্যাণ্ড দিয়া এ বর্ণ গেলির মতো গায়ে আঁটিলে খাস-গ্রহণে এতটুকু কষ্ট হয় না; স্বচ্ছন্দভাবে খাস গ্রহণ করা চলে।





ষোড়শ পর্ব

হানা ফার্নস বন্দিনী

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

সেই নির্কাসিত জার্মান নাবিকটার ৩বিম্যতের জন্ত আমার বা মেরীর আর কোন উৎকর্ষা রছিল না; কারণ কাপ্তেন ভন রথভেন তাহাকে রুইস দ্বীপ হইতে 'ইউ'-বোটে তুলিয়া-লইয়া স্বদেশে গিয়াছিল, এ বিষয়ে আমাদের অসু-মাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার পর হানা ফার্নস হঠাৎ আমাদের দ্বীপে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিবে—এ আশঙ্কাও আমাদের মনে স্থান পাইল না। কারণ কয়েক দিন পূর্বে যে ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্ঘ্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন পর্যন্ত তাহার নিবৃত্তির কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইল না। আমরা জানিতাম, ঝড়-বৃষ্টির বিরাম না হইলে হানা ফার্নস বড়-দেশ ত্যাগ করিতে সাহস করিবে না; সুতরাং তাহার সম্বন্ধেও আপাততঃ আমরা নিশ্চিত।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল, এবং আকাশ পরিষ্কার হইল। তখন এক দিন আমরা আমাদের সঙ্গে লইয়া তাহার নৌকায় রুইস দ্বীপে যাত্রা করিল। যে জার্মান নাবিকটাকে সেখানে সে নির্কাসিত করিয়াছিল—তাহার ভাগ্যে কি ঘটয়াছিল, তাহা জানিবার জন্ত আমরা যে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা তাহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

যথাসময়ে রুইস দ্বীপের পার্শ্ব-তটে আমাদের বোট ভিড়িলে আমরা আমাদের তাহার বোটে বসাইয়া-রাখিয়া দ্বীপে নামিয়া গেল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা পরেই সে হতাশ ভাবে তাহার বোটের নিকট ফিরিয়া আসিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম;

দেখিলাম, তাহার মুখ অত্যন্ত মলিন, এবং তাহার ভাল চক্ষুটিতে দারুণ উৎকর্ষা প্রতিফলিত।

আমসু তাহার নৌকায় উঠিয়া-বসিয়া ভগ্নস্বরে আমাকে বলিল, “সেই জার্মানটাকে ত দ্বীপের কোনও অংশে দেখিতে পাইলাম না। সে অদৃশ্য হইয়াছে! ক্ষুধাতৃষ্ণায় যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে তাহার মৃতদেহ ত পড়িয়া থাকিত; কিন্তু তাহার মৃতদেহেরও সন্ধান পাইলাম না! কোথায় গেল সে? অদ্ভুত কাণ্ড!”—তাহার কণ্ঠস্বর উৎকর্ষায় ব্যাকুল।

আমি তাহার কথা শুনিয়া গভীর বিষ্ময়ভরে বলিলাম, “দ্বীপ হইতে সে অদৃশ্য হইয়াছে? তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলে না?—আশ্চর্য্য বটে!”—সৌভাগ্যক্রমে আমি আমার মনোভাব গোপন করিতে পারিলাম। প্রকৃত রহস্য যে আমার অজ্ঞাত নহে, আমার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমসু তাহা বুঝিতে পারিল না।

যাহা হউক, এই ব্যাপারে সে যে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল, তাহার আচরণেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। সেই দিন রাত্ৰিকালে সে তাহার পাকশালায় দীর্ঘকাল অধীর ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিলাম; যেন কোনও দিকে সে চিন্তা-সমুদ্রের কুল দেখিতে পাইতেছিল না!

আমসু দীর্ঘকাল নির্কাক থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, “তুমি আর ওখানে অলস ভাবে বসিয়া থাকিও না, ওঠ; উঠিয়া এখনই সাগর-কূলে যাও। আজ আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, সমুদ্র স্থির; আমার মনে হইতেছে, ক্রান্তীয়মান আজই তাহার 'ইউ'-বোটে এখানে আসিয়া পৌঁছাবে। গত দুই দিন হইতে তাহার এখানে আসিবার কথা, তাহার না আসিবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না; সে

নিয়ম-বাধিয়া কাষ করে, কিন্তু এবার তাহার কি হইল— তাহা অনুমান করা কঠিন; যদি তাহার ‘ইউ’-বোট না ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে এই রাত্রেই সে এখানে আসিয়া পড়িবে।”

আমি জাশ্মাণ কাপ্তেন রুষ্টারম্যানকে ভালই জানিতাম। সে প্রকাণ্ড জোয়ান নাজী, অত্যন্ত রুক্ষভাষী, এবং কঠোর-প্রকৃতি। আমি জানিতাম, যদি সে তাহার ‘ইউ’-বোটে আসিয়া পড়ে, এবং সমুদ্র-বেলা হইতে আমাদের সাড়া পাইতে একটু বিলম্ব হয়, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া সে হান্নামা বাধাইতে পারে! এই জন্ত আমি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি গরম-পোষাকে সজ্জিত হইলাম, এবং দ্বারের পশ্চাদ্ধর্তী ‘ছক’ হইতে লঠনটা নামাইয়া-লইয়া গৃহত্যাগের জন্ত প্রস্তুত হইলাম। আমাকে গমনোত্তম দেখিয়া মেরীও গরম-কোটটা পরিয়া-লইয়া আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

আমরা উভয়ে সমুদ্র-বেলায় উপস্থিত হইয়া একটা উচ্চ টিবির উপর পাশাপাশি বসিয়া পড়িলাম।

আমরা কিছু কাল সেখানে বসিয়া রহিলাম। মেরী নির্বাক ভাবে চারি দিকে চাহিতেছিল। সে হঠাৎ আমার হাতখানা টানিয়া-লইয়া তাহা সজোরে টিপিয়া ধরিল; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, “ঐ দিকে চাহিয়া দেখ, পিটার!”

মেরী নির্নিমেষ নেত্রে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিল। তাহার নির্দেশ অনুসারে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল! কারণ, আমি পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে সমুদ্রবক্ষস্থ একখানি বৃহৎ ডিক্কী স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইলাম। তাহার মাস্তুলে বৃহৎ পাল প্রসারিত; পাল ফুলাইয়া ডিক্কীখানা কুলের দিকেই আসিতেছিল।

মেরী রুদ্ধশ্বাসে বলিল, “হানা ফার্গসের ডিক্কী! হানা আসিতেছে পিটার!”

মেরীর অনুমান সত্য। সেই ডিক্কীতে হানা ফার্গস্ আমাদের দ্বীপে আসিতেছিল।

আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম, সেই স্থানটিতে পাহাড়ের ছায়া পড়ায় আমাদের দেহ সেই ছায়ায় ঢাকা ছিল; সুতরাং আমরা হানা ফার্গসের

অদৃশ্য থাকিয়া দেখিতে পাইলাম—সে সমুদ্র-কূলে ডিক্কী ভিড়াইয়া পাল নামাইয়া ফেলিল; তাহার পর ডিক্কীর নঙ্গরটি দুই হাতে ধরিয়া সমুদ্রকূলস্থ বালুকা-স্তূপের উপর দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইল। তাহার দেহ ম্যাকিন্টোসে আবৃত, এবং চন্দ্রালোকে তাহার আকৃতি অতি ভীষণ দেখাইতেছিল। সে মাথা তুলিয়া দৃঢ়পদে চলিতেছিল। তাহার মুখ গম্ভীর, এবং চক্ষুতে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। তাহার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। আমি মৃদু স্বরে মেরীকে বলিলাম, “এখন আমাদের কর্তব্য কি?”

মেরী বলিল, “এখন আমি কি করিব, তাহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছি, পিটার!”

মেরী আমার হাত ছাড়িয়া-দিয়া সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল, এবং হানা সাগর-বেলায় বালুকারাশির উপর যে স্থানে তাহার নৌকার নঙ্গর প্রোথিত করিতেছিল—সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

মেরীকে একাকিনী সেই দুর্দান্ত-প্রকৃতি নারীর নিকট যাইতে দেখিয়া আমার একটু হুশ্চিন্তা হইল; তাহাকে ঐ ভাবে যাইতে দেওয়া সঙ্গত নহে ভাবিয়া, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিলাম।

আমি কিছু দূরে থাকিতেই মেরীর গম্ভীর স্বর শুনিতে পাইলাম। সে হানার সম্মুখীন হইয়া উত্তেজিত স্বরে তাহাকে বলিল, “এখানে তুমি কি চাও?”

মেরীর কথা শুনিয়া হানা ফার্গস্ তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রালোকে দেখিলাম—তাহার মুখকান্তি অতি ভীষণ হইয়াছে।

হানা মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বিজ্রপভরে বলিল, “কে ও, রূপসী ছুকরী! তুমি আসিয়াছ? সারা অন্ধ রূপ যে উছলিয়া পড়িতেছে!”

মেরী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, “তুমি কি চাও? কি মতলবে এখানে আসিয়াছ?”

হানা ফার্গস্ গুঞ্চ হাসিয়া নীরস স্বরে বলিল, “এখানে গোপনে কি কাণ্ড চলিতেছে, তাহাই আবিষ্কার করিতে আসিয়াছি। আমি আরও জানিতে চাই—আমার ভাই কোথায়? তাহার সন্ধান না পাই, তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইব—এ আশা আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই।”

হানার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—সে বিশেষ-কিছু না জানিলেও কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া ঐ সকল কথা বলিল; কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মেরী নিস্তরু ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেরীকে নির্বাক দেখিয়া হানা মৃদু হাসিয়া নীরস স্বরে পুনর্বার বলিল, “আমার কথা শুনিয়া তোমার যে কণ্ঠরোধ হইল সুন্দরী! দেখ, তুমি আমাকে যেরূপ নির্বোধ বলিয়া ঠাছর করিয়াছ—আমি সত্যই সেরূপ নির্বোধ নহি। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি—এই ‘ব্ল্যাক গল ফার্শ্ব’ কি একটা রহস্যপূর্ণ খেলা চলিতেছে! সেই রহস্যটা কি, তাহার আগাগোড়া আমি আবিষ্কার করিব। বুঝিয়াছ? সকল বিষয়ই আমাকে জানিতে হইবে। আমাকে প্রতারণিত করিবে—সে সাধ্য তোমাদের নাই সুন্দরী!”

তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া উঠিল; এবং তাহার কণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেক শব্দে নিদারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞা পরিস্ফুট হইল। সে আরও যে সকল কথা বলিল, তাহা অশ্রীয়ালা গালাগালিতে পূর্ণ।

কিন্তু মেরী তাহার কোন কথার প্রতিবাদ করিল না, তাহার সহিত তর্ক করিতে মেরীর ঘৃণা হইল; হানার মুখের দিকে আর না চাহিয়া নিস্তরু ভাবে সে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ গভীর, প্রদীপ্ত নেত্রে ঘৃণা প্রতিফলিত।

অবশেষে সে বিচলিত স্বরে আমাকে বলিল, “পিটার!”—সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল।

আমি তাহার অঙ্গুলি-নির্দেশ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চাহিলাম। যে দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল—তাহা দেখিয়া আমার যেন শ্বাসরোধ হইল! আমি সেই দিকে চাহিয়া চন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত সমুদ্র-বক্ষে একটি আলোক দেখিতে পাইলাম; সেই আলোক অতি তীব্র, সুলোহিত। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শুভ্র চন্দ্রালোকে একখানি ‘ইউ’-বোটের বিভিন্ন অংশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। সেই সুলোহিত আলোকশিখাটি ‘ইউ’-বোটেরই আলোক।

বুঝিতে পারিলাম,—উহা ‘ইউ’-বোটেরই সাক্ষেতিক আলোক!

মেরী আমাকে বলিল, “উহাকে লণ্ঠনের সাক্ষেতিক

আলোক দেখাও পিটার! ‘ইউ’-বোটের কাণ্ডেন আমাদের সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছে।”

এ অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি, মেরীর তাহা সুবিদিত; কিন্তু মেরীর কথা শুনিয়া আমি অস্ফুট স্বরে বলিলাম, “তুমি ত আমাকে লণ্ঠন তুলিয়া সাক্ষেতিক আলোক দেখাইতে বলিতেছ, মেরী! কিন্তু হানা ফার্মস্ ঐখানে দাঁড়াইয়া আছে। সে এখানে উপস্থিত থাকিতে ‘ইউ’-বোটের নাবিকগণকে এখানে আসিতে ইঙ্গিত করা পাগলামি ভিন্ন আর কি?”

মেরী এ-কথা শুনিয়াও দৃঢ় স্বরে পুনর্বার বলিল, “উহাকে সাক্ষেতিক আলোক দেখাও পিটার!”

এ কথার পর আমি আর তাহার প্রতিবাদ না করিয়া বালুকারাশির উপর বসিয়া-পড়িয়া হঠাৎকেন লণ্ঠনের বাতি জ্বলাইয়া লইলাম, এবং লণ্ঠনটা হাতে লইয়া উচু করিয়া তুলিয়া ধরলাম; পরে যথানিয়মে তাহা কয়েকবার আন্দোলিত করিলাম। তাহার পর আমি সরিয়া গিয়া মেরীর পাশে দাঁড়াইলাম। মেরী তখন হানা ফার্মসের সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। হানা ফার্মস্ আমাদের সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। সে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া নিস্তরু ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহার বিক্ষারিত চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমুদ্র-বক্ষস্থিত ‘ইউ’-বোটের দিকে প্রসারিত।

আমি ‘ইউ’-বোটের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কক্ষবর্ণ মসীবিন্দুর গ্রায় কি পদার্থ ‘ইউ’-বোটের পাশ হইতে সাগর-বেলার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; কয়েক মিনিট পরে বুঝিতে পারিলাম, উহা ‘ইউ’-বোটের একখানি ডিক্সী। তাহা রূপ-রূপ শব্দে দাঁড় ফেলিয়া ক্রমশঃ সমুদ্র-তটের অভিমুখে আসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া হানা ফার্মস্ বুঝিতে পারিল, উহা সাগর-বেলার কোন্ স্থানে ভিড়িবে। তদনুসারে হানা সরিয়া-গিয়া সেই স্থানটিতে উপস্থিত হইল, এবং ডিক্সীখানির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার ভাব-ভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ লক্ষিত হইল না।

ডিক্সীখানি কয়েক মিনিট পরে তীরে ভিড়িলে দুই জন নাবিক ডিক্সী হইতে তীরে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার মাথা ধরিয়া রহিল। তখন লেদার-জ্যাকেটপরিহিত কাণ্ডেন রুষ্ঠারম্যান ডিক্সী হইতে সমুদ্রকূলে অবতরণ করিল।

কাপ্তেনকে ডিঙ্গী হইতে নামিতে দেখিয়া অদূরবর্তিনী হানা গভীর বিষয়ে উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, “কি আশ্চর্য্য! ইহারা যে জার্মান!”

দীর্ঘদেহ গম্ভীর-প্রকৃতি কাপ্তেন রুষ্ঠারম্যান হানার মস্তব্য শুনিতে পাইল। সে পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হানার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর মেরীর ও আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীরস স্বরে বলিল, “এই স্ত্রীলোকটা কে?”

কিন্তু মেরী বা আমি কাপ্তেনের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্বেই হানা ফার্গস্ তীর দৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “তোমরা এই খেলা খেলিতেছ? এই খেলা কত দিন হইতে চলিতেছে? তা বেশ, উপকূলের ব্রিটিশ প্রহরীগণের এ সকল কথা জানিতে বিলম্ব হইবে না।”—তাহার চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

কথা কয়টি বলিয়া হানা সেখানে আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়াইল না; সে আমাকে তাহার সম্মুখস্থ পথ হইতে অপসারিত করিবার জন্ত আমার কাঁধে সজোরে এক ধাক্কা দিল। সেই ধাক্কায় আমি পড়িতে পড়িতে কোন-রকমে সামলাইয়া লইলাম; কিন্তু সে আমার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিল না। সে তাহার নৌকা লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।—সে তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া নৌকা ভাসাইয়া দিবে—ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম।

হানাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেরী ব্যাকুল ভাবে কাপ্তেন রুষ্ঠারম্যানের হাত ধরিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “শীঘ্র উহাকে ধরুন, কাপ্তেন, পলাইতে দিবেন না। এই স্ত্রীলোকটা বাঘিনীর মত ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক; ও বড়-দেশ হইতে আসিয়াছে, ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর। ও কি বলিয়া গেল, তাহা শুনিয়াছেন ত?”

মেরীর কথা শুনিবার পূর্বেই কাপ্তেন রুষ্ঠারম্যান হানার মতলব বুঝিতে পারিয়াছিল; সুতরাং তাহাকে মেরীর অনুরোধের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল না। সে তাহার অনুরোধকে লক্ষ্য করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, “ঐ স্ত্রীলোকটাকে শীঘ্র পাক্‌ডাও। উহাকে ধরিয়া আমরা কাছে হাজির কর।”

তাহার আদেশ শুনিয়া বিশালকায় বলবান নাজী নাবিকদ্বয় হানা ফার্গস্কে ধরিবার জন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। হানা তাহার বোটের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই নাবিকদ্বয়ের হাতে পড়িল। সে তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্ত ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। তাহার আর্তনাদে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। দুই জন বলবান নাজী নাবিকের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিষ্ফল লাভ করা তাহার অসাধ্য হইল। তাহারা তাহাকে টানিতে টানিতে কাপ্তেনের নিকট লইয়া আসিল। হানা পরিশ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল; কিন্তু মুক্তিলাভের চেষ্টায় বিরত হইল না।

কাপ্তেন রুষ্ঠারম্যান মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এখন ইহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিব?”

মেরী বিচলিত স্বরে বলিল, “আপাততঃ উহাকে আমাদের পাকশালায় লইয়া যাওয়াই কর্তব্য।”

কাপ্তেন বলিল, “বেশ তাহাই হউক; পরে যাহা সম্ভব মনে হইবে—সেইরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।”

সপ্তদশ পর্ব

আমস্ ক্রোবির লাঞ্ছনা

হানা ফার্গস্ আমসের পাকশালায় নীত হইল। আমি মেরীকে সঙ্গে লইয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিয়া-ছিলাম। আমসের পাকশালায় প্রবেশ করিয়া হানা আর বিদ্মুত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, বা একটিও কথা বলিল না। তাহাকে গম্ভীর ভাবে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া আমার মনে হইল, ভাগ্যে যাহা আছে ঘটবে তাবিয়া সে চিন্তা ত্যাগ করিয়াছে; কারণ, তাহার নিষ্ফল-লাভের সকল পথ রুদ্ধ। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, সে যে বন্দিনী, এ কথা যেন সে ভুলিয়া গিয়াছিল!

আমরা পাকশালায় প্রবেশ করিয়া আমস্ ক্রোবিকে টেবলের নিকট দণ্ডায়মান দেখিলাম। সে আতঙ্কভিত্ত হইয়া প্রথমে হানার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর জার্মানগুলিকে তাহার পাহারায় নিযুক্ত দেখিয়া তাহার মুখ মৃতের মুখের স্থায় বিবর্ণ হইল। তাহার সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার

মনে হইল, মামুদের তেমন হতাশ ভাব—তেমন কাতর মুখছবি আমি জীবনে আর কখন দেখি নাই! একটি কথা মাত্র তাহার মুখ হইতে নিঃসারিত হইল। সে ভয় স্বরে বলিল, “আর আমার রক্ষা নাই; ইংরেজরা এবার আমাকে গুলী করিয়া মারিবে।”

তাহার কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

কাপ্তেন ক্লষ্টারম্যান আমসের মস্তব্য শুনিয়া তাহাকে বলিল, “আমারও সেইরূপই মনে হইতেছে। আমরা এই জ্বীলোকটিকে সমুদ্রতটে দেখিতে পাওয়ায় ধরিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছি। সে কিরূপে সেখানে আসিয়াছিল, কেনই বা আসিয়াছিল, তাহা তোমার মেয়ের জানা থাকিতে পারে; মেরীকে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সকল কথা বোধ হয় জানিতে পারা যাইবে।”

আমস্ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে চাহিলে মেরী হানার আবির্ভাব-সংক্রান্ত সকল কথাই প্রকাশ করিল। হানার সহিত তাহার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহার কিছুই গোপন করিল না।

আমস্ অধীর ভাবে মেরীর কথা শুনিয়া হানার মুখের দিকে চাহিল; তাহার ভাল চকুটি হইতে যেন অগ্নি-ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতে লাগিল! সে হানাকে লক্ষ্য করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, “তুমি এই ভাবে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছিলে! তোমার ভাই সন্দেহে সকল বিষয়ের সন্ধান লইয়াও তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার নাই। তোমার দুর্ভাগ্য যে, এই শেষ বার এখানে আসিয়া তুমি ধরা পড়িয়া গিয়াছ। তুমি দেশে ফিরিয়া যাইবে—এ আশা ত্যাগ কর।”

হানা ফার্মস্ আমসের কথা শুনিয়া মুহূর্তকাল নীরব রহিল; তাহার পর তাহার মুখ হইতে যেন ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল! সে তীব্র স্বরে বলিল, “ওরে স্বদেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক নরপশু! এইবার আমি জানিতে পারিয়াছি, আমার ভাইএর ভাগ্যে কি ঘটয়াছিল! সে তোর এখানে আসিলে—”

আমস্ হানার কথায় বাধা দিয়া, সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, “তুমি কচু জানিতে পারিয়াছ! আমি পূর্বেও তোমাকে বলিয়াছি—তোমার ভাই কোনও দিন এই দ্বীপে

আসে নাই। আমরা কোন দিন তাহাকে এখানে দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাহা বিশ্বাস না করিয়া তুমি এখানে গোপনে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছ! উত্তম; তোমার ভাগ্যে কি আছে—শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে। আমরা যাহাতে বিপন্ন না হই, সেজন্য তোমাকে লইয়া কি করা যাইবে, তাহা স্থির করিতে বিলম্ব হইবে না।”

তাহার পর সে কাপ্তেন ক্লষ্টারম্যানকে বলিল, “ইহাকে লইয়া কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাই; তুমি আমার সঙ্গে একবার বাহিরে যাইবে?”

তাহারা উভয়ে পাকশালার বাহিরে গিয়া পরামর্শে যাহা স্থির করিল, সে সকল কথা আমস্ আমার ও মেরীর নিকট পরে প্রকাশ করিয়াছিল। লেফটেন্যান্ট হ্যাগান কি অবস্থায় আলান ফার্মস্কে গুলী করিয়া মারিয়াছিল; ফার্মস্কে দেশে ফিরিতে না দেখিয়া তাহার ভগিনী হানা তাহার সন্ধানে পুনঃ পুনঃ আমাদের দ্বীপে আসিতে-ছিল বটে, কিন্তু এই শেষ বার আসিয়া সে জার্মান ‘ইউ’-বোট-সংক্রান্ত সকল গুপ্ত-রহস্য জানিতে পারিয়াছে। আমস্ কাপ্তেন ক্লষ্টারম্যানকে এই সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া, এ অবস্থায় কি কর্তব্য, তৎসম্বন্ধে তাহার উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

যাহা হউক, পরামর্শ শেষ হইলে উভয়ে পাকশালায় ফিরিয়া আসিল। আমি আমসের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখে ভীষণ প্রতিহিংসার সঙ্কল্প পরিস্ফুট দেখিলাম।

আমস্ হানা ফার্মসের মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “তোমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা আমরা স্থির করিয়াছি।—তোমাকে জার্মানীতে লইয়া গিয়া আটক রাখা হইবে; কিন্তু পলায়নের চেষ্টা করিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে—এ কথা তুমি ভুলিও না!”

আমসের কথা শুনিয়া হানা কোন কথা বলিল না; কিন্তু তাহার চকুতে ভীষণ হিংস্রতা প্রতিকলিত হইল। সে ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

আমস্ তাহাকে নির্বাক দেখিয়া বলিল, “হাঁ,

জার্মানিতেই তুমি প্রেরিত হইবে। এই জার্মান কাপ্তেনই তোমাকে তাঁহার বোটে তুলিয়া-লইয়া স্বদেশে যাইবেন। উনি এখানে উঁহার বোটের খোরাক লইতে আসিয়াছেন। তুমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়া কিছু কাল পূর্বে উঁহাকে উঁহার বোটের ডিকী হইতে সাগর-তটে নামিতে দেখিয়াছ, এবং উনি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন, কিছু কাল পরে তাহাও জানিতে পারিতে। এ অবস্থায় যদি তুমি ধরা না পড়িয়া নির্ঝিল্লি বড়-দেশে পলায়নের সুর্যোগ পাইতে, তাহা হইলে এখানকার সকল রহস্যই উপকূলস্থ বৃটিশ প্রহরীদের নিকট প্রকাশ করিতে; এবং আমি শুনিয়াছি, এ সকল কথা তুমি তাহাদের নিকট প্রকাশ করিবে—মেরীকে ইহাও বলিয়াছিলে। উপকূলের বৃটিশ প্রহরীরা ইহা জানিতে পারিলে আমাদের ঘরবাড়ী কর্তৃপক্ষের আদেশে তোপে উড়াইয়া দিবে, এবং স্বদেশ-দ্রোহী ও শত্রুপক্ষের সাহায্যকারী বলিয়া আমাদেরও গুলী করিয়া হত্যা করিবে। এইজন্যই তুমি যাহাতে আর বড়-দেশে ফিরিতে না পার—আমাদিগকে তাহারই উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। ইহার একমাত্র উপায় তোমাকে জার্মানিতে প্রেরণ করা। সেখানে কোন বন্দীশিবিরে তোমাকে আটক রাখা হইবে। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে আটক থাকিতে হইবে। জার্মান ‘গেষ্টাপো’ তোমার ভার গ্রহণ করিবে। তোমার অসংযত জিহ্বা দ্বারা আমরা বিপন্ন না হই, এজন্য তোমার সম্বন্ধে এইরূপই ব্যবস্থা করিতে হইল।”

হানা ফার্গস্ সক্রোধে বলিল, “ওরে নরপশু! যে ভাবে তুই আমার ভাইকে নির্ঝাক করিয়াছিস, সেই ভাবেই আমাকেও নির্ঝাক করিবার জন্য তুই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিস; কিন্তু আমি জানিতে চাই—সে কোথায়? তাহাকে হত্যা করিয়াছিস, না তাহাকেও এই ভাবে জার্মানিতে পাঠাইয়াছিস?”

আমস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, “উঁহার একটাও করা হয় নাই। সে কোন দিন আমাদের এই দ্বীপে আসে নাই, এ কথা আমি একাধিক বার বলিয়াছি। সেই একই কথা আর কত বার তোমাকে বলিতে হইবে?”

হানা ফার্গস্ গর্জন করিয়া বলিল, “তুমি তোমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হাজার ছ’হাজার বার ও-কথা আমাকে

বলিলেও আমি তাহা বিশ্বাস করিব না। তুমি তোমার নাজী বন্ধুদের সহযোগে তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছ—এবং তাহার মৃতদেহ সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—ইহাই সত্য কথা। এই অপরাধের জন্য তোমার ফাঁসি হইবে—ইহা তুমি জানিয়া রাখ। তুমি আশা করিও না—তোমার এই স্বদেশদ্রোহিতা, তোমার বিশ্বাসঘাতকতা আমি প্রকাশ করিতে না পারিলেও চিরদিন গোপন থাকিবে।”

হানার কথা শুনিয়া আমস্ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার সেই গুঞ্চ হাস্যে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল।

হাসি বন্ধ করিয়া আমস্ বলিল, “তুমি ভাবিতেছ—তুমি যেমন তোমার নিকৃদ্দিষ্ট ভাইয়ের সন্ধানে এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছ—সেইরূপ তোমার সন্ধানেও তোমার আত্মীয়-স্বজন বড়-দেশ হইতে এখানে আসিবে। কিন্তু তুমি স্থির জানিও, তাহারা এখানে আসিয়া কিছুই জানিতে পারিবে না। কারণ, কাপ্তেন ক্লষ্টারম্যান তোমাকে লইয়া জার্মানিতে যাত্রা করিবার সময় তোমার বোটখানিও সঙ্গে লইয়া বড়-দেশের কাছাকাছি গিয়া তাহা ছাড়িয়া দিবেন; তখন তাহা আরোহিহীন অবস্থায় সমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে। তোমার দেশের লোক তাহা দেখিয়া মনে করিবে—তুমি তোমার বোট হইতে কোন-রকমে সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়াছ। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা তাহারা কোন দিন জানিতে পারিবে না।”

অতঃপর আমস্ কাপ্তেন ক্লষ্টারম্যানকে বলিল, “তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমার বোটের খোরাক তাহাতে তুলিয়া দিয়া আসি।”

আমস্ কাপ্তেন-সহ হানাকে লইয়া সমুদ্রকূলে চলিয়া গেল, এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাপ্তেনের ‘ইউ’-বোট তাহার গন্তব্য-পথে যাত্রা করিল। হানা ফার্গস্ বন্দিনী হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল। হানা ‘ইউ’-বোটে উঠিয়া, মুক্তিলাভের জন্য আর কোন চেষ্টা করিল না; কারণ, সে বুঝিতে পারিয়াছিল—তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। তাহারা প্রস্থান করিলে আমস্ তাহার পাঁকশালায় প্রত্যাগমন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া

মনে হইল, হানাকে জার্মানীতে প্রেরণ করিয়া সে নিশ্চিত হইয়াছে। সে প্রকৃততা ও উৎসাহ গোপন করিতে পারিল না।

আমসু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উভয় হস্ত পরস্পর ঘর্ষণ করিতে করিতে উৎসাহভরে বলিল, “দজ্জাল মাগীর সম্বন্ধে ঠিক ব্যবস্থাই করা হইয়াছে; আর সে আমাদের বিরুদ্ধ করিতে পারিবে না; তাহার তয়ে আর আমাকে উৎকণ্ঠায় কাল কাটাইতে হইবে না।”

মেরী বলিল, “তাহা হইলেও তুমি অত নিশ্চিত হইও না বাবা!”

আমসু তাহার তামাকের কালো পাইপটা বাহির করিয়া তাহাতে তামাক ভরিতে ভরিতে বলিল, “নিশ্চিত হইব না—তার মানে? সে চলিয়া গিয়াছে—তবে আর কাহাকে ভয়? আমি যে জার্মান নাবিকটাকে নির্ধাসিত করিয়া আসিয়াছি—তাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহা যদি ঠিক জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার সকল দুশ্চিন্তার অবসান হইত: আমি সতাই সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও সুখী হইতে পারিতাম।”

সেই নির্ধাসিত জার্মান নাবিকের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল, আমসু তাহা জানিতে না পারায় তাহার যে দুশ্চিন্তা হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা হ্রাস হইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে সেই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা সে ভুলিয়া গেল। নিজের কার্য-নৈপুণ্যে তাহার যে বিশ্বাস ছিল—সেই বিশ্বাস অবশেষে ফিরিয়া আসিল।

হানা ফার্নস জার্মানীতে প্রেরিত হইবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে এক দিন রাত্রিকালে আমসের ‘ব্ল্যাক-গল ফার্মে’ এক জন জার্মান আসিয়া পড়িলেন। আমসু সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল—তিনি জার্মান নৌবিভাগের প্রধান কর্মচারীগণের অন্ততম। স্বদেশে তাঁহার পদ-গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অসাধারণ।

এই কর্মচারী যখন আমাদের দ্বীপে অবতরণ করিলেন—সেই সময় আমি সাগর-বেলায় পাহারায় ছিলাম। তিনি আমার অদূরে ‘ইউ’-বোটের একখানা ডিকী ভিড়াইয়া তাহা হইতে নামিয়া আসিলেন। যে ‘ইউ’-বোটে তিনি আসিয়াছিলেন, তাহা আইরিস সাগর দিয়া উইলহেমসভনে প্রত্যাগমন করিতেছিল;

তাঁহাকে আমাদের দ্বীপে নামাইবার জন্তই সেখানে তাহা অল্প সময়ের জন্ত থামিয়াছিল।

লোকটিকে আমি পূর্বে কখন দেখি নাই। তাঁহার দেহ সুদীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ; আভিজাত্য-গৌরব তাঁহার চোখে-মুখে পরিস্ফুট। তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত তেজস্বী ও দান্তিক বলিয়াই আমার ধারণা হইল। দুই জন নাবিক তাঁহার ব্যবহার্য দ্রব্যপূর্ণ ব্যাগ লইয়া তাঁহার অমুসরণ করিল। তিনি ‘ইউ’-বোটের পরিচালক কাপ্তেন ভন স্কনারের সঙ্গে আমসের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

এই আগন্তুকটি কে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া এবং তাঁহার বাজাডম্বরে বিম্বিত হইয়া আমি একটু দূরে থাকিয়া সেই দলের অমুসরণ করিলাম। তাঁহারা সকলে আমসের পাকশালায় প্রবেশ করিলে আমি সকলের শেষে সেখানে উপস্থিত হইলাম।

মেরী সার্টির আস্তিন গুটাইয়া, টেবলের নিকট দাঁড়াইয়া আমাদের সান্ধ্য-ভোজনে ব্যবহৃত ডিস্গুলি ধুইতেছিল। আমসু অগ্নি-কুণ্ডের অদূরে তাহার চেয়ারে বসিয়া ধূমপানের আয়োজন করিতেছিল। সে কাপ্তেন ভন স্কনারকে দেখিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাপ্তেন স্কনার পাকশালায় প্রবেশ করিয়া গভীর স্বরে বলিল, “গুড ইভনিং, ফ্রোবি!”—তাহার পর তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “ইনি জার্মান নৌ-বিভাগের অন্ততম প্রধান কর্মচারী—লেফ্টেন্যান্ট কাউন্ট আগষ্ট জোলার্ন। ইনি এখানকার কাজ-কর্ম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখানকার কাজ শেষ করিয়া ইনি তিন দিন পরে জার্মানীতে ফিরিবেন, ইঁহাকে লইয়া-যাইবার জন্ত একখানি ‘ইউ’-বোট এখানে প্রেরিত হইবে।”

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া আমসু কাউন্টকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ললাট স্পর্শ করিল; এবং হাসিবার ভঙ্গিতে দাঁত বাহির করিয়া বলিল, “আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আনন্দিত হইলাম কাউন্ট! আপনি এখানকার কাজ-কর্ম পরিদর্শন করিয়া কোন কার্যের ক্রটি আবিষ্কার করিতে পারিবেন না—এ বিষয়ে আমি আপনাকে—”

আমসের কথা শেষ হইবার পূর্বেই কাউন্ট তাহাতে

বাধা দিয়া বলিলেন, “সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া আমি শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিব।”

কাউন্ট জোলার্ণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার মনে হইল, একরূপ দম্ভপূর্ণ নীরস কণ্ঠস্বর আর কখন আমার কর্ণগোচর হয় নাই!—তিনি তৎক্ষণাৎ কাপ্তেন স্কনারের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, “স্কনার, আমি আর অধিক কাল তোমাকে এখানে আটক করিয়া রাখিব না ; আশা করি, তুমি নিরাপদে দেশে পৌঁছিতে পারিবে।”

তন স্কনার বলিল, “ধন্যবাদ মহাশয় !”

অতঃপর সে নাজী-প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জার্মান নাবিকদ্বয়ের সহিত সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

কাপ্তেন স্কনার প্রস্থান করিলে আমরা তাহার চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া কাউন্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “তাহা হইলে আপনি এখানকার কাজ-কর্ম পরিদর্শন করিতেই আসিয়াছেন ?”—সে পকেট হইতে পাইপটা বাহির করিয়া, তাহাতেই দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া বলিল, “শুনলাম, আপনি জার্মানীর এক জন কাউন্ট। জার্মানীর কাউন্ট কিরূপ লোক, তাহা আমার ঠিক জানা নাই, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিব বলিয়া আশা হইতেছে। আর আমি যে কি রকম কাষের লোক, আশা করি, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া আপনিও তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনাকে প্রথমেই জানাইয়া রাখিতেছি—যে সকল কাঁকিদার, ফাজিল-চালাক লোক আপনি সর্বদাই আপনার চতুর্দিকে দেখিতে পান—যদি আপনি আমাকে সেই প্রকৃতির একটা অঙ্গর—”

কাউন্ট তাহার কথায় বাধা দিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, “থামো ; আগে ওঠো, শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়াও !”

কাউন্ট জোলার্ণের এই আদেশ যেন চাবুকের মত আমসের পিঠে পড়িল ! একরূপ উদ্ধত আদেশ আমস পূর্বে কোন দিন কাহারও মুখে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া-ছিল কি না সন্দেহের বিষয়। কিন্তু কাউন্টের এই কঠোর আদেশ শুনিয়া আমস একরূপ চমকাইয়া উঠিল যে, তাহার হাতের পাইপটা হঠাৎ সেই মুহূর্তে মাটিতে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল।

কিন্তু আমস কাউন্টের আদেশ পালন না করিয়া

বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল ; তাহার পর অক্ষুট স্বরে বলিল, “কি বলিলে ?”

কাউন্ট বলিলেন, “আমার আদেশ,—শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়াও !”

কাউন্টের স্নগম্ভীর দৃষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমস মুস্‌ড়িয়া গেল ; কিন্তু সে তাঁহার আদেশ অগ্রাহ করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর অক্ষুট স্বরে বলিল, “কেন ? আমার অপরাধটা কি ? ওঃ !”

কাউন্ট জোলার্ণ ক্রভঙ্গি করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, “তোমার বেয়াদপি আমি সহ্য করিব না। যতক্ষণ তুমি আমার সম্মুখে থাকিবে, ততক্ষণ তোমাকে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে ; আমার আদেশ না পাইলে তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার সম্মুখে বসিবে না।”

আমস বিস্ময়ে মুখবাদান করিয়া বলিল, “ক্রীতদাসের মত ?”

কাউন্ট জোলার্ণ তাহার প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, “তুমি ইহাও জানিয়া রাখ যে, যখন আমার সহিত তুমি কথা কহিবে, তখন আমার পদোচিত সম্মান বজায় রাখিয়া, তোমার যাহা বলিবার থাকে তাহা বলিবে। আমি যে কয় দিন এখানে থাকিব, সেই কয় দিন তোমার যেম স্বরণ থাকে, আমি জার্মান নৌ-বিভাগের এক জন সম্মান-ভাজন সম্ভ্রান্ত কর্মচারী ; তাঁহার প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা সাধারণের কর্তব্য, আমার প্রতি সেইরূপ সম্মান প্রদর্শনে তুমি কদাচ অবহেলা করিবে না।—আমার কথা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ ?”

আমস অক্ষুট স্বরে বলিল, “বুঝিলাম মহাশয় !”

কাউন্ট বলিলেন, “উত্তম। এখন আমার সঙ্গে চল—তোমার শূয়ারের খোঁয়াড়টা একবার দেখিয়া আসি।”

আমস বিস্মিত ভাবে বলিল, “শূয়ারের খোঁয়াড় ? সে আবার কি ?”

কাউন্ট বলিলেন, “তুমি যেখানে বাস কর, সেই স্থান-টাকেই শূয়ারের খোঁয়াড় বলিয়াছি। আমাকে কয়েক দিন এখানে থাকিতে হইবে ; একজন্ত আমাকে একটি ঘর বাছিয়া লইতে হইবে।”

আমস সদর্পে বলিল, “আমি যদি এখানে বাস করিতে

পারি, তাহা হইলে আপনারও বাসের অসুবিধা হইবে না। আমার বাড়ীতে এই ঘর ভিন্ন দোতালায় আরও দুইটি বাসের ঘর আছে। তাহাদের একটিতে আমি বাস করি, অল্প ঘরটি খালি পড়িয়া আছে। আপনাদেরই অল্প একখানা 'ইউ'-বোটের পরিচালক—লেফ্টেন্যান্ট ছাগেন্ আমায় কোন ইংরেজ অতিথিকে সেই কক্ষে গুলী করিয়া হত্যা করিবার পর হইতে কেহই সেই কক্ষে বাস করে না। আপনি মিষ্টার, আপনাদের সেই লেফ্টেন্যান্ট-টার কীর্তির কথা কিছু শুনিয়াছেন কি? সে এখানে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া খুব বীরত্ব ফলাইয়া গিয়াছিল।”

আমাদের কণ্ঠস্বরে প্লেথ পরিষ্কৃত হইল; তাহা লক্ষ্য করিয়া আমার আশঙ্কা হইল, উদ্ধত কাউন্ট জোলার্ণের চাবুক হয় ত তখনই তাহার পিঠে পড়িবে।

কিন্তু তাহার সৌভাগ্যক্রমে কাউন্ট জোলার্ণ তাহার বিক্রম গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, “হাঁ, সে কথা আমি শুনিয়াছি।”

আমস্ উৎসাহভরে বলিল, “ছাগেন্ বড়ই নোংরা কায করিয়াছিল। তাহার ব্যবহারে আমার অস্বস্তির সীমা ছিল না। আমাকে বড়ই সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। ছাগেন্ যে সেই কক্ষে বাস করিতেছিল—ফার্নস তাহা জানিত না; কিন্তু সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ফার্নস তাহাকে দেখিতে পাইল, সঙ্গে সঙ্গেই ছাগেনের রিভলবারের গুলী ছুটিল। সেই এক গুলীতেই ফার্নস ঘরের কাছে পড়িয়া অক্লান্ত লাভ করিল। কিন্তু যদি সে না মরিয়া কোন কৌশলে পলায়ন করিতে পারিত, তাহা হইলে এত দিন আমারও ইহলীলা সাজ হইত, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের আড্ডাও ইংরেজের তোপে উড়িয়া যাইত।—এ সকল কথা এখন থাক। আপনি আমার সঙ্গে দোতালায় যাইলে সেই ঘরটি আপনাকে দেখাইতে পারি।”

অতঃপর আমস্ একটা বাতি ধরাইয়া-লইয়া পাকশালা ত্যাগ করিল, এবং কাউন্ট জোলার্ণকে সঙ্গে লইয়া কাঠের জীর্ণ সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিল। কাউন্ট জোলার্ণ দোতালার কক্ষ পরীক্ষা করিয়া আমসের নিকট কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি

নাই; তবে সেই কক্ষ দেখিয়া তিনি যে নিরাশ হইবেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

কিছু কাল পরে কাউন্ট জোলার্ণ আমসের সহিত পাকশালার প্রত্যাগমন করিলেন। কাউন্ট জোলার্ণ শয়ন-কক্ষ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা উহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম। তিনি আমসকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলেন, “ঐ ঘরে কি মানুষ বাস করিতে পারে? ঐ নোংরা গর্ভে আমার কুকুরকে বাস করিতে দেওয়াও তাহার পক্ষে অপমানজনক! কাল তুমি ঐ ঘরের ভিতর যত দূর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে।”

আমস্ বলিল, “তা বেশ; আপনি যে ছেলেটিকে দেখিতেছেন, উহার নাম পিটার,—ও আপনার আদেশানুযায়ী সকল কায শেষ করিবে।”

কাউন্ট জোলার্ণ গরম হইয়া বলিলেন, “না, ও করিবে না; আমার আদেশানুযায়ী ঐ কায তুমিই করিবে। তোমাকে স্বহস্তে উহা করিতে হইবে। ও-ঘর তুমি নিজেই ঐরূপ নোংরা করিয়া রাখিয়াছ; তোমার নিজের গলদ তুমিই সাফ করিবে।”

আমস্ সক্রোধে বলিল, “আমাকেই করিতে হইবে? আপনি কোন্ অধিকারে আমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন?”

কাউন্ট রুক্ষস্বরে বলিলেন, “আমি তোমার সহিত তর্ক করিতে চাহি না। এ কায তোমাকেই করিতে হইবে।”

আমস্ ক্রভঙ্গি করিয়া বলিল, “আমি স্বহস্তে কাঁটা ধরিয়া ঘরের মেঝে পরিষ্কার করিব এ আপনার অত্যন্ত অসঙ্গত অনুরোধ!”

কাউন্ট বলিলেন, “অনুরোধ? না, আমি তোমাকে এ কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছি না, ইহা আমার আদেশ।”

আমস্ নির্ঝাক্ ভাবে কাউন্ট জোলার্ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রোধে অপমানে তাহার মুখ আরক্তিম হইল, এবং তাহার ভাল চোখ হইতে যেন অগ্নিশূলিক নিঃসারিত হইতে লাগিল।

কাউন্ট অতঃপর আমার ও মেরীর মুখের দিকে

চাহিয়া বলিলেন, “আমার জিনিসপত্রগুলি দোতালায় লইয়া গিয়া আমার ঘরে রাখিয়া দাও।”

আমস্ কাউন্টের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “না, উহারা এখন যাইতে পারিবে না। পিটারকে এখন সমুদ্র-কূলে যাইতে হইবে; কারণ, কোন ‘ইউ’-বোট আসিলে তাহাকে আলো দেখাইয়া সাড়া দেওয়াই উহার প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে কখনও অবহেলা করা হয় না-মিষ্টার, এ কথা আপনি জানিয়া রাখুন।”

কাউন্ট বলিলেন, “তুমি প্রত্যেক কর্তব্য কি ভাবে পালন কর, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্তই আমি এখানে আসিয়াছি। তুমি কি ভাবে তোমার কর্তব্যগুলি পালন করিয়া আসিতেছ, তাহা আমি সহজেই জানিতে পারিব।

তুমিই এখন সমুদ্রতীরে গমন করিবে, এবং পিটার যতক্ষণ সেখানে যাইতে না পারে—ততক্ষণ সেখানে থাকিবে।”

আমস্ আপত্তির সুরে বলিল, “কিন্তু আমি এখন—”
কাউন্ট তাহার কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “আমি তোমার কোন আপত্তি শুনিতে চাহি না। এই মুহূর্তেই তুমি সমুদ্র-কূলে যাও,—ওঠো !”—তিনি দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

আমস্ কাউন্ট জ্বালালের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া অল্প দিকে মুখ ফিরাইল, এবং পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, লণ্ঠনটি হাতে লইয়া আপন মনে বক্-বক্ করিতে করিতে পাকশালা ত্যাগ করিল। তাহার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় !

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বন্যা আনো

আমার রুদ্ধ হৃদয়-দুয়ারে—আঘাত হানো ;
পামণ-কারার ভাঙিয়া আগল—বন্যা আনো ।
কানায় কানায় উছলিত মোর পরাণ-মন,—
বাধনে জড়ায়ে—কাদিছে নীরবে অন্তঃকণ ।
হৃদয়-দুয়ার অন্ধ হ’য়েছে—আঘাত হানো ;
আলোর জোয়ারে ভেসে এসে তুমি—বন্যা আনো ।

অনেক কথা ও অনেক গানের রুদ্ধ নদী ;
স্রোত পাবে কোথা সাগরের ডাক না শোনে যদি ?
অনেক রূপের বর্ণে-গন্ধে পরাণ মোর,
পরিপূর হ’য়ে ঘুমিয়ে রয়েছে আবেশে ঘোর ।
রুদ্ধ কথার ঘুম ভেঙে দিতে—আঘাত হানো ;
সকল বাঁধন মুছে ফেলে দাও—বন্যা আনো ।

অনেক আঘাত ব্যর্থ হ’য়েছে—আঘাত করি’ ;
এতোটুকু তবু কাঁপেনি দ্বার ওঠেনি নডি’ ।
ধির জীবনের করুণ হতাশা বেদনা মানি,
কেঁপেছে কেবল শঙ্কিত তীরু হৃদয়খানি ।
মম সাধনার প্রিয়তম তুমি—আঘাত হানো ;
ব্যর্থ আঘাতে আঘাত হানিয়া—বন্যা আনো ।

তোমার স্বপ্নে পূর্ণ আমার—সকল প্রাণ ।
তোমার রূপের জ্যোতিতে জড়ানো কথা ও গান ।
পৃথিবীর শত দুঃখ-বেদনা ভুলের মত—
ভুলে যাই আমি পরমানন্দে বিষাদ যত ।
পামণ হৃদয়ে রুদ্ধ তটিনী—আঘাত হানো ;
তোমার রূপের আলোক-ধারায়—বন্যা আনো ।

শ্রীঅমরেশ দত্ত ।



অবসাদ-জড়তায়

দেহ-মন সারাক্ষণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছে—কাজে উৎসাহ নাই, ইচ্ছা নাই, দেহ-মন যেন ঝিমাইয়া আছে—এমন অবস্থা ঘটিলে বৃষ্টিবন—কোষ্ঠবদ্ধতার ফল। কোষ্ঠ-বদ্ধতার ফলে মানবদেহ সর্বরোগের নিগ্রহে-উপদ্রবে জর্জরিত হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা-নিবারণের একমাত্র উপায়, ব্যায়ামে দেহযন্ত্রটিকে সচল ও সক্রিয় রাখা। ঘর-কন্নর কাজ করিলেই ব্যায়ামের ফল মিলিবে না। তাহা মিলিলে স্নুগ্‌হিণীদের দেহ আজ মেদে-মাংসে স্থূল বর্তুল আকারে কদর্য্য বা অক্ষম হইত না!

আলস্যের ফলে যেমন কোষ্ঠবদ্ধতার উৎপত্তি হয়, তেমনি আবার ভালো-মন্দ না বাছিয়া নির্বিচারে যা-তা খাইলেও কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটে! কোন্ খাদ্য বর্জন করিতে হইবে, তাহা জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন—পর্যাপ্ত ফল ও তরী-তরকারী খাওয়া! কোষ্ঠবদ্ধতার জন্ত যারা নানা উপসর্গ ভোগ করেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা আশী জনের ব্যাধি খাদ্য-নিয়ন্ত্রণে এবং ব্যায়ামে নিশ্চয় সারিবে!

চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ানোর ভঙ্গী যদি সঠিক না হয়, তাহা হইলেও কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিবে। আমাদের দেহ-যন্ত্রটি এমন ভাবে গঠিত যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে যদি যথোচিত চালনা না করি, চলা-ফেরা না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকি, তাহা হইলে স্বাস্থ্য খারাপ হইবে এবং দেহের গঠন বিকৃত ও কদর্য্য হইবে। কাটারি, সাবল, হাতা, বেড়ি—এ-সব যদি ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখি, তাহা হইলে তাহাতে যেমন মরীচা ধরে, মোটর-গাড়ী না চালাইয়া যদি গেরাজে বন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে তারা যেমন বিকল ও অচল হয়, তেমনি দেহ-যন্ত্রটিকে না খাটাইলে তাহাও মরীচা ধরিয়া বিকল-অচল হইবে!

কোষ্ঠবদ্ধতায় জোলাপ খাওয়া আর বিষ খাওয়া প্রায় একই কথা! স্নুহ অবস্থায় আমরা যে-খাদ্য গ্রহণ করি, তাহার সম্পূর্ণ পরিপাক ঘটিয়া তাহা হইতে আবর্জনা-নিষ্কাশনে সময় লাগে ৩৬ হইতে ৪৮ ঘণ্টা। জোলাপ খাইলে পাকস্থলীর স্নুহ বিল্লীগুলি আহত হয়;—পীড়িত হয়। নিত্য জোলাপ-গ্রহণে পাকস্থলী অস্নুহ হইয়া পড়ে; এজন্য জোলাপ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। ভাত-ডাল লুচি-রুটি যথেষ্ট খান, আপত্তি নাই; কিন্তু তার সঙ্গে নিয়ম করিয়া প্রত্যহ প্রচুর ফল ও তরী-তরকারী খাইবেন। তাহা হইলে কোষ্ঠবদ্ধতায় কোনো কালে ভুগিতে হইবে না!

কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণতা এবং অগ্নিমান্দ্য; এবং তার ফলে শরীর সর্ব-ব্যাধির লীলাভূমি হইয়া সাংঘাতিক পরিণাম ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। মেয়েদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, সংসারের ছ'চারিটা কাজ করিলেই ব্যায়াম-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল! এ বিশ্বাস ভিত্তি-হীন। ব্যায়ামের অর্থ, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পরিচালনা। আহার এবং ব্যায়াম-বিধি পালন করিয়া চলুন, কোষ্ঠবদ্ধতা বা অজীর্ণতা-হেতু অস্নুহতা ঘটিবে না—দেহ মেদে-মাংসে ভরিয়া কদর্য্য বা দেহের গঠন বিকৃত হইবে না!

কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অজীর্ণতায় মানুষের মেজাজ বিগড়াইয়া যায়, নিদ্রা হয় না, দেহ-মন অবসাদে ভরিয়া থাকে। পেট ভরিয়া খাওয়া-দাওয়া করিব অথচ ব্যায়াম করিব না,—ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অজীর্ণতাকে বরণ করা অনিবার্য্য!

সকালে-সন্ধ্যায় খানিকটা বেড়াইয়া আসা ভালো। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত—সকল সময়ে বেড়ানোর অভ্যাস রাখিলে জোলাপ লইবার কোনো প্রয়োজন জীবনে হইবে না।

আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে নানা কারণে নিত্য-দিন সকালে-সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হওয়া হয় তো সম্ভব হইবে না। বেড়াইতে যাওয়ার সুবিধা থাকিলে

নাই; তাঁরা নিত্য-দিন প্রাতে উঠিয়া খোলা বাতাসে থাকিবে। এইভাবে দাঁড়াইয়া ডান দিকে দেহ বাঁকাইয়া গভীর-ভাবে শ্বাস গ্রহণ করিবেন। তাহাতে অঙ্গীর্ণতার চার বার দেহখানিকে ঘুরাইতে হইবে, তার পর বা-দিকে

১। চিং হইয়া শোওয়া

প্রতিকার হইবে। এই সঙ্গে কয়েকটি সহজ ব্যায়াম-বিধি পালন করা কর্তব্য।

১। মেঝেয় চিং হইয়া শুইয়া পড়ুন (১নং ছবি)। তার পর চট করিয়া উঠিয়া বসুন; বসিয়া হু'হাতে দুই হাঁটু



২। হাঁটু ধরুন

(২নং ছবির ভঙ্গীতে) ধরুন। হু' হাঁটু ধরিয়া তখন মেঝেয় চিং হইয়া শুইয়া ডাহিনে-বামে গড়াগড়ি দিন। আট-দশ বার গড়াগড়ি দিবেন; গড়াগড়ি দিয়া আবার উঠিয়া বসুন। গড়াগড়ি দিবার সময় এবং বসিবার সময় হাঁটু ধরিয়া থাকিবেন, কদাচ ছাড়িবেন না।

২। এবার উঠিয়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া সামনের দিকে ঈষৎ ঝুকুন। দুই হাত পিছনে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে মুষ্টিবদ্ধ



৩। হু'হাতে মুষ্টি

চার বার। এ ব্যায়ামে শিতারের ক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে।

৩। এবার মাথার উপর দুই দিকে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়ান। যতখানি উর্কে তোলা সম্ভব, দুই হাত তুলিবেন। তার পর দুই পা প্রসারিত করিয়া ৪নং ছবির মতো দুই হাত এক করিয়া পায়ের ফাঁক দিয়া পিছন-দিকে দু'হাত প্রসারিত করিয়া দিন। যতক্ষণ পারেন, এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, এবং জোরে-জোরে নিশ্বাস লইবেন। ঝুঁকিয়া পায়ের ফাঁক দিয়া পিছন-দিকে হাত প্রসারিত করিবার সময় শ্বাস ত্যাগ করিবেন। ছ'বার এ ব্যায়াম করা চাই।

৪। এবার ৫নং ছবির মতো ডান পায়ে



৪। দুই হাত এক করিয়া

দাঁড়াইয়া হাঁটুর কাছ হুঁড়াইয়া ডান পা তুলুন। ডান পা তুলিতে হইবে বুকের কাছ পর্য্যন্ত। দুই হাত প্রসারিত থাকিবে। এবার লাফ দিয়া ডান পায়ে দাঁড়াইয়া বা পা তুলুন বুকের কাছ পর্য্যন্ত! প্রথমে মূহু তালে ছয় বার লাফ দিবেন; তার পর দ্রুত তালে লাফ দিতে হইবে। বিশ বার পঁচিশ বার এইরূপ লক্ষ-লীলা করা চাই। এ-ব্যায়ামে

দেহের গঠন ভালো থাকিবে; মেদ-মাংস জমিয়া জ্বলন-দেশ ভারী হইবে না।

৫। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া যত জোরে পারেন,



৫। ঠাটু হুঁড়াইয়া

নিশ্বাস গ্রহণ করুন। পরিপূর্ণ নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন; করিয়া তার পর তাহা ত্যাগ করুন। এ শ্বাস-ব্যায়ামে তলপেটের পেশী স্তম্ভ থাকিবে এবং কোষ্ঠবদ্ধতার আশঙ্কা এতটুকু থাকিবে না!

জানিয়া রাখুন

অনেক সময় না জানিয়া আমরা এমন কতকগুলি কদভ্যাসের দাশু করি যে, তার ফলে শ্রী-সৌন্দর্য

মাটি হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্য এ কদভ্যাসের ফলে ঝরিয়া যায়। না জানিয়া মুখে-চোখে এমন ভঙ্গী আমরা প্রকটিত করিয়া তুলি, আয়নায় সে-ভঙ্গী দেখিলে নিশ্চয় শিহরিয়া উঠিব! এমন কয়েকটি কদভ্যাসের কথা আজ বলিতেছি। যদি মুখশ্রী অটুট রাখিতে চান, তাহা হইলে প্রাণপণে এ-সব কদভ্যাস ত্যাগ করিবেন।

সেলাই করিতে করিতে হাতের কাছে কাঁচি না থাকিলে অনেকে দাঁত দিয়া সেলাইয়ের সূতা কাটিয়া ফেলেন। এটি দারুণ কদভ্যাস। দাঁত দিয়া সূতা কাটিবাব সময় কপালে কোঁচ পড়ে। নিত্য-দিন এ অভ্যাসের ফলে কোঁচ পড়িয়া কপালে অকাল-বার্দ্ধক্যের রেখা ঘনীভূত হইয়া মুখশ্রী মলিন করিয়া দেয়। তার উপর দাঁতে সূতা কাটার দরুণ দাঁতের অস্বাস্থ্য ঘটে মনে রাখিবেন।

তার পর সংসারের কাজকর্মের সারাদিন দারুণ ব্যস্ত আছি, কেহ হয় তো আসিলেন—তাড়াতাড়ি তখন মাথার অবিগ্ৰস্ত কেশগুলোতে চিরুণী লাগাইয়া আঁচড়াইয়া লই। এভাবে চিরুণী-চালনার সময় মাথার উপর এতটুকু মায়াদয়া থাকে না! এ যেন মাথায় চিরুণী চালানো নয়, ঝোপে-ঝোপে কোদাল টানা! এমন করিয়া মাথায় চিরুণী চালাইলে চুলের গোড়ায় বেশ আঘাত লাগে; তার ফলে চুল উঠিয়া মাথায় টাক পড়ে! মাথা-আঁচড়ানোর কাজে ধৈর্য্য এবং যত্ন চাই। মাথার কেশ এতটুকু অযত্ন সহিতে পারে না, এ কথা মনে রাখিবেন।

মুখে পাউডার মাখিবার সময় অনেকে মুখ-চোখ নানা ভাবে বিকৃত করেন; তাহাতে মুখ-চোখের গড়ন বিকৃত হয়।

অনেকের আবার কেমন বদ স্বভাব, যখন-তখন আঙুল দিয়া নাকের ডগা চাপিয়া থাকেন। এ কদভ্যাসে নাকের ডগা খাবড়াইয়া যায়। অলক্ষ্য এই সব মুখভঙ্গীর জন্ত গালে-মুখে কোঁচ পড়িয়া মুখের সৌন্দর্য্য-হানি ঘটে।

হাতে টাইট চুড়ি-বালা আঁটিলে কি বিপত্তি ঘটে, জানেন? হাতে ব্যথা বাজিলে সে চুড়ি-বালা টানাটানি করিতে হয়। তখন ঠোট ফোলে, মুখ বিকৃত হয়। এজন্ত ঠোট ঝুলিয়া পড়ে, ঠোট পুরু হয়; এবং আরো নানা ভাবে ঠোটের গড়ন বদলাইয়া বিকৃত হইয়া যায়। টাইট জামা-জুতা বা গহনা কদাচ পরিবেন না। দারুণ ভাবে কষিয়া কোমরে গ্রন্থি দিয়া কদাচ শাড়ী-বডিশ্ বা কোট-প্যান্ট পরিবেন না। চলিতে-ফিরিতে বসিতে-দাঁড়াইতে দেহের কোথাও যদি চাড় পড়ে বা ব্যথা বাজে, তাহা হইলে দেহের গঠনে বিকৃতি ঘটিবে এবং দেহশ্রী ক্ষুণ্ণ হইবে, জানিবেন।

নখ খাওয়া, চোখ মিটমিট করা—এগুলো দেখিতে শুধু অশোভন বা কদর্য্য নয়, এ সব কদভ্যাসে সৌন্দর্য্যশ্রী রীতিমত আহত হয়। যদি চান সৌন্দর্য্যশ্রী মলিন হইবে না, তাহা হইলে দেহকে সর্বদা সহজ ও স্বচ্ছন্দ রাখিতে হইবে!

বৈপরীত্য

হারালে একটি তারা কিবা তায় ক্ষতি?
ক্ষণেক না হবে স্নান জগতের জ্যোতি।
শুকালে একটি তৃণ, উষরের শ্বাস
কভু নাশি করে ক্ষীণ শ্রামল স্রহাস!

একটি বিহগ মুক যদি রয় ভ্রমে—
প্রভাতের কোলাহল কিছু তায় কমে?
যানে শুধু মানবের চির-দুখ ডাকি—
লুকানো অতীতে এক জীবনের কাঁকি!

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়



কয়লা-শিল্পের সঙ্কট

পাথুরিয়া কয়লা একটি মূল উপাদান। গৃহস্থের রন্ধনশালা হইতে বিশ্বকর্ষার সর্বপ্রকার কৰ্মশালায় ইহার প্রয়োজন যেমন অধিক, সেইরূপ অপরিহার্য। এই উপাদান ব্যতীত বহু শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন অসম্ভব। বাষ্পীয়যন্ত্র, বাষ্পীয়পোত ও বাষ্পীয়যান পরিচালনার মূল উপাদান পাথুরিয়া কয়লা। আলকাতরা এবং সহরাকলে যে গ্যাসের আলো ফলে, তাহাদেরও মূলে এই উপাদান। পাথুরিয়া কয়লা কল-কারখানার প্রাণ-স্বরূপ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে ভারতে বহু শিল্পের প্রসার, এবং টানে রপ্তানী বৃদ্ধি হেতু পাথুরিয়া কয়লার উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। সর্বোচ্চ উৎপাদন ঘটয়াছিল, গত ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে—২৮,৩৪৭,৯০৭ টন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন অপেক্ষা ৩৩ মিলিয়ন (নিযুত) টন অধিক। গত বৎসরের উৎপাদন অঙ্ক—২৭,৬৬২,৭৮৮ টন, এবং বর্তমান ইংরেজী বর্ষের প্রথম ছয় মাসের আনুমানিক উৎপাদন—১৪,০০০,০০০ টন।

পাথুরিয়া কয়লার স্বাভাবিক চাহিদা ২৩ মিলিয়ন টন। সুতরাং গত তিন বৎসর চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন হইয়াছে অনেক অধিক। আর্থিক হিসাবে ইহার ফল হইয়াছে মূল্য-সঙ্কোচ। নিম্নে গত বিংশতি বর্ষের উৎপাদন ব্যয়, রপ্তানী, আমদানী এবং খনি-খাতমুখের গড়-মূল্যের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল,—

সাল	সমগ্র ভারতের উৎপাদন (হাজার টন)	ব্যয় সরবরাহ (হাজার টন)	খনি-খাতমুখে টন প্রতি গড় মূল্য	ভারতীয় কয়লার বৈদেশিক রপ্তানী (হাজার টন)	বৈদেশিক কয়লার ভারতে আমদানী (হাজার টন)
১৯১৯	২২,৬২৮	২২,১১৯	৪১০	৫০৮	৪৮
১৯২০	১৭,৯৬২	১৬,৭৩৭	৫২/০	১,২২৪	৩৯
১৯২১	১৯,৬০২	১৯,০২৭	৬৫০	২৭৫	১,০০০
১৯২২	১৯,০১০	১৮,৯৫৩	৭১/০	৭৭	১,২২০
১৯২৩	১৯,৬১৬	১৯,৫২০	৭২/০	১৩৬	৬২৪
১৯২৪	২১,১৭৪	২০,৯৬৭	৭/০	২০৬	৪৬৩
১৯২৫	২০,৯০৪	২০,৬৮৮	৬/০	২১৬	৪৮৩
১৯২৬	২০,৯৯৯	২০,৬০১	৪৫/০	৬১৭	১৯৩
১৯২৭	২২,০৮২	২১,৫০৬	৪১/০	৫৭৬	২৪৩
১৯২৮	২২,৫৪২	২১,৯১৬	৩৫/০	৬২৬	২১০
১৯২৯	২৩,৫১৮	২২,৬৯২	৩৫/০	৭২৬	২১৮
১৯৩০	২৩,৮০৩	২৩,৩৪১	৩৫/০	১৬১	২১৭
১৯৩১	২১,৭০৬	২১,২৭৫	৩৫/০	৪৪১	৮৮
১৯৩২	২০,১৫৩	১৯,৬০৬	৩৫/০	৫১৯	৪৭
১৯৩৩	১৯,৭৮৯	১৯,৩০২	৩৫/০	৪২৬	৬৭
১৯৩৪	২২,০৫৭	২১,৭২৭	২৫/০	৩৩০	৭২
১৯৩৫	২৩,০১৬	২২,৭৯৯	২৫/০	২১৭	৭৭
১৯৩৬	২২,৬১০	২১,৯৩৯	২৫/০	৬৭১	৫৮
১৯৩৭	২৪,০৩৬	২৪,০৪৩	৩৫/০	৯৯২	৬১
১৯৩৮	২৮,৩৪২	২৬,৯৯৯	৩৫/০	১,৩৪৩	৪৬

কেহ কেহ এই উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধিকে শিল্পের সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া স্বীকার করেন না। অবশ্য, এই সকল ব্যক্তি উৎপাদক-শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের অভিযোগ এই যে, যদিও বর্তমান মহাবিপ্লবের প্রারম্ভ কাল হইতে, যুদ্ধাত্মক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও, যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হেতু, পাথুরিয়া কয়লার চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি ইহার মূল্য তদনুপাতে বৃদ্ধি হয় নাই। তাহাদের কাহারও কাহারও মতে, এই বৃদ্ধিত চাহিদা কয়লার মূল্য হ্রাস হইতে দেয় নাই মাত্র; তদপেক্ষা অধিক কিছুই করে নাই।

উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্তমান মূল্য-হার আদৌ লাভজনক নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই-চারি আনা মূল্য-বৃদ্ধিকে বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করা যায় না; কারণ, কয়েকটি অতি আধুনিক আইনের ফলে, শ্রমিক ও অজ্ঞাত কৰ্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধি এবং কয়লার খনির নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভাব ও সাজ-সরঞ্জামের দ্রুত মূল্য-বৃদ্ধি হেতু উৎপাদনের ব্যয় কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, কয়লা-শিল্পের যে স্বাভাবিক মন্দা, তাহা চাহিদা-বৃদ্ধি সত্ত্বেও, সমভাবে অব্যাহত রহিয়াছে।

এবস্থি অবস্থার হেতু এই যে, ভারতের বর্তমান সম্ভাব্য উৎপাদন শক্তি, সর্বোচ্চ উৎপাদন, ২৮ মিলিয়ন টন অপেক্ষা অনেক অধিক এবং ৩৩-৩৪ মিলিয়ন টনের নিকট-বর্তী। আশঙ্কা এই যে, যুদ্ধের অবসানের পরে, নিয়মিতরিত্ত চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটিলেও, বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে—১৯১৯ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেরূপ মূল্য-বৃদ্ধি ঘটয়াছিল, সেরূপ মূল্যবৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। সাময়িক ক্ষণস্থায়ী মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিলে পারে; কিন্তু এইরূপ তেজী অবস্থার অদূর পশ্চাতে যে অবশ্যস্বাভাবী মূল্য-হ্রাসরূপ প্রতিক্রিয়া আসিবে, তাহার ফল শিল্পের পক্ষে সমূহ ক্ষতিজনক হইবে।

উপরোক্ত তালিকার দৃষ্ট হইবে যে, কয়লার সমগ্র ভারত-গড়-মূল্য নিম্নমুখী হইয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে টন প্রতি সর্বনিম্ন মূল্য ২৫০ আনায় পৌঁছিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে, যখন কয়লার চাহিদা কয়লা ব্যবসায়ের ইতিহাসের সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, তখন প্রতি টনের গড়-মূল্য হইয়াছিল মাত্র ৩৫০ আনা। এই মূল্য যে

কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা এই শিল্পের সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে ও সংশ্রব আছে, অতি সহজেই তাঁহার বোধগম্য হইবে।

খনি হইতে কয়লার উত্তোলন আর পূর্বের তায় সহজ-সাধ্য নহে। নব নব বিধি-ব্যবস্থার ফলে এবং শ্রমিকদিগের মজুরী বৃদ্ধিহেতু উৎপাদনের ব্যয় ক্রম-বর্দ্ধমান হইয়াছে। অল্পপক্ষে, গত এবং বর্তমান বর্ষের গড়-মূল্য এখনও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের গড়-মূল্য অপেক্ষা কম। সুতরাং শিল্পের পরিস্থিতি পূর্ব্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের কয়লার মূল্য, পূর্বেরও যেমন, এখনও তেমনই, সর্বাপেক্ষা কম। এইরূপ মূল্যাবনতি শিল্পের পক্ষে অনিষ্টকর; কারণ, মূল্যের অল্পপাতে উৎপাদনের ব্যয় লঘু করিয়া খনির মালিকগণ আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে বাধ্য। ফলে বেকর সতর্কতা এবং সচিবতা অবলম্বন করিলে কয়লার অপচয় ঘটে না, সেরূপ যত্ন ও চেষ্টার অভাব অপরিহার্য হয়। কয়লার উৎস অনস্তু নহে, সুতরাং প্রত্যেক ব্যবহারোপযোগী কয়লা-খণ্ডকে রক্ষা করিবার আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, এই কয়লার সরবরাহের উপর শিল্পের জীবন নির্ভর করিতেছে।

খনি-মালিকের ব্যয়-সঙ্কোচ প্রচেষ্টার ফলে শ্রমিক ও কর্মচারী-দিগের আয়ের স্বল্পতা ঘটে; কর্মদিগের নিরাপত্তার নিমিত্ত যে সকল উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা কর্তব্য তাহারও বাত্য ঘটে; ভাবী বিপদ নিবারণ করিবার নিমিত্ত ব্যয়সাধ্য কোন প্রতিকার সম্ভব হয় না; খনির উন্নতি প্রতিহত হয়, এবং সম্পদ ও সম্পত্তির ভবিষ্যৎ ক্ষুণ্ণ হয়। উচ্চ শ্রেণীর কয়লা উত্তোলন করিয়া, অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্য লাভ করিবার আশায়, নিম্ন শ্রেণীর কয়লার প্রতি উপযুক্ত মানাবোগের অভাবে নিকৃষ্ট, অথচ কোন না কোন প্রকারে ব্যবহারোপযোগী, কয়লার অত্যধিক অপচয় ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রদানের ব্যাঘাত ঘটে, এবং অজ্ঞান দায়িত্বের অথবা বিলম্বিত নির্বাহ, অথবা আংশিক, কিংবা সম্পূর্ণ, প্রত্যাখ্যানের ফলে, মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এবং স্থলবিশেষে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। মূলধন আকৃষ্ট করিবার পথেও বিঘ্ন ঘটে।

এই সকল বাধা-বিপত্তি দূর করিবার নিমিত্ত কয়লা-শিল্প সংশ্লিষ্ট সমিতি সকল আইন দ্বারা উৎপাদন হ্রাস করিয়া মূল্যের হার উচ্চ রাখিবার জগৎ একাধিক বার সরকারে প্রার্থনা জানাইয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। শাসন-তন্ত্র কোন বিশিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী হইয়া ক্রেতা ও কয়লার প্রতি নির্ভরশীল শিল্পের অনুবিধার প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

কয়লার খনির মালিকদিগের অভিযোগ এই যে, ভারতে কয়লার মূল্য অন্যান্য দেশের মূল্যের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। একরূপ মূল্য-পার্থক্য স্বাভাবিক; কারণ, ভারত রক্ত-প্রসূ হইলেও, মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা, শ্রেণী-ধর্মনির্বিশেষে নিঃস্ব। অন্যান্য দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন—তাহাদের তুলনায় ভারতের শিল্প সমূহ অজ্ঞাপিও শৈশবের ভূমিকায় আপনাদের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টামাত্রে রত। সুতরাং গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল বিধি-নিষেধের প্রয়োগ ও প্রবর্তন সমীচীন ও সম্ভব, আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে তাহা সম্ভব নয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নিকৃষ্ট অবস্থাও এখন বিদ্যমান নাই; সুতরাং মুষ্টিমেয় খনিক ও শ্রমিকের নিমিত্ত শাসন-প্রণালী শত সহস্র ক্রেতাও উচ্চমূল্য

অল্পমূল্য শিল্পের ক্ষীণ অভ্যুদয়ের পথে নতুন বিঘ্ন উপস্থাপিত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ও বিহারের প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই প্রচেষ্টা সমর্থিত হইয়াছিল—তাহাদের আয়-সঙ্কোচের প্রতিবিধান হেতু। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তির বিবেচ্য বিষয় প্রাদেশিক পরিবেষ্টনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে,—তাঁহাদের দৃষ্টি স্বভাবতঃই সূদূর-প্রসারিত।

শিল্পের উদ্দেশ্য কি? দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন। দেশের উন্নতি দেশবাসীর অর্থ ও সামর্থ্যের প্রতি নির্ভরশীল। সুতরাং “দেশের” উন্নতিই আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূলমন্ত্র। বহু অনেক হিতসাধনের জগৎ যদি সংখ্যারের ক্ষতিও হয়, সে ক্ষতি সর্বতোভাবে উপেক্ষণীয়।

কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে মূল্যবৃদ্ধি ব্যতীতও শিল্পের উন্নতি সম্ভব; এবং সেই সম্ভাবনা খনির স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকবর্গের সম্পূর্ণ সাধ্যাত্ত। প্রথমতঃ, মূল নীতি ও রীতির ঐক্য; দ্বিতীয়তঃ, কার্য-প্রণালীর শৃঙ্খলা; তৃতীয়তঃ, অথবা অপচয় নিবারণ; চতুর্থতঃ, অনুসন্ধান এবং অনুশীলন দ্বারা কয়লার বিস্তৃত ভাবে নব-নব ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবন; পঞ্চমতঃ, বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত এবং সর্বশেষে উর্দ্ধতন কর্মচারী ও অধঃস্থল শ্রমিকের অপরিমিত বৈষম্যের জায়গায় সামঞ্জস্য সংসাধন।

কয়লা-শিল্পে, বর্তমানে, তিনটি প্রভাব ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আছে—ভারতীয় খনিজ সমিতি, (Indian Mining Association) ভারতীয় খনিজ সমবায় (Indian Mining Federation) এবং ভারতীয় খনি-মালিক সমিতি (Indian Colliary Owners' Association)। প্রথমোক্তটি মুখ্যতঃ ষেতান্ন সঙ্ঘ। এই ত্রিধর্মসমিত ত্রয়ের মূল ও মূখ্য নীতি ও রীতি ত্রিধা বিতর্ক। এই ত্রি-সমিতির অভিসন্ধি, অর্থাৎ উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় ও উপায় অভিন্ন-মুখী হওয়া প্রয়োজন। বর্ণধর্ম বিত্তিন্নতা প্রযুক্ত কিছু কিছু স্বার্থ-সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য; কিন্তু তাহাতে মূল নীতি ও রীতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব নহে।

মূল নীতি ও রীতির ঐক্য সংস্থাপিত হইলে কয়লা-শিল্পে গৃহস্থলার বিধান (organisation) সহজসাধ্য হইবে। সকলে একযোগে কার্য করিলে, উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ, স্থিতিশীল মূল্যমান নির্ধারণ এবং বিক্রয় ব্যবস্থা অচিরেই অমুষ্টিত হইতে পারিবে।

শুণ ও মূল্যানুযায়ী উৎপাদন ও সরবরাহ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে অজ্ঞায় প্রতিযোগিতা-সত্ত্বত বিবেদ-বহি অচিরেই নির্বাপিত হইবে, এবং অসমঞ্জস স্বযোগ লাভ হেতু এই অমূল্য মূল উপাদানের অথবা অপচয় নিবারণ হইবে। অপচয় করিলে অভাব অনিবার্য। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের এই ভূগর্ভস্থ সম্পদ পর্যাপ্ত,— অপর্ধ্যাপ্ত নহে। অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের এই বিশিষ্ট সম্পদ নিঃশেষিত বাইয়া হইতে পারে।

অপচয় নিবারণকল্পে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কয়লা-উদ্ধারণ সমিতির (Coal Mining Committee) সুপারিশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র কর্তৃকগুলি আবশ্যকীয় বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। খনির অভ্যন্তরে কয়লা সাজাইবার এবং শ্রমিকদিগের বিপদ-আপদ নিবারণ করিবার সুসঙ্গত বিধি-নিষেধের প্রবর্তন করিয়াছেন।

একটি সজ্জীকরণ বৈঠকের (Stowing Board) সৃষ্টি হইয়াছে। কয়লার নতুন নতুন ব্যবহারের উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন-কল্পেও সরকার যত্নশীল হইয়াছেন। যুদ্ধবশতঃ পরিস্থিতি উদ্ভূত চৈতন্য-বশতঃ দিন দিন নানা শিল্পের সংস্কার ও সম্প্রসারণ সংঘটিত হইতেছে এবং ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা-মূলক সন্মানসন্ধান প্রতিষ্ঠানের (Board of Scientific and Industrial Research) আবির্ভাব অত্যন্ত অমূল্য ও আশাশ্রিত। কয়লাশিল্পের নির্বন্ধশীল অত্যাশঙ্কক দাবী এই যে,—ভারতীয় কয়লাকে ইন্ধনোপযোগী করিবার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা (A comprehensive scheme of fuel research)। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় বৈঠকের গবেষণা-মূলক অনুসন্ধান অনুশীলনের ফলে যদি ভারতীয় কয়লাকে ইন্ধন (fuel)-রূপে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কয়লা-শিল্পের একটি মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে। এই প্রচেষ্টার সাফল্য অবশ্যস্বাভাবিক; কিন্তু সরকার যে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পরিপূষ্টি কয়লা-শিল্পের উক্ত সমিতিত্রয়ের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। স্বল্প তাপে অস্বারীকরণ (Low-temperature carbonisation) এবং হ্রস্বীকরণ (Hydrogenation) হেতু বিশেষ গবেষণামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সর্বপ্রকার অপচয় নিবারণ পূর্বক, উৎকর্ষের অপকর্ষ সাধন না করিয়া কয়লা-শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ নিয়ন্ত্রণই (Rationalisation) ইহার মুক্তির একমাত্র উপায়।

আইনের নিগড়ে উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিলে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফল কখনই স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না। বরং এই প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কুফল প্রসব করে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার আইন প্রণয়নে অসম্মতি জানাইয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা সমীচীন। সরকারের আশঙ্কা ছিল, আইনের দ্বারা উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিলে, খনির মালিকগণ অপচয় নিবারণে সচেষ্ট নাও হইতে পারেন, এবং শিল্পের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উপস্থিত লাভের লোভেও সঞ্চারিত করিতে অসমর্থ অথবা অনিচ্ছুক হইতে পারেন। এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূল্যক নহে।

সুতরাং রাজদ্বারে আইনের প্রার্থী না হইয়া খনির মালিকগণ, অর্থাৎ সমিতিত্রয় যদি সজ্জবদ্ধ হইয়া শিল্পের সমুন্নয়নকল্পে একান্তিসন্ধিতে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেই সঙ্কটের অবসান হয়। আমরা যে তালিকা দিয়াছি, তাহা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হইবে যে, কয়লার উৎপাদন ও প্রয়োজন প্রায় তুল্য; সুতরাং সমিতিত্রয় একযোগে যদি বর্ণ ও ধর্ম-বৈষম্য বিন্যস্ত হইয়া অসঙ্কোচে অপচয়-বর্জিত উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলেই মূল্য-মানের স্বৈর্য্য সম্পাদন সহজ হইতে পারে; এজন্য সরকারী সাহায্য নিপ্রয়োজন।

কয়লা-খনি-মালিকগণের এক গুরু অভিযোগ এই যে, রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য করা দূরে থাক,

নিজেদের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে স্ব স্ব খনি হইতে সুলভে কয়লা নিষ্কাশন করিয়া ভারতের কয়লা ব্যবসায়কে পঙ্গু ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছেন। আমরা এই অভিযোগের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যদি কোন গৃহস্থ নিজের প্রয়োজনের নিমিত্ত গৃহপ্রাঙ্গণে শাক-সজ্জী উৎপন্ন করিয়া হাটবাজার হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় না করে, অথবা বাজার হইতে মৎস্য ক্রয় না করিয়া গৃহ-সন্নিধানে পুঙ্করিণী খনন করাইয়া সাংসারিক প্রয়োজনের নিমিত্ত মৎস্যের চাষ করে, তাহা হইলে শাক-সজ্জী অথবা মৎস্য-ব্যবসায়ীর সেই গৃহস্থের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ থাকিতে পারে? রেলওয়ে খনি হইতে ২-৫ মিলিয়ন টন পরিমাণে কয়লা উদ্ধৃত হয় মাত্র। রেলওয়েই কয়লার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রেতা। তাহার এখনও ভারতোৎপন্ন কয়লার শতকরা ত্রিশ ভাগেরও অধিক কয়লা খরিন করে। রেলওয়ের নিকট কয়লা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত খনির মালিকদিগের মধ্যে মূল্য সম্বন্ধে আত্মঘাতী নীতি অনুসৃত হয়। অধিক পরিমাণে মাল সরবরাহ করিবার লোভে, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, ক্রম-নিম্ন (sliding scale) অথবা সর্বনিম্ন হারে দর দিয়া তাঁহারা চুক্তি (order) সংগ্রহ করেন। এ দোষ কাহার?

রেলওয়ে সম্বন্ধে খনির মালিকদের আর একটি অভিযোগ এই যে, গত দুই বৎসর রেলপথের আর অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও রেল-কর্তৃপক্ষ খনি-মালিকদিগের তীব্র আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কয়লার চালানের উপর অতিরিক্ত মাগুল শতকরা সাড়ে বারো হইতে পনেরো ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ অভিযোগ সমীচীন, এবং ইহার প্রতিকার প্রয়োজন। এক জন সুপ্রসিদ্ধ খনি-মালিক সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বর্তমান সমিতিত্রয়ের একযোগে একটি বোধ-প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা কর্তব্য। এই প্রতিষ্ঠান ভারতোৎপন্ন সমুদায় কয়লা ক্রয় করিয়া লইবে, এবং চাহিদা অনুযায়ী একটি যুক্তিসঙ্গত হারে সকল ক্রেতার নিকট ঐ প্রতিষ্ঠান-নিযুক্ত বিক্রেতার দ্বারা কয়লা বিক্রয় করিবে। তাহা হইলে তাঁহারা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনও সহজে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন। আকস্মিক অতিরিক্ত চাহিদার নিমিত্ত কিছু উদ্ভূত মাল রাখিবারও ব্যবস্থা হইবে।

খনির মালিকদিগের স্বার্থের দিক হইতে এ প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বেচারী ক্রেতাদের পক্ষে এই একচেটিয়া আধিপত্য বিরূপ ফল প্রদান করিবে, তাহাও বিবেচ্য।

সমস্ত উৎপন্ন মাল ক্রয় করিবার নিমিত্ত যদি খনি-মালিকগণ একমত্য অবলম্বন করিয়া সজ্জবদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলে আপোষে একযোগে ঐক্যাবলম্বন পূর্বক অপচয়হীন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধা কি? বরং সেই প্রচেষ্টা সহজ ও সুলভ হইবে।

শিল্প-বাণিজ্য সাহায্যে অর্থ-সামর্থ্য এবং অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান দ্বারা উন্নতি ব্যতীত স্বরাজ নাই। সর্দার স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত সুবিধা পরিহার পূর্বক বাচাতে সমষ্টিগত স্বার্থ পুষ্ট ও সম্যকরূপে সংরক্ষিত হয়, তৎপ্রতি ধনিক ও শ্রমিক উভয়েরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।





ছোটদের আসব

গল্পদাতার বৈঠক

এ দিন বৈঠক বসিতেই ছেলে-মেয়েরা সকলেই একসঙ্গে গল্পদাতার পানে চাহিয়া আবিদার ধরিল—সে দিনের কথা যেন মনে থাকে দাতা, সে দিন বলেছিলেন—আসছে বৈঠকেই এ-গল্প শেষ হবে।—হবে ত?

দাতা তখন গড়গড়ার নল ফুড়ুক-ফুড়ুক টানিয়া মুখ হঠতে ধোঁয়া ছাড়িতেছিলেন; নলটি নামাইয়া মুহু হাসিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, কথাটা ভুলিনি, মনে আছে; আজ তোমরা বেশ স্কুঁওর সঙ্গেই বাড়ী যাবে। সন্ধ্যাবেলা শাঁকের আওয়াজ শুনে আজ আর মন ডঃখে ভঁরে উঠবে না।

দাতা তখন গল্প আরম্ভ করিলেন।

রাজকন্তা সন্ধ্যার সময় পক্ষিরাণী আর হীরেমনটিকে নিয়ে এ-মহল থেকে চলে গেলেন; তার খানিক পরেই রাজা-পেটেল তার ছোকরা চাকরটাকে পাঠালে মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং আর প্রসাদ সিংকে ডেকে আনতে। তাঁরা আগতেই রাজা পেটেল সব কথা তাঁদের কাছে বললো।—রাজকন্তার সঙ্গে তার যে সব কথাবার্তা হ'য়েছিল—হীরেমন পাখী, পক্ষিরাণী, আর ব্যাধের আনা সেই মথা তোতাপাখীটা নিয়ে,—এক একটি ক'রে তা সমস্তই শুনিয়া দে বললো—এখন কি করা যায় বলুন।

মন্ত্রীরা ত নিশ্চিত মনেই বাড়ী গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন—তাঁদের জিদই পাকে-প্রকারে বজায় থেকে গেলো; এখন বিষেটা হ'লেই তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু রাজা পেটেলের মুখে হঠাৎ এই সব নতুন খবর শুনে, ভয়ে হুশিচস্তায় তাঁদের হুই চক্ষু কপালে উঠলো।

কৃষ্ণ সিংহের পাটোয়ারী বুদ্ধি; বিপদে তিনি খেই হারান না। রাজা-পেটেলকে বললেন—ভাবনা কি? তুমি ত মস্ত গণৎকার, গ'ণে দেখ-না ব্যাপারখানা কি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ সিং বলে উঠলেন,—ঠিক কথা, আমরা এ কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলুম! আর দেবী নয়, খড়ি নিয়ে বসে যাও, গ'ণে দেখ—যার দেহটা দখল ক'রে তুমি রাজা হ'য়ে বাহাদুরী দেখাচ্ছে, তার আত্মাটা এখন কার দেহের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে।

রাজা-পেটেল বললো—আমার সন্দেহ হচ্ছে, ঐ হীরেমন পাখীটার দেহের ভেতরই সে প্রবেশ ক'রেছে।

কৃষ্ণ সিং বললেন,—বেশ ত, গ'ণেই দেখ-না; হাতে পাঁজী, কোন্ বার—তা নিয়ে তর্কের কি দরকার?

রাজা পেটেল তখন গ'ণতে বসলো। কষ্ট প'থরের এখানা

চৌকি সেই ঘরে অনেকখানি বারণা জুড়ে প'ড়ে ছিল; তার ওপরেই চ'ললো গণনার তোড়—আঁকের পর আঁকে খড়ির সাদা দাগে অভ-বড় পাখরখানা ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ভরে গেলো,—কিন্তু কিছুতেই রাজা-পেটেল খুঁজে পেলো না—রাজার আত্মা কোথায় লুকিয়ে আছে,—হীরেমনের সেই পাগলটাকা দেহটির ভেতরে, না আর কোনো ব্যাগায়! শেষে হাতের খড়িখানা ছুড়ে ফেল-দিয়ে সে বলে-উঠলো,—হ'ল না; এত চেষ্টাতেও খুঁজে পেলুম না, আর পাবোও না এ জন্মে!

হুই মন্ত্রীই একসঙ্গে চার চোখ পাকিয়ে তার পানে চেয়ে বলে উঠলেন,—ও কথার মানে?

রাজা-পেটেল বললো,—মানে এই, যে সিদ্ধপুরুষ এই গণনা বিজ্ঞাটি আমাকে শিখিয়েছিলেন, তিনি সতর্ক ক'রবার জন্মে বলে-দিয়েছিলেন, দেহ-মন অঙ্ক হ'লে এ বিজ্ঞা ফলবে না; সবই গুলিয়ে যাবে। এখন তাই তো হয়েছে দেখছি; আমার বিজ্ঞে সব গুলিয়ে গেছে—তাই গ'ণতে পারলুম না। এখন কি করা যায় বলুন।

মন্ত্রীরা তখন মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন,—তাই ত! তাহ'লে এখন উপায়? ঐ হীরেমনটা যদি সত্যিই রাজা হয়?

রাজা-পেটেল বললো,—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? ব্যাধ যে মরা-তোতটা এনেছে, ঐটি নিশ্চয়ই সেই তোতা—যার জন্মে আমরা এত কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছি। সেও মাথা খেলিয়ে এই চাল চলেছে—তোতার দেহ থেকে বেরিয়ে কোন রকমে হীরেমনের দেহের ভেতরে সোঁধিয়েছে। নইলে আমাকে দেখেই অমন ক'রে শাসায়? নিশ্চয়ই ওর ভেতরে র'য়ে-গেছে রাজা দীপকর; এখন আপনারা যেমন ক'রেই পাবেন—ঐ হীরেমনটাকে রাতারাতি নিকেশ ক'রে ফেলুন। নিশ্চিত হওয়া যাক।

কৃষ্ণ সিং বললেন,—তাকে নিকেশ করা তো এখন সোজা নয়; যেখানে সে আছে—সেখানে কারও চালবাজী চলবে না; সে বড়ই কঠিন ঠাই।

প্রসাদ সিং বললেন—ঐ ব্যাধটাকে আগে হাত করতে হবে। আমার মনে হয়, গে অনেক খবর দিতে পারবে।

রাজা-পেটেল বললো,—কিন্তু রাজকন্তা তাকে নজরবন্দী ক'রে রেখেছেন। পাখী-মারার শাস্তি তাকে নাকি নিতে হবে। রাজকন্তা পক্ষিরাণীকে নিয়ে তার অপরাধের বিচার করবেন।

কৃষ্ণ সিং বললেন,—তার আগেই আমরা তার সঙ্গে দেখা করবো।—তার পর তিনি প্রসাদ সিংকে বললেন,—এসো, আমরা ব্যাধের সঙ্গে আগে বোঝা-পড়া করি; তার পর অঙ্ক ব্যবস্থা, অর্থাৎ কেমন ক'রে ঐ হীরেমনটাকে সরাতে পারি, তার উপায় স্থির করা যাবে।

রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—আবার কিরছেন ত ?

কৃষ্ণ সিং বললেন,—নিশ্চয়ই ; তুমি কিন্তু ঘুমিও না যেন, জেগে থেকে। আমরা কিরবই, এক ঘণ্টা হোক, দু'ঘণ্টা হোক, আর পাঁচ ঘণ্টাই হোক—রাত পোহাবার আগেই কিরবো, আর এর একটা হেস্ট-নেস্ট ক'রবই করবো।

প্রসাদ সিং বললেন,—তুমি যদি ঠিক থাক, কার সাধ্য তোমাকে ঠকায় ? রাজার দেহ সাক্ষী দেবে—রাজা তুমিই। পাখীর কথা কি দাম ? হ্যাঁ, তবে সন্দেহ যখন হ'য়েছে, পাখীটাকে সরানো চাই-ই।—বলেই দু'জনে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অতিথিশালার বে-ঘরে ব্যাধের-পো সমস্ত দিনের পর রাজ-ভোগ খেয়ে দিব্যি পরিষ্কার বিছানার জাড় হ'রে শুয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিলো, হুই মন্ত্রী এলেন সেই ঘরের সামনে। তাঁরা দেখলেন, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, বড় বড় দুটো কড়ায় মজবুত একটা তালা লাগানো। কিন্তু দরজার কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে, আর সাদা বিছানার ওপর কুচকুচে কালো চেহারার একটা লোক শুয়ে আছে।

রাজার হুই মাতব্বর মন্ত্রীকে তত রাতে অতিথিশালার নজরবন্দী ব্যাধের ঘরটির সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেই, বেঁটে-রকম একটা ছোট ছেলে ছুটে এসে, হেঁট হ'রে তাঁদের গড় ক'রে মুখখানি তুলে দাঁড়ালো। তার চোখদু'টি যেন জিজ্ঞাসা ক'রছিল—কি চাই আপনাদের মশায় ?

মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং বললেন,—বিকলে যে ব্যাধ একটা মরা পাখী নিয়ে এখানে এসেছিল, তাকে বোধ হয় এই ঘরেই রাখা হ'য়েছে।

ছেলেটি হাত দু'খানি জোড় ক'রে খুব নম্র স্বরে বললো—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার জিহ্বাতেই তাকে রাখা হ'য়েছে।

প্রসাদ সিং বললেন,—এই লোকটাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার দরকার হ'য়েছে। তাই এত রাত্তিরে আমরা এখানে এসেছি। তুমি দরজার তালাটি খুলে দাও বাবা !—কি মিষ্টি তাঁর কথা, যেন রসগোল্লা !

হাতদু'টি তেমনই জোড় ক'রে নম্র স্বরে ছেলেটি বললো—বেশ ত, আপনারা একটু বসুন ; আমি এক-দৌড়ে গিয়ে রাজকন্ডার হুকুমটা নিয়ে আসি।

কথাগুলো ব'লেই সে অন্দরের দিকে তীরের মতো বেগে ছুটে চললো। হুই মন্ত্রী তার দিকে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন, ছেলেটিকে তাঁরা কোন কথা আর বলবারও সময় পেলেন না। ঘরের সামনেই বসবার আসন ছিল, কিন্তু তাঁরা সেখানে বসলেন না।

খানিক পরে ছেলেটি তেমনই ছুটেতে ছুটেতে এসে ব'ললো—তাই ত, এখন কি করি বলুন দেখি ? রাজকন্ডে তাঁর ঘরে নাক ডাকিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছেন ; অথচ তিনিই ব'লে রেখেছেন—'খবরদার ! আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ও-ঘরের তালাটি কখনো কাউকে খুলে দেবে না—তা যিনিই আশ্রম বা ছয়ার খুলতে বলুন !'

মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং বললেন—তোমার কোন ভয় নেই, দরজা তুমি খুলে দাও বাবা। আমি তোমাকে তালা খুলতে বলেছি—এ কথা শুনে রাজকন্ডা কিছুই বলবেন না।

ছেলেটি এ কথা ক'রে কোন উত্তর দিল না, মুখখানা নামিয়ে মাথা ভেঁজে দাঁড়িয়ে রইলো, দেখে মন্ত্রী প্রসাদ সিং জামার ভেতর থেকে

একটি মোহর বের ক'রে বললেন,—দেখ বাবা, ঐ ব্যাধটার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে ; আমরা ত আর রাজকন্ডের হুকুমের আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে। তার চেয়ে এক কাষ কর,—এই মোহরটি তুমি নিয়ে রাখ, মিঠাই কিনে খেও। সুড়-সুড় ক'রে দরজার তালাটি খুলে দাও ত, কেউ এ-কথা জানতে পারবে না ; আর জানলেও তোমাকে সে জন্তে গাল খেতে হবে না।

মোহরটি দেখে লোভে ছেলেটার চোখ-দুটো যেন চক্-চক্ ক'রে উঠলো। চিলে যেমন খাবারের ঠোঙ্গার ওপর ছোঁ মেরে খাবার তুলে নেয়, ঠিক তেমনি ক'রেই ছেলেটি মন্ত্রী প্রসাদ সিংয়ের হাত থেকে মোহরটি তুলে নিল ; একগাল হেসে সে বললো—বাঃ, বেশ ! আপনাকে আর কিছুই বলতে হবে না ; আমি এখনি তালা খুলে দিচ্ছি। সোণার টাকা চোখেই দেখিছি, হাতে কখন পাইনি। আপনাদের দয়ায় সেই মোহর পেয়েছি হাতে, দরজাটা কি আর খুলে না দিয়ে পারি ? না হয় রাজকন্ডের কাছে দুটো বকুনিই খাবো, কিন্তু মোহরটা ত আমার ভোগে লাগবে।

মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং বললেন—বকুনিই বা খাবে কেন ? নাই বা জানালে রাজকন্ডাকে এ-কথা। এত রাত্তিরে এ-দিকে আর কেউ ত নেই ; তুমি যে দোর খুলে দিয়েছ, কি ক'রে তিনি তা টের পাবেন ? তোমাকে বকুনি থেকে বাঁচাতে আমরা না হয় কথাটা চেপেই রাখবো।

ছেলেটি এক-মুখ হেসে অমনি ব'লে-উঠলো,—সত্যি ? বাহাঃ ! তাহ'লে আর আমার ভাবনা ? আশ্রম—আপনারা, আমি দোর খুলে দিচ্ছি।

সাজানো ঘরে নরম তুলতুলে ধব-ধবে বিছানার শুয়ে ব্যাধের-পো'র ঘুম হচ্ছিল না, শুয়ে শুয়ে সে কত-কি ভাবছিল ; এমন সময় দোর-খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হোমরা-চোমরা দু'টি মানুষকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে ব'সলো। ভয়ে তার মুখখানা তখন শুকিয়ে গেছে।

মন্ত্রী প্রসাদ সিং জিজ্ঞাসা করলেন—তুমিই ত সেই মরা তোতা পাখী বেচতে এনেছিলে ?

ব্যাধ বিছানা থেকে নেমে হেঁট হ'য়ে প্রণাম ক'রে ব'ললো—আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্ম্মাবতার,—আমিই সেই ব্যাধ।

মন্ত্রী কৃষ্ণ সিং বললেন—এখন আগাগোড়া সব কথা আমাদের কাছে খুলে বল ত ওস্তাদ ! কি ক'রে পাখীটাকে পেয়েছিলে, কোথায় এ-পাখী ছিল, আর কার হাতে কেমন ক'রে সেটা শিঙে ফুকলো,—কিছু না লুকিয়ে সব খুলে বলো।

ব্যাধের বুকের ভেতরটা টিপ-টিপ ক'রে উঠলো। তোতার ব্যাপারটা গোড়া থেকেই সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়লো রাজকন্ডার হুকুম—'কারও কাছে তুমি এ-সব বলতে পাবে না', এমন কি, রাজা নিজে যদি জিজ্ঞাসা করেন—তবুও চেপে যাবে।' কথাগুলো যেন চাবুকের মত পিঠে প'ড়ে তাকে সতর্ক ক'রলো। সে তখন মনটিকে বেশ শক্ত ক'রে বললো,—আমার কোন কসুর হয়নি ধর্ম্মাবতার ! আমার হাতেও পাখীটা মারা পড়েনি। চ'্যাড়া শুনেই রাতারাতি বনের ধারে জাল পাতি। এক পাল তোতা সে জালে প'ড়েছিল, কিন্তু ধরবার আগেই ফুড়ু-ফুড়ু ক'রে আর সবগুলোই উড়ে পালালো, শুধু একটি পড়লো ধরা। তাকে বাঁচার পুরে রাজবাড়ীতে আনছিলুম। আমি ত জানতুম, অ্যাঁত তোতাই আমার বাঁচার আছে ; কিন্তু আমার বরাতের দোষে পথেই

সে অক্ষা পেলো। কি করি, লোভটা আর ছাড়তে না পেরে সেই মরা ভোতাই বেচতে আনি। ভেবেছিলুম, হয় ত কিছু মিলবে; কিন্তু শেষকালে এমন উঃড়া কাঁসাদে পড়তে হবে, তা জানলে কি আর এ-পথ মাড়াই? বরাত—বরাত!—বলেই ব্যাধের-পো ছ'হাতে কপাল চাপড়তে লাগলো।

ছই মন্ত্রী মিলে তাকে অনেক জেরা করলেন; কিন্তু ব্যাধ এমন জাকা সেক্জে জেরার জবাব দিতে লাগলো যে, একটিও কাবের কথা তার মুখ থেকে তাঁরা বার করতে পারলেন না।

পাহারাদার ছেলেটি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিলো। মন্ত্রীদের জেরা শেষ হ'লে সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো,—দরজা কি এবার বন্ধ করবো? অনেক রাত হ'য়ে গেছে কি না!

মন্ত্রীরা কিছু না ব'লে গম্ভীর হ'য়েই সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছেলেটি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তালায় চাবি দিতে লাগলো। এ-দিকে ছই মন্ত্রীর মধ্যেও চুপি-চুপি একটা পরামর্শ হ'য়ে গেল।

ছেলেটি চাবি বন্ধ ক'রে মন্ত্রীদের সামনে এগিয়ে এসে বেশ মিনতির স্বরে বললো—এখন আপনাদের হাতেই সব; যদি চেপে বান ভালই, আর যদি ব'লে দেন—আমার লাঞ্ছনায় তখন হয় ত ঞ্চাল-কুকুর কানবে। রাজকন্ডের বা মেজাজ, কণেক তুই, কণেক কষ্ট, আমার অদেটে যে কি আছে, ভগবানই জানেন।

প্রসাদ সিং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দেশ কোথায় থাকা? ছেলেটি উত্তর দিলো—আরায়। ভিন মুলুকের রাজ্যের এলাকা সেটা।

প্রসাদ সিং বললেন,—রাতারাতি বড়লোক হ'তে চাও থাকা? ছেলেটি অবাক হ'য়ে মন্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে রইলো, উত্তর দিতে পারলো না। প্রসাদ সিং এবার কথাটা একটু সোজা ক'রে বললেন,—কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারোনি; যা বলছি, তা বেশ-ক'রে মন দিয়ে শোনো। একটা কাষ যদি এই রাতারাতি তুমি করতে পারো, আমরা তোমাকে এত টাকা শিরোপা দেব যে, আর তোমাকে রাজকন্ডার মন জুগিয়ে চাকরী ক'রে খেতে হবে না, আরায় ফিরে গিয়ে বড়মাসুখী-চালে সারা জীবনটা কাটাতে পারবে।

ছেলেটার চোখ দুটো লোভে আবার তেমনিই চক্-চক্ ক'রে উঠলো। মনের আনন্দ আর চাপতে না পেরে সে ব'লে-উঠলো—একটা মোহর পেয়েই মন আমার বদলে গেছে; মনে হচ্ছে—নকরী কি ঝকমারীর কাষ; কত সাধই মনে জাগছে! তা দেখুন, ঠিক এই রকম আর দশটি মোহর যদি আপনাদের কাছে পাই, তবে এমন কোন কাষ নাই যা আমি করতে গররাজি হবো—মাসুখ খুন করতেও আমার আপত্তি হবে না—যদি ধরা না পড়ি।

প্রসাদ সিং একটু হেসে তাড়াতাড়ি বললেন,—না, না, মাসুখ খুন তোমাকে করতে হবে না, আমরা তোমাকে অতটা বেপরোয়া হ'তে বলি-নে;—আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটা পাখী, সেটাকে যদি খুন করতে পারো—

মন্ত্রীর কথা শেষ না-হ'তেই ছই চোখ কপালে তুলে সে বলে-উঠলো—ও-বাবা, তবেই সেরেছে! এ রাজ্যে যে পাখী খুন করলেও সাজা নিতে হয়; দেখছেন না—ঐ ব্যাধটাকে কেমন নজরবন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছে। তবু ত সে নিজের হাতে খুন করেনি তার তোতাকে। পাখীকে খুন করলে রাজকন্ডে কি আর আমাকে আস্ত

রাখবেন? ছ'টুকরো ক'রে কেটে কেমনে বাগে! যে যাগী মেরে—বাপ-রে।

মন্ত্রী বললেন—তোমার নাগাল পেলো ত! আর কেমন ক'রেই বা টের পাবেন তিনি—যে তুমিই তাঁর পাখীকে মেরেছ? আমাদের কথা-মত যদি কাষ কর, কাক-চিলেও জানতে পারবে না; মাঝ-থেকে তুমি বড়মাসুখ হ'য়ে যাবে হে। দশ মোহর কি ব'লছ? ও ত খোড়াই; এত মোহর তোমাকে দেওয়া যাবে যে, তুমি ছ'হাতে অমন কত দশ মোহর এক দিনেই উড়িয়ে দিতে পারবে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে ছেলেটার চোখ দুটো যেন পরম আনন্দে নেচে নেচে উঠছিল, মুখখানায় তার হাসি আর প্বরছিল না। তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর কাছটিতে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলো—আগে বলুন ত, কি করতে হবে? রাজকন্ডের বিস্তার পাখী কি না, কোনটাকে রাতারাতি সাবাড় করতে হবে?

মন্ত্রী প্রসাদ সিং চার দিকে চেয়ে—আশে পাশে কেউ নেই দেখে চাপা-গলায় ব'ললেন,—আজ বিকেলে পক্ষিরাণী যে পাখীটাকে এনেছে—

চোখ-দুটো বড় ক'রে ছেলেটি বলে উঠলো,—ঐ হীরেমন পাখীটাকে?

প্রসাদ সিং বললেন,—চুপ, আস্তে। ঐ হীরেমনটি হচ্ছে এ রাজ্যের হুম্বন; রাজকন্ডাকে লুকিয়ে তাকে মারতে হবে। মারবার এমন কন্দী তোমাকে ব'লে দেব—এক লহমায় কাষটা শেষ হ'য়ে যাবে, কেউ টের পাবে না। এসো—কাণে কাণে কারদাটুকু শিখিয়ে দিই।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছেলেটির কাঁধের কাছে মুখখানা নামালেন; ছেলেটিও কন্দীটা শোনবার জন্তে কাণ খাড়া ক'রে বৈল।

রাজা-পেটেল তার সাজানো-গোছানো মস্ত বড় শোবার ঘর-খানার ভেতর এ-মুড়ো থেকে সে-মুড়ো পর্যন্ত অনবরত পাইচারী ক'রে বেড়াচ্ছিল, আর—চলতে চলতে এক একবার ধম্কে দাঁড়িয়ে কত কথাই ভাবছিল; ঘরের মাঝখানে হাতীর দাঁতের এক চমৎকার পালঙ্কের ওপর এক হাত পুঙ্ক আর দুধের মত সাদা ধবধবে বিছানাটি খালি পড়ে' রয়েছে, রাজা-পেটেলের তা ছোঁবারও সুরসং হয়নি। হঠাৎ রাজবাড়ীর পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে তিনটে বেজে গেল; শব্দগুলো মনে মনে গুণেই রাজা-পেটেল চমকিয়ে হঠাৎ দরজার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে দোরের সম্মুখে টাঙ্গানো সোনার ঝালর-দেওয়া পরদাখানা হুলে উঠলো, আর তা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন ছই মাতব্বর মন্ত্রী—কৃষ্ণ সিং আর প্রসাদ সিং।

রাজা-পেটেল এঁদেরই প্রতীক্ষা করছিলো। সে চেয়ে দেখলো—ছ'জনেরই মুখে হাসি, চোখের দৃষ্টি যেন আগেই জানাচ্ছে—ভয় নেই, কাষ হাসিল ক'রেই এসেছি।

রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—তাহ'লে খবর বোধ হয় ভাল? কৃষ্ণ সিং বললেন,—এই মাথার বুদ্ধি এত-বড় রাজ্যটাকে চালাচ্ছে, একটা মেরের বুদ্ধিকে আর অচল করতে পারবে না?

প্রসাদ সিং হাসি-মুখে বললেন,—এই বুদ্ধির দমকে হীরেমনের দম একদম বন্ধ হ'য়েছে।

কথাটা শুনেই আত্মদে রাজা পেটেলের দমবন্ধ হবার জো

আর কি ! তার পর সে জিজ্ঞাসা করলো,—কি করে সেটা সম্ভব হ'ল ?

কৃষ্ণ সিং জানালেন,—যার শিল বার নোড়া—তারই ভেঙ্গেছি হাতের গোড়া।—এই ভাবেই কাঁচ শেষ করা হ'য়েছে।

শ্রীমাদ সিং বললেন,—রাজকন্ডার অল্পগত বিখ্যাতী লোক দিয়েই পাখীটাকে বিষ খাওয়ানো হ'য়েছে। অর্থাৎ পেয়েছে, এ খবর নিয়ে তবে এখানে এসেছি। রাজকন্ডা এই মাত্র জেনেছেন; এখন শোক চলছে। তোমার কথাই ঠিক; যে সব কথা শুনলুম, রাজা দীপকর ওর ভেতরেই সঁদিয়েছিল। আজ তার সব লীলাই সাজ হ'ল। এখনই তুমি সে খবর পাবে। তুমি এখন বিছানার ওয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকো। আমাদের এখন এখানে থাকা ঠিক হবে না! টাকা দিয়ে অনেকের মুখ বন্ধ করতে হ'য়েছে। সবার ওপর ঐ খুনে-ছোকরাটা একটা মস্ত আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; সেটাকেও বিলিপ্তর শোঁকাতে হবে এই রাস্তারই;—এ কাণ্ডের ঐ হচ্ছে এখন একমাত্র খোঁচ, ওটাকে না ভাঙলে নিশ্চয় হবার জো নেই। কাল সব শুনো, এখন তাড়াতাড়ি ওয়ে পড়ো!—কথা শেষ ক'রে দুই মন্ত্রী স'রে পড়লেন।

এ-মহলে বতগুলো পাহারাদার ও তাদের উপরওয়ালা ছিল, মন্ত্রীরা টাকা দিয়ে আগেই তাদের সকলকে হাত ক'রেছিলেন।

রাজা-পেটেল এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিছানার ওপর দেহটা এলিয়ে দিলো। নেহের ভেতরের মনটা তার এবার আনন্দে যেন নেচে উঠলো; আর সেই নাচের গমকে ফস্ ক'রে ভেসে উঠলো পাশাপাশি দু'টি পরীর মতন সুন্দরী কন্ডার রূপ। একটি হচ্ছে—রাজকন্ডা, অর্থাৎ পক্ষিরাজী। রাজকন্ডা ত তার মুঠোর ভেতরেই আসে-আসে হ'য়েছে; এখন পক্ষিরাজীকেও অল্প হাতের মুঠোর ভেতর আনতে তার মনটা যেন হঠাৎ উসুখুসু করতে লাগলো। এই মেরটিকে তার ভারি ভালো লেগেছিল; মনটা সে-সময় মুসড়ে ছিল ব'লেই মুখে কিছু বলেনি সে, কিন্তু তার মনের ভেতরে যে সাধটি ভাল-পাল পাকাছিল—তার অন্তর্ধ্যামী ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারেনি।

পক্ষিরাজীর কথা ভাবতে ভাবতে রাজা-পেটেলের চোখের পাতা ঘুঘুর হাওয়ার যেন জড়িয়ে এলো, ঘুঘুর সঙ্গে সঙ্গে পক্ষিরাজীও যেন পরীর মতন পাখি মেলে স্বপ্নের বাতাসে ভর দিয়ে রাজা-পেটেলের মনের ভেতরে উড়ে এলো। রাজা-পেটেলের মনে হ'ল—তারও যেন দু'টি পাখা গজিয়েছে, কিন্তু পক্ষিরাজী এমনি দুটু যে, পাখাদু'টি ধ'রে রেখেছে জোর ক'রে, কিছুতেই তাকে উড়তে দেবে না। রাজা-পেটেল বতই মিনতি ক'রে বলে—'ছেড়ে দাও, পক্ষিরাজী, ছেড়ে দাও আমাকে!' পক্ষিরাজী ততোধিক শক্ত হ'য়ে দুটুমীর হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে বলে—'উহঁ, তা হবে না; ছাড়া তুমি পাবে না, আমার কাছেই চিরবন্দী হ'য়ে থাকবে।'

উঠুন, উঠুন—কত ঘুমুচ্ছেন!—নরম হাতের পরশের সঙ্গে পরিচিত গলার সুমিষ্ট স্বরের আমেজে রাজা-পেটেলের এমন সুখের ঘুমটি হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। দুই চোখ রগড়ে সামনে ভালো ক'রে চাইতেই মুখখানা তার হাসিতে ভরে উঠলো; ধড়মড় ক'রে উঠে-বসেই সে বললো—ভারী আশ্চর্য্য তো! এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে আপনারই সঙ্গে যে আলাপ করছিলাম! চোখ-মেলোই দেখছি—এখানেও আপনি, একবারে সশরীরে সামনে হাজির!

চোখে-মুখে কোঁতকের ভঙ্গী ফুটিয়ে পক্ষিরাজী বললো,—কি ভাগ্যি আমার! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমারই সঙ্গে আপনি আলাপ করছিলেন? কিন্তু দেখবেন, রাজকন্ডার কাছে যেন কস্ ক'রে কথাটা কাঁচ ক'রে ফেসবেন না, তাহ'লে তিনি হয় ত মানে বসবেন।

রাজা-পেটেল মুখখানা গম্ভীর ক'রে বললো,—রাজকন্ডার কথা আর বলবেন না! আগে ভালর ভালর বিয়েটা ত হয়ে বাক্, তার পর দেখ বো তিনি কত মুরোদের রাজকন্ডা, আর আমি কি রকম মরদ রাজা—

আড়-চোখে এই মামুষটার মুখের নিষ্ঠুর ভঙ্গীটা লক্ষ্য ক'রে পক্ষিরাজী বললো—কি আলাপটা করছিলেন আমার সঙ্গে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, বলুন না—শুনি!

রাজা-পেটেল পক্ষিরাজীর মুখের দিকে বেহারার মতন তাকিয়ে থেকে বললো—সে ভারি মজার স্বপ্ন! আপনি যেন আমাকে জোর ক'রে ধরে রেখেছেন, কিছুতেই ছাড়বেন না; বত বলি—ছাড়ুন, আপনিও অমনি মাথা নেড়ে বলেন—'উহঁ, আপনি আমার চিরবন্দী।'—বলেই রাজা-পেটেল হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। তার পর পক্ষিরাজীর পানে এক নজরে চেয়ে বললো—এ স্বপ্ন যদি সত্যি হয়?

পক্ষিরাজী একটা নিশ্বাস ফেলে বললো—কিন্তু হবার যে উপায় নেই রাজা! দু' ছুটো বাধা—

চমকে-উঠে রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—কেন, কেন? কিসের বাধা?

পক্ষিরাজী মুখখানি মলিন ক'রে বললো—শোনেননি? রাজকন্ডার হীয়েমন কাল রাস্তার পটল তুলেছে। তার শোকে তিনি পাগল! আমি সেইজন্মেই তো তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাকতে এসেছি।

মনের আছাদটুকু চেপে রেখে মুখে দুঃখের ভাবটুকু আনবার চেষ্টা করতে করতে রাজা-পেটেল বললো—বলেন কি! হীয়েমনটা হঠাৎ ম'রে গেছে? আহা হা—অমন-খাসা বচনবাগীশ পাখী—

পক্ষিরাজী বললো—ব্যাপার বা দেখছি, হয় ত বিয়েটা আপনার আরও পেছিয়ে যাবে। কাষেই এটা একটা বাধা ছাড়া আর কি?

রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—বাধা বলছেন কেন বলুন ত? পক্ষিরাজী বললো—বাধা নয়? রাজকন্ডার সঙ্গে আগে বিয়ে না হ'লে ত আর আমার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা উঠতে পারে না। তা-ছাড়া, আমাকে বিয়ে করতে হ'লে আপনাকেও একটা পরীক্ষা দিতে হবে। সে-ও একটা মস্ত বাধা যে!

চোখের পাতাগুলো কুঁচকে রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—পরীক্ষাটা আবার কিসের?

পক্ষিরাজী বললো—রাজকন্ডার কাছে শুনিছি, আপনি নাকি নিজের দেহ থেকে বেরিয়ে মড়ার দেহে ঢুকে তাকে বাঁচাতে পারেন! এই পরীক্ষা দিয়েই তো রাজকন্ডাকে জয় ক'রেছেন। এখন আমাকে জয় করতে হ'লেও এই পরীক্ষাই আপনাকে দিতে হবে। আমি ত একথা বিশ্বাসই করিনি; কিন্তু রাজকন্ডা বলেছেন—ও-কথা সত্যি। তাই সেই কথা শুনে পর্যন্ত পরীক্ষাটা নেবার জন্তে আমার মনটা উসুখুসু করছে।

রাজা-পেটেল বললো—আপনি বা শুনেছেন তা মিছে নয়।

মড়ার দেহে চুকে আমি তাকে বাঁচাতে পারি; কিন্তু আমি সেই দেহ থেকে বেরিয়ে এলেই সে, যে মড়া—সেই মড়াই থাকবে।

পক্ষিরাজী বললো—তা থাকুক গে! আপনি যে এটা পারেন, এত বড় একটা বিজ্ঞের আপনি জাহাজ, শুধু সেইটুকুই আমি দেখতে চাই। আপনি যদি সত্যিই এ পরীক্ষের জিতে যান, তাহলে—

পক্ষিরাজী কথা শেষ না করেই তার চোখ দুটোর এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে রাজা-পেটেলের মুখের দিকে তাকালো। রাজা-পেটেল সেই দৃষ্টিতে বেন কেমন বিহ্বল হ'য়ে গেল; তার পর বললো—আচ্ছা, আমি রাজী। কিন্তু কথা রইলো—আমার স্বপ্ন মিছে হ'তে দেবে না।

মুচকি হেসে পক্ষিরাজী বললো—ভোরের স্বপ্ন কি কখনো মিছে হয় রাজামশায়!—আমি কথা দিচ্ছি, কিছুতেই আপনাকে কাছ-ছাড়া করব না, চিরবন্দী ক'রেই রাখবো। স্বপ্ন আপনার ফলবে—ফলবে—ফলবে।

রাজা-পেটেল বললো,—তাহলে এতগুলো মড়া একটা চাই তো, তার যোগাড় করতে হবে।

পক্ষিরাজী বললো—একটা মড়ার যোগাড় করা আর এমন শক্ত কি? রাজকন্ডের অত-বড় চিড়িয়াখানা, নিত্যই ত একটা না একটা জানোয়ার মরছে।

রাজা-পেটেল এবার চমকে-উঠে বললো—তা বলে রাজকন্ডের ঐ সাধের মরা হীরেমনের দেহের ভেতর আমি চুকবো না—এ-কথা কিন্তু আগেই ব'লে রাখছি।

পক্ষিরাজী বললো—না গো মশায়, তার দরকার হবে না; আমি কি বোকা?—হীরেমনের সে গালি-গালাজ আপনি এখনো ভুলতে পারেন-নি, তা কি আমি জানি না? আমি এমন পরীক্ষের যোগাড় করেছি, যাতে সাপও মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না। রাজকন্ডের সামনেই পরীক্ষটা হবে, আর আমাদের বাঁধাবিধির কথাটাও অমনি—বুঝছেন?

রাজা-পেটেল হাঁ করে এই মুখেরা মেয়েটির পানে চেয়ে রইলো। রাজ্য, রাজকন্ডা—সমস্তই তার সামনে থেকে বেন সরে গেছে—শুধু ভাসছে এই অদ্ভুত মেয়েটি—পক্ষিরাজী!—তার পানে চেয়েই আমতা-আমতা ক'রে রাজা-পেটেল বললো—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, পক্ষিরাজী!

পক্ষিরাজী অমনি খপ ক'রে রাজা-পেটেলের হাতখানি ধরে মুহুম্বল একটি টান দিয়ে, চোখের কালো কালো তারা দু'টি ব্রিয়ে বললো—বুঝিয়ে দেবো রাজকন্ডের সামনে, এখন চলুন ত!

রাজা-পেটেল মুখটি বন্ধ ক'রে চললো পক্ষিরাজীর সঙ্গে;—বেন কাচপোকা তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে চললো।

রাজকন্ডা তার ঘরেই বসেছিল। আজ তার মুখে হাসি নেই, চোখের পাতাগুলি বেন ভিজ, স্কন্দর ঠোঁঠহু'টি বিরস, দৃষ্টি উদাস।

ঘরের মাঝে বেনারসীর পরদাটা গুটানো রয়েছে, আর সোনার দাঁড়ে হীরেমনের মৃতদেহটা হুলছে। রাজকন্ডার কোলের ওপর গুরে প্রকাণ্ড একটা মদা বেজি তার গলার হারছড়াটি নিয়ে খেলা করছে। খানিক তাকাতেই ব্যাধের সেই খাঁচা; তার ভেতরে তোতা পাখীর মৃতদেহটা কাত হ'য়ে পড়ে আছে।

পক্ষিরাজীর সঙ্গে রাজা-পেটেল ঘরে ঢুকতেই রাজকন্ডা বললো—

আমুন, আপনার মনকামনাই সিদ্ধ হয়েছে;—হীরেমন পালিয়ে গেছে আপনার ভয়ে। ঐ দেখুন, তার মরা শরীর দাঁড়ে বুলছে।

রাজা-পেটেল মুখখানা ভার ক'রে বললো—আমার মনকামনা সিদ্ধ হ'য়েছে—এ-কথা বলবার হেতুটা কি?

রাজকন্ডা বললো—আপনাকে প্রথমে দেখেই সে কথো উঠেছিল, মন্দ বলেছিল; আপনি তাতে খুব রেগেছিলেন। কিন্তু আসলে ওটা যে পাখী, সেখানো বুলিই বলে—সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন আপনি।

রাজকন্ডার মুখে এ-কথা শুনে রাজা-পেটেল বেন অনেকটা আশস্ত হলো। রাজকন্ডার পানে শুধু একটবার চেয়ে আস্তে আস্তে পাশের একটি সোফার ওপর হেলান দিয়ে সে বসে পড়লো, কোন উত্তর আর দিলো না।

রাজকন্ডা আড়চোখে চকিতের মত তার দিকে চেয়ে মুখের ভাবটুকু আরও একটু গভীর ক'রে বললো—কাল রাত হুপুর পর্যন্ত বেচারা বেশ ভালোই ছিল, তার পর কি যে হ'ল, কিছুই বুঝতে পারলুম না!

রাজা-পেটেল এবার বললো—ওর মরার শোকটা দেখছি আপনার খুবই লেগেছে। আপনি হয় ত বিশ্বাস করবেন না—আমিও মনে দারুণ ব্যথা পেয়েছি। রাগ? পাখীর কথা? না, পাখীর কথা আমি রাগিনি, রাগতে পারি নে।

রাজকন্ডা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললো—আর একটা দিনও যদি বেচারা বেঁচে থাকতো!

রাজা-পেটেল জিজ্ঞাসা করলো—তাহলে কি হ'ত?

রাজকন্ডা বললো—কাল রাত্তিরে ঠিক মাহুঘের মতন পষ্ট কথায় আমাকে বললো—‘আমার অনেক কথাই বলবার আছে, কাল রাজসভায় সবার সামনেই তা বলবো; শুনে সভাপুঙ্ক সব লোক অবাক হ'য়ে যাবে।’—সে কথা আর সে বলতে পেলে না, আমাদেরও তা শোনা হ'ল না।

রাজা-পেটেলের বুকের ভেতর কথাগুলো বেন হাতুড়ীর ঘা মারলো! মনে মনে সে শিউরে উঠে ভাবলো—ভাগিনা, বুদ্ধি খাটিয়ে আগেই ওটাকে নিকেশ করা গেছে; নইলে রাজসভায় সবই ত ফাঁস ক'রে দিত! সর্বনাশ হ'ত।

পক্ষিরাজীর কথায় তার চমক ভাঙলো। হাত দু'খানি জোড় ক'রে সে তখন রাজকন্ডাকে বলছিল,—আমার এত সাধের উপহারটি আনা বিফল হ'ল রাজকন্ডা! আমার বা আফশোস হচ্ছে—

রাজকন্ডা বললো—তোমার কি দোষ বোন! তুমি ত চেঁচায় কন্ডুর করনি! এমন পাখী আমাকে দিয়েছিলে, জীবনে যার জোড়া দেখিনি। পাখী মাহুঘের মতন কথা কয়,—তুমিই তা প্রথম দেখালে। এখন তুমিই বল, আমি তোমাকে কি দিয়ে খুসী করি?

পক্ষিরাজী আবার হাত-হু'টি জোড় ক'রে বললো—আমি যা চাইব, তা কি আপনি প্রাণ ধ'রে আমাকে দিতে পারবেন রাজকুমারী?

রাজকন্ডা বললো—খুব পারবো, বল, কি তুমি চাও?

পক্ষিরাজী একটুখানি কি ভেবে রাজা-পেটেলের দিকে তার ঠাপার কলির মত আঙ্গুলটি বাড়িয়ে ফস ক'রে বলে বসলো—আমি চাই ওঁকেই!

বিশ্বরে চোখ-মুখ বিকৃত ক'রে রাজকন্ডা বললো—এ্যা—
কি ব'ললে ? রাজাকে চাও তুমি ?

পক্ষিরাণী বললো—মাগে তাহ'লে আমার কথাটা শুধুন
রাজকুমারী ! আপনার মতন আমিও একটা পণ ক'রে মরেছি যে !
আপনার রাজার অদ্ভুত বিস্তার কথা শুনে ইস্তক আমি কি যেন
হ'য়ে গেছি ! কিন্তু নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত সে কথা বিশ্বাস
ক'রতে পারিনি । রাজাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে তিনি বললেন—সত্যি ।
কিন্তু এখনো আমি বিশ্বাস ক'রতে পারিছিনে রাজকন্ডা ! ব্যাধের ঐ
মরা পাখীটা খাঁচার ভেতরেই ত ম'রে প'ড়ে আছে ; উনি যদি ওর
মৃতদেহে চুকে ওঁর সেই অদ্ভুত বিস্তারের পরীক্ষা দিতে পারেন,—
তাহ'লে আমিও যদি ওঁকেই চাই, বলুন—আপনি তাতে আপত্তি
করবেন না—রাগ করবেন না—বাধা দেবেন না ?

রাজকন্ডা দিব্যি প্রশংসা মনেই বললো—বেশ, তাই হবে ।
আমি তাতে খুসীই হব, রাগ করবো না, আপত্তি ক'রে বাধাও
দেব না ।

খিল-খিল ক'রে হেসে, আর হুই হাতে তালি দিয়ে এবার
পক্ষিরাণী রাজা পেটেলের দিকে চেয়ে বললো—বুঝলে ত এখন
হাঁদারাম, দেখলে ত মেয়ে-বুদ্ধির দৌড়,—এখন তোমার বিস্তার
দৌড়টা দেখিয়ে বাজি মাত করো !

রাজা-পেটেল গম্ভীর হ'য়ে বললো—তবে দেখো ।—কথার
সঙ্গেই সে সোকার শীটে ঠেস দিয়ে ব'সলো, মনে হ'ল যেন ঘুমিয়ে
পড়লো । ওদিকে খাঁচার ভেতরে মরা তোতা পাখীটাও যেন ঘুম
ভেঙ্গে উঠে, ফুড়ুং ক'রে উড়ে খাঁচার ডাক্তিটার উপর ব'সলো,—তার
পর দিব্যি মানুষের মত স্বরে ব'লে উঠলো,—বিশ্বাস ত এখন হ'ল !

রাজকন্ডাও অমনি ধড়-মড় ক'রে এমন জোরে উঠে দাঁড়ালো যে,
তার কোলের ওপর শুয়ে যে বেজিটা এতক্ষণ দিব্যি ক্ষুণ্ডিতে খেলা
ক'রছিল—তার মৃতদেহটা গড়িয়ে মেঝের ওপরে ছিটকে পড়লো ।

সঙ্গে সঙ্গে সোকার ঘুমন্ত দেহটাও সজাগ হ'য়ে সোজা উঠে
দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর স্বরে বলে-উঠলো,—আমার দেহে এবার
আমি কিরে এসেছি রাজকন্ডা !

খাঁচার ভেতরে বহু তোতা পাখীটাও চোখ-মুখ খিঁচিয়ে কর্কশ
স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—মিথ্যাবাদী—বজ্জাতী—কারসাজী !

পক্ষিরাণীও অমনি ছুটে-গিয়ে হু'হাতে তোতার খাঁচাটা তুলে-
ধ'রে বললো—কে মিথ্যাবাদী ? কার কারসাজী ? আমার ?—
মিথ্যে-কথা ; নিশ্চয়ই আমি কথা রেখেছি । আমার কথাও রইলো,
আর তোমার স্বপ্নও ফসলো,—পক্ষিরাণী কিছুতেই তোমাকে কাছ-
ছাড়া করবে না, চিরবন্দী ক'রেই রাখবে । এখন রাজকন্ডার হুকুম—

রাজকন্ডা হাসিমুখে বললেন,—তুমি ওটাকে নিতে পারো,
আমি খুসী হ'য়েই তোমায় ওটা দান করবুম ।

রাজা দীপঙ্কর বললো—হুঃখের কথা, পেটেল তার দেহটা
নিজের হাতেই কেটে টুকরো-টুকরো ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে
দিয়েছে । থাকলে, তাকে আনিয়ে আনন্দ করা যেত ।

পক্ষিরাণী তোতার খাঁচাটা তুলিয়ে বললো,—এখন এই
তোতাই আমাদের আনন্দ দেবে । মাঝে মাঝে আমরা পাখীর
মুখে মানুষের ভাষা শুনবো !

আসল ব্যাপারটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ । এ-সব
তিনটি প্রাণীর বুদ্ধির ফল ; মন্ত্রীদেব চক্রান্তে—রাজা দীপঙ্করের

আত্মা হীরেমনের দেহ থেকে একটা সস্ত-মরা বেজীর দেহে আশ্রয়
নিয়েছিল ।

যে বেঁটে খাটো ছেলেটি হুই দিগপজ মন্ত্রীকে নিয়ে খেলিয়েছিল,
সে এই সময় আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে রাজার পারের কাছে মাথাটি
হুইয়ে ব'ললো—মন্ত্রী মশায়রা ছেলেটাকে তুলিয়ে ভেবেছিলেন,
মস্ত চাল চেলেছেন ; কিন্তু নিজেরাই মাত হ'য়ে লজ্জায় বিষ
গিলেছেন ।

রাজকন্ডা বললো—এতে হুঃখ করবার কিছু নেই । পাপের
শাস্তি এমনি ক'রেই পেতে হয় ।

রাজা হু' হাতে ছেলেটাকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে বললেন—
লোভের কাঁদে পড়নি বলেই তুমি রাজার কোলে উঠলে ; তোমার
সব ভারই আমি নিলুম ।

রাজকন্ডা তখন ব্যাধকেও ডেকে তার হাজার টাকার তোড়াটির
সঙ্গে আর একটি ঐ রকম তোড়া দিয়ে বললো, তোমাকে ঐ
তোতাটির খবরদারী করতে হবে । এর জন্তে তুমি মোটা মাইনে
পাবে, তোমার কোন কষ্ট আর থাকবে না ।

সখীরা এই সময় ছুটে এসে খবর দিলো—বান্ধালা থেকে বড়ো
রাজা পাত্র-মিত্র, লোক-জন নিয়ে ছেলের কাছে এসেছেন ।

রাজকন্ডা তার পটলচেরা চোখ দুটি মেলে রাজার পানে চেয়ে
বললো—কত কষ্টই তুমি পেয়েছ !

রাজা দীপঙ্কর তার হাত হু'খানি ধ'রে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন,—
আমার সব কষ্টই ঘুচে গেছে তোমাকে পেয়ে ।

পক্ষিরাণী অমনি তাহাতাড়ি কোথা থেকে একটা শাঁখ এনে
পো' ক'রে দিলে বাজিয়ে,—সখীরাও সঙ্গে সঙ্গে ছলু দিয়ে উঠলো ।

মন্দিরেও এই সময় সন্ধ্যার শব্দ বোঝে উঠতেই গল্পদাতা
বললেন—এর পর কি হ'ল বুঝতেই পারছ ; সেটা তোমরাই ভেবে
নিও । গল্প আমার শেষ হ'ল ।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রকৃতির পরিচয়

গাছ-পালার প্রাণ আছে ; গাছ-পালাও মানুষের মতো
শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে,—এ কথা সত্য ।

কিন্তু কি করিয়া গাছ-পালা শ্বাস-প্রশ্বাস লয় ?

বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান করিয়াছেন ।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রোফেসর পার্শি স্মিথ এই

তত্ত্বের নানা অনুসন্ধান প্রথম প্রবৃত্ত হন । দেওয়ালের
গায়ে মাছি বসিতে দেখিয়া সিনেমা-ক্যামেরায় সে

মাছির নানা ভঙ্গীর বহু চিত্র তিনি গ্রহণ করেন । তার
পর সে ছবি ছাপিয়া বেশ শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ-যন্ত্রযোগে

প্রত্যেকখানি ছবির পর্যালোচনা করেন এবং এই পর্যা-
লোচনার ফলে কীট-পতঙ্গ ও গাছ-পালার বহু গোপন
তথ্যাবিষ্কারে তিনি সমর্থ হইয়াছেন !

প্রজাপতি উড়িতেছে, বাতাসের দোলায় গাছের ছোট ফুল ছলিতেছে—এ সবেই ছবিও তিনি ক্যামেরায় তুলিয়াছেন। প্রজাপতি পাখা নাড়িয়া কি ভাবে ওড়ে, ফুলের কুঁড়ি কি করিয়া ধীরে-ধীরে দল মেলিয়া ফুটিয়া ওঠে,—তার ধারা-পর্যায় স্বিথ সাহেবের ছবিতে সুস্পষ্ট রেখায় ধরা পড়িয়াছে; এবং ত্রিশ বৎসরের সাধনার গৃহে যে চিত্রশালা তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে চিত্রশালাকে আজ সত্যই প্রকৃতির বিরাট কারখানা বলিয়া মনে হয়! মাকড়শা কি করিয়া তন্তু নিষ্কাশিত করিয়া জাল বোনে, তার ক্রম-পর্যায়ও স্বিথের ছবিতে ঝাঁক আছে! চারা-গাছ কি করিয়া মাথা তুলিয়া বড় হয়, মাছের ডিম ফাটিয়া



১। শিকড়ের গায়ে মিহি রেখা

কি করিয়া মৎস্য-শিশুর আবির্ভাব ঘটে, সিনেমা-চিত্রে স্বিথ সে রহস্য কাহারো নয়নাস্তরালে রাখেন নাই! এ চিত্রশালা আজ পৃথিবীর বিশ্বয় উৎপাদন করিয়াছে।

প্রকৃতি-সাধনায় তাঁর নিষ্ঠা অপরিসীম। গভীর রাত্রে তাঁর আলোক-রশ্মিপাতে ক্যামেরা লইয়া তিনি লতা-পাতা, পুষ্প-পল্লবের ছবি তুলিয়া বেড়াইতেছেন,—ছোট একটি কীটের পানে চাহিয়া ধ্যান-তন্ময় হইয়া আছেন—এ দৃশ্য নিত্য দেখা যায়; এবং এ ব্রত-সাধনে তাঁর পত্নী প্রধান সহায়!

স্বিথ সাহেব বলেন, ত্রিশ-বৎসরের সাধনায় আমি লক্ষ্য করিয়াছি, বড় হইতে কোনো কোনো গাছের সময় লাগে ছ'বৎসর, তিন বৎসর, দশ বৎসর! আবার কোনো গাছ ছ'এক মাসেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। কাজেই

গাছ-পালার পরিচয় গ্রহণ করিতে আমাকে অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইয়াছে। একটি গাছের ছবি আজ তুলিলাম, কাল তুলিলাম,—এমনি ভাবে ছ'বৎসর চার-বৎসর ধরিয়া নিত্য দিন এক-একটি গাছের ছবি তুলিতে হইয়াছে। সব ছবি ফিল্ম-ক্যামেরায় তুলিয়াছি। এ জন্ত কোনো ছবি দৈর্ঘ্যে হয় তো দশ-বারো হাজার ফুট হইয়াছে। ছবি তুলিয়া পর্দায় সে ছবি ফেলিয়া বার-বার দেখিয়া তবে তার অন্তরের রহস্য জানিতে

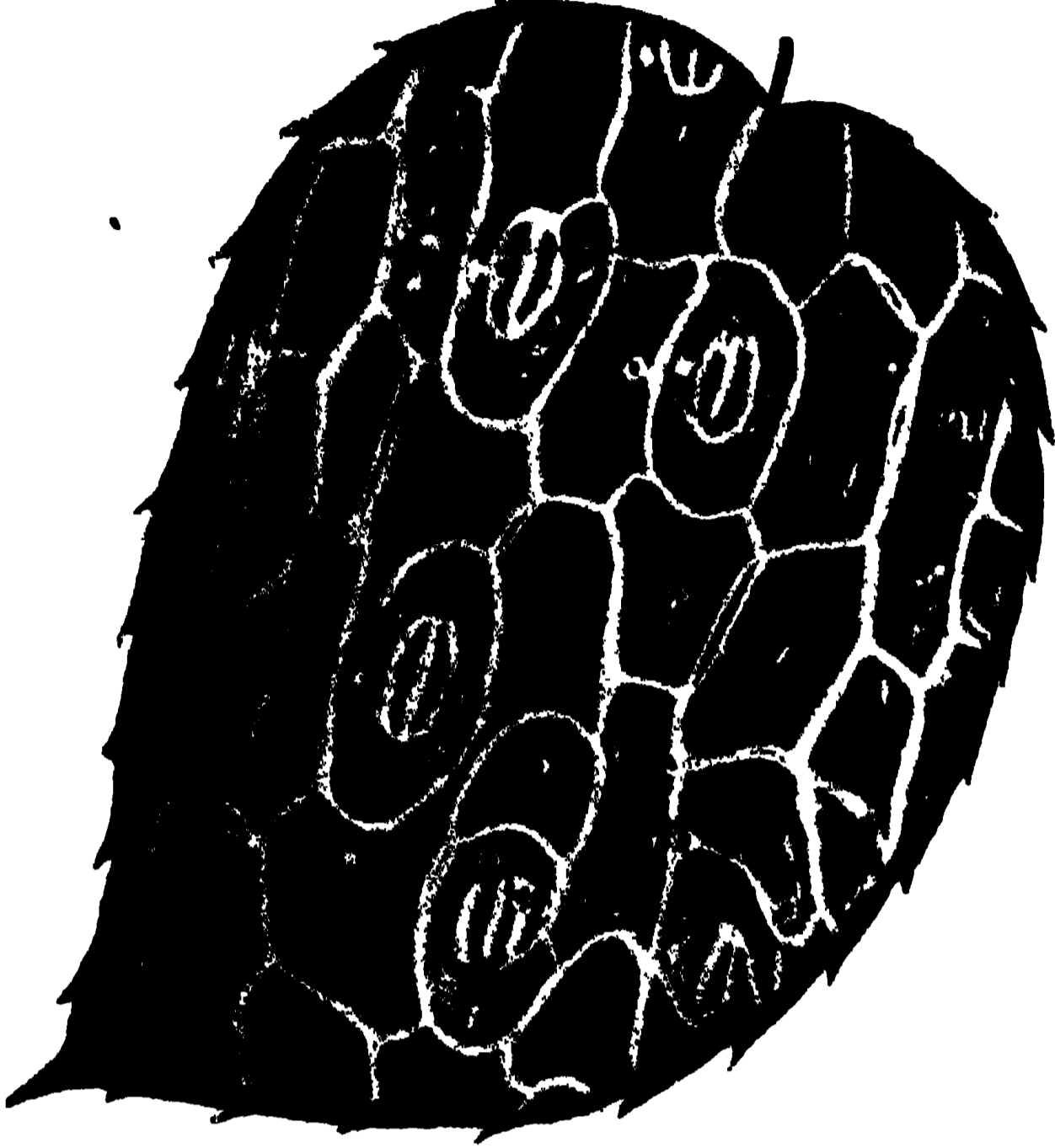


২। লাল-রস

পারিয়াছি এবং এমনি করিয়া প্রকৃতির ধরের চাবি খুলিয়া আজ আমি সে-ঘরের অনেক গোপন রহস্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছি।

খেলার ছলে অনেক সময় আমরা চারা-গাছ উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলি। গাভি, তুচ্ছ একটা গাছ! ফেলিয়া দিলে কি-বা ক্ষতি! কি-বা তাহাতে অনিষ্ট হইবে! কিন্তু এ তন্তু জানিয়া আজ বুঝিয়াছি, চারা উপড়ানো নিষ্ঠুরতা। দুর্বাদলকে পায়ে মাড়াইয়া পিষিয়া মারি, সে প্রাণ

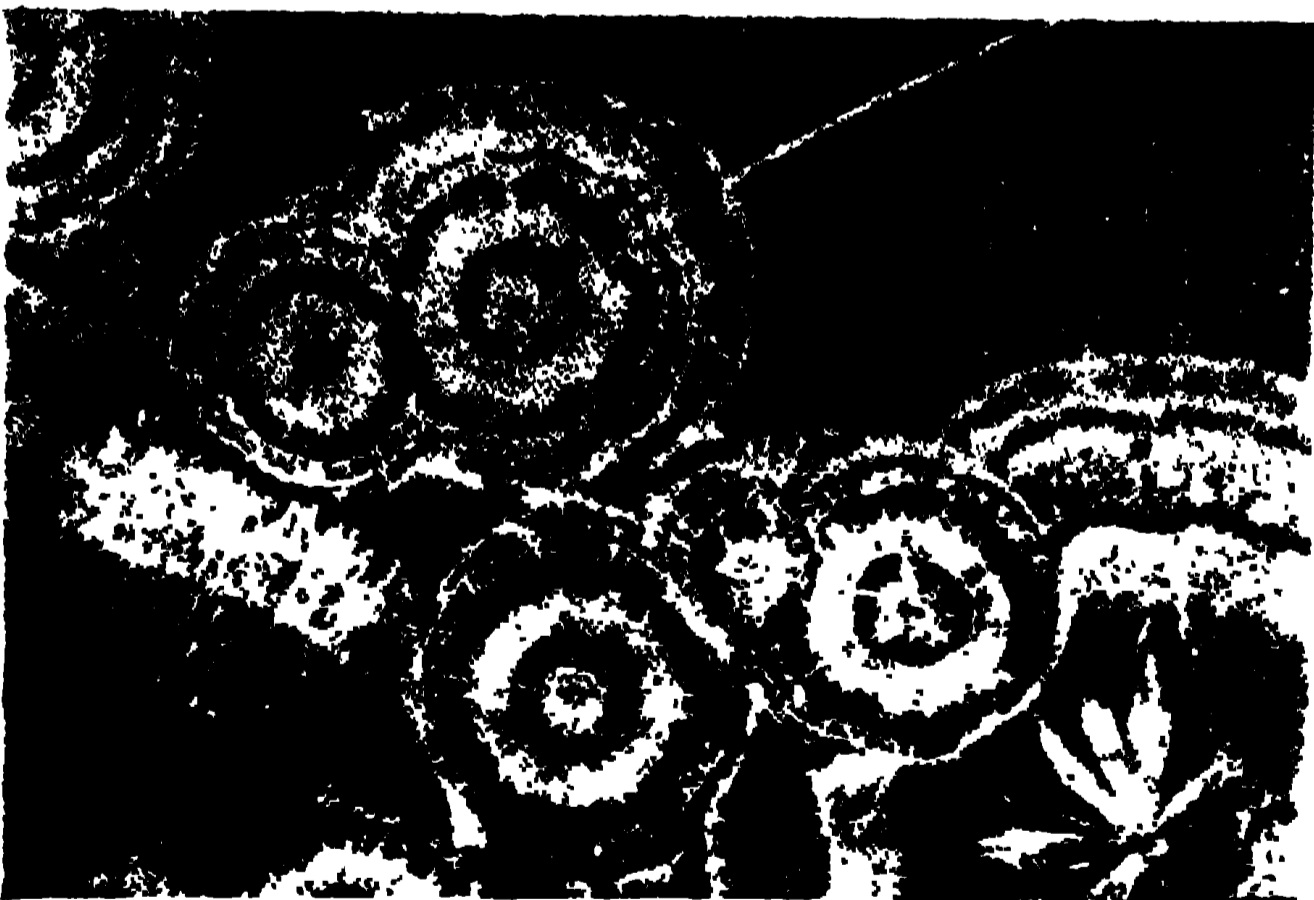
জীব-হত্যার মতো নৃশংস আচরণ! চারা গাছ, বড় গাছ
দূর্ভাষাস—এ সবে শিকড়ে কত জটিলতা! এ সব
অবোলা তৃণপত্র যাহাতে বাঁচিয়া বাড়িয়া উঠিয়া নিজেদের



৩। গাছের পাতা

জন্মকে সার্থক করিতে পারে, সেজন্য বিধাতা কি বিপুল
আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, গাছ-পালাকে কত রকমে
সাহায্য করিয়াছেন, দেখিলে বিশ্বয়ের সীমা থাকে না!

শ্বিথ সাহেবের তোলা শিকড়ের ছবি দেখিলে বুঝিতে



৪। চিনির ফটিক দানা

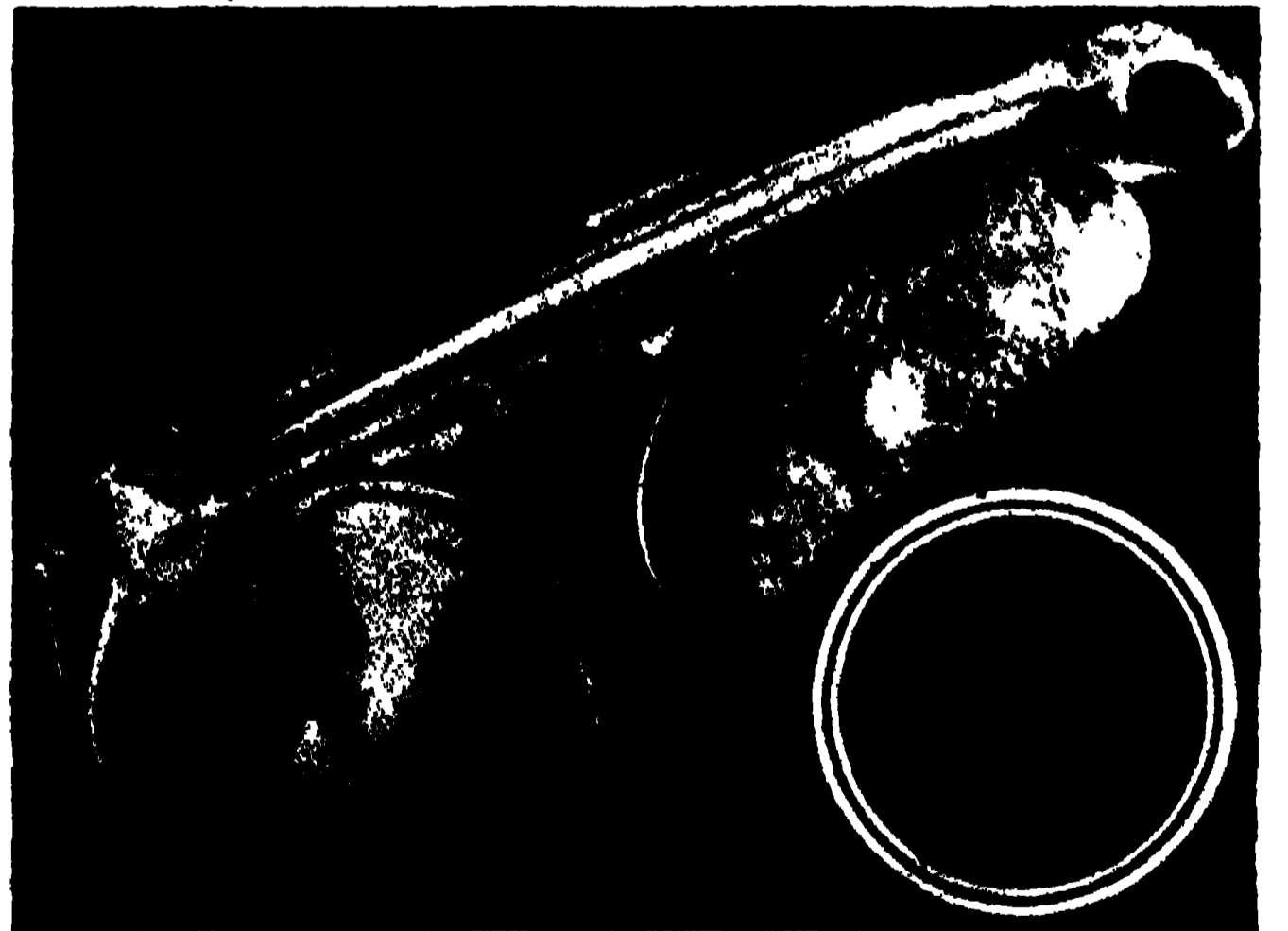
পারি, চন্দ্রচক্ষে শিকড়কে যতই সহজ মন্থণ দেখি,
আসলে শিকড় তেমন সহজ মন্থণ নয়। ১নং ছবিতে
দেখিবে, শিকড়ের গায়ে আগাগোড়া কেশ-রাশির

মতো অজস্র মিহি-রেখা। এগুলির সাহায্যে গাছ-পালা
মাটি হইতে আর্দ্রতা ও জীবন-রস সংগ্রহ করে। তার
পর ২নং ছবির পানে চাহিয়া চাখো, দীর্ঘ শিকড়ের নীচে
শুভ্র ঐ-যে কতকগুলি গোলক-বিন্দু, ওগুলি লাল-রস।
রসালো জেলির মতো এ-রস শিকড়ে লাগিয়া থাকে—



৫। ভ্যানিলা-দানা

শিকড়কে আর্দ্র রাখে। মানুষের দেহে যেমন রক্তকোষ
আছে, এগুলি তেমনি গাছের 'রক্ত-কোষ'! ইহারি জোরে
গাছ-পালা জীবন্ত থাকে। কলকজা সচল রাখিতে হইলে
তাহাতে যেমন তৈল (lubricant) দিতে হয়,
নহিলে কলকজায় 'জাম' ধরে, কলকজা অচল হয়—



৬। ডিম ফাটিয়া মৎস্ত-শিশু

এই কোষ-নিহিত লাল-রসে অভিষিক্ত থাকে বলিয়া
মাটির বুক ফুঁড়িয়া শিকড় বহু নিম্নে পথ করিয়া নামিয়া
যাইবার সময় শিকড়ের গা অক্ষত থাকে, নিরাময় থাকে।

গাছ-পালা উপড়াইয়া ফেলিলে শিকড় হইতে এ লালা-রস ঝরিয়া যায়। ২নং ছবিতে সাদা-কালোর যে বর্ণাভাস দেখিতেছ, কালো আভাসটুকু শিকড়; কালোর গায়ে ঐ যে শুভ্র আভা, ও-আভাটুকু শিকড়ের গায়ে-মেশা লালা-রস।

৩ নম্বর ছবি দেখিয়াছ? ওটি গাছের পাতা। পাতাটিকে খুব বর্ধিত-আকারে দেখানো হইয়াছে। পাতার গায়ে ঐ যে সাদা-সাদা রেখা—ওগুলি রক্তরেখা। এগুলি নিত্যক্ষণ খুলিতেছে, বৃদ্ধিতেছে। চর্মচক্ষে এ ব্যাপার দেখা যায় না এবং এই রক্তের খোলা-বোজায় গাছ স্বাস গ্রহণ ও প্রস্বাস ত্যাগ করে। নিখাসে গুচপালা কার্বন-ডায়ক্সাইড বাষ্প গ্রহণ করে। এ



৭। ট্রাউট-শিশুর আবির্ভাব

বাষ্প গ্রহণ না করিলে গাছ-পালা বাঁচে না, বাঁচিতে পারে না।

৪নং ছবিতে ফুলের মতো আলপনার যে শুভ্র রেখা, ওগুলি চিনির দানা!

৫নং ছবিতে ভ্যানিলা-সারের স্ফটিক-দানা—যেন একঝাড় চারাগাছ!

স্মিথ সাহেব তাঁর ক্যামেরায় এ-সব ছবি তুলিয়াছেন।

৬নং ছবিখানি কিসের, বলিতে পারো? ভাবিতেছ, বাগ্‌যন্ত্র? না, বাগ্‌যন্ত্র নয়। ডিম হইতে মৎস্য-শিশুর আবির্ভাবের ছবি!

৭নং ছবি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন শিকড় ফাটিয়া লতাগুল্ম উঠিয়াছে! আসলে কিছু লতা বা শিকড়ের ছবি এ নয়। একরাশ ট্রাউট-মাছের ডিম ফাটিয়া ট্রাউট-শিশুর উদয়-ছবি!

স্মিথ সাহেবের নৈষ্ঠিক সাধনায় প্রকৃতির অজ্ঞাত মহলের লক্ষ দরজা আজ উন্মুক্ত হইয়াছে এবং সে খোলা দ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া মাহুদ আজ প্রকৃতির গোপন রহস্য জানিতে সমর্থ হইয়াছে।

আতস-বাজি

এই কার্তিক মাসে কালীপূজার রাত্রে বাজি গুড়াইবার ধুম আজ এ-যুগে শুধু যে অব্যাহত আছে তা নয়, সে-ধুম



বাকুদ-বাগী বাজিকর

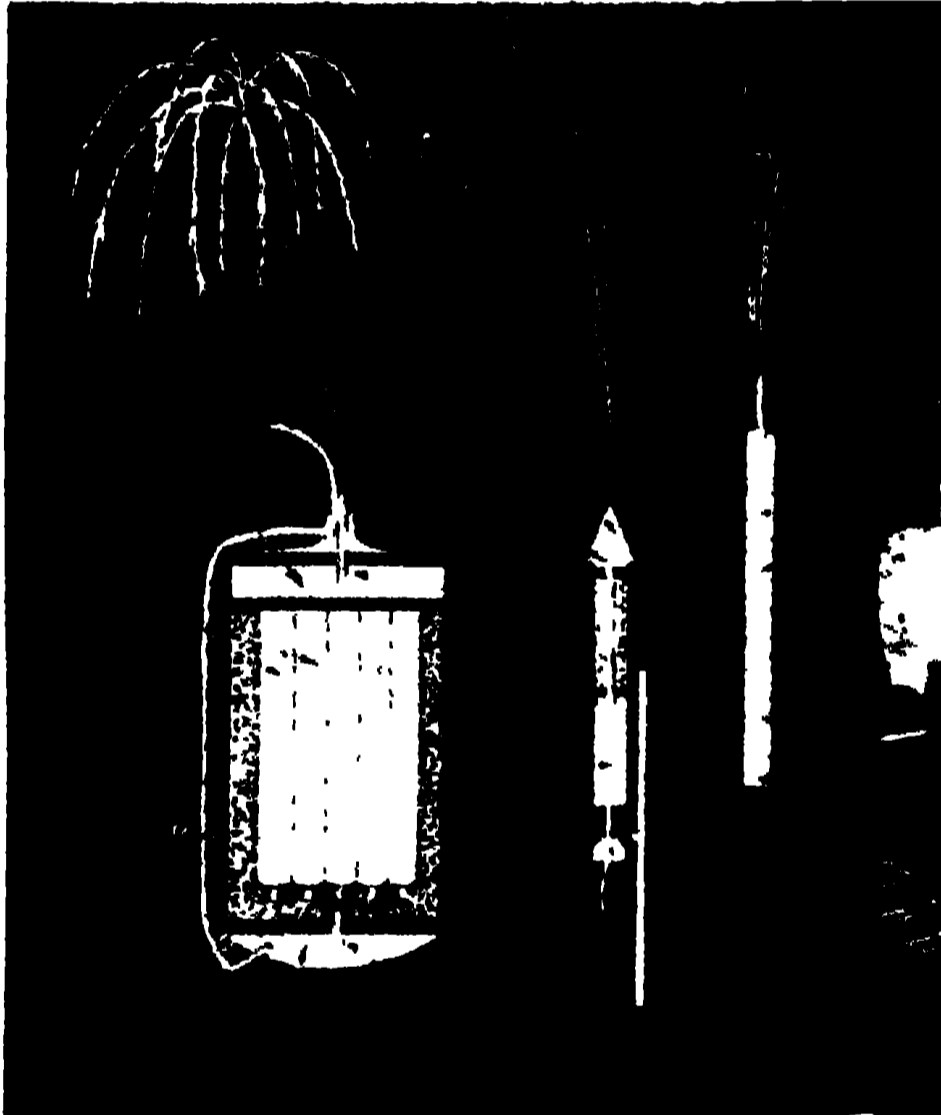
আরো বাড়িয়াছে। তার কারণ, আতস-বাজিতে এখন শিল্প-কলার মোহন-স্পর্শ আসিয়া মিশিয়াছে!

ছেলেবেলায় আমরা ভুঁই-পটকা, চীনা-পটকা, তুবড়ি, হাউই, তারা, বোমা, চকী—এই সব বাজি পাইলেই আনন্দে বিভোর হইতাম! কদম-ঝাড় এবং রকমারি অল্প ভালো বাজির সমারোহ বা দেখিতাম, তা সেই কাশীপুরে পূজার সময় যে রামলীলা হইত, সেই রামলীলার উৎসবে। সে সময় ধনাঢ্য-সৌখীন গৃহেও রকমারি বাজির সমারোহ দেখা যাইত; এবং ফরমাশ দিয়া রুকমারি বাজি বা পোড়ানো হইত, তা ধনী-ঘরে বিবাহের প্রোসেশনে।

এখন এ যুগে ছোট-বড় সকল ঘরেই আতস-বাজির বহর অনেকখানি বাড়িয়াছে। রোমান ক্যাণ্ডেল, রকমারি রকেট—এমনি নানা বাজি সুলভে এবং অজস্র পরিমাণে বাজারে আজ কিনিতে পাওয়া যায়।

যত দূর মনে পড়ে, আমাদের দেশে আতস-বাজির প্রথম সমারোহ দেখিয়াছিলাম আমাদের বাল্যকালে বর্তমান-সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের পিতামহ সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক-উৎসবে। সে সময় যুরোপীয় অল্পাধানে বিলাতী বাজিকর ব্রকের বাজিতে প্রথম আমরা আলোর রেখায় দুর্গ, রণ-তরী, সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্তি ফুটিতে দেখিয়াছিলাম। সে সময়ে কলিকাতার চীনা-সমাজও সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব করিবার জন্ত ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যে রকমারি বাজি পুড়াইয়াছিল, সে বাজি

দেপিতে রাত্রি কাটিয়া গিয়াছিল! সন্ধ্যার পূর্বে মাঠে গিয়া দেখি বাঁশ ও বাঁথারি র ঝাড়া বাঁধিয়া কয়েকটি ছোট বেড়ার চিয়া রাপিয়াছে; তার পর রাতে দেখি, সেই সব



রকমারি বাকুদে রকমারি ফুলঝুরি

বাঁশ-বাঁথারির ঝাড়ে আগুন দিবা-মাত্র সেই বাঁশ-বাঁথারি বাঁধন কাটিয়া তালগাছের মতো দীর্ঘ-আকারে অজস্র ডালপালা মেলিয়া দিল! সে ডালপালায় লাল, নীল, বেগুনি—নানা রঙের আলোর ফুল ফুটিতে লাগিল; তার পর সেই সব ফুল আবার সশব্দে কাটিয়া আলোর-আলোর অজস্র লতা-পাতা ফুল-ফলের ফুলঝুরি রচিয়া তুলিল! মনে আছে, রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেলেও চীনাদের সে বাজি শেষ হইবার কোনো আশ! দেখা যায় নাই!

সে-দিন হইতে আজ পর্যন্ত আতস-বাজির রাজ্যে

নিত্য নূতন কি উৎকর্ষই না সাধিত হইয়াছে! আতস-বাজি তৈয়ারীর অর্থ এখন আর বাকুদ-ঠাশার কশরতি বা কেরামতি নয়! তাহাতে আজ শিল্পীর যে-প্রতিভা ফুটিতেছে, দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়!

আতস-বাজির শিল্পীদের মধ্যে সব-চেয়ে কৃতিত্ব লাভ



জাহাজ-বাজির বাকুদ-মশাল

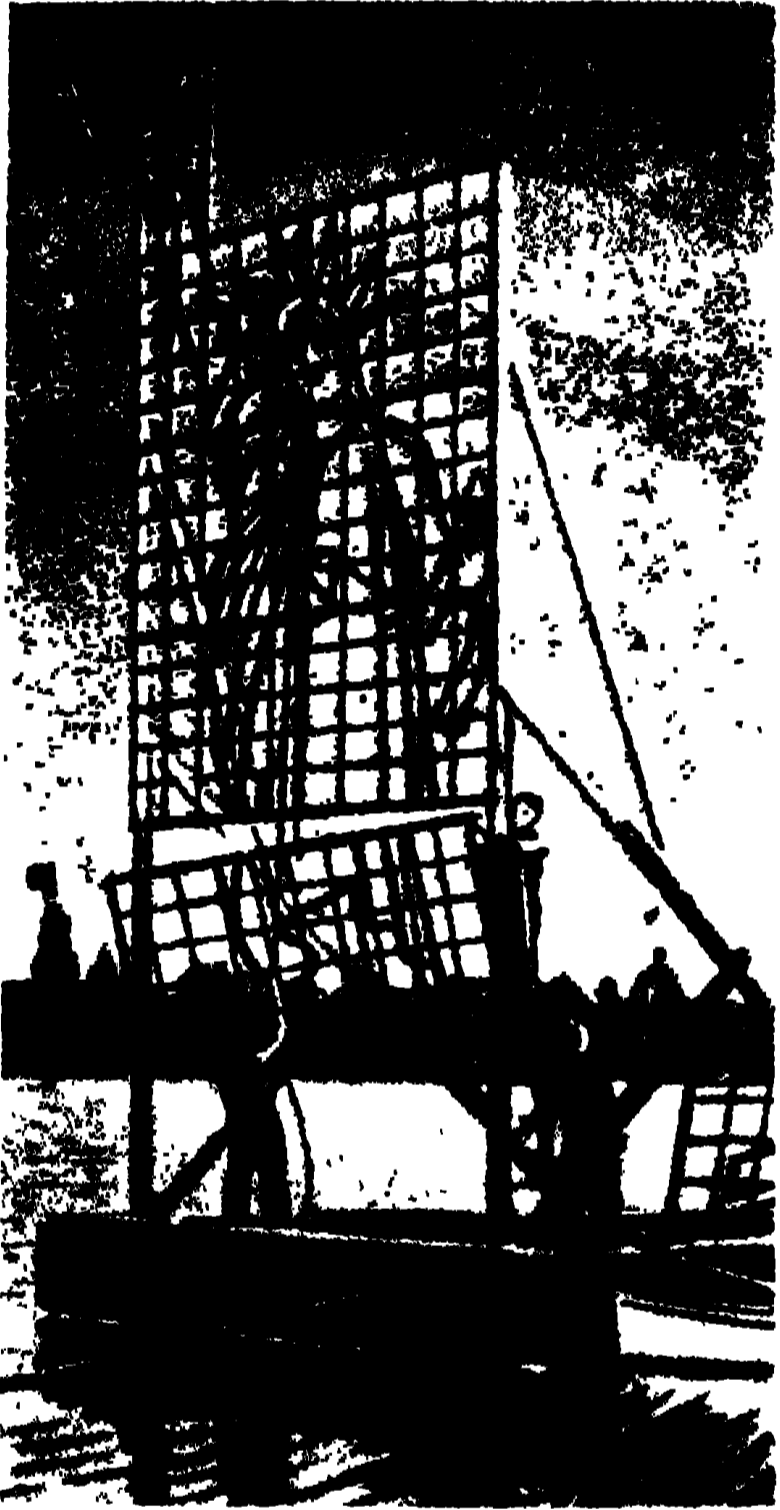


ফুল-কাটা রকেট

করিয়াছেন নিউ ইয়র্কের শ্রীযুত ডাকিন্ড। তিনি বলেন, যে-কোনো রকম ফটোগ্রাফ আমাকে আনিয়া দিন, আতস-বাজিতে আলোর ^{রেখায়} অক্ষরে নিখুঁতভাবে আমি সে ফটো ফুটাইয়া তুলিব (anything you show me in photographs, I can reproduce them in fire-works); এবং হাতে হাতে তিনি এ-কথার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁর

পটুতা দেখিয়া ডাফিন্ড সাহেবকে অনেকে আতস-বাজির নাট্যকার 'Dramatist in fire-works' আখ্যা দিয়াছেন।

নিউ ইয়র্কে সম্প্রতি যে বিরাট বিশ্ব-প্রদর্শনী বসিয়াছিল, সে-মেলায় রকমারি আতস-বাজি দেখিয়া দর্শকের দল বিমুগ্ধ বিহ্বল হইয়াছিলেন। ১৭০ রকম বাজি পুড়িয়াছিল; সে-বাজির ওজন ছিল ২০০ টন। আতস-বাজিতে আলোর একটি হৃদ দেখানো হইয়াছিল; হৃদটি লম্বে-প্রস্থে ছিল এক হাজার ফুট। হৃদের বুকে আতস-বাজির আলোর রেখায় প্রায় ২০০ বোট, নৌকা, ষ্ট্রিমার এবং মোটর-লঞ্চ

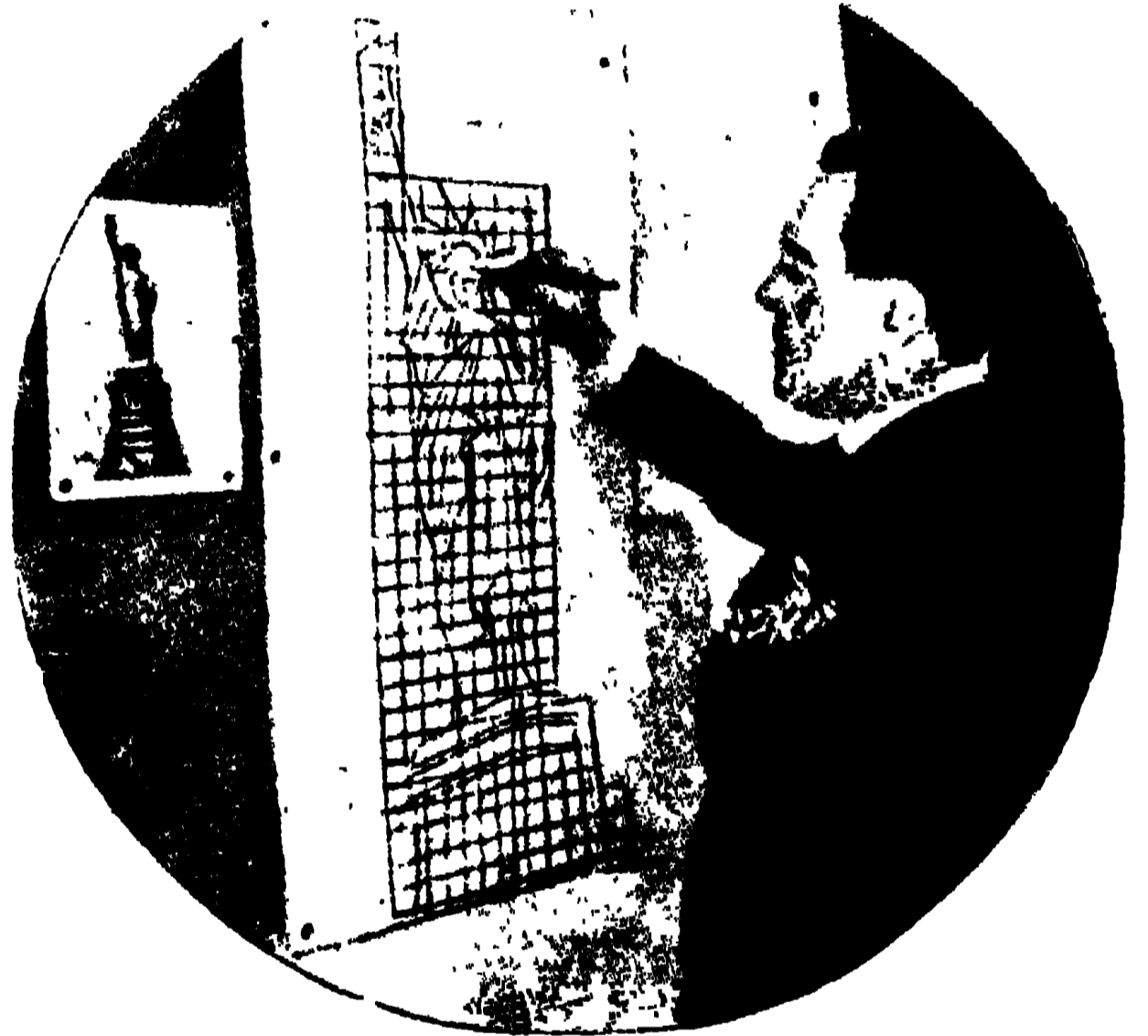


বাজির আলোর যে-মূর্তি ফুটিবে,
তার কাঠামো

ফুটিয়াছিল। সে হৃদের বুকে আবার রণ-তরী ছিল। সে রণ-তরী হইতে মুহূর্তে কামান দাগা হইয়াছিল। তাছাড়া জলের বুকে রকমারি আরো কত বাজি হইয়াছিল,—রঙীন আলোর লহর; রোমান ক্যাণ্ডেল; নানা রঙের আলোর ফুল-পাতা, লতা-গুল্ম এবং রূপালি ও সোনালি নিঝর-ধারা! বায়ু-বোমা ফুটিয়া ছিল,—সেগুলি ফাটিয়া অজস্র আলোর ফুল আকাশে এক-হাজার ফুট উচ্চে হুশ-হুশ শব্দে উঠিয়া গেল; গিয়া আকাশ-পথে সেই প্রত্যেকটি ফুল আবার সশব্দে ফাটিয়া কৃষ্ণ ধূমে মিলাইয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল! এ বোমার আলোর ধারায় কি শুধু ফুলের ঝাড় ছিল? তা নয়! ক্রীশানখীমামের ঝাড় ছিল, অজস্র নক্ষত্র ছিল, সাপ ছিল, ঝাউ-পাতার ঝালর ছিল, মাছ ছিল! আকাশের পটে আলোর লেখায় যে-ছবি ফুটিয়াছিল, তার আর তুলনা নাই! এ-বাজি দেখিয়া সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন—

These bombs are master-pieces of the pyrotechnic's art.

আতস-বাজিতে এই যে রকমারি রঙ ফলানো—বিশিষ্ট ধাতব-লবণের সহিত পোটাশিয়াম পারক্লোরেট এবং আরো বিশিষ্ট অক্সিডাইজিং রাসায়নিক সামগ্রী মিশাইয়া এ-রঙ ফলানো হয়। ষ্ট্রনটিয়াম-লবণে হয় লাল, আলো; বেরিয়ামে সবুজ; সোডিয়ামে হরিদ্রা; ম্যাগনেশিয়াম এবং এ্যালুমিনিয়ামে সাদা; এবং প্যারিস-গ্রীণে নীল রঙের আলো। ডাফিন্ডের বাজিগুলির মধ্যে সব-চেয়ে চমকপ্রদ হইয়াছিল—আলো-হৃদের বুকে আলোর রেখায় রচা জর্জ ওয়াশিংটনের এক বিরাট প্রতিমূর্তি! এ বাজি ফাটিয়া



কাঠামো-রচনা

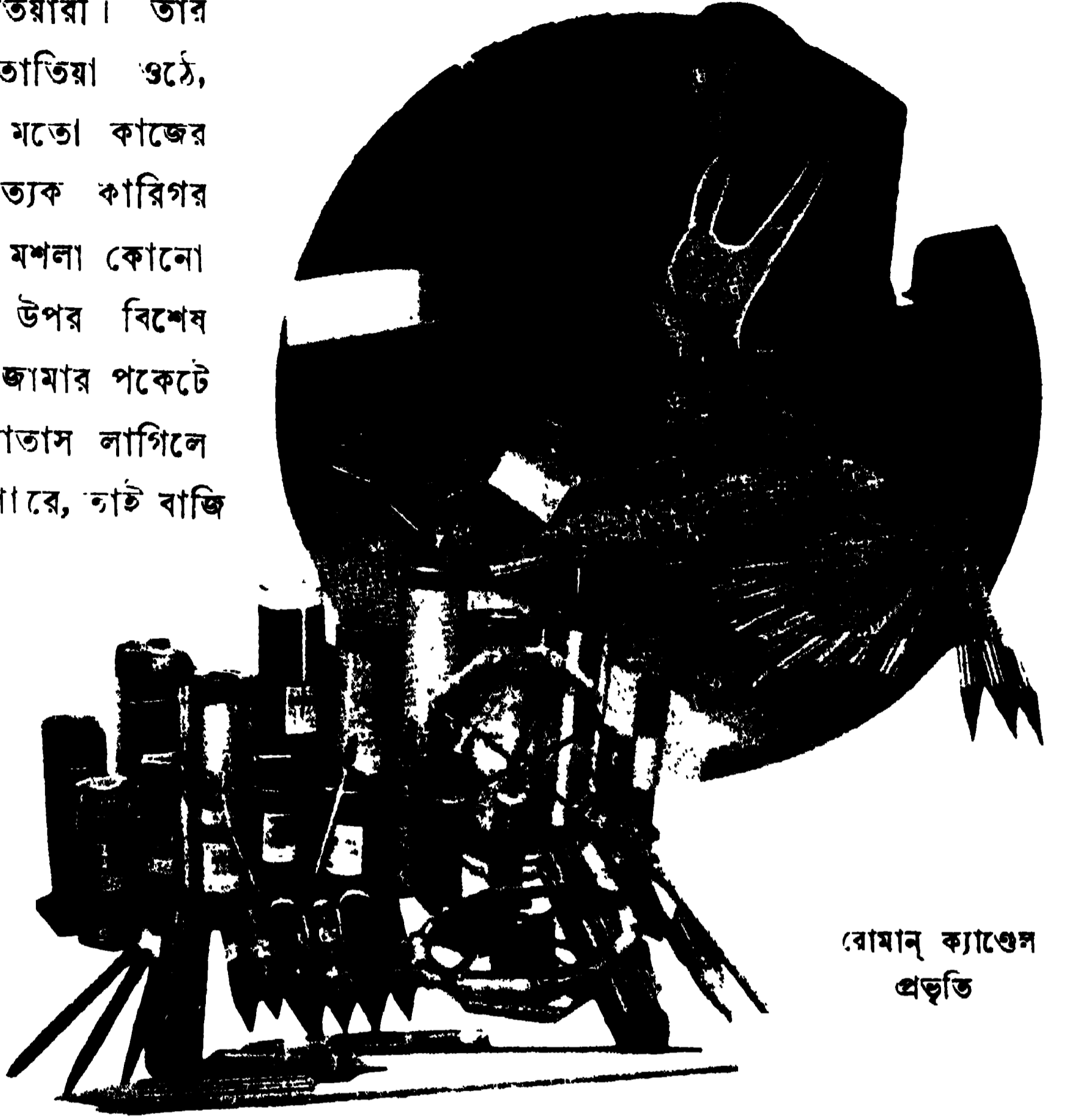
মূর্তির মাপায়-গায়ে অজস্র আলোর নক্ষত্র ঝরিয়া পড়িয়াছিল! সে এক অপূর্ণ দৃশ্য! তার উপর এ-কালের সকল সামগ্রী—সাবমেরিন, রণ-তরী, এ্যাডুলান্স, দুর্গ, নায়েগ্রা-প্রপাত—এ-সবের কোনোটি আর ডাফিন্ড সাহেব আতস-বাজির আলোর লহরে ফুটাইতে বাকী রাখেন নাই!

কত কারিগর লাগাইয়া সতর্কভাবে এ-সব বাজি তৈয়ারী করা হয়, শুনিলে বিশ্বের সীমা থাকিবে না! বাকুদ লইয়া যত-কিছু কাজ দিনের বেলায় করা হয়। রাত্রে পাছে আলোর কণা বা তাপ লাগিয়া বিপত্তি ঘটে, এজন্য রাত্রে বাজি তৈয়ারী করা হয় না। যে-সব পাত্র এ-কাজের জন্ত ব্যবহার

করা হয়, সেগুলি কাঠ বা পিতলের তৈয়ারী। তার কারণ, বারুদ ঠাণ্ডিতে অল্প ধাতু যদি তাতিয়া ওঠে, বিপদ ঘটতে পারে! অর্ধ ঘণ্টার মতো কাজের উপযোগী বারুদ ও মশলা লইয়া প্রত্যেক কারিগর কাজ করে। ইহার চেয়ে বেশী বারুদ বা মশলা কোনো কারিগরকে দেওয়া হয় না। তার উপর বিশেষ পাত্রে ভিন্ন খোলা হাতে বা রুমালে বা জামার পকেটে করিয়া বারুদ বহিতে দেওয়া হয় না। বাতাস লাগিলে কোনো-কোনো বারুদ জলিয়া উঠিতে পারে, তাই বাজি তৈয়ারীর জন্য ছোট ছোট স্তম্ভ দর আছে। নানা ঘরে নানা রকমের বারুদ লইয়া কাজ চলে।

বিষয়োগ ঘটতে পারে, এমন ধাতের বিভিন্ন বারুদ বা মশলা মিশাইবার সময় সতর্কতার সীমা থাকে না!

আমাদের দেশে আতস-বাজি তৈয়ারী করিবার জন্য ছেলেমেয়েদের অনুরাগ খুব বেশী। এ অনুরাগ ভালো। তবে কালী-পূজার সময় এই বাজি তৈয়ারী করিতে গিয়া অসতর্কতার ফলে প্রতি বৎসর কত না বিপত্তি ঘটে! যারা বাজি তৈয়ারী করে, তাহাদিগকে খুব বেশী সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। বাজি তৈয়ারী করিতে মসিয়া তোমাদের প্রতিভা



রোমান ক্যাণ্ডেল
প্রভৃতি

রকমারি বাজি

ডাফিল্ড সাহেবের মতো দিব্য-বিকশিত হোক, এই আশায় ডাফিল্ড সাহেবের আতস-বাজি তৈয়ারীর কথা এবং সেই সঙ্গে কয়েকখানি ছবি এই দেওয়ালীর দিনে তোমাদের হাতে উপহার দিলাম।

পারের মায়ী

ওপারে শ্রামল ছোট গ্রামখানি হরণ করেছে মন,
সারাদিন ধরে' পাখীরা শোনায় হারানো দিনের বাণী।
ছায়া-ঘন বনে বিটপী-কুমুম করে কত কাণাকানি!
সাধ হয় মোর রক্ত বটের সাথে করি আলাপন।
আকাশের নীলে মিলে গেছে শত শঙ্খচিলের পাখা,
বাঁধা-ঘাটে কাঁদে ভগ্ন সোপান বক্ষে বেদনা বাজে;
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে ছোট ছোট ঢেউ নদী-কিনারার কাছে।
জনহীন পথ গ্রামের ভিতরে চলে গেছে আঁকাবাঁকা।

উদাস হাওয়ায় মুয়ে' মুয়ে' পড়ে পথের কুম্ভকো-লতা,
আসে নাকো মাঠে খেলা করিবারে ছেলেরা আগের মত,
আসে না বধুরা গাগরী ভরিতে বাঁধাঘাটে অবিরত,
মুখোমুখি হয়ে' কছে নাকো কেহ হুঃখ-সুখের কথা।
ডোঙ্গার উপরে লগি বেয়ে বেয়ে চলেছি গাঁয়ের পানে,
নাহি দেখা যায় একটি কুটার পট-ভূমিকার পরে—
বেলা প'ড়ে আসে, সারি সারি ঝোপ শিহরিছে বায়ুভরে,
গাখালের বাঁশী বাউলের গান পশে নাকো মোর কাণে।

বুঝিতে পারি না কেন যে আমার নয়নে অশ্রু নামে।
বিগত সুগের স্মৃতি-সম্পদ খাঁজিতে চ'লেছি গ্রামে।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।



কয়েক দিন পরের কথা।

নৈশ-ভোজনের পর সকলে বসিয়া গল্পালাপ করিতে-
ছেন। মিসেস্ গ্রেহামই প্রথমে নিনার কথা তুলিলেন।
তিনি প্রশ্ন করিলেন, “নিনাকে নিয়ে আপনারা কি
উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে এসেছিলেন?”

মিসেস্ সিংহ। ওর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়—এইরূপই
ইচ্ছা ছিল।

মিসেস্ গ্রেহাম। আমার জানতে আগ্রহ হয়—
আপনারা কি ব্রাহ্ম?

মিসেস্ সিংহ। না আমরা হিন্দুই আছি; আমাদের
ইংলণ্ডে আসতে দেখে আপনি বোধ হয় মনে ক’রেছেন
আমরা ব্রাহ্ম, কিন্তু আজকাল বাঙ্গালী হিন্দুদের অনেকেই
সমুদ্রপারে যাচ্ছেন; এ বিনয়ে হিন্দু সমাজ এ-কালে
যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করছে।

মিসেস্ গ্রেহাম। তা বটে; কিন্তু হিন্দুর ঘরে এত-
বড় অনুচ্চ মেয়ে এ-কালে তো বেশী দেখা যায় না! এক
শেলীকে দেখছি, আর দেখছি আপনার নিনাকে।

মিসেস্ সিংহ। ঠিক মনের মতন বর পাইনি কি না,
তাই নিনার বিয়ে এখনও দিতে পারিনি;—ইচ্ছা আছে,
এইবার শীতকালেই ওর বিয়েটা দিয়ে ফেলুব। উপার্জন-
ক্ষম বিলাত-ফেরত ছেলেরই সন্ধান করছি।

মিসেস্ গ্রেহাম। সে বরকম অবিবাহিত ছেলে তো এই
জাহাজেই একটি আছে; মানে—মিষ্টার দত্ত, ছেলেটিকে
তো বেশ ভালই মনে হয়...

নিনা এতক্ষণ বসিয়া স্তব্ধ গুঁজিতেছিল—কি
করিয়া তাহার বিবাহের প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া অল্প কথা
পাড়াবে। মিসেস্ গ্রেহামের কথা শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি

বলিয়া উঠিল, “মিষ্টার ডাট্ চিরকুমার। তা ছাড়া, তাঁর
যে মেজাজ! কোনও মেয়ে স্বেচ্ছায় তাঁকে বিয়ে
করতে চাইবে, এমন তো মনে হয় না।”

মিসেস্ গ্রেহাম বিস্মিতভাবে বলিলেন, “তাই
না কি? আমি তো দেখি, ছেলেটি ভারি নম্র, আর
তার মেজাজও বেশ ঠাণ্ডা।”

প্রসঙ্গটা এইভাবে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মিসেস্
সিংহ প্রমাদ গণিলেন; নিনাকে সুনীলের কথা লইয়া
আলোচনা করিতে দিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল
না। তিনি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্ত বলিলেন,
“সুনীলের কথা নিয়ে আলোচনা না করাই আমি ভাল
মনে করি।”

এই সাক্ষ্য-মজলিসে সুনীলের ও হিন্দুকুমারীদের
বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইতেই শেফালী সেই
স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। বিনয় বাবুর স্ত্রী সেই অযোগ্যে
তাঁহার নারীমূল্য কৌতূহল পরিত্যক্ত করিবার জন্ত মিসেস্
গ্রেহামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখুন, শেলী মেয়েটিও
গোড়া হিন্দু; তবু এত দিনেও ওর বিয়ে হয়নি যে?”

মিসেস্ গ্রেহাম মুহূ হাসিয়া বলিলেন, “আপনি বড়
শক্ত প্রশ্ন করেছেন! শেলী বলে, বিয়ে ও করবে না। ও
আরও বলে, আপনাদের দেশে গ্রামের জনসাধারণ বিনা-
চিকিৎসায় দলে দলে মারা পড়ে; বিশেষতঃ ও-দেশের
স্ত্রীলোকরা রোগে ভুগে মরবে, তবু পুরুষ-ডাক্তারকে দিয়ে
চিকিৎসা করাবে না! এ তাদের অসঙ্গত লজ্জা, না
কুসংস্কার—তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি।”

মিসেস্ সিংহ। ও-কথা কতকটা সত্য বটে, কিন্তু এই
সমস্তায় শেলী কি করবে—মানে সে কি করতে পারে?

মিসেস্ গ্রেহাম বলিলেন, “ও কিছু করতে পারবে—

এই আশাতেই তো ডাক্তারী শিখেছিল; আর সেই জন্তই ইংলণ্ডে এসে ডাক্তারী-শিক্ষা শেষ ক'রেছে। ওর ইচ্ছা, এইবার বাঙ্গালা দেশের কোনও গ্রামে গিয়ে বসবে, এবং সেই অঞ্চলের গরীবদের বিনা-পয়সায় চিকিৎসা করবে।”

এই সকল সংবাদে মিসেস্ সিংহের কৌতূহল বর্ধিত হইল। শেফালীর নম্র স্বভাবে অল্প দিনেই তাঁহারা তাহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন : বিশেষতঃ, সে পিতৃমাতৃহীনা, এই সংবাদে তাহার প্রতি করুণায় ও সমবেদনায় তাঁহাদের হৃদয় আগ্রস্ত হইয়াছিল। সে ডাক্তার হইয়া চিরকুমারী থাকিবে, সে এত রূপবতী ও গুণবতী, তথাপি বিবাহ করিবে না, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয় বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “উহার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ সন্দেহ নাই; কিন্তু এমন সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হবে না, এ যেন বিশ্বাস হয় না। ওর তো ঐ-রকম মত; কিন্তু ওর অভিভাবকরা কি বলেন?”

মিসেস্ গ্রেহাম। তা' তো জানি না। বছর-দুই আগে যখন আমরা দেশে আসি, আমাদের বন্ধু ডাক্তার ঘোষ আমাদের হাতে ওর ভার দিয়েছিলেন। এই দু'বছরে ওর স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় পেয়ে আমরা এমন মুগ্ধ হ'য়েছি যে, আমার মনে হয়, শেলী কোন দিন যদি বিয়ে করে, তাহ'লে তার স্বামী আপনাকে পরম ভাগ্যবান ব'লেই মনে ক'রবে। ইংলণ্ডে অনেক ছেলেই ওকে বিয়ে করবার জন্ত ভারী আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিল; তা কেউ ওর কাছে এক বিন্দু উৎসাহ পায়নি : কাউকে ও আমল দিত না; প্রকৃত ব্যাপার যে কি, কিছুই বুঝতে পারি-নে! এক-এক বার সন্দেহ হয়, হয় তো ব্যর্থ-প্রণয়ই এর মূল। কিন্তু আমার ধারণা, যুবকরা কখনই ওকে অবিবাহিত থাকতে দেবে না; ওর মত রূপবতী গুণবতীকে বিবাহ করতে কা'র না আগ্রহ হবে?

এ সকল কথা শুনিয়া নিনা বলিল, “শেলীদি'র রূপ-গুণের তুলনা নেই; কিন্তু যদি সুনীলদা'কে সে আকৃষ্ট করতে পারে, তবেই বুঝবো, সত্যিই তার ক্ষমতা অসাধারণ।”

মিসেস্ গ্রেহাম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “তা বটে, কিন্তু ছেলেদের মন আকৃষ্ট করবার কোনও চেষ্টাই তো

শেলীর নেই! পরীক্ষা করতে হ'লে যুবকদেরই করতে হবে। সুনীল যদি এ জন্ত চেষ্টা করে, আর কৃতকার্য হয়, তাহ'লে তাকে আমি অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করব; মনে করব, সে সত্যি ভাগ্যবান।”

এই সকল আলোচনার পর তাঁহাদের মজলিস্ ভাঙ্গিয়া গেল; এবং সকলেই স্ব স্ব কেবিনে প্রবেশ করিলেন। সিংহ সাহেব শয়ন করিতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, “দেখ, এত দিন আমরা মিছে কাষেই যুরে মলুম! নিনাটার মনের এক কোণেও সুনীলের প্রতি প্রণয় জাগেনি, আর সুনীলেরও তাই। নিনা সুনীলের কাছে থাকবার সুযোগ পাবে মনে ক'রেই একটা বছর আমরা বিলাতে কাটালুম। সুনীলের মনের মতন হ'য়েই গড়ে-উঠবে, এই আশায় নিনাকে সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে শিক্ষা দিলুম; কিন্তু এখন দেখ'চি, সবই বিফল হ'ল! সুনীল যদি নিনাকে বিয়ে না করে তো কি যে হবে, কিছুই বুঝতে পারছি নে! এ-কালের ছেলেরা শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করতে চায় বটে, কিন্তু মেয়েদের এতখানি আধুনিক ভাবে শিক্ষিতা দেখলে অনেকেই ভড়কে যায় ব'লে আমার মনে হচ্ছে।”

মিসেস্ সিংহ। তুমি বুঝা ভয় পাচ্ছ! তোমার পরম বন্ধুটিকে তুমি কি চেন না? মিঃ দত্ত যে রকম কড়া মেজাজের লোক, তা'তে তাঁর তাড়ায় সুনীলের কোনও আপত্তি টিকবে ব'লে তো মনে হয় না।

বিনয় বাবু। কি ছেলেমানুষের মতো কথা বলে। তুমি! তোমার ঐ অনুমান সত্য হ'লে এত দিনেও তিনি সুনীলের মত করতে পারেননি কেন? সুনীলের স্বভাব নম্র বটে, কিন্তু তার জেদ্ অসাধারণ! বাপের এত টাকা, অভাব কিছুই নেই, তবু সে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের জন্ত চাকরী জুটিয়ে নিলে। কে জানে, সে লুকিয়ে বিয়ে করেছে, কি কাউকে ভালবেসেছে কি না।

মিসেস্ সিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তোমার ঐ রকম অনুমান সত্য ব'লে মনে হয় না। আমার ভয় হয়, ঐ শেলীটাকে শেষে সে আত্মসমর্পণ ক'রে না বসে! ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি, সে যেন শেলীর কাছে কাছে দূরতাই ভালবাসে!”

বিনয় বাবু স্ত্রীর উক্তির সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “শুধু

কি তাই? আমিও বেশ বুঝতে পারি, শেলীকে কাছে পেলে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে; আর শেলী তার কাছে না থাকলে তাকে ভারী অগমনস্ক দেখা যায়, সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। সুনীলের এই রকম ভাবভঙ্গি আমার বড় ভাল মনে হয় না; অন্ততঃ তা' আমাদের সঙ্কল্পের অমুকুল নয়।”

মিসেস্ সিংহ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “বীরেন বাবু কোন মতেই শেলীকে বোঁ করবেন না। যত বড় সন্দরীই সে হোক, কোথাকার কে তার নেই ঠিক; পশ্চিমাঞ্চলের একটা সাধারণ ডাক্তারের মেয়েকে বউ ক'রে ঘরে আনবেন—তেমন লোক তিনি নন। তিনিও কম জেদী না কি?”

বিনয় বাবু অল্প কথা ভাবিলেন; তিনি বলিলেন, “শুধু রূপ-গুণই তো নয়, ওদের সঙ্গতিও খেতে আছে ব'লেই মনে হয়। তা' না থাকলে কি শিক্ষার জগৎ নেয়েটা ছু'বছর বিলাতে থাকতে পারতো? না, দেশে ফিরে বিনা-পয়সায় গরীবদের চিকিৎসা করবে ব'লে সঙ্কল্প স্থির করতে পারতো? ঐ সঙ্গে আভিজাত্যও আছে ব'লেই আমার মনে হয়! সন্ধান নিয়ে হয় তো কোন দিক দিয়েই ওকে উপেক্ষা করা চলবে না।”

মিসেস্ সিংহ স্বামীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া বলিলেন, “কি যে হবে, কি ক'রে বলি? তা যাই হোক, আমি কিন্তু সহজে হা'ল ছাড়ছি নে; সুনীলকে জামাই করি, এ আমার অনেক দিনের সাধ। নিনার কি যে বুদ্ধি! সুনীলের সঙ্গে কেবল ছেলেমানুষী আর ফুকুড়ী ক'রেই আমোদ পায়।”

বিনয় সিংহ স্ত্রীর মুখের দিকে চাভিয়া বলিলেন, “সে বরং ভালই। নিনা তাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করবে, আর সুনীল তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে তার অসহ হবে; মেয়েটার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে বড় দুশ্চিন্তার বিষয়! এই জগৎই আমি চাই, সুনীলের আগে যত হোক।”

৪

ভারত মহাসাগর প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে; তাহার দিগন্তব্যাপী বিশাল বক্ষে সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার চিহ্নমাত্র আর বর্তমান নাই। কিন্তু দশ দিন পূর্বে সুনীলচন্দ্রের

বক্ষে চিহ্না-তরঙ্গের যে ভীষণ আন্দোলন ও আলোড়নের সূচনা হইয়াছে, এখনও তাহা প্রশমিত হয় নাই; তাহা শান্ত ও সংযত হওয়া দূরের কথা—দিনে দিনে তাহার বেগ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অধিকতর অশান্ত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে! শেষের কয়েকটি বৎসর তাহার নিস্পৃহ জীবন আনন্দ-সমুদ্রাসিত না হইলেও তাহার শান্তির অভাব হয় নাই। মধ্যে মধ্যে পিতামাতার পীড়াপীড়িতে, আর একঘেয়ে অনুরোধে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে বিবাহ-প্রসঙ্গের আলোচনায় লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু পরিণাম তা পত্নী জীবিত থাকিতে সে পুনর্বার বিবাহ করিবে না—তাহার এই সুদৃঢ় সংকল্প ক্রমেই যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল; কারণ, ইহা যৌবনেরই ধর্ম—মানব-প্রকৃতির সংস্কার। সে কিশোর বয়স হইতে আনন্দময়ী নিনার সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিল; তাহার উপর প্রাপ্ত-যৌবনা তরুণী নিনার উদারতা, মধুর ব্যবহার, চরিত্রগত কোমলতা ও সরলতা কমশঃ তাহার মনে স্নেহের আকর্ষণ প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সকল কারণেই সুনীলচন্দ্র পিতা-মাতাকে পরিতুষ্ট করিবার জগৎ নিনাকে বিবাহ করিবে, এইরূপ মনোভাবকে কতকটা প্রশ্রয় দান করিয়াছিল। জীবনে সে কখন প্রকৃত প্রণয়ের আশ্বাদন লাভ করিতে পারে নাই, সুতরাং নিনাকে জীবনসঙ্গিনী-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গিবিহীন মরুময় কর্মজীবন হয় তো মাধুর্য্যমণ্ডিত হইবে, এই আশাও মধ্যে মধ্যে তাহার হৃদয়াকাশে ক্রমঃ-কাদম্বিনীর বক্ষ-বিরাজিত সৌদামিনীচ্ছটার ঞায় আলোক-লেখার বিকাশ করিত। কিন্তু মার্শেই বন্দরে এক নিমেষে তাহার সকল সঙ্কল্প ওলট-পালট হইয়া গেল! সুনীলচন্দ্র সহসা সেই অজ্ঞাত-কুলশীলাকে তাহার মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া বসিল।

শেলীকে প্রথম দেখার পর হইতেই সুনীলের মনে কি ব্যাকুলতা, কি আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রকৃত প্রেমিক ভিন্ন অল্প কেহ তাহা ধারণা করিতে পারিবে না। দিবারাত্রি ধ্যান-জ্ঞানে তাহার একমাত্র চিন্তা, কি করিয়া সে এই তরুণীর পরিচয় সংগ্রহ করিবে। সুনীল জানিত, পরিচয়ের বিশেষ কোন মূল্য নাই; সে ইহাও জানিত যে, কয় দিন পরে বিরহের স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই তাহার সম্বল থাকিবে না; সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী বেদনাই তাহার

শেষ অবলম্বন! তথাপি তাহার প্রাণ কোনও বাধা মানিল না। ক্রমে সুনীল শেলীর পরিচয় পাইল, তাহার সহিত আলাপও হইল; কিন্তু তাহাতে কেবল তাহার তৃষাই বাড়িল। অমৃত-সাগরের কূলে আসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া সেই অমৃত পান করিবার অধিকার তাহার নাই; তাহার প্রেমতৃষ্ণা লক্ষ গুণ বর্দ্ধিত হইল। প্রাণ চায়, কর্তব্য ও ভয় দূর করিয়া এই অমৃতস্রোতে সে ভাসিয়া যায়, কিন্তু তাহার মন প্রহরীস্বরূপ হইয়া পিতামাতার আজ্ঞা, এবং ধর্ম ও সমাজের দাবীর কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নিরপরাধা বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া প্রণয়-সুখ লালসা-স্রোতে কি সুনীল ভাসিয়া যাইবে? কর্তব্য কঠোর বলিয়া কি সে কর্তব্য পালনে বিমুগ্ধ হইবে? এত দিন স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করিতে তাহার সাহস হয় নাই সত্য, কিন্তু শেষে কি জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সেই পথ সে ত্যাগ করিবে? কে জানে, সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া প্রণয়ের সুখ পাইবে কি না, কিন্তু আজ সে শেলী ভিন্ন জীবন সুখ-শান্তিহীন, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রপ্রতাপ শুষ্ক মরুতুলা মনে করিতেছে। এখন সেই স্ত্রীকে আনিয়া তাহার প্রাপ্য ভালবাসা তাহাকে দিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আর তাহার নাই। শেলীই এখন তাহার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথম প্রেমের প্রচণ্ড আবেগ সুনীলকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

সুনীল চিন্তাকুল চিন্তে নিঃস্বপ্ন ডেকের এক প্রান্তে বসিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে উদাস দৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া আছে—এমন সময় নিনা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, “সুনীলদা, তোমার হ’ল কি বল তো। অস্থখ-চেষ্টা করেছে না কি?”

সুনীল নিনার এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিল, বিরক্তির স্রোত তাহার মনে বহিয়া গেল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া সে সংযত স্বরেই বলিল, “না, ও-সব কিছু নয়।”

নিনা আকারের স্বরে বলিল, “সে আমি শুনিছিনে; কি হ’য়েছে, আমাকে বলতেই হবে।”

সুনীল। তোমাকে বলি কি ফল? তুমি তো আর তার প্রতিকার করতে পারবে না।

নিনা। রোগটা কি, তা না জেনে কোন ডাক্তারই

তার প্রতিকার করতে পারে না। আপাততঃ তোমার রোগের প্রধান লক্ষণ দেখছি—খামকা চ’টে ওঠা! একা থেকে থেকে তোমার মেজাজ বড় খারাপ হ’য়ে যাচ্ছে; এর একমাত্র ঔষধ—একটি জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ। আমি ব্যবস্থা দিচ্ছি—তুমি শীঘ্র বিয়ে ক’রে ফেল। নৈলে তোমার অবস্থা হবে—‘যথারণ্যং তথা গৃহম্।’—নীতি উপদেশ আমার এক-আধটু পড়া আছে।

নিনার সরস বাক্যস্রোতে সুনীলের বিরক্তি ভাসিয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল, “আমার মত বুড়োকে কোন্ তরুণী বিয়ে করবে? আর জানই তো, বিয়ের জন্ত পাগলামি একটুও আমার নেই।”

নিনা। অর্থাৎ বিয়ে-পাগলা বুড়োর দলে তুমি ভিড়তে চাও না; তবে যদি শেলীদি’কে পাও—সে আলাদা কথা, অর্থাৎ বর্জিতবিধি! কেমন, একথা ঠিক কি না?

সুনীল শিহরিয়া চারি দিকে চাহিল; তাহার পর কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “ও কি বলছো? সব তাতেই তোমার ফুর্কুড়ি! শেলী যদি ও-কথা শুনতে পায় তো কি মনে করবে বল দেখি! সে কি কোনও দিন সে ভাব দেগিয়েছে? এ-সব কথা কা’রও মনে জেগেছে জানলে, হয় তো আমার সঙ্গে মিশতেই তা’র সঙ্কোচ হবে।”

নিনা হাতে তালি দিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; উল্লাসভরে বলিল, “এবার ধরা প’ড়ে গেছ দাদা! তোমার এ রোগের লক্ষণ আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য ক’রে আসছি; এখন আর লুকিয়ে কি হবে?”

সুনীল কৃত্রিম গাঙ্গীর্যো মুখ ভার করিয়া বলিল, “কি আমার ডাক্তার রে! মুখ দেখেই রোগ ধ’রে ফেলেন।”

নিনা। অমন ক’রে একলা ব’সে চাঁদের পানে চেয়ে থাকলে, আর আমোদ-প্রমোদ সব ত্যাগ ক’রে শেলীদি’র সঙ্গে আলাপে মশ্গল হ’য়ে থাকলে, কে না বুঝতে পারে? কথায় বলে, যেখানে বাধা—সেখানে হাত!

সুনীল তাহাকে জেরা আরম্ভ করিয়া বলিল, “এই তো সে-দিন তুমিই বলে, আমি চিরকুমার।”

নিনা। তা হোক; আর আমায় ছেঁদো কথায় ভোলাতে পারছ না কিন্তু।

সুনীল। যা' খুসী ভাবো গিয়ে যাও ; তবে আমার অনুরোধ, তোমার এই ডাক্তারী বিদ্যেটা আর বেশী ফলিও না। শেলীকে তোমার খেয়াল-মতো কিছু বলতে যেও না। সে বড় বিস্মী হবে, এটা মনে রেখো।

নিনা। আচ্ছা, ঠাট্টা থাক ; একটা কাণের কথা বলি শোন, হেসে উড়িয়ে দিও না। আমার মনে হয়, শেলীদিকে বিয়ে করলে তুমি সত্যিই সুখী হ'তে পারবে। তোমরা দু'জনে যখনই এক সঙ্গে বেড়াও, তখনই আমার মনে হয়—যেমন চেহারায় তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে, তেমনই তোমাদের দু'জনের মনের মিলও যেন তোমাদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। সত্যি, তোমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করবার শক্তি কতকটা লোহা আর চুম্বকের শক্তির মতনই।

সুনীল। চমৎকার ঘটকালি করতে শিখেছ ! আমাকে না হয় ব্যাধিগ্রস্ত দেখলে, কিন্তু শেলী যে বিয়ে করতে চায়, এর লক্ষণটা দেখলে কোথায় ? শুনেছ তো, তার জীবনের সঙ্কল্পের কথা ? আমার মধ্যে এমন কি অসাধারণত্ব আছে বল, যা'র আকর্ষণে সে এত-বড় মহৎ সঙ্কল্প ছেড়ে আমাকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে ?”

নিনা প্রগল্ভতা ত্যাগ করিয়া চিন্তিত ভাবে বলিল, “শেলীদির কিছুই বোঝা যায় না, সত্যি ! যখনই তা'কে তোমার কাছে দেখি, মনে হয়, তুমি চেষ্টা ক'রলেই তা'কে নিজের মতে ফিরাতে পার,—কিন্তু আমার এ ধারণার কারণ জিজ্ঞেসা করলে তা তোমাকে বলতে পারব না।”

সুনীল শুধু হাশ্বে বলিল, “শেলী তোমায় ভালবাসে কি না, তাই আমার প্রতিও একটু করুণা প্রকাশ করে।”

নিনা এবার মুকব্বির ভঙ্গিতে বলিল, “ছেলেমানুষী করো না। আমি বলি, তুমি চেষ্টা ক'রে যাখো। একা থেকে এ-ভাবে তোমার জীবনটা নষ্ট করা ভাল হচ্ছে না। আর তো ক'দিন পরেই বোম্বে পৌঁছে যাবে ; তখন আর শেলীকে পাবে কোথায় ? এরই মধ্যে একটা ঠিক ক'রে ফেল।”

কথা শেষ করিয়া নিনা সুনীলকে ডেকের আমোদ-প্রমোদের আড্ডায় লইয়া গেল। সেই রাতে সুনীল শয়ন করিয়া একটা বিষয়ে কতকটা স্বস্তিবোধ করিল।

বহু দিন হইতেই সিংহ সাহেবরা ও তা'র পিতা-মাতা নিনার সহিত তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু সে মত দিতেছে না। ইহা সে বিষম সমস্তা বলিয়াই মনে করিতেছিল। যদিও তাহার মনের কোণে নিনার প্রতি স্নেহ ছাড়া অন্য কোনও ভাব ছিল না, তথাপি তাহার অনেক বারই ভয় হইয়াছে, পাছে নিনার মনে তাহার প্রতি প্রণয়ের উদ্বেক হয়। আজ সে বুঝিতে পারিল, তাহার সে ভয় অমূলক ; নিনা তাহাকে দাদার মতই দেখে। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া সুনীল নিশ্চিন্ত হইল। সে স্থির করিল, এইবার বাড়ী ফিরিয়া সে তাহার পিতা-মাতাকে জানাইবে, তাহাদের পরস্পরের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। যদি তাহাকে কর্তব্য ও ধর্ম পালন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণীতা পত্নীকে বরণ করিয়া সে গৃহে আনিবে। আর যদি হৃদয়ের কামনা পূর্ণ করিতে হয়, তবে শেলীকে লাভ করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে ; তাহার হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে শেলী তিন্ন অন্য কাহারও স্থান ছিল না।

৩

অর্ণবপোতে সমুদ্রযাত্রার শেষ-রাত্রি সমাগত। পরদিম প্রভাতে জাহাজ বোম্বাই-বন্দরে ভিড়িবে। ডেকের উপর আজ যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে ; যুবক-যুবতীরা নৃত্যানন্দে বিহ্বল। প্রবীণ-প্রবীণারা তরুণ ও তরুণী আরোহীদের যৌবনের এই লীলা-রঙ্গ সন্দর্শনে প্রথম যৌবনের মধুর স্মৃতি উপভোগ করিতেছেন। বাঙ্গালী আরোহীরা সকলেই সেখানে উপস্থিত, কেবল শেফালীই সে দলে নাই। ডেকের নিভৃত পূর্ব-অংশে চন্দ্রালোকে একাকিনী বসিয়া শেফালী বিহ্বল চিন্তে কয়েক দিন পূর্বের ঘটনাবলীর আলোচনা করিতেছে। তাহার ব্যর্থ-জীবন সার্থক করিতে সে কত পরিশ্রম করিয়াছে ; তাহার অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়াছে—আর্তের ও পীড়িতের সেবায়। তাহার সেই বিবাহের অভিনয় ও স্বপ্নকুলের অবজ্ঞা সে ভুলিতে চাহে ; প্রণয়-সুখ যখন তাহার ভাগ্যে নাই, তখন কেন এই প্রলোভন, কেনই বা আশার এই কুহক-লীলা ? এত দিন তো স্বামী তাহার শুধু অতীতের স্মৃতির শ্রায় করুনালোকে বিরহজিত ছিল ; তখন আত্মাভিমান ছিল, কিন্তু তৃষা ছিল না। উপেক্ষিতাই

সে ছিল, কিন্তু এখন যে সে বাঙ্কিতাও বটে ;—সত্য তাহার স্বামী তাহাকে স্ত্রী বলিয়া জানে না, কিন্তু জানিলে গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ না করিতেও পারে ; কিন্তু তাহার ব্যবহারে ও মনের ভাবে বেশ বুদ্ধিতে পারা যায় যে, সে শেফালীকে ভালবাসে। নিয়তির এ কি কঠোর উপহাস ! যে স্বামীর পদসেবাই তাহার প্রাণের কামনা, যাহার রূপ ও গুণে সে আজ মুগ্ধ, তাহাকেই আজ পরপুরুষের মত দূরে রাখিতে হইতেছে ! শেফালী ছাত্রজীবনে বহু যুবকের সহিত পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার মনের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে নাই ; সুনীলকে দেখিয়া-অবধি কেন তাহার প্রাণ বুদ্ধি-বিবেকের সীমা লঙ্ঘন করিয়া এমন উচাটন হইয়া উঠিয়াছে ? কোথায় আজ তাহার কুলাভিমান, কোথায় বা সেই তেজস্বিনী বালিকার সুদৃঢ় সঙ্কল্প ? এই প্রণয়ের জাগরণে তাহাকে কি চিরহুঃখিনী হইতে হইবে ?

আর সুনীলও অদ্ভুত লোক ! সে যদি শেফালীকে গ্রহণ না করিবে, তবে এত দিনেও আবার বিবাহ করিল না কেন ? নিজের মত রূপবতী, গুণবতী তরুণীকে সে সহজেই পাইতে পারে, তথাপি সে কৰ্মস্থানে কেন নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করে ? আর সে সদা-প্রফুল্লা সুরসিকা নিজের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াই বা কেন গম্ভীরপ্রকৃতি শেলীর লাহচর্যের পক্ষপাতী ? শেলী তো কোনও দিন তাহাকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই ; তবে কেন তাহার এই আগ্রহ ? প্রত্যহ প্রত্যাষে শেলীর অমুসন্ধান ডেকে আসিয়া নিভূতে কেন তাহার সহিত মিশিবার চেষ্টা ? প্রভাতেই তো তাহাকে শেলীর নিকট বিদায় লইতে হইবে। তাহার পর কি হইবে ? এই চির বিদায়ের পর শেলীর মধুর স্মৃতিই কি তাহার অবশিষ্ট জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইবে ?

নৃত্যগীতের মধ্যে সুনীল অগ্ৰমনস্ক ; এত লোকের মধ্যে থাকিয়াও তাহার সকলই শূন্য মনে হইতে লাগিল। তাহার ছুই চক্ষু একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিল, কোথাও সে তাহার মানস-প্রতিমার মূর্তি দেখিতে পাইল না। সকলেই সেখানে আছে, কেবল শেলীই মাই। অল্পক্ষণ পরে এই সূখ আমোদ-প্রমোদ সুনীলের অসহ্য হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া গেল—শেলীর সন্ধানে। অক্ষুট চন্দ্রালোকে

সাধনয়না নতমুখী শেফালীর সন্ধান মিলিল। সেখানে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সুনীল ব্যথিত হইল। সে ভাবিল, যে এত সুন্দরী, তাহার এইরূপ মনকোভের কারণ কি ? তাহার জীবনে কি কোন শোকের ইতিহাস আছে ? তাহার ব্যথার ব্যথী কি কেহই নাই ? কেহ কি তাহার সুপ্ত জীবনে নব জাগরণ দিতে পারে না ? কয়েক মিনিট দূর হইতে শেলীর দিকে চাহিয়া-থাকিয়া সুনীল তাহার নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, “মিস্ মিত্র !”

সচকিত ভাবে শেলী মুখ তুলিয়া বলিল, “আপনি ? আপনি এখানে এলেন যে ? নাচ তো এখনও চলছে, তবে সেখান থেকে কি জন্ত উঠে এলেন ?”

কম্পিত স্বরে সুনীল উত্তর দিল, “আমরা সকলে আপনাকে খুঁজছিলুম ; আপনারই খোঁজে এসেছি। আপনি একলা দাঁড়িয়ে—ও কি, কাঁদছেন ?”

শেলী কিঞ্চিৎ চকিত ভাবে বলিল, “না, কাঁদিনি তো। স্থির সমুদ্রে চন্দ্রালোকের অপূর্ণ শোভা দেখে আনন্দে বোধ হয় চোখে জল এসেছিল ! সমুদ্রের এই শান্তরূপ আমার বড় ভালো লাগে,—কি গভীর, অথচ কত শাস্ত !”

সুনীল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, “আমার আর নাচ ভাল লাগল না। এমন সুন্দর চাঁদের আলো, স্নিগ্ধ আকাশ, স্থির সমুদ্র,—এ দৃশ্য ছেড়ে আর আমি ও-দিকে যাব না। আপনার আপত্তি না থাকলে এখানেই খানিক থাকতে চাই।”

শেফালী নীরব রহিল। সে কি বলিবে ? সুনীল তাহার স্বামী, কয় দিন পূর্বে তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া এত দিন পরে সে অন্তরে তাহাকে নূতন করিয়া বরণ করিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে ; কিন্তু যদি তাহাকে অপমানিত হইতে হয় ! সে স্থির করিল, তাহার বংশের অমর্যাদা সে করিবে না।

কয়েক মিনিট কেহই কোন কথা বলিল না। তাহার পর সুনীলই প্রথমে বলিল, “এই জাহাজে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কেটেছে।”

শেলী কোন উত্তর দিল না, সে নির্বাক। সুনীল আবার বলিল, “মিস্ মিত্র, আমার একটা অমুরোধ আছে, রাখবেন ?”

শেলী শিহরিয়া উঠিল ; এ কি মরীচিকা, না জীবনে

বসন্তের প্রথম আভাস ?—সে কৃত্তিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,
“কি অমুরোধ আপনার ?”

সুনীল কোমল স্বরে বলিল, “আপনার ঠিকানাটা আমাকে দেবেন কি ? মানে—যেখানে আপনি থাকবেন ?”

শেলী এক মুহূর্তে মানসিক দুর্বলতা দমন করিয়া কহিল, “আমার ঠিকানা নিয়ে কি লাভ ? আমি কখন কোথায় থাকি, তার তো স্থির নেই।”

সুনীল অমুনয়ের সঙ্গে বলিল, “যদি আপনার অমুমতি পাই তো আপনি দেশে ফিরে যেখানেই থাকুন, আমি আবার দেখা করব আপনার সঙ্গে। এটা সত্যিই আমার আন্তরিক কামনা।”

শেলী একটু বিপন্ন হইয়া বলিল, “বাংলা দেশের কোন দুর্গম পল্লীগ্রামে আমাকে থাকতে হবে ; সেখানে যাওয়ার কষ্ট কেন আপনি সহ্য করবেন ?”

সুনীল মাথা কাঁকাইয়া বলিল, “হ’লই বা দুর্গম পল্লীগ্রাম, সে তো মানুষের অগম্য স্থান নয় ; আশা করি, আমাকে বঞ্চিত ক’রবেন না।”

শেলী কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, “আমার সন্ধান আগ্রায় ডাক্তার ঘোষের কাছে সব সময়েই পাবেন ; কিন্তু তা’তে আপনার কি লাভ হবে ? আমাদের জীবনের ধারা ভিন্নমুখী—তা তো আপনি জানেন।”

সুনীল ও-কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, “আগ্রায় কি আপনি যাবেন ?”

শেলী মুহূর্তে কাল চিন্তা করিয়া বলিল, “হাঁ, দেশে ফিরবার আগে প্রথমে একবার আগ্রা ও এলাহাবাদ ঘুরে যাব। আর প্রতি বৎসরই অল্প কয়েক দিনের জন্ত এক-এক বার আগ্রায় আমাকে যেতেই হবে।”

সুনীল। আগ্রায় ডাঃ ঘোষের ওখানে যাবেন, তিনি কি আপনার কোন আত্মীয় ?

শেলী মুখ তুলিয়া বলিল, “তিনি পরম হিতৈষী ; বাবার তিনি পরম বন্ধু ছিলেন।”

সুনীল নোট-বহি বাহির করিয়া ডাঃ ঘোষের ঠিকানাটি লিখিয়া লইয়া শেলীকে আবার জেরা করিল, “আর এলাহাবাদ যাবেন বললেন, সেখানে কে আছে ?”

শেলী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “দাদার কাছে যাওয়ার দরকার হবে।”

কথাটা বলিয়াই শেফালীর মনে হইল—উহা সুনীলের নিকট প্রকাশ করা ভাল হইল না। তাহার আশঙ্কা হইল, কথায় কথায় তাহার দাদার নাম প্রকাশ হইলে তাহার সকল সতর্কতাই বিফল হইবে। তাই কথাটা গোপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, “দাদা ও বৌদি’ আমায় বড়ই ভালবাসেন, কিন্তু আমি আমার জীবনের ব্রত ত্যাগ ক’রে তাঁদের তো গলগ্রহ হ’তে পারবো না। তবু তাঁদের সঙ্গে এত দিন পরে একবার দেখা করাই উচিত ; দেশে ফিরেছি, না গেলে তাঁদের মনে বড়ই কষ্ট হবে। আর আপনাকেও তো কলকাতায় যেতে হবে—আপনার মা-বাপের সঙ্গে দেখা করতে ?”

সুনীল চঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, “না, আমি সোজা টুণ্ডলায় চ’লে যাব ; টুণ্ডলাই আমার কর্মস্থান কি না।”

শেলী বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল, “সে কি ? এত-দিন পরে দেশে ফিরলেন, আপনার মা-বাবা আপনাকে দেখবার জন্ত কি খুব ব্যস্ত হবেন না ? আপনি দেশে ফিরে তাঁদের সঙ্গে দেখা না ক’রলে তাঁরা মর্মান্বিত হবেন যে !”

সুনীল মুখ ফিরাইয়া বলিল, “আমিও তাঁদের দেখবার জন্ত যে কম ব্যাকুল, তা’ নয় ; কিন্তু যে কারণেই হোক, তাঁদের সঙ্গে দেখা করি, এতটুকু সাহস আমি সঞ্চয় ক’রে উঠতে পারিনি।—অবিশি, এটা আমার পরম দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।”

শেলী এ-কথা শুনিয়া কি ভাবিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার স্নমধুর হাস্যধ্বনি সুনীলের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিল। সহসা যেন তাহার মনের সংযমের বাধা টুটিয়া গেল ; সে আবেগভরে বলিল, “কি মিষ্টি আপনার হাসি ! আপনার এমন প্রাণখোলা মধুর হাসি এ পর্যন্ত আর কোনও দিন শুনিনি। আমার মনে হ’চ্ছে, যঁার হাসি এমন মিষ্টি, তিনি কি কারণে সব সময় গম্ভীর হ’য়ে থাকেন ? আপনার সঙ্গীদের মনে আনন্দদানের জন্ত আপনার সর্বদা হাসাই উচিত।”

লজ্জায় শেলীর মুখ আরক্তিম হইল ; কিন্তু সে সুনীলের বাক্য-স্রোতে বাধা দিয়া বলিল, “থাক, থাক, —তুমি আমোদে আপনি যে মন্ত ওস্তাদ, তা বেশ বুঝতে

পেরেছি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, আপনি গভীর প্রকৃতি স্বাধীনচেতা পুরুষ। এখন আপনার এই বালক-মূলভ স্বভাবের পরিচয় পেয়ে,—বাপ-মাকে আপনি এত ভয় করেন তা শুনে না হেসে কি থাকে যায়? এমন কি অন্ডায় কাঁচ আপনি ক'রেছেন যে, ভয়ে তাঁদের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে থাকাই দরকার মনে ক'রছেন?”

সুনীল একটু ভাবিয়া বলিল, “ইচ্ছা হয় সব কথাই আপনাকে খুলে বলি, ব'লে মনের ভার পাতলা করি; কিন্তু সে সব কথা আপনাকে যে ব'লবার নয়! যদি কোন দিন সম্ভব হয়, তো আপনাকে সব কথাই বলব, আর বলবার জন্মে—যত দূরেই থাকি, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা ক'রব। আমি সত্যিই মাঝে মাঝে নিতান্ত প্রগল্ভ বালকের মতোই ব্যবহার করি; ভগবান আমাকে চরিত্রের দৃঢ়তা দেন, মনে বল ও সাহস দেন, এইটুকু আমি তাঁর কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা ক'রছি। কর্তব্য পালনে আমি অকুণ্ঠিত সাহস পাই, এইটাই আমার একান্ত কামনা।”

সুনীল আর কোন কথাই বলিতে পারিল না; তাহার কণ্ঠরোধ হইল। কাতর নয়নে সে চন্দ্রকরোজ্জ্বল প্রশান্ত জলধি-বক্ষে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তাহার মনোভাবের এই পরিবর্তন দেখিয়া শেফালী ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখনই তাহার প্রাণাধিক প্রিয়তমের নিকট নিজের পরিচয় দিতে তাহার আগ্রহ—আকিঞ্চন প্রবল হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই আবার অভিমান আসিয়া তাহার এই সঙ্কল্পের পথ রুদ্ধ করিল। বিবাহ-রাত্রিতে স্বামীর সেই বিরাগভরা কঠোর ব্যবহার, তাহার অবস্ফাৰ্ণ প্রত্যাখ্যানের স্পষ্ট কথাগুলি তখনই স্মরণ হইল, এবং তাহা স্মৃতিক্ক কণ্ঠকের মতো তাহার মর্ষ বিদ্ধ করিল। সে একবার ভাবিল, হয় তো কর্তব্য-পথ বলিতে সুনীল নিজাকে বিবাহ করিবার কথাই বুঝিয়াছে।—সে পূর্বেই শুনিয়াছে, সুনীলের পিতা-মাতার একান্ত ইচ্ছা, নিজার সহিত তাহাকে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

সুনীল মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া পুনর্বার বলিল, “বহু বৎসর ধ'রেই এই সাহসটুকু আমি কামনা ক'রেছি; কিন্তু কর্তব্যপালনের সাহস এখন পর্য্যন্ত আমি সঞ্চয় ক'রতে

পারিনি। তার ওপর ভগবান আমায় আবার এই নূতন সমস্য়া ফেলেছেন; জানি না, কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে এবং কখনো সম্ভব হবে কি না।”

এ-কথা শুনিয়া শেফালী হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। তবে কি সুনীল তাহার পরিণীতা পত্নীরই প্রতি তাহার কর্তব্যের ইঙ্গিত করিল? সেই জন্মই কি এত দিন ধরিয়া সে বিবাহ না করিয়া সুখ-শান্তিহীন, কঠোর, নিসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছে? এই জন্মই কি সে নিজার মত রূপে-গুণে অলঙ্কৃত বাঞ্ছিতারও পাণিগ্রহণে সম্মত হইতে পারে নাই? তাহার এই নূতন সমস্যা কি শেলীরই প্রতি তাহার প্রণয়-সঞ্চার? তাহার এই চিন্তার কারণ যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শেফালীর এখন কর্তব্য কি? শেলীর অজ্ঞাতসারেই তাহার সর্বাঙ্গে তড়িত-প্রবাহের গায় যেন আনন্দ-শিহরণ অনুভূত হইল। তাহার প্রস্ফুটিত কমলদল তুলা মুগমগুল গভীর আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শেলীর মুগের এই অপরূপ কাস্তি আর এক জন দেগিতে পাইল;—সে নিনা। নিনা যে অল্পকাল পূর্বে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা শেলী বা সুনীল লক্ষ্য করে নাই। সে আর চূপ করিয়া থাকিতে পারিল না; একটু অগ্রসর হইয়া হাসিয়া বলিল, “ব্যাপার কি? তোমরা দু'জনে মুখোমুখী হ'য়ে কল্প-লোকে ভ্রমণ ক'রছ না কি? পাঁচ মিনিট কাল ঠায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু তোমাদের কা'রও সে-দিকে খেয়াল নেই! সুনীলদা', এইবার কর্তব্য-পালনটা তাড়াতাড়ি ক'রেই ফেল না। এই মধুর টাদিনী রজনীতে, শমুদ্রের বুকে এই জাহাজেই প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হ'য়ে যাক। শেলীদি', তোমাকে 'বউদি' ব'লে ডাকতে পারি? আমার দাদাটির অবস্থা তো ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক দেখছি—প্রেমের খ্যাপলা-জালে একদম আটক! কবি ব'লেছেন—‘প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে? গরব সব হায়, কখন টুটে যায়, সলিল ব'য়ে যায় নয়নে।’—প্রেমের খেলা এমনই খেলায় বটে!”

শেফালী নিজাকে তৎক্ষণাৎ বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া সম্মেহে বলিল, “আচ্ছা পাগলী দেখছি তো! এক নিশ্বাসে

এঁত কথা ব'লতে তোমার হাঁপ লাগেনি ? আর তোমার কল্পনাও খুব উর্ধ্বর বটে, এই অল্প সময়েই অনেক-কিছু আবাদ ক'রে ফেলেছে !”

সুনীল নিনার মুখের দিকে চাহিয়া নীরস স্বরে বলিল, “নিনা, সব সময় তোমার ঠাট্টা ! তোমার ও-রকম রঙ্গ আমার ভাল লাগে না। তুমি যা ভাবছো, তা কিন্তু নয়। জাহাজের সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করা তো দোষের নয়, দোষ তোমার চোখের।”

নিনা হাসিয়া বলিল, “অত চট্টো কেন, দাদা ? আমি কি না এলুম তোমাদের সঙ্গে মিশে একটু আনন্দ করতে, আর তুমি অরসিকের মত রেগেই টং ! আমি তো আর ঘাস খেয়ে এত-বড়টা হইনি, কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আমার ঘটে আছে বৈ কি ! তা আমি আসায় তোমাদের প্রেমালোপে যদি ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে, তবে আমি না হয় খ'সে প'ডছি। কি বল, শেলীদি' ?”

শেফালী নিনাকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “তোমারও কি দাদার ওপর ও-রকম অভিমান করা উচিত ? হয় তো ঠাঁর মনটা এখন ভাল নেই ; কি যেন উনি ভাবছেন। এস, আমরা এই চাঁদের আলোয় ব'সে গল্প করি, আজকার এই রাত্রিটুকু আনন্দে কাটাই। আমাদের সমুদ্রযাত্রার আজই তো শেষ, এ-জীবনে আর আমাদের দেখা হবে কি না, কে জানে ?”

নিনা ব্যগ্রভাবে শেফালীর মুখ চাপিয়া-ধরিয়া আগ্রহ-ভরে বলিল, “দেখ শেলীদি', ও-কথাটি আর একটিবারও মুখে এনো না, ভাই ! কিছু দিন বেঁচে থাকলে তোমাতে আমাতে আবার দেখা হবেই। তুমি যেখানে থাক, আর আমি যখন যেখানেই থাকি,—বছরে বেশী না হোক, একবারও তোমার সঙ্গে দেখা করব দিদি ! আমি যাকে ভালবাসি, তাকে কখনও ভুলিনে ; ছিনে-জোকের মতন তাকে ধ'রে থাকি, ছাড়িনে।—আকাশে সূর্য্য, আর সরোবরে পদ্ম, লক্ষ যোজন দূরে থাকলেও তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে ; আর আমরা ছ'জনে থাকবো তো বাঙ্গালা দেশেই।”

শেফালী হাসিয়া বলিল, “কথাগুলো তোমার ভাই খুবই মিষ্টি লাগল ; কিন্তু সংসারের ব্যবস্থা চিরদিন এক-রকম থাকে না। তুমি তো আর চিরদিনই এ-রকম স্বাধীন

থাকবে, না, তোমার বিয়ে হবেই ; তার পর তোমার বর যদি এই নগণ্য লেডী-ডাক্তারটাকে তাঁর বাড়ীতে ঢুকতে না দেন, তখন ?”

নিনা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “সে সব হবে-টবে না ; তা' ক'রলে ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে অনর্থ ঘটাবো না ? নিজের ঘরে আমি যখন গিল্লী হব, তখন তোমাকে তো আমার বাড়ীতে এনেই আটক ক'রে রাখব ; সেই বাঁধন কেটে তুমি চ'লে যাবে—তার জো কি ? কারও বাধা আমি মানব না, কক্ষনো না।”

শেফালী হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। তখন হয় তো ব'লে ব'সবে, ‘এ আপদ কোথা থেকে এসে জুটলো, বিদেয় হ'লে বাঁচি' !”

সুনীল এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে উভয়ের আলাপ শুনিতেছিল, এবং মন সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নিনা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া স্বপক্ষে যে সকল কথা বলিল, তাহা শুনিয়া সুনীল বলিল, “এ তো তোমার এক-তরফা মন্তব্য হ'ল, নিনা ! ধর, যদি মিস্ মিত্রেরই বিয়ে হ'য়ে যায়, আর ঠাঁর স্বামী-রত্নটি যদি ঠাঁকে মুহূর্তের জগু চক্ষুর আডাল করতে না চান, তাহ'লে তখন কি করবে তুমি ? তাঁর ওপর তোমার তো আবদার খাটবে না।”

নিনা আবদারের স্বরে বলিল, “ইস, ছাড়বেন না বৈ কি ! আমি তাহ'লে তাঁর সঙ্গে হাতাহাতি ক'রব না ? শেলীদি' ! আমি তাই এখন থেকেই ব'লে রাখছি, কা'রও কোন বাধা আমি মানব না ; তুমি কিন্তু তাঁকে আগে থেকেই সাবধান ক'রে দিও—তা তিনি যিনিই হোন।”

শেলী আবার খল-খল করিয়া মধুর হাসিয়া বলিল, “ভয় নেই ভাই, আমার আর বিয়ে হবে না। বিয়ে আর আমি ক'রব না—এ তুমি ঠিক জেনে রাখ, নিনা !”

নিনা এই ‘আর’এর মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অবিশ্বাসের স্বরে বলিল, “ই্যা গো ই্যা, বিয়ে তোমার হবে না, তা তুমি জেনে রেখেছ ! দেখো, ঠিক একটি বছরের মধ্যেই তোমার বর এসে তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে, আর বলবে—‘দেহি মে পদপূজবমুদারং’—একথা আমি বলে দিচ্ছি।”

সুনীল হাসিয়া বলিল, “উঃ, মস্ত গণৎকার-ঠাকরুণ, সে-কালের সেই খনা আর কি!”

এইরূপ হাস্ত-পরিহাসে অল্পকাল পূর্বের সেই বিবাদের মেঘ কাটিয়া গেল। শয়ন-কাল পর্যন্ত তিন জনের সহর্ষ আলাপের আর বিরাম ঘটিল না।

সেই রাত্রিতে শয়নের পূর্বে নিনা শেলীর কামরায় প্রবেশ করিল, এবং বিদায়কালে শেলীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার দুই গালে চুম্বন দান করিয়া গদগদ স্বরে বলিল, “শেলীদি, তুমি সুনীলদা’কে প্রত্যাখ্যান করনি তো? ওকে আমি আর কোনও দিন এতখানি বিচলিত দেখিনি! আমার কিছু বিশ্বাস, ও তোমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব ক’রেছিল। সত্যি কথা বল আমায়—লক্ষ্মীটি! জানতে আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছে—সত্যি।”

শেলী কৃত্রিম গাঙ্গীর্ঘ্য প্রকাশ করিয়া বলিল, “তুমি সত্যিই একটি আস্ত পাগল, এতে আর আমার ভুল নেই! তোমার দাদা কোন্ ঘরের ছেলে, তা তো আর আমার জানতে বাকি নেই; আমার মত গেঁয়ো লেডী-ডাক্তারকে বিয়ে করা তাঁর কি মানাবে, না পোষাবে? আর তাঁর বাবা-মা—তাঁরাই বা তাতে রাজী হবেন কেন? তোমার দাদার মনের এক প্রান্তেও এ-কথা স্থান পায়নি—এ-কথা আমি খুব জোর ক’রেই বলতে পারি, নিনা! আর আমিও তো সংকল্প করেছি যে, আর আমি বিয়ে ক’রুব না; কারণ আমার পক্ষে তা যে একবারেই অসম্ভব, তাই! আমার বিয়ের কথা তুমি তোমার মন থেকে মুছে ফেল। বিশেষতঃ, তোমার দাদার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় খুব সম্ভব এইখানেই চিরদিনের মত শেষ।”—শেলী অতি কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া রাখিল।

নিনা অবিশ্বাসের সুরে বলিল, “দেখ শেলীদি, যত বিজ্ঞই তুমি হও, এ বিষয়টা আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশী বুঝি। তুমি নিজেকে যতই নগণ্য বলে পরিচিত

কর, তোমার চেহারায়, তোমার চাল-চলন ও ব্যবহারে সম্ভ্রান্ত বংশের ছাপ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। এই লেডী-ডাক্তারীটা তোমার একটা বাহ্যিক খোলস মাত্র, এ-কথা আমি বেশ ভালই জানি। তুমি তোমার প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে রাখবার জন্ত যতই চেষ্টা কর, আমাকে তুমি প্রতারিত করতে পারবে না। তোমার আত্মগোপনের বাহ্যিক খোলসটা সকলকে বিম্বিত ক’রে এক দিন খ’সে পড়বে—এ বিষয়ে আমার একরক্মিও সন্দেহ নেই।”

শেলী ঈর্ষ হাঙ্গিয়া বলিল, “নিনা, তুমি কি জান না, অনেক সময় পাকা জহুরীরও ভুল হয়,—পাকা জহুরীও নকলকে আসল বলেই জাহির করে।”

নিনা মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, “ও-কথা সত্য হ’তে পারে; আমি কিছু ঠিক জানি—আমার ভুল হয়নি। দেশে ফিরে তোমার আসল পরিচয় আমি ঠিক বা’র করুব—এ তুমি জেনে রাখো।”

শেলী মুখভার করিয়া বলিল, “কেন? বিনা-পরিচয়ে কি আমাকে মানতে চাও না? সেই জন্তই কি সঙ্গিনী ক’রবার আগে আমার কুল-শীলের খবর চাও—সেইটাই কি তোমার কাছে বড় হ’ল?”

নিনা সোহাগভরে শেলীর গালে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিল, “কি যে বল তুমি! তা তুমি যেই হও, আর যাই হও, চিরদিনই তুমি আমার আদরের দিদি; এ-জীবনে আর তোমাকে ছাড়বো না, তা তো বলেই রেখেছি। আসল পরিচয় তোমার আগেও চাইনি, পরেও চাইনে।”

শেফালী এ-কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইল; সে তাহার আত্মপরিচয় গোপন করিয়া জীবন যাপন করিবে, এ সম্বন্ধে সে ত্যাগ করে নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনীলিমা দেবী।





দপ্তর

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভবদেব-পদ্ধতি

বঙ্গদেশীয় অধ্যাপক মহাশয়গণ কর্মকাণ্ড-পদ্ধতির ভট্ট গুণ-বিষ্ণুর টীকারই সম্পূর্ণ পক্ষপাতী জানিয়া মৎসম্পাদিত ভবদেব-পদ্ধতির প্রথম সংস্করণে আমি ঐ টীকাই দিয়াছিলাম এবং পুস্তক লেখার সঙ্গে-সঙ্গেই মুদ্রণকার্যও আরম্ভ করাইয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই দেখিলাম, উহাতে অনেক গোলযোগ। তখন কতকগুলি ফর্ম্ম ছাপা হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িতেও পারিলাম না। যেন তেন প্রকারেণ গৌজা-মিগ দিয়া পুস্তক বাহির করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত বাহির করিতে হইয়াছিল এবং তখন শরীরও নিতান্ত অসুস্থ ছিল বলিয়া তাহাতেও ঐরূপই থাকিয়া গিয়াছে।

গুণবিষ্ণুর টীকা অনেকেই ছাপাইয়াছেন। সম্প্রতি ষ্টিশ, চার্চ কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ মহোদয় নানা পুস্তক আলোড়নপূর্ব্বক অতি বিস্তৃত ভাবেই উহা সম্পাদন করিয়াছেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ হইতে উহা প্রকাশিতও হইয়াছে। উহাতে 'ক' এই সংক্ষিপ্ত নাম দিয়া আমার ভবদেব-পদ্ধতির বহুতর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত নাম 'হু' রাখিলাম।

ভট্টনারায়ণের সম্পূর্ণ ভাষ্য সহ গোভিলগৃহসূত্র এত কাল পাওয়া যায় নাই। স্মার্তশিरोमणि স্মৃতিতত্ত্বকার রঘুনন্দনের সংস্কারতন্মুখেই ভট্টভাষ্যের কিছু কিছু অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম-এ বাগ্‌চি ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ তত্ত্বরত্ন শাস্ত্রী মহোদয় সম্পূর্ণ ভট্টনারায়ণ-ভাষ্য সহ গোভিল গৃহসূত্র সম্বন্ধে সম্পাদন করিয়াছেন। উহা সংস্কৃতগ্রন্থমালার ১৭ নং পুস্তক। উহার পাদটীকাতেও আমার প্রতি কটাক্ষপাত আছে। আমি উহার সংক্ষিপ্ত নাম 'ন' রাখিলাম।

(ক) হু-পুস্তকের উপক্রমণিকায় আমার পুস্তক সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

Though a little less than half of Gunavisnu's commentary Ch Mbh finds place in the work, the numerous emendations freely made by the editor without the support of any manuscript, and the equally unwarranted rejection of

passages have detracted very much from the value of the edition.

(খ) প্রাস্তাবিক নিবেদনে লিখিত হইয়াছে—উত্তরবিবাহ-কর্ম্মান্তে অন্নস্ততিবিনিযুক্তে “অন্নং প্রাণস্ত পঙ্বিংশস্তেন বয়ামি স্বাসৌ” ইতি মন্ত্রে পরিপাঠিতং বঙ্গমার্ধকং “পঙ্বিংশ”পদং শ্রীমচ্ছায়া-চরণকবিরত্নমহোদয় সম্পাদিতায়ামম্মাভিঃ “ক” ইতি সংক্ষিপ্তনাম্না সংক্ষেপিতায়ঃ (প্রথমাক্ষনাবৃত্তৌ ৭৯ পৃঃ, দ্বিতীয়াক্ষনাবৃত্তৌ ১১২ পৃঃ, তৃত্বপ্রভাষ্যক ২৫১ পৃঃ) “বড়্বিংশ”শ্বেন পরিণতং “পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাতিরিক্ত” ইত্যেবংরূপয়া ব্যাখ্যয়া সংবোধিতক দৃশ্যতে। শ্রীমৎসীতামাখসিদ্ধান্তবাগীশ-শরচ্চন্দ্রকাব্যব্যাকরণতীর্থ-মহোদয়াভ্যাং সম্পাদিতে পুরোহিতপ্রদীপে (১ম খণ্ডে ৭৪ পৃঃ) পুনস্তদেব পদং “পঙ্বিংশ”রূপেণ পঠিতম্। মহামহোপাধ্যায়শ্রীমৎ-পরমেশ্বরবামহোদয়সংশোধিতে অম্মাভিম্ ইতি সংক্ষিপ্তনাম্না সংক্ষেপিতে ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে তটস্যব পদস্ত “পঙ্বিংশ” ইতি পাঠস্বীকৃত্য “পচেরচঃ পরো বিশঃ হুম্ হ্রস্বসীতি হুমাগমঃ মিপাতমাদ্ বর্গান্তঃ” ইতি ভাষ্যেহো মুদ্রাপিতঃ। মন্ত্রটস্যেতস্তাকর-ভূতে মন্ত্রত্রাক্ষণে অম্মৎসংগৃহীতেষু দ্বিত্রেষাদর্শপুস্তকেষু চ পঙ্বিংশ ইত্যেব পাঠঃ পর্য্যালক্ষত। ইত্যম্মাভিরত্র স এব পাঠৌ গৃহীতঃ।

(গ) সমাবর্তনে “গন্ধর্কোহস্যপাব। উপ মামব।” ইহাই মন্ত্র ত্রাক্ষণের পাঠ। গুণবিষ্ণুর টীকাধৃত পাঠ “গন্ধর্কোহস্যপ মা অব।” ‘মা অব’ হলে অসন্ধি থাকায় আমি মনে করিয়াছিলাম—লিপিকর বা মুদ্রাকরাদির প্রমাদে মন্ত্রের ও গুণবিষ্ণুর টীকার পাঠ কিয়দংশে পঠিত হইয়াছে। একত্র মধীর পুস্তকে মন্ত্রত্রাক্ষণের পাঠই ধরিয়া গুণবিষ্ণুটীকার মধ্যে পঠিত অংশে সাযণভাষ্য দিয়াছি। এই অপরাধে ম-পুস্তকের পাদটীকার লিখিত হইয়াছে—বিজ্ঞাবারিধিত আকরগ্রন্থপাঠমেব মূলে সন্নিবেশ্য তদম্মসারিণীং গুণবিষ্ণুটীকাং রচয়া-বভূবেতি তস্ত সাহসমেব ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে তাদৃশপাঠাম্পলক্বে-রিত্তি স্রষ্টব্যং সুধীভিঃ। ঐদৃশৈরেব রচনাকুশলৈঃ প্রকৃতৌ গ্রন্থপাঠঃ প্রচ্ছাত্তে ইত্যেতদ্ হৃদৈবং শাস্ত্রগ্রন্থানামিতি।

একণে উল্লিখিত উভয় পুস্তকের আলোচনার সহিত স্বীয় পুস্তকের আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১) ভবদেব কুশণ্ডিকার লিখিয়াছেন—“উপৰ্য্যখঃস্থিতদাক্ষণ-বামমুষ্টিভ্যাং কলপুপকুশান্ গৃহীত্বা বিরূপাক্ষপং কুর্যাৎ। পরমেষ্ঠী ঋষিঃ কল্পরূপোহগ্নিদেবতা বিরূপাক্ষপে বিনিয়োগঃ। ও ভূত্বংস্বরো মহাস্তমাস্তানং প্রপত্তে। বিরূপাক্ষোহপি দস্তাক্তি...।

অথ যদি কাম্যকর্মার্থে কুশলিকা ক্রিয়তে, তদা প্রথমমন্ত্রলিং বন্ধা ও তপশ্চ তেজশ্চ...তানি প্রপত্তে, তানি মামবন্ত । ইতি অশ্বত্থ । পশ্চাৎ বিরূপাক্ষমন্ত্রঃ কুর্য্যাৎ ।" তপশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রের সংজ্ঞা প্রপদ । ভবদেব বিরূপাক্ষ মন্ত্রেরই ঋষ্যাদি ধরিয়াছেন, তপশ্চ মন্ত্রের ঋষ্যাদি ধরেন নাই । ঋষ্যাদি ব্যতিরেকেও মন্ত্রপাঠ প্রচলিত আছে ; যথা—সকলমন্ত্র, শ্রাদ্ধমন্ত্র, নবগ্রহমন্ত্র ইত্যাদি ।

হু-পুস্তকে তপশ্চ ইত্যাদি এবং বিরূপাক্ষোহসি ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র একত্র ধৃত হইয়াছে । ভাষ্য—“বজুরিদম্ পরমেষ্ঠী ঋষিঃ ক্রতুরূপোহগ্নিদেবতা বিরূপাক্ষরূপে বিনিয়োগঃ ।” ইত্যাদি । টিপ্পনী—“মৈ-ক-পুস্তকয়োঃ প্রপদমন্ত্রস্তাত্ত ভূরিত্যারভ্য প্রপত্ত ইত্যস্তো মন্ত্রভাগো অনন্তরপঠিতস্ত বিরূপাক্ষমন্ত্রস্তাদিমতয়া গৃহীতো দৃশ্যতে ।”

ন-পুস্তকের ভটভাষ্যেও এইরূপ ; যথা—তপশ্চৈত্যাদিকং প্রপদং জপিষ্য...বিরূপাক্ষোহসীত্যাদিকং বৈরূপাক্ষমারভ্যোচ্ছুসেৎ (৪।৫।৮) ।

বক্তব্য—‘মন্ত্রভাগো অনন্তর’ ইহা শুদ্ধিপত্রে ধৃত হয় নাই । গুণবিষ্ণুটীকা দেখিয়া পণ্ডিত, অপণ্ডিত সকলেই কাম্যকর্ম করিবার সময়ে অগ্নে “পরমেষ্ঠী ঋষিঃ” ইত্যাদি বলিয়া তার পর তপশ্চ ও বিরূপাক্ষমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং ভবদেবের প্রকৃত পাঠকে অনেক স্থলে বিকৃতও করিয়াছেন । তপশ্চ মন্ত্রের ক্রতুরূপ অগ্নি ত হুরের কথা, কোনও অগ্নিই দেবতা নহেন । “দেবতা মন্ত্রবাক্যান্তি-ধেয়া” যে মন্ত্রবাক্যের বাহা অভিধেয় (বাচ্য), তাহাই সেই মন্ত্রের দেবতা । অতএব তপশ্চ মন্ত্রের দেবতা তপঃ তেজঃ শ্রদ্ধা ইত্যাদি । “তানি প্রপত্তে, তানি মামবন্ত” এই অংশে শরণাগতি ও প্রার্থনা উভয়ই আছে ; কিন্তু “ভূভূবঃস্বরোঁ মহাশ্চমাত্মানং প্রপত্তে” এই অংশে কেবল শরণাগতিই আছে, প্রার্থনা নাই ; ইহাতে প্রক্রমভঙ্গ দোষ ঘটে । স্মৃতি পণ্ডিত মাঝেই জানেন—রঘুনন্দন ভটভাষ্যকেই সমধিক প্রমাণ মানিয়া সংস্কারতত্ত্বে বহু স্থলে সরলা (গোভিল গৃহ্মপুত্রের প্রাচীন টীকা) ও ভবদেবভট্টের উক্তিকে হেয় বলিয়াছেন । সেই রঘুনন্দন এখানে ভবদেবের উক্তি ভটভাষ্যেরই সম্মত হওয়ার তাহাকে হেয় না বলিয়া লিখিয়াছেন—“চতুর্থপ্রপাঠকস্ত পঞ্চমকণ্ডিকায়াং গোভিলঃ—বৈরূপাক্ষং পুরস্তাক্ষো-মানামিতি । বিরূপাক্ষ-শব্দো বিজ্ঞতে অত্রৈতি বৈরূপাক্ষঃ ও ভূভূবঃস্বরোঁমিত্যাদিকো মন্ত্রঃ ।”

(২) হু-পুস্তকে বিরূপাক্ষ মন্ত্রের ভাষ্য—“তথা চ স্মৃতিঃ সর্কতঃ পাণিপাদান্তঃ ইতি ।” টিপ্পনী—মৈ-ক তথাচ স্মৃতিঃ ।

বক্তব্য—‘সর্কতঃ পাণিপাদান্তঃ’ শুদ্ধিপত্রে নাই । ঐ বচনটি গোভিলপুত্রকৃত-গৃহ্যসংগ্রহোক্ত বলিয়া স্মৃতিই বটে ; কিন্তু গুণবিষ্ণু-পুটীকার প্রকৃত পাঠ “তথা চ স্মৃতিঃ ।” সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং সংশোধন করিয়া “স্মৃতিঃ” লিখিয়াছেন । যেহেতু, রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বে হোমপ্রকরণে গৃহ্যসংগ্রহ হইতে কর্তৃবিশেষে অগ্নির বিশেষ নাম উদ্ধৃত করিয়া পরে লিখিয়াছেন—“বিশেষ-মামাজ্ঞানে গুণবিষ্ণুগৃহ্য স্মৃতিঃ—সর্কতঃপাণিপাদান্তঃ... । গুণবিষ্ণুনা তু স্মৃতিরিত্তি কৃৎ সর্কতঃপাণিপাদান্তঃ ইতি লিখিতম্ ।”

(৩) ভবদেব প্রায়শ্চিত্তহোমে শাট্যারনহোম ধরায় রঘু-নন্দন লিখিয়াছেন—“ভবদেবভট্টোক্ত-প্রায়শ্চিত্তাস্ত্রক-শাট্যারনহোমো নিশ্চয়ঃ ভট্টমার্যার্যৈর্গোভিলভাষ্যে (১।৮।১৫) তদপ্রমাণীকৃতম্ ।” কৃষ্ণজুর্বেদে শাট্যারনের উক্ত হোমের ৯টি মন্ত্রের মধ্যে ৪টি মন্ত্র

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ; তৈত্তিরীয় আরণ্যকই নারায়ণোপনিষদ্ নামে পৃথক্ গ্রন্থ । ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম মন্ত্র কৃষ্ণজুর্বেদের ; তন্মধ্যে ৫ম মন্ত্রটি সামবেদেও আছে, কিন্তু উত্তরার্ধ অগ্ররূপ । ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্র সামবেদেও অবিকলই আছে । ৮ম মন্ত্র তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ; সামবেদেও আছে, কিন্তু প্রথম চরণটি অগ্ররূপ । ৯ম মন্ত্রটি কেবল ঋগ্বেদে ও কৃষ্ণজুর্বেদে আছে । ১ম হইতে ৮ম পর্যন্ত প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা অগ্নি ; সায়ণ-ভাষ্যেও তাহাই আছে ।

হু-পুস্তকে ১ম হইতে ৮ম পর্যন্ত মন্ত্রের দেবতা ভিন্ন ভিন্ন । ২য় মন্ত্রের পাঠ—“পাতি নো বিশ্ব বেদসে ।” ভাষ্য—বৈশ্বদেব্যং যজুঃ । হে ‘বিশ্ব’ বিশ্বে দেবাঃ ‘বেদসে’ বেদসঃ অসাত্ত্বজ্ঞানিত-পাপসমুদ্ভূতারা বেদনারাঃ সকাশাৎ ‘নঃ পাতি’ । বিশ্ব ইতি সামান্ত্য-পেক্ষয়া একবচনম্ । বেদসে ইতি বিদ বেদনাখ্যাননিবাসেষু “সর্কধাতুভ্যোহস্মন্” চতুর্থী পূর্ববৎ (পঞ্চম্যর্থ) ।

বক্তব্য—দেবতা অর্থে বৈশ্বদেব হয়, বৈশ্বদেব্য হয় না । পাণিনীয় ধাতুপাঠে “বিদ চেতনাখ্যাননিবাসেষু” আছে ; ‘বেদনা’ কোথা হইতে পাইলেন ? সায়ণ—“বিশ্ববেদাঃ ; বিশ্ববেদসে কৃৎস-জ্ঞানসিদ্ধার্থম্ ।” বিশ্ববেদাঃ অগ্নির নাম ; যথা সংক্ষিপ্তসারে “বিশ্বপূর্বাঙ্ঘিভিঃস্বরোঁ । (অস্প্রত্যয়ঃ) বিশ্ববেদাঃ বিশ্বভোজাঃ অগ্নিঃ ।”

(৪) হু-পুস্তকে ৪র্থ মন্ত্র—“সব্যং পাতি শতক্রতো ।” ভাষ্য—“হে শতক্রতো” ‘সব্যং’ সব্যো যাগঃ তত্র ভবং ফলং ‘পাতি’ বিষ্ণুগেহপি যজ্ঞে যথোক্তকলদো ভব ।’ ন-পুস্তকের পাদটীকাতোও এইরূপ মন্ত্র ও ঐরূপ ব্যাখ্যা ।

বক্তব্য—তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, সূতরাং নারায়ণোপনিষদেও “সর্কং পাতি শতক্রতো ।” সায়ণ—শতসংখ্যাকাঃ ক্রতবো যজ্ঞাঃ যেন অগ্নিনা নিষ্পাত্ত্বস্তে সোহয়ং শতক্রতুঃ, হে শতক্রতো, সর্কং জ্ঞানসাধনং গুণশাস্ত্রাদিকং পাতি ।” ‘শতক্রতু’ ইজ্ঞেরই প্রসিদ্ধ নাম । হু-পুস্তকের ভাষ্যে ও ন-পুস্তকের পাদটীকায় উহার কোনও ব্যুৎপত্তি নাই ; সূতরাং তাহাদিগের মতে উহা ইজ্ঞেরই সম্বোধন । ‘সব্যং’ পাঠ কোন্ বেদে আছে ?

(৫) হু-পুস্তকে ও ন-পুস্তকের পাদটীকায় ৫ম মন্ত্রের পাঠ সম্পূর্ণ সামবেদের ।

(৬) ৭ম মন্ত্রের পাঠ সামবেদে “সহ রযা ।” হু-পুস্তকে “সহর্জা ।” ন-পুস্তকের পাদটীকায় সহর্জা ধরিয়া, সামবেদের পাঠ “সহ রযা” লিখিত হইয়াছে । সহর্জা পাঠ কোন্ বেদের ?

(৭) নবগ্রহহোমে “বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন” মন্ত্রটি ঋগ্বেদে, গুরুষজুর্বেদে ও কৃষ্ণজুর্বেদে আছে । সর্কত্রই মন্ত্রের তৃতীয় চরণটি “প্রভঞ্জংসেনাঃ প্রমৃণো যুধা” সায়ণ ও মহীধর—“সেনাঃ দৈত্যানাং সৈন্তানি প্রভঞ্জন্ বিমৃদনন্” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । প্রভঞ্জন্-সেনাঃ স্থলে সন্ধি করিলে সকারের আদিত্তে বিকল্পে ধুট্, (ধ্) আগম এবং স পরে থাকায় ধ্ স্থানে ৎ ।

হু-পুস্তকে “প্রভঞ্জংসেনাঃ” ভাষ্য—প্রভঞ্জতাং বিমর্দং কুর্কতাং দৈত্যানাং সেনাঃ ।” প্রভঞ্জংসেনাঃ কোন্ বেদের পাঠ ?

(৮) শেষ বারের অগ্নিপৰ্য্যায়ের মন্ত্র—“অদিত্তেহজ্ঞমংহাঃ । অজুমতেহজ্ঞমংহাঃ ।”

হু-পুস্তকে—“অদিত্তে অধমংহাঃ । অজুমতে অধমংহাঃ ।” ন-পুস্তকের পাদটীকাতোও এইরূপ ।

বক্তব্য—অকারের লোপ না হইবার স্ত্র কি ?

(১) শাস্তিমন্ত্র—করা ন। করা। অভী যুগঃ। স্বস্তি ন। এই ৪টি মন্ত্রকেই সকলে শাস্তিমন্ত্র বলিয়া জানেন। উহাদের আদিতে ভবদেবপঙ্কতির প্রচলিত বিকৃত পাঠ—“মহাবামদেব্য ঋষিঃ বিরাড্ গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শাস্তিকর্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ইহাতে সকলেই বুঝিয়াছেন—উহা ৪টি মন্ত্রেরই ঋষ্যাদি।

হু-পুস্তকে ভাষ্য—“গায়ত্র্যস্তিত্রঃ [ত্রিষ্টুবেকা] ইন্দ্রদেবতাকাঃ শাস্তিকর্মণি বিনিয়ুক্তাঃ মহাবামদেবদৃষ্টাঃ।” টিপ্পনী—ভ—মৈ—গায়ত্র্যশ্চতস্রঃ। ন-পুস্তকের পাদটীকায়—“বামদেব্যমন্ত্রাস্ত—করা ন...। করা...। অভী যুগঃ...। স্বস্তি ন...।”

বক্তব্য—কেবল ভ—মৈ কেন? গুণবিষ্ণু টীকার সমস্ত পুস্তকেই, সম্পাদক মহাশয়ের সংগৃহীত সমস্ত আদর্শ পুস্তকেও “গায়ত্র্যশ্চতস্রঃ” আছে; সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া যে ঐরূপ পাঠ করিয়াছেন, তাহা ‘ক্রচেষ্ট’ চিহ্ন দ্বারা ই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। মহাবামদেব্য বা মহাবামদেব নামে কোনও ঋষি ছিলেন না। কাভ্যায়নের সর্কাক্ষরমণীতে কোনও মন্ত্রেরই ঋষি মহাবামদেব্য বা মহাবামদেব নাই। তাহাতে প্রথম ৩টি মন্ত্রের ঋষি বামদেব। ‘বামদেবেন দৃষ্টং সাম’ এই বাক্যে “বামদেবাড্ ড্যাড্ ড্যাড্” (৪।২।১) স্ত্র দ্বারা ড্যাং বা ড্যা প্রত্যয়ে বামদেব্য হয়। অতএব ‘বামদেব্য’ পদটি ঐ সামন্ত্রের বিশেষণ। এইজন্য গোভিল বলিয়াছেন—“অপবৃন্তে কর্মণি বামদেব্যগানং শাস্ত্যর্থম্।” ছন্দোগপরিণিষ্টে আছে “অস্তে চ বামদেব্যশ্চ গানমিত্যথবা ত্রিধা।” তদনুসারে ভবদেবও লিখিয়াছেন—“শাট্যায়নগোমাদি-বামদেব্য-গানাস্তং সর্কাক্ষরসাধারণমুদীচ্যং কর্ম কৰ্তব্যম্।” গানের প্রকারভেদে বামদেব্য গানই মহাবামদেব্য হইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্রত্রয়ের কোনওটারই বিরাট গায়ত্রী ছন্দঃ নহে। প্রথমটার শুদ্ধা গায়ত্রী, দ্বিতীয়টার নিচং গায়ত্রী, তৃতীয়টার পাদনিচং গায়ত্রী। ঐ এই একাক্ষর মন্ত্রের ছন্দঃ দৈবী গায়ত্রী হইলেও সন্ধ্যাপঙ্কতি-কারেরা যেমন কেবল গায়ত্রী বলিয়াছেন, সেইরূপ উক্ত ৩টি মন্ত্রেরও প্রকারভেদের উল্লেখ না করিয়া কেবল গায়ত্রী ছন্দঃ বলা যাইতে পারে। পরন্তু “স্বস্তি ন” মন্ত্রের ঋষি রাহুগণ গোতম (মহাবামদেব্য, মহাবামদেব বা বামদেব নহেন); ছন্দঃ বিরাটস্থানা ত্রিষ্টুপ্ (গায়ত্রী নহে); দেবতা বিশ্বেদেবাঃ (ইন্দ্র নহেন); বিনিয়োগ স্বস্তিবাচনে (শাস্তিকর্মে নহে)। গোভিল না বলিলেও ভবদেব জয়ন্তধামীর বচন অনুসারে ঋষ্যাদির উল্লেখ না করিয়াই “স্বস্তি ন” মন্ত্রটি ধরিয়াছেন। জয়ন্তধামীর বচন যথা—“স্বস্তিবাচনমন্ত্রেষ্টং সর্কাক্ষরমুদ্বিকর্মণাম্। আদাবস্তে প্রয়োক্তব্যমিতি মন্ত্রবিদাং মতম্।” হু-পুস্তকে “স্বস্তি ন” মন্ত্রেরও দেবতা ইন্দ্র বুঝিয়া ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—“নঃ” অস্মাকম্ ‘ইন্দ্রঃ’ ‘স্বস্তি’ শাস্তিঃ ‘দধাতু’। কিভূতঃ? বৃদ্ধপ্রবাঃ বৃদ্ধবাক্যকারা; তথা পূবা, ‘বিশ্বেদেবাঃ’ সর্কাক্ষরঃ। তথা তাক্যঃ, অরিষ্টনেমিঃ অব্যাহত-গতিপ্রসরাঃ। তথা বৃহস্পতিঃ। ‘স্বস্তি নঃ দধাতু’। ভাষ্যকার ‘কিভূতঃ?’ বলিয়া বেক্রপ পুনঃ পুনঃ ‘তথা’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে পূবা বিশ্বেদেবাঃ ও ‘তাক্যঃ অরিষ্টনেমিঃ’ মিশ্র বিশেষণ এবং তন্মধ্যে প্রথম দুইটি নিব্বর্ধকই বুঝায় (মাহু-টাঙ্ক, গরু টক, চাণা-ভুবা ইত্যাদি স্থলে অস্তপদের জ্ঞায়); সম্পাদক মহাশয় পৃথক পদ বুঝাইবার জন্ত মध्ये মধ্যে ‘কমা’ চিহ্ন দিয়াছেন।

ইন্দ্রকে বুঝাইবার জন্ত ‘তাক্যঃ’ পদের ব্যুৎপত্তি করা ভাষ্যকারেরই উচিত ছিল না কি? ভাষ্যের অর্থ বুঝিবার জন্ত বাহারা অভিধান ঘাঁটিবেন, তাহারা নানার্থ মেদিনীকোষে দেখিতে পাইবেন—“তাক্যঃ হ্রস্বশালয়োঃ। গরুড়াঙ্কে সুপর্ণে পুংসি ক্রীবে রসাজ্জনে।” ইহাদের কোনটাই ত ইন্দ্রকে বুঝায় না।

(১০) বিবাহে কটপাদপ্রবর্তনে বধুর পাঠ্যমন্ত্র মন্ত্রত্রাক্ষণে এই-রূপ—“প্র মে পতিধানঃ পশ্বাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্।” তদনুসারে গোভিলসূত্র—পশ্চাদগ্নেঃ সংবেষ্টিতং কটম্বেং-জাতীয়ং বাহন্যং পদা প্রবর্তয়ন্তীং বাচয়েৎ—প্র মে পতিধানঃ পশ্বাঃ কল্পতামিতি। গৃহ্যসংগ্রহে—“পদা প্রপত্ত পশ্বানং পতিধানং সং-জপেষধুঃ। বরো বাহত্র জপেয়স্ত-মা কণিস্তাদিতি স্থিতেঃ।” সায়ণ—‘মে’ মম ‘পতিধানঃ’ পত্যা সহ ঋষতে অনেন ইতি পতিধানঃ ‘পশ্বাঃ’ মার্গঃ ‘শিবা’ শিবঃ কল্যাণকরঃ, ‘অরিষ্টা’ অরিষ্টঃ বিঘ্নশূন্যচ ‘প্রকল্পতাং’ সম্পত্তাম্। যেন পথা অহং ‘পতিলোকং’ পতিকুলং ‘গমেয়ং’ গচ্ছেম্।

হু-পুস্তকে—“প্র মে পতি বা নঃ পশ্বাঃ কল্পতাম্। শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্।” ভাষ্য—‘নঃ’ অস্মাকং পতিঃ ‘মে’ মদর্থং ‘পশ্বাঃ’ পশ্বানং ‘প্রকল্পতাং’ প্রকরোতু। ‘বা’ যেন পথা অহং ‘শিবা’ সুখাবহা ‘অরিষ্টা’ অহিংসিতা ‘পতিলোকং’ পতিকুলং ‘গমেয়ং’ গচ্ছামি। ন-পুস্তকের গোভিলসূত্রে—“প্র মে পতি বা নঃ পশ্বাঃ কল্পতাম্।” উহার পাদটীকায় ঐরূপ পাঠ এবং ব্যাখ্যাও হু-পুস্তকের জায়।

বক্তব্য—মন্ত্রটি বধু একা বলিবে, তবে ‘নঃ পতি’ আমাদের পতি, বলিবে কেন? ‘বা’ (যে পথ দিয়া) পদটি প্রথম বাক্যের অন্তর্গত, দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়ার সহিত তাহার অর্থ করা কি দৃশ্যের নহে? কৃপ ধাতু অকর্মক, উহার অর্থ ‘করোতু’ ক্রিয়ার হইল? বধু আপনাকে অনর্থক সুখাবহা (সুখজনিকা) বলিবে কি জন্ত? তা ছাড়া শিব শব্দের অর্থ কি সুখ? প্রথমে ‘নঃ পতি’ (আমাদের পতি) বহুবচনে বলিয়া, পরে ‘অহং ‘গমেয়ং’ (আমি যাইব) একবচনে বলিবে কেন? ‘গমেয়ং’ আশীর্ষিণ্ডের পদ, তাহার প্রতিশব্দ ‘গচ্ছামি’ লটের পদ ক্রিয়ার হইতে পারে? বরের বাড়ী যাতায়াতের পথ কি থাকে না? তাহাকে কি উড়া জাহাজে বিবাহ করিতে যাইতে হয়? আহা, সে বেচারাকে বধু লইয়া বাড়ী যাইবার জন্ত কোদাল, কুড়ল, ঝুড়ি লইয়া পথ প্রস্তুত করিতে যাইতে হইবে! মন্ত্রত্রাক্ষণের ও গৃহ্যসংগ্রহের বিকৃত মন্ত্র বাহাতে আছে, তাহা কি প্রকৃত গোভিলসূত্র? “প্র মে পতি বা নঃ পশ্বাঃ” এরূপ পাঠ কোন্ বেদে আছে?

(১১) লজ্জা বশতঃ বধু যদি ঐ মন্ত্র না পড়ে, তাহা হইলে পতিই দুইটি পদের পরিবর্তন করিয়া ঐ মন্ত্রটি এইরূপে পড়িবে—প্রাশ্নাঃ পতিধানঃ পশ্বাঃ.....গম্যাঃ।

হু-পুস্তকে—প্রাশ্নাঃ পতি বা নঃ পশ্বাঃ..... গম্যাঃ। ন-পুস্তকের গোভিলসূত্রেও ঐরূপ পাঠ। উহার পাদটীকাতেও ঐরূপ পাঠ ও ঐরূপই ব্যাখ্যা।

বক্তব্য—পূর্ববৎ মন্ত্রত্রাক্ষণ ও গৃহ্যসংগ্রহ-বিকৃত পাঠই কি গোভিল ধরিয়াছেন? তাহা হইলে মন্ত্রের অর্থ হয় এইরূপ—আমাদের পতি ইহার পথ প্রস্তুত করুক, যে পথে, তে কন্তে, তুমি পতিগৃহে যাইবে।

বক্তব্য—পতিদের পতি কোন্ জন ? সে কোন্ গরজে কতার পতিগৃহে বাইবার ১/৪ প্রস্তুত করিয়া দিবে ? “প্রাত্নাঃ পতি বা নঃ পত্নাঃ” এরূপ পাঠ কোন্ বেদে আছে ?

(১২) সপ্তপদীগমনে—“সপ্ত সপ্তভো। হোত্রাভ্যো বিকৃণ্ডা নয়তু।” প্রথম সংস্করণে প্রক্ দেখিবার ক্রটিতে ‘হোত্রাভ্যো’ পদটি মূলে ছিল না, টাকায় ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে মূলেও আছে। হুর্গামোহন বাবু দ্বিতীয় সংস্করণও দেখিয়াছেন (খ)। তথাপি তিনি ১ম সংস্করণের ঐ ভুলটি প্রদর্শন করিতে বিন্মৃত হন নাই।

(১৩) ভোজনগোমের একটি মন্ত্রে পড়্‌বিশ্ব স্থলে আমি ষড়্‌বিশ্ব করিয়াছি। তাহা তিনি উপক্রমণিকায় ধরিয়াছেন (খ)। এরূপ করিবার কারণ এই যে, ভাষাকারে ঐ অদ্ভুত পদের অর্ধ ‘বন্ধন’ লিখিয়াছেন, কিন্তু ব্যুৎপত্তি লেখেন নাই বলিয়া আমার সংশয় হইয়াছিল যে, আমার আদর্শ মন্ত্রব্রাহ্মণ-পুস্তকে বহু মুদ্রাকর-প্রমাদের জায় এখানেও ষ্ স্থানে ষ্ হইয়াছে। কেবল আমার নহে, অনেকেরই যে এরূপ সংশয় হইয়াছে, তাহা সম্পাদক মহাশয় উপক্রমণিকায় দেখাইয়াছেন। তজ্জন্ম ঐ স্থানে কেহ পড়্‌বিশ্ব, কেহ পড়্‌বিশ্ব করিয়া ষথেষ্ট ব্যুৎপত্তিও করিয়াছেন। আমি এরূপ করিয়াও নিশ্চিত ছিলাম না। উহার প্রকৃত পাঠ ও ব্যুৎপত্তি জানিবার জন্ত বহু অহুসন্ধান করিয়া উভয়ই অবগত হইয়া হুর্গামোহন বাবুর সম্পাদিত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য বাহির হইবার বহু পূর্বেই সায়ণভাষ্য সহ ভবদেব-পদ্ধতির তৃতীয় সংস্করণের জন্ত কপি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সম্প্রতি উহা ছাপা হইতেছে এবং অভিনীত বাহির করিবার জন্ত ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় যে, পুনঃ পুনঃ ‘পড়্‌বিশ্ব’ অকারান্ত লিখিয়াছেন, তাহা নহে; উহা অসুভাগাস্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। এইজন্মই ভাষাকারে উহার অর্থ ‘বন্ধন’ না লিখিয়া ‘বন্ধনঃ’ লিখিয়াছেন।

(১৪) উপনয়নে ব্রহ্মচর্যব্রতসমাপনের ৫টি মন্ত্র আছে। মন্ত্রব্রাহ্মণে তাহাদের পাঠ—“অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তৎ তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ধ্যাস-মিদমহম্নতাং সত্যমুপৈমি।” ইত্যাদি।

হু পুস্তকে—“তেনর্ধ্যা সামদমহম্নতাং।”

বক্তব্য—মন্ত্রব্রাহ্মণে ষেরূপ পাঠ আছে, ভবদেব সেইরূপই ধরিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যও সেইরূপই ভাষ্য করিয়াছেন। গুণবিষ্ণু কোন্ বেদে তাহার লিখিত পাঠ পাইয়াছেন ?

(১৫) সমাবর্তনে ব্রহ্মচর্যব্রত সমাপনের ৫টি মন্ত্র মন্ত্রব্রাহ্মণে নাই। গোভিলসূত্র হইতেছে—“সর্বত্রাচারিষং তদশকং তেনারাংসমুপাগামিতি।” উহার অর্থ—পূর্বোক্ত মন্ত্রপঞ্চকে যেখানে চরিষ্যামি (লুট্) আছে, সেখানে অচারিষং (লুঙ্) বলিবে। এইরূপ যেখানে তচ্ছকেয়ং (আশীর্লিঙ্) আছে, সেখানে তদশকং (লুঙ্)। যেখানে ঋধ্যাসং (ঋধ্, আশীর্লিঙ্, ষাসম্) আছে, সেখানে অগাংসং (রাধ্, লুঙ্, অম্)। যেখানে উটৈমি (লট্) আছে, সেখানে উপাগাম্ (লুঙ্, অম্)। তাহা হইলে মন্ত্রগুলি এইরূপ হইবে—“অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তৎ তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাংস-মিদমহম্নতাং সত্যমুপাগাম্।” ইত্যাদি। গুরুবজ্রকর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখাতেও এইরূপ দুইটি ষথ আছে; যথা—(আরম্ভে) “অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি

তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্। ইদমহম্নতাং সত্যমুপৈমি।” (১৫)। (সমাপনে) “অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তদশকং তন্মে রাধীদমহং ষ এবাম্মি সোহ্মি।” (২২৮)।

হু-পুস্তকে—“অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তৎ তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহম্নতাং সত্যমুপাগাম্।” এরূপ পাঠ কোন্ বেদে আছে ?

(১৬) আমার পুস্তকে যে যে স্থলে গুণবিষ্ণুভাষ্যবিকৃষ্ট আকর-গ্রন্থের পাঠ আছে এবং গুণবিষ্ণুর ভাষ্য যে যে স্থলে আকরগ্রন্থের বিকৃষ্ট, হুর্গামোহন বাবু তত্তৎস্থলে টিপ্পনী করিয়াছেন—“আকরগ্রন্থে মুদ্রাপিতঃ পাঠঃ।” ইহার ভাবার্থ—গাহারা সায়ণভাষ্য সহ বেদ ছাপাইয়াছেন, তাহাদের সবই ভুল। হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে এবং গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে ষেরূপ পাঠ আছে, তাহাই ঠিক।

বক্তব্য—সায়ণাচার্য্য কি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক না দেখিয়া ভাষ্য লিখিয়াছেন ? তাহার সময়ে ত ছাপাখানা ছিল না। তিনি কি তবে ভবিষ্যদৃষ্টিশক্তিপ্রভাবে মুদ্রাপয়িত্যমাণ পুস্তকের পাঠ দেখিয়াই ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন ?

কেবল এই ১৬টি মাত্র স্থল নহে, আরও বহুতর স্থলে হু-পুস্তকে আমার ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল স্থলের উল্লেখ করিতে আমি অসমর্থ। রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পূর্বে দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন—

মহিমানং ষত্বকীর্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।

শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ন্তয়া।

আমারও সেই কথা। ন-পুস্তকের পাদটাকায় যাহা লিখিত হইয়াছে (গ), তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে পড়িয়াছিল—

“আত্মচ্ছিত্রং ন জানাসি পরচ্ছিত্রাত্মসারিণী।”

ন-পুস্তক-সম্পাদক মহাশয়ও একস্থলে (১) গুণবিষ্ণুর লিখিত অংশ তুলিয়া ভট্টভাষ্যের পাঠ, এবং দুই স্থলে (১০।১১) গুণবিষ্ণুর কল্পিত পাঠ তুলিয়া গোভিলসূত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। পাদটাকার মহাশয়ও বহু স্থলে গুণবিষ্ণুর কল্পিত পাঠ ধরিয়া বেদোক্ত পাঠ বলিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সুতরাং তাহারা নিজেও ত আমার জায় সাহস দেখাইয়াছেন এবং গ্রন্থের প্রকৃত পাঠকে প্রচ্ছাদিত করিয়াছেন।

(১৭) উপনয়নে “সমিধমাধেহি” ইত্যাদি স্থলে ন-পুস্তকের পাদটাকায় লিখিত হইয়াছে—“ব্রহ্মচারিণামুক্তচতুষ্টয়প্রতিজ্ঞাস্থ আ সমাবর্তনাং সমিধাধানং বিহিতং দিবানিত্রা চ নিবন্ধা। তদন্তরন্ত দিবানিত্রাদৌ ন দোষঃ। অতএব বৈদ্যকেষু পঠ্যতে মধ্যাহ্নে শীতলে স্বপ্যারিণি বাতহিমাশ্রিতে ইতি। পরং সমস্তকগণ্ডবজ্জলপানং সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম চ বাবজ্জীবমেব কর্তব্যমিতি। তদুক্তং কাশীখণ্ডে” ইত্যাদি।

বক্তব্য—‘দিবানিত্রাদৌ’ এই আদিপদে প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটাকে ধরিতে হইবে, সমিধাধানকে কি ? তিনি “কর্ম কুরু” ইহাতে ‘কর্ম’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—গুরুগুণ্যাদি ও অধ্যয়নাদি, এই দুই প্রকার যাজ। এখন অপ্রাসঙ্গিক অভিনব অর্থ টানিয়া আনিয়া প্রমাণসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন কেন ?

ইদানীন্তন বিজ্ঞবালকদিগের সন্তঃ সমাবর্তন হওয়ার ব্রহ্মচর্য ব্রত, গুরুগুণ্য ও বেদাধ্যয়ন অনাবশ্যক বলিয়া আমিই আশঙ্কিত

গৃহসূত্রবৃত্তি ও পারস্করগৃহসূত্রের হরিহরভাষ্য দেখিয়া কৰ্ম শব্দের অর্থ সন্ধাবন্দনাদি লিখিয়া, অন্যান্য বিষয়ের সহিত ৬০ বৎসর পূর্বে “বিষম সমস্তা”র প্রকাশ করিয়াছিলাম, তার পর ১৩২৩ সালে ভবদেবপদ্ধতিতেও উহা দিয়াছিলাম। তন্মধ্যে সন্ধ্যার যাবজ্জীবন কর্তব্যতা সম্বন্ধে শাতাতপের ৩টি শ্লোকের মধ্যে তৃতীয় শ্লোকটিমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহার চতুর্থ চরণ “স শঠোত্রাক্ষণঃ স্মৃতঃ।” ন-পুস্তকের পাদটীকায় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ভট্টাচার্য্য কাবাতীর্থ সাংখ্যরত্ন জ্ঞান-সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় উহার অর্থসঙ্গতি করিতে না পারিয়া উহার পরিবর্তে “স শঠোত্রাক্ষণঃ স্মৃতঃ” করিয়াছেন। স্বয়ং শাতাতপসংহিতা দেখিলে উহার অর্থসঙ্গতি অনায়াসেই করিতে পারিতেন। যাহা হউক, তাঁহার আমার ভ্রমপ্রদর্শন ও নিশ্চয় করার আমি উপকৃত হইয়া তাঁগাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞই রহিলাম।

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের সম্পাদিত ছান্দোগ্যমন্ত্র-ভাষ্যে (গুণবিক্ষু টীকায়) বেদবিরুদ্ধ ও গোভিলগৃহসূত্রবিরুদ্ধ আরও বহুতর মন্ত আছে। তন্মধ্যে কতিপয়মাত্র প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম পাঠগুলি বেদোক্ত এবং ডাশের পরবর্তী পাঠগুলি তাঁহার পুস্তকস্থ জানিবেন।

[বিবাহে] ত্বা উত্তরা—দুহামুত্তরা। আসনেচ্ছিত্রাঃ—আসনে অচ্ছিত্রাঃ। মা রাঙ্কি—মা ঋঙ্কি। প্র হু বোচং—প্র হু বোচং। মা যোষ্ঠাঃ—মাযোষ্ঠাঃ। শীলৈব্ যক্ পাতকং—শীলে চ যচ্ পাতকং। শান্মলিং—শান্মলিং। বহুভুং কুণ্ণ—বহুভুং কুণ্ণ। বাহপুত্র্যা—বা অপুত্র্যা। বাতপশব্যা—বা অপশব্যা। [নামকরণে] অহোরাত্রো—অহোরাত্রো। [অন্নপ্রাশনে] প্রদাতারং তারিষ—প্রদাতারং তারিষ। [উপনয়নে] মমগম্মহি—মমগম্মহি। অগ্নিষ্টে—অগ্নিষ্টে। অভুর ইদন্তে—অভুর ইদন্তে। ব্রহ্মচার্য্যাসৌ—ব্রহ্মচার্য্যাসৌ। সুশ্রবঃ সুশ্রবসং—সুশ্রব সুশ্রবসং। এবমহং সুশ্রবঃ—এবমহং সুশ্রব। [সমাবর্তনে] যে অপ্ স্বস্ত—যেপ্ স্বস্ত। মমুথো—মনৌকো। তান্ সৃজামি—তান্ সৃজামি। যেনাপামৃষতং—যেনাপামৃষতং। নেত্রো স্থঃ—নেত্রো স্থঃ। গন্ধর্কোহস্যাপাব, উপ মানব—গন্ধর্কোহস্যাপ মা অব। [সন্ধ্যায়] শমু নঃ—শমনঃ। যদাক্রিয়া পাপমকার্যং—যদাত্র্যা পাপমকার্যং। যত্রিস্তদবলুপ্পতু—অহস্তদবলুপ্পতু। যৎ কিঞ্চ—যৎ কিঞ্চিৎ। ইদমহং মামমৃত-যোনৌ—ইদমহমমৃতযোনৌ। সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি—সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাস্বনি জুহোমি। যদ্বচ্ছিত্রমভোজ্যং—যদ্বচ্ছিত্র-

মভোজ্যঞ্চ। মামাপোহসতাঞ্চ—মামাপো অসতাঞ্চ। যদহা পাপমকার্যং—যদহা পাপমকার্যং। অহস্তদবলুপ্পতু—যত্রিস্তদব-লুপ্পতু। যৎ কিঞ্চ—যৎ কিঞ্চিৎ। ইদমহং মামমৃতযোনৌ—ইদমহমমৃতযোনৌ। সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি—সত্যে জ্যোতিষি পরমাস্বনি জুহোমি। জাতবেদস ইত্যশ্চ কথ্যপ ঋষিঃ—.. কাণ্যপ ঋষিঃ। স নঃ পর্ষদতি—স নঃ পরিষদতি। উর্দ্ধনৈতং—উর্দ্ধলিঙ্গং। বিশ্বরূপায়—বিশ্বরূপং। [ব্রহ্মযজ্ঞে] অগ্নিমীড়ে—অগ্নিমীলে। নি হোতা—নিহোতা। শম্বে দেবীঃ... অথর্কবেদাদিমদ্রোহং পিপ্লাদদৃষ্টং, বরুণদৈবতঃ, ছন্দো গ্যুরতী, “শম্নো ভবন্ত” ইত্যত্র “আপো ভবন্ত” ইতি পঠাতে, ব্যাখ্যানমুক্তং গ্রহণ্যে; (বক্তব্য) ঐ মন্ত্রটি অথর্কবেদের আদি মন্ত্র নহে; উহার পিপ্লাদ পৃথি নহেন, বরুণও দেবতা নহেন; কেবল শম্নো ভবন্ত স্থলে ‘আপো ভবন্ত’ পাঠ করিলে “শম্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্ত” হয়, তাহাই হইবে কি? [পার্করণশ্রাঙ্কে] যে অস্তরিক্ষে য উপ—যে অস্তরিক্ষে উপ। তেহবস্তমান্—তে অরস্তমান্। ব্রাক্ষণশ্চ মুখেহমুতেহমৃতং—ব্রাক্ষণশ্চ মুখে অমৃতে অমৃতং। মধু বাতা—মধুবাতা। অক্ষয়মী মস্তের গুণবিক্ষুত অর্থেদিক পাঠ—“অক্ষয়মীমদস্ত হবপ্রিয়া অধুত অস্তোবত স্বভানবো বিপ্রান্ বিচরা মতী যো জান্ বিদ্রতে হরী।” (ঐম পুস্তক দৃষ্টব্য); সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া বেদোক্ত পাঠই ধরিয়াছেন, কিন্তু অনবধানতা বশতঃ ভাষ্যের দুই স্থলে সংশোধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যথা—‘অবপ্রিয়াঃ’ অবস্তি তপ্যস্তি যানি হবীং য় তানি প্রিয়াণি যেথাং তে; ‘যঃ’ যে পিতরঃ। আ মা বাজশ্চ...আ মা গস্তাং পিতরামাতরা চা মা সোমো অমৃত-যেন গম্যাং (মাধ্যন্দিন শাখা); ...আ মা গতং পিতরামাতরা যুবমা মা সোমোহমৃতস্যায় গম্যাং (কাথ শাখা);—দুর্গামোহন বাবু ‘আ মা গস্তাংই রাখিয়াছেন। বহু দেয়ক নো অস্ত—বহু দেয়ক নোহস্তি। [একোদ্বিষ্টশ্রাঙ্কে] পিতৃলোকান্—পিতৃন্ লোকান্। পবিত্রাসি বৈষ্ণবী—পবিত্রমসি বৈষ্ণব্যম্। এহি পিতঃ সোমা—...সৌম।

এইরূপ অর্থেদিক ও গোভিলগৃহসূত্রবিরুদ্ধ, ভাষ্যকারের স্বকপোল-কল্পিত মন্ত্রে কৰ্ম করিলে তাহা সফল হয়, কি পণ্ড তয়, ইহা সন্দীগণের বিবেচ্য।

শ্রীশ্রীমাচার্য কবিবর-বিভাবারিধি।

তোমার পূজা

নেপানে বাথায় উঠিছে গড়িয়।

অশ্রুর সবে।

সেথা ফুটে তব পূজার পদ

স্বন্দব মনোহর।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী



পূর্ব-প্রকাশিতের পর

দুঃখী কৃষ্ণদাসের জীবনকথা একটু রহস্যময়। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত সখ্যভাবের উপাসক। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে তিনি ব্রজের সুবল সখা। সখা হইলেও মধুর ভাবের বা কাঙ্ক্ষাভাবের রহস্য সকলই তাঁহার গোচরীভূত। 'শ্রীউজ্জলনীলমণি' গ্রন্থে সুবল সখার যে চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, প্রিয়াগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে প্রণয়-কলহ করিয়া চলিয়া যান, তবে সুবল তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া নানা উপায়ে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করেন, এবং সখার নিকট কিয়াইয়া আনেন।

শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শাখাসমূহের কয়েকটি শাখায় মধুর রসের ভজন প্রথা বিদ্যমান। শ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরও শ্রীল গৌরীদাসের অন্তরঙ্গ-সেবায় দীক্ষিত। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবের নিকট 'উজ্জলনীলমণি'-প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাসের শ্রীরূপাঙ্গু ভজনপদ্ধতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মিল। "স্বভক্তগণকে শুদ্ধা ভজনপদ্ধতি" শিক্ষা দেওয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারের অঙ্গ উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যদেব "অনর্পিতচারী" শুদ্ধ প্রীতিরস দান করিতেই ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল গৌরীদাস-শিষ্য হৃদয়ানন্দ হৃদয়ের অতি নিভূতে এই ভাব গোপন রাখিতেন। এইজন্য তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবকে লিখিলেন, "আমার শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাসকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; ইহার মনের যে অভিসায, তাগ তুমি সর্বভাবে পূর্ণ করিও।"—দুঃখী কৃষ্ণদাসকেও তিনি লিখিলেন, "শ্রীজীব জানিবে তুমি আমার দোসর।" কৃষ্ণদাস এই সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন, এবং শ্রীজীবকে ও হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরকে একই ভঙ্গের দুইটি বহির্বিবাক্যরূপে দর্শন করিতেন। তিনি সখ্যভাবে নিকুঞ্জ ও সেবালাভে অভিসারী হইয়া এক দিন শ্রীজীবের নিকট তাঁহার হৃদয়ের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

শ্রীজীব পরমার্থ-পথে বাহ্য চরম সত্য, অঙ্গুগত শিষ্যকে তাহাতে বঞ্চিত রাখা কিছুতেই উচিত বলিয়া মনে করিলেন না। কৃষ্ণদাস বাহ্য জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি তাহারই সন্তুস্তর দিতেন। এই ভাবে মধুর ভাবের সেবাপ্রাপ্তিই যে জীবের সর্বশেষ সার্থকতা, তাহা তিনি অকপটে দুঃখী কৃষ্ণদাসের নিকট ব্যক্ত করিলেন। সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচার করিয়া কৃষ্ণদাসের যে প্রত্যয় হইয়াছিল, শ্রীজীব গোস্বামীর কথায় সে প্রত্যয় স্মৃঢ় হইল। তখন তিনি জীবের নিকট হইতে যুগলকিশোরের নিত্যলীলা-স্মরণ পদ্ধতির সংবাদ লইলেন। শুদ্ধ অন্তরে চিন্তাতেই নহে—বাহিরেও তিনি রাগহলীর কুঞ্জ সন্মার্জনী-প্রয়োগের সেবা গ্রহণ করিলেন। শ্যামানন্দপ্রকাশ বলিতেছেন :—

"রাধা-কৃষ্ণ রাসলীলা শুনে রাজিদিনে।

সেই-ব মধুর বস্ত ক'বে আশ্বাদনে।"

মধুরে বাড়িল লোভ অঙ্গ চেষ্টা নাই।

কুঞ্জ-সেবা করি রহে শ্যামানন্দ গোসাই।

শ্রীবৃন্দাবনের কনক কুঞ্জের সন্ন্যাসনে।

নিত্য ঝাঁট দেন সেবা করেন বিহানে।"

এই ভাবে এক দিন দুঃখী কৃষ্ণদাস 'ঝাড়ু দিবার' সেবা-কার্য করিতে করিতে প্রাণোন্মাদক ভাবের উত্তেজনায় অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। শ্রীজীব বহুক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণদাসকে না দেখিয়া বাকুল হ্রসবে তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে কুঞ্জ প্রবেশ করিয়া, কৃষ্ণদাসকে মূর্ছিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া কুটারে লইয়া আসিলেন। অনেক সস্তূর্ণের পর কৃষ্ণদাসের বাহুকৃতি হইল। শ্রীজীব এতাদৃশ মর্মা শিষ্যকে আর কোনওরূপে প্রত্যাখান করিতে পারিলেন না।

স্পর্শমণির স্পর্শে চৌহও স্বর্ণে পরিণত হইয়া থাকে। শ্রীজীবের রূপানিবেকে দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যসেবায় অধিকারী হইয়া শ্যামানন্দে পরিণত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

ভক্তিরাজ্যের পরীক্ষা

শ্রীরূপ গোস্বামী—শ্রীল নারদপঞ্চরাত্র হইতে উত্তমা ভক্তির যে লক্ষণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে—

"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরম্ভেদে নিৰ্মলং।

হৃদ্যকেন হৃদীকেশসেবনং ভক্তিক্রিয়াতে।"

অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরকে অমুকুল ভাবে অঙ্গাভিসায-বিরহিত হইয়া জ্ঞান-বস্তুদির দ্বারা অনাবৃত ভাবে সেবনকে ভক্তি নামে অভিহিত করা হয়।" সেবন সর্বোপাধিরহিত হইলেই নির্মল হইয়া থাকে। এইরূপ নির্মল সেবন ভক্তির মূল-লক্ষ্য। এইরূপ নির্মল ভক্তির সাধনে সাধকের শ্রীভগবৎপ্রীতি ভিন্ন অঙ্গ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। এইজন্য নিকুঞ্জ ভক্তির রাজ্য—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, উপাধির গন্ধ থাকিলে চলিতেই পারে না। উপাসনার রাজ্যে অঙ্গুভূতি বা সাধ্য বস্তুর কুপা-প্রাপ্তিই সাধককে আচার্য্য-পদবীতে উন্নীত করিয়া থাকে। সর্ব-ভারতে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত নিকুঞ্জাধি প্রেম-ভক্তির মহিমা-প্রচারের জন্ত উপযুক্ত আচার্য্যের প্রয়োজন। শ্রীজীব সেইরূপ উপযুক্ত আচার্য্যগণের আগমনেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীভগবান এইরূপ আচার্য্য-পদবীর উপযুক্ত সাধন-বল-সম্পন্ন তিনটি মহারত্নকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাদিগকে এক দিকে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পারদর্শী করিয়া অঙ্গ দিকে সাধনবলে বলীয়ান করিয়া লইতে হইবে। আচার ও প্রচার—এই দুই বিষয়ে

তুল্যরূপে দক্ষ না হইলে তাঁহাদিগকে আচার্য্য-পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা বাইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যদেব গুণকেই প্রধান-রূপে বরণ করায়, শ্রীল-রঘুনাথ দাস গোস্বামী কায়স্থকূলে জন্মগ্রহণ করিলেও যেমন তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামি-রূপে বৃত্ত হইয়াছিলেন, যখন জাতির অন্তর্ভূত হরিদাস ঠাকুর যেমন নামসঙ্কীর্ণনের মূল আচার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, বৈষ্ণবশোভিত হইলেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন শ্রীগোবিন্দ-লীলাসূত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি বৈষ্ণবগণের নিত্যস্মরণীয় গ্রন্থের প্রণেতা আচার্য্যরূপে বৃত্ত হইয়াছেন, শ্রীজীব কায়স্থকুল-সম্বৃত্ত পরম ভক্তিমান চিরকুমার নবোত্তম দাসকে ও সঙ্গোপকুল-সম্বৃত্ত শ্যামানন্দকেও—জাতি নির্বিশেষে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার গুরু ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়নেই কৃতিত্ব অর্জন করেন নাই, সাধনবলেও বলীয়ান—ইহা দেখাইবার জগুই তিনি ইহাদের ভক্তিসাধনার পরীক্ষার আয়োজন করিলেন।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম 'শ্যামানন্দ' হওয়ার, এবং তিনি নৃপুত্রকৃতি তিলক ধারণ করায় গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে একটু আলোচনার কারণ ঘটিল। শ্যামানন্দ শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য, এবং হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের পার্শ্ব ভক্ত শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল গৌরদাস পণ্ডিতের প্রিয়তম শিষ্য। আবার হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যদেবের পরমপ্রিয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতৃপুত্র। গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে, বিশেষতঃ, গোড়বঙ্গ ও উৎকলে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সর্বশ্রেণীর বৈষ্ণবগণের বিশেষ সম্মানভাজন। গৌরদাস পণ্ডিত সখ্যভাবের উপাসক—ব্রজধামের সুবল সখার অবতার বলিয়া প্রখ্যাত। কালনায়—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রিয়সখা শ্রীল গৌরদাস পণ্ডিতের মহিমার ও প্রভাবের অন্ত নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়ে এক দিন একখানি নৌকা বাহিয়া গঙ্গাপথে আসিয়া সেই নৌকা বাহিবার "বৈঠা"খানি জীবকে নামপ্রথম দান করিয়া ভবনটী উত্তার্ণ করাইবার জগুই দান করেন। ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের প্রিয় ভ্রাতৃপুত্র হৃদয় বা হৃদয়ানন্দকে তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া-আনিয়া তাঁহাকে নিজের উপযুক্ত শিষ্যরূপে সর্ববিধে—শাস্ত্র ও সাধনায় সুশিক্ষিত করেন। একদা একটি মহোৎসব উপলক্ষ করিয়া ইনি ইহার প্রিয়তম শিষ্যকে যে কৃপা করেন, তাহার ফলে—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহ হৃদয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। তদবধি ইনি "হৃদয়চৈতন্য" এই গুরুদত্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই গৌরদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীযুক্তা বসুধা দেবীকে ও শ্রীযুক্তা জাহ্নবী দেবীকে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন। শ্রীল গৌরদাস পণ্ডিতের এই সুবিখ্যাত শিষ্যের নাম সমগ্র গোড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত। এখন ইহারই শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীজীবের কৃপায় "শ্যামানন্দ" নামে বিখ্যাত হইলেন। ইহাতে গুরু ত্যাগ করিয়া শ্রীজীবের নিকট তিনি পুনরায় দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন— এইরূপ সন্দেহের কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল। অধিকা-কালনায়

শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের নিকট এ সংবাদ প্রচারিত হইল। তিনিও বলিলেন—

"মহাপ্রভু হেন কথ কতু নাহি করে।
গুরু ছাড়ি গুরু করে না শুনি সংসারে।"

—(শ্যামানন্দ-প্রকাশ)।

তবে অসম্প্রদায়ী অবৈষ্ণব গুরু হইলে—সে গুরু ত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগুরু-গ্রহণের কথা শ্রীহরিভক্তি-বিন্যাস-প্রমুখ বৈষ্ণব-স্মৃতিবিবন্ধে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীল গৌরদাস পণ্ডিত ঠাকুরের পরিবার কি অবৈষ্ণব ও অসম্প্রদায়ী?

প্রত্যুতঃ, নিজের জন্ত না হইলেও, গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের বিপুল আদর্শে পাছে মালিন্য স্পর্শ করে, এই জন্ত হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরকে চিন্তিত হইতে হইল। তিনি প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে লোক মারফৎ শ্রীজীবের নিকট পত্র পাঠাইলেন;—শ্রীজীব তাহার যে উত্তর দিলেন, তাহাতে সংশয় আরও বাড়িয়া উঠিল। শ্রীজীবের পত্রোত্তরে হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর জানিতে পারিলেন যে, "তিনিই নাকি স্বপ্নাবেশে কৃষ্ণদাসকে কৃপা করিয়াছেন।" এই সমস্তার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্ত শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর কয়েক জন শিষ্যের ও ভক্তের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলে শ্রীজীব পরম সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া উপযুক্ত বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীজীব ব্রজধামের সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, শ্রীরাসস্থলীতে এক বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। তথায় সমাগত মোহান্তগণ শ্যামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণদাস, তুমি কাহার সেবক? তোমার গুরুদত্ত 'কৃষ্ণদাস' নাম পরিবর্তিত হইয়া তোমার নাম শ্যামানন্দ হইল কেন? তোমার তিলক-চিহ্নের পরিবর্তনেরই বা কারণ কি?"

শ্যামানন্দ শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর ও শ্রীজীবকে প্রণাম করিয়া, সমগ্র বৈষ্ণব মোহান্তমণ্ডলীর চরণ-বন্দনা পূর্বসর কৃতাজলিপুটে কহিলেন,—"এ অধম জন্মে জন্মে শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের দাসাঙ্ক-দাস, তিনিই স্বপ্নযোগে এই নাম-পরিবর্তনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।"

তখন মোহান্তগণ তাঁহাকে এষ্ট কথা সপ্রমাণ করিতে বলিলেন। তিনি যে ভাবে তাগ প্রতিপন্ন করিলেন, তাহা একরূপ অলৌকিক ব্যাপার যে, বর্তমান কালে শিক্ষিত সমাজ তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে সন্দেহান হইবেন; বিশেষতঃ, আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ, এজন্ত আমরা তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

সিদ্ধ ভক্তগণের তিন প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। শ্রীল চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল মহাপ্রভুর এই তিন প্রকার অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই তিন দশার নাম—অস্তর্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। যখন ভক্ত নিত্যলীলায় সিদ্ধদেহে উপনীত হইয়া তাঁহার অভীষ্টদেবের নিত্যলীলা দর্শন করেন ও সিদ্ধদেহে অভীষ্টদেবের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তখন তাঁহার বাহ্যদেহে চৈতন্যের কোনও লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না। এই অবস্থার নাম অস্তর্দশা। অতঃপর ভক্ত যখন এই অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া—বহির্বিষয়ক জ্ঞানের দিকে চিন্তকে উন্মুখ করেন—সেই অবস্থার নাম অর্দ্ধ-বাহ্যদশা। তখন নিত্য-লীলা দর্শনের স্মৃতি ভাবায় প্রকাশ হইতে থাকে—তাৎকালিক ভাবায় তাহার যে বর্ণনা হয়, তাহা "প্রসঙ্গ" নামে অভিহিত

হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর এই 'প্রলাপ' তাঁহার গ্রন্থরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার পর যখন ভক্তের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে 'বাহ্যনশা' নামে অভিহিত করা হয়। বাহ্যনশায় ভক্ত ব্যবহারিক জগতের ব্যবহারিক কার্যে প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য লাভ করেন। শ্রীভাগবতের টীকাধার বাকের পরা, পশুস্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই চারি অবস্থায় শ্রীধরস্বামিপাদ প্রকারান্তরে এই অবস্থাসমূহই বিচার করিয়াছেন।

সে বাহ্যই হউক, অতঃপর শ্যামানন্দ মোহান্তগণের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—“শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর আমার গুরুদেব শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের মূর্তি ধারণ করিয়া আমাকে কৃপা করিয়াছেন। যদি আমি সত্য সত্যই ইহাদের ভৃত্য হই—তবে এই নাম ও তিলক ধুইয়া মুছিয়া দিলেও কিছুতেই তাহা অদৃশ্য হইবে না, বরং উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে।”

তখন মোহান্তগণের আদেশে শ্যামানন্দ ঠাকুর সকলের সম্মুখে উপবেশন করিলে, শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর স্বহস্তে তাঁহার ললাটের তিলক ও বক্ষোদেশে লিখিত 'শ্যামানন্দ' নাম ধৌত করিয়া দিলেন। শ্যামানন্দ তখন তন্নয় চিত্তে শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ললাটে অঙ্কিত নূপুরাকৃতি তিলক ও বক্ষোদেশে লিখিত 'শ্যামানন্দ' নাম পূর্বাশ্রমে উজ্জ্বলতররূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এইরূপে নাম ও তিলক যত বার ধৌত করা হইল, তত বারই উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া ভক্তগণ সকলেই প্রেম্যানন্দভরে হরিশ্রবণি করিয়া উঠিলেন, এবং শ্যামানন্দও বিনীতভাবে হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের শ্রীচরণদ্বয়গলে পতিত হইলেন। শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর প্রেমাস্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বৃকে টানিয়া লইলেন। তখন মোহান্তগণ সকলেই শ্যামানন্দকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার অপূর্ণ ভক্তিবলের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্যামানন্দও শ্রীকীর্তনের আদেশ লইয়া হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহার সেবার প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এইখানেই পরীক্ষার শেষ হইল না। “শ্যামানন্দ-প্রকাশে” বর্ণিত আছে যে, উহার পরদিনই শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর শ্যামানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ শ্রীব্রজপরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। রাসোৎসবের দিনে তাঁহার রাসহুলীতে সমাগত হইলে শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় দেখিতে পাইলেন যে, সধীগণের সহিত শ্রীশ্রীরাধা ও শ্যামসুন্দর রাসমণ্ডলে নৃত্য করিতেছেন; ইহা দেখিয়া শ্যামানন্দ ঠাকুর আশ্চর্যবিশ্বিত হইয়া দ্বীলোকের স্রায় অর্দ্ধাবগুণে মস্তক আবৃত করিয়া গোপালনাগণের স্রায় নাচিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাব দেখিয়া সখ্যভাবে সিদ্ধ শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর শ্যামানন্দকে সখ্যভাবে ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে শ্যামানন্দ যখন তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন, তখন ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন,—“তুমি যখন শ্রীকৃষ্ণের সখ্য ভাব ত্যাগ করিয়া, গোপীভাবে নিরত হইয়া গোপীর লক্ষণ ধারণ করিয়াছ, তখন আর তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি?”

শ্যামানন্দ নিস্তার বিনীত ভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,—

“প্রভো! স্বয়ং শ্রীল পণ্ডিত ঠাকুরও ত' শ্রীরাধারাবীর ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অমুক্ণ শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবস্থান, এবং শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন দর্শন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। কখনও কুঞ্জমধ্যে তিনিই (সুবল সখা) শ্রীরাধিকার বেশ ধারণ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহার সহবাসেই আমার এই ভাবের উদগম হইয়াছে।” হৃদয়ানন্দ ঠাকুর ইহা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া আরম্ভনৈতে বলিলেন,—“আমি কখনই পণ্ডিত ঠাকুরের নিকট একরূপ কথা শুনি নাই। অতএব তুমি গোপীভাব ত্যাগ করিয়া সখ্যভাবেরই আচরণ কর।” শ্যামানন্দ এ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ঠাকুরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া-পড়িয়া বলিলেন,—“প্রভো! কৃপাপ্রাপ্ত ভাব-সায় আমি কি প্রকারে ত্যাগ করিব? ইহার অপেক্ষা দেহ ত্যাগ করাও যে আমার পক্ষে সুসাধ্য। অতএব আমাকে একরূপ আদেশ করিবেন না।” এই কথা শুনিয়া হৃদয়ানন্দ ঠাকুর নিদারুণ ক্রোধে আশ্চর্যবিশ্বিত হইয়া শ্যামানন্দের পৃষ্ঠে একরূপ প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন যে, শ্যামানন্দের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল;—কিন্তু শ্যামানন্দ তাহাতে বিন্দুমাত্র বেদনা বোধ না করিয়া “শ্রীকৃষ্ণদেবের কৃপা হইল” বলিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হইয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন,—“প্রভো! আপনার ত' অনেক পুত্র, তাহার পরে না হয় একটি কন্যা সন্তানই হইল—ইহা ভাবিয়া এই শরণাগত দাসের অপরাধ মার্জনা করুন।”

হৃদয়ানন্দ ঠাকুর এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, শ্যামানন্দকে কোলে লইয়া বহু আশীর্বাদ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রহার করিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দ বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীকীর্তনের নিকট গমন করিলেন। রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় ঠাকুর হৃদয়ানন্দ ঠাকুর এক অপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন করিলেন! তিনি দেখিলেন, স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহার শুভ্র উত্তরীয় শোণিত রঞ্জিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুর বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—“আমার এ অবস্থা তোমার কৃপাতেই হইয়াছে। শ্যামানন্দ আমার আত্মা; তুমি প্রভারে তাহার অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছ; সেই ব্যথা আমারই অঙ্গে বাজিয়াছে, এবং তাহাতে আমার দেহ হইতে রক্তপাত হইয়া আমার বসন সিদ্ধ হইয়াছে।”

তখন হৃদয়ানন্দ ঠাকুর অত্যন্ত কাতর হইয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কৃমাপ্রার্থনা পূর্বক বলিলেন,—“হে ভক্তবৎসল দয়াময়, শ্যামানন্দ যে আপনার স্বরূপ, ইহা জানিতাম না। ভক্ত যে ভগবানের অভিন্ন তনু, তাহা আজ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। কিন্তু হে নাথ! আমি ভক্তপ্রোহী, আমার কোনওরূপে নিস্তার নাই। কিন্তু আপনার এ অবতার ত' করুণা বিতরণের জন্য—আপনি আমার সমস্ত অপরাধ কমা করুন।” শ্রীচৈতন্যদেব তখন প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—“আমার স্থানে অপরাধ হইলে আমি তাহা কমা করিতে পারি, কিন্তু আমার ভক্তের নিকট অপরাধ করিলে তাহা কমা করিবার সাধ্য আমার নাই। অতএব তুমি শ্যামানন্দকে প্রসন্ন করিয়া দ্বাদশ দিনব্যাপী মহোৎসব কর—তাহাতে তোমার এ অপরাধের ক্ষালন হইবে।”

৮ হৃদয়ানন্দ ঠাকুর এই স্বপ্নদর্শনে বিচলিত হইলেন। নিদ্রা-ভঙ্গের পর তাঁহার নিদ্রা হইল না। যতটুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল, এই কথার আলোচনায় কাটাইয়া দিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে যাবতীয় বৈষ্ণব মোহাস্তম্ভগণকে সংবাদ দিয়া আনন্দ পূর্বক তাঁহাদিগের নিকট এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, এবং কত্বা সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ ভিক্ষা করিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, যখন শ্যামানন্দ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা সমস্ত স্বপ্নই সার্থক প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন এ বাপাবেও অশ্রদ্ধা হইবে না। অতএব শ্যামানন্দের তুষ্টিবিধান পুংসব ষাটশ মহোৎসব অবশ্যকর্তব্য বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিলেন।

শ্যামানন্দ এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মোহাস্তম্ভগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—“এ ব্যাপারে আমিই দোষী;—আমার প্রভু শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের কোনও দোষ নাই; অতএব আপনারা কৃপা করিয়া আমাকেই এই ষাটশ মহোৎসব সম্পন্ন করিবার অমুমতি প্রদান করুন।” শ্রীগুরুদেবের মন্যাদা এই ভাবে রক্ষা করিয়া সকল অপরাধের বোঝা স্বৈচ্ছায় স্বীয় মস্তকে তুলিয়া-লওয়ার বৈষ্ণবসমাজের সকলেই শ্যামানন্দকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দভরে স্বয়ং মহোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজমণ্ডলের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইহাতে বিশ্মিত হইলেন। সকলেই শ্রীজীবের ও শ্যামানন্দের অলৌকিক ভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। মথুরার বণিক ও শেঠ মহাশয়গণ শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের ও শ্রীজীবের পরম ভক্ত—তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাবে সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন। শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের অপ্রকটে দীনাতিদীন শ্রীজীবই ব্রজমণ্ডলের একমাত্র নেতা। তাঁহার একটিমাত্র আদেশ—সার্বভৌম সম্রাটের আদেশ অপেক্ষাও অধিকতর সমাদরের যোগ্য। তাঁহার বিন্দুমাত্র সেবা করিতে পারিলে তাঁহারা “বল্ল ও কৃতকৃতার্থ হইলাম” বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের বড়ই দুঃখ যে, তাঁহারা এইরূপে সেবা করিবার গুণ অবসর প্রাপ্ত হন না। আজ সেই গুণ অবসর উপস্থিত দেখিয়া মথুরার ধনীশ্রেষ্ঠ বণিক ও শেঠ হইতে আশ্রয় করিয়া ব্রজমণ্ডলের অতিদীন ব্রজবাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেকে ভাবে ভাবে, কেহ গোশকট পূর্ণ করিয়া, কেহ বা নিজেই উৎসবের জব্যাদি বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন। এতই জব্যাসক্তার আসিল যে, তাহার দ্বারা ষাটশ দিন ত’ দূরের কথা, মাস ভরিয়া মহোৎসব চলিতে পারে। ব্রজমণ্ডলের সর্ব সম্প্রদায়ের গৃহস্থ ও উদাসীন ভক্তমণ্ডলী মিলিত হইয়া, যাহার যে কার্য্য ভাগ করিয়া লইলেন। এক দিকে পর্ব্বতপ্রমাণ ভক্ষ্যরাশি, অশ্রদ্ধা দিকে শাস্ত্রব্যাখ্যা, কীতন ও সাধুসমাগম।—যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহার তুলনা মিলে না।

উৎসব শেষ হইলে শ্যামানন্দ হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার নিকটই অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব-প্রকারে গুরুদেবের আনুগত্য করিয়া তিনি গুরুদেবের পরম শ্রীতিভাজন হইলেন। অবশেষে শ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর যখন শ্রীকৃষ্ণাবন হইতে শশিষ্যে গোড়দেশে যাত্রা করিলেন—তখন শ্যামানন্দ ঠাকুর তাঁহাদের সহিত বহু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেন। অবশেষে হৃদয়-চৈতন্য ঠাকুর বহু প্রকারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবনে ফিরাইয়া দিলেন; শ্রীজীবের নিকট অধ্যয়ন শেষ করিয়া পরে

তাঁহাকে গোড়ের আশ্রিতে আদেশ করিলেন। শ্যামানন্দ শ্রীকৃষ্ণদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীজীবের চরণতলে সমাগত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণসনাতনাদি ছয় গোস্বামীই শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মের আচার-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান গুরু। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণাবনে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা যে শুদ্ধা মাধুর্য্যগর্ভা সাধনপদ্ধতির প্রচার করেন, তাহাই ‘শ্রীকৃষ্ণপাণ্ডুগা’ সাধনপদ্ধতি নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। গোড়ীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এই পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরের দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভু সেই আদর্শ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের নিকিঞ্চন গোস্বামিগণের জগদগুরুত্ব স্থাপন করিলেন। মহা প্রতিভাশালী শ্রীজীবই এই প্রতিষ্ঠা মহাযজ্ঞের মূল পুরোহিত—ইহা দ্বারাই তিনি গোড়ীর বৈষ্ণব-জগতের ভবিষ্যৎ মীমাংসা করিয়া দিয়া যান।

শ্রীল নরোত্তমের দীক্ষালাভের ব্যাপারও এক মহা-পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরোত্তম আকৌমার ব্রহ্মচারী, সুদৃঢ়সংকল্প শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দীক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস কি প্রকারে ‘আচার্য্য’ উপাধিতে ভূষিত হইলেন এবং নরোত্তম কি প্রকারে ‘ঠাকুর মহাপদ’ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন—তাহা প্রেমভক্তির রাজ্যে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের এক পরমোদার্য্যময় মহাহুতবতার প্রমাণ।

সে-কালে ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য, উপাধ্যায়, চক্রবর্তী এই সকল পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক উপাধি অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণই গুরু নিকট লাভ করিতেন। শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে সার্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি এই দুইটি উপাধিই মাত্র প্রামাণিক হুত্বাদিতে পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে বা তাহার পরবর্ত্তকালে শিরোমণি, তর্কালঙ্কার প্রভৃতি উপাধিও অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। সে কালে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নিজেরা সে উপাধি ব্যবহার করিতেন না। তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী ও দেশের লোকরাই তাঁহাদিগকে এই সম্ভ্রমবাচক উপাধিতে অভিহিত করিতেন। এই ত গেল সাধারণ সমাজের কথা—ইহার উপর দীনাতিদীন—তৃণাপেক্ষা সুনীচ হওয়াই যাহারা জীবনের আদর্শরূপে কামনা করিতেন—সেই বৈষ্ণবসমাজে ‘উপাধি’ সর্ব্বভাবেই পরিত্যক্ত ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। অসীম পাণ্ডিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী নিজেকে “বরাকরুপঃ” বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অতুলনীয় প্রতিভাবান, ভক্তি, বিনয় ও পাণ্ডিত্যের মহাগর্ব্বস্বরূপ শ্রীজীব নিজের পরিচয় দিয়াছেন—‘জীবক’ বা ‘অতিকৃষ্ণ জীব।’ তাঁহারা নিজেরা ছিলেন সর্ব্বত্যাগী অকিঞ্চন বৈষ্ণব—লোকে তাঁহাদিগকে গোস্বামী বা গোসাঞি নাম দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ভ্রমক্রমেও ‘গোস্বামী’ উপাধি গ্রহণ করেন নাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য স্ব-রচিত পদে “শ্রীনিবাস দাস” বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ‘নরোত্তম ঠাকুর’ নরোত্তম দাস নামে গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন—শ্যামানন্দ স্ব-রচিত পদে “হুঃখিনী” বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তবুও জনসমাজ ইহাদিগের গুরুদত্ত উপাধিতে ইহাদিগকে অভিহিত করিয়া ধন্য-হুইত।

শ্রীনিবাস যখন শ্রীজীবের নিকট “উচ্ছলনীলমণি” গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন শ্রীজীব সাধন-জগতে শ্রীনিবাসের অশ্রদ্ধা

কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহা দেখিবার জন্ত “উদ্ভলনালমাগর”
একটি শ্লোক লইয়া আলোচনা করেন। শ্লোকটি এই—

সখি! রোপিতো দ্বিপত্রঃ শতপত্রাখোন যো ব্রহ্মচারি।

সোহয়ঃ কদম্বভিঙ্গঃ ফুলো বনভবধুমুদতি।

—(উদ্ভাপনবিভাব—উঃ নীঃ)

অনুবাদ—হে সখি! যে কদম্ব বৃক্ষের চারাটির দুইটি পত্র উদগত
হইবার সময় ত্রিকুঞ্চ ব্রহ্মচারে রোপন করিয়াছিলেন, সেই শত-
পত্রাখা কদম্ববৃক্ষের চারাটি এখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দভরে
প্রফুল্ল হইয়া গোপবধুগণের চুঃখ উৎপাদন করিতেছে।

ত্রিকুঞ্চ যখন ত্রিবন্দাবন ত্যাগ করিয়া মধুরার গমন
করিয়াছেন—এই কদম্ববৃক্ষের বর্ণনাটি সেই সময়ের। ত্রিকুঞ্চ
ত্রিবন্দাবনের প্রাণ। ত্রিকুঞ্চের জন্মই ত্রিবন্দাবন। ত্রিকুঞ্চের বিরহে
ত্রিবন্দাবনের তরুলতা পত্র-পুষ্প যেন পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে,
হৃদের জল শুকাইয়া গিয়াছে, হৃদের কমল-পুষ্পগুলিও শুষ্ক,—অধিক
কি, ত্রিবন্দাদেবী নানা ফুলে যে বিলাসকুঞ্জ সজ্জিত করিয়াছিলেন—
তাঁহাও শুকাইয়া গিয়াছে। ত্রিবন্দাবনের পশু, পক্ষী ও মানব
সকলেরই প্রাণের প্রাণ ত্রিকুঞ্চ,—তাঁহার অভাবে ব্রহ্ম-জনেরা যে
বাঁচিয়াছিল—সে শুধু ত্রিযোগমায়া দেবীর অবটনঘটনপটঙ্গী
লীলার মহিমায়। এইরূপ স্মৃত্তিক ত্রিকুঞ্চবিরহে তরুণ কদম্ববৃক্ষ
কিরূপে প্রফুল্লভাবে বিরাজ করিতেছিল? ইহাই এই শ্লোকটির
অন্তর্নিহিত সমস্যা। ত্রিনিবাস ইহার উত্তরে জানাইলেন যে,
ত্রিকুঞ্চ স্বহস্তে এই কদম্ববৃক্ষটি রোপন করিয়াছিলেন,—ইহাকে তিনি
ভুলিতে পারেন নাই; এইজন্ত এই বৃক্ষটির কথা সর্বদা তাঁহার মনে
পড়ায়—এই বৃক্ষটির প্রকরণভাব দেখা গিয়াছিল। ত্রিনিবাসের এই
উত্তরে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তিভাবের গূঢ় বিকাশ দেখিয়া ত্রিজীব
তাঁহাকে “আচার্য্য” উপাধিতে ভূষিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।
ত্রিনিবাস ত্রিজীবের আদেশে তাঁহার সম্মুখে ব্রহ্মবাসী ছাত্রদিগকে
অধ্যাপনা করাইয়াও নিজের আচার্য্য পদবী লাভের যোগ্যতার
পরিচয় দিয়া ত্রিজীবকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। এই প্রকার নানা-
কার্য্যে ত্রিনিবাসের ভক্তিরসের অমৃতভবের গভীরতা দেখিয়া ত্রিজীব
ত্রিনিবাসকে ভক্তি-ধর্ম আচার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন।
অনন্তর ত্রিজীব গোস্বামী ত্রিব্রহ্মগুণের গোস্বামী ও মোহান্তদিগের
সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ পূর্বক ত্রিনিবাস
আচার্য্যকে “আচার্য্য” উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি ত্রিনিবাস
গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে “আচার্য্য”রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

‘ত্রিভক্তিরত্নাকর’ নরোত্তমের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

নরোত্তম-চেষ্টা দেখি প্রভু লোকনাথ।

দীক্ষামন্ত্র দিয়া সুখে কৈল আত্মসাত।

ত্রিগোপাল ভট্ট আদি সবে কৃপা কৈল।

ত্রিজীব গোস্বামী পাঠারম্ভ করাইল।

অন্নদিনে বহু শাস্ত্র হৈল অধ্যয়ন।

দেখি হেন শক্তি প্রশংসয়ে সর্বজন।

অন্তের দুর্গম এঁছে প্রকাশে আশয়।

ত্রিকুঞ্চ গোস্বামীর সদা হর্ষ অতিশয়।

সর্বজ্ঞেই সবার লইয়া অমৃততি।

নরোত্তমে দিলেন “ত্রিমহাশয়” খ্যাতি।

বৃন্দাবনে আনন্দ বহন গণাকাম।

ত্রিজীবের স্নেহ কত নারি বর্ণিবার।

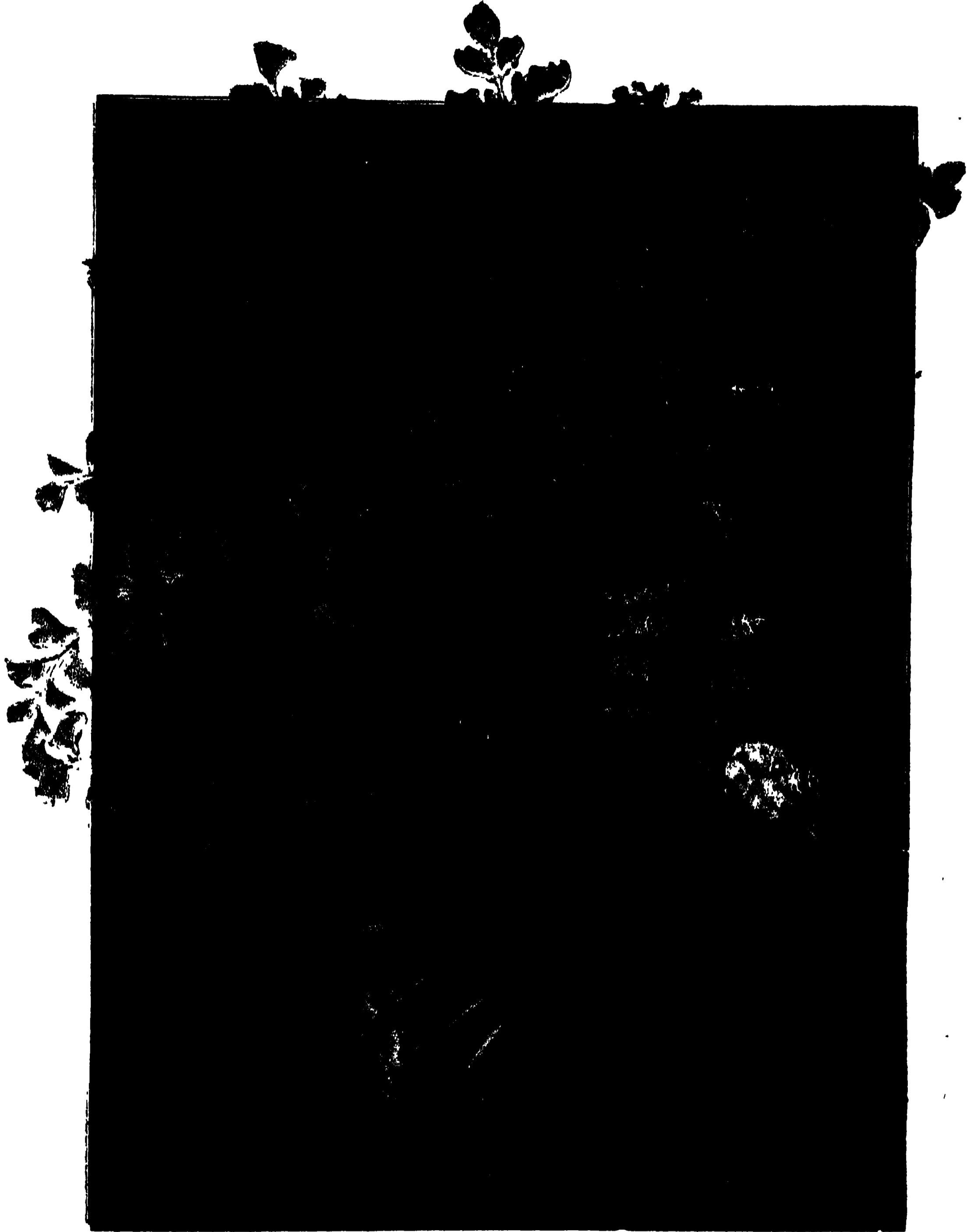
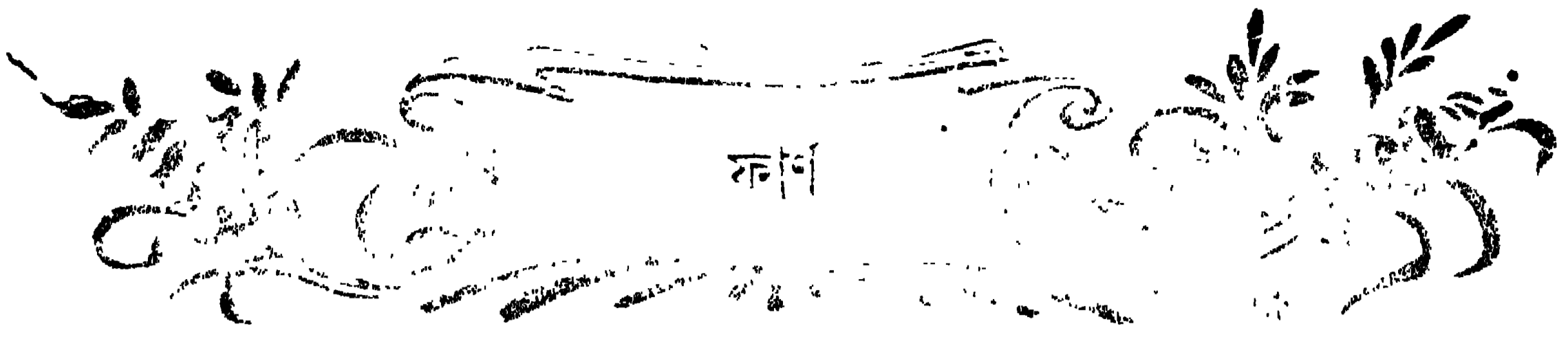
ত্রিনিবাস নরোত্তম প্রেমের ভাজন।

ত্রিজীবের যেন দুই বাছ দুই জন।

—ভঃ রঃ, ৪র্থ বঙ্গ, ১৪৭ পৃঃ ; (বঃ সঃ)

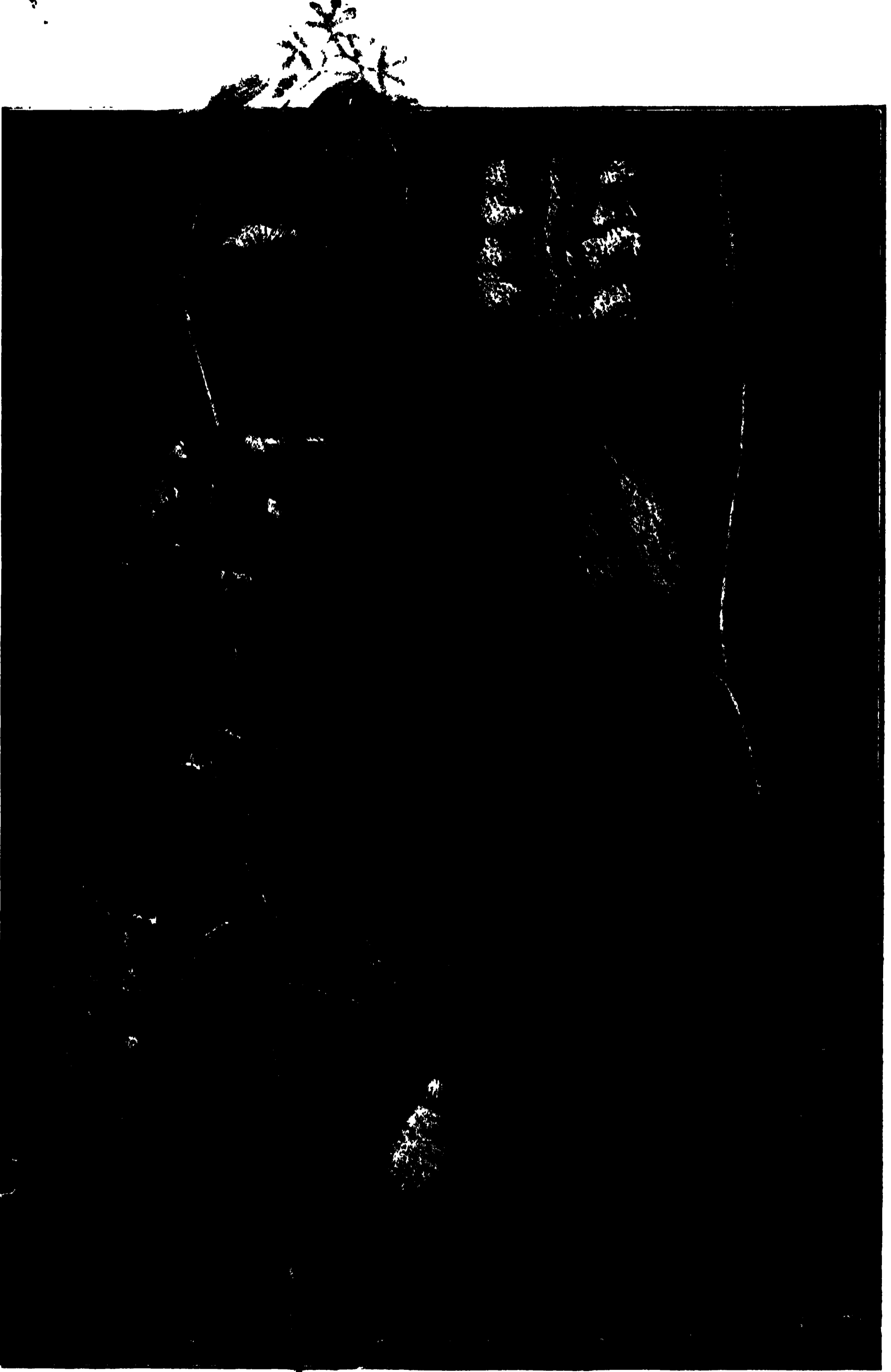
কিন্তু ‘প্রেমবিলাস’ বলিতেছেন, নরোত্তমকে “ঠাকুর মহাশয়”
উপাধি প্রদত্ত হয়। বস্তুতঃ, পরবর্তী বৈষ্ণবগণ নরোত্তমকে
“ঠাকুর মহাশয়” নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন। নরোত্তম
কি প্রকারে “ঠাকুর মহাশয়” হইলেন, তদ্বিষয়ে ‘প্রেমবিলাসে’ একটি
উপাখ্যানও প্রদত্ত হইয়াছে। নরোত্তম একদা কুঞ্জে বসিয়া
ত্রিকুঞ্চদৃষ্ট প্রণালীতে লীলাশ্রয়ণ করিতে করিতে নিদ্রা ও
জাগরণের সন্ধিস্থানে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময় ত্রিরাধিকা
কুঞ্জমধ্যে আসিয়া কহিলেন—“কুঞ্চদৃষ্ট প্রণালীতে মানস সেবাতেই
সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। তোমার মানস-সেবার নিষ্ঠা দেখিয়া আমি
অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। মধ্যাহ্নে ত্রিকুঞ্চ আমার কুঞ্জে
আগমন করিয়া ক্ষীর সেবা করিয়া থাকেন; সেই জন্ত আমার
সখীগণ দুগ্ধ আবর্তন করিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া থাকেন! তুমি
চম্পকসতার কুঞ্জে থাকিয়া দুগ্ধ-আবর্তনরূপ নিত্যসেবা গ্রহণ কর।
অন্ত হইতে তোমার নাম “চম্পকমঞ্জরী” হইল! নরোত্তম স্বপ্নপ্রায়
এই ব্যাপার দেখিয়া চৈতন্যলাভ পুরঃসর ভাবিলেন, ত্রিরাধিকার এই
আদেশ হইলেও আমার গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত কোনও
স্বাতন্ত্র্য আচরণ করা উচিত নহে। অনন্তর তিনি ত্রিলোকনাথ
গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই ব্যাপার নিবেদন করিলেন।
গোস্বামীজি এই কথা শুনিয়া পরম স্নেহভরে নরোত্তমকে
বলিলেন,—“নরোত্তম! তুমি পরম ভাগ্যবান, তাই তুমি
কিশোরীজির সাক্ষাৎরূপাদেশে তাঁহার সেবা প্রাপ্ত হইয়াছ; অস্ত
হইতেই তুমি ঐ প্রকারে মানস-সেবায় প্রবৃত্ত হও।” গুরুদেবের
আদেশে নরোত্তম এই প্রকারে মানস-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।
এক দিন নরোত্তম অন্তর্দর্শায় মানস-সেবার দুগ্ধ-আবর্তনে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে দুগ্ধ উথলিয়া উঠিল,—দুগ্ধ পড়িয়া-
বাইতেছে দেখিয়া তিনি হস্ত দ্বারা উহা নিবারণ করিতে গেলে
হাত পুড়িয়া গেল—তথাপি সেবার উৎকর্ষায় সেই অত্যাধিক দুগ্ধ-
পাত্র চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিলেন। কিছুকাল পরে বাহুদশায়
ব্যবহারিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে,
বাহু শরীরেও তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি পুড়িয়া গিয়াছে।
কোনওরূপে গাভবস্ত্রে হাত ঢাকিয়া, তিনি প্রত্যাহ যে সময়ে
গুরুদেবের নিকট বাইতেন, সেই সময়ে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত
হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরম প্রেমিক কল্পাসাগর
ত্রিলোকনাথ গোস্বামী শিষ্যের এই ব্যাপার অবগত হইয়া
তাঁহাকে কোলে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং দীনতার
খনি লোকনাথ প্রভু ইহাতে নিজের কৃতিত্বের সম্ভাবনামাত্র
যুছিয়া ফেলিবার জন্ত বলিলেন, “ত্রিজীবের কৃপাকলে তোমার
শ্রয়ণ মননের এইরূপ ফললাভ হইয়াছে। ত্রিজীব গোস্বামীও
নরোত্তমের এই প্রকার ভ্রমনিষ্ঠা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে “ঠাকুর মহাশয়” এই নাম প্রদান করিলেন। তদবধি
নরোত্তম “ঠাকুর মহাশয়” নামে বিখ্যাত হইলেন।

ত্রিসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি এল)।



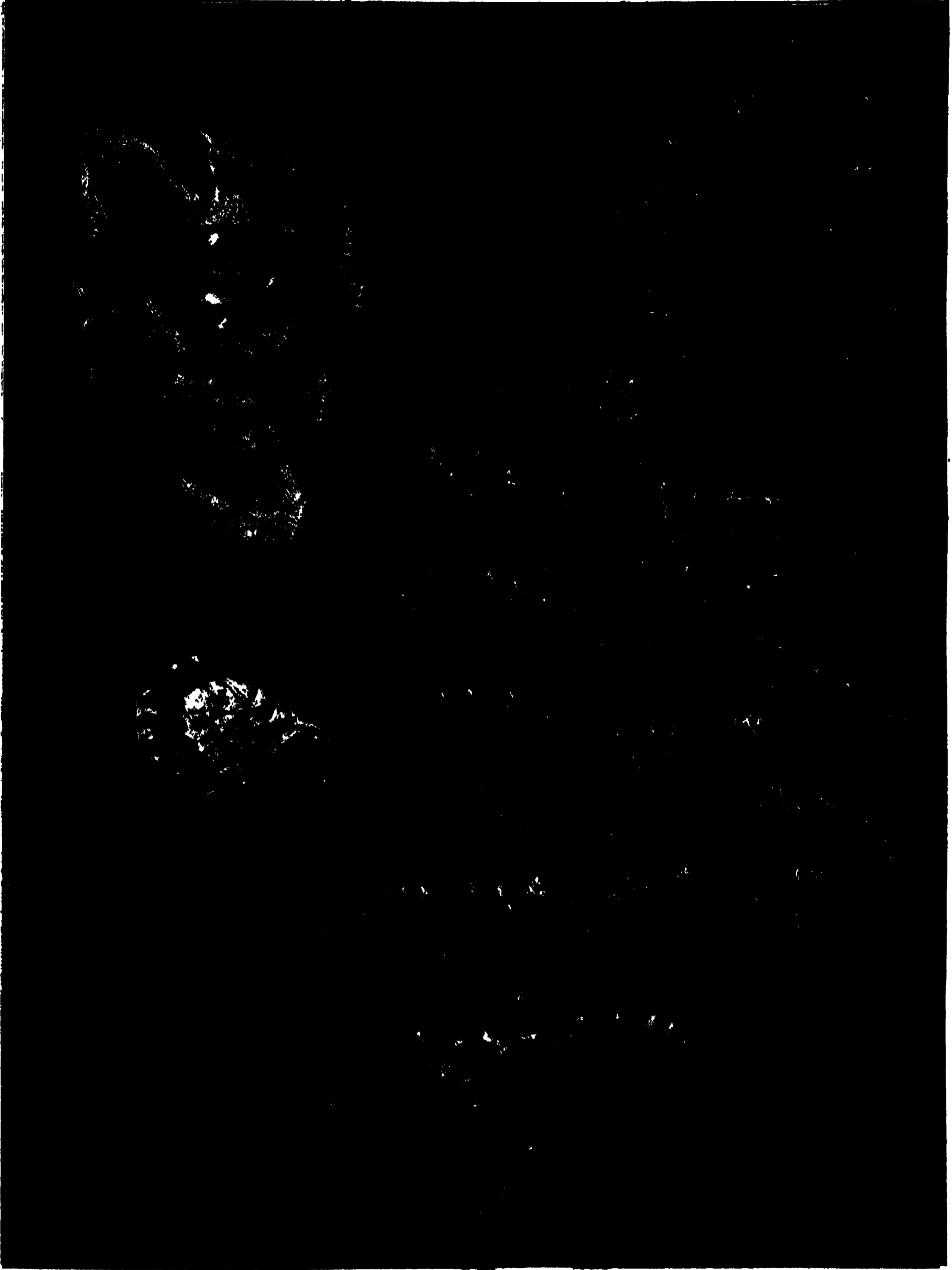
কিশোরীর কেশ-গুচ্ছ

সবুজের উপর কি যে আমাদের মায়া ! এ মায়া জন্ম-গত ! . ভালোবাসে ; বইয়ের পাতায়-পাতায় রকমারি লতা-
তাই ছেলেমেয়েরা কচি-সবুজ লতা-পাতা লইয়া খেলিতে পাত্তা গুঁজিয়া সবুজ-প্ৰীতির পরিচয় দেয় ।;



সপ-ত্রিহা।

ছেলে-বয়সের এই সবুজ-প্রীতি বড়-বয়সে সবুজ আমরা বাগান রচনা করি, বাড়ীর উঠানে মাটি গাছ-পালার উপর প্রসারিত হয়। তাহারি ফলে না পাইলে টবে করিয়া পাম ও পাতা-বাহার

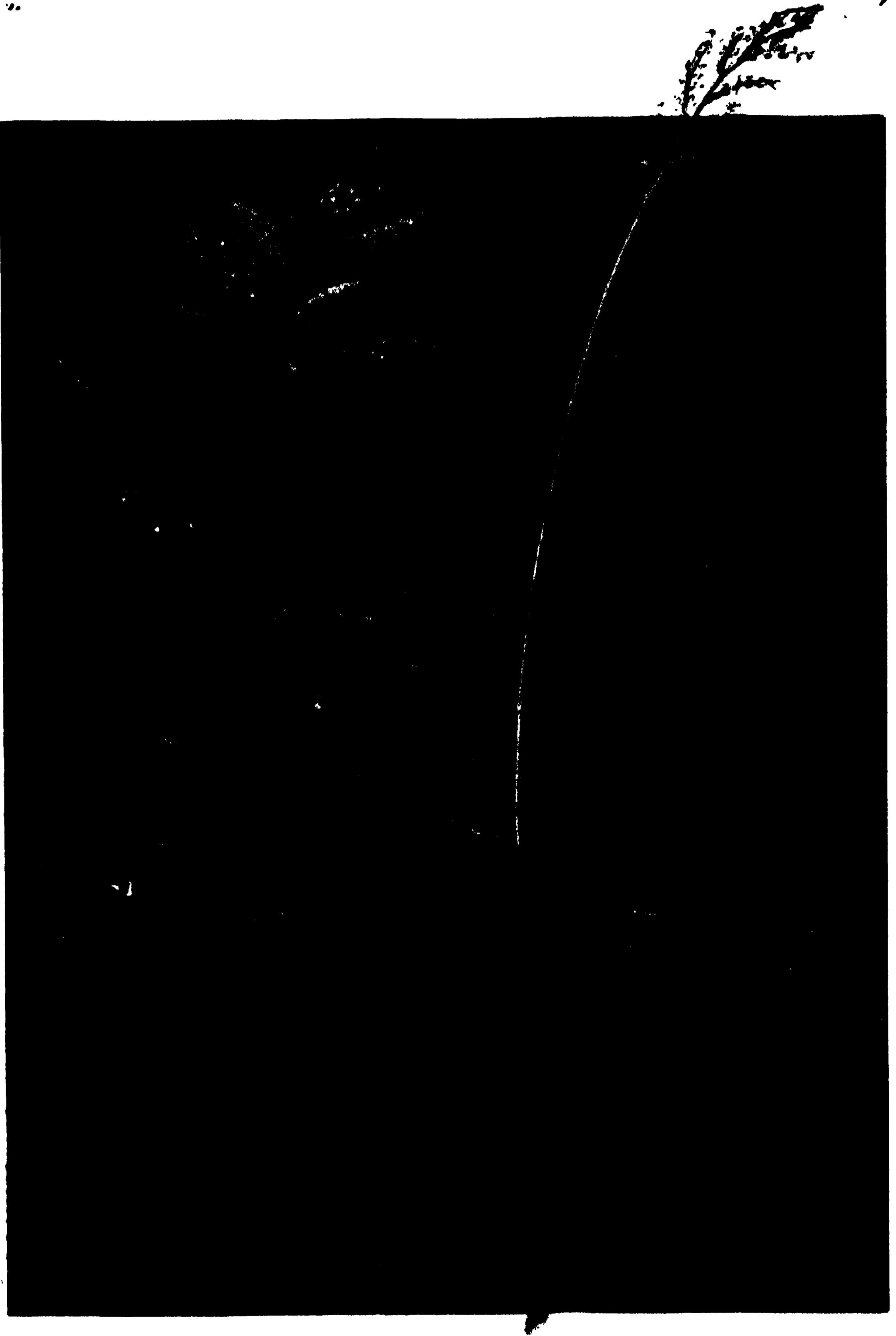


কমন্‌উড

(খুব সাধারণ ফাগ)

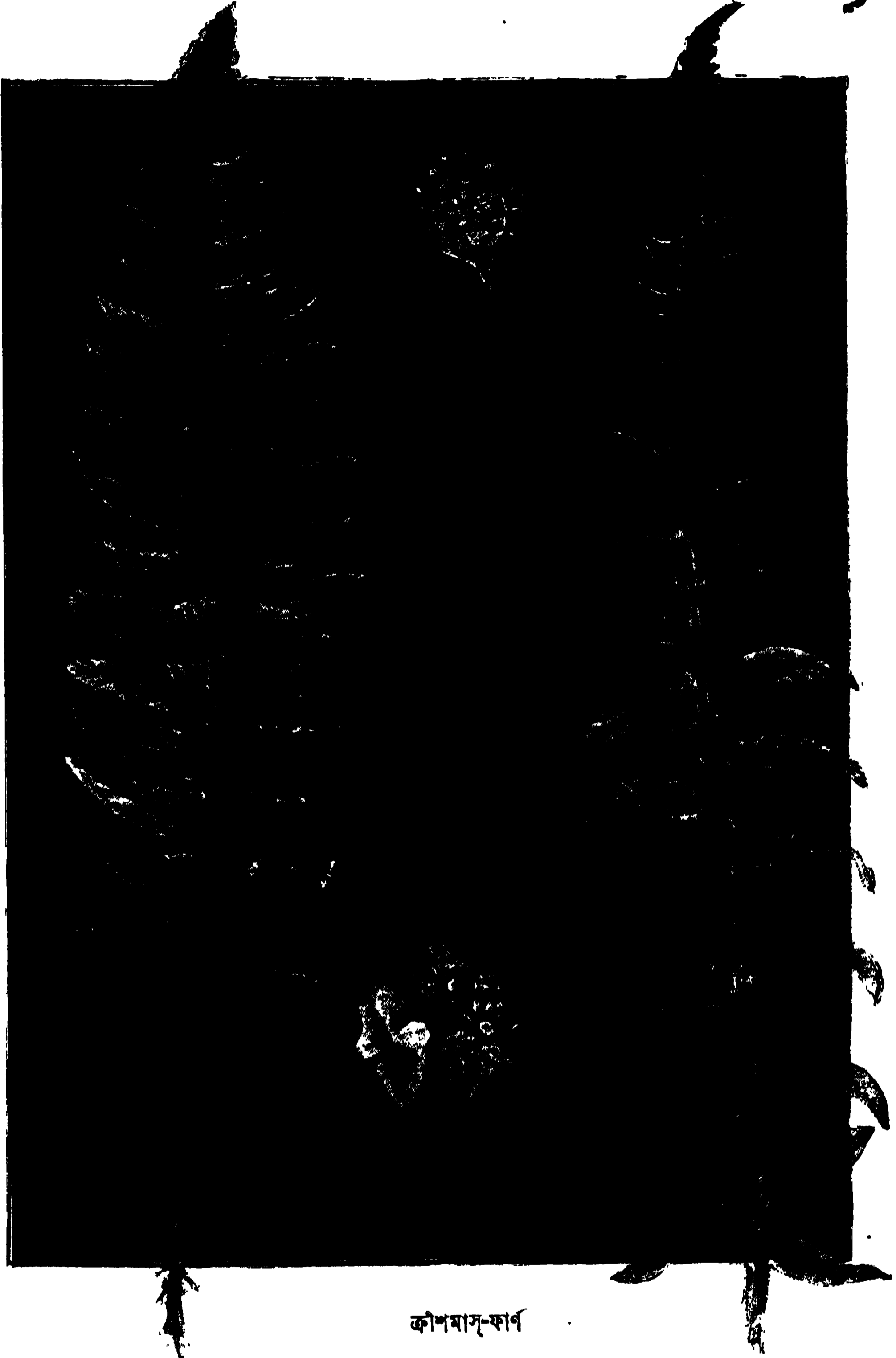
ফুল-বাহার গাছ-পালা পুঁতিয়া নয়ন-মনের আনন্দ সাধন
করি।

যাদের এ-প্রীতি বেশী, তাঁরা শুধু দেশের গাছ-পালা
লইয়া খুশী থাকিতে পারেন না; দেশ-বিদেশের নয়ন



ম্যাট্রিক্স-স্ট্রাকচার

বিমোহন গাছ-পালা আনিয়া সে-সবের সমাদর করেন। কোনো কালে ফুল ফোটে না, শুধু পাতার বাহার, সে এ-সমাদর শুধু ফল-গাছেই আবদ্ধ থাকে না; যে-গাছে গাছের উপরও প্রসারিত হয়। এবং এই অমুরাগের



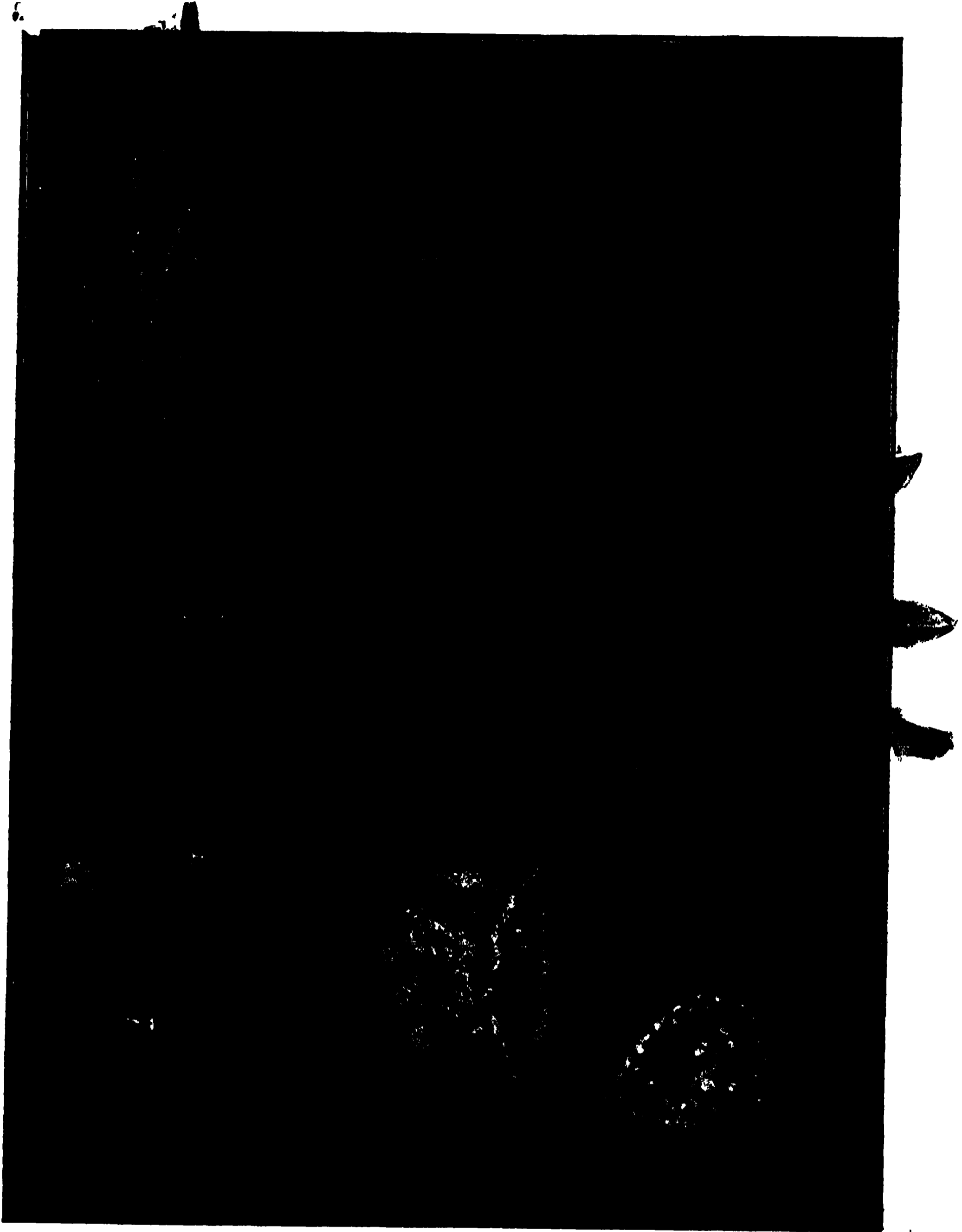
ক্রীশমাস্-ফার্ণ

বশে মাম্বুম বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া পাতা-বাহার নানা
রকমের গাছপালা খুঁজিয়া আনিয়া বাড়ীর ও বাগানের
শোভা-বর্ধন করে।

বনে এক-জাতের গাছ মেলে, তার নাম Ferns.
এ-সব গাছের পাতায় শুধু রকমারি বাহার; এবং সে

পাতার বর্ণ চির-সবুজ। তাই এই ফার্ণের লালনে
সৌখীন নর-নারীর যত্ন ও আদরের আজ সীমা দেখি না।

‘ফার্ণ’ কথার বাঙলা-প্রতিশব্দ পত্রাঙ্গ। অর্থাৎ এ-
গাছের দেহ পত্রে পত্রময় বলিলে অত্যাক্তি হইবে না!
ফার্ণে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি মাধুরী! কবি-দার্শনিক



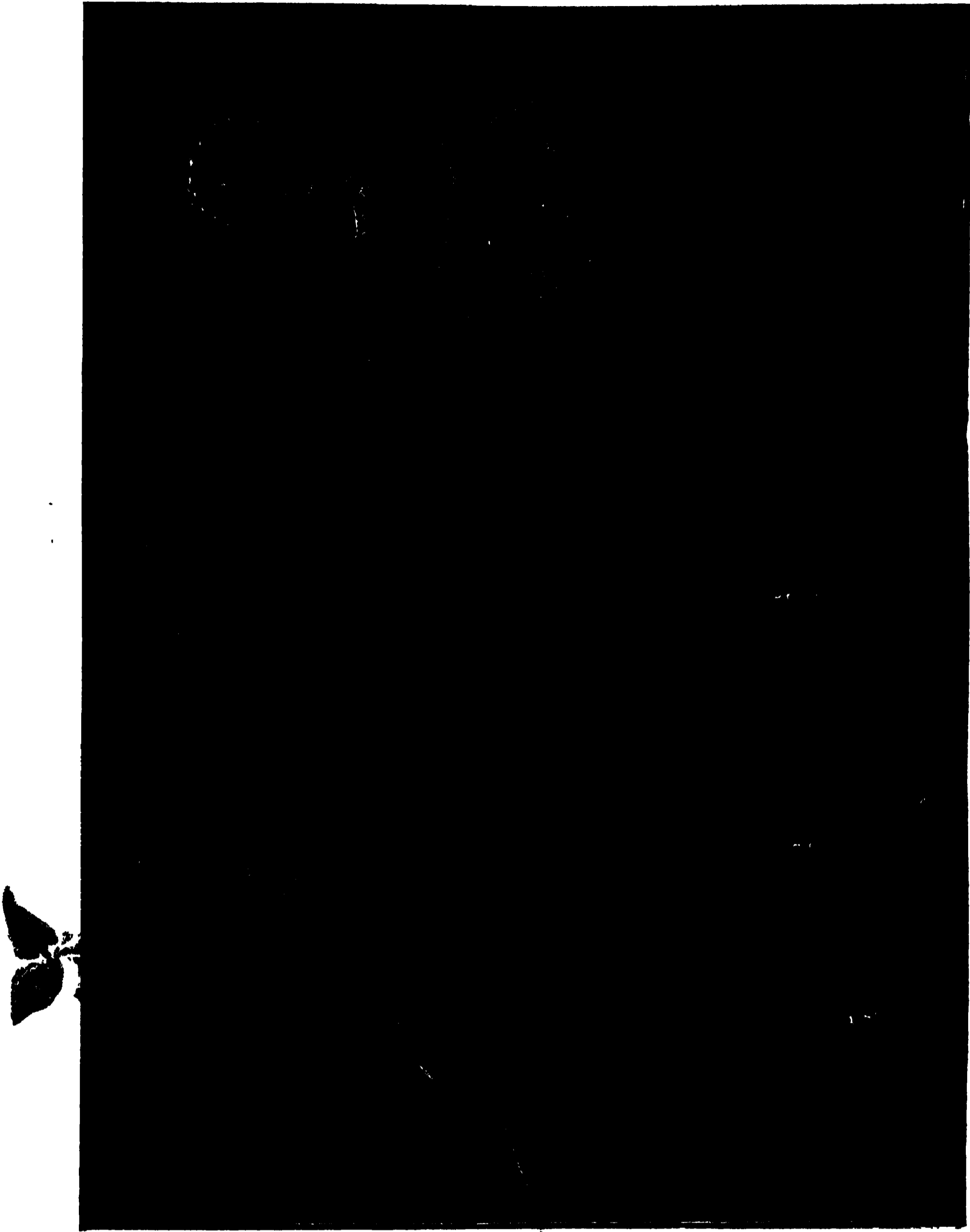
লজ্জাবতী

হইতে স্মৃতি করিয়া অকবি অতি-সাধারণ লোকও ফার্ণের রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। 'ফার্ণ' যেন বিরাম-আরামের প্রতিচ্ছবি! দেখিলে দেহ-মনের শ্রান্তি নিমেষে ঘুচিয়া যায়।

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন,—Truly, in beauty of leaf they are unsurpassed. ফার্ণের পাতায় বাহারের তুলনা নাই! কে যেন সকল দিকে

সামঞ্জস্য রাখিয়া অতি-যত্নে এ-সব পত্র-পল্লব রচনা করিয়াছে!

ফার্ণের পাতার গড়ন অনেকটা পাখীর পালকের মতো। 'ফার্ণ' কথাটির উৎপত্তি লাতিন Pinna কথা হইতে। পিনার আসল অর্থ, পালক। ফার্ণের পাতার গড়নে পালকের গড়ন-সাদৃশ্য দেখিবেন। উদ্ভিদশাস্ত্রে তাই fern-like কথাটি পত্র-পল্লবের পালক-ভাব

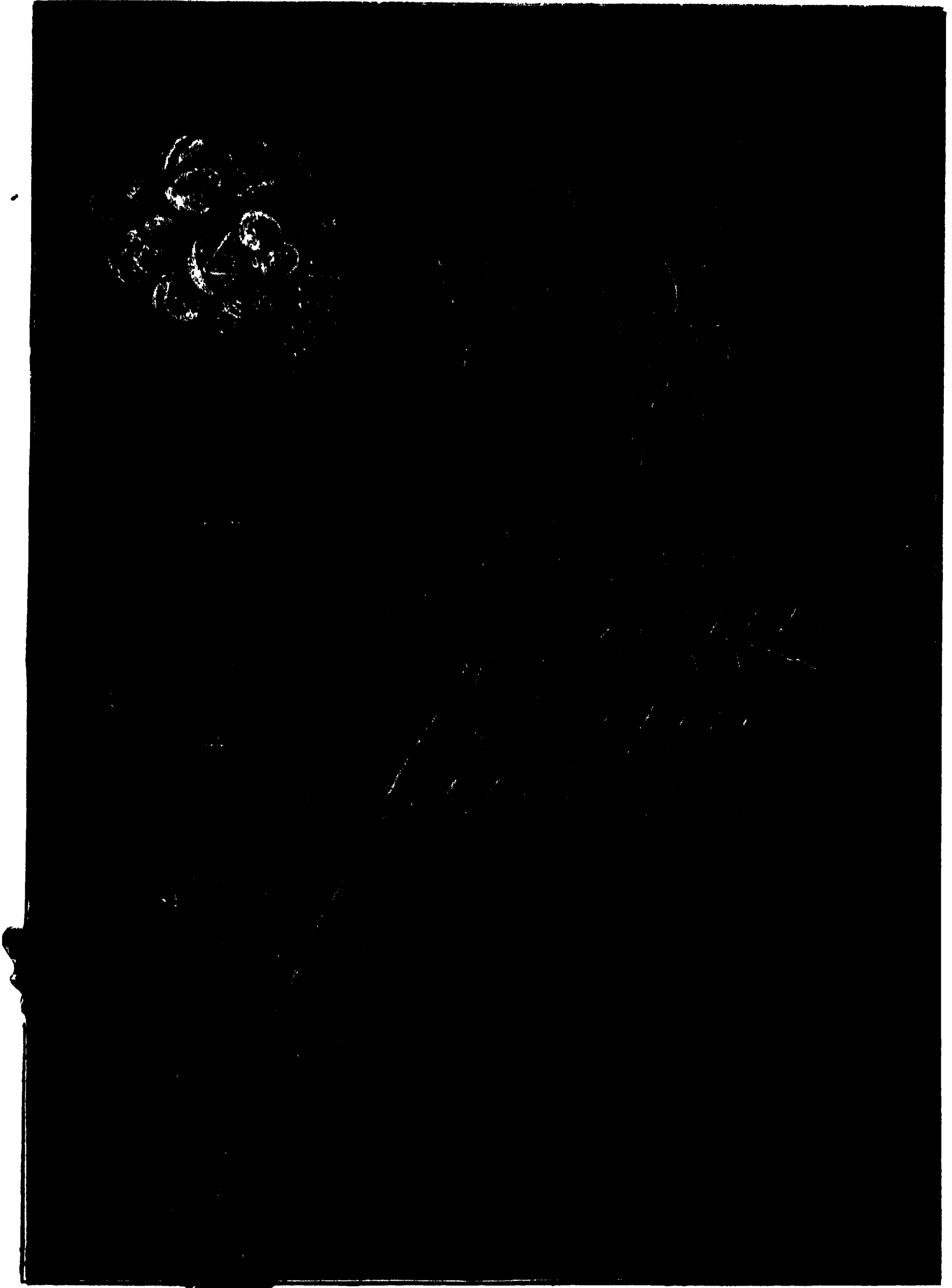


বুঝাইতে ব্যবহার করা হয় (to signify a feathery quality of the foliage suggestive of ferns —the highest group among the flowerless plants.) ।

ফাৰ্ণে কদাচ ফুল ফোটে না। ফাৰ্ণের মতো দেখিতে কোনে গাছে যদি ফুল ফুটিতে দেখেন, তাহা হইলে জানিবেন, শাস্ত্র-মতে সেগুলি ফাৰ্ণ নয়। বিদেশী লুইট

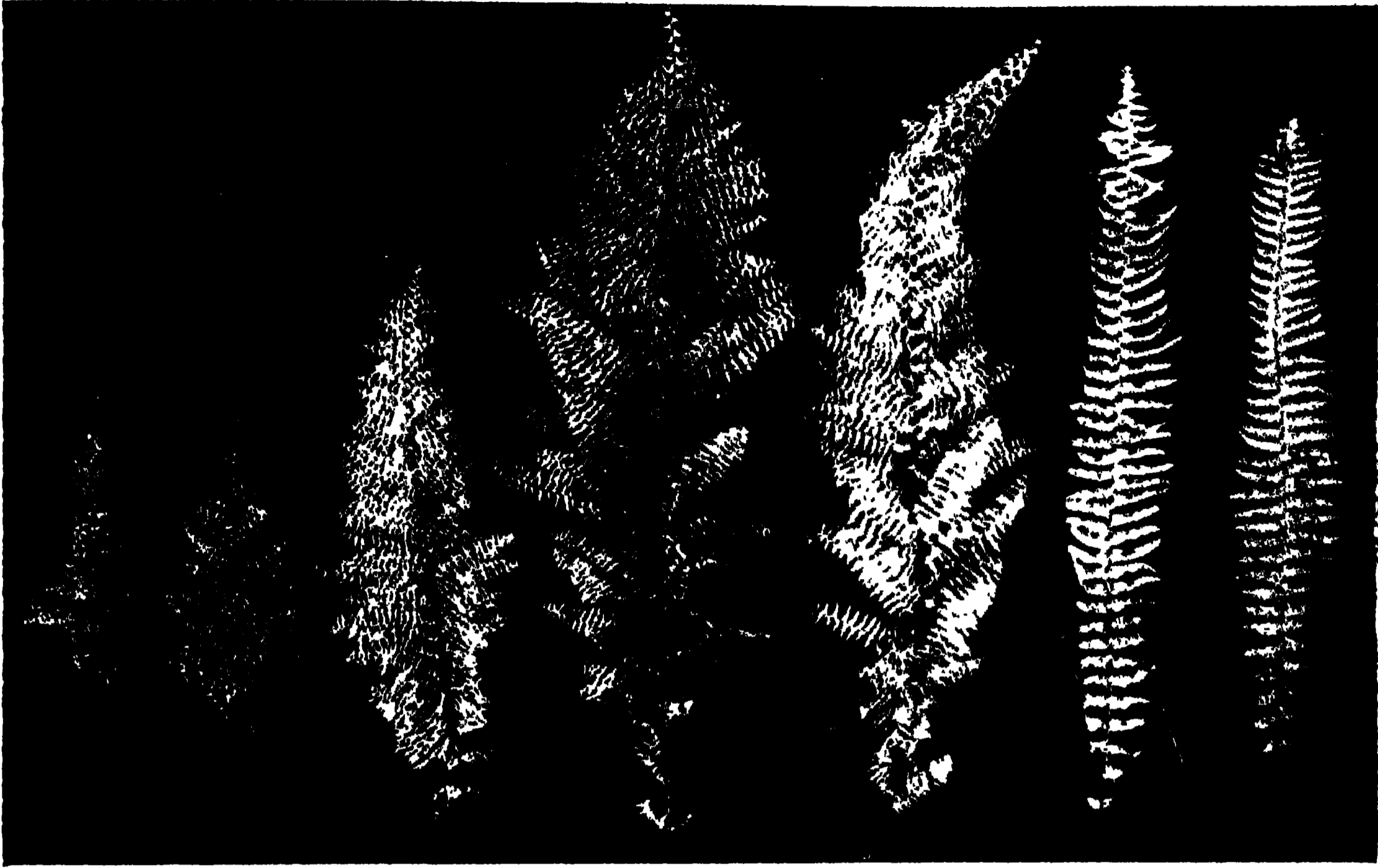
ফাৰ্ণ নামে এক-জাতের পুষ্প-তরু দেখিতে অবিকল ফাৰ্ণের মতো; কিন্তু সেগুলি ফাৰ্ণ নয়। সেগুলি উদ্ভিদ-শাস্ত্রের মতে 'বে-বেরি' জাতীয় পুষ্প-তরু।

ঠাণ্ডা ও গরম দেশ—হু' দেশের মাটিতেই ফাৰ্ণের জন্ম হয়। দেশ-ভেদে তাদের আকারে-প্রকারে বহু প্রভেদ দেখা যায়। ঘন বনে যেমন ফাৰ্ণ জন্মায়, তেমনি আবার পাহাড়ে-পর্বতে বা তুষার-প্রদেশে জন্ম লইতেও



ইন্টারপ্লেট-ফর্শ

তার কোনো বাধা ঘটে না। ফর্শ-সম্বন্ধে এ-যাবৎ এত আজ এতটুকু গলদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। ফর্শের আন্ত-
 রকমের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন হইয়াছে যে, ফর্শের পূর্বিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞেরা বলেন,
 জাতি-গোষ্ঠীর সাংগঠক পরিচয়-নির্ধারণে সুধী-সমাজে ফর্শের জন্ম হয় মনুষ্য বা জীব-জন্মের বহুকাল পূর্বে।



তলোয়ার-ফাৰ্ণ—ফ্লোরিডা



গাছের ডালে "বিহঙ্গ-নীড়"-ফাৰ্ণ—কিলিগাইন্‌ দ্বীপপুঞ্জ

খনি হইতে আজ আমরা যে কয়লা পাইতেছি, একয়লা সেই আদি-যুগের ফাৰ্ণের পাষণ-রূপ।

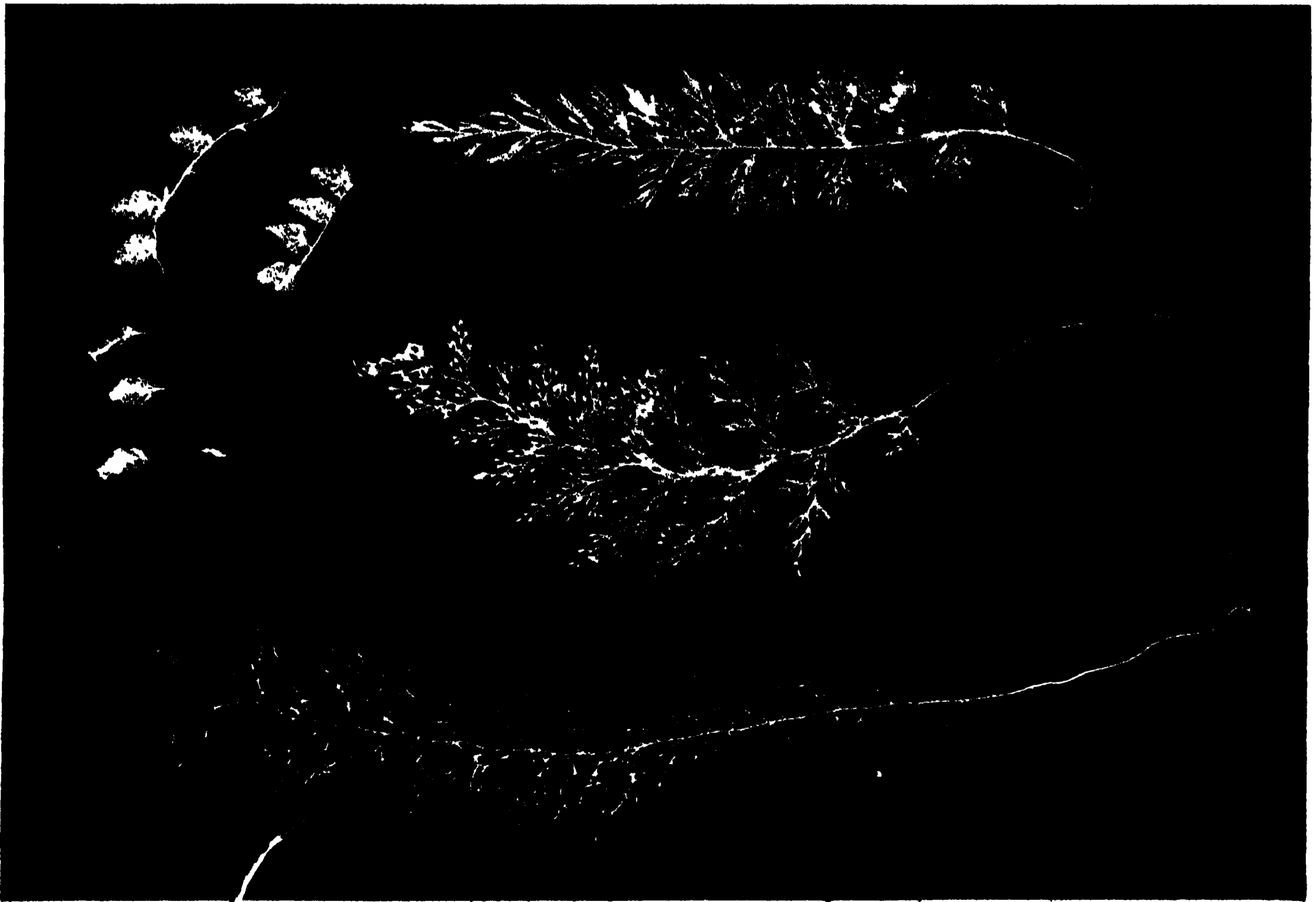
আজ পর্যন্ত আট-হাজার জাতের ফাৰ্ণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই আট-হাজার ফাৰ্ণের মধ্যে আছে বারোটি প্রধান শ্রেণী বা জাতি; এবং ১৭৫টি উপ-শ্রেণী বা পরিবার। ফাৰ্ণের গোত্র-কাহিনী রোমালের মতো সরস এবং উপভোগ্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফাৰ্ণের সঙ্গেই মানুষের পরিচয় কিছু বেশী। যুরোপের বহু প্রদেশের ফাৰ্ণের পরিচয় আজ পর্যন্ত নব-সমাজে অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। উত্তর-আমেরিকায়—ওধু মেক্সিকোর উত্তর-সীমা পর্যন্ত প্রায়

অর্থাৎ এই ফাৰ্ণই পৃথিবীর বিরাট উদ্ভিদের অত্যন্ত আদি-পুরুষ—They were among the first and the simplest of the larger land-plants.

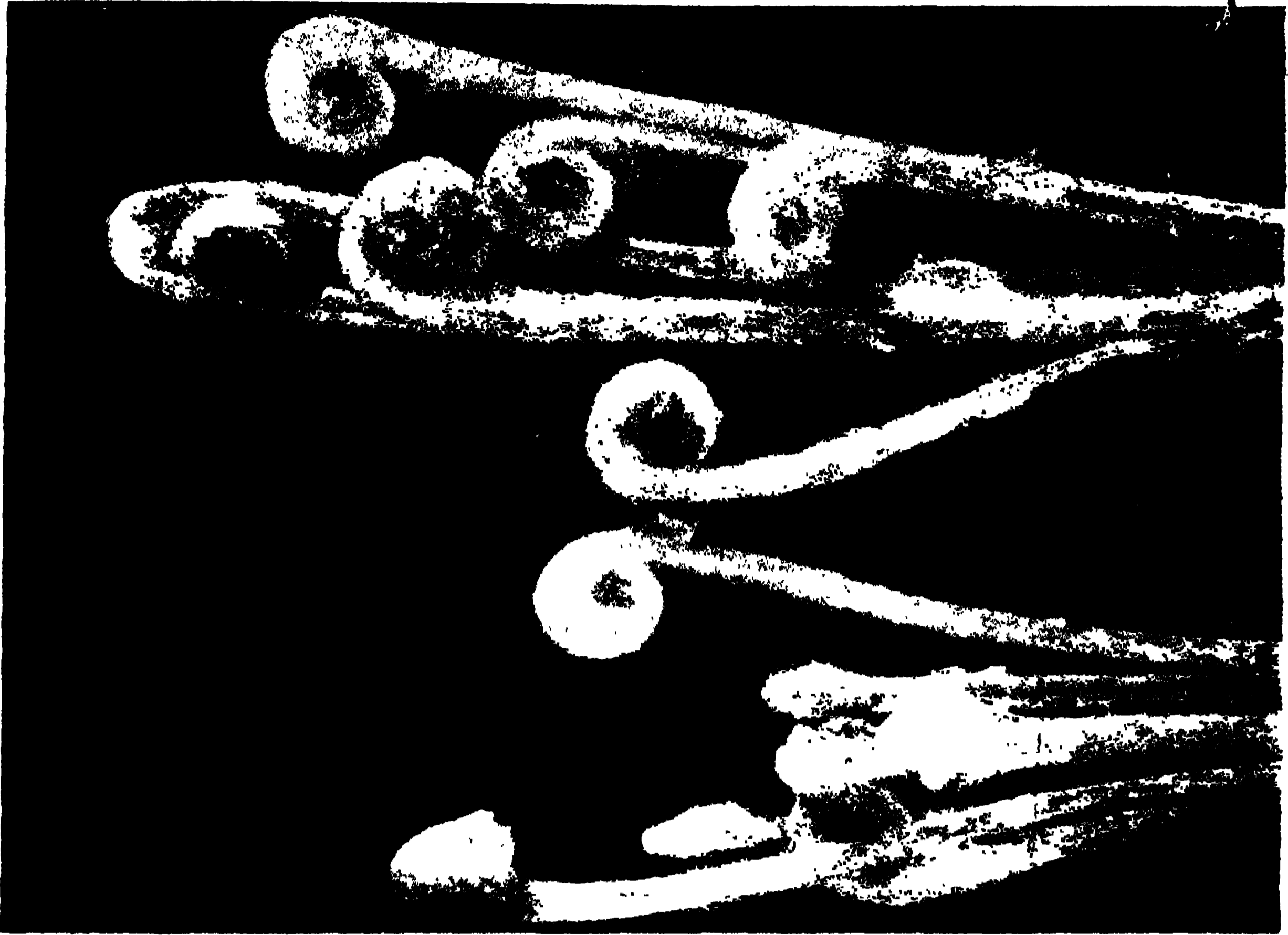
২৫০ জাতের ফাৰ্ণের পরিচয় মিলিয়াছে এবং উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞেরা এখনো নিত্য নব-নব কৃত ফাৰ্ণ যে আবিষ্কার করিতেছেন, তার আর সংখ্যা নাই।



ফুলের বনে রয়েছে কার্ণ



কার্ণ নয়—বনে মিহি বেশ্য ।



ବାଲୁନା ଗଛ—ଗିନାମନ-କାର୍ପ ।

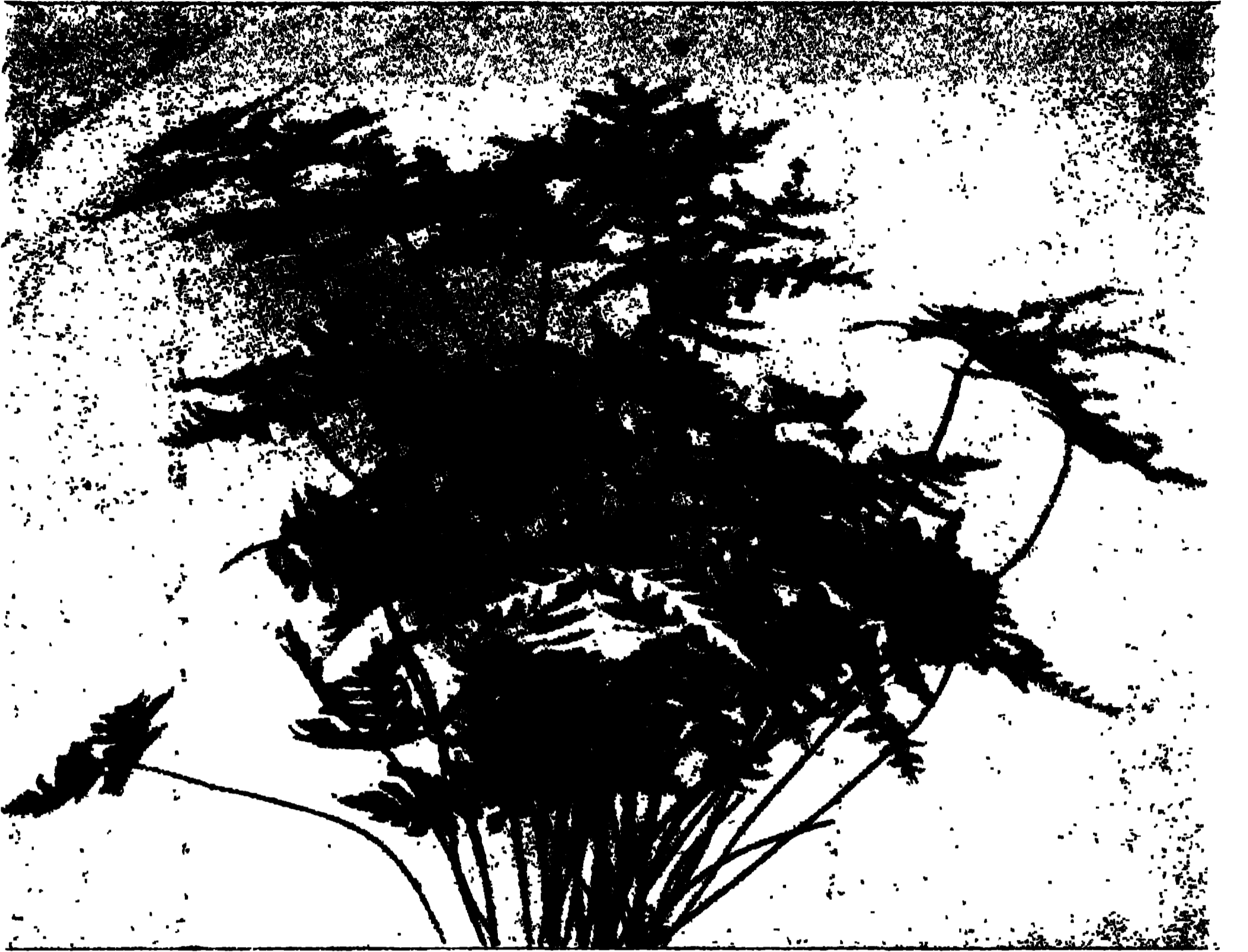


କାର୍ପ-ବୃକ୍ଷ—ହାତ୍ୟାରି ବାଲେ

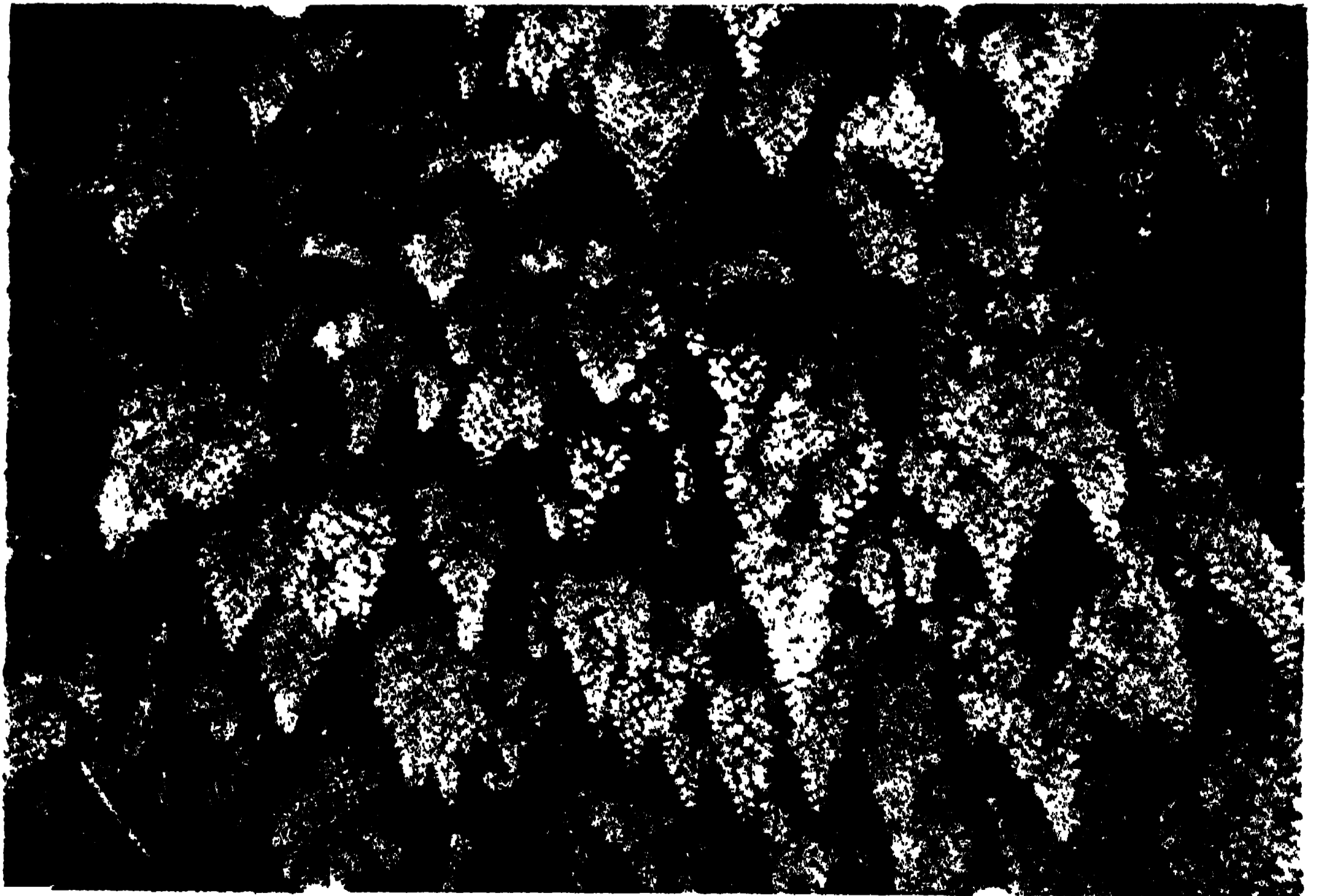
মাটিতে শিকড়
ধরিয়া ই যে শুধু
ফাৰ্ণের জন্ম, তা
নয়। ফিলিপাইন
দ্বীপপুঞ্জ এ বং
ব্রহ্মদেশে বড় বড়
গাছের মাথায়-
ডালে পাতায়-
পাতায় নাগালের
উর্ধ্বে নানা রক-
মের ফাৰ্ণ অজস্র-
ভাবে জন্মিতে
দেখা যায়।

ফাৰ্ণ-সংগ্ৰহ অনে-
কের কাছে রীতি-
মত নেশা বা
বাতিকের মতো !
এই ফাৰ্ণ সংগ্ৰহ
করিতে কত লোক
দুর্গম বনে-জঙ্গলে
গি য়ি-প র্ব তে
বিচরণ ক রি য়া
ফি রি তে ছে ন ।
তাঁদের সে-বিচরণ
কতক যেমন সফল
হইতেছে, তেমনি
এই ফাৰ্ণ সংগ্ৰহ
ক রি তে গি য়া
অনেকে আ বা র
কঠিন ব্যাধিতে,
হিংস্র-পশুর মুখে
অথবা অপঘাতে
জী ব ন বিসর্জন
দিয়াছেন !

জামেকা দ্বীপে
ফাৰ্ণ প্রচুর অজস্র



মকর বৃক্কে এ ফাৰ্ণ জন্মায়



'বিশোৰী-বেশ' ফাৰ্ণ—ফ্লোরিডা

ভাবে জন্মায়। এখান হইতে প্রায় ৫০০ বিভিন্ন জাতের ফাৰ্ণ আনিয়া য়ুরোপে-আমেরিকায় তাদের ফল ফলানো হইয়াছে। মেক্সিকো হইতে চিলি পর্যন্ত এই সমগ্র প্রদেশ চুঁড়িয়া সন্ধানী বিশেষজ্ঞের দল হাজার-

দেখা যায়। এখানে এক-জাতের ফাৰ্ণ আছে, তার নাম জুতার-ফিতা ফাৰ্ণ। তাল গাছের পত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া এ ফাৰ্ণ জন্মায়; এবং ফিতার মতো হাজার-হাজার ফাৰ্ণের ঝাড় ঝুলিতে থাকে।

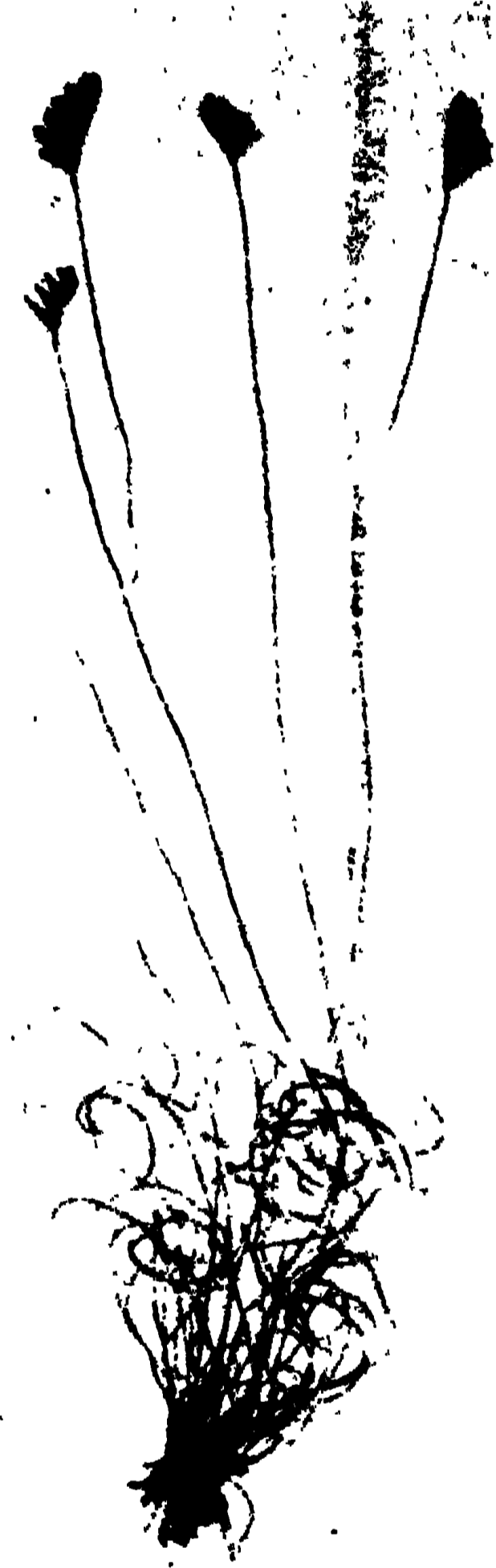
আর-এক জাতের ফাৰ্ণ আছে, তার নাম Hand-fern বা হাত ফাৰ্ণ! এ ফাৰ্ণ এবং এ্যাডাস-টঙ বা সর্প-জিহ্বা ফাৰ্ণ—এই দু' জাতের ফাৰ্ণ আমেরিকার পূর্বাঞ্চল ছাড়া আর



ফাৰ্ণ-গাছ—ববছাপ

হাজার জাতের ফাৰ্ণ আনিয়া য়ুরোপ-আমেরিকার মাটিতে পুঁতিয়া মাটির বুক সবুজ-শ্রীতে কাণ্ডিমান করিয়া তুলিয়াছেন।

ফ্লোরিডায় ফাৰ্ণগুলির আকৃতি-প্রকৃতিতে বহু-বৈচিত্র্য



'কুণ্ডিত-তৃণ' ফাৰ্ণ

কোথাও দেখা যায় না। কেন,—বিশেষজ্ঞেরা আজো তার কারণ নির্ধারণ করিতে পারেন নাই।

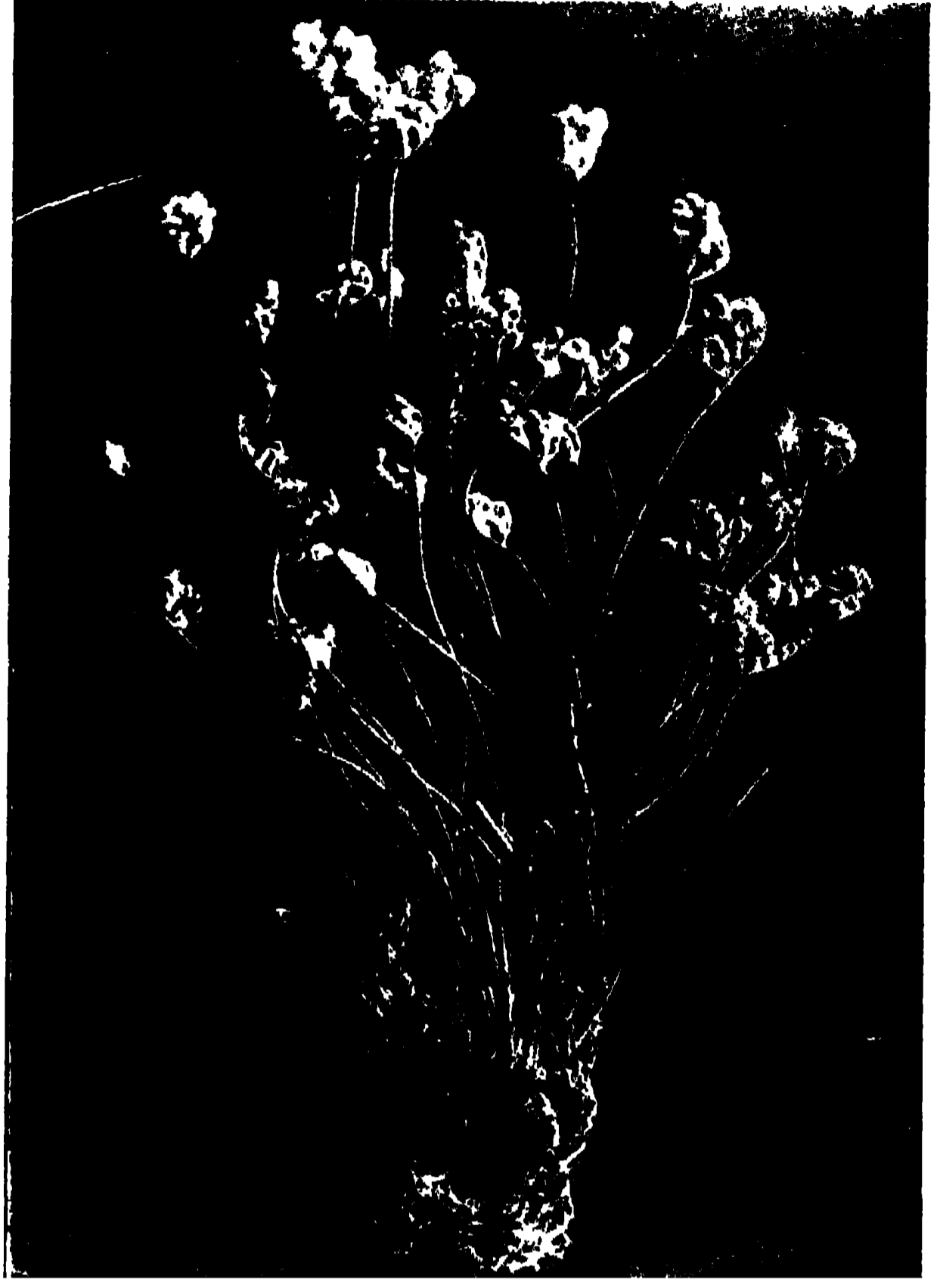
ফ্লোরিডায় মেড্‌নহেয়ার বা কিশোরীর কেশগুলি বলিয়া এক-জাতের 'ফাৰ্ণ' জন্মায়। এ ফাৰ্ণ দু' জাতের। এক রকমের নাম, রতিদেবীর কেশ-গুচ্ছ। এগুলির মাধুরী অপূৰ্ণ। ফ্লোরিডায় এবং আমেরিকায় এ ফাৰ্ণের দেখা মিলিবে। আর এক জাতের নাম, বাটাডোশ্ ফাৰ্ণ।

এগুলি খুব স্তম্ভারণ-জাতের ফাৰ্ণ। সকল দেশের পথে-ঘাটে যত্র-তত্র অজস্র ভাবে এ ফাৰ্ণ জন্মিতে দেখা যায়।

নিউ-জাৰ্শি প্রদেশে দেবদারু গাছের গায়ে এক-জাতের ফাৰ্ণ জন্মায়, তার নাম কুঞ্চিত তৃণ বা curly grass. এ ফাৰ্ণ ঘাসের মতো। নিউ-জাৰ্শির দেবদারু কুঞ্জ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথাও এ ফাৰ্ণের দেখা মিলিবে না।

ফাৰ্ণের জন্ম-কাহিনী বেশ রহস্যময়। মাটীর নাম-গন্ধ নাই এমন রুক্ষ যে-পাহাড়, সে-পাহাড়ের পাৰ্বাণ-দেহ ফুঁড়িয়াও ফাৰ্ণ উঠিয়াছে, এ দৃশ্য বিরল নয়! তবে এ ফাৰ্ণে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। এ ফাৰ্ণে পত্রগুলোর নীচের দিকটা মোমের মতো নরম এবং আর্দ্র; অথচ পাতার উপরের দিক দেখিতে রুক্ষ এবং শুষ্ক। পাতার ছ' পিঠের এ পার্শ্বকার জন্ত বাহার যা খোলে, চমৎকার! বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই আর্দ্রতা-হেতু ইহাদের অজস্রতা যেমন অবাধ, পরমায়ু তেমনি দীর্ঘ হয়।

বালুময় মরু-প্রান্তরেও ফাৰ্ণ জন্মায়। মরুর ফাৰ্ণ এবং রুক্ষ-গিরির ফাৰ্ণ—এ-দু'য়ের বিশেষত্ব এই যে, দারুণ গ্রীষ্মে ও প্রখর রৌদ্রতাপে এ-সব ফাৰ্ণের পত্র-পল্লব মুদিত-চকুর মতো দল গুটাইয়া থাকে; বৃষ্টি-বাদলায় বা রাত্রে ঠাণ্ডা



উষর-প্রান্তরের ফাৰ্ণ

পড়িলে সে পত্র-পল্লব আবার দল মেলিয়া বৃক ফুলাইয়া শোভা-মাধুরীতে জাগিয়া ওঠে।



মৃগ-জিহ্বা ফাৰ্ণ (বড় বিরল)



লেডি ফাৰ্ণ—ফুলের বনে জন্মায়

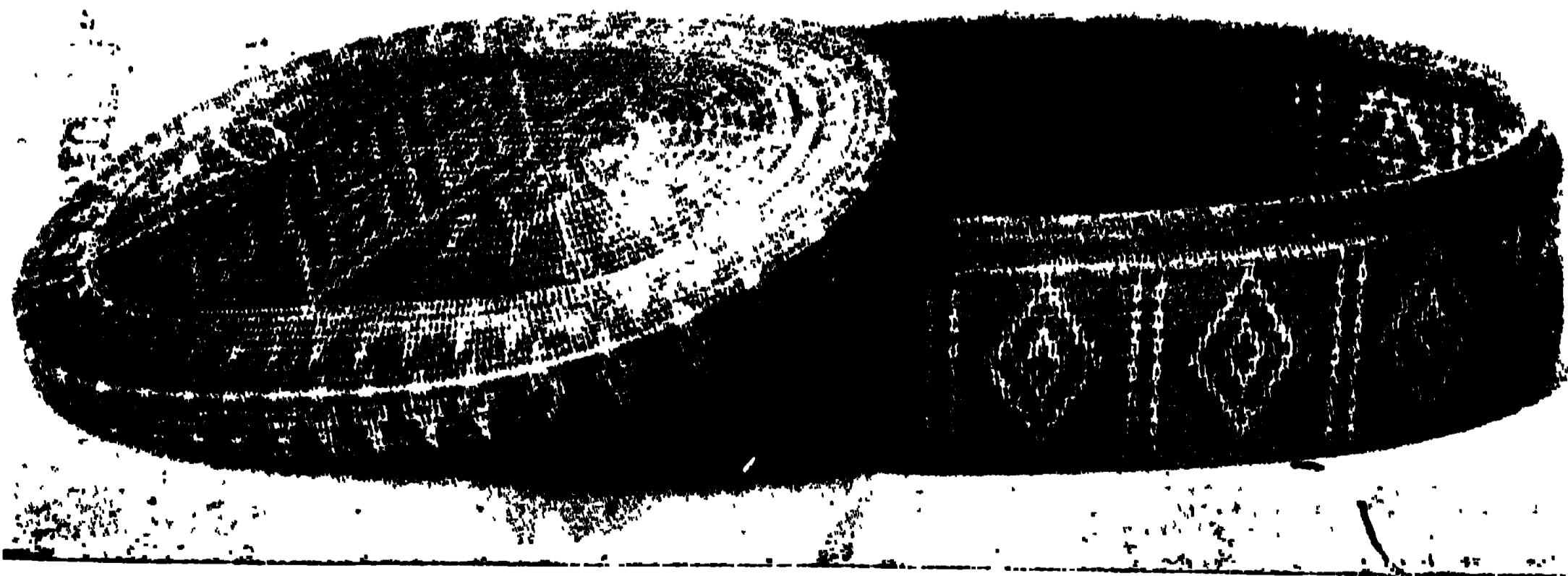
সব-চেয়ে ছোট জাতের ফাৰ্ণ দেখা গিয়াছে কেন্‌টাকি প্রদেশে গিরি-নিঝরের কোলে। শৈবালের গায়ে ঘেঁষ দিয়া এ ফাৰ্ণ মাথা তোলে! ভিজা বেল-পাথরের গায়েও

জন্মায় না। এ ফাৰ্ণ মাথায় বাড়ে তালগাছের মতো; অর্থাৎ বিশ হইতে আশি ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়; শাখাপ্রশাখা আদৌ নাই, কাণ্ড হয় তালগাছের মতো। অষ্ট্রেলিয়াতেও

এ ফাৰ্ণ অজস্রভাবে জন্মায়। দেখিলে মনে হইবে, শৈবাল-দল! আসলে কিন্তু এগুলি শৈবাল নয়—ফাৰ্ণ!

বৃষ্টির জল বুকে ধরিয়া রাখিবে, ফাৰ্ণের সে শক্তি বা সুর্যোগ আদৌ নাই! কুয়াশা-বাপ্পটুকু ধরিয়া রাখিবার মতো সামর্থ্য যে-ফাৰ্ণের নাই, সেও দীর্ঘজীবী হয়; সেও দল মেলিয়া শোভা-মাধুরীতে ভরিয়া ওঠে। ইহার কারণ, ফাৰ্ণের পাতায় শিরার মতো যে-রেখা দেখা যায়, বায়ু হইতে বাষ্প সংগ্রহ করিয়া সেই রেখাই ফাৰ্ণকে সরস ও জীবন্ত রাখে।

সব-চেয়ে বড় আকারের যে-ফাৰ্ণ, তার নাম *Cyathea* ceae। পোর্টোরিকো, হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জ ভিন্ন আর কোথাও এ ফাৰ্ণ



লতানে ফাৰ্ণে বোনা প্যাটারি (শ্রাম দেশ)

বড় বড় ফাৰ্ণ জন্মায়। অষ্ট্ৰেলিয়ানরা এ-জাতের ফাৰ্ণকে বলে ফাৰ্ণ-গাছ (Fern trees)।

ইংলণ্ডের বোটানিক্যাল উদ্যানে ফাৰ্ণের লালন-সম্বন্ধে বিশেষ সূব্যবস্থা আছে। দেশ-বিদেশে হইতে সেখানে প্রায়

দু' হাজার বিভিন্ন

জাতের ফাৰ্ণ

আনিয়া সেই সব

ফাৰ্ণকে লালন ও

রক্ষা করিবার

জন্ত কোনো টিকে

কাচের, কোনো-

টিকে বা তৃণ-খচিত

ঘরে রাখা হই-

য়াছে। ফাৰ্ণের

ধাত বুদ্ধি য়া

কোনো ঘরে তাপ

রাখা হইতেছে

৪৫ ডিগ্রী, কোনো

ঘরে ৫০, কোনো

ঘরে ৬০, আবার

কোনো ঘরে বা

৭৫ ডিগ্রী। রক্ষা-

কল্পে এসব ফাৰ্ণের

আদি-জন্ম-ভূমির

জল-বাতাসের

অসুস্থরূপ জল-

বাতাসের ব্যবস্থা

করিতে হইয়াছে। যে-ফাৰ্ণ রক্ষ পাছাডের গায়ে জন্মায়,

সে-ফাৰ্ণকে পাথরে-রচা নকল পাছাড়ে রাখা হইয়াছে ;

যে-ফাৰ্ণ নিৰ্ব্বাৰ-শৈবালে জন্মায়, তাকে রাখা হইয়াছে

নকল বৰ্ণার শৈবাল-শয়নে ! আবার যে-সব ফাৰ্ণ ছায়ায়

বাঁচে, তাদের রাখা হইয়াছে বিশেষভাবে তৈয়ারী

ছায়ামিষ্ট ঘরে।

এখানকার শিবপুরের বোটানিক্যাল উদ্যানেও ফাৰ্ণের

কুঞ্জ-গৃহটি দেখিবার মতো।

প্রাচীন যুগে এই সব ফাৰ্ণ নানা ব্যাধিতে ওষধি

লতারূপে ব্যবহার করা হইত। ফাৰ্ণের পাতা হইতে

প্রাচীন মিশরে, গ্রীসে এবং আমেরিকায় বিবিধ পানীয়

রচিত হইত। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসী-

সমাজে ক' রকমের ফাৰ্ণ এখনো মিষ্ট রসের সৃষ্টিকল্পে



গাছ-ফাৰ্ণ—অষ্ট্ৰেলিয়া

প্রচুর ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। হাওয়াই দ্বীপে বৃক্ষ-ফাৰ্ণে

গোঁড় জন্মায়। সেখানকার অধিবাসীরা আলুর মতো এ গোঁড়

খায়। গাছ-ফাৰ্ণে টেলিগ্রাফ-পোষ্টের কাজ চলিতেছে।

খুব দীর্ঘজীবী এবং মজবুত বলিয়া এ-সব ফাৰ্ণ-পোষ্ট সম্বন্ধে

হুঁচিস্তার কোনো কারণ থাকে না।

যবদ্বীপে সুদীর্ঘ যে ফাৰ্ণ-গাছ জন্মায়, সে গাছ কাটিয়া

তাহাতে সিগার-কেশ ও টুপি তৈয়ারী হয় ; শ্বাম-প্রদেশে

গাছ-ফাৰ্ণের ছাল ও লতানে ফাৰ্ণ দিয়া ঝুড়ি-প্যাটারি তৈয়ারী

হয়। এ সব প্যাটারি-ঝুড়িতে তারা নানা রকমের নান্নার কাজ

করে। পাশ্চাত্য সৌখীন-সমাজে সে সব চূপড়ি-ঝুড়ির আদরের সীমা নাই!

ঘর সাজাইবার জন্ত তিন রকম ফাৰ্ণের আদর সবচেয়ে বেশী। এক রকমের ফাৰ্ণ ১। ক্রীশ্মাস বা বড়দিন ফাৰ্ণ; ২। কমন-উড-ফাৰ্ণ বা সাধারণ গাছ-ফাৰ্ণ; এবং ৩। সিনামন বা দালচিনি ফাৰ্ণ। যাঁরা ফুলের ব্যবসা করেন, তাঁদের কাছে এ তিন রকম ফাৰ্ণের প্রয়োজন খুব বেশী। তার কারণ, বোকে তোড়া বা বটনহোল রচিবার সময় এই তিন রকমের ফাৰ্ণ দিয়াই তাঁরা তোড়া, বটনহোল ও বোকে বাঁধেন। এ তিন রকমের ফাৰ্ণ রেশমী-সূতার মতো বেশ মিহি; এবং এ-সব ফাৰ্ণের গায়ে ফুলের বাহার খোলে চমৎকার! এ তিন জাতের ফাৰ্ণ প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায়।

ফাৰ্ণের একটি বিশেষ গুণ—সে ম র গ-জ য়ী। ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, রৌদ্র-তাপে বা আঘাতে ফাৰ্ণ মরিতে জানে না!

অনেকের ফাৰ্ণ-প্ৰীতি

এত বেশী যে, তাঁরা ফাৰ্ণ জমান। জমাইবার জন্ত ফাৰ্ণ আনিয়া তাকে পুঁতিতে হইবে, এমন বিধি নাই। ফাৰ্ণ আনিয়া ডুয়ারের মধ্যে রাখিয়া দিন, বইয়ের পাতায় শুঁজিয়া রাখুন,—দশ বৎসর, বিশ বৎসর, চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরেও সে-পাতার বর্ণ জলিয়া যাইবে না; জীর্ণ হইয়া সে-পাতা চূর্ণ হইবে না। ফাৰ্ণের এই যে জ্ঞান, এমন জ্ঞান উত্তর-রাজ্যে আর কোনো গাছপালার নাই!

এবার আমরা কয়েকটি বিশেষ-জাতের ফাৰ্ণের পরিচয় দিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

১। র্যাটল্-সাপ (Rattle-snake) ফাৰ্ণ! এ-ফাৰ্ণ দেখিতে ফুলস্ত-গাছের মতো। উত্তর-আমেরিকায় এ-ফাৰ্ণ অজস্র ভাবে জন্মায়। এ-ফাৰ্ণে মঞ্জরীর উদ্ভব হয়। তখন চেহারা হয় দেখিতে সাপের মতো। মঞ্জরীর



কানন-পথে সাধারণ ফাৰ্ণ

বর্ণ কাল্চে-হরিদ্রা—সেগুলি দেখিতে আধার-পুটের মতো। এ-পুটের মধ্যে গন্ধক-বস্তুর গুটি বা দানা থাকে।

২। সর্প-জিহ্বা ফাৰ্ণ (Adder's Tongue)! এ ফাৰ্ণের পাতা দেখিতে অনেকটা আলুর পাতার মতো। জন্ম উত্তর-আমেরিকায়।

৩। ইন্টারাপ্‌টেড্ ফাৰ্ণ।—জন্ম এশিয়ায় এবং আমেরিকায়।

- ৪। কিশোরীর কেশ (Maiden-hair)। এ ফার্ণের জন্ম মেক্সিকোয় এবং এশিয়ায়। এ ফার্ণের পাতায় রঙের বাহার খুব নমন-বিমোহন।
- ৫। কমন-উড ফার্ণ। বোকে বা বটনহোল্ রচিতে এ ফার্ণের ব্যবহার প্রশস্ত। জন্ম উত্তর-আমেরিকায় এবং এশিয়ায়।
- ৬। ক্রীশ্‌মাস ফার্ণ! অপর নাম Dagger fern বা ছোরাছুরি-ফার্ণ। সকল দেশেই অজস্রভাবে
- ৭। Sensitive বা লজ্জাবতী লতা।
- ৮। চলন্ত বা walking fern! এ ফার্ণের বিশেষত্ব—ইহার পাতার ডগায় মূল গজায়। সেই মূল হইতে আবার নূতন ফার্ণের সৃষ্টি হয়। এ-ফার্ণের পাতা চির-সবুজ। জরাজীর্ণ হইলেও পাতার সে সবুজশ্রী কখনো লোপ পায় না।

নারী-প্রশস্তি

তোমারে হেরেছি শরৎ-প্রভাতে
শুভ্র শেফালি-ফুলের মত।
চরণে ধ্বনিত মধু নুপুর
নয়ন ছ'খানি সরমে নত।

অতনু-বিজয়ী তনু দেহ-লতা,
নিশীথ-নিবিড় কেশের রাশি।
রূপের মাঝারে অরূপ-প্রতিমা—
ভুবন-ভুলানো মধুর হাসি।

অন্তঃসলিলা শুনেছি ফস্ক—
তুমি কি তাহার মুরতি নব ?
অথবা বিভূতি-ভূষিত-বহি
না জানি কেমন স্বরূপ তব।

সৃষ্টির আদি প্রভাত হইতে
বন্দনা তব গেয়েছে কবি।
পূজেছে প্রেমিক প্রণয়-কুম্ভমে
শিল্পী এঁকেছে তোমার ছবি।

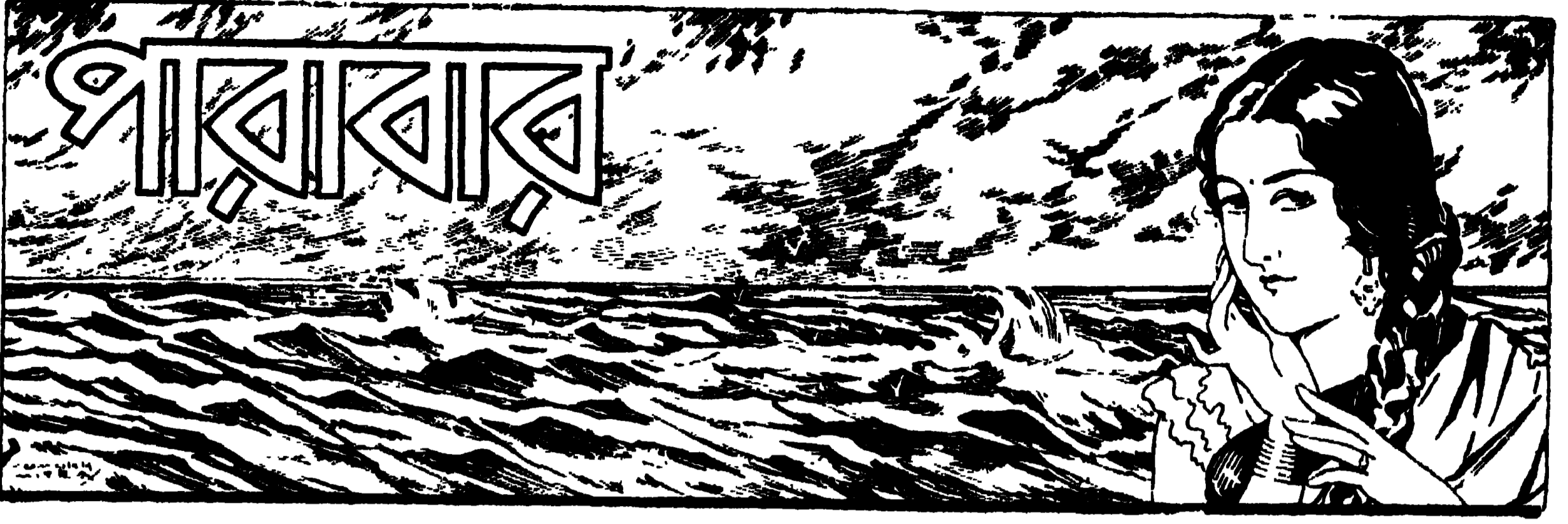
গৃহে গৃহে তুমি 'যশোদা'-জননী
'গোপাল'-শিশুরে লইয়া কোলে
কোথাও শাসিছ, কোথাও হাসিছ,
রোষ-ভরে,—কভু কৌতুহলে!

ইন্দ্ৰিতে তব লভিয়া প্রেরণা
না জানি সে কোন্ সন্মোহনে
বিহ্ব্যতে নর বাঁধিবারে চায়—
যদিও বজ্র নিষেধ হানে।

কর্ণযোগের কঠোর সাধন,
তুমি যে সেথায় দীক্ষা-গুরু!
তব করুণার কম বারি-পাতে
ফলপ্রসূ কত সাহারা-মরু

হাসিয়া, শাসিয়া যে-ভালোবাসিয়া
প্রেমের অমরা সৃজিছ তুমি,
বর্ণনাভীত সে-কাহিনী, তাই
আনত শীর্ষে তোমারে নমি।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)।



(উপন্যাস)

১৮

বীণার হাসি-খুশী কোথায় ভাসিয়া গেল...

তবু তাকে হাসিতে হইল, কথা কহিতে হইল। কিন্তু সে হাসি, সে কথার সঙ্গে প্রাণের যোগ রহিল না। অক্ষয় অভিনেতা যেমন নাটকের কথা মুখস্থ করিয়া গ্রামোফোন-রেকর্ডের মতো সে-কথা উদ্গীরণ করিয়া যায়, বীণার এ কথা, এ হাসি ঠিক সেই রেকর্ডের মতো প্রাণহীন।

কিরণ বলিল,—তোমার কি হলো সলিল? হাসছো, কথা কহছো...কিন্তু যেন আর-এক মানুষ!

বীণার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বলিল,—মাথাটা হঠাৎ কেমন ধরে উঠলো...

প্রতিমা ও নন্দরাণীর মা কাছে বসিয়া খাওয়াইতে-ছিলেন; বীণার এ কথা প্রতিমার কানে গেল। তিনি বলিলেন,—মাথা ধরেছে?

অপ্রতিভ কণ্ঠে কোনো মতে বীণা বলিল,—একটু...

প্রতিমা বলিলেন,—এখনো সম্পূর্ণ সারতে পারোনি মা! তা এক কাজ করো, খাও—খেয়ে তিন জনে একটু পায়চারি করো। বাতাসে মাথা-ধরা সেরে যাবে। তা ছাড়া সন্ধ্যা হলো, আমরা এখনি ফিরবো।

বীণা উঠিতে চায় না! মনের মধ্যে যেন অন্ধকারের বস্তু বহিয়া চলিয়াছে! সে অন্ধকারে ছায়া-মূর্তির মতো কত দৈত্য, কত প্রেত হুঙ্কার করিতেছে! তারা যেন বলিতেছে, একবার যখন আমাদের খর্পরে পড়িয়াছ, পড়িয়া আমাদের গণ্ডীতে পা দিয়াছ, তখন কত দুর্ভোগ সহিতে হইবে, তার কি আর হিসাব আছে!

বীণা ভাবিতেছিল, ইহার চেয়ে কাশীতে বেশ

ছিল! কেন যে এমন সাধ হইয়াছিল...এমন অদ্ভুত খেয়াল...

সেই শ্রীপতি কলিকাতায় আসিয়া উঠিয়াছে! নিশ্চয় তাহারি সন্ধানে! বীণা জানে, শ্রীপতি কেমন লোক! গল্পে-উপন্যাসে পড়িয়াছে villain! আগে ভাবিত, মানুষ না কি এমন কখনো হয়? ও-সব মিথ্যা কল্পনা! লেখক-দের বাড়াবাড়ি করা স্বভাব, তাই এমন সব লোকের কথা তাঁরা গল্পে লেখেন! কিন্তু শ্রীপতি...আগাগোড়া যে ভাবে বিব্রত করিয়া আসিতেছে, গল্প-উপন্যাসের কোনো villain তার সিকির-সিকি করিতে জানে না!

কিরণ বলিল,—সলিল! কিছু খেলে না মা...

নন্দরাণী বলিল,—আইস-ক্রীমটা খাও তাই...

বীণা বলিল,—সত্যি, পারছি না...

প্রতিমা বলিল,—না খেতে চায়, ওকে জেদ করো না মা। সত্যি, মাথা ধরলে এক-এক জনের শরীরের যে-অবস্থা হয়, আমি নিজে ঐ-দলের...জানি তো!

তিন জনে উঠিল। কিরণ বলিল,—কোন দিকে যাবে? বাইরের দিকে?

বীণা শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—না, না...ও-দিকে ভারী ভিড়...তার চেয়ে এ-দিকে...ঐ সব গাছপালা...

—বেশ...

তিন জনে ঘুরিতে বাহির হইল। নন্দরাণী বলিল—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হবার আগে কলিকাতার লোক কোথায় গিয়ে নিশ্বাস ফেলতো, সত্যি তাই, মাঝে মাঝে আমি সে-কথা ভাবি।

কিরণ বলিল,—বাবা বলেন, তোদের কলিকাতা

তো চমৎকার হয়েছে রে...আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতা যা ছিল...গড়ের মাঠ ছাড়া এমন একটু জায়গা ছিল না যেখানে গিয়ে মানুষ হাঁক ছাড়তে পারে। এখন তোদের আমলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেক, ষ্ট্রাণ্ড! বাবা বলেন, তখনকার ইডেন গার্ডেনে ব্যাণ্ড-ষ্ট্রাণ্ডের সামনে ধুতি-চাদর পরে যাওয়া বারণ ছিল! কত দিকে কত বিধি-নিষেধ যে ছিল ওদের ছেলেবেলায়! বাবার কাছে সে-কালের কলকাতার গল্প শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাই! ভাবি, আমাদের এ কলকাতা...সে-কলকাতা বাঙালীর কাছে ছিল যেন সাউথ-আফ্রিকার কেনিয়া। গোরার পথে বেরুলে বাঙালী-ভদ্রলোক তাদের কাছ থেকে দেড়শো হাত দূরে সরে যেতো...পাছে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়!

হাসিয়া নন্দরাণী বলিল—সত্যি?

কিরণ বলিল—বাবার কাছে শুনি। বাবাকে মাঝে-মাঝে আমরা ধরি, ধরে বলি, তোমাদের সে-কালের কলকাতার রূপকথা বলো বাবা...বাবা বলেন।

এ-কথায় বীণার মন নাই। তার মন ভরিয়া শ্রীপতি সেই ছাপি-বয়ের কাঠি-চোষা মূর্তি লইয়া বসিয়া আছে। সে মনে আর কোনো-কিছু প্রবেশ করিবে, তার ঠাই নাই!

ফিরিবার সময় কাঁটা হইয়া বীণা চলিল সকলের পিছনে। সকলের আড়ালে নিজেকে রাখিয়া বাহিরে আসিল। বাগান, দীঘি, গাড়ী-ঘোড়া, মানুষ-জন ছাড়িয়া ছুই চোখের দৃষ্টি গাছতলায় সেই সাপের সন্ধানে আকুল, অধীর!...ঐ সে গাছ-তলা...ও গাছ-তলায় ঐ সে-বেঞ্চ ..

কিন্তু বেঞ্চ সে নাই!...মনের উপর দিয়া যেন এক-ঝলক বসন্ত-বাতাস বহিয়া গেল।

এবার গাড়ীতে উঠিবার পালা...তার পূর্বে নূতন-সখিহের আবেগ-শ্রীতির কত দীর্ঘশ্বাস যে বিকীর্ণ হইল!

নন্দরাণী বলিল,—এক দিন এসো ভাই আমাদের বাড়ী বেড়াতে...

মুখে শুক হাসি...বীণা বলিল,—যাবো।

কিরণ বলিল—যাবে কি! আগে বিয়ে হোক...

নন্দরাণী বলিল—কেন, এখন যেতে দোষ আছে?

কিরণ বলিল—দোষ নেই। কিন্তু বিয়ে যদি না হয়, ভাব করে শেষে তোমার অভাবে পস্তাবো না কি? কি বলো ভাই সলিল?

নন্দরাণী কোনো কথা কহিল না...সরমের রক্ত-রাগে তার মুখ একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল।

প্রতিমা বলিলেন—ওকে ছেড়ে দে কিরণ। রাত হয়ে যাচ্ছে...

কিরণ বলিল—সেই তো দু'দিন বাদে বাড়ীতে নিয়ে যাবে মা...তার চেয়ে আমি বলি, আজই নিয়ে চলো না কেন!

প্রতিমা বলিলেন,—দিন-ক্ষণ দেখে নিয়ে যেতে হয় রে!

কিরণ বলিল—ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্ত আবার দিনক্ষণ দেখবে কি!...লক্ষ্মীর জন্ত সব সময়ে ঘরের দোর খোলা থাকবে।

নন্দরাণীর মা বলিলেন—লক্ষ্মীপূজাও সব-বারে হয় না মা। লক্ষ্মীপূজার জন্ত আলাদা তিথি-বার ঠিক আছে।

কিরণ বলিল,—আমরা এ-লক্ষ্মীকে জল-চৌকির উপর কলার পেটোয় বসিয়ে ধান দিয়ে পূজা করবো না তো!

নন্দরাণীর মা বলিলেন—দু'দিন সবুর করো মা...ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের ঘরে ও যেন লক্ষ্মী হয়ে কলার পেটোটুকুতেই বসতে পায়...

প্রতিমা বলিল—আয় কিরণ, আর দেরী করিস নে...

কিরণ বলিল—আসি ভাই বৌদি। কত দোষ-ক্রটি করেছি, সে-সব ক্ষমা করো...বুঝলে?

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল—আমার দোষ-ক্রটিও তুমি ক্ষমা করো .

বীণা কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! ভয়ে সে কাঁটা হইয়া আছে! এখানে দাঁড়াইয়া এ-সব কথাবার্তা তার ভালো লাগিতেছিল না! গাড়ীতে বসিয়া নিজেকে নিরাপদ করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়! শ্রীপতি যদি কাছাকাছি কোথাও থাকে?...হঠাৎ যদি আবার এখানে আসিয়া পড়ে?...

প্রতিক্রম এই চিন্তা! এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে রোমাঞ্চ...

কিরণ তাকে ছোট একটা ধাক্কা দিল, দিয়া বলিল—
তুমি মীরব হয়ে রইলে যে সলিল ! বৌদির সঙ্গে বিদায়-
সম্ভাষণ করো। না হ'লে বাড়ী গিয়ে বৌদি ঠিক বলবে,
সলিলা মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়নি !

সপ্রতিভ হইয়া বীণা চাহিল নন্দরাণীর দিকে। যুহু
কর্ণে কহিল,—আসি ভাই...

—আমিও আসি...

প্রতিমা আবার তাড়া দিল, বলিল—আয় রে
কিরণ...সলিলার মাথা ধরেছে, শুনছিস্ ! তা'ছাড়া গুঁদেরো
রাত হয়ে যাচ্ছে, আজকের মতো ছেড়ে দে ! যাস বরং
এক দিন ক'জনে মিলে লেকে কিছা বায়োস্কোপ দেখতে,
কিছা শিবপুরের বাগানে...তখন প্রাণ খুলে আলাপ
করিস !

কিরণ বলিল—সত্যি ?

প্রতিমা বলিল—হ্যাঁ।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিগলিত হইয়া কিরণ বলিল—
হ্যাঁ মা, সে বেশ হবে। সে-দিন দাদাকেও বরং সঙ্গে
নেবো...আমাদের গাইড হবে। তাহ'লে নাঃ, সত্যি
এবার আসি, ভাই বৌদি...

ও-বাড়ীতে বিবাহের কথাবার্তা দিনে দিনে পুঞ্জিত
ঘনীভূত হইয়া অবশেষে এক দিন পাকা হইয়া উঠিল।
এবং বিবাহের আয়োজন শুরু হইয়া গেল।

সে আয়োজনের চেউ আসিয়া তারাচরণের গৃহকে
রীতিমত আঘাত করিল। তারাচরণ রায়কে নানা
পরামর্শের জন্ত ও-বাড়ীতে ছুটিতে হয়। হিরণ্য, প্রতিমা,
কিরণ—তারাও এ-বাড়ীতে নিত্যক্ষণ ছুটিয়া আসে।

কিরণ আসিয়া সলিলাকে ধরে, বলে—এসো ভাই,
দাদাকে নিয়ে জু'তে যাবার ব্যবস্থা করেছি। একটা মস্ত
চক্রান্ত করেছি...যাকে বলে, রীতিমত প্লট।

এ-বাড়ীর এই হাসি-কলরবের মধ্যে ডুব দিয়া
বীণা তার মনের আশঙ্কা ও সংশয় ধুইয়া-মুছিয়া সাফ
করিতে চায়।

বীণা বলিল—কি প্লট, শুনি ?

কিরণ বলিল—কারো কাছে বলবে না, বলো ?
যুগাক্ষরে এতটুকু ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নয় ?

বীণার মন কোঁতুহলে ভরিয়া ওঠে। বীণা বলে—
সত্যি বলবো না...

কিরণ বলিল—ও-দিকে বৌদিকে টেলিফোন করেছি,
তোমার জন্ত বড্ড মন কেমন করছে ভাই, তোমাকে ভারী
দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে...তা আসবে একবার জুয়ে ? আমি
যাবো...সলিলাকে নিয়ে যাবো। বৌদি বলেছে, আচ্ছা।

কিরণ হাসিল।

বীণা বলিল—তার পর ?

কিরণ বলিল—দাদা তো আমার এ ব্যবস্থার কথা
জানে না—দাদাকে বলিনি। দাদাকে শুধু বলেছি,—
চুপচাপ বসে শুধু বৌয়ের মুখ ধ্যান করছো...কাজকর্ম
নেই...চলো দিকিনি আমাদের নিয়ে আলিপুরের
চিড়িয়াখানায়। দাদা বললে,—বেশ, চ।...দাদা জানে
না যে, ও-দিকে বৌদিকে জুয়ে আসতে বলেছি...আবার
বৌদিকেও বলিনি যে, দাদাকে নিয়ে দাদার সঙ্গে আমরা
জুয়ে যাচ্ছি...

বীণা কোনো জবাব দিল না...নিষ্পলক নেত্রে
শুধু কিরণের পানে চাহিয়া রহিল।

মনে হইতেছিল, কি জুখে আছে কিরণ ! শুধু
কিরণ কেন, কিরণের বাড়ীর দাসী-চাকরগুলো পর্য্যন্ত।
নিজের মনে হাসি-গল্প করিতেছে...ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে
...কোনো দিকে বাধা নাট, দ্বিধা নাই, সংশয় নাই,
ভয় নাই ! আর সে...?

এ সংশয়, এ ভয়ের ভার মাঝে মাঝে এমন ভারী
হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসে যে, বীণা ভাবে, আর
পারি না ! ভাবে, তারাচরণের পায়ের উপরে পড়িয়া
কাঁদিয়া সব কথা খুলিয়া বলি...সব অপরাধ স্বীকার
করিয়া তাঁর পায়ের ধরিয়া ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাহিয়া বলি,
আমি সলিলা নই, আমি বীণা ! আমি চোর, আমি ঠক,
আমি বঞ্চক...আমি...আমি...কিন্তু আমাকে তাড়াইয়া
দিয়ে না ! তোমার পায়ের নীচে আমার জন্ত একটু
নিরাপদ আশ্রয় রাখিয়া দিয়ে। পায়ের নীচে সে
আশ্রয়টুকু ছাড়া আরু আমি কিছু চাই না...কিছু না...
তোমার ধন, তোমার দৌলত, তোমার শাড়ী-সেমিজ,
গাড়ী...মেহও আমি চাই না ! এ-সব চাহিবার দাবী
আমার নাই ! এ-সবের লোভও কখনো করিব না !...

তার বিরহ মুখ, বাকহীন মূর্তি দেখিয়া তারাচরণ
তাকে বুকে টানিয়া লন, বলেন—মুখ এমন মলিন কেন
দিদি ? অসুখ করেনি তো ?

কল্পিত কর্তে বীণা জবাব দেয়—না...

—তবে ?

বীণার চুই চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। তারাচরণের
পানে সে চাহিয়া থাকে। মুখে কথা নাই...মনের দ্বারে
সেই শ্রীপতি আসিয়া দাঁড়ায়...মাঠের ধারে বেঞ্চে
বসিয়া ছাপি বয়ের কাঠি চুষিতেছে।

এখানে কোনোমতে হয় তো মনকে সে ঠিক করিয়া
লইতে পারিত...কিন্তু কোথা হইতে যে লক্ষ্মীছাড়া
শ্রীপতিটা দুই গ্রহের মতো তার পিছনে আসিয়া
উদয় হইল !

১৯

মনের উপর রৌদ্র-মেঘের বিরাম রহিল না ! এবং এই
রৌদ্র-মেঘের অবিরাম ছন্দের মধ্য দিয়া এক দিন কিরণ
আসিয়া সলিলাকে বলিল,—দাদার আজ পাকা-দেখা,
সলিলা। সাত দিন পরে বিয়ে।

সলিলা শুনিল, কোনো কথা বলিল না।

কিরণ বলিল,—আমি তোমাকে নিতে এসেছি।
দাছুর অমুমতি নিয়ে তবে এসেছি...

সলিলার বুকে মৃদু একটু কাঁপন ! ও-বাড়ীর বিবাহ...
তার মানে, প্রচণ্ড ভিড়...কত-রকমের কত লোক কত
দিক হইতে আসিয়া জমবে !

ভিড়ের নামে সলিলার ভয় এখন এত বেশী বাড়িয়া
উঠিয়াছে...

ছ'দিন কাটিয়া বিবাহের দিন আসিয়া দেখা দিল।

সকালের দিকে বীণা চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া-
ছিল। কিরণ ভালোবাসে, প্রতিমা ভালোবাসে, ও-বাড়ীতে
তার কত আদর, বীণা বোঝে। বুঝিলে কি হইবে ?
ও-বাড়ীতে লোকের ভিড়...সে যেন ভয়ে আকুল হইয়া
আছে ! কে হয় তো এমন লোক আসিয়া উপস্থিত
হইবে, বীণাকে দেখিয়া বলিয়া বসিবে, ওমা, তুমি না
কাশীতে থাকিতে—সেই কীরোদাময়ীর বাড়ীতে ?

এমন ঘটে নাই ! এমন ঘটিতে পারে না বলিয়া কাশীর
কথা এত দিন সে কল্পনাও করে নাই ! কিন্তু সে-দিন
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে শ্রীপতিকে দেখিয়া
অবশি এ ভয় মনকে এমন করিয়া তুলিয়াছে যে,
এক দিনের জন্ত সে স্থস্থির হইতে পারে না !

দাক্ষায়ণী আসিয়া ডাকিলেন,—সলিলা...

সলিলা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কেন পিশিমা ?

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—ওমা, এখনো চুপচাপ বসে
আছো ! ওরা সব তৈরী হয়েছে। মামাবাবু বললেন,
এক সঙ্গে তোমরা তিন জনে ও-বাড়ীতে যাবে...

কুণ্ঠিত স্বরে বীণা বলিল—আমি জানতুম না
পিশিমা...

মুখ ঝাঁকিয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন,—এর আবার
জানান দিতে হবে না কি ! কি যে ভাবো, বুঝিয়ে বাছো !
তা, ই্যা আমি এসেছিলুম তোমার বৌদির বেনারসী-শাড়ী-
খানা ময়লা হয়ে গেছে...আমি দেখিনি তাই কাচানো
হয়নি। যেটি না দেখবো, সেটির আর কিছু হবে না ! হ'ঃ!
ই্যা, তা ভালো কথা, তোমার একখানা বেনারসী ওকে
দাও. বুঝলে ! না হলে ঐ ময়লা শাড়ী পরে গেলে
এ-বাড়ীর মান থাকবে না !

বীণা বলিল,—আমি বার করছি পিশিমা, যেখানা
পছন্দ হয়...

দাক্ষায়ণী বলিলেন—যে পরবে, তাকেই বরং ডেকে
দি। তোমরা হচ্ছেো বাড়ীর মেয়ে—তোমরা সাদাসিধে
শাড়ী পরে গেলে ক্ষতি হবে না...কিন্তু ও বৌ-মানুষ
কি না, তাই, মানে,...

দাক্ষায়ণী গেলেন বৌমাকে ডাকিতে ; বীণা তার
দেওয়াজ খুলিল।

বৌমার পছন্দ ভালো...দেখিয়া-শুনিয়া সন্ত-কেনা
দেড়শে টাকা দামের পেঁয়াজী রঙের বেনারসী
পছন্দ করিল। বীণা বলিল,—বেশ, এটাই নাও
বৌদি...

বৌদি বলিল,—কিন্তু ব্লাউশ্ ? তোমার জামা কি
আমার গায়ে হবে ছোট-ঠাকুরঝি ?

বীণা বলিল,—গায়ে দিয়ে ছাখো...

গোটা দেবাজটা বৌদির চার্জে দিয়া বীণা সরিয়া দাড়াইল।

বৌদি বলিল,—তুমি কিন্তু শীগ্গির নাও ভাই! আর কত দেবী করবে?

বীণা একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে কি সাধ করিয়া দেবী করিতেছে? কিরণ অত ভালোবাসে...তারো মন পড়িয়া আছে সেই কিরণের কাছে! প্রতিক্ষণে মন বলিতেছে, ছুটিয়া যাই, চলো! কিন্তু পা সরিতে চাহিতেছে না! কেন সরিতেছে না, তা যদি কাহাকেও আজ খুলিয়া বলিতে পারিত! হয় রে, তা পারে না, পারে না, পারে না...

তারচরণ রায় আসিলেন, বলিলেন—শুনছো সলিলা-দিদিমণি ..

বীণা বলিল,—দাছ...

তারচরণ বলিলেন,—কি হচ্ছে তোমাদের? তিন জনে মিলে শাড়ীর দোকান খুলে বসেছো...

বিরজা তাড়াতাড়ি বলিল,—বৌদিকে একখানা ভালো শাড়ী বেছে দিচ্ছে কি না...বললে, তিন জনে এক সঙ্গে যাচ্ছি এক-বাড়ী থেকে...

কথাটা শুনিয়া বীণা চমকিয়া উঠিল। এ-কথার অর্থ? বীণা যেন যাচিয়া ডাকিয়া আনিয়া শাড়ী দিতেছে—বিরজা এ কথা কেন বলিল?

কিন্তু তারচরণ এ-কথায় যেমন খুশী হইলেন, তেমনি তাঁর মনের কোণে একটু বিরক্তি না ধরিল, এমন নয়! বীণার এতখানি বিবেচনা...পরের জন্ত এমন ত্যাগ-স্বীকার! সে জন্ত বীণার উপর খুশী হইলেন। বিরক্তির কারণ, বীণা ভালো, মুখে কথা নাই, তাই তার দেবাজ খুলিয়া ভালো শাড়ী-জামাগুলো তখন চ করিয়া দিবার কি ইহাদের প্রয়োজন ছিল?

তারচরণ রায় বলিলেন,—শীগ্গির করে নাও সব। ও-বাড়ী থেকে ছ'বার তাগিদ এসেছিল...এখনি না গেলে দুর্জয়ময়ীর বেশে কিরণময়ী এসে যে বাক্যবাণ ছুড়বে... কিরণকে জানো তো দিদি...

বীণা জানে, বীণাকে কিরণ কতখানি ভালোবাসে...

বীণা বলিল,—আমি এখনি তৈরী হয়ে নেবো দাছ .

তারচরণ রায় বলিলেন,—হ্যা, নাও।...কি পরে তুমি যাচ্ছে...আমাকে সে-সাজ দেখিয়ে। তাড়াতাড়ি চলে য়ো না, বুঝলে দিদি...

তার পর তিনি চাহিলেন বিরজার পানে; বলিলেন,—সলিলা গা ধুতে যাক। তোরা দু'জনে ততক্ষণে ওর জামা-কাপড়গুলো দেবাজে তোলু...আমি দেখি।

বিরজা প্রমাদ গণিল। বৌদির শাড়ী-জামা বাছিতে আসিয়া সেই অবসরে সেও একখানা শাড়ী বাছিয়া লইয়াছে...মিজের শাড়ীর চেয়ে এ শাড়ী দামী; তার উপর কাজের বাড়ীতে কে জামে, সকড়ি লাগিতে পারে, কত বিপ্রাট ঘটিতে পারে! শাড়ী যদি নষ্ট হইয়া যায়? তার চেয়ে যদি কিছু ঘটে, বীণার শাড়ীর উপর দিয়াই ঘটয়া যাক!

ইহা ভাবিয়া দেবাজ হইতে শাড়ী-জামার স্তুপ বাহির করিয়া ডাঁই করিয়া তুলিয়াছে! এ-সব এমনি রাখিয়া সরিয়া পড়িবে, ভাবিয়াছিল! কোথা হইতে অকস্মাৎ তারচরণ রায় আসিয়া এমন আদেশ দিলেম...একখানি-একখানি করিয়া এ-শাড়ী-জামা তুলিতে প্রাণ যে বাহির হইয়া যাইবে!

কিন্তু উপায় নাই।

এ-দিককার কাজ সারিয়া তিন জনের ও-বাড়ীতে যাইতে আরো আধ-ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তারচরণ রায় দাঁড়াইয়া বীণার বেশভূষা দেখিলেম...এমন বেশ-ভূষায় সাজিলেও বীণার মনে সেই আতঙ্ক...এ-আতঙ্ক এ ক'দিনে তার মনে শিকড় গাড়িয়া ডালপালা মেলিয়া বাড়িয়া এমন কায়েমি ঠাঁই গ্রহণ করিয়াছে...

তার মলিন মুখ দেখিয়া তারচরণ রায়ের মনে আঘাত লাগিল। মনের মধ্যে যেন সপ্তসিদ্ধ উথলিয়া উঠিল! সব কাড়িয়া লইয়া দুঃখী-কাঙালকে ঘরে আনিয়া আজ তিনি মণির আসন পাতিয়া তাহাতে বসাইতে চান! যে-দিন তার সব ছিল...মা...বাপ...

দাক্ষায়ণী আসিয়া বলিলেন,—ব্যাপার কি? এখনো তোমাদের হলো না [ব্রাঙ্ক] ? ও-দিকে বর বেকুবের সময় হয়ে এলো যে! এসো, এসো...

তারাপদ রায়কে দেখিয়া বলিলেন,—মামাবাবু!

তারাপদ রায় বলিলেন—তুইও যাচ্ছিস নাকি দাকে?

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—বৌ অনেক করে বলে' গেছে...
তুমি যাবে না মামাবাবু ?

তারাচরণ রায় বলিলেন—যাবো। তবে বরযাত্রী
যাবো না...হিরণের ওখানে ঘুরে আসবো বৈ কি। তা
তোরা এক সঙ্গেই যা...তোরা ও-বাড়ীতে গিয়ে গাড়ী
পাঠিয়ে দিলে সে-গাড়ীতে আমি যাবো ..

বর-বরযাত্রী বাহির হইয়া গেলে কিরণ বলিল—
তোমার-আমার নেমস্তন্ন হয়েছে সলিলা...

নিমন্ত্রণ !

বীণা কহিল—কোথায় ?

কিরণ বলিল—কনের বাড়ীতে। দাদার শাওড়ী
অনেক করে' মাকে বলে' পাঠিয়েছেন...তা' ছাড়া আরো
একটা জিনিষ দেখাচ্ছি...

বলিয়া কিরণ ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহির
করিয়া আনিল। কহিল—পড়ে চাখো...

বীণা চিঠি পড়িল।

এ চিঠি নন্দরাণী লিখিয়াছে...বিবাহের বধু নিজে।

নন্দরাণী লিখিয়াছে—

প্রিয়তমাসু

ভাই কিরণময়ী

লক্ষী ভাই, তোমার সঙ্গে আজ থেকে যে-সম্পর্কই
হোক, তুমি আমার বন্ধু। আগে থেকেই আমা-
দের এ বন্ধুত্ব হয়েছে। শুধু তুমি কেন, সলিলাও
আমার বন্ধু। আমার বিয়েতে আমার ইচ্ছা, তোমরা
দুই বন্ধুতে এখানে আসবে। তাই তোমাদের দুই বন্ধুকে
আজকের এ-রাত্রি বিশেষ করে নেমস্তন্ন করছি। নিজে
নেমস্তন্ন করে আসবো, সে উপায় হবার জো নেই!
শুধু সেই কারণে যেতে পারলুম না। চিঠি পাঠিয়ে
নেমস্তন্ন করছি। এ-চিঠিতে মনের কতখানি আগ্রহ
ভালোবাসা পাঠাচ্ছি, যদি বুঝতে পারো, আমার

বিশ্বাস, তাহ'লে তোমরা দু'জনে নিশ্চয় আসবে—কোনো
বাধাকে বাধা বলে' মানবে না।

তুমি আর সলিলা আমার সত্যিকারের ভালোবাসা
মিষ্ণো ভাই।

তোমাদের আদর-ভালোবাসার
নন্দরাণী।

চিঠি পড়িয়া বীণা কিরণের পামে চাহিল।

কিরণ বলিল—যাবে তো ? এমন করে লিখেছে !
না যাওয়া ভালো দেখায় না।

বীণা কোনো জবাব দিল না।

কিরণ বলিল—মাকে এ চিঠি দেখিয়েছি। চিঠি দেখে
মা বলেছে,—যা !...তোমার যাওয়া ? দাঁহু দোতলায়
আছেন...মা'র সঙ্গে কথা কইছেন। এ-চিঠি দেখিয়ে
এখনি আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে আসছি...

অনুমতি আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তারাচরণ রায়
আসিলেন, প্রতিমা আসিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—চমৎকার মেয়েটি...
বুঝলে মা ! এই যে চিঠি লিখে এদের দু'জনকে
নেমস্তন্ন করেছে, এ থেকে বুঝছি, মেয়েটি সত্যি-সত্যি
ঘরের লক্ষী হবার মতো...

প্রতিমা কহিলেন,—ওরা যাবে কাকা বাবু ? পাঁচ
জনে যদি কিছু বলে যে, মেয়েরা বরযাত্রী এসেছে ?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—স্নেহকে কখনো অস্বীকার
করো না মা। স্নেহের ব্যাপারে পাঁচ জনের কথা গ্রাহ্য
করতে নেই। নিজের জীবন দিয়ে আমি সে-শিক্ষা
পেয়েছি ! স্নেহের চেয়ে বড় সম্বল মানুষের জগতে আর
কিছু নেই ! ওরা যাবে...নিশ্চয় যাবে। এর জন্ত যদি
কেউ কিছু বলে, তাতে কাণ দিয়ে না, মা।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি-পথে

কালো জলধরে গগনে হেরিলে মনে পড়ে ঘনশ্রাম ;
কৃক কোকিল স্মৃতি-পথে আনে তোমার অন্ত নাম।
নিকব-কৃক ভোরুণা তমাল,
গাছে কালো জাম মধুর রসাল,
শত রূপে শুধু তোমারে প্রকটে, নয়নের অভিরাম।

সব কাজ তুলে, বয়নার কূলে, বসি আনমনে একা ;
কালো জলে বাধা, কালো-প্রোমে বাঁধা, পাই তো তোমার দেখা।
তোমারে নেহারি আঁধি-তার-মাঝে,
আঁধার নিশীথে তব রূপ যাজে,
মধুরিমা-স্তরা কিবা মনোহর অল্পম তব ঠাম।

শ্রীধামিনীমোহন কর (অধ্যাপক)।



আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

রণনীতির পরিবর্তন—

যুরোপীয় যুদ্ধে রণনীতির আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্দনস্থলে ছুরিকাঘাতের প্রয়াস সফল হইবার আশু সম্ভাবনা না দেখিয়া জার্মান সেনানায়কগণ রণনীতির পরিবর্তন সাধনে বাধ্য হইয়াছেন। হিটলার মনে করিয়াছিলেন

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অবহিত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন, তদনুসারে উত্তোগ-আয়োজনও আরম্ভ হইয়াছে।

যুরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র—বিশেষতঃ ফ্রান্সকে আশাতীত অল্পকালের মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া হিটলারের এই আশুপ্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, বৃটেনও অল্পকালের মধ্যে জার্মানীর আঘাতে



বোমা-বর্ষণে বিরাট অগ্নিকাণ্ড

যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের “মাতৃভূমিকে” পর্যুদস্ত করিতে পারিলে সমগ্র সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করা সহজসাধ্য হইবে; বৃটিশ সরকার অল্পকাল স্থানান্তরিত হইলে সাম্রাজ্যের প্রতি ঐ সরকারের কড়ুৎ স্বভাবতঃ শিথিল হইয়া যাইবে। এই জন্ত এত দিন প্রধানতঃ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধেই জার্মানীর সমর-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। বৃটেনের পরাজয় সঙ্ঘটন প্রভূত আশ্বাসসাধ্য হইলেও ইহাই বৃটিশ সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার সংক্ষিপ্ত পন্থা; তাই, এই প্রয়াসের সাফল্যের জন্ত হিটলার যে কোন “মূল্য” প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সমগ্র শব্দকালের প্রাণপণ চেষ্টায় বৃটেন-জয়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই; তাই জার্মান সেনানায়কগণ



লণ্ডনে সেন্ট গাইলে বোমা বর্ষণের পর; এই স্থানে ক্রমণয়েলের বিবাহ হইয়াছিল এবং কবি মিন্টন সমাহিত হইয়াছিলেন—

বোমার আঘাতে মিন্টনের পস্তরমূর্ত্তি ধূলিলুপ্তিত হইয়াছে

পর্যুদস্ত হইবে। বর্তমান যুগের যুদ্ধে বিমান-শক্তির গুরুত্ব সর্বাধিক; অন্তরীক্ষে বাহ্য প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত, সে অজ্ঞেয়। আধুনিক রণবিজ্ঞানের এই মূল সত্য উপলব্ধি করিয়া জার্মান সেনানায়কগণ বৃটেনের বিমান-শক্তি বংশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বৃটেনের সমগ্র সমর-শক্তি বাহাতে মাতৃভূমির রক্ষায় নিয়োজিত হইতে না পারে—বিশেষতঃ বৃটিশ নৌবহর বাহাতে স্থানান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হয়, এই উদ্দেশ্যে হিটলার মধ্য

প্রাচীতে ইটালীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। হিটলারের আশা ছিল—এই ব্যবস্থা অল্পযায়ী যুদ্ধ পরিচালিত হইলে অনতিকালের মধ্যেই বুটেনের আকাশে জার্মানীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তখন কোন শুভ মুহূর্তে ইংলিস্ প্রণালী অতিক্রম করা জার্মান বাহিনীর আর অসাধ্য হইবে না। বুটেনের জনসাধারণ বাহাতে বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ-পরিচালনায় বিরোধিতা করে এবং ইংলিস্ প্রণালীর উত্তর তীরে অবতীর্ণ হইবার পর জার্মান বাহিনীর অভীষ্ট বাহাতে সহজেই সিদ্ধ হয়, তদুদ্দেশ্যে বুটেনের বেসামরিক অঞ্চলেও নির্বিচারে বোমা বর্ষিত হইয়াছে।

হিটলার ও তাঁহার সহযোগীদিগের শব্দকালীন প্রচেষ্টা সফল হয় নাই; অন্তরীক্ষে প্রতিদ্বন্দিতায় বৃটিশ বৈমানিকগণ আশাতীত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, বৃটিশ জনসাধারণের দৃঢ়তাও অতুলনীয়।

রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে,—এই ভাবেই অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বুটেনের অন্তরীক্ষে প্রভূত স্থাপনের প্রয়াস বিফল হওয়ায় জার্মানী এখন মধ্য ও অদূর প্রাচীতে মনোযোগ প্রদান করিতেছে। শীতকালে বুটেনের বিরুদ্ধে অভিযান অসাধ্য হইলেও শীতকালই আফ্রিকা ও এশিয়ার অভিযান পরিচালনের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সময়। বুটেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযান পরিচালনের কল্পনা আপাততঃ পরিত্যক্ত হইলেও বুটেনকে লক্ষ্য করিয়া জার্মানী যে বিরাট সমরায়োজন করিয়াছে, তাহা পরিত্যক্ত হইবে না—নরওয়ের ষ্ট্যাভেঞ্জার হইতে ফ্রান্সের ব্রেষ্ট পর্যন্ত অঞ্চলে জার্মানীর যে “সঙ্গীন” বুটেনের বিরুদ্ধে উদ্ভূত রহিয়াছে, উহা তদবস্থাতেই থাকিবে। বৃটিশ সরকার ও বুটেনের জনসাধারণ বাহাতে স্বস্তির



বিমান হইতে মেনিন্ গান্ চালান হইতেছে

কেহ কেহ মনে করেন যে, জার্মান বৈমানিকগণ বুটেনের বিমানঘাটা ও বিমানের কারখানার প্রতি মনোযোগ প্রদান অপেক্ষা বেসামরিক লক্ষ্যের প্রতি অধিকতর অবহিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদিগের বিফলতার অগতম কারণ। সে বাগ হউক, অন্তরীক্ষে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া জার্মান বৈমানিকগণ সম্প্রতি তাঁহাদিগের আক্রমণ-কৌশল পরিবর্তনে বাধ্য হইয়াছেন; নূতন কৌশলে আক্রমণকালে তাঁহাদিগের অল্পসংখ্যক বিমান বিনষ্ট হইতেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ও বুটেনের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সমান। জার্মানীর বিমান-আক্রমণের নূতন পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, উহার তড়িৎগতি (blitzkrieg)

নিঃস্বাস ফেলিতে না পারেন, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ রক্ষার আয়োজন বাহাতে অপরিবর্তিত রাখিতে হয়, এবং জার্মানীর বিভিন্ন স্থানে বৃটিশ বিমান-আক্রমণের প্রাবল্য বাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তদুদ্দেশ্যে জার্মানী এক দিকে যেমন তাহার সমরায়োজন হ্রাস করিবে না, তেমনই বুটেনের প্রতি তাহার বিমান-আক্রমণও সমান ভাবেই চালাইতে থাকিবে। অনির্দিষ্ট কাল অপ্রশমিত গতিতে বিমান আক্রমণ পরিচালন বাহাতে সম্ভব হয়, তদুদ্দেশ্যেই জার্মান বৈমানিকগণ হয় ত সম্প্রতি আক্রমণ পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়াছেন। জার্মানী আশা করে, এই ভাবে বুটেনের সমরায়োজনের বৃহত্তর অংশ যদি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে

আফ্রিকা ও এশিয়ার অভিযান অল্পকালের মধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

কূটনীতিক তৎপরতা—

জাৰ্মানীর বণ-নীতির পরিবর্তন সাধিত হইবামাত্র প্রকাশে ও যবনিকার অন্তরালে কূটনীতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। হিটলার মুসোলিনির সহিত সাক্ষাৎ করেন; ফ্রান্সের বর্তমান ভাগ্য-নিয়ন্তা মঃ লাভাল ও মার্শাল পিঠের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; স্পেনের সীমান্তে গমন করিয়া জেনারেল ফ্রান্সোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ব্লুকান্ অকলে কূটনীতিক চাকল্যের সৃষ্টি হয়; এথেন্স,

যদি জাৰ্মানী ও ইটালী ফ্রান্সের নৌ ও বিমানবাহর ব্যবহারের অধিকার লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত পশ্চিম এশিয়ার সীরিয়া, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ফ্রান্সের কোন কোন স্থান এবং আফ্রিকার কোন কোন ফরাসী অঞ্চল যদি নাজী ফ্যাসিষ্ট শক্তিবল্য ঘাঁটীকপে ব্যবহারের সুবিধা পায়, তাহা হইলে সহজেই বৃটিশ সাম্রাজ্যে আঘাত করা সম্ভব হইতে পারে। ফ্রান্সের পিঠে-সরকারের পক্ষে সহযোগিতার নামে জাৰ্মানীকে এই সকল সুবিধা প্রদান অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ বৃটেনের অবরোধ ব্যবস্থায় ফ্রান্স বর্তমানে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর মিষ্টার চার্চিল



শত্রুপক্ষের বিমান দৃষ্ট হওয়ায় বৃটিশ গোলন্দাজ সৈন্যের তৎপরতা

আঙ্কারা, বুকারেষ্ট, সোফিয়া প্রভৃতি সর্বত্র রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদিগের গতিবিধি ও গোপন আলোচনা চলিতে থাকে। এই সময় জাৰ্মান সৈন্য রুমানিয়ায় পৌঁছিতে আরম্ভ করে। আফ্রিকায় ইটালীয় বাহিনীর তৎপরতা অপ্রত্যাশিত ভাবে হ্রাস পায়।

হিটলারের কূটনীতিক প্রচেষ্টার ফলাফল অপ্রকাশিত থাকিলেও সে বিষয়ে সঙ্গত অনুমান অসম্ভব নহে। ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা-দিগের সহিত হিটলারের আলোচনা সম্পর্কে মার্শাল পিঠে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা অস্পষ্ট। তিনি জাৰ্মানীর সহিত ফ্রান্সের সহযোগিতার (collaboration) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সহযোগিতা কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা অনুমান-সাপেক্ষ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনের সময়

ফরাসী জাতির নিকট আবেদন জানাইয়া এক বেতার-বক্তৃতা করিয়াছিলেন; সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে আমেরিকাস্থিত ফরাসী দূত মঃ হায় মন্তব্য করেন—If he had said something about the easing of the blockade for the benefit of French women and children that would touch the French people very much. মঃ হায়ের এই উক্তিতে অবরোধ-ব্যবস্থায় ফরাসী জাতির হৃদয়শূন্য এবং বৃটেনের প্রতি ফরাসী জাতির মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। কাজেই বৃটেনের এই অবরোধ-ব্যবস্থা শিথিল হইবার আশায় পিঠে সরকারের পক্ষে জাৰ্মানীর সমর প্রচেষ্টার পরোক্ষে সহযোগিতা করা অসম্ভব নহে।

তাহার পর স্পেন। নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রতি স্পেনের

আন্তর্জাতিক সঙ্কে গত আধুনিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। স্পেন ও তাহার ফ্যাসিষ্ট এক-নায়ক জার্মানী ও ইটালীর প্রভাবাধীন হইলেও এই রাষ্ট্রটি যুদ্ধে লিপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্পেনে সম্প্রতি কোন সামরিক আয়োজন লক্ষিত হয় নাই। স্পেনের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র-গুলিও বৃটিশ-বিরোধী প্রচারকার্যে লিপ্ত হয় নাই। তবে, স্পেন জার্মানীকে কতকগুলি সামরিক সুবিধা প্রদান করিতে পারে—সম্ভবতঃ ফ্রান্স-হিটলার সাক্ষাৎকারে এই সম্পর্কিত ব্যবস্থাই হইয়াছে। স্পেন জার্মান বাহিনীকে জিব্রাল্টরে পৌছিবার সুবিধা দিতে পারে। তবে, তাহাতে স্পেনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইবে, এবং দেশ সমরক্ষেত্রে পরিণত হইবে। কাজেই, জার্মানীকে এই সুবিধা দানে ইতস্ততঃ করা স্পেনের পক্ষে অসম্ভব নহে। তবে স্পেনীয়

হয়, তাহা হইলে পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে স্পেনীয় ও ফরাসী ঘাঁটীগুলি ব্যবহার করিয়া বৃটিশ নৌবহরকে বিপন্ন করা সম্ভব হইতে পারে। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অংশে ওরাণ, আলজেরিয়া, কসিকা, মার্সেলিস্ এবং টুলোয় ফ্রান্সের নৌ ও বিমানঘাঁটা আছে; কার্ডাঙ্কেনায় স্পেনের একটি নৌঘাঁটা আছে; ইটালীর পশ্চিম উপকূলে এবং সাদিনিয়ায় ইটালীর নিজস্ব কতকগুলি নৌ ও বিমান-ঘাঁটা আছে। এই সকল ঘাঁটা ব্যতীত জিব্রাল্টরের অপর পারের সিউটা এবং বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জও যদি ইটালী ও জার্মানী ঘাঁটা স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত



বুটেনের সুরক্ষিত পর্যবেক্ষণ-কক্ষ ;—এই কক্ষ হইতে সমুদ্র-বক্ষে শত্রুর অবস্থানক্ষেত্র লক্ষ্য করা হয় এবং তদনুসারে গোলন্দাজ সৈন্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়

সরকার স্পেনের, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের এবং স্পেনীয় মরক্কোর কোন কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল জার্মানীকে ব্যবহার করিতে দিতে পারেন; তাহার পরিবর্তে জার্মানী হয় ত উত্তর আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত কতক অঞ্চল স্পেনকে প্রদান করিবে। এই ব্যবস্থায় "সাপ মরিবে কিন্তু লাঠি ভাঙিবে না"—জার্মানী ও ইটালী উপকৃত হইবে, কিন্তু স্পেনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

আফ্রিকা ও এশিয়ার বুটেনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম ভূমধ্যসাগরকে নাজী-ফ্যাসিষ্ট হৃদে পরিণত করা প্রয়োজন। স্পেন ও ফ্রান্স যদি এই বিষয়ে জার্মানী ও ইটালীর সহিত সহযোগিতা করে, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অংশে নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য হইবে। স্পেনের আমুক্যল্যে জিব্রাল্টর প্রণালী-পথ বন্ধ করা যদি সম্ভব



দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডের নির্জন উপকূলে শত্রুর জল প্রতীক্ষা

শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে একমাত্র জিব্রাল্টর ব্যতীত বুটেনের আর কোন ঘাঁটা নাই।

পশ্চিম-ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা হইবার পর ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে ফ্রান্সের সহযোগিতায় ইটালী বৃটিশ নৌবাহিনীর অবরোধে সমর্থ হইতে পারে। সিসিলি ও ফরাসী-অধিকৃত টিউনিসের মধ্যবর্তী প্যাটেলেরিয়া দ্বীপটি ইটালীর অধিকারভুক্ত। ইটালী যদি ফরাসী অধিকৃত টিউনিসের উপকূলবর্তী বিজাটার নৌ ও বিমানঘাঁটা ব্যবহারের অধিকার পায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইটালীর দক্ষিণ উপকূল হইতে টিউনিস পর্য্যন্ত হুর্ভেত্ত "প্রাচীর" সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। এই সকল স্থান হইতে বৃটিশ অধিকৃত মাল্টার প্রতি প্রবলতর আক্রমণ চালিত হওয়াও সম্ভব।

তাহার পর পূর্ব-ভূমধ্যসাগর। এই অঞ্চলে উত্তরে গ্রীসের অবস্থানক্ষেত্র সামরিক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; দক্ষিণে মিশরের উপকূলেও প্রভুত্বপ্রয়োগী শক্তির অধিকার বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। এই জল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় একই সময় গ্রীসের সহিত কূটনীতিক আলোচনা এবং মিশরে সামরিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। লিবিয়ার ইটালীয় বাহিনী মিশরের উপকূলে সিদিবারাণি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া উত্তর অঞ্চলের কূটনীতিক প্রচেষ্টার ফলের জল অপেক্ষা করিতেছিল।

ইটালীর গ্রীস্ আক্রমণ—

কূটনীতিক প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রীস্কে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব না হওয়ায় ২৮শে অক্টোবর ইটালী তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। ইটালী গ্রীসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছে যে, গ্রীস্ তাহার সমুদ্রাংশ ও ঘাঁটা বুটেন্কে ব্যবহার করিতে দিয়াছে। এই অভিযোগ যদি সত্য না ও হয়, তাহা হইলেও ইহা যে কোন সময় সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল। গ্রীস্ বুটেনের অনুরক্ত; বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে বুটেন্ এবং ক্রাসের নিকট হইতে পোল্যাণ্ড, রুম্যানিয়া ও গ্রীস নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; গ্রীস্ এখনও সে আশ্রয় ত্যাগ করে নাই। গ্রীসের অধিকৃত ক্রীট, মেফালোনিয়া, কফু প্রভৃতি দ্বীপ সামরিক সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রীট ঈজিয়ান সাগরের প্রহরীস্বরূপ; বুটেন্ যদি ঐ দ্বীপ ব্যবহারের অধিকার পায়, তাহা হইলে ইটালীর সহিত ডোডেকেনীজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে।



শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য বৃটিশ সৈন্য আত্মরক্ষার স্থান হইতে নিজস্ব হইতেছে

কফু ও মেফালোনিয়া অধিকারে সমর্থ হইলে বৃটিশ বিমানগুলি ইটালীর অত্যন্ত নিকটবর্তী হইত; আয়োনিয়ান ও আড্রিয়াটিক সাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত। এইরূপ সামরিক গুরুত্ব-সম্পন্ন গ্রীসকে যদি স্বপক্ষে আনয়ন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট আধিপত্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে; তাই গ্রীসকে স্বপক্ষে আনয়নের কূটনীতিক প্রচেষ্টা বিফল হইবার পরই ইটালী তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

ইতঃপূর্বে দুর্বল প্রতিবেশীর প্রতি প্রবলের আক্রমণের ফল বাহা হইয়াছে, এই আক্রমণের ফলও তাহাই হওয়া সম্ভব। বুটেন্ গ্রীসের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে বটে; কিন্তু মধ্য ও অদূর প্রাচীর সমরায়োজন ক্ষুণ্ণ করিয়া গ্রীসের পার্শ্ব দণ্ডায়মান হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ইটালীর বাহিনীর প্রধান অংশ ঈজিয়ান সাগরের তীরবর্তী আলোনিকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইটালীর বাহিনী ঐ অঞ্চলে পৌঁছিলে স্থলপথে

ঈজিয়ান সাগরের সহিত তাহাদিগের সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে। দক্ষিণে ক্রীট দ্বীপ যদি ইটালীর পক্ষে হস্তগত করা সম্ভব না-ও হয়, তাহা হইলেও আলোনিকা প্রাপ্তিতে ডোডেকেনীজের সহিত তাহার সংযোগ আর বিচ্ছিন্ন হইবে না। বস্তুতঃ, বৃটিশ বিমান ও নৌবহর যদি তৎপরতা অবলম্বন করে, তাহা হইলে ক্রীট দ্বীপ বুটেনের অধিকারভুক্ত হওয়া হয় ত অসম্ভব নহে। অবশ্য, বুটেনের মান্টা, আলেকজেন্দ্রিয়া ও সাইপ্রাসের ঘাঁটা হইতে ক্রীটের দূরত্ব অপেক্ষা ইটালীর বেন্‌ঘাজী, তবরুক ও ডোডেকেনীজের ঘাঁটা হইতে উহার দূরত্ব অল্প। ক্রীট, যদি বা ইটালীর হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলেও গ্রীস্ রাজা এবং কফু, মেফালোনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ যে ইটালীর কবল হইতে রক্ষা পাইবে না, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।



মোটর সাইকেলে আরুঢ় জার্মান-বাহিনী

তবে, ক্রীট, যদি বুটেনের অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে বুটেনের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হইবে না।

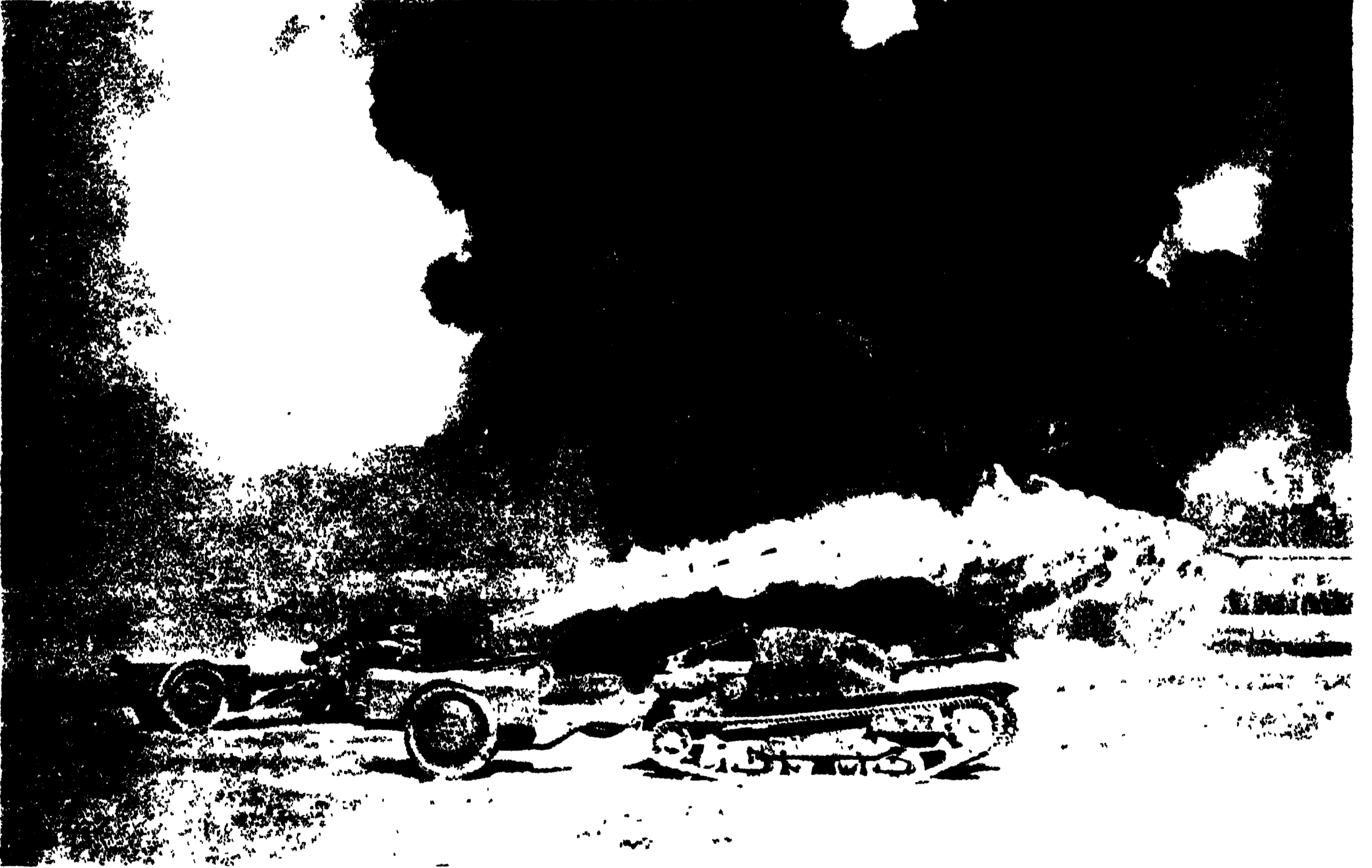
সপ্তাহকাল পূর্বে ইটালী গ্রীস আক্রমণ করিলেও এই আক্রমণের প্রচণ্ডতা এখনও বৃদ্ধি পায় নাই। তিন মাস প্রস্তুত হইয়া ইটালী এই আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেও উহার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি না পাওয়া অর্ধপূর্ণ। ইটালী হয় ত আশা করে যে, গ্রীস্ সত্বর আত্মসমর্পণ করিবে। জার্মান-বাহিনীর গ্রীসে আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে।

ইটালীর গ্রীস আক্রমণে একমাত্র ত্বরক্ণ ব্যতীত অন্য কোন বলকান রাষ্ট্র বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে নাই। গ্রীস্ ইটালীর অধিকৃত হইলে যুগোস্লাভিয়া তিন দিকে ফ্যাসিষ্ট-শক্তি কতৃক পরিবেষ্টিত হইবে; ইটালীর অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্ত বুল্গেরিয়া ও তুরস্কের সহিত সংযুক্ত হইবে। ইহা ব্যতীত, আলোনিকা বন্দরটি যুগোস্লাভিয়া ও বুল্গেরিয়ার বহির্বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ যুগোস্লাভিয়া ইটালীর-দ্রীক সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করে নাই; বুল্গেরিয়া গ্রীস্কে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া

বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছে, বুলগেরিয়ার রাজা বোরিস্‌ ঠিক এই সময় ডোব্রুজা প্রান্তির জঙ্গ নাজী ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রবরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। বুলগার সংবাদপত্রগুলি ইটালীর সমর্থক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। তুরস্ক ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ইনেউমু ঘোষণা করিয়াছেন—বুটেন ও তুরস্ক একযোগে বলকানের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছে; তুরস্ক বর্তমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলেও সে তাহার বন্ধুত্বের সম্মান করিবে; তাহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সে বিরত থাকিবে না। এলা নভেশ্বর তুর্কি জাতীয়-পরিষদে ঐরূপ ঘোষণা করিবার পূর্বাধিন প্রেসিডেন্ট ইনেউমু

মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির নিষ্ক্রিয়তা—

বুটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রাথমিক আয়োজন স্বরূপ ভূমধ্যসাগরকে নাজী-ফ্যাসিষ্ট হুদে পরিণত করিবার যে প্রয়াস চলিতেছে, তাহা সফল করিবার জঙ্গ ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলেও নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই জঙ্গ মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি ইটালীয় বাহিনী লইয়া মিশরের উপকূল-পথে সুরেজের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইটালীর গ্রীস আক্রমণের ফলে বুটেনের ভূমধ্যসাগরস্থিত নৌ ও বিমান বহরের বৃহত্তর অংশ



অগ্নিবর্ষা ইটালীয় ট্যাঙ্ক

মধ্য প্রাচীর বুটিশ সামরিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎকার ও উল্লিখিত ঘোষণাবাদী হইতে মনে হয়, তুরস্ক কেবল নাজী-ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর পূর্বাভিমুখী অভিযান প্রতিরোধের জঙ্গ প্রস্তুত নহে, সে বুটেনের সহিত সামরিক সহযোগিতার জঙ্গও প্রস্তুত হইতেছে। গ্রীসের সাহায্যার্থ তুরস্ক যে অগ্রসর হয় নাই, ইহারও বিশেষ কারণ আছে। ইটালী হয় ত গ্রীস আক্রমণ করিয়া তুরস্ককে প্রতিশ্রুতিয়া আহ্বান করিতেছিল। তুরস্ক যদি গ্রীসে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ইটালীয় বাহিনীর প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে হয় ত সেই সুযোগে জার্মান বাহিনী বুলগেরিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া অন্তর্বলে আনা-টোলিয়া অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিত। তুরস্ক নিরপেক্ষ থাকায় ইটালীর সেই "চাল" নষ্ট হইল বলিয়াই অস্বাভাবিক হয়।

উত্তরাঞ্চলে নিয়োজিত হইবার সময় মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির বাহিনী তাহাদিগের নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করিবে বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। ইচ্ছাতেই মনে হয়, হয় ত পূর্ব-ভূমধ্যসাগরস্থিত বুটিশ বিমান ও নৌবহরের উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রীসের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় নাই; অথবা স্পেন ও ফ্রান্সের সহযোগিতায় সমগ্র ভূমধ্যসাগরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট তৎপরতার জঙ্গই মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ তৎপরতার সময় স্বভাবতঃ ইটালীয় বাহিনীর পক্ষে মিশরের উপকূলপথে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে।

অভিযান কোন্‌ দিকে?—

ভূমধ্যসাগরে প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রবর, বোধ হয়, নিজদিগের মধ্যে কর্তব্যভার বিতণ্ড করিয়া লইবে।

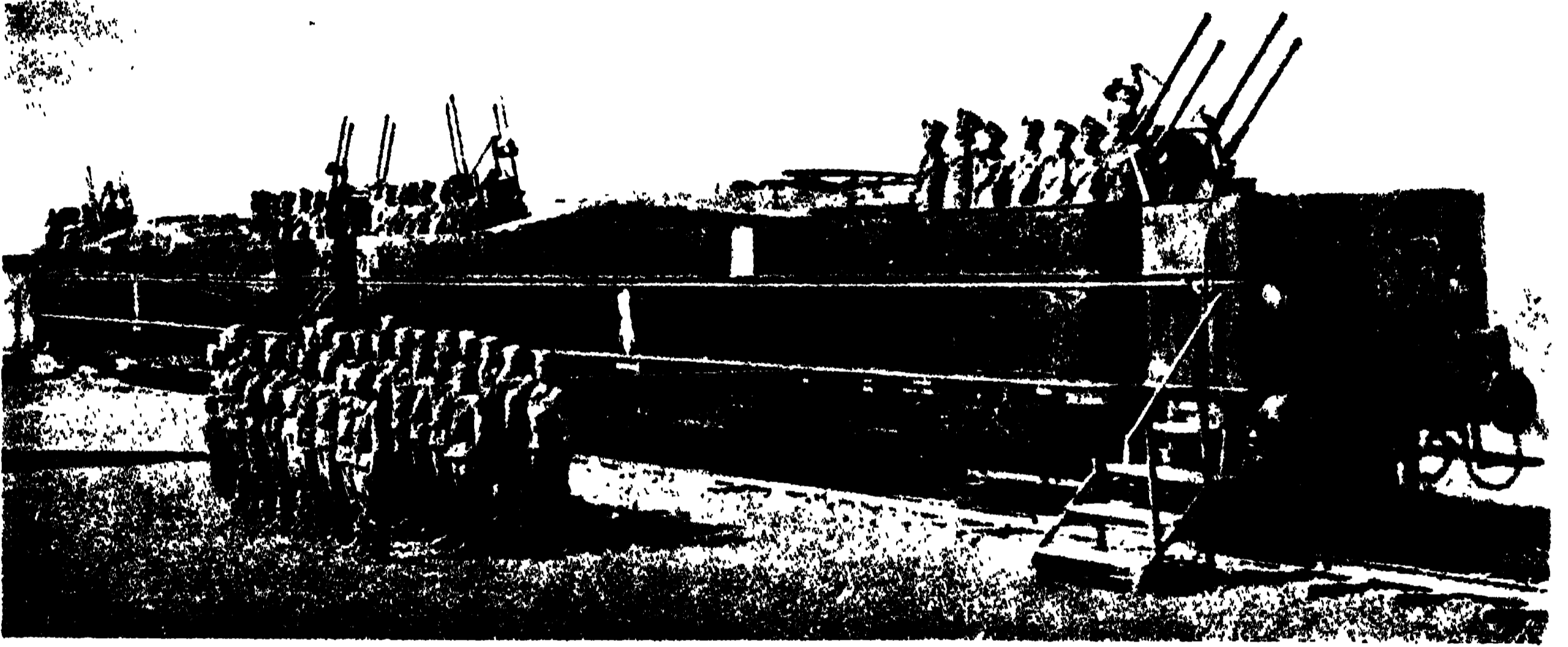
জার্মানী সীরিয়াকে ঘাঁটীকপে ব্যবহার করিয়া ইরাক ও প্যালেষ্টাইন্ অঞ্চলের তৈল-সম্পদে স্বীয় অধিকার বিস্তারের প্রয়াস পাইবে। নিউই-হিটলার আলোচনার ফলে জার্মানী সীরিয়াকে ব্যবহার করিবার অধিকার লাভ করিয়া থাকিতেও পারে।

এদিকে ইটালী সুরেজ ও লোহিত সাগরের পথে তাহার পূর্ব-আফ্রিকার অধিকৃত অঞ্চলের সহিত সংযোগসাধনে সচেষ্ট হইবে। পশ্চিম-এশিয়ার তৈলে ট্যাঙ্ক ও বিমান পূর্ণ করিয়া জার্মান বাহিনী আরও পূর্বে বৃটিশ-মুক্তমণি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবে কি না, তাহা অস্বাভাবিক। তবে, ইহা সত্য যে, পারস্য উপসাগরের তীর হইতে জার্মান বিমান এবং পূর্ব-আফ্রিকা হইতে ইটালীর বিমান ও সাব-মেরিন আরবসাগর মথিত করিতে চেষ্টা করিবে। ভারতবর্ষের সহিত বৃটেন্ এবং আফ্রিকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয় চেষ্টার ক্রটি করিবে না। বৃটেনের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অংশের সংযোগ এবং বৃটেনের প্রাচ্য

উপস্থিত হইয়া জলপথে সীরিয়ায় পৌঁছিবাব চেষ্টা করিবে কি না, তাহা বলা যায় না। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর সম্পূর্ণরূপে পক্ষ না হওয়া পর্যন্ত সাইপ্রাসের পার্থ দিয়া জলপথে সীরিয়ায় পৌঁছান সম্ভব নহে। কাজেই, ভূমধ্যসাগরের বক্ষে যুযুধান পক্ষদ্বয়ের শক্তিশরীকার ফলের উপরই জলপথে জার্মান বাহিনীর পশ্চিম-এশিয়ার গমনের সুবিধা অসুবিধা নির্ভর করিতেছে।

ত্রিশক্তির চুক্তি—

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গিণে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে দশ বৎসরের জন্য এক রাজনীতিক ও সামরিক চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তিতে জাপান যুরোপের নব-বাবস্থায় জার্মানী ও ইটালীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে; পক্ষান্তরে, জার্মানী ও ইটালী এশিয়ার নব-বাবস্থা প্রতিষ্ঠায় জাপানের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। এই চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে, এখনও যুরোপীয় যুদ্ধে অথবা চীন-



হিটলারের নিকট হইতে মুসোলিনি এই কামানসম্মিবিষ্ট বেল-শকটখানি উপহার পাইয়াছেন

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাই নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের আসন্ন অভিযানের প্রধান লক্ষ্য।

ভূমধ্যসাগরে যদি নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ইটালীর পক্ষে তাহার পূর্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্যের সহিত জলপথের সংযোগ স্থাপন অসম্ভব হইবে না। কিন্তু জার্মানী কিরূপে সীরিয়ায় পৌঁছিবে, তাহাই প্রশ্ন। রুম্যানিয়ায় যে জার্মান বাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া তাহারা গমনের সুবিধা পাইবে। ডোবরুজা পুনঃপ্রাপ্তিতে বুলগেরিয়া নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের অধীন হইয়াছে। মেসিডোনিয়ার মধ্য দিয়া ঈজিয়ান সাগরে পৌঁছিবাব সুবিধার জন্য বুলগেরিয়া আকাজিক; তাহার এই আকাজিকাও নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুগণ হয় ত পূরণ করিবেন। বুলগেরিয়া অতিক্রম করিলে জার্মান বাহিনী তুরস্কের সীমান্তে পৌঁছিবে। তুরস্ক যদি জার্মান বাহিনীকে অগ্রসর হইতে দিত, তাহা হইলে তাহারা বস্ফোরাস প্রণালী অতিক্রম করিয়া আনাতো-লিয়ার মধ্য দিয়া সহজেই সীরিয়ায় পৌঁছিতে পারিত। তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি অসম্ভব হইলে তাহারা গ্রীসে

জাপান যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হয় নাই, এইরূপ কোন শক্তি যদি চুক্তিবদ্ধ কোন শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তাহা হইলে শক্তিদ্বয় পরস্পরের সহিত রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও সামরিক সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবে। চুক্তিবদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সহিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহযোগিতা কোন পরিবর্তন হইবে না।

এই চুক্তির প্রধান লক্ষ্য আমেরিকা ও বৃটেন্। বর্তমান যুদ্ধে আমেরিকা সর্বতোভাবে বৃটেন্কে সাহায্য করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া জাপান যদি প্রসার লাভে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে আমেরিকা স্বভাবতঃ তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য অধিকতর সচেষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে বৃটেনের মার্কিনী সাহায্য প্রাপ্তিতে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। এইভাবে সুদূর প্রাচীর প্রতি আমেরিকাকে অধিকতর অবহিত করিয়া জার্মানী ও ইটালী পরোক্ষে বৃটেনের সমর-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছে। ইহা ব্যতীত, জাপান নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের শীতকালীন অভিযানে পরোক্ষে সহযোগিতা করিতে পারে। ইতোমধ্যে সে ইন্দো-চীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইন্দো-চীনের অর্থনীতিক সম্পদ আহরণ তাহার অন্ততম

উদ্দেশ্য। শ্রাম জাপানের অমূল্য; শ্রাম ও ইন্দো-চীনকে স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহারের সুযোগ পাইলে জাপান ক্রমে ব্রহ্মদেশ ও সমগ্র মালয় উপদ্বীপের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইতে পারে। সর্বোপরি, জাপান অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট প্রাচ্য অংশের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে জাপানের পক্ষে ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপ দাবী করিয়া বৃটেনের সহিত শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব নহে। অবশ্য, তাহার পূর্বে চীনের যুদ্ধের অবসান হওয়া প্রয়োজন।

ত্রিশক্তির চুক্তির ফলে সর্বোপেক্ষা অধিক উপকৃত হইয়াছে চীন, আনন্দিত হইয়াছে সোভিয়েট রুশিয়া। জাপানের ক্রম-বর্ধমান সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষা দমন করিতে হইলে চীনকে বাঁচাইয়া রাখা এবং তাহার সমরণশক্তি বৃদ্ধি করা যে কত প্রয়োজন, তাহা বৃটেন ও আমেরিকা আজ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। তাহারাই আজ চীনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। পক্ষান্তরে, সোভিয়েট রুশিয়ার আনন্দের কারণ—এই চুক্তির ফলে জাপান ও আমেরিকার বিরোধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং বর্তমান যুরোপীয় যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সমগ্র জগতের নাজী-ফ্যাসিষ্ট ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যদি আত্মঘাতী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং তখনও সোভিয়েট রুশিয়া যদি কোশলে আপনাদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলেই সে কূটনীতিকের বিরাট জয় লাভ করিবে। সোভিয়েট রুশিয়া আশা করে—পৃথিবীব্যাপী আত্মঘাতী সংগ্রামের ফলে যুদ্ধান শক্তিগুলি যখন দুর্বল হইয়া পড়িবে, তখন বিভিন্ন দেশে কমুনিষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব। অক্ষুণ্ণ-শক্তি সোভিয়েট রুশিয়ার সহযোগিতায় সেই সকল বিপ্লব যদি সাফসামঞ্জিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব কমুনিষ্ট প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হয় ত সকল হইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ত্রিশক্তির চুক্তি পূর্বের কমিউন-বিরোধী চুক্তির জায় সোভিয়েট-বিরোধী মিলন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; সোভিয়েট-জার্মান সৌহার্দ্যের ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থার আনন্দ পরিবর্তন হইয়াছে—ইটালী ও জার্মানী অর সোভিয়েট রুশিয়ার অঙ্গস্পর্শের কল্পনা করে না; জাপান এখন সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রসার লাভের জন্ত সমুৎসুক।

ব্রহ্ম-চীন-পথ উন্মুক্ত—

জাপানের ইন্দো চীনে প্রবেশের পরই যখন ত্রিশক্তির চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখনই চীনে সমরোপকরণ প্রবেশের জন্ত বৃটেন পুনরায় ব্রহ্ম চীন পথ উন্মুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করে। গত ১৭ই জুলাই তিন মাসের জন্ত ঐ পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল; তিন মাস অতিক্রান্ত হইবার পর ১৭ই অক্টোবর পুনরায় ঐ পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ঐ পথে প্রচুর সমরোপকরণ চীন অভিমুখে রওনা হইয়াছে। চীনের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, ঐ সকল দ্রব্য কান্দিঙ্গে পৌঁছিয়াছে; পক্ষান্তরে জাপান বলিতেছে যে, ইন্দো-চীন হইতে প্রেরিত জাপানী বিমান ইউনান প্রদেশে মেকং নদীর সেতু ধ্বংস করিয়া সমরোপকরণের চীনে

পৌছান অসম্ভব করিয়াছে। কাহার কথা সত্য, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হংকং ও ইন্দো-চীনের পথ অবরুদ্ধ হইবার পর ব্রহ্ম-চীন পথই চীনের প্রাণস্বরূপ। সে ঐ পথ রক্ষার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবেই। জাপানী বিমানের তৎপরতার সাময়িক ভাবে ঐ পথ অবরুদ্ধ হইলেও স্থায়ীভাবে উহা বন্ধ করা সম্ভব হইবে না।

ব্রহ্ম-চীন পথ সাময়িক ভাবে বন্ধ করিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভা উল্লেখযোগ্য কূটনীতিক সাফল্যলাভ করিয়াছেন। জাপানের দাবীতে সাময়িক ভাবে পশ্চাদপসরণ করিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভা সুদূর প্রাচীর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগ্রহান্বিত করিতে পারিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করিয়াছে যে, জাপানের ঔদ্ধত্যের ফলে তাহার সুদূর প্রাচীর স্বার্থ বিপন্ন; এখন তাহার ঐ স্বার্থ-রক্ষার জন্ত অত্যন্ত তৎপর হইয়াছেন। বৃটেন এখন তাহার সুদূর প্রাচীর স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব অনায়াসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অর্পণ করিতে পারিতেছে। সুদূর প্রাচী সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কত দূর উৎকলিত হইয়াছে, তাহা চীন হইতে প্রবাসী মার্কিনীদিগের স্বদেশে অপসারণের ব্যবস্থা হইতেই সুপরিষ্কৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই তৎপরতার জাপানকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে।

সুদূর প্রাচীতে সন্ধির জনরব -

সম্প্রতি এই মর্মে জনরব শুনা যাইতেছে যে, জাপান চীনের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্ত আগ্রহান্বিত। এই জনববের মূলে সত্য থাকাই সম্ভব। জাপান এখন সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া এবং চীনের যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রসার লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্ত জাপানের সুস্পষ্ট আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। চীনের সহিত মীমাংসা না হইলে সোভিয়েট-জাপান সৌহার্দ্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে; সোভিয়েট রুশিয়া চীনকে সাহায্য দানে বিরত হইতে সম্মত হয় নাই। ইহা ব্যতীত, চীনের পার্শ্বতা অঞ্চলে শক্তিক্রয় করা অপেক্ষা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রসার-লাভে সচেষ্ট হওয়া জাপানের পক্ষে অধিকতর লাভজনক। উত্তর চীন যদি তাহার অধিকাভুক্ত থাকে, তাহা হইলেই চীনের “মধ্য” সে পান করিতে পারিবে। সন্ধির জন্ত আগ্রহান্বিত হইলেও জাপান ঐ অঞ্চল ত্যাগে কখন সম্মত হইবে না,—হইতে পারে না।

জাপান সন্ধির জন্ত ব্যর্থ হইলেও মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক্ জাপানের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। তিনি এখন বৈদেশিক সাহায্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছেন; কাজেই, তিন বৎসর জাতির চরম-তঃখভোগের পর আজ আন্তর্জাতিক অবস্থা যখন চীনের অমূল্য, তখন রাজ্যের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করিয়া তিনি জাপানের সহিত কেন সন্ধি করিবেন? এই প্রশ্নে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমেরিকা ও বৃটেন চীনকে প্রচুর সাহায্য দান করিয়া এবং সর্বপ্রকার কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চীন-জাপান সন্ধি অসম্ভব করিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে পারে; কারণ, জাপানের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য দমনের জন্ত চীনকে যুদ্ধে রত রাখাই একান্ত প্রয়োজন।

স্বাধীনতার প্রথম

যুদ্ধের উদ্দেশ্য

বৃটিশ জাতি কি জন্ম যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা জানিবার জন্ম কংগ্রেসের নেতারা বড়লাটকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই প্রশ্নের স্পষ্ট কোন উত্তর পান নাই। কংগ্রেসের কর্তারা আশা করিয়াছিলেন,—বৃটিশ সরকার গণতন্ত্রের রক্ষার্থে স্বৈরতন্ত্রের বা নাজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, এই উত্তর পাইবেন; তাহা শুনিয়া কংগ্রেস বলিতেন, তাঁহারা এই যুদ্ধের অবসানে ভারতকে স্বাধীনতা দিবেন, এবং এদেশে খাঁটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবেন—এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করুন। কিন্তু বৃটিশ সরকারের নিকট সেরূপ কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই; কাজেই কংগ্রেসের মনের আশা মনেই বিলীন হইয়াছিল। সম্প্রতি গমপোটে ভারতসচিব মিষ্টার আমেরী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বটেন কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছেন তাহা বিবৃত করিয়াছেন। ভারতসচিব বলিয়াছেন—“যুরোপের সর্বত্র যাহাতে গায়বিচারের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কড়ক সম্মানের দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়—তাহার জন্ম আমরা যুদ্ধ করিতেছি। কেবল তাহাই নহে। বড় জাতি এবং ছোট জাতি যাহাতে পাশাপাশি থাকিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে, এবং যাহাতে সর্বত্র অরাজকতার স্থানে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাও আমাদের উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে আমাদের চেষ্টার দ্বারা আমরাদিগকে রক্ষা করা এবং আমাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা যুরোপকে রক্ষা করাও আমাদের সর্বপ্রথম কার্য।”—মিঃ আমেরীর এই উক্তি হইতেই বুঝা যায় যে, বটেনের যুদ্ধ করিবার সমস্ত লক্ষ্যই যুরোপে নিবদ্ধ। এশিয়া তথা ভারত, আফ্রিকা এবং আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। এক কথায়, তাঁহারা যুরোপীয় এবং খেতাজ জাতির বিষয়ই ভাবিতেন,—এশিয়া এবং আফ্রিকার বণী জাতির কথা তাঁহাদের মনে স্থান পাইতেছে না। মিষ্টার আমেরী

ভারতসচিব; কিন্তু তাঁহার মুখে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আশার কথাই নাই। তিনি মনে করেন, ভারত বটেনের সম্পত্তি; হিটলারের আক্রমণ হইতে এই সম্পত্তি রক্ষা করাই তাঁহাদের কাজ। তিনি বলিয়াছেন, সুবিধা পাইলে হিটলার ভারতবর্ষ এবং বৃটিশ-শাসিত আফ্রিকাও আক্রমণ করিতে পারেন। সে জন্ম ভারতকে প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতবাসীর মনে যে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। ইহাতে ভারতবাসীর মনে কিরূপ অশান্তির সঞ্চার হইতেছে, ইহা তাঁহারা যে বুঝিতে পারিতেছেন—তাহা ভারতসচিবের বক্তৃতা পাঠে বুঝিবার উপায় আছে কি?

লোকগণনায় ভুল

লোকগণনায় যে ভুল হইতেছে, সে কথা আমরা পূর্বে হইতেই বলিয়া আসিতেছি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত বিশেষ পরিশ্রম করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যানির্দেশে ভুল হইয়াছে। এই ভুল গণনার ফলে মুসলমান-জনসংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা অধিক করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। অনেকে এইরূপও সন্দেহ করিতেছেন যে, ইহা ইচ্ছাকৃত ভ্রম। কারণ, যে সকল মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভাবে পূর্ণ, তাঁহাদের স্বার্থও মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য দেখাইবার দিকে। যাহারা এই কথা বলিতেছেন, তাঁহারা বলেন যে, বর্তমান সময়ে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদিগকে অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করিবার জন্ম তাহাদের সংখ্যা অধিক দেখানই আবশ্যিক। এই অনুমান সত্য হইলে ইহা নিঃসন্দেহেই অত্যন্ত হীনতা-সূচক কার্য্যপদ্ধতি। সেই জন্ম এবার যাহাতে লোকগণনা নির্ভুল হয়, তাহাই কর্তব্য।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছিল, প্রত্যেক স্থানে দুই জন করিয়া গণক নিযুক্ত করিতে হইবে,—এক জন মুসলমান এবং আর এক জন অমুসলমান,—হিন্দ বা খৃষ্টান যাহাই

হউক। তাহা হইলে গণনা কতকটা নিভুল হইবার আশা ছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই যুক্তিবদ্ধ প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। পরন্তু বাঙ্গালা প্রদেশের জ্ঞান ব্যবস্থা হইয়াছে যে, মুসলমানরাই মুসলমান-গণনাকার্য সম্পন্ন করিবেন, কিন্তু হিন্দুদিগের গণনার ভার কাহাদের হস্তে অর্পিত হইবে, তাহার কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় নাই। এজ্ঞান অনেকের বিশ্বাস, বাঙ্গালার মুসলমান-দিগের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করাই কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়। আমরা কিন্তু একরূপ মনে করিতে পারিতেছি না। তবে যাহাতে লোকের মনে ঐরূপ সন্দেহ স্থান পাইতে না পারে, সেইরূপই ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্তব্য। পত্রান্তরে প্রকাশ, মাহুব-গণনা এবার যাহাতে নিভুল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জ্ঞান শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় আদম স্মারের সুপারি-টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডাচের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কি ফল হইয়াছে, তাহা প্রকাশ নাই। ইহা ভিন্ন এবারকার গণনায় একরূপ আর একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহার ফলে গণনায় ভুল হইতে পারে। পূর্বে গণনা-কারীরা গণনা করিবার নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে প্রত্যেক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সেই বাড়ীর লোকসংখ্যা গণনা করিয়া আসিতেন, শেষে চূড়ান্ত গণনার দিন কোন্ বাড়ীতে কয় জন লোক আছে, তাহা মিলাইয়া দেখিয়া তালিকা সংশোধন করা হইত। এবার শুনিতেছি, শেষ এক দিনে সেই এক সময়ে গণনা করা হইবে না। ইহার ফলে গণনায় বিশেষ ভুল থাকিয়া যাইতে পারে। আদম স্মারীর গণনায় ভুল হইলে অনেক বিষয়েই ভুল হইয়া যাইবে। কারণ, আদম স্মারের হিসাবে ভুল থাকিলে বার্তিক ব্যাপারের অনেক সিদ্ধান্তই ভুল হওয়া অপরি-হার্য। সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইতেছেন কি না, তাহা এখন পর্য্যন্ত জনসাধারণ জানিতে পারে নাই; কিন্তু তাহা জানাইবার প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

হিন্দু প্রদেশে হিন্দু-জন্ম

নব-গঠিত হিন্দু প্রদেশে কিরূপ ভীষণ অশান্তি আরম্ভ ও শাসন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। তথাকার

সরকার এবং শিকারপুর জিলায় এমন এক দিনও যাইতেছে না, যে দিন তাহার বিভিন্ন অংশে কোন না কোন হিন্দু আহত, নিহত, অথবা তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত না হইতেছে। বিশৃঙ্খলা এত দূর বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, কোন কোন গ্রামের বহু হিন্দু অধিবাসী গ্রাম ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে মিষ্টার গান্ধীরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি মল্লম লীগকেও এই বিষয়ের একটা মীমাংসা করিতে বলিয়াছেন। মল্লম লীগ এই অবস্থার জ্ঞান কতকটা দায়ী, একরূপ ধারণা ইহার মধ্যে অনেকেরই মনে স্থান পাইয়াছে। লীগ হিন্দুদিগের সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন বলিয়া এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, একরূপ অনুমান করিবার জায়সম্মত কোন কারণ আছে কি না, নিরপেক্ষ-ভাবে তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। তবে তাহার কি ফল হইবে, তাহা বলা কঠিন। সম্প্রতি লীগের কার্যকরী সমিতি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে পারেন নাই, একরূপ লোক আছেন কি না জানি না। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এই অবস্থা সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হইয়া বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, “এ দোষ হিন্দুদেরই! সিদ্ধান্তে অরাজকতা নাই। উহার প্রকৃত স্থান হিন্দু-সংবাদপত্রে এবং হিন্দু সংবাদদাতাদিগের মনের ভিতর। হিন্দুরাই আসল কথা চাপিয়া রাখিয়া কেবল অতিরঞ্জিত (অত্যাধিক্যপূর্ণ?) সংবাদ প্রচার করিতেছে। তবে যদি কোথাও জীবনযাত্রা নির্বাহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম ঘটাই থাকে, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান দায়ী ঐ দেশবাসী সংখ্যান হিন্দুদিগের অবলম্বিত আচরণ এবং তাহাদের সভা-সমিতি। কারণ, উহাদের ব্যবহার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার অক্ষুণ্ণ মনে।”

এই অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া সে-কালের কোন রাজ্যের রাত-অমাত্যের ‘মুবারুদ্দিন গজকয়ঃ’ নামক সিদ্ধান্ত মনে পড়িল। অমাত্যশ্রেষ্ঠ রাজধানীতে অদৃষ্টপূর্ব্ব একটি বরাহের আবির্ভাবে—তাহা কোন্ জন্তু স্থির করিতে না পারিয়া, তাঁহার নাসিকা ও কর্ণের ছিদ্র হইতে তুলার ছিপি অপসারিত করিয়া বুদ্ধি বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন, হয় হাতী আহারাভাবে খর্ব্বকায় হইয়াছে—না হয়

ইন্দুর অতি-ভোজনে দৃষ্টপূষ্ট হইয়া ঐ আকার লাভ করিয়াছে। জীবনযাত্রা নির্বাহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না, লীগের কার্যকরী সমিতি সে বিষয়ে নিশ্চিত নহেন,—তবে তাহার কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিত! এ অদ্ভুত যুক্তি নহে? মিঃ গান্ধীর লেখার ভাবে প্রকাশ, ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা দেশ ছাড়িয়া অন্তর্ভুক্ত চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে মুসলমান-দিগেরও অস্ববিধা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সত্যই যদি সেইরূপ হইত, তাহা হইলে কি হিন্দুদের এই ভাবে নিহত হওয়া সম্ভব হইত? প্রতিদিনই তথায় খুন হইতেছে, মোহড়ী বিভাগের মীরপুরে এবং খানপুরে সম্প্রতি কয়েক জন হিন্দু নিহত হইয়াছে। অনেকে সেই জন্ত এই অঞ্চলে সাময়িক আইন প্রবর্তিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সিদ্ধ প্রাদেশিক মন্ত্রম লীগের সভাপতি সম্প্রতি তথাকার হিন্দু এবং মুসলমান নেতাদিগের এক সম্মেলনী সভা আহ্বান করিতে চাহিয়াছেন। তাহাতে কি বেদনায় বেলেস্তারার ব্যবস্থা হইবে? যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সিদ্ধ দেশটি পাকা পাকিস্থানে পরিণত হইবার পূর্বে এই সমস্যার সমাধান হইবে কি?

‘প্রাচ্যগুচ্ছে’র পরামর্শ-পরিষদ

দিল্লী নগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্য অধিকার-গুলির প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া পরামর্শ-পরিষদের অধি-বেশন হইয়াছে। এই সম্মেলনীতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সিংহল, ভারত, রোডেসিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, পূর্ব-আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, এবং হংকংএর প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়া-ছেন। রজার কমিশনও গ্রেট বৃটেনের প্রতিনিধি হিসাবে ইহাতে উপস্থিত আছেন। ইহা ভিন্ন ভারত সরকারের মনোনীত কয়েক জন সদস্যও “চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওল-পরামাণিক”-বৎ মজলিসে সমাগত হইয়াছেন। বড় লাটের শাসন-পরিষদের অন্ততম সদস্য সার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ ভারতীয় সদস্যদিগের মুখপাত্র হিসাবে তত্র বিরাজমান। গত ৮ই কার্তিক ভারতের বড় লাট এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “বিগত যুরোপীয় মহাবুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের এলাকাভুক্ত রাষ্ট্রগুলি সৈন্ত, অর্থ, এবং যুদ্ধের উপকরণাদি প্রেরণ করিয়া যথাসাধ্য

াহায্য করিয়াছিল। এবার যুদ্ধের উপকরণাদির প্রয়োজনই সর্কাপেক্ষা অধিক। সেই জন্ত স্ময়েজ খালের পূর্বস্থিত বৃটিশ রাজ্যগুলি কি ভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার অনুসন্ধানকল্পেই এই সম্মেলনের অধিবেশন।” এই মহাব্যেই সম্মেলনের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। বড় লাট ভারতবর্ষকে অভিনন্দিত করিয়াছেন—অন্ত কোন কারণে নহে—তাহার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্ত। গ্রেট বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, তাঁহারা অস্ত্র-সরবরাহের জন্ত একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে চাহেন। কেহ কেহ মনে করিতেছেন, যে সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব দেশেই অস্ত্রাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবেন। সম্মেলনের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এখন কার্য করিবার পালা। লর্ড লিনলিথগো আরও বলিয়াছেন, “যুদ্ধের এবং শান্তির উভয় সময়েই তাঁহারা পরস্পর ব্যবস্থা পূর্বক সুসম্বন্ধ ভাবে শিল্পের সহযোগিতার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া থাকেন।”—কিন্তু ভারতবাসীরা এ কথা স্বীকার করিবে, সরকার তাহার পথ রাখিয়াছেন কি? বিগত যুরোপীয় মহাবুদ্ধের সময় রেলওয়ের জন্ত আবশ্যিক অনেক দ্রব্যই এদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধের বিপদ কাটিলে সেই সকল দ্রব্য এদেশ হইতে লওয়া হইয়াছিল কি? রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ উহা আর গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধের পূর্বে যেমন বিলাত হইতে ঐ সকল দ্রব্য আমদানী করিতেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে আবার বিলাত হইতেই উহা আমদানী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে এদেশের যে সকল কারখানা ঐ সকল দ্রব্য নির্মাণ করিতেছিল, তাহাদিগকে কি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই? এবার যাহাতে সেরূপ না হয়, সে জন্ত দেশের কারখানাওয়ালাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করা সরকারের কর্তব্য বলিয়া যদি এদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পরি-চালকবর্গ দাবী করেন, তবে কি তাহা অসম্ভব হইবে?

হিন্দুজ্ঞানে জ্ঞানাজ্ঞান

এবার বর্ধমান সহরে বিজয়ার দিন, দশভূজা প্রতিমা বিসর্জনের জন্ত রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া ব্যাপারে বিষম বিতর্ক ঘটিয়াছিল। হিন্দুরা রাজপথ নির্মাণের ও

তাহার সংস্কারসাধনের জন্ত যথাযোগ্য অর্থব্যয় করিবে, এই হেতু রাজপথে তাহাদের কোন অধিকার থাকিবে, একরূপ আশা করা কি এ-কালে সম্ভব? আজ কেবল বর্ধমানের কেন, ভারতের অন্যান্য বহু স্থানে ইহার যে দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইতেছে,—সমগ্র ভারতে দুই দিন পরে যে তাহা দেখা দিবে না, ইহার নিশ্চয়তা কি? নিরঞ্জনের পর প্রতিমা কিছু কাল পূজামণ্ডপে ফেলিয়া রাখিয়া, বহু পরামর্শে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া, কয়েক দিন দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া, ও বিস্তর সাধ্যসাধনার পর অবিহিত-ভাবে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। আবার কালী পূজা শেষ হইয়াছে; না কালীর বিসর্জনের ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছে জানিতে পারি নাই। বিসর্জন পূজার অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও উহাতে যখন পদে পদে এত বাধা, তখন হিন্দুর উপায় কি? রাজপথে বাগভাণ্ড সহকারে প্রতিমা লইয়া যাইলে পথের পাশ্বে মসজিদে যদি উপাসনা-নিরত ভক্তবৃন্দের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা পড়ে,—তাহা হইলে রাজপথ ত্যাগ করিয়া দূরে মসজিদ নির্মাণ করাই সমীচীন, এবং ইহাই সম্ভবতঃ নিরপেক্ষ ব্যবস্থা; কিন্তু আজ এই সম্ভব ব্যক্তি কে গুণিত্তেছে? একরূপ অবস্থায় হিন্দুদিগের কর্তব্য কি, তাহাই নিরূপণের যোগ্য। তবে দুর্দিনে সকলেরই সংযতভাবে কার্যো প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। বাঙ্গালা সরকারের হিন্দু সচিবরা যখন এ বিষয় সম্বন্ধে নির্বিকার অথবা নিরুপায়, তখন তাহাদের মুখাপেক্ষা না করিয়া একটা নির্বিরোধ পন্থা স্থির করা অপরিহার্য হইয়াছে।

গোয়ার অত্যাচার

ইদানীং ভারতে পূর্বের ত্রায় আর গোয়ার গুণ্ডামীর কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। উহা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক ঝাঁক গোরা তাহাদের গন্তব্যপথে বোম্বাইএ নামিয়া অল্প কাল তথায় অবস্থিতি করিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই তাহারা কেবল যে ভীষণতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহাই নহে,—তাহারা এ-দেশীয় স্ত্রীলোকের অপমানও করিয়াছিল। একটা গোরা জনৈক গুজরাটী বালিকাকে রাজপথে ধরিয়া তাহার সহিত তাহাকে

নাচিতে বাধ্য করিয়াছিল; আর একটা গোরা কোন উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ের একটা ছাত্রীর উভয় গণ্ডদেশ এমনভাবে দংশন করিয়াছিল যে, তাহার গণ্ডের ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিয়াছিল। ইহা ভিন্ন গাড়ী-ওয়াল, ট্যাক্সিওয়ালাদিগকেও উহারা নানাভাবে বিব্রত করিয়াছিল। বোম্বাইয়ের মেয়র এই বিষয়টি বোম্বাই-গবর্নরের গোচর করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে বোম্বাই-লাটের সেক্রেটারী যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা ভারত-বাসীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ বা সম্মানজনক নহে। গান্ধীজীও ব্যাপারটা বড় লাটের গোচর করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইল, তাহা প্রকাশ হইবে কি না অন্তমান করা কঠিন। গান্ধীজী নিজ ব্যক্তি, গত বিয়য়ের জন্ত হয় ত 'শোচনা' করিবেন না। গোয়ারা যুদ্ধস্থলে যাইতেছে বলিয়া কি তাহাদের সকল অপরাধ মাজনাযোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? সে-কালে ত্রাতুপুত্র ভাতের হাঁড়িতে মূত্রত্যাগ করিলে বিধবা পিসিমা সাদরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিয়াছিলেন, 'আহা, ছেলেমানুষ, বুদ্ধি হয়নি, করুক।'—কিন্তু এ নজির কি সর্বত্রই চলে?

পাকিস্তান সংগঠন

ভারতবর্ষকে হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব মশ্লেম লীগই প্রথমে উত্থাপন করেন। এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এদেশের শাসনকর্তাদেরও এই প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি এবং তাহার কতকটা সমর্থনও আছে। ডাক্তার মুঞ্জের সহিত এ সম্বন্ধে লর্ড লিনলিথগোর আলোচনা হইয়াছিল। ডাক্তার মুঞ্জ বড় লাটকে বলেন,—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অগণ্ড রক্ষিত হইবে, এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সরকারের কর্তব্য। উত্তরে বড়লাট বলিয়াছেন, "হিন্দু-সভা এ বিষয়টি যে দিক দিয়া দেখিতেছেন, কর্তৃপক্ষ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন সত্য, কিন্তু পাকিস্তানের পরিকল্পনাটি একেবারে বাদ দেওয়া যায় না।"—ডাক্তার মুঞ্জেরই মুখ হইতে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি করাচি হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—আগামী ২৫শে কার্তিক দিল্লীতে মশ্লেম লীগের শাসনতন্ত্র

সাব-কমিটির যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে পাকিস্তানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া তাহা মিষ্টার জিন্নার সকাশে উপস্থাপিত করা হইবে। লীগের লাহোর বৈঠকে পাকিস্তানের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, উক্ত সাব-কমিটি তাহার কিছু পরিবর্তন করিবেন; তাহাতে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে স্থানান্তরিত করা হইবে না।

বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কতকটা অঞ্চল, দিল্লী, দক্ষিণপ্রদেশের কয়েকটি জিলা, দুইটি জিলা ভিন্ন সমগ্র বাঙ্গালা, আসাম, হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, এবং মাদ্রাজের কিয়দংশ লইয়া এই পাকিস্তান রচিত হইবে। পাকিস্তানের সমস্ত অংশই স্বতন্ত্র থাকিবে বটে, কিন্তু তাহার সমস্তটাই এক স্বাধীন মগ্নেম রাজ্যেব শাসনাধীন রহিবে। ইহাতে মনে হইতেছে যে, বাঙ্গালার দুইটি জিলা ভিন্ন আর সকল জিলাই পাকিস্তানের জঠরে প্রবেশ করিয়া পরিপাক হইবে। বাঙ্গালার কোন্ কোন্ জিলা পাকিস্তানের পক্ষে দুপ্পাচ্য, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ লীগের সাব-কমিটি তাহা ঠিক করিবেন। বলা বাহুল্য, সকল মুসলমান এ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন না। এমন কি, অনেকেরই ইহাতে আপত্তি আছে। সার মহম্মদ ইয়াকুব সম্প্রতি বলিয়াছেন,— “মুসলমানদিগের আসল পাকিস্তান এখন যেরূপ বিপন্ন, বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধে উহা সেরূপ বিপন্ন হয় নাই।” তিনি ঐ সকল আসল এবং পবিত্র পাকিস্তান রক্ষার জন্ত চেষ্টা করিতে মুসলমানদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু মগ্নেম লীগের উৎসাহী সদস্যগণ সে বিষয়ে অবহিত হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী সম্বন্ধে যেরূপ “না ঘরকা, না খাটকা” মত গ্রহণ করিয়াছেন, এই পাকিস্তান সম্বন্ধেও সেইরূপ মত গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, মগ্নেম লীগ এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ সহকারে স্বীয় মত প্রচার করিতেছেন। কংগ্রেসের ব্যবহারকে মৌন সম্মতি বলা যাইতে পারে। সুতরাং পাকিস্তান প্রস্তাব শেষ কালে হয় ত গৃহীত হইতেও পারে। দেখা যাইতেছে যে, শাসকগণ আজকাল বুদ্ধি-তর্কের দিক দিয়া সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিতেছেন না। কংগ্রেসও এ বিষয়ে কোন কথা বলিতেছেন না।

রেলওয়ে কন্ফারেন্স

গত ৯ই কার্তিক শনিবার দিল্লী নগরে রেলওয়ে সামতির বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেন্ট মিষ্টার সি, এ, মুরহেড এবং ভারত সরকারের যান-বাহন বিভাগের সদস্য সার এণ্ডরু ক্লো বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় বর্তমান যুদ্ধের সময় রেলওয়ের কার্য-পরিচালনে যে সকল অসুবিধা ঘটিতেছে, প্রধানতঃ সেই কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই সম্মিলিতে রেলওয়েগুলির কার্যসূচী এবং কার্যনীতি ফলভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। এবার ঔপকূলিক জাহাজের অভাব হেতু রেলওয়েগুলিকে অনেক গুরুত্ব মালপত্র বহন করিতে হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, ইহাদিগকে বহুসংখ্যক যাত্রীও লইয়া যাইতে হইতেছে। সাময়িক কার্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও বহন করিতে হইতেছে। রেলওয়েগুলি যথাবিহিতভাবে এই সকল কামা সংসাধনে সমর্থ হইতেছে, ইহাই তাঁহাদের যোগাতার পরিচায়ক। ইহাতে তাঁহাদের আশাও বর্ধিত হইতেছে।

রেলওয়ে কন্ফারেন্সে সার বিভাগের জন্ত আবশ্যিক দ্রব্যাদি নিশ্চয় করিতে হইতেছে বলিয়া কতকটা অসুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু এই কার্যে এই সঙ্কটকালে কতব্যের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এদেশে যদি রেল-গাড়ী এবং রেলের ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার সুব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। এই সম্মিলিত সভাপতি মিষ্টার মুরহেড বলিয়াছেন, সরকার শীঘ্রই এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতেছেন।—কিন্তু এই ব্যবস্থা পূর্ণ হইতেই করা উচিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতে রেলগাড়ী প্রভৃতি নিশ্চয় করিবার উপাদানের এবং শ্রমিকেরও অভাব নাই। সুতরাং পূর্বে চেষ্টা করিলেই এই অভাব পূর্ণ করা সুসাধ্য হইত। এখন চারিটি বহু কন্ফারেন্সে ঐ সকল মালগাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু উহারা আরও অধিক সংখ্যক মালগাড়ী প্রস্তুত করিতে পারে। এদেশের যাত্রীদিগের সুবিধার ব্যবস্থা কি করা হইতেছে, ইহাদের উক্তি তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। বিনা টিকিটে দুই-চারি জন লোক

রেলগাড়ীতে যাতায়াত করে, সে কথা ভারত সরকারের রেলওয়ে বিভাগের সদস্য উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা নিন্দনীয় বটে, কিন্তু ভারতবাসী যাত্রীরা যে তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া নানা লাঞ্ছনা সহ করিয়া রেল-ট্রেনে ভ্রমণ করে,—সে সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ নির্বাক ছিলেন। বাসের এবং লরীর সহিত প্রতিযোগিতায় রেলওয়ের যথেষ্ট অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে; কিন্তু বাস এবং লরীর সহায়তায় রেলওয়েগুলির নানাভাবে সুবিধা হইতেছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহারা রেলপথ হইতে বহু দূরবর্তী অঞ্চলের দ্রব্যাদি বহন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া আসে, এবং তাহা বহন করিয়া রেলওয়ে সমূহ লাভবান হয়—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় আছে? কিন্তু সে সম্বন্ধেও তাঁহারা নির্বাক কেন?

বসুমতী-কংগ্রেস বিরোধ

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। তিনি কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্য, এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে জনসাধারণের সুযোগ্য প্রতিনিধি—ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। তিনি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সহোদর। শ্রীযুত সুভাষ বাবুর সহিত কংগ্রেসের বিচ্ছেদ-কাহিনী সকলেরই বোধ হয় স্মরণ আছে। সুভাষ বাবুর সহিত কংগ্রেসের বিচ্ছেদের পরও শরৎ বাবু কংগ্রেসের সদস্য আছেন। ইহার পর বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের উপনির্বাচন লইয়া নিখিল ভারতীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সহিত শরৎ বাবুর তথা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মতভেদ ঘটে। শরৎ বাবু তাঁহার মনোনীত তিন জনকে সমর্থন করিতে থাকেন, কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী বোর্ড এক জনকে বাদ দেন। এই ব্যাপার ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া বাঙ্গালার কংগ্রেসওয়ালাদিগের মধ্যে ঘোর বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। শরৎ বাবু কংগ্রেসের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়া কংগ্রেস শরৎ বাবুকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া এই দুঃসময়ে ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের দোষ দিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের বাঙ্গালা-বিশেষের গুরু প্রথর হইয়াছে। বাঙ্গালার জনমত শরৎ বাবুর সমর্থন করিতেছে। শরৎ বাবু এই সঙ্কটকালে পরিষদ ত্যাগ করিলে বাঙ্গালার

স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। আমাদের বিশ্বাস, কংগ্রেসের ঔদ্ধত্যের নিকট বাঙ্গালা মস্তক অবনত করিবে না। এখন কি হয়, দেখা যাক।

কেন্দ্রীপরিষদে নূতন করে দিল

‘বোঝার উপর শাকের আট’ বলিয়া একটা আছে; কিন্তু গত ১৯শে কার্তিক মঙ্গলবার কেন্দ্রী পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে ভারত সরকারের অর্থসদস্য সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্ত ছয় কোটি টাকা নূতন কর স্থাপনের জন্ত যে অতিরিক্ত ফাইন্যান্স বিল পেশ করিয়াছেন, তাহাকে বোঝার উপর আর একটা বোঝা না বলিয়া ‘শাকের আট’ বলা কি সম্ভব হইবে? অর্থসদস্য সার জেরেমি রাইসম্যান হিসাব দিয়াছেন—ব্যয়ের খাতে মোট সতের কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছে, এবং তিন কোটি টাকা আয় কম হইয়াছে। এই কুড়ি কোটি টাকার মধ্যে গত বৎসরের উদ্বৃত্ত সাত কোটি টাকা বাদ দিলেও তের কোটি টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা। নূতন ট্যাক্সে পূরা বৎসরে ছয় কোটি টাকা আয় হইবে।

এই অতিরিক্ত অর্থবিলে সুপার-ট্যাক্স ও কর্পোরেশন-ট্যাক্স সহ সকল প্রকার আয়করের উপর কেন্দ্রী সরকারের প্রয়োজনে শতকরা ২৫ ভাগ অতিরিক্ত কর স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাতে পূরা বৎসরে পাঁচ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে, এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের জন্ত যে কর ধার্য হইয়াছে, তাহা ১৫ ভাগ বর্দ্ধিত করা হইবে। বেতন ও ডিভিডেণ্ড হইতে যে পরিমাণ অর্থ কাটা হয়, তাহাও শতকরা ২৫ ভাগ বর্দ্ধিত হইবে।

ডাক-বিভাগের মাণ্ডলও বর্দ্ধিত হইবে। এক আনা ডাক-টিকিটে যে পত্র যাইত, তাহার জন্ত পাঁচ পয়সা মাণ্ডল দিতে হইবে। বুক-প্যাকেটের প্রথম পাঁচ তোলায় আধ আনা মাণ্ডল ছিল, তাহা বাড়িয়া আবার তিন পয়সা হইল। ব্রহ্মদেশে পাঠাইবার চিঠির মাণ্ডল দুই আনা, এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে পাঠাইবার চিঠির মাণ্ডল সাড়ে তিন আনা হইল। এতদ্বিন্ন, টেলিগ্রামের মাণ্ডলও বর্দ্ধিত হইল। প্রত্যেক (ভারতীয়) অর্ডিনারী টেলিগ্রামে এক আনা, এবং প্রত্যেক জরুরী টেলিগ্রামে দুই

আনা হিসাবে অতিরিক্ত কর লওয়া হইবে। ট্রাক টেলিফোনের শুষ্ক শতকরা দশ ভাগ বর্দ্ধিত হইল। এই সকল তিল কুড়াইয়া যে বেল হইবে,—তাহাতে এক কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে।

ডাকমাণ্ডুল বৃদ্ধি করায় দেশের দরিদ্র লোকের অর্থকষ্ট এই দুঃসময়ে আরও বর্দ্ধিত হইবে। বুক-প্যাকেটের মাণ্ডুল বৃদ্ধির প্রস্তাব শুনিয়াও পূর্বে আমরা বহুবার তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি; কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। সরকার অনেক অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করিয়া, যাহারা হাজার হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন—এই দুঃসময়ে তাঁহাদের বেতন শতকরা একটা নির্দিষ্ট হারে কমাইয়া এই আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের যাহাতে কষ্ট হয়, অসুবিধা হয়, আয় বৃদ্ধির জন্ত সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া কি সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? ইহার পর যদি দেশে সঙ্কট উপস্থিত হয়, এবং আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন সরকার আয় বৃদ্ধির জন্ত আর কি উপায় অবলম্বন করিবেন? দেশের জনসাধারণের করদানের শক্তি কি নিঃশেষিত হয় নাই?

ভারতে সমরায়োজনের ব্যবস্থা

কেন্দ্রী পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের সমর-প্রচেষ্টার বিবরণ বিবৃত করিবার সময় অর্থসদস্য সার জেরিমি রাইসম্যান বলিয়াছেন—প্রাথমিক ব্যবস্থারূপে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্র-সজ্জিত প্রায় ৫ লক্ষ সৈন্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্বপ্রকার সৈন্যদলে সৈন্য-সংগ্রহ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতরক্ষার বহির্ব্যবস্থায় সাহায্য করিবার জন্ত ৬০ সহস্রাধিক সৈন্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। সর্বপ্রকারে ১ লক্ষ লোক সৈন্যদলে গৃহীত হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশের সামরিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। পূর্কের ৫ হাজার মোটর-যান বর্দ্ধিত হইয়া ৩০ হাজার হইয়াছে; আগামী বৎসর এই সংখ্যা দ্বিগুণ করা হইবে। সাজোয়া-গাড়ী নির্মাণের অসুবিধা দূর করা হইয়াছে। প্রতি মাসে শত শত টন লৌহ-প্লেট নির্মিত হইতেছে। আগামী বর্ষে ৩ হাজার সাজোয়া

গাড়ী নির্মিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারতে সর্ব-জাতীয় অস্ত্র ও রসদ বর্তমান প্রয়োজনের হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে নির্মিত হইতেছে। এতদ্বিিন্ন, ১০ কোটি রাউণ্ড ক্ষুদ্র অস্ত্রোপযোগী ও ৪ লক্ষ রাউণ্ড কামানের রসদ ইত্যাদি এবং বহু লক্ষ সামরিক পরিচ্ছদাদি ভারতের বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তিও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। মাইন উত্তোলনকারী বহুসংখ্যক জাহাজ, সাবমেরিন, স্কানী টহলদারী জাহাজ ভারতের বন্দর ও পোতাশ্রয়-গুলির পাহারায় নিযুক্ত আছে। ভারতের পোতাশ্রয়-পযোগী কন্সালোগুলিতে বিশেষভাবে অস্ত্রসজ্জিত মাইন-উত্তোলনকারী জাহাজ ও টহলদারী জাহাজ নির্মিত, এবং নৌ-সৈনিক ও নৌ-কর্মচারীর সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতের বিমানশক্তি বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা বিশেষভাবেই করা হইতেছে। বৎসরে ৩ শত পাইলট ও ২ সহস্র মেকানিককে শিক্ষাদানের চেষ্টা হইতেছে। অতি আধুনিক শ্রেণীর বিমানের জন্ত বিমানাশ্রয়ের প্রসার-বৃদ্ধির আয়োজন চলিতেছে; ইমারৎ নির্মাণ হইতেছে। শিক্ষাদানের জন্ত বিস্তর বিমান বৃটেন হইতে আমদানী হইতেছে। ভারতেও বিমান-নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিমান-পরিচালনযোগ্য স্পিরিট, তৈল প্রভৃতি প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

ঢ্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাবে অর্থসদস্য তাহার উপযোগিতার কথা ত শুনাইয়া দিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজনের সময় ভারত আত্মরক্ষায় কত দূর কৃতকার্য হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এ জন্ত টাকার অভাবের কথা শুনিতে না হইলেই মঙ্গল।

যুদ্ধে ভারত

সম্প্রতি মাদ্রাজের শাসনকর্তা সার আর্থার হোপ বর্তমান যুদ্ধে সাহায্যদান প্রসঙ্গে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, “যাহাদের বৃটিশ সরকারের সহিত হয় ত মতের বিরোধ আছে, তাঁহাদের সর্বাস্তঃকরণে এই যুদ্ধে ক্রিষ্ট বৃটেনকে সাহায্য করিবার জন্ত অগ্রসর হওয়া উচিত।” এ দেশের

জনসাধারণ গ্রেট ব্রিটেনের অধীন প্রজা, অতএব তাহাদের তাহা অবশ্যকর্তব্য,—সার অর্থার উহার হেতু-নির্দেশে যদি এই কথা বলিতেন, তাহা হইলে কাহারও কোন কথা বলিবার ছিল না। কারণ, ভারতবাসী যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তখন তাহারা ব্রিটিশ জাতিকে এই যুদ্ধে সাহায্য করিতে বাধ্য; কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই। তিনি এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য-নির্দেশে তাহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, “এই যুদ্ধ ডেমক্রেসী বা গণতন্ত্রের জন্ত যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমরা দেখিতে চাই যে, ভবিষ্যতে আমাদের সভ্য জাতিরূপে, ভারতেই হউক আর ব্রিটেনেই হউক, বাস করিবার অধিকার আছে।” ব্রিটিশ জাতি সম্বন্ধে এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর সম্বন্ধে কি এই কথা সরল ভাবে বলা যাইতে পারে?

ভারতসচিব মিষ্টার আমেরী উহার পর যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহারা যুরোপে গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশে অর্থাৎ এই ভারতের কুত্রাপি গণতন্ত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, গণতন্ত্রের লক্ষণই এই যে, যেখানে দেশীয় সরকার দেশের লোকের হিতার্থ এবং দেশের লোক কর্তৃক পরিচালিত হয়, সেইখানেই গণতন্ত্র বিরাজিত। এ দেশে কি তাহাই হয়? তাহা যদি না হয় এবং ব্রিটিশ সরকার যদি যুদ্ধান্তেও ভারতবাসীকে গণতন্ত্র দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিটুকুও দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাদের বিঘোষিত গণতন্ত্রের অনুকূলে ভারতবাসী আকৃষ্ট হইতে পারে না। যাহার যাহা নাই, এবং যাহা পাইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ থাকা কিরূপে সম্ভব বা সম্ভব হইতে পারে? মাদ্রাজ লর্ড বলেন, “আরও দুইটি কারণে ভারতবাসীর সর্বান্তঃ-করণে গ্রেট ব্রিটেনের সহায়তা করা কর্তব্য। প্রথমতঃ, আমরা অধিকারের জন্ত যুদ্ধ করিতেছি। আমরা ধর্মের জন্ত যুদ্ধ করিতেছি। ধর্ম বিষয়ে এবং অগ্ন্যায় বিষয়ে মত-প্রকাশে স্বাধীনতা দানের জন্ত আমরা যুদ্ধ করিতেছি।” লোকের অধিকার যাহাতে নাই,—তাহার মর্ম তাহারা সাধারণতঃ বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহার উপর তাহাদের দরদ থাকিবারও কথা নয়।

ধর্ম সম্বন্ধে মত-প্রকাশে ভারতবাসীর কতকটা স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু অগ্ন্যায় বিষয়ে যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব, এ বিষয়ে মতভেদ আছে কি? তবে বাঙ্গালায় ধর্ম-চরণের স্বাধীনতা একালে কতটুকু রক্ষিত হইতেছে, মাদ্রাজের নবাগত লর্ডের তাহা জানা না থাকিতে পারে। তাহা জানিয়া লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন নহে; দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। তবে তিনি শেষ কারণ যাহাতে পাইয়াছেন—তাহা অনেকটা সত্য বটে; হিটলারের জয় হইলে “আমরাও যাইব, তোমরাও যাইবে।” এই উক্তি যে অতুক্তি, ইহা কে বলিবে? ধর্ম এবং সংস্কার-রক্ষার স্বাধীনতা ভারতবাসী পছন্দ করে এবং চিরদিনই করিবে। সেজন্য ভারতবাসী নাজী-শাসন অপেক্ষা ব্রিটিশ-শাসনের অধিকতর পক্ষপাতী, ইহা তাহাদের অন্তরের কথা।

গান্ধীজীর তৃতীয় পক্ষ

গান্ধীজীর পূর্বপ্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন এবং দলবদ্ধ ভাবে আইনভঙ্গ আন্দোলন নিফল হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। দলবদ্ধ ভাবে আইনভঙ্গ আন্দোলনের ফলে বহু লোক জেলে গিয়াছিল, বহু পরিবারের কষ্ট হইয়াছিল, তাহা গান্ধীজী বুঝেন। সেই জন্ত বোধ হয় তিনি এবার ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন যে, সকলেরই মনোভাব ব্যক্ত করিবার শ্রায়সম্মত অধিকার আছে; সে অধিকার ক্ষয় করা উচিত নহে। এই যুক্তি দেখাইয়া তিনি বড় লর্ডের নিকট যাহারা যুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী, তাহাদিগকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারণা করিবার স্বাধীনতা চাহেন। বড় লর্ড সেরূপ স্বাধীনতা দেন নাই,— দিতে পারেন না, ইহা জানা কথা। এক্ষণে অবস্থায় গান্ধীজী ভিনোবা ভাবে নামক এক ব্যক্তিকে দিয়া ব্যক্তিগত-ভাবে আইন অমান্য করাইলেন। ফলে সেই ব্যক্তি বিনা-শ্রমে তিন মাসের জন্ত জেলে আটক রহিল। আশা করি, এইখানেই এই আন্দোলনে পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে। কারণ, ইহাতে কোন সফল ফলিবে না। আমরা এই ঘটনার সংবাদ মাত্র জানাইয়া রাখিলাম।

কেন্দ্রী পরিষদে স্মৃত্যচক্র

কেন্দ্রী পরিষদের সদস্য সূর্য্যকুমার সোম মহাশয়ের পরলোকগমনে সদস্যের পদ খালি হওয়ায় ঢাকা বিভাগের অমুসলমান কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবার জন্ত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ-চন্দ্র নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত অঘোরবন্ধু গুহ মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিয়াছিলেন। ইহারা তিন জনই যোগ্য ব্যক্তি, এবং স্বদেশের নিষ্ঠাবান সেবক; কিন্তু দেশগৌরব শ্রীযুক্ত স্মৃত্যচক্র বস্তু শেষ-মুহুর্তে এই পদের প্রার্থী হওয়ায় তাঁহারা সকলেই স্মৃত্য বাবু দাবীই অগ্রগণ্য মনে করিয়া স্বৈচ্ছায় মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহার করিয়া-ছিলেন। ইহা তাঁহাদের সুবিবেচনা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। স্মৃত্যচক্র বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। বড় লাঠি কর্তৃক তাঁহার নির্বাচন স্বীকৃত হইলেও স্মৃত্যচক্র এখন ভারত-রক্ষা আইনানুসারে হাজতে অবস্থিতি করিতেছেন, এ কারণে তিনি গত এই নভেম্বর কেন্দ্রী পরিষদের হৈমন্তিক অধিবেশনের আরম্ভের দিন পরিষদের কার্যে যোগদান করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত স্মৃত্যচক্র বস্তু নাম ডাকা হইলে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র আনন্দধনি করেন। বড় লাঠির বিশেষ আদেশে ভিন্ন স্মৃত্যচক্রকে অধিবেশনে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে—তাঁহার সম্মতি নাই। যাহা হউক, স্মৃত্যচক্র কংগ্রেস কর্তৃক বহিস্কৃত হইলেও তাঁহার সম্মুখে তাঁহার স্বদেশবাসীরা কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার নির্বাচনেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেন্দ্রী পরিষদের বর্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব হিসাবে ইহাতে স্মৃত্যচক্রের যোগদানে বাধা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

মিঃ রুজভেন্ট পুনর্নির্বাচিত

লণ্ডন হইতে প্রেরিত ডই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ রুজভেন্ট তৃতীয় বার মার্কিং যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ উইল্কি পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাকে মাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিঃ রুজভেন্ট তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা অনেক অধিক ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন—ইহাই জানিতে পারা গিয়াছে। মিঃ রুজভেন্ট পর পর তিন বার মার্কিং যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া এ বিষয়ে 'রেকর্ড' স্থাপন করিলেন। রুজভেন্টের এই জয়ের সংবাদে গ্রেট বৃটেনের সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসী আনন্দিত হইয়াছে; কারণ, তিনি পুনর্বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায়, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজ মার্কিং যুক্তরাজ্যের নিকট নানা ভাবে সাহায্য লাভের আশা করিতেছে। রুজভেন্ট

এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার পূর্বেই বলিয়া-ছিলেন, “বিমান ও অস্ত্র যে-কোন যুদ্ধোপকরণ দ্বারা বৃটেনকে সাহায্য করা হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে গণ-তন্ত্রের শেষ আশ্রয়স্থল বৃটেনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত আমরা যুদ্ধে যোগদানও করিব।”—কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী উইল্কি বৃটেনকে এ ভাবে সাহায্য দানের কথা বলিতে পারেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন, “যুক্তরাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্তই আমরা যুরোপীয় যুদ্ধে জড়িত হইব না; তবে আমরা প্রচুর সমর-সম্ভার উৎপন্ন করিয়া বৃটেনের নিকট বিক্রয় করিব। আমেরিকা যুরোপীয় সমরে যোগদান করিলে প্রশান্ত মহাসাগরে ও সুদূর প্রাচ্য-ভূখণ্ডে জাপান কর্তৃক মার্কিংের স্বার্থ বিপন্ন হইবে।”

সুতরাং মিঃ উইল্কি জয়লাভ করিলে বৃটিশ জাতি মার্কিং যুক্তরাজ্যের নিকট আশানুরূপ সাহায্য পাইতেন বলিয়া মনে হয় না। মিঃ রুজভেন্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় মার্কিং পররাষ্ট্র-নীতি বৃটেনের অক্ষুণ্ণ হইবে সন্দেহ নাই। এজন্ত জার্মান জাতি তাঁহার নির্বাচনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়; কারণ, গ্রেট-বৃটেনকে মার্কিং জাতির সাহায্যদানের মূল্য জার্মান জাতির অজ্ঞাত নহে। যাহা হউক, বর্তমান যুদ্ধ অতঃপর কোন্ পথে চলিবে, এবং গ্রেট বৃটেন মার্কিং যুক্তরাজ্যের নিকট প্রত্যক্ষতঃ ও পরোক্ষতঃ কিরূপ সহায়তা লাভ করে ও তাহার পরিণাম কি, সমগ্র সভ্য জগত তাহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে সন্দেহ নাই। গ্রেট বৃটেন মার্কিং যুক্তরাজ্যের যথাযোগ্য সাহায্য পাইলে জার্মানী সন্ধির জন্ত উৎসুক হইতেও পারে।

পণ্ডিত জওহরলালের কারাদণ্ড

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর সহিত কোন কোন বিষয়ের আলোচনার জন্ত ওয়ার্কায় গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনের সময় গত ১৪ই কার্তিক সায়ংকালে তাঁহাকে ছেওকি ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গোরক্ষপুর অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে পণ্ডিতজী যে সকল বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন, সেই সকল বক্তৃতা-সম্পর্কেই তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে ধরা হইয়াছিল। এলাহাবাদ ষ্টেশনের ১৫ মাইল দূরস্থ ছেওকি ষ্টেশনে জওহরলালজী ট্রেন পরিবর্তনের জন্ত ট্রেন হইতে অবতরণ করিতেই পুলিশের এক জন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যান। প্রথমে তাঁহাকে এলাহাবাদের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট উপস্থিত করা হয়। তাহার পর তাঁহাকে গোরক্ষপুরে লইয়া গিয়া তথায় জিলা-জেলের মধ্যে গত ৪ঠা নভেম্বর তাঁহার বিরুদ্ধে মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। তাঁহার ছুটি ভগিনী সেখানে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মামলার বিচারকালে পণ্ডিতজী বলেন, যাহা প্রমাণিত তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া সরকারী উকিল অথবা কষ্ট পাইয়াছেন। হাকিম বিচার শেষ করিয়াছেন; পণ্ডিত-জীকে ৩ দফা অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেক দফায় এক বৎসর চারি মাস হিসাবে মোট চারি বৎসরের জ্ঞা কারাদেশ দণ্ডিত করা হইয়াছে।

পরমাচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন

বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি—ঋষিকল্প পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে গত ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে বারাণসী-ধামের চৌষটি যোগিনী ঘাট হইতে অমৃতলোকে যাত্রা করিয়াছেন। ব্রহ্মলোক-যাত্রার বহু দিন পূর্বেই পরম পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় মণিকর্ণিকার ব্রহ্মনালের চরণপাদুকায় তাঁহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইবার জ্ঞা বারাণসী-কালেক্টারের অনুমতি-পত্র আনা হইয়া রাখিয়াছিলেন। শেষ-শয়নের জ্ঞা দীর্ঘ কুশাসন প্রস্তুত করাইয়া—চিত্তা প্রজ্বলন জ্ঞা দেশলায়েব পরিবর্তে চকমকি—শোলা—নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া সম্বন্ধে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজ শ্রাদ্ধের—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীদিগকে বিদায় দানের স্বেচছা দিয়াছিলেন। দীর্ঘকালের রোগ-যন্ত্রণা তাঁহার তপস্যায় পরিণত হইয়াছিল। সেই সাধনার সিদ্ধিতে শরীরত্যাগের কম দিন পূর্বে হইতে তিনি সর্বদা ব্রহ্মময়ী মায়ের সান্নিধ্য—তাঁহার স্নেহ-সুকোমল স্পর্শ অনুভব করিতেছিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে করিতে—সুপ্রসন্ন বদনে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া, পূর্ণ সজ্ঞানে তিনি সানন্দে নখর শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই হিন্দুর বাঞ্ছিত মৃত্যু—নির্কীর্ণ মুক্তি।

পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় বাঙ্গালার—তথা সমগ্র ভারতের অলঙ্কার—প্রতিভা-পাণ্ডিত্যের দীপ্ত জ্যোতিঃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে সনাতনী হিন্দুসমাজের যে ক্ষতি হইল—স্বধর্মনিষ্ঠ আদর্শ ব্রাহ্মণের যে অভাব ঘটিল—পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার অন্ধ অনুসরণে ব্যস্ত বর্তমান যুগে তাহা পূর্ণ হইবার আশা নাই।

২৪ পরগণার বিদ্যাসাধনার লীলানিকেতন—ভট্টপল্লী—ভাটপাড়ায় ১২৭৩ সালে তর্করত্ন মহাশয় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা স্বর্গীয় নন্দলাল বিচারত্ন মহাশয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জয়রাম জায়ভূষণ—পরে স্বনামধন্য খাচার্য্য শিবচন্দ্র সার্কভৌম মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া, ১২৯৩ সালে তর্করত্ন মহাশয় যোগেন্দ্রনাথ বসুর অনুরোধে 'বঙ্গবাসী'র শাস্ত্র-প্রচার কার্যের ভার গ্রহণ করেন। তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদন করিয়া, বহু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের উপস্থারের

পরিষ্কার ও সাংখ্যদর্শনের পূর্ণিমাটীকা প্রণয়ন তাঁহার বিশিষ্ট দান। ১২৯৬ সালে তিনি স্বভবনে চতুর্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদ্যার্থীগণকে জ্ঞান ও অন্নদানের ব্যবস্থা করেন। গিরিশচন্দ্র বসুর অনুরোধক্রমে কিছু দিন তিনি বঙ্গবাসী কলেজে অবৈতনিক সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্যে ব্রতী হইয়া-ছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-সময়ে সন্দেহ-ক্রমে সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন—তিন দিন হাজতবাসকালে তিনি জলবিন্দু পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই।

তিনি ব্রাহ্মণসভার সভাপতি—একবার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি—সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদের—মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফণ্ডের নিয়ন্তা—জাতীয় শিল্প-পরিষদের সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। সরকার তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্মাননার জ্ঞা 'মহামহো-পাধ্যায়' উপাধি প্রদান করিলেও তিনি দরবারে সে সনদ আনিতে যান নাই; সরকারের প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তি—'মহামহোপাধ্যায়ের' পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন নাই। সর্বদা আইনের প্রতিবাদে তিনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'মহামহো-পাধ্যায়' উপাধি বর্জন করেন।

দক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্তমান বেদাণ্ড ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দর্শন ও সঙ্গলাভে তর্করত্ন মহাশয় ধন্য হইয়া-ছিলেন। ঠাকুরের দেহানসানে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ নবীন সন্ন্যাসীপুন্দ যখন বরাহনগরে মঠ স্থাপন করিয়া সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন তর্করত্ন মহাশয় প্রায়ই মঠে গমন করিয়া তাঁহাদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন পদব্রজে বাঙ্গালা দেশ পরিভ্রমণে বাহির হইয়া, বাঙ্গালায় বেদ অমূল্যলন প্রবর্তনের জ্ঞা ভট্টপল্লীতে উপনীত হন, তখন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাকে পরম সমাদরে স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন—প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে আহার্য্য সাজাইয়া আনন্দিত করিতেন। ভাটপাড়ায় বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শে ভট্টপল্লী-সংস্কৃত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে দেশগৌরব সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করার ফলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ-বেদান্ত অধ্যাপনার স্বেচছা প্রবর্তন করেন।

তর্করত্ন মহাশয় পরে কাশীধামে গমন করিয়া স্বগৃহে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত বিদ্যার্থীগণের জায়-বেদান্ত অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রায় দশ বৎসর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে তর্করত্ন মহাশয়ের কাশীনিবাসে বহুবার আসিয়া তাঁহার সুপরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর ভারতমাণ্ড

তর্করত্ন মহাশয় পাঁচ বৎসর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে ধর্মোপদেশক হইতে পারিবেন না, তাঁহার প্রবর্তিত এই নিয়ম সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় তর্করত্ন মহাশয় কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

অম্পৃগগণকে মন্দির-প্রবেশ অধিকার প্রদানের আইনের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন পরিচালন করেন। 'মাসিক বসুমতী'র অক্ষয় সম্পাদকের একান্ত অনুরোধে—প্রথমে তর্করত্ন মহাশয় সদলে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে গমন করিয়া, শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন। সেই আশীর্বাদের অনুরোধে সার নৃপেন্দ্রনাথ ভারত সরকারের আইন-সদস্যরূপে এই ধর্মধ্বংসকারী বিল নিরোধ করিয়া, স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু সমাজের ধর্মরক্ষা করিয়া ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন।

প্রধানতঃ তর্করত্ন মহাশয়ের প্রয়াসে গান্ধীজীর গুরুবাবুর মন্দির-আন্দোলনও প্রতিহত হয়—গান্ধীজী অনশনে বিরত হন। প্রবর্তক সজ্জের আচার্য্য শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বারবেদায় গান্ধীজীর সহিত তর্করত্ন মহাশয়ের তর্কযুদ্ধের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেই আলোচনা-সভায় তর্করত্ন মহাশয়ের অবিসম্বাদী যুক্তিনৈপুণ্যে গান্ধীজীর যুক্তিসিদ্ধান্ত শতধা বিচ্ছিন্ন হয়। পূণার ধর্মসম্মেলনে অশান্ত-উত্তেজিত জনতা তর্করত্ন মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতার শাস্ত-সম্মোহিত-সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাম্বিত হইয়াছিল। সরকারী আদেশে ভবানীপুর ব্রিজিতলায় শিবলিঙ্গ অপসারিত হইলে—প্রতিবাদকল্পে তর্করত্ন মহাশয় পণ্ডিতগণের অগ্রণী হইয়া লাটসাহেবের নিকট গমন করেন। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী সংস্কৃত বক্তৃতা শুনিয়া—আবেশ-বিহ্বল ভাব দেখিয়া লাটসাহেব মুগ্ধ হন এবং তৎক্ষণাৎ ব্রিজিতলায় শিবলিঙ্গ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করেন। বারাণসী ও ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ সম্মেলন তর্করত্ন মহাশয়ের নিয়ন্ত্রণে সফল হইয়াছিল—দেশে ব্রাহ্মণ-গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি বর্ণাশ্রম স্বরাজসজ্জের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

শেষ-জীবনে কাশীবাসকালে তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার স্নেহাস্পদ 'বসুমতী'-স্বত্বাধিকারীর অমুনয়ে শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীর দুইটি খণ্ডের প্রাঞ্জল অনুবাদ ও সম্পাদন করেন। সেই অমূল্য সম্পদ বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরে তিনি অনন্তচিন্ত হইয়া ব্রহ্মহূত্রে শক্তিভাষ্য প্রণয়নে আত্মনিবেদন করেন। রোগযজ্ঞণা অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল ত্রায়প্রস্থান বেদান্তদর্শনের নহে—শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষদ্রাজি—স্মৃতিপ্রস্থান শ্রীমদ্ভগবত-গীতারও শক্তিভাষ্য প্রণয়ন সমাপন করিয়া পূজ্যপাদ

আচার্য্য তর্করত্ন মহাশয় শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মহনীর চিন্তার দানে ধর্মজগৎ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি যে শিবাবতার শঙ্কর—ভক্তাবতার রামানুজ—মাধব প্রভৃতি আচার্য্যের সমকক্ষ দার্শনিক—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। দীর্ঘ দিন বাঙ্গালী দার্শনিক পণ্ডিতের প্রতিভা-পাণ্ডিত্য—নূতন চিন্তার দানে দর্শনশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয় নাই—তর্করত্ন মহাশয়ের জীবন-সাধনা তাই সার্থক হইয়াছে—গৌরব-জ্যোতি সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ধর্মপ্রাণ ভারতে প্রতিভাবতার বিভিন্ন আচার্য্য বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়া অমর কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু

ভা র তে র—
বি শে ষ তঃ
বাঙ্গালার সর্ব-
শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসম্প্র-
দায়ের উপজীব্য
বেদান্ত-দর্শনের
শক্তিভাষ্য প্রণ-
য় নে কো ন
পণ্ডিত মহা-
শয়ই এ পর্যন্ত
মনোযোগী হন
নাই। তাই
অনন্ত-সাধারণ
প্র তি ভা ও
মনীষার অধী-
শ্বর ভা র ত-
পূজ্য তর্করত্ন
মহাশয় ব্রহ্ম-
হূত্রে—গীতা—
উ প নি ষ দে র
ব্যাখ্যায় শক্তি-
বাদ স্মৃতি-



সর্বশাস্ত্র-পরমাচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন

ষ্ঠিত করিয়া—শাস্ত্রদর্শন প্রণয়নে বাঙ্গালী হিন্দুর যুক্তি-লাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এজন্ত ভাষার শক্তিতে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন সম্ভবপর নহে।

ভারতের বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল—সর্বদা সহপদে দানে উৎসাহিত করিতেন। ধর্মপ্রসঙ্গে কাহারও মনে কোন সংশয় হইলে—স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থায় কাহারও সন্দেহ হইলে তিনি স্বতঃ-প্রথমে তাঁহাদের সন্দেহ নিরসন করিতেন। কোন যুক্তি-তর্কের সাহায্যেই তাঁহার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সম্ভবপর হইত না। বিভিন্ন শাস্ত্রের শ্লোকরাশি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল—অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন,—এরূপ

অলৌকিক সৃতিশক্তি যোগী-ঋষির পক্ষেই সম্ভব। তিনি কোন কোটিপতির লক্ষ টাকার প্রেলোভন উপেক্ষা করিয়া সগর্বে চির দারিদ্র্য বরণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবস্থা দেন নাই।

‘মাসিক বসুমতী’ তর্করত্ন মহাশয়ের অমুগ্ধ লাভে ধৃত হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রভাদীপ্ত প্রবন্ধে-নিবন্ধে ‘মাসিক বসুমতী’র গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়াছে। মূর্খ্য খনস্থায়ও তিনি ‘মাসিক বসুমতী’র কথা বিশ্বস্ত হন নাই। সেই অবস্থাতেও আশ্বিন-সংখ্যায় তিনি যে মাতৃস্তুতি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মনিবেদিত ভক্তিমাধুরী উদ্ভাসিত—ঋষি-প্রভা বিভাসিত। তাহার পরও নৃসিংহ-দেবকে স্মরণ করিয়া তিনি মুখে মুখে যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কাব্যজগতে তাহা অতুলনীয়। অল্প পরিসরে তর্করত্ন মহাশয়ের পুণ্যময় স্মদীর্ঘ জীবন-সাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন সম্ভব নহে। তাঁহার আশীর্ব্বাদে— তাঁহার সুপবিত্র জীবনযজ্ঞের জ্যোতিরশ্মিরেখার অনুসরণে পথত্রান্ত বঙ্গবাসী আবার স্বধর্ম্মের পথে অবিচলিত দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয়ডঙ্কা নিনাদে জগদ্বাসীকে উদ্বোধিত করুক। তর্করত্ন মহাশয়ের চির জীবনের আশা সফল হউক।

পরলোকগত বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

গত ১৬ই আশ্বিন বুধবার প্রভাতে ৭টার সময় নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, এই সংবাদে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল, এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি এক রকম ভালই ছিলেন। সেই দিন প্রভাতে চা পান করিবার পর হৃদযজ্ঞের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ার তাঁহার মৃত্যু হয়।

বরদাপ্রসন্নবাবু থিয়েটার, বায়োস্কোপ ও রেডিয়ার জন্ত অনেক নাটক, প্রহসন ও গান রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অনেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং ‘বসুমতী’র সহিত অনেক দিন তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার রচিত কোন কোন নাটক সাহিত্য-সমাজে প্রশংসিত হইয়াছিল। তিনি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন, এবং সাহিত্যসেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ঢাকা জিলার বঙ্গবোগিনী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবন কলিকাতাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল; আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাক্তার বারিদবরণ পরলোকে

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় গত ৯ই কার্তিক শনিবার ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আমরা মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিয়াছি। ডাক্তার বারিদবরণের পিতা স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চন্দননগরের প্রতিষ্ঠাপন্ন অধিবাসী ছিলেন। বারিদবরণ চন্দননগরের ডুপ্পে কলেজ হইতে



ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন, এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেও তিনি পরে হোমিওপ্যাথির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া হোমিওপ্যাথি মতে রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসায় তাঁহার এরূপ হাতবশ হইয়াছিল যে, যে সকল চিকিৎসক এক্ষণে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসায় রত আছেন, তিনি তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়গণের অগ্রতম বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এ দেশের এক জন সুচিকিৎসকের অভাব হইল। তিনি মিষ্টভাষী এবং জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার সহৃদয়তার জন্ত তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার পাঠানুরাগ প্রবল ছিল, এবং আজীবন তিনি ছাত্রের ত্রায় জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

তর্করত্ন মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে

১

গত আশ্বিনের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে বাঙ্গলার—শুধু বাঙ্গলার নয়—ভারতের আন্তিক সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকুলের অগ্রণী, সর্বদর্শন-পরমাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন ৬কাশীধামে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্বক নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। ইহাতে আন্তিক হিন্দু সম্প্রদায়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। গত কয়েক বৎসর তাঁহার সহিত নানা কারণে আমার সাক্ষাৎ বার্তালাপাদি ব্যাপার দুর্ভাগ্যক্রমে বিরত ছিল; কিন্তু তাঁহার মহাপ্রয়াণের পূর্ববর্তী দিবসে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় যখন আমি শুনলাম, তিনি আমার সহিত শেষ-দেখা করিবার জন্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার সেই মহাপ্রয়াণের শয্যায় তাঁহাকে দেখিবার জন্ত, শুধু দেখিবার জন্ত নহে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে সকল ব্যবহারে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছি, একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্তও পরদিন বেলা ৯টার সময় তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে সময়ে তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছি, এবং দেখিয়া আমার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধাগৌরবপূর্ণ ভাবের উদয় হইয়াছিল, সাধারণ সমক্ষে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আমার একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে হওয়ার আমি এখানে তাহার কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

তাঁহার সহিত আমার যে প্রকার নিকট-আত্মীয় সম্বন্ধ ছিল, তদনুসারে এ প্রকার কিছু লেখা বর্তমান কালের নীতি অনুসারে সুসঙ্গত কি না, তাহা জনসাধারণ বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি আমার তৎকালীন মনের অবস্থা যদি হিন্দু সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ না করি, তবে আমার পক্ষে তাহা কর্তব্যের ক্রটি বলিয়াই আমার প্রতীত হয়, এবং আমার মনে হয়—সেই কর্তব্যনিষ্ঠ মহাপ্রাণ লোকাভীত পুরুষশ্রেষ্ঠের যে জাজ্বল্যমান—সকলের শিক্ষাপ্রদ ব্রহ্মণ্যমূর্তির অলৌকিক চিত্র তাঁহার মহাপ্রয়াণকালে আমার নয়নে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় বর্তমান সময়ে আন্তিক হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য জ্ঞেয়; এই কারণেও আমি ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

গীতায় আছে :—

ওমিত্যোকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামমুশ্বরন্ ।

যঃ প্রযাতি তাজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

বাল্যকাল হইতে এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অনেকবারই গীতার এই পুণ্যশ্লোক পড়িয়াছি, কিন্তু এই শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য যে প্রত্যক্ষভাবে আমার সম্মুখে কখনও প্রকাশিত হইতে পারে, এরূপ আশা আমি পূর্বে কখনও করি নাই; কিন্তু মহাপ্রয়াণের জন্ত উদ্বৃত্ত, বিবশাক্ষ, অথচ সম্পূর্ণ চেতনা-সম্পন্ন তর্করত্ন মহাশয়কে মৃত্যুশয্যায় শয়ান দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত সেই সময়ের যথাসম্ভব কয়েকটি কথাবার্তা করিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, গীতার উক্ত শ্লোক যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছে। মরণ আসিয়া সম্মুখে দাড়াইয়াছে—তখন তর্করত্ন মহাশয়ের এ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান, অথচ কোনও প্রকার ভয়ের, উদ্বেগের, বা বিকলতার কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না! তিনি তখন আমার হাতে হাত মিলাইয়া—দীর, গম্ভীর ও ঈষদম্পর্শস্বরে আমাকে বলিলেন, ‘দেখ প্রমথ! আমি মরণের জন্ত প্রস্তুত আছি। জগদম্বার চিদানন্দময়ী মূর্তি আমার উপরে, নীচে, আশে-পাশে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; জগদম্বার এমন করুণা আমি এ জীবনে আর কখনও অনুভব করি নাই। আমার ভয় নাই, আনার কোনও উদ্বেগ নাই, আমার সর্বদাই মনে হইতেছে—অপার্থিব আনন্দের সমুদ্র উদ্দেশ হইয়া আমাকে গ্রাস করিতেছে। আমি ত চলিলাম, তুমি রহিলে, যতটুকু পার—সনাতন ধর্ম্মের মহনীর পুণ্য আদর্শ যাহাতে অক্ষয় থাকে—সে জন্ত তুমি সামর্থ্যানুসারে চেষ্টা করিবে, ইহাই আমার তোমার কাছে শেষ নিবেদন।’

তাঁহার সহিত আরও কতকগুলি কথা হইয়াছিল, আরও হৃদয়-দ্রবকর কতকগুলি ব্যবহার হইয়াছিল; এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করা বর্তমান সময়ে আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে তাৎকালিক বিবরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইল। আশা করি, শ্রদ্ধেয় আন্তিক সম্প্রদায় তাহা পাঠ করিয়া—তর্করত্ন মহাশয়-কি ছিলেন, তাঁহার তিরোভাবে আন্তিক হিন্দু-ভারতের কি

দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়া,
—এখনও হিন্দুর আত্মরক্ষার জন্ত কি করা কর্তব্য, সে
বিষয়ে ভাল করিয়া ভাবিবার জন্ত প্রস্তুত হইবেন।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)।

২

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কয়েক বৎসর ধরিয়া
জ্বর, শূলবেদনা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কাতর
ছিলেন। মধ্যে মধ্যে একটু ভাল থাকিলেও তাঁহাকে
প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকিতে হইত; শেষে মৃত্যু ক্রমেই
নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাপ্রয়াণের
প্রায় এক বৎসর পূর্বে হইতে তিনি মানসসরোবরস্থ স্বকীয়
বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া চৌঘট্টা ঘাটের উপর
অবস্থিত ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার
একমাত্র আকুল আকাঙ্ক্ষা—হিন্দুর এই স্তম্ভবিহীন তীর্থে
সুরধনীকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহারই তীরে জীবনের
শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক শ্রীশ্রীবিষ্ণুনাথের পাদপদ্মে
বিলীন হইয়া, মুক্তিক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে পবিত্র লাক্ষণকূলে
জন্মগ্রহণের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এমন কে আছেন, যিনি তর্করত্ন
মহাশয়ের নাম শ্রবণ করেন নাই? তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা,
স্বদেশপ্রেম, শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, কঠোর রুচুসাধন,
ঋষিবাক্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মণোচিত
তেজঃ ও সাহস, ভগবদভক্তি এবং তাঁহাতে একান্তভাবে
নির্ভরতা, আন্তিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক নরনারীর
চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিয়াছে। সকলেই
তাঁহাকে দেবতার গায় সম্মান করিত। ষাঁহার তাঁহার
সহিত একমত হইতে পারিতেন না, তাঁহারাও তাঁহাকে
শ্রদ্ধা ও ভয় করিতেন। বর্তমান সময়ে তাঁহার তুল্য প্রগাঢ়
পাণ্ডিত্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

মৃত্যু নিকটে, কিন্তু মৃত্যুভয়হীন, রোগে ভুগিয়া দেহ
অস্থিচর্ম্মসার, কিন্তু প্রায় দিবারাত্রিই পুঁথি লেখা চলি-
তেছে! নিজে লিখিতে যখন অসমর্থ হইলেন, তখনও মুখে
বলিয়া যাইতেছেন, অপর কেহ লিখিয়া লইতেছে। এই
দারুণ যন্ত্রণাদায়ক রোগশয্যায় পড়িয়া-থাকিয়াই তাঁহার
অন্তিম জীবনে কয়েকখানি দ্রুত অমূল্য গ্রন্থ লিখিত হয়,
কয়েকখানি মুদ্রিতও হয়। তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের

শক্তিভাষ্য, গীতাশক্তিভাষ্য, উপনিষদের শক্তিভাষ্য, ও
কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে
তিনি যে সুন্দর সুন্দর অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোক অনর্গলভাবে
লিখিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ, নৃসিংহদেব সম্বন্ধে যে সকল
শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে অবাক
হইতে হয়!—কোন্ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া একরূপ
দুর্বল শরীরেও এমন সক্রিয় মন সর্কদাই কার্যে রত ছিল,
তাহা আমাদের মত শ্রদ্ধাবুদ্ধিবিহীন মানব কিরূপে ধারণা
করিবে? শাস্ত্রের কত জটিল সমস্যা দিনের পর দিন
সমাধান করিয়া বুদ্ধমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিতেন। সর্কা-
পেক্ষা চমকপ্রদ হইতেছে—তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে
তাঁহার শেষ মিলন বা অস্তিত্ব বিদায়গ্রহণের দৃশ্য।

প্রতিবৎসরই ভট্টপল্লীস্থ ভবনে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব
হইয়া থাকে। দেহে যত কাল শক্তি ছিল, তর্করত্ন মহাশয়
তত দিন স্বয়ং মায়ের পূজা করিয়াছেন। তিনি যখন পূজা
করিতে বসিতেন, তখন সেই মৃন্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ীরূপে
প্রতিভাত হইত। তাঁহার নয়ন যুগলে দরদরিত অশ্রুধারা,
ও ভক্তিভরে ‘মা মা’ রবে আকুল আহ্বান—চণ্ডীমণ্ডপে
এক দিব্যভাবে সঞ্চারণ করিত; সে সময়ে অস্তিত্ব
পামণ্ডের হৃদয়ও ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইত; সান্ত্বিকভাবে
বিকাশে সর্কাঙ্গে পুলক ও নয়নে আনন্দাশ্রু দেখা দিত।
যিনি তাহা না দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সে ভাবের
অনুভব করা কদাচ সম্ভবপর নহে।

বর্তমান বর্ষে মহাপূজার সময় পূজা নিকিয়ে সম্পন্ন
হইবে কি না, এই ভাবনায় সকলেই আকুল! মহালয়ার
তিন দিন পূর্বে তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীজীব
গায়তীর্থে ডাকিয়া বলিলেন—“শ্রীজীব, তুমি ভাট-
পাড়ায় যাও, মায়ের পূজা সম্পন্ন কর; যিনি দয়া করিয়া
এ দিনের গৃহে আসিয়াছেন, আর এত কাল ষাঁহার অফুরন্ত
করণার ধারা আমার উপর অজস্রভাবে বর্ষিত হইয়াছে,
তিনি নিশ্চয়ই শেষরক্ষা করিবেন।” পিতার অন্তিম
পাইয়া শ্রীজীব গায়তীর্থে মহামায়ার পূজার জন্ত ভাটপাড়ায়
যাত্রা করিলেন। নবমীর দিন কাশী হইতে ‘তার’ আসিল,
‘পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকিলে সত্ত্বর চলিয়া আইস।’
বিসর্জনের পূর্বে যাত্রা করিবেন কি না ভাবিয়া গায়তীর্থে
ইতস্তত করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুনরায় ‘তার’

আসিল, “অবস্থা সঙ্গীন !” এই ‘তার’ পাইয়া তিনি সেই রাত্রিতেই কাশীযাত্রা করিয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, তখনও তর্করত্ন মহাশয় পূর্ণ সজ্জান। তিনি পুত্রের মুখে পূজা সূসম্পন্ন হওয়ার সংবাদ শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ, জগজ্জননী ভগবতীর অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া, এবং জননীর শাস্তিময় ক্রোড়ে কাঁপাইয়া পড়িবার সকল বাধাই অপসারিত হইয়াছে বুঝিয়া, গভীর শান্তি ও অটল নির্ভরের ভাব তাঁহার মুখে পরিস্ফুট হইল; কিন্তু মনে হইল, একটি বিশেষ দৃষ্টি জীবনে যেন রহিয়া গিয়াছে—যে জন্ত প্রাণ তখনও বাহির হইতেছিল না। প্রিয় ভগিনীপতি ভারতবিশ্বত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে যে শেষ-দেখা হয় নাই! প্রায় ১৫ বৎসর কাল যাবৎ ধর্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা লইয়া উভয়ের মতভেদ, ফলভেদ, দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যাপ্ত বন্ধ!

আবাল্যসঙ্গী এই দুইটি হৃদয় যে গভীর প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ, উল্লিখিত বিরোধ সত্ত্বেও যে অকৃত্রিম প্রীতি এতকাল অন্তঃসলিলা ফল্লুর আয়—উভয়ের হৃদয়ে সমভাবেই প্রবাহিত ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তর্করত্ন মহাশয়ের অন্তিমকালে এই দুই মহাপ্রাণ বন্ধুর মিলনের স্বর্গীয় দৃশ্য! যে কয় জন ভাগ্যবান ব্যক্তি সেই দৃশ্য-সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় অনির্কচনীয় মধুর রসে আপ্ত হইয়াছিল। এ কথা শুনিতে রূপ-কথার মত, ইহা কেবল সাধনাপূত জীবনেই সম্ভবপর।

শ্রীজীব সন্নিকটবর্তী হইবামাত্র তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, “একবার তোমার পিসে-মহাশয়ের কাছে যা, এবং যদি তাঁর প্রতিকূল ভাব না থাকে, তাহলে এই শেষ সময়ে তিনি যেন একবার দেখা করেন।” এদিকে কখন কি হয় ভাবিয়া, এবং পথশ্রমজনিত ক্লান্তি প্রভৃতি কারণে ‘একটু পরে যাইব’ ভাবিয়া, আয়তীর্থ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া এবং বহু লোকের সমাগমজনিত ব্যস্ততাবশতঃ অবকাশ পান নাই। এদিকে কখনও তিনি মাতৃরূপ-দর্শনে বিভোর, কখনও বা দু’-একটি কথা বলিতেছিলেন,—এই অবস্থায় তর্করত্ন মহাশয়ের সময় কাটিতেছিল। দিবাবসানের

পূর্বেই তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “কই? তোমার পিসে-মহাশয় কি এলেন না?” আয়তীর্থ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, “আপনার কাছ ছেড়ে যেতে পারিনি, তা আমি এখনই যাচ্ছি।” তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, “এখন তাঁর বেড়াবার সময়, গেলে হয় ত দেখা হবে, না, সন্ধ্যার পর যা’স।” রাত্রি সাড়ে ৮টার সময়েও শ্রীজীব যান নাই দেখিয়া বলিলেন, “এখনও তুই যাসনি?” তখনই আয়তীর্থ ব্যস্তভাবে তর্কভূষণ মহাশয়ের শিবালয়স্থ গৃহে উপস্থিত হইয়া পিতৃ-আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। মিলনের যে ব্যাকুল আগ্রহ তর্কভূষণ মহাশয়ের হৃদয়ে এত কাল রুদ্ধ ছিল, আজ যেন তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি তখনই দেখা করিতে যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেও সকল দিক ভাবিয়া পরদিন প্রাতঃকালে যাওয়াই স্থির করিলেন। একাদশীর প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ বেলা হইলে তর্করত্ন মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কই? প্রমথ এল না?”—শ্রীজীব বলিলেন, “তিনি পূজাপাঠ শেষ করে আসবেন বলেছেন; তিনি এলেন বলে!” এই কথা শেষ হইতে না হইতেই তর্কভূষণ মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তর্করত্ন মহাশয় ইহা জানিবামাত্র তাঁহাকে কাছে পাইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, মুমূর্ষু দেহে যেন নববলের সঞ্চার হইল! ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, “তুমি আমার একেবারে কাছে এসে ব’স।” শ্রীজীবকে বলিলেন, “এত কাছে, তবু ত আমি মুখখানা দেখতে পাচ্ছি নে!” শ্রীজীব জল দিয়া চক্ষু ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন; তথাপি দেখিতে পাইলেন না। তখন আর একবার শ্রীজীব গব্যন্তের দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তর্করত্ন মহাশয় হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “এইবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি; তুমি একবার আমাকে ভাল করে জড়িয়ে ধর, তোমার মুখখানা আমার একের ওপর রাখ।” তর্করত্ন মহাশয় তর্কভূষণ মহাশয়কে এই কথা বলিয়া শ্রীজীবকে বলিলেন, “আমার হাতখানা তুলতে পারছি নে, একবার প্রমথের কাঁধের উপর উঠিয়ে দাও।” উভয়ের চক্ষেই জল! সকলে নিস্পন্দ ও নির্ঝাঁক হইয়া দেখিতেছেন, “এ বাস্তব, না স্বপ্ন!” এ মিলনে উভয়ের কি পরিতৃপ্তি! কত পুরাতন কথা, পূর্বের স্মৃতি

উভয়ের মনকে আলোড়িত ও মথিত করিতে লাগিল; এবং ধীর শাস্ত্র স্বরে একঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ চলিল। তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, “জীবনে হয় ত অকারণে তোমার মনে কত বাথা দিয়েছি, আজ আমার প্রার্থনা—সে সকল তিক্ত স্মৃতি মন হ’তে একেবারে মুছে ফেল, আমাকে—আমাকে ক্ষমা কর।” তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, “এখন আমি ব্যবহার-রাজ্যের পরপারে, সমাজ ও ধর্মের জন্ত তোমার মত পরম প্রিয়জনকেও দূরে রেখেছিলাম। তোমার সহিত আর এখন কিসের বিরোধ? জীবনে তোমার মনেও অনেক ক্লেশ দিয়েছি, তুমিও আমাকে ক্ষমা কর। আমি ত চললাম—তুমি রইলে; যাতে বর্তমান সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রকৃত ধর্মপথে চালিত হয়, সে জন্ত তোমার শক্তি প্রয়োগ ক’রবে। তোমারও বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু শক্তির অভাব হবে না। তুমি সম্মত হ’লে মৃত্যুকালে এ আমার পরম শাস্ত্রের কারণ হবে। আর এক কথা, আমার পুত্রেরা রৈল—তাদের প্রতি তোমার যেন পূর্বের মত পুত্রবৎ স্নেহ থাকে।”

তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন—“তুমি যাবে কোথায়? আমি তোমাকে ঋণি ব’লে জানি, তোমাকে আবার ভারতে আসতে হবে। এই পথহারা ধর্মহীন ভারতকে আবার সনাতন মুক্তিমার্গ তোমাকেই দেখাতে হবে। তোমার আবির্ভাবে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের দুর্দশা ঘুচেবে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আসবার কামনা করি, সেবার তোমার বিরোধী রূপে নয়, তোমাকে সর্কতোভাবে অনুসরণ করবার জন্ত। আর তোমার পুত্রদের কথা ব’লছ—আজকালকার দিনে এমন পুত্ররত্ন খুব কম ভাগ্যবানই লাভ করতে সমর্থ হ’য়েছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, সকল দিক্ দিয়াই বর্তমানে তারা আদর্শ-স্বরূপ। ত্রীজীব, স্ত্রীজীব ও সঞ্জীব এবং বধুমাতারা সকলে মিলে এই দীর্ঘকাল যাবৎ বিধা ও অলস বর্জন ক’রে শ্রদ্ধার সঙ্গে অকুণ্ঠিতচিত্তে ও পরিপাটীরূপে পিতৃসেবার যে মহনীয় আদর্শ দেখিয়েছে, তা’ প্রত্যেক মানবের অনুকরণযোগ্য।”—তর্করত্ন মহাশয়ের মুখমণ্ডল প্রকৃত হইয়া উঠিল। তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, “তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় এই কাশীধামে। মদীয়

পরমারাধ্য পিতৃদেব যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তুমি তাঁর নিকট প’ড়বার জন্ত এসেছিলে—তোমার সে আশা পূর্ণ হয়নি; কিন্তু প্রথম দর্শনেই তুমি আমার আপন হ’য়ে-ছিলে। আজ আবার এই কাশীধামেই তোমার কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছি। বাল্যকালের সে দিনের কথা কি তোমার মনে আছে? তোমাতে আমাতে প্রায় সর্বদা একসঙ্গে বাস। এক দিন সারারাত্রি ভাট-পাড়ার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গাতীরে ব’সে হু’জনে নানা কপাবাড়াই, হাসিঠাট্টায় কাটাই। শেষ-রাত্রিতে যখন চৈতন্য হ’ল, তখন গৃহে প্রত্যাবর্তন ক’রে গুরুজনদের বকুনি খাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য ব’লে মনে না হওয়ায়, গঙ্গার ঘাটেই গায়ের চাদর বিছিয়ে উভয়ে শুয়ে-ছিলাম। প্রভাতে প্রাতঃস্নানের জন্ত গ্রামের বয়োবৃদ্ধ অনেকেই ঘাটে উপস্থিত। আমাদের সেই অবস্থার দেখে পূজ্যপাদ শ্রীধর ঠাকুর্দা-মশায় খেদ করে ব’লেছিলেন, ‘এই দুটো ভেলে একেবারেই ব’য়ে গেছে,—এদের আর কিছু হবার আশা নেই!’ কেহ বা আমাদের সেই রকম প্রীতি দেখে ব’লেছিলেন, ‘এরা স্ত্রীপুত্রন হলে নিশ্চয়ই বিবাহ হোত’।”

তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়া চলিলেন—“আজ বুঝি কথার শেষ নেই—দেখ তর্করত্ন! তুমি প্রায়ই বলতে (অবশ্য ঠাট্টা করে), আমাকে তোমার প্রণাম করা উচিত। বয়সে আমি তুমি অপেক্ষা কিছু ছোট হ’লেও যেহেতু তুমি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ ক’রেছ, সেই হেতু আমি তোমার গুরুজন, এবং প্রণম্য। কিন্তু তোমার সে কথায় আমি কোনও দিন মনোযোগ দিইনি; আজ আমি সত্যসত্যই তোমাকে প্রণাম ক’রছি—আদর্শ ব্রাহ্মণ ব’লে—ঋণি ব’লে।”—নয়নের জল দ্বিগুণ বহিল, হৃদয়ে হৃদয় স্পর্শ হইল, বাহুবন্ধন ক্ষণকালের জন্ত স্তূড় হইল,—পরক্ষণেই শিথিল হইয়া পড়িবার জন্ত।

সেই দিন রাত্রি, অর্থাৎ গত ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় তর্করত্ন মহাশয় সজ্ঞানে কাশীলাভ করেন, এবং মণিকর্ণিকায় ব্রহ্ম-নালাতে তাঁহার পার্শ্ব দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়।

শ্রীবেণনাথ ভট্টাচার্য্য।

ত্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ‘বসুমতী’ রোটারী মেসিনে ত্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শান্তাঙ্গ



১৯শ বর্ষ]

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

[২য় সংখ্যা]

গীতার দার্শনিক রহস্য

(গীতোক্ত সাংখ্য-যোগ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের ভিত্তিতে রচিত বেদান্তের
অন্ততম প্রশ্ন হইলেও উপনিষদের উপপাদন ও গীতার
উপপাদনের মধ্যে যে বড় রকমের একটা প্রভেদ আছে,

তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গীতা সমন্বয়সাধক
মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বেদান্তজ্ঞানের ত্রায় সাংখ্যবিজ্ঞানও
প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। যোগ-নিষ্ঠা, ভক্তিবাদ,
বিশেষতঃ, মানবদেহধারী ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতিও
প্রধান ভাবেই আলোচিত হইয়াছে এবং এই সকল
আলোচনার দ্বারা গীতার একটা নিজস্ব রূপের বিকাশ
হইয়াছে। উপনিষদ জ্ঞানপ্রধান। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক
প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ উপনিষদে সাংখ্য-প্রক্রিয়ার নামগন্ধও
পাওয়া যায় না। মৈত্রী, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে অব্যক্ত,
মহৎ প্রভৃতি সাংখ্য-দর্শনোক্ত পরিভাষার নাম শুনা
যায় বটে, কিন্তু তাহার অর্থ উপনিষদে সাংখ্য-প্রক্রিয়া
অনুসারে করা হয় নাই, বেদান্তের পদ্ধতিতেই করা
হইয়াছে। গীতার আলোচনায় কিন্তু সাংখ্যকে একেবারে
বাদ দেওয়া হয় নাই। অবশ্য সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত
যেমনটি, তেমনটি গীতায় গৃহীত হয় নাই। গীতায় শেষ
পর্ধ্যন্ত সাংখ্যজ্ঞানের উপর অদ্বৈত-বেদান্তের প্রাধান্যই

প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র নহে ইহা
আত্মরূপ পরব্রহ্মেরই দ্বিবিধ বিভাব। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিও
পুরুষ, এই মহাদ্বৈতের অদ্বৈতে পর্যাবসানই গীতায় ধ্বনিত
হইয়াছে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ গীতায় অঙ্গীকৃত
না হইলেও ত্রিগুণময়ী সাংখ্য-প্রকৃতি হইতে গুণোৎকর্ষের
তারতম্য অনুসারে ব্যক্ত জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে—
এই সম্বন্ধে সাংখ্য-সিদ্ধান্তই গীতায় গৃহীত হইয়াছে ;
সাংখ্যানুমোদিত করাকর বিচারই গীতায় বিবৃত হইয়াছে।
নিগুণ পুরুষ সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র, এই মতও গীতায় গৃহীত
হইয়াছে। ফলে দেখা যায় যে, উপনিষদোক্ত অদ্বৈত-মতের
সহিত দ্বৈতবাদী সাংখ্য-মতের সৃষ্টি-ক্রম প্রভৃতি যে সকল
অংশে সাম্য থাকিবে, ঐ সমন্বয়ের দৃষ্টিতেই সাংখ্য-জ্ঞান
ও বেদান্ত-জ্ঞান গীতায় আলোচিত হইয়াছে। গীতার
ত্রায় মহাভারতের অধ্যাত্ম বিচারেও এইরূপ সমন্বয়ের
আভাস পাওয়া যায়। ভক্তিবাদ সম্বন্ধেও গীতার উক্তির
মৌলিকতা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। ভক্তিবাদ

অতি প্রাচীন। প্রাচীনতম উপনিষদে সপ্তম উপাসনার যে উপদেশ আছে, তাহা হইতেই ক্রমে ভাবময়ী ভক্তি-গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছে। অব্যক্ত নিষ্কল নিরাকার পরমব্রহ্মের ধারণা করা কঠিন বলিয়া আকাশ, মনঃ, সূর্য্য, অগ্নি, যজ্ঞ প্রভৃতি প্রতীক তত্ত্বকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করার কথা প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃত বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রাচীন উপনিষদে যে সকল প্রতীকের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোথায়ও মনুষ্যদেহধারী পরমেশ্বরের প্রতীকের কথা বলা হয় নাই। পরবর্তী উপনিষদে রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, নারায়ণ, মহেশ্বর প্রভৃতির উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে (১)। ঋতস্বতর উপনিষদে পরা ভক্তির কথা শুনা যায় (২)। বৃহদারণ্যকোক্ত যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর উপাসনার সহিত ঋতস্বতরোক্ত ভক্তিবাদের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, বৃহদারণ্যকোক্ত প্রতীক উপাসনায় উপাশ্রয়ের প্রতি উপাসকের যে অনুরক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া ভক্তিবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভক্তিবাদের সহিত অবতারবাদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। যজ্ঞরূপ উপাসনায় অবতারবাদের কোন স্পষ্ট বিকাশ নাই, স্মৃতরাং সেখানে উপনিষদে ভক্তি শব্দের প্রয়োগ না বলিয়া উপাসনা শব্দের প্রয়োগ করাই সম্ভব মনে হয়। এই অবতারবাদ ঋতস্বতরে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সত্য, কিন্তু মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী, এবং গোপালতাপনী প্রভৃতি উপনিষদে অবতারবাদ ও ভক্তিবাদ যেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, ঋতস্বতর উপনিষদেও তাহা এত স্পষ্ট নহে, কেন না, প্রথমতঃ, ঋতস্বতরের নির্দেশই মহানারায়ণ প্রভৃতি হইতে অস্পষ্ট; দ্বিতীয়তঃ, রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি যে সকল দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা বৈদিক দেবতা, উহা দ্বারা মানবদেহধারী দেবতারই কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী প্রভৃতির যে নির্দেশ তাহাতে সংশয়ের কোনই অবকাশ নাই, স্মৃতরাং বলিতে হয় যে,

বৃহদারণ্যকে যাহা বীজরূপে বর্তমান, ঐ বীজই ঋতস্বতর, মৈত্র্যপনিষদে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়া মহানারায়ণ প্রভৃতি উপনিষদের ক্ষেত্রে সুবিশাল ভক্তি-বিটপীতে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশে গীতার স্বাতন্ত্র্য অতি স্পষ্ট। গীতায় ভক্তি যে জ্ঞানেরই সুবাসিত রূপ, ইহা প্রতিপাদন করিয়া ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই ত গেল ভক্তিবাদের কথা, তার পর কর্মযোগ সম্বন্ধে গীতার বক্তব্য এই যে, মুক্তপুরুষের পক্ষে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি বা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত কর্ম উপনিষদে গোণ বলিয়া অভিহিত হইলেও কর্মত্যাগ করা চলিবে না। সকাম কর্ম অবশ্য কামনার বহিতে আছতি যোগায় বলিয়া তাহা জ্ঞানীর সর্বথা পরিত্যজ্য, কিন্তু নিকাম কর্ম চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদন করে বলিয়া তাহা সর্বদাই অমুণ্ডেয়। ঈশাশাস্ত্রোপনিষদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, “এ জগতে আমরণান্ত কর্মের অমুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিতে চেষ্টা করিবে।”—কুর্কনেবেহ কর্ম্মণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। ঈশাঃ ১।১। ঐ কর্ম্মামুষ্ঠানের সঙ্গে কামনা ত্যাগের কথাও পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল স্থলে শাস্ত্রে কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, ঐ সকল স্থলে সকাম কর্ম্মত্যাগেরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। নিকাম কর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই, এ কথা স্পষ্ট বাক্যে গীতায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-সূত্রকারও “সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেশ্চবৎ” (ব্রঃসূঃ ৩।৪।২৬) এই সূত্রে জ্ঞানেও কর্ম্মের অপেক্ষা আছে, ইহাই সূত্রোক্ত “সর্বাপেক্ষা” কথা দ্বারা সূচনা করিয়াছেন। এই নিকাম কর্ম্মযোগ “যোগনিষ্ঠা” বলিয়া গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মফলের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে তুল্যতা বোধই যোগ বলিয়া গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে—সমত্বং যোগ উচ্যতে। গীঃ ২।৪৮। কর্ম্মযোগে বুদ্ধির সমতা লাভ করিতে হইলে চিত্ত-নিরোধ ও সমাধি একান্ত আবশ্যিক। এই হিসাবেই যোগকে গীতায় সাধনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগসাধনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তকে কি ভাবে নিরোধ

১। মৈত্র্যপনিষৎ ৭।৭, ঋতস্বতর ৫।১৩।

২। বস্তু দেবে পরা ভক্তির্ধ্বা দেবে তথা গুরো।

তর্কসম্বন্ধে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশস্ব মগাখনঃ। ঋতস্বঃ ৩।২৩

করিতে পারা যায়, তাহা দেখান হইয়াছে। (গী: ৬।৩৫) চিত্ত-নিরোধের আবশ্যকতা প্রভৃতিও বর্ণিত হইয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, গীতায় যে যোগের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা উপনিষদুক্ত প্রাচীন যোগমার্গ, পতঞ্জলি-কৃত যোগ-দর্শন নহে। পাতঞ্জল যোগদর্শন গীতার পরবর্তী। যে সময়ে গীতা রচিত হইয়াছিল, পাতঞ্জল-দর্শন তখনও স্বতন্ত্র দর্শন প্রস্থান হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে নাই। এই জগুই গীতোক্ত যোগরহস্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, পাতঞ্জল-সূত্র অপেক্ষা কঠ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ প্রভৃতির যোগ-দৃষ্টির সহিত গীতোক্ত দৃষ্টির সাম্য অধিক। নিষ্কাম কর্মযোগই যোগ, ইহাই প্রাচীন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত গীতায় অনুমৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের তুলনায় পতঞ্জলির “চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ” (যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ পাতঞ্জল-সূঃ ১।১।১) যোগের আধুনিক অর্থ। সম্ভবতঃ পতঞ্জলির কাল হইতেই যোগ শব্দের ঐ অর্থ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

গীতোক্ত সাংখ্য-যোগ-রহস্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতায় কোথায়ও সাংখ্য-যোগকে এক করিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে, কোথায়ও বা পৃথক করিয়া বলা হইয়াছে। এখন এই সাংখ্য-যোগ শব্দের অর্থ কি? সাংখ্য-দর্শন যোগ-দর্শন কি? গীতায় সাংখ্য শব্দের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে কপিল-কৃত সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন কথা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না। যদিও মহাভারতে স্পষ্টই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ দেখা যায়, কপিল আশুরিকে এবং আশুরি পঞ্চশিখকে ঐ বিজ্ঞাদান করেন, এইরূপে সাংখ্য-দার্শনিক-সম্প্রদায়ের কথাও মহাভারতে শুনা যায়। গীতায় ‘সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ’ বলিয়া কপিল মুনির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই কপিলই যে সাংখ্য-শাস্ত্রকার কপিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। তার পর, এই সিদ্ধ কপিলই সাংখ্যশাস্ত্রকার কপিল, এ কথা মানিয়া লইলেও গীতায় সাংখ্য শব্দে যে কপিলকৃত সাংখ্য-দর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই। যোগ শব্দেও পতঞ্জলির যোগ-দর্শন গীতায় গৃহীত হইয়াছে, এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।৩৯ শ্লোকে) যে সাংখ্য-বুদ্ধি ও যোগ-বুদ্ধির

কথা বলা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাংখ্যবুদ্ধি বলিয়া সেখানে আত্ম-বিজ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। আত্মা অজড়, অমর, শোক-দুঃখাতীত, অপরিবর্তনশীল ও অবাঙ্মনসগোচর। জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পড়িয়া আত্মা বিভিন্ন কায় পরিগ্রহ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু আত্মার ঐ কায় পরিবর্তন আমাদের বেশ পরিবর্তনেরই মত। আমরা যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করি, আত্মাও সেইরূপ রোগ-জরা-জীর্ণ বিকল শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর পরিগ্রহ করিয়া থাকে (১)। আমার বেশ পরিবর্তনে আমি পরিবর্তিত হই না, যেই আমি, সেই আমিই থাকি, আত্মা ও কায় পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হন না,—যেই আত্মা, সেই আত্মাই থাকেন। নানা পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তনীয় এই আত্মাই বিশ্বপ্রাণ, জগদাধার, সর্বব্যাপী ও চিন্ময়। অজ, নিত্য, শাস্বত এই আত্মবিজ্ঞানই গীতায় সাংখ্যবুদ্ধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গীতার এই সাংখ্যবুদ্ধি শব্দের অর্থ বিবেক-জ্ঞান। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে স্পষ্টতঃ জ্ঞান-নিষ্ঠা বা জ্ঞান-যোগকেই সাংখ্য-যোগ বলা হইয়াছে এবং ঐরূপ বিবেক-জ্ঞান যাহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও “সাংখ্য” বলা হইয়াছে (গীতা ৫।৫)। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কপিলের সাংখ্যমত যাহারা অনুসরণ করিয়া থাকেন, কেবল তাঁহারা “সাংখ্য” নহেন, যাহারা বেদান্তী বা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাহারাও গীতার মতে “সাংখ্য” পদবাচ্য। সাংখ্য শব্দ এখানে ব্যাপক অর্থেই লওয়া হইয়াছে। সাংখ্য বলিলে সমস্ত বিবেকশাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্রকেই বুঝায়। গীতায় কোথায়ও সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে সাংখ্যদর্শনের প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, গীতার অন্ততঃ দুইটি প্রয়োগে “সাংখ্য” শব্দে কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশ শ্লোকে “অন্তে সাংখ্যেন যোগেন” বলিয়া যে সাংখ্য-যোগের উল্লেখ করা

১। বামাংসি জীর্ণানি যথা বিহার, নবানি গৃহ্মাতি নরোহ-
পরানি। তথা শরীরানি বিহার জীর্ণাঙ্গানি সংযাতি নবানি দেহী।
গীতা ২।২২'

হইয়াছে, তাহাতে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের “সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি” (১৮।৩৩ শ্লোক) বলিয়া যে “সাংখ্যের” নির্দেশ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা সাংখ্য-দর্শনেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষ্যকারও টীকাকারদিগের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “সাংখ্যেন যোগেন” বলায় স্পষ্টতঃ সাংখ্যের সহিত যোগের অভেদ সূচনা করা হইয়াছে এবং সাংখ্যকে এখানে আত্মজ্ঞানের উপায় হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। একরূপ ক্ষেত্রে সাংখ্য শব্দে সাংখ্যদর্শন, যোগ শব্দে যোগদর্শন, এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা যায় কি? আচার্য্য শঙ্কর তদীয় ভাষ্যে “সাংখ্য” কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দৃশ্য, আমি ঐ গুণত্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, এবং গুণত্রয়ের যাহা কিছু ব্যাপার, আমি তাহারই দ্রষ্টা, আমি অবিনাশী অপরিণামী আত্মা, এইরূপ বুদ্ধিই সাংখ্যবুদ্ধি (১)। শঙ্করাচার্য্য যোগ শব্দের কোন তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন নাই। শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় যোগ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অষ্টাঙ্গ যোগ; সাংখ্য শব্দের অর্থ তাঁহার মতে শঙ্করাচার্য্যেরই অল্পরূপ; প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে বিভিন্ন (বিলক্ষণ), এই আলোচনার নামই সাংখ্যজ্ঞান। অষ্টাঙ্গ যোগের বিবরণ পাতঞ্জল-দর্শনে এবং উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং শ্রীধরস্বামীর এই অর্থ হইতেও যোগ শব্দের অর্থ যে পাতঞ্জল-যোগ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সাংখ্য শব্দে সাংখ্য-দর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জ্ঞান সূচনা করিলে ও কপিলোক্ত সাংখ্য-দর্শনই যে সাংখ্য শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহাও নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। রামানুজের মতে সাংখ্যযোগ শব্দে এখানে জ্ঞান-যোগকেই বুঝায়, (সাংখ্যেন যোগেন জ্ঞানযোগেন, রামানুজভাষ্য) মধুসূদন সরস্বতীর মতে সাংখ্য-যোগ শব্দে স্পষ্টতঃ বেদান্ত-বেদ্য বিবেক-জ্ঞানকে বুঝায়, (বেদান্তবাক্যবিচারজন্তেন চিন্তনেন, মধুসূদনকৃত টীকা) অষ্টাদশ অধ্যায়ে “সাংখ্যে

কৃতান্তে প্রোক্তানি” বলিয়া যে সাংখ্য শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাতে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট বাক্যে সাংখ্য শব্দে বেদান্তকে বুঝিয়াছেন, (সাংখ্যং বেদান্তঃ শং ভাষ্য)। কৃতান্ত শব্দ তাঁহার মতে বেদান্তেরই বিশেষণ, বেদান্ত জ্ঞান উদ্ভিত হইলে সমস্ত কর্মের অন্ত হইয়া যায় বলিয়া বেদান্তকে ‘কৃতান্ত’ বলা হইয়া থাকে। মধুসূদন সরস্বতী এখানে শঙ্করাচার্য্যের অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামী সাংখ্য শব্দের এখানে দুই রকম ভাবেই অর্থ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম অর্থ আচার্য্য শঙ্করেরই অল্পরূপ অর্থাৎ সাংখ্য শব্দের অর্থ বেদান্ত। দ্বিতীয় অর্থে তিনি আভাসে সাংখ্য শব্দে সাংখ্য-শাস্ত্রকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেই শাস্ত্রে পদার্থের পরিগণনা ও নির্ণয় আছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্রই শ্রীধর স্বামীর মতে এখানে সাংখ্য শব্দে বুঝাইয়া থাকে (১)। যে সকল মনীষী গীতোক্ত সাংখ্য শব্দের সাংখ্যশাস্ত্র অর্থ করিতে চাহেন, তাঁহারা হয় তো শ্রীধর স্বামীর অর্থই বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া মনে করিবেন। আমরা এই মতের কোন সন্দেহ ভিত্তি আছে বলিয়া মনে করি না। আমাদের মতে গীতায় সাংখ্য শব্দ ব্যাপক তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। গীতায় কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের কোন উল্লেখ নাই, প্রাচীন উপনিষদকৃত সাংখ্যমতই গীতার উপজীব্য। গীতোক্ত সাংখ্যদর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেও আমাদের এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়া থাকে।

গীতোক্ত সাংখ্যমতের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাংখ্যদর্শনোক্ত অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাত্মত, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে (২) এবং এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব যে সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, তাহাও আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন— (তানি এতানি সাংখ্যাশ্চতুর্বিংশতি-তত্ত্বানি আচক্ষতে। শং ভাষ্য গীঃ ১৩।৫)। অব্যক্ত শব্দের অর্থ কি?

১। সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানং বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদা সখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তদ্বানি অশ্রিত্তি সাংখ্যম্ কৃত্তোহন্তোনির্ণয়োহ-শ্রিত্তি কৃত্তান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব। শ্রীধরকৃত টীকা ১৮।৩৩

২। মহাত্মতাত্ত্বহঙ্কারো বুদ্ধিব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দর্শকক পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ। গীঃ ১৩।৩

১। সাংখ্যং নাম ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা যয়া দৃশ্যাঃ অহং তেভ্যোহন্তঃ তদ্ব্যাপার সাক্ষীভূতঃ নিত্যোগুণবিলক্ষণ আশ্রিত্তি চিন্তনমেব সাংখ্যো যোগঃ। শং ভাষ্য ১৩।২৪

যাহা ব্যক্ত বা প্রকাশিত নহে, তাহাই অব্যক্ত— এইরূপ ব্যাপক অর্থ ধরিলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কেই অব্যক্ত বলিয়া ধরা যায়। চরক-সংহিতায় যে প্রাচীন সাংখ্যমত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ ব্যাপক অর্থ করিয়া অব্যক্ত শব্দ দ্বারাই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। গীতায় অব্যক্ত শব্দে জড়বর্গের মূল কারণ প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে, আবার প্রলয়ের তামসী নিশায় সমস্তই অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায় (১)। গীতার এই উক্তি হইতে অব্যক্ত শব্দে যে জগজ্জননী প্রকৃতিকেই বুঝায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া গীতায় স্বতন্ত্র ভাবে পুরুষেরও নিরূপণ করা হইয়াছে—‘প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ব্যানাদী উভাবপি।’ গীঃ ১৩।২০। এই পুরুষের স্বরূপ সাংখ্য-দর্শনে যে ভাবে নিরূপিত হইয়াছে, গীতায়ও সেই ভাবেই উক্ত হইয়াছে। গীতা বলেন যে, এই পুরুষ নিঃস্বর্ণ, নির্লেপ, নির্বিকার, স্বয়ং অকর্তা উদাসীন সাক্ষিমাত্র। অতএব দেহে সংযুক্ত থাকিয়াও এই পুরুষ কিছুই করেন না, নির্লিপ্তই থাকিয়া যান (২)। সাংখ্যদর্শনের মতেও পুরুষ অনাদি, সর্বব্যাপী, চৈতন্যময়, নিত্য, নিঃস্বর্ণ, নিরঞ্জন, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, নিষ্কল ও অপরিণামী (৩)। সাংখ্যোক্ত এই পুরুষের বর্ণনায় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পুরুষকে নিঃস্বর্ণ নির্লেপ বলিয়া আবার ক্ষেত্রজ্ঞ, দ্রষ্টা, ভোক্তা বলা হইয়াছে। এইরূপ উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ নহে কি? নিঃস্বর্ণ হইলে ঐ পুরুষ আবার দ্রষ্টা, ভোক্তা হন কিরূপে? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন যে, কর্তৃত্ব যেরূপ প্রকৃতির স্বাভাবিক, ভোক্তৃত্ব সেইরূপ পুরুষের স্বাভাবিক। পুরুষ নিঃস্বর্ণ, ইহার তাৎপর্য এই, সত্ত্বরজঃ ও তমো গুণের কোন সত্ত্ব পুরুষে থাকিতে পারে না এবং

নাই; পুরুষকে নিঃস্বর্ণ বলায় পুরুষের গুণসত্ত্বই সাংখ্য-মতে নিবারিত হইয়াছে, পুরুষের ভোক্তৃত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। ক্রিয়া সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের ধর্ম, পুরুষে সত্ত্বরজঃ-সত্তমো গুণ নাই, স্তুরাং ক্রিয়াসত্ত্বও নাই, কর্তৃত্বও নাই। পুরুষ স্বভাবতঃ অকর্তা, মিথ্যা অভিমান বশতঃই সে নিজকে কর্তা বলিয়া মনে করে।

পুরুষ অকর্তা হইয়াও ভোক্তা, (পুরুষঃ সর্বদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুর্ভূত্যাতে। গীতা ১৩।২০) এই মত গীতাও অনুমোদন করিয়াছেন (১)। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ও নিত্য, পার্থক্য এই যে, প্রকৃতি পরিণামিনী, পুরুষ অপরিণামী, কূটস্থ ও নির্লেপ। প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা বলিয়াই সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চ এই প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত। প্রকৃতিই সমস্ত ক্রিয়াশক্তির মূল। দেহেক্রিয়াদির সমস্ত কার্যও প্রকৃতি হইতেই স্মৃতি হইয়া থাকে। “আমি স্মৃখী,” “আমি দুঃখী” এইরূপে যে স্মৃখ-দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে, তাহা অচেতন প্রকৃতির সম্ভব নাই বলিয়া ভোগ পুরুষেরই বৃত্তিতে হইবে। এই স্মৃখ-দুঃখের ভোগই তো সংসার। ঐ স্মৃখ-দুঃখ ভোক্তরূপে পুরুষও সংসারের যাত্রাপথে হেতু এবং সংসারী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সমস্ত কার্য-বর্গ এবং ঐ কার্যবর্গের কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, প্রকৃতি হইতেই বিকাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রকৃতিকেই কার্যকারণ সমূহের কর্তা বলা হইয়া থাকে। কার্য-কারণ সমূহের কর্তারূপেই প্রকৃতিকে সংসারের কারণ বলা হয়। প্রকৃতি-পরিণাম এই বিবিধ ভোগ্যবস্তুর যদি কেহ উপভোক্তা না থাকে, তবে সংসার চলে কিরূপে? ভোগই তো সংসার। ইহার উত্তরেই গীতায় ভোক্তরূপে পুরুষকেও সংসারের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (২)। অবিকারী নিত্য নিরঞ্জন পুরুষের স্মৃখ-দুঃখের ভোগরূপ সংসার সম্ভব হয় কিরূপে? আর অপরিণামী অজ পুরুষ সংসারের স্মৃখ-দুঃখ ভোগ করিতে যাইবেনই বা কেন? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ

১। অব্যক্তাং ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

যাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে। গীঃ ৮।১৮

২। অনাদিষ্বান্নিঃস্বর্ণস্বাৎ পরমাঙ্কায়মব্যয়ঃ। শরীরহোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। গীতা ১৫।৩২

৩। অত্রাহ কঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে—পুরুষঃ অনাদিঃ নৃশ্বঃ সর্ব-গতশ্চেতনোহি গুণো নিত্যো দ্রষ্টা ভোক্তাছকর্তা ক্ষেত্রবিদমলোহি প্রসব-ধর্মী। তত্ত্বসমাসবৃত্তি।

১। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে। ৩।২৭

প্রকৃতিভ্যে চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।

বঃ পশুতি তথাঙ্কানমকর্তারং স পশুতি। গীতা ১৩।৩০

২। কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতির্ভূত্যাতে।

পুরুষঃ সর্বদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুর্ভূত্যাতে। গীতা ১৩।২১

ইহারা উভয়েই অজ, অনাদি এবং সর্বব্যাপী। ব্যাপিনী প্রকৃতির সহিত সর্বব্যাপী পুরুষের ঘনিষ্ঠ যোগ অরণ্যাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। এই অনাদি প্রকৃতি সংযোগ বশতঃই পুরুষ স্বীয় চিন্ময় রূপ বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির গুণ স্মৃৎ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। গীতাও এই মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, “পুরুষ প্রকৃতিতে উপগত হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসমূহ উপভোগ করেন। গুণসঙ্গই পুরুষের বিবিধ যোনিতে জন্মলাভের হেতু হইয়া থাকে (১)।” গীতার উক্তির তাৎপর্য এই যে, পুরুষ যে নানা জন্ম, নানা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ঘুরিয়া মরে, গুণসঙ্গ বা বাসনাই তাহার একমাত্র মূল। এই বাসনার মূল কি? প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংসর্গ, এবং তাহার ফলে প্রকৃতিতে পুরুষের তাদাত্ম্যভিমানই বাসনার মূল নিদান। পুরুষের এই সংসর্গকেই গীতার ভাষায় বলা হইয়াছে—পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতির উপভোগ। এই উপভোগ যখন শান্ত হয়, কামনার দুর্জয় বহ্নিশিখাও তখন নির্দীপিত হয়। এই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়, আপনাকে সত্বাদি গুণত্রয় হইতে নির্লিপ্ত বলিয়া বুঝিতে পারে। ঐ নির্লিপ্ত পুরুষ কোন কার্য করিলেও সেখানে তাহার কোনরূপ ফলাভিসন্ধি বা অভিমান না থাকায় ঐ কর্মের ফল স্মৃৎ, দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যোনি-ভ্রমণের কারণ কর্ম-বীজও সঞ্চিত হইতে পারে না। পুরুষের এই নির্লিপ্ত ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিয়াছেন যে, দেহ সংযুক্ত হইয়াও পুরুষ কিছু করেনও না, কিছুতে লিপ্তও হন না—‘শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন কেরোতি না লিপ্যতে।’ গীতা ১৩।৩২। “পদ্মপত্রমিবাস্তসা” পুরুষ সমস্ত বিকারপ্রবাহে পতিত হইয়াও অবিকারী, নির্লেপ এবং কূটস্থ। পুরুষের এইরূপ স্বরূপবিজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, এবং এই জ্ঞানই দুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্টতম উপায়। ইহার ফলেই পুরুষ মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করে। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান বা বিভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ব্যক্ত জগৎ,

অব্যক্ত প্রকৃতি ও জ্ঞানময় পুরুষ এই তিনটি বিভিন্ন তত্ত্বের ভেদ জ্ঞান দৃঢ় হইলে পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতাতেও ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের, প্রকৃতি এবং পুরুষের পার্থক্যজ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন— ‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োক্তানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম।’ গীতা ১৩।৩। গীতার মতে যাহারা জ্ঞানচক্র সাহায্যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের ভেদ দেখিতে পান, এবং ভূত সমূহের প্রকৃতি ও মোক্ষের স্বরূপ বুঝিতে পারেন, তাহারা পরমপদ বা নির্বাণ লাভ করেন (১)। জ্ঞানই মুক্তির সাধক, এ কথা গীতা স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ শব্দের অর্থ কি? ইহাই বিচার্য। গীতা বলিয়াছেন যে, এই শরীরই ক্ষেত্র এবং এই শরীরকে যিনি জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ। স্মৃৎ-দুঃখরূপ ফল যে ভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র এবং ঐ শরীররূপ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকিয়া যিনি “অহং” মম এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন, স্মৃৎ-দুঃখ ফল ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই ক্ষেত্রজ। এইরূপ অর্থে ভোগায়তন শরীরই ক্ষেত্র, এবং জীবই ক্ষেত্রজ, ইহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। কিন্তু গীতায় পরবর্তী শ্লোকেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাদি-স্তম্ভ পর্য্যন্ত নিখিল বিশ্ব-শরীরেই আমাকে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে। এইরূপে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজের যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। গীতার এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরকেই ক্ষেত্রজ বলা হইয়াছে, কেন না, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ব্যতীত নিখিল শরীর-জ্ঞান জীবের সম্ভব হয় না, জীব তাহার নিজ শরীরকেই জানিতে পারে, পরের শরীরকে জানিবে কিরূপে? ক্ষেত্রজঃ ‘চ’ এই চ-কার দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রও যে ভগবানেরই রূপ, ইহাই বুঝা যাইতেছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম ও পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকৃত, স্মৃৎ-দুঃখ গীতার মতে পরমেশ্বরকে ক্ষেত্রজ বলায় কোন বাধা নাই। কপিলকৃত সাংখ্য-শাস্ত্রে পরমেশ্বর স্বীকৃত হন নাই, বরং প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছেন। এই অবস্থায় কপিলাসু্যমোদিত সাংখ্য-মতাসু্যসারে ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ বলিবার উপায় নাই, জীবই ক্ষেত্রজ।

১। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভূক্তে প্রকৃতিমান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্বোনিজন্মসু। গীতা ১৩।২২

১। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজয়োরেবমস্তমং জ্ঞানচক্রুবা।

ভূতপ্রকৃতিমোক্শকং বে বিদুর্বাভি তে পরম্।

গীতা ১৩।৩৫

এই ক্ষেত্রজ জীব প্রতি শরীরে বিভিন্ন। সাংখ্যদর্শন বহু পুরুষবাদ স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু এবং প্রত্যেক পুরুষই বিশ্বব্যাপী। এই বিশ্বব্যাপী অসংখ্য পুরুষের কল্পনা সকল সাংখ্যকারই সমর্থন করেন, তবে গোড়পাদ তাঁহার ভাবের এক স্থলে “পুমানপ্যেকঃ” বলিয়া অজ্ঞাত ভাবে এক-পুরুষবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন সত্য, তবে তাহা বর্তমান সাংখ্যসিদ্ধান্ত নহে। হয় তো প্রাচীন সাংখ্যে প্রকৃতিও যেমন এক, পুরুষও সেইরূপ এক বলিয়াই মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। গীতোক্ত সাংখ্যমতেও এক-পুরুষবাদই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। গীতা পুরুষের বহুত্ব মানেন না। গীতা বলেন যে, একমাত্র সূর্য যেমন নিখিল বিশ্বকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ এক মাত্র পুরুষই সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে (১)। গীতার মতে ভগবানই ক্ষেত্রজ-রূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত : এই অংশে গীতোক্ত সাংখ্যমতের সহিত বর্তমান প্রচলিত কপিল-সাংখ্যমতের পার্থক্য সুস্পষ্ট, কেন না, সাংখ্যেরা এখানে ক্ষেত্রজ পুরুষ বলিতে ঈশ্বর বুঝেন না, জীব বুঝেন। জীব ও প্রকৃতি এই উভয়ের সংযোগে যে জৈব সৃষ্টি নিম্পন্ন হয়, এখানে জীব যেমন ব্যষ্টিজীব, প্রকৃতিও সেইরূপ সমষ্টি প্রকৃতি নহে, অথগু প্রকৃতির এক ভগ্নাংশ মাত্র। ব্যষ্টিজীব যখন বিবেক-জ্ঞান লাভ করে, তখন প্রকৃতির ঐ ভগ্নাংশেরই পরিণাম নিরুদ্ধ হয়, সমষ্টি প্রকৃতি বা অথগু প্রকৃতির পরিণাম অক্ষুণ্ণই থাকে। এক অথগু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগের ফলে এই যে নিখিল বিশ্ব রচনা চলিতেছে, এখানে পুরুষ বলিতে সমষ্টি পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভকেই বুঝায়। এই হিরণ্যগর্ভই পুরুষমোক্ষম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ঈশ্বর-বাদে সম্মুখল। পরমেশ্বরের বীক্ষণের ফলেই সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া প্রকৃতি-পরিণাম এই বিশ্বনাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন—“আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করিতেছে (২)।” পরমেশ্বরের

এই অধ্যক্ষতা বা অধিষ্ঠানই প্রকৃতিতে পুরুষের গর্ভাধান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—প্রকৃতিতে আমি যে গর্ভ-আধান করি, তাহার ফলেই সমস্ত ভূত-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। জগতে যে কিছু মূর্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রকৃতিই তাহার যোনি, আর ‘আমি তাহার বীজপ্রদ পিতা (১)। এই অব্যক্ত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকেই বলা হইয়াছে, ভগবানের ছরতিক্রমণীয় মায়ী—‘মম মায়ী ছরত্যয়া।’ এই প্রকৃতিই বিশ্বযোনি মহাশক্তি। ঈশ্বরের অধ্যক্ষতায় জগজ্জননী প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এ বিষয়ে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত গীতার সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ অন্তরূপ। সাংখ্যকারের মতে প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। প্রকৃতি স্বভাবতঃ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদনের জন্ত জগদাকারে পরিণত হইয়া থাকে। অচেতন প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন, “দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃই দধিরূপে পরিণত হয় : বৎসের পোষণের জন্ত যেমন মাতৃস্তনে অচেতন দুগ্ধের ধারা প্রবাহিত হয় ; অচেতন জল যেমন লোকের উপকার সাধন করিবার জন্ত বাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিও পুরুষের মোক্ষ-সাধনের জন্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।” চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই প্রকৃতির মহাদিরূপে পরিণাম সিদ্ধ হয় (২)। প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃ-সিদ্ধ, এই সাংখ্যমত গীতা অমুমোদন করেন নাই, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এখানে গীতার মত ও সাংখ্যমত

১। মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তন্মিৎ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত। গীতা ১৪।৩

সর্বযোনিষু কোশ্চেষু মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা। ১৪।৪

২। অচেতনশ্যপি প্রধানশ্চ প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্ত্যুপ-
পত্তেঃ। দৃষ্টক অচেতনং চেতনানিষ্ঠিতং পুরুষার্থায় প্রবর্তমানং
যথা বৎসবিবুদ্ধ্যর্থমচেতনং কীরং প্রবর্ততে, যথা জলমচেতনং
লোকোপকারায় প্রবর্ততে, তথা, প্রকৃতিরচেতনাপি পুরুষবিমোক্ষায়
প্রবৃত্ত্যুপ-
পত্তেঃ, সর্বদর্শনসংগ্রহ সাংখ্যদর্শন।

যথা ভূগপন্নবোধকাদি নিমিত্তান্তর নিরপেক্ষং স্বভাবাদেব
কীরাত্তাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাত্তাকারেণ
পরিণমতে ব্রঃ সঃ শাং ভাষ্য ২।২।৫—৫

১। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎসং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎসং প্রকাশয়তি ভারত। গীতা।

২। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মরতে সচরাচরম্।

হেভূনানেন কোশ্চেষু জগদ্ বিপরিবর্ততে। গী ১।১০

তুলনা করিলে গীতার মতই যে উৎকর্ষ, তাহা প্রতিভাত হইবে। বাস্তবিকই কি অচেতন প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ পরিণাম সম্ভব? এখানে স্বতঃসিদ্ধ কথার অর্থ কি? প্রকৃতি তাহার পরিণামে কোনরূপ কারণই অপেক্ষা করে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা গেলে প্রকৃতির পরিণামকে স্বতঃসিদ্ধ বলা যায়। ইহাই কি সাংখ্যসিদ্ধান্ত? প্রকৃতির পরিণামের উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ এবং ঐ পরিণামের কারণ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ। চুষক যেমন নিজের কোন কার্যো ব্যাপ্ত না হইয়াও স্বীয় উপস্থিতি দ্বারা লোহা আকর্ষণ করে, সেইরূপ নিজস্ব পুরুষও নিজ সান্নিধ্য দ্বারা প্রকৃতির পরিণাম সাধন করেন। ইহাই প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বিচার করিলে প্রকৃতি পরিণামকে স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় কেমন করিয়া? তার পর, সৃষ্টির প্রতি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যেমন উপাদান কারণ, সেইরূপ জীবের কর্ম, অদৃষ্ট প্রভৃতিও যে নিমিত্ত কারণ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। বিজ্ঞান ভিক্ত তদীয় সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যে কর্ম যে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম গুণময়ী সৃষ্টির উপাদান কারণ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতি অনাদি সমষ্টিজীবের কর্ম যে নিমিত্ত কারণ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সৃষ্টির উন্নতির প্রকৃতির ক্ষোভ বা পরিণাম হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা সৃষ্টির প্রতি কালও যে অগ্র্যতম কারণ, তাহা বুঝা যায় (১)। সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্ত কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যসূত্রে (২।২৯) রাগ বা তৃষ্ণাকে সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্ত কারণ বলা হইয়াছে। এই তৃষ্ণাই কাম বা অবিবেক, ইহাই সৃষ্টির কারণ, ইহা প্রাচীন সাংখ্যচার্য্য পঞ্চশিখও স্বীকার করিয়াছেন—“অবিবেকনিমিত্ত ইতি পঞ্চশিখঃ।” পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহারই ফলে সৃষ্টি হয়। “যেমন

স্ত্রী-পুরুষের সহযোগে পুত্র উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের সহযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে (১)।” উপরে প্রদর্শিত সাংখ্যমত আলোচনা করিলে প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহাই প্রমাণিত হয়। শঙ্করাচার্য্য তদীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে “রচনামুপপত্তেশ্চ নামুমানম্” ইত্যাদি সূত্রে) প্রগাঢ় যুক্তির সাহায্যে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ পরিণামবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা এখানে প্রবন্ধবিস্তারের ভয়ে শঙ্করাচার্য্যের যুক্তির আলোচনা করিলাম না। অচেতন প্রকৃতি, চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে, এই ব্রহ্মসূত্রসিদ্ধান্তই “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরম্” এই গীতা-বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমরাও ইহাই গীতোক্ত সাংখ্য-সৃষ্টির সিদ্ধান্ত বলিয়া পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই গীতোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনিই উপনিষদ, ভাগবত প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির পরিণাম যে পুরুষের অধিষ্ঠান জন্ত, এ কথা গীতার গ্রায় স্পষ্ট বাক্যে ভাগবতও স্বীকার করিয়াছেন। “কাল উপস্থিত হইলে পরম পুরুষ পরমাত্মা গুণময়ী মায়াতে পুরুষরূপে বীৰ্য্য আধান করিলেন, ফলে মহত্তত্ত্ব আবির্ভূত হইল (২)।” উপনিষদও ইহার অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি বা মায়ার সংস্পর্শে আসিলেই পুরুষের সিসৃক্ষা বা সৃজনী বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে এবং ঐ সৃজনী বৃত্তিবশতঃই পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির অধ্যাক্ষতায় বহু নামে এবং বহু রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরম পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে বা জীবনীশক্তিরূপে জগতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন (৩)। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতিও সত্য, প্রকৃতি কার্য্য জগৎও সত্য, কার্য্যও সত্য, কারণও সত্য। মাটি হইতে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, এখানে নূতন ঘট জন্মে না, ঘট

১। যথা স্ত্রীপুরুষসংযোগাৎ সূতোৎপত্তিস্তথা প্রধান পুরুষ-সংযোগাৎ সর্গস্ত উৎপত্তিঃ। গোড়পাদ ভাষ্য-কারিকা ২১।

২। কালবৃত্ত্যা তু মায়্যাং গুণমহ্যামধোক্জঃ। পুরুষেণ-স্বভূতেন বীৰ্য্যমাধস্ত বীৰ্য্যবান্। ততোহভবৎ মহত্তত্ত্বম্। ভাগবত ৩।৫।২৬

৩। তৎ সৃষ্ট। তদেবাহুপ্রাবিশৎ, তৈত্তিরীয় ২।৩।১ অনেন জীবেন আশ্রনা অল্পপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি, ছান্দোগ্য ৩।৩।২

১। ব্যক্তিতেদঃ কর্মবিশেষাং সাংখ্যসূত্র ৩।১০। অত্র বিশেষ বচনাং সমষ্টি সৃষ্টিজীবানাং সাধারণৈঃ কর্মভির্ভবতীত্যাত্ম। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

কর্মাকুষ্টের্বানাদিতঃ সাঃ সৃঃ ৩।৬২। যতঃ কর্মানাদি অতঃ কর্মভি-
রাকর্ষণাদপি প্রধানস্রাবশ্চকী ব্যবহিতা চ প্রবৃত্তিঃ।

বিজ্ঞানভিক্ত-ভাষ্য।

স্বল্পরূপে মাটিতেই অবস্থিত ছিল, ঐ স্বল্পরূপে কারণ-শরীরে বিদ্যমান ঘটের বর্তমান স্থল আকারে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হইয়া থাকে মাত্র। অবিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না। অসৎ আকাশ-কুমুদ কোন দিনই হয় নাই, হইবে না। যাহা সৎ, তাহা চিরদিন আছে এবং থাকিবে, ইহাই সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদের মূল রহস্য। গীতা এই সৎকার্যবাদ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তুরও বিনাশ নাই, 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত্যঃ' ২।১৬। ঐতিহ্য বলিয়াছেন যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এই উৎপত্তির পূর্বেও সৎই ছিল—'সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ' ছাঃ ৬।১।

গীতা সাংখ্যোক্ত সদ্বাদ সমর্থন করিলেও সাংখ্যোক্ত দ্বৈতবাদ বা প্রকৃতি-পুরুষবাদই চরম তত্ত্ব, এই সিদ্ধান্ত অমুমোদন করেন নাই। প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এই দুই-ই সত্য, অজ ও নিত্য। এই দ্বৈতবাদই সাংখ্য-দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত। এই উভয়ের সমন্বয়ে যে এক অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার কোন আভাস নাই, কিন্তু গীতায় প্রকৃতি ও পুরুষ এই মহাদ্বৈতের অদ্বৈতে পর্যাবসানই ধ্বনিত হইতেছে। গীতার মতে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষ বা জীব ভগবানেরই দ্বিবিধ বিভাব মাত্র। গীতায় প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমার প্রকৃতি দুই প্রকার— পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটি আমার অপরা প্রকৃতি; এতদব্যতীত জীব আমার পরা প্রকৃতি। জীব জগতের জীবন। জগতে অস্তঃপ্রবিষ্ট এই জীবরূপ পরা প্রকৃতিই জগৎ ধারণ করিয়া আছে। আমার এই জড় ও চেতন প্রকৃতি হইতেই সমস্ত ভূত-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়নিদান, আমিই চরম তত্ত্ব, আমার উপরে আর কিছু তত্ত্ব নাই। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেই-রূপ এই নিখিল বিশ্বই আমাতে অন্তর্স্থিত রহিয়াছে (১)।

গীতার এই উক্তি অতি স্পষ্ট। ইহা হইতে জড়-প্রকৃতি ও জীব যে গীতার মতে ভগবানেরই বিভাব বা প্রকার-ভেদ (aspect), তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এই জড়-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতিকে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের উর্দ্ধে অবস্থিত এক পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তমের নির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ পুরুষোত্তমই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। ক্ষর ও অক্ষরের অতীত উত্তম তত্ত্ব বলিয়া উহাকে বলা হয় পুরুষোত্তম (১)। গীতার এই ক্ষর, অক্ষর পুরুষতত্ত্ব আলোচনা করিলে মনে হয় যে, চরাচর জগতে সর্বত্র একপুরুষ-দৃষ্টিই গীতার যথার্থ রহস্য; এই রহস্য ব্যক্ত করিবার জন্তই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি সমস্ত ক্ষীয়মাণ জড়-প্রকৃতিকেই ক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে, আর, দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া দেহাদির বিকার যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেই জীবপ্রকৃতিকে অক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে (দেহেষু নশ্বৎস্বপি নির্বিকার-তয়া তিষ্ঠতীতি কৃষ্ণশ্চেতনো ভোক্তা স ত্বক্ষর পুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ শ্রীধর-টীকা ১৫।১৬) এই ক্ষর প্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতি, অক্ষর প্রকৃতি বা জীবপ্রকৃতি যাহার বিভাব, যিনি ক্ষর জগৎ ও অক্ষর পুরুষ বা জীবের অন্তরে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে শাসন করেন, যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর বা ক্ষেত্রজ জীব যাহার অবিভক্ত রূপ সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মাই চরম তত্ত্ব। এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বই গীতায় উপ দিষ্ট হইয়াছে।

অপরেয়মিতস্তৃণাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।

এতদ্বোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যাধারয়—

অহং কুৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।

মন্তঃ পরতরং কিঞ্চিং নান্তদন্তি ধনঞ্জয় ।

মায় সর্কমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব । গীতা ১।৫—৭

১। ষাণ্ডিনী পুরুষো লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কৃষ্ণশ্চৈবাক্ষর উচ্যতে ।

উত্তমঃ পুরুষত্ত্বঃ পরমাত্মেত্যাদাহতঃ ।

যো লোকজয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ।

যস্মাৎ ক্ষরাদতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।

গীতা ১৫।১৬—১৮

১। ভূমিরাপোহনলং বায়ুঃ ঋং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়াং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা ।

শ্রুতিও গীতোক্ত পুরুষোত্তমবাদেরই সমর্থন করিয়া পরম পুরুষকে “প্রধান-ক্ষেত্রজ-পতি,” প্রধান-পুরুষেশ্বর প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া বলিয়াছেন যে, এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পরমাঙ্গাই স্বয়ং প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ আত্মাকে শাসন করেন। এক অদ্বিতীয় দেবতাই উভয়ের প্রভু। এইরূপে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ এই

মহাদ্বৈতের অদ্বৈতে পর্য্যবসান প্রদর্শন করাই গীতোক্ত সাংখ্য-রহস্য বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। গীতা এই দ্বৈতবাদকে চরম ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব না বলিয়া পুরুষোত্তম পরতন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করায় দ্বৈতসাংখ্য ও অদ্বৈত-বেদান্তের সমন্বয় দৃষ্টিই গীতায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (অধ্যাপক, এম-এ, পি, আর, এম্, পি, এইচ্, ডি, কাব্য-ব্যাकरण-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ) ।

ব্যথার পূর্ববী

আজি দিনান্তে, পথের প্রান্তে, খুলি' জীবনের খাতা
একে একে তা'র, দেখি বার বার উনবাটখানি পাতা।
কিছু নাহি বুকি, সব তিজি-বিজি, কালি-ঢালা আগা-গোড়া।
রংয়ের বাহার নাহিক তাহার, নহে তা' সোনায় মোড়া।
জানি নাক' কবে, খুলিল কি ভাবে, প্রথম পাতাটি তা'র ;
শুধু মনে পড়ে, মাথার উপরে নিবিড় মেঘের ভার !
চির-শ্রাবণের আকাশে আমার শুধুই বারেছে ধারা।
কতু মধুমান আসিয়া আমার দুয়ারে দেখনি সাড়া।
কতু শরতের সোনালী আভাস তোলেনি হৃদয়ে চেটে ;
ভুলাইতে ব্যথা, হ'টা ভাল কথা ভুলেও কহেনি কেউ।

সব-চেয়ে-বড় আপনার বা'রা আমারে ঘিরিয়া আছে,
সব-চেয়ে-বড় আঘাত আমারে তাহারাই জানিয়াছে !
বাহাদের তরে দিহু অকাতরে আপনারে বলিদান,
বিনিময়ে তা'রা দেয় মোরে শুধু জ্বালা আর অপমান।
ঘরে ও বাহিরে, বা'দের আদরে টানিয়াছি এই বৃকে,
তারাই দিতেছে কঠিন আঘাত, তা'রাই আসিছে রুখে !
ধর রবিতাপে পুড়ে যায় দেহ, ছুটে যাই দেখি ছায়া ;
অমনি সে-ছায়া যায় যে সরিয়া, বুকি তাহা মরু-মায়া !
বা'দের তাহিয়া নিজেই ভুলেছি, চাহি নাই নিজ-পানে,
অশ্রু বা'দের দিয়াছি মুছা'য়ে, তা'রাই জুকুটি জানে !
কত যে সহিছি, কত সহিতেছি, কি আর কহিব আমি ;
অস্তর-তলে যে আগুন হলে, জানে অস্তরবাসী।
লক্ষ্মীর কপা হাবা'হু হেলায় ভারতীর পদ সেবি ;
লক্ষ্মীছাড়ার পূজায় এদিকে প্রীত ন'ন বাগ্‌দেবী।
তটিনীর কুল ভাঙ্গে এক পারে, আর পারে গ'ড়ে ওঠে ;
আমার কপালে ধরিল ভাঙ্গন হই কুলে একজোটে !
কোন সঞ্চয় হোলো নাক' তাই, এক কড়া নাহি পুণ্য ;
দিন গেল কাটি ; কাঁধের বুলিটি র'য়ে গেল হায় শূন্য !
হৃৎকের পুঁথি কেটেছে পোকায়, পাতাগুলি পড়ে খ'সে ;
আজি অবেলায়, শতক দালায়, তা'ই নিয়ে আছি ব'সে।

ভাঙ্গা-চোরা দেহ, না আছে পাথের, সন্ধ্যা নার্মিয়া আসে।
কি করিয়া যা'ব বাকী পথটুকু ভাবিতেছি মহাত্মাসে !
বা'রা চ'লে যায়, তা'রা না তাকায়, একাকী পড়িয়া থাকি।
পারের পারানি নাহিক বাহার, কে নেবে তাহারে ডাকি !
কেহ নাহি মোর, কিছু নাহি মোর, বৃথা দিন গেল কাটি ;
শৃঙ্গ বুলিটি বারে বারে হায় মিছা-মিছি শুধু ঘা'টি !
হোয়েছে ভালই মোর কিছু নাই—সুখ-সম্পদ কোন।
খেয়া-বাটে গিয়া বলিব ডাকিয়া—পাটনি গো,
শোন—শোন,
নাহি মোট-ঘাট, কোন ঝঞ্জাট, এতটুকু ঠাই দাও।
তরীতে তোমার লাগিবে না ভার, তুলে নাও—তুলে নাও।
তোমার খাতাটি দেখ যদি খুলে আমার হিসাব নিয়া,
দেখিবে গো স্বামী, সত্যই আমি অতি-বড় দেউলিয়া।
তবু যদি প্রভু, উঠে থাকে কতু, 'জমা' মোর এক 'পাই,'
সেই মূলধনে দাও গো চরণে—দাও এক রতি ঠাই।
ধরণীর ধূলা এসেছি মুছিয়া, তরণীতে পাছে লাগে।
তুলে নাও প্রভু, তুলে নাও মোরে, বড় ভয়
প্রাণে জাগে।

মানবের বেশে দানবের দল ঘিরেছে আমায় আজ।
মরণ দানিয়া বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও হৃদয়-রাজ !

শ্রীঅসমঙ্গ মুখোপাধ্যায় ।



৬

পরদিন প্রত্যুবেই তাঁহাদের জাহাজ বোম্বাই বন্দরে উপনীত হইলে সকলেই তাঁরে নামিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। সুনীল মিষ্টার সিংহের আসবাব-পত্র সংগ্রহ করিয়া নিজের লগেজগুলির সঙ্গেই জাহাজ হইতে নামাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহার পর শেলীকে সাহায্য করিতে চলিল; কিন্তু এ জন্ত তাহার আগ্রহ-প্রকাশ নিষ্ফল হইল; কারণ, সে জানিতে পারিল, মিস্ মিত্র গ্রেহাম-দম্পতির সহিত পূর্বেই নামিয়া গিয়াছে। অতঃপর সুনীল মিঃ সিংহকে সঙ্গে লইয়া গুন্ধ-আফিসের গোলমাল চুকাইতে গেল। সেই অবসরে মিসেস্ সিংহ নিনা সহ গুন্ধ-আফিসের বাহিরে আসিতেই শেফালীকে কিছু দূরে দেখিতে পাইলেন। নিনা তাহার সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া বলিল, “না ব’লে-ক’য়ে চুপে চুপে স’রে পড়াটা কোন্ দেশী ভদ্রতা? তোমার গাড়ী তো আমাদের গাড়ীর অনেক পরেই ছাড়বে; তবে এত ব্যস্ত হওয়ার কারণ কি?”

শেলী মৃদু হাসিয়া বলিল, “না, ব্যস্ত আর তেমন কি? জিনিস-পত্রগুলো নামিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা ক’রতে একটু আগেই আসতে হ’য়েছিল। তা সে সব শেষ ক’রে আমি কি তোমাদের কাছে বিদায় না নিয়েই চ’লে যেতুম ভাই!”

নিনা কিন্তু তখনই শেফালীর নিকট হইতে তাহার আগ্রার ঠিকানাটি সংগ্রহ করিল। শেলীদের ট্যাক্সি ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইল। মিষ্টার সিংহ ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট শেলী পূর্করাতেই বিদায় লইয়াছিল; নিনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সে আর তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে গেল না।

মাল-পত্র লইয়া সুনীল ও মিষ্টার সিংহ যথাসময়ে বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে সিংহ-পরিবারের জিনিস-পত্র গুহাইয়া দিয়া সুনীল নতমস্তকে মিঃ সিংহ ও তাঁহার পত্নীর পদস্পর্শ করিতেই মিষ্টার সিংহ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে না সুনীল?”

সুনীল নতমুখেই বলিল, “আজ্ঞে, আমি সোজা আমার কাম্বুস্থানেই যাচ্ছি।”

মিঃ সিংহ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “তা কি সম্ভব হ’তে পারে? কত দিন পরে দেশে ফিরলে, আর মা-বাপের সঙ্গে দেখাটাও ক’রবে না? তা’-ছাড়া, তোমার ওপর মস্ত একটা জরুরী সমস্যার মীমাংসার ভার আছে যে!”

তাঁহার অবশিষ্ট কথা শেষ হইবার পূর্বেই নিনা অগ্ৰ দিক্ হইতে আসিয়া সুনীলের হাত ধরিয়া তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া গেল। সুনীল নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তি বোধ করিল। যখন তাহারা সেখানে ফিরিয়া আসিল, তখন অগ্ৰ কোন কথার আলোচনার সময় ছিল না।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে মিষ্টার সিংহ বিচলিত স্বরে স্ত্রীকে বলিলেন, “তোমার কথায় নির্ভর ক’রে বড়ই মুশ্কিলে পড়লুম দেখছি! তুমি তো এত কাল ধ’রে ‘সুনীল—সুনীল’ ক’রেই পাগল! কিন্তু দেখলে একবার তার কাণ্ডকারখানা?”

এই সময় নিনা সমস্ত ট্রেনখানা ঘুরিয়া দেখিবার জন্ত সেই কামরা হইতে নামিয়া গেল। মিষ্টার সিংহ সেই স্মৃযোগে বলিলেন, “ভাগ্যি রক্ষে যে, নিজাকে কোনও কথা এ পর্যন্ত বলা হয়নি।”

মিসেস্ সিংহ স্বামীকে কি উত্তর দিবেন, তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া

মিঃ সিংহ ঘা দিয়া বলিতে লাগিলেন, “ওদের ও-ভাবে মেলামেশা করতে দিয়ে কি লাভ হ’ল ? এত দিন মেয়েটার বিয়ে না দিয়ে কেবল বৃথা আশায় থেকে সময় নষ্ট হ’ল অনেক ! বেলার যে বিয়ে দিয়েছি, পুরানো প্রথানুসারে কম বয়সে তার বিয়ে হ’য়েছে, তাতে সে কি অসুখী ? মিছি-মিছি নিনাকে এত বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো রেখে, তার মাথার ভেতর কতকগুলো উদ্ভট আধুনিক ধারণা ঢুকিয়ে দিয়ে—তার মস্তকটি বেশ পরিপাটিক্রমেই চর্কণ ক’রলে ! তুমি নিজেও কি অসুখী হ’য়েছ ? আমাদের উদ্ভ্রমণ তো সেই সনাতন চালেই সম্পন্ন হ’য়েছিল !”

মিসেস্ সিংহ স্বামীর সকল অভিযোগ নীরবেই শুনিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেবের জেরা শেষ হইলে ব্যারিষ্টার-গৃহিণী সংযত স্বরে বলিলেন, “দেখ, অত উত্তেজিত হ’য়ো না। হিন্দুর মেয়ে আমি, বিধিলিপি মানি ; ভাগ্যে যা আছে হবে, কলকাতায় ফিরে যা’ ভাল মনে হয়—কো’র। আমার তো বিশ্বাস, দত্ত সাহেবকে বল্লেই সব ঠিক হ’য়ে যাবে। সুনীল ও নিনায় তো বেশ ভাব হ’য়েছে, দেখা গেল। আমার মনে হয়, সুনীল তার বাবার কথা অগ্রাহ্য করবে না।”

মিষ্টার সিংহ কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাভরেই বলিলেন, “তুমি এ সব বিষয়ে নেহাৎ আনাড়ি ! মানুষের চরিত্র বুঝবার শক্তি তোমার নেই। সুনীল নিনাকে ভালবাসে সত্য, কিন্তু সে ভালবাসায় প্রণয়ের লেশমাত্র নাই ; নিনাকে ও ছোট বোনের মতো স্নেহ করে। সেই জন্তই মনে হচ্ছে, সে নিনাকে কিছুতেই বিয়ে করবে না। আরও মনে হয়—সুনীল আকৃষ্ট হ’য়েছে ঐ মিস্ মিত্রের প্রতি। মেয়েটি সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ ; তার সঙ্গে নিনার তুলনা করতে যাওয়া ভুল—তা সে যতই শিক্ষা পাক, আর রুচি তার যতই ‘রিফাইণ্ড’ হোক !”

মিসেস্ সিংহ উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, “রেখে দাও ও-সব ফাল্গুতো কথা ! আমার নিনা কিসে ঐ মেয়েটার চেয়ে কম, শুনি ? শেলীর অকাল গাঙ্গীর্যো তা’র মুখের সব লাবণ্য লোপ পেয়েছে, আর আমার নিনার সদাই হাসিমুখ ! সে মুখ দেখে—যার চোখ আছে, সেই মুগ্ধ হয়। দেখনি, জাহাজে যুবকরা সকলে নিনার সঙ্গেই মিশতে চাইত ; শেলীর দিকে কেউ ঝেঁসতো কি ?”

মিষ্টার সিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “শেলীর কাছে একটু উৎসাহ পেলেই দেখতে প্রত্যেক যুবকই ওর দিকে ছুটতো। শেলীকে হঠাৎ বুঝতে পারা যায় না ; যা’ক, সে তর্কে আর কাজ নেই। ভেবে-চিন্তে যা’ হোক করা যাবে এর পর।”

সুনীলকে রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আগ্রাগামী ট্রেনে উঠিতে দেগিয়া গ্রেহাম-দম্পতি যত বিস্মিত হইলেন, শেফালীকে ততোধিক বিস্মিত হইতে হইল। শেফালী শুনিয়াছিল—সুনীল তাহার কর্মস্থান টুঙলায় যাইবে ; কিন্তু সে যে সেই ট্রেনেই যাইবে পূর্বমুহূর্তেও শেফালী ইহা ধারণা করিতে পারে নাই। একবার তাহার মনে হইল, সুনীলের সঙ্গে এক ট্রেনে না যাইলেই সে ভাল করিত ; বিদায়ের পালা সে তো পূর্বেই শেষ করিয়াছিল। সেই বেদনাটাকে আর নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিতে তাহার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয় কি এক অব্যক্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল ; ইহার কারণ তো তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

পথে যাহাতে গ্রেহাম-দম্পতির ও শেফালীর স্বাচ্ছন্দ্যের বিন্দুমাত্র অভাব না হয় সুনীল সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাগিল। বড় বড় ষ্টেশনে ট্রেন থামিলে সে তাঁহাদের কামরায় উঠিয়া সংবাদ লইতে লাগিল ; খবর লইতে, এবং মধ্যে মধ্যে সরস গল্পে তাঁহাদের আনন্দবর্ধন করিতে তাহার যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষিত হইল।

ট্রেন আগ্রা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইলে সুনীলই সহযাত্রীগণকে নামাইয়া-লইবার সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিল।

রমাপ্রসাদবাবু ও তাঁহার পুত্রকে সে কোন কাজে হাত দিতে দিল না। বিদায় গ্রহণের সময় সুনীলের কাতর নয়নে কত কথাই ফুটিয়া উঠিল ; কিন্তু কম্পিত ওষ্ঠে কিছুই ব্যক্ত হইল না। মিসেস্ গ্রেহাম রমাপ্রসাদবাবুর নিকট ‘মিষ্টার দত্ত’ বলিয়া সুনীলের পরিচয় দিলেন, এবং তাহার শিষ্টাচারের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। পরে ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার সময় রমাপ্রসাদবাবুকে কথায় কথায় বলিলেন,—“He is a very nice young man. Don’t be surprised if you find him carrying away your girl some day.”—কথাগুলি শুনিয়া

রমাপ্রসাদবাবুর মনে আতঙ্ক হইলেও কোন মন্তব্যই তিনি প্রকাশ করিলেন না; এবং শেফালীর সহিত স্ত্রীলোকের আর যে দেখা হইবে—তাহা সম্ভব বলিয়াও তাঁহার মনে হইল না।

শেফালী আগ্রায় কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া রমাপ্রসাদবাবুকে বলিল, “এইবার আমি কনকপুর যাব, তবে এলাহাবাদে দাদার কাছে দিন পনের থেকে যাব। কনকপুরের হাসপাতাল আর গরীবদের ভার আমাকেই নিতে হবে। কনকপুরের সব আমাকেই দেখাশুনা করতে হবে দেখছি,—দাদা তো তাঁর বৈজ্ঞানিক-গবেষণাতেই বিভোর, অল্প কোন কাজ দেখতে পারেন না;—কিন্তু সব ভার পরের উপর তো ফেলে রাখা চলে না। আমাদের দাদামণির কীর্তিগুলি সবই খাতে বজায় থাকে, সে বিষয়ে আমাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।”

রমাপ্রসাদবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তোমার কথাগুলি সঙ্গত বটে, কিন্তু তোমার মত তরুণীকে একা সেখানে পাঠাই কি ক’রে? আর সম্ভব তো ও-প্রস্তাব কাণেই তুলবে না। তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথাই হ’য়েছে। তোমার অভিপ্রায় তো জানতুম; তাই গরমের সময় সম্ভব আর আমি ছু’ মাস কনকপুরে থেকে সব দেখে-শুনে এসেছি। গ্রামের লোকগুলি তেমন সোজা নয়; তোমার সেখানে একা থাকা চলবে না। তবে তোমার পিসিমা যদি তোমার কাছে থাকেন, তা’ হলে কাজ চ’লতেও পারে।”

শেফালী ক্ষুব্ধেরে বলিল, “জ্যেষ্ঠামশায়, আপনি বলছেন কি? আপনারা এত কষ্ট ক’রে যে আমার শিক্ষা দিলেন, সবই কি বৃথা হবে? বিলেত পর্য্যন্ত ঘুরে এলাম; আর নিজের দেশে এত বয়সেও নিজেকে সামলে চলা আমার অসাধ্য হবে? নিজের উপর এতখানি অবিশ্বাস আমার নেই।”

রমাপ্রসাদ মুহূ হাসিয়া বলিলেন, “মা, তুমি পল্লী-সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জান না। পরচর্চা ভিন্ন পল্লীগ্রামের লোকের যেন আর কোনও আলোচনার বিষয় নেই; কেবল পরের কথার আলোচনা আর দলাদলি তাদের সময় কাটাবার উপলক্ষ। বিশেষতঃ, পাড়ারগেয়ে-মেয়েরা পরনিন্দা পেলে তার আলোচনাতেই আসর

জমকায়, তেমন মিষ্টি আর কিছুই নয়! গ্রামে শিক্ষার প্রচারও যেমন কম, তার আদরেরও তেমনই অভাব।”

শেফালী মাথা নাড়িয়া বলিল, “না জ্যেষ্ঠামশায়, গ্রামের লোক এ-কালে আর সে রকম নেই; কনকপুরের সকলেই আমাকে খুব ভালবাসে।”

রমাপ্রসাদ অবিশ্বাসভরে বলিলেন, “আমিও পাড়া-গাঁয়ের ছেলে মা! ভেবো না যে, পাড়ারগাঁয়ের লোকের নিন্দায় আমি আনন্দ পাই। আমি অবসর পেলেই এখনও নিজের গ্রামে যাই। এই জগুই গ্রামের জন-সাধারণের মনের সন্ধীর্ণতার কথা ভালই জানি। তাদের গুণ অনেক; যাদের তারা আপনার জন মনে করে, তাদের জগু প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু যদি তাদের মনের মত না হও, তবে তারা নানা রকমে তোমার অনিষ্ট করবে, দুর্নাম প্রচার ত সামান্য বিষয়! দোষ-ত্রুটি পেলেই তা নিয়ে আন্দোলন করা, আর আত্মনির্ভরশীল তেজস্বী ব্যক্তিকে অপদস্থ ক’রেই তাদের আনন্দ!”

শেফালী তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া বলিল, “আমি তো কোনও অশ্রয় কাজ করিনি, এবং ভবিষ্যতেও করব না—তখন আর আমার ভয় কি?”

রমাপ্রসাদ তথাপি বলিলেন, “তুমি তা বুঝতে পারবে না মা! আমরা যে ভাবে গ্রাম-অগ্রায়ের বিচার করি, তারা ঠিক সে ভাবে তার বিচার করে না। তুমি বিলেত থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ ক’রে এসেছ, এ শিক্ষা আমরা ভাল বলি, প্রশংসা করি; কিন্তু তারা বলবে, স্ত্রীলোকের পক্ষে এ ভয়ানক লজ্জার বিষয়, ভয়ঙ্কর বেহায়াপনা! তুমি আর্ডের সেবার জগু এত ব্যাকুল হ’য়ে উঠেছ; তা’ও নিন্দনীয় ব’লে তাদের মনে হ’তে পারে। অবশ্য, অগুরে তারা স্বীকার করবে যে, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু মন্দ লোকের সংখ্যাই বেশী, তাদের দলে মিশে সকলেই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। মেয়েমানুষের বিলেতে যাওয়া, ডাক্তার হ’য়ে আসা, তারা এ সকলের সমর্থন করবে না; এমন কি, তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করাও তাদের অসাধ্য হবে না।”

শেফালী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল, “আমার পল্লীবাসীদের অত হীন মনে করতে পারছিনি; আমাকে যে তারা সকলেই বড় ভালবাসে!”

রমাপ্রসাদ এ কথা শুনিয়াও নিরস্ত না হইয়া বলিলেন, “সে দিন কি আর আছে মা ? তুমি তো জান, তোমার বিয়ে নিয়ে গ্রামে সে সময় কি রকম ঘোঁট হ’য়েছিল ! তোমার দাদামণির ছিল—দোর্দ্দিগু প্রতাপ ; তাঁর সাহস, পরাক্রম ছিল সিংহের মত ; তুলনায় আর সকলে ছিল যেন শেগালের দল ! যত দিন তিনি ছিলেন, কেউ কোনও কথা বলতে সাহস ক’রেনি। এখন ও-অঞ্চলের পল্লী-সমাজের গোড়ল হ’য়েছে রণেন্দ্র ; তোমাদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব তো তোমার অজ্ঞাত নয়।—আর যা’র জোর বেশী, দেশের লোক তাকেই ভয় করে, তারই আদেশ পালন করে।”

শেফালী বিস্মিত ভাবে বলিল, “রণেন্দ্র দাদা কর্তা হ’ল কি ক’রে ? জ্ঞানেন্দ্র কাকা কি তবে বেঁচে নেই ?”

রমাপ্রসাদ সকল সংবাদই জানিতেন ; তিনি বলিলেন, “জ্ঞানেন্দ্রবাবু জীবিত আছেন বটে, কিন্তু তিনি এখন বাতে শয্যাগত, জীবন্ত ; ভাল-মন্দ কোন কথাতেই তিনি থাকেন না। কাজেই রণেন্দ্র হ’য়েছে এখন ‘ভ্যাড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক !’ তোমাদের দুই গ্রামের ভদ্রলোকমাত্রেই এখন রণেন্দ্রের কথা মেনে চলবে। রণেন্দ্র যে তোমায় বিয়ে করতে পায়নি, সে অপমান কি সে ভুলেছে, ভেবেছো ? তোমাদের অনিষ্ট করবার কোন সুযোগই সে ত্যাগ করবে না।”

শেফালী বলিল, “আপনি কি মনে করেন—জ্ঞানেন্দ্র কাকা এই রকম অশ্রান্তের সমর্থন করবেন।”

রমাপ্রসাদ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, “না মা, আমি তা আদৌ বিশ্বাস করিনে। আমি জানি—তিনি ও তাঁর স্ত্রী ভারি অহুতপ্ত হ’য়েছেন, তাঁদের অমৃত্যু আশ্চর্যিক। এবার আমরা যখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সেই সময় জ্ঞানেন্দ্র-বাবু সন্তোষকে ডাকিয়ে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা ক’রেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা, তোমার স্বস্তুরকে তিনি সকল কথা জানিয়ে যা’তে তোমাকে তাঁরা নিয়ে যান, তার ব্যবস্থা করেন। তিনি তখন মুক্তকণ্ঠেই নিজের দোষ স্বীকার ক’রেছিলেন। এমন কি, তিনি এত দূর ব্যথিত হ’য়েছেন যে, তাঁর স্ত্রীকে তোমার শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দিতেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহের পরিচয় পেয়ে-ছিলাম।”

এ কথা শুনিয়া শেফালীর বিশ্বাসের সীমা রহিল না। সে বলিয়া উঠিল, “বলেন কি জ্যাঠামশায় ! জ্ঞানেন্দ্র কাকার মনের এত পরিবর্তন হ’য়েছে ? আমি জানি, তিনি আমার ছেলেবেলা থেকেই আমাকে খুব ভালবাসতেন। আপনার যখন এই রকম ধারণা, তখন আমার দুশ্চিন্তার আর কি কারণ থাকতে পারে ? এখন তিনি আমার অভিভাবক হ’তে পারবেন না কি ?”

রমাপ্রসাদ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না মা ! জ্ঞানেন্দ্র-বাবু বুড়ো হ’য়েছেন ; রণেন্দ্রের প্রবল জিদ, তার সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন কেন ? রণেন্দ্রকে ঠিক চিনে উঠা তোমার অসাধ্য ! মামুষের কোন সদগুণই সে পায়নি। সে ভয়ঙ্কর অসচ্চরিত্র, তার উপর দারুণ কুচক্রী। এমন কোন কুসম্ম নেই, যা করতে তার কুণ্ডা হবে। হয় তো কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হ’য়ে সে তোমাকে নির্ঘাতন করবে, এবং যখন তার সকল চেষ্টা বিফল হবে—তখন সে অগত্যা তোমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে ; এমন কি, তোমার কলঙ্ক রটিয়ে তোমার স্বস্তুরবাড়ীতে চিঠি পাঠানোও তার অসাধ্য নয় ! এখন তুমি দূরে আছো, তোমার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছে না ; কিন্তু তুমি গ্রামে গিয়ে বসলে, তার দুশ্চরিত্র কি রকম প্রবল হ’য়ে উঠবে, আর সে কি ভাবে তোমার সর্বনাশের জন্ত বড়যন্ত্র করবে—এ সব কথা চিন্তা ক’রে আমি বড়ই ভীত হ’য়েছি।”

শেফালী ব্যথিত চিত্তে বলিল, “তবে দাছুর হাস-পাতালের কি ব্যবস্থা হবে ?”

রমাপ্রসাদ তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্ত বলিলেন, “তার খুব ভাল ব্যবস্থাই আমরা ক’রে এসেছি মা। ভাল ডাক্তার ও লেডী ডাক্তার বসিয়ে এসেছি। গরীব লোক-সকল দেশেই তো অহুকম্পার যোগ্য ; তুমি আমার বা সন্তোষের কাছে থেকে স্থানীয় দরিদ্র পরিবারগুলির সেবায় জীবন সার্থক করলেই বা ক্ষতি কি ? তা’তেও আর্ন্তের সেবা ভালই হবে। আমার ইচ্ছা, তুমি দুই ভদ্র-পরিবারদের দুঃখ-কষ্ট মোচনেরই চেষ্টা কর। আমার মনে হয়, দুঃখ-কষ্ট তা’দেরই সব চেয়ে বেশী ; শত অভাবে কষ্ট পেলেও তারা সহজে কারো কাছে তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা জানাতে চায় না। তুমি তাদের চিকিৎসা

ক'রে, ঔষধ ও পথ্যের সুব্যবস্থা ক'রে—আর্তের সেবা-জনিত কর্তব্য পালন করতে পারবে।”

শেফালী সহানুভূতিভরে বলিল, “আর পথ্যের যত অনাথ, আর্ন্ত, ভিখারী,—তাদের কি কেউ দেখবে না?”

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “দুঃখীদের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রতে আমি তো তোমায় নিষেধ করিনি মা! তা'দের সেবাও তুমি অনায়াসেই করতে পারবে। তাদের কিছু চিকিৎসার চেয়ে বেশী দরকার শিক্ষার। যদি তারা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকতে শেখে তো অনেক রোগ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে; আর তা'দের বাসের ঘরগুলিতে প্রচুর আলো ও বাতাস প্রবেশের সুব্যবস্থা হওয়া দরকার। অপরিষ্কৃত, বায়ুহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন সঁাতা ঘরই যত রোগের বাস্তুভিটা।”

শেফালী ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, “আচ্ছা, তবে এখন কিছু দিন সেই ব্যবস্থাই করা যাক।”

রমাপ্রসাদ সোৎসাহে বলিলেন, “বেশ, ও-সব ব্যবস্থা আমিই ক'রে দিতে পারবো। কিন্তু তুমি একা সব কাজ ক'রে উঠতে পারবে না; এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করতে ও পরামর্শ দিতে পারে, এ রকম লোক চাই। সে চেষ্টাও আমি করছি। তোমার উদ্দেশ্য বাহিরে প্রকাশ হ'লেই গরীবরা দলে দলে এসে জুটবে; তখন তোমার কাজের অন্ত থাকবে না। বিনা-পয়সায় কে চিকিৎসা করে, আর করতে পারেই বা কয় জন?”

শেফালী বলিল, “আর সব তো ঠিক হ'ল, কিন্তু আমি ভাবছি, জ্ঞানেন্দ্র কাকা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসবেন না তো? সত্যিই যদি তিনি কাকীমাকে আমার শাস্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন, তা হ'লে আমি হয় ত বড় বিপদে প'ড়বো। বিশেষতঃ, আমার স্বশুর-শাস্ত্রী যদি মনে করেন, আমরাই প্রকারান্তরে সাধাসাধি করছি; তা হ'লে সে ভারী লজ্জার বিষয় হবে আমার পক্ষে।”

রমাপ্রসাদ তাহাকে নিশ্চিত্ত করিবার জন্ত বলিলেন, “আমরা জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ ক'রে এসেছি; তিনিও ব'লেছেন, আমাদের না জানিয়ে বা আমাদের অমতে ও-রকম কোন কাজ ক'রবেন না। কিন্তু আমার মনে হয় মা, জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ হ'লে খুব ভালই হ'তো। তোমার স্বশুর যখন বুঝতেন যে,

তোমার প্রতি শক্রতা ক'রে জ্ঞানেন্দ্রবাবু অমৃতপু; যখন জানতেন যে, বরপক্ষ তোমাদের বংশ-গৌরবের পরিচয় পেয়েও কেবল অর্থলোভেই তোমাদের বিপন্ন ক'রেছিল; যখন তিনি দেখতেন যে, শক্রও তোমার গুণে মুগ্ধ হ'য়ে, নিজের ভুলের জন্ত অমৃতপু; তখন নিশ্চিতই তাঁর মনের পরিবর্তন হ'ত। তাঁকে ঔদ্ধত্য ত্যাগ করতে হ'তো। তার পর তোমাদের মিলন হ'লে জ্ঞানেন্দ্রবাবুও তৃপ্তি লাভ ক'রতেন, আর সত্যই মনে হ'তো, এত দিনে ভ্রমসংশোধন হ'ল। কিন্তু সন্তোষ কিছুতেই এতে রাজী হ'ল না; অতি কঠিন তার পণ।”

শেফালী উৎসাহভরেই বলিল, “দাদা সঙ্গত কাজই ক'রেছেন। তিনি নিজের বংশের মর্যাদা সঙ্গন্ধে খুবই সচেতন।”

রমাপ্রসাদ তথাপি বলিলেন, “না মা, আমার আন্তরিক ইচ্ছা, তোমার স্বশুরের সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলি। তোমার মত মেয়ে যে একাকিনী অকূল সংসারসাগরে ভেসে বেড়াবে, এ চিন্তা সত্যই আমার অসহ্য! তোমার সব থাকতেও—সব থেকেই তুমি চিরজীবন বঞ্চিত হ'য়ে থাকবে,—এ দুঃখ রাখবার কি স্থান আছে মা! ও-দিকে সন্তোষ ব'লছিল, ছেলেটা এত দিনেও না কি বিয়ে করেনি। তুমিও কি সারাটি জীবন এমনি ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারবে?”

শেফালী দৃঢ় স্বরেই বলিল, “কেন পারব না? আমাদের দেশের কত বালবিধবা ভোগবিলাস ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসিনীর মত সারাজীবন অতিবাহিত করে। যুরোপে কত কুমারী কত মহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করে; বিবাহের চিন্তাই তাদের থাকে না, ভোগসুখেও তারা বীতস্পৃহ।—আমারও জীবনধারণের কোন উপলক্ষের অভাব হবে না।”

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “আশীর্ব্বাদ করি মা, তোমার জীবন যেন পবিত্র থাকে; কিন্তু মনে রেখো, মনে-প্রাণে পবিত্রভাবে চিরজীবন অতিবাহিত করা বড়ই শক্ত কাজ—অতি দুর্লভ ব্রত।”

শেফালী অন্তরের সঙ্গে জগদীশ্বরের ককণা—সহায়তা প্রার্থনা করিল। তিনি তাহার মনে বল-সঞ্চার করেন, তাহাকে ধর্মপথে পরিচালিত করেন—ইহাই সে মনে

মনে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল ; এবং কিছু কাল নিস্তর থাকিয়া রমাপ্রসাদবাবুকে জানাইল, দুই দিন পরেই সে দাদার সঙ্গে দেখা করিতে এলাহাবাদে যাইবে। সেখান হইতে শারদীয়া পূজায় তাহারা কনকপুর যাইবে, ও পরে সে আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে। আগ্রায় ফিরিয়া রমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে ঘুরিয়া সে কাজ শিখিবে।

যাত্রার দিন শেফালী রমাপ্রসাদবাবুকে বলিল, “আমার নামে কোন পত্রাদি এলে পাঠিয়ে দেবেন। আর যদি কোন ভদ্রলোক দেখা করতে আসেন তো ব’লে দেবেন, পূজার পর যেন তিনি এখানেই আসেন।”—শেষ কথাটি বলিতে শেফালীর মুখ লজ্জায় অরুণাভ হইল ; তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল। তাহা লক্ষ্য করিয়া রমাপ্রসাদবাবু মনে মনে শঙ্কিত হইলেন।

তিনি ভাবিলেন, “কে এই ভদ্রলোক—যাহার কথা বলিতে শেফালীর মনের ভাব এইরূপ হইল ? তিনি বলিলেন, “কার দেখা করতে আসবার সম্ভাবনা আছে, তার নামটা কি শুন্তে পাইনে মা ?”

শেফালী কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, “তিনি মিষ্টার দস্ত ; যিনি জাহাজে আমাদের সঙ্গে দেশে ফিরেছিলেন।”

রমাপ্রসাদবাবু আগ্রহ গোপন করিয়া নিম্পৃহের ত্রায় বলিলেন, “তোমার সঙ্গে তাঁর কত দিনের আলাপ ?”

শেফালী তাঁহার কণ্ঠস্বরে হুশিস্তার আভাস পাইয়া মুহূ হাসিয়া বলিল, “জ্যাঠামশায়, ভয় পাবেন না। আমি হিন্দুর মেয়ে, বিবাহিতা ; আমার আত্মগৌরব—কুলগৌরব আমি ভুলিনি, ভুলতে পারিনে। ভুলিনি বলেই তো তাঁর কাছে আমাদের পরিচয় গোপন করতে আপনাকে অনুরোধ করছি।”

রমাপ্রসাদবাবু এবার আর কৌতুহল দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছেলেটি কে ? কোথায় থাকে ? কি করে ?”

শেফালী বলিল, “তিনি টুঙলায় থাকেন ; বোধ হয়, রেল ইঞ্জিনিয়ারী চাকরী করেন। তাঁর সঙ্গে জাহাজেই আলাপ হ’য়েছিল। আর কে—কি বলব ? নাম আমার বলা চলে না,—কলিকাতার ব্যারিষ্টার দস্ত সাহেবের ছেলে।”

রমাপ্রসাদবাবু ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, “আমাকে

আগে বলোনি কেন মা ? হায় হায় ! তা হ’লে কি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিই ?—সে কি তোমায় চিন্তে পারেনি ?”

শেফালী নতমুখে বলিল, “না। আমি কোনও পরিচয় দিইনি ; পরিচয়ে কেবল বলেছি, আমি আপনার স্নেহ-কণ্ঠ। বংশের কথা বা দাদার কথা উঠলেই আমি অল্প কথা তুলে সে কথা চাপা দিতুম। তিনি অনেক বার জিজ্ঞাসা করলেও আমি কনকপুরের নাম বলিনি।”

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “মা শেলী, আমি তোমাকে এখন কোথাও যেতে দিচ্ছি ; আমি সুনীলকে টুঙলা থেকে এনে তার হাতে তোমাকে সমর্পণ ক’রব।”

শেফালী দৃঢ় স্বরে বলিল, “না জ্যাঠামশায়। সে কিছুতেই হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে কোনও চেষ্টা হ’লে আমার দাদুর স্বর্গীয় আত্মা চঞ্চল হবে, কুলমর্যাদা অটুট থাকবে না। আর আমি জানি, মিষ্টার দস্ত’র বাপ-মা একটি মেয়ের সঙ্গে গুঁর বিয়ে দেবেন—মনস্থ ক’রেছেন। সেও এই জাহাজেই এল,—ভারি চমৎকার মেয়েটি। আমি তার সুখের পথে কাঁটা হ’তে চাইনে। আর দাদাও এ ভাবে উপযাচিকা হ’য়ে আমাকে যেতে দিতে চাইবেন না, আমিও যাব না। যাওয়া অসম্ভব !”

রমাপ্রসাদ বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, “যদি তাঁর আবার বিয়ে ঠিক হ’য়ে থাকে, তা হ’লে তোমার সঙ্গে তার দেখা করবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? মিসেস গ্রেহাম বলেছিলেন, তোমার প্রতি তার টান আছে।”

শেফালী মাথা নাড়িয়া বলিল, “না ; ও-সব কিছু নয়। জাহাজে পরিচয় হ’য়েছিল, আগ্রায় এত কাছে আছেন, তাই ব’লেছিলেন, এ-দিকে এলে হয় তো দেখা ক’রে যাবেন। আপনি যেন সব গোলমাল ক’রে আমাকে সঙ্কটে ফেলবেন না।”

রমাপ্রসাদবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। আপাততঃ তিনিও সুনীলকে শেফালীর পরিচয় না দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি আশা করিলেন, জগদীশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় তো কোনও দিন উভয়ের মিলন হইবেই,—চিরহুঃখিনী শেফালী স্মৃথী হইবে ; কিন্তু সুনীলের পিতা-মাতা আবার তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন—এই সংবাদে তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। [ক্রমশঃ ।

শ্রীমতী নীলিমা দেবী ।



সংসারে দু'টি প্রাণী,—স্বামী অজিত, স্ত্রী সুনীলা ।

পয়সা-কড়ি আছে । দাস-দাসী, রেডিয়ো, মোটর, টেলিফোন, টেনিশ, সিনেমা, থিয়েটার অর্থাৎ যা-যা থাকিলে এ-যুগে জীবন সচল হয়, অভিযোগ ওঠে না, তার সব আছে । নাই শুধু দু'জনের কোনো কাজ ।

তবু সুনীলার মন যেন খাঁ-খাঁ করে ! নিত্য সেই এক ক্রটান ! সকালে উঠিয়া স্বামীর সঙ্গে টেবিলে বসিয়া চা-টোষ্ট-পোচ ; তার পর অজিত কোথায় বাহির হইয়া যায় ; বাড়ীতে সুনীলার কাছে আসে রেবা, মলি, বিনীতা, অনিন্দ্যা । তাদের সঙ্গে বসিয়া খানিকটা হাসি-গল্প ; তার পর সেই স্নান-আহার ; ছুপুরে একখানা বই লইয়া বসা ! কোনো দিন টেলিফোনে শচীশ বলে,—শিবপুর যাবে ? সুনীলা বলে,—উনি বেরিয়ে-ছেন ! কোনো দিন রেডিয়ো খুলিয়া সেই একঘেয়ে চর্কিত-চর্কণ । তার পর বৈকালের দিকে...

ছটা বাজে । আজ কারো দেখা নাই । অজিত ছুপুরবেলায় বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনো ফেরে নাই । তার কি হইয়াছে, ক'দিন টিকি দেখা যায় না !

বারান্দায় বসিয়া সস্ত-কেনা একখানা নভেল লইয়া সুনীলা তার পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছে । সামনে টিপয়ের উপর আইস-ক্রীম, চকোলেটের বাক্স...

অজিত আসিল ; কহিল,—বেরুবে ?

সুনীলা কহিল,—কোথায় ?

সিনেমায় । সব হাউসে নতুন ছবি ।

—বিলিতি ? না, দেশী ?

—দেশী-বিলিতি...যা চাও !

খানিকটা নিখাসের বাষ্প সুনীলার বুকে পুঞ্জিত হইয়া উঠিল । সুনীলা বলিল,—তুমি যাচ্ছে ?

অজিত কহিল,—হ্যাঁ । আমি যাচ্ছি রক্তিতে বাঙলা ছবি দেখতে । দেবদাসী অঞ্জলি ।

সুনীলা বলিল,—বাঙলা ছবি দেখবার সখ আমার নেই ।

অজিত সুনীলার পানে চাহিল ।

সুনীলা বলিল,—সব একঘেয়ে গল্প ! একটা মেয়ের পিছনে ছুটেছে দু'জন জোয়ান পুরুষ, idiots ! না হয় দু'জন পুরুষের পিছনে ছুটেছে একটা মেয়ে, fool !

অজিত কহিল,—And such is life . জীবনেও তাই ঘটছে !...যে আব-হাওয়া দেশে এসেছে...আমরা নিত্য নতুন চাই...

সুনীলা কোনো জবাব দিল না ।

অজিত কহিল,—আমি যাই । স'ছটায় শো !

অজিত চলিয়া গেল । সুনীলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল । মনের উপর অনেক কথা ভিড় করিয়া জমিল ।

সুনীলার বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর...ক' বছরে কত দিক হইতে কত তরঙ্গ আসিয়া জীবনে লাগিয়াছে !

ডায়োসেশান্ হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সুনীলা গেল কলেজে পড়িতে । কলেজে প্রবেশ করার সঙ্গে মনের উপর নূতন পৃথিবীর উদয় ! সোসাইটি...গ্যামর...এ-সবের মোহ ধীরে-ধীরে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল । গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে...মেয়েকে বাপ একালের মতো করিয়া মানুষ করিবার জন্ত কতপানি আকুল ! মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ জোগাইতে হইবে বলিয়া বাড়ীর বামুন

ছাড়াইরা মা গিয়া হেঁশেলে ঢুকিলেন ; বাপ ট্রাম ছাড়িয়া
ইটা-পথে অফিস-যাতায়াত শুরু করিলেন ! সব দিকে
খরচ-বাঁচানোর বিপুল আয়োজন !

সুনীলাকে গান-শেখানোর জন্ত মাষ্টার আসিল ।
কিন্তুবন্দীর সর্ভে বাপ আনিয়া দিলেন নূতন অর্গান...

তার পর একটি-দু'টি করিয়া বন্ধু-বান্ধবের আসা-যাওয়া
...গোপা । তার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়িত...ব্যারিষ্টার
শচীনাথের কন্যা ; গোপার পিস্তুতো দাদা অক্ষয়...
গান-বাজনায় ওস্তাদ...আরো কত জন...

তার পর অক্ষয়ের মোহ ! এক দিন স্পষ্ট ভানায়
অক্ষয় বলিল...

সুনীলা জবাব দিল না । তার মুখ-চোখ লজ্জায়
রাঙা হইয়া উঠিল !

বাপ সে-কথা শুনিলেন । বাপ বলিলেন—পাগল !
অক্ষয়ের না আছে টাকা-কড়ি...না কোনো ফিউচার !
গান-বাজনা করে...ওতে কি হবে ? মেয়েকে আমি
যে-ভাবে গড়ে তুলছি, কোনো সিভিলিয়ান, কি ব্যারিষ্টার
...না হয় মডার্ণ যুগের কোনো জমিদারের ছেলে...

অক্ষয় তবু এ-বাড়ীতে আসিত...

তার পর বি-এ পড়িবার সময় কোথা হইতে রাজপুত্র
অজিত আসিয়া দেখা দিল ! সুনীলা রূপসী, গান-বাজনায়
তার খুব খ্যাতি, তার উপর বি-এ পড়িতেছে...

অজিত তাকে লুফিয়া লইল ।

বাপের পয়সা লাগিল না । সুনীলা পাইল যোগ্য
বর, বড় ঘর...বাপ যেমনটি চাহিয়াছিলেন !

অক্ষয় আজো বিবাহ করে নাই । বলে, পয়সা
কোথায় ? কি দিয়া পুষ্টি ?

অক্ষয় গ্রামোফোনে গানের রেকর্ড দেয় ; রেডিয়োতে
গান গায়...তাছাড়া দু'-চারিটা স্কুলে গানের মাষ্টারী
করে ; ক'টা সিনেমা-কোম্পানিতে মিউজিক শেখায় ।

সুনীলা নিশ্বাস ফেলিল । হাতের বই হাতে গোলা
...মন অতীতের স্মৃতি-রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে...

দু'দিন পরের কথা...

ছপুরবেলায় ছন্দা-রেবা-সাধনারা দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া

গিয়াছে । নানা কথার সঙ্গে ইজিতে-ভঙ্গীতে আর যে-কথা
বলিয়া গিয়াছে...

অর্থাৎ বিজু ফিশ্ কোম্পানির তোলা নূতন বাঙলা
ছবি "দেবদাসী অঞ্জলি"তে অঞ্জলির ভূমিকায় নামিয়া
কাঁকণ মজুমদার যে নৃত্যলীলা দেখাইয়াছে, সে লীলা
দেখিয়া অনেকের মন একেবারে মশগুল—বিশেষ
করিয়া অজিতের মন ! অজিতের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা
আজ নিবিড়...কাঁকণের ওখানে প্রায় তার নিমন্ত্রণ...

তারা চলিয়া গেলে কথাটা লইয়া সুনীলা অনেক
ভাবিল...ভাবিল, অজিতের কি অপরাধ ! নাচ
দেখিয়া যদি...

সুনীলার মন এত ছোট নয় যে, এ লইয়া মনে
একটা বিশ্রী আবহাওয়া গড়িয়া তুলিবে !

বেলা সাড়ে পাঁচটা । অজিত এখন বাড়ী আসিয়াছে ।
আসিয়াই বাথ-রুমে ঢুকিয়াছে স্নান করিতে ।

টেলিফোন বাজিল ।

সুনীলা ধরিল, বলিল,—হালো...

—অজিত বাবু আছেন ?

—আছেন । আপনি ?

—আমি কাঁকণ মজুমদার...

কাণের উপরে যেন লক্ষ কামান দাগিল ! সুনীলার
মন চকিতে আঁধারে আচ্ছন্ন হইল...সারা দেহ টলমল
করিয়া উঠিল !

নিমেষের জন্ত !

তখন সুনীলা বলিল—তিনি স্নান করছেন । আপনি
ধরে থাকুন...আমি খপর দিচ্ছি ।

সুনীলা গিয়া বাথ-রুমের দ্বারে করাঘাত করিল
ভিতর হইতে প্রশ্ন,—কে ?

সুনীলা বলিল—আমি । তোমাকে টেলিফোনে
ডাকছে...কাঁকণ মজুমদার ।

উত্তর,—ও...খাচ্ছি...বলো, পাঁচ-মিনিট...

টেলিফোনের রিসিভার ধরিয়া অজিত কহিল—
ইয়েস...হ্যাঁ - আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি বেরুচ্ছি...

রিসিতার রাখিয়া অজিত চাহিল স্ননীলার পানে।
স্ননীলা দাঁড়াইয়া ছিল একটু-দূরে...গম্ভীর মূর্তি!

অজিত বলিল,—বিপিন মজুমদারের মেয়ে কাকণ মজুমদার। বিপিনবাবু ছিলেন সবজজ্জ্। বেরিলীতে বাড়ী। কাকণ বি-এ পাশ করে ফিল্মে নামছেন! ওঁর সাত ভাই। বিপিনবাবু কিছু রেখে যেতে পারেননি...খুব অভাব। তাই!...কাকণের নাচ দেখবার জিনিষ!...

স্ননীলা কোনো জবাব দিল না।

অজিত বলিল—বিজু কোম্পানির অবস্থা ভালো নয়...কাকণের মাইনে জোগাতে পারছে না!...নভেলটি প্রোডিউসারের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হচ্ছে। নভেলটির প্রোপ্রাইটর হিমাংশু চৌধুরী আমার বন্ধু...আমি থেকে সে কন্ট্রাক্ট ঠিক হবে, তাই যেতে বলেছে।

অজিত বাহির হইয়া গেল...

স্ননীলা আসিয়া বসিল ড্রয়িং-রুমে সোফায়।

সন্ধ্যা তখন পৃথিবীর বুকে কালো পর্দা টানিয়া সব আলো ঢাকিয়া দিয়াছে!

মন বলিল, অভাব মিটাইবার জন্য এ শুধু কন্ট্রাক্ট করানো নয়! তার সঙ্গে...

পুরুষের মন! চট করিয়া ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে যেমন ভরিয়া উঠিতে পারে, তেমনি আবার চট করিয়াই সব-কিছু সে ভুলিয়া যায়! সব-কিছু বিসর্জন দিতে তার কোথাও বাধে না! নাচের মোহ...

এক দিন এই অজিতকে পাশে লইয়া স্ননীলা বিভোর হইয়াছিল! শয়নে-স্বপনে অজিতকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না!...জাগরণে সর্কক্ষণ অজিতকে পাশে-পাশে রাখিয়াও মন আরো কত কি চাহিত!

সেই অজিত! স্ননীলার মনে আজ কোনো বৈচিত্র্য, কোনো আবেশ রচনা করিতে পারে না!...সংসারে আর-পাঁচটা জিনিষ যেমন আছে, অজিতও তেমনি আছে! ...তার সে সরস আকর্ষণ...কোথায় আজ?

অজিতের কাছে স্ননীলাও আজ এমনি বিরস...তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে!

স্ননীলা ভাবিল, স্বামী আর স্ত্রী...কি লইয়া হুঁজনের মন সারা জীবন সরস-বিচিত্র থাকে, কে জানে!

একটু পরে শৈল আসিল। তার সঙ্গে আসিল হৈমবতী।

স্ননীলা বলিল,—হৈম! ওঃ, কত যুগ পরে দেখা!

শৈল বলিল,—ওর শ্বশুর-বাড়ী সেই দুর্গাপুরে!

স্ননীলা বলিল,—বিলেত থেকেও লোকে আসা-যাওয়া করে। দুর্গাপুর বিলেতের চেয়ে দূর নয়!

হৈমবতী বলিল,—তা নয়। সেখানে মস্ত সংসার—আমার আসা চলে না ভাই।

স্ননীলা বলিল,—এমন গিন্নী হয়েছিস্ হৈম...

শৈল বলিল,—তা হয়েছে। এই তো হুঁদিন এসেছে! এর মধ্যে বুড়ো শাশুড়ী চিঠি লিখেছেন—বেশী দিন থেকে না বো-মা, আমার কিছু ভালো লাগছে না!

স্ননীলা বলিল,—খুব সেকলে...তোমার শ্বশুর-বাড়ীর লোক-জন, না হৈম?

হৈম বলিল,—পাড়া-গাঁ...হাজার হোক। কিন্তু সেকলে বলছিস্ কি মনে করে?

স্ননীলা বলিল,—মানে, তোমার অমন গান-বাজনার সখ ছিল...এখন ছেড়ে দিয়েছিস্ নিশ্চয়?

হৈম বলিল,—গান-বাজনার সময় পাই না ভাই...

স্ননীলা বলিল,—তার চেয়ে বল, গান গাইলে সেখানে সকলে বাইজী-বৌ বলে নিন্দা করবে!

হৈম বলিল,—তা নয় ভাই স্ননীলা। আমার শাশুড়ী সময় পেলেই আমার গান শুনতে চান। গাই...

হাসিয়া স্ননীলা বলিল,—রামপ্রসাদের গান নিশ্চয়?

হৈমবতী বলিল,—না। রবিবাবুর গান...

শৈল বলিল,—যা ভাবছিস্ স্ননীলা, তা নয়, সত্যি! এখানে ও এলো জুতো পায়ে দিয়ে। ওর শাশুড়ী বলেন,—সহরে বরাবর থাকো বৌমা, পথে-ঘাটে বেরুবার সময় জুতো পায়ে দিয়ে। না হ'লে পায়ে লাগবে।

—সত্যি?

বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ননীলা চাহিল হৈমবতীর পানে...

হৈমবতী বলিল,—তিনি বলেন, এখানে কোথায় জুতো পায়ে দিয়ে বেড়াবে! তা ছাড়া পাঁচ জনে কি চোখে দেখবে! মেয়েদের পায়ে জুতো দেখা তাদের অভ্যাস নেই! ভাববে, বিবি-বৌ!

হৈম বলিতে লাগিল তার সংসারের কথা...তার

স্বপ্নের কথা! স্বামী এখনো তার জগৎ ফুল আনিয়া উপহার দেয়! ভালো সাজে সাজাইয়া মুখের পানে ছ' দণ্ড তাকাইয়া থাকে!...

এ-সব কথা কেমন-ধারা শুনাইল...যেন কবিতার কথা...গল্পের কথা! ভাবিল, হৈমর জীবনে এখনো এমন সরসতা আছে! স্বামীর প্রেমে, স্বামীর সোহাগ-বচনে হৈম বিমুগ্ধ!...আর সে?

সুনীলার মনে হইল, সে যেখানে আছে, সেখানে হাজার-পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্ব্ জ্বলিতেছে! আলোর সে তীব্র জ্যোতিতে চোখ বলশিয়া যায়! আর হৈম? সে যেন প্রদীপ-হাতে উঠানের সেই তুলসীতলায় দাঁড়াইয়া আছে...টাদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সারা উঠান ভরিয়া গিয়াছে!

হৈম চলিয়া গেল রাত তখন আটটা। সুনীলার বুক হৈম অনেকগুলো চেউ দিয়া গেল। সে চেউয়ের আঘাতে...

সুনীলা ভাবিতেছিল, হৈম! সুনীলার বাপের চেয়ে হৈমর বাপের অবস্থা ঢের-ভালো ছিল। হৈমর বাপ ছিলেন বড় উকিল...হৈম নিজে ছিল খুব সৌখীন মেয়ে। কলেজের ক্লাশে, গানে-গল্পে এই হৈম সোসাইটির স্বপ্ন দেখিত! সে-হৈম আজ সোসাইটির পাশেও স্থান পায় নাই...বাস করিতেছে নিরীলা আঁধার-বনের কোণে কোন্ ছোট পল্লীগ্রামে...শাশুড়ী-স্বামী, ছাওর-ননদের সঙ্গে...ভিড়ের মধ্যে! আর সুনীলা...

তবু হৈমর মুখে আজো কি সহজ-সরল হাসি! হৈমর প্রাণের উপর কোনো দিক হইতে ভারী চাপ পড়ে নাই! শাইকোলজি মানিয়া হৈম নিশ্বাস ফেলে না! সন্ত-বিবাহিতা কিশোরীর মতো স্বামীর কথা বলিতে এখনো তার ছ'চোখ সরসতায় আর্দ্র হইয়া ওঠে! লজ্জায় কথা জড়াইয়া যায়! আর সুনীলা...?

বুক ভরিয়া খুব-বড় একটা নিশ্বাস...

সুনীলার মনে হইল, সে একা! ঐশ্বর্য্য, দাস-দাসী, লোক-জন থাকিতেও সে নিঃসঙ্গ-লোকচারিণী! তার আশে-পাশে কেহ নাই!...

স্বামী অজিত?

লাস্ক-কৌতুকে নাচিয়া বেড়াইতেছে!

মাথার উপর জ্যোৎস্নার সাগর! গভীর রাত্রি। বাড়ীর সকলে নিদ্রার ধোরে আচ্ছন্ন। সুনীলা শুধু জাগিয়া বসিয়া আছে খোলা গাড়ী-বারান্দায়!

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

অজিত ফিরিল।

সুনীলা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

অজিত আসিয়া বলিল—এখনো ঘুমোওনি?

অজিতের মুখে-চোখে হাসির দীপ্তি!

সুনীলা বলিল,—না...

অজিত বলিল—বড় ঘুম পেয়েছে। শুয়ে পড়িগে...

সুনীলা বলিল—খাবে না?

অজিত কহিল,—না। নেমস্তন্ন ছিল।

একটা কথা...বিদ্যুতের শিখার মতো সুনীলার মন-খানাকে বিঁধিয়া তাতাইয়া দিল!

সুনীলা বলিল—নেমস্তন্ন ছিল বোধ হয় সেই কাকণ মজুমদারের ওখানে?

অজিতের মুখে কে যেন পাথর ছুড়িয়া মারিল! অজিত কহিল—হ্যাঁ।

অজিত দাঁড়াইল না; গিয়া বিচানায় শুইয়া পড়িল।

পরের দিন সকাল-বেলা।

চায়ের টেবিলে অজিত আর সুনীলা। কারো মুখে কথা নাই!

সুনীলা বলিল—তুমি এমন অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হয়ে থাকো কেন? তোমার মন যদি কাকণ মজুমদারকে চায়, তোমার পায়ের উপর কেঁদে পড়ে আমি বলবো, ওগো, আমার বুকের উপরে দাঁড়িয়ে এ-উৎসব তুমি করো না...তা তুমি ভেবো না!...তেমন শিক্ষা আমি পাইনি। জীবনকে মেলোড্রামা কিম্বা ফিল্মের গল্প বলে আমি কোনো দিন ভাবি না। ভাবতে পারবো না!

অপ্রতিভের মতো অজিত চাহিল সুনীলার পানে।

সুনীলা বলিল—তুমি যদি তাকে ভালোবাসো... তোমার মন যদি তাতে খুশী থাকে, ভালো কথা!

অজিতের সর্ব্বাঙ্গ কেমন অবশ হইয়া আসিল... বাহিরের কলরব-কোলাহল কাণে অস্পষ্ট হইয়া উঠিল!

সুনীলা কহিল—শুধু একটা কথা...পাঁচ জনে এসে
আমায় ব্যঙ্গ করে যাবে, এমন কিছু করো না!

সুনীলা আর বলিতে পারিল না; চেয়ার ছাড়িয়া
উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

অজিত কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল...যেন চেতনা নাই!

ঘরের এক-দিকে বড় খাঁচায় ছিল এক-রাশ ছোট
পাখী, যখন চেতনা ফিরিল, তখন কাণে শুনিল
সেই-পাখীরা কল-কাকলী শুরু করিয়াছে!

ছপুরবেলায় গাড়ী বাহির করাইয়া সুনীলা গাড়ীতে
বসিল; ড্রাইভারকে বলিল,—ভবানীপুর...

ভবানীপুরে থাকে অক্ষয়। সুনীলা সে বাড়ী চেনে।

ফ্ল্যাট-বাড়ীর দোতলার ঘর। অক্ষয় একা থাকে।

ঘরে বসিয়া অক্ষয় গানের সুর রচনা করিতেছিল।

সুনীলাকে দেখিয়া সে অবাক! বলিল—নীলা!

...তুমি হঠাৎ দীনের ভবনে!

সুনীলার গম্ভীর মূর্তি! গম্ভীর কণ্ঠে সুনীলা বলিল—
কাব্য করতে আসিনি!

অক্ষয় বলিল—তা জানি। তবে হঠাৎ?

সুনীলা বলিল—কাজ আছে।

—বলো।

সুনীলা বলিল—কাঁকণ মজুমদার বলে কে এক মস্ত
আর্টিষ্ট এসে দেখা দেছে তোমাদের ফিল্ম-জগতে?

অক্ষয় বলিল,—হ্যাঁ। বিপিন মজুমদার ছিলেন সর্ব-
জ্ঞ। তাঁর মেয়ে কাঁকণ। কিন্তু হঠাৎ তার কথা?

সুনীলা বলিল—ওঁর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে!...
কাঁকণের নামে উনি একেবারে মশগুল!

অক্ষয় বলিল—অজিত বাবু?

—হ্যাঁ।

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুনীলা বলিল—
ভেবো না, সেজ্ঞ আমার বুকে অক্ষয় সাগর উথলে
উঠছে! তা নয়। তবে scandalকে আমার ভয়!

অক্ষয় বলিল—কথাটা চার দিকে প্রচার হয়েছে বটে!
আমি শুনেছি, কাঁকণকে নিয়ে অজিত বাবুর মোটর-
ড্রাইভ। নতুন কোম্পানির সঙ্গে কাঁকণের কন্ট্রাক্ট হচ্ছে,

তাতে অজিত বাবু দাঁড়াচ্ছেন কাঁকণ মজুমদারের
গ্যারান্টির!...তাছাড়া নিত্য নতুন উপহার-উপঢৌকন!
অর্থাৎ সারাদিন ছু'জনে একসঙ্গে আছেন। আমি অবশ্য
দেখিনি...শোনা কথা! অনেকে বলছে, কাঁকণকে উনি
না কি বিবাহ করবেন!

সুনীলা এ-কথা শুনিল। গুম্ব হইয়া রহিল।...তার
পর একটা নিশ্বাস।

নিশ্বাস ফেলিয়া সুনীলা বলিল—হুঁ...

অক্ষয় চাহিল সুনীলার পানে।

সুনীলা ডাকিল—অক্ষয়...

অক্ষয় বলিল—বলো...

সুনীলা বলিল—আজই সকালে দর্প করে ওঁকে
বলেছি, এর জন্ত তোমার পায়ে ধরে আমি কাঁদবো—
তা ভেবো না!...কথা তা নয়। আমি শুধু
ভাবছি, পাঁচ জনে এসে হেসে ছু'কথা শুনিয়া যাবে!
তাছাড়া...

সুনীলা চুপ করিল।

অক্ষয় তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সুনীলা বলিল—আমি কারো মুখের পানে চাইতে
পারবো না...

অক্ষয় হাসিল, বলিল—বুঝেছি। লোকে ভাববে,
তোমার চেয়ে এমন superior being...মানে, তার
মোহ এত বেশী যে, অজিতবাবু তোমাকে সাইডিংয়ে
ফেলে বে-লাইনে চলেছেন!

সুনীলার মনেও এই কথাটা প্রবল হইয়া দেখা
দিয়াছে! সোসাইটিতে তার পোজিশন্ আছে...
এমন রূপ, এমন গুণ...সে-রূপ-গুণ লইয়া তার জীবনে
এমন সার্থকতা...সুনীলা জানে, পাঁচ জনে তার পানে
কতখানি ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায়!

অক্ষয় বলিল,—ভয় নেই সুনীলা। অজিতবাবুব
এ ছু'দিনের মোহ...glow, glamour দেখে মানুষের
চমক লাগে না? এ সেই চমক! আতস-বাজির প্রচণ্ড
আলো মানুষকে চমক দেয়...সে চমক ক্ষণেকের...
সে-আলোয় মানুষ বাস করতে পারে না! বাস করবার
জন্ত মানুষ চায় নিষ্ক আলো...যাতে চোখ ঝলসাবে না,
অথচ আলোয় চারি দিক সুস্পষ্ট থাকবে।

সুনীলা চাহিল অক্ষয়ের পানে, কহিল,—তোমার কাছে এসেছি...কেউ জানেন না। এসেছি এই জন্ত। মানে...

কথাটা সে শেষ করিল না...অক্ষয়ের পানে চাহিল।

অক্ষয় তার পানেই চাহিয়া ছিল: তার দৃষ্টির সঙ্গে সুনীলার চোখের দৃষ্টি মিলিল।

অক্ষয় দেখিল, সুনীলার ও-দৃষ্টিতে সেই বিহ্বলতা.. সেই সঙ্গে করুণ মিনতি! সুনীলা দেখিল, অক্ষয়ের দৃষ্টিতে চিরদিনকার সেই প্রীতি..আবেগ!

অক্ষয় কহিল,—বলো...আমায় কি করতে হবে?

সুনীলা বলিল,—আমি এর শোধ নিতে পারি! উনি জানেন, তুমি আমায় ভালোবাসো! এখনো!... এক দিন...

নিখাসের বাপ্পে সুনীলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

অক্ষয় বলিল,—এক দিন...কি? বলো...

সুনীলা বলিল—তুমি বিয়ে করোনি...তাই নিয়ে উনি আমায় তামাসা করেন।...আমি এক দিন বলেছিলুম, তুমি যদি অবহেলা করো, আমার তবু এক জন থাকবে, যে আমায় ভালোবাসে! তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সে আমায় মাথায় করে রাখবে!

অক্ষয়ের মাথায় তীব্র রক্তস্রোত...

অক্ষয় বলিল,—এ কথা তুমি বলেছিলে?

—বলেছিলুম।...এক বার আমার মনেও হয়েছিল... কিন্তু...

সুনীলার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। সুনীলা কহিল—পাঁচ জনে আমার পানে করুণার দৃষ্টিতে চাইবে...shocking!

অক্ষয় বলিল,—এ দায় থেকে তোমায় উদ্ধার করবো?

সুনীলা কহিল—তুমি ছাড়া এমন-জন আমার আর কেউ নেই, অক্ষয়। তাই আজ তোমায় মনে করে তোমার কাছে আমি এসেছি...

অক্ষয় হাসিল। বলিল,—ভালোই করেছো! আমি তোমায় রক্ষা করবো।

পরের দিন সকালবেলা।

অক্ষয় আসিল কঁাকণের গৃহে।

কঁাকণ কহিল—অক্ষয়বাবু!

অক্ষয় কহিল—আলাপ-পরিচয় করতে এলুম।

নভেলটি প্রডিউসার্শে আমি মিউজিক শেখাবো...কাল সন্ধ্যায় কন্ট্রাক্ট সই করে এসেছি।

কঁাকণ বলিল,—সত্যি? বলেন কি! আপনি অবাক করে দিলেন অক্ষয়বাবু!...বাঁধা-কন্ট্রাক্টে কোথাও আপনি কাজ করতে চান না, আর...

অক্ষয় কহিল—ভাবলুম, এ-রকম দুর্ভয় গৌ ভালো নয়! যখন ব্যবসা বলে এ-বিড়াকে অবলম্বন করেছি... টাকা-দেনেওলা ব্যবসায়ীর কাছে অহঙ্কারকে বড় করে ধরলে এক দিন যদি পস্তাতে হয় শেষে...

কঁাকণ বলিল—খুব ভালো হলো! গানে আমি কাঁচা। কেউ আমার temperament বুঝে আমায় গান গাওয়াতে পারে না...সেজন্ত আমার কতখানি দুঃখ!

অক্ষয় কহিল—আমি চেষ্টা করবো...কিন্তু সেজন্ত ভালো করে আমাকে পরিচয় নিতে হবে আপনার মনের...

কঁাকণ কহিল—নিশ্চয়!

দু'দিনে অক্ষয় এমন সুরের ফাঁদ পাতিল...

অজিত আসে; আসিয়া বলে,—আজ কি কথা ছিল?

কঁাকণ একটা সুর বাজাইতেছিল, বলিল,—কি কথা?

অজিত বলিল,—ডায়মণ্ড-হার্কার টিপ...

কঁাকণ কহিল,—কিন্তু চারটের সময় অক্ষয়বাবু আসবেন..পরশু থেকে স্কটিং সুরু...

অজিত কহিল,—এ-সুর এ্যাদিন কোথায় ছিল?

কঁাকণ বলিল,—না, না...এটাকে আজ দখল করতেই হবে। আমার ambition জানেন তো, to shine in ফিল্ম-ওয়ার্ল্ড!

অজিত বলিল,—কিন্তু যে-কথা আছে...আমার সঙ্গে আপনার...

হাসিয়া কঁাকণ কহিল,—এক দিন ডায়মণ্ড-হার্কার না গেলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে?

মাসখানেক পরের কথা।

স্কটিংয়ের পর তুহিন-নিলয়ে চায়ের আসর।

অক্ষয় বলিল,—অজিতকে তুমি বিয়ে করবে সত্যি?

তার স্ত্রী রয়েছে...

কাঁকণ বলিল,—We are in love.

অক্ষয় বলিল,—Love! অজিত তোমাকে ভালো-বাসে, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। এ ওর নেশা! চমক!...ওর স্ত্রী সুনীলার নেশাতেও এক দিন ও এমনি উদ্ভ্রান্ত হয়েছিল। না হ'লে গরীবের ঘরের মেয়ে সুনীলা...ওর স্ত্রী হবে...সুনীলা তা স্বপ্নেও ভাবেনি কোনো দিন!

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া কাঁকণ বলিল,—আপনি বিয়ে করেননি কেন অক্ষয়বাবু?...Any romance?

অক্ষয় বলিল,—যদি বলি, ঠ্যাং?

—সত্যি?

কাঁকণের ছুঁচোখে কৌতূকের শিখা!

অক্ষয় কহিল,—বিশ্বাস হয় না?...আমি গরীব... আমার আবার রোমান্স!

—না, না। তা নয়।

—ত.ব? অক্ষয় বলিল,—তোমরা মেয়ে-জাতটা মানুষের কি দেখে ভালো, ভুলে ভালোবাসে...বুঝতে পারি না! আমি এক জনকে ভালোবাসতুম। আমার পয়সা ছিল না, তাই সে খামাকে তাচ্ছিল্য করলে। তার বিয়ে হয়েছে খুব বড়-ঘরে। অগাধ ঐশ্বর্য। কিন্তু স্বামী? আমি জানি, স্বামী-স্ত্রীতে কোনো মতে তারা এক-বাড়ীতে বাস করছে। স্ত্রী তার বান্ধবীদের নিয়ে, সাজ-সজ্জা নিয়ে আছে; আর স্বামী ঘুরছে নব-নব রূপসীর রূপে মশ্গল হয়ে!

কাঁকণ কোনো জবাব দিল না, অক্ষয়ের পানে চাহিয়া রহিল। ছুঁচোখে একাগ্র দৃষ্টি!

অক্ষয় বলিল,—এ বিয়ের প্রয়োজন? শাওঁ, গাওঁ, জুয়েলারি, আর .সোসাইটিতে জাঁক-জমক, অহঙ্কার-গর্ক! কেউ আমাকে ভালোবাসে না...আমি ভালো-বাসবো এমন-জন আমার নেই...the very idea... মনে হ'লে আমি শিউরে উঠি! বিয়ে না করি, তার অর্থ আছে। কিন্তু বিয়ে করবো...অথচ স্বামী পাবে না স্ত্রীকে, স্ত্রী পাবে না স্বামীকে...আমাদের দেশে এই যে অপূর্ব নাট্যাভিনয় সুরু হয়েছে, এ নাটকের জুড়ি পৃথিবীর কোনো দেশে আর পাবা না, বোধ হয়! অজিতের স্ত্রী আছে...সে-স্ত্রীকে ফেলে সে ঘুরছে

তোমার পিছনে! তোমাকে ও বলে, ভালোবাসে... তুমি সে-কথা বিশ্বাস করো...আমাকে এ-কথা বিশ্বাস করতে হবে?

কাঁকণের সারা মনে কেমন আতঙ্ক...সে যেন কাঁটা!

অক্ষয় বলিল—তবু তুমি বিশ্বাস করবে! কারণ, অজিতকে অবিশ্বাস করলে তোমাকে হারাতে হবে অজিতের পরিচর্যা...তার মোটরে চড়ে ড্রাইভ, তার আবেগ-কম্পিত স্তুতি-বচন, তার এই দাশু! এ-সবের মোহে যদি ভালো, তা হ'লে ছাই লেখাপড়া শিখেছো! ঘরে স্ত্রী আছে...সুন্দরী স্ত্রী...মুখ্য নয়...সুহাসিনী, সুভাষিনী...সে-স্ত্রীকে ফেলে যে-স্বামী অগ্র মেয়েকে বলে, ভালোবাসি...well, আমি মেয়ে-মানুষ হলে তেমন-লোককে ঘণা-ভরে সরিয়ে দিতুম...প্রশয় দিতুম না... কোনো দিন না!

কাঁকণের মনের আতঙ্ক একেবারে পাহাড়ের মতো তুঙ্গ হইয়া উঠিল।

ছ'-এক সপ্তাহ পরে সিনেমা-সাপ্তাহিক-কাগজগুলায় খপর বাহির হইল...

সুরশিল্পী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বায়ের সঙ্গে আমাদের নৃপুর-চারিণী নৃত্যময়ী রূপ রাণী কুমারী কাঁকণ মজুমদারের শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। বড় দিনের ছুটিতে ছ'জনে হনিমুনে বাহির হইবেন। যোগোন এমন যোগা-যোজনায় আটের মহল প্রজ্ঞাপতির পাখার মতো বিচিত্র রমণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই!

সন্ধ্যার একটু আগে অজিত আসিয়া ডাকিল,— সুনীলা...

বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সুনীলা প্রসাধন করিতেছিল...

অজিত ঘরে আসিল।

আয়নার সামনে সুনীলা নিজের রূপরাশিকে যেন অজস্র-ধারে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে!

সে রূপ-রাশির সামনে অজিত বিশ্বাস-মোহে... বিমুগ্ধ! মৌন-মূক...

সুনীলা ফিরিয়া চাহিল; কহিল,—কিছু বলবে?

অজিত কাছে আসিল। সুনীলার গ্রীবা... যেন
মৃগাল! সে-গ্রীবা অজিত চুম্বনে অভিশিক্ত করিল।

সুনীলার দেহে-মনে শিহরণ! সুনীলা কহিল,—কি
করো...আঃ!

অজিত বলিল,—জানো, তোমার সেই অক্ষয়...হুঁঃ,
এত কাল বিয়ে করেননি। এখন করেছেন...

—সত্যি ?

—হ্যাঁ। কাকে, জানো ?

—কাকে ?

—কাকণ মজুমদারকে। ফিল্ম-আর্টিষ্ট কাকণ!...
Scandalous! তাছাড়া কাকণকে কোন্ ভদ্রলোক বা
বিয়ে করবে! হাজার হোক...

সুনীলার মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল!

অজিত বলিল,—আমার ওপর দিন-কতক কি রকম
ভর করেছিল ঐ কাকণ! হুঁঃ...নেহাৎ আমি শক্ত ছেলে
...তা হ্যাঁ, ভালো কথা, ভাবছি দিন-কতকের জগ
বেড়াতে বেরবো! দিল্লী...আগ্রা...যাবে ?

—যাবো।

—পরন্তু যদি বেরুই ?

—বেশ।

সন্ধ্যার সময় অক্ষয়ের বাড়ীর সামনে মোটর আসিয়া
দাঁড়াইল। মোটর হইতে নামিল সুনীলা।

অক্ষয় ছিল বাহিরের ঘরে। বলিল,—নীলা।

তার হুঁচোখে আনন্দের দীপ্তি...

সুনীলা কহিল,—সত্যি, কি কেলেঙ্কারী করলে অক্ষয়!
দেশে আর মেয়ে ছিল না? শেষে ঐ কাকণ মজুমদার!

অক্ষয়ের বুকখানা ধব্ধ করিয়া উঠিল! হুঁ চোখের
সামনে আলো যেন দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল!

অক্ষয় কোনো কথা বলিল না।

সুনীলা বলিল,—ওর কাছেও দিনকতক ভর করেছিল
তোমার ঐ কাকণ!...সাবধানে থেকো...শেষে যেন...
মানে, তোমার সে লাঞ্ছনা-অপমান, বেইজ্জতী আমা-
দেরো লাগবে! হাজার হোক...

অসহ! সেই সুনীলা...ফ্যাশনেব্ল্ সোসাইটির
মাথার মণি! সে এমন ইতর!

রাগে অক্ষয়ের গা জ্বলিল। ভাবিল, বলে, খব্দার!

কি করিয়া সে-রাগ সামলাইয়া চূপ করিয়া রহিল...

সুনীলা কহিল,—বো এই বাড়ীতেই আছে? বো
দেখাবে না?

—না...

অক্ষয়ের স্বর বেশ কঠিন।

সুনীলা বলিল—কোথায় যাচ্ছে হনিমুন করতে ?

অক্ষয় বলিল,—তুমি চলে যাও সুনীলা! আমার
স্ত্রীর সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করবে, এ-অধিকার তোমাকে কেউ
দায়নি!

সুনীলার হুঁচোখে আগুনের শিখা! চোখের সে
আগুন কথায় ছিটাইয়া সুনীলা বলিল,—ওঃ, ভয়ঙ্কর
ভালোবাসা যে! এ ভালোবাসা ক'দিন থাকে, দেখবো!

কথাটা বলিয়া সুনীলা সদন্তে চলিয়া গেল।

বাহিরে মোটর।...সশব্দে মোটর চলিয়া গেল।

কাকণ আসিল; বলিল,—কে এসেছিল ?

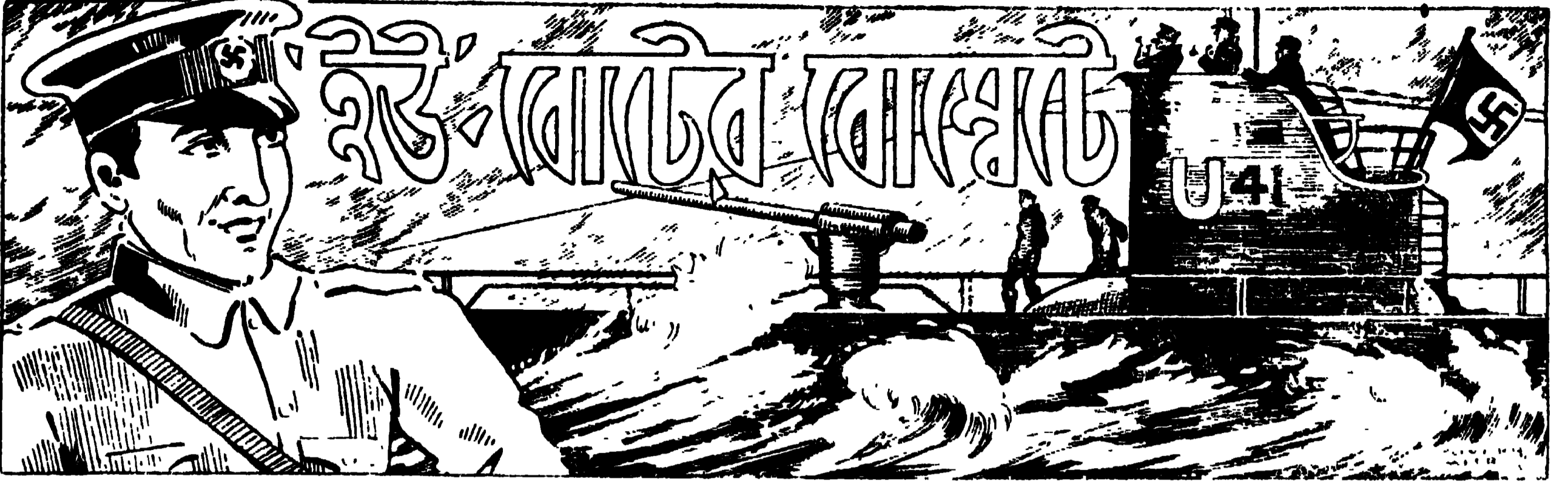
—একটা স্ত্রীলোক...নেহাৎ হতভাগা! এক দিন
আমার কাছে ভিখিরীর মতো এসে সাহায্য চেয়েছিল...
আমি তাকে কি সাহায্য না করেছি!

—তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল ?

—না। ওর কথা শুনে মনে হলো না, সে-উপকারের
কথা ওর মনে আছে!...ভয়ানক ইতর মন! এরা আবার
শিক্ষা-সভ্যতার গর্ভ করে! ধিক!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।





অষ্টাদশ পর্ব

আমসের দস্তশূল !

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

কাউন্ট জোলার্ণের আদেশে আমস্ সাগর-বেলায় প্রস্থান করিলে আমি মেরীকে সঙ্গে লইয়া দোতালার উপস্থিত হইলাম, এবং কাউন্টের বাসের জন্ত যে কক্ষটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বাসোপযোগী করিবার জন্ত পরিকার করিতে লাগিলাম ; তাহার পর তাঁহার জিনিসপত্রগুলি পাকশালা হইতে আনিয়া সেই কক্ষে গুছাইয়া রাখিলাম। হাতের কাজ শেষ হইলে আমরা পাকশালায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া, কাউন্ট আমাকে সমুদ্রকূলে গমন করিয়া আমসের কার্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। আমি সেখানে গমন না করিলে পাহারা ছাড়িয়া আমসের বাড়ী ফিরিবার উপায় ছিল না।

আমি সমুদ্রকূলে গমন করিয়া আমস্কে একটি বালুকাস্তূপে উপবিষ্ট দেখিলাম,—সে একখান পাথরে ঠেস্ দিয়া নিশ্চরভাবে বসিয়া ছিল। তাহার তামাকের পুরাতন পাইপটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে ধূমপানের জন্ত একটা নূতন পাইপ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল ; সে তাহাতে গুঁড়া তামাক সাজিয়া গভীর ভাবে ধূমপান করিতেছিল। হরিকেন লঠনটা না জালিয়া সে এক পাশে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। চতুর্দিক তখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

আমাকে আসিতে দেখিয়া আমস্ ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? তোমার এখানে আসিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি ?”

আমার সেখানে আসিতে কি কারণে বিলম্ব হইল—

তাহা তাহাকে জানাইলে সে বলিল, “সেই শয়তানটা তাহার বিছানায় শুইতে গিয়াছে কি ?”

আমি বলিলাম, “কাহার কথা বলিতেছ ?—কাউন্ট জোলার্ণ ?—না, এখনও তিনি শয়ন করেন নাই।”

আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, “সেই হতভাগা নাজীটা এখনও শুইতে যায় নাই ? তবে আমি এখন বাড়ী ফিরিতেছি না। সে শয়ন করিলে আমি বাড়ী যাইব। আমার মেজাজ এখন এতই খারাপ হইয়া আছে যে, তাহার সঙ্গে দেখা হইলে আমি হয় ত এরকম কোন ব্যবহার করিয়া বসিব—যেজন্ত পরে আমার অনুতাপ হইতে পারে।”

এই কথা বলিয়া আমস্ উন্মাদের মতো হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল ; তাহার পর বলিতে লাগিল, “রাস্কেলটা আমার সঙ্গে এ ভাবে আলাপ করিতেছিল—যেন আমি কীট-পতঙ্গের চেয়েও তুচ্ছ ! আমি বাড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের সকল আদেশ পালন করিতেছি ; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল প্রকৃতিতে সকল বিপদ মাথায় লইয়া নিত্যা নিয়মিত ভাবে এই অর্পিতকর কঠোর কর্তব্য পালন করিতেছি। সময় নাই, অসময় নাই, কি দিন, কি রাত্রি, সকল সময় প্রসন্ন মনে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি। তাহার এই পুরস্কার !—প্রতিদানে এই ইতর ব্যবহার !”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমস্ মূখ হইতে পাইপটা খুলিয়া হাতে লইল ; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, “কিন্তু এইরূপ ব্যবহার আমি সহ্য করিব না। উহার ব্যবহার সত্যই আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যদি এই শয়তান এখনকার আড্ডা পরীক্ষা করিবার জন্ত উৎসুক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে সঙ্গে না লইয়াও একাকী তাহা পরীক্ষা করিতে পারে ; সেজন্ত

আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার অপমান করিবার প্রয়োজন কি? এ আমার নিজস্ব 'ব্ল্যাক-গল্ ফান্স',—জার্মান নৌ-বারিক নহে, বেটা দুর্নুখ নাজীটার কি তাহা বুঝিবার শক্তি নাই?"

এই সকল কথা বলিয়া আমস্ সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর অন্ধকারের ভিতর দিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। আমি নির্ঝক্ ভাবে একাকী নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া রহিলাম। সেই স্থানে আমাকে প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল।

প্রত্যুষে আমি শ্রান্ত দেহে ও অবসন্ন মনে বাড়ীর দিকে চলিলাম। আমি পাকশালায় প্রবেশ করিয়া, অগ্নিকুণ্ডের অদূরে আমার বিচালীর শয্যা প্রসারিত করিয়া তাহার উপর শয়ন করিলাম; মুহূর্ত্ত পরেই আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি চক্ষু মেলিতেই মেরীকে দেখিতে পাইলাম; সে পোষাক পরিয়া ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অতঃপর আমি উঠিয়া মেরীকে তাহার পাকশালার কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলাম। মেরী কাউন্ট জোলার্ণের আদেশ অনুসারে তাঁহার কামাইবার জন্ত এক মগ্ জল গরম করিয়া রাখিয়াছিল। আমি সেই জল লইয়া দোতালায় চলিলাম।

মেরীর প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে কাউন্ট জোলার্ণ তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে নীচে নামিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার পরিধানে সামরিক পরিচ্ছদের পরিবর্তে সাধারণ পরিচ্ছদ ছিল। সেই বেশেও তাঁহাকে চমৎকার মানাইতেছিল। এমন মাতঙ্গর, তেজস্বী লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; আমার পরিচিত জার্মানদের মধ্যে তাঁহারই মুখে অভিজাত্য-গৌরব পরিস্ফুট দেখিলাম।

কাউন্ট মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা কোথায়?"—তিনি একখান চেয়ার টানিয়া-লইয়া টেবলের কাছে বসিয়া পড়িলেন।

মেরী বলিল, "বাবা এখনও শুইয়া আছেন।"

কাউন্ট আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি তাহার শয়ন-কক্ষে যাও, শীঘ্র তাহাকে ডাকিয়া আনো।"

আমি তৎক্ষণাৎ পাকশালা ত্যাগ করিয়া দোতলায়

চলিলাম, এবং আমসের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিলাম।

আমস্ ভিতর হইতে গর্জন করিল, "কে তুমি—দরজা খুলে তাইতেছ?"

আমি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলাম, "আমি পিটার, তোমাকে ডাকিবার জন্ত—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্বেই আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "শীঘ্র চলিয়া যাও। ও-ভাবে আমাকে বিরক্ত করিলে আমি উঠিয়া তোমার পিঠে বেত ভাঙ্গিব।"

কিন্তু তাহার আদেশে আমি পলায়ন না করিয়া বিনীত ভাবে বলিলাম, "আমি নিজের ইচ্ছায় আসি নাই; কাউন্ট জোলার্ণ তোমাকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন, সেই জন্ত তোমাকে বিরক্ত করিতে হইল।"

আমার উত্তর শুনিয়া আমস্ মুহূর্ত্ত কাল নির্ঝক্ রহিল; তাহার পর আপন-মনে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার পর সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি তাহার কাছে ফিরিয়া-গিয়া তাহাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বল। সে নিজে খুব সকালে উঠিয়াছে বলিয়া আর সকলেও ঐ রকম সকালে উঠিবে, তাহার একরূপ আশা করা অস্বাভাবিক। অতঃপর সকলে তাহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য নহে। তুমি তাহাকে বলিতে পার—আমি এখন উঠিব না। যতক্ষণ আমার ইচ্ছা, আমি শুইয়া থাকিব। যখন আমার উঠিবার ইচ্ছা হইবে, তখন উঠিব, তাহার পূর্বে উঠিব না। যাও—তাহাকে এ কথা জানাও।"

তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ তীব্র হইল। আমার কথায় সে বিরক্ত হইয়াছে—ইহা বুঝিয়াও আমি বলিলাম,— "কিন্তু—"

আমস্ আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আবার আমার কথার উপর কথা! যদি এখনই চলিয়া না যাও—তাহা হইলে আমি উঠিয়া বেতের চোটে তোমার পিঠের চামড়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিব। পাজী, বদমা'স্,—নিকালো!"

আমস্ শীঘ্র উঠিবে না বুঝিয়া আমি নীচে নামিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলাম।

আমাকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া কাউন্ট জোলার্ণ

আমার মুখের উপর তীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,
“কি হইল ?”

আমি বলিলাম, “আমাদের কথা শুনিয়া মনে হইল,
এখন তাড়াতাড়ি তাহার শয্যা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা
নাই।”

কাউন্ট নীরস স্বরে বলিলেন, “তুমি কি বলিতে চাও
—সে উঠিয়া-আসিতে অসম্মত ?”

আমি অনিচ্ছার সহিত বলিলাম, “তা—আপনি যাহা
বলিলেন, তাহাই বোধ হয় সত্য; ইহা ভিন্ন আর কি
বলা যাইতে পারে ?”

আমার কথা শুনিয়া কাউন্ট জোলার্ণ আর কোন
কথা বলিলেন না, তিনি চেয়ার ঠেলিয়া-ফেলিয়া হঠাৎ
সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর সেই কক্ষ ত্যাগ
করিলেন। তিনি সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া আমাদের
শয়ন-কক্ষের রুদ্ধদ্বার এক ধাক্কায় খুলিয়া ফেলিলেন; সেই
শব্দ আমি পাকশালা হইতেই শুনিতে পাইলাম।

কাউন্ট উত্তেজিত স্বরে ডাকিলেন, “স্কেবি !”

আমসু তাহার শয়ন-কক্ষের ভিতর হইতে গর্জন
করিয়া বলিল, “তুমি এখানে কি চাও ? যাও, এই
মুহুর্তেই আমার ধর হইতে বাহির হইয়া যাও। কে
তোমাকে বিনা-এত্তেলায় আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ
করিতে বলিয়াছে ? যাও, শীঘ্র চলিয়া যাও !—আমার
কথা শুনিতে পাইয়াছ ?”

অপমানিত নাজী কাউন্ট কঠোর স্বরে বলিলেন,
“শয্যা হইতে উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া নীচে
যাইবার জন্ত তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। হাঁ,
পাঁচ মিনিট মাত্র—তাহার অধিক নহে।—আমার কথা
বুঝিতে পারিয়াছ ?”

এই কথা বলিয়া কাউন্ট সশব্দে নীচে নামিয়া
আসিলেন, এবং পাকশালায় প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিয়া
অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে প্রাতর্ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমসু নীচে আসিতে যদি অধিক বিলম্ব করে, তবে
তাহার কিরূপ ফল হইবে তাহা বুঝিতে না পারিলাম মেরী
ও আমি উৎকর্ণ হইয়া স্তব্ধভাবে পাকশালায় বসিয়া
রহিলাম। আমাদের মন নানা চিন্তায় আলোড়িত
হইতে লাগিল। কাউন্ট জোলার্ণ কিরূপ কঠোরপ্রকৃতি

দৃঢ়ান্ত নাজী—তাহার কিছু কিছু পরিচয় পূর্বেই
পাইয়াছিলাম। আমসু তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে
তাহাকে দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে—এ বিষয়ে
আমাদের সন্দেহ ছিল না।

যাহা হউক, আমসু কি ভাবিল বলিতে পারি না;
কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই সে শয্যা ত্যাগ করিয়া নীচে
নামিয়া আসিল। সিঁড়িতে তাহার ভারী বুটের শব্দ
শুনিতে পাইলাম।

আমসু যখন পাকশালায় প্রবেশ করিল—তখন তাহার
বিশৃঙ্খল বেশ-ভূনা দেখিয়া আমাদের বিশ্বয়ের সীমা রহিল
না! তাহার মাথার কক্ষ চুলগুলি কপালের উপর
ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ভাল চকুটি ক্রোধে লোহিত
বর্ণ ধারণ করিয়াছিল; তাহা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
নিঃসারিত হইতেছিল। তাহার মুখের খোঁচা খোঁচা
দাড়ি-গোঁফে কয়েক দিন ক্ষর স্পর্শ না হওয়ায় তাহার
মুখ অত্যন্ত কদাকার দেখাইতেছিল। তাহার কদর্যা
মুখভঙ্গি দেখিয়া আমাদেরই মন ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া
উঠিল।

আমসু উত্তেজিত ভাবে তীরস্বরে বলিয়া উঠিল,
“আমি আসিয়াছি; আপনার কি বলিবার আছে, তাহা
শুনিয়া আমি পুনর্বার শয়ন করিতে যাইব। তাহার
পর যতক্ষণ ইচ্ছা আমি শয্যায় পড়িয়া বিশ্রম করিব।
কাহারও আদেশে আমার শয্যাত্যাগের অভ্যাস নাই।
—আমার কথা আপনি বুঝিতে পারিলেন ?”

আমসু দৃঢ়পদে টেবলের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার
পর পুনর্বার উত্তেজিত স্বরে বলিল, “হাঁ, আপনার সঙ্গে
বুঝাপড়া শেষ করিয়া আমি ফিরিয়া যাইব,—এই কথাই
আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।”

তাহার কথা শুনিয়া কাউন্ট জোলার্ণ সক্রোধে
বলিলেন, “তুমি আমার সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে আসিয়াছ?
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত কি ভাবে আলাপ করিতে হয়, তাহা
তুমি জান না; কিন্তু যদি এই প্রকার অভদ্রভাবে আর
একটিও কথা মুখ হইতে বাহির কর—আমার আদেশ
পালনে গাফিলী কর—তাহা হইলে আমি তোমাকে
বলিয়া রাখিতেছি, আমার সঙ্গে তোমাকে জার্মানীতে
যাইতে হইবে। আমি তোমাকে জার্মানীতে লইয়া

গিয়া নো-সামরিক আদালতে অভিব্যক্ত করিব। তোমার এইরূপ অব্যাহতা ও দণ্ডের জগ্গ তোমাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে।”

আমস্ বলিল, “আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার আপনার অসাধ্য, কারণ আমি জার্মান নহি।”

কাউন্ট জোলার্ণ সরোনে বলিলেন, “না, তুমি জার্মান নহ; কিন্তু তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, তুমি জার্মানীর বেতনভোগী ভৃত্য, তুমি জার্মানীর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ। আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা কার্যে পরিণত হইবে, এবং তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। যদি তোমার কোন কার্যে বা ব্যবহারে আমাকে অসন্তুষ্ট হইতে হয় তাহা হইলে আমি তোমাকে জার্মানীতে লইয়া গিয়া ঐ ভাবে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করিব, ইহা তুমি নিঃসন্দেহে জানিয়া রাখ। যদি সেখানে নো-সামরিক আদালতের বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড না-ও হয়, তাহা হইলেও দীর্ঘকাল তোমাকে কোন কারা-শিবিরে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।”

এ কথা শুনিয়া আমস্ কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, চক্ষুতে আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল।

আমস্ স্থলিত স্বরে বলিল, “আ—আমি কোন অগ্রায় কথা বলি, আমার এ উদ্দেশ্য ছিল না; কিঞ্চিৎ আমোদের (fun) জগ্গই আমি উহা বলিয়াছি। আমার চেহারা দেখিয়া আমাকে যতই নীরস বলিয়া আপনার ধারণা হউক, আমি সত্যই রসিক লোক। আপনাকে সেই রস বিতরণের একটু লোভ—”

কাউন্ট জোলার্ণ আমসের মুখের উপর অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তাহার কণ্ঠরোধ হইল। কাউন্ট মুহূর্তকাল ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “তোমার মতো নোংরা, অলস, ঘৃণিত জীব আমি আর কোথাও দেখি নাই! কত কাল পূর্বে তুমি দাড়ি-গোফ কামাইয়াছিলে? কবে তুমি সাবান ও জল স্পর্শ করিয়াছিলে? না, তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিও না; আমি জানি, তুমি মিথ্যা কথা বলিবে। তোমার পরিচ্ছদের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। তোমার জ্যাকেট কি রকম নোংরা—তাহা কি তোমার বুঝিবার শক্তি আছে?

উহাতে একটিও বোতাম নাই!—তোমার বুট, তোমারা জার্সি,—উহা পুড়াইয়া ফেলিবার যোগ্য! তুমি কাঁধ সোজা করিয়া আমার সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াও।”

আমস্ কাউন্টের আদেশ পালন করিলে কাউন্ট তাহার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “গত রাত্রে আমি তোমাকে তোমার থাকিবার ঘর উত্তমরূপে ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সেই আদেশ পালন করিবার পূর্বে তোমার দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। তোমার দিকে চাহিয়া-দেখিতেও আমার ঘৃণা হইতেছে। যাও, তুমি কামাইয়া স্নান কর, তাহার পর আমার সম্মুখে আসিও।”

আমস্ মাথা চুলকাইয়া বলিল, “হাঁ, যাইতেছি মহাশয়!”—সে তৎক্ষণাৎ কাউন্ট জোলার্ণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল।

আমস্ কিছুকাল পরে কাউন্টের আদেশ পালন করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে কাউন্ট বলিলেন, “হাঁ, এখন তোমাকে কতকটা ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে; এখন যাও, তোমার ঘর পরিষ্কার কর।”

আমস্ কাউন্টের আদেশ পালনের জগ্গ সারা দিন যেরূপ পরিশ্রম করিল, আমি ও মেরী তাহাকে আর কখন সেরূপ কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে দেখি নাই।

কাউন্ট জোলার্ণ সেই অবসরে ‘ডেভিলস্ কেভে’ প্রবেশ করিয়া, তৈল, পেট্রল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য সঞ্চিত ছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ধীপের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে আমি পাহারা দেওয়ার জগ্গ সমুদ্র-বেলায় গমন করিলাম। সেখানে আমার চারি ঘণ্টা পাহারা দেওয়ার নিয়ম ছিল; সেই চারি ঘণ্টা অতীত হইলে আমসের সেখানে পাহারা দিতে আসিবার কথা ছিল; এজগ্গ আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কয়েক মিনিট পরে আমস্ আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সে ছুই হাতে মুখ চাপিয়া-ধরিয়া ‘উঃ, গেলাম, মরিলাম’ শব্দে আর্তনাদ করিতে লাগিল।

আমি বিচলিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি হইয়াছে? ও-ভাবে আর্জুনাদ করিতেছ কেন?”

আমস্ আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “সেই যে বদ্ লোকট বের্লিন হইতে আসিয়াছে—কাউন্ট বলিয়া যে নিজের পরিচয় দিয়াছে, সে আমাকে দাঁত পরিষ্কার করিবার জন্ত একটা টুথ-ব্রস দিয়াছিল; লোহার ভুলের মতো সেই শক্ত ব্রস দিয়া দাঁত মাজিতে গিয়া আমার বিলকুল দাঁতের গোড়া জখম হইয়াছে, যন্ত্রণায় মুখ নাড়িতে পারিতেছি না! আমার দাঁতের শূলুনী কত দিনে আরাম হইবে কে জানে? উ-হু-ও:!”

আমস্ দাঁতের যন্ত্রণায় সমুদ্রতটে দাপাদাপি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার দুর্দশা দেখিয়া আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইলাম না। খাসা জন্ম হইতেছে!

আমস্ কাউন্ট জোলার্গকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে বলিল, “সারাদিন আমি কি কষ্ট পাইয়াছি—তাহা বলিবার নয়। আমার শরীরের সমস্ত হাড় ভয়ানক টাটাইতেছে। আমার দুই হাঁটু বেলেস্তাবা দেওয়ার মতো ফুলিয়া ঢাক হইয়াছে। এই হতভাগা জার্মানটার উপর আমার কি রকম ঘৃণা হইয়াছে—তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। আমি কিরূপে উহাকে জন্ম করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি তোমাকে দুই-একটা কথা বলিব, তাহা তুমি মন দিয়া শোনো। এই জার্মানটা আমাকে বলিতেছিল—যদি আমি তাহার অবাধ্য হই, তাহা হইলে সে আমাকে জার্মানীতে লইয়া গিয়া সেখানে সামরিক আদালতে আমাকে অভিযুক্ত করিয়া শাস্তিদান করিবে; কিন্তু তাহার এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা—দমবাজি মাত্র!”

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, “কাউন্ট এই কথা বলিয়া তোমাকে ভয় দেখাইয়াছেন?”

আমস্ বলিল, “হাঁ, সে না বলিলে আমি উহা জানিলাম কিরূপে? কিন্তু তাহার কথা মিথ্যা নয়? যদি সে আমাকে জার্মানীতে লইয়া যায়, তাহা হইলে কে তাহাদের এই আড্ডা চালাইবার ভার লইবে? জন-দুই জার্মান নাবিক আসিয়া এই ভার লইবে? কিন্তু তাহা কি সম্ভব? মনে কর, সেই সময় যদি বড়-দেশ হইতে আমার পরিচিত দুই-এক জন জেলে এখানে

আসিয়া পড়ে? ডোনাল্ডসনরা বা স্কাই-দ্বীপ হইতে কোন লোক হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারার ব্ল্যাক-গল ফার্মে আমস্ স্ফোবির পরিবর্তে দুই-এক জন জার্মান নাবিককে দেখিতে পাইলে কি মনে করিবে? এই সকল জার্মান নাবিক ইংরেজী ভাষায় একটা কথাও বলিতে পারে না। তাহার পর ইংরেজ প্রহরীরা হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়িলে তাহার কি ফল হইবে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ।”

আমি নির্দ্বন্দ্ব ভাবে তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম; তাহার কথাগুলি যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, ইহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না।

আমস্ দুই গালে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিল, “আমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছ, সে আমাকে ওয় দেখাইবার জন্তই মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আমাকে এখান হইতে সরাইবার উপায় নাই; সেরূপ করিলে উহাদেরই সন্দর্শন হইবে—ইহা কি সেই দাস্তিক জার্মানটা বুঝিতে পারে নাই? আমাকে বের্লিনে লইয়া যাইলে উহাদিগকে এই আড্ডা উঠাইয়া দিতে হইবে। জার্মানীর দৃশ্য হিটলার কখন সে কাজ করিবে না। আমি উহাকে এ সকল কথা বুঝাইয়া দিব। হাঁ, এ কাজ আমাকে অবিলম্বে করিতে হইবে, তুমি এখনই আমার সঙ্গে ঘরে চল।”

উনবিংশ পর্ব

আমসের লাঞ্ছনা

আমস্ স্ফোবির ধারণা হইল, সে তাহার অকাট্য বৃদ্ধির সাহায্যে কাউন্ট জোলার্গকে নির্দ্বন্দ্ব করিতে পারিবে। এই জন্ত সে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রকূল হইতে গৃহে ফিরিল; তাহার আদেশে আমাকেও তাহার অনুসরণ করিতে হইল। কাউন্টের সহিত তাহার তর্ক-বিতর্কের কি ফল হয়, তাহা জানিবার জন্ত আমারও কৌতূহল হইয়াছিল; স্মরণ্য আমি গভীর আগ্রহে আমসের পাকশালায় উপস্থিত হইলাম। কাউন্ট জোলার্গ তখন পাকশালায় বসিয়া মেরীর সহিত গল্প করিতেছিলেন। তিনি আমস্কে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিতে দেখিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া

দাঁড়াইলেন, এবং তাহার মুখের উপর তীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, “সমুদ্রতীরে হাজির থাকিয়া এগন তোমার সেখানে পাহারা দেওয়ার কথা ; এই কর্তব্য পালন না করিয়া হঠাৎ তোমার বাড়ী ফিরিবার কারণ কি জ্ঞেবি !”

আমস্ রুদ্ধ স্বরে বলিল, “আমার কর্তব্যের জ্ঞান আপনাকে মাথা ঘামাইতে হইবে না। আপনাকে আমার দুই-একটি কথা বলিবার আছে ; অত্যন্ত জরুরি কথা—তাহাই বলিতে আসিয়াছি।”

কাউন্ট নীরস স্বরে বলিলেন, “কি এগন জরুরি কথা যে, তোমার অবশ্যকর্তব্য কন্ম উপেক্ষা করিয়া তাহাই বলিবার জ্ঞান তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলে ?”

আমস্ উত্তেজিত ভাবে কাউন্টের সম্মুখে দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বিকৃত স্বরে বলিল, “কথা এই যে, আপনি—হুম্—তুমি একটি নিরাজ্ঞ মিথ্যাবাদী,—আর আমি—”

আমসের মুখের অবশিষ্ট কথা তাহার মুখেই রহিল ! কাউন্ট জোলার্গ তাহার প্রায় এক হাত দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমসের মুখ হইতে ঐ কথা বাহির হইবামাত্র কাউন্ট তাহার স্তূঢ় হস্তের বঙ্গমুষ্টি মুহূর্ত্তে উদ্ধে তুলিয়া বিদ্যুৎবেগে তাহার চুয়ালে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াই, ঘাড় ধরিয়া তাহাকে তুলার বস্তুর মতো উদ্ধে তুলিলেন ; এবং অদূরবর্তী দেওয়ালে একরূপ বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে, আমস্ দেওয়ালে আহত হইয়া পাকশালার মেঝের সেই কোণে ছিটকাইয়া পড়িল, খাড় কাত করিয়া পুনঃ পুনঃ খাবি খাইতে লাগিল !

কাউন্ট জোলার্গ অটল অচলের ঞায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আরক্ত নেত্রে তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাহার মুখ পাণ্ডুর বর্ণ, এবং দুর্দমনীয় নিষ্ঠুরতা তাহার কুক্ষিত অধরোষ্ঠে পরিস্ফুট !

আমস্ দুই-তিন মিনিট আড়ষ্ট দেহে পড়িয়া-থাকিয়া আঘাত-যজ্ঞায় গৌ-গৌ শব্দ করিতে করিতে ধীরে-ধীরে মাথা তুলিল ; কিন্তু চক্ষু মেলিয়া সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল, যেন সে নিবিড় কুছাটিকারাশি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল ! অবশেষে সে বুক ভর দিয়া অদূরবর্তী টেবলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং টেবলের পায় দখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাউন্টের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অতঃপর সে গাঢ় স্বরে বলিল, “তুমি আমাকে মারিয়াছ, আমি অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছি ; আমার সকল কথা না শুনিয়াই আচম্বিতে আমাকে প্রহার করিয়া যে বর্ধরতার পরিচয় দিয়াছ—তাহা বীরত্ব বলিয়া কাহারও লম্ব হইবে না। কিন্তু আমার যাহা বলিবার আছে—তাহা তোমাকে শুনিতে হইবে। তুমি আজ সকালে ভয় দেখাইবার জ্ঞান আমাকে বলিয়াছিলে—যদি আমি তোমার আদেশ পালন না করি—তাহা হইলে আমাকে তুমি জার্মানীতে লইয়া গিয়া সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করিবে। কিন্তু ইহাকে ধাপ্পা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ? তুমি জান, ঐরূপ কার্য তোমার অসাধ্য ; তাহা তোমার করিবার শক্তি নাই—তা তুমি কাউন্টই হও—আর যে-কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই হও। তুমি এই কারণে আমাকে জার্মানীতে লইয়া যাইতে পার না যে, আমাকে জার্মানীতে নির্বাসিত করিলে তোমাদের কোন কোন জার্মান নাবিকের হস্তে এই আড্ডা পরিচালনের ভার গুস্ত করিতে হইবে। সেই সময় আমার পরিচিত কোন কোন ইংরেজ স্থানান্তর হইতে আসিয়া যখন জানিতে চাহিবে, আমি কোথায় গিয়াছি—তখন তাহাদের অবস্থা কি হইবে ?—আমি সেই জার্মান নাবিকদের কথা বলিতেছি।”

কাউন্ট জোলার্গ নীরস স্বরে বলিলেন, “তুমি কি বলিতে চাও, এই অঞ্চলে তোমার পরিচিত একরূপ লোক আছে—যাহারা জানে, তুমি স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকা করিয়া ‘ইউ’-বোট পরিচালনে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছ ?”

আমস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, আমি সে কথা বলিতেছি না। এই আড্ডা হইতে জার্মান ‘ইউ’-বোট-সমূহে খোরাক সরবরাহ করা হয়, এ সংবাদ কোন ইংরেজের জানা নাই। আমি নিজের স্বার্থের জ্ঞান, আমার সর্বনাশ না হয়—এই উদ্দেশ্যে এই সংবাদ গোপন রাখিয়াছি। বাহিরের কোন লোককে ইহা জানিতে দিই নাই। কিন্তু বাহিরের অনেক লোকই ত আমাকে জানে, তাহারা হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া যদি আমার পরিবর্তে জার্মান নাবিকগণকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আমার সম্বন্ধে কি জানিতে

পারিবে?—তখন সকল রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে; তাহার কি ফল হইবে—ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না—তোমাকে সেরূপ নির্যোধ বলিয়া ধারণা করিবার কোন কারণ আছে কি?”

কাউন্ট আমসের কথা শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “এ তোমার ভুল ধারণা ক্ষেপিত! ও সকল কথা আমি পূর্বেই চিন্তা করিয়াছি। যদি আমি তোমাকে দণ্ডিত করিবার জন্ত জার্মানীতে লইয়া যাই, তাহা হইলে আমি তোমার কার্যের ভার কোন জার্মান নাবিকের হস্তে অর্পণ করিব—এরূপ করনা তুমি মুর্খের জন্ত মনে স্থান দিও না। যে সকল জার্মান ‘ইউ’-বোট এই অঞ্চলে যাতায়াত করে—তাহাদের কাপ্তেনরা সকলেই এই আড্ডার কথা জানে, এবং ‘ইউ’-বোট সমূহের খোরাক কোথায় সংগ্ৰহ আছে—তাহাও তাহাদের সুবিদিত। সুতরাং তুমি এই দ্বীপ হইতে অপসারিত হইলে তোমার সহায়তা ভিন্নও তাহারা গুপ্তস্থান হইতে ‘ইউ’-বোটের খোরাক সংগ্ৰহ করিয়া কাজ চালাইতে পারিবে; তাহাদের কাহারও কোন অসুবিধা হইবে না।”

আমস্ বলিল, “কথাটা আমাকে জলের মত সরল করিয়া বুঝাইয়া দিলে! কিন্তু এই মুহূর্ত কত দিন চলিবে—তাহার নিশ্চয়তা নাই; তোমাদের ‘ইউ’-বোটগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া সাগরে-সাগরে শত্রুজাহাজ ধংস করিয়া বেড়াইবে, ইহা তোমাদের সমর-নীতির অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু তুমি যে ব্যবস্থার কথা বলিলে—সেই ব্যবস্থায় কিছু দিন কাজ চলিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল তাহা চলিবে না—চলিতে পারে না। মনে কর, এক দিন কোন ‘ইউ’-বোটের কাপ্তেন তাহার ‘ইউ’-বোটের খোরাক সংগ্ৰহ করিতে এই দ্বীপে আসিয়া বৃটিশ প্রহরীগণকে এখানে অপেক্ষা করিতে দেখিল—তখন তাহাকে কি সঙ্কটে পড়িতে হইবে না? সমুদ্রকূল হইতে সাঙ্কেতিক আলোক না দেখাইলে এই দ্বীপে অবতরণ করা কোন ‘ইউ’-বোটের পক্ষেই নিরাপদ নহে।—আমার এই মুক্তি অকাটা।”

কাউন্ট জোলার্ণ বলিলেন, “হইতে পারে; কিন্তু তাহারও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা কঠিন নহে। এক সপ্তাহের মধ্যেই কেহ আসিয়া এই ভার গ্রহণ করিবে। তুমি অত্যন্ত নির্যোধ বলিয়াই মনে করিয়াছ—জার্মান গোয়েন্দা বিভাগে এমন কোন কর্মচারী নাই যে, এখানে আসিয়া তোমার ভাই বলিয়া অথবা অন্ত কোন আত্মীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া এই আড্ডা পরিচালন করিতে অসম্মত হইবে। আমাদের কর্মচারীগণের মধ্যে এরূপ লোক ডজন-ডজন আছে—যাহারা ইংরেজের মতই ইংরেজী ভাষায় অনর্গল আলাপ করিতে পারে। এখানকার কাজ তাহারা অবলীলাক্রমে পরিচালিত করিতে পারিবে।”

কাউন্ট জোলার্ণের মন্তব্য শুনিয়া আমস্ নীরাক ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল—সে জার্মানীতে নিক্ষেপিত হইলে ব্ল্যাক-গল ফার্মের কার্য পরিচালনের জন্ত দুই-এক জন জার্মান নাবিক এখানে প্রেরিত হইবে; তাহারা যে এই কার্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না, এবং সে কাউন্ট জোলার্ণের নিকট এই মুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবারই চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কাউন্ট জোলার্ণ অন্য প্রকার বাবস্তার কথা বলিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবেন—আমস্ তাহা অনুমান করিতে পারে নাই।

আমস্কে হতভম্ব ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কাউন্ট জোলার্ণ তাহাকে কঠোর স্বরে আদেশ করিলেন, “আমার যাহা বলিবার ছিল—তাহা তোমাকে বলিয়াছি। অতঃপর আমার কর্তব্য স্থির করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। আমার আর যাহা বলিবার আছে—তাহা তুমি পরে শুনিতে পাইবে; এখন সমুদ্রতীরে যাও, সেখানে তোমার পাহারায় থাকিবার প্রয়োজন আছে। পিটার তাহার কাজ শেষ করিয়া আসিয়াছে, এবার তোমার পালা; কিন্তু তোমার কর্তব্যের ক্রটি হইলে তোমার অমঙ্গল হইবে।”

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।





ভূগলী জেলার ইতিহাস

২য় খণ্ড

(ভূগলীর অতীত কাহিনী)

ভূগলীর নামের উৎপত্তি—ভূ (বহু) গলী (বণিক) অর্থাৎ যেখানে বহু বণিক বাস করে, সেই স্থানের নাম ভূগলী; চলিত কথায় স্থানটি ভূগলী নামে পরিচিত।

ভূগলীর সীমা :—পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে অজয় নদ, পশ্চিমে মানভূম, এবং দক্ষিণে দারকেশ্বর নদ ও তাহারই দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদ—ইহাই দক্ষিণ-রাঢ়ের সীমা। ভূগলী এই দক্ষিণ-রাঢ়ে অবস্থিত ছিল (১)। বর্তমান হাওড়া জেলার আমতার নিকটস্থ পেঁড়ো-বসন্তপুৰ ইহাতে ভূগলী জেলার পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ভূগলীর রাজ্য বিস্তৃত ছিল (২)। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পাণ্ডুদাস নামক রাজা দক্ষিণ-রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। তিনিই এই রাজ্যকে ভূগলী বা ভূগলী নামে অভিহিত করেন। বৈশেষিক-দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ জ্ঞান-কন্দলীর গ্রন্থকর্তা শ্রীধর আচার্য্য ভূগলীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার ঐ পুস্তকে তিনি নিজের ও ভূগলীর এই পরিচয় দিয়াছেন :—

“আসীদক্ষিণ রাঢ়ে চং দিজানাং ভূগলীগ্রাম।

ভূগলীগ্রামিণী গ্রামো ভূগলীজনানামঃ ॥”

—ত্র্যধিক দশোত্তর নবশত শকাব্দে জ্ঞানকন্দলী-রচিত।

শ্রীপাণ্ডুদাস রচিত ভট্ট শ্রীধরবেশ্যম্ ॥ (৩)

দক্ষিণরাঢ়ে ভূগলী গ্রামের ব্রাহ্মণগণ বহু সংখ্যাবিশিষ্ট এবং এখানে বহু শ্রেণী বা বণিকের বাস। ১১৩ শকে (ইংরেজী ১১১ খৃঃ) রাজা পাণ্ডুদাসের আকাজক্ষা তৃপ্তির জন্ত শ্রীধর আচার্য্য জ্ঞানকন্দলী গ্রন্থ রচনা করিলেন।

১১১ খৃষ্টাব্দে এই ভূগলীনিবাসী বাঙ্গালী শ্রীধরই বৌদ্ধধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। ১০৯২ সালে কৃষ্ণমিশ্র যে ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’

নাটক লেখেন, তাহাতে ভূগলীর ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধির ও জাতি-ভিমানের প্রশংসা অনেক কথার উল্লেখ আছে।

ভূগলী গ্রামের নামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঞী ছিল। রাঢ়ীয় শ্রেণীর পঞ্চ গোত্রের মধ্যে কশ্যপ গোত্রে শুভ নামে এক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজা ভূগলী বা ভূগলী গ্রাম দান করেন। তাহা হইতেই ভূগলী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। বল্লালসেনের প্রাচুর্য্যে ভূগলীর প্রাধান্য লোপ হয়। যেমন ভূগলী হইতে ভূগলীর উৎপত্তি, তেমনি সিদ্ধল বা সিধলা হইতে সিদ্ধল গ্রামের উৎপত্তি। সিদ্ধল গ্রামের ভবদেব ভট্ট, উড়িষ্যার রাজা হরিবর্মা দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই সিদ্ধল গ্রাম সাতগাঁ বাছোর বহির্ভাগে উত্তর-রাঢ়ে অবস্থিত। এক সময়ে ভূগলী সর্ববিষয়ে উন্নত ছিল।

তারকেশ্বরের প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণে ও দামোদর নদের নানাধিক ১২ মাইল পূর্বে “দিল আকাশ” নামক গ্রামখানি এখনও বর্তমান আছে। ঐ গ্রাম বোণ নদীর পূর্বে দিকে অবস্থিত। নদীটি এখনও বর্তমান; কিন্তু এখন উহা “বোণের খাল” নামে পরিচিত। ‘দিল আকাশের’ পূর্বে খুড়ীগ্রাম। বহুকাল পূর্বে ঐ গ্রামে হুন্দাস চণ্ডালগণ বাস করিত। “শনিয়া খাণ্ড” নামক পরাক্রান্ত বাগদী এই সকল চণ্ডালের রাজা ছিল। শনিয়া নরবলি দিবে বলিয়া একটি ব্রাহ্মণ-বালককে ধরিয়া-আনিয়া জানিতে পারে, ঐ বালকের বলি দেওয়ার উপযুক্ত বয়স হয় নাই; সুতরাং শনিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। ইহাতে ঐ বালকের প্রতি তাহার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়, একজন্ম তাহাকে আর বলি দেওয়া হইল না। ঐ বালকের নাম ছিল চতুরানন। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে চতুরানন রাজা শনিয়ার মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক চতুরানন স্বার্থসিদ্ধির জন্ত প্রতিপালক শনিয়াকে পানোয়ত্ত অবস্থায় হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া বসিলেন।

তারাদেবী নামে চতুরাননের একটিমাত্র কন্যা ছিল—ফুলিয়া-নিবাসী সদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সন্তিত তারাদেবীর বিবাহ হয়। চতুরাননের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সদানন্দ রাজা হইয়াছিলেন। সদানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হন। এই সদানন্দের বংশই পরে ভূগলীরাজ-বংশ। কৃষ্ণচন্দ্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ্যলাভ করেন। এই কৃষ্ণচন্দ্রই খানাকুল কৃষ্ণগণের ও জঙ্গীপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা।

এই সময়ে গোঁড়াধিপতি রাজা গণেশের পুত্র চৈতন্য বা যত্ন মুসলমান হইয়া হিন্দু-পীড়ন আরম্ভ করেন, কিন্তু মণিলাল নামক সন্ন্যাসী চৈতন্য বা যত্নকে সংযত করেন। ইহার পর যত্ন

(১) সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা

(২) গোঁড়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড

(৩) Journal of Asiatic Society of Bengal 1912, P. 34.

হিন্দুবিষয়ে তিরোহিত হইয়াছিল। রাজা উদয়নারায়ণ উদয়-
নারায়ণপুর ও বর্তমান হাওড়া জেলার শিবপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত
করেন। ভূরগুট রাজবংশের তালিকা নিয়ে প্রকাশিত হইল।

সদানন্দ

ভূরগুট—রাজা ক্রমনারায়ণ—কালাপাহাড়:—

কৃষ্ণচন্দ্র

কালাপাহাড় যদিও পূর্ববঙ্গের অধি-
বাসী ছিলেন, তথাপি ভূরগুটের সহিত
তাঁহার জীবনের বিচিত্র কাহিনীর ইতিহাসে
বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় নিয়ে তাঁহার জীবন-
বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

দেবনারায়ণ
(১৩০৬ শক
হইতে ১৩৮৪
শক পর্য্যন্ত)

‘বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস’-প্রণেতা

উদয়নারায়ণ

বলেন, কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কাল-
চাঁদ রায়। বাল্যকালে তাঁহার মাতা
তাঁহাকে “রাজু” বলিয়া ডাকিতেন।

শিবনারায়ণ
ক্রমনারায়ণ
(দ্বিতীয়া পত্নী
রাণী ভবশঙ্করী)

গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত চক্রবর্তী
মহাশয়ও এই উক্তির সমর্থন করেন। কিন্তু
‘হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস’-প্রণেতা বিধু-
ভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, কালাপাহাড়ের
প্রকৃত নাম “রাজীবলোচন।” তাঁহার বাল্য-
কালের ডাক-নাম “রাজু” হইতেই “রাজীব-
লোচন” নাম ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাঁহার
নাম যাহাই হউক, আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে
তাঁহার “কালাপাহাড়” নামই ব্যবহার করিব।

প্রতাপনারায়ণ

কালাপাহাড়ের পিতা জগদানন্দ ‘রায়’

নরনারায়ণ

লক্ষ্মীনারায়ণ
(শেষ রাজা)

রূপনারায়ণ
উপাধিধারী হইলেও—‘একটাকিয়া’ ভাড়াডী-বংশজাত। বর্তমান
রাজহাসি, খানা মান্দা, বীরজাওনা গ্রামে বাস ছিল। কালচাঁদ
শ্রীপুর-(কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর—এখন কর্ণনাশা-গর্ভে
বিসীন) নিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ
করেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে তিনি গৌড়ের বাদশাহ সলিমান
কররাণির নিকট চাকরির উমেদারীতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন।

সলিমান কররাণির কন্যার নাম ছলারি বিবি। তখন তাঁহার
বয়স ১৭ বৎসর,—তখনও তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। কালচাঁদ
এক দিন মহানন্দার স্নানান্তে স্তবপাঠ করিতে করিতে গৃহে কিরিতে-
ছিলেন, সেই সময় ছলারি বিবি তাঁহাকে দেখিয়া একরূপ আকৃষ্ট
হইলেন যে, তাঁহাকে ‘খসম’ করিবার জন্ত বিবির ‘দেল’ হইল।
কথিত আছে, এই সংবাদ শুনিয়া বাদশাহ কালচাঁদকে এই
বিবাহে সম্মত হইতে আদেশ করিলেন; কিন্তু কালচাঁদ সম্মতি
দান না করায় বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ
করিলেন। বখাসময়ে কালচাঁদ বধ্যভূমিতে নীত হইলে ছলারি
বিবি সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বাতককে না কি অহুরোধ
করিলেন—আগে তাঁহাকে বধ করিয়া পরে বাদশাহের আদেশ পালন
করা হউক। কালচাঁদ এই মহীয়সী মহিলার আত্মত্যাগের
পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। এই
ভাবে তাঁহাদের পরিণয় হইল। ‘বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস’-
প্রণেতা ঘটনাটি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু বিধুভূষণ
ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন,—সলিমান কররাণি রাজা ক্রমনারায়ণের
সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়াছিলেন, এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন-
স্বরূপ কালচাঁদকে গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কালচাঁদের গৌড়ে

বাস করিবার সময় এক দিন বাদশাহের পুত্রশালা হইতে একটি ব্যাজ
বাহির হইয়া পড়ে। কালচাঁদ বলে ও কৌশলে ব্যাজটি ধরিয়া
পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে, তাঁহার শৌর্ভ্যে-বীর্ভ্যে মুগ্ধ হইয়া ছলারি বিবি
তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর কাল-
চাঁদের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সম্ভবতঃ এই শেখোক্ত বিবরণই
নির্ভরের যোগ্য।

এই বিবাহের পর কালচাঁদ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত হইবার
জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন; তৎকালে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা
হরিচন্দন দেব-ই হিন্দু সমাজের অধিনায়ক; এজন্য কালচাঁদ
হিন্দু সমাজে আশ্রয়লাভের জন্ত তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু
হরিচন্দন দেব যখনীপতিকে হিন্দু সমাজে গ্রহণের অহুমতি না দিয়া
তাঁহাকে কঠোর তিরস্কার করিয়া বিতাড়িত করিলেন। ব্রাহ্মণ
সমাজও তাঁহাকে গ্রহণের অহুমতি দিলেন না। এই ভাবে তিরস্কৃত
এবং হিন্দুসমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া কালচাঁদ প্রতিহিংসা
গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, হিন্দু দেব-দেবী ও হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিবার
বাসনা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি “কালাপাহাড়”
হইলেন।

কালচাঁদ প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রথমে রাজা ক্রমনারায়ণের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে ভূরগুটে গমন করেন। তিনি রাজা ক্রমনারায়ণকে
যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে ‘দাদা’ বলিয়া সম্বোধন
করিতেন। রাজা ক্রমনারায়ণ মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে সাহসনা দানের চেষ্টা
করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। বাহা
হউক, অবশেষে তিনি অঙ্গীকার করিলেন, রাজার রাজ্যসীমায় তিনি
অত্যাচার-উৎপীড়ন করিবেন না। কিন্তু এই কাহিনীর কতখানি
সত্য, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিধুভূষণ বাবুর মতে রাজীবলোচন ক্রমনারায়ণের জ্ঞাতি-
ভ্রাতা; কিন্তু এই উক্তি সত্য হইতে পারে না। কারণ, ক্রমনারায়ণ
রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ—সদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বংশ; কিন্তু কালচাঁদ
(রাজীবলোচন) বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

সলিমান কররাণি পাঠান। তিনি আকবর সাহের সহিত সন্ধি
করিয়া গৌড়ের অধিপতি হইয়াছিলেন। রাজা মুকুন্দদেব ক্রমনারা-
য়ণের বন্ধু ছিলেন। ইহার উভয়েই পাঠানের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু
সলিমান ভূরগুট অধিকারের চেষ্টা করায় রাজা ক্রমনারায়ণ ও উড়ি-
ষ্যার রাজা মুকুন্দদেব তাহাতে বাধা না দিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন
না। রাজা ক্রমনারায়ণ উড়িষ্যার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলে
কালচাঁদই উড়িষ্যার সৈন্ত ও ভূরগুটের বাঙ্গালী সৈন্তবাহিনীর
সেনাপতি হইলেন। সপ্তগ্রামে হিন্দু সৈন্তের সহিত পাঠান সৈন্তের যে
ভীষণ যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে সলিমানের শোচনীয় পরাজয় হইল।
অতঃপর বারংবার যুদ্ধ করিয়াও সলিমান জয়লাভ করিতে না
পারায় অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। রাজা ক্রমনারায়ণ ও
মুকুন্দদেব উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সলিমান সপ্তগ্রাম
ত্যাগ করিয়া গৌড়ে প্রস্থান করিবার পর কালচাঁদ ছলারিকে বিবাহ
করিয়া মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। কারণ, মুসলমান-
হিত্যকে বিবাহ করায় হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে থাকিবার জন্ত তাঁহার
সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল—এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি।
অতঃপর তিনি সলিমানের সেনাপতি হইয়া হিন্দুর দেবদেবী ও
হিন্দুমন্দির ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। কালচাঁদের মুসলমানী নাম

‘মহম্মদ ফখরুলি’। কিন্তু এই সময় হইতে তিনি হিন্দুর নিকট ‘কালাপাহাড়’ নামে পরিচিত হইলেন।

কালাপাহাড় পাঠানের সেনাপতিত্ব লাভ করিয়া পাঠান সৈন্যসহ উড়িষ্যা-রাজ্যের আয়োজন করিলেন। ভূরগুটের ভিতর দিয়া গোড় হইতে উড়িষ্যা যাইবার সোজা পথ ছিল। রাজা রুজনারায়ণের নিকট তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞাটির স্মরণ করিয়া কালারচাঁদ অতি সংযত ভাবে সৈন্যে ভূরগুট অতিক্রম করিলেন। ভূরগুট অতিক্রম করিবার সময় যে স্থানে তিনি শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটির নাম ‘পাহাড়পুর’। ইহা ভারকেশরের প্রায় তিন কোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ভূরগুট অতিক্রম করিয়াই কালারচাঁদ কালাপাহাড়ী হাত দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব এই সময় বিদ্রোহী সামন্তরাজগণের বিপ্লবে নিহত হইয়াছিলেন; সুতরাং উড়িষ্যা ধ্বংস করা কালাপাহাড়ের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল। জগন্নাথ দেবের পাণ্ডুরা জগন্নাথ দেবকে চিন্তা হ্রদের নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কালাপাহাড় তাহা জানিতে পারায় পুরুষোত্তম বিগ্রহ সংগ্রহ করেন এবং জিব্রীতে পাঠাইয়া সেখানে তাহা ভস্ম পরিণত করিবার আদেশ দিলেন। কথিত আছে, হিন্দুরা উহা অর্দ্ধদণ্ডাবস্থায় গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন, পাণ্ডুরা ঐ অর্দ্ধদণ্ড বিগ্রহ উড়িষ্যায় লইয়া গিয়া জগন্নাথ-মূর্তি পুনঃনির্মাণ করেন। কেহ কেহ বলেন, জগন্নাথ-মূর্তি অর্দ্ধদণ্ডাবস্থায় উড়িষ্যার সন্নিহিত সমুদ্রে নিক্ষেপ হইয়াছিল; সমুদ্র-গর্ভ হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া জগন্নাথ-মূর্তি পুনর্বার নির্মাণ করা হইয়াছিল; সম্ভবতঃ এই কিংবদন্তীই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

রাজা রুজনারায়ণ ও রাণী ভবশঙ্করী

রাজা রুজনারায়ণের রাজত্বকালে ভূরগুট যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও গৌরব-পূর্ণ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত ছিল, এবং ধনধান্যেরও প্রাচুর্য লক্ষিত হইত। সেখানে বিহারী দস্ত নামক ধনাঢ্য গন্ধ-বণিকের একটি মোকাম ছিল। তাঁহার বাণিজ্য-ব্যবসায় স্ত্রীমাতা, জাভা, ও বালীদ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এ কথা আজ উপকথায় পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেও বিহারী দুর্ভাগ্যক্রমে নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য সংসারের প্রতি আসক্তি না থাকায় তিনি আমতার নিকট কাটশাকড়ার একটি শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লক্ষ্মণদেবের “শক্তি-পুর শাসনে” ‘কাঠসঙ্গা’ নামে কাটশাকড়ার উল্লেখ আছে। দামোদর-তীর হইতে সোজা দশ মাইল দক্ষিণে, এবং সোনামুখী হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বাদসাহী রাস্তার পূর্বধারে কাঠসঙ্গা অবস্থিত। এই রাস্তা যেখানে দামোদর অতিক্রম করিয়াছে, সেই স্থান হইতে কাঠসঙ্গার দূরত্ব ১২ মাইল। কাঠসঙ্গার মৌজা নম্বর ৩৫।* রুজনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির এখনও বর্তমান আছে। কথিত আছে, এই মন্দিরে যে সময়ে মহাসমারোহে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, সেই সময় সেখানে কোন দরিদ্রা রমণীর শিশুপুত্র ক্ষুধায় কাঁড় হইয়া রোদন করিতেছিল। পুত্রের ক্ষুধাধারণের আশায় স্ত্রীলোকটি প্রহরীর নিকট কিছু খাদ্য-সামগ্রী চাহিলে প্রহরী

তাহাকে কঠোর স্বরে বলিল, “এখনও ভ্রাঙ্কণ-ভোজন হয় নাই, এখন খাবার মিলিবে না। তোর ছেলে এভাবে আমাদিগকে বিরক্ত করিলে উহাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিব।”—অবশেষে প্রহরী জননীকে ক্রোড় হইতে রুজনারায়ণ শিশুটিকে ছিনাইয়া লইয়া, আছাড় মারিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইল। ইহাতে সেই জনতার ভিতর হইতে অসন্তোষপূর্ণ চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইলে, রাজা রুজনারায়ণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি শিশুর মাতার নিকট তাহার রোদনের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং শিশুকে কোলে লইয়া ভাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন, এবং আহারদানে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। শিশুর ভোজনকালে এক জন সন্ন্যাসী রাজার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “ভগবান তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। তিনি দরিদ্রের মুখ দিয়াই অহার্য গ্রহণ করেন। ঐ ক্ষুধিত শিশুর মুখ দিয়া তিনি ভোজন করিয়াছেন। তাঁহার আশীর্বাদে তুমি পুত্র-লাভ করিবে। তুমি পুনরায় বিবাহ কর; সেই পত্নীর গর্ভে তোমার পুত্র জন্মিবে।” সন্ন্যাসী এই বর প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরিণত বয়সে তাঁহার বিবাহ করা কি উচিত হইবে?

অতঃপর এক দিন তিনি নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে মদীতীরে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, একটি রূপসী তরুণী অশ্বে আরোহণ করিয়া হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার বর্ষার সাহায্যে একটি ভীষণাকৃতি দুর্দান্ত বজ্রমহিষকে আক্রমণ করিয়াছে। উভয়ে ভীষণ যুদ্ধে রত। কিছুকাল যুদ্ধের পর মহিষটি মিহত হইল। এই অদ্ভুত দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া রাজার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তিনি তীরে উঠিয়া যুবতীর পরিচয় লইলেন, এবং জানিতে পারিলেন, যুবতীর নাম ভবশঙ্করী, তাঁহার পিতার নাম দীননাথ চৌধুরী। এই যুবতীই রাজা রুজনারায়ণের দ্বিতীয়া মহিষী রাণী ভবশঙ্করী।

দীননাথ চৌধুরী তাঁহারই রাজ্যের খ্যাতনামা বোদ্ধা ছিলেন। পুত্র না থাকায় কতকালই তিনি শৈশবাবধি অন্ধ-ব্যবহার, অশ্চালনা প্রকৃতি নানা বিচার্য পারদর্শী করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার হস্তে তরবারি থাকিলে কেহই তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিত না। মহাশক্তি তাঁহার প্রতি প্রসঙ্গা ছিলেন। ভবশঙ্করীর প্রতিজ্ঞা ছিল, যে বীরপুরুষ অসিযুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাঁহাকেই তিনি পতিত্ব বরণ করিবে। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ—রাজগুরুর আদেশে বিনা অসিযুদ্ধেই তাঁহাকে রাজা রুজনারায়ণের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিতে হইল; তবে রাজা যে দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করিতেন না, তাহা তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছিল।

রাজা রুজনারায়ণ কয়েক বৎসর পরে নাবালক পুত্র প্রতাপ-নারায়ণকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন; রাণী ভবশঙ্করীই নাবালক পুত্রের রক্ষার ও সশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

রাজা রুজনারায়ণ জীবিত থাকিতে পাঠানগণ কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই। পাঠান সেনাপতি ওসমান যখন দেখিলেন, রুজনারায়ণ পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র নাবালক, এবং স্ত্রীলোক রাজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে, তখন পাঠান সেনাপতি সুধস্বপ্নে বিভোর হইয়া ভূরগুট আক্রমণের সঙ্কল্প

* সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৩৯ ভাগ, ২য় সংখ্যা।

করিলেন। বৈধব্য অবস্থায় রাণী ভবশঙ্করী কাটশাকড়ার শিব-মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মন্ত্রী হুল্লভরাম ও সেনাপতি চতুর্ভূজের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ইষ্ট-দেবতার আরাধনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

এই সময়ে ওসমান, সেনাপতি চতুর্ভূজের সহিত বড়বস্ত্র আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসঘাতক চতুর্ভূজ ওসমানকে জানাইল, রাণী সন্ন্যাসীদের ভোজন করাইতে কাটশাকড়ার শিবমন্দিরে প্রত্যহ উপস্থিত থাকেন, এবং সেই স্থানে বাসও করেন; অতএব ঐ স্থানেই রাণীকে ধরিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ওসমান এই সংবাদ পাইয়া ১৪১৫ জন মাত্র রণনিপুণ যোদ্ধাসহ হিন্দুবশে আমতার বাজারে উপস্থিত হইলেন। ধৃত শৃগাল সিংহীকে কৌশলে বন্দী করিবার প্রয়াসী। কিন্তু রাণীর গুপ্তচর পাঠান কুলকলঙ্কের এই ঘৃণিত অভিধান-বার্তা রাণীর গোচর করিল। রাণী কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; সৈন্ত-সমাবেশের জন্ত সেনাপতি বা মন্ত্রীকেও আদেশ করিলেন না। এদিকে নৈশ-অন্ধকারে পাঠান সেনাপতি অমুচরবর্গ সহ রাণীকে বন্দী করিবার আশায় নির্দিষ্ট স্থানে ধাবিত হইল। রাণীর প্রহরিনীগণ মন্দিরের বহির্ভাগে সতর্কভাবে কর্তব্যপালনে রত ছিল।

আততায়ী পাঠানগণের সহিত যুদ্ধিমের প্রহরিনীগণের যুদ্ধ বাধিলে ঘোষণার কোলাহলে, অস্ত্রের ঝন্ঝনায় ধ্যানমগ্না রাণীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া অসিহস্তে মন্দিরের বহির্ভাগে উপস্থিত হইলেন; তখন উভয় পক্ষে প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল। রাণী অবিচলিত চিত্তে নিশ্চল পাষণ মূর্তির স্তায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বীরাজনা দেহরক্ষীদের অসির আঘাতে ওসমানের অমুচরবর্গের অধিকাংশ নিহত হইল। ওসমান এক বৃকের অন্তরালে থাকিয়া রাজ্যের তেজঃপূর্ণ মূর্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাণী ওসমানের এইরূপ ভীকৃতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতে, অথবা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আদেশ করিলেন। ওসমান রাণীর তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দুই জন মাত্র অমুচর জীবিত, তখন পলায়ন ভিন্ন প্রাণরক্ষার উপায় নাই। অগত্যা পলায়ন করিয়া তাহাকে প্রাণরক্ষা করিতে হইল। রাণীর নিকট জগৎ-সিংহাসী পাঠান সেনাপতি ওসমানের এই প্রথম পরাজয়।

রাণী ভবশঙ্করী স্বয়ং সৈনিকদিগকে যুদ্ধ-শিক্ষা দিতেন। তাঁহার দেহরক্ষীরা সকলেই নারী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে পুরুষ যেমন বীর ছিলেন, নারীও সেইরূপ বীরাজনা ছিলেন। তাঁহার বীরপ্রসূ, বীরের জননী ছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে হিন্দু মহিলার বীরত্বের, সাহসের এই গৌরবময় কাহিনী আজ বিশ্বস্তির অন্ধকারে বিলীন, কোন উপলক্ষেও তাহার স্থান হয় নাই।

ওসমানের দ্বিতীয় আক্রমণ

পাঠান সেনাপতি ওসমান এই ভাবে বিফলমনোরথ ও অবমানিত হইয়া পলায়ন করিবার পর নির্লজ্জের স্তায় পুনর্বার রাণীর সেনাপতি চতুর্ভূজের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। ওসমানের প্রথম আক্রমণের সময় চতুর্ভূজ সম্পূর্ণ

নিষ্ক্রিয় ছিলেন; কিন্তু এবার তিনি ওসমানকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এবারে ওসমান পাঁচ শত সুশিক্ষিত সৈন্তসহ রাণীর বিরুদ্ধে গোপনে অভিযান করিল এবং সদলে নৈশ-অন্ধকারে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কথিত আছে, কোন বাধ ঐ জঙ্গলে পক্ষী শিকার করিতে আসিয়া অরণ্যমধ্যে অশ্বের ধূমকেতু দেখিতে পায়। সে ক্রৌড়হলভবে অগ্রসর হইয়া বহু সৈন্ত-সমাবেশ লক্ষ্য করিল। সে অবিলম্বে নগরে কোতয়ালকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কোতয়াল সেনাপতিকে সংবাদ দিলে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি চতুর্ভূজ তাহাকে ভাড়াইয়া দিল, বলিল, উহা মিথ্যা কথা। কিন্তু পাছে সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং রাণী সন্দেহ করেন, এই ভয়ে চতুর্ভূজ সৈন্তদলসহ খানাকুল অভিমুখে বাত্মা করিল। সৈন্তগণের অভাবে রাজধানী অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। মন্ত্রী গুপ্ত বড়বস্ত্র বুঝিয়া রাণীকে সংবাদ পাঠাইলেন।

বাসুড়ীর কালীবাড়ী

রাণী ভবশঙ্করী বৈশাখী অমাবস্ত্যার বাসুড়ীর কালীবাড়ীতে পূর্ণাভিষেক জন্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। রাণীর গুরু ও হুল্লভরাম গুপ্তচর-মুখে পাঠানের আক্রমণ-সংবাদ জানিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ভূজের বড়বস্ত্রও তাঁহার গোচর হইল। রাণীকে সংবাদ দেওয়া হইল, পাঠানেরা সেই রাত্রিতেই বাসুড়ী আক্রমণ করিবে। রাণী কিন্তু পূর্ণাভিষেকের সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। স্মরণ মন্ত্রী ও রাণীর গুরু পরামর্শ করিয়া ছাওলাপুরের দুর্গাধিপতিকে গুপ্তভাবে সৈন্ত লইয়া বাসুড়ীতে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন, এবং চতুর্ভূজের বিশ্বাসঘাতকতা ও সৈন্তাপসারণ বৃত্তান্তও তাঁহাকে জানাইলেন। এই সেনাপতি জুধ হইয়া, চতুর্ভূজকে ধরিয়া আনিবার প্রার্থনা করিলে রাণী তাঁহাকে শাস্ত করিয়া বুঝাইলেন, তখন ঐ কার্যের সময় নহে। চতুর্ভূজ ভাবিল, এইবার ওসমানের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে—তাহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে; কারণ, সকল সৈন্ত তাহারই সঙ্গে ছিল, বিশেষতঃ বাসুড়ী অরক্ষিত। বাহা হউক, সেই অমাবস্তাতেই রাণীর পূর্ণাভিষেক হইল। অভিষেকান্তে রাণীর চেতনা বিলুপ্ত হইল। ওদিকে পাঠান সেনাপতি ওসমান নৈশ-অন্ধকারে দামোদর নদ উত্তীর্ণ হইয়া সসৈন্তে বাসুড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া বাসুড়ী-মন্দির আক্রমণ করিল। ছাওলাপুরের সেনাপতিও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া বাসুড়ীতে সুর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মশালের আলোকে চারিদিক আলোকিত হইল—বাসুড়ীর মন্দির সেই আলোকে উজ্জাসিত হইয়া উঠিল। অস্ত্রের ঝন্ঝনায়, সৈন্তগণের বিকট চীৎকারে, অশ্বের ধূমকেতুতে বহু দূর পর্যন্ত ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে রাণীর মোহ ভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ অসিচর্ম ধারণ করিয়া বীরাজনার স্তায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এবং স্বয়ং সৈন্তচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। রাণীকে যুদ্ধবেশে সৈন্ত-পরিচালনার অগ্রসর দেখিয়া বাঙ্গালী সৈন্তমণ্ডলী ভীমবেগে পাঠানগণকে আক্রমণ করিল। রাণীর দেহরক্ষার নিযুক্তা প্রহরিনীরা ও সৈন্তসমূহ সবেগে তাঁহার অগ্রসরণ করিল। এই নারী-সৈন্তের সকলেরই কটিতে সুশাশিত

অসি, হস্তে তীক্ষ্ণাশ্র শূল। তাহারা সকলেই অস্বাভাবিক। রাজপুত্র
বীরাজনাগর মুসলমানের বিরুদ্ধে সৈন্ত-পরিচালনা করিয়াছিলেন ;
কিন্তু এ ভাবে নারী-দেহরক্ষণী-বর্গে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের কেহ
কখনও শক্রসৈন্ত আক্রমণ করেন নাই। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসে
উপেক্ষিত অপূর্ব বিবরণ।

বাসুভীর যুদ্ধ

মুসলমানের সহিত যে সকল অস্বাভাবিক ও পদাতিক সৈন্ত
আদিয়াছিল, তাহারা সকলেই স্ত্রীনিপুণ বোদ্ধা, নির্ভীক বীরপুরুষ।
ওসমানের নেতৃত্বে পাঠান সেনাগণ “আলা হো আকবর” ধ্বনিতে
গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া হিন্দু সৈন্তবাহিনী আক্রমণ
করিল। ওদিকে রাণীর সৈন্তগণও “জয় কালী” শব্দে পাঠান সৈন্তদের
আক্রমণ করিল। ছাওলাপুরের দুর্গাধিপতি এক দিক আক্রমণ
করিলেন, রাণীও তাঁহার দেহরক্ষিণী নারী-সৈন্ত লইয়া অপর দিক
আক্রমণ করিলেন, এবং মহাশক্তিদত্ত অসি লইয়া পাঠানের
দুপ্রবেশ বৃহ ভেদ করিয়া মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।
পাঠান সৈন্তগণ সেই বেগ সহ করিতে অসমর্থ হইল। তাহারা
রাণীর মুক্তকেশী, অসিধারিণী ভীমা মূর্তি দেখিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে
অভিভূত হইল। বাঙ্গালী সৈন্য মহাবিক্রমে পাঠান ধ্বংস করিতে
লাগিল। অবশেষে পাঠানগণের পরাজয় হইল। তাহাদের
অধিকাংশই নিহত হইল। ওসমান হতাবশিষ্ট সৈন্ত লইয়া পলায়ন
করিলেন। ভূরগুটে পাঠান সেনাপতি ওসমানের এই দ্বিতীয় পরা-
জয়। ইহার পর ওসমান আর কখনও ভূরগুটে আক্রমণ করে নাই।

বাদশাহ আকবর, রাণী ভবনকরীর বীরত্ব-কাহিনী অবগত হইয়া
তাঁহাকে “রায়বাঘিনী” উপাধিতে ভূষিত করিয়া, বহুবিধ উপহার
দানে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি রাজা
মানসিংহকে ভূরগুটে প্রেরণ করেন।

এই ত গেল রাজরাণীর বীরত্বের কাহিনী। ভূরগুটের সতী-
লক্ষ্মীদের সঙ্ক্ষেপে দুই-একটা কথা উল্লেখ না করিলে এই পবিত্র
কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিবে।

বর্তমান দুই-এক জন হিন্দুলেখক বলিয়াছেন, নারীজাতিকে
শাসনে রাখিবার জন্ত সতীত্ব একটা বাঁধনমাত্র। একালে নারীত্বের
ভুলনার সতীত্বের গৌরব সামান্য। বহু শিক্ষিতা হিন্দুনারীর আদর্শ
এইরূপ উন্নত হইয়াছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সহমরণ-প্রথা আইন দ্বারা
বহিত হইলেও বহু দিন পর্যন্ত এই প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।
আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও অনেক সাক্ষী মহিলা স্বৈচ্ছায় স্বামীর
সহিত চিতানলে পুড়িয়া মরিতেন; তাঁহাদিগকে স্বার্থপর পুরুষ
আত্মীয়গণ বলপূর্বক পুড়াইয়া মারিত—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে;
পন্থ ইংরেজ কর্মচারীরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, স্বৈচ্ছায়
তাঁহারা দেহত্যাগ করিতেন। পুরাতন সংবাদপত্র হইতে প্রতিপন্ন
হইবে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সতীর আত্ম-বিসর্জনের দৃষ্টান্ত
ভূরগুটেতে বিরল নহে।

৫৮৫ সংখ্যা, ১৬ই বৈশাখ, ১২৮৮ সাল, ইং ১৮০১—২৮
এপ্রিল, সমাচার-চন্দ্রিকা হইতে গৃহীত—

“১লা শ্রাবণের প্রকাশিত পত্রপ্রাণ সতী”

সতীনিবারণ আইনের পর যে যে সতী হন এবং সহগমন
করিতে নিবারণিত হইয়া বাহারা প্রাণত্যাগ করেন।

জেলা হুগলীর ভূরগুট পরগণার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের ভগীরথ
নন্দীর ৭ই আষাঢ় পরলোক হয়, ১৮ দিবস পরে তাঁহার স্ত্রীর
কাল হয়।

“১২ই চৈত্র প্রকাশিত পত্রপ্রাণ সতী”

জেলা বর্ধমানের ভূরগুট পরগণার খেপু গ্রামের ৮নামমোহন
ষোণের কান্তন মাসে মৃত্যু হয়, কয়েক দিবস পরে তাঁহার স্ত্রী
প্রাণত্যাগ করে।

সহমরণ

আমাদিগের পরিচিত কোন বিশ্বস্ত লোকের পত্রের দ্বারা
জানা গেল যে, ভূরগুট পরগণার বসুনাথপুর গ্রামের রামহুলাল
বাগ নামক এক ব্যক্তি উত্তররাঢ়ীয় কৈবর্ত—তাঁহার বচঃক্রম অমুমান
পর্ববৃষ্টি বৎসর হইয়াছিল। কোন রোগোপলক্ষে গত ১৭ই ফাল্গুন
রাত্রিতে তাঁহার পরলোকগমন হইলে কল্পনাময়ী নারী তৎপত্নী
সহগমনোগ্রীবী হইয়া একটা আত্মশাখা ভাঙ্গিয়া মৃত ব্যক্তির পাদদ্বয়ের
নিকট বসিল; সে রজনী সকলে জাগরণে যাপন করিলে পরদিন
মৃত ব্যক্তির পুত্র সীরামজীবন বাগ ও সীরামকৃষ্ণ বাগ অত্যন্ত ভীত
হইয়া গ্রামের মণ্ডলকে সংবাদ করিলে সে কহিল, এ ভয়ানক
ব্যাপার বটে, মণ্ডল প্রভৃতি সতীকে অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত
রাখিয়াছিল; যখন সতীপতির অর্ধেক শরীর দাহ হইল, এমত
সময়ে সাক্ষী অতি শীঘ্র সাহসপূর্বক অগ্নিকুণ্ডে বস্তু প্রদানপূর্বক
আত্ম-দেহ দাহ করিলেন।

এই সকল সতী হিন্দু রমণীর গৌরব।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন)।

মধ্যযুগে বাঙ্গালীর বিদ্যাশিক্ষা

(আলোচনা)

‘মধ্যযুগ’ বলিতে কোন যুগ বুঝায়, ইহা লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর
মতভেদ লক্ষিত হয়; কারণ, দেশভেদে ও কালভেদে সভ্যতা ও
সংস্কৃতির গতি কোথাও দ্রুত, কোথাও অপেক্ষাকৃত মন্দ্র। এই জন্তই
স্বয়ংপের ও ভারতের ‘মধ্যযুগ’ যে একই সময়ে বর্তমান ছিল, ইহা
বলিবার উপায় নাই। স্বয়ংপের ‘মধ্যযুগ’কে কেহ কেহ অতীতের
‘অন্ধকার যুগ’ (Dark Age) বলিয়াই মনে করেন; অর্থাৎ এই
যুগে সংস্কৃতির দিক দিয়া জাতির বিশেষ উন্নতি হয় নাই।
ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা দেখিয়া অনেকে মুসলমান রাজত্ব কালকে
ভারতের ‘মধ্যযুগ’ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। কেহ কেহ হর্বর্ডনের
রাজত্বের পরবর্তী কাল হইতে ‘মধ্যযুগ’ বলিয়া নির্দেশ করেন।
সংস্কৃতির দ্বারা লক্ষ্য করিয়া শেষোক্ত সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হইলেও,
বাংলাদেশের শিক্ষাদীকার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ‘মধ্যযুগ’
বলিতে এইরূপ নির্ধারণ সঙ্গত বলিয়া ধারণা করা যায় না। কিন্তু
বাংলাদেশের সংস্কৃতির দ্বারা বিচার করিয়া কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি
রাজা গণেশের সময় (১৪১৪ খৃঃ অঃ) হইতে নবাব শায়েস্তা
খাঁর শাসনকাল পর্যন্ত ‘মধ্যযুগ’ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন

ইহাদের মতে 'মধ্যযুগ' পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। শেষ-সীমা সযক্বে এ দেশের শিক্ষিত সমাজের মতভেদ না থাকিলেও আরম্ভকাল সযক্বে মতান্তর লক্ষিত হয়। 'মধ্যযুগ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যে কালকে বুঝিয়া থাকি, সেই কালের শিক্ষাদীকার ধারা বিচার করিলে দেখিতে পাই, উহার উৎসমুখ বহু দূরে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে, সুলতানবর্তী পালরাজগণের রাজত্বকাল হইতে এই একই ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই ধারাটি ব্রাহ্মণ্য বা পৌরাণিক ধর্মের ধারা। অনেকে বলিতে পারেন—পালনুপতিগণ বৌদ্ধযুগের লোক; কিন্তু আমরা জানি, গুপ্তসম্রাটগণের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। পালবংশীয়গণের সময়ে হিন্দুধর্মের তরুণ অরুণ প্রদীপ্ত প্রভাব উদীয়মান এবং বৌদ্ধধর্মের গৌরব-রবি তাহার প্রভাবের সান্নায়ে অস্তাচল-চূড়াবলম্বী। এই নবোদিত হিন্দু-ধর্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে পালরাজবংশের অভ্যুদয় কাল—অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ্ব হইতে মধ্যযুগের আরম্ভকাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা বাইতে পারে। বস্তুতঃ, বাঙ্গালার শিক্ষার ইতিহাসে মধ্যযুগ বলিতে নবম শতাব্দীর প্রথম হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত গণ্য করা উচিত। তবে বুঝিবার সুবিধার জন্ত নব শত বৎসরব্যাপী দীর্ঘ এই যুগকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা বাইতে পারে,—

(১) বৌদ্ধ ধর্মের শেষ যুগ (২) পৌরাণিক যুগ ও (৩) বৈষ্ণব-ধর্মের যুগ। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এই তিনটি যুগের সাধারণ ধর্ম বলিয়া গণ্য করা বাইতে পারে।

এই মধ্যযুগে দেশের শাসনকর্তা বিদ্যাশিক্ষায় পরম উৎসাহী ছিলেন, বিদ্যান ব্যক্তির দেশের সর্বত্র পূজ্য বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কিন্তু সেই সময়ে রাষ্ট্রের (State) উদ্ভব হয় নাই, গণশক্তিরও জাগরণ হয় নাই। এইজন্য প্রজাসাধারণ সরকারের নিকট শিক্ষার অধিকারের দাবী করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বাহ্যিক আমরা এখন গণশিক্ষা (Mass Education) বলি, তাহার স্বরূপ তখন পৃথিবীর কোন দেশেই মানবচিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যুরোপেও এই শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। সেই কালে রাজার খাসে শিক্ষাবিভাগ বলিয়া কোন বিভাগ ছিল না বটে, কিন্তু বিজ্ঞানসাহী নুপতিগণ প্রজার মন হইতে অজ্ঞান-ভিমির অপসারিত করিবার জন্ত বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেন। সে-কালের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের শিক্ষাদান নিত্যকর্তব্যেরই অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। কেবল যে বৌদ্ধ বা হিন্দুরাজগণই বিজ্ঞানসাহী ছিলেন এরূপ নহে, ইসলাম-ধর্মাবলম্বী হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ প্রমুখ শাসনকর্তারাও বিদ্যার সম্মান প্রদর্শন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার (Free Primary Education) ধূয়া উঠে নাই, কিন্তু সে-কালের জনসাধারণের শতকরা নিয়ানকই জন গণমূর্খ ছিল, এরূপ মনে করা সম্ভব নহে। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ঠিক শতকরা কত জন নরনারীর অক্ষর পরিচয় ছিল, তাহার কোন তথ্য আজও সংগৃহীত করা সম্ভব হয় নাই বটে, কিন্তু শেষ ভাগের অবস্থা আমরা পরবর্তীকালের ইতিহাস আলোচনার ফলে সহজেই ধারণা করিতে পারি। এডাম, ওয়ার্ড প্রমুখ যুরোপীয়গণের লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়—এ দেশে ইংরেজের

প্রভূ প্রভিষ্ঠার পূর্বে বাঙ্গালার পুরুষদের মধ্যে ন্যূনকরে শতকরা ২০ জনের অক্ষর পরিচয় ছিল। যি: এডামের বিবৃত অতিমত হইতে জানিতে পারা যায়—বঙ্গদেশে সেই সময়ে এক লক্ষ পাঠশালা ছিল। বর্তমান যুগে স্যার ফিলিপ হার্টগ উহা নিরবচ্ছিন্ন গজিকাধুম বলিয়া অবজ্ঞাতেরে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেও সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা অসম্ভব।

প্রাথমিক শিক্ষা

মধ্যযুগে বাঙ্গালাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কি না, এবং থাকিলে উহার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য। ভিন্সেন্ট স্মিথ অশোকের রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে ধারণা হয়, অশোকের রাজত্বকালে প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। অশোকের পরবর্তীকালে সেই ব্যবস্থার অবনতি হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান হয় না; বরং বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'অক্ষরিকা' ক্রীড়ার উল্লেখ হইতে এইরূপই ধারণা হয় যে, শিশুদের অক্ষর পরিচয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধযুগে সর্ব-সাধারণের জন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হওয়ার শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল। ফলতঃ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসম্ভব নহে; তবে এই সকল বিদ্যালয় 'পাঠশালা' নামে অভিহিত হইত কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

প্রাচীন কালে কেবল ব্রাহ্মণগণেরই শিক্ষাদানের অধিকার ছিল; সুতরাং ব্রাহ্মণই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিতেন। পরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণের জাতিও শিক্ষাদানের কিকিৎ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তবে, এ শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে; উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের অধিকার মধ্যযুগের শেষ ভাগেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। বঙ্গদেশে পাঠশালার শিক্ষকতা শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরাই একচেটিয়া করিয়াছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। পৌরাণিক যুগের প্রথমে যখন ব্রাহ্মণ পাঠশালায় শিক্ষাদান করিতেন, তখন ব্রাহ্মণের ছাত্রও পাঠশালায় বিভাজ্য করিতে বাইত; কিন্তু শুধু ব্রাহ্মণ ছাত্রেরই শাস্ত্রাচরণের অধিকার ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণসন্তান উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত উৎসুক হইত, তাহারা পাঠশালার গমন না করিয়া অন্ন বয়স হইতে গৃহে বা নিকটবর্তী টোলে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিত। বৈদ্যাদি জাতির সাংসারিক জ্ঞানের প্রয়ে জন থাকার ঐ সকল জাতির সন্তান-গণকে পাঠশালার প্রেরণ করা অপরিহার্য মনে হইত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছাত্রদের নিকট পাঠশালার দ্বার বহু দিন পর্যন্ত রুদ্ধ ছিল। সে দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন—চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যবর্গ।

সে-কালের পাঠশালাগুলি বিদ্যার 'আলয়' ছিল, বিজ্ঞা-বিপণি ছিল না। ছাত্রগণকে মাসিক বেতন বাবদ কিছুই দিতে হইত না; তবে রাজা ও প্রজা সকলেই বিদ্যাদাতাকে সাধ্যসূত্রে আর্থিক সাহায্য করিতেন, এবং দেবোত্তর সম্পত্তি প্রভৃতি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ শিক্ষকের অন্নকষ্ট নিবারণ করিতেন। ছাত্রগণও নানা দ্রব্য-পূর্ণ সিধা দিয়া গুরুসেবার প্রাচীন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিত। কিন্তু সে দিন আর নাই; বিজ্ঞা এখন পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক ছুঃখেই বর্তমান যুগের শিক্ষককে 'বিজ্ঞাবণিক' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

আলোচ্য যুগের প্রথম ভাগে পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, লিখন, পঠন ও হিসাব—ইংরেজীতে সংক্ষেপে যাহাকে বলে, 'Three R's'। পঠনের ভাগ ছিল নামমাত্র, কারণ, মুদ্রিত পুস্তকের তখন অস্তিত্ব ছিল না। ভাষাশিক্ষাও বেশী দূর অগ্রসর হইত না, কারণ, বাহা ভাষা নামে এখন পরিচিত, তখন তাহার জ্ঞানবস্থা। তখন ইহার অপর নাম 'পৈশাচী প্রাকৃত' বা 'ভাষা'। বৌদ্ধপণ্ডিতগণের কৃপায় এই ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হইতেছিল, এবং সেই জ্ঞান ইহার উন্নতিও হইতেছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ বৌদ্ধ ধর্মের পতন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান হইল। ব্রাহ্মণগণ না কি বিধান দিলেন—রামায়ণ-পুরাণাদি এই ভাষায় শ্রবণ করিলে রৌরব নরকে গমন অপরিহার্য হইবে। জ্ঞানার্জনের ফলে নরকে বাস উদার ব্যবস্থা বটে! কিন্তু এই অবস্থায় পাঠশালায় ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। পরবর্তীকালে রামায়ণ-মহাভারতের বাঙ্গালা সংস্করণ হইলে পাঠশালার ছাত্রদের কিছু কিছু সুবিধা হইয়াছিল। মধ্যযুগের শেষ ভাগে পাঠশিক্ষার আরও উন্নতি হইয়াছিল; তবে মুদ্রাবন্ধের অভাবে সে কালে পাঠশিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা ছিল না বলিলে, বোধ হয় অতুক্তি হইবে না।

পাঠশালার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল—লিপিকুশলতা। আধুনিক যুগের পাঠশালার গুরুমহাশয়গণও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। সে-কালে যখন এ দেশে কাগজ আমদানী হয় নাই বা দুর্লভ ছিল, তখন ভূমিতে, তালপাতায়, ও কদলীপত্র লিখন অভ্যাস করিতে হইত। এখন যেমন ছোট ছোট ছেলেরা প্রথমেই পুস্তক হইতে বর্ণপরিচয় করিয়া পরে লিখিতে শিখে, সে-কালে অক্ষর পরিচয় হইত খড়ির সাহায্যে দাগা বুলাইয়া। 'হাতেখড়ি' কথাটিই ইহার প্রমাণ। এই পদ্ধতিটি আধুনিক শিক্ষকগণ হয় ত বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু ডাক্তার মস্তেসরী,—যিনি শিশুশিক্ষায় যুগান্তর আনিয়াছেন,—তিনিও এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। মস্তেসরী প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পঠনের পূর্বে লিখন শিক্ষা নিলে তাহার ফল ভালই হয়।

গণিত বা গণনা শিক্ষা পাঠশালার ইতিহাসে প্রথম হইতেই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, শুধু গণনা শিক্ষার জন্মই লোকে এক সময় ছেলেদের পাঠশালায় পাঠাইত। প্রথমে কি প্রণালীতে গণিত শিক্ষা হইত, তাহা এখন ঠিক জানা যায় না। কিন্তু শুভকরের 'আর্য্য' রচিত হইবার পরবর্তীকালে পাঠশালায় মৌখিক গণনা-পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার পাঠশালায় শুভকরী হিসাব শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে। একাধিক ইংরেজ শিক্ষাজীবী উচ্চশিক্ষিত ভাষায় শুভকরী শিক্ষা-প্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন। এই জন্মই বোধ হয় বহু দিন পরে আবার বাঙ্গলাদেশের বিজ্ঞান-শুলিতে শুভকরের আদর হইয়াছে।

উচ্চশিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা বলিতে আমরা এখন বাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা মধ্যযুগে ছিল না। ছিল শুধু প্রাথমিক শিক্ষা বা পাঠশালার শিক্ষা, আর ছিল উচ্চশিক্ষা বা টোল ও সজ্জারামের শিক্ষা। এই দুই প্রকার শিক্ষার মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল না। টোল, চতুপাঠীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—বিদ্যার্থীকে সংস্কৃত ভাষার

সাহায্যে বেদ, বেদান্ত, জ্ঞান, ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য, দর্শন প্রভৃতিতে পারদর্শী করা। বৌদ্ধবিহারে শিক্ষার্থীরাও ব্যাকরণ, জ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতেন। তবে বেদাদি পাঠ না করিয়া তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে হইত। সুতরাং সজ্জারামের শিক্ষাও যে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে দেখা যায়, বাঙ্গলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুইটি ধারা বর্তমান ছিল, একটি বৌদ্ধ, আর একটি হিন্দু। তখনও বাঙ্গলাদেশে বৌদ্ধধর্মের আলোক নির্বাপিত হয় নাই; তখনও নাগন্দা, উদগুপুর ও বিক্রমশিলা অক্ষুণ্ণ ভাবে স্বমহিমা প্রচার করিতেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও পালরাজগণ বিহারের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। জগদলবিহার এই সময়ের কীর্তি। কিন্তু পালনৃপতিগণ বৌদ্ধভাবাপন্ন হইলেও হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। এই কারণে দেশে টোল, চতুপাঠীর আদর বাড়িতেছিল। ক্রমে দেখা গেল, বৌদ্ধ ধর্মের ভিতরে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। তাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল—তুর্কী-আক্রমণের পর। তুর্কী-আক্রমণে উদগুপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিহারগুলির ধ্বংসের সহিত বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষা চিরকালের জন্ম বিলুপ্ত হইল; এবং তাহাতে হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাও বাধা পাইল বটে, কিন্তু বিলুপ্ত হইল না। বৌদ্ধের সজ্জারামগুলি লোপ পাইলেও, হিন্দুর টোলগুলির অস্তিত্ব বর্তমান রহিল।

বৌদ্ধ ধর্মের আলোক নির্বাপিত হইবার পর হিন্দুর টোল মাথা তুলিতে লাগিল। ইহার ফলে ক্রমশঃ মিথিলা এবং পরে নবদ্বীপ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করিল। পরবর্তী যুগে বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, ও ভটপল্লী উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, বাংলার টোলের শিক্ষাপদ্ধতিতে বৌদ্ধ-প্রভাব বর্তমান। তাঁহার মতে—'the life lived till the other day in a Bengali tol must be an exact replica of the life lived in an earlier period in such places as the caves of Ajanta or Ellora.'—(Footfalls of Indian History, p. 245.) তবে তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, বৌদ্ধ-শিক্ষার ধারাও প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিকট ঋণী।

টোলের শিক্ষা-প্রণালী বর্ণনা করিবার পূর্বে সজ্জারামগুলির শিক্ষাব্যবস্থার কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্ৰাসঙ্গিক নহে। যাহারা উত্তর জীবনে শ্রমণ হইতেন, কেবল যে তাঁহারা বিহারে শিক্ষালাভ করিতেন, এরূপ নহে; যে কোনও বৌদ্ধ-শিক্ষার্থীর সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল। এই সকল স্থানে বেদপাঠ হইত না বটে, কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণ বহু বৎসর ধরিয়া অধীত হইত। কেহ কেহ সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর কাল কেবল ব্যাকরণেরই চর্চা করিতেন। বৌদ্ধ-বিহারে সর্বাপেক্ষা অধিক চর্চা হইত জ্ঞানশাস্ত্রের। পরবর্তী যুগের নৈয়ামিকগণ বৌদ্ধদের নিকট এতদূর ঋণী ছিলেন। বাঙ্গালার গৌরব নব্যজ্ঞানের উৎপত্তিহীন বৌদ্ধ সজ্জারামের মধ্যেই খুঁজিতে হয়। ঐতিহাসিক মিঃ কী লিখিয়াছেন,—'Mediaeval Indian logic from A. D. 400 to 1200 was almost entirely in the hands of Jainas and Buddhists, and their books on the subject are very numerous.'—(Indian

Education in Ancient and Later Times. F. E. Keay. p 109.) অর্থাৎ '৪০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় জ্ঞানশাস্ত্র জৈন ও বৌদ্ধদের হস্তে স্তম্ভ ছিল, এবং তাঁহারা ঐ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।' ইহা হইতেই বুঝিতে পারি—টোলের শিক্ষা ও সজ্জারামের শিক্ষার মধ্যে একটা সঙ্কট ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পতনের পর হিন্দুদের মধ্যে যে শিক্ষার আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইল 'পুরাণ' ধর্মের উপর। এই যুগের শিক্ষা সেই জন্ত পৌরাণিক শিক্ষা নামে অভিহিত হইতে পারে। পৌরাণিক শিক্ষার যুগে মিথিলা বাঙ্গালার হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এই মিথিলা নবদ্বীপ অপেক্ষাও প্রাচীন। বখ্‌তিয়ারের গোড়-বিজয়ের বহু দিন পূর্বেও মিথিলা স্বাধীন ছিল।

জ্ঞান ও দর্শনের জন্ত মিথিলা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতেই জ্ঞানদর্শন কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে জ্ঞানশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। নবদ্বীপের খ্যাতি প্রচারিত হইবার পূর্বে বারাণসীতে অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিত বিদ্যাচর্চা করিতেন। তবে বারাণসী কোন দিনও মিথিলা বা নবদ্বীপের জ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই।

মধ্যযুগের বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গৌরব নবদ্বীপ। ১০৬৩ খৃঃ অঃ সেনবংশীয় কোন নৃপতি এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২০৩ খৃঃ অঃ বখ্‌তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ জয় করেন; কিন্তু উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া ইহার সুনাম ও প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে, এবং চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবকালে ইহা যশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। বাঙ্গালী স্বাধীনতা হারাইলেও নবদ্বীপের গৌরব নষ্ট হয় নাই। মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপের অবস্থা 'চৈতন্যভাগবতে' এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—

'নবদ্বীপের সমৃদ্ধি কে বর্ণিবারে পারে।

এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।

ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।

সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।

সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব করে।

বালকে হো ভট্টাচার্য্য সমে কক্ষা করে।'

নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন—বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন, এবং 'নবদ্বীপচন্দ্র' শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব। ষোড়শ শতাব্দী নবদ্বীপের ইতিহাসে এক সুবর্ণ যুগ। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—এই সময়ে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া নবদ্বীপে শিক্ষালাভ করিত। ভাষার অতিরঞ্জন স্বীকার করিলেও এইরূপই প্রতীতি হয় যে, এখানে বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীর সমাগম হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ১১০০ জন ছাত্র এখানে বিদ্যালাভ করিত। তখন অধ্যাপক-সংখ্যা ছিল ১৫০। ১৬৮০ খৃঃ অঃ রাজা ক্রমের সময় নবদ্বীপে ৪০০০ ছাত্র ও ৬০০ অধ্যাপকের অস্তিত্ব ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল—আড়াই শ'তে, এবং টোলের সংখ্যা তখন মাত্র ৩০টি।

যে নব্যজ্ঞান বাঙ্গালার গৌরব, তাহার জন্মস্থান এই নবদ্বীপ। এক সময় ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছিল—এই জ্ঞানের জন্মই। স্মৃতি ও ব্যাকরণের স্থান ছিল তাহার নিয়ে।

সে-কালে অন্তত বহু দিন দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া বহু প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিতে এখানেই আসিতেন, অর্থাৎ নবদ্বীপ ছিল—সে-কালের 'পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট।' তবে সে কালের শিক্ষাপ্রণালী ছিল ভিন্ন প্রকার। নোট লিখাইয়া দিয়া বা অনর্গল বক্তৃতা করিয়া তখনকার দিনে অধ্যাপনার রেওয়াজ ছিল না। সে-কালের শিক্ষাপ্রণালী ছিল এইরূপ :—দুই জন অধ্যাপক দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের কোন জটিল সমস্যা লইয়া তর্ক করিতেন। ছাত্রগণকে তাঁহাদের সেই তর্ক শুনিয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে হইত। বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভূহ মনে হইলে শিষ্যরা অধ্যাপকগণকে প্রশ্ন করিতে পারিতেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-প্রণালীর মত ইহা প্রাণহীন ছিল না। নবদ্বীপের রাজারাও এক-এক সময় পারিষদবর্গসহ পণ্ডিতদের তর্ক শুনিতে আসিতেন, এবং তর্কে বিজয়ী পণ্ডিতকে যোগ্য পুরস্কারদানে সম্মানিত করিতেন।

প্রাচীন কালে শিষ্যের গুরুগৃহবাসের জায় টোলের ছাত্রগণও প্রথম যুগে টোলেই বাস করিত, কিন্তু ক্রমশঃ সে ব্যবহার পরিবর্তন হয়। প্রথমে টোলে শুধু ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার ছিল। চৈতন্যদেবের সময় হইতে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হয়। তাই মুকুন্দ ও নরহরি সরকার বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইয়াও নবদ্বীপের টোলে দর্শন পাঠ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তবে কায়স্থ বা অন্যান্য শ্রেণীর সংশ্লেষেরও জ্ঞান ও স্মৃতির টোলে প্রবেশাধিকার ছিল না। পরে বৈষ্ণবের টোলে সর্বশ্রেণীর ছাত্র শিক্ষালাভ করিতে পারিত। মধ্যযুগে টোলে সংশ্লেষের প্রবেশাধিকার না থাকিলেও তাহাদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ মুক্ত ছিল। ধনবান্ সংশ্লেষ গৃহে পণ্ডিত রাখিয়া পুস্তকগণকে সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করাইতেন। এই জন্ত মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে দেখিতে পাই—শ্রীমন্ত 'বেণের' পুত্র হইয়াও অল্প বয়সে ভারবি, মাধ ও কালিদাসের কাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিল।

পারসী শিক্ষা

মধ্যযুগে প্রাথমিক শিক্ষার বাহন ছিল—মাতৃভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালী-ভাষা, এবং উচ্চশিক্ষার বাহন ছিল—সংস্কৃত। মুসলমান-বিজয়ের পর আর একটি ভাষার চর্চা আরম্ভ হইল, তাহা পারসী। মুসলমানী শিক্ষার ইহাই প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রথমে মুসলমানদের মস্তবে ও মাত্রাদায় ইহার স্থান ছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন ইহা আদালতের ভাষা (Court-language) পরিণত হইল—তখন হিন্দুদের পক্ষেও ইহা শিক্ষা করা অপরিহার্য হইয়া উঠিল।

বাদশাহ সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে হিন্দুরা সর্বপ্রথম পারসী শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে উর্দুভাষার সৃষ্টি হয়। সকলেই জানেন—হিন্দী ও পারসী ভাষার সংমিশ্রণে উর্দুভাষার উৎপত্তি। যে সকল হিন্দু তখন পারসী শিখিতেন—রাজদরবারে উচ্চপদলাভই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত। হিন্দুদের মধ্যে পারসী শিক্ষা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—বাদশাহ আকবরের রাজত্ব। ইহার কারণ, আকবরের উদারনীতির ফলে উচ্চ রাজকার্যের দ্বার হিন্দুদের জন্ত সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছিল। রাজা টোডরমল্ল পারসী শিক্ষা-বিস্তারে আকবরকে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনিই নিয়ম করেন—সমস্ত সরকারী হিসাবপত্র পারসী ভাষায় রাখিতে হইবে। উচ্চ

পদের আশায় মধ্যযুগের শেষ ভাগে কারস্থসন্ধানগণ সঙ্কত অপেক্ষা পারসীরই অধিকতর পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যত্নে বাইতেন না, কোন মুসলমান মৌলভীর বাড়ীতে গিয়া পারসী শিখিতেন। কোন কোন ব্রাহ্মণপুত্রও রাজকাৰ্যের লোভে পারসী শিখিতেন। রাজা রামমোহন রায়েব পিতৃকুলে পারসী শিক্ষার রেওয়াজ ছিল।

দ্বীশিক্ষা

মধ্যযুগকে দ্বীশিক্ষার 'অন্ধকার যুগ' মনে করিলে ভুল হইবে। উচ্চশিক্ষা দ্বীজাতির অধিকাংশেরই ভাগ্যে ঘটিল না সত্য, কিন্তু সাধারণ শিক্ষা অনেক বালিকাই পাইত। বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে ভিক্ষুণীরা উচ্চশিক্ষা পাইতেন, তাহার প্রমাণ খেরীগাথাগুলি। মধ্যযুগের পল্লীগীতিতেও দ্বীশিক্ষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি গীতিকথা হইতে জানা যায় যে, সময় সময় অপেক্ষাকৃত

বয়স্ক বালিকারাও পাঠশালার শিক্ষালাভ করিত। গবেষণার ফলে মধ্যযুগের বহু মহিলা-কবির নাম এ-কালে আবিষ্কৃত হইতেছে। চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী ও জুবময়ীর কথা হইতে সে-কালের দ্বীশিক্ষার আভাস পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসমাজেও বিদূষী নারীর বিশেষ অভাব ছিল না। সেরূপ অভাব ঘটিলে মাধুরীদাস বৈষ্ণবপদ-রচয়িত্রী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন না। হটী বিজ্ঞানকার বাঙ্গালার বিদূষীগণের অলঙ্কার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; তাঁহার অনেক শিষ্য-শিষ্যা ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বীশিক্ষার কিছু প্রমাণ পাই—মুকুন্দরামের কাব্যে। কবিকঙ্কনের ধুলনা বেণের মেয়ে হইয়াও লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন; সুতরাং মধ্যযুগে দ্বীশিক্ষার অবস্থা আমরা যতখানি শোচনীয় মনে করি, তাহা সেরূপ শোচনীয় ছিল না—এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা বাইতে পারে।

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ (এম-এ, বি-টি)।

পতিতার বিচার

প্রচার-মন্দিরে আসি' প্রভু যিশু মূহু হাসি'
ধর্ম্মকথা কহেন সকলে,
শিষ্যগণ এক মনে অমৃতের বাণী শুনে
ভাসে সবে নয়নের জলে।

হেন কালে ব্যভিচারী কলঙ্কিনী এক নারী
ল'য়ে আসে ক্রুদ্ধ জনগণ,
নীতিবিৎ কতিপয় ধর্ম্মধ্বজী মহাশয়
প্রভু-পদে করে নিবেদন :—

“ব্যভিচারী পতিতার কর প্রভু স্তুবিচার
সমাজের মঙ্গলকারণ,
শাস্ত্রের বিধান এই ব্যভিচার করে যেই
লোষ্ট্রাঘাতে তাহার মরণ।”

যিশু মহাপ্রভু ক'ন— “তোমাদের যেই জন
মনে-প্রাণে পবিত্র নিষ্পাপ,

করিয়া সে লোষ্ট্রাঘাত কর এর দেহপাত
দূরে যা'ক ধরার ত্রিতাপ !”
প্রভুর আদেশ শুনি' অন্তরে প্রমাদ গণি'
একে একে চ'লে গেল সবে।

অপমান লাজ-ভয়ে নারী সঙ্কুচিতা হয়ে
রহে সেথা দাঁড়ায়ে নীরবে।
প্রভু যিশু ক্ষণ-পরে কহিলেন স্নেহভরে—
“অভাগিনী কলঙ্কিনী নারী !

তব তমু-মন-প্রাণ পরমপিতার দান,
তোমাতে কি শাস্তি দিতে পারি ?

তোমার ঐ দেহ মাঝে ভগবান্ সদা রাজে ;
অপরাধ কমিহু তোমার,
পুত তব দেহখানি পবিত্র মন্দির জানি'
কলুষিত করিও না আর।”

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)



অদৃষ্টির অভিশাপ

১

লিলি দরিদ্রের ঘরে জন্মিলেও তাহার রূপের খ্যাতি ছিল ; সম্ভবতঃ এই জগৎই সে সম্পত্তিশালিনী নিঃসন্তান মাসিমার স্নেহ আকর্ষণ করিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে আশ্রয়প্রতিপালিত হইতেছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে সে পনের বৎসরে পড়িতেই মাসিমার মৃত্যু হইল, এবং তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই মেসোমহাশয় পাকা চুলে চৌপদ পরিয়া, পুনরায় বিবাহ করিয়া এক বাড়ী বোঁ ধবে আনিলেন। কাজেই এত দিনের আশ্রয় হারাইয়া দীর্ঘকাল পরে লিলিকে তাহার অপরিচিত পিতৃগৃহেই ফিরিয়া আসিতে হইল।

লিলির পিতা হরগোবিন্দ সেন গ্রাম্য-স্কুলে মাষ্টারী করিয়া কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন, এত বড় অনুচ্চ কণা আচম্বিতে গলায় পড়ায় তাঁহাকে বিমম বিপন্ন হইতে হইল ; কিন্তু উপায় ত কিছু নাই, কাজেই মনের ক্ষোভ দমন করিয়া তিনি পাত্র-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে পাত্র একটি মিলিল ; সে তাহার ভাগ্য এবং অটল পুরুষকারে নির্ভর করিয়া যৎসামান্য মূলধনে কলিকাতায় ছোট্ট একখানি দোকান খুলিয়াছিল, এবং দেশে তাহার বিধবা মাতা স্বামীর বাস্তুভিটায় কুঁড়ে আগলাইতেছিলেন। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার।

পাত্র স্বয়ং লিলিকে দেখিতে আসিল। সেই রূপমুগ্ধ যুবক লিলিকে এতই ভাল বাসিয়াছিল যে, একটি হরিতকী লইয়াই পরবর্তী লগ্নে তাহাকে বিবাহ করিবার দিন স্থির করিয়া গেল। হরগোবিন্দবাবু নিশ্চিত হইলেন।

গায়ে-হলুদের দুই দিন পূর্বে লিলি প্রতিবেশী হরিশ রায়েব শিউলীগাছ-তলায় ফুল কুড়াইতে গিয়া হঠাৎ

একটি যুবকের সম্মুখে পড়িল ; যুবকটি তখন সেই গাছ-তলায় দাঁড়াইয়া ছিল। স্নিগ্ধ প্রভাতের মধুর সৌন্দর্য্যে তখন চারিদিক পূর্ণ ; তনী তরুণী মূর্ত্তিমতী উষার মত অপক্লপ সৌন্দর্য্যে যুবককে মুগ্ধ করিল। সে বাক্শক্তি হারাইয়া শুধু এই সজীব, নিম্মল আলেখ্যের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার তৃনর্ভ দৃষ্টিপাতে লিলি একটু বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল : সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া কহিল, “কত মেয়ে ত এখানে ফুল নিতে আসে, তোমায় ত কোন দিন দেখিনি ? তুমি কোথায় থাক ?”

লিলি পূর্বে কলিকাতায় থাকিয়া স্কুলে পড়িত, এবং খুব বেশী পর্দানশীনও ছিল না ; কাজেই লজ্জায় বিহ্বল না হইয়া একটু মৌন থাকিয়া যত্ন স্বরে কহিল, “আমাদের বাড়ী কাছেই।”

“কাছেই ? তোমার বাবার নাম কি ? তোমারই বা নাম কি ?”

“বাবার নাম হরগোবিন্দ সেন। আমার নাম লিলি।” —বলিয়া সে গমনোচ্ছতা হইল।

যুবক হরিশ রায়েব ধনী আত্মীয়ের পুত্র স্কুমার ; একটা পারিবারিক উৎসবে সে হরিশ রায়েব বাড়ীতে আসিয়াছিল। সে বলিল, “হরগোবিন্দ সেনের মেয়ে তুমি ? তোমারই ত বিয়ে তবে ?”

লিলি নতমুখে পলায়নের চেষ্টা করিল ; কিন্তু অশিষ্ট স্কুমার তাহার পথরোধ করিয়া কহিল, “শুনেছি, পাত্রটা খুবই গরীব ?” কথাটা বলিয়া সে লিলির দিকে আর একটু সরিয়া গিয়া কহিল, “আমার দিকে চেয়ে দেখ দেখি লিলি, আমায় তোমার পছন্দ হয় ? আমিও অবিবাহিত। আমার টাকা-কড়ির অভাব নেই, প্রচুরও বলা যায়।—তুমি আমায় বিয়ে করবে ?”

লিলি মুখ আরক্তিম করিয়া কহিল, “পথ ছাড়ুন বাড়ী যাই। ছিঃ, কেউ দেখতে পায় যদি?”

সুকুমার এবার লিলির হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, এবং তাহার চিবুক ধরিয়া মুখখানি উচু করিল। লিলি তখন সবলে আপনাকে মুক্ত করিয়া অত্যন্ত বিচলিত চিন্তে গৃহে ফিরিল।

ইহার পরদিনই গ্রামশুদ্ধ লোক সবিস্ময়ে শুনিল, সুকুমার বিনাপণে লিলিকে বিবাহ করিতেছে। গ্রামের লোক হরগোবিন্দ মাপ্তারের সৌভাগ্যে হিংসায় জ্বলিতে লাগিল, এবং ধাড়ি মেয়ে ঘরে রাখিলে যে কেমন করিয়া ছেলেদের মাথা খাওয়া যায়, তাহার আলোচনায় গ্রামের বিভিন্ন আড্ডা মুখরিত করিয়া তুলিল।

সুকুমারের পিতা পাটের দালালী করিয়া প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া যান। সুকুমার সম্পত্তি সাবালক হইয়া তাহা দুই হাতে উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িয়া অবশেষে নাম কাটাইয়া সে সম্পত্তি ‘কাপ্তেন’ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেজন্য তাহার বিবাহে বাধা ঘটিল না; শুভদিনে সুকুমারের হাতে লিলিকে সম্প্রদান করিয়া হরগোবিন্দবাবু আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

২

লিলি উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রেমিক স্বামীর সহিত কলিকাতায় আসিলে প্রথম দুই-চারি মাস তাহার খুব আনন্দেই কাটিল; কিন্তু ইহার পর সুকুমারের নৃতনের মোহ কাটিলে সে তাহার পূর্ব ইয়ার ও মোসাহেবদের দলে মিশিয়া কাপ্তেনী আরম্ভ করিল।

লিলি তরুণী হইলেও চতুরা; তাহার সন্দেহ হওয়ায় সে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, “আজকাল ফিরতে তোমার এত রাত হয় কেন? কি খাও তুমি? যুগে এমন বিশ্রী গন্ধ, ছিঃ!”

সুকুমার ভয়ানক চটিয়া-উঠিয়া বলিল, “সকল কথার হিসেব চাইবার তুমি কে? তোমাকে যে বিয়ে করেছি—এই তোমার বাপের ভাগিয়া! আমি কি তোমার বাপের চাকর?”

এত বড় রূঢ় কথা শুনিয়া লিলিও জ্বলিয়া উঠিল,

রুদ্ধ-রোষের সহিত কহিল, “বাবার নাম নিয়ে খোঁটা দেওয়ার তোমার দরকার কি? তিনি গরীর হ’লেও তোমার গুরুজন তো?”

সুকুমার পত্নীর ঔদ্ধত্যে ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং জুতা খুলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। তাহার পর কঠোর স্বরে কহিল, “ভারী গুরুজন! আমার এই পায়ে তোমায় দিয়ে তোমার বাবার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হ’য়ে গেছে, তা কোন দিন ভেবে দেখেছ? তেজ দেখাতে আসো আমাকে? গরীবের মেয়ে—ম’রতে ঘর নিকিয়ে, বাসন মেজে, আর উহুনে ফুঁ-পেড়ে,—তা নয়, পায়ের ওপর পা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পিণ্ডি গিলচো; তাই অত তেজ হ’য়েছে!”

প্রহারের যাতনা লিলির যত না হইল, অপমানের বেদনা তাহার দ্বিগুণ হইল। উত্তেজিত স্বরে সে বলিল, “তোমার এই ধন-দৌলতের চেয়ে তা’তেই আমি শান্তি পেতাম।” হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। একটু পরেই সুকুমার বাহিরে চলিয়া গেল। লিলি সন্ধান লইয়া জানিল, বন্ধুবান্ধব ও বসন্ত বাইজীকে লইয়া সে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে স্কুর্তি করিতে গিয়াছে।

লিলি স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। স্বামী ফিরিয়া আসিলে সে কি দৃশ্য দেখিতে পাইবে—তাহা কল্পনা করিয়া ঘুণা ও আতঙ্কে বারম্বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, এবং এই মনুষ্যত্ববর্জিত, কদাচারী, স্থগিত নরপশুটাকে লইয়া তাহাকে আজীবন দগ্ধ হইতে হইবে ভাবিয়া ক্রোধে ও মনের কষ্টে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল।

গভীর রাত্রে সুকুমার ফিরিয়া আসিল; তখন তাহার ঘোর মস্তাবস্থা। বিতৃষ্ণায় লিলির সারা-চিন্তা তিস্ত হইয়া উঠিল; তবু কর্তব্যানুরোধে সে আসিয়া তাহার পরিচর্যা করিতে লাগিল। সুকুমার তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্থলিত স্বরে বলিল, “মেরা বিবিজান, একটু নাচ না ভাই!” হুর্গন্ধে লিলির অনুরোধের অন্ত পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিতেছিল; তড়িৎবেগে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, “আচ্ছা তুমি শোও, আমি নাচব তোমাকে শুইয়ে।”

সুকুমার টলিতে টলিতে উঠবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “কে শোবে?...আমি? ককনো নয়। বাইজী সম্মুখে

যার, সে শোবে শযায়?—রে দূত, তোর এ আকার
'শুনি' ইচ্ছা করিবারে!" পরক্ষণেই সে গান ধরিল,
"শ্রামলিয়া বাট রোকেরে মায় কোয়সে যাঁউ যমুনা?"

ক্রোধে ক্ষোভে লিলির বুক ফাটিয়া যাইতেছিল;
কোন মতে চোখের জল চাপিয়া সে বলিল, "হচ্ছে কি?
ঝি-চাকর সকলে দেখছে, আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি।"
—কোন মতে সুকুমারকে শাস্ত করিয়া সে ঘুমাইলে লিলি
দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

অনেক বেলায় সুকুমার 'খোঁয়ারী ভাঙ্গিয়া' উঠিল;
লিলির দিকে অর্ধমুদিত চক্ষে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমায়
রাতে শেকল দিয়ে গিছলে কেন?"—কণ্ঠস্বর ভয়ানক
উগ্র।

লিলি আশা করিয়াছিল, সুকুমার এক বার অন্ততঃ
মৌখিক লজ্জাও প্রকাশ করিবে, কিন্তু বিপরীত ব্যবহার
দেখিয়া সে বিস্মিত হইল; বলিল, "ও কথা তোমায়
কে বললে?"

সুকুমার গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, "পাজি, ছোটলোক,
বজ্জাত! আমার বাড়ী ব'সে তুমি আমার ওপর অত্যাচার
করবে, আর আমি তা' জানতে পারব না? আমার
ওপর 'কত্তাও ফলাতে' আসো তুমি কোন্ সাহসে?
তোমার অধিকার কি?"

লিলি সহ করিতে পারিল না, বলিল, "তা ত' বটেই!
অধিকার আর কি? বড়লোকের গোয়ালে গরু
থাকে, আস্তাবলে ঘোড়া থাকে, ঘরে দামী আসবাব-
পত্র থাকে, তেমনি স্ত্রীও থাকে; তার বেশী অধিকার বড়-
লোকের স্ত্রীর নেই।" সে ঘর হইতে চলিয়া গেল,
এবং প্রতিজ্ঞা করিল, আর কোন দিন কিছু বলিবে না।
স্বামীর যথেষ্টাচারে বাধা দিবার অধিকার যদি তাহার
না থাকে, তবে যাচিয়া অপমানিত হইবার প্রয়োজন
কি?

৩

সুকুমার যেন কতকটা লিলির উপর আক্রোশেই
বিলাসের শ্রোতে আরও বেশী করিয়া গা ঢালিয়া দিল।
লিলি তাহার প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না, সুকুমারকে
ও পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা

করিতে লাগিল; কিন্তু বলা বাতুল্য, তাহার সকল চেষ্টাই
নিফল হইল।

ইহার পর আজ বাগান, কাল গাড়ী, পরশু একখান
বাড়ী, এমনি করিয়া তাহার সম্পত্তিগুলি একে একে বিক্রয়
হইতে লাগিল। অর্থাভাবে সুকুমার জুয়া ধরিল।
তাহার বিলাসিতায় যাহা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও
উড়িয়া যাইতে লাগিল। অভাবের দুশ্চিন্তা ভুলিবার
জন্ত সুকুমার দিবারাত্রি বোতল-বোতল মদ চালাইতে
আরম্ভ করিল, এবং এই অত্যাচার সহ না হওয়ায়
অবশেষে সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইল।—'শনৈঃ
পর্যন্তলজ্জনম্!'

এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অপব্যয়ে বিশেষ কিছু রক্ষা
পায় নাই; শেষে যাহা কিছু সম্বল ছিল, লিলি সর্বস্বপণ
করিয়া তদ্বারা স্বামীর চিকিৎসা চালাইতে লাগিল।
দেড় বৎসর ক্লান্তির সহিত অক্লান্তভাবে যত্ন করিয়া, যাহা
কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহা সমস্তই ব্যয় করিয়া লিলি যে দিন
স্বামীকে মৃত্যুদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিল, সে দিন বাস-
ভবনখানি এবং লিলির হাতের চুড়ী কয়গাছা-ছাড়া
তৃতীয় সম্বল বলিতে কিছুই রহিল না। সুকুমার স্তব্ধ হইল
বটে, কিন্তু দক্ষিণ হাতখানি পঙ্গু হইয়া গেল।

লিলি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া বলিল, "বাড়ীটা
ভাড়া দিয়ে, চল না হয় বাবার কাছে থাকি?" সুকুমার
উত্তর দিল, "তোমার ইচ্ছা হয় যেতে পার। আমি এখান
থেকে এক পা-ও নড়ব না। মরতে হয় এখানেই
মরব। স্ত্রী সুদিনের সঙ্গিনী—তা' আমার বেশ জানা
আছে।"

ইহার পর লিলি আর কিছু বলিতে পারিল না বটে,
কিন্তু দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। হাতের
মূল্যবান চুড়ী ক'গাছা বিক্রয় করিয়া কয়েক মাস চলিল;
কিন্তু আর ত চলে না। কয়েক দিন পরে একখানি
সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন হঠাৎ লিলির নজরে পড়িল।
সেটি এই;—

"একটি অশিক্ষিতা বঙ্গমহিলার জন্ত শিক্ষয়িত্রীর
প্রয়োজন। ইংরেজী, বাংলা, সেলাই ও গান-বাজনা
শিখাইতে হইবে। বেতন যোগ্যতামুসারে দেওয়া
হইবে। ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের নিঃসন্তান বিপন্ন রমণীর

আবেদন সর্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে। আবেদনকারিণী—নং বস্ত্রের ঠিকানায় পত্র লিখুন।”

লিলি বিজ্ঞাপনটা অনেক বার পড়িল, শেষে স্বামীর কাছে লইয়া গেল।

সুকুমার তখন অতীতের প্রমোদ-সঙ্গিনীদের চিত্রপূর্ণ এনুবাম দেখিতেছিল; লিলি সেখানে প্রবেশ করিলে প্রশ্ন করিল “কি ব্যাপার? উহা হয় কি পদার্থ?”—কণ্ঠস্বর বিদ্রুপপূর্ণ।

লিলি বিজ্ঞাপনটা দেখাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সুকুমার তাহা পড়িয়া বলিল, “তুমিই করবে এ কাজ?”

লিলি চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তা’ ছাড়া উপায় কি? বাঁচতে হবে ত?”

সুকুমার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, “তাই ব’লে তুমি চাকরী করতে যাবে? আমার স্ত্রী করবে পরের চাকরী, ওঃ!”

এমন কণ্ঠস্বর লিলি কোনও দিন শোনে নাই। সে ব্যথিত স্নেহভরে স্বামীর অবশ দক্ষিণ হস্ত কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, “নইলে তোমায় কি খাওয়াব? আর যে কোন সম্বলই নেই।”

সুকুমার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিল, শেষে কাতর স্বরে কহিল, “তাই কর তবে।”

৪

লিলি সেই দিনই দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। তিন-চার দিন পরে সে উত্তর পাইল,—‘আগামী রবিবার বেলা পাঁচটার মধ্যে বিজ্ঞাপনদাতার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইবে।’

সুকুমার পাশের বাড়ীর একটি ছেলেকে ডাকিয়া লিলির সঙ্গে পাঠাইয়া দিল। নম্বর দেখিয়া বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল। লিলির পরিচয় শুনিয়া একটি দাসী তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। লিলি তখন ভাবিতেছিল, এই দাসীর সহিত তাহার পার্শ্বক্য কতটুকু? দাসী তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের যে কক্ষের সম্মুখে আসিল—তাহার দ্বারে একখানা সবুজ পর্দা প্রসারিত ছিল। দাসী দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল, “বৌমা, বেরিয়ে এসো গো!”

পর্দা সরাইয়া একটি তরুণী বাহিরে আসিল। তাহার রং কালো, কিন্তু মুখখানা সুশ্রী এবং হাসিমাখা; তরুণী

কীর্ণাঙ্গী। বয়স সতের কি আঠার—তার বেশী নয়।

লিলি নতমুখে নমস্কার করিল। মেয়েটি তাহার হাত ধরিয়া পাশের ঘরে আনিয়া বসাইল; তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, “দোষ নেবেন না ভাই, জানতে ইচ্ছে হ’চ্ছে—আপনিই কি লিলি গুপ্ত?”

লিলি নতমুখেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। কি ভাবে লিলি এই মেয়েটির সহিত আলাপ আরম্ভ করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। একটু নীরব থাকিয়া সে প্রশ্ন করিল, “পড়বেন কি আপনিই?”—মেয়েটির নাম রাধিকা; সে বলিল, “হাঁ; আমার স্বামী মুখ-হাত ধুয়ে আসছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইবেন। এক্ষণি আসছেন তিনি।”

লিলি আবার একটু থামিয়া বলিল, “আপনার সঙ্গেই কথা কইলে—কি চলবে না?”

রাধিকা লিলির সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া বলিল, “তা’ আপনি যখন গুঁর সামনে বেরুতে চান না, তখন আমিই আপনার হ’য়ে কথা কইব। কি বলেন?”

লিলি ধীরে ধীরে বলিল, “আপনি কি প’ড়বেন? আমি ত খুব বেশী লেখাপড়া জানি-নে, ম্যাট্রিক পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছিলুম।”

রাধিকা সহাস্ত্রে কহিল, “আমি কথামালা পর্য্যন্ত প’ড়েছিলাম; উনি মাষ্টারী ক’রে চরিতাবলীখানা শেষ করিয়েছেন।”

পাশের ঘরে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে উঠিয়া গেল, এবং কিছুকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “গুঁকে সব কথা বলেছি। উনি জানতে চান, মাসে পঞ্চাশ টাকা ক’রে পেলেন আপনার পোষাবে কি?”

লিলি বৃষ্ণিল, তাহাকে বিপন্ন জানিয়া এই দয়ালু দম্পতি তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা অধিক বেতনে তাহাকে কাজে নিযুক্ত করিতে চায়। সে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া চাকরী গ্রহণ করিতে সম্মত হইল।

রাধিকা একটু ভাবিয়া বলিল, “শ্রামবাজারে আপনার বাড়ী না? শ্রামবাজার থেকে বকুলবাগান অনেকটা পথ; আপনি কি ট্রামে আসবেন?”—কথাটা বলিতে সে যে ক্রুদ্ধ হইল, লিলি তাহা স্পষ্ট বৃষ্ণিতে পারিল।

লিলি নয়ন অবনত করিল, এ কথাটা সে পূর্বে ভাবে

নাই। এমন দিন গিয়াছে, যখন সে নিজের 'ড্যামলার কারে' ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে; আর আজ অসংখ্য পুরুষের ভীড় ঠেলিয়া তাহাকে তাহাদের সঙ্গে ট্রামে যাতায়াত করিতে হইবে! তাহার এই বাইশ বৎসরের প্রস্ফুটিত যৌবনের লাষণ্য-বিকশিত দেহ কত কুলোকের আলোচনার বিষয় হইবে। এ কথা ভাবিতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল। পাশের ঘর হইতে গৃহস্বামী তাহাদের আলোচনা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "কেন রাধা, আমাদের 'উইপেট'খানাই তো প্রত্যহ ঔকে আনতে ও রেখে আসতে পারবে। ট্রামে একা যাতায়াত করা ঔর উচিত হবে না।"

রাধিকা উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তা হ'লে কাল থেকেই আসছেন ত? বারোটায় মোটর পাঠাব।"—লিলি তাহার সরলতায় মুগ্ধ হইল; নিরাশার নিবিড় অন্ধকারে সে আলোকের ক্ষীণপ্রভা দেখিতে পাইল।

লিলি বাড়ী ফিরিলে স্কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল—তোমার চাকরীর?"

লিলির নিকট সকল কথা শুনিয়া স্কুমার সন্ধিগ্ন স্বরে কহিল, "বউটির বয়স সতের আঠার'র মধ্যে; তা হ'লে তার স্বামীর বয়স ত্রিশের বেশী না হওয়াই সম্ভব।—কত হবে মনে হ'ল?"

লিলি ক্র কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আমি ত ঔকে দেখিনি। তিনি অন্ম ঘরে ছিলেন কি না।"

স্কুমার অর্ধ স্বগত ভাবে বলিল, "ওই ত্রিশের মধ্যেই, বেশ...মোল কলাই পূর্ণ।...তার বৌটি দেখতে কেমন?—তোমার ছাত্রী গো!"

লিলি ঠোঁঠ উন্টাইয়া কহিল, "খুব কালো।—তা হ'লে ওখানে কি চাকরী করব না?"

স্কুমার জিহ্বা ও তালুর সংযোগে অস্ফুট শব্দ করিয়া বলিল, "আমার এখন যা অবস্থা, তাতে তুমি যে-কোন উপায়ে ছু'পয়সা রোজগার ক'রে আমায় খাওয়ালেই আমি বাঁচি! ভাল-মন্দ বাচ-বিচার ক'রবার আমার আর দরকার নেই। যে তোমায় বেশী টাকায় রাখবে—সে-ই আমার বন্ধু।"

তাহার কদর্য ইঙ্গিত শুনিয়া লিলির সর্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল। সন্ধিগ্নচেতা কটুভাষীর সহিত তর্ক করিতে

তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে উঠিয়া গৃহকর্ষ করিতে চলিল।

৩

দিন সাত-আট পরের কথা।

লিলি রাধাকে পড়াইতেছিল। পড়ায় রাধিকার আদৌ আগ্রহ নাই; সে বই ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমার আর পড়তে ভাল লাগে না দিদি!"

লিলি বলিল, "তবে অঙ্ক নিয়ে বসুন।"

"অঙ্ক আমার মাথায় ঢোকে না। তুমি বরং একটা গান গাও; পরশু যে গান গেয়েছিলে—"

"তার চেয়ে আপনি একটু গান শিখলে হ'ত না?"

"হাঁ, হোত বৈ কি! গাধার মতো গলা নিয়ে এই ভর ছুপুয়ে চেঁচাই, আর ধোপারা দড়ি নিয়ে ছুটে আশুক!"—বলিয়া সে লিলির কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল, এবং বালিকার মত তাহাকে ছু'হাতে জড়াইয়া-ধরিয়া আব্দারের সুরে কহিল, "একটু গল্প কর না ভাই! দেখ দিদি, তুমি যদি আমায় 'আপনি' বলবে, তা হ'লে কিন্তু মজা দেখাব—তা ব'লে দিচ্ছি।—তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ভাই? বাবার নাম কি?"

লিলি অগত্যা গল্পই করিতে লাগিল; বলিল, "আমার বাপের বাড়ী মজিলপুরে। বাবার নাম হরগোবিন্দ সেন। তোমার বাপের বাড়ী কোথায়? এখানে ত বাসা; দেশের বাড়ী কোথায়?"

রাধিকা বলিল, "আমার বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী সবই তোমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের কাছে।—বাপের বাড়ী কল্যাণপুর, শ্বশুরবাড়ী নাজরায়। সেখানে আমাদের এখন আর কেউ নেই।"

নাজরার কথা শুনিয়া লিলি প্রশ্ন করিল, "তোমার শ্বশুরের নাম কি?"

রাধিকা বানান করিয়া বলিল। শুনিয়া লিলি পামাণ হইয়া গেল! এই মনীশই সেই পাত্র—যাহার সহিত লিলির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়! এই দীর্ঘ কালেও লিলি কোন কথাই বিস্মৃত হয় নাই।

"রাধা!"

এই সম্বোধন শুনিয়া লিলি হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

সে মুখ তুলিতেই সন্মুখে দেখিল, রূপবান যুবক, রাধার স্বামী মনীশ ! মনীশের দেহ দীর্ঘ, রূশ চইলেও বলিষ্ঠ,— যেন একগাছি পাকা বাঁশের সুদৃঢ় সুদৃশ্য লাঠি ! তাহার অমল শুভ্র ললাটের উপর স্থানভ্রষ্ট কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ বিশৃঙ্খল ভাবে লুটাইতেছিল ; তাহার নিম্নে চিত্রিতবৎ ক্রতলে উজ্জ্বল শোভন মনোহর চকু দু'টি জল-জল করিতেছিল । ঘন পত্রাবরণের ভিতর হইতে তাহার দীপ্তি কিছু তীব্র বলিয়া লিলির মনে হইল । মনীশের সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া প্রশান্ত মাধুর্য্য যেন হিল্লোলিত হইতেছিল ; ঠিক যেন একটি নবপল্লবিত দেবদারু তরু তাহার সকল সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়া লিলির সন্মুখে সমুপস্থিত !

এই মনীশ ?...এত সুন্দর...এত তরুণ...এত মনোরম ?...

মনীশও চিত্রাঙ্গিতের মত লিলির মুখ-পানে চাহিয়া ছিল । কবির কাছে কল্পনার মত, চিত্রকরের সন্মুখে তাহার আদর্শের মত—নিরাভরণা এই উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী তাহার চিত্তকে তন্দ্রালস করিয়া তুলিল । লিলি রাধাকে সরাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল, এবং সন্ধিৎ পাইয়া মনীশও সেই কক্ষ ত্যাগ করিল । রাধিকা উচ্চ হাসিতে যেন প্রায় ফাটিয়া পড়িয়া সেই সঙ্গেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং পাশের ঘরে গিয়া তাহার স্বামীকে বলিল, “কি গো । ও কি বাঘ না সাপ, পালিয়ে এলে যে বড় ?”

“তুমি ইয়ে,—মানে ছুটু, শোন ।” বলিয়া মনীশ তাহাকে টানিয়া আনিয়া পাশে বসাইল ।

রাধিকা বলিল, “বেশ ত তুমি ! আমি এখানে বসে থাকি, আর দিদি ওখানে একা বসে, থাকুক ! আজ এমন সময়ে এলে যে ?”

“বড় মাথা ধরেছে । আচ্ছা যাও, ঔকে বাড়ী পাঠিয়ে এখানে এসো । আমি শুয়ে থাকছি ।”

রাধিকা ও-ঘরে গিয়া দেখিল, লিলি চাদর গায়ে দিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে । সে রাধিকাকে বলিল, “এখন তা হ'লে আমার ছুটা ত ?”

রাধিকা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল ; ঘাড় হেলাইয়া সন্মতি জানাইল ।

মোটরে উঠিয়া বসিয়া-পড়িয়া লিলি চোখ বুজিল ।

এই বাড়ী-ঘর, এই দাসদাসী, এত ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বোপরি ঐরূপ ভালবাসার আধার স্বামী—সবই ত তাহার হইত ; শুধু সাজান বাগানে ঝোড়ো-হাওয়ার মত স্কুমার আসিয়া সব লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিয়াছে ! যেখানে সে রাণীর আসন পাইত, আজ সেখানে সে দয়ার ভিখারিনী, মাত্র পঞ্চাশটি মুদ্রার পরিচারিকা !...

নিজের নিত্য অভাব, নিত্য অনটনপূর্ণ সংসারের সহিত সে রাধিকার সুঐশ্বর্য্যপূর্ণ সংসারের তুলনা করিল । নিজের সর্ব্বদা-কটুভাষী স্বামীর সহিত রাধিকার স্নেহশীল, পত্নীবৎসল স্বামীর তুলনা—সে ইচ্ছা-পূর্ব্বক না করিলেও তাহার অজ্ঞাতেই মনে উদয় হইল । দীর্ঘনিঃশ্বাস পতনের সঙ্গে তাহার মনে হইল, যে কিছু সুখ-সম্পদ বিধাতা তাহার জন্ম সঞ্চিত রাখিয়াছিল, রাধিকা তাহার সেই অধিকার সমস্তই যেন চুরি করিয়া ভোগ করিতেছে !

লিলি গৃহে প্রবেশ করিতেই ঘরে পানীয় জল না রাখিয়া যাওয়ার অপরাধে স্কুমার তাহাকে গালাগালি আরম্ভ করিল । এ সব লিলির গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু আজ স্কুমার মনের উপর এগুলো অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইল । চকিতের জন্ম তাহার মনশ্চক্কে সন্মুখে ভাসিয়া উঠিল—তাহার জীর্ণ ভগ্ন পিতৃগৃহের একাংশ, মনীশ বিবাহ করিবার আশায় তাহাকে দেখিতে গিয়া যেখানে বসিয়া আগ্রহভরে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল । সে দিনের সেই পুরাতন স্মৃতিটি আজ রূপণের ধনের মত লিলির যেন একান্ত আকাজ্কিত সম্বল হইয়া উঠিল ।

৬

লিলি চলিয়া গেলে রাধিকা ঘরে আসিয়া দেখিল, মনীশ ক্র কুঞ্চিত করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে । বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখিলেই বুঝিত, সে অতীতকে হাতুড়াইয়া কি একটা হারাণ জিনিস খুঁজিতেছে । লিলিকে দেখিয়া অবধি তাহার মনে হইতেছিল, পূর্বে সে ইহাকে কোথাও দেখিয়াছে, কিন্তু কোথায় এবং কি স্ত্রে, তাহা কিছুতেই স্মরণ হইতেছিল না । রাধিকা একটি ছোট কিল উচাইয়া স্বামীর নাকে মৃদু আঘাত করিয়া কহিল, “ইস ! তাবা হ'ছে কি ?”

মনীশ তাহার হাতখানি ধরিয়া কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল, “উনি চ’লে গেছেন?”—রাধিকা “হাঁ” বলিয়া, এ-কথা সে-কথার পর লিলির পরিচয় জানাইল।

মনীশ চমকিয়া উঠিয়া রাধিকার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “হরগোবিন্দ সেনের মেয়ে লিলি?”

রাধিকা একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, “তুমি চেন না কি?”

কোন ঘটনা উপলক্ষে সে লিলির পরিচয় পাইয়াছিল, মনীশ স্ত্রীর নিকট তাহা প্রকাশ করিল না; শুধু চাপা ক্রোভের সহিত কহিল, “উনি বনিয়াদী ধরের বৌ; ও-অঞ্চলে সকলেই তাঁদের চেনে।”

পরদিন লিলি আসিলে রাধিকা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল: বলিল, “তোমার ভগিনীপতি হন উনি, তুমি তাঁর সঙ্গে কথা কবে না কেন শুনি? উনি তোমায় চেনেন ব’ললেন যে!”

লিলির মুখ নিশ্চিন্ত হইয়া গেল; অশ্রুট স্বরে সে কহিল, “কেন তুমি তাঁকে ব’ললে? ছি ছি, ভারী অন্ডায়!”

“অন্ডায় বৈ কি! আমি তাঁকে ধরে আনছি।” বলিয়া রাধিকা ত্বরিত-পদে উঠিয়া গেল।

লিলি আপত্তি করিবার অবকাশ পাইল না; তাহার বুকের রক্ত হিম-শীতল হইয়া উঠিতেছিল! কি করিয়া সে মুখ তুলিয়া মনীশের মুখের পানে চাহিবে?...

চোখের পলক ফেলিবার পূর্বেই অনিচ্ছুক স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে রাধা সেই ঘরে ঢুকিল, এবং লিলির মুখ খুলিয়া দিয়া কহিল, “যদি তুমি কথা না কও, তা হ’লে বুঝব, আমায় তুমি পর ভাবো। ভয়ানক দুঃখ পাবো—তা’ ব’লে রাখছি।”

লিলি তথাপি নতমুখে বসিয়া রহিল।

রাধিকা অস্ত; কিন্তু মনীশ তাহার বিপন্ন অবস্থার কারণ উপলব্ধি করিয়া দয়াদ্রকণ্ঠে কহিল, “আমি আপনাকে এ-ভাবে কষ্ট দিতে চাই না; কিন্তু রাধাকে দেখছেন ত? বি-চাকরের সামনে টানাটানি করতে লাগল ব’লে দায়ে প’ড়ে আসতে হ’ল। ছি: রাধা! কেন তাঁকে এমন ক’রে কষ্ট দিচ্ছ? বড় বিরক্ত করছো তাঁকে!”

স্বার ত নীরব স্বাক্ষর চলে না; কাজেই লিলি মৃদু

স্বরে কহিল, “না, না, বিরক্ত কি? আপনি বসুন।” তাহার ব্যবহারে আড়ষ্ট ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া মনীশ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাই তাহার কুণ্ডা দূর করিবার অভিপ্রায়ে হাসিমুখে কহিল, “আপনি যদি কষ্ট না পান, তা হ’লে আমার দিক থেকে তাঁ বোল আনাই লাভ! রাধার দিদি নেই, আমি তাই এ যত্নে বঞ্চিত ছিলাম, সে আক্ষেপ দূরে গেল।”

লিলি স্নান হাসিয়া কহিল, “এ অভাগিনীকে আপনারা দু’জনেই যে আত্মীয়া ব’লে স্বীকার করতে চাইছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।”

মনীশ কাতর নেত্রে লিলির দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল বহু পুরাতন স্মৃতি,—যে দিন সে প্রথম যৌবনে মুগ্ধ নেত্রে লিলিকে দেখিয়াছিল, তাহাকে লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়া বিবাহ করিতে বাস্তু হইয়াছিল।

৭

পাঁচ-ছয় মাস পরের কথা।

পূজার উপহারের জন্ত মনীশ অলঙ্কারের ক্যাটালগ দেখিয়া রাধিকার গহনা গড়িতে দিবার প্রস্তাব করিতেছিল। উভয়ে মিলিয়া প্যাটার্ণ পছন্দ করিতে লাগিল। পছন্দ হইলে রাধিকা সঙ্কুচিত ভাবে স্বামীকে বলিল, “একটা কথা বলব?”

মনীশ স্নেহে তাহার মুখখানি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া কহিল, “এত সঙ্কোচ কেন রাধা, বল না।”

রাধা বাধ-বাধ স্বরে বলিল, “দিদির হাতে শুধু দু’-গাছা ক’রে কাচের চুড়ী আছে। এক জোড়া রুলী গড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।”

মনীশ কহিল, “রুলী কেন? চুড়ী, হার,—যা তোমার ইচ্ছে হয় দাও না রাধু! আমি কি তোমায় বারণ করেছি? কিন্তু তুমি দিলেও উনি তা নেবেন কি?”

রাধিকা একমুখ হাসিয়া বলিল, “আমার সঙ্গে ও পারে? আমি ঠিক পরিয়ে দেব দেখো!”

লিলির নিরাভরণ অঙ্গ মণি-মুক্তার অলঙ্কারে সাজাইতে মনীশের অন্তর অমুগ্ধ ব্যাকুল হইত; তথাপি বর্তমানে উহা উচ্চারণ করা পর্য্যন্ত অসম্ভব বলিয়া সে গোপনে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “মেয়েদের গহনা

মেয়েরাই বোঝে ভাল ; আমার মতের অপেক্ষা না রেখে ভূমি যা ইচ্ছা দাও । কি দেবে শুনি ?”

রাধিকা উৎসাহ পাইয়া বলিল, “এক জোড়া চুড়ী আর একটা সুরু হার,—কেমন ?”

মনীশ ঔদাসীত্বের সহিত কহিল, “বেশ ত ।”—কিন্তু মনে হইল, রাধিকা এতটুকু দিয়াই সন্তুষ্ট হইল কেন ? তাহার পর অলঙ্কার গড়িয়া আসিলে রাধিকা এক দিন লিলিকে দেখাইয়া বলিল, “পরিয়ে দাও দিদি !”

লিলি পরাইয়া দিয়া তাহাকে সর্কাস্ত্রকরণে আশীর্বাদ করিল, “চিরসুখী হও বোন !”

এবার রাধিকা বস্ত্রাঞ্চল খুলিয়া একটা মোড়ক বাহির করিয়া লিলির একপানা হাত ধরিতেই সে সবিস্ময়ে কহিল, “ও কি ! চুড়ী কার ?”

“তোমার । এক সন্নে ছ’ বোনে গয়না পরব ব’লে গড়িয়েছি ভাই—”

লিলির মুখ এ-কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিল ; ধীর স্বরে সে কহিল, “পাশের মোড়াটার কি ?”

তাহার মুখভাব দেখিয়া রাধিকা ভডকাইয়া গেল ; কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, “এক ছড়া হার ।”

“ও-সব তুলে রেখে এস ।”

“কেন দিদি ?”—তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ ।

“আমি পরব না ।”

“আমি যে তোমার জন্ত বড় পছন্দ ক’রে গড়িয়েছি ভাই !”—রাধিকা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল । তাহার কণ্ঠস্বর বেদনাপূর্ণ ।

“অন্ডায় করেছ ; আমায় আগে জানালে আমি তোমায় নিবেদন করতুম ।”

গৃহে ফিরিয়া মনীশ সকল কথা শুনিল । কেন যে লিলি বেতন ব্যতীত তাহাদের দেওয়া সামান্য বস্তুটুকুও লয় না, মনীশ তাহা ভাল করিয়াই বুঝিত ; যেখানে লিলি সংসারের অধীশ্বরী হইত, সেখানে আজ সে দয়ার দান লইবে,—এবং তাহাও আবার রাধিকার হাত দিয়া ? ...রাধিকা তাহার যাহা হরণ করিয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে কি ওই ছই-একখানা তুচ্ছ গহনায় ?...

মনীশ গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, “বিশ্বনিয়ন্তা ! যাহা হুপ্রাপ্য, যাহা আশাতীত, তাহাতেই

মানুষের আকাঙ্ক্ষা দাও কেন ? এ কি তোমার নিষ্ঠুর অমোঘ বিধান প্রভু ?...”

সে ভাবিল, লিলি তাহার অনায়াসলভ্য ছিল, তবু সে রিধাতার কোন্ নিষ্ঠুর বিধানে তাহার সান্নিধ্য হইতে অন্তর্হিত হইল ? কিন্তু সে ক্ষতি মনীশ ভোলে নাই, শুধু চাপা পড়িয়াছিল ; আর সেই লিলিই সর্বস্ব হারাইয়া এক দিন নিয়তি-পরিচালিত হইয়া ভিকার বুলি লইয়া তাহারই দুয়ারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইল ! আজ সমাজ-সংস্কার, লোক-লজ্জা, সমস্ত বাধা ডিঙাইয়া লিলিকে আপনার করিয়া লইবার জন্ত তাহার শাস্ত্র শোণিত-কেশে অকস্মাৎ এ কি মরণোন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে ? ...মনীশ অসীম বেদনার সহিত ভাবিত, তাহার এই বিপুল সম্পদ যদি পূর্বে থাকিত, তবে কি সে লিলিকে হারাইত ?...চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী সেই ত তাহার কাছে ধরা দিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে পাওয়ার অর্ধেক আনন্দ যেন লিলির অভাবে অপূর্ণ !

দ্বিতীয় দিনে লিলি আসিলে মনীশ ক্ষুব্ধ অভিমানের সহিত কহিল, “কাল আপনি আমাদের ছ’জনকেই বড় ব্যথা দিয়েছেন লীলা দেবী ।...আমরা কি আপনার এতই পর ? কোন স্নেহের দাবী কি আমরা করতে পারি না ?”

গলার স্বরটা যে ঠিক অনুযোগের নয়, তার চেয়েও যেন কিছু বেশী—এই রকমই লিলির মনে হইল ; কিন্তু সে সংযত হইয়া মুখ তুলিয়া কহিল, “মনীশ বাবু, আপনারা ব্যথিত হবেন জানি আমি ; কিন্তু একটু ভেবে দেখলে আপনারা আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন ।”—বলিয়া একটু মৌন থাকিয়া সে কহিল, “এক সময় আমারও স্মৃতি ছিল : অনেক বহুমূল্য গহনা আমি প’রেছি । আজ আমার সব গেছে—আত্মসম্মানটুকু ছাড়া । আপনারা দেওয়া গহনা প’রে আমার স্বামীর সামনে কি ক’রে দাঁড়াতে পারি বলুন ত ?”—মনীশের মুখের পানে চাহিয়া লিলি ধামিয়া গেল ; রাধিকার অপেক্ষাও তাহার মুখ অধিক ব্যথিত, বেদনাক্লিষ্ট ।

সেই বেদনাতুর মুখখানি লিলির হৃদয়ের মাঝে দিন দিন অক্ষুণ্ণ পীড়া দিতে লাগিল । তবু লিলি এই একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিল যে, সে মনীশের দান গ্রহণের

অদম্য লোভকেও দমন করিয়াছে। মনীশের দেওয়া তুচ্ছ উপহারও তাহার পক্ষে অমূল্য বস্তু, তাহাও সে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে !

৮

আরও কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছিল।

মনীশের অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছিল। সে ব্যবসায়ী মানুষ; তার নিজের বেশ বড় আফিস ছিল, পূর্বে সে এগারটা—পাঁচটা আফিস করিত, কিন্তু সম্প্রতি সে ইচ্ছানুরূপ আফিসে যাতায়াত করিতে লাগিল; অর্ধেক দিন আফিস কামাই করিত। কিন্তু তাহার এই অমনোযোগের ফলে প্রচুর ক্ষতি হইতে লাগিল; কর্মচারীর বাতিবাস্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু মনীশ তাহাতে দৃকপাত করিল না। বাড়ীতেও মহা অশান্তি চলিতে লাগিল; মনীশ সর্বদা বিরক্ত, সর্বদা অগমনক্ষ, সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া রাধিকার সহিত কলহ করিত, তাহাকে তিরস্কারও করিত; কোন কোন দিন অনাহারেই আফিসে বাহির হইত।

ব্যাপার দেখিয়া লিলি উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার কারণানুসন্ধান করা তাহার সর্বাগ্রে উচিত, সে কিছুই করিল না; শুধু অকারণে লাঞ্চিত হইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

এক দিন লিলি আসিয়া দেখিল, রাধিকা অত্যন্ত শুষ্কমুখে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। লিলি তাহার পাশে বসিয়া সম্মেহে কহিল, “কি হয়েছে রাধা?”

রাধিকা অঞ্চলে সিক্ত চক্ষু মুছিয়া কহিল, “আজ ভাই মিছামিছি রাগ ক’রে, না খেয়ে আফিসে চলে গেল।”—একটু নীরব থাকিয়া কহিল, “পুরুষ জাতটা বড়ই নির্দয়, নয় দিদি!”

লিলি তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, “ঠিক বলেছিস রাধা! আমায় যদি কেউ পুরুষ-চরিত বর্ণনা করতে ব’লে, তা হ’লে আমি বলি, এরা সত্যিই আগুন! দূর থেকে বড় সুন্দর, দেখলে বুক ক’রে রাখতেই ইচ্ছে করে। একটু কাছে যাও, তার অন্ন তাতটাও গিলি লাগবে; কিন্তু আরও কাছে পাবার লোভে যদি বুক নিয়েছ—অমনি মরেছ! দয়া-ধর্ম এরা জানে না, পুড়িয়ে

ছাই ক’রে দেবে, তার পর আর ফিরেও চাবে না! তবু এ অভাগা জাতকে বুক ক’রাই যে নারীর স্বভাব!”

মনীশ আসিয়া সহাস্তে ঘরের কাছে দাঁড়াইল। সে এইমাত্র আসিয়াছে—এখনও কাপড় ছাড়ে নাই।

লিলি আবার বলিল, “কিন্তু ওদের নইলেও খেয়ে চলে না। সংসারের প্রত্যেক পদেই যে ওদের চাই! জানি পুড়ে মরব, তবু ত দূরে রাখা যায় না! কিন্তু প্রদীপ ও পতঙ্গের উপমা ত চিরদিন অমর হ’য়ে আছে!”

সহসা রাধিকার স্নান মুখের দিকে চাহিয়া মনীশ কহিল, “তুমি এখনও খাওনি রাধা? যাও, খেয়ে এস—” রাধা কহিল, “তুমি?”

“আমি খেয়েছি। সত্যি বলছি। যাও, আর দেবী কোর না, বেলা প’ড়ে এলো।”

রাধিকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া গেল।

খোলা জানালা দিয়া রৌদ্রদীপ্ত আকাশের পানে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া মনীশ বলিল, “আমি শুনেছি সব। পুরুষের সম্বন্ধে আপনি যা বললেন, এ কি আপনার মনের কথা? আপনি কি নিজে এ ভাবে পুড়েছেন?”

তাহার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, তাহাতে লিলি চমকিয়া মুখ তুলিয়া মনীশের মুখের দিকে চাহিল, কি দেখিল সেই জানে; কিন্তু সে সসঙ্কোচে দৃষ্টি নত করিল।

মনীশ ক্ষণকাল বোধ হয় উত্তরেরই প্রত্যাশা করিল; তাহার পর কহিল, “কিন্তু প্রদীপ ও পতঙ্গের উপমা যে প্রত্যক্ষ সত্য, তা ত আমি নিজেকে দিয়েই স্পষ্ট দেখছি। প্রদীপ ত বেশ নির্ঝাঁত-নিষ্কম্প আছে, কিন্তু পতঙ্গ যে অনেক কাল আগেই দগ্ধ হ’য়ে গেছে!”

লিলির সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল; আবেগরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, “এ কি বলছেন আপনি?”

অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে মনীশ কহিল, “আমায় বাধা দেবেন না। এক বার পর-জীলুক নির্লজ্জ হ’য়ে আমার মনের আগুন ব্যক্ত করতে দিন?...ঈশ্বরের নির্ভর পাশা-খেলার দানে আজ আপনি পরজী; কিন্তু এক দিন আমারই কাছে আসবার জন্য আপনি দু’হাত বাড়িয়েছিলেন, এবং আমিও প্রাণের সমস্ত আগ্রহ, একাগ্রতা তেলে-দিয়েই আপনাকে বরণ করতে চেয়েছিলুম,—মাঝ থেকে কেন

যে সব ওলট-পালট হ'য়ে গেল, তা আপনার জানা থাকতে পারে।”

নিশ্চয় কক্ষের মাঝে তাহার ব্যথিত করণ সুর কাঁপিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। একটু নীরব থাকিয়া সে পুনরায় ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, “সে দিন আপনার রূপটাকেই ভালবেসেছিলুম, আপনাকে নয়; কিন্তু নিয়তির কঠোর ইচ্ছিতে আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'ল। এবার রূপ নয়, আপনার আত্যন্তরীণ স্বর্গীয় পদার্থ কোম্বভের মতো মন আমায় মুগ্ধ—অভিভূত ক'রলে!”

“মনীশবাবু, মনীশবাবু!...”

“এখন শুধু জানতে চাই, আমার এ মৌন অর্ঘ্য আপনার কাছ-পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না? আমার এ নিঃশব্দ নিবেদন আপনার অন্তর স্পর্শ ক'রেছে কি না?”

মুহূর্তের জন্ত লিলির নিকট খতীত ভবিষ্যৎ মুছিয়া গেল; সারা বিশ্ব হরিৎ হইয়া উঠিল,—দুই কর্ণবিবর ভরিয়া স্বর্গীয় স্বাক্ষর বহিল। কিন্তু সে নিমিষের জন্ত; পরক্ষণেই লিলি আত্মস্থা হইয়া কহিল, “এ-কথা আপনার আমাকে বলা উচিত নয়, এবং তার উত্তর যাই হোক, আমি দেব না।...কিন্তু এর পর আমার আর এ-বাড়ীতে আসাও অসুচিত। কাল থেকে আমি আর আসব না।”

মুহূর্তের মধ্যেই মনীশ সজাগ হইয়া যুক্তকরে কহিল “আমার দুঃসাহস ক্ষমা করুন। আমার ওপর দয়া ক'রে এই অপ্রিয় ঘটনাটা বিস্মৃত হ'ন।...রাধাকে কি বলব আমি?”

লিলি বলিল, “রাধাকে ব্যথিত করবেন না, সে অত্যন্ত সরলা,—” বলিয়া সে দাতে ঠোট কাঁপিয়া বলিল, “বলবেন, হাঁ বলবেন—তার অনুপস্থিতিতে আমি আপনাকে প্রলুব্ধ করেছিলুম।”

উল্টা! মনীশ কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

লিলি চাদরটা গায়ে জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; ছয়রের বাহিরে আসিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া স্তব্ধ নির্বাক মনীশের দিকে তাহার তৃষিত চক্ষু'টি নিবদ্ধ করিল, তাহার পরই নিঃশব্দে নামিয়া গেল।

৯

চার বৎসর পরের কথা।

মনীশ আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিল, সহসা টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই রিসিভারটা তুলিয়া

লইয়া শুনিল, মাড়োয়ারী হস্পিট্যাল হইতে তাহাকে ডাকিতেছে। লিলি নামী কোন রোগিনী তাহার সহিত অন্তিম-সাক্ষাৎ করিতে চায়—শুনিয়া মনীশ স্তব্ধ হইয়া গেল। এত দিন পরে পায়ালী তাহাকে ডাকিল কি না অন্তিমকালে!

পরক্ষণেই সে মাড়োয়ারী হস্পিট্যালে যাত্রা করিল। সমস্ত পথ সে শুধু ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিল, যেন শেষ দেখা হয়।

সেখানে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিল, পাঁচ দিন পূর্বে কে বা কাহারো অনাথা বলিয়া উহাকে হাসপাতালে রাখিয়া গিয়াছে।

মনীশ ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, “আর কি বাঁচান যায় না উহাকে?” অত্যন্ত ব্যাকুল স্বর!

বন্ধুহানীয় অধ্যক্ষ অপাঙ্গে তাহার দিকে চাহিয়া, একটু হাসিয়া কহিলেন, “আপনি যে বড় কাতর হ'লেন দেখছি! উনি কে? প্রথম যৌবনের কোন কিছু—”

মনীশ সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিল, “বাঁচান যায় না? কি রোগ—”

অধ্যক্ষ বলিলেন, “রোগ কিছুই নয়; অনাহারে পাকস্থলী শুকিয়ে গেছে। সন্ধ্যা কাটবে না।”

মনীশ ভূতাবিষ্টের মত আড়ষ্ট ভাবে রোগীর কক্ষে চলিল।

পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই সে চমকিয়া উঠিল,—এই কি সেই রূপের ডালি লিলি?...এ যে জরাজীর্ণ কঙ্কালমাত্র!...অনাহারে লিলি এমন হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে?.....

আপনাকে কথঞ্চিৎ সম্বত করিয়া মনীশ লিলির শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, “লিলি!”—

লিলি স্তিমিত দৃষ্টি মেলিল; নিজ্জীবিতায় তাহার চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে! মনীশের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিবার পর সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, “তুমি এসেছ!”—তাচার শীর্ণ কপোল বাহিয়া অক্ষর ধারা নামিল।

“লিলি, লিলি,—এ কি করলে তুমি।” মনীশ লিলির

শীর্ণ হাতখানা চোখের উপর চাপিয়া ধরিতেই তাহা রুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল।

বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া যাইবার পর মনীশ প্রশ্ন করিল,
“তোমার স্বামী—তঁার বাড়ী—”

লিলি মৃদুকণ্ঠে খামিয়া খামিয়া যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই,—মনীশের বাড়ীর চাকরী যাওয়ার সংবাদ শুনিয়াই স্বকুমার হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিতে যায়, এবং তাহাতে তাহার মাথার শিরা ছিড়িয়া মৃত্যু হয়। বাড়ীখানা স্বকুমারের জৈনিক ‘স্বচ্ছন্দ’ জাল দলিলের সাহায্যে গ্রাস করে। নিরাশয় হইয়া লিলি পিত্রালয়ে গেল। পিতা পূর্বেই স্বর্গে গিয়াছিলেন; বিধবা মাতা নিজের ও কন্টার গ্রাসাচ্ছাদনের যোগ্য অর্থের অভাবে মনের কষ্টে জলে ডুবিয়া চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাভ করেন।

এত দূর শুনিয়া মনীশ কাতর কণ্ঠে কহিল, “তখনও আমায় জানালে না কেন?—তার পর?”

লিলি আড়ষ্ট স্বরে কহিল, “এক গৃহস্থের বাড়ী চাকরাণী-গিরি চাকরী নিয়েছিলুম; তবে একটু উঁচুদের ঝি-গিরি।” বলিয়া সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর বলিল, “যত দিন খাটতে পেরেছি, তত দিন সেখানেই

ছিলুম, অক্ষম দেখে শেবে তারা এখানে ফেলে দিবে গেছে। চার বছর আমি পেট ভরে খাইনি মনীশ!”—

বলিয়া সে মনীশের বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিল।

মনীশ কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে কহিল, “এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে আজ শেষমুহুর্ত্তে আমায় ডেকে—”

অশ্রুসজল চক্ষে মনীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের কথা শেন হইল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া চলিল। অকস্মাৎ নীরবতা ভাঙিয়া লিলি বলিল, “একটু জল দাও, ওঃ, বড় কষ্ট!” সে মনীশের হাতখানা প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিল।

মনীশ তাড়াহাড়ি একটু জল দিয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, “লিলি, লিলি!”.....

বার-কয়েক লিলির বিবর্ণ ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, জাঁখিপল্লব দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল; তাহার পরই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে শান্ত হইয়া গেল।

ধরিত্রীর বুকে তখন শীতের সঙ্ক্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সেই সান্ধ্য অন্ধকার মনীশের চক্ষুতে তামসী নিশীথিনীর সূচিভেদ্য অন্ধকার অপেক্ষাও নিবিড়,—অসীম বলিয়াই প্রতিভাত হইল।

শ্রীমায়াদেবী বসু।

কুফল

স্রষ্টা-মানব, শিল্পী ও কৃতি, আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক,

সুফল ফলিতে তারা দিল যত কুফল ফলিল তার অধিক!

ছিল না জীবনে এতো আড়ম্বর,

এতো ঘনীভূত বলাইয়ের স্তর,

সৃষ্টির নব সম্ভারে বৃথা বেড়ে গেল প্রয়োজন,

বাঁচা মরা সে তো পড়ে আছে আজো তবু শত বন্ধন!

জ্ঞান লভি' লভি' সভ্য জগৎ হয়ে গেল জ্ঞানহারা,

বাণীর প্রসাদে বীণা হ'ল খর, বহে অশান্তি-ধারা!

কে চেয়েছে স্মৃতে মেঘ-জাল বোনা—

আকাশের বুকে করি আনাগোনা,

আজ হানা দিতে কে করিবে মানা, কুফল ফলিল যত!

বৃথা প্রয়োজনে আহ্বান করি আপদ বেড়েছে শত!

খলের কবলে সূখা হ'লো বিষ নিশ্বাস বিষময়,

গরল উগারি অমৃতে মিশায়ৈ দিল শুধু পরিচয়

সভ্যতা নামে সবটুকু ছল,

ক্ষতির অঙ্ক বাড়িছে কেবল,

লাভ বোল আনা ছিল' এর চেয়ে সনাতনী ফিরে পাওয়া!

বহু জীবন সেও ছিল ভালো প্রকৃতির সাথে ধাওয়া!

শ্রীকমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ, বি-কম)।



ওলন্দাজ উপনিবেশের শিল্প-বাণিজ্য

যুরোপের যুদ্ধ আর এখন যুরোপের সীমায় আবদ্ধ নাই; ইহা আফ্রিকা মহাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে, এবং সম্প্রতি ত্রিশক্ৰি-চুক্তির পর স্বল্প প্রাচীণ এই মহাযুদ্ধে বিজড়িত হইবার সম্ভাবনা দেখা বাইতেছে। জাপান পূর্ব-এসিয়ায় যে New order-এর প্রতিষ্ঠার সংকল্প অবিরত কোদণ্ড-টঙ্কাবে জগতে বিঘোষিত করিতেছে, তাহাতে বৃটেন ও আমেরিকাকে শঙ্কায়িত হইতে হইয়াছে। প্রাচ্য ইহাদিগের উপনিবেশ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট স্বার্থ বিপুল। কিন্তু এই দুইটি খেতজাতি ব্যতীত অল্প দুইটি খেতজাতির স্বার্থও পূর্ব-এসিয়ার সামান্য নহে,—তাহারা হইতেছে ফরাসী ও ওলন্দাজ। ভাগ্যবিড়ম্বনাবশতঃ তাহারা জাপানের উদ্বেগ প্রতিরোধ করিবার কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে না পারিলেও একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। চীনের উপর আক্রমণ আরও তীব্রতর ভাবে চালাইতে পারিবে বলিয়া জাপান ইতিমধ্যেই ফরাসী ইন্দোচীনে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অবস্থাভিজ্ঞ অনেক লোক মনে করেন যে, ইহা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও জাপানের এইরূপ অগ্রগতির মূল প্রেরণা হইতেছে—তাহার বহুকাল-পোষিত দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণেরই অভিলাষ। ইন্দোচীন ও শ্বামের ভিতর দিয়া জাপান যদি সমুদ্রতীরে উপনীত হইতে পারে, তাহা হইলে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, হল্যান্ড—সকলেরই উপনিবেশ সমূহ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। মোটের উপর তুচ্ছনা করিলে দেখা যায়, এই সকল উপনিবেশের মধ্যে হল্যান্ডের উপনিবেশের গুরুত্বই অধিক। সেই জন্ত ডাচ, ইষ্ট ইণ্ডিজ, বা পূর্ব-এসিয়ার অবস্থিত ওলন্দাজ উপনিবেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে প্রকাশিত হইল।

মালয়-দ্বীপপুঞ্জ

মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণস্থিত মালয়-দ্বীপপুঞ্জই পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ দ্বীপ-সমাবেশ। এই দ্বীপপুঞ্জে বহুসংখ্যক বৃহৎ দ্বীপ আছে। প্রাচীন কালে এই অঞ্চল মহাচীনের প্রভাবাধীন ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ নাবিক ম্যাগেলানের ভূপরিভ্রমণের কিছু কাল পর হইতেই এই সকল উর্বর ও রমণীয় দ্বীপে যুরোপীয় জাতি সমূহের দৃষ্টি নিপতিত হয়, এবং দ্বীপগুলি অধিকারের জন্ত তাহারা পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করে; তাহার ফলে অতীতে একাধিকবার যুদ্ধবিগ্রহও হইয়া গিয়াছে। বর্তমান সময় মালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট (প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশ-দ্বারে অবস্থিত) দ্বীপ সমূহে তিনটি খেতাজ জাতি প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে—বৃটিশ, আমেরিকান ও ডাচ। শ্বাম রাজ্যের দক্ষিণস্থ মালয় উপদ্বীপের অধিকাংশ (স্ট্রেট সেটলমেন্টস,

ফেডারেটেড ও গণ-ফেডারেটেড, মালয় স্টেটস) এবং বোর্নিও ও নিউগিনির কতকাংশ বৃটিশ শাসনাধীন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত। অনেকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ ব্যতীত ষব দ্বীপ, সিলিবিস্, সুমাত্রা এবং বোর্নিও ও নিউগিনির কিয়দংশ লইয়া ডাচ, ইষ্ট ইণ্ডিজ, নামক ওলন্দাজ উপনিবেশ সংগঠিত।

ওলন্দাজগণের অধিকারভুক্ত দ্বীপ সমূহের মধ্যে কতকগুলি নগণ্য হইলেও অল্প কয়েকটির প্রাকৃতিক সম্পদ অতুলনীয়। বিশেষতঃ, গত দুই শতাব্দীব্যাপী অক্লান্ত বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টায় ওলন্দাজগণ ইহাদিগকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। খনিজ, প্রাণিজ, ও উদ্ভিজ্জ—সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদনেই ইহারা এত দূর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে যে, আধুনিক জগতে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজ, একটি প্রধান প্রাচ্য বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। খনিজ তৈল, পাম তৈল (নারিকেল তৈলজাতীয়), রবার, কুইনাইন, শর্করা প্রভৃতির জন্ত অনেক জাতিই আজ হল্যান্ডের মুখ-পেক্ষী। বস্তুতঃ, এই প্রাচ্য রাজ্যখণ্ডের জন্তই হল্যান্ড জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি-সমূহের অন্তর্ভূত। সাময়িক ব্যতীত ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যে কত অধিক, তাহা উক্ত উপনিবেশ সমূহে নিম্নপ্রদত্ত স্থূল পরিচয় হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। ওলন্দাজাধিকৃত দ্বীপগুলির মোট আয়তন প্রায় ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার বর্গ-মাইল; এবং জনসংখ্যা ৬ কোটি ৭ লক্ষেরও অধিক।

ষব দ্বীপ

অক্লান্ত ওলন্দাজ দ্বীপ-অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও ষবদ্বীপের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য অনেক অধিক। কারণ, পূর্ব-এসিয়ার ওলন্দাজ রাজ্যের অধিবাসিগণের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক ষব দ্বীপে বাস করে। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ষব দ্বীপে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন বর্তমান। অধিবাসিগণ নিরীহপ্রকৃতি; অধিকাংশ লোক গ্রামেই বাস করে। যাতায়াতের জন্ত ডাচ সরকার-নির্মিত রেল ও ট্রাম-পথই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। নদীর কর্দমাক্ত তীর ও প্রচণ্ড শ্রোত নদীপথে ভ্রমণের প্রধান অন্তরায়।

আগ্নেয়গিরি-উৎকৃষ্ট লাভা-প্রবাহসম্মত ষব দ্বীপের মাটি অত্যন্ত উর্বর। সেই জন্ত এই দেশে এক দিকে স্বভাবজ তরুলতাদির পুষ্টি যেমন সতেজ ও ক্ষুদ্র, কর্ষিত-কালের উৎপাদনের হারও সেইরূপ অধিক। বহু উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট বাঁশ, সেগুন, পাইন,

আবলুস, অণ্ডক প্রভৃতি নানাবিধ শস্যকর বৃক্ষ বর্তমান। ওলন্দাজ সরকারের প্রচেষ্টায় অনেক নতন ফসলও সাফল্যের সহিত উৎপাদিত হইতেছে; তন্মধ্যে সিকোনা সর্বাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় সমকালেই ভারতে ও যবদ্বীপে সিকোনার চাষ আরম্ভ হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্বাচন, প্রজনন ও পালন করিয়া চাষে এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, যব দ্বীপ এখন কুইনাইন উৎপাদনে সমগ্র জগতের বাজারে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কুইনাইন প্রস্তুতের প্রধান কারখানা ব্যাণ্ডোয়েঙ্কে অবস্থিত। নিরাট বাগিচা সমূহে ইক্ষু, চা, কফি, রবার, কোকো, কোকা-নারিকেল প্রভৃতিও বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। মশলা ও গন্ধতৈলও এই দ্বীপের বহির্বিপণিত্বের অঙ্গতম পণ্য।

ডাচ বৈজ্ঞানিকগণ অল্প দেশ হইতে আনীত ফসলকে যব দ্বীপের জলবায়ু ও মৃত্তিকাসহ করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে গীদে অঞ্চলে একটি সুবিস্তৃত-পরীক্ষা-ক্ষেত্র ও পালনাগার স্থাপিত হইয়াছে। বুইটেন বর্গের প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক উচ্চান হইতেও এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়।

যব দ্বীপে দুই শতাব্দিক জাতীয় পক্ষী দেখা যায়। বনে-জঙ্গলে বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, হরিণ, শূকর প্রভৃতির অভাব নাই। এখানকার বাঘ নরভুক নহে; নদীতে ও উপকূলস্থ সমুদ্রে যথাক্রমে কুম্ভীর ও এক জাতীয় তিমি পাওয়া যায়। বিবধর ও অজ্ঞাত জাতীয় সর্পও প্রচুর। যব দ্বীপবাসীরা সর্প-ভক্ষণে অভ্যস্ত। সর্প ও অজ্ঞাত সর্পস্বপের বিচিত্র বর্ণের চর্ম আধুনিক সময়ে নানা দেশে রপ্তানি হইতেছে। শুটকি মাছ ও সামুদ্রিক শামুক (জিপ্যাং) নিকটবর্তী দেশ সমূহে চালান যায়। জাস্তব তৈল ও চর্কির ব্যবসায়ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যব দ্বীপের 'বাটিক' নামক বহু বর্ণে শোভিত মনোমুগ্ধকর বস্ত্র উক্ত দেশের অস্বচ্ছাত চাকশিল্পের নিদর্শন। 'ক্রিশ' (কিরিচ) নামে অভিহিত নক্সা-করা মালয় তরবারিও অনেক বৈদেশিক পর্যটকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে।

সুমাত্রা ও বোর্নিও

সুমাত্রা দ্বীপ মালয় উপদ্বীপ ও যব দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার বর্গফল ১৬৫০০০ মাইল। জনসংখ্যা ৭০ লক্ষের উপর; অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্য; সুদূর মধ্যভাগে দুই-একটি নরভুক জাতি বাস করে। নদী সমূহের কিয়দংশ জলবান চলা-চলের যোগ্য। উদ্ভিদসমষ্টি যব দ্বীপ অপেক্ষাও বিশাল ও বিচিত্র-তর। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পুষ্পপ্রসবী গাছ—*Rafflesia arnoldii* এই দেশেই দৃষ্ট হয়। এই বিরাট ফুলের ব্যাস ২ হইতে ২।০ হাত। দ্বীপে বহুবিধ প্রাণীও আছে; তাহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে বনমাহুঘ বা ওরাং-ওটাং; সুমাত্রা ও বোর্নিও দ্বীপের গভীর অরণ্যমধ্যেই ইহার বাস করে। শিকারীর উপদ্রবে ইহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

চন্দন, আবলুস, গুপারি, নারিকেল, খদির (চাকা), পিপুল, রজন-উৎপাদক দাসার ও লবান প্রভৃতি গাছ স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে এই দ্বীপে চা, রবার, এলাচি প্রভৃতির

বাগিচা বহু সংখ্যায় স্থাপিত হইয়াছে, এবং দ্বীপে জনবসতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বোর্নিও বৃহৎ দ্বীপ; ইহার বর্গফল ২৯০,০০০ মাইল। বৃটিশ অধিকৃত অংশ উত্তর দিকে অবস্থিত। উহা সমস্ত দ্বীপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ; অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ওলন্দাজ শাসনাধীন; এই অংশের জনসংখ্যা ২১ লক্ষ ৯৪ হাজার। জনসমষ্টি দায়াক, মালয়, নেগ্রিটো, বুগি ও চীনা জাতিসমূহ দ্বারা গঠিত। দায়াকরা পূর্বে অতীব ভীষণপ্রকৃতি ছিল; এখন অনেকটা শাস্তস্বভাব হইয়াছে। সমুদ্রতীরবাসী দায়াকগণ মৎস্ত শিকারে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। সাম্পিটান নামক ৮ ফুট দীর্ঘ ফুকনল (Blow pipe) শিকারের প্রধান যন্ত্র। ইহা দ্বারা ২৫ ফুট দূর পর্যন্ত বেগে তীর নিক্ষেপ করিয়া মৎস্ত বিদ্ধ করা যায়। জলে কামমারী ফল ফেলিয়া মৎস্তকে অজ্ঞান করিতেও দেখা যায়। বড় বড় খুঁটির উপর দায়াকরা গৃহ নির্মাণ করে। তর্গম অঞ্চলে ইহার বড় বড় গাছ কাটিয়া ও তৎসমুদয় মাটির উপর পাশাপাশি শায়িত করিয়া রাস্তা তৈয়ারী করে।

দ্বীপের অভ্যন্তরে নিবিড় অরণ্যরাজি বিবাজিত। অস্বচ্ছাত উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে আবলুস, চন্দন, কপূর, দারুচিনি ও নানাবিধ রজন-উৎপাদক বৃক্ষাদিই প্রধান। বোর্নিও ও সুমাত্রার যে তরু হইতে কপূর পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ কপূরতরু *Cinnamomum Camphora* হইতে স্বতন্ত্র। ইহার নাম *Dryobalanops aromatica* এবং ইহা প্রধানতঃ উত্তর বোর্নিও, উত্তর-পশ্চিম সুমাত্রা ও লাবুয়ান নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই স্বভাবজ কপূর বৃক্ষকাণ্ডের ভিতর কঠিন অবস্থায় জন্মিয়া থাকিতে দেখা যায়। এক প্রকার কীট গর্ত করিয়া কাণ্ডের ভিতর বায়ু-প্রবেশের পথ করিয়া দেয়; তাহাতেই কপূর জমাট বাঁধে। যে সকল গাছ উক্ত প্রকার কীটাক্রান্ত না হয়, সে সকল গাছে কপূর তরল অবস্থাতেই (Camphor oil) থাকিয়া যায়। এই কপূরের নাম *Borneo Camphor*;—ভারতের বাজারে ইহা 'ভীমসেনী কপূর' নামে পরিচিত।

প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ্জ সম্পদ অপেক্ষা বোর্নিওস্থ খনিজ সম্পদই অধিকতর মূল্যবান। এখানকার বহু বিস্তৃত তৈল-খনি সমূহ ডাচ, ইষ্ট ইণ্ডিজকে জগতের অঙ্গতম মোটর তৈল (Motor fuel)-উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। বালিক পাপুয়ানই ডাচ সেল তৈল (Dutch Shell Oil) রপ্তানির প্রধান বন্দর। শুনা যায়, এই স্থান হইতে জাপানের আবশ্যকীয় ইন্ধন-তৈলের শতকরা ৪০ ভাগ সরবরাহ করিবার চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এখনও পর্যন্ত অনেকগুলি খনি পূর্ণমাত্রায় তৈল উৎপাদন করিতেছে না। ভবিষ্যতে ডাচ সেল তৈল যে পৃথিবীর তৈলের বাজারে আরও অধিক প্রসার লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই দ্বীপে তৈল ব্যতীত অল্প কতকগুলি মূল্যবান পদার্থেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যথা—কয়লা, স্বর্ণ, হীরক, রৌপ্য, সীসা, তামা, এন্টিমনি, দস্তা, বিসমাথ, প্রাটিনাম, পারা ও আর্সেনিক। এইগুলি নিষ্কাশনের কার্য যুদ্ধের পূর্বেই অল্পবিস্তর চলিতেছিল। এখন যুদ্ধোপকরণোপযোগী খনিজ দ্রব্যেই সবিশেষ মনোনিবেশ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ, বোর্নিও এবং সুমাত্রা এই দুইটি দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল। তাহার সামান্য অংশ মাত্রই এ পর্যন্ত ব্যবহারে আসিয়াছে।

সমুদ্রতীরে হইতে অধিক দূরে অবস্থিত কয়েকটি অকল এখনও পর্ধাস্ত অপরিজ্ঞাত। ভবিষ্যতে যে জাতি এই সকল দ্বীপের অধিকারী হইবে, তাহাদের পক্ষে দ্বীপগুলি প্রচুর ধনাগমের আকর হইয়া উঠিবে।

সিলিবিস্ ও অন্যান্য দ্বীপ

আয়তন হিসাবে সিলিবিসের স্থান বোর্নিওর নীচেই। ইহার বর্গফল ৭০,১৬০ মাইল। লোকসংখ্যা ৩২ লক্ষ ৮ হাজার। দ্বীপের মধ্যভাগ পর্বতসঙ্কুল। সিলিবিস দ্বীপেও নানাধকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়; কিন্তু অজ্ঞাত দ্বীপের তুলনায় এখানে খনির কার্য অল্পই চলিতেছে। চতুর্দিকে ঘন-সম্মিষ্ট বনরাজির মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় তালবর্গীয় (Palmaeae) বৃক্ষ, দারুচিনি, জায়ফল, লবঙ্গ, বেত ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। রবার, কফি, নারিকেল প্রভৃতির চাষ ক্রমশঃ বন্ধিত হইতেছে। সাগুদানার গাছও এই দ্বীপে প্রচুর। প্রকৃত সাগুদানা Metroxylon Rumphii-নামক তাল-বর্গীয় বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমবর্গীয় অজ্ঞাত বৃক্ষ হইতেও ব্যবসায়িক গুণে তসার সংগ্রহ করিয়া সাগুদানা প্রস্তুত করে। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ কাটিলে উহার অভ্যন্তর হইতে যে পরিমাণ গুণেতসার পাওয়া যায়, তাহা একটি ক্ষুদ্র পরিবারেব ছয় মাসের খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। প্রাণীজ পদার্থের মধ্যে সিলিবিস্ দ্বীপ হইতে চামড়া, গুচ্ছ মাছ, ও কচ্ছপের খোলা বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

মলকা দ্বীপপুঞ্জ ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েকটি স্বদৃশ্য দ্বীপের সমষ্টি। দামার রজন এ স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বাবজান্ দ্বীপে একটি গাছে, এমন কি, ৫ সের পরিমিত রজন নিঃসৃত হইয়া কাণ্ডে সংকীর্ণ থাকে। সাগুদানা ও কাজুপট তৈলও রপ্তানির অল্পতম দ্রব্য। এই দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপে মুক্তাও পাওয়া যায়। পরদেশী (Bird of paradise) নামক প্রসিদ্ধ পক্ষীর মূল্যবান পালক নানা দ্বীপ হইতে সংগৃহীত হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সীসাই এই সকল দ্বীপের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

আম্বোয়ানা দ্বীপ এক সময়ে লবঙ্গের জন্ম বিখ্যাত ছিল; এখন জাঞ্জিবার প্রভৃতি অজ্ঞাত স্থলে প্রচুর লবঙ্গ উৎপাদিত হওয়ার এই দ্বীপের লবঙ্গ ব্যবসায় কমিয়া গিয়াছে; নারিকেল দ্বারা সেই অভাব পূরণ হইতেছে। বান্দা দ্বীপ জায়ফল ও জৈত্রি উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র। এখান হইতে বৎসরে অন্যান ৬ লক্ষ মণ জায়ফল, ১৫ লক্ষ মণ জৈত্রি রপ্তানি হয়।

নিউগিনি দ্বীপের কতক অংশ ওলন্দাজ-শাসনাধীন। এই বৃহৎ দ্বীপের আয়তন ৩ লক্ষ বর্গ মাইলেরও অধিক। এই দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর, কিন্তু তাহার সঠিক বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই। বহির্বিজ্ঞানের দ্রব্যাদির মধ্যে নানাবিধ কাষ্ঠ, রবার, নারিকেল শাঁস, কোকা, কফি ও মুক্তাই প্রধান।

বাণিজ্য-ব্যবসায়

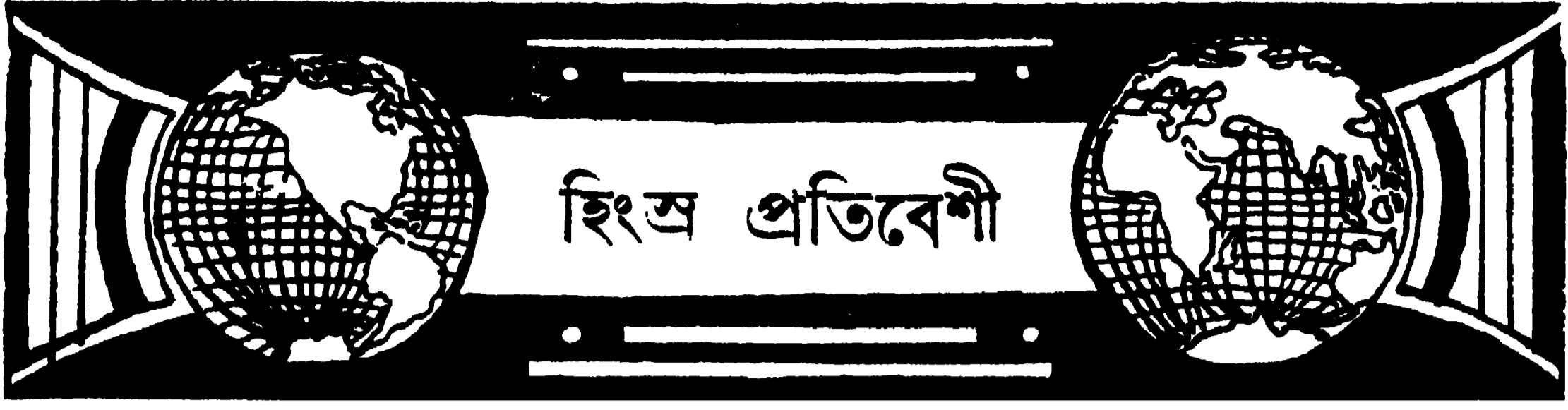
উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের প্রধান দ্বীপগুলি নানা প্রকার ব্যবহারিক দ্রব্যে পরিপূর্ণ। সমগ্র ওলন্দাজ উপনিবেশের সর্বপ্রকার উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্যের পরিমাণ যে বিপুল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ওলন্দাজ সরকারের উপনিবেশ বিভাগ এই সকল দ্বীপের বাণিজ্য-দ্রব্যের হিসাব প্রকাশ করেন, কিন্তু ইংরেজীতে সব সময় তাহার অনুবাদ পাওয়া

যায় না। কিছুকাল পূর্বে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট (Imperial Institute) এর বুলেটিনে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রধান দ্রব্যাদির উৎপাদন বা রপ্তানির তালিকা নিয়ে প্রকাশিত হইল:—

নাম	পরিমাণ (টন হিঃ)
ইক্ষু শর্করা	১৮,৪২,০০০
রবার	১,৩২,৭৪৬
কফি	৫৭,৩৪০
কোকোয়া ফল	১,১৪৭
কোকা পাতা	১,৫০০
চা	৪৮,৮০০
তামাক (পত্র ও পত্রাংশ)	৫২,৬৪০
পাম তৈল	৩০৪৭
নারিকেল শাঁস	৬৩,০০০
শিমুল বীজ	২১,০০০
তিল "	১,২০০
চিনাবাদাম	১৩,৭০০
রেড়ী বীজ	১,০০০
শিশাল শন	১,৪০০
সিকোনা বকল	৬,১০০
কুইনাইন	৫৫৩,০০০ পাউণ্ড
সয়াশীম	৭,৫০০
গোলমরিচ (খেত ও কৃষ্ণ)	১০, ০০০
গুপারি	৭,৮০০
জায়ফল	৩০০
সাইট্রোনোলা তৈল	৪৮০

বলা দরকার যে, উপরোক্ত তালিকা বিগত দশকের অঙ্কাদি হইতে সংকলিত। তাহার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল দ্রব্যেরই উৎপাদন ও রপ্তানি বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য ফসলের মধ্যে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজের ধান, ভুট্টা, লাল আলু, শিমুল আণু প্রভৃতির বহু বিস্তৃত চাষ হয়। কুইনাইন উৎপাদনে যব দ্বীপ জগতে যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার অল্পতম কারণ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাপক ভাবে চাষ। সিকোনা চাষের জন্ম অন্যান ১৩৮টি বাগিচা রহিয়াছে। কিছু কাল পূর্বে উক্ত বাগিচা সমূহের মোট জমির পরিমাণ ছিল— ২৪,১৬৫ বাওরা (১ বাওরা = ২৪৭১ একর = ৭৪১৩ বিঘা) ; এখন চাষের পরিসর আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাকৃতিক অবস্থা সমূহের সুবিধা গ্রহণে ওলন্দাজগণের কৃতিত্ব অসাধারণ। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের অনেক মূল্যবান তরুলতা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে; কিন্তু সেইরূপ স্বভাবজ ফসল সংগ্রহ করিয়াই ওলন্দাজগণ সন্তুষ্ট নহেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া বহু ফসলের উৎকর্ষ সাধন ও উচ্চল ভবিষ্যৎ-যুক্ত নূতন নূতন ফসল প্রবর্তিত করিয়া উপনিবেশের আয়বৃদ্ধির উপায় আবিষ্কারে ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিকগণ নিয়ত রত আছেন। তাহার ফলও বৎসরের পর বৎসর ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজের আর্থিক ক্রমোন্নতিতে পরিষ্কৃত হইতেছে।

শ্রীনিবন্ধবিহারী দত্ত।



(শিকার-কাহিনী)

সিরোল রাজসাহী জিলার সদরের এক প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র পল্লী। বহু কাল পূর্বে এই পল্লী সমৃদ্ধ থাকিলেও পরে ইহা বিধ্বস্ত হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও সিরোল দুর্গম অরণ্যে সমারত ছিল। সেই অরণ্যে তখন দুইটি বহু পুরাতন সমৃদ্ধ পরিবারের বিস্তীর্ণ বাসভবন ছিল; একটির নাম ছিল—সিরোলের 'বাবু-বাড়ী', অণ্ডটি সিরোলের 'রাজবাড়ী'; 'বাবু' নবাবী আমোলের খেতাব। এ-কালে যেমন 'রাজা'র নীচে 'রায় বাহাদুর', সে-কালে সেইরূপ 'রাজা'র নীচেই 'বাবু' খেতাবের সম্মান ছিল। কিন্তু সে দিন আর নাই; আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এই উভয় পরিবারেরই দুরবস্থা, এবং তাঁহাদের বাসভবনেরও ভগ্নাবস্থা। তাহার পর ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে সেই প্রাচীন 'বাবু-বাড়ী'—বহু দূরব্যাপী জীর্ণ দ্বিতল অট্টালিকাশ্রেণী বিধ্বস্ত হইয়া সমভূমি হইয়াছিল, এবং 'রাজবাড়ী'ও শ্রীলষ্ট,—ধ্বংসোন্মুখ। তাহার পর বহু ব্যয়ে সেই বিধ্বস্ত অট্টালিকা-সমূহের জীর্ণসংস্কার করিবেন, সেই প্রাচীন বাসভবনের অধিকারিগণের আর্থিক অবস্থা সেরূপ সচ্ছল ছিল না।

এই সকল বিধ্বস্ত অট্টালিকার চতুর্দিকে যে দুর্গম অরণ্য ছিল, সেই অরণ্যে ভীষণাকার বহু ব্যাঘ্র নিঃশঙ্ক-চিত্তে বিচরণ করিত; এজন্ত শিকারীরা মধ্যে মধ্যে সিরোলের অরণ্যে ব্যাঘ্র শিকার করিতে আসিতেন। সিরোলে যে দুই-চারি ঘর সাধারণ গৃহস্থ বাস করিত, বাঘের ভয়ে তাহারা সূর্যাস্তের পর আর ঘরের বাহিরে আসিতে সাহস করিত না; তাহাদের পালিত পশু—ছাগল, ভেড়া, গরু-বাছুরগুলিকে রাত্রিকালে গোয়াড়ের ভিতর হইতেই বাঘে পরিয়া লইয়া যাইত। অবশেষে কয়েক বৎসর পূর্বে এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পূর্ব-বঙ্গ রেলপথের রাজসাহী-নাখা আমলুরা স্টেশন পর্য্যন্ত প্রসারিত

হইলে সিরোলের জঙ্গলরাশি অপসারিত হইয়াছিল, এবং এজন্ত ব্যাঘ্রের উপদ্রবও হ্রাস পাইয়াছিল; কিন্তু এই রেলপথ যখন নিৰ্ম্মিত হয়, তখনও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঘ লাইনের নিকট দিবাভাগেই গুরিয়া বেড়াইত! সেই সময়ের এক দিনের কথা আমার স্মরণ আছে, এবং সে কথা মনে হইলে এখনও বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠে! সেই দিন আমার মাতা ও স্ত্রী আমাকে অনুরোধ করিলেন—আমাদের পল্লীপ্রান্তে রেলের লাইন কি ভাবে পাতা হইতেছে, এবং বেল-লাইন কোন্ দিক দিয়া বাইতেছে—তাহা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে হইবে। আমি জানিতাম, তখনও লাইনের ধারে দিবাভাগেই বাঘ বাহির হয়; তথাপি তাঁহাদের আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারায়, সেই অপরাহ্নে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সঙ্কীর্ণ নিৰ্জ্জন অরণ্য পথ অতিক্রম করিয়া অদূরবর্তী রেল-লাইনের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই লাইনের অন্ন দূরেই আমার ইটখোলায় ইট নিৰ্ম্মিত হইতেছিল। আমরা সেই ইটখোলায় দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। সুলোহিত তপন-কিরণে তখনও চতুর্দিক আলোকিত; সূর্য্য সমুচ্চ বৃক্ষচূড়ার অন্তরালে পশ্চিম গগন-প্রান্তে অন্তগমন করিতেছিল। সহসা একটা বোটকা গরু আমাদের নাসারঞ্জে প্রবেশ করিল! কয়েক মিনিট পরেই দেখি, বড় বন-বিড়ালের মত দুইটি ব্যাঘ্রশাবক খেলা করিতে করিতে ইটখোলায় প্রবেশ করিয়া আমাদেরই সম্মুখে উপস্থিত! ব্যাঘ্র-মাতা হয় ত শাবকদ্বয়ের সহিত আসিয়া অদূরে কোথাও প্রতীক্ষা করিতেছে ভাবিয়া আমরা ভীত হইলাম; এবং আর সেখানে না দাঁড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেই ব্যাঘ্রশাবকদ্বয় নাচিতে নাচিতে আমাদের অনুরণন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্ত কি উপায় অবলম্বন করিব, দাঁড়াইয়া তাহাঁই

ভাবিতেছি—সহসা দেখিলাম, ভীষণদর্শন প্রকাণ্ড বাঘিনী অশ্রুট গর্জন করিতে করিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইটখোলায় প্রবেশ করিল, এবং আমাদের প্রায় কুড়ি হাত দূরে থাকা পাতিয়া বসিয়া-পড়িয়া, অগ্নিময় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ লাস্কুল ঈষৎ আন্দোলিত করিতে করিতে গৌ-গৌ শব্দে শাবকদ্বয়কে যেন আহ্বান করিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার মনে হইল, আমরা তাহার শাবক চুরি করিতে আসিয়াছি ভাবিয়া বাঘিনীটা ক্রুদ্ধ হইয়াছে,—তখনই আমাদের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার জন্ত প্রস্তুত!

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে আমার মাতা ও স্ত্রীর মূর্ছার উপক্রম হইল। আমি কি করিব—কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পলায়ন করিতেও সাহস হইল না; সর্কাজ তখন আড়ষ্ট। যাহা হউক, মাতাকে অদূরে উপবিষ্ট দেখিয়া শাবক-দুইটি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আর আমাদের অনুসরণের চেষ্টা না করিয়া দ্রুতবেগে তাহাদের মাতার নিকট ফিরিয়া গেল, ও তাহার চারি পাশে লাফাইয়া খেলা করিতে লাগিল। শাবকদ্বয়কে নিকটে ফিরিতে দেখিয়া বাঘিনী আর সেখানে অপেক্ষা করিল না; সে আমাদের আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া শাবকদ্বয়সহ অবিলম্বেই ইটখোলা ত্যাগ করিল, এবং রেল-লাইনের পার্শ্বস্থ অরণ্যে অদৃশ্য হইল।

কিন্তু তখনও ভয়ে আমাদের পা উঠিতেছিল না; বাঘিনীটার মুখ এত বড় যে, সে মুখব্যাদান করিলে মানুষের মাথা অনায়াসে তাহার মুখবিন্দরে প্রবেশ করিতে পারিত, এবং মনুষ্য শোণিতের স্বাদ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা থাকিলে তাহার কবল হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতাম না। কিন্তু কি জানি, বাঘিনীটা হঠাৎ যদি ফিরিয়া আসে, ভাবিয়া আমরা অসহায় ভাবে চারি দিকে চাহিতেই ইটখোলার অদূরে এক জন লোকের দেখা পাইলাম। সে নিকটে আসিলে চিনিলাম, যাহারা আমার ইট প্রস্তুত করিতেছিল—তাহাদেরই দলের মজুর। তাহাকে আমাদের বিপদের কথা জানাইলে—সে বিস্মিত না হইয়া বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, “বাঘ ত দিনে-দুপুরে ছামেসাই এখানে দূরে বেড়ায়! বাঘিনীটার হয় তো সন্দো হ'য়েছিল, আপনারা ওর বাচ্চা ধরতে এসেছেন।

সে যে আপনাদের ঘা'ল করেনি—এ আপনাদের নিহাৎ বরাতের জোর! বাচ্চা দুটো আরো খানিকক্ষণ আপনাদের কাছে ঘুরাঘুরি ক'রলে—ওড়া ঠিক আপনাদের ওপর লেফ দিয়ে গর্দান কেমড়িয়ে ধ'রতো।” যাহা হউক, লোকটা আমার অনুরোধে আমাদের সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীর দিকে চলিতে চলিতে বলিল, “ফিরবার সময় মাদীডে যদি আমারই ঘাড়ে লেফিয়ে পড়ে তো ফাসাদে প'ড়বো; বলা তো যায় না। বনে-ঝাড়ে এক-এক দিন ভারী জবোব 'হেতের' নজরে পড়ে। গরু-বাছুর মেরে পৈলট ক'রলো।”

বাঘ যে আমাদের বাড়ীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহার অল্প প্রমাণও ছিল। এক দিন আমার মা (তখনও সন্ধ্যা হয় নাই) উঠানের ইঁদারায় রজ্জুবদ্ধ বালুতি নামাইয়া জল ভুলিতেছিলেন; সেই সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরটা পূর্ব দ্বারের একতালার ছাদের দিকে উদ্ধমুখে চাহিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে ও লাফাইতে লাগিল। মা প্রথমে তাহার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু ইঁদারার জলে বালুতি ডুবাওয়া তাঁহার জানিতে কৌতূহল হইল—কুকুরটা কি জন্ত ও-রকম লম্ফ-বাম্ফ করিয়া চীৎকার করিতেছে? কোন অপরিচিত লোক, কি পাড়ার কাহারও গরু-বাছুর বাড়ীতে আসিলে সে ঐরূপ করিত। মা তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া একতালার ছাদের দিকে চাহিতেই দেখিলেন—সেই বৃহৎ কুকুরটার তিন গুণ আকারের প্রকাণ্ড একটা বাঘ একতালার ছাদের উপর কার্ণিস বেসিয়া বসিয়া আছে! তাহার লক্ষ্য ঐ কুকুরটা; কিন্তু কি ভাবিয়া সে বাড়ীর আঙ্গিনার ভিতর লাফাইয়া-পড়িয়া কুকুরটাকে আক্রমণ করিল না, তাহা সে-ই জানিত। মা বাঘটাকে দেখিয়া বালুতি-দড়ি সব ইঁদারার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ‘বৌমা, বাঘে খেলে!’ বলিয়া মুহূর্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার ক্রুদ্ধ করিলেন! আমার স্ত্রী ঘরের বারান্দায় ছিলেন; তিনিও ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিলেও তৎক্ষণাৎ ‘যঃ পলায়তি স জীবতি’ নীতির অনুসরণ করিলেন। আমি কাছারী-বাড়ী হইতে অন্তরে আসিয়া এই ঘটনার কথা জানিতে পারিলাম। বাঘ তখন অদৃশ্য হইয়াছিল। যে একতালার ছাদে বাঘটা উঠিয়া আসিয়াছিল—তাহার পশ্চাতে ইট ও রাবিশের স্তূপ

উচু হইয়া পড়িয়া ছিল; দীর্ঘকাল তাহা অপসারিত না হওয়ায় তাহারই উপর দিয়া বাঘটা কুকুরের লোভে ছাদে উঠিয়াছিল।

আমার সেই কুকুরটি সাহসী ও বেশ শিক্ষিত ছিল; তাহার ভয়ে কোন চোর আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিত না। দিবসে সে বাধা থাকিত, সন্ধ্যার পর তাহার গলার শিকল খুলিয়া দিতাম; সারা রাত্রি সে বাড়ীর আঙ্গিনার ভিতর ঘুরিয়া পাহারা দিত। কিন্তু আর এক দিন রাত্রিকালে বাঘ আসিয়া আমার কুকুরটিকে ধরিয়া লইয়া গেল। তাহার আর্তনাদ শুনিতে পাইলেও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি নাই।

কুকুরটিকে হারাইয়া আমার বড় দুঃখ হইল; এমন প্রভুভক্ত কুকুর আর পাইব বলিয়া আশা করিতে পারিলাম না। মনে হইল, কুকুর গিয়াছে—এবার বাঘ আমার গরুর গোয়ালে প্রবেশ করিয়া গরু-বাছুর মারিবে। বাঘটাকে আর না মারিলে চলে না; কিন্তু বাঘ ত একটা নয়! এমন হিংস্র প্রতিবেশী লইয়া কি করিয়া এই বনে বাস করিব?

কি উপায় করিব ভাবিতেছি, এমন সময় এক দিন আমার প্রতিবেশী উজীর সেখ আমার কাছারিতে আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, “বাবু, আমার ‘সন্ধানাশ’ হ’য়েছে; গ্যালো চোতে এক কুড়ি-বারো ট্যাকা দিয়ে যে কুলে দাম্ড়াটা কিনেলাম, নাঙ্গল বলেন, গাড়ী বলেন—এমন টানতো! এক-হাঁটু কাদার মণ্ডি হ’তি বিশ মোণ বুজাই গাড়ী দুই কুলে টাণ্ডে তুলেচে; আমার সেই বলদ কাল রেতের ব্যালা মাঠে চরতে বেরিয়ে আর ঘুরে এলো না। আজ দেখি, বোনির ধারে তারে বাঘে মেরেচে! এ বাবু, আমার পুতুর-শোগ, আপনার ত বোনুক আছে, বাঘটাকে মারেন বাবু, নৈলে সিরোলে যে বাস করাই দায়!”

আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, “তোমার গাড়ীর বলদ মারলো, আমারও ক্ষতি বড় কম করেনি; আমার কুকুরটাকে ধ’রে নিয়ে গিয়ে সেবায় লাগিয়েছে। চল, দেখে আসি, কি ভাবে তোমার বলদ মেরেছে। কুমার বাহাছুরকেও সঙ্গে নিয়ে যাই; আমরা এক সঙ্গেই শিকার করি কি না।”

সিরোলের ‘কুমার’ আমার প্রতিবেশী বলিলে অত্যাঙ্ক

হইবে না; কারণ, আমার বাড়ী হইতে সিরোলের রাজ-বাড়ীর দূরত্ব অধিক নহে। বৈষয়িক অবস্থা মন্দ হওয়ায় ‘কুমার’ বলিলে তিনি লজ্জিত হইতেন; এজন্য আমরা তাঁহাকে ‘রায়জি’ বলিতাম। আমরা উভয়ে একত্র বহু বার ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছি; এজন্য এই ব্যাপারে তাঁহাকে সঙ্গে লওয়াই সঙ্গত মনে করিলাম।

রায়জি আমার প্রস্তাবে সন্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। উজীরের সঙ্গে অদূরবর্তী অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, অরণ্যমধ্যে একটি পরিতৃপ্ত স্থানে বলদটার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, বাঘ বলদটাকে স্থানান্তরে হত্যা করিয়া সেখানে টানিয়া আনিয়াছিল। দেখিলাম, তাহার গলা ফুটা করিয়া রক্তপান করিয়াছে, এবং তাহার পশ্চাত্তাগের কোমল অংশটা ছিঁড়িয়া খাইয়াছে; দেহের অন্তঃস্থ অংশ অক্ষত। বুঝিতে পারিলাম, বাঘ সময়ান্তরে আসিয়া ভক্ষণ করিবে, এজন্য মড়িটা সেখানে রাখিয়া গিয়াছে।

আমরা তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করিলাম। শকুনের দল আসিয়া মৃতদেহটি বিকৃত করিতে বা দূরে টানিয়া লইয়া যাইতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে প্রায় চারি হাত দীর্ঘ একটি বংশদণ্ড সেই স্থানে পুতিয়া, মৃত বলদটার চারি পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সেই বংশদণ্ডে বাঁধিয়া রাখা হইল। বাঁশের সেই গৌজটার প্রায় আড়াই হাত মাটির ভিতর থাকিল; সুতরাং বাঘটা কোন সময় সেখানে আসিয়া মৃতদেহটি স্থানান্তরিত করিবে—তাহার উপায় রহিল না। অতঃপর আমরা গাছের কতকগুলি ডাল কাটাইয়া তদ্বারা মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিলাম। এই সকল কাজ শেষ করিয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

বেলা শেষ হইবার পূর্বেই আমরা উভয় শিকারী এক একটি বন্দুক ও কয়েকটি অতিরিক্ত কার্তুজসহ বলদের মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইলাম। গাছের ডাল-পালায় মৃতদেহটি আবৃত থাকায় তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। আমরা সেই সকল ডাল-পালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, অদূরে যে সকল বড় গাছ ছিল, তাহার দুইটিতে দু’জনে উঠিয়া বসিলাম। ভাবিলাম, যদি সন্ধ্যার পূর্বে মড়ির নিকট বাঘ আসে, তাহা হইলেই তাহাকে গুলী করা সম্ভব হইবে; নতুবা

রাত্রিকালে সেই গভীর অরণ্যে গাছে বসিয়া বাঘের প্রতীক্ষা করা সম্ভব হইবে না; বিশেষতঃ, সারা রাত্রি গাছের ডালে বসিয়া-ধাকাও সম্ভব নহে। বাঘটা হঠাৎ যে বলদটাকে দূরে টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহারও উপায় ছিল না; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি—বলদটার চারি পা সূদৃঢ় রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া, দড়িটা শক্ত করিয়া সেই খুঁটার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। বৃক্ষে আরোহণ করিবার পূর্বে সেই বন্ধন এবং খুঁটাটি পুনর্বার পরীক্ষা করিলাম। আমরা উভয়ে খুঁটাটি ধরিয়া যথাসাধ্য বলপ্রয়োগে টানা-টানি করিয়া একটুও নড়াইতে পারিলাম না।

রাজসাহী মশার আতিশয্যের জন্ত বিখ্যাত। সেই অরণ্যের ভিতর দিবাবসানেও মশকের সঙ্গীতধ্বনির বিরাম ছিল না; কিন্তু আমরা মশক-দংশন সহ করিয়াই গাছে বসিয়া রহিলাম। কিছু কাল পরে সূর্যাস্ত হইল, এবং সন্ধ্যার পূর্বেই অন্ধকারে সেই বনভূমি আচ্ছন্নপ্রায় হইল। সন্ধ্যা-সমাগমের পূর্বে বাঘ না আসিলে আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইবে ভাবিয়া আমরা প্রতি মুহূর্তে অধীর হইতে লাগিলাম; কারণ, অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলী করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু আমাদের দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হইল না; আমরা বৃক্ষে আরোহণ করিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে, এবং সেই বনভূমি সাক্ষ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার পূর্বেই—অরণ্যমধ্যস্থ শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মস্-মস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই শব্দ শুনিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম; সত্যই কি উহা ব্যাঘ্রের পদশব্দ? কয়েক মিনিট পরেই সকল সন্দেহ দূর হইল; দেখিলাম, একটি ভীষণাকৃতি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র অরণ্যের অন্তরাল হইতে বলদের মৃত-দেহের নিকট লাফাইয়া পড়িল। ঐরূপ বৃহৎ ব্যাঘ্র এ অঞ্চলে অতি অরলই দেখা গিয়াছে!

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও তেমন নিবিড় হয় নাই; আলো-অন্ধকারের সেই মিলন সময়ে দেখিলাম—বাঘটা বলদের মৃতদেহের কাছে বসিয়া, মাথা কাত করিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া-ধরিয়া তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। আমার হাতের বন্দুক হাতেই রহিল। আমার শিকারী বন্ধুটিও অস্ত্র বৃক্ষশাখায়

বসিয়া ব্যাঘ্রের কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতেছিলেন; সেই অবস্থায় আমরা তাহাকে গুলী করিবার অব্যর্থ সুযোগ না পাওয়ার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। গুলী করিয়া যদি তাহাকে হত্যা করিতে না পারি, এবং সে যদি আহত অবস্থায় পলায়ন করে, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে বুঝিয়া আমাদের দৈর্ঘ্যাবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল; কিন্তু এক-এক মিনিট এক-এক ঘণ্টার জায় দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, মৃত বলদটার পদচতুষ্টয় দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সেই রজ্জু বাঁশের খুঁটাতে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। বাঘটা বলদের ঘাড় কামড়াইয়া-ধরিয়া টানাটানি করিয়াও যখন তাহাকে সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারিল না, তখন সে সেই বাঁশের গোঁজের দিকে চাহিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিল, কি কারণে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে! এবার সেই খুঁটার দিকে চাহিয়া সে তাহার অগ্রভাগ কামড়াইয়া ধরিল, এবং ঘাড় বাঁকাইয়া উপরের দিকে এমন একটা হ্যাচ্কা টান দিল যে, সেই টানেই সুদীর্ঘ খুঁটাটা মাটির ভিতর হইতে উপড়াইয়া আসিল!

বাঘটার শক্তির পরিচয় পাইয়া আমার বিশ্বাসের সীমা রহিল না! যাহা হউক, খুঁটাটা ঐ ভাবে উৎপাটন করিতে বাঘটার বোধ হয় কিঞ্চিৎ পরিশ্রম হইয়াছিল, এ জন্ত উহা উপড়াইয়া-তুলিয়া সে মড়ির পাশে বসিয়া দুই একবার হাঁপাইল। সেই সময় সে একবার মাথা তুলিতেই আমি তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া ‘দডাম্’ শব্দে গুলী বর্ষণ করিলাম। সেই অব্যর্থ গুলীতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইল। গুলী খাইয়াই বাঘটা ভীষণ আর্তনাদ করিয়া শূন্যে একটা লাফ দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে গুইয়া পড়িল; আর তাহার কোন সাড়া-শব্দ পাইলাম না।

আমার শিকারী বন্ধু অস্ত্র পার্শ্বের বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া বাঘের অন্তিম বিক্রম লক্ষ্য করিতেছিলেন। বাঘ আহত অবস্থায় হঠাৎ উঠিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনিও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ গুলী বর্ষণ করিলেন; কিন্তু তাহার প্রয়োজন ছিল না, আমার গুলীতেই তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছিল।

আমরা বৃদ্ধ হইতে নামিয়া অরণ্যের বাহিরে আসিতেই কতকগুলি গ্রামবাসীকে অরণ্যের দিকে যাইতে দেখিলাম। উপযু্যপরি দুই বার বন্ধুকের শব্দ শুনিয়া বাঘ মরিয়াছে ভাবিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিল। তাহারা নিহত বলদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাঘ মরিয়া পড়িয়া আছে। চারি জন গ্রামবাসী বাঘের চারি পা রজ্জুবদ্ধ করিয়া, তাহাকে বাঁশে ঝুলাইয়া আমার বাড়ীতে লইয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

বাঘটাকে দেখিয়া মা বলিলেন, ইঁদারায় জল তুলিবার সময় সে দিন তিনি একতালার ছাদের কাণিশের নিকট যে 'দস্তি'কে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়াছিলেন, এ সেই 'ওরেবৎ'টাই বটে!—কিন্তু হঠাৎ এক বার দেখিয়া গোরা-বারিকের অর্দ্ধদিগম্বর কোনও ঞাংটা-গোরা ও বনের বাঘ—এই উভয়কে সনাক্ত করা আমাদের পক্ষে সমান কঠিন! সিরোলের ব্যাঘ্র-বারিকে সে সময় বিস্তর বৃহন্নাল ব্যাঘ্রাচার্য্য সপরিবারে বাস করিত : কোনটি কুকুরের লোভে আমার ঘরের ছাদে আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

এ বহু দিনের কথা। তখন আমার যৌবন কাল, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু আমার সেই যৌবন কালের ব্যাঘ্র-সঙ্কুল সিরোল এ-কালে আর নাই। সে অরণ্যও আর নাই। রেলপথ নির্মিত হওয়ায় সে-কালের সুবিশাল দুর্ভেদ্য অরণ্য অপসারিত হইয়াছে। দুই পাশে জঙ্গল কাটিয়া রেল-স্টেশন পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ নির্মিত হইয়াছে; পথে সর্বদা লোক এবং যানবাহন চলিতেছে। স্টেশনের দিকে সহর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে; বন কাটিয়া নগর বসিতেছে। রেল-স্টেশনের অদূরবর্তী দুর্গম অরণ্যসঙ্কুল স্থানে এখন আমরা প্রজ্ঞাপত্তন করিতেছি। বাঘের দলও দূরে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু এখনও কোন কোন দিন রাত্রি কালে আমার গৃহসংলগ্ন পুষ্করিণীর পাড়ে আম-বাগানের ভিতর ব্যাঘ্রের গর্জন-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়;—মনে হয়, গৃহস্থ-পল্লীসমিহিত লোভনীয় অরণ্য হইতে বহু দূরে নির্বাসিত হওয়ায় এক-এক বার তাহারা তাহাদের পূর্ব-অধিকারের সীমায় আসিয়া অতীত সুখের কথা ভাবিয়া আর্তস্বরে আক্ষেপ করিতেছে!

শ্রীভবানীচরণ বাবু।

প্রথম চুম্বন

স্বপ্নের ভূমি এসেছিলে নব সাজে
পরিপূর্ণ ক'রে প্রাণের পিয়লাখানি,—
স্বপন-বিভল নিরীলা নিশ্চিতি মাঝে
খুলেছিলে তার সরমের আবরণী—

গোলাপী-সুরার উচ্ছল হাসিরাশি
মুরছি পড়িল তব অধরের কোণে;
ছিয়া-মাঝে মোর কে যেন বাঁজালো বাঁশী,
রে মধুপ মধু পান করো মধু-বনে;

আকাশের শশী সেই সুরে দিল সাড়া
নব অসুরাগে কুমুদিনীদলে চুমি;
লঘু সমীরণ কিশলয়ে দিল নাড়া—
কুম্মিত হ'ল নির্জলা মরুভূমি।

নব যৌবন-কামনা সে কভু নহে—

সে যে পদ্মার স্রোত নিত্য নূতন বহে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার (এম-বি)।

বিজ্ঞান-জগৎ

এ কাগজ আগুনে পোড়ে না।

বৈজ্ঞানিক মিশ্রণে কাগজকে আজ এমন চমৎকার তৈয়ারী করা হইয়াছে যে, আগুনের শিখায় ধরিলে এ কাগজ আদৌ পুড়িবে না। এ কাগজ অদাহ। এ কাগজের ঠোঙায় জল রাখিয়া জল



কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা

গরম করা হইতেছে। তার উপর এ কাগজে লিখিলে বা এ কাগজে বই ছাপিলে ঘাম লাগিয়া কাগজ চূপসাইয়া বাইবে না; বা তাহা বিক্রী ও দাগী হইবে না। আজ এ-যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের জন্ত এ কাগজ তৈয়ারী হইয়াছে।

সিগারেট-বিলাস

আমেরিকার প্রান্তর-পথে বা বিজ্ঞান সমুদ্র-তীরে কোনো সিগারেট-সেবী হয় তো সিগারেট আলিবার জন্ত দেশলাই চান, অথচ কাছে

দেশলাই নাই বা এমন লোকজন কাছে নাই—যাঁর কাছে দেশলাই চাহিবেন। বিজ্ঞান-পথচারী সিগারেট-সেবীর চুঃখ বুদ্ধিয়া সেখানকার মিউনিসিপালিটি পথে প্রাপ্তবে এবং বিজ্ঞান সমুদ্র কূলে পোর্ট-বল্ডের মতো অগ্নিশিখাদারিনী নারী-পুস্তলি-মুক্তি রচিয়া



চুম্বার আগুন

রাখিয়াছেন। এই নারী-পুস্তলির অধরে আছে ব্যাটারিয়ুক্ত সিগারেট-আলিকা। নারী-পুস্তলির অধরের এই আলিকাপ্রভাগে সিগারেটের অপ্রভাগ সংলগ্ন করিয়া আলিলনের তদ্বীতে নারী-পুস্তলিকে ধরিয়া তার পিঠে বোতাম টিপিলেই অধর আলিকার অগ্নিশিখা দেখা দিবে; এবং চুম্বন-সীলার হলে সিগারেট আলিয়া বিলাস-সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন।

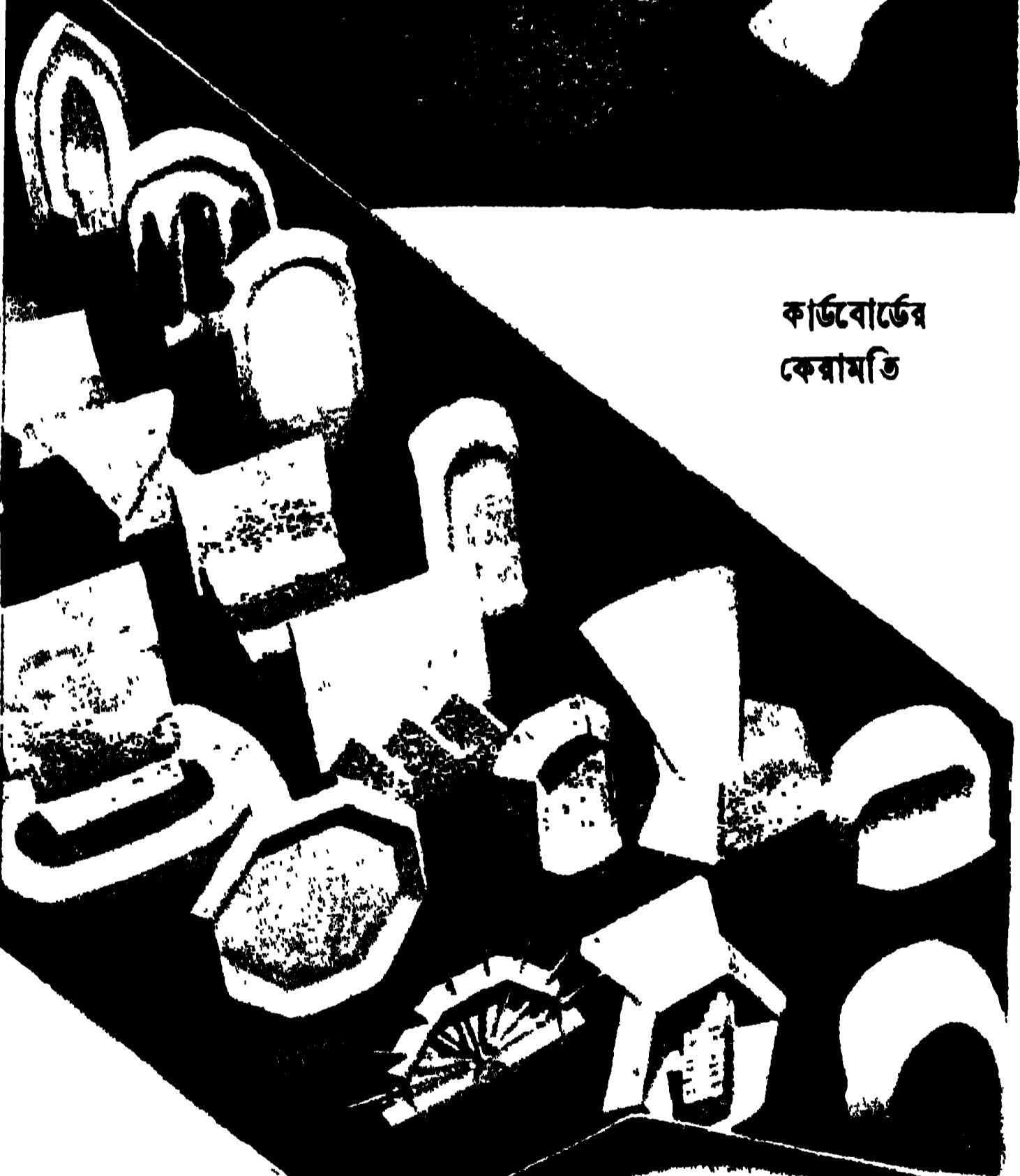
কার্ডবোর্ডে কারিগরি

এক পীণ ফ্লাট কার্ডবোর্ড। সে কার্ডবোর্ডকে ভাঁজে-ভাঁজে সিকি-ইকি করিতে পাবেন? এ কাজ দুঃসাধ্য, অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

এঞ্জিনীয়ার। যন্ত্রকৌশলে চাপ দিয়া কার্ডবোর্ডকে শত-ভাঁজ করিয়া তিনি আজ নানা আসবাবপত্র তৈয়ারী করিতেছেন। কার্ডবোর্ডের এ-সব আসবাবপত্র শুধু যে গৃহসজ্জা বা প্রয়োজন সাধন করে, তা নয়; এ আসবাবপত্র-মারফৎ বিজ্ঞাপনী-প্রচারে তিনি যুগান্তর আনিয়াছেন। তাঁর হাতের কাজের কয়েকটি মাত্র নয়না পাশের ছবিতে দেখুন।



কার্ডবোর্ডের
কেয়ামতি



এ-সব এক-পীণ
কার্ডে তৈয়ারী

কিন্তু এই অসম্ভবকে আজ সম্ভব করিয়াছেন নিউ ইয়র্কের লন্ড, আইল্যান্ড-সিটির অধিবাসী ঐযুক্ত রিচার্ড পেন্ড। তিনি এক জন

অণুবীক্ষণ-চশমা

রোগে, দৌর্যলো, বয়স-দোষে অনেকের চোখের দৃষ্টি-শক্তি এমন ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, সে-চোখে চশমা আঁটিয়াও তাঁরা চোখে কিছু দেখিতে পান না।



অন্ধের দৃষ্টি

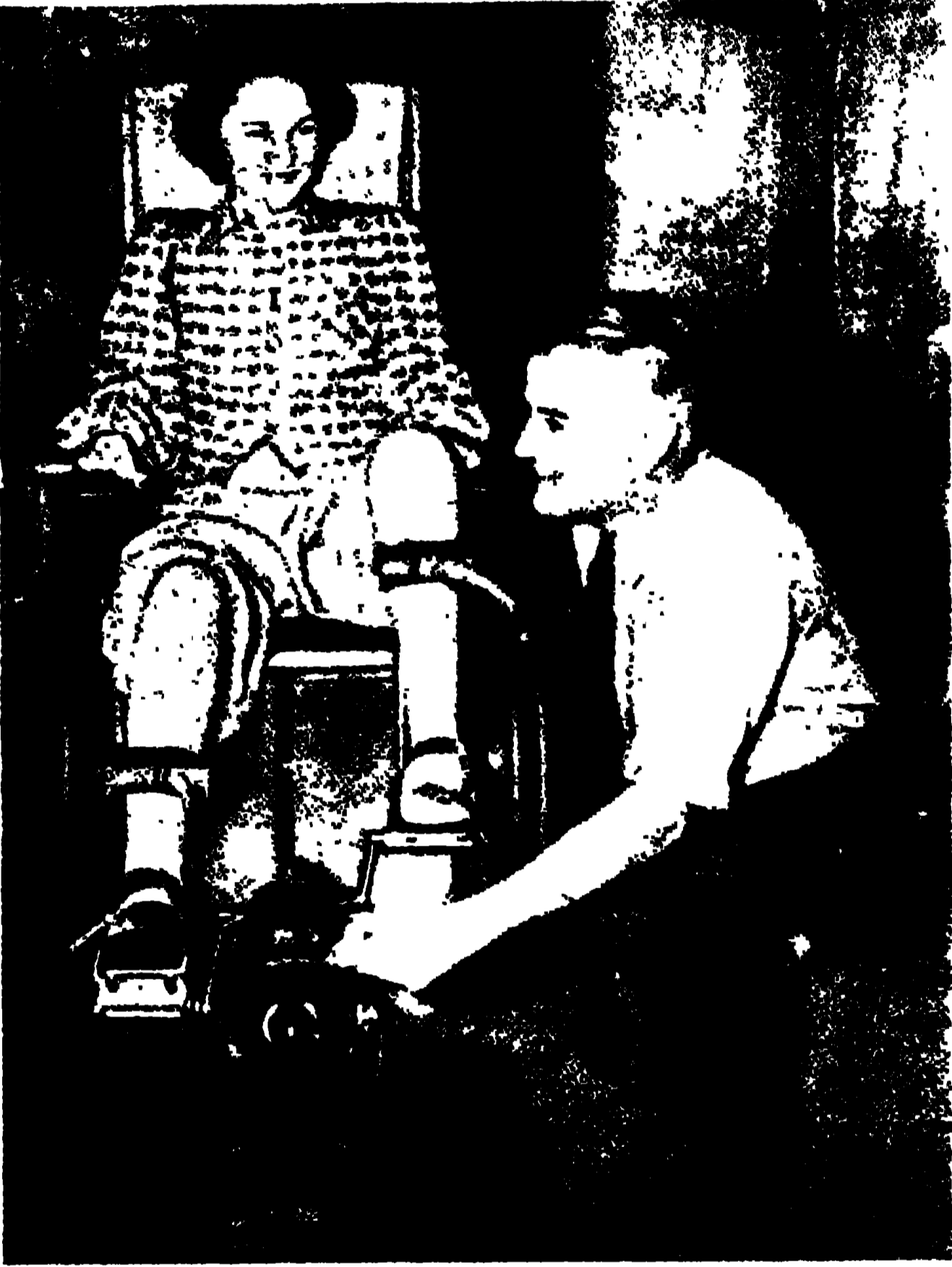
এমন ক্ষীণ যাদের দৃষ্টিশক্তি, তাঁদের দৃষ্টিদানকল্পে মার্কিন চক্ষু-চিকিৎসক উইলশন অণুবীক্ষণ-চশমা তৈয়ারী



করিয়াছেন। এ চশমার লেন্স খুব ছোট। অণুবীক্ষণের আদর্শে সে লেন্স নির্মিত। লেন্সের উপর অভিনব অতি-সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণ সংলগ্ন আছে। তার লেন্সের শক্তি এত বেশী যে, অক্ষও এই অণুবীক্ষণ-চশমা চোখে আঁটিয়া বইয়ের অক্ষর দেখিতে পাইবেন বলিলে কথটা অত্যাক্তি হইবে না।

পক্ষাঘাতে আরাম

লগ্ন এঞ্জেলেশে নানা ভাবে প্রায় ৭৮ বার ব্যর্থকাম হইয়া অবশেষে হুই বৈজ্ঞানিক সহোদর পক্ষাঘাত-রোগ-আরোগ্য-কল্পে এক বকম ব্যায়াম-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক প্রবাহযোগে



বাত-সারানো যন্ত্র

চলে। এ যন্ত্রে দু'টি পাদানি এবং হাতদানি আছে। পক্ষাঘাত রোগে যাদের হাত বা পা অসাড়, অচল, তাঁদের হাতে ও পায়ে ষ্ট্রাপ বাঁধিয়া এ যন্ত্রের হাতদানিতে বা পাদানিতে তাঁদের হাত ও পা রাখিয়া যন্ত্রযোগে তাঁদের হাতে-পায়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া হাত ও পায়ের ব্যায়াম-সাধন স্বচ্ছন্দভাবে নির্বাহিত হয়। এ ব্যায়ামে বাত ও পক্ষাঘাত সারিতেছে।

কাজী-বর্ষাতি

বর্ষাতি-কোট গায়ে আঁটিলে বৃষ্টির জলসেক হইতে পরিভ্রাণ-লাভ হয় সত্য; কিন্তু ভারী বলিয়া বর্ষাতি-কোট গায়ে আঁটিয়া জলবৃষ্টিতে

থাকিয়া কোনো বকম পরিশ্রমের কাজ বা খেলাধুলা করা চলে না। সপ্রতি রেশমের চেয়েও হালকা এবং মিহি বর্ষাতি-কোট-পেন্টু লেন



নতুন বর্ষাতি

তৈয়ারী হইয়াছে। এ কোট-পেন্টু লেন আঁটিয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া খেলাধুলা, দৌড়বাজি বা যে-কোনো কাজ করুন, অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হইবে না।

কেশ-পরিচর্যা

মাথার চুল পাতলা হওয়া, মাথার টাক পড়া, অল্প-বয়সে মাথার চুল পাক ধরা—এ-সব উপসর্গ মাথার অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। এ তিন

বিপত্তি - মোচনের স্তম্ভ কেশ-তৈল বা টাকের উষ্ম ব্যবহার করিলে কোনো ফল হইবে না। এ তিন বিপত্তি-মোচনের একমাত্র উপায়, মাথার 'লন-মলন' বা মেশাজ্। হাতে ত্রাশ



বৈজ্ঞানিক ত্রাশ

দোতলা, তিন-তলার সমান উঁচু এক বিচিত্র ত্রিচক্র-বান রচিতা তার উপর বসেন বিমানপোত-বিভাগের পাইলট; পাইলটের পাশে বসেন বোমা-বিভাগ-শিক্ষার্থী সৈনিক। বিস্তীর্ণ মাঠে 'লক্ষ্য' (target) রাখা হয়; এবং ত্রিচক্র-বান চলিবার সময় শিক্ষার্থীকে বোমা ফেলিয়া সে-লক্ষ্য অভ্রান্তভাবে ভেদ করিতে হয়। লক্ষ্যটুকু দূর হইতে দেখিয়া রাখিতে হয়, কারণ, বোমা ফেলিবার সময় এ-লক্ষ্য চোখে দেখা যাইবে না। আগে হইতে প্রত্যক্ষ-করা-লক্ষ্যে—অজ্ঞানে নির্ভর করিয়া বোমা নিক্ষেপ করা চাই। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, এ রীতিতে যেমন হাতে-কলমে এবং অভ্রান্তভাবে বোমা-নিক্ষেপে পটুতা লাভ করা যায়, এমন আর অন্য কোন রীতিতে হয় না।



ধরিয়া মাথার পরিচর্যা তেমন যুৎসই হয় না বলিয়া সম্প্রতি মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা বৈজ্ঞানিক শক্তি-চালিত একরকম ত্রাশ তৈয়ারী করিয়াছেন। প্রাগে আঁটিয়া এ ত্রাশ মাথার ধকন, এ ত্রাশ মিনিটে ৫০০০ স্পন্দন তুলিবে। পনেরো মিনিট কাল হাতে ত্রাশ ধরিয়া সবলে মাথা আঁচড়াইলে বে-ফল মিলিবে না, এ ত্রাশে এক-মিনিটে তার বেশী ফল পাইবেন। সেক্টি-স্ক্রের মতো এ ত্রাশকে মুড়িয়া বাস্তবন্দী করিয়া রাখা চলে। এ ত্রাশে মাথার কেশ ক্লেশ-যুক্ত হয়; এবং মাথার শিরা-উপশিরা এ ত্রাশের ঘর্ষণ-মর্দনে অস্থস্থ হইতে পারে না বলিয়া এ ত্রাশ-ব্যবহারে মাথার কেশ ঘন থাকে, পাকে না; এবং মাথার টাক পড়ে না।

বোমা-বিভাগ

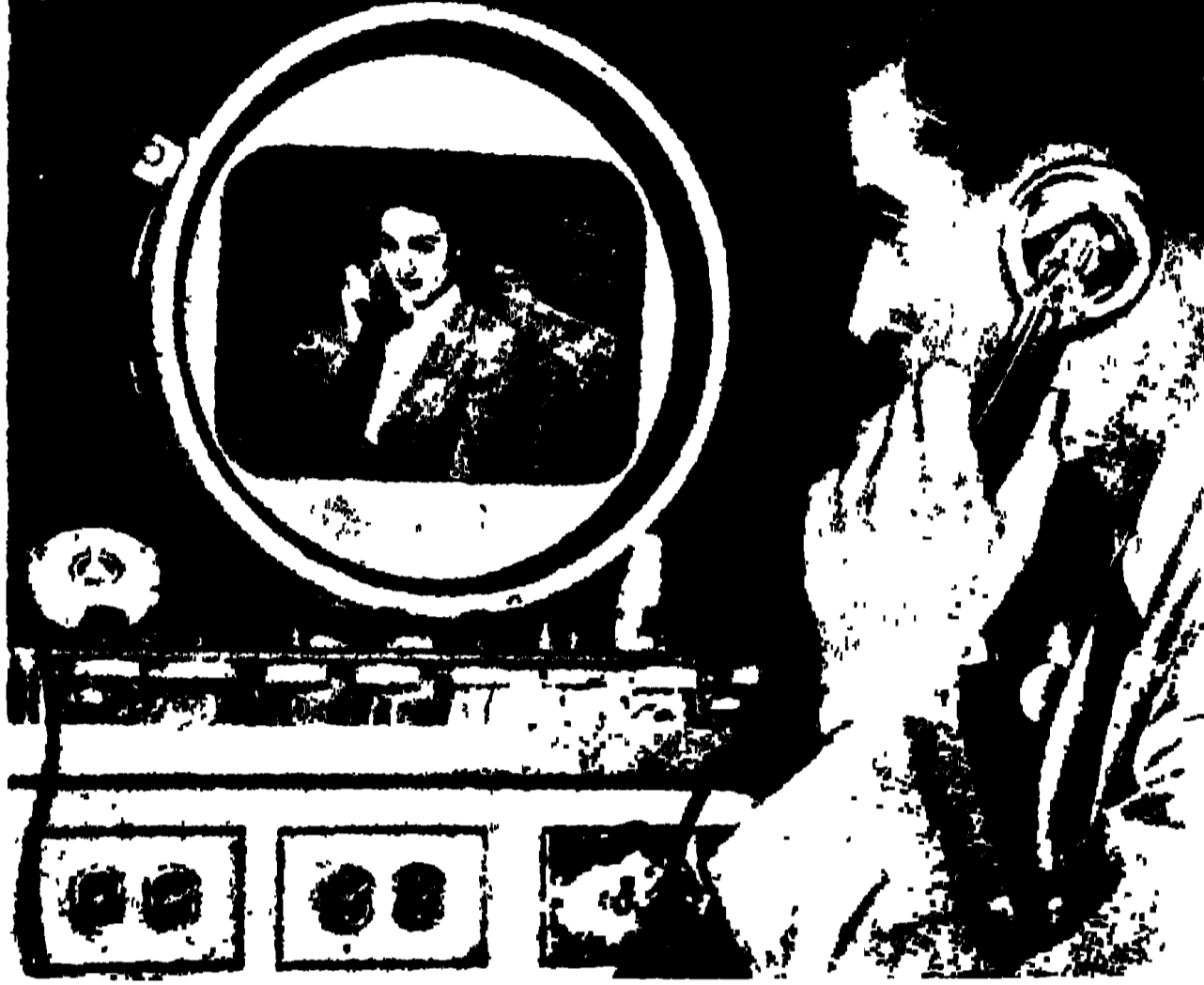
বোমা ফেলার কশরতি শিখিবার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার সেনা-বিভাগে নূতন রকমের ব্যবস্থা হইয়াছে।



বোমা-বিভাগ প্রাকৃতিক ত্রাশ

টেলিভিশন-টেলিফোন

নিউ ইয়র্কের বিশ্ব-প্রদর্শনীতে সম্প্রতি সেখানকার জেনারেল মোটর কোম্পানি টেলিভিশন-টেলিফোন যন্ত্র দেখাইয়াছিলেন। টেলিফোন-যন্ত্রের সহিত তাঁরা একটি সুবহু টেলিভিশন-ট্রান্সমিটার যন্ত্র আঁটিয়া এতহুভয়ের মধ্যে বারো ইঞ্চি ব্যবধানে মোটা পর্দা ফেলিয়া দেন। পর্দার এ দিকে এক জন ধরিলেন রিসিভার এবং অপর দিকে আর

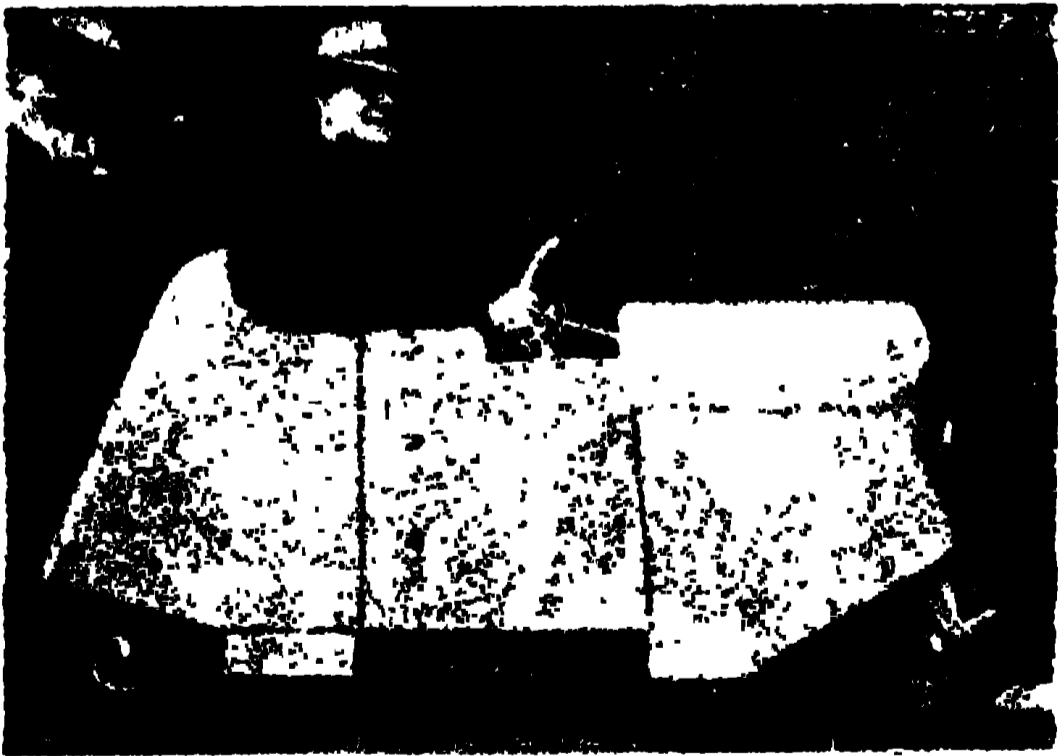


টেলিফোন-টেলিভিশন

এক জন টেলিভিশনে কথা কহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্দার ছ' গিঠে ফুটিল ছ' জনের ছবি। জেনারেল মোটর কোম্পানি আশার বাণী শুনাইয়াছেন, এই টেলিফোন-টেলিভিশন যন্ত্র ছ'-এক বৎসরের মধ্যে সকলের উপভোগ্য করিয়া তাঁরা বাঞ্চারে বাহির করিতে পারিবেন।

চেয়ার-গাড়ী

হুর্কল হুবির বা অশক্ত বৃদ্ধেরা আপনা হইতে গাড়ীতে চড়িয়া পথে একটু-আধটু বাহাতে বিচরণ করিতে পারেন, একত্র ছ'ঘোড়ার শক্তি-

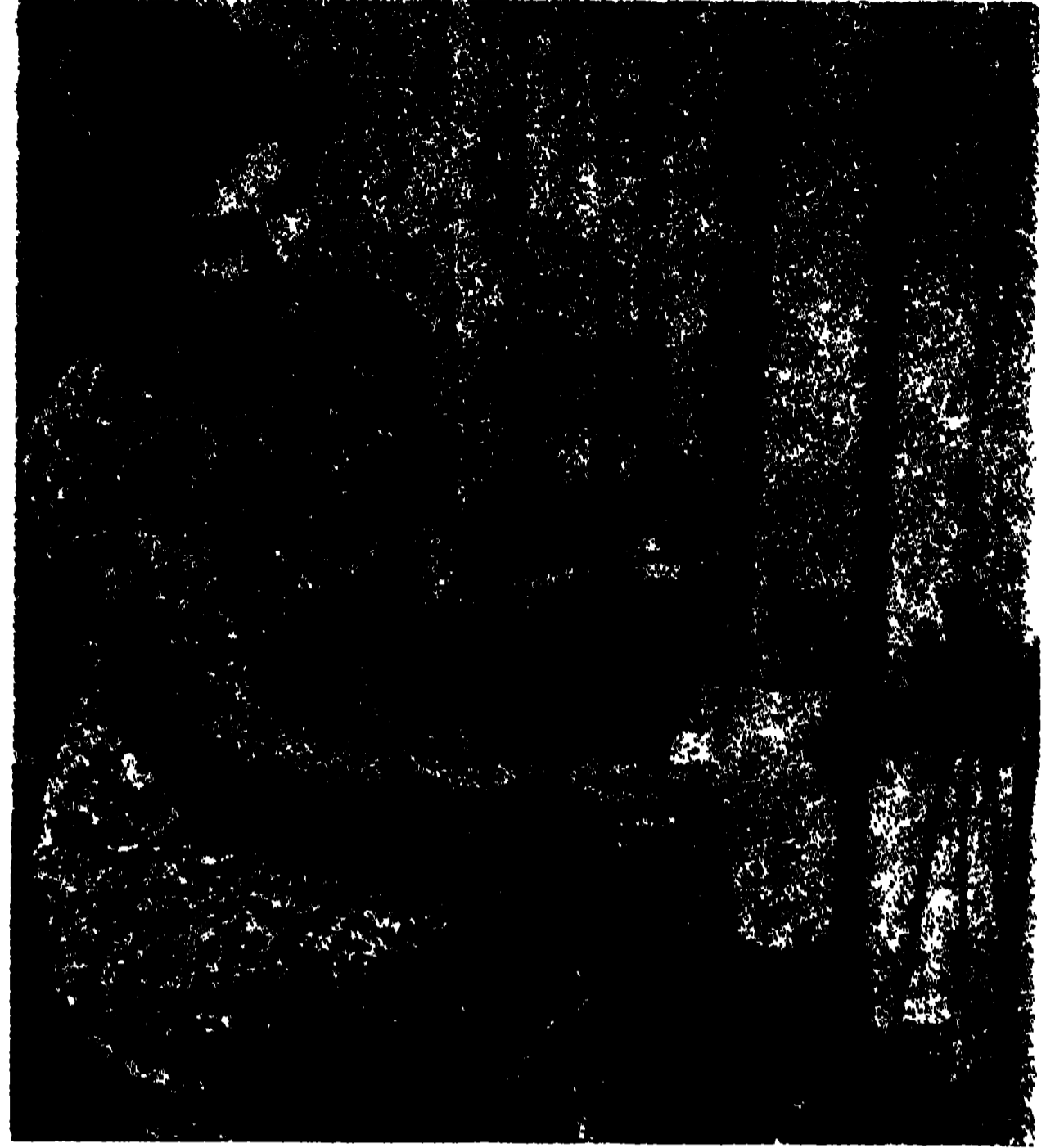


চেয়ার-গাড়ী

সামর্থ্য-সম্পন্ন মোটর-এঞ্জিনযুক্ত চেয়ার-বান প্রস্তুত হইয়াছে। এক প্যালন পেট্রোলে এ-গাড়ী ১০০ মাইল পথ চলিবে; ষ্টীয়ারিং হুইল সাহায্যে গাড়ী চলিবে এবং এ-গাড়ী চালানো খুব সহজ। তার উপর এ-গাড়ী বিশ-মাইল বেগে চলে বলিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ।

পর্দায় ফুলদানী

ঘরের ঘরে-জানলার যে-পর্দা খাটান, সে-পর্দার ঝাজে-ঝাজে



পর্দা-ফুলদানী

ফুলদানী রচিতা তোলা কঠিন নয়। উপরের ছবি দেখুন—পর্দার মাঝে-মাঝে ভাঁজ করিয়া পকেট রচনা করা হইয়াছে।

নেগেটিভের স্বাস্থ্য-রক্ষা

সম্প্রতি এক রকম রাসায়নিক-দ্রাবক তৈয়ারী হইয়াছে। সে দ্রাবকে নরম কাপড় ভিজাইয়া সেই ভিজা কাপড়খানি ফটো-নেগেটিভের গারে মুছ ভাবে ঘষিয়া দিলে নেগেটিভের দেহ এমন হইবে যে,



নেগেটিভের প্রাণ

তাহাতে কখনকালে নখের দাগ, ঝাঁড় বা আঙুলের ছাপ লাগিয়া নেগেটিভ ধারাপ হইবে না; ফিল্ম নেগেটিভ হুন্ডাইয়া বা কুঁকড়াইয়া যাইবে না; এবং নেগেটিভের পরমাণু-হ্রাস বা তার বিনাশ ঘটবে না।

সজীবদর্শন বা প্রত্যক্ষদর্শন

ঈশ্বর—জীবাণু—জগৎ এই তিনের অস্তিত্ব ও সম্পর্ক লইয়াই দর্শনশাস্ত্রের যত আলোচনা। দর্শন হউক বা না হউক, প্রত্যেকেই অন্ততঃ শ্রবণ ও মনন দ্বারা (মনে মনে বিচার দ্বারা) এই তিনের অস্তিত্ব ও সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা ব্যক্তিগত মত পোষণ করে। এ জগতে প্রত্যেকেই দার্শনিক। প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা যতই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, দর্শনশাস্ত্রও ততই উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে থাকে। তবে চিন্তাধারা প্রণালীবদ্ধ ভাবে পরিচালনা করিতে গেলে, চিন্তের স্বৈর্য্য ও প্রতিভার প্রয়োজন। যে যতটুকু ধারণা করিতে পারে, তাহার চিন্তা সেই পর্য্যন্ত উঠিয়া বলে যে, ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই। এই-ই শৈব। অসত্য উলঙ্গ জাতি রক্ষের মধ্যে তাহার ঈশ্বরকে স্থাপিত করিয়া পূজা করে। তাহার শ্রবণ-মননের সাহায্যে বৃক্ষকেই আশ্রয় করিয়া তাহার দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা করে। জগতের প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব দর্শন আছে। নিজে জানিয়াই হউক বা পরের মুখে শুনিয়াই হউক, প্রত্যেকেই একটা বিশিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া চলে, এবং এই বৈশিষ্ট্যই জাতির বন্ধনের আভ্যন্তরীণ সূত্র।

জাতিগঠন সাধারণতঃ এই দার্শনিক মতের উপর নির্ভর করে। হিন্দু ধর্মের জাতিগঠনের কথা এখন বাদ দিলাম। আধুনিক জগতে এই পদ্ধতি অবলম্বনেই জাতি সকল সংগঠিত হইয়া থাকে। হিটলার যে দেশ-জয়ের যুক্তি দিয়াছেন, তাহাও এই দার্শনিক মতের উপর নির্ভর করিয়া। যে জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, ধারণা ও দার্শনিক মত এক ধারায় চলে, হিটলার সেই জাতিকে এক রাইখের অধীনে দেখিতে চাহেন। মুসলমানগণের জাতিগঠনও সেই ভাবেই।

একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। জীলোককে পিতা-মাতা ত্যাগ করিয়া অপরিচিত একটা পুরুষকে স্বামিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই আশ্রয়ে থাকিতে হয়। তাহার চিন্তের আসক্তি তাহাকে

স্বার্থের আশ্রয় গ্রহণ করাইয়া সব ভুলাইয়া দেয়। ঠিক সেইরূপ নিজের দেশ, নিজের ভাই-বোন সব ভুলিয়া গিয়া একই দর্শনের সেবকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া স্বদেশদ্রোহী ও স্বজনদ্রোহী হইয়া থাকে। মূলে হইল এই দর্শন। তাহাদের নূতন চিন্তাক্ষেত্র এক।

গতানুগতিকের দলেই জগতের হাজারকরা ৯৯ জন লোক চলিয়া থাকে। সম্পাদকের মস্তব্য ব্যতীত যেমন স্বাধীন মত কদাচিৎ কেহ পোষণ করিয়া থাকে, তেমনই চলতি মনের সমর্থন করিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ মানব তদনুসারে স্বীয় মতের গঠন করে ও চলিয়া থাকে। রাইনল্যাণ্ডে সবাই টুপী নাড়িয়া হিটলারের নায়কত্ব চাহিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে চিন্তা করিয়া ভাল-মন্দ বিচার করিয়া মতস্থির কে কম জন করিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। গতানুগতিকতাই জগতের মূল নীতি। আদি পিতা আদম যে ভাবে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়াছিল, আমরা আজ পর্য্যন্ত ঠিক সেই ভাবে ঈশ্বরের আকর্ষণে সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিতেছি ও ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। যিশুখৃষ্ট যে ভাবে পোষাক পরিধান করিয়া শিক্ষা দিতেন, পোপাদি যাজকগণ এখনও সেই পোষাকই পরিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যিশুর প্রকৃত ভাব যে কি পরিমাণে বর্তমান, তাহা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা কঠিন নহে। বশিষ্ঠদেব যে ভাবে সন্ধ্যা করিতেন, ব্রাহ্মণগণ সেই ভাবেই অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা মন্ত্র আওড়াইয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তাহারা কি কারণে হীনবল? প্রত্যেকের কার্য্যপদ্ধতি হইতে বুঝা যায় যে, গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ঠাট বজায় রাখিয়া চলা হইতেছে। প্রকৃত পদার্থের বিষয় ধারণাই নাই, তাহাকে উপলব্ধি করা ত দূরের কথা!

আর উপায়ই বা কি? বিষয়সেবী জীব জীবনব্যাপী যে চিন্তায় মগ্ন রহিল, তাহাতেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইল। মনের দৈন্ত্য ঢাকিবার জন্তই তাহার এই ধর্ম্মালোচনার

প্রয়াস। দেহ যখন বিকল হইতে থাকে, তখনই মনের দৈন্ত ধরা পড়ে এবং মানুষ নিজের প্রকৃতির অনুরূপ ক্ষেত্র সন্ধান করিয়া লয়। নিজের চিন্তা বা বিচার করিয়া বুঝিবার মত অবসর ও ক্ষমতা উভয়েরই অভাব হইয়া থাকে।

প্রতিভা কদাচিৎ দেখা যায়। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, যিশু, বহু শতাব্দীতে এক জন জন্মগ্রহণ করেন। স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে তাঁহাদিগকে উপদেশাদি পরিবেশন করিতে হয়। রাজা অশোক রাজার ভাবের বোধ ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ শক্তির আবেশে তাঁহারা ভরপুর হইয়া জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা অতিমানব ও মানুষের শক্তির বাহিরের পদার্থের অধিকারী হইয়া নিজেরা কৃতার্থ হন। উদারচিত্ত অবতারগণ শুধু নিজেরাই তৃপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহারা সকলের জ্ঞান—সর্বপ্রকার লোকের জ্ঞান পন্থা নির্দেশ করিয়া থাকেন। অক্ষম জীব নিজেদের শক্তিহীনতা-হেতু সেই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। যে স্থরে আমরা বাস করি, সে স্থর হইতে অত উচ্চের চিন্তা করাও অসম্ভব। তাই আমরা মহাজন-দর্শিত প্রকৃষ্ট পন্থারই অনুসরণ করি।

অবতারগণ তপস্কার বলে ঈশ্বরের আদেশ ও উপদেশ লাভ করেন। কেহ কেহ ঈশ্বরের পুত্র। সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বর তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতেন। সাধারণের পক্ষে এ সমস্ত ব্যাপার যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। তাই কেহ বা এ সমস্ত অলীক মনে করেন, আর কেহ বা ভক্তিরসে আপ্ত হইয়া, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হন। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যুক্তির বাহিরের পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে কথঞ্চিৎ শিক্ষিতচিত্ত রাজী হয় না। ইহাতে নাস্তিকের সংখ্যা বাড়িতেছে। তাহারা ঠিক নাস্তিকও নয়, আস্তিকও নয়। তাহারা বলে, দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারিলে সবই মানি, সবই বিশ্বাস করি। কিন্তু ধর্ম-জগতে সকলেই শিশু। চিন্তের সৈধ্য না জন্মিলে উচ্চচিন্তা আসে না, এবং মনের শিক্ষা না হইলে ঈশ্বরাদির ধারণা ত দুয়ের কথা, গণিতের সামান্য একটা সমস্যার সমাধান করাই সম্ভব হয় না। মানুষের চিন্তের স্বাভাবিক ধর্ম—সে অজ্ঞানার দিকে

ছুটিতে চায়। এই অজ্ঞানারে পাওয়ার জ্ঞান সেই আদমের যুগ হইতে তাহার যে সাধনা চলিতেছে, তাহার কখনও বিরাম হইবে না। তাই সে বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। অজ্ঞানার মধ্যে সে খোঁজে তৃপ্তি, তাহার পরম প্রিয়ের সন্ধান। যদিও অজ্ঞানারে জানাতেই জ্ঞানের প্রসার, তথাপি অজ্ঞানার পশ্চাতে যদি জ্ঞানার স্থিরাসন না থাকে, তাহা হইলে সে অগ্রসর হইতেই পারে না। এই স্থিরাসন আছে বলিয়াই প্রাকৃতিক দর্শন, সামাজিক দর্শন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন মানুষের চিন্তের ক্ষুধা মিটাইয়া তাহাকে তাহাদের পশ্চাতে ছুটাইতেছে। দিনের পর দিন মানুষ নিত্য নূতনের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইতেছে, এবং আরও নূতনের জ্ঞান উদ্গীৰ্ণ হইতেছে।

শরীরের অধিনায়ক মন। মানুষ শরীরের ক্ষুধা মিটাইয়াই শুধু তৃপ্ত হইতে পারে না বলিয়া তাহার এই আধ্যাত্মিক অভিযান। প্রকৃতির জগতে প্রত্যেক জিনিষই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া যায়। সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বস্তুও মানুষের বুদ্ধির নিকট ধরা দিতেছে। প্রকৃতির নিকট হইতে তাহার এই প্রাপ্তিতে এবং আধ্যাত্মিক জগতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের গতির সম্ভাবনা না থাকায়ও তাহার জ্ঞানের অপ্রাপ্তিতে মানুষ স্বতঃই বাহ্য পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা মানুষকে এই সসীম জগতের কালদেশ পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে তৃপ্ত থাকিতে দেয় না। তাই তাহাকে অসীমের সন্ধানে অনন্তের পশ্চাতে চলিতে হয়।

মনের সাহায্যেই তাহাকে সমস্ত জগতের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়ের খবর লইতে হইবে। সে ত শুধু মনের কাছেই সকল খবর পায়। চোখ দেখে যখন মন দেখে। মন যখন যে বিষয়ে স্থির হয়, তখনই সে সেই বিষয়ের জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। মনের স্থিরতাই জ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। মনের অস্থিরতা মানুষকে জ্ঞানের পথে ছুটায়, আবার জেয় পদার্থে অভিনিবেশ দ্বারা মন স্থির হইলে জ্ঞানলাভ হয়—আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়।

বাহ্য পদার্থ মনকে যখন তৃপ্ত করিতে পারে না, তখন মনকে একটা স্থিরাসন করিয়া লইয়া আভ্যন্তরিক জগতে অসীম ও অনন্তের সন্ধানে যাইতে হয়।

প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ জগতের একটা, না একটাকে স্থিরাসন করিয়া লইয়া এই আস্তর জগতে অসীমের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

জগৎ তাঁহার সৃষ্টি। এইরূপ অসংখ্য জগতের অস্তিত্ব তাঁহাতে সম্ভব। এই ভাবের উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরে স্রষ্টা আরোপিত হইয়া থাকে। এক ক্ষুদ্র মন যখন এত বড় বড় বিষয়ের ধারণা করিতে পারে, তখন এই বিশ্বমানবের মনসমষ্টি কত মহান, কত বিরাট। তাই তিনি বিশ্বাত্মা।

এইরূপে একটা না একটা পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান হইয়া মহাপুরুষগণ তাঁহাদের চিত্তের ক্ষুধা মিটাইয়াছেন। কেহ বিচারমার্গ অবলম্বনে নেতি-নেতি করিয়া তাঁহাতে গিয়া ইতি দিয়াছেন—কেহ বা যোগমার্গাবলম্বনে সমাপ্তি হইয়া অমৃতের আনন্দ লাভ করিয়াছেন—কেহ বা তাঁহার করুণার কথা স্মরণ করিয়া ভক্তিরসে আপ্ত হইয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। মোটের উপর একটা সূত্র অবলম্বন করিয়া তবেই তাহার অন্তকূলে মনের গতিবেগ বন্ধ করিয়া দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি মধ্যপথে মনের চলনায় ভুলিয়া পথিপার্শ্বস্থ শোভায় আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেইখানেই রহিয়া গিয়াছেন। উদ্ধের খবর তাঁহার কাছে আর পৌঁছায় নাই।

সকল মহারথীই একটা না একটা পস্থা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরই হউক আর প্রকৃতিই হউক, এক জনকে আদর্শ রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। চিত্তের অবস্থা অনুসারে ফললাভের তারতম্য হইয়াছে। তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন কি না, তাহার ঠিক নাই, কিন্তু তাঁহাদের পরবর্তী সেবকগণ তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কথোপকথন পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়া ভক্ত সংগ্রহ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সকল মহাপুরুষই বলেন, শাস্ত্রের অনুশাসন—আমার ভিতর দিয়া প্রকাশিত ঈশ্বরের বাণী। আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবেই ঈশ্বরের তুষ্টি হইবে।

এখানে তাঁহারা সর্ববাদিসম্মত হইয়া এক জন স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়া লয়েন। কিন্তু সেই ঈশ্বরকে কেহ দেখিয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের স্বরূপের বর্ণনাতেও যে বিভিন্ন মতের উল্লেখ আছে, তাহাতে কোনও প্রবুদ্ধ-চিত্ত নির্ভর করিতে

পারে না। জীবিত লোকের কেহই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখে নাই। অথচ অতীতে তিনি দেখা দিয়াছেন, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত ধর্মমত চলিয়া আসিতেছে। একটা কিছু অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া তাই সকলে ধর্মকে আশ্রয় করে; প্রকৃত তথ্যলাভে যে কয় জন কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

এই সংশয়ের দোলায় দোহুল্যমান হইয়া ফরাসী দর্শনের প্রবর্তক ডেকার্টিস (Descartes) বলিয়াছেন যে, চিন্তাধারা আরম্ভ হইতেছে নিজেকে লইয়া। সবই অস্বীকার করা যায়, কিন্তু আমি আছি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি (Cogito ergo Sum)।—তিনি এই মতবাদ লইয়া কতক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বাস্তব সত্তার উপর ভিত্তি করিয়া তবে মানসিক বিজ্ঞানের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে তিনিই এই বাস্তবদর্শনের প্রবর্তক।

এই বাস্তবদর্শন বা প্রত্যক্ষদর্শন চরম বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে বেদান্তদর্শনে। বেদান্তদর্শন বেদের সার হইলেও কোনও কিছু বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় নাই। যে জ্ঞানই লাভ করা যাউক না কেন, বিচার করিয়া ও উপলব্ধি করিয়া তবেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অনুভব করিয়াই তবে সত্যের প্রকাশ করিতে হইবে।

অনেকে বলিতে পারেন, আপ্তবাক্য প্রমাণমূলক এবং তাহারই উপর এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেই আপ্তবাক্যও বিনা বিচারে কাহাকেও গ্রহণ করিতে বলা হয় নাই। মানুষের বিচারশক্তি মছন করিয়া যে সত্য লাভ করা যায়—মানুষ প্রজ্ঞাবলে যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, সেই তত্ত্বই গ্রহণযোগ্য, অতথ্য নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণই এই দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

এই দর্শন ঈশ্বর বা অলৌকিক কোনও পদার্থের অস্তিত্বকে ধরিয়া-লইয়া তবে স্বীয় মতবাদ রচনা করে নাই। এই দর্শন দেখাইয়া, শুনাইয়া, বুঝাইয়া, উদাহরণ দিয়া, মনের মধ্যে গাঁথিয়া দিয়া তবেই প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছে। ঈশ্বর বলিয়াছেন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কথা ইহাতে নাই। আবার যুক্তি-গুলিও কঠিন ভাষার আবরণে আবৃত রাখিতে কখনও চেষ্টা

করে নাই। পিতা পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়া একাদি-ক্রমে বহু প্রকারে বহু উদাহরণের সাহায্যে প্রকৃত তত্ত্ব নির্দেশ করাইয়া পুত্রকে কৃতার্থ করিতেন। পুত্রও যতক্ষণ না নিজে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ উপদেশ পাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। শেষে সত্যলাভ করিয়া, 'এইবার আমি ঠিক জানিলাম' বলিয়া জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইতেন। এই প্রকার আধ্যাত্মিক বেদান্তদর্শনের সর্বত্রই দেখা যায়।

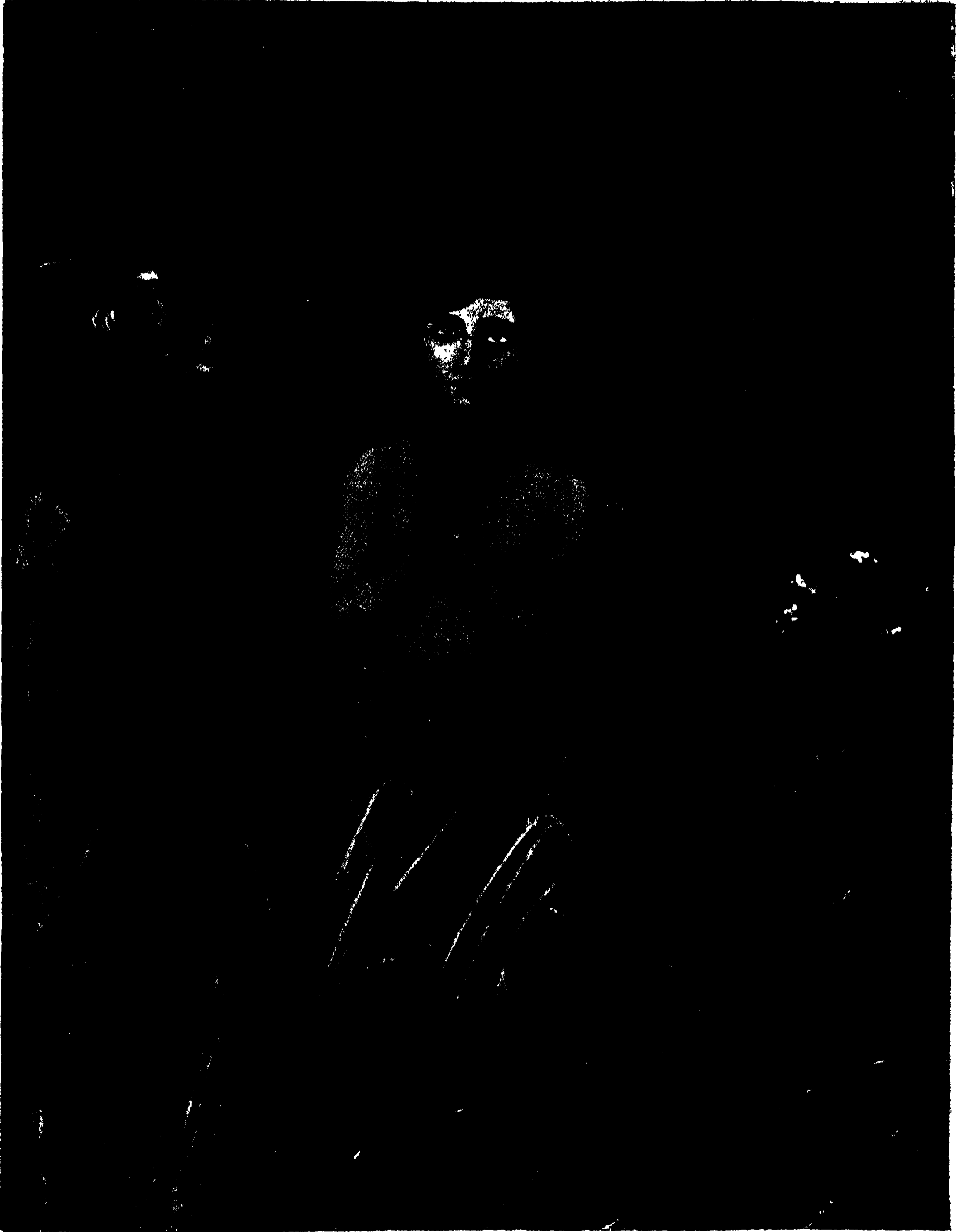
ব্যাসদেব সূত্রাকারে এই দর্শনের প্রণালীবদ্ধ একটি মতবাদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ও বহু ভাষ্যকার প্রতিভার তারতম্য অনুসারে এই দর্শনের মতবাদকে বৃদ্ধিতর্ক সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সকলেই তাঁহার নিজের রঙ্গিন চশমার সাহায্যে এক এক প্রকারে এই দর্শনের আকৃতি দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সব ছাড়িয়া ইহার মূল তত্ত্ব জানিতে হইলে উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

'তুমি' আর 'আমি' এই দুই বাক্যের পার্থক্য লইয়াই প্রথম বুদ্ধির অবতারণা করিয়াছেন আচার্য্য শঙ্কর। জগতে আছে মাত্র বিষয়ী ও বিষয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, আমি ও তুমি। দেহের কথা ধরিলেও দেখা যায় যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহাকে আমি আমার সত্তা বলিয়া মনে করি, তাহা নষ্ট হইয়া গেলেও আমার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, স্মৃতরাং দেহটিও 'আমি' নহি। আমার দেহ। দেহও 'তুমি'র মধ্যে পড়ে। এই দেহকে অবলম্বন করিয়া যে আছে, সে-ই হইতেছে আমি। এই 'আমি'র উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যক্ষদর্শন বেদান্তের উৎপত্তি। প্রথমতঃ এই 'আমি'র বিষয় আলোচনা করিয়া দেখান যায় যে, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বন্ধু, এমন কি এই দেহ পর্যন্তও একটা অভিমান দ্বারা আচ্ছন্ন আছে এবং সেই অভিমানটিই 'আমি' হইয়া রহিয়াছি। আমি অভিমানকে আশ্রয় করিয়া আমার জগৎ সৃষ্টি করিয়া একটা জগৎ-জোড়া 'আমি' হইয়া বসিয়া আছি। এই 'আমি'র কোনওখানে একটু ক্রটি হইলেই আমি আত্মহারী হইয়া যাই। অথচ সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেলেও আমার কিছুই ধ্বংস হয় না। এই ভাবে বিচার করিয়া উপনিষদ দেখাইয়াছেন যে, দৃশ্যমান জগতে যত কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, তাহা আমি নহি, অথচ 'আমি' ছাড়া আর কিছুই

নাই। 'অহং ব্রহ্মাশ্মি', 'তত্ত্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে দেখান হইয়াছে যে—যে আমি এতটুকু হইয়া আছি, সেই আমিই সর্বাত্মা। বুদ্ধিতে পারা যায় না, একেমন হইয়ালি। উপনিষদের ঋষি অমনি উপাখ্যানের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। ইন্দ্র ও প্রতর্দন প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মের উপদেশ পাইলেন। সুররাজ ক্রমাগত তিন বারেও ঠিক বুদ্ধিতে না পারিয়া বার বার দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তবে প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রজাপতি নখ, চুল প্রভৃতির ব্যবধানের দ্বারা দেখাইলেন যে, দেহের পরিবর্তনেও যে পরিবর্তিত হয় না, সেই হইতেছে আত্মা। কিন্তু প্রতর্দন উহা বুদ্ধিতে না পারিয়া দেহকেই আত্মা ভাবিয়া—দেহের উপাসনা করাকেই ব্রহ্মোপাসনা—এই বুদ্ধিলেন। মিশরের মগি-উপাসকগণ, বোধ হয়, প্রতর্দনেরই বংশধর। দেবরাজ বিচার করিয়া দেখিলেন যে, নখ, চুল না থাকিলেও আমার পরিবর্তন হয় না। এই ভাবে কয়েক বার বিভিন্ন প্রকারের উপদেশ পাইয়া তিনি বুঝিলেন যে, সে সূত্র সকলের মধ্যে অনুসৃত রহিয়াছে—অথচ যাহার পরিবর্তন নাই, সেই সূত্রই আত্মা।

শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা দেখাইলেন যে, যেমন বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রাদির মধ্যে একই লৌহ রহিয়াছে, বিবিধ প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে যেমন একই স্বর্ণ রহিয়াছে, তেমনি একই বিরাট আত্মা যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, সে সর্বত্র সমান ভাবে বর্তমান আছে। তত্ত্বমসি—সেই আত্মাই তুমি। জগৎকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই দর্শন লৌহ বা স্বর্ণের বিবিধ অবস্থায় যে নাম ও রূপ রহিয়াছে, সেইরূপ সমস্ত পদার্থই নাম, রূপের বিভিন্নতা দ্বারা জগৎ-রূপে সাজিয়া আছে। প্রকৃত পক্ষে একই আত্মা সর্বত্র অনুসৃত হইয়া আছেন।

ব্রহ্ম অর্থ বৃহৎ। তিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। তিনি সব। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই দর্শন কোনও অননুভূত পদার্থের কল্পনা করে নাই। তোমার, আমার, জগতের সমস্ত বিভিন্নতা বাদ দিলে যে সত্তার সর্বত্র উপলব্ধি হয়, তাহাই ব্রহ্ম। স্মৃতরাং জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতীত অপর কোন বস্তুর সত্তাকে স্থান না দেওয়ায় এই দর্শন সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য, সমস্ত বিচারসহ, এবং



শ্রী

[শিল্পী—শ্রী চরিত্র গাঙ্গুলী]

..

118

সর্ববাদিসম্মত। নিজেই নিজের শক্তিকে পরিচালনা করিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এই দর্শন যে মতবাদের প্রচার করিতেছে, তাহাতে বাদ-বিসংবাদ নাই। বাদীই নাই, বিবাদী কোথায় থাকিতে পারে? ভাল-মন্দের প্রশ্নই এখানে নাই। বিচারের মাপকাঠি নিজে, বিচারক নিজে, আসামীও নিজে, ফরিয়াদীও নিজে। নিজে কি, নিজেই বিচার করিয়া দেখ। বিচারের ফলে যেখানে পৌঁছিতে, সেই পর্য্যন্তই তোমার গতি। কাহাকেও দোষ দেওয়ার কিছুই নাই। নিজেই নিজের জন্ত দায়ী। কত দূর অগ্রসর হইলে, না পিছিয়ে গেলে, কিছুই তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। স্থির হইয়া চিন্তা কর, তবেই তোমার অবস্থা ঠিকমত বুঝিতে পারিবে।

জগৎ সম্বন্ধেও তুমিই বিচার করিয়া দেখ যে, যাহা

দেখ, তাহা ঠিক কি না? উপনিষদের উপাখ্যানগুলির সাহায্য লও, এবং বুঝিতে চেষ্টা কর যে, তোমার বিচার ঠিক হইতেছে কি না? প্রত্যেকেই নিজের কাছে ধরা দিতে বাধ্য। মন্দিরে, মসজিদে বা গির্জায় ভগবানকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার যো নাই। ধরা পড়িতেই হইবে।

এই মতবাদের উপলব্ধির জন্ত মন্দির লাগে না— উপাসনার নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন নাই। হৃদয়-মন্দিরে ভজনা কর বিশ্বেশ্বর বিশ্বব্যাপীকে। সেখানে গেলে বিশ্বই থাকে না। ব্রহ্মের উপাসনা করে ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই অর্পণ হয় ব্রহ্ম হবির। ব্রহ্মই আহুতি দেয় ব্রহ্মাগ্নিতে। ব্রহ্মেই গতি, ব্রহ্মের এই ফললাভ। নির্কালেই শান্তি। জ্বলনই নির্কালের কারণ। শান্তি—শান্তি—শান্তি।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাতের কথা

রাতের বাতাস মৃদু নিশ্বাস ছাড়িয়া বহিছে ধীরে,
বুঝি বা রাতের বেদনা লইয়া ফিরে।
দিবসের শেনে ডুবিল যে-সব গভীর আঁধার দহে'
বাতাসের দূত তাদের বারতা বহে।
ধরণীর বুকে হায়,
বারতা বহিয়া রাতের বাতাস কাহারে খুঁজিয়া যায় ?
পথে নাই পথচারী,
মনের দুঃখ মনেতে রহিয়া হ'য়ে ওঠে আরো ভারী।
কে কোথায় জেগে রয় ?
পৃষ্ঠিত যত গোপন বারতা কার কাছে সে বা কয় ?

রাতের বাতাস দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বহিয়া যায়,
তাহার বেদনা বুঝিবে না কেহ হায় !
বন্ধু ভাবিয়া হৃদয়ের কথা তরুর কাছে সে কয়,
তরুও তখন নীরবে ঘুমায়ে রয়।
পৃথিবীতে কেহ নাই,
বেদনার বোঝা রাখিবার তার নাই যে গো কোন ঠাই।
তখন অসহ দুঃখে,
প্রতি রাতে তার লিখে যায় কথা অসীম আকাশ-বুকে।
সে বাণী গোপনে রয়,
আকাশের বুক-তাই এত কালো—এত রহস্যময় !

শ্রীবিদ্যাসাহায়।



পরাজয়

১

অধ্যাপক প্রশান্ত কলেজে যাইবার জন্ত প্রস্তুত : সহস্রা পত্নী রিণা সেই কক্ষ প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—“রোজই বলব মনে করি, কিন্তু আজ আর না বললে চলছে না।”

প্রশান্ত সেই কক্ষের দেয়ালে সংরক্ষিত বড় ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, “এখন আমার কোন কথা শুন্বার সময় হবে না ! আর এটা কথা বলবার সময় নয়।”

রিণা ঝঙ্কার দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “রাতে ভাইপোর পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাক, তখন শুন্বার অবসর হয় না ; সকালে কলেজের তাড়া।—তা হ’লে দেখি, আমার আর বলা হয় না।”

রিণা একখান চেয়ারে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া-পড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিল, “তোমার এই চারটি শ’ টাকা রোজগারে এত বড় সংসার প্রতিপালন করা—কার সাধ্য তা বলতে পারো ?”

প্রশান্ত রিণার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “যত দিন চাকরী ছিল, সংসারে দিয়েছেন, এখন চাকরী নেই—দেবেন কোথা থেকে ?”

রিণা বলিল, “কিন্তু আর একটা চাকরীর জন্ত চেষ্টাও ত করেন না। ছেলে-মেয়েই তাঁর সাতটি পুষ্টি—আজকালকার যুদ্ধের এই দুর্শ্ল্যের বাজারে...চলে কি ক’রে ?”

প্রশান্ত বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ‘টাইটা’ ঠিক বাধা হইল কি না দেখিতেছিল। অগ্ণাৎ দিন রিণাই তাহার ‘টাই’ বাধিয়া দিত ; আজ তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া প্রশান্ত এ কাজে তাহার সাহায্য চাহিল না।

প্রশান্ত বলিল, “আর এক যুদ্ধের সময় আমি ছোট ছিলাম, দাদাই কত কষ্টে আমাকে মানুষ ক’রেছিলেন ; আর এবার তিনি সপরিবারে কি না খেয়ে মরবেন, এই কথা বলতে চাও ?”

রিণা ক্রোধভরে বলিল, “কেন, তাঁরা দেশের বাড়ীতে গিয়ে ত থাকতে পারেন। তোমারও ত দু’টি ছেলেমেয়ে। মেয়েকে তিনি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিন। ছেলেকে চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করতে বলুন।”

প্রশান্ত রিণার কথায় কোন গম্ভব্য প্রকাশ না করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

দাদা বিজয়ের পাঁচ পুত্র, ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবিনয় ‘আই-এ’ দিবে। প্রথমা কন্যা লীনা ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে।

প্রশান্ত ভ্রাতৃপুত্র সুবিনয়কে লেখাপড়া শিখাইতেছে, ইহাতেই রিণার বৃকে ঈর্ষ্যার আগুন জলিতেছে।

বিজয়ের স্ত্রী সুরমা পল্লীগ্রামের মেয়ে। স্বভাবটি নম্র ; স্বামীর চাকরী যাওয়াতে ছোট জা’য়ের অত্যাচার নীরবে সহিয়া যাইতেছিল। ইহাতে রিণার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতেছিল না। সে এক্ষণে কি কৌশলে ইহাদের তাড়াইবে, তাহারই ফন্দী খুঁজিতেছিল।

স্বামীর চাকরী যাওয়াতে সুরমা উড়িয়া পাচকটিকে বিদায় দিয়া নিজেই দুই বেলা রান্না করিতেছে। একটি মাত্র দাসী আছে ; সে রিণার ছেলেমেয়ে লইয়াই ব্যস্ত। কাজেই সুরমার এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই।

রিণা সহরের শিক্ষিতা মেয়ে—আধুনিকা। সে অত ঝঙ্কি পোহাইবে কেন ? তাহার ইচ্ছা—উহাদের পৃথক্ করিয়া দিয়া সে সংসারের কর্ত্রী হইয়া বসিবে ; বড় জা’কে আমোল দিবে না। কিন্তু নির্কোষ প্রশান্ত তাহার এই সাধু সঙ্কল্প বুঝিতে পারিতেছে না ! এই জন্তই রিণার সকল আক্রোশ বড় জা’য়ের উপর।

দারুণ শীতের প্রত্যুষে উঠিয়া বড়বৌ রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া যথাসময়ে স্কুল-কলেজের ভাত দিবে, আর রান্নাঘর হইতে বাহির হইবে বেলা দু’টায়।—তাহার এই প্রাণপণ পরিশ্রমও অশিক্ষিতা রিণার নিকট তুচ্ছ ; নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য।

২

পরদিবস প্রশান্ত আহারে বসিয়া বলিল, “বৌদি, .. দাদা কি কোন কাজের চেষ্টা ক’রছেন? শুন্ছি, আমি একা না কি পেরে উঠছি না—এত বড় সংসারের ভার!”

সুরমা প্রশান্তকে পরিবেশন করিতে করিতে চমকিয়া উঠিল। প্রশান্তের মুখ হইতে যে এ-রকম কথা বাহির হইবে, সুরমা পূর্বেই তাহার আভাস পাইয়াছিল—রিণার কয়েক দিনের ব্যবহারে।

সুরমা বলিল, “তুই-এক যায়গায় চেষ্টা কচ্ছেন বৈ কি! বুকের বাজার কি না, বলছিলেন—কোথাও তেমন সুবিধে হ’য়ে উঠছে না; আর, হিন্দুরা না কি চাকুরী পাবেও না।”

রিণা কোন দিন প্রশান্তের আহারের সময় নীচে নামে না। বোধ হয় ঐ কথাগুলি শুনিবার জন্তই সে দিন ছেলের দুধ লইবার অড়িলায় সে নীচে আসিয়াছিল।

প্রশান্তের কথা শুনিয়া রিণা বলিল, “উনি ত নবাব খাজা খাঁ নন যে, গোষ্ঠীশুদ্ধ পুষ্টে পারবেন!”

প্রশান্ত রিণার কথাগুলি শুনিয়া একটু জোর পাইল; বলিল, “ছেলের জন্মতিথিতে কিছু খরচ আছে। আমার প্রফেসর বন্ধুদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করতে হবে।—এ দিকে আবার তোমার ছেলে-মেয়ের পরীক্ষার ফি...”

রিণা দ্বিতলের সিঁড়ির দিকে আসিতে আসিতে ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল, “নিতি নেই, ছায় কে?—নিতি রোগী দেখে কে? মেয়ের পড়া ছাড়িয়ে দাও। ছেলে কোথাও কাজকন্মের চেষ্টা করুক।”

সুরমার কণ্ঠে কথা সরিল না। ইহার কয়েক মিনিট পরে সে যখন দুধের বাটিটা প্রশান্তের পাতের কাছে রাখিয়া দিল, তখন তাহার সজল চক্ষু হইতে এক ফোঁটা অশ্রু হঠাৎ প্রশান্তের হাতের উপর পড়িল। সুরমা ইহা জানিতে পারে নাই; কিন্তু প্রশান্ত কিছু কাল গুম্ব হইয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

সে দিন কলেজের ছাত্রদের বিশ্বয়ের অবধি রহিল না! প্রফেসর মহাশয় অনবরত অসংলগ্ন কথা বলিয়া যাইতেছিলেন; যেন তিনি ঘোর অশ্রমনস্ক!

কলেজ হইতে বাড়ী আসিয়া, বিজয়কে ধর্মাস্ত্র কলেবরে ফিরিতে দেখিয়া প্রশান্ত ক্রুদ্ধচিত্তে খানিকক্ষণ

তাহার দিকে চাহিয়া-থাকিয়া বলিল, “এত রোদ্দুরে কোথায় গিয়েছিলে দাদা?”

বিজয় কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, “একটা কাজের চেষ্টায় ক-দিন থেকে হাঁটা-হাঁটি করছি কি না; কিন্তু কোন সুবিধে ক’রে উঠতে পারছি নে।”

প্রশান্ত খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, “তোমার কি কোন-কিছুর অভাব হচ্ছে? আর কে তোমাকে এই ছপুয়ে রোদে চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে ব’লেছে? এই ছপুয়ে রোদে আর তুমি ঘুরে বেড়িও না দাদা!”

—“তুই আর কত পেরে উঠবি ভাই?...তবু যদি মাসে ত্রিশটে টাকাও আনতে পারি...” বিজয়ের কণ্ঠস্বর বেদনাপূর্ণ।

বিজয়ের কথা শেষ না হইতেই প্রশান্ত কিঞ্চিৎ উপেক্ষাভরে বলিল, “মাসে ত্রিশ টাকার আঁমার কিছুই সাশ্রয় হবে না। তার জন্তে এই কাঠ-ফাটা রোদে হয়রান হ’য়ে লোকের—”

বিজয় বাধা দিয়া বলিল, “কিন্তু ছেলে-মেয়ের পরীক্ষার ফি, তাদের পড়ার খরচ—এ সবই ত আছে।”

প্রশান্ত বিচলিত স্বরে বলিল, “তোমার ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ তা ব’লে কখনও কি আটকিয়েছে,—না—ছেলের পরীক্ষার ফি—দিতে এখনই আটকাবে?”

বিজয় বলিল, “থাক—এখন ও সব কথা। এখন জল-টল খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ’ ভাই!”

রাত্রিতে প্রশান্ত শয়ন করিলে রিণা ক্রুদ্ধা বাধিনীর মত গর্জন করিয়া বলিল, “এই বিঘ্নে নিয়ে তুমি ‘প্রোপেসারি’ কর—এই বড় তাজ্জবের কথা! তোমার দুঃখ এ-জন্মেও যাবে না। যে পুরুষ স্ত্রীর কথা না শোনে—সে আবার মানুষ? ও-বেলা তুমি আর এমন কি কথা বলেছো? সেই কথা লাগানোতেই ত তোমার দাদা অত রোদ্দুরে কাজের চেষ্টায় বেরিয়েছিলেন। বাবা:, সে কি খোঁটা! বলা হলো—‘দেওরের মুখ নাড়া খেয়ে আর ক-দিন চালানো যাবে?’”

রিণার কথায় যে অত্যাক্তি ছিল, প্রশান্ত ইহা বুঝিতে পারিল। সে বিরক্তি সহকারে বলিল, “একটু ঘুমোতে

দাও—রাত হ'য়েছে। ও-সব বচন এখন মূলতুবি রাখলেও কতি নেই।”

রিণা আশন-মনে খানিকক্ষণ 'গজর-গজর' করিয়া পাশ ফিরিয়া গুইল।

৩

দুই বৎসর পরের কথা।

বিজয়ের ভাগ্যে আর চাকুরী জুটিল না। এত দিন এত চেষ্টা করিয়াও সামান্য কুড়ি টাকার একটা চাকুরীও সে মিলাইতে পারিল না।

সংসার ঠিক একই ভাবে চলিয়া যাইতেছে; আলো-ছায়ার খেলার বিরাম নাই।

এবার প্রশান্তের কন্যার জন্ম-তিথির উৎসব হইবে। রিণা হীরার আংটির ফরমাস করিয়াছে,—প্রশান্তকে তাহা কিনিয়া দিতেই হইবে।

রিণা এই উপলক্ষে তাহার পিত্রালয়ে নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠাইল, এবং দুই-এক জন আত্মীয়া ও বান্ধবীকেও নিমন্ত্রণ করিল।

জন্মতিথির ঠিক পূর্বেদিন সন্ধ্যাকালে প্রশান্ত তাহার ঘরের ভিতর বহুক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। রিণার নিকট কথাগুলি প্রকাশ করিতে তাহার কিঞ্চিৎ কুণ্ঠা হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহা তাহাকে তখন না বলিলে পরদিন হয় ত সকলের নিকট তাহাকে অপদস্থ হইতে হইবে। বিশেষতঃ, রিণার প্রকৃতি তাহার অজ্ঞাত নহে।

প্রশান্ত সেই কক্ষে পায়চারী করিতে করিতে সহসা চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া বলিল, “আমি মনে কচ্ছি...কাল এক সঙ্গে দুই কাজই শেষ করবো। সুরেশের পৈতেটাও না দিলে আর ভাল দেখাচ্ছে না।”

আসন্ন ঝড়ের পূর্ব-মুহূর্তে আকাশের অবস্থা যেরূপ ভীষণ হয়, রিণার মুখমণ্ডল তাহার অপেক্ষাও ভীষণ গম্ভীর হইল। রিণার সকল সঙ্কল্পই ইহাদের দ্বারা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহার কোন আশা পূর্ণ হয় না; ইহাই হইল তাহার ভীষণ ক্রোধের কারণ। রিণা জুড়া ভুজঙ্গিনীর গায় ফাঁস করিয়া গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, “তোমার মনের ভাবটা কি খোলসা করে বল তো শুনি আমি।”

প্রশান্ত বিচলিত স্বরে বলিল, “মনের ভাব আর কি ?

তুমি শিক্ষিতা হ'য়েও সংসারের খরচ সামলিয়ে চলতে পার না, সে দোন কি আমার ? ছেলেটার পৈতে ত দিতেই হবে ; আর যদি এক খরচেই দুই কাজ হ'য়ে যায়, তাতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে ?”

রিণা কাঁচের সহিত বলিল, “সে কাজ পরে করলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো না। আর কালীঘাটে গিয়ে পৈতে দিয়ে আনলে খরচও বেশী লাগে না। তুমি আমাকে তোমার দুঃমন ব'লেই মনে করো—তা কি আর আমি জানিনে ?”

প্রশান্ত একটু নরম স্বরেই বলিল, “তুমি এটুকু বুঝলে না ! তোমার মেয়ের জন্মতিথির যা উৎসব সবই হবে ; লোকও বিস্তর নেমস্তন্ন করা হ'য়েছে। ঐ সঙ্গে ঐ বাজাটটা মিটিয়ে ফেলতে কোন মুশ্কিল নেই।”

রিণা এবার তাহার শাণিত অন্ত কোমমুক্ত করিল ; হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, “আগে জানলে আমি মা-বাবাকে নেমস্তনের কার্ড পাঠাতুম না কখনো। তাঁরা কোন দিন ধারণাও করতে পারেননি যে, আমার হাত-পা বেঁধে কি ভাবে আমাকে মাঝ-দরিয়ায় নিক্ষেপ করেছেন ! ওঃ, এত লাঞ্ছনাও আমার ভাগ্যে ছিল ! মা বসুন্ধরা দ্বিধা হ'লে আমি—”

কিন্তু বসুন্ধরা দ্বিধা হইবার পূর্বেই প্রশান্ত নির্দাক ভাবে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মেয়ের জন্মতিথির উৎসব ও ভাস্করপোর উপনয়ন উপলক্ষে রিণার পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন।

রিণার মাতা জামাতার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া ভয়ঙ্কর চটিয়া উঠিলেন।

সুরেশের অঙ্গুলীতে মূল্যবান অঙ্গুরী, পরিধানে গরদের জোড়—উপনয়নের কোন উপকরণের বা অলুষ্ঠানের কোন ক্রটি হয় নাই। প্রশান্তের কন্যার জন্ম হীরাবসানো আংটি কেনা হয় নাই, এ জন্ম রিণা নবকীত অঙ্গুরীটি কন্যার আঙ্গুলে পরায় নাই।

রিণার পিতা-মাতা অবিলম্বে কন্যার সঙ্গতির একটা ব্যবস্থা না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করা সঙ্গত মনে করিলেন না।

নিমন্ত্রিতদের আহ্বার সমাধা হইলে প্রশান্ত তাহার

ঘরে প্রবেশ করিল। তখন মা ও মেয়েতে মহোৎসাহে পরামর্শ চলিতেছিল।

প্রশান্ত একটু শঙ্কাকুল চিত্তেই ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বস্তর-শাশুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আজই কি আপনাদের বাড়ীতে না গেলে হ’ত না?”

প্রশান্তের শাশুড়ী মাথা কাত করিয়া যতখানি সাধ্য তীব্র বিষ ঢালিয়া বলিলেন, “থাক্তে আর দিচ্ছ কই বাবা! আমি ভেবেছিলুম, সুপাত্রে পড়েছে—মেয়েটা আমার খাসা সুখেই থাকবে। কিন্তু এখন দেখছি, আমার সেটা ভুল ধারণা!”

সেই কক্ষে প্রবেশের পূর্ব-মুহূর্তে প্রশান্ত যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিল।

স্বস্তর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহাকে বলিলেন, “এ সব কি দেখছি! জান ত আজকালকার বাজার,... এত ধুমধাম করবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তোমার ভাইপোর উপনয়নের কথা আমি বলছি-নে। গীরার জন্ম-তিথি উপলক্ষেই বা এত খরচপত্র করা কেন? একে এতগুলি কুপোষ্য প্রতিপালন করতে হচ্ছে,—তারা তোমার ঘাড়ে চেপে খাসা গুছিয়ে নিচ্ছে;—আর তুমি দিল-দরিয়া হ’য়ে দু’হাতে টাকা উড়ো’চ্ছে! ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয় বাবাজি!—বিয়ে-থাওয়া ক’রেছো, দু’ ছেলের বাপ,—আরও যে না হবে, তাও ত নয়।”

স্বস্তর মহাশয়ের অতগুলি উপদেশ এক সঙ্গে শুনিয়া প্রশান্তের মনের গতি কিরূপ হইল, তাহা অত্রের বুঝিবার উপায় রহিল না।

প্রশান্ত বলিল, “কি করবো বলুন! আমাকেই ত সব কর্তে হচ্ছে। তা ছাড়া উপায় কি?”

এবার শাশুড়ী বাকা মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, “তুমি সব ঘাড়ে নিয়েছো বলেই ত তোমাকে করতে হচ্ছে। কথায় বলে, ‘ভাই ভাই, ঠাই ঠাই!’ সে কথা কি তোমার মনে আছে?”

প্রশান্ত তর্ক এড়াইবার জন্ত বলিল, “ঠিক ব’লেছেন, আমি গোড়ায় অতটা বুঝতে পারিনি। এদার আমার চৈতন্য হ’ল; আপনাদের মত হিতৈষী আমার আর কে আছে এ বিশ্বসংসারে?”

প্রশান্তের কথাগুলি শাশুড়ীর মনের মত হইল। উপদেশ

নিষ্ফল হয় নাই বুঝিয়া তিনি সঙ্কট চিত্তে বলিলেন, —“মেয়েও ত’ বড় হ’য়েছে। পার তোমাকেই কর্তে হবে।...কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না।”

কথাগুলি শুনিয়া প্রশান্ত মাথা চুলকাইতে লাগিল; এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “আমাদের গাঁয়েই দেখে-শুনে ওর বিয়ে দিতে হবে।”

স্বস্তর বলিলেন, “তোমাকে দেখবার কেউ নেই, কিন্তু তাদের দেখবার জন্ত তুমি আছ ব’লেই তারা হাত-পা গুটিয়েছে। তা যাই হোক, এখন থেকে ভাবতে শেখ বাবাজি! আমার চুল পেকে গেল সংসার টানতে টানতে; তুমি ত ছেলে মানুষ। বুড়োর কথাগুলো স্মরণ রেখো।”

রিণা নিতান্ত ভালমানুষের মত মা-বাপের কথাগুলি শুনিতো লাগিল; তাহার বড়ই মধুর মনে হইল। বড় ভাই কি স্বস্তরের চেয়ে আপন? ভুল! উত্তমার্জ জীর পূজনীয় পিতাঠাকুর অপেক্ষা গুরুতর গুরুজন আর কে?

প্রশান্ত যখন সেই কক্ষের বাহিরে আসিল, তখন সুরমা ও বিজয় পুত্রকন্যা সহ প্রসন্ন মনে আলাপ করিতে-ছিল। তাহাদের সম্মুখে আসিয়া প্রশান্ত কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, “তোমাদের জন্তে আমার সবই গেল শুনছি! অবশেষে আমাকে না কি ভিক্ষার ঝুলি সঞ্চল ক’রে ঘুরতে হবে—এই বিশ্বমাঝে!”

মুহূর্তে সকলের হাসিমুখ ম্লান হইয়া গেল। বিজয় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিল, “পৈতের জন্তে এত বেশী খরচ করবার কি দরকার ছিল ভাই!”

প্রশান্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, “তা বললে কি হয়? সবই যে তোমাদের চাই। আমার প্রচণ্ড চৈতন্য হ’য়েছে। কাল থেকে তোমাদের সংসার বুঝে নিও।”

প্রশান্ত শয়ন-কক্ষে আসিয়া শয্যায় গুইয়া পড়িল। রিণা বহু দিন পরে পরম আগ্রহভরে প্রশান্তকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, “ভেবেছেন ঠাণ্ডা, দেওর টাকার কুমীর—যত ইচ্ছে শুবে নিই। আলাদা হ’য়ে এখন সংসার চালিয়ে দেখুন—কত ধানে কত চাল!”

রিণার পিতা-মাতা ইহার কিছুক্ষণ পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন। প্রশান্তের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া রিণা পুনরায় বলিল,—“দেখলে ত, তোমাকে একবার খেতে বললে? কেমন বিবেচনা দেখ!”

প্রশান্তের চক্ষু তখন নিদ্রাজড়িত, তথাপি সাগ্রহে সে বলিল, “বৌদি অনেকক্ষণ আমাকে ও দাদাকে এক সঙ্গে ধাইয়েছেন। তুমি ত কোন দিন আমার খেতে দাও না; অকর্ম্মার ধাড়ী। কেবল পরের কাজের খুঁত ধরো,—খবরের কাগজের সম্পাদকগুলার মতো।”

রিণা বক্রমুখে বলিল,—“তা জানলে আর ও কথা বলতে না; জান না ত—আমি তোমাকে পরিবেশন কর্ত্তে গেলে, দিদি অমনি বলে ওঠে—‘ধাক্ ধাক্, আমি দিচ্ছি, তুমি বুঝে দিতে পারবে না। তার একটু মাছ-তরকারী বেশী লাগে’—কত যেন দরদ।”

প্রশান্ত তৃপ্তিপূর্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “বৌদি’র হাতেই ত মানুষ হ’য়েছি; আমার খাওয়ার সম্বন্ধে বৌদি’র যতটা বোঝে—এমন আর কে বুঝবে? বৌদি’ই ত তোমাকে রান্না শিখালো; এখন তোমার গুরুমারা বিচ্ছেদ হ’য়েছে।”

রিণা কথাটার মোড় ফিরাইয়া বলিল, “তুমি তাহ’লে বড় জানো! ভালো ভালো পেটির মাছগুলো সবই ভান্নর আর তার ছেলে-মেয়েদের জন্তে রেখে দেয়। তুমি বাজারের খরচ কি কম দাও?”

প্রশান্ত তিস্তস্বরে বলিল, “উপদেশ থাক্, তুমি চূপ কর; শরীরটা ভাল লাগছে না। তুমি যাও, খেয়ে এস।”

রিণা বলিল, “আমার খাওয়া মায়ের সঙ্গে ঢের আগেই হ’য়ে গিয়েছে।”

প্রশান্ত বলিল, “বৌদি’র খাওয়া বোধ হয় এখনও হয়নি। তুমি তাঁকে দিয়ে এস।”

রিণা প্রশান্তকে চিনিত; প্রশান্ত একটুতেই নরম হইয়া যায়। এই বুদ্ধিহীন অস্থিরমতি স্বামীকে সে কোনও প্রকারে কায়দায় আনিতে পারিতেছিল না; এ জন্ত তাহার নারী-জীবনে প্রচণ্ড দিক্কার জন্মিয়াছিল। এত কৌশল, অভিনয় সবই বৃথা!

রিণা বলিল, “তাকে আর বলতে হবে না। কোন সকালে সে খেয়ে নিচ্ছে। নিজের পেটের দরকার সে ভালই বোঝে।”

প্রশান্ত ত্রস্তভাবে শয্যাভ্যাগ করিয়া বিজয়ের শয়ন-কক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল, দ্বারের অর্গল বন্ধ।

পরের দিনের কথা।

রিণা প্রত্যাষে উঠিতে পারিত না; বেলা আটটার পর শয্যাভ্যাগ করিত। কক্ষের বাড়ী, অধিক রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিল, সে জন্ত পরদিন উঠিতে তাহার আরও খানিক বেলা হইল। সুরমার তখন প্রায় অর্ধেক রান্না শেষ হইয়াছে; পুত্র-কন্যারা স্নান করিয়া আহারে বসিয়াছে। প্রশান্ত স্নান করিতেছিল।

রিণা ভাবিয়াছিল, বড়বৌ পৃথকভাবে রান্না করিবে। কিন্তু প্রশান্তকে স্নান করিতে দেখিয়া রিণা অধিমূর্ত্তি ধরিয়া স্নানের ঘরের সম্মুখে গিয়া বলিল, “এ কি রকম দেখছি? কাল কি বলিছিলে—আমার মা-বাবার সামনে?”

প্রশান্ত ক্রোধভরে বলিল, “এক জন বেলা ন-টা পর্য্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোক, আর সকলে না খেয়ে কলেজে-স্কুলে যাক।”

রিণা বলিল, “ভদ্রলোকের এক কথা; কিন্তু এখানে সবই উল্টো।”

সে ক্রোধভরে একেবারে রান্না-ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। একটু ভাবিয়া ঝড়ের মতো বেগে বলিল, “ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি; কিন্তু এমন নিধিরে, নাতখোয়ারী মেয়েমানুষ আমি জীবনে দেখিনি!”

সুরমা ছোট জায়ের কঠোর তিরস্কার আমোলে না আনিয়া মূছ স্বরে বলিল, “তুমি রাঁধতে এলে আমি কি আসতুম? আমি না এলে ঠাকুরপো কি কলেজের ভাত পেতো? না খেয়ে কলেজে যাবে—সেটা ভাল মনে হয়নি।”

“না হয়—না খেয়েই যেতো। তোমাকে সে কথা ভাবতে ত বলেনি কেউ। ভারী দরদ! স্পষ্ট বললেই হয়—নিজের ছেলে-মেয়ে স্কুল-কলেজে যাবে, সেই জন্তেই সকালে রাঁধবার এত তাড়া।”

সুরমা এ কথাও প্রতিবাদ না করায় রিণা গম্ভীর-গম্ভীর করিতে করিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে প্রশান্ত আহারে বসিলে সুরমা বলিল, “কাল থেকে যা জুটবে তাই খাবে ওরা। আর এত গম্ভীর ভাত মুখে তুলতে ইচ্ছা হয় না। ছোটবৌ আমাকে যা-না-তা’ বলে বকে গেল।”

প্রশান্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, “বলবে না? একশ’ বার বলবে! তার গায়ের জ্বালায় বলে। তোমাদের হিংসেয় সে কি কম জন্ছে? তার সংসার—সে কোথায় কর্তৃত্ব করবে, না তাকে পরাজয় স্বীকার ক’রে নীচু হ’য়ে থাকতে হ’য়েছে! এতে গায়ে জ্বালা ধরে না?”

প্রশান্ত আহার শেষে হাত-মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, “দাদা একটা কাজের চেষ্টাও করুছেন না, তাঁর ত বিবেচনা করা উচিত।”

ছপুর্বে বিজয় আহারে বসিলে সুরমা বলিল, “দেখ, একটা কাজ-কর্মের চেষ্টা কর। ঠাকুরপো ত জবাব দিয়েছে। ও-বেলা আলাদা হ’য়ে রাঁধবার হুকুম দিয়েছে।”

বিজয় ভাতগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ভাল করিয়া তাহার খাওয়া হইল না।

সুরমা রিণাকে আহারের জন্ত ডাকিল। রিণা ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল, সে নিজেই বাড়িয়া লইবে।

সুরমা সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া রান্নাঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া যখন দ্বিতলে উঠিল, তখন বিজয় একটা ছাতা হাতে করিয়া নীচে নামিতেছিল।

সুরমা বলিল, “এই খেয়ে উঠলে, একটু জিরিয়ে বেরুলে হ’ত না?”

বিজয় বলিল, “এক জায়গায় একটা কাজের ঠিক হচ্ছে, দেখি কি হয়।”

ও

বিকালে স্কুল-কলেজের ছুটি হইলে বিজয়ের ছোট-ছোট পুত্র-কন্যা জলখাবারের জন্ত আবদার করিল; সুরমা অমুখের ভাণ করিয়া নীরব রহিল। শুষ্কমুখে তাহারা খেলা করিতে চলিয়া গেল।

রিণা প্রশান্তের বৈকালিক জলখাবার, ও পুত্র-কন্যার জলখাবার দাসীকে দিয়া দ্বিতলে পাঠাইয়া রান্না চাপাইল। প্রশান্ত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াই কি ভাবিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রিণা উপরে গিয়া দেখিল, টেবিলের উপর প্রশান্তের জলখাবার পড়িয়া আছে; খাবারগুলিতে হাতও পড়ে নাই।

* * * *

বিজয়ের ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকুরী হইয়াছে। সুরমা পৃথকভাবে রাখিয়া স্বামী-পুত্রদের খাইতে দিয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও তাহার নিস্তার নাই। রিণা প্রত্যেক বিষয়ে একটা না একটা খুঁত ধরিয়া তাহার কলহের পেশা বজায় রাখিল।

প্রশান্তের কন্যা মীরা সুরমার কাছে খাইবার জন্ত আবদার করিত। রিণা তাহার দাসীকে দিয়া তাহাকে অল্প কোথাও সরাইয়া দিত।

একই রান্নাঘরে দুই পরিবারের রান্না হইয়াছে। প্রশান্ত আহারে বসিয়াছে। রিণা পরিবেশন করিতে করিতে বলিল, “একটা ঠাকুরের ব্যবস্থা কর।”

প্রশান্ত শ্লেষভরে বলিল, “বৌদি’ এতগুলি লোকের রান্না একাই করতেন,—তাঁর কোন দিনও ঠাকুরের দরকার হয়নি। আর দুটো লোকের রান্না, তাও একখানার বেশী ছুঁখানা তরকারী হয় না, কাজেই ঠাকুর না হ’লে কি ক’রে চলে?”

রিণা ঝাঁঝিয়া বলিল, “আমরা পাড়াগাঁয়ের বাদী-ক্রাশের মেয়ে নই যে—রান্নায় ঝালু হব।”

শুনিয়া সুরমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সুরমা তাহার দেবরটির মনোভাব পুরাদস্তুর জানিত। আহারের সময় সে নিজে পরিবেশন না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না। সুরমা খানিক ইতস্ততঃ করিয়া মাছের কোলের বাটিটা প্রশান্তের পাতের কাছে রাখিয়া আসিল।

প্রশান্ত সুরমার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আমাদের বাজার থেকে তুমি আনাড়-তরকারী নিলেই পারতে। তোমার হেঁসেল থেকে দিলে তোমাদের কুলোবে না বৌদি’!”

সুরমা ভারী গলায় বলিল, “কুলোবে, তুমি খাও।”

প্রশান্ত আহার শেষ করিয়া বলিল, “গয়লা তোমাদের দুধ দিয়েছে?”

সুরমা বলিল, “দুধ কি হবে ঠাকুরপো! আমার কোলে ত কচি-কাচা নেই!”...

প্রশান্ত তাহার মনের কষ্ট বুঝিয়া নির্ঝাক রহিল।

* * * *

দুই মাস পরের কথা।

সে দিন কলেজ হইতে প্রশান্ত আসিয়া রিণাকে বলিল, “লীনার বিয়ের ঠিক করুন। এবার তোমার

মাকে তিন-চার দিন আগে থেকে আনতে হবে। কারণ বৌদি' ত তেমন পাকা গিন্নী ন'ন ?...কি বল ?”

রিণা বলিল, “তোমার ভাইবির বিয়েতে আমার মা এসে কি করবেন ?”

প্রশান্ত সহজ স্বরে বলিল, “ভাইবির বিয়ে দিচ্ছে কে ? আমাকেই ত সব করতে হচ্ছে। যাতে কাজটা নির্বিঘ্নে শেষ হয়, সেটা ত করা দরকার।”

রিণা বলিল, “কত দিতে হবে ! পাত্র কেমন ?”

প্রশান্ত বলিল, “পাড়াগাঁয়ের ছেলে, চাষ-আবাদ আছে। বেশী কিছু দিতে হবে না। টাকা শ' চারেকের মধ্যেই সব হ'য়ে যাবে। তুমি কাল লীনার হাতের চুড়ীর মাপটা ভাল ক'রে নিও। বৌদি' বুঝতে পারবে না।”

রিণা বলিল, “যা সোণার দর হ'য়েছে ! তুমি আমার পাতের উপর গ'ড়তে দিও। কেউ বুঝতে পারবে না।”

প্রশান্ত বলিল, “তাই হবে ; তা' ছাড়া কি নিরেট দেওয়া পোষায় ?”

বিজয় ও সুরমা বড়ই অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিল। লীনা সুন্দরী ও শিক্ষিতা, আর সে যাইতেছে কোন্ সুদূর পল্লীগ্রামে ! সুরমা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “সবই ভাগ্য ! আস্তাকুড়ের ধোঁয়া স্বর্গে যায় না। তা নইলে পাকা-দেখার সময় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না।”

বিজয় বলিল, “তা—না নিয়ে যাক। লীনাকে বিয়ের দিনই পাকা দেখবে। মন খারাপ করো না, স্বরণ রেখো, ঈশ্বর মঙ্গলময়।”

রিণা অন্তরাল হইতে ইহাদের কথাগুলি শুনিয়া বলিল, “যা করছে, তাই যথেষ্ট। এতখানিই বা কে করে ? তোমাদের জন্তে এবার থেকে ডাকাতি করুক !”

সে দিন কলেজে যাইবার সময় প্রশান্ত সুরমাকে বলিল, “বৌদি', বিকেলের দিকে একটু সকাল ক'রে রান্না চাপিও। আমি যে রায় বাহাদুরের ছেলেকে পড়াই—সে আসবে। তার জন্তে একটু জল-খাবারের যোগাড় করো।”

সুরমা রন্ধন-কার্যে ব্যস্ত ছিল ; দেবরের কথাগুলি কাণে যাইতেই বলিল, “উনি বলছিলেন—দেশের সেই পাত্রটির কথা। ছেলেটি বি-এ পড়ে, কলকাতাতেই আছে।”

সুরমা ভাবিল, মেয়েটি শিক্ষিতা—শিক্ষিত পাত্রের হাতে পড়িলেই সুখী হইবে।

প্রশান্ত রুক স্বরে বলিল, “তা ত জানি। তোমরা আমাকে কি মনে কর ? কোন রাজা-বাদশা-গোচের লোক ব'লে ঠাউরিয়ে রেখেছ ? পাকা-দেখে এলুম ; এখন নতুন কথা ! তোমাদের যা খুসী কর, আমি জানি না।”—বলিয়া প্রশান্ত বাহিরে চলিয়া গেল।

পুনরায় একত্র রন্ধন-কার্য আরম্ভ হওয়ায় রিণা সুরমার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিল। সুরমা দেবরের কথায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সকলের আহার শেষ হইলে মনের কষ্টে সে না খাইয়াই দ্বিতলে চলিল।

বিকালে একটি সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবক প্রশান্তের সহিত তাহাদের বাড়ীতে আসিলে, প্রশান্ত তাহাকে সযত্নে নিজের কক্ষে বসাইয়া সুরমার সন্মানে চলিল। সে দেখিল, রান্নাঘর অন্ধকার ; কোনও আয়োজন নাই !

রিণাকে সম্মুখে দেখিয়া প্রশান্ত বলিল, “বৌদি' কোথায় ?”

রিণা গম্ভীর স্বরে বলিল, “আমি অত খোঁজ রাখি-নে ; আর তার দরকারই বা কি ?”

প্রশান্ত রিণার ‘মিলিটারী’ মেজাজ দেখিয়া সুরমার কক্ষে প্রবেশ করিল, বলিল, “এ কি বৌদি', তুমি এখনও শুয়ে রয়েছো ?”—পরে সুরমার শুক মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে কহিল, “কিছু খাওনি বুঝি ? আচ্ছা, তোমরা যে রাগ কর,—রাগ কর কার উপর ? আমার ত কারও উপর রাগ ক'রবার উপায় নেই ! এখন দেখছি, সব চেয়ে বেশী বিপদ আমার ! নাও, উঠে খেয়ে নাও ; ছেলেটাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। বড়লোকের ছেলে, কতকগ একলাটি ব'সে থাকবে ?”

প্রশান্ত এবার লীনার খোঁজে গেল। লীনা তখন কি একটা সেলাই লইয়া ব্যস্ত ছিল। প্রশান্ত দেখিল, লীনা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশেই বসিয়া আছে।

ঝি উনানে আঁচ দিয়া ময়দা মাখিতে শুরু করিয়াছে। রিণা তাহার ঘরের দরজার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে দেখিল, একটি সুশ্রী যুবক তাহারই ঘরের ভিতর বসিয়া একখানি পুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

বিস্মিতা রিণা প্রশান্তকে বলিল, “ছেলেটি কে ?”

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল, “বুঝতে পাচ্ছ না ! যে ছেলে-টির কথা এক দিন তোমাকে ব’লেছিলাম,—সেই রায় বাহাদুরের ছেলে । আমাকে ‘কাকাবাবু’ ব’লে ডাকে—অতি সরলপ্রকৃতি ।—তুমি বৌদি’কে একটু সাহায্য করবে ?”

রিণা অভিমানের স্বরে বলিল, “উনি কচ্ছেন কখন । কেন, আমাকে বল্লি কি করতুম না ?”

প্রশান্ত আর তথায় দাঁড়াইতে সাহস করিল না ; কলহপ্রিয়া রিণা এখনই কি একটা ছুতো ধরিয়া বচসা আরম্ভ করিবে !

প্রশান্ত রান্না-ঘরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, “কই, সব তৈয়েরী হ’ল ?”

সুরমা একটা খেত-পাথরের বাটিতে ক্ষীর ঢালিতে ঢালিতে বলিল, “হ্যাঁ, হ’য়েছে ; কিন্তু এখন দিয়ে আসবে কে ?”

প্রশান্ত লীনাকে ডাকিয়া বলিল, “ধাবারের ডিস, আর ফলের ডিস নিয়ে আমার সঙ্গে চল ।”

লীনা মুখ কাচু-মাচু করিয়া বলিল, “আমিই দিয়ে আসব ? তার চেয়ে সুরেশ যাক না ।”

প্রশান্ত রাগিয়া-উঠিয়া বলিল,—“আমি বলছি, তবু তোর আপত্তি ?”

রিণা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল । লীনা ঐ নবাগত যুবককে খাবার দিতে গেল, ইহার কারণ কি ?

খানিক পরে সেই আগন্তুক যুবকসহ প্রশান্ত বাটার বাহিরে গেল ।

ক্রমে বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল । রিণার মাতা পুরাদস্তুর কর্তৃত্বের ভার লইয়াছিলেন । বিবাহের জন্ত প্রচুর দ্রব্যাদির আয়োজন দেখিয়া—রিণার মাতা বলিলেন, “আয়োজন যা দেখছি বাবা, এতে হাজারের ওপর লোক খাওয়ান যায় !”

প্রশান্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “আমার বন্ধু-বান্ধব—বরযাত্রী নিয়ে শ’-চারেক লোক হবে ।”

বিবাহের সভা স্ফূটকরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল । সুরমা বিবধ মুখে সকল কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেছিল ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বর পঞ্চাশখানি মোটরে বরযাত্রীসহ প্রশান্তের বাড়ীর বহির্দ্বারে সমাগত হইল । কন্যাপক্ষের লোক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন ।

ক্ষণপরেই লীনার পাকা-দেখা হইয়া গেল । নারী-মহলে সাড়া পড়িয়া গেল । একটি বৌ বলিল,—“নেকলেসে খুব দামী হীরা বসানো আছে ।”

রিণা ও তাহার মাতার মুখ অসম্ভব-রকম গম্ভীর হইয়া উঠিল । তাঁহারা ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন,—সভাস্থলে দৃষ্টিপাত করিতেই রিণা চমকিয়া উঠিল । বর তাহার চেনা বলিয়া মনে হইল । কি আশ্চর্য্য, সেই রায় বাহাদুরের পুত্র !—রিণার মাথা ঘুরিয়া গেল ।

গোধূলি-লগ্নে বিবাহ । কনে আনিবার সাড়া পড়িয়া গেল । প্রশান্ত ব্যস্তভাবে রিণাকে বলিল, “স্ত্রী-আচারের সময় হ’ল । তোমরা সকলে তৈয়েরী হ’য়ে নাও ।”

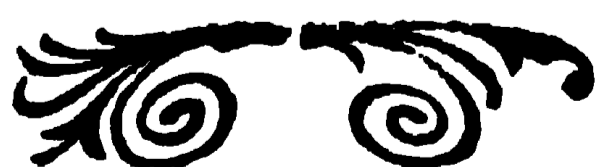
রিণা কোন কথা বলিল না ।

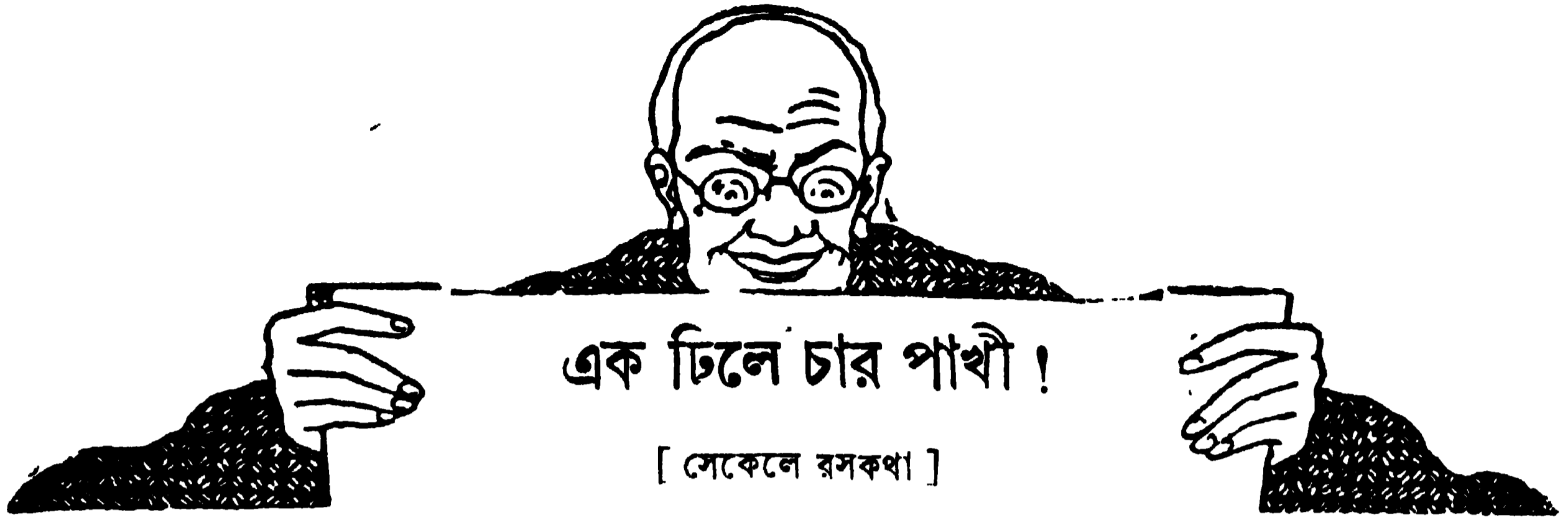
পরক্ষণে প্রশান্ত একখানি রূপার থালায় কতকগুলি নোট ও টাকা সভাস্থলে রায় বাহাদুরের কাছে আনিয়া তাহা গণিতে বলিল । সকলে সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিল ।

পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক,—ওনিয়া রিণার মুখ হুঃখে অভিমানে শুকাইয়া চূণ হইয়া গেল !

এ সংসারে জয়ের মাল্য যে সুরমাই কঠে ধারণ করিয়াছে—রিণা এত দিনে তাহা বুঝিতে পারিল । সে পরাজয় স্বীকার করিয়া, তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল । নির্কোষ প্রশান্ত তাহাকে প্রতিদিন ঠকাইয়া-আসিয়া, তাহার মাতৃস্থানীয়া বৌদিদিকে তাহার চেয়ে বড় করিল । এ হুঃখের কি সীমা আছে ?

শ্রীপ্রেমলতা দেবী ।





১

প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের কাহিনী।

কোনও গ্রামের ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক ছুইটি ব্রাহ্মণ যুবক পরস্পরের পরস্পর বন্ধু ছিল। ছুই বন্ধুতে পরামর্শ করিল, তাহারা এমন গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিবে, যিনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। কিন্তু অনেক অন্বেষণ করিয়াও তাহারা সেরূপ গুরু পাইল না। তখন তাহারা উভয়েই ভগবান্ কান্তিকেশের আরাধনার প্রবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে কান্তিকেশ প্রসন্ন হইয়া উভয়কেই স্বপ্নে বলিলেন, "পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ নামে এক পণ্ডিত আছেন। তাঁহার নিকটে তোমরা সকল বিজ্ঞাই শিখিতে পারিবে।"—অতঃপর ছুই বন্ধুই পরমানন্দে শুভদিনে পাটলিপুত্র নগরে যাত্রা করিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নগর ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিলে শেষে একটি ভ্রমলোক বলিলেন, "বর্ষ নামে এক জন ব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু তিনি পণ্ডিত নহেন;—তিনি মহামূর্খ, মহা-নির্কোষ!"—তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় তাঁর বাড়ী ম'শায়?" তিনি বলিলেন, "এই রাস্তা ধরিয়া পূর্বদিকে যাইলে, কিছু দূরে বাঁ দিকে একটা গলি পাইবে; সেই গলিতে ঢুকিয়া, বাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সে-ই তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিবে।"

তাহারা সেই গলিতে প্রবেশ করিয়া একটা খোলার বাড়ীর দ্বারদেশে একটা সধবা প্রৌঢ়া রমণীকে দাঁড়াইয়া-থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বর্ষ পণ্ডিতের বাড়ী কোন্টা?"—তিনি বলিলেন, "তাঁর কাছে কি দরকার?" তাহারা বলিল, "আমরা তাঁর কাছে বিজ্ঞাপিকা করিতে আসিয়াছি।" প্রৌঢ়া বলিলেন, "এইটাই তাঁর বাড়ী; কিন্তু তিনি ত পণ্ডিত ন'ন বাবা! তিনি মহামূর্খ, তাঁর উপর মহানির্কোষ! আমার দেবর এই নগরের রাজার সভাপণ্ডিত। তিনি কিছু কিছু সাহায্য করেন, তাই ছ'-বেলা আমাদের ছ'মুঠা আগার জ্বাটে। তোমরা নাম ভুল করিয়াছ, বাবা! উপকর্ষ না বলিয়া, ঐ নাম করিতেছ!" তাহারা বলিল,— "না মা, নাম ভুল হয় নাই; যিনি তাঁহার নাম বলিয়া দিয়াছেন, তিনিও ভুল করিবার পাত্র নহেন। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করিব। তিনি কি বাড়ীতে আছেন? যদি থাকেন, দয়া করিয়া একবার ডাকিয়া দিবেন কি?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তিনি বাড়ীতেই আছেন। বাহিরে যাইলে লোকে ঠাটা করিয়া নানা কথা কহে বলিয়া তিনি আর বাড়ীর বাহিরে যান না; সর্বকণ ঘরের কোণেই বসিয়া থাকেন। যাও না বাবা, ঐ ঘরে। আমি তরকারি-ওয়ালীদের নিকট তরিতরকারী কিনিবার জন্ত এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

তাহারা নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। গৃহস্থানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমরা? কি চাও?"

বন্ধুদ্বয় ভূমিতে বসিয়া বলিল, "এক গুরুর নিকটেই সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। বহু অন্বেষণ করিয়াও সেরূপ পণ্ডিত না পাওয়ায় আমরা কান্তিকেশের আরাধনা করিয়া-ছিলাম। তিনি স্বপ্নে আপনার নাম ও ধাম বলিয়া দিয়াছেন; তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

বর্ষ পণ্ডিত বলিলেন, "দেখ বাবা, আমি মূর্খ ও নির্কোষ বলিয়া সকলেই আমাকে ঠকায়; বাড়ীর বাহির হইলেই সকলে ঠাটা করে। ছেলেরা আমার নামে ছড়া বাঁধিয়াছে—'বর্ষ বর্ষ বর্ষ, তোমার নাইকো কেন হর্ষ, মুখ কেন বিমর্ষ? তোমার মাথায় আর্কফলা, তোমার বুদ্ধিটি কাঁচকলা!' অধিক কি, গিন্নীও কত তিরস্কার করিয়া থাকেন। মনের দুঃখে আমিও কান্তিকেশের আরাধনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকেও স্বপ্নে প্রত্যাশেষ করিয়াছেন—'যদি একটি ক্রান্তিধর ছাত্রকে পড়াইতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার সর্ববিজ্ঞা আয়ত্ত হইবে, তুমি মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিবে।'—তোমরা সেইরূপ একটি বাসক যদি সংগ্রহ করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগকে পড়াইতে পারি।"

তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেইরূপ বাসকের সন্ধান চলিল। নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া এক দিন সাংকালে তাহারা কোন গ্রামে এক প্রৌঢ়া রমণীকে তাঁহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকে সন্নিহয়ে বলিল, "মা, আমরা বিদেশী। এই রাত্রিতে থাকিবার জন্ত আপনার আশ্রয়-ভিক্ষা করিতেছি।"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "এস বাবা, বাড়ীর মধ্যে।"—এই বলিয়া মেটে-ঘরের দাওয়ার কবল পাতিয়া তিনি তাহাদিগকে বসিতে দিলেন; প্রদীপ জালিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি ব্রাহ্মণের বিধবা। একটি ছোট পুত্র মাত্র লইয়া এখানে বাস করি। বড়ই গরীব আমি—অতিথি-সংস্কারের শক্তি ত আমার নাই। আমার এই ক্রটি তোমরা উপেক্ষা করিও।"

তাহারা ছেলে ধরিতেই বাহির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণীর ছেলে আছে শুনিয়া বলিল, "মা, আমাদের জন্ত আপনার এত কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি দয়া করিয়া আশ্রয় দিলেন, ইহাতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা আহাৰ করিতেও চাহি না। দয়া করিয়া আমাদের পুষ্করিণী দেখাইয়া দিন, আমরা পা-হাত ধুইয়া সাংস্কার্য করিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তা কি হয় বাবা? তোমরা ব্রাহ্মণ, অতিথি, আমার বাড়ীতে আসিয়া উপবাসী থাকিলে আমার পাপ হইবে, ছেলেরও অকল্যাণ ঘটবে। ঘরে বৎসামাত্র বাহা আছে, তাহাই আহাৰ করিবে।"—ব্রাহ্মণী অতঃপর তাহাদিগকে পুষ্করিণী দেখাইয়া দিলেন।

ভাঙা সন্ধ্যা করিয়া ফিরিয়া আসিলে, ব্রাহ্মণী ঘরে-প্রস্তুত
কিঞ্চিৎ চিনির-পুলী উভয়ে জল খাইতে দিলেন।

জল খাইয়া তাহার জিজ্ঞাসা করিল,—“ম', আপনার ছেলের
কি নাম? বয়স কত? সে কোথায়?”

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—“তাহার নাম কাত্যায়ন। সে ভারি ছরস্তু;
ভাল জিনিগটী না হইলে খায় না, মন্দ জিনিসে তাহার কচি নাই,
সে তাহা ফেলিয়া-রাখিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই জন্ত
তিনি তাহাকে ‘বরকচি’ বলিয়া ডাকিহেন। সে পাঁচ বৎসরে
পড়িয়াছে। ঐ যে গান শুনিতে পাইতেহ; নন্দ নামক
একটি যুবক ঐ গান গায়িতেছে। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে
নন্দ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে
গান শুনাইত। তিনি ওর গান শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন।
তুই বৎসর বিধবা হইয়াছি; ও সেই সময় হইতে আর এ বাড়ীতে
আসে না। ওর গান শুনিতে তাঁহাকে মনে পড়ায় আমার
তুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে থাকে। আজ সন্ধ্যার পূর্বে হইতেই
নন্দ গান করিতেছে। বরকচি খেলা করিয়া অল্পক্ষণ পূর্বে
বাড়ীতে আসিয়া বলিল, ‘নন্দ দা অনেক দিন আমাদের
বাড়ীতে আসেনি; আমি তার গান শুনে আসি মা!’—আমি
বলিলাম, ‘সন্ধ্যা হ’ল, এর পর তুই অক্ষুণ্ণে একা কি ক’রে
আসবি?’—সে আমার কথা শুনিয়া না, ছুটিয়া চলিয়া গেল;
তাই আমি সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলাম।”

বলিতে বলিতেই বরকচি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। অপরিচিত যুবক-
ঘরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া সে মাকে বলিল, “নন্দ দা কেমন
ক’রে বাজাচ্ছে আর গাইছে, শুনবে মা?”—এ কথা বলিয়াই তুই
হাতে তুই উন্নত বাজাইতে বাজাইতে সে গায়িতে আরম্ভ করিল,—

‘হরেন’াম হরেন’াম হরেন’াম কেবলং।

কলৌ নাস্তি কলৌ নাস্তি অজদপি সবলং।

হরেন’াম হরেন’াম হরেন’াম কেবলং।

সত্যযুগে ছিল ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞবিধান,

দ্বাপরে সেবাসুষ্ঠান,

কলৌ সঙ্কীর্ভনং বলং।

হরেন’াম হরেন’াম হরেন’াম কেবলং।’

গানটী সুদীর্ঘ; তাহার আন্তোপাস্ত নিখুঁত ভাবে গায়িয়া
বরকচি বলিল, “বউ কিদে পাছে মা! খাবার দেবে চল।”—মাতা
আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া বন্ধনশালায় প্রবেশ
করিলেন। বরকচি জিজ্ঞাসা করিল, “ওরা কারা মা?” মা বলিলেন,
“ওঁরা অতিথি। বাড়ীতে অতিথি এলে তাঁদিগে গুরুঠাকুরের
মত ভক্তি ক’রতে হয়, থাকবার জায়গা দিতে হয়, আদর-বন্দ
ক’রতে হয়, খাওয়াতে হয়। না ক’রলে পাপ হয়, অকল্যাণ হয়;
বুঝিলি?”

—বরকচি বলিল, “বুঝেছি মা!”

তুই বন্ধুতে বলাবলি করিতে লাগিল, “এই ছেলেটিই ঋতিধর।
পাঁচ বছরের ছেলে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখে-শুনে এসে ঠিক তালে-
তালে বাজাতে লাগল। অত বড় গানটা শুনেই মুখস্থ ক’রে, ঠিক
সুরে, বিগুণ উচ্চারণ ক’রে কেমন গাইলে!”

ব্রাহ্মণী বালককে খাওয়াইয়া, আঁচাইয়া দিয়া, হাত-মুখ

মুছাইয়া ঘরে শোয়াইয়া, পুনর্বার অতিথিদের জন্ত পাক করিতে
বসিলেন। পাক সমাপন হইলে, স্থান করিয়া, তাহাদিগকে
পরিতৃপ্তরূপে আহাৰ করাইলেন। আহাৰান্তে তাহারা বলিল,
“মা! আপনার কাছে আমাদের একটা প্রার্থনা আছে।”

ব্রাহ্মণী বলিলেন, “কি বাবা, বল।”

তাহারা বলিল—“আমরা একই গুরুর নিকট সমস্ত বিজ্ঞা
শিখিবার জন্ত উৎসুক হইয়া, বহু অহুস্কানেও সেরূপ গুরু না
পাওয়ার কান্তিকের আরাধনা করি। তিনি আমাদের তুই
জনকেই স্বপ্নে বলিলেন, পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ নামে পণ্ডিত
আছেন, তাঁর কাছে সকল বিজ্ঞা শিখিতে পারিবে। আমরা তাঁহার
কাজে গিয়াছিলাম। সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ‘আমি
মহানূর্ষ বলিয়া, আমিও কান্তিকের আরাধনা করিয়াছিলাম।
তিনি আমাকেও স্বপ্নে বলেন—একটি ঋতিধর বালককে
পড়াইতে আরম্ভ করিলে তোমার সকল বিজ্ঞা আয়ত্ত হইবে,
তুমি মহাপণ্ডিত হইবে। তোমরা যদি একটি ঋতিধর বালক
আনিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে শিক্ষাদান
করিতে পারি।’—তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা নানা দেশে
ঘুরিয়াছি। কোথায়ও ঋতিধর বালক পাই নাই। আপনার
ছেলেটিই ঋতিধর। দয়া করিয়া উহাকে আমাদের সঙ্গে
প্রেরণ করুন, মা! ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।”

ব্রাহ্মণী বলিলেন, “তিনি খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। আমার
ইচ্ছা, উহাকেও সেইরূপ পণ্ডিত করিব। কিন্তু বাবা, ও নিতান্ত
শিশু; কোথায় যাইবে? কি করিয়া ইটিবে? কি খাইবে? কাহার
কাছে গুইবে? সেই ভাবনাতেই যে মন বড় ব্যাকুল
হইতেছে।”

যুবকধর বলিল, “মা! আপনাকে আমরা মা বলেছি।
ওকে ছোট ভাই বলেই মনে করি। আমরা ওকে কোলে-কাঁধে
ক’রে নিয়ে যাব, খুব আদর-বন্দ ক’রব, নিজদের কাছে খাওয়াব,
শোয়াব। আপনার জন্তে ওর মন কেমন ক’রলে নিয়ে আসব—
আপনার পা চুঁয়ে দিব্য করছি। আমাদের এ প্রার্থনা পূর্ণ
ক’রতেই হবে।”—ব্রাহ্মণী তাহাদের কাতরতা দেখিয়া আর
কোনও আপত্তি করিতে পারিলেন না। সম্মতি দিতেই হইল;
পরদিন তাহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন
করিয়া আসিলে, ব্রাহ্মণী বরকচিকে কিছু খাওয়াইয়া কোলে লইয়া
মুখচুখন করিয়া তাহাদের হাতে সাঁপিয়া দিয়া বলিলেন, “বাবা,
এঁরা তোমার দাদা, এঁদের সঙ্গে প’ড়তে যাও। যখন বা দরকার
হবে, ওঁদিকে জানাবে। মন দিয়া পড়া-শুনা ক’রবে।”

তাহারা ব্রাহ্মণীর পদধূলি লইয়া বরকচিকে কোলে করিয়া
পাটলিপুত্রে চলিল। ব্রাহ্মণীর তুই চক্ষু অক্ষুণ্ণ হইল।
যথাকালে বর্ষ পণ্ডিতের নিকট পৌঁছিলে তিনি উপবর্ষকে
ভাকাইয়া তাঁহার উপদেশানুসারে শুভদিনে নিজেই বরকচির
“বিজ্ঞারম্ভ” করাইলেন। তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিতেই দেবতার
ঘরে তিনি সর্কবিজ্ঞার পারদর্শী হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-জানিত
খ্যাতি দিগ্দেশে প্রচারিত হইল। ক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই
তাঁহার নিকট বহু ছাত্রের সমাগম হইল। উপবর্ষ রাজাকে
বলিয়া তাঁহার যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং
টোল-বাড়ীও নির্মাণ করাইলেন।

২

ছাত্রদিগের মধ্যে পাণিনিও ছিলেন। তিনি ছিলেন বালিকা বরক্টি তাঁহাকে সর্বদাই উপহাস ও অপমান করিত। তিনি বিবন্ধবন্ধনে কালযাপন করিতেন। এক দিন গুরুপত্নী তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, “বাবা পাণিনি, তুমি কিছু দিনের ছুটি লইয়া কাশী যাও। সেখানে বিশ্বনাথের আরাধনা করিলে, তাঁহার বরে তুমি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইতে পারিবে। তখন আর কেহই তোমাকে অশ্রদ্ধা বা উপহাস করিতে পারিবে না।”

পাণিনি সেই দিনই রাত্রিশেষে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাশীযাত্রা করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া, প্রাতে গঙ্গা-স্নান করিয়া, বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া পূজা ও প্রণাম করিলেন। তার পর মণিকর্ণিকায় গিয়া চক্রতীরের চতুর্দশ বনের মধ্যে বিশ্ববৃক্ষ মূলে বসিয়া, রত্নাক্রমালায় বড়কর মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত দিনের মধ্যেই ভগবান বিশ্বনাথ সদয় হইয়া তাঁহাকে চতুর্দশ মাহেশ্বর স্তত্র দান করিলেন।

পাণিনি ঐ চতুর্দশ মাহেশ্বর-স্তত্র অবলম্বনে অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। ব্যাকরণ রচনা সমাপ্ত হইলে তিনি পুনর্বার পাটলিপুত্রে আসিয়া গুরু ও গুরুপত্নীর চরণে প্রণাম করিলেন। বরক্টি প্রভৃতি সমস্ত ছাত্রই পাণনিকে সর্ববিদ্যার বিশারদ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ইতঃপূর্বে গুরুগৃহেই গর্ভাষ্টমে বরক্টির উপনয়ন হইয়াছিল। তাঁহার বয়স এখন ২৪ বৎসর, তখন এক দিন উপবর্ষ আসিয়া বর্ষকে বলিলেন, “দাদা, আমার কস্তা সুরুচির বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে, একটি সংপাত্রের আবশ্যক। আপনার ছাত্রদিগের মধ্যে সর্কোৎকৃষ্ট কে?”

বর্ষ বলিলেন, “সর্কোৎকৃষ্ট বরক্টি।”

উপবর্ষ বলিলেন, “আপনার অনুমতি হয় ত তাহার সঙ্গেই সুরুচির বিবাহ দিই।”

বর্ষ বলিলেন, “স্বচ্ছন্দেই দিতে পার।”

শুভদিনে শুভ মগ্নে সুরুচির সহিত বরক্টির শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই বিবাহে রাজা বরক্টিকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বৌতুক দিয়াছিলেন। বরক্টি পাটলিপুত্রেই অটালিকা নির্মাণ করাইয়া পত্নীসহ বাস করিতে লাগিলেন। একটি বিখ্যাত প্রৌঢ়া দাসীও রাখিয়া দিলেন।

এখন পাণিনির সহিত বিচারে বরক্টিই পরাজিত হইয়া পরিত্যক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, পাণিনি কাশীতে গিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়া ঐরূপ অসাধারণ বিদ্যান্ হইয়াছেন। বিশ্বেশ্বরের বরে অধিকতর বিদ্যান্ হইবার অভিপ্রায়ে বরক্টিও কাশী-গমনের সঙ্কল্প করিলেন। সুরুচিকে বলিলেন, “আমি অধিকতর বিদ্যান্ হইবার জন্ত বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিতে কাশী যাইব। তুমি সাবধানে থাকিবে। বাড়ীতে দুইটি মাত্র অবলা স্ত্রীলোক থাকিবে বলিয়া, আমার নিকট যে আট শত মোহর ছিল, তাহা বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে ভরসা হইল না; এক্ষণে গঙ্গারাম বণিকের কাছে তাহা গচ্ছিত রাখিয়াছি। লোকটি বড়ই নিষ্ঠাবান, ধার্মিক। আমাকে অত্যন্ত ভক্তি করে সে। তাহাকে বলিয়াছি, তোমার এখন বত টাকার দরকার হইবে, দাসীকে তাহার নিকট পাঠাইলেই সে তাহা দিবে।”

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বরক্টি কাশীতে গমন করিলেন। সুরুচি প্রত্যহ প্রত্যবে উঠিয়া, দাসীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, তাহার পর স্বামীর সিঁইলাভ কামনার শিবপূজায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতেন।

৩

তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যে গঙ্গাস্নানার্থী যুবকগণের অনেকেই মুগ্ধ হইত। এক দিন তিনি স্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন, রাজার ছোট মন্ত্রী তখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন। নির্জল পথে সুরুচিকে একাকিনী চলিতে দেখিয়া ছোট মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, “আমি রাজার ছোট মন্ত্রী। তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। রতিপতি তাঁহার পুস্পসরে আমাকে বিদ্ধ করিয়াছেন; প্রাণ আমার আনচান করিতেছে। বৈবরষ ধরিতে নারি আর। এ জন্ত আমার কামনা, তোমার বাড়ীতে গিয়া আমি আমোদ-আহ্লাদ করি। এক দিন পিছু-পিছু গিয়া তোমার বাড়ীও দেখিয়া আসিয়াছি।—তুমি কি বল?”

সুরুচি ভাবিলেন, “যদি ক্রোধ প্রকাশ করি বা অস্বীকার করি, তাহা হইলে ইনি আমার অনিষ্ট করিতে পারেন।”—এই ভাবিয়া তিনি মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আপনি আমাদের বাড়ীতে যাইবেন, এ ত আমার পরম সৌভাগ্য! তবে কি না, প্রত্যহ বাতায়াত করিলে লোক জানা-জানিতে ছ’জনেরই কলঙ্ক ঘটবে; মুখ দেখান ভার হইবে। আপনি ত জানেন, মকর-সংক্রান্তির দিন এখানে সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত “ভাগীরথী-মেলা” হয়। সে রাত্রে সহরে জনপ্রাণীও থাকে না। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সূর্যাস্তের পূর্বে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া স্নান করিয়া, গঙ্গা-মাতার পূজা-দিয়া প্রসাদ খাইয়া, সারারাত্রি উৎসব-আমোদ করিয়া, অক্লণোদয়ে স্নান-শেষে বাড়ীতে ফেরে।—দয়া করিয়া সেই দিন সন্ধ্যার পর যাইবেন।”

মন্ত্রী আনন্দিত হইয়া স্নান করিতে চলিলেন।

পরদিন সেই সময়েই রাজার প্রৌঢ়বরক্টি পুরোহিত আপন পরিচয় দিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিলে, সুরুচি ঐ সকল কথা বলিয়া ঐ রাত্রেই এক প্রহরের সময় তাঁহাকেও যাইতে বলিলেন। তার পরদিন নগর-রক্ষক আত্মপরিচয় দিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিলে, সুরুচি তাঁহাকেও ঐ রাত্রেই দ্বিপ্রহরের সময় যাইতে বলিলেন। স্বামীর কল্যাণ-কামনার পৌরী পূর্ণিমার ছাদশটি আক্ষণ ভোজন করাইবার ইচ্ছায়, পূর্ন-দিন গঙ্গারাম বণিকের নিকট হইতে পনেরটি টাকা চাহিয়া আনিবার জন্ত দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। গঙ্গারাম বলিল, “তোমার হাতে টাকা দিব না; বৈকালে আমি নিজে গিয়া তাঁর হাতে দিয়া আসিব।”—সে বৈকালে আসিয়া সুরুচির নিকট উপস্থিত হইয়া ঐরূপ কুৎসিত প্রস্তাব করিয়া বলিল, “তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তা হ’লে আমি এক পয়সাও দিব না। আমার নামে নালিস ক’বলে, আমি বলব—বরক্টি আমার কাছে কিছুই গচ্ছিত রেখে যাননি। তোমার ত কেহ সাক্ষী নেই; তুমি আমার কি ক’ববে?”

সুরুচি প্রমাদ গণিয়া পূর্কোত্তরূপ সমস্ত কথা বলিয়া মকর-সংক্রান্তির রাত্রে তৃতীয় প্রহরের প্রথমেই তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে বলিলেন।

বণিক বলিল, “সেই দিনেই টাকা আনিব। এখন তুমি ধার-কৰ্ম করিয়া ব্রাহ্মণভোজন চালাও।”

সুফ্ৰটি বেণের নিকট সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া, মায়ের নিকট হইতে ত্রিশ টাকা ধার করিয়া আনিবার জন্য দাসীকে পাঠাইলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-ভোজনে অর্ধেক টাকা খরচ করিয়া, দাসীর সহিত পরামর্শের পর তাহাকে কিঞ্চিৎ গোপনীয় উপদেশ দিয়া, ছুতোর-মিষ্টী ডাকাইয়া বৃহদাকার একটা গাছ-সিন্দুক প্রস্তুত করাইলেন। তাহার গায়ের চারি দিকেই ৩৪টা করিয়া বড় বড় ছিদ্র করাইয়া উহা সদর-ঘরের মধ্যে বসাইলেন। তার পর অত্যন্ত গাঢ় তেল-কালিতে খানিক আতর মিশাইয়া সেই কালিঘারা চারিটি বড় বোতল পূর্ণ করিলেন। চারিখানা ময়লা ঝাকড়াও ষোঁগাড় করিয়া রাখিলেন। তন্নিম্ন বড় বড় চারি কলসী কুয়ার জল তুলাইয়া রাখিলেন। আর একখানা গীড়িও পাতিয়া রাখা হইল।

মকর-সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যাকালে সদর-দরজায় খিল আঁটিয়া দাসী ভিতরে বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে ছোট-মস্ত্রী আসিয়া বন্ধ দ্বারের কড়া নাড়িল। দাসী দ্বার খুলিলে মস্ত্রী ভিতরে প্রবেশ করিতেই দাসী দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাকে বলিল, “আপনি এসেচো বাবা, একটা কথা বলি শোন। আমার মা-ঠাওরাণটির এই বয়সই বেজাই ছুটি-বাই! উনি গল্পাচ্ছান ক’রে, চামারয়া রাস্তায় ঝাড়ু দেয়, সেই রাস্তা দিয়ে আসতে হয় ব’লে, বাড়ীতে এসেই পাৎকো-তলায় বসে। মাথা থেকে পা অব্দি সর্বো অঙ্গে গোবর মাখে। আমি পাৎকোর জল তুলে তেনার গায়ের-মাথায় ঢেলে দিই। এই রকমে শুকনু হ’য়ে তবে ঘরে-দোরে ওঠে; আপনিও তো সেই রাস্তা দিয়েই এসেচ। আপনি তেল মেখে চান না ক’লে অন্যরে যাবার হুকুম নেই। এই ঘরের মন্দি গন্ধ-তেল, জল, আপনার তরে রাখা হ’য়েছে।”

মস্ত্রী বলিলেন, “চল তবে ঘরের মধ্যে।” ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, “আলো নেই ঘরে? বজ্র অন্ধকার যে!”

দাসী বলিল, “বাবা-ঠাওর কাশী যাওয়া অব্দি এ ঘর তো আর খোলা হয়নি। আজ সাজের বেলা আলো জ্বালতে এসে লঠনে ধেমন তেল ঢেলেচি বাবা, অমনি ছর্-ছর্ ক’রে সব তেল প’ড়ে তি নাগলো। লঠনের তলা কেসে গেছে। শুধু তেল মাথা আর চান করা বৈ তো নয়, আলোরই বা দরকার কি? (ঝাকড়াখানা হাতে দিয়া) এই গামছাখানা প’রে আপনার পোষাক ছেড়ে ঐ ধারের আলনায় রেখে—এই গীড়িতে ব’সো বাবা!”

মস্ত্রী বসিলে দাসী সেই গন্ধ-তেলের একটা বোতল বাহির করিয়া তাহাকে তেল মাখাইতে বসিল। এক বোতল তেলকালি ঘষিয়া ঘষিয়া সর্বাক্ষে মাখাইতে প্রায় এক প্রহর কাটিল। তার পর এক কলসী জল আনিয়া মস্ত্রীবরের মাথায় ঢালিয়া দিল।

মস্ত্রী বলিলেন, “উঃ, বাবা রে গেছি। এই শীতের রাতে এত ঠাণ্ডা জল! জলটুকু যদি গরম ক’রে রাখতে বাছা!”

দাসী বলিল, “গরম ক’রতে গেছলুম বাবা! মা-ঠাওরণ ব’লে, গরম জলে চান ক’লে কি শুকনু হওয়া যায়? কাঁচা জলে চান ক’রতে হয়।”

এমন সময় রাজার পুরোহিত আসিয়া কড়া নাড়িলেন।

মস্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে কড়া নাড়ে বি?”

দাসী ব্যস্তভাবে কহিল, “রাজার পুরুষ-ঠাওর।”

মস্ত্রী বলিলেন, “কি সর্বনাশ! ঠুকেও আসতে বলা হ’য়েছে?”

দাসী বলিল, “উনি তো অনেক দিন হ’তে পিত্যই আসে বাবা! আজ কি নতুন আসছেন?”

মস্ত্রী কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তাই তো! ভালো মুছিল! এখন লুকোই কোথায়?”

দাসী বলিল, “লুকোবার তো জায়গা নেই বাবা। ঐ খালি সিন্দুকটা প’ড়ে আছেন, ওর মন্দিই ঢুকে পড়ো,—আর উপায় কি? আমি ডালাখান তুলে ধ’রুচি।”

মস্ত্রী সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক ধারে বসিয়া, দুই হাঁটু ছুঁহাতে ধরিয়া ধর্-ধর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। দাসী ডালা বন্ধ করিয়া সদর-দরজা খুলিয়া দিল। রাজ-পুরোহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, দাসী তাহাকেও ঐ সব কথা বলিয়া ঐরূপে তেল মাখাইয়া মাথায় জল ঢালিবে, সেই সময় সহর-কোতোয়াল আসিয়া কড়া নাড়িল। নিরুপায় পুরোহিত লুকোইতে চাহিলে দাসী গাছ-সিন্দুকের ডালা তুলিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে বলিল। তিনি চুকিয়া, আর এক জন কে বসিয়া আছে, বুঝিতে পারিয়া—একটু তর্কতে উবু হইয়া বসিয়া দাক্ষণ শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। সহর-কোতোয়ালকে স্নান করাইতে করাইতেই গঙ্গারাম বেণের আবির্ভাব। সে কড়া নাড়িলে সহর-কোতোয়ালও দাসীর কথায় গাছ-সিন্দুকে চুকিয়া, দুই ধারে দুই জন বসিয়া আছে বুঝিতে পারায়, মাঝখানে উবু হইয়া বসিয়া ভয়ে ও শীতে কাঁপিতে লাগিল।

বণিককে যখন তেল মাখান হইতেছিল, তখন সুফ্ৰটি বাহিরে আসিয়া সদর-ঘরের দ্বারের শিকল আঁটিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি আমার টাকা আনিয়াছেন?”

বণিক বলিল, “আজ আনা হয় নাই। কা’ল আনিয়া দিব।” সুফ্ৰটি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার স্বামী আপনার কাছে কত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন?”

বণিক বলিল, “আট শ’ মোহর।”

সুফ্ৰটি, “ঠিক আট শ’ মোহর? না, আরও কিছু বেশী? সত্য কথা বলুন।”

বণিক, “ঠিকই আট শ’ মোহর, তার বেশী নয়;—আমি কখনও মিথ্যা কথা কহি না।”

সুফ্ৰটি, “ঠিকই আট শ’ মোহর?”

বণিক, “হাঁ, ঠিকই আট শ’ মোহর।”—সুফ্ৰটি শিকল খুলিয়া দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দাসী বণিককে স্নান করাইয়া বলিল, “সেঁ। কাপড়ে, সেঁ। চুলে সদর-দরজা খুলে উপরে চেয়ে দেখবে গণেশের মূর্তি আছেন। তেনাকে পেমাম ক’রে ষোড় হাতে জানাও, ‘বাবা সিদ্ধিদাতা গণেশ, আমি যে কাজে এসেছি বাবা, তা সিদ্ধি কর, তোমার জোড়া হীড়র দিয়ে পূজো দেব।’ বণিক যখন ঐরূপ বলিতেছিল, তখন দাসী সদর-দরজা বন্ধ করিয়াছিল। বণিক বলিল, “দরজা খোল গো! আমি বাহিরে রইলাম, তুমি দরজা বন্ধ ক’রলে কেন?”

দাসী বলিল, “চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাচ্ছিসনে— গজাতীর থেকে সব মানুষ ফিরে আসছে, ভোর হ’য়েছে? এমন সময় ভদ্র লোকের বাড়ীতে পর-পুরুষ ঢোকে?”—বণিক তখন আপনার অঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখে সর্বাক্ষে কালিমাথা।

লোক-জনের ভীড় ক্রমেই বাড়িতেছে—দেখিয়া সে নিজের বাড়ীর দিকে দৌড়াইতে লাগিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বাড়ীর সদর-দরজার কড়া নাড়িতেই তাহার স্ত্রী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বণিক্ বাড়ীতে ঢুকিয়া বলিল, “পাওনা টাকার তাগাদায় গিয়ে এক বদমায়েস খাতকের হাতে আমার এই লাকনা। সব কথা পরে বলব, এখন আমার গায়ের কালি তুলে দাও।”

বেশে-বৌ এক বালতি জল, ধানিকটা ধইল, তিন-চারিটা নারিকেল-ছোবড়ার মুড়ো আনিয়া পাতকো-তলায় বসিয়া আগে তাহার মুখের কালি তুলিতে লাগিল। বণিক্ বলিল, “শান্তে য’বো গো। উঃ, জলে ম’লাম। ছাল-চামড়া বিনিয়ে যাচ্ছে যে।”

বেশে-বৌ বলিল, “আলকাতরার মতো চটচটে কালি মেখে এসেছ, গায়ের কারেমী হ’য়ে ব’সেছে কি না। মুড়ো দিয়ে জ্বোরে জ্বোরে না ঘস্লে ও রং উঠবে?”

ও-দিকে দাসী গাছ-সিন্দূকের তালি বন্ধ করিয়া, সদর দরজায় তালি দিয়া, সুরুচির সঙ্গে রাজবাড়ী চলিল। সুরুচি খিড়্‌কির পথে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি সভাপণ্ডিতের কস্তা, রাজা রাণীর সুপরিচিতা। রাণীর সঙ্গে দেখা হইলে রাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা সুরুচি, এত ভোরে কি দরকারে এসেছ?”

সুরুচি বলিলেন, “বড় বিপদে প’ড়েই এমন সময় এসেছি রাণী-মা। মহারাজ উঠলে তাঁর কাছেই সব কথা বলব, আপনিও শুনবেন।”

রাজা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বিপদ, মা সুরুচি?”

সুরুচি বলিলেন, “মহারাজ। আমার স্বামী কাশী গেছেন শুনেছেন ত? আপনার দেওয়া সেই হাজার মোহরের মধ্যে খরচ বাদে যে আট শ’ মোহর ছিল, যাবার সময় গঙ্গারাম বেণের কাছে তা গচ্ছিত রেখে বান। গত পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্মণভোজন করার ব’লে পনের টাকা চেয়ে আনবার জন্ত দাসীকে পাঠিয়েছিলাম। সে ব’লেছে, তার কাছে তিনি এক পয়সাও গচ্ছিত রেখে বাননি। তাই মহারাজ, আপনার কাছে এসেছি, আপনি বিচার ক’রে আমার টাকগুলির উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।”

রাজা বলিলেন, “রাজসভায় পাশে স্ত্রীলোকদের বসবার জন্ত চিক্-ফেলা যে ঘর আছে, তুমি দাসীকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঘরে ব’সো-গে। রাজসভায় দরবারে ব’সে তোমার নাশিশ শুনবো, এক বিচার করবো।”

সুরুচি রাজার কথায় সেই ঘরে গিয়া বসিলেন।

রাজা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে বসিলে সুরুচির কি অভিযোগ জিজ্ঞাসা করা হইল। সুরুচি চিকের অন্তরাল হইতে বলিলেন, “মহারাজ! আমার নাম শ্রীমতী সুরুচি দেবী, আমার পিতার নাম শ্রীযুক্ত উপবর্ষ পণ্ডিত, আমার স্বামীর নাম দাসী বলিবে”—দাসী বলিল, ‘আমার মনিবের নাম বরুচি শর্মা,—রাজ-দরবারে আমার নাশিশ এই যে, আমার স্বামী কাশী যাবার সময় গঙ্গারাম বণিকের কাছে আট শ’ মোহর গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। সে এখন তাহা স্বীকার করিতেছে না। আমি সেই টাকার জন্ত মহারাজের নিকট বিচারপ্রার্থিনী।’

গঙ্গারাম বণিককে অবিলম্বে রাজসভায় হাজির করিবার আদেশ হইল। এক জন বরুচি গঙ্গারামের বাড়ীতে গিয়া বলিল,

“আমি রাজসভায় বরুচি। এখনই রাজসভায় তোমার তলব হ’য়েছে, জলদি চলো।”

তখন সবেমাত্র গঙ্গারামের মুখের কালিটা তোলা হইয়াছিল। গঙ্গারাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানা কবসা কাপড় এমন ভাবে কোঁচা লুটাইয়া পরিল যে, পা পর্যন্ত ঢাকা পড়িল। একটা বেনিয়ান গায়ের দিয়া তার উপর শীতবস্ত্র জড়াইল, এবং হাত দুইটা শীতবস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

রাজসভায় উপস্থিত হইতেই তাহাকে কাঠ-গড়ায় পুরিয়া “হলফ্” পড়ান হইলে দ্বিতীয় মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বরুচিকে জান?”

গঙ্গা—“হাঁ হজুর, জানি।”

মন্ত্রী—“তিনি কাশী যাবার সময় তোমার কাছে আট শ’ মোহর গচ্ছিত রেখে গেছেন?”

গঙ্গা—“না হজুর! এক পয়সাও গচ্ছিত রেখে বাননি।”

প্রধান মন্ত্রী—“সুরুচি! তোমার সাক্ষী কে?”

সুরুচি—“হজুর! তিনি গোপনে রেখে গেছেন; কোনও মানুষ ত সাক্ষী নাই; তবে—সাক্ষী আছেন দেবতারা।”

প্রধান মন্ত্রী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবতারা সাক্ষী কি রকম? তাঁরা কি তোমার জন্ত রাজসভায় এসে সাক্ষ্য দিবেন?”

সুরুচি বলিলেন, “আমার স্বামী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতার ঘটস্থাপনা ক’রে প্রত্যহ পূজা ক’রতেন। তাঁরা ঘটে অধিষ্ঠান ক’রে তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন। আমার সঙ্গেও যাবে যাবে কথা ক’ন। তিনি কাশী যাবার সময় তিনটি ঘট একটা গাছ-সিন্দুকে পুরে তালি বন্ধ ক’রে গেছেন। সেই গাছ-সিন্দুকটা রাজসভায় আনলে তাঁরা আমার কথার উত্তর দিবেন।”

দেবতারা সাক্ষ্য দিবেন, এই অভূত ব্যাপার দেখিবার জন্ত সভাস্থ সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। রাজা বরুচিকে আদেশ করিলেন, “চারি জন মুটে সঙ্গে ক’রে এখনই বরুচির বাড়ীতে গিয়ে সেই সিন্দুকটা নিয়ে এসো।”

সুরুচি বলিলেন, “মহারাজ! চারি জনের কর্ম নয়; অন্ততঃ আট-দশ জন পাঠান। তিন দেবতা তর ক’রেছেন, ভারী কি কম?”

রাজার আদেশে দশ জন মুটে লইয়া বরুচির বাড়ী চলিল। সুরুচির দাসীও সদর-দরজায় তালি খুলিয়া গাছ-সিন্দুকটা দেখাইয়া দিবার জন্ত তাহাদের সঙ্গে চলিল।

সুরুচি বলিলেন, “মহারাজ! সিন্দুকটা বসাবার জন্ত রাজসভায় একধারে গঙ্গাজল দিয়া স্থান পরিষ্কার করাতে আজ্ঞা হোক।”

রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ করা হইল। সিন্দুকটা আনিয়া সেই স্থানে রাখা হইলে প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, “সুরুচি! তোমার সাক্ষীগণকে প্রশ্ন কর।”

সুরুচি হাত-যোড় করিয়া বলিলেন, “হে ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর! আপনারা আমার কথার উত্তর দিন, না দিলে হাতে হাঁড়ি ভাঙ্গার মত এই রাজ-সভায় আপনাদের ঘট বাহির করিয়া সকলের সমক্ষে ভাঙিয়া ফেলিব। আমার স্বামী গঙ্গারাম বণিকের নিকট আট শ’ মোহর গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। হে ব্রহ্মা! আপনি জানেন?”

সিন্দূকের ভিতর হইতে উত্তর হইল—“হঁ”।

“হে বিষ্ণু! আপনি জানেন?”

উত্তর—“হঁ”।

“হে মহেশ্বর! আপনি জানেন?”

ভিন্ন কণ্ঠে উত্তর—“হঁ”।

উত্তর শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। রাজা বলিলেন, “কি রকম দেবতা, দেখবার জন্য আমাদের কৌতূহল হ’চ্ছে; সুরুচি! সিদ্ধকের চাবি দাও।” সুরুচি বলিলেন, “মহারাজ! তিনি চাবি আমাকে দিয়া যাননি; কোথায় রেখেছেন, তাও ব’লে যাননি।”

রাজা বলিলেন, “তবে সিদ্ধকের তালা ভাঙ্গাই?”

সুরুচি বলিলেন, “মহারাজের ধেরুপ অভিক্রটি।”

রাজার আদেশে তালা ভাঙ্গিয়া তালা খোলা হইলে, সকলেই দেখিলেন,—ঘট নহে, দেবতা নহে, ছুতের মতো কালো তিন ব্যক্তি নতমুখে সিদ্ধকের ভিতর উপবিষ্ট। তখনই তাহাদিগকে বাহির করিয়া সভায় দাঁড়-কবান হইল। সকলে দেখিলেন, তাহাদের আশাদ-মস্তক কালি-মাখা, পরিধানে ময়লা শাকড়া।

রাজা বলিলেন, “কে এরা? মুখের কালি ধুইয়া দাও।”

মুখের কালি অপসারিত হইলে, রাজা বলিলেন, “ছোট মন্ত্রী! আমি ভেবেছিলাম, তোমার শরীর হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় আজ তুমি রাজসভায় অমুপস্থিত। সहर-কোটাল! তুমি কি বরকটির বাড়ীতে রাত্রিকালে সিদ্ধকের ভিতর বিক্রাম ক’রেই নগর-রক্ষা করছিলে? পুরুত মশায়। বরকটি কি আপনাকে ঘটপূজার ভার দিয়া গেছেন, তাই সিদ্ধকে আসন গ্রহণ ক’রেছিলেন?”

সুরুচি বলিলেন, “মহারাজ! বেণের গায়েও তেলকালি মাখান

হ’য়েছিল। ঔদের চারি জনের কাপড়-চোপড়ও আমাদের বৈঠক-খানায় আছে।”

তখনই গঙ্গারামের গাজাবরণ অপসারিত হইলে সকলেই দেখিলেন, তাহারও সর্বাঙ্গে কালি। কেবল মুখটাই পরিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু কাণের কাছে ও মাথার চুলের ভিতর তখনও কালির বাহার বর্তমান।

রাজা তখন আদেশ দিলেন, “গঙ্গারাম বণিকের হাবর-অহাবর সমস্ত সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইল। তাহার অর্ধেক সুরুচির প্রাপ্য। ছোট-মন্ত্রী, রাজপুরোহিত ও সहर-কোতোয়ালকে এই অবস্থায় উন্টা গাধায় চড়াইয়া ঢাক বাজাইতে বাজাইতে সहरের সকল বাস্তায় ঘুরাইয়া সहर হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হউক। উহাদের মধ্যে যে কেহ এই রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করিবে, সে ১২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবে।”

তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল। তার পর রাজা সুরুচিকে বলিলেন, “মা সুরুচি! তুমি ধেরুপ কোঁশলে আপন সতীত্ব-ধর্ম রক্ষা ক’রেছ, তজ্জন্ত আমার নিকট হইতে হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার পাইবে। ষত দিন তোমার স্বামী ফিরিয়া না আসেন, তত দিন সরকার হইতেই তোমার সংসারযাত্রা নির্বাহ হইবে। স্ত্রীলোকের সতীত্বই পরম ধর্ম।—কোকিলানাং স্বরেকপং, নারীকপং পতিব্রতম্। বিভারুপং কুরুপানাং, কুমারুপং তপস্বিনাম্।”

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরচয়।

মৌন

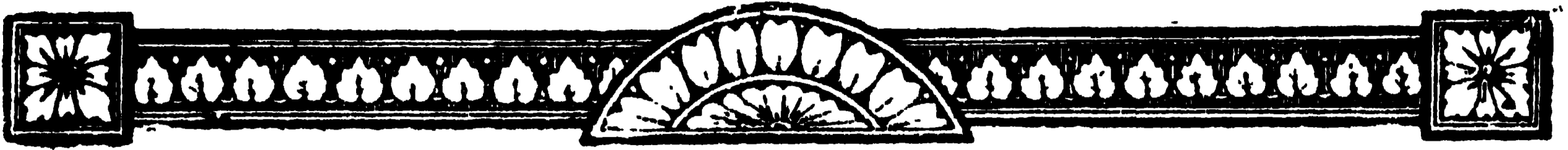
যাজ্বিক জাগো জাগো উন্নয়ন যৌবন-ছন্দে,—
ছিন্ন করিয়া দাও আঁখিপুটে তন্ত্রার বন্ধ,—
অস্তুর ভ’রি তোল জাগ্রত দীপ্ত-আনন্দে,
মর্শ্ব-কমল হ’তে বিথারিছে রূপ-রস-গন্ধ!
অরুণের বর্ণাভা লয়ে ও কি বিকশিছে মুক্তি,
আলোকের উল্লাসে পূর্ণিত নভোনীল সিদ্ধ,
মুক্তা কি বাহিরিল বিদারিগা আপনার গুক্তি,
কৃষ্ণা-আমার বুকে প্রভাসিল পূর্ণিমা ইন্দু!

বিশ্বের বেদনায় টলমলি’ উঠিয়াছে স্বর্গ,
ঝরে’ প’ড়ে পারিজাত শিশিরের অশ্রুতে সিক্ত,
লক্ষ্মীরে পাসরিয়া দুর্ভাগা কাঁদে সুরবর্গ,
কল্প ও মন্দার দাবহত নিঃশেষ রিক্ত!
স্বর্গ-বীণায় আর বাজে নাকো মূর্ছনা মন্দ,—
মন্দাকিনীর জলে নাহি আর উচ্ছল নৃত্য,
আজি হায় ইন্দ্রিয়া জলধির কারাগার বন্ধ,
অপহৃত নিমেষেই অমরার বৈভব-বিস্ত!

হুঃখেরে মস্থিয়া ত্রিভুবন-অস্তুর-লক্ষ্মী,—
উঠিলেন উদ্ভাসি কম-করে মঙ্গল-শঙ্খ,
করণা-কিরণ-স্নাত কজ্জল কালো হু’টি অন্ধি
বিদুরিয়া পদপাতে দৈত্র ও মৃত্যু আতঙ্ক!
বন্ধু, তোমার তরে তাঁর করে নাহি বরমালা,
ঝরিবে না শীর্ষেতে স্নুকোমল করুণার দৃষ্টি,
তুমি চির দুর্ভাগা,—রুদ্রের চির-প্রতিপাল্য,
তোমাদেরি হুঃখের বনিয়াদে গড়ি’ ওঠে সৃষ্টি!

বিকশিবে নন্দন, জ্যোৎস্না সে শিশিরের কুঞ্জ,—
মানুষ ভুলিয়া যাবে বেদনার গভ-ইতিবৃত্ত,—
যৌবন-উল্লাস ছড়াইবে নব নব পুঞ্জ
লক্ষ্মীর অবদানে পূর্ণিবে বিশ্বের চিত্ত।
ভুঞ্জিবে নব-যুগ তোমাদেরি’ সাধনার মূল্য,—
তোমরা রহিবে শুধু বিলুপ্ত বিশ্বতি মর্শ্ব,
তোমাদের অঞ্জলি চিরদিন রহিবে অতুল্য
জীবনের পথচারী চলো আজ মৃত্যুর ধর্ম্মে।

শ্রীকালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য।



বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীজীব শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিনটি প্রতিভাবান্ ভজনপরায়ণ ছাত্র হাতে পাইয়া যথাযোগ্য যত্নসহকারে ইহাদিগকে শ্রীমতাপবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, সিদ্ধান্তশাস্ত্র, বৈষ্ণবস্মৃতি, রসশাস্ত্র এবং স্বরচিত ও শ্রীকৃষ্ণসনাতন-প্রণীত যাবতীয় গ্রন্থাবলী সুচারুরূপে অধ্যয়ন করাইলেন। শ্রীমদনগোস্বামী শ্রীরাধাকৃষ্ণে থাকিয়াই এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে ডাকিয়া কহিলেন,—

—“তন কৃষ্ণদাস ।
নরোত্তমদাসে হইল কৃপার প্রকাশ ।
যে করিল গুরুসেবা যে ভজনরীতি ।
তাহাতেই এই সাক্ষী দেখিল সংপ্রতি ।
গুরুকৃপা সাধন করিলে হেন হয় ।
শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থে বাক্য আছে নির্ণয় ।

—প্রেমবিলাস, ১২ বিলাস ।

এইরূপ অপূর্ণভাবে তিনটি অন্তরঙ্গ শিষ্যকে সর্বপ্রকারে সুশিক্ষিত করাইয়া, তাঁহাদিগকে নিজে ও নিজ-নিজ গুরু এবং শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত পার্বদ-ভক্তবর্গ দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীজীব তাঁহাদিগকে এক-একটি সঙ্গী ভক্তি-মহাবিভ্যালয়ে পরিণত করিলেন। এইবার তাঁহাদিগের দ্বারা তিনি গোড়, বঙ্গ ও উৎকলে—শ্রীচৈতন্যদেব যে অসমোর্ধ্ব প্রেমমাধুর্য্যগর্ভ ভাগবতধর্ম জীবের কল্যাণের জন্ত দান করিয়া গিয়াছিলেন—তাহা জাতিবর্ণনির্বিশেষে অধিকারীমাত্রকেই দান করিবার জন্ত শ্রীভ্রমরামহইতে প্রেরণের শুভসংকল্প করিলেন।

শ্রীজীব ইহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে পাঠাইবার পূর্বে একবার শ্রীভ্রমরামের যাবতীয় লীলাস্থল দেখাইবার অভিলাষ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত স্বামী লীলারসজ্ঞ প্রবীন ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের সঙ্গী রাঘবপণ্ডিত গোস্বামীও ঐ সময়ে ভ্রমরামের যাবতীয় লীলাস্থলী দর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। শ্রীজীব এই পরম-ভক্ত গোস্বামীর সহিত ইহাদিগকে ভ্রমরামের যাবতীয় লীলাস্থল দর্শনে পাঠাইলেন। শ্রীস রাঘবপণ্ডিত গোস্বামী দক্ষিণা-পথবাসী ব্রাহ্মণ। ইনি এক দিকে যেমন পণ্ডিত ও বিচক্ষণ, অন্য দিকে সেইরূপ প্রেমিক ভক্ত। ইনি সর্বদা গোবর্ধন পর্বতের নিকট থাকিয়া ভজন করিতেন। “ভক্তিরত্নপ্রকাশ” নামক একখানি গ্রন্থ ইহারই বিরচিত। ইহার এই নিরপেক্ষ স্নিগ্ধপ্রাণ ভক্তের সহিত ভ্রমরামের যাবতীয় তীর্থ দর্শন করিলেন, এবং ইনি প্রত্যেক তীর্থের লীলার কথা ইহাদিগকে পরমাদরে বুঝাইয়া দিলেন। বহু স্থানেই ইহার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণদ্বয়গণের বিশেষ বিশেষ রহস্যলীলার অমুভব করিয়াও ধস্ত হইলেন। যে যে তীর্থস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুপবিত্র জীবনের নানাপ্রকার অলৌকিক অবদানের দ্বারা যে যে লীলাস্থল পরিচিহিত ছিল—তাহা দেখিয়া এবং সেই সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করিয়া অপূর্ণ ভক্তি-বৈচিত্র্যে ইহার পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ

সনাতনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের কার্য প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার বুঝিলেন যে, কিরূপ শক্তিশালী মহাভক্তের উপযুক্ত হস্তে শ্রীচৈতন্যদেব এই সকল কার্যের ভার দিয়াছিলেন। ইহার সমগ্র ভ্রমরামের লীলাস্থল দর্শনান্তর শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী—প্রমুখ ভক্তগণের যোগ্যতা ও অসাধারণ সামর্থ্যের কথা আলোচনা করিয়া ভ্রমরাম হইতে ভক্তিগ্রন্থ ও যাবতীয় গোস্বামী-রচিত গ্রন্থ ইহাদিগের সহিত গোড়দেশে পাঠাইবার সংকল্পের কথা প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য, সকলেই এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দান করিলেন।

নবম অধ্যায়

গ্রন্থ-লুপ্তন ও শাস্ত্র-প্রচার

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অলৌকিক কৃপায় শক্তিলাভ করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র হইতে যে সকল অমূল্য তত্ত্ব আহরণ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, শ্রীজীব গোস্বামী তাহা ভক্তসমাজে বিতরণের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সাহায্যে সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, শ্রীজীব এরূপ আশা করিয়াছিলেন। এই জন্ত তিনি এই তিনটি ব্রহ্মচারী ছাত্রকে ‘আচার্য’ পদবী প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা গোড়, বঙ্গ ও উৎকলে ভক্তিধর্ম ও গোস্বামি-শাস্ত্রবাহী প্রচারের ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের তিরোভাবের পর শ্রীজীবই তাঁহাদের উদ্দিষ্ট শ্রীভগবৎ-সেবাপথে কায়মনোবাক্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব ভক্তগণের রক্ষক ও পালন-কর্তারূপে পরিণত হইলেন। শ্রীল মদনমোহন, শ্রীল গোবিন্দদেব, শ্রীল গোপীনাথ ও শ্রীল রাধা-দামোদর এই পরম ধর্মে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে এই কার্যের যোগ্য করিয়া তুলিলেন। তখন যে ভাবে ভক্তি-গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোড়ে প্রেরণ করিতে হইবে,— শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসনাতনের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া, শ্রীজীবের উপরই তাহার আশ্রোপান্ত বন্দোবস্তের ভার পড়িল। শ্রীবৃন্দাবনে তখন ভজন-রসিক বহু বৈষ্ণব বাস করিতেছিলেন। সর্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ক্ষৌর্যকার্য সম্পন্ন করিয়া, বর্ষাঋতু হইতে চারি মাস একই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই সময় এইরূপে শ্রীভগবৎকীর্তন-প্রধান যে ব্রত ভক্ত সন্ন্যাসিগণ বা বৈষ্ণবগণ পালন করিয়া থাকেন—তাহাকে ‘চাতুর্মাস্ত ব্রত’ কহে। চাতুর্মাস্ত ব্রতের শেষ মাস কার্তিক মাস—বৈষ্ণবমাসেরই নিয়ম-পূর্বক শ্রীবিষ্ণু-সেবার ও শ্রীহরিকথা-কীর্তনের মাস; এই জন্ত এই মাস নিয়ম-সেবার মাস নামে অভিহিত। শ্রীবৃন্দাবনে ও

শ্রীপুরীধামে বৈষ্ণবগণ এখনও নিষ্ঠা সহকারে নিয়মসেবা ব্রত পালন করিয়া থাকেন।*

কার্তিক মাসের এই নিয়মসেবা শেষ হইলে শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনে কয়েক দিবস-ব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করিলেন, এবং চৌরাশি-ক্রোশ বিস্তৃত ব্রজমণ্ডলের বাবতীর বৈষ্ণব ও মোহান্তগণকে শ্রীবৃন্দাবনে আনয়ন করিলেন। ঐ মহোৎসবকালে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের সম্মুখেই শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্য সত্বে বলিলেন,—

“বহুশ্রমে সর্বশাস্ত্র পড়াইল ইহাৰে ।
সবে মিলি কৃপা কর ইহাৰ উপরে ।
আমার প্রভুর শক্তি হয় ইহা প্রতি ।
শ্রীভট গোসাঞি ইহাৰে কৃপা কৈল অতি ।”

—প্রঃ বিঃ—১২শ বিলাস।

অতঃপর তিনি শ্রীনিবাসের শাস্ত্রাধ্যয়নের ইতিবৃত্ত, তাঁহার অপূৰ্ণ মহিমা, তাঁহার নিষ্ঠা—এই সকল বিস্তৃতভাবে বৈষ্ণবসমাজে বিবৃত করিয়া—তাঁহার “আচার্য্য” উপাধি লাভের কথা বলিলেন। অতঃপর শ্রীজীব নরোত্তমের মহিমা-কীর্তন করিয়া শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর কৃপাপ্রাপ্তির আখ্যান বিবৃত করিলেন। শ্রীল নরোত্তমকে শ্রীজীব কেন “ঠাকুর মহাশয়” উপাধি দান করিয়া শ্রীনিবাসের সহিত বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়া, শ্রীল নরোত্তমের প্রতি বৈষ্ণব সমাজের আশীর্ব্বাদ তিচ্ছা করিলেন। শ্রীজীব ইহার পরে শ্রামানন্দকে বৈষ্ণবগণের নিকট উপস্থিত করিলেন। যখন শ্রীজীব এই সুন্দর যুবকের গুণাবলী বর্ণনা করিলেন, তখন সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ আশ্চর্য্য হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন; এবং এই তিন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যুবকের দ্বারা যে জগতের মহামঙ্গল সাধিত হইবে, ইহা জানিয়া সকলেই শ্রীগোবিন্দদেবের নিকট ইহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীজীবের এই কার্য্যে পরমাগ্রহে সকলে সম্মতি দান করিবার পর শ্রীজীব মথুরা নগরে তাঁহার বা শ্রীরূপ-সনাতনের যে সকল অল্পরাগী সেবক ছিলেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং সমগ্র জগতের পক্ষে এই প্রস্থাবলীর প্রচার যে পরম কল্যাণপ্রদ, ইহা বুঝিয়াই তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ-প্রেরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার আদেশ দান করিলেন।

সঙ্কল্পিত শুভদিনে, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব মোহান্তই শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী বাবতীর বৈষ্ণব প্রস্থাবলী চারিটি পেটিকার আবদ্ধ ও একটি সিন্ধুকের মধ্যে স্থাপন করিয়া মোমজামা দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিলেন। ঐ গ্রন্থ-সম্পূটে অন্তঃস্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাবতীর সিদ্ধান্ত গ্রন্থ—বিশেষতঃ, শ্রীভাষ্য, মাধ্বভাষ্য-প্রমুখ ব্রজহরের বাবতীর বৈষ্ণব ভাষ্য এবং ক্রমদীপিকা, নৃসিংহ-পরিচর্যা প্রমুখ অন্তঃস্থ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ, নানাবিধ টীকাসমেত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রমুখ পুরাতন গ্রন্থসমূহ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের টীকা সমেত উপনিষদাবলী, ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ প্রমুখ প্রস্থাবলী

বিভাজন ছিল, এরূপ অল্পমান অসম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর, শ্রীরূপ গোস্বামীর, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর, ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর বাবতীর গ্রন্থ, শ্রীজীবের ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের যে গ্রন্থ তখন পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল—সেই সকল গ্রন্থও এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বলা বাহুল্য, গ্রন্থসংখ্যা এইরূপ অধিক ছিল বলিয়াই তাহা বহুদূর জন্ত হইখানি গো-শকটের প্রয়োজন হইল।

হুইখানি গো-শকট (পঞ্চদশ জন) সশস্ত্র প্রহরিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীগোবিন্দ-মন্দির হইতে যাত্রা করিল। অতঃপর “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ধ্বনি সহকারে শকটস্থয় মথুরাভিমুখে চালিত হইল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রামানন্দ সকলকে স্বধাযোগ্য প্রণাম, আলিঙ্গনাদি করিয়া গোঁড়ে যাত্রা করিলেন। শ্রীজীব, শ্রীল রাঘব-পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজপ্রমুখ কয়েক জন ভক্ত শ্রীনিবাসাদির সহিত মথুরায় আসিলেন। মথুরায় রাজনিবাস করিয়া প্রভাতে গ্রন্থপূর্ণ শকট লইয়া তাঁহারা গোঁড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীজীব মথুরার মহাজনগণের দ্বারা রাজকীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রামানন্দের সহিত আরও কিছু দূর গমন করিয়া শ্রীজীব, রাঘবপণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিদায় গ্রহণ করিলেন; এবং সকলকেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, তাঁহার প্রেমধর্ম্ম ও তদীয় অভিন্নবপু ভক্ত গোস্বামীদিগের গ্রন্থ প্রচায়ে আদেশ দান করিলেন। পরমধীর শ্রীজীব গোস্বামীর এই সময়ের অবস্থা সত্বে “নরোত্তমবিলাসে” বর্ণিত আছে,—

“শ্রীজীব গোস্বামী কোটি সমুদ্র গভীর।

বিচ্ছেদে ব্যাকুল-চিত্ত—বাহ্যে মহাবীর।”—২য় বিলাস।

গ্রন্থপূর্ণ শকটসহ ইহারা মথুরার রাজপথ দিয়া এটোরা হইতে মারিখণ্ডের বনপথে চলিলেন। এখানে অনেক নীলাচল-ষাত্রী তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইল। এই পথেই শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত তিনটি মহাপ্রাণ যুবক সর্বত্যাগী গোস্বামীদিগের গ্রন্থরূপী মহাশক্তি সংগ্রহ করিয়া, সেই পথেই গোঁড়দেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে তাঁহারা পঞ্চকোট পর্য্যন্ত আসিয়া ক্রমে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিলেন।

মহাপরাক্রান্ত মল্লরাজ বীর হাধির তখন বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধীশ্বর। বহু বীর-সৈন্তে ও বৃহৎ বৃহৎ কামানে তাঁহার রাজধানী সুরক্ষিত। কথিত আছে, তিনি সৈন্তদল সাহায্যে ধনবানদিগের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না।

কয়েক জন মহাজন বহু ধনরত্নপূর্ণ সিন্ধুক গোশকট সাহায্যে গোঁড়দেশে লইয়া যাইতেছেন, এই সংবাদ বীর হাধিরের কর্ণগোচর হইলে, দৈবজ্ঞের গণনার ইহা সমর্থিত হইল। তখন রাজা এই মহাজনগণের গোবানের পশ্চাতে চর নিযুক্ত করিলেন। গোশকট ক্রমে রঘুনাথপুর-সন্নিহিত মালিয়ারায় উপস্থিত হইলে রাজা জানিতে পারিলেন, এই সকল মহাজনগণ গোবানসহ ঐ স্থানের এক ভৌমিকের ভবনে রাজনিবাস করিবেন; এবং তাঁহাদের সঙ্গে ১৫ জন সশস্ত্র রক্ষী আছে। বীর হাধির হুই শত সুরক্ষিত সৈন্ত পাঠাইয়া আদেশ করিলেন, কাহারও প্রাণহানি না করিয়া সমস্ত ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিতে হইবে। গাড়ী গোপালপুবে

* কার্তিক মাসের ব্রতোপবাসবিধি শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসের বোড়শ বিলাসে ব্রষ্টব্য।

পৌছিলে সকলে সেখানেই রাজিবাঁস করিবার সংকল্প করিলেন। ছই প্রহর রাজি পধ্যস্ত সকলে কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করিয়া পথপ্রান্তিকবশতঃ ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।—সেই সময় রাজপ্রেরিত সৈন্যদল সিন্দুক ধনরত্ন পূর্ণ মনে করিয়া, কাহারও প্রাণহানি না করিয়া লুঠিয়া রাজধানীতে লইয়া গেল। সিন্দুকটি খুলিয়া পরীক্ষা না করিয়াই তাহার উছা একেবারে রাজা বীর হাঙ্গিরের সকাশে উপস্থিত করিল।

শ্রীভগবান অতি অলৌকিক উপায়ে তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণসনাতনের ও শ্রীজীবের অভিলাষ পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রীশ্রীমানন্দ কত দিনে গোড়, বঙ্গ ও উৎকলে পৌছিবেন, কত দিনে ভক্তগণকে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের অধ্যাপনা আরম্ভ হইবে, কোন্ সৌভাগ্যবান্ ধনী কত দিনে ভক্তিগান্ধ-প্রচারের জঙ্গ উপযুক্ত চতুৰ্পাঠী স্থাপনের সহায়তায় অগ্রসর হইবেন—গ্রন্থরাজি লইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে রাজ্য করিবার পরই তিন জনে এই প্রকার নানা কথার আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থপ্রচারে এই বিলম্ব পরমকৌতুকী মহাপ্রভুর কি সম্ব হইতে পারে? তাই তিনি বিষ্ণুপুরকে গ্রন্থপ্রচারের প্রথম কেন্দ্র নির্বাচন করাইয়া বিষ্ণুপুরাধিপত্যকে কুতর্ভ করিবার জঙ্গই তাঁহার দ্বারা এই অমূল্য-রত্নরাজি লুঠন করাইলেন। লীলাময়ের লীলা কি দুর্কৌশল্য!

গ্রন্থরাজি লুষ্ঠিত হওয়ার শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রীশ্রীমানন্দ কিরণ ব্যথিত হইলেন তাহা কেবল অমুভবযোগ্য। তাঁহাদের চিরপোষিত আশাসতার মূল যেন সহসা উৎপাটিত হইয়া গেল— তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনা যেন ব্যর্থ হইল। ভক্তিরত্নাকর এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

নরোত্তম কহে—আমি প্রাণ তেরাগি ব।

শ্রীশ্রীমানন্দ কহে—এই অনলে পশিব।

শ্রীনিবাস আচার্যের মনে হইল বাহা।

কহিতে বিদরে হিরা—কি কহিব তাহা। —৭ম তরঙ্গ।

অঃহা, কি মর্ষভেদী উচ্ছাস! কিন্তু শ্রীজীব প্রবীণ শ্রীনিবাসের হস্তেই সকল ভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনিও অধীর হইলে ইহাদিগকে কি করিয়া শাস্ত করিবেন? এইজঙ্গই তিনি নরোত্তম ও শ্রীশ্রীমানন্দকে নানা মধুর উপদেশে প্রবোধ দান করিয়া খেহুরীতে পাঠাইলেন; এবং কয়েক জন প্রহরীকে এই সংবাদ সহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। গো-শকট ও অস্ত্র সঙ্গী-প্রহরীদিগকে এক স্থানে রাখিয়া তিনি একাকী গ্রন্থের অমূল্যত্বানে বহির্গত হইলেন।

যিনি অন্তর্ধানিরূপে বীর হাঙ্গিরের স্তদয়ে থাকিয়া গ্রন্থাপহরণের প্রেরণা দিয়াছিলেন—তাঁহারই প্রেরণায় কৃষ্ণবল্লভ নামক এক জন পবিত্রচরিত্র ভক্ত ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় হইল। শ্রীনিবাসের অপূর্ব মতিমা স্তদয়ঙ্গম করিয়া কৃষ্ণবল্লভ অচিরেই তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীনিবাস দেউলিগ্রামে কৃষ্ণবল্লভের বাসগৃহে আসিয়া অবস্থান করিলেন; তিনি তাঁহারই নিকট জানিতে পারিলেন, বীর হাঙ্গিরের রাজসভায় ভাগবত পাঠ হইতেছে। শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় ভাগবত পাঠ শুনিতে গেলেন। প্রেমবিলাসকার বলিতেছেন— প্রথম দিন গোপনে কৃষ্ণবল্লভের সহিত রাজসভায় বাইরা ভাগবত পাঠ শুনিয়া আসিলেন; কিন্তু ব্যাস নামক যে ব্রাহ্মণটি ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, তিনি শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের ঢীকা পড়েন

নাই, সুতরাং তিনি যেভাবে নিজের ইচ্ছামত ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, শ্রীনিবাস তাহা শুনিয়া সুখ পাইলেন না। পরদিন রাজসভায় ভাগবত-পাঠ শুনিয়া বলিলেন,—

“ব্যাস-ভাবিত এই গ্রন্থ ভাগবত।

শ্রীধর স্বামীর ঢীকা আছরে সন্মত।

কিবা বাধানহ ইহা বুঝনে না যায়।

ইহার অর্থ নাহি হয় পণ্ডিত-প্রতিভায়।”

প্রেমবিলাস। ১৩শ বিলাস।

পরদিন ব্যাস ভাগবত-ব্যাখ্যা করিবার সময়ে শ্রীধরের অসন্মত ব্যাখ্যা করিয়া বসিলেন। শ্রীনিবাস তাহা দেখাইয়া দিলে—

“পণ্ডিত কহে মহারাজ! ভাগবতের অর্থ।

আমা বিনা বাধানয়ে কাহার সামর্থ্য।

কোথাকার ক্ষুদ্র বিপ্র, মধ্যে কহ কথা।

কিবা বাধানিবে তুমি, আমি বৈসে এখা।”—প্রেমবিলাস। ৬।

অতঃপর রাজ্যে সাগ্রহে শ্রীনিবাসকে শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে বলিলে শ্রীনিবাস আচার্যগণের পদ স্মরণ করিয়া ভক্তিপূত চিত্তে শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বয়ং রাজা, রাজপণ্ডিত ও রাজসভাস্থ সকল শ্রোতাই চমৎকৃত হইলেন।

রাজা বীর হাঙ্গির ও তাঁহার সহধর্মিণী, রাজকুমার ব্যাস চক্রবর্তী, সকলেই শ্রীনিবাসের আকৃতি ও প্রকৃতি, পাণ্ডিত্য ও সদাচার দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীনিবাস ধীরে ধীরে আত্ম-পরিচয় প্রদানপূর্বক গ্রন্থলুঠনের বিদ্য বিবৃত করিলেন। বিষ্ণুপুররাজ অমুতপ্ত হইয়া যে, গ্রন্থগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন তাহাই নহে, পরন্তু সপরিবার তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজ ঐশ্বর্য ও রাজ্য তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিবাস খেতুরীতে গ্রন্থপ্রাপ্তির শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, এবং যে শকটস্থ গ্রন্থ আনিয়াছিল, সেই শকটস্থ শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, ও শ্রীগোপীনাথের জন্য রাজপ্রদত্ত উপহারে পূর্ণ করিয়া অজ্ঞধারী বন্ধিগণের সহিত গ্রন্থপ্রাপ্তির ও বিষ্ণুপুররাজের মতি-পরিবর্তনের সংবাদসহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর-রাজকে, রাণীকে, রাজপুরোহিতকে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং রাজপুরোহিত ব্যাস চক্রবর্তী ও কৃষ্ণবল্লভকে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। রাজসভায় প্রতিদিন শ্রীভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগান্ধ আলোচিত হইতে লাগিল।—ক্রমে বিষ্ণুপুরের বহুলোক ভক্তিপথের পথিক হইল—অধিক কি, বিষ্ণুপুররাজ্য অনতিবিলম্বে যেন হরিভক্তি-প্রবাহে পরিপ্লাবিত হইল।*

* প্রেমবিলাসের ত্রয়োদশবিলাসে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুপুরে গ্রন্থাপহরণের সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরাধাকৃষ্ণে কাঁপ দিয়া আত্মবিসর্জন করেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছিলাম, প্রেমবিলাসের বিবরণ বিশেষ সাবধানতা সহকারে পরীক্ষা না করিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ, শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি-রত্নাকর বা নরোত্তমবিলাসের সহিত মত-বিবোধের স্থলে প্রেমবিলাসের বর্ণনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু দুঃখের বিবরণ, পরমশ্রদ্ধাঙ্গন অধ্যাপক ৮ সতীশচন্দ্র মিত্র



পাটের কথা



আজ মধ্য এবং পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই ঘাটে-মাঠে পাটের কথা; তাহার কারণ স্বপ্রকাশ। বর্তমান কালে পাটই বাঙ্গালার প্রধান ক্ষেত্রজ ও শ্রেষ্ঠ পণ্য। কিন্তু বাঙ্গালার কৃষকরা অধিক লাভের আশায় এবার অত্যন্ত অধিক জমিতে পাট বপন করিয়াছে। বাঙ্গালা সরকার পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন ব্যবস্থাই এবার করেন নাই। এই কার্যে তাঁহারা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন—এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। তাঁহাদের বুদ্ধির বিশেষ অভাব সৃচিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, পাট এমন একটি পণ্য যে, অতি সামান্য কারণেই উহার মূল্যের অতিশয় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। উহার চাহিদারও কিছু স্থিরতা নাই। শস্তাদি চালান দিবার এবং রক্ষা করিবার পক্ষে পাটের খলিয়া যেকোন উপযোগী, তেমন উপযোগী অন্য কোন অল্পকল্প অংশ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ার ইহার বিক্রয় অবাধে চলিলেও ইদানীং ইহার চাহিদা বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। মার্কিনমূল্যে পূর্বাপেক্ষা কম পাট কাটিতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম সাত মাসে প্রশান্তমহাসাগর-তীরস্থ দেশগুলি বাদ দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, ঐ বৎসর মার্কিণে ৩৮ কোটি ১০ লক্ষ গজ পাটের জিনিষ কাটিয়াছিল। উহার পূর্ব-বৎসর কাটিয়াছিল ৫১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ; মার্কিণ যুক্তরাজ্য ও অন্ত কয়েকটি দেশে কত গাঁইট পাট গত পাঁচ বৎসরে চালান গিয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল,—*

দেশের নাম	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
মার্কিণ	৩২০,০০০	৪৮০,০০০	৬১৫,০০০	৩৬৫,০০০	২৭০,০০০
স্পেন	২৬০,০০০	২৮০,০০০	১৫,০০০	—	৩৫,০০০
ইতালী	৮৫,০০০	৪৫,০০০	৪৫,০০০	৪০,০০০	২০,০০০
ইটালী	৪৩০,০০০	২৩৫,০০০	৫৪০,০০০	৩৬৫,০০০	২৪৫,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা}	১৩০,০০০	১৬৫,০০০	২০০,০০০	২৩৫,০০০	১৮৫,০০০
জাপান	১২৫,০০০	১৪০,০০০	১৭৫,০০০	১২৫,০০০	১৪০,০০০

* মিঃ উইগলস ওয়ার্থের বক্তৃতার প্রদত্ত হিসাব হইতে গৃহীত।

দেশের নাম	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮	১৯৩৮-৩৯
অল্পাংশ প্রাচ্য বন্দরে	১০০,০০০	১৪০,০০০	১১০,০০০	৭০,০০০	৮০,০০০
জার্মানী	২২০,০০০	২১০,০০০	২৭০,০০০	৮১৫,০০০	৮৭০,০০০
ফ্রান্স	৪৪০,০০০	৪০৫,০০০	৪৭০,০০০	৩৪১,০০০	৪২৫,০০০

সকল দেশের হিসাব এস্থলে উদ্ধৃত না হইলেও সর্বত্রই পাটের চাহিদা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে। বর্তমান যুরোপীয় যুদ্ধের সম্ভাবনায় ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই গ্রেট-ব্রিটেনে এবং ফ্রান্সে অধিক পাট রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থায় নির্ভর করিয়া বিচার চলিতে পারে না।

পাটের চাহিদার কোন স্থিরতা নাই। উহার হ্রাস-বৃদ্ধি খাম-খেয়ালী ভাবেই ঘটয়া থাকে। তাহার কারণ, পাটের কতকগুলি অল্পকল্প পণ্য উহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ইহার ফলে আমাদের, বিশেষতঃ, বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার যে বিষম বিপর্যয় ঘটতেছে, তাহাতে চুশ্চিত্তার সীমা থাকে না; কারণ, পাটই এখন বাঙ্গালী জাতির ধনার্জনের প্রধান উপায়। গত এক শতাব্দীর অধিক কাল হইতে শিল্পপ্রধান বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান হওয়ার যে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, সংপ্রতি কৃষির প্রসার এবং বহির্বাণিজ্যের বিস্তার-হেতু অধিক অর্থাগম হওয়ার এ পর্য্যন্ত তাহার তীব্রতা তেমন বেশী মনে হয় নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের ডাণ্ডী নগরে প্রথমে পাটের আমদানী হয়। তৎপূর্বে পাটের বিশেষ আদর ছিল না; অধিক কি, যুরোপে উহার নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু পাটের আদরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার দরও চড়িতে লাগিল। পাটের প্রধান বিশেষত্ব—বাঙ্গালা, আসাম এবং বিহারের জুই-একটি স্থান ভিন্ন আর কোথাও ইহার আবাদ সম্ভাষণপ্রদ নহে। পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্রের পলিপড়া চর-জমিতে উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অথচ সর্বত্রই পাটের প্রয়োজন। কাজেই ইহাকে বাঙ্গালার লক্ষ্মীস্বরূপ পণ্য বলা যাইতে পারে। এখন এই পাটের চাহিদা যদি হ্রাস পায়, অথবা উহার দর

যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর সর্বনাশ হইবে। উহার চাহিদা বাহাতে হ্রাস পায়, সে জন্ত চেষ্টাও যে না হইতেছে, এ কথা বলা যায় না।

চাহিদার অধিক পাট উৎপন্ন করিলে উহার মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইবেই। প্রধানতঃ কলওয়ালারা উহার খরিদার। তাহারা গুদামে পাট সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং ফসল অধিক হইয়াছে বুঝিতে পারিলে মাল ক্রয়ের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে না; এই জন্তই পাটের দর কমিয়া যায়। পাট কখন ১৮ টাকা মণ, আবার কখন আড়াই টাকা মণও বিক্রয় হইয়া থাকে। মূল্যের এরূপ তারতম্য অল্প কোন পণ্যেরই হয় না। কয়েক মাস পূর্বে যে পাট ১৭ টাকা মণ বিকায় হইয়াছে, আজ মফস্বলে সেই পাট সাড়ে তিন টাকাতোও কিনিবার ক্রেতার অভাব। পল্লী-গ্রামের কোন কোন স্থানে গুটি পাট আড়াই টাকা হইতে এগার সিকা মণ বিকায় হইতেছে, আর দেশী পাট ৩ টাকা ৯ আনা হইতে ৩ টাকা বার আনা দরে বিকায় হইতেছে। ঐ দরে পাট বেচিলে কৃষকের খরচাই উঠে না, লাভ হওয়া দূরের কথা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এবার পাট অধিক উৎপাদিত হওয়ায় তাহার আদর নাই; কেহই কিনিতেছে না। যুদ্ধের পূর্বে এই পাট বিক্রয় করিয়া ৭০ কোটি হইতে ৯০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ভারতের আয় হইয়াছিল। ফলতঃ বাঙ্গালায় অধিক পাট জন্মে বলিয়া বাঙ্গালীরই অধিক লাভ হইয়াছিল। প্রত্যেক বাঙ্গালীর গড়ে প্রায় ১২ হইতে ১৪ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। এখন পাটের দর অতিশয় নামিয়া যাওয়ায় কেবল যে চাষী মহলেই হাহাকার উঠিয়াছে এরূপ নহে, সকল সম্প্রদায়কেই সেই আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে।

গত বৎসর পাট বুনিবার পূর্বে বাঙ্গালার সচিবসভ্য এক ইস্তাহার জারী করিয়া বলিয়াছিলেন, এবার কেহ ১২ টাকা মণের কম দরে পাট কিনিতে বা বেচিতে পারিবে না; অর্থাৎ যে গুটি-পাট এখন মফস্বলে আড়াই টাকা এগার সিকা মণ বিকায় হইতেছে, তাহাও ১২ টাকা না হয় মফস্বলে এগার টাকা মণ বেচিতে হইবে, ইহাই হইয়াছিল সচিব দলের অর্থাৎ সরকারী ফতোয়া। কিন্তু বাঙ্গালার ব্যবসায়ী সচিবরা যদি ভাল পাট ৬০ টাকা মূল্যে লইবেন বলিয়া ঘোষণা না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই

তাহারা বেপরোয়া হইয়া এত বেশী জমিতে পাট বুনিত না। এবার এখনও যুদ্ধ চলিতেছে; কিন্তু এবারকার যুদ্ধ পরিখাতেও হইতেছে না, এবং পাটের বস্তারও তেমন প্রয়োজন হইতেছে না বলিয়াই তাহাদের ধারণা ছিল; কাজেই পাটের অত্যধিক চাহিদা নাই। তবে ইতিমধ্যে দুই কোটি বালির বস্তার ফরমাস হইয়াছে, তাহাতে পাটের মূল্যের কি তারতম্য হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্ত সাগরপথ বিঘ্নবহুল হওয়াতে এবং অল্প কারণে জাহাজের অভাব হওয়ায় সাগরপথে পাট স্থানে স্থানে অল্প চালান যাইতেছে। সুতরাং এবার অদূর ভবিষ্যতে যে পাটের মূল্য নিশ্চিতই বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে,—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এদিকে মণ-করা পোণে তিন টাকা দরে গুটি-পাট বেচিয়া, এবং পৌনে ৪ টাকা মূল্যে দেশী পাট বেচিয়া চাষীদের মূলেই লোকসান হইতেছে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালায় প্রায় ২ লক্ষ টন (এক টন প্রায় সওয়া ২৭ মণ) করিয়া পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পাট উৎপাদন-কার্যে ১ লক্ষ চাষী নিযুক্ত আছে। ইহা ভিন্ন দালালী, যাচনদারী, মালবহনকারী, আড়ৎ-দারী প্রভৃতি কার্যেও বহু লোক নিযুক্ত থাকে। ভারতে যত পাট উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৯০ ভাগ বাঙ্গালায় জন্মে। গত যুদ্ধের পূর্বে ভারতে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাঁইট পর্য্যন্ত পাট উৎপন্ন হইত; সরকারী নিয়ন্ত্রণ-চেষ্টার ফলে উহা কমিয়া প্রায় অর্ধেক—৬০ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাতেও পাটের মূল্য পূর্বে অবস্থায় থাকে নাই। উহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং এজন্ত সাবধান হওয়া উচিত। বার্তিক-নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অদূরদর্শীর ঞ্চায় খেয়াল অমুযায়ী কাজ করিলে তাহার ফল মন্দ হইবেই। পণ্যের মূল্য প্রধানতঃ যোগান এবং টানের উপর নির্ভর করে। শত বৎসর পূর্বে পাট উপেক্ষিত পণ্যই ছিল; উহার মূল্য প্রতি মণ বোধ হয় দুই টাকা আড়াই টাকাই ছিল। কিন্তু তখন এ দেশের লোকের যে সামান্য শিল্প-বাণিজ্য ছিল, তাহাতে তখন পাটের চাহিদা ছিল না বলিয়া লোকে বিশেষ কষ্ট-বোধ করিত না। তাহার পর এক দিকে শিল্প যেমন হ্রাস পাইয়াছে, অল্প দিকে আবাদী জমির পরিসর

বৃদ্ধি এবং রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির ফলে কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে লোকে সেই কষ্টের তীব্রতা অনুভব করে নাই। এই রপ্তানী বাণিজ্য-পণ্যের মধ্যে পাটই সর্বপ্রধান। পাটের দর মণ-করা তিন টাকা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পনের-নোল টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। সেই জন্ত কেবল পাট বেচিয়াই বাঙ্গালার লোক প্রতি বৎসর ৬০—৬২ কোটি টাকা পর্যন্ত পাইয়াছিল। ইদানীং সকল কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা এবং মূল্য বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু অগ্ৰাণ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় পাটের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর সেই পাটের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছেই, পরন্তু বাঙ্গালার আর্থিক পরিস্থিতির অনেক ওলট-পালট ঘটিয়াছে। এবার ঠিক কি পরিমাণ পাট জন্মিয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। কারণ, এবার যে পরিমাণ জমিতে যত পাটের চাষ হইয়াছিল, জলের অভাবে সেই সমস্ত পাট কাটা হয় নাই। সরকারের প্রকাশিত পাট-ফলনের পূর্বাভাস সকল সময় নিভুল হয় না। মিষ্টার উইগিল-ওয়ার্থ (Wiggle'worth) বিলাতে তাঁহার বক্তৃতার বলিয়াছেন যে, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের পূর্বে এ দেশে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাঁইট বা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মণ পাট জন্মিত। এবার এ দেশে পাটের উৎপত্তি যদি ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পাটের ফলন এবার ঐরূপই হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালায় যে পাট জন্মিয়াছে, তাহার পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি মণ ধরা যাইতে পারে। ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে কলিকাতার পাটের বাজারের হিসাবে প্রকাশ, উৎকৃষ্ট ১নং তৈয়ারী গাঁইটের মূল্য ছিল ৩২ টাকা ৪ আনা; কিন্তু রপ্তানী-কারকরা ঐ দিন কোন পাট খরিদ করেন নাই। অর্থাৎ খুব ভাল গাঁইট-বন্দী পাট ৬ টাকা চারি আনা মণ বেচিতে চাহিলেও তাহার খরিদদার মিলে নাই। এখন পাকা গাঁইটবন্দী পাট যদি মণকরা ৬ টাকা ৪ আনায় বিক্রয়, তাহা হইতে চানী কত পায়? তাহা কলিকাতায় লইয়া যাইবার এবং গাঁইটবন্দী করিবার খরচ ত আছেই; সুদূর অঞ্চলস্থ চানী মণকরা সাড়ে ৫ টাকার অধিক মূল্য কিছুতেই পাইবে না। গত বৎসরও চানীরা এই সময়

উহার দ্বিগুণ মূল্য পাইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় সাধারণ গুটি-পাট যে আড়াই টাকা তিন টাকা মণ মফস্বলে বিক্রাইবে, ইহাতে বিশ্বয়ের কোন কারণ নাই। এত অল্প মূল্যে বাজারে বেচিবার লোক আছে, কিনিবার লোক আদৌ নাই। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে গুটি-পাটের মূল্য ত মণ-করা ৭ টাকা সাড়ে ১৩ আনা বিক্রাইয়াছিল। ১ মণ পাট উৎপাদন করিতে কৃষকের খোরাকী সমেত খুব কম করিয়া ধরিলেও সাড়ে চারি টাকা খরচাই পড়ে। কাজেই এবার কৃষকদিগকে আসলেই লোকসান দিতে হইতেছে; অর্থাৎ তাহাদের পাট উৎপন্ন করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা তাহারা পাইতেছে না;—তাহাদিগকে তাহা অপেক্ষা মণকরা ১০ পাঁচ সিকা দেড় টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। এখন এবার যদি ৫৪ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষকদিগের ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি হইবে বলিয়াই মনে হয়। এখন যদি ১০ লক্ষ লোক এই পাট উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক রায়তকে প্রায় ৬ টাকা করিয়া গড়ে আসলে লোকসান দিতে হইবে। এই দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা বড় কম ক্ষতি নহে। বাঙ্গালার সচিবসভ্য এবং গবর্নরও বলিতেছেন যে, এবারকার বৃদ্ধি কেবল বিমানাক্রমণ হইতেছে,—স্থলে অধিক বৃদ্ধি হয় নাই। সেই জন্ত বৃদ্ধি পাটের তেমন টান হইতেছে না। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের যেরূপ পরিস্থিতি, তাহাতে এবার বিমান বৃদ্ধিই অধিক হইবেই—ইহা জানা কথা। অশিক্ষিত চানীরা তাহা বুঝে নাই, সেই জন্ত তাহাদিগকে ঐ ক্ষতি সহিতে হইয়াছে। যে দেশের বুদ্ধিমন্ত সচিবরাও ইহা বুঝেন নাই, সে দেশের নির্বোধ ও অশিক্ষিত সাধারণ চানীরা যে তাহা বুঝিবে না,—ইহাতে বিশ্বয়ের কি কারণ থাকিতে পারে? সার জন হার্বার্ট এ দেশে নূতন আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি ব্যাপারটা যদি না বুঝিয়া থাকেন, সে জন্ত তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া অসঙ্গত।

বর্তমান সময়ে বাঙ্গালার বহির্বাণিজ্যের অবস্থা মোটের উপর মন্দ বলা যায় না। সত্য বটে, যুরোপীয় মহাদেশে এ দেশের পণ্য অধিক চালান যাইতেছে না,—কিন্তু অল্প দিক দিয়া তাহা কতকটা পোষাইয়া যাইতেছে।

গ্রেট ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় পণ্য অধিক চালান যাইতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় শতকরা ১০২ টাকা হিসাবে, কানাডায় শতকরা ৯০ টাকা হারে এবং অস্ট্রেলিয়ায় শতকরা ৮০ টাকা হারে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে গণিব্যাগ বা বস্তার রপ্তানীই অধিক হইয়াছে। আমেরিকার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে এবার ভারত হইতে প্রায় দশ কোটি টাকার পণ্য অধিক চালান গিয়াছে, তন্মধ্যে মার্কিনের সহিত বাণিজ্যে ভারত শতকরা ৮৩ ভাগ পণ্য বেশী চালান দিয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, এই যুদ্ধ মিটিয়া গেলে ঐ সকল দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী কমিবে কি না? অধিকন্তু পাটের চাহিদা ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে কি না? যুদ্ধের পর যুরোপীয়েরা যখন বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ভারতীয় বাণিজ্য কিছু কমিবেই। তাহার পর পাটের রপ্তানী ক্রমশঃ কমিবে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে। কয়েক বৎসর ধরিয়া পাটের রপ্তানী কমিয়া আসিতেছে, ইহা বাণিজ্যের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল,—

খৃষ্টাব্দ	কত টন চালান গিয়াছে	উত্তর মূল্য কত
১৯২৭—২৮	১৭, ৭৬, ৬৫২	৮৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা
১৯২৮—২৯	১৮, ০৯, ৩৫৭	৮৯ " ২৫ " "
১৯২৯—৩০	১৭, ৬৪, ৮৩৯	৭৯ " ১০ " "
১৯৩০—৩১	১৩, ৮৬, ৩৫৪	৪৪ " ৭৮ " "
১৯৩১—৩২	১২, ৪৯, ৬৩৫	৫৩ " ১৪ " "
১৯৩২—৩৩	১২, ৪২, ৮০১	৫১ " ৪৪ " "
১৯৩৩—৩৪	১৪, ২০, ৩২৩	৩২ " ৬০ " "
১৯৩৪—৩৫	১৪, ৩৭, ১৯২	৫২ " ৫৪ " "

উপরের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিদেশে ক্রমশঃ পাট এবং পাট হইতে প্রস্তুত পণ্যের চালান কম হইয়া আসিতেছে। আবার মূল্যের দিক দিয়াও পাট বেচিয়া ভারতের আয় দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। আট বৎসরে প্রায় ৫১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পাট অর্থাৎ প্রায় ৫২ কোটি টাকা ভারতে কম আমদানী হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের, বিশেষতঃ, বাঙ্গালার আয় অত্যন্ত কমিতেছে। কলিকাতা হইতে যত পণ্য বিদেশে চালান যায়, তাহার অর্ধেক (শতকরা ৫০ ভাগ) পাট এবং পাটজাত পণ্য। ইহার রপ্তানী হ্রাস পাইলে ভারত

সরকারের গুদ-খাতে রাজস্ব কম পড়িবে, এবং কৃষকদিগের বাড়া-ভাতে বালি পড়িবে। এখন কথা হইতেছে যে, সরকার দুই-এক বৎসর না হয় কোনও গতিকে পাটের রপ্তানী কিছু বৃদ্ধি করিতেও পারেন, কিন্তু চিরকাল তাহা পারিবেন না। শণ, সিসল (Sisal) প্রভৃতি অংশুগুলি পাটের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। ইহাদের প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ বাড়িবে কি না, তাহা বুঝা কঠিন; কারণ, শণ, সিসল প্রভৃতি গুণে পাটের সমকক্ষ নহে। কিন্তু কাগজের বস্তার চাহিদা নানা দিক দিয়াই বাড়িতেছে। ফলতঃ অবস্থা দেখিয়া শঙ্কা হইতেছে যে, পাট বাবদ বাঙ্গালার আয় আরও কমিবে। এক্ষণে অবস্থার পূর্ক হইতে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। এখন কি উপায়ে সাবধান হইতে হইবে, এবং ঐ ক্ষতির পূরণ করিতে পারা সম্ভব হইবে, তাহা সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যিক।

১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে পৌণে ৯৭ কোটি টাকার পাট এবং পাটজাত পণ্য বিদেশে চালান গিয়াছিল। সে হিসাবে ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে পাট ও পাটজাত পণ্য বেচিয়া ভারতীয় কৃষক ও পাট-কলওয়াল তাহার তিন ভাগের এক ভাগ টাকা পাইয়াছিল। ইদানীং আরও অল্প টাকা পাইতেছে। এক্ষণে অবস্থায় এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্ত চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি উচিত নহে। কৃষির দিক দিয়া কতটুকু ক্ষতি পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাও যেমন দেখিতে হইবে, তেমনই শিল্পের প্রসার-সাধন দ্বারা সেই ক্ষতি বিশেষ ভাবে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্প, শর্করাশিল্প প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিতে পারিলে সেই ক্ষতি কতক পরিমাণেও পূরণ করা সম্ভব হইবে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগেরও অবহিত হওয়া আবশ্যিক। যদি সময় থাকিতে এই বিষয়ে বাঙ্গালীরা অবহিত না হন,—তাহা হইলে অচিরে বাঙ্গালার ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইবে। পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়াতে কেবল কৃষকসম্প্রদায়ের দারুণ ক্ষতি হয় নাই, মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে এবং এ কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে আর নিশ্চেষ্ট থাকি উচিত নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিজ্ঞানজ্ঞ)।



মিসেস্ ব্যানার্জি

১

হেড মাস্টার সূর্য্যবাবু যখন স্কুলের সেক্রেটারীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, তখন সেক্রেটারী মতিলালবাবু স্নেহভাবে তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া, গড়গড়ার সুদীর্ঘ নলের মুখ চুষন করিয়া ধূমপানে রত। তিনি একটু সোজা হইয়া বসিয়া ঈষৎ শিরঃসঞ্চালনে প্রত্যভিবাদন জানাইলেন; তাহার পর স্মিতমুখে সূর্য্যবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আসুন আসুন মাস্টার মশায়, বড় জরুরি খবর আছে, বলছি—বসুন।”

ফরাসের এক পাশে উঠিয়া-বসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, “তা হ’লে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা হ’য়েছিল! তিনি এসে preside করতে পারবেন—ঐ তারিখে?”

“আরে সে তো পারবেনই, বন্দোবস্তটা তো এক রকম ঠিকই ছিল। তবে ব’লেছিলেন একটা খবর নিতে, আমরা কার্ড “ইন্স” করবার আগে—হঠাৎ জরুরী কোনও কাজে যদি তাঁকে বাইরেই যেতে হয়—”

“ওঃ, তা হ’লে বাধা কিছু হবে না? তিনি আসতে পারবেন!”

“সে সব কিছু হবে না হে, সে সব কিছু হবে না। সব ঠিক আছে। তবে সেই জরুরি খবরটা হচ্ছে এই—হাঁ, কি মনে হয় বলুন দিকিন! মাস্টারীবুদ্ধির দৌড়টা একবার দেখাই যাক!”

একটু হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, “মনে আর কি ক’রতে পারি? মাস্টারীবুদ্ধি যে অতি ভোঁতা, তা’ সবাই তো জানে। তবে ম্যাজিস্ট্রেট এসে preside ক’রবেন, এর ওপরেও যদি জরুরি খবর আর কিছু থাকে সেটা—সেটা এই হ’তে পারে—মানে, নামজাদা কোনও লেডী এসে প্রাইজগুলি ছেলেদের হাতে তুলে দেবেন।”

“হা! হাঃ হাঃ! কে ব’লে মাস্টারীবুদ্ধি ভোঁতা? একে-বারে সুরধার যে! হাঁ, ঠিক ধ’রেছেন মাস্টার মশায়! মস্ত নামজাদা এক জন লেডী এসেই প্রাইজগুলি হাতে ক’রে দেবেন। তা বলুন-দিকি, এই মহিয়সী মহিলাটি কে?”

সূর্য্যবাবু সহাস্তে কহিলেন, “নেহাৎ গ্রাম্য স্কুল-মাস্টার, দৃষ্টিটা অত উঁচুতে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে না। বুদ্ধিটা—তা সে যেমনই থাক, মানসিক উদ্ভাবন-বহনকার চেলী বুধা। প্রয়োজনও এমন-কিছু দেখছি না। তা সোজা ব’লেই কেলুন না, ইনি কে?”

“মিসেস্ ব্যানার্জি।”

“মি—সে—স্ ব্যা—না—র্জি!”

“মিসেস্ এম অর্থাৎ মারা ব্যানার্জি এম-এ, ইন্সপেক্টেস্ অব স্কুলস্।”

“ওঃ!”

“নাম অবিশিষ্ট শুনেছেন। এডুকেশনিষ্ট (educationist) কে না শুনেছে? বড় এক জন স্কলার—ইংলিশে ফার্ট’ ক্লাস এম-এ, ক’লকেতার আগে প্রফেসর ছিলেন—কোন কলেজে— তা তো—”

“বিভাসাগর কলেজে। তবে এম-এ তিনি ফার্ট’ ক্লাস নন, সেকেন্ড ক্লাস।”

“বটে! তা হ’লে তো বেশ জানেন তাঁকে দেখছি। আলাপ পরিচয় কিছু—”

“আলাপ পরিচয়—কি আর থাকবে? তবে—তবে—দেখেছি তাঁকে ক’লকেতার—”

“সেকেন্ড ক্লাস এম-এ, অথচ অত বড় একটা প্রফেসরও হ’য়ে-ছিলেন! আর আপনি ফার্ট’-ক্লাস এম-এ—ক’ বছরের সিনিয়রও নিশ্চয়ই হবেন।”

“হাঁ” বলিয়া তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিয়া থামিলেন।

“আর ক’রছেন কি না এসে এই গ্রাম্য স্কুলে মাস্টারী!”

একটু হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, “তা আর কি করি বলুন? দিনকাল বা প’ড়েছে—”

“কিন্তু উনি তো সেকেন্ড ক্লাস—প্রফেসরীতে ফার্ট’ ক্লাস পেলে সেকেন্ড ক্লাস?—তবে কি না উনি লেডী—”

“হাঁ, ওঁরা একটা preference পাবেনই; আবার যদি লেডী প্রফেসর কেউ চান—সেকেন্ড ক্লাসও নিতে হবে, ফার্ট’ ক্লাস যদি একান্তই হুল’ভ হয়!”

“হাঁ, তা বটে। কিন্তু আপনি কোন প্রফেসরীতে কোনও কলেজে যাননি! ক’লকেতার তো ছিলেনও—”

চাপা একটি নিশ্বাসের সঙ্গে মান মুহূ. একটু হাসিও সূর্য্যবাবুর মুখে ফুটল; কহিলেন, “বাইনি—মানে পাইনি। ক’লকেতার কোনও কলেজে ইংরেজীর প্রফেসরী তখন খালিই হয়নি।”

“কিন্তু বাইরেও তো অনেক কলেজ আছে।”

“আছে। প্রফেসরীও ভাল একটা কলেজে পেয়েছিলাম—”

“বটে! তা কি ক’রে ফস্কালো?”

“ছেড়ে এসেছিলাম ক’লকেতার থাকব ব’লে, ভেবেছিলাম, প্রফেসরী কোনও কলেজে একটা পাবই, কিন্তু জুটল না।”

“কিন্তু আপনি দরখাস্ত ক’রেছিলেন, তাতে তো এ সব কথা কিছু ছিল না?”

“না। ওটা আর দিইনি। মনে হ’ল, গ্রাম্য স্কুলের হেড মাস্টারীর পক্ষে ওটা একটা qualification হবে না, বরং dis-qualificationই হবে। হুই—একটা স্কুলে দরখাস্তে ওটার উল্লেখ

ক'রে ঠকেছি। কতৃপক্ষ মনে ক'রেছেন, ফাষ্ট ক্লাস এম-এ, অত বড় কলেজে প্রফেসরী ক'বেছে। গ্রাম কোনও ইস্কুলে গিয়ে থাকবে না বেশী দিন। কাজ একটা হাতে নেই ব'লেই আপাততঃ যাচ্ছে, আবার গেলেই ছেড়ে পালাবে।”

“হঁ।” আমরা তো জানতামই না কিছু, তবে এ আলোচনা অবিশ্বিত কিছু হ'য়েছিল; আপনাকে হ'র তো রাখা যাবে না বেশী দিন—”

হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, “কিন্তু র'য়ে গেলাম তো এই হু'তিনটে বছর; স্ততরাং ভাবনা আপনাদের কিছু নেই, যদি রাখতেই চান আমাকে।”

মতিলালবাবুও একটু হাসিয়া উত্তরে কহিলেন, “রাখতে আপনাকে চাই না?—বলেন কি মাষ্টার মশায়! আপনার মত এমন যোগ্য লোক কোথায় আর পাব? স্কুলটি আপনার হাতে স'পে দিয়ে এক দম নিশ্চিত হ'য়ে র'য়েছি। এখন রাখতে ক'দিন আপনাকে পারব—এই যা কিছু ভাবণার আছে।”

“কিছু ভাবনা নেই মতিলালবাবু! যাচ্ছি আর কোন্‌ চুলোয় আজই? যাব—যদিই হ'ক শেষে সেই চুলোতেই!”

“থাক এ সব কথা এখন। সে চুলোতে সবাইকেই এক দিন যেতে হবে। তবে কি না অন্তিম কালহরণম্—যদিই জিহ্মিয়ে থাকা যায়, সেই ভাল।”

“হাঁ, অতিদুঃখীও কেউ বড় চায় না—সেটা এগিয়ে আসুক। ভারটা যতই অসহনীয় হ'য়ে উঠুক, ডাক শুনে যম এসে সাম্নে দাঁড়ালে ব'ল্বে, ভারটা আবার মাথায় তুলে দেও।”

“থাক ও সব কিলোসকী এখন মাষ্টার মশায়! আমাদের ভাবতে হ'চ্ছে একটা fitting reception ঠকে কি ক'রে দিতে পারি।”

“সেটা—ভাল যা মনে করেন ক'রবেন। আমি সাধ্যমত সাহায্য আপনাদের ক'রব।”

“সাহায্য! কেবল সাহায্য কি বল্ছেন মাষ্টার মশায়! আপনাকে সবই ক'রতে হবে।”

“হঁ—”

“তাই মনে হ'ছিল মাষ্টার মশায় আর একটি মিসেস্‌ ব্যানার্জি যদি আপনার এখানে থাকতেন তো ভাবতাম না, কারণ লেডী'র অভ্যর্থনা—ও সব লেডী'রাই করতে পারেন ভাল।”

সূর্য্যবাবু একটু হাসিলেন—কহিলেন, “তা লেডী, আপনাদের এ গাঁয়েও চের আছেন। এই ধরন না আপনার বাড়ীতে—”

“আর রেখে দিন, রেখে দিন মাষ্টার মশায়! এঁরা সব মেয়ে-মাছুর, লেডী কেউ নয়। স্ততরাং মিসেস্‌ ব্যানার্জি দ্বারা যা হ'তে পারতো মাষ্টার ব্যানার্জি, আপনাকেই সেটা ক'রতে হবে।”

“হঁ—তা আমাদের তো দিন দশেক দেরি আছে। উনি—”

“Inspection tour এ বেরিয়েছেন, ব'ল্লেন, আর ক'টা ব্যয়গা বুরে সময়মত সহরে এসে পৌঁছুবেন।”

কণকাল কি ভাবিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, “তা বেশ, আসছেন, যা দরকার হয় করা যাবে। অভ্যর্থনা—তা বিপেয়ভাবে আর কি করা যেতে পারে, বুঝতে পারছি না। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবও আসছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে তো ঠ'র জন্তে আলাদা একটা কিছু করা যায় না। এক চা আর কিছু খাবার-টাবারের বন্দোবস্ত,—তা উনি তো পর্দানশীন নন, আর জাত-বিচারও বোধ হয় করেন না।

ইস্কুলের একটা ঘরেই হু'জনের জন্তে যা হয় ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যেতে পারে।”

মতিলালবাবু কহিলেন, “ভাবছি কি জানেন, এক জন বাঙ্গালী মহিলা—উচ্চপদস্থ—আসছেন—বাঙ্গালী'র এই গ্রামে, মেয়েদের দিয়ে একটা অভ্যর্থনা-সঙ্গীত, একটা অভিনয়, আর কেবল একটুকরা খাবার দিয়ে বিদায় না ক'রে, কোনও বাড়ীতে সন্ধ্যার পর ভাল ক'রে একটু খাইয়ে-দাইয়ে দেবার বন্দোবস্ত যদি করা যেত—”

“হাঁ, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত—সে আপনাদের বাড়ীতে, কি আর যেখানে হয় ক'রতে পারেন—যদি রাত অবধি থেকে থেকে যেতে উনি রাজি হন। তবে অভিনয় আর অভ্যর্থনা-সঙ্গীত—সেগুলো এই পুরস্কারবিতরণের সভার ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্নে কেবল তাঁর সম্মান প্রদর্শনের জন্ত পৃথকভাবে করা শোভন হবে কি না, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।”

“তা বটে—তা বটে! তবে হুই-এক ঘণ্টা আগে যদি আসতে পারেন, তবে তাঁর অভ্যর্থনার জন্ত একটা সভা তখন-তখনই স্থাপন ক'রে নেওয়া যেতে পারে। হাঁ, এই ঠিক হবে! খাসা প্র্যানটা মাথায় এল বটে! কি বলেন মাষ্টার মশায়?”

“হাঁ, সেটা—করা যেতে পারে বটে, তবে কি না, এখানে সেটা না ক'রে আপনাদের বালিকা-বিদ্যালয়ে—সেটাও তো তাঁকে নিয়ে দেখান উচিত—যদি যান—আপনি সেখানেই অভ্যর্থনাটা—”

“হ্যাঁ—হ্যাঁ, খাসা suggestionটা দিয়েছেন মাষ্টার মশায়! তাই করা যাবে। বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম ক'রে গিয়ে ধ'রে-প'ড়লে এড়াতে পারবেন না। আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।”

সূর্য্যবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, “আমি কি ক'রে যাব মতিবাবু! সেই দিনেই তিনি এসে ওখানে পৌঁছুবেন। এদিককার বন্দোবস্ত সব আমাকেই তো ঠিক ক'রে রাখতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসছেন, মিসেস্‌ ব্যানার্জিও আসছেন—একটা কেলেকারী শেষে না হয়।”

“তা বটে, বটে! তবে বালিকা-বিদ্যালয়ে যা কিছু বন্দোবস্ত ক'রতে হয়, আপনিই সব ক'রে দেবেন। কিন্তু ডেকে আনছি, তাঁর পদের যোগ্য অভ্যর্থনা হওয়া চাই। তার ভার আপনাকেই নিতে হবে।”

“নেওয়া যাবে।”

আচ্ছা তা হ'লে লেগে যান, আজ থেকেই। প্যাণ্ডালও ওখানে ক'রতে হবে।”

“হাঁ, তা হ'লে উঠি এখন। নমস্কার!”

“আস্থান তবে, নমস্কার!”

২

সূর্য্যবাবুর ভেমন একটা উৎসাহ উত্তম কিছু দেখা গেল না, অজুহাতও অবশ্য ছিল; স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভার সূর্য্যবাবু চেঁচা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদির সময় ছাত্রদের প্রস্তুত করা। শরীরও তখন না কি কিছু অস্থস্থ হইয়া পড়ে। সেক্রেটারী মতিলালবাবু অগত্যা বালিকা-বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের সহায়তার মিসেস্‌ ব্যানার্জির যথাগম্য বোগ্য সঞ্চর্নার বন্দোবস্ত সবই করিয়া ফেলিলেন।

নির্দিষ্ট দিন আসিয়া পড়িল। অপরাহু পাঁচ ঘটিকার স্কুলের

পুরস্কার-বিতরণ সভার সময় স্থির হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয়ে সর্জন-সভার সময় স্থির হয় বেলা তিনটায়। গ্রামটি ছিল জেলার সদর হইতে নদীতটে দশ মাইল দূরে; নিকটবর্তী রেলওয়ে-স্টেশন হইতে দুই-তিন মাইলের মধ্যেই। গরুর গাড়ী আর দুই একখানা অতি জীর্ণ ছাঁকিড়া ষোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়; গ্রামবাসীরা গ্রাম্য পথে তাহাতেই স্টেশনে যাতায়াত করে। কিন্তু এ সব পথে মিসেস্ ব্যানার্জিকে কিছুতেই আনা চলে না। বন্দোবস্ত হইয়াছিল ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার লঞ্চে আসিবেন; সেক্রেটারী মহাশয় নিজে এবং গ্রামবাসী সহরের একজন উকিল একখানি মোটর-বোট ভাড়া করিয়া মিসেস্ ব্যানার্জিকে লইয়া আসিবেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের পর সময়মত স্কুলের প্রাক্ষণের সম্মুখে মধুর নহবৎ-বাস্ত-মুখর সুসজ্জিত তোরণদ্বারে উভয়েই এক সঙ্গে সমাগত ও সর্জনিত হইবেন।

যথাসময়ে মিসেস্ ব্যানার্জি আসিয়া পৌঁছিলেন; বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁহার সর্জননাও যথারীতি ও যথাসম্ভব সমারোহেই সম্পন্ন হইল। সেক্রেটারী মতিলালবাবু তো ছিলেনই; হাই স্কুলের পক্ষ হইতেও শিক্ষক কেহ কেহ সেখানে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যবাবু নিজে গেলেন না, স্কুল-প্রাক্ষণের তোষণদ্বারে মিসেস্ ব্যানার্জিকে তিনি প্রথম সর্জননা করিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও মিসেস্ ব্যানার্জি উভয়ে এক সঙ্গেই স্কুলের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার এই নূতন নহে। সূর্য্যবাবু তাঁহাকে সেলাম জানাইয়া যুক্তকরে মিসেস্ ব্যানার্জিকে নমস্কার করিলেন। সেক্রেটারী মিসেস্ ব্যানার্জির দিকে চাহিয়া কহিলেন, “ইনি আমাদের হেডমাষ্টার বাবু সূর্য্যকুমার ব্যানার্জি এম এ।”

মিসেস্ ব্যানার্জি একটু শিরনত করিলেন। মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না; প্রতি-নমস্কারও করিলেন না। সকলেই কেমন যেন একটু বিস্মিত হইলেন। বাহা হউক, সভামণ্ডপে গিয়া সকলে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। দুইটি ললনা কর্তৃক মাল্য-দানের পর আবাহন-সঙ্গীত আরম্ভ হইল। এইরূপ সব সভার উপযোগী গীত-রচনার ও তাহার সুর-বোজনায় হেড মাষ্টার বিশেষ দক্ষ ছিলেন। নির্বাচিত এইরূপ একটি গানই সমস্বরে কয়েকটি বালক আরম্ভ করিল। হঠাৎ মিসেস্ ব্যানার্জি কেমন যেন অবসন্ন ভাবে টেবিলের উপরে মাথাটি রাখিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট চমকিয়া চাহিলেন, সঙ্গীত বন্ধ হইল; ত্রস্তব্যস্ত ভাবে সেক্রেটারী নিকটে আসিয়া কহিলেন, “আপনি কি বিশেষ অসুস্থ বোধ করছেন মিসেস্ ব্যানার্জি? লোকের ভীড়, বড় গরমও হয়ে উঠেছে—”

একটু উচু হইয়া হাতের উপরে মাথাটি রাখিয়া মান মূহু স্বরে মিসেস্ ব্যানার্জি কহিলেন, “না না, ও-সব কিছু নয়। তবে—তবে—ক’দিন ঘোরাফেরা করছি খুব—হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল—ও এফুনি ভাল হ’য়ে যাবে—আপনারা কাজ বন্ধ করবেন না। একটু—একটুখানি বাইরে যেতে পারলে ভাল হ’ত। নিবেলা একটা ঘর যদি—”

“হাঁ হাঁ—নিশ্চয়ই। হাঁ, সূর্য্যবাবু—”

সূর্য্যবাবু সহকারী এক জন শিক্ষককে কহিলেন, “ওঁকে লাইব্রেরী ঘরটার নিরে যান বিনয়বাবু! দপ্তরীকে ব’লে দিন, চট ক’রে

আমার ঘর থেকে বিছানাটা এনে টেবিলের উপরে বিছিয়ে দিক। আর কিছু জল আর একখানা পাখাও—কাউকে বলুন নিয়ে আসুক। মিস্ ঘোষও (বালিকা বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষয়িত্রী) দয়া ক’রে উঠে গিয়ে কাছে একটু বসুন। আশা করি, এখুনি উনি ভাল হ’য়ে উঠবেন—”

মিস্ ঘোষ আসিয়া হাতখানি ধরিলে মিসেস্ ব্যানার্জি ধীরে ধীরে উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “মাফ ক’রবেন মিষ্টার টমসন, কাজ বন্ধ ক’রবেন না। সঙ্গীত হোক, আর রিপোর্টটাও বয় পড়া হ’ক; এরি ভেতর একটু সুস্থ হ’য়ে বোধ হয় আমি ফিরে আসতে পারব।”—বলিয়া শিক্ষয়িত্রী মিস্ ঘোষের হাত ধরিয়া সভা-মণ্ডপ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বিনয়বাবুও দপ্তরীকে লইয়া গিয়া বন্দোবস্ত বাহা সব প্রয়োজন করিয়া দিয়া আসিলেন। আবার সঙ্গীত হইল, হেড মাষ্টার রিপোর্ট পড়িলেন, ছাত্রদের আবৃত্তি আরম্ভ হইল। মিসেস্ ব্যানার্জি তখন মিস্ ঘোষের সঙ্গে ফিরিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে বেশ ধীর ভাবেই মিসেস্ ব্যানার্জি পুরস্কারগুলি ছাত্রদের হাতে তুলিয়া দিলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদের সংক্ষিপ্ত দুই-একটি বক্তৃতার পর মিসেস্ ব্যানার্জি উঠিয়া লিখিত একটু সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তার পর ম্যাজিষ্ট্রেট উঠিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জি তখন এক টুকরা কাগজে কি লিখিয়া হেড মাষ্টারের হাতে দিলেন। হেড মাষ্টার পড়িয়া কাগজখানি নিঃশব্দে পকেটে রাখিলেন, কোনও-রূপ সাড়াও দিলেন না, উত্তরেও কিছু লিখিয়া জানাইলেন না। বাহারা তাহা লক্ষ্য করিল, তাহারা একটু বিস্মিতই হইল। কি উনি জানাইলেন অথবা জানিতে চাহিলেন? হয় তো রিপোর্টটা উনি শোনে নাই, তাই দেখিবেন বলিয়া চাহিয়াছেন। কিন্তু হেড মাষ্টারের উত্তরে জানান উচিত ছিল—সভার পর পাঠাইয়া দিবেন, অথবা তাঁহার হাতেই দিয়া দিবেন। তখনও তো দিয়া দিলে পারিতেন। এটা কেমন যেন একটু অশিষ্ট ব্যবহার বলিয়াই কাহারও কাহারও মনে হইল।

সভার কাজ হইয়া গেল, সকলে বাহির হইলেন। হেড মাষ্টার ও অগ্গাণ কেহ কেহ সঙ্গে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার লঞ্চে তুলিয়া দিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জির দিকে ফিরিয়া যুক্তকরে মতিবাবু নিবেদন করিলেন, “তা হ’লে এখন দয়া ক’রে একটিবার চলুন, শরীরের কুটীরে পায়ের ধুলো দেবেন—এই যে পাকী এসেছে—”

মান একটু হাসিয়া মূহু স্বরে মিসেস্ ব্যানার্জি উত্তর করিলেন, “আজ্ঞে দেখছেন তো, শরীরটা হঠাৎ কেমন অসুস্থ হ’য়ে প’ড়েছে। তা যদি মাফ ক’রতে পারেন—”

“আজ্ঞে, ক্লেশ আপনাকে কিছু দিতে চাই না। তবে বাড়ীর আর পাড়ার মেয়েরা সব পথ চেয়ে রয়েছেন, একটিবার দর্শন লাভ ক’রবেন, মুখের দুটো কথা শুনবেন—”

“ও, আচ্ছা, চলুন তবে,” বলিয়া পাকীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, “তা পাকী আবার কেন? আপনাদের সঙ্গে হেঁটেই তো বেশ যেতে পারব।”

যুক্তকরে মতিবাবু কহিলেন, “আজ্ঞে না না, শরীর অসুস্থ, পথও নেহাৎ কম নয়—পাকী এসেছে, ওতেই উঠুন।”

নিকটেই নদীতীর। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার লঞ্চে উঠিতেছেন; হেড মাস্টার প্রভৃতি আরও অনেক লোক সেখানে দাঁড়াইয়া। সে দিকে একবার চাহিয়া মিসেস্ ব্যানার্জি পাকীতে উঠিলেন।

পরদিন ছুটি ছিল; বেলা প্রায় দশটার সময় সেক্রেটারী ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন; হেড মাস্টার তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়াছেন। মতিবাবু সগর্ভ উল্লাসে তাঁহার গৃহে মিসেস্ ব্যানার্জির স্তায় দেশ-বরণ্যা মহিয়সী মহিলার দর্শনদানের সকল ঘটনা সবিস্তার বিবৃত করিতেছেন।

দপ্তরী তখন উদ্দিপরা একটি বেয়ারাকে লইয়া আসিল,— বেয়ারা একখানি পত্র সূর্য্যবাবুর হাতে দিল।—বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মতিবাবু কহিলেন, “এ যে মিসেস্ ব্যানার্জির বেয়ারা!” কি, কি লিখেছেন তিনি?”

“দেখুন।”

পত্রখানি সূর্য্যবাবু মতিবাবুর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন; পড়িয়া মতিবাবু কহিলেন, “আপনাকে গিয়ে একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে অনুরোধ করিছেন, আজ বিকেলে।—তাই তো! কেন—কি ব্যাপার বলুন তো?”

একটু হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, “কি করে বলব—যাই দেখি, কি বলেন।”

“কাল সভায় দেখলাম, এক ঢুকরা কাগজে কি লিখে আপনার হাতে দিলেন—”

“হাঁ। সেটা—সেটা—এই জানিয়ে দিলেন, শরীর অসুস্থ, ম্যাজিষ্ট্রেটের বক্তৃতার পর সভাটা যেন আর বেশীক্ষণ চালান না হয়—”

“ও, কিন্তু—কিন্তু—আমার ধগ্বাদের বক্তৃতা হ’ল, ছেলেদের শেষ গানটাও হ’ল; সময় তো কম লাগল না তাতে। আপনি তাঁর কথাটা—”

“কত আর সময় লেগেছে? ওগুলোও তো না হ’লে নয়।”

“আবার গিয়ে দেখা কর্ত্তেও লিখেছেন। ভাবছি, আমাদের এমন কোনও ক্রটি হ’য়েছে কি না, যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হ’তে পারেন।”

একটু হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, “ক্রটি যে কি হ’য়েছে, তা বুঝতে তো পারছিনি কিছু। আর তা কিছু হ’লে গাল দিতে আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে আপনার কাছেই সেটা জানিয়ে যেতেন, না হয় Visitors’ Book তো পাঠান হ’য়েছে, তাতেই লিখে রেখে যেতেন।”

“তা বটে, তা বটে! তবে ডেকে পাঠালেন—”

“কে জানে? হয় তো—হয় তো এই ইঞ্চলটার কাজকর্ম্ম দেখে, কি যে রিপোর্টটা পাঠিয়েছেন, তাই প’ড়ে, হয় তো মনে হ’য়েছে, আমার মত এক জন হেড মাস্টার আর হয় না! হাঃ হাঃ হাঃ, উঠি তবে এখন।”

“হাঁ, ঐ চিঠির একটা উত্তর—”

“ও! হাঁ, একখানা চিঠির কাগজ আর একখানা খাম—”

সেক্রেটারী নিজেই উঠিয়া খুব ভাল একটা ডাক-কাগজের প্যাড ও তাহারই উপযোগী পুরু একখানি খাম আনিয়া দিলেন।

হেড মাস্টার লিখিয়া দিলেন, বৈকালে ষাটটা হইতে ষাটটার মধ্যে তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

২

সহরের ডাক-বাংলোয় মিসেস্ ব্যানার্জি ছিলেন। বৈকালে সূর্য্যবাবু গিয়া এতলা দিলেন। বেয়ারা আসিয়া মেম সাহেবের সেলাম জানাইল; সূর্য্যবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, “ব’স।”

নিঃশব্দে সূর্য্যবাবু সম্মুখের একখানি আসনে বসিলেন। নত-মুখে কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া মিসেস্ ব্যানার্জি কহিলেন, “তুমি শেষে এই কুলে এসে চাকরী নিয়েছ?”

“হাঁ।”

“কিছুই আমি জান্তাম না!”

“তা হবে।”

“বুণাকরেও যদি একটু জান্তে পারতাম, ওখানে যেতাম না। গিয়ে—গিয়ে যে অবস্থায় প’ড়লাম—কি করে যে সামলে উঠতে পারলাম, তা বুঝতেই পারছিনি—”

সূর্য্যবাবু নীরব।

অতি আয়াসে কথঞ্চৎ আত্মসম্বরণ করিয়া মিসেস্ ব্যানার্জি কহিলেন, “তুমি তো জান্তে যে, আমার ওখানে যাবার বন্দোবস্ত হ’য়েছে?”

“জান্তাম।”

“একটু খবর যদি আমাকে দিতে—”

“ওঁরা বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন, আমি চাকর মাত্র—inter-fare (হস্তক্ষেপ) কর্ত্তে চাইনি। আমার যা কর্ত্তব্য হ’তে পারে, তাই পালন কর্ত্তবার চেষ্টা করিছি।”

“তা করিছ, কর্ত্তেও পেরিছ। তা তুমি পুরুষমানুষ, সব পার। কিন্তু আমি—আমি মেয়েমানুষ মাত্র।”

সূর্য্যবাবু উত্তর করিলেন, “পুরুষের মত এ-সব কাজে এলে পুরুষের মতই শক্ত হওয়া দরকার।”

“কিন্তু হঠাৎ ও-ভাবে ওখানে তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ—এটা—এটা—পুরুষ হ’লেও তুমি বোধ হয় সামলাতে পার্ত্তে না।”

“জানি না।”

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া মিসেস্ ব্যানার্জি কহিলেন, “তা এখানে এই চাকরী নিয়ে কেন এলে?”

“কি করব? এর চাইতে ভাল জায়গায় ভাল কোনও চাকরী আর তো পেলাম না।”

“এত ভাড়াই বা কি ছিল? চেষ্টা কর্ত্তিলে, কর্ত্তে—দেখ্তে—ভাল কাজ সময়মত অবিশি জুটত।”

“সে সময় কবে হ’ত, হ’তই কি না এ জীবনে, তা জানি না। বুধা আর বড় আশায় কত ঘুরব? তাই অগত্যা শেষে যা পেলাম, তাই নিয়ে চলে এসাম। দেখলাম, এর চাইতে ভাল কিছু আর জুটছেই না।”

“কিন্তু চলে তো যাচ্ছিল।”

“যাচ্ছিল তোমার। আমার যাচ্ছিল না। স্ত্রীর অন্নদাস হ’য়ে যে চলা—সেটাকে কোনও পুরুষের পক্ষে চ’লে-যাওয়া বলা যায় না।”

“অন্নদাস! অন্নদাস কিসে বপ্ততে পার? আমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের রোজগারের টাকা খেয়ে তোমাদের সংসার করি, আমরাও তা হ’লে তোমাদের অন্নদাসী!”

সূর্যাবাবু কহিলেন, “স্বামীর বোজগারে প্রতিপালিত হবার একটা দাবী জ্বীদের আছে। স্বামিগৃহের গৃহিণী তারা, গৃহিণীর বা কিছু কাজ, সেই টাকা নিজেদের হাতে খরচ ক’রেই তাদের তা চালাতে হয়। পুরুষরা টাকা বোজগার ক’রে এনে দিতে পারে, সংসার চালাতে নিজেদের কেউ পারে না। সেটা জ্বীদেরই চালাতে হয়।”

মিসেস্ ব্যানার্জি উত্তর করিলেন, “সেই সংসার চালান মানে তো পেটে দু’টি খেয়ে দাসীর কাজ করা। রান্না-বার্না, জল তোলা, বাসন-মাঝা—”

“বোজগার অন্ন হ’লে কাজেই এগুলো ক’রতে হয়। বেশী বোজগার যারা ক’রতে পারে—চাকর-চাকরাণী, পাকের বায়ুন রেখে রাণীর হালে তাদের জ্বীরা থাকে। কেবল এদের কাজগুলো তাদের দেখতে হয়। যে চাকরী আমি কোর-ছিলাম পশ্চিমের সেই কলেজে, মোটা মাইনে ছিল, আরও বাড়ত, ঠিক তেমনি এক জন গৃহিণী হ’য়েই আমার পাশে সোনার সংসারেই তুমি থাকতে পারতে। কিন্তু তুমি গেলে না, আমাকেই শেষে চাকরী ছেড়ে আসতে হ’ল।”

গভীর একটি নিশ্বাস সূর্যাবাবু চাপিয়া গেলেন। মিসেস্ ব্যানার্জি কহিলেন, “তা অমন একটা কাজ তখন পেলাম, সরকারী চাকরী—টাকার দিক দিয়েই বল, শিক্ষার গৌরবের দিক দিয়েই বল, যার পর নাই লোভনীয়; মেয়েমানুষও তার শক্তির একটা সার্থকতা চায়। বাইরে এত বড় একটা কর্মক্ষেত্র পেলে তুমি ছেড়েও সংসারের সর্কার গভীর ভেতরে যে তাকে গুটিয়ে থাকতেই হবে, এ দাবী বোধ হয় কেউ করতে পারে না—”

“সংসারই যদি একটা থাকে—বিবাহিতা আর সন্তানের মাতা নারীমাত্রের তা আছে—তার কাজগুলোও তাকে চালিয়ে নিতে হবে। তুমি যে চাকরী নিয়েছিলে, যখন-তখন বাইরে বাইরে তো ‘টুরে’ বেরোতে হ’ত, সেটা তোমার পক্ষে অসম্ভব হ’য়েই উঠল। দায়টা গিয়ে পড়ল আমার ওপর—যখন চাকরী ছেড়ে তোমার সংসারে এসে ব’সলাম।”

“তা এ সব কাজে দরকার সত্য, পুরুষরা যদি সাহায্য কিছু করে আর করবার মত অবসরও যদি হয়, কি এমন আপত্তির কারণই বা থাকতে পারে?”

“কিছু সাহায্য দরকারমত সাধারণ গৃহস্থ পুরুষ সবারই ক’রতে হয়, ক’রেও থাকে। সে দরকার চয়, জ্বীরা যদি অসুস্থ হ’য়ে পড়ে, কি সংসার খুব বড় হ’য়ে উঠলে, একা যদি সব দিক সামলাতে না পারে। কিন্তু সব দায়টা কোনও পুরুষ নিতে পারে না, যেমন না কি আমাকে নিতে হ’য়েছিল—চাকরী ছেড়ে আসবার পর। সঙ্কটটাই তখন উন্টে গেল! তুমি হ’লে বাইরের কাজে টাকা বোজগারের কর্তা, আর আমি হ’লাম—সেই টাকার তোমার সংসারের গৃহিণী!”

বেশ একটু যেন লজ্জা পাঠিয়া আনত মুখে মিসেস্ ব্যানার্জি উত্তর করিলেন, “ও কথা কেন ব’লছ? চাকরী ছেড়ে যখন এসেছিলে—এই আশা ক’রেই তো এসেছিলে—এখানেই আবার ভাল একটা চাকরী কোনও কলেজে পাবে।”

“হী, আশা একটা ছিল বই কি! তবে এ আকাঙ্ক্ষাটাও ছিল, তেমন চাকরী একটা সহজে না-ও পেতে পারি; কারণ, জান্তাম,

পুরুষের চাকীরর বাজারে ভিড় বড় বেশী। তবু এলাম, এটাও মনে হ’ল, আমরা স্বামি-জ্বী এক হ’য়ে এক বায়গায় এক সংসারেই থাকব বলে। স্বামি-জ্বী দু’ জনে দু’ বায়গায় চাকরী করবে, দু’রে দু’রে আলাদা আলাদা থাকবে, সেটা বিবাহিত জীবনের একটা বিড়ম্বনা মাত্র!”

“সে তো ঠিক কথাই। সেটা সত্যিকার স্বামি-জ্বী কেউ পারেও না। তাই না তোমাকে অত ক’রে বার বার লিখলাম।”

“আমিও পারলাম না। তাই শেষে চ’লে এলাম। কিন্তু একত্রে যে থাকতে হবে, সে বিবেচনাটা কেবল স্বামীকেই ক’রতে হবে, আর তার জন্ত আর বা কিছু দরকার, তাও কেবল স্বামীকেই ক’রতে হবে, জ্বীর কোনও দায় নেই, বিবেচনা নেই, এটাও তো হ’তে পারে না। একত্র থাকব? এখানে এসে চাকরী আর পেলাম না, দেখলাম একত্র থাকতে হ’লে তোমার অন্নদাস হ’য়ে তোমার সংসারে গৃহস্থালী ক’রে, ছেলেপিলেদের মা হ’য়েই জীবনটা কাটাতে হবে! আর চাকরী একটা পেলেই বা কি? তুমি সরকারী চাকরী কর, আজ ক’লকাতায় আছ, কাল ঢাকায়, পরন্তু চাটগাঁয়—কবে কোথায় বদলী হয়ে যাবে, ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে অমনি গিয়ে সেখানেও আমি একটা চাকরী পাব, এমন তো হ’তে পারে না। কাজেই একত্রে থাকার মানেই হচ্ছে, তোমারই অন্নদাস হ’য়ে, তোমারই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কিরতে হবে, আর যেখানে যাবে, তোমার গৃহস্থালী গুছিয়ে ব’সতে হবে, সেটা—সেটা ব্যাটাছেলে কারও ধাতে বরদাস্ত হয় না,—সত্যি যদি সে ব্যাটাছেলেই হয়।”

নীরবে মিসেস্ ব্যানার্জি কিস্তকাল কি ভাবিলেন, শেষে গভীর একটি নিশ্বাস ভ্যাগ ব’রয়া ধীরে ধীরে বহিলেন, “তা এ ভাবে ছেড়ে যাবার আগে এ-সব কথা একটা আলোচনাও যদি আমার সঙ্গে ক’রতে—”

“কি হ’ত? অত বড় চাকরী আর পদ-গৌরবের মায়া ছেড়ে আমার সংসারের গৃহিণী হ’য়ে থাকতে তুমি রাজি হ’তে! আর একটা সংসার প্রতিষ্ঠা ক’রব—সে সামর্থ্যই বা আমার তখন কোথায়? তবু ছিলাম,—আশায় ছিলাম, যদি কোনও সুবিধে ক’রতে পারি। কিন্তু দেখলাম, সুবিধে আর কিছু হবে না। হ’লেই বা কি? হয় তো যেমন আমার একটা সুবিধে হবে, অমনি তোমার বদলীর হুকুম হবে,—দূরে আর কোথাও। আবার দাবী ক’রবে, চাকরী ছেড়ে আমার সঙ্গে চল। আর মেজাজও তোমার তখন বা হ’য়ে উঠেছিল। ছোট-খাটো সব সাংসারিক ব্যাপারেও এমন সব কথা-ও আমাকে শুনতে হ’ত—”

“গৃহিণীর স্বামীকে অমন কত কথা বলে থাকে।”

“চাকরে স্বামীরাই তা সহিতে পারে। কারণ, তারাই তাদের ভর্তা, জ্বী তার গৃহিণী আর ভার্য্যা মাত্র। তা সে যাক, ও সব কথা আর না তোলাই ভাল। যখন বুঝলাম একত্র থাকা বরাবর আর সম্ভব নয়,—তুমি বদলী হ’য়ে কোথাও গেলেই আলাদা আবার হ’তেই হবে—যদি স্বাধীন আমি থাকতে চাই—”

“সে যখন হ’ত, তখন না হয় একটা পরামর্শ ক’রে কতব্য একটা স্থির করা যেত। কিন্তু হঠাৎ কিছু না ব’লে ক’রে একদম তুমি পালিয়ে গেলে—ক’টা বছর একটু খবর পর্যন্ত দেওনি! মনেও হয়নি, কি ভাবে আমি দিনের পর দিনগুলো কাটিয়েছি! আমার

কথা না হয় কিছু নাই তেবেছ, কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলো, তারাও তো তোমার—”

বলিতে বলিতে বাস্পকণ্ড কণ্ঠে মিসেস্ ব্যানার্জি ধামিয়া গেলেন। সূর্য্যবাবুরও চক্ষে জল আসিল। কণকাল মুখ কিরায়ীরা কাশিয়া কহিলেন, “তাদের খবর নিতাম, খবর সর্ব্বদা পেতাম। ক’লকেশ্যর আমার এক বন্ধুর সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ক’রে নিরেছিলাম।”

মুখ তুলিয়া মিসেস্ ব্যানার্জি চাহিলেন, কহিলেন, “মাসে মাসে টাকা কি তিমিই পাঠাতেন?” -

“হ্যাঁ।”

“কত মাইনে তুমি এখন পাও?”

“আশী টাকা মাসে।”

“তা থেকে চল্লিশ টাকা ক’রে মাসে মাসে পাঠাও। কি ক’রে তোমার চলে।”

“বাছে তো চলে। গ্রামে একটা লোক থাকি, কতই আর খরচ লাগে।”

“এ টাকাই বা পাঠাও কেন? ওদের তো না খাইরে আমি রাখি না।”

“অতি স্বল্পদেই ওদের রাখছ জানি। তবে ওদের দক্ষণ এ দায়টা প্রধানতঃ আমারই বটে। কেবল তোমার বাড়ি ফেলে রাখতে চাইনি।”

“হাক্, এসব তর্ক-বিতর্ক এখন মিছে। বা হবার হ’য়ে গেছে। তা এখন কি ক’রবে তুমি?”

“কি আর ক’রব? বা ক’রছি তাই?”

“আর আমি—”

“বা ক’রছ, তাই ক’রবে। কি আর ক’রতে পার?”

“তা হ’লে এই ভাবে আলাদা-আলাদা থেকেই জীবনটা আমাদের কাটাতে হবে?”

“হু’জনকেই চাকরী ক’রে যদি খেতে হয় তো কাজেই হবে।”

“চাকরী এক ব্যয়গায়ও হু’জনে করা যায়! অনেকে ক’রেও থাকে। আমি বলি, তুমি আবার ক’লকেশ্যর চল, ওখানেই চাকরীর চেষ্টা কর, না হয়—না হয় আলাদা কোথাও থেকেই ক’রবে—”

“কি খেয়ে কোথায় থাকব? মাসে মাসে মেসের খরচটা

যোগাতে হবে তো তোমাকে? তার পর চাকরী আর একটা পাব, তারই বা নিশ্চয়তা কি? ভিড় আমাদের দিন দিন বাড়ছে,—বড় বেশীই বেড়ে উঠছে। শেষে হয় তো গ্রাম্য সুলেও এই মাইনের একটা হেড মার্টারী আর জুটবে না। আর চাকরী ওখানে একটা জুটলেই বা একত্র থাকবার সম্ভাবনা কি আছে?”

মিসেস্ ব্যানার্জির মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। “কিয়ৎকাল চাহিয়া থাকিয়া কল্পিত স্বপ্নে শেষে কহিলেন, “তা হ’লে—তা হ’লে এ বিচ্ছেদ আমাদের দূর হবার নয়।”

সূর্য্যবাবু উত্তর করিলেন, “হ’তে পারে—যদি এমন কোনও বড় চাকরী আমি কোথাও পাই, আর তখন আমার সংসারের গৃহিণীর পক্ষে আকৃষ্ট ক’রে তোমাকে আনতে পারি—তবে। কিন্তু তার কোনও দূর সম্ভাবনাও দেখছি না।”

চক্ষে জল আসিল। অতি আশ্রাসে আত্মসম্বরণ করিয়া মিসেস্ ব্যানার্জি কহিলেন, “আর আমি যদি এখুনি চাকরী ছেড়ে এই গ্রামে তোমার এই সংসারেরই গৃহিণী হ’তে প্রস্তুত হই?”

হাসিয়া সূর্য্যবাবু কহিলেন, “পাপল হ’য়েছ মারা? তাও কখন সম্ভব? তুমি চাইলেও এই গ্রামে এত হীন ক’রে আজ তোমাকে নিয়ে রাখতে আমি রাজি নই।”

“একটা—একটা ভুল ক’রেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত জীবন ভ’রে এমনি ক’রতে হবে?”

“এমন অনেক ভুল মাহুয করে, তার ফল সারাটি জীবনেও কেউ আর সোধরাতে পারে না। ভুল তুমি যেমন ক’রেছিলে, আমিও ক’রেছিলাম। মনে হ’চ্ছে, সত্যিই তুমি দুঃখ পাচ্ছ, তবে জেনো, আমিও কম পাচ্ছি না। তবে কি ক’রব? এ তার ব’য়েই জীবন কাটাতে হবে।—আচ্ছা, তা হ’লে উঠি এবার মারা।”

“বাবে। সত্যি বাবে? এখুনি বাবে?”

“কি করব! যেতে তো হবেই। মিছে আর কেন? কথা আর নতুন কিছু নেই। আমারও গাড়ীর সময় হ’য়ে এল।”

“কবে আবার দেখা হবে?”

দেখা আর এ অবস্থার না হওয়াই ভাল। তবে ক’লকেশ্যর যদি বাই, দেখা করবার চেষ্টা করব।—বলিয়াই সূর্য্য বাবু বাহির হইয়া আসিলেন।

হার, এই শিক্ষিত স্বামী, ও এই তাঁহার শিক্ষিতা স্ত্রী!

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ।

রাজকন্যা ও দরিদ্রকন্যা

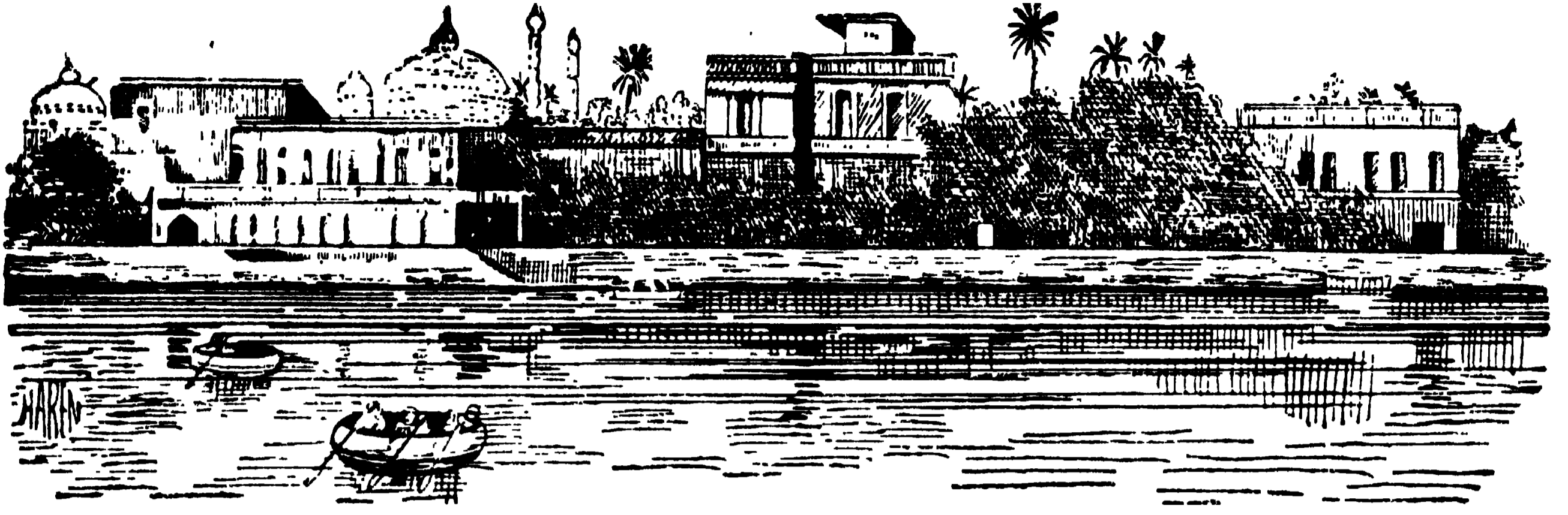
রাজকন্যা রহিয়াছে মুখ ভার করি,

নূতন মুক্তার মালা নিজ কণ্ঠে পরি’—

নিখুঁত হয়নি তার মালার গড়ন,
রাজকন্যা তাই আজি, বিষাদিত-মন।
ও-দিকে দরিদ্রকন্যা, কুঁচের মালার,
তুঁট হ’য়ে গর্ভ-ভরে সবারে দেখায়।

কুঁচের মালার কাছে মুক্তার মালিকা,
যেন আজি মূল্যহীন—নাহি জ্যোতি-শিখা।
মুক্তা কি মনের মুক্তি কভু দিতে পারে,
তুঁট মানসের কাছে রাজারাও হারে।

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত।



আইস-ল্যাণ্ড

ভূষারের দেশ—ভূষারিকা বা আইস-ল্যাণ্ড! নাম শুনিলে মনে হয়, সারা দেশ ভূষারে ঢাকিয়া আছে! পথ-ঘাট, মাঠ-বাট, ঘর-বাড়ী, দীঘি-নদী, সবুজ গাছপালা, তৃণ-শস্ত্র, ফল-ফুল—এ-সবের চিহ্নও বুঝি নাই! চারিদিকে শুধু ভূষার আর ভূষার!

আইস-ল্যাণ্ড আণ্বেয়-গিরির দেশ। তবে আণ্বেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতে কোনো দিনই আইস-ল্যাণ্ডের বিশেষ কোনো অনিষ্ট হয় নাই। অতীত যুগে এ-সব আণ্বেয়গিরি কিরূপ অগ্নিক্রীড়া করিয়াছিল, আজো এ-দ্বীপের বুক

আইস-ল্যাণ্ড দ্বীপটি আসলে কিন্তু তেমন নয়! গ্রীণ ল্যাণ্ডের ভূষার-প্রান্তরের গা ঘেঁষিয়া উত্তর-মেরুর তোরণ-পথে অবস্থিত হইলেও আইস-ল্যাণ্ড সবুজ-শ্রীতে বিমণ্ডিত; এবং যুরোপ-আমেরিকার মতো আইস-ল্যাণ্ডের পথে-ঘাটে লোক



১১

হেক্‌লার বুক পাছ-নিবাস

জনের তেমনি ভিড়! ঘর-বাড়ী প্রচুর—সে-সব বাড়ী-ঘরে হাসি-গল্প-গানের উচ্ছ্বাস-সমারোহ তেমনি চলিয়াছে! ধারা আইস-ল্যাণ্ড এবং গ্রীণল্যাণ্ড ছ' জায়গাতেই গিয়াছেন, তাঁরা বলেন, আইস-ল্যাণ্ডের এ-নামকরণে মন্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে! আইস-ল্যাণ্ডের নাম গ্রীণল্যাণ্ড এবং গ্রীণল্যাণ্ডের নাম আইস-ল্যাণ্ড রাখিলেই নামকরণ সার্থক হইত

জুড়িয়া তার বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। নয়ন-বিমোহন বৈচিত্র্য থাকিলেও অত্র প্রদেশের মতো আইস-ল্যাণ্ডে বন-জঙ্গল, বড় বড় ক্ষেত-মাঠ, ফল-ফুলের বড় বাগিচা বা আবাদী জমির তেমন ঘনঘটা দেখা যায় না।

বহু প্রাচীন যুগে আণ্বেয়-গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে সাগর-বক্ষ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এ-দ্বীপের জন্ম! এখানকার বিরাট বিপুল আণ্বেয়-গিরির নাম হেক্‌লা। সে-কালে

হেক্‌লা যখন অগ্নি-মূর্তিতে জাগিয়া উঠিত, তখন ঘটত দারুণ ভূমিকম্প এবং প্রলয়-ঝড়। সে ঝড়ে, সে ভূমিকম্পে কত প্রাণ যে ধ্বংস পাইয়াছে, তার আর সীমা-পরিসীমা নাই! এখনো সেখানে ভূমিকম্প হয়—প্রায় হয়; তবে এ-ভূমিকম্প সংহারের তেমন রুদ্র মূর্তি ধারণ করে না।

এখানে ভূমিকম্পের বেগ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সবচেয়ে তীব্র হইয়াছিল। সে ভূমিকম্পে ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর; সেই সঙ্গে লাভ যা হইয়াছে, সে লাভের তুলনায় একতিকে তুচ্ছ বলিলে অগ্রায় হইবে না! এ ভূমিকম্পে আইস-ল্যাণ্ডে বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণের (Great Geyser) সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রস্রবণ-সৃষ্টির পূর্বে আইস-ল্যাণ্ডে

কোনোটি হইয়াছে নিসর্গ-রচিত বন্দর; কোনো স্থান বা দুর্গম-দুর্গ। বহু স্থানে আরো বহু পরিবর্তন ঘটয়া সমগ্র প্রদেশটি নানা ভাবে মানব-সমাজের কল্যাণকর হইয়া উঠিয়াছে। এ-সব বন্দরের মধ্যে রেইকজাবিক বন্দরের নাম সর্বাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য।

আইস-ল্যাণ্ডের পথ-ঘাট তেমন স্বচ্ছন্দ-সুগম নয়; এজন্ত বহির্জগতের সঙ্গে নিত্য-নিয়মিত খবর-বার্তা রাখা অসম্ভব। আভ্যন্তরীণ নগর এবং গ্রামগুলির মধ্যে খবর-বার্তা রাখিতে অনেকখানি সময় লাগে। চিঠিপত্র সকলের ঘরে বিলি হয় না। ডাক-হরকরা এক-এক মহল্লার চিঠি-পত্রাদি সেই মহল্লার বড় কোনো কৃষি-ফার্মে রাখিয়া যায়; লোক আসিয়া সেই সব ফার্ম

হইতে সে-সব চিঠিপত্র লইয়া যায়।

পথের দুর্গমতার জন্ত বা হিরের লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশার সুবিধা আদৌ নাই; এজন্ত এখানকার অধিবাসীরা অতিথি পাইলে অতিথির আদর-যত্ন করিতে প্রাণ একেবারে ঢালিয়া দেয়!

আমরা যে-ঘরে শয়ন করি, সে-

ঘরকে বলি থাকিবার ঘর (living room)। আইস-ল্যাণ্ডে এই শয়ন-ঘরকে বলা হয় বাথ-রুম। কেন এ নাম, তার একটু ইতিহাস আছে।

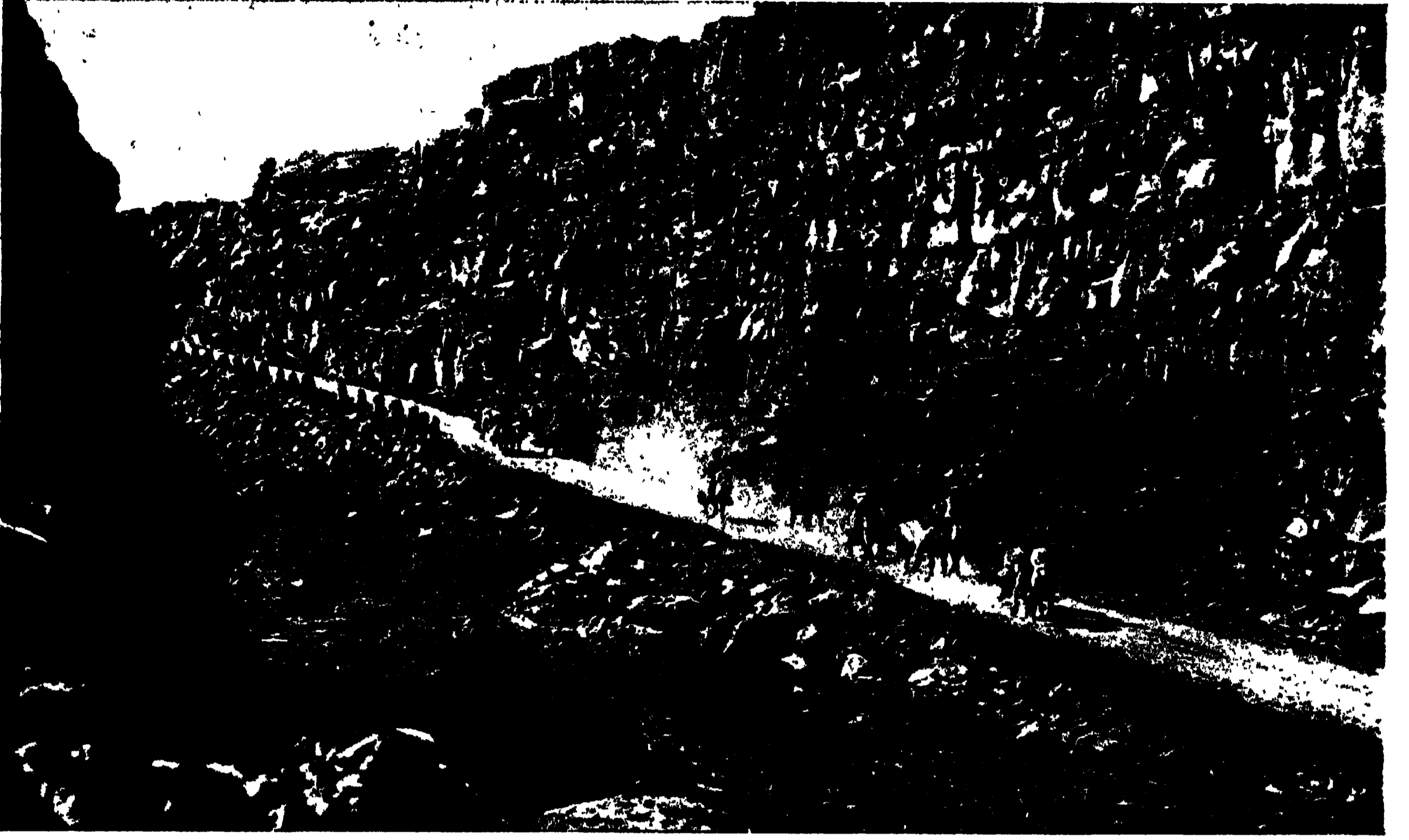
আইস-ল্যাণ্ড পূর্বে ছিল জ্ঞানীর দেশ; সাধুর দেশ। এই সব জ্ঞানীর নাম saga। প্রাচীন কালে এ-দ্বীপ বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে Viking নামে এক দল উত্তরে (Northern) জাতি



হেক্‌লা-বাত্তীর বিশ্রাম

ছোটখাট অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল—কিন্তু সেগুলি ছিল নিষ্করের মতো! এই উষ্ণ প্রস্রবণটি দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে-সব ছোটখাট প্রস্রবণগুলি আবার সজীব এবং জলধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; তাছাড়া ছোটখাট আরো বহু প্রস্রবণের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই প্রস্রবণগুলির জন্ত আইস-ল্যাণ্ডের নানা স্থান এমন অপূর্ব কৌশলে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, তার



খিঙ্ডেলার উপত্যকা—এইখানে হাজার বৎসর ধরিয়া শাসন-সভার অধিবেশন হয়



পাহাড়ের কোলে লোকালয়



কাপড় কাচা



সাবেকী-বেশে আধুনিক।



হাল-ক্যাশনে



চিরন্তনী-বেশভূষায়

এখানে আসিয়া
 বুঠ-পাট করিয়া
 আধিপত্য বিস্তার
 করে। ভাইকিংরা
 অত্যন্ত প্রমোদ-
 প্রয়াসী ছিল ;
 আরা ম-বিলাসে
 দিনাতিপাত
 করিত। শীতের
 জন্ত গরম জল
 ছাড়া ঠাণ্ডা জল
 ব্যবহার করিত
 না। পরিচ্ছন্নতার
 দিকে বিশেষ লক্ষ্য
 ছিল বলিয়া
 সকলে প্রত্যহ
 বহুবার স্নান
 করিত। এ জন্ত
 বাড়ীর মধ্যে
 স্নানের ঘরটিই
 ছিল বাসের
 ঘর, অর্থাৎ বৈঠক-
 খানা! প্রত্যেক
 গৃহের মেঝে
 জুড়িয়া স্নানের
 জলের প্রকাণ্ড
 চৌবাচ্ছা নির্মিত
 হইত।

শীতের দেশ
 বলিয়া জল খুব
 ঠাণ্ডা; সে জলকে
 আরামপ্রদ করি-
 বার জন্ত বড়-বড়
 পাথরকে আগুনে দারুণ ভাবে তাতাইয়া চৌবাচ্ছার জলে
 ফেলা হইত। বনের গাছ কাটিয়া স্তুপাকার করিয়া সেই
 সব কাঠ, পুড়াইয়া এই আগুন জালা হইত। কাঠ

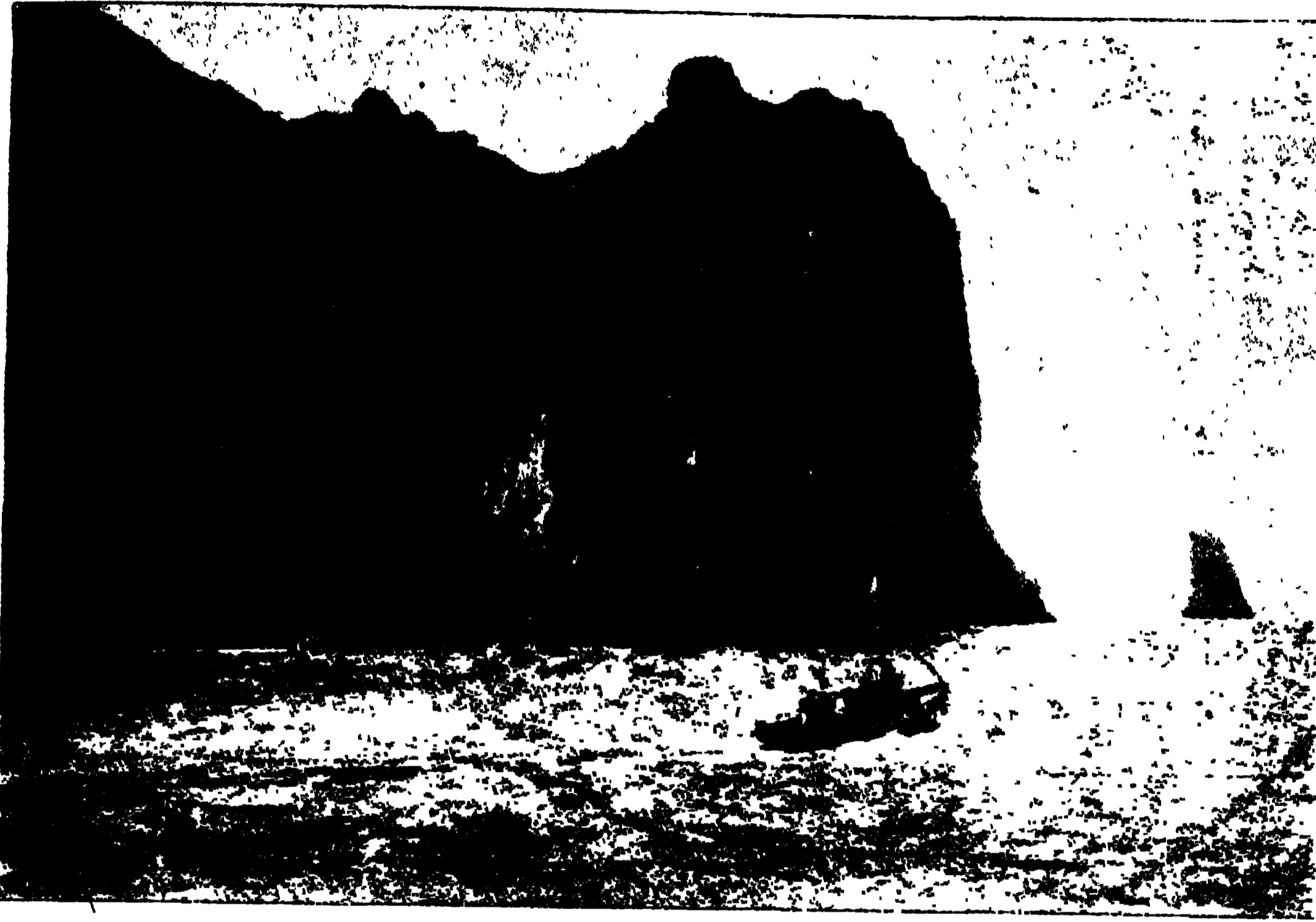


হেং-মাছের মৎস্য

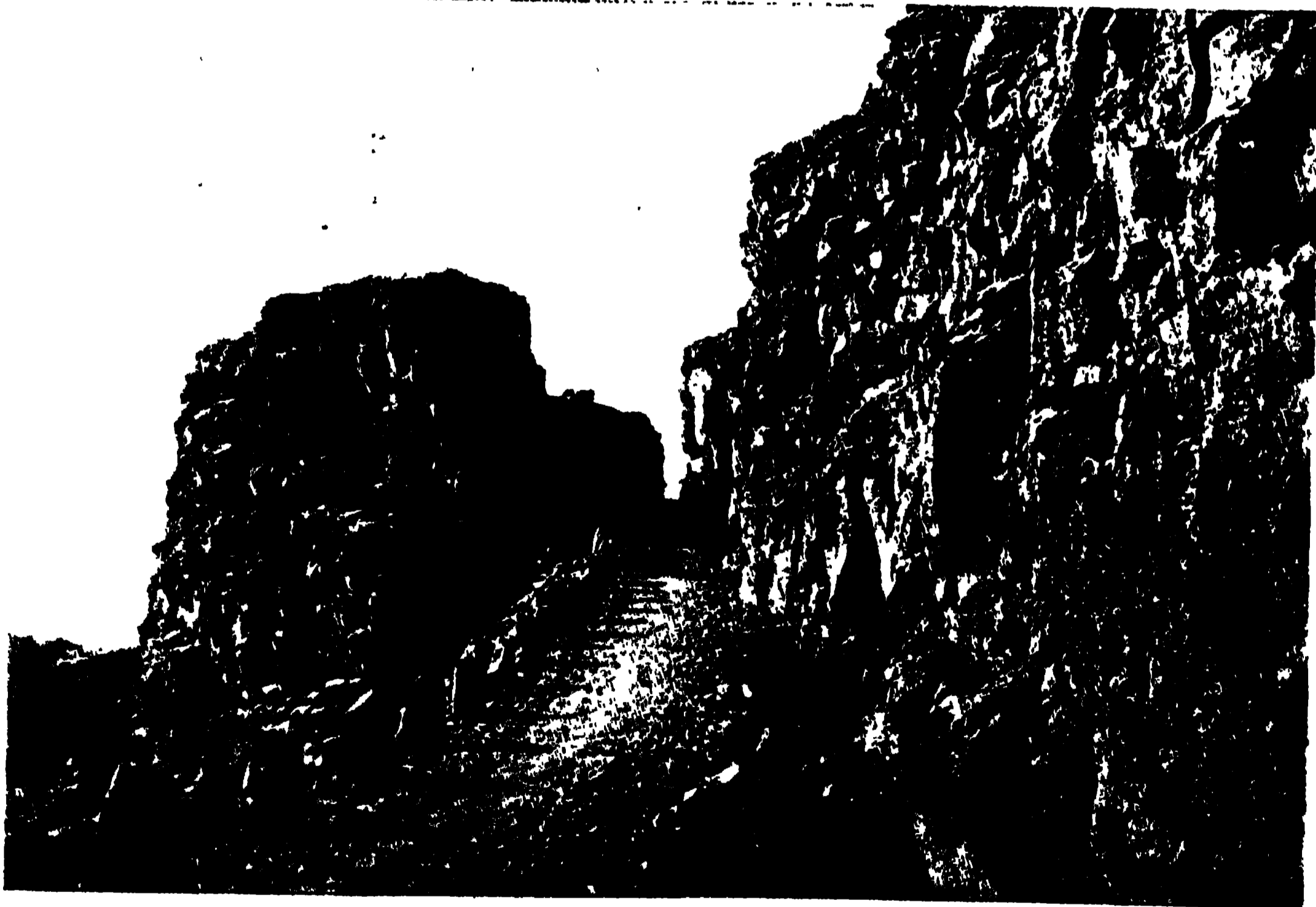


গরম-জলে নানা কাজ

পুড়াইতে পুড়াইতে ক্রমে বন-জঙ্গল নিষ্পাদপ হইয়া গেল ;
 কিন্তু শয়ন-ঘরের সে বাথ-রুম আজো তেমনি আরামের
 ও বাসের ঘর রহিয়া গিয়াছে !



মাছের নৌকা



পাহাড়পথ

এখন এই সব প্রস্রবণের জলের জন্তু আলানি-কাঠের
প্রয়োজন এখানে আদৌ অনুভূত হয় না।
এই গরম জলের কল্যাণে আইস-ল্যাণ্ডের বহু

লোক সমুদ্রে গিয়া মাছ-ধরার কাজে মাতিয়া ওঠে।
বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তা মিলিয়াছে বলিয়া আইস-
ল্যাণ্ডে এখন কল-কারখানারও সৃষ্টি হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটি
হা ই ডো-ইলেক-
ট্রিক শক্তিয়োগে
এখানকার প্রস্র-
বণগুলির জল
লইয়া আলানির
প্রয়োজন সিদ্ধ
করিতেছে
মেয়েদের কাপড়-
চোপড়কাটা,
ঘর-কন্নার কাজ
—সবই এই প্রস্র-
বণের জলে
সংসাধিত হইয়া
থাকে। ইলেক্-
ট্রিসিটি বা বৈদ্যু-
তিক প্রবাহের
ব্যবহার সঙ্গে-
সঙ্গে শ্রম-শিল্পে
এখন প্রভূত উন্নতি
হইয়াছে।

ব্যবসা বলিতে
এখানে মেবের
ব্যবসা; চাষ-বাস
এবং মাছের ব্যবসা।
মাছের এখানে
সীজন (season)
বা সময় আছে।
বছরে সব সময়
প্রচুর মাছ মিলে
না। মাছের সময়
আসিলে সামর্থ্য-
মতো দেশ-ভিত্তিক



কাজে চলে

আইস-ল্যাণ্ডের দক্ষিণদিকে আছে ভেটমানেইজার ডিম সংগ্রহ করা বড় কঠিন। পাহাড়ের চূড়ায় দড়ির কাঁশ দ্বীপ। শুধু এই মাছের ব্যবসা হইতে এখানে বছরে প্রায় আটকাইয়া সেই দড়ি ধরিয়া পাহাড়ে চড়িলে তবেই দশ লাখ ডলার-মুদ্রা আমদানি হয়। এ দ্বীপটিতে তিন ডিম ও পাখীর নাগাল মিলে।

হাজার লোকের বাস। বছরে দু'বার এখানে হয় মাছের সীজন। একবার শীতের গোড়ায়, আর একবার বসন্ত কালে। সে সময়ে নানা দেশ হইতে বহু লোক এখানে মাছ ধরিতে আসে। মাছ ধরিয়া এসব মাছকে সাফ করিতে হয়। সে কৌশল শুধু এ-দ্বীপের অধিবাসীরাই জানে।



ঘোড়ার পিঠে নদী পার

সাফ করিবার ফলে মাছ দীর্ঘকাল তাজা থাকে। এ-দ্বীপের বহু অধিবাসী শুধু মাছ সাফ করিয়া (cleansing) ঘণ্টায় দু'-চার ডলার রোজগার করে।

আইস-ল্যাণ্ডে বহু গিরি-পর্বত আছে। এ-সব গিরির বন্ধে বহু সামুদ্রিক পাখীর বাস। এই সব পাখী ও পাখীর ডিম সংগ্রহ করিয়া সেই ডিম এবং পাখী বেচিয়া অনেকে বহু অর্থ উপার্জন করে। এই সব পাখী ও পাখীর

এখানকার হাঁসের বৃকে যে মিহি পালক গজায়, সে পালক জাহাজে ভরিয়া যুরোপের বহু সহরে চালান যায় এবং বিলাসী-মহলে বেশ চড়া দামে সে পালক বিক্রয় হয়।

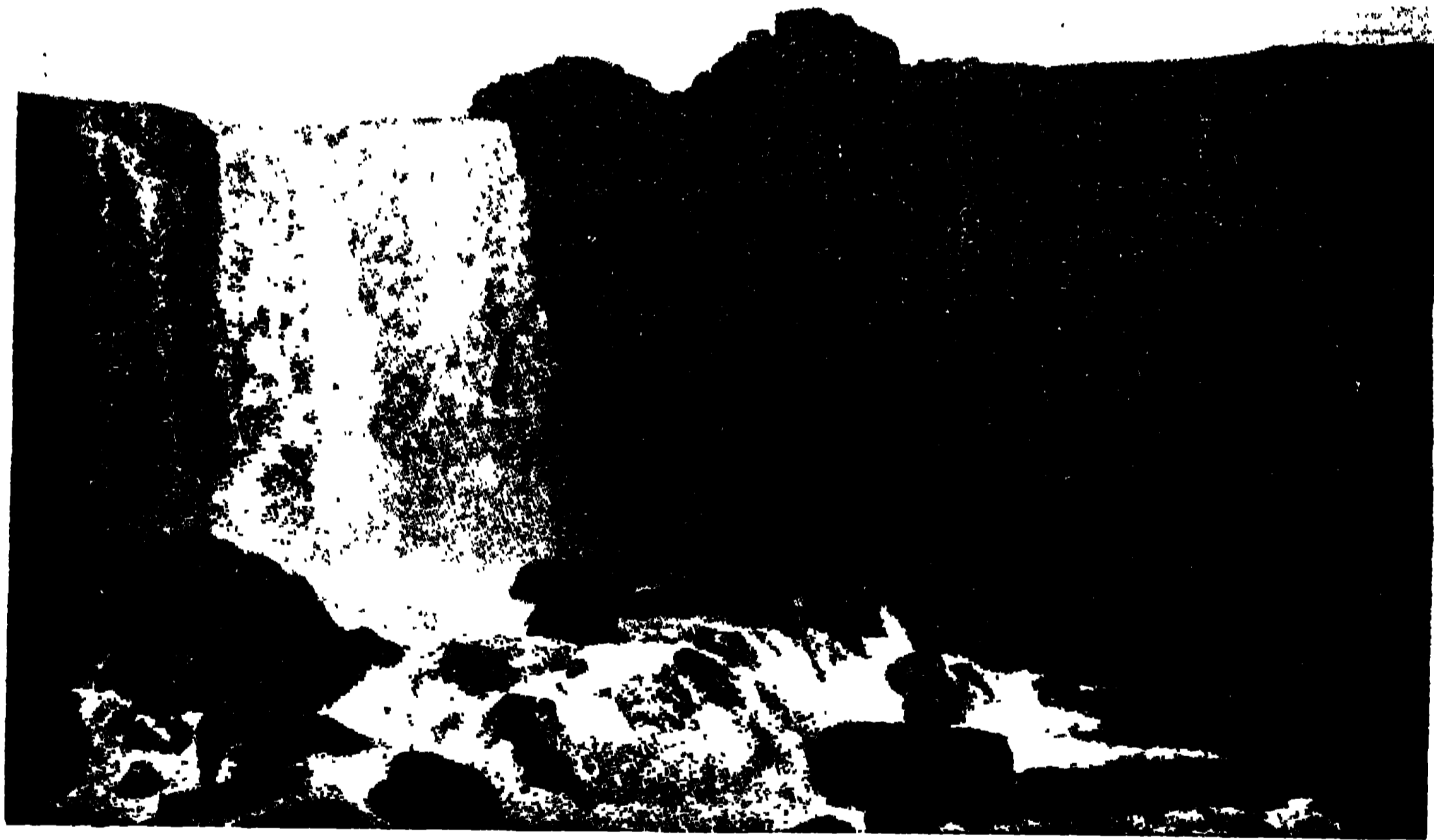
কাকাভুয়ার মতো এক-জাতের সামুদ্রিক পাখী আছে, তার নাম পাকিন্। এ-পাখা তেমন উড়িতে পারে না, কাজেই ধরা সহজ। এ-পাখীর পালক



রেইকজাবিক-সহর

বেশ চড়া দামে যুরোপে-আমেরিকায় বিক্রয় হয় এবং এ-পাণীর মাংস? একবার সে-মাংসের স্বাদ পাইলে জীবনে না কি তাহা ভুলা যায় না!

বাড়ী-ঘর কাঠ-নির্মিত। নিত্য ভূমিকম্প হয় বলিয়া বাড়ী-ঘর কাঠ দিয়া নির্মিত হয়। কোনো বাড়ী সমতল ভূমে—কোনো বাড়ী বা পাহাড়ের উপর। বাড়ীতে যদি আগুন



এ-প্রশবণের জলে বৈদ্যুতিক-শক্তির বোধন

আইস-ল্যাণ্ড বহুকাল ধরিয়া ডেনমার্কের অধীন ছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্ক সে অধীনতা-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া আইস-ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা ও স্বাভাব্য দিয়া তাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়াছে। আজ আইস-ল্যাণ্ডবাসীরা নিজেদের দেশের শাসন-পালন-কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাহ করিতেছে।

এখানকার প্রধান সহর রেইকজাবিক। এখানকার

লা গে, এ জ গু বাড়ীর জানলায় তারের দড়ি কুণ্ড-লীকৃত করিয়া বাধা থাকে; আগুন লাগিলে এই তারের দড়ি ধরিয়া লোকজন নীচে নামিয়া নিরাপদে সমতল-ভূমে পলায়ন করিতে পারে।

হেকলা আগ্নেয়-গিরির বিরাট দেহ আজ আর

অগ্নিচক্রে খেলায় মাতে না! সে দেহ পড়িয়া আছে নির্বিষ, নির্লিপ্তের মতো! বিদেশীরা এ আগ্নেয়-গিরিতে বেড়াইতে আসেন। পাহাড়ের গায়ে দু'-তিনটি পাষাণ-নিবাস আছে। সেখানে ব্যবস্থা যা আছে, তাহাতে বিদেশীদের কোনোরূপ অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না।

পূর্বে বলিয়াছি, আইস-ল্যাণ্ডের পথ-ঘাট তেমন স্বচ্ছন্দ-সুগম নয়। সে কথায় এমন মনে করিবেন না যে,

সর্বত্র খান'-খোন্দল টপ্কাইয়া পাথর ডিগ্গাইয়া পথ চলিতে হয়! রেইকজাবিক, রুটাজোদার, হেস্ভর, হোলতাস্তাদির, সিকলিবেয়ার প্রভৃতি সহরে পাকা রাস্তা আছে। সে রাস্তা প্রায় ৪০।৫০ বৎসর মাত্র তৈয়ারী হইয়াছে। এ পথে মোটর-লরি এবং মোটর-গাড়ী চলে। পাকা রাস্তার পরিমাণ সর্ব-সমেত প্রায় ৪৫০ মাইল হইবে। অল্প পথ-ঘাটে চলিবার জন্ত টাটু-ঘোড়া একমাত্র বাহন। এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা ঘোড়ায় চড়িতে পটু। ঘোড়ায় চড়িয়াই চলার কাজ সারিতে হয়। এক গ্রাম হইতে অল্প গ্রামে যাইতে ছোট-ছোট অসংখ্য পর্বত এবং নদী পার হইতে হয়। এ সব নদীর জল কোথাও বেশী গভীর নয়। কাজেই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া এ সব নদী অনায়াসে পার হওয়া যায়। যে-সব গভীর নদী আছে; সেগুলি নৌকায় চড়িয়া পার হইতে



হয়। এখন এই সব গভীর নদীতে বিদেশী স্কনার, মোটর-বোট ও ছোটখাট স্টীমারের আমদানি হইয়াছে। মোট-ঘাট, বেসাতি-পশরা—এ সবও ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া বহা হয়। মরুর বুকে মরু-যাত্রীর সহায় যেমন উট, এখানকার অধিবাসীদের ঘোড়া ঠিক তেমনি সহায়।

শ্রীমতী ইশোবেল হাচিশন নামে এক জন ধনাঢ্য মার্কিন-মহিলা আইস্-ল্যাণ্ড-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেখানকার যে-পরিচয় তিনি লিখিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য।

তিনি লিখিয়াছেন—আইস্-ল্যাণ্ডের ভীমকান্ত সৌন্দর্য্য-মাধুরী দেগিবার জন্ত আমি আট দিন একাদিক্রমে টাটু-ঘোড়ায় চড়িয়া এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। রাত্রে শুধু বিশ্রাম করিতাম। প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিক্রমণ শুরু হইত; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে পরিক্রমণের বিরাম থাকিত না। এখানকার রৌদ্র-মেঘের লীলা-খেলা ভুলিবার নয়! রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিতেছে, সন্ধ্যা মেঘে ও কুয়াশায় চারিদিক ভরিয়া গেল—হয় তো এক-পশলা ঝিল-ঝিলে বৃষ্টি, নয় দিগন্ত

কৃষিবীরা

ব্যাপিয়া রঙে রঙিন রামধমুর বিকাশ! এমনি রৌদ্র-মেঘের লীলা-মাধুরীতে বিমুক্ত মন লইয়া গলোশে-প্রপাতের সামনে এক দিন আসিয়া দাঁড়াইলাম। সে জল-ধারায় সাবানের অজস্র ফেনা—সে ফেনার ছোট-বড় বুদবুদে রঙের কি অপকল্প বাহার!

এখানে তেমন ধন বন-জঙ্গল নাই— তবু যেদিকে চাই, দেখি শ্রামলশ্রীতে চারিদিক ভরিয়া আছে! মাটির বুকে, পাহাড়ের বুকে নানা রঙে রঙিন অজস্র পাহাড়ী ফুল ফুটিয়া আছে। আলস ও আলসের কাড়াকাছি পাহাড়ী জমিতে যে-সব ফুল ফোটে, এখানেও ঠিক তেমনি ফুল!

সে ফুলের যেমন অজস্রতা, তেমনি মাধুরী। পাখাও এখানে অজস্র !

এখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই খুব সদালাপী এবং অমায়িক ; অতিথি পাইলে তাকে মাথায় করিয়া রাখে। এক দিন এক পাহাড়ী পাহাড়-নিবাসে আমাকে রাজিয়াপন করিতে হইয়াছিল। এক-পেয়লা দুগ্ধ পান করিয়া জানলার ধারে বসিয়া আছি—ঘরে আলো নাই। ভৃত্য গিয়াছিল নীচেকার গ্রামে বাতির সন্ধানে। এমন সময় দেখি, একটি স্ত্রীলোক পাহাড় বহিয়া নামিয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া সে জানলার কাছে

তার পর প্রশ্ন করিল—আর কিছু চাই ?

মনে হইল বলি, তোমাকে চাই। রাত্রে যদি এখানে থাকো, গল্প করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিব।

কিন্তু সে-কথা বলিলাম না।

রাত্রে তার দেওয়া কঞ্চলের শয্যায় আরামে ঘুমাইলাম। পরের দিন সকালে সে আসিল। সঙ্গে আনিল এক পেয়লা দুগ্ধ এবং সামুদ্রিক পাখীর দু'টি ডিম। পাহাড়-নিবাসের অতিথির সেবা করিয়া সে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিল। আর আমার তৃপ্তি ? ভাষায় তা জানানো যায় না !...



তরণী তরণে

আসিল, বলিল—অন্ধকারে বসিয়া আছো কেন ? বলিলাম—ভৃত্য বাতি আনিতে গিয়াছে। এ কথা শুনিয়া তখনি নিজের পশরা হইতে ঝাকড়া বাহির করিয়া মশাল তৈয়ারী করিল ; মশাল জালিয়া হাসিয়া সে বলিল—Good lamp ! (দিব্যি বাতি !) তার পর বলিল—বিছানা আনিয়াছ ? বলিলাম—না। তার নিকটে ছিল কাঁথা ও কঞ্চল। সেই কাঁথা ও কঞ্চল বিছাইয়া সে আমার শয্যা রচনা করিয়া দিল। বলিল—বিদেশী লোক রাত্রে শীতে কষ্ট পাইবে ! কাল সকালে আসিয়া আমি আমার কাঁথা-কঞ্চল লইয়া যাইব।

এখানে মেয়ে-পুরুষে কোনো পার্থক্য দেখি নাই। ক্ষেতে মেয়ে-পুরুষ এক-সঙ্গে কাজ করিতেছে। মেয়েরা সংসারের কাজে যেমন পটু, বাহিরের কাজেও তেমনি। মিউনিসিপ্যালিটির কাজ, বলিতে গেলে, মেয়েরাই করে, তাদের কার্য-তৎপর-তায় সারা দেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেশটিকে নিসর্গ যেমন রকমারি সাজে সজ্জিত করিয়াছে—এখানকার লোকজনও তেমনি নিসর্গের সে-সজ্জার সঙ্গে ভাল রাখিয়া ধর-বাড়ী পথ-

ঘাট চমৎকার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে। মেয়েরা বেশ স্ত্রী এবং লজ্জাশীলা। বেশভূষায় পারিপাট্য ও বর্ণশ্রী সাধনের দিকে প্রবল মনোযোগ। বেশভূষায় যুরোপীয় বা মার্কিন শ্যাশনের বাহুল্য দেখি নাই—নিজেদের সনাতন বেশভূষায় সামান্য একটু কাটছাঁট করিয়া লইয়াছে। সে কাটছাঁটে শোভনতা বা কমনীয়তা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। মহিলাটি দু'-চারিটি ইংরেজী কথা জানেন। তাঁর স্বামী বেশ পণ্ডিত। ভালো ইংরেজী জানেন। তাঁর ঘরে ছোট লাইব্রেরীটিতে সেক্সপীয়র, ডিকেন্স, সার অলিভার লজ,

এবং শ্রীযুত রবীন্দ্র-
নাথ ঠাকুরের
কয়েকখানি গ্রন্থ
দেখিয়া ছিলাম।
রবীন্দ্রনাথের
গ্রন্থগুলি অবশ্য
ইংরেজী অনুবাদ।
মহিলাস্বামী
বলিলেন, এ বই-
গুলি পড়িয়া
তিনি বহু আনন্দ
পান!

এখানে জীবন-
যাত্রার প্রণালী
বেশ জটিল এবং
কঠিন। সমস্ত
এখানে অনেক।
সকল অশুভা,
সকল কষ্ট সহিয়াও
এখানকার লোক
এই-দীপেই আজী-
বন বাস করেন;
বিলাস বা পয়সার
লোভে দেশ
ছাড়িয়া অত্র
গিয়া থাকিবার
দিকে কাহারো
কুচি বা বাসনা
দেখা যায় না!
দেশের গর্ব-
গৌরবে সকলের
মন ভরিয়া আছে।

এখানকার
অধিবাসীদের

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা সর্ব-জাতির অক্ষয়যোগ্য!
ইহাদের স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে অস্ত্র জাতির স্বদেশপ্রেমের



গল্ফশ-প্রপাত



কড়-মাছের আড়

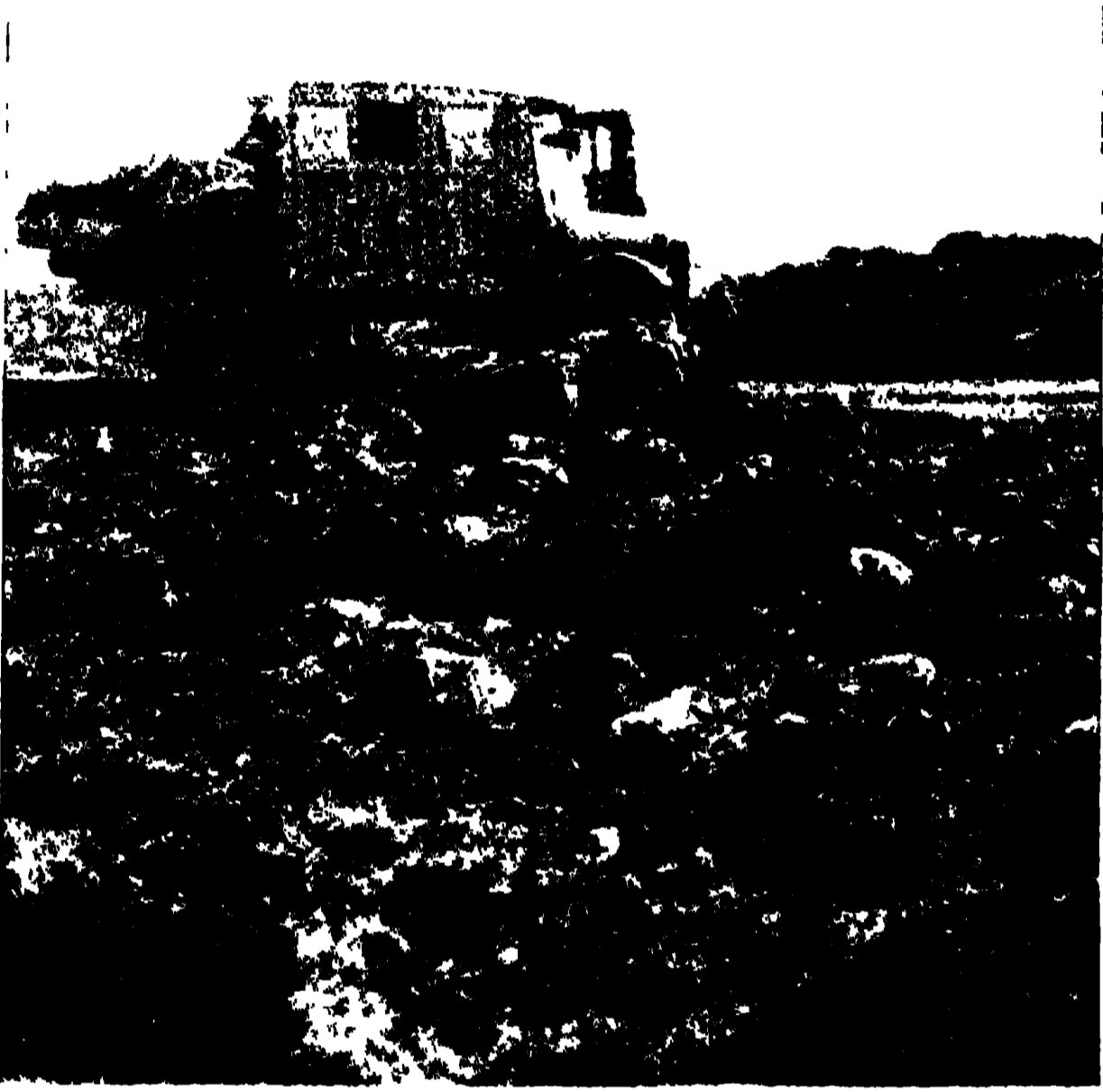
পার্বক্য আছে। এ সম্বন্ধে যুরোপে-আমেরিকায় একটি
কাহিনী খুব বেশী রকম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এক

জন তরুণ আইস-ল্যাণ্ডার কানাডায় গিয়াছিলেন। অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—কোন জাতের লোক তুমি? কোন্ মহাদেশ হইতে তুমি আসিয়াছ? উত্তরে তরুণ বলিয়াছিলেন,—আমি তোমাদের কোনো মহাদেশ হইতে আসি নাই। আমি আইস-ল্যাণ্ডার।

অতি প্রাচীন যুগে যুরোপ-আমেরিকা যখন অশিক্ষিত বর্ষরের বাসভূমি ছিল, তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কাহারো

যে, বিবাহ হইলেও নারীকে তার পিতৃদত্ত নাম বা গোত্র-পরিচয় ত্যাগ করিয়া স্বামীর নাম, স্বামীর গোত্র গ্রহণ করিতে হয় না; নারী পিতৃদত্ত নামগোত্র রক্ষা করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আইস-ল্যাণ্ড তার এক-সহস্রতম জন্ম-বার্ষিকী-উৎসব সম্পাদন করিয়াছে। সে সময় যে জাতীয়-সঙ্গীত বিরচিত হইয়াছিল, সে-সঙ্গীত বিদেশীর কাছে নিজেদের গৌরব-ঘোষণায় মুখর নয়! তাহাতে



দুর্গম পথে মোটর-লরি



ক্ষেতের কাজে মেয়ে-পুরুষ

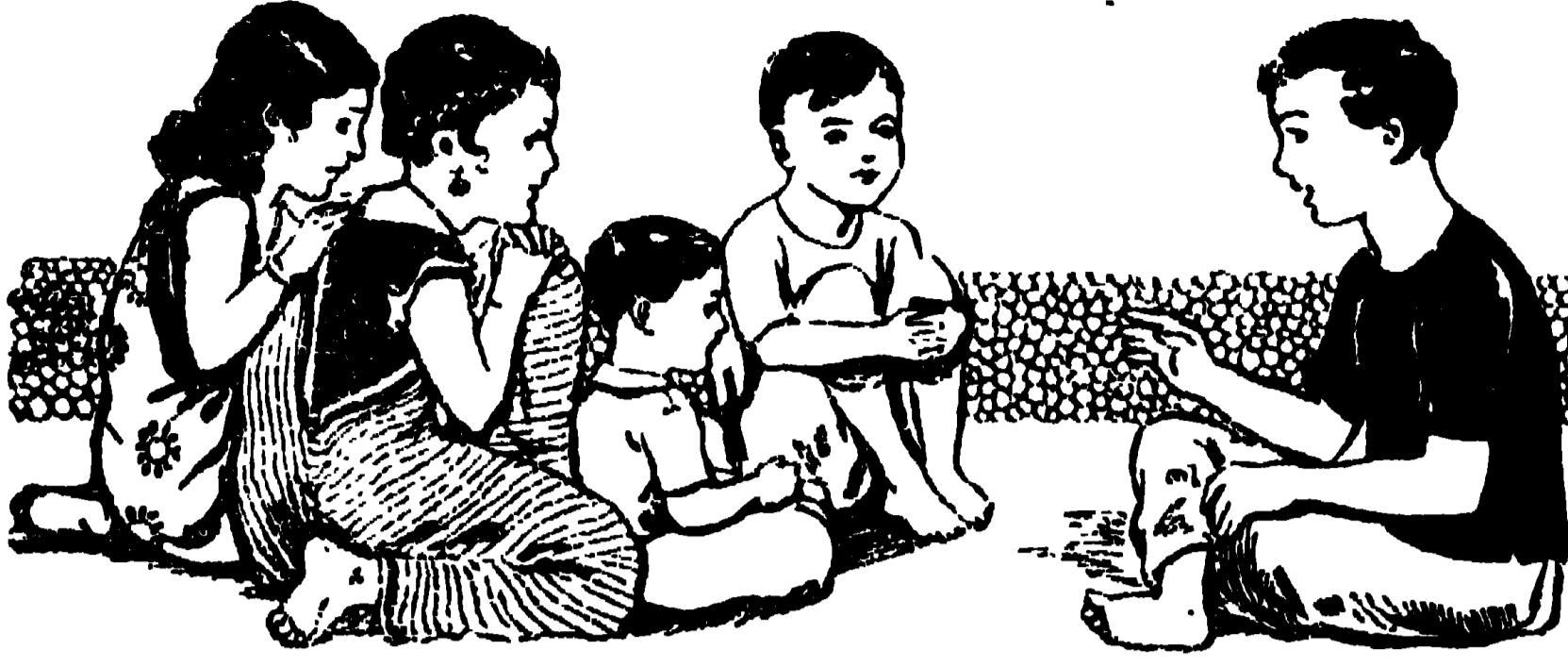
সাহায্য না লইয়া আইস-ল্যাণ্ডবাসীরা জ্ঞানে-সংস্কৃতিতে গৌরবের আসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁদের সে শিক্ষা-সংস্কৃতির রেশ আজো মিলাইয়া যায় নাই! এখানকার অধিবাসীরা জগতের অন্য সব অশিক্ষিত পুখী অধিবাসীর মতো প্রখ্যাত পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও সাধারণ-জ্ঞান, সহজ-বুদ্ধি এবং সাহিত্যরসামুভূতিতে এ-জাতির বৈশিষ্ট্য আজো সকল জাতির শঙ্কার সামগ্রী।

আইস-ল্যাণ্ডের সাগা-সাহিত্য কবিত্ব-সম্পদে সমৃদ্ধ। আইস-ল্যাণ্ডের পল্লী-গীতির বৈচিত্র্য ও মাধুর্যের তুলনা নাই!

রাজনীতির ক্ষেত্রে আইস-ল্যাণ্ডই নারী-জাতির সাম্য স্বীকার করিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীকে সর্ব-প্রথম ভোটাধিকার দান করিয়াছে। নারীর মর্যাদা এখানে এমন

অহঙ্কারের বিন্দু-বাপ্প দেখা যায় নাই! সেখানকার পথে-ঘাটে সর্বজনের কণ্ঠে আজ এই গানটি নিত্য ধ্বনিত হইতেছে। সে-গান,—

দেবতা মোদের মাতৃ-ভূমির,
পিতৃ-ভূমির দেবতা।
আমরা তোমার বন্দনা-গান গাহি!
তোমার সূর্যরশ্মি মোদের প্রাণ!
তুমি মহা-কাল—আদি ও অন্ত নাহি!
হাজার বরষ—হাজার মোদের কাছে;
কাল-মহীকহে একটি কুসুম-কলি—
তোমারে পূজিতে তোমারে জানাতে নতি
আগিছে হাসিছে ঝরিয়া যেতেছে চলি!
হাজার বরষ মোদের তুষার-দেশে—
হাজার বরষ এই তুহিনের ভূমে—
কাল-মহীকহে ছোট কুসুম-কলি
আগিছে ঝরিছে তোমারি চরণ চূমে!



ছোটদের আসব

নির্বাসিতা রাজকন্যা

(রূপকথা)

ছোট মেয়ে লীনা। কতই বা তার বয়স? বড়-জোর নয় কি দশ বছর; কিন্তু এই বয়সেই কি তার প্রতাপ! সমবয়সী মেয়েদের ত কথাই নেই, ছেলেরাও তার ভয়ে আড়ষ্ট; অতি-বড় ছুঁই ছেলেও লীনাকে ঘাঁটাতে চায় না। কারও এক বিন্দু বেয়াদপি সে সহ্য করে না। এমন কি, এই একরঙা মেয়েটির সঙ্গে তকরার ক'রতেও কারও সাহস হয় না। তারা জানে—লীনাই তাদের দলের চাই, লীনাকে তাদের মানা চাই-ই।

তোমরা হয় ত ভাবছ—লীনারা খুব বড় লোক, তাদের অনেক পয়সা, বিস্তর লোকজন তাদের তাঁবেদারী করে;—তাই লীনার এত প্রতাপ, সবাই তাকে অত মানে, ভয় করে। কিন্তু এ সব অনুমান সত্য নয়। ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরে খুব গরীবের মতোই লীনারা বাস করে। তার মাথার ওপরে এক মা, আর অভিভাবকের মত এক সাধু ছাড়া আর কেউ নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'টি বেলা মা ও মেয়েকে খাটতে হয়; সেই খাটুনির পয়সায় কোন রকমে তাদের দিন চলে।

লীনার মায়ের যে সামান্য সম্বল ছিল, তা দিয়ে লীনা হাট থেকে তুলে কিনে এনে মাকে দেয়; মা ঘরে বসে তা দিয়ে চরকায় সূতো কাটেন। সেই সূতোর বাণ্ডিল ঘাড়ে ক'রে লীনাকে আবার হাটে যেতে হয়—ব্যাপারীদের কাছে তা বেচবার জন্তে। সূতো বেচে ও তুলে কিনে যে পয়সা বাঁচে, তাতেই কষ্টে-স্বপ্নে এদের দিন চলে যায়।

কিন্তু মা ও মেয়ের চেহারা আর আচার-ব্যবহার দেখলে মনে হয়, এত কষ্টে এ-ভাবে সংসার চালানো যেন তাদের সঙ্গে খাপ খায় না। যেন খুব বড় সংসার

চালালেই এদের মানায়। মা'র বয়স একটু বেশী হ'লেও, এখনো মনে হয়—দেহখানি তাঁর যেন কাঁচা সোনায় গড়া। গায়ের রঙটির মতই আশ্চর্য রকমের স্নন্দর তাঁর মুখ-চোখ, নাক—এমন কি, মুখের কথাটি পর্যাস্ত! মেয়েকেও যেন বিধাতাপুরুষ মায়ের রূপগুলি সবই চেলে দিয়েছেন। কেবল একটি জিনিস মেয়েটি মায়ের চেয়ে বেশী পেয়েছে; সেটি হচ্ছে তেজ। মায়ের মুখখানি সদাই মলিন; মনটিও তাঁর এতই নরম যে, কেউ কখন তাঁকে রাগতে দেখেনি; উঁচু কথাটি পর্যাস্ত কেউ কোন দিন তাঁর মুখে শোনেনি! মনে কষ্ট হ'লে সকলকে লুকিয়ে তিনি আঁচলে চক্ষু মোছেন; কেউ অগ্রায় কিছু করলে বা তাঁর মনে আঘাত দিলে নিঃশব্দে তা সহ করেন।

লীলা কিন্তু এ-সবের ধার দিয়েও যায় না। মায়ের এই নরম গুণগুলি সে কিন্তু মোটেই পায়নি; হয় ত বিধাতাপুরুষ ইচ্ছা ক'রেই এ বিষয়ে একটু কারচুপি ক'রেছেন। তাতে লীনার মেজাজটি হ'য়েছে মায়ের মেজাজের ঠিক উল্টো। কেউ যদি কোন রকম কটুকথা তাকে বলে, বা মিছিমিছি তাকে বকে, মুখটি বুজে তা সহ করার মেয়েই সে নয়; সূদে-আসলে তখনি তার শোধ তুলে তবে ছাড়ে! এক-রঙা মেয়ে হ'লে কি হয়? তার শরীরের শক্তি দেখে সমবয়সী মেয়েরা বলে—ও সূদে-পালোয়ান! আর তার মনের জোর দেখে বিধাতাপুরুষও বোধ হয় মনে মনে হাসেন। যারা এই মেয়েটিকে জর্জর করতে গিয়ে নাকালের একশেষ হয়, তারা বলে—মেয়েটা যাহু জানে, ওর চোখদুটোর চাহনিত্তে এমন কিছু আছে—যার জন্তে জন্তু মানুষ সবাই কাবু হ'য়ে পড়ে! মায়ের ইচ্ছা, মেয়ে ঝগড়াকাঁটি না ক'রে চুপচাপ দিন কাটাক; কিন্তু মেয়ে ঝগড়ার দিয়ে বলে—সে আমি পারব না, আমাকে আমার স্বভাব ছাড়তে বোলো না মা!

সহর থেকে অনেক দূরে বন-জঙ্গল আর পাহাড়ে-ঘেরা গ্রামখানির নাম পাহাড়পুরী। এ গ্রামে মেয়েদের বাসই বেশী; টাপা কলের মতো তাদের গায়ের রঙ, তাই বাইরের লোক এই গ্রামখানিকে বলে—পরীর পুরী। লীনার মা বর্ণারাগী এই পাহাড়পুরীর মেয়ে। তিনি ছিলেন, এ অঞ্চলের রূপসী-শিরোমণি। বাংলার কোন রাজ্যের রাজা এই পাহাড়ে শিকার করতে এসে, বর্ণারাগীর অপরূপ রূপ দেখে, তাঁকে বিয়ে করবার জন্তে ব্যাকুল হ'লেন। বর্ণারাগীর বাবা ছিলেন ভয়ঙ্কর জেদী মানুষ। তিনি আসাম প্রদেশের অহম-রাজের বংশধর, রাজ-সিংহাসনে তাঁর দাবী ছিল; কিন্তু রাজার অমতে তিনি পাহাড়পুরীর এই গরীব গৃহস্থের মেয়েকে বিয়ে করায় সর্বস্বান্ত হ'লেন। শেষে তিনি রাজ-প্রাসাদ ও রাজমুকুটের আশা ত্যাগ ক'রে পাহাড়পুরীতে এসেই বাস করেন। বর্ণারাগীই তাঁর এক মাত্র সন্তান। কিন্তু তার পাঁচ বছর বয়সে তার মা পা-পিচলিয়ে পাহাড় থেকে খদে প'ড়ে মারা যান। বর্ণারাগী বাপের স্নেহ-যত্নেই বড় হয়। তার পর বাংলাদেশের রাজা বর্ণারাগীকে দেখে যখন বিয়ে করতে চাইলেন, তখন তার বাপের মনে এই ভেবে আনন্দ হ'ল যে, তাঁর ছুখে বিধাতার দয়া হওয়ায়, আসামের চেয়ে সব দিক দিয়ে বড় যে বাংলা, সেই দেশের রাজাকে ডেকে এনেছেন, তাঁর মেয়ের ছুখ দূর ক'রবার জন্ত। হাসি-মুখেই তিনি মেয়েকে রাজার হাতে তুলে দিলেন।

বর্ণারাগীকে নিয়ে রাজা বাংলায় চ'লে গেলেন। মেয়েকে বিদায় দিয়ে তার বাপের মন ভেঙ্গে পড়ল। এই মেয়েটিই ছিল তাঁর এক মাত্র অবলম্বন: এখন কি নিয়ে তিনি পাহাড়পুরীতে প'ড়ে থাকেন? এই সময় এক সাধুর শুভাগমন হ'ল তাঁর বাড়ীতে। সাধুর বিভূতি দেখে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন; সাধুও তাঁর ভক্তিতে তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। পর্ণকূটারখানি সাধুর আশ্রম হ'য়ে দাঁড়ালো। বর্ণার মায়ের নামে সাধু তার নাম রাখলেন—পূর্ণাশ্রম।

এর পাঁচ বছর পরে এক দিন সকালে ফুলের মত ফুটফুটে একটি থুকীকে কোলে নিয়ে একটি তরুণী বিধবা

এসে দাঁড়ালেন এই আশ্রমের দোরে; বন্ধ দরজায় ধা দিয়ে কান্নার সুরে ডাকলেন—বাবা!

থুট ক'রে দরোজাটি খুলে তার ছ'পাটি কপাটের ওপর হাত ছ'খানি রেখে, ঋণির মত যে সাধুপুরুষটি দেখা দিলেন, তাঁর মুখের পানে চাইতেই মেয়েটির সকল ছুখ-কষ্ট যেন এক নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল; মনে হ'ল—যেন তাঁর বাপের স্নেহমাথা মুখখানা এই ঋণিতুল্য মানুষটির মুখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুখখানি তুলে মেয়েটি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমার বাবা কোথায়?

মেয়েটির কথার উত্তর না দিয়ে সাধু তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তুমিই ত বর্ণারাগী—বাংলা থেকে পালিয়ে এসেছ? ভালই ক'রেছ মা, ঘরে এসো!

বিধবা কান্দ-কান্দ স্বরে এবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন—বাবাকে দেখছি না কেন? তিনি কোথায়?

সাধু তাঁর ডান হাতখানি আকাশের দিকে তুলে ব'ললেন—তিনি ঐখানে।--সেখান থেকেই তোমাকে দেখছেন।

কথাটা শুনেই সেই তরুণী বিধবা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, দেহটাও তাঁর এলিয়ে প'ড়ল; কোলের থুকীটি প'ড়ে যায় দেখে সাধুটি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ধরে ফেলে, কোলের মেয়েটিকে নিজের কোলে নিয়ে ব'ললেন—ছি মা, স্থির হও! সময় হ'তেই বাবা তোমার চলে গেছেন; আর আমি যে তোমাদেরই পথ চেয়ে বসে আছি। আমাকে পর ভেব না মা! আমি তোমার বাবার গুরু, আর তোমার মেয়েটির দাচ্।

তোমরাও বোধ হয়, এবার বুঝতে পেরেছ, ঐ ছোট্ট থুকীটিই হচ্ছে লীনা, আর তাকে যিনি কোলে ক'রে দরোজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই বর্ণারাগী।

পাঁচ বছর আগে এই বর্ণাই রাজরাগী সেজে রাজার সঙ্গে চতুর্দোলায় চড়ে, কত দুর্গম পথ পার হ'য়ে বাংলার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন; সঙ্গে ছিল কত লোক-জন। সারা পথের লোক পাহাড়ে-মেয়ের সৌভাগ্য দেখে অবাক হ'য়েছিল;—আর আজ সেই বর্ণারাগীই এক-কাপড়ে, পায়ে হেঁটে এক বছরের মেয়েটিকে বুকে ক'রে, পাহাড়পুরের সেই কুঁড়ে ঘরখানিতেই আশ্রয় নিতে গিরে এলেন। একেই বলে বিদিলিপি!

রাজা যত দিন বেঁচে ছিলেন, ঝর্ণার আদরের সীমা ছিল না ; রাজা তাকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। কিন্তু রাজার আর একটি রাণী ছিলেন। সেই রাণীর নাম ছিল অঙ্গনা। অঙ্গনার বাবা ছিলেন রাজার এক মন্ত্রী। রাজা-কিন্তু অঙ্গনার চেয়ে ঝর্ণারানীকেই বেশী ভালবাসতেন। তার কারণ, ঝর্ণার মনটি ছিল বড় নরম, আর ভারী সরল, কিন্তু অঙ্গনা ছিলেন যেমন অহঙ্কারী তেমনি কুচক্রী। ঝর্ণারানী সতীন অঙ্গনাকে নিজের বোনটির মতোই ভালবাসতেন, তাঁর মনে এতটুকু হিংসাও কোন দিন স্থান পায়নি ; কিন্তু ঝর্ণার হিংসায় অঙ্গনা সর্বদা যেন জ্বলে মরতেন। তিনি কেবলই ছল খুঁজে বেড়াতেন, কি ক'রে ঝর্ণাকে তাড়িয়ে রাজাকে তাঁর বশে রাখবেন। রাজা কিন্তু ঝর্ণারানীকেই পাটরাণী ক'রে অঙ্গনাকে আরো চটিয়ে দিলেন। তার পর এক দিনের ব্যবধানে ঝর্ণারানীর আর অঙ্গনার একটি ক'রে মেয়ে হ'ল। ঝর্ণার মেয়েটির জন্ম এক দিন আগে হওয়ায় রাজ্যের নিয়ম অনুসারে জ্যেষ্ঠার মর্যাদা তাকেই দেওয়া হ'ল। ভবিষ্যৎ ভেবে আঁতুড়-ঘরেই রাণী অঙ্গনার মনে বিষাদ ঘনিয়ে এল। যদি রাজার কোন পুত্রসন্তান না হয়, তা হ'লে তাঁর সতীনের এই মেয়ে—এক দিনের বড় ব'লেই সিংহাসন পাবে,—এই চিন্তায় তিনি অস্থির হ'য়ে উঠলেন। দু'টি মেয়েই কিন্তু আশ্চর্য্য রকমের সুন্দরী, আর দু'জনের মুখের আদলও একই রকমের ! দুই রাজকন্যার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্যের জন্ত রাজবাড়ীর সকলেরই এমনি ধোঁকা লাগতে লাগল যে, কোন্ মেয়েটি কার, কেউ সহজে তা ঠিক করতে পারত না ! ঝর্ণারানী আদর ক'রে তাঁর মেয়েটির নাম রাখেন—লীনা ; আর অঙ্গনার বাবা রাজার মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্মা তাঁর নাতনীটির নাম রাখেন—নীলা। কিন্তু কোন্টি লীনা আর কোন্টিই বা নীলা, রাজা ও দুই রাণী ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারত না। মেয়ে দু'টির গলার স্বর পর্য্যন্ত একই রকমের ; তফাতের মধ্যে এইটুকু ধরা যেত—ঝর্ণারানীর মেয়ে লীনা হ'য়েছিল ভারী শাস্ত, আর অঙ্গনার মেয়ে নীলার স্বভাব তেমনি ছরস্ব।

বছর-তাই পরে সুস্থ সবল রাজা হঠাৎ এক দিন এমনি অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লেন যে, আর তাঁকে উঠে বসতে হ'ল না। রাজপুরী আঁধার ক'রে, প্রজাদের হাহাকারে ডুবিয়ে,

রাণী ও রাজকন্যাদের ছেড়ে তিনি পরলোকে প্রস্থান ক'রলেন। ফলে লীনাকে নিয়ে পাটরাণী ঝর্ণা পড়লেন অকূল পাথারে। অঙ্গনার বাবা শ্রীগোপাল শর্মা রাজপুরুষদের সাহায্যে তাঁর মেয়েকেই রাজ-সিংহাসনে বসালেন। ঝর্ণারানীর সম্বন্ধে সকলকে জানিয়ে দিলেন—সে পাহাড়ীদের মেয়ে ; রাজা তাকে বিয়ে করেননি, ধরে এনে তাঁর প্রাসাদে রেখেছিলেন। সে এখন রাণী অঙ্গনার বাঁদীগিরি করবে, তা' ছাড়া তার গতি নাই !

স্বামীর শোকে অভাগিনী ঝর্ণার বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল, তার ওপর এই মর্শ্মভেদী কথা শুনে তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল ! এ বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের কোন পথই তিনি দেখতে পেলেন না। এই অবস্থায় আর একটা সাংঘাতিক খবর পেয়ে তিনি ভয়ে ও হুশিস্তায় ব্যাকুল হ'লেন। তাঁর এক বিশ্বাসী দাসী চুপি-চুপি তাঁকে খবর দিলে—দুই রাণীর মেয়ে দু'টির চেহারা এক-রকম ব'লে, পাছে পরে কোন গোল বাধে, তাই লীনাকে খুন করাই ঠিক হ'য়েছে ! মায়ের প্রাণ—এ কথা শুনে কি আর স্থির থাকতে পারে ? তখনই তিনি মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললেন, মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্তে সব ছেড়ে-ছুড়ে তিনি তাকে নিয়ে পালাবেন ; তার পর তাঁদের ভাগ্যে যা থাকে হবে। তিনি তাড়াতাড়ি গোপনে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলেন। দামী-দামী যে সব গয়না, কাপড়-চোপড়, ধনরত্ন তাঁর নিজের ছিল, সে সমস্তই তাঁর সেই বিশ্বাসী দাসীর হাতে তুলে দিয়ে ব'ললেন—এ সব তুমি নাও, যা করতে হয় কর, আমি কিছুই চাই না, শুধু মেয়েটিকে নিয়ে এ পুরী থেকে চুপি-চুপি পালাতে চাই।—দাসী সেই সব ধন-রত্নের জোরে রাতারাতি ঝর্ণারানীকে মেয়ের সঙ্গে সকলকে লুকিয়ে সরিয়ে দিলে। রাজরাণী অনাথিনীর মত রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। তার পর কোলের মেয়েকে নিয়ে অশেষ কষ্ট আর আপদ-বিপদের ভেতর দিয়ে কি ক'রে যে, পাহাড়পুরীতে এসে পৌঁছাতে পারলেন, তা শুধু তিনিই জানেন। কিন্তু এমনি তাঁর পোড়া অদৃষ্ট যে, পাহাড়পুরীতে এসেই শুনলেন, বাবাও তাঁর স্বর্গে চ'লে গেছেন ; সংসারে তাঁর আপনার ব'লতে আর কেউ নেই !

এই সময় এই সাধুপুরুষ যেন তাঁর মুখ চেয়েই

ব'সেছিলেন। পিতৃশোকের ধাক্কাটা একটু সামলে নিয়েই ঝর্ণারাগী বুঝতে পারলেন, যে সাধুপুরুষের আশ্রয় তিনি লাভ ক'রেছেন, তিনি অন্তর্যামী; আর তাঁর কথা থেকেই ঝর্ণারাগী তা জানতে পারলেন। তখন এই সিদ্ধ তপস্বীর পায়ের কাছে লুটিয়ে-প'ড়ে তিনি ব'ললেন—আমার লীনাকে আপনার হাতেই সঁপে দিলুম। রাজার মেয়ে ও, কিন্তু আজ অদৃষ্টের ফেরে সর্কহারা! ওর কেউ নেই, এখন ভরসা শুধু আপনিই, বাবা!

সাধু ঝর্ণারাগীকে আশ্বাস দিয়ে ব'ললেন—ভরসা ভগবান। তুমি ভেব না মা! আমি সবই জানি। তোমার লীনাকে মানুষ করবার ভার ভগবানই আমার হাতে অর্পণ ক'রেছেন; সে ভার নিলুম আমি।

সেই থেকে বিধবা রাজরাণী ঝর্ণা সন্ন্যাসিনীর মতো এই আশ্রমেরই একপাশে ছোট্ট একখানি কুঁড়ে-ঘরে এসে লীনাকে নিয়ে বাস ক'রছেন। আর সেই দিন থেকেই সাধু নিয়েছেন লীনাকে মানুষ ক'রে দেওয়ার ভার। দুই বছরের ভেতরেই মেয়ের চালচলন দেখে মায়ের ত এক-বারে চক্ষুস্থির রাজবাড়ীতে থাকতে যে-মেয়ে ছিল ভারী ঠাণ্ডা—যার কোন রকম ছরস্তুপনা ছিল না, রাজপুরীর সবাই ব'লতো—তাই ত, কি ঠাণ্ডা মেয়ে এই রাণীর,—কিন্তু দু'টি বছরের ভেতরে এই সাধুটির হাতে প'ড়ে তাঁর অমন শাস্ত মেয়ে কি ছরস্তুই হ'য়েছে!—কে ব'লবে, এইটাই আগেকার সেই ঠাণ্ডা মেয়েটি? ঝর্ণারাগী যাকে কাপড়ের পুঁটলিটির মতো কত বন-জঙ্গল পাহাড় পার হ'য়ে, তেপান্তর মাঠের ভেতর দিয়ে এই লম্বা পথ ভেঙ্গে ব'য়ে এনেছেন, একটি টুঁ-শব্দও যার মুখ থেকে বেরুইনি কোনও দিন,—সেই মেয়ের ছরস্তুপনা দেখে ঝর্ণারাগী এক দিন সাধুর পানে চেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন— বাবা, এ কি আমার সেই লীনা? এ রকম ছুঁ কি ক'রে হ'ল?

সাধু একটু হেসে বললেন—এরই যে দরকার হ'য়েছে মা! এখনই কি দেখছো? ছুঁমীতে এই ত সবে ওর হাতে-খড়ি! আর একটু বড় হোক, তখন দেখবে তোমার লীনার কাণ্ড!

মা আর কি ব'লবেন? তিনি সাধুর কথা শুনে চুপ

ক'রেই রইলেন। সাধুর হাতেই যখন মেয়েকে মানুষ ক'রবার জন্তে তুলে দিয়েছেন, তখন ত আর বলতে পারেন না—আমার মেয়েকে যেন ছরস্তুপনা শেখাবেন না, বাবা!—তা-ছাড়া, ছেলে-মেয়েকে মানুষ করার মানে ত আর শুধু খাইয়ে-পরিয়ে বড় ক'রে তোলা নয়—তাদের খেলা-ধুলা, পড়া-শুনা, লোকের সঙ্গে মেলা-মেশার ধারা—এ সবও ত শেখাতে হবে! কাজেই ঝর্ণারাগী সাধুর ওপরেই মেয়ের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকাই উচিত মনে ক'রলেন।

সাধু লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েকে কি যে শেখান, তা তিনিই জানেন; কিন্তু দিনের পর দিন মেয়েটির প্রতাপ বাড়তেই লাগলো। তিন বছরের মেয়ের দৌড়-ঝাঁপ দেখে আর তার মুখে তেজের কথা শুনে সকলেরই তাক লেগে গিয়েছিল; আরও দু'বছর যেতেই মেয়েটির অদ্ভুত ক্ষমতা সারা পাহাড়পুরীটাকেই বিন্মিত ক'রে তুলল!

এক দিন হ'য়েছে কি শোন :—লীনা সাধু-দাছটির জন্তে পাহাড়ে ফুল তুলতে গিয়েছে, হাতে আছে তার ছোট্ট একটি ফুলের সাজী; সঙ্গে আর কেউ নেই, সে একাই একটি একটি ক'রে লাল করবী ফুল তুলছে, আর তার হাতে-ঝোলান সাজীতে রাখছে, এমন সময় 'হিস্ হিস্' শব্দ ক'রে নীল রঙের একটা পাহাড়ে সাপ সোজা হ'য়ে একবারে লীনার মুখখানির সামনে ফণা তুলে দাঁড়ালো! লীনা জানতো, এই জাতের সাপগুলো ভারি শঠ, মানুষের চোখের ওপর এদের বড্ড লোভ; তাই তাড়িয়ে-ধ'রে চোখে মারে ছোবল! লীনা! কিন্তু তার মুখখানার এত কাছে এত বড় সাংঘাতিক সাপটাকে ফণা তুলে দাঁড়াতে দেখেও এতটুকু ভয় পেল না; শুধু সে জোর গলায়—এইও, সবুর!—এই কথাটি ব'লেই তার বড় বড় চোখ দুটো পাকিয়ে সাপটার পানে তাকালো। কি তার সেই চাহনির তেজ! মনে হ'ল, বুঝি তার চোখের তারা-দুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে, আর তাদের ভেতর থেকে আগুনের হলুকা ছিটকে বেরুচ্ছে! সাপের চোখ দুটো বুঝি তাতে বলসে গেল; কেন না, একটু পরেই তার কুলোপানা চওড়া ফণাটা আশ্বে আশ্বে কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে গেল। আর যাবে কোথায়? অমনি লীনা সাঁ ক'রে তার হাতখানা চালিয়ে সাপের সেই কঁোকড়ানো মাথাটা মুঠোর

ভেতরে চেপে ধরলো ; আর সেই পাহাড়ের গায়ে পাঁচ বছরের এই মেয়েটির সঙ্গে অত-বড় দুর্দান্ত পাহাড়ে সাপটার রীতিমত লড়াই আরম্ভ হ'ল। মুখ-ছাড়িয়ে মিতে না পেরে সাপটা তখন তার ল্যাজের দিক দিয়ে মেয়েটির দেহ পাকে পাকে জড়াতে লা'গল। এদিকে খাড়ার সঙ্গীর দল দূর থেকে পাহাড়ের ওপরে লীনাকে দেখতে পেয়ে তার কাছেই ছুটে আসছিল। কাছে এসেই তারা দেখলে এই কাণ্ড ! লীনা সাপের মাথাটা জোর ক'রে চেপে ধ'রে আছে, আর সাপটা তার দড়ার মতো লম্বা সবল দেহ দিয়ে লীনার সর্কাজ জড়াচ্ছে।

দেখেই ত তাদের চক্ষুস্থির ! একটু পরেই তারা হে-চৈ শুরু ক'রে দিলে ; জন-দুই ছেলে চোঁচাতে চোঁচাতে ছুটলো লীনার মাকে খবর দিতে—‘ওগো, শীগ'গীর এসো লীনার মা ! তোমার লীনাকে সাপে খেয়ে ফেললে।’

মা তা শুনেই ভারী ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ছুটে এলেন। ঝর্ণারাগীর চীৎকার শুনে সাধুও তাঁর আশ্রম থেকে বের-লেন। কিন্তু পাহাড়ের সেই জায়গাটিতে এসেই তাঁরা সকলে ছ'চোখ কপালে তুলে কি দেখলেন শুনবে?—লীনা একটুও না দমে, কিম্বা সাপের মাথাটা মুঠো থেকে না খুলে, সেই হাতখানি মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাপের জড়ানো দেহটা নিজের দেহ থেকে খুলছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজটি শেষ ক'রেই সাপটাকে যখন সে তফাতে ছুড়ে ফেলে-দিলে, তখন সাপটা হাড়গোড়ভাঙ্গা 'দ'য়ের মতন নিজ্জীব হয়ে প'ড়েছে, পালাবার শক্তিটুকুও তার তখন নেই !

মা ছুটে এসে মেয়েকে কোলে ক'রে ব'ললেন—কি সর্কনেশে মেয়ে তুই ! সাপের সঙ্গে এমনি ক'রে লড়াই করলি ?

লীনা এক-মুখ হেসে জবাব দিলে—আমার দোষ কি ? আমি ত ফুল তুলছিলুম, কেন ও হতভাগা আমাকে কামড়াতে এলো ?

মা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—যদি সত্যিই কামড়াতো, কি করতিসু ?

মেয়ে তার বড়-বড় চোখ দু'টি ঘুরিয়ে অমনি ব'লে উঠলো—ইস ! কামড়ানো অতোই সোজা কি না ? আমার চোখ নেই !

কথাটা মা ঠিক বুঝতে পারলেন না, মেয়ে চোখের কথা ব'ললে কেন ? সাধু এই সময় কাছে এসে দাঁড়াতেই ঝর্ণারাগী তাঁর পানে চাইলেন। সাধু ব'ললেন—লীনা ঠিকই বলেছে মা ! এই বয়সেই ও চাইতে শিখেছে। প্রত্যেক জীবের চোখে একটা আশ্চর্য্য রকমের আলো আছে। সেই আলোটি যে জালতে জানে—সবই সে দেখতে পায় ; জন্তু-জানোয়ারই ব'লো, আর চোর-ডাকাতই ব'লো—কেউ তার সামনে মাথা তুলতে পারে না।

সাধুর কথা আর সকলে অবাক হ'য়েই গুনলে, কিন্তু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা কেউ ক'রলে না। সাধুও কৌশল ক'রে কথাটা ঐখানেই চাপা দিলেন ; কিন্তু সেই দিন থেকে লীনার শক্তির পরিচয় পেয়ে পাহাড়পুরীর ছেলে-মেয়েরা লীনাকেই তাদের দলের সর্দারী ব'লে মেনে নিলে।

সেই সময় থেকে নানা ভাবে এই রকম প্রতাপ আর সাহসের পরিচয় দিয়ে লীনা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তার পানে চাইলেই মনে হয়—যেন কাঁচা সোনার নির্মিত একটি জীবন্ত প্রতিমা। চেহারায় যেমন তার কোন খুঁৎ নেই, মানুষের জীবনে যা যা দরকার, চেষ্টা ক'রে যেগুলো আয়ত্ত করতে হয়, লীনার তার কোনটির অভাব নেই। কথাবার্তায় তর্ক-বিতর্কে সে হঠে না, দৌড়-ঝাঁপে সে সকলের শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্যভেদে কার সাধ্য তাকে আঁটে ? সাঁতারে কেউ তাকে কোন দিন হারাতে পারেনি। লীনার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে এসে পাহাড়পুরীর সব ছেলেকেই হার মানতে হ'য়েছে ; সেই দলের কয়েকটা দুর্দান্ত ছেলের হাতের আঙ্গুল লীনা তার কজির চাপে জন্মের মত পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। কিন্তু এ সব শিক্ষা লীনা যে কখন পেয়েছে, আর এই বয়সেই কেমন ক'রে সে সব বিষয়ে এত বড় ওস্তাদ হ'য়ে উঠেছে—তা কেউ জানে না। সাধু যে তাকে নিজের হাতে সব দিক দিয়ে পাকা-পোক্ত ক'রে তোলবার জন্তে গোড়া থেকে শিক্ষা দিয়ে আসছেন, সে খবর কারও জানা ছিল না ; এবং লীনাও তার শিক্ষার কথা কাউকে জানাতো না। মেয়েটি এ-সব বিষয়ে ভারি পাকা ! কোন কথা নিয়ে তর্ক

আরম্ভ হ'লে তার মুখে কথার খই ফুটলেও সমবয়সীদের সঙ্গে মিলে-মিশে খেলা-ধুলার সময় ঘরের কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় না। মনের কথা চেপে রাখবার অভ্যাসটুকুও সে তার সাধু-দাছর কাছেই পেয়ে এসেছে।

জ্ঞান হ'য়ে অবধি লীনা শুনে আসছে, তার বাপ নেই; জ্ঞান হওয়ার আগেই সে পিতৃহীন হওয়ায় এই সাধুই তাকে দাছর মত যত্নে পালন ক'রছেন। এ কথাও সে লোকের মুখে শুনেছিল, তার বাবা ছিলেন মস্ত রাজা, রাজবাড়ীতে সে জন্মেছিল; কিন্তু এমনি তার দুর্ভাগ্য যে, সুখের মুখ সে দেখতে পেলেনা,—সব হারিয়ে মায়ের সঙ্গে সেই কুঁড়ে-ঘরে আসতে হ'য়েছে।—কথাগুলো শুনে তার মনটি ভারী মুসড়ে গিয়েছিল। সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না—সত্যিই যদি সে রাজার মেয়ে, তা হ'লে কেন তাদের এমন দুর্দশা হোল।

এক দিন সে সাধু-দাছর কাছে কথাটা পাড়লে; মুখখানা ভার ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—হাঁ দাছ, সত্যিই আমি রাজার মেয়ে? আমার বাবা ছিলেন কি সত্যিই কোন রাজা, আমার মা ছিলেন তাঁর রাণী? তবে আমাদের এ দশা কেন? কেনই বা মাকে এত কষ্ট করতে হয়? আর আমিই বা কেন স্ত্রী কেটে কাঁধে ব'য়ে হাটে-বাজারে তা বিক্রী করতে যাই?

লীনার মুখে এই সব কথা শুনে সাধুর মুখখানা সে-দিন এমনই গম্ভীর হ'য়েছিল যে, লীনা আর কোন দিন তাঁর সে-রকম মুখ দেখেনি। সেই দিন সাধু এই মেয়েটিকে যে-সব কথা ব'ললেন, আর যে-রকম ক'রে তার দুটো কাণের ভেতর ছিপি এঁটে দিলেন—লীনা কোন দিন তা ভোলেনি, আর সে-ছিপি খুলতে কোন দিন সে চেষ্টাও করেনি।

সাধু সে-দিন লীনাকে এই ব'লে বোঝালেন—আগেকার কথা সব ভুলে যাও, শুধু একটা কথা মনে রাখো দিদি—জ্ঞান হ'য়ে অবধি যা দেখছো, সেটা নির্ধাত সত্যি। তোমার মায়ের কষ্ট, তোমার কষ্ট, এ ত সবই দেখা যাচ্ছে। এ কষ্ট তোমাকে যুচাতে হবে। গায়ের জ্বারে, বুদ্ধির জ্বারে, মনের বলে একটা মস্ত রাজার সিংহাসনে তোমাকে ব'সতে হবে। পরের কথায়

কাণ দেবে না। কোন কথা বুঝতে না পারলে আমাকে বলবে, আমি তোমার মনের ভার নামিয়ে দেব। আর ঠিক সময়ে আমি তোমাকে সবই বুঝিয়ে ব'লব।

লীনা মুখখানি নীচু করে ব'লল—তাই হবে দাছ! আমি আর কারও কথায় কাণ দেব না; দুটো কাণেই ছিপি এঁটে দিলুম।

সেই থেকে বছরের পর বছর চলে গেছে, কিন্তু আর কোন দিন সাধু-দাছ লীনার কাজে এমন কোন কসুর পাননি, যাতে তাকে আবার সতর্ক করবার দরকার হয়। সাধুও ভুলে যাননি যে, এক দিন লীনাকে তাদের অতীত সব কথা নিজের মুখেই বলতে হবে।

লীনার বয়স বারো বছর পূর্ণ হ'তেই এক দিন সাধু-দাছ তাকে তাঁর কাছটিতে বসিয়ে আগেকার সমস্ত কথা একটি একটি ক'রে শুনিতে দিলেন। তার দাছর কথা, দিদিমার কথা, মায়ের ছেলেবেলাকার কথা, বাংলাদেশের রাজার কথা, রাণী হ'য়ে তার মায়ের যে সৌভাগ্য হয়েছিল, রাণীর সতীন মনে মনে কি ভাবে তাঁকে হিংসা ক'রত; তার, আর নীলার জন্মকথা, রাজার অকালমৃত্যু, তার ফলে নীলার দাহ চক্রান্ত, তার পর লীনাকে বাঁচাবার জন্তে কি ক'রে তার মা পাহাড়পুরীতে পালিয়ে আসেন—সবই তাকে শুনিতে দিলেন।

এবার লীনার চোখ দুটো যেন ধক-ধক ক'রে জলে উঠলো। মুখখানা ফুলিয়ে ঘাড়টি বাঁকা ক'রে সে জোর গলায় ব'লল—আমি এর শোধ নেব দাছ!

দাছ ব'ললেন—হ্যাঁ, দিদি, এই জন্তেই তোমাকে আমি নিজের হাতে গ'ড়ে তুলেছি। এইবার ভাব দিদি, তোমার মা ছিলেন রাজরাণী, তুমি রাজকন্যা, রাজার প্রাসাদে তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছ, অন্ডায় ক'রে দুষ্টরা তোমাদের ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রছে। দারুণ কষ্টের ভেতর দিয়ে তুমি মানুষ হয়েছ, শিক্ষা পেয়েছ, শক্তি পেয়েছ,—বুঝতেও পেরেছ সব। এইবার তোমাকে প্রস্তুত হ'তে হবে।

লীনা গুরুর পায়ের গোড়ায় মাথা রেখে ব'ললে—আশীর্বাদ করুন দাছ, মা'র কষ্ট যেন যুচাতে পারি। আমার বাবার সিংহাসনে আমি বসাব আমার দুঃখিনী সর্কহারী মাকে!

ওদিকে লীনারই মত চেহারা নিয়ে লীনার বোন নীলা

বাংলার রাজপ্রাসাদে থেকে কি রকম শিক্ষা পেয়েছিল, কি ভাবে তাদের সুখের দিন চলেছে, তার পর দুই বোনের অদৃষ্ট কোন্ পথে চলতে শুরু ক'রলে—সে কাহিনী আগামী বার তোমরা শুনতে পাবে।

—গল্পদাহ।

হঠাৎ যদি

বুদ্ধিবশ্ত বলং তস্ত—এর চেয়ে বড় সত্য কথা আর নাই! শৃগালের বুদ্ধি-কৌশলের কাছে ছরস্ত পশুরাজ এবং পরাক্রান্ত গজরাজের পরাজয়ের বহু কাহিনী তোমরা নানা বইয়ে পড়িয়াছ, নিশ্চয়! আজ আমরা মানুষের বুদ্ধি-কৌশলের কথা বলিতেছি।

আজ পথে চলিবার সময় সে-কালের মতো সামনে দক্ষ্য-সর্দার আসিয়া হঠাৎ হানা না দিলেও নির্জন পথে-ঘাটে গুণ্ডা-বদমায়েসের অতর্কিত আক্রমণ যে ঘটে না, এমন নয়! লাঠি বা রিভলভার হাতে লইয়া আমরা পথ চলি না। কাজেই এমন অতর্কিত আক্রমণে কি করিয়া আত্মরক্ষা করিব?

পথে চলিয়াছ, বাঁকের আড়ালে বদমায়েস লোক ওৎ পাতিয়া আছে, যেমন তুমি মোড়ে আসিবে, অমনি আক্রমণে তোমাকে বিধ্বস্ত করিবে। বদমায়েসের অস্তিত্ব বা মনোভাব তুমি জানো না—তোমার হাতে না আছে একগাছা লাঠি বা ছড়ি বা ছাতা! বলা তো, মোড়ের মাথায় আসিবামাত্র হঠাৎ যদি সে তোমায় আক্রমণ করে, কি করিয়া তুমি সে-আক্রমণ রোধ করিয়া নিজেকে বাঁচাইবে?

আচম্কা এমন আক্রমণে দুর্বস্তের তলপেটে সজোরে ঘুবি মারিবে; কিম্বা সুবিধা থাকিলে জুতাগুচ্ছ জোর-লাধি! এ ঘুবিতে বা এ লাধিতে দুর্বস্ত যত বড়

জোয়ান-ই হোক, তাকে ভুতলশায়ী হইতেই হইবে। একটা কথা মনে রাখিও, যে আক্রমণ করিবে, ঘুবি বা লাধি খাইবার কল্পনা সে করে নাই, কাজেই এ অবস্থায় এইটাই আত্মরক্ষার মোক্ষম উপায়।

তোমার হাতে যদি ছাতা থাকে, তাহা হইলে জানিবে, তোমার হাতে মহা-অস্ত্র আছে! ছাতা এ-অবস্থায় আত্মরক্ষার অমোঘ উপায়। তবে ছাতাটিকে লাঠির মতো ধরিয়া ব্যবহার করিতে বা দুর্বস্তকে মারিতে যাইয়ো না। মোড়া-ছাতার জোর খুব কম; ছাতা ধরিয়া দুর্বস্তের মুখে বা পেটে সজোরে খোঁচা দিবে! চিবুকের নীচে যদি খোঁচা মারিতে পারো, আরো ভালো!



হাঁটুর গুঁড়ার বিপত্তি-মোচন

তার পর লাঠি—বাবু-লাঠি হোক, মোটা-লাঠি হোক—লাঠি মারিয়া আক্রমণ-রোধের বিশেষ বিধি আছে। সে-বিধি,—

১। লাঠির খোঁচা মারিতে হইবে শক্রর চিবুকের নীচে।

২। লাঠির হাতলের দিক দিয়া (পরের পৃষ্ঠার ছবি)



ছাতার খোঁচা



গলার লাঠি



শপাং বেণ্ট



ছাতার বকমফের



খোঁচার আর-এক ধারা



পায়ের লাঠির হাতল

মুখে সবেগে আঘাত। লাঠিকে একটু কাৎ করিয়া
এ-আঘাত দিতে হইবে।

৩। লাঠির হাণ্ডেল দিয়া ছব্বন্তের হাঁটু ঘিরিয়া
ঝোরে হ্যাচ্কা-টান্। যত-বড় জোয়ান ছব্বন্ত হোক,

এ-টানে তাকে ধরাশায়ী হইতেই হইবে! আক্রমণ করিয়া ছুর্ভুত যদি তোমাকে চাপিয়া আঘাত করে, এমন বে-কায়দায় নিজের দাঁতগুলির সদ্যবহার করিতে ভুলিয়ো না—শক্রর দেহে যেখানে পারো, সজ্ঞারে একেবারে মরণ-কামড় দিয়ো।

চপেটাঘাত প্রায়ই নিষ্ফল হয়; কারণ, ছুর্ভুতদের লোহার মতো দেহে কঠিন চপেটাঘাত পুষ্প-বর্ষণের মতো লঘু হইয়া বাজে। ঘৃষি—বজ্র-মুষ্টির ঘৃষি আশু ফলপ্রদ।

হইলটি যেন হাতের নাগালে থাকে! যারা মোটর-যাত্রীকে আক্রমণ করে, পথে তারা গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া বা মোষের গাড়ী খাড়া করিয়া আগে হইতেই পথ বন্ধ করিয়া রাখে। পথিমধ্যে দূর হইতে যদি এমন বাধা জ্বাখো, আক্রমণের আশঙ্কা বুঝিয়া সতর্ক হইবে। বাধা দেখিয়া মোটর থামাইবামাত্র এ-সব ছুর্ভুত ঝোপ-ঝাপের গোপন অন্তরাল হইতে আসিয়া আক্রমণ করে। বিলাতে এ-ঘটনা প্রায় নিত্যকার ব্যাপার। আমাদের দেশেও আমরা যেমন



তলপেটে গুঁতা

তবে ঘৃষি মারিতে হইবে শক্রর পেটে, নাকে, রগে। যদি মুখের নাগাল না পাও, তাহা হইলে তলপেটে ঘৃষি মারিবে। সেফ্‌টা-পিন, টাই-পিন—শক্রর অঙ্গে আমূল বিধিয়া দিবার প্লযোগ পাইলে তার সদ্যবহারে কদাচ কাল-বিলম্ব করিবে না। হাতের আঙুলে নখ থাকিলে সেই-নখে বিধিয়াও পথে অনেকে এ-সব শক্রর আক্রমণ বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছেন। অস্ত্র-হিসাবে আমাদের এই হাতের নখগুলি তুচ্ছ নয়!

নির্জন জঙ্গল-পথে মোটর-যাত্রীকে এখনো মাঝে মাঝে ছুর্ভুতের হাতে চোট খাইতে হয়। জঙ্গল-পথে মোটর চালাইবার সময় হুঁশিয়ার থাকা কর্তব্য—ষ্টয়ারিং

ছোট বাসে ঘৃষি বাঁচে

বহু বিলাতী আচার আমদানি করিয়া সে সব আচারকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছি, আমাদের দেশের ছুর্ভুতদের মধ্যেও অনেকে তেমনি এই বিলাতী ছুর্ভুততার আমদানি করিয়াছে। এ-জগৎ নির্জন বন-পথে মোটর-যাত্রীর উচিত, হুঁশিয়ারভাবে মোটর-পরিচালনা। গাড়ীতে লাঠি রাখা উচিত। ষ্টয়ারিং-হুইল, ক্যামেরা-ষ্ট্যাণ্ড, কাঁচের শিশি—এগুলোও অস্ত্রহিসাবে সে সময় চমৎকার! কোমরের বেণ্ট এ-যাত্রায় চমৎকার অস্ত্র!

মোটর-যাত্রীর উচিত, গাড়ীতে খানিকটা তার রাখা। আকস্মিক আক্রমণে তার দিয়া কৌশলে যদি ছুর্ভুক্তকে একবার ঘিরিতে পারা যায়, তার পর তারের কাঁশ টানিলে মরণ-যাতনা সহিয়া ছুর্ভুক্ত পলায়নের পথ খুঁজিবে!

আত্মরক্ষার কয়েকটি মাত্র উপায়ের কথা আমরা মোটামুটি বলিলাম। অত্র উপায়? ক্ষেত্রে কন্ঠ বিধীয়তে।

তবে একটি কথা সর্বদা মনে রাখিয়া, হঠাৎ যদি কোনো ছুর্ভুক্ত এ-ভাবে আক্রমণ করে, বুদ্ধি যেন ভয়ে লোপ না পায়! বুদ্ধি হারাইলে কৌশল করিবে কিসের জোরে?

শক্তি-পরীক্ষা

জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিব, বিজ্ঞা শিখিয়া পণ্ডিত না হইলেও কৃতিত্বে অনেকে অসাধারণত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। নেপোলিয়ন, সিসিল রোড্‌স্—ইহারা দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন না; তবু যে-কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, বহু পণ্ডিতের ভাগ্যে সে কীর্তির সিকিও জোটে না! বহু ক্ষেত্রে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদীর গর্ভ খর্ব হইয়া যায়!

কেন এমন হয়? লেখাপড়ায় যার মাথা খেলে না, মন খেলে না, কি করিয়া তার মাথা ও মন এতখানি শক্তির পরিচয় দেয়?

এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বহু অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁরা বলেন, এক জন যে-কাজ করিয়াছেন, অত্র জনের পক্ষে সে-কাজ দুঃসাধ্য বা অসম্ভব হইবার কোনো কারণ থাকিতে পারে না।

এ অনুশীলনের ফলে জানা গিয়াছে, আমাদের সকলের শক্তি বা মন এক দিক দিয়া একই পথে বিকাশ লাভ করে না। অঙ্কে কারো মাথা খোলে; কারো মাথা খোলে কলকল্লা তৈরী করার দিকে; আবার কারো মাথা খোলে গান-বাজনায় বা ললিত-কলায়।

কার কোন্ দিকে মাথা খুলিবে, আগে হইতে বুঝিয়া তাকে যদি কিশোর-বয়স হইতে সেই দিকে

সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তার শক্তি বা প্রতিভার বিকাশ অসাধারণ হইতে পারে।

বিশ্ব লেখাপড়ায় অমনোযোগী; ক্লাশে কোনো দিন সে পড়া বলিতে পারে না, তার অত্র নিত্য বুকুনি খায়, মার খায়, নীল-ডাউন হয়—অর্থাৎ ক্লাশে তার শক্তির আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। অথচ বিশ্ব হয় তো চমৎকার গান গায়, ছবি আঁকে; কিম্বা কাদা-মাটি লইয়া আশ্চর্য্য নিখুঁতভাবে নানা রকমের মূর্তি গড়িতে পারে! কিম্বা যন্ত্রপাতির সূক্ষ্ম কারিগরি বুঝিতে সে ওস্তাদ! বিশ্বর এ শক্তির দিকে না চাহিয়া বিশ্বর মা-বাপ যদি তার পিছনে ছুঁ-তিন জন টিউটর রাখিয়া ক্রটিন বাঁধিয়া তাকে বইয়ের পাতায় গুঁজিয়া বিজ্ঞা গিলাইতে বন্ধপরিষ্কার হন, তাহা হইলে ঘবিয়া-মাজিয়া বড়-জোর সে না হয় একটা পাশ করিবে! তার পর? যেদিকে তার শক্তি, সেদিকটা বন্ধ হইয়া একদা হয় তো কোনো মার্চেন্ট-অফিসের দ্বারে গিয়া কেরাণীগিরির উমেদারী করিবে। ফলে তার ইহ-জন্মটা মাটা হইয়া যাইবে!

বৈজ্ঞানিক সাধনায় বিশেষজ্ঞেরা আজ ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক শক্তির মাপ কষিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁরা বলেন, শক্তির পরীক্ষা করিয়া মাপ কষিয়া ছেলেমেয়েকে ঠিক ভাবে চালনা করো, দেখিবে, সে ছেলেমেয়ে কৃতী হইয়া ধন-মান লাভ করিয়া কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য গড়িয়া তুলিবে।

আমাদের নিত্যকার জীবনে দেখিতে পাই—ধরো, একটা গল্প পড়া হইল! এক জন ছেলে তার সূক্ষ্ম মর্শটুকু চট করিয়া বুঝিল; আবার অত্র ছেলে গল্প শুনিয়া তার কিছুই বুঝিল না! মোটর-গাড়ী কি করিয়া চলে—বুঝাইয়া দিলে চট করিয়া শ্রাম-সে কৌশল বুঝিয়া লয়; গোপাল কিন্তু শতবার বলিলেও তাহা বুঝিতে পারে না, হাঁ করিয়া মুখের পানে তাকাইয়া থাকে! আবার ভাষাতত্ত্ব ধরো, গোপাল চট করিয়া রাজ্যের 'এটিমলোজি' আওড়াইয়া যাইবে, শ্রাম তখন হাঁ করিয়া মুচের মতো মুখের পানে চাহিয়া থাকিবে!

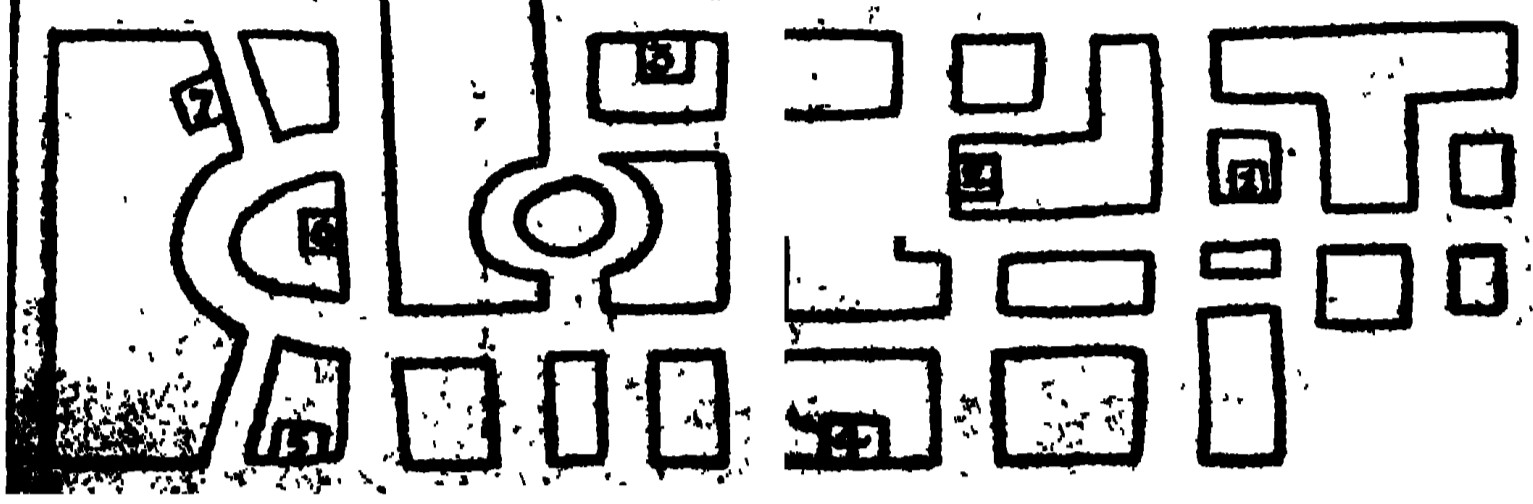
কোন্ ছেলের কি শক্তি,—বৈজ্ঞানিকের দল পরীক্ষায় আজ তাহা নির্ণয় করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তাঁদের পরীক্ষার ছুই-চারিটা প্রণালীর কথা বলিতেছি। সে

প্রণালী অবলম্বন করিয়া তোমরাও অনায়াসে নিজেদের
এবং বন্ধু-বান্ধবের মনন-শক্তির পরীক্ষা লইতে পারো।

বাড়ীগুলির প্রত্যেকটি থাকিবে তোমার গাড়ীর
বা-দিকে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। ধরো, তোমাদের বন্ধু শৈলেশ
পূজার ছুটিতে হাজারিবাগে গিয়াছে। হাজারিবাগ
হইতে সে চিঠি লিখিল, “এক দিন পাহাড়ে চড়িয়া-

কাগজে রেখা টানিয়া গাড়ী-গেরাজ আঁকিয়া ছবির
নির্দেশ-মতো বাড়ীতে পরখ করিয়া চাখো! যে
যত শীঘ্র এ-কাজে সাফল্য লাভ করিবে, জানিয়া,
তার বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ!

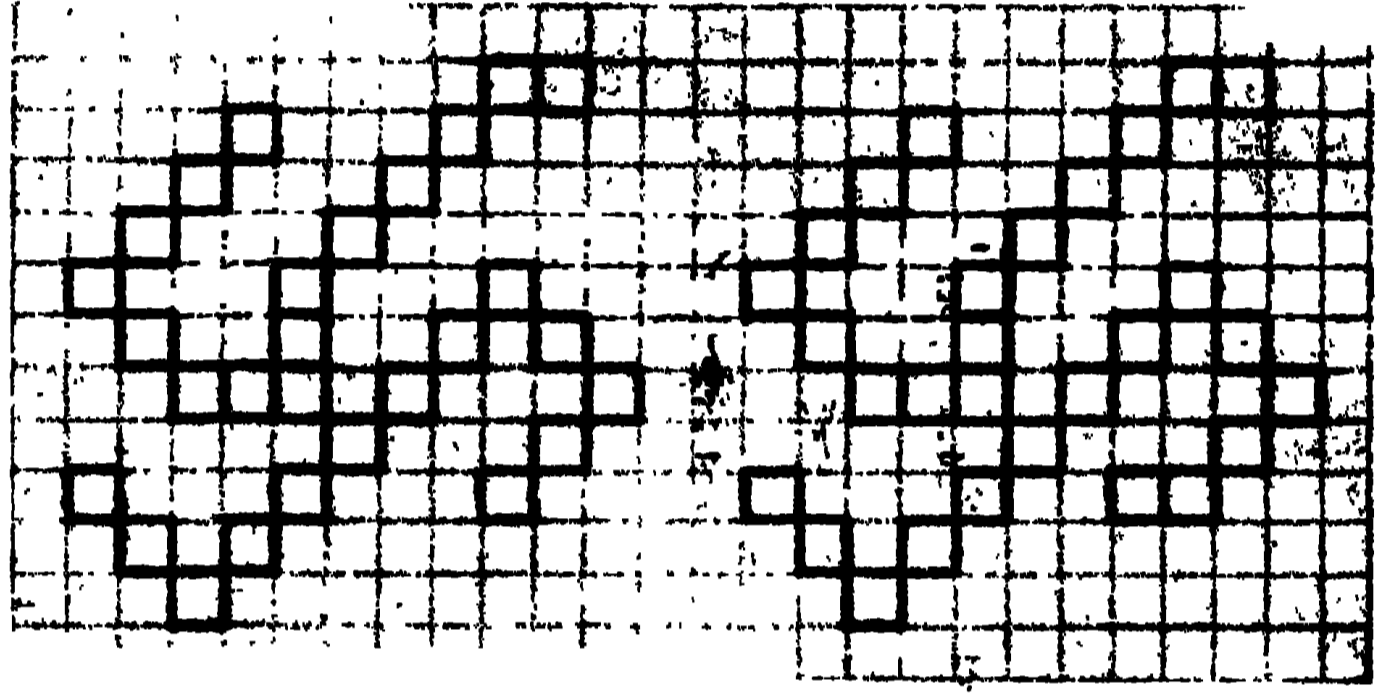


১। বাড়ী-গাড়ী-গেরাজ

ছিলাম। নামিবার সময় কি করিয়া বেটকরে
পড়িয়া গিয়া একখানা হাত ভাঙ্গিয়াছি।”

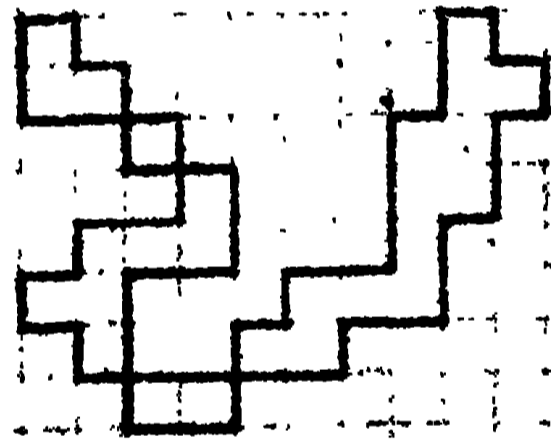
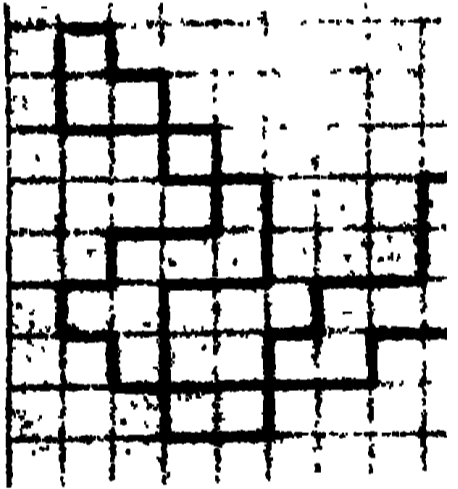
ব্যস, এইটুকু! বলো তো, শৈলেশ পড়িয়া
কোন হাত ভাঙ্গিয়াছে?

অনেকেই এক-নিমেষে উত্তর দিবে—বা
হাত! কারণ, ডান হাত ভাঙ্গিলে শৈলেশ চি



৩। আর-একটি হাঁদ

আছে। চটু করিয়া দশ সেকেন্ডের মধ্যে
বলিয়া দাও, কি এবং কোথায় সে
পার্থক্য। বলিতে দশ সেকেন্ডের চেয়ে
বেশী সময় লাগিলে হার হইল, জানিবে।



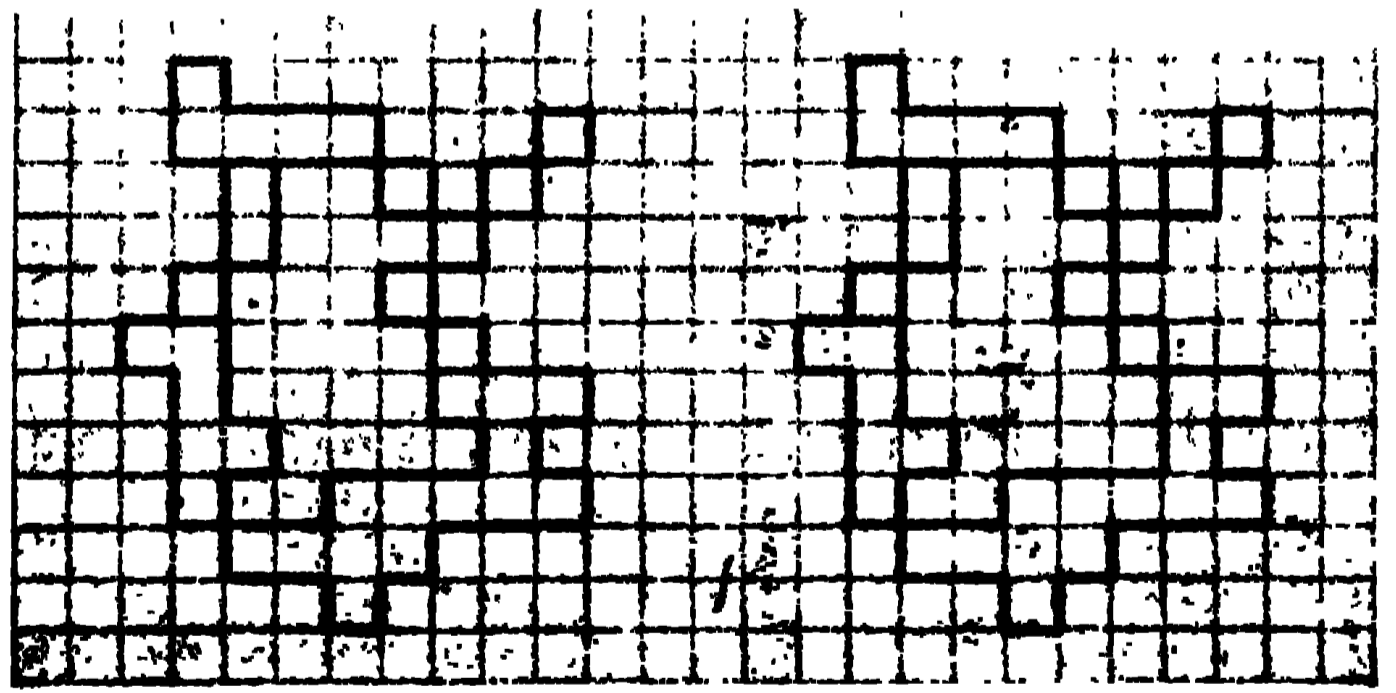
২। একটি হাঁদ

লিখিতে পারিত না। অসুমনে নির্ভর করিয়া
এই যে উত্তরটুকু দিলে, এ উত্তরে সহজ-বুদ্ধির
পরিচয় পাওয়া যায়।

এটি গেল খুব সহজ প্রশ্ন। এখন হু'-
একটি কঠিন প্রশ্নের কথা তুলিতেছি।

১ নং ছবি দেখিতেছ—‘x’ চিহ্নটির অর্থ
মোটর-গাড়ী; গাড়ীটি আছে গেরাজের মধ্যে।

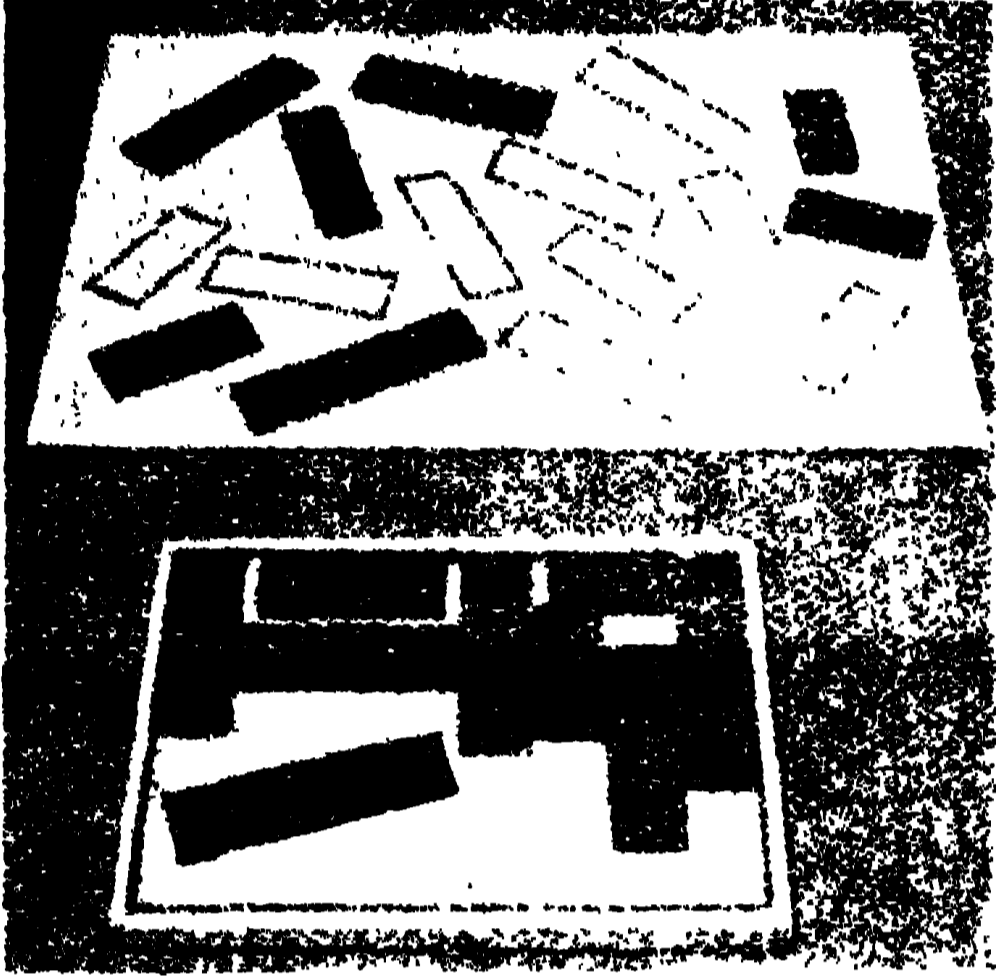
গেরাজ হইতে এ-গাড়ী বাহির করিয়া ডান-দিককার পথ
দিয়া চালাইয়া লইয়া যাও। এমন ভাবে চালাইতে
হইবে, গাড়ী যেন ১, ২, ৩ বা অন্য সংখ্যাবিশিষ্ট
বাড়ীগুলির পাশ দিয়া যায়। বা-দিক ছাড়িয়া গাড়ী
একদম ডান দিকে চালাইতে পারিবে না; আবার



৪। আর একটি

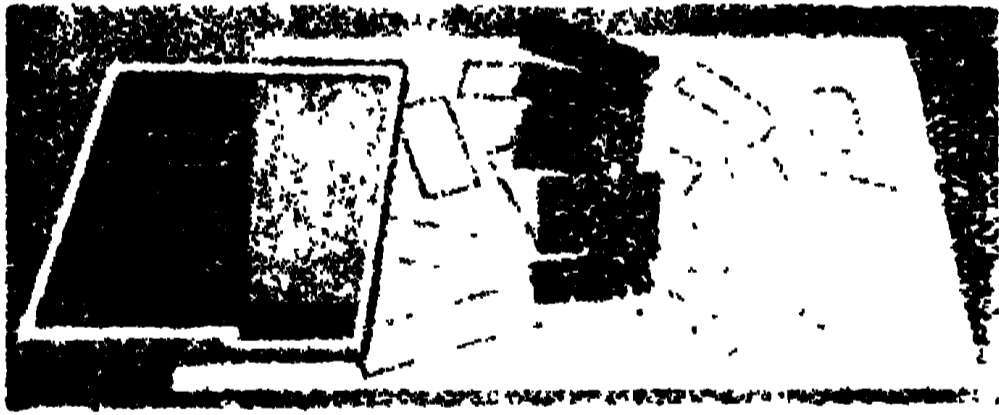
এবার ৫ ও ৬ নম্বর ছবি চাখো। এ পরী-
ক্ষার জন্য একখানি ট্রে চাই, আর চাই বোল-
খানি কার্ডবোর্ডের টুকরা। টুকরাগুলি ছবির
টুকরার আকারে কাটিয়া লইতে হইবে। এবার
যদি তোমাদের বলি, কার্ডবোর্ডের টুকরাগুলি ট্রেতে

তুলিয়া রাখো। যে-সব ছেলের প্রকৃতি অলস বা এলোমেলো, কাজে ছাঁদ রাখিবার দিকে যাদের লক্ষ্য নাই, কোনো মতে কাজ সারিতে পারিলেই হইল, সে-সব ছেলে, দেখিয়ো, কার্ডবোর্ড রাখিবে ঐ ৫ নম্বর ছবিতে উপর-দিকে যেমন করিয়া টুকরাগুলো রাখা



৫। আনাড়ির গাত

হইয়াছে, তেমনি ভাবে; তাদের চেয়ে যারা একটু ধীর এবং বুদ্ধি-কৌশল দেখাইতে পটু, তারা রাখিবে ৫ নম্বর ছবির নীচের দিককার ভঙ্গীতে। যে-সব ছেলের মন আর্টের দিকে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার দিকে যাদের



৬। বাঁদিকে পটুতার নিদর্শন

সহজ লক্ষ্য আছে, তারা রাখিবে ৬নং ছবির বাঁ-দিককার সজ্জা-ভঙ্গীর ছাঁদে। জানিয়ো, শেখোক্ত দলের ছেলে-মেয়েরা শিল্পকর্মে পটুতা লাভ করিবে।

কে কত শীঘ্র কাজ করিতে পারো, যদি তার পরীক্ষা লইতে চাও ৭নং ছবিখানি চাখো। টেবিলের উপর ছুঁসারে কতকগুলি 'ডাঁটি' দেখিতেছ, আর দেখিতেছ কতকগুলো আঙ্গুস্তা (thimbles)। কে কত শীঘ্র ঐ ডাঁটির মাথায় আঙ্গুস্তাগুলি বসাইতে পারো,—ছাপো

তো! যার দেরী হইবে, সে অকর্ম্মা; যে চট করিয়া পারিবে, সে কুশলী।

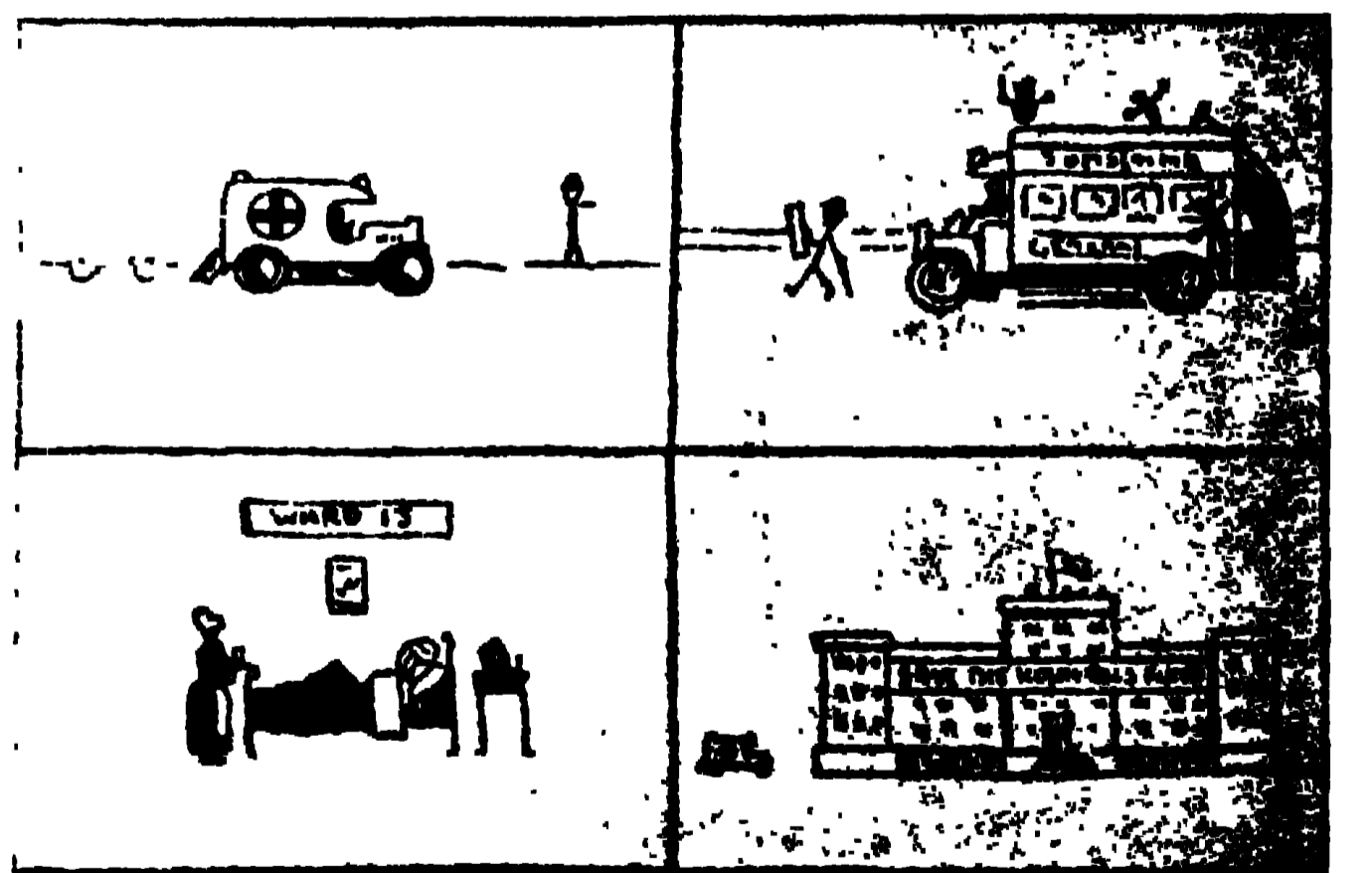
এবার বুদ্ধি-পরীক্ষার আর একটি পর্ব বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করি।



৮নং ছবিখানি চাখো। একটিতে আছে এম্বুলান্স গাড়ী; আর একখানিতে আছে দোতলা-বাস; তৃতীয় ছবিতে আছে

৭। আঙ্গুস্তা ও ডাঁটি

হাসপাতালে রোগীর শয্যা; চতুর্থ ছবিতে হাসপাতাল-বাড়ী। এ চারখানি ছবি এলোমেলোভাবে সাজানো



৮। ছবিতে গর

আছে। সঠিক ভাবে সাজাইতে পারিলে এ চারখানি ছবিতে ছোট একটি গর মিলিবে! ছবিগুলি

দেখিয়া পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে বলিয়া দাও, কোন্ ছবির পর কোন্ ছবি বসিবে। পাঁচ সেকেণ্ডে যদি বলিতে না পারো, তাহা হইলে তুমি ফেল !

বই পড়ার নিয়ম

তোমাদের মধ্যে যারা বই পড়তে ভালোবাসে, তাদের পক্ষে জীবন কোনো দিন দুর্কল-ভার বলে মনে হবে না। কারণ, বইয়ের মতো বন্ধু মানুষের আর নেই ! দুঃখে-শোকে সাহায্য দিতে, কাজের সময় উৎসাহ বা শক্তি জোগাতে বইয়ের শক্তি অসাধারণ। অবশ্য যা-তা বইয়ের কথা বলছি না,—ভালো বইয়ের কথা বলছি। ভালো বই কাকে বলে, সে কথা আর-এক দিন বলবো। বই যাদের ভালো লাগে না, আজ শুধু তাদের উদ্দেশ্য করে ক'টি কথা বলতে চাই।

প্রথম, তোমাদের মধ্যে যারা ছেলে, তাদের কাজ, স্কুলের পড়া তৈরী করা। মেয়েদের মধ্যে স্কুলের পড়ার উপর অনেককে ঘরের পাঁচটা কাজ করতে হয়—ছোট ভাইবোনদের দেখা-শুনা, সংসারের কাজে মাকে ও দিদিদের সাহায্য করা। তবে খুব কাজই করো, স্কুলের বইয়ের বাহিরে আরো যে-সব বই আছে, এ-বই সকলেরই পড়া প্রয়োজন। জগতের কোথায় কি খটছে,—তা ডাড়া বিজ্ঞানে, সাহিত্যে কত নতুন নতুন কথা নিত্য প্রচারিত হচ্ছে, এ সবের সঙ্গে পরিচয় না হ'লে মানুষের মন প্রসারিত হয় না, মন ছোট থেকে যায় ; মানুষের আর পশুতে তফাৎ থাকে না !

বাইরের বইয়ে যাদের মন বসে না, তারা প্রথমে এক কাজ করো। প্রত্যহ খপরের কাগজ পড়া অভ্যাস করো। দেশ-বিদেশের খপর পড়বার সময়—পারো যদি একখানি ম্যাপ আর অভিধান কাছে রেখো। তা হ'লে কাগজ-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপ দেখে বহু দেশ-বিদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং নতুন নতুন অনেক কথা শিখতে পারবে। জগতে কোনো শিক্ষা নিষ্ফল হয় না, এ-কথা সব সময়ে মনে রাখবে। খপরের কাগজ যদি নিত্য-দিন পড়ো, তা হ'লে সকল-দিককার সকল পরিচয় তোমাদের নখদর্পণে থাকবে।

তার পর মাসিক-পত্র। তবে এগুলি পড়বার আগে একটু বাছ-বিচার করা দরকার। বাড়ীতে মা-বাবা কিম্বা দাদা-দিদিদের জিজ্ঞাসা করো, তাঁরা তোমাদের উপযোগী মাসিক-পত্রাদি বেছে দিতে পারবেন। সেই সব মাসিকপত্র পড়বে।

পড়ার অভ্যাস করতে হ'লে কতকগুলি নিয়ম মানা চাই। সে নিয়মগুলির কথা বলি,—

১। যে রকম জিনিষ পড়তে ভালো লাগে, আগে সেই রকম বই বা লেখা পড়তে আরম্ভ করো। যে-সব নতুন তত্ত্ব জানতে চাও, আগে সেই-সব পড়ো—তার পরে পড়ো সেই সব কথা, যে-সব কথা জানা উচিত। যে-সব লেখা পড়তে ক্লিষ্ট হয় না, তা পড়বার চেষ্টা করলে পড়া-ব্যাপার পশুশ্রমে পরিণত হবে ! সকলের পক্ষে ক্লিষ্ট বদলানো সম্ভব নয়। তবে ক্লিষ্ট-বদলানোতে যে-শক্তির প্রয়োজন, সে শক্তি-সাধনায় উপকার আছে, সন্দেহ নেই।

২। ইতিহাস ভূগোল পড়ো। নিজের দেশের পুরাণ-ইতিহাস সম্বন্ধে পড়া চাই। একসঙ্গে অনেকগুলি বই পড়বার চেষ্টা করো না। যা পড়বে, ধীরে ধীরে পড়ো। পড়ে সব বোঝা চাই। না হ'লে পড়ে কোনো লাভ নেই।

৩। বাড়ীতে একখানি ভালো ডিক্শনারী আর ভালো এ্যাটলাশ থাকা চাই। কোনো নতুন কথার সঙ্গে পরিচয় হ'লে যদি তার মানে না জানো, তখন ডিক্শনারী খুলে মানে দেখবে। সে-কথার মানে কাকেও জিজ্ঞাসা করে জানতে যেয়ো না। ডিক্শনারী থেকে মানে দেখায় লাভ হবে এই যে, একটি নতুন কথার সঙ্গে আরো দু'-দশটা নতুন কথা শিখতে পারবে।

মানে না জেনে কোনো কথা ছেড়ে দিয়ে না। মন তাতে চিরদিন পশু দুর্কল থাকবে, মূর্খতা কোনো দিন মুচবে না।

বাইরের বই পড়বার জন্ত একটা সময় নির্দিষ্ট রুটিনে বেঁধে রাখবে। শরীরের স্বাস্থ্যের জন্ত খেলাধলার যেমন প্রয়োজন, মনের স্বাস্থ্যের জন্ত স্কুলের পড়ার উপবে বাইরের বই পড়ার প্রয়োজনও ঠিক ততখানি।

যে-বই ভালো লাগবে, পয়সার সামর্থ্য থাকলে সে

বই কিনেবে। বই কিনে ছোট একটি লাইব্রেরী যদি গড়ে তুলতে পারো, তা হ'লে জেনো, জীবনে মস্ত বন্ধু পেলে ! উপকার ছাড়া এ-বন্ধু কোনো দিন এতটুকু অপকার করবে না ; মনে এক-ভিল আঘাত দেবে না।

যে-বই পড়া দরকার, শুধু সেই বই কিনবে। তবে পড়বার আগে বোঝা যাবে না তো, কোন্ বই ভালো এবং কেনবার যোগ্য ! কাজেই কেনবার সময় ষাঁদের মতের উপর বিশ্বাস আছে, তাঁদের মত নিয়ে বই কিনবে। এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন,—One book read is worth a dozen books looked at দশখানি বইয়ের পাতা উল্টে যে-ফল পাবে না, একখানি বই পড়লে তার চেয়ে অনেক বেশী উপকার পাবে ! এ কথাটি মনে রেখো।

বই কেনবার সময় নতুন সংস্করণ দেখে বই কিনো। ইতিহাস, ভ্রমণ-কাহিনী, মজাজ বিজ্ঞানের বই, এ্যাড-ভেঞ্চার, দেশ-বিদেশের কাহিনী—এ বইয়ের স্থান আর-সব বইয়ের উপরে ! তার পর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক। তবে ছেলে-বয়সে নাটক-উপন্যাস না পড়লে ক্ষতি নেই। কারণ, সে-সব বইয়ে মনস্তত্ত্বের যে-সব জটিল কথা আছে, সংসার এবং লোকজনের যে-পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে—জীবনের সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ না হ'লে নাটক-নভেল পড়ে সে-সবের মর্ম ঠিক বুঝতে পারবে না ; নাটক-নভেলের যে দিকটা খেলো এবং রসালো, তার ছোঁয়াচ লেগে মনে অস্বাস্থ্যের সঞ্চার হতে পারে !

সে-কালে আমাদের দেশে দেখেছি, ছেলেমেয়েরা রামায়ণ-মহাভারত পড়ে' প্রায় তা কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলতো। এ

বুগে অনেক ছেলেমেয়ের ও-ছ'খানি বইয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই, দেখি। এর চেয়ে বিসদৃশ ব্যাপার কল্পনা করা যায় না ! রামায়ণ-মহাভারত পড়তেই হবে আর-সব বই পড়বার আগে। তাতে শুধু নীতি-শিক্ষা হবে, তা নয় ; এদেশের প্রাণের তত্ত্ব—ও-ছ'খানি বই পড়লে বুঝতে পারবে। কথা আছে—'খা নেই (মহা) ভারতে, তা নেই ভারতে !' রামায়ণ-মহাভারত পড়া থাকলে বড় হয়ে বুঝতে পারবে, নানা জটিল মনস্তত্ত্ব, ঘরোয়া প্রীতি-বিরোধ, কূট রাজনীতি—এ-সবের সমস্ত তত্ত্ব আমাদের ঐ রামায়ণ-মহাভারতে লেখা আছে।

অনেকের বাড়ীতে লাইব্রেরী আছে, জানি। কিন্তু লাইব্রেরী থাকা এক ; আর সে লাইব্রেরীর বই পড়া আর-এক জিনিষ। বাড়ীতে ভালো কয়টা আছে—সে কয়টা নিত্যদিন চোখে দেখি, কিন্তু সে-কয়টার ভালো জল যদি পান না করি, তা হ'লে কয়টা রেখে কি লাভ ? সে-কালের মা-দিদিমা, পিশিমা-ঠাকুমা'রা নিত্য সন্ধ্যায় বসে গল্প বলতেন। রাজার গল্প, রাজকন্য়ার গল্প। সে-গল্প শুনে ছেলে-মেয়ের মন কল্পনাকুশল হ'তো, তারা চিন্তা করতে শিপতো। আজ অনেক বাড়ীতে গল্পের সে-পাট উঠে গেছে ! সে জগৎ আজকাল ছেলেমেয়ের মন মরুভূমির মতো নীরস রুক্ষ হচ্ছে—ছেলে-মেয়ের মনে কল্পনার ফাল্গুণ দোলে না, তাদের মন বাস্তব গণ্ডী ছেড়ে কল্পনা-লোকে বিচরণ করতে পারে না ! দুঃখের বিষয়, মনেই নেই। বাড়ীতে আবার সেই গল্পের আসর বসাতে হবে ; সে-গল্প শুনে ছেলে-মেয়ের মন কল্পনা-কুশল হবে।

পূর্ণকাম

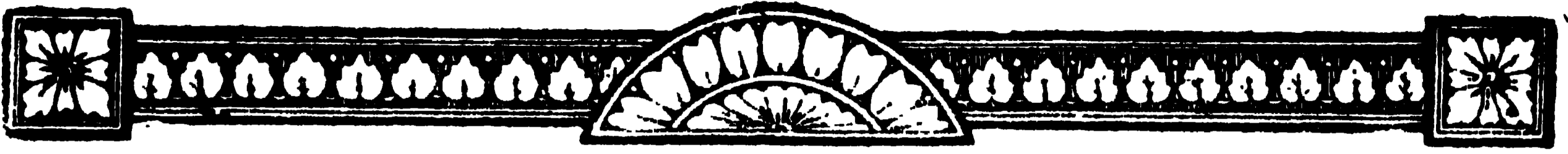
মোকপদে লক্ষ্য যার,

উপলক্ষ এ সংসার—

নহে নিঃস্ব ; সারা বিশ্ব

শুভাকাজী বন্ধু তার।

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ।



ভীষণ-দর্শন সামুদ্রিক মৎস্য

(প্রাণিতত্ত্ব)

‘রাক্সেসে-রাই’ নামক সামুদ্রিক মৎস্য অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন অংশের অধিবাসীর নিকট ‘শয়তান-রাই’ নামেও পরিচিত। বলা বাহুল্য, আমাদের পশ্চিম-বঙ্গে বাটা-জাতীয় যে স্তন্যদু মৎস্য ‘রাই-কোড়’ বা পল্লী-অঞ্চলে ‘রাই-খন্নরা’ নামে অভিহিত, তাহার সহিত এই ‘রাক্সেসে-রাই’এর জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করিতে হইলে ভূ-বিবরণবাসী নেংটি ইঁদুরও হাতীকে তাহার জ্ঞাতি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারে ; উভয়েই স্থলচর এবং চতুষ্পদ।

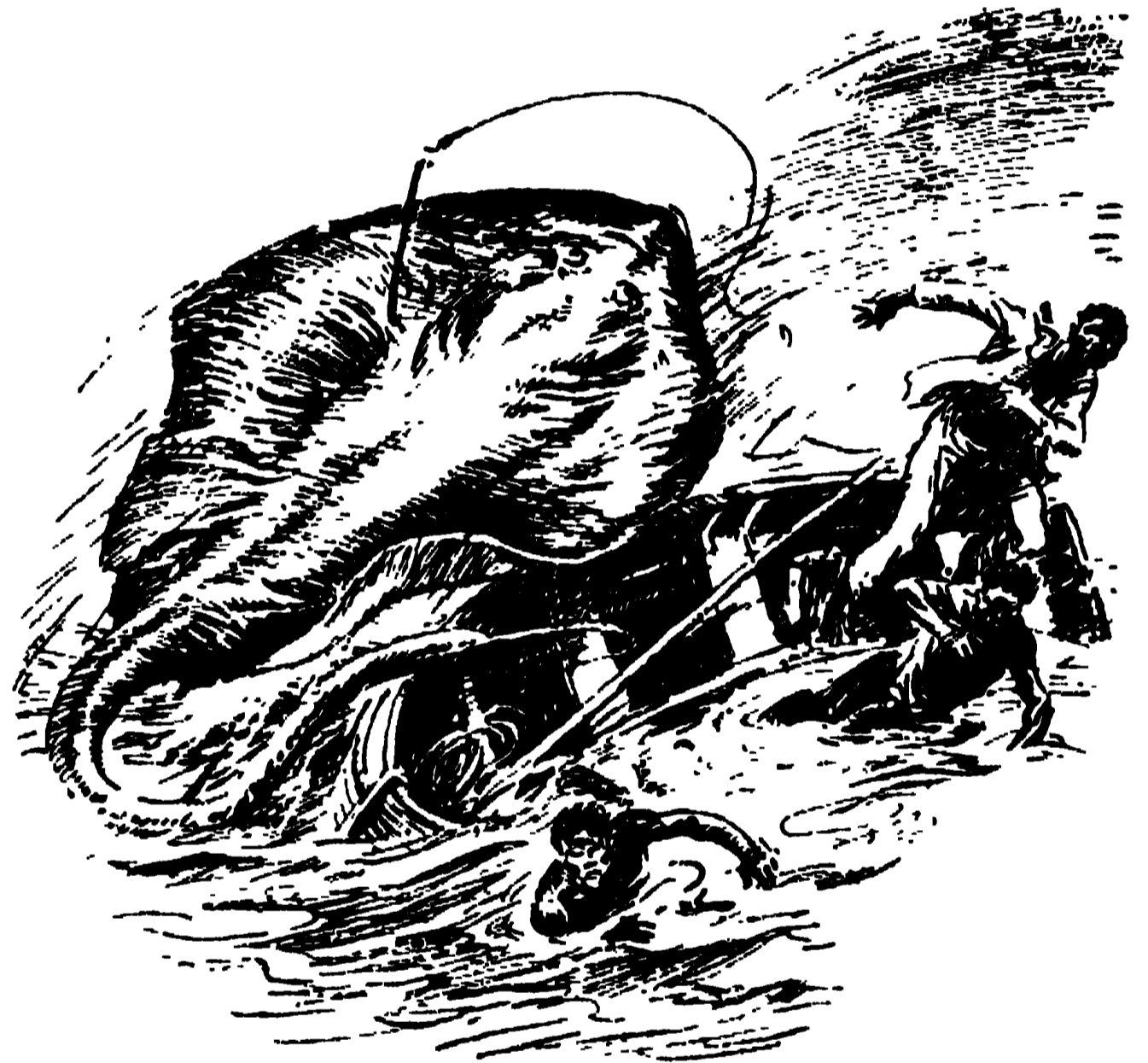
অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে যে সকল প্রবাল-সাগর (Coral-seas) বর্তমান, সেই সকল সাগরে অতীব ভীষণ-দর্শন ও অদ্ভুতাকৃতি বহু প্রকার সামুদ্রিক জীব লক্ষিত হয়, তাহাদের মধ্যে ‘রাক্সেসে-রাই’ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগকে সাধারণতঃ উপকূল-সন্নিহিত পার্শ্বত্যা দ্বীপের প্রান্তবর্তী মগ্ন-গিরিকন্দরে বাস করিতে দেখা যায় ; কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞানবিদগণ ইহাদের সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কোন জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই সকল রাক্সেসে-রাইএর দেহ যেরূপ বিশাল, আকৃতিও সেইরূপ ভয়াবহ বলিয়া, জনসাধারণের ধারণা—ইহারা অত্যন্ত হিংস্র এবং মানবের মহাশত্রু ; কিন্তু এই ধারণার মূলে কোন সত্য নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহারা অত্যন্ত নিরীহ জীব ; তবে শিকারী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য ইহারা যে শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা অতীব বিস্ময়কর।

রাক্সেসে-রাইএর আকার প্রায় চতুষ্কোণ ; ইহার মস্তক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু উদর তুম্বার-শুভ্র। ইহার আকৃতির বৈচিত্র্য এই যে, ইহার দেহের বিস্তার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রশস্ততর। ইহার দুই পাশে যে দুইখানি পাখনা আছে, দেহের তুলনায় তাহাদের আকার অনেক বৃহৎ, এবং তাহা বিশালকায় বাছড়ের পক্ষযুগলের অনুরূপ।

রাক্সেসে-রাইএর চক্ষু অতি বৃহৎ—তাহার ব্যাস প্রায় দুই ইঞ্চি। মাথা চ্যাপটা। ইহার মুখের দুই পার্শ্বে

দুইটি দাঁড়া আছে, তাহা জ্বর ঞায় পাক-বিশিষ্ট ; এবং আঠারো ইঞ্চি হইতে দুই ফিট দীর্ঘ। এতদ্বিন্ন, ইহার পশ্চাতে হস্তীর লাস্থুলের ঞায় যে লেজ আছে, তাহাও প্রায় চারি হাত দীর্ঘ।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশের সমুদ্রেই সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার রাক্সেসে রাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহের বিস্তার প্রায় পনেরো হাত, এবং হা-মুখের দৈর্ঘ্য কখন



সামুদ্রিক রাক্সেসে-রাই মৎস্য

কখন এক গজেরও অধিক হইয়া থাকে। হা-মুখের বিস্তার দুই ফিট। ইহারা মুখ-ব্যাদান করিলে দাঁত দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সতর্কভাবে পরীক্ষা করিলে নীচের মাড়িতে সহস্রাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতল দাঁত দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহা পাতলা ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। কিন্তু উপরের মাড়িতে একটিও দাঁত নাই ! ইহাদের দাঁত খাণ্ডদ্রব্য চর্কণের জন্য ব্যবহৃত হয় না ; সুতরাং এই দস্তশ্রেণীর উপযোগিতা কি, প্রাণিতত্ত্ববিৎগণ এখন পর্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। আট ফিট পরিধির একটি শিশু-রাক্সেসের দস্তশ্রেণী অমুবীক্ষণের সাহায্যে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছিল, তাহা সংখ্যায় চারি হাজার !

রাক্সেসে-রাই অগ্নাত মৎস্য বা কুম্ভীরের ঞায় ডিম পাড়ে না, ইহারা শাবক প্রসব করে! ইহাদিগকে শিকার করিতে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক কার্য। কারণ, শিকারীরা যে বোটে ইহাদিগকে শিকার করিতে যায়, ইহারা সময়ে সময়ে সেই বোট-পর্যন্ত উন্টাইয়া দিয়া থাকে, এবং শিকারী সমেত বিসর্জন হইয়া যায়! অল্প দিন পূর্বে উত্তর-অষ্ট্রেলিয়ার তিন জন মৎস্যজীবী একখানি বোটের সাহায্যে একটি বিরাটদেহ রাক্সেসে-রাই টেঁটা (harpoon) দিয়া গাঁথিলে, রাক্সেসেটা এক গুঁতায় বোট উন্টাইয়া ফেলিয়া শিকারীত্রয়কে সমুদ্রগর্ভে সমাহিত করিয়াছিল!

ইহাদের দেহের শক্তি অসাধারণ, এবং ইহারা আক্রান্ত হইয়া যে প্রবল বেগে ছুটিতে থাকে, কেবল গুনিয়া তাহা ধারণা করা যায়না। কোন কোন রাক্সেসে-রাই এইরূপ বেগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া যে সকল বোট টানিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের ওজন ইহাদের দেহের ওজন অপেক্ষা বহু গুণ অধিক। কখন কখন টেঁটাবিদ্ধ রাক্সেসে-রাই শিকারীদের বোট টানিয়া লইয়া গিয়া কোন কোন প্রবাল-গিরির সংঘর্ষে চূর্ণ করিতে উদ্যত হওয়ায় শিকারীরা আশ্চর্যকার জন্তু টেঁটা-সংলগ্ন রজ্জু বোট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মিষ্টার ই, কে, প্যাটারসন নামক এক জন শিকারী পত্রাণ্ডরে লিখিয়াছেন, “কিছু দিন পূর্বে আমি এক দল শিকারীর সঙ্গে রাক্সেসে-রাই শিকার করিতে যাই; আমরা যে রাক্সেসে-রাইটাকে দেখিতে পাইলাম, তাহার দেহের বেড় অন্যান্য কুড়ি ফুট! এই বিকটাকার জলজন্তুটা অতি ধীরে জলের উপর সাঁতার দিয়া গুরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং তাহার বিশালাকার পাখনাদ্বয় মধ্যে মধ্যে জলের ভিতর ভীষণ বেগে আন্দোলিত হওয়ায় সাগরের জলরাশি উচ্ছলিত ও আলোড়িত হইতেছিল।

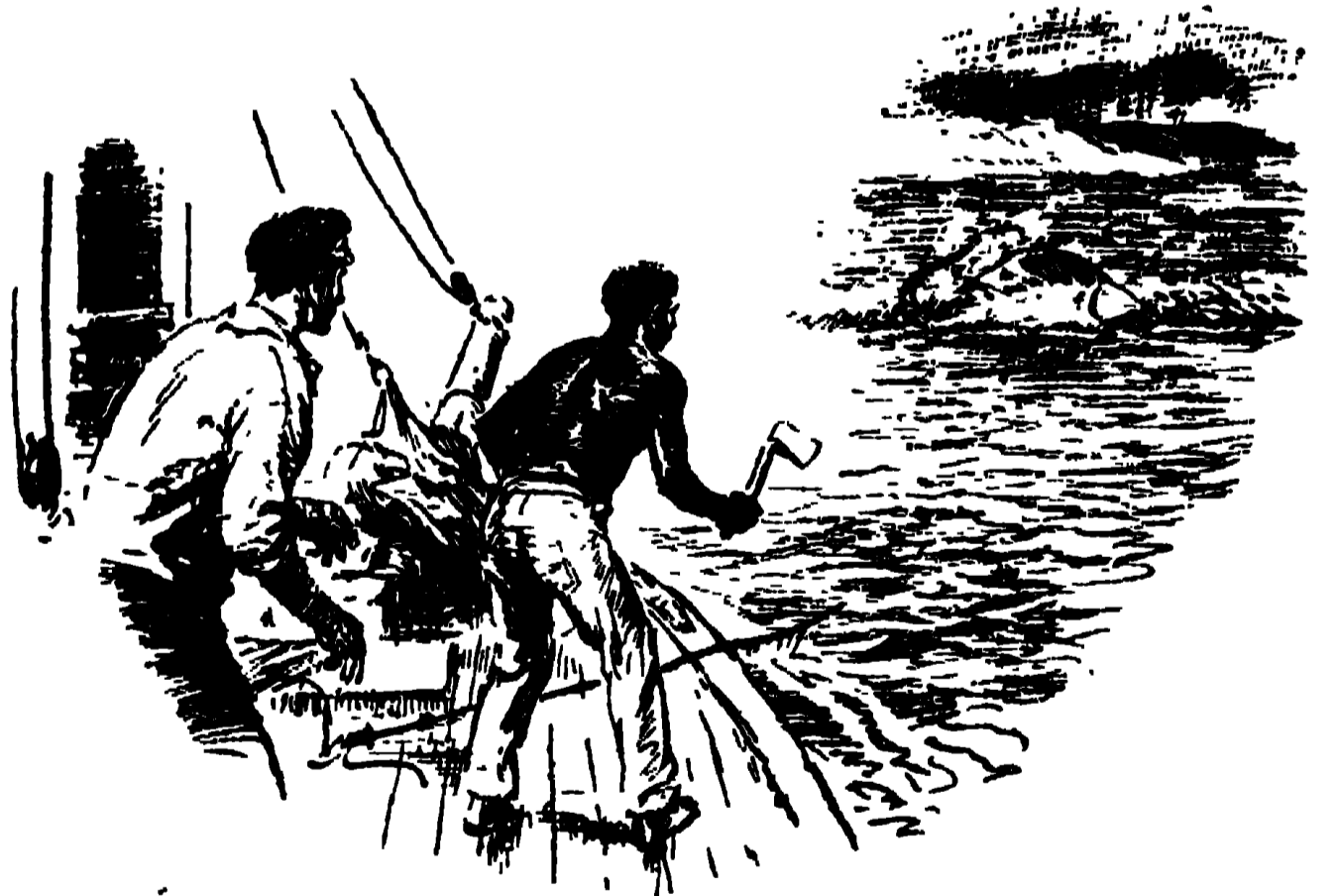
“আমাদের বোট জানোয়ারটার নিকট নীত হইলেও সে তাহা গ্রাহ্য করিল না। বোটে হ্যারি নামক এক জন ডুবুরি ছিল; সে টেঁটা দ্বারা তাহার দেহ বিদ্ধ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইল। সেই টেঁটার পশ্চাদ্ভী কড়ায় যে স্পৃষ্ট রজ্জু আবদ্ধ ছিল, তাহা দুই শত ফুট দীর্ঘ। হ্যারি বোটখানার কিনারায় দাঁড়াইয়া, রাক্সেসে-রাইটার প্রায় দশ ফুট দূর

হইতে তাহার পিঠ লক্ষ্য করিয়া সবেগে টেঁটা নিক্ষেপ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছঙ্কার দিয়া টেঁটার কড়া-সংলগ্ন রজ্জু দৃঢ়যুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

“টেঁটা রাক্সেসে-রাইটার পৃষ্ঠে গভীর ভাবে বিদ্ধ হইলেও সে দুই-তিন সেকেন্ডে নড়িল না; কিন্তু তাহার পরেই সে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহার পাখনাদ্বয়ের আঘাতে জলরাশি এরূপ আলোড়িত করিল যে, বহু দূর লইয়া সমুদ্রজল ফেনিলোচ্ছসিত হইল; তাহার পর টেঁটা লইয়া এরূপ বেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল যে, সেই আকর্ষণে বোটখানি বিহ্বাদেগে ছুটিয়া চলিল। টেঁটার আবদ্ধ রজ্জু টন-টন শব্দ করিয়া সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

“হ্যারি সেই রজ্জু সামলাইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি তাহার শেষ মুড়াটা বোটের ডেকের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। রাক্সেসে-রাইটা এক টনেরও অধিক ভারী বোট মোচার খোলার মতন অনায়াসে একটি প্রবাল-শৈলের দিকে এরূপ প্রচণ্ড বেগে টানিয়া লইয়া চলিল যে, আমাদের আশঙ্কা হইল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহা সেই প্রবাল-শৈলের সংঘর্ষে শতখণ্ডে চূর্ণ হইবে!

“বোটের মাঝি সতয়ে চীৎকার করিয়া বলিল, ‘টেঁটার দড়ি এই মুহূর্তেই কাটিয়া দাও, নতুবা বোটখানি পাহাড়ে



টেঁটার রজ্জু কাটিতেছে

আছড়াইয়া-পড়িয়া চূর্ণ হইবে, আমরা সকলেই ডুবিয়া মরিব।—হ্যারি অগত্যা একখানি কুঠার লইয়া দড়িটা কাটিয়া দিল। রাক্সেসে-রাইটা মুহূর্ত মধ্যে একটি প্রবাল-শৈলের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া এরূপ বেগে তাহাতে তাহার পিঠ ঘষিতে লাগিল যে, টেঁটা বাঁকিয়া-চুরিয়া তাহার

পিঠ হইতে খসিয়া পড়িল। তাহার পর সে সাঁতরাই দিয়া সেই প্রবাল-শৈলের অন্বেষে চলিয়া গেল।”

এই সকল রাক্ষসে-রাই শ্বেচ্ছায় মানুষের কোন ক্ষতি না করিলেও বা হিংসার পরিচয় না দিলেও, অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশের সমুদ্রে অল্প এক জাতীয় ভীষণাকার জলজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের সম্বন্ধে এ-কথা খাটে না। এই অদ্ভুতাকৃতি জলজন্তু গো-লেজা (cow-tail) রাই নামে পরিচিত। ইহাদের লাস্কুল অত্যন্ত সাংঘাতিক অস্ত্র!

গো-লেজা রাইএর আকৃতি রাক্ষসে-রাইএর আকৃতির অনুরূপ হইলেও ইহাদের মাথা ও লেজের



সামুদ্রিক গো-লেজা রাই মৎস্য

আকার ভিন্ন প্রকার। ইহাদের লেজ দেখিতে অনেকটা গরুর লেজের অনুরূপ; কিন্তু ইহাদের লেজ স্ত্রীক্ক কণ্টকরাশি দ্বারা আবৃত। এই সকল কণ্টকে বঁড়সীর মতো তীক্ষ্ণধার ‘আল’ আছে। ইহাদের লেজ সমগ্র দেহ অপেক্ষা দীর্ঘ; তাহা কখন কখন আট নয় ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের লেজের গোড়া স্থলকায় ব্যক্তির বাহুমূলের ত্রায় স্থূল। লেজের উপরিভাগ কতকগুলি বৃহৎ কণ্টকে আবৃত। এই সকল কণ্টকের আঘাতে মনুষ্য-দেহে যে ক্ষত হয়, তাহা সাধারণতঃ বিষাক্ত হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয়, নতুবা সমগ্র দেহের শোণিত বিষাক্ত হইতে পারে।

এই সকল গো-লেজা রাই যখন মগ্ন-শৈলের নিকট সমুদ্র-বক্ষে ভাসিতে থাকে, সেই সময় তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চল থাকিলে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না; মনে হয়, তাহা মগ্ন-শৈলেরই একটি অংশ। কিন্তু কোন কারণে শাস্তিভঙ্গ হইলে গো-লেজা রাই তাহার পাখ্না জোড়াটা একরূপ প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত করে যে, চারি পার্শ্বস্থ বালি-কাদা প্রভৃতি আলোড়িত হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত সমুদ্র-জল ঘোলা হইয়া যায়। তাহার পর তাহার সাংঘাতিক লাস্কুলের আক্ষালন একরূপ বিপজ্জনক হইয়া থাকে যে, যদি কোন দুর্ভাগা শিকারী তাহার লাস্কুলের নিকট আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে লাস্কুলের কণ্টকাঘাতে তাহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে মিঃ প্যাটারসন লিখিয়াছেন, “একবার আমরা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির মধ্যস্থ টরেসু প্রণালীতে একটি বিশালকায় গো-লেজা রাই টেঁটা দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম। আমরা অতি কষ্টে তাহাকে আমাদের বোটে টানিয়া তুলিলে, সে বোটের উপর ভীষণ ধস্তাধস্তি আরম্ভ করিল। আমাদের বোটের পরিচালকের মুখ তাহার লেজের আঘাত হইতে এক চুলের জন্ত বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার লেজ বোটের এক পার্শ্বে সবেগে আছড়াইয়া পড়িতেই, লেজের স্ত্রীক্ক কণ্টকগুলি বোটের তক্তায় প্রায় দুই ইঞ্চি বিধিয়া তাহা ফুটা হইয়া গেল।

গো-লেজা রাইএর লেজের কাঁটাগুলির অগ্রভাগ কেবল তীক্ষ্ণ নহে, তাহার সূক্ষ্ম আলগুলি উন্টা দিকে বাঁকা; এজন্য এই সকল কণ্টক কাহারও দেহে বিদ্ধ হইলে টানিয়া খুলিতে পারা যায় না; তাহা ক্ষতস্থান হইতে বাহির করিতে হইলে ছুরীর ডগা দিয়া ক্ষত-প্রশস্ত করিতে হয়, এজন্য আহত ব্যক্তির যত্ননা দুঃসহ হইয়া উঠে। এই সকল কণ্টকের অগ্রভাগে বিষ না থাকিলেও প্রত্যেক কণ্টকের গোড়ায় এক একটি ক্ষুদ্র থলি আছে, তাহা অতিশয় তীব্র বিষে পরিপূর্ণ। কণ্টকের ভিতর কেশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকায় সেই বিষ কণ্টকাগ্র দিয়া ক্ষতের ভিতর সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই বিষ কোন সমুদ্রচর প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে সেই প্রাণীর আকস্মিক মৃত্যু অপরিহার্য হইলেও, উহা নরশোণিতে মিশ্রিত হইবার অব্যবহিত পরে যদি

সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়—তাহা হইলে সেই আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইতে পারে; তবে তাড়াতাড়ি প্রতিষেধের ব্যবস্থা করা উচিত। এই কার্যে বিলম্ব হইলে আহত মনুষ্যের প্রাণ-রক্ষার জন্য ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা সমগ্র দেহ বিষাক্ত হইয়া থাকে। এই ভাবে দেহ-শোণিত বিষাক্ত হওয়ায় অনেক শিকারীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।

টরেম্ প্রণালী এবং উত্তর-অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা গো-লেজা রাই শিকার করিলে তাহারা উহাদের লেজের কণ্টকগুলি সম্বন্ধে সঞ্চয় করিয়া রাখে; এবং তাহা মৎস্য-শিকারের জন্য ব্যবহৃত বর্ষার অগ্রভাগে গাঁথিয়া তাহার সাহায্যে মৎস্য শিকার করে। এই সকল কাঁটার তীক্ষ্ণাগ্র জল রহিত মৎস্যের দেহে বিদ্ধ হইলে আহত মৎস্য মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিতে পারে না; তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলচর পশু-শিকারেও এই

সকল বর্ষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে-কালে স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা গো-লেজা রাই-এর লেজের কণ্টক তাহাদের তীরে ব্যবহার করিত, এবং এই সকল কণ্টকের অগ্রভাগে তীব্র বিষ মাখাইয়া সেই বাণ দ্বারা শত্রুনিপাত করিত। খেতাজ আততায়ীগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহারা অনেক সময় এই সকল বাণ ব্যবহার করিত।

গো-লেজা বাইএব সংখ্যা এ-কালে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, বিশেষ চেষ্টা না করিলে তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তবে এ-কালেও যে সকল ডুবুরী মুক্তার সন্ধানে বিবস্ত্র দেহে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করে, তাহারা কখন কখন গো-লেজা রাই কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু সমুদ্রে নামিবার সময় তাহারা অজ্ঞাতসারে উহাদের শাস্তিভঙ্গ না করিলে গো-লেজা রাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডুবুরীদিগকে আক্রমণ করে না।

বসুমতীর বসুধারা

রবির প্রাণের বসুধারা

বরায় করে সালঙ্কারা,

গড়িয়ে পড়ে উসার করে

সাতটি রঙের প্রভা।

রবির গানের বসুধারার

হলে কিবা সাতনরী ছান

বিশ্ববাসীর গ্রীবায়, বা ডায়

বক্ষ-তটের শোভা।

ছিমাচলের তুষার গলা

বসুধারা কলোচ্ছলা,

সপ্তনদীর মেহে গারত-

মন্ম-শীতল রাখে।

হিমকরের চিরস্তনী

বসুধারার আলিম্পনী

গড়িয়ে পড়ে অরণ্যানীর

পাতার ফাঁকে ফাঁকে :

সরস্বতীর তন্ত্রী হ'তে

সাতটি সুরের কলস্রোতে

বসুধারা গড়িয়ে পড়ে

কল্পতরুর 'পরি'।

গড়িয়ে পড়ে বাণীর প্রীতি

কাব্য, কথা, নাট্য, গীতি,

রস-বিচার, তত্ত্ব, নীতির

সাতটি ধারা ধরি'।

শ্রীকালিদাস রায়।



ঘুম-পাড়ানিয়া

দেহকে সুস্থ-সবল এবং সুশ্রী-সুন্দর রাখিতে হইলে ব্যায়াম ও আহারের যেমন প্রয়োজন, নিদ্রারও তেমনি প্রয়োজন আছে। আহারের অনিয়মে দেহ যেমন অসুস্থ হয়, দেহের শ্রীসৌন্দর্য্য বিমলিন হয়, তেমনি নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিলে কিম্বা অতি-নিদ্রা বা অল্পনিদ্রা বা অনিদ্রায় দেহ অসুস্থ হয়—দেহের সৌন্দর্য্যশ্রী মলিন হয়, বিলুপ্ত হয়। এজন্ম ব্যায়াম ও আহারের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার বিধি-নিয়ম যথারীতি মানিয়া চলা কর্তব্য।

সংসারে আমাদের শান্তি-সুখে নিত্য ব্যাঘাত ঘটে। তার ফলে মনের উপর পীড়ন-অত্যাচারের সীমা থাকে না। মন ভালো না থাকিলে দেহ ভালো থাকে না; এবং দেহ-মনের অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিলে যেমন ক্ষুধার উদ্বেক হয় না, আহারে রুচি থাকে না,—তেমনি নিদ্রাও চোখের ধারে ঘেঁষ দিতে চায় না! হুঃখে-শোকে যে-অবসাদ, এবং উল্লাস-আনন্দের আতিশয্যে যে-উত্তেজনা, তার ফলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে।

এ-উপসর্গ সংসারে নিত্যই প্রায় লাগিয়া আছে! একটা-না-একটা উপসর্গ! হয় টাকার অভাবে উদ্বেগ—ছেলেমেয়ের বা স্বামি-স্ত্রীর কঠিন পীড়া, না হয় মামলা-মকদ্দমা! এ-সবের উর্দ্ধলোকে বিচরণ করিয়া চলিবার সৌভাগ্য বড় বেশী লোকের ঘটে না। গভীর রাত্রি—সকলে নিদ্রা-সুখে নিমগ্ন, আমি একা বিনিদ্র বিভাবরী যাপন করিতেছি—ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া চলি-রাছে—রাত্রির নিশ্চরতার মধ্যে ঘরে-বাহিরে বিচিত্র শব্দ-তবন্ধের উদয়-বিলয় ঘটতেছে—আর আমি চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া আছি! চোখে ঘুমের ছায়া-পাতের চিহ্ন নাই! মাথা দপ্‌দপ্‌ করিতেছে—রগ টনটন করিতেছে—সমস্ত দেহ তেদ করিয়া একটা দাক্ষণ জ্বালা

—এ ব্যাপারে একটি রাত্রে মাসুঘের চেহারা কি হইয়া যায়, কে না দেখিয়াছেন?

কাজেই নিদ্রার বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া চাই। রাত্রে শয়নের এক-ঘণ্টা পূর্বে কোনো রকম উত্তেজক বা অবসাদ-জনক চিন্তা লইয়া মস্তিষ্কে পীড়িত করিবেন না; রাগারাগি, বকাবকি বা আগামী-কল্যা সংসার কি করিয়া চলিবে,—ছেলেমেয়ের অসুখ সারিবে, না, বাড়িবে—এমনি চিন্তা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। শয়নের পূর্বে মনে সুখ-আশার স্বপ্ন জাগাইয়া তুলুন; হাশ্বে-গল্পে শয়নের পূর্ক-ক্ষণ অতিবাহিত করুন। যত দুঃখ, যত অভাব থাকুক, ভাবনা-চিন্তায় যখন তাহা ঘুচিবে না, তখন সে-দুশ্চিন্তা মাথায় বহিয়া নিদ্রাকে কেন নির্ক সনে পাঠাই! রোগ বলুন, শোক বলুন, দারিদ্র্য বা অভাব-অভিযোগ বলুন, দেহ-মন ভালো থাকিলে তবেই সেগুলার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাদের বিলোপ-সাধনে আমরা সমর্থ হতে পারিব। দেহ-মন যখন দুশ্চিন্তায় কাতর, তখন তার সঙ্গে অনিদ্রার সংযোগ ঘটিলে দেহ-মনের কোনো-কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না। কাজেই নিদ্রার প্রয়োজন যে খুব বেশী, সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

তার উপর সৌন্দর্য্য-শ্রী। এক দিন যদি বেশী রাত্রি জাগিয়া কাজ-কর্ম, গল্প-গুজব, হাসি-গান আমোদ-আহ্লাদ করিয়া কাটান, পরের দিন দেখিবেন, চোখের কোলে কালির রেখা পড়িয়াছে, হু'চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে, মুখ মলিন রুক্ষ হইয়াছে। দেখিবেন, ফুল্ল-নলিনী একটি রাত্রেই ম্লান-মলিন! সুতরাং নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাত্রি-জাগরণ—দেহশ্রীকে মলিন বিলুপ্ত করিতে এত-বড় শত্রু আর নাই!

আমোদ-আহ্লাদের কথা বলিলাম এই জন্ম যে, রোগ-শোকের ক্লেশ-যাতনায় দেহ-মন এমনিতেই অসুস্থ

মলিন হয়; আমোদ-আহ্লাদে মন সরস থাকে, তবুও একটি রাত্রির অনিদ্রার ত্রীসৌন্দর্য্য কতখানি ম্লান হয়, মলিন হয়, তাহা বুঝাইবার জ্ঞ।

দেহকে সুশ্রী ছাঁদে গড়িবার জ্ঞ যে ব্যায়াম-বিধি পালন করিতে হয়, নিদ্রার জ্ঞও তেমনি আলাদা ব্যায়াম-বিধি আছে। সে বিধি মানিয়া চলিলে নিদ্রা-সুখে যেমন বঞ্চিত হইবেন না, তেমনি এ-ব্যায়ামে দেহশ্রী এবং দেহের গঠন সুছাঁদে গড়িয়া দেহকে সুকুমার-সুন্দর করিয়া তুলিবে।

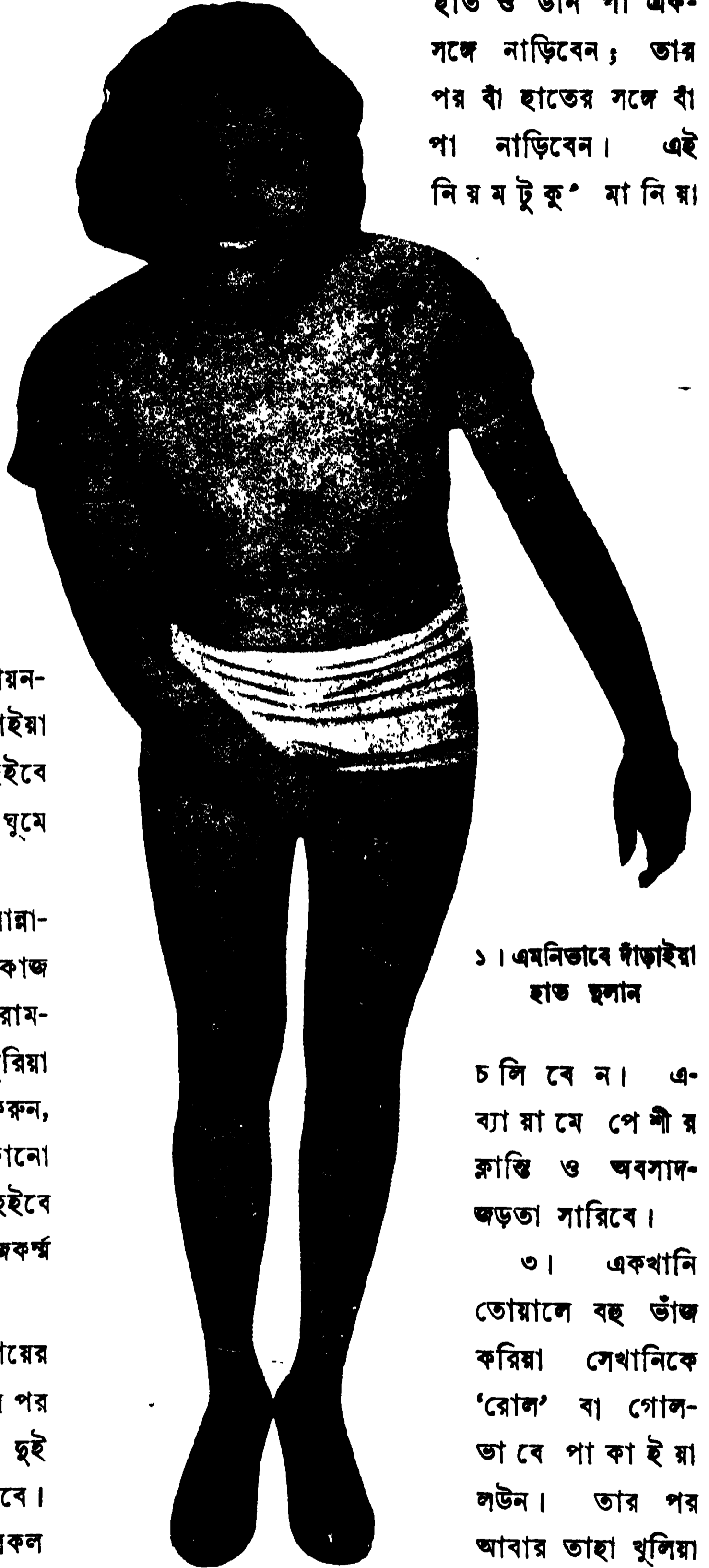
এ ব্যায়াম-বিধি খুব সহজ এবং সরল। সংসারের নানা কাজে আমাদের দেশের মেয়েদের প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। নিদ্রার ব্যায়াম-বিধি মানিয়া চলিলে শ্রান্তি ঘুচিয়া দেহে-মনে তাঁরা আরাম পাইবেন; তার উপর বিছানায় শয়ন-মাত্র নিদ্রা আসিয়া ছ'চোখে মায়ার তুলি বুলাইয়া দিবে! নিদ্রার জ্ঞ কোনো প্রয়াস করিতে হইবে না—রাত্রে নিত্য ঠিক সময়টিতে দেখিবেন, ঘুমে ছ'চোখ আচ্ছন্ন হইবে!

তাছাড়া বাড়ীতে যাদের বাটনা বাটিতে হয়, রান্না-বান্না করিতে হয়, আরো পাঁচটা কায়িক-শ্রমের কাজ করিতে হয়, দেখিবেন, এ-ব্যায়ামে পেশীগুলির বিরাম-আরাম ঘটিবে কতখানি! দাঁড়াইয়া, ঝাঁকিয়া-চুরিয়া বা আসনপিড়ি হইয়া বসিয়া যতক্ষণ যত কাজই করুন, এ-ব্যায়ামে সকল ক্লান্তির বিরাম ঘটিবে! কোনো রাত্রেই অনিদ্রার অশান্তি-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। এ ব্যায়ামের নাম ঘুম-পাড়ানিয়া। দিনের কাজকর্ম চুকিলে নিত্য এ ব্যায়াম করিতে হইবে।

১। মেঝের সিধা-খাড়া ভাবে দাঁড়ান। দুই পায়ের গোড়ালিতে গোড়ালিতে ঠেকিয়া থাকিবে। তার পর ১নং ছবির ভঙ্গীতে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া দুই হাত শুধু ছলান। পাঁচ মিনিট হাত ছলাইতে হইবে। এ দোলন-ব্যায়ামে মেয়েদের কর্মক্লাস্ত দু'হাতের সকল ক্লান্তির অপনোদন হইবে।

২। হামা দিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে ঘরের মেঝের পাঁচ মিনিট-কাল বিচরণ করুন। হামা দিবার সময় ডান

হাত ও ডান পা এক-সঙ্গে নাড়িবেন; তার পর বা হাতের সঙ্গে বা পা নাড়িবেন। এই নিয়ম টুকু' মানিয়া



১। এমনিভাবে দাঁড়াইয়া হাত ছলান

চলিবেন। এ-ব্যায়ামে পেশীর ক্লান্তি ও অবসাদ-জড়তা সারিবে।

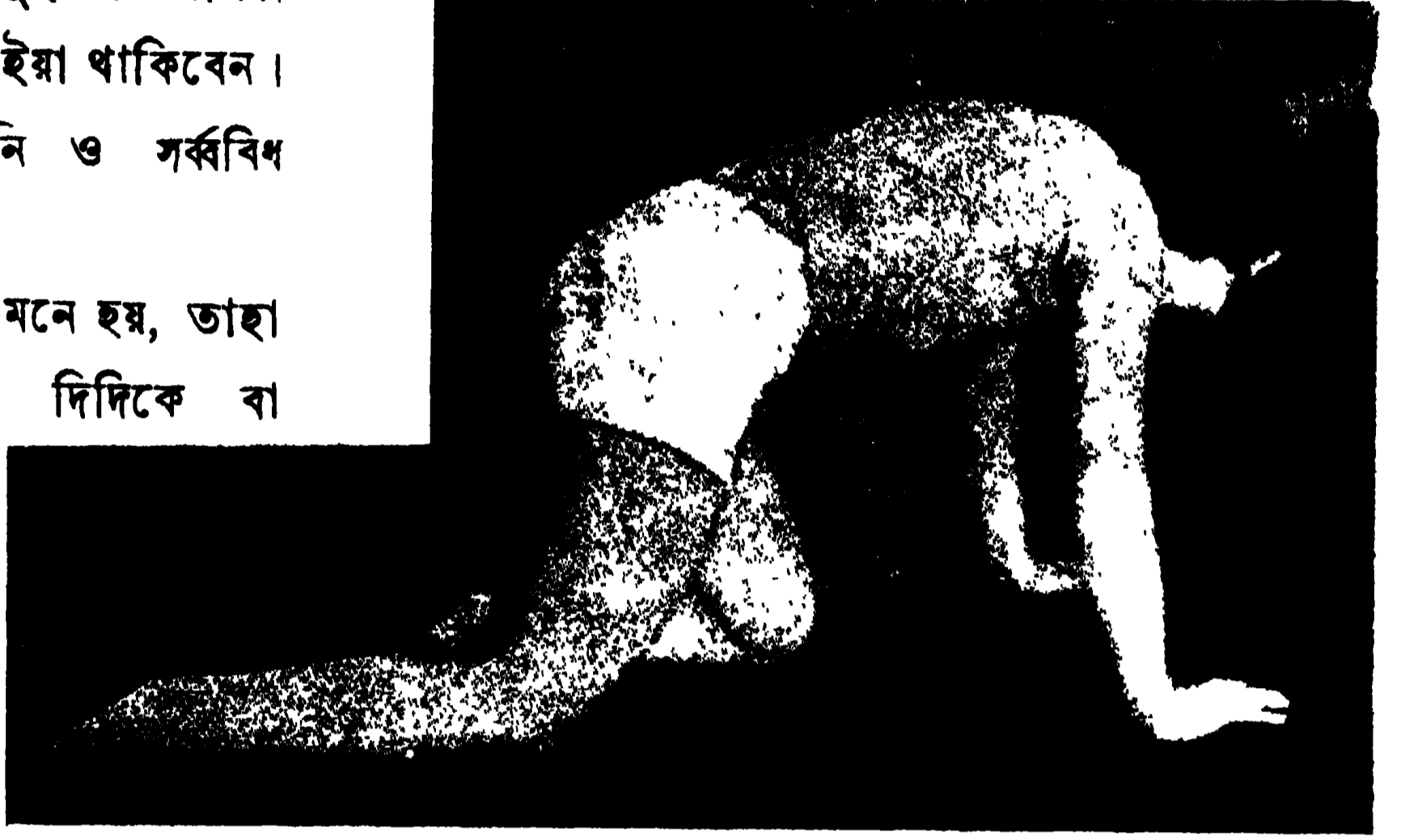
৩। একখানি তোয়ালে বহু ভাঁজ করিয়া সেখানিকে 'রোল' বা গোল-ভাবে পাকাইয়া লউন। তার পর আবার তাহা খুলিয়া

মেলিয়া লইতে হইবে; তার পর আবার সেখানিকে ভাঁজ করিয়া গোল করিয়া পাকান। দশ-বারো বার ভাঁজ করিবেন। খুলিবেন; আবার

ভাঁজ করিবেন। এ-ব্যায়ামে হাতের আঙুলগুলির জড়তা ঘুচিবে।

৪। পা ছ'খানির ক্লাস্তি-মোচনের জন্তু ঐ তোয়ালে-খানি মেঝের বা শক্ত বিছানায় (গদি বা তোষকের উপর নয়) ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া সেই ভাঁজ-করা তোয়ালের উপর ৪নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পা রাখিয়া শুইয়া থাকুন। প্রায় পনেরো মিনিট শুইয়া থাকিবেন। ইহাতে পায়ের কটুকটানি, বন্‌বনানি ও সর্ববিধ অস্বাচ্ছন্দ্য লোপ পাইবে।

৫। নানা কারণে দেহ যদি ভার মনে হয়, তাহা হইলে সিধাভাবে দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া দিগিকে বা ছোট বোনকে বা বাড়ীর অপর কাহাকেও বলুন, ৫নং ছবির ভঙ্গীতে আপনার একখানি করিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া কনুই হইতে সমস্ত হাতখানি ধীরে ধীরে তিনি ডলিয়া দিবেন। এমনি ভাবে দুই হাতের পরিচর্যা করুন; অস্বাচ্ছন্দ্য



২। হামা দিন



৩। তোয়ালে ভাঁজ করা

৬নং ছবির ভঙ্গীতে ঘাড়ের নীচে রাখিয়া অর্থাৎ তোয়ালের উপর ঘাড় রাখিয়া শুইয়া পড়ুন। মাথা রাখিবেন, তোয়ালের একেবারে প্রান্তভাগে।

৭। পায়ের ভার-বোধ বা অস্বাচ্ছন্দ্য সারাইবার জন্তু ৭নং ছবির ভঙ্গীতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন। বাড়ীর আর-কাহাকেও বলুন, আপনার পা ছ'খানি তুলিয়া ধরিয়া উঠাইবেন-নামাইবেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোড়ালির উর্দ্ধভাগটুকু (৭নং ছবিতে যে-ভাবে পায়ের যে-জায়গা

ও ক্লাস্তি ঘুচিবে।

৬। অনেক সময় ঘাড় যেন কাঠের মতো শক্ত বোধ হয়; ঘাড়ে ব্যথা ধরে, ঘাড় টনটন করে। এই উপ-সর্গে গো ল-ভাঁজ - ক রা তো যা লে খা নি



৪। শ্রান্ত চরণের উপাধান

এ রীতির অন্তরালে আদি-যুগে ছিল সৃষ্টি-রক্ষার ইঙ্গিত। মোহন বেশে সাজিয়া নারী পুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিত; তার ফলে জীব-জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কাজ অব্যাহত ছিল।

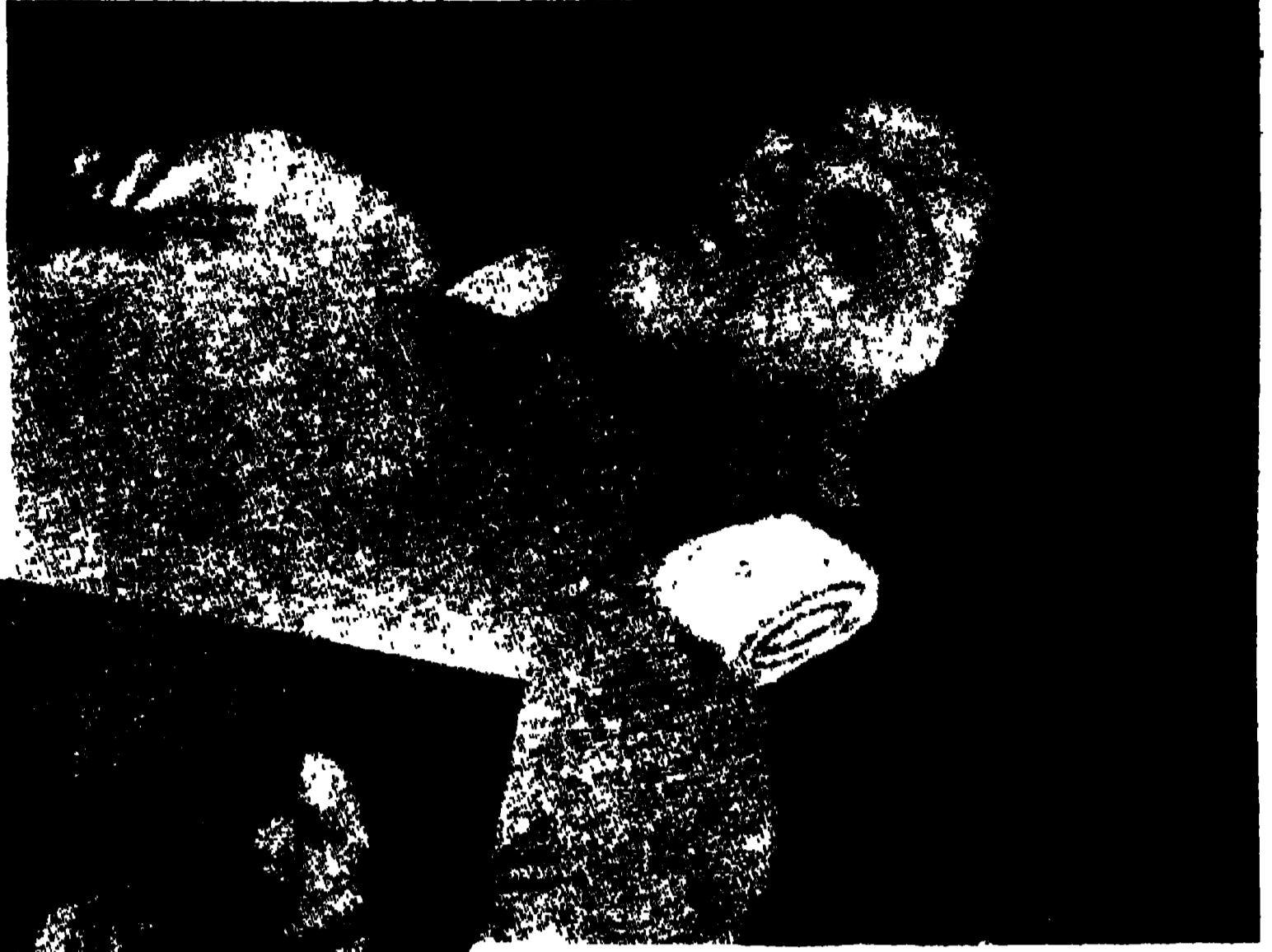
আদি-যুগে নারীর এ-প্রসাধনে পুরুষের চিত্তাকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা যতখানি ছিল, এ যুগে সমাজ-বন্ধনের নামা স্তব্যবস্থায় সে-প্রয়োজনীয়তা ততখানি আর নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও নারীর বেশভূষা-প্রীতির

কোনো কালে ভোগ করিবেন না!

সাজ-সজ্জা

সাজ সজ্জা বা প্রসাধন করার রীতি নারী-সমাজে চলিয়া আসিতেছে সেই আদি-যুগ হইতে।

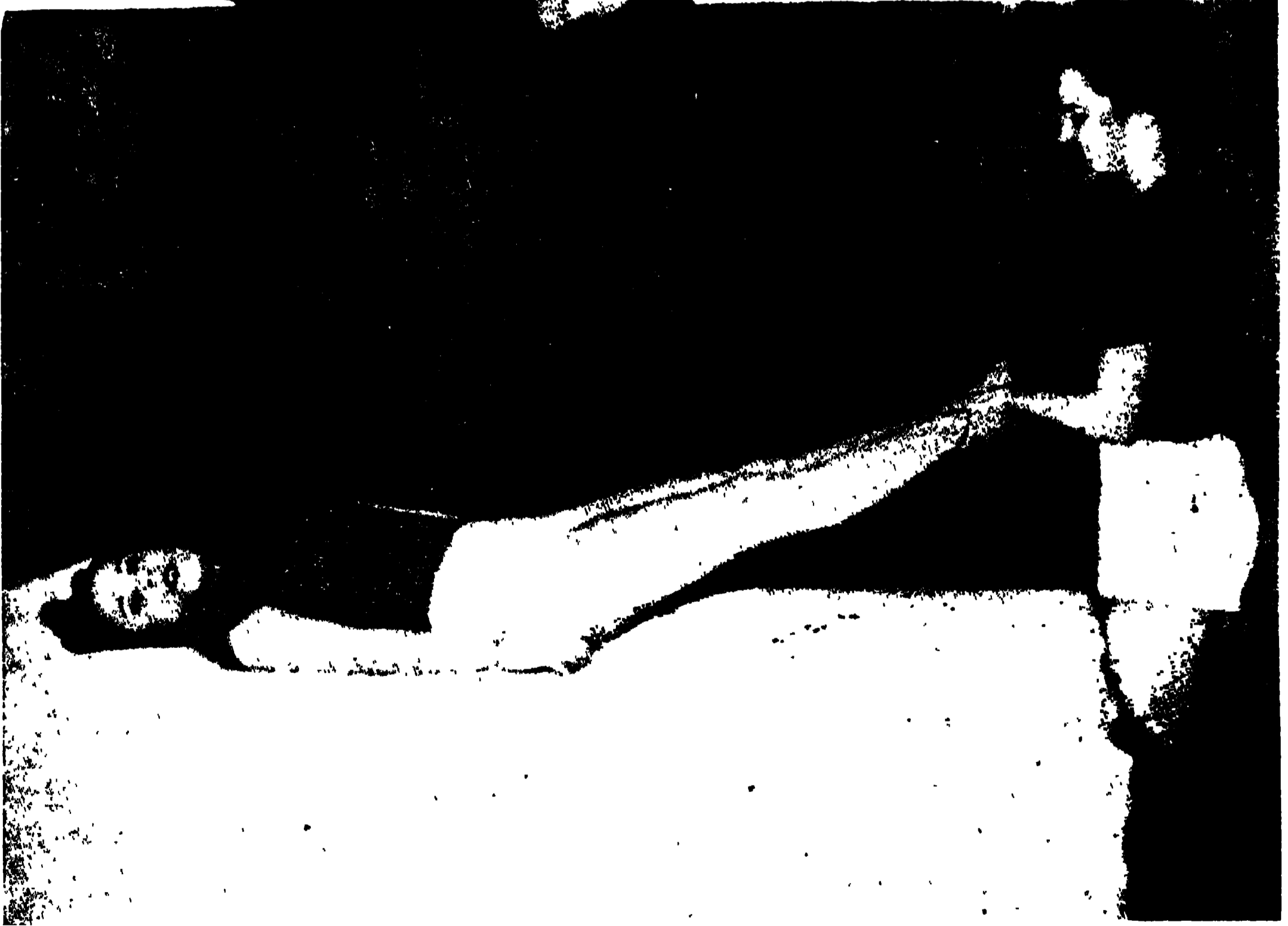
মাত্রা যে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে
সন্দেহ নাই। এ প্রসাধন-প্রীতির
প্রসার আমরা আরো বেশী দেখিতে
চাই। এ প্রসাধন-প্রীতির ফলে
সংসার রমণীয় হইবে, কান্তিদীপ্তিতে
ভরিয়া থাকিবে। সৌন্দর্য চিরদিন



৫। ষাড়ের নীচে তোয়ালে



৬।
হাত
ডসা



৭। পায়ের পরিচর্যা

উপাসনার সামগ্রী। সংসার সুন্দর হইলে মানুষের মনও
সুন্দর হইবে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, বেশ-ভূষার বিধি-নিয়ম-
গুলি সকলে জানেন না বলিয়া একই বেশ-ভূষায় কোনো

নারীকে আমরা দেখি, মহিমময়ী লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো, আবার কাহাকেও বা দেখি, জড়ভরত সং! যাঁদের সং দেখি, বেশ-ভূষায় তাঁদের বিমূঢ়তাই তাহার কারণ। এ জন্ত যাকে যে-বেশে যে-ভূষণে মানায়, তাঁকে সেই রকম বেশ-ভূষা করিতে হইবে। লেডি চ্যাটার্জীর মতো বেশ-ভূষা করিলে শ্রীমতী ঘোষাল-জায়াকে হয় তো ভালো দেখাইবে না; তেমনি শ্রীমতী ঘোষাল-জায়ার সহজ-সরল বেশে-ভূষায় লেডি চ্যাটার্জীকে হয় তো দেখাইবে কুশ্রী কুৎসিত! নারী-সমাজকে তাই বেশ-ভূষায় সঠিক সামঞ্জস্য-বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাহাকে কি বেশ-ভূষায় মানাইবে, তার সঠিক হিসাব কবিয়া দেওয়া চলে না। আপনাদের আয়নাই সে-কথা বলিয়া দিবে।

গায়ের বর্ণ, দেহের ঋজুতা বা স্থূলতা, মুখের গোল বা লম্বা গড়ন, কেশের দৈর্ঘ্য বা বিরলতা, কপালের গড়ন, গ্রীবার গড়ন—অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ গড়ন বুঝিয়া কোন্ রঙের শাড়ী, কোন্ রঙের ব্লাউশ্ কার অঙ্গে মানাইবে, কার অঙ্গে দৃষ্টিকটু হইবে; চুল তুলিয়া বা কপালের উপর চুল নামাইয়া খোঁপা বাঁধিলে কার মুখ মানাইবে; 'ভী' গলা ব্লাউশ বা 'গোল'-গলা ব্লাউশ, দু'টির মধ্যে কোন্টিতে ভালো দেখাইবে—এ সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বেশ-ভূষা করিতে হইবে! নহিলে শ্রীমন্ত বাবুর কালো-কোলো স্ত্রী শ্রীমতী জগদম্বা দেবী যদি পিঙ্ক রঙের শাড়ী পারেন, কালো মুখে পাউডার ছড়ান, তাহা হইলে তাঁকে বিস্মী ভিন্ন স্ত্রী দেখাইবে না! এদিকে শ্রীমতী জগদম্বা যদি সচেতন না হন, তাহা হইলে তাঁর বেশ-ভূষা হইবে হাস্যাম্পদ!

বয়স-হিসাবেও বেশে-ভূষায় পার্থক্য বিধান করা চাই। চল্লিশ বৎসর বয়সের প্রৌঢ়া যদি বেশ-ভূষায় সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন, তাহা হইলে ও-বয়সেও তিনি নারী-সমাজে মধ্যমণির দীপ্তি বিকশিত করিয়া তুলিবেন। তাঁর পাশে আধুনিক মিস রেবা রায়কে বিমলিন দেখাইবে!

ফটোগ্রাফ তুলাইবার সময় মেয়ে-সমাজে বেশ-ভূষায় এবং চেহারায় এমন উৎকটতা প্রকটিত করিতে দেখা যায়, যে ফটোর নারীকে আসল-নারী বলিয়া চেনা যায় না। ফটোর নারীকে আসল-নারীর চেয়ে কুশ্রী দেখায়!

ফটো তুলাইবার সময় মুখে-চোখে বেশী পাউডার মাখিবেন না; চোখে কাজল-রেখা টানিতে চান, সে রেখা যেন খুব মিহি স্থল হয়! কুজ বা রঙ আদৌ মাখিবেন না। মাখিলে ফটোর মুখের সঙ্গে আসল-মুখের কোনো সাদৃশ্য থাকিবে না। লিপষ্টিক কদাচ ব্যবহার করিবেন না। মাথার কেশ পূর্বে সাবান-জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবেন; ফটো তুলিবার পূর্বে মাথার কেশ সম্বন্ধে ত্রাশ করিয়া লইবেন; তার পর খোঁপা বাঁধুন বা কেশ প্রলম্বিত রাখুন, ক্ষতি নাই! ধোয়া-মাজা কেশে ফটোর বাহার খুলিবে; তেলা-কেশে, ভিজা-কেশে কদাচ ফটো তুলাইবেন না।

মাথার কেশ-প্রসাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখি। মাথায় নিত্য ত্রাশ চালাইবেন। বলিবেন, পুরুষ-মানুষের মতো? উত্তরে বলিতেছি, হাঁ। ত্রাশ দিয়া মাথার কেশকে ঝাঁপাইয়া তুলিবেন; তার পর কেশ-গুলিকে আলতোভাবে কপালের উপরে-উপরে নামাইয়া তবে চুল বাঁধিবেন। কাণের উপর দিয়া চুলগুলিকে তুলিয়া দিবেন। কাণের খানিকটা মাত্র খোলা থাকিবে। কাণের উপর দিক একটুখানি যেন কেশে ঢাকা থাকে, দেখিবেন। যাঁদের কপাল বড় বা উঁচু, তাঁরা এক গুচ্ছ কেশ বুলাইয়া কপালের উপর ফেলিবেন।

মাথায় মরা-মাষের জন্ত অনেককে বহু দুর্ভোগ সহিতে হয়। মাথায় ঘাম হইলে সে-ঘাম শুকাইয়া এই মরা-মাষের উৎপত্তি হয়। মরা-মাষের উপসর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাহিলে দিনে তিন-চারিবার ঈষৎসং সাবানজলে মাথা ধুইতে হইবে; তার পর ভোঁতা বা মোটা-দাড়া চিক্রণী দিয়া বেশ জোরে-জোরে ঘষিয়া চুল আঁচড়াইবেন। তার পর মাথায় আবার সাবান ঘষিয়া ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইবেন। এবার মাথা মুছিয়া মাথায় অল্প লেবুর রস ঘষিয়া-ঘষিয়া মাখিবেন। তার পর আবার ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইয়া ফেলুন। ছ'বেলা মাথায় ত্রাশ চালাইয়া চুল আঁচড়াইবেন। যে ত্রাশের দাড়া বা bristles বেশ দীর্ঘ ও কঠিন, এমন ত্রাশ দিয়া মাথা আঁচড়াইতে হইবে। দিন-পনেরোর পরিচর্যায় মরা-মাষ সারিবে। তবে আবার না মরা-মাষ হয়, এজন্ত কেশের পরিচর্যা বন্ধ করিলে চলিবে না—পরিচর্যার মাত্রা শুধু কমাইয়া দিবেন।



রম্পার

গতবারের স্যুটটি ছিল সাত-আট বছরের ছেলের জন্ত। এবারে যে রম্পার-এর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এটি নেহাৎ ছুপ্পোষ্যদের জন্ত। এটি এখনই বুনে ফেলতে পারলে খুব সময়োপযোগী হবে, কেন না, আরো ঠাণ্ডা পড়লে ছোটদের ঠাণ্ডা-লাগার হাত থেকে নিরাময় রাখার পক্ষে এটির প্রয়োজন হয় তো থাকবে না।

রম্পারটি নির্দেশ-অনুযায়ী-মাপের করতে উল লাগবে চার আউন্স। তিন আউন্স সাদা (ধি-প্লাই বা তিন খেইয়ের পশম); আর এক আউন্স নীল (ধি-প্লাই)। চোন্ধ নম্বরের একটি ক্রুশের কাঁটা; এক-জোড়া আট নম্বরের বোনার কাঁটা; আর পাতলা ঝিনুকের বা সাদা সেলুলয়েডের ছ'টা বোতাম।

জামাটির মাপ হবে ঝুল (কাঁধ থেকে পায়ের ঘের অবধি)—১৬½ ইঞ্চি; ছাতি—২০ ইঞ্চি; হাতের ঝুল (নীচের দিকে না মুড়ে)—১০ ইঞ্চি।

এখন খে-সব সংক্ষেপোক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলির যথাযথ টীকা দিয়ে আসল কথা আরম্ভ করবো।

সো: = সোজা; উ: = উন্টো; কে: সো: = কেবল সোজা বুনে যেতে হবে; রি: = রিপিট করতে হবে (অর্থাৎ একই জিনিষ আবার বুনেতে হবে); এ: স: = ছোটো ঘর এক সঙ্গে নিয়ে একটা ঘর তুলতে হবে। সা: উ: = সামনে উল দিয়ে একটা ঘরের জায়গায় ছোটো ঘর তুলতে হবে; ঠ: ঠি: = ঠকিঃ ঠিচ বা মোজা বোনার প্যাটার্ণ; ম: ঠি: = মস্ ঠিচ, বা সাবুদানা প্যাটার্ণ (অর্থাৎ ১টা সো: ১টা উ: প্যাটার্ণে বুনেতে হবে, কিন্তু শেষের ঘরটি ঘাতে শেষ, তাতেই আবার আরম্ভ করতে হবে

তার পরের কাঁটা); ঘ: ক: = ঘর কমানো; ঘ: বা: = ঘর বাড়ানো।

পিঠের দিক

[তলার দিক থেকে কাজ আরম্ভ করতে হবে। সাদা উলে কুড়িটি ঘর তুলুন, তার পর চার লাইন বুনুন ঠ: ঠি:। তার পর ৫ম লাইন থেকে প্রত্যেক লাইনের শেষে ৫টি করে ঘর তুলে যান, যতক্ষণ না কাঠিতে ১০০টি ঘর হয়। তার পরও কিন্তু ঠ: ঠি:-এ বুনে যেতে হবে যতক্ষণ না ১১½ ইঞ্চি বোনা হয়। এইবার এক লাইন সোজা বুনে তার পরের লাইন থেকে হাতের কাঁদ তৈরী শুরু হবে। ছোটো ঘর উন্টো ভাবে এ: স:, ৩টে উ:, * থেকে রি: করে যান শেষ-অবধি। এখন তা হ'লে কাঠিতে ৮০টি ঘর রইলো।] এইবার ১টা সো: ১টা উ: প্যাটার্ণে ছ' লাইন বুনুন। তবে প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় ছ'টি করে ঘর বন্ধ করবেন। ৩য় লাইনের গোড়ায় এবং শেষে একটি করে ঘর কমাতে হবে। ১টা সো:, ১টা উ: প্যাটার্ণে বুনে যান এবার—৩ ইঞ্চি, ঘর না কমিয়ে। তার পর (রম্পারটির সোজা দিকে) ১টা সো:, ১টা উ: প্যাটার্ণে ২৬টি ঘর বুনে যান; পরের ২২টি ঘর বন্ধ করে ফেলুন, তার পর বাকি ২৬টি ঘর বুনুন ১টা সো:, ১টা উ: প্যাটার্ণে। ঘরগুলো ছোটো কাঠিতে ভাগ হয়ে গেল; এখন প্রতি কাঠির গলার দিকের লাইন আরম্ভ করার প্রথমেই ১টি করে ঘ: ক:—যতক্ষণ না ২৬টি ঘর কমে ২০টিতে দাঁড়ায়। এবার ঘর বন্ধ করে ফেলুন। (ছ' দিককার কাঁধ একই ভাবে বুনবেন।)

সামনের দিক

এ-দিকটি অবিকল পিঠের দিকের [] ব্রাকেট-ভুক্ত নির্দেশ-অনুসারে বোনা হবে—হাতের ফাঁদ করবার আগে পর্যন্ত যেভাবে বোনা হয়েছে। তা হ'লে আমরা কাঠিতে পাচ্ছি ৮০টি ঘর।

হাতের ঘর—এবার ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনতে হবে। প্রথম লাইনটা সমান বুনে (সোজা দিকে) আরম্ভ করতে হবে দ্বিতীয় লাইন। প্রথমেই ১টি ঘর বন্ধ করতে হবে, তার পর ৩৫টি ঘর ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে, ৪টি মঃ ষ্টিঃ, তার পর বাকী ৪০টি ঘর অল্প একটা কাঠিতে তুলে রেখে—৩য় লাইন বুনতে হবে—৪টে মঃ ষ্টিঃ, ৩৫টা ঘর ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে। ২য় ৩য় লাইন একবার রিঃ করুন।

এখন বোতামের ঘর করুন নীচের নির্দেশ-অনুসারে—

প্রথম ৩৫টি ঘর ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনুন, তার পর ১টা মঃ ষ্টিঃ, ১টা উঃ সাঃ, ১টা এঃ সঃ, ১টা মঃ ষ্টিঃ। এখন ২য় আর ৩য় লাইন রিঃ করে যান, যতক্ষণ না (অর্থাৎ যেখান থেকে প্রথম ঘর কমানো আরম্ভ হয়েছিল) তিন ইঞ্চি বোনা হয়। এবার আর একটি বোতামের ঘর করুন আগের নির্দেশ-অনুসারে। ২য় ৩য় লাইন একবার রিঃ করে গলাটি আরম্ভ করুন :—

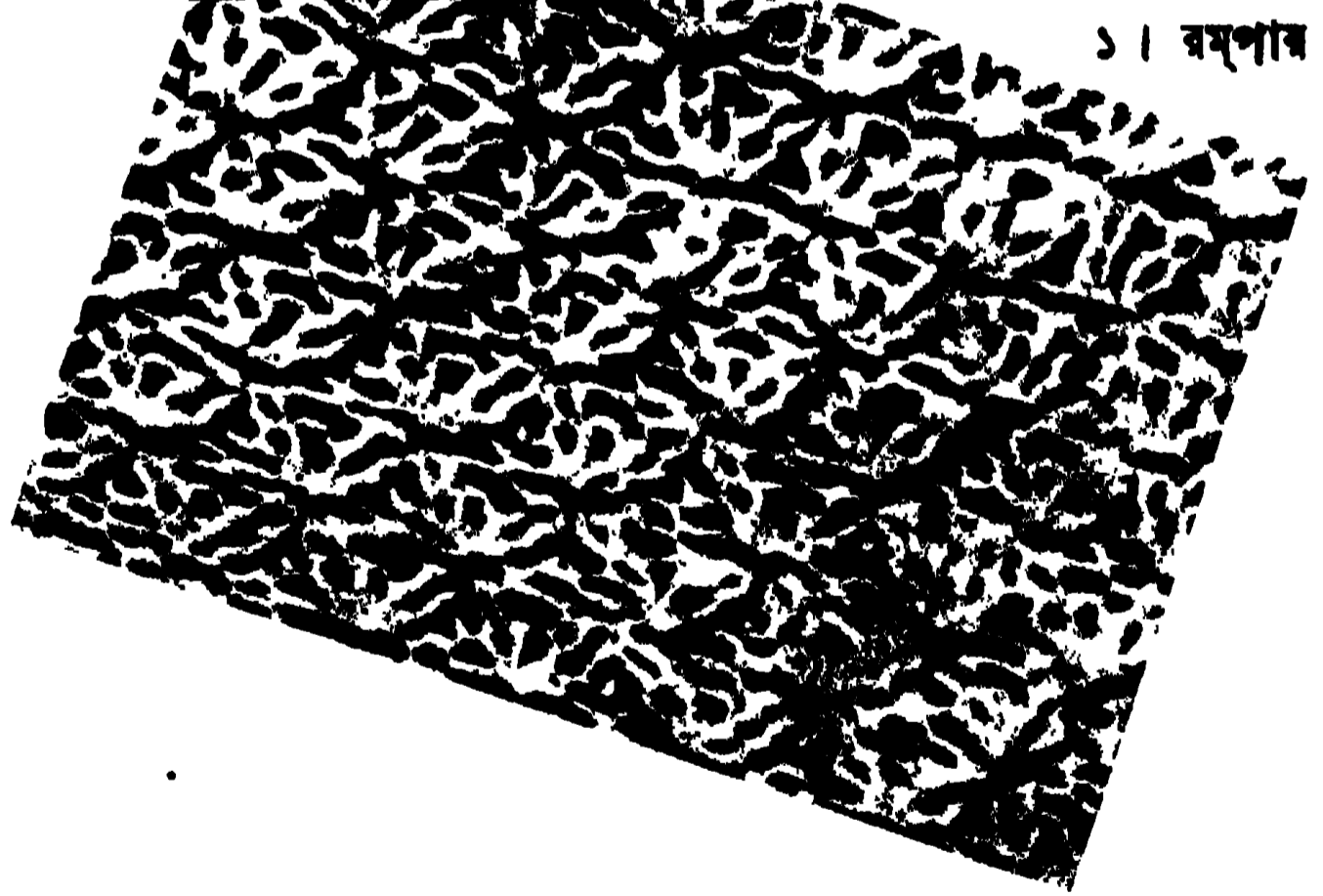
প্রথমেই ১৬টি ঘর বন্ধ করুন, তার পর গলার দিকে ১টি করে ঘর বন্ধ করে যান প্রত্যেক ২য় লাইনের গোড়ায়। এই ভাবে বুনে যখন কাঠিতে ২০টি মাত্র ঘর বাকী থাকবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলুন। এখন যে ৪০টি ঘর আর-একটি কাঠিতে রেখেছিলেন, সেগুলি ঠিক ওপরের নির্দেশ-অনুসারে বুনে যান। কেবল বোতাম

ঘর তোলার লাইনগুলোর ৪টি ঘর চার রকম ভাবে না বুনে ৪টিই মঃ ষ্টিঃ বুনবেন।

এখন সামনে-পিঠে ছ' দিকেরই অংশ বোনা হলো! এবার হাত বুনতে হবে। অবশ্য ইচ্ছা করলে হাত না বুনতেও পারেন। তা হলে কিন্তু



১। বসুপার



২। মকিং

হাতের ঘরটিতে ক্রুশ দিয়ে ছ' লাইন চেন-ষ্ট্রিচ করে দিতে হবে।

হাত (ছোটোই এক-রকম)

হাতের কজির দিক থেকে আরম্ভ। ৪০টি ঘর তুলুন সাদা উল দিয়ে। ২ ইঞ্চি বুনুন—২টো সো, ২টো উঃ

প্যাটার্ণে। তার পর ঠ: ঠি: বুনতে হবে আগাগোড়া, তবে প্রতি আট লাইন অন্তর লাইনের ছ'ধারে ২টি ঘর বাড়াতে হবে। এই ভাবে ঘর বাড়িয়ে যান, যতক্ষণ না ঘর বেড়ে সংখ্যায় ৫০টি দাঁড়ায়। তার পর কিন্তু আর ঘর না বাড়িয়ে বুনেন যান, আরম্ভ করার পর যতক্ষণ না ১০ ইঞ্চি বোনা হয়। এখন প্রত্যেক লাইনের প্রথমে ১টি করে ঘর কমিয়ে যান; কাঠিতে যখন ৩৪টি ঘর থাকবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

কলার

নীল উলে ৩০টি ঘর তুলুন। ১ম লাইন—ম: ঠি:। ২য় লাইন আরম্ভে এবং শেষে ১টি করে ঘর তুলুন, সমস্ত লাইনটি বুনুন ম: ঠি:। এর পরের প্রত্যেকটি লাইন ২য় লাইনের মতো বুনুন। যখন কাঠিতে ৪৮টি ঘর হবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলবেন। ঠিক এমনি ভাবেই আর-একটি টুকরো তৈরী করুন।

বেন্ট

নীল উলে ৬টি ঘর তুলুন। ১৯ ইঞ্চি বুনেন যান ম: ঠি:। এইবার এক লাইন অন্তর ১টি করে ঘর কমান; এ-সব ম: ঠি:-তে করবেন কিন্তু। এই ভাবে যখন কাঠিতে ২টি মাত্র ঘর থাকবে, তখন সে ছ'টি এ: স: করে উলটুকু অবশিষ্ট ঘরটির মধ্যে দিয়ে এনে টেনে নিন।

রম্পারের সামনে যে স্মকিং করা আছে, সেটি কি ভাবে করা হয়েছে খানিকটা আন্দাজ পাবেন বোধ হয় ২নং ছবি দেখে। কার্পেটের ছাঁচে নীল উল পরিয়ে নিন। এখন বুকের বা দিকটায় আগে কাজ করুন। কাঁধ থেকে স্মকিং আরম্ভ করুন। এ লাইনটি বোনা

হয়েছে ১টি সো:, ১টি উ: প্যাটার্ণে। এখন ছুঁচ আর উল দিয়ে প্রতি উ: ঘরের ছ'পাশে যে ছ'টি সোজা ঘর আছে, তাদের এক সঙ্গে সেলাই করে দিন। অর্থাৎ ২টি করে সোজা ঘর একত্র সেলাই করে যান। তার পর আগের ৩টি লাইন ছেড়ে ৪র্থ লাইনে কাজ করুন। কিন্তু এবারে সব প্রথমের সোজা ঘরটি ছেড়ে দ্বিতীয় ঘর থেকে কাজ আরম্ভ করবেন। অর্থাৎ আবার ২টো সোজা ঘর এক সঙ্গে জুড়ে নিন ছুঁচ আর উল দিয়ে। এবারে বোধ হয় বুঝতে পারছেন, একটি করে কোণ তৈরী হলো। কোণটির নীচে আর একটি কোণ করলেই বরফি-কাটা নক্সার লাইন তৈরী হবে। কিন্তু তা করতে আর বিশেষ কিছু করতে হবে না। কেবল আগের ছ'টি লাইন ক্রমাগত রি: করে যেতে হবে। এই ভাবে ১২ লাইন স্মকিং তৈরী হ'লে—ডানদিককার বুকটিতে ঠিক একই নিয়মে কাজ করুন। পিঠের দিকেও এই একই নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন।

এখন রম্পারের প্রত্যেকটি অংশই তৈরী হয়ে গেছে। এইবার এর টুকরোগুলোর ওপর অল্প-ভিজ্ঞে একটি কাপড় চাপা দিয়ে ইঞ্জি চালিয়ে নিন। তার পর এক-এক করে সব টুকরোগুলো যথাস্থানে জুড়ে নিন। এখন কলারটির ধারিতে নীল উল দিয়ে এবং ক্রুশ দিয়ে এক লাইন চেন তৈরী করে নিন। দুটো পায়ের ঘেরেও ৪ লাইন করে চেন বুনেন নীল উলে। এছাড়া বেন্টটা আটকে রাখবার জন্তু কোমরের ছ'ধারে দুটো লুপ করে নিন। এখন বুক এবং পায়ের দিকে ২টি এবং ৩টি বোতাম বসিয়ে নিলেই দেখবেন, ছবছ ছবির রম্পারের মতো কিছা তার চাইতেও ভালো দেখতে হয়েছে—যেটি বুনলেন।

উক্তি

নারীর উক্তি :—

সব চেয়ে পাই ব্যথা তার কাছে আমি

আপনারে নিঃস্ব ক'রে ভালবাসি যারে,

ছ:খ মোর এই!

পুরুষের উক্তি :—

ব্যথা-রূপে নিত্য আমি পেয়ে তারে বুক

কত স্মৃষ্টি হই জেনে ভোলেনি কো মোরে—

ছ:খ এতে নেই!

শ্রীলক্ষ্মী বিশ্বাস।

ইতিহাসের অনুসরণ

হায়দার আলির নৌ-বাহিনী

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহীশূর রাজ্যে হায়দার আলি খাঁ বা হায়দার শা নামক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষটির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম জীবনের বিশেষ কোন কথা জানিবার উপায় নাই; এবং যাহা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাও নির্ভরযোগ্য নহে। হায়দার আলির পিতা নাদিম খাঁ দশ-হাজারী মনসবদার, অর্থাৎ দশ সহস্র সৈন্যের পরিচালক ছিলেন। বাঙ্গালোর দিবাগালী-চূর্গে হায়দার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র চূর্গটি কোলার ও অন্ধোটা অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। নাদিম খাঁ এই ক্ষুদ্র চূর্গটি, এবং উহার অধিকারভুক্ত স্থানগুলি মিজাম-উল-মন্দের নিকট জায়গীরস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। হায়দার আলি আরব দেশের কোরেশী-বংশ সম্বৃত বলিয়া দাবী করিতেন। কর্নেল উইল্ক্স (Wilks) লিখিয়াছেন,—হায়দার আলির পূর্বপুরুষরা পঞ্চনদের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণপথে আসিয়াছিলেন। ইহাদের আর্থিক অবস্থা একরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভিক্ষালব্ধ অল্পে ইহাদিগকে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতে হইত। কর্নেল উইল্ক্স লিখিয়াছেন, তাঁহার ইতিহাসের উপাদান তিনি দেশীয়দিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল কথা নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাস-লেখক হিউ মারে কর্নেল উইল্ক্সের প্রদত্ত বিবরণে নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলেন; হায়দার আলির পিতার নাম ছিল ফতে মহম্মদ। তিনি একরূপ নিঃস্ব ছিলেন যে, অন্নের দ্বায় নির্ভর করিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইনি বহু কষ্টে প্রথমে মহীশূররাজ্যের সৈন্যদলে প্রবেশ করেন; কিন্তু অবশেষে ফৌজদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি দুই বার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর কোন সন্তানাদি ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে দুইটি পুত্রসন্তানের জন্ম হইয়াছিল। মারে বলেন, এই পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠটির নাম সাবাজ, এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নামই হায়দার। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ধর্গটন তাঁহার

ইতিহাসে হায়দার আলির পিতার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামের উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন, হায়দার আলি ফরাসীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করায়, তাঁহার সম্বন্ধে সমসাময়িক ইংরেজ লেখকগণের বর্ণিত বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। কিন্তু এম, এম, ডি, এল, টি নামক লেখক হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের যে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা টিপু সুলতানের পুত্র প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন; সেই জন্ত তাহা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। এই লেখকের মতে হায়দার আলির পিতার নাম নাদিম খাঁ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ইস্মাইল। এই লেখকটি ফরাসী, এবং মোগল সাম্রাজ্যের জনৈক সেনানায়ক ছিলেন। ইহার লিখিত বিবরণই প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়। ফরাসীরা তাঁহার মিত্র হায়দার আলি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ অবগত ছিলেন। এই জন্তই এই ফরাসী-লেখকের গ্রন্থ হইতে হায়দার আলির পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম, এবং বংশ-পরিচয় এখানে প্রকাশ করা হইল।

যে সময় হায়দার আলির বয়স সাত বৎসর মাত্র, সেই সময়ে তাঁহার পিতা নাদিম যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তাঁহাদের যথাসর্বস্ব শত্রু-কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হায়দারের জননী পুত্রদ্বয়সহ তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। হায়দার অতঃপর এই মাতুলের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইলেও বিন্দুমাত্র বিদ্বার্জন করিতে পারেন নাই। ২৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি না কি কিছুই করেন নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন—তিনি লাম্পটে এবং শিকারেই ঐ বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার না কি বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞান ছিল না। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকের একটি গুণ এই যে, তাঁহারা যাহাদের প্রতিকূল, তাঁহাদের নিন্দাবাদে অত্যন্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন। হায়দার ২৭ বৎসর বয়সে সর্বনিম্ন শ্রেণীর সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু ঐ কার্যে

তিনি দ্রুত উন্নতি-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি মহীশূরের হিন্দু নরপতির সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া অসাধারণ যোগ্যতা-বলে কিছুকাল মধ্যেই মহীশূর রাজ্যের অগ্রতম শাসনকর্তার পদ অধিকার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনকাহিনী বিচিত্র হইলেও নিষ্কলঙ্ক ছিল না। তবে সিংহাসন অধিকারের পর তাঁহার চরিত্রের বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং প্রজাবর্গের সকল অভাব-অভিযোগের কথা শ্রবণ করিতেন; এবং তাঁহার জ্ঞান এবং বিশ্বাসমতে যাহা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইত, সেই ভাবেই তিনি অপরাধীর বিচার-কার্য সম্পন্ন করিতেন। এ স্থলে হায়দারের একটি বিচারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে, তাহা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলি কোইম্বাটুরে ছিলেন; সেই সময় এক দিন অপরাহ্ন পাঁচটার সময় তিনি অনুচরবর্গসহ ভ্রমণে বাহির হন। তিনি কিয়দূর অগ্রসর হইলে, পশ্চিমার্শে দণ্ডায়মানা একটি প্রৌঢ় রমণী মাটীতে লুটাইয়া-পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—“আমি বিচার চাহি!” হায়দার তৎক্ষণাৎ তাঁহার শব্দটির গতিরোধ করিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার নিকট উঠিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। রমণী নিকটে আসিলে, তিনি তাহাকে তাহার কি প্রার্থনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটি কাতরভাবে বলিল, “হুজুর, আমার একটিমাত্র কন্যা; আগা মহম্মদ তাহাকে আমার নিকট হইতে বলপ্রকাশে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।” হায়দার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আগা মহম্মদ মাসাধিক পূর্বে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে; এত দিন তোমার অভিযোগ না করিবার কারণ কি?” স্ত্রীলোকটি কহিল, “হুজুরের দরবারে আমি অনেকবারই আবেদন করিয়াছি; কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। আমার দরখাস্ত আমি হায়দার শাহ’র হাতে দিয়াছিলাম।”—এই হায়দার শাহ’ অভিযোগকারিদিগের দরখাস্ত নবাবের নিকট পেশ করিত, এবং তাহাদিগকে নবাবের নিকট লইয়া যাইত। সে সরকারের অগ্রতম পদস্থ কর্মচারী ছিল। সে আহ্বানমাত্র হায়দার আলির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল,—“এই নারী ও উহার কন্যা উভয়েই বারাজন। ইহারা অত্যন্ত হীনভাবে জীবনযাপন করে।

উহার প্রার্থনা হুজুরের শ্রবণের অযোগ্য।”—নবাব এই জবাব শুনিয়াই রাজপ্রাসাদে গাড়ী ফিরাইতে বলিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে প্রাসাদে গমন করিতে আদেশ করিলেন। নবাব-দরবারের সকল আমলাই এই ব্যাপারে অত্যন্ত সজ্জন্ত এবং আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হায়দার শাহ’ নবাব-সরকারের সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল; কিন্তু কেহই তাহার অনুকূলে নবাবকে কোন অনুরোধ করিতে সাহস করিল না। অবশেষে যুরোপীয় সেনাপতি নবাবকে তাহার অনুকূলে অনুরোধ করিলে হায়দার আলি বলিয়াছিলেন,—“আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রজা যে আবেদন করিবে, তাহা রাজার গোচর না করা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। শক্তিহীন এবং দুর্বল ব্যক্তি যাহাতে গ্ৰায়বিচার প্রাপ্ত হয়, শক্তিমান নৃপতির তাহা দেখা কর্তব্য। ভগবান রাজাকেই দুর্বল প্রজার একমাত্র রক্ষক করিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় যে নৃপতি প্রজার প্রতি অত্যাচারে উদাসীন থাকেন, এবং অত্যাচারীর প্রতি দণ্ডবিধান না করেন, তিনি প্রজার প্রীতিলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।” তিনি তখন সাধারণের দৃগ্ভূমিতে হায়দার শাহ’কে স্থাপন করিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুই শত বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। এই আদেশ অবিলম্বেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার শরীররক্ষী হাবসী অশ্বারোহী সেনাপতিকে আদেশ দিয়াছিলেন, সে সেই নারীকে সঙ্গে লইয়া আগা মহম্মদের বাসগ্রামে যাইবে; যদি তথায় তাহার কন্যাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে যেন প্রত্যর্পণ করা হয়, এবং রক্ষী যেন আগা মহম্মদের ছিন্ন-মস্তক লইয়া আসে। বলা বাহুল্য, হাবসী-সর্দার আগা মহম্মদের অবরোধে সেই যুবতীকে পাওয়ায় আগা মহম্মদের ছিন্ন-মুণ্ড আনিয়া হায়দার আলিকে প্রদর্শন করিয়াছিল। অথচ আগা মহম্মদ মুলতান হায়দার আলি খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। সে পঁচিশ বৎসরকাল হায়দার আলির পেশকারের কার্যে নিযুক্ত ছিল। তাহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব তাহাকে বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন। যে সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সময়ে আগা মহম্মদের বয়স ৬০ বৎসর। সে ঐ যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার মাতার

অসম্মতিতে তাহাকে ধরিয়ে লইয়া গিয়াছিল। হায়দার আলি বলিতেন, “যে ব্যক্তি নারী ধর্ষণ করে, কোরাণের বিধান এই যে, তাহাকে বধ-দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে।” এ-কালের মুসলমানগণের এ কথা স্মরণ রাখিবার যোগ্য। এই দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে—হায়দার আলির প্রিয়পাত্রগণ অপরাধ করিলে, তিনি তাহাদিগকেও দণ্ড-দান করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দু-মুসলমান সকলের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন। তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতার সাহায্যে মহীশূরের হিন্দু নরপতিকে বন্দী করিলেও সাধারণ লোক তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরূপ হয় নাই।

হায়দার আলি ইংরেজদিগের প্রবল শত্রু ছিলেন। তিনি ফরাসীদিগের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরেজদিগের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন। স্থলে তাঁহার সৈন্যবল প্রবল ছিল; কিন্তু তীক্ষ্ণদর্শী হায়দার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রবল নৌবাহিনী ভিন্ন তাঁহার পক্ষে সাগরতীরস্থ স্থানগুলি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং তিনি একটি প্রবল নৌবাহিনী গঠন করিবার জন্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্ত তাঁহার সৈনিকদিগকে ফরাসীদিগের নেতৃত্বে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। ইংরেজ জাতি সাগরে বিশেষ বলবান ছিলেন। পর্তুগীজরাও তাঁহাদের নৌবহরের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেন। পেশোয়ারেরও নিজস্ব এক রণতরী-বাহিনী ছিল। মালাবার উপকূল অঞ্চল জয় করিবার ফলে তথাকার প্রসিদ্ধ বন্দরগুলি হায়দার আলির অধীনে আসিয়াছিল। ঐ সকল বন্দর ইংরেজ কর্তৃক আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্ত হায়দার আলি (তখন ‘হায়দার নায়ক’ নামে পরিচিত) ক্ষিপ্ততার সহিত একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত কারিকর এবং পোত-নির্মাণের তত্ত্বাবধারকের অভাবে নৌবাহিনী গঠন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়াছিল। বিশেষতঃ, নৌবাহিনী পরিচালন-কার্যে অভিজ্ঞ কর্মচারীও তাঁহার ছিল না। কর্ণেল উইল্‌কিন্স একবার মাত্র তাঁহার নৌবাহিনীর উল্লেখ

করিয়াছেন। কাপ্তেন লো বরং হায়দার আলির নৌবল সম্বন্ধে তদপেক্ষা বিস্তৃততর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন পর্তুগীজদিগের লিখিত বিবরণ হইতেও হায়দারের নৌবল-সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। কাপ্তেন লো তাঁহার “ভারতীয় রণতরীর ইতিহাস”* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার তাঁহাদের এক-বহর রণপোত, চারি শত সৈন্য, এবং বহুসংখ্যক সিপাহী হায়দার আলির অধিকারভুক্ত মালাবার উপকূল অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উত্তম সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। এই অভিযানকারী পোতসমূহ ওনোরের সান্নিধ্যে অর্থাৎ হোনাবারে হায়দার আলির নৌ-নির্মাণ স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিল। হায়দার আলি নৌবাহিনী-পরিচালনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আলি বে (লতিফ আলি বেগ ?) নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক আলি বেকে এই পদে নিযুক্ত করায় নবাবের নৌ-বিভাগের পদস্থ কর্মচারীরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, আক্রমণকারী ইংরেজ নৌবাহিনী নিকটস্থ হইবামাত্র হায়দার আলির নৌবাহিনী হইতে দুইখানি জাহাজ, দুইখানি ত্রিমাঙ্গুল-বিশিষ্ট যুদ্ধ-জাহাজ (Grab), এবং দশখানি গ্যালিভাট শ্রেণীর জাহাজ আক্রমণকারীদিগের দলে যোগদান করে; সুতরাং ইংরেজরা একপ্রকার বিনাযুদ্ধেই ওনোর এবং ওনোর নদীর মোহনা-সন্নিহিত সুদূর কিল্লাসহ দ্বীপটি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, হায়দারের পক্ষে ঐ নৌবাহিনী থাকায় বরং তাঁহার ক্ষতিই হইয়াছিল। কারণ, স্থল-যুদ্ধে নবাব সুদক্ষ ও রণকুশল সেনাদলের সাহায্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেও জলে তাঁহার নিজের জাহাজই শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিয়াছিল। ইংরেজের জাহাজ ওনোর জয় করিয়া ম্যাঙ্গালোরে প্রস্থান করে। হায়দার আলি তাঁহার নৌ-বাহিনীর পরিচালনায় অশিক্ষিত আলি বেকে তাঁহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহার কারণ, তিনি যুরোপীয়-দিগকে বিশ্বাস করিতেন না। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

* Low's History of the Indian Navy vol. I.

আরম্ভ হইলেই উহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহা-
দিগের দলে যোগদান করিত।

যাহা হউক, এই ব্যাপারে হায়দার আলি মর্মান্তিক
দুঃখিত হইলেও বিন্দুমাত্র ভগ্নোদ্গম বা নিরুৎসাহ হন নাই,
ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি দ্বিগুণ তৎপরতার সহিত
তাঁহার নৌ-বাহিনী পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।
তাঁহার সমসাময়িক কোনও পর্তুগীজ একখানি পত্রে
যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, উইল্ফ্র
এবং লো তাঁহার নৌ-বাহিনী যেরূপ হীনবল বলিয়া বর্ণনা
করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা সেরূপ দুর্বল ছিল না।
এই পর্তুগীজ পত্রলেখক লিখিয়াছেন, হায়দার আলি তাঁর
নৌ-বাহিনী এ ভাবে বর্ধিত হইতেছে যে, উহা যুরোপীয়-
দিগের শঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আরও
লিখিয়াছেন, “আপাততঃ আমরা হায়দার আলিকে
জলদস্যু নামে অভিহিত করিলেও তাঁহার নৌ-বাহিনী
যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে তিনি জলপথে শীঘ্রই
প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া জলযুদ্ধে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া
উঠিবেন। ভাগ্যলক্ষী তাঁহার অনুকূল হইলে তিনি হয়
ত আমাদিগের সর্বনাশ-সাধনে সমর্থ হইবেন।” এই
সময়ে হায়দার আলির নৌ-বহরে ত্রিশখানি রণতরী, এবং
বহুসংখ্যক সৈন্য-সমন্বিত মালবাহী জাহাজ ছিল। এক
জন ইংরেজ এবং কয়েক জন যুরোপীয় তাহা পরিচালিত
করিতেন।

উইল্ফ্র এবং লো এই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেন
নাই। হায়দার আলির নৌ-বিভাগের যুরোপীয়
পরিচালক যে ইংরেজ ছিলেন, এ কথা ঐ দুই জন
ইংরেজ ইতিহাস-লেখক কোন স্থানে প্রকাশ করেন
নাই,—ইহা উক্ত পর্তুগীজ লেখকের বর্ণিত বিবরণ
হইতেই জানিতে পারা যায়। যে সময়ে দক্ষিণাপথে
ইংরেজে ও ফরাসীতে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়
কোন ইংরেজ নৌ-যোদ্ধা ইংরেজের বৈরী হায়দার
আলির নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান
করা অসাধ্য। হায়দারের নৌ-বাহিনীর যুরোপীয়
অধ্যক্ষ এবং তাঁহার সহকারী যুরোপীয়রা কোন্
দেশের অধিবাসী ছিলেন, ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণ
তাহা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা যে কত দিন পর্যন্ত

হায়দার আলির নৌ-বিভাগের পরিচালন-কার্যে নিযুক্ত
ছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে
ওনোরের নৌযুদ্ধে যে সকল জাহাজ হায়দার আলির
পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিশ্বাসঘাতকের ঞায় ইংরেজ-
নৌ-বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের অধ্যক্ষগণ
কোন্ দেশের লোক ছিল, ইতিহাস-লেখক কাণ্ডেন লো সে
সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নীরব। কর্ণেল উইল্ফ্র ও ঐ পত্রে অবলম্বন
করিয়াছিলেন। পর্তুগীজ লেখকটি হায়দার আলির
নৌ-বিভাগের যে অধ্যক্ষের কথা বলিয়াছেন, তিনি ১৭৬৮
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হায়দারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন কি না,
তাহাও জানিবার উপায় নাই। তবে এ কথা সত্য যে,
এই সময়ে ভারতবাসীরা যে সকল যুরোপীয়কে নিজের
অধীনে সামরিক-কার্যে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহাদের
অনেকেই, যুরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে
যুরোপীয়দিগের পক্ষেই যোগদান করিতেন; এই ভাবে
অন্নদাতা প্রভুর সর্বনাশ করিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ
করিতেন না! দৌলতরাও সিদ্ধিয়ার কতকগুলি সামরিক
কর্মচারী এরূপ কার্য করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-
পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে; তবে ঐ সকল বিশ্বাসঘাতক
যুরোপীয়ের সকলেই ইংরেজ ছিলেন না।

জোস্ পেড্রো ডে কোমারা (Jose Pedro de
Comara) নামক পর্তুগীজ-লেখক ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এক
পত্রে লিখিয়াছেন, জোজ আজেলার্স নামক কোন
ওলন্দাজের নেতৃত্বে হায়দার আলি ভাটকল (Bhatkal)
বন্দরে নূতন এক দল শক্তিশালী নৌ-বাহিনী সংগঠনের
জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, হায়দার
আলি স্থল-যুদ্ধে যেরূপ অজেয় হইবার জন্ত সচেষ্ট
ছিলেন, জলযুদ্ধেও সেইরূপ প্রাধান্যলাভের চেষ্টা
করিতেছিলেন। সেই জন্ত তিনি দক্ষিণ উপকূলে বহু
রণতরী প্রভৃতি নিৰ্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ
পর্যন্ত তাঁহার আটখানি তিন মাস্তুলযুক্ত যুদ্ধজাহাজ ছিল।
প্রত্যেক জাহাজে ২৮টি হইতে ৪০টি করিয়া কামান ছিল।
ইহা ভিন্ন তিনি আরও ৮খানি ক্ষুদ্রতর তরী (Palas)
নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন। উহা সাগরে সাগরে বিচরণ
করিত। আরও লিখিত হইয়াছিল, “সম্প্রতি তিনি এক
প্রহ অজেয় রণতরী নিৰ্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ওনোরের নিকট—অস্ট্রেলিয়ার নিকট তাঁহার নৌ-বহর নির্মাণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।” যে ওলন্দাজের হস্তে নবাব হায়দার আলি এই রণতরী-নির্মাণের ভার দিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে জাহাজ নির্মাণের এক জন মিস্ত্রী মাত্র ছিল। অথচ সে হায়দার আলিকে বলে, সে স্পন্দক ইঞ্জিনিয়ার! এই ব্যক্তি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন বৎসরের মধ্যে হায়দার আলিকে একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী নির্মাণ করিয়া দিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল। জোস পেড্রো বলিয়াছেন, “বিশেষজ্ঞ কারিকরের অভাবে তিন বৎসরের মধ্যে এই কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই।” উহা সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণই ছিল। ইহার পর অত্র একখানি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়,—হায়দার আলি কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যস্থিত অঞ্চল বা দোয়াব দখল করিবার পর দেখা গিয়াছিল যে, তিনি ভাটকলের নিকট যে পোতাশ্রয় প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাহার কার্য আশামুরূপ অগ্রসর হয় নাই। তাহার কারণ, উক্ত পৰ্ব্বতগুঞ্জ পত্র-লেখকের মতে, ঐ স্থানের সাগরের খাড়ি পোতাশ্রয় নির্মাণের অমুকূল ছিল না; অধিকন্তু, যে সকল ব্যক্তি ঐ কার্য-পরিদর্শনের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্রটিতে ঐ কার্যে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিতেছিল। এই পত্রখানি ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লিখিত হইয়াছিল। ইহার পর হায়দার আলি আর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না।

হায়দার আলির মৃত্যুর পূর্বে ইংরেজরা কি ভাবে তাঁহার বর্ধনশীল নৌ-শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কাশ্মির লো'র প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। তাহাতে প্রকাশ, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভারতের পশ্চিম-ঔপকূলিক নৌ-বাহিনীর পরিচালন-কার্যে নিযুক্ত সার এডওয়ার্ড হিউজেস্ কর্তৃক হায়দারের রণতরীগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ঐ সময় হায়দার আলির সহিত ইংরেজদিগের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ইংরেজের ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ সার এডওয়ার্ড হিউজেস্ তাঁহার সমগ্র রণতরী-বহর সহ ম্যাঙ্গালোরের অদূরবর্তী সাগর-বন্দে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, ঐ স্থানে হায়দার আলির নৌবিভাগীয় অস্ত্রাগার

ও পোতাশ্রয় ছিল। সার এডওয়ার্ড দেখিতে পাইলেন, জাহাজ নোঙ্গর করিয়া রাখিবার আখড়ায় দুইখানি জাহাজ, একখানি বড় তিন মাস্তলের জাহাজ (Grab), তিনখানি দুই মাস্তলধারী পোত, এবং অনেকগুলি ছোট ছোট জাহাজ নোঙ্গর করিয়া ছিল। ঐ জাহাজগুলির মাস্তলে নবাব হায়দার আলির পতাকা উড়িতেছিল। সার এডওয়ার্ড উহা দেখিয়াই থামিলেন; এবং যখন দেখিলেন, সেগুলি শক্তিশালী এবং সশস্ত্র রণতরী, তখন তিনি তাহাদের যত দূর সম্ভব নিকটবর্তী হইয়া নোঙ্গর করিলেন। অতঃপর তিনি বোম্বাই রণতরী বিভাগের দুইখানি যুদ্ধ-জাহাজের আশ্রয়ে থাকিয়া ঐ জাহাজগুলিকে বিধ্বস্ত করিতে আদেশ করিলেন। ইংরেজ নৌ-সৈন্যগণ তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষিপ্ততার সহিত ঐ কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই বিপক্ষের দুইখানি বৃহৎ জাহাজ দগ্ধ ও বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হয়। উহাদের মধ্যে একখানি জাহাজে ২৮টি কামান, এবং অন্যখানিতে ২৬টি কামান ছিল। একখানা ছোট রণতরীতে ১২টি কামান ছিল; সেখানি পাছে শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়, এই আশঙ্কায় নবাবের অনুচরবর্গই সেখানি দগ্ধ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল। আর একখানি দশ-কামানযুক্ত ছোট জাহাজ দড়ি কাটিয়া সাগরের দিকে বাহির হইবার চেষ্টা করিলে সেখানিও ইংরেজের আয়ত্তে আসিয়াছিল। তৃতীয় ক্ষুদ্র রণতরীখানিকে অন্ত্রাণ ছোট নৌকার সহিত তীরের দিকে চাপিয়া পড়িতে বাধ্য করা হইয়াছিল। এতদ্বিন্ন, মাঝারী রণতরীখানি তাহার সমস্ত ভারী জিনিষগুলি ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়াছিল।* ইহাই লো-প্রদত্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইংরেজের আকস্মিক আক্রমণেই হায়দার আলির নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে হায়দার আলির নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত হয়, এবং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে দুর্শ্চকিৎস কৰ্কটরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

কর্ণেল কার্ক প্যাট্রিক লিখিয়াছেন,—হায়দার আলি নৌ-বাহিনীর গঠনে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই।

* Low's History of Indian Navy vol. I p. 178.



কিন্তু পর্তুগীজদিগের প্রদত্ত বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারা যায়, ঐ উক্তি সত্য নহে। হায়দার বুঝিতেন,— নৌ-বাহিনী ব্যতীত তাঁহার পক্ষে ইংরেজদিগকে সম্পূর্ণ বাধা দেওয়া সম্ভব হইবে না। সেই জন্ত তিনি নৌ-বাহিনী গঠনে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার পক্ষে অসুবিধাও অনেক ছিল। যুরোপীয়দিগের সমকক্ষ নৌ-বহর প্রস্তুত করিতে হইলে যুরোপীয় ইঞ্জিনিয়ার ও কারিকরের প্রয়োজন; কিন্তু তিনি তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি ফরাসীদিগের নিকট হইতে ঐরূপ বিশেষজ্ঞ কারিকর কেন যে গ্রহণ করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ, ঐরূপ বিশেষজ্ঞ ফরাসী তখন এ দেশে অধিক আসিত না। তিনি জ্ঞানিতেন, তাঁহার আমলে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা তরী-নির্মাণে স্পৃহা; তিনি প্রথম এক জন ইংরেজকেই ইহার অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। কিন্তু কি কারণে তিনি আর কোন ইংরেজকে ঐ পদ প্রদান করেন নাই,

তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। যাহা হউক, নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও হায়দার আলি এমন একটি প্রবল নৌ-বাহিনী প্রস্তুত করিতেছিলেন যে, তাহার জন্ত ইংরেজ এবং ওলন্দাজ এই উভয় জাতিকেই শঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মার এডোয়ার্ড হিউর্জেস তাঁহার রণতরী-বহর সহসা বিধ্বস্ত করিবার পর তিনি আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু অনেকে বলেন যে, তাঁহার বয়স কত হইয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। কোন ফরাসী-লেখক বলিয়াছেন, তাঁহার পরিজন-বর্গের বিশ্বাস, তিনি ৮২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি ৪৪ বৎসর বয়সে প্রথমে সৈনিকের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তিনি ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন) ।

শীত আসে

শীত আসে আর হিম আসে ওই ঠাণ্ডা হিমালয় হ'তে,
শীত আসে আর পত্র ঝরে গহন বনের শয্যাতে ;
শীত আসে আর মৃত্তিকা সে সঙ্কুচিত লজ্জাতে,
শীত আসে আর পুষ্প মরে আড়ষ্টতার ভয় হ'তে !

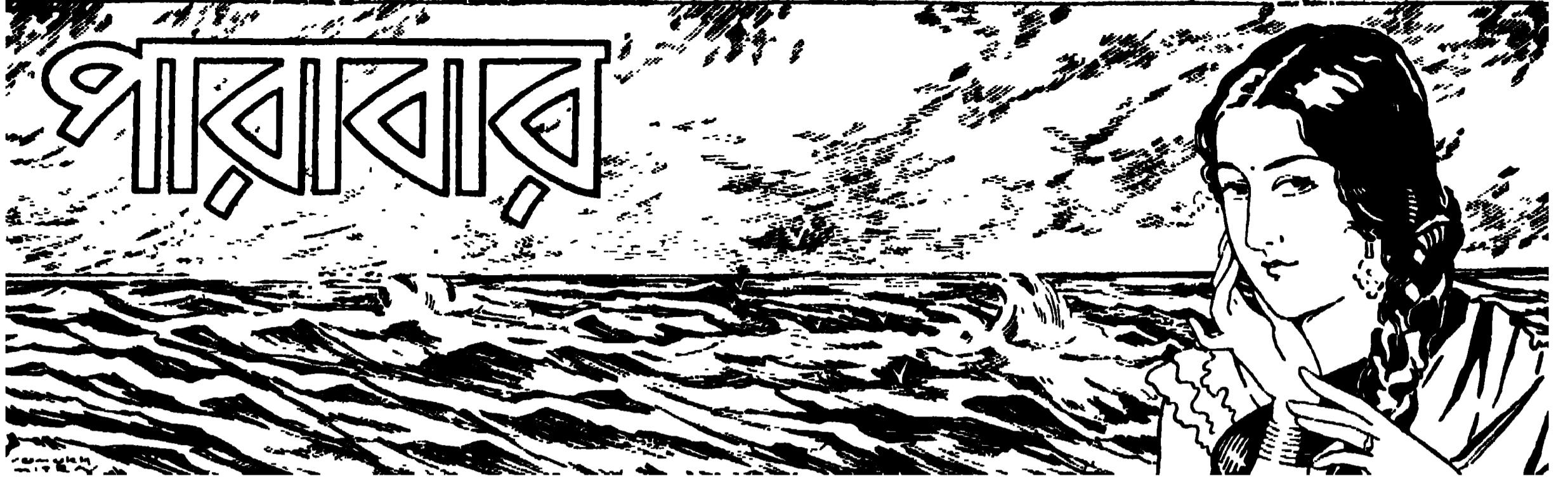
ধূসরতার সৃষ্টি বুঝি রান্ধসী-শীত জয় করে,
কুঞ্জাটিকা-কয়লা এবং ধূলায় সমাকীর্ণ সে ;
মোমের মতো দীপ্তিহারা চন্দ্র হ'ল শীর্ণ যে ;
শীত আসে আর রুদ্ধতা তার সজলতা ক্ষয় করে !

কোথায় প্রজাপতির নাচন ?—কুঞ্জ কাঁদে শূন্যতায়,
তুষার ঝরে মৃত্যু সম, রিক্ত ধরার ক্ষেত্রতে ;—
মাঘের বায়ু বাঘেরও আয়ু ভাঙছে যেন বেত্রতে ;
রৌদ্র-তাপে মূর্ছাহত উঠছে নদে বাষ্প হায় !

শীত আসে আর হিম আসে ওই বরফ-সাগর সব চূয়ে,
দস্তে তাহার তীক্ষ্ণ কি বিষ ক্ষুরের মতো রক্ষিত ;
ক্ষুদ্র বেলা গড়িয়ে চলে, কুলায় কাঁপে পক্ষী তো !
শীত-গোধূলি কখন মরে খেজুর-বনের ধার ছুঁয়ে !

প্রোতের মতো শীত আসে ওই তীক্ষ্ণ টানের দিন ধরি,—
সজ্জনে ঝরে—সুপারী গাছ কাঁপছে করুণ মস্তুরে ;
কিসের ব্যথা—কোন্ হাহাকার ঝিল্লী-স্বরের অন্তরে ;
বক্ষ্যা ধরা বিবর্ণতার নিঃশ্বাসে কার যায় ভরি !

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়



বিবাহের পর ও-বাড়ীতে বাসরের আমোদ।

বধূ নন্দরাণী ডাকিল—মা...

মা বলিলেন,—কেন ?

নন্দরাণী বলিল—তোমার কুটুম-বাড়ীর দু'টি মেয়ে এসেছে, মনে রেখো। বিয়ে দেখলেই তাদের পেট ভরবে না! তুমি বসে থেকে তাদের খাইয়ো...ভিড়ের মধ্যে ওদের গুঁজে দিয়ো না যেন!

মা বলিলেন,—না রে, তোরা তিন জনে একসঙ্গে বসে খাবি। সে-ব্যবস্থা আমি কি না করেছি ?

তিন জনে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছিল। আহারের সঙ্গে হাসি-গল্প...

হঠাৎ কিরণ চাহিল নন্দরাণীর মায়ের পানে, বলিল,—এ কি রকম হলো মাসিমা! কনেকে তো আজ বরের সঙ্গে বাসরে এক-পাতে খেতে হয়। আমাদের চিরকালের সে-রীতি ত্যাগ করলেন কি বলে ?

মা হাসিলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

ঠাকু'মা-সম্পর্কীয়া এক জন বিধবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—লোক দেখিয়ে নন্দরাণী আজ খেলে না গো! এর পর থেকে তাই খাবে। আজ তোমাদের কৃতার্থ করে দিচ্ছে আর কি! তোমরা আর ওকে পাশাপাশি আসনে বসে একসঙ্গে খাবার জন্মে পাবে না কি ?

কিরণ চাহিল নন্দরাণীর পানে, কহিল—তাই না কি বৌদি? কিঙ্ক শাস্ত্রে-পুরাণে এমন কথা লেখা নেই! লেখা আছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ এনে মায়ের অন্নই চান পড়ে। নন্দদের অন্নর কথা কৈ, কোনো পুরাণে

পড়িনি, বা এমন গল্প কোনো দিদিমা-ঠাকু'মার মুখেও শুনি নি কোনো দিন!

বীণা যেন লুচি-তরকারী লইয়া খেলা করিতেছে...

নন্দরাণীর মা বলিলেন—তুমি কিছু খাচ্ছো না কেন মা ?...লজ্জা করছে বুঝি ?

কিরণ কহিল—লজ্জা কিসের সলিলা ? খাও...

মৃদু স্বরে বীণা বলিল—খাচ্ছি...

নন্দরাণীর মাসিমা-সম্পর্কীয়া আর-একটি মহিলা বলিলেন—এইটি বুঝি তারাচরণবাবুর নাতনী ?

নন্দরাণীর মা বলিলেন,—হ্যাঁ...

মাসিমা বলিলেন,—বরাত বটে! তারাচরণবাবুর এ স্মৃদ্ধি যদি আর ক' বছর আগে হতো! আহা, তা হ'লে ছেলে দুঃখ পেয়ে যেতো না...বৌ-চারুও স্নেহের মুখ দেখতো! তাই ভাবি, মেয়েটির মায়ের কথা! বিয়ে করে যেন চোর হয়ে ছিল বেচারী!...আমি জানতুম কি না তাকে! স্বামীর অত ভালোবাসা...মুখখানি মলিন করে বলতো, আমার জন্তু উনি দারিদ্র্য-দুঃখ মাথায় নেছেন। এ-দুঃখ কখনো যাবে না আমার!

তিনি বীণার পানে চাহিলেন; বলিলেন—তোমার মার নাম ছিল চারু...না ?

বীণার বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। আবার ঐ কথা!

কোনো মতে মাথা নাড়িয়া বীণা বলিল,—হ্যাঁ।

মাসিমা বলিলেন,—ভাগলপুরে আমরা ক' বছর ছিলাম যে! উনি তখন ভাগলপুরের মুন্সেফ। আমরা থাকতুম খঞ্জরপুরে। আমাদের বাঙলার পাশে ছোট্ট দোতলা বাড়ী...সেই বাড়ীতে থাকতেন বিজ্ঞানাথবাবু। ওখানকার কলেজে প্রোফেশরি করতেন। চারু ছিল সেই বিজ্ঞানাথ বাবুর বোন।...তখন তার বয়স হবে

সত্তেরো আঠারো বছর...যেমন লেখাপড়া জানতো, তেমনি চমৎকার গান গাইতে পারতো। চমৎকার মেয়ে! হঠাৎ হলো বিদ্যানাথবাবুর বসন্ত—সাত দিনের দিন ভদ্রলোক মারা গেলেন। সলিলার বাবা সন্তোষবাবু তাঁর কি সেবাই না করেছিলেন! বিদ্যানাথবাবু মারা যাবার পর সংসার অচল হলো। তখন এই সলিলার বাবা সন্তোষবাবুই সে-সংসারকে আপনার করে বাঁচিয়ে রাখলেন!...কি চমৎকার মানুষ ছিলেন এই সন্তোষবাবু ..

এ-কথায় আনন্দ-উৎসবের আলো যেন স্নান হইয়া গেল!

নন্দরাণী বলিল,—সলিলার মুখ কি ওর মার মতো হয়েছে মাসিমা?

মাসিমা চাহিলেন বীণার পানে। ভয়ে লজ্জায় বীণার মাথা যেন পাতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! সে ঘামিয়া একশা...

মাসিমা বলিলেন,—মুখখানি তোলা তো মা, দেখি।

মুখ কি তোলা যায়! অপরাধের কালিতে মুখ ভরিয়া আছে! অথচ মুখ না তুলিলে নয়!

অতি-কষ্টে বীণা মুখ তুলিল।

মাসিমা অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—না এ-মুখ দেখে কে বলবে, সেই মায়ের মেয়ে! মায়ের মুখখানি ছিল যেন প্রতিমার মতো! মাথায় খোলো-খোলো কোঁকড়া চুল... চোখ দু'টি টানা-টানা...যেন হরিণের চোখ!...তবে মায়ের চেয়ে মেয়ের রঙে জেল্লার জোর আছে...চারু ছিল শ্রামবর্ণ!

কিরণ বলিল,—বিয়েতে আপনি গেছলেন মাসিমা? ...সন্তোষ কাকার যখন বিয়ে হয়...

মাসিমা বলিলেন,—গেছলুম বৈ কি!...আমরা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দি...আমি বরণ করেছিলুম। আচ্ছা সলিলা, তোমার দিদিমাকে তুমি ঠাখোনি? না?

বীণার মুখে জবাব নাই!

মাসিমা বলিলেন,—কি করেই বা দেখবে? চাকুর বিয়ের আট মাস পরেই তিনি মারা যান। তার পর সলিলার মাকে নিয়ে সন্তোষবাবু কাশীর কলেজে

প্রোফেসরি নিয়ে চলে গেলেন।...বিয়ের আগে তারা-চরণবাবু লোক পাঠিয়ে ছিলেন—বিয়ে যাতে না হয়—ছেলেকে বরণ করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত! নিজের চিঠি লিখেছিলেন—ত্যাগপত্র করবেন বলে শাসিয়ে! খুব রাগ করেছিলেন। ভাগলপুরে এ-কথা নিয়ে একেবারে হুলস্থল পড়ে গিয়েছিল!

বীণার খাওয়া মাথায় উঠিল!...ভয়ে তার যা হইতে-ছিল...

তার সে স্তম্ভিত ভাব লক্ষ্য করিয়া নন্দরাণীর মা বলিলেন,—তোমার এ-সব কথা এখন রাখ ভাই শিবানী,...মেয়ের মন দুঃখে-বাথায় ভরে কি রকম হয়ে গেল, ঠাখ দিকিনি! ..না মা, তুমি খাও!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাসিমা বলিলেন,—সে-দিন যখন শুনলুম, তারাচরণবাবুর স্মৃতি হয়েছে...মা-বাপ-হারা নাত্নিটিকে ঘরে এনেছেন, নাত্নি বলে বুকে নেছেন,—শুনে আমার তখন কি আক্লাদ যে হলো! মাকে জানতুম কি না! চমৎকার মানুষ ছিল সলিলার মা, আছা! স্বস্তুরের আদর-যত্ন যদি পেতো! অজস্র দুঃখ-কষ্ট ভোগ করলেও মুখখানি হাসিতে ভরে থাকতো সব সময়ে। সকলকে কত দরদ-যত্ন! মনখানি ছিল স্নেহের স্মৃদ্ধুর! সেই মায়ের মেয়ে ভগবান ভালো করুন!

এত দরদ...এত প্রার্থনা...

বীণার বুকের মধ্যে তবু আগুন জ্বলিতেছে!...সলিলার মায়ের কথা মনে হইতেছিল! সে-বুকে স্নেহের কি সমুদ্র ছিল, বীণাও তা জানে! নহিলে বীণার আজ অস্তিত্ব থাকিত না!

তাঁর সে স্নেহের খুব প্রতিদান বীণা দিতে বসিয়াছে! ...পুণ্যবতী সাধবী সতী চারুলতা...তাঁর পাশে বীণার মা অতসী?...এখানে আজ তার এত আদর...সকলে তাকে এত স্নেহ করেন, এমন ভালোবাসেন! ঘৃণাকরে যদি এঁরা জানিতে পারেন, সে সলিলা নয়, বীণা! শুধু তাই, এ-বীণা কি-মায়ের মেয়ে! যদি শোনেন, তার মা অতসী এক দিন...

ঐ শ্রীপতি...

হায় রে, সব ভুলিয়া মানুষের মতো বাঁচবে ভাবিয়া কি দুঃসাহসে ভর করিয়া বীণা এখানে আসিয়াছে! স্বপ্নে

ভাবে নাই, এখানে এত দিক দিয়া তার এ দুঃসাহসিকতার, তার এ স্মগতীর প্রতারণা-অভিসন্ধির রহস্য-ভেদের এমন বিপুল ইঞ্জিত এ-বাড়ীতেও এই মাসিমার হাতে আছে! কথায়-কথায় মাসিমা যদি চাকরুতা দেবীর সম্বন্ধে, সন্তোষবাবুর সম্বন্ধে আরো পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন? বীণা তার কি জবাব দিবে? তাঁদের কতটুকু কথা—সে তার কি জানে! এঁরা তাদের কথা জানেন অনেক-বেশী!...

মনে-মনে ঠাকুর-দেবতাদের ডাকিয়া বীণা বলিল,—কোনো মতে এ সঙ্কটে উদ্ধার করো, ঠাকুর! এখান হইতে কোনো মতে নিরাপদে আমায় বাহির করিয়া দাও! এত আদর, এত ভালোবাসা আমার কেন সহিবে? এ ভালোবাসা, এ আদর আমাকে নয়! এ আদর সলিলাকে! এ ভালোবাসা সলিলার জন্য! চোর সাজিয়া আদর-ভালোবাসা আদায় করাও এমন কঠিন, তা সে জানিত না!

নিত্য-দিন নব-নব উপসর্গ ..

সে-দিন কতখানি সুখ, কতখানি আনন্দের মাঝখানে ঐ শ্রীপতি আসিয়া দেখা দিয়াছে! সে আতঙ্ক মনের উপর জমাট বাধিয়া আছে...এখনো মিলাইবার অবসর মিলে নাই! ইহারি মধ্যে এখানে আবার এ কি আজ নূতন উপসর্গ!

ভয়ে সে কাঁটা হইয়া গেল! কে জানে, কাল সকালে কোথা হইতে আবার নূতন কি উপসর্গ আসিয়া দেখা দিবে!

কেন সে এখানে আসিয়াছিল?

ক্ষীরোদাময়ী তাকে অনাদর করেন নাই—অবহেলা করেন নাই। নিজের ছেলেদের সঙ্গে সমান-আসন দিয়া তাকে নিজের মেয়ের মতোই দেখিতেন। তার মাকে লইয়া শ্রীপতির যে সব পীড়ন-অত্যাচার সহ করিয়াছেন, সে পীড়ন সহিবার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল? যাচিয়া এতখানি অত্যাচার পরের জন্ত কেহ সহে না! সহিতে পারে না!

সেই ক্ষীরোদাময়ীর স্নেহ ভুলিয়া, ছশ্চিন্তার পাথরে তাঁর মনটাকে পিষিয়া-ছেঁচিয়া চোরের মতো সে পলাইয়া আসিয়াছে! এতখানি অকৃতজ্ঞতা...ভগবান তার শাস্তি দিবেন না, এ কখনো সম্ভব?

বীণা ভাবিতেছিল, আর নয়! চোর সাজিয়া যদি বা দিন কাটানো সম্ভব হয়...সে-চৌর্য্য ধরা পড়িলে যে-লাঞ্ছনা...সে লাঞ্ছনার মতো দুর্ভোগ আর নাই!...

ভাবিল, ঘটনাচক্র যে-ভাবে ঘুরিতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে দু'-এক দিনের পর তার চৌর্য্য যদি ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে বীণা তাহাতে বিন্দু-মাত্র আশ্চর্য্য হইবে না!

সে দুর্ভোগ ঘটবার পূর্বে এখান হইতে পালানো যদি সম্ভব হয়!

কিন্তু কোথায় যাইবে? এখানে এ সহর...সে চেনে না...জানে না!...কাশী তার চেনা জায়গা!

কাশীতেই যাইবে!

ক্ষীরোদাময়ীর কাছে?

তাই! গিয়া তাঁর পায়ে উপর পড়িয়া বলিবে, বড় লোভ হইয়াছিল...তাই গিয়াছিলাম, মাসিমা!...আর কখনো যাইব না! তোমার পায়ে পড়িয়া থাকিব...যত দিন তুমি পায়ে রাখিবে!

সেই ঠিক...

এখানে এই নন্দরানী...কিরণ...কিরণের মা প্রতিমা দেবী...বাবা হিরণ্য...এঁরা তার কোনো অনিষ্ট করেন নাই! ইহাদের সঙ্গে এ প্রতারণা করিবার তার প্রয়োজন ছিল না! সাধ করিয়া ইহাদের সে প্রতারণিত করিতে আসে নাই! কিন্তু এ-কথা কে বিশ্বাস করিবে? কে বুঝিবে, কি ঘটনা-চক্রে...

এ ঘটনা...ইহাও বীণাই সৃষ্টি করিয়াছে...এঁরা সৃষ্টি করেন নাই! তার উপর ঐ বৃদ্ধ তারাচরণ রায়...

সন্তোষ মামা...চাকরুতা দেবী সলিলা...তাঁদের প্রতি তারাচরণ রায় যত রূঢ় আচরণ করুন, বীণার উনি কোনো ক্ষতি, কোনো অনিষ্ট করেন নাই! উঁহার সঙ্গে এ ছলনা, এত-বড় প্রতারণা কি বলিয়া বীণা করিতে আসিল? উঁহার বুকের উপর যে-আসনে উনি বীণাকে বসাইয়াছেন...ওঁর এই অগাধ ঐশ্বর্য্য...এ সব উনি বীণাকেই দিবেন। এ প্রতারণায় বীণা কত লোককে ঠকাইয়া তাদের কত-কি ছিনাইয়া লইতেছে! এ প্রতারণায় বঞ্চিত হইবেন প্রথমেই ঐ দাক্ষায়ণী দেবী...দাক্ষায়ণী দেবীর মেয়ে বিরজা...তাঁর ছেলে...

মাথার মধ্যে দপ-দপ করিতে লাগিল। চারি দিককার কল-কোলাহল, উৎসব-রব সব মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বীণার চেতনাও যেন লুপ্তপ্রায়! সে কি করিতেছে...কি করিবে, খেয়াল নাই, হুঁশ নাই!

কিরণের কথায় হুঁশ হইল। কিরণ বলিল—দুমে পাতের উপর ঢুলে পড়ছো যে সলিলা! ওঠো, আঁচিয়ে বিছানায় একটু গড়িয়ে নাও না হয়...

নন্দরাণীর মা বলিলেন,—রাত্রে এইখানেই থাকো মা। এত ঘুম পাচ্ছে...

কিরণ বলিল—দাছ ভাববেন...

নন্দরাণীর মা বলিলেন,—তাকে খপর পাঠিয়ে দেবো। তুমিও থাকো কিরণ.. সলিলাও থাকবে। খানিকটা ঘুমিয়ে নিলেই ওর এ-ভাব কেটে যাবে'খন...কি বলো মা? শুধু ঘুম পাচ্ছে? না, শরীর অসুস্থ বোধ করছো?

কম্পিত কণ্ঠে বীণা বলিল—বড় মাথা ধরেছে...

নন্দরাণী বলিল—তা হ'লে শুয়ে পড়ো'গে...

নন্দরাণীর মা বলিলেন—আমার ঘরে ভিড নেই। ও-ঘরে কাকেও যেতে দেবো না। আমার ঘরে আমার বিছানায় তুমি শোবে চলো মা। বাড়ী যদি যেতে হয়, বেশ, একটু ঘুমোও...ঘুমুলে মাথাটা যদি ছাড়ে, শরীর সুস্থ বোধ করো, তা হ'লে যেয়ো। আজকের দিনে ফিরতে বেশী রাত হ'লে দাছ ভাববেন না...কেমন?

২১

পরের দিন সকালে বধু-বরণ দেখিতে বীণা আর ও-বাড়ীতে গেল না। তার মন ভরিয়া যে-আতঙ্ক...

রাত্রি বলিয়া নিজের মনকে কোনো রকমে কাল লুকাইয়া রাখিয়াছিল! তার হীনতা.. তার চলনা কারো চোখে ধরা পড়ে নাই! কিন্তু আজ যদি এ দিনের আলোয়...

কে জানে, কোথা হইতে কারা সব আত্মীয়-জন বা অল্প পাঁচ রকমের লোক আসিয়া হাজির হইবে...মস্ত ভিড! সে ভিড়ে কারো চোখে তার এ মিথ্যা বেশ, মিথ্যা পরিচয়, তার সব মিথ্যা যদি ধরা পড়িয়া বিপদায় গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া তোলে? রাত্রে কাল তার চোখে

ঘুমের ছায়া আসিয়া দেখা দেয় নাই! যে-হুঁশিয়ায় রাত্রি কাটিয়াছে...

সকালে দাছ আসিয়া তার পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—এ কি চেহারা দিদি! অসুস্থ করেনি তো?

—না...

তারাচরণ রায় একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বীণার কপালে হাত রাখিয়া দেখিলেন, বলিলেন,—অনেক রাত্রির অবধি জাগা...এর মধ্যে উঠলে কেমন, দিদি? আর-একটু ঘুমোও...

—না...

উঠিয়া মুখ-হাত ধুইবার পর হইতে কেবলি মনে হইতেছে, এ-ভাবে এখানে থাকা চলে না! থাকা উচিত নয়!...ধরা পড়ার কথা নয়! মানুষকে ঠকাইয়া তার টাকা-পয়সা আদায় করা তাহাতে যে-অপরাধ, যতখানি পাপ হয়, এ-ভাবে প্রতারণা করিয়া স্নেহ-আদর আদায় করাতেও তেমনি অপরাধ, ঠিক ততখানি পাপ..

তাই সে স্থির করিয়াছে, তারাচরণকে সব কথা লিখিয়া এ অপরাধের জন্ত ক্ষমা চাহিবে। তার পর চলিয়া যাইবে। কাশীতে নয়! কোণায় যাইবে, জানে না, তবে এখানে আর থাকিবে না...

না...না...থাকিবে না।

চিঠিতে ভালো করিয়া বুঝাইয়া লিখিবে যে, ধন-ঐশ্বর্যের লোভে সলিলা সাজিয়া সে এখানে আসে নাই। সে আসিয়াছিল স্নেহের কাঙাল হইয়া। সেই সঙ্গে এ-ইচ্ছাও মনে ছিল...তারাচরণ রায়ের যে-পরিচয় সন্তোষ-বাবুর কাছে ও চারুলতা দেবীর কাছে এক দিন শুনিয়াছে, শুনিয়া অবধি তার ইচ্ছা হইত, তাঁর স্নেহাতুর হৃদয়ের শূন্যতা সে যদি একটুও পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে...

তখন ভাবে নাই, স্নেহের এ-পিপাসা মিটাইতে গেলে কত দিক দিয়া কতখানি বিরোধ, কতখানি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়...আর-পাঁচ জনকে কতখানি বঞ্চনায় নিষ্কপ করিতে হয়! তার উপর স্নেহের ধারা...সে-ধারা রক্ত-মাংসের সম্পর্ক-খাত ধরিয়া যেমন সাবলীল সহজ ভাবে

প্রবাহিত হয়, এমন ভাবে নিঃসম্পর্কীয়তার খাত ধরিয়া বহিতে গেলে কত বিরোধ, কত দ্বন্দ্ব, কত দিকে কত কোলাহলের যে সৃষ্টি হয় !

সে তা জানিত না...জানিলে কখনো এমন করিয়া এ-ইচ্ছা লইয়া...

ও-বাড়ীতে বধূ লইয়া বর আসিতেছে...লোক আসিয়া বার-বার তাগিদ দিয়া গিয়াছে—সলিলা দিদিমণি এসো !

বীণা জবাব দিয়াছে—শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে...

এ-কথা না শুনিয়া কিরণ নিজে আসিল। ডাকিল,—সলিলা...

খোলা জানলার পাশে বসিয়া বীণা আকাশের পানে চাহিয়াছিল...আকাশের গায়ে পঁজা-তুলার মতো অসংখ্য ছোট মেঘ। হালুকা স্বচ্ছ মেঘের রাশি...রৌদ্র-কিরণে মনে হইতেছিল যেন নানা রঙের প্রলেপ ! বাতাসের ভরে সেগুলো ছুটাছুটা করিয়া ফিরিতেছে।

মেঘের পানে চাহিয়া বীণা ভাবিতেছিল, সে যদি হঠাৎ আজ ওমনি মেঘ হইয়া এখানকার লোক-জন, বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া আকাশে গিয়া উঠিতে পারিত...

সে চলিয়া গেলে এখানে কারো বুকের কোনো-খানে একটুও দাগ পড়ে কি না, আকাশে বসিয়া দেখিত !...

তার উপর এই যে মায়া...

এ-মায়া মনে জমিয়া কতখানি প্রসারিত হইয়াছে ! তারাচরণ রায়কে সত্যই মনে হয়, যেন কত আপন-জন...বুঝি, এত আপন পৃথিবীতে আর কেহ নাই ! বীণাকে তিনি এত ভালোবাসেন...

মনে হইতেছিল, সে সলিলা নয় ; সে বীণা...এ-কথা জানিতে পারিলে তখন উনি কি করিবেন ? বকিয়া মারিয়া বীণাকে নির্বাসন দিবেন ? না, জুগতীর স্নেহের একটি কণা...

কিরণ আসিয়া বলিল,—বেশ লোক তুমি সলিলা ! বৌ ও-দিকে এলো বলে...বাবা কখন বেরিয়ে গেছেন বৌ আনতে, বর আনতে ! আর তুমি এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো !...নাও, তাড়াতাড়ি সেজে নাও...

হুঁচোখে করুণ মিনতি...বীণা বলিল,—আমার বউ মাথা ধরেছে, ভাই।

কিরণ বলিল,—সত্যি ? কিন্তু...

বীণা বলিল,—একটু সুস্থ হলেই আমি যাবো।

কিরণ কোনো জবাব দিল না...নিরুপায় দৃষ্টিতে বীণার পানে চাহিয়া রহিল।

দাক্ষায়ণী দেবী আসিলেন, বলিলেন,—এ কি সলিলা ! এখনো বসে আছো !...বিরজা, বৌমা ওরা কখন তৈরী হয়েছে !

কিরণ বলিল—সলিলার শরীরটা ভালো নয়, পিশিমা !

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—ও...তা হলে কি করে ও যাবে ? চলো মা কিরণ, আর দেবী করে না। ও-দিকে বৌ আসবার সময় হয়েছে...

নিখাস ফেলিয়া কিরণ বীণার পানে চাহিল, কহিল—বৌ এলে একটু পরে আবার আমি আসবো। তুমি একটা ওষুধ-বসুধ খাও বরং...বুঝলে সলিলা। আমি দাতুকে বলে যাচ্ছি।...এ-সময়ে অসুখ করলে চলবে না, ভাই। তুমি অসুখ করে এ-বাড়ীতে পড়ে থাকলে বিয়ের আদ্যক আমোদ মাটা হয়ে যাবে।

কিরণ চলিয়া গেল। দাক্ষায়ণী দেবীও সেই সঙ্গে...

বীণা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল...তার পর কি মনে হইল, টেবিলের ডায়ার খুলিয়া মোটা একখানা রাইটিং-প্যাড বাহির করিয়া লিখিতে বসিল...নিজের প্রভারণার কাহিনী। লিখিল—

শ্রীচরণ-কমলেষু

দাতু...

কিন্তু কি লিখিবে ? কোন্‌খান হইতে এ-কাহিনী শুরু করিবে ? মা-অতসীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী ?...কিন্তু মা!...মায়ের কলঙ্ক-কাহিনী... মেয়ে হইয়া লিখিবে ? ছি !

হুঁচোখ জলে ভরিয়া আসিল ; এবং চোখের ঘন-বাস্পের আবরণে বাহিরের পৃথিবী ধুইয়া ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল !

ও-বাড়ীর কুলশ্যার রাত্রে একা এ-বাড়ীতে কিন্তু পড়িয়া থাকা সম্ভব হইল না। কিরণ আসিয়া নিজের হাতে সাজাইয়া-গুছাইয়া বীণাকে লইয়া গেল।

বীণাকে যাইতে হইল। সে গেল যেম বিচিত্র
সাজ-পোষাক-পরা কাঁচের পুতুল! প্রাণ যেম বুকের
কোটর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

সেখানকার আনন্দ-উৎসবে নিজেকে সে সকলের
আড়ালে মৌনতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিল...

নন্দরাণী বলিল—কি হয়েছে ভাই? ...এমন মলিন
মুখ...

মুখে স্নান হাসি...বীণা বলিল—শরীরটা ভালো নেই।

কিরণ বলিল,—সত্যি সলিলা...খুব কষ্ট হচ্ছে?

বীণা ছোট্ট জবাব দিল। বলিল,—না...

গান-বাজনা...হাসি-গল্প...কত লোক-জন...কত আসা-
যাওয়া...যেন আলো-আঁধারের চমক্ বহিয়া চলিয়াছে!

বীণা যেন ও-সবেব বাহিরে আর-এক জগতে বসিয়া
লহরের লীলা-রহস্য দেখিতেছে! ও-জগতের সহিত তার
যেন কোনো যোগ নাই! সে যেন ও-জগৎ-ছাড়া জীব!
তার জগতে সে আছে একা...তার জগতে তার
আশে-পাশে কেহ নাই...কিছু নাই!

পরের দিন এক কাণ্ড ঘটিল।

বেলা তখন বারোটা...

কিরণ আসিয়া তারাচরণ রায়কে ডাকিল,—দাছ...

তারাচরণ রায় খাইতে বসিয়াছেন...সামনে বসিয়া
বীণা। দাক্ষায়ণী দেবীও সে ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কি দিদি? সলিলাকে
নিত্তে এসেছো?

কিরণ বলিল,—না। ঘটকালী করতে এসেছি!

—তার মানে?

—সলিলার সম্বন্ধ এনেছি। বিয়ে দিলে কি ঘটকালী
পাবো, বলো দাছ...

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাকে আমার
অদেয় কি আছে...বলো? তোমার গলায় মালা দেবো...
তাতে হবে?

হাসির উচ্ছ্বাসে মুখ ভরিয়া কিরণ বলিল,—নিশ্চয়।
তবে সে মালা হবে মুক্তোর মালা। আর তার
এক-একটি মুক্তো হবে ডিমের মত বড়!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—ভাই হবে দিদি...

কিরণ বলিল,—নতুন বৌদি এসেছে। এই বৌদির
পিশতুতো ভাই...বুঝলে দাছ! ছেলে বিলেত থেকে
এ্যাকাউন্ট্যান্সি পাশ করে এসেছে। এ্যাসিষ্ট্যান্ট
এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের চাকরি পেয়েছে। বৌদির
পিশিমা সে-দিন সলিলাকে দেখেছেন কি না...দেখে তাঁর
খুব পছন্দ হয়েছে। কাল রাত্রে মার সঙ্গে তাঁর কথা
হচ্ছিল। আমি শুনে ফেলেছি। ওঁরা লোক পাঠাবেন
কাল-পরশুর মধ্যে। আমি তাই আগে থেকে প্রজ্ঞাপতির
দূত হয়ে এসেছি। এ ঘটকালীর claim কিন্তু আমার!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—নিশ্চয়। তুমি আগে
তোমার ক্রেম ফাইল করে গেলে যখন...

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—দাঁড়া। বিয়ে বললেই
কি বিয়ে হয়! কোণী আছে...রাশিচক্র আছে। সে
সব মিলুক!

উচ্ছ্বসিত ভাষায় কিরণ বলিল,—সে সব মিলবে,
পিশিমা...এত ভালো ছেলে! সলিলার সঙ্গে সব মিলবে,
নিশ্চয়! তার পর কিরণ চাহিল বীণার পানে; বলিল,—
তোমার কাছ থেকেও কি আদায় করি, তখন দেখো।
জানলে দাছ, বর দেখতে যেন রাজপুত্রুর। বিলেত থেকে
এলেও বাঙালী আছে ট্যাঙ্ক হয়নি! আর বরের কি
নাম, জানো?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কি নাম?

কিরণ বলিল,—স্বর্ণদ্যুতি রায়।

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—ও কি নাম রে, বাবা!
কবিরাজী ওমুধেরই এমন নাম হয়, শুনেছি! কি নাম
বলিল?

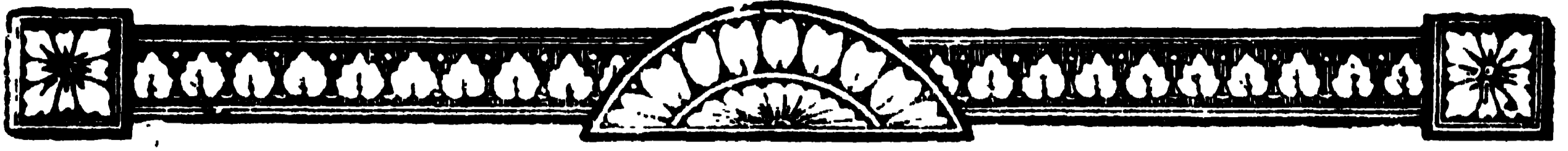
কিরণ বলিল,—স্বর্ণদ্যুতি রায়...

তার পর কিরণ বীণার পানে চাহিল, বলিল,—নামটা
বেশ নতুন-রকমের, না দাছ? আর খাশা মিল হবে...
সলিলা আর স্বর্ণদ্যুতি! শুনেছো সলিলা, এ নাম জপ
করো আজ থেকে...বুঝলে!

বীণার মুখে হাসি নাই, কথা নাই! বীণা কাঁঠ হইয়া
বসিয়া রহিল!

[ক্রমশ:

শ্রীসৌরীজমোহন মুখোপাধ্যায়।



আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

সম্প্রতি ইটালীয়-গ্রীক সঙ্ঘর্ষের অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলীর প্রতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। বুটেন্ ও জার্মানী অথবা বুটেন্ ও ইটালীর প্রত্যেক সঙ্ঘর্ষের গুরুত্ব পূর্বে কিছু কাল অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়াছিল। সম্প্রতি বৃটিশ সৈন্য সিদিবরাণি হইতে ইটালীয়-দিগকে বিতাড়িত করায় ঐ অঞ্চলের যুদ্ধের কিঞ্চিৎ গুরুত্ব উপলব্ধি হইতেছে।

গ্রীক-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষ—

প্রায় দেড় মাস পূর্বে ইটালী কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইয়াছে। আক্রমণের প্রারম্ভ হইতেই ইটালীয়দিগের বিক্রম প্রকাশ পায় নাই। ইহাতে প্রথমে কেহ কেহ মনে করেন যে, ইটালী হয় ত সত্তর গ্রীসের আত্মসমর্পণ আশা করিতেছিল। ইটালী যদি সেইরূপ আশা করিয়াও থাকে, তাহা হইলে উহা ব্যর্থ হইবার পরও ইটালীয় বাহিনীর বিক্রম লক্ষিত হয় নাই। বরং গ্রীক সৈন্য বরাবরই ইটালীয়-দিগকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করিয়াছে;—তিন সপ্তাহ যুদ্ধের পরই তাহারা ইটালীয়দিগকে গ্রীস হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়, এবং আলবেনিয়ায় শত্রুর পশ্চাদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে উত্তর-আলবেনিয়ায় করিঞ্জা অধিকার করিয়া গ্রীকবাহিনী এল্বাসান্ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে; দক্ষিণে স্রাটি কোয়ারাণ্টা তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, ইটালীয় সৈন্য আর্জিরোক্যাট্টো ত্যাগ করিয়াছে।

গ্রীস কর্তৃক আক্রমণকারী ইটালীর এই পরাজয়ে বিশ্বের প্রত্যেক নিরপেক্ষ দর্শক আনন্দিত হইয়াছেন; কিন্তু ক্ষুদ্র গ্রীস কর্তৃক একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তির এইরূপ শোচনীয় পরাজয় তাঁহাদিগকেও বিস্মিত করিয়াছে। ইহা সত্য যে, গ্রীস কেবল স্বীয় বিক্রমেই ইটালীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় নাই; বস্তুতঃ, ইটালীর পর্যাপ্ত শক্তি গ্রীসের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় নাই। গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযানে ইটালীর এই আগ্রহের অভাব অত্যন্ত দুর্কোধ্য বটে! গ্রীসকে আক্রমণ করিয়া ইটালী যদি পরোক্ষে মধ্য ও অদূর প্রাচীতে বুটেনের সামরিক ব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত করিতে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সে অভিপ্রেতি বহু পূর্বেই ব্যর্থ হইয়াছে; ইহার জন্ত এত বিলম্বের প্রয়োজন ছিল না। কোন কোন বলকান-রাষ্ট্রকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা গ্রীস আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইলে সে উদ্দেশ্যও এত দিনে বিফল হইয়াছে; গ্রীসের কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া নাজী-ফ্যাসিষ্ট রোষের সম্মুখীন হয় নাই। কাজেই, ইটালী কেন তাহার সামরিক মর্যাদা এইভাবে বিনষ্ট হইতে দিতেছে, তাহা বুঝা দুষ্কর। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, জার্মানীর মিত্রশক্তি ইটালীর সামরিক মর্যাদা এইভাবে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও নাজী নেতৃবৃন্দ নিক্রোধেগ!

সম্প্রতি ইটালীর প্রধান সেনাপতি মার্শাল ব্যাডগলিও এবং আরও কয়েক জন বিশিষ্ট সামরিক কর্মচারী পদত্যাগ করিয়াছেন। সামরিক বিভাগে এই পরিবর্তন হয় ত গ্রীক-অভিযানের

সহিত সঙ্ঘ-বিবর্জিত নহে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গুনিতে পাওয়া গিয়াছে, আলবেনিয়ায় ইটালীয় সৈন্যের দুর্বস্থা নিবারণের উদ্দেশ্যে সেখানে রণ-দল "ব্ল্যাকসার্ট" যোদ্ধা প্রেরিত হইতেছে—dispatch of picked Blackshirt fighters in an attempt to stop the rot in Albania. এই "ব্ল্যাকসার্ট"-বাহিনীকে প্রেরণের আবশ্যিকতা এত দিন উপলব্ধ হয় নাই; সামরিক কর্মচারীদের পদত্যাগের পর আলবেনিয়ায় দুর্বস্থা নিবারণ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা হইতে হয় ত ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট দল ও সামরিক কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক বিদ্বেষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রীসের যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া ইটালীর সামরিক বিভাগের উপর ফ্যাসিষ্ট দলের আধিপত্য স্থাপনের জন্ত স্বনিকার অন্তরালে হয় ত হীন যড়যন্ত্র চলিতেছিল। খুব সম্ভব, মার্শাল ব্যাডগলিও গ্রীস-অভিযানে ফ্যাসিষ্ট দলের সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত ছিলেন; হয় ত তাঁহার স্বাধীনভাবে কার্য করিবার ক্ষমতাও ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্তই ফ্যাসিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয় ত ইচ্ছা করিয়া গ্রীসে ইটালীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় উদাসীন ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন; জার্মানী হয় ত তাহাদিগের নির্দেশেই নিক্রোধেগ ছিল। যদি ফ্যাসিষ্ট দলের অভ্যুত্থানকাঙ্ক্ষা গ্রীসে ও আলবেনিয়ায় ইটালীয় বাহিনীর পরাজয়ের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে এখন যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তিত হইতে পারে। ইটালীর সামরিক কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা উত্তমরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং তাহার ফলে বিশিষ্ট সামরিক কর্মচারীদের অপসারিত করা হইয়াছে। এখন ফ্যাসিষ্ট দলের মর্যাদা রক্ষার জন্ত গ্রীস অভিযান সম্পর্কে ইটালীর উদাসীনতার আর সম্ভব হইবে না।

একমাত্র দলগত বিরোধের জন্ত যে ইটালীর সামরিক মর্যাদা এইভাবে বিপন্ন করা হইয়াছে, ইহা অসম্ভব মনে হইতে পারে। কিন্তু একনায়ক-শাসিত দেশে এইরূপ অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, ইটালীতে দেশের জনমত অথবা ভাবে ফ্যাসিষ্ট নেতৃবৃন্দের অনুগত নহে; রাজ্যের প্রতি এবং ফ্যাসিষ্ট দলের অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের প্রতি জনমতের আনুগত্য উপেক্ষণীয় নহে। কাজেই, প্রবীণ সমর-নায়কদিগের অপসারণের জন্ত ফ্যাসিষ্ট দল বিরাট যড়যন্ত্র প্রবৃত্ত হইতে পারে। বর্তমান যুদ্ধে ইটালী লিপ্ত হইবার কিছু কাল পরেই লিবিয়ায় যখন রহস্যজনক-ভাবে মার্শাল বাল্‌বোর মৃত্যু ঘটে, তখনও সন্দেহ করা হইয়াছিল যে, সামরিক বিভাগে ফ্যাসিষ্ট দলের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে হয় ত কৌশলে মার্শাল বাল্‌বোকে অপসারিত করা হইয়াছে।

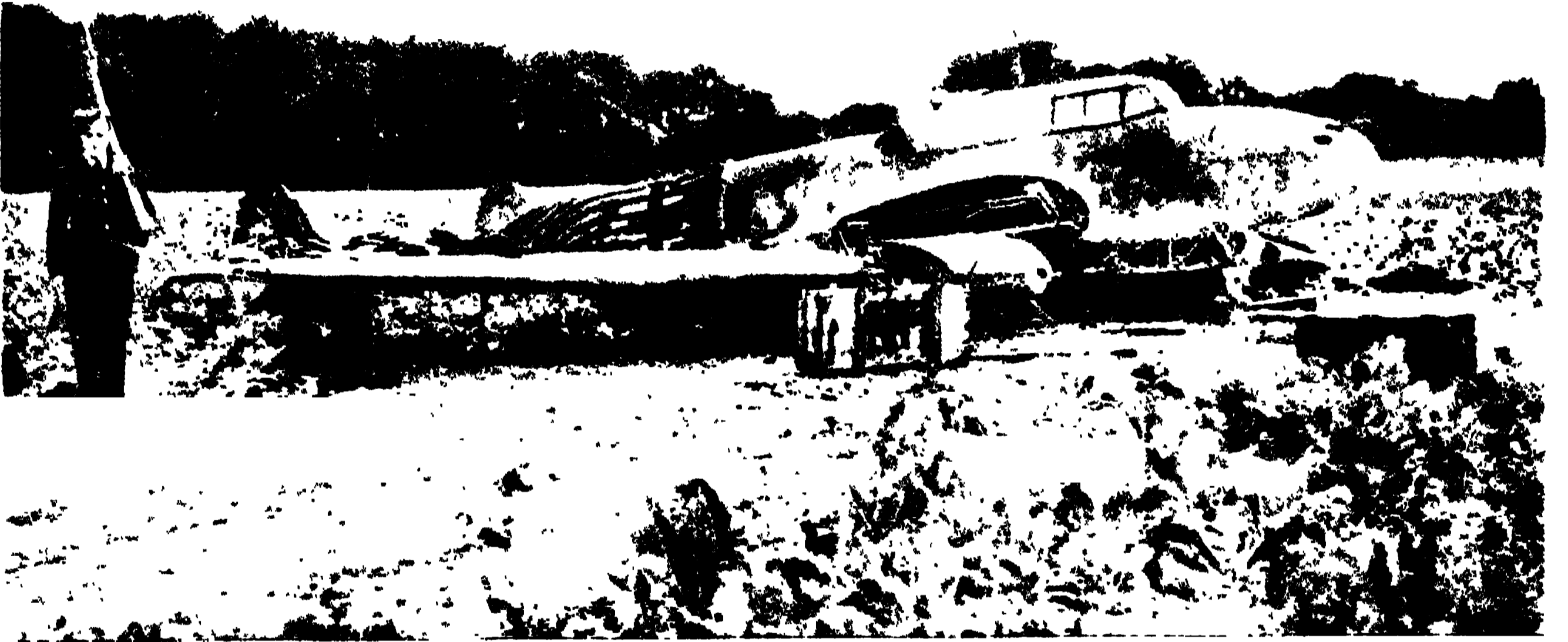
ইটালীর বাহিনী গ্রীসের নিকট পরাজিত হইলেও ইটালীর সকল আশা নির্মূল হইয়াছে, এইরূপ মনে করিবার কারণ এখনও ঘটে নাই। সামরিক বিভাগ সম্বন্ধে ফ্যাসিষ্ট দলের যড়যন্ত্র সফল হইবার পর গ্রীক-বাহিনী পরাজিত করিতে যে বিলম্ব হইবে না—এই স্থির বিশ্বাসেই হয় ত, ইটালীর সামরিক মর্যাদা বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও, ফ্যাসিষ্ট দল এত দিন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। ইটালীয়-গ্রীক

সম্বর্ষের সুযোগে ক্রীট দ্বীপের নৌ ও বিমানঘাটি আধিকার করিয়া বুটেন পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে শক্তিশালিত করিয়াছে। কিন্তু ঐ দ্বীপে বুটেনের আধিপত্য-বিস্তার ইটালী কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিত না। হয় ত এই অঞ্চলই ইটালী প্রথমে অভিযোগ করিয়াছিল যে, গ্রীসের নৌ ও বিমানঘাটি বুটেনের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছিল। ইজিরান সাগরেও বুটেনের প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছে; ঐ সাগরের ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জের সহিত ইটালীর সংযোগ এখন বিচ্ছিন্ন। ফ্যাসিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয় ত মনে করেন যে, ইজিরান সাগরের উপকূলে নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ডোডেকেনিজের সহিত পুনরায় সংযোগ স্থাপনে বিলম্ব হইবে না।

জার্মানী গ্রীক-ইটালীয় সম্বর্ষে লিপ্ত হইবে কি না, এই প্রশ্ন অনেকের মন আন্দোলিত করিতেছে। যত দূর মনে হয়, যুগোস্লাভিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া গ্রীসকে আক্রমণ করা জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব নহে। ইটালীর সামরিক বিভাগে ফ্যাসিষ্ট দলের

সম্ভোগ করিতেছিল। হাজেরি বহু পূর্ব হইতেই নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের অনুরক্ত, সে কমিটার্ণ-বিষোধী চুক্তির অন্ততম স্বাক্ষরকারী ছিল; সম্প্রতি জার্মানী ও ইটালীর অনুরোধেই সে ট্রান্সিলভেনিয়া প্রদেশের বিশাল অংশ লাভ করিয়াছে। রুম্যানিয়ার রাজা কারলের সিংহাসন-ত্যাগের পর হইতে ঐ দেশে নাজী-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ঐ রাষ্ট্রটি এখন জার্মানীর একটি প্রদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্লোভাকিয়াকে জার্মানী তাহার নিজের প্রয়োজনেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ভূতপূর্ব জেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের এই অংশকে সে পূর্ব সীমান্তের একটি প্রহরী-রাষ্ট্ররূপে (Buffer State) জিয়াইয়া রাখিয়াছে। কাজেই এই তিনটি রাষ্ট্রকে নব-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করায় জার্মানী যেমন কোন নতুন সুবিধা লাভ করে নাই, তেমনই আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রেও ইহাতে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নাই।

জার্মানী যখন নব-ব্যবস্থার প্রসারে প্রবৃত্ত হয়, তখন মনে



এইরূপ বহুসংখ্যক জার্মান বিমান আক্রমণকালে ভূপতিত হইয়াছে

আধিপত্যের অভাবই হয় ত এত দিন জার্মানীকে গ্রীক-ইটালীয় সম্বর্ষ হইতে দূরে রাখিয়াছিল। বর্তমানে সে অসুবিধা যখন তিরোহিত হইল, তখন জার্মানীর পক্ষে তাহার মিত্রশক্তি ইটালীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, যুগোস্লাভিয়ার সুর এখন ক্রমেই জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সম্প্রতি হাজেরি ও যুগোস্লাভিয়ার সম্বন্ধের যে উন্নতি-লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, জার্মানীর গোপন হস্ত নিশ্চয়ই কার্য করিতেছে।

জার্মানীর কূটনীতিক তৎপরতা—

জার্মানীর তৎপরতা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—সামরিক এবং কূটনীতিক। কূটনীতিকক্ষেত্রে হাজেরি, রুম্যানিয়া ও প্লোভাকিয়ায় জার্মানী তাহার তথাকথিত নব-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। এই তিনটি রাষ্ট্র জার্মানীর নব-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সে কোন নতুন সুবিধা লাভ করে নাই—কারণ, এই সকল রাষ্ট্রকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহারের অধিকার জার্মানী পূর্ব হইতেই

হইয়াছিল যে, বুল্গেরিয়াও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং এই ভাবে তুরস্কের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া জার্মানী ঐ রাষ্ট্রটিকে স্বদলে আনয়নের জন্ত প্রয়াস পাইবে। বুল্গেরিয়া নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিবলের অনুরক্ত; সে আশা করে যে, তাহার ইজিরান সাগরে প্রবেশ-পথ লাভের আকাঙ্ক্ষা ঐ দুইটি রাষ্ট্রকে তোষামোদ করিলেই পূরণ হইবে। কাজেই জার্মানীর নব-ব্যবস্থায় বুল্গেরিয়ার প্রবেশ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জার্মানী দেখিল যে, তুরস্কের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া ঐ রাষ্ট্রকে পরোক্ষে “চাপ” দিলে কোন কাজ হইবে না, বরং উহাতে অসুবিধারই সৃষ্টি হইবে; কারণ হাজেরি, রুম্যানিয়া ও প্লোভাকিয়া নব-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবামাত্র তুরস্ক দাদানেলিজ অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া জানাইয়া দিয়াছিল যে, সে জার্মানীর আক্রমণমূলক প্রয়াস প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তুরস্কের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই জার্মানী তাহার নব-ব্যবস্থার প্রসারে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই; তন প্যাপেন আঙ্কারায় প্রত্যাবর্তন করিয়া

তুরস্কে আশ্বাস দিয়াছেন—Germany has no intention of waging a Balkan campaign and no intention of attacking Turkey. জার্মানী বর্তমানে তুরস্কে স্বপক্ষে আনয়নের জন্ত—বিশেষতঃ, দার্দানেলিজের পথে পশ্চিম-এশিয়ায় প্রবেশের সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে—তুর্কি সরকারের সহিত গভীর কূটনীতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই আলোচনা যাহাতে শান্তিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে চালিত হইতে পারে, সেই জন্ত জার্মানী ইচ্ছা করিয়াই বুলগেরিয়াকে এখন তাহার নব-ব্যবস্থার বাহিরে রাখিতেছে; গ্রীক-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষে জার্মানী এত দিন যে অস্বাভাবিক উদাসীন প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার অন্ততম কারণও বোধ হয় ইহাই।

কেহ কেহ অসুমান করেন যে, সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তিতে জার্মানী তাহার নব-ব্যবস্থা বুলগেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত করিতে সাহসী হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহার ফল সুদূর-প্রসারী হইবে। সোভিয়েট রুশিয়া যদি বুলগেরিয়াকে জার্মানীর প্রভাবমুক্ত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তুরস্কের পথে জার্মান-বাহিনীর পশ্চিম-এশিয়ায় প্রবেশ সে নিশ্চয়ই উদাসীন ভাবে লক্ষ্য করিবে না। বুলগেরিয়া অপেক্ষা দার্দানেলিজ ও বস্ফোরাস প্রণালী জার্মানীর প্রভাবমুক্ত রাখাই সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মতবিরোধের ফলেই জার্মানী যদি বুলগেরিয়ার প্রভাব বিস্তারে ক্ষান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পশ্চিম-এশিয়ায় গমনের সমগ্র পরিকল্পনাই ত্যাগ করিতে হইবে। গ্রীক-ইটালীয় সঙ্ঘর্ষ-ফলে এখন পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে—বিশেষতঃ, সিজিয়ান সাগরে বুটেনের প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে গ্রীক-দিগকে পরাভূত করিয়া স্ত্রালোনিকা পর্যন্ত নাজী-ক্যাম্প প্রভুত্ব বিস্তার যদি সম্ভবও হয়, তাহা হইলেও জল-পথে পশ্চিম-এশিয়ায় পৌঁছিবার প্রয়াস বিফল হইবে।

বার্লিনে মলটভ—

বার্লিনে মঃ মলটভের সহিত দুই দিনব্যাপী আলোচনা জার্মানীর আর একটি কূটনীতিক প্রয়াস। মঃ মলটভ একাধারে রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র-সচিব; তাহার পক্ষে বার্লিনে আগমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতঃপূর্বে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী কখনও কূটনীতিক উদ্দেশ্যে দেশান্তরে গমন করেন নাই। মঃ মলটভের সহিত ৩২ জন রুশ-বিশেষজ্ঞ বার্লিনে আসিয়াছিলেন; মঃ মলটভ দুই দিন পরেই মস্কো প্রত্যাবর্তন করেন, রুশ-বিশেষজ্ঞগণ বার্লিনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকেন। বার্লিনে সরকারী বিজ্ঞাপিতে বলা হইয়াছে যে, মঃ মলটভের বার্লিন আগমনের প্রথম উদ্দেশ্য—জার্মানী ও ইটালী এবং পরে জাপানের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার মিলনের ক্ষেত্র স্থির করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—সোভিয়েট

জার্মান চুক্তির ভিত্তিতে আরও ব্যাপক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা। ইহা ব্যতীত, সোভিয়েট-জার্মান মৈত্রী-বন্ধন যে শিথিল হয় নাই, তাহা প্রমাণ করাও নাজি মলটভের বার্লিনে আগমনের অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল।

জার্মানীর সরকারী বিজ্ঞাপিত ব্যতীত মঃ মলটভের বার্লিনে আগমনের কারণ সম্বন্ধে অল্প বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এ সম্বন্ধে বহু সম্ভব এবং অসম্ভব গবেষণার কথা শুনিয়াছে। যত দূর মনে হয়, মঃ মলটভ প্রধানতঃ দুইটি কারণে বার্লিনে গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, ত্রিশক্তির চুক্তির ফলে অথবা জার্মান-বাহিনীর রুমানিয়ার প্রবেশে সোভিয়েট-জার্মান মৈত্রী-বন্ধন যে শিথিল হয় নাই, ইহা সমগ্র বিশ্বের সমক্ষে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজনীয়তা জার্মানী উপলব্ধি করিতেছিল; সোভিয়েট ও জার্মানীর সম্ভাবিত মনোমালিন্য সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারকার্যের ফলে জার্মানীর



বুটেনের কোন স্থানে এই ভূগর্ভস্থ আশ্রয়-স্থলের প্রধান প্রবেশ-দ্বার বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে—একটি অপরিষ্কার সুড়ঙ্গ দিয়া স্ত্রালোনিকা নিষ্কাশিত হইতেছে

কূটনীতিক প্রচেষ্টায় হয় ত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। জার্মান সরকারের বিজ্ঞাপিতেও এই কারণটি স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, বর্তমানে রুশিয়ার সহিত বুটেনের বিশেষ সম্ভাব চলিতেছে না। দানিয়েভ কমিশনে রুশিয়া যোগ দেওয়ার বুটেন সম্ভষ্ট হয় নাই। বার্লিনে অঞ্চলের যে কয়েকটি রাষ্ট্র সম্প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বুটেনে গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ডার সম্পর্কে এখনও মীমাংসা হয় নাই। কাজেই রুশ সরকারের পক্ষেও সোভিয়েট-জার্মান মিলনের দৃঢ়তা জানাইয়া পরোক্ষে বুটেনকে কূটনীতিক “চাপ” দিবার উদ্দেশ্যে মঃ মলটভকে বার্লিনে প্রেরণ করা সম্ভব। এই দুইটি কারণ ব্যতীত, অল্প কোন কারণে একাধারে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলটভের বার্লিনে আসিবার প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক নহে—সকল প্রকার প্রয়োজনীয় আলোচনাই রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে চলিতে পারিত। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে পোল্যান্ড, কিন্‌ল্যান্ড, বাল্টিক

রাষ্ট্রসমূহ, বেসারবিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে ; কিন্তু সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রীর বার্লিনে আগমনের প্রয়োজন হয় নাই। অবশ্য মঃ মলটভ কেবল আনুষ্ঠানিক ভাবে বার্লিন পরিদর্শন করিয়াই প্রত্যাবর্তন করেন নাই। তিনি অর্থনীতিক ও রাজনীতিক আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্থনীতিক আলোচনা সম্পর্কে বলা যায়, এই বিষয়ে জার্মানীর পক্ষে যেমন সোভিয়েট কৃষিকাকে প্রয়োজন, তেমনই কৃষিকার পক্ষেও জার্মানীকে প্রয়োজন। সুদীর্ঘ সংগ্রাম-পরিচালনে নিয়মিত ভাবে কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হওয়া জার্মানীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ; পক্ষান্তরে, যুদ্ধের সময় অর্থনীতিক বিষয়ে উপকৃত হইতে সোভিয়েট কৃষিকা অত্যন্ত উদগ্রীব। তাহার পর, রাজনীতিকক্ষেত্রে দার্দানেলিজ ও সুদূর প্রাচীর সম্পর্কে মঃ মলটভের সহিত আলোচনা হওয়াও সম্ভব।

মঃ মলটভ মস্কো প্রত্যাবর্তন করিবার পর স্পেনের পরবর্ত্ত-সচিব সোনিব স্ত্রনারের সহিত নাজী নেতৃবৃন্দের আর একবার আলোচনা হয়। এই আলোচনার মর্ম্ম জানা যায় নাই। তবে, সম্প্রতি মার্কিন নৌসচিব কর্ণেল নক্স এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, স্পেনে এক ডিভিসন জার্মান সৈন্য বেসামরিক পরিচ্ছদে অবস্থান করিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে জিত্রান্টের—এমন কি, দক্ষিণ আফ্রিকাও বিপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। স্পেন সম্পর্কে ইতঃপূর্বে 'মাসিক বসুমতী'তে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্পেনকে যে কোন সময়ে জার্মানী স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারে ; জার্মানী যদি আফ্রিকায় গমনের সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্পেন কখনও তাহার অন্তরায় হইবে না। সম্প্রতি জিত্রান্টের অপূর্ণ পাবে টেঞ্জিয়াবে স্পেনের সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সহিত জার্মানীর ভবিষ্যৎ সমর-পরিকল্পনার সংযোগ থাকা অসম্ভব নহে।

জার্মানীর সামরিক প্রচেষ্টা—

জার্মানী এখনও বুটেনে যথেষ্ট বোমা-বর্ষণ করিতেছে ; সম্প্রতি কভেনট্রিতে বোমা-বর্ষণের ফলে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বুটেনের পক্ষ হইতেও জার্মানীর বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষিত হইতেছে। শ্রমশিল্প কেন্দ্র, বন্দর প্রভৃতি বোমা-বর্ষণে বিধ্বস্ত করিবার জন্য জার্মানী এখন অধিকতর তৎপর হইয়াছে। এই সময় সমুদ্রবক্ষে জার্মানীর সাবমেরিন অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছে। হিটলার নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, বুটেনকে অবরোধ করিবার প্রয়াস আরও প্রবল হইবে। বস্তুতঃ, জার্মানী এখন এই বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বুটেনের শ্রমশিল্প পঙ্গু করিবার কার্যে তাহার বিমান-গুলি প্রবলভাবে নিয়োজিত হইতেছে, সমুদ্রবক্ষে জার্মানীর সাব-মেরিনগুলিও তৎপর হইয়াছে ; ইহা ব্যতীত জার্মানীর রণপোত দক্ষিণ আটলান্টিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—দক্ষিণ আমেরিকার সহিত বুটেনের বাণিজ্য-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাই জার্মান রণপোতের উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি ফরাসী উপকূলের জার্মান কামানগুলি হইতে ভোভার অঞ্চলে প্রবলভাবে গোলা বর্ষিত হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, জার্মান-বাহিনীর পক্ষে শীতের কুরাশায় আত্মগোপন করিয়া বুটেনে অবতরণ করিতে সচেষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। এই উদ্দেশ্যেই

ফরাসী উপকূলে জার্মান কামানশ্রেণীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং কামানের সংখ্যাও না কি বৃদ্ধিত হইতেছে। বুটেন বিমানের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সত্ত্বেও ফরাসী উপকূলের কামানশ্রেণীর বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ফরাসী উপকূলে এখন যে সকল কামান আছে, তাহাদের পাল্লা ২৮ মাইল ; উহাদের গোলা ভোভার অঞ্চলে পতিত হইতে পারে। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী ৭০ মাইল পাল্লার একটি কামান হইতে প্যারিসে গোলা বর্ষণ করিয়াছিল ; লগুনে গোলা-বর্ষণের উদ্দেশ্যে ঐ শ্রেণীর কামান না কি এখন জার্মানীতে প্রস্তুত হইতেছে। গোলা বর্ষণরত কামানের সাহায্যে বুটেন-রণপোতকে দূরে রাখিয়া বুটেন ছাঁপপুঞ্জ সৈন্য অবতরণ করানই জার্মানীর বুটেন-আক্রমণ-পরিকল্পনার প্রধান কারণ। বুটেনের আকাশে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া বুটেনে সৈন্য অবতরণ করাইবার জন্য জার্মানী সমগ্র শরৎকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু তাহার



ফরাসী উপকূলের জার্মান কামান ;—ইহা সহজেই স্থানান্তরিত করা চলে

সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এখন বুটেনের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাজেই, শরৎকালে উত্তম আবহাওয়ার যাহা সম্ভব হয় নাই, প্রচণ্ড শীতে বুটেন যখন আরও অধিক গরমশালী, তখন তাহা বিফল হইবার সম্ভাবনা আরও অধিক বলিয়াই মনে হয়।

লোরেন জার্মানীর অঙ্গীভূত—

সম্প্রতি জার্মানী ফ্রান্সের লোরেন প্রদেশটি অধিকার করিয়াছে। এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আজ জার্মানী যখন বুটেনের অবরোধ-ব্যবস্থার ফলে বিপন্ন, তখন সে যে এই খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল অধিকার করিতে প্রয়াসী হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে লোরেন সর্বপ্রথম ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে জার্মানী বিজয়ী হইয়া ঐ প্রদেশটি অধিকার করিয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের পর লোরেন প্রদেশটি পুনরায় ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রদেশের শতকরা ৭০ জন জার্মান-ভাষাভাষী ; ৩০ জন ফরাসী ভাষায় কথা বলে। লোরেন প্রদেশ অধিকার করিবার পূর্বে অধিকাংশ ফরাসী অধিবাসী তথা হইতে ফ্রান্সে অপসারিত হইয়াছে।

আফ্রিকার যুদ্ধ—

সম্প্রতি আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনী সিদিবারাণি হইতে ইটালীয়-দিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। লিবিয়াস্থিত ইটালীয় বাহিনী গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মিশরে প্রবেশ করে, এবং উপকূল-পথে ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়া সিদিবারাণি অধিকার করে। তদবধি গত তিন মাস ইটালীয় বাহিনী তথা হইতে আর পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইটালী গ্রীস আক্রমণ করিবার পর বৃটেনের আফ্রিকাস্থিত সমর-ব্যবস্থার কতকাংশ গ্রীসে নিয়োজিত হইলে সিদিবারাণি হইতে ইটালীয় বাহিনী পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার এত দিন তাহা করে নাই। ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর হইতে আফ্রিকার বৃটিশ বাহিনী কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত ছিল; বর্তমানে তাহাদিগের যে প্রতি-আক্রমণ হইল, ইহার ফলে আফ্রিকার সামরিক ব্যবস্থার হয় ত আমূল পরিবর্তন হইবে।

ওয়ান্স-সরকার ও জাপান—

গত ১লা ডিসেম্বর জাপান নানকিংএ তাহার প্রভাবাধীনে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সহিত যথার্থীতি কূটনীতিক সন্ধি স্থাপন করিয়াছে। গত মার্চ মাসে চীনের বিতীষণ ওয়ান্স চেং-উইর নেতৃত্বে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তদবধি জাপান এই সরকারকে চীনের একমাত্র বৈধ সরকার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এত দিন তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ চিয়াং-কাই-সেকের প্রতি চীনাঙ্গের আনুগত্য অটল; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বার্থবান শক্তিগুলির নিকট চিয়াং-কাই-সেকের সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অধিকতর। এখন জাপান উত্তর-চীনের এই সরকারকে একটি সজ্জাতিত ব্যবস্থার (Fait accompli) রূপ দিতে চাহিতেছে। হয় ত সে আশা করে, ইহার ফলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে উহাকে স্বীকার করাইয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না। আপাততঃ, খনিজ ও কৃষিজ সম্পদে উন্নত উত্তর-চীন শোষণের জন্য ঐ অঞ্চলে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাগত। জাপানের সহিত ওয়ান্স-সরকারের যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে একটি কমিটার্ণ-বিরোধী অনুচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জাপান আশঙ্কা করে যে, ক্রমে চিয়াং-কাই-সেকের শাসনাধীন চীনা অঞ্চল রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। এই জন্য সে পূর্বাভূ ওয়ান্স-সরকারের সহিত কমিটার্ণ-বিরোধী চুক্তি করিয়া রাখিল।

জাপান জানিত যে, তাহার প্রভাবাধীন ওয়ান্স-সরকারকে আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে কেহ মানিয়া লইবে না। বস্তুতঃ, জাপানের জাবেদার মাঞ্চুকো-সরকার ব্যতীত অন্য কেহ উহাকে মানিয়া লয়ও নাই। সোভিয়েট রুশিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে, ওয়ান্স-সরকারের প্রতিষ্ঠায় চীন-সম্পর্কে তাহার নীতির পরিবর্তন হয় নাই, অর্থাৎ

সে চিয়াং-কাই-সেকের সরকারকেই চীনের বৈধ সরকার বলিয়া মানিয়া চলিবে, এবং জাপানের সহিত যুদ্ধে ঐ সরকারকে সে পূর্বের স্তায় সাহায্য করিবে। সম্প্রতি জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার মাংসুয়োকো এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ওয়ান্স-সরকারের সহিত জাপানের চুক্তি হওয়ার সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সৌহার্দ স্থাপনের জন্য তাঁহাদিগের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কমিটার্ণ-বিরোধী চুক্তি সন্ধিতে তিনি বলিয়াছেন যে, উহার সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার কোন সম্পর্ক নাই—চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্য ঐ চুক্তি করা হইয়াছে।

জার্মানীও ওয়ান্স সরকারকে মানিয়া লয় নাই—সে চিয়াং-কাই-সেকের সরকারকেই চীনের বৈধ সরকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। জাপানের মিত্র জার্মানীর এই কার্যে অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; জাপানের মঙ্গলের জন্য জার্মানী ইহা করিতেছে। জাপান এখন আর পার্বত্য অঞ্চলে মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকের অনুসরণে ধাবিত হইতে আগ্রহ-হিত নহে, সে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে, হয় ত মালয় উপদ্বীপে অর্থনীতিক প্রভাব—সম্ভব হইলে রাজনীতিক অধিকার বিস্তারের জন্য আগ্রহান্বিত। কিন্তু চীনের ব্যাপারে মীমাংসা না হইলে তাহার পক্ষে অল্পতর মনোযোগী হওয়া একরূপ অসম্ভব। জাপান সম্প্রতি বুঝিয়াছে যে, বৃটেন অথবা আমেরিকার সহায়তায় চীনের ব্যাপারে মীমাংসা হইবার সুদূরবর্তী আশাও আর নাই; বরং এই দুইটি শক্তি চীনকে যুদ্ধে রত রাখিবার জাপানের অল্পতর প্রসার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত করিতে চাহে। এই জন্য জাপান এখন সোভিয়েট একনায়ক ষ্ট্যালিনের পদে তৈল-মর্দন করিয়া চীনের ব্যাপারে মীমাংসা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। জাপানকে যদি এই কার্যে সহায়তা করিতে হয়, তাহা হইলে চীনের চিয়াং-কাই-সেক সরকারের সহিত জার্মানীর সন্ধি অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজন। জার্মানী যদি চিয়াং-কাই-সেকের সরকারের সহিত সন্ধি বর্জন করে, তাহা হইলে সে কখনও ভবিষ্যতে চীনের ব্যাপারের মীমাংসা তথা সোভিয়েট-জার্মান সন্ধির উন্নতি-সম্পর্কে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রিশক্তির চুক্তি হইবার পর হইতে জাপান ও সোভিয়েট রুশিয়ার সন্ধির উন্নতি-সাধনের জন্য জার্মানী যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

শ্যাম ও ইন্দোচীন-সঙ্ঘর্ষ—

সম্প্রতি শ্যাম ও ইন্দোচীনের সীমান্তে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার মাংসুয়োকো এই সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে জাপানের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জাপানের ইচ্ছিতেই শ্যামের পক্ষে ইন্দোচীনের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব। এই সীমান্তের সঙ্ঘর্ষ যদি ক্রমে ঐ দুইটি রাষ্ট্রের ব্যাপক যুদ্ধে পরিণত হয়, তাহা হইলে জাপান হয় ত শ্যামের পক্ষাবলম্বন করিয়া ক্রমে মালয় উপদ্বীপে প্রভুত্ব-বিস্তারে প্রয়াসী হইবে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

সামরিক প্রথম

ভারত সচিবের হস্তক্ষেপ

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্স সভায় ভারত সচিব মিষ্টার আমেরী “ভারতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা” সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বর্তমান যুদ্ধে ভারতবাসীরা গত বারের যুদ্ধের ত্রায় সামরিক প্রচেষ্টা করিতেছে, সে কথা ভারত সচিব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার উক্তিতে এ দেশের কোন শ্রেণীর লোকই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ঐহারা কংগ্রেসের সদস্য এবং মতাবলম্বী, তাঁহারা ত সন্তুষ্ট হইতে পারেনই নাই, অধিকন্তু যে সকল রাজনীতিক-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কংগ্রেসের সহিত সকল বিষয়ে একমত নহেন, তাঁহারাও যে তাঁহার উক্তিতে অসন্তুষ্ট, এ ভাব তাঁহারা গোপন করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি অল্প দিন পূর্বেও ভারত সরকারের আইন-সদস্য ছিলেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, তিনি কংগ্রেসের ত্রায় পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী করেন না; তিনি চাহেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। তিনি বলিয়াছেন, ভারত সচিব কংগ্রেসের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলিবেন না। তিনি কংগ্রেসের পক্ষেও ওকালতি করিতেছেন না; বরং তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেসের ভাব দেখিয়া তিনি নিরুৎসাহই হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার মনে হয়, এই সময় কংগ্রেসের পক্ষে যথাসাধ্য প্রচেষ্টার সমর্থন ঘটিলেই ভারতবাসীর অধিক কল্যাণ সাধিত হইত। ইহা অবশ্য তাঁহার ব্যক্তিগত মত। তাহা হইলেও তিনি এ কথা বলিয়াছেন যে, ভারত সচিব তাঁহার দেশবাসীকে এবং সাগরপারস্থ অন্ত্য দেশবাসীকে ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি যে ভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহার দেশবাসীরা এবং অন্ত্য সকলে ভারতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভুল বুঝিবে। ভারত সচিবের বক্তৃতা পাঠে মনে হয় যে, ভারতের বর্তমান অচল অবস্থার

জন্ত যেন কংগ্রেসই একমাত্র দায়ী; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ইহার জন্ত মল্লম লীগ বরং অধিক দায়ী। ভারত সচিব বলিয়াছেন, “মুসলমানদিগের মনের এই ভয়—প্রদেশগুলিকে নূতন করিয়া সজ্জিত এবং সম্মিলিত করিয়া উহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দিলে হয় ত নিরস্ত হইতে পারে, তবে কেন্দ্রী সরকারের দিক হইতে পররাষ্ট্রিক দেশরক্ষা এবং আর্থিক নীতির একতা-সাধনের জন্ত যথাসম্ভব অল্প হস্তক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

সার নৃপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—এই কথাগুলি পাঠ করিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। কারণ, মিষ্টার জিন্না বারংবারই বলিয়াছেন, তিনি ডেমক্রেসী (অর্থাৎ গণশাসন) চাহেন না। সম্ভবতঃ, তিনি যদি পাকিস্থান-প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে না পারেন, তাহা হইলে মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে গণশাসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারেন। মিষ্টার জিন্না প্রকাশে বলিয়াছেন,—কেবলমাত্র সামাজিক বা ধর্ম বিষয়ে নহে, অন্য বিষয়েও যাহাতে হিন্দুরা মুসলমানদিগের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন,—তিনি তাহাই চাহেন। সার নৃপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—তিনি মিষ্টার জিন্নার কথার সমালোচনা করিতে চাহেন না; তবে তিনি বলেন যে, যদি প্রদেশগুলির ক্ষমতা অধিক বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের বৈরিভাব না কমিয়া বরং বর্ধিতই হইবে; সুতরাং মিষ্টার আমেরীর কথামত উহার দ্বারা ভয়ের নিরসন হইবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। ভারত-বাসীকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না,—এ কথা মিষ্টার আমেরী খুব দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,—কিন্তু মুসলমান-দিগের ভাব এবং পাকিস্থান সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। মিষ্টার জিন্না উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা পাকিস্থান চাহেন; তবে যুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্থানের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে চাহেন না। কংগ্রেসও ত যুদ্ধের সময় পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রাপ্তির দাবী করিতেছেন না। মিষ্টার আমেরী স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয়

শাসন-যন্ত্রের সংগঠন ভারতবাসীরই কার্য; কিন্তু তাহার উপর তিনি যে অতিরিক্ত দফা চাপাইয়াছেন—তাহাই সর্বনাশকর। সে দফাটি এই যে, প্রস্তাবিত গণতন্ত্রমূলক স্বায়ত্ত-শাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের সংখ্যান্ন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবার অধিকার থাকিবে না। ইনি আরও বলিয়াছেন, “এক পক্ষের উপর সমস্ত দোষের পশরা চাপান উচিত নহে। বৃটিশ জাতির সাহস ভূবনবিখ্যাত; মিষ্টার আমেরী যেরূপ নির্ভীকতার সহিত কংগ্রেসের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবীর নিন্দা করিয়াছেন, পাকিস্থান প্রস্তাবেরও সেইরূপ নির্ভীকতার সহিত নিন্দা করিলেই ঠিক কাজ করা হইত।”—ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। অনেকে সন্দেহ করিতেছেন, পাকিস্থান-প্রস্তাব বোধ হয় ফরমাইসী ব্যাপার (Command performance)!

ভাওয়াল মামলার আপীল

এত দিন পরে হাইকোর্টে ভাওয়াল সন্ন্যাসী-কুমারের মামলার বিচার শেষ হইল। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাণী বিভাবতী হাইকোর্টে যে আপীল করিয়াছিলেন, তাহাতে তিন জন বিচারপতির দুই জন, বিচারপতি শ্রীযুত চাক্ৰচন্দ্র বিশ্বাস, এবং বিচারপতি কষ্টেলো একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করেন, সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের মধ্যম কুমার শ্রীযুত রমেশনারায়ণ রায়। তিনিই ভাওয়ালের রাজসম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী। বিচারপতি কষ্টেলো ছুটীতে বিলাতে থাকা-কালে এই মামলার রায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; এ জন্ত তাহা রায় বলিয়া গ্রাহ্য হইবে কি না, এই প্রশ্ন লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। বিচারে স্থির হইয়াছে—বিচারপতি কষ্টেলো যখন ঐ মামলার বিষয় অল্প বিচারপতিদ্বয়ের সহিত যথাবিহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং স্বপদস্থ থাকিয়া তাঁহার স্বাক্ষরিত রায় প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তাহা রায় বলিয়া গ্রাহ্য হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সুতরাং ঐ মামলা সম্বন্ধে যে একটু গোল উঠিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ঢাকার অতিরিক্ত জজ শ্রীযুত পান্নালাল বসুর রায়ই আপীলে বহাল রহিল। এখন মধ্যম কুমারের পত্নী রাণী বিভাবতী ইহার বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিবেন কি না, তাহা তাঁহার বিচক্ষণ পরামর্শদাতারা বলিতে

পারেন; তবে তাঁহার উকীল প্রসঙ্গক্রমে হাইকোর্টের এজলাসে বলিয়াছিলেন, তাঁহার মক্কেলের আর অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই। এখন কার্যতঃ কি হইবে, বলা যায় না। এই মামলায় উভয় পক্ষেরই বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আপীল-বিচারের রায়ে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা এই মামলা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্বেই বলিয়াছি; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিশ্চয়োজন।

—

সংগ্রাম ও বৃটিশ পার্লামেন্ট

বর্তমান সময়ে যুরোপে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা লইয়া বৃটিশ পার্লামেন্ট এবং বৃটিশ জাতি এতই ব্যস্ত হইয়াছেন যে, অল্প কাজে মন দিতে পারিতেছেন না। এই যুদ্ধ-জনিত উদ্বেগও তাঁহাদের এত অধিক যে, ভারতীয় শাসনযন্ত্র-সংক্রান্ত কোন সমস্যার কথা তাঁহারা চিন্তা করিতেও অসমর্থ,—ইহা অনেক ইংরেজেরই মুখে শুনা যাইতেছে; এমন কি, কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের উদ্বোধন কালে এবার লর্ড লিনলিথগো যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও ঐ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু কথাটা কি সত্য? বৃটিশ পার্লামেন্ট যাহাই কিছু করিতেছেন, তাহা কেবলই যে যুদ্ধ-ব্যাপার সম্পর্কিত, এরূপ মনে করিবার উপায় নাই, আর তাহার দৃষ্টান্তের অভাব এই ভারতেও নাই। শাসন-সংস্কার আইনে ব্যবস্থিত ছিল যে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা একাধিক প্রদেশে বিস্তৃত, সে বিশ্ববিদ্যালয়-ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন প্রাদেশিক সরকার কোনরূপ আইন করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই যুদ্ধের সময়েই সেই ব্যবস্থার সংশোধন করিয়া-লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এখন বাঙ্গালা এবং আসাম, এই দুই প্রদেশে বিস্তৃত। এই বিলখানি যদি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করা হইবে, এবং হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-শিখ-ব্রাহ্ম-জৈন প্রভৃতি অমুসলমান সম্প্রদায়ের বুদ্ধির এবং প্রগতির সঙ্কোচসাধন করা হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য, ভারতীয় শাসনসংস্কার-সম্পর্কিত এই ব্যবস্থার

সঙ্কোচসাধন করা হইয়াছে কি ইঙ্গ-জার্মান যুদ্ধের প্রয়োজনে? বর্তমান জার্মান যুদ্ধের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কি গুট সঙ্কট বিদ্যমান যে, এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্ষমতা ধর্ম না করিলে এবং বঙ্গীয় অমুসলমান সম্প্রদায়ের মানস-প্রগতিতে বাধা না দিলে চলিত না? ব্যাপারটা সাধারণ বুদ্ধির আয়ত্তে আনে, কাহার সাধ্য?

রাজস্ব বিল দুই দ্বার অগ্রাহ

ভারতের রাজস্ব সচিবের উপস্থাপিত রাজস্ব বিল (যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ কর আদায়ের জন্ত যে আইনের পাণ্ডুলিপিখানি) ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করা হইয়াছিল, তাহা গত ৩রা অগ্রহায়ণ ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক অগ্রাহ হইলে, তাহার পরদিনই বড়লাট উহা পাশ করিবার জন্ত তাঁহার সুপারিশ সহ ব্যবস্থা-পরিষদে পুনঃ-প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত পরিষদ এই দ্বিতীয় বারও উহা পূর্ববৎ অগ্রাহ করেন। বিলখানির পক্ষে প্রথম বারের ত্রায় দ্বিতীয় বারও ৫৩ ভোট, এবং বিপক্ষে ৫৫ ভোট হইয়াছিল। বিলখানির ভাগ্য যে এইরূপই হইবে, তাহা বোধ হয়, কাহারও বুদ্ধিতে বিলম্ব হয় নাই। যাহা হউক, বিলখানি যখনিয়মে বড়লাটের সার্টিফিকেটের জোরে পাশ হইবে, এবং দেশের লোককে নির্দ্ধারিত কর দিতে হইবে, এ বিষয়ে কাহারও কি সন্দেহ থাকিতে পারে? এখানে এ কথাও বলা আবশ্যিক যে, মসলেম লীগের সদস্যগণ এই বিলখানির অমুকূলে বা প্রতিকূলে ভোট প্রদান করেন নাই। তাঁহাদের এই প্রকার তুষ্ণীভাব অবলম্বন সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথাই বলিতেছেন। কাহারও কাহারও অমুমান, তাঁহারা পাকিস্থানের প্রস্তাবটি পাকাপাকি করিয়া লইবার জন্ত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, এই বিল পাশ হইলে মুসলমানদিগকেও কর দিতে হইবে, সেই জন্ত মুসলমান জনসাধারণ এই বিলের বিরোধী ছিলেন; লীগের সদস্যদিগের ভোটের বলে বিল কেন্দ্রী ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক গ্রাহ হইলে কতকগুলি মুসলমান সম্ভবতঃ লীগের প্রতি বিমুখ হইতেন। লীগ যাহাদের প্রতিনিধি, তাঁহাদের অনেকে লীগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে লীগকে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে হইত না? এখন ত কর দিতেই

হইবে, লীগ বলিতে পারে, বিলখানি পরিষদে তাঁহাদের অমুকূল্য লাভ করে নাই; বড়লাট সার্টিফিকেট বা শৈশ্বর-ক্ষমতাবলে এই বিল আইনে পরিণত করিয়াছেন।—তবে উভয় পক্ষেরই এ সকল কথা অমুমানমাত্র।

সে যাহাই হউক, বিলখানির স্বরূপ গতি হওয়া উচিত, তাহাই হইয়াছে। কারণ, বৃটিশ সরকার এই যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সময় এ সম্বন্ধে ভারতবাসীর মতামত জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাও ভারতবাসীর নিকট প্রকাশ করেন নাই। এই যুদ্ধে ভারতের স্বার্থসিদ্ধি হইবে কি না এবং যদি হয়, তবে তাহার স্বরূপ কিরূপ হইবে, তাহাও ভারতবাসীর নিকট ব্যক্ত করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় খরচা প্রদানের জন্ত ভারতবাসীর মত লইতে আসা গণতন্ত্রসম্মত কার্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সেই জন্ত যাহারা দেশবাসীর প্রতিনিধি, তাঁহারা এই বিলের অমুকূলে ভোট প্রদান করেন নাই। নির্দ্ধারিত প্রতিনিধিদিগের ৫ জন মাত্র বিলের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যাহারা বিলের অমুকূলে ভোট দেন নাই, তাঁহাদের মত এই যে, নির্দ্ধারিত করের সাহায্যে অর্থ আদায় না করিয়া এইরূপ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা-প্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করিয়া অর্থ সংগ্রহ করাই উচিত। অনেকে ঐ অর্থ দিতে সম্মত, তাহা শ্রীযুত ভূলাভাই দেশাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন। রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন, এই যুদ্ধে বৃটেনের প্রতিদিন ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, আর যুদ্ধ-বাবদ ভারতের প্রতিদিন ২০ লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় হইতেছে; অর্থাৎ বৃটিশ জাতি এই যুদ্ধে যত টাকা খরচ করিতেছে, ভারতবাসী তাহার ৬০ ভাগের এক ভাগ মাত্র খরচ করিতেছে। রাজস্ব-সচিবের এই উক্তি সত্য হইতে পারে,—কিন্তু গ্রেট বৃটেন শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ হইয়া সমগ্র পৃথিবী হইতে খাঁটি রসটুকু সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে,—আর ভারতবাসী সর্বহারা হইয়া এবং কৃষিমাত্র সম্বল করিয়া দিন দিন উৎকট দারিদ্র্যই বরণ করিতেছে। সুতরাং উভয় দেশের তুলনা করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তন্নিম্ন, এই যুদ্ধে মোড়লী করিবার জন্ত দায়ী কে? অথচ ‘ম্যাও’ ধরিবার সময়

ভারতবাসীর ডাক পড়িল! যাহা হউক, এই দুঃসময়ে আমাদের উপবাস করিয়াও বুটেনকে অর্থ সাহায্য করা উচিত; কিন্তু সে দান স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইলে তাহার মৰ্য্যাদা রক্ষা হয় কি?

কংগ্রেস-সদস্যগণের মুক্তির দাবী

গত ৭ই অগ্রহায়ণ লণ্ডন হইতে তারযোগে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া লীগ এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু-প্রমুখ কংগ্রেসের কারারুদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে অবিলম্বে মুক্তি দান করিতে হইবে। বিলাতের ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের ছুতপূর্ব সভাপতি মিষ্টার এলিন গড্‌ রয়ডেন, এবং কমন্স সভার সদস্য মিঃ এস, এস, সিলভারম্যান এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মেসার্স ভার্নন বার্টনেট, গ্রেহাম হোয়াইট, হেনরী নেভিসন, এবং লর্ড লিট্‌গয়েল প্রভৃতি পার্লামেন্টের সাত জন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন। বহু আচ্ছা! সে-কালে কমন্স সভায় ভারতের কথা আলোচনাকালে সদস্যদের ঘুম আসিত। একটা গল্প মনে পড়িল। লণ্ডনের কোন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র-গণকে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেন, 'ভারত কি?' কেহ বলিল, 'গাধার মত জানোয়ার', কেহ বলিল, 'টাকার গাছ'; একটা ছেলে বলিল, 'ঘুম পাড়াইবার মজা!' শিক্ষক সন্ধান লইয়া জানিলেন, ছেলেটির বাপ কমন্স সভার সভ্য, সে পিতার সঙ্গে কমন্স সভায় গিয়া দেখিয়াছে—সেখানে ভারতের কথা উঠিলেই সকলে ঘুমাইতে আরম্ভ করেন; এ-কালে সত্যরা ভারত-কথা শুনিয়া না ঘুমাইয়া অনেকেই ভারতের পক্ষ লইয়া বক্তৃতায় ক্ষুধা বৃদ্ধি করেন; ভারতের অবস্থা যেমন তেমনই থাকে! স্মরণ্য এ সম্বন্ধে মস্তব্য অনাবশ্যক।

বিমান-যুদ্ধ শিক্ষার অগ্রহ

বিমানের সাহায্যে আকাশ-যুদ্ধের কৌশল-শিক্ষার জন্য ভারতবাসীর যথেষ্ট আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিছু দিন পূর্বে নিখিল ভারতের ৩ হাজার ২ শত ৯৭ জন যুবক এই সমর-কৌশল শিক্ষার জন্য

আবেদন করিয়াছিলেন। এত দিনে প্রার্থীর সংখ্যা সম্ভবতঃ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ সকল আবেদন-কারীর মধ্যে ৮ শত ৬৭ জন পঞ্জাবের অধিবাসী; এবং ৪ শত ২২ জন বাঙ্গালী। প্রার্থীদের মধ্যে বাঙ্গালী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শারীরিক বল বা বিজ্ঞাবুদ্ধির কার্যে বাঙ্গালী কোন দিন পরাধীন নহে; তথাপি বাঙ্গালী অসামরিক জাতি বলিয়া তাহাদের দুর্নাম-ঘোষণার ক্রটি নাই; ইহার প্রকৃত কারণ কাহার অজ্ঞাত?

পাকিস্তানের প্রস্তাব কাহার অস্বীকার?

পাকিস্তান-রচনার প্রস্তাব কাহার উর্ধ্বর মস্তিষ্কে প্রথমে গজাইয়া উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত; তবে তিনি পীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এই অদ্ভুত প্রস্তাবটি কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি মোলানা আবুল কালাম আজাদের স্বন্ধে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—মোলানা আজাদই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই পরিকল্পনা জাহির করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই মোলানা মহোদয় 'ইউনাইটেড প্রেসের' কোন প্রতিনিধির সহিত আলোচনায় এই উক্তির প্রতিবাদে বলিয়াছেন,—পাকিস্তান প্রস্তাবটি অনিষ্টকর, অসাধ্য, এবং কাজে লাগাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। উহা যতই অনিষ্টকর, এবং অকেজো হউক না কেন,—কর্তার ইচ্ছায় বা খেয়ালে কার্য হওয়াই নিয়ম। মানুষ যে ফল লাভের ইচ্ছায় কোন একটা বিশেষ উপায় অবলম্বন করে,—সে উপায় অনেক সময় সেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে না। উপায় ব্রাহ্ম হইলেই তাহা অত্যন্ত কুফল প্রসব করিয়া থাকে।

সিন্ধুপ্রদেশে অরাজকতা

আমরা পূর্বাপর বলিয়া আসিয়াছি—সিন্ধুপ্রদেশে যে প্রকার অরাজকতা দৃঢ়মূল হইয়াছে, তাহা যে-কোন শাসকের পক্ষে ঘোর কলঙ্কসূচক, ইহাতে সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রভাবিত গুণ্ডার দল অকুতোভয়ে নিরীহ সমাজের লোকদিগকে হত্যা করিতেছে; অথচ

ঐ প্রদেশে শাসকদল রহিয়াছেন, সচিবমণ্ডলী আছে, শাসনকর্তাও বর্তমান, কিন্তু দীর্ঘকালেও এই গুণামীর দমন হইল না! নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইবার পর হইতেই ঐ প্রদেশের এইরূপ দারুণ দুর্দশা ঘটিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক গুণামীর নিবৃত্তির উপায় নির্ণয় করিবার জন্ত মোলানা আবুল কালাম আজাদ কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সিন্ধুপ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। প্রকাশ, তিনি ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন সেই ব্যবস্থার কি ফল হয়, তাহা দেখিবার জন্ত আজ সমগ্র সত্য-সমাজ উদ্গ্রাব। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট মোলানা মহাশয় বলিয়াছেন,—“সিন্ধু প্রদেশের বর্তমান দোষ অপসারিত করিবার জন্ত শক্তিশালী মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে যে সচিবসঙ্ঘ সংগঠিত হইয়াছে, তাহার ফলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি আশা করি, অল্প দিনের মধ্যেই সিন্ধু প্রদেশটি অত্র সকল প্রদেশের সমকক্ষ হইতে পারিবে।”—মৌলানা সাহেব গাছে কাঁটাগের মুচির আবির্ভাব দেখিয়াই গৌফের আঠা ছাড়াইবার জন্ত তেল খুঁজিতেছেন! আমাদের বিশ্বাস, কার্যফল দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করাই সম্ভব। এই জঘন্য নারকীয় ষড়যন্ত্রের যাহারা দলপতি, তাহাদিগকে ধরিয়া যথাযোগ্য শাস্তি দিতে না পারিলে ইহার স্থায়ী প্রতিকারের আশা আছে কি? তাহা জানিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

চাকুরীতে সাম্প্রদায়িকতা

স্যার এণ্ড্রু ক্লো (Sir Andrew Clow) ভারত-সরকারের যান-বাহন বিভাগের সদস্য। গত ১২ই কার্তিক নূতন দিল্লীতে রেলওয়ে সমিতির যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রদায়িক হিসাবে কর্মচারীদিগের পদোন্নতি করিবার ব্যবস্থার দোষের উল্লেখ করিয়া নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

“আমি ইহা স্পষ্টই বুঝিতেছি, এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—এই সমিতির সকলেই আমার সহিত এক-মত হইবেন যে, অভিজ্ঞতাকে এবং যোগ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল সাম্প্রদায়িক হিসাবে পদোন্নতির ব্যবস্থা করিলে তাহার ফল অতি ভীষণ হইবে। আমার এ কথা বলিবার

উদ্দেশ্য এই যে, যে ক্ষেত্রে পদস্থ ব্যক্তির প্রবীণতা (seniority) অনুসারে পদোন্নতির নিয়মিত ব্যবস্থা, সে ক্ষেত্রে যদি কোন প্রবীণ কর্মচারী দেখিতে পায় যে, এক জন নবীন (junior) কর্মচারী অত্র সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া উচ্চ পদ পাইল, এবং যে ক্ষেত্রে যোগ্যতর ব্যক্তিকে উল্জন করিয়া অযোগ্য লোককে উচ্চ পদ প্রদান করা হইল, আমি তাহাদের কথাই বলিতেছি। ইহার ফল এই হইতেছে যে, আমরা যে সকল লোক পাইতেছি, তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট লোকের প্রতি যেরূপ সম্ভব, সেরূপ সদ্যবহার করিতেছি না। এইরূপ হইলে চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক ভাব বৃদ্ধি পাইবে, এবং যে ক্ষেত্রে কর্মচারীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সে ক্ষেত্রে কাজে দৃঢ় আনুগত্যের এবং সখ্য-বন্ধনের অভাব ঘটিবে।”

স্যার এণ্ড্রু ক্লোর কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। যদি কেবল সর্বনিম্ন যোগ্যতা (minimum qualification) দেখিয়া বা কার্যতঃ অত্র সম্প্রদায়ের অযোগ্য লোককে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য লোককে চাকুরী দেওয়া হয়, বা কোন কর্মচারী সম্প্রদায়-বিশেষের লোক বলিয়াই তাহাকে অত্র সম্প্রদায়ের বহুদর্শী এবং যোগ্যতম লোককে উপেক্ষা করিয়া উচ্চতর পদ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কর্মচারীদিগের কার্যে আনু-রক্তি থাকে না, পরস্পর একতা থাকে না,—এবং যে সকল কর্মচারী নিয়োগ-কর্তাদিগের বিশেষ অনুগত হইত, তাহারা তাহাদের উপর বিরক্ত হয়। ইহা স্বাভাবিক। স্বভাবের এই গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। ইহাতে সাধারণের কার্যের ক্ষতি হয়, ব্যয়বাহুল্য ঘটে, এবং দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হয়। যে সম্প্রদায় অথবা অনুগৃহীত, সে সম্প্রদায় ক্ষুধিত গৃহের ত্রায় অধিকতর অনুগ্রহের জন্ত সোর-গোল করিতে থাকে; যে সম্প্রদায় উপেক্ষিত, তাহারা কাজের জন্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে চাহে না। অথচ ইহাতে কোন প্রকার সুফল পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা ভেদনীতি সফল হইতে পারে,—কিন্তু ভেদনীতি যে কখনই কল্যাণপ্রদ হয় না, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বরপণ-নিবেধক আইন

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বিখাস বন্দ্যায় ব্যবস্থা-পরিষদে বরপণ-নিবেধক আইনের এক পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বরপণ-প্রথা হিন্দু সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর, এবং অনিষ্টজনক। ইহা বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে, এবং ইহার ফলে অনেক বালিকা আত্মহত্যা করিয়াছে—ইত্যাদি। বরপণ-প্রথা বহু কাল হইতে এ দেশে প্রচলিত আছে, এ কথা সত্য নহে। ৭০ বৎসর পূর্বেও ইহা ছিল না; তখন কুলীনের বরপণ ছিল ৭ টাকা, কোথাও বা ৯ টাকা। ইহা নূতন আমদানী। আমাদের বিখাস, আইনের সাহায্যে এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারের কোন আশা নাই। পাণ্ডুলিপিখানিতে ব্যবস্থা হইয়াছে, যে ব্যক্তি ৫১ টাকার অধিক বরপণ দিবে এবং লইবে, তাহার উত্তরেই এই আইন অনুসারে দণ্ডিত হইবে। তবে কন্ডার পিতামাতা অথবা অভিভাবক স্বেচ্ছায় কন্ডাকে অলঙ্কার বা যৌতুক প্রদান করিলে তাহা বরপণ বলিয়া গণ্য হইবে না; এবং আইনের আমলে আসিবে না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, পাণ্ডুলিপিখানি আইনে পরিণত হইলে উহাতে কোন ফলই হইবে না। এই কন্ডাই এই নিষ্ফল আইনের সমর্থন করা যায় না। তবে এইরূপ আইন হইলে কন্ডাকে তাহার বিবাহকালে যে অলঙ্কার দেওয়া হয়, তাহা স্ত্রীধনে পরিণত হইবে; উহাতে স্বামীর অধিকার থাকিবে না। স্ত্রীর পক্ষে এইটুকুই লাভ।

মানচিত্রে অ্যাতঙ্ক

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, এলাহাবাদে এবং পুণায় পুলিশ দোকান হইতে সাধারণ মানচিত্র কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। কেন? মানচিত্রের মধ্যে কি বিপ্লবের বীজ লুকাইয়া থাকে? এ উৎপাত অন্ততঃ ঘটিবে কি? ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানচিত্র হয় ত পরিবর্তিত হইয়া অন্ততঃ অঙ্কিত হইবে; কিন্তু সেজন্য খেতান্ন-বিশেষের জুতাতক ও ছত্রাতকের জায় পুলিশের মানচিত্রাতকের কি কারণ ঘটিল, তাহা বুঝা যাইতেছে না!

নিখিল ভারতীয় মহিলা-সমিতি

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় নারী-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন এই সমিতি কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব এই, পৃথিবী-জুড় নারীরা যেন সম্মিলিত হইয়া বৃদ্ধ-নিবারণ, এবং যাহাতে জায়ধর্ম অনুসারে আন্তর্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তি হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করেন। কাগজে-কলমে প্রস্তাবটি অতীব মনোহর হইলেও কার্যে পরিণত করা কি সম্ভব? প্রথমতঃ, বিশ্ব-সংসারের সকল নারীই এক-মতাবলম্বিনী হইবেন, ইহা বিধাতাপুরুষও আশা করিতে সাহস করিবেন না। নারীরা সাধারণতঃ শাস্তির পক্ষপাতিনী, এ কথা সত্য,—কিন্তু বিবাদের গন্ধে আনন্দ লাভ না করেন, সংসারে এরূপ নারীরও অভাব আছে কি? এই প্রশ্নে আজ মনে পড়িতেছে—বুয়ার বৃদ্ধের পূর্বে কোন নারী প্রেসিডেন্ট ক্লগারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি অবিলম্বে বৃদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন না, ইহার কারণ কি? 'Blackmail or Wai' নামক পুস্তিকাখানি নারীই রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, বৃদ্ধ অপরিহার্য হইলে তাহার কি গতিরোধ করা যায়? নারীরাও কি পুরুষদিগকে বৃদ্ধে প্রোৎসাহিত করেন না? সুতরাং কার্যক্ষেত্রে এই প্রস্তাব প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

মহিলারা আরও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন,—বিবাহে বরপণ-গ্রহণ বন্ধ করিতে হইবে। অধুনা আইন করিয়াও তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বরপণের অভাবে বরের জননী জুড় হইয়া অনেক স্থলেই বধুকেও খোঁটা দিতে ছাড়েন না, দীর্ঘকাল তাহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইতে চাহেন না—ইহা কাহার অজ্ঞাত? আইন দ্বারা সমাজের সংস্কার-সাধনের চেষ্টার ফল কিরূপ হয়, সর্দা-আইন পাশ হইবার পর তাহার প্রমাণের অভাব হইয়াছে কি? সর্দা-আইনকে আরও বলবৎ করিবার ফলে সমাজে বিশেষ বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে

পারে। হিন্দুধর্মে আস্থাবান কোন হিন্দু কোন মতেই হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদের সমর্থন করিতে পারিবেন না। এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা আলোচনা নিম্নয়োজন। বর্তমান প্রগতির যুগে নারী-সমিতির এই সকল প্রস্তাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে 'যা হোক তা হোক বেশ' বলিয়া তাহাদের সমর্থন করিবার উপায় নাই। আমরা এই সকল প্রস্তাবে বর্তমান বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের কল্যাণপ্রদ কিছুই দেখিতে পাইলাম না; তবে আমরা নিরাশ হইলেও তাঁহাদের উৎসাহের অভাব হইবে না; তাঁহারা এই ভাবে 'নূতন কিছু' করিবার জ্ঞান সভায় সম্মিলিত হইবেনই।

কৃষ্ণনগরে হিন্দু-সভার অধিবেশন

এবার নদীয়া-কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় হিন্দু-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহা নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক শাখা। সার মনমথনাথ মুখোপাধ্যায় এই অধিবেশনের সভাপতি, এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহাদের সভাপতিত্বে এবং সদস্যগণের চেষ্টা-যত্নে সভার অধিবেশন সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সভায় বহু লোকের সমাগমে অনেককেই স্থানাভাবে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

দশম প্রস্তাবে বঙ্গীয় সচিবমণ্ডলীর শাসন-নীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু জনসাধারণের আদৌ মতভেদ নাই। বর্তমান সচিবসঙ্ঘের শাসনকালে সংখ্যালঘু হিন্দুদিগের প্রতি যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে সকল বাধা এবং অসুবিধা উদ্ভাবিত হইতেছে, সভাপতি মহাশয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই সভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে, বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত আছে, তাহা আপাততঃ বন্ধ রাখা হউক। এই হিন্দুসভায় বলা হইয়াছে, বাঙ্গালার বর্তমান সচিবমণ্ডলী সমগ্র হিন্দুদিগের আস্থা হারাইয়াছেন, এবং বর্তমান-প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি একেবারেই অচল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই প্রস্তাবটির প্রতি বাঙ্গালী প্রদেশের গভর্নর সার জন আর্থার হারবার্টের দৃষ্টি

বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সমিতি দৃঢ়তার সহিত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-ব্যবস্থারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৃটিশজাতি দৃঢ়তার সহিত প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির একান্ত পক্ষপাতী; কিন্তু তাঁহারা এই গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির মূলমন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থার কেন এত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে হিন্দু-সভার সাফল্য কামনা করি।

ব্যক্তিগত আইন অমান্য

আইন-অমান্য আন্দোলন ক্রমশঃ সমগ্র ভারতেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। গান্ধীজীর এই ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলন প্রদেশ-বিশেষে সীমাবদ্ধ হয় নাই; সকল দেশেই ইহা বিস্তারলাভ করিয়াছে। গান্ধীজী কোন কোন নারীকে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করায় সাধারণের ধারণা হইয়াছিল, তিনি নারী-মাত্রকেই এ বিষয়ে নিরস্ত করিয়াছেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা; এ পর্য্যন্ত অনেক নারী গান্ধীজীর সন্মতিক্রমেই সত্যাগ্রহ করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ফলেই সরকারী জেল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধান সচিব হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির সভ্য প্রভৃতিতে পূর্ণ হইতেছে; কিন্তু এখনও কয়েদী-শ্রোতের বিরাম নাই! মাদ্রাজের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী, অন্ধ্র প্রদেশের ভূতপূর্ব মন্ত্রীরা, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী প্রভৃতি মহিলারা কারাবদ্ধ হইয়াছেন। পঞ্জাবের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণ সিং ব্যক্তিগত আইন-অমান্য হেতু গ্রেপ্তার হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার এক আনা জরিমানা হইয়াছে; ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তাহা প্রদান করিয়া সম্পূর্ণ সিংকে তাঁহার আন্তরিকতার অভাবের জ্ঞান নিন্দা করিয়াছেন। গান্ধীজী তাঁহাকে না কি সত্যাগ্রহ করিতে অনুমতি দেন নাই। কলিকাতায় কোন কোন সত্যাগ্রহীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নাই; কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফলের কারণ বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এই সমস্তায় গান্ধীজীর অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

ভবিষ্যতের ইতিহাস-লেখকগণ ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি কি ভাবে লিখিবেন, তাহা কি শাসকগণ ভাবিতেছেন? লর্ড লিনলিথগো এবং বিলাতী মন্ত্রি-মণ্ডলীকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, এইরূপই আমাদের ধারণা। বর্তমান মুহুর্তকালে ভারতের রাজনীতি-গগনের এই অবস্থা উপেক্ষণীয় নহে।

যুদ্ধের ব্যয়

পূর্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, বর্তমান যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিদিন ৯০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২ কোটি টাকা হিসাবে ব্যয় হইতেছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, এখন গ্রেট ব্রিটেনের ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭ শত পাউণ্ড হিসাবে প্রত্যহ এই যুদ্ধের জন্য ব্যয় হইতেছে; অর্থাৎ প্রায় ১৬ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা প্রতিদিন তাঁহাদিগকে ব্যয় করিতে হইতেছে। এই ব্যয় ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। গ্রেট ব্রিটেনকে মার্কিং হইতে যুদ্ধ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, এবং জাহাজ কিনিতে হইতেছে; সুতরাং ব্রিটেনের বহু অর্থ মার্কিং জাতিরই উদর পূর্ণ করিতেছে। লর্ড লোথিয়ান বলিয়াছেন—ব্রিটেনের স্ত্রবর্ণ-সঞ্চয় এবং “সিকিউরিটি” প্রভৃতি সমস্তই প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। ব্রিটিশ সরকার মার্কিংয়ের নিকট আবার ৬০খানি মালবাহী জাহাজের জন্য বায়না দিয়াছেন; ইহারও মূল্য অল্প হইবে না। সুতরাং ব্রিটিশ জাতিকে এ জন্য চিন্তিত হইতে হয় নাই, এ কথা বলা যায় না; কিন্তু যেরূপে হউক, তাঁহাদিগকে শেষ রক্ষা করিতেই হইবে। তাঁহাদের আশ্রিত বহু দেশ তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। ও-দিকে জার্মানী অনেকগুলি রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে শোষণ করার অর্থসঙ্কটে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে, নতুবা এত দিন তাহাদের চক্ষু কপালে উঠিত!

চিকিৎসা-শিক্ষার সংকোচ

বিগত অক্টোবর মাসে দিল্লী নগরে যে মেডিক্যাল কাউন্সিল বা চিকিৎসা-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সদস্যরা মেডিক্যাল স্কুলগুলি উঠাইয়া দিবার

জন্ত অথবা উহার শিক্ষার বিস্তার-সাধনের জন্ত এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবটি কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে অর্থা-ভাবে বারো আনা লোক চিকিৎসকের সম্পূর্ণ এবং আবশ্যিক সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে না। রোগীর অস্তিমকালে তাহার অগত্যা ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়াও চিকিৎসক ডাকে। এরূপ অবস্থায় লোক যাহাতে সুলভে সুচিকিৎসক পায়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন। মেডিক্যাল স্কুলগুলি সেই অভাব পূর্ণ করিতেছে। বহু স্থলেই দেখা যায় যে, মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ চিকিৎসক অপেক্ষা মেডিক্যাল স্কুলের উত্তীর্ণ কোন কোন ডাক্তার চিকিৎসা-কার্যে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যে দেশে সুশিক্ষিত চিকিৎসকের অভাবে রোগী হাতুড়িয়ার হস্তে প্রাণ দেয়, সে দেশে মেডিক্যাল স্কুলগুলি বন্ধ করিবার পরামর্শ প্রদান কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। গত ৯ই অগ্রহায়ণ কলিকাতায় যে নিখিল বঙ্গীয় লাইসেন্সিয়েট ষ্টুডেন্টের সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতেও উহার অনুরূপ প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছিল। আমরা চিকিৎসক এবং সম্ভাবিত চিকিৎসকদিগের এরূপ মনোবৃত্তি দেখিয়া দুঃখিত। এ দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প। লোক নিঃস্ব; অতএব চিকিৎসার ব্যয় যত অল্প হয় ততই মঙ্গল।

ভারতে মুসলমান-সংখ্যা

ভারতে মুসলমানের সংখ্যা কত? যুক্ত-প্রদেশের একখানি সংবাদপত্রে কোন লেখক লিখিয়াছেন, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শুনা যাইত যে, ভারতে মুসলমান-দিগের সংখ্যা ৭ কোটি। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মল্লম লীগ ঘোষণা করেন—ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ৮ কোটি। তাঁহারা কোন্ হিসাবে নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেহ তাহা জানে না। তাহার পর-বৎসরেই বলা হইল, ভারতের মুসলমান-সংখ্যা ৯ কোটি! ভারতের মুসলমানদিগের এই সংখ্যা কি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে? আবার এবার আদম সুমারে বাঙ্গালার লোক-গণনা লইয়া নানা সমস্তার উদ্ভব হইতেছে। ইহা যে সাম্প্রদায়িকতার অবশ্যস্বীকারী ফল, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ‘বঙ্গমতী’ রোটারী মেসিনে ত্রিশশিভুষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



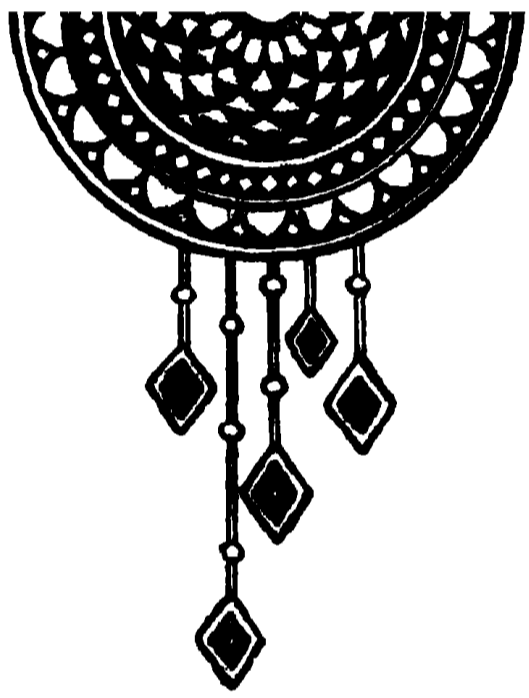
“পদ” শুধু সৌন্দর্যের নয়-আবরণ”



১৯শ বর্ষ]

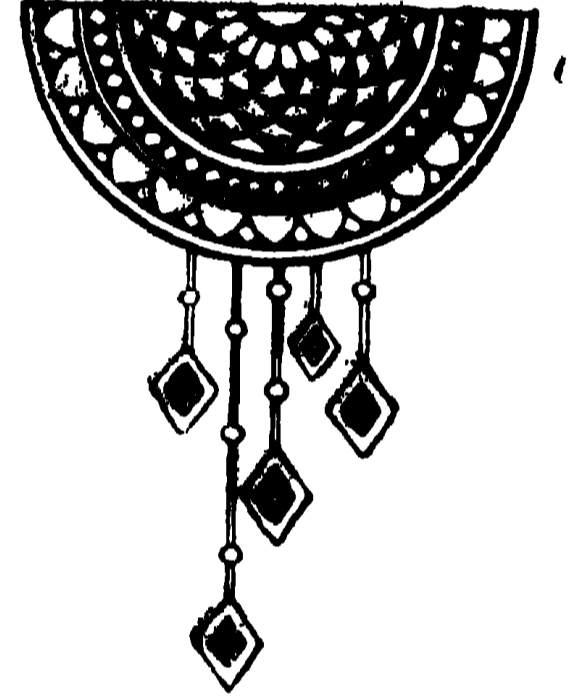
পৌষ, ১৩৪৭

[৩য় সংখ্যা



পূর্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর*

(৩)



শ্রাবণ সংখ্যার 'মাসিক বসুমতীতে' ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মহর্ষি জৈমিনি নিরীশ্বরবাদের প্রচারক ছিলেন না। বর্তমান প্রবন্ধে ও পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে

আলোচনা করা যাইতেছে—জৈমিনিমতের বিভিন্ন চুইটি মুখ্য প্রশ্ন—আচার্য্য কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর মিশ্রের সম্প্রদায়ে নিরীশ্বরবাদের পোষক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

অধ্যাপক কীথ অবশ্য ইহাদিগের উভয়ের স্বক্কেই নিরীশ্বরবাদের অভিযোগ চাপাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—'নিরীশ্বরবাদের পূর্ণ পরিণতি কুমারিল ও প্রভাকর উভয়ের মতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নহে'। (১) বস্তুতঃ কুমারিল ও প্রভাকর

নিরীশ্বরবাদের সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থক ছিলেন না, তাহার বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ বা মহোদয় তাঁহার 'প্রভাকর-মীমাংসা'-শীর্ষক স্মৃতিস্তিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'কুমারিল এক সঙ্গে সমস্ত জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় স্বীকার করেন নাই'। ইহার প্রমাণস্বরূপে তিনি কুমারিল-কৃত 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র চারিটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে বা মহোদয়ের অভিমত উদ্ধৃত হইল—

'কুমারিলের ঈশ্বর-সম্বন্ধে মতবাদ 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র 'সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারে' দৃষ্ট হয়। তিনিও সমস্ত জগতের এক সঙ্গে (শ্লোক ১১৩) সৃষ্টি (শ্লোক ৪৭) ও প্রলয় (শ্লোক ৬৮) স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল কারণে সর্বজ্ঞের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, সেই সকল যুক্তির Prabhākara and Kṇmārila....."—Keith, Karma-mīmāṃsā, p. 61.

* এ সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ—'মাসিক বসুমতী', আষাঢ় ১৩৪৭, ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ—'মাসিক বসুমতী', শ্রাবণ ১৩৪৭—দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধগুলি রচনার মদীয় আচার্য্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-বর্ষ্য শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহোদয়ের উপদেশ ও মদীয় স্বর্গত পিতৃব্যদেব ডক্টর পণ্ডিতনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের Introduction to the Pūrva Mīmāṃsā গ্রন্থ আমার প্রধান উপলব্ধি।

(১) "The full development, however, of the doctrine (atheism) is, as usual, to be found in

উপর নির্ভর করিয়াই তিনি স্রষ্টারও অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন (শ্লোক ৪৭-৫২, ১১৪-১১৭)' । (২)

এই প্রসঙ্গে ইহা বিচার করা একান্ত কর্তব্য যে— কুমারিলের এই স্রষ্ট্রনিবেধ-বাদ তাঁহার চরম অভিপ্রায়-সূচক, অথবা ইহা অল্প কোনরূপ গূঢ় উদ্দেশ্যমূলক প্রৌঢ়িবাদ মাত্র । একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যাইবে, কুমারিল 'সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারে' এই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন বলিয়া মনে হয়, ইহার মূলে একটি নিগূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে । তিনি ঈশ্বরের আত্যন্তিক নিষেধ কদাপি কৃত্রাপি করেন নাই । তাঁহার আপাততঃ প্রতীয়মান স্রষ্ট্রনিবেধের অন্তরালে যে গভীর অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাই নিম্নে পরিষ্কার করা যাইতেছে ।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনের অনুগামিগণ বিশ্বাস করেন যে, বেদ-রচনা বা বেদ-নিয়ন্ত্রণে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য আছে । কুমারিল মুগ্ধ্যতঃ শ্রায়-বৈশেষিকের এই মতবাদের খণ্ডনোদ্দেশ্যেই শ্রায়-বৈশেষিক-দর্শনের যুক্তি-কল্পিত স্রষ্ট্র সন্তাব-নিষেধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কুমারিলের আশঙ্কা এই

(২) "Kumārila's views with regard to God are found in the S'loka-vārtita, Sambandhāksepapari-hāra. He also denies the creation (s'loka 47) and dissolution (68) of the universe as a whole (113) ; he bases his denial of the Creator on the same grounds as that of the 'omniscient person' (47-59, 114-117)."—Indian Thought, Vol. II, p. 262.

প্রমাণরূপে উল্লিখিত শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"প্রবৃত্তিঃ কথমাশ্চা চ জগতঃ সম্প্রতীয়তে ।

শরীরাদেবিনা চাস্ত কথমিচ্ছাপি সর্জনে" । ৪৭ ।

"প্রলয়েহপি প্রমাণং নঃ সর্কোচ্ছেদায়কে ন হি ।

ন চ প্রয়োজনং তেন স্তাৎ প্রজাপতিকর্ষণা" । ৬৮ ।

"তস্মাদন্তবদেবাত্ম সর্গপ্রলয়কল্পনা ।

সমস্তকরুজমভ্যাং ন সিধ্যত্যপ্রমাণিকা । ১১৩ ।

সর্কজবন্নিবেধা চ স্রষ্ট্রঃ সন্তাবকল্পনা ।

ন চ ধর্মাদৃতে তন্ত ভবেল্লোকাবিশিষ্টতা । ১১৪ ।

ন চানন্তুষ্টিতো ধর্মো নাস্তুষ্ঠানমৃতে মতেঃ ।

ন চ বেদাদৃতে সা স্তাঘেদো ন চ পদাদিভিঃ । ১১৫ ।

তস্মাৎ প্রাপপি সর্কোহমী স্রষ্ট্রাসন্ পদাদয়ঃ ।

স্তাৎ তৎপূর্ককতা চাস্ত চৈতন্তাদমদাদিবৎ । ১১৬ ।

এবং যে যুক্তিভিঃ প্রাহস্তেবাং দুর্লভমুত্তরম্ ।

অবেধো ব্যবহারোহয়মনাদিবেদবাদিভিঃ" । ১১৭ ।

—সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার ।

যে—যদি তিনি শ্রায়-বৈশেষিক মতের অনুসরণক্রমে স্বীকার করেন যে, জগৎস্রষ্ট্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে ও বেদকে নিত্য না বলিয়া ঈশ্বর-স্রষ্ট্র বলিয়া নির্ধারণ করাই সম্ভব, তাহা হইলে বস্তুতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রমাণিত হইতে পারে না । সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহারের ১১৪ শ্লোকে তিনি যে উপমাটির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তাঁহার উক্তি—“সর্কজবন্নিবেধা চ স্রষ্ট্রঃ সন্তাবকল্পনা ।” ‘সর্কজবৎ’ (অর্থাৎ সর্কজের মত)—এই বাক্যাংশটি বিশেষ গভীরার্থক । উক্ত শ্লোকটির সরল বাঙ্গালা অর্থ— স্রষ্ট্র অস্তিত্ব-কল্পনা সর্কজের (অস্তিত্ব-নিরূপণের) শ্রায়ই নিষেধের যোগ্য । পার্শ্বসারথি মিশ্র তাঁহার ‘শ্রায়রত্নাকর’-নামক ‘শ্লোকবার্ত্তিক’-ব্যাক্যায় উক্ত শ্লোকের বিবরণ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—“যথা চ বুদ্ধাদেঃ সর্কজত্বং পুরুষত্বাদমদাদি-বন্নিবিদ্ধম্, এবং প্রজাপতেরপি স্রষ্ট্রত্বং নিবেধ্যম্” । (৩) অর্থাৎ—আমাদিগের শ্রায় বুদ্ধ প্রভৃতিও শরীরধারী পুরুষ ছিলেন । শরীর-পরিচ্ছেদ-হেতু আমাদিগের যখন সর্কজত্ব সম্ভব নহে, তখন তদদৃষ্টান্তে পরিচ্ছিন্ন-শরীরধারী বুদ্ধাদির সর্কজত্বও সিদ্ধ হয় না । ঠিক এইরূপ যুক্তির সাহায্যে বলা যায় যে, প্রজাপতিও একজন বিগ্রহ-বিশিষ্ট পুরুষ ; অতএব তাঁহার পক্ষেও জগতের স্রষ্ট্রত্ব সম্ভব নহে । কারণ, প্রজাপতিকে একবার পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেই তাঁহার শরীর স্বীকার করিতে হইবে । শরীর স্বীকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উৎপত্তি-নাশও স্বীকার্য্য । তাহা হইলে স্বয়ং প্রজাপতিও আমাদিগেরই মত অনিত্য হইয়া পড়েন । আর আমাদিগের পক্ষে যখন জগৎস্রষ্ট্র সম্ভব নহে, তখন তদদৃষ্টান্তে প্রজাপতির পক্ষেও জগৎস্রষ্ট্র করা সম্ভব হইতে পারে না । সংক্ষেপে বলিতে যাইলে দাঁড়ায় এই যে, পার্শ্বসারথি বুঝাইতে চাহিয়াছেন—প্রজাপতির স্রষ্ট্রত্ব যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত করা অসম্ভব—ইহাই কুমারিলের উক্তির নিগূঢ় অভিপ্রায় ।

পার্শ্বসারথির এই বিবৃতি কতটা যুক্তিসহ, তাহা সবিশেষ আলোচ্য । এ কথা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না যে,

(৩) শ্রায়রত্নাকর সহিত শ্লোকবার্ত্তিক, পৃঃ ৬৭৩, চৌধাধা সংস্করণ ।

‘সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারে’র উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পড়িলেই আপাততঃ মনে হয় যেন কুমারিল বলিতে চাহেন যে—ঈশ্বর (তা তিনি শরীরীই হউন আর অশরীর চৈতন্যমাত্র-স্বরূপই হউন) জগতের স্রষ্টা বা অধ্যক্ষ (পালয়িতা—কর্মফলদাতা—নিয়ন্তা) কিছুই নহেন; আর সমগ্র জগতের এক সঙ্গে উৎপত্তি বা প্রলয়ও সম্ভব নহে। কিন্তু যদি ঐ শ্লোকগুলির প্রথম দৃষ্টিতে প্রতীয়মান অর্থটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া না থাকিয়া পূর্বাপর প্রকরণের সহিত মিলাইয়া উহাদিগকে বিশ্লেষিত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ শ্লোকগুলির সাহায্যে কুমারিল মোটেই ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব উড়াইয়া দিতে চাহেন নাই; তিনি কেবল জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-কল্পনা অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা প্রয়োজন। কুমারিলের মূল শ্লোকটি—“সর্বজ্ঞবিশেষ্যা চ স্রষ্টুঃ সত্ত্বাবকল্পনা।” এ স্থলে নিষেধ্য কি? স্রষ্টা কখনই নিষেধ্য নহেন। কারণ, তাহা হইলে ‘সর্বজ্ঞবৎ’ এই উপমাটি দিবার কোনই সার্থকতা থাকিত না; আর তাহা ছাড়া ‘স্রষ্টুঃ’ সত্ত্বাবকল্পনা নিষেধ্য্যা’ এইরূপ বাক্যাংশ রচনা না করিয়া ‘স্রষ্টা নিষেধ্য্যা:’ অথবা ‘স্রষ্টুঃ সত্ত্বাবো নিষেধ্য্যা:’—এইরূপ সোজাসুজি পদযোজনা করিলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইতে পারিত। তাহা হইলে বস্তুতঃ নিষেধ্য কি? উপরি-উদ্ধৃত বাক্যটির ঘটক পদগুলি বিশ্লেষিত করিলে দেখা যাইবে যে, নিষেধ্য হইতেছে ‘কল্পনা’ (‘নিষেধ্য্যা স্রষ্টুঃ সত্ত্বাবকল্পনা’)। এই ‘কল্পনা’ পদটির অর্থ হইতেছে ‘অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে নিরূপণ’।

যাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা অবধারিত, অথবা শব্দ-প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধ বা সুসাধ্য, তাহাকে কল্পনার বিষয় বলা চলে না। কারণ, প্রত্যক্ষের বিষয় সর্বদাই সিদ্ধ; শব্দ-প্রমাণের গোচরীভূত বস্তু কখনও সিদ্ধ কখনও বা সাধ্য (সাধ্য হইলেও উহা নির্দোষরূপে সাধ্য)। আর কল্পনা বা অনুমানের বিষয় কেবল সাধ্য, অথচ উহাতে দোষ প্রবেশের সম্ভাবনাও কখন কখন থাকিতে পারে। (৪) প্রত্যক্ষ ও আগমের মধ্যে একটি পার্থক্য

এই যে, প্রত্যক্ষ কেবল সিদ্ধ বস্তুবিষয়ক হইলেও শব্দ সিদ্ধ-সাধ্য উভয়-বিষয়ক হইতে পারে। অবশ্য যে স্থলে প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণ সিদ্ধ বস্তুকেই বিষয়ীভূত করে, সে স্থলেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্ট-সিদ্ধ বস্তু (যেমন ঘট-পটাদি) বিষয়ে প্রত্যক্ষেরই প্রাধান্য; শব্দ-প্রমাণ তাহার প্রতিকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলে প্রত্যক্ষানুসারে নেয়। (৫) পক্ষান্তরে, অদৃষ্ট-সিদ্ধ বস্তু (যেমন স্বর্গ, পরমেশ্বর প্রভৃতি) একমাত্র আগম বা শব্দ-প্রমাণের গোচর; তদ্ব্যয় প্রত্যক্ষের কোন অধিকারই নাই। আর যে যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রবৃত্তি হইবার যোগ্যতা থাকে, অনুমান প্রমাণ (যুক্তি বা তর্ক) কেবল সেই সেই ক্ষেত্রেই প্রবৃত্ত হইতে পারে। ধর্ম, অধর্ম, স্বর্গ, ঈশ্বর প্রভৃতি অদৃষ্ট-সাধ্য ও সিদ্ধ বস্তু বিষয়ে এই কারণেই প্রত্যক্ষ বা অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এ সকল বিষয়ে আগমই একমাত্র প্রমাণ। অতএব, স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুমান-প্রমাণ-গম্য হইতে পারে না—কেবল এই উদ্দেশ্যেই ভট্টপাদ স্রষ্টার অস্তিত্ব-কল্পনাকে ছেয়-বোধে উহার নিষেধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্ব কখনও নিষেধ করেন নাই। শ্লোকবার্ত্তিকের উদ্ধৃত শ্লোকগুলির আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, কুমারিল ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব কখনও অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের মত মানবের কল্পনা (অর্থাৎ অনুমান বা যুক্তিতর্ক) মাত্র দ্বারাই সিদ্ধ হইবার যোগ্য, সেস্বরূপ ঈশ্বরকে তিনি জগৎ-কারণ বলিতে একেবারেই নারাজ। তাঁহার মতে, আমাদের কল্পনার উপর যাহার অস্তিত্ব-সিদ্ধি একান্তভাবে নির্ভর করে, তিনিই আবার জগতের সৃষ্টিকর্তা—ইহা অপেক্ষা অযৌক্তিক ও হাস্যকর মতবাদ আর কি থাকিতে পারে।

কুমারিল সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে ‘সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার’ প্রকরণ রচনা করেন নাই। তাঁহার এ প্রকরণ রচনার মূলে আছে বেদের কৃতকল্প-বাদ নিরাসের চেষ্টা। প্রাচীন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতাবলম্বিগণের অনেকেই প্রথমে কেবল অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বর-সিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ও পরে প্রচার করিয়াছেন যে, বেদ

(৪) “বস্তুনাহুমিতোহপ্যর্থঃ কুশলৈরহুমাতৃভিঃ। অভিব্যক্ত-ভবৈরহৈরহুভৈবোপপাত্তে”।—ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্র-কর্তৃক (২।১।১১)।

(৫) এই জন্ত বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—সহস্র স্রুতিবাক্য-বলেও একটি ঘট পটে রূপান্তরিত হইতে পারে না—“ন হাগমাঃ সহস্রমপি ঘটং পটমিতুমীশতে”—ভামতী, অধ্যায়ভাষ্য।

(উক্তরূপ আনুমানিক) ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট। (৬) কুমারিল বিশেষ প্রযত্নসহকারে এই জাতীয় মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই 'সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার' রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, বেদকর্তা ঈশ্বর স্বীকার করা অপেক্ষা বরং মোটেই ঈশ্বর স্বীকার না করা ভাল; আর যে বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট, সে রূপ শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যও তিনি স্বীকার করিতে চাহেন নাই। অতএব, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারের ১১৪-১১৭ সংখ্যক শ্লোকগুলির তাৎপর্য অমূল্যমান করিলে দেখা যাইবে যে, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ বা মহোদয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে ভাট্টপাদের স্বারসিক অনুবাদ নহে। যে সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার প্রকরণ বেদের পৌরুষেয়ত্ব বা কৃতকত্ব নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই রচিত, তাহার মধ্য হইতে সমগ্র জগতের সৃষ্টি-প্রলয় সম্বন্ধীয় মতবাদ কিরূপে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগোচর।

পূর্বেকৃত চারিটি শ্লোকের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, ভট্টপাদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

(১) বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। ইহা কোন পুরুষ- (মানব অথবা ঈশ্বর)-কর্তৃকই সৃষ্ট নহে।

(২) ঈশ্বর যে জগৎস্রষ্টা সে বিষয়ে অপৌরুষেয় নিত্য বেদই একমাত্র প্রমাণ।

(৩) কেবল অনুমান-প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব কোনক্রমেই সাধিত হইতে পারে না।

শ্লোক চারিটির অর্থ বিশেষ অস্পষ্ট নহে। কেবল যত কিছু গোলমাল বাধিয়াছে ১১৪ শ্লোকটির প্রথমার্ধ লইয়া—“সর্বজ্ঞবন্নিবেধ্যা চ স্রষ্টুঃ সম্ভাবকল্পনা”। ইহার আক্ষরিক বাঙ্গালা অর্থ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে—স্রষ্টার অস্তিত্ব-কল্পনা সর্বজ্ঞের জ্ঞানই নিষেধার্থ। কথাটি আরও একটু তলাইয়া দেখা যাউক। যখন সর্বজ্ঞ-(বুদ্ধ)-কর্তৃক রচিত কোন গ্রন্থে

দেখা যায় যে, তিনি আপনাকে আপনি 'সর্বজ্ঞ' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তখন কেবল তাঁহার সেই উক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে 'সর্বজ্ঞ' বলা যুক্তি-সঙ্গত হয় না। ঠিক সেইরূপ—যখন স্বীকার করা হয় যে, বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট, আর সেই বেদই বলেন যে ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, তখন বেদের সেই উক্তি জ্ঞানতঃ নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। (৭) যে ঈশ্বর মানবের কল্পনা-প্রসূত (অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব-সিদ্ধি কেবল পৌরুষেয় অনুমানের উপর নির্ভর করে), এমন ঈশ্বর-কর্তৃক রচিত শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ভট্টপাদ মোটেই রাজী নহেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎস্রষ্টৃত্ব একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণ-গম্য, আর এই শ্রুতি নিত্য, স্বতন্ত্র ও অপৌরুষেয়। শ্রুতি যে কেবল মানব-রচিত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় তাহা নহে, পরন্তু ইহা ঈশ্বর-কর্তৃকও রচিত নহে। (৮) ইহা কৃতকত্ব-দোষ-হ্রষ্ট নহে—ইহা নিত্য। ইহার অধিক কোন কথা কুমারিল উক্ত প্রকরণে বলিতে চাহেন নাই। অতএব, তিনি ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব স্বীকার করেন না—এরূপ অভিযোগ তাঁহার উপর আরোপ করিবার বিশেষ কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বরং জ্ঞান-বৈশেষিক মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি স্থানে স্থানে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও জগৎ-কারণত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। আগামী প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(৭) ভট্টপাদ উহা চোদনাত্মক বিবরণে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন— “নর্ত্তেতদাগম্যং সিধ্যৈ চ তেনাগমো বিনা।

দৃষ্টান্তোহপি ন তত্তান্তো নুবু কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে।”

—(চোদনাত্মক, শ্লোকবার্ত্তিক, ১৪২ শ্লোক)

“ন হি যুক্তস্ত সর্বজ্ঞত্বে তদাগমমন্তরেণাত্মং প্রমাণমন্তি, অতঃ সর্বজ্ঞপ্রীতত্বে সিদ্ধে তদাগমস্য প্রমাণত্বং তৎপ্রামাণ্যে চ তৎসিদ্ধি-বিত্তীতরেতরাশ্রয়ম্। অশরীরস্য চ ভাষাদিরহিতস্যাগমপ্রণয়নমপি কথমিতি ন বিদ্যঃ। শরীরযুক্তেন স্বসর্বজ্ঞেন প্রীতস্য ন প্রামাণ্যং স্যাদিতি। যদি স্বভবেহপি কশ্চিন্মুতঃ সর্বজ্ঞো দৃশ্যেত ততোহইহপি মুতঃ সর্বজ্ঞ ইতি মুক্ত্যতে, ন তু তদন্তি।”—জায়রস্বাকর।

(৮) নৈয়ারিকগণ স্বীকার করেন যে, বেদ মানবসৃষ্ট নহে, কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট বটে।

(৬) এইরূপ প্রক্রিয়ার দোষ উপলব্ধি করিয়া আচার্য্য উদয়ন উপাধ্যায় গবেষণ প্রভৃতি পরবর্ত্তী যুগের নৈয়ারিকগণ ঈশ্বর-সাধক অনুমানের উপোদলকরূপে শ্রুতিপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরকে বেদকর্তা বলিয়া স্বীকার করার এ প্রক্রিয়াও নির্দোষ বলিয়া গণ্য হয় নাই। ঈশ্বরসৃষ্ট শ্রুতি কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে ইতরে-তরাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়ে।



বিধাতার হাতে বোধ হয় তেমন কাজ ছিল না, তাই মৃৎ হাশ্বে তিনি বীণার ভাগ্য-চক্র লইয়া তাহাতে দম্ . দিয়া সেটিকে চালাইতে উত্তত হইলেন।

ও-বাড়ীর বিবাহের গোলমাল খামিবামাত্র কিরণ আর নন্দরাণী ছ' জনে মাতিয়া উঠিল—স্বর্ণহ্যতির সঙ্গে বীণার বিবাহ-সূত্র বাঁধিয়া দিবার উদ্দেশ্যে। ছ' পক্ষে পাত্র-পাত্রী দেখা চুকিল। কোষ্ঠীর যেমন বালাই ছিল না, তেমনি কোনো পক্ষেই মতান্তর ঘটবার কারণ ছিল না। বর-পক্ষ পয়সার কথা মুখে উচ্চারণ করিল না; বোঝে, তারাচরণ রায়ের বিপুল সম্পত্তি এই পৌত্রীর সহিত তাদের কূলেই আসিয়া পৌঁছবে! একমাত্র পৌত্রী—আর কোনো ভাগীদার নাই! তারাচরণ রায় দেখিলেন, ছেলেটি যেমন কৃতী; তেমনি নরম আর সহজ আচার-ব্যবহার!

সে-দিন খাইতে বসিয়া দাক্ষায়ণী দেবীর কাছে তারাচরণ কথাটা পাড়িলেন।

দাক্ষায়ণী কাছে বসিয়াছিলেন,—বীণাও ছিল সামনে। তারাচরণ বলিলেন—এখনি বিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু ছেলেটি ভালো...অত করে ধরেছে...

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—বিয়ে তো দিতেই হবে। আজ দিলে দেবে, কাল দিলেও দেবে। ছেলে নয় যে ঘরে রাখবে! তা ছাড়া ডাগর মেয়ে...এর চেয়ে বুড়ো বয়সে বিয়ে দিলে লোকে বলবে কি!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—হঁ!...কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল, এমন পাত্র যদি পাই, যে এইখানেই আমাদের সঙ্গে থাকবে...

দাক্ষায়ণী দেবী ক্র কুক্ষিত করিলেন, কহিলেন—না, না...ঘর-জামাই! মাগো! সব সময় সরকার-গোমস্তার

মতো চোর হয়ে থাকবে! মানুষের মতো মানুষ যে, সে কখনো ভেতুড়ে হয়ে থাকতে চায়?...লোকের কাছে পরিচয় দেবে কি? এই ভালো...বিয়ে করে বৌ নিয়ে চলে গেল...মাঝে মাঝে আসবে-যাবে...

বুকের যে-জায়গাটা বীণা ভরিয়া তুলিয়াছে, সে-জায়গাটা আবার তেমনি খালি হইয়া যাইবে, এ চিন্তা তারাচরণ রায়ের মনে কাটার মতো বিঁধিতেছিল! তিনি জানেন, পৌত্রী...ছেলে নয়, মেয়ে! পরের জন্তই মেয়েকে লোকে মানুষ করে! তাই বীণার বিবাহের চিন্তায় তিনি বুকে ব্যথা বোধ করিতেন!...পাঁচ জনের কাছে পাছে এ দুর্বলতা ধরা পড়ে, এজন্ত ঘৃণাকরে মনের একথা কারো কাছে কোনো দিন প্রকাশ করেন নাই,—বিবাহের কথায় হাঁ-ছঁ বলিয়া সায় দিয়াছেন! ভাবিয়া-ছিলেন, কহিতে কহিতে এক-কথা যদি এক দিন সহসা মস্তুর হইয়া পড়ে, তিনি যেন মুক্তি পান! কিন্তু তাহা ঘটিল না!

তারাচরণ রায় বীণার পানে চাহিলেন। একান্ত সঙ্কোচভরে বীণা বসিয়া আছে...মুখে কথা নাই, চোখে হাসির আভাস নাই! যেন কতখানি অপরাধ করিয়াছে, এমন ভাব!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—পারবে দিদি আমার ছেড়ে বরের কাছে থাকতে?

এ-কথায় বীণার সঙ্কোচ আরো বাড়িল। সে মাথা আরো নীচু করিল!

দাক্ষায়ণী দেবীর হাড় জলিয়া গেল। আদিখ্যেতা! দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—তোমায় ক'দিন বা দেখছে ক'দিন বা পেয়েছে যে, তোমার কাছ থেকে স্বস্তরবাড়ীতে গিয়ে থাকলে পৃথিবী অন্ধকার দেখবে?...সে বয়ং বলতে পারো বিরজাকে! সে-বারে সেই দিনাজপুর থেকে

স্বপ্ন এসেছিল না? বিরজা গুম্ব হয়ে রইলো...নাওয়া নেই, খাওয়া নেই...মেয়ে কি রকম যেন হয়ে গেল! খুব বকলুম...তখন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, এ-বাড়ী ছেড়ে কোথাও আমি যাবো না, যেতে পারবো না...দাছকে কে দেখবে? তখন তো ওই তোমার এটা-ওটা কাজ করতো—ফাই-ফরমাশ্ খাটুতো। চিরদিন তোমার কোলেই ও বড় হয়েছে! কথায় বলে, অপ্পে না নোয় বাঁশ,—বাঁশ করে টাশ-টাশ!...কচি বয়স থেকে সলিলা যদি তোমার কাছে থাকতো, তা হলে বটে, সলিলা তোমাকে ছেড়ে স্বপ্ন-ঘর করতে যেতে কাঁদতো!... কি বলো সলিলা? আমার বাপু পষ্ট কথা...

পষ্ট হইলেও এ-কথা তারাচরণ রায়ের ভালো লাগিল না! তিনি বলিলেন,—বিরজার বিয়ের স্বপ্নে ভূমি চুপচাপ আছে বলেই আমি কোনো কথা কই না।...পাছে ভাবো, তাড়াতে চাই!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—কিন্তু তোমাকেই তো বিয়ে দিতে হবে। হাজার হোক, সলিলার চেয়ে বিরজা বয়সে বড়। বিরজার বিয়ের আগে সলিলার বিয়ে দিচ্ছ ভূমি, পাঁচ জনে এতে এরি মধ্যে পাঁচটা কথা বলতে শুরু করেছে! আমি তাদের বলি, তোরা চুপ কর বাপু...বিরজা আমার মেয়ে...আমি আশ্রিতা বৈ নই! চারা বলে, এ-ছেলেটির সঙ্গে কর্তাবাবু তো বিরজার বিয়ের কথা বলতে পারতেন! আমি তাদের বলি, বিরজাকে ওদের পছন্দ হবে কেন? জানে, সলিলার সঙ্গে বিয়ে দিলে ছেলে এক দিন এখানকার রাজ্য-ঐশ্বর্য পাবে...

কথাটা বাজের মতো মনে বাজিল...তাই কি?

মনকে তারাচরণ রায় চকিতে শাসন করিলেন। তাই দি হয়...সত্য-কথা! এ সত্যকে তিনি চাপা দিয়া রাখিতে পারেন না! কিন্তু...এ কথায় দাক্ষায়ণীর মনে অজ্ঞান আক্রোশের যে হলু...

তারাচরণ বলিলেন—বেশ, ঘটকদের ডেকে বলে দিই, বিরজার জন্তু পাত্র আহুক। এঁদেরো বলি, বিরজা বড়... তার বিয়ে হলে তবে সলিলার বিয়ে দেবো...এঁরা দু'দিন বুর করুন।

বীণাকে চট করিয়া পর-গৃহে বিদায় করিতে হইবে না, চিন্তায় তারাচরণ যেন একটু আরাম বোধ করিলেন!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—বিরজার বিয়ে হাজাম তো কিছু নেই। একটা ছেলে ধরে এনে তার হাতে ধরে দেওয়া...

তারাচরণ রায় বলিলেন—এ-কথার মানে?... আমার কাছে আছে...আমার আপন-জন...তোমাদের ভার যখন নিরেছি, তখন দেখলে পারো, কি আমি করি...

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—আমি তা জানি। ঐ মেয়ের জন্তুই আমার যা-কিছু ভাবনা। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমার আর ভাববার কিছু থাকে না!...তোমারো বয়স হচ্ছে...ভগবান না করুন, যে ছুঃখ-কষ্ট মনে-মনে ভোগ করছো এত বছর ধরে', তোমার যদি কিছু হয়... মেয়েটার ইহ-জন্ম নষ্ট হয়ে যাবে! তাই আমার বলা!

তারাচরণ রায় বলিলেন—হুঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দেছো দক্ষ! মেয়ে-দুটোর বিয়ে দিলে আমরা ইহ-জন্মের কাজ শেষ হয়। ভালো কথা, তোমার শশিকান্তকে বলো, হেসেথলে বেড়ালে আর চলবে না। তার আমি চাকরির ব্যবস্থা করছি। শশীকে বলো, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। একটা চাকরি আছে। ভালো চাকরি। মাসে এখন একশো টাকা করে পাবে; তার পর ভালো কাজ করতে পারলে উন্নতির আশা আছে।...এই বেলা সব নিজের-নিজের গুছিয়ে নিক! আমিও সব গোছগাছ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চাই, বুঝলে?

দাক্ষায়ণী দেবী এ-কথার কোনো উত্তর দিলেন না,— একবার শুধু বীণার পানে চাহিলেন। বীণা যেন মাটা হইয়া মাটাতে মিশিয়া যাইতেছে!

তারাচরণ রায় বলিলেন—একটা নাৎনী...সত্যি, তার বিয়ে দিয়ে যে কটা দিন থাকি, ওদের ভালো!... আমি তো চিরদিন বাঁচবো বলে' এখানে আসিনি...

কথার শেষে তারাচরণ রায় মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তারপর ক্ষীরের বাটীতে ভাত ফেলিলেন।

বৈকালের দিকে বীণা নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সামনে খড়খড়ি খোলা। খোলা খড়খড়ি দিয়া বাহিরে অনেকখানি আকাশ দেখা যাইতেছে, বীণা সেই আকাশের পানে চাহিয়া আছে। তার মনের উপর যেন

কুক্কেন্দ্র যুদ্ধ চলিয়াছে ! মনে তেমনি কোলাহল, তেমনি
অস্ত্র-বাক্তনা !

কিরণ আসিল, আসিয়া ডাকিল—সলিলা...

বীণা ফিরিয়া চাহিল ।

কিরণ বলিল,—একলাটি ঘরের কোণে বসে আছো
যে...

মুখে স্নান হাসি...বীণা বলিল,—এমনি ..

কিরণ বলিল,—আমি এসেছিলুম তোমার ছ'চারটে
সেমিজ-ব্লাউশ নিতে । বৌদির পিশিমা লোক পাঠিয়ে-
ছেন,—বৌমার ছ'-তিনটে সেমিজ-ব্লাউশ পাঠিয়ে দিয়ে
বলে' । তৈরী কবতে দেবেন কি না !

বীণা কোনো জবাব দিল না ।

কিরণ বলিল,—দাহুর কাছে গিয়েছিলুম । দাহু রাজ্যের
দলিল-পত্র খুলে বসেছেন । বললেন, সলিলাকে বলে
চেয়ে নিয়ে যাও...

বীণার যেন চেতনা নাই ! কথাগুলো সে শুনিল...
কিরণ যেন তাকে এ-কথা বলিতেছে না, আর-কাকে
বলিতেছে !

কিরণ বিশ্বয়বোধ করিল, বলিল,—বাঃ ! চূপ করে
বসে রইলে যে ! ওঠো...উঠে আলমারি খুলে বার
করে দাও...

এ-কথায় বীণা যন্ত্র-চালিতের মতো উঠিল...উঠিয়া
যন্ত্র-চালিতের মতোই চাবি দিয়া আলমারি খুলিল ; খুলিয়া
কিরণের পানে চাহিল...

কিরণ বলিল,—কি ! পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে তবু !

এবার বীণা কথা কহিল,—কোনো মতে বলিল,—
তুমি নাও ভাই...

কিরণ বলিল,—বেশ...

নানা প্যাটার্ণের ব্লাউশ-সেমিজ নাড়িয়া-চাড়িয়া
দেখিয়া কিরণ কটা বাছিল ; বাছিয়া বলিল,—মাপ ঠিক
আছে তো ?

মাথা নাড়িয়া বীণা জানাইল, হাঁ ।

কিরণ বলিল,—দেবাজ বন্ধ করো...

বীণা আলমারি বন্ধ কারল ।

কিরণ বীণার পানে চাহিল । অনেকক্ষণ চাহিয়া
রহিল ; তার পর ডাকিল,—সলিলা...

বীণা চাহিল কিরণের পানে । চোখের দৃষ্টি যেন
পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতো !

একটা কথা কিরণের মনে বিছাতের শিখার
মতো চকিতে আগিয়া মিলাইয়া গেল ।

কিরণ বলিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ? সত্যি
জবাব দেবে ?

বীণা শুধু নিশ্বাস ফেলিল ।

কিরণ বলিল,—এ বিয়ে তোমার অমত আছে ?

বীণার দেহে-মনে কিরণ যেন কাঁটার চাবুক মারি-
য়াছে ! বেদনায় বীণার দেহ-মন মুইয়া বাঁকিয়া হুমড়াইয়া
কেমন যেন হইয়া গেল ! তার মুখে কথা ফুটিল না ।

কিরণ লক্ষ্য করিল বীণার মুখ কাগজের মত সাদা !

কেন ?

ছোট এই 'কেন' প্রশ্নটুকুকে ঘিরিয়া কিরণের মনে
অসংখ্য চেউ...

এত বয়স পর্যন্ত সলিলা কাশীতে পরাশ্রয়ে কোথায়
পড়িয়াছিল...সেখানে এমন কোনো বন্ধু ?...হয় তো দরদে-
প্রীতিতে সলিলার মনে কুম্ভমরাশি ফুটাইয়া তুলিতেছিল...

ছ'চোখের গভীর দৃষ্টিতে কিরণ অনেকক্ষণ বীণার
পানে চাহিয়া রহিল । সে-দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া বীণা
চোখ নামাইল ।

ব্লাউশ-সেমিজগুলো বিছানার উপর রাখিয়া কিরণ
বীণার হাত ধরিল, ডাকিল,—সলিলা...

বীণা আবার চাহিল কিরণের পানে...

কিরণ বলিল,—সত্যি বলা...আমায় তোমার বন্ধু
বলে জেনো সলিলা । এমন বন্ধু...যে-বন্ধু তোমার জন্ত
সকলকে অগ্রাহ করতে পারে...

বীণার বুকে মৃদু কাঁপন !

কিরণ বলিল,—এখানে বিয়ে করতে যদি তোমার
এতটুকু আপত্তি থাকে, বলা...কেউ কারণ জানবে
না । বিয়ে আমি বন্ধ করে দেবো ।

বীণা এ-কথার জবাব দিল না । কি জবাব দিবে ?
তার মনের মধ্যে যা হইতেছিল...কথায় তা কাহাকেও
বুঝানো যায় না !

কিরণ বলিল—আর-কাকেও পছন্দ করেছো বিয়ের
জন্ত ?

বীণার সমস্ত মন ভরিয়া একটা আর্ন্ত ক্রন্দন...

বীণা বলিল,—না, না, তা নয়...

—তবে ?

বীণা ভাবিল, মনের এ-ভার সে আর বহিতে পারে না। চোরের মতো এমন করিয়া পরের সৌভাগ্য, পরের সম্পদ চুরি করিয়া...ওঃ !

সে একেবারে ছমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তার ছ'চোখের পিছনে জল !

সে-দৃশ্যে কিরণ অভিভূত হইল, বলিল—সস্তোষ কাকার জন্ত মন কেমন করছে ?...না, মার জন্ত...?

বীণার চোখে জল-ধারা তখন উচ্ছ্বসিত হইয়াছে !

বীণাকে কিরণ বুকে জড়াইয়া ধরিল। কাহারো মুখে কথা নাই।

বীণা যেন অকূলে কূল পাইয়াছে ! কিরণও দরদে গলিয়া বীণার হৃৎকথ যতখানি পারে, নিজে বুকে তাহা যেন অনুভব করিতেছে !

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল...

হঠাৎ বীণার মনে হইল, এ সে কি করিতেছে ? তার চেয়ে কিরণকে সব কথা প্রকাশ করিয়া...

বলিলে...সকলের স্বপ্না-লাঞ্ছনা বহিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, সত্য ! কিন্তু তারাচরণ রায় আজ যে-কথা বলিয়াছেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বীণাকে...এবং এই সম্পত্তির জন্তই রাজপুত্র-মন্ত্রিপুত্র আসিয়া আজ তার কণ্ঠে বরমাল্য দিতে উত্তত হইয়াছে ! বীণা যদি এ-পরিচয়ে এ-বাড়ীতে না আসিত, তাহা হইলে তারাচরণ রায়ের সম্পত্তি পাইত ঐ দাক্ষায়ণী দেবীর ছেলেমেয়ে ! এবং তাহা হইলে হয় তো এ-রাজপুত্র বিরজার কণ্ঠ-ভূষার জন্ত বরমাল্য লইয়া উদয় হইত !

বীণার মনে এই যে স্বপ্ন চলিয়াছে, এ স্বপ্ন এক-নিমেষ বিরাম জানে না ! সব কথা সে খুলিয়া বলিতে চায়...কিন্তু তার কথা শুনিয়া যদি সকলে মনে করেন, বিষয়-সম্পত্তি, বিলাস-ঐশ্বর্যের লোভে কোথাকার এক ভিখারিণীর কণ্ঠা বীণা...বীণা ঐশ্বর্য চায় না, সম্পদ চায় না...চায় শুধু নিরাপদ আশ্রয় ! কি করিয়া...কি করিয়া সে তাহা বুঝাইবে ? এমন যদি সম্ভব হয়...এ-বিবাহে স্বামীর উপর নিশ্চিন্ত-নির্ভর রাখিতে পারে...এমন নির্ভর যে

সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি বুঝিবেন, বীণা কেন এ কাজ করিয়াছে...

বীণার ছ'চোখে জল...

কিরণ বলিল—কেঁদো না সলিলা। তোমার হৃৎকথ আমি বুঝি, কিন্তু দাছুর কথা ভাবো...ওঁর হৃৎকথ তোমার-আমার হৃৎকথের চেয়ে কত-বেশী !

সজল চোখে বীণা কিরণের পানে চাহিয়া রহিল।

কিরণ বলিল—অমন করে চেয়ে আছো যে ! একা থাকলে মন খুব খারাপ হবে, জানি। আমার সঙ্গে বরং আমাদের ওখানে চলো...বুঝলে ! আমার এ-কথায় 'না' বলো না, লক্ষ্মীটি।

বীণা কোনো জবাব দিল না।

কিরণ বলিল—যাবে ?

এত আদর, এমন ভালোবাসা...না বলা চলে না ! বীণা না বলিতে পারিল না, বলিল,—যাবো।

—এসো...

বীণাকে লইয়া কিরণ ফিরিল।

ফিরিবার সময় একবার তারাচরণের ঘরে উঁকি দিল। বলিল—সলিলাকে নিয়ে যাচ্ছি দাছুর...

তারাচরণ বলিলেন—কোথায় ?

—আমাদের ওখানে।

তারাচরণ বলিলেন—তাই ভালো। আমি ভাব-লুম, বুঝি, তোমার সেই স্বর্ণদ্যুতির বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছো !

হাসিয়া কিরণ বলিল—বড্ড হিংসে হচ্ছে তার ওপর—না ? সলিলাকে সে এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে যেতে চায় !

তারাচরণ বলিলেন—হচ্ছে বৈ কি ! ছ'দিন আমার কাছে থাকবে, তা কারো সইছে না ! না তোমাদের, না তোমাদের সেই মিষ্টার স্বর্ণদ্যুতি সাহেবের !

কিরণ বলিল—সলিলারো সইছে না, না কি ?

এ-প্রশ্নে তারাচরণ রায় চাহিলেন বীণার পানে। বীণার মুখ মলিন...আনন্দের একটু কণাও ও-মুখে নাই ! দেখিয়া তারাচরণ কোনো কথা বলিলেন না ; চূপ করিয়া রহিলেন।

২৩

ঘটকদের অসাধ্য কাজ নাই! তারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া হৈ-হৈ শব্দে পাঁচ-সাতটি পাত্র আনিয়া হাজির করিল। তাদের মধ্য হইতে তারাচরণ বাছিয়া ঠিক করিলেন সত্ত ডাক্তারী-পাশ-করা অরবিন্দকে। অরবিন্দ শুধু পাশই করিয়াছে! যুক্কি নাই যে চাকরি জোগাড় করিয়া দিবে! পয়সা নাই যে ডিসপেন্সারি খুলিয়া ব্যবসা সুরু করিবে।

তারাচরণ বলিলেন,—নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেবো। ডিসপেন্সারি খুলে বসো, বাপু। তার পর বিরজার ভাগ্য আর তোমার হাতযশ!

অরবিন্দর মা নাই, বাপ নাই, এক দাদা আছে। সে দাদা বন্দায় চাকরি করে। কাজেই বিবাহের জন্ত তার আয়োজন করিবার কিছু ছিল না। শুধু পাঁজি দেখিয়া একটা দিন স্থির করিলেই হয়...

তারাচরণ ভিতর-বাড়ীতে আসিয়া ডাকিলেন,—
দক্ষ...

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—কেন?

তারাচরণ বলিলেন,—এই ছেলেটিকে পছন্দ করেছি। তৈরী ছেলে। এর পিছনে কাট-খড় খরচ করতে হবে না!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—তুমি যা ভালো মনে করবে, তাতে আমি কোনো কথা বলতে পারি? বিশেষ আমার কে আছে যে দেখবে!

কথার মধ্যে সেই প্রচ্ছন্ন হল! তারাচরণ রায়ের মনে এ-হলু দাক্ষায়ণী দেবী অনেক ফুটাইয়াছেন; কাজেই এ-হলু তাঁকে আর বিধে না! তিনি বলিলেন,—আবার কি চাও? ডাক্তার-জামাই! এই যে তোমার শশিকান্ত—ডাক্তার হবার সামর্থ্য তার আছে? হুঁ, না ডাক্তার, না মোক্তার! শশীর জন্ত কোন্ ব্যবস্থাটা করা হয়নি? তোমার জামাইকে পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিচ্ছি...তার উপর গহনাও কোন্ হাজার-ছত্তিনের না দেবো!...আবার কি চাও? বাজারে এ ছেলের দাম আছে—দশ-পনেরো হাজার হাঁকলে অনায়াসে তা পায়।...বিয়ের একটা দিন ঠিক করিয়ে

ফ্যালো ভটচাষি মশায়কে ডাকিয়ে এনে। দিন স্থির হলে আমার জানিয়ে, ছেলেটিকে আমি খপর পাঠাবো। সে তৈরী হয়ে বসে আছে। যে-দিন বলবো, এসে বিয়ে করবে।

কথাটা বলিয়া তারাচরণ রায় দাঁড়াইলেন না, বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দাক্ষায়ণী দেবী গুম্ব হইয়া রহিলেন। তাঁর মুখে যেন বৈশাখী মেঘের ভীষণ ছায়া!

শশিকান্ত আসিয়া ডাকিল,—মা...

দাক্ষায়ণী কথা কহিলেন না।

শশিকান্ত বলিল—চাকরিতে তো জয়েন করেছি, এ-দিকে বিপদ...

বিপদের কথায় দাক্ষায়ণী মুখ তুলিয়া ছেলের পানে চাহিলেন।

শশিকান্ত বলিল,—আমার সঙ্কীর বিয়ে দিন-আষ্টক পরে। ও তো যাবে বলে' ক্ষেপেছে।

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—কে? বৌমা? তা বেশ, তোমার দাছকে গিয়ে বেলো। এ-দিকে বিরজার বিয়ের দিনও তিনি ঠিক করছেন...

শশিকান্ত বলিল,—সে তো এক রাস্তিরের ব্যাপার। ছেলের কেউ কোথাও নেই...নিঃশব্দে আসবে, এসে বিয়ে করে বৌ নিয়ে চলে যাবে। ব্যস!

দাক্ষায়ণী দেবীর মনের মধ্যে যেন আগুনের সাগর ফুঁশিতেছিল!

তিনি বলিলেন,—তোমার যা-খুশী করো গে বাপু... আমার মিছে বলা! আমি যদি মায়ের মতো মা হতে পারতুম, টাকা-পয়সা দিতে পারতুম...তা হলে বটে অন্য কথা ছিল! আমি হলুম পর-ধরী...পরের হাত-তোলায় বাস করছি।

শশিকান্ত দেখিল মায়ের যে মেজাজ...বলিল,— তা হলে আমি তাদের লিখে দিতে বলি, কেউ এসে যেন নিয়ে যায়...

শশিকান্ত চলিয়া যাইতেছিল...দাক্ষায়ণী বলিলেন,— এখানে গুর ননদের বিয়ে—তাতে থাকা উনি দরকার মনে করছেন না বুঝি?

শশিকান্ত বলিল,—সেখানে খটার বিয়ে...ওর ঐ একটি ভাই!

দাঁকাগীর মনে হইল, পৃথিবীতে কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে...অকস্মাৎ! না হইলে তাঁকে এমন নিঃসহায় হইতে হইবে কেন? ছেলে-মেয়ে...যাদের জন্য তিনি জন্মিয়া মরিতেছেন, ছুনিয়ার অবিচার দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছেন...সে ছেলেমেয়েও তাঁর মুখ চাহিতে জানে না!

বিশ্ব-সংসারের উপর রাগ হইল। স্বর্গগত মা-বাপ, স্বর্গগত স্বামী...স্বস্তর-বাড়ীর নিঃস্বতা...এমন ভাগ্যও তিনি করিয়া ছিলেন! বিধবা আরো পাঁচ জনে হয়...কিন্তু তাঁর মতো এতখানি দুর্গতি তাদের মধ্যে কে ভোগ করিতেছে! হতভাগা স্বামী...স্বামীটা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত! বাঁচিয়া না থাকুক, পয়সা-কড়ি যদি রাখিয়া যাইত...

ও-দিকে আদরের পৌত্রীর বিবাহের জন্ত কি সমারোহে আয়োজন চলিয়াছে! আর বিরজার বেলায় কোনো মতে নমো-নমো করিয়া কাজ সারা! বিরজা সত্যই কিছু ভাসিয়া আসে নাই!...ঐ সলিলা...কোথায় পঁদাড়ে পড়িয়াছিল...তার সর্কনাশ করিতে ধেড়ে-বয়সে এখানে আসিল টশ্ কুড়াইতে!...তার চরণ রায়ের বা কি আঁকল!...পারিতেন না উনি এই দামী ডাক্তার পাত্রের হাতে আদরের পৌত্রীকে সমর্পণ করিতে! নগদ পাঁচ হাজার টাকা! কেন, এই দামী ডাক্তার-পাত্রের হাতে সলিলাকে দিতে কি হইয়াছিল? তোমার বিষয়-সম্পত্তির মালিক হইয়া একটা ছোট ডিস্‌পেন্সারি কেন, মস্ত-গোটা হাসপাতাল বানাইতে পারিত যে!...তা নয়...

কিন্তু এ-তর্ক কার সঙ্গে করিবেন? এ পক্ষপাতিতার কথা কাকে বুঝাইয়া বলিবেন?

রাগে তিনি জ্বলিতে লাগিলেন। সে রাগ কথায় ফুটিল না। তার কারণ, কথায় ফুটিলে এমন চীৎকার তুলিবেন যে, তার ফলে হয় তো বা তার চরণ রায় এ-বিবাহ ছাটিয়া নির্লিপ্ত নির্বিকার হইয়া উঠিবেন! যদি বা সাত-দেবতার দ্বার ধরিয়৷ এ-মতি হইয়াছে...

এখন কি আর সে তার চরণ আছেন...আদরের নাৎনী আসিয়াছে! তাকে লইয়া মাতন চলিয়াছে! তুলিয়া গিয়াছেন, দুঃখে-দুর্দিনে এত-বড় সংসারটাকে মাথায় করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এই দাঁকাগীর বামনী!

মা'কে নিরুত্তর দেখিয়া শশিকান্ত চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার ঠিক আগে তার চরণ রায় আসিয়া বীণার সঙ্গে দেখা করিলেন।

বীণা চুপচাপ বসিয়াছিল। তার চরণ রায় বলিলেন, —একটা গান শুনতে এলুম দিদি...গাইবে?

তার চরণের কণ্ঠ আর্দ্র...বীণার মন সে আর্দ্রতার ভিজিয়া গেল। মনে হইল, অতি দুশ্চিন্তায় বীণা কাতর...তার মনে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক বাসা বাঁধিয়া দংশনে তাকে অর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, সত্য! কিন্তু এই নিরীহ স্নেহ-পাগল বৃদ্ধ! তাঁর বুকে আর-এক রকমের যাতনা! সে যাতনা কতখানি তীব্র, বীণা তা জানে! তার চরণকে সে চিনিয়াছে...তাকে পাইয়া তার চরণ কত দিনের কত দুঃখ তুলিয়াছেন, বীণা তাহা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করে। উপলব্ধি করে বলিয়া কোনো দিন তাঁর পায়ের উপরে পড়িয়া মনের কপাট খুলিয়া বলিতে পারিল না, দাছ...আমি সলিলা নই...আমি বীণা!

বীণাকে নিরুত্তর দেখিয়া তার চরণ রায় ইজিচেয়ারে বসিলেন, বলিলেন—কাছে এসো দিদি।

বীণা কাছে আসিল।

তার চরণ রায় তাকে প্রায় বুকের উপরে টানিয়া লইলেন। বীণা তাঁর বুকে মুখ লুকাইল।

বীণার পিঠে হাত রাখিয়া তার চরণ রায় স্নেহে বলিলেন—দুঃখ করো না দিদি। মেয়ে-মানুষকে স্বামীর ঘরই করতে হয়...স্বামীর ঘরই তার নিজের ঘর। আজ তোমার মা-বাবা যদি বেঁচে থাকতো, তা হলে তারাও তোমার বিষয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরই তোমাকে পাঠিয়ে দিত। কাছে চিরদিন ধরে রাখতে পারতো না! আমাকেও তাই করতে হচ্ছে, দিদি। আমি একা থাকবো, কেউ আমার কাছে থাকবে না, এতে আমার কষ্ট হবে খুব।...কিন্তু এ কষ্ট সহিতে হবে দিদি। আমার আগে আমার বাপ-ঠাকুর্দা এমন দুঃখ সয়ে গেছেন...আমি সহিবো...আবার তোমার যখন মেয়ে হবে, বিষয়ে দিয়ে তাকে পরের ঘরে পাঠিয়ে তোমাকেও এমনি দুঃখ সহিতে হবে ভাই।...এর জন্ত কাঁদে না...কাঁদতে নেই। যে-ঘরে তোমায় পাঠাচ্ছি, সেই ঘর আলো করে তুমি চিরদিন থাকো। তোমার মায়ের মতো সব গুণ তোমার হোক...শুধু তার

ভাগ্য তুমি পেয়ো না দিদি...ভগবানের কাছে কায়-মনে আমি এই প্রার্থনা করি .

ভূগভীর স্নেহের এ-কথা বীণার বুকে জমাট বেদনার স্তূপে আঘাত দিল। সে আঘাতে বেদনার স্তূপ ভাঙ্গিয়া অশ্রু-ধারায় কাটিয়া বিগলিত হইল।

তারচরণ রায় বীণার মাথায়-গায়ে হাত বুলাইলেন। অনেক বুলাইলেন। বলিলেন—তুমি যদি কথা না শোনো দিদি...তা হলে আমারো কান্না পাবে।

চোখ মুছিয়া মুখ তুলিয়া মলিন হাস্তে বীণা ডাকিল,
—দাছ...

তারচরণ রায় বলিলেন—দিদি...

বীণা বলিল—তার চেয়ে আমি যদি বরাবর তোমার কাছে থাকি ?

—বিয়ে করবে না ? বিয়ে না করে' ?

বীণা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

তারচরণ রায় বলিলেন—তা কি হয় দিদি ?

—বিলেতে অনেক মেয়ে যে সারা-জীবন বিয়ে করে না।

তারচরণ রায় হাসিলেন ; বলিলেন—বিলেতের কথা আলাদা। এ তো বিলেত-দেশ নয় যে, তা হবে।

বীণা কোনো কথা কহিল না...চুপ করিয়া রহিল।

তারচরণ রায় নিশ্বাস ফেলিলেন...তার দু'চোখে মেঘের মলিন ছায়া !

বীণা ডাকিল—দাছ...

তারচরণ রায় বীণার পানে চাহিলেন।

বীণা বলিল—ক'দিনে তুমি কেন আমায় এত ভালো-বাসলে দাছ ?

একটা নিশ্বাস ! তারচরণ রায় সে-নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ভগবান এ ভালোবাসা বুকে দেছেন, দিদি। এ ভালোবাসা তিনি মা-বাপ, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা সবার বুকে দেছেন বলেই তাঁর সৃষ্টিধারা যুগ-যুগ ধরে' চলে আসছে ! না হলে পৃথিবীতে মানুষের আজ চিহ্ন থাকতো না !

বীণা এ-কথার জবাব দিল না। তার মনের মধ্যে একরাশ প্রশ্ন ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকাইতেছিল...

তারচরণ রায় বলিলেন,—তুমি যে আমাকে এত ভালোবাসো ! তোমার মা, তোমার বাবা...তাদের আমি কত হৃৎ-কষ্ট দিয়েছি...তোমাকে এত দিন কষ্ট দিয়েছি...তবু তুমি আমায় এত ভালোবাসো কেন, বলতে পারো ?

কথাটা বলিয়া তারচরণ বীণার পানে চাহিয়া রহিলেন। বীণা চাহিয়াছিল খোলা ষড়খড়ি দিয়া বাহিরে যে-আকাশ দেখা যাইতেছিল...সেই সঙ্গে ও-দিক-কার বারান্দায় যে ঝিলমিলি, ঝিলমিলির গায়ে ছুটো পায়রা বসিয়া আছে, সে-সবের পানে ! দৃষ্টি সে-দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও মন কিন্তু...

বীণা ফিরিয়া চাহিল তারচরণ রায়ের পানে, ডাকিল,
—দাছ...

তারচরণ রায় বলিলেন,—দিদি...

বীণা কহিল,—আচ্ছা, আমি যদি সলিলা না হয়ে আর কেউ হই ?

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ কেমন আতঙ্কে ছম্ছম্ করিয়া উঠিল...মাথা ঘুরিয়া গেল...দু'-চোখের সামনে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী ! কাণে শুধু ভাসিয়া আসিল তারচরণ রায়ের কণ্ঠস্বর। তারচরণ রায় বলিলেন,—তার মানে ?

বীণা কহিল—বলো না...ধরো...কেউ যদি এসে তোমায় বলে, আমি সলিলা নই...আমি আর-এক জনদের মেয়ে ! আমার মা নেই, বাপ নেই, পৃথিবীতে আপন-জন কেউ নেই...তোমার এখানে সলিলা সেজে এসে তোমার স্নেহ-ভালোবাসা চুরি করে আদায় করছি ? যদি সত্যি-সত্যি তাই হয় ? বলো না, যদি...

কথার শেষ-দিকে বীণার স্বর জড়াইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন সবলে বীণার কণ্ঠ চাপিয়া-চাপিয়া ধরিয়াছে ! কণ্ঠে কথা আর বাহির হইল না...

মাথা আরো ঘুরিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, ঘরটা যেন ছলিতেছে...ভূমিকম্পের বেগ !

বাহিরে গোধূলির ঐ স্নিগ্ধ আলোর উচ্ছ্বাসটুকু যেন নিবিয়া আসিতেছে ! চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করিয়া যেন সেই শ্রীপতির মুখ...সে-মুখে বিকট হাসির রেখা ! ভয়ে বীণা চক্ষু মুদিল।

তার পর...

চোখ মেলিয়া চাহিয়া বীণা দেখে, বিছানায় সে শুইয়া আছে...পাশে বসিয়া তারাচরণ রায়। তাঁর ছ'-চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এখন ভালো বোধ করছো দিদি?

বীণা এবার ভালো করিয়া চাহিল। বলিল,—বিছানায় এলুম কখন, দাছ?

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—নিজ্ঞে এসেছো কি! আমি এনে শুইয়ে দিয়েছি। মাথা ঘুরে আমার কোলে লুটিয়ে পড়লে...যত ডাকি, জবাব নেই! ...ষে-ভয় হয়েছিল!

কুষ্ঠাভরে বীণা বলিল,—আর-কাকেও ডাকোনি তো দাছ?

—না।

আঃ! ডাকিলে সকলে কি মনে করিত? ভাবিত, মেয়েটা যেন কি! কথায়-কথায় কি কীর্ত্তিই করে!

বীণা উঠিয়া বসিল।

মনে পড়িল, যে-প্রশ্ন করিয়াছিল! মনে পড়িল, চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে শ্রীপতির মুখ...রূপকথার গল্পে ধোঁয়া হইতে যেমন দৈত্যের আবির্ভাব হয়, তেমনি! মনে-মনে হাসিল। এমন নিরাপদ নীড়ে বসিয়াও যদি এমন করিয়া এ-ভয় মনে জাগে, তাহা হইলে বাঁচা কেন!

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব পায় নাই! আবার প্রশ্ন করিবে? বীণা চমকিয়া উঠিল!...না...থাক!

বীণা-বলিল,—আমি গান গাই, দাছ। তুমি গান শুনতে চাইলে!

তারাচরণ বলিলেন,—কষ্ট হবে না?

—না। তুমি ভাবছো, আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলুম?

তা নয়। দিন-রাত শুধু ভাবি কি না...

তারাচরণ রায় বলিলেন,—আর ভেবো না। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, তোমার কোনো ভাবনার কারণ নেই, জেনো।

বীণা মাথা নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

তার পর সে উঠিয়া অর্গানের সামনে বসিল। বলিল,—কি গান গাইবো?

—যে-গান তোমার ইচ্ছা।...বিয়ে হয়ে গেলে আর তোমার গান শুনতে পাবো না তো...

বীণা কহিল,—আবার ঐ কথা। তা হলে আবার আমি ভাবতে বসবো।

—না দিদি, আর ভেবো না। তুমি গান গাও...

বীণা গাহিল,—

"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না,
(সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।)
কান্না-হাসির বাধন তারা সইলো না
(সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)
আমার প্রাণে গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা,
উড়ে গেল, সকল কথা কইলো না।
(সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)"

চমৎকার গান...চমৎকার কণ্ঠ!

তারাচরণের মনের মধ্যে যেন সিঁদু উথলিয়া উঠিল!

গান শেষ হইলে তারাচরণ রায় বলিলেন—তোমার নানা-রঙের দিন তোমার বুকে সোনার খাঁচায় চিরদিন থাকবে!...কিন্তু এ-ছুঃখের গান কেন গাইলে, দিদি?

বীণা কহিল,—নতুন শিখেছি। বড় ভালো লেগেছে এ-গানটি...

—রবীন্দ্রনাথের গান?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এ-গানে খুশী হলুম না। আনন্দের গান শুনতে চাই আমি।

বীণা কহিল,—ছুঃখের গান আমার বড় ভালো লাগে দাছ...

—না...এবার একটা সুখের গান গাও দিকি... রবীন্দ্রনাথ সে-গানও অনেক লিখেছেন।

বীণা কহিল—সুখের গান? আচ্ছা...

বীণা গাহিল—

আজ কি তাহার বারতা পেলো কিশময়?

ওরা কার কথা কয় বনময়?

আকাশে আকাশে দুরে দুরে

সুরে-সুরে

কোন্ পথিকের গাহে জয়?...

তারাচরণ কহিলেন—বেশ, বেশ, বেশ গান দিদি। সেই পথিকের জয়-গান গাও...জয়...জয়...

বীণা গাহিতে লাগিল,—

চাপা-কোরকের শিখা জলে
ঝিল্লী-মুখর ঘন বনতলে...

এমন সময় দাক্ষায়ণী দেবী ঘরে প্রবেশ করিলেন,
কহিলেন—আমোদ-আহ্লাদ হচ্ছে, এ সময় বিরক্ত
করবো ?

কথা শুনিয়া বীণার কণ্ঠ নীরব...তারাচরণ চাহিলেন
দাক্ষায়ণীর পানে ।

দাক্ষায়ণী বলিলেন—তুমিই বলেছিলে, তাই ভটচাষি

মশায়কে ডাকিয়ে এনেছিলুম । এসে পাঁজি দেখে তিনি
দিন ঠিক করেছেন...পাঁচিশে আষাঢ় ।

তারাচরণ কহিলেন,—পাঁচিশে আষাঢ় ! ও ! আজ
হলো ক' তারিখ ?

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—আজ আষাঢ় মাসের আঠারো
তারিখ ।

—মাবে সাত দিন বাকী ! তা বেশ, ঐ তারিখই
ঠিক রইলো । ছেলেটিকে আমি চিঠি লিখে জানাই ।

দাক্ষায়ণী দেবী কহিলেন—তোমার ইচ্ছা...

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আবর্তন

বিদেশী কবিতার ভাবাবলম্বনে—

গোলাপ হ'য়ে প্রেমের কলি উঠিত যদি ফুটে'—

আমি হতেম তাহার কিশলয়,
মোদের জীবন একই সাথে উঠিত বিকশিয়া
দুখের রাতে, সুখের দিনে খালোয় তরঙ্গিয়া !

সর্বহার্য রিক্ত ধরায় শম্প সমারোহে
শ্রামোন্মাদে ধূসর ব্যথাময়

গোলাপ হ'য়ে প্রেমের কলি উঠিত যদি ফুটে'—

আমি হতেম তাহার কিশলয় !

* * * * *

আমি যদি নিতেম কায়া বাণীর রূপে রূপে

স্বরের লীলা রচিত ভালবাসা,
একই সাথে একই গানে মিলিয়া যেতো দৌহে,—
ওষ্ঠ মোদের মিলিত আসি পুলক-সমারোহে !

তৃষ্ণাহত চাতক যথা বাদল-ধারা পানে,
তৃপ্ত হতো—মিটিত চির-আশা !

আমি যদি নিতেম কায়া বাণীর রূপে রূপে
স্বরের লীলা রচিত ভালবাসা !

জীবন হ'য়ে জাগিয়া তুমি উঠিতে যদি প্রিয়া,
মরণ আমি হতেম তব প্রেমে,

অরুণ-আলো হিমচ্ছায়া রহিত তবে মিশি,—
শীতের জরায় উঠিত মাতি মাধবী-মধুনিশি ;
বনাঞ্চলে নবীন লীলা হাজার ফুলে-ফলে—

প্রাণের সাড়া আসিত সেথা নেমে,
জীবন হ'য়ে জাগিয়া তুমি উঠিতে যদি প্রিয়া,

মরণ আমি হতেম তব প্রেমে ।

* * * * *

আনন্দেরই রাণীর রূপে আসিতে যদি তুমি
ব্যথার রাজা হতেম আমি তবে !

গগন-পথে ছুটিয়া চলে প্রেমের তুরঙ্গম
দিতেম আমি মন্দ করি যাত্রা সে দুর্দম—
বাতাস হ'তে শক্তি লুটি নিয়মে বাধি তারে

ওষ্ঠে দিতেম রশ্মি সর্গোরবে—
আনন্দেরই রাণীর রূপে আসিতে যদি তুমি—

ব্যথার রাজা হতেম আমি তবে ।

শ্রীকালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য



প্রাচ্য-পুঞ্জের পরামর্শ-পরিষদ



গত ৮ই কার্তিক শনিবার লর্ড লিনলিথগো দিল্লী নগরে প্রাচ্য-পুঞ্জের পরামর্শ-পরিষদের উদ্বোধন করিয়াছিলেন—এ সংবাদ পাঠকগণের সুবিদিত। তাহার পর এই পরিষদের কার্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, এই পরিষদের আশ্রয় চেষ্টায়, না জানি, এ দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠার কতই সুবিধা ঘটবে। কিন্তু বর্তমানে দিন যাইতেছে, ততই যেন এ দেশের জনসাধারণের মন নিবিড় নৈরাশ্রে আচ্ছন্ন হইতেছে। কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে অমুসন্ধানকার্য চালাইবার জন্ত পরিষদ অনেকগুলি উপসমিতিতে বিভক্ত হইয়াছে। অল্প দিন পূর্বে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, দিল্লীতেই পুনর্বার এই পরিষদের পূর্ণ অধিবেশন হইয়াছিল; সেই অধিবেশনে সকল দেশের প্রতিনিধিদিগের নেতৃবর্গ ভারতে পরিষদের স্থলাভিষিক্ত একটি স্থায়ী সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সেই সমিতিই পরিষদের পক্ষ হইতে কার্য পরিচালিত করিবেন, এবং তাঁহাদের অবধারিত ক্ষেত্র মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ, পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা, এবং পণ্যোৎপাদনের নূতন উৎসগুলিকে বথাবিহীন ভাবে বিস্তৃত করিতে থাকিবেন। কর্মটির সম্পূর্ণ রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই,—তবে শুনিতো পাওয়া যাইতেছে যে, রিপোর্টে প্রকাশ, এই পরিষদের কাজ এখনও শেষ হয় নাই; কেবল উহাতে বলা হইয়াছে যে, রিপোর্ট দ্বারা বিশেষ কোন কার্য সাধিত হইতে পারে না। পরিষদ কেবল কি করা কর্তব্য, সেই বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন, আর কোন্ দিকে কি ভাবে অমুসন্ধান করা আবশ্যিক,—তাহারও নির্দেশ দান করিতে পারেন। সেই জন্ত তাঁহারা একটি স্থায়ী সমিতি রক্ষার পরামর্শ দিয়াছেন।

এই ত ব্যাপার। অন্ততঃ এইটুকু মাত্র বর্তমান সময় পর্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে। পরামর্শ-সভা আর একটি সমিতির স্বল্পে সকল ভার জ্ঞপ্ত করিয়া আপনার কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন। ভারতবর্ষকে ক্রমশঃ শ্রমশিল্পের পথে অগ্রসর করিবার পরিকল্পনাটি, রেলপথের মন্বরগামী মালবাহী ট্রেনের মত আপাততঃ এক পাশে ফেলিয়া রাখা হইল। পরিষদ প্রকৃত পক্ষে এই কার্যের পরামর্শ দিয়াছেন, বা আদৌ কোন পরামর্শই দিয়াছেন কি না, তাহা এখন পর্যন্ত সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; সুতরাং এই ব্যাপারে আমরা বিশেষ কোন আশা পোষণ করিতে পারিতেছি না, বরং আমরা কতকটা নিরাশই হইয়াছি।

বর্তমান অবস্থায় এরূপ অমুমান কোনক্রমেই অসঙ্গত নহে, ভারত সরকার ভারতবাসীকে শ্রমশিল্পের পথে নিশ্চিত ভাবে পরিচালিত করিবার অমুকূলে কোন পরিকল্পনাই করেন নাই। সল্প কিছু করা হইলে নিশ্চিতই তাহা জানিতে পারা যাইত। ব্রিটিশ সরকার এ-কাল পর্যন্ত ভারতে যে শিল্প-বাণিজ্যনীতি পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে সাধারণের মনে এই নন্দেই ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে যে, অমুকূলে অবস্থা

পাইলেও ভারত সরকার এ দেশে শ্রমশিল্প সুপ্রতিষ্ঠ করিবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন; বরং তাঁহারা ভারতবর্ষকে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্প পণ্যের উৎপত্তি-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্ত আগ্রহবান। তাঁহারা গ্রেটব্রিটেনকে ধরিত্রীর কর্মশালায় পরিণত করিতে চাহেন। সে জন্ত তাঁহারা কাঁচা-মাল যোগাইবার উপযোগী বিপুল ক্ষেত্র স্বকীয় আয়ত্তের মধ্যে রাখা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করেন। স্বদেশকে বিশাল কামারশালা বা কারখানায় পরিণত করিতে হইলে ঐরূপ কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্ত ব্রিটিশ-পতাকা সর্বত্র ব্রিটিশ-বাণিজ্যেরই অমুসরণ করিয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিস্তীর্ণ বনভূমির বিলোপসাধন করিয়া কৃষিক্ষেত্রের পস্তন করিয়াছেন। ভারতে বাগাতে বাণিজ্য-পণ্যের উৎপাদন অধিক হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন,—এবং বাঙ্গালা ভিন্ন অল্প সকল প্রদেশেই সেচেরও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ভারত হইতে কাঁচা-মাল রপ্তানী, এবং ব্রিটেন হইতে ভারতে শ্রমশিল্প আমদানীর সুব্যবস্থা করিতে গিয়া ৭ শত কোটি টাকা ব্যয়ে যে রেলপথ নির্মিত হইয়াছে, তাহার কাজ চালাইবার জন্ত একটি বোল্ট (bolt) বা নাট (nut) পর্যন্ত এ দেশে প্রস্তুত করিবার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই! অথচ ব্রিটিশ সরকার যে পূর্বে কৃষির উন্নতিসাধন-কল্পেও অসাধারণ কিছু করিয়াছেন, সে কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। তবে অজ্ঞাত শ্রমশিল্প সম্বন্ধে তাঁহারা যতখানি উদাসীন প্রকটিত করিয়াছেন, কৃষি সম্বন্ধে ততখানি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই—এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতে টাটায় লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত থাকায় বিগত যুদ্ধের সময় রেলপথের জন্ত অত্যাবশ্যক বিবিধ লৌহ-উপকরণ প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু সকলেই সবিষয়ে লক্ষ্য করিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হইলে তাঁহারা ভারতীয় লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না। অথচ আমাদের স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহিত ও পুনর্জীবিত করিবার জন্ত কংগ্রেস সরকারকে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১০ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত অমুরোধ করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে ফল বিশেষ কিছু হইয়াছিল বলিয়া দেশের লোক জানিতে পারিয়াছে কি?

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত ভাবেই যুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। সকলেই জানেন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সেই যুদ্ধের অবসান হয় নাই। সেই যুদ্ধে শিল্প-সম্পদহীন এবং কৃষিমাত্র সম্বল ভারতবাসী ব্রিটিশ জাতিকে বেরূপ সাহায্যদান ও উপকৃত করিয়াছিল, তাহা ইংরেজ জাতির অজ্ঞাত ছিল না। সেই যুদ্ধের সময়ে ভারতের পক্ষে শ্রমশিল্প-গঠনের গুণভোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে সেই সুযোগে ভারতের শ্রম-শিল্প সংগঠনের জন্ত সনির্ভর অমুরোধ করিয়াছিলেন।

তাহার পর-বৎসর ভারত সরকারের প্রতিকূল নীতির ফলে ভারতের শ্রমশিল্প সংগঠনের পথে যে সকল বাধা উপস্থাপিত হইয়াছিল, কংগ্রেসকে সে দিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। যথা, সরকারের প্রতিকূল রাজস্ব-নীতি, মুদ্রা-নীতি, রেলওয়ের ভাড়ার হার প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যবস্থার জল্প কংগ্রেসকে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। সরকার এই সমস্ত সাময়িক প্রয়োজনে ভারতে শ্রমশিল্প-সম্পর্কিত বাপারের অনুসন্ধানকল্পে এক 'রয়াল কমিশন' সংগঠন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, সরকার কমিশনের বিচার্য বিষয়ের তালিকায় সরকারী রাজস্বনীতি-সম্পর্কিত বিষয়টি বাদ দিতে বিশ্বস্ত হন নাই।

যাহা হউক, সরকারের উদাসীন সঙ্কেও বিগত যুরোপীয় মহা-যুদ্ধের সময় ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প উন্নতিপথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কর্তৃপক্ষের ধারণা হইয়াছিল, ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের প্রসারে লাক্ষাসায়ারের বস্ত্র-শিল্পের সঙ্কেচ সাধিত হইতে পারে; ভারতীয় কার্পাস-কলগুলি অধিকাংশই ভারতীয় মূলধনে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার লভ্যাংশ ভারতবাসীরই প্রাপ্য, লাক্ষাসায়ারের তাঁতিরা ইহা যে স্বনন্দরে দেখিবে, ইহা কেহই আশা করিতে পারেন নাই। সেই জল্প যুদ্ধবাবদ বায়বুদ্ধির অজুগাতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সরকার অল্প মূল্য পণ্যের আমদানী শুল্কের হার শতকরা সাড়ে ৫ টাকা হইতে সাড়ে ৭ টাকায় চড়াইয়া দিলেও কার্পাস-পণ্যের আমদানী-শুল্কের হার সেই সাবেক সাড়ে ৫ টাকায় রাখা হইল। সার উইলিয়ম মেয়ার সে সময় বলেন যে, সাত্রাজ্যের এই দুর্দিনে ইহাতে আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না। অগত্যা ভারতবাসীরা এই অসঙ্গত প্রস্তাবে আপত্তি না করিয়া সুবোধ বালকের আয় মুখ বৃদ্ধিয়া রহিল। তাহার পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার ভারতের পক্ষ হইতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড বা প্রায় দেড় শত কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন। সেই ঋণের সুদ প্রভৃতি পৌনঃ-পুনিক ধরচ মিটাইতে আর এক দফা করবুদ্ধির প্রয়োজন হইল। তখন ভারত সরকার আমদানী বস্ত্রের উপর ধার্য আমদানী-শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া সাড়ে সাত টাকা হারে ধার্য করিলেন। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে তখন বলা হইয়াছিল, তাহার ঐ দেড় শত কোটি টাকা প্রদান করিতে রাজী আছে, কিন্তু তাহাদের প্রধান দাবী এই যে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপর যে স্বদেশী শুল্ক নির্দিষ্ট আছে, তাহা অপরিবর্তিত রাখিতে হইবে, লাক্ষাসায়ারের তাঁতির দল এই দাবীর কথা গুলিয়া বিষম কোলাহল আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু সেই সময়ের ভারত-সচিব মিষ্টার নেভিল চেম্বারলেন বিলাতী তাঁতিদের আবদারে কোনক্রমেই সম্মতি দান করেন নাই। লাক্ষাসায়ারের তাঁতিরা তখন—বুটিশ সাত্রাজ্যের সেই দারুণ দুর্দিনে আইরিশ জাতীয় দলের সাহায্যে বুটিশ সরকারকে বিপর্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করিতেও কুঠাবোধ করে নাই। কেবল অ্যাস্কুইথের উদারনীতিক দলের ভোটের জোরেই সে-বার বুটিশ মন্ত্রিমণ্ডলকে বিভাডিত হইতে হয় নাই, তাহার স্বপদস্থ থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এক শ্রেণীর ইংরেজ ভারতবাসীর শিল্পোন্নতি প্রচেষ্টার কিরূপ প্রতিকূল, এই ঘটনাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাহার উপর ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যে সময়ে ভারতে কোন শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটে, সেই সময়েই কতকগুলি পুঁজিওয়ালারা যুরোপীয় মহাজন ভারতে আসিয়া শ্রম-শিল্পের কারখানা খুলিয়া বসে। তাহাদের

মূলধন এবং অভিজ্ঞতার প্রতিযোগিতায় ভারতের অনভিজ্ঞ, দরিদ্র কারখানাওয়ালাদিগকে অকৃতকার্য হইতে হয়। তাহার হাতে-হেতেরে প্রতিপন্ন করে—“তোব শিল তোব নোড়া, তোবই ভাগি দাঁতের গোড়া।”

এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। বুটেনে ভারতীয় শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠার বিরোধী লোক অনেক আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বুটিশ সরকার এবং ভারত সরকার উভয়ের কেহই ভারতবাসীকে শ্রমশিল্প গঠনের পথে অগ্রসর হইতে দিতে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করেন নাই। এবার আবার এই যুদ্ধ উপলক্ষে ভারতের পক্ষে শ্রমশিল্প সংগঠনের সুযোগ উপস্থিত; কিন্তু সুযোগের সহিত অসুবিধাও যথেষ্ট আছে। সে দিন পশ্চিম শ্রীযুত হৃদয়নাথ কুঞ্জর রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ভারত সরকার অবিলম্বে ভারতে বিমান প্রস্তুতের একটি কারখানা, এবং মোটর-গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করুন। এ প্রস্তাবটি সকলেরই অনুমোদন লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সরকারী সরবরাহ-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল যে স্তর ধরিয়াছিলেন, এবং ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব যে ভাবে তাহার প্রতিবন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা ঐ কার্যে সরকারের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়া কেহই মনে করিতে পারেন নাই। তাহাদের ধূম্বা এই যে, ঐ কাজ করিবার পথ যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কল; এই ছেতু সরকার এ বিষয়ে বিশেষ কোন সিদ্ধান্তই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহাতে দেশবাসীর উৎসাহের শিখা দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল; কিন্তু বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো যেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ধরণে ভারতবাসীকে আশ্বাস দিয়া বলেন, ভারতে শ্রম-শিল্পের বিকাশসাধনের জল্প যাহা করা সম্ভব, তাহা সাধ্যানুসারেই করা হইতেছে।—কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কোন কণ্ঠ-পদ্ধতির নির্দেশ দান করেন নাই। এখন কি আর ফাঁকা কথাই চিড়া ভিজান সম্ভব হইবে? অথচ যুদ্ধের জল্প সাময়িক প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সস্তার উৎপাদনের উপায় নির্ধারণ করাই প্রাচ্য-পুঞ্জ পরিষদের মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু এই উপলক্ষে ভারতে খাঁটি স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, ইহা ভারতবাসী-মাত্রেরই ধারণা হইয়াছিল। শেষে তাহা হইল কি? বরং এই সুযোগে বুটিশ এবং অল্পাঙ্গ বিদেশী পুঁজিওয়ালারা ভারতে আসিয়া কল-কারখানা স্থাপনের সুযোগ লাভ করিতে পারে, এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে,—‘কেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের’ দিল্লীস্থ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাই এত আশার উৎফুল্ল হইবার পর এখন মনে হইতেছে, আমাদের আশা কোথায়?

ভারতে কতকগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠার আশার কথা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান যুদ্ধের সময়ে ভারতে কতকগুলি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বিদেশ হইতে এখন সেই সকল পণ্যের আমদানী তত অধিক হইতেছে না। এখন এ দেশে সেই সকল পণ্য প্রস্তুত করা সম্ভব হইতে পারে। তবে উহা কার্যে পরিণত করিবার পথে কতকগুলি অসুবিধাও ঘটিয়াছে। যুরোপের বহু রাজ্য জার্মানীর নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার তথা হইতে অনেক মাল এ দেশে আমদানী হইতেছে না,—ইহাই একটা বিশেষ সুবিধা। আবার ঐ সকল পণ্য প্রস্তুত করিতে

হইলে বিদেশ হইতে উহার কতকগুলি উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় ; এ দেশে উহা পাওয়া যায় না। সেগুলি পাইবারও বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। শেযোক্ত অসুবিধার জন্তও গত ১৫ মাস মধ্যে ভারতীয় শ্রমশিল্প বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন, যুদ্ধের জন্ত অত্যন্ত অধিক হারে করধার্যা হওয়াতে এবং মূলধনের অভাব ঘটতেও অসুবিধা কম হইতেছে না। আর একটি কারণ, কতকগুলি বিশেষ শ্রমশিল্পের জন্ত সেই সকল শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরও অভাব। ফলতঃ, এবার বহুবিধ কারণেই বর্তমান যুদ্ধের সময় ভারতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কষ্টিক সোডা, সোডা অ্যাস্, উৎকৃষ্ট লোহার চাদর প্রভৃতি। এইবারকার এই যুদ্ধের পূর্বে বিদেশ হইতে,—বিশেষতঃ, গ্রেট ব্রিটেন, সুইডেন, জার্মানী, বেলজিয়াম, ইটালী, প্রভৃতি দেশ হইতে ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের কলাইকরা বাসন এ দেশে আমদানী হইত। এখন উহার অধিকাংশ দেশই জার্মানীর করকবলিত ; কাজেই ভারতে ঐ সকল দেশ হইতে কলাইকরা বাসন আসিতেছে না। কিন্তু ভারতে কলাইকরা বাসনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শিল্প এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বৈদেশিক প্রতিযোগিতার জন্ত ইহা বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এখন বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে বটে,—কিন্তু ভারতে ইহা প্রস্তুত করিবার বহু মাল-মসলারও অভাব আছে। ইহা প্রস্তুত করিবার জন্ত যে ইম্পোর্টের চাদরের একান্ত প্রয়োজন, তাহা বিদেশ হইতে আনা হইতে হয়। এই ধরনের ইম্পোর্টের চাদর এ দেশে প্রস্তুত হয় না কেন, তাহা কে বলিবে? সম্ভবতঃ, উহা প্রস্তুতের ব্যয় অনেক অধিক। তাহা হইলেও উহা এ দেশে টাটা কোম্পানী প্রভৃতির কারখানায় প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইহা ভিন্ন অজ্ঞাত কতকগুলি মাল-মসলাও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অধিকন্তু, কলাইকরা বাসন প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি রাসায়নিক উপকরণের প্রয়োজন ; তাহাও এ দেশে মিলে না। প্রতি বৎসর দেড় কোটি টাকার কাচ-নির্মিত শিল্পদ্রব্য এ দেশে আমদানী হয়। তন্মধ্যে কেবল বাঙ্গালাতেই ৫০ লক্ষ টাকা

মূল্যের ঐ দ্রব্য আমদানী হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে সোডা অ্যাসের প্রয়োজন। উহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কাজেই বর্তমান সময়ে ভারতে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধন এবং প্রসারসাধন করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ঐরূপ রবারের কাজে এবং অজ্ঞাত কতকগুলি জিনিষ প্রস্তুত করিবার উপকরণের অভাব অসুভূত হইতেছে। ঐ সকল প্রয়োজনীয় বস্তু এ দেশে উৎপন্ন করিবার জন্ত শীঘ্রই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এজন্ত চেষ্টা করিতে হইলে সরকারের সাহায্যপ্রাপ্তির প্রয়োজন। হুঃখের বিষয়, সরকার এই সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। সরকারের এই প্রকার উপেক্ষায় এ দেশের লোক অসন্তুষ্ট। অনেকের ধারণা, সরকার এ দেশে জাতীয়-শিল্প বা স্বদেশী-শিল্প গঠন করিতে অসম্মত।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এ দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে যথাযোগ্যরূপে শ্রমশিল্প গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। যদি অধীন বা সহযোগী দেশের অধিবাসীদিগকে সাম্রাজ্যের দুর্দিনে ধন-জন দিয়া সাহায্য করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দেশকে সেইরূপ সাহায্য করিবার উপযোগী করিয়া গঠিত করা আবশ্যিক। দারিদ্র্য কখনও বর্তমান সময়ের বিপদে যথাযোগ্য অর্থ সাহায্য করিতে পারে না। নিতান্ত জোর করিয়া বা স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া দারিদ্র্যদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিলে তাহার পরিণাম কল্যাণপ্রদ হয় না ; দেশের ভিতর একটা ছরস্তু অসন্তোষ জন্মে। সেই জন্ত দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে সর্ব-প্রথমে দেশে শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যুদ্ধ মিটিবার পর আর এরূপ সুবিধা পাওয়া যাইবে না। কারণ, তখন নানা দেশ হইতে ভারতে ভূরিপরিমাণে শ্রমশিল্পজাত পণ্যের আমদানী হইতে থাকিবে। তখন শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠার বা উহার উন্নতিসাধন এখন অপেক্ষা বিশেষ কষ্টকর হইবে ; সেই জন্ত এই দিকে দেশবাসীর অধিক অবহিত হওয়া আবশ্যিক। আমাদের শঙ্কা হইতেছে, এই যুদ্ধ শেষ হইলে আবার কতকগুলি বৃষ্টিশ উপনিবেশিক এ দেশে কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের সার শোষণ করিতে পারে। তখন প্রকৃত স্বদেশী কারবার প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিচারক) ।

আবছায়া

কল্পনা স্রোতে হাজার হাজার ফুল
নিত্য ভাসিয়া যায়
স্বপন বিলাসে নন্দ-লীলায় তারা
কত কি কহিতে চায় ।
কান পাতি যবে ব্যাকুল বাসনা লয়ে'
চির মৌনতা রাজে,—
লাল হ'য়ে যায় প্রাণের বলাকা মোর
আশাহতদের লাজে ।

এলায়ে দেহটি অলস ঘুমেতে যবে
মায়ার সমাধি-তলে
সিদ্ধ-শকুন ক্ষুধিত সাগর-বুকে
ভাসে দেখি দলে দলে ;
হুঃসাহসেতে তাদেরে ধরিতে যাই
কুয়াশা ধনায় আসে
বিরহ-বিধুরা কুর নাগিনীর হায়,
অকরণ নিখাসে ।

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ ।

বহির্বাণিজ্যের বিপর্যয়

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের উত্তর শাখার যুগ্ম অধিবেশনে (৪ঠা অক্টোবর) মহামন্ত্র বড়লাট বাহাদুর তাহার আন্তর্জাতিক-পরিস্থিতি-সংক্রান্ত অভিভাষণে যুরোপের যুদ্ধের ফলে, আমাদের বহির্বাণিজ্যের যে বিবম বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ এবং উৎপ্রতিকারকল্পে যে রূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক অভিভাষণে বাণিজ্য-নীতির বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে, সুতরাং এই উল্লেখ ও ইঙ্গিত অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

যুরোপে যুদ্ধের ফলে ভারতের পক্ষে যুরোপের বাজার বন্ধ হইয়া যে জটিল ও কুটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, আমরা এখানে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

এক বৎসর পূর্বে যুদ্ধের যে পরিস্থিতি ছিল, এখন তাহা নাই। সঙ্গে সঙ্গে, যুদ্ধারম্ভে শিল্প-বাণিজ্যের যে পরিস্থিতি ছিল, এখন তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তখন বাহা প্রত্যাশা ছিল, এখন তাহা নিরাশায় বিলীন হইয়াছে। নিত্য-ব্যবহার্য্য অপরিহার্য্য দ্রব্যাদির দ্রুতমূল্যের আশঙ্কায় গৃহস্থ যেমন সঙ্কুচিত হইয়াছিল, ব্যবসায়িকমাত্রই তেমনি পণ্যের উচ্চ মূল্যের স্বপ্নে উৎফুল্ল হইয়াছিল। একের আতঙ্ক এবং অঙ্কের আকাঙ্ক্ষা উভয়ই অমূলক হইয়াছে।

বর্তমান মহাবিপ্লবের গতি প্রকৃতি যেমন বিগত মহাযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, বর্তমান বিপ্লবের ফলাফলও তেমনি বিগত মহাযুদ্ধের ফলাফল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে। বিগত মহাযুদ্ধে ভারত নামে-মাত্র যুদ্ধমান দেশ ছিল, এবং মিত্রশক্তি-সমূহকে যথাসম্ভব যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়া বহু শিল্পের উদ্ধার ও উন্নতি সাধনপূর্বক আর্থিক অভ্যাদয় লাভ করিয়াছিল। এবারেও ভারত সে সুযোগ হারায় নাই; কিন্তু গতবারে লাভের অঙ্কই অধিক ছিল। এবারে আয়ের সহিত ব্যয়ের অঙ্কের বিবম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এবারে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভারতকে অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং যুদ্ধোপকরণের ক্রমবর্ধমান বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে। সুতরাং গতবারের তুলনায় আভ্যন্তরীণ অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

মূল্য-শাসনের আর প্রয়োজন নাই। কৃষিজাত দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য, নদীতে বান-বৃদ্ধির স্রাব শিল্পসমূহের আকস্মিক অভ্যাদয় এবং যুদ্ধসম্ভার সরবরাহ করিয়া অতিরিক্ত লাভের স্বপ্ন একে একে হুরীভূত হইয়াছে। সমুদ্রপথে জাহাজ-চলাচলের দারুণ বাধা-বিপত্তিহেতু বহির্বাণিজ্যের আগম-নিগম নিরুদ্ধ হইয়াছে। ফলে দ্রব্যমূল্য যুদ্ধের প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধমুখী হইয়া নিম্নগামী হইয়াছে। মজুত মালের পরিমাণ দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কোম্পানীর কাগজ এবং বোধ-প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয়-বিক্রয়-বাট (Stock Exchange) বিকল হইয়াছে। বর্তমানের ক্ষিপ্ত রূপান্তর এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিপত্তির অবসাদের সঞ্চার করিয়া, অবসন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্যের পরিকল্পনাকে জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টাই এখন একমাত্র আত্মরক্ষার উপায়। কিন্তু সে পথে দুর্ভাগ্য বাধা। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের পরিচালক নহি, আমরা শিল্প-বাণিজ্য পরিকল্পনার স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত। আমাদের গতি-পথ অঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন; আমাদের স্বাভাবিক পরাধীনতার কঠিন নিগড়ে শৃঙ্খলিত—কৃদ্ধবীর্ষ্য। জাতীয় শাসন-শক্তি, আজ যে পন্থার অনুসরণ করিলে বর্তমানের বিপর্যয় ও ভবিষ্যতের বিভীষিকা বিদূরিত করিতে পারিত,—নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্র সে পথে পদ-সঞ্চালন করিতে বিমূধ; যে স্বাধীনতা থাকিলে আমরা আমাদের শিল্প-বাণিজ্যকে জাতীয় অভ্যাদানের অঙ্গকুল করিয়া, কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্যবিধান-পূর্বক, মিত্রশক্তিকে প্রভূত সাহায্য করিতে পারিতাম—সে স্বায়ত্ত-শাসনের আমরা অধিকারী নহি।

বর্তমান অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিলে, প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আমাদের রপ্তানী-ব্যবসায়ের বিপর্যয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভারতের প্রাথমিক উৎপাদকদিগের ভাগ্য এই রপ্তানী ব্যবসায়ের সহিত নিবিড় ভাবে বিজড়িত। যুরোপে জার্মানী ও ইতালীর প্রবল অভ্যাচার-অনাচারে ঐ মহাদেশের প্রায় সকল প্রধান প্রধান বিপণি ভারতের পক্ষে কৃদ্ধ হইয়াছে। ইহা আজ সকলেরই বিদিত যে, যুরোপের বাজার সমূহ বন্ধ হওয়ার ফলে আমাদের ত্রিশ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে; অর্থাৎ ত্রিশ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমরা বিদেশে পাঠাইতে পারি নাই। স্বদেশে এই পণ্যের কাটতির সুযোগ নাই। সুতরাং চাহিদার অতিরিক্ত মাল বাজারে মজুত। ইহার অবশুস্তাবী ফল, দ্রব্যমূল্যের অবধা হ্রাস।

বহির্বাণিজ্যের এই সঙ্কোচন যে কেবল মূল্য হিসাবে অনিষ্টপ্রদ, তাহা নহে; উদ্ভূত পণ্য হিসাবে, ক্ষতি আরও গুরুতর। যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় মূল্যবৃদ্ধি আমলে আনিলেও স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, আমাদের বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি হ্রাস-মূল্যের নিদর্শন অপেক্ষা বহুগুণ পরিমাণে গুরুতর। বর্তমান যুদ্ধ চলিবে, তত দিন অবরুদ্ধ বাজারের কিঞ্চিৎ অংশের উদ্ধারসাধনও সম্ভব নহে। যুদ্ধবাসনেও তাহার সম্যক উদ্ধার অসম্ভব। কারণ, গতযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, যে-কোনও দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপক যুদ্ধের পরে সর্বপ্রকার বাজারের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। আমদানীর আকর এবং রপ্তানীর ক্ষেত্র ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। যুদ্ধের পূর্বে যে সকল দেশ কোন বিদেশী পণ্যের মুখাপেক্ষী থাকে, যুদ্ধের পরে তাহারা সেই পণ্যে আত্মনির্ভরশীল হয়; অথবা নূতন আমদানী-আকরের (Source of imports) সহিত সঙ্ঘ সংস্থাপন করে। সুতরাং যুদ্ধের সময় রপ্তানিকারী দেশসমূহে যে উদ্ভূত-পণ্য জমিয়া যায়, যুদ্ধের অবসানেও আর তাহার উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া যায় না।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। আমাদের রপ্তানী ব্যবসায় প্রধানতঃ কৃষিজ পণ্যে নিবদ্ধ। যুরোপের শিল্পপ্রধান দেশসমূহ আমাদের

দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল ক্রয় করে। অল্পতম সে সকল মালের ক্রয় বিক্রয়। আমাদের দেশেও ঐ সকল মালের সম্যক কাটুতির আশা নাই। কারণ, ঐ সকল কাঁচা মালকে পাকা মালে, অর্থাৎ পরিণত পণ্য (Finished or manufactured goods) পরিবর্তিত করা বর্তমানে আমাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং এই সকল বাজার হইতে বঞ্চিত হইয়া, আমাদের যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ হওয়া অসম্ভব। এই ক্ষতির ফলে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এবং তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষমতাও হ্রাস পাইয়াছে।

এই ক্ষতি পূরণ করিতে হইলে, আমাদেরকে সাম্রাজ্যান্তর্গত এবং যুরোপের বহির্ভূত, দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য-সংস্থাপন এবং সংবর্ধন করিতে হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের দেশের মধ্যেও নূতন-নূতন শিল্পের সৃষ্টি এবং চলতি শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন; নতুবা যুদ্ধমান-জাতি পরিত্যক্ত আমাদের উদ্ভূত কাঁচা-মালের সঙ্গতি হওয়া অসম্ভব।

এই সূত্রে প্রভূত ক্রয়শক্তিসম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রের কথা স্বতঃই মনে হয়। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্রের চৈতন্য উদ্ভূত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কিছু দিন পূর্বে বাণিজ্য-বার্তা বিভাগের পরিচালক ডাক্তার মীক এবং ভারত সরকারের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা ডাক্তার গ্রেগরীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন—সেখানকার বাজারের আবহাওয়া এবং গতি-প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া, কিরূপে ভারতের সহিত ঐ বিশাল দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক অধিকতর ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় নির্ধারণেই এই চেষ্টা প্রযুক্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তার গ্রেগরী ফিরিয়া আসিয়াছেন সাম্রাজ্যান্তর্গত প্রাচ্য-দেশসমূহের (Eastern Group Conference) দিল্লী বৈঠকে যোগদান করিবার নিমিত্ত। তাহাদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের উদ্দেশ্য কতটুকু সার্থক হইয়াছে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পণ্য অধিকতর পরিমাণে লইবার কোন অথবা কতটুকু আশা দিয়াছেন, তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। সংবাদপত্রের বিবরণাদি হইতে কতটুকু অনুমান করা যায়, তাহাতে আশাশ্রিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। ডাঃ গ্রেগরীর রিপোর্ট ভারত সরকারের বিবেচনাধীন।

বর্তমান ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে এই অর্থ-নৈতিক অভিব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু কল্পক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থায় অভিজ্ঞ কোন শিল্পাশ্রয়ী অথবা ব্যৱসায়ী এবং ভারতের বণিক সম্প্রদায়ের সহিত অগ্রে পরামর্শ না করিয়া এই অভিব্যক্তি প্রেরণের উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না। সেরূপ করিলেও এই উত্তম যে সাফল্যমণ্ডিত হইত, তাহাও বলা যায় না। কারণ, ভারতের জায় আর্জেন্টাইন এ ব্রিজিল ও কুবিপ্রধান দেশ। তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট-প্রতিবেশী, এবং চলতি যুদ্ধের সুবিধাও তাহাদের সহিত প্রচুর; তথাপি যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্যসংস্থাপন কতটুকু দৃঢ় ও বিস্তৃত করিতে পারা যায়, ততটুকুই আমাদের লাভ।

আমাদের নিকট-প্রতিবেশী জাপানের সহিত বাণিজ্য-বিস্তারের সুযোগ ও সুবিধা ছিল প্রচুর। কিন্তু বর্তমানে জাপানে রপ্তানী বাণিজ্যের ব্যাপ্তির পরিসর বহুল পরিমাণে খর্বীকৃত হইয়াছে। জাপানের সহিত রপ্তানী-বাণিজ্য বিস্তারেরও এখন কিছু বিপদ

আছে। এমন কোন পণ্য এখন প্রচুর পরিমাণে জাপানে পাঠান যায় না, বাহা জাপান হইতে পুনঃপ্রেরিত হইয়া যুদ্ধমান শত্রুপক্ষের হস্তগত হইতে পারে। এ বিপদ সমস্ত যুদ্ধ-নির্লিপ্ত দেশের সহিত বহির্বাণিজ্যে বিস্তারিত; পক্ষান্তরে, বহু দিন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে চীনের সহিত লিপ্ত থাকিয়া, জাপানের অর্থ-নৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটয়াছে। জাপান এখন পূর্বেকার জায় আমদানী পণ্যের মূল্য বোগাইতে পারিতেছে না।

আমাদের বহির্বাণিজ্য প্রসারের একমাত্র ক্ষেত্র এখন সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহ। যুদ্ধ পরিচালনা-সৌকর্যের নিমিত্ত সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্পর্ক এখন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। এই সৌহার্দ্যের ফলে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের সহিত বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়া যুরোপের বাজার-বন্ধনা-ঘটিত ক্ষতির কিছু পূরণ হইতে পারে। গত কয়েক মাসের বহির্বাণিজ্যের গতি লক্ষ্য করিলে এই সুযোগের সত্যতা ও সম্ভাবনা সহজেই উপলব্ধি হয়। এ কথাও এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধমান শত্রুপক্ষীয় দেশসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি ক্রমশঃ একরূপ দৃঢ় হইতেছে যে, যুদ্ধের অবসানে আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থাপিত হইলেও, ভারতের সহিত ঐ সকল দেশের বাণিজ্য পূর্বেকার জায় ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ হইবে না।

চিন্তার বিষয়, ভারত সরকারের লক্ষ্য এই অবশ্যজ্ঞাবী পরিস্থিতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও দৃঢ়নিবন্ধ হইতে পারে নাই। যুদ্ধ-পরিচালনা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার একরূপ ব্যাপৃত ও ব্যস্ত যে, এ-দিকে ঐকান্তিক মনোযোগ দেওয়াও তাহাদের পক্ষে এখন সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ-দিকে অবস্থা ক্রমে হীন হইতে হীনতর হইতেছে, এবং সুযোগ ফুরাইলে তাহাকে পুনরাবস্থ করা হুকুম। এখনও একটি বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনা বিরচিত হইলে ভবিষ্যতের কর্তব্যপন্থা সুগম হইত। বলা বাহুল্য, ভারতের শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি আমাদের দেশের পক্ষে যেমন উপকারী, বৃটেনের পক্ষেও তদপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে। সুতরাং যত অধিক পরিমাণে আমরা অনধিকৃত ও অনাবিকৃত বাজারের দখল পাই, ততই মঙ্গল। কিন্তু তাহার নিমিত্ত যুক্তিপরিষ্কৃত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এইরূপ প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘ সময়টি মাস সময় লাগিয়াছিল।

এই শুভ উদ্দেশ্যে রপ্তানী-পরামর্শদাতা-পরিষদ (Export Advisory Council) গঠন, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা-বিস্তার সংক্রমে দৃঢ় প্রেরণ এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বাণিজ্য-তত্ত্বাবধায়ক আমীন (Trade Commissioner) নিয়োগ অতি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু এই সকল শুভ অনুষ্ঠান বতরূপ কার্যকরী ও ফলপ্রসূ না হইতেছে, ততরূপ বিশেষ আশাশ্রিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না; সুতরাং বিষয়, রপ্তানী-পরামর্শ-দাতা-পরিষদের গত অধিবেশনে ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নতিবিধান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওলন্দাজ-অধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য দেশে বাণিজ্য-তত্ত্বাবধায়ক আমীন-নিয়োগ এবং অস্ট্রেলিয়ার সহিত একটি বাণিজ্য-চুক্তিবিরয়ক প্রস্তাবলীর আলোচনা হইয়াছিল। এই সকল বিষয়ে সর্বদা সুবন্দোবস্ত হইলে অচিরে সুফলের আশা করা যায়।

বহির্বাণিজ্যের আশা প্রসার-প্রয়াস ব্যতীত আমাদের কল্যাণ

নাই। যুদ্ধ-পরিস্থিতির ফলে রপ্তানী ব্যবসায়ের যে সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়াছে, তাহাতে কৃষিজ পণ্যের সমৃদ্ধ কৃতি হইয়াছে। কৃষিজ পণ্যের রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে প্রাথমিক উৎপাদকদের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইয়াছে; এবং যে পরিমাণে তাহাদের অর্থাগম কমিয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণে তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ হওয়াতে পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, এবং চাষীদের অর্থাভাব ঘটিয়াছে। ফলে, তাহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতেছে। যে পরিমাণে মোট রপ্তানী কমিয়াছে, সেই পরিমাণে আমাদের দেশ দরিদ্র হইয়াছে। সুতরাং দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ রায়তদের সম্মুখে নিদারুণ অর্ধ-কষ্ট এবং অভাব-অনাটন সমুপস্থিত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও বঙ্গীয় সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন; কিন্তু প্রতিকার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রথম উচ্চাঙ্গে সকলেই আশাবিত্ত হইয়াছিল যে, গত মহাযুদ্ধের সময়ে যেমন পণ্যের স্থায়ী মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতিপুঞ্জের আর্থিক স্বচ্ছলতা ঘটিয়াছিল, এবারেও তেমনটিই ঘটিবে, এবং সর্বসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতার সহচররূপে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারও বর্ধিত হইবে; আমাদের ক্রয়-শক্তিও অজ্ঞাত দেশের সাধারণ লোকের জায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এক বৎসরের মধ্যেই সে আশা স্বপ্নের জায় বিলীন হইয়াছে। দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। দেশের লোকের অর্ধ-কুচ্ছলতা ঘটিয়াছে, ক্রয়শক্তি বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে, সুতরাং শিল্প-সম্প্রসারণের পথও রুদ্ধ হইয়াছে। বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় কল-বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং অতি প্রয়োজনীয় অথচ এ দেশে দুপ্রাপ্য কাঁচা-মাল আমদানীর অভাবে শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি অসম্ভব হইয়াছে। ফলে, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাহেতু অধুনা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মূলধনের মালিকগণের এখন “ন বধৌ ন তসৌ” অবস্থা। শিল্প-সমুন্নয়নকল্পে সরকারের কোন সর্বতোমুখী

আও কার্যকরী পরিকল্পনার অভাবে যুদ্ধ-শিল্প ব্যতীত অস্তিত্ব শিল্পের প্রসার ও অগ্রগতি প্রতিহত। অগ্রগতি প্রতিহত হইলে অবসাদ ও অবনতি অবশ্যজ্ঞাবী। কোন প্রকারে প্রচলিত শিল্প সমূহের অধোগতি রুদ্ধ করিয়া সাম্যাবস্থা সংরক্ষণহেতু সকল প্রবৃত্তি প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু শিল্পের আশুপ্রসার এবং প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বহির্বাণিজ্য বিপর্যয় হেতু উদ্ভূত পণ্যের সক্ষমতা সম্ভব নহে।

সুখের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটি আমদানী-রপ্তানী সংগঠনের (Export Import Syndicate) পরিকল্পনা পরিপুষ্ট করিতেছেন। সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সংস্থাপন দ্বারা যুরোপের বাজার-বর্ধিত ভারতীয় উদ্ভূত কাঁচা-মালের বথাসম্ভব কাটতি-ব্যবস্থা এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। আমাদের দেশে দুপ্রাপ্য অথচ শিল্প-পরিচালন হেতু অত্যাবশ্যক, যে সকল মাল আমরা পূর্বে যুরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে আনিতাম, সেই সকল দ্রব্যসমূহের বতগুলি যে পরিমাণে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ হইতে আনয়ন করা সম্ভব, তাহার ব্যবস্থাও এই সংগঠন করিবেন। উৎপাদন হ্রাস করিয়া বাজার হইতে কিছু উদ্ভূত মাল আটক রাখিয়া, এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া প্রধান প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যমানকে যুক্তিসঙ্গত উর্ধ্বে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা প্রবর্তনপূর্বক প্রবর্তিত হইবে।

কিন্তু এ সকল সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। দেশের স্থায়ী কল্যাণ হেতু উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পের প্রসার এবং বহির্বাণিজ্যের বিস্তার প্রয়োজন। যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধের ফলাফল বেরূপ ঘটিবে, তাহারই উপর সে প্রচেষ্টা নির্ভর করিবে। স্বাবলম্বন এবং আত্মপ্রাচুর্য্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ ভিত্তি নিহিত। সেই দূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় শিল্প-তদন্ত সমিতির (Indian Industrial Commission) বহু দিন-উপেক্ষিত সুপারিশগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। এখন হইতেই তাহার অমুশীলনের প্রয়োজন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শতাব্দী

শতাব্দী তব ক্রুর অভিযান থামাও এবে।

অথবা ধরার ক্ষীণ স্পন্দন বিলীন হবে।

অসীম আকাশ করিয়াছ গ্রাস মেটাতে ক্ষুধা,

নিঃশেষে পান ক'রেছ যতেক রূপ ও সুধা।

ইস্পাত আর লোহা পাথরের স্তূপের মাঝে—

সঘনে তোমার অগ্রগতির বিয়াণ বাজে।

ষড়যন্ত্র ও হীন স্বার্থের লুকু জাঁগি,

বন্ধু-স্বজন, প্রতিবেশিদের দিতেছে কাঁকি।

তটিনীর মূহু কুলু-কুলু ধ্বনি, বায়ুর গীতি,

আলোর ঝর্ণা, উন্নত-শির বনস্পতি—

যজ্ঞ-দানব হাসে খল-খল এদের বুকে।

প্রলয় নাচন নাচে সত্যতা-পিপাসা স্নেহে,

এখনো কি তব মেটেনি পিপাসা সর্বগ্রাসী,

নরমেধ সৃষ্টি হাসিছ কি তাই অটুহাসি ?

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)



[তৃতীয় খণ্ড]

১

শারদীয়া পঞ্চমী। সুনীল আকাশে শরতের সূর্য উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে ; নব শশুরাশি তাহার কিরণধারা-সম্পাতে কাঞ্চনাতা ধারণ করিয়া কনকপুর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। বিশেষতঃ, কনকপুর আজ আবার অভিনব সাজে সুসজ্জিত। গত দুই বৎসর যথানিয়মেই সেখানে জগজ্জননীর পূজা সম্পন্ন হইয়াছে ; কিন্তু শেফালীর অল্পপস্থিতিতে মিত্র-ভবনের শারদীয় উৎসবে প্রাণের স্পন্দন ছিল না। এবার সেই স্বদেশহিতৈষিণী বিদুষী মহিলার পুনরাগমনে উৎসবের আয়োজনে নবোৎসাহ লক্ষিত হইতেছে ; গ্রামের সর্বত্র নব প্রাণের সঞ্চারণ হইয়াছে। সন্তোষ ও তাহার স্ত্রী যেন আনন্দ-স্রোতে ভাসিতেছে, এবং শেফালীর সহযোগে প্রত্যেক আয়োজনের তত্ত্বাবধান করিতেছে। দরিদ্রগণকে বিতরণের জন্য যে গাঁটবন্দী ধুতি ও সাড়ী কলিকাতা হইতে আনীত হইয়াছে, সেগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে গুছাইয়া রাখা হইতেছে ; কিন্তু কেবল বস্ত্র দান করিয়াই শেফালী পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে না, আরও কিছু চাই, তাই সে সন্তোষকে বলিল, “দাদা, তোমার খোকা হ’লে তার ভাতে গ্রামের প্রত্যেক গরীব-দুঃখাকে ভাত ও জল খাবার বাসন দান ক’রতে হবে। তাদের প্রত্যেকের ঘরে এই শুভ অল্পষ্ঠানের এক-একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকা দরকার।”

সন্তোষ হাসিয়া বলিল, “আমার অত পয়সা কোথায় শেফালী ?”

শেফালী গম্ভীর স্বরে বলিল, “আমি কি ব’লেছি, সে সব তোমাকেই দিতে হবে, দাদা! আমাদের বংশের ছুলালের মঙ্গল-কামনায় আমি কি এইটুকু ভারও নিতে

পারবো না ? আমি দেব খালা, আর তুমি দেবে এক-একটা ঘটা ;—তা দেখে গ্রামের সকলে আমোদ ক’রে সেই পুরাণো ছড়াটা ব’লবে—‘আ-দেখ্লেঘ ঘটা হ’ল, জল খেতে খেতে বাচ্ছা ম’ল’ !”

সন্তোষ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, “বাঃ, আবার ঘটার কথা ব’লছিস্ কেন ? এ যে তোর ভয়ঙ্কর আব্দার !”

ভাই-বোনের এই সকল সরস আলোচনা শেষ হইবার পূর্বেই বৃদ্ধ নায়েব আসিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, “বড় বিপদ, দাদাবাবু !”

সন্তোষ নায়েবের চিন্তাক্রিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “বিপদ ! ব্যাপার কি মহেশবাবু ?”

মহেশবাবু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, “পুরুতঠাকুর গ্রামের ও নিকটস্থ গ্রামগুলির ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন ; তিনি ফিরে-এসে ব’ললেন, এক জনও তাঁর নেমস্তন্ন নিলে না ! কেবল তাই নয়, তারা পুরুতঠাকুরকে ভয় দেখিয়েছে, তিনি যদি এ-বাড়ীতে পূজা করেন, তবে তাঁকে একঘরে হ’য়ে থাকতে হবে। তিনি কেবল যে সমাজেই রহিত হ’বেন, এমন নয় ; তাঁর ধোপা-নাপিত পর্যন্ত বন্ধ হবে ! শুন্ছি না কি, সেই ভয়ে কেউ এ-বাড়ীতে পূজা করতে আসবে না।”

সন্তোষ ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ? আমাদের অপরাধটা কি—যে, এত কঠোর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হ’ল ?”

মহেশবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, “সে কথা মুখে আনতেও লজ্জা হয়, দাদাবাবু ! রণেনবাবুর বড়যন্ত্রই এর কারণ। তাঁর মোড়লীতেই এই বড়যন্ত্রটা গজিয়ে উঠেছে !”

সন্তোষ বলিল, “তা বুঝা গেছে, কিন্তু কারণটা কি, তাই জানতে চাচ্ছি।”

মহেশবাবু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, “আজ্ঞে,—কথাটা বড়ই—” এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

সন্তোষ ঈষৎ বিচলিত স্বরে বলিল, “তা বলতে কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন? কি হ’য়েছে খুলে বলুন; তা শুনলে আমার মূর্ছা হবে, আপনি এরূপ আশঙ্কা ক’রবেন না।”

মহেশবাবু নতমস্তকে বলিলেন, “প্রচার করা হ’য়েছে—দিদিমণি বিলেতে এক ইংরেজ ডাক্তারের সঙ্গে বাস ক’রছিলেন; পরে তাঁকে বিয়ে ক’রে তাঁরই সঙ্গে এ দেশে এসে আগ্রায় সংসার পেতেছেন। দিদিমণি না কি রীতি-মত মেম-সায়ের হ’য়েছেন। লোক-ভুলানোর মতলবে দিনকতকের জন্তে দেশে এসে সাড়ী প’রেছেন। সকলে না কি খবর পেয়েছে, আগ্রায় তাঁদের কুঠীতে বিস্তর পোষা মুরগী চ’রে বেড়াচ্ছে। রোজ দু’-বেলা দু’-জোড়া তাঁর সেবায় লাগে! কাঁটা-চামচে সব রূপোর!”

এই মিথ্যা অপবাদের কথা শুনিয়া সন্তোষ ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইল; কিন্তু বহু চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, “আমার বাড়ীর পূজায় কাউকে—জনপ্রাণীকেও চাই-নে। মহেশবাবু, আপনি এগনই সকলকে জানিয়ে দিন—যিনি স্বৈচ্ছায় আমার বাড়ীতে না আসবেন, তাঁকে আমরা চাই-নে; আর প্রজাদেরও এই মর্মে সংবাদ দেবেন যে, তাদের যদি একঘরে হ’বার ভয় থাকে—তবে আমার বাড়ীতে তাদেরও আসবার দরকার নেই। তারা এ কথাও জেনে রাখুক যে, আমার তরফ থেকে তার জন্ত তাদের কোনও রকমে উৎপীড়িত হ’বার আশঙ্কা নেই। আর আমাদের পুরুতঠাকুরকেও ব’লে দেবেন যে, তাঁকে আমি বিপন্ন করতে চাইনে; তাঁর যা’ প্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে, তা পুরো-পুরিই তিনি পাবেন। সকলের বিরক্তিভাজন হ’য়ে এ বাড়ীতে তাঁর পূজা করতে আসবার দরকার নেই।”

মহেশবাবু উৎকণ্ঠিত চিন্তে বলিলেন, “তবে পূজা কি হবে না?”

সন্তোষ বলিল, “কেন হবে না? আমাদের কনকপুর ভিন্ন কি এ বাঙ্গালা মূলুকে পুরুত নেই? না, অগ্র কোথাও দুর্গোৎসব হয় না? কলকাতা ত মগের মূলুকে নয়; কলকাতা থেকে পুরুত আনিয়া পূজার ব্যবস্থা

করা কঠিন হবে না। কলকাতার কোন পুরোহিত পন্নী-গ্রামের মোড়লদের দ্বারা এক-ঘরে হ’বার আশঙ্কায় মহামায়ার পূজা বন্ধ ক’রে পলায়ন করবে না, এ কথা সকলে বিশ্বাস করতে পারে।”

মহেশবাবুকে নিস্তক্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সন্তোষ আরও বলিল, “যান, আর দাঁড়িয়ে-থেকে সময় নষ্ট করবেন না; এখনি গিয়ে সকলকে বলে দিন—আমি কারও সাহায্য চাই-ও না, কাউকে ভয় ক’রবারও কারণ নেই। মোড়লদের প্রতিকূলতার পূজা আমার বন্ধ হবে না; এ বাড়ীতে মহামায়ার পূজা পণ্ডও কেউ করতে পারবে না।”

মহেশবাবু বহুদর্শী প্রবীণ কর্মচারী; জীবনে অনেক ঠেকিয়া, নানা অসুবিধা সহ করায় সমাজকে তিনি ভয় করিতেন। এই জন্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “সকলকে একেবারে ছেঁটে ফেলে-দেওয়া কি ভাল হবে? বরং ভাল-রকম সামাজিক দিগে সকলকে বশীভূত করাই সঙ্গত।”

সন্তোষ মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, তা কিছুতেই হবে না। আমি ঘুষ দিয়ে কাউকে বশ করতে চাইনে; আর তা’তে তো মিথ্যা অপবাদটা মেনেই নেওয়া হবে।”

সন্তোষের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নায়েব মহাশয় কুণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করিলে শেফালী আরক্তিম মুখখানি তুলিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল, “আমি না হয় আজই রাস্তিরে এখান থেকে চলে যাই; তা’ হ’লে এ সব সামাজিক গোলমাল হয় ত সহজেই মিটে যাবে।”

সন্তোষ অভিমানোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আমি তোমার মুখে এ কথা শুন্ব মনে করিনি, বোন! তোমার এত স্মৃশিক্ষা, মনের বল, ও সংসাহস—তার পরিণাম কি এই? মিথ্যা অপবাদের ভয়ে মাথা হেঁট ক’রতে হবে—কতকগুলো হামবড়া মুর্খের পায়ের কাছে? এর চেয়ে বেশী বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হ’তে পারে?”

শেফালী বিনীত ভাবে বলিল, “দাদা, ওরা অবুঝ, অজ্ঞান, ওদের মন সঙ্কীর্ণ; তাই ব’লে রাগের মাথায় একটা-কিছু করা তোমার পক্ষে শোভা পাবে না। তুমি মাথা ঠাণ্ডা ক’রে তেবে দেখ—নায়েব মশায়ের প্রস্তাবটা সঙ্গত কি না।”

সন্তোষ দৃঢ় স্বরে বলিল, “আমি না ভেবে কোনও কথা বলিনি। আমার যা সঙ্কল্প, তাই বলেছি; তা’র বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না। তোমার উপর কলঙ্কের এক বিন্দু আভাসও যা’তে পড়তে পারে—তা আমার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। যারা তোমাকে চায় না, তাদের সঙ্গে আমার কোন সঙ্কল্প থাকবে না,—থাকতেও পারে না।”

সন্তোষকুমারের এই সংকল্পের কথা অতি অল্প সময়েই চারি দিকে প্রচারিত হইল ও তাহা স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। নানা লোক নানা ভাবে এই প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করিতে লাগিল।—কেহ বলিল, “ছোকরার বড়ই আশ্পর্কা! কুল-পুরোহিত ত্যাগ ক’রে কলকাতা থেকে ভাড়াটে পুরুত এনে মায়ের পূজা! ব্রাহ্মণের শাপে নির্বংশ হবে না?”—কেহ বা বলিল, “টাকার গরমে একেবারে কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত হ’য়ে প’ড়েছে! টাকার কাঁড়ি যদি ঘরে মজুত ছিল তো—বোনটার বিয়ের সময় টাকা বা’র করতে বুকে ছড় গেল কেন? রণেনবাবুরা তখন মুখের মতো জুতো ক’ষে বসিয়ে-দিয়েছিলেন!”—আর এক জন এ কথায় সায় দিয়া সবেগে মাথা ও হাত নাড়িয়া বলিল, “দেখ না, বোনটাকে যে ঘরে বিয়ে দিয়েছে, তারাও ও-বউ ঘরে নিলে না। কলকাতার শিক্ষিত পরিবার কি না, ঠিক ব্যবহারই তারা কোরেছে।”—কেহ ভয়ে ভয়ে বলিল, “সন্তোষবাবু আমাদের দেশের রাজা, এমন প্রজাবৎসল জমিদার আজকাল সর্বদা বড়-একটা দেখা যায় না। আর দিদি-মণির আচার-ব্যবহারে এতটুকুও বিবিয়ানা দেখা যাচ্ছে না,—তিনি যেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী,—যেমন রূপ, তেমনি গুণ! একমাত্র রণেনবাবুর কথায় নেচে তাঁদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা কি উচিত হচ্ছে?”—এ কথা শুনিয়া আর এক জন আকাশে গলা চড়াইয়া বলিল, “আরে রেখে দাও, ও সব ফাল্গুতো কথা! সন্তোষ ছোকরা দেশের কাউকে মানুষ ব’লেই গ্রাহ্য করে না। আমাদের কাউকে একবার ডেকে, কি করা উচিত, সে সঙ্কল্পে একটা কথা-পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলে? সকলের পরামর্শ নিয়ে চললে তার ভালই হ’তো—বোকারাম এটাও বুঝতে পারলে না হে!”

এক জন সনাতনপন্থী ধার্মিক বৃদ্ধ বলিলেন, “ও-সব

কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; কিন্তু হিন্দুর মেয়ে কে কবে বিলেতে গেছে বল তো? তা দেশে ফিরে-এসে একটা প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করলে না, পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা! এ সব অনাচার সহ্য ক’রতে হবে সমাজে বাস ক’রে? ঘোর কলি, ঘোর কলি! হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল—এই সব অকালকুস্মাণ্ডের দোষে!”—

এইরূপ নানা প্রকার তর্ক-বিতর্কে পরিশ্রান্ত হইয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলী রণেন্দ্রবাবুর সন্মানে চলিল। তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত সমাজরক্ষা-সংক্রান্ত কোনও কাজেই কাহারও অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না।

পরদিন প্রভাতে সন্তোষকুমার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থিত আজিনায় চিন্তাকুলচিত্তে পাদচারণ করিতেছে—সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র ভাবে কাটাইয়াও তাহার চিন্তার বিরাম নাই। এই সামাজিক বিপ্লবে তাহাকে সুপরামর্শ দান বা পথ প্রদর্শন করিবে, তাহার এরূপ হিতৈষী কেহই নাই। রমাপ্রসাদবাবু সুদূর প্রবাসে; অথচ এই প্রকার জটিল সামাজিক সমস্যায় কর্তব্য সঙ্কল্পে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আজ কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী অভয়াচরণ মিত্রের পৌত্র সামাজিক নির্যাতনের ভয়ে বংশের সঙ্কম নষ্ট করিবে?—ইহা অসম্ভব। রণেন্দ্র কি সমাজের এত-বড় মোড়ল হইয়াছে যে, সকলেই তাহার অন্টার আদেশে পরিচালিত হইবে? এই প্রসিদ্ধ মিত্র-পরিবার গ্রামের জ্ঞাত, প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলের নিমিত্ত, স্থানীয় জন-সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই তাহার বিস্মৃত হইবে? এই সকল চিন্তায় আকুল হইয়া সন্তোষ চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে ঘুরাফেরা করিতেছে, সেই সময় অদূরে পাক্কীবাহক বেহারাদের কণ্ঠনিঃসৃত ঐকতানিক ‘হিঁয়ো-হম, হিঁয়ো-হিঁয়ো হম’ শব্দ শুনিয়া তাহার চিন্তাশ্রোত অবরুদ্ধ হইল। সচকিত ভাবে সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, বাহকরা তাহার সম্মুখে যে পাক্কী নামাইল—স্বয়ং জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাহার মধ্যে প্রসারিত শয্যায় উপবিষ্ট।

সন্তোষ ব্যগ্র ভাবে পাক্কীর দ্বারে আসিয়া, বস্তু মহাশয়কে ধরিয়া পাক্কী হইতে বাহির করিল; সঙ্গে সঙ্গে বলিল, “এ কি! আপনি এখানে? এ-যে আমার স্বপ্নের অগোচর! এত কষ্ট ক’রে আপনার এখানে আসবার

কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোন আদেশ থাকলে, আমার তো ডেকে-পাঠালেই হ'ত। আমি তৎক্ষণাৎ আপনার দ্বারস্থ হ'য়ে আপনার আদেশ পালন করতুম কাকা!”

বুদ্ধ জ্ঞানেশ্বরবাবু কোমল স্বরে বলিলেন, “তুমি গেলে কোনও কাজ হোত না বাবা! এই মনুষ্যত্ববর্জিত, আত্মীয়ভ্রোহী নরাধমকে তুমি চার-পাঁচ দিনের জগ্ন তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দেবে কি? তুমি ‘কাকা’ ব'লে আমায় সম্বোধন করলে; কিন্তু আমি এই সম্মানের সম্পূর্ণ অযোগ্য বাবা! তোমাকে মুখ দেখাতেও আমার লজ্জা হয়!”

সন্তোষ ফুরুর স্বরে বলিল, “এ কি কথা বলছেন? এ কথা ব'লে আমায় অপরাধী করবেন না; গুরুজন আপনি, আমার বাড়ীতে থাকবেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য; এজগ্ন আপনি আমার সম্মতি প্রতীক্ষা করায় আমি অত্যন্ত ফুরুর ও লজ্জিত হচ্ছি। আমার বাড়ী-ঘর সব আপনার নিজের ব'লেই মনে করা উচিত।”

এই সকল কথা আলোচনা হইতে-হইতেই সেই সুপ্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে বহু লোকের সমাগম হইল! বর্ষাধিক কাল জ্ঞানেশ্বরবাবু শয্যাগত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি কি উদ্দেশ্যে হঠাৎ গৃহত্যাগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার ও বহু দিনের পরম শত্রু মিত্র-পরিবারের বাড়ীর দিকে চলিয়াছেন—ইহা জানিবার জগ্ন কৌতূহল হওয়ায় গ্রামের অনেক ভদ্রলোকই তাঁহার পাকীর অনুসরণ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানেশ্বরবাবুর ইচ্ছানুযায়ী সেই সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই স্নবহৎ আরাম-কেদারা আনীত হইলে, তাহাতে তিনি উপবেশন করিয়া ক্লাস্তদেহ প্রসারিত করিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া শেফালী ভাড়াভাড়ি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অতঃপর তাঁহার পথশ্রম-লাঘবের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কয়েক মিনিট পরেই তাঁহার পুত্রের নিদাঘ-অপরাহ্নের মেঘের জায় গস্তীর মুখে সেই স্থানে উপস্থিত! জ্ঞানেশ্বরবাবু কিঞ্চিৎ স্নহ হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রণেশ্বর বলিল, “জানতে পারি কি, এ কি কাণ্ড? আপনার কি মাথা-খারাপ হ'য়েছে? কাউকে বলা-কওয়া নেই,

বেহারা ডাকিয়ে পাকী-চেপে হঠাৎ এখানে এলেন কি মতলবে?”—রণেশ্বরের কণ্ঠস্বরে উৎকট পিতৃভক্তি উচ্ছসিত!

জ্ঞানেশ্বরবাবু রণেশ্বরের কথায় কণপাত না করিয়া শেফালীকে বলিলেন, “মা-লক্ষ্মী, তোমার এই রুগ্ন, অকর্মণ্য কাকাটিকে নিয়ে তোমাদিগকে দিন-কয়েক একটু কষ্ট-ভোগ করতে হবে; কিন্তু সে জগ্ন মা, তুমি যে বিশেষ অনুবিধা বোধ করবে না বা বিরক্ত হবে না, তা আমার জানা আছে। ছেলেবেলা থেকে সেবাই যে তোমার পরম ধর্ম—তা কি আর আমার অজ্ঞাত?”

শেফালী অবনত মুখে প্রশান্ত স্বরে বলিল, “আপনার সেবা ক'রতে আমাদের অনুবিধা হবে, এ চিন্তা আপনার মনে না-এলেই আমরা অধিক সুখী হ'তুম। আপনার মনের কোণেও এ চিন্তা স্থান পেলে আমি মনে বড়ই ব্যথা পাব কাকা!”

জ্ঞানেশ্বরবাবু তাঁহার পাকা-মাথা নাড়িয়া সোৎসাহে বলিলেন, “ভাল কথা, মা! তুমি নীচেয় এই দিকেরই কোনও একটা ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। তা' হ'লে আমি দু'বেলা জগ্নাতার রাজা চরণমুগল দেখতে পাব, আর সন্তোষের পূজার কাজে সহায়তাও কিছু কিছু করতে পারব। মহাশক্তি জগদ্ধননী আমার এ রুগ্ন দেহে তাঁর সেবার জগ্নে কিঞ্চিৎ শক্তি-সঞ্চায় করবেন না কি? মায়ের রূপাতেই পশু গিরিলঙ্ঘন করে।”

শেফালীকে দেখিয়া প্রতিবেশীরা একটু দূরেই ছিলেন, জ্ঞানেশ্বরবাবু তাঁহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সকলে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলে জ্ঞানেশ্বরবাবু সকলকে লক্ষ্য করিয়া অচঞ্চল-স্বরে বলিলেন, “আপনারা সকলে মিলে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা মা-শেফালীকে অপমানিত করবার জগ্নে, আর সন্তোষকে সমাজচ্যুত করবার মতলবে একটি চক্রান্ত পাকিয়েছেন,—এ কথা হঠাৎ আমি কাল রাত্রে জানতে পেরেছি। বেশ, আপনাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; কিন্তু এ কথাও জানবেন যে, সন্তোষের যদি জাত গিয়ে থাকে তো আমারও গিয়েছে। সন্তোষের বাড়ীর পূজায় ধারা আসবেন না, আমার বাড়ীর পূজাতেও তাঁদের যোগদানের প্রয়োজন নেই।—এ বাড়ীর পূজার ভার আমিই নিলুম।

সন্তোষের কুল-পুরোহিত চক্রাস্তের ভয়ে এ বাড়ীতে পূজা ক'রতে অসম্মত হওয়ায় আমি স্থানান্তর থেকে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনতে লোক পাঠিয়েছি। ব্রাহ্মণের কোনও ক্ষতি আমরা করতে চাই নে। কোন্ মুর্খের প্ররোচনায় আপনারা এই হীন চক্রাস্তে যোগ দিয়েছেন, তাও আমি জানি; বেশ, তা'কে নিয়েই আপনারা থাকুন।”

তাহার পর তিনি ঠাঁহার মধ্যম পুত্রকে বলিলেন, “জিতেন, তোমরা এখন বাড়ী যাও, আমি এই ক'দিন এখান থেকে নড়চি-নে। তোমার মা'কে আমার অনুরোধ জানিয়ে ব'লবে, আমার বিশেষ ইচ্ছে, তিনি পূজার কয়েক দিন এই বাড়ীতেই আহারাদি করেন, আর মা-শেফালীকে পাশে বসিয়ে একসঙ্গে আহার করেন। তোমরা ছোট ছুই ভাইও এখানেই থাকবে, ও সন্তোষকে যত্ন ক'রে আমাদের বাড়ীতে খাওয়াবে। তোমার দাদার সম্বন্ধে আমি কোন কথাই ব'লব না।”

সমবেত গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে নির্ঝাঁক! রণেন্দ্র বেত্রোহত কুকুরের ঝায় অপমানিত হইয়া চলিয়া গেল। এই সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকে রাষ্ট হইল। ছুই গ্রামের জমিদারের বিপক্ষে যাইবার সাহস কাহারও হইল না; সকলেই উভয় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, মায়ের পূজা যথাবিহিত ভাবে স্নসম্পন্ন করিলেন। ব্রাহ্মণরাও স্ব-স্ব কর্মে যোগ দিলেন, এবং সন্তোষের পুরোহিত নির্ভয়েই পূজা শেষ করিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু পূজার কয় দিন সন্তোষের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিলেন। শেফালীর সেবায় ও যত্নে তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন। বস্তুতঃ, জ্ঞানেন্দ্রবাবু যত প্রীত হইলেন, ঠাঁহার অন্তরের ক্ষোভ ও অনুরোধ সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। ক্রোধপরবশ হইয়া তিনি এমন রূপবতী গুণবতী বালিকার কি সর্কনাশের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি লজ্জায় ও মনস্তাপে বিচলিত হইলেন।

বিজয়া দশমীর দিন অপরাহ্নে জ্ঞানেন্দ্রবাবু গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শেফালীকে বলিলেন, “মা, এইবার আমি বাড়ী যাই; আজ আমার সেখানে থাকা দরকার। তোমরা তো আগ্রা চ'লে যাবে, আবার কবে স্মবিধা হবে জানি না, তাই আমি বাড়ী ফিরবার আগে ছুই

একটা কথা ব'লে যাই। মা, তোমার কাছে আমি বড় অপরাধী; এ অপরাধের জন্তে আমি নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না; এর প্রায়শ্চিত্তও নেই। জেনে-শুনে তোমার যে শক্রতা আমি ক'রেছিলাম, জানি, তার প্রতীকার কিছুই নেই;—ভগবানও বোধ হয় আমাকে দয়ার পাত্র ব'লে মনে করবেন না।”

শেফালী বিচলিত স্বরে বলিল, “কাকাবাবু, আপনি ও-সব ভুলে যান। যা' কিছু হ'য়েছে, তা' সবই আমার কর্মফলে, বিধাতার বিধানে;—মানুষের কি সাধ্য, ব'লুন? আর যা' সব হ'য়েছে, হয় তো তা মঙ্গলেরই জন্ত। ভগবান চিরমঙ্গলময়। আর আপনারা আমার জন্ত এত কাতর হ'য়েছেন কেন? আমার মনে কোনও আক্ষেপ নেই, দুঃখ নেই; আনন্দেরও অভাব নেই। সংসারী হলুম না ব'লে আপনাদের দুঃখ; কিন্তু গরীবদের নিয়ে আমি এমন সংসার গড়ে' তুলব যে, দেখবেন—আমার স্মুখ, আমার গৌরবও অপরের ঈর্ষার কারণ হবে।”

শেফালীর উক্তি শুনে জ্ঞানেন্দ্রবাবু কথঞ্চিৎ শাস্তি লাভ করিলেন। শেফালীর অন্তরে কিছু দিন পূর্বে হইতে নৈরাশ্র-ভরা যে একটা বেদনার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কথায় তিনি তাহার আভাস পাইলেন না। কথা কহিতে-কহিতে তাহার মুখে যে অসীম তৃষার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শেফালীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, ‘আজ পাঁচ বৎসর ধ'রে আমি দয়াময়ের কাছে প্রাণ ভ'রে কেবল একটি প্রার্থনা করছি; তিনি কি এতই নির্ভর যে, আমি পাপী ব'লে আমার সে প্রার্থনাটি তিনি পূর্ণ করবেন না? তোমাকে তোমার স্বামীর সঙ্গে মিলিত না দেখে ম'লে আমি মৃত্যুকালে শাস্তি লাভ ক'রতে পারব না মা!’

এই কথা বলিয়া তিনি যাইবার জন্ত উঠিলেন। সন্তোষ ঠাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, “পিতৃমাতৃহীন আমরা ভয় পেতুম যে, দেশে আমাদের অভিভাবক কেউ নেই; আজ আপনাকে পেয়ে আমাদের সে ভয় দূর হ'য়েছে।”—জ্ঞানেন্দ্রবাবু আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না; ঠাঁহার ছুই চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু টল-টল করিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

পতঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণ-মহাভাষ্য

পম্পশাহিক—অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

৫

অর্থবাদ সম্বন্ধে আর একটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য সুরেশ্বর তাঁহার বৃহদারণ্যক-ভাষ্য-বার্ত্তিকে অন্তর্ভাবে অর্থবাদের তিন প্রকার বিভাগ দেখাইয়া গিয়াছেন।*

(১) যে স্থলে অত্র প্রমাণের সহিত অর্থবাদবাক্যের আপাততঃ বিরোধ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পর্য্যবসানে তাহা স্ততিরূপে পরিণত হয়, সেই স্থলে সেই অর্থবাদ ‘গুণবাদ’ শব্দে অভিহিত হয়। “যজমানো বৈ প্রস্তরঃ” (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ৬।৭) এই স্থলে যজ্ঞের কর্তা যে যজমান তাঁহার সহিত ‘প্রস্তর’ নামক কুশ-মুষ্টির + অভিন্নতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ‘প্রস্তর’ নাম কুশ-মুষ্টির সহিত যজমানের ভিন্নতা সিদ্ধ আছে; অতএব “যজমানো বৈ প্রস্তরঃ” এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত যজমান এবং প্রস্তরের অভেদ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এস্থলে পর্য্যবসানে এই বিরোধ থাকে না। যজমান যেরূপ

যাগক্রিয়ার নিকাহক, ‘প্রস্তরে’রও সেইরূপ যাগক্রিয়া নিকাহে উপযোগিতা আছে। এইরূপে যজ্ঞের ফলস্বামী যজমানের সহিত ‘প্রস্তরে’র তুল্যতা প্রতিপাদনের ফলে ‘প্রস্তরে’র স্ততি পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইজন্য এই অর্থবাদটি ‘গুণবাদ’।

(২) যে অর্থবাদ কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বস্তুকে প্রকাশ করে, সেই অর্থবাদ ‘অনুবাদ’ নামে অভিহিত হয়। “অগ্নির্হিমশ্চ ভেষজম্” * (অগ্নি শীতের ঔষধ = বিনাশক) ইহা একটি অর্থবাদ-বাক্য। অগ্নির দ্বারা শীতের নিবৃত্তি হয়, ইহা সর্বজন-বিদিত; এই জন্য এই অর্থবাদ বাক্যটি লৌকিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বস্তুকে প্রতিপাদন করিতেছে; অতএব ইহা ‘অনুবাদ’।

“ইন্দ্রো হ যত্র বৃত্রায় বজ্রং প্রজহার, স প্রহৃতশ্চতুর্দ্বাং ভবৎ।” শতপথ ব্রাহ্মণ (১।২।২।১) ইহার অর্থ—ইন্দ্র যে সময় বৃত্রকে বজ্রের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, তখন সেই বজ্র বৃত্রের শরীরে প্রহৃত হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

এই অর্থবাদের সহিত অত্র কোন প্রমাণের বিরোধ নাই অথবা এই অর্থবাদে বর্ণিত বিনয় অত্র কোন প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। অতএব এই অর্থবাদ ‘ভূতার্থবাদ’ শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য।

মহাভাষ্যকারের প্রদর্শিত “তেহসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্কন্তঃ পরাবভূবুঃ” এই অর্থবাদকে এই ‘ভূতার্থবাদে’র অন্তর্গত বলিতে পারা যায়।

* বিবোধে গুণবাদঃ স্তাদনুবাদোহবধারিতে।

ভূতার্থবাদস্তদানাদর্থবাদস্তিধা মতঃ।

—বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক—সম্বন্ধবার্ত্তিক ৫৬৭

+ তত্র প্রকৃতীর্ণৌ চতশ্রৌ দর্ভমুষ্টিয়চ্ছিত্তে, প্রথমা দর্ভমুষ্টিম’জ্জৈঃ সংস্কতা বেতাং জুহুর্ষশ্চাং নিধীয়তে, বিধৃতিসংজ্ঞকয়োক্রমগণ-রোদ’র্ভয়োক্রপরি বা চ প্রাগগ্রা স্থাপিতা ভবতি, সা ‘প্রস্তর’ ইত্যুচ্যতে।—শ্রোতপদার্থনিব’চন—ইষ্টিক্রকরণ ৮৭।

প্রকৃতি ইষ্টিতে (দর্শ ও পূর্ণমাস নামক বাগ-বিশেষে) চারি মুষ্টি কুশ ছেদন করা হয়; তাহার মধ্যে মন্ত্রপূত প্রথম কুশমুষ্টি ‘প্রস্তর’ শব্দে অভিহিত হয়। যজ্ঞের বেদির যে স্থানে ‘জুহু’ নামক হোম-পাত্র স্থাপন করা হয়, সেই স্থান প্রথমে এই মন্ত্রপূত প্রথম কুশ-মুষ্টির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপরে ‘জুহু’কে বিস্তৃত করা হইয়া থাকে এবং ‘বিধৃতি’ নামক উত্তরাগ্র কুশদ্বয়—বাহ্য যাগবেদির উপরে বিস্তৃত থাকে—তাহার উপরেও এই ‘প্রস্তর’ নামক কুশ-মুষ্টিকে স্থাপন করা হয়। বাগের পরিসমাপ্তির কিছু পূর্বে এই ‘প্রস্তর’কে মন্ত্রের দ্বারা ‘আহবনী’ নামক অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে।

* কঃ বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিক্কায়তে পুনঃ।

কিং স্বিক্কায়তে ভেষজং কিং স্বিদাবপনং মহৎ।

প’র্থা একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।

অগ্নির্হিমশ্চ ভেষজং ভূমিরাবপনং মহৎ।

—তৈত্তিরীয়সংহিতা ৭।৪।১১

এই স্থলে দ্বিতীয় শ্লোকে যে চারিটি বাক্য আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই ‘অনুবাদ’।

ব্যাখ্যা।—এক সময়ে অশুরগণ বুদ্ধে দেবতাদের নিকট পরাজিত হইয়া দেবতাদের পরাজয়ের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে অশুররা দেবতাদের উদ্দেশে ‘হে অরয়ঃ’ ‘হে অরয়ঃ’ (হে ‘শক্রগণ’ হে ‘শক্রগণ’) এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে থাকিয়া ‘অরয়ঃ’ এই শব্দের ‘র’ স্থানে ‘ল’ উচ্চারণ করে। যজ্ঞ-কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে এইরূপ অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগের ফলে অশুররা দেবতাদের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। এই জন্ত বাক্যে যজ্ঞে অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করিবে না। অপশব্দ (অশুদ্ধ শব্দ) যজ্ঞে; আমরা ‘যজ্ঞে’ না হই, এই জন্ত ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য।

“হেহলয়ঃ” এইরূপ প্রয়োগে কোন অংশে অশুদ্ধি-দোষ ঘটিয়াছে, এ বিষয়ে একটু বিচার করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ‘হে + অলয়’ এই স্থলে হৈ হে প্রয়োগে হৈহয়োঃ* এই সূত্র অনুসারে প্লুতস্বর হওয়া উচিত ছিল। প্লুতস্বর হইলে এ স্থলে সন্ধি হইয়া ‘হেহলয়ঃ’ এইরূপ হইত না, কিন্তু প্রকৃতিভাব ! হইয়া ‘হে অলয়ঃ’ এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। এই প্লুত-প্রযুক্ত প্রকৃতিভাব না করায় এখানে অশুদ্ধি-দোষ ঘটিয়াছে।

অত্র পক্ষ ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, “অগ্নীং প্রেনে পরশু” চ (চা২।৯২) এই সূত্রের মহাভাষ্যে বলা হইয়াছে, সমস্ত প্লুতই বিকল্পে হইয়া

* “হৈ হে প্রয়োগে হৈহয়োঃ” চা২।৮৫।

“হৈ হে প্রয়োগে দূরাক্তে যদ্ বাক্যং বর্ততে তত্র হৈহয়োরেব প্লুতো ভবতি।” কাশিকা—দূর হইতে সন্ধানের নিমিত্ত যে বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, সেই বাক্যে যদি ‘হৈ’ অথবা ‘হে’ শব্দ থাকে তাহা হইলে সেই ‘হৈ’ এবং ‘হে’ শব্দের প্লুত ছইবে। (অস্ত্রের অর্থাৎ বাক্যের টি’ ভাগের প্লুত হইবে না)। যেমন—‘হে ৩ দেবদত্ত’ এই বাক্যে ‘হে’ শব্দের প্লুত হয়; দেবদত্ত ‘হৈ ৩’ এই বাক্যে ‘হৈ’ শব্দের প্লুত হয়; এখানে প্লুত বুঝাইবার উদ্দেশে হে’ এবং ‘হৈ’ শব্দের পরে ‘৩’ এই অঙ্কটি যোগ করা হইয়াছে। প্লুত স্বরের তিন মাত্রা হওয়ার ‘৩’ এই অঙ্কটি প্লুত বুঝাইবার উদ্দেশে স্বরের পরে ব্যবহৃত হয়।

† “প্লুতপ্রগৃহা অচি নিত্যম্” ৬।১।১২৫। (কাশিকার মতে এই সূত্রে “নিত্যম্” এই শব্দটি নাই; মহাভাষ্যমতে এখানে “নিত্যম্” এই শব্দটি আছে।)

ইহার অর্থ—অচ্, অর্থাৎ স্বর পরে থাকিলে প্লুতস্বর ও ‘প্রগৃহ’ সংজ্ঞক স্বরের প্রকৃতি ভাব হয়—সন্ধি হয় না।

থাকে *। এ জন্ত এ স্থলে প্লুতস্বর এবং প্লুত-প্রযুক্ত প্রকৃতিভাব না করায় কোন দোষ হয় নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, বীপ্সা অর্থে পদের দ্বিত্ব। হয়; এখানে “হেহলয়ঃ” এই পদসমুদায়াক বাক্যের দ্বিত্ব করায় অশুদ্ধি-দোষ ঘটিয়াছে।

এখানে বীপ্সা অর্থে দ্বিত্ব কবা হইয়াছে—ইহা অপর পক্ষ স্বীকার করেন নাই। এখানে বক্তার ইচ্ছানুসারে পদ-সমুদায়ের দুইবার উচ্চারণ কবা হইয়াছে ‡। কোন সূত্র অনুসারে এখানে দ্বিত্ব হয় নাই। এখানে “অরয়ঃ” এই শব্দের অন্তর্গত ‘র’ স্থলে ‘ল’ উচ্চারণ করিয়া “অলয়ঃ” এইরূপ বিকৃতি ঘটান হইয়াছে অর্থাৎ ‘অরি’ শব্দটিকে ‘অলি’ শব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহাই এই বাক্যের অশুদ্ধি।

এই শেনোক্ত মতটিই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিবার যোগ্য।

“যজ্ঞে না ভূমেতাধোয়ং ব্যাকরণম্”—এই স্থলে ‘যজ্ঞে’ শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থের সঙ্গতি হয় না। ‘যজ্ঞে’ শব্দের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ, একটি অর্থ—দেশ-বিশেষ §। অপর অর্থ মনুষ্য—জাতিবিশেষ ¶; এই দুই অর্থের যে কোন অর্থ

* “সর্কঃ প্লুতঃ সাহসমনিচ্ছতা বিভাষা বক্তব্যঃ”।—মহাভাষ্য। পম্পশার উদ্যোতে এবং প্রকৃতিভাবপ্রকরণের প্রৌচমনোরমায় “বক্তব্যঃ” এই স্থলে “বর্তব্যঃ” এইরূপ পাঠ আছে। ইহার অর্থ—গাহারা সাহস অর্থাৎ শাস্ত্রত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারাও সমস্ত প্লুতের বিকল্পে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহাতে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অতিক্রমপ্রযুক্ত দোষ হয় না।

† “নিত্যবীপ্সয়োঃ” (চা১।১৪)

“আভীক্ষ্যে বীপ্সায়াং চ জ্যোত্যা পদস্ত দিবর্চনং শ্রাৎ।—দ্বিত্বান্তকৌমুদী—দ্বিত্ব-প্রক্রিয়া।—‘পৌনঃপুত্’ এবং ব্যাপ্তি অর্থে পদের দিবর্চন হয়।—‘হেহলয়ঃ’ এইটি পদ নহে, পদ-সমুদায়; এই জন্ত এখানে এই সূত্র অনুসারে দ্বিত্ব হইতে পারে না।

‡ বাক্যের এইরূপ ঐচ্ছিক দ্বিত্ব “অনাবৃষ্টিঃ শব্দানাবৃষ্টিঃ শব্দাৎ” (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২২) ইত্যাদিস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

§ কৃষ্ণসারস্ত চরতি যুগো যত্র স্বভাবতঃ।

স জ্ঞেয়ো বজ্রয়ো দেশো যজ্ঞেশ্বশস্ততঃ পরঃ।

—মনুসংহিতা ২।২৩

“প্রত্যস্তো যজ্ঞেশ্বশস্ততঃ শ্রাৎ।”—অমরকোষ ভূমিবর্গ ৭

“চাতুবর্গ্যব্যবস্থানং যশ্মিন্ দেশে ন বিচ্ছতে।

তং যজ্ঞবিষয়ং প্রাছঃ।”

—মহেশ্বরপ্রণীত অমরবিবেকটীকার (ভূমিবর্গ ৭) উক্ত।

¶ “ভেদাঃ ক্রিয়াংশবরণপুঙ্গুয়া যজ্ঞজাতয়ঃ।”

—অমরকোষ—শূত্রবর্গ ২০

এখানে গৃহীত হইলে বাক্যার্থের সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। এই জন্ত এস্থলে ‘শ্লেচ্ছ’ শব্দের প্রসিদ্ধি-লভা এই দুই অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার যোগার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। নিন্দার্থক ‘শ্লেচ্ছ’ ধাতুর উত্তর কন্ম্বাচ্যে ‘ঘঞ্’ প্রত্যয়ে * নিম্পন্ন যে ‘শ্লেচ্ছ’ শব্দ, তাহারই এখানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব এখানে শ্লেচ্ছ শব্দের অর্থ নিন্দা, দেশবিশেষ বা মনুষ্যজাতি-বিশেষ নহে। ব্যাকরণ-শাস্ত্র-পরিম্পন্ন শব্দের উচ্চারণ না করিয়া যজ্ঞকন্ম্ব তাহার বিপরীত উচ্চারণ করিলে পাপ জন্মে; এইজন্ত এই-রূপ অশুদ্ধ উচ্চারণের ফলে উচ্চারণকর্তা নিন্দা হইয়া থাকেন।

“তেহসুরা হেহলয়ো হেহলয়ঃ” ইত্যাদি বাক্য প্রচলিত কোন ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় না। মাধ্যম্নিনশাখার শতপথব্রাহ্মণে “হেহলয়ো হেহলয়ঃ” এইরূপ পাঠের পরিবর্তে “হেহলবো হেহলবঃ” এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উপসংহারে “তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো ন শ্লেচ্ছৎ” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে ‘অরয়ঃ’ এই শব্দের ‘র’ স্থানে ‘ল’ করা হইয়াছে এবং ‘য়’ স্থানে ‘ব’ করা হইয়াছে—ইহাই অশুদ্ধি।

মূল।—“দুষ্টঃ শব্দঃ।”

দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা

মিথ্যাশ্রয়ন্তো ন তমর্গমাঃ।

* “অকর্তৃণি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্” (৩৩১১) এই স্তত্র অমুসারে এ স্থলে ‘ঘঞ্’ প্রত্যয় হয়।

এখানে ‘শ্লেচ্ছ’ শব্দ যৌগিক হওয়ায় সূত্রের অন্তর্গত “সংজ্ঞায়াম্” এই অংশের সহিত বিরোধের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু এই সূত্রের মহাভাষ্যে “সংজ্ঞায়াম্” এই অংশ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া এরূপ আশঙ্কার এখানে অবকাশ নাই।

† “শ্লেচ্ছা নিন্দ্যাঃ। শাস্ত্র-বোধিত-বিপরীতানুষ্ঠানাদিত্তি ভাবঃ।” শব্দকৌশল। “শ্লেচ্ছা ইতি কন্ম্বণি ঘঞ্।”

—মহাভাষ্যপ্রদীপ।

“নহু শ্লেচ্ছা নাম পুরুষবিশেষো দেশবিশেষো বা স কথমপশব্দো-হত আহ—‘ঘঞি’তি। নিন্দাবচনাদ্ শ্লেচ্ছাতোরিত্তি ভাবঃ। নিন্দা চ শাস্ত্রবোধিত-বিপরীতৌচ্চারণেন পাপসাধনত্বাৎ। এবং চ শ্লেচ্ছা ইত্যস্ত নিন্দ্যা ইত্যর্থো ইতি দিক্।” —মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্যোত

‡ “ইদং ভাষ্যাদিবু প্রসিদ্ধং ক্রতিপাঠমমুসৃত্য ব্যাখ্যাতম্। অয়ং চ পাঠঃ কচিচ্ছাখ্যায়ামঘেষণীয়ঃ। মাধ্যম্নিনানাং শতপথব্রাহ্মণে তু ‘হেলবো হেলব’ ইতি বদন্ত ইতি পঠিত্বা তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো ন ‘শ্লেচ্ছদি’তি পঠ্যতে। তত্র বকার স্থানে বকারোহপশব্দ ইতি স্পষ্টমেব।”—শব্দ-কৌশল।

স বাগ্জ্যো যজমানং হিনস্তি

যথেন্দ্রশক্রঃ স্বরতোহপরাধাৎ ॥ ইতি।

দুষ্টাঙ্কদান্ মা প্রযুক্ত্বহীতাদোয়ং ব্যাকরণম্। “দুষ্টঃ শব্দঃ।”

অনুবাদ।—“দুষ্টঃ শব্দঃ” (এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য স্মৃতিত করা হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে) (উদাত্তাদি) স্বর এবং (অকারাদি) বর্ণের (অনুথা উচ্চারণের) নিমিত্ত (যে) শব্দ দুষ্ট (হয়, সে শব্দ) মিথ্যাশ্রয়ন্ত (হওয়ায়) (উচ্চারণকর্তার তাৎপর্য্য বিনয়ীভূত যে অর্প) সে অর্পকে প্রকাশ করেন না। সেই বাক্যরূপী বজ্র যজমানের (স্বয়ং যজ্ঞকর্তার) হিংসা করিয়া থাকে। (তাহার উদাহরণ) যেমন ‘ইন্দ্রশক্র’ (এই শব্দটি) (উদাত্তাদি) স্বরের (অনুথা উচ্চারণের) নিমিত্ত (যে অপরাধ অর্থাৎ দোষ, সেই) অপরাধে যজ্ঞ-কর্তার হিংসা করিয়াছিল (অর্থাৎ অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়াছিল।) আমরা দুষ্ট শব্দের প্রয়োগ না করি, এইজন্ত ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য। ‘দুষ্টঃ শব্দঃ’ (এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য স্মৃতিত হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হইল।)

ব্যাখ্যা।—স্বপ্তার পুত্র বিশ্বরূপের প্রতি ইন্দ্র অসন্তুষ্ট ছিলেন; এই অসন্তোষের ফলে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করেন। স্বপ্তা পুত্রবধে ক্রুপিত হইয়া ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত বুরনামক অস্ত্র পুত্র উৎপাদন করার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে “স্বাহেন্দ্রশক্রবক্রম” এই বাক্যের দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয়। এখানে ‘শক্র’ শব্দ তাহার প্রসিদ্ধ অর্থ যে বিদেবী, সে অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু এই শব্দটি যৌগিকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ‘শদ্’ ধাতুর উত্তর ‘শিচ্’ প্রত্যয় করিয়া তাহার উত্তর উণাদিক ‘ক্রণ্’ প্রত্যয় করিয়া ‘শক্র’ শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে; নিজস্তের অন্ত্যবর্ণের পূর্ব অকারের স্থানে আকার হয়। এইজন্ত এখানে ‘শক্র’ এই প্রকার রূপ না হইয়া ‘শাক্র’ এই প্রকার রূপ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু প্রজ্ঞাদিগণে (৫৪৮) ‘শক্র’ এইরূপ অকারবৃক্ত ‘শক্র’ শব্দের পাঠ করা হইয়াছে; এইরূপ নিপাতনের *

* “নিপাতনং নামান্তাদৃশে প্রয়োগে প্রাপ্তেহজ্ঞাদৃশপ্রয়োগ-করণম্”—পরিভাবেন্দুশেখর—১১৭ পরিভাষা।

—ব্যাকরণ শাস্ত্র অমুসারে যে রূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত, সে রূপ প্রয়োগ না করিয়া আচার্য্যের অজ্ঞপ্রকার প্রয়োগ করার নাম ‘নিপাতন’। এখানে শাস্ত্র অমুসারে ‘শাক্র’ এইরূপ প্রয়োগ হওয়া

ফলে 'শক্র' শব্দের সাধুত্ব হইয়াছে * । 'ইন্দ্রশক্র' এই শব্দে ষষ্ঠীতৎপুরুন সমাস করিলে ইহার অর্থ হয়—ইন্দ্রের ঘাতক ; তাহা হইলে "ইন্দ্রশক্রবর্ধক" এই বাক্যের এইরূপ অর্থ হয়—ইন্দ্রের ঘাতক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও' । তৃত্যের এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত ছিল । ষষ্ঠীতৎপুরুন সমাস হইলে 'ইন্দ্রশক্র' শব্দটির অস্ত্যস্বর উদাত্ত হওয়া উচিত ছিল । ঋত্বিকের অনবধানতাবশতঃ এই শব্দটির উচ্চারণে দোষ ঘটিয়াছিল । তিনি এই শব্দটিকে অস্ত্যদাত্ত উচ্চারণ না করিয়া আদ্যদাত্ত উচ্চারণ করিয়াছিলেন । 'ইন্দ্র' শব্দ ঔণাদিক রনু প্রত্যয়ের+ দ্বারা নিম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার আদ্যস্বর উদাত্ত হয় । বহুব্রীহিসমাসে সেই আদ্যস্বর উদাত্ত থাকিয়া যায় এবং সমগ্র সমাস-পদের অবশিষ্ট স্বরগুলি অমুদাত্ত হয় । অতএব দেখা যাইতেছে, এ স্থলে ঋত্বিক বহুব্রীহির যে স্বর, তাহারই প্রয়োগ করিয়াছিলেন । ইহার ফলে 'ইন্দ্রশক্র' শব্দের অর্থ হইয়া গিয়াছিল—'ইন্দ্র যাহার ঘাতক, সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও' ; এইরূপ বিপরীত অর্থের প্রতীতির ফলে তৃত্যের যজ্ঞের ফল অত্যন্তবিরুদ্ধ হইয়াছিল । তিনি চাহিয়াছিলেন এমন পুত্র—যে পুত্র ইন্দ্রকে বধ করিবে, কিন্তু তাঁহার যজ্ঞের ফলে যে বৃত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, সে ইন্দ্রকে বধ করিতে

উচিত ছিল ; কিন্তু পাণিনি প্রজ্ঞাদিগণে 'শক্র' এইরূপ পাঠ না করিয়া 'শক্র' শব্দে হ্রস্ব অকারের প্রয়োগ করিয়াছেন ; পাণিনির এইরূপ প্রয়োগ করার ফলে 'শক্র' এইরূপ অশুদ্ধরূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং 'শক্র' এইরূপ শুদ্ধরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে ।

* 'শম্' ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিলে—তাহার অস্ত্যবর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণের দীর্ঘ স্থলে হ্রস্ব হইয়া যায় ("মিতাং হ্রস্বঃ" ৬।৪।১২) । সুতরাং এই হ্রস্ব হওয়ার জন্ত কোনরূপ প্রয়াস করিতে হয় না । নিম্নস্ত 'শম্' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ক্রুণ্' প্রত্যয় করিয়া, প্রজ্ঞাদিগণে 'শক্র' এইরূপ তকারযুক্ত পাঠের ফলে 'ম' স্থানে 'ত' আদেশ হইয়াছে—এরূপ স্বীকার করিলেও 'শক্র' শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু 'ত' আদেশও নিপাতনে হইয়াছে,—ইহা স্বীকার করিতে হইবে । +

ঋজুস্রাগ্রবজ্রবিপ্রকুত্রচূরকুরধুরভ্রোপ্রভেরভেলগুক্রগুরুগৌরব-
জ্ঞেরামালাঃ । (উণাদি ২য় পাদ) রন্নস্তা উনবিংশতিঃ । ...
... 'ইদি' "ইন্দ্রঃ" —সিদ্ধান্তকৌমুদী ।

রনু প্রত্যয়ের 'নু'র ইৎ সংজ্ঞা হয় বলিয়া এই প্রত্যয়টি 'নিৎ' । ক্রিদ্ভঙ্গ এবং নিদ্ভঙ্গ শব্দের আদি উদাত্ত হয়,—“ক্রিত্যাদির্নিত্যম্” (৩।১।১১৭) “ক্রিতি নिति চ নিত্যমাদিকদাত্তো ভবতি ।” —কাশিকা । 'ইন্দ্র' শব্দটি নিৎ প্রত্যয়ান্ত হওয়ার ইহার আদ্যস্বর 'ইকার'টি উদাত্ত হয় ।

পারে নাই, ইন্দ্রই তাহাকে বধ করিয়াছিলেন । ষষ্ঠীতৎপুরুনের স্বরের প্রয়োগ না করিয়া, প্রমাদবশতঃ বহুব্রীহির স্বরের প্রয়োগ করার জন্ত বাক্যের অর্থে যে বৈপরীতা ঘটিয়াছিল—সেই বৈপরীত্যের ফলে তৃত্য তাঁহার যজ্ঞের অভীপ্সিত ফলে বঞ্চিত হইয়া বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আমরা যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠানে শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে, তাহার ফলে অভীপ্সিত ফল হইতে বঞ্চিত হইব এবং অনভীপ্সিত ফলের ভাগী হইব । ব্যাকরণের জ্ঞান থাকিলেই অশুদ্ধ উচ্চারণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে । অতএব অশুদ্ধ উচ্চারণের পরিহারের জন্ত ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ।

মন্তব্য ।—'পাণিনীয়শিক্ষা'তেও * এই শ্লোকটি পঠিত আছে ; কিন্তু সেই স্থলে "দুষ্টিঃ শব্দঃ" এই দুইটি শব্দের স্থানে "মল্লো হীনঃ" এইরূপ পাঠ আছে । 'পাণিনীয়-শিক্ষা' হইতে ভাষ্যকার এই শ্লোকটি আহরণ করিয়াছেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অবিচার করা হয় । বর্তমান সময়ে যে 'পাণিনীয়শিক্ষা' প্রচলিত—ইহা পাণিনির রচিত নহে, অথ কোন পণ্ডিত ইহার সঙ্কলন-কর্তা ; তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আমি 'পাণিনীয়'মতামুসারে শিক্ষা বলিতেছি † । যিনি এই শিক্ষার সঙ্কলন-কর্তা ‡ তিনি যে মহাভাষ্যকার অপেক্ষা পরবর্তী, ইহা তাঁহার লেখার ভঙ্গী হইতেই বুঝিতে পারা যায় । এই শ্লোকটি 'পাণিনীয়-শিক্ষা' হইতে ঐমৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে, ইহা মনে করা উচিত নয় । তবে এই শ্লোকটি পতঞ্জলি তাঁহার পূর্ববর্তী শিক্ষা-গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; বর্তমান 'পাণিনীয়শিক্ষা'তেও এই শ্লোকটি পূর্ববর্তী শিক্ষা-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । শিক্ষা-গ্রন্থে এই

* পাণিনীয়শিক্ষা—৫২ ।

† "অর্থশিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়মতঃ যথা ।"—পাণিনীয়-শিক্ষা—১ ।

‡ 'পাণিনীয়শিক্ষা'তে যে সকল শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোক 'নারদীয়শিক্ষা' প্রভৃতি শিক্ষা-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় । এই জন্ত যিনি 'পাণিনীয়শিক্ষা'কে বর্তমান আকার দিয়াছেন, তাঁহাকে রচয়িতা বা প্রণেতা না বলিয়া, সঙ্কলন-কর্তা বলিলেই ভাল হয় । এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে বলিয়া এই প্রসঙ্গের বিস্তার করা হইল না ।

শ্রীকটিব “মস্তো হীনঃ স্বরোণা বর্ণতো না” এইরূপ পাঠ থাকিলেও পতঞ্জলি তাহাকে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন।

“ইন্দ্রশক্রবর্ধস্ব”—ইহার মন্ত্র নাই; প্রামাণিক বেদজ্ঞ-গণের যে সকল বেদবাক্যে ‘মন্ত্র’ ব্যবহার পূর্বপরম্পরা হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল বেদ-বাক্যকে মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়। “ইন্দ্রশক্রবর্ধস্ব” অথবা “স্বাহেন্দ্র—শক্রবর্ধস্ব” ইহা বেদে পঠিত থাকিলেও, ইহা ত্রুষ্টির কল্পিত বাক্যের অনুকরণরূপেই পঠিত আছে; ইহাকে মন্ত্ররূপে পাঠ করা হয় নাই—ইহা বৈদিক শিষ্টসম্প্রদায়ে মন্ত্ররূপে পরিগৃহীত নহে; এই কারণে এই বাক্যের মন্ত্র নাই; অতএব এ স্থলে “মস্তো হীনঃ” এইরূপ পাঠের সঙ্গতি নাই দেখিয়া ভাষ্যকার তাহার পরিবর্তে “দুষ্টিঃ শক্ঃ” এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। শিক্ষাগ্রন্থে যদিও “মস্তো হীনঃ” এইরূপ পাঠ আছে, তথাপি সে স্থলেও অর্থ-সঙ্গতির অমুরোধে ‘মন্ত্র’ শব্দের ‘শক্’ এই অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

কেবল মন্ত্র নহে,—অন্য শব্দও যদি স্বর-বর্ণ-দোষে দুষ্টি হয়, তাহা হইলে তাহার যজ্ঞকর্ম্মে উচ্চারণ প্রত্যাহারের কারণ হইবে—ইহা স্মৃতিত করার উদ্দেশে এখানে ‘মস্তো-হীনঃ’ এই পাঠ পরিবর্তিত করা হইয়াছে—এবং “দুষ্টিঃ শক্ঃ” এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে—এইটুকু এখানকার সার কথা।

কেহ কেহ মনে করেন,—“স্বাহেন্দ্রশক্রবর্ধস্ব” ইহা যে মন্ত্র নয়, ইহার কোন প্রমাণ নাই। যজ্ঞকর্ম্মে মন্ত্রের ‘একশ্রুতি’*

* উদাত্ত, অমুদাত্ত এবং স্বরিত,—ইহার প্রত্যেকটি স্বর পৃথগ্ভাবে উচ্চারিত হয়; যে স্থলে এইরূপ পৃথগ্ভাবে উদাত্তাদির উচ্চারণ না করিয়া সামান্তভাবে অকারাদি বর্ণের উচ্চারণ করা হয়, সেইস্থলে ‘একশ্রুতি’ স্বর বৃত্তিতে হইবে।—“সা (একশ্রুতিঃ) চ স্বরাবিভাগঃ।”—ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি। এই ‘একশ্রুতি’র অপরা নাম ‘প্রচয়’। কাভ্যায়ন-প্রণীত ‘শুক্লযজুঃপ্রতিশাখ্যে ‘একশ্রুতি’ স্বরকে ‘তান’ স্বর বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই ‘একশ্রুতি’কে মহাভাষ্যকার ‘স্বর-সর্বনাম’ এই শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন—“একশ্রুতিঃ স্বর-সর্বনাম।”—মহাভাষ্য (৬।৪।১৭৪)। ইহার তাৎপর্য এই যে, যেখানে উদাত্ত, অমুদাত্ত এবং স্বরিত,—এই তিনটি স্বরের মধ্যে কোনো একটি স্বরকে পৃথগ্ভাবে উচ্চারণ না করিয়া এবং তাহাদের বৈলক্ষণ্যের বিবক্ষা না করিয়া সামান্ত ভাবে স্বরবর্ণের উচ্চারণ করা হয়, তাহাই ‘একশ্রুতি’। এ বিষয়ে বিশেষ-জিজ্ঞাসুগণ উক্ত স্থলের মহাভাষ্য এবং কৈয়ট দেখিবেন।

স্বর বিহিত আছে* ; এ স্থলে সেট ‘একশ্রুতি’ স্ববেবই উচ্চারণ করা উচিত ছিল; তাহা না করিয়া ‘ইন্দ্রশক্’ শব্দটির যে আদিস্বর উদাত্ত উচ্চারণ করা হইয়াছিল, ইহাই এ স্থলে ‘স্বরাপরাধ’—স্বরদোষ। এইরূপ দুষ্টি উচ্চারণের ফলেই ত্রুষ্টির যজ্ঞের ফল বিপরীত হইয়াছিল। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে;—

কাব্যপ্রকাশকার মন্যটতট-প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন, উদাত্তাদি স্বরের প্রভাবে বেদেই অর্থ-বিশেষের প্রতীতি হয়; তাহাদের এই কথার অভিপ্রায় বিচার করিলে দেখা যায়—বৈদিক সংস্কৃত ব্যতীত অন্য সংস্কৃতে উদাত্তাদি স্বরের জন্ম অর্থের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য হয়, ইহা তাহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। স্মৃতিরূপে বৈদিক সংস্কৃত ব্যতীত অন্য সংস্কৃতে উদাত্তাদি স্বরের ব্যবহার হইতে পারে না, ইহাও তাহাদের অভিপ্রায় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পরন্তু আলঙ্কারিক-দের এই সিদ্ধান্ত বৈয়াকরণসম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে বৈদিক প্রয়োগের জন্ম যে সকল সূত্র রচনা করা হইয়াছে, সেই সকল সূত্রে বিশেষ ভাবে বেদের কথা উল্লিখিত আছে; এমন কি, যে সকল বৈদিক প্রয়োগ কেবল বেদের মন্ত্র-ভাগ কিংবা কেবল ব্রাহ্মণ-ভাগেই হইয়া থাকে, সেই সকল প্রয়োগের সিদ্ধির জন্ম যে সকল সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে ‘মন্ত্র’ অথবা ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দের স্পষ্ট

* “যজ্ঞকর্ম্মণ্যজপন্যুত্থামস্ব” (১।২।৩৪)

“যজ্ঞকর্ম্মণি মন্ত্র একশ্রুতিঃ শ্রাজ্জপাদীন্ বর্জ্জয়িষা।”—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী—সাধারণস্বরপ্রকরণ।

† “যদি বা একশ্রুত্যভাবাদেবাত্র প্রত্যবায়ঃ।”

—পদমঞ্জরী ১।১

“কেচিত্ত্ব একশ্রুতিপ্রসঙ্গেহুদাত্তোচ্চারণাদেবেন্দ্রশক্রপদে দুষ্টি-
ভমিত্যাহঃ।—ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি ১।১

‡ “ইন্দ্রশক্ররিত্যাদৌ বেদ এব ন কাব্যে স্বরো বিশেষ-
প্রতীতিকুৎ।”—কাব্যপ্রকাশ ২।১৯

“কাব্যমার্গে স্বরো ন গণ্যত ইতি চ নয়ে।”

—কাব্যপ্রকাশ ২।৮৪

“স্বরস্ত বেদ এব বিশেষকুৎ, ন কাব্যে।”—সাহিত্যদর্পণ ২।২৬

ছন্দসি পুনর্ব্বাচ্যে কবচনম্ ১।২।৬১; ছন্দসি সহঃ ৩।২।৬৩

নেত্বরাছন্দসি ৭।১।২৬, ইত্যাদি।

উল্লেখ আছে * । স্বরের মধ্যে যে সকল স্বর কেবল বেদেই হইয়া থাকে, তাহাদের জন্মও বিশেষ সূত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে † । এই সকল পর্যালোচনা করিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বেদ ব্যতীত লৌকিক-সংস্কৃত ভাষায় স্বরের ব্যবহার নাই, একরূপ যাহারা মনে করেন, তাহাদের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ‡ ।

এই প্রসঙ্গে এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য । আমাদের বঙ্গদেশে যে বেদ-পাঠ করা হয়, তাহাতে উদাত্তাদি স্বরের যোগ না করিয়া সাধারণভাবে ‘একশ্রুতি’ স্বরের দ্বারাই পাঠ করা হয় । অনেক মনে করেন, আমাদের দেশের এইরূপ বেদ-পাঠ শুদ্ধ নহে এবং এইরূপ পাঠ করায় শুভ ফলের পরিবর্তে অশুভ ফলই হইয়া থাকে । কিন্তু এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন । বেদ-পাঠ ‘উদাত্ত’, ‘অনুদাত্ত’ ও ‘স্বরিত’ এই তিন স্বরের সহযোগে যেমন করা যাইতে পারে, সেইরূপ ‘একশ্রুতি’ স্বরের সহযোগেও করা যাইতে পারে ; তাহাতে কোন দোষ হয় না § । তবে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, উদাত্তাদি-স্বরের সহযোগে বেদ পাঠে যে অধিক ফল হয়, একশ্রুতি স্বরের সহযোগে সেই অধিক ফল হয় না ¶ । যজ্ঞকালে যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়, মহর্ষি পাণিনি কতিপয় স্থল ব্যতীত তাহাতেও ‘একশ্রুতি’ স্বরের বিধান করিয়াছেন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় ॥ বঙ্গদেশে কি

বৈদিক কি পৌরাণিক সকল মন্ত্রই ওঙ্কারযুক্তরূপে পঠিত হয় ; একরূপ প্রণালী অত্র দেশে দেখা যায় না ! এইরূপ ওঙ্কারযুক্তরূপে মন্ত্র-পাঠ করিলে মন্ত্রের উচ্চারণে যাহা কিছু ত্রুটি—যাহা কিছু বিচ্যুতি, তাহার পরিহার হয় * ।

মূল ।—“যদধীতম্ ।”

“যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শক্যতে ।

অনগ্নাবিব শুকৈধো ন তজ্জলতি কহিচিৎ ॥”

তস্মাদনর্থকং মাদিগীত্বহীত্যাভ্যয়ং ব্যাকরণম্ ।
‘যদধীতম্’ ।

অনুবাদ ।—‘যদধীতম্’ । (এই প্রতীকের দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত করা হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে) যাহা অধীত অর্থাৎ পঠিত হয় অথচ (উদাত্তাদি-স্বর-প্রমুখ ব্যাকরণ-শাস্ত্রীয় সংস্কারের জ্ঞান না থাকায় অথবা অর্থ-জ্ঞান না থাকায়) বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত না হইয়া কেবল পাঠের দ্বারা উচ্চারিত হয়, অগ্নির অসন্নিধানে শুষ্ক কাঠের ত্রায় সেইরূপ অধ্যয়ন নিষ্ফল হয় ।

আমরা নিষ্ফল অধ্যয়ন না করি, এইজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্তব্য ।

ব্যাখ্যা ।—শব্দের উদাত্তাদিস্বর এবং অন্যান্য সংস্কারের জ্ঞান ব্যাকরণের দ্বারাই হইতে পারে ; শব্দের অর্থজ্ঞানও ব্যাকরণের অধীন । এইজন্য যিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন করেন নাই, তাহার পক্ষে উদাত্তাদি-স্বর-প্রমুখ শব্দের সংস্কার জানা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ অর্থের পরিজ্ঞানও অসম্ভব । শব্দের সংস্কার জানিতে হইলে কিংবা অর্থজ্ঞান করিতে হইলে ব্যাকরণের অধ্যয়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই । অতএব নিষ্ফল অধ্যয়নের পরিহার করিতে যিনি ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে ব্যাকরণের অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য ।

মন্তব্য ।—নিকৃতে (১২৩) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে । কোন্ গ্রন্থ হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা জানা যায় না । এই শ্লোকের নিকৃতে একটু পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায় । মহাভাষ্যে যে স্থলে ‘যদধীতম্’ এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়,

* মন্ত্রে স্বস্বরশব্দবৃদ্ধহৃচ্চুগমিজনিত্যো লেঃ ২।৪।৮০ ; মন্ত্রে

বৃষষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ ৩।৩।১৬ ; মন্ত্রেঘাভ্যাৎদেৱান্ননঃ ৬।৪।১৪১ ; ইত্যাদি । দ্বিতীয়া ব্রাহ্মণে ২।৩।৬০ ।

† আত্মদাত্তং দ্বাচ্ ছন্দসি ৬।২।১১৯ ; বিভাষাছন্দসি ৬।২।১৬৪ পরাদিশ্ছন্দসি বহুসম্ ৬।২।১১৯ ।

‡ “স্বরবিধৌ ছন্দোহধিকারাত্বাৎ ।”—শব্দকৌস্তভ ১।১

“ন চ স্বরত্র বেদমাত্র বিষয়কত্বাত্তত্র (—লৌকিকে) তৎপ্রযুক্ত-
গণদোষয়েন প্রসক্তিরিতি বাচ্যম্ । তদ্বিধৌ ছন্দসীতি অনধিকারাত্বং ।”—ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধি ১।১ ।

“এতেন ভাষায়াং স্বরে নান্ত্যেবেতি ভ্রাম্যন্তঃ পরান্তাঃ,
স্বরবিধৌ ছন্দোহধিকারাত্বাচ্ছ ।—লঘুশব্দেদুশেখর—সাধারণস্বর-
প্রকরণ ‘বিভাষাছন্দসি’ সূত্র ।

§ কাশিকা ১।২ ৩৬ ।

¶ লঘুশব্দেদুশেখর সাধারণস্বরপ্রকরণ—‘বিভাষাছন্দসি’ সূত্র ।

॥ “বজ্রকর্ণণ্যজপন্যামসু” ১।২।৩৩

* বঙ্গ-অনুষ্ঠানতিরিক্তং চ যচ্ছিত্রং বদধীতম্ ।

যদমেধ্যমণ্ডং চ যাত্বামং চ বদভবেৎ ।

তদোঙ্কার-প্রযুক্তেন সর্বং চাবিকলং ভবেৎ ॥—যোগিষাজবক্য ।

নিরুক্তে সেই স্থলে 'যদগৃহীতম্' এইরূপ পাঠ আছে ; তাহা হইলে নিরুক্ত অমুসারে এই শ্লোকের পূর্বাঙ্কের পাঠ এইরূপ পর্য্যবসিত হইতেছে ;—

“যদগৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে ।”*

ইহার অর্থ—যাহা শব্দমাত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং যাহার অর্থাংশ অপরিজ্ঞাত আছে, তাহা কেবল পাঠের দ্বারা উচ্চারিত হয় ।

নিরুক্তে (১২৩) এই শ্লোকের পূর্বে

“তথাপি জ্ঞান-প্রশংসা ভবত্যজ্ঞাননিন্দা চ—

স্বাগৃহয়ং ভারহারঃ কিলভূদ

অনীত্য বেদং ন জানাতি যোহর্গম ।

যোহর্গজ্জ ইৎ সকলং তদমশ্বতে

নাকমেতি জ্ঞানবিশ্বতপাপ্যা ॥ ।”

ইহার অর্থ—শাস্ত্রে জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা আছে—

যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থে অনভিজ্ঞ থাকে, সেই স্বাগৃ অর্থাৎ শুষ্ক বৃক্ষের ত্রায় ব্যক্তি (এখানে শুষ্ক কাষ্ঠের স্তম্ভের ত্রায় ব্যক্তি) কেবলমাত্র ভারেরই বাহক ; যিনি অর্থে অভিজ্ঞ, তিনি ইহলোকে সমস্ত কল্যাণের ভাগী হ'ন এবং জ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করিয়া পরলোকে স্বর্গের অধিকারী হ'ন ।

এই বাক্যটি মহাভাষ্যকারের প্রতিপাত্ত বিনয়ের অনুকুল হইলেও তিনি ইহা মহাভাষ্যে উদ্ধৃত করেন নাই । ইহার পরবর্তী “যদগৃহীতম্” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাই

* “গৃহীতং শব্দতঃ, অবিজ্ঞাতং তু অর্থতঃ ।”—শব্দকৌশল ১।১

† তত্র গৃহীতং শব্দতঃ, অবিজ্ঞাতমর্থত ইতি বোধ্যম্:—মহাভাষ্যপ্রদীপোত্তোত ১।১

‡ “গৃহীতং শব্দতঃ । অবিজ্ঞাতমর্থতঃ প্রকৃত্যাদিবিভাগেন চেত্যর্থঃ ।—ব্যাকরণসিদ্ধান্তস্থানিধি ১।১

† এইরূপ একটি শ্লোক সূত্রসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

“যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্ত বেস্তা ন তু চন্দনস্ত ।

এবং হি শাস্ত্রাণি বহুনাধীতা, চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্ বহস্তি ।”—

চন্দনভারের বাহক গর্দভের যেরূপ ভারেরই জ্ঞান থাকে—চন্দনের কোন জ্ঞান থাকে না, এইরূপ যে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাহার অর্থে অনভিজ্ঞ থাকে, সে ব্যক্তি গর্দভের ত্রায় কেবল বহন করে অর্থাৎ তাহার সে অধ্যয়ন কেবল বৃথা পরিশ্রম হয়, তাহাও যাহা সেই ব্যক্তির কোন লাভ হয় না ।

তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে । যে কথা এই “স্বাগৃহয়ং” শ্লোকে দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান হইয়াছে, সেই কথাই পরবর্তী “যদগৃহীতম্” এই শ্লোকের দ্বারা কোনরূপ দৃষ্টান্তের অবতারণা না করিয়া সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ; এইজন্য ভাষ্যকার পরবর্তী শ্লোকের প্রদর্শনই লাঘবের অনুরোধে সমীচীন মনে করিয়াছেন ।

অর্গজ্ঞানরহিত বেদের যে অধ্যয়ন, তাহা নিষ্ফল—এই সিদ্ধান্তে নিরুক্তকার যাস্ক এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয় । পূর্বমীমাংসাদর্শনের ‘মন্ত্র-নিজ্ঞাধিকরণে’* অর্থের আরকরূপে যজ্ঞকর্ম্মে মন্ত্রের উপযোগ স্বীকৃত হইয়াছে । এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়,—যাহার অর্গজ্ঞান নাই, তাহার উচ্চারিত মন্ত্রের কোন ফল নাই, সেইরূপ ব্যক্তির উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াও সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল ।

কিন্তু এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় আছে । যে ব্রহ্মতেজের কামনা করে, সেইরূপ বালকের পঞ্চম বর্ষে উপনয়ন দেওয়ার বিধান শাস্ত্রে আছে । পঞ্চম বর্ষের বালকের যদি উপনয়ন হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সন্ধ্যাবন্দনা অবশ্যই কর্তব্য । কিন্তু পঞ্চম বর্ষের বালকের পক্ষে গায়ত্রী কিংবা সন্ধ্যাবন্দনার সমস্ত মন্ত্রের অর্গজ্ঞান সম্ভাবিত নহে । তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—যে সকল শাস্ত্রকার পঞ্চমবর্ষের বালকের উপনয়নের বিধি বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা অভিপ্রেত যে, এই উপনীত বালকের অর্গ-জ্ঞান না থাকিলেও গায়ত্রী কিংবা সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রের কেবল উচ্চারণের দ্বারাই সন্ধ্যাবন্দনার ফললাভ হইবে । ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, অর্গজ্ঞান না থাকিলেও অবস্থা-বিশেষে মন্ত্রের উচ্চারণ সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয় না । তবে যাহার অর্গজ্ঞান আছে, তাহার মন্ত্রপাঠে বিশিষ্ট ফললাভ হইবে । নিরুক্তকার এবং মহাভাষ্য-কারের অভিপ্রায়ও এস্থলে এই ভাবেই ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত ।

* পূর্বমীমাংসাদর্শন ১ম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ ; ৩১—৫৩ সূত্র ।

† “ব্রহ্মবর্ষসকামস্ত কার্গং নিপশ্য পঞ্চমে ।

—মমুসংহিতা ২।৩৭

পূর্বমীমাংসার মস্তলিঙ্গাধিকরণে অর্থের স্বাক্ষররূপে মস্তের সার্থক্য স্বীকৃত হইলেও, স্থল-বিশেষে অর্থের প্রকাশ না করিলেও মস্তের ব্যর্থতা অঙ্গীকৃত হয় নাই; অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্মের জনকরূপেও স্থল-বিশেষে মস্তের উপযোগ আছে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে*। অতএব আমরা এ স্থলে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি যে, অর্থজ্ঞান না থাকিলেও মস্তের উচ্চারণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না; তবে অর্থজ্ঞান থাকিলে মস্তের উচ্চারণ হইতে যেরূপ প্রকৃষ্ট ফলের লাভ হয়,—যাহার অর্থজ্ঞান নাই— তাহার উচ্চারিত মস্ত সেইরূপ প্রকৃষ্ট ফলের সাক্ষ্য হয় না।

মূল।—‘যস্তু প্রযুঙেক্ত’
যস্তু প্রযুঙেক্ত কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোহনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্যোগবিদ্ হুম্যতি চাপশব্দৈঃ।

অনুবাদ।—যে নিপুণ (ব্যক্তি) শব্দ প্রয়োগের

* ভাট্টদীপিকা—১ম অধ্যায়—২য় পাদ—৪র্থ অধিকরণ।

সময়ে (অর্থ-) বিশেষে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করেন সেই বাগ্যোগবিদ্ পরলোকে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হ'ন, অপ- শব্দ অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দের দ্বারা দূষিত হ'ন।

ব্যাখ্যা।—ব্যাকরণে যে শব্দ যে অর্থে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির বিভাগের দ্বারা ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, সেই শব্দ সেই অর্থে সাধুশব্দ অর্থাৎ শুদ্ধ শব্দ; সেই অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া অত্র অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ করিলে, ব্যাকরণ-ব্যুৎপাদিত হইলেও ব্যাকরণের অনভিমত সেই-রূপ অর্থে সেই শব্দ অপশব্দ অর্থাৎ অশুদ্ধ শব্দ। বর্তমান কালে প্রথম পুরুষের এক বচনে ‘ভবতি’ শব্দ ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত হইয়াছে; ‘ভবতী’ এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তির এক বচনেও ‘ভবতি’ এই-রূপ ব্যাকরণে ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এই ব্যাকরণ-সম্মত অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া অত্র অর্থে যদি ‘ভবতি’ এই শব্দটির প্রয়োগ করা হয়, তবে সেটি অপশব্দের মধ্যে পরিগণিত হইবে অর্থাৎ কেহ যদি ‘ত্বং ভবসি’ এইরূপ প্রয়োগের পরিবর্তে ‘ত্বং ভবতি’ এইরূপ প্রয়োগ করেন, তবে তাহা অশুদ্ধই হইবে।

শ্রীহারাগচন্দ্র শাস্ত্রী।

অদূরবর্তিনী

আজকে যেন সব প্রাণময় পানান-বুকে সংজ্ঞা জাগে,
ক'রছে সৃষ্টিভেদে আঁধার আবাহন-আভা কোন্ দিবাকে।
দীন চকোরের ক্ষীণ ডাকে হায়—
টাদের স্মৃধা আজ উথলায়,
শুধু তুণের কাতরতায় জলদ-জালে টান যে লাগে।

সুফল বুঝি ফলনে আহা যুগের যুগের তপস্কারি,
গঙ্গা আজি নাম্বে ধরায় আভাস যে তার ওই নেহারি।

তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ কেন

চঞ্চল আজ লাগছে হেন,

‘অনাগ ৩’ তবঙ্গেনি হিল্লোলে বুক হুলুড়ে আগে ?

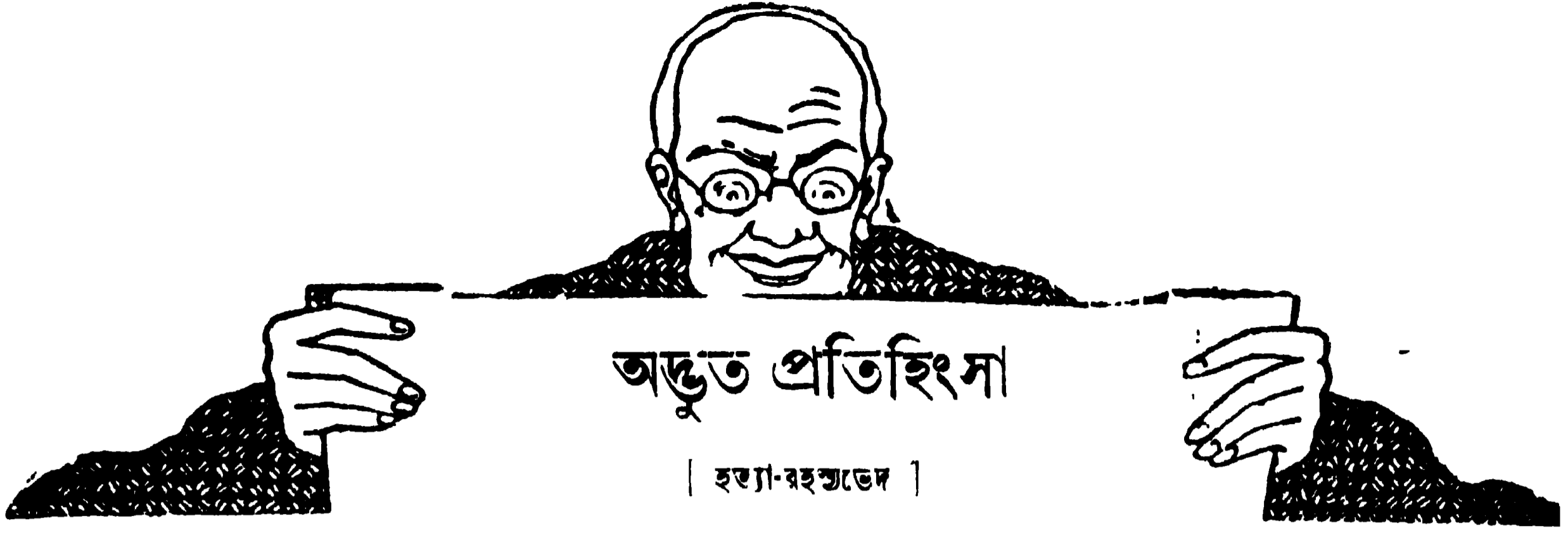
আসছে কে ওই, হাসছে কে ওই, শুনি কাহার নুপুর-ধ্বনি
কাহার চরণ-পরশ পেয়ে ধ্বজ হবে এই অবনী ?

দেবীর ভালে চক্রেলেখা

আঁধার ভেদি দিচ্ছে দেখা—

শুভ্র এবং আশীর্বাদ ওই বরছে গ'লে অমুরাগে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



অদ্ভুত প্রতিহিংসা

| হত্যা-রহস্যভেদ |

মিষ্টার এফ. ডব্লু. গ্যালওয়ে কিছু দিন পূর্বে বিহারের কোন জিলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তাঁহার এলাকাস্থিত কোন খানার ভারপ্রাপ্ত একটি মুসলমান দারোগা একটি হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার পাইয়াছিল। এই দারোগাটি হত্যাকাণ্ডের যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা একরূপ অকাটা যে, সেই সকল প্রমাণে নির্ভর করিয়া জজ ও জুরীরা আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করিতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মিঃ গ্যালওয়ে স্বয়ং এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার গ্রহণ করিয়া যে ভাবে প্রকৃত অপরাধীর অপরাধ প্রতিপন্ন করেন, তাহা গোয়েন্দাগিরিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়সূচক। মিঃ গ্যালওয়ে সংপ্রতি লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় এই হত্যা-রহস্যভেদের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্ত তাহার অনুবাদ নিয়ে প্রকাশিত হইল। এই বিবরণে মিষ্টার গ্যালওয়ে নিজের ও পক্ষগণের নাম পরিবর্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, ঘটনার প্রত্যেক বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য, এবং তাঁহার কোন কথা অতিরঞ্জিতও নহে। এই বিবরণে তিনি খানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে মহম্মদ আলি, এবং তাহার উপরওয়ালা পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টকে (অর্থাৎ নিজেকে) মিষ্টার রেনল্ডস্ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মিষ্টার গ্যালওয়ে লিখিয়াছেন, “রামপ্রসাদ নামক একটি লোক কোন গ্রামে বাস করিত। লোকটি বৃদ্ধ, এবং তাহার জীবন শান্তিতেই অতিবাহিত হইতেছিল; তাহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য ছিল না, এবং তাহার কোন কার্যে কোন দিন গ্রামবাসীদের মনোযোগও আকৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সে হঠাৎ নিহত হওয়ার তাহার হত্যাকাণ্ডে গ্রামে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল।

এই সময় গ্রামস্থ খানার কার্যভার যে দারোগার হস্তে স্তম্ভ ছিল, ধরিয়া লউন—তাহার নাম মহম্মদ আলি। সে তরুণ যুবক; কর্তব্যনিষ্ঠ দারোগা বলিয়া তাহার সুনাম থাকিলেও পুলিশের জটিল কার্যে তাহার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। যে সকল কর্মচারী পুলিশ বিভাগের নিম্নতর পদে নিযুক্ত থাকিয়া যোগ্যতাবলে দারোগার পদে উন্নীত হয়, মহম্মদ আলি সেই শ্রেণীর কর্মচারী ছিল না; সে পুলিশ-ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া একেবারেই পুলিশের সাব-ইন্স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। এ জন্ত পুলিশের কার্যের ‘দাঁড়া-দস্তুর’ (methods) তাহার জানা থাকিলেও কেতাবী-বিচার বাহিরে হাতে-কলমে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা সে আরম্ভ করিতে পারে নাই, এবং মনুষ্যচরিত্র অধ্যয়নের সুযোগও সে লাভ করিতে পারে নাই। এই জন্ত তাহার অধীনস্থ কর্মচারীরা

অনেক সময় নিজের খেয়ালেই চলিত, এবং তাহাকে বাহা বুঝাইয়া দিত, সে তাহার ক্রটি ধরিতে পারিত না।

মহম্মদ আলি হাতে-কলমে কাজ করিতে গিয়া দেখিল—অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা বড় কঠিন ব্যাপার, এজন্ত পদে পদে তাহার চেষ্টা বিফল হইত; এবং এই ভাবে সে অকৃতকার্য হওয়ার তাহার এলাকায় অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল। ইহাতে সে নিরুৎসাহ হইলেও কিছু দিন পরে তাহার হাতে একরূপ একটি ‘কেস’ আসিল, তাহার তদন্ত-কার্যে সে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবে বলিয়াই আশা করিল, এবং উৎসাহের সহিত তদন্ত-কার্যে প্রবৃত্ত হইল।

এক দিন প্রভাতে গ্রাম্য চৌকিদার খানায় আসিয়া দারোগা মহম্মদ আলিকে সংবাদ দিল—রামপ্রসাদ নামক এক জন লোকের মৃতদেহ একটি কূপের ভিতর পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। সেই ব্যক্তি কূপে লাফাইয়া-পড়িয়া আত্মহত্যা করে নাই—ইহার প্রমাণ এই যে, তাহার মৃতদেহে আঘাত-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সে কূপের ভিতর কয়েক দিন পড়িয়া ছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কূপটি গ্রাম হইতে কিছু দূরে থাকায় গ্রামের লোক-জনকে প্রায়ই সেই কূপের জল ব্যবহার করিতে হইত না।

এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ আলি অবিলম্বে তদন্ত আরম্ভ করিল। তাহার পর সন্ধান করিতে কবিত্তে সে যে সূত্র আবিষ্কার করিল, তাহা হইতে তাহার সন্দেহ হইল, সেই গ্রামেরই কোন লোক বৃদ্ধকে হত্যা করিয়াছিল। পুলিশের কার্যে মহম্মদ আলিরও গুপ্তচর ছিল। সেই গুপ্তচরের নিকট সে জানিতে পারিল—রামপ্রসাদের পরিবারবর্গের সহিত গ্রামস্থ আর এক জন লোকের দীর্ঘকাল হইতে প্রবল বিরোধ চলিতেছিল,—তাহার নাম ইমামবক্স।

সকল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইমামবক্স সন্দেহে দারোগার সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল। এক জন গ্রামবাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংবাদ দিল—প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে দুই জন অপরিচিত ব্যক্তিকে ইমামবক্সের ঘরে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। আর এক জন গ্রামবাসী দারোগার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল—সে এক দিন রাত্রিকালে তাহার শস্তক্ষেত্র হইতে বুনো শূয়ার তাড়াইবার জন্ত মাঠে বাইবার সময় দেখিতে পায়—তিন জন লোক ইমামবক্সের বাড়ীর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; সেই তিন জনের এক জন যে স্বয়ং ইমামবক্স—ইহা সে হস্তপ করিয়া বলিতে পারে।

গ্রাম্য চৌকিদার যে অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, রাত্রিকালে সে না ঘুমাইয়া সারারাত্রি গ্রামের ভিতর চৌকি দিয়া বেড়ায়, ইহা প্রতিপন্ন

করিবার জন্ত সে দারোগাকে জানাইল—সে পাহারায় বাহির হইয়া সেই তিন জন লোককেই দেখিতে পাঠিয়াছিল ; কিন্তু রাজির অন্ধকারে তাহার মিশিয়া যাওয়ার, সে দীর্ঘকাল তাহাদের উপর নজর রাখিতে পারে নাই। বিশেষতঃ, তখন পর্যন্ত কাছাকেও সন্দেহ করিবার কারণ না থাকায়, সে তাহাদিগকে চিনিবারও চেষ্টা করে নাই ; তবে এখন তাহার মনে হইতেছে—তাহাদের এক জনকে সে খোঁড়াইতে দেখিয়াছিল ; কিন্তু সে কে, তাহা কিরূপে বলিবে ?—ইমামবন্দ খোঁড়া ছিল—ইহা সকলেই জানিত।

চৌকিদারের কথা শুনিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার উপায় ছিল না ; কিন্তু মহম্মদ আলি বৃষ্টিতে পারিল—চৌকিদারের এই বিবৃতি তাহার সিদ্ধান্তের অন্তর্কূল। এইজন্ত সে কর্তব্যানুরোধে ইমামবন্দের ঘর খানাতলাস করিল। অবশেষে সে ইমামবন্দের গোশালার প্রবেশ করিয়া চালের দিকে চাহিতেই ‘চালের বাতায়’ একখানি লাঠী পাইল ; লাঠীখানা রক্ত-মাখা ! লাঠীখানি বেশ ভারী, এবং তাহা কাঠনির্মিত, তাহার মাথা পিত্তল-মণ্ডিত।

এই লাঠী পাওয়ার দারোগার ধারণা হইল—ইমামবন্দই প্রকৃত অপরাধী ; কারণ, গ্রামের পাঁচ-ছয় জন লোক সেই লাঠী দেখিয়া সনাক্ত করিল—উহা ইমামবন্দেরই লাঠী বটে। তাহার সকলেই জানিত, সেই লাঠী ইমামবন্দের জমণের সঙ্গী। দারোগা এবার ইমামবন্দের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সদরে চালান দিল। মহম্মদ আলি শোণিত-রঞ্জিত লাঠীখানা কাগজ দ্বারা মুড়িয়া সেই সঙ্গে সদরে পাঠাইয়া তাহার উপরওয়ালাকে অনুরোধ করিল—লাঠীখানাতে যদি অঙ্গুলি-চিহ্ন থাকে, তবে অঙ্গুলিচিহ্নের বিশেষজ্ঞ যেন তাহা পরীক্ষা করেন ; এবং তাহাতে যে রক্ত লাগিয়াছিল, তাহা যেন রাসায়নিক পরীক্ষা-গারের রসায়নবিৎ দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।—এই সকল কাজ শেষ করিয়া মহম্মদ আলি ঘটনার পরিণতির জন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার তদন্ত-কার্য যে সম্পূর্ণ নিখুঁত হইয়াছিল, এবং ইমামবন্দের নিক্তিলাভের কোনও উপায় ছিল না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল।

যথাসময়ে রামপ্রসাদের শব-ব্যবচ্ছেদের ‘রিপোর্ট’ মহম্মদ আলির হস্তগত হইল। সেই রিপোর্ট পাঠে সে জানিতে পারিল—কোন ভারী ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। লাঠীতে যে অঙ্গুলি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইল, তাহা ইমামবন্দেরই অঙ্গুলি-চিহ্ন ! সুতরাং ইমামবন্দ যে-জালে ভড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে তাহার মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা রহিল না। গ্রামের জন-সাধারণ দারোগার সহিত একমত হইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—দায়বীর বিচারে কি ফল হইবে, বিচারের পূর্বেই তাহা বৃষ্টিতে পারা গিয়াছে।—ইমামবন্দের ফাঁসি হইবে—এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

এত-বড় একটা খুনের ‘কিনারা’ করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া সাব-ইন্স্পেক্টর মহম্মদ আলির আনন্দের সীমা রহিল না ; এই ভাবে আর দুই-একটা হত্যাকাণ্ডের অপরাধীকে ধরিয়া দিতে পারিলে তাহার প্রমোশন অপরিহার্য, এ বিষয়েও তাহার সন্দেহ রহিল না। আর কয়েক বৎসর এইরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে সে বহু ‘সিনিয়র’ দারোগাকে অতিক্রম করিয়া ইন্স্পেক্টর, এবং ইন্স্পেক্টর হইতে পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবে ; পরে

নববর্ষ-দিনের ‘গেজেট’ খুলিয়াই দেখিতে পাইবে—সরকার তাহাকে ‘খাঁ বাহাদুর’ খেতাবে বিভূষিত করিয়াছেন !—সে মনের সুখে আকাশে কেলা নির্মাণ করিতে লাগিল। সে ইংরেজী ভাষা ভাল জানিত না ; কিন্তু এত-বড় একটা তদন্ত-ব্যাপারে সে পুলিশের কর্তৃপক্ষকে তাহার ইংরেজি বিজ্ঞার দক্ষতার চমৎকৃত করিবার জন্ত তাহার মাতৃ-ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় শেষ-ডায়েরী লিখিয়া সদর-আফিসে পাঠাইয়া দিল।

জিলা পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ রেনল্ডস্ তাঁহার সদর-আফিসে ইমামবন্দের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় রত ছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই সকল প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার মুখ গভীর ও জু কুঞ্চিত হইল। তিনি সাব-ইন্স্পেক্টর মহম্মদ আলি-প্রেরিত রিপোর্ট পুনর্বার পাঠ করিয়া, তাঁহার তামাকের পাইপটা মুখ হইতে বাহির করিয়া টেবলের উপর নামাইয়া রাখিলেন এবং সাব-ইন্স্পেক্টরকে লক্ষ্য করিয়া ‘গাথা’ বলিয়া হুকুম দিলেন।

পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট রেনল্ডস্ যে বৃহৎ জিলার শাস্তি রক্ষার ভার পাঠিয়াছিলেন, সেই জিলায় খন-অধম নিতাই লাগিয়া থাকিত ; অপরাধীসন্দেহে বাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইত, তিনি তাহাদিগকে বিচারার্থ চালান দিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেন। আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সম্বন্ধে তিনি যে সকল কাগজপত্র পাঠিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার কেবাণীকে ফেরত দিলেন বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কি আদেশ দিবেন—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ইমাম-বন্দের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল—তাহা তাহার কিরূপ প্রতিকূল, ইহা তাঁহার বৃষ্টিতে বিলম্ব হয় নাই ; কিন্তু কিছু-কাল চিন্তা করিয়া তাঁহার ধারণা হইল—এই সকল অকারণ প্রমাণের অন্তর্ভালে যে গভীর রহস্য সংগুপ্ত আছে—দারোগা মহম্মদ আলি তাহার মর্ম্ম বৃষ্টিতে পারে নাই ; সংগৃহীত প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া সে ইমামবন্দকেই বৃদ্ধ রামপ্রসাদের হত্যাকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

এইরূপ চিন্তার পর রেনল্ডস্ সমগ্র ‘ফাইল’টি পুনঃগ্রহণ করিয়া, তাহার আত্মোপাস্ত অত্যন্ত সতর্কভাবে আর একবার পাঠ করিলেন, এবং আসামীর বিরুদ্ধে আরোপিত প্রমাণগুলি কি ভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা মনে মনে আলোচনা করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—সাব-ইন্স্পেক্টর এই সকল প্রমাণে নির্ভর করিয়া প্রতারিত হইয়াছে ; প্রকৃত রহস্যভেদ করিয়া সত্য নির্ণয় করা তাহার অসাধ্য হইয়াছিল।

রেনল্ডস্ সাব-ইন্স্পেক্টরের রিপোর্ট পুনর্বার পাঠ করিয়া তাঁহার কেবাণীকে উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, ‘সাব-ইন্স্পেক্টরকে লিখিয়া দাও—তাহার প্রেরিত রিপোর্টে তাহার নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সে ইংরেজীতে বিচা না কলাইয়া ভবিষ্যতে তাহার রিপোর্ট যেন উর্দুতেই লিখিয়া পাঠায়। এই মামলা এক সপ্তাহের জন্ত মুলতুবি রাখিতে আদালতকে অনুরোধ কর। ইতিমধ্যে আমি অথবা ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সরেজমিনে তদন্ত করিব, এবং সাক্ষীগুলিকে পরীক্ষা করিব। আমি আজ অপরাহ্নে ‘ক্লাবে’ বাইবার সময় জেলখানার বাইব, এবং আসামী ইমামবন্দ আয়সমর্ধনের জন্ত কি বলিতে চাহে—তাহা শুনিয়া লইব।’

সুপারিন্টেন্ডেন্ট রেনল্ডস্ নির্দিষ্ট সময়ে জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। আসামী ইমামবক্স তখন জেলখানার একটি নিভৃত কক্ষে পা গুটাইয়া বসিয়াছিল। অপরাহ্নের সূর্যালোক একটি বাতায়নের ভিতর দিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণ সমূহের গুরুত্ব ইমামবক্সের অজ্ঞাত ছিল না; এই জন্তই সে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল; ভাগ্যে বাহা আছে—ঘটিবে ভাবিয়া সে তখন সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট।

এই সময় পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট রেনল্ডসের আদেশে কারাকক্ষের দ্বার উদ্বাচিত হইলে, ইমামবক্স উঠিয়া-দাঁড়াইয়া দ্বারপ্রান্তে জেলারকে, এবং তাঁহার কিছু দূরে এক জন 'সাহেব'কে দণ্ডায়মান দেখিল। সে তাঁহাদের উভয়কে সেলাম করিলে মিঃ রেনল্ডস্ জেলারকে বলিলেন, 'আমি কে, তাহা উহাকে জানাও। আমি উহাকে বাহিরের আজিনায় লইয়া বাইতে চাই। সেখানে আমি উহার সহিত কোন কোন কথার আলোচনা করিব; অজুত কেহ তাহা শুনিতেনা পার—এইরূপই আমার ইচ্ছা। আমার নিকট কোন দেহরক্ষী থাকিবে না বটে, কিন্তু সে অজুত চিন্তার কোন কারণ নাই; আমার আত্মরক্ষার শক্তি আছে।'

ইমামবক্স পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কথাই বলিল না; সে আত্মসমর্পনেরও চেষ্টা করিল না। মিঃ রেনল্ডস্ বুকিতে পারিলেন—পুলিশকে সে আদৌ বিশ্বাস করে না। তাহার মুখে অবজ্ঞার ভাবই পরিস্ফুট হইল। মিঃ রেনল্ডস্ তাহার মনের ভাব বুকিতে পারিয়া তাহার সহিত সহানুভূতিভরে আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাকে নির্ঝাঁকু দেখিয়া বিন্দুমাত্র অসন্তোষ বা অদীরতা প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমি কয়েক বৎসর পূর্বে যে সকল দেওয়ানী মামলা করিয়াছিলে, সেই সকল মামলার নথিপত্র আমি পড়িয়া দেখিয়াছি। রামপ্রসাদের পরিবারবর্গকে তুমি দেখিতে পার না—আমার এই অনুমান কি সত্য নহে?'

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রশ্ন শুনিয়া ইমামবক্স কোন কথাই বলিল না; সে নতমস্তকে নির্ঝাঁকু ভাবে ছুই গায়েব বুড়া আঙ্গুল দিয়া মাটা খুঁড়িতে লাগিল।

মিঃ রেনল্ডস্ তাহাকে নির্ঝাঁকু দেখিয়া পুনর্বার বলিলেন, 'তোমাদের শেষ মামলার বিচার ছয় মাস পূর্বে শেষ হইয়াছে; হাকিম তোমার অজুতুলেই রায় দিয়াছিলেন। জলের দখলি-স্বত্ব তোমাতেই বর্তিয়াছিল। রামপ্রসাদ যে তাহার পর তোমার বিরুদ্ধে মামলা চালাইবে, তাহার উপায় ছিল না। এ অবস্থায় এই নিরুপায় পরাজিত শত্রুর সহিত তোমার বিরোধ চালাইবার কি কারণ ছিল?'

ইমামবক্স মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, 'না, কোন কারণ ছিল না।'

মিঃ রেনল্ডস্ বলিলেন, 'দেখ ইমামবক্স, এ পর্যন্ত তুমি যে সকল মামলা চালাইয়াছ, প্রত্যেক মামলাতেই তুমি যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ; বোকামি করিয়া কোন মামলা নষ্ট কর নাই; কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তুমি এ রকম নির্ঝাঁকু মতো কাজ করিলে কেন? এই ব্যাপারে আমি তোমার বিন্দুমাত্র দূরদর্শিতার পরিচয় পাই নাই! লাঠীখানা যেখানে

রাখিলে অতি সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়—সেখানে তাহা কি অজুত রাখিয়াছিলে? সেই লাঠী ত তোমারই, না তোমার নয়?'

ইমামবক্স বলিল, 'সাহেব, লাঠীখানা যে আমার, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। গ্রামের বিস্তর লোক জানে, ও লাঠী আমারই। কিন্তু আমার লাঠী হারাইয়াছিল, এ কথা বলিলে কে তাহা বিশ্বাস করিত?'

রেনল্ডস্ বিস্মিত ভাবে বলিলেন, 'তুমি বলিতেছ কি? মামলার ফলাফল যে ঐ লাঠীর উপরেই নির্ভর করিতেছে!'

ইমামবক্স বলিল, 'তা জানি সাহেব! দারোগা যখন আমার লাঠীর সন্ধান করে—তখন আমি তাহাকে জানাই—আমার লাঠীখানা হারাইয়া গিয়াছে। এ কথা শুনিয়া দারোগা হাসিয়া বলিল, "তোমার লাঠী হারাইয়াছে বলিতেছ, ইহার প্রমাণ কোথায়?"—সত্যই তাহার প্রমাণ নাই। পরে বুকিতে পারি—উহা কেহ চুরি করিয়াছিল। কিন্তু কে আমার কথা বিশ্বাস করিবে? আর এ কথা বলিয়াই বা ফস কি?'

রেনল্ডস্ বলিলেন, 'না, এ কথা বলিয়া কোন ফল নাই সত্য; কিন্তু তুমি মুখ তুলিয়া অসঙ্কোচে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার ঐ কথা বলিতে পারিবে? রামপ্রসাদ যে সময় মারা যায়—সে সময় লাঠীখানা তোমার দখলে ছিল না—এ কথা বলিতে তোমার সাহস হইবে কি?'

ইমামবক্স অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার এই আদেশ পালন করিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলিলেন, 'উত্তম, এখন তুমি বাইতে পার। আমি নিজেই এই সকল ব্যাপারের তদন্ত করিব।'

অনন্তর ইমামবক্স তাঁহার ইঙ্গিতে প্রহরীকর্তৃক কারাকক্ষে নীত হইল। রেনল্ডস্ সঙ্কল্প করিলেন—তাহার বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা প্রমাণ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল—তিনি তাহার অসারতা প্রতিপন্ন করিবেন।

মিঃ রেনল্ডস্ পরদিন প্রভাতে অনুবীক্ষণের সাহায্যে (with a magnifying glass) লাঠীখানার প্রত্যেক অংশ সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর অঙ্গুলিচিহ্ন-পরীক্ষককে জেরা করিলেন। তিনি লাঠীতে একটি বিশেষ চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হওয়ার তিনি আনন্দিত হইলেন। অঙ্গুলিচিহ্ন-পরীক্ষক তাঁহার উপদেশ শুনিয়া প্রস্থান করিল।

জিলা-পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সরেকমিনে তদন্তে আসিতে-ছেন শুনিয়া পুলিশ সাব-ইন্স্পেক্টর মহম্মদ আলির আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। সে হত্যাকাণ্ডের তদন্তে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা তাহার উপরওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহার শ্রম সফল হইবে, ইহা সে পূর্বে আশা করিতে পারে নাই। সে তাহার আফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া খাতা-পত্র সাজাইয়া রাখিল। 'পুলিশ সাহেব' তদন্তে আসিয়া কোন বিষয়ে কোন ক্রটি আবিষ্কার করিবেন—তাহার উপায় রহিল না।

দারোগা সাক্ষীগণিকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে শিখাইয়া-পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখিল। কোন্ সাক্ষী কোন্ কথার পর কি বলিবে, তাহা তাহারা মুখস্থ করিয়া রাখিল। কিন্তু এত আয়োজন, পরিশ্রম,—সকলই বিফল হইল। পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট তখন তদন্তে আসিলেন না। তিনি মামলা-সম্পর্কীয় সকল লোককে

কৌশলে গ্রাম হইতে সরাইয়া দিলেন, তাহার পর এক দিন হঠাৎ এক জন আদালী সঙ্গে লইয়া সরেজমিনে তদন্ত করিতে আসিলেন, এবং বে-ভাবে তদন্ত আরম্ভ করিলেন—তাহা সম্পূর্ণ নূতন, এবং দারোগার কল্পনাতীত !

গ্রামের প্রধান ব্যক্তির একটি অখণ্ড বৃক্ষের ছায়ার পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে একটিও অনাবশ্যক কথা বাহির হইল না। সকলেই বুঝিয়াছিল—অধিক কথা বলিলে হয় ত আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইবে; কিন্তু সাক্ষ্য দিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না। তাহাদিগকে স্বল্পভাবী দেখিয়া মিঃ রেনল্ডস্ খুসী হইলেন।

অতঃপর মিঃ রেনল্ডস্ গ্রামবাসিগণকে সঙ্গে লইয়া পূর্বোক্ত কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন; গ্রামের বহু সাধারণ অধিবাসী ও বালক-বালিকা কৌতূহলভরে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কূপটি বালুকাপূর্ণ মাঠের ভিতর অবস্থিত ছিল; একটি মেঠো-পথ দিয়া তাঁহাদিগকে সেই কূপের নিকট গমন করিতে হইল। সকলে কূপ হইতে কিছু দূরে থাকিতে মিঃ রেনল্ডস্ তাহাদিগকে সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ অগ্রাহ করিয়া কেহই কূপের নিকট যাইতে সাহস করিল না।

এবার রেনল্ডস্ তাঁহার আদালীকে সঙ্গে লইয়া কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন; আদালীর হাতে একটি ছোট পুঁটলী ছিল। লোকগুলি দূরে দাঁড়াইয়া কৌতূহলভরে তাঁহাদের কাজ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

কূপের নিকট অনেকগুলি পদচিহ্ন ছিল, অধিকাংশই স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন বলিয়া মিঃ রেনল্ডসের ধারণা হইল। যে সকল পদচিহ্ন গ্রামের দিকে প্রসারিত ছিল, মিঃ রেনল্ডস্ সেগুলি লক্ষ্য না করিয়া, কূপ হইতে প্রায় এক শত গজ দূরে গমন করিয়া অর্ধ-চক্রাকারে তাহা ঘুরিয়া দেখিলেন। সেখানে তিনি মাঝুয়ের চলিবার একটি পথ দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে খামিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং এক জন গ্রামবাসীকে আহ্বান করিয়া সেই পথের নিকট দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার আদালীকে সঙ্গে লইয়া কি দেখিতে দেখিতে সেই পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি, গ্রামবাসীরা তাহা বুঝিতে না পারায় অস্কট স্বরে আলোচনা করিতে লাগিল।

যে স্থানে দশ-বার জন লোক দাঁড়াইয়াছিল, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের আদালী সেই স্থানে আসিয়া দুইটি সর্কীর্ণ পথ সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত দেখিয়া উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিছু দূরে মাটি অত্যন্ত কঠিন থাকায় সেখানে পথ অদৃশ্য হইলেও তাহার পর নবম জমি ছিল; এজন্ত পথটি পুনর্বার দৃষ্টিগোচর হইল। এই পথে খালি-পায়ের চিহ্নগুলি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া গেল, এবং স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল—উভয় পথের ব্যবধানে যে সর্কীর্ণ স্থান ছিল—তাহার উপর দিয়া কোন ভারী দ্রব্য টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

রেনল্ডস্ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম—এখানে তাহার অতিরিক্ত কিছু দেখিতেছি। এখন তোমরা কাজে লাগিয়া যাও; আগুন জাল, আমি জন-দুই ভ্রম-লোক ডাকিয়া আনি।'

অতঃপর রক্ষনোপযোগী একটি পাত্র আনীত হইলে পূর্বোক্ত বাণ্ডিলে যে সকল দ্রব্য ছিল, তাহা সেই পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অগ্নির উত্তাপে তাহা তরল হইলে সেই তরল পদার্থ সুপারিস্কট পদচিহ্নগুলির উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল। কিছু কাল পরে তাহা শীতল হইলে জমিয়া কঠিন হইল। কিন্তু তাহা কঠিন হইবার পূর্বেই দুই জন সাক্ষীর স্বাক্ষরিত একখণ্ড কাগজ সেই পদার্থের উপরের অংশে বসাইয়া দেওয়া হইল। স্থায়ী প্রমাণরূপে সনাক্ত করিবার জন্তই এইরূপ করা হইল; অতঃপর তাহাদের উপর হইতে ময়লাগুলি ধুইয়া ফেলিয়া, সেই কঠিন পদার্থগুলি মাটি হইতে তুলিয়া-লইয়া সতর্কতা সহকারে ঢাকিয়া রাখা হইল। এই কার্য শেষ হইলে রেনল্ডস্ তাঁহার অশ্ব আরোহণ করিয়া থানায় চলিলেন। এবার তিনি স্থির করিলেন—সেই সকল পদচিহ্ন কাহাদের, তাহাই তিনি আবিষ্কার করিবেন। কাহারা যে সন্দেহের পাত্র, ইহা তিনি পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন।

বাহা হউক, মিঃ রেনল্ডস্ যখন সেখানে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্বেই সকল কাজ শেষ করিবার জন্ত রেনল্ডস্ ব্যগ্রভাবে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিলেন। মহম্মদ আলি তৎপূর্বেই তাহার লোকগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল। রেনল্ডস্ তাহাদের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, এ বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ লক্ষিত হইল না।

রেনল্ডস্ দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাক্ষীরা এখনও এখানে হাজির আছে কি? উহাদিগকে ও-ভাবে আর দাঁড় করাইয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। এই মুহূর্তেই এক জন কন্টেবলকে মোম ও রজন আনিবার জন্ত বাজারে পাঠাও।'

তাঁহার আদেশ শুনিয়া সাব-ইন্স্পেক্টর গভীর বিষ্ময়ে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া রেনল্ডস্ বলিলেন, 'আমার আদেশ তুমি শুনিতে পাউয়াছ কি? এক সের মোম, এবং এক সের রজন আনাটতে হইবে; কিন্তু কন্টেবলকে বলিয়া দাও, সে যেন বিভিন্ন দোকান হইতে তাহা ক্রয় করে। তাহাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে বলিবে।'

মহম্মদ আলি এক জন কন্টেবলকে বাজারে পাঠাইবার জন্ত ডাকিয়া-আনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাহেব মোম আর রজন লইয়া কি করিবেন?'

কন্টেবল বলিল, 'খোদা মালুম! সাহেব যদি নিজের ইচ্ছায় তাহা না বলেন, তাহা হইলে ও-কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা কি গোস্তাকি হইবে না?'—কন্টেবল তাড়াতাড়ি বাজারে চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে রেনল্ডস্ বারান্দার টেবলের নিকট বসিয়া-পড়িয়া ক্রমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে দারোগা মহম্মদ আলিকে বলিলেন, 'মহম্মদ আলি, তুমি তোমার ডায়েরিতে লিখিয়াছ, ইমামবক্তের বাড়ী খানাতলাসীর সময় তোমার নিকট আসামী স্বয়ং, দুই জন সাক্ষী, এবং চৌকিদার হাজির ছিল। সে সময় অন্য কোনও লোক সেখানে উপস্থিত ছিল কি?'

মহম্মদ আলি বলিল, 'হাঁ সাহেব, রামপ্রসাদের পুত্র প্রতাপ আমাদের সঙ্গে গিয়াছিল। ঐ যে—সে এখন ওখানে বসিয়া আছে।'—সে অদূরবর্তী একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিল।

বেনডস্ বলিলেন, 'খানাতলাসীর সময় সে কি সেই কার্যে কোন রকম সাহায্য করিয়াছিল?'

মহম্মদ আলি তৎক্ষণাৎ বলিল, 'না সাহেব, খানাতলাস-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে সে যোগদান করে নাই। আমাদের সঙ্গে যে চৌকিদার ছিল, সে গোয়াল-ঘরের চালের এলোমেলো ভাবের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।'

বেনডস্ প্রশ্নমূচক দৃষ্টিতে চৌকিদারের মুখের দিকে চাহিলেন।

চৌকিদার বলিল, 'হাঁ হুজুর, প্রতাপ আমার সঙ্গে এই সকল কথার আলোচনা করিতে করিতে গোয়াল-ঘরের চালের দিকে চাহিলে সেই দিকে আমারও নজর পড়িল।'

বেনডস্ দারোগাকে বলিলেন, 'যে লাঠী পাওয়া গিয়াছিল, সেই লাঠী তুমি ভিন্ন আর কেহই হাত দিয়া স্পর্শ না করে—এ বিষয়ে তুমি কি সতর্ক ছিলে, মহম্মদ আলি?'

মহম্মদ আলি বলিল, 'হাঁ সাহেব, ইহা আমি হ্রস্ব করিয়া বলিতে পারি। আমি নিজের হাতে তাহা টানিয়া বাহির করি, এবং সেই সময় তাহাতে রক্তের দাগ দেখিতে পাই। তাহার পর সেই লাঠী আর কেহ স্পর্শ করে নাই।'

বেনডস্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'তুমি নিজের হাতে তাহা টানিয়া বাহির করিয়াছিলে বলিলে; লাঠীর মাথার দিকটা ধরিয়া টানিয়াছিলে, না সফ্র দিকটা ধরিয়াছিলে? স্বরণ করিয়া ঠিক উত্তর দাও।'

মহম্মদ আলি ধাঁধায় পড়িয়া বলিল, 'লাঠীখানার পিতল চক্চক্ করিতেছিল—তাহাতেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। লাঠীর অবশিষ্ট অংশ ঢাকা ছিল। আমি তাহার দুই মুতা হাত দিয়া ধরিয়াছিলাম; উহার মধ্যস্থল স্পর্শ করি নাই। উহা দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছিল, উহাতে অঙ্গুলি-চিহ্ন আছেই।'

বেনডস্ বলিলেন, 'প্রতাপ কি করিল? উহা কি আসামীরই লাঠী বলিয়া সনাক্ত করিল?'

মহম্মদ আলি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, সে তাহা করে নাই, সাহেব! কিন্তু দুই জন সাক্ষীই, এবং বাহারি ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল—তাহারাও সকলে জানিত—উহা ইমামবন্দেরই লাঠী। তা ছাড়া, বিশেষজ্ঞেরও রিপোর্ট আছে সার!'

পুলিশ-সুপারিনটেন্ডেন্ট তাহার কার্যতৎপরতায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া তাহার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের চিহ্ন লক্ষিত হইল। এই সকল একাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও সাহেব কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছেন? তাহার উদ্দেশ্যই বা কি?—দারোগা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

বেনডস্ দারোগাকে বলিলেন, 'এক বাসতি সূক্ষ্ম বালি আনাইয়া তাহা এক ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটিতে ছড়াইয়া দাও। এখন আমি কোন সাক্ষীকে জেরা করিব না। উহাদের প্রত্যেকে কি সাক্ষ্য দিবে, তাহা তোমার ঠিক জানা আছে, মহম্মদ আলি! যাহারা লাঠী সনাক্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে, চৌকিদারকে এবং প্রতাপকে ঐ দল হইতে বাহির কর। নামগুলি লিখিয়া সেই ভাবে পর পর উহাদিগকে দাঁড় করাও। অস্ত্র সকলে তফাতে অপেক্ষা করিতে পারে।'

বেনডস্‌র আদেশ অনুসারে ছয় জন লোককে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্থাপন করা হইল। পুলিশ-সুপারিনটেন্ডেন্ট অতঃপর কি করিবেন,

তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। পুলিশের অস্ত্রাভ্যর্থনায় কিছু দূরে দাঁড়াইয়া বেনডস্‌র কার্য-প্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিল। বেনডস্‌র আদেশে যে বালিগুলি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল—সেই দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বালি আনিয়া ঐ ভাবে ছড়াইবার কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না। মিঃ বেনডস্‌র পকেট হইতে কাগজ-জড়ান পার্শ্বগটির এক অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই বা কোন্ কাজে লাগিবে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না।

কিন্তু তাহাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইল না; কারণ, অতঃপর এক জনের নাম ধরিয়া ডাক পড়িতেই উক্ত ছয় জনের এক জন সাড়া দিল। মিঃ বেনডস্ তাহাকে প্রসারিত বালুকায়ণির উপর দিয়া হাঁটিয়া বাইবার আদেশ করিলেন। সেই ব্যক্তি এই আদেশ পালন করিলে মিঃ বেনডস্ উঠিয়া-গিয়া সেই ব্যক্তির পদচিহ্নের সহিত তাহার পকেটস্থিত পার্শ্বলের ছাঁচ সতর্ক ভাবে মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

এই কার্য শেষ হইলে মিঃ বেনডস্ সেই সাক্ষীটিকে বিদায় দান করিয়া বালিগুলি সেই স্থান হইতে ঝাড়িয়া-ফেলিতে আদেশ করিলেন; প্রসারিত বালুকায়ণি অপসারিত হইলে আবার বালি ছড়াইয়া দেওয়া হইল, এবং দ্বিতীয় সাক্ষীকে তাহার উপর দিয়া পূর্ববৎ হাঁটিয়া যাঁতে বলা হইল। সে এই আদেশ পালন করিলে তাহার পদচিহ্নও পূর্ববৎ তাহার পকেটের ছাঁচের সহিত তিনি মিলাইয়া দেখিলেন।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তির পালা। সে ঐভাবে নূতন এক স্তর বালির উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া বাইবার পর মিঃ বেনডস্ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সেই পদচিহ্নগুলি বিভিন্ন দিক হইতে সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিয়া, তাহার পকেটস্থিত পার্শ্বলের ছাঁচের সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি মাথা তুলিয়া দারোগা মহম্মদ আলির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তুমি এই সাক্ষীর অঙ্গুলীর ছাপ লইবে, মহম্মদ আলি! আমি উহার দুই হাতের সকল অঙ্গুলীরই ছাপ চাই।'

এ কথা শুনিয়া দারোগা গভীর বিষ্ময়ে মুখ-ব্যাদান করিল। কিন্তু সুপারিনটেন্ডেন্টের আদেশের প্রতিবাদ করিবে, তাহার সেরূপ সাহস ছিল না; তাহার আদেশ পালন না করিয়া তাহার নিষ্কৃতি ছিল না। সে তাহার এই আদেশ পালন করিতে বাইবে—সেই সময় মিঃ বেনডস্‌র আদালতী কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, সে তাহার ইঙ্গিতে রক্ষণযোগ্য একটু হাঁড়ি লইয়া আসিল—এবং বাজার হইতে বাহা কিনিয়া আনা হইয়াছিল—তাহার বাণ্ডিস খুলিতে আরম্ভ করিল; তাহা পূর্ববৎ অগ্নিতে জ্বল দিয়া তরল হইলে, মিঃ বেনডস্ স্বয়ং সেই উত্তপ্ত তরল পদার্থ তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের উপর ঢালিয়া দিলেন। বতকণ তাহা শীতল না হইল—ততক্ষণ তিনি অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিলেন; শীতল হইলে বাদামী-রঙ্গের সেই পদার্থটি তুলিয়া লইলেন—তাহা তখন শক্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহার ধূলা-ময়লা ঝাড়িয়া-ফেলিয়া খানিক জল আনিতে আদেশ করিলেন। পাঁচ-সাত জন লোক জল আনিবার জন্য দৌড়াইয়া গেল।

কিন্তু মিঃ বেনডস্‌র পরীক্ষা তখনও শেষ হয় নাই। তিনি পুনর্বার বালির স্তর মুছিয়া সেখানে নূতন বালি ছড়াইয়া তাহার

উপরা'দিয়া চতুর্ধ সাক্ষীকে পরিচালিত করিলেন ; কিন্তু অবিলম্বেই তাহাকে বিলম্ব দান করা হইল। অতঃপর পঞ্চম সাক্ষীর পালা আসিল। সে ঐ ভাবে বালুকা-স্তরের উপর দিয়া চলিয়া বাইবার পর প্রতাপই কেবল বাকি রহিল।

প্রতাপ ঐ ভাবে বাণির উপর দিয়া চলিয়া বাইবার পর রেনল্ডস্ উৎসাহভরে সোজা হইয়া বসিয়া, তাহাকে ফিরিয়া-আসিতে আদেশ করিলেন। তখন মহম্মদ আলি তাহার আজুলের ছাপ লইবার জন্ত তাহাকে টেবলের নিকট লইয়া গেল। অতঃপর তাহার পদচিহ্ন গ্রহণের জন্ত মোম ও রজন পূর্ববৎ অগ্নির উত্তাপে তরল করিয়া তাহার পদচিহ্নের উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল।

এইবার মিঃ রেনল্ডস্ দারোগাকে বলিলেন, 'মহম্মদ আলি, তুমি তোমাদের স্থলে অঙ্গুলি-চিহ্নসমূহ তুলনা করিতে শিখিয়াছিলে। তুমি অঙ্গুলীর যে সকল ছাপ লইয়াছ, এইগুলির সহিত তাহাদের তুলনা কর।'—এই কথা বলিয়া তিনি একখানি লেফাপার ভিতর হইতে অঙ্গুলি-চিহ্নিত কয়েকখানি ফটো বাহির করিয়া মহম্মদ আলির হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার পর একটি সিগারেট মুখে শুঁজিয়া ধূমপান করিতে করিতে কৌতূহলভরে দারোগার কাজ দেখিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট পরে মহম্মদ আলি বেনল্ডসের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল—তিনি দুইটি পদচিহ্নের ছাঁচ পাশে রাখিয়া অঙ্গুলি সরাইয়া ফেলিয়াছেন।

দারোগা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিব্রত ভাবে বলিল, 'আমার ভুল হইতে পারে সার! কারণ, আমি এ বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞ নহি। কিন্তু আমার ধারণা, আমি শেষ লোকটির যে সকল অঙ্গুলীর ছাপ লইয়াছি, তাহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলীর ছাপ এই ফটোর ছাপের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে।'

বেনল্ডস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ডান হাতের, না বাঁ হাতের অঙ্গুলীর ছাপ?'

দারোগা বলিল, 'ডান হাতের। কিন্তু আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি সার, হত্যাকাণ্ডের সত্য ইহার কি সম্বন্ধ?'

বেনল্ডস্ তাহার এই প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, 'এখন পদচিহ্নের এই ছাঁচগুলি মিলাইয়া দেখ।'

মহম্মদ আলি তাহা মিলাইয়া দেখিয়া বলিল, 'হাঁ, ঠিক একই রকম বটে; এমন কি, ষড়ো আজুলের নীচে যে কাটা দাগটি আছে, তাহা পর্য্যন্ত মিলিয়া গিয়াছে সার! আগাগোড়া মাপেরও কোন পার্থক্য নাই।'

বেনল্ডস্ বলিলেন, 'এই সাক্ষীর কি নাম দেখিয়া রাখ; কিন্তু এখন কোন কথা প্রকাশ করিও না। উহাদের প্রত্যেকেই এখানে আসুক, তখন আমি বলিব—তোমার নিকট কি গোপন করা হইয়াছে। ইমামবন্দে যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ী নহে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি।'

দারোগা বলিল, 'কিন্তু আমি যথাযোগ্য সম্মান সহকারেই আপনাকে জানাইতেছি, তাহার বিক্রমে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অকাট্য; সেই প্রমাণ খণ্ডন করা হয় নাই সার!'

বেনল্ডস্ অবিচলিত স্বরে বলিলেন, 'কিন্তু তোমার মন সঙ্কীর্ণ ভীতে আবদ্ধ থাকিয়া কার্যে ব্যাপৃত আছে মহম্মদ আলি! আমার ধারণা ছিল—এ পর্বাস্ত বাহা করা হইল, তাহার ফলে সত্যের আলোকে তোমার মত নির্বোধকেও রহস্তের

অন্ধকারে পথ দেখাইতে পারিবে। এখন তুমি একটু বুদ্ধি ধরচ কর দেখি।'

অতঃপর মিঃ রেনল্ডস্ অঙ্গ সকলের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে আদেশ করিলেন, 'স্বামপ্রসাদের পুত্র প্রতাপ, তুমি উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াও। তোমাকে আমার কোন কোন কথা বলিবার আছে। অঙ্গ বাহার এখানে হাজির আছে—তাহারাও আমার কথা শুনিতে পারে। কিন্তু আমার কথাগুলি বলিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে আমি আর একটা ল্যাম্প চাই। তাহা উচু করিয়া ধরিতে হইবে, যেন আমি প্রতাপের মুখ স্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাই।'

পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের আদেশ শুনিয়া প্রতাপ অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ল্যাম্পের আলোক তাহার মুখের উপর পড়িল, এবং সেই আলোকে তাহার পশ্চাত্ত্বিত অঙ্গুলি লোকগুলিকেও দেখিতে পাওয়া গেল। এক জন কনষ্টেবল বারান্দার ধারে দাঁড়াইয়া, হরিকেন-লঠনটা প্রসারিত হস্তে উচু করিয়া ধরিয়া রহিল। দারোগা মহম্মদ আলি পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে বসিয়াছিল; তাহার মুখে ভয় ও হুশিঙ্কা পরিস্ফুট। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা সে তখনও বুঝিতে পারে নাই।

বেনল্ডস্ তাঁহার মুখ হইতে অর্ধদণ্ড সিগারেটটা বাহির করিয়া লইলেন। দর্শকগণ স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর বেনল্ডস্কে মুখ তুলিয়া তাঁর দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতে দেখিয়া ভয়ে সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, তাহাদের বুক কাঁপিতে লাগিল। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না; কিন্তু প্রত্যেকেরই আশঙ্কা হইল—তাহাকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্ত জবাবদিহি করিতে হইবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হরিকেন-লঠনের অক্ষুট আলোকে অদূরে দণ্ডায়মান প্রত্যেক ব্যক্তির মুখ একে একে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার দৃষ্টি সোপানের উপর দণ্ডায়মান প্রতাপের মুখের উপর সন্নিবিষ্ট হইল।

বেনল্ডস্ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'প্রতাপ, যে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে—সে তোমার পিতা; এবং যে ব্যক্তি তোমার পিতার হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে, সে তোমার শত্রু, তোমাদের সমগ্র পরিবারেরই শত্রু; এ কথা কি সত্য নহে? তোমরা পরস্পরকে দীর্ঘকাল হইতে শত্রু-বোধে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছ। এই ঘৃণার কথা তোমাদের কাহারও অজ্ঞাত নহে। তোমরা যে সকল মামলা করিয়া আসিয়াছ, সেই সকল মামলার নথি-পত্রের ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জলের দখলি-স্বত্ব লইয়া যে মামলা হইয়াছিল, সেই মামলার আদালতের বিচারে তোমাদের পরাজয় হইয়াছিল, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তুমি এবং তোমার আত্মীয়গণ সেই মামলার আপীলে কোন স্মৃফলের আশা না থাকায় ইমামবন্দের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভের কি উপায় থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছিলে।

'সে গ্রামের ভিতর দিয়া বাইবার সময় তোমাদিগকে দেখিতে পাইলে তোমাদের পরাজয়ের জন্ত ঠাটা-বিজপ করিত, তোমাদিগকে কেপাইয়া ফুলিত; কিন্তু তোমরা ইহার প্রতিকারের কোন উপায়

দ্বির করিতে পারিতে না, এবং পাছে তোমাদিগকে সন্দেহ করা হয়, এই ভয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতে না। অবশেষে তোমরা ভাবিয়া দেখিলে—এখানকার খানার দারোগাটি অদূরদর্শী, ছোকরা কর্মচারী, তাহার চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করা সহজ হইবে। এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের বাড়ীতে তোমার যে বৃদ্ধ বাপ ছিল, তাহার অবস্থার কথা তোমার স্মরণ হইল; তুমি ভাবিয়া দেখিলে, অক্ষয় বৃদ্ধ এখন আর লাঙ্গল বা গরুর গাড়ী চালাইতে পারে না, সে এখন সম্পূর্ণ অকর্মণ্য, এবং সংসারের ভারস্বরূপ। সে বসিয়া-বসিয়া উপার্জিত অন্ন ধ্বংস করে; ইহা ভিন্ন তাহার অল্প কোন কাজ নাই! সুতরাং তাহার উপর তোমার দৃষ্টি পড়িল, এবং শয়তান আসিয়া তোমার স্বপ্নে ভর করায়—সেই অকর্মণ্য বৃদ্ধকে কাজে লাগাইবার জন্ত তোমার আগ্রহ হইল, শয়তান তোমার কাণে-কাণে বলিল—এই বৃদ্ধকে সরাইয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই; তাহার ষারাই তোমার কার্যসিদ্ধি হইবে।

‘কিন্তু এজন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে; সুতরাং তোমাকে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হইল। অবশেষে সেই সুযোগ আসিল; ইমামবক্তার লাঠীখানা চুরি করিবার সুবিধা হইল। এই লাঠী চুরি করিয়াও তোমাকে কাণ খাড়া করিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইল; কারণ, ইমামবক্তা তাহার লাঠী চুরি যাওয়া স্বপ্নে গ্রামের লোকদের কোন কথা বলে কি না, তাহা জানা প্রয়োজন বলিয়াই তোমার ধারণা হইল। লাঠী-চোর বলিয়া তোমাকে সন্দেহ করা হয় কি না, তাহা জানিবার জন্ত তুমি উৎসুক হইবে—ইহা তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ইমামবক্তা এ স্বপ্নকে উচ্চবাচ্য না করায় তোমার আশা পূর্ণ হইল।’

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রেনল্ডস্ ক্ষণকালের জন্ত নীরব হইলেন; প্রতাপ এ সকল কথা শুনিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় কনষ্টেবলটা হাত বদলাইয়া হরিকেন-লঠনটা অন্য হাতে লইল। মহম্মদ আলি অধীর ভাবে এক হাঁটু অন্য হাঁটুর উপর তুলিয়া বসিল। এইবার তাহার মনে হইতে লাগিল, তদন্ত কার্যে তাহাকে হয় ত প্রতারণিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহার অমুকুলে অকাটা প্রমাণ বর্তমান, তাহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

মহম্মদ আলি ভাবিল, সাহেব অহুমানের নির্ভর করিয়াই এই সকল কথা বলিয়াছেন। অহুমান কখন প্রমাণের স্থান অধিকার করিতে পারে না; সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নাই বুঝিয়া, সে গাঁট হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখে অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। অন্যান্য লোকও ঐরূপই ভাবিতে লাগিল। মহম্মদ আলি আশ্চর্য চিন্তে তাহাদের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু তাহাদের মুখ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহারা বুঝিয়াছিল, পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট দারোগা মহম্মদ আলি অপেক্ষা অনেক অধিক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং তিনি তাহা সপ্রমাণ করিবারই ব্যবস্থা করিতেছেন।

তাহাদের অহুমান শেষ হইবার পূর্বেই রেনল্ডস্ প্রতাপকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, ‘প্রতাপ, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি যে, তুমি হিন্দু হইয়াও তোমার বৃদ্ধ পিতা রামপ্রসাদকে তাহার নিদ্রিত অবস্থায় লাঠী মারিয়া হত্যা করিতে কুণ্ঠাবোধ কর নাই! হাঁ, ঐ লাঠী দিয়াই তাহাকে হত্যা করিয়া তোমার কোন আত্মীয়ের সাহায্যে তাহার মৃতদেহ ঐ কুপের নিকট টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

বালির উপর তোমার পায়ের দাগ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তোমাদের শরুই যে তোমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে, ইহার উপযুক্ত প্রমাণের প্রয়োজন হইবে বুঝিয়া, তুমি তাহার সেই লাঠী তাহারই গোয়ালঘরের চালে খুঁজিয়া রাখিয়াছিলে; তুমি জানিতে, তাহা সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। উহা যে তুমিই সেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, তাহার প্রমাণ এই যে, সেই লাঠীতে রক্তের দাগের স্তবর তোমার ছুইটি অঙ্গুলীর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে!’

এবার দারোগা মহম্মদ আলি বিশ্বয়ভরে একটা হুকুম দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রেনল্ডস্ তাহার বিশ্বয়ের কারণ বুঝিতে পারিয়া, অঙ্গুলী-চিহ্নের ফটোর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, ‘এই অঙ্গুলী-চিহ্নের উপর সব নির্ভর করিতেছে; অঙ্গুলী-চিহ্নের বিশেষজ্ঞও উহা লক্ষ্য করে নাই; তোমাকে বেশী দোষী করিতে পারি না।’

অতঃপর রেনল্ডস্ প্রতাপকে সন্ধান করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘অপরাধী বলিয়া কাগাকে সন্দেহ করা হইবে—তাহা তুমি ভালই জানিতে; এ জন্ত কাহারও বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ করা তুমি আবশ্যিক মনে কর নাই। এখন আসামীর বাড়ী খানাতলাস হয়, তখন তুমি সেখানে হাজির ছিলে, কারণ, তোমার আশঙ্কা হইয়াছিল—লাঠীখানা সকলের দৃষ্টি এড়াইতেও পারে। উহা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, তাহা তোমার কোণলেট ধরা পড়িলেও তুমি এরূপ চতুর যে, লাঠীখান নিজে সনাক্ত কর নাই; গ্রামের সকলেই জানিত, উহা ইমামবক্তারই লাঠী। কিন্তু অতিরিক্ত সতর্ক হইয়াই তুমি ভুল করিয়াছ। আমার বয়স নিতান্ত অল্প নয়, কিন্তু তোমার মত শীন প্রবৃত্তির ইতর মানুষ জীবনে দেখি নাই,—নিজের বাপকে হত্যা করিবার জন্ত লাঠী তুলিতে তোমার হাত হইতে লাঠী খসিয়া পড়িল না,—তোমার হাত আড়ষ্ট হইল না, ইহাই আশ্চর্য্য!’

রেনল্ডসের কথা শুনিয়া অগাধ লোক সেই পিতৃহত্যার ছায়া স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

রেনল্ডস্ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, ‘ওরে পিতৃহত্যা! তোর আর কি বলিবার থাকিতে পারে?’

ছুই-বার প্রতাপের ওষ্ঠ কম্পিত হইল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না; অবশেষে সে হতাশ ভাবে বলিল, ‘বাবা এ জন্ত আমাকে অহুমতি দিয়াছিল।’

রেনল্ডস্ তাহার দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, ‘সে তাহাকে খন করিবার জন্ত তোমাকে অহুমতি দিয়াছিল? কি মিথ্যাবাদী!’

পিতৃহত্যা প্রতাপ চারি দিকে চাহিয়া, তাহার সাক্ষীগণকে ঘৃণায় তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধবে বলিল, ‘হাঁ, আমার বাপের আদেশ-পত্র আমার সঙ্গেই আছে। আমাদের মহাশয় কঁাসিতে মরিবে, এই আশায় বাবা স্বৈচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। তাহার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া তাহার আদেশ পালন করিয়াছি মাত্র। এই কন্দী তাহার নিজেরই। এজন্য তাহার নিকট হইতে হুকুমনামা লিখিয়া-লইয়া আমি এ কাজ করিয়াছি। পিতৃ-আজ্ঞা কি করিয়া অগ্রাহ করি?’

এই কথা বলিয়া প্রতাপ তাহার পাকড়ের মুড়া হইতে একখান চিরকুট খুলিয়া তাহা রেনল্ডসের হস্তে অর্পণ করিল।

রেনল্ডস্ প্রতাপের পিতা রামপ্রসাদের স্বহস্ত-লিখিত সেই

অতিথি-সম্বন্ধনা

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ টালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা বাড়ী কিনেছেন। অনেকেই ত বাড়ী কিনছে বা তৈয়ার করাচ্ছে, কিন্তু প্রাইভেট-কলেজের অধ্যাপকের এই বাড়ী-কেনার মধ্যে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। পরিবারবর্গকে দেশে রেখে, মেসে থেকে, কত দিন এক বেলা না খেয়ে, গোটা-পাচেক টুইশনী ক'রে টাকা জমিয়ে, কলকাতা সহরে বাড়ী কেনা, এ কি রীতিমত সাধনা নয়? সে যাই হোক, সিংহ মশায়ের বরাত ভালো। বাড়ী কেনবার মত টাকা তিনি জমাতে পেরেছেন। অনেকে আজীবন কাল চেষ্টা ক'রেও ভদ্রভাবে থাকা এবং খাওয়ার সংস্থান ক'রতে পারে না। তা' ছাড়া তিনি স্বেযোগও পেয়েছিলেন ভাল। “রেনি পার্কে”র কাটার সাহেব বুদ্ধের জন্ম হঠাৎ ‘হোমে’ চ'লে যাবার সময় নতুন বাঙলো আসবাবপত্রসহ নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করেন। যাকে বলে “লক, ঠক অ্যাণ্ড ব্যারেল।” আর আমাদের ভাগ্যবান দ্বিজেন সিংহ—“গট ইট ফর এ সঙ্গ।”

স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে বে-দিন তিনি সেই বাড়ীতে পদার্পণ ক'রলেন, গৃহপ্রবেশও বোধ হয় বলা যেতে পারে, সেই দিনই কোন-রকমে খবর পেয়ে কলেজের ওটি তিন-চার অধ্যাপক-বন্ধু সঙ্গীক সেখানে গিয়ে হাজির। অমনি চায়ের ধুম প'ড়ে গেল। চাকর ভজুয়া তাড়াতাড়ি বাজার থেকে পাউরুটী নিয়ে এল; কিন্তু জ্যাম বা জেলী পাওয়া গেল না। দ্বিজেন বাবু স্ত্রীকে ব'ললেন, “দেখ, সাহেবের সব জিনিসই তো রয়েছে, একবার প্যান্টুতে খোঁজ কর, কিছু-একটা মিলতে পারে।”—অতিথিদের ড্রইংরুমে বসিয়ে স্বামি-স্ত্রীতে মিলে এটা ফেলে ওটা হাঁটকে শেষে এক পাত্রে জ্যাম আবিষ্কার করলেন। গিন্নী ব'ললেন,

“যা হোক, মান ত বাঁচল।” তিনি দীর্ঘ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কর্তা ব'ললেন—“তা না হয় হ'ল, কিন্তু কত কালের পুরোধো, কে জানে, যদি কারো অসুখ-বিসুখ হয়?” গিন্নী বাধা দিয়ে ব'ললেন—“তার জন্ম ভাবনা কি? বটার কুকুর টেবীকে খাইয়ে পরখ করলেই ত হয়।” বটা অধ্যাপক সিংহের পুত্রের নাম। ভাল নাম বটকৃষ্ণ সিংহ। কর্তা খুসী হ'য়ে ব'ললেন—“ভাগ্যিস তুমি ছিলে, নইলে আমার যে কি দশা হোত—” ইত্যাদি মধুর আলাপ।

অতঃপর টেবীকে নিয়ে শ্রীমান্ বটকৃষ্ণের প্রবেশ; টেবীকে কিঞ্চিৎ মাংস প্রদান, আগ্রহ সহকারে তাহা ভক্ষণ করিতে করিতে টেবীর লাঙ্গুল আন্দোলন, এবং মরিবার অথবা শরীর অসুস্থ হইবার কোন লক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষিত না হওয়া; পরে টেবী-সহ বটার স্থানান্তরে প্রস্থান।

ড্রইংরুমে জ্যাম, রুটী, চা, এবং গোসগল্প দিব্যি চ'লছে, যাকে বলে আড্ডাটা পুরোনাত্রায় জমে উঠেছে—সেই সময় কাঁদতে কাঁদতে শ্রীমান্ বটকৃষ্ণের আবির্ভাব! তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন হোল, “কি ব্যাপার, কাঁদছিস কেন?”

“টেবী মরে গেছে।”

ব্যস! কর্তা-গিন্নীর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। হায় হায়, শেষে এতগুলো প্রাণী বেঘোরে মারা যাবে? বটাকে সেখান থেকে চ'লে যেতে ব'লে অধ্যাপক দ্বিজেন সিংহ অন্ততঃ কঠে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে ব'ললেন। দেখতে দেখতে কারো পেট-ব্যথা, কারো মাথা-ঘোরা, কারো বমন ইত্যাদি আরম্ভ হ'য়ে গেল। ডাক্তার-বদ্বিতে বাড়ী ভ'বে গেল। ষ্টমাক-ওয়াশিং, পম্প, এনিমা—আরও কত কি! রাত বারোটা-নাগাদ সকলে অতি কঠে

বাড়ী ফিরলেন। মিসেস্ ব্যানার্জীকে ছেঁচারে ক'রে গাড়ীতে তুলতে হ'ল ; এক জন ডাক্তার সঙ্গে গেলেন। অনেকগুলো টাকাই বেরিয়ে গেল। যাক, কেউ যে মারা গেল না, তাই রক্ষা ! তাঁদেরই জন্ত এতগুলো প্রাণী মৃত্যু-মুখে প্রায় পতিত হ'য়েছিল আর কি !

ভোরে উঠেই মিষ্টার আর মিসেস্ সিংহ সকলের বাড়ী গিয়ে দেখে এলেন—কে কেমন আছেন। অনেকেরই অবস্থা তখনও খারাপ ; তবে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। বেলা ন'টার সময় বাড়ী ফিরতেই শ্রীমান্ বটার সঙ্গে তাঁদের দেখা। সবে সে ঘুম থেকে উঠেছে। বাপ-মাকে দেখে টেবীর শোকটা আবার নতুন ক'রে চেগে উঠল। ফুঁপিয়ে কেঁদে-ফেলে সে ব'ললে—“বাবা, টেবী কাল মারা গেছে।” দ্বিজেন বাবু তাকে কোলে তুলে-নিয়ে আদর ক'রে চোখ মুছিয়ে দিয়ে ব'ললেন—“আমি তোমায় আর একটা কুকুর কিনে দেব।—কি বল গা ?”

গিন্নী ব'ললেন—“বটেই তো ; আমাদের জন্তই তা সে বেচারার প্রাণ গেল।”

“ই্যা রে বটা, কুকুরটা কি বমি ক'রে মারা গেল ?”

শ্রীমান উত্তর দিলে—“না মা ! আমি রাস্তায় বল ফেলেছিলুম, সে তাড়াতাড়ি তুলে-আনতে গিয়ে হঠাৎ বাস-চাপা প'ড়ে মরে গেল।”

দ্বিজেন বাবু রেগে কোল থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে ব'ললেন—“যা, পড়া নিয়ে বস্ গে। সব সময় কুকুর আর বল !”

বটা কিছুই ঠিক বুঝতে পারলে না, ‘যঃ পলায়তি স জীবতি’ পস্থা অবিলম্বে অবলম্বন ক'রলে।

কতকগুলো টাকা অনর্থক জলে পড়লো ! কর্তা-গিন্নী পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

গোধূলি

বেলা যে রে পড়ে এলো

দীর্ঘ হ'য়ে এলো তরু-ছায়া,

সময় যে নাহি আর কোথা ঘাট কোথা পার

চারি দিকে ধেরা যেন আঁধারের মায়া।

ছিল মোর বাসখানি,

ধর-ধর কাঁপে তম্বুতল ;

নয়নে আঁধার ঘন, শুনি শুধু শন্-শন্

ও-পারেতে ঝাউ-বন কাঁদে অবিরল।

আজি মোর কিছু নাই,

সরু শূন্য পথ-পাশে আমি ;

আঁখি দু'টি ছল ছল বেদনার অশ্রুজল

কি যেন গুঁজিছে নিত্য মৌন স্তব্ধ নামি'।

কাঁদে পাখী দূর বনে,

ভেসে আসে সিক্ত ক্লাস্ত সুর,

মরমের মর্ষস্থলে বিরহের শিখা জলে

পাইতে তোমারে বহু সুন্দর মধুর।

শ্রী শশিনীকুমার পাল



দম্পতি

বিবাহের ব্যাপারটাকে স্ত্রীত কি-জানি-কেন রীতিমত একটা সমস্তার মতো দেখিয়া আসিতেছিল। এ-সম্বন্ধে তার মনে কোথায় কি যে একটা বড়-রকমের 'কিন্তু' ছিল, তা' সে অতি-বড় অন্তরঙ্গের কাছেও প্রকাশ করিয়া বলিত না। শুধু নিজের মনেই সে এই রকম সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে, ছোট ভাইটির বিবাহ দিয়া তাহাকেই সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, নিজে কোন দিন ও-সব বাধাট ঘাড়ে লইবে না।

কিন্তু সংসারী হইবার পূর্বেই ছোট ভাই পল্টু এক দিন অকস্মাৎ সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল। শোকের প্রথম ধাক্কা সামলাইতে স্ত্রীতর অনেক দিন কাটিয়া গেল। পৈতৃক ব্যবসায়, বিষয়-সম্পত্তি, জমিদারী যথেষ্ট থাকিলেও স্ত্রীত কয়েক মাস ধরিয়া তার কোনো দিকেই নজর দিল না। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইল। নায়েব-গোমস্তা-কন্সচারীরা চিঠি লিখিয়া বাবুর কোন জবাব পায় না। অনেক সময় চিঠি মালিকের সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসে। সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, হায়, এত বড় বংশের একমাত্র বংশধর এমনি করিয়া সংসার ছাড়িয়া উদাসী হইয়া গেল! সেই সময় হঠাৎ এক দিন স্ত্রীত দেশে ফিরিল, তাহার সঙ্গে একটি অষ্টাদশী নববধু!

পুরবীর বাবা আউদ্-রোহিলখণ্ড রেল চাকরীর পর অবসর লইয়া এলাহাবাদে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। সেখানে যেমন করিয়াই হোক, স্ত্রীতর সঙ্গে পুরবীর আলাপ; তাহার পর প্রেম এবং বিবাহ। স্ত্রীত তাই যখন-তখন তাহাকে আদর করিয়া বলে, বাঙ্গালা দেশ থেকে এত দূরে তুমি যে এমন করে আমার দর্পচূর্ণ করবার সঙ্কল্প করে বসেছিলে, তা কি ছাড়া একবার কল্পনাও করতে পেরেছিলুম!

পুরবী ছেলেমানুষের মত হাসিয়া বলে,—আচ্ছা সতীত তুমি কি বিয়ে করবে না বলে পণ করে বসেছিলে? ভারী ছুটু গো তুমি!

—কেন, ছুটুনির কি পেয়েছ?

—সংসারের সকলেই বিয়ে করছে, আর তুমি কি এতো বড়ো পীর যে, বিয়ে করবে না?

স্ত্রীত হা-হা করিয়া হাসির রোল তুলিত। নূতন রাজ্যের নূতন এই আবহাওয়ার মধ্যে সে যেন আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িত।

স্ত্রীত ঠিক করিল, বধূকে লইয়া কলিকাতায় থাকিবে। গ্রামে আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা আছেন, সকলেই তাহার বিবাহের সংবাদ পাইয়া বড়ই খুসী; তাহারা একান্ত অমুরোধ জানাইল, নববধূকে লইয়া একবার গ্রামের বাড়ীতে এসো। জ্ঞাতি-খুড়ামহাশয় লিখিয়াছেন, এখানে জাগ্রত কুল-দেবতা আছেন; বৌমাঝে নিয়ে এসে একবার ভাল করে তাঁর পূজা দেওয়া উচিত—যাতে তাঁর আশীর্বাদে চৌধুরী-বংশের দিন-দিন উন্নতি হয়।

কাশী হইতে পিসীমা কি-একটা মাদুলী পাঠাইয়া লিখিয়াছেন, বৌমাঝে পরতে দিও এটি। আর একটি-বার এসে ছু'জনে আমাকে দেখা দিয়ে যেও। নিতান্ত অথর্ক হ'য়েছি বাবা, নইলে নিজেই যেতাম তোমাদের দেখতে।

স্ত্রীত কিন্তু এ-সব কিছুই করিল না। পিসীমার মাদুলীটা হাতে লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া পুরবী হাসিয়া বলে,—কিসের মাদুলী এটা—বল না গো! কি হয় এতে? ওটা হাতে বাধলে আমি বাঁচবো বুঝি অ-নে-ক কাল?

বসিকতায় বৌমাঝে স্ত্রীতর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়,—ও মাদুলী পরলে শীগ্গীর তোমার একটি—

পূরবী মুখ বাকা করিয়া বলিয়া ওঠে—আঃ, কি অসভ্য তুমি!

স্বরত ইজিচেয়ারে হেলিয়া-পড়িয়া জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে বলে,—আচ্ছা, তা না হ'লে আমাদের এই বাড়ী-ঘর বিষয়-আশয়, এ-সব কি বিশ্রী খাপছাড়া লাগবে ভেবে দেখেছ কোন দিন?

বলিতে-বলিতে স্বরতর অন্তরের চিত্তর কেমন যেন একটা আচ্ছন্নতা নিবিড় হইয়া ওঠে। কথাটাকে পূরবী কি ভাবে গ্রহণ করিল, সেটুকু লক্ষ্য করিতেও সে ভুলিয়া যায়।

ইহার কয়েক দিন পরেই স্বরতর নজরে পড়িল, পূরবী সেই ছোট্ট সোণার মাছলীটি কোন্ সময় নিজের হাতে পরিয়াছে। স্বরত অন্তরে এক অপূর্ণ আনন্দ অনুভব করিল। অবশ্য, পূরবী যে এটা কোনো-কিছু মনে করিয়াই পরিয়াছে, এ-কথা জোর করিয়া বলা চলে না। বাঙ্গালী ধরের মেয়ে, মাছলীর প্রতি আকর্ষণ তাহার চিরন্তন সংস্কার, তা গুণ তার যা-ই কেন হোক না! তবু, স্বরতর মনে খসির সীমা রছিল না।

পূরবী একা; স্তরাং আজ-কাল কার্যগতিকে স্বরতকে যেনায়েই খাইতে হয়, পূরবীকেও সঙ্গে লইয়া খাইতে হয়। সে-দিন নায়েবের নিকট হইতে তাগিদ আসিল, অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্তও গ্রামে না আসিলেই নয়। স্বরত মহা দুর্ভাবনায় পড়িল। কেন বলা যায় না, পূরবীকে স্বগ্রামে লইয়া খাইতে তার একেবারেই অনিচ্ছা। পূরবী কিন্তু বাঁকিয়া বসিয়াছে, কিছুতেই সে একা এখানে পড়িয়া থাকিবে না। তা ছাড়া, জীবনে সে কখনো পাড়াগাঁ দেখে নাই, এ-সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না।

স্তরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে লইয়া খাইতেই হইল। কয়েকটা দিন নায়েব-গোমস্তার সঙ্গে মহলে-মহলে দুরিবার পর স্বরত গ্রামের বাড়ীতে ফিরিল। পূরবীকে বলিল,—তোমার কেমন কষ্ট হচ্ছে এখানে? নিজের খেয়ালে যেমন লাফিয়ে এলে!

পূরবী মুখ ভার করিয়া বলিল,—এখানে এসে তুমি

এমনি-করে সরে পড়বে জানলে কখনো আমি আসতুম না।—বলিতে-বলিতে হঠাৎ তার হুঁটি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, এবং পরমুহর্তেই তাহা ঝর্-ঝর্ করিয়া গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

স্বরত তাহাকে কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলিল,—আচ্ছা পাগল তো! কালই তো আমরা ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়!

স্বামীর বুকে মাথা গুঁজিয়া পূরবী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল; একটা কথাও বলিতে পারিল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া স্বরত বলিল,—পাড়া-গাঁ তোমার কেমন লাগলো—কৈ বললে না তো?

—ভালো নয়, একদম ভালো নয়। আমি ম'রে গেলেও আর সেখানে যাচ্চিনে। তুমিও যেতে পাবে না—তা বলে রাখছি

অন্য এক সময় সে স্বামীকে বলিল,—আচ্ছা, তোমার মায়ের সেই বড় ছবিখানা এখানে আনিয়ে নাও না কেন? ভারী সুন্দর ছবি, আমার বড়ই ভালো লাগলো! খুব ছেলেবেলার ফটো তাঁর, নয়? এই আমারই মতো বয়েসের হবে বুঝি?

স্বরত অগ্ৰমনস্ক ভাবে জবাব দিল,—তা হবে হয় তো।

পূরবী বলিল,—তোমার একদম মনে পড়ে না তাঁকে? খুব ছোট্টটি ছিলে তুমি তখন, নয়?

—হ্যাঁ, বোধ হয় ১০ দিন কি ১৫ দিন তখন আমার বয়েস।

পূরবী মাথাটা এক পাশে অনেকখানি হেলাইয়া বিজের মতো বলিল,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি স-ব গুনিছি। তুলোর প্যাডের ওপর শুইয়ে তোমার পিসীমাই তোমাকে মামুন ক'রেছিলেন। নয়?

—হুঁ—বলিতে-বলিতে স্বরত হাতের কাছে রেডিও-সেটের বোতামটা ঘুরাইয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মিশ্র-ভূপালীর খানিকটা মূর্ছনা নিষ্কর-ধারার মত উৎসারিত হইয়া উঠিল।

স্বরত বলিল,—ভারী চমৎকার গানটা তো? দাও তো ঐ প্রোগ্রামটা, দেখি, কে গাইছে!...ওঃ, কুমারী উত্তরা বহু! বেশ উচ্চ দরের গাইয়ে বটে!

গান শেষ হইলে সুরত বলিল,—কেমন, ভালো লাগলো না ?

—মন্দ নয়। আচ্ছা, ওদের বিয়ে হয়নি এখনো ? এ কুমারীটির কত বয়স ?

সুরত বলিল,—সেটা যদিও আমার জানা সম্ভব নয়, তবু ধরো না, বয়স বেশীই হয়েছে। বেশী বয়স পর্যন্ত অনেক মেয়েরই তো আজকাল বিয়ে হয় না। ওটা তোমার খুব খারাপ লাগে বুঝি ?

পূরবী জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল,—একেবারেই না। বিয়ে হ'য়ে তো ভারী লাভ ! তার চেয়ে মেয়েদের বিয়ে না করা বরং অনেক ভালো।

তাহার কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া সুরতর মনে হইল, কি-যেন একটা কথা বলিতে গিয়াও সে বলিতে পারিল না ! অথচ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কথাটা যেন তাহাকে স্বস্তি দিতেছে না।

পরের দিন কিন্তু কুয়াশাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। সুরত নীচেকার ঘরে খাতাপত্র লইয়া একা বসিয়া কি-সব কাজ করিতেছিল, পূরবী ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমে সদরের দিকের দরজাটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিল ; তার পর সরিয়া আসিয়া সুরতর চেয়ারের হাতার উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলিল,—আজ আমার গা-ছুঁয়ে তোমাকে একটা দিব্যি করতে হবে !

সুরত অবাধ হইয়া গেল।

—দিব্যি ! কিসের দিব্যি ? হঠাৎ—কথাবার্তা নেই, দিব্যি করতে হবে ? কি দিব্যি করতে হবে শুনি ?

ততক্ষণে পূরবী স্বামীর ছ'খানা হাত ছ' হাতে টানিয়া নিজের বুকের উপর খুব জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—আমাদের কোনো দিন ছেলেমেয়ে কোনো দিন আমাদের হবে না, বলো আমার গা ছুঁয়ে !

হাসিতে গিয়া সুরত হঠাৎ যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিল ! বলিল,—তার মানে ?

পূরবী জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল,—কিছুই যেন জানো না তুমি ! এ-কথা তোমাদের গাঁয়ের সকলেই তো জানে গো ! শুধু তোমার মা-ই তো নন, বাবার যিনি মা ছিলেন, তিনিও তো মারা যান্ আঁতুড়েই ! তার আগেও তোমাদের বংশের—

সুরত হঠাৎ বেশ জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—কে বলেছে তোমায় এ-সব আজগুবি কথা, বল তো ? লোকের কি, একটা ছুতো পেলেই হ'লো ! কে কবে কোথায় কি-জন্তে মারা গেছে, তার জন্তে বুঝি বংশের—

—হ্যা গো হ্যা, তুমি তো ভারী জানো ! তোমাদের বংশের বড ছেলের প্রথমকার বউ কেউ কখনো বেঁচেছে বলতে পারো ? প্রথম একটা ছেলে হ'লেই মরে গেছে সকাই।

সুরত হঠাৎ কি বলিবে খুঁজিয়া না-পাইয়া বলিল,—আমি কিন্তু ও-সব একেবারেই বিশ্বাস করিনে !

পূরবীর দু'টি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বলিল,—তা তো করবেই না গো ! তুমি জানো, আমি মরে গেলেও তোমার ছেলেকে তুমি বাঁচিয়ে রাখবে যেমন করেই হোক। আমাকে তুমি একদম ভালোবাসো না !

সুরত বড়ই মুঞ্চিলে পড়িয়া গেল ! মনে-মনে তার আপশোনের সীমা রহিল না—কেন সে পূরবীকে গ্রামের বিনাক্ত আবহাওয়ার ভিতর লইয়া গিয়াছিল ! মহলের যা-হয় হইত, ইহার তুলনায় সে-ক্ষতির পরিমাণই বা কতটুকু !

পূরবী নীরবে কাঁদিতেছিল। সে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইতে গেল ; পূরবী সে আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতেই বলিল,—আমি মরে গেলে তোমার আর ক্ষতি কি বল ? আবার তো তুমি—

সুরত তাহাকে কিছুতেই শাস্ত করিতে পারে না। সে তার হাত ধরিয়া টানিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

স্বামীর মুখের প্রতিশ্রুতি শুনিয়া পূরবীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। হাসিতে-হাসিতে সে বলিল,—সত্যই আমার এমনি ভয় করে ! এই দেখ না, যে-দিন থেকে ঐ-সব কথা শুনিছি, সে-দিন থেকেই পিসীমার মাদুলীটা আমি খুলে রেখেছি।

সুরত বলিল,—আচ্ছা মুঞ্চিল তো ! ও-মাদুলীটা পিসীমা যে কেন পাঠিয়েছেন, তা বুঝি তুমি বুঝতে পারছো না ! ওটা তোমার নিজেরই জন্তে। এই সন্দেহটা

মেয়েদের মনে এমনি পাকা হ'য়ে গেছে যে, আমি বিয়ে ক'রেছি শুনে, গী ভয়টাই সব আগে মনে হ'য়েছে, তাই তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করেই তিনি এই মাহুলীটা পাঠিয়েছিলেন,—আর কিছু মনে করে নয়।

—তবে তুমি সে-দিন আমার ও-কথা বললে যে বড়! এমনি ছুটু তুমি!

এ-সংসারে স্নেহেরও যেমন কোনো নিদ্রিষ্ট চেহারা নাই, তেমনই দুঃখেরও নাই। স্বামীর নিকট যে প্রতিশ্রুতিটুকু আদায় করিয়া পূরবী মনে একটা অপূর্ণ আরাম অনুভব করিয়াছিল, কয়েক দিনের মধ্যে সেইটাই কিঙ্ক তাহার দারুণ অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল। সর্বদাই তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বামী যেন আজকাল একটু বেশী রকম গভীর, আর অশ্রমস্ব থাকিতেই ভালবাসে! আগের মত হাসি-গল্পে সে যেন আর প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারে না। পূরবীর মনে হয়, সে নিশ্চয় তাহারই উপর রাগ করিয়াছে। নিশ্চয়ই তাই, নহিলে বাড়ীতে আর কে আছে যে—

এক দিন সে স্বামীকে বলিল,—তুমি আজকাল অমন করে থাকো কেন বল তো গো! আমার ওপর রাগ হয়েছে বুঝি?

বিস্মিত কণ্ঠে স্নেহত বলিল,—আমার রাগ হ'য়েছে? তা থাকার তোমার ওপর? তুমি তো খাসা কল্পনা করতে শিখেছো!

—সত্যি করোনি রাগ? এই আমার গা ছুঁয়ে বল।

স্নেহত বাহুবন্ধনের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া স্নেহত তাহাকে বলিল,—না গো না, তোমার ওপর রাগ আমি করিনি—করিনি; করতে পারবোও না কোনো দিন।

কিন্তু মুখের এই আশ্বাসটুকু প্রাতঃসূর্যালোকে কুয়াশার মত অদৃশ্য হইতে বিলম্ব হইল না।

সে-দিন কথায়-কথায় অনেক দিনের অনেক পুরাণো কথাই উঠিয়া পড়িয়াছিল। স্নেহত বলিল,—আমার জীবনের যে-কিছু জল্পনা-কল্পনা ওলোট-পালোট করে দিয়ে চ'লে গেল পলটু। কোনো দিন এ-কথা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি যে, আমরা এক-মায়ের ছেলে ছিলাম না। সে আজ বেঁচে থাকলে আমার জীবনের সবটুকু ধারাই যেতো বদলে। প্রয়াগ-তীর্থে শ্রীমতী পূরবীর সঙ্গে

পরিচয়ের সুযোগও কোনো দিন হ'তো না। স্নেহত আজকের এই চৈতালী পূর্ণিমাতে তোমার সঙ্গে বসে—

পূরবী চাপা অভিমানের সুরে বলিল,—বিয়ে করার যখন তোমার এতই আপত্তি ছিল, তখন সে দুষ্কর্ত্ত করতে গেলেই বা কেন?

স্নেহত একটু স্নান হাসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর হইয়া বলিল,—কেন? তা কি করে বলবো বল! ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে হঠাৎ এক দিন বুঝতে পারলুম, মানুষের মনের ভেতর মুক্তির জগ্রে যেমন একাগ্রতা আছে, তেমনই বন্ধনের স্পৃহাও তার কম নেই। বাহিরের মুক্তি যেমন এক দিকে তাকে আকর্ষণ করছে, ছোট্ট একটা স্নেহনীড়ের মধুর বন্ধনও তাকে তেমনই ডাকছে। মানুষ নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণতা কোনো দিনই পায়নি—কোনো দিন পাবেও না পূরবী! তার পূর্ণতার অনেকখানি খোরাক সে সংগ্রহ করবে তার এই সঙ্কীর্ণতার নীড়টুকু থেকে; তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, এই সব বন্ধনের ভেতর থেকেই। এই রকমের একটা চেতনার ভেতর দিয়েই আমার জীবনে পূরবীর বাঁশী বাজলো,—তার সুরের মধ্যে ঘরে-ফেরার সঙ্কেতটুকু নিয়ে। তাই, পরিশ্রান্ত দেহে ঘুরে-ঘুরে আন ঘর না বেঁধে উপায় রইলো না।

পূরবী একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—তা ছাড়া তোমাদের বংশের তুমিই যে একমাত্র ছেলে।

স্নেহত একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিতে-চাপিতে বলিল,—তা, পলটু চলে যাবার পর তো আমিই হলুম একা! সত্যিই, এ-কথাও আমার কত দিন মনে হয়েছে, যেন আমার বংশের অতীত আত্মাগুলি আমার দিকে চেয়ে আছেন তাঁদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। এটাকে সংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারো পূরবী! কিন্তু এ ভয়ঙ্কর গভীর সংস্কার। হয় তো এই সংস্কারও আমার হাত ধরে টেনে এনে ক্রমে আমাকে সংসার-রচনায় বাধ্য করলে।

রাত্রে শয্যায় বিনিদ্র নয়নে পড়িয়া-থাকিয়া পূরবী স্বামীর ঐ কথাগুলো লইয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে-ছিল। ও-পাশে খাটের উপর স্নেহত গভীর নিদ্রায় অভিভূত। মাথার দিকের দেয়ালে ফিকে-নীল বেড-ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সেই ঝাপসা আলোতে ঘরের

ভিতর একটা অবাস্তবের স্বপ্নছায়া! পূরবীর একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীকে ডাকিয়া তোলে। উঠিয়া সে স্বামীর খাটের উপর গিয়া বসিল। স্বামীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া তাহার কিন্তু তাহাকে জাগাইতে ইচ্ছা হইল না। স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া-চাহিয়া আজ সন্ধ্যার কথাগুলি আবার একে-একে তার মনে পড়িতে লাগিল। সমস্ত কথাগুলির নীচে যে একটা অব্যক্ত অল্পযোগ প্রচ্ছন্ন ছিল, পূরবী তাহা স্পষ্ট ধরিতে পারিয়াছে। বংশের একটি মাত্র ছেলে সে, এইখানেই এই বংশের যবনিকা পড়িবে না কি? এ-সব কথা ভাবিয়া স্বামীর মনে বেদনার অন্ত নাই, এবং তার জন্ম সে নিশ্চয় পূরবীকেই দায়ী করিয়া রাখিয়াছে।

সামনের দেওয়ালে তাহার শাশুড়ীর ছোট একখানি ফটো ঝুলিতেছে। ঝাপসা নীল আলোতে ফটোর চেহারাটা অস্পষ্ট দেখাইলেও তাহার মুখখানি যেন স্পষ্ট তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। আর ভাসিয়া উঠিল, গ্রামের বাড়ীর সেই মস্ত বড় অয়েল-পেটিংখানা। সে-মুখ যেমন সুন্দর, তেমনি জ্যোতির্ময়। যেন এক বিরাট ত্যাগের গরিমা তাঁর চোখে-মুখে জলিতেছে। যেন নিজেকে স্বচ্ছায় বিসর্জন দিয়াও তিনি তাঁহার সংসারকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। পূরবী তন্ময় হইয়া সেই ছবিখানির পানে চাহিয়া রহিল।

তার পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

কিছু দিন হইল, পূরবীর অটুট স্বাস্থ্য যেন ভাটার টান পড়িতে শুরু হইয়াছে। স্মরণ এত দিন লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু হঠাৎ সে-দিন নিদ্রিতা পত্নীর পানে চাহিয়া-চাহিয়া তাহার মনে হইল, পূরবী এই কয় দিনে অনেক-খানি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দু'টি চোখের কোণে একটা কালির দাগ যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কেন? পূরবীর কিছু অল্পখ করিয়াছে কি?

পূরবীকে কোন কথা না বলিয়া সে এক দিন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়া পূরবীকে বলিল,—তুমি বড় রোগা হ'য়ে যাচ্ছ। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, এত দিন চেষ্টাই পড়েনি। ডাক্তারকে তাই ডেকে নিয়ে এসেছি, একবার তৈয়েরী হ'য়ে নাও দেগি!

পূরবী হঠাৎ যেন রীতিমত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল; বলিল, কি অদ্ভুত মানুষ তুমি! কথাবার্তা নেই, হঠাৎ ডাক্তার এনে হাজির! কিছু আমার হয়নি,—সত্যি কিছু না। তুমি ডাক্তারকে বিদেয় করে দাও—পায়ে পড়ি তোমার।

নিতান্ত অবাধ্য হইয়াই পূরবী আজ স্বামীর কথার ব্যতিক্রম করিল। অগত্যা ডাক্তারকে বিদায় করিতেই হইল।

কিন্তু বেশী দিন কাটিল না। স্বামীর উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তার স্থানে আনন্দের লহর তুলিয়া কথাটা এক দিন প্রকাশ করিয়া ফেলিল পূরবী নিজেই। স্মরণ পূরবীর মুখের পানে নির্বাক ভাবে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সে-দৃষ্টির নীচে তাহার উচ্ছ্বসিত পুলকটুকু পূরবীর কাছে ধরা পড়িতে দেয়ী হইল না। অভিমানে পূরবীর বুকের ভিতরটা ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু অভিমান চাপিয়া রাখিয়া চোখে-মুখে হাসির রং ফলাইয়া বলিল,—আমি রোগা হচ্ছি দেখে তোমার খুব ভয় হ'য়েছিল, নয়? ভয় নেই গো! এই ধাক্কা সামলাবার আগে আমি কিছুতেই মরবো না, তা দেখে নিও।

হাসির আবরণ দিয়া পূরবী সে কি করণতম কথাটা বলিতে চায়, বুঝিয়াও স্মরণ কিছুই যেন বুঝিল না, মুখের এমনি একটা ভাব দেখাইল। কিন্তু, নিরালায় বসিয়া সে নিজের অন্তরকে বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। এই দুঃসহ আনন্দ-বার্তাটুকু পাওয়ার পর কি-যে তার করা উচিত, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। নিজের আনন্দকে সে অস্বীকার করিতে পারে না। অথচ সেই আনন্দের পিছনকার বিভীষিকার চেহারাটাকে সে ভুলিতে চাহিলেও পূরবী নিজেও ভুলিবে না,—তাহাকেও ভুলিতে দিবে না। নিজের মনকে স্মরণ বারম্বার বলিতে থাকে—মিথ্যা—মিথ্যা, কত বড় ভিত্তিহীন মিথ্যা যে এটা, তা' সে নিজে ভালো রকমই জানে। কিন্তু এই মিথ্যা আতঙ্কের কালো ছায়াটাকে পূরবীর অন্তর হইতে কেমন করিয়া সে নিঃশেষে মুছিয়া দিবে?

দিন যায়, স্বামিস্ত্রী উভয়ে যেন চেষ্টা করিয়াই সেই প্রশ্নটা এড়াইয়া চলে। অথচ ঐ একটি বিনয়কে কেন্দ্র করিয়া দু'জনেরই দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। আজকাল পূরবী

প্রায় সর্বক্ষণই সংসারের নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখে! স্ত্রীভাব, মন্দ কি! পাঁচ রকম ব্যাপারে নিজেকে যতটা জড়াইয়া রাখিতে পারে, ততই তো ভালো!

সে-দিন কি-একটা বিশেষ প্রয়োজনে পূরবী বৈঠক-খানা হইতে স্বামীকে বাড়ীর ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। দোতালার শোবার-ঘরের পাশের ছোট ঘরখানি অ-দরকারী এলোমেলো জিনিষে সর্বদা পূর্ণ থাকিত। আজ সে-ঘরে পা বাড়াইয়া স্ত্রীভাব অবাক হইল। সমস্ত ঘরখানি আগাগোড়া বাড়িয়া-মুড়িয়া তক্তকে করা হইয়াছে। দেওয়াল-আলমারির কাচগুলি প্রায় সবই ভাঙিয়া গিয়াছিল, তাহাতে নূতন কাচ শোভা পাইতেছে। আলমারির ভিতরে একমারি খেলনা; স্প্রিং-দেওয়া রেল-গাড়ী, মোটর, উডোজাহাজ, ছোট-বড় রকম-রকম পুতুল। মেঝের এক পাশে একটি বাক্সকে নূতন ঠেলাগাড়ী, এবং টাই-সাইকেল। স্ত্রীভাব স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া নির্বাক হইয়া রহিল। পূরবী খিল খিল করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল; পরে বলিল,—আমার হাতে যে-ক'টা টাকা ছিল, সব আমি তোমার ছেলের জন্তে খরচ করে ফেলেছি। আমায় তা দিও কিন্তু। আর আমার সেলাইয়ের কলটা খারাপ হ'য়ে গেছে, সেটা মেরামত করিয়ে দিতে হবে। ওর জন্তে কত কাজ যে আমার আটকে আছে—

বলিতে-বলিতে সে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছাটি গলার উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া একটি ট্রান্স খুলিল। তার পর ট্রান্সের ভিতর হইতে একরাশ ছোট-ছোট রেশমী ও পশমী জামা বাহির করিয়া এক-একটি করিয়া স্বামীর সামনে খুলিয়া ধরিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে স্ত্রীভাব বলিল,—এ-সব তুমি নিজেই তৈয়রী ক'রেছ না কি পূরবী?

—নইলে বাজার থেকে কিনে এনেছি বুঝি? কিনে তো তুমিও দেবে। এগুলো—বলিয়া মুহূর্তমাত্র নীরব থাকিয়া আবার বলিল,—এ-সবই তোমাকে দেখিয়ে রাখছি আজ! এর একটি জিনিষও যেন আমার নষ্ট না হয়। নষ্ট হ'লে স্বর্গে গিয়েও আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো না।

কোন জবাবই স্ত্রীভাব সহসা খুঁজিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল,—আমার ওপর তোমাকে কোনো ভারই দিতে হবে না পূরবী! সে-ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছি। সহরের সব-চেয়ে বড় ডাক্তার আর নার্সকে আমি—

পূরবী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়াছিল—অবোধ শিশুটির মতোই। শিশুরই মতো সরল অর্থহীন একটু হাসিতে তার ডান গালের नीচে স্ত্রীভাব একটু টোল পড়িয়াছিল। চোখ নামাইয়া বাস্তব ভিতর জামা-পোষাকগুলি তুলিতে-তুলিতে বলিল,—ডাক্তার তুমি আনবে না, তাই আমি বলিছি বুঝি? কি রকম যে নিরেট তুমি হচ্ছে। দিন-দিন—!

—তোমার কাণ্ড দেখে সত্যিই আমি বোকা ব'নে গেছি পূরবী! এ-ভাবে আরো কিছু দিন কাটলে হয় তো বা সত্যিই পাগল হ'তে হবে আমায়!

হাসিয়া স্বামীর মুখের উপর মুখ তুলিয়া পূরবী বলিল,—তা হয় তো তুমি যাবেও। কিন্তু আচ্ছা, ইয়া গো, পিসীমা তো তোমাকে মানুষ ক'রেছিলেন, কিন্তু তোমার তো কেউ নেই যে—

স্ত্রীভাব তাহার মুখের উপর হাত চাপিয়া বলিল,—নিষ্ঠুর তুমি পূরবী! ছেলে চুলোয় যাক, আমি চাই তোমাকে! তুমিই—

পূরবী হঠাৎ স্বামীর হাতখানা ঝাঁকানি দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল,—আবার নিষ্ঠুর বলা হচ্ছে আমাকে! খবদার বলছি, আর কখনো যদি মুখে আনবে ঐ অলক্ষণে কথা! যে আজ সত্যি-সত্যি আমাদেরই এক জন হ'য়ে গেছে, তার সম্বন্ধে কি ক'রে বলতে পারলে ও-কথা, নিষ্ঠুর কোথাকার! তোমার মা যখন তোমায় এতটুকু রেখে চলে গিয়েছিলেন, তখন যদি বাবা ঐ-কথা বলতেন, তখন কি হতো তোমার বল তো শুনি!

বলিয়া পূরবী খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে যে উদ্গত অশ্রুর বিন্দুটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তা কিছুতেই গোপন রহিল না।

নির্দিষ্ট মেয়াদের নিষ্করণ দিনগুলি যতই ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, স্ত্রীভাব চাকল্য ততই বাড়িয়া উঠিল।

জাগ্রতে ও নিদ্রায় কত এলোমেলো কথাই পূরবীর যে মনে হয় ! মনে হয়, এলাহাবাদে তাহাদের বাড়ীর কথা, মা-বাবা এবং ভাইবোনগুণি। সেখান হইতে হঠাৎ এক দিন অজানা এক জনকে আশ্রয় করিয়া এখানে চলিয়া আসা। জীবনে এত বড় বিমূঢ়তা আর কি থাকিতে পারে ? কেন যে মানুষ এত বড় ভুল করে ! মনে হয়, কালই স্বামীর নিকট জিদ ধরিবে, তাহাকে এলাহাবাদে রাখিয়া আসিবার জন্ত। কিন্তু তখনই আবার মনে হয়, স্মৃত্ত হয় তো দুঃখ পাইবে। নিদারুণ খতিমানের মাঝেও নিরভিমান টানিয়া মনে-মনে বলে,—নাঃ, থাক ! দুঃখ সে কাহাকেও দিবে না। আত্মাহুতি সে দিতে আসিয়াছে, দিবেও নিতান্ত নিরুপদ্রবেই।

স্বপ্নে এক-এক দিন মনে হয়, তাহাকে যেন কে আট্টে-পৃষ্টে বাধিয়া ফেলিয়াছে। চীৎকার করিয়া সে কাঁদিতে চায়, পারে না। কে এক জন তাহার পাশে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করে। প্রথমটা ভাল নজর পড়ে না, তার পর দেখে, স্মৃত্ত ! কিন্তু, কি বিশী বিকট তাহার মূর্ত্তি ! কি কুৎসিত তাহার হাসি ! ভয়ে পূরবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ঠিক পাশেই নিদ্রামগ্ন স্বামীর মুখের উপর চোখ পড়ে। চোখ কিন্তু যেন সরিতে চায় না সে-মুখের উপর হইতে। একান্ত নির্ভরতায় সে তার মাথাটি চাপিয়া ধরে স্বামীর প্রশস্ত বৃকের নীচে।...

সেদিন এলাহাবাদ হইতে একখানা চিঠি আসিল স্মৃত্তর নামে। পূরবী চিঠিখানা একান্ত সাগ্রহে স্বামীর হাত হইতে টানিয়া লইয়া খুলিয়া পড়িতে গেল। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত পড়া হইল না। চিঠি হাত হইতে পড়িয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে পূরবীও আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িল।

হঠাৎ দিন-দুইয়ের জরে পূরবীর মা'র মৃত্যু হইয়াছে ; সেই নিদারুণ বার্তা আসিয়াছিল ঐ পত্রখানিতে।

কিন্তু স্মৃত্ত পরে বুঝিল, ওটা শুধু উপলক্ষ মাত্র। এই শোকের ধাক্কায় পূরবী শয্যা গ্রহণ করিল, এবং দুই দিন যাইতে-না-খাইতে প্রবল জ্বরে সংজ্ঞা হারাইল।

জ্বরের ঘোরে পূরবী কত কি-য়ে বলে, কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না। দু'খানি নিশীর্ণ পাঞ্জুর বালু বাড়াইয়া সে কাহাকে যেন গুঁজিতে থাকে।

স্মৃত্ত কাছে বসিয়া আছে, বরফের ব্যাগ মাথায় ধরিয়া। ও-পাশে নার্স, তার সামনে ডাক্তার। হঠাৎ এক সময় নির্নিমেঘ বিহ্বল দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া পূরবী বলিল,—মা ! মাকে ডেকে দাও না একবার ! আমি মরে যাচ্ছি, আর সে বুঝি...মা গো মা, কি নির্ভর সকলে—কি দারুণ নির্ভর !

স্মৃত্ত ডাকিল,—পূরবী !

আস্তে-আস্তে তার চোখের পাতা মুদিয়া আসিল। মনে হইল, পরম শান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িল বুঝি !

দুই দিন দুই রাত এমনি জ্বরের ঘোরে কাটিয়া গেল। দুই জন নার্সের হাতে রোগীর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া স্মৃত্ত চুপ-চাপ উপরের ঘরে বসিয়া থাকে। মনে-মনে যে বিভীষিকাকে সে এত দিন জোর করিয়া অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল, সে আজ তাহার সমস্ত বাঁওসতা লইয়া তাহাকে স্তম্ভিত—আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পূরবীর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিবার ক্ষমতাটুকুও তাহার আর নাই।

মনে কত কথাই আসিতেছে। বিবাহ সে করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু সে পণ টিকিল না। নিয়তির স্ননিশ্চিত অনুশাসন ! যে নিদারুণ অভিশাপ এই চৌধুরী-বংশের বৃকের উপর ডানা মেলিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে এড়াইবার জন্ত তাহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। বিবাহ করিবার পরেও ভাবিয়াছিল, ও-কথাটা পূরবীকে কখনো জানিতে দিবে না, কিন্তু পূরবী জানিল। পূরবী যদি কিছুই না জানিত, তাহা হইলে আসলে কিছুই হয় তো ঘটত না। নিরন্তর একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকিয়া-থাকিয়া—কিন্তু উপায় কি, অনিবার্য্যকে ঠেকাইয়া রাখিবে কে ? ঠিক এই অনিবার্য্য নিয়তির চক্রে কোন্ স্মৃত্ত প্রবাস হইতে পূরবী আসিল তাহাদের এই অভিশপ্ত সংসারের বধুত্বের মাঝে আত্মাহুতি দিবার জন্ত। এ একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র নহে, পূরবীর অনিবার্য্য কঠোর নিয়তি !

ঠ্যা, স্মৃত্ত নিশ্চিত বুঝিয়াছে, পূরবী মরিবে। এই বংশের ভবিষ্যৎ বংশধরটিকে রাখিয়া তাহাকে মরিতেই হইবে, যেমন এক দিন তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার জননী। পিসীমা তাহাকে মানুষ করিয়া

তুলিয়াছেন কি অপরিসীম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া। কিন্তু স্মৃত্ত কেমন করিয়া বাঁচাইয়া তুলিবে পূরবীর শিশু-সন্তানটিকে ?

মনে পড়িল, ও-ঘরে পূরবীর সমাগত সন্তানের জন্ম সেই অপূর্ণ আয়োজন। না, পূরবীর শেষ সাধনাকে স্মৃত্ত অপূর্ণ রাখিবে না। যেমন করিয়া হোক, দুর্ভাগা ছেলেটাকে সে বাঁচাইয়া তুলিবেই। অতঃপর ঐটুকুই হইবে স্মৃত্তর জীবনব্যাপী সাধনা।

ভাবিতে-ভাবিতে স্মৃত্তর মনে হইল, সারা জগতের তিতর ঐ কঠোর কর্তব্যসাধনটুকু তাহার জীবনের চরম এবং পরম সত্য। পূরবীর জীবনের উদ্দেশ্য যেমন শুধু সেই সন্তানকে পৃথিবীর বুকে আনিয়া দেওয়া, তাহার নিজের জীবনের উদ্দেশ্যও তেমনি তাহাকে এই পৃথিবীর বুকে স্প্রতিষ্ঠিত করা। তা ছাড়া তাহাদের জীবনের আর কোন মূল্য নাই। পূরবীর কর্তব্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং তাহার ব্রত শুরু হইতে চলিয়াছে।

ডাক্তার স্মৃত্তকে ডাকিয়া বলিলেন,—যে-রকম অবস্থা দেখছি, তাতে শিশু আর প্রসূতি দু'জনেরই জীবন বিপন্ন। তবে আমাদের চেষ্টায় বড়-জোর এইটুকু সম্ভব হ'তে পারে যে, দু'জনের মধ্যে এক জনের আশা ছেড়ে দিয়ে অপরটিকে বাঁচিয়ে তোলা। যদি প্রসূতিকে বাঁচাতে হয়, শিশুর আশা ছাড়তে হবে; আর যদি শিশুকে চান, তবে—

স্মৃত্ত কাঁঠ হইয়া রহিল। কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ডাক্তার বলিলেন,—এ-কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করাও যে কত নিষ্ঠুর! কিন্তু না করলেও নয়।

স্মৃত্ত বলিল,—আমি বলছি আপনাকে একটু পরেই। মিনিট পনেরো আমায় সময় দিন ভাববার!

তাহার ইচ্ছা হইল, একবার পূরবীর ঘরে গিয়া দেখিয়া আসে; কিন্তু পা উঠিল না। সে বরাবর তিন তলার ছাদের উপর উঠিয়া গেল।

ভরা-শ্রাবণের অমাবস্তা। এইমাত্র খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে গোটাকয়েক তারা দেখা দিয়াছে। বর্ষা-বিধ্বস্ত ধরিত্রী যেন মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। শুধু তার নিশ্চতন দেহের গভীর

নিশ্বাসের শব্দটুকু মাত্র শোনা যাইতেছে। চারি দিকে মৃত্যুর কালো ছায়া যেন কাহার প্রতীক্ষায় শুক হইয়া আছে।

স্মৃত্তর মনে হইল, ঠিক এমনি এক বিতীষিকাময়ী রজনীতে সে-ও আসিয়াছিল তাহাদের অভিশপ্ত বংশের বর্জিতটুকু বহিয়া। আজ আবার ঠিক সেই অভিশাপের মধ্য দিয়া আসিতেছে তাহার ভবিষ্যৎ বংশধর। ডাক্তার বলিতেছে, পূরবীকে বাঁচাইতে হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হয়। অথচ স্মৃত্ত নিজে তো বুঝিতেছে, পূরবীকে বাঁচাইতে পারে, এমন সাধ্য বৃষ্টি স্বয়ং বিধাতারও নাই!

অতীত দুঃস্বপ্নের মত কত কথা ভীড় করিয়া আসে মনে! কিন্তু উন্নতের মত স্মৃত্ত সে-সব হ'হাত দিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়। মিথ্যা—মিথ্যা! মৃত্যু যখন ছুয়ারে পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া, তখন মিথ্যা এই ভালবাসার অজুহাত! ভালবাসা দিয়া পূরবীকে বাঁচানো যায় না,—অসম্ভব! কিন্তু চেষ্টা করিলে হয় তো বাঁচানো যায় পূরবীর সন্তানটিকে। সে বাঁচিলে পূরবীর স্মৃতিটুকুও অন্ততঃ বাঁচিয়া থাকিবে।

পাশের বাড়ীতে এগারোটা বাজিয়া গেল। স্মৃত্তর যেন চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। ডাক্তারকে সামনে দেখিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল,—ছেলেটাকে যদি বাঁচতে পারেন ডাক্তার বাবু, তারই চেষ্টা করুন; অল্প চেষ্টা বৃথা।

আর এক মুহূর্ত্তও না দাঁড়াইয়া সে বরাবর বৈঠকখানায় আসিয়া পাথরের মত শুক হইয়া বসিল।

সারা রাত্রিটা সেই ভাবেই কাটিল। ভোরের দিকে কখন একটু টেবলের উপর মাথা রাখিয়া স্মৃত্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিতে নার্স খবর দিল, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেটিকে বাঁচানো যায় নাই। পূরবী মিনিট-দশেক পূর্বে একটা মরা ছেলে প্রসব করিয়াছে।

রুদ্ধনিশ্বাসে স্মৃত্ত জিজ্ঞাসা করিল,—আর সে—
নার্স জানাইল,—অবিশ্রি, ইনি এখনো বেঁচে।—
তবে—

আর কিছু নার্সও বলিল না, স্মৃত্তও শুনিবার জন্ম

বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিল না। তেমনি জীবন-মরণের মাঝখান দিয়া সে-দিন এবং রাতটাও কাটিয়া গেল। সমস্ত দিনরাত্রির ভিতর স্ত্রত একবারও উপরে উঠিতে পারিল না।

তার পর একটি-একটি করিয়া অনেকগুলি দিবস ও অনেকগুলি রজনী তাহাদের লোহার মত ভারী পা ফেলিয়া এই বাড়ীর বৃকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেই চরণ-চিহ্ন বৃষ্টি এ-বংশের ইতিহাসে কোনো দিন নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে না।

মাস-ছুই পরে অকস্মাৎ এক দিন এ-বাড়ীর ঘর-দ্বার প্লাবিত করিয়া শরতের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার বন্যা বহিল। আকাশ হাসিল, এ-বাড়ীর সব-কিছুই হাসিল। কারণ, আজ এক জন্মান্তরের পরেই বৃষ্টি এ-বাড়ীর গৃহিণীর মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়াছে।

দোতালার বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারের উপর পাতলা নরম গদী পাতিয়া স্ত্রত পূর্বীকে শোয়াইয়া দিয়াছিল; এবং নিজে তাহারই পাশে একখানি চেয়ার টানিয়া-লইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহার অন্তরের সময়কার কত-কি কাহিনী! পূর্বীর কাছে এ-যেন নব-জীবনের অরণালোকে গত জীবনের তমসচ্ছন্ন স্বপ্ন-কথা!

ক্লীণকণ্ঠে পূর্বী বলিল,—নার্স সে-দিন বলছিল আমায় সব। বললে এমনি অবস্থা দাঁড়ালো যে, এক জনকে বাঁচাতে গেলে আর এক জনের মায়ী ছাড়তে হয়।...তোমায় বৃষ্টি বলেছিল ওরা তাই?

স্ত্রতর মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া গেল সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত জ্যোৎস্না। চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, সে-দিন ছাদের উপরকার সেই বিতীষিকাময়ী শ্রাবণ-রাত্রি! সে-রাত্রির স্ত্রতকে আজ সে নিজেই যেন চিনিতে পারিল না। গলার ভিতরটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া আজ সে পূর্বীকে বলিবে, সে-দিনের সমস্তাটার সে কি নির্দম ভাবে সমাধান করিয়াছিল। সে যে নিজেই বিশ্বাস করিতে পারে না—

খুব মিষ্ট ফিকে একটুখানি হাসিয়া পূর্বী বলিল,—ওরা বৃষ্টি জিজ্ঞেস করলে তোমায়? আর তুমি কি বললে? বললে যে, আমাকেই চাও? সত্যি, বল না?

স্ত্রত তাহার কপালের উপরকার কৃষ্ণিত চুলের গুচ্ছটি নাড়িতে-নাড়িতে বলিল,—নইলে বলবার আর কি ছিল পূর্বী!

পূর্বীর শীর্ণ কম্পিত ঠোঁট দু'খানির ফাঁকে শুধু অশ্রুট স্তরে বাহির হইল,—কি নির্ভর তুমি গো!

ধীরে ধীরে চোখ দু'টি তার মুদিয়া আসিল অপূর্ব স্বপ্নাবেশে। স্নগভীর স্বস্তির নিশ্বাস টানিয়া স্ত্রত মনে-মনে বলিল,—সত্যিই চেয়েছিলুম আমি তাই পূর্বী! সে রাত্রিটার সবটাই ছিল মিথ্যা, সবটাই ছিল নির্ভর বীভৎসতায় ভরা।

একখানি শীর্ণ হাত পূর্বী তার স্বামীর দিকে বাড়াইয়া দিল। স্ত্রত সেটিকে বৃকের উপর চাপিয়া ধরিল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

রাজা ও সাধু

সর্বত্যাগী সাধু এক বসিয়া শ্মশানে,

প্রশান্ত সহাস-দৃষ্টি, আছে আশ্র-ধ্যানে।

হেন কালে রাজা এক আসিয়া তথায়,
ত্যাগী-শ্রেষ্ঠ সাধু বলি, বাধানে তাঁহার।
কহে সাধু, “মহারাজ, তুমি সর্বত্যাগী,”
রাজা কহে, “কেন মোরে কর পাপভাগী।

ত্যাগের লক্ষণ কোথা, কহ দয়া ক’রে।”
সাধু কহে ব্যঙ্গ হাসি, “আমি বার তরে,
করিয়াছি সর্বত্যাগ, সে পরম ধন,
অনায়াসে মহারাজ করেছ বর্জন।”

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অদ্বৈত-বেদান্ত



গীতোক্ত অর্থ দৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমতঃ গীতার “অব্যক্ত” ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করা আবশ্যিক। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু—জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন, জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই বিভাব বা মায়িক বিকাশ, ইহাই অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র। গীতায় বর্ণিত ব্রহ্মবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে অদ্বৈত-বেদান্তের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে গীতার মর্ম কি, তাহা আমরা বিচার করিব এবং গীতোক্ত অদ্বৈতবাদ যে উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত, তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব। অব্যক্ত ও ব্রহ্ম এই দুইটি শব্দ গীতায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অব্যক্ত কথাটি সাধারণ অর্থে, যাহা ব্যক্ত নহে, তাহাই অব্যক্ত, এই অর্থেই পুরুষ ও প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। ভগবান্ জগদ্ব্যাপী স্বীয় মূর্তিকেও অব্যক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্ত মূর্তিনা—। অবাঙ-মনস-গোচর নির্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্ম-বস্তুকেও অব্যক্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অবিকারী অচিন্ত্য আত্মাকেও অব্যক্ত বলিয়া গীতায় বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দে কোথায়ও বেদকে, কোথায়ও জগজ্জননী প্রকৃতিকে, কোথায়ও পরমেশ্বরকে, কোথায়ও বা পরব্রহ্ম তত্ত্বকে বুঝান হইয়াছে। পরব্রহ্মই যে পরমাত্মা এ কথা গীতায় স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, উপনিষদে আত্মার যে স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে আত্মা নিত্য, স্বপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ, চিন্ত্যস্বরূপ এই রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ংজ্যোতিঃ, চিন্ত্য, সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ আত্মাকে গীতায় অব্যক্ত বলা হইল কিরূপে?— এই প্রশ্নে গীতার উত্তর এই যে, যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং স্থূল তাহাই ব্যক্ত। আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে, জাগতিক বস্তুর গ্রাহ্য স্থূলও নহে, এই জগত্ই সর্বসাক্ষী সর্বাধার সর্বাভ্যর্থ্যামী আত্মাকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে উপনিষদের ব্রহ্মও অব্যক্ত। ব্রহ্মের কোন রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই; স্মৃতরাং তাহা কোন মতেই চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয়

হইতে পারে না; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে বলিয়া ব্রহ্ম অহুমেষ্যও নহে, কেন না, যাহা বাহ্য প্রত্যক্ষের অতীত অচিন্ত্যতত্ত্ব, তাহার সম্বন্ধে অহুমানও করা চলে না। আত্মার যথার্থ স্বরূপ কি? ইহার উত্তরে গীতা বলেন যে, আত্মা আকাশের গ্রায় বিভূ অচল, অটল, নিষ্ক্রিয়, শাস্ত, অবিকারী, স্বতন্ত্র এবং নির্লিপ্ত। আত্মার এই প্রকার স্বরূপদর্শন অনায়াস-সাধ্য নহে। কেন না, আত্মা স্বভাবতঃই দুর্বিজ্ঞেয়, মায়ী-যবনিকা ভেদ করিয়া আত্মার যথার্থ রূপ দর্শন করা মায়ী-মুক্ত জীবের পক্ষে নিতান্তই দুর্লভ; তার পর, এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন, এইরূপ উপদেষ্টাও দুর্লভ। আত্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ ঈশ্বরতুল্য গুরু লাভ করা বাস্তবিকই বড় সৌভাগ্যের কথা। যদি ভাগ্যবশে ঐরূপ সঙ্গুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবুও শ্রুতির অগম্য, বাক্যের অগম্য, মনের অগম্য, বুদ্ধির অগম্য, নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, আত্মতত্ত্ব গুরু শিষ্যকে বুঝাইয়া দিবেন কিরূপে? কারণ, ব্রহ্ম-স্বরূপ তো বলিয়া বুঝাইবার নহে। এই জগত্ই গীতা আত্মা, আত্ম-দর্শন ও আত্মদর্শী এই তিনকেই পরম আশ্চর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, ‘আত্মতত্ত্ব প্রথমতঃ শোনাই যায় না, শুনিলেও বুঝা যায় না। আত্মবিৎ বক্তাও আশ্চর্য্য, শ্রোতাও আশ্চর্য্য, জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য ১।’ হে অর্জুন, এই পরমাশ্চর্য্য আত্মাই আমি। তুমি “আত্মবান্” অর্থাৎ আত্মসমাহিত হও, তবেই তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, তোমার মধ্যে আমার বিকাশ হইবে,—তোমার জীবন-প্রবাহ অনন্ত জীবন-পারাবারে মিশিয়া পূর্ণতা লাভ করিবে। যিনি আত্মরতি, ও আত্মকাম, তিনিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞেয়,

১। আশ্চর্য্যং পশুতি কশ্চিৎকেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তত্বেব চাত্তঃ।
আশ্চর্য্যবচেনমতঃ শৃণোতি ঞ্ছাপ্যেনং বেদ নট্বেব কশ্চিৎ ২। ২
শ্রবণাদ্ বাপি বহুভির্যোগ্যে ন ভ্যঃ শৃণোত্বেহপি বহুবোঃ ন বিদুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ত লভা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলাণুশিষ্টঃ।

তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার প্রভু নহে, তিনিই ইন্দ্রিয়গণের প্রভু; কাম ও কামনা তাঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না, সংসারিক সুখ-দুঃখ তাঁহার চিত্তকে উদ্বেলিত করে না, তাঁহার চিত্ত সর্বদা ব্রহ্মানন্দে ভরপুর। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কোনরূপ অজ্ঞান-বন্ধন থাকিতে পারে না, তাহার অজ্ঞানের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, মোহপাশ কাটিয়া গিয়াছে, সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার থাকে না, জ্ঞান-সূর্যের উদয়েও সেইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার থাকিতে পারে না। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরিণামে আনন্দময় ব্রহ্মতেই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যান। গীতার ভাষায় ইহারই নাম “ব্রাহ্মী স্থিতি”। এই ব্রাহ্মী স্থিতি যিনি লাভ করেন, তিনিই ব্রহ্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহাই গীতোক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মবাদের মূল কথা।

উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের সগুণ ও নিগুণ এই দ্বিবিধ বিভাবের কথা বলা হইয়াছে, গীতায়ও সেরূপ পরমাশ্রী পরব্রহ্মের সগুণ ও নিগুণ এই দ্বিবিধ বিভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। নিগুণ পরব্রহ্মকে বলা হইয়াছে—অনাদি, অনন্ত, অজর, অমর, অক্ষয় ও সনাতন। গীতার মতে এই অক্ষর-ব্রহ্ম সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা সদস্যতের অতীত তত্ত্ব, —ত্বমক্ষরং সদস্যং তৎ পরং যৎ—গী: ১।১৭। ইনিই অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে অবস্থিত জ্যোতির জ্যোতি: পরম জ্যোতি:।—জ্যোতিষামপি তজ্ জ্যোতিস্তমস: পরমুচ্যতে গী ৩।১৮। ইনিই বিশ্বপ্রাণ, জগদাধার, ভূত জগতের অন্তরেও তিনি, বাহিরেও তিনি, দূরেও তিনি, নিকটেও তিনি। জগতে বিভক্ত হইয়াও অবিভক্ত, ব্যক্ত হইয়া অব্যক্ত এই পরব্রহ্মই বিশ্বরূপে চরাচরে বিদ্যমান।

“সর্বত্র চরণ কর, মুখ শির: সর্বস্থান,
শ্রবণ নয়ন লোকে, ব্যাপি সর্ব অবস্থান।
যেন সর্বেন্দ্রিয় বৃত, সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত
নিগুণ গুণের ভোক্তা অনাসক্ত সর্বভূৎ।” ১

শ্রুতিও এই বিরাট পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

(১) সর্বত: পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষি শিরো মুখম্।
সর্বত: শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতম।
অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণ ভোক্তৃ চ।

গীতা ১৩।১৪—১৫

তিনি সহস্র শির:, সহস্র নয়ন ও সহস্র চরণ। তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং জগতের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যান নাই, জগতের বাহিরেও তিনি আছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যাহা কিছু সমস্তই সেই পুরুষ। “হ্যালোক ইহার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য ইহার চক্ষু:, দিক ইহার কর্ণ, বেদ ইহার বাণী, বায়ু ইহার প্রাণ, বিশ্ব ইহার হৃদয়, পৃথিবী ইহার চরণ; ইনি সমস্ত ভূতের অন্তরাশ্রা। সেই দ্যুতিময় দেবতা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে বাহুবৃত্ত এবং পক্ষীকে পক্ষবৃত্ত করিয়াছেন ১।” গীতাও এই শ্রুতির প্রতিধ্বনি করিয়া ভগবানের বিশ্বস্তর মাস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ই বিশ্ব-আশ্রা পরব্রহ্ম, পরম পবিত্র, জগদাধার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ শাস্ত্রত পুরুষ— ইনিই আদিদেব অজ ও বিভূ ২। ইনিই আবার জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, গতি ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী ও শরণ-স্থান—গতিভর্তা প্রভু: সাক্ষী নিবাসং শরণং সূহৃৎ। এইরূপে ভগবান্ অনন্তগুণময়। গুণ-ব্রহ্মের বর্ণনায় গীতা উচ্ছসিত। সে বর্ণনা বড়ই মন্দ্রস্পর্শী। বেদ ও উপনিষদেও ভগবানের বিরাট ভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা গীতার মত এত সরস ও হৃদয়গ্রাহী নহে। এই বর্ণনায় গীতার ভাব-সম্পদের ত্রায় কাব্য-সম্পদও পরিষ্ফুট হইয়াছে। শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে পুন: পুন: গীতা ধ্যান করিলে সে বর্ণনার সৌন্দর্য্য ভক্ত সাধকের মানস-নেত্রে প্রতিফলিত হয়। সত্যদ্রষ্টা অর্জুন ভগবানের সেই অতুলনীয় রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, হে বিশ্বরূপ! তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই।

১। (ক) সহস্রশীর্ষা পুরুষ: সহস্রাক্ষ: সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্বতো বৃহাহত্যতিষ্ঠদশাজুলম্।
পুরুষ এবদং সর্বং বদভূতং বচ ভব্যম। ঋগ্বেদ পুরুষশ্রুত
(খ) অগ্নিমূর্দ্ধা চক্ষুর্বা চন্দ্রসূর্যো দিশ: শ্রোত্রে বাগ্বিবৃত্যশ্চ বেদা:।
বায়ু: প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্ত পদ্ভ্যাং পৃথিবীহেব সর্বভূতান্তরাশ্রা।
—মুণ্ডক ২।১।৪

(গ) বিশ্বতশ্চক্ষুরূত বিশ্বতোমুখ বিশ্বতো বাহুবৃত্ত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতন্ত্রে ছাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক:।
—শ্বেতাশ্বতর ৩।৩

২। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান।
পুরুষং শাস্ত্রং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম।

—গী ১০।১৫।

“তুমিই অক্ষর, জ্ঞেয় পরতর,
তুমিই বিশ্বের পরম নিধান।
তুমিই অব্যয় নিত্য ধর্মাশ্রয়
সনাতন তুমি পুরুষ-প্রধান ॥”

তুমি বিশ্ববীজ, তোমা হইতেই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে, তোমাতেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আবার কালে তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। তুমি জগতের কর্তাও বটে, ভক্তাও বটে, সংহর্তাও বটে। তুমি অনন্তবীৰ্য্য, অমিতবিক্রম ও অমিতপ্রভাব।

“তুমিই অমৃত তুমিই মৃত্যু
তুমি লোকপূজ্য তুমি গরীয়ান্।
অতুল প্রভাব ! নাহি তিন লোকে
শ্রেষ্ঠ দূরে থাক তোমার সমান ॥
তুমি বিশ্বব্যাপী, হে অনন্তরূপ,
তুমি জ্ঞাতা জ্ঞেয় ধাম সর্বোত্তম।
বায়ু, যম, বহ্নি শশাঙ্ক, বরুণ,
পিতামহ পিতা প্রজাপতি আর।
সহস্র তোমায় নম নম নম,
নম নম তোমা নম বার বার ॥
সম্মুখে পশ্চাতে নম নম নম
সর্বদিকে সর্ব ! করি নমস্কার।” ১

গীতায় এইরূপে তত্ত্ব অর্জুন শ্রীভগবানের বিভূতি বর্ণনা করিয়াছেন। গীতা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল, স্মৃতরাং বিশ্ব-পতি পরমেশ্বরের লীলা-রহস্য সবিস্তারে গীতায় বর্ণিত হইবে, ইহা তো স্বাভাবিক ; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই ঈশ্বর-বাদও সগুণ ব্রহ্মবাদকে অঙ্গীকার করিলে নিগুণবাদ মিথ্যা হইয়া পড়ে না কি ? সগুণ ঈশ্বরবাদী বৈদান্তিক আচার্য্য

রামানুজ তৎকৃত শ্রীভাব্যো নিগুণবাদের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন, পক্ষান্তরে নির্কিশেষ অষ্টমতবাদী আচার্য্য শঙ্কর সগুণ ব্রহ্মবাদকে মায়ার বিলাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপনিষৎ-সাহিত্যে ব্রহ্মের যে সগুণ ও নিগুণ এই দ্বিবিধ বিভাব দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সগুণ বিভাব প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব নহে, উহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। পরব্রহ্ম যখন মায়াময় হন, তখন তাঁহাকে “মহেশ্বর” বলা হয়—মায়িনস্ত মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর। ময়া-ব্রহ্মের যবনিকা বা তিরস্করণী—এই তিরস্করণী দ্বারা আবৃত হইলেই ত্রিগুণময়ী ময়াকে আশ্রয় করিয়া স্বভাবতঃ নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ হন এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন ১। সগুণ ভাবে মায়িক বলিলে অবশ্য সগুণ ও নিগুণ-বাদের উপপত্তি করা চলে, উপনিষদেও এই ভাবেই সগুণ-বাদের উপপত্তি করা হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে গীতার বক্তব্য কি, তাহা দ্রষ্টব্য। ঈশ্বরবাদ-মুখরিত গীতায় যতই বিস্তৃত ভাবে সগুণ ঈশ্বরবাদের বর্ণনা করা হউক না কেন, সগুণ পরমেশ্বরই চরম তত্ত্ব, এমন কথা গীতায় কোথায়ও বলা হয় নাই। তার পর, সগুণ ও নিগুণ যখন একেরই দ্বিবিধ বিভাব, তখন ইহার মধ্যে বাস্তবিক যে কোন বিরোধ নাই, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ স্পষ্ট বাক্যেই “দ্বৈ বাধ ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্ত্য়ামূর্ত্ত্য়” বলিয়া ব্রহ্মের মূর্ত্ত সগুণ রূপ ও অমূর্ত্ত নিগুণ রূপের পরিচয় দিয়াছেন। এই অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত রূপই পর ও অবর রূপে উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে ; এই পর ও অবর রূপকে সমাহৃত করিয়াই ব্রহ্মকে এক কথায় “পরাবর” বলা হইয়াছে। উপনিষদের উক্তরূপ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, যিনি বিশ্বাতিগ, তিনিই বিশ্বানুগ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাশ্রয়, তিনিই ভগবান্। এক অদ্বয় তত্ত্বই নানা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন—

বদন্তি যন্তত্ববিদস্তত্ত্বং তজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্রয়তি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

ভাগবত ১।২।১১

১। স্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং স্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্।

স্বমব্যয়ঃ শাস্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে।

গী ১১।১৮

পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত স্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।

ন স্বংসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহস্তো লোকজয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ।

গী ১১।৪৩

বায়ুর্ধমোহগ্নিবর্কণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃষ্ণঃ পুনশ্চ কুরোহপি নমো নমস্তে।

গী ১১।৩৯

১। নারায়ণে ভগবতি তদ্বিদং বিশ্বমাহিতম্।

গৃহীত মায়োকুণ্ডলঃ সর্গাদাবণ্ডলঃ স্মৃতঃ। ভাগবত ২।৬।২৯

আশ্রয়মায়াং বশীকৃত্য সোহহং গুণময়ীং দ্বিজ।

স্বক্ণং বক্ণং হরন্ বিধং দধে, সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম।

ভাগবত ৪।৭।৪৮

নিগুণ ব্রহ্মেই লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে। সেই জগুই ভূমাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন, “হে ভূমা, তুমিই সগুণ, তুমিই নিগুণ, তুমিই সমস্ত, মন ও বুদ্ধির গোচর তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুরূপ উপদেশই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমি নিজেই অমৃত অব্যয় নিত্য চিদানন্দময় নিগুণ নিরূপাধিক ব্রহ্মের ধনীভূত ব্যক্ত রূপ, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা ২; এই প্রতিমাই অমৃত ব্রহ্মের মূর্ত্ত বিকাশ, নিরূপাধিক ব্রহ্মের সোপাধিক অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ যিনি সগুণ, তিনিই নিগুণ। ব্রহ্মাও ভগবান্ বাসুদেবকে স্তুতি করিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন—“হে ভগবন্, তুমিই এক অদ্বিতীয় আত্মা, তুমিই পুরাণ পুরুষ সত্য স্বয়ংজ্যোতিঃ অনাদি অনন্ত নিত্য নিরঞ্জন সর্বান্তর্ধ্যামী সদা পূর্ণ সুখস্বরূপ, তুমিই অদ্বয় নিরূপাধি অমৃতময় পরম ব্রহ্ম ৩।” ব্রহ্মের সোপাধিক মূর্ত্ত রূপকেও যিনি ঐকান্তিক ভক্তির সহিত সেবা করেন, তিনিও ব্রহ্মস্বরূপই প্রাপ্ত হন। নিগুণ ও সগুণ মূলতঃ একই তত্ত্ব।

“অনন্ত সাগরের যে নিবাস, নিরূপ, প্রশান্ত, নিখর অবস্থা, ইহাই ব্রহ্মের নিগুণ ভাব; আর সমুদ্রের যে লহরীসকুল, বীচিবিক্রম ফেনিল তরঙ্গিত অবস্থা, ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্রম; একই ব্রহ্ম কখন সগুণ, কখন নিগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্রম হইতেছে, আবার বিক্রম সমুদ্র প্রশান্ত ভাব

১। শীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নিগুণশ্চ গুণক্রিয়াঃ। ভাগবত ৩।৭।১২
সর্কঃ স্বমেব সন্তোণা বিগুণশ্চ ভূমন্।

নাভ্যং স্বনস্ত্যপি মনো বচসানিরুক্তম্। ভাগবত ৭।১।৪৮

২। ব্রহ্মণো সি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়শ্চ চ।

শাধতশ্চ চ ধর্মশ্চ সুধৈশ্চৈকান্তিকশ্চ চ। গী: ১।৪।২৭

সগুণ ঈশ্বরকে অমৃত অব্যয় অক্ষর চিদানন্দময় ও ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা করার কেহ কেহ মনে করেন যে, সগুণ ব্রহ্মবাদই গীতার প্রতিপাদ। গীতা ঈশ্বরবাদে ভরপুর হইলেও পরমেশ্বরবাদই চরমতত্ত্ব, এমন কথা গীতার কোথায়ও স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই, সুতরাং ঐরূপ মত আমরা সমর্থন করিতে পারি না।

৩। একব্রহ্মাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আভঃ।

নিত্যোহেকঃসোহেক্স স্বখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণাধরো যুক্ত উপাধি-
তোহবৃত্তঃ।

ধারণ করিতেছে; পরব্রহ্ম মায়া-যবনিকার আবরণে সগুণ সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরো-
হিত করিয়া নিগুণ নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্যায়ক্রমে
মহা সমুদ্রের এই দুই অবস্থা; পর্যায়ক্রমে ব্রহ্মেরও ঐ
দুই বিভাব। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন
সঙ্কীর্ণ, সসীম ও সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার তিরস্করণী
তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ পুনরায় অসীম, অনাবৃত ও অনন্ত
হইতেছেন।” বিশ্বাতিগ পরম পুরুষ যিনি একাংশ মাত্রে
সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তিনি স্বীয় মায়া বা
তিরস্করণী দ্বারা আবৃত হইয়াই বিশ্বানুগ সগুণরূপে প্রকা-
শিত হইয়া থাকেন। ইহা পরম পুরুষের যথাগ স্বরূপ না
হইলেও অজ্ঞ ব্যক্তির চরম ও পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে
না বলিয়া অব্যক্ত পরম পুরুষকেও ব্যক্তভাবাপন্ন বলিয়া
মনে করিয়া থাকে। মূঢ়নী ব্যক্তিগণ পরম ভাব জানিতে
পারে না। মায়াময় জগতে মায়ামুগ্ধ জীবের সঙ্কীর্ণ
দৃষ্টি মায়ার ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন বলিয়া এই জীব ও জগতের
অন্তরালে মায়ার অতীত যে অক্ষর অব্যয় পরম ব্রহ্ম বিরাজ
করিতেছেন, বিনাস্ত জীব তাহা দেখিতে পায় না। যে
মায়াবশে অব্যক্ত ভগবান্ ব্যক্তরূপ পরিগ্রহ করিয়া
থাকেন, সেই মায়াপাশ ছিন্ন করা অত্যন্ত দুষ্কর—‘মম
মায়া হুরত্যায়া’। এই মায়া-যবনিকার অন্তরালে
ভগবানেব যে খব্যক্ত নিত্য চিন্ময় আনন্দময় রূপ আছে,
মূঢ়নী ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না। এই মায়া
সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, ত্রিগুণময়ী মায়াব প্রভাবেই সমস্ত
জগৎ মোহিত। মায়ামুগ্ধজীব “আত্মানাশ্চ” বিবেকবিহীন
বলিয়াই জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না।
জীবের দৃষ্টি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আবরণ আবৃত,
এই জগুই যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই গুণের বিকাশ,
যিনি স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও গুণের অধিষ্ঠানরূপে বিরাজ
করিতেছেন, সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্কে মূঢ় জীব দেখিতে
পায় না, তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারে না—এবং তিনি যে

১। নাহং প্রকাশঃ সর্কশ্চ যোগমায়াসমায়ুতঃ। গীতা ৭।২৫।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মত্তস্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজ্ঞানস্তো মামব্যয়মহুত্তমম্। গীতা ৭।২৪

ত্রিভিগুণমর্ষের্তাঐবেতিঃ সর্কমিদং জগৎ।

মোহিতং নাতিজানাতি যামেত্যঃ পরমব্যয়ম্। গীতা ৭।১৩

সর্বজীবের আত্মরূপে জীবদেহে বিরাজ করিতেছেন, তাহাও উপলব্ধি করিতে পারে না, অর্থাৎ মায়াদৃষ্টি সত্ত্বে ব্রহ্মদৃষ্টির উৎপন্ন হয় না, হইতে পারে না। এই জগত্ই মায়াদৃষ্টি ছিন্ন করা একান্ত আবশ্যিক। এই দুস্তর মায়াদৃষ্টি ছেদ করিতে পারে কে? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—যাহাদের বিবেকদৃষ্টি মায়ার ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন, তাহারা প্রকৃত পথ দেখিতে পায় না। পাপকার্য্যেই তাহাদের রতি দেখা যায়। সংসারভোগের কুহকিনী আশায় তাঁহাদের মন চঞ্চল হয়। অজ্ঞানের ফল—দম্ভ, অভিমান প্রভৃতি তাঁহাদের চিত্তকে

কলুষিত করে এবং দম্ভ ও অভিমানে কলুষিত চিত্তে আশ্রয়-ভাবের উদয় হয়, দেবতাব স্থান পায় না। এইজগত্ ঐ সকল পাপাসক্ত মূঢ়ী নরাদমগণ ভগবানের শরণাপন্ন হয় না। ভগবানের কল্যাণ-আশীষও উহাদের উপর বার্ষত হয় না। পক্ষান্তরে, যাহারা অভিমান-অহঙ্কার দূরে ফেলিয়া একান্ত দীন ভাবে ভগবানের অভয় চরণে শরণ লন, ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহাদিগেরই মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দেন—‘মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে’—৭।১৪।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (অধ্যাপক)

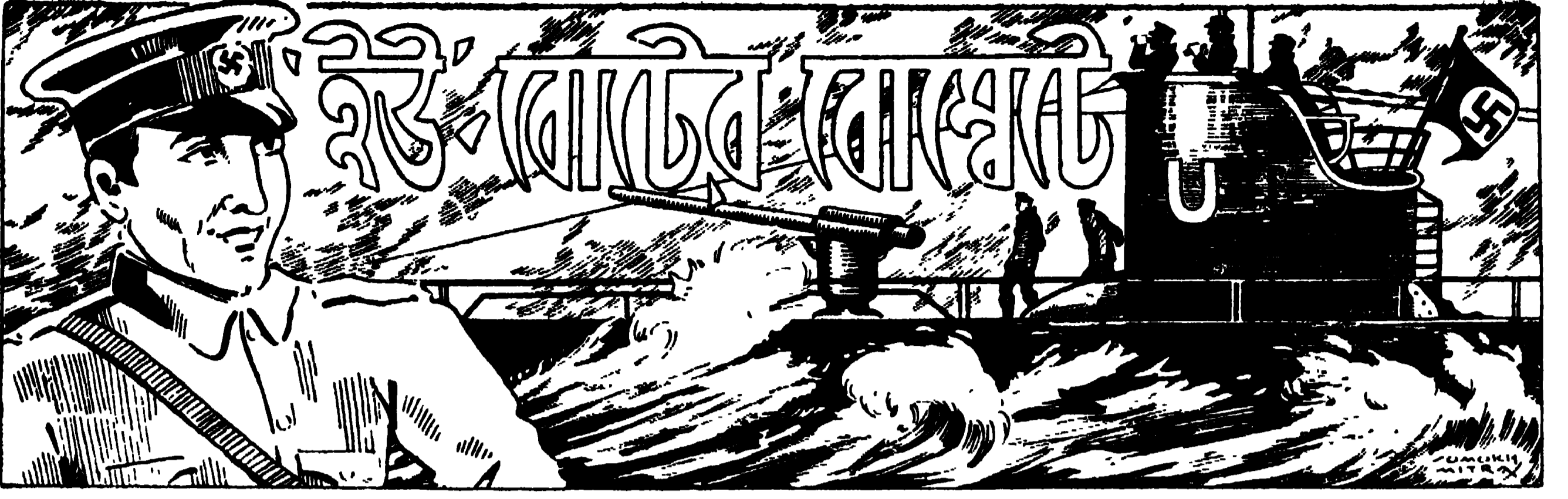
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি।

যাত্রা

দিন বুঝি হ'য়ে এল শেষ—
মনে হয় একটি নিমেষ,
এনে দিল তুলে যাওয়া জীবনের রথ।
হয় ত বা জানা ছিল পথ,
তবুও তোমার কুটারের স্নিগ্ধ ছায়ে বসি,
পলকে ভুলিয়াছিলাম আমি যে বিদেশী।
বিস্মৃতির ছলনার মোহে
বুঝি মোরা তুলেছিলাম দৌহে—
ভরেছিলে বিদায়ের ডালা
ভেবেছিলে মিলনের মালা
বাধিবে বন্ধনে তার একটি কণেরে—
শুভ মোর গতিরে ঘেরিয়া
তোমার মিনতি যবে কহে উচ্ছসিয়া
জীবনেরে কোথা যাবে ছাড়ি—
গিয়েছিলাম হয় ত পাশরি
এবার ভাসাতে হ'বে তরী
দিতে হবে অনন্তের পাড়ি।
তাই মোর মুগ্ধ আঁধি-কোলে
উঠেছিল বুঝি টলমলে—দু'টি অশ্রুকণা।
মিথ্যা নয়, ভুলিয়া যেও না
তোমার কুন্তল-মূলে
জীবন-সরসী হ'তে দিয়েছিলাম তুলে
ক্রন্দনীর অশ্রুণীরে ভেজা দু'টি কুবলয়।
মানিনি কো কয় কতি ভয়,
দেবতার ছিল বাহা তুলি সেই কণে
দিমু তোমা অকারণে,
মুহুর্তে বিলায়ে দিমু অনন্ত সক্ষয়।

তুমি শুধু উঠেছিলে কাঁপি
আপনার দীনতায়ে ফুক বুকে চাপি।
সফ্যা নামে, স্তব্ধ নভে,
তুলে যাও সে কণের ছবি
ও-পারের বেহুছায়ে
রাখালের ক্রান্ত সুর বাজায় পূরবী—
অনাগত কোন্ কণে,
তোমার মানসবনে ফুল হ'য়ে যদি কত ফুটি,
দেবতার শূপকাঠে বলি দিতে যেও না কো ছুটি—
তোমার ধ্যানের মাঝে
যদি কোন শাস্তিহারা সাঁঝে
ছলনা করিতে আসে তব্বর পথিক
খুলে ফেলো ক্রন্দ আঁধি।
তোমার তপস্রাতলে যুমন্ত বালিকা
তুচ্ছ করি পাষাণের কুপার কণিকা
বন্ধনের গলে যদি—সঁপে তার মুক্তির মালিকা
যুক্তি কোথা খুঁজে পাবে আর—
দেবতা গর্জ্জবে ঘোষে—
সর্বহারা হবি যে রে অভিশাপে তাঁর।
আঁধারে ভাসিতে হ'বে জানি
সফ্যারতি হেথা হ'বে তাও সত্য মানি
ভয় নাই, তোমার প্রদীপ তবু
অকারণে চাহিব না কড়,—
শুধু, যা দিয়েছ তুমি তুলি দেবতারে—
তাই নিয়ে ভেসে যাব,
জীবনের আলো-অন্ধকারে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র।



বিংশ পর্ব

বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

আমস্ ফ্রোবি কাউন্ট ভন জোলার্ণ কর্তৃক লাহিত হওয়ার দুই দিন অত্যন্ত বিষন্ন ভাবেই কাজকর্ম করিতে লাগিল; তাহার মুখে অধিক কথা শুনিতে পাইলাম না। তাহার ঘরের ভিতর যে সকল ময়লা জমিয়াছিল, তাহা সে নিঃশব্দে পরিষ্কার করিলে কাউন্ট জোলার্ণ তাহাকে ঘরের বাহিরের প্রাচীরগুলি চূণকাম করিতে আদেশ করিলেন। আমস্ বলিল, সেখানে চূণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই; এ অবস্থায় সে কিরূপে দেওয়ালগুলি চূণকাম করিবে? ঐ কার্য তাহার অসাধ্য। কিন্তু কাউন্ট জোলার্ণ সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন; তিনি স্বয়ং চারি দিক খুঁজিতে খুঁজিতে গুদামের ভিতর একরাশি চূণ আবিষ্কার করিয়া আমস্কে তাহা দেখাইয়া দিলেন।

আমস্ কাউন্টের প্রদীপ্ত চক্ষুর দিকে চাহিতে সাহস করিল না; সে নতমুখে মাথা চুলকাইয়া বলিল, “ওখানে চূণ আছে—ইহা আমার স্মরণ ছিল না।”—কাউন্ট তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন কি না, জানি না; কিন্তু আমস্কে তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইল। ঘরের দেওয়ালগুলি সে স্বহস্তে চূণকাম করিল।

কাউন্ট জোলার্ণ এইভাবে তিন দিন ব্ল্যাকগল ফার্শে বাস করিয়া আমস্কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তৃতীয় দিন রাত্রিকালে একখানি ‘ইউ’-বোটের আবির্ভাব হইল; স্থির ছিল, সেই ‘ইউ’-বোট আসিলে তাহাতেই কাউন্ট জোলার্ণ জার্মানীতে ফিরিয়া যাইবেন।

এই ‘ইউ’-বোটের চালক কাপ্তেন সারলাক যে সময় একখান ডিকী লইয়া সমুদ্র-তটে অবতরণ করিল, সেই

সময় আমস্ সাগর-বেলায় পাহারায় নিযুক্ত ছিল। কাপ্তেন সারলাক ডিকী হইতে নামিয়া আমস্কে কাউন্টের কথা জিজ্ঞাসা করিল; কাউন্ট জোলার্ণ আমসের পাকশালায় বিশ্রাম করিতেছেন শুনিয়া কাপ্তেন সারলাক একাকী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। কাউন্ট পাকশালায় তখন কাপ্তেন সারলাকেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

কাপ্তেন সারলাক কয়েক মিনিট নিম্নস্বরে কাউন্টের সহিত কি পরামর্শ করিল। তাহার পর কাউন্ট মেরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোমার বাপের সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরি কথা আছে; কথাগুলি গোপনীয়। এইজন্য আমার ইচ্ছা, তুমি কাপ্তেন সারলাকের সঙ্গে তাহার ‘ইউ’-বোটে যাও; আমরা যতক্ষণ দেশে ফিরিবার জন্ম প্রস্তুত না হই—ততক্ষণ তুমি সেখানেই অপেক্ষা করিবে।—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?”

মেরী সবিস্ময়ে কাউন্টের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “এখান হইতে আমার চলিয়া যাওয়া কি খুব বেশী দরকার?”

কাউন্ট জোলার্ণ বলিলেন, “হাঁ, খুব দরকার বলিয়াই তোমাকে ও-কথা বলিয়াছি।”

মেরী তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কিন্তু কাউন্ট জোলার্ণের মত পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া গরম কোটে দেহ আবৃত করিয়া সে কাপ্তেন সারলাকের সহিত দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কাপ্তেন সারলাক পাকশালার দ্বারের বাহিরে যাইতে উদ্ভত হইয়াছে, সেই সময় কাউন্ট জোলার্ণ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “সারলাক, তুমি এখানে ফিরিয়া আসিবার সময় ছয় জন নাবিক ও আমস্ ফ্রোবিকে সঙ্গে আনিবে।”

কাপ্তেন সারলাক বলিল, “আপনার আদেশ স্বরণ থাকিবে মহাশয়!”—অনন্তর সে নাজী-প্রথায় কাউন্টকে অভিবাদন করিয়া মেরী সহ দ্বারপ্রান্ত হইতে অদৃশ্য হইল।

কাপ্তেন সারলাক ও মেরীর প্রস্থানের পর পাকশালার দ্বার রুদ্ধ হইলে কাউন্ট জোলার্ণ তাঁহার সিগারেট-কেশ বাহির করিয়া একটি সিগারেট মুখে গুঁজিলেন, এবং দিয়াশলাইয়ের কাঠি জালিয়া তাহা ধরাইয়া-লইয়া অগ্নি-কুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ তখন একরূপ গম্ভীর ও মুখের ভাব একরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল যে, আগসের কি ক্রটি হইয়াছিল, এবং তাহাকে তাঁহার কি বলিবার ছিল—তাহা বুঝিতে না পারায় আমি বডই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

মিনিটের পর মিনিট ধীরে-ধীরে অতিবাহিত হইতে লাগিল; অবশেষে কাউন্ট গম্ভীর ভাবে কি ভাবিতে ভাবিতে এবং ভারী বুটের ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতে করিতে টেবলের নিকট আসিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ইহার দুই-এক মিনিট পরেই পাকশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; এবং কাপ্তেন সারলাক ছয় জন দীর্ঘদেহ, ভীমকাস্তি নাজী নাবিক ও আমস্ সহ পাকশালায় প্রবেশ করিল।

আমস্ দ্বারের নিকট দাঁড়াইতেই কাউন্ট জোলার্ণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, “ক্রোবি, এখানে এসো।”

ক্রোবি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া টেবলের নিকট আসিয়া নীরস স্বরে বলিল, “আমাকে তোমার কি বলিবার আছে?”

কাউন্ট আমসের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “হ্যান্স পিলসেন নামক কোন লোককে চেন তুমি?”

আমস্ সবেগে মাথা নাড়িয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “না, চিনি না; ঐ নামও কোন দিন শুনি নাই।”

কাউন্ট বলিলেন, “আমি তোমাকে চিনাইয়া দিতেছি। কাপ্তেন স্ট্রিনম্যানের বোট যখন এই আড্ডায় ধোরাক লইতে আসিয়াছিল, সেই সময় এই নৌ-সৈনিক তাহার বোট পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া তোমার এখানে

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সময় পঁচিশ পাউণ্ড তাহার নিকট সঞ্চিত ছিল। সেই টাকা কোথায় তাহা তুমি জান; তথাপি তুমি কি এখনও বলিবে—তাহাকে চিনিতে না?”

কাউন্টের কথা শুনিয়া আমস্ মস্তক অবনত করিল; ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, এবং দাঁতে দাঁত বাধিয়া ঠক্-ঠক্ শব্দ হইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল—এই পলাতক নৌ-সৈনিক তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সে তাহার সঞ্চিত পঁচিশ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছিল, এবং তাহাকে বড়-দেশে রাখিয়া আসিবে, এইরূপ আশা দিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাহাকে নির্জজন পার্বত্য দ্বীপে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিল, এ সকল সংবাদ কাউন্ট জোলার্ণের অজ্ঞাত নহে! আমি এবং মেরী ‘ইউ’-বোটের কাপ্তেনের নিকট এ কথা প্রকাশ করিয়া-ছিলাম, আমস্ তাহা জানিত না; কিন্তু আমাদের নিকট সংবাদ পাইয়া একখানি ‘ইউ’-বোটের কাপ্তেন সেই দ্বীপ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া জার্মানীতে লইয়া গিয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম।

পলাতক জার্মানটার কথা আমসের বিলক্ষণ স্বরণ ছিল; কিন্তু তাহা কাউন্টের নিকট স্বীকার করিতে তাহার সাহস হইল না। সে মুখ বুজিয়া অবনত মস্তকে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কাউন্ট জোলার্ণ তাহাকে নীরব দেখিয়া গর্জন করিয়া বলিলেন, “আমার প্রশ্নের উত্তর দাও; বোবার মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? তুমি তাহাকে চিনিতে?”

আমস্ ঢোক-গিলিয়া বাধ-বাধ স্বরে বলিল, “আ-আমি তা-তা-তাহাকে চি-চিনিতাম বটে; তা-তা এ খবর তু-তুমি কাহার নিকট জা-জানিতে পারিয়াছ? আ-আমি—”

কাউন্ট তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, “আমি যাহা পড়িতেছি—শোন।”

তিনি পকেট হইতে একখানি ভাঁজ-করা পুরু কাগজ বাহির করিলেন, এবং তাহার ভাঁজ খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

“ক্লীন রেঞ্জ”

৫ই ডিসেম্বর।

“টর্পেডো বিভাগের সৈনিক হ্যান্স পিলসেন শত্রু-পক্ষের সীমান্তকর্ত্তী জলপথে বোট হইতে পলায়নের

অপরাধে উইলহেমস্‌ভেনের নৌ-সামরিক আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হওয়ায়, গত ৩রা ডিসেম্বর ক্লীনের 'রাইফেল-রেঞ্জ' এক দল রিজার্ভ সৈনিকের গুলীতে নিহত হইয়াছে।"

পাঠ-শেষে কাউন্ট জোলাণ কাগজখানি পূর্ববৎ ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন; তাহার পর তীব্রদৃষ্টিতে আমসের মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "সেই লোকটিকে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহার নিকট হইতে তুমি যে পঁচিশ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছ, সে টাকা কোথায়?"

আমস্ আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "সে টাকা আমি তোমাদের জন্তই গচ্ছিত রাখিয়াছি। উদ্দেশ্য আমার ভালই ছিল। তা তোমরা কিরূপে সেই হতভাগাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলে?"

কাউন্ট জোলাণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহা তুমি কোন দিন জানিতে পারিবে না। জার্মানীর চক্ষু সর্বত্র-ব্যাপী—এ-সংবাদ কি তোমার অজ্ঞাত? আমস্ ফ্রোবি, এই অপকর্মে তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা অতি কঠোর দণ্ডের যোগ্য। তোমাকে এই দণ্ডদানের জন্ত, এবং ভবিষ্যতে তুমি আমাদের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না কর, এ বিষয়ে তোমাকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে; এখানে আসিয়া আমি তোমার কার্যপ্রণালী এ কয় দিন সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়াছি। এখন তোমাকে তোমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।"

অতঃপর কাউন্ট জোলাণের আদেশে নাজী নাবিকরা আমসের পাকশালার পশ্চাদ্ভর্তী আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া তিন খণ্ড শক্ত কাঠ সংগ্রহ করিল, এবং ঐ তিনখানি কাঠ তেকাঠার আকারে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিল। নাজী নাবিকের দল আমসের পাকশালা হইতে তাহাকে টানিতে টানিতে সেই তেকাঠার নিকট লইয়া গেল, এবং সে বিকট চিংকারে বাধা দান করিলেও তাহারা তাহাকে সেই 'টিকটিকি'র উপর ফেলিয়া, তাহার হাত-পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল।

নাজী নাবিকরা এইবার আমসের কটিদেশের পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া তাহাকে প্রায় বিবস্ত্র করিয়া ফেলিল।

তাহার পর চন্দ্রনির্মিত গ্রহিবিশিষ্ট কঠিন চাবুক দ্বারা সবেগে তাহার অঙ্গসেবা আরম্ভ করিল। প্রত্যেক বার আঘাতে তাহার অঙ্গের বিভিন্ন অংশ দড়ার স্থায় ফুলিয়া উঠিয়া স্থানে স্থানে শোণিতরাশি উৎসারিত হইতে লাগিল। আমস্ সেই স্তূদৃত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল; কাউন্ট জোলাণকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে লাগিল। কিন্তু নাজী নাবিকরা তাহার আর্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া কাউন্টের কঠোর আদেশ পালন করিল। আমি আমসের কষ্ট দেখিতে না পারিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলাম, এবং তাহার আর্তনাদ অসহ্য হওয়ায় কাণে আঙ্গুল গুঁজিয়া এই কঠোর নির্যাতনের নিরন্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সেই রাত্রেই ভীষণপ্রকৃতি কাউন্ট জোলাণ 'ইউ'-বোটে জার্মানীতে প্রস্থান করিলেন। আমস্ ফ্রোবি ব্র্যাকগল ফান্সের পাকশালায় পড়িয়া থাকিয়া আঘাত-যন্ত্রণায় ইঁপাইতে লাগিল। দীর্ঘকাল তাহার নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। বেদনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ টাটাইতে লাগিল, এবং আঘাত-স্থানগুলি ভয়ানক ফুলিয়া উঠিল। বলিষ্ঠ নাজী নাবিকগুলা দেহের সকল শক্তিপ্রয়োগে তাহাকে চাবুক মারিয়াছিল; এই নির্ভুর ব্যবহারে তাহাদের মনে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় নাই।

যাহা হউক, আমসের আর্তনাদ ঈশ্বর হ্রাস হইলে আমি ও মেরী তাহাকে পাকশালার মেঝে হইতে তুলিয়া, ধরাধরি করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে লইয়া চলিলাম। ইহার পর কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে ধীরে ধীরে তাহার বেদনার উপশম হইল; কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহার উঠিয়া চলিবার সামর্থ্য না হওয়ায় সে পাহারার জন্ত সাগরকূলে যাইতে পারিল না। একত্র আমি ও মেরী তাহার পরিবর্তে সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত সাগর-বেলায় বসিয়া 'ইউ'-বোটের প্রতীক্ষায় পাহারা দিতে লাগিলাম।

পলাতক নৌ-সৈনিকটির প্রতি আমস্ যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, সে কথা তাহার শত্রুপক্ষের নিকট আমিই প্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলাম; একত্র আমস্কে এই প্রকার কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইল। মনে মনে এ কথার আলোচনা করিয়া আমার মন অনুশোচনার পূর্ণ

হইল। পলাতক নৌ-সৈনিকটির প্রাণরক্ষা হইলেও আমার সান্ত্বনা লাভের একটু উপায় থাকিত ; কিন্তু জার্মান-সরকার তাহাকে গুলী করিয়া মারিল, অথচ আমসেরও নির্ঘাতনের সীমা রহিল না ! আমস আমার প্রতি যতই অশ্রদ্ধা ও নির্ভর ব্যবহার করুক, সে আমায় প্রতিপালক ও রক্ষক ; অথচ আমি তাহার নির্ঘাতনের উপলক্ষ হইলাম !

মেরী সারা রাত্রি জাগিয়া সাগর-কূলে পাহারায় থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রীতিকর বলিয়া আমার মনে হইল। মেরীর পরিবর্তে আমিই সারা রাত্রি পাহারায় থাকিবার সঙ্কল্প করিলাম। আমার তাহাতে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না ; কারণ, আমি প্রত্যহ দিবাভাগে দীর্ঘকাল ঘুমাইয়া লইতাম। কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়াও মেরীকে নিষ্কৃতি দান করিতে পারিলাম না। রাত্রিকালে আমি সমুদ্রকূলে পাহারা দিতে বসিলেই মেরী সেখানে উপস্থিত হইত, এবং আমার সঙ্গে জাগিয়া পাহারা দিত। আমরা সাগর-বেলায় বালুকার একটি স্তূপের উপর বসিয়া নিদ্রাহীন নেত্রে দীর্ঘরাত্রি অতিবাহিত করিতাম। কিন্তু সময় কাটাইতে আমাদের তেমন কষ্ট হইত না : কারণ, আমরা লেফটেনাণ্ট হ্যাগেন, নাজী জার্মানী, এই যুদ্ধে হিটলারের পরাজয় হইলে জার্মানীর অবস্থা কিরূপ হইবে, জার্মান ‘ইউ’-বোটের বোম্বটেগিরি আর কত দিন চলিবে—ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে গল্প করিয়া শ্রান্তি-বোধ করিতাম না, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনাকষ্টেই অতিবাহিত হইত।

এক দিন রাত্রিকালে আমি একাকী সমুদ্রতটে বসিয়া পাহারা দিতে দিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষে চাহিয়া গাঢ় রক্তবর্ণ একটা আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলাম। উহা ‘ইউ’-বোটের আলোক—ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি হরিকেন লণ্ঠনটা উর্দ্ধে তুলিয়া আন্দোলিত করিলাম। কিছু কাল পরে লেফটেনাণ্ট রথভেন ‘ইউ’-বোটের এক-খান ডিঙ্গী লইয়া তীরে আসিয়া নামিল।

লেফটেনাণ্ট রথভেনকে আমার অদূরে ডিঙ্গী হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া আমি বালুকা-স্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দেখিয়া লেফটেনাণ্ট বলিল, “হাল্লো পিটার ! তুমি পাহারায় আছ দেখিতেছি, আমস কোথায় ?”

আমি বলিলাম, “তাহার শরীর ভাল নাই, এজন্য সে পাহারায় আসিতে পারে নাই : কিন্তু কাজ ত বন্ধ থাকিতে পারে না, এজন্য এ সময় পাহারার পালা আমসের হইলেও তাহার কাজ আমাকেই করিতে হইতেছে।”

রথভেন বলিল, “আমসের শরীর ভাল নাই ? এ যে তোমার মুখে নূতন কথা শুনিতেছি ! লোহার মতো শক্ত তাহার দেহ ; কোন দিন তাহাকে অসুস্থ দেখি নাই। তাহার অসুখটা কি ?”

কথাটা রথভেনের নিকট প্রকাশ করিব কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। শেষে মনে হইল—তাহার নিকট সত্য কথা প্রকাশ করায় কোন ক্ষতি নাই ; বিশেষতঃ, সংবাদটা তাহার নিকট গোপন থাকিবে না, আমি না বলিলেও মেরী তাহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিবে। এই জন্য আমস কাউন্ট জোলাণের আদেশে কি কারণে চাবুক খাইয়াছে, এবং কঠোর প্রহারে তাহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই লেফটেনাণ্ট রথভেনের নিকট বিবৃত করিলাম। কোন কথা গোপন করিলাম না।

লেফটেনাণ্ট রথভেন স্তব্ধবিশ্বয়ে আমার সকল কথাই শ্রবণ করিল, সে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিল না। কিন্তু আমার কথা শেষ হইলে সে শিস্ দিয়া উঠিল, এবং উৎসাহভরে বলিল, “শয়তানটা তাহার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করিয়াছে। কাউন্ট জোলাণের ব্যবহারে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশে তাঁহাকে কে না জানে ? জার্মান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের মধ্যে তাঁহার ঞ্জয় নিয়মনিষ্ঠ লোক আর এক জনও আছেন কি না সন্দেহের বিষয়। তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ ; এজন্য সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। জার্মানীর নৌ-বিভাগ তাঁহার কঠোর শাসনে সন্ত্রস্ত। যাহা হউক, চাবুকের আঘাতে বেচারী অর্জ্জ্বরিত হইয়াছে শুনিয়া আমি দুঃখিত হইলাম।”

আমি বলিলাম, “আমস প্রথম হইতেই তাঁহাকে তাঁহার পদোচিত সম্মান প্রদর্শন করে নাই বলিয়া তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন ; তাহার উপর পলাতক জার্মান নাবিকটার প্রতি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সে তাহার সঞ্চিত টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহার

প্রমাণ পাইয়া তিনি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে অশিষ্ট ভাষায় আক্রমণ করিয়া আমস্ পূর্বেও তাঁহার ঘৃসি খাইয়াছিল; কিন্তু তথাপি তাহার শিক্ষা হয় নাই। তোমাদের প্রতি সে অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছে।”

লেফ্টেন্যান্ট রথভেন হাসিয়া বলিল, “আমসের মতো অর্থলোলুপ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়! আমাদের ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে। টাকার জন্ত সে সকল কুকর্ষই করিতে পারে। টাকার লোভেই সে স্বদেশ-দ্রোহিতা করিয়া আমাদের সাহায্য করিতেছে; ইহাতে আমরা উপকৃত হইলেও তাহার এই ফিকির দীর্ঘকাল চলিবে না। তোমার ও মেরীর ভাগ্য কি আছে ভাবিয়া আমার মন উদ্বেগে পূর্ণ হইয়াছে। যাহা হউক, মেরী এখন কোথায়?”

আমি বলিলাম, “আমি তাহাকে পাকশালায় দেখিয়া আসিয়াছি।”

লেফ্টেন্যান্ট বলিল, “আমি আমার ‘ইউ’-বোটের খোরাক সংগ্রহ করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। আর এক কথা; আমার ভাই ও লেফ্টেন্যান্ট হ্যাগেনের এখানে আসিবার কথা ছিল, তাঁহারা আসিয়া-ছিলেন কি?”

আমি বলিলাম, “না। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহারা এই দ্বীপে আসেন নাই।”

লেফ্টেন্যান্ট বলিল, “তাহা হইলে তাঁহারা আজ-কালের মধ্যেই এখানে আসিবেন। আমরা প্রায় একই সময়ে উইলহেমসভেন হইতে যাত্রা করিয়াছি; তাঁহাদের এখানে পৌঁছিতে আর অধিক বিলম্ব হইবার কথা নয়।”

যে সকল নাবিক তাহার ডিক্সী লইয়া সমুদ্রতটে আসিয়াছিল, তাহারা তখন পর্যন্ত ডিক্সী লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। লেফ্টেন্যান্ট রথভেন তাহা-দিগকে আড্ডা হইতে ‘ইউ’-বোটের খোরাক সংগ্রহ করিয়া বোটে লইয়া যাইতে আদেশ করিল। সেই রাত্রে আকাশ পরিষ্কার এবং সমুদ্র স্থির ছিল, বায়ুর বেগও প্রবল ছিল না; এই জন্ত তাহাদের কার্য শেষ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না, এবং তাহাতে তাহারা

কোনরূপ বাধাও পাইল না। তাহাদের আরক কার্য শেষ হইলে লেফ্টেন্যান্ট তাহাদিগকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমসের পাকশালায় চলিল। আমি তাহার অঙ্গুরণে উত্তত হইলে সে বলিল, “না পিটার, এখন তুমি বাড়ী ফিরিও না, তুমি আমার ডিক্সীর কাছে অপেক্ষা কর; আমার ভাই অথবা অল্প কেহ কোন বোটে হঠাৎ এখানে আসিয়া সাক্ষাতিক আলো দেখাইতে পারে।”

লেফ্টেন্যান্ট রথভেনের এ কথা সঙ্গত মনে করিয়া আমি তাহার সঙ্গে ঘরে যাইবার জন্ত আর আগ্রহ প্রকাশ করিলাম না, তাহার ডিক্সীর নিকট বসিয়া রহিলাম। লেফ্টেন্যান্টের আদেশে ‘ইউ’-বোটের যে দুই জন নাবিক ডিক্সীতে বসিয়াছিল, তাহারা লেফ্টেন্যান্টের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিল; কিন্তু আমি তাহাদের কোন কথা বুঝিতে পারিলাম না।

কয়েক মিনিট পরে এক জন নাবিক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কাউন্ট জোলার্নের আদেশে আমসকে চাবুক মারা হইয়াছিল বলিয়াছ, এ কথা কি সত্য?”

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি লেফ্টেন্যান্ট রথভেনকে আমসের শাস্তি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, নাবিকর ডিক্সীতে বসিয়া তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি কোন কথা গোপন না করিয়া সকল কথাই প্রকাশ করিলাম। আমার কথা শুনিয়া এক জন নাবিক বলিল, “আমসের জায় বিশ্বাসঘাতকের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।”—দ্বিতীয় নাবিক বলিল, “যে নাবিকটি তাহার ‘ইউ’-বোট ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সে পরে ধরা পড়ায় নো-সামরিক আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পলায়নের জন্ত তাহার দোষ দেওয়া যায় না। যুদ্ধে তাহার বিতৃষ্ণা হইয়াছিল, এবং সাবমেরিণে দীর্ঘকাল আটক থাকায় ধৈর্য ধারণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল; বিশেষতঃ, হিটলার দেশের সকল লোকের উপর কর্তৃত্ব করিয়া তাহাদিগকে যেরূপ কঠোর শাসনে রাখিয়াছে, দেশের লোকগুলিকে নানা প্রকার অভাবের কষ্ট সহ করিতে বাধ্য করিয়া বহুবিধ করতারে যে ভাবে তাহাদিগকে



১৫৪. ১৫৪. ১৫৪. ১৫৪. ১৫৪.

১৫৪. ১৫৪.

১৫৪. ১৫৪.

নিষ্পেষিত করিতেছে, তাহাতে অনেকে যে হিটলারের অত্যাচারে ক্ষেপিয়া উঠিবে, ইহাতে বিশ্বয়ের কোন কারণ নাই। হিটলার তাহাদিগকে—জার্মান জাতিকে বড় করিতে চাহে। সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদিগকে প্রাধান্য-দানের জন্ত সে দেশে দেশে যে আগুন জালিয়া তুলিয়াছে, সেই আগুনে যদি তাহাদের ধন-প্রাণ, সুখ-শান্তি পুড়িয়া ভস্ম হয়—অনাহারে তাহাদিগকে মরিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সুখের আশা করিয়া লাভ কি?—জার্মানীর জনসাধারণের মনের ভাব এই নাবিকদের কথায় পরিস্ফুট হইল। কিন্তু তাহাদের মনের কষ্ট স্বদেশে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে, সেটুকু স্বাধীনতাও তাহাদের ছিল না। তাহাদের ঘরে-বাহিরে সর্বত্র সরকারের গোয়েন্দা তাহাদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছে; এজন্য ইংলণ্ডের সমুদ্রকূলে আসিয়া তাহারা প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিতে সাহসী হইয়াছিল।

তাহারা উভয়ে এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল, সহসা তাহাদের এক জন মাথা তুলিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চাহিল, এবং মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল, “কোনও শব্দ শুনিতে পাইতেছ? কাণ পাতিয়া শোন ত।”

নাবিকের কথা শুনিয়া আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে সমুদ্রের বিশাল বারি-বিস্তারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নাবিক-দ্বয়ও স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বহু দূর হইতে ঘস্-ঘস্ শব্দ আমাদের শ্রবণ-গোচর হইল; অত্যন্ত অস্ফুট শব্দ। সমুদ্র-বক্ষ হইতে নৈশবায়ু-প্রবাহে এই শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কিসের শব্দ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

এক জন নাবিক উত্তেজিত স্বরে বলিল, “কোনও জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ!”—নাবিকটি তৎক্ষণাৎ ডিঙ্গী হইতে জলের কিনারায় লাফাইয়া পড়িয়া আমার সম্মুখে আসিল, এবং আমার হাত ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, “সম্ভবতঃ ইংরেজের কোন পাহারার জাহাজ সমুদ্রে ঘুরিয়া পাহারা দিতে দিতে এই দিকে আসিতেছে; এখানে আমাদের বোটের সন্ধান পাইলেই সর্বনাশ! তুমি দৌড়াইয়া বাড়ী যাও, লেফটেন্যান্টকে এ সংবাদ জানাইতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না। যাহা

করিতে হয়—তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়া তাহা তিনি করুন।”

বলা বাহুল্য, আমার আর কোন কথা শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। ‘ইউ’-বোট আক্রান্ত হইলে আমাদেরও সর্বনাশ ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। উহা যে কোন বৃটিশ ‘প্যাট্রল বোট’র ইঞ্জিনের শব্দ, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমসের হৃৎকিতায় না জানি আমরা কি বিপদেই পড়িব—ভাবিয়া আমি রুদ্ধনিশ্বাসে বাড়ীর দিকে দৌড়াইতে লাগিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাকশালার দ্বারে উপস্থিত হইলাম, এবং রুদ্ধদ্বার খুলিয়া-ফেলিয়া দেখিতে পাইলাম—লেফটেন্যান্ট রথভেন অগ্নি-কুণ্ডের অদূরে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে মেরীর সহিত গল্প করিতেছিল।

আমি ব্যাকুল স্বরে বলিলাম, “লেফটেন্যান্ট রথভেন, সমুদ্রতট হইতে কিছু দূরে একখানা জাহাজের সাড়া পাওয়া গিয়াছে; ডিঙ্গীর নাবিকদের আশঙ্কা, উহা বৃটিশ প্যাট্রল-বোট। তাহাদের এই অসুমান সত্য হইলে—”

আমার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্বেই লেফটেন্যান্ট রথভেন মেরীর মুখের দিকে আর ফিরিয়া না চাহিয়া ঝড়ের মত বেগে পাকশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া তাহার ডিঙ্গীর নিকট উপস্থিত হইল।

লেফটেন্যান্ট পাকশালা ত্যাগ করিলে আমিও দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম; কারণ, লেফটেন্যান্ট তাহার ডিঙ্গীর নিকট আসিয়া কি করে, তাহা দেখিবার জন্ত আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, জাহাজখানি যদি সত্যই বৃটিশ ‘প্যাট্রল-বোট’ হয়, ও তাহা জার্মান ‘ইউ’-বোটখানির সন্ধান পায়—তাহা হইলে অতঃপর কি কাণ্ড ঘটে, তাহা জানিবার জন্ত ব্যাকুল হওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু আমি যথাসাধ্য দ্রুতবেগে দৌড়াইয়াও লেফটেন্যান্ট রথভেনকে ধরিতে পারিলাম না। আমি সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া দেখি—লেফটেন্যান্ট তাহার ডিঙ্গীতে উঠিয়া একরূপ বেগে ডিঙ্গী চালাইতেছিল যে, তাহা সমুদ্রবক্ষে ভাসমান ‘ইউ’-বোটের নিকটস্থ হইয়াছিল বলিয়াই আমার মনে হইল। আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের কোন অংশে ‘ইউ’-বোটখানি দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু

তাহা কি ইংরেজের জাহাজের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে?—আমি রুদ্ধনিশ্বাসে সমুদ্র-কূলে দাঁড়াইয়া রহিলাম; আমার বুকে যেন হাতুড়ী পড়িতে লাগিল।

আরও কয়েক মিনিট জাহাজের ইঞ্জিনের সেই ঘস্-ঘস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম; আমার মনে হইল, জাহাজ-খান দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের দ্বীপ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল; কিন্তু তাহা আমাদের নিকটে আসিল না, তাহার ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া বায়ুপ্রবাহে মিশিয়া গেল।

আমি বুঝিতে পারিলাম, লেফটেন্যান্ট রথভেন সেই জাহাজের ভয়ে 'ইউ'-বোট সহ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। সেই রাত্রে আর তাহার আবির্ভাবের সম্ভাবনা না থাকায় আমি সমুদ্রতট হইতে পাকশালায় ফিরিয়া আসিলাম।

মেরী পাকশালায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল: সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলে আমি বলিলাম, “জাহাজখানা চলিয়া গিয়াছে মেরী! সৌভাগ্যক্রমে তাহা আমাদের দ্বীপের নিকট আসে নাই।”—হঠাৎ লেফটেন্যান্ট রথভেনের কথা স্মরণ হওয়ায় মেরীকে বলিলাম, “লেফটেন্যান্ট রথভেন আমাকে বলিয়া গিয়াছে—তাহার ভাই ও ছাগেন আজ রাত্রেই এখানে আসিতে পারে; তাহারা একত্র উইলহেমসভেন হইতে যাত্রা করিয়াছিল।”

মেরী বলিল, “সে কথা আমি শুনিয়াছি; রথভেন আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে।”

আমি বলিলাম, “তাহা হইলে এখনই সমুদ্র-কূলে আমার যাওয়া উচিত, কারণ, এই রাত্রেই তাহারা আসিয়া-পড়িতে পারে।”

মেরী বলিল, “হাঁ, যাওয়াই উচিত; কিন্তু তুমি কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।”

আমি মেরীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম; সে গরম কোটটা পরিয়া লইল। কয়েক মিনিট পরে আমরা সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া প্রভাতকাল পর্যন্ত সেখানে পাহারায় রহিলাম; কিন্তু সেই রাত্রে আর কোন 'ইউ'-বোট সেখানে আসিল না।

পূর্ব আকাশ উবালোকে সুরঞ্জিত হইলে আমি হরিকেন লণ্ঠনটা তুলিয়া-লইয়া বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিতেছিলাম, সেই সময় মেরী হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল, “পিটার, ঐ দিকে চাহিয়া দেখ।”

আমি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া-দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিতেই সমুদ্রকূল হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে একখানি 'ইউ'-বোটের কোণাকৃতি 'টাউয়ারে' অরুণ-কিরণ প্রতিফলিত দেখিলাম; কয়েক মিনিট পরেই তাহার রক্ষণ সূদীর্ঘ ডেক স্পষ্টরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আমি সেই 'ইউ'-বোটের খেতবর্ণ নম্বর চিনিতে পারায় মেরীকে বলিলাম, “উহা কাপ্তেন ভন রথভেনের লোটই বটে; ছাগেন ও কাপ্তেন রথভেন ঐ বোটে আসিতেছে।”

আরও কয়েক মিনিট পরে 'ইউ'-বোটের টাউয়ারের উপর কয়েক জন আরোহীকে দণ্ডায়মান দেখিলাম; তাহাদের মস্তক ও মুখের অধিকাংশ বস্ফাচ্ছাদিত। তাহারা সমুদ্র-বেলায় আমাদিগকে দণ্ডায়মান দেখিয়া ক্রমাল উড়াইয়া অভিবাদন করিল; আমরাও ঐ ভাবে প্রত্যভি-বাদন করিলাম। অতঃপর 'ইউ'-বোটখানি সমুদ্র-বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, “উহারা ঐ ভাবে বোটের ভিতর বায়ু গ্রহণ করিতেছে; শীঘ্রই উহা সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এবং সন্ধ্যার পূর্বে আর সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিবে না। মেরী, আজ রাত্রে ছাগেনের সঙ্গে তোমার দেখা হইবে।”

মেরী উল্লাসভরে বলিল, “হাঁ, আজ রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা হইবে। চল, এখন বাড়ী ফিরিয়া যাই; প্রাতর্ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর ছাগেনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। আজ আমার সুপ্রভাত!”

মেরী উৎসাহভরে বাড়ীর দিকে চলিল; আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু সেই জাহাজখানির ইঞ্জিনের শব্দ শুনিয়া আমার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছিল; রাত্রিকালে হঠাৎ কোন বিপদ ঘটতে পারে—এই আশঙ্কায় আমার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিজ্ঞান-জগৎ

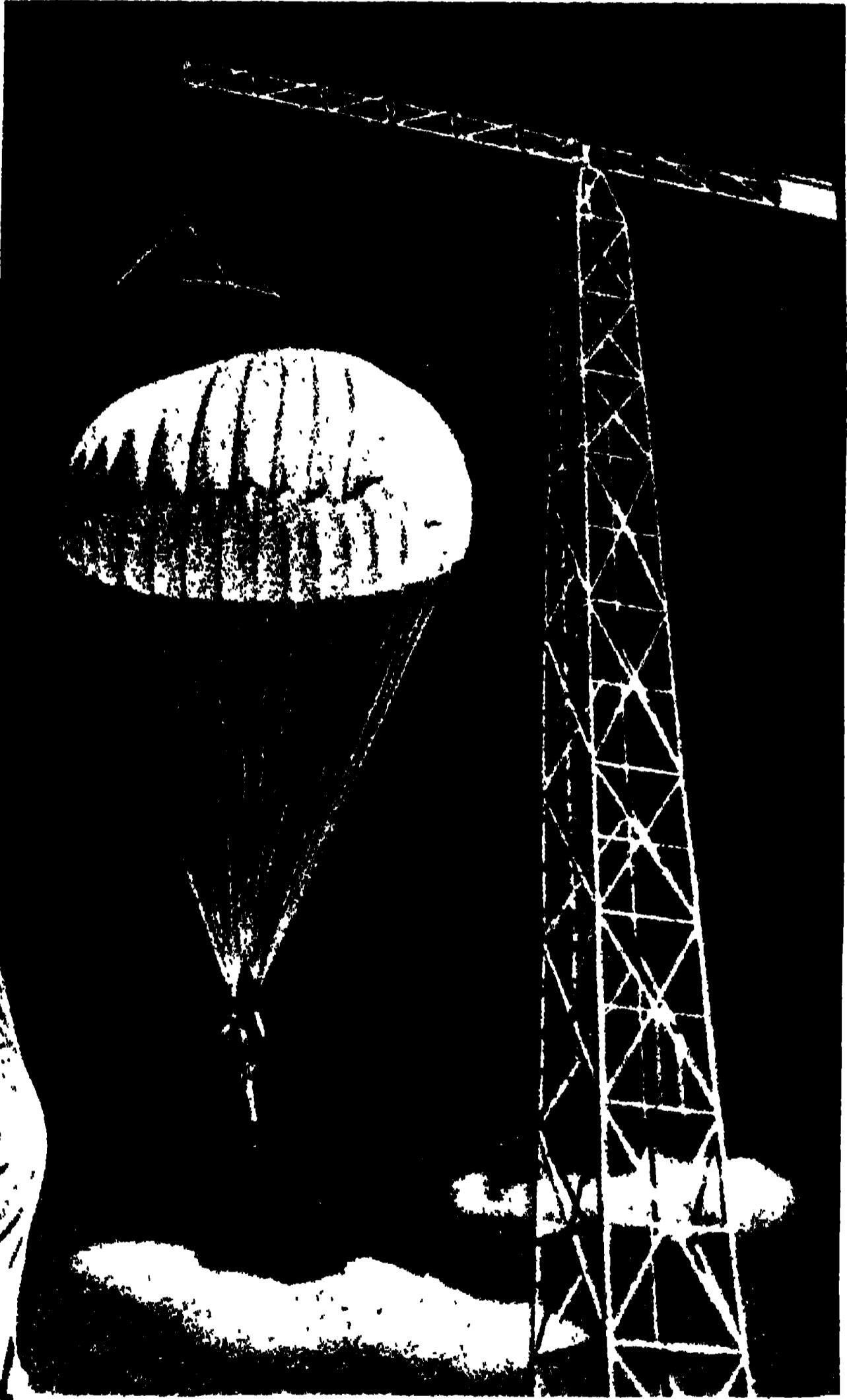
প্যারাসুট-বাহিনী

স্বাধীন প্যারাসুট-বাহিনীর কার্য-তৎপরতা দেখিয়া আমেরিকার ফৌজ-বিভাগে এক দল প্যারাসুট-বাহিনীর (Parachute Troops) সৃষ্টি হইয়াছে। এ-দলে এখন আছেন দু'জন অভিনায়ক এবং আটচল্লিশ জন সেনা। ফোর্ট বেনিংয়ের ভলান্টিয়ার-দল হইতে এ-বাহিনীর সৃষ্টি। সম্প্রতি এ-দলের শিক্ষার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল শুভ; কাজেই এখন হাজার-হাজার সেনাকে এই প্যারাসুট-বিজ্ঞা শিখানো হইবে, স্থির হইয়াছে। দলটি বিমান-পদাতিক নামে অভিহিত হইবে। এ-দলের



বর্ষাবরণ খাঁটা

সেনাদের শিক্ষার জন্য হার্টস্-টাউনে ১২৫ ফুট উচু টাওয়ার নির্মিত হইয়াছে; টাওয়ারের সঙ্গে একটি ঢাকনি-খোল সংলগ্ন আছে। এই ঢাকনির নীচে প্যারাসুট রাখা হয়—ঢাকনির



ঢাকনির নীচে প্যারাসুট

আচ্ছাদনের জন্ত প্যারাসুটটি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িবে নড়িবে, সে সম্ভাবনা নাই।

এ বিদ্যার প্রথম পর্কে তার দিয়া সুরক্ষিত খোলা প্যারাসুট-সাহায্যে শিক্ষার্থীকে উচ্চ কোনো স্থান হইতে ঝাঁপ খাইতে হয়। ছাতার যেমন শিক এবং সেই শিকে ছাতা যেমন খোলা থাকে, প্যারাসুটও তেমনি ঐ তারের বন্ধনীতে খোলা থাকে; কাজেই শিক্ষার্থীদের পক্ষে পড়িয়া হাত-পা ভাঙ্গিবার বিদ্যুৎ

আশঙ্কা নাই। প্যারাশুটের তলদেশে বসিবার জন্য দোলনা বা আসন নাই; শিক্ষার্থীকে মজবুত এক-রকম বর্মাবরণ পরানো হয়; সে-জন্ত প্যারাশুট ধরিয়া মাটিতে নামিলে আঘাত লাগিবে না, অথচ ভূমি-স্পর্শজনিত প্রথম যে তীব্র রকমের অস্থিত্ব, সেটুকুও নিরাপদে অভ্যাস হইবে। দ্বিতীয় পর্কে শিক বা তার-বিহীন খোলা প্যারাশুটযোগে ভূমে অবতরণ-

সহরের বাহিরে হেড লাইট জ্বালা অত্যাৱশ্যক। মোটর চালাইয়া শশীবাবু চলিয়াছেন উত্তর-মুখে—দক্ষিণ দিক হইতে রবিবাবু আসিতেছেন। দু'জনেই মোটরে হেড-লাইট জ্বালিয়াছেন। একের গাড়ীর হেড-লাইটের দীপ্তিতে অপরের চোখ বলসিয়া চোখে ধাঁধা লাগিবে; একত্র রাতে মোটর চালাইবার সময় ড্রাইভারের চোখে ব্যবহারের জন্ত তারের বুনানিযুক্ত জালি পরুকলা তৈয়ারী হইয়াছে। চশমার ক্রেমে এই জালি-পরুকলা আঁটিয়া চোখে দিয়া গাড়ী চালান—চোখের উপর যে-আবরণ রচিত হইবে, তাহাতে পথ দেখিতে পাইবেন; অথচ অপরের



মাটিতে নামিয়া প্যারাশুট হইতে বাতাস-ঝরানো



জালি-চশমা

অভ্যাসের পালা। এ সময় বাতাসের গতি বুঝিয়া শিক্ষার্থী তাঁর প্যারাশুটটিকে এদিকে-ওদিকে যথেষ্ট পরিচালনা করিতে পারেন। এ-পর্কে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষক থাকেন; তিনি প্যারাশুট-চালনার ইঙ্গিত শিখাইয়া দেন। তৃতীয় বা শেষ পর্কে মোড়া প্যারাশুট লইয়া অভ্যাসের পালা। শিক্ষার্থীকে এ সময়ে ঝাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যারাশুটটিকে খুলিয়া কায়দা-মাসিক চালনা করিতে হয়। পাছে বিঘ্ন ঘটে, একত্র সেফটি-তারের সাহায্যে তাঁকে অক্ষত দেহে মাটিতে নামাইবার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্কে শিক্ষালাভের সময় প্যারাশুটের তলদেশে শিক্ষার্থীকে বসিতে হয়—বসিবার জন্য দোলনার মতো আসন বাধা আছে।

নিশীথে মোটর-চালনা

রাতে মোটর চালাইবার সময় গাড়ীর হেড-লাইট না জ্বালিলে চালকের গা প্রতি-পদে ছমছম করে। সহরের পথে আলো আছে—সে-জন্ত হেড-লাইট জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। হেড-লাইটের জ্যোতিতে সহরের পথে পথিক বা মোটর-চালকের চোখ বলসিয়া যায়, তাহাতে অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিতে পারে বলিয়া রাতে সহরের পথে মোটরে হেড-লাইট জ্বালা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং সে-অপরাধে আদালতে জরিমানার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু

গাড়ীর হেড-লাইটের তীব্র আলোর চোখে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

মাটির টবে

মাটির টবে ফুলের বা পাতা-বাহার গাছ পুঁতিয়া বসিবার বা শুইবার যের সে টবে রাখিতে অনেকে কেমন কুঠা বোধ করেন—কালো



মাটির টবের মাটা ঢাকা

মাটির 'নীচতা'র জন্য। তাঁরা যদি টবের গা পেইন্ট করিয়া লন, তাহা হইলে মাটির মাটি ঢাকা পড়িয়া টবে বাহার খুলিবে। টবে পেইন্ট লাগাইলে টবের গা দিয়া জল চুঁইবে না, জল পড়িবে না।

গলা-কাচে ফুঁ

আমাদের এই সহর কলিকাতায় সিঁ ছুরিয়াপটা অঞ্চলে কাচ গলাইয়া সেই গলা কাচে ফুঁ দিয়া অশিক্ষিত দেশীয় কারিগরের দল

কাজে আমেরিকা আজ বিশেষ রকম মূল্যিয়ানা দেখাইতেছে। সেখানে অনেকে কল-কারখানার তোয়াক্কা না রাখিয়া কাচে ফুঁ দিয়া বিচিত্র কৌশলে ঘর সাজাইবার জন্ত নানা রকম পল্ল-পল্লী, অল্প টুকিটাকি আসবাব প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছেন। তাঁদের



কাচের নলে ফুঁ



গলা কাচে হরিণের খোঁবা ও শিং



এবারে আস্ত হরিণ

একদা আতরের ফুকা শিশি, টেট-টিউব, চুঙ্গি-গ্রাশ তৈয়ারী করিয়া জীবিকার্জন করিত। বিজলী বাতির প্রাচুর্য্যবের পূর্বে দেখিয়াছি, তাদের হাতের চুঙ্গি-গ্রাশ দীপ-দানের উৎসবকে দীপ্তিসমৃদ্ধ করিত। সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময় দীপালী-উৎসবে তাদের

সৃষ্টি-কৌশলের একটু পরিচয় পাশের ক'খানি ছবিতে পাওয়া যাইবে।

কাপড়ে ফটোগ্রাফ

ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞেরা ফটোগ্রাফের এমন উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন যে, তার ফলে রুমালে, বাতিশের ওয়াড়ে, জামায়—অর্থাৎ যে



ফুঁয়ের জোরে কাণ ও শিং

হাতের হাজার-হাজার চুঙ্গি-গ্রাশে দীপ জালিয়া এই কলিকাতা সহরকে যে আলোর মালায় সাজানো হইয়াছিল, তাহাতে সকলের মন মুগ্ধ হইয়াছিল, পথ-ঘাট বিচিত্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। এখন কাচের বড় বড় কারখানা হওয়ার জন্ত তাদের হাতের বিচিত্র সৃষ্টি এই সব আতরের শিশি ও চুঙ্গি-গ্রাশ বাজাবে আর দেখা যায় না। গলা কাচে ফুঁ দিয়া এই যে শিল্প-রচনা—এ



ওগো আমার প্রিয়

কোনোরূপ বস্ত্রে প্রিয়জনের ফটোগ্রাফ সুস্পষ্টভাবে ডেভেলপ ও প্রিন্ট করিয়া চিত্ত-তৃপ্তি-সাধনে সমর্থ হইবেন।

বয়া-ওভারকোট

এবারের এ-যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী-বিভাগ এক রকম জীবন-রক্ষক ওভারকোট তৈয়ারী করিয়াছে। সে ওভারকোটে এক সঙ্গে চারটি লোক জলের উপর অনায়াসে ভাসিয়া থাকিতে পারে। কোর্টটি

গ্যাভাডিন কাপড়ে তৈয়ারী। কোটের লাইনিং বে-উপাদানে তৈয়ারী, তাহা সোলার চেয়েও ছ'গুণ হালকা। উপাদানটি গরম; তাই এ কাপড় গায়ে থাকিলে জলের বুকে



কোট

গা হিম হইবে না, গরম থাকিবে। এ-কোট গায়ে থাকিলে স্বয়ং বরুণদেবও নরলোকের কোনো জীবকে জল-তলে টানিয়া লইয়া বাইতে পারিবেন না !



কোট-গায়ে সাঁতার

এ ছুরির গড়ন সম্পূর্ণ অল্প রকমের। একবার এ ছুরি চালাইলে ফলমূল এক সঙ্গে তিন-কালি করিয়া কাটা চলিবে। সব ফালি এক মাপের হইবে। তিনখানি করিয়া লম্বা ব্লেড ক্রমে আঁটিয়া এ ছুরির হইয়াছে

অতিক্ষুদ্র
রেডিয়ো-যন্ত্র

বাইক-বিহারিণীর স্বর-যন্ত্র

ফল-কাটা ছুরি

ফল কাটনার অল্প নূতন ধরণের এক রকম ছুরি তৈয়ারী হইয়াছে।



তিন-কালি কল

বাড়ীতে রেডিয়ো-যন্ত্র রাখিয়াও অনেকে তৃপ্তি পান না; মোটর-গাড়ীতে রেডিয়ো-যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া বিচরণ-কালটুকুকে স্বর সরস করিয়া তোলে! ঋদের মোটর-গাড়ী নাই, বাইকে চড়িয়া পাড়ি সারিতে হয়, তাঁদের বিহার-ক্ষণটুকুকে স্বর-সঙ্গীতময় করিয়া তুলিবার জন্য অতিক্ষুদ্র রেডিয়ো-যন্ত্র বিকচিত হইয়াছে। ছবিতে দেখিবেন, রিমের কাছে ব্যাটারি এবং ছাণ্ডলের গায়ে রেডিয়ো-যন্ত্র। বাইকের ছাণ্ডলে এ-যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া অনায়াসে রেডিয়ো-প্রোগ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন। এ যন্ত্রটি এমন কৌশলে নির্মিত যে, সুইচ, টিপিয়া স্বর ও স্বরকে গুরু-লঘু-গ্রামে চড়াইতে-নামাইতে পারিবেন। এ যন্ত্রটির মাপ লম্বা সাড়ে চার, প্রস্থে স' তিন, এবং উচ্চতায় আট ইঞ্চি মাত্র।



ইতিহাসের খবুসর

আফগান রাজ্যের অতীত কথা

আফগান রাজ্য বা আফগানিস্থান অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে, হিন্দু জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল, সে কথা র্যাপসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য ইতিহাস-লেখকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। অনেকের মতে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলই আর্য্য মনীষিগণের কর্ণনিঃসৃত সুপবিত্র বেদগানে প্রতিধ্বনিত হইত ; তবে ইহা স্বরণ রাখিবার যোগ্য যে, আধুনিক কালে যে নিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আফগানিস্থান নামে মানচিত্রে অঙ্কিত দেখা যায়, প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে সেই নিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যে একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। বর্তমান আফগানিস্থান ইরানের মালভূমি হইতে পূর্ব দিকে সুলেমান গিরিরাজি, এবং উত্তর দিকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। বর্তমান সময়ে উহার বিস্তার ১ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গ-মাইল। প্রাচীন কালে এই রাজ্যের বিস্তার এত অধিক ছিল না ; এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড একই রাজার শাসনাধীনও ছিল না। এই অঞ্চলটি মরুস্থলীতে এবং শৈলশ্রেণীতে পরিপূর্ণ থাকায় এই অঞ্চলটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন রাজার শাসনাধীন ছিল। হিন্দুকুশ পর্বতের সামুদ্রিক অর্ধেক বৌদ্ধমূর্তি এবং দুর্গম গিরিগুহায় ধূম-ধূসর যজ্ঞকুণ্ডের লুপ্তাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কথিত আছে। এই আফগান রাজ্যের পূর্ব দিকেই আর্য্যনিবাসের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইস্থান (Seistan) এবং বেলুচিস্থানেও যে অতি প্রাচীন কালে আর্য্যনিবাস ছিল, তাহা মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণও স্বীকার করিয়াছেন। যে সময়ে ম্যাসিডনপতি আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে—অর্থাৎ কিছু কম আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে—এই অঞ্চল আর্য্যসভ্যতালোকে সমৃদ্ধ ছিল। কত কাল ধরিয়া তথায় যে হিন্দুসভ্যতা বিরাজিত ছিল,—তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে, তাহার কিছু কিছু উল্লেখ যে না আছে, এরূপ নহে। রামায়ণে দেখিতে পাই, যে সময়ে রাজা রামচন্দ্র

অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন, সেই সময়েই কেকয় প্রদেশের রাজা যুধাজিৎ গন্ধর্ভগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া রাজ্য রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কেকয় রাজ্য পঞ্জাবের বিপাশা নদীর পশ্চিম দিক হইতে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গন্ধর্ভদিগের অধিকার ছিল সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে। বিপাশার বর্তমান নাম বিয়াস নদী। উহা শতদ্রু নদের করদ নদী। ইহার পশ্চিম দিকেই প্রাচীন কেকয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। গন্ধর্ভগণ সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরেই ছিল, পরে তাহার পূর্ব তীরে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ রাজ্যটি বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই অঞ্চলে গোধূম, ছোলা, জোয়ার প্রভৃতি শস্য প্রচুর উৎপন্ন হয়, এবং বেদানা, আঙ্গুর ও স্বচ্ছন্দ-বনজাত বৃক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই জন্ত যুধাজিৎ এই রাজ্যটিকে ফলমূলে পরিশোভিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। গন্ধর্ভরা সংখ্যায় তিন কোটি ছিল বলিয়া রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। তিন কোটি লোক কেবল যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই ছিল, এরূপ অনুমান হয় না ; কারণ, এখন এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষের কিছু অধিক হইলেও সাড়ে ২৪ লক্ষেরও কম। সুতরাং এই গন্ধর্ভ রাজ্যটি কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উহা আফগান রাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ রামায়ণ-কথিত বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে নিতান্তই অসম্মত ; কিন্তু যখন উহা প্রাচীন কাল হইতেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তখন উহা অবিশ্বাস করিবার কি কারণ থাকিতে পারে ?

সেই স্বরণাতীত যুগের কোন প্রস্তর-ফলক বা তাম্র-শাসন প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ভারতের দ্বিতীয় পুস্ত্রের নাম পুঙ্কল। তাহার নাম অনুসারে যে মহানগরী স্থাপিত হইয়াছিল, গ্রীক ঐতিহাসিকরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকরা পুঙ্কলাবতীকে পিউখ্লামোতি

(Peukhlaoty) নামে অভিহিত করিয়াছেন। আলেক-
জাণ্ডার বিনাযুদ্ধে তক্ষশীলা অধিকার করিয়াছিলেন,
কিন্তু পুঞ্চলাবতী অধিকার করিবার সময় তাঁহাকে বৃদ্ধ
করিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ-
ফলে উহা আর অধিক দিন স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে
পারে নাই। পেশোয়ার রাজ্যও পুঞ্চলের নাম বহন
করিতেছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

এই পুঞ্চলাবতী নগরীটি কোথায় ছিল? ইহা ছিল
সিন্ধু নদের অপর তীরে, কাবুল নদীর সহিত সিন্ধু নদের
সঙ্গম-স্থলে। কাবুল নদীর প্রাচীন নাম কুভা (Kubha),
গোমল নদীর প্রাচীন নাম ছিল গোমতী। কুরুম্
উপত্যকার নাম ছিল কুরুম্। এখন প্রশ্ন এই, কেকয়
রাজ্যটির বিস্তার কতখানি ছিল? অনেকেরই মতে ইহা
বিপাশার পশ্চিম পার হইতে ইরাবতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত
ছিল। ভারতের মাতামহের নাম ছিল অশ্বপতি। তিনি
ঐ ছোট রাজ্যটির অধিপতি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,
কেকয়ী নামে ইরানী ভাষার গন্ধ পাওয়া যায়! কিন্তু
কেকয়ী ভারতের মাতার আসল নাম ছিল না; তিনি
কেকয়-রাজের দুহিতা বলিয়াই তাঁহাকে কেকয়ী বলা
হইত। কেকয়ীর পিতার নাম ছিল অশ্বপতি, তাঁহার
ব্রাতার নাম ছিল যুধাজিৎ বা যুধধন, দাসীর নাম ছিল
মহুরা। এ সমস্তই অর্থাৎ নাম। কেকয় রাজ্যের পশ্চিম-
উত্তর দিক হইতে গন্ধর্করা ঐ রাজ্যে আসিয়া উপত্য
আরম্ভ করিয়াছিল। ভারত যখন কাবুল ও সিন্ধুর সঙ্গমস্থলে
পুঞ্চলের জন্ত পুঞ্চলাবতী নগরী নির্মাণ করিয়াছিলেন, তখন
তিনি গন্ধর্কদিগকে আফগান-ভূমি পর্য্যন্ত বিতাড়িত
করিয়াছিলেন। এই পুঞ্চলাবতী খাইবার গিরিসঙ্কটের-
অদূরবর্তী, এবং পেশোয়ার হইতেও তাহা অধিক
দূরবর্তী নহে। ইহার পরই গান্ধার দেশ। উহা খাস
আফগানিস্থানে। মিষ্টার সি. ভি. বৈল্ড তাঁহার 'Riddle of
Ramayana' নামক গ্রন্থে অনুমান করিয়াছেন যে,
ভারতের মাতামহ অশ্বপতির রাজ্য ছিল আফগানিস্থানে।
আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া-
ছিলেন, তখন আফগান রাজ্যে হিন্দুদিগের এবং বৌদ্ধ-
দিগেরই বাস ছিল। কেবল আফগানিস্থানে নহে, পবন
সেইস্থান এবং বেলুচিস্থানেও আর্গ্য-সত্যতা দেদীপ্যমান

ছিল। ইহা ম্যাক্লেওনের প্রদত্ত মেগাস্থেনিসের আলেক-
জাণ্ডারের ভারতাক্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। তবে
কেকয় রাজ্য যে আফগানিস্থানের ভিতর ছিল না,—সে
বিষয়ে সন্দেহ নাই। লাসেন (Lassen)-প্রমুখ
খ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তারা বলিয়াছেন, সোফায়েটিস্
(Sophates) নামক যে রাজ্যটির কথা আলেক-
জাণ্ডারের দিগ্‌বিজয় সম্পর্কে শুনা যায়, তাহাই ছিল
অশ্বপতির কেকয় রাজ্য।

এই গন্ধর্কগণ আধুনিক আফগানিস্থানের ভিতর
দিয়া কেকয় রাজ্যের প্রান্তভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিল,
তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে গান্ধার দেশটাই
গন্ধর্কগণের বাসভূমি ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ
আছে। গন্ধর্কগণ সঙ্গীত-বিদ্যায় দক্ষ ছিল। তাহারা
অনার্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভারত কর্তৃক সীমাগু
বিজয়ের পর দেখা যায় যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার-রাজ-
নন্দিনী গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের
শ্বশুরের নাম ছিল স্তবল; ইহা সম্পূর্ণ সংস্কৃত নাম। ভীম
দুর্যোধনকে অনেক গালি দিয়াছিলেন,—কিন্তু দুর্যোধন
অনার্যবংশজার পুত্র, এমন কথা কোথাও বলেন নাই।
বরং গন্ধর্করা ধার্মিক এবং দেবযোনিজ ছিল, এরূপ
প্রমাণ পাওয়া যায়। গন্ধর্ক অর্থে ধার্মিকও বুঝায়। পরে
গন্ধর্কগণ সুর্য্যোপাসক হয়, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামায়ণে ভারত কর্তৃক গন্ধর্ক-বিজয়ের যে বৃত্তান্ত বর্ণিত
আছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, এ কথা
মনে করা অসঙ্গত। পঞ্চাশতের আফগান রাজ্যের উত্তর-
পশ্চিমে অবস্থিত বখ্লিক (Bakh) অঞ্চলই বৈদিক
যুগের বখ্লিক দেশ। উহা কাবুল এবং অক্সাস (Oxus)
নদীর ব্যবধান-ভূমিতে অবস্থিত। গ্রীকরা এই স্থানকেই
ব্যাক্টিয়া বলিতেন। এই ব্যাক্টিয়ার সত্যতা প্রাচীন
ব্যাবিলোনিয়া এবং নিনিভার সমসাময়িক ছিল, ইহাও
য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই
বখ্লিক দেশের ভূগর্ভ হইতে হিন্দু যুগের এবং বৌদ্ধ যুগের
অনেক পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং সপ্রমাণ
হইতেছে যে, ঐ অঞ্চলে অতি প্রাচীন কালে বৈদিক ধর্ম
প্রচলিত ছিল। অনেকে বই ধাবণা, বৈদিক ধর্মাবলম্বীরা
ঐ দিক হইতেই ভারতে আসিয়াছিলেন। আফগান

রাজ্যে, সেইস্থানে, এবং বহ্লিক অঞ্চলে এমন অনেক স্থান আছে, যাহাদের নাম দেখিয়া সেগুলিকে বৈদিক বলিয়া বুঝা যায়। সেই জন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যগণের পিতৃভূমি বহ্লিক অঞ্চল হইতে কাশ্চপ হ্রদ (Caspian Sea) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পৌরাণিক যুগে (রামায়ণ-মহাভারতের রচনাকালে) আফগান রাজ্যের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধার-রাজকুমারী সৌবনা বা গান্ধারীর উদ্বাহ-বন্ধন ভারতের সহিত আফগান রাজ্যের ঘনিষ্ঠতা সূচনা করে। তৎকালীন আফগান-রাজ্যের নাম ছিল স্তবল, এবং তাহার পুত্রের নাম ছিল শকুনি। মহাভারত-বিখ্যাত 'শকুনি যামা' ও তন্ত্র পিতা গান্ধারপতি অশ্বপতি যে আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গন্ধর্ষেরা পাশা খেলাতেও খুব পারদর্শী ছিল; ইহার প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্যেও বিদ্যমান: শকুনি যামা পাশা খেলাতেই বুদ্ধিষ্টিরকে পরাজিত করিয়া কুরুকুলধ্বংসের কাবণ হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য মতে যখন সন্দেহের কুহেলিকাবৃত কাব্য-সাহিত্যের যুগ হইতে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক যুগে উপনীত হওয়া যায়, আলেকজান্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণেই তাহার আরম্ভ। সে প্রায় সওয়া দুই হাজার বর্ষেরও অধিক পূর্বের কথা। সে সময়ে বেবুচিস্তান, সেইস্থান, এবং আফগানিস্তানে হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং সূর্য্যোপাসকদিগের ধর্ম্ম প্রবর্তিত ছিল; এ কথা গ্রীক-লেখকগণ বলিয়া গিয়াছেন। সে সময় মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্তিত হয় নাই। সম্ভবতঃ, পারস্ত হইতে অগ্নির উপাসকগণ ঐ অঞ্চলে আসিয়া প্রভাববিস্তার করিতেছিল। আলেকজান্ডার কর্তৃক ঐ অঞ্চল বিজয়ের পরেই মৌর্য্য চন্দ্র-গুপ্ত ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই সম্ভবতঃ, ঐ অঞ্চলে জৈন ধর্ম্ম কিছু উৎসাহ পাইয়াছিল। তাহার পরে অশোকের আমলে ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য হিরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পতনের পরও এই অঞ্চলে হিন্দু-রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তুর্কীরাও ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকে পতা বিস্তার করিয়াছিল। মৌর্য্য-রাজগণের পতনের পর ঐ অঞ্চলে তুর্কীশাহী

এবং হিন্দুশাহী শাসন প্রবর্তিত ছিল, এ কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুশাহী অর্থে হিন্দু-বাদশাহী। হিন্দু-রাজগণের রাজধানী ছিল উক্ক বা অহিন্দ নগরে। উহা এটকের আরও উত্তরে সিন্ধু নদীতীরে অবস্থিত ছিল। আর কাবুলে তুর্কীশাহী রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুষাণ-রাজগণের মধ্যে কুজুল কদফিসা আফগান রাজা এবং পঞ্চনদের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের শেষ গ্রীক রাজা কুজুল কদফিসা এক জন কন্মচারীতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাহার পর চক্রবর্তী রাজা ছিলেন ভীম কদফিসা। তিনি ছিলেন শৈব। বারাগর্সী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ভীমই কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁহার মুদ্রায় শিবের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইহার পরই কণিক কুষাণ রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আমল হইতে আফগান রাজ্য বহু কাল হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজগণের শাসনে ছিল। কণিকই শকাদ্দা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। যুরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলেন যে, শক জাতি (Scythians) হিন্দু নহে। তাহারা যুরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে এবং এশিয়ার পশ্চিম অংশে বাস করিত। তাহারা হিন্দু ছিল না। কিন্তু হিন্দুদিগের মতে শক জাতি ক্ষত্রিয়, এবং হিন্দু ছিল। কুষাণ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল ভীম; এ নামটি সম্পূর্ণ হিন্দু নাম। এক্ষণে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও শকগণ বিদেশী ছিল, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। 'শীদিয়ান' শব্দের সহিত শক শব্দের ধ্বনিগত কতকটা সাম্য দেখিয়াই শকরা যে শীদীয় ছিল, ইহা অনুমান করা সম্ভব নহে। আফগান রাজ্যেও কণিকের বংশধরদিগকে হিন্দুশাহী রাজা বলা হইত। অথচ বৌদ্ধগণকে আফগান অঞ্চলের লোক হিন্দু বলিত। কণিক পরে শৈবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বলেন, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আফগান রাজ্যের লোকরা হয় অগ্নির উপাসক, না হয় বৌদ্ধ, না হয় হিন্দু ছিল। * ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ঐ অঞ্চলে কণিকের পরও প্রায় আট-নয় শত বৎসর

* Encyclopedia of Islam p. 162.

কাল হিন্দু বা বৌদ্ধ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দু রাজ্য জয়চন্দ্রের পরাজয় পর্যন্ত আফগান রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে হিন্দু রাজ্যই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আফগান রাজ্যের শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন জয়পাল। তিনি সাবুক্তিগীন কর্তৃক পরাজিত হইলে আফগান রাজ্যে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। রাজা জয়পাল ব্রাহ্মণ ছিলেন।

এই সময় পর্যন্ত আফগান রাজ্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। গজনীর মামুদের সহিত উলু উৎবী নামক তাঁহার যে লেখক আসিয়াছিলেন, তিনিই একাদশ শতাব্দীতে 'তারিখ-ই-যুমিনি' অভিধায় এই অঞ্চলের এক ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। অনু বিরানীও প্রসঙ্গতঃ আফগান জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মতে আফগানরা অত্যন্ত অসভ্য এবং বর্বর জাতি। ইহারা দুর্ভীক্ষ ছিল। তুর্কী-শাসকদিগকে ইহাদের সহিত অবিশ্রাম সংগ্রাম করিতে হইত। ইহারা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বা তাহার পরেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। ইহারা একটা মিশ্র জাতি বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। লংওয়ার্থ তেমসের মতে আফগানরা তুর্কি ইরাণিয়ান জাতি; আফগানরা কিন্তু সে কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা যেন-ই ইজ্জেরেলের (অর্থাৎ ইজ্জেরেলের সন্তান-গণের) বংশধর। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে, তাঁহারা ইজ্জেরেলের বংশধর—সুতরাং ইহুদী। কাবুলে এখনও অনেক হিন্দু আছেন। তাঁহারা ঐ রাজ্যের প্রাচীন হিন্দুদিগেরই বংশধর। আমীর সাবুক্তিগীনই প্রথমে আফগান জাতিকে তাঁহার সৈনিকদলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র খ্যাতনামা মহম্মদ নুরি বহুসংখ্যক আফগানকে তাঁহার সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তিরেলের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ যখন পরাজিত এবং নিহত হন, তখন বহুসংখ্যক আফগানই মহম্মদ নুরির অমুকূলে যুদ্ধ করিয়াছিল। শুনা যায়, পৃথ্বীরাজের সেনাদলেও কতকগুলি আফগান ছিল। তাহারা মুসলমান ছিল না। ইহার পর কিছু কাল আর আফগান জাতির কথা শুনা যায় নাই।

খৃষ্টীয় ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে দিয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লী রাজ্যের

অধীশ্বর হইয়াছিলেন। স্বনামধ্যাত ঐতিহাসিক নিন্-হাজ-ই সিরাজ তাঁহার 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বলবন মেওয়াট এবং বটেহর প্রদেশের হিন্দুদিগকে দমন করিবার জন্ত ৩ হাজার আফগানকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারা অত্যন্ত কঠোরস্বভাব, এবং অসমসাহসিক লোক ছিল। আফগানরা তৈমুরের ভারত আক্রমণের স্মরণে ভারতে কতকটা স্মৃতিধা করিয়া লইয়াছিল। এই সকল আফগান সর্দারের মধ্যে শেরশাহ সুরই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আফগানরা ইহার পূর্বে কোন সময়েই আফগান রাজ্যে তাহাদের কোনরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই।—ইহারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কোন কার্য করিতে বিশেষ অভ্যস্ত নহে। সেই জন্ত ভারতে মুসলমান রাজত্বকালেও দিল্লীর বাদশাহগণ আফগান রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতেন। তাহার পর নাদির শাহের আক্রমণের ফলে দিল্লীর দুর্বল বাদশাহ মহম্মদ শাহ নাদির শাহকে আফগান রাজ্য ছাড়িয়া দেন। নাদির শাহ নিহত হইবার পর তাঁহার অল্পতম অনুচর আহম্মদ শাহ আবদালি নামক জনৈক আফগান-সর্দার আফগান রাজ্যের পূর্বাংশ প্রাপ্ত হন। ইনিই প্রথমে আফগান রাজ্যে স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার খেতাব হইয়াছিল হুররি দৌরান। সেই জন্ত তাঁহার নাম আহম্মদ শাহ আবদালির পরিবর্তে আহম্মদ শাহ হুরাণি হইয়াছিল। এই আহম্মদ শাহ হুরাণিই ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি চূর্ণ করেন। ইহার পূর্বে আর কখনও আফগান জাতি স্ব-শাসন উপভোগ করে নাই। তৎপূর্বে আফগান জাতি কখনও পারস্যের, কখনও তুর্কীদের, এবং কখনও বা ভারতীয় রাজগণের অধীন ছিল। পরে আবার রণজিৎ সিংহ পেশোয়ার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো আফগানিস্থানের অধিপতি দোস্ত মহম্মদের সহিত সন্ধি করেন। কিছু দিন পূর্বে হইতে আফগানিস্থান স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত।

শ্রীশশিভূষণ যুগোপাধ্যায়।



বঙ্গদেশে কৃষিমূলক শিল্প

বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা অল্প দুশ্চিন্তার বিষয় নহে। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বন করিলে ভারত স্বাবলম্বী ও অগ্রগত দেশের সমকক্ষ হইতে পাবে, তাহা এখন হইতেই নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পূর্বকালে দেশের অবস্থা যেরূপ থাক, ব্রিটিশ শাসনে আসিয়া এ দেশ ক্রমশঃ কৃষিপ্ৰধান হইয়া পড়িয়াছে। কাঁচা মাল রপ্তানি ও প্রস্তুতীকৃত দ্রব্য আমদানি কিছু কাল পূর্ব-পর্যন্তও ভারতীয় বাণিজ্যের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে তাহার কিছু পরিবর্তন কিছু আরম্ভ হইয়াছে। বিগত দশকের, অর্থাৎ ১৯৩০-১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির বিবরণ পর্যালোচনা করিলে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। ভারত আজকাল কেবল কাঁচা মালই রপ্তানি করে না; দেশ মধ্যে কাঁচা মালের সদ্ব্যবহারও আরম্ভ হইয়াছে। তন্তুমূলক শিল্পে (Textile Industry) এখন আমরা আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইয়াছি; ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প জগতের সম-শ্রেণীর বৃহৎ শিল্পের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; স্বকীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত শর্করাও ভারতীয় কল সমূহে উৎপাদিত হইতেছে; কাগজের জন্তুও আমরা এখন আর সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী নহি;—এইরূপ দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশে কিছু দিন হইতে শিল্পের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতে নূতন শিল্পযুগের সূচনার এই শুভ মুহূর্তে দেশের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক কথাই আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়। কংগ্রেসও এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছে। এ দেশে আধুনিক যুগো-পযোগী শিল্প সমূহ যতই অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই

মঙ্গল; কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ভারত প্রায় ৪০ কোটি মানবের অধ্যুষিত একটি মহাদেশ-বিশেষ। এই বিরাট জনমণ্ডলীর ভরণপোষণার্থ কৃষিকার্যকে চিরকালই প্রথম স্থান দিতে হইবে। সেই জন্ত শিল্পের মধ্যেও যেগুলি কৃষিজাত দ্রব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই-গুলিতেই অধিক মাত্রায় সাধারণের মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য। এইরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ যেকোন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। আবার শুধু শিল্প-পরিকল্পনা হইলেই চলিবে না; সঙ্গে সঙ্গে কৃষির প্রভূত উন্নতিসাধনের পরিকল্পনাও অপরিহার্য। কারণ, এ দেশে ধাতু, কাপাস, ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান প্রধান ফসলের ফলন অগ্রগত উন্নতিশীল দেশ অপেক্ষা অনেক কম। এ দেশের কৃষি ও শিল্প পরস্পর বিজড়িত। কৃষক ও বণিক, উভয়েরই স্বার্থের সামঞ্জস্য রাখিয়া যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা হইতেই অধিকাংশ দেশবাসী উপকৃত হইবে। কৃষিমূলক শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ভারতের সকল প্রদেশেই সমান। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার কথাই বলিতেছি। বঙ্গদেশ এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠায় কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে উহার প্রসারলাভের সম্ভাবনা কিরূপ, তাহাই বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

ধাতু

ধাতুই বাঙ্গালার প্রধান শস্য; অগ্রগত প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালায় ধানের জমির পরিমাণ অনেক অধিক। সমগ্র ভারতের মোট ধান-চাষের জমির শতকরা সাড়ে ২৬ ভাগ বাঙ্গালা দেশেই অবস্থিত। ধান হইতে চাউল উৎপাদন এখন এ দেশে একটি প্রধান শিল্প পরিণত হইয়াছে। ছোট-বড় অনেক কলই সহর ও গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে ইহা অপরিহার্য

হইলেও, চাউলের কল যে অবিগিশ কল্যাণপ্রদ—ইহা স্বীকার করা যায় না। এক দিকে এইরূপ কলের প্রবর্তনে ‘চেলুকী’ নামী এক শ্রেণীর গ্রাম্য দুঃস্থা স্ত্রীলোকের জীবিকার্জনের উপায় রহিত হইয়াছে; অত্র দিকে যাহারা কল-ভাঙ্গা চাউল ব্যবহার করে, তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষিত হইতেছে। কলে-ছাঁটা স্তমার্জিত মক্ষণ চাউলের মোহে পড়িয়া অনেক লোক অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে (Deficiency diseases) আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে। ফলতঃ, অধিক মাত্রায় ‘মাজা’ চাউল বাঙ্গালার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের এতই হানিকর হইয়া উঠিয়াছে যে, Science Congress Association-এর বিগত বার্ষিক অধিবেশনে ভারতীয় পোষণতত্ত্বানু-সন্ধানাগারের অধ্যক্ষ খাচুতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ ডক্টর আয়ক্রয়েড এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, একরূপ চাউল প্রস্তুত ও বিক্রয় করা আইন-প্রণয়ন দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

কল দ্বারা ধান হইতে চাউল করা বাতীত এ দেশে ধাতুসংক্রান্ত অত্র শিল্পের প্রচলন নাই। কিন্তু এই প্রকার একাধিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। উদাহরণ-স্বরূপ এ স্থলে দুইটি উল্লেখযোগ্য। ধান কাটিবার সময় নাড়ার গোড়ার দিকে খানিক বাদ দেওয়া হয়। তাহা কতকটা সারের কাষ করে বটে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিয়া ধানের চাষ চলে না; বরং ঐভাবে পরিত্যক্ত অংশের অত্ররূপ সন্ধ্যবহার লাভজনক হইতে পারে। অত্র দেশে বিচালীর এই ভাবে পরিত্যক্ত অংশ হইতে Paste Board ও Straw Board প্রস্তুত হইতেছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও ইহাদের চাহিদা আছে; এবং বিদেশ হইতে এই শ্রেণীর দ্রব্যের আমদানিও অল্প নহে। গ্রাম্য-শিল্পরূপে ধাতুর গোড়া (নাড়া) হইতে প্যাকিং-কার্খের জন্ত পিস্‌বোর্ড প্রস্তুত হইতে পারে।

ধাতু-সংক্রান্ত আর একটি শিল্প—ধাতুর কুঁড়া হইতে তৈল-নিষ্কাশন। কলে বা টেকিতে চাউল ছাঁটিবার সময় তাহার আনুসঙ্গিক কুঁড়া প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণ তৈল আছে। চাউলের কুঁড়া দীর্ঘকাল

পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়; এজন্ত ইহার টাটকা ব্যবহারই ফলপ্রদ। জাপানে সরকারী কৃষি ও শিল্প বিভাগের ‘Rice Application Laboratory’তে দীর্ঘ-কালব্যাপী পরীক্ষার ফলে অল্প দিন পূর্বে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কুঁড়াতে যে তৈল বর্তমান, তাহার পরিমাণ শতকরা প্রায় ২২ ভাগ। এই তৈল সাবান ও ফটো-ফিল্ম প্রস্তুত, রেশম পরিষ্কার, রন্ধন ও অত্রাণ কার্খ্যে ব্যবহার করিতে পারা যায়। এখন জাপান ও কোরিয়ায় কুঁড়ার তৈল উৎপাদনের জন্ত ৩৪টি কল স্থাপিত হইয়াছে, এবং উৎপাদিত তৈল টাকায় প্রায় ৪ সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, তৈল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে উহার পশুখাত্তরূপে মূল্য যেমন কমিয়া যায় না, কুঁড়ার সন্ধ্যক্লেও উহা বলা যায়। কুঁড়ার তৈল বা Rice-Bran oil চীনা-বাদাম-তৈলের সম-প্রকৃতির, এবং উহা সমরূপ প্রসার লাভ করিবে বলিয়াই অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত।

পাট

পাট বঙ্গদেশের একচেটিয়া ফসল। পাট চাষে, ব্যব-সায়ে ও শিল্পে অল্প দিন পূর্বেও যথেষ্ট লাভ হইত। কিন্তু বর্তমান সময়ে পাটের বাজারে কিরূপ সঙ্কট উপস্থিত, তাহা এ দেশের জনসাধারণের অজ্ঞাত নহে। সম্প্রতি কেন্দ্রী-সরকার পাট, তুলা, চীনা-বাদাম ও গোধূমের বাজার-দরের কিরূপে উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধান করিতেছেন। তবে পাট সন্ধ্যক্লে চাষ-নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন অত্র কোন আশু ফলপ্রদ উপায় লক্ষিত হইতেছে না। বিগত দশকে পাট-শিল্পের গতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক দিকে প্রস্তুতীকৃত মালের আমদানি যেমন কমিয়াছে, অত্র দিকে উক্ত শ্রেণীর পণ্যের রপ্তানিও তেমনি বাড়িয়াছে। ১৯৩২-৩৩ ও ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে আমদানি-করা পাট-জাত পণ্য সমূহের মূল্য যথাক্রমে ১৩-৪৬ ও ৯-১৭ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সমশ্রেণীর যে পরিমাণ মাল রপ্তানি হয়, তাহার মূল্য দাঁড়ায় ১৩-১৭ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশীয় পাট-শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ইহাও কিন্তু দ্রষ্টব্য যে, একাল-পর্যন্ত এই শিল্প নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতের গণ্ডিতেই আবদ্ধ রহিয়াছে—যথা—সূতা, দড়ি, খলে, চট, ক্যাথিস ইত্যাদি। শান্তির সময়ে পৃথিবীর নানা দেশে এই সকল দ্রব্য রপ্তানি করিয়া যথেষ্টই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে—যেমন বর্তমান সময়ে—বাজারের বিপর্যয় বশতঃ এই সকল দ্রব্যের কাটুতির অন্তরায় ঘটায়, কৃষক ও কল-ওয়ালারা, উভয় সম্প্রদায়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এক উপায়ে এইরূপ অবস্থার প্রতিকার হওয়া সম্ভব। পাট-কল-সমূহ যদি কেবলমাত্র পূর্কোক্ত শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত না করিয়া কঞ্চল, গায়ের চাদর, কৃত্রিম পশম, আলপাকা প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে এ দেশে ও বিদেশে ঐ সকল দ্রব্যের কাটুতি হওয়ায় সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভের উপায় হইতে পারে। বস্তুতঃ, এ দেশের পাট-কলগুলিতে এই প্রকার ব্যবস্থা থাকিলে বর্তমান কালে পাটের সমগ্রা একরূপ জটিল হইয়া উঠিত না।

তুলা

অতীত কালে যাহাই থাকুক, বর্তমান কালে বাঙ্গালায় তুলা চাষের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প; সমগ্র ভারতে ১,৪৪,৩৯,০০০ একর কার্পাস চাষের জমির মধ্যে বাঙ্গালায় মাত্র ৫৮,০০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়া থাকে, এবং তাহাও কেবল ৪টি জিলায় অর্থাৎ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম পার্শ্বত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বঙ্গদেশে তুলার চাষ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও কাপড়ের চাহিদা হ্রাস হয় নাই। ৫ কোটির অধিক-সংখ্যক বঙ্গবাসীর জন্ম বৎসরে প্রায় ৯০ কোটি গজ বস্ত্রের প্রয়োজন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলা দেশে কার্পাস-শিল্পের সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা কত অধিক। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পূর্বে তুলার কারখানা-শিল্পের দিকে বাঙ্গালীর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তাহারা তাঁতজাত ও বিলাতী কাপড়ের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিত। বস্তুতঃ, বঙ্গদেশে প্রথম কাপড়ের কল স্বদেশী যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিলম্বে আরম্ভ হইলেও তুলার কারখানা-শিল্প এ প্রদেশে ক্ষিপ্ৰগতিতেই অগ্রসর হইতেছে। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার কলগুলিতে

৯,৭৬,৮৯,২৬৩ গজ কাপড় নির্মিত হইত; সেই স্থলে ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ২০,৬২,০৯,৩১২ গজ নির্মিত হইয়াছে; অর্থাৎ ছয় বৎসরের মধ্যে বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ১১১ ভাগ বৃদ্ধিত হইয়াছে। এই প্রকার উন্নতি সন্দর্শনে উল্লসিত হইবার কারণ থাকিলেও এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালার বাজারে বৎসরে প্রায় ১৪ কোটি টাকার কার্পাসজাত দ্রব্য বিক্রয় হয়; তন্মধ্যে বর্তমান কলগুলি সরবরাহ করিতেছে ন্যূনাধিক ৩ কোটি টাকার মাল।

বঙ্গদেশকে বস্ত্র-শিল্পে স্বাবলম্বী হইতে হইলে এখনও অনেক উদ্যম, অধ্যবসায় এবং অর্ধ-ব্যয়ের প্রয়োজন। এখন প্রায় ২৮টি কাপড়ের কলে কাষ চলিতেছে, এবং প্রায় ৫৮টি কল প্রতিষ্ঠার পর কার্যক্ষম হইবার জন্ম বিভিন্ন স্তরে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু যেকোন দ্রুতগতিতে বাঙ্গালায় কাপড়ের কল রেজেস্টারী হইতেছে, তদনুপাতে মূলধন সংগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

বাঙ্গালার তুলা-শিল্প উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও কাঁচা মাল সম্বন্ধে তাহার পরমুখাপেক্ষিতা হ্রাস হইতেছে না। তুলার উৎপাদন-কেন্দ্র সমূহ বঙ্গদেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত, এবং সেই সকল স্থান হইতে তুলার আমদানি অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। যে তুলা এ দেশে এখন উৎপন্ন হয়, তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই সকল কারণে বাঙ্গালা দেশেই উৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়নোপযোগী তুলার চাষের ব্যবস্থা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইতে পারে না, এই ধারণার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্তই অমূলক। পূর্কালে একরূপ তুলা এ দেশে যে যথেষ্ট পরিমাণেই উৎপন্ন হইত, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব নাই। সম্প্রতিও কতকগুলি পরীক্ষায় (যথা চাকেশ্বরী মিলের) উক্তরূপ তুলার চাষে আশামূ-রূপ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। দীর্ঘ আঁশের তুলা কয়েকটি নির্বাচিত কেন্দ্রে ধারাবাহিক ও ব্যাপক ভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা যত শীঘ্র করিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতি ও সরকারী কৃষি বিভাগ যুক্তভাবে যে পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত হইলে কার্পাস চাষ ও শিল্প, উভয়েরই প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, একরূপ আশা অসঙ্গত নহে।

ইক্ষু

বর্তমান কালে ভারতে যে সকল নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইক্ষু-শর্করা শিল্পটি অননুসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে পরিমাণ চিনির আমদানি হইয়াছিল, তাহার মূল্য ছিল ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে এই মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিদধিক সাড়ে ১৪ কোটি টাকায় নামিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১৪ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। দেশের অভাব পূর্ণ করিয়াও ইহা হইতে সাড়ে ৩ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়াই অনুমান হয়।

ভারতীয় শর্করা-শিল্পে এখন যুক্তপ্রদেশ ও বিহারই শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত। অত্র কোন প্রদেশ যাহাতে এই শিল্পে অগ্রসর হইতে অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করিতে না পারে, তজ্জন্ত বহুবিধ, এমন কি, প্রতিরোধক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইতেছে! ইহা কিন্তু অযৌক্তিক; কোন দ্রব্য স্থলভে উৎপাদিত হওয়ার পক্ষে যে স্থলের প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল, সেই স্থলেই উহা সমধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বঙ্গদেশের জল, হাওয়া, ও মৃত্তিকায় ইক্ষু-ফসল উৎকৃষ্টরূপেই উৎপন্ন হয়। ফলনের তুলনা করিলে দেখা যায়, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে একর-প্রতি ১৫।১৬ টন ইক্ষু জন্মে; কিন্তু বঙ্গদেশে উহার উৎপাদনের মাত্রা সাধারণতঃ দ্বিগুণ; বাঙ্গালার কোন কোন অংশে একর-প্রতি ৪০ টন ইক্ষুও উৎপন্ন হইয়াছে। আবার শর্করার অনুপাতও বঙ্গদেশজাত ইক্ষুতে তুলনায় যে অধিক, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রতি-একরে উৎপন্ন ইক্ষুর গুড়ের পরিমাণ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে উক্ত পরিমাণ জমির ইক্ষু হইতে গুড় পাওয়া যায় যথাক্রমে ২৪৬০ এবং ২৭০০ পাউণ্ড; কিন্তু বঙ্গদেশে পাওয়া যায় ৪৬৪৩ পাউণ্ড। প্রসঙ্গতঃ, এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, গুড়ের জন্মস্থান এই বঙ্গদেশই;

গোড় হইতে গুড় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই অনেকের ধারণা।

বঙ্গদেশে আপাততঃ প্রায় ১০টি চিনির কল কাষ করিতেছে; কিন্তু এ প্রদেশে শর্করা-শিল্প সম্প্রসারণের যথেষ্ট অবসর আছে, তাহা, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা ও আসামে বৎসরে ৫০ হইতে ৫৫ লক্ষ মণ চিনি ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে এখন প্রাদেশিক কলগুলিতে মাত্র কিঞ্চিদধিক ১৪ লক্ষ মণ চিনি প্রস্তুত হইতেছে। শুধু বাঙ্গালা ও তাহার প্রতিবেশী আসামের চিনির অভাব মোচন করিতেই এখনও ২০।২৫টি নূতন কল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে।

বলা বাহুল্য যে, ইক্ষু-শর্করা-শিল্প প্রসারের সহিত ইক্ষু-চাষের পরিমাণ বৃদ্ধিও অবশ্যপ্রয়োজনীয়। বঙ্গদেশে ইক্ষুচাষের উপযোগী জমির অভাব নাই; জলাভাব বশতঃ পশ্চিম-বঙ্গের ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কোন কোন জিলা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ব্যাপক ভাবে ইক্ষুরোপণের অস্ববিধা থাকিলেও পূর্ববঙ্গের অনেক জিলাতেই ব্যাপক ভাবে ইক্ষুচাষের ব্যবস্থা হইতে পারে।

শর্করা-শিল্পের অধিকতর প্রসারের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ এই যুক্তির অবতারণা করা হয় যে, এখনই প্রয়োজনাত্মিক শর্করা ভারতে উৎপাদিত হইতেছে; উহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধিত হইলে শিল্পের ক্ষতি হইবে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই যুক্তি অসার। চিনি উদ্বৃত্ত থাকিবার কারণ, মূল্যাধিক্য বশতঃ জনসাধারণ উহা কিনিতে পারে না। এ কথা কেহই বলিতে পারেন না যে, এ দেশে মাথাপিছু চিনির ব্যবহার অত্যন্ত সূসভ্য দেশের অনুরূপ। বস্তুতঃ, উহার ব্যবহার তুলনায় অনেক কম। উপযুক্ত অঞ্চলে ইক্ষুর চাষে এবং শর্করা উৎপাদনে অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শিত হইলে শর্করার মূল্য বর্তমান মূল্য অপেক্ষা আরও হ্রাস করা যাইতে পারে। অত্র দিকে উদ্বৃত্ত শর্করা কাটাইবার স্বাভাবিক পথ রপ্তানি। ভারতের স্বার্থের দিকে World's Sugar Conventionএর দৃষ্টি নাই। এ বিষয়ে ভারত সরকার স্বীয় কর্তব্য পালন করিলে রপ্তানির পথ উন্মুক্ত হইতে পারে, এবং ভারতীয় শর্করা-শিল্পও বহু গুণে বৃদ্ধিত হয়।

নারিকেল

নারিকেল বৃক্ষের প্রায় কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় না। ক্রমশ, সম্মার্জনী প্রস্তুতের মোটা তন্তু, দড়ি-দড়া, মেজেতে বিছাইবার গালিচা, মাহুর, তৈল, সুরা, শর্করা, গৃহ-নির্মাণের উপাদান, গ্যাস-শোষক কয়লা এবং সর্বোপরি উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয়—এ সমস্ত একই এই মহোপকারী তরু হইতে সংগৃহীত হয়। বঙ্গদেশে নারিকেল বৃক্ষের প্রসার অল্প নহে; মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, বাধর-গঞ্জ, খুলনা, নোয়াখালি প্রভৃতি সাগর-সন্নিহিত জিলা-সমূহে নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এক পয়সায় একটি ডাব অনেক স্থানেই কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের ত্রায় বাঙ্গালায় নারিকেলের সন্ধ্যাবহার হইতেছে না। ব্যবসায় উদ্দেশ্যে উৎপাদন করিলে নারিকেল হইতে কিরূপ আয় হইতে পারে, নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। ১০০০ গাছের প্রত্যেকটিতে ন্যূনকল্পে ৪০টি হিসাবে ফল ধরিলেও ৪০,০০০ নারিকেল পাওয়া যায়। তাহা হইতে খোসা পাওয়া যায় প্রায় ২৪ টন (১ টন=২৭১০ মণ), এবং উক্ত খোসা হইতে ৩ টন তন্তু বাহির হয়। এতদ্বিধ, উক্ত সংখ্যক স্পষ্ট নারিকেল হইতে প্রায় ১ টন শুষ্ক শাঁস পাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা হইতে ১৫।১৬ মণ নারিকেল-তৈল নিষ্কাশিত হইতে পারে। নারিকেল-তৈলের খৈল অতি পুষ্টিদায়ক পশু-খাদ্য, এবং দেশে ও বিদেশে ইহার চাহিদাও অল্প নহে। কিন্তু বঙ্গদেশে এ সকল শিল্প এখনও সংগঠিত হয় নাই। এখন এ দেশে উৎপাদিত নারিকেলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই ডাবরূপে ব্যবহৃত হয়; অবশিষ্ট ৩০ ভাগ রুনা অবস্থায় পাওয়া যায়। রুনা নারিকেলের বেশীর ভাগই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; যে পরিমাণ নারিকেল হইতে নারিকেল-তৈল উৎপাদিত হয়, তাহা বোধ হয়, মোট ফসলের শতকরা ১০।১৫ ভাগের অধিক হইবে না। বিপুল পরিমাণ নারিকেল-খোসা পচিয়াই নষ্ট হয়, তাহার সামান্য অংশ মাত্রই জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। বিগত কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার-বৃদ্ধির চেষ্টা

করিতেছেন। তাঁহাদিগের কার্য সাফল্যমণ্ডিত হইলে দেশের যে প্রভূত উপকার হইবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। শুষ্ক নারিকেল (Dessicated coconut) ও নারিকেল-তৈলজাত কৃত্রিম মাখনেরও বিদেশে যথেষ্ট চাহিদা আছে। এ সকল শিল্পের প্রতি এখন পর্য্যন্ত দেশ-বাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

তৈলবীজ

ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে তৈলবীজ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই শ্রেণীর ফসল রপ্তানির মাত্রাও কম নয়। জগতের বাজারে যে পরিমাণ তৈলবীজ রপ্তানি হয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ ভারতোৎপন্ন। ২।১টি বীজ—যথা রেডী ও সোরগুঁজা, ভারতের একচেটিয়া ফসল। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানে বড় বড় কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গদেশে তৈল-শিল্প কিয়ৎ পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হইলেও এ দেশে তৈলবীজের চাষ অল্প কয়েকটি প্রদেশ অপেক্ষা অল্প। দৃষ্টান্তরূপে শর্ষপ ও রাইয়ের কথা বলিতে পারা যায়। বঙ্গপ্রদেশে ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে ৩,৫৭,০০০ টন রাই ও শর্ষপ উৎপাদিত হয়, সে স্থলে বাঙ্গালায় উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ ১,৮০,০০০ টন। কলিকাতার সরিষার তৈলের কলসমূহকে প্রধানতঃ অল্প প্রদেশের বীজের উপর নির্ভর করিতে হয়। এ দেশে শর্ষপ চাষের বিস্তার ও উহার তৈলমাত্রা (oil contents) বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বিশেষরূপেই বাঞ্ছনীয়। মধ্য-য়ুরোপে শর্ষপ তৈল হইতে কৃত্রিম মাখন প্রস্তুত হয়। তদ্রূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিলে দেশে ব্যবহৃত না হউক, বিদেশে কাটতির সম্ভাবনা আছে। বঙ্গদেশে তিসির চাষ অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু কলিকাতাই তিসি-তৈল ও খৈল রপ্তানির প্রধান বন্দর। তিল ও রেডীও বঙ্গদেশে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু ব্যবসায়িক হিসাবে চীনা-বাদামের চাষ নাই বলিলে অত্যাশঙ্কিত হয় না। চীনা-বাদাম স্বল্পমাত্রায়ই হালকা বেলে-মাটিতে উৎপাদিত হইতে পারে, বঙ্গদেশে সেরূপ মাটিরও অভাব নাই। কিন্তু প্রভূত চাহিদা সত্ত্বেও এই তৈল উৎপাদনে বাঙ্গালা এখনও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে।

উপসংহারে কতিপয় অর্ধবৃত্ত তৈলবীজের উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এগুলির বীজ সংগ্রহ পূর্বক তাহা হইতে তৈল-নিকাশন গ্রাম্য-শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর। ইহাদের বীজোৎপন্ন তৈল অগ্ৰাণ্ড ব্যবসায়িক তৈলের সমকক্ষ না হইলেও, বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্ত ইহাদের অল্প-বিস্তর চাহিদা আছে। মহয়া বীজ এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রধান। আহাৰ্য্য তৈল ও অগ্ৰাণ্ড শিল্পের উপাদানরূপে মহয়া তৈলের যথেষ্ট কাটতি আছে। রোহিতক, শিয়ালকাঁটা, হিজলী বাদাম, করঞ্জা, নিম, কুমুম ফল, চিরঞ্জি, পুনাগ, নাগকেশর প্রভৃতিও এই শ্রেণীভুক্ত। আধুনিক ক্ষুদ্রাকারের কলের ঘানির সাহায্যে উক্ত প্রকার বীজসমূহ হইতে তৈল-নিকাশন কুটার-শিল্পরূপে উৎপাদনের স্থানে পরিচালিত হইতে পারে। বঙ্গদেশে

যে সকল স্বভাবজ তৈল-বীজ পাওয়া যায়, তাহাদিগের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া অতীব প্রার্থনীয়। তৈল-বীজ রপ্তানী সমূহ ক্ষতিকর। কারণ, তাহাতে শুধু তৈলই যে দেশের বাহিরে চলিয়া যায়, এরূপ নহে; অধিকন্তু দেশ পশু-খাদ্য ও জমির সারেও বঞ্চিত হয়। তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ও দেশের মাটির উর্বরতা—উভয়েরই হানি হয়। সুখের বিষয়, বিগত দশকে তৈল-বীজ রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গিয়া দেশ-মধ্যে তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই অবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উত্তরোত্তর ইহার উন্নতি হয়, দেশীয় তৈল-শিল্পের হিতাশ্রয়ী সকল ব্যক্তিরই সে বিষয়ে অবহিত হওয়া অবশ্যকর্তব্য।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

চির-ভাস্বর

বৃথাই ঘুরেছি আঁধারে
ঘুরে ঘুরে সারা রাত্তি ।
মাঠে, ঘাটে, মঠে, দেউলে
হাতে লয়ে ক্ষীণ বাতি ।
হারায় আলোর মাঝারে
তোমারে খুঁজি যে আঁধারে,
সকল রবির সবিভা
জলজল তব ভাতি ।

থাক' না লুকায়ে গোপনে
বৃথা কেন খোঁজা তবে ।
তেজ সংবরি ধেয়ানে
তুমি জাগ অনুভবে ।
হে রবি, তোমারে হেরিতে,
বৃথা দীপ দিবা-নিশীথে
হারাই তোমার আলোকে
ঝলসে নয়ন পীতি ।

শ্রীকালিদাস রায়



মনের চাবি

চাবি দেখলেই ব্যবহারিক জীবনে এর যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা' আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় না; আমাদের প্রায় সকলেরই ধারণা—বাক্সজাতীয় পদার্থে চাবি লাগানই এর একমাত্র কাজ। জিনিষ খোয়াবার ভয় যদি না থাকত, তবে আর অনর্থক কেউ কাজ বাড়াই না, এটা অত্যন্ত সত্যি। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই চাবি আমাদের অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। যে ভাবেই ভাবি না কেন—শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় নেই যে, চাবির অভাবে আমাদের কাজের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা; এমন কি, দৈনন্দিন জীবন চালাবার যে চাকা তা'ও অচল হওয়ার উপক্রম হয়। তাই মনে হয় যে, জিনিষ যত ছোট, যত তুচ্ছই হোক না কেন, সেই অনুপাতে তার মূল্য যে কমবে, এটা সত্য নয়;—ছোট এক-টুকরো হীরে, তার দাম প্রকাণ্ড একটা লোহার বীমের চেয়ে অনেক বেশী চেয়ে একটুও কম নয় নিশ্চয়ই। লোহার একটা চাবির দাম বড়-জোর ছ'-তিন পয়সা; কিন্তু কাজের বেলা তার দাম ধ'রে কাজ আদায় করি না, বা স্বেচ্ছায় সেটা ফেলে দিই না। মনের চাবির অবস্থা এইভাবে বিচার করা যায় না; এ হ'ল সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির জিনিষ, এর সঙ্গে বাস্তবতার কোন সম্বন্ধই নেই। এ সম্বন্ধে মন-চাবিকে চাবির কোটায় আমরা না ফেলে পারি না।

অতি তুচ্ছ ও নগণ্য হ'লেও চাবির অভাবে আমাদের যে কত রকম অসুবিধা ভোগ কর'তে হয়, এখানে তার গোটাকত উদাহরণ দেওয়া যাক। সাংসারিক

ব্যক্তিমাত্রেরই এই সব বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তবুও "অধিকন্তু ন দোষায়।"

রাত্রির অন্ধকার অপসারিত ক'রে, যবনিকার আড়াল থেকে দিনমণি তাঁর আলোক-সম্ভার নিয়ে যখন বেরিয়ে আসেন, আমরা ঘুমের মায়া কাটিয়ে তখনই চোখ মেলে তাকাই বাইরের দিকে। শুধু সূর্যের আলো দেখে প্রত্যয় হয় না, চট ক'রে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠবার সময় হ'লো কি না, সেটা যাচাই ক'রে দেখি। ঘড়ি হ'ল কর্মজগতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা। তাকে কেন্দ্র ক'রে আমরা আমাদের প্রতিদিনের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করি। ইনি আবার অতিমাত্রায় অভিমাত্রী, প্রতিদিন একই সময়ে চাবি না দিলে, অভিমানে নির্ঝাক হয়ে থাকেন। ফলে সময় ঠিক পাওয়া যায় না; স্কুল, কলেজ ও অফিসের ভাত ঠিক সময়টিতে দেয়া যায় না; তাড়া-তাড়ি করতে হয়, আর সব 'ভেস্টে' যায় ও দ্বিগুণ খাটুনি খাটতে হয়। এক-কথায় প্রতিপদে ও প্রতিকাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ গেল এক রকমের অসুবিধা। আবার অন্য ভাবেও ঘড়ি তার ক্ষোভ প্রকাশ করে, যেমন প্রায়ই যদি চাবি দিতে ভুল হয়, অথবা এক-এক দিন এক-এক সময়ে চাবি দেয়া যায়, তবে ঘড়ি যায় বিগড়ে। তাকে কায়দায় আনতে হ'লে, স্থান পরিবর্তন ও অর্ধব্যয় অপরিহার্য। পাঠাও দোকানে, দাও টাকা, আন ফিরিয়ে; ঘড়ি তখন আবার যথানিয়মে কাজ দেবে। এই গেল ঘড়ির ব্যাপার।

ধরা যাক বাস, পেটারী ইত্যাদি। ট্রাক, সিঁদুক, আলমারীতে চাবি না দিলে তহবিল তস্করের ও সঞ্চিত দ্রব্য চুরি যাওয়ার রীতিমত আশঙ্কা আছে। তাই একটার উপর দুটো তালা লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়;

কখনও বা নানা অক্ষর দিয়ে চাবি তৈয়েরী করিয়ে তাকে আরও নিরাপদ করা হয়। চাবি যদি ঠিক না হয়, একের চাবি অন্যের গায়ে লাগান হয়, তবে বিপদ দেখা দেয় অল্প ভাবে। ভুল চাবি দিয়ে হঠাৎ হয় ত বন্ধ করা কি খোলা গেল, কিন্তু ফিরে তাকে খোলা বা বন্ধ করা আর হ'য়ে উঠে না। বিফল প্রয়াস ও পরিশ্রমের পর মিস্ত্রী ডাকিয়ে পয়সা খরচ ক'রে তাকে কার্যোপযোগী করতে হয়। সব চেয়ে গুরুতর জটিল ব্যাপার দাঁড়ায় তখনই, যখন ঠিকমত চাবি নিলেম, দেখে-শুনে চাবি লাগালেম, সাবধানে চাবিটা রেখেও দিলেম, কিন্তু যেই দরকার প'ড়ল, শত খোঁজাখুঁজি ক'রেও তখন তার সন্ধান পাওয়া গেল না। সম্ভব অসম্ভব সব স্থান অহুসন্ধান করা হলো; শেষে ছেলেদের বকসিস কবুল করে খুঁজতে লাগিয়ে দেয়া হলো, কিন্তু লাভ বিশেষ কিছু হ'ল না। ফলে বাজার-হাট রইল বন্ধ, কাপড় বার করা হ'ল না, নোংরা পোষাকেই তাড়াতাড়ির জন্তে বেরিয়ে যেতে হ'ল; নিশ্চয়ই নিঃশব্দে নয়; স্ত্রীকে, ছেলেমেয়েকে যদৃচ্ছা কটু কথা ব'লে বেরিয়ে গেলেন বাড়ীর কর্তা। স্ত্রীও গরম মাথায় ঝাল ঝাড়লেন ছেলেদের উপর, সামান্য দোষের জন্ত তিরস্কার করলেন বি, চাকর ও রাঁধুনীকে। যদি তাঁকে নিজেই রান্না করতে হয়, তবে ডাল-তরকারীতে মুণের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন, ছুঁটি-একটি ব্যঞ্জন হয় ত বা একটু পুড়েও গেল, নয় ত হাতে লাগালেন ছ'য়াকা—বহুক্ষণ ধরে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগলেন। লোক ডাকিয়ে বাক্স ভেঙ্গে বা অন্য চাবি দিয়ে বাক্স খোলাবার হাজ্জামার পর হয় ত চাবি আত্মপ্রকাশ করলো। সামান্য চাবি এমনিতর বিশৃঙ্খলা সচরাচরই ঘটছে—ঘটাবেও।

জল অপচয় ও ট্যাক্সের ভয়ে চাবি দিয়ে রাখা হ'ল কলে, কিন্তু কোথায় রেখেছি, মনে করতে পারছি না; মস্ত সাশ্রয় হ'ল—রাস্তার কল হ'ল সম্বল সেই বেলার মত। সেলাইয়ের কলের চাবি ঠিক জায়গায় না রেখে আজ এখানে, কাল ওখানে রাখছি। তাড়াতাড়ির সময় এক দিন চাবি কোথায় রেখেছি, খুঁজেই পেলাম না; অগতির গতি সূচ-সূতোর শরণাপন্ন হ'তে হ'লো—এমনিতে কিন্তু পারতপক্ষে একে আমলই দেই না, এখন

আদর করে কাজে লাগাই ও কার্য উদ্ধার করি। এই ত গেল আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের চাবির তালিকা ও তা খোয়ানোর দুর্গতি। এই দুর্ভোগ অনেকেই ভুগেছেন; যারা ভোগেননি, ভবিষ্যতে তাঁদেরও যে ভুগতে হবে না, এমন কথা হলপ করে বলা শক্ত।

চাবি যখন হারায়, মানুষ তা টের পায় ও খোঁজে আতিপাঁতি ক'রে; না পেলেও খোঁজার বিরাম থাকে না। মনের চাবি কিন্তু সম্পূর্ণ অল্প ধরণের। একে হারালে জীবনের সুখ-শান্তি চিরতরে নষ্ট হয়, মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেয়, খুঁজতে গেলে অশান্তির মাত্রা বেড়েই যায়। এই কলকার্টিটি লোকে যখন হারায়, তখন টের পায় না; কারণ, বিনা চাবিতেও মন পবনবেগে তার কাজ ক'রে যায়, নিজস্ব ক্ষতি কিছুই হয় না। মুস্কিল, অশান্তি বা কিছু দুর্ভোগ ভুগতে হয় তাকেই, যে অল্প এক জনের মনের চাবিটির সন্ধান করতে ব্যগ্র হয় ও চেষ্টা করে। যত দিন মনের মিল থাকে, জীবনচাকা ময়ূণ-গতিতে চলতে থাকে; এই চাবির অস্তিত্বের কথা মনেই হয় না, তাই খোঁজও পড়ে না, এবং হারাবার ভয়ও মনে জাগে না। যে দিন থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলহ ও মতান্তর দেখা দেয় দুই পরমাঙ্গীয় ও নিকট-আঙ্গীয়দের ভেতর, তখনই বোঝা যায়, কল বিগড়েছে, চাবি ঠিক খেলছে না; ধীরে ধীরে তা' বিকলই হ'তে থাকে, এক দিন অবশেষে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ভাল বুঝে তখন যা কিছু করা যায়, তারই ফল দাঁড়ায় বিপরীত; সবটাকেই 'উন্টা বুঝলি রাম'—অবস্থা হয়; প্রতি পদে ভুল বোঝা এবং তা' শোধরাবার চেষ্টায় ধাওয়া-করা সন্তোষ দাম্পত্য-কলহ, পারিবারিক অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ সংসারে অহরহই ঘটছে। মনের চাবি যখন একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তখনই বুঝতে চাইলে বোঝা যায় যে, নিত্য নিত্য খিটিমিটি ও কলহের হেতু হ'ল মনের কলকার্টি হারান।

আমি এক জন ভুক্তভোগী; আপনাদের সময়ে সাবধান করে দিচ্ছি,—মনের মিল থাকার পর যখনই দেখবেন যে, তিনি আপনাদের তুচ্ছ মতভেদ ও অপ্রিয় বাক্য হেসে উড়িয়ে না দিয়ে প্রত্যুত্তর করছেন, এবং আপনিও তাঁর সব কথা ও কাজ বিনা-প্রতিবাদে ও প্রসন্ন মনে গ্রহণ

করতে পারছেন না, উপরন্তু নিজের কথাই জের টেনে জয়ী হতে চাচ্ছেন—যুক্তি দেখিয়ে, নয় ত গরম গরম কথা শুনিয়ে, তখনই জানবেন যে, আপনি মনের চাবি হারিয়ে ফেলেছেন। সেই সময়ই যদি সাবধান হ'তে না পারেন প্রত্যেক কাজে ও কথায়, তবে পরিণাম হবে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, অনেক সময় দুর্ভিক্ষ।

মাতা ধর্মজীবীর সঙ্গে মেয়েদের তুলনা করা হয় ; আশা করা হয়, মেয়েরা হবেন সর্বসংস্কার। সংসার শাস্তিপূর্ণ করতে হ'লে মেয়েদের—তথা মেয়েদের, যে ব্যবহারই পান না তাঁরা, নির্বিবাদে সহ্যে যাওয়াই তাঁদের উচিত। অন্নায় করা ও অন্নায় সহ্য উচিত নয় কোনক্রমেই। তবুও দেখা যায় যে, গৃহলক্ষ্মীরা যতই সহনশীলা হন, ততই গৃহে মঙ্গল আনতে পারেন। বাংলা দেশের মেয়েরা বুক ফাটলেও কোন দিন মুখ ফুটতে দেননি, আজও তার ব্যতিক্রম হ'লে অশান্তি দেখা দেবে নানা ভাবে। আত্মত্যাগ, ও নিজেকে বিলিয়ে অপরকে পুষ্ট করা ও হুঁষ্ট করা মেয়েদের চিরন্তন কর্তব্য। জগৎ প্রগতির পথে যতই এগিয়ে চলুক না কেন, যত দিন বিধিদত্ত বিধান মা হবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা থাকবে মেয়েদের, তত দিন সংসারে বাস ক'রে গার্হস্থ্যধর্ম পালন ও প্রকৃতির অক্ষুশাসন এদের মানতে হবে, এবং সব-কিছু বিশেষ ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য ক'রেও যেতে হবে। এই হ'ল বিধির বিধান ; একে উর্ন্তোতে গেলেই বিপত্তি। পুরুষ তার শক্তি ও পৌরুষ নিয়ে শীর্ষস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে—সমাজে। মুখে তারা যতই সমস্বাধীনতা প্রচার করুক, বড়াই করুক বা সদাশয়তাই দেখাক, স্বামী হিসাবে তারা যে বড়, তাদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে যে প্রাধান্য দিতে হবে, এই ধারণা এতই বদ্ধমূল ও সংস্কার-জাত যে, একে ভুলতে বা চাপা দিতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরাই পারেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে মেয়েরা যদি মাথা নীচু ক'রে না থাকেন, তবে ছোট বা বড় সংঘর্ষ অনিবার্য। বিয়ের আগে অনেক ছেলেই উচ্ছাস দেখায়, আদর্শবাদ প্রচার করে, কিন্তু প্রার্থিতা আসতে এসে প'ড়লে আদর্শবাদের চিহ্নও আর খুঁজে পাবার উপায় থাকে না ! স্বামী চিরকাল স্বামীই থাকবেন, স্ত্রীকে তাঁর অধীন হ'তে হবে ; নতুবা সাংসারিক শাস্তি, শৃঙ্খলা ও সূখের আশা ছরাশামাত্র, অথবা সূদূরপর্যায় হ'লেই মনে হয়।

এই সব কথা যে প্রচারকের নীতিবাদ নয়, এর পিছনেও যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তার প্রমাণস্বরূপ এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেখাব।

কর্তাটির সঙ্গে আমার আলাপ বহু বছর আগে—প্রায় এক যুগ হ'তে চলল। তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের পরিচিত বন্ধু ও হিতৈষী। সবে কলেজ থেকে অর্থকরী বিজ্ঞা আয়ত্ত ক'রে বেরিয়েছেন ; ব্যবহারে ও কথাবার্তায় অত্যন্ত মিশুক, সুবোধ এবং শাস্ত-শিষ্ট। তাঁর মনটি ছিল কল্পণাপ্রবণ ; গান-বাজনায়, অঙ্কনে ও খেলায় বেশ দখল আছে ; সবার উপর চেহারাখানাও মনোরম। মোট কথা, সব দিক দিয়েই শোভনীয় পাত্র ; কিন্তু স্তনতে পেতাম, বিয়ে তিনি করবেন না ; তার কারণ সকলের অজ্ঞাত।

প্রথম যখন আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তখন আমি ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ি—বয়স ১৫।১৬ ; নিজেকে বেশ 'হাম-বড়া' ব'লেই মনে করি। স্কুলের জগৎ এক দিকে যেমন সমস্ত মন অধিকার ক'রে থাকত স্কুল-খোলার দিনে, তেমনি অবসর-কালে দেশের কাজ করার ঝোঁক ছিল—প্রবল। মন থাকে তখন ভাবপ্রবণ। যে আদর্শ মনের কোণে আসন পাতে, তাই তার খোরাক খুঁজতে বেরিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থান সম্বন্ধে মনকে উদাসীন ক'রে রাখে। ছাত্রী-সভা, মহিলা-সমিতি, ব্যায়াম-সমিতি ইত্যাদির হিড়িকে মেয়েমহল ছাড়াও যে পৃথিবীতে অল্প জগৎ আছে, এবং সময়ে মনও কেড়ে নিতে পারে, এমন ধারণা একেবারেই ছিল না। 'সোসাল সারভিস' করা ও লেখাপড়া শিখে শিক্ষকতা করা—এই ছিল জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমার মনের ভাব ছিল তখন এইরূপ। কিন্তু আর এক জনের মনের ভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। আমাকে দেখেই তাঁর বহু দিনের বাঞ্ছিতা মানসী ব'লে ধারণা হ'ল। রূপের জৌলসে বোধ হয় চোখে লাগল ধাঁধা !

তাই বুঝি যে ভাবেই দেখতেন, তাতেই উৎসারিত হ'য়ে উঠত তাঁর কল্পনাতে রসের উৎস। পিকচার গ্যালারীতে কবে তিনি এক গোধূলি-রাণীর ছবি দেখেছিলেন, সেই ছবি জীবন্ত হ'য়ে হঠাৎ দেখা দিল সামান্য একটা চঞ্চলা তরুণীর মূর্তিতে ! যৌবনে যাকে

মন অর্পণ করা যায়, তার থেকে আর মন সরিয়ে ফেলা যায় না; বিশেষতঃ, সেই মন যদি হয় কল্পনাবিলাসী, সৌন্দর্যের পূজারী ও স্নেহপ্রবণ। যে বীজের অঙ্কুর দেখা দিল এই ভাবে, তা' দিনে দিনে শাখাপল্লবই বিস্তার করতে লাগল, কুসুমকোরকের কোন সম্ভাবনাও কিন্তু দেখা দিল না। মনের মণিকোঠায় রূপণের ধনের মত সময়ে তিনি এই প্রেমকে লুকিয়ে রাখলেন; কারণ, তাঁর মতে মানসীকে প্রার্থনা করার যোগ্যতা না কি তাঁর ছিল না, এমন কি, সেই ইচ্ছা প্রকাশ করলে তা' ধৃষ্টতা বলে মনে করবার আশঙ্কাও না কি ছিল যথেষ্ট!

ইতিমধ্যে নানা ঘটনাপরম্পরায় তিনি হ'য়ে উঠলেন পরিবারের অতিশয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাড়ীর সকলের কাছে তিনি ছিলেন, অত্যন্ত সুবোধ ও সুশীল, গুণেরও সীমা ছিল না; এর বেশী অন্য পরিচয় তাঁর ছিল না। ফলে, তাঁর মনের এই চাকুলের খবর ছিল সকলের অজ্ঞাত। বি-এ পরীক্ষার আগে আমার প্রথম মনে হয়, এ'র অন্তরঙ্গতার ভেতর অন্য ভাব আছে, চোখ যেন কি বলতে চায়, স্পর্শের অসুভূতি সাধারণের চেয়ে ভিন্ন—একটু যেন দরদমাখান। একটু একটু সন্দেহ মনের কোণে উঁকিও দিত, কিন্তু পড়ার চাপে ও কলেজের হুজুগে কোন সন্দেহই মাথা তুলবার অবসর পেত না। যে সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল অতি সঙ্কোচে, তা' দৃঢ়ভিত্তি নিল এম-এ পরীক্ষার সময়। এই ধারণার কথা, সন্দেহের কথা প্রকাশের উপায় ছিল না; কারণ, বিশাল সামাজিক বাধা ও বহুমূল সংস্কারের প্রাচীর প্রবল ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—আমাদের মাঝখানে। একে উপেক্ষা করবার মত সংসাহস তখনও আমাদের মনে জাগেনি।

পরীক্ষাবসানে কার্যোপলক্ষে বিদেশে গেলাম, ফিরে এলাম বি-টি পড়তে। এই সময় যে সন্দেহ আমার মনেই ছিল, এক দিন আকস্মিক ভাবে তা' আত্মপ্রকাশ করল। যে আশা তিনি সজ্ঞাপনে অবরুদ্ধ রেখেছিলেন অন্তরের অন্তরালে, তাই এক দিন বাণী পেল, এবং মুক্তগতি নির্ঝরনের মত প্রচণ্ড বেগে সকল বাধা ভাসিয়ে দিয়ে দক্ষিণের দিকে ধাবিত হ'ল। লোকনিন্দা, লোকলজ্জা—কোন ভয়ই আর প্রেমপ্রকাশকে বাধা দিতে পারল না। অপমান, লাঞ্ছনা, মনঃকষ্ট অনেক ভোগ করবার পর ভগবান্ মুখ

তুলে চাইলেন। মিলনের পথ হ'ল সুগম। তখন আমি ছিলাম তাঁর মানসী, প্রেমসী ও হৃদয়রাজ্যের রাণী; কল্পরাজ্যে বিচরণ ক'রে আমি সংসারের কাঁটার খবর রাখতে পারিনি, ভাবতাম, জীবন-চাকা প্রেমের জোরে অবাধে মসৃণ ভাবেই চলে যাবে; জীবনের কঠোর ও নগ্ন সত্য, সাংসারিক জটিলতা কখনই কোন আড়াল রচনা করতে পারবে না—আমাদের মারো। তখনকার দিন ছিল স্বপ্নময়, মধুময়, বাস্তবতা কপটতা সৃষ্টি করার কোন সুযোগ পায়নি। কোন দিন যে এই সঙ্কল্পের ব্যতিক্রম হ'তে পারে, তা চিন্তা করা দূরে থাক, কল্পনায়ও আসত না। বিয়ের মাসখানেক পরেই বাস্তবতায় নেমে প্রথম টের পেলাম, যা বলা যায়, কার্যতঃ তাই করা সম্ভব নয়। জীবন শুধু কল্পনা নয়, শুধু কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তাতে কাঁটার আঁচড়ও যেমন আছে, তেমনি কর্তব্যের শৃঙ্খলও পদে পদে বাধা সৃষ্টি ক'রে জীবনের সুখ ও মনের শান্তি নষ্ট ক'রে থাকে। বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হ'লে যতটা ধৈর্য ও সহনশীলতা অত্যাবশ্যক, আমার চরিত্রে তার বিন্দুমাত্রও নাই। তাই স্বভাবের ঔদ্ধত্য ও অসহিষ্ণুতায় ঝড়-ঝাপটা প'ড়ত স্বামীর উপর, তিনি হাসিমুখে সবই সহ্য করতেন। কিন্তু সহ্য করারও একটা সীমা আছে, ক্রমে তিনিও অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন, ফলে কথা-কাটাকাটি, সময়ে সময়ে কথা প্রায় বন্ধই হয়ে যেত। এক জনের কথা ও ভাবধারা অত্রে ঠিক সেই ভাবে নিতেম না, ভুল বোঝবার পালা শুরু হ'ল, এবং এর অবশ্যস্বাবী ফল—মনঃকষ্টও পেতে হ'ত। এখন বুঝি, মনের চাবি-হারানোর দরুণ এত মানসিক ক্লেশ পেতে হ'য়েছে। ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির ফলে নিজের ক্রটি বুঝতে পারলাম, এবং এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় যে সহিষ্ণুতা, তা-ও বোধগম্য হ'ল। প্রেমের বাধন প্রায়শঃই ছিন্ন হয় না সত্য, কিন্তু সংসারে চলতে হ'লে প্রেমই যে একমাত্র পাথর হ'তে পারে না—তা' বুঝতে পারলাম। জগৎ প্রগতির পথে যতই এগিয়ে যাক না কেন, মেয়েদের ধরিত্রীর মত ধৈর্যশালিনী না হ'তে পারলে সংসার সুখের হ'তে পারবে না, নানা প্রকার অশান্তি নানা রূপে দেখা দেবে।

দাম্পত্য-কলহের স্থায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পকাল

স্থায়ী হয়, কিন্তু যত অল্প দিনই থাকুক না কেন, এর দাহন অত্যন্ত তীব্র। আমারও এইরূপ মানসিক ক্রেশের সময় আত্মবিচার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানের চিন্তাশীলনে একটি সত্য প্রকট হ'য়েছে। চাবি হারানই, তা সে যার চাবিই হোক না কেন—অমঙ্গল ও অশান্তির আগমন সূচনা করে। বিয়ের পরই আমি স্কটকেশের চাবি হারিয়ে ফেলে-ছিলাম। সেই থেকে আমার একটা সংস্কার বদ্ধমূল হ'য়েছে যে, চাবি হারালে সকলেরই কথায় ও কাজে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। মনের চাবি কোন অস্তিত্ব নেই মনি, কিন্তু মনা-স্তুর ও মতান্তরই জানিয়ে দেয় যে, মনেরও চাবি আছে। যত রকম চাবি আছে, তার ভেতর মনের চাবি হারিয়েই সব চেয়ে দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। অত্যাচ্য চাবি হারালে ক্ষতি হয় সাময়িক ভাবে, এবং তা অর্থের উপর দিয়েই যায়; কিন্তু মনের কল-কাঠিটি খোয়ালে জীবনব্যাপী অশান্তি দেখা দেয়, এবং মর্মভেদী যন্ত্রণা জীবনকে অবাধে পীড়ন করতে থাকে। সেই জগতই মনে হয়, চাবি হারালেই সাবধান হওয়া অবশ্য-কর্তব্য। সময়ে সাবধান না হলে দুর্ভোগের আর অন্ত থাকে না।

শ্রীকলবালী রায়।

উলের ব্লাউশ

শীতের দিনে নারী-সমাজে এখন পশমী ব্লাউশ-কোট গায়ে দেবার রীতি সচল হয়েছে। বাড়ীর মেয়েরা নিজেদের হাতে নানা ছাঁদের জাম্পার, সোয়েটার, ব্লাউশ প্রভৃতি তৈরী করছেন। এ ব্লাউশ-সোয়েটারের শ্রী-ছাঁদ যাতে ভালো হয়, সকলেই তা চান। এ-মাসে তাই আমরা স্ত্রীদের একটি ব্লাউশ-বোনার নির্দেশ দিলাম।

এ-ব্লাউশটি লেশ-স্টিচ প্যাটার্নের; দেখতে জটিল হলেও এটি বোনা খুব সহজ। এটি বুনতে যে-কোন রঙের ৬

আউন্স উল চাই (৪ প্লাই); আর সেই-সঙ্গে এক জোড়া ১২নং এবং এক জোড়া ৯নং কাঠি চাই। এ ছাড়া লাগবে ১২নং একটি ক্রেশের কাটা আর দু'টো কাঠের পুঁতি (wooden beads)।

নির্দেশ-অনুযায়ী বুনলে এটির ঝুল হবে ১৬ ইঞ্চি, ছাতি ৩১ ইঞ্চি আর হাতের ঝুল সাড়ে ৫ ইঞ্চি। অবশ্য ইচ্ছা করলে হাতের ঝুল কমিয়ে নিতেও পারেন।



ব্লাউশ গায়ে

এর সংক্ষেপোক্তির সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। মামুলি সোঃ, উঃ, ধঃ কঃ, ধঃ বাঃ ছাড়া এতে আরো কয়েকটি উক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—এঃ সঃ = দুটি ঘর এক সঙ্গে নিয়ে একটি ঘর তোলা; ঘঃ তুঃ নিঃ = ঘরটি না বুনে তুলে নিন; নাঃ ঘঃ তুঃ = না-বোনা ঘরটির মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট ঘরটি তুলে নিন। উঃ সাঃ = উল সামনে দিয়ে একটা ঘরের জায়গায় দু'টো ঘর তুলে

নিন; ডিঃ সিঃ = ডবল ক্রুশ অর্থাৎ ক্রুশ করে একটি ঘরের জায়গায় দু'টি ঘর তুলে নিন।

সামনের দিক

১২নং কাঠিতে ৮৬টি ঘর তুলুন। ৩ ইঞ্চি ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনে যান। তার পর ৯নং কাঠি দিয়ে আসল প্যাটার্ণটি আরম্ভ করুন। ১ম লাইন—১টা সোঃ, * ১টা উঃ সাঃ, ১টা ঘঃ তুঃ নিঃ, ২টো ঘর এঃ সঃ; এখন এই ঘরটি নাঃ ঘঃ তুঃ নিন, ১টা উঃ সাঃ, ৩টে সোঃ। * থেকে লাইনের শেষ অবধি রিঃ করে যান। শেষের একটি ঘর

জন্ম ঘর বাড়াতে হবে। (এ ব্লাউশের হাত-দু'টি আলাদা করে তৈরী করতে হবে না)।

এর পরের ৮ লাইনের আরম্ভে ৬টি করে ঘঃ বাঃ হবে এবং আগাগোড়া নির্দিষ্ট প্যাটার্ণে বুনে যেতে হবে—নতুন-তোলা ঘরগুলি সমেত। এই ভাবে কাঠিতে ১৩৪টি ঘর হবে। এখন যথানিয়মে বুনে যান। হাতটি যখন চার ইঞ্চি বোনা হবে, তখন প্যাটার্ণের ৩য় লাইনটি অবধি বুনে এই ভাবে ৪র্থ লাইনটি বন্ধন—৪৬টি ঘর উঃ, ৪২টি ঘর বন্ধ করে ফেলুন, ৪৬টি ঘর উঃ। দু'ধারের এই ৪৬টি করে ঘর দু'টো বাড়তি কাঠিতে রেখে দিন।

পিঠের দিক

এ-দিকটি অবিকল সামনের দিককার নির্দেশ-অনুযায়ী বুনেবেন। শেষ কালে যে ৪৬টি করে ঘর থাকবে, দু'ধারের সেগুলি দু'টো কাঠিতে তুলে নিন। এখন সামনের এক দিকের ঘরগুলি আর পিছনের ঠিক সেই দিকেরই ঘরগুলি এক সঙ্গে বুনে ফেলতে হবে। মানে, এ-কাঠি থেকে একটি ঘর নেবেন, আর ও-কাঠি থেকে একটি ঘর নেবেন। দু' কাঠি থেকে দু'টি ঘর নিয়ে ১২নং কাঠি দিয়ে দু'টি ঘর এঃ সঃ বুনে ফেলবেন। তার পর দু'টি ঘরের সমষ্টি এই ঘরটিকে এর পরের ঘরটির সঙ্গে একত্র বন্ধ করে ফেলবেন। এই ভাবে কাঁধ-দু'টি জোড়া হয়ে গেল। এখন হাতের ঘর থেকে ৭২টি ঘর তুলে নিয়ে ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে এক ইঞ্চি বুনুন। তার পর ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

এইবার দু'টি পাশ জুড়ে ফেলুন। ক্রুশ দিয়ে গলার চার লাইন ডিঃ সিঃ করুন। তার পর উলটি দু' হালি করে নিয়ে ক্রুশ দিয়ে দেড়-গজ আন্দাজ লম্বা একটি চেন বুনে নিন। উলের চেনটি গলার চারিদিকে ঘিরে দিন—যাতে করে ফিতের দু'ধারের দু'টি মুখ টানলেই গলায় কোঁচ পড়ে। স্ততোটি যাতে খুলে না যায়, সেজন্ম এর দুই মুখে কাঠের পুঁতি দু'টি পরিয়ে গিঁট দিয়ে দিন।

এইখানে একটা কথা বলি, এ ধরনের জালি-জালি প্যাটার্ণে তৈরী জিনিষ সাধারণ উলের জামার চেয়ে ঢিলে হয়, এ-কথা মনে রাখবেন।



লেশ ষ্টিচ

সোঃ করুন। ২য় লাইন—সমস্ত উল্টো করুন। ৩য় লাইন—১টা সোঃ, * ৩টে সোঃ, ১টা উঃ সাঃ, ১টা ঘঃ তুঃ নিঃ, ২টো ঘর এঃ সঃ, এখন এই ঘরটি নাঃ ঘঃ তুঃ, ১টা উঃ সাঃ। * থেকে রিঃ করে যান। শেষের ঘরটি ১টা সোঃ করুন। ৪র্থ লাইন—সমস্ত ঘর উল্টো বুনুন।

এই চার লাইনে প্যাটার্ণটি সম্পূর্ণ হয়েছে। আগাগোড়া এই চার লাইনের প্যাটার্ণ রিঃ করে যান। এই ভাবে যখন এগারো ইঞ্চি বোনা হবে, তখন হাত দু'টির



সংবাদপত্রের জন্মকথা

(এ-দেশে ও বিদেশে)

বিংশ শতাব্দীর সুসভা জগতে আজ সংবাদপত্রের স্থান কত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, তাহা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আত্মপ্রবুদ্ধ নব-নারীর ব্যাপক রাষ্ট্রীয় চেতনা পর্যবেক্ষণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

রাষ্ট্রে, সমাজ ব্যবস্থায়, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, শিল্প-বাণিজ্যে, কৃষি ও অর্থনীতিতে—সুসভা মানবসমাজের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে সংবাদপত্রের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর দূরতম প্রদেশের সংবাদও কত অল্প সময়ে সংগৃহীত হইয়া সংবাদ-পিপাসু নব-নারীর কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য প্রতিদিন তাহাদিগের গৃহদ্বারে প্রচারিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। সংবাদপত্রই এ যুগে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে পারস্পরিক পরিচয়ের শৃঙ্খলে গ্রথিত করিয়া বিশ্বমানবতার সমন্বিত আদর্শে উন্নীত ও উন্নত করিয়াছে। সেই-জন্ম কেবলমাত্র কোন দেশ-বিশেষের সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যেই নহে—সমগ্র বিশ্বের স্ববিস্তীর্ণ ক্ষেত্রেও রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি-সম্পর্কিত বিষয়ে বৃহত্তর বিপ্লব-সাধনেরও ক্ষমতা সংবাদপত্রের আছে; প্রকৃতপক্ষে এই পুণাতন পৃথিবীকে ভাঙিয়া নূতন ভিত্তিতে নূতন করিয়া গড়িয়া-তুলিবার স্পর্ধা যদি কাহারও থাকে, তবে একমাত্র সংবাদপত্রই তাহার দাবী করিতে পারে। আপনাকে লোকচক্ষুর অস্ত্রবলে রাগিয়া প্রতিনিয়ত যাহারা নীরবে দেশ ও জাতি-গঠনের কাধে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এবং এই কার্যে ব্যাপৃত আছেন, মাতৃমন্ত্র দীক্ষিত সেই আত্মভোলা সাধকের দল দেশে-দেশে যুগে-যুগে স্বদেশ-জননীর পূণ্য-পাদপীঠমূলে নিজেদের বৃকের বক্তৃতা অক্ষুণ্ণচিত্তে উৎসর্গ করিতেছেন। তাঁহাদিগের হস্তস্থিত আলোকবর্তিকার উজ্জ্বল শিখায় নির্ভর করিয়া সমগ্র জাতি বঙ্কা-বিক্ষুদ্ধ রাজ্যে কণ্টক-সমাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথে দৃঢ়পদে জয়যাত্রায় অগ্রসর হইয়াছে। রাষ্ট্র ও সমাজজুক সাংবাদিকগণ জাতির নমস্।

আজিকার বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে এমন কোন সভা দেশ বা জাতির কথা কল্পনা করাও যায় না, যে দেশ বা জাতির কোন প্রকার সংবাদপত্র নাই; কিন্তু এমন দিনও ছিল, যখন পৃথিবীতে সংবাদপত্রের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বস্তুতঃ, সংবাদপত্রের—প্রকৃত রাজনৈতিক সংবাদপত্রের উৎপত্তি খুব অধিক দিনের ঘটনা নহে।

অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সিড্‌নে মর্নিং হেরাল্ড' এক সময় মস্তব্য করিয়াছিলেন,—

“পৃথিবীর প্রতি-দশখানি সংবাদপত্রের মধ্যে সাতখানি ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত, এ-কথায় ইংরেজগণ গর্বান্বিত করিতে পারেন; কিন্তু সংবাদপত্রের জন্মস্থান ইংলণ্ড নহে—সে বিষয়ে তাহাদিগের গর্বান্বিত করিবার কিছুই নাই।”

কথাটা বিশেষ ভাবেই অমুখাবনযোগ্য।

বহু—বহু বৎসর পূর্বে রোম নগরীতে দৈনন্দিন ঘটনাবলীসহ একখানি ক্ষুদ্রাকার প্রচার-পত্রিকা প্রকাশিত হইত বলিয়া জানা যায়। তাহার নাম ছিল—'Acta Diurna'। রোমে তখন প্রবলপ্রতাপ জুলিয়াস সীজারের 'ডিক্টেটরী' শাসন প্রবর্তিত। সহরের কোন প্রকাণ্ড স্থানে এই প্রচারপত্র লটকাইয়া রাখা হইত, এবং সম্ভবতঃ অল্প কয়েকখানি পত্র বিক্রয়ও হইত। ১৯৯০ বৎসর পূর্বে জুলিয়াস সীজার যখন এঙ্গেল সাক্সন ও জুটদিগের ভয়ভূমি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার জন্য ডোভার অতিক্রম করেন, তখন সে সংবাদ এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

এই প্রচারপত্রে যে ভাবে সংবাদ প্রকাশিত হইত, তাহার ৩টি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

(১) It thundered, and an oak was struck in that part of Mount Palatine called Summa Velia early in the afternoon.

(২) A fray happened in a tavern at the lower end of Banker Street, in which the keeper of the 'Hogin Armour' tavern was dangerously wounded.

(৩) Tertinius, the Aedile fined the butchers for selling meat which had not been inspected by the overseers of the markets.

তখন লিনোটাইপ মেশিনের বা কোন দৈনিক সংবাদপত্রের লক্ষাধিক সংখ্যা মুদ্রণের কথা লোকের কল্পনারও অগোচর ছিল। কাজেই পাঠক সংখ্যাও মুষ্টিমের ছিল। যাহাই হউক, জুলিয়াস সীজারের সঙ্গেই এই সংবাদপত্রখানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু উহা জগতের প্রথমতম সংবাদপত্র হইলেও পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্র নহে। এই গৌরব রোমের নহে,—চীনের। সহস্রাবধিক বৎসর পূর্বে চীন দেশে সিঙ্কের কাপড়ের উপর সংবাদ মুদ্রিত করিয়া যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত, আজিও তাহা সেই ভাবেই প্রকাশিত হইতেছে। চীন দেশ হইতে প্রকাশিত 'পিকিন্-গেজেট' পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্র।

অনেকে—বিশেষতঃ যুরোপীয় সাংবাদিকরা—বলেন, সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার গৌরব জাৰ্মানীর। বিনা-প্রমাণে ও বিনা-যুক্তিতে এই উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না; তবে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে জাৰ্মানীতে সংবাদ-প্রচারপত্ররূপে এক প্রকার কাগজ বাহির হইত, ইহা সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে তথায় এরূপ কোন অমুঠান ছিল বলিয়া জানা যায় না—যাহাকে অনেকটা সংবাদপত্রের অমূকপও বলা যাইতে পারে।

১৩১৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানিতে ইজিনল্ফ্ এমেল নামক এক ব্যক্তি একখানি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করেন; উহার নাম—‘ফ্রাঙ্কফার্টার জার্নাল’। ইংলণ্ডে যে এ সময়ে কোন প্রকার সংবাদ-পরিবেশনমূলক পত্র ছিল না, তাহা সর্বজন-স্বীকৃত কথা। জাখানিয়েল বাটার ও অন্যান্য কয়েক জন ব্যবসায়ী মিলিয়া লণ্ডনে সর্বপ্রথম ‘দি উইকলি নিউজ’ নামক একখানি কাগজ প্রকাশ করেন। উহা ১৬২২ খৃষ্টাব্দ বা সম-সাময়িক ঘটনা। জার্মানীর ও লণ্ডনের যে দুইখানি প্রচার-পত্রের নাম উল্লিখিত হইল—সংবাদ-পরিবেশন বা জনমতগঠন উহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। পণ্যক্রমের প্রচারই উহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এবং উদ্যোগ-স্বর্ণ সকলেই ছিলেন—ব্যবসায়ী।

ইহার পর ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে প্যারী সহরে যে সংবাদ-পত্রখানি প্রকাশিত হয়, তাহার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার ছিল। এই সংবাদপত্রখানিই পরে ‘গেজেট ডু ফ্রাঁস’ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে, এবং রাজনীতিক রীচলুর পৃষ্ঠপোষকতার প্রচারে ও প্রভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে।

বর্তমানে সংবাদপত্রে ‘লীডার’ বা প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া যে মতামত প্রকাশ বা জনমত গঠনপ্রচেষ্টার রীতি লক্ষিত হয়, তাহার ইতিহাস খুব অধিক দিনের নহে। স্টিফট, ডিফো, বলিঙ্কক প্রভৃতি লেখক ও সাংবাদিকগণের সমস্র হইতেই ইহার আরম্ভ। এ স্থলে এ কথার উল্লেখ অপ্ৰাসঙ্গিক নহে যে, প্রকৃত রাজনীতিক সংবাদপত্রের জন্মস্থান ফ্রান্স, এবং ফরাসী-বিপ্লবের সূত্রপাতের সময়েই তাহার আরম্ভ। বহু দিন পূর্বে—ফরাসী-বিপ্লবের প্রারম্ভকালে কোন ফরাসী সাংবাদিক সাংবাদিকগণের কর্তব্য সম্বন্ধে যে আদর্শের কথা বলিয়াছিলেন—মাজিও তাহা প্রত্যেক নিষ্ঠাবান সংবাদপত্র-সেবীর আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত ও বিবৃত হইতেছে।

“Suffer yourself to be blamed, imprisoned, condemned—suffer yourself even to be hanged ; but publish your opinions. It is not merely a right—it is a duty”—কি আশ্চর্যকথাপূর্ণ নির্ভীক উক্তি।

ফরাসী-বিপ্লব কেবল ফরাসী দেশেরই অস্তুর্নিবিষ্ট বিপ্লব মাত্র নহে; উহা দ্বারা জগতের ভিত্তি বিকম্পিত, এবং পৃথিবীর সভ্যতার প্রকৃতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের সংবাদপত্রের জন্মের ইতিহাস পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে আর একখানি সংবাদপত্রের নাম করাও অবশ্যকর্তব্য। উহার নাম—‘মার্কুরে ডু ফ্রাঁস’। ইহাও ফ্রান্সের সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র। নবমপন্থী রাজনীতিকরাই ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; কিন্তু ক্রমে উহা দেশের তৎকালীন চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী বুদ্ধিজীবীগণের হস্তে আসিয়া পড়ে, এবং ফ্রান্সের রাজনীতিকক্ষেত্রে অসাধ্যসাধনের শক্তির উৎসরূপে পরিগণিত হয়।

- যুরোপের অন্যান্য দেশে রাজনীতিক সংবাদপত্রের জন্ম মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। ফরাসী-বিপ্লবের সময় হইতে, বিশেষ ভাবে উহার পরে—পৃথিবীর নবনারীর আদর্শবাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব সংঘটিত হয়। সংবাদ জানিবার ও জানাইবার কৌতূহল এই সময় হইতে সর্বদেশেই জনসাধারণের মধ্যে অসাধারণভাবে বৃদ্ধিত

হয়। কাজেই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বৈপ্রবিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং জনসমাজের এই স্বাভাবিক কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরে এক জন লোক একটা ক্ষুদ্র—সংবাদপত্র নহে, সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করেন। তাঁহার নাম এখন সমগ্র সভ্যজগতে সুপরিচিত ও সমাদৃত—তিনি জুলিয়াস রয়টার। তখন বার্তা আদান-প্রদানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও উপকরণাদির কথা লোকের কল্পনাভীত ছিল। তথাপি তিনি সর্বপ্রথম এই তথ্য আবিষ্কার ও এই সত্য প্রতিপাদন করেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদপত্রকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ করিবার জন্ত একটি ব্যাপক সংবাদসরবরাহ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত। এই প্রস্তাব লইয়া তিনি যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া অধিকাংশ সাংবাদিকই হান্ত সংবরণ করিতে পারেন নাই। সংবাদপত্র নাই, অথচ সংবাদ বিক্রয় করিবার জন্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এই প্রথম প্রয়াস তথায় অবজ্ঞাত হয়। এমন কি, লণ্ডনের বিখ্যাত ‘টাইমস’ পত্রের সম্পাদকও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন! একমাত্র ‘দি মর্নিং এভভার্টাইজার’ তাঁহাকে পরীক্ষামূলক ভাবে স্রযোগ দান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ক্রমশঃ একে-একে সকলেই তাঁহার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে সম্মত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিলাতের সাংবাদিকগণ সকলেই প্রচারপত্র রচনা করিতেন। সংবাদপত্র-জগতে তাহাদিগের নাম অমর হইয়া আছে, তাহাদিগের প্রায় সকলেই এই প্রচারপত্রের লেখকরূপে জাতির হইয়াছিলেন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রথম সাময়িক প্রচার-পত্র প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সময় এক নূতন প্রচেষ্টা ক্রমশঃ সংবাদপত্র-জগতে পরিষ্ফুট হইতে লাগিল। বিদেশের সংবাদ সংগৃহীত হইয়া অনেক দিন পরে-পরে একত্র গ্রথিত ভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সকল সংগ্রহ-পত্রিকার কিছু কিছু এখনও লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ‘মার্কুরিয়াস্ ব্রুটেনিকাস্’ (২২শে আগষ্ট, ৬৮৩ খৃঃ) নামক সংবাদপত্র মাত্র ৪ বৎসর কাল জীবিত ছিল। তাহার পরে—ক্রমশঃয়ের সময়—প্রধান সংবাদপত্ররূপে যে সংবাদপত্রদ্বয় বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহাদিগের নাম—‘পলিটিকাস্’ ও ‘পাব্লিক ইন্টেলিজেন্সার’। শেষোক্ত সংবাদপত্র ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রেটব্রুটেনে সংবাদপত্রের জীবন কখনই নিরক্ষণ ছিল না। নানা বিপদ ও বাধা অতিক্রম করিয়া—সকল দেশের মতো সেখানেও সংবাদপত্র সমূহকে আশ্রয় করা করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। রাজকীয় রোষবহিতে বহু সংবাদপত্র ভস্মীভূত হইয়াছে, বহু সাংবাদিক বিপন্ন হইয়াছেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে ‘অক্সফোর্ড গেজেট’ প্রকাশিত হয়; কিন্তু নানা কারণে বাধ্য হইয়াই উহাকে (২৪ সংখ্যা হইতে) নাম পরিবর্তন করিতে হয়। উহাই পরে ‘দি লণ্ডন গেজেট’ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ডিফোকে রাজনীতিক মতবাদের জন্ত কারাবন্দ কবা হয়; কিন্তু তিনি কারাপ্রকোষ্ঠ হইতেই তাঁহার বিখ্যাত ‘রিভিউ’ পত্রিকা প্রকাশ (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৭০৪ খৃঃ) করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে। সুলভে বহুল-প্রচারের জন্ত ‘ডেলি নিউজ’ পত্রকে

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক পেনী মূল্যের কাগজে পরিণত করা হয়। আমাদের দেশে 'সুলভ সমাচার' ও 'পরমা আকসরব' এক দিন এই আদর্শেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সে পরের কথা; বাহা হউক, বিলাতে ক্রমে আরও বহু বিখ্যাত সংবাদপত্রের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে অনেকগুলি এখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্ররূপে সভ্য-জগতে সমাদৃত হইয়াছে।

বিদেশে সংবাদপত্রের জন্ম-ইতিহাস পর্যালোচনা করা বিশেষ গবেষণাসাপেক্ষ। বর্তমান নিবন্ধে সেই ইতিহাসের তথ্যসম্বন্ধানু-পথের ইঙ্গিতমাত্র করা হইল।

—অতঃপর এ দেশের কথা।

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের জন্ম-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এ দেশে ইংরেজ-শাসন প্রবর্তনের প্রথম যুগে কতিপয় বে সরকারী যুরোপীয় ব্যক্তির উৎসাহেই সর্বপ্রথম কলিকাতায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

অধ্যাত্মবাদের স্মৃতিকাগার ভাবতরঙ্গ আত্মিক উন্নতির প্রতিই চিরদিন লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে। সেই জন্ম আজ প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। আর্ধ্যজাতির অদৃষ্টিত ভারতভূমি কখনই প্রচারের দিকে যথেষ্ট মনোযোগী হইবার অবসর গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ, সেই জন্মই রাজনীতিক বা অর্থনৈতিক অথবা সমাজ-ব্যবস্থামূলক সংবাদ-সববরাহের জন্ম কিংবা জন্মত সংগঠনের নিমিত্ত কোন প্রকার সংবাদ-পত্র ভারতবর্ষে ছিল না। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু-রাজগণের রাজত্বের রাজকীয় ঘোষণাদি প্রচারের জন্ম কোন প্রকার সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, এ কথা সত্য। তাহার পর মুসলমান-রাজত্ব-কালে বৈদেশিক পর্যাটকগণের এবং সমসাময়িক হিন্দু ও মুসলমান রাজকর্মচারীগণের লিখিত বিবরণ হইতে যে সকল রাজনীতিক ও সমাজ-ব্যবস্থামূলক তথ্য অবগত হওয়া যায়, তাহার মধ্যেও সংবাদ-পত্রের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায় না। কাজেই এ কথা সর্বথা স্বীকার্য যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে ইংরেজ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর—প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নহে—কয়েক জন উৎসাহী যুরোপীয় মনস্বী দ্বারা এই দেশে সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর বণক্ষেত্রে ভারতের ললাটে পরাজয়ের মসীচিহ্ন লিপ্ত হইবার পর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ায়েন হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার গভর্নরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ক্লাইভ এ দেশে ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্বের সূত্রপাত করিলেও ওয়ায়েন হেষ্টিংসই তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এই সময়েই কোম্পানীর কর্মচারীগণ এ দেশে ইংবেজীভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানসম্পন্ন কেবাণী প্রভৃতির প্রয়োজন বিশেষ ভাবেই অনুভব করিলেও এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন ইংরেজ শাসকগণ এ দেশে সংবাদপত্র প্রচলনের প্রচেষ্টাকে প্রথম হইতেই অত্যন্ত 'সন্দেহ'র দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন; কেন না, ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার উইলিয়াম বোন্টস্ নামক যুরোপীয় ভ্রমলোক কলিকাতায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন দেখিয়া ক্রুদ্ধ ইংরেজ শাসকগণ তাঁহাকে অবিলম্বে মাদ্রাজের পথে যুরোপে প্রস্থান করিতে হইবে। ইহার পর আরও কয়েক ব্যক্তি অল্প

ভাবে অনুরূপ চেষ্টা করার সরকারের বিরোধিতায় অকৃতকার্য হইয়াছিলেন।

সত্যের কঠোরোধ করিয়া রাখা সাময়িক ভাবে সম্ভব হইলেও স্থায়ীভাবে তাহা সম্ভব নহে। সরকারের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও, এবং নানা ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়াও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেমস্ অগাষ্টাস হিকী কলিকাতায় 'বেঙ্গল গেজেট' নামক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। উহাই এ দেশের প্রথম সংবাদপত্র। 'বেঙ্গল গেজেট'র এইরূপ পরিচয় দেওয়া হয়,—

"A weekly political and commercial paper open to all parties, but influenced by none,"

অর্থাৎ—

এই রাজনীতি ও বাণিজ্য-বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি সকল দলেরই মুখপত্র,—কিন্তু কাহারও প্রভাবান্বিত নহে।

সরকার প্রথমাবধিই ইহাকে 'সন্দেহ'র দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করেন। এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের দশ মাস পরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে সরকার এক আদেশ জারী করিয়া ডাক বিভাগের মারফৎ ইহার প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই আদেশের ফলে ইহার প্রচার ক্ষুণ্ণ হইলেও প্রকাশ বন্ধ হয় নাই। পর-বৎসর জুন মাসে ইহার সম্পাদক গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর নানা ভাবে চেষ্টার পর কর্তৃপক্ষ এই সাপ্তাহিক পত্রখানির বিলোপসাধনে সমর্থ হন।

যে ইংরেজ জাতি স্বদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্ম চিরদিন সংগ্রাম করিয়া আনিয়াছেন, ভারতবর্ষের সংবাদপত্র প্রবর্তনের প্রথম প্রয়াসের প্রতি তাঁহাদিগের এই সহানুভূতিলেশহীন অনাচার এ দেশের রাজনীতিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিয়া তাঁহাদিগেরই সামঞ্জস্যহীন দৈপায়ন-সঙ্কীর্ণতাব পরিচয় প্রদান করিতেছে। অমর কবি মিল্টনের 'এরিওপেজিটিকা' ইংরেজী সাহিত্যের গর্ব—ইংরেজের গৌরব; কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত দেশের জন্ম তাহার আদর্শ কল্পিত হয় নাই।

বাহাই হউক, 'বেঙ্গল গেজেট'র প্রকাশ রহিত হইলেও এ দেশ হইতে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা নিমূল করা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর 'বেঙ্গল জার্নাল' ও 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশিত হয়। সরকারের কার্যের সমালোচনা করা প্রত্যেক সংবাদপত্রের প্রাথমিক কর্তব্য; কিন্তু চিরদিনই দেখা গিয়াছে, রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিচালক-বর্গ সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণুতা পোষণ ও প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ, যে রাষ্ট্র পরিচালকবর্গ জনমতের দ্বারা সমর্থিত নহেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর অসহিষ্ণুতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই দুইখানি সংবাদপত্রও তৎকালীন সরকারের কার্যাবলী তীব্রভাবে সমালোচনা করা আপনাদিগের কর্তব্য বলিয়াই বিবেচনা করিয়া-ছিলেন। ফলে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল জার্নালে' প্রকাশিত রচনার জন্ম উইলিয়াম ডুরেনকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদককেও গ্রেপ্তার করিয়া বিতাড়িত করা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই সংবাদপত্রের সম্পাদক মিষ্টার সিদ্ধ বাকিংহামকে বিতাড়িত করিবার পরই সরকার সংবাদপত্র-দলনের জন্ম নানাবিধ কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা, বোধ কবি, অপ্রাসঙ্গিক

হইবে না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে সংবাদপত্রের অধিকার-সম্বোধকারী এক আইনের খসড়া তৎকাল-প্রচলিত নিয়মামুসারে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে দাখিল করা হয়। এ দেশের জনমত তখন নিগূহীত সংবাদপত্রগুলিরই সমর্থন করিতেছিল। বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায় তখন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং অধিকাংশ স্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আকৃষ্ট হইলেও রাজনীতিক চেতনা, ও স্বদেশের প্রতি কর্তব্য-জ্ঞান বিসর্জন করেন নাই। কাজেই প্রস্তাবিত আইনের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। এ কথা গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশবাসীর পক্ষ হইতে শিক্ষিত বাঙ্গালী ৬ জন যুবক সেই প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেন; তাঁহাদের নাম—দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।—এ দেশ-প্রবাসী কোন যুরোপীয় এই প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। বাগা হটক, সরকার এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া প্রস্তাবিত আইন জারী করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই এ দেশবাসী “আবেদন আর নিবেদনের খালা বয়ে’ বয়ে’ নতশির।”

ভারতে জাতীয়তার ভাবধারা যে বাঙ্গাল দেশ হইতেই প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জাতিকে ঐক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে এই সময় যে রাজনীতিক চিন্তাধারা ও দেশাস্বাবোধের আদর্শ স্ক্রিয়িত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্তিলাভ করিতে থাকে। এই আদর্শ-প্রচারে সংবাদপত্রের দান যে সামান্য নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সময়ের সংবাদপত্রের কথাতেই এক জন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,—

“Who could have foreseen that those cat-callings of bugle-boys, practising their prentice pipes in some out-of-the-way angle of the ramparts were destined to grow into clear trumpet-notes which should arouse sleeping camps to great constitutional struggles, and sound the charge of political parties in battle?...”

এই সকল ঘটনাই এ দেশে সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠার জন্ম-ঐতিহাসের প্রথম দিকের ঘটনা। তাহার পর ক্রমশঃ বাঙ্গালী জাতি নানা কারণে ক্ষুণ্ণস্বার্থ হইয়া বহু প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম ও আন্দোলন আরম্ভ করে। সেই সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনকে সমর্থন এবং তাহার শক্তি বৃদ্ধি ও আদর্শ প্রচার জন্ত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সংবাদপত্রের প্রয়োজন অপরিহার্যরূপেই অনুভূত হয়। তাঁহারা সংবাদপত্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস মেটকাক বড়লাট হইয়া এ দেশে আসেন, এবং পূর্বে হইতে নিগূহীত ও স্বাধীনতার বঞ্চিত মুদ্রাষত্রের বন্ধন-পাশ ছিন্ন করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। বাঙ্গালী তাঁহার এই অনুষ্ঠান কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়াছিল, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরও স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিল।

বাঙ্গাল ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের জন্ত যখন চেষ্টা করা হইতেছিল, তখন ত্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনারীরা ‘সমাচার-দর্পণ’ প্রকাশ করেন। ইহাকেই বাঙ্গাল ভাষায় মুদ্রিত এই প্রদেশের প্রথম

সংবাদপত্র বলা যায়। ইহার ভাষা, বা মুদ্রণের পদ্ধতি বা হরপের আদর্শ বর্তমান যুগে বাহুঘরে সংরক্ষণের যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যে সময় ইহা প্রকাশিত হয়, তখনকার যুগে ইহা পরম বিষয়কর ব্যাপার বলিয়াই অনুভূত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে ‘সমাচার-দর্পণ’ প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, গঙ্গাকিশোর (ধর ?) ভট্টাচার্য মহাশয়ের ‘বাঙ্গাল গেজেট’ই বাঙ্গাল ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র। ‘সমাচার-দর্পণ’ ও ‘বাঙ্গাল গেজেট’ একই সময়ের কাগজ; কিন্তু শেষোক্ত পত্রের প্রথম প্রকাশের তারিখ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রামমোহন রায়ের ‘ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন’ ১৮২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই (কেহ কেহ অনুমান করেন, সেপ্টেম্বর) মাসে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই ৪ঠা ডিসেম্বর (?) তারিখে ‘সম্বাদ-কৌমুদী’ প্রকাশিত হয়। এই পত্রে রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা প্রবন্ধ লিখিতেন। সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদকামী বলিয়া রামমোহন রায়ের সঙ্গিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতভেদ হয়, এবং ভবানীচরণ ‘সম্বাদ-কৌমুদী’র সংস্রব ত্যাগ করিয়া ‘সমাচার-চন্দ্রিকা’ প্রকাশ করেন (১৮২২ খৃঃ)।

বাঙ্গালার সঙ্গিত তৎকালে ফার্সী ভাষাতেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; কারণ, ফার্সী ভাষার চর্চায় সে সময় শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ অল্পরাগ প্রকাশ করিতেন। দেওয়ান রামমোহন রায়ের ‘মিরাত-উল-আখরার’ এবং কোন সওদাগরী আফিসের ‘জাম-ই-জাহান নুমা’ তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মার্টিন সাহেবের ‘বেঙ্গল হেরাল্ড’ বাঙ্গালী, ইংরেজী, নাগরী ও ফার্সী এই চারি ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত।

অতঃপর কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সম্বাদ-প্রভাকর’ের কথা। ‘সমাচার-চন্দ্রিকা’র ১২৩৭ সালের ২২শে মাঘের সংখ্যায় লিখিত হয়,—

“পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকর নামক সমাচারপত্র এতদ্বারা প্রকাশ পাইবার জল্পনা হইয়াছিল। সংপ্রতি গত ১৬ই মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে।”—কাজেই ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ তারিখে ‘সম্বাদ-প্রভাকর’ প্রকাশিত হয়, ইহা প্রামাণ্যসূত্রে অবগত হওয়া যায়। পাথুরিয়াঘাটার ৬যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে ‘সম্বাদ-প্রভাকর’ দৈনিক-পত্রে পরিণত হয়। কিছুকাল পরে ইহার একটি মাসিক সংস্করণও হয়। সংবাদ ব্যতীত সাহিত্য ও জ্ঞানামূলকসমূহ প্রভাকরের লক্ষ্য ছিল। তৎকালীন বাঙ্গালী-সমাজের সর্বগ্রগণ্য সুধী ও লেখকগণ প্রভাকরে তাতেখড়ি দিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেন। ত্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের ‘বাঙ্গাল সাময়িক সাহিত্যে’ লিখিত হইয়াছে,—

“অক্ষয়কুমার দত্তের জায় কবিবর বঙ্গলাল, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু ও মনোমোহন, কাঙ্গাল হরিনাথ, সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ প্রভৃতিও প্রভাকরের দপ্তরে শিক্ষানবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন।”—প্রভাকরই বাঙ্গালার প্রথম দৈনিক-পত্র। এই সময় আরও কয়েকখানি (যথা সম্বাদ-সুধাকর, সমাচার-সভারাজেন্দ্র, জ্ঞানাসেবণ, সোমপ্রকাশ, সম্বাদ-সারসংগ্রহ, সুলভ সমাচার প্রভৃতি) সংবাদ ও সাহিত্য-পত্র আত্মপ্রকাশ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কবিদের ঈশ্বর জগদীশ্বর জীবন-চরিতে' আর একখানি পত্রিকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

"প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব ও রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে 'সংবাদ-রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হইলেন।"

ইহার পরবর্তী কালে হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু-পেট্রিফট', মনোমোহন ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নাম বর্ণনীয়। 'অমৃতবাজার' প্রথম বাঙ্গালায় এবং পরে আংশিকরূপে ইংরেজীতে পরিচালিত হইত। দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদ-পত্র দমনের জন্ত লর্ড লিটন যখন কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করেন, তখন সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র এক রাত্রির মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা পরিবর্তিত করিয়া পরদিন প্রভাতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র আয়োজিত ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়া সমগ্র ভারতে বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছিল। 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র রাষ্ট্রতন্ত্র-স্বপ্ননাথের সম্পাদনায় যখন নূতন ভাবে বাহির হয়, তখন তাহার বিবর্তিত প্রচারের ও প্রভাবের শক্তি সমগ্র দেশে অনুভূত হইয়াছিল। 'বঙ্গবাসী' তরুণ যুবক সম্প্রদায়ের, এবং 'সঞ্জীবনী' ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্রমে 'ভিতবাদী' 'বসুমতী', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারকরূপে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

'বসুমতী'র প্রকাশ সম্বন্ধে একখান উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের বহুল প্রচার ব্যতীত জনমত সংগঠিত—সার্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব নহে বুলিয়া 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংসাহিত্যরাজি বিনামূল্যে, (পরে নামমাত্র মূল্যে) উপহাররূপে বিতরণ করিয়া—

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতি অনাস্থার যুগে সাপ্তাহিক 'বসুমতী' বাঙ্গালার গৃহে গৃহে সুপ্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি 'দৈনিক বসুমতী' প্রবর্তন—প্রচার করেন।

এই সকল সংবাদপত্রের নামের সহিত বঙ্গ-জননী বহু সুসম্মানের অমর নাম বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বহু বিখ্যাত দেশনায়ক ও সাংবাদিকের পুণ্যস্মৃতি আজও বাঙ্গালীকে এই সকল সংবাদপত্রের নাম গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে প্ররোচিত করে। ইহাদিগের মধ্যে যে কয়খানি সংবাদপত্র এখনও জাতির অতীত গৌরবগর্ভময় বহু দিবসের বহু বিচিত্র স্মৃতিধ্বজা বহন করিয়া জাতির জন্ত অনাগত ভবিষ্যতের যে পথ নির্দেশ করিতেছে, তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে; তাহারা দেশ ও জাতির জাতীয় সম্পদ।

আজ পৃথিবীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার এবং রাজনীতিক নবদর্শনের প্রচার বিঘ্নশূন্য করিবার পুণ্যকর্মে এবং জনসাধারণের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সর্বপ্রকার স্বাধীনতা রক্ষার গুরু-দায়িত্বে সংবাদ-পত্রের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিপদের কণ্টকসঙ্কুল বন্ধু পন্থায় শিক্ষা ও নির্ঘাতনেও আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা সহকারে সংবাদপত্রকে অগ্রসর হইতে হয়। কাজেই ইহার ইতিকথা জাতির স্মৃতিকথার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবেই বিজড়িত হইয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। বাঙ্গালীকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সে দুঃখের কারণ নিরসন করিতে হইবে, বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনায় অগ্রণী হইতে হইবে। জাতির অগ্রগতির ইতিহাসের সহিত তাহার সংবাদপত্রের জন্ম ও গতি-প্রগতির ইতিহাসও সুবিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যিকতাও বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে।

শ্রীগঙ্গাপদ বসু।

চাষী

ভিক্ষার তরে একদা নগরে বুদ্ধ বাহির হ'ন,
দেখেন অদূরে এক গৃহদ্বারে সমবেত বহু জন,—
তগুল ধান ভূস্বামী দান করিছে ভাঙু ভরি';
প্রভু তা'র পাশে ভিক্ষার আশে দাঁড়ান পাত্র ধরি'।
ভিক্ষার্থী হেরি' ঘৃণা-ভরে কহিলেন ভূস্বামী—
"ভিক্ষুক যেই তারে নাহি দেই তগুলকণা আমি।
শস্ত্রের মাঠে সারাদিন খাটে চাষবাস যা'রা করে
ভাঙার-দ্বার মুক্ত আমার নিত্য তাদের তরে।
সন্ন্যাসী তুমি নাহি চম্বো ভূমি, শুধু পরান্নভোজী
অলস জীবন করিছ যাপন ধর্মের নামে মজি'।"

শুনিয়া বচন তথাগত ক'ন—“আমিও যে চাষী, ভাই!
ভাঙামি করি' ভাঙুটি ভরি' ভিখ নিতে আসি নাই।
শুন, ভূস্বামি, চাষ করি আমি এই দেহ-ভূমি মম,
পাপ রিপুগণ করি বর্জন জমির আগাছা সম।
সংযম বারি সিঞ্চন করি' চিত্ত-ভূমিতে মোর
ক্ষেত্র উষর করি উর্ধ্বর সারাটি জীবন-ভোর।
শস্ত্র যেমন করে কর্তন ভূমি-কর্ষণকারী
শ্রেষ্ঠ ফসল নির্বাণ-ফল লভি আমি দেহধারী।”
ভূস্বামী শুনি' অমিতাভ-বাণী ভাসে নয়নের জলে,
লভিয়া শিক্ষা লইল দীক্ষা নমি' তাঁর পদতলে!

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)।



দড়ি-লাফ

স্কিপিং বা দড়ি-ডিকানো খেলা! মেয়েদের অঙ্গ-গঠনের পক্ষে স্কিপিংয়ের মতো সহজ ব্যায়াম-পদ্ধতি আর নাই!

বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বেও আমরা দেখিয়াছি, সহরে ও পল্লীগামে ছ'-সাত হইতে বারো-তেরো বৎসরের মেয়েরা দড়ি লইয়া নানা কৌশলে নানা ভাবে সেই দড়ি ডিকাইয়া খেলা করিতেন। এ শুধু খেলা নয়! এ খেলায় যে-ব্যায়াম, তাহা যেমন আয়াস-সাধ্য, তেমন মেয়েদের সর্বদেহ এ-ব্যায়ামে বেশ স্ত্যাম-ছন্দে গড়িয়া ওঠে! এ-ব্যায়াম বরাবর করিতে পারিলে যৌবন সহজে নারীর দেহ ছাড়িয়া ধরিয়া পড়িবে না। এ ব্যায়ামে নারীর দেহ অপরূপ শ্রী-সৌন্দর্য্যে গড়িয়া উঠিবে,—কোথাও মেদ জমিবে না। গ্রীবা, বাহু, বক্ষ, চরণ, কোমর, পেট—সব বেশ সমঞ্জস-শ্রীতে বিভূষিত থাকিবে।

এ-খেলায় যেমন পরিশ্রম, আনন্দ-কৌতুকও ঠিক সেই পরিমাণে মিলিবে। এ ব্যায়ামের জন্ম অসাধারণ রকমের বা মূল্যবান দড়ির প্রয়োজন নাই; তবে নারিকেল-দড়ি হইলে চলিবে না। তাহাতে হাত ছড়িয়া যাইবে। এ ব্যায়ামের জন্ম যে-দড়ি লইবেন, তাহা যেন মসৃণ হয়, মজবুত হয়। মজবুত হওয়ার প্রয়োজন, ব্যায়াম করিতে গেলে দড়ি ছিঁড়িয়া যাইবে না। দড়ির দু'প্রান্তে দুটি কাঠের হাতল লাগাইতে পারিলে

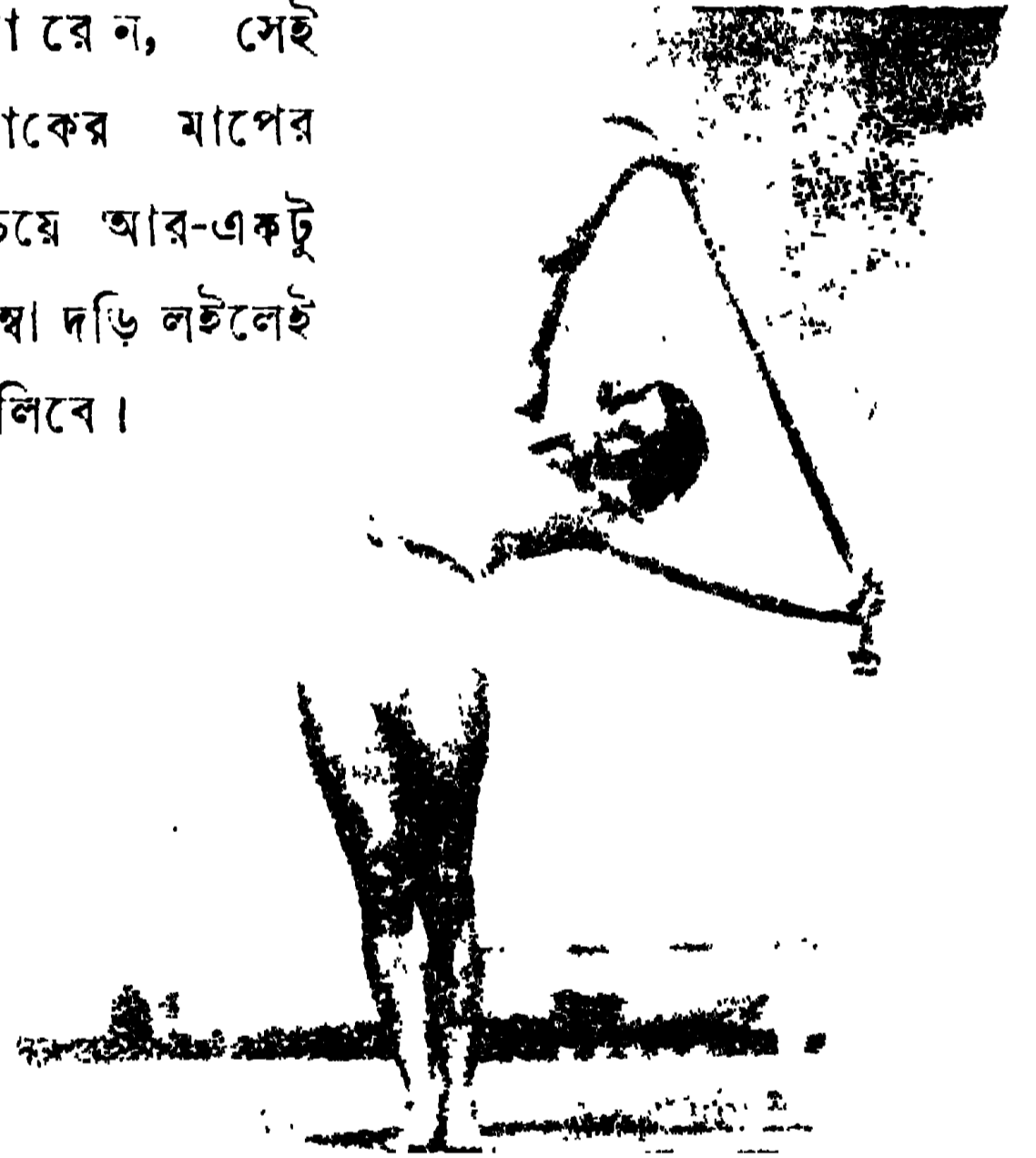
ধরিবার পক্ষে অনেকখানি সুবিধা হইবে। তা' ছাড়া সূতায় পাকানো স্কিপিং-দড়ি বাজারে কিনিতে পাইবেন। দাম সামান্য।

দড়িটি লম্বে কতখানি হইবে, জানা প্রয়োজন। যিনি দড়ি লইয়া ব্যায়াম করিবেন, সোজা খাড়া দাঁড়াইয়া তিনি দু'হাত উদ্ধে তুলুন—দু'হাত যতখানি

ফাঁক করিতে পারেন, সেই ফাঁকের মাপের চেয়ে আর-একটু লম্বা দড়ি লইলেই চলিবে।



১। হাঁটু মুড়িয়া



২। বাঁ দিকে হেলা

ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এ-দড়ি কতখানি দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন।

দড়ি লইয়া প্রথমে ১ নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়িয়া দাঁড়ান। লম্ব দিতে হইবে এমন ভঙ্গীতে দাঁড়াইবেন। দড়ি ডিকাইবার সময় এই ছবির ভঙ্গীতে দড়ি ধরিয়া হাঁটু মুড়িয়া তবে লাফ খাইতে হইবে।

দাঁড়াইয়া ২ নং ছবির ভঙ্গীতে দড়ি ধরিয়া একবার বাঁ দিকে কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত হেলাইয়া দিবেন,—

তার পর ডান দিকে হেলাইবেন। একবার বাঁ দিকে, পরক্ষণে ডান দিকে বেশ ক্ষিপ্ৰবেগে দেহাংশ হেলাইতে হইবে।

কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহ-ভাগ পিছন দিকে হেলাইয়া দিবেন। এইভাবে ডান পা তুলিয়া দেহের উপরার্দ্ধ-ভাগ



৩। দড়ি-পায়ে ডান-পা তোলা



৪। হুঁ হাত পিছনে

দশ-বারো বার জোরে-জোরে এক-বার পিছন দিকে এবং পরক্ষণে সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া দোল খাইবেন। তার পর বাঁ-পা এমনি করিয়া দড়িতে আটকাইয়া সামনে তুলিয়া আবার দশ-বারো বার এ-ব্যায়াম করিবেন।

এবার ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাতে

দড়ি ধরিয়া পিছন দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিন। তার পর কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহ-ভাগ সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া দিবেন; এবং দড়ি-ধরা হাত সামনের দিকে তুলিয়া দেহাগ্রভাগ পিছন দিকে হেলাইবেন। একবার সামনে, পরক্ষণে পিছনে দেহাগ্রভাগ ঝুঁকাইয়া এ-ব্যায়াম করিবেন দশ-বার।

তার পর ৫ নং ছবির ভঙ্গীতে এই দড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মাথা ও পা গলাইয়া ক্ষিপ্ৰবেগে লক্ষ দিতে হইবে। ষোল হইতে বিশ বার লাফ দিবেন।

এইবার দড়ির মধ্যভাগ পিছন দিকে পায়ে চাপিয়া অপর দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া ৬ নং ছবির ভঙ্গীতে



৫। দড়ি ডিঙাইয়া লাফ



এবার জোরে-জোরে

তার পর দুই হাতে দড়ি ধরিয়া তার মধ্যভাগে পায়ের ভর দিয়া ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে ডান পা তুলুন—ষতখানি উঁচু করিয়া তুলিতে পারেন, তুলিবেন। এ-সময়ে

কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত পিছন দিকে হেলাইয়া দিন। এভাবে দড়ির এক প্রান্ত পায়ে চাপিয়া দেহকে একবার পিছনে, পরক্ষণে সামনের দিকে হেলাইতে



৬। পায়ে চাপিয়া হুঁহাতে দড়ি ধরিয়া

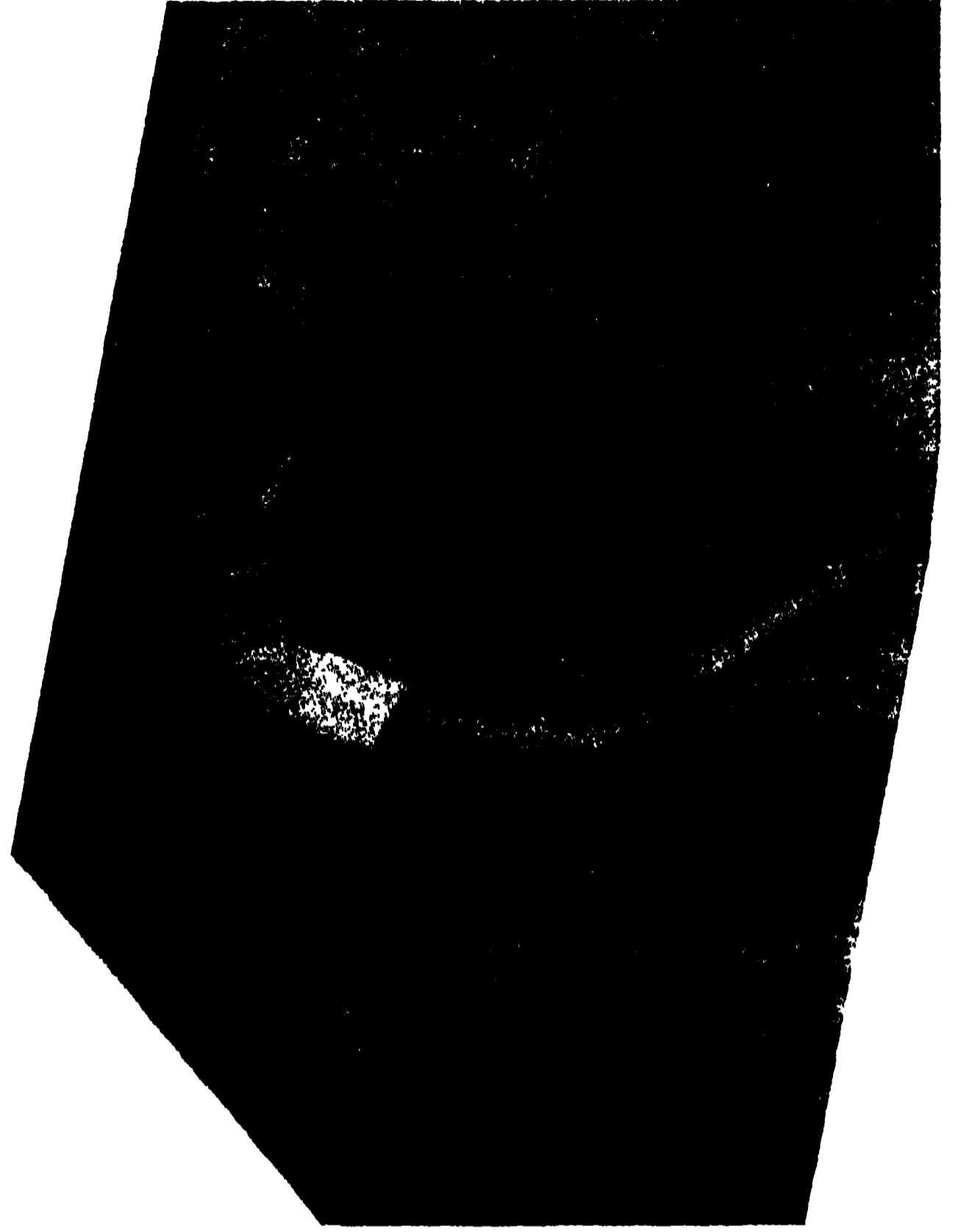
হইবে; বেশ ক্ষিপ্ত তালে অস্ততঃ বারো বার হেলাইতে হইবে।

তার পর বা পায়ের আঙুলের কাছে দড়ির প্রান্ত লাগাইয়া ৭ নং ছবির ভঙ্গীতে বা পা তুলিয়া দুই হাতে দড়ির অপর ভাগ ধরিয়া সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিতে হইবে; এই ভাবে দড়িতে পা আটকাইয়া মৃদু তালে দেহাগ্রভাগ হুলাইতে হইবে। লাগামের মতো একবার বা পায়ে, পরের বারে ডান পায়ে দড়ি আটকাইয়া এ-ব্যায়াম করা চাই। এ-ব্যায়াম ষোল বার করা চাই।

ব্যায়ামগুলি করিবার সময় ছবিতে যেমন দেখিতেছেন, দু' পা ঠিক সেই মতো রাখিবেন।

সুখের সন্ধানে

পৃথিবীতে সকলেই আমরা সুখের কামনা করি। স্বামী, ছেলে-মেয়ে, ঘর-সংসার, দেহ-মনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য—এ-সব যদি রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে



৭। পা তুলিয়া

আমাদের সুখের আশা নৈরাশ্রে পরিণত হইবে! দেহ-মনের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যের কথা আমরা নিত্য আলোচনা করিতেছি। সুখের সন্ধানে কোথায় মিলিবে, সে সম্বন্ধে আজ একটু আলোচনা করিব।

কি করিলে সুখী হই, এ-প্রশ্ন আমাদের সকলের মনে অহর্নিশি জাগিয়া আছে। সুখ কোথায়, কিসেই বা সুখ, সে সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব না জানিয়া আমরা সুখের আশায় আকুল হই বলিয়া সুখের মুখ-দেখা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না!

আবার এ-কথাও ঠিক, দুঃখ না পাইলে সুখের দাম বুঝা যায় না,—সুখ কাহাকে বলে, তাহাও আমাদের অপরিজ্ঞাত থাকে। দুঃখ পাইলে অস্থির হইলে চলিবে না। সে দুঃখ কেন, কিসে সে-দুঃখ-মোচন হইবে, ধীরভাবে আলোচনা করিয়া যোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তবেই দুঃখ ঘুচিবে। নচেৎ দুঃখ পাইয়া পাগলের মতো ছুটাছুটি করিলে দুঃখ আমাদের কোনো দিন ঘুচিবে না।

টাকাতেই সুখ, এ-কথা মনে করা বাতুলতা! ধনের পাহাড়ে বহু ধনী বসিয়া আছেন—কিন্তু মনে সুখ নাই, এ-দৃশ্য সংসারে বিরল নয়! ধনীর সালঙ্কারা গৃহিণী—দাস-দাসী, বাড়ী-গাড়ীর মালিকানী লইয়াও কাঙালের চেয়ে ব্যথা-ভারে প্রপীড়িতা—দেখা যায়। অতএব ধনকে সুখের একমাত্র বাহন বলিয়া বিবেচনা করিলে ভুল করিবেন। দুঃখ পুষিয়া মন-ভারী করিয়া থাকিলে দেহখানি অচিরে নানা ব্যাধির শরে জর্জরিত হইবে। এজন্য মহাজনের উপদেশ মানিতে হইবে। মহাজন বলিয়াছেন—যত দুঃখ পান, কদাচ নিরাশ হইবেন না। ‘চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ’—এ-কথার মতো দামী কথা আর নাই!

রোগ বা বিয়োগের বেদনায় যে-দুঃখ, সে-দুঃখ-মোচনের উপায় নাই, সত্য। তবু সে-রোগ বা বিয়োগ-ব্যথা দুর্লভ্য এবং অনতিক্রম্য জানিয়া মনকে যদি আমরা সবলে অল্প দিকে ফিরাইয়া লই, তাহা হইলে সে-দুঃখের গভীরতা যে কমিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই! ভালো-বাসার নৈরাশ্র বা বিচ্ছেদের ব্যথাও জোর করিয়া না ভুলিলে দুঃখ সার হইয়া থাকিবে!

সংসারে স্বামি-স্ত্রীতে যে অ-বনিবনা ঘটে, সে অ-বনিবনা কি সত্যই দূর করা যায় না? এ অ-বনিবনার দুঃখ কে না ভোগ করেন? একটু বিচার করিয়া মেজাজকে বশ করুন, স্বামি-স্ত্রী পরস্পরে মনকে একটু সহনশীল করুন, অ-বনিবনা ঘুচিয়া ছ’ মনে অমুরাগ গভীর হইবে!

ইচ্ছা খোয়াইয়া স্বামীর চরণে দাসীর মতো লুটাইয়া থাক!—তাহাতে স্বামীর মনে গৌরবের আসন কায়েমি করা সে-যুগে সম্ভব থাকিলেও এ-যুগে সম্ভব হইবে না। স্ত্রীকে স্বামীর মনের মতো হইতে হইবে; স্বামীকে স্ত্রী নিজের মূল্য বুঝাইয়া দিবেন। স্ত্রীতি, ভালোবাসা হয় সমানে-সমানে। দাস্ত্র-যেখানে একমাত্র সম্বল, সেখানে অমুকম্পা মিলে, ভালোবাসা মিলিতে পারে না। স্বামি স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক—অমুকম্পার সম্পর্ক নয়,—এ-কথা মনে রাখিলে স্বামীর মন-না-পাওয়ার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।

সংসারে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মন খুলিয়া মেলামেশা করিতে হইবে। শাসনে ভক্তি আদায়

করা হয় তো সম্ভব, কিন্তু ভালোবাসা তাহাতে আদায় করা যাইবে না! ছেলেমেয়ের মন বুঝিয়া স্নেহে-মায়ায় যদি তাদের মাহুস করিতে পারেন, তবেই তারা বড় হইয়া মানিবে; নচেৎ তাচ্ছলা করিবে। তখন সংসারে সুখ পাইবেন না—সংসার দুঃখময় হইবে। অতএব এ-দুঃখ যাহাতে না ঘটে, বুঝিয়া ছেলেমেয়ে মাহুস করিবেন। স্নেহে-মায়ায় মাহুস করার অর্থ, তাদের সব আব্দারকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। সে প্রশ্রয় দিলে ছেলেমেয়ে স্বৈচ্ছাচারী স্বার্থপর হইবে, আপনাকে মানিবে না। না মানিলে আপনার দুঃখ-ভোগ ললাট-লিপির মতো দুর্লভ্য জানিবেন।

যদি সুখী হইতে চান, তাহা হইলে এই ষাটটি বিধি মানিয়া চলিবেন।

১। সংসার কঠিন। এ সংসারে সকলের দাবী মানিয়া তবে নিজের দাবী পেশ করিবেন। কঠিন বাস্তব জগৎকে মানিয়া নিজের কর্তব্য করিতে হইবে; ভালো-বাসায় বুক ভরিয়া রাখিতে হইবে। অসত্য পরি-ত্যাগ করিয়া সত্যকে অবলম্বন করিয়া চলিবেন।

২। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কদাচ উদাসীন হইবেন না। নির্মূল বাতাস, পুষ্টিকর খাদ্য, সূর্যালোক এবং ব্যায়াম—ঔষধের চেয়ে অনেক ভালো, এ-কথা মনে রাখিবেন। পারত-পক্ষে ঔষধ খাইবেন না।

৩। মনকে বশে রাখিতে হইবে। ঘৃণা, হিংসা, অর্ধৈর্ষা, ভয়, ক্রোধ—এ-সবের বাষ্প যেন মনে না জমিতে পারে, সতর্ক থাকিবেন। তাহা হইলে কোনো দুঃখে, কোনো রকম নৈরাশ্র-কোভে এতটুকু আঘাত পাইবেন না।

৪। পুরুষের প্রধান কর্তব্য—কাজ; রমণীর প্রধান কর্তব্য—ভালোবাসা। এ-কথা কদাচ ভুলিবেন না।

৫। মনকে সরস রাখিতে হইবে। হাসিতে শিখিবেন। গোমড়া-মুখ কদাচ নয়।

৬। কোনো কারণে ব্যথাভরে মন পীড়িত হইলে বা অসুখী বোধ করিলে, কাহারো কাছে সে দুঃখের কথা খুলিয়া বলিতে লজ্জা বা দ্বিধা করিবেন না। আর-একজনের দরদে-সাহায্য মনের ব্যথা অনেকখানি হাল্কা হয়।

৭। অর্থ এবং আহাৰ-নিদ্রা-সাধনা ছাড়া একটা-না-একটা সখ যেন থাকে। সেলাই-বোনার কাজ, কবিতা বা গল্প-রচনা, ছবি আঁকা—এমনি একটা-না-একটা বিষয়ে মনকে জাগ্রত রাখা চাই। তাহাতে মনের ব্যথা অনেকখানি ঘুচিবে।

৮। একা থাকিবেন না। বন্ধু চাই। সামাজিকতায় মন সুস্থ থাকে; দুঃখ-ভার লঘু হয়।

৯। বয়স যতই বাড়ুক, তাহাতে কাতর হইবেন না। সকল বয়সেই মানুষ সুখাধিকারী হয়। সুখের সঙ্গে বয়সের এমন কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—Every age has its compensation.

১০। আজ পয়সার অভাব হইয়াছে বলিয়া নৈরাশ্রে অভিভূত হইবেন না। আজ মেঘ, কাল রৌদ্র—এ-কথা মানুষের জীবনেও সত্য!

১১। যখন যে-অবস্থা ঘটিবে, তাহাতেই সুখী থাকিতে হইবে। হাঁকু-কাকু করিলে অতৃপ্তি বাড়িবে বৈ কমিবে না।

১২। অপরের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া নিজের সুখ ভোগ করিবেন। অপরকে যত খুশী করিবেন, নিজের মনের সুখ ঠিক সেই পরিমাণে বেশী করিয়া মিলিবে।

‘আর পারি না’, ‘জীবন যেন অন্ধকারে ভরিয়া গেছে’—এমন কথা সূচ্যগ্র রেখাতেও মনে যেন উদয় না হয়!

ঝরা পাতার গান

সে-দিন রাতে শুনেছিলেম ঝরা পাতার গান,
শুনেছিলেম কেমন ক’রে কাঁদছে তাদের প্রাণ।
নিরীলা এক নদীর ধারে
অজানা এক বনের পারে,
ছিলেম শুয়ে ঘাসের ’পরে—উঠছে নদীর তান,
এমন সময় শুনতে পেলেম ঝরা পাতার গান।

তখন সবে আকাশ-কোণে উঠেছে ক্ষীণ চাঁদ,
ছড়িয়ে দেছে দিক্‌বিদিকে রূপালী তা’র ফাঁদ।
মূর্ছাহত কণ্ঠহারী
নীরব বনে নাই কো সাড়া,
কেবল কোথায় বর্ণাধারা বাজায় কল-তান,
হেন কালে উঠলো কাঁপি’ ঝরা পাতার গান!

বলছে তারা করুণ সুরে, ঝরছি মোরা ঝরছি গো,
জীবন মোদের হয়নি কো শেষ—মরছি, তবু মরছি গো!
শুনবে না কেউ মোদের কথা,
বুঝবে না কেউ মোদের ব্যথা,
কার তরে হায় আমরা মিছা করছি জীবন-দান!
গভীর সুরে উঠলো কাঁদি’ ঝরা পাতার গান!

বিষাদ-ভরা নিশাস ফেলি’ শিউরে ওঠে বন,
শিউলি দিল অশ্রুশি ব্যথায় ভরা মন।
মেঘের আড়ে চাঁদ লুকালো
নিমেষে দিক্‌ আঁধার হলো,
ব্যথায় বিধুর রাত্রি দিল বাঁশীতে তার তান—
সেই বাঁশীতে শুনেছিলেম ঝরা পাতার গান!



পরিচালিকা

এক

একটা সেলাইয়ের কাজ হাতে লইয়া নীলা অশ্রুমনস্ক ভাবে বসিয়াই রছিল ; সেলাই করিবার আগ্রহ তাহার একটুও দেখা গেল না। আজ তাহার কেবলই মনে হইতেছে, তাহার চেয়ে সুখী যেন সকলেই,—এমন কি, ঐ লক্ষ্যহীন আকাশের পাখীটাও, আর ঐ পাপড়ি-ছেঁড়া শ্বেত-করবী-টুকুও।—বেদনা মানুষকে আক্রমণ করিলে সে এমনি মুহমান হইয়া পড়ে।

ঝি আসিয়া কহিল, মা, গা ধুতে যাবেন না ?

নীলার চমক ভাঙিল। কহিল, হ্যাঁ, যাই।

বাথ-রুম হইতে বাহির হইয়া নীলা ছাদে আসিয়া বসিল। যোতির মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, কুটনো কুটবেন না ?

শ্রান্ত কণ্ঠে নীলা কহিল,—না ; আজ তোরাই কুটে নে। আমার মাদুর-বালিশ এখানে দিয়ে যা।

নীল আকাশে রক্ত-গোলক একটা রূপালী মোহের সৃষ্টি করিয়াছে। খণ্ড-খণ্ড শুভ্র লঘু মেঘপুঞ্জ বিক্ষিপ্ত ভাবে আকাশ-সাগরে সন্ভরণ করিতেছে। নীলার মনে হইল, আজ তাহাকে অত্যন্ত অপমানিত হইতে হইয়াছে। সে-ব্যথা সে মনের নিভৃত অন্তরালে লুকাইয়া রাখিতে চায়, অপরে তাহারই আলোচনা করিয়া বাক্যের কশা-ঘাতে তাহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করে।

চারি বৎসর পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর এ-পর্যন্ত সে পিত্রালয়ে গিয়াছে মাত্র একবার। তাহার পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ধনি-কন্ডা সে, ধনীর ঘরেই তাহার বিবাহ হইয়াছে ; কিন্তু স্বামীটি মাতাল ! যে-মুহুর্তে এ কথা সে জানিতে পারিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সকলেরই সঙ্গে এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে। তাহার মনে

সর্বদাই আতঙ্ক, কখন স্বামীর সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কথা আলোচনা আরম্ভ হয় ! সে জানে, তাহাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। সে অপমান তাহার অসহ। আজ ছপুরে পিসিমা কত কঠোর কথা শুনাইয়া গিয়াছেন— তাহার স্বামী মাতাল, ছ'হাতে টাকা উড়ায়, কুস্থানে গিয়া পড়িয়া থাকে, মান-সম্মত সবই নষ্ট হইল—ইত্যাদি। সমবেদনায়, অশ্রুবর্ষণে ও সহৃদয়তায় তিনি বিন্দুমাত্র কাৰ্পণ্য করেন নাই। কিন্তু আত্মগ্লানি ও অপমানে নীলার চিত্ত আজ বিহ্বল, উদ্ভ্রান্ত। কাহারও সহিত একটু কথা কহিতে তাহাকে যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়।

শুভ্র মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের কোন কোন অংশ দেখা যাইতেছে ; নীলার ক্রমাগতই মনে হইতেছে—একটা গাঢ় স্বচ্ছ নীলিমায় মহাশূন্য পরিব্যাপ্ত। তাহার নিম্নে পড়িয়া আছে—যত কিছু স্থূল পদার্থ লইয়া এই স্থাবর-জঙ্গমসঙ্কুল চরাচর—একখানা ছবির মত। নীলার মনে হইল—এই স্থূলের জগতে সব চেয়ে বেশী স্থূল তার মানুষগুলোই ; কারণ, তাহারাই সব চেয়ে বেশী হতভাগ্য, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, এক ঘণ্টা পরে কি ঘটিবে, তাহা ধারণা করিতে পারে না। অকারণ সুখের হাত এড়াইতে পারে না, অকারণ দুঃখও সহ্য করিতে পারে না।

ভাবিতে ভাবিতে নীলার দুই চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল। সে তাহা মুছিবার চেষ্টা করিল না। তাহার দৃষ্টি তখন সেই দিগন্তব্যাপী নীলিমা অতিক্রম করিয়া কোন্ উদাস, অনাসক্ত সর্বনিয়ন্তার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত।

দুই

—আচ্ছা, আজ তিন দিন না খেয়ে আছ কেন বল দেখি ! কি হ'য়েছে ?

প্রব্রকর্তা নীলার স্বামী মণীশ। নীলা আজ তিন দিন কেন যে জলস্পর্শও করে নাই, তাহা সে-ই জানে। স্ত্রীর এই বিচিত্র আচরণে মণীশ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। এই শাস্ত, সহনশীলা, পবিত্র-হৃদয়া পত্নীকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভয় করে। আরও কতকগুলি কারণে সে নীলাকে ভালোও বাসে। মণীশ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, নীলার আত্মসম্মানজ্ঞান অসাধারণ। স্বামীকে চরিত্রহীন মাতাল জানিয়াও কোন দিন সে বিদ্রোহের সুর তুলে নাই, কোন অপ্রীতিকর মন্তব্যও প্রকাশ করে নাই। তাহার মন-পরীক্ষার জন্ত রহস্যচ্ছলে মণীশ বলিয়াছে,—তোমার ভাগ্য এতই মন্দ যে, শেষে একটা জঘন্য অমানুষ স্বামী জুটল, না নীলা?—নীলা মাথা নাড়িয়া বলিয়াছে,—কৈ, আমি তো তা বুঝতে পারিনে। আমার স্বামী বাড়ীতে আমার কাছে তো ভালই, তবে বাড়ীর বাইরে তিনি কেমন, সে খোঁজে আমার কি দরকার?

নীলার উত্তর শুনিয়া মণীশকে মুগ্ধ হইতে হয়। মনে মনে সে লজ্জিত। এমন স্ত্রীলা, গুণবতী স্ত্রীর সে নিতান্ত অযোগ্য স্বামী,—এ কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয় আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হয়; কিন্তু তবু সে বড় অসহায়, নেশার মোহ সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিল না।

মণীশ ব্যগ্রভাবে নীলার হাত চাপিয়া-ধরিয়া অমুযোগ-পূর্ণ স্বরে কহিল,—নীলা, লক্ষীটি বল—কেন খাবে না? তুমি কি মৃত্যুপণ ক'রেছ?

নীলা মৃদু কণ্ঠে কহিল, যদি তা কোরেই থাকি, তাতে কার কি ক্ষতি? আমি তো তোমার সংসারে দরকারের বাইরে।

করুণ ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া মণীশ কহিল,—কেন এ কথা বলছ নীলা? আমি তো কোন দিন তোমার অযত্ন করি-নি।

নীলা শাস্ত কণ্ঠে কহিল,—অযত্ন কর না স্বীকার করি। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে শুধু যত্ন-পাওয়াটাই বড় জিনিষ নয়। নারী চায় যশ—শুধু নিজের নয়, স্বামীরও। মাহুষের রক্ত-মাংসের দেহটা দীর্ঘস্থায়ী নয়; কিন্তু যশের দেহ এই নখর পৃথিবীতেও অমর। সেই যশ যে হারিয়েছে, জীবন-ধারণ তার পক্ষে বিড়ম্বনা। ধনীদের কেউ কেউ অনেক সময় যশের দিকে ফিরেও চায় না, ভোগ-সুখটাই

বেশী বোঝে। কিন্তু তাদের ধন নরকের পথের পাথের দিতেই ফুরিয়ে যায়। সমাজ তাদের জীবন যুগার চোখে দেখে, এবং তাদের মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আরাম পায়। কিন্তু যে-ধনী নিরুদয় চরিত্র নিয়ে সমাজের কল্যাণের জন্তে তার ধন-সম্পত্তি উৎসর্গ করে, সে জীবনে পায় মানব-সমাজের আশীর্বাদ, আর মৃত্যুর পর লাভ করে অমরত্ব।

—আচ্ছা নীলা, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আজ থেকে আমি শুধু সমাজের হিতসাধনই ক'রব; তুমি যাতে সুখী হও, তাই হবে আমার জীবনের ব্রত।

নীলা হাসিল। মণীশের মনে হইল, এ হাসি যেন বিধাতার বজ্র অপেক্ষা নিশ্চয়, কঠোর। সে ধীর স্বরে আবার বলিতে লাগিল,—ওগো, শুধু সমাজের হিতের জন্তে দুটো রাজসিক কাজ ক'রলেই মানুষ বরণ্য হয় না। ধনীরা কোঁকের মাথায়, কখন বা খ্যাতির লোভে দান-খয়রাত কোরে বাহবা লাভ করে; আবার কোঁকে প'ড়ে কত গর্হিত কাজও করে। কিন্তু যথার্থ সমাজ-হিতৈষী হোতে হ'লে চাই—সংযম, চরিত্রবল, সত্যনিষ্ঠা।

—বেশ, তাই হবে গো, অন্ততঃ প্রাণপণে চেষ্টা করব সেই-রকম হ'তে; অর্থাৎ সমাজের একটা আদর্শ জীব হ'বার জন্তে। তোমারই হাতে নিজেকে সমর্পণ করলুম, নীলা! যদি সম্ভব হয়, আমায় তুমি মানুষ কোরে তোল। কিন্তু তোমার মৃত্যু বা উপেক্ষা আমায় আরও দ্রুত অধঃপাতের পথেই টেনে নিয়ে যাবে, এটা ঠিক জেনে রেখ তুমি।

নীলা স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—সত্যি বলছ তুমি? আমার হাতে তুমি নিজেকে সমর্পণ করলে আজ থেকে? এঁটা, ঠিক?

—হ্যাঁ, নীলা! তুমি বিশ্বাস কর, আমার কথার নড়-চড় হবে না।

—তবে চল, আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্তে তুমি একটা প্রতিজ্ঞা করবে।

—সে আবার কোথায়? কেন, আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস নেই?

নীলা স্বাগুর মত দাঁড়াইয়া রছিল। তাহার উপবাস-ক্লিষ্ট মুখখানা বিগুঢ়, বিবর্ণ। মণীশ তাহার মুখের পানে

কিছুক্ষণ চাহিয়া-ধাকিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। তাহার বিশৃঙ্খল, কক কেশগুচ্ছে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল,—তুমি একটি আস্ত পাগল, অর্থাৎ উন্মাদিনী! লক্ষ্মীটি, খেতে বোস, আর আমার মনে কষ্ট দিও না। আমি সত্যিই বড় অমৃতপ্ত; সাধু ভাষায় বলছি—অমৃতাপানলে আমার হৃদয়কুঞ্জ প্রচণ্ড বেগে দগ্ধ হ'চ্ছে!

নীলা আপনাকে আলিঙ্গন-মুক্ত করিয়া ভৎসনার সুরে বলিল—যাও; ঠাট্টা!

মণীশ কহিল, না, ঠাট্টা নয়, সত্যি। এইবার খাবার আনতে বলি?

—না।

—না? তা হলে তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না? উঃ, কি কষ্ট!

মণীশ ক্ষুব্ধ স্বরে এই কয়টি কথা বলিয়া কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রছিল। নীলার তখন হুই চোখ দিয়া অশ্রুর বান নামিয়াছে। সে বাপ্পাকুল কণ্ঠে কহিল,—বিশ্বাস করব না কেন? তবে এখনি তোমার অন্তরের অন্তস্তলে যে ভিত্তি স্থাপিত হোল, সেটা তেমন দৃঢ় না হোতেও পারে তো?

তাহার কথায় বাধা দিয়া মণীশ উত্তেজিত ভাবে কহিল,—আর যেখানে নিয়ে যেতে চাইছ, সেইখানে গিয়ে প্রতিজ্ঞা কোরে ফেললেই, সেই ভিত্তিটা বুঝি কংক্রীটের মতো শক্ত হ'য়ে উঠবে?

তাহার কণ্ঠস্বরে শ্লেষের আমেজ সুপরিষ্কৃত; কিন্তু নীলা তাহা উপেক্ষা করিয়াই কহিল,—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

তাহার কণ্ঠের অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় মণীশ বিন্মিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল—বেশ, তা হলে কোথায় যেতে হবে—চল।

কিন্তু তাহার মুখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল একটা অপ্রসন্নতার ছাপ।

তিন

আজকাল নীলার মানসিক অবস্থা অনেক ভাল। মণীশ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছে।

মন ভাল থাকিলে কাজের উপর ঝোক পড়ে, কাজ

করিবার ক্ষমতাও বাড়ে। নীলাকে এইবার নিত্য দেখা বাস—ঝাড়া মোছা, বোনা, সাজানো প্রভৃতি শ্রমসাপেক্ষ কাজে ভারী ব্যস্ত।

সে-দিন সকালে মণীশের বৈঠকখানা-ঘরে নীলা ঢুকিয়া দেখিল—চারি দিক্ যেমন অপরিষ্কার, তেমনি বিশৃঙ্খল; ক্ষুব্ধ মনে টেবিলটা সাফ করিয়া গুছাইতে-গুছাইতে নজর পড়িল পেপার-ওয়েট-চাপা একখানা খাম। খামখানার উপর শুধু স্বামীর নামটা মেয়েলি-ছাঁদে ইংরেজীতে লেখা। ক্র কুঞ্চিত করিয়া নীলা দ্বিধাভরে একবার বাহিরে চাহিল, তাহার পরই মনে পড়িল, স্বামী নিজের চরিত্র-সংশোধনের ব্যাপারে তাহারই হস্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এ জন্ত সে আর ইতস্ততঃ না করিয়া খামের ভিতর হইতে চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিল। ছোট চিঠি, মাথার কাছে সেই দিনেরই তারিখ। সে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়িল,—

“প্রিয় মণীশ, আজ সন্ধ্যায় আটটার সময় দেখা কোরো। ইডেন-গার্ডেন প্যাগোডার পেছনে একটা বেঞ্চে যেন দেখতে পাই। ক'দিন তোমার দেখা পাইনি; সাক্ষাতে সব শুনবে এবং শুনব—

তোমারই মলয়া।”

নীলা আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রছিল। একটু আগেও তাহার গর্ভ ছিল—স্বামীর চরিত্র সে সংশোধন করিয়াছে। তাহার বুকের ভিতর তুমুল তুফান উঠিল; সে যেন দিশে-হারা হইয়া পড়িল। পূর্বে যখন সে এই-রকম কোন বেদনাদায়ক ঘটনার সম্মুখীন হইত, তখন ধৈর্য্য হারাইত না। এই চিন্তাই তাহার মনে সব-চেয়ে বেশী যজ্ঞগাদায়ক যে, তাহার স্বামী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অপরাধী হইয়াছে। এ জন্ত নিজেকেও সে অপরাধিনী বোধ করিতে লাগিল।

পত্রখানা যথাস্থানে রাখিয়া, চার-তলার ছাদের যে ঘরটি তাহার দুঃখে-ক্ষোভে একান্ত আশ্রয়, সে সেই ঘরটিতে উপস্থিত হইল। ঝকঝকে মার্কেলের মেঝে, তাহার এক ধারে শুভ্র মর্শ্বর-বেদীর উপর সুদৃশ্য সুবর্ণ-পালঙ্কে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি। রজত-নির্মিত দীপাধারে স্বর্ণ-প্রদাপ প্রজ্জ্বলিত। ধূপ-ধূনার মধুর সৌরভে বায়ু-স্তর সুরভিত। দেওয়ালে দেব-দেবীর কয়েকখানা চিত্রপট প্রলম্বিত। রূপার রেকাবে প্রস্ফুটিত টাটকা হুই ছড়া

ফুলের গোড়ে-মালা। স্বর্ণ-পালঙ্কের দুই পাশে মূল্যবান ফুলদানিতে সুগন্ধি ফুলের স্নবহৎ তোড়া।

নীলা সেই সুগল-মূর্তির সমুখে নতজান্নু হইয়া বসিয়া যুক্তকরে কহিল,—প্রভু, আলো দাও ; মোহের অন্ধকারে কর্তব্যের পথ হারিয়েছি, আমায় পথ দেখাও !

তাহার নয়নসুগল হইতে অশ্রুধারা উৎসারিত হইয়া, বুঝি সেই প্রেমের দেবতার চরণে অর্ঘ্যরূপে অর্পিত হইল।

চার

স্নাত্তি তখন আটটা বাজিয়া কয়েক মিনিট অত্যন্ত হইয়াছে। একখানা সুদৃশ্য মোটর-কার নিঃশব্দে আসিয়া ইডেন্-গার্ডেনের বড় গেটের অদূরে আসিয়া থামিল।

—বীরেন, চুপি চুপি গিয়ে দেখে এস তো প্যাগোডার পিছনে কোন বেঞ্চিতে তোমার বাবু বসে আছেন কি না। দূর থেকে দেখেই চোলে আসবে। দেখো, তিনি যেন তোমাকে দেখতে না পান। শিগ্গির যাও, তুমি এসে খবর দিলে আমি যাব। ততক্ষণ আমি গাড়ীতেই বোসে রইলুম।

বীরেন বিনীত ভাবে কহিল,—আপনাকে এখানে একলা রেখে যেতে ভয় হয় বৌদিদি ! ফোর্টের গোরা-গুলোর ধর্মজ্ঞান নেই, তাদের কেউ কেউ এ-সময়ে হস্তা ক'রে এ-দিকে ঘুরে বেড়ায়। তাদের উৎপাতের কথা প্রায়ই শুনে পাওয়া যায়।

নীলা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,—আচ্ছা, চল, আমিও তোমার সঙ্গেই যাই।

বীরেন মণীশের বিশ্বাসী সোফেয়ার। বাল্যকাল হইতে মণীশের পিতার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। মণীশকে সে অগ্রজের মতই ভালবাসে ও মাণ্ড করে, এবং নীলাকে মায়ের মতই শ্রদ্ধা করে। মণীশের চরিত্র-হীনতার জন্ত সে আন্তরিক দুঃখিত।

মলয়ার আহ্বানে মণীশ যথাকালে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু বাড়ীর মোটর-কার লয় নাই। কারণ, বীরেনকে আজ বিশ্বাস করিতে তাহার ভরসা হয় নাই।

প্যাগোডার কিছু দূরে থাকিতেই বীরেন নীলাকে কহিল,—ঐ দেখুন, বৌদিদি, দাদা বাবু বেঞ্চে বোসে আছেন, তাঁর পাশে দেখছি একটি মহিলা !

নীলা আর একটু অগ্রসর হইয়াই স্থাগুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বীরেনকে প্যাগোডার আড়ালে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া, সে ধীরপদে অগ্রসর হইল।

মলয়া তখন এক-মনে মণীশের সহিত কথা কহিতেছে এবং মণীশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া তাহা শুনিতেছে, তাই নীলা নিকটবর্তিনী হইবার পূর্বে তাহার আগমন ইহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

মণীশ হঠাৎ নীলাকে তাহাদের সন্নিকটে দেখিতে পাইয়া চমকাইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে কহিল,—এ কি ! নীলা ! এমন সময়ে তুমি এখানে ?

হাস্তমুখে নীলা উত্তর দিল,—একটু হাওয়া খেতে। হঠাৎ নিভতে আবছায়ায় বোসে নিবিষ্ট মনে গল্প করছ দেখে কৌতূহলটা হৃদমনীয় হ'য়ে উঠল কি না, তাই জানতে এলুম, ব্যাপারখানা কি ?

মণীশ আমতা-আমতা করিয়া কহিল,—এমন কিছু নয়, এই ইনি—

তাহাকে বাধা দিয়া মলয়া কহিল,—নমস্কার ! আপনি বুঝি মণীশ বাবুর স্ত্রী ? মণীশ বাবুকে খুব শাসনে রেখেছেন তো দেখতে পাচ্ছি !

তাহার তরল হাস্তধ্বনিতে নির্জ্বল উদ্ভান প্রতিধ্বনিত হইল। সে বলিতে লাগিল,—আমি ঔর অনেক দিনের পরিচিতা ; এমন কি, আপনার সঙ্গে ঔর বিয়ের ঢের আগে থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। আজ একটা বিশেষ দরকারে ঔর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

নীলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—যত কালেরই পরিচিতা হোন, আপনার পক্ষে এটা ভুলে যাওয়া একটুও উচিত নয় যে, আপনি তরুণী, আর উনিও তো বুড়ো হননি। বন্ধুত্বটা যখন এতই নিবিড়, দিনের বেলা স্বচ্ছন্দে সাধারণ ভাবে দেখা করতে পারতেন। বিশেষ আমি যখন আপনার বন্ধুপত্নী, আপনারই কি উচিত ছিল না, আমার সঙ্গেও পরিচিত হওয়া ? নিজের বাড়ীতেও তো ঔকে ডেকে পাঠাতে পারতেন। আপনার ব্যবহার যে সমর্থনযোগ্য নয়, ভদ্রমহিলারও উপযুক্ত নয়, এটা বুঝতে না পারার মতো আপনার বুদ্ধির অভাব আছে ব'লে তো মনে হয় না।

যাক্, আমি যাচ্ছি, নমস্কার! আপনারা কথা কন।
হঠাৎ এসে পড়ে আপনাদের গোপনীয় আলাপে বাধা
দিয়ে ফেলেছি, এজন্য আমি দুঃখিত, আশায় মাফ করবেন।

নীলা দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল। মণীশ ব্যগ্র কর্তে
ডাকিল,—নীলা, শোন!—কিন্তু নীলা ফিরিল না।

পাঁচ

সকালে ভূত্যের হাঁকাহাঁকিতে শুন ভাঙ্গিতেই বীরেন
শুনিল, মণীশ তাহাকে তলপ করিয়াছে। শুনিয়াই
তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

বাল্যকাল হইতে মণীশের কাছে থাকিলেও সে যে
ভৃত্য, এ কথা বীরেন কখনও ভুলে নাই। মণীশের
আদেশ ছিল, তাহার বিনা-অনুমতিতে কাহারও দরকারে
বাড়ীর গাড়ী সে বাহির করিতে পারিবে না। কিন্তু
এই আদেশ তাহাকে পূর্বেদিন সন্ধ্যাকালে অমান্ত করিতে
হইয়াছিল। তাহার কারণ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।
শুধু তাহাই নহে, ইডেন-গার্ডেনে মণীশের সহিত
সাক্ষাতের পর নীলা উত্তেজিত গায়ে গাড়ীতে ফিরিয়া
মূর্ছিতপ্রায় অবস্থায় যখন আদেশ করে—শ্রামবাজার
চল মাগিমার বাড়ী;—তখন সে আদেশও বীরেন পালন
করিয়াছিল। ঘটনাচক্র যে মণীশের স্বার্থের এতটা
প্রতিকূল দাঁড়াইবে, তাহা সে অগ্রে বুঝিতে পাবে নাই।
এই জন্তই মণীশের আফ্রানে সে অধিকতর ভীত হইল।

যাহা হউক, চোখে-মুখে কয়েক বাপুটা জল দিয়া
মুখ মুছিতে-মুছিতে বীরেন ছুটিল বাড়ীর মধ্যে! মণীশ
তখন তাহার শয়ন-ঘরে সিগারেট মুখে গুঁজিয়া একখানা
ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান। তাহার তখনকার চেহারা
দেখিলে মনে হয়, তাহার উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া
গিয়াছে! বীরেনের পদশব্দে সে তাহার দিকে চাহিয়া
কহিল,—তোমাকে অনেকক্ষণ আগে ডেকে পাঠিয়েছি।

কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে বীরেন প্রমাদ গণিল।

মণীশ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—নীলা কোথায়?

বীরেন আমতা-আমতা করিয়া কহিল,—কাল রাত্তিরে
তিনি শ্রামবাজার গেছেন।

উত্তেজিত কর্তে মণীশ কহিল, কে তাকে নিয়ে গেল?

বীরেন অত্যন্ত সঙ্কচিত হইয়া পড়িল। সে নীরব।

মণীশ পুনরায় উচ্চকণ্ঠে কহিল,—চূপ কোরে রইলে
কেন? উত্তর দাও।

বীরেন বিনীত কর্তে কহিল,—আজ্ঞে, বৌদিদির হুকুম
তো কখনো অমান্ত করতে পারিনি, তাই—

—কিন্তু আমার বিনা-অনুমতিতে কারো কোনো
দরকারে গাড়ী বার করতে যে নিষেধ করেছি, এ কথা
অগ্রাহ্য করবার কারণ কি?

—আজ্ঞে, আপনি তো তখন বাড়ী ছিলেন না; তাই
বৌদিদিকে তখন আপনারই প্রতিনিধি ভেবে নিয়ে
গিয়েছিলুম। আপনাব আদেশ অগ্রাহ্য করি, সে গুণ্ডতা
আমার নেই।

মণীশ একটা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া ইজি-
চেয়ারে হেলিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবে
ধূমপান করিবার পব কহিল,—সে কবে ফিরে আসবে,
সে কথা বলোছে?

—আজ্ঞে, তা তো কিছু বলেন-নি। শুধু বললেন,
—তুমি ফিরে যাও, মার বাড়ীর পুরত-ঠাকুরকে দিয়ে
রাধা-গোবিন্দজীর পূজা করিয়ে।

—বাস্! আর কিছু নয়?

বীরেন মাথা নাড়িয়া কহিল,—আজ্ঞে না। তবে
আমি নিজে থেকে যখন জিজ্ঞাসা করলুম, আপনাকে
কবে এসে নিয়ে যাব? তার উত্তরে বললেন, তোমার
আসতে হবে না; যখন যাব, এখানকার মোটরেই যাব।

মণীশ অর্ধদৃষ্টি সিগারেট ছাই-দানিতে নিক্ষেপ করিয়া
কহিল,—তুমি গাড়ী নিয়ে এখন সেখানে যাও, আমি চিঠি
দিচ্ছি। তার সঙ্গে দেখা কোরে চিঠিটা দেবে; আর
বলবে যে, আমি বলেছি, এখনি যেন ফিরে আসে।

ছয়

সে-দিন সকাল হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে—একঘেয়ে ঝবু-
ঝবু ঝবু-ঝবু শব্দের বিরাম নাই। এত বৃষ্টিতে মন যেন
আপনা হইতেই কন্দ্ববিমুখ হইয়া পড়ে।

গোল-বারান্দায় একখানি রকিং-চেয়ারে শুইয়া মণীশ
বৃষ্টিপাত দেখিতেছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলার মত তাহার
মনটাও যেন অসংখ্য ধারায় বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলই আছাড়
খাইতেছে। সে বাল্যে মাতৃহারা এবং মৌবনের

প্রায়শ্চৈ পিতৃহারা হইয়াছিল। তাহার পব অতি-
ভাবকহীন অবস্থাপন্ন যুবকের ভাগ্যে সচরাচর যাহা
ঘটে—মণীশের ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।
যৌবনে অসৎ সঙ্গ পড়িয়া তাহার চরিত্র কলুষিত হইল।
কিন্তু সে অমানুষ নয়; নীলাকে বিবাহ করিয়া সে
নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিল। নীলার মধ্যে সে একটা
পবিত্র মানসরঞ্জন আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। এখন সে
উত্তমরূপেই বুঝিয়াছে—নীলাকে সে ভালবাসে।

কিন্তু আজ সে নীলার কাছে দুঃচরিত্র, মাতাল।
পবিত্রতার কাছে তাহার অপবিত্র জীবনটা যেন অতিমাত্রায়
দুর্ভেদ, ঘৃণ্য, এবং জঘন্য। নীলার কল্যাণকর ঐকান্তিক
অনুরোধে পড়িয়া দেবতার সম্মুখে দেব-নির্ম্মাল্য হাতে
লইয়া সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, মোহের বশবস্তী হইয়া
সে তাহাও লঙ্ঘন করিয়াছে।

মণীশ কোন দিন দেব-দেবীকে বিশ্বাস করিতে শিখে
নাই, বা ভক্তিতন্দের পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ
করিবার আকর্ষণও কোন দিন অনুভব করে নাই। তবে
হিন্দু-পরিবারে প্রতিপালিত হওয়ায় স্বাভাবিক সংস্কার-
বশতঃ সে দেব-দেবী মানিত; এবং বোধ হয়, এইজন্মই
স্ত্রীর অভাবজনিত তীব্র বেদনা তাহার চিত্তকে যেন
রাধাকৃষ্ণের সেই যুগলমূর্তির দিকে একটা অজ্ঞেয় আকর্ষণে
টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্ভত। সে বার-বার শিহরিয়া
উঠিয়া মনে মনে বলিতেছে,—আমার অপরাধ কঠিন,
প্রভু! আমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপে লিপ্ত হ'য়েছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই সে হঠাৎ উঠিয়া বসিল।
তাহার পর হৃৎ-ঘরে প্রবেশ করিয়া কাহাকে ফোন
করিয়া সাড়া লইল। কিয়ৎ কাল পদচারণ করিবার পর
'কলিং-বেল্টা' টিপিয়া রকিং-চেয়ারে আবার দেহ ঢালিয়া
দিল। অবিলম্বে প্রত্যাশিত পদশব্দ কানে আসিতেই
মাথা তুলিয়া কহিল,—কে, বীরেন?

বীরেন সম্মুখে আসিয়া কহিল,—আজ্ঞে, হাঁ।

—আমি এখনি অতুলকে আসতে ফোন ক'রেছি।
গাড়ী নিয়ে যাও, তাকে নিয়ে এস।

বীরেন চলিয়া গেলে মণীশের মনে হইতে লাগিল,
পৃথিবীটা যেন অবাস্তবের রঙ্গভূমি ছাড়া আর কিছু নয়—
যেন সিনেমার স্ক্রীন! বাস্তবের মূর্তি লইয়া নিতান্ত আত্মীয়

বন্ধু সকলেই নিজ-নিজ পালা অভিনয় করে, কিন্তু কার্য-
ক্ষেত্রে খুঁজিলে তাহার প্রত্যেকে অবাস্তবেই বিলীন হয়

সাত

বীরেন অতুলকে মণীশের কাছে পৌছাইয়া দিয়া
চলিয়া গেল। অতুল মণীশের অকৃত্রিম বন্ধু হইলেও
মণীশ এত দিন তাহাকে এড়াইয়াই চলিয়াছে। কারণ,
অতুল সচ্চরিত্র, এবং স্পষ্ট-বক্তা; কিন্তু মণীশের নিঃস্বার্থ
হিতৈষী। সে সম্মুখে আসিবামাত্র মণীশ আগ্রহপূর্ণ
অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে কহিল,—এস, এস ভাই, অতুল! আজ
তোমার সঙ্গ-সুখ একান্তই প্রার্থনীয় মনে হচ্ছে। চল,
ঘরের মধ্যে গিয়ে বসা থাক।

অতুল হাস্য-প্রফুল্ল মুখে কহিল,—কেন হে, হঠাৎ
আমার সঙ্গ-সুখের লোভটা তোমার এত অসম্বরণীয় হয়ে
উঠল কেন?

মণীশ কহিল,—অনেক দিন তোমার গান শোনা হয়-
নি। আজ আমায় গান শোনাও, ভাই, দয়া কোরে।
আমি সত্যিই আজ দয়ার পাত্র। তুমি তো কত বার
ব'লেছ, আমি এক দিন সকলের দয়ার পাত্র হবো। আজ
সেই-দিন এসেছে; তাই তোমাকেই মনে পোড়ে গেল
সকলের আগে। বিশ্বাস কর, ভাই, আমি একটুও মিথ্যে
বা অতিরঞ্জিত কথা বলিনি।

মুখের হাসি বজায় রাখিয়াই অতুল কহিল,—কেন,
ব্যাপার কি যে, এর মধ্যে অমৃতে এতই অকৃতি?

মণীশ ঘরের মধ্যে আসিয়াই একখানা কোঁচে বসিয়া
পড়িল। তাহার দুই চোঁখ বাম্পাচ্ছন্ন, তাহা লক্ষ্য করিয়া
অতুল চমকাইয়া উঠিল। সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কহিল,—
কি হোল তোমার মণীশ? তোমার কি কোন অসুখ
হ'য়েছে?

মণীশ মাথা নাড়িয়া কহিল,—না। আমি নিজের
পাপে আজ গুণবতী স্ত্রীটিকে হারিয়েছি, অতুল! তাকে
পেয়ে অবধি কখনো সুখা করতে পারিনি, শেষে সুখী
করবো বোলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাও
রাখতে পারিনি,—আমার এমনি দুর্ভাগ্য!

অতুল কহিল,—খুলে বল, ভাই। তোমার সব কথাই
হেঁয়ালীর মতো বোধ হ'চ্ছে।

মণীশ ধীরভাবে তাহার দুর্ভাগ্যের সকল কথা জানাইয়া অবশেষে কহিল,—হ্যা, স্বীকার করি, মলয়ার প্রতি এক কালে আমার মনে মোহের সঞ্চার হ'য়েছিল, কিন্তু সে মোহ অনেক আগেই ছুটে গেছে। তবে মলয়া মাঝে-মাঝে আমার কাছে অর্থ সাহায্য চায়—তার সাংসারিক অসচ্ছলতাই এর কারণ; আমি নিঃস্বার্থ ভাবেই তাকে সাহায্য করি।

—তা, এ কথা কি তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে কোন দিন প্রকাশ করনি?

—না ভাই, ভয়ে তাকে তা' বলতে পারিনি, কি জানি, যদি জেরার মধ্যে এমন কিছু বেরিয়ে যায়, যাতে সে বুঝতে পারে, এক সময়ে মলয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাটা—ইয়ে—কি বলি—একটু সন্দেহজনক হ'য়েই দাঁড়িয়েছিল। তাই এবার অনেক দিন পরে সে যখন চিঠি লিখে ইডেন-গার্ডেনে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, তখন ভাবলুম, কথাটা চুপি চুপি শুনে আসাই ভাল। কিন্তু নীলা সেই-দিনই লাইব্রেরীতে ঢুকে মলয়ার সেই চিঠিখানা দেখতে পায়; আমি তখন তা জানতে পারলে কি আর এ বিলাট ঘটে?

অতুল কহিল—তার পর তাঁকে আনতে গেছলে?

মণীশ কহিল, বীরেনের মারফৎ চিঠি দিয়ে তাকে আনবার জন্ত গাড়ী পাঠাই; কিন্তু চিঠির উত্তর লিখে গাড়ী ফেরত দিয়েছে। তার পর ফোনে কথা বলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু শুনলুম, সে ওখানে নেই; কোথায় মেয়েদের একটা আশ্রম হয়েছে, সেইখানে গিয়ে জুটেছে।

সে উঠিয়া টেবিলের ডায়ার হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া অতুলের সম্মুখে রাখিয়া কহিল, প'ড়ে দেখ।

অতুল লেফাপা হইতে পত্রখান বাহির করিয়া নিঃশব্দে পাঠ করিল।

“প্রিয়তম, হ্যা, তুমি ঠিকই লিখেছ, আশাভঙ্গের ব্যথা বুকে নিয়ে বড় কষ্টেই আমি চ'লে এসেছি। আমারই ভালবাসার বলে তোমার কাছে ফিরে যেতে লিখেছ। তা যেতুম আমি, যদি বুঝতুম, আমার বিশ্বাসের ভিত্তি বেশ শক্ত, অটল। কিন্তু এখন নিজের উপরেও আর আমার বিশ্বাস নেই। হয় তো তোমার

ভালবাসার খাতিরেই এক দিন আমাকে ফিরে যেতে হবে, এবং তোমার কমা লাভ করাও আমার পক্ষে হয় তো অসম্ভব হবে না; কিন্তু সে-দিন যে কবে আসবে, নীত্র আসবে, কি আমার সুখশাস্তিহীন অসহায় জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তোমাকে শেষ দেখা দেখবার জন্তে আসবে—তা জানিনে।

অযোগ্য সেবিকা
নীলা।”

চিঠিখানা পড়িয়া, অতুল মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, মণীশ দেওয়ালের একখানা ছবির পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া শুক্ন ভাবে বসিয়া আছে। সহানুভূতিভরে তাহাকে ডাকিতেই সে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, চিঠিটা পড়লে? তবে দাও, ওটা তুলে রাখি।—তাহার পর তাহা হাতে লইয়া নীরস হাস্তে কহিল,—আমার চিরস্মরণীয় শাস্তির প্রতীক হয়ে রইল এ চিঠি, বুঝলে ভাই?

তার পর উভয়েই নিশুন্ধ!

আট

গঙ্গা যেখানে ক্রমশঃ সরু হইয়া এক-ফালি চাঁদের মতো ঝাঁকিয়া গিয়াছে, তাহারই পূর্বদিকের কোলের কাছে একটি অবলাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা এক সজ্জদয় ধনবান ব্যক্তি। নানা স্থানে তিনি এইরূপ আশ্রম ও ধর্মশালা স্থাপন করিয়া তাঁহার বিপুল অর্থের সদ্যবহার করিতেছেন।

ঐ অবলাশ্রমটি এখন শতাধিক অনাথার আশ্রয়স্থল। এক জন প্রৌচা সন্ন্যাসিনীর হস্তে তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার ভার গুস্ত আছে। মেয়েদের নৈতিক উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে এখানে শাস্ত্রানুমোদিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে; তন্নিম্ন, যাহাতে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া স্বাবলম্বিনী হইতে পারে, তাহারও উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

অবলাশ্রমের চারি পাশে প্রশস্ত উদ্যান। এক পাশে সারি-সারি শয়ন-কক্ষ; আর এক দিকে পাকশালা ও ভাঁড়ার ঘর। সম্মুখে প্রকাণ্ড হল, সেই হলস্থিত বেদীতে উপবেশন করিয়া যোগিনী-মাতা আশ্রমবাসিনী নারী-দিগকে শিক্ষা দান করেন। হলের সম্মুখেই আর-একটি হল শুভ্র মর্ম্মর-মণ্ডিত; তাহারই এক প্রান্তে রাধাক্ষাম

বিগ্রহ রজত-পালকে বিরাজিত। পার্শ্ববর্তী দরদালানে বিশ-ত্রিশটি মেয়ে হাসি-গল্প করিতে করিতে ফুলের সাজ রচনা করিতেছে, এবং তাহার আর এক পাশে কয়েকটি রমণী কুটনা কুটিতেছে।

শীতের অবসানে সবেমাত্র বসন্ত সমাগমের আভাস পাওয়া যাইতেছে। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। আজ সকাল হইতেই টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আপন শয়ন-কক্ষের জানালার ধারে নীলা একাকিনী বসিয়া আছে। কলনাদিনী গঙ্গাবক্ষে তাহার দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ। কত কি প্রশ্ন তাহার মনে জাগিতেছে! মানুষের পক্ষে কোন্টা বেশী শ্রেয়স্কর—সংসারশ্রম, না সন্ন্যাসশ্রম? জীবের চরম লক্ষ্য কি? সঙ্গ-সঙ্গ কেবলই তাহার মনে হইতেছে, গৃহে থাকিয়াও মানুষ সন্ন্যাসী হয়, আবার আশ্রমে থাকিয়াও গৃহী। এই যে আশ্রম, বৈরাগ্যের গৈরিক কেতন ইহারও উর্দ্ধে উড়াইয়া, তাহার নিম্নস্থ গৃহেই আশ্রয় লওয়া হয় নাই কি? এখানে কি নাই? রৌদ্র হইতে শীতল ছায়ায় যাইবার আগ্রহ, বৃষ্টিধারা হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্ত ব্যাকুলতা, যশের কামনা, অপযশের ভয়—এখানে কাহার নাই?

ঝিম্-ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি। ছুপ-ধবল গঙ্গার বুকে ছোট-ছোট পাল তুলিয়া ডিক্সিগুলি নাচিয়া চলিয়াছে; বর্ষণ-সিক্ত কুঁড়িগুলি ধীরে-ধীরে ফুটিয়া-উঠিয়া প্রকৃতির সাক্ষ্য প্রসাদনে যোগ দিয়াছে।—নীলার মানস-নয়নে ফুটিয়া উঠিল—তাহার একান্ত নিবিড় চারি বৎসরের সংসারের চিত্র। মনে পড়িল, চারি বৎসরের মধ্যে একটি দিনের জন্তও সে গৃহত্যাগ করিয়া অত্র কোথাও বাস করে নাই।

—ও মা! ও নীলাদি, সন্ধ্যা-বন্দনার সময় হ'য়ে গেছে, আর তুমি এখনও এমন চুপটি কোরে বোসে আছ? চল।

নীলা চমকিয়া উঠিয়া দেখিল—আশ্রম-ভগিনী প্রতিভা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। সে লজ্জিত ভাবে কহিল, —তুমি যাও ভাই, আমি কাপড় বদলেই যাচ্ছি।

নীলা যখন মন্দিরে প্রবেশ করিল, তখন বন্দনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা মাতার্তীর স্তবে স্তব মিলাইয়া গায়িতেছে—“অধরং মধুরং বদনং মধুরং—”

নয়

মণীশের শরীর ভাল নাই। আজ-কাল আর সে বিছানা হইতে উঠিতেই পারে না। তাহার গৃহ-চিকিৎসক ডক্টর রায় এত দিন চিকিৎসা করিয়াও বিশেষ ফল না পাওয়ায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কলিকাতাতেই মণীশের এক পিসিমা থাকেন। তাঁর ছেলেরা প্রত্যহই মণীশের খবর লইতে আসে। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ আরও খারাপ হইতেছে দেখিয়া তাহারা এক জন বিজ্ঞতর চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। শুক্রবার কোন প্রকার ক্রটি না হয়, এজন্ত দু'জন নার্সকেও তাহারা নিযুক্ত করিল—এক জন দিনে, আর এক জন রাত্রে থাকিবে।

মণীশের দেহ শীর্ণ ও লাবণ্যহীন। আজ-কাল বেশী কথা কহিবারও ক্ষমতা নাই। জাগ্রত অবস্থায় সে উদাস নয়নে চাহিয়া থাকে। রোগের গম্বস্তি আছে, কিন্তু রোগীর কাতরোক্তি নাই। বন্ধুরা দেখিতে আসিলে তাহার বিরক্তি ধরে। শুধু অতুল আসিলে মুখখানা প্রফুল্ল হয়। মাঝে-মাঝে অতুলকে গান গায়িতে বা বই পড়িয়া শুনাইতে বলে।

আরও মাসখানেক একই ভাবে অতীত হইলে চিকিৎসক মত প্রকাশ করিলেন যে, রোগী এইবার খারোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহার অল্প দিন পরেই মণীশ বীরেনকে ডাকিয়া কহিল,—নার্সদের এইবার ছুটি দাও, বীরেন।

বীরেন মৃদুকণ্ঠে কহিল,—আরও দিন-কয়েক রাখলে ভাল হয় না? এখনো তো আপনি সম্পূর্ণ সারেননি।

মণীশ কহিল,—সারতে যেটুকু বাকি আছে, তার জন্তে তোমরাই তো রয়েছ।

কথার শেষে নিশ্চিত নয়নে চাহিয়া সে একটু হাসিল। তাহার পর কহিল,—না, না, আর ওদের দরকার নেই। ডাক্তারের মত যাই হোক, আমি বেশ বুঝেছি, আমার বারো আনা অল্প মনের। বুঝলে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—তাই আমি ভাবি, বীরেন, আমার চিরদিনের অক্ষয় স্মৃতি হঠাৎ কে চুরি করলে? যত ভাবি, ততই অবাক হই।

বীরেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অগ্র দিকে মুখ ফিরাইল।

নার্স ছই জনকে বিদায় দেওয়া হইলে বীরেন এবং পুরাতন ভৃত্য গোকুলই মণীশের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিল।

এক দিন সকালে মণীশকে ঔষধ ও পথ্য দিয়া বীরেন ডাক্তারকে রিপোর্ট দিতে চলিয়া গিয়াছে, সেই অবসরে সিঁড়িতে কাহারও পরিচিত পদশব্দ শুনিতে পাইয়া মণীশ উদ্গ্রীব হইয়া সহসা সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর পুনর্বার উপাধানে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিল। সিঁড়ি দিয়া যে উঠিতেছিল, সে ধরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহা অসম্ভব করিয়াও মণীশ চক্ষু মুদিয়াই পড়িয়া রহিল। আগন্তুক গাবিল, মণীশ ঘূমাইতেছে। সে তখন অতি সন্তপণে তাহার মাথার কাছে বসিয়া তাহার চুলের মধ্যে ধীরে-ধীরে অঙ্গুলী চালনা করিতে লাগিল।

মণীশ এইবার আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—কে ? নীলা ? আমি জানতুম, তুমি আসবে; তাই তোমারই আশা-পথ চেয়ে সেরে উঠবার জন্তে এত আকাঙ্ক্ষা, এত চেষ্টা। কি কোরে খবর পেলে, নীলা—মরণের

পথে আমি এগিয়ে যেতে-যেতে তোমারই দর্শন-কাঙাল, তাই এ যাত্রা আর যাওয়া হ'লো না ?

মণীশের ললাটে ছই ফোঁটা তপ্ত-অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অসীম তৃপ্তিতরে মণীশ কহিল,—আঃ ! নীলা, তোমার কোলের উপর আমার মাথাটা তুলে নাও।

নীলা তাহাই করিলে, মণীশ উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—আর কখনো আমাকে এমন অসহায় ফেলে যাবে না তো, নীলা ?

বাম্পাকুল কণ্ঠে নীলা উত্তর দিল,—কেমন ক'রে যাব বল ? তুমি যে আমায় কত শক্ত ক'রে বেঁধেছ, আগে তা' বন্ধতে পারিনি তো, তাই গিয়েছিলুম।

মণীশ নীলার ডান হাতখানা বুকে চাপিয়া-ধরিয়া গাঢ় স্বরে কহিল,—আজ সেই গানটা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে নীলা ! গাইতে পারবে ?

—কোনটা ?

সপ্রেম-দৃষ্টিতে স্বামী'র মুখের পানে চাহিয়া নীলা আঁচল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিল।

মণীশ কহিল, সেই যে—

কত সে দূর বিরহ-লোক

পার হ'য়ে এলে, মম প্রিয় !

শ্রীহলারানী মুখোপাধ্যায়।

এবারও রহিনু ঋণী

তোমার প্রেমের ঋণ চিরদিন রয়ে গেল বুকে,
কত যুগ-যুগান্তর বহিতেছি পরম কোঁতুকে !
নয়নে ধরেছ তুমি—তোমার ও-রূপ-স্বধামৃত,
সে-রূপ-মাধুরী আজো হৃদয়েতে রয়েছে সঞ্চিত !

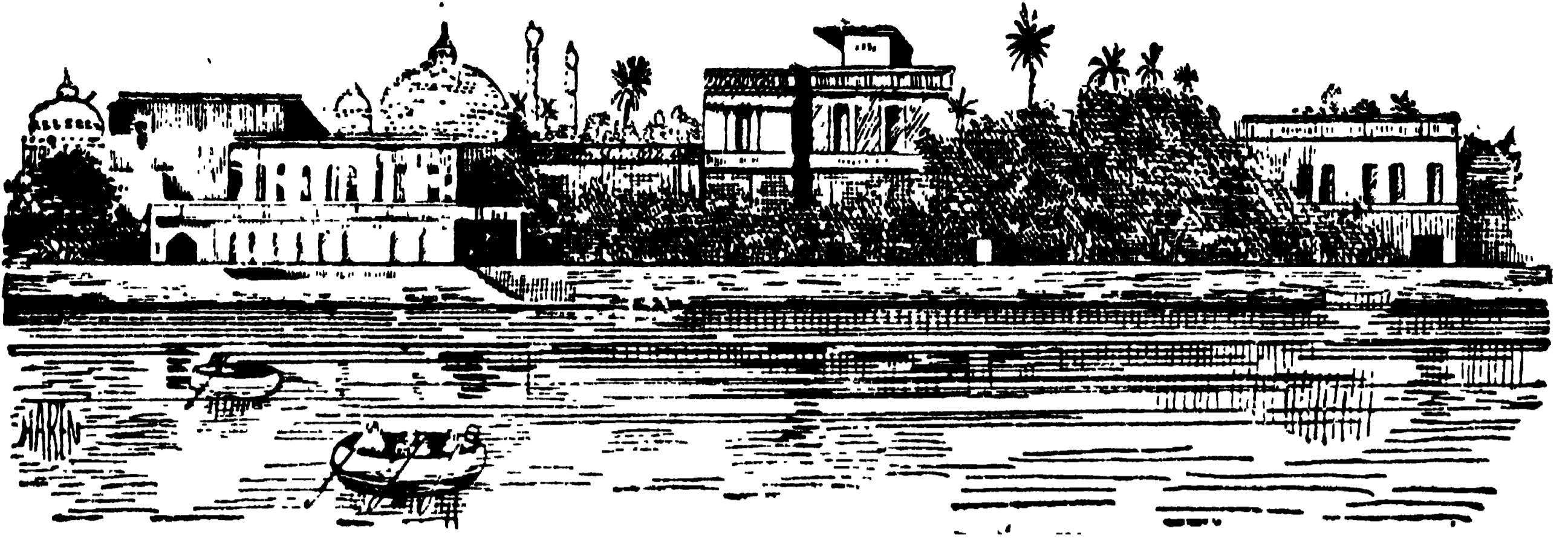
মধুর ভাষায় তব অমৃত উছলি পরে ঝরি',
আমি যে নিয়েছি মোর হৃদয়ের শূন্য ভাণ্ড ভরি' !
কুন্তলে নেমেছে তব শাঙনের ঘন মেঘভার,
স্নিগ্ধ-শাস্ত রূপে তার পূর্ণ হ'ল অন্তর আমার !

চরণ-অলঙ্কারে—গোলাপের রক্তরাগ ফুটি',
'সকল অন্তর মোর তারি' তরে পড়েছিল লুটি',
অধর পরশে তব নিখিলের রসামৃত-ধারা,
কত ফুলে বিকশিত করিয়াছে অন্তর-সাহারা !

এ-বারও তোমার ঋণ পরিশোধ হ'ল নাকে। তাই,

যুগ-যুগ ঋণভান বুকে ক'রে বড়িয়া বেড়াই !

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল (কবিশেষণ)



বেথলিহাম

আমাদের যেমন বারাণসী, মুসলমানের যেমন মক্কা, খৃষ্টানের কাছে বেথলিহাম তেমনি পুণ্য-তীর্থ। যজ্ঞ-যুগে মানুষের মন আজ পিষিয়া চূর্ণ হইয়া গেলেও বেথলিহামের

নাই। সে সব গলি-ঘুঁজি আমাদের কাশী-গয়ার গলি-ঘুঁজির মতো পাথরে বাঁধানো। গলির দু'পাশে হাজার দেড়-হাজার বৎসরের পুরানো বাড়ী-ঘর। এ-সব বাড়ীর



বেথলিহামের বাড়ী-ঘর—পাথরের দেওয়াল ; মাটির ছাদ

নামে খাঁটি খৃষ্টান আজো মাথা নত করিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করে।

সহর-হিসাবে বেথলিহাম খুব ছোট ; জেরুশালেম এবং হেরুসেনেব মধ্যে অবস্থিত। এখানকার পথ-ঘাট তেমন প্রশস্ত নয়। আঁকা-বাঁকা গলি-ঘুঁজির অন্ত

দেওয়াল পাথরের তৈয়ারী ; হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার জল খাইয়া দেওয়ালের গা দেখিতে কালো ঝুলের মতো ! অনেক বাগান আছে, বাগিচা আছে। আঙুরের ক্ষেত, জলপাইয়ের ক্ষেত,—ফল-ফুলের বাগান অজস্র। পথে-ঘাটে কলরব নাই, কোলাহল নাই।

এখানকার নর-নারী সভ্য-যুগের ব্যবসাদারী-বুদ্ধিতে পরিপক্বতা লাভ করে নাই। আচারে-ব্যবহারে-স্বভাবে-বেশে-ভূষায় তারা আছে আজো সেই আদি-কালের পল্লী-বাসীর মতো। বাইবেলে আমরা যে-সব নর-নারীর কথা পড়ি এবং বেথলিহামের পথে-ঘাটে আজ যে-সব নর-নারী বিচরণ করে, তাদের দেখিলে সেই বাইবেলে

বর্ণিত নর-নারীর দেশের লোক ও বংশধর বলিয়া চিনিতে ভুল হইবে না!

বেথলিহাম সहरটি পা হাড়ে র কোলে জেরুশালেমের উত্তরে অবস্থিত। নগরের বুক চিরিয়া দীর্ঘ পথ। এই পথ সোজা গিয়াছে এক দিকে জেরুশালেমে; আর-এক দিকে হেরনে।

বেথলিহামে অনেক মুসলমানের বাস; তা ছাড়া সকলেই খৃষ্টান। খৃষ্টান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছ'সাত হাজার। এখানকার খৃষ্টান অধিবাসীরা মনে-প্রাণে খৃষ্টান। তাঁদের মনে ঘেঁষ-হিংসা নাই। তাঁরা যেমন সদালাপী এবং অমায়িক, তেমনি অতিথিপরায়ণ। মামলা-মকদ্দমা এখানকার খৃষ্টান-সমাজে অজানিত বলিলে অত্যাঙ্কি হইবে না।

এখানে কোলাহল নাই এবং লোক-জন সাদাসিধা সরল ভাবে জীবনযাপন করে বলিয়া মনে করিবেন না, তারা অলস বা কন্দ-বিমুখ, প্রেমোদ-স্বপ্নে গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে! এখানে ধর্ম বা পলিটিক্স লইয়া দলাদলি নাই, গণ্ডগোল নাই। সে-সবের দিকে কাহারো বোঁক নাই। সকলেই কাজ-কর্ম লইয়া আছে। সে-অল্প শিল্প-কাজে এখানে বহু বৈচিত্র্য এবং উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

এখানকার পথ-ঘাটের গঠনে বৈচিত্র্য আছে। গলি-ঘুঁজি যেমন আছে, তেমনি কোথাও পথের মাঝে দোতলা-তিনতলার সমান উঁচু সোপানশ্রেণী; সে-সোপান অতিক্রম করুন, ও-দিকে আবার পথ। পাহাড়ী জায়গা বলিয়া পথ কোথাও উঠিয়াছে মাথার উপরে, আবার কোথাও পায়ের তলায় নামিয়া গিয়াছে।



চারণ-ভূমি

পথের ধারে-ধারে রকমারি দোকান। এ-সব দোকানে বসিয়া নানা শিল্পী নানা শিল্প রচনা করিতেছে। কেহ মালা গাঁথিতেছে; কেহ মাটি লইয়া বিচিত্র নক্সাদার তৈজসাদি তৈয়ারী করিতেছে; কেহ তাঁতে কাপড় বুনিতেছে; কেহ কাপড়ে নানা ছাঁদের নক্সা তুলিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারী করিতেছে। সারি-সারি গহনার দোকান—কেহ গড়িতেছে হার, কেহ গড়িতেছে মাহুলি, কেহ বোতাম, কেহ বা নেকলেস। দেশ-বিদেশ হইতে নিত্য এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা এ-সব বস্তু সমাদরে কেনে, কিনিয়া দেশে গিয়া প্রিয়জনদের উপহার দেয়।

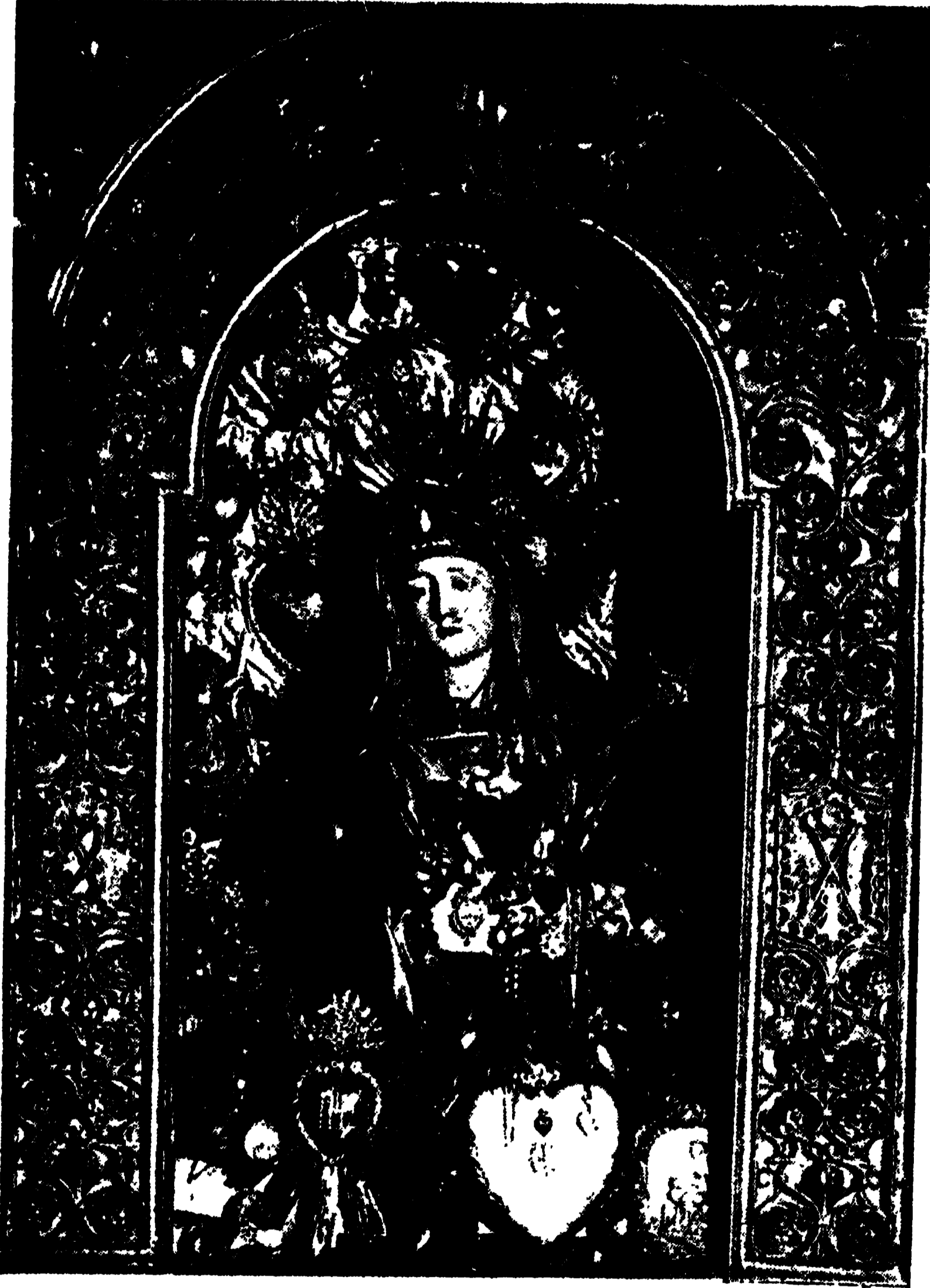
পথের ধারে-ধারে দেবদেবীর অসংখ্য মন্দির আছে—মঠ আছে, আশ্রম আছে। মন্দিরে মেরি-মাতার মূর্তি।

কোনো মূর্তি পাথরে গড়া—কোনো মূর্তি বা রৌপ্য-নির্মিত। এক জন মার্কিন পর্যটক পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। এ-গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন,—বেথলিহামের সঙ্গে ভারতের কাশ্মীরের

দোকানে যেমন বিচিত্র শিল্প-সজ্জার, বেথলিহামেও ঠিক তেমন দেখিয়াছি। তিনটি পুণ্যতীর্থ দেখিলে মনে হয়, এ তিনটি তীর্থ যেন একই সূত্রে গাঁথা এক-বিধাতার সৃষ্টি! পুতুল-খেলনা তৈয়ারী করিয়া বেথলিহামের ছোটখাট

এই সব শিল্পী যে অর্থ উপার্জন করে, তাহাতে তাদের সংসার-যাত্রা-নির্বাহে কোনো অসুবিধা ঘটে না। তারা যেমন ভিক্ষারতি জানে না, তেমনি বিদেশী যাত্রী পাইলে ঠকাইয়া দাঁও কম্বার প্ররতিও নাই! সংসার প্রতিপালন করিয়াও সকলে বেশ কিছু সঞ্চয় রাখিতে সমর্থ; তা ছাড়া এই শিল্প-কাজকে যুগযুগান্ত কাল অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া এখানকার অধিবাসীদের মনে যে স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মসম্মানবোধ দেখা যায়, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোথাও কোনো সমাজে দেখা যাইবে না। These industries have cultivated a sense of independence and self-respect in the natives of Bethlehem.

বেথলিহামে কল-কারখানা নাই। দোকান-ঘর বা কারখানা যা আছে, তা ঐ বাড়ীর কোনো কামরায়। বাড়ীর লোক-জন এ-সব দোকানে কারিগরী করে। মাহিনা-করা কারিগর নাই বলিলেও চলে। মেঝেয় বসিয়া ছুঁ-চারিটা সাবেকী-যন্ত্র লইয়া কি বিচিত্র শিল্পই না ইহার রচনা



শ্রীশ্রীমেরি-মূর্তি

আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। অনেক সময় মনে হইয়াছে, ধর্ম্মের দিক দিয়া হিন্দুর সঙ্গে খৃষ্টানের পুণ্য-ভক্তির প্রকাশ-রীতিতে যেমন মিল দেখা যায়, এমন আর-কোনো ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায় না! কাশ্মীরে এবং গয়ায় যেমন অজস্র মন্দির, মন্দিরের আশে-পাশে বহু দোকান, এবং সে

করিতেছে! কাজ চলিয়াছে অবিরাম! কাজ করিতে করিতে কেহ গান গায়িতেছে, কেহ পাশোপবিষ্ট ছেলেকে পড়া বলিয়া দিতেছে, কেহ বা ছেলেমেয়ের বিবাহের কথা পাকা করিতেছে! কাজ ঠিক চলিয়াছে—অথচ হাতের এ-কাজ বিশ্ব-সভায় প্রদর্শন করিলে লোকে কারিগরীর প্রশংসা ছাড়া নিন্দা করিতে পারিবে না!

এখানকার মেয়েরা রূপে-গুণে যেন লক্ষ্মী! সংসারের কাজ-কর্ম আছে; সে কাজ-কর্মের অন্তরালে অবসর মিলিলে একটা-না-একটা কাজে হাত দিবেন। আলস্য বা বিলাস তাঁরা জানেন না।

জন্ হোয়াইটিং নামে এক জন ইংরেজ লেখক বেথলিহাম দেখিয়া-আসিয়া একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন, এক দিন এক শিল্পীর গৃহে গিয়াছিলাম। আঠারো বৎসর বয়সের রূপসী তরুণী এ-বাড়ীর গৃহিণী। একটি

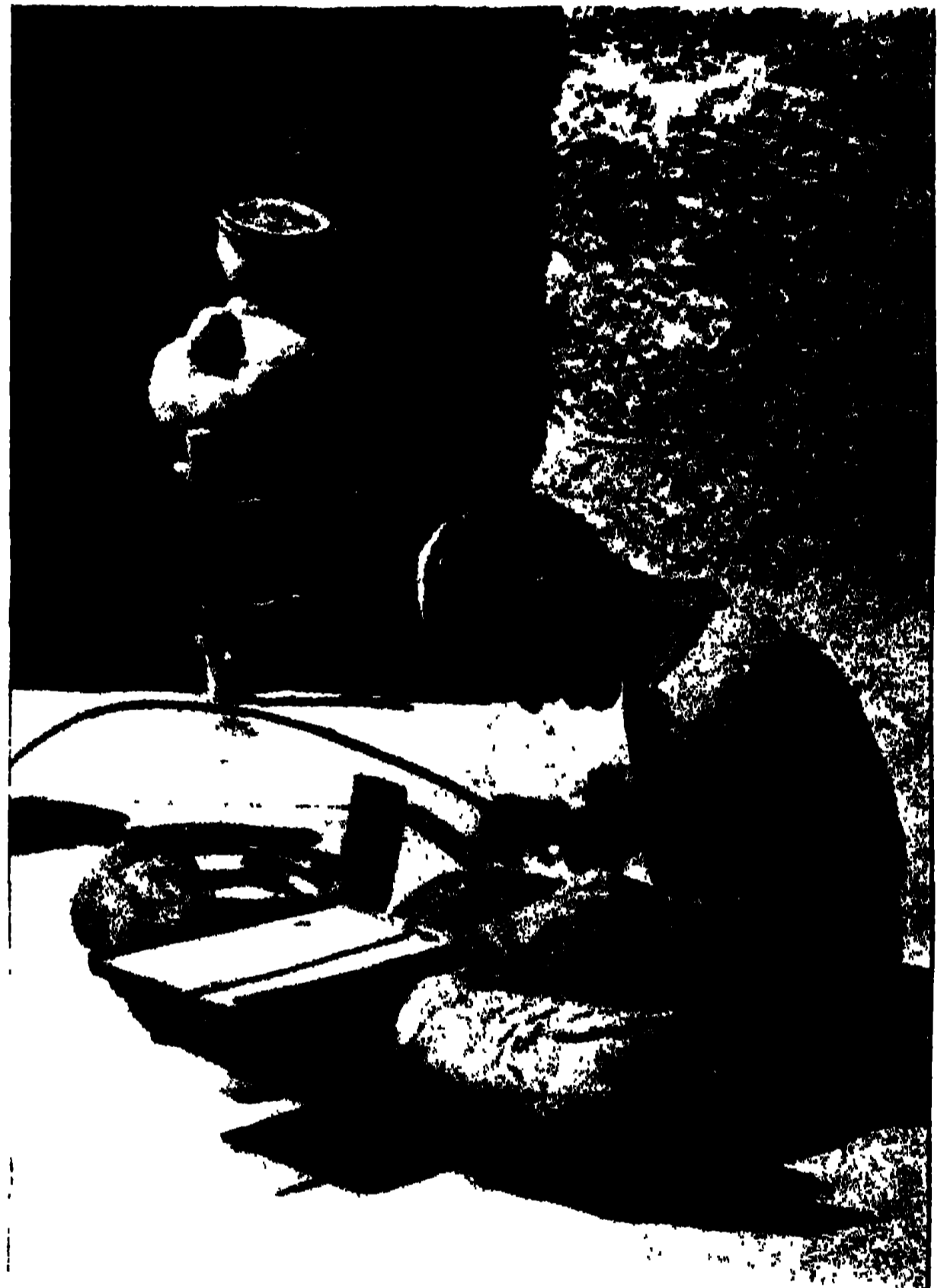


গহনার কারিগর

শিশু-সন্তানের জননী। মুক্তায় বিঁধ করিয়া সেই বিঁধে তার চালাইয়া রূপসী গৃহিণী মুক্তার মালা গাঁথিতেছিলেন। কাছে দোলনা; দোলনায় শিশু শুইয়া আছে। জননী কাজ করিতেছে—মাঝে-মাঝে পরম-স্নেহে শিশুর পানে চাহিয়া হাসিতেছে—ছড়া গায়িয়া শিশুকে মনের আবেগ-ধারায় অভিসিক্ত করিতেছে—আবার শিশু কাঁদিলে দোলনায় মৃদু দোল দিতেছে। ঘরের আর-এক দিকে ছোট উম্মুনে হাঁড়ি চাপানো—রান্না হইতেছে। স্বামী ক্ষেতে গিয়াছে কাজ করিতে—ক্ষেত হইতে ক্ষুধার্ত

হইয়া ফিরিবে,—ফিরিবামাত্র স্বামীকে অন্ন বাড়িয়া দিবে। এক সন্ধ্যে তিনটি কাজ করিতেছে—অথচ তার মুখে-চোখে যে হাসির লহর দেখিয়াছি, সে-হাসি সভ্য-যুগের বিলাসিনী-সমাজে কোনো দিন দেখি নাই!

এখানকার মুসলমান শিল্পীদের হাতে যে জপের মালা তৈয়ারী হয়, তার কলানৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইবেন। এক-রকম ফলের বীজ লইয়া তারা সে বীজে রঙ করে। এ বীজকে বলে মক্কা-ফলের বীচি। বীজগুলি



নকল-মুক্তার বোতাম তৈয়ারী

দেখিলে হাতীর দাঁতের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়! এ-বীজ রঙাইয়া সেই রাঙানো-বীজে মালা গাঁথে। সে-মালা মক্কা ও মদিনার বাজারে পুণ্যকামী মুসলমানের দল সাগ্রহে ক্রয় করেন।

বেথলিহামের গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের অবস্থা এখানকার মতো "দিন-আনা দিন-খাওয়া"-গোছের নয়। সকলেরই সঙ্গতি আছে। বিদেশের সহিত কাজ-কারবার করেন। অনেকে যুরোপ-আমেরিকায় গিয়া বাণিজ্য-সম্পর্ক এমন সুদৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত করিয়া আসিয়াছেন



বেথলিহামের পথে



মাগরী-স্তম্বে

যে, সে কারবারের কল্যাণে ছু'-তিম পুরুষ-যাবৎ প্রচুর সঙ্গতি-সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেকে ব্যবসায়-সম্পর্কে সারা জীবন আমেরিকায়-মুরোপে অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ-বয়সে দেশে ফিরিয়াছেন—দেশের মাটিতে দেহরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে।

বেথলিহামে মুক্তার ব্যবসায়ের খুব বেশী পশার। তার পর কফি এবং মশলার ব্যবসায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এখান হইতে মুরোপে ও আমেরিকায় প্রচুর কফি এবং মশলা চালান যায়। এ-কারবারের মালিক বিদেশী বণিক নয়, মালিক বেথলিহামবাসী।

এখানে প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতির রেশ আজো বেশ সজীব ভাবে বিদ্যমান দেখা যায়। ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার সময় ছেলে-মেয়ে আজো গুরুজনদের পায়ে নতি জানাইয়া তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এ-রীতি দেখিয়া ওল্ড টেষ্টামেন্টের সেই patriarchal blessings-এর ছবি চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে।

এখানকার পুরুষের পক্ষে বিদেশী-বিবাহ এ-যুগেও খুব নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত। বেথলিহামবাসীরা আজ বিদেশে দোকান-কারবার ফাঁদিয়া সেখানে বাস করিতে গেলেও বিদেশকে 'ঘর' বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখেন নাই! বাড়ীর যে বড়, সে যায় বিদেশে ব্যবসা করিতে; তার পর ছোট ভাই-ভাইপোর মধ্যে বয়সে যে যেমন বাড়িয়া ওঠে, সে-হিসাবে তার ডাক পড়ে বিদেশের কারবারে। সে বিদেশে যায় এবং

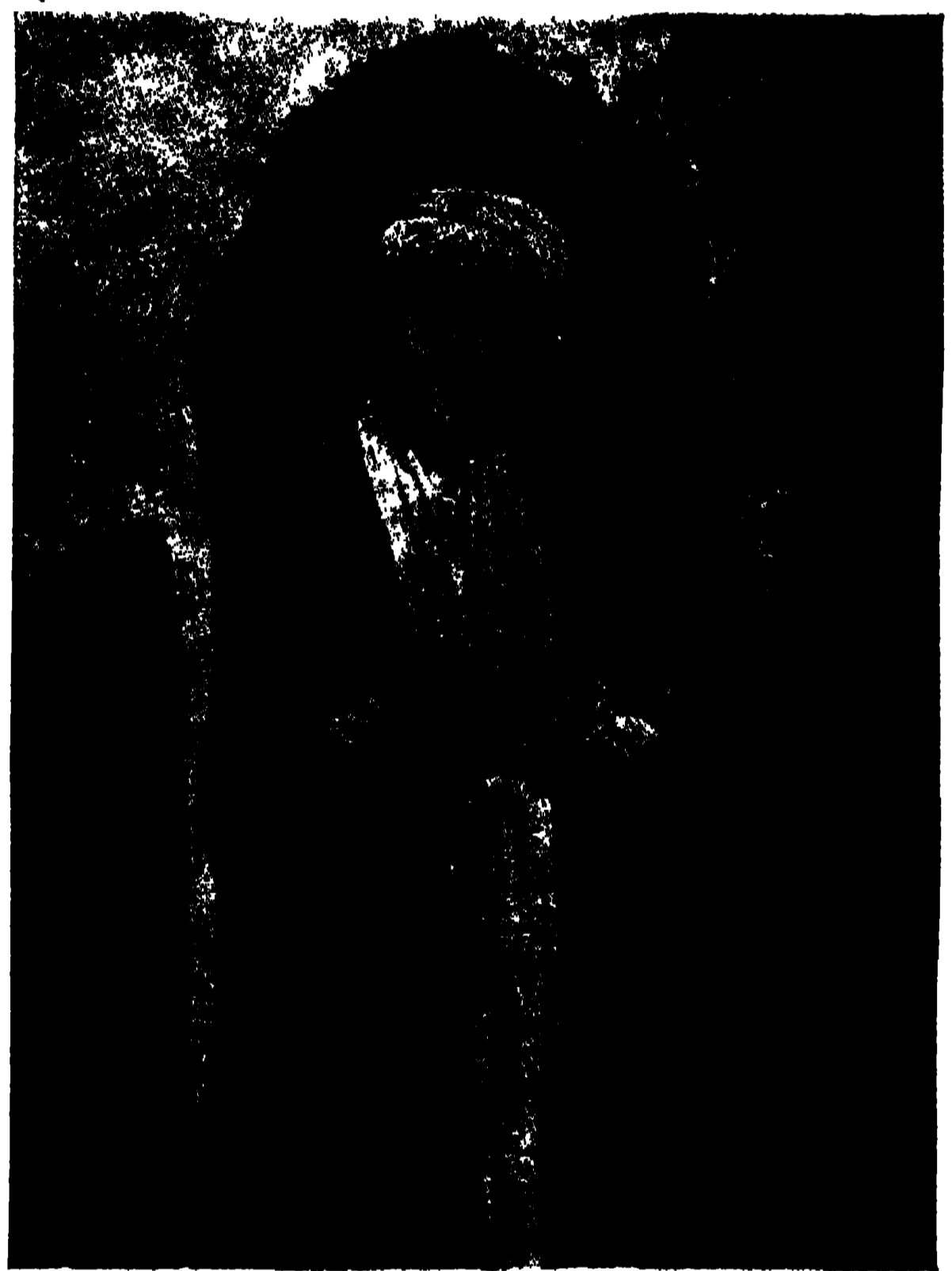
সেখানে ব্যবসা-বৃদ্ধি পাকিলে যে-বড় এত কাল ব্যবসাদারীর জন্ম বিদেশে ছিল, সে দেশে ফিরিয়া আসে। এমনি ভাবে বেথলিহামবাসীর বিদেশী কারবারের ধারা আজ দেড় শত ছুই শত বৎসর ধরিয়। অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

বড় যখন দেশে ফিরিয়া আসে, দেশে তখন উৎসবের সাড়া জাগে। জেরুশালেমের রেলষ্টেশনে আত্মীয়-বন্ধুরা গিয়া জড়ো হয় বড়কে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্ম। অভ্যর্থনার জন্ম গান রচনা করা হয়; এবং সেই গান গায়িয়া মহা-ধুমধামে বড়কে ট্রেন

বিবাহাছুষ্ঠান বেথলিহামে একটি স্বরণীয় ব্যাপার। কাজে-কর্মে মাহুষ না হইলে পুরুষ আজ বিবাহ করিতে চায় না! কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয়, বাড়ীর বড় ছেলে বিদেশে ব্যবসা করিতে গেল; কাজের ব্যস্ততায় দশ-পনেরো বৎসর দেশে ফিরিতে পারিল না! তার পর এক দিন ছেলেকে ফিরিতে হইল—মা বা গুরুজনের কথায়। বাড়ীতে সকলে কষ্টা নির্বাচন করিয়া রাখিয়া-ছেন—ছেলে আসিয়া তাকে বিবাহ করিবে। বিবাহের ব্যাপারে বেশী-ভাগ সংসারে মা-বাপ-গুরুজনের বর-বধু-নির্বাচনে আজো গোলযোগ ঘটে না।



তরুণী জননী



মুসলমান ব্যবসায়ী

হইতে নামাইয়া গৃহে আনা হয়। এখন মোটর-গাড়ীতে করিয়া আনা হয়। পূর্বে যখন মোটর-গাড়ী ছিল না, তখন উটের পিঠে বসাইয়া আনা হইত। গানের সমারোহ এ-যুগেও উঠিয়া যায় নাই! তার পর বাড়ীতে ভোজের সমারোহ চলে—যেখানে যত আত্মীয়-বন্ধু আছে, এ-ভোজে সকলের নিমন্ত্রণ হয়। ভোজ-সমারোহ কোথাও চলে এক সপ্তাহ, কোথাও বা দু'-তিন সপ্তাহ ধরিয়। কি গর্বে, কি গৌরবে সকলে কৃতী আত্মীয়-বন্ধুর সমাদর করেন,—দেখিবার সামগ্রী!

বিবাহে আত্মীয়-বন্ধুদের সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। সকলকে ভোজ্যদানে, উপহার-দানে পরিতৃপ্ত করার ঘট পড়িয়া যায়। কিন্তু শুভাশীর্ষাদাদি-জ্ঞাপন চলে প্রাচীন আরবী-ভাষায়। এ-ভাষার রেওয়াজ আজ পর্যন্ত শুধু আশীর্ষচনেই টিকিয়া আছে।

পুরুষ-মাহুষের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে বেথলিহামে বাধা-ধরা কোনো বিধি নাই; কিন্তু মেয়েদের বিবাহ সকল গৃহেই প্রায় দশ-বারো-চৌদ্দ বৎসর বয়সে সম্পাদন করা হয়। বিবাহ-বেশে প্রাচ্য-রীতিতে বর্ণ ও দীপ্তির



রাচেলের সমাধি—খুটান, ইহুদী এবং মুশলিমের পুণ্যতীর্থ



কুয়া-তলা—এই কূপের সম্মুখস্থ গৃহে খুট জন্মিয়াছিলেন

আড়ম্বর আছে প্রাচীন যুগের মতো। সাদা পোষাক পরাইয়া কস্তুর বিবাহ—সে-ফ্যাশন আজো চলে নাই।

বিবাহের মতো মাসিক অনুষ্ঠানে অনিমন্ত্রিত রবাহূত কেহ আসিয়া যদি প্রীতিভোজে বসিয়া যায়, তাহাকে তাড়াইতে নাই—এ রীতি বেথলি-হাম-সমাজ এখনো মানিয়া চলিতেছে।

বিবাহানুষ্ঠানের জন্ত গ্রামের পুরাতন চার্চ—চার্চ অফ্ দি নেটিভিটিতে বিবাহ দেওয়া—সকলে পরম কাম্য বলিয়া মনে করে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যে-গৃহে যীশু জন্ম লইয়া-ছিলেন, এ চার্চ সেই বাস্তু-জমির উপরে গঠিত হইয়াছে। এ চার্চটি সম্রাট কনষ্টানটাইন কর্তৃক ৩৩০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়; তার পর পঞ্চম শতাব্দীতে জাষ্টিনিয়ান ইহার সংস্কার-বিধান করেন। ওল্ড টেষ্টামেন্টের হিব্রু-অনুবাদক সেন্ট জেরোমি এই চার্চে বাস করিতেন। তার পর এ চার্চ বহু স্তম্ভ-দুঃখ বিরোধ-দ্বন্দ্বের বাড়-ঝাপটা সহিয়া আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে।

এ চার্চের প্রবেশ-দ্বার এত ছোট যে, হেঁট হইয়া তবে মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এক জনের বেশী দু'জন এক সঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে না। কপাটটি লৌহ-নির্মিত। লৌহদ্বার পার হইলে খিলানযুক্ত দালান বা নাট-মন্দির। বর ও বধু আসিয়া এই দালানে দাঁড়ায়। অভিভাবকের দল মেরি-মাতার পূজা-নিবেদন করেন, তার পর পুরোহিত আসিয়া বর-বধুকে আশীর্বাদ করেন।

এখানকার যে-সব প্রাচীন গৃহ

বহু-বহু বৎসরের বহু
বিল্ব-বিপত্তি কাটাইয়া
আজো বাঁচিয়া আছে,
সে গুলির নিশ্চাণ-
পঙ্কতিতে বৈশিষ্ট্য
আছে। বাড়ীর সদর-
প্রবেশ-দ্বার ছোট।
এ ঘর পার হইয়া
খিলান-করা উঠান।
প্রতি গৃহে এমনি
উঠান আছে। উঠান
ছাদে-ঢাকা; এবং
ঘরগুলি এই উঠানের
গায়ে-গায়ে নিশ্চিত।
এই উঠানে বসিয়া
খাওয়া-দাওয়া হয়,
কাজ-কর্ম করা হয়।



দূরে চার্চ অফ দি নেটিভিটির চূড়া দেখা যায়

এই দালানে বসিয়া সকলে সুখ-দুঃখের গল্প করেন।
দালানের কোণে দোলনা খাটানো আছে; সে দোলনায়
খোকাথুকু শুইয়া ঘুমায়। উঠানের দেওয়ালে 'শিকা'
ঝুলিতেছে; ঝুড়ি-চ্যাঙারি আছে। অর্থাৎ এই উঠানটি
পরিবারের ভাঁড়ার ঘর, বসিবার ঘর, ভোজনালয়। সব
কাজ এই উঠানে করা হয়। বাহিরের পুরুষ-মামুয়ের
পক্ষে এ উঠানে প্রবেশ-অধিকার নাই। তাঁদের বসিবার
জন্ত বাহিরে টুল পাতা হয়—মাদুর বিছানো হয়।

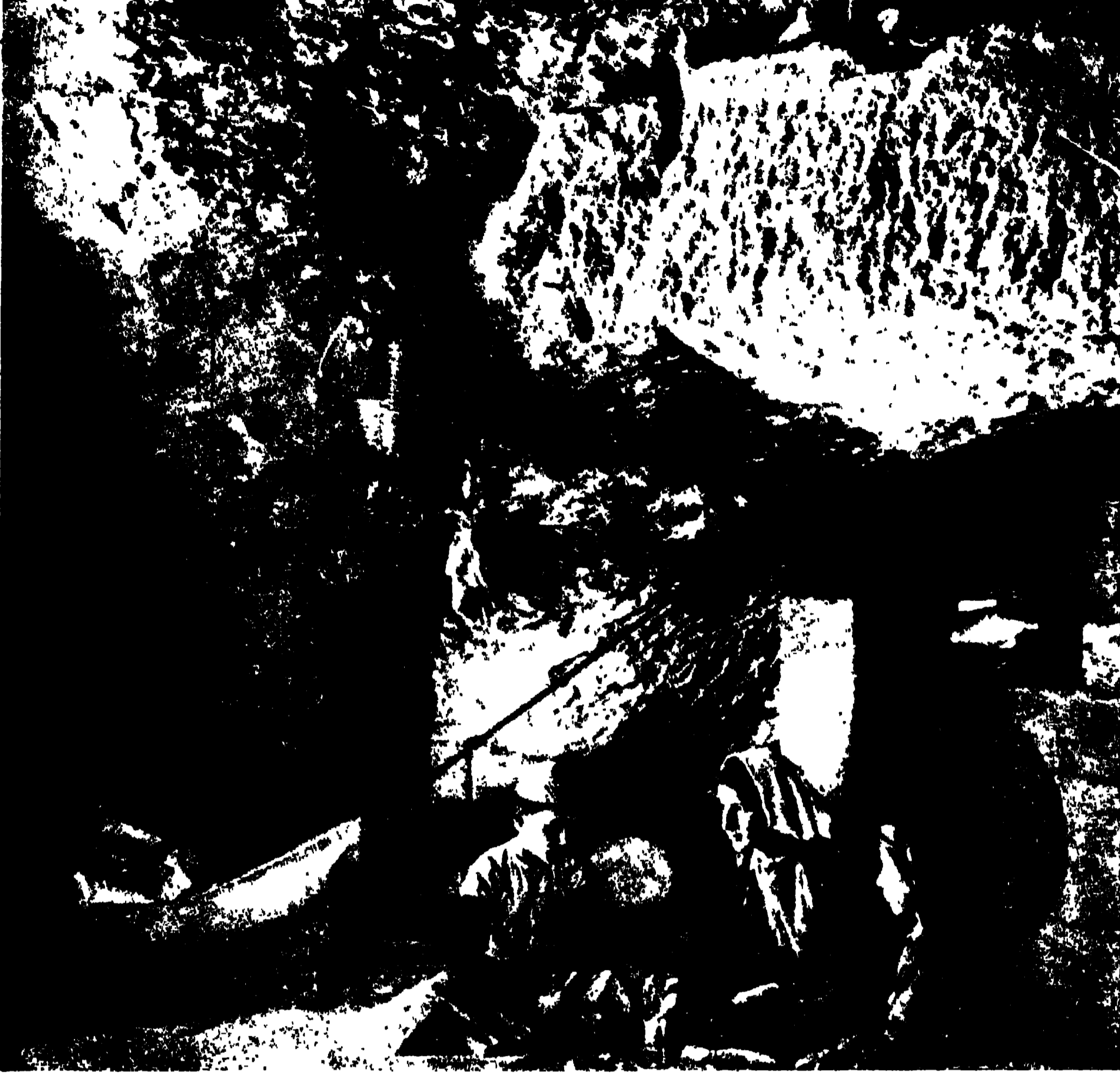
বেথলিহামবাসীরা নিজেদের কাজ-কর্ম-বাণিজ্য-
ব্যবসা ঘর-সংসার লইয়া দিনাতিপাত করেন। পুণ্যতীর্থ
বলিয়া এখানে বিদেশী বহু যাত্রীর সমাগম হয়।
বড়দিনের সময় যাত্রীর ভিড় বিপুল হইয়া ওঠে। সে
সময় জেরুশালেম হইতে বেথলিহাম পর্যন্ত সারা পথ জন-
কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকে। গাধা ও উটের পিঠে চড়িয়া
কত যাত্রী তীর্থ করিতে আসেন। বিলাস-ঐশ্বর্যের মায়ী
ত্যাগ করিয়া তাঁরা এ তীর্থের ধূলি মাথায় লন, অঙ্গে
মাখেন।



চার্চ অফ দি নেটিভিটির উপাসনা-ঘরে সূর্য্য-কিরণ

পাহাড়ের চূড়ায় আছে 'বেইট লাম' বা রুটি-
ঘর (House of Bread)। যাত্রীরা দূর হইতে

এই রুটি-ঘর দেখিবামাত্র আনন্দে জয়ধ্বনি তোলেন।
মোগলসরাই ছাড়িয়া ট্রেন গঙ্গার পুলে উঠিলে ও-পারে



গৃহস্থ-বাড়ী



মোতলা পথ

বা রা গ সী-ধা মে র
আ ভা স চো খে
জা গি লে আমরা
যেমন জয়ধ্বনি করি,
এ জয়ধ্বনি ঠিক তারি
মতো !

এই পাহাড়ের
কোলে অতি-প্রাচীন
একটি নিবার - কূপ
আছে। তার দু'টি
মুখ। রোম-সম্রাটেরা
এ কূপটি পাথরে
বাধাইয়া দিয়াছেন।
এখন এই নিবার
হইতে জেরুশালেমে
পানীয় জল সরবরাহ
করা হয়। কূপের
আশে-পাশে তৃণশস্ত্র-
শোভিত বন ভূমি।
সেখানে সকলে মেন
চরায়; উটের দল

এই বনভূমিতে বিশ্রাম করে, কূপের জলে পিপাসা দূর
করে। এ কূপের নাম মাগি কূপ (Well of the Magi) .

এই কূপ সম্বন্ধে বাইবেল-গ্রন্থে মথি-লিখিত অধ্যায়ে
একটি কাহিনী আছে। তিন জন সাধুকে রাজা হেরড
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, খৃষ্ট-জন্মের সূচনাপাতে কেন তাঁর
মনে এত উদ্বেগ? সাধুত্রয় সে প্রশ্নের উত্তর-সমাধানের
জন্তু রাজাদেশে বেথলিহামে আসিতেছিলেন। রাতে
তাঁরা এইখানে বিশ্রাম করেন। তাঁদের উটগুলি
পিপাসার্ত ছিল। তাদের এই কূপের জল পান করানো
হয়। কূপ হইতে জল লইবার সময় সাধুরা কূপের
জলে প্রদীপ্ত নক্ষত্র দেখিতে পান। এই নক্ষত্র
খৃষ্টের দিব্য-জ্যোতিঃ !

এই পাহাড়ের পরেই বেথলিহাম শুরু হইয়াছে।
পূর্ব দিকে মুক্ত সমতল উপত্যকা পাহাড়ের প্রাচীরে
ঘেরা। পশ্চিমে ভূজ পর্বত। পর্বতের গায়ে থাকে-থাকে

জলপাই, ডুমুর আর
আঙ্গুরের ক্ষেত।

ফশলের মধ্যে
যব এখানে প্রচুর
জন্মায়; তা ছাড়া
বাঁলি, নানা বিধ
দাউল; ফল ও তরী-
তরকারীর ফশল
প্রচুর ফলে।

বেথলিহামের
পাহাড় হইতে পাশে
জুড়িয়ার মরু-প্রান্তর
দেখা যায়, বাইবেলে
এই মরুভূমিকে স্কেপ-
গোটের মরু বলিয়া
অভিহিত করা
হইয়াছে। তার পরেই

ডেড শী। ডেড শী Sea-levelএর চেয়ে ১৩০০ ফুট নিম্নদেশে
অবস্থিত। পাহাড়ের আড়ালে ডেড শী নিজেকে এমন
গোপন রাখিয়াছে যে, তার চিহ্ন দেখা যায় না।

ডেড শীর অদূরে উত্তর দিকে জর্ডান উপত্যকা। এই
উপত্যকার অঙ্গ ভেদ করিয়া শামল বনানী-শ্রেণীর মধ্য
দিয়া জর্ডান নদী বহিয়া চলিয়াছে। জর্ডানের পূর্ব-তীরে
নীলাভ মোয়াব পাহাড়।

বেথলিহাম হইতে যে-পথ হেঁচনে গিয়াছে, সেই
পথের বাঁকে জেকবের পত্নী রাচেলের অনাড়ম্বর সমাধি
দেহ আছে। রাচেলের সম্বন্ধে জেনেসিস, ৩৫ অধ্যায়ে লেখা
আছে, “তাঁরা চলিলেন।……এফ্রাথা এখান হইতে বেশী
দূরে নয়।……রাচেল এইখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ
করিলেন। এবং এফ্রাথার পথে বেথলিহামে তাঁর
দেহ সমাহিত করা হয়। জেকব সেই সমাধির উপর একটি
প্রস্তরমাত্র রক্ষা করেন।”

এই সমাধি হইতে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার পথে পামার
উপত্যকা। প্রত্যাশিত ভূমির (Promised Land)
সন্ধানে বাহির হইয়া সাধুগণ (Patriarchs) এইখানে
বিশ্রামের জন্ত ছাউনি ফেলিয়াছিলেন।



ধানা-ঘর



মুসলমান-বমণী

বেথলিহামের সর্বত্র পুণ্যস্থতির বহু নিদর্শন বিস্তারিত
আছে।



ক্ষেতের ফসল



আঙুর-ক্ষেতের হোঁজ

খৃষ্টানে-মুসলমানে ধর্ম লইয়া এখানে ঘেঁষ-বিরোধ নাই, এ-কথা পূর্বে বলিয়াছি। বেশীর ভাগ লোক চাষবাস করে, মেঘ চরায়। বেথলি-হামের চারণ-ভূমি দেখিলে মনে হয়, এ যেন রাখালের দেশ! মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করিতেছে, মেঘ চরাইতে বাহির হইয়াছে। ধান, খড় প্রভৃতি বহিবার জন্ত এখানে বাহন ঐ উট!

ছেলে-মেয়ে—বেথলি হাম বা সীর যেন নয়ন-মণি! বন্ধা নারী এখানে অত্যন্ত দুর্ভাগিনী বলিয়া নিন্দিতা। বন্ধার মুখ-দেখা পাপ, এমনি এখানকার অধিবাসীদের ধারণা।

শিশু জন্মিলে প্রথমেই তার সর্বাঙ্গে বেশ করিয়া লবণ মাখানো হয়; তার পর শিশুর হাত-পা মুড়িয়া দেহের সঙ্গে নরম তুলা জড়াইয়া

চওড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হয়! লবণ মাখাইয়া শিশুকে এমনি ভাবে বাঁধিয়া রাখা হয় সাত দিন; তার পর ছ'মাস তাকে লবণ মাখানো চলে। লবণ মাখাইলে দেহ খুব শক্ত-সমর্থ হয়—ইহাই ধারণা।

এখানকার দাক্ষাক্ষেতগুলি দেখিবার বস্তু। প্রত্যেকটি ক্ষেতে বড় বড় হোঁজ বা চৌবাচ্চা নির্মাণ করা হয়। চৌবাচ্চাগুলি হয় খুব গভীর—প্রায় কূপের মতো। শীতকালে এখানে প্রচুর বারিপাত হয়; চৌবাচ্চাগুলি তখন জলে পরিপূর্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে এই জল কাজে লাগে। চৌবাচ্চাগুলি পাহাড়ের বেল-পাথর কাটিয়া বোতলের ছাঁদে রচনা করা হয়। কূপের মুখের দিকটা করা হয় বোতলের মুখের মতো সরু এবং তলার দিক প্রশস্ত। এ জল বরফের মতো শীতল। গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে এ জল যেন অমৃত-সমান! কাহার কূপের জল কত শীতল, তাহা লইয়া পাড়ায়-পাড়ায় রীতিমত যেন রেবারেবি চলে। এক-একটি কূপের জল এমন ঠাণ্ডা যে, দারুণ গ্রীষ্মেও সে জল পান করিতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগে!



ক্ষেতের ফসল

বেথলিহাম প্রভৃতি গ্রাম-নগরগুলি বলিতে গেলে মরুর বুকে অবস্থিত। কাজেই এখানকার লোক এই শীতল জলের মর্ম্ম যেমন উপলব্ধি করে, এমন আর অন্য দেশের লোক করিতে পারে না! ডেভিডের কাহিনীতে তাঁর পিপাসা-প্রসঙ্গে কথিত আছে—ফিলিষ্টাইনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দারুণ শ্রান্ত পিপাসার্ত ডেভিড মরুক্ষেত্রে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—কেহ যদি এ সময়ে আমাকে বেথলিহামের শীতল জল আনিয়া দিতে পারিত! (Oh, that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem!)

বেথলিহামের পৌরাণিক নাম ডেভিডের নগর (City of David)। এখানে জন্ম লইলেও ডেভিড কিন্তু বেথলিহামে দার্ষ দিন বাস করেন নাই। ডেভিড সামুয়েলের পিতার মেঘ চরাইতেন। সামুয়েল তাঁকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করেন। রাজা হইয়া ডেভিড বেথলিহাম ত্যাগ করেন। রাজা সলের সঙ্গে ডেভিডের প্রথমে বেশ সৌহার্দ্য ছিল; তার পর সল তাঁকে বিদ্বেষের চোখে দেখিলেন। বিদ্বেষের বেশে

ডেভিডকে তিনি যুগ্যবৎ এঙ্গেদি ও ডেকোরার মরু-বক্ষে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। সলের মৃত্যুর পর ডেভিড হেব্রনে আসিয়া সাত বৎসর রাজত্ব করেন; তার পর তেলিশ বৎসর রাজত্ব করেন জেরুশালেমে।

ডেভিডের নামে নগরের নামকরণ হইলেও বেথলিহামে ডেভিডের নামে মন্দির বা মঠের একটু ক্ষুদ্র চিহ্নও নাই!

বড়দিনের সময় বেথলিহামে শুক্রিয় যে উৎসব চলে, তার তুলনা নাই! ১৯০০ বৎসরেও এ উৎসবে বিরাম ঘটে নাই। এ উৎসবের কোনো অল্পস্থানে এতটুকু অঙ্গহানি দেখা যায় না! অধিবাসীরা এ সময়ে সেই প্রাচীন যুগের সরল-চিত্ত রাখালী বেশে, রাখালী রীতিতে দারিদ্র্য বরণ করিয়া যীশুর নাম-গানে প্রাণ-মন উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়। বড়দিনের অধিবাস-রজনীতে মেঘপাল লইয়া ভক্তদল মাঠে-বাটে আসিয়া বসে প্রভূ যীশুর উদয়-ক্ষণকে অভিনন্দিত করিতে! মাঠে-বাটে তাদের অধিবাস-নিশি অতি-বাহিত হয়। পরদিন উষার আলোক-প্রকাশের সঙ্গে



বড়দিনের অধিবাস-রজনীতে

লুক-লিখিত বাণী উচ্চারণ করিয়া সকলে গৃহে —Let us now go each unto Bethlehem and
প্রত্যাগমন করে। সে বাণী—এসো, এবার আমরা see this thing which has come to pass.
বেথলিহামে যাই—গিয়া প্রত্যাশিত উদয়-লীলা দেখি! —(Luke II : 15.)

ফুল ও ছেলে

আমার বাড়ীর গাঁদাটাও ভালো, তোমার গোলাপ থাক—
ওহে ধনী, তব দীনতা আমায় করিয়াছে নির্ঝাক!
অফিসে তোমার সাহেব তুমিতে বাগান উজাড় কর!
মোর ছোট মেয়ে সে-দিন সকালে শিউলি ক'রেছে জড়—
বন্ধ্যা তোমার গৃহিণী তাহারে ডাকিয়া বলেন, “খুকী,
বেশ প'ড়ে আছে গাছের তলায় কুড়িয়ো না ফুল উ কি?”

* * * * *

শিউলী গাছ ত শাল গাছসম জঙ্গল হয়ে আছে,
ভুলেও তোমরা কেহই কখনো যাও না তাহার কাছে।
মালঞ্চ-ভরা চম্পা চামেলী ম্যাগনোলিয়া ও গুল্ম
মোর মেয়েটারে মানা করা আছে ছোবে না গাছ কি ফুল—

পাহাড়-প্রমাণ শিউলি হইতে ছোট তা'র সাজিটার
দুই মুঠা ফুল কুড়াইয়া আনে, মানা ক'রে দিলে তায়!
চাহি নাকো ফুল, ফুটুক এ-গৃহে নিত্য শিশুর হাসি!
বন্ধ্যা, তোমার গাছের ও-ফুল এক দিনে হয় বাসি!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।



তারকার কথা

(জ্যোতিষ-সংক্রান্ত আলোচনা)

নক্ষত্রমণ্ডল ও তারকার নামকরণ

মানুষের আদিম মনে জগতের প্রথম কল্পনা রচিত হয়েছে বিস্তৃত এক চত্বরে; তার দিগন্ত ঘিরে নীল ক্ষটিকের দিগন্তবিস্তৃত খিলান, আকাশের দেবতা তার উপর থেকে জেলে দিত ছ্যালোকস্থিত বিন্দু বিন্দু আলোকের দীপালী।

চন্দ্রালোকবিহীন অন্ধকারাবৃত নিশীথে নির্মেষ গগন-পটে তারকার মেলা যে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বের রহস্য নিয়ে আসে, আমাদের শাদা চোখ ও সাধারণ বুদ্ধি তা থেকে অন্তত একটা তথ্য সংগ্রহ করে,—তারকারা বিশৃঙ্খল ভাবে বিকীর্ণ দ্যুতিমান কণিকার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু; তাদের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অপরিবর্তনীয়। তারকার জটলা যেন বিনি-সূতোয় গাঁথা মালায় টুকরা আকাশ-গম্বুজের অভ্যন্তরে জ্যামিতিক রেখাচিত্রে বিচিত্র আকারে সংলগ্ন রয়েছে। প্রাচীন কালে এই সকল নক্ষত্র-চিত্রে নানারূপ পার্থিব সামগ্রীর প্রতীক কল্পনা করা হ'ত। মেঘ, বৃষ, মিথুন, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন প্রভৃতি রাশি বা নক্ষত্রমণ্ডলের (constellation) নাম এর পরিচিত দৃষ্টান্ত। অনেক ক্ষেত্রে পৌরাণিক দেবতা, অসুর ও নায়ক-নায়িকাদের নামে নক্ষত্রমণ্ডলের নামকরণ হ'য়েছে। বহুসংখ্যক নক্ষত্রমণ্ডলের সন্নিবেশকে কোন আখ্যায়িকার ঘটনাবলী অনুসারে এমন ভাবে বিবৃত

করা হ'য়েছে যে, আকাশের নীচে পৃথিবীর ঘুরে ঘাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্পকথার ছবিগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'তে থাকে। পের্সিয়ুস ও অ্যাণ্ড্রোমিডার কাহিনী, সেফিউস, ক্যাসেপিয়া অ্যাণ্ড্রোমিডা, পের্সিয়ুস, পেগাসস ও সেটাস এই ছয়টি নক্ষত্রমণ্ডলকে বিবৃত করে।—সমুদ্রের মধ্যে এক পাহাড়ের গায়ে অ্যাণ্ড্রোমিডার প্রসারিত হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। সেফিউস ও ক্যাসেপিয়া তাকে নিকট থেকে দেখছেন, অথচ তাকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। ক্রুদ্ধ দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্ত তার পিতা সেফিউস নিজেই সন্তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রেছেন। অ্যাণ্ড্রোমিডা অসামান্য সুন্দরী, কিন্তু তার মা ক্যাসেপিয়া মেয়ের রূপের কথা নিয়ে বেশী গর্ব করায় দেবতার কোপে এই বিপত্তি। ক্যাসেপিয়া উজ্জল তারকা-সজ্জিত W আকারের সিংহাসনে ব'সে আছেন, আর লক্ষ্য ক'রছেন, দেবতাদের প্রেরিত জলদৈত্য সেটাস, অ্যাণ্ড্রোমিডাকে গ্রাস ক'রতে আসছে। হঠাৎ পক্ষীরাজ ঘোড়া পেগাসস পের্সিয়ুসকে পিঠে নিয়ে উড়ে এল। পের্সিয়ুসের হাতে মেডুসা-রাক্ষসীর স্তম্ভশিখর মুণ্ডটি ঝুলছে। মেডুসার চোখ-দুটো আগুনের তাঁটার মতো জ্বলছে, সে দৃষ্টি যার উপর পড়বে, সে-ই পাষাণে পরিণত হবে! পের্সিয়ুস পক্ষীরাজ ঘোড়া হ'তে এক লাফে নেমে পা দিয়ে ধূলো ছড়িয়ে দিলেন; সেই ধূলোয় একখণ্ড তারার মেঘ জমে উঠল,—সে মেঘ এখনও সেই একই ভাবে

বিরাজ করছে। তার পর মেঘের আড়াল থেকে মেডুসার মাথাটা সেটাসের সামনে এগিয়ে দিলেন; সে-দিকে দৃষ্টি-নিষ্কেপ করতেই সেটাস পাথরে পরিণত হ'ল। পের্সিগুসু তখন অ্যান্ড্রোমিডাকে বন্ধনমুক্ত করলেন। সেটাস জলদৈত্যের পাশে মীন, কুম্ভ ও এরিডানসু নক্ষত্রমণ্ডল বিद्यমান। এরিডানসু, আঁকা-বাঁকা নদী-রেখার অমুরূপ; এজন্ত তাকে নদী ব'লে কল্পনা করা হ'য়েছে। উপকথার এই কয়টি নক্ষত্রমণ্ডল শরৎকালে আকাশের শোভা বর্ধন করে। পশ্চিমাংশে এদের অন্তর্গমনের পর পূর্ব-গগনে কালপুরুষের উদয় হয়। তার কটিবন্ধে তিনটি উজ্জল তারকা দপ্ দপ্ ক'রে জলে। কালপুরুষের সঙ্গে আসে বড় কুকুর (Canis Major), ছোট কুকুর (Canis Minor), শশক (Lepus), একশৃঙ্গী (Monoceros) ও বৃষরাশি (Taurus)।

তারকামণ্ডলের নামকরণে, পৌরাণিক কাহিনার সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক গল্পও প্রচলিত আছে। মিশরের রাজা তৃতীয় টলেমি যখন সিরিয়া-বিজয়ে অভিযান করেন, তাঁর স্নেকেশী স্ত্রী বের্নিসিসু রাজার মঙ্গল প্রার্থনায় দেবতার নিকট নিজের সুন্দর চুলগুলি 'মানত' করেন। যথাকালে রাজা জয়ী হ'য়ে ফিরে এলে রাণী স্বহস্তে কর্তিত আপনার কেশদাম পুরোহিতকে প্রদান করেন। কিন্তু রাজা এই ব্যাপারে অত্যন্ত মর্ষাহত হন; কারণ, 'স্নেকেশিনী-শিরশোভা কেশের ছেদন' সে-কালে দৃষ্টিকটু বলিয়াই বিবেচিত হইত। পুরোহিত কিন্তু রাজাকে শাস্ত করবার জন্ত বলেন, রাণীর কেশরাশি ইতিমধ্যে স্বর্গধামে নীত হ'য়েছে। অনন্তর আকাশের এক নক্ষত্রমণ্ডলকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেন—পৃথিবীর সমস্ত লোক চিরকাল ধ'রে ঐখানে রাণীর কেশকলাপের সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে। বস্তুতঃ, সেই তারকামণ্ডলের আকৃতি কতকটা কেশ-গুচ্ছেরই অমুরূপ। বসন্তের সন্ধ্যায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের নিকট অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সেই বের্নিসিসের কেশগুচ্ছ (Coma Berenices) এখনও আপন স্বমহিমায় প্রদীপ্ত,—জ্বল-জ্বল করছে।

নক্ষত্রমণ্ডলগুলি প্রত্যেকে যেন আকাশনগরীর এক-একটি পথ; পথ সর্বত্র সরল নয়, কোথাও বক্র, কোথাও সর্পিল গতি। আর তারকাপুঞ্জ সেই পথপ্রান্তবর্তী

হর্ম্যরাজি। মহানগরীর কোন নির্দিষ্ট গৃহের সন্ধানের জন্ত পথের নামের সঙ্গে তার নম্বরেরও উল্লেখ থাকে। যে সকল গৃহ প্রাসাদোপম, তাদের থাকে নিজস্ব নাম; নম্বরের চেয়ে সেটা বেশী পরিচিত। আকাশ-নগরীর তারকা-প্রাসাদ সমূহেরও নিজস্ব নাম আছে। লুকক (Sirius), স্বাতী (Arcturus), ব্রহ্মহৃদয় (Capella), অভিজিৎ (Vega) প্রভৃতি তারকা-প্রাসাদগুলি খুব উজ্জল আলোক-প্রদীপ্ত; এদের সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। ১৬০৩ অব্দে জে, বায়ার (J. Bayer) গ্রীক অক্ষরে তারকাকে নম্বর দ্বারা অভিহিত করবার রীতি প্রবর্তন করেন। নক্ষত্রমণ্ডলে যে তারকাটি সর্বপ্রধান, তার নামের আগে 'আল্ফা' অক্ষর বসে; মণ্ডলের দ্বিতীয় তারকাটিকে 'বিটা' অক্ষর দ্বারা পরিচিত করা হয়; এইরূপ ক্রমানুসারে গামা, ডেল্টা, এপসিলন প্রভৃতি গ্রীক অক্ষর দিয়ে তারকাগুলিকে চিহ্নিত করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। সেই চিহ্নানুসারে লুককের নাম আল্ফা বড় কুকুর (L Canis Majoris), কারণ লুকক, বড় কুকুর-মণ্ডলের সর্বপ্রধান তারকা। লুকককে চেনা খুবই সহজ; আকাশমণ্ডলে এর চেয়ে উজ্জলতর তারকা লক্ষিত হয় না। বায়ার-প্রবর্তিত গ্রীক অক্ষরের পরিবর্তে ফ্লামস্টেড্ (Flamsteed) তারকার সাংখ্যিক ঠিকানা প্রচলন করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে এমন বহু তারকাকে সাংখ্যিক নম্বরে চিহ্নিত করা হ'য়েছে, বায়ারের প্রচলিত রীতিতে যাদের কোনও নামকরণ হয়নি। অবশ্য, অনেক তারকার ঠিকানায় দুই রীতিরই প্রচলিত আছে। যথা—মঘার (Regulus) ঠিকানা হচ্ছে ৩২, সিংহমণ্ডল (32, Leonis) অথবা আল্ফা লিওনিস (L Leonis)। যে সকল তারকার দীপ্তি অতি ক্ষীণ, তাদের নক্ষত্রমণ্ডলের ঠিকানা থাকে না; কোনও জ্যোতিষির তারকা-তালিকায় তার যে ক্রমিক সংখ্যা লেখা আছে, তাকে সেই সংখ্যার সহিত সেই জ্যোতিষির নামসংযুক্ত ক'রে নির্দেশ করা হয়। ব্রাডলি ১৯৪০, অথবা গুরুম্ব্রিজ্ ২,২৩০, এই ধরনের তারকার দৃষ্টান্ত।

সমস্ত আকাশের মধ্যে অতিশয় উজ্জল কুড়িটি তারকার নাম, নক্ষত্রমণ্ডলান্তর্গত নাম সহ পর-পৃষ্ঠায় লিখিত হইল।

তারকা	নক্ষত্রগুণ	দূরত্ব—আলোক বর্ষ = আলোক বর্ষ = ৫৮৯ X ১০ ^{১২} মাইল	দীপন ক্ষমতা সৌর- দীপ্তির গুণিতক হিসাবে
সুকক (Sirius)	L Canis Majoris	৮.৬	২৬.৩
অগস্ত্য (Canopus)	L Carinae	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
আলফা সেকুরী (Alpha Centura)	L Centuri	৪.৩	১.১
অভিজিৎ (Vega)	L Lyræ	২৬	৫০
ব্রহ্মহৃদয় (Capella)	L Aurigæ	৫২	১৮৫
স্বাতী (Arcturus)	L Bootis	৪১	১০০
বাণরাজা (Rigel)	B Orionis	৫০০	১৫০০
প্রভাস (Procyon)	L Canis Minoris	১০.৫	৫.৫
আর্কেরার (Ar- cherer)	L Eridani	৭০	২০০
বিটা সেকুরী (Beta Centuri)	B Centuri	৩০০	৩০০০
অবণী (Altair)	L Aquilæ	১৬	৯.২
আর্দ্রা (Betelgeux)	L Orionis	২০০	১২০০
আলফা ক্রুশিন (Alpha Crucis)	L Crucis	২৩০	১৬০০
আল্‌ডিবারান (Aldebaran)	L Tauri	৫৭	৯০
পোলাক্স (Polux)	L Geminorum	৩২	২৮
চিত্রা (Spica)	L Viriginis	২৩০	১৫০০
জ্যোষ্ঠা (Antares)	L Scorpiæ	৫৮০	৪০০০
ফোমালহাট (Fomal- haut)	L Picis Australis	২৪	১৩.৫
ডেনেব (Deneb)	L Cygni	৬০০ (?)	১০,০০০(?)
রগুলা (Regulus)	L Leonis	৫.৭	৭০

স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তারকামণ্ডলের কোনটি দপ্‌দপ্ করছে, কোনটি মিটমিটে; আপেক্ষিক ব্যবধান ও সন্নিবেশ স্থির থাকলেও তারা পূর্বাকাশ হ'তে ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে এগিয়ে যায়; নিজের মেরু-দণ্ডের উপর পৃথিবী ঘুরতে থাকে, এজন্ত চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর তাদের উদয়াস্ত ঘটে। কিন্তু আকাশ-মেরুর উত্তর-কেন্দ্রে ধ্রুবতারা ও দক্ষিণ-কেন্দ্রে হাডলির অক্ট্যান্ট দু'টি স্থির বিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে; এরা উদয়াস্তহীন। মাঝে-মাঝে এমন কয়েকটি গগনবিহারী চোখে পড়ে, যাদের আলো কম্পনশীল নয়; তারা অবিরাম একই ধারায় কিরণ বিতরণ করে, তারকাপুঞ্জের আলোয় পশ্চাতে রেখে তারা এগিয়ে চলে। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে এবং রাত্রির কালভেদে বিভিন্ন রাশি ও নক্ষত্রের দৃশ্যপটে

এগুলিকে অবতীর্ণ হ'তে দেখা যায়। তারকাদের সংখ্যার তুলনায় এরা নগণ্য; এদের নাম গ্রহ।

তারকার আলো কম্পনশীল কেন?

তারকার আলোর যে সূক্ষ্ম রশ্মি আমাদের চক্ষুতে প্রতিফলিত হয়, তাকে পৃথিবীর কয়েক মাইল পুরু বায়ুস্তর ভেদ ক'রে আসতে হয়। এই ভাবে আসবার সময় আলোক-রশ্মির আগমন-পথ বায়ুস্তরের মধ্যে বেঁকে যায়। রশ্মি কতটা বাঁকে, বায়ুর ঘনত্বের উপর তা নির্ভর করে। তাপমাত্রার সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধির জন্ত বায়ুর ঘনত্ব অবিরত পরিবর্তিত হয়। কাজেই তারকার আলোকের এই তির্য্যগ-বর্তনে (Refraction) সর্বদাই চঞ্চলতা থাকে। বায়ুস্তরের ঘনত্বের অস্থিরতা এমনও হ'য়ে থাকে, যাতে আলোর সূক্ষ্ম রশ্মির প্রান্তস্থিত বিপরীত দিকের তরঙ্গ বায়ুর বিভিন্ন প্রভাবশীল বেধ (effective thickness) ভেদ ক'রে আসে; এ-কারণে তারকার আলোকতরঙ্গ সবগুলি একসঙ্গে এসে জোটে না। হয় ত একটা আলোক-তরঙ্গশ্রেণী অপর শ্রেণীর তরঙ্গ অপেক্ষা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্ধ-পরিমাণ পথ পিছিয়ে পড়ল; যেখানে একটা তরঙ্গের চূড়া এসে লাগছে, সেখানে অপর তরঙ্গের খাদ গিয়ে মিশছে; ফলে দুইটি তরঙ্গ পরস্পর খণ্ডিত হয়ে আলোর বদলে অন্ধকার সৃষ্টি ক'রল। আলোর দুইটি তরঙ্গ এই ভাবে মিশে যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়, তাকে 'আলোকের ব্যতিচার' (Interference of light) বলে। তারকার আলোতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ মেশানো থাকে; তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্যই নানা রঙের অহুভূতি আনে। বহু রঙের আলোকতরঙ্গ যখন পরস্পরকে খণ্ডন করে, তখন তারকার আলোক কম্পনশীল প্রতীত হয়, এবং সেই কম্পিত আলোর মধ্যে নানা রকম রঙের আভাস পাওয়া যায়। তারকার আলোক-তরঙ্গের এই ব্যতিচার তার উৎসস্থানে হয় না, আমাদের চক্ষের মণির উপরেই এই ঘটনা ঘটে। আমাদের চক্ষে গ্রহগাত্রের দৃশ্যমান বৃত্তাকার ক্ষেত্র, তারকার বিন্দুতুল্য দৃশ্য অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ অধিকার করে। গ্রহের আলোকরশ্মি বেশী স্থান জুড়ে আসবার সময় তার তরঙ্গ সমূহ পরস্পর মিলিত হ'য়ে সর্বত্র প্রায় সমান হ'বার সুযোগ পায়। এজন্ত

গ্রহের আলো তারকার আলোর মতো কম্পনশীল দেখায় না।

গ্রহগাত্রে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় তাদের উজ্জ্বল দেখায় ; কিন্তু তারকা স্বতঃদ্যুতিমান। সূর্য্য তারকাদের সমপর্যায়ভুক্ত ; সে একাই আমাদের পৃথিবীর অক্ষকার দূর করে, অথচ অসংখ্য তারকা তা পারে না ; এর কারণ, অপরাপর তারকার তুলনায় সূর্য্য পৃথিবীর সন্নিহিত। সূর্য্যের দূরত্ব ৯২,৯০০,০০০ মাইল ; আর নিকটতম তারকা আল্ফা-সেঞ্চুরির দূরত্ব ২৫,৫০০,০০০,-০০০,০০০ মাইল বা প্রায় সওয়া ৪ আলোকবর্ষ। পাঠক এই দূরত্বের কোন ধারণা করতে পারলেন ?

আলোকবর্ষ কি, তা অনেকের জানা থাকলেও সে স্বল্পে সম্যক ধারণা হওয়া কঠিন। এক ঘণ্টার পথ ব'লে যেমন মানুষ ঘণ্টায় যতখানি পথ হাঁটে বোঝায়, তেমনি এক আলোকবর্ষ বলতে বোঝায়, আলো বৎসরে যতটা পথ অতিক্রম করে। আলোর বেগ সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল, এই তীব্র বেগে চলতে চলতে আলোক-তরঙ্গ এক বৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ কোটি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। এক আলোকবর্ষের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর পরিধির প্রায় চব্বিশ কোটি গুণ। মাকড়সার জালের সূক্ষ্ম তন্তুর এক সের মাত্র পৃথিবীর কটিদেশ একবার বেঁটন করবার পক্ষেই যথেষ্ট। কিন্তু পৃথিবী হ'তে আল্ফা-সেঞ্চুরি পর্য্যন্ত সংযোগ করতে হ'লে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মণ এইরূপ সূক্ষ্মতম তন্তু সংগ্রহ করতে হয়। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগ-বিশিষ্ট যান দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত গতিতে চললে পৃথিবী হ'তে সূর্য্য পর্য্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম ক'রতে ১৭৭ বৎসর লাগে ; আর সওয়া ৪ আলোকবর্ষের পথ অতিক্রম করতে তার পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হয়। এ থেকেই মুদিত নেত্রে এক নিশ্বাসেই অনুমান করা যায়, পৃথিবী হ'তে সূর্য্যের দূরত্বের তুলনায় নিকটতম তারকার মহাকর্ষ, তারকার গতি ও বস্তুত্ব কত অধিক দূরবর্তী !

তারকা সমূহ মহাকাশের স্পন্দ-লোকে অবস্থান করায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও তাদের আকার নিরূপণ করা যায় না। বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পর্য্যবেক্ষণ করলেও সেগুলিকে আলোকের বিন্দুমাত্র মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীর কৌশল

ও যন্ত্রতন্ত্র এই প্রকার ক্ষুদ্ররূপে প্রতীয়মান তারকা সমূহেরও বস্তুত্ব ও আয়তনের পরিচয় সংগ্রহ করেছে। তারকার বস্তুত্ব নিরূপণ যে সম্ভব হয়েছে, তার কারণ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় বস্তুর উপর বিশ্ব জুড়ে চলেছে মহাকর্ষ বলের লীলা। যখন দেখি, বিশ-ত্রিশ মণ ওজনের বস্তু কেউ টেনে তুলতে পারে না, লোহার গোলা ছুঁড়ে দিলে সরল পথে বেরিয়ে না গিয়ে মাটিতে এসে ঠেকে, মহাসমুদ্রের বুকে চিরকাল ধ'রে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, চন্দ্র অবিশ্রান্ত ভাবে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরে বেড়ায়, তখন মহাকর্ষের বলে আমরা বিশ্বাস করি। ল'ছেরিয়া এবং আডাম্‌স্‌ ইউরানাসের চলার পথের সামান্য ব্যতিক্রম দেখে নেপচুন আবিষ্কার করেন, পার্সিভাল্‌ লাওয়েল্‌ সারা-জীবন গুলটোকে দেখতে না পেয়েও শুধু নেপচুনের কক্ষপথে চেয়ে তার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হন,—এই মহাকর্ষ বলে দৃঢ়বিশ্বাসের ফলে। আইনষ্টাইন্‌ দেখিয়েছেন, মহামতি নিউটনের দেওয়া মহাকর্ষবিধির গাণিতিক বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত নয়, আর, মহাকর্ষের বল শিকলে-বাঁধা গাড়ীতে ইঞ্জিনের টানের মতো যান্ত্রিক বলমাত্র নয়। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় তাঁদের সে পার্থক্যের উল্লেখ নিশ্চয়োজন।

এক সের চিনি ও এক সের কুইনীন্‌ উভয়কেই পৃথিবী সমান জোরে টানে, কারণ দুয়েরই ওজন (weight) এক ; বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে গেলে উভয়ের বস্তুত্ব (mass) সমান। ওজন এবং বস্তুত্ব গণিতের হিসাবে এক হ'লেও এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য আছে। কোনও বস্তুকে পৃথিবী যত জোরে টানে, সেটি তার ভার বা ওজন, এবং তার অবয়বে যে পরিমাণ বস্তু আছে, তাকে বলা হয় বস্তুত্ব। বস্তুত্ব এক থেকেও জিনিষের ওজন বদলাতে পারে—পৃথিবীর কেন্দ্র হ'তে দূরত্বের তারতম্য হিসাবে। নিউটন দিব্য-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, বাগানের পতনশীল আপেল ফলের প্রতি পৃথিবীর অথবা পৃথিবীর প্রতি আপেল ফলের যেমন টান আছে, সেইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রের প্রতিও তার টান আছে। যার বস্তুত্ব বেশী, তার প্রতি মহাকর্ষের টান বেশী হয়, এক সের বস্তুর চেয়ে দুই সের বস্তুর উপর পৃথিবীর দ্বিগুণ টান হয় ; দুইটি বস্তুর ব্যবধান যত বাড়ে, তাদের পরস্পরের টান ততোধিক কমে।

কিন্তু দূরত্ব যতই অধিক হোক, মহাকর্ষের টান ছিন্ন হয় না। বিশ্বের সমস্ত তারকাকে প্রভাবান্বিত না ক'রে সামান্য অঙ্গুলি-হেলন পর্য্যন্ত অসম্ভব।

সূর্য্য মহাকর্ষের বলে সৌর-পরিবারের প্রত্যেকের গতি নিয়ন্ত্রিত করছে; তারা যে কক্ষ ধ'রে পথ চলে, তা গণনায় ব'লে দেওয়া যায়। পৃথিবী চন্দ্রকে কি ভাবে টানে, তা ধরা পড়ে চন্দ্রের গতিতে; তাই থেকে হিসাব ক'রে পৃথিবীর ওজন বা বস্তুত্ব স্থির করা হয়েছে। গ্রহদের প্রত্যেকের গতিবিধি হ'তে হিসাব ক'রে জানা যায়, সূর্য্যের বস্তুত্ব পৃথিবীর ৩৩২,০০০ গুণ। তারকাদের বস্তুত্বও তাদের আপেক্ষিক গতি হ'তে নির্ণীত হয়।

তারকাদের প্রকৃত গতি সাধারণ-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না; কিন্তু বিভিন্ন বৎসরে গৃহীত তারকাদের আলোকচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কোন কোন আলোক-বিন্দুর পারস্পরিক দূরত্ব পূর্ব্বের চেয়ে পরিবর্তিত হ'য়েছে। ১৯১৪তে গৃহীত আলোকচিত্রে তারকাদের যে সন্নিবেশ ছিল, ১৯৪০এর আলোকচিত্রে তার সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হ'য়েছে। Blink Microscope যন্ত্রে পরীক্ষা করলে এই প্রভেদটা সহজে বোঝা যায়। কিরণচ্ছত্র যন্ত্রের সাহায্যে তারকার গতি-নির্ণয়ের আর একটি কৌশল আবিষ্কৃত হ'য়েছে। কোনও তারকার কিরণচ্ছত্রে যে সকল রেখাবলী দেখতে পাওয়া যায়, তারকার গতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্থিতিস্থান পরিবর্তিত হয়। এ থেকে ব'লে দেওয়া যায়, কোন্ তারকা নিকটে আসছে, এবং কোন্ তারকা দূরে যাচ্ছে। উপরোক্ত দুই উপায়ের সমবায়ে তারকার গতি-বেগ ও গমনের অভিমুখ জানা গিয়েছে।

সহজ-দৃষ্টিতে মেঘমুক্ত আকাশে কিঞ্চিদধিক তিন হাজার তারকা লক্ষিত হয়। কিন্তু এখান থেকে আকাশকে সম্পূর্ণ দেখা যায় না; বাকী আধখানা আকাশ আমাদের অবস্থিতির বিপরীত গোলার্ধে দিগন্ত-সীমার অন্তরালে আবৃত আছে; সেখানেও খালি-চোখে দৃশ্যমান তারকার সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র। কোন যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে স্পষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীমণ্ডল হ'তে সর্ব্বসমেত ৭,৬৪৭টি তারকা দেখতে পায়। কিন্তু ক্ষমতা-সম্পন্ন দূরবীক্ষণযন্ত্রের সহায়তায় বহু কোটি তারকা পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব। মানবচক্ষু অপেক্ষা ফটোগ্রাফির

ক্যামেরা আরও অধিক সংখ্যক তারকার সন্ধান দেয়। মাউন্ট উইলসন্ মানমন্দিরে এক শত ইঞ্চি প্রতিফলকযুক্ত যে দূরবীক্ষণযন্ত্র আছে, তাতে ক্যামেরা খাটিয়ে দেড় শত কোটি তারকার ফটোগ্রাফ গৃহীত হ'তে পারে।

তারকারা সকলে একক থাকে না, অনেকে যুগলে অবস্থান করে; এরা পরস্পর চক্রাকার পথে আবর্তনশীল। মহাকর্ষ বলের প্রভাবেই যুগল নক্ষত্রের একে অপরের সান্নিধ্য এড়াতে পারে না। এদের চক্রাকার নৃত্যগতি জ্যোতির্বিদ্যাকে তারকার ওজন বুঝে লওয়ার সুযোগ দান করে। এ পর্য্যন্ত বিশ হাজারের অধিক যুগল নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যুগল নক্ষত্র ব্যতীত ত্রয়ী ও চতুরাংশিত নক্ষত্রের (Triplet & Quadruplet) সংখ্যা নিতান্ত বিরল নয়।

তারকাদের বস্তুত্ব পর্য্যালোচনায় জানা যায়, সূর্য্যের বস্তুত্ব তাদের প্রায় মাঝামাঝি। কোন কোন তারকার বস্তুত্ব সূর্য্যের শত গুণ। কিন্তু অধিকাংশ তারকা ওজনে সূর্য্যের দশ গুণের অধিক নয়। সূর্য্যাপেক্ষাও লঘুতার তারকার সন্ধান মেলে; লঘু তারকার পাঁচ-সাতটি একত্রে সূর্য্যের বস্তুত্বের সমান। সূর্য্যের বস্তুত্ব যদি মাঝারি আকারের মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে লঘু তারকাগুলি বালকের সহিত এবং গুরু তারকাগুলি স্থলকায় মানুষের সহিত তুলনীয়।

তারকাদের আয়তন ও দীপ্তি

তারকাদের অবয়বের আয়তন নির্ণয় করতে গৌণ উপায়ের আশ্রয় নিতে হয়। মাইকেলসনের ব্যতিচারমান যন্ত্রে (Michelson's Interferometer) কয়েকটি বৃহৎ তারকার ব্যাস নিরূপিত হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ তারকার তেজের পরিমাপ হ'তে তাদের আয়তন গণনা করা হয়। ভূগোলতন্ত্রের ১২,০০০ গুণ স্থান জুড়ে সূর্য্য হ'তে তেজোরাশি মহাকাশের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হচ্ছে। তার দীপ্তির তুলনায় অপর তারকাগুলি কত হীনপ্রভ মনে হয়; কিন্তু প্রদীপ নিকটের ভূমিকে ঘেরূপ আলোকিত করে, দূরবর্তী স্থানকে সেরূপ করিতে পারে না। সূর্য্য পৃথিবী হ'তে যতখানি দূরে অবস্থান করছে, তাকে যদি তার চেয়ে দশ গুণ দূরে সরিয়ে দেওয়া যেত, তা হ'লে বর্তমানের পাওয়া সূর্য্যের

আলোর শতাংশের একাংশমাত্র ভুলোক স্পর্শ করতো। সকল তারকার স্বকীয় দীপ্তি সমান হ'লে তারা কিরূপ উজ্জ্বল দেখাতো, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো তাদের দূরত্বের উপর; কিন্তু তারকায় তারকায় দীপ্তির প্রভেদ শুধু দূরত্বের জ্ঞান দেখায় না; তাদের আলোক-দানের ক্ষমতায় পার্থক্যও এর অন্ততম কারণ। নয়কোটি উনত্রিশ লক্ষ মাইল দূর হ'তে সূর্যের যে আলোটুকু আমাদের কাছে আসে, ৩,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক প্রদীপ সূর্যের দূরত্বে জ্বলে তার সমান আলো পাওয়া যেতে পারে। সূর্য হ'তে পৃথিবীতে আলো আসতে আট মিনিট সময় লাগে, আর লুক্রক হ'তে আলো আসে আট বৎসরে; অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল লুক্রক তারকা সূর্য্যাপেক্ষা পঞ্চাশ লক্ষ গুণ দূরে আছে। লুক্রক যদি সূর্যের সহিত স্থান-বিনিময় করতো, তা হ'লে পৃথিবীর হ্রদ, নদী, মহাসাগর অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুবৎ বিলুপ্ত হ'তো, মেরুপ্রদেশের হিম-আবরণ অপসৃত হ'তো, ধরিত্রীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব থাকতো না। লুক্রকের একটি ক্ষীণদীপ্তি সহচর আছে। তার আলো এতই মৃদু যে, সেরূপ অমৃত তারকা একত্র হ'লে লুক্রকের দীপ্তির সমকক্ষ হ'তে পারে। সূর্যের স্থানে লুক্রকের সহচর থাকলে পৃথিবীর সমস্ত জল জমে বরফ হ'য়ে যেত; বায়ু-মণ্ডল ঘনীভূত হয়ে ভূমির উপর তরল বায়ুর প্লাবন বহিতো। লুক্রকের দীপ্তি সূর্যের ২৮ গুণ, আর তার সহচরের দীপ্তি সূর্যের তৃত্ব অংশ। কিন্তু এমন তীব্র দীপ্তির তারকা আছে, যার কাছে লুক্রকের দীপ্তি স্নান দেখায়; আবার এমন ক্ষীণদীপ্তিরও তারকা আছে, যার কাছে লুক্রকের দুর্বল সহচরও নিজের তেজের গর্ভ করতে পারে। পূর্বে বলা হ'য়েছে, তারকাদের আলো প্রকৃতপক্ষে কম্পনশীল নয়। কিন্তু এক শ্রেণীর তারকা অনিয়ত দীপ্তিসম্পন্ন; একটা কালের ব্যবধানে তাদের আলো কমে বাড়ে। S. Doradus এইরূপ অনিয়তদীপ্তি তারকার (Variable Star) একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। যখন সে দীপ্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায়, তার দীপন-ক্ষমতা (candle power) পাঁচ লক্ষ সূর্যের সমান হয়। সূর্য সারা বৎসরে যতটা তেজ বিকিরণ করে, এম্ ডোরাডাস্ এক মিনিটেই তা ব্যয় ক'রছে। সূর্য হঠাৎ যদি এই তারকার মতো

তেজস্বী হয়ে ওঠে, গাছপালা, জীবজন্তু সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সূজলা-সুফলা পৃথিবীর স্থানে থাকবে খালি বাষ্পের পিণ্ড। এ-পর্যন্ত যত নিশ্চৈত্র তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, 'হবলফ্ ৩৫২' তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষীণদীপ্তি; এর দীপনক্ষমতা সূর্যের পঞ্চাশ হাজার ভাগের একাংশ। এই তারকাকে যদি অরণ্যচারী জোনাকীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সূর্য হবে পল্লী-অঙ্গনের তেলের প্রদীপ, আর এম্ ডোরাডাস্ ইঞ্জিনের সন্ধানী আলো (সার্চ-লাইট)।

তারকার রঙ ও তাপমাত্রা

তারকারা নানা রঙে—লাল, নারাজি, হলুদে, শাদা, নীলাভ, বেগুনে। তাপমাত্রার বিভিন্নতার জ্ঞান এদের এই বর্ণ-বৈচিত্র্য। অত্যন্ত শুষ্ক চুল্লীর অগ্নিকুণ্ড হ'তে তোলা লৌহপিণ্ড প্রথমে শাদা দেখায়, বাইরের বাতাস লেগে ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত তার রঙ বদলায়; শাদা হ'তে হলুদে, তার পর রক্তবর্ণ, শেষে ঘোলাটে লাল হ'য়ে তার আলো নিবে যায়। অভিজ্ঞ ধাতুপ্রস্তুতকার চুল্লীর আগুনের রঙ দেখে মোটামুটি বলতে পারে, তার তাপমাত্রা কত। আগুনের রঙ দেখে তার যথার্থ তাপমাত্রা নির্দেশ করতে পারে, এমন যন্ত্রও আজকাল পাওয়া যায়। তারকার আলোর রঙ তার তাপমাত্রার নিশানা। ঘোলাটে লাল তারকা সবচেয়ে কম গরম; তার তাপমাত্রা ১৪০০ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী। সর্বাপেক্ষা উষ্ণ তারকার গাত্রের তাপমাত্রা প্রায় ৪০,০০০ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী। তাপমাত্রার এই দুই সীমার মাঝে তারকারা বিভিন্ন তাপমাত্রায় অবস্থিত; এদের অনেকের উষ্ণাবস্থার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে মেলে না।

আলোকদানশীল তারকার পরিমণ্ডলবর্তী পরমাণুরা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। যার তাপমাত্রা কম, তার পরমাণুরা নিরাসক্ত (neutral atom); তাপমাত্রা বেশী হ'লে পরমাণু হ'তে ইলেক্ট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে—পরমাণুরা আয়নাইজড্ হয়। যে তারকার তাপমাত্রা খুব বেশী নয়, আবার খুব কম নয়, অর্থাৎ মাঝামাঝি, তার মধ্যে আয়নাইজড্ ও অনায়নাইজড্ উভয় পরমাণুই বিদ্যমান। তারকাগাত্রের

পরমাণু হ'তে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে আয়ুকুল্য করে তার পরিমাণগুলোর ঘনত্ব। ঘনত্ব কম হ'লে পরমাণু-দের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়, এবং স্বাধীন নিরসঙ্গ ইলেকট্রনের সহিত আয়নাইজ্‌ড্ পরমাণুর মিলনের স্ফুযোগ কমে যায়। এজন্য কম ঘনত্ববিশিষ্ট তারকার কিরণচ্ছত্রে আয়নাইজ্‌ড্ পরমাণুজনিত রেখাবলী সবল আকার গ্রহণ করে, কিন্তু অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট তারকার কিরণচ্ছত্রে সেই রেখাসমূহ দুর্বল থাকে। সূর্যের পরিমাণগুলোর উচ্চতর স্তরের ঘনত্ব নিম্নতর স্তরের ঘনত্ব অপেক্ষা কম; উচ্চতর স্তরে তাপমাত্রা কম হওয়া সত্ত্বেও সেখান থেকে পাওয়া আলোকের কিরণচ্ছত্রে আয়নাইজ্‌ড্ পরমাণুজনিত রেখাবলী নিম্নতর স্তরের তদ্রূপ রেখাবলী অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট ও তীব্র। কারণ, উচ্চতর স্তরের কম ঘনত্ব অধিক সংখ্যক পরমাণুর বিভাজন-সংঘটনের স্ফুযোগ দিয়েছে।

তারকাদের কিরণচ্ছত্রের বিভিন্ন রঙীন আলো অবলিপ্ত ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে নানা অণুপরমাণুর অস্তিত্ব ও অবস্থা নির্দেশক যে রেখাবলীর সমাবেশ থাকে, তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে তারকাদের এক-একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হ'য়েছে। একই ধরনের কিরণচ্ছত্র প্রদানকারী দুইটি তারকার মধ্যে যার দীপ্তি বেশী, তার কিরণচ্ছত্রে আয়নাইজ্‌ড্ পরমাণুজনিত রেখাবলী অধিকতর তীব্র দেখা যায়। যে সকল তারকার দীপ্তি ও দূরত্ব জানা আছে, তাদের আয়নাইজ্‌ড্ ও নিরাসক্ত পরমাণু-জনিত কিরণচ্ছত্রীয় রেখাবলীর সহিত দীপ্তির একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থির করা হ'য়েছে। তদনুসারে যে কোনও তারকার কিরণচ্ছত্রের ফটোগ্রাফ হ'তে কেবল বিশেষ নির্ধারিত রেখাবলীর তীব্রতা মেপে তার দীপ্তি নির্ণয় করা যায়। এই উপায় অবলম্বনে প্রায় ছয় হাজার তারকার দীপ্তি অথবা দূরত্ব নিরূপিত হ'য়েছে।

যে তারকাদের কিরণচ্ছত্রের ধরণ এক রকম, তাদের 'গাত্রের উজ্জ্বলতা' (surface brightness) বা প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে নিঃসৃত তেজের পরিমাণ প্রায় এক। লাল তারকার গাত্রের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে যে পরিমাণ তেজ বিকীর্ণ হয়, উষ্ণতম তারকাগাত্রের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি হ'তে তার তিন লক্ষ গুণ শক্তি নিঃসৃত হয়।

প্রথমটির গাত্রের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি হ'তে নিঃসৃত তেজ এক-একটা ছোট ডিঙি নৌকো চালাবার শক্তি দিতে পারে; আর শেষেরটির প্রতি বর্গ-ইঞ্চি গাত্রের তেজ এক-একটা বড় অর্ণবপোত পূর্ণ বেগে চালাতে পারে।

তারকার শক্তির উৎস

তারকাদের এই তেজ বা শক্তি কোথা হ'তে উৎসারিত হয়? সাধারণ 'পাওয়ার-শেপনে' শক্তি উৎপন্ন করা হয় কয়লা পুড়িয়ে। সূর্য যে হারে তার তেজ বিকিরণ করে, সেই মাত্রায় শক্তি সরবরাহের জন্য যদি 'পাওয়ার-শেপনে' বসাতে হয়, তবে তার জন্য সর্বদা প্রতি মিনিটে ত্রিশ লক্ষ কোটি টন কয়লা যোগাতে হবে। কয়লা পোড়ালে তার পরমাণুগুলো অপর প্রকার পরমাণুর সঙ্গে মিশে ভিন্ন আকারে সাজানো হয়ে যায়; কয়লার মধ্যে যতগুলি পরমাণু ছিল, তার একটিও ধ্বংস হয় না, কেবল তার রূপের পরিবর্তন ঘটে। রেডিও অ্যাক্টিভ বস্তু যখন আপনা-আপনি ভেঙে গিয়ে শক্তি বিকিরণ করে, তখন তারও পরমাণু গঠনের কণিকাগুলি ধ্বংস হয় না। কিন্তু সূর্য ও তারকাদের বস্তুর পরমাণু সমূহ ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেই ধ্বংসের ফলেই তাদের তেজের সৃষ্টি হচ্ছে। তারকায় এক্ষেত্রে যে সকল পরমাণু রয়েছে, তার কতকগুলি পরক্ষণেই এক বলক তেজে পরিণত হ'ল। সূর্য এইভাবে প্রতি মিনিটে যে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন বা প্রতি দিন ছত্রিশ হাজার কোটি টন বস্তু ক্ষয় ক'রে ফেলছে, তেজরূপেই সেই বস্তু প্রকাশ পাচ্ছে। এই তেজের শক্তি কিরূপ—বলি; এক আউন্স বস্তু তেজে রূপান্তরিত হ'লে তার যে শক্তি, তার সাহায্যে সমগ্র বাঙলা দেশের কলকারখানা, যানবাহন, আলোক ও তাপ-সরবরাহের দৈনিক প্রয়োজন সিদ্ধ হ'তে পারে। এ থেকে অনুমান করা যায়, সূর্য প্রতিদিন কতখানি শক্তি বিকীর্ণ করে। অপরূপ তারকাতেও দীপনক্ষমতার অনুপাতে বস্তু ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। তেজ-বিকিরণের ফলে তারকার ভার ক্রমশঃ লঘু হচ্ছে। যে তারকার ওজন অত্যন্ত কম, মোটের উপর বলা যায়, তার বয়স খুব বেশী। ওজনে যে সব চেয়ে ভারী, সেই তারকাই

নক্ষত্র-সমাজে সর্বকনিষ্ঠ। লঘু তারকা অপেক্ষা ভারী তারকার দীপনক্ষমতাও তীব্রতর।

জ্যোতিষিগণ পর্যবেক্ষণ ও গণনা-সাহায্যে জেনেছেন, এক-একটা তারকার বয়স নিতান্ত অল্প, অর্থাৎ অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ কোটি বৎসর মাত্র! কোটি কোটি বৎসরও হ'তে পারে। পঞ্চাশ লক্ষ কোটি বৎসর পূর্বে সূর্যের বস্তু বর্তমান সময়ের চেয়ে অনেক বেশী ছিল; দীপ্তিও ছিল বহু গুণ অধিক। কিন্তু সূর্যের অবয়বের মোট বস্তুভেদে অল্পপাতে তার দৈনিক ক্ষয়ের পরিমাণ সামান্য। পৃথিবীর জন্মকাল হ'তে আজ পর্যন্ত প্রায় দুই শত কোটি বৎসর অতীত হ'য়েছে; এর মধ্যে সূর্যের ওজন কমেছে মাত্র দশ হাজার ভাগের একাংশ বা ০.০০১%।

তারকাদের অনেকে আয়তনে পৃথক হ'লেও তাদের গাত্রের উজ্জ্বলতা (surface brightness) অভিন্ন। এক বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে যে পরিমাণ তেজ বিকীর্ণ হয়, সেইটিই তার গাত্রের উজ্জ্বলতার পরিমাপ। গাত্রের উজ্জ্বলতায় সমান, অথচ আয়তনে পৃথক, এমন দুইটি তারকার মধ্যে বৃহত্তর তারকা ক্ষুদ্রতরের চেয়ে পরিমাণে বেশী তেজ বিকিরণ করে। কোনও তারকার গাত্রের উজ্জ্বলতা এবং সমগ্র অবয়ব হ'তে বিকিরিত তেজের পরিমাণ জানা গেলে, গণনা দ্বারা তার আয়তন স্থির করা যায়। অধিকাংশ তারকার আয়তন এই উপায়েই নির্ধারণ করা হ'য়েছে।

উজ্জ্বল তারকা ক্ষীণ তারকার চেয়ে আকারে বড়; কিন্তু তারকাদের ওজনে খুব বেশী প্রভেদ নেই। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, ক্ষীণ তারকা অপেক্ষা উজ্জ্বল তারকার মধ্যে বস্তুর নিবিড়তা অল্প। কোন কোন তারকার আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান, তাদের দশ লক্ষটা অনায়াসে সূর্যের কুক্ষিগত হ'তে পারে। আবার এমন তারকাও আছে, যারা সূর্যের চেয়ে আকারে অনেক বড়।

আর্দ্রা তারকার কেন্দ্রে যদি সূর্যের অবস্থান হয়, তবে পৃথিবীর কক্ষপথ তার অবয়বের সীমান্ত অতিক্রম করে না। জ্যেষ্ঠা তারকার ব্যাস আর্দ্রার দ্বিগুণ। ক্ষুদ্র তারকার আয়তন ধূলিকণার অল্পপাতে কল্পনা করলে, সূর্যের আয়তন হয় মটর গুঁটার একটি দানার মতো,

এবং সেই অল্পপাতে বৃহত্তর তারকার আয়তন হবে মোটর-গাড়ীর সমান। নীচের তালিকায় সাতটি তারকার রঙ, গায়ের তাপমাত্রা, দীপনক্ষমতা, বস্তু, ঘনত্ব ও ব্যাসের পরিমাপ দেওয়া গেল :—

তারকা	রঙ	গাত্রের তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী	সূর্যের	ব্যাস মাইল হিসাবে
জ্যেষ্ঠা	লাল	৩,১০০	৩০	৩ × ১০ ^{-৭} ৪৩০,০০০,০০০
আর্দ্রা	লাল	৩,১০০	১৫	৩ × ১০ ^{-৭} ২১৮,০০০,০০০
স্বাতী	নারাঙি	৪,৩০০	৮	৩ × ১০ ^{-৮} ২১
সূর্য	হলদে	৬,০০০	১	১'৪১ ৮৬৬,০০০
লুকক	শাদা	১১,০০০	২'৪	০'৪২ ১৫৬০,০০০
অগস্তা	শাদা	১১,০০০	১০০	১ × ১০ ^{-৮} ৮৬,৬০০
মঘা	নীলাভ	১৬,০০০	৬০	২ × ১০ ^{-৩} ২৫,১৮০,০০০

তারকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা

তারকাদের তাপমাত্রা দেহের বহির্ভাগের চেয়ে অভ্যন্তরে অধিক। সূর্যের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা দেড় কোটি (সেন্টিগ্রেড) ডিগ্রী। কয়েক বৎসর পূর্বে সূর্যের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা চার কোটি ডিগ্রী ব'লে অনুমান করা হ'য়েছিল; সূক্ষ্মতর গবেষণা ফলে এখন তা দেড় কোটি ডিগ্রী ব'লে নির্ধারিত হ'য়েছে। এত অধিক তাপমাত্রায় বস্তুর পরমাণু হ'তে ইলেকট্রনের খোলস অংশত খুলে যায়, এবং চূর্ণীকৃত পরমাণুসমষ্টি উপরিস্থ বস্তুর চাপে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে অবস্থান করে। গ্যাসীয় অবস্থায় থেকেও সূর্যকেন্দ্রের ঘনত্ব এই কারণে পার্থিব যে কোনও কঠিন বস্তুর চেয়ে অনেক বেশী। পৃথিবীর বস্তুকে যদি সূর্য-কেন্দ্রবর্তী বস্তুর মতো ঠেসে রাখা যেত, তা হ'লে কয়েক টন কয়লা জামার পকেটে পুরে রাখাও অসম্ভব হ'ত না। কোন কোন তারকার অভ্যন্তর সূর্য-কেন্দ্রের তাপমাত্রা অপেক্ষা দশ-বিশ গুণ অধিক উত্তপ্ত। সে তাপমাত্রায় ইলেকট্রনরা পরমাণুর বন্ধন হ'তে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ করে; সেখানে পরমাণু-চূর্ণের উপর চাপের প্রভাবে বস্তুর ঘনিষ্ঠতা সূর্যকেন্দ্রের চেয়ে নিবিড়তর হয়। ঘনত্ব অধিক ব'লে এই সকল তারকা আকারে ছোট, কিন্তু শক্তি-বিকিরণের প্রাচুর্য্যে তাদের আলোর রঙ শাদা।

শাদা বামন-তারকা

এদের গায়ের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে ২৫০ অশ্ব-শক্তির তেজ বেরিয়ে যায়। রঙ শাদা এবং আকারে ছোট ব'লে এদের নাম শাদা বামন (White Dwarf) লুককের সহচর, শাদা বামন-তারকার দৃষ্টান্ত।

সূর্য্যও তার সমশ্রেণীর মাঝারি আকারের তারকাপুঞ্জ সংখ্যায় সর্বাধিক। এদের গুরুত্বের তারতম্যের ক্রমানুসারে সজ্জিত করলে রঙ এবং দীপনক্ষমতার ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়; সব চেয়ে গুরুতর তারকা নীলাভ-শাদা রঙের, তার চেয়ে কম ওজনের তারকাগুলি যথাক্রমে শাদা, হলুদে, নারাঙি ও লাল; যাদের ওজন কম, তাদের দীপনক্ষমতাও অল্প। এইপ্রকার তারকাদের প্রধান-অনুক্রমিক-তারকা (Main Sequence Star) বলে।

প্রধান অনুক্রমিক তারকা

প্রধান অনুক্রমিক তারকা সমূহের অন্তরের উত্তাপ প্রায় এক রকম। যে সকল তারকার অভ্যন্তর এদের অপেক্ষা শীতলতর, তাদের কেন্দ্রগত-পরমাণুপুঞ্জ প্রায়শঃ অক্ষত দেহে অবস্থান করে; তাপমাত্রা কম হওয়ায় সাধারণতঃ তাদের অন্তরের পরমাণু হ'তে ইলেক্ট্রনের বিচ্ছেদ হয় না। বস্তু যতই ঘনসন্নিবিষ্ট হোক, ইলেক্ট্রন পরমাণুর সহিত আবদ্ধ অবস্থায় থাকলে পরমাণুরা কেউ কারও ইলেক্ট্রনের প্রদক্ষিণ-পথ অতিক্রম ক'রে অপরের এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। দশ-বিশ লক্ষ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী উত্তাপ যাদের অন্তরে রয়েছে, এমন তারকার বাস্তব অবস্থা এই রকম। আর্জা ও মীরা (Mira) তারকা এই শ্রেণীর। এরা ঘনত্বে কম, কিন্তু আকারে বড়; এত বড় যে, এক একটি বিশ্বস্তর মুষ্টি—কোটি সূর্য্যের স্থান জুড়ে থাকে। আর্জা আড়াই কোটি সূর্য্যের এবং তিন কোটি সূর্য্যের আয়তনের সমান। অধিক জায়গা জুড়ে আছে ব'লে, এদের দীপন-ক্ষমতাও প্রচণ্ড; কিন্তু বহির্দেহের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্র হ'তে নিঃসৃত তেজের পরিমাণ সামান্য—কোথাও অর্ধ অশ্বশক্তি কোথাও বা তার কিছু বেশী। সূর্য্যগাত্রের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ৫০ অশ্বশক্তির তেজ বিকিরণ করে; প্রধান অনুক্রমিক-তারকাদের মধ্যে যার রঙ নীল,

তার গায়ের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি ৫০,০০০ অশ্বশক্তির তেজ বিতরণ করে।

লাল ও হলুদে দানব-তারকা

আর্জা, মীরা, জ্যেষ্ঠা ও তাদের সমজাতীয় তারকাদের অনেকের রঙ লাল, কারও বা হলুদে। রঙের বিশেষত্ব এবং আকারের বিশালতার জন্য এদের লাল-দানব, ও পীত-দানব (Red and Yellow Giants) বলা হয়। লাল-দানব-তারকা মীরার একটি শাদা বামন সহচর আছে। মীরাকে প্রদক্ষিণরত সেই শাদা-বামনটির আকারের তুলনা দিতে হ'লে হস্তীর চারিদিকে আবর্তনশীল মশকের উপমা দেওয়া চলে। যুগল নক্ষত্রের সহচরদ্বয় আকারে কতটা বিপরীত হ'তে পারে, মীরা ও তার সহচর তারকাই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

চঞ্চলদীপ্তি তারকা

দানব-তারকাদের অনেকে চঞ্চল-দীপ্তিসম্পন্ন। এদের দীপ্তির পরিবর্তনশীলতার কাল একেবারে সুনির্দিষ্ট নয়—প্রায় তিন শত দিনের কাছাকাছি। ৩২০ হ'তে ৩৭০ দিনের মধ্যে মীরার দীপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। দীপ্তি যখন কম থাকে, তখন তার গায়ে টাইটেনিয়াম-অক্সাইডের মেঘ ভেসে ওঠে। এ থেকে বোঝা যায়, তার গায়ের উত্তাপে কোন কোন রাসায়নিক যৌগিক নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

এ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বিভিন্ন প্রকার চঞ্চলদীপ্তি তারকার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। পের্সিয়াস রাশিতে অ্যাল্গল নামে একটি তারকা আছে, তার আলো প্রায় উনষাট ঘণ্টা স্থির থাকে, তার পর পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে তার দীপ্তি ক্রমশঃ ম্লান হয়ে, পরবর্তী পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে ধীরে ধীরে আবার উজ্জ্বল হ'তে থাকে। এর দীপ্তির হ্রাসবৃদ্ধি কোনও আঙ্গিক কারণে নির্ভর করে না। অ্যাল্গল যুগল-নক্ষত্র। দুই সহচরে পরস্পর গ্রহণ-লাগানোর ফলে অ্যাল্গলের দীপ্তির এই হ্রাসবৃদ্ধি। এ ধরনের প্রায় দুই শত যুগল নক্ষত্র জ্যোতিষীর পর্য্যবেক্ষণ-সীমার অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে।

'নভা' তারকা

আর এক ধরনের তারকা আছে, যাদের আলো বহু যুগ পরে এক বার হঠাৎ জ্বলে উঠে, তার পর ধীরে ধীরে

জ্ঞান হয়ে যায়। এদের নাম 'নভা' (Nova); নভার অর্থ নতুন; কিন্তু নভা তারকাগুলি প্রকৃতপক্ষে পুরাতন। নভা একুইলে (Nova Aquilae) নামক তারকাটি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন হঠাৎ জলে ওঠে; তার সাধারণ দীপ্তি আধ ঘণ্টার মধ্যে দেড় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে সূর্যের তিন লক্ষ গুণ দীপনক্ষমতা লাভ করেছিল। নভা একুইলে যখন জ্বলে উঠল, তখন দেখা গেল, একটি জ্যোতির্শ্ময় গ্যাসের আবরণ তার গা থেকে বেরিয়ে, কেন্দ্র হ'তে বহির্শূঁখে ফুলতে ফুলতে ছুটে চলেছে; কিন্তু কিছু দিন পরে আলো স্তিমিত হওয়াতে সেটি আর লক্ষ্য করা গেল না। নভা তারকা জ্বলে ওঠার সময় তার শরীর ফুলতে থাকে প্রচণ্ড গতিতে; তার গ্যাসীয় গাত্র সেক্ষেত্রে হাজার মাইল বেগে বিস্ফারিত হয়। এই হঠাৎ বিস্ফারণ-ক্রিয়ার হেতু কি, তা আজও নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভব হয়নি। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, হয় ত সব তারকাই এক কালে নভা ছিল বা হবে। আমাদের সূর্যও হয় ত এমনি ভাবে আপন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

ডেল্টা সিফাই (Delta Cephei) নামে একটি চঞ্চল-দীপ্তি তারকা আছে, তার আলো ৫৬ দিন অন্তর হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এর কিরণচ্ছত্র পরীক্ষা করে জানা গিয়াছে, তারকাটির গাত্র, দীপ্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সময় বহির্শূঁখে উঁচু হয়ে ওঠে, এবং দীপ্তি হ্রাস হওয়ার সময় অস্তশূঁখে সঙ্কুচিত হ'য়ে নেমে যায়। ডেল্টা সিফাইয়ের সমধর্মী আরও কতকগুলি তারকার দেখা পাওয়া যায়; তাদের সকলের দীপ্তির কম্পনকাল এক না হ'লেও, দীপনক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে সমান। ডেল্টা সিফাইয়ের সমধর্মী ব'লে এই সব তারকার নাম Cepheid variables বা সিফাইধর্মী তারকা।

সিফাইধর্মী তারকা

সিফাইধর্মী তারকাদের গাত্রদেশ বারংবার উন্নত অবনত হয় কেন, তা নিয়ে অনেক গবেষণা হ'য়েছে; কিন্তু এখনও কোন নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। জ্যোতির্বিদগণ এই তারকার দীপ্তির কম্পন হ'তে এমন অনেক তথ্য সংগ্রহের সুবিধা পেয়েছেন, যা প্রকৃত অবি-কম্পিত-দীপ্তি তারকার নিকট হ'তে পাওয়া যায় না।

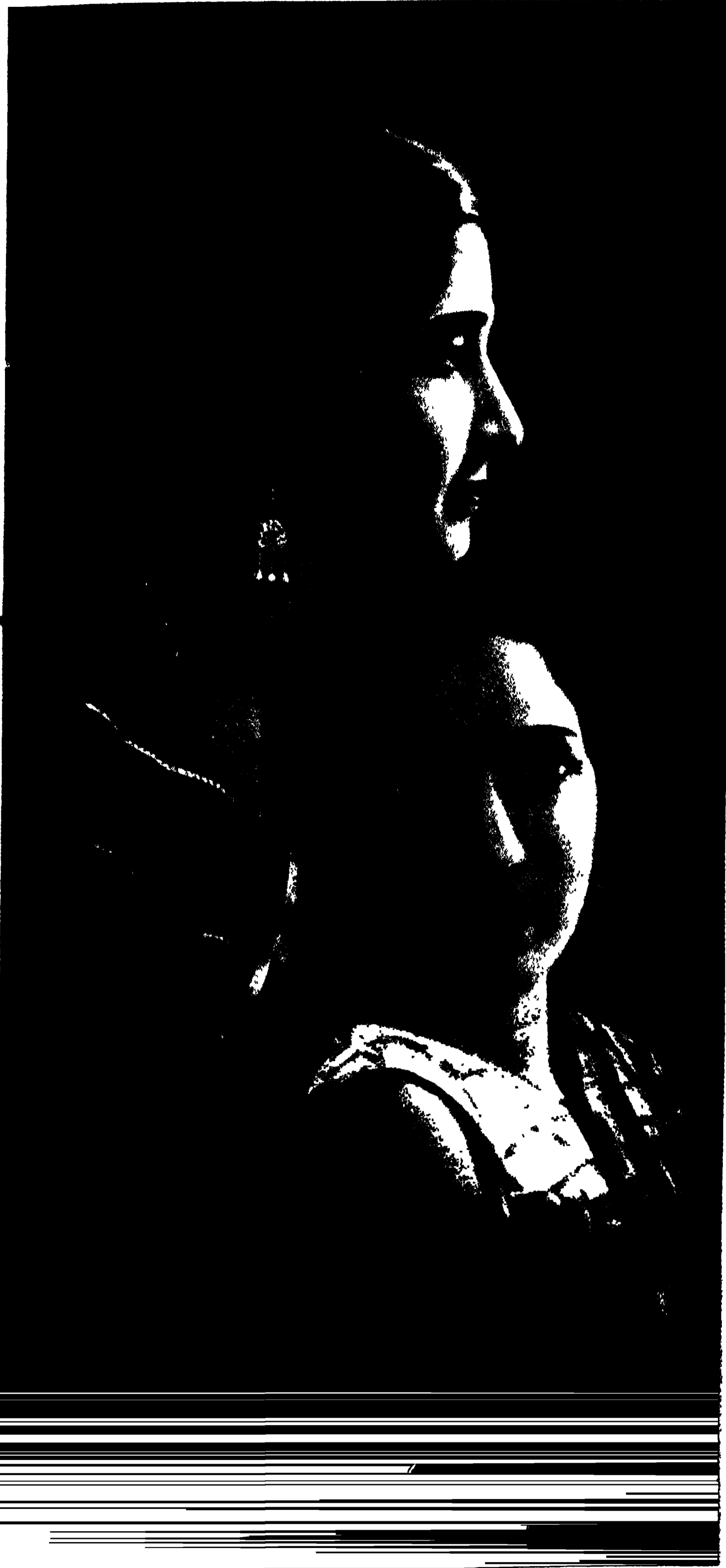
এই তারকাগুলি জ্যোতির্বিদদের পক্ষে আকাশসমুদ্রে আলোক-সুস্তের মতো; দীপ্তির কম্পনশীল নিশানা দিয়ে এরা নিজেদের দূরত্ব জানিয়ে দেয়।

গোলকীয় স্তবক

ধনু, বৃশ্চিক, ওফায়কস্ (Ophiuchus) রাশির মধ্যে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বহুসংখ্যক সিফাইধর্মী তারকা অপরাপর তারকাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হ'য়ে স্তবকে স্তবকে জটলা করছে। স্তবকের আকার একত্র সঞ্চরণশীল মৌমাছির কাঁকের মতো গোলকীয়। প্রত্যেক তারকা যেন এক-একটি মধুমক্ষিকা—তারা কাঁকের কেন্দ্রের কাছে বেশী ঘেঁষাঘেঁসি ক'রে আছে, আর গোলকের বহিরঞ্চলে এদিকে-ওদিকে তাদের অল্প কয়েকটি ছড়িয়ে আছে। এই ধরণের তারকার কাঁকের নাম (Globular Cluster) গোলকীয় স্তবক। পাঁচ-ছয়টি গোলকীয় স্তবকে খালি-চোখে দেখতে পাওয়া যায়। স্তবকস্থিত সিফাইধর্মী তারকার দূরত্বের মাপ ক'রে গোলকীয় স্তবকের দূরত্ব জানা গিয়াছে। সব চেয়ে নিকটতম স্তবকটির দূরত্ব ১৮,৪০০ আলোক-বর্ষ। যে অবস্থায় আমরা একে দেখতে পাই, তা প্রকৃতপক্ষে তার ১৮,৪০০ বৎসর পূর্বেকার অবস্থা। সে সময়ে পৃথিবীর মানুষ আদিম অসভ্য, বনচারী; কৃষিকার্য তখন তার অজ্ঞাত।

আলোক মিনিটে এক কোটি দশ লক্ষ মাইল বেগে চ'লে গোলকীয় স্তবকটির নিকট হ'তে পৃথিবীতে পৌঁছনর মধ্যে মানুষের ছয় শত বংশ-পরম্পরার জীবন-নাট্যের অভিনয় শেষ হ'ল; লিখিত হ'ল তার সত্যতার কাহিনী, জাতীয় উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত। মনে রাখতে হবে, এই স্তবকটি নিকটতম। এক শত জ্ঞাত গোলকীয় স্তবকের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী, তার আলো পৃথিবীতে আসতে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বৎসর লাগে। এক-একটি গোলকীয় স্তবকের ব্যাস এক শত হ'তে দুই শত আলোক-বর্ষ; তার মধ্যে কোন কোনটিতে এক লক্ষের অধিক তারকা আছে। গোলকীয় স্তবক অপেক্ষা ছায়াপথ-বেষ্টিত আমাদের নক্ষত্রজগৎ (Galaxy) অধিক সংখ্যক তারকা-সম্বিত ও বৃহত্তর। এই নক্ষত্রজগতই একটি ব্রহ্মাণ্ড।

শ্রীনীলরতন কর।

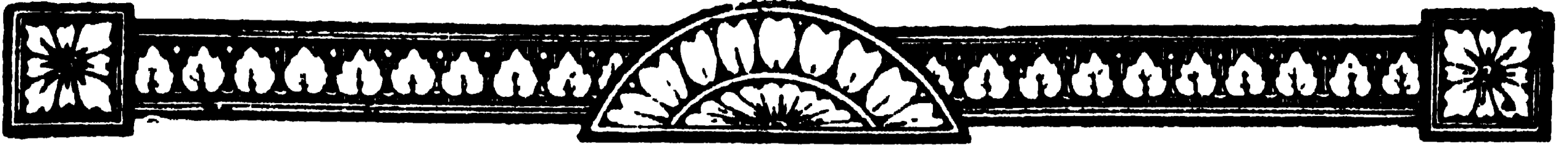


୧୩୪୭ । “ଅଧର କି କୁହାଦାନେ ଚିତ୍ତେର ଉନ୍ମତ୍ତ,
ପ୍ରତିପୂର୍ଣ ବାଣୀ • ୧ ନିଶ୍ଚଳ ନାୟକ ୧”

[ଶିଳ୍ପୀ—କିଷ୍କିନ୍ଦର ବେହେରା]

ବନବାଣୀ

[ଶିଳ୍ପୀ—ଶ୍ରୀକାନ୍ତ]



প্রস্তাবিত বিক্রয়-কর

বাঙ্গালার সচিব দল বঙ্গদেশের উন্নতি-সাধনের অজুহাতে এক নূতন বিক্রয়-কর স্থাপনের আয়োজন বেশ পরিপক্ব করিয়া তুলিয়াছেন! এই বিষয়ের আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্ত গত নবেম্বর মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে একটি 'বিল' পেশ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে রাজস্ব-সচিব মিঃ সারোয়ার্দী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে,—দেশের সংগঠনমূলক কার্যের প্রবর্তন দ্বারা তাঁহারা এ দেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন,—তবে কি না, এই কার্যের প্রবল বাধা—অর্থাৎ বাব। বোম্বাই, পঞ্জাব বা মাদ্রাজে শিক্ষার জন্ত জনপ্রতি যে টাকা ব্যয় হয়, অর্থাৎ বাবের জন্তই বাঙ্গালায় তাহার অর্ধেকও ব্যয় করা যাইতেছে না। এমন কি, কৃষিবিভাগের জন্ত প্রতি-বৎসর যে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন, তাহাও ব্যয় করা যাইতেছে না। অতএব নূতন কর স্থাপন ভিন্ন আর উপায় কি? এই জন্ত বঙ্গদেশের দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর একটি কর স্থাপন করিতে হইবে। অতএব বিক্রয় দ্রব্যের উপর আপাততঃ শতকরা দুই টাকা হারে কর স্থাপন করা হইবে,—অবশ্য প্রয়োজন হইলে ঐ হার বাড়াইয়া শতকরা তিন টাকাও করা চলিবে। সাধারণতঃ যে সকল ব্যবসায়ী বৎসরে কুড়ি হাজার টাকার মাল বিক্রয় করে, তাহাদের উপরেই এই কর স্থাপন করা হইবে। ইহাতে ঐ সকল ব্যবসায়ী যাহাদিগের নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শতকরা দুই টাকা হারে করের জন্ত বর্দ্ধিত মূল্য কাটিয়া লইবেন; ইহাতে ক্রেতা-মাত্রকেই এই কর দিতে হইবে। বস্তুতঃ, কুটীর-বাসী নিরন্ন কৃষক হইতে প্রাসাদবাসী কোটিপতি পর্যন্ত প্রত্যেককেই অল্পাধিক পরিমাণে এই করভার বহন করিতে হইবে। তবে শিল্পীর নিকট যে কাঁচামাল বিক্রয় করা হইবে, তাহার উপর এবং চাউল, ডাল, লবণ, সর্ষপতৈল, গুড়, মাতগুড়, চিনি, পাঁউরুটি ও দুগ্ধের উপর এই কর ধার্য্য হইবে না। তত্ত্বিন্ন, বৈদ্যুতিক শক্তি

অথবা পেট্রল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের উপর কোনও বিশেষ কর নির্ধারিত আছে, তাহার উপর এবং বঙ্গদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বঙ্গদেশের বাহিরে বিক্রয়ের জন্ত প্রেরিত হইবে, তাহার উপরও এই কর ধার্য্য হইবে না।

এই নূতন কর স্থাপনের কথা শুনিয়া সর্কাগ্রে একটা কথা মনে হয়, পক্ষীবিশেষ আকাশের অতি উর্দ্ধে উড়িলেও তাহাদের দৃষ্টিশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে, বহুদূরবর্তী ভাগাড় অতি সহজেই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এই সচিব দলেরও দৃষ্টিশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে, কর স্থাপনের জন্ত এরূপ একটি বিষয় তাঁহারা বাছিয়া লইয়াছেন, যাহার প্রভাব হইতে দেশবাসী কাহারও নিস্তার নাই। এই কর সম্বন্ধে যাহাতে সকলেরই একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে অতি সংক্ষেপে রাজস্ব-সচিবের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম বিবৃত হইল। তথাপি প্রসঙ্গতঃ আইনের পাণ্ডুলিপি হইতে দুই-একটি কথার আলোচনা করিলে এই করের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুবিধা হইবে। আইনের পাণ্ডুলিপির পরিশিষ্টে যে তফ্শীল প্রদত্ত হইয়াছে— তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধকে এই করের কবল হইতে নিষ্কৃতি দান করা হইলেও দুগ্ধজাত বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের (Cream or other milk products) উপর এই কর স্থাপিত হইবে। অতএব ঘোল, ছানা, দধি, মাখন, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্য কিছুই বাদ পড়িবে না। কিন্তু মদ্যের উপর যাহাতে এই বিক্রয়-কর স্থাপন না করা হয়, সে বিষয়ে সচিবগণ বিজ্ঞোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তফ্শীলের ৯ দফায় (beverages of all descriptions) মদ্য জাতীয় সমস্ত পানীয় দ্রব্যকেই বিক্রয়-করের এলাকা হইতে নির্বাসিত করিয়া অপূর্ব বিচারশক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে! মদ্যপায়ী বা মদ্যবিক্রেতাকে এই সুযোগ দানের অর্থ জনসাধারণ কি সত্যই দুর্কোধ্য মনে করিবে?

রেজিষ্ট্রেশনের উপদ্রব

ইহার পর এই বিক্রয়-কর আইনের পাণ্ডুলিপির ৭ ধারার (১) উপধারায় আছে—

“যত দিন পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি এই আইন অনুসারে কর-ধার্যের যোগ্য, তত দিন কোনও বিক্রেতাই বিক্রেতা-হিসাবে তাহার নাম রেজেষ্ট্রী না করিয়া এবং আইনসম্মত রেজিষ্ট্রেশন-সার্টিফিকেট না রাখিয়া ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না।”

এই উপধারা অনুসারে নাম রেজেষ্ট্রী না করিলে সেই ব্যবসায়ীর দুই হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং অবিরত এইরূপ অপরাধ করিতে থাকিলে যত দিন পর্য্যন্ত এই অপরাধ করা হইবে, তত দিন তাহাকে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, যে-যে ব্যবসায়ী যে-যে দ্রব্যের ব্যবসা করিবেন, তাঁহাকে সেই-সেই দ্রব্যের জন্ম নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া সার্টিফিকেট লইতে হইবে। যে দ্রব্যের সার্টিফিকেট নাই, সে দ্রব্য তাঁহার সার্টিফিকেটের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যদি তিনি ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাকেও ঐরূপ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। অর্থাৎ সকল মাথা একই ক্ষুরে কামাইবার ব্যবস্থা!

রাজস্ব-সচিব এই সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, শুধু দোকানদারদিগকেই নহে, আমদানিকারক প্রত্যেক ব্যবসায়ী, শিল্পী, কণ্ট্রাক্টর—প্রত্যেকেই এই ভাবে নাম রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। অতএব নাম-রেজেষ্ট্রী ব্যবসায়ী-মাত্রকে করিতেই হইবে। এই রেজিষ্ট্রেশন একবার করা হইলে তাহার মেয়াদ কত দিন, —মাস, বৎসর, কি জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত—তাহার কোনও উল্লেখ নাই, তাহা সরকারের ‘খাস’ বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং সরকার প্রতি-বৎসরেও ৭ ধারা অনুসারে নাম রেজেষ্ট্রী করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রতি-বৎসরই কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই যে রেজিষ্ট্রী-ফি বাবদ ব্যয় করিতে হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে কি? ঐ টাকার পরিমাণ কত হইবে, আইনের পাণ্ডুলিপিতে তাহারও উল্লেখ নাই। বরং আইনের পাণ্ডুলিপির ২২ ধারার ২ উপধারার (৬)

দফায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—এ সম্বন্ধে কার্যপদ্ধতি নির্দেশের ভার সরকারের হস্তেই ব্রহ্ম থাকিবে। কিন্তু এমন গুরু বিষয় এরূপ অনির্দিষ্ট ভাবে চাপিয়া রাখা কত দূর যুক্তিসঙ্গত?

এই কার্যপদ্ধতি আইনের পাণ্ডুলিপিতে বিবৃত না থাকায় এবং সরকার স্বেচ্ছানুযায়ী এ সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন—এই প্রকার ব্যবস্থা থাকায়, আইনটি সরকারের একটি ‘ঘরোয়া’ আইনেই পরিণত হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে না কি? যাহাদের কিঞ্চিৎ বিবেচনাশক্তি আছে, তাঁহারা ই বুঝিতে পারিবেন, নাম-রেজেষ্ট্রী করিবার এই বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকিলে ব্যবসায়িগণের অসুবিধা অনিবার্য, এবং প্রস্তাবিত আইনখানি এই ক্রটির জন্ম যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন?

কমিশনারের অপ্রতিহত ক্ষমতা

প্রস্তাবিত আইনে যিনি কমিশনার নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার হস্তে অপ্রতিহত ক্ষমতা ব্রহ্ম করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও উপেক্ষাযোগ্য নহে। আইনের পাণ্ডুলিপির ১৬ ধারায় কেহ নাম-রেজেষ্ট্রী করিবার উপযুক্ত ব্যবসায়ী কি না, অথবা কোনও বিক্রেতা কনট্রাক্টর কি না, কিংবা কোনও বিশেষ দ্রব্য ক্রয় করিবার অধিকার ক্রেতার রেজিষ্ট্রেশন-সার্টিফিকেটে প্রদত্ত হইয়াছে কি না, তাহার একমাত্র বিচারকর্তা হইবেন এই আইনানুসারে নিযুক্ত দোর্দণ্ড প্রতাপশালী কমিশনার বাহাদুর। এতদ্ব্যতীত, এই আইন পরিচালনের উদ্দেশ্যে কর স্থাপনাদি ব্যাপারেও কমিশনারের ক্ষমতা অসীম,—তিনি যাহা স্থির করিবেন, তাঁহার সেই নির্ধারণের বিরুদ্ধে প্রতিকার-প্রার্থী হইয়া অন্তের নিকট আপীল ত দূরের কথা, কোনও দেওয়ানী আদালতে সে সম্বন্ধে কোনও আপত্তি পর্য্যন্ত করা চলিবে না! আয়করের কমিশনারের নির্ধারণের বিরুদ্ধেও আপীল করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু এই বিক্রয়-করের কমিশনারের কার্য “সীজারের পত্নীর গায়” সকল সন্দেহের অতীত। তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত, এবং তিনি যেন অপ্রাস্ত ! অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে কি?

আইনের পাণ্ডুলিপির সপ্তদশ ধারায় বলা হইয়াছে, “এই আইনানুসারে কর-ধার্য্য হইলে অথবা কমিশনার বা তাঁহার অধীনস্থ কোনও কর্মচারী এই আইন বা ইহার কার্য্য-পরিচালনোদ্দেশ্যে রচিত নিয়মাবলী অনুসারে কোনও আদেশ প্রদান করিলে, এই আইন-নির্দিষ্ট উপায়ে ভিন্ন কোনও দেওয়ানী আদালতে তদ্বিষয়ে আপত্তি করা চলিবে না, অথবা ঐ প্রকার করধার্য্য করিবার বিরুদ্ধে বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনও আপীল বা পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিচারের জন্ত দরখাস্ত করা চলিবে না।”—ইহা কি অপূর্ব ব্যবস্থা নহে?

উল্লিখিত ধারা অনুসারে এই কমিশনারের ক্ষমতা যে কি প্রকার অপ্রতিহত হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। স্মরণ্য হিসাব পরিদর্শন, হিসাব পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে খানাতল্লাস, করধার্য্য ইত্যাদি বিষয়ে—কমিশনারই অধিতীয় নিয়ন্তা। এক-হস্তে এইরূপ বিরাট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিবার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভারত সরকারের আয়কর বিধানেও লক্ষিত হয় না; কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে সচিবসম্মত এই বিস্ময়কর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

প্রস্তাবিত আইনের ১৯ ধারায় যে ৭ দফায় এই আইন ভঙ্গ করা যাইতে পারে, তাহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। যথা—

(১) এই আইন অনুসারে নাম রেজিস্ট্রী না করিয়া ব্যবসা পরিচালন;

(২) এই আইন অনুসারে হিসাব-নিকাশ দাখিল না করা বা অপ্রকৃত হিসাব দাখিল করা;

(৩) রেজিস্ট্রেশন-সার্টিফিকেটে ক্রেতা যে যে দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স লইয়াছেন, সেই সকল দ্রব্য ব্যতীত যে সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ের লাইসেন্স তাঁহার নাই, সেই সকল দ্রব্যের লাইসেন্স আছে, এইরূপ মিথ্যা সংবাদের সাহায্যে মাল ক্রয় করা;

(৪) এই আইনের ১১ ধারায় যে প্রকারে ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব-রক্ষা করিবার বিধান আছে—তাহা ভঙ্গ করা;

(৫) কমিশনার হিসাবের খাতা দেখাইবার আদেশ দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ না দেখান;

(৬) কোনও কর্মচারী ঐ উদ্দেশ্যে খানাতল্লাসী করিতে গেলে বা কোনও হিসাবের খাতা লইতে গেলে তাহাকে বাধা দেওয়া;

(৭) ব্যবসায়ের নাম পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তন, বা প্রকৃতি পরিবর্তন সম্বন্ধে যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে না জানান।

উক্ত ৭ প্রকারের কোনও একটি আইন লঙ্ঘন করিলেই ঐ ব্যবসায়ী দুই হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারিবেন, এবং দণ্ড সত্ত্বেও যদি ঐ প্রকার অপরাধে তিনি বিরত না হন, তবে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা হারে অর্থদণ্ড ভোগ করিতে থাকিবেন। তবে, এই সকল অপরাধের জন্ত কোনও প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বা কোনও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার হইবে। কমিশনার ইচ্ছা করিলে দুই হাজারের অনধিক টাকা লইয়া, বা অপরাধীকে যত কর দিতে হইত, তাহার দ্বিগুণের অনধিক অর্থ লইয়া এইরূপ মোকদ্দমা মিটাইয়া লইতে পারেন। এই ব্যাপারেও কমিশনারের হস্তে কি প্রকার বেপরোয়া ক্ষমতা গ্ৰস্ত করা হইয়াছে, তাহাও প্রণিধান করিয়া এই বিল যে বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত নহে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে?

প্রস্তাবিত বিলের ২২ ধারায় ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। বিক্রয়-কর ধার্য্যের জন্ত অন্তঃস্থানের ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরা কাহারও নিকট কোনও সংবাদ পাইলে, বা কোনও দলিলাদি পাইলে তাহা তাঁহারা এই ধারা অনুসারে গোপন রাখিতে বাধ্য। যদি উহা তাঁহারা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাদের ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে, এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারে। অবশ্য, বিক্রয়-করের কমিশনারই করধার্য্য করিবার ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ—তাঁহার নির্ধারণই শেষ নির্ধারণ, তাঁহার আদেশের প্রতিকূলে আপীল নাই। কোনও ব্যবসায়ীর কোনও শত্রু কমিশনারকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া, বা জাল দলিল দেখাইয়া কোনওরূপে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া যদি তাহার উপর করধার্য্য করাইতে পারে, তবে তাহার আর প্রতিকার নাই। কারণ, এই ধারা অনুসারে বিভাগীয় এই সকল গুপ্ত সংবাদ শাস্তির ভয়ে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—

এবং কমিশনারের সিদ্ধান্তের উপরেও আর আপীল নাই। সুতরাং এ অবস্থায় নিরপরাধ ব্যবসায়ীর অকারণ অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের কোন আশাই নাই।

পুস্তক-ব্যবসায়ের বিপদ

ইংলণ্ড বা যুরোপীয় অগ্রাণু সভ্য দেশে জ্ঞান-বিস্তারে কোনরূপ বাধা ঘটিতে না পারে, সে জগৎ সে দেশের অধিবাসিবর্গ বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই কারণে অগ্র দেশ হইতে পুস্তকাদি আমদানি হইলে ঐ সকল দেশে তাহাদের উপর কোনওরূপ শুল্ক ধার্য্য হয় না। আমাদের দেশে কাগজ শিল্পের উন্নতিসাধনের অজুহাতে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত না হইলেও এত দিন বিদেশাগত কাগজের উপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য্য হইয়া আসিতেছে। এই মহাবুদ্ধি নরওয়ে, সুইডেন-প্রমুখ দেশ হইতে কাগজ আমদানিতে বাধা হওয়ায় বিদেশাগত কাগজের মূল্য প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা জ্ঞান-বিস্তারের পথে যে কত দূর অসুবিধা ও বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত অগ্রের ধারণা করিবারও শক্তি নাই। কিন্তু অভিনব বিক্রয়-কর স্থাপিত হইলে কাগজের উপর আর এক দফা কর বসিয়া এক মুরগী তিনবার জবাই করিবার দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট হইবে। ফলে কাগজের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে। তাহার উপর এই কাগজ আবার যখন মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়-যোগ্য পুস্তকে পরিণত হইবে, তখন তাহার উপর আবার আর এক দফা বিক্রয়-কর বসিবে! সরকারী শাসন-যন্ত্রের বিরাট ব্যয়ভার নিরীহের জগৎ সরকার ইতিপূর্বে ডাকমাশুল, রেজিষ্টারী ফি: ও মনি-অর্ডারের ফি: অসম্ভব বর্দ্ধিত করিয়া শুলভ সাহিত্য-প্রচারে ও সার্বজনীন শিক্ষা-বিস্তারের পথ রোধ করিয়াছেন। সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র, পুস্তকাদি—কোনও দ্রব্যই এই বিক্রয়-করের করাল কবল হইতে যে অব্যাহতি পাইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনাই আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালায় শিক্ষার বিস্তার এতই অল্প যে, এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক বর্ণজানহীন। তাহার পর এই ভাবে যদি একবার কাগজের উপর উচ্চ হারে শুল্ক ও সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র বা মুদ্রিত পুস্তকের উপর অসম্ভব উচ্চ হারে ডাকমাশুলের উপর পুনর্বার বিক্রয়-কর

বসাইয়া বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন করা হয়, তবে এই তিন দফা করভারে দেশে জ্ঞানবিস্তারে যে কি বাধা উপস্থাপিত হইবে, তাহা বুঝিবার জগৎ অধিক বিঘ্নাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই! একেই এই বুদ্ধির সময় কাগজ ও মুদ্রণোপকরণের অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধি দেশের জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে—ইহার পর দেশের লোক, বিশেষতঃ, দরিদ্র ছাত্রগণ পুস্তকের বর্দ্ধিত মূল্যের গুরু ভারে অত্যন্ত প্রপীড়িত ও বিপন্ন হইবেই। বাঙ্গালা দেশে পুস্তক ব্যবসায়ের অবস্থা উন্নতিজনক নহে। পাঠ্য-পুস্তকের যে সকল ব্যবসায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় করেন, তাহাদের একরূপ ক্রীত মূল্যেই ঐ সকল পাঠ্য-পুস্তক বিক্রয় করিতে হয়। কারণ, বিশ্ব-বিদ্যালয় স্বপ্রকাশিত পুস্তকে শতকরা এক বা দেড় টাকার অধিক কমিশন প্রায়ই পুস্তক-ব্যবসায়ীগণকে দেন না। ইহার উপর যদি বিক্রয়-করের জগৎ শতকরা দুই টাকা বা পরে তিন টাকা বিক্রয়-কর দিতে হয়, তবে পুস্তক ব্যবসায়ীগণের পক্ষে ঐ সকল পুস্তক বিক্রয় করা সম্ভবপর হইবে না।

একেই ত ডাকমাশুল অসম্ভব বৃদ্ধির ফলে মফঃস্বলের ক্রেতাগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন; তাহারা ইচ্ছা থাকিলেও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি কিনিতে পারেন না। তাহার উপর, এই ভাবে যদি বিক্রয়-করের দৌরাণ্ডের প্রবর্তন হয়, তবে দেশে জ্ঞানবিস্তারে প্রভূত বাধা হইবে। অথচ উজীর সাহেব সগর্বে ফতোয়া দিয়াছেন যে, এই বিক্রয়-করলক্ষ অর্থে দেশে শিক্ষা-বিস্তার ও প্রভূত উন্নতি সাধন করিবেন। দেশের উচ্চতর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে জ্ঞানবিস্তারের পথের এই বাধা অপসৃত করিবার জগৎ পুস্তক-ব্যবসায়কে এই বিক্রয়-করের হস্ত হইতে অব্যাহতিদান সর্বতোভাবে কর্তব্য। বিশেষতঃ, কাগজের উপর যদি এক দফা বিক্রয়-কর বসে, তবে পুস্তক-ব্যবসায়ের উপর আবার করস্থাপন অত্যন্ত অসঙ্গত; তাহা কোনও ক্রমেই সমর্থিত হইতে পারে না। রাজস্ব-সচিব এই 'বিল' ব্যবস্থা পরিমর্দে উপস্থিত করিবার সময়ে বলিয়াছেন—

"It is not our intention to levy a tax on the sale of goods every time they change

ownership ; our intention is to tax only one of these changes and for this reason we speak of the proposed tax as a one-point or single-point tax.”

অর্থাৎ “প্রত্যেক বারই দ্রব্য বিক্রীত হইয়া হস্তান্তরিত হইলেই তাহার উপর কর ধার্য করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। পরিবর্তনের মধ্যে একবার মাত্র কর ধার্য করাই আমাদের ইচ্ছা, এবং এই হেতুবাদে এই করকে ‘এক-মুখান’ কর শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে।”

রাজস্ব-সচিবের এই উক্তির প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করা অভিপ্রেত হইলে এ দেশে মুদ্রিত কোনও সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র, বা কোনওরূপ পুস্তক ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য করা আদৌ সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ, ঐ সকল সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র, বা পুস্তকের উপাদান—কাগজ, কালি বা মুদ্রণ দ্রব্যের উপর এক দফা কর আদায় করা হইবে, তাহাতে মতভেদ নাই; অতএব সে হিসাবেও সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র বা পুস্তক-বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

এই প্রকারে চামড়ার উপর যদি কর ধার্য হয়, তবে সেই চামড়ায় প্রস্তুত জুতার উপর কর ধার্য হইলে, অথবা তুলার উপর কর ধার্য হইলে, পুনর্বার সূতার উপর এবং ঐ সূত্র-নির্মিত শিল্পদ্রব্যের উপর আর একবার কর ধার্য হইলে তাহাতে একই দ্রব্যের আকৃতি পরিবর্তনের সহিত কোথাও দুই বার, কোথাও বা তিন বার পর্যন্ত কর-ভার স্থাপিত হইবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা

করিয়া দেশের লোক এই প্রকার বিক্রয়-করের আইন প্রণয়নে আপত্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। এই আইনে জনসাধারণ পুনঃ পুনঃ কর-ভারে প্রপীড়িত হইবে।

দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা মহাযুদ্ধের জ্ঞান ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে ; ইহার উপর দুর্ভিক্ষ, পাটের মূল্যহ্রাস ইত্যাদি কারণে দেশে এখন নূতন কোনও কর স্থাপন করিলে দেশবাসীর কষ্ট সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিবে। এরূপ অবস্থায় এই কর ধার্য করা বর্তমান সময়ে কোনওরূপে সম্ভব নহে। গরু মারিয়া জুতা দানের নীতি সমর্থনযোগ্য নহে।

যদি নিতান্তই কর ধার্য করিবার অনিষ্টকারিতা বুঝিবার শক্তি বর্তমান সচিবসভ্যের না থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ মন্দের ভাল হিসাবে সংবাদপত্র বা পুস্তক ব্যবসায়কে এই কর হইতে অব্যাহতি দান করা কি কারণে প্রয়োজন, তাহা আমরা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি।

কলিকাতার পুস্তক-প্রকাশক সমিতি এই করে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া ইতোমধ্যেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্ন্যস্ত্র বিক্রেতৃবর্গও ইহাতে আপত্তি করিয়াও গত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় “হরতাল” করিয়াছেন।

আমরা আশা করি, যেখানে কোনও কাঁচা মালের উপর কর ধার্য হইবে, সেখানে সেই দ্রব্যে প্রস্তুত শিল্পের উপর যাহাতে কর ধার্য না হয়, অন্ততঃ তাহার ব্যবস্থা হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল) ।

অদৃষ্ট ও কর্মফল

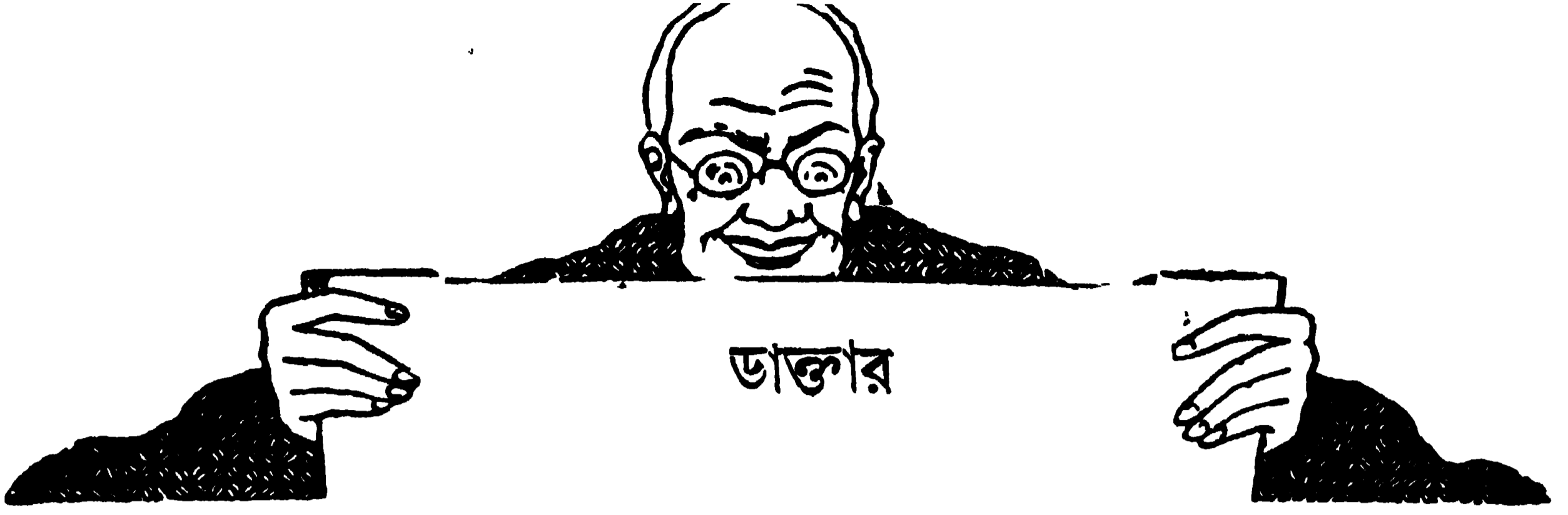
অদৃষ্টের লক্ষ্য করি কহে- কর্মফল,

“সংসারেতে দুঃখ তুমি বাড়াও কেবল !

কর্মবীর তাই আমি চাই ভাবিবারে,
অমোঘ বিধান তব নিত্য অত্যাচারে।”
অদৃষ্ট হাসিয়া কহে, “বুঝিলাম সবই,
কিন্তু বীর, আমি শুধু তব প্রতিচ্ছবি !

তুমি যাহা ক’রে যাও অতি সঙ্কোপনে,
কেহ বা জানিল তাহা, কেহ নাহি জানে !
তারি ফলে মোর সৃষ্টি, রহি তব পিছে,
বিশ্বেরে জানাই আমি তুমি নহ মিছে !”

শ্রীনন্দ সেনগুপ্তা ।



১

—ওঃ—

—আজ কি শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে ?

—ভাল লাগছে না। ওঃ—

—ডাক্তারকে খবর দেবো ?

—নাঃ,—থাক্।

—ওগো আমার যে বড় ভয় করছে—

—আচ্ছা, তবে রামাবতারকে একবার পাঠিয়ে দেও।

চপলা ক্রতগতি গৃহ হইতে নিজস্ব হইল। পুরাতন হিন্দুস্থানী চাকর রামাবতারকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, 'বাবুর অসুখ বেড়েছে—হরেন ডাক্তারকে শীগ্গির ডেকে মিয়ে আয়।'

—'এখন যে ডাক্তার রুগী দেখেন। এখন কি তিনি আসতে পারবেন ?'—চাকর বলিল।

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, 'সে কথায় তোর দরকার কি ? তুই তাঁকে আমার নাম করে বলবি যে, এখনি আসা দরকার।'

রামাবতার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রস্থান করিল।

গিরীন্দ্র পোর্ট কমিশনাসের অধীনে ভাল চাকরী করেন। হঠাৎ অল্পের অসুখ হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন। হরেন ডাক্তার পাড়ায় থাকেন, তাঁহাকেই ডাকা হইয়াছে। ডাক্তারের বয়স কম হইলেও হাতযশ আছে। অনেকেই ডাকে।

ডাক্তার রোগী দেখিলেন, দর্শনী নিলেন। বলিয়া গেলেন, কাল আবার আসিবেন। পরদিনও আসিলেন, তার পরদিনও। এইরূপে ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। ডাক্তার কোনও কোনও দিন ছু'বেলা আসিতে লাগিলেন। তাঁহার ভিজিট দিতে হয় না।

—'গিরীন বাবু, আপনি ব্যস্ত হন কেন ? অসুখ সেরে গেলে আমার পারিশ্রমিক দেবেন। এখন ঐ নিয়ে ভাববার দরকার কি ?'

গিরীন বাবু বলিলেন—'আপনার দয়া অসীম।—বেশ তাই হবে।' পরিবারকে বলিয়া দিলেন, 'হিসেবটা রেখো। ডাক্তার না ডাকতেও আসছেন যখন, তখন বোধ হয়, প্রত্যেক বার ভিজিট না দিলেও চলবে। কি বল ?'

চপলা উত্তর করিল না। অঞ্চলের খুঁট পাকাইতে পাকাইতে পথ্য তৈয়ার করিতে গেল।

২

—'আজ আমার রাতে এখানে থাকা দরকার। মনে কোনও দ্বিধা করবেন না। আমি প্রাণপণে আপনার উপকার করবো।'—ডাক্তার চপলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।

রোগী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বড় ক্লান্ত। চিকিৎসার কোনও ক্রটি হইতেছে না। ডাক্তার প্রাতে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় আসিয়া দেখিতেছেন। অনেক সময় নিজের ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিয়া খাওয়াইতেছেন। কিন্তু রোগ কমিতেছে না। বলিলে বলেন, 'রোগের কোর্স ত সে নেবেই। আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে না,—এইটে শুভগ্রহ বলতে হবে।'

ডাক্তার খুব যত্ন করিতেছেন; প্রতিবারে অনেককণ ধরিয়া রোগীকে পরীক্ষা করেন। গল্প করিয়া রোগীকে প্রকৃত রাখিতে চেষ্টা করেন। চপলা তরুণী, সে রোগের কিছু বুঝে না। কিন্তু ডাক্তারের ব্যবহারে মুগ্ধ। সে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, কখন হরেন ডাক্তার আসিবেন। তাঁহার গাড়ীর হর্ণ শুনিবার জন্ত সে উৎকর্ণ হইয়া থাকে,

এবং যতক্ষণ ডাক্তার থাকেন, ততক্ষণ সে স্বামীর অস্থির কথার, নিজের বিপদের কথা সব ভুলিয়া যায়।

আজ রোগীর অবস্থা বিশেষ খারাপ বলিয়া বোধ হইল। ডাক্তার বলিলেন, ‘আমি রাত্রে আসিব, এবং সমস্ত রাত্রি থাকিব।’

চপলা চমকিয়া উঠিল। সে মাথার উপর হাত দিয়া ঘোমটা একটু নামাইয়া দিল। মুখে কিছু না বলিলেও ডাক্তার দেখিলেন যে, তাহার সহজ প্রফুল্ল মুখখানি যেন কালি হইয়া গেল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে গিরীন্দ্র বলিলেন, ‘অস্থির ত কচ্ছে না। আর কাউকে ডাকলে হতো না?’—

চপলা যন্ত্রের মত বলিল, ‘ডাক্তার আসলে বলব। শুঁকে না জিজ্ঞেস করে’ ডাকা ত যায় না।’—

গিরীন্দ্র, ‘তা বটে!’—বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বেশী কথা বলিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল। তিনি তবুও একটু খামিয়া বলিলেন, ‘আমি এ অস্থির থেকে যে ভাল হবো—সে আশা নেই।’—

‘কে বললো? তুমি নিশ্চয়ই ভাল হ’য়ে উঠবে। ডাক্তার বলেছেন—’

—‘ডাক্তার বলেছেন—’ গিরীন্দ্র একটু হাসিতে চেষ্টা করিলেন।

৩

শীতকালের দীর্ঘ রাত্রি। ডাক্তার ৯টার সময় আসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ‘এই সময়টা একটু ভয়ের—; তবে, বোধ হয়, কেটে যাবে।’

চপলা বলিল, ‘আর কোনও বড় ডাক্তারকে ডাকা আবশ্যিক মনে করেন?’

ডাক্তার ব্যস্তভাবে বলিলেন, ‘না, না, সে দরকার হবে না। দেখবার আর কি আছে?—আমি ত খুব ভরসা করি যে, এর চেয়ে খারাপ হবে না।’

চপলা বললো, ‘উনি বলছিলেন কি না—’

ডাক্তার বলিলেন, ‘ওঃ! আপনি ত দেখছেন, আমি কত পরিশ্রম করছি? এখন আর এক জন এসে’ যশ নিয়ে যাবে—সে-টা কি ভাল দেখায়?’

রোগী পাশ ফিরিয়া গুঁইয়াছিলেন। ডাক্তার তাহার

সমস্ত মমতা সুরে মিশাইয়া বলিলেন, ‘আপনার জন্তেই আমি আজ এখানে থাকবো বলে’ এসেছি। এতেও কি আপনার চুশ্চিন্তা গেল না?’

ডাক্তারের চক্ষু চপলার চক্ষুর সহিত মিলিল। কৃতজ্ঞতায় তাহার বুক ভরিয়া গেল। সে ডাক্তারের লুকু-দৃষ্টির বিনিময়ে তাহার কটাক্ষ-শর ত্যাগ করিল।

৪

—‘একটু চা করে’ দেব কি?’ রাত্রি তখন ১২টা। ডাক্তার ঘুমের ঔষধ দিয়া রোগীকে ঘুম পাড়াইয়াছেন।

‘আপনার হাতের চা? আমাকে জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যিক’, বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন। চপলা চা তৈয়রী করিয়া আনিল। ডাক্তার বলিলেন, ‘রোগীর ঘরে খাব না।’

—‘বেশ ত! আমার সঙ্গে আসুন।’

ডাক্তার চপলার অমুবর্তী হইলেন। অল্প কক্ষ গিয়া একটা টিপয়ের উপর চা রাখিয়া চপলা একটা চেয়ার তাহার নিকটে স্থাপন করিল। ডাক্তার চা-পানে প্রবৃত্ত হইলেন।

—‘কেমন দেখছেন এখন?’

—‘বেশ ত যুচ্ছেন’ বলিয়া ডাক্তার একটু মৃদু কাশিলেন।

—‘তা ত দেখছি! কিন্তু নাড়ী?’—

—‘নাড়ী মন্দ কি?—নাড়ী তেমন ভাল নয়! রোগীর ঘরে থাকবার কোনও দরকার হয় ত না হ’তেও পারে।’ বলিয়া ডাক্তার চপলার চোখের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিলেন।

চপলার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিয়া বলিল, ‘তবে আপনি এখনি কি বাড়ী যাবেন?’

—‘না! তা কি হয়? আমি এসেছি—দেখুন, আপনার জন্তে—অর্থাৎ আপনি একলাটি হয় ত ভয় পাবেন, এ জন্তে আমি থাকব। তবে অল্প ঘরে থাকলেও হ’তে পারবে।’

—‘বেশ, আপনার জন্ত পাশের ঘরে ব্যবস্থা করে’ দিচ্ছি; একটু বিশ্রাম করবেন।’

ডাক্তার চা খাইয়া একবার রোগীর ঘরে গেলেন।

রোগী তখন বেশ যুগ্মেছেন। তখন তিনি চপলাকে বলিলেন, ‘আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন। তার পরে আমি বিশ্রাম করতে যাব।’

—‘না, না, ডাক্তার বাবু, আমি ঠিক বসে’ থাকতে পারবো।’

ডাক্তার বলিলেন, ‘আমি যত দূর বুঝতে পারছি, তাতে এ-দিকে কোনও ভয়ের কারণ নেই। শেব-রাত্রিটা ভাল কাটবে কি না, বুঝতে পারছি-নে—

শেষোক্ত কথাগুলি ডাক্তার চপলার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন। তাহার উচ্ছ্বল অলকরাশি ডাক্তারের তপ্ত নিখাসে ছলিয়া উঠিল।

ডাক্তার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, ‘আমি বলছি, আপনি একটু গড়িয়ে আসুন।’

চপলা আর কথা কহিতে পারিল না। সে একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুইতে গেল।

একখানা ইজি-চেয়ারে শুইয়া সে স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, তাহার স্বামীর আত্মা হাওয়াম ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার দুইটি করুণাতরা চক্ষু সে এই মর্ত্যের দিকে ফিরাইয়া যেন তাহারই সন্ধান করিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া সে যেন হঠাৎ বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জ্ঞান তাহার হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

চপলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, ডাক্তারের

লোনুপ দুইটি চক্ষু। সে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। স্বামীর ঘরে গিয়া দেখিল, স্বামী যাতনায় ছটফট করিতেছেন। পাশে ইন্ডেকশানের পিচকারী রহিয়াছে।

চপলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি, হলো কি ? ডাক্তার বাবু, ইন্ডেকশান কেন ?’

ডাক্তার সংক্ষেপে বলিলেন, ‘হার্ট ফেলু করছে।’

স্বামী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, ‘বড় যন্ত্রণা!—জলে যাচ্ছে।—উঃ!’

চপলা ইন্ডেকশানের স্থানটি দেখিল। তুলার ঢাকা সরাইয়া সেই ক্ষতস্থানে মুখ দিল ও কতকটা রক্ত চুষিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। কেন সে করিল, তাহা সে জানে না। কিন্তু রোগী যেন আরাম পাইল। রোগী একটু সামলাইলে চপলা বলিল, ‘ডাক্তার বাবু, এইবার আপনি একটু শুয়ে নিন-গে।’

ডাক্তার একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যন্ত্রচালিতের ত্রায় নির্দিষ্ট কক্ষে গেলেন। চপলা তাঁহাকে সে ঘরে নিজেই পৌঁছিয়া দিল।

তার পরে সে ধীরে ধীরে বাহির-হইয়া গিয়া সস্তর্পণে দরজা ভেজাইয়া দিল।

ডাক্তার হঠাৎ উঠিয়া তাহার প্রায় পশ্চাতে পশ্চাতেই আসিলেন। কিন্তু দরজায় হাত দিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। দেখিলেন, দরজা বাহির হইতে রুদ্ধ!

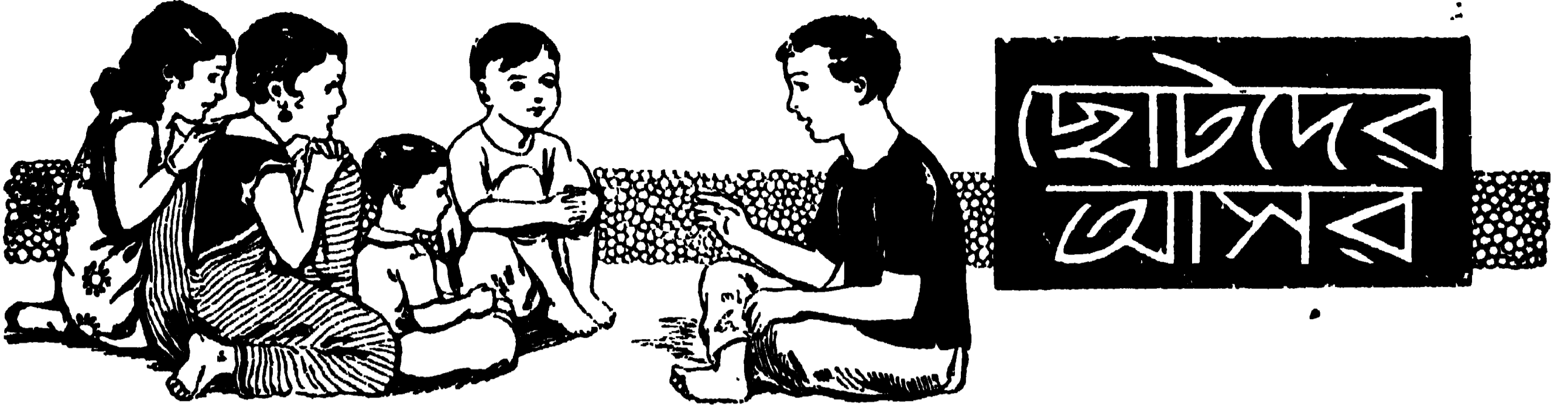
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম-এ, অধ্যাপক, রায়বাহাদুর)।

পাতা-ঝরার ডাক

পাতা-ঝরার ডাক এসেছে ছায়ার ঘেরা শীতের তপোবনে
মান কুহেলির আড়াল হ’তে নিবিড় শ্রামল স্নেহেরি অঙ্গনে।
শুক বত বনের পাতা, শিথিল-তম্বু শাখার কোলে-কোলে,—
জীবন-সীমা পার হ’য়ে আজ শেব-রাত্রির পরশ-তালে দোলে।
ছড়িয়ে দিয়ে শাখার বাজ গভীর ধ্যানে দাঁড়িয়ে তরুণ
শীতের তরে অর্ঘ্য সাজায় মাটির খালয় পাতার আভরণ,
শিউলী-শাখা কাঁপিয়ে গেল হিমেল হাওয়া ধূসর-চেতনার ;
কোমল সুরে শুকনো পাতা ঝরিয়ে দিল আপন পাদচ্ছায়।
গাঁদার ঝোপে কুস ফুটেছে রঙ্গীন-হাসি হাসছে উপহাসে ;
অতসী আজ উঠল সেক্রে কনকবরণ হরিৎ কুলের রাশে।
শীত এনেছে ওদের ডেকে, ফুলে ফুলে তারই আবাহন ;
ওদের পরেই তার পড়েছে সাজিয়ে দিতে শীতের তপোবন।

ভূষণহারা বিটপিদল সাজবে যবে বসন্ত-উৎসবে,—
অতসী আর গাঁদার কুসুম,—তাদের সেখা আসন নাহি হবে।
তাই বুঝি শীত আদর ক’রে ওদের ডেকে এনেছে এই বেলা ;
এই জগতের নিখিল-সভার কেনই ওরা সইবে অবহেলা ?
বসন্তের ওই পূজারীদের তাই বুঝি শীত করল হতমান ;
তাদের তরে র’য়েছে তো বসন্তেরি আনন্দ-আহ্বান।
আমার পরেও রাগ ক’য়েছে তুল করে আজ বসন্ত-বিষেবী,
ভেবেছে সে মন বুঝি মোর ভালবাসে বসন্তেরই বেশী।
তাই চাহে সে আমার বৃকে ঝরিয়ে দিতে সবুজ পাতা বত ;
জানে না তো শীতকে আমি ভয় করি না ওই তরুদের মত।
অমর কবি শেলী যে আজ বৃক হ’তে মোর কইছে চেনা সুরে,
“শীত যদি গো এলোই, তবে বসন্ত কি রইতে পারে ঘুরে ?”

শ্রীনীলেন্দ্র গুপ্ত।



নির্বাসিতা রাজকন্যা

[রূপ-কথা]

দুই

লীনার মা যে লীনাকে নিয়ে বেঁচে আছেন, আর তাঁর বাপের গুরু সিদ্ধ সাধুটির আশ্রয় লাভ ক'রে কষ্টে-স্বপ্নে কোন রকমে দিন কাটিয়ে চ'লেছেন, এ খবর কিন্তু রাজবাড়ীতে লীনার মা'র সতীন বা তাঁর সেই ফন্দিবাজ বাপ মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্মাটি মোটেই জানতেন না। তাঁরা জানতেন—লীনার মা লীনাকে নিয়ে রাজবাড়ী থেকে পালাবার সময় পথে ডাকাতে হাতে প'ড়ে খুন হ'য়েছিল। তারা জানেন, দুনিয়া থেকে তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

খবরটা লোকের মুখে শুনেই তাঁরা বিশ্বাস ক'রে নেননি, বিশ্বাস ক'রবার মতো প্রমাণও পেয়েছিলেন। লীনার মা নিজের ধন-দৌলত, গয়না-গাঁটি, দামী কাপড়-চোপড় ছ'হাতে বিলিয়ে দিয়ে যাদের সাহায্যে পালাবার পথটি খোলসা ক'রে নিয়েছিলেন, তারাই আসল ব্যাপারটা চেপে রাখবার জন্তে ডাকাতে হাতে এদের মৃত্যুর মিথ্যা খবরটি রটিয়েছিল। সেই সঙ্গে লীনার দাসী এমন কৌশলে লীনার মায়ের গায়ের কাপড়, আর লীনার ঘাগরাটি রক্তে লাল ক'রে রাজবাড়ীতে এনে দেখায় যে, তা দেখে খুনের ব্যাপারটি সত্যি ব'লেই সকলের বিশ্বাস হয়েছিল। মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্মাও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যময় প্রচার ক'রে দিলেন যে, রাজপুরীর ধন-দৌলত হাতিয়ে এই পাহাড়ী মাগীটা তার খুকীকে নিয়ে পালাচ্ছিল; পথে তাদের প্রাণ গিয়েছে; ডাকাতে হাতে তাদের পাপের শাস্তি ভগবান হাতে-হাতেই দিয়েছেন।

মন্ত্রীর যারা পেয়ারের লোক, খোসামুদের দল, তারা কথাটা শুনেই হাসি-মুখে বলেছিল—একেই বলে, ঘাঁড়ের

শত্রু বাধে মারে! রাণীমাকে আর কষ্ট ক'রে সেই পাহাড়ে-মাগীটাকে তাড়াতে হ'ল না। সে ভালই হ'য়েছে।

কিন্তু রাজবাড়ীর আর রাজধানীর অনেক লোকই খবরটা শুনে শোকে-দুঃখে মুসড়ে প'ড়েছিল; কেন না, তারা জানতো—লীনার মা'ই ছিলেন রাজার পাটরাণী; তাঁকেই রাজা প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতেন, প্রজারাও তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ক'রতো।

কিন্তু রাতারাতি রাজার হঠাৎ মৃত্যু, আর তার পরেই তাঁর পাটরাণী ও রাজকন্যার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে এত বড় রাজ্যের ভেতরে একটি লোক ছাড়া আর কেউ সেই মন্ত্রীটিকে প্রশ্ন করতে সাহস করেনি। যিনি এই সাহসটুকু দেখিয়েছিলেন, তাঁর নাম সুসেন বৈষ্ণব। রাজা বেঁচে থাকতে রাজসভায় এ'র খ্যাতি ছিল সবার চেয়ে বেশী। রাজ্যের ভেতরে এ'র মত গুণী লোক আর একটিও খুঁজে পাওয়া যেত না। লোকটি মহাপণ্ডিত; চিকিৎসায় তাঁর হাতবশের জন্ত লোকে বলতো, ইনি সাক্ষাৎ ধনুস্তুরি। রোগীর চেহারা দেখেই, ইনি, তার কি রোগ ব'লে দিতে পারতেন—নাড়ী দেখা তো পরের কথা! তাঁর চেহারা দেখলেই মনে হয় যেন, সে-কালের কোন মুনি-ঋষি! লম্বা শাদা দাড়ি তাঁর বুক ঢেকে ফেলেছে, মাথার কোঁকড়ানো শাদা চুলগুলি লতিয়ে ঘাড়ে প'ড়েছে; বড় চোখ দুটোর ভেতর কালো তারা যেন আগুনের ভাঁটা! কাটা মানুষকে জোড়া দেবার যে কথাটা লোকে বলে, এ'র সম্বন্ধে সে কথা খাটে।

কিন্তু রাজ্যের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এক মরণাপন্ন রোগীর চিকিৎসা করতে ইনি যে-দিন রাজধানী ছেড়ে দূরে গেলেন, সেই রাতিরেই রাজা অসুখে প'ড়লেন। রাজা সে সময় ছোট রাণীর ঘরে ছিলেন; ছোট রাণী তখনি তাঁর বাপের কাছে এ খবর পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বাবা মন্ত্রী শ্রীগোপাল

শর্মা এই খবর শুনবার জন্তই যেন অপেক্ষা ক'রছিলেন ; তখনি তিনি ছু'জন বণ্ডি নিয়ে রাজবাড়ীতে ছুটে এলেন । তাঁরা রাজাকে তখনই ওষুধ দিলেন, ব'ললেন—ভয় মেই । রাজার কিন্তু তখন জ্ঞান ছিল না । কথাটা পাটরাণীরও কানে গেল ; কিন্তু ছোট রাণীর মহলে আসবার পথে তাঁকে বাধা দেওয়া হ'ল । পাটরাণী তখনি রাজার এক বিখাসী চাকরকে ডেকে চুপি-চুপি বললেন—গতিক ভাল বুঝছি নে বাবা ! আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে ; তুমি শীগ্গীর রাজবণ্ডি স্নসেনের বাড়ীতে যাও ; তিনি কোথায় রোগী দেখতে গেছেন খবর নিয়ে—ঘোড়ায় চ'ড়ে সেইখানে গিয়ে এই বিপদের কথা তাঁকে জানাও ; এই রাস্তিরেই তাঁকে আনা চাই ।

রাণীর কথামত কাজটা চুপি-চুপিই করা হ'ল ; কিন্তু রাজবৈষ্ণ স্নসেন এত দূরস্থ গ্রামে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন যে, খবর পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি রওনা হ'লেন বটে, কিন্তু আসতে আসতে পথেই রাতটুকু কেটে গেল । যখন রাজপুরীতে তিনি এসে পৌঁছলেন, তখন সবে ভোর হ'য়েছে । ও-দিকেও সব শেষ ! রাজার মৃতদেহ খুব ঘটা ক'রে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্ত তখন আয়োজন চলছিল ।

রাজবৈষ্ণ স্নসেনকে দেখেই মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্মা শিউরে উঠলেন । আর—রাজার বিবর্ণ মুখখানার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই রাজবৈষ্ণ স্নসেন ব'লে উঠলেন,—রাজার দেহে যে বিষক্রিমার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ! ব্যাপার কি মন্ত্রি !

মুখ বাঁকা ক'রে মন্ত্রী ব'ললেন,—হ্যাঁ, রাজার দেহটাই বিষয়ে গিয়েছিল কি না—তাতেই ওঁর মৃত্যু হ'য়েছে । মুখেও তাই বিষক্রিমার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন ।

স্নসেন জিজ্ঞাসা করলেন,—রাতারাতিই রাজ-দেহ বিষয়ে গেল কেমন ক'রে ! তা কি সম্ভব হ'তে পারে ?

মন্ত্রী এবার চোখ-ছুটো পাকিয়ে ব'লে উঠলেন,—বণ্ডি মশায়ের লজ্জা ক'রছে না, কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রতে ? রাজ-সরকারের মাইনে খাচ্ছেন, অথচ ছ'টাকা উপরি উপার্জনের জন্ত রাজধানী ছেড়ে বাইরে চ'লে গিয়েছিলেন ! কার হুকুমে গিয়েছিলেন—শুনি ?

কথাটা শুনেই স্নসেন একেবারে 'খ' ! রাজাও কোন

দিন তাঁকে এমন ক'রে ধমকাননি, তিনি তাঁকে সম্মান ক'রে চলতেন ; কোন দিনও তাঁর কৈফিয়ৎ চাননি । অনেক লোকের সামনে কথাটা উঠলো, তাই তিনি আন্তে আন্তে উত্তর দিলেন,—কারুর হুকুম নিয়ে আমাকে কোন দিন চলতে হয়-নি । তবে বাইরে যে গিয়েছিলুম, সে রাজারই এক প্রজাকে মৃত্যু-মুখ থেকে বাঁচাতে ; আর রাজাও তা জানতেন, এবং আমাকে যেতে নিষেধ করেননি । রুগীটিকে বাঁচিয়েই আমি ফিরে আসছি । কিন্তু আমার এই একটি রাত্রির অনুপস্থিতিতেই রাজা বেঘোরে মারা গেলেন, কেউ তাঁকে বাঁচাতে পারলো না ! রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতেই আমাকে খবর দেওয়া হয়নি কেন ?

শেষের প্রশ্নটা শুনেই মন্ত্রী রাগে জলে উঠলেন । মুখখানা খিঁচিয়ে বিক্রপের সুরে বললেন,—হ্যাঁ, রাজার চিকিৎসা বন্ধ রেখে ধম্বস্তরি ঠাকুরের সন্মানে সারা রাজ্যটা তোলপাড় করাই আমাদের উচিত ছিল বটে ! রাজার রাজ্যে ত আর কোন বণ্ডি নেই ! লজ্জা হ'লো না ও-কথা মুখে আনতে ?

স্নসেন বললেন,—আছে ত অনেকেই, কিন্তু তাদের কেউ রাজাকে বাঁচাতে পারলে না কেন ? রাজার দেহে উগ্র বিষের আমদানি কোথা থেকে হ'লো, কেউ তার সন্ধান ক'রেছিল ? এমনও কি হ'তে পারে না যে, রাজাকে কেউ ইচ্ছে ক'রেই বিষ খাইয়েছে ?

রাজবাড়ীর বিশাল প্রাঙ্গণে রাজার মৃতদেহ ঘিরে যারা শোকে আচ্ছন্ন হ'য়ে এতক্ষণ বিলাপ ক'রছিল, স্নসেন বৈষ্ণের এই কথা শুনে তারা চমকে উঠলো । কি সর্বনাশ ! রাজবৈষ্ণ এ ব'লছেন কি ? এমন কি, মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্মা পর্যন্ত এই কথায় নির্বাক ! তাঁর মুখখানা হঠাৎ শুকিয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল । কেন, কে বলবে ?

স্নসেন এই সময় ব'ললেন,—রাজার দেহ আমি পরীক্ষা করব ।—কথাটা বলেই তিনি রাজার মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেলেন ; কিন্তু মন্ত্রী তখনি কেঁদো-বাঘের মতো তাঁর সামনে লাফিয়ে-পড়ে বাধা দিয়ে বললেন,—খবরদার, সরে দাঁড়ান—আমরা আপনাকে রাজার মৃতদেহ ছুঁতে দেব না ।

শাস্ত মুখখানা গম্ভীর ক'রে, বড় বড় জলন্ত চোখ ছোটোর দৃষ্টি মঞ্জীর ফুর মুখখানার ওপর স্থাপন ক'রে স্নসেন দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—কেন, জানতে পারি কি ? রহস্তভেদ হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয় ?

মঞ্জী বললেন,—আপনি অনাচারী, অশুচি, অস্পৃশ্য, রাজার মৃতদেহ স্পর্শ ক'রবার অধিকার আপনার নেই।

এত বড় শক্ত কথা শুনেও রাজবৈষ্ণু স্নসেন রাগ ক'রলেন না, বিশ্বয়ও প্রকাশ ক'রলেন না ; শুধু একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে ব'ললেন,—আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তার ওপর চিকিৎসক। অনাচারী, অশুচি, ও অস্পৃশ্য আমি !—এ সকল প্রলাপোক্তির অর্থ কি ?

মঞ্জী হৃদ্ধার দিয়ে উত্তেজিত স্বরে ব'ললেন,—আপনারই পেশার দোষে। যে অর্থলোভী চিকিৎসক পয়সার জন্তে মুচি-মুদফরাসেরও বিছানায় ব'সতে কুণ্ঠিত নয়—তার আবার জাত ? জ্যাস্ত মানুন্দের কাছে বড় হিসেবে আপনার পক্ষে সব দরজা খোলা, অবাধ আপনার প্রবেশাধিকার ; কিন্তু সেই মানুষ ম'রলে তার ত্রিসীমাতেও আপনার যাওয়া নিষেধ, তা ছোঁয়া ত দূরের কথা ! ব্রাহ্মণ হ'লেও হিন্দুর শাস্ত্রবিধি আপনি লঙ্ঘন ক'রতে পারেন না।

স্নসেন বৈষ্ণু প্রতিবাদের স্নরে ব'ললেন,—রাজা যত দিন বেঁচে ছিলেন, এ ব্যবস্থা দেননি কেন ? তখন এ বিষয় সম্বন্ধে বোঝা-পড়া হ'তে পারতো।

মঞ্জী ব'ললেন,—ব্যবস্থা বরাবরই আছে ; এখন থেকে এই ব্যবস্থাই চলবে। আমরাই ব্যবস্থাপক।

মঞ্জীর কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দলের সকলেই তাঁর প্রস্তাবের সমর্থন ক'রে ব'লে উঠলো,—মঞ্জী-মশাই খাঁটি কথাই ব'লেছেন। রাজার দেহ নাই বা ছুঁলেন। যখন তিনি মারা গেছেন, তখন তাঁর দেহ নিয়ে খাঁটা-খাঁটি ক'রেই বা কি লাভ ? তাঁর দেহ পরীক্ষা ক'রে তাঁকে ত বাঁচাতে পারবেন না ; তবে আর বাজে তর্কে বৃথা কেন সময় নষ্ট ক'রবেন ?

কিন্তু এ সকল কথা শুনেও স্নসেন নিরস্ত হ'লেন না ; তিনি ব'ললেন,—রাজার দেহ কিরূপে বিযুক্ত হওয়ায় তিনি মারা গেলেন, তা-ও তো জানা উচিত। আমার যখন সন্দেহ হচ্ছে, আমি পরীক্ষা ক'রে সে সন্দেহ ভঞ্জন

করতে চাই। এ অধিকার আমার আছে, আমি যখন রাজার চিকিৎসক।

এ কথা শুনে মঞ্জী দাঁত খিঁচিয়ে ব'ললেন,—আর আমি একে রাজার মঞ্জী, তার ওপর তাঁর স্বস্তর—তাঁর ছোট রাণীর পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর, আমার 'ডবল' সন্মান ! স্নতরাং ভাল-মন্দ বিচার আমিই করব, তুমি কে হে, বাপু !—যাও, সরে পড়, শোকের সময় এ ভাবে আর বিরক্ত ক'রো না।

স্নসেন বৈষ্ণু কিন্তু নিরস্ত হ'তে নারাজ। রাজার মৃতদেহটি দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, স্বাভাবিক ভাবে কোন রোগে তাঁর মৃত্যু হয়নি ; নিশ্চয়ই তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হ'য়েছে। এর প্রতীকার তাঁকে করতেই হবে। তাই তিনি সকলকে লক্ষ্য ক'রে দৃঢ় স্বরে ব'ললেন,—আমি ব'লছি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি—রাজাকে বিষ খাইয়েই হত্যা করা হ'য়েছে। আমি এর প্রতীকার চাই, এই রাজহত্যার গুপ্ত-রহস্ত আমি উদঘাটন করতে চাই।

আগেই বলেছি, রাজার মৃতদেহ ঘিরে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল—তাদের দলের প্রায় সকলেই এই স্বস্তর-মঞ্জীটির হাতের লোক। রাজবাড়ীর অগ্র যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, তারাও এই কুচক্রী মঞ্জীকে ভয় ক'রতো, তাঁর আদেশ মেনে চ'লতো। কাজেই যার মনে যাই থাকুক, মঞ্জীর ভয়ে এ-কথা শুনেও তারা টুঁ শব্দটিও ক'রল না।

মঞ্জী এই সময় স্নসেনের কথাটা অগ্রাহ ক'রে উড়িয়ে দিবার ভঙ্গিতে ব'ললেন,—এই বড়টির মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে, তাই পাগলের মতো যা তা ব'লতে শুরু লজ্জা হ'চ্ছে না, তোমরা শুর কথায় কান দিয়ে না।—দেয়ী হ'য়ে যাচ্ছে, রাজার দেহ তুলে-নিয়ে সৎকার ক'রতে চল।

তখনই সাড়া প'ড়ে গেল।—সুস্তিত স্নসেন বৈদ্যের চোখের ওপরেই রাজার মৃতদেহ নিয়ে বিরাট মিছিল চলতে আরম্ভ ক'রল।

স্নসেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে শ্মশানগামী প্রাণহীন রাজদেহের দিকে চেয়ে ব্যাকুল স্বরে ব'ললেন,—মহারাজ ! রোগের কবল থেকে তোমাকে মুক্ত ক'রবার—তোমার

জীবন রক্ষা করবার ভার ছিল আমারই ওপর। কিন্তু রাজধানীতে আমার অল্পপস্থিতির সুযোগে কেউ তোমার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। এ মৃত্যুর রহস্য আমাকে আবিষ্কার করতেই হবে। আজ থেকে এই হ'ল আমার ব্রত। আমার প্রতিজ্ঞা, তোমার হত্যাকারীকে বা'র করে আমি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করবই। তোমার বেতনভোগী ভৃত্য আমি, এ কর্তব্য আমায় প্রাণপণে পালন করতেই হবে, মহারাজ !

এর পরই মন্ত্রী তাঁর মেয়ের পক্ষ থেকে পাটরাণী ঝর্ণারানীকে জব্দ করিবার জন্তে যে চক্রান্ত করেন, আর তা জানতে পেরে ঝর্ণারানী সব ছেড়ে, শুধু মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্তে কি কৌশলে রাজপুরী থেকে পালিয়ে যান—সে-সব কথা তোমরা আগেই শুনেছ।

কিন্তু ঝর্ণারানীর গায়ের রক্তমাখা চাদর, আর তাঁর মেয়ে লীনার ঘাগুরাটি দেখিয়ে যখন মন্ত্রীর তরফ থেকে সকলকে জানানো হ'ল যে, তারা ডাকাতির হাতে খুন হ'য়েছে,—তখন এই স্নসেন বৈদ্যই আবার তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি ব'ললেন—এ কথা সত্য হ'তে পারে না ; রাজার মৃত্যুর মতো এই কাণ্ডের ভেতরেও দুর্ভেদ্য রহস্য আছে, সন্দেহ নেই।

মন্ত্রী দেখলেন, আর সকলেই তাঁর কথা সত্য ব'লে মেনে নিচ্ছে, খালি এই লোকটাই লোকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলে, তাঁকে অপদস্থ করবার জন্তে ক্রমাগত চেষ্টা করছে ! স্নতরাং একে জব্দ না করলে তাঁর কল্যাণ নেই—এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না।

রাজার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই এই মন্ত্রী হ'য়ে বসেছেন রাজ্যের সর্বসর্কা। বল-বুদ্ধির কলকাঠি সবই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তাই রাজবৈদ্য স্নসেনকে তাঁর চালে মাত হ'তে হ'ল। সেই যে রাজার শ্মশানযাত্রার সময় মন্ত্রী তাঁকে ব'লেছিলেন—তুমি অনাচারী, অশুচি, অস্পৃশ্য ! এই কথাগুলিই স্নসেন বৈদ্যের কাল হ'য়ে দাঁড়ালো। মন্ত্রী জানতেন, নাড়ি-টেপা পেশাটির জোরে স্নসেন বৈদ্য বিস্তর টাকা উপার্জন করতেন, আর রাজা পর্যন্ত তাঁকে গুরু মতোই মানতেন, তাই—তাঁর স্বজাতি ব্রাহ্মণরা প্রকাশে তাঁকে যতই শ্রদ্ধা দেখাক না কেন, মনে-মনে তাঁর হিংসা করতো। এবার সুযোগ বুঝে—মন্ত্রী এই দিক দিয়ে এমনি

কৌশলে কল-কাঠি টিপে দিলেন যে, ব্রাহ্মণরা এক-জোট হ'য়ে তাদের এই গুণী ও মানী স্বজাতীয় ভদ্রলোকটির পেশার দোষ ধ'রে, তাঁকে জব্দ করবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে পড়লো।

স্নসেন বৈদ্যকে তারা জানালো,—আপনি আচারব্রত হ'য়েছেন। বৈদ্য-বৃত্তি ব্রাহ্মণের নয়, এতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অমর্যাদা হয়। সমাজে থাকতে হ'লে আপনাকে এ বৃত্তি ত্যাগ করতে হবে, আর এত দিন যে পাপ করছেন, তার জন্তে প্রায়শ্চিত্ত করে আপনাকে শুদ্ধ হ'তে হবে।

চিকিৎসা-ব্যবসায় ব্রাহ্মণের পেশা নয় বটে, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি। স্নসেন বৈদ্য ব'ললেন,—আমি যে কাজে ব্রতী, এর চেয়ে বড় কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। মানুষকে আমি ব্যাধিমুক্ত করি, মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করি। ব্যাধির সঙ্গে-সঙ্গেই বৈদ্যের সৃষ্টি। মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বৈদ্যশাস্ত্র রচনা করেন। সৃষ্টির সূচনা থেকে ব্রাহ্মণই বৈদ্য,—ব্রাহ্মণরাই করে আসছেন সকল ব্যাধিরই প্রতীকার ; আর আজ তোমরা ব'লছ, ব্রাহ্মণের পক্ষে সেটা অনাচার। আশ্চর্য্য বটে !

ব্রাহ্মণরা বললো,—মহর্ষিদের কথা আলাদা, তাঁরা ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। কলিযুগে এ সব খাটবে না। এখন আপনার সামনে দুই পথ। হয়—বৈদ্যবৃত্তি ছেড়ে প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণ হোন, নতুবা আমাদের সংস্রব ত্যাগ করে, ঐ পেশা নিয়েই থাকুন।

স্নসেন ব'ললেন,—বেশ, আমি আমার পেশাকেই মেনে নিলুম। নিষ্ঠার সঙ্গে আমি বৈদ্যশাস্ত্র প'ড়েছি, বৈদ্য-বৃত্তির ভেতর দিয়েই আমি আমার জীবনের ধর্ম ও কর্মের সন্ধান পেয়েছি ; আজ তোমাদের দয়াতে এই বৃত্তিকে নিয়েই আমি একটা আলাদা জাত হ'য়ে যাচ্ছি। এত কাল বৈদ্য কথাটার মানে ছিল—বিদ্বান কিম্বা চিকিৎসক। আজ থেকে বৈদ্য ব'লতে বোঝাবে—বৈদ্য জাতি। আর আমি হচ্ছি—এই জাতের আদিপুরুষ।

রাজবৈদ্য স্নব্রাহ্মণ স্নসেন এই দিন থেকে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধ ত্যাগ করে বৈদ্য হ'লেন। শুধু বৈদ্য হ'য়েই স্নসেন কান্দ হ'লেন না, প্রতিজ্ঞা করলেন—এই বৈদ্যের প্রতাপে সমস্ত বাঙলাকে তিনি এক দিন স্তম্ভিত করবেন।

এবার মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ! যে পাহাড়ে-মেয়েটিকে রাজ্যের সকলে পাটরাণী বলে জানতো, আর যার কোলের মেয়েটি তাঁর নাতনীর চেয়ে একটি মাত্র দিনের বড় বলে রাজার সিংহাসনে বসতো, রাজপুরীতে থাকলে খাদের নিয়ে গোল বাধবার একটা ভয় ছিল—তারা মানে-মানে পালাতে গিয়ে এমন জায়গায় প্রেরিত হ'য়েছে, যেখান থেকে আর তাদের ফিরে আসবার কোন আশাই নেই। তার পর—যে চালাক-চতুর রাজবৈদ্যটি তাঁর পিছনে লেগে তাঁকে বিপদে ফেলতে পারতো, মাথা খেলিয়ে তাকেও তিনি মাত ক'রেছেন ; এখন আর কে ঐ-সব ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসবে ? কাজেই তিনি এখন নিশ্চিত হ'য়েই রাজকন্যা নীলাকে উপলক্ষ ক'রে রাজ্যের সর্বস্বত্ব হ'য়ে বসলেন। তিনি এখন আর ঠিক মন্ত্রী নন, রাজ-প্রতিনিধি।

বাচ্চা মেয়ে নীলা একে ত রাজার মেয়ে, তার ওপরে সে-ই এখন রাজ্যের মালিক ; তার সেবা, যত্ন, আদর, খাতির যে কত, সে ত তোমরা বুঝতেই পারছ ! মাটিতে এখন তার পা-ছ'খানি ফেলবারও জো নেই—হাজার চোখ প'ড়ে থাকে তার পানে। আর এই আদরিণী রাজকন্যাটি জ্ঞান হ'বার পর হ'তেই বুঝতে পেরেছে, তার কোনও অভাব নেই, সে যা' চাইবে, তাই পাবে। ছোটবেলা থেকেই সে দেখেছে, তার মুখের একটি কথা শোনবার জন্তেই কত লোক কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে ! তার মুখের কথা শুনেই তারা হাঁটু-গেড়ে ব'সে জোড় হাত মাথায় তুলে বলে—আপনার কি হুকুম, রাজকন্যে ?

তার ফল এই হ'ল যে, রাজা বেঁচে থাকতে যে মেয়ের ছরস্তুপনা দেখে প্রাসাদস্বয়ং সকলের তাক লেগে যেত, রাজার মৃত্যুর পর দাছুর অজস্র আদর-যত্নে সেই মেয়েটি এমনি অপদার্থ হ'য়ে উঠলো—যেন সে মোমের পুতুলটি !

মেয়ের এই স্মৃতি দেখে রাণী অঙ্গনার মনে আনন্দ আর ধরে না ! রাজা বেঁচে থাকতে তাঁর এই মেয়েটি যখন ছরস্তুপনায় সবাইকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতো, আশে-পাশে যা চোখে প'ড়তো—তাঁই ফেলে, ভেঙ্গে-চূরে তছনছ করতো,—রাজা তখন তাঁর পাহাড়ে-রাণীর মেয়ে নীলাকে কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে ব'লতেন—দেখ দেখি, এটি

কেমন লক্ষ্মী ! এ জানে—এক দিন একে সিংহাসনে ব'সতে হবে, তাই লক্ষ্মীছাড়ার মতো মাটিতে ছটোপুটি করতে এ রাজী নয় !

রাজার কথাগুলো তখন ছোট রাণীর গায়ে যেন কাঁটার মতো বিঁধতো ! তিনি অমনি বাঁধিনীর মত ছুটে গিয়ে দস্তি মেয়ের ছরস্তুপনায় বাধা দিতেন ; ছম-দাম ক'রে তার পিঠে কীল-চড় বসিয়ে চোখ পাকিয়ে ব'লতেন,—পোড়ারমুখী মেয়ে ! কার কাছে এ-সব খেয়াল শিখিছিস বলতো শুনি !

রাজা তখন বাধা দিয়ে ব'লতেন,—আহা ক'রছো কি ? ছেলেমানুষ, ওর কি জ্ঞান-বুদ্ধি হ'য়েছে ! ছরস্তুপনা ওর স্বভাব, মারলে-ধরলে কি লীনার মতো সুশীলা হবে ভেবেছ ?

কিন্তু সেই মেয়ে নীলার কি পরিবর্তনই আজ হয়েছে ! এখন সে নিজের দু'টি পায়ে তার ছোট দেহখানির ভার বহিতেও নারাজ,—খেলা-ধূলা করা ত দূরের কথা ! রাণী অঙ্গনা এক-একবার ভাবেন, রাজা যদি একটি দণ্ডের জন্তেও স্বর্গ থেকে নেমে আসেন এখানে, তিনি তাঁকে দেখিয়ে দেন তাঁর মেয়েটিকে ; আর মুখখানা উচু ক'রে বলেন,—দেখছ তো, আমার বাবার হাতে প'ড়ে আমার সেই ছরস্তু মেয়ে নীলা এখন কি রকম শাস্ত হ'য়েছে ? তোমার সিংহাসনে তোমারি মতো কেমন ভারি কি হ'য়ে ব'সছে ! তোমার লীনা যদি বেঁচে থাকতো—পারত এমন ক'রে আমার নীলার মতো ব'সতে ?

ছোট রাণীর বাবা শ্রীগোপাল শর্মা নীলাকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলেন,—দেখছ ত মা, তোমার মেয়েকে কেমন মানুষ ক'রে তুলেছি ? এর পর দেখবে—ওর ইসারা-তেই এত বড় রাজ্যটি চলবে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কেউ কথা কইতে পারবে না—এমনি হবে ও রাসভারী !

কিন্তু এই রাজকন্যাটিকে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে, তাতে সে শুধু নিজের দিকটাই ভাল ক'রে দেখে আসছে। সে জানে—সবারই ওপরে তার আসন, তার ওপরে কেউ নেই। এমন কি, তার দাছ, তার মা—এরাও তার হুকুমে চ'লবে। আর যারা তার পরিচর্যা করে, সদাসর্বদা তাকে ঘিরে থাকে, তারা তো তার পোষা কুকুর, বিড়াল, গোক, ঘোড়ারই সামিল।

অম্বা দাসী যুমাবার আগে রাজকন্ঠা নীলার পদসেবা ক'রতো। অম্বার হাত ছ'খানি খুব নরম, আর পা-টেপবার ধরণটি বড় আরামের ছিল ব'লে, নীলা জানায়, সে যখন বিছানার শোবে, অম্বাই তার সেবা ক'রবে। অম্বা এতে যেন বর্ত্তে যায় ; তার মনে আছ্লাদ আর ধরে না। খাওয়া-দাওয়ার পর রাজকন্ঠা বিছানায় গু'য়ে-পড়লেই অম্বা তার পেছনে এসে পা-ছ'খানি কোলে নিয়ে বসতো ; পদসেবা ক'রে তার ঘুম পাড়ায়।

এক দিন রাজকন্ঠা পদসেবায় একটু খুঁত পেয়ে একে-বারে রেগেই আঙুন !

দাসীটি নিজের কোলের ওপর পা-ছ'খানি রেখে আস্তে আস্তে টিপে দিচ্ছিল। রাজকন্ঠা খপ্ ক'রে পা-ছ'খানি তার কোল থেকে তুলে-নিয়েই সজোরে মারলে তার মুখে এক লাথি ! 'মাগো'—ব'লে দাসীটি যাতনায় টেঁচিয়ে উঠলো। তখন জানতে পারা গেল, এ দাসী অম্বা নয় ! অম্বার অসুখ হওয়ায় তার বদলে অম্বা একটি দাসী রাজকন্ঠার পদসেবা করতে এসেছিল।

রাজকন্ঠার রাগ আরো চড়ে গেল। অম্বার অসুখের কথা সব চালাকি ! হুকুম হ'ল,—অম্বার ঘাড় ধ'রে টেনে আনো আমার কাছে, তার অসুখ আমি গুঁতোর চোটে সারিয়ে দিচ্ছি।

অম্বা দাসী মাথার অসুখে অস্থির হ'য়ে, তার ছোট্ট বিছানাটিতে প'ড়ে কাতরাচ্ছিল ; সেই অবস্থায় তাকে রাজকন্ঠার সামনে টেনে আনা হ'ল। রাজকন্ঠা তার মুখের পানে একটুবার চেয়েই ব'লে উঠলো,—ঘরের দেয়ালে ওর মাথাটা তিনবার খুব জোরে ঠুকে দে, তা হ'লেই ওর মাথার অসুখ সেরে যাবে।

কথাটা শুনে সবাই যেন আকাশ থেকে প'ড়ল ! সাত বছরের একটা মেয়ে—হলোই বা রাজকন্ঠা, এরাই একে ছ'বছর বয়স থেকে কোলে-পিঠে নিয়ে মানুষ ক'রে এসেছে,—আজ কি না তারই মুখে এই নিষ্ঠুর কথা ! মনে এতটুকু দরদ নেই ! অসুখের জন্ত পদসেবা করতে পারেনি, তার জন্তে এই কঠিন শাস্তি !

রাজকন্ঠা তার মাথাটা বালিসের ওপর থেকে উচু ক'রে দেখলো—তার দাসীরা সব খাটের সামনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তার সেই হুকুম তামিল

ক'রলো না। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো—চাঁপা দাসীর ওপরে।—অম্বার মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দেবার হুকুমটি সে তাকেই দিয়েছিল। রেশমী বালরের বাহার-দেওয়া, পাখীর পালকভরা মাথার বালিসটির নীচে পাণের সোণার ডিপেটি রাজকন্ঠার নজরে প'ড়তেই, সে খপ্ ক'রে সেটি তুলে নিয়ে, চাঁপার মাথায় সজোরে ছুড়ে মারলো। ডিপেটা গিয়ে লাগলো চাঁপার মুখে ; সজে-সজে তার ঠোঁট কেটে দর-দর ক'রে রক্তের ধারা ছুটলো।—মুখে ঝাঁচলটি চাঁপা দিয়ে চাঁপা হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

কিন্তু রাজকন্ঠা তাতে ক্রক্ষেপ না ক'রে চোখ-ছুটো পাকিয়ে চাইলো শ্রামা দাসীর পানে।—তারই ওপর এবার হুকুম হ'ল,—অম্বার মাথাটা ঘরের দেয়ালে ঠুকে দে—জোরে জোরে তিনবার। দেবী করলে তোর কপালেও—

কিন্তু চাঁপার শাস্তি দেখে শ্রামার আর এক মুহূর্ত্তও দেবী করতে সাহস হ'ল না। সে অম্বার মাথাটা ছুই হাতে ধ'রে জোরে জোরে তিনবার তার পেছনের দেয়ালে ঠুকে দিলে !

আঘাত পেয়ে অম্বা উঠলো চীৎকার ক'রে, আর তার কান্নার সজে-সজে রাজকন্ঠা নীলা গোলাপ ফুলের মতো তার সুন্দর মুখখানার ভেতর থেকে শাদা শাদা দাঁতগুলি বার ক'রে স্ফূর্ত্তিতে হেসে উঠলো, সজে-সজে ব'ললো, কেমন শাস্তি ! মাথার অসুখ সারলো এখন ?

সাত বছর বয়সেই যে-মেয়ের মেজাজ এমন বে-সায়ন্তা, এর পর তার সেই মেজাজ যে আরো কত উচুতে উঠেছিল, তা তোমরা সহজেই ধারণা করতে পারবে। আসছে বৈঠকে এর পরের সব কথা আমি বলবো। সে অনেক কথা, সে সব এখানেই আজ বন্ধ থাক।

—গল্প দাছ।

কাজের হৃদিশ

যে-কাজই আমরা করি না কেন, কাজ-হিসাবে প্রত্যেকটি কাজ করিবার বিশিষ্ট ধারা আছে। সে-ধারা মানিয়া না চলিলে এক জন যে-কাজ সহজে করিতে পারে, সেই কাজই অপরের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে !

লিখিতে বসিয়া কি ভাবে কলম ধরিব, তাহা জানা চাই ;
নহিলে আনাড়ির মতো কলম ধরিলে অক্ষর বা ছাঁদ
খারাপ হইবে, লিখিতে সময় বেশী লাগিবে, না হয়
লেখার লাইন ঝাঁকিয়া-চুরিয়া
যাইবে।

শুধু লেখার বেলায় নয়, সব
কাজের সম্বন্ধেই এ-কথা খাটে।

বাক্স-তোরঙ্গ বা লগেজ বহা—
কেহ স্বচ্ছন্দে বহিতে পারে, আবার
কেহ-বা সামান্য একটা স্লটকেশ
বহিতে হিমসিম খায় ! দেওয়ালে
বা প্যাকিং-বাক্সে পেরেক-আঁটা—
কেহ চমৎকার টাইট-ভাবে পেরেক
আঁটে, কেহ-বা পেরেক আঁটিতে
গিয়া হাতুড়ির ঘায়ে আঙুল
ছেঁচিয়া ফেলে, পেরেকও ঝাঁকিয়া-
চুরিয়া বাহির হইয়া আসে,—
দেওয়ালের গায়ে শত স্থান পেরেক-
কব ঘায়ে চূণ-বালি খসিয়া বিক্রী
কদর্যা হয় ! এমন যে ঘটে, তার
কারণ, কাজের হৃদিশ কেহ জানে,
কেহ জানে না। যে জানে,
কাজের নামে সে ভয় পায় না,
তার হাতে কাজ সুসম্পন্ন হয়।
আর সে-হৃদিশ যে জানে না, তার
কাছে কাজ যেন বাঘ ! তার
কাজ কোনো দিন সফল বা সুন্দর
হয় না। বল-খেলা বলো, চড়ি-
ভাতি বলো অর্থাৎ সকল
ব্যাপারেই এ কথা খাটে। তোমা-

দের মধ্যে যারা বক্সিং দেখিয়াছ, কুস্তির প্যাচ দেখিয়াছ,
নিশ্চয় তারা ওস্তাদ-খেলোয়াড়ের কৌশল দেখিয়া বিন্মিত
বিমুগ্ধ হইয়াছ !

আমাদের নিত্যকার ছু'-চারিটা কাজের হৃদিশের
কথা বলিতেছি।

বড় বাক্স-তোরঙ্গ বহার কৌশলের কথা প্রথমে

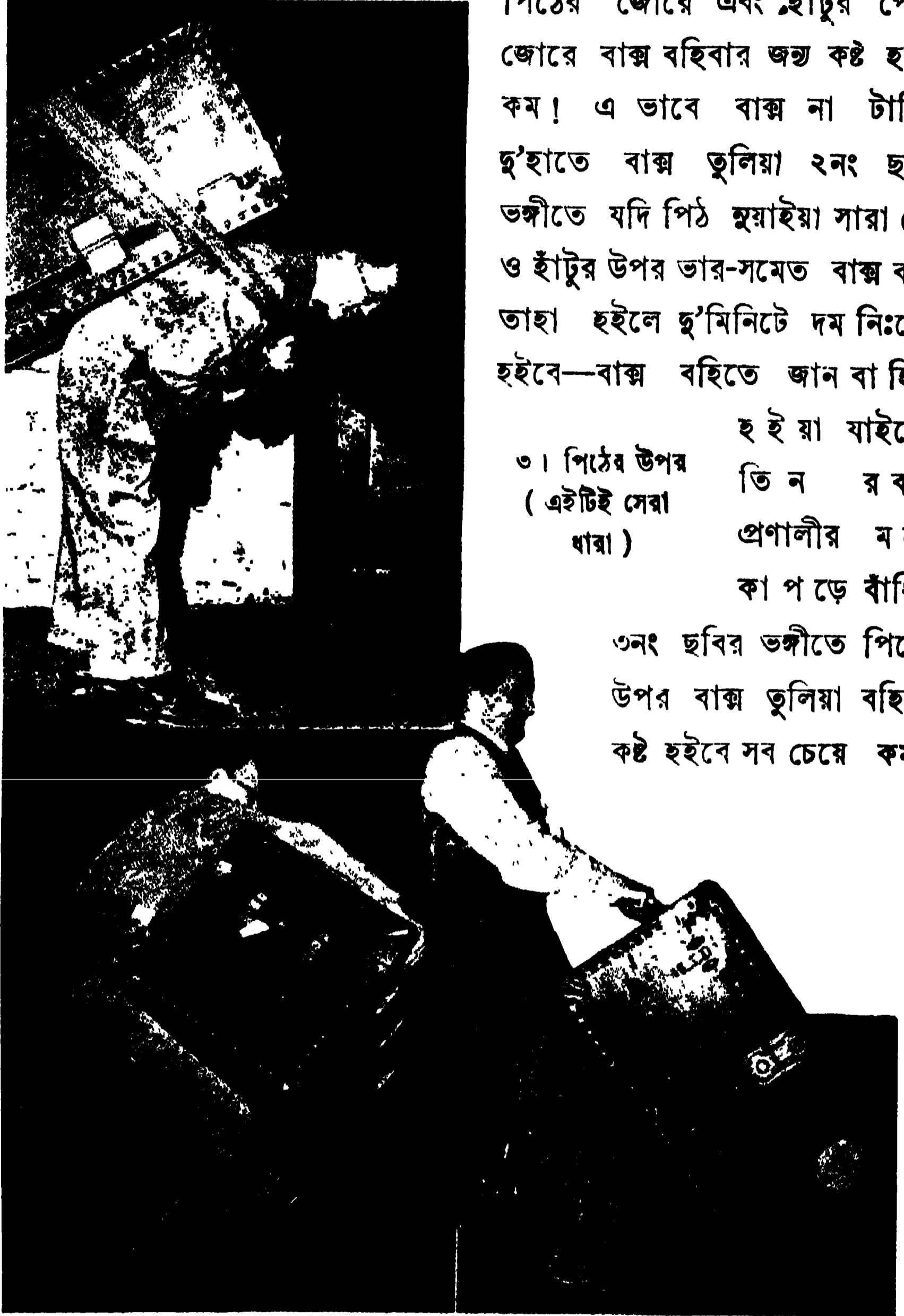
বলি। পর-পর যে-তিনখানি ছবি দেখিতেছ,—ভারী বড়
একটা বাক্স বহার ছবি এক দিক তুলিয়া ধরিয়া হাঁটুর ভর
দিয়া ছু' হাতে বাক্স ধরিয়া ঐ যে টানাটানি ! ইহাতে

পিঠের জোরে এবং হাঁটুর পেশীর
জোরে বাক্স বহিবার জ্ঞ কষ্ট হইবে
কম ! এ ভাবে বাক্স না টানিয়া
ছু'হাতে বাক্স তুলিয়া ২নং ছবির
ভঙ্গীতে যদি পিঠ মুয়াইয়া সারা দেহ
ও হাঁটুর উপর ভার-সমেত বাক্স বহি,
তাহা হইলে ছু'মিনিটে দম নিঃশেষ
হইবে—বাক্স বহিতে জান বা হি র
হ ই য়া যাইবে।

৩। পিঠের উপর
(এইটিই সেরা
ধারা)

তি ন র ক ম
প্রণালীর মধ্যে
কা প ড়ে বাধিয়া

৩নং ছবির ভঙ্গীতে পিঠের
উপর বাক্স তুলিয়া বহিলে
কষ্ট হইবে সব চেয়ে কম !



২। ছু'হাতে তুলিয়া

১। বাক্স ধরিয়া টানাটানি

তার পর ৪ এবং ৫নং ছবি ঠাখো। চারিটা স্লটকেশ
বহিতে হইবে। কি করিয়া বহিবে ? ৪নং ছবির ভঙ্গীতে
এক-হাতে একটি কেশ, অপর হাতে তিনটি লইয়া
বহিতে গেলে দেহের ব্যালান্স থাকিবে না ; দেহ এক
দিকে হেলিয়া থাকিবে এবং এ-ভাবে দেহ হেলিয়া থাকিলে
গায়ে ব্যথা হইবে, কষ্ট হইবে খুব বেশী এবং পাঁচ বার

বাক্স নামাইতে হইবে! এ-ভাবে চারটি স্লটকেশ না
বহিয়া ৫নং ছবির ভঙ্গীতে সমান-ভাগাভাগি ভাবে বহিলে

মাত্র তুলিয়া মোজা পরিয়ো—তাহাতে দেহের সমতা
রক্ষা পাইবে এবং সহজে ও স্বচ্ছন্দভাবে মোজা পরিতে
পারিবে।

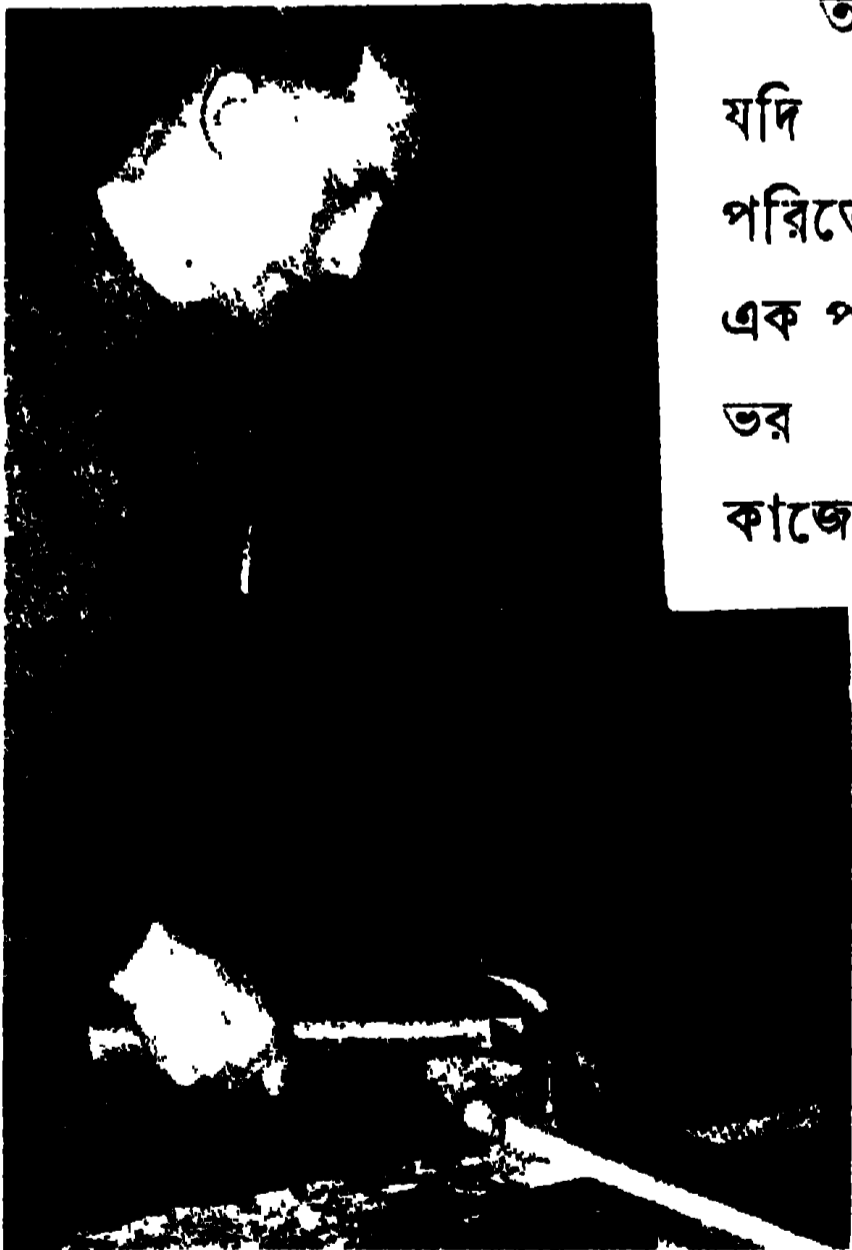


৪। এক-হাতে একটি

৫। দু'হাতে ভাগাভাগি

দেহের ব্যালান্স রক্ষা পাইবে, কষ্টও কম হইবে।
এই ধরণটিই সঠিক ভঙ্গী জানিয়ো।

ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটিয়া পেশীগুলো হুম্‌ড়িয়া-মুচ্‌ড়িয়া
বেদনাতুর হইবে।



৬। ঠিক ধরা

তার পর দাঁড়াইয়া
যদি দু'-পায়ে মোজা
পরিতে হয়, কি করিবে?
এক পায়ের উপর দেহের
ভর রাখা যায় না।
কাজেই এক পা মেঝেয়
রাখিয়া অপর
পা তুলিয়া সে-
পায়ে মোজা
আঁটবার চেষ্টা
করিলে দেহের
ব্যালান্স হারা-
ইয়া টলিয়া
পড়িবে। না

পড়িলেও তাহাতে অস্বাচ্ছন্দ্যের সীমা থাকিবে না। তাহা
না করিয়া এক-পা মেঝেয় রাখিয়া যে-পায়ে মোজা
পরিলে, সে-পায়ের চেটো মেঝেয় রাখিয়া গোড়ালিটুকু

হাতুড়ি ধরিতে হইলে ৬নং
ছবির ভঙ্গীতে হাতুড়ি ধরিয়ো।
তাহাতে কজ্জীতে জোর পাইবে,—
হাতুড়ির আঘাত হইবে গুরুগম্ভীর ও
সার্থক। ৭নং ছবির ভঙ্গীতে ধরিলে
হাতুড়িকে কায়দা করিতে পারিবে
না।

চেয়ারে বসা—তাহারো কৌশল
জানা চাই। যখন চেয়ারে বসিবে,
মাথা তুলিয়া সিধা-ভাবে বসিয়ো,—
এ-ভাবে বসায় ক্লান্তি বোধ করিবে
না। ঝুঁকিয়া বা বাঁকিয়া চেয়ারে
বসিলে পিঠের মেরুদণ্ড ব্যথার ভরে
টনটন করিবে, দেহে রক্ত-চলাচল-

বাইসিক্ল চড়াতেও কৌশলের প্রয়োজন। হাঁটু

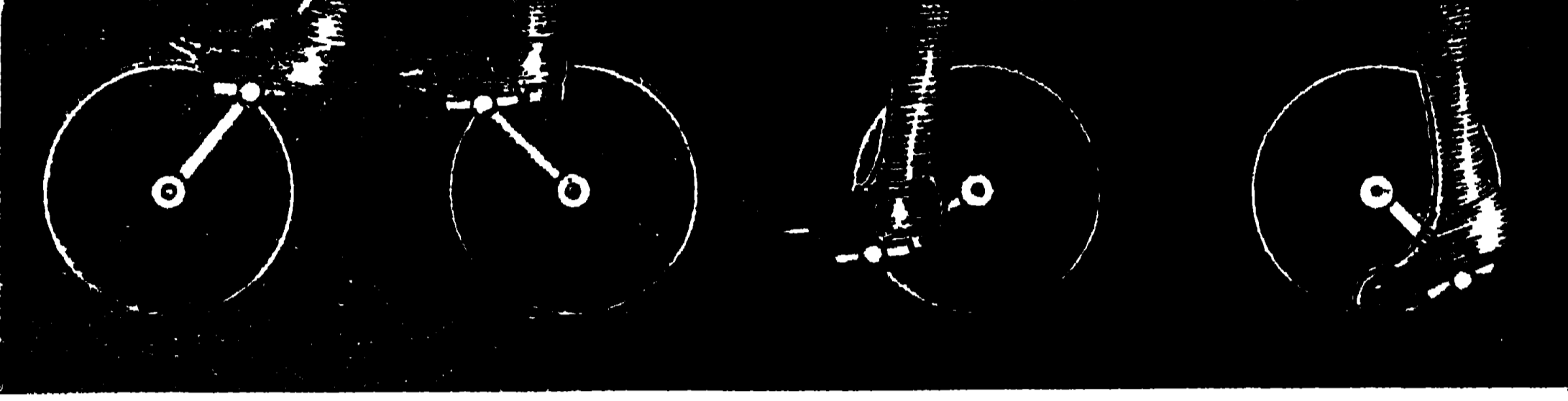


৭। ভুল হাতুড়ি ধরা

যত মোচড় পাইবে, বাইসিক্ল-চালনায় তত শ্রান্তি
বোধ করিবে। তার পর বাইসিক্ল-চালনায় প্যাডলিংয়ের
উপরেই দ্বিচক্র-গাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য। ৮নং ছবির

ভঙ্গীতে প্যাড্লে পা না রাখিয়া ৯নং ছবির ভঙ্গীতে পা রাখিয়া প্যাড্লে করিয়ো, দেখিবে, ছ'-সাত ঘণ্টা অবিরাম বাইসিক্লে চালাইলেও ক্লান্তি বোধ করিবে না—তার উপর সাইক্লে চলিবে দ্রুততর গতিতে।

মে-কোনো কাজই করো, দেহকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে রক্ষা করিয়ো, তাহা হইলে কাজে কষ্ট বা



৮। এমন নয়

অস্বাচ্ছন্দ্য চইবে কম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক অবস্থানে সব কাজ কষ্টকর এবং দারুণ দুঃসাধ্য হয়, এ কথাটি সব সময়ে মনে রাখিয়ো।

—

পলকে প্রলয়

এ্যাক্সিডেন্ট বা দৈব-দুর্ঘটনা—চক্ষের পলকে অকস্মাৎ এমন বহু ঘটনা ঘটে, যাহা নিবারণ করিবার কোনো উপায় থাকে না! অথচ এ দুর্ঘটনায় কাহারো চোট-জখম হইলে তার অব্যবহিত-পরের-ক্ষণটুকুর উপর মানুষের জীবন-মরণ অনেক-সময় নির্ভর করে! এই ক্ষণটুকুতে আমরা যদি যথারীতি কর্তব্য করিতে না পারি, তাহা হইলেই সর্বনাশ!

পথে মোটর-এ্যাক্সিডেন্ট কিম্বা খেলার মাঠে এ্যাক্সিডেন্ট ঘটিলে কেহ যদি জখম হন, তাহা হইলে তখন ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, দু'-চার মাইল বা দশ-বারো মাইলের মধ্যে ডাক্তার মেলে না! শ্বাসরোধ হইয়া কিম্বা দারুণ রক্তস্রাবে, কিম্বা সর্প-দংশন ঘটিলে বিষের ফলে অথবা আঘাত-জনিত 'শক' (shock) বা সন্মোহে আহত ব্যক্তি মারা যাইতে পারেন। কাজেই এ অবস্থায় কি করিব? মোটরের আঘাতে কারো চোট-জখম হইলে

আনাড়ির মতো তাঁকে টানা-তোলা করিতে নাই, তাহাতে বিপত্তি ঘটতে পারে। হয় তো তাঁর বুকের পাজরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিম্বা গলার কোনো হাড় ভাঙ্গিয়াছে! এ অবস্থায় তাঁকে ঠাই-নাড়া না করিয়া যেখানে এ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়াছে, সেইখানেই রাখিয়া ডাক্তার বা যারা যথাযোগ্য পরিচর্যা জানেন,

এমন কাহাকেও ডাকিয়া আনিবে!

গলার হাড় বা বুকের পাজরা ভাঙ্গিলে সে-অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে আনাড়ির মতো নাড়া-

৯। এমনি!

চাড়া করিলে নানা উপসর্গ ঘটিয়া তাঁর প্রাণনাশ ঘটতে পারে; অথচ সতর্ক পরিচর্যায় এ-বিপত্তি অনায়াসে নিবারণ করা চলে।

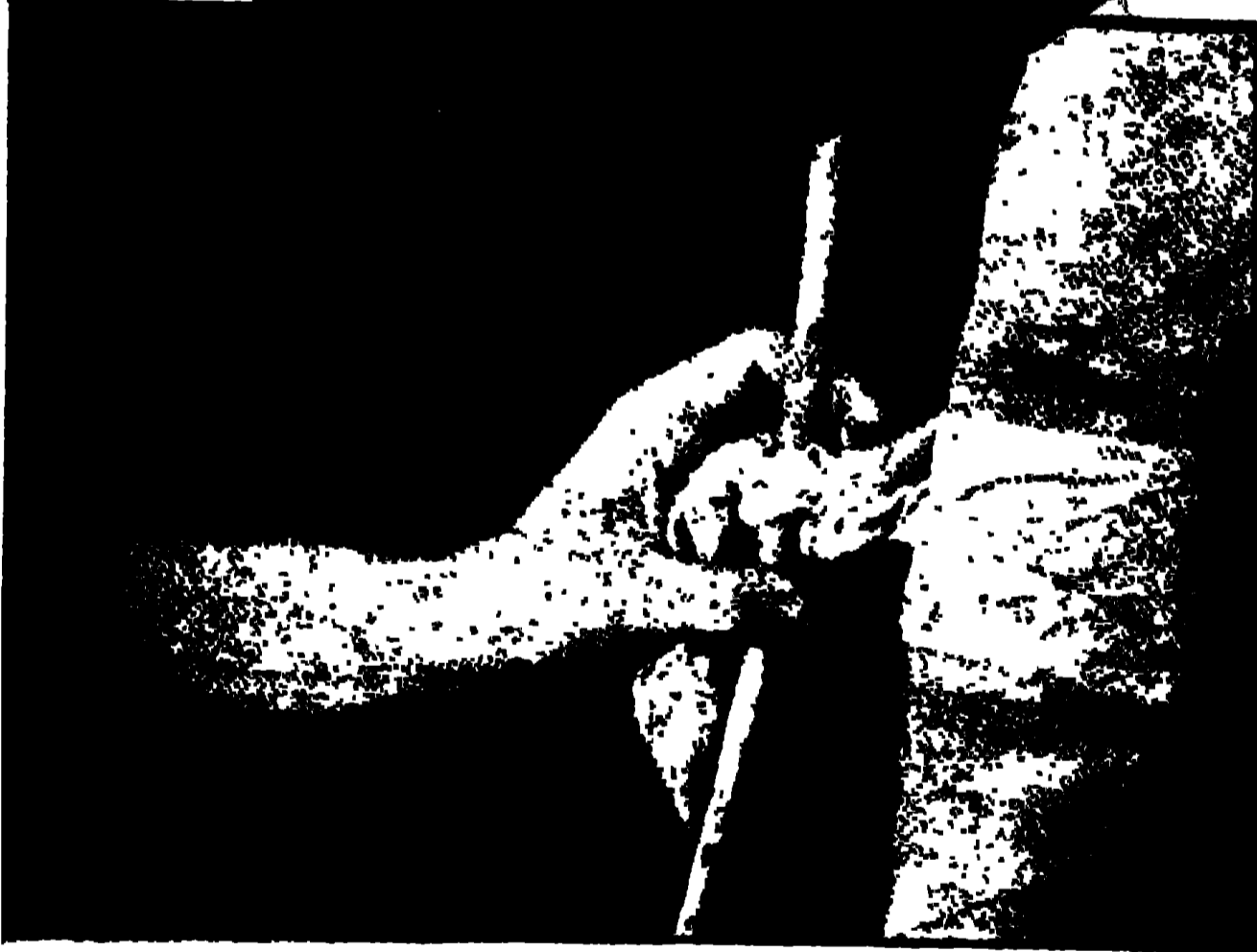
হাড়গোড়-ভাঙ্গার ফলে মানুষের মৃত্যু কিম্বা জখমী ব্যক্তি জন্মের মতো বিকলাঙ্গ হইতে পারে। এ জন্ত আনাড়ি-হাতে জখমী ব্যক্তিকে টানা-ইঁচড়া করা খুব অশ্রায়। টানাটানিতে ভাঙ্গা হাড়ের কুচি লাগিয়া দেহের রক্তনলী (blood-vessels) ছিঁড়িয়া রক্তস্রাব ঘটতে পারে; ক্ষত সেপ্টিক হইতে পারে; এবং তার ফলে হয় তো একটা অঙ্গ কাটিয়া বাদ (amputation) দিতে হয়! পাজরার ভাঙ্গা হাড়ের খোঁচায় ফুশফুশ-যন্ত্র ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, তার ফলে মৃত্যু সুনিশ্চিত! কোথায় হাড় ভাঙ্গিয়াছে, বুঝিবার উপায় যখন নাই, তখন পথে বা খেলার মাঠে কিম্বা অল্প জায়গায় এ্যাক্সিডেন্টে কাহারো চোট-জখম হইলে আনাড়ি-হাতে কদাচ তাঁকে টানা-তোলা করিয়ো না! সে-অবস্থায় তাঁকে যতখানি স্বচ্ছন্দ রাখিতে পারো, রাখিবে; তার বেশী আর-কিছু করিয়ো না!

হাড় ভাঙ্গিলে splint বা বাড় বাঁধিতে হয়। এ-কাজ বিশেষজ্ঞ ভিন্ন আর কাহারো করা উচিত নয়। বাঁধার ক্রটিতে অনেকে পরে বিকলাঙ্গ হইতে দেখা গিয়াছে। এ জন্ত এ্যাক্সিডেন্ট ঘটিলে যোগ্য চিকিৎসকের

পরিচর্যা-লাভেব পূর্বে কি করা উচিত, ছোট বয়স হইতে তাহা শেখা প্রয়োজন। সে-সময়ে আমরা মোটামুটি সাধারণ ক'টি কথা তোমাদের বলিয়া রাখি। কথাগুলি ভালো করিয়া বুঝিবে। এই প্রাথমিক বিধি জানা থাকিলে এ্যাক্সিডেন্ট ঘটবার পরক্ষণেই যোগ্য সেবা-পরিচর্যায় আহত ব্যক্তিকে



১।
হাতের
রক্ত বন্ধ
করা



২। টুর্নিকেট-বীতি

শুধু যে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে সমর্থ হইবে, তা নয়; বহু ক্ষেত্রে তাদের প্রাণ-রক্ষা করিতে পারিবে।

দেহের কোনো জায়গার হাড় ভাঙ্গিলে তার পরিচর্যার জন্য যোগ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য পাইতে যদি বিলম্ব হয়, তাহাতে তেমন অনিষ্ট হইবে না; কিন্তু আঘাতের ফলে যেখানে প্রচুর রক্তস্রাব ঘটিতেছে, সেখানে আশু-প্রতিকারের উপায় না করিলে ফল হইবে সাংঘাতিক।

শিরা-বন্ধনী কাটিয়া-ছিঁড়িয়া রক্তস্রাব ঘটিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে মানুষের মৃত্যু ঘটা বিচিত্র নয়! আহত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব ঘটিতেছে দেখিলে প্রথমেই হাতের চাপ দিয়া সে-রক্ত বন্ধ করিতে হইবে। যেখান দিয়া রক্ত পড়িতেছে, সেই জায়গা এবং যেখানে হৃদযন্ত্রের অবস্থান, এই দু'জায়গায় আঙুল দিয়া চাপিয়া থাকিবে বহুক্ষণ,—যতক্ষণ না রক্তস্রাব বন্ধ হয়! আমাদের দেহের ক'জায়গায় হাড়ের উপর দিয়া শিরা-উপশিরা বহিয়া গিয়াছে; এ শিরা-বন্ধনী কাটিলে যদি এ শিরা-বন্ধনীর অবস্থান নির্ণয় করিতে পারো, তাহা হইলে রক্তপড়া বন্ধ করা সহজ হইবে। সে-অবস্থান শিথিতে হইবে সচিত্র শরীর-তত্ত্বের বই পড়িয়া। এ্যাদভেদ্য এবং রূপকথার গল্প-কাহিনীর মতো এ-বই পড়িয়া আয়ত্ত করা প্রয়োজন। কারণ আত্মীয়-বন্ধু, সঙ্গী-সহচর-দিগের মধ্যে কার কবে এ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে, জানা নাই! এ বিদ্যা জানা থাকিলে এ্যাক্সিডেন্ট ঘটিলে বহু ক্ষেত্রে তাদের যে অকাল-মৃত্যু ঘটবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই!

টুর্নিকেট-বীতিতে (২নং ছবি দেখা) দারুণ রক্তস্রাব চক্ষের নিমেষে বন্ধ করা যাইবে। রক্তস্রাব হইতেছে দেখিলে তখনি ক্ষতস্থানে কাপড় বা উড়ানি ছিঁড়িয়া কিম্বা ক্রমাল, মোজা অথবা তুলার প্যাড—অর্থাৎ নরম কোনো আচ্ছাদনী দিয়া বেশ চওড়া ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দিবে। আঁট করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিবে। বাধিয়া নিশ্চিত হইলে চলিবে না; পনেরো মিনিট অন্তর এ-বাঁধন একবার করিয়া আলুগা করিয়া দেওয়া চাই, নহিলে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত-চলাচলের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া, আহত

ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিতে পারে। এ-ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া যোগ্য চিকিৎসক আনাইতে ভুলিয়া না। আহতকে টানাটানি করিয়া এ-সময় চিকিৎসকের কাছে লইয়া না গিয়া আহতকে বিশ্রাম করিতে দিয়ো!

আঘাত-জনিত শক বা উত্তেজনা বড় ভয়ঙ্কর! দেহের হাড় ভাঙ্গিলে বা রক্ত-ক্ষরণ হইলে সে-শকে অনেক সময় মৃত্যু ঘটে। সে-শক নিবারণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়,

—কাজেই এ বিপদে মানুষ যেটুকু করিতে পারে, সেটুকু করিতে যেন কালক্ষেপ, গোলযোগ বা চেষ্টামেচি না হয়,—সে সম্বন্ধে হুঁশিয়ার!

শকের লক্ষণ প্রকাশ পায় আহতের বিবর্ণতায় এবং মূর্ছাতুর ভাবে! শকের জন্তু কপালে এবং করতলে গভীর শ্বেদ-সঞ্চার হয়; হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হইয়া আসে; এবং নাড়ীর গতি অতিশয় ক্ষিপ্ত ও ক্ষীণ; এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়মিত হয়। অনেক সময় শীতকম্প ও বিব-



মিষা দেখা দেয়। চেতনা থাকিলেও রোগী কেমন আচ্ছন্নের মতো হইয়া পড়েন; তাঁর চিন্তাশক্তি লোপ পায়। তিনি কথা বলিতে পারেন না। 'কেমন আছেন?' বার-বার জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর মেলে না! কিম্বা

৩। খপরের কাগজ দিয়া বাড় বাঁধা উত্তর যদি বা মেলে, সে-উত্তর হয় অতি-ক্ষীণ! রোগী বড়জোর বলেন, 'দুর্বল' কিম্বা 'শীত করিতেছে'।

এ-অবস্থা ঘটিলে রোগীকে গরম (warm) করা চাই। শাল, আলোয়ান, সূজনি, কপুল, গরম জামা বা হাতের কাছে হালুকা যে-কাপড় মিলিবে, তাহা দিয়া তখন তাঁর দেহ বেশ ঢাকিয়া দিবে। সম্ভব হইলে গরম জলের বোতল লইয়া সেক দিবে। বোতল, ফ্লানেল কাছে না থাকিলে 'থান-ইট' তাতাইয়া তার সেক দিবে। এ সময় গা ডলিয়া দিলে বিশেষ লাভ হইবে না। তা ছাড়া গা ডলিয়া দিতে গেলে গায়ের আচ্ছাদনী খুলিয়া দিতে হয়। সে-কাজ সম্পূর্ণ অমুচিত হইবে।

মস্তিষ্কে কিম্বা হৃদযন্ত্রে অপ্রচুর রক্ত-সঞ্চালনহেতু 'শক' হয়। এ জন্তু আহতকে এ সময় ঠিক-ভাবে অবস্থিত রাখিবে। এ অবস্থায় রোগীকে লম্বালম্বি ভাবে শোয়াইয়া দিয়ো। মাথায় বালিশ দিয়ো না—মাথা নীচুতে রাখিয়া

কোমর হইতে পায়ের তলা পর্যন্ত উচু করিয়া রাখিবে। বুকে চোট না লাগিলে এ-অবস্থায় রোগীকে কখনো বসিয়া থাকিতে দিবে না। মাথায় চোট লাগিলে লম্বালম্বি ভাবে তাকে শোয়াইয়া রাখিবে—পা যেন উর্দ্ধে তোলা না থাকে।

আহতকে কিছু গরম দুধ খাইতে দিতে পারে' তবে না দিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, ষ্টিমুলান্টের চেয়ে এ-সময় দেহে উত্তাপ-দান ও দেহকে সঠিক ভাবে শাসিত রাখার প্রয়োজন অনেক-বেশী। এ সময় আধ-গ্লাস জলে এক-চামচ (চায়ের চামচ) অ্যারোমিটিক স্পিরিট অফ এ্যামোনিয়া পান করাইলে অনেক উপকার হইবে! দুধের চেয়ে গরম চা, গরম কফি উপকারী। চামচে



৪। এমনি করিয়া চেয়ারে বসাইয়া

করিয়া পান করাইবে; কিম্বা সামর্থ্য থাকিলে রোগী চুমুক দিয়া পান করিবেন। এক-চুমুকে নিঃশেষ পান করা নয়—টোকে-টোকে পান করাইয়ো। ব্রাণ্ডি কদাচ দিবে না; কারণ, ব্রাণ্ডির ফল অবসাদ-জনক (depressing).—Alcoholic drinks at such time are depressants not stimulants and should not be given. তবে রক্তক্ষরণ বন্ধ হইবাব পূর্বে কিম্বা রোগী যদি অচেতন থাকেন, তাহা হইলে কোনো পানীয় তাঁর মুখে দিবে না।

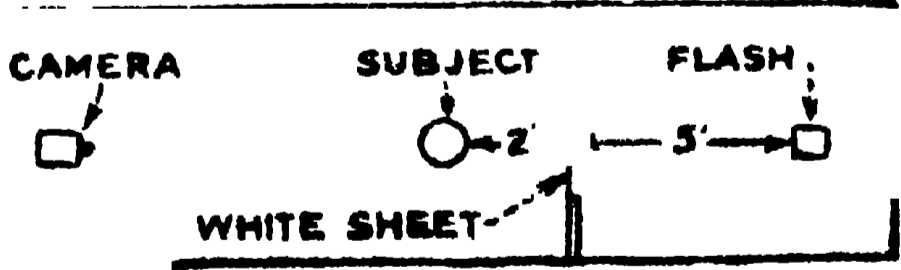
আহত ব্যক্তিকে বহিবার সময় পাঁজাকোলা করিয়া বহা উচিত নয়। পূর্ব-পৃষ্ঠার ৪নং ছবির ভঙ্গিতে চেয়ারে বসাইয়া তাঁকে লইয়া যাইবে।

কেহ বিষপান করিলে তখনি চিকিৎসক ডাকিবে। পাকস্থলী ধোয়াইয়া এ বিষ নিষ্কাশিত করা প্রয়োজন। বিষ-নিষ্কাশনের জন্ত রোগীকে সাবান-জল বা লবণ-জল কিম্বা দুধ, কফি বা সুপ পান করিতে দিবে। ইহাতেও যদি বমি না হয়, জল পান করাইয়া গলার বাহিরে শুড়শুড়ি দিবে। শুড়শুড়ি দিলে রোগীর বমি হইবে; সে-বমির সঙ্গে বিষ নিষ্কাশিত হইবেই। এ সময়ে তরল পানীয় প্রচুর পান করাইয়ো। তাহাতে বমি হইবে এবং বমি হইলে বিষ বাহির হইয়া যাইবে। এ পরিচর্যা করিলেও খুব-শীঘ্র চিকিৎসক আনা হইবার ব্যবস্থায় যেন ক্রটি না হয়।

আমাদের কুশ-কুশ-যন্ত্রটি যদি যথারীতি অক্সিজেন-বাম্প পাম্প করিয়া দেহে পরিচালিত করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের শ্বাসরোধ (suffocation) ঘটে। গলায় দড়ি, বিষবাম্প-গ্রহণ, জলে ডোবা, বৈদ্যুতিক শক্—এ সবে শ্বাসরোধ ঘটে। শ্বাসরোধ ঘটিলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-বহানো (artificial respiration) প্রয়োজন। এ জন্ত চিকিৎসকের শরণ-গ্রহণ অবশ্য-কর্তব্য। কারণ, এ বিঘা বই পড়িয়া শেখা যায় না।

চিত্র-চতুরিকা

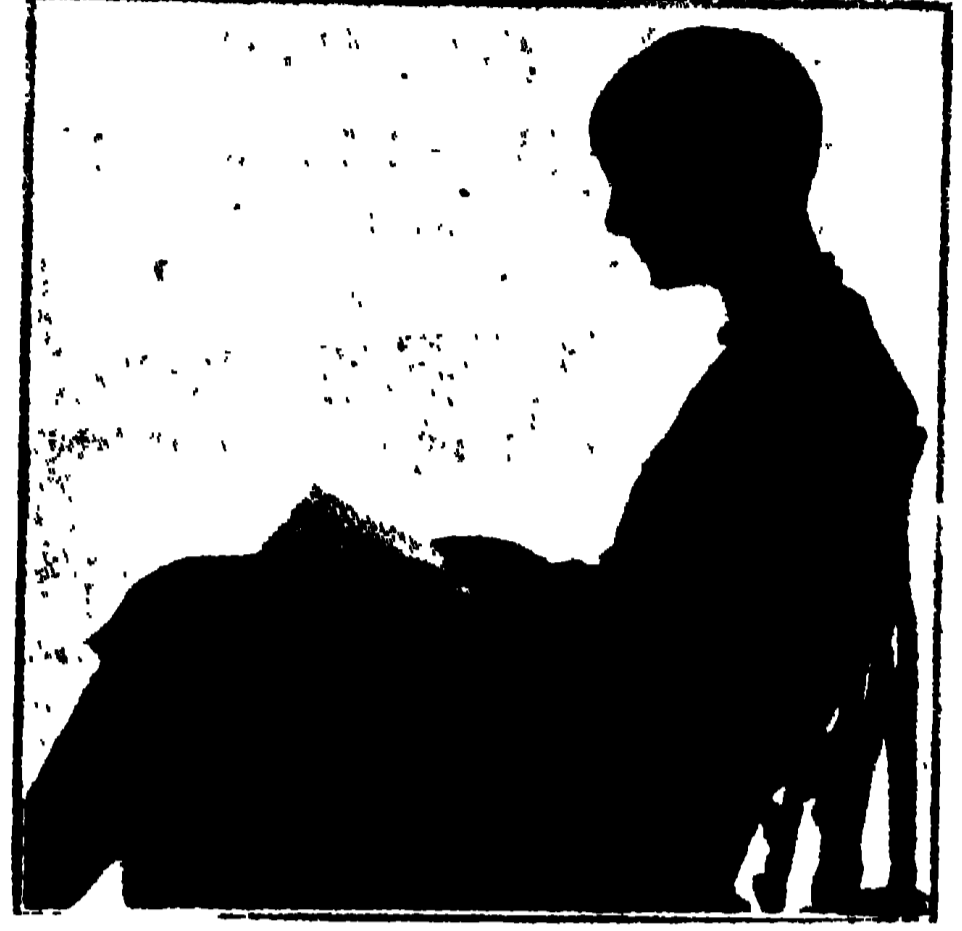
তোমাদের মধ্যে অনেকের ক্যামেরা আছে এবং সে ক্যামেরা লইয়া ছবি তোলার কাজে কেবলমতি দেখাইবার



১। অবস্থান-নির্দেশ

জন্ত তোমরা আকুল! 'মাসিক-বঙ্গমতী'র ১৩৪৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যায় ক্যামেরার কেবলমতির কয়েকটি কথা পূর্বে লিখিয়াছিলাম, আজ আবার কিছু নূতন-কথা বলিতেছি।

প্রথমেই ধরো সিলুয়েট-ছবি। ২নং ছবিতে যে-সিলুয়েট দেখিতেছ, এ-সিলুয়েট কি করিয়া তুলিবে? যার ফটো তুলিবে, তাঁকে বসাত বড় একখানি পর্দার দু' ফুট দূরে



২। সিলুয়েট

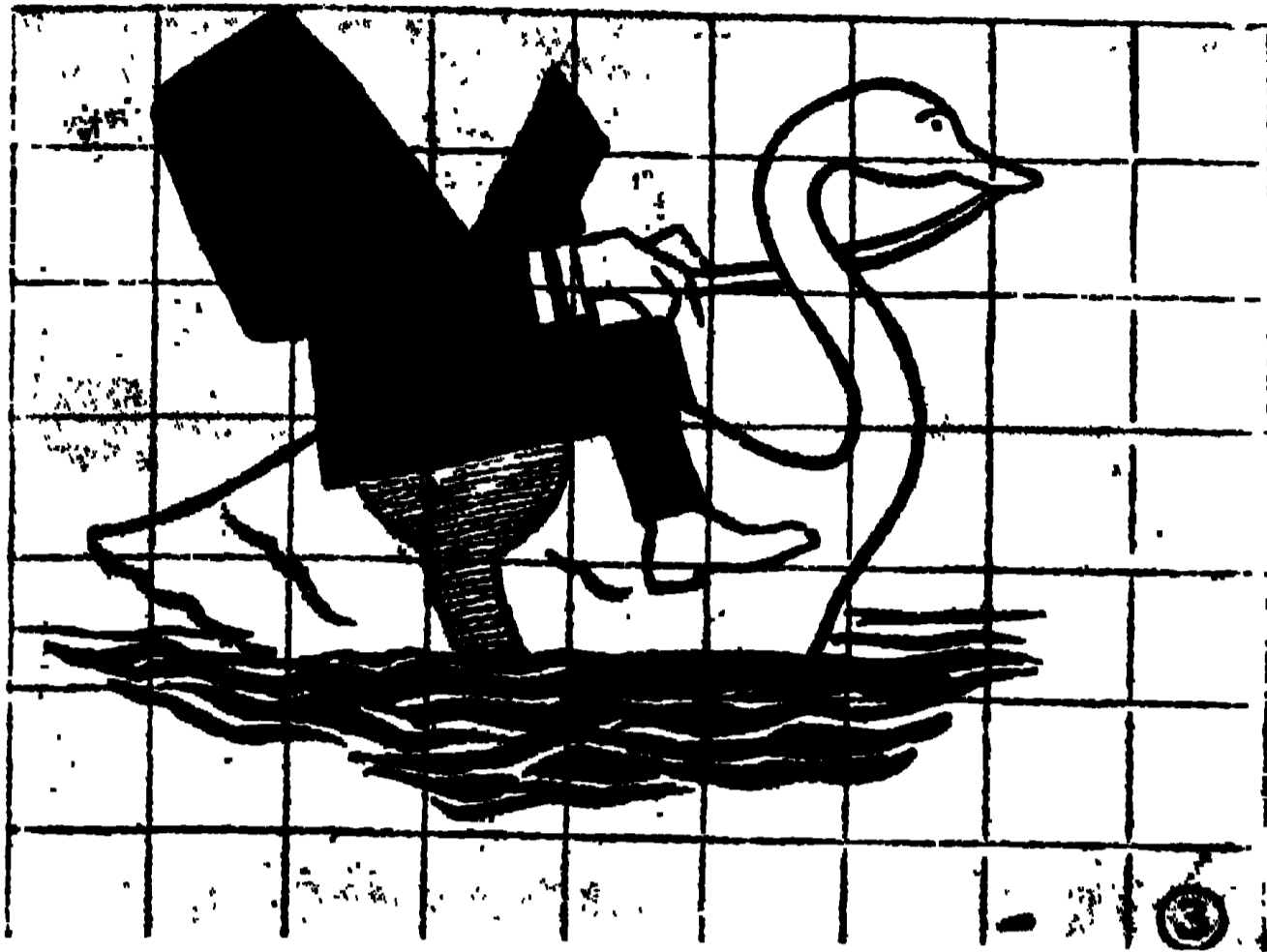
সামনে। বিছানার চাদর খাশা পর্দা হইবে। পর্দার পাঁচ ফুট পিছনে রাখো ফ্যাশ-লাইট—আর যার ছবি তুলিবে, তাঁর সামনের দিকে রাখো ক্যামেরা। যে-ঘরে ছবি তুলিতেছ, সে-ঘরটি অন্ধকার করিয়া দাও। কোথাও এত-টুকু রক্ত-পথ দিয়া যেন এক বিন্দু আলো এ-ঘরে না প্রবেশ



৩। আর একখানি সিলুয়েট

করে! যার ছবি তুলিতেছ, তাঁকে এমন ভাবে বসাত যে, তাঁর মুখ সম্পূর্ণ "প্রোফাইলে" থাকিবে। চোখের পাতার ছায়াও যেন ক্যামেরায় আভাসে না দেখা যায়, এমন ভাবে বসাইতে হইবে। তার পর ক্যামেরার শাটার খুলিয়া পিছনকার ঐ আলো জালিয়া দাও। আলো জলিবামাত্র ক্যামেরার শাটার বন্ধ করো—ব্যস! এবার ঘরের দ্বার-জানলা খুলিয়া দাও। তোমার

কাজ চুকিয়া গিয়াছে। ছবি ডেভেলপ আর প্রিন্ট? মায়ুলি প্রথায় করে। ১নম্বরের রেখা-চিত্র দেখিলে ক্যামেরা ও পর্দা প্রভৃতির অবস্থানের হদিশ পাইবে।



৪। আঁকিয়া লও



৫। আজব ছবি

তার পর কাটুন বা আজব ছবি! প্রথমেই ৪নং ছবির মতো একখানি রঙ্গ-চিত্র আঁকিয়া লও। এটি ফটোর 'ফোর-গ্রাউণ্ড'। এ ছবির মূর্তির ঘাড়ে মুখ ও মাথা থাকিবে না। গলার নীচে এই ছবি রাখিয়া (৬নং ছবির ভঙ্গীতে) ফটো তুলিও—৫নং ছবির মতো ফটো উঠিবে! এ-রকম কাটুন-ফোর-গ্রাউণ্ড বাজারে অনেক কিনিতে পাওয়া যায়। কিম্বা এরূপ রঙ্গ-চিত্র ইঞ্জিয়া-ইকু দিয়া মোটা কাগজে আঁকিয়া লইতে পারো! এ ফটো তুলিবার সময় ষাঁর ছবি

তুলিতেছ, তাঁর পিছনে সাদা একখানি বিছানার চাদর খাটাইয়া দিয়ো।

পরপৃষ্ঠায় ১০নং ছবি দেখিতেছ—ভঙ্গলোকটি কত বড় মাছ ধরিয়াছেন! এমন মাছ জলে মেলে? এ-ছবি তুলিতে হইলে ৪৭৫ পৃষ্ঠায় ১৩নং ছবির ভঙ্গীতে ছিপে মাছ গাঁথিয়া সেই ছিপ হাতে লইয়া দাঁড়াও। দাঁড়াইয়া তোমার ভাইকে বা বন্ধুকে বলো তোমার ছবি তুলিতে। ছিপ, মাছ এবং ক্যামেরার অবস্থান হইবে ঠিক এই ৫নং ছবির মতো! তার ফলে মাছ-হাতে তোমার যে-ছবি, সে-ছবি হইবে ঠিক ঐ ১০নং ছবির মতো।

পরপৃষ্ঠায় ৭নং ছবিখানি দেখিতেছ! বারো-হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো নয় কি? ছেলের



৬। ছবি লইয়া বস

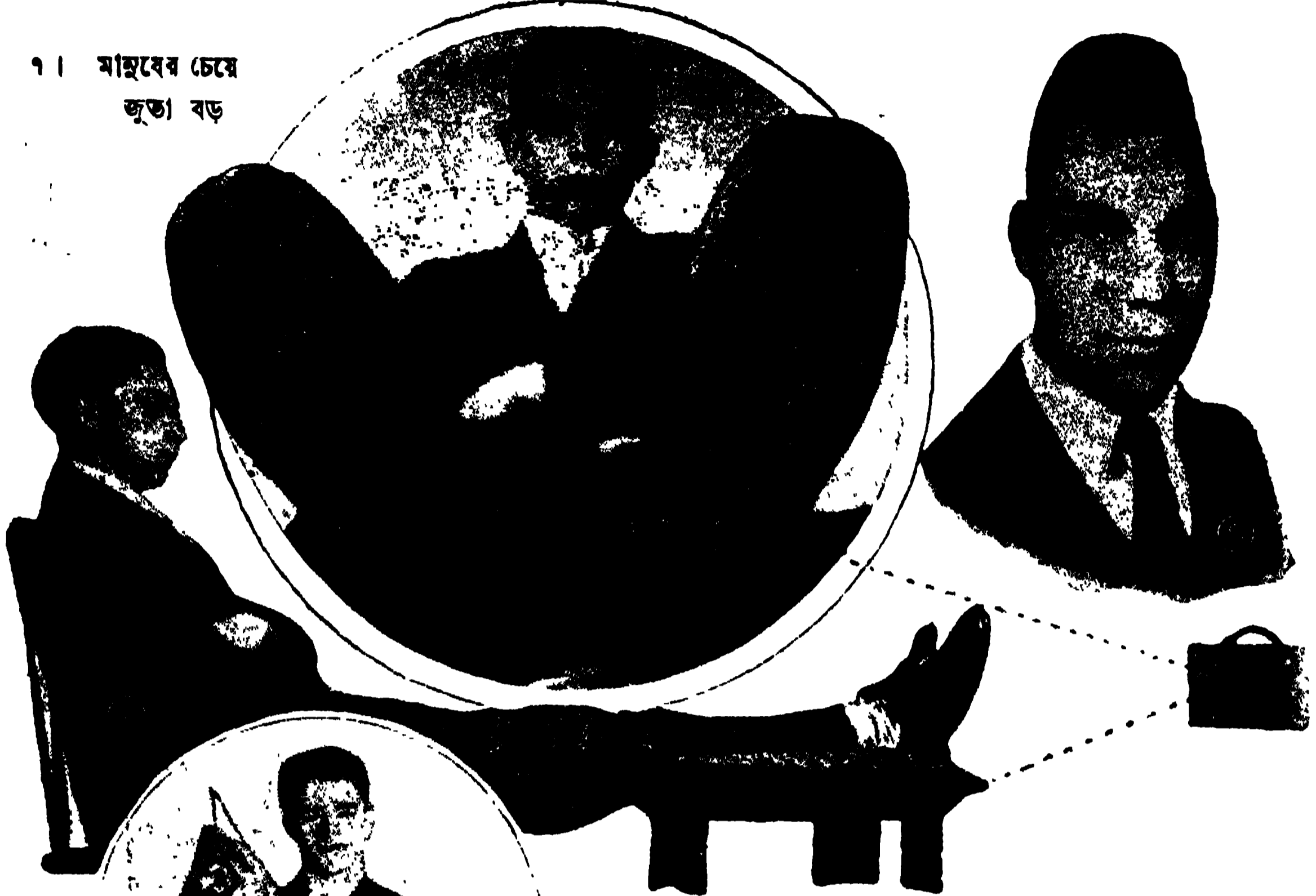
পায়ের জুতা-জোড়া ছেলেটির চেয়েও বড়! এ-ছবি তুলিতে হইলে ষাঁর ছবি তুলিবে, তাকে বসিও ঐ ৯নম্বর ছবির ভঙ্গীতে। একখানা চেয়ারে বসাইয়া খানিকটা দূরে একটা টুলের উপর দুই পা সে প্রসারিত করিয়া দিবে! এইবার সামনে ক্যামেরা লইয়া ফটো তোলো—৭নং ছবির মতো অতিকায়-জুতা-সমেত ফটো উঠিবে।

৮নং ফটোতে এ ভঙ্গলোকটির মুখের এ কেমন গড়ন। তার পর ঐ ৪৭৫ পৃষ্ঠায় ১২নং ছবির মুখ? ফটোয় এমন মুখ কি করিয়া ফুটিল? এ ধরণের ফটো লইবার রীতি—ষাঁর মুখ এমনি ভাবে ফটোয় গড়িতে চাও, তাঁর একখানি ফটোগ্রাফ লইয়া সে-ফটোগ্রাফখানির মুখ-ভাগটুকু হাত দিয়া চ্যাপ্টাইয়া-কুঁচকাইয়া-হুন্ডাইয়া সেই চ্যাপ্টানো-তোবড়ানো মুখের ফটো তোলো—এমনি

মুখের ছবি পাইবে। অভ্যাসে ছবি ছুঁড়ানো-মুচুড়ানোর কায়দা রপ্ত হইবে।

দাঁড় করাইয়া মেয়েটির ফটো লওয়া হইয়াছে! ক্যামেরা ছিল মেয়েটির কাছ হইতে পনেরো ফুট দূরে। মেয়ের ফটো তুলিয়া তার পর মাপ কবিয়া একটি বোতলকে এমন

৭। মানুষের চেয়ে
জুতা বড়



৮।
এ কেমন
মুখ!



১০। কত বড় মাছ

৯। এমনি পা রাখিয়া ভাবে রাখিতে হইবে—যেন ঐ ছবি তোলা বোতলের মাঝামাঝি পূর্ব-গৃহীত মেয়ের ছবি সঠিক প্রতিফলিত হয়। এবার কিশোরীর প্রতিচ্ছবি-সমেত ঐ প্লেটটি আর-একবার বোতলের সামনে একপোজ করে! মাপজোপ কবিতে যদি ভুল না হয়, তাহা হইলে বোতল ও মেয়ে—দু'জনের প্রতিচ্ছবি ১১নং ছবির ভঙ্গীতে মিলিয়া-মিশিয়া এমনি অপরূপ ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইবে! বোতলের ফটো তুলিবার সময় একপোজারের সময়টুকু বাড়াইতে হইবে। দু'-চারিবার অভ্যাস করিলেই এ-কাজ রপ্ত হইবে।

ক্যামেরা লইয়া এ-কেরামতির কাজ—অভ্যাসে কত বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তার সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা চলে না!

মানুষ হওয়া

ছবি! মেয়েটি নিশ্চয় বোতলের মধ্যে ঢোকে নাই! তবে কি করিয়া এমন ফটো হইল? ঘন-কালো পর্দার সামনে

মানুষের মতো মানুষ হ'তে গেলে শুধু লেখাপড়ায় পাশ করলেই চলবে না! সকলে যাতে তোমাকে ভালোবাসেন,

তোমার সঙ্গ কামনা করেন, এমন ভাবে নিজেকে গড়ে তোলা চাই। অর্থাৎ সদালাপী, অমায়িক, নিরহঙ্কার, উদার এবং শিক্ষা-বিভূষিত হ'তে হবে। সমাজে পয়সা-কড়ির আদর আছে, সত্য। সকলের পক্ষে পয়সা-কড়ি প্রচুর ভাবে উপার্জন করা সম্ভব না হ'তে পারে; কিন্তু মানুষ হবার জন্ত যে গুণগুলির উল্লেখ করলুম, ও-সব গুণের অধিকারী হওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব। কি করে এ গুণগুলি আয়ত্ত হবে, বলি।

সদালাপী হবার কথা বলছি। স্কুলে পড়া-শুনার মধ্যে গল্প-সল্প করার অবসর মিলবে না। পড়া-শুনার পর অবসর ঘটলে আলাপ-আলোচনার চর্চা করতে হবে। বি-এ, এম-এ পাশ করে অনেকে তেমন কথা-বার্তা কইতে পারেন না—গম্ভীর জড়ভরত হয়ে থাকেন। এমন লোককে কেউ ভালোবাসে না। যিনি ভালো কথাবার্তা কইতে পারেন, ছেলে-বুড়ো সকলের আসরে তাঁর আদর হয়। ক্লাশে দেখেছো



১১। বোতলের মধ্যে মেয়ে

১২। মুখের রকমফের



তা, যে ছেলে চটপটে, কথাবার্তা কইতে পটু, ঠাট্টার-মশায়রা তাকে বেশ প্রীতির চোখে দেখেন। কথা-বার্তা যা হইবে, সে কথা-বার্তা

যেন বয়সানুরূপ হয়; জ্যাঠামিতে পর্য্যবসিত না হয়! যখনই কথা কও, মন খুলে কথা কইবে। কথা-বার্তায় অশোভনতা বা অভদ্রতা যেন কখনো না প্রকাশ পায়।



১৩। মাছের ছবি তোলা

সংযমে! কি করে কথাবার্তায় পটুতা লাভ করা যায়, বলি। যা দেখেছো, যা শুনেছো—সে অতিজ্ঞতা বিবরণ নিখুঁত ভাবে দেবার চেষ্টা করবে। অতিরঞ্জন করো না—

চলতে হবে। অত্যা সে এ গুণ সহজে আয়ত্ত হবে। মেজাজ খারাপ করে কটু কথা বলায় বা হা-হুরি নেই—বা হা হুরি জেনো খারাপ-মেজাজ জাহির না করে আত্ম-

অত্যাঙ্কি করো না—মিথ্যা বলো না। অতিরঞ্জন, অত্যাঙ্কি বা মিথ্যা-কথনে ছুনিয়ায় হাশ্রাম্পদ হ'তে হয়, এ কথা মনে রেখো। লোকে তাহ'লে চালিয়াৎ বলে ঘৃণা করবে।

কোনো বই প'ড়ে নতুন কিছু যদি শিখতে পারো, তার বৃত্তান্ত সহজ ভাষায় বলবার চেষ্টা করবে। ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে আসর বসিয়ে এ সব কথার আলাপ-আলোচনা করো। পথে বেড়াতে বেরিয়ে যা-কিছু দেখবে, তার ধারাবাহিক বৃত্তান্ত বিবৃত করো। তার পর বইয়ে-পড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা নিয়ে আলোচনা করবে। ভাই-বোন ও আত্মীয়-বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করো—

আকাশে সব-চেয়ে ঐ যে বড় তারাটি—ওর নাম কি ?

গাছে লোণা জল দিলে গাছ মরে যায় কেন ?

আমরা কেন হাঁচি ?

হাঁসের ডানা জলে ভেজে না কেন ?

এ সব কথার আলোচনায় সকলের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। তার পর নিত্য-দিন খপরের কাগজ পড়া চাই। পলিটিক্স সম্বন্ধে বাড়ীতে বাবা-মা জ্যাঠা-কাকা যে-সব আলোচনা করেন, তা শুনে পলিটিক্স সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবে; তাতে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে। দাদার কাছ থেকে খেলা-ধুলার রিপোর্ট শুনবে; দিদিদের কাছ থেকে রান্না-বার্না ও পোষাকের ফ্যাশন-বিবরণ সংগ্রহ করবে; মায়ের কাছ থেকে নিত্য কত কি শিখতে পারো! পত্র-পত্রিকাদিতে যে সব কার্টুন-ছবি ছাপা হয়,

সেগুলি দেখবে, বুঝবে। ভালো কবিতা-গল্প পড়বে। ভালো কবিতা মুখস্থ করবে। এমনি ভাবে দেশ-বিদেশের বিচিত্র সংবাদ নিত্য-দিন ঠিক করে জানতে হবে। জানলে অনেক-কিছু শিখবে; এবং সে-সব কথা নিয়ে আসরের আলোচনাকে সরস, সুমধুর, সরল করে তুলতে পারবে। সরস কথা বলবার ভঙ্গী আয়ত্ত হ'লে আলাপে-আলোচনায় যে-পটুতা লাভ করবে, সার' জীবন তার জন্ত সুখময় হবে।

দেশের কোন্ বড়লোক কবে জন্মেছিলেন বা মারা গেছেন, এ-সবের সাল-তারিখ যেন কর্তৃস্থ থাকে! মহাপুরুষদের জীবন-চরিত্র পড়ে তাঁদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি আয়ত্ত করে রাখা চাই। তাহ'লে জগতে কারো কাছে কোনো তর্কে যেমন পরাস্ত হবে না, নিজের তেমনি পটুতায় পরিতৃপ্তি বোধ করবে।

মানুষ হ'তে হ'লে আর-একটি গুণ থাকা চাই। সে গুণ—কোনো-না-কোনো-রকম একটা সখ থাকা চাই। মাছ-ধরা, টিকিট-জমানো, পাখী-পোষা—এমনি কোনো সখ! বিখ্যাত দার্শনিক হাজলিট বলেন,—যে-লোকের কোনো-রকম সখ নেই, সে অপদার্প!

খেলা-ধুলায় বিরাগী হ'লে চলবে না। মনের উপর বিরাট গান্ধীর্যের পাথর চাপিয়ে রাখলে সে-পাথরের চাপে মহুঘ্য চূর্ণ হয়ে যাবে—এ-কথা মনে রেখে মনকে সরস-সরল-সজীব রাখতে হবে।

ধন্যবাদ

তোমাদের এই উৎসবে সখি, ডাকোনি যে মোরে, ধন্যবাদ!

মানিনি ছুঃখ, করিনি ভিক্ষা, ধরিনি মর্শ্বে অন্ন সাধ।

যেথা এসেছিল বড় বড় রথী,

সেথায় যাওয়া কি নহে হৃৎসতি ?

উঠেছিল যেথা মলি-চামেলির চাটুকারণিতার জয়-নিবাদ,

তোমাদের সেই উৎসবে সখি, ডাকোনি যে মোরে, ধন্যবাদ!

হংসের মাঝে বকের সমান থাকিতাম আমি দীপ্তিহীন;
না জানি কখন কি কথা বলিয়া আখ্যা পেতাম অর্ধাচীন!

ও ঘারে মোটর রহিত না খাড়া,—

সোফার দিত না গুম্ফেতে চাড়া;

আমারে দেপেই মহাশুণী জন হয় তো হ'তেন মুকঠিন!

হংসের মাঝে বকের সমান রহিতাম আমি দীপ্তিহীন।

নব্যারা দেখে হয় তো জলিত,—আরো তাহাদের জননীগণ!
কি জানি কখন কাহার কোপেতে ভস্ম হইত এ অভাজন!

কি যে সভ্যতা—কি যে মাধুরিমা,

কত সহনীয় ত্রাকামির সীমা—

না জানি কখন না বুঝিয়া ছায়, করিতাম শেষে কি অপরাধ!

তোমাদের এই উৎসবে সখি, ডাকোনি যে মোরে, ধন্যবাদ!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি



উৎকলিত প্রতীকার, বহুবিধ অহুমান এবং স্থলভ জনরব প্রচারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর একটি মাস অতিবাহিত হইয়াছে। প্রধানতঃ জার্মানীর ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্বন্ধেই এই প্রতীকা, অহুমান ও জনরব-প্রচার।

এক মাস পূর্বে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটেনের সাফল্যের পর বহু কাল বার্দিয়া অবরোধ করিয়া সম্প্রতি বৃটিশ বাহিনী উহা অধিকার করিয়াছে; আলবেনিয়ার গ্রীক সৈন্তের অগ্রগতির দ্রুততা অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়াছে; অন্তরীক্ষে ও সমুদ্রবক্ষে জার্মানীর তৎপরতা সমভাবেই চলিতেছে; কূটনীতিকক্ষেত্রে জার্মানীর প্রয়াস এখনও শেষ হয় নাই। নিরপেক্ষ শক্তিগুলির মধ্যে মাঝিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় নাজী-ক্যাসিষ্ট-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সোভিয়েট রুশিয়ার মনোভাব আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং জাপানের সুর কিঞ্চিৎ নরম হইয়াছে।

উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধ—

ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃটিশ সৈন্তগণ অকস্মাৎ উত্তর-পশ্চিম মিশরে আক্রমণ করিয়া ইটালীয়দিগকে ঐ অঞ্চল হইতে বহিস্কৃত করে। তাহার পর, বৃটিশ বাহিনী মিশরের সীমান্ত পার হইয়া লিবিয়ায় প্রবেশ করে, এবং সীমান্তের নিকটবর্তী ইটালীর বার্দিয়া দুর্গটি অবরোধ করে। এই দুর্গে প্রবল ভাবে আক্রমণ চালাইয়াও বৃটিশ বাহিনী তিন সপ্তাহের মধ্যে উহা অধিকারে সমর্থ হয় নাই। সম্প্রতি বার্দিয়ার পতন ঘটয়াছে। বর্তমানে বৃটিশ-বাহিনী পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে ইটালীর অল্পতম প্রধান নৌ-ঘাঁটা তক্রক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে, বৃটিশ বাহিনী তক্রকের ১৫ মাইল দূরে পৌঁছিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্তের সাফল্য-সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চার্চিল বলিয়াছেন যে, ইহা আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্তের প্রথম শ্রেণীর বিজয়—“they constitute a victory which in this African war is of the first order.” কেবল আফ্রিকায় কেন—বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর স্থলভাগে ইহাই বৃটিশ বাহিনীর সর্বপ্রথম বিজয়লাভ। নরওয়ে, ডানকার্ক, বৃটিশ সোমালিল্যান্ড এবং আফ্রিকার অন্যান্য বর্ণক্ষেত্রেও এত দিন বৃটিশ সৈন্তের “সাফল্যজনক প্রত্যাবর্তনের” কাহিনীই বিশ্ববাসী শ্রবণ করিয়াছে, এত দিন পুনঃ পুনঃ “সাফল্যজনক প্রত্যাবর্তনের” কালে বৃটিশ বাহিনীর যে সামরিক মর্যাদার হানি হইতেছিল, তাহা এইবার তাহাদিগের সাফল্যজনক অগ্রগতিতে পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বৃটেনের বিনষ্টপ্রায় সামরিক মর্যাদার পুনরুদ্ধারে ভারতীয় সৈন্তদল বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। লিবিয়ায় অতঃপর যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ হইবে, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, বৃটিশ বাহিনী যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে,

তাহাতে তাহাদিগকে প্রতিবোধ করা ইটালীয়দিগের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। মিশর ও লিবিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা যদি অতিরঞ্জিত না হয়, তাহা হইলে ইটালী এই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইটালীর ১৪ হাজার সৈন্ত না কি বন্দী অথবা বিনষ্ট হইয়াছে, বহু সমরোপকরণ বৃটিশ বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। এই অঞ্চলে আড়াই লক্ষ ইটালীর সৈন্ত ছিল বলিয়া অহুমান করা হয়। আড়াই লক্ষ সৈন্তের মধ্যে ১৪ হাজার সৈন্তহানি নিশ্চয়ই তৎপরনীম্ন ক্ষতি। বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি যদি এখন প্রতিকূল হয়, তাহা হইলেও তাহারা ইতোমধ্যে যে বিজয়লাভ করিয়াছে, তাহার নৈতিক ও সামরিক মূল্য অসাধারণ।

ইটালীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে মিশরে প্রবেশ করিয়া, ব্যাপক আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, আপনাকে উত্তমরূপে ঐ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, এবং ইটালী হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণের অবাধ সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে চাচ্ছিলেন। সুদীর্ঘ তিন মাসে তিনি মিশরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইটালী হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারেন নাই। এই জন্তই বিপুল সৈন্ত লইয়া সমুদ্রবর্তী ৮০ মাইলব্যাপী বালুকারাশিতে প্রবেশ করিতে তিনি সাহসী হন নাই।

মার্শাল গ্রাৎসিয়ানিকে প্রয়োজনীয় জব্যাদি সরবরাহে ইটালীর অসামর্থ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভূমধ্যসাগরে এখনও বৃটেনের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। গত ১৮ই নভেম্বর মুসোলিনী ক্যাসিষ্ট দলের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—Italian Navy is protecting the lines of communication so efficiently that the British Navy has been unable to interrupt or even hamper them. মুসোলিনীর এই উক্তি যে অসার দস্তের পরিচয় ব্যতীত অল্প কিছুই নহে, তাহা মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির নিজস্বতায় বুঝিতে পারা গিয়াছে। ইটালীর নৌবাহিনী যদি সত্যি সংযোগ রক্ষায় সমর্থ হইত, তাহা হইলে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি এত দিন—বিশেষতঃ ইটালীর গ্রীস আক্রমণের পর নিশ্চিতই সুরেজ অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্ত প্রবল চেষ্টা করিতেন। খুব সম্ভব, ইটালীর সমরনায়কগণ আশা করিয়াছিলেন যে, পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ তীরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহারা ঐ অঞ্চলের জলভাগে বৃটিশ-প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিবেন। তাহাদিগের পরিকল্পনা অহুযায়ী গ্রীসকে পরাভূত করিয়া ঈজিয়ান সাগরের তীর পর্যন্ত ইটালীর প্রভুত্ব বিস্তারের সম্ভাবনা আপাততঃ বেরূপ দূরীভূত হইয়াছে, সেইরূপ মিশর হইতে ইটালীয় বাহিনী বিতাড়িত হওয়ার এলেক্জেন্দ্রিয়া ও সুরেজ পর্যন্ত ইটালীর অধিকার বিস্তারের স্বপ্নও বিফল হইল। মিশর ও লিবিয়ায় বৃটেনের সাফল্যের ফলে

এই সামরিক সুবিধা যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, সেইরূপ এই সাফল্যে বৃটিশ সৈন্যের বিনষ্টপ্রায় সামরিক মর্যাদার পুনরুদ্ধারও গুরুত্বহীন নহে। অবশ্য, অন্তরীক্ষে পাঁচ মাস কাল জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া বৃটেন্ ইতিপূর্বে তাহার প্রতিরোধ-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল।

লিবিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি যদি সত্তর প্রতিকূল না হয়— তাহারা যদি ক্রমে ইটালীর নৌ-ঘাঁটি তরুণ ও বেন্‌ঘাজী অধিকারে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে বৃটেন্ হয় ত একচ্ছত্র অধিকার লাভ করিবে। গ্রীক-ইটালীয় সংঘর্ষের সুযোগে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরে কতকগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বৃটেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ইটালীতে ত্রিশিসি ও ট্যারান্টোর নৌ ও বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ চালিত হইতেছে। এদিকে ডোডেকেনিজ দ্বীপপুঞ্জের নৌ ও বিমানঘাঁটির সহিত ইটালীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

গ্রীক-ইটালীয় সংঘর্ষ—

আলবেনিয়ার গ্রীকদিগের অগ্রগতির স্মিতপ্রভা হ্রাস পাইয়াছে। গত এক মাসে দক্ষিণ অঞ্চলে শিমারী নামক স্থানটির অধিকারই তাহাদিগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য; ঐ অঞ্চলে তাহারা না কি ভেলোনার ২০ মাইল দূরে পৌঁছিয়াছে। উত্তর অঞ্চলে তাহারা এখনও এল্বাসান লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এ-দিকে বৃটিশ ও ইটালীর বিমান বাহিনী পুনঃ পুনঃ বোমা বর্ষণ করিয়া ভেলোনা বন্দরের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। ভেলোনা, টেপেজিনি, ক্রিসুরা প্রভৃতি স্থান বাহাতে ইটালীর হস্তচ্যুত না হয়, ততদক্ষেপে ইটালী মধ্য-আলবেনিয়ায় সুদীর্ঘ দুর্গশ্রেণী রচনা করিতেছে।

গ্রীক সৈন্যের অগ্রগতি মন্থর হইবার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আবহাওয়ার অবস্থা তাহাদিগের অত্যন্ত প্রতিকূল—weather remains the worst enemy of the Allies. একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্ভোগের জন্তই যে গ্রীক বাহিনীর অগ্রগতি মন্থর হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা দুষ্কর। ফ্যাসিষ্ট শক্তির প্রতি প্রকৃতি দেবীর পক্ষপাতিত্ব করিবার কোন কারণ নাই; প্রাকৃতিক দুর্ভোগে উভয় পক্ষেরই সমান অসুবিধা ঘটবার কথা। বস্তুতঃ, ইটালীয় বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা এক্ষণে দৃঢ় হইয়াছে। মধ্য-আলবেনিয়ায় ইটালী যে ব্যূত্বশ্রেণী রচনার আয়োজন করিয়াছে, তৎসম্পর্কিত সংবাদে স্বীকার করা হইয়াছিল—ঐ আয়োজন হইতে এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, ইটালীর বর্তমান রক্ষাব্যবস্থা বিনষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ইটালীয় বাহিনী যে সম্প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি-আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাও স্বীকার করা হইয়াছে।

উত্তর আফ্রিকা ও আলবেনিয়ায় ইটালীর শোচনীয় পরাজয়ে জার্মানীর পক্ষে নিরুদ্বেগ থাকা স্বাভাবিক নহে; ইটালী ও জার্মানীর সামরিক মর্যাদা এক্ষণে অবিচ্ছিন্ন। জার্মানী কি ভাবে ইটালীকে সাহায্য করিতে পারে, তাহাই প্রশ্ন। সম্প্রতি ইটালীর পক্ষ হইতে সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্ত কিছু জার্মান বিমান ও বৈমানিক সৈন্য ইটালীতে পৌঁছিয়াছে। সম্ভবতঃ, বলকান অঞ্চলে অটলতা বৃদ্ধির আশঙ্কায়

যুগোস্লাভিয়া অথবা বুল্গেরিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীসকে আক্রমণের চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে যদি বৃটেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে ইটালীতে আগত জার্মান সৈন্যের দ্বারা ইটালী বিশেষ উপকৃত হইবে না। ইটালীর সহিত লিবিয়ার যে স্বাভাবিক সংযোগ ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা কয়েক জন জার্মান বৈমানিকের চেষ্টাতেই পুনরায় স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ-প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইলে তাহার জল ব্যাপক আয়োজন আবশ্যিক। তাহার পর, ইটালী হইতে আলবেনিয়ার গ্রীক বাহিনীকে আঘাত করিবার চেষ্টাও সহজ হইবে না। বর্তমানে আফ্রিকাতিক সাগরে বৃটিশ বিমানবহর বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে; কফু, সেফালোনিয়া প্রভৃতি আফ্রিকাতিক সাগরের রক্ষি-দ্বীপগুলি হইতে বৃটিশ বিমান-



গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী জন্ মেটাঙ্কাস

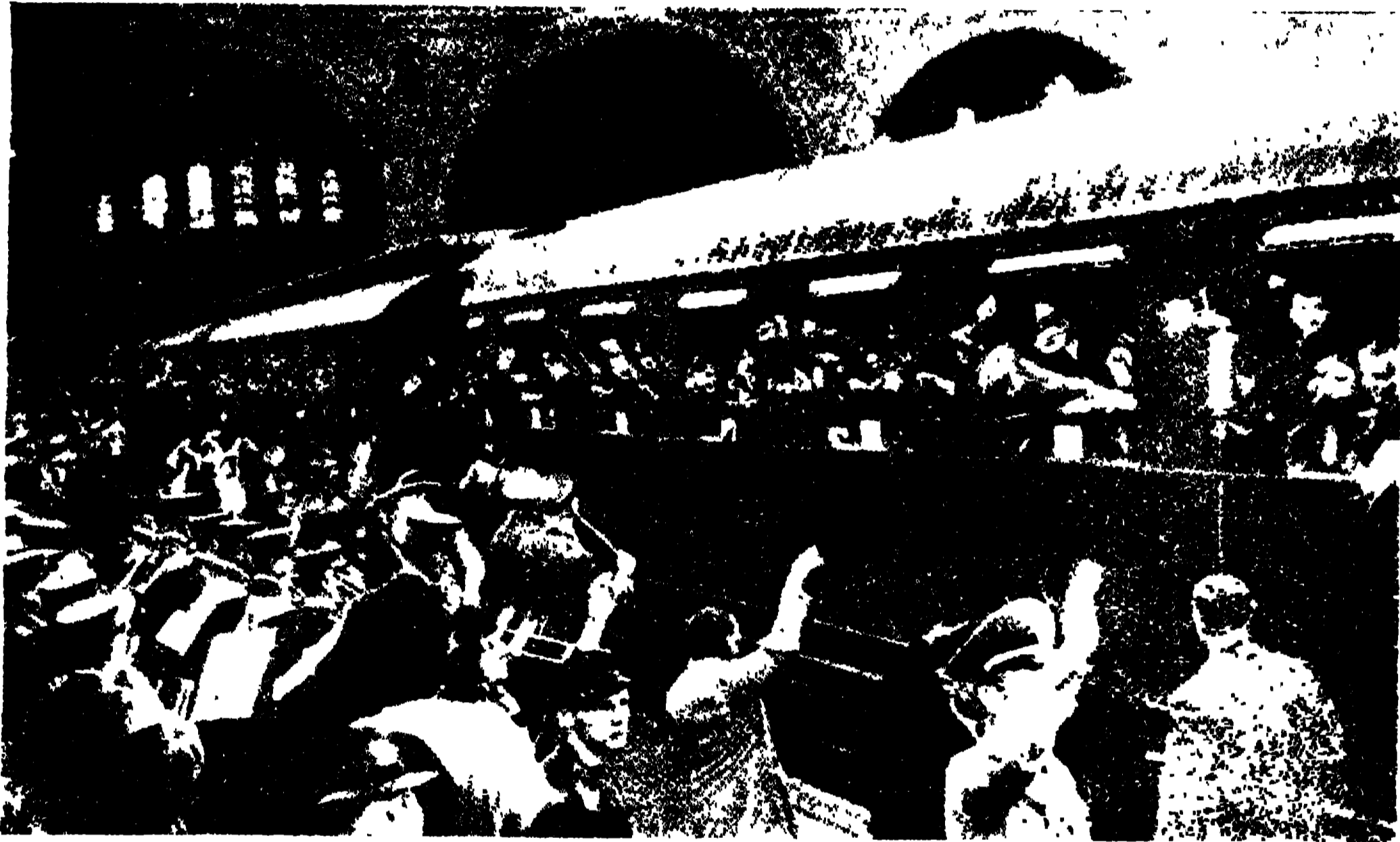
বহর অতি সহজে ইটালীয় ও জার্মান বিমানগুলিকে বিশেষ ভাবে বাধা দিতে পারিবে। এই প্রশ্নে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুই মাসের অধিক কাল যুদ্ধে গ্রীস যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে এই অঞ্চলে বৃটেনের বিশেষ সামরিক সুবিধা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে জার্মানীর সহযোগিতায় অথবা ইটালীর নিজেয় বর্ধিত প্রচেষ্টায় যুদ্ধের অবস্থা যদি গ্রীসের প্রতিকূলও হয়, তাহা হইলেও গ্রীকদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইবে। অবশ্য, ফ্রান্স ও স্পেনের সহযোগিতায় সমগ্র ভূমধ্যসাগরে যদি নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা চলে, তাহা হইলেই নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

জার্মানীর সামরিক তৎপরতা—

বৃটেনে জার্মানীর বিমান আক্রমণের প্রাবল্য সময় সময় হ্রাস পাইলেও, উহা একরূপ সমতাবেট চলিতেছে; এবং সম্প্রতি উহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্মানী এক্ষণে প্রধানতঃ বৃটেনের

শ্রমশিল্পকেন্দ্র এবং পোতাশ্রয়ের প্রতি বিমান আক্রমণ চালাইতেছে ; কভেন্ট্রি, মাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম, শেফিল্ড, লিভারপুল ও কার্ডিফ তাহার প্রধান লক্ষ্যস্থল। লণ্ডনের বেসামরিক অঞ্চলে বোমা বর্ষণের প্রাবল্যও হ্রাস পায় নাই ; সম্প্রতি সমগ্র লণ্ডন সহর জ্বালাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গৃহ অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা-বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বুটিশ বিমানবহরও জার্মানী এবং জার্মান অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছে ; খাস বার্লিন, ডুসেলডর্ফ, ব্রীমেন, ম্যান্‌হীম, লোরিয়েট ও বর্দোর সাবমেরিন-ঘাঁটি প্রভৃতি বুটিশ বিমানের প্রধান লক্ষ্যস্থল। বুটিশ বিমানবহর কিছু কাল হইতে জার্মানীতে ও জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে বিমান আক্রমণ চালাইলেও বুটিশ সরকারের কোন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এই আক্রমণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।



বুটিশ বিমানের আক্রমণ-আশঙ্কায় বার্লিনের বেসামরিক অধিবাসিগণ স্থানান্তরিত হইতেছে

জার্মানী ও বুটেনের বিমান আক্রমণের তুলনা করিলে জার্মানীর আক্রমণের গুরুত্বই বহুগুণ অধিক মনে হইবে। এবং তাহার বিশেষ কারণও আছে। বুটেন এখনও সমর-সজ্জায় জার্মানীর সমকক্ষ হয় নাই। গত বৎসর এপ্রিল মাসে নরওয়ে হইতে বুটিশ সৈন্য অপসারিত হইবার পর বখন বুটিশ মন্ত্রিসভার আমূল পরিবর্তন হয়, তখন কমন্স সভায় আলোচনা-কালে মিষ্টার চার্চিল বলিয়াছিলেন—
Our numerical deficiency in the air.....has condemned us and will condemn us for sometime to come to a great deal of difficulty, suffering and danger.... সমর-সজ্জা সম্পর্কে বুটেনের এই দৌর্বল্য যে এখনও দূরীভূত হয় নাই, তাহা মিষ্টার চার্চিল গত ১৯শে ডিসেম্বর কমন্স সভায় বক্তৃতাকালেই স্বীকার করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—“...we are still only a half-armed nation fighting a fully armed nation which has already

passed the saturation point in its armament.” অতঃপর তিনি বলেন যে, কোন দেশের শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হইলে তাহার জঙ্গ অন্ততঃ তিন-চারি বৎসর সময় আবশ্যিক ; এই বিষয়ে জার্মানী চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, পক্ষান্তরে, বুটেন মাত্র দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। মিষ্টার চার্চিল আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁহারদিগের চেষ্টার ফলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে তাঁহারা যে সাহায্য লাভ করিতেছেন, তাহাতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বুটেনের সমরসজ্জা সম্পূর্ণ হইবে।

বুটেনের এই অর্ধেক সমর-সজ্জার কিয়দংশ আফ্রিকাতেও নিয়োজিত হইয়াছে, বুটিশ বিমানবহর আলবেনিয়াতেও যুদ্ধ করিতেছে। মধ্য ও অদূর-প্রাচীতে বহুসংখ্যক উপনিবেশিক সৈন্য সন্নিবেশিত হইলেও, এখনও সমরোপকরণ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সাহায্যদানের যোগ্যতা বুটিশ উপনিবেশগুলি অর্জন করে নাই। বুটেনের এই

স্বল্প সমরসজ্জার স্বীয় গৃহ-রক্ষা বাতীতও অল্পত্র নিয়োজিত ; পক্ষান্তরে, জার্মানী তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া বুটেন আক্রমণে প্রবৃত্ত। এইরূপ অবস্থায় জার্মানীর আক্রমণের প্রাবল্য অত্যধিক হওয়াই স্বাভাবিক ; বস্তুতঃ, জার্মানীর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের তুলনায় বুটেনের প্রতি-আক্রমণ নগণ্য।

এখন সমুদ্র-বক্ষেও অত্যন্ত তৎপর হইয়াছে ; বুটেনের শ্রমশিল্প-কেন্দ্র ও পোতাশ্রয়ে বোমা-বর্ষণ এবং সমুদ্রবক্ষে জার্মান সাবমেরিন ও বর্ণপোতের তৎপরতা লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, অর্থনীতিকক্ষেত্রে

বুটেনকে পঙ্গু করাই জার্মানীর আস্ত লক্ষ্য। ইহা ব্যতীত, বুটেন সম্প্রতি তাহার উপনিবেশগুলিতে সমরোপকরণের কারখানা স্থাপন করিয়াছে ; কোন কোন উপনিবেশে সৈন্যগণ প্যারাসুটে অবতরণ প্রভৃতি আধুনিক যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করিতেছে। কাজেই, উপনিবেশগুলির সহিত বুটিশ দ্বীপপুঞ্জের স্বাভাবিক সংযোগ বিপন্ন হইলে জার্মানী সামরিক বিষয়েও সুবিধা লাভ করিতে পারে। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধ অপেক্ষা বর্তমান যুদ্ধে জার্মানী সমুদ্র-বক্ষে আক্রমণ পরিচালনের বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছে ; ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিম উপকূলের নৌঘাঁটিগুলি আজ তাহার অধিকারভুক্ত ; পক্ষান্তরে, আয়ার রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার ফলে দক্ষিণ আয়ল্যান্ডের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বুটেনের হস্তচ্যুত। দক্ষিণ আমেরিকা, বারমুডা এবং আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সহিত বুটেনের সামুদ্রিক সংযোগ বিপন্ন করিবার জঙ্গ জার্মানী আজ পশ্চিম-ফ্রান্সের ব্রেট, লোরিয়েটে, সেন্টলেজার ও বর্দোর ঘাঁটি ব্যবহার করিতেছে।

পক্ষান্তরে, এই সমুদ্রপথেব নিকটে বুটেনের পেম্ব্রোক ডেভনপোর্ট ও পোর্টল্যান্ড বাতীত অল্প কোন ঘাঁটা নাই—দক্ষিণ আয়ল্যান্ডের বেয়ারহাভেন্ ও কোভ্ ঘাঁটা এবার তাহার হস্তচ্যুত। ক্যানাডার সহিত গ্রাসগোর সংযোগপথেও জার্মান বিমানগুলি ফ্রান্স হইতে আক্রমণ চালাইতেছে। ইহা ব্যতীতও, জার্মানীর দুই-একখানি রণপোত আটলান্টিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরে জার্মানীর একখানি রণপোতের আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। ডিসেম্বর মাসের শেষে এই জাহাজখানি অষ্ট্রেলিয়ার নিকটে নরু নামক একটি দ্বীপে গোলাবর্ষণ করিয়াছে। জানুয়ারী মাসের প্রথমে নিউজিল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার ফ্রেজারের এক বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই জাহাজখানি গত কয়েক মাসে ৭ খানি বৃটিশ, ১ খানি করাসী ও ২ খানি নরোয়েজিয়ান জাহাজ নিমজ্জিত করিয়াছে। এই জাহাজখানি নিরীহ জাপানী বাণিজ্য-জাহাজরূপে আত্ম-গোপন করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে বিচরণ করিতেছে। সম্প্রতি এই জার্মান জাহাজ হইতে ৫০০ বন্দীকে এমিরাট দ্বীপে অবতরণ করান হইয়াছিল; তাহা-দিগকে তথা হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। জার্মানী করূপে এই রণপোতখানি প্রশান্ত মহাসাগরে প্রেরণ করিল, এবং ঐ অঞ্চলে উহা কোথা হইতে কয়লা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছে, তাহা জানা যায় নাই। আক্রমণকারী

জাহাজকে ধরিবার জন্ত বুটেনের পক্ষ হইতে ঐ অঞ্চলে কঠোর ভাবে জাহাজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে; কোন কোন স্থানে বৃটিশ ও ওলন্দাজ জাহাজগুলি মাইন স্থাপন করিয়াছে, জাহাজখানি বাহাতে অতিক্রমিত কোন ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

বিচ্ছিন্ন ভাবে এক বা একাধিক জাহাজের এই তৎপরতার সামরিক মূল্য অতি অল্পই; কিন্তু এই ভাবে শত্রুপক্ষের সামুদ্রিক বাণিজ্য ও শত্রু-দেশের বাজিআহাজের স্বাভাবিক গমনাগমনে সামরিক ভাবে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করা সম্ভব। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারত মহাসাগরে 'এম্‌ডেন'র উপদ্রবে জার্মানী কোন সামরিক সুবিধা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু দুই মাসের কম সময়ের মধ্যেই ঐ জার্মান ক্রুজারখানি ৭০,০০০ টন বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং মাদ্রাজেও গোলাবর্ষণ করিয়াছিল।

সমুদ্রবক্ষে জার্মানীর তৎপরতা কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, বুটেনের খাণ্ড-সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী লর্ড উল্টনের এক বক্তৃতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। ডিসেম্বর মাসের শেষে লর্ড উল্টন বুটেনের গৃহকর্ত্রীদিগের উদ্দেশে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, গত বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে খাণ্ড-সরবরাহে অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা। তাহার কথা—

The enemy is making a direct attack on our food-ships and sinking a number of them. This is indeed a war in all its starkness against food by which we sustain life. This war against food supplies may grow in intensity as the months go on.



বার্লিনে বৃটিশ বিমানের অগ্নি-প্রজ্জ্বালক বোমা-বর্ষণের পর

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে জার্মানীর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালিত হইবার আশঙ্কা এখনও বিদূরিত হয় নাই। নরওয়ে হইতে বর্দা পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকার অঞ্চলে জার্মানীর বিরাট সমরায়োজন এখনও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। করাসী উপকূল হইতে জার্মানীর কামানগুলি এখনও মধ্যে মধ্যে ডোভার অঞ্চলে অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রচণ্ড শীতে প্রাকৃতিক দুর্ভোগের মধ্যে বুটেনে সৈন্ত অবতরণ করানই জার্মানীর প্রধান উদ্দেশ্য; শত্রু-পক্ষকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যেই সে ইচ্ছা করিয়া জার্মান সৈন্তের গতিবিধি সম্বন্ধে নানারূপ জনরব প্রচার করিতেছে। অবশ্য, জার্মানীর সম্ভাবিত আক্রমণ সম্বন্ধে বুটেন অত্যন্ত সতর্ক। মিষ্টার চাচ্চিল তাহার ১৯শে ডিসেম্বরের বক্তৃতায় বলিয়াছেন—The Winter season offers some advantages to an invader to counter-balance those which belong to the Summer season.....It will be a disaster if anyone

suppose that the supreme mortal dangers are passed.

জার্মানীর কূটনৈতিক গতিবিধি—

জার্মানীর কূটনৈতিক গতিবিধি সম্বন্ধে বৈদেশিক সাংবাদিকগণ বহু গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল গবেষণার প্রধান কথা—ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর বিরোধ অসম্ভব, সোভিয়েট-জার্মানীর বিরোধও অদূরবর্তী। ফরাসী জার্মান মনোমালিঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণার মূগ উৎস—ডিমেন্ডের মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফ্রান্সের সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভালের পদচ্যুতি, এবং গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পবেই তাঁহার মুক্তিলাভ। জার্মান কর্তৃপক্ষ না কি মঃ লাভালকে মুক্তি দিবার জন্য ভিসি সরকারকে বাধ্য করিয়াছেন। এই ঘটনার পর এইরূপ আত্মমানিক সংবাদও প্রচারিত হইয়াছে যে, জার্মানী ফ্রান্সের মধ্য নিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশপথ দাবী করিয়াছে, কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাহাতে সম্মত হন নাই, তাহারা জার্মানীকে এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে অধিক চাপ দিলে তাঁহারা ফরাসী নৌ-বহর লইয়া আফ্রিকায় চলিয়া যাইবেন। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভিসি কর্তৃপক্ষ ঘীরে ঘীরে ফরাসী নৌ-বহর আফ্রিকায় স্থানান্তরিত করিতেছেন। সোভিয়েট জার্মান মনোমালিঙ্গ-সম্পর্কিত গবেষণার উৎস সম্ভবতঃ সোভিয়েট নেতৃত্বের সমরশক্তি। গত নভেম্বর মাসের প্রথমে মঃ ক্যানিনিন্ দৃঢ় কণ্ঠে সোভিয়েট রুসিয়ার নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যেন তাঁহাদিগের এই নীতির পরিবর্তন হইয়াছে; সোভিয়েট নেতৃত্ব অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে বহুমুখী প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১লা জানুয়ারী মঃ ষ্ট্যালিন "রেড ষ্টার" পত্রে এক স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—The U. S. S. R., are confronted with the danger of military aggression, সম্ভবতঃ সোভিয়েট নেতার এই সমরশক্তিকে ভিত্তি করিয়া সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে যে, লাও হইতে গুডেসা পর্যন্ত স্থানে নীল্টার নদীর তীরে জার্মানীর বিরুদ্ধে বিরাট সোভিয়েট বাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সোভিয়েট-জার্মান মনোমালিঙ্গের অস্তম কাণ্ডস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, রুমানিয়ার "আয়রণ-গার্ড" দল কমুনিষ্টদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে।

প্রথমে ফরাসী-জার্মান মনোমালিঙ্গ-সম্পর্কিত সংবাদটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। মঃ লাভালের পদচ্যুতি সম্পর্কে জার্মানীর সহিত ভিসি সরকারের গুরুতর মনোমালিঙ্গের কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা বুঝা হুঙ্কর। মঃ লাভালের পরিবর্তে যে ব্যক্তিটি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই মঃ ফ্রান্সিসের নাজী-অনুরক্তি সন্দেহের অতীত। কাজেই ফরাসী পররাষ্ট্র সচিবের পদে মঃ লাভালের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে জিদ্ করিয়া জার্মানী ফ্রান্সের সহিত অবস্থা বিরোধ ঘটাইবে কেন? রাজনীতিকক্ষেত্রে ব্যক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা নীতির গুরুত্বই অধিক। আর ব্যক্তিত্বের দিক হইতে ইহারাই দুই জনই ফ্রান্সের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী।

ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর যে এখন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আলোচনার বিষয়ে কোন

কথাই প্রকাশিত হয় নাই—এই সম্পর্কিত সকল সংবাদই অত্মমান-মূলক। নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির যদি ফ্রান্সের নৌ-ঘাটী ও নৌ-বহর ব্যবহারের সুবিধা পায়, এবং স্পেনের সহযোগিতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা ভূমধ্যসাগরে কিরূপ বিপুল শক্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহা গত আর্থিন ও কার্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্বপ্তমানে ইটালীর



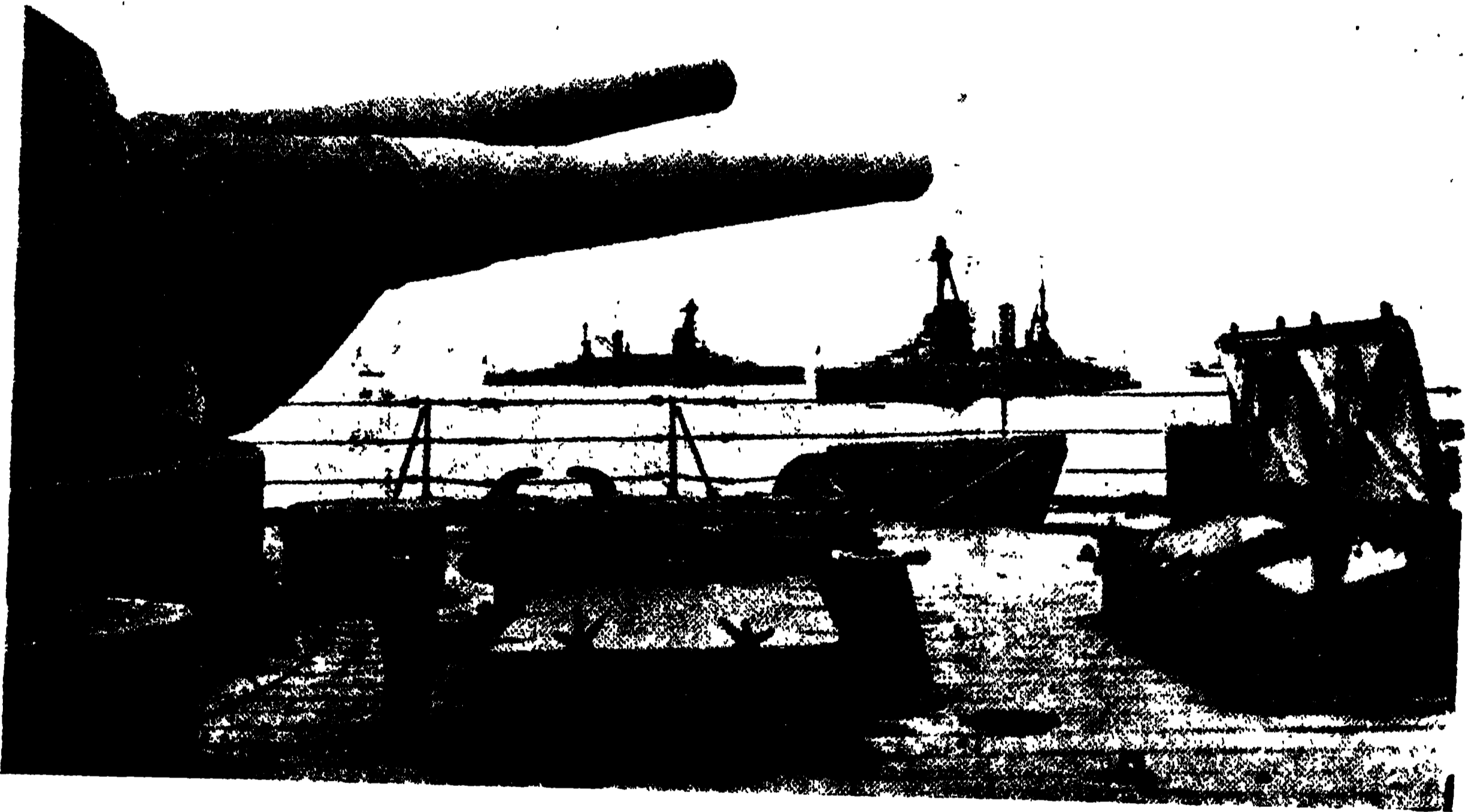
ফরাসী উপকূলস্থিত জার্মান কামানগুলিকে প্রত্যুত্তর দানের জন্ত 'বুটেনের উপকূলে এই সকল কামান স্থাপন করা হইয়াছে

পরাজয়ে জার্মানীর উৎকলিত হওয়া সম্ভব; ইটালীতে জার্মান ঠৈমানিকের আগমনের সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ ভূমধ্যসাগরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে ইটালীকে তাহার বর্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করা হুঙ্কর। এই জন্তই বোধ হয় এখন ফরাসী জার্মান আলোচনা সম্পর্কিত আত্ম-মানিক সংবাদগুলিতে ফরাসী নৌ-ঘাটী ও নৌ-বহরের অসঙ্গ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইতেছে।

উদ্ধৃত অবস্থা সবক্ষে বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, বর্তমানে জার্মানীর পক্ষে ফ্রান্সের নৌ-বাটী ও ফরাসী নৌ-বাহিনী দাবী করা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য এই দাবীতে সম্মত হইলে, এখনও ফ্রান্সের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহা বিলুপ্ত হইবে। ফ্রান্স এই ভাবে আত্মবলিদানে সম্মত হইবে কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। বুটেনের অর্থনীতিক অবরোধের জন্য ফ্রান্স বর্তমানে অত্যন্ত বিপন্ন। কাজেই এই অবরোধজনিত দুঃখ হইতে পরিভ্রাণ লাভের আশায় ফ্রান্সের পক্ষে জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ একান্ত অসম্ভব বিধরও নহে। অবশ্য মার্শাল পেট্টা ফরাসী নৌ-বহর ও নৌ বাটীরূপী "হাতের গোলাম" দেখাইয়া জার্মানীর নিকট হইতে কতকগুলি সুবিধালাভের চেষ্টা করিতে পারেন।

কথা উল্লেখ করিয়া মার্শাল পেট্টা পরোক্ষে বুটেনের কথাই বলিয়াছেন। বুটেন-সম্পর্কে ফরাসী এক-নায়কের এই বক্তব্য প্রবণ করিলে ফরাসী-জার্মান বিরোধ-সম্পর্কিত জনরব গুরুত্বহীন বলিয়া মনে হইবে। আবার ফ্রান্সের সমর-সচিব জেনারল হাঁজিগার সীরিয়ার অধিবাসীদিগের উদ্দেশে বলিয়াছেন—Wounded France is not giving up. এই উক্তিকে জার্মানীর দাবী সম্পর্কে ফ্রান্সের দৃঢ়তার ইঙ্গিত বলিয়া মনে করা বাইতে পারে।

সোভিয়েট-জার্মান মনোমালিন্দের আশঙ্কা নিতান্ত গুরুত্বহীন বলিয়া মনে হয়। গত মহাযুদ্ধে চতুর্দিকে শত্রু সৃষ্টি করিয়া কৈশর যে তুল করিয়াছিলেন, পুনরায় সে তুল বাহাতে না হয়, সে জন্য হিটলার পররাষ্ট্রক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে-



বুটেনে জার্মান বাহিনীর অবতরণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য ইংলিশ প্রণালীতে এই সকল কামান-সজ্জিত রণপোত বিচরণ করিতেছে

ফ্রান্সের প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে দুই জন বিশিষ্ট ফরাসী রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞের যে উক্তি আমরা সম্প্রতি প্রবণ করিয়াছি, তাহা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। নববর্ষের বাণীতে মার্শাল পেট্টা তাহার স্বদেশবাসীকে বলিয়াছেন—Do not listen to those who seek to exploit your miseries and to disunite the nation. এই সতর্কবাণী বুটেন এবং বুটেনের আশ্রিত জেনারল ডী গল্ ও "ক্রী ফ্রান্স" প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাহার পর, তিনি আরও বলিয়াছেন—ফরাসী জাতির অনাহারে দিন কাটাইবার সময় আসিতেছে; যুদ্ধে তাহাদিগের শত্রু নষ্ট হইয়াছে, অবরোধের ফলে তাহারা সমুদ্রপারের খাদ্যসামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অবরোধের

ছেন। পক্ষান্তরে, জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রুশিয়ার প্রত্যক্ষ স্বার্থ বিপন্ন না হইলে রুশিয়ার পক্ষেও যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে, সোভিয়েট রুশিয়া অত্যন্ত সাবধান; বর্তমান আন্ত-জাতিক বিপর্যয়ের সময় কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাহাতে তাহার স্বার্থসম্পন্ন অঞ্চলে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ না হয়, সেই জন্য চতুর্দিকে তাহার প্রথম দৃষ্টি রহিয়াছে। সোভিয়েট এক-নায়ক হয় ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই সমরশক্তির কথা বলিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব—

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ৩০শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বুটেনকে

সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তা সন্দেহে বঞ্চিতা করিয়াছেন, তাহা নাস্তী-ক্যাসিষ্ট শক্তিবলের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণার তুল্য। এই বঞ্চিতা পাঠে মনে হয়, বুটেনকে যথাশক্তি সাহায্য-দানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদি কাহারও বিরুদ্ধ-ভাব থাকে, তাহা হইলে তাহা দূর করিবার জন্ত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অতঃপর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ না বলিয়া বোধ হয়, বুটেনের অল্পকালে "যুদ্ধ-বিরতি" জাতি বলাই অধিকতর সম্ভব হইবে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন—In the military sense Britain and her Empire today are the spearhead of resistance to world conquest... No Dictator, no combination of Dictators will weaken our determination to aid Britain by threats of how they will construe that determination

গণতান্ত্রিক সরকারের এই মনোভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্যদানের যে নূতন পরিকল্পনা কংগ্রেসে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা যদি কার্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিক স্বার্থও বর্তমান যুদ্ধে বিজড়িত হইবে। ৬ই জানুয়ারী তিনি কংগ্রেসে এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জন্ত এইরূপ সমরোপকরণ প্রস্তুত করিবে, যাহার অধিকাংশ ভবিষ্যতে তাহার নিজের প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সকল উপকরণ তাহার অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিবে না; ঐ সকল উপকরণ যুদ্ধের পর তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যর্পণ করিবে, অথবা উহার বিনিময়ে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদান করিবে।

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন এই মর্মে সংশোধিত হইয়াছিল যে, যুদ্ধান শক্তিবর্গ "নগদ মূল্যে ও স্বকীয় দায়িত্বে" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবে। এই সর্ত্তেই বুটেন এত দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিতেছিল; কিন্তু সম্প্রতি বুটেনের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, তাহাকে যদি ঋণ দেওয়া

না হয়, তাহা হইলে সে আর অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিতে পারিবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বুটেনকে ঋণদানে আপত্তির কারণ ছিল; গত মহাযুদ্ধের সময় বুটেন তাহার নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সে সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই। এই ভুলই একাধিক অধমর্ষের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা কেবল না পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মর্মে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে, যে সকল রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই, তাহারা আর নূতন ঋণ পাইবে না। এই আইনই "জনসন স্মার্ট" নামে অভিহিত; ইহা বাতিল না হইলে বুটেনের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইত না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে জনসন স্মার্ট প্রকারান্তরে বাতিল হইবে, এবং বুটেনকে সাহায্যদান করা সম্ভব হইবে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে কূটনীতিক বিষয়েও বুটেন যথেষ্ট উপকৃত হইবে। নিরপেক্ষতা আইন যে ভাবে সংশোধিত হইয়াছিল, তাহাতে বুটেনকে সাহায্য-দানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বর্তমান যুদ্ধে বিজড়িত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। "নগদ মূল্যে ও স্বকীয় দায়িত্বে" ক্রীত সমরোপকরণ বিনষ্ট হউক, বা শস্ত্র-হস্তেই পতিত হউক, তাহাতে মার্কিনী সরকার অথবা মার্কিনী ধনিকদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। উল্লিখিত সর্ত্তে যে শক্তি অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিয়াছে, সে যদি অস্ত্রের নিকট পরাজিত হয়, তাহা হইলেও বিক্রোতা-রাষ্ট্রের উৎকর্ষার কারণ নাই। কিন্তু বহুমূল্য সমরোপকরণ ইজারা দিবার পর ইজারা-প্রদানকারীর পক্ষে নিরুদ্বেগ থাকা সম্ভব নহে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি প্রচুর সমরোপকরণ বুটেনকে ইজারা দেন, তাহা হইলে মার্কিন সরকার নিজের স্বার্থেই ঐ উপকরণ বাহাতে বুটেনের শস্ত্র হস্তে পতিত না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইবেন। ইজারাদার বুটেন বাহাতে পরাজিত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও মার্কিনী সরকার ও মার্কিনী ধনিকের স্বার্থ হইবে।

শ্রীঅতুল দত্ত

আমি, আর ওরা

জানি না, তোমারে সুন্দরী বলে কি না,
তোমারে যাহারা দেখিয়াছে প্রিয়তমা ;
মোর কাছে তুমি সুন্দরতমা, সখি !
মোর চোখে তুমি রূপময়ী অমুপমা ।
জানি না, তোমারে সুচরিতা বলে কি না,
আর যা'রা সবে দেখেছে তোমারে লগি' ;
আমি জানি, তুমি সুচরিতা, মোহনীয়া ;
মোর কাছে তুমি চির-মধুময়ী, সখি !
জানি না, তোমার সেবায় মুগ্ধ কি না,
তোমার হাতের সেবা যারা লভিয়াছে ;—
মমতা-বিধুরা, আমি তো তোমারে জানি,—
কে বলে, তোমার সেবার তুলনা আছে ?

তোমারে যাহারা জানিয়াছে, তা'রা সবে
জানি না, তোমায় স্নেহময়ী বলে কি না ;—
আমি তো তোমার মন-প্রাণ জানিয়াছি—
স্নেহ-মমতায় নহ তুমি, নহ দীনা !
অতি সাধারণ তোমারে যাহারা বলে,
তাহারা সবাই তোমারে জেনেছে ভুল ;—
আমি তো তোমারে চিনিয়াছি ভালো ক'রে—
আমি জানি, প্রিয়া, তোমার নাহি কো তুল !
অশনি-কঠোরা, কুসুম-কোমলা তুমি,
দানে ও ক্ষমায় তুমি চির-অরূপণা ;
চরিত-বিজয় মহীয়সী তুমি নারি !

প্রেমের ধর্মে মঙ্গলা, অতুলনা ।

শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (এম-এ) ।

বঙ্গবন্ধু প্রবন্ধ

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ মহাকালের তমসচ্ছন্ন গর্ভে বিলীন হইয়াছে। একটি বৈশিষ্ট্যের জন্ম এই বর্ষ আলোচনার যোগ্য। যুরোপীয় মহাবুদ্ধি এই বৎসরটিকে মসীলিপ্ত করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষের প্রথম তিন মাস উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; কিন্তু তাহার পরেই দুঃখের তমোময়ী নিশীথিনী যেন বিদ্যুৎ-গতিতে প্রায় সমগ্র যুরোপই আচ্ছন্ন করিয়াছে। ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, রুমেনিয়া, যুগোস্লাভেকিয়া, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, গ্রীস, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি সকল দেশেরই অধিবাসীবর্গের দীর্ঘশ্বাস শূন্যে বিলীন হইতেছে; সর্বত্রই দরিদ্রের হাহাকার, অভাবগ্রস্তের আর্ন্তনাদ গগন-পবন মুখরিত করিতেছে। ফিনল্যান্ড রুবিয়ার করকবলিত। ইটালী যুদ্ধে নামিয়া দারুণ অভাবে জর্জরিত। জার্মানী পোল্যান্ড-জয়ের চেষ্ঠার জন্ম ব্রিটেনের প্রচণ্ড আক্রমণে সমরানলে দগ্ন হইতেছে; স্বীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্ঠায় গ্রেট ব্রিটেনকে দুর্ব্বার সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। ইহার পর-বৎসর এই সকল ব্যাপারের কিছু কিছু সজ্বাটিত হইয়া থাকিলেও আলোচ্য বর্ষেই ইহার ব্যাপক ফল পরিলক্ষিত হইয়াছে। সেই জন্মই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে উহার বিবাদময় বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে চিরদিন মসীলিপ্ত করিয়া রাখিবে। জার্মানীর আক্রমণে ইংলণ্ডের ক্ষতি নিতান্ত অল্প হয় নাই; গত যুরোপীয় মহাবুদ্ধে ইংলণ্ডের একমুখী ক্ষতি হইয়াছিল কি না সন্দেহ; কিন্তু ইংরেজ জাতি এখনও অটল রহিয়াছে। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া হিটলারের হৃদয় বিচলিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। হিটলার গ্রেট ব্রিটেন আক্রমণের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই;—কখনও পারিবেন কি না, তাহা অসুমান করা মানব-কল্পনার অতীত। তবে ইংরেজকে সাহসনা দানের জন্ম তাঁহাদের অসুখুলে

শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, তাহা সফল হওয়া অবশ্যই প্রার্থনীয়।

এ-দিকে যুরোপের এই মহাদুঃখের তিমিরজাল পৃথিবীর সকল দেশেই অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাণিজ্যের গতি রুদ্ধ হইতেছে, জ্ঞানের আলোক ক্রমশঃ নির্ঝাঁগোন্মুখ হইয়া আসিতেছে, মানবজাতির মনস্থিতা ক্ষীণ, এবং দানব-শক্তি দুর্ব্বার হইয়া উঠিতেছে; ইহা আশার কথা ভাবিয়া কেহই স্বস্তিবোধ করিতে পারিবেন না। এই হাহাকার কেবল যুরোপেই সীমাবদ্ধ নহে—ইহা কোন না কোন আকারে, এক মার্কিন যুক্তরাজ্য ভিন্ন, অত্র সকল দেশেরই বায়ুমণ্ডলে অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যের সাগরতটেও উদ্বেগের তরঙ্গাঘাতের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—তাহা প্রেসিডেন্ট রুজ্ভভেন্টের বক্তৃতায় সুপরিষ্কৃত হইয়াছে।

আমাদের এই ভারতেও দুঃখের এবং অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া দেশবাসিগণকে বিশেষ ভাবে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। দুই দিন পূর্বে ষাঁহার বিভিন্ন প্রদেশে দায়িত্বপূর্ণ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রেষ্ঠতম রাজপুরুষগণেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা স্বেচ্ছায় কারাগারের উচ্চ অবরোধের অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া দেশের ভাগ্যফল কি, তাহা জানিবার জন্ম উৎসুক! বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের ‘স্পীকার’, এমন কি, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রীর পর্য্যন্ত যখন স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়াছেন, সেই সময় এক প্রদেশের পরিষদের মুসলমান ‘স্পীকার’কে খেতাব দানে উচ্চ কৃতার্থ করা হইল, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিশেষতঃ, কংগ্রেসের সভাপতিকে পর্য্যন্ত সত্যগ্রহের জন্ম প্রতীক্ষা করিতে হয় নাই। বাঙ্গালার পাটের দর নামিয়া যাওয়ায় সর্বসাধারণের দুঃখ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি রাজবিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে শঙ্কা হইতেছে—এই সকল বিধি-প্রয়োগের ফলে সম্প্রদায়বিশেষ

নিষ্পিষ্ট হইয়া জড়ে পরিণত হইবে। বাঙ্গালায় যে মনীষা অল্প দিন পূর্বেও তাহার উজ্জ্বল প্রভায় সমগ্র ভারতভূমিকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, এত দিন পরে তাহা যেন নির্কাপিত হইবার আশঙ্কা এ দেশের সকলের চিত্তকেই অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্তই আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালার সর্ব স্থান হইতে মর্মভেদী হাহাকার সমুখিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে। সুদূর প্রাচীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে ভীষণ সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া চীনের বিভিন্ন প্রদেশ বিধ্বস্ত করিতেছে, দিগ্দাহী-দাবানলোখিত ধূমরাশির ত্রায় তাহা মানব-জাতির, বিশেষতঃ, এশিয়াবাসীর ভাগ্য-গগন নৈরাশ্রের ধূমে আচ্ছন্ন করিতেছে। তাই মনে হইতেছে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ চিরকালই মানবজাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা মসীলিখু করিয়া রাখিবে।

ইংরেজী ভাষা-সমিতি

৪ঠা পৌষ লঙ্কা সহরে ইংরেজী ভাষা-সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বৃক্তপ্রদেশের শাসনকর্তা সার মরিস হ্যালোট এই সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অন্যান্য ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ এই সমিতিতে যোগদান করেন। এই সমিতিটি নূতন। ভবিষ্যতে যুবকদিগের শিক্ষায় ইংরেজী ভাষার স্থান-নির্গম এই সমিতির অন্ততম বিবেচ্য বিষয়। এই সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীবৃত্ত অমরনাথ বা মহাশয়ের অভিভাষণ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, খৃষ্টমাস পর্বেই এত অধিক সভা-সমিতির অধিবেশন হয় যে, সাধারণে তাহার অনেকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে অবহিত হইতে পারে না; সুতরাং ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। অনেকে ভারতীয় শিক্ষায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষপাতী। অনেক চিন্তাশীল বহুদর্শী ব্যক্তির বিশ্বাস, ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মুখ্য স্থানে স্থাপন করিলে দেশীয় ভাষাকে পরোক্ষ ভাবে দুর্বল করা হয়। এ অবস্থায় প্রতিভাশালী এবং চিন্তাশীল লেখক-গণ তাঁহাদের চিন্তার ফল দেশীয় ভাষায় প্রকাশ না করিয়া ইংরেজী ভাষাতেই প্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস

লিখিয়াছিলেন ইংরেজী ভাষায়। মাইকেল মধুসূদন প্রথম কবিতা লেখেন ইংরেজীতে। এ-কালের শ্রীবৃক্তা সরোজিনী নাইডু, এবং সে-কালের অরুদত্ত, তরুদত্ত প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্য-কুঞ্জের নাইটিঙ্গেল বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে পরিচিতা হইতে পারেন,—কিন্তু বাঙ্গালার কাব্য-কুঞ্জে তাঁহাদের কুহ-তান কোনও দিন প্রতিধ্বনিত হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লুকবি মনোমোহন ঘোষ, হরীজনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষা-সম্পন্ন কবিগণের কবিত্বসৌরভে তাঁহাদের মাতৃভাষা বঞ্চিতা। গদ্য-সাহিত্যেও এইরূপ অনেক ইংরেজী লেখকের নাম করা যাইতে পারে। অধ্যাপক অমরনাথ বা-ও আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষাকে মুখ্য স্থলে স্থাপন-প্রথার সমর্থন করেন নাই। শিক্ষায় সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষাকে মুখ্য স্থান দিলে শিক্ষায় কৃত্রিমতা বর্দ্ধিত হয়, এবং শিক্ষার পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টায় অনেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। বঙ্কিম বাবু “হিন্দু হেরাল্ডের” সম্পাদক গিরীন্দ্র বাবু কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় সন্দর্ভ লিখিতে অমুরুদ্ধ হইলে, বাঙ্গালায় তাঁহার পত্রের জবাব দিয়া লিখিয়াছিলেন, “সমুদ্রে শিশির-সেক করিব না, নিজের যাহা আছে তাহা পরের ঘরে বিলাইয়া দিব না।”—কথা-গুলি সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত।

সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগ

সম্প্রতি খুলনায় প্রাদেশিক মেডিক্যাল পরিষদের যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার সমবেত সদস্যদিগকে “সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের চাকুরিয়াদের পুনর্গঠন” সম্পর্কে একটি লিখিত প্রস্তাব বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটির ভিতর কিঞ্চিৎ চাতুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। শুনা যাইতেছে, বাঙ্গালা সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাবের বিষয় বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শীঘ্রই না কি ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য আরম্ভ করিবেন। এই প্রকার ব্যস্ততার কোন হেতু আছে কি না, তাহাই সাধারণের বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। ঐ ব্যাপারে উল্লেখ করা হইয়াছে, সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার মহাশয়ের প্রস্তাব এই যে, স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারীরা সকলেই

স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ অধীন হইবেন; অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারই তাঁহাদের ভাগ্য-বিধাতা হইবেন। এইরূপে তাঁহারা সচিবসভ্যেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হইবেন। এই জন্তই আশঙ্কা হয়, সমবায় বিভাগের কর্মচারীদিগের দ্বারা সচিববৃন্দ এখন তাঁহাদের যে কার্য সাধন করিয়া লইতেছেন,—স্বাস্থ্যবিভাগের এই কর্মচারীবর্গ দ্বারাও তাঁহারা সেই কার্যসাধনের সুযোগ লাভ করিবেন। বিশেষতঃ, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-নির্বাচনের সময় সমাগতপ্রায়; এ সময়ে বাঙ্গালার সচিবরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচন-সম্পর্কিত অনেক কার্য সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিবেন। “ছাঁদন দড়ি গোদা-বেড়ি তুমি এখন কার?” উত্তর—“যার হাতে আছি, এখন আমি তার।” সুতরাং নির্বাচন-কালে স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারীরা যদি ‘যার হাতে আছেন তার’ কাজ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ কি বিস্মিত হইবে? সুতরাং এত তাড়াতাড়ি ‘শ্রদ্ধ গড়াইবার’ প্রয়োজন নাই কি?

পাটসমস্যায়

বাঙ্গালার সর্বকর্মকুশল সচিবগণের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বাঙ্গালার পাটের দর একেবারে ধূলায় লুটাইতেছে; এই ব্যাপারে সকলেই চিন্তিত। কারণ, ইহার সহিত সর্বসাধারণেরই স্বার্থ বিজড়িত। মধ্যে গুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালা সরকার পাট ক্রয়ের জন্ত ভারত সরকারের নিকট ৬ কোটি টাকা ঋণ লইবেন। কিন্তু সে প্রস্তাবটি কি মাঠে অর্থাৎ রাজধানীর প্রান্তরে মারা গেল? সম্প্রতি দিল্লীতে জুট-মিল্‌স এসোসিয়েশনের সদস্যদিগের সহিত প্রাদেশিক সরকার সমূহের এক পরামর্শ-বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে যে কোন সম্ভাষণক সিদ্ধান্ত হইয়াছে—এরূপ গুনিতে পাওয়া যায় নাই; তবে কলওয়ালারা এইরূপ সর্ভে পাট কিনিতে সম্মত হইয়াছেন যে, ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত তাঁহারা সাড়ে ৩৭ লক্ষ গাঁইট পাট কিনিবেন। বর্তমান বৎসরে অন্ততঃ ১ কোটি গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে; তন্মধ্যে কলওয়ালারা যদি সাড়ে ৩৭ লক্ষ গাঁইট

পাট ক্রয় করেন, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ কি সুবিধা হইবে? ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অনেক অল্প পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইলেও তাহার পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ গাঁইট; এবার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পাট উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পাটের অর্ধেকেরও কম—প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গাঁইট মাত্র যদি কলওয়ালারা চারি দফায় ক্রয় করেন, তাহাতে এ দেশের চাষীদের কোন লাভ হইবে না। কলওয়ালারা বাঁধা-দরে ঐ পাট কিনিবেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে পাটের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ বস্তা প্রস্তুত করিবার ‘পোড়েন’ নাই, তাহাকে সর্বনিম্ন পাট বলিয়াও গণ্য করা হইবে না। যাহাতে অন্ততঃ ঐরূপ আছে, তাহাকেই সর্বনিম্ন পাট বলিয়া গণ্য করা হইবে। দেশী পাটের দর হইবে বড় জোর ৭ টাকা, সাড়ে ৭ টাকা মণ। সর্বোৎকৃষ্ট পাটের দর কিছু অধিক হইবে। এক মণ পাট উৎপন্ন করিতে কৃষকদিগের গড়ে সাড়ে ৪ টাকা হইতে ৫ টাকা খরচাই পড়ে। ভাল পাট উৎপাদন করিতে আরও কিছু অধিক খরচা পড়িয়া থাকে। কাজেই এই দরে পাট বিক্রয় হইলে কৃষকরা কিরূপ লাভবান হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মোকামে পাট লইয়া যাইবার খরচা প্রভৃতিও আছে। সেই ব্যয় নির্বাহ করিয়া তবে ভাল পাট কলওয়ালাদিগের নিকট সাড়ে ৭ টাকা মণ বিক্রয় করিতে হইবে; সুতরাং কলওয়ালারা এই দিল্লী-পরিষদে বিশেষ কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। সচিববৃন্দ তাঁহাদের ‘সাত চোঙার বুদ্ধি’ এক করিয়া পাটের ফুঁপি ধরিয়া যতই টানাটানি করিতেছেন, পাটের গ্রন্থি ততই জটিল হইয়া উঠিতেছে। এখন দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়!

মাদুরায় হিন্দু সভা

বর্তমান পৌষ মাসের ১৩ই তারিখে দক্ষিণাপথের মাদুরায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সভারকর ইহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তাঁহার প্রধান বক্তব্য—“সরকার বখন হিন্দুদিগকে

বিশেষ ভাবে সাময়িক শিক্ষাদানের সুযোগ দিয়াছেন, তখন আমি আইন অমান্ত আন্দোলনের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি না।”—এই স্থানেই কংগ্রেসের সহিত তাঁহার মতবৈধ। তাঁহার মূল কথা, হিন্দুদিগের সাময়িক ভাবে সম্বন্ধ হওয়া সর্ব-বিষয়েই বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, তাহাদিগকে বহিঃশত্রুর এবং অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। গান্ধীজীর ‘অহিংসা ধর্ম’ তাঁহার আস্থা নাই; কারণ,



বীর বিনায়ক দামোদর সভারকর

তাঁহার মতে ‘অহিংসা’ সরকারকে হিন্দুদিগের শ্রাস্তসঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করাইতে এবং মোশ্লেম লীগের ‘গান্ধী পড়িয়া’ আক্রমণের প্রবৃত্তিকে প্রতিহত করিতে পারে না। অহিংসা-নীতিকে তিনি আত্মঘাতী-নীতি বলিয়া মনে করেন। তবে এ কথাও তিনি জানেন, হিংসার পথে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এ অবস্থায় তিনি কি করিবেন? পশুপলে যে দাবী স্বীকার করাইতে পারা যায় না, নৈতিক বলে এবং আত্মিক বলে তাহা স্বীকার করাইতে পারা যায়। ইহাই হিন্দুর শিক্ষা। কিন্তু

নৈতিক বল অর্জন করিতে কল্পসাধ্য সাধনা চাই,— সেই আত্মিক শক্তি লাভ করিতে হইলে আত্মিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক আলোচনায় কোন লাভ নাই।

হিন্দু মহাসভার আপাততঃ লক্ষ্য—উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনলাভ। এ বিষয়ে তাঁহার কংগ্রেস এবং উদারনীতিক দলের মধ্যপন্থী। মিঃ সভারকর ভারতবর্ষকে শিল্পপ্রধান করিতে চাহেন। ভারতে বড়-বড় শিল্পের কর্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পণ্য উৎপাদনে বৈদেশিক শিল্পের প্রতিযোগিতা প্রতিহত করাই তাঁহার লক্ষ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বিদেশী শিল্পজাত পণ্যকে আমল না দেওয়ার জন্ত উহা বর্জন করাই বিধেয়। আদম-সুমারে যাহাতে ঠিক লোকগণনা করা হয়, হিন্দুদিগের সংখ্যা যাহাতে যথার্থ ভাবে লিখিত হয়, তাহা করা কর্তব্য।

হিন্দুসভার সভাপতি মহাশয় উদারনীতিকদিগের শ্রায় নাজীবাদ ও ফাসিষ্টবাদের প্রতি উগ্র বিদ্বেষ প্রকাশ না করিলেও নাজীবাদ ও ফাসিষ্টবাদের নিন্দাই করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, গ্রেট বৃটেমই হউক, আর জার্মানীই হউক, ফ্রান্সই হউক, আর ইটালীই হউক, এবং পোল্যান্ডই হউক অথবা হল্যান্ডই হউক, যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহই নীতিজ্ঞানের প্রভাবে অথবা গণ-শাসনপ্রীতির প্রণোদনে বর্তমান যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। যাহারা যুদ্ধে যোগদান করে নাই, সেই রুসিয়া ও মার্কিংও লোকহিতৈষণা অথবা গণতান্ত্রিকতার জন্ত যুদ্ধে বিরত আছে, এরূপ নহে; সকলেই স্বার্থের জন্ত,—আত্মপোষণের জন্ত এই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, বা ইহা হইতে ঘুরে আছে। এ প্রসঙ্গ লইয়া বাদামুবাদ করা এখন বৃথা এবং অসঙ্গত। ইংলও যে নিঃস্বার্থ ভাবে অর্থাৎ কেবল ডেমোক্রেসীর প্রেমে যুদ্ধ হইয়া এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, এ কথা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে কোন মতবাদে মসৃণল না হইয়া, যাহাদের দ্বারা আমাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইবে, তাহাদেরই সহিত আমাদের সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু কাহার বা কাহাদের দ্বারা আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইবে, তাহা কি প্রথমে বুঝিতে পারা যায়? সেই জন্ত মিষ্ট কথায় কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সঙ্গত মনে। তিনি বলেন, এই যুদ্ধে বৃটিশ জাতি

এ-ভাবে পরাজিত হইতে পারে না যে, জার্মানী তাহাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইতে পারিবে। আর ইংরেজ জয়ী হইলেও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার রত্নটি পকেট হইতে বাহির করিয়া ভারতবাসীকে উপহার দিবে না।

যাহা হউক, তিনি বলিয়াছেন, ইংরেজ যদি এই যুদ্ধের পর এক বৎসরের মধ্যে আমাদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। ইনি পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং হিন্দুদিগকে কংগ্রেসের অনুকূলে ভোট দিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইনি সমগ্র হিন্দুজাতিকে সম্মবন্ধ হইতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সকল হিন্দু সকল বিষয়েই যে একমত হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না; তবে তিনি সরল এবং স্বাধীন ভাবে তাঁহার মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন, এ জন্ত তিনি সকলেরই প্রশংসাই।

নিখিল ব্রহ্ম-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

বঙ্গদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীরা বড়দিনের ছুটির সময় রেঙ্গুন সহরে নিখিল ব্রহ্ম-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোর্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ, পি-আর-এস, সেই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের বিশেষ পরিশ্রমে এবং যথেষ্ট ত্যাগস্বীকারে আপনাদের কুষ্টিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্ত এই প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ ভারতের সান্নিধ্যেই অবস্থিত; এই দুই দেশের মধ্যে নিবিড় সংযোগ ছিল। ব্রহ্মদেশ ভারতের ধর্ম দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল, কেবল ইহাই নহে, মন্দির-গঠনের স্থাপত্য, সাহিত্যিক ভাব, প্রশস্তি-লিখন প্রভৃতি দ্বারাও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রবাসী বঙ্গবাসীদিগের ব্রহ্মের সহিত বাঙ্গালার ভাবের আদান-প্রদান করা আবশ্যিক। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা

করা যে অবশ্যকর্তব্য, ইহা তাঁহারা ভুলিতে পারেন না। বিশেষতঃ, ভারতের সহিত ব্রহ্মের রাজনীতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হৃদয়ের যোগসূত্র ক্ষুদ্র হওয়াই উচিত, এবং সাহিত্যই প্রধান মিসন-সূত্র। আমরা এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

বড়লাটের পুনরুজ্জী

১লা পৌষ লর্ড লিনলিথগো 'এসোসিয়েটেড্ চেম্বারস অব কমার্সে' বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, তিনি বিগত আগষ্ট মাসে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই দিবার নাই! ঐ সময়ে তিনি ভারতবাসীদিগকে কি রত্ন দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ত আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তগুলের পরিবর্তে তুষে ভারতবাসীরা ভুষ্ট হইতে পারিতেছে না,—ইহাই কি ভারতবাসীর অপরাধ? ভারতে যে কয়টি রাজনীতিক দল আছে, তাহার মধ্যে উদারনীতিক দল অল্পেই সত্ত্বষ্ট হইতে রাজী। কিন্তু তাঁহারাও তাহাতে সত্ত্বষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা কলিকাতায় উদারনীতিক সভার বার্ষিক অধিবেশনে বিবিধ বক্তার উক্তিভেদেই প্রকাশ; সুতরাং বড়লাট ভুষ্ট করিবার মত কিছু দিতে চাহিয়াছেন, তাহা বলিবার উপায় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, কংগ্রেসের অশুষ্টিত সত্যগ্রহ দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকেরও মনোভাব প্রতিফলিত করে না। তাঁহার এই মন্তব্য, কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁহার বহু-পূর্ববর্তী এক বড়লাটের মন্তব্য—'মাইক্রস্কোপিক মাইনরিটী'রই প্রতিধ্বনি। কিন্তু বড়লাট যদি এইরূপই বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি সত্যই ভুল বুঝেন নাই? উহা দেশের সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলিত না করিতে পারে, কিন্তু বহু লোকেরই মনোভাব যে প্রতিবিম্বিত করে, তাহাতে সন্দেহ আছে কি? যাহারা কিছু দিন পূর্বে ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশে সংখ্যাধিক প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন, যাহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত ৭টি প্রদেশের রাজনীতির কার্য ও শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের পশ্চাতে যে অধিক সংখ্যক সম-মতাবলম্বী লোক নাই,—এরূপ মনে করা কি দূরদর্শিতার পরিচায়ক?

বড়লাট বলিয়াছেন, গত ৮ই আগষ্ট তিনি যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা “সরল, অকপট এবং উদার মনোভাব-প্রসূত।”—এ-মনোভাব হয় ত সত্য; কিন্তু ভারতের কোন রাজনীতিক দল যখন সে দান গ্রহণ করিল না, তখন তাঁহাদের বুঝা উচিত ছিল—উহাতে এমন কোন ফ্রটি ছিল, যে জগৎ কেহই উহা গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। আসল কথা, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্র এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, ফাঁকা কথায় তাহা ভিজাইবার আবধা নাই। তাঁহারা যদি ইতোমধ্যে যুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলেও দেশের লোক তুষ্ট হইতে পারিত; কিন্তু তাঁহারা সেরূপ প্রতিশ্রুতি দিতেও প্রস্তুত নহেন। তবে লোক কি গ্রহণ করিবে? কংগ্রেসের সভাপতি বড়লাটের ঐ অভিভাষণ সম্বন্ধে এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের কয়েক জন পদস্থ সদস্যের বিজ্ঞতাপূর্ণ পত্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “উহাতে নূতন কিছুই নাই। কংগ্রেস সম্মানজনক সর্ত্তে সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব করে; কিন্তু সরকার এ সম্বন্ধে আর কিছু বলেন নাই। সুতরাং কংগ্রেস বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থার পুনর্বিবেচনা করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছেন না।”

—

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের প্রতিবাদ

হকাই মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের প্রতিবাদকল্পে ৬ই পৌষ শনিবার হাজরা পার্কে যে বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা নানা কারণেই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিবাদ-সভায় প্রায় ১০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল, এবং বহু বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয় হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইয়া এই সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় ৭ শত স্কুলের সম্পাদক, প্রধান শিক্ষক ও অন্ত্রাণ্ড শিক্ষক, এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই বিলখানি বাঙ্গালায় কিরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতেই তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় বার্কক্য-জীর্ণ এবং ব্যাধিক্লিষ্ট দেহেও স্তম্ভিত কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সভাপতির দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং

জ্ঞানের সমর্থক, কর্তব্যনিষ্ঠ সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রতিবাদ-সভার অধ্যক্ষনা সমিতির সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। অতি অল্প দিন পূর্বে কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেও প্রতিপন্ন হইয়াছে—এই সভার উপযোগিতা কত অধিক।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে সার এণ্ডরু স্কোবলের বিলের প্রতিবাদকল্পে এক



আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল;—উৎসাহ এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় এই সভা তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন বলিয়া মনে হয় নাই। বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলীর এই বিলখানির প্রতিকূলে দেশের লোকের যে বিক্ষোভ লক্ষিত হইতেছে,—এক বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে উদ্ভূত বিক্ষোভের সহিতই তাহার তুলনা চলিতে পারে।

এই বিরাট প্রতিবাদ-সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে যে সকল কথা বলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েক জন বক্তার

হুই-একটি বিশেষ উক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত করা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “এই বিলখানির উদ্দেশ্য, মনে হইতেছে—বঙ্গালার শিক্ষাকে মুসলমানী-শিক্ষায় পরিণত করা, এবং আর্থিক দিক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পঙ্গু করা।” অধিকন্তু, “এই বিলখানি কৃতবৃত্ততার মনোবৃত্তি লইয়া পরিকল্পিত হইয়াছে।” কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাঁহাদের অর্থে পুষ্টি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্তই যেন এই পাণ্ডুলিপিখানি পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই জন্ত সার মন্মথনাথের এই উক্তি সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। এই বিলখানি যাঁহাদের পরিকল্পনা, তাঁহাদিগকে স্ৰাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টের দোহাই দিতে দেখিয়া সার মন্মথনাথ হাশ্ব সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বিলখানিতে স্ৰাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টের মূল নীতিই উপেক্ষিত হইয়াছে।

আচার্য্য সার পি, সি, রায়ের অভিভাষণটি দুর্বল দেখে পাঠ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইবে বলিয়া, ডক্টর শ্রীধুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। আচার্য্য রায় বলিয়াছেন, “এই বিলখানি আদৌ শিক্ষা-সম্পর্কিত নহে,—ইহা রাজনীতিক এবং সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা মাত্র।” যিনি অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল শিক্ষাদান-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য, এবং অত্যাভিবিহীন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বঙ্গালার স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের এবং শিক্ষাদানে ব্রতী ব্যক্তিগণের বংশ-পরম্পরার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্ত বঙ্গালার সচিব-গণের এই প্রচেষ্টা দেখিয়া আচার্য্যদেব বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “এই বিলখানি আইনে পরিণত হইলে ভিতর এবং বাহির হইতে সরকারই ইহার উপর কর্তৃত্ব করিবেন, বোর্ড তাহাদের প্রভুদিগের আদেশ ব্যতীত কোন নূতন কার্যের সূত্রপাত করিতে পারিবে না।”—তাঁহার এই উক্তি বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। এই বিলখানির আলোচনা-প্রসঙ্গে আচার্য্য রায় বলিয়াছেন, “আমরা এখন অতি সঙ্কট অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেছি। আমাদের চারি দিক নিবিড় তিমির-জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের

লোকের মন দারুণ বিবাদে নিমগ্ন হইতেছে। তবে এতগুলি প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি এখানে সমবেত হইয়াছেন—ইহা দেখিয়া আমার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে।”

আন্তোষ-হলে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি-প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ সারগর্ভ বক্তৃতায় বলেন, “শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করিলে তাহার ফল অতি ভয়ানক হইবে। ৫ হাজার বৎসর ধরিয়া এই ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন এবং প্রতীচীর শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। জার্মানীর, রোমানদিগের, এবং মার্কিণের পুনরভ্যুদয়ে ও রোমা রোঁলার ও মেটার্ণিকের চিন্তার ভাবধারা ভারতীয় চিন্তা হইতেই গৃহীত হইয়াছে।”—আজ মাধ্যমিক শিক্ষা বিপর্যস্ত করিয়া সেই চিন্তার উৎস রুদ্ধ করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা প্রতিহত করিবার জন্ত সমস্ত বঙ্গালীর বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা অবশ্যকর্তব্য।

উদারনীতিক-সঙ্ঘের অধিবেশন

গত ১৩ই পৌষ শনিবারে কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে উদারনীতিক সঙ্ঘের ২২তম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়; ১৫ই পৌষ উহার কার্য শেষ হইয়াছিল। এক সময় এই উদারনীতিক দলই ভারতের সর্বপ্রধান রাজনীতিক দল ছিল; কিন্তু কালের সহিত সমান ভাবে পদক্ষেপ করিয়া চলিতে পারে নাই বলিয়া ইহাকে আজ রাজনীতি-ক্ষেত্রে অনেক পিছাইয়া পড়িতে হইয়াছে। এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ রাজনীতিক, সাহিত্যবিশারদ জন মর্লি বলিয়াছিলেন, ‘উদারপন্থিগণকে পুনর্গঠিত কর (Rally the Moderates) ; তখন যদি বৃটিশ-কর্তৃপক্ষ এই দলের দাবী পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতে এইরূপ অশান্তি উপস্থিত হইত না; বৃটিশ জাতিকেও ভারতের জন্ত এত চিন্তিত হইত হইত না। ভারত বৃটিশ জাতির নির্ভরযোগ্য সহায় হইয়া তাঁহাদিগকে এই সাময়িক সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু সে সুযোগ ত্যাগ করিয়া বৃটিশ জাতি কত দূর বুদ্ধিমত্তার;

কিরূপ বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। যাহা হউক, সেই সাবেক উদারনীতিক দলের যাহারা এখনও অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারা হই ভারত সভার সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের বার্ষিক সভার অধিবেশন শেষ করিয়াছেন। এবার উদারনীতিক সজ্জের মিষ্টার ভি, এন, চন্দবরকর সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন; এবং



মিষ্টার ভি, এন, চন্দবরকর

লর্ড সিংহ অভ্যর্থনা সভার সভাপতি হইয়াছিলেন; উভয়েরই বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইহাদের উভয়ের মুখে একই কথা—আমরা ওয়েস্ট মিনিষ্টার স্ট্যাটুট-নির্ধারিত স্বায়ত্ত-শাসন চাহি। আমরা বৃটিশ রাজ্যের পরিবার হইতে স্বতন্ত্র হইতে চাহি না; আমরা বৃটিশ জাতির সহিত সংখ্যবদ্ধ হইয়া, সমাধিকারসম্পন্ন হইয়া থাকিতে চাহি। আজ বৃটিশ জাতি যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, সে যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ। অতএব এই যুদ্ধে যাহাতে বৃটিশ জাতির জয় হয়, তাহাই করা আমাদের কর্তব্য।

লর্ড সিংহ বাঙ্গালী, তিনি বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা বিশেষ ভাবেই অনুভব করেন; সেই জন্ত বাঙ্গালার

বেদনা তাঁহার বক্তৃতায় সুস্পষ্টরূপেই ধ্বনিত হইয়াছিল। এই জন্তই তিনি সাম্প্রদায়িক নির্দোষ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,— ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা যে, ভারতের শাসনযন্ত্রের প্রগতির বিনয় যে ভাবেই পরিকল্পিত হউক,—জাতির মধ্যে যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ এবং বিঘ্ন স্থান না পায়, এবং প্রাবল্য লাভ না করে, সে দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত।

কথাগুলি যে সত্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন কি, যাহারা যবনিকার অস্ত্রাঙ্গে থাকিয়া স্বার্থসাধনকল্পে সূত্রাকর্ষণে দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারাও



লর্ড সিংহ

কথাগুলির যথার্থ্য অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। কেবল কতকগুলি লোক তুচ্ছ কারণ দেখাইয়া ইহার সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, এবং যথাসাধ্য করিতে থাকিবেন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালায় যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যে সংখ্যালব্ধ সম্প্রদায়ের অধিকারের আশ্রয় বা জিহ্বাদার, এরূপ উদার মনোভাব প্রতিফলিত হইতেছে না। যোগ্যতা এবং চরিত্রবলের বনিয়াদের উপর শাসন-কার্য্য-সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না করিয়া জাতি, সম্প্রদায় এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের বনিয়াদের উপর উহা আইন-বলে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। এজন্য আমরা পশ্চাদাবর্তন করিতেই বাধ্য হইতেছি; ইহার ফলে সমগ্র দেশে 'ইনকুইজিশানের' আমল উপস্থিত হইতেও পারে। ইনি আরও বলিয়াছেন, এই বিংশ শতাব্দী

সাম্প্রদায়িক-নির্বাচন রোয়েদাদের জায় পশ্চাদবর্তী ব্যবস্থা-প্রবর্তনের যুগ নহে, এবং ভারতবর্ষও ঐরূপ প্রতিকূল ব্যবস্থা-প্রবর্তনের ক্ষেত্র নহে। ইদানীং বাঙ্গালায় যে সকল প্রতিকূল বিধি প্রণীত হইয়াছে, লর্ড সিংহ-তাহা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

মিষ্টার চন্দ্রবরকর অল্প ভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন। উদারনীতি কি, এবং তাহার দার্শনিক তত্ত্বই বা কিরূপ, তাহার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, “উদারনীতির মূল-মন্ত্র এই যে, জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী, গোষ্ঠী বা দল যাহাতে সমগ্র দেশের প্রকৃত স্বার্থের উপরে বাইতে না পারে, তাহাই কর্তব্য। সে দিন মিষ্টার আমেরী—‘ভারতই সর্ব-প্রথম’ এই ধূয়া ধরিয়াছেন। ইহার বহু দিন পূর্বে পর-লোকগত সার ফিরোজ সা মেটা কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে ভারতবাসী,—আর যদি কিছু থাকে, তবে তাহার পশ্চাতে তাহাদের স্থান, জাতি হিসাবে ইহাই ভারতের শেষ অবলম্বন। ভারতে একতা স্থাপন এবং জাতীয়তার সংগঠনই উদারনীতির দ্বিতীয় দফা। যাহাতে সেই একতার অপভ্রব ঘটে, তাহা করিলেই বৃদ্ধিতে হইবে, আমাদিগকে চির পরাধীন করিয়া রাখিবার জন্ত তাহা প্রবর্তিত হইতেছে। সামাজিক জীবনে একটি মাত্র জাতীয়তা হইতে পারে। ইহার মূল একতা। ইহারই নাম ভারতীয় জাতীয়তা। ভারতে এখন যদি সে ভাব দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্ত বহু দূর যাইতে হইবে না। মিণ্টোমর্লি-শাসনসংস্কারে যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাই ইহার মূল কারণ।”—এ কথা যে সত্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহা যাহারা সরকারের সর্বপ্রধান সমর্থক, সেই দলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা। মিষ্টার চন্দ্রবরকর তাঁহার অভিভাষণে আরও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,—“ব্রিটিশ সরকার সুদৃঢ় স্বরে বহুবার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিবেন, কিন্তু কত দিন পরে ভারতবাসী সেই অধিকার পাইবে, তাহা বলা আবশ্যিক। তিনি বলিয়াছেন, বৃদ্ধ অবসানের পর যথাসম্ভব অল্প কালের মধ্যে ঐ অধিকার দেওয়া কর্তব্য। তাঁহার

মতে দুই বৎসরের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি পালন করা অবশ্য-কর্তব্য। তাহার পর ভারতবাসীরা তাহাদের মুক্তির পথ আপনারা প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ সরকারের ভারতে তাঁহাদের গুণ ইচ্ছা জ্ঞাপক একটি মিশন প্রেরণ করা কর্তব্য। ঐ মিশন ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বন্ধুত্বের চুক্তি করিবেন। সেই সন্ধি আয়র্লণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধির ছবছ নকল না হউক, কতকটা ঐরূপ ভাবে হইবে।”—ইনি আরও বলিয়াছেন, “ভারতবাসীর সহিত ইংলণ্ডের শাসন-সমস্তার সমাধান সর্বাগ্রে করিতে হইবে। উহার সমাধান না হইলে অল্প সমস্তার সমাধান হইবে না।”—ইনি পাকিস্থান পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত উদারনীতিকদিগের যে যে বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহার কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য এইবার স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইল।

প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলন

১৩ই পৌষ শনিবার জামসেদপুরে বঙ্গীয় ‘প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের’ অধিবেশন হইয়াছিল, এবার এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন ঐযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, এবং টাটার কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, জে, গাণ্ডী মূলসভায় সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; তিনি বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিবৃত করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন—অনুবাদ পাঠেই তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত পরিচিত। তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলেন, বাঙ্গালা গ্রন্থ যাহাতে সকলে পড়ে, এবং বাঙ্গালার চিন্তার ভাবধারার সহিত অন্যান্য প্রদেশের লোক যাহাতে পরিচিত হইতে পারে, সে জন্ত সকলের চেষ্টা করা উচিত; তবে তাঁহার উক্তির মধ্যে একটি বিশেষ কথা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, “বাঙ্গালীরা সাহিত্য সম্বন্ধে যত দূর অবহিত, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে তদ্রূপ অবহিত নহেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সময় বাঙ্গালায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করিয়াছিল, সে সময় বাঙ্গালীরা শিল্প ও

বাগিজ্যে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করেন; কিন্তু তাহার পর তাঁহারা কেরাণীগিরির মোহে আকৃষ্ট হইয়া শিল্প-বাগিজ্যের সেবা ত্যাগ করেন। আজ বাঙ্গালার পাট-

“বাঙ্গালা সাহিত্য কেবল যে বাঙ্গালীর ধর্মীয় স্পন্দনই প্রকাশ করে, এরূপ নহে, উহা অশান্ত প্রদেশের লোকের হৃদয়ের স্পন্দনও প্রতিফলিত করে; সেই জন্ত আমি বলি—



শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত



টাটাব জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার জে. জে. গাভী

কল, কমলার ধনি প্রভৃতি প্রায় সকলই বৈদেশিকগণের হস্তগত, কার্পাস কল এবং চিনির কল বাঙ্গালীর অধিক নাই; ইহার কারণ বাঙ্গালীর ধৈর্যের অভাব। তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ নাই। অধিকন্তু, উত্তেজনাজনক কার্যেই তাঁহারা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। সুদূর সঙ্কল্পের বশবর্তী হইয়া মৌন-ভাবে তাঁহারা কার্যপরিচালনে অসমর্থ। যে সকল কার্য সংসাধনের জন্ত লোক-নয়নের অন্তরালে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহাতেই নিরন্তর ব্রতী থাকিতে হয়, এবং অদম্য জিদের সহিত যাহাতে আসক্ত থাকিতে হয়, সেই সকল কার্যে বাঙ্গালীর মন বসে না। সার পি, সি, রায়ও এই কথা বলিয়াছেন।”—কথাগুলি সত্য হইলেও সাহিত্য-সম্মেলন এই সকল প্রসঙ্গের অবতারণার স্থান নহে। বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে অবাদালী সভাপতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলেও তিনি বলিয়াছেন—

বাঙ্গালীর সাহিত্যে যাহা গৌরবচোতক, তাহা সমগ্র ভারতেরই গৌরবচোতক।” এই সভায় শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতাটি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বিজ্ঞান-কংগ্রেস

এবার বারাণসীধামে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বৈঠক বসিয়াছিল। সার আর্দেশীর দালাল তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটি চিন্তাশীলতাপূর্ণ ও চিন্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি কেবল বৈজ্ঞানিক নহেন, শিল্প-সেবাতেও তাঁহার দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধকালীন সুবিধা সম্বন্ধে ভারতীয় শিল্প প্রগতির পথে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না কেন, সে সম্বন্ধে সার

আর্দেশীর অতি সম্ভরণে তাঁহার স্মৃতিস্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক এবং শৈল্পিক অমুসন্ধান-সমিতির কথা আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, এই বোর্ড প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; কারণ, উহা যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহা দ্রুত প্রগতি-সাধনের অমুকুল নহে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রী সরকারের একটি বিভাগের সহিত উহার সংস্রব রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগে ইহার কার্য-পরিচালনোপযোগী পর্যাপ্ত লোক নিয়োগ করা হয় নাই। এক কথায় সকল দিক হইতেই এই বোর্ডকে সরকার পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছেন। এই বোর্ডের ব্যয়-নির্বাহের জন্ত সরকার প্রথমে কেবল ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় কার্য-নির্বাহের জন্ত এই টাকার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। সরকারের লাল-ফিতার বন্ধনে আবদ্ধ শিল্প-সংক্রান্ত কার্য দ্রুত উন্নতিসাধনে কখনও সমর্থ হয় নাই। সার আর্দেশীর আলিপুরের 'স্টেট-হাউস'কে জাতীয় ভৌতিক এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরিণত করিতে চাহেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, অমুকুল রাজনীতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হইলে শ্রমশিল্প কুত্রাপি উন্নতিলাভে সমর্থ হয় না। ভারতে শ্রমশিল্প যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে না, সে-জন্ত সরকারী নীতি যে কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী—এ কথা তিনিও বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিযোগ কি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে? নতুবা এ আক্ষেপ অরণ্যে রোদন মাত্র!

উষারানী দেবীর কারাবরণ

সাঁওতাল-পরগণাস্থ ছমকার ফরওয়ার্ড-ব্লকের সভানেত্রী শ্রীমতী উষারানী মুখোপাধ্যায় ভারতরক্ষা আইনে ধৃত হইয়া কারাবাসিনী হইয়াছেন। ছমকা-জেল হইতে তাঁহাকে হাজারিবাগ-জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী স্বামী দেবী তাঁহার সঙ্গেই আছেন।

শ্রীমতী উষারানী ছমকার নানাপ্রকার সদমুঠানে রত ছিলেন। তাঁহার চেষ্ঠাতেই সেখানে জনসাধারণের মধ্যে ফরওয়ার্ড-ব্লকের প্রতিষ্ঠা হয়; এবং তাঁহার আগ্রহের জন্তই ভূতপূর্ব রাজকর্মচারী শ্রীমতী হরিবিষ্ণু কামাথ আই, সি, এস চাকবি-ত্যাগের পর তাঁহাকে ছমকার

ফরওয়ার্ড-ব্লকের সভানেত্রীর পদ প্রদান করেন। তাঁহার দেশহিতব্রত প্রশংসনীয়।

পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য

কেন্দ্রী পরিষদের সদস্য পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া দিল্লীর আরউইন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু চিকিৎসায়



পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য

তাঁহার কোন উপকার হয় নাই। কিছু দিন রোগ ভোগ করিয়া ১৯শে পৌষ শুক্রবার রাত্তিকালে এই হাসপাতালেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মৃতদেহ তৎপর-দিন এলাহাবাদে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে যৌবন-সীমা অতিক্রম করেন নাই। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, এবং কেন্দ্রী-পরিষদে স্বদেশবাসীর স্বার্থ-সমর্থনের চেষ্ঠা করিতেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও খ্যাতনামা সাংবাদিক, মাতৃভাষার সেবায় আমাদের সহযোগী স্মৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সংপ্রতি অশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার কর্মস্থান বোম্বাই নগরে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের স্পন্দন রহিত হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এই দুঃসংবাদে আমরা আত্মীয়-বিয়োগবেদনা অনুভব করিয়াছি। নগেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে



নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বঙ্গসাহিত্যের কত ক্ষতি হইল, যাহারা বহু দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যের সহিত ধনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গসাহিত্যের যে সকল নবীন লেখক সাহিত্য-সাধনায় সাফল্য লাভ করিয়া সুলেখক বলিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারস্তর বহু পূর্ব হইতেই নগেন্দ্রনাথ সুলেখক বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন, এবং তিনি বঙ্কিম-বুগের লেখকগণের সমসাময়িক না হইলেও শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর কর, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুত

যতীন্দ্রমোহন সিংহ ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাপন্ন সেবকগণের সমসাময়িক ছিলেন; তিনি স্মর্দীর্ঘ জীবনে ইহাদের অনেকেরই অপেক্ষা দীর্ঘকাল মাতৃ-ভাষার সেবার সুর্যোগ লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃ-ভাষার জায় ইংরেজী ভাষাতেও তাঁহার লিপিকুশলতা অসাধারণ ছিল, এবং তিনি এই শক্তির সম্যক সম্ব্যবহার করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের একরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন পুরাতন কৃতী সেবকের জীবন-কথা আলোচনার যোগ্য।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিহারের মতিহারীতে নগেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মথুরানাথ গুপ্ত সব-জজ ছিলেন। তিনি প্রথমে ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন; পরে ত্রিশ বৎসর বয়সে ইংরেজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়া এই ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ পিতার মধ্যম পুত্র। তিনি কলিকাতার কলেজে যখন অধ্যয়ন করেন, তখন পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবাক্তব উপাধ্যায়, সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। কিন্তু

সংবাদপত্রের সেবায় আকৃষ্ট হওয়ায় সহসা একুশ-বাইশ বৎসর মাত্র বয়সে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থ করাচিতে উপস্থিত হইয়া 'ফিনিক্স' নামক সংবাদ-পত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। এই কার্যে তিনি আট বৎসর কাল লিপ্ত থাকিবার পর, লাহোরে আসিয়া লাহোরের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'ট্রিবিউনের' সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। এই কার্যেও তিনি পাঁচ বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া দীর্ঘকাল পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি 'প্রভাত' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার গ্রে-স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিতেন; গ্রে-স্ট্রীটের এক প্রান্তে তাঁহার বাড়ী, ও অত্র প্রান্তে তখন 'বঙ্গমতী' আফিস ছিল। তাঁহার গৃহে সর্বদাই খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের সমাগম হইত। সাধারণের নিকট তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন; এজন্য অনেকেই ভুল ধারণায় তাঁহাকে দান্তিক মনে করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার হৃদয় কোমল ছিল, এবং বহুগণ তাঁহার সরস আলোচনায় মুগ্ধ হইতেন।

নগেন্দ্রনাথ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান পিপল' নামক একখানি সংবাদপত্রের ভার গ্রহণ করিয়া এক বৎসর পরে তাহার স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ হইতে 'লীডার' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিছু দিন পরে 'ইণ্ডিয়ান পিপল' 'লীডারের' সহিত সম্মিলিত হইলে তিনি 'লীডার' পরিচালিত করিতে থাকেন; কিন্তু এই পত্রিকার পরিচালক-বর্গের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি 'লীডারের' সংস্রব ত্যাগ করেন, এবং লাহোরে গমন করিয়া পুনর্বার 'ট্রিবিউনে' যোগদান করেন। তিন বৎসর পর তিনি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া কাশিমবাজার মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে তাঁহার রাজনীতি-কার্যে সহায়তা করেন, এবং অতঃপর 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন।

কিন্তু প্রবাসেই তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল; পুনর্বার তাঁহাকে প্রবাসী হইতে হইল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সুপ্রসিদ্ধ টাটা কোম্পানীর তৈল-কলের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিয়া বোম্বাই নগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। টাটার পাশী হইলেও গুজরাতি ও ইংরেজী ভাষায় 'প্রজামিত্র' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছিলেন; নগেন্দ্র বাবু টাটা কোম্পানীর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া 'প্রজামিত্রের' ইংরেজী অংশের সম্পাদন-ভার গ্রহণে দীর্ঘকালের সাহিত্য-সেবাস্রত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বোম্বাই সহরে পাশীশ্রেষ্ঠ দাদাভাই নওরোজীর ঐরূপ দ্বিভাষার (ইংরেজী ও গুজরাতি) 'রাস্ত-গোফ্তার' নামক একখানি পত্রিকা ছিল, তাহাও তিনি সুচিন্তিত প্রবন্ধসম্মানে সমৃদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র বাবু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে টাটার কার্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাহার আকাজিক সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশের অবসর পাইলেন। এই সময় তিনি 'মাসিক বঙ্গমতী', 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি 'ভারতী' ও 'সাহিত্যে'ও গল্প লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'ছইবার' 'চুরি না বাহাচুরী'

প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠ করিলে গল্পের যাহুকর প্রভাত-কুমারের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি মনে পড়ে। তাঁহার রচনার ভাষা স্বচ্ছ, সরল, এবং সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত। কি সাহিত্যে, কি সংবাদপত্র-সম্পাদনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সাহিত্যালোচনায় লিপ্ত ছিলেন, এবং তাহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার অধ্যয়াজি 'বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে ভগবান্দ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শন লাভ করিয়া তিনি ধন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র বাবুর তিন পুত্র ও চারি কন্যা; তাঁহার পত্নীও জীবিত আছেন। তাঁহাদের এই শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্দ্রী নগেন্দ্র বাবুর আত্মার কল্যাণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বারীন্দ্রনাথ সেনের শোচনীয় মৃত্যু

বারীন্দ্রনাথ সেন ফরিদপুর অঞ্চলের জমিদার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের অভিপ্রায়ে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। হিসাব-শিক্ষকের কার্যে তিনি সেখানে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগও পাইয়াছিলেন। তিনি সফল-মনোরথ হইয়া যথাসময়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন; কিন্তু বিধাতার বিধান অন্তরূপ! ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি লণ্ডনের গাওয়ার ষ্ট্রীটস্থ ভারতীয় ছাত্রাবাসে জার্মান-বিমান হইতে বর্ষিত বোমার আঘাতে নিহত হইয়াছেন। এক মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার জন্ম; আর এক মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার জীবনের অবসান! বারীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই অনেক সঙ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার শোকাক্ত পিতা-মাতাকে সাহসনাদানের ভাষা নাই; ভগবান্দ্রী তাঁহাদের অন্তরে শান্তিদান করুন।

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বঙ্গমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



“এখানে বসুমতী গীত রচনা করতেন
মুখপাশি তুলে দাবা; অনেক-অভ্যন্তর
বড় বড় হাট চক্ষু পলক-প্রদায়—”



[১৯শ বর্ষ]

মাঘ, ১৩৪৭

[৪র্থ সংখ্যা]

আচার্য্য ভর্তৃহরি

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে
বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে স্থলবিশেষে প্রসঙ্গক্রমে
দার্শনিক বিষয়ের চর্চা দেখিতে পাওয়া যায়।

সূত্রকার পাণিনি এবং বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পরে

পতঞ্জলির আবির্ভাব। পতঞ্জলির পূর্ববর্ত্তী সময়ের বৈয়াকরণগণের কোন দার্শনিক গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না; মহাভাষ্যের পূর্বে “সংগ্রহ” নামে একখানি গ্রন্থ ছিল; সেই গ্রন্থের প্রণেতা ব্যাডি এবং সেই গ্রন্থ লক্ষ্মণোকাঙ্ক ছিল। পুণ্যরাজ বাক্যপদীয়ার টিকায়, কৈয়ট মহাভাষ্যপ্রদীপে ও নাগেশভট্ট মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্যোতে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১)। এই গ্রন্থে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা ছিল। শব্দ নিত্য কি অনিত্য,—এই প্রকারের বিচার সে গ্রন্থে ছিল, ইহা আমরা মহাভাষ্য হইতে জানিতে পারি (২)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সে গ্রন্থে দার্শনিক বিচার ছিল। কিন্তু সেই গ্রন্থ

বহু পূর্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। মহাভারতের শ্রায় বিশাল সেই “সংগ্রহ”, যে সময়ে বৈয়াকরণরা আলম্বনশতঃ অভ্যাস করিয়া রাখিতে অসমর্থ হইতেছিলেন, সেই সময়ে পতঞ্জলি বৈয়াকরণদের সুবিধার জন্য পূর্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষিপ্ত ভাবে সংগৃহীত করিয়া মহাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন (৩)।

প্রাধান্তেন পরীক্ষিতং নিত্যো বা ত্যং কার্যো বেতি।—মহাভাষ্য-পম্পশাহিক।

- (৩) প্রায়ৈণ সংক্ষেপকটীনম্নবিজ্ঞাপরিগ্রহান্ ।
প্রাপ্য বৈয়াকরণান্ বৈ সংগ্রহেহস্তমুপাগতে ।
কুতেহখ পতঞ্জলিনা গুফণা তীর্ধদর্শিনা ।
সর্কেষ্বাং শ্রায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে ।

—বাক্যপদীয় ২।৪৮৪, ৪৮৫

(১) “ইহ পুরা পাণিনীয়েহস্মিন্ ব্যাকরণে ব্যাড্যপরিচিতং
গ্রন্থলক্ষপরিমাণং সংগ্রহাভিধানং নিবন্ধনমাসীৎ ।”—বাক্যপদীয়
দ্বিতীয়কাণ্ড (৪৮৪ শ্লোক) পুণ্যরাজ টিকা। সংগ্রহে গ্রন্থবিশেষে ।—
মহাভাষ্যপ্রদীপ—পম্পশাহিক। সংগ্রহো ব্যাডিকুতো লক্ষ্মণোক-
সংখ্যাকো গ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধিঃ ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত।

(২) কিং পুননিত্যঃ শব্দ আহোবিৎ কার্যঃ । সংগ্রহে এতৎ

“সংগ্রহ” গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা মহাভাষ্যকারের সময়ে
বিলুপ্ত হইলেও, মহাভাষ্যকার সে গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন, ইহাতে কোন
সন্দেহ নাই। মহাভাষ্যে আরও দুই স্থলে “সংগ্রহের” উল্লেখ দেখিতে
পাওয়া যায়;—(১) পম্পশাহিকে “সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে” এই কাত্যায়ন-
বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি “সিদ্ধ” শব্দটিকে ‘নিত্য’ এই অর্থে ব্যাখ্যা
করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে প্রমাণরূপে “সংগ্রহে”র উল্লেখ করিয়া-
ছেন :—“সংগ্রহে কার্যপ্রতিবন্ধিতাবাগ্ভামহে নিত্যপর্যায়বাচিনো

আমরা মহাভাষ্যে দার্শনিক বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা লক্ষ্য করিলেও সে গ্রন্থে দার্শনিক বিষয়ের প্রাধান্য দেখিতে পাই না ; তাহার কারণ, মহাভাষ্যকার শব্দের সাধনের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, সুতরাং

গ্রহণমিতি । ইহাপি তদেব ।” (২) উত্তরপ্রাণ্টী কর্মণি (২।৩.৬৬) সূত্রের মহাভাষ্যে একটি বার্তিকের উদাহরণে “সংগ্রহে” নাম উল্লিখিত হইয়াছে,—“শোভনা খলু দাক্ষায়ণ্য সংগ্রহস্ত কৃতিঃ । শোভনা খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্ত কৃতিঃ ।” মহাভাষ্যে এইরূপ “সংগ্রহে”র উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, ভাষ্যকারের সময়ে “সংগ্রহে”র অধ্যয়নের বিলোপ ঘটিলেও, তাহার গৌরব পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয়ে জাগরুক ছিল ।

বাস্তবিকরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে সংগ্রহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—

“অসৌ পুনর্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্
সর্বোশ্বখঃ প্রষ্টুন্ননাঃ কপীজঃ ।
উজ্জ্বলিরেবস্তগিরিং জগাম
গ্রন্থং মহদ্ ধারয়ন্তপ্রমেচঃ ।
সসংগ্রহস্ত্যর্থপদং মহার্ঘং
সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীজঃ ।
মহস্ত কশ্চিৎ সদৃশোহস্তি শাস্ত্রে
বৈশারদে ছন্দোগতো তর্থেব ।” ৮।১।৪৪-৪৫

এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, হনুমান্ সর্বোশ্বখের নিকট “সংগ্রহ” সহিত ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।

বাক্যপদীর টীকাকার পুণ্যরাজ “সংগ্রহ” গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । বাক্যপদীর ত্রয়োদশকাণ্ডের ২৬ শ্লোকের টীকায় দুইবারে “সংগ্রহে”র তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সংগ্রহকারের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । ফোটিবাস্তবিকের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বলা হইয়াছে—বাক্যের অন্তর্গত পদের কোন অর্থ নাই ; বাক্যার্থের পর্য্যালোচনা করিয়া পদার্থের কল্পনা করা হয়, এই মাত্র । এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শনের উদ্দেশে “তদুক্তং সংগ্রহে” এই বলিয়া একটি শ্লোক প্রদর্শিত হইয়াছে ;—

“নহি কিঞ্চিৎ পদং নাম রূপেণ নিয়তং কচিৎ ।

পদানামর্থরূপং চ বাক্যার্থাদেব জায়তে ।”

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোন পদের সহিত কোন অর্থের সম্বন্ধ নাই ; বাক্যার্থ হইতেই পদের অর্থ কল্পিত হয় ।

ইহার পরে, এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই আরও দুইটি শ্লোক “সংগ্রহে”র নামে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায় ;—

শব্দার্থয়োরসম্বন্ধে ব্যবহারে পৃথক্ ক্রিয়া ।

যতঃ শব্দার্থয়োস্তস্বমেকং তৎ সমবস্থিতম্ ।

সম্বন্ধস্ত ন কর্তাহস্তি শব্দানাং লোকবেদয়োঃ ।

শব্দেবেব হি শব্দানাং সম্বন্ধঃ স্তাৎ কৃতঃ বধম্ ।”

ইহার তাৎপর্য এই যে, শব্দ এক অর্থের পারমাণ্বিক স্বরূপ একই ; কেবল ব্যবহারিক অবস্থায় ইহাদের ভেদ করা হয় । বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃত ভাষার শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ থাকার শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি জন্মে,—সেই সম্বন্ধের কেহ

দার্শনিক বিষয় তাঁহার আলোচ্যের মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই । তথাপি তিনি প্রসঙ্গক্রমে যে সকল দার্শনিক তত্ত্বের সংক্ষিপ্তভাবে সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে বীজরূপে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে বৈয়াকরণগণের দার্শনিক মত পল্লবিত হইয়া বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল । মহাভাষ্যকারের পরবর্তী কালে বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ে দার্শনিক আলোচনার যে বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমরা ভর্তৃহরির বাক্যপদীরে দেখিতে পাই । আচার্য্য ভর্তৃহরি মহাভাষ্যের একখানি টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।

কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত কৈয়টোপাধ্যায় সেই ভর্তৃহরি-রচিত টীকা অবলম্বন করিয়া মহাভাষ্যের “মহাভাষ্য-প্রদীপ” নামে টীকা প্রণয়ন করেন (৪) ।

পাণিনির সূত্রগুলি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারি পাদে (=অংশে) বিভক্ত—ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন ; এই সূত্রের উপর, কাত্যায়ন আবশ্যিকতা অনুসারে বার্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন । পতঞ্জলি মহাভাষ্যে প্রধানভাবে বার্তিকব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেও সূত্রগুলির স্পষ্ট এবং যথার্থ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন (৫) । ভর্তৃহরি সমগ্র মহাভাষ্যের টীকা

কর্তা নাই, অতএব এই সম্বন্ধ অনাদি । কোন ব্যক্তি যদি শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ করে, তবে সে অস্ত্র কোন শব্দকে অবলম্বন করিয়া সে সম্বন্ধ করিবে । যে শব্দকে অবলম্বন করিয়া অস্ত্র শব্দের সম্বন্ধ করা হইবে, সেই শব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধও অস্ত্র শব্দকে অবলম্বন করিয়া করিতে হইবে । এইরূপে অনবস্থাদেব ঘটায় শব্দের ষাণ্ডা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ করা বাইতে পারে না, অতএব শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনাদি, ইহাই পর্য্যবসিত হইতেছে ।

যে স্থলে অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশে ‘ঘট’ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, ‘ঘট’ শব্দ—এই অর্থেই ‘ঘট’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, সে স্থলে একটি ‘ঘট’ শব্দ বাচক এবং অস্ত্র ‘ঘট’ শব্দটি বাচ্য । এইরূপ দুইটি ঘট শব্দ পরস্পর বিভিন্ন দুইটি শব্দ হইলেও আকারের সাদৃশ্যবশতঃ অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—ইহা “সংগ্রহ”কার বলিয়াছেন—এ কথা পুণ্যরাজ একস্থলে বলিয়াছেন ;—“সংগ্রহকারস্ত অভিধেয়ং স্বরূপং নাভিধানতাং প্রতিপত্ততে তদ্বভিধেয়মেব গোপিণ্ডাদিবৎ, তুল্যরূপতয়া অভিধানতামনাপন্নমপি সমুচ্চার্য্যমাণ-স্বেনাবসীন্নত ইত্যাহ ।”—বাক্যপদীরটীকা ১।৬৫

(৪) তথাপি হ্রিব্বন্ধে সারণে গ্রন্থসেতুনা ।

ক্রমমাণঃ শব্দৈঃ পারং তস্ত বাস্তাবি পদুবৎ ।

—মহাভাষ্যপ্রদীপ-উপক্রম ।

(৫) মহাভাষ্যে পাণিনির সকল সূত্র ব্যাখ্যাত হয় নাই ;

লিখিয়াছিলেন; তাহা না হইলে, কৈয়ট কেবল তাঁহার টীকাকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায় সমর্থ হইতেন না। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন পণ্ডিত বর্দ্ধমান হুরি “গণরত্নমহোদধি” নামক একখানি ব্যাকরণসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; সেই গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রের অপেক্ষিত গণপাঠ প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান হুরি স্বয়ং এই “গণরত্নমহোদধি”র একখানি টীকাও লিখিয়া গিয়াছেন। সেই টীকায় তিনি ভর্তৃহরির পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,— ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় এবং প্রকীর্তকের প্রণেতা এবং মহাভাষ্যের তিনটি পাদের ব্যাখ্যাতা (৬)। বর্দ্ধমান হুরির এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি ভর্তৃহরি-প্রণীত মহাভাষ্যটীকার তিন পাদ মাত্র দেখিয়াছিলেন,— তাঁহার সময়ে এই মহাভাষ্যটীকার তিনটি পাদ মাত্র প্রচলিত ছিল।

এখানে একটি বিচার্য্য বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। অধ্যাপক ম্যাকডনেল তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কৈয়টের সময় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (৭)। জৈন পণ্ডিত বর্দ্ধমান হুরি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে “গণরত্নমহোদধি” রচনা করেন,—ইহা তিনি গ্রন্থশেষে লিখিত পৃষ্ঠে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,— বিক্রমাদিত্য হইতে ১১৯৭ বর্ষ গত হইলে “গণরত্নমহোদধি” রচিত হইয়াছে (৮)। বিক্রমাদিত্যের অঙ্কের নাম সংবৎ। এই সংবৎ হইতে ৫৬ বৎসর বাদ দিলে খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ১১৯৭ হইতে ৫৬ বাদ দিলে ১১৪১ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি,— খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গণরত্নমহোদধি রচিত

পতঞ্জলি যে স্থলে আবশ্যিকতা অনুভব করেন নাই, সে স্থলের ব্যাখ্যা করেন নাই।

(৬) ভর্তৃহরিবাক্যপদীয়প্রকীর্তকয়োঃ কর্তা মহাভাষ্যত্রিপাঠা ব্যাখ্যাতা চ।—বর্দ্ধমানহুরিকৃত গণরত্নমহোদধি-ব্যাখ্যা—উপক্রম।

(৭) The Mahabhashya was commented on in seventh Century by Bhartrihari in his vakya-padiya.....and by Kaiyata (probably thirteenth Century)—A History of Sanskrit Literature, (Macdonell) P. 431 (Fourth Edition.)

(৮) সপ্তনবত্যধিকেষুদশসু শতাব্দীতেষু।
বর্ষাণাং বিক্রমতো গণরত্নমহোদধিবিহিতঃ।

হইয়াছিল। সেই সময়ে ভর্তৃহরির মহাভাষ্যটীকার তিন পাদ মাত্র প্রচলিত থাকিলে, তাহার পরের শতাব্দীতে ভর্তৃহরির টীকার অবলম্বনে কৈয়টের মহাভাষ্য-প্রদীপ রচনা সম্ভাবিত হইতে পারে না। এই গ্রন্থ সত্যের অমুরোধে বলিতে হইবে, অধ্যাপক ম্যাকডনেল কৈয়টের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সময় যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় না।

বর্দ্ধমান সময়ে ভর্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাপ্য হইয়াছে। এই টীকার খণ্ডিত কিয়দংশ বার্লিন লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে, ইহা আমরা ডাক্তার কীলহর্নের সম্পাদিত এবং বম্বে গভর্নমেন্টের শিক্ষাবিভাগ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মহাভাষ্য দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হইতে জানিতে পারি (৯)। কিছু দিন পূর্বে এক জন পাজাবী পণ্ডিত একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রে ঘোষণা করেন, তিনি ভর্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকার সম্পূর্ণ পুস্তক পাইয়াছেন। তিনি সেই পুস্তকের কিয়দংশ ধারাবাহিকভাবে একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেই গ্রন্থের রচনা-পদ্ধতি ও ভর্তৃহরির অলৌকিক প্রতিভা এবং অসামান্য পাণ্ডিত্যের বিষয় পর্যালোচনা করিলে, সেই গ্রন্থ যে ভর্তৃহরির বিরচিত মহাভাষ্য-টীকা, সে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ উপস্থিত হয়।

ভর্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকা বহুদিন হইতে বিলুপ্ত হইলেও, তাহার স্মৃতি এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এই টীকার বিলোপ হওয়া সম্বন্ধে কাশীর প্রাচীন পণ্ডিত-সম্প্রদায়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। আমরা পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৬ শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নকালে এই কিংবদন্তী এইরূপ শুনিয়াছি;—

(৯) Of Bhartrihari's Commentary on the Mahabhashya no complete manuscript has yet been discovered, and for a knowledge of that work we therefore can only consult the fragments preserved in the Berlin Library.—The Vyakana-Mahabhashya vol. II. Preface, P. 12.

সম্প্রতি বার্লিন লাইব্রেরী হইতে এই খণ্ডিত টীকার কটাপ্রাক করাইয়া মাস্তাজের গভর্নমেন্ট লাইব্রেরীতে আনা হইয়াছে।

ভর্তৃহরি অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি মহাভাষ্যের টীকা রচনা করিয়া তাহার শেষে এই শ্লোকটি সংযোজিত করেন;—

অহো ভাষ্যমহো ভাষ্যমহো বসুমহো বসুম্।

মামদৃষ্টা গতঃ স্বর্গমকুতার্ধঃ পতঞ্জলিঃ ॥

—মহাভাষ্য অপূর্ব গ্রন্থ; আমিও অপূর্ব মানুষ। আমাকে না দেখিয়া পতঞ্জলি অকুতার্ধ অবস্থায় স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

ভর্তৃহরির এই শ্লোক, তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলী অতি গুরুতরভাবে গ্রহণ করিলেন। এই শ্লোকের দ্বারা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া, সেই সময়ের পণ্ডিতগণ একযোগে স্থির করিলেন, তাঁহারা ভর্তৃহরির কোন গ্রন্থই প্রচারিত হইতে দিবেন না। সে সময় মুদ্রা-যন্ত্র না থাকায় গ্রন্থ-প্রচারের একমাত্র উপায় ছিল অধ্যাপনা; পণ্ডিতগণ একযোগে ভর্তৃহরির গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতে অস্বীকার করিলেন। গ্রন্থ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রচলিত না হইলে অল্প দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক গতিতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে,—এই আশঙ্কায় ভর্তৃহরি ব্যাকুল হইলেন এবং নিজের গর্ভিত উক্তির জন্ত পণ্ডিতমণ্ডলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার গ্রন্থের প্রচারের জন্ত অনেক অমুনয়-বিনয় করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতগণ অনেক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইলেও মহাভাষ্যের টীকাখানিকে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না; ভর্তৃহরির অপর গ্রন্থ বাক্যপদীয় অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রচলিত করিলেন। এইরূপে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় পরিগৃহীত না হওয়ায় ভর্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকা বিলুপ্ত হইল।

এই কিংবদন্তীর কতটুকু সত্যতা আছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ভর্তৃহরি অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার প্রণীত মহাভাষ্যের একখানি টীকা ছিল,—এ সংবাদ আমরা এই কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারি। এই কিংবদন্তীকে অবলম্বন করিয়া ভর্তৃহরির মহাভাষ্যের বিলুপ্ত টীকার স্মৃতি এই সময় পর্যন্ত কাশীর পণ্ডিত-সমাজে চলিয়া আসিতেছিল। পুণ্যরাজ তাঁহার প্রণীত বাক্যপদীয়ের দ্বিতীয় কাণ্ডের টীকায় অনেক স্থানে ভর্তৃহরিকে ‘টীকাকার’ এই শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা ভর্তৃহরি যে মহাভাষ্যের টীকাকার, তাহাই স্মৃতিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকদের গ্রন্থে “শ্রায়বার্ত্তিকতাৎ-পর্যটীকা” কার বাচস্পতি মিশ্রের উল্লেখ এই ভাবে ‘টীকাকার’ শব্দের দ্বারা করা হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। (প্রামাণ্যবাদ-দীক্ষিতি ও তাহার গাদা-ধরীর আরম্ভ ভাগ দ্রষ্টব্য।) আমাদের মনে হয়, ভর্তৃহরির টীকার লোপ অন্য কারণে ঘটিয়াছে। কৈয়টের “মহাভাষ্য-প্রদীপ” ভর্তৃহরির টীকাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থে ভর্তৃহরির টীকার সার-সংগ্রহ ছিলই; তাহার উপর স্থল-বিশেষে কৈয়ট নিজের উদ্ভাবিত নূতন কথাও লিখিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্তী গ্রন্থে কিছু না কিছু অধিক বিষয়ের সমাবেশ থাকা স্বাভাবিক। সে কালে প্রত্যেকখানি গ্রন্থ হাতে লিখিয়া রাখিতে হইত। কৈয়টের গ্রন্থখানিতে মহাভাষ্য বুঝিবার উপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত আছে মনে করিয়া, সেই গ্রন্থেরই অধ্যাপনা প্রচলিত করা হয়, ফলে ভর্তৃহরির টীকার অধ্যাপনা বন্ধ হইয়া যায়। তখন অনাবশ্যক মনে হওয়ায় ভর্তৃহরির টীকা লিখিয়া রাখার ব্যবস্থা রহিত হইয়া যায়। এই ভাবে ভর্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকার বিলোপ ঘটে।

মহাভাষ্য-টীকা ব্যতীত ভর্তৃহরি ‘বাক্যপদীয়’ নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমরা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থ এখনও বর্তমান আছে বটে, কিন্তু এখন ইহার সমগ্র অংশ পাওয়া যায় না; ইহার কোন কোন অংশ লুপ্ত হইয়াছে, ইহা বাক্যপদীয়ের পুণ্যরাজ ও হেলারাজের প্রণীত টীকা পর্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায়।

এই বাক্যপদীয় তিন কাণ্ডে বিভক্ত; প্রত্যেক কাণ্ডের বিভিন্ন নাম আছে; প্রথম কাণ্ডের নাম ব্রহ্মকাণ্ড, দ্বিতীয় কাণ্ডের নাম বাক্যকাণ্ড, এবং তৃতীয় কাণ্ডের নাম প্রকীর্তক। বাক্যপদীয় শব্দের অর্থ,—বাক্য এবং পদকে বিষয়রূপে অবলম্বন করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে,—সেই গ্রন্থ (১০)।

(১০) বাক্যপদে অধিকৃত্য কৃতং বাক্যপদীয়ম্।—শিও-কন্দমসভম্বেজজননাদিত্যশ্চ: ।—৪১৩৮৮—দ্রষ্টব্য—মহামহো-পাধ্যায় ৮নংস্বাধর শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় কর্তৃক লিখিত

জৈন পণ্ডিত বর্ধমান সুরি বাক্যপদীয় ও প্রকীর্তককে বিভিন্ন গ্রন্থরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি অর্থোক্তিক নহে। “বাক্যপদীয়” এই নাম হইতে বুঝা যায়, এই গ্রন্থে বাক্য এবং পদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এইরূপ আলোচনা প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডেই প্রধানভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় কাণ্ডে দ্রব্য, গুণ, জাতি, ক্রিয়া এবং কারক প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা থাকায় এই তৃতীয় কাণ্ডের “প্রকীর্তক” এই নাম সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ‘Benares Sanskrit series’এ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বাক্যপদীয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডের উপসংহারে কাশীর তাৎকালিক সুবিখ্যাত পণ্ডিত পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৬গঙ্গাধর শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় লিখিয়াছেন, হস্তলিখিত তাঁহার আদর্শ পুস্তকে দ্বিতীয় কাণ্ডের সমাপ্তিতে “সমাপ্তা বাক্যপদীয়-কারিকা” এইরূপ লিখিত ছিল। অতএব দ্বিতীয় কাণ্ডেই বাক্যপদীয়ের সমাপ্তি হইয়াছে। তৃতীয় কাণ্ড একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, এরূপ ধরিয়া লইলে কোন দোষ ঘটে না।

ভর্তৃহরির সময় সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ডাক্তার কীলহর্ন তাঁহার সম্পাদিত মহাভাষ্যের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় অধ্যাপক ম্যাকডনেলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ভর্তৃহরির সময় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বভাগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (১১)। অধ্যাপক ম্যাকডনেলও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন (১২)।

এই সিদ্ধান্ত নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করার পক্ষে বাধা আছে।

বাক্যপদীয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডের উপসংহার (Benares Sanskrit Series, 1887 A. D.)

(১১) Thanks to Professor Max Muller's discoveries, we know now that he (= Bhartrihari) lived before the middle of 7th Century A. D.—Vyakarana Mahabhashya vol. II (Dr. Kielhorn) Preface, P. 12.

(১২) Bhartrihari lived in the first half of the seventh Century—A History of Sanskrit Literature (Macdonell) 4th Edn. P. 340.

ভর্তৃহরির মৃত্যু ৬৫১ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, ইহাও ম্যাকডনেল উক্ত গ্রন্থের ৩২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

অধ্যাপক ম্যাকডনেলের মতে “কাশিকা” বৃত্তির সময় প্রায় ৬৫০ খৃষ্টাব্দ (১৩)। এই কাশিকা বৃত্তিতে “বাক্য-পদীয়ম্” এই শব্দটি উদাহরণরূপে উল্লিখিত আছে (১৪)। এই উদাহরণটির অর্থ যে গ্রন্থ-বিশেষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সূত্রের দ্বারা “বাক্যপদীয়ম্” এই শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, সে সূত্রটিতে “অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে” (৫।৩।৮৭) এই সূত্রের অমুভূতি আছে, সুতরাং গ্রন্থ অর্থে-ই এই উদাহরণটি প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। ভর্তৃহরির সময় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধরিলে “কাশিকা” বৃত্তি এবং বাক্যপদীয়, এই দুই খানি গ্রন্থ সম-সাময়িক হইয়া পড়ে। বাক্যপদীয় গ্রন্থ যে “কাশিকা”র সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই (৫।৩।৮৮) সূত্রের “কাশিকা” বৃত্তি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। যে সময়ে মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না, সকল পুস্তক হাতে লিখিয়া রাখিতে হইত, সেই সময়ের একখানি গ্রন্থ,—সে গ্রন্থ যতই উপাদেয় হউক না কেন,—তাহার প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই অতি-প্রসিদ্ধির আশা করা যায় না।

অধ্যাপক ম্যাকডনেল ভর্তৃহরিসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবাদের ঞায় কথা নির্দিষ্টভাবে মানিয়া লইয়াছেন। ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্যের প্রণেতা, ইহা টীকাকারেরা লিখিলেও তাহার সম্ভব ও অসম্ভব সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়া না দেখা, ম্যাকডনেলের ঞায় প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতের পক্ষে উচিত হয় নাই (১৫)। নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতক এই শতকত্রয়ের প্রণেতা বাক্যপদীয়-কার ভর্তৃহরি, ইহাও ম্যাকডনেল অতি গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১৬) ; কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তাঁহার মনে আসে নাই। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিঁসিং বৈদিক অষ্টম-সিদ্ধান্তের প্রতি

(১৩) About 650 A. D. was composed the first Complete Comm. on Panini, the Kashika vritti—Ditto P. 432.

(১৪) কাশিকা ৪।৩।৮৭

(১৫) দ্রষ্টব্য—A History of Sanskrit Literature P. 340.

(১৬) দ্রষ্টব্য—A History of Sanskrit Literature (Macdonell) P. 329.

একান্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও বেদের প্রতি পরমবিশ্বাসী আচার্য্য ভর্জুরির বহুবার বৌদ্ধ ধর্মের গ্রহণ এবং পরিত্যাগ সত্ত্বে যে অবিশ্বাস্ত সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, তাহাও ম্যাকডনেল নির্বিকারে গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানে সত্যের অমুরোধে আমাদের বলিতে হইতেছে, অধ্যাপক ম্যাকডনেলের কখনও বাক্যপদীয় গ্রন্থের অমূল্যন করিবার অবকাশ ঘটে নাই। তিনি যদি কখনও বাক্যপদীয় গ্রন্থখানি পর্যালোচনা করিতেন, তাহা হইলে, বাক্যপদীয়কে মহাভাষ্যের সিদ্ধান্তানুগামী স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে উল্লেখ না করিয়া মহাভাষ্যের টীকারূপে উল্লেখ করিতেন না। স্ফোটবাদ সত্ত্বে বর্তমান সময়ে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভর্জুরির বাক্য-পদীয় সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও প্রাচীন গ্রন্থ (১৭); পরবর্তী কালে মণ্ডন মিশ্র “স্ফোটসিদ্ধি” গ্রন্থে স্ফোটবাদের সমর্থন করিলেও, এই গ্রন্থখানি স্ফোটবাদের মৌলিক গ্রন্থ নহে; ভট্ট কুমারিল প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে যে দুর্ধর্ষ যুক্তিজালের রচনা করিয়াছিলেন, এই স্ফোটসিদ্ধিগ্রন্থ প্রধানভাবে তাহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। অধ্যাপক ম্যাকডনেলের স্ফোট সত্ত্বে যথার্থ ধারণাই ছিল না। তিনি “স্ফোট” এই শব্দটিকেও বিকৃতরূপে “স্ফুট” (Sphuta) এই আকারে গ্রহণ করিয়াছেন (১৮)। মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন, “ভারতীয় বৈয়াকরণগণ মীমাংসাদর্শনের শব্দের নিত্যতাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং “স্ফুট”

(১৭) মহাভাষ্যে স্ফোটের উল্লেখমাত্র আছে; পতঞ্জলি স্ফোটের সমর্থনের জন্য কোনরূপ বিচারের অবতারণা করেন নাই; —এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দো ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ।...স্ফোটশ্চ তাবানেব ভবতি ধ্বনিকৃত্য বুদ্ধিঃ।

ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্ত খলু লক্ষ্যতে।

অন্যো মহাশ্চ কেবাধিকৃত্য তৎ স্বভাবতঃ।

—মহাভাষ্য ১।১।৭০

“যেনোচ্চারিতম সায়ালাজুলকুদধুরবিবাণিনাং সংপ্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ” মহাভাষ্যের পশ্চাৎকারিকের এই উক্তিকেও মহাভাষ্যের টীকার কৈয়ট এবং বাক্যপদীয়ের টীকার পুণ্যরাজ স্ফোটের প্রতিপাদকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।—ঋষ্য, মহাভাষ্য পশ্চাৎকারিকের মহাভাষ্যপ্রদীপ এবং বাক্যপদীয় দ্বিতীয় কাণ্ডের পুণ্যরাজকৃত ১—২ শ্লোকের টীকা।

(১৮) ঋষ্য—A History of Sanskrit Literature (Macdonell), P. 407,

(Sphuta) সম্বন্ধীয় যোগদর্শনের মতবাদকে দার্শনিক রীতিতে পরিপুষ্ট করিয়াছেন অর্থাৎ প্রত্যেকটি পদের মধ্যে অর্থ-প্রতীতির উপায়রূপে ইন্দ্রিয়ের অগোচর শব্দত এবং অন্তর্নিহিত একটি মূলবস্তু স্বীকার করিয়াছেন (১৯)।” কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় মীমাংসা ও যোগদর্শনের শব্দ-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত হইতে বৈয়াকরণগণের এই বিষয়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহার অমুধাবন করেন নাই। মীমাংসকগণ অকারাদি প্রত্যেক বর্ণকে নিত্য, ব্যাপক এবং এক বলিয়া স্বীকার করেন। উচ্চারণের দ্বারা এই নিত্য বর্ণের অভিব্যক্তি হয়; এই অভিব্যক্তির বিষয়ীভূত বর্ণসমুদয়কে পদ বলা হয় এবং এইরূপ পদসমূহকে বাক্য বলা হইয়া থাকে, ইহাই মীমাংসকগণের মত। আচার্য্য ভর্জুরির মতে বাক্যে পদ-বিভাগ নাই এবং পদে বর্ণ-বিভাগ নাই। তাঁহার মতে বাক্য অখণ্ড (২০); স্মৃতরাং দেখা যাইতেছে, বৈয়াকরণের শব্দের নিত্যতাবাদী হইলেও তাঁহাদের মতের সহিত মীমাংসকগণের মতের অত্যন্ত পার্থক্য আছে। আচার্য্য ভর্জুরি এই অখণ্ড বাক্যকে অর্থ-প্রতীতির হেতুরূপে নির্দেশ করিয়াছেন—তাঁহার মতে এই অখণ্ড শব্দ জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং এই শব্দব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। যোগদর্শনে ‘স্ফোট’ নামক অখণ্ড শব্দ স্বীকৃত হইলেও, তাহাকে জগতের মূল কারণরূপে স্বীকার করা হয় নাই; স্মৃতরাং যোগদর্শনের মতের সহিতও বৈয়াকরণগণের স্ফোটসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের ঐক্য নাই।

অদ্বৈত-বেদান্তের দার্শনিক ধারার পারস্পর্য্য পর্যালোচনা করিলে দেখিলে পাওয়া যায়, আচার্য্য শব্বরের পরম গুরু গোড়পাদাচার্য্য যে অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(১৯) The Indian grammarians accepted the Mimamsa dogma of the eternity of sound and philosophically developed the Yoga theory of the sphuta or the imperceptible and eternal element in every word as the vehicle of its sense.—A History of Sanskrit Literature (Macdonell), P. 407.

(২০) পদে ম বর্ণা বিভক্তে বর্ণেষবয়বা ন চ (বর্ণেষবয়বা ইব) ।
বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন ।

বাক্যপদীয় ১।১৭

করিয়াছিলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেই সিদ্ধান্তকে জন-সমাজে প্রচুরভাবে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের পূর্বে অদ্বৈত-বেদান্তের যে সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল, তাহাকে 'শঙ্কর-পূর্ববেদান্ত' (Pre-Shankar-Vedanta) শব্দে অভিহিত করা হয়। আচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধি এই মতের অন্তিম গ্রন্থ, এ কথা বলিলে, বোধ হয় কোন দোষ হয় না। আচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কুঞ্জস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয়ের সম্পাদকতায় মাস্ত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কিছু দিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের মূল গ্রন্থ উপনিষদ্ হইলেও, এই উপনিষদের ব্যাখ্যাভেদে সিদ্ধান্তভেদ ঘটিয়াছে। শঙ্কর-পূর্ব-বেদান্তের আদি প্রবর্তক কে ছিলেন, তাহা এ সময় নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। ইহার প্রবর্তক যিনিই হ'ন না কেন, আচার্য্য ভর্তৃহরি যে এই শঙ্করপূর্ববেদান্তের একজন প্রধান আচার্য্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ভট্ট নারায়ণকণ্ঠের প্রণীত 'শ্রীমৎগেজ্জাগম'-বৃত্তিতে অদ্বৈত-বেদান্তের মতের উল্লেখপ্রসঙ্গে ভর্তৃহরিকে অদ্বৈত-বেদান্তের আচার্য্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (২১)। যে শব্দব্রহ্মবাদ ভর্তৃহরির সম্মত, আচার্য্য মণ্ডন তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধির প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় সেই শব্দব্রহ্মবাদের সমর্থন করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই বিষয়ে ভর্তৃহরির সহিত মণ্ডনের মতের ঐক্য আছে। শুধু ইহাই নহে, আচার্য্য মণ্ডন তাঁহার 'স্ফোটসিদ্ধি' গ্রন্থে ভর্তৃহরির স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সমস্ত দার্শনিক যুক্তির তীব্র সমালোচনা করিয়া ভর্তৃহরির মতের সমর্থন করিয়াছেন। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায়, অদ্বৈত-বেদান্তের আচার্য্য মণ্ডনমিশ্র ভর্তৃহরির অনুগামী ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আচার্য্য ভর্তৃহরি 'শঙ্করপূর্ববেদান্তের' স্মপ্রাচীন ও প্রামাণিক আচার্য্য, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

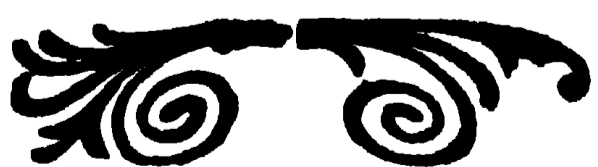
(২১) ভট্টনারায়ণকণ্ঠ-কৃত শ্রীমৎগেজ্জাগম ১।১১

আচার্য্য ভর্তৃহরির দার্শনিক সম্প্রদায় এক সময়ে এরূপ প্রবল ছিল যে, ত্রায়মঞ্জরীকার জয়স্বভট্ট, মীমাংসাবাস্তিক-কার কুমারিলভট্ট, অদ্বৈতবাদের প্রসিদ্ধ প্রবর্তক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং তত্ত্বসংগ্রহকার শাস্ত্ররক্ষিত প্রভৃতি বৈদিক ও অবৈদিক দার্শনিকগণ নিজদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে ভর্তৃহরির মতের খণ্ডনের জন্ত গুরুতর প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন।

ভর্তৃহরি-প্রণীত বাক্যপদীয়ের যে অংশ এখন পাওয়া যাইতেছে (২২), তাহাতে ভর্তৃহরির পূর্ববর্তী নানা প্রকার দার্শনিক মতের উল্লেখ আছে; যে সকল আচার্য্য এই সকল বিভিন্ন মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। মহাভাষ্যের পর হইতে ভর্তৃহরির পূর্ব পর্য্যন্ত স্মদীর্ঘকালের মধ্যে যে সকল দার্শনিক-চিন্তাশীল বৈয়াকরণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভর্তৃহরির গ্রন্থে যে সকল দার্শনিক বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির একটা পূর্বপারম্পর্য্য ছিল, ইহা স্মনিশ্চিত। যে পরিপুষ্ট চিন্তার পরিচয় আমরা বাক্যপদীয়ে দেখিতে পাই, তাহার একটা ধারাবাহিক গতি স্বীকার না করিলে গুরুতর অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। এই জন্ত মনে হয়, আমাদের সংস্কৃত-রত্নভাণ্ডারের অনেক রত্নই কালের কঠোর পীড়নে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীহার্যচন্দ্র শাস্ত্রী।

(২২) আলঙ্কারিকগণের পরম প্রামাণিক মন্মট ভট্ট তাঁহার কাব্যপ্রকাশের কারিকাগুলি রচনা করিয়া, সেই সকল কারিকার উপর স্বয়ং বৃত্তি রচনা করিয়াছেন; এই বৃত্তি গড়ে রচিত হইয়াছে। আচার্য্য ভর্তৃহরিও বাক্যপদীয়ের কারিকা রচনা করিয়া গড়ে তাহার বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা বাক্যপদী-দ্বিতীয়-কাণ্ডের পুণ্যরাজপ্রণীত টীকা হইতে আমরা জানিতে পারি। বর্তমান সময়ে ভর্তৃহরি-কৃত এই 'বাক্যপদী-বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র 'বাক্যপদী'-কারিকাও এখন পাওয়া যায় না; এমন কি, তৃতীয়কাণ্ডের কারিকার মধ্যেও ভর্তৃহরি-কৃত বহু কারিকার বিলোপ ঘটিয়াছে এবং তৃতীয়কাণ্ডেই কুমারাজ-কৃত বহু কারিকা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।





কোজাগর পূর্ণিমা। অপরাহ্ন-সমাগমে শ্রান্ত তপন অস্তগমনোন্মুখ; তাহার স্নলোহিত হিরণ্ময় প্রভা শুভ্র মর্শ্বরফলকে প্রতিফলিত হইয়া সম্রাট সাজাহানের অবি-নন্দন প্রেমের স্মমহান স্মৃতিসৌধ তাজমহলকে যেন সুবর্ণ-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত তাজমহলের সেই রূপ, সেই অপূর্ব শোভা, চিত্রপটে সংরক্ষণের জন্ত একাগ্র-চিন্তে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতেছে—সন্তোষকুমারের স্ত্রী মঞ্জুলেখা। তাহার সঙ্গে আসিয়াছে মঞ্জুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দীপ্তেন্দ্র, এবং ননদিনী শেফালী। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া দীপ্তেন্দ্র শেফালীকে বলিল, “রোগীকে সামলাতে পার না, কি রকম ডাক্তার তুমি? বাবা বলে গেলেন, মঞ্জুর খানিক ঘুরে-ফিরে বেড়ান দরকার, তা ঘণ্টাখানেক ধ’রে কি যে এক ছবি নিয়ে বসেছে, উঠবার নামটি নেই!”

শেফালী বলিল, “ঠিক বলেছ, দীপুদা! মঞ্জু আমাকে একদম গ্রাহ্য করে না। বৌদি হয়েছে কি না, ভাবে, আমার কথা মানবার দরকার নেই। আর আমাকেও একটু ভয়ে-ভয়ে চলতে হয় কি না, তাই বেশী কিছু বলতে পারি-নে।”

শেফালীর কথা শুনিয়া মঞ্জু মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, “আহা, ভয়ে উনি লুকোবার জন্তে পিঁপড়ের গর্ত খোঁজেন! চিরকালই তো বৌরা ননদীর ভয়ে কেঁপে মরে; কবে আর কে ননদকে ভাজের ভয়ে কাঁপতে দেখেছে?”

শেফালী প্রতিবাদের সুরে বলিল, “জান তো শ্রীরাধাই নির্ভয়ে বলেছিল,—‘ননদিনী বোলো নাগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে’! কিন্তু সে তর্ক থাক।

এইবার আমার হুকুম তামিল কর দেখি; এখন আর হাত না চালিয়ে, উঠে-পড়ে আমাদের সঙ্গে পা চালাও,—খানিক বেড়ানো যাক। প্রতি-বছরের মত এবারেও এখানে অনেক বাঙ্গালী এসেছেন। চল, তাঁদের দেখা যাক, আর তাঁদের রকমারি সাজসজ্জাগুলো দেখা যাবে।”

অগত্যা মঞ্জু চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম গাড়ীতে পাঠাইয়া চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দীপ্তেন্দ্র তাহার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিল।

ভ্রাতা-ভগিনীতে এমন নিবিষ্ট চিন্তে গল্প করিতেছিল যে, শেফালী কখন তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, ইহা কেহই লক্ষ্য করে নাই! শেফালী অন্তমনস্ক ভাবে সমাধিসংলগ্ন উত্তানের দ্বারের দিকে চাহিয়া যে দৃশ্য দেখিল, সে দিকে চাহিয়া সে সমাধির নিকট হইতে অল্প কোন দিকে যাইতে পারিল না। যুরোপীয়ের পরিচ্ছদধারী একটি প্রৌঢ় বাঙ্গালী একটি প্রৌঢ়াকে সঙ্গে লইয়া মমতাজ বেগমের সমাধির দিকে যে সময় অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় একটি তরুণ যুবক তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল। কে এই যুবক? তাহার আকৃতি ও চলনের ভঙ্গিতে তাহার স্মৃতি শেফালীর মনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে? শেফালী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহারা তাহার নিকটে আসিয়া পড়িলে সে বুঝিল, তাহার দৃষ্টবিভ্রম হইয়াছে। যুবকটি স্ননীল নহে, কিন্তু এই যুবকের আকার-প্রকার স্ননীলের অনুরূপ বটে। শেফালীর অনুমান হইল—নবাগত যুবকটি স্ননীলের কোনও নিকট-আত্মীয় হইতে পারে। কিন্তু এই অপরিচিত আগন্তুকগণকে দেখিয়া তাহার হৃদয়

কেন যে আশায় ও আনন্দে আন্দোলিত হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

আগন্তুকগণ তাজমহলের নিম্ন স্তরে সমাধিস্থলে গমন করিলেন। শেফালী তাঁহাদিগকে আর একবার দেখিবার আশায় সমাধিগৃহের দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দীপেন্দ্র ও মঞ্জু ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, “তুমি এখানে? চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবচো?”

শেফালী সত্য কথাই বলিল, তবে একটু ঘুরাইয়া— বলিল, “মনে হ’ল, কয়েক জন চেনা লোক নীচের গোর-গুলি দেখতে গেলেন; তাই দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা চল, আমি এখনই আসছি।”

হল পরেই প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া বাহিরে আসিলেন, যুবকটি তখনও তিতরে ছিল। শেফালী যেন কোন আলোকের প্রতীক্ষায় সেই অন্ধকারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিল।

হঠাৎ নারীকণ্ঠে আর্তনাদ হইল, “ওগো, আমার শীঘ্র ধর। আমি যে বাঁচি-নে!”

শেফালী সভয়ে দেখিল, প্রৌঢ়া জলমগ্ন ব্যক্তির গায় শূন্যে বাহু প্রসারিত করিয়া অবলম্বন খুঁজিতেছেন! তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া যান দেখিয়া শেফালী তাঁহার সম্মুখে লাফাইয়া-পড়িয়া দুই হাতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর সে সংজ্ঞাহীনা মহিলাটির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, সেইখানেই বসিয়া-পড়িয়া তাঁহার মাথার কাপড় খুলিয়া দিল, এবং জামা-কাপড়ের বন্ধনাদি শিথিল করিল। সেই সময় দীপেন্দ্র ও মঞ্জুও সেই স্থানে আসিয়া পাড়িতার শুশ্রূষায় শেফালীকে সাহায্য করিতে লাগিল। শেফালীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও প্রকৃত অবস্থা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল।

এই আকস্মিক বিপদে প্রৌঢ়ার স্বামী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন, এবং ব্যাকুল ভাবে তাঁহার পুত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শেফালী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “দীপুদা, মোটর নিয়ে ডাক্তার আনতে যান। ডাক্তার রমাশ্রীসাদ বাবু আমার জ্যেষ্ঠা মশায়, তিনিই এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; সংবাদ পেলেই তিনি এখানে এসে পড়বেন। তাঁর পরামর্শ ভিন্ন রোগীকে স্থানান্তরিত করা সঙ্গত মনে হয় না।”

প্রৌঢ় ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “তোমরা দয়া ক’রে সিভিল সার্জন বা অথ কোন ইংরেজ ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা কর। এ-দেশী ডাক্তারদের উপর আমার তেমন শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নেই; তারা বিশেষ কিছু জানে না, তাদের ওপর আমি নির্ভর ক’রতে পারবো না।”

সুশীল সেখানে আসিয়া পড়িলে শেফালী তাহাকে বলিল,—“আপনি দয়া ক’রে আমার দাদার সঙ্গে যান, ডাক্তারকে নিয়ে চলে আসবেন।” সে দীপেন্দ্রকে বলিল, “সিভিল সার্জনকে বলবে যে, আমার মনে হয়, বেশী Blood pressureএর জন্মই এ-রকম হ’য়েছে, তিনি যেন সেই জন্ম প্রস্তুত হ’য়ে আসেন!”—সে বরফ এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঔষধও আনিতে বলিল।

প্রৌঢ় তাহার প্রস্তাব শুনিয়া বিরক্তিতে বলিলেন, “তোমার মতামত ডাক্তারকে জানাবার কি দরকার? ছেলেমানুষ তুমি, যা বোঝ না—সে সম্বন্ধে অনধিকারচর্চা না করাই উচিত নয় কি।”

দীপেন্দ্র তাঁহার অবশিষ্ট মন্তব্য শুনিয়া অপ্রসন্ন ভাবে বলিল, “আমার ভগিনী চিকিৎসা-কার্যে কোন ইংরেজ ডাক্তারের চেয়ে অপটু নয়, মশায়! ও বিলাত থেকে ডাক্তারীর খুব ভাল ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছে, তা জানেন না ব’লেই—”

শেফালী তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “ও-সব কথা থাক, আর দেৱী করো না, শীগ্গির যাও।”—দীপেন্দ্র অগত্যা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া সুশীলকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল।

তাহারা প্রস্থান করিলে প্রৌঢ় সাহেব বাবুটি চিন্তাকুল চিন্তে শেফালীকে বলিলেন, “এই আকস্মিক বিপদে আমি বড়ই বিহ্বল হ’য়ে পড়েছিলুম। আমরা কলকাতার লোক, বিদেশে রোগ হ’লে বড়ই ভয় পাই; কর্তব্য স্থির করতে না পেরে কি বলতে কি বলেছি, তুমি কিছু মনে ক’রো না মা! আর তুমি যে পাশকরা ডাক্তার, বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেচো, তা তো আমি জানতুম না। তোমায় দেখে সে-রকম ধারণাই হয় না; তা কি রকম বুঝ্চো তুমি? ভয়ের কোন কারণ নেই তো?”

শেফালী নতমুখে বলিল, “আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না;

আপাতত: আশঙ্কার কোন কারণ নেই বটে, তবে ঠুকে খুব সাবধানে রাখতে হবে।”

শেফালীর কথায় প্রৌঢ় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন; তাহার পর তিনি তাহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। শেফালী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনারা কত দিন আগ্রায় এসেছেন?”

প্রৌঢ় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া কি ভাবিলেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু বলিলেন, “আমরা আজই সকালে টুঙলা থেকে এখানে এসেছি। সিমলা থেকে ফিরবার পথে টুঙলায় এসে আমার বড় ছেলের কাছে কয়েক দিন আছি। জ্যোৎস্নালোকে তাজ দেখবার আশায় আমরা সকলেই আজ এখানে এসেছি। আমার বড় ছেলে, মেয়ে, আর একটি বন্ধুকণা বাসা থেকে এখনই এখানে এসে পড়বে। আজই রাত্রে টুঙলায় ফিরে যাবার ইচ্ছা আছে।”

শেফালী মুখ না তুলিয়াই বলিল, “তা কি ক’রে হবে বলুন? রোগীকে বড়-জোর সহর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া চলতে পারে; কিন্তু যত দূর সম্ভব, ঠুং নড়া-চড়া না করাই উচিত। এখন দিন-কতক আগ্রাতেই আপনাদের থাকা চাই। রোগীটির অবস্থাই সর্বপ্রথম বিবেচ্য।”

প্রৌঢ় বিব্রত ভাবে বলিলেন, “কিন্তু তার উপায় কি?”

শেফালী মৃদু স্বরে বলিল, “উপায়ের অভাব হবে বললে তো মনে হয় না। মনে হচ্ছে—বাজালীর সংশ্রব আপনি এড়াতে চান; এষ্ট জগুই আপনার অসুবিধা। কিন্তু আপনি বোধ হয় বুঝতে পারবেন, এ-রকম রোগীকে হোটেলে রাখা সম্ভব নয়; আর ঠুকে এখানকার হাসপাতালে রাখতেও আমরা বলতে পারিনে। তবে আপনি যদি এখানে বাজালীর বাড়ীতে কয়েক দিন থাকতে সম্মত হন, তা হলে আমরা তার ভাল ব্যবস্থাই করতে পারি। সেখানে থাকতে আপনাদের কোন অসুবিধা বা কষ্ট হবে না—এ আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি।”

বাজালী সাহেবটি এই প্রস্তাবে যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, “আমার ছেলেরা আসুক তো, তার পর সিভিল সার্জনের সঙ্গে পরামর্শ ক’রে কর্তব্য স্থির করা যাবে।”

শেফালী চারি দিকে চাহিয়া একটু চঞ্চল হইয়া বলিল, “ডাক্তাররা এখনও এলেন না, ঔষধ-পত্রেরও কোন ব্যবস্থা হ’ল না। রোগীকে এই অবস্থায় বেশীক্ষণ রাখতে আমার সাহস হচ্ছে না। জিনিষপত্রগুলো এসে পড়লে প্রাথমিক কর্তব্য আমিই ক’রে ফেলতে পারতুম।”

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গেই রমাপ্রসাদ বাবুর কর্তৃত্ব তাহার কর্ণগোচর হইল। তখনই মঞ্জু খগ্রসর হইয়া তাঁহাকে রোগীটির নিকট লইয়া আসিল। তিনি কিছুই জানিতেন না, কাজ শেষ করিয়া অবসর পাওয়ার শেফালী ও মঞ্জুর সন্ধানে সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনি সকল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং রোগীর পরীক্ষায় মনঃসংযোগ করিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে তিনি শেফালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রোগীটির অবস্থা দেখে তুমি কি ব্যবস্থা করেচ মা শেলী?”

রমাপ্রসাদ বাবু শেফালীর নিকট আশ্চোপাশ্চ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, “তোমার সকল ব্যবস্থা ঠিকই হ’য়েছে।” তার পর তিনি রোগীটির স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনাকে বেশ শক্ত হ’তে হবে, মশায়! ব্যাপার বিলক্ষণ সঙ্কটজনক বটে, তবে বিপদের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। যন্ত্রাদি ও ঔষধ-পত্র এসে পড়লে ঠুং চেষ্টনা সম্পাদন করা বোধ হয় তেমন কষ্টকর হবে না। ভগবানের অসীম করুণা, তাই ভাগ্যক্রমে মা শেলী এখানে এসে প’ড়েছিল। সকল ব্যবস্থাই মা আমার সঙ্গে-সঙ্গে ক’রে ফেলেছে। কিন্তু রোগীকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখা স্থির ক’রছেন?”

কর্তৃটি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আমি কি আর স্থির ক’রব বলুন? আমি ভাবছি, ইংরেজদের কোন ভাল হোটেলে গিয়ে উঠলে ক্ষতি কি?”

রমাপ্রসাদ বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, “এ কি কথা বলছেন আপনি? আপনি বাজালী, বিদেশে এসে বিপন্ন হ’য়েছেন; আর আমরা এখানে থাকতে আপনাকে হোটেলে আশ্রয় নিতে হবে? আপনারা আমার বাড়ীতে চলুন, সেখানেই রোগীর চিকিৎসার ও পরিচর্যার সুব্যবস্থা হবে; আশা করি, আপনাদের তাতে কোনও রকম কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। আমরা বাজালী বটে, কিন্তু ইংরেজদের চেয়ে লম্বীছাড়ার মতো থাকি-নে।”

প্রৌঢ় মুখখানা হাঁড়ির মতো গম্ভীর করিয়া বলিলেন, “সে কথা সত্য হতে পারে; কিন্তু আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ ক’রে আপনাদিগকে কোন অসুবিধায় ফেলতে চাই-নে। বিশেষতঃ, অন্নের অসুগ্রহ গ্রহণের অভ্যাস বা প্রবৃত্তিও আমার নেই।”

রমাপ্রসাদ বাবু গভীর সহানুভূতিভরে বলিলেন, “এই সুদূর প্রবাসে আমাদের প্রবাস-ভবনে স্বজাতীয় অতিথির অভ্যর্থনায় ও সেবায় কি আনন্দ, তা উপভোগের শক্তিতে ভগবান আমাদের বঞ্চিত করেন-নি মশায়! আমার বাড়ীতে আপনাদের বাসের সকল রকম সুবিধাই ক’রে দিতে পারুব; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা ক’রলেও অল্প কোথাও তা’ সম্ভব হবে না; আর সে-রকম কোন ব্যবস্থায় আমিও তৃপ্তিলাভ ক’রতে পারব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমার ছেলে ফিরে এলেই তা’কে সব ঠিক ক’রে রাখবার জন্ত পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

প্রৌঢ় তাঁহার মুখের দিকে প্রস্নহচক দৃষ্টিতে চাহিয়া মুক্কিয়ানার ভঙ্গীতে বলিলেন, “আপনিই বুঝি ডাক্তার রমাপ্রসাদ বাবু? আপনার সহৃদয়তা ও সৌজন্তে আমি মুগ্ধ; কিন্তু আপনি তো আমার পরিচয় পান-নি; আমার মত সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে বিপন্ন দেখে, কেবল বাঙ্গালী ব’লেই কি নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করছেন?”

রমাপ্রসাদ বাবুকে অগত্যা বলিতে হইল, “আপনি বাঙ্গালী, আমারই স্বদেশবাসী,—আপনার এই পরিচয়-টুকুই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তবে আপনার শ্রায় সম্ভ্রান্ত অতিথির পরিচয় পেলে যে, আলাপ-আলোচনার পথ সুগম হয়, সে-কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্য নাত্র।”

এরূপ আতিথ্য মিষ্টার দস্তর ধারণার অতীত। আজীবন কলিকাতার ‘এরিষ্টোক্রাসী’ ও ‘ব্যারিষ্টোক্রাসী’র স্বার্থপরতার মধ্যে বাস করিয়া অপরিচিত আগন্তুককে উপযাচক হইয়া গৃহে স্থান দেওয়া তিনি সম্ভব বলিয়া কখনও মনে করেন নাই। আর তাঁহাদের মত ধনাঢ্য সমাজে তো কোন অপরিচিতকে কেহই গ্রহণীয় বলিয়াও মনে করেন না। কণকাল পরে মিষ্টার দস্ত বলিলেন, “আমার নাম বীরেন্দ্রনাথ দস্ত, আমি, কলিকাতা হাইকোর্টে

ব্যারিষ্টারী করি। আমার টুঙলায় আসবার কারণ, আমার একটি ছেলে সেখানে ইঞ্জিনিয়ার। অনেক দিন আমরা তাকে দেখিনি তাই—”

পরিচয় শুনিয়া রমাপ্রসাদ বাবু উৎকণ্ঠিত চিত্তে শেফালীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার মুখে দৃঢ় সঙ্কল্প পরিষ্কৃত। তিনি শেফালীকে বলিলেন, “আমাদের guest-houseএ এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করা যাক।”

শেফালী অবিচলিত স্বরে বলিল, “সেখানে ওঁদের কোনও অসুবিধা হবে না ব’লেই ত মনে হয়। মঞ্জুকে আপনার গাড়ীতে আগে পাঠিয়ে দিলে সে সব বিলি-ব্যবস্থা ক’রে রাখবে।”

বীরেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাবে কতকটা অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আপনাদের এত বিব্রত করা কি উচিত হবে? বরং যদি সিভিল সার্জেন হাসপাতালে রাখবার একটা ব্যবস্থা ক’রে দিতে পারেন—তাই ‘ডিজায়ারেব্ল’ ব’লে মনে হয়। এত রাত্রে বাড়ীতে থাকবার জন্ত নার্শ সংগ্রহ করা কঠিন হ’তে পারে। রোগীর পরিচর্যা বাড়ীতে তেমন ভাল হয় না, তা’ জানি কি না।”

অতঃপর বীরেন্দ্র বাবুর পুত্রসহ সিভিল সার্জেন আসিয়া, রমাপ্রসাদ বাবুকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, “রমাপ্রসাদ বাবু পূর্বেই চিকিৎসার ভার লইয়াছেন, তখন আমাকে ডাকিবার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। আপনারা উঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেন। আপনি সম্ভবতঃ জানেন না—উনি এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।”

যাহা হউক, সিভিল সার্জেন রমাপ্রসাদ বাবুর অসুস্থতায় পীড়িতার রোগ পরীক্ষা করিলেন এবং সকল কথা শুনিয়া মিষ্টার দস্তকে বলিলেন, “চিকিৎসা প্রথম হইতেই ঠিক হইয়াছে। আপনার স্ত্রী সঙ্কটের অবস্থা অতিক্রম করিয়া-ছেন; কিন্তু এখন এক মাস তাহাকে আগ্রায় থাকিয়া স্বাস্থ্য-সঞ্চয় করিতে হইবে। যত দূর সম্ভব, উঁহাকে নড়া-চড়া করিতে না দেওয়াই প্রয়োজন। রমাপ্রসাদ বাবু রোগিণীকে নিজের বাড়ীতে উঁহার চিকিৎসাধীন রাখিতে চাহেন; ইহা অপেক্ষা সংযুক্তি আর হিল, হইতে পারে? ,ল, তীক্ষ্ণ-

অগত্যা বীরেন্দ্র বাবুকে সেখানেই রাখতে লাগিল।

হইতে হইল। তদনুসারে অতি সন্তর্পণে রোগিণীকে স্থানান্তরিত করা হইল। রমাপ্রসাদ বাবু শেফালীকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

মঞ্জু পূর্বে আসিয়া সকল ব্যবস্থাই শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহের ও বন্দোবস্তের পারিপাট্য দেখিয়া ধনাঢ্য ব্যারিষ্টার 'মিষ্টার ডাট'কেও বিস্মিত হইতে হইল; তিনি তাঁহার পত্নীর পরিধানের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত সজ্জিত দেখিলেন। উদ্ভান-পরিবেষ্টিত অতিথিশালার একটি সুপ্রশস্ত শয়ন-কক্ষে এক জনের শয়ন-যোগ্য পালকে সুকোমল স্ত্রী শয্যায় রোগিণীর শয়নের ব্যবস্থা। শেফালী ও মঞ্জু সমস্তে তাঁহার সিক্ত বসন খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিল। তখন দুই জন ডাক্তার ও শেফালী তাঁহার চিকিৎসায় রত হইলে দীপ্তেন ব্যারিষ্টার সাহেবকে পার্শ্ববর্তী শয়ন-কক্ষে লইয়া গিয়া অতিথি-সংকারের সুব্যবস্থা করিল। মধ্যে বিরামাগারের অন্তরালে দুইটি শয়ন-কক্ষে সুনীল ও তাহার ভ্রাতার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উদ্ভানের অপর পারে রমাপ্রসাদ বাবুর বাসভবনে নিনার ও প্রতিমার শয়নের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তাররা আসিয়া বীরেন্দ্র বাবুকে 'ঠাণ্ডা' করিলেন। সকল ব্যবস্থা শেষ হইলে শেফালী অবসর পাইয়া নিনাকে বলিয়া আসিল, "আজ আমি তোমাদের কাছে বেশী আসতে পারব না বটে, কিন্তু মঞ্জুর হাতে তোমাদের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিত থাকব। তোমাদের যা' দরকার, সে জন্ত ওকেই বলবে।"

দীপ্তেন্দ্রের ও মঞ্জুর যত্ন ও আদরে বীরেন্দ্র বাবুদের সকলেই কতকটা নিশ্চিত হইলেন। অবশেষে রাত্রি সাড়ে ১০টায় ডাক্তাররা অভয় দিলে তাঁহাদের বিমর্ষ ভাব অন্তর্হিত হইল।

বীরেন্দ্র বাবুর আগ্রহে ও অনুরোধে রমাপ্রসাদ বাবু ও 'ডাক্তার সাহেব' উভয়েই আহাশাস্ত্রে অতিথিশালায় রাত্রি-বাস করিলেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে রহিল—রমাপ্রসাদ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অলকেন্দ্র ও শেফালী।

পরদিন প্রভাতে দস্ত-গৃহিণী চেতনা লাভ করিলে

ও প্রতিমাকে সঙ্গে লইয়া সুনীল টুঙলায় গিয়া

নিত্য-ব্যবহার্য্য জব্যাদি লইয়া আসিল। সিভিল

সুনীলও কিছু দিনের ছুটি পাইল।

০

পরদিন হইতে রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ীর সকলেই রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বীরেন্দ্র বাবুর শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার নার্শ আনিতে দিলেন না। রমাপ্রসাদ বাবুর পত্নী বলিলেন, "পূজায় আমার ভরপুর সংসার থাকতে কি সেবার জন্ত লোকের অভাবে নার্শ আনাতে হবে?"—তিনি স্বয়ং সকালে রোগীর কাছে থাকিতেন, দ্বিপ্রহরে থাকিত তাঁহার কণা মঞ্জু বা তাঁহার পুত্রবধূ। রাত্রির ভার শেফালী আর কাহারও হাতে দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না; সূত্রাং রাত্রি ১০টা হইতে সকাল সাড়ে ৮টা পর্য্যন্ত সে স্বয়ং ঔষধ-পথ্যাদি ও সেবার সকল ভার গ্রহণ করিত। আর বীরেন্দ্র বাবুর ইচ্ছানুসারে সুনীল ও সুনীল পালা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিত।

শেফালীর অবিশ্রান্ত সেবা, যত্ন ও পরিশ্রমেও সদা প্রফুল্ল-ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। শুধু রোগীর সেবানৈপুণ্যে নহে, দস্ত-পরিবারস্থ সকলেরই অদর-যত্নে শেফালী একরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিল যে, সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া পড়িল।

সাধারণতঃ আমরা যাহাকে একগুঁয়ে ও উদ্ধত বলি, প্রতিষ্ঠাপন্ন জেদী ব্যারিষ্টার মিষ্টার দস্তের প্রকৃতিও সেইরূপ। তাঁহার মেজাজ এই বিপদে আরও 'গরম' হইয়া উঠিয়াছিল; এ জন্ত তাঁহার পুত্রকন্যারা নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন তাঁহার সম্মুখে যাইতে চাহিত না। কেবল শেফালীই নম্র ব্যবহারে ও সুমিষ্ট "বাবা" সম্বোধনে তাঁহাকে অরত করিয়াছিল। এই প্রকার কন্দপটু, বুদ্ধিমতী, অথচ এত ধীর ও শান্ত-প্রকৃতির মেয়ে যে বাঙ্গালী হিন্দুর পরিবারে থাকিতে পারে, তাহা মিষ্টার দস্ত পূর্বে কোন দিন ধারণা করিতে পারেন নাই। তিনি অনেক সময় ভাবিতেন, কে এই সম্ভ্রান্তবংশীয়া, বিদূষী, অপরিণীতা তরুণী? তাহার পরিচয় জানিবার জন্ত তাঁহার প্রচণ্ড কৌতূহল হইত; কিন্তু কাহারও সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার এই আগ্রহ পূর্ণ হইল না। এই অপূর্ণ রহস্যময়ীর কোন পরিচয়ই তিনি জানিতে পারিলেন না।

দস্ত-গৃহিণী শেফালীর পরিচর্য্যায় এতই মুগ্ধ ও তাহার পক্ষপাতিনী হইলেন যে, যুহুর্ন্তের জন্তও তাহাকে

ছাড়িতে চাহিতেন না। মাতৃহীনা শেফালী তাঁহার স্নেহ-কোমল ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, এবং স্নেহময়ী জননীকেই তাহার মনে পড়িত। তাহার মনে হইত, ভাগ্যদোষেই এমন মমতাময়ী মাতার আশ্রয় হইতে তাহাকে দূরে থাকিতে হইয়াছে। নিজের পিতৃকুলের গৌরব যদি সে ভুলিতে পারিত, তাহা হইলে এই নূতন মায়ের নির্ভরতাপূর্ণ শাস্তিময় আশ্রয় আর তাহাকে ত্যাগ করিতে হইত না। কিন্তু যত দিন পর্যন্ত তাহার স্বশুর-পরিবার—কেবল তাহার রূপ-গুণকে নহে, তাহার পিতৃ-কুলের প্রাপ্য সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাকে বধূষে বরণ করিয়া গ্রহণ না করিবেন, তত দিন সে তাঁহাদের নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ করিবে না। কঠোর পরীক্ষার মধ্যে সে মুহূর্তের জন্তও এই স্মৃতি সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইল না।

কিন্তু স্নানিলের অবস্থা কিরূপ? সমুদ্রবক্ষে অর্ধ-পরিষ্কৃত প্রণয়ের জ্যোতিঃ এখন তাহার পিপাসু-নেত্রে স্ফুটতর হইয়া উঠিল। তাহার চাহনিতে যেন আত্মদানের আভাস শেফালীর নারীত্বের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত মিশ্রিত হইয়া অপরূপ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। শেফালীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিবার স্পৃহা যতই তাহার প্রবল হইতে লাগিল, আশা যেন ততই ক্ষীণতর হইয়া তাহাকে যন্ত্রণাহত, ব্যথিত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

স্নানীল এবং প্রতিমাও তাহাদের শেলীদি'র এতই ভক্ত হইল যে, তাহার চরিত্রের আদর্শ পূজার যোগ্য বলিয়াই তাহাদের ধারণা হইল। তাহাদের যত আকাঙ্ক্ষা এই শেলীদি'র কাছে; এবং কি উপায়ে তাহাকে পরিতুষ্ট করিবে, অমুক্ষণ তাহারা তাহাই চিন্তা করিত। বিশেষতঃ, নিনার তো কথাই নাই,—অবসর পাইলেই সে তাহার জাহাজের সঙ্গিনী শেফালীর কাছে গিয়া বসিত। সে তো কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই—ঘটনাচক্রে প্রবাসে এ ভাবে তাহাদের মিলন হইবে। সম্পূর্ণ অপ্ৰত্যাশিত ভাবে তাহার সঙ্গ লাভ করিবে?

কয়েক দিন পরে দস্তগুহিণীর রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে মিষ্টার দস্ত শেলীকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা, আমার লোক-জন তো সব এসে পড়েছে; কাল থেকে এখানেই আমাদের পাক-শাকের ব্যবস্থা করিবে দাও। তোমার

জ্যাঠা মশায়ের ওপর আর জুলুম ক'রতে আমার বড়ই সঙ্কোচ হচ্ছে, আর এত জুলুম অসঙ্গতও বটে। কিন্তু আমি তো তোমার বাবার ক্লাসে ‘প্রমোসন’ পেয়েছি,— সে অধিকার তুমিই আমায় দিয়েচ মা! কাজেই আমার প্রবাসের এই সংসারের সকল ভার তোমাকে নিতে হবে! প্রতিমা মায়ের আত্মরে ছোট মেয়ে, এখনও সংসার করতে শেখেনি; নিনা বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু বিদেশে ও-সব ঝঙ্কি সামলাতে পারবে না, তাই তোমাকেই এ কষ্টটুকু স্বীকার ক'রতে হবে। তোমার জ্যাঠাই-মার নিজেরই এক প্রকাণ্ড সংসার; তাঁর পক্ষে আর একটা সংসারের সব দেখাশুনা করা সম্ভব হবে না, কাজেই, তুমি ছাড়া এ ভার আর কে নেবে বল? এতে তোমার তেমন বেশী কষ্ট হবে না তো মা?”

অন্তরের ব্যথা দমন করিয়া শেফালী বলিল, “ওতে আমার এক বিন্দুও কষ্ট নেই; বরং আপনার সংসারের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে পারলে আমার কত আনন্দ হবে, তা পরমেশ্বরই জানেন। কিন্তু জ্যাঠা মশায় আপনার এ ব্যবস্থায় রাজী হবেন কি না সন্দেহ।”

বীরেন্দ্র বাবু দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, “তাঁকে রাজী ক'রতেই হবে। তিনি আমাদের জন্তে যা ক'রছেন, অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়ের নিকটও এ-কালে তা' আশা করা যায় না; অন্ততঃ আমার কোন আত্মীয় এই রকম বিপন্ন হ'লে তার জন্তে আমি এতখানি ত্যাগস্বীকার কর্তে পারতুম না মা! আমি একটু আত্মহিতৈষী; এক দল অপরিচিত লোককে—তারা আমাদের স্বজাতি—বান্দালী—এই খাতিরে নিজের বাড়ীতে রেখে রোগীর চিকিৎসা ও সেবার সকল ভার নিয়ে কে এত ঝঙ্কট সহ করে বল? তা'র উপর আরও জুলুম ক'রব? আমি মানুষ তো? আমার তা অসাধ্য মা!”

শেফালী শেষের কথাগুলির কিছুই শুনিল না। তাহার মন তখন অল্প চিন্তায় আন্দোলিত হইতেছিল। সে চিন্তা কি, আমাদের বুদ্ধিমতী পাঠিকা যদি তাহা না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝা এত দূর পয্যন্ত এ সকল কথার আলোচনা করিয়াছি! শেফালী তাহার প্রাপ্য ভার পাইল, কিন্তু তাহার স্বশুরের পক্ষে যে ক্রটিটুকু রহিয়া গেল, তীক্ষ্ণ-ধার কণ্টকবৎ তাহাই তাহার মর্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল।

পরদিন হইতে শেফালিকা তাহার স্বপ্নের প্রবাসের সংসারের কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিল। তাহার পরিশ্রমের অস্তরহিল না। সংসারের ভার লইলেও রোগীর সেবার আংশিক দায়িত্ব সে ত্যাগ করিল না। এ সকল ভার সে সানন্দচিত্তে বহন করিলেও তাহার অস্তরের স্তম্ভ ব্যথা মধ্যে-মধ্যে তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। ভাগ্যলক্ষীর এই পরিহাস অতি কঠোর ও বিড়ম্বনাপূর্ণ বলিয়াই তাহার মনে হইতেছিল।

আত্মশ্রী, দান্তিক বীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ক্রমশঃ আত্মত্যাগিনী সেবাপরায়ণা শেফালীর সম্পূর্ণ বশীভূত হইতে হইল। আহালাদি, এমন কি, অপরাহ্নে ভ্রমণ পর্যন্ত সকল বিষয়েই তাঁহাকে শেফালীর মুখাপেক্ষী হইতে দেখা গেল, যেন ইহাতেই তাঁহার আনন্দ! তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার পরিবর্তে দিনগুলি শান্তিতে অতিবাহিত হইতে লাগিল। পরিবারের অগ্র সকলেও সুখ-শান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিল; কেবল সুনীলই বিনিদ্র-রজনী ও শান্তিহীন দিবসগুলি ব্যাকুল হৃদয়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় যাপন করিতে লাগিল। তাহার যে কোনও অবলম্বন নাই! তাহার অতীতের স্মৃতি ছুঁই, ভবিষ্যৎ নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

* * * * *

দেখিতে দেখিতে আরও এক সপ্তাহ অতীত হইল। এই কয়েক দিনেই উভয় পরিবারের আত্মীয়তা ও প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হইল। নিনার ব্যবহারে মনে হইত, তাহার প্রিয়সঙ্গী শেলীদি'র আপনার লোকের কাছে তাহার সঙ্কুচিত হইবার যেন কোনও কারণ নাই। সে রমাপ্রসাদ বাবুর গৃহের সকলকেই আপনার করিয়া লইল। তাঁহারাও সকলে তাহার সরলতা ও প্রফুল্ল স্বভাবে মুগ্ধ হইলেন। তাহার স্বভাবে যে বালিকাসুলভ চপলতা ছিল, তাহা তাহার হৃদয়ের মাধুর্যেরই নিদর্শন, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ গভীর হইয়া উঠিল; কিন্তু নিনার এই মোহিনী শক্তি দীপ্তেনকেই সর্কাপেক্ষা অধিক মুগ্ধ করিল। নারীজাতির হৃদয় এত সরল, এত দূর অকপট হইতে পারে—ইহা যেন তাহার কল্পনার অতীত! সে চিরদিনই নারীর আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু নিনার আকর্ষণ প্রথম

বসন্তের সুখস্পর্শ অনিল-হিল্লোলবৎ তাহার বড় মধুর— বড়ই উপভোগ্য মনে হইল। পিপাসাতুর মধুপ যেমন নব-প্রফুটিত কুমুমদলের মাদকতাপূর্ণ সৌরভে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কবির ভাষায়, যেমন—

“বাঁধা ঘোরে বাঁধিতেরে ঘিরে
লাঙ্ঘিত ভ্রমর যথা মুদিত পদ্মের কাছে,”—

সে নিনার প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হইল। নিনাকে অবলম্বন করিয়া তাহার হৃদয় নিনাময় হইল। নিনাও যেন দীপ্তেনের স্নিগ্ধ ভালবাসার জন্ত তৃপ্ত হইয়া উঠিল। এত দিন সে অনেক শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের পরিচয়ও পাইয়াছে, কিন্তু একরূপ আকর্ষণ সে আর কখনও অনুভব করে নাই। সুনীলকে সে চিরদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া আসিয়াছে, তাহার রূপ কখনও তাহার হৃদয় আকৃষ্ট মুগ্ধ করিতে পারে নাই; তাহার সান্নিধ্যে হৃদয়ের আলোড়ন সে কখনও অনুভব করে নাই। দীপ্তেন ও নিনা অবসর পাইলেই চুম্বকাকৃষ্ট লৌহবৎ পরস্পরের সান্নিধ্য-লাভের চেষ্টা করিত।

উভয়ের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া এক দিন রাত্রিকালে রমাপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, “এত দিনে হয় তো আমার মনের সাধ পূর্ণ হবে। ছেলেটা চার বৎসর একা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অবসর-কালে তা'কে যে একটু যত্ন করবে, এমন কেউ নেই! মিভিলিয়ানদের প্রথম জীবনে অধিকাংশ স্থলেই নির্জন বাস অপরিহার্য হ'য়ে ওঠে। সেই অবস্থায় কেবল সাধ্বী পত্নীই তাকে আনন্দ দিতে পারে।”

রমাপ্রসাদ বাবু ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলেন, “সে তো বুঝলুম, কিন্তু তোমার ছেলে যে স্ত্রীলোকের দিকে ঘেঁসতেই চায় না! কত ভাল-ভাল মেয়ে তো দেখালে, তার গৌ ফিরলো কি? ‘বিয়ে ক’রে কি হবে? বেশ তো আছি’—এই তো তার বুলি, সে কি তা ছেড়েছে?”

ঘোষজায়া বলিলেন, “এইবার সে-বুলি বদলাবে গো! দেখে নিও তুমি। দেখনি, নিনার জন্তে সে যেন পাগল? নিনা ত স্বজাতিরই মেয়ে,—সব রকমে আমাদের বো হ'বার উপযুক্ত। আমার মনে হয়, দীপু ওকে পেলে সুখী হবে।”

রমাপ্রসাদ বাবু এ কথা সমর্থনে বলিলেন, “তা আমিও লক্ষ্য করেছি! কিন্তু এ যে বামন হ’য়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ার মতো হবে! আমি বরং মনে মনে প্রার্থনা করি, দীপু যেন ওর প্রতি আকৃষ্ট না হয়; নতুবা পরে আর কাকেও ওর মনে ধরবে না।”

ঘোষজায়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “তা যা-ই বল, আমার বড় সাধ—নিনাকেই বউ করি। মেয়েটিকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে।”

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “সাধ কি আমারই হয় না? কিন্তু আমাদের মত ঘরে—কলকাতার বড়লোক মানুষ স্ত্রী, মেয়ে দিতে কেন রাজী হবেন? তাঁদের চোখে আমরা মফস্বলের নেটিভ ডাক্তার বৈ ত নই, স্নাতরাং নগণ্য ব্যক্তি;—জজ বা বড় ব্যারিষ্টার হ’লে এক দিন বরং তা সম্ভব হ’তো।”

ঘোষজায়া বলিলেন, “তা আমার ছেলে তো সিভিলিয়ান, আর আমাদের অবস্থাও সত্যি-সত্যি অগ্রাহ্য করবার মতনও নয়।”

রমাপ্রসাদ এবার হাসিয়া বলিলেন, “ছেলের এখনকার বেতনে ঐ রকম বড়লোকের মেয়ের হাত-খরচাও কুলোবে না, তা ভেবে দেখেচ? আমি তো আর বেশী-কিছু দিতে পারব না যে, স্বচ্ছন্দে ওদের চ’লে যাবে।”

ঘোষজায়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, নিনা সে রকম মেয়ে নয়। তার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আমাদের ঘরে এসে অস্বস্তি হবে ব’লে মনে হয় কি?”

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “ওর প্রকৃতি বেশ নম্র ব’লেই মনে হয়; সকল রকমেই মনের মতো বটে। কিন্তু নিনা যদি দীপুকে বিয়ে ক’রতে চায়ও, ওর বাপ-মা তাতে তো রাজী হবেন না। পাত্র হিসাবে সুনীল যে আরও অনেক ভাল।”

ঘোষজায়া বলিলেন, “সুনীলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হ’য়েছে না কি? সে রকম ভাব তো মোটেই দেখা যায় না।”

রমাপ্রসাদ—“বীরেন বাবু অনেক দিন থেকেই নিনাকে বৌ করবেন—ঠিক ক’রে রেখেছেন; কেবল সুনীলকে বাগে আনতে পারছেন না। মেয়েটারও যে সে দিকে বিশেষ ঝোঁক আছে—তা তো মনে হয় না। কিন্তু বীরেন বাবু সহজে নিনাকে হাত-ছাড়া করছেন না,—এ কথা আমার তিনি ব’লেছেন।”

কিছুক্ষণ পরে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন, “যা’ক ও কথা, আমি শেফালীর জন্তই বেশী চিন্তিত। তোমরা স্ত্রীলোক, এ-সব বিষয় তোমাদের বেশী নজরে পড়ে; তোমার কি মনে হয়, সুনীল শেফালীর প্রতি আকৃষ্ট হ’য়েছে? সুনীল যদি শেষ-পর্যন্ত ওকে বিয়ে করতে চায়, তো মেয়েটার জীবন ব্যর্থ হয় না।”

ঘোষজায়া বলিলেন, “সুনীলের মনোভাব—যা’র একটু দৃষ্টিশক্তি আছে, সেই বুঝতে পারে। শেলী কাছে থাকলে সুনীল তারই দিকে অনিমেঘ নয়নে চেয়ে থাকে, আর দূরে থাকলে চক্ষু যেন তারই সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। শেলী কিন্তু ভয়ঙ্কর চাপা মেয়ে, তার মনের ভাব একটুও বুঝবার উপায় নেই; একেবারে যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত! তবে তাকে তো আমার জানতে বাকী নেই; তার প্রাণ সুনীলের জন্ত যতই ব্যাকুল হোক না কেন, সুনীল যদি সেই পল্লীবাসিনী পরিত্যক্তা পত্নীকে গ্রহণ করে, তবেই শেলীকে পাবে, নতুবা নয়; সুনীল তো জানে না—শেলীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই; সমস্তা যে ঐখানেই!”

রমাপ্রসাদ চিন্তিত ভাবে বলিলেন, “সে কথা সত্য, শেফালী তার উচ্চ আদর্শ থেকে কখন বিচ্যুত হবে না। তার স্বামী কর্তব্যব্রত হবে, তা সে কখন সন্দেহ ক’রবে না; বরং সর্বত্যাগিনী হ’য়ে চিরজীবন সন্ন্যাসিনীর ব্রত পালনেও তার আপত্তি হবে না। আর শ্রদ্ধা যেখানে নেই, পতিভক্তি সেখানে আসতে পারে কি? এ কথাও আমার মনে হয় যে, সুনীল যদি কর্তব্যের অনুসরণ ক’রতেও চায়, বীরেন বাবু তা’তে বাধা দেবেন। সুনীলের উপর আমার ধারণা ভালই হ’য়েছে। ছেলে বাপের মত অহঙ্কারী নয়। তার বাপের দৃষ্টি নিনার বাপের সম্পত্তির ওপর।”

রমাপ্রসাদ বাবু ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, “সুনীলের ওপরও কিন্তু আমার একটু রাগ হয়। পুরুষ-মানুষের অতখানি দুর্বলচিত্ত হওয়া ঠিক নয়। যদি শেফালীকে—পল্লীবাসিনী শেফালীকে সে ত্যাগই করবে তো এত দিন বিয়ে করেনি কেন? আর নিনার বাপ-মাকেই বা কেন এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখেছে?”

ঘোষজায়া বলিলেন, “নিনার বাপ-মা যে সুনীলকেই জামাই করতে চান, তা’ কি ক’রে জানলে?”

রমাপ্রসাদ বলিলেন, “শেলীর কাছে শুনেছি—
জাহাজে নিনার মা তাকে সব কথাই ব’লেছিলেন।
সেই জাহাজে মিষ্টার ও মিসেস সিংহ মেয়ে ঘাড়ে ক’রে
বিলেতে ছুটেছিলেন, শেষ চেষ্টা ক’রে একই জাহাজে
ফিরেছিলেন। দত্ত-পরিবারের সঙ্গে নিনার দেশভ্রমণে
আসবার কারণও বোধ হয় তাই; অর্থাৎ কাছাকাছি
থাকলে যদি মিলামিশায় প্রণয়ের উদ্রেক হয়। শেলী
বেচারার ওপর কি অত্যাচারই না হ’চ্ছে! তার মানসিক
শক্তি পরীক্ষার কি শেষ নেই? এই সকলের উপর এত
শারীরিক পরিশ্রম তার কত দিন সহ্য হবে? এই ক’
দিনেই কি রকম শুকিয়ে উঠেছে দেখেচো?”

ঘোষজায়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন, “শেলীর জন্ত
আমায়ও বড় ভাবনা হ’য়েছে। ও তো সবই জানে,
সুনীলকে স্বামী বলে চেনে-ও। সব জেনে মনের সকল
ব্যথা চেপে রেখে এমন প্রফুল্ল মুখে দিনের পর দিন
কাটিয়ে দেওয়া আর সুনীলের সঙ্গে নির্লিপ্ত ভাবে ব্যবহার
করা—এক শেফালীই পারে; বোধ হয়, রঙ্গমঞ্চের সুনীপুণা
অভিনেত্রীদেরও তা অসাধ্য! তার অন্তরের দ্বন্দ্ব,—মনের
ভিতরে যে তুফান চলছে, তার আভাস মাত্র বাইরে
প্রকাশ পায় না; এমন কি, আমরা সব জেনেও তার
কোনও চিহ্ন খুঁজে পাইনে! জগদীশ্বরের কি অভিপ্রায়,
তা তিনিই জানেন।”

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

সুখের ঘর

বেধোঁচ জীবনপ্রাতে ডগের সাথে সুখের ঘর ;
সে যে মোর সকাল সাঝে সকল কাজে জড়িয়ে আছে বুকের পর ।
জীবনের কঠিন পথে
সে আমার নিত্য সাথী আপন হ’তে রে,—
ভরি’ মোর অশন-বসন ঘুম-জাগরণ কারণে
আবার’ বক্ষে মোরে রক্ষা করে ব্যথার চির তারুণ্যে ।

সে আমার	আশার আশান সব অবসান অঙ্কে তা’র ;	সুখ আমার	যুগান্তরে বড়’র ঘরে আমন্ত্রণ ;
বত মোর	প্রাণের গীতি সাধের স্মৃতি তা’র পীরিতির কণ্ঠহার । বেদনার অক্ষরায় সে আমার পুণ্যাভিষেক নিত্য করায় রে,—	ক্ষণিকের	এই অতিথির ব্যাধের গীতির উগ্রপ্রীতি লোভায় মন । আসে যাক্ নাই কো মানা হবে না তা’র তরে মোর মন ‘দেওয়ানা’ রে ;—
বসি’ মোর	চিত্তবাসে দীর্ঘশ্বাসে শ্রান্তিহীন	ডগ আমার	ব্যথার ব্যথী পথের সাথী, আপন জন ;
কহে তা’র	মর্ম্মকথা গুপ্তব্যথা তপ্তভাষায় রাত্রিদিন ।	উর্গারি’	নেশায়-তরল হাসির গরল বিষায় না কো সরল মন ।
কোথা সুখ	বেদনহরা ! ‘সুখের পারাবত’ তো সে ;	নাহি মোর	দৃপ্ত গরব,—কীর্তি-সরব প্রাসাদ নাই ;
কামনার	স্বর্ণবাণে মর্মে হানে গর্ভমানে মস্ত সে । চাওয়া তা’র ক্ষিপ্ত করে, পাওয়া তা’র উন্মাদনায় চিত্ত ভরে রে,—	চাহি না	স্বর্ণ-মৃষ্টি, পর্ণ-কুটা কার জুকুটি সহিবে, ভাই ! ভয়ে মোর নাই কো ভীতি, সে জাগায় নিত্য গাহি প্রভাত-গীতি রে,—
যাওয়া তা’র	সর্বনাশা,—সর্ব-আশার শেষ-বিদায় ;	আছি বেশ	ডগের নীড়ে, সুখের ভিড়ে হারাই নাই ;
কোথা সুখ	শ্রান্তিহরণ ! অন্তঃকরণ তপ্ত করে মস্ততায় ।	গাঁথি হার	অক্ষমালায় এট নিরালায় ডগের গলায় পরাই তাই ।

. শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ ।



অঞ্জনা দেবী

বড়দিনের ছুটীতে আসাম গিয়াছিলাম। একা নয়—ছ'জন বন্ধু ছিলেন সাথী। অসিত আর বিজয়। শিকারে তাঁদের গভীর অহুরাগ। আমার ও-সখ নাই। আমি নিরীহ লেখক, গল্প লিখি। আমাকে তাঁরা ধরিলেন,—একটা নতুন এন্টপেরিয়েন্স...সঙ্গে চলো।

পাজি দেখিয়া বাহির হই নাই! যাত্রা নিফল! কোথায় বাঘ-ভালুক! পাখীর ঝাঁক দেখিয়াই শিকারের সখ মিটিল!

বনের পথে ফিরিতেছিলাম। রাণীপোতার ছোট ইন্সপেকশন-বাঙলোয় এক বাঙালী গুদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। সাহেবী পোমাক-পরা।

পরিচয় হইল। শচীন্দ্র সান্তাল। এখানকার ডেপুটি। বন-বাদাও লইয়া আছেন। রাণীপোতায় আসিয়াছিলেন একটা তদারকীর কাজে। থাকেন, রাণীপোতা হইতে চার ক্রোশ দূরে শালবনে।

সান্তাল সাহেব বলিলেন,—যখন দেখা হলো, ছাড়বো না। আমার ওখানে ছ'চার দিন থেকে তার পরে ফিরবেন। আপত্তির কারণ ছিল না।

হাকিমের সঙ্গে হাতীর পিঠে শওয়ার হইয়া শালবনে আসিলাম।

উঁচু টিলার উপর পরিচ্ছন্ন বাঙলো-বাড়ী। চারিদিকে বন—পাখীর কল-কাকলীতে ভরিয়া আছে। ছোট-খাট ছ'-একটা পাহাড়ে-নদী। মনে হইল, এমন বনে এমন বাঙলো-বাড়ী পাইলে বনবাসে কিসের দুঃখ!

হাতী হইতে নামিলাম।

সান্তাল সাহেব বলিলেন,—আমার স্ত্রী খুব খুশী হবেন আপনাদের দেখে! একা এই বনে বাস করছেন...কথা ক'বার লোক বলতে শুধু আমি!

আমি বলিলাম,—ছেলেমেয়ে?

সান্তাল সাহেব বলিলেন—হয়নি।

অসিত বলিল—তাকে একা রেখে বেরিয়েছিলেন?

সান্তাল সাহেব বলিলেন—চাকরি-রক্ষা করতে।

আমি বলিলাম,—যদি তাঁর অসুখ-বিসুখ হতো?

বিজয় বলিল—চোর-ডাকাতের ঝগড়া আছে!

মুহু হাত্তে সান্তাল সাহেব বলিলেন—অসুখ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা যে হয় না, তা নয়। আমার স্ত্রী বলেন, অসুখ হলে যদি সারবার হয়, সে-অসুখ সারবেই। আর খাবার অসুখ হলে কারো সাধ্য নেই, সারাবে! কুইন ভিক্টোরিয়া, জর্জ দি ফিফ্—এঁদেরো কেউ সারাতে পারেনি!

আমি কহিলাম—কথাটা সত্য!

সান্তাল সাহেব বলিলেন—বনে নিক্রপায়ে বাস করি, কাজেই সনাতন-কথাগুলোর উপর আস্থা না রাখলে চলে না! তা ছাড়া এখানে হাসপাতাল আছে, ডাক্তার আছে। আর সেপাই-পাহারওয়াল আছে বাড়ী চৌকি দিতে...

অসিত বলিল—হু...

একটা ভৃত্য আসিল। আসামী ভৃত্য।

সান্তাল সাহেব বলিলেন—মেম-সাব?

সে বলিল, মেমসাহেব বেড়াইতে গিয়াছেন।

সান্তাল সাহেব আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। চায়ের ফরমাশ করিলেন; তার পর বলিলেন,—আমি দেখি, কি খাবার আছে। এখানে মাছ-মাংস মেলে, ফল-মূল মেলে, কুটি মেলে। কমলা লেবু অজস্র! আর কমলা-মধু আছে। চায়ে চিনির বদলে মধু দিতে বলি!

চায়ের আসর।

সান্তাল সাহেব বলিলেন,—শালবন যা জায়গা, সত্যি, মেয়েদের পক্ষে এখানে বাস করা শক্ত। এখানে আমরা আছি আজ তিন বছর। উনি আবার সহরে ছিলেন বরাবর...লেখাপড়া জানেন...গান-বান্ধনা জানেন। ঔর

পক্ষে এ-বনে বাস করা... তবে, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।
আমার স্ত্রী বলেন—সহরের মানুষের সঙ্গে মিশতে, কথা
কহিতে ভুলে গেছি...দেখলে গা কেমন যেন ছম্-ছম্ করে!

আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিজয় বলিল—ইনি উপস্থাসিক
...দেখুন,গল্পে-শব্দে যদি তাঁকে একটু আরাম দিতে পারেন!
কহিলাম,—বিবাহ হয়েছে ক' বছর?

—প্রায় সাত বছর হলো। একটু বেশী বয়স?
বিয়ে করবো না, ভেবেছিলুম। চাকরি নিয়ে বনে-জঙ্গলে
যুরছি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা। আমার
এক বছর বাড়ীতে এসেছিলেন। সেখানে আমার খুব অস্থখ
হয়। গুর সেবা...জীবনে ভুলবো না। তার পরেই আর কি...

হাসিয়া আমি কহিলাম,—আমরা তা হলে যে-সব
রোমান্স লিখি, সেগুলো নিছক ভূয়ো নয়! জগতে সত্যি-
কার রোমান্স ঘটে!

সাত্তাল কহিলেন—রোমান্স বলতে পারেন! চাকরির
আর সাত-আট বছর বাকী। তার পর পেন্সন নেবো।
গুকে বলেছি, পেন্সন নিয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকবো।
আমার জন্তু উনি যেমন বনবাস-হুঃখ সহ্য করছেন, তেমনি
এ-বনবাসের খেণারৎ হবে তখন।...কিছু উনি বলেন ..
কথা শেষ হইল না। বাহিরে নারী-মূর্ত্তি!

বুঝিলাম, মিসেস সাত্তাল।

তরুণী নন...তবু তারুণ্যের আভা মুখে জলজল
করিতেছে! নিটোল দেহ। মনে হয়, হাজার নারীর
মধ্যে দাঁড়াইলে ইঁহার পানে চাহিতেই হইবে! চেহারায়
এমন দীপ্তি!

সাত্তাল সাহেব বলিলেন,—এসো শান্তি। বাড়ীতে
অতিথি-সমাগম! এঁরা কলকাতার লোক, বন থেকে
ধরে এনেছি...

শান্তি দেবী আসিলেন, মূহু হাস্তে কৃতান্তলি-পুটে
বলিলেন,—নমস্কার!

তার পর আলাপ-পরিচয়। অসিত বড় চাকুরে...বিজয়
ডাক্তার...শিকারে ছ'জনের প্রচণ্ড অমুরাগ। আমি গল্প-
উপস্থাস লিখি। আসিয়াছি বন্ধুদের সঙ্গে আসামের জঙ্গলে
এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে!

শান্তি দেবী বলিলেন—“আনুকোরা” উপস্থাস আপনার
লেখা, না?

বলিলাম,—ই্যা।

শান্তি দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—
এ-বনে রাজ্যের মাসিক-পত্র আনিয়ে, গল্প-নভেল পড়েই
দিন কাটাই। দায়ে পড়ে বাঙলা-সাহিত্যের চর্চা করি।

সাত্তাল বলিলেন,—এবং সঙ্গীত-চর্চাও করেন।
সে অবশ্য আমার বিরাম-স্থখের জন্তু...নিজের সখে নয়।

অসিত বলিল—আমরাও গান শুনে আনন্দ পাই!
হাসিয়া সাত্তাল বলিলেন,—শুনবেন। অতিথিদের
সেবার জন্তু উনি গাইবেন বৈ কি, নিশ্চয় গাইবেন!

সন্ধ্যার পর।

সাত্তাল সাহেবের হেডক্লার্ক আসিয়াছিলেন, কেদার
বড়ুয়া। ছ'জনে বারান্দায় কি কথাবার্তা হইল...তার
পর সাত্তাল ঘরে আসিলেন, বলিলেন,—শিকার করতে
চান? আমার হেডক্লার্ক কেদার বড়ুয়া এসেছে...মস্ত
শিকারী। ওর সঙ্গে...

অসিত আর বিজয় যেন লাফাইয়া উঠিল!

সাত্তাল বলিলেন,—চলুন, তা হলে আপনাদের
শিকারের ব্যবস্থা করে দি।

তিন জনে বাহিরে ছুটিলেন কেদার বড়ুয়ার কাছে।

ঘরে শান্তি দেবী এবং আমি।

শান্তি দেবী বলিলেন,—আপনার গল্প আমার খুব
ভালো লাগে। ফী-মাসেই তো আপনার গল্প ছাপা হয়
দেখি “প্রগতি” কাগজে। প্রগতি এলে আমি সব ছেড়ে
আপনার লেখা আগে পড়ি।

আনন্দে-গর্বে আমি কহিলাম,—আমার সৌভাগ্য!

বলিলেন,—মানুষের মনের এত কথা যে লেখেন,
সে-কথায় সত্য-কিছু আছে? না, নিছক কল্পনা?

বলিলাম,—দেখা-জানা কথার সঙ্গে কল্পনা মেশাই।
নিছক কল্পনা নিয়ে আমি কারবার করি না!

শান্তি দেবী জবাব দিলেন না...ছুই চোখের অবিচল
দৃষ্টি আমার মুখে নিবন্ধ করিলেন।

আমি তাঁর পানেই চাহিয়াছিলাম...শান্তি দেবীর
ছ'চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন ভয় ও সংশয়ের মলিন ছায়া!
ও-দৃষ্টি বড় করুণ। যেন ভীতি-বিহ্বলা হরিণীর দৃষ্টি!

হঠাৎ মনে হইল, এ দৃষ্টি যেন আগে কোথায়

দেখিয়াছি! দু'টি ডাগর চোখে এমনি নিরুপায় অসহায় দৃষ্টি!...এমনি প্রতিমার মতো মূর্ত্তি...এই রঙ...রঙে আঙনের হলুকা নাই, শুধু আলোর দীপ্তি!

অনেকক্ষণ পরে শান্তি দেবী বলিলেন,—গেল-মাসে আপনার একটা গল্প পড়েছি...“নারীর ইতিহাস”...

কহিলাম,—প্রণতিতে বেরিয়েছিল।

—হ্যাঁ। আচ্ছা, ও-গল্পের নায়িকা হিরণকে আপনি দেখিয়েছেন...বেশী-বয়সে নায়ক অরবিন্দকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। তার পর যখন জানতে পারলে, অরবিন্দ আগে শৈলকে বিয়ে করে তাকে ত্যাগ করে এসেছিল, তখন শৈলকে আনিয়ে স্বামীর হাতে সঁপে দিয়ে তিন জনে মিলে ঘর-সংসার করতে লাগলো।...মেয়ে-জাতটাকে এমন অপদার্থ করে গড়তে আপনার বাধলো না?

আমি কহিলাম,—স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর গতি কি, বলুন?

শান্তি দেবী বলিলেন,—মেয়েদের নিজেদের আত্ম-সম্মানবোধ থাকবে না? জানেন তো বঙ্কিমবাবু লিখে গেছেন ভ্রমরের মুখ দিয়ে...স্বামী যত দিন ভক্তির যোগা, তত দিন স্ত্রী তাকে ভক্তি করবে!

তার পর ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া খাবার বলিলেন,—বাঙলা দেশের মেয়েকে কবে আপনারা মাহুষ করে গড়বেন জান বাবু? তাদের গন, তাদের সুখ-দুঃখ—সেগুলোর অস্তিত্ব...চিরদিন তাদের কাঠের পুতুল করে রাখবেন?

কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিলাম, দেওয়া হইল না...সাত্তাল-সাহেব আসিলেন।

বলিলেন,—ওঁরা মশগুল! কেদারের সঙ্গে কাল সকালে সব বাঘ মারতে বেরুবেন।...আপনি যাবেন?

আমি বলিলাম,—না...যখন আশ্রয় পেয়েছি, তখন আর বনে বাঘের মুখে যাবো না। এ্যাদিন তো ঘুরলুম বাঘ দেখবো বলে।...কিন্তু বাঘ কি, একটা বেরাল পর্য্যন্ত নজরে পড়লো না! শুধু নিরীহ পাখা মারা। একে শিকার বলে না পাখী-মারাকে কশাইগিরি বলে।

সাত্তাল বলিলেন,—এ দেশের লোক বিষ-মাখা তীর ছুড়ে জন্তু-জানোয়ার মারে! আমার মনে হয়, বাজে কথা। ওরা বলে, তীরে শুধু বিষ-মাখানো নয়...

হরিণ-ছাগলের গা-ফুঁড়ে রক্তে বিষ ইনজেক্ট করে দেয়... সে হরিণ কিম্বা ছাগলকে ধরলে বাঘকে মরতেই হবে।

আমি বলিলাম,—এমন বিষ আছে?

শান্তি দেবীর পানে চাহিলাম, কহিলাম,—আপনি বিশ্বাস করেন মিসেস সাত্তাল?

শান্তি দেবীর কেমন যেন উন্মনা ভাব!

বলিলেন,—বিষের কথা বলছেন?

বলিলাম,—হ্যাঁ। এমন বিষ আছে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তি দেবী বলিলেন,—না, না, বিষ-টিষ শুনলে আমার বুক কেমন কেঁপে ওঠে...

সাত্তাল সাহেব বলিলেন,—তা ছাড়া জানেন জ্ঞান বাবু, এই বুনো সমাজ এমন যে, ঘরে মেয়ে জন্মালে ওরা সে-মেয়েকে সত্ত্ব তখনি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। ডাক্তারী-বিদ্যায় সে-বিষের সন্ধান মেলে না!...এই সে-দিন একটা বুনোর ঘরে এমন কাণ্ড হয়েছিল। মাকে আমি সাজা দিলুম...এক বছরের জেল।

বলিলাম—মা মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল?

সাত্তাল বলিলেন,—হ্যাঁ। ওরা বলে, মেয়ে-জাতটা অসার, অপদার্থ। তাকে মাহুষ করতে খরচ...অথচ মা-বাপকে আয় দেবে না।

আমি বলিলাম—এমন খুনীকে এক বছরের জেল!

সাত্তাল বলিলেন—এদের পক্ষে এক-বছর কয়েদে থাকা অসহ্য ব্যাপার! তা ছাড়া এ হলো নন-রেগুলেটেড্ জায়গা—এখানে একটু কাজীর বিচার-প্রথা অবলম্বন করতে হয়। মেয়ে-মাহুষকে ফাঁশি-কাঠে ঝুলোনো...shocking! মেয়ে-জাত!

রাত্রে চোখে ঘুম আসিতেছিল না! মনের উপর শান্তি দেবী এমন আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন! কেবলি মনে হইতেছিল...দেখিয়াছি...কোথায় যেন এই শান্তি দেবীকে! ও-মুখ নূতন নয়...অপরিচিত নয়!...

কিন্তু কোথায়?

সহসা মনে পড়িল...

পৃথিবী যেন ছলিয়া উঠিল! সঙ্গে-সঙ্গে ক'বছর আগেকার ঘটনাগুলো বারোছোপের ছবির মতো চোখের সামনে...

কি খেয়াল হইল...উঠিয়া পেন আর কাগজের প্যাড্ লইয়া লিখিতে বসিলাম।

লিখিলাম—

“.....রূপসী নারী...বিহুসী...”

আইনের পাকে আসামী হইয়া তাকে আদালতে দাঁড়াইতে হইল।

অপরাধ...খুন! স্বামিহত্যা!

দিনের পর দিন অভাগিনী মলিন-মুখে বসিয়া আছে আসামীর কাঠগড়ায়। উকিল সওয়াল-জবাব করিতেছে, সাক্ষীর পর সাক্ষীর এজাহার চলিয়াছে। তার পর এক দিন জজ আর জুরি বলিল—আসামী নির্দোষ! খালাশ!

আইনের চোখে নির্দোষ হইলে কি হইবে, সমাজে যে ছুঁনাম, যে কলঙ্ক রটিল, সমাজে আর কি তার স্থান হয়?

কিছু কোথায় যায়? যদি বাঁচিতে চায়? কতই বা বয়স!

এমন সুন্দর পৃথিবী...এই আলো-বাতাস...এমন অজস্র ফুল-ফল...মাথার উপরে নীল আকাশ...বুকে মেহ-মায়া প্রীতি-ভালোবাসা...মনে কত সাধ, কত আশা!

সমাজ যদি ঠাই দেয়, বুক-ভরা সাধ-আশা দিয়া হয় তো আবার সুখের সংসার গড়িতে পারে!

আজ দেখিলাম সেই নারীকে!

পাঁচ বৎসর পূর্বে এই নারীকে দেখিয়াছি খুনের দায়ে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়! এ নারীর কাহিনী লইয়া কাগজে-কাগজে তখন কত লেখা-লেখি...কত মন্তব্য...কদর্য্য নির্ভর কত ইঙ্গিত!

আজো যেন স্পষ্ট দেখিতেছি, পরণে সেই লাল পাড় পাড়ী...গায়ে মোটা চাদর...মলিন-মুখী কিশোরী!

অঞ্জনা দেবীর মর্দমার কথা বাঙলা দেশ আজো ভোলে নাই, নিশ্চয়! ধনী-ঘরের বধু...স্বামী ব্রজনাথ চৌধুরীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া আদালতে তাঁর বিচার!

আদালতে কত মামলা নিত্য হয়...কিন্তু এমন? ভদ্র বাঙালী-ঘরের বধু স্বামীকে হত্যা করিয়াছে!

আদালতে কি ভিড়! সে ভিড়ে তাঁর সেই অবিচল প্রশান্ত মূর্ত্তি! যেন ছায়ার দেহ লইয়া আদালতে বসিয়া আছেন। তাঁকে লইয়া আদালতে এত কলরব-কোলাহল

—তার সঙ্গে অঞ্জনা দেবীর যেন কোনো সম্পর্ক নাই! কাঁশি জেল খালাশ...কোনো-কিছুতে আগ্রহ নাই!

ব্রজনাথ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যু...তাঁর দেহ-মধ্যে পাওয়া গিয়াছে বিষ! সকলের সন্দেহ পত্নী অঞ্জনা দেবীর উপর!

সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিয়া বলিয়া গেল অঞ্জনা দেবীর উপর স্বামী ব্রজনাথের পীড়ন-অপমানের কাহিনী! অঞ্জনা দেবী না কি কার কাছে বলিয়াছিলেন, অপমানের এমন শোধ দিব, তার জন্ত যদি কাঁশি-কাঠে বুলিতে হয়, বুলিব।

এ-কথার পরের দিন হঠাৎ ব্রজনাথের অসুখ।... ডাক্তার? অঞ্জনা দেবী বলিলেন,—না! ডাক্তার কি করিবে? তাই ডাক্তার ডাকা হইল না। তার পর রাত্রে ব্রজনাথের জীবন-দীপ নিবিয়া গেল!

মাতাল দুশ্চরিত্রে ব্রজনাথ মরিল। ব্রজনাথ বাচিয়া থাকিয়া স্ত্রীকে যখন পীড়ন করিত, তখন এ-পরিবারের জন্ত কাহারো মাথা-ব্যথা ধরে নাই! আজ ব্রজনাথ মরিবামাত্র এ-পরিবারের জন্ত সকলে একেবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিল!

লোকজন কলরব তুলিল। পুলিশ আসিল; এবং অঞ্জনা দেবীর সেই কথার জের তুলিয়া পুলিশ তাঁকেই দিল চালান। ব্রজনাথের পাকস্থলীর মধ্যে বিষ পাওয়া গেছে! এ-বিষ কে আর দিবে? ধরে আছে স্ত্রী—প্রহারে-পীড়নে জর্জরিতা স্ত্রী! সে বলিয়াছিল, এমন শোধ দিব, তার জন্ত যদি কাঁশি-কাঠে বুলিতে হয়...

শিহরিয়া সকলে বলিল, যে-স্ত্রী এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে...সে-স্ত্রীর পক্ষে স্বামি-হত্যা বিচিত্র নয়!

তার পর কাগজে-কাগজে এ খুনের মর্দমার লইয়া কি কলরব! আতঙ্কে শিহরিয়া কোনো কাগজ লিখিল,—গেল, এবার হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর ধর্ম একেবারে লোপ পাইল! স্বামী না হয় প্রহার করে,—স্বামী ইহলোকের দেবতা...জীবন-দেবতা...সে-দেবতার প্রহার পুষ্পাঞ্জলির মতো গায়ে লইতে পারো না...? স্ত্রী হইয়া স্বামীর প্রাণ লইবে এমন করিয়া! প্রাণ কাহারো চিরদিনের ইজারা-করা নয়! ক্ষণিক তার মেয়াদ! সে প্রাণ রক্ষা করিতে স্বামীকে হত্যা! এ-প্রাণ লইয়া এখন কি করিবে মা-লক্ষ্মি? যার স্বামী গেল, তার তো ইহ-জন্মটাই গেল!

কোনো কাগজ লিখিল—এই তো চাই! কে বলে মা, তুমি অবলে! পীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক দিন জাগিয়াছিলেন মহিমাশূর-দলনী। যে-স্বামী দুশ্চরিত্র মাতাল, অত্যাচারে যে-স্বামী তোমার দেহ-মন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে, সে-স্বামী সাক্ষাৎ মহিমাশূর! তাকে নিধন করিয়া নারীর শক্তি, নারীর মহিমা প্রচার করিয়া জলদ-মন্ত্র স্ববে বলো—মাতৈঃ! এই তো চাই! এবার আশা হইয়াছে, ভারত-ললনার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে!

কিন্তু মামলায় গলদ বাহির হইল। অনেক গলদ! এ বিষ কে আনিয়া দেছে? ঘরের কোণে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া যে-বধ একান্তে বসিয়া শুধু লাঞ্ছনা-পীড়ন সচিয়াছে, বাজারে সে গিয়া বিস আনিয়াছে—প্রমাণ মিলিল না! লোকজন খানিয়া দিয়াছে বলিয়া কাচারো উপরে এতটুকু সন্দেহ নাই! এমন দোকানীর সন্ধান মিলিল না...যে বিস দিয়াছে! জুরির দল বলিল—এ বিস বাহির হইতে পেরে পড়িয়াছে! যে-মাতাল পথে-ঘাটে মদ খাইয়া বেড়ায়, তাকে বিস দিতে বাহিরে লোকের অভাব হয় না।

কাজেই মামলা ফাঁশিয়া গেল। অঞ্জনা দেবী খালাশ!

খালাশ পাইয়া তিনি গৃহে গেলেন না। মা-বাপের কাছে ফিরিলেন না। ছ'-চার জন বান্ধবী ছিল, তারা বলিল—খামাদের কাছে এসো। অঞ্জনা দেবী বলিলেন, যে-কলঙ্ক রটিয়াছে, লোকালয়ে বাস করিতে পারিব না!

তার পর...

কোথায় গেলেন অঞ্জনা দেবী? অঞ্জনা দেবীর মকর্দমার উদ্ভেজনা খামিবার সঙ্গে সঙ্গে কালের তরঙ্গে কোথায় তিনি ভাসিয়া গেলেন, কেত সে-সংবাদ রাখিল না! সকলে তাঁকে ভুলিয়া গেল।

কিন্তু আমি ভুলি না! উপন্যাসের প্লট খুঁজিতে বসিয়া মন তাঁকে খুঁজিত! কোথায় গেলেন? আশ্চর্য! তাঁর মামলার বিবরণ লইয়া মামুল্য এমন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল...তার পর এখন কোথায় তাদের সে কৌতূহল?...কাগজে-কাগজে নিত্য সেই কত রচনা, ...ট্রামের ধারে-ধারে তাঁর নামে ছড়া ও গল্পের রকমারী বই...আসরে-বৈঠকে লোকের মুখে তখন আর অন্য কথা ছিল না...শুধু অঞ্জনা দেবী! তার পর?

আজ কত কাল পরে এই নিষ্কন বন-তলে

প্রতিমার মতো সেই মূর্তি...সুখের সংসার...স্নেহে প্রেমে খণ্ড নিশ্চিত নির্ভর...

সে অঞ্জনা দেবীকে সাত্তাল সাহেব কোথায় পাইলেন? সাত্তাল সাহেব জানেন এক দিন কি বর্ষের নির্ভর রহস্য-কৌতুক...কি তীব্র অভিশাপ এই অঞ্জনা দেবীকে ঘিরিয়া দিকে-দিকে উৎসারিত হইয়াছিল?

অঞ্জনা দেবী আজ নাম বদলাইয়াছেন! তিনি আজ অঞ্জনা দেবী নন...শান্তি দেবী! সব অশান্তি-বিরোধের শেষে শান্তি চাহিয়া নাম লইয়াছেন শান্তি দেবী!

এ শান্তি সত্যই পাইয়াছেন?...”

এই পর্য্যন্ত লিখিমাছি, তার পর যোগে দাক্ষণ ঘূমের ঘোর...

লেখা এইখানেই শেষ...

পরের দিন সকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম...একা। কারো সঙ্গ, কারো কোলাহল ভালো লাগিতেছিল না...বাই একা বাহির হইয়াছিলাম। মনের উপর অঞ্জনা দেবী সারাক্ষণ বিচরণ করিতেছেন! কখনো সেই পুরানো অঞ্জনা দেবীর মূর্তিতে...আদালতে বসিয়া মলিনমুখী অশ্রু-ময়ী অঞ্জনা দেবী! পরক্ষণে এই শান্তি দেবী...স্নিগ্ধ-হাস্ত-ময়ী...স্বামীর প্রেমে দুঃখ ভুলিয়া এ-গৃহের গৃহলক্ষ্মী!

ফিরিয়া আসিলাম বেলা তখন দশটা। বজুরা বাহিরে গিয়াছে...সাত্তাল সাহেব বাড়ী নাই।

আসিয়া বারান্দায় বসিয়া আছি...মিষ্ট গন্ধে বাতাস ভরিয়া গেল!

চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। দেখি, স্নান-শেষে কৃষ্ণ কেশদাম এলায়িত করিয়া মাথার উপর লাল-পাড় শাড়ীর একটু আবরণ...শান্তি দেবী! বলিলেন,—বেড়ানো হলো? কহিলাম,—হ্যাঁ...

চারিদিকে চাহিলেন। আরো কাছে আসিলেন। বলিলেন—রাত্রে গল্প লিখছিলেন?

বুকখানা ধড়াশু করিয়া উঠিল।

—কমা করবেন...অনুমতি না নিয়ে সে গল্প আমি পড়েছি।

মাথা ভুলিতে পারিলাম না।

বলিলেন—ভেবেছিলুম, অল্প-কিছু গল্প। তা নয়...
বাস্তব!

আমি কোনো কথা কহিলাম না। তাঁর পানে
চাহিলাম...দু' চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি লইয়া!

শান্তি দেবী নিখাস ফেলিলেন, বলিলেন—সব
নিয়েই গল্প লেখবার অধিকার আছে...সকলের।

নার এ গল্প কত লোকে পড়বে...নতুন রকমের
...বাঙালী ঘরের বৌ স্বামীকে মেরেছে বলে আদালতে
...য়েছে আসামী হয়ে! লোকের খুব চমক লাগবে...

মনের উপর যেন চাবুক পড়িল!

শান্তি দেবী বলিলেন—মানুষকে শুধু গল্পের খোরাক
গাবার উপাদান বলেই আপনারা জানেন...না?

তার মনে সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার কি অক্ষুরস্ত উৎস
হ, সে-খপর রাখেন না? যে-সব মানুষের কথা

ধন...পুতুলের মতো যে-সব মানুষকে আপনাদের
...নাটকে ইচ্ছামত দেবতা সাজান, দানব গড়ে

লন, খেয়াল-ভরে নাচান-খেলান...কখনো ভেবে
ছেন, তারা সত্যিকারের পুতুল নয়? তারা মানুষ

ত আঘাতেও তাদের মনকে তারা চূর্ণ হতে দেয়
সারিয়ে তুলতে চায়? তারা বাঁচতে চায়?

আমি কহিলাম—বলেছি তো, সত্যিকারের মানুষ যা
... তাদের উপর একটু করুণা মেশাই।

—মস্ত কীর্তি রাখবেন, না? এই অজ্ঞানা...একে যে
... দেখেছিলেন...বাইরে থেকে লোকজনের কথায় এর

রিচয় পেয়েছিলেন, সেইটুকুই এর সব পরিচয়?
...জ্ঞানার মনের মধ্যে কোনো দিন প্রবেশ করেছেন?

পমান-লাজ্জায় তার দিন কেটেছে, রাত্রি কেটেছে...
... ৫ বাস করেও সে কতখানি জগৎ-ছাড়া ছিল...সে

...য় কখনো নিয়েছেন? জানবার চেষ্টা করেছেন,
...নিগ্রহ-পীড়নেও তার মন ভেঙ্গে-চূরে ঝরে যায়নি

...বাঁচতে চেয়েছিল, সুখী হতে চেয়েছিল? তার
...ছিল অজস্র মায়া-মমতা...সে মায়া-মমতা দিয়ে সে

...ছিল একখানি সংসার গড়ে তুলতে? আজ যদি
...ক সে-অজ্ঞানার সত্য পরিচয় আমি বলি...

...তার-একটা নিখাস ফেলিলেন; তার পর বলিলেন,—
...মানুষের কতটুকু খপর রাখে, জ্ঞান বাবু? মানুষের

বিচার করতে বসে বাইরের বাজে কথার উপর নির্ভর করে
আমরা কতখানি অবিচার করি...সে-কথা ভেবে দেখেছেন

কোনো দিন? মানুষকে সত্যি এ-ভাবে দেখবেন না!
মেডিকেল-কলেজের ছেলেরা যে-ভাবে শব-দেহ উন্মো-

...ছিঁড়ে-কুটে এ্যানাটমি-বিজ্ঞা শেখে, তেমন করে কাটা-
...হেঁড়ার সূত্র ধরে মানুষের মনকে বিশ্লেষণ করলে

...সে-মনের পরিচয় পাবেন না .
এ-কথা শুনিলাম। উত্তর দিতে পারিলাম না...

শান্তি দেবী হাসিলেন। মলিন মূহু হাসি।
হাসিয়া আবার বলিলেন,—আপনার এ গল্পে প্রাণ নেই,

...জ্ঞান বাবু। রাগ করবেন না। মানে, আমি এ-গল্পে প্রাণ
...দিতে পারি...সত্যিকার প্রাণ! আসামীর ডকে বসে অজ্ঞানা

...দেগতো, রাজ্যের লোক তার পানে তাকাচ্ছে...তাদের
...চোখে কত-রকমের দৃষ্টি...সে-দৃষ্টি তার গায়ে বিঁধতো

...তীরের মতো! তখন তার মনে কত কথা জাগতো...কত
...বেদনা! পুরাণে আমরা পড়েছি, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা!

...সে অগ্নি-পরীক্ষা কি, তা যদি বুঝতেন!
কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। লজ্জায় ক্ষোভে

...মন যেন চূর্ণ হইয়া যাইবে! কোনো মতে আমি
...বলিলাম—সে অজ্ঞানা দেবীকে যদি ভুলে যাই? এ গল্প

...যদি আমি না লিখি?
শান্তি দেবী উদাস নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া

...রহিলেন...কিছুক্ষণ। তারপর বলিলেন—আপনার পাঠক-
...পাঠিকা যদি এ-গল্প না পড়ে, তাতে আপনার ক্ষতি

...হবে? আপনি যদি বলেন, লোক শিক্ষা...যদি বলেন,
...প্রতারণায় আর-একজনকে ভুলিয়ে এই বালির ঘর তৈরী

...করা...এ কতখানি অজ্ঞায়, কত-বড় পাপ?...আমি
...বারণ করবো না জ্ঞান বাবু...করা উচিত হবে না!

...আপনি যদি মনে করেন, এ গল্প লিখে আপনার
...পাঠক-সমাজকে আপনি চমক দেবেন, তাদের খুশী

...করবেন, তাদের উপদেশ দেবেন,—তাতে যদি আমি বা
...আমার স্বামী লজ্জা পান, তা হলেই কি আপনি কলম বন্ধ

...করবেন? আপনারা লেখক-মানুষ...পরের সুখ-দুঃখ
...নিয়ে যে-ভাবে আপনারা বিশ্লেষণ করতে বসেন, তাদের

...দোষ-চূর্নিত্যর বাইরের দিকটাই শুধু দেখেন...এ
...দোষ-চূর্নিত্যর পিছনে কি বাস্তবতা, কতখানি নিরাশা,

ক্লান্ত, বেদনা জেগে থাকে, সে-খপর আপনারা কখনো
জান্ন না...আপনাদের পাঠক-পাঠিকারা তো জান্নই না...

কথাটা বলিয়া শাস্তি দেবী আবার নিশ্বাস ফেলিলেন।
বড় নিশ্বাস। তার পর চূপ করিয়া আকাশের পানে
চাহিয়া রহিলেন...হু' চোখে সেই উদাস দৃষ্টি!

আমি বলিলাম,—আমায় কমা করুন শাস্তি দেবী...
এ লেখা আমি ছাপতে দেবো না। যে-পর্যন্ত লিখেছি,
ছিঁড়ে আপনার সামনেই পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছি!

শাস্তি দেবী বলিলেন,—মেয়েদের কথা লিখতে বসে
একটু মমতা-ভরে লিখবেন জ্ঞান বাবু। তারা বড় অসহায়,
নিরুপায়...কি অসহ্য যাতনা সয়ে তারা বাইরের জগতে
অবিচল মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়ায়...মেয়ে-জন্ম না নিলে শুধু
সাইকলোজি পড়ে তা বুঝতে পারবেন না। সে-দিনের
সে-লাঞ্জনা মনে হলে আজো আমি শিউরে উঠি!...কিন্তু
জানেন, আজ আমি কি-সুখে সুখী! সে-লাঞ্জনার কথা
ভুলে গেছি...জীবনে সে যেন মস্ত দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম!
ভালোবাসা কি বস্তু...ভালোবাসায় মানুষের মন কি
হয়...বিশ্বাস করুন, আজ আমি বুঝেছি! পুরাণে
অহল্যা-পাষণীর মানুষ হবার কথা আগে বুঝতে পারতুম
না...বাল্মীকি-মুনি কি করে অহল্যার বাধা বুঝে তাকে
আবার পাষণ থেকে মানুষ করেছিলেন, আজ বুঝতে
পেরেছি। হয় তো বোঝাতে পারবো না! শুধু
এইটুকু বলতে পারি...সে-দিনকার সেই লাঞ্জিতা কালি-
মাখা অঞ্জনা আজ আর সে-অঞ্জনা নেই! আপনাদের সভ্য
সমাজে যে সুখ, যে সম্মানগৌরব সে পায়নি, আজ
সভ্যতার আড়ালে বনে সে-সুখ, সে-সম্মান পেয়ে তার
পুনর্জন্ম হয়েছে, সত্যি! যিনি তাকে এ সুখ, এ গৌরব
দেছেন, তিনি...অঞ্জনার স্বামী...অঞ্জনা তাঁকে ভগবানের
উপরে আসন দেছে!..আপনার এ লেখা পড়ে
আমার আতঙ্ক হচ্ছে! স্বামী যদি জানতে পারেন...
নিজেকে কতখানি গোপন করে অঞ্জনা এসে গুর কাছে
দাঁড়িয়েছে!

নিশ্বাসের বাস্পে শাস্তি দেবীর কথা রুদ্ধ হইয়া গেল।
তিনি চূপ করিলেন। হুই চোখের পিছনে স্তম্ভিত অশ্রু...

তাহা লক্ষ্য করিলাম। লেখার গর্ভ নিমেষে চূর্ণ-
বিচূর্ণ হইয়া গেল!

কহিলাম,—কমা করবেন। সাত্তাল সাহেব সত্যি
জানেন না আপনার জীবনে এক দিন কি ঝড় বয়ে গেছে?
শাস্তি দেবী আবার নিশ্বাস ফেলিলেন...হুই
চোখ মুদ্রিত করিলেন। অনেকক্ষণ স্তিমিত নয়নে
রহিলেন। তার পর শুধু বলিলেন,—না...

তার পর অল্প দিকে চাহিয়া মৃদু-কম্পিত স্বরে বলিলেন,
—উনি এত ভালো, এমন সহজ বিশ্বাসে আমার আশ্রয়
দেছেন!...শুধু আশ্রয়? আমাকে রাণীর আসন দেছেন!
উনি যদি সে-কথার বিন্দুগাপ কোনো দিন জানতে
পারেন...উনি বাঁচবেন না! এত ভালোবাসেন...আমার
কথায় সহর ছেড়ে চিরদিন এই সব বুনোর দেশে বনে-
বনেই চাকরির বাবস্থা করে দিন কাটাচ্ছেন! লোক-
জনকে আমি ভয় করি। জানেন জ্ঞান বাবু, হাসি-তামাসার
লোভে মানুষ এমন মত্ত হয় যে, সে হাসি-তামাসায়
অপরের সর্বনাশ হতে পারে, সে কথা সে ভাবে না!...
আমার ভালো লাগে না বলে উনি সমাজ...বন্ধু-বান্ধব...
সব ছেড়ে ভোলা-মহেশ্বরের মতো এই জঙ্গলে-জঙ্গলে
আজ সাত বছর বাস করছেন! কেন আমার সহর ভালো
লাগে না, কেন আমি সমাজ চাই না, সে সম্বন্ধে কখনো
আমায় ছোট-একটি প্রশ্ন করেননি! এ-ত্যাগ, এ-মহেশ্বের
দাম আমি ছাড়া আর-কেউ বুঝবে না! পুরুষ-মানুষ আরো
দেখেছি...এঁকেও দেখছি। স্বামী-স্ত্রীও অনেক দেখেছি...
স্বামীকে আমাদের শাস্ত্রে দেবতা বলে। মনে হয়, শুধু
এঁর মতো স্বামীই দেবতা! সহর থেকে কেউ এলে
আমার ভয় করে জ্ঞান বাবু! মনে হয়, যদি সে-কথা ওঠে?
আমায় ডেকে যদি উনি জিজ্ঞাসা করেন—এ-সব সত্য?
আমি জানি, আমি নির্দোষ। আদালত আমায় শুধু-শুধু
খালাশ ছায়নি। সে-বিন আমি দিইনি। এ-কথা খুব সত্য!
তবু গুর সামনে এ-কথা বলবার সাহস আমার হবে না।

এ-কথায় আমার নভেলিষ্ট-মন মাতিয়া উঠিল। আমি
বলিলাম—আমার কি মনে হয়, জানেন?

—কি?

—আপনি যখন নির্দোষ, তখন সব কথা বলতে কি
কতি?

শাস্তি দেবী যেন শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন—না,

না, মাহুকের মন! আপনি নভেল লেখেন, এ-কথা জানেন তো, কখনো যদি অভিমান-বশে গুর মনে ছোট-একটা প্রশ্ন জাগে, তা হলে আমাদের এ-স্বর্গ ছায়ার মতো মিলিয়ে যাবে!

কহিলাম,—তবু মনে হয়, স্পষ্ট বোঝাপড়া হয়ে গেলে আপনার মনে কোনো দিন আর আতঙ্ক জাগবে না!

—স্বামি-স্বামী মনে যদি কোনো-কিছু গোপন রাখে, তাতে কি ক্ষতি?

বলিলাম,—হুঁ...

কথাটা বলিয়া গল্প-লেখা কাগজগুলো আমি ছিড়িয়া ফেলিলাম।

শান্তি দেবী বলিলেন,—আপনার এ দয়া কোনো দিন ভুলবো না!

সন্ধ্যার পর বজুরা বলিলেন—কাল ভোরেই যাত্রা! কাছে আছে মাজুরা জঙ্গল। সেখানে বাঘ মিলতে পারে। না মেলে, ঐ পথেই দেশের দিকে পুনর্যাত্রা!

সকালে হাতী আসিল। দুটো হাতী।

সান্তাল আমার হাতীতে চড়িয়া বসিলেন, বলিলেন,—চলুন, একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

শান্তি দেবী বিদায়-সম্ভাষণ করিলেন; বলিলেন,—আবার আসবেন জান বাবু। আপনার নতুন বই ছাপা হলে আমাদের কথা মনে করে সে-বই পাঠাবেন।

হাসিয়া সান্তাল সাহেব বলিলেন,—ভি-পি ডাকে?

আমি বলিলাম,—না। উনি আমাকে যে-মঙ্গ দেছেন, ...আমার গুরু!

তার পর যাত্রা।

গাছপালার আড়ালে বাঙলো-বাড়ী মিলাইয়া গেল। তবু ঐ দেখা যায় সবুজ পত্র-পল্লবের ফাঁকে সাদা শাড়ী...পায়ে-পায়ে শান্তি দেবী কত দূর যে আসিলেন!

ঘণ্টা খানেক পরে একটা ধোড়ো আটচালা।

সান্তাল সাহেব বলিলেন,—আমি এইখানে নামি।

কহিলাম,—কি করে বাড়ী ফিরবেন?

কহিলেন,—এটা পুলিশ-ফাঁড়ি। ওদের বাইসিকল আছে। তাতে চড়ে ফিরবো।...নিতান্ত নিকরপায় না হলে শান্তিকে একা রেখে দূরে কোথাও আমি যাই না জান বাবু! বেচারী আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ...এক দিন যে-দুঃখ পেয়েছেন...আপনাকে বলতুম! গুর বেদনার কাহিনী যদি লেখেন! মানে, আমি বিধবা-বিবাহ করেছি। এক দিন স্বামি-হত্যার দায়ে গুঁকে আসামী হতে হয়েছিল—এ-কথা বিশ্বাস করতে পারেন?

চমকিয়া উঠিলাম। কহিলাম,—আপনি সব জানেন?

—জানি। কিন্তু উনি জানেন, আমি সে-কথা জানি না! আমি কোটে যেতুম সে-মকদ্দমা দেখতে! গুর উপর পীড়ন-অত্যাচারের সে-কথা শুনে আমার মন কি ব্যথায় ভরে উঠেছিল! তার পর কত সন্ধান করে গুঁকে গুঁজে পাই!...উনি সে-সব কথা ভুলতে চান, বাস্পাকারে আমিও গুঁকে কিছু বলিনি...বলবার কোনো প্রয়োজন হয়নি। উনি আমায় দেবতা করে তুলেছেন! নিজের অস্তিত্ব রাখেন নি!...যেন আমার ছায়া! বিশ্বাস করতে পারেন, এ যুগের বিদুষী মেয়ে... she lives in me? গুঁকে আমি শুধু ভালোবাসি, তা নয়, শ্রদ্ধা করি! এমন মন আমি কখনো দেখিনি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

স্বর্গ ও মর্ত্য

স্বর্গ যথায়
রয়েছে থাকুক ;
আমি তাহা নাহি চাই ।
আমার যা' কিছু
সকলি হেথায়
সবারে হেথায় পাই ;
এ ধরায় পাই
যারা সুখী হয়—
সুখ যদি হেরে মোর,
যাহারা আমার
ব্যথায় ব্যথিত—
বরণে নয়নলোর ।

হেথা হেরি আমি
পরিচিত যাহা ;
সকলি ধরায় মম—
আপনার জন
সকলে হেথায়—
তুমি আছ, প্রিয়তম ।
স্বর্গ আমার
এই ধরা-বুকে—
পরিচিত পুরাতন,
ধরার ধলায়
স্বদেশ আমার—
আর কিসে প্রয়োজন ?
শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী ব্রহ্মচারী (মহারাজ-কুমারী) ।



আশাপথের শেষে

১

একটুখানি নিস্তক থাকিয়া শাস্তা ডাকিল,—বাবা !

চন্দ্রনাথ চোখ না মেলিয়াই বলিলেন,—হাঁ, মা, আমি তখন যা বলছিলাম, এখনও তাই বলছি। বাপ-মা বুঝতে না পেরে যদি একটা ভুলই ক'রে-বসে, তা হ'লে বুদ্ধিমান ছেলে-মেয়ে কি সে ভুল শুধরিয়ে নেবে না? যদি তা করে, তা হ'লে বাপ-মা অনুতাপ থেকে মুক্তি পায়।

শাস্তা একটু থামিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—ভুল ত তুমি কিছু করোনি বাবা!—আর যদি তা ক'রতেই, সে আলাদা কথা; কিন্তু এ যে শুধরোবার নয়!—ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

চন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—হাঁ মা, ভগবানের কাছে আমার এইটুকুই ব'লবার আছে যে, আমি হাত-পা না বেঁধেই তোকে জলে ফেলে দিয়েছি—অর্থাৎ সাঁতার দিয়ে পার হ'বার উপায় আছে। যদি আমি জেদ ক'রে তার হাতে তোকে সোঁপে দিতাম, তা হ'লে আজ নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই আমাকে মরতে হ'ত! উঃ, এত বড় পাষণ্ড, এমন অকৃতজ্ঞ!—তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রু-রাশির প্লাবনে ঝাপসা হইয়া উঠিল; কটু কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তিনি যেন ব্যথিত হইলেন। ধীরে-ধীরে ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া, পাশ-বালিশটা বুকের আরও কাছে টানিয়া-লইয়া তিনি শাস্তার বহু বার-শ্রুত কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করিলেন; বলিলেন,—কুড়ি বছর আগের কথা, কিন্তু সেই বস্তার প্রচণ্ড গর্জন আজও যেন তেমনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি!—গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—বানের জলে সারা গ্রাম ভেসে গেছে, কোথাও একটু স্থান নেই; ভোরে উঠে জলের কিনারায় গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড আম গাছ উপড়িয়ে প'ড়েছে,—তাতে বেধে আছে একটা তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে; আর বুকে তার

আঁচল জড়িয়ে বাঁধা তিন-চার বছরের একটি ছেলে! অতি কষ্টে টেনে তুলে' দেখি, দু'জনেই জীবিত আছে। ঘরে এনে যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষায় দু'জনেরই চেতনা ফিরে এল। পরিচয় পেলুম, বালিকা হরিহর ঞায়রত্নের মেয়ে, আর শিশুটি নরদেব শাস্ত্রীর ছেলে। উভয় পরিবারের অল্প সকলেই জলে ডুবে মারা গেছে। মেয়েটি ছেলেটিকে হাতের কাছে পেয়ে কোন রকমে নিজের আঁচল দিয়ে বাঁধে। আজীবন অবিবাহিত থেকে অধ্যাপনা করাই ছিল আমার সঙ্কল্প; কিন্তু জীবনের চাকা হঠাৎ ঘুরে গেল। গ্রামস্থ মুকব্বিদের আদেশ হ'ল, মেয়েটি আমাকেই গ্রহণ করতে হ'বে।—চন্দ্রনাথ আবার চুপ করিলেন। স্মৃতির দুঃসহ বেদনায় তিনি যেন কাতর হইয়া পড়িলেন!

শাস্তা পিতার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল,—ও-সব কথা থাক বাবা, তোমার কষ্ট হ'চ্ছে।

চন্দ্রনাথ ঈষৎ কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,—না মা, কষ্ট-টষ্ট কিছু হচ্ছে না। মনে হ'চ্ছে, জল থেকে তুলেছিলাম অমৃত আর গরল—দুই-ই! তোমার মা অসামান্য গুণবতী ছিলেন বটে, কিন্তু রূপেন ছিল তেমনই নিশ্চর্ণ।

পিতার মস্তব্য শুনিয়া একটা অব্যক্ত বেদনার ছায়া শাস্তার চোখে-মুখে প্রতিফলিত হইল; সহসা সে কথা বলিতে পারিল না। অল্পক্ষণ নির্ঝক থাকিয়া সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া অল্পস্বরে বলিল,—নিশ্চর্ণ ত তিনি নন বাবা—তোমার কথাই যে অসঙ্গত হ'য়েছিল। তুমি ত জানতে, বিলেতে যাবার জন্তে তাঁর আগ্রহ ছিল কত বেশী!—আমারই ত মুখের দিকে চেয়ে তুমি তাঁর সেই সঙ্কল্পে বাধা দিয়ে বসলে!

চন্দ্রনাথ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—আমার কথা অসঙ্গত হ'য়েছিল? অন্তায় ক'রেছিলাম আমি? গরীব

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ আমি, আমার কি সাধ্য যে, বিলেতে তার লেখাপড়ার খরচ চালাই? কেন, এ-দেশে থেকে বি-এ পাশ করলে কি শিক্ষা লাভ হয় না?

কৃগকাল নির্ঝাঁক থাকিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,— তার আন্কার হয় ত গ্রাহ্য করতে পারতুম, খরচ-পত্রের ব্যবস্থাও কোন রকমে করা যেতে পারতো; কিন্তু ঐ যে বললে, বিলেত থেকে ফিরে এসে বিয়ে করলেই চলবে,— তার এ প্রস্তাবে আমি নির্ভর করতে পারতুম না; হাঁ, তা বিশ্বাস করা আমার অসাধ্য হ'ল। রূপেন তোর জন্মের পর থেকেই ত জানে—তুই তার বাগদত্তা বধু; তোর মা দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে খেলা দিত, আর ব'লত—বড় হ'লে খুকুর সঙ্গে রূপেনের বিয়ে দেব। তার চিরদিনের এই কামনা, প্রাণতরা আগ্রহ, আকিঞ্চন, সে পাষাণ অনায়াসে অগ্রাহ্য ক'রলে!

অব্যক্ত বেদনায় শাস্তার বুকের ভিতর টন্-টন্ করিতেছিল; সে স্নান মুখে বলিল—চিরদিন কি মানুষের মনের ভাব অপরিবর্তিত থাকে, বাবা!

চন্দ্রনাথ কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—ও-কথা সত্য বটে মা! না হ'লে, যার ওপর এতখানি নির্ভর ক'রে নিশ্চিত ছিলুম, সে কি এমন নিশ্চিত মনে নিরুদ্দেশ-যাত্রা ক'রতে পারতো?—তাঁহার রোগশীর্ণ কপোল বহিয়া অশ্রুর দু'টি ক্ষীণ ধারা ঝরিয়া পড়িল; সে-দিকে শাস্তার তখন দৃষ্টি ছিল না।

২

কয়েক দিন হইতে চন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। কবিরাজ মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিত ভাবে শাস্তার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠী কিছু দিন পূর্বেই বন্ধ হইয়াছিল; তথাপি গ্রামস্থ দুই-এক জন প্রাক্তন ছাত্র রুগ্ন গুরুর সেবা-শুশ্রূষার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। শাস্তা বিনীত ভাবে তাহাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সে বুদ্ধিতে পারিয়াছিল, পিতার জীবন-দীপ নির্ঝাঁকোগ্রস্থ। সেবা উপলক্ষে যাহারা সেখানে থাকিবে, তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবেই; কিন্তু পিতা পরলোকে প্রস্থান করিলে, সেই ঘনিষ্ঠতার ফলে তাহার মনে অশান্তির সঞ্চার হইতে

পারে। সুতরাং যে বিপদ অপরিহার্য, তাহার জন্ত তাহার একাকী প্রস্তুত হওয়াই শ্রেয়ঃ। এই বিপদে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এবং তাহার সহিত স্কন্ধ মিলাইয়া পিতার সেবায় যে তাহাকে সাহায্য করিবে, তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবে বলিয়া তাহার আশা ছিল,— সে আজ এক বৎসর নিরুদ্দিষ্ট!—হৌক্—তথাপি তাহার নির্দিষ্ট স্থান শাস্তা অজ্ঞ কাহাকেও দিতে পারিবে না।

সন্ধ্যা-সমাগমে এক মুঠা ভাত রাখিয়া ঢালিয়া লইয়া, ও তাহা নাকে-মুখে গুঁজিয়া শাস্তা পিতার পাশে আসিয়া বসিল, এবং তাঁহার অস্থিসার দেহের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। সে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। যে সময়টুকু সে এই রোগজীর্ণ কঙ্কালটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারে, ততক্ষণই সে নিরাপদ; তার পর এই বিশাল পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একাকিনী। কোন দিকে তার এতটুকু বন্ধন নাই, স্নেহ-মমতা নাই, কোন আশ্রয় নাই! এই সকল কথা ভাবিতে-ভাবিতে রূপেনের মুখখানি তার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আজ সে যদি এখানে উপস্থিত থাকিত! শাস্তাকে বিবাহ সে নাই-বা করিত, তবু এখানে থাকিলে শাস্তা এমন বিপদে অভয় পাইত, তাহাকে এমন নির্ঝাঁকব, নিরাশ্রয় হইতে হইত না। একখানি সবল বাহু এবং কোমল হৃদয় তাহার সাহায্যের জন্ত উন্মুখ থাকিত। রূপেন তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইলেও নিশ্চয় হইতে পারিত না, সে বিষয়ে শাস্তার সন্দেহ ছিল না। এই সতের বৎসর বয়সে সংসারের সবই তাহার অজ্ঞাত। পাঁচ বৎসর পূর্বে স্নেহময়ী জননী ইহ-লোক হইতে বিদায় লইয়াছেন; এত দিন পিতার পক্ষপটে সে নিরাপদ ছিল। সেই আচ্ছাদন অপসারিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই,—কিন্তু যে-দিন তাহা শাস্তাকে ঝঙ্কা-ঝটিকা-বিক্রুক ও ধূলি-বালুকাসমাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরে নিরাশ্রয় ভাবে ফেলিয়া-রাখিয়া দূরে চলিয়া যাইবে, সে-দিন তাহার জীবনে কি ঘোর বিপদই আসিয়া পড়িবে! জীবনের দুর্গম বন্ধুর পথে তাহার হাত ধরিয়া এক পা আগাইয়া দিবে, সংসারে যে এমন কেহই নাই! জীবন-পথে যে তাহার সহযাত্রী হইবে বলিয়া তাহার আশৈশব বিশ্বাস ছিল, সে নিতান্ত উপেক্ষাতরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছে। তাহার পিতার

সহিত কথাস্তর হওয়ায় যে-দিন সে সংসারে বীতরাগ হইয়া গৃহত্যাগ করে, সে-দিন রূপেনকে স্ট্রটকেসে জামাকাপড় গুছাইতে দেখিয়া শাস্তা সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—জামাকাপড় গুছাচ্ছো যে! কোথায় যাবে?

রূপেন রুক্ষ স্বরে উত্তর দিয়াছিল—পথের ভিখারী যে, পথেই তার স্থান; ঘরে থাকা তার পোষায় না। জলে ডুবেও যখন মরিনি, তখন হঠাৎ মরবার ভয় নেই। যে দিকে ছুঁচক্ষু যায়, সেই দিকেই যাব। যেমন হঠাৎ এক দিন এসেছিলুম, তেমনি হঠাৎ বিদায় হচ্ছি; কোথায়, কেন, তার কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না।

সেই কথা স্মরণ করিয়া শাস্তার চক্ষু দু'টি নিঃশব্দে বিন্দু বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু শাস্তার অন্তরে তাহার মুখখানি স্তব্ধ-রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে—তাহা মুছিবার নয়; আর আছে, এই গৃহে তাহার বিশ বৎসরের কত-শত স্মৃতি-চিহ্ন!

চন্দ্রনাথ ডাকিলেন,—শাস্তা!

ক্ষিপ্ৰ হস্তে সে উদগত অশ্রু-প্রবাহ অঞ্চলে মুছিয়া-ফেলিয়া ভারী গলায় বলিল,—কি বলছ বাবা! জল দেব কি?

চন্দ্রনাথ তাহার কণ্ঠস্বরে রোদনের আভাস পাইয়া মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ রহিলেন; তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—না মা, জল থাক; একটা কথা বলব ভাবছিলুম।

শাস্তা নির্ঝাঁকু ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সে জানে, পিতার বক্তব্যটা কি। তাঁহার নিজের দিন যতই শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই তার অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন।

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—আমাদের দু'জনেরই ভুল হ'য়েছিল—গোড়া থেকেই এ-রকম একটা সঙ্কল্প করা। যাই হোক, বিধাতা যখন তা ভেঙেই দিলেন, তখন এ তাঁর মঙ্গল ইচ্ছাই বলতে হবে।

কণকাল নিঃশব্দে থাকিবার পর তিনি পুনরায় বলিলেন,—আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে সংসারী ক'রে যাব, তা হ'ল না; যাই হোক, মুরারীকে আর তর্ক-তীর্ধকে ব'লে গেলে তারা প্রাণপণে চেষ্টা করবে। তারা সৎপাত্র স্থির করতে পারলে, তুমি তাতে আপত্তি করো না মা!

পিতার কথা শুনিয়া শাস্তার মুখ মৃতের মুখের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। মিনিট-কয়েক পরে সে বলিল,—বাবা, চিরদিন তুমি আর মা যা ব'লে এসেছ, তা কি মিথ্যে হ'য়ে যাবে? আমি যে হিন্দুর মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে বাবা!

চন্দ্রনাথ নির্ঝাঁকু ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সত্যই, শাস্তা তাহার জন্মগত সংস্কার ত্যাগ করিবে কিরূপে? শৈশবাবধি তাঁহারা উভয়ে শাস্তার মনে প্রোথিত যে বীজে জলসেক করিয়া তাহা অঙ্কুরিত এবং আজ মহীরুহে পরিণত করিয়াছেন, এক কথায় তাহা সমূলে উৎপাটিত করা কি সম্ভব?—চন্দ্রনাথ কিছু কাল নির্ঝাঁকু থাকিয়া বলিলেন,—এই কি মা তোমার শেষ কথা?

শাস্তা দৃষ্টি নত করিয়া সিন্ধু কণ্ঠে বলিল,—সেই আশীর্বাদই করো বাবা!

মিনিট-পনের পরে চন্দ্রনাথ বলিলেন,—তাই যদি হয় মা, তা হ'লে একটা কাজ করব।—বলিয়া কণকাল কণ্ঠার মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া-থাকিয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন,—ব্যাক্ষে যে ছ' হাজার টাকা গচ্ছিত আছে, ওটা তাকেই দিয়ে যাব।...তার জন্মেই ওটা অনেক কষ্টে সঞ্চয় ক'রেছিলুম।...সে আমার ভুলেছে, কিন্তু আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছি নে—পারলে বোধ হয় শাস্তি পেতুম। তা এ সম্বন্ধে তুই কি বলিস?

শাস্তা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল,—এখনি, এখনি বাবা! টাকাগুলো তাঁকেই দাও। আমি তা নিয়ে কি করব?—বলিতে বলিতে দুঃসহ বেদনায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।—অশ্রু রোধ করা অসাধ্য হওয়ায় ব্যথিতা বালিকা পিতার বুকের পাশে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার চোখের জলে চন্দ্রনাথের উপাধান সিন্ধু হইল; তিনি ভগ্ন স্বরে বলিলেন—চূপ কর মা! কাঁদিসনি; সে ফিরে আসবে,—নিশ্চয় ফিরে আসবে। আমার উমা মায়ের তপস্বী কখন কি বিফল হ'তে পারে?

০

চন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্ম-শাস্তি শেষ হইলে হিতৈষী প্রতিবেশীরা শাস্তার তবিদ্যৎ চিন্তায়

অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। মুখ্যজ্যে-গৃহিণী এক দিন স্নানের ঘাটে আসিয়া শাস্তাকে স্নান করিতে দেখিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ না শাস্তি, শুনিছ তোর বাপ তার টাকা-গুলো সবই না কি সেই হাভাতে ছোঁড়াটাকে দান ক'রে গেছে ?

শাস্তা নিম্ন স্বরে বলিল,—হ্যাঁ, দিয়েছেন।

মুখ্যজ্যে-গিন্নী বলিলেন—দিয়ে গেছে, সত্যি তা হ'লে ? এমন বোকামিও কেউ করে ? তা—লেখাপড়া কিছু ক'রে গেছে, না মুখে-মুখে ? লেখাপড়া ক'রে দিয়ে থাকলে আর কোন উপায় নেই ; নইলে ও-কথা চেপে যাওয়াই ভাল। কি বলিস ?

শাস্তা বলিল,—লেখাপড়া কিছু ক'রে যাননি ঠাকুমা, কিন্তু তাতে ক্ষতি কি ? টাকাটা তো আমার বাবার, আমার যখন তাঁর ইচ্ছে জানিয়ে গেছেন, তখন তা না দেব কেন ?

মুখ্যজ্যে-গৃহিণী রুদ্ধ স্বরে বলিলেন,—বুড়ো বয়েসে তোমার বাবার ভীমরথি হ'য়েছিল ! বলি, তোমার থাকবে কি, সেটা শুনি ? শুনিছ, ঐ না কি তাঁর যথা-সকলি !

শাস্তা বলিল,—ঠিকই শুনেছেন ঠাকুমা ! তবু ষাঁর টাকা, তাঁর ইচ্ছেমত দিতে হবে ত !

মুখ্যজ্যে-গিন্নী এ-কথা শুনিয়া গর্জন করিয়া বলিলেন,—আ-মর ছুঁড়ী, আকেলখাকী, তোর বাপের সকলি তাকে দিয়ে কি শেষে আমড়া চুষবি ? মা-বাপ ত স্নানের স্বপন ঢেরই দেখেছিল, বর হবে রাজপুতুর, দরোজায় হাতী বাধা থাকবে, আরও কতো কি ! হ'ল ত সবই ; এখন হাতের-পাতের সকলি খুইয়ে শুকিয়ে মরতে সাধ গেছে বুঝি ?

শাস্তা স্নান হাসিয়া চূপ করিয়া রহিল। পল্লীর সর্ব-সাধারণের ঠান্দিদি লক্ষ্মীঠাকরুণ বলিলেন,—হ্যাঁ না ছুঁড়ি ! শুনিছ, তুই না কি ছেরটা কাল আইবুড়ো থাকতে চা'স ? গুজোবটা কি সত্যি ?

ঘাটের বৈঠকে সমাগতা ছোট-বড় সকলেরই চক্ষু অসংবরণীয় কৌতুকে বিস্ফারিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। খাসা মজার খবর বটে !

শাস্তা নত মুখে থাকিলেও তাহার মনে হইল,

পল্লীবাসিনী বহু রমণীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার মত বিধিতেছে ! সে মুখ তুলিয়া চকিত দৃষ্টিতে একবার চারি দিকে চাহিল ; তাহার পর অমুচ্চ স্বরে বলিল,—সত্যি কথাই শুনেছ ঠান্দি ! তা' যার যেমন বরাত ! তোমারও প্রায় সেই দশাই নয় কি ?

বৃদ্ধা কর্কশ স্বরে বলিলেন,—না লো, তা নয় ! প্রজাপতির ইচ্ছেয় গলায় মালা ত উঠেছিল, সে খবর রাখিস ? ঘর নাই-বা করলুম, চার হাত তো এক হ'য়েছিল।

শাস্তা এবার দুষ্ট হাসি হাসিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না ; হাসিয়া বলিল,—ওঃ, ভারী ত বিয়ে ! বিয়ের রাত ছাড়া বরের মুখই ত দেখনি ঠান্দি ! আর শুনিছ, তোমার দিদির না কি বিয়েই হয়নি। কথায় বলে, 'বড় থাকতে ছোটোর বিয়ে, মেজো ভাবে গালে হাত দিয়ে', তোমাদের তাই !

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সগর্বে বলিলেন,—নাই-বা হ'ল বিয়ে, কুলীনের ঘরে অমন মেয়ে কত র'য়েছে। অ-ঘরে ত আর কাজ করতে পারে না। তুই ছোস্তিরী বামুনের মেয়ে, তুই আয়বুড়ো থাকবি কোন্ হুঃখে লা ?

শাস্তা বলিল,—শ্রোত্রীয় বামুনের সব মেয়েই ভাগ্য-বতী, আর কুলীনের মেয়ে হ'লেই হবে হুঃখিনী, এমন কি কথা ঠান্দি ! বরাত কি কেউ বদলাতে পারে ?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শাস্তা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সে পলাইতে পারিলে বাঁচে।

সে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, জ্ঞাতিকাকা মুরারী ঠাকুর বারান্দায় বসিয়া আছেন। শাস্তা তাঁহাকে বসিবার আসন দিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া-আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলে, মুরারী বলিলেন,—উকিল বাবু ব'লছিলেন, তোমার বাবার ইচ্ছেমত ও-টাকাটা তুমি রূপেন বাবাজীকেই দেবে ?—না, মত পরিবর্তন ক'রেছ ?

শাস্তার মুখে বেদনার ছায়া পড়িল ; সে মৃদু স্বরে বলিল,—না কাকা, মত পরিবর্তনের কারণ নেই ; বাবার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। কিন্তু তিনি ত নিরুদ্দেশ, টাকা দেওয়া হবে কি ক'রে ?

মুরারী বলিলেন,—চেষ্টা করতে হবে—যাতে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। চন্দ্রদা' অভিমান ক'রে রইলেন,

কিন্তু সে অভিমানের মর্যাদা রাখবে কে? ‘পরের ছেলে খায়, আর বন পানে ধায়।’ হিঃ, কি অকৃতজ্ঞ!

অপরাধী সে সত্য, কিন্তু সে কথার আলোচনা শাস্তার সহ হইল না, সে বাধা দিয়া বলিল,—কি করবেন কাকা?

মুরারী বলিলেন,—বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখি, একখানা ইংরেজী আর একখানা বাংলা কাগজে; চোখে তার পড়বেই।

শাস্তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে বলিল,—তবে তাই করুন। এত দিন বিজ্ঞাপন দিলে হয় ত এসে পড়তে পারতেন।

মুরারী ক্ষণকাল নিস্তরু থাকিয়া বলিলেন,—তা হয় ত পারত; কিন্তু এমনও ত হতে পারে, সে কোথাও চাকরী-বাকরী পেয়ে সংসার পেতে ব’সেছে।

শাস্তার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল, পাঞ্জুর মুখখানি সে অবনত করিল; তাহার পর শুকস্বরে বলিল,—তা হ’লেই বা কি? ও ত বাবার দান—কোন সর্ভ নেই ত। তিনি যেখানে থাকুন, এসে টাকাটা নিয়ে গেলেই আমি বাবার কাছে যে সত্য-বন্দী আছি, তা থেকে মুক্তি পাব।

মুরারী স্তব্ধ-বিশ্বয়ে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—তাই দেব মা, দেখি চেষ্টা ক’রে। রোজই শ্রীধরকে তুলসী দিচ্ছি, সে কি বৃথা হবে?

মুরারী চলিয়া গেলে শাস্তা শূন্য-মনে উঠানের পার্শ্বস্থ ফুল-বাগানের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে রূপেনের হস্ত-রোপিত নানা জাতীয় গোলাপের গাছ আছে। একটা ব্ল্যাক-প্রিন্স গাছে গোটা-ছই ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া সে নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। এই গাছটির একটি ফুলের জন্ত রূপেনের কি আকিঞ্চন ছিল! তখন ইহাতে ফুল ফুটিত না, এখন ফুটিয়াছে, কিন্তু আকিঞ্চন করিবার ব্যক্তি এখানে নাই! শাস্তা ফুল দু’টি তুলিয়া লইল। ঘরে রূপেনের একখানি প্রতিকৃতি ছিল, তাহার পায়ের দিকে একটি স্ততার বন্ধনী দেওয়া;—দেখিলেই বুঝা যায়, সেখানে নিত্য ফুল দিয়া সাজান থাকে;—ফুল দু’টি স্ততায় আটকাইয়া শাস্তা ছবির দিকে স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

সহসা বাহিরে গীতধ্বনি হইল। সে কান পাতিয়া শুনিল,—বৈষ্ণবী খঞ্জনী বাজাইয়া গায়িতেছিল,—

“রাই, যার তরে নিলে কলঙ্কিনী নাম—

বিধির নির্বন্ধে সে বা হৈল বাম,

চন্দ্রাবলীর কুণ্ডে দেখে এমু হায়!

রাধিকা-রঞ্জন ধরে তার পায়—

এমনি বিধির বিপাক হৈল হে।—”

শাস্তা সরিয়া আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল; তাহার অশ্রুসিক্ত শুক মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সকলেই যেন আজ তাহাকে কঠোর ভাবে জানাইয়া দিতে চায়—রূপেন তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু শাস্তার আশাতরু শুক হয় নাই। তথাপি আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায় ও নিঃস্ব মনে করিয়া শাস্তা সেইখানেই বসিয়া ছই জাহ্নুর মধ্যে মুখ-শুঁজিয়া বুকভাঙ্গা বেদনায় গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৪

যুক্তপ্রদেশের কোনও অখ্যাত নগরে একটি দ্বিতল অট্টালিকার নিভৃত কক্ষে রূপেন্দ্র শুইয়া ছিল। আজ চার-পাঁচ দিন হইতে তাহার জ্বর। স্থানীয় স্কুলে সে মাষ্টারী করে। বেতন প্রায় শতাবধি টাকা। বাড়ীখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটি ভৃত্য মাত্র রূপেনের সংসারের কর্ণধার।

বর্ষা কাল। সকাল হইতে টিপ্-টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; এখন জোরে চাপিয়া আসিল। পূর্ব দিকের খোলা জানালা দিয়া বৃষ্টির ঝাপটায় মেঝের অনেকটা ভিজিয়া যাইতেছে দেখিয়া রূপেন অগত্যা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল, এবং জানালাটা বন্ধ করিয়া একখানা চাদর গায়ে জড়াইয়া আবার শুইয়া পড়িল। যুক্ত-দ্বারের বাহিরে বৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে তাহার মনে পড়িল—বাজালার বৃষ্টিপ্লাবিত পল্লীর রূপ, সেই সঙ্গে কত অতীত স্মৃতি! মনে জাগিয়া উঠিল—কি তার বিচিত্র জীবন! মা ছিলেন—গর্ভধারিণী না হইয়াও অপূর্ব স্নেহময়ী। পিতা প্রতিপালক মাত্র, তথাপি জন্মদাতা অপেক্ষাও স্নেহময়। আর শাস্তা?—রূপেনের বুকের ভিতরটা ধড়-ফড় করিয়া ওঠে, সারা অন্তর বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কি মধুর, নম্র

বিনীত দেবীর মত স্বভাব তার! কি অগাধ, কত গভীর প্রেম তার বুকে; অথচ কত ভীক সে প্রেম,—কখনও আত্মবিকাশের চেষ্টা মাত্র করে নাই! একবার মাত্র সে সংযম হারাইয়া রূপেনের কাছে ধরা দিয়াছিল; যে-দিন সে চলিয়া আসে, সেই দিন সে কথা শুনিয়া শাস্তা তাহার জামুর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল; ব্যাকুল রোদনের সহিত মিনতি করিয়া বালিয়াছিল,—রাগ ক’রে চ’লে যেয়ো না গো! একটু—একটু দয়া করো এ অভাগীকে—!

রূপেন জানিত, সে তাহার বাগদত্তা, তথাপি চিরস্নেহ-মধুরা শাস্তার কাতর মিনতিতে সে কর্ণপাত করে নাই,—বিলাত যাইবার জন্ত ব্যাকুলতা তাহাকে এতই অভিভূত করিয়াছিল। শাস্তার মুখখানি তাহার মনশ্চক্রে ভাসিয়া উঠিল। হয় ত মনোকষ্টে সে শুকাইয়া গিয়াছে; কাঁদিয়া-কাঁদিয়া অশ্রুখে পড়িয়াছে, এবং ব্যাকুল হৃদয়ে তাহার আশাপথ চাহিয়া আছে!...

রূপেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তাহার ইচ্ছা, সে ফিরিয়া যায়; কিন্তু পারে না, লজ্জা বাধা দেয়। ফিরিয়া গেলে দেশের লোক কি বলিবে? সকলে টিটকারী দিয়া হাসিতে থাকিবে; সে যে মৃত্যুর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি! যদি ফিরিয়া যায়, শাস্তা কি করিবে? রূপেন চক্ষু মুদিত করিল; মনে হইল, শাস্তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। বেদনায় তাহার বুকের ভিতরটা টন-টন করিতে লাগিল।

“বাবুজী পার্কেল আয়া”—ভৃত্যের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

রূপেন চোখ মেলিয়া চাহিল; দেখিল, ডাকের একটা পার্কেল লইয়া ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। কাশীতে সে এক-খানি রেশমী চাদর পাঠাইতে লিখিয়াছিল, তাহাই ডাকে আসিয়াছে। রসিদ সহি করিয়া, পার্কেল খুলিয়া সে কাপড়গুলি বাহির করিল, এবং নাড়িয়া-চাড়িয়া বিছানার এক পাশে রাখিয়া পূর্ববৎ শুইয়া পড়িল। অতীতের স্মৃতি তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। অগ্রমনস্ক ভাবে প্যাকিং-কাগজের মোড়কটার দিকে কয়েক মিনিট চাহিয়া-থাকিয়া হঠাৎ সে পাগলের মত ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং মোড়কের কাগজখানা টানিয়া লইল; তাহা কোন বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা। তাহাতে

প্রকাশিত যে বিজ্ঞাপনটি তাহার চোখে পড়িয়াছিল, তাহা এই:—“নিরুদ্ধিষ্ট রূপেননাথ মুখোপাধ্যায়—এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি, আমার পিতৃদেব ৮চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মৃত্যুকালে আপনাকে ছয় হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। আপনার বর্তমান ঠিকানা জানিতে না পারায় উক্ত টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি। আপনি স্বয়ং আসিয়া লইলে, অথবা উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ পত্র লিখিলে ঐ টাকা আপনাকে দেওয়া হইবে, ইতি।—শ্রীমতী শাস্তা দেবী, গ্রাম—বড় নাজানিপুর, পোঃ—কাথুলি, জিলা—নদীয়া।” রূপেনের অবশ হস্ত হইতে কাগজখানা খসিয়া পড়িল; সে অক্ষুট কাতরোক্তি করিয়া বালিসের উপর ছম্‌ড়ি-খাইয়া পড়িল। মনে হইল, তাহার হৃৎপিণ্ডে সহস্র শেল বিদ্ধ হইয়াছে!

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সে মুখ তুলিল, বর্ষণ-ধূসর মেঘের মতই তাহা পাণ্ডুর। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, পরম নির্ভাবানু চন্দ্রনাথ যে শাস্তাকে অগ্র পাত্রের সম্প্রদান করেন নাই, তাহা যেন রূপেন স্থিরই জানিত। আজ সে একা, এই বিশাল পৃথিবীতে একেবারে নিরবলম্ব, সম্পূর্ণ রিক্ত, এবং নিরীকব! রূপেনের চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতে লাগিল। কেন সে চলিয়া আসিয়াছিল? যিনি তাহাকে নিশ্চিত-মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া আশৈশব সন্তান-বৎ স্নেহে প্রতিপালন করিলেন; তাঁহার অন্তিম কালে সে তাঁহাকে মর্শ্বেদী চিন্তা হইতে কেন মুক্ত করিল না? শাস্তার ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি কি পরলোকেই শাস্তিতে আছেন?

মন কিঞ্চিৎ সংযত হইলে রূপেন কাগজটার তারিখ দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু প্যাকিং-কাগজের সেই অংশটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত দুই-একটি টেলিগ্রামের তারিখ দেখিয়া তাহার মনে হইল, প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বের বিজ্ঞাপন।

রূপেন জামুর উপর ললাট রাখিয়া ভাবিতে লাগিল,—এখন সে কি করিবে? শাস্তাকে পত্র দিবে কি?—কিন্তু—কিন্তু, না। বিজ্ঞাপনে টাকার উল্লেখ না থাকিলে তাহার পক্ষে তাহা সহজ হইত; এখন সে কুঠা বোধ করিতে লাগিল। সে বহুকণ ভাবিয়াও ভাবনার কুল-কিনারা পাইল না; শেষে স্থির করিল, ছুটি লইয়া সে গৃহে ফিরিবে,

এবং যদি শাস্তার বিবাহ হইয়া থাকে, তবে টাকাগুলি তাহাকে যৌতুক দিবে; আর বিবাহ না হইয়া থাকিলে, শাস্তা ত তাহারই। নিরুদ্ভিতার ফলে সে এক জনকে হারাইয়াছে, সে ক্ষতি তাহার সহিয়াছে; কিন্তু শাস্তাকে হারাইবার ক্ষতি তাহার সহিবে না। হাঁ, সে যাইবে, সে নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরিবে।

৫

আসন পাতিয়া দিয়া শাস্তা দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। আগন্তুক সম্পর্কে শাস্তার পিসে মশায়। তিনি বিনা-ভূমিকায় বলিলেন,—দেখ মা, চন্দর ভায়ার লোকান্তরের পর ত প্রায় দেড় বছর কাটলো; রূপেনের কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ারও কিছু কল্প হইনি। এত দিনের মধ্যে একটা বিজ্ঞাপনও কি তার চোখে পড়েনি?...আমার ত মনে হয়, সে ইচ্ছা ক'রেই উপেক্ষা ক'রছে।

শাস্তা পায়ের নখ খুঁটিতেছিল; মুহূর্তে বলিল,—কিন্তু ওতে আপত্তির কিছু নেই ত। টাকা নিতে উপেক্ষার কি কারণ থাকতে পারে?

বুদ্ধ রামনাথ তর্কতীর্থ একটু ভাবিয়া বলিলেন,—তবে, ঈশ্বর না করুন, এমনও হ'তে পারে, সে—হয় ত—হয় ত পৃথিবীতে নেই।

শাস্তা যেন হঠাৎ বর্ষার একটা খোঁচা খাইল, এমনই চমকিয়া উঠিল; একবার বুদ্ধের মুখপানে চাহিয়া দৃষ্টি অবনত করিল। তাহার শত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া অশ্রু-রাশি দর-দর ধারায় ঝরিতে লাগিল।

রামনাথ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া শেষে বিব্রত ভাবে বলিলেন,—মা, বুড়ো ছেলের ভীমরথি হ'য়েছে, মার্জনা ক'রতে হবে। কি ব'লতে কি ব'লে ফেলেছি। কাণ্ডিকের মত স্বাস্থ্যবান ছেলে সে, ভগবান্ তাকে কুশলেই রাখুন।—একটুখানি খামিয়া বলিলেন,—আজ আসি মা, আবার আসব।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে, শাস্তা শ্রুণাম করিয়া বলিল—মাঝে মাঝে আসবেন, পিসে মশায়! বড্ডই একা থাকি।

তর্কতীর্থ ব্যথিত নেত্রে সর্কহারা এই তরুণী তাপসীব দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সপ্তাহান্তে তর্কতীর্থ মহাশয় পুনরায় আসিলেন; দুই-চারিটা অবাস্তর কথা পর বলিলেন,—উকিল বাবু বলছিলেন, এত দিনেও রূপেন বাবাজীর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না, আর চন্দ্রনাথ ভায়ার লিখিত কোন দানপত্রও নেই; তখন ও-টাকার জন্তে তুমি অনর্থক ব্যস্ত হইয়ো না।

শাস্তা নিস্পৃহ স্বরে বলিল,—বাবার মুখের কথাই আমার কাছে লিখিত দানপত্রের অধিক। তা ছাড়া, টাকা নিয়ে আমিই বা কি করব, পিসে মশায়?

তর্কতীর্থ একটু কাশিয়া গলাটা ঝাড়িয়া বলিলেন,—তা বললে ত চলবে না মা, টাকার দরকার যাতে হয়, তাই ক'রতে হবে। তোমায় সংসারী হতে হবে। ও-টাকাটা তোমারই।

শাস্তা এ-কথায় একটুও বিস্মিত হইল না, সে যেন এ জন্ত প্রস্তুতই ছিল; ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল,—আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, দত্তাপহারী হ'তে বলেন আমার?

তর্কতীর্থের মুখে কথা আটকাইতেছিল; তথাপি তিনি বলিলেন,—মা, তোমার বাবা যখন এ-দানের কথাটার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁর জ্ঞানটা একটু বিকারাচ্ছন্নই ছিল ব'লতে হয়। তাই ও-দান সিদ্ধ নয়।

শাস্তা মাথা হেঁট করিয়া রহিল; কথাটা উচ্চারণ করিতে সঙ্কোচ হইতেছিল, তথাপি সঙ্কোচ বশতঃ তাহার নীরব থাকিবার উপায় ছিল না; তাই অমুচ্চ স্বরে বলিল,—কিন্তু আমাকে?...আমাকে ত পূর্ণজ্ঞানেই তিনি দান ক'রতে চেয়েছিলেন। আপনারা ত সবই জানেন।

তর্কতীর্থ গভীর নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিলেন,—সে কথা আর কেন তুলছ মা? তা' ছাড়া ও-প্রাচীন রীতি, সবটা কি এ-যুগে চলে?—ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন,—নরেশ ব'লছিল, টাকা সে চায় না, তোমার সম্পত্তিতে তার লোভ নেই; তবে সে চন্দ্রনাথ ভায়ার ছাত্র, তাঁর মেয়ে তুমি,—সে তোমাকে বিবাহ করতে চায়। সম্পত্তি তার স্ত্রী-বিয়োগ হ'য়েছে। নরেশ যে-সে ছেলে নয় মা! বিজ্ঞা-বারিধি উপাধি পেয়েছে; তার উপর সংস্কৃত নিয়ে এম-এ পাশ ক'রেছে। অতি অমায়িক ছেলে,—তোমার বাবার ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র সে।

শাস্তা মুহূর্তে কাল জাহুর উপর ললাট রাখিয়া বসিয়া

ধাকিবার পর মুখ তুলিল; পাংশু-মুখে বলিল,—তিনি আমার বাবার ছাত্র, আমার বড় ভাই;—তাকে বলবেন, এ-কাজ হয় না। তা ছাড়া, পণ্ডিত লোক হ'য়ে তিনি অন্তর্পুরী কণ্ঠা নিতে চান কি ক'রে?

তর্কতীর্থ বলিলেন,—বলনুম ত মা, সমস্ত প্রাচীন রীতি চলে না, এ-ও যেমন হয় না। তা বেশ ত, নরেশকে বিবাহে আপত্তি থাকে, পাত্রাভাব হবে কি?

শান্তা নিয় স্বরে বলিল,—না হ'লেই কি চলবে না পিসে মশায়?

তর্কতীর্থ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—না মা, তা চলে না। যৌবনে স্বামী ব্যতীত স্ত্রীলোকের অণু আশ্রয় নেই।

শান্তা মুখ তুলিতে গেল, পারিল না; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—যদি অন্য রকম হ'ত পিসে মশায়! আপনি কি এ-কথা মুখে আনতে পারতেন? যৌবনে যারা বিধবা হয়?

তর্কতীর্থ কাণে হাত দিয়া বলিলেন,—দুর্গা, দুর্গা! ছি মা, ও-কথা মুখে এনো না। কি জান মা, তুমি মেয়ে, তোমায় বলাও শক্ত;—কি জান মা, বিধবা সাধারণতঃ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, কামনা তাঁকে বড় একটা কেউ করে না। ঐ বৈধব্য-বেশের মধ্যেই সে গণ্ডীটুকু দাগ দেওয়া থাকে,—কিন্তু কুমারী তা নয়—

শান্তা বাধা দিয়া বলিল,—তাই যদি হয় পিসে মশায়, তবে তাই হোক—বলিয়া শান্তা চক্ষুর নিমেষে হাতের চুড়ীগুলি টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, এবং ক্ষিপ্ত হস্তে পরণের সাদীখানার পাড় একটির পর অণুটি তাড়াতাড়ি ছিঁড়িতে লাগিল।

তর্কতীর্থ 'কর কি, কর কি' বলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—পাগল হ'লে না কি? এ-রকম অলক্ষণের কাজ ক'রতে আছে?

শান্তা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—না পিসে মশায়, আর নয়। নিরামিষ খাই, এই সাদীখানা আর চুড়ী ক'গাছার জন্তে নিত্য এ-সব কথা শুনেতে ভাল লাগে না। বাবা আমার নিষ্ঠাবান্ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন,—মা আমার যেন সাক্ষাৎ অন্তর্পুরী ছিলেন; তাঁদের মেয়ে আমি আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের রুচির অনুসরণ ক'রে আমার পিতৃ-পিতামহের আদর্শের অসম্মান করতে পারব না।

মা বাবা বাগদান ক'রে গেছেন, আমার ক্ষমতা নেই, তা খণ্ডন করি।—তাহার আর্দ্র কণ্ঠ নীরব হইল।

রামনাথ সজল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৬

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়; শান্তা তুলসীমঞ্চের কপাল রাখিয়া বসিয়া-বসিয়া কাঁদিতেছিল। অব্যক্ত ক্রোধে ও বেদনার তাহার বুকখানা যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। আত্মগ্লানিতে তাহার সারা অন্তর গভীর আর্দ্রনাদ করিতেছিল। স্বহস্তে সে নিজের এমন অকল্যাণ কামনা করিল! রূপেন যেখানেই থাক, সে কুশলে থাক, দীর্ঘায়ু হোক, সামান্য মানুষের কথা সহ্য করিতে না পারিয়া সে কোঁকের মাথায় আপনাকে কঠোরতম অভিসম্পাতে বিড়ম্বিত করিল! নিজের রিক্ত মণিবন্ধ ও শুভ্র বস্ত্রের পানে চাহিয়া সে ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

গৃহে এমন একটি প্রাণী নাই যে, তাহাকে একটি সাস্বনার কথা বলে, কিম্বা চোখের জল মুছায়। শান্তা আজ এতই অশ্রমনস্ক যে, পিসে মশায় চলিয়া যাইবার পর সদর দরজা বন্ধ করিবার কথা তাহার স্মরণ ছিল না। তাহা খোলা পড়িয়া ছিল।

* * * * *

সদর দরজার ভিতর জিনিসপত্রগুলো টানিয়া আনিয়া খিল বন্ধ করিয়া রূপেন ভিতরের দিকে চলিল; চারি দিকে পালক-পিতা ও পালয়িত্রী মাতার শত স্মৃতি-চিহ্ন চোখে পড়িয়া তাহার মনকে বিলাস্ত করিয়া তুলিল। ভিতরের প্রাঙ্গণে পা রাখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বিধবা শান্তা! জগদীশ্বর! ইহাই দেখিবার জন্ত কি সে শত-শত ক্রোশ দূর হইতে ছুটিয়া আসিল? এই দেড় বৎসরের মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়াছে, বিধবাও হইয়াছে! অপ্রস্তুতি কুমুম-কলিকা বিকাশের অবসর পাইল না, আতপ-তাপে বলসিয়া গেল! বিধবা পিতৃহীনা শান্তা ভুলুগ্ধিতা হইয়া কাঁদিতেছে; তাহাকে সাহসনা দিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত রূপেনের নাই! কি বলিবে সে? কি তাহার বলিবার আছে? সকল বিলাটের মূল ত সে নিজেই! বিধবা পরস্ত্রীকে সন্মোদনের ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না; পলকহীন বিস্ফারিত চক্ষুতে শান্তার দিকে চাহিয়া সে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শাস্তা নিজেই এক সময় এ-দিকে চাহিল, রূপেনকে দেখিয়া, সে যেন ভূত দেখিল, এই ভাবে চমকিয়া উঠিল ; কিন্তু ভয় পাইল না। মৃত-জ্ঞানেই সে তাহার দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল,—তবে কি সত্যিই তুমি নেই ? আমি আজ সব খুলে ফেলেছি,—আমার চোখের জল কি সহ্য করতে না পেরে তুমি এসেছ ? যদি এসেছ, তবে নাও—ওগো, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। আমি আর তোমায় ছেড়ে থাকব না।—তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

এতকণ্ঠে রূপেন কতকটা বুঝিতে পারিল।—সে ক্ষিপ্ত পদে শাস্তার নিকটে যাইতে-যাইতে বলিল,—হাঁ, এসেছি। কিন্তু ভূত হয়ে নয়, যেমন ছিলুম তেমনিই। আমি মরে গেছি, কে তোমায় এ খবর দিলে ?—বলিতে-বলিতে সে শাস্তার কাছে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,—দেখ দেখি, এ কি ভূতের হাত ?

শাস্তা হতবুদ্ধির মত তাহার মুখের দিকে অর্ধহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কাঁপিতে-কাঁপিতে হেলিয়া পড়িল। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

রূপেন তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া-ফেলিয়া কোলের উপর টানিয়া লইল ; পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহার মুখে বাতাস দিতে লাগিল ; অমুচ্চ স্বরে বলিল,—বিধবা-বেশ দেখে যে ধোঁকা লাগছে ! এ কি আমি নিজে মরেছি, না আর কেউ ?

মিনিট চার-পাঁচ পরে শাস্তা চোখ মেলিয়া চাহিল ; সে যেন স্তম্ভস্বপ্ন দেখিয়া জাগিল, এমনই প্রকৃত মুখ ! রূপেনের চোখের উপর তাহার গভীর দৃষ্টি অচঞ্চল, চাহিয়া-চাহিয়া যেন ‘নয়ন না তিরপিত ভেল !’ রূপেনও তাহার গালের জলবিন্দুগুলি রুমালে মুছাইয়া দিয়া বলিল,—এখন বিশ্বাস হচ্ছে, আমি ভূত নই ? দেখছ, আমার গা কেমন গরম।...কে তোমায় খবর দিলে—আমি মরেছি ? এ বেশ কেন তোমার ?

শাস্তার মুখে সলজ্জ হাসি দেখা দিল ; উঠিয়া বসিতে-বসিতে মৃদু কণ্ঠে বলিল,—নিরুপায় হ’য়েই আজ এ বেশ করেছি, নইলে আর ঘরে-বাইরে টিকতে পাচ্ছিলুম না যে !

রূপেন বলিল,—সন্দেহ কাটিয়ে দাও, আমি মরেছি বলেই ত এ বৈধব্য বেশ ? এর মধ্যে আর কেউ নেই ত ?

শাস্তা রূপেনের জাহুর উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুট স্বরে বলিল,—তোমার আশাপথ চেয়ে শেবে—না, আমি কুমারী—”

—তাই বলো, দেহে প্রাণ এলো !—বলিয়া রূপেন তাহার মাথাটি বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল,—কথা পরে হবে, আগে তুমি হাতে ক’গাছা চুড়ী, আর একখানা সাড়ী পরে এসো। তোমার পানে আমি যে চাইতে পাচ্ছি নে—শাস্তা !

শ্রীমায়াদেবী বহু।

প্রিয়া

প্রিয়া, তুমি স্নন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায়।

তোমারে হেরিয়া অরূপ চমক দোহুল দিতেছে কায়।

শেফালির বাস জোছনার হাসি

তোমার নিশ্বাসে বয়ানেতে ভাসি

কতই স্নন্দর মাধুরী বিকাশি উঠিছে ফুটিয়া হায়।

প্রিয়া, তুমি স্নন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায়।

বাসন্তী উবার অরুণিত আভা

হৃদয়ে বলকি উঠিতেছে প্রভা ;

নিদাঘ কালের বলসিত বিভা নাহিক তোমারি ছায়।

প্রিয়া, তুমি স্নন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায়।

করুণাকিঙ্কর বিনয় মহিমা

আশ্রয়ে লাগ্ত তব দয়া ধৃতি কমা

তোমাতেই শুধু তাদের উপমা—তোমাতে পেয়েছে কায়।

প্রিয়া, তুমি স্নন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায়।

সাওন বাদল ঝর-ঝর ধারা

ভেঙ্গে দেয় যবে বিয়হের কারা

তোমায় হৃদয় উপস্থিত্রে ওঠে মৃদল মধুরতায়।

প্রিয়া, তুমি স্নন্দরী নব মঞ্জরী স্নিগ্ধ-শীকর বায় ॥

ডক্টর কবিরাজ।



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অদ্বৈত-বেদান্ত



[পূর্বামুত্ত]

মায়া ব্রহ্মের তিরস্করণী, অথচ ব্রহ্মই ইহার আশ্রয়, পক্ষান্তরে এই মায়াই জগজ্জননী মহামায়া—এই জন্তাই ইহাকে গীতার ভাষায় “দৈবী” মায়া বলা হইয়াছে। অন্ধকার যেমন যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই গৃহকেই আবৃত করে, সেইরূপ দৈবী মায়াও যেই আত্মাকে আশ্রয় করে, সেই আত্মাকেই আবৃত করে। ইহাই মায়ার আবরণশক্তি, আর যে শক্তি প্রভাবে মায়া জগৎ সৃষ্টি করে, জগৎ-প্রসবিনী সে শক্তিই মায়ার বিকল্প শক্তি। এই শক্তিঘরের প্রভাবেই মায়া জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিচিত্র বিশ্বনাটকের অভিনয় করিতেছে—ব্রহ্ম মূর্ত্তি জীবকে মুখ-দুঃখের কাঙ্গাল সাজাইয়া কত হাসাইতেছে, কত কান্দাইতেছে। এই মায়ার খেলা যখন সাজ হয়, জ্ঞানের আলোকে যখন অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হয়, তখন ব্রহ্ম-বিতাব জীব ও জগৎ তিরোহিত হয়, সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া উঠে, ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’—এই বুদ্ধিই স্থির হয়।

সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—এই বিবেক-জ্ঞানই গীতায় “ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে”, “ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি” প্রভৃতি উক্তি দ্বারা সূচিত হইয়াছে। মায়া ও অজ্ঞান শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, অবিद्या শব্দের প্রয়োগ গীতায় পাওয়া যায় না। তার পর এই মায়া ও অবিद्याকে অনির্বাচনীয় (সদসদভ্যামনির্বাচ্যা) বলিয়া যে অদ্বৈত-বেদান্তে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এই অনির্বাচ্যবাদ গীতায় স্পষ্টতঃ কোথায়ও বিবৃত করা হয় নাই। জীব ও জগৎকে ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করায় জীব ও জগৎ যে ভগবদ্-ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, ইহাই বুঝা যায়।

গীতার মতে জীবের স্বরূপ—জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি? ইহা বুঝাইবার জন্ত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ পার্শ্বসারথি অর্জুনকে আত্মতত্ত্বের বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন

যে, দেহ অনিত্য, জরা-মরণশীল; কিন্তু এই দেহাশ্রয়ী আত্মা অজর, অমর, সত্য, সনাতন; আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, আদি-অন্ত নাই; আত্মা অবিকারী, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অপ্রমেয়, বিশ্বব্যাপী; বিশ্বপ্রাণ। ১ এই আত্মাই পরম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের যাহা লক্ষণ, সেই লক্ষণ দ্বারাই গীতায় আত্মাকে লক্ষিত করা হইয়াছে। ফলে আত্মা ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, ইহাই গীতায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য উপদেশই গীতোক্ত আত্মতত্ত্ব বিবরণের মর্ম্ম, এ বিষয়েও কোন বিবাদ নাই। ভগবান্ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, আমিই পরম ব্রহ্ম এবং আমিই আত্মা, হে অর্জুন, সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থানকারী জীবও আমি, আমিই জীবহৃদয়ে অবস্থান করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকি, সকল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ২

হে অর্জুন, তুমিই সেই পরম আত্মা পরমব্রহ্ম। তুমিই আমি, আমিই তুমি, তোমার আমার মধ্যে বস্তুতঃ কোনরূপ কোন ভেদ নাই, ইহাই গীতোক্ত আত্মোপদেশের সার মর্ম্ম—এই মর্ম্ম বুঝাইবার জন্তই গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে—“জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ” —মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। এখানে স্পষ্ট বাক্যেই ভগবান্ জীবকে তাঁহার অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে অংশ বলার তাৎপর্য্য কি? ভগবান্ পরমব্রহ্ম, বস্তুতঃ তিনি আকাশের স্থায় সর্বব্যাপী, অপরিণামী, নিরংশ এবং নিরবয়ব, তাঁহার আবার অংশ

১। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে। ২।২০

২। অহমাশ্মা শুড়াকেশ সর্বভূতামস্থিতঃ। ১০।২০

ক্ষেত্রজ্ঞাশপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত। ১৩।৩

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে।

—গীতা ২।২৪

কি? যাহার ক্ষয়-ব্যয় আছে, পরিণাম আছে, অবয়ব-বিভাগ আছে, তাঁহারই অংশ সম্ভব। অক্ষর, অব্যয়, অবিকারী, অচল, ধ্রুব আত্মার অংশ-বিভাগ সম্ভব হয় কিরূপে? নিরংশ, নিরূপাধিক ব্রহ্মের স্বতঃ অংশ থাকিতে পারে না, ইহা সত্য কথা, তবে নিরংশেরও অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে—যেমন একই অখণ্ড আকাশকে ঘটের অন্তর্গত কল্পনা করিয়া ঘটাকাশ বলা হইয়া থাকে এবং অনন্ত মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের একটা বাহ্যিক ভেদও সূচিত হয়, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাঙ্গার কোটি কোটি জীবতত্ত্ব অরূপে রূপের কল্পনা যাত্র। একই সূর্য যেমন নিখিল জগৎকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ একই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। ১ এই আত্মা সর্বদেহে অবস্থিত থাকিয়াও শরীরধর্মের দ্বারা কলুষিত হন না, নির্লেপ ভাবেই অবস্থান করেন। আত্মার স্বীয় রূপের কোনই বিচ্যুতি হয় না। আকাশ যেমন সর্বত্র বিরাজমান থাকিয়াও গ্রীষ্ম, বর্ষা, অগ্নি, ধূম, ধূলি, কর্দমাদি দ্বারা দূষিত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেব, দানব, মানব, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণিদেহে বিরাজ করিয়াও দেহ-ধর্ম দ্বারা কলুষিত হন না। আত্মা দেহে থাকিয়াও দেহ-ধর্মে নির্লিপ্ত। ২ আত্মন যেমন আধারভেদে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আত্মাও সেইরূপ দেহভেদে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। দেহভেদে আত্মার এই ভেদ-বুদ্ধি যে কল্পিত, তাহা বুঝাইবার জন্য ভূতজগতে আত্মা অবিভক্ত হইলেও ‘বিভক্তমিব চ স্থিতম্।’—১৩-১৭, এই শ্লোকে ইব শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। গীতাতে সর্বভূতে বিরাজমান আত্মা যে এক, বহু নহে, তাহা অতি স্পষ্ট বাক্যেই বলা হইয়াছে। এক আত্মা নানা অসংখ্য অগণিত জীবদেহে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজ করিয়াও নির্লেপ, নির্ভিকারই থাকিয়া যান, এইরূপে আত্মার নির্লিপ্ততার যে উপদেশ গীতায়

দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা আত্মা ব্রহ্মরূপ, ইহাই গীতোক্ত উপদেশের মর্ম বলিয়া বুঝা যায়।

গীতায় অর্জুনকে ভগবান্ “তত্ত্বমসি”, সেই ব্রহ্মই তুমি, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গীতোক্ত উপদেশের সহিত উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের উপদেশের পূর্ণ সাম্য বিদ্যমান। উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রে যে ভাবে জীবতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, গীতার উপদেশের সহিত তাহার কোনই বিভেদ নাই। গীতায় যেমন আত্মাকে অক্ষর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়, উৎপত্তি-বিনাশরহিত, অনাদি, অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, বৃহদারণ্যক, কঠ, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদেও তদনুরূপ বর্ণনাই শুনিতে পাওয়া যায়। ১ ব্রহ্মসূত্রেও আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ নাই—আত্মা নিত্য, চিৎ-স্বরূপ; ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই, চরাচর দেহের জন্ম-মৃত্যু, উৎপত্তি-বিনাশই, দেহান্তঃস্থিত আত্মার আরোপিত হয় এবং তাহার ফলে জীব জন্মগ্রহণ করিল, জীব মরিল, এইরূপ লৌকিক ব্যবহার চলে। বাস্তবিক অক্ষর, অমর আত্মার জন্ম-মৃত্যুর কথা উঠিতেই পারে না। ২

১। স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহজবোহমৃতোহভয়ঃ।

বৃহদারণ্যক—৪।৪।২২

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিৎ কঠ—২।১৭

জীবাপেতং বাব কিল ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে।

ছান্দোগ্য—৩।১।১৩

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্তোহয়ং পুরাণঃ ইত্যাদি। কঠ—২।১৮

আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ স বা এষ মহান্ অজ্ঞ আত্মা

বৃহদারণ্যক—৪।৪।২২

স সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাঙ্গা। খেতাখতর—৬।১১

২। (ক) নাম্মাঙ্গতে নিত্যত্বাচ্চ তাত্যঃ। ব্রহ্মসূত্র ২।২।১৭

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ২।২।৪২

জ্যোত্বেভব ২।৩।১৮

(খ) চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত ত্রাৎ তদব্যপদেশো ভাস্কস্তদ্ব্যভাব-ভাবিত্বাৎ। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৬ নহু লৌকিকো জন্মমরণ ব্যপ-দেশো জীবন্ত দর্শিতঃ সত্যং দর্শিতো ভাস্কস্তেষু জীবন্ত জন্মমরণ ব্যপদেশঃ। কিমাশ্রয়-পুনর্মুখ্যঃ বদপেক্ষয়া ভাস্ক ইত্যুচ্যতে চরাচর-ব্যাপাশ্রয়ঃ। স্বাবরজঙ্গমশরীরবিকরৌ জন্মমরণশর্দৌ ত্রঃ নুঃ শংভাব্য। আচ্ছা, জগতে জীবের জন্ম-মরণের কথা তো শুনা যায়, সত্য বটে জীবের জন্মমরণ শুনা যায়, তাহা গোঁপ, মুখ্য নহে, জন্মমৃত্যু মুখ্যতঃ কাহার? চরাচর দেহের, স্বাবর ও জঙ্গম শরীরের সব্বক্ষেই জন্মমরণ শব্দ মুখ্যতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

১। প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত। গী—১৩।৩৩।

২। শরীরহোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।

গী—১৩।৩১।

যথা সর্বগতং সৌন্দ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্বজীবস্থিতোদেহে তথাঙ্গা নোপলিপ্যতে। গী—১৩-৩২

আত্মা এক কি বহু? ইহার উত্তরে গীতা যেমন স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, আত্মা এক, বহু নহে, উপনিষদও সেইরূপ স্পষ্ট ভাষায় এক আত্মবাদেরই উপদেশ দিয়াছেন। উপনিষদের ভাষায় আত্মা চিন্ময়, অপ্ৰকাশ, আত্মা ব্যতীত সমস্ত জড় ও অপ্ৰকাশ। আত্মার আলোকেই সমস্ত জীব, জগৎ আলোকিত হইয়া থাকে। এক আত্মা নিখিল বিশ্বচরাচরে অন্তঃপ্রবিষ্ট আছেন, এবং সাক্ষিরূপে অবস্থান করিয়া অগণিত দেহ-যজ্ঞ আবর্তিত করিতেছেন। আত্মা সাক্ষী, চিন্ময়রূপ কেবল নিঃশব্দ ও নিলেপ হইলেও (সাক্ষী চেতা কেবলো নিঃশব্দ শ্বেত, ৬।১১ অসঙ্কোহয়ং পুরুষঃ বৃহদাঃ ৪।৩।১৫) বিভিন্ন দেহে অবস্থিত আত্মাকে অজ্ঞ লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করে। আত্মার এই ভেদ যে মিথ্যা ও কল্পিত, উপনিষদ তাহা নানা প্রকার দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। “আকাশ যেমন এক হইলেও ঘটাদির মধ্যবর্তী হইয়া ঘটাকাশ, গৃহাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করে, এবং অনন্ত মহাব্যোম হইতে ঐ সখণ্ড আকাশ পৃথক্ বলিয়াও মনে হয়, যেমন একই সূর্য বা চন্দ্র বিভিন্ন জলাধারে প্রতিবিম্বিত হইলে জলাধারের বিভিন্নতা বশতঃ বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ একই সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা বিভিন্ন জীবশরীরে এবং ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রভৃতি উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ আত্মা এক, বহু নহে, ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত, গীতারও সিদ্ধান্ত।^১ উপনিষদের ঐ চন্দ্র-সূর্যের দৃষ্টান্ত হইতে জীব যে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব, ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীক্ষমান হয়। ব্রহ্মসূত্রও সূর্যাদির দৃষ্টান্ত সমর্থন করিয়া জীব যে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব, এই প্রতিবিম্ববাদই সমর্থন করিয়াছেন (আভাস এব চ ২।৩।৫০, অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ৩।২।১৮ সূত্র) এই প্রতিবিম্ববাদের পাশাপাশি, ঘটাকাশ, মহাকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীব অনন্ত ভূমা ব্রহ্মের সখণ্ড সসীম অভিব্যক্তি,

এইরূপ “অবচ্ছেদবাদ”ও বেদান্তে স্থান লাভ করিয়াছে। গীতার উপনিষদ্রুত আকাশের দৃষ্টান্ত এবং সূর্যের দৃষ্টান্ত এই উভয়বিধ দৃষ্টান্তই (গীতা ১।৩।৩২-৩৩) গৃহীত হইয়াছে এবং অসঙ্গ নিরংশ আত্মার কার্যিক অভিব্যক্তি যে মায়া-কল্পিত, তাহা এই উপনিষদ-সিদ্ধান্তেই সমর্থন করা হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের অংশ, এই মতটি গীতার যেমন স্পষ্ট বলা হইয়াছে, উপনিষৎ এবং ব্রহ্মসূত্রেও ইহা সেকপ স্পষ্টতঃই প্রকাশ করা হইয়াছে। নিরংশ আত্মার অংশ ভাগ হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর গীতার, ব্রহ্মসূত্রে এবং উপনিষদে তুল্যরূপেই দেওয়া হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত গীতার নানা ভাবে নানা ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

“তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি” “সোহহম্” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” চার বেদের পূর্বোক্ত চারটি মহাবাক্য দ্বারাও জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, এই সত্যই প্রমাণিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এই সিদ্ধান্ত মানিয়া নিলে জীবের যেমন সুখ-দুঃখ বোধ আছে, ব্রহ্মেরও সেইরূপ সুখ-দুঃখ বোধ স্বীকার করিতে হয়, নতুবা জীবব্রহ্মের অভেদ বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে গীতা বলিয়াছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে পরমাত্মা পরব্রহ্মের কোন সুখ-দুঃখ ভোগ নাই, পরমাত্মা শরীরে অবস্থান করিয়াও দেহ-ধর্মে নির্লিপ্ত। ‘শরীরস্থোহপি কোন্তেষ্য ন করোতি ন লিপ্যতে।’ এই নিলেপ অসঙ্গ আত্মার সুখ-দুঃখ ভোগ হইবে কিরূপে? আত্মার সুখদুঃখ বোধ না থাকিলে সেই আত্মাই যদি জীব হয়, তবে তাঁহার সুখ-দুঃখ বোধ হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, সুখ-দুঃখ তো অন্তঃকরণ বা মনের ধর্ম, ঐ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইতাই জীব। জীব অনাদি অজ্ঞান বশতঃ স্বীয় নিত্য চিন্ময় রূপ বিশ্বত হইয়া অন্তঃকরণের ধর্ম সুখদুঃখাদি নিজের মনে করিয়া শোক-মোহের অধীন হয়, ইহাই চৈতন্তের মায়াশক্তি, ইহাই জীবের মোহের কারণ, ‘অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ।’ আত্মার প্রতিবিম্ব বা ছায়াকেই অজ্ঞ লোকেরা আত্মা বলিয়া ভ্রম করে। প্রতিবিম্ব যেখানে পড়ে, সেই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে বৈদান্তিক পরিভাষায় আত্মার উপাধি বলে। ঐ উপাধি প্রতি-ক্লেবে বিভিন্ন, সেই অজ্ঞ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এক হইলেও

১। আকাশমেকং হি বখা ঘটাদিবু পৃথগ্ভাবৎ।
তথাস্মিকো হ্রনেকশ্চ জলাধারেষুবাংগুমান্।
এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একথা বহুবা চৈব দৃষ্টতে জলচন্দ্রবৎ।

উপাধিতত্ত্ব জীব বিভিন্ন। জলপূর্ণ পাত্রে আকাশস্থ সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, পাত্র বতটি থাকে, প্রতিবিম্বও ততটিই পড়ে, সূর্য এক হইলেও ছায়াসূর্য্য বহু দেখা যায়। পাত্রগুলি সূর্যের উপাধি, ঐ উপাধির ভেদবশতঃ ছায়াসূর্য্যও বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। কোনও পাত্রের জল কাঁপিতে থাকিলে সেই পাত্রস্থ ছায়াসূর্য্য কাঁপিতে থাকে, অত্যাশ্রয় পাত্রস্থ ছায়াসূর্য্য কাঁপে না। আর, আকাশস্থ সূর্য্যও কাঁপে না, সেইরূপ ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব স্ব স্ব উপাধি-শবলিত হইয়া বিভিন্ন সুখ-দুঃখময় কর্মফল ভোগ করিলেও এক জীবের কর্মফল অত্র জীবে ভোগ করার প্রশ্ন উঠে না, নিরূপাধি ব্রহ্মেরও কোন সুখ-দুঃখ ভোগের আপত্তি আসে না। উপাধিসমূহ পরস্পর মিশিয়া যায় না, পৃথক থাকে, অতএব জীবসমূহ এবং তাঁহাদের জৈবভোগই বা মিশিয়া যাইবে কেন? জীবের এইরূপে উপাধিক ভেদ থাকিলেও জীব ও ব্রহ্ম যে বস্তুতঃ অভিন্ন তত্ত্ব, ইহাই গীতা, উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মসূত্রে কোন কোন স্থলে জীব হইতে ব্রহ্মকে অধিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ। ২।১।২২ ব্রঃ সূত্র) (অধিকোপদেশাত্মু বাদরায়ণ-সৈব্যং তদর্শনাৎ ৩।৪।৮ ব্রঃ সূত্র) সেখানে অবিভক্ত জীব হইতে বিভক্ত ব্রহ্মের উৎকর্ষতারই সূচনা করা হইয়াছে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব এমন কথা বলা হয় নাই। জীব অবিভক্ত, অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-নিদান; স্মৃতরাং ঈশ্বর জীব হইতে অধিক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। তার পর, ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম হইতেও অক্ষর নিগুণ ব্রহ্ম অধিক, ইহাই “মন্তঃ পরতরং কিঞ্চিৎ নাগ্ৰদন্তি ধনঞ্জয়” এই গীতান্নোকে এবং গীতোক্ত পুরুষোত্তমবাদে ব্যক্ত হইয়াছে। অষ্টম-বেদান্তেরও ইহাই মূল কথা। জীব ঈশ্বর বা ব্রহ্মের ভেদ স্বরূপগত নহে, উপাধিগত, উপাধির খোলস ছাড়িয়া দিলে জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদই থাকে না, সকলই এক হইয়া যায়। ইহাই অষ্টম-বেদান্তবাদ। জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াও এই কথাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অংশ অপেক্ষা অংশী অধিক, প্রতিবিম্ব হইতে বিম্ব অধিক, ছায়া অপেক্ষা কায়া অধিক, এই আধিক্যকে লক্ষ্য করিয়াই জীব হইতে ব্রহ্মকে

ব্রহ্মসূত্রে অধিক বলা হইয়াছে। ছায়া ও কায়ার মধ্যে, বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে অংশ ও অংশীর মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, এই জগত্ই অধ্যাত্মশাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বা ঐক্য সমর্থিত হইয়াছে। গীতাও জীব ব্রহ্মের ঐক্যই নিঃসংশয়ে অনুমোদন করিয়াছেন। “জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ” “সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাব-বান্” এই মত সমর্থন করায় জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অষ্টম-বেদান্তের পথই গীতায় অনুকরণ করা হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

গীতার মতে জগতের স্বরূপ কি?—গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিচার করা গেল। জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতার মর্ম্ম কি, তাহা আমরা বর্তমান আলোচনা করিব। জীবকে যেমন গীতায় ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে, জগৎকেও সেইরূপ ব্রহ্মের অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই এই উভয়বিধ প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া জানিবে। ভগবানের অধ্যাক্ষতায়ই প্রকৃতি চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রসব করে। এই জগত্ই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমিই সমস্ত ভূতজগতের বীজ, আমি হইতেই জগতের উৎপত্তি, এবং আমাতেই নিবৃত্তি। এই জগদ্যোনি বিশ্ব-প্রকৃতিতে আমি যে বীজ আধান করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত-জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জগতে যত কিছু মূর্তির উদ্ভব হইয়াছে, প্রকৃতিই তাঁহাদের জননী এবং আমিই তাঁহাদের বীজ-আধানকারী পিতা। সৃষ্টির উষায় অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয় এবং সৃষ্টির সন্ধ্যায় ব্যক্ত চরাচর অব্যক্ত প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে সৃষ্টি-সংহার-চক্র নিয়ত আবর্তিত হইতেছে। ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে উপগত হইয়াই পুনঃ পুনঃ জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনিই নিখিল জগতের ধারক এবং পোষক। তিনি স্বীয় অব্যক্ত মূর্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সমস্ত ভূত-জগৎই “সূত্রে মণিগণা ইব” তাহাতে অনুস্থ্যত রহিয়াছে, তিনি কিন্তু ভূত-জগতে অবস্থিত নহেন। ভূতগ্রামের মধ্যে, জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তরালে থাকিয়াও তিনি নির্লিপ্ত, উদাসীনরূপে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং নিক্রিয়, কোন ক্রিয়াই তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি পুনঃ পুনঃ জগৎ সৃষ্টি করেন—তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-নিদান, “উপদ্রষ্টামুমস্তা চ ভক্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ”,—এই তিনিই আবার, “উদাসীনবদাসীন” নির্লেপ, নিষ্ক্রিয়, নির্মিকার। তিনি অকর্তা অথচ জগতের সৃষ্টিকর্তা, ভগবন্ত্বে গীতায় বহু স্থানে এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ করা হইয়াছে, এই বিরোধের সমাধান কি, তাহাও গীতায় প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতোক্ত ঐ সমাধান আলোচনা করিলে ভূত-জগৎ সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত কি, জগৎ সত্য কি মিথ্যা—এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। অজ, অব্যয় অবিকারী, পরমাশ্রম সর্বভূতেশ হইয়াও স্বীয় মায়াবশে শরীর ধারণ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হন—‘প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মায়মা ।’ মায়াই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের কারণ। ভগবানের পরা প্রকৃতি জীবও অপরা প্রকৃতি জগৎ ভগবান্ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। পরা প্রকৃতি জীবই ভোক্তা, অপরা প্রকৃতি জগৎ ভোগভূমি বা ভোগ্য। ব্রহ্মের ভোক্তাভাব ও ভোগ্যভাব মায়িক বিলাস। ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগতের সত্তা ও ভগবৎসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত জীব ও জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই জন্মই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমিই সর্বোত্তম তত্ত্ব, আমা হইতে কোন বস্তুই পরমার্থতঃ সত্য ও স্বতন্ত্র নহে। সমস্তই আমাতে গ্রথিত, আমা দ্বারা অনুপ্রাণিত, আমার সত্তায় সত্তাবান্। গীতার ঐ উক্তি হইতে জগতের যে কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহাই বুঝা যায়। গীতায় জগতের যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্ম স্বীয় মায়া বা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করেন—এই প্রকৃতিই জগদ্যোনি, ইহা গীতোক্ত সৃষ্টিরহস্য। এইরূপ বলার কারণ এই যে, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অকর্তা, নির্লেপ, নিরঞ্জন ; সূতরাং সে জগৎসৃষ্টি করিতে পারে না, গুণময়ী প্রকৃতি জড়স্বভাবা, এই জন্ম সে-ও স্বাধীন ভাবে সৃষ্টিক্রিয়া নির্বাহ করিতে পারে না, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি ইহারা একক কেহই জগৎ সৃষ্টিতে সমর্থ নহে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই যখন মিলিত হয়, তখনই ইহারা বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করিতে

পারে। গীতা বলিয়াছেন, “হাবর-জন্ম যত কিছু উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগই তাহার হেতু বলিয়া জানিবে।”—গী ১৩।২৬। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের সংযোগের ফলেই মূর্ত-জগতের উদ্ভব হইয়াছে। হে কৌশ্লেয়, দেবতা, মাহুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিখিল যোনিতে সে সকল শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রকৃতি বা মায়া তাঁহাদের জননী, আর প্রকৃতিতে গর্ভ আধানকারী আমিই তাঁহাদের জনক।^১ এই জগজ্জননী প্রকৃতি অথবা সূখদুঃখ ভোগায়তন নিখিল শরীর ক্ষেত্র, আর এই ক্ষেত্রকে যিনি ‘অহং মম’ এইরূপে জানেন, শরীরে থাকিয়া শরীরের অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ, এই ক্ষেত্রজই পরা প্রকৃতি বা জীব, এই জীবও যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব নহে, ইহা বুঝাইবার জন্ম ভগবান্ বলিয়াছেন যে, নিখিল ক্ষেত্রে এক আমাকেই ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিও—‘ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্ব ক্ষেত্রেষু ভারত,—গী: ১৩।১। ক্ষেত্রও আমি ক্ষেত্রজও আমি,—আমি আমার অব্যক্ত মূর্তিতে সমস্ত ব্যাপিয়া আছি—‘ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা’ ৯।৪। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ আমার ব্যক্তরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অরূপ আত্মা ব্যক্তরূপ পরিগ্রহ করিলেন কিরূপে ? ভগবান্ বলিলেন, ইহাই মায়া। মায়াবশেই অব্যক্ত, অমূর্ত, অরূপ আমি, ব্যক্ত, মূর্ত ও রূপবান্ বলিয়া প্রতিভাত হই। এই সমস্তই মায়ার খেলা। প্রকৃতি বা মায়াই সমস্ত ক্রিয়া শক্তির মূল এবং পুরুষের সূখ-দুঃখ ভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ক্ষেত্রজ পুরুষ মায়া বা প্রকৃতিতে উপগত হইয়াই সেই প্রকৃতিজাত সূখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।^২ যদিও প্রকৃতিই সমস্ত কার্য নির্বাহ করে, তবুও পুরুষ অভিমান বশতঃ নিজকে কর্তা বলিয়া মনে করে এবং কর্মফল সূখ-দুঃখ ভোগ করে। ইহার কারণ কি ? উত্তরে গীতা বলিয়াছেন যে, পুরুষের গুণসঙ্গ বা প্রকৃতি-সঙ্গই ইহার কারণ। প্রকৃতিতে উপগত হওয়ার ফলে প্রকৃতির সহিত পুরুষের “তাদাত্ম্যাভিমান” উৎপন্ন হয়,

১। সর্ববোনিবু কৌশ্লেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি বাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ বোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা । গী ১৩।১৪

২। কার্যাকারণ-কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সূখদুঃখানাং ভোক্তৃষে হেতুরূচ্যতে । গী: ১৩।২০

পুরুষঃ প্রকৃতিষো হি ভুক্তৃষে প্রকৃতিজান্ গুণান । গী: ১৩।২১

এবং অভিমানবশতঃ পুরুষ প্রকৃতির ধর্মকে নিজের নিজের ধর্ম মনে করিয়া গুণের ফল সুখ-দুঃখ শোক-মোহ ভোগ করিয়া থাকে। পুরুষের সংযোগের ফলে জড় প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। প্রকৃতির সহিত পুরুষের এই তাদাত্ম্যভিমানই বেদান্তে ‘অধ্যাস’ বা মায়াগ্রহি বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি জড়, পুরুষ চিৎ-স্বরূপ। চিৎ ও জড় আলোক অন্ধকারের মত পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন। এইরূপ বিরুদ্ধ দুইএর মধ্যে কোনরূপ “তাদাত্ম্য” বা অভেদ বুদ্ধি থাকা যদিও সম্ভবপর নহে, তবু অজ্ঞান বশতঃ লোকের মনে ‘অহং’ ‘মম’ “আমি” “আমার” এইরূপ তাদাত্ম্যভিমান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ঐ তাদাত্ম্যবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে আত্মার অভিমান বা অহংকারও নিবৃত্তি হইয়া যায়। আত্মা তখন স্বীয় সচ্চিদানন্দ-রূপে অবস্থান করেন। আত্মাকে যিনি অকর্তা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া জানেন, তিনিই তত্ত্বদ্রষ্টা এবং যথার্থ জানী। জ্ঞানিগণ সর্বব্যাপী সর্বগ আত্মাকে সমস্তের অধিষ্ঠানরূপে দর্শন করিলেও ইহাকে “স্বতন্ত্র” “অসঙ্গ” বলিয়াই দর্শন করেন। সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার অন্তরালে যে একই পরম আত্মতত্ত্ব নিখিল জীবজগতের শাসক, ভাসক ও অন্তর্ধ্যামিরূপ বিরাজ করিতেছে, তাহাও তাহাদের বিবেকদৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে। আর, যাহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু নাই, সেই অজ্ঞানিগণই আত্মাকে শোক-মোহের অধীন বলিয়া মনে করে। সর্ব-সাক্ষী আত্মতত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে না। গীতা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের মৌলিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিভিন্ন জীববর্গ যে একই পরমাত্মার বিকাশ, তাহাও গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টা বিবেকী যখন পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত ভূত সমূহকে একই আত্মায় অনুস্থিত দেখিতে পান, তখন এক অদ্বিতীয় আত্মা হইতেই যে ভূত সমূহ বিস্তারলাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন এবং সমস্ত জীব ও জগৎই পরিণামে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।—গীতা ১৩।৩০। জানার তখন সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন—সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই আত্মবাসিত, ‘ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্।’ এইরূপ সর্বত্র যাহার আত্মদর্শন হয়, সেই একদর্শীর শোকই বা কোথায়,

মোহই বা কোথায়? অর্থাৎ জানী ব্যক্তির আত্মাকে সুখ-দুঃখ শোক-মোহের অতীত বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং জীব ও জগৎ যে সাক্ষী আত্মারই মায়িক অভিব্যক্তি, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারেন। ভূতজগতের বাহা কিছু বিস্তার দেখা যায়, সমস্তই সেই ব্রহ্ম, ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন ভূত-জগতের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, স্বতন্ত্র দৃষ্টি নাই। ‘অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পত্ততে তদা।’—গীতা ১৩।৩০। গীতার এই ব্রহ্ম সম্পত্তি দ্বারা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জীব ও জগৎ যে অসত্য, ইহাই সূচিত হয়। যদিও গীতায় স্পষ্টবাক্যে কোথায়ও জগতের মিথ্যাত্ব কথিত হয় নাই, তবুও প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সঙ্গ বা তাদাত্ম্যভিমানের ফলেই যে জগতের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা স্পষ্টতঃ গীতায় বলা হইয়াছে। আলোক অন্ধকারের মত দুই বিরুদ্ধ-স্বভাব বস্তুদ্বয়ের (চিৎ ও জড়) মধ্যে এই তাদাত্ম্য-ভিমান যে সত্য হইতে পারে না, তাহা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃতি-পুরুষের তাদাত্ম্যভিমান যদি মিথ্যা হয়, তবে ঐ অভিমানের ফলে উৎপন্ন জীবও জগদ্বিভাব মিথ্যাই হইবে, সত্য হইতে পারিবে না। অতএব গীতার মতে জীব ও জগৎ মিথ্যা, এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লাওয়া ভিন্ন কোন গত্যন্তর নাই। অবশ্য কেহ কেহ “নাসতো বিদ্বতে ভাবো নাভাবো বিদ্বতে সতঃ” গীতার এই উক্তি মূলে সদ্বাদ সমর্থন করিয়া জগৎ যে সত্য, ইহাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, আমাদের মতে উক্ত প্রচেষ্টা বিচারসহ নহে। আমাদের মতে সংকারণবাদ বা ব্রহ্মসত্যতাবাদই গীতোক্ত শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংকার্যবাদ বা জগৎসত্যতা-বাদ সমর্থিত হয় নাই। যাহা বিনাশী এবং দেশ, কাল ও বস্তু-পরিচ্ছিন্ন তাহাই অসৎ, আর যাহা দেশ, কাল ও বস্তু-পরিচ্ছিন্ন নহে তাহাই অবিনাশী সদ্বস্তু। যে বস্তু অণ্ড্র নাই, এখানে আছে তাহাই দেশপরিচ্ছিন্ন, তাহা অসৎবস্তু, যাহা পূর্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, কেবল এখন মাত্র বিদ্যমান আছে তাহাই কালপরিচ্ছিন্ন, তাহাও অসৎ, সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদের নাম বস্তু-পরিচ্ছেদ, এই ত্রিবিধ ভেদের কোনওরূপ ভেদ যে পদার্থে দৃষ্ট হয় তাহাও অসৎ, যাহা দেশপরিচ্ছিন্ন নহে, কালপরিচ্ছিন্ন নহে, বস্তুপরিচ্ছিন্নও নহে তাহাই সৎ। এই দৃষ্টিতে বিচার

করিলে দেশ, কাল ও বস্তুপরিচ্ছিন্ন জগৎ যে অসত্য এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। 'সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাষ্টিতীয়ম্' এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও ১ পূর্কোক্ত সদব্রহ্মবাদই সমর্থিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্বে সদরূপেই বিদ্যমান ছিল। সেই সদব্রহ্মই এক অষ্টীয় বিশ্বপ্রাণ পরমাত্মা, নিখিল জগৎই আত্মময়, সেই আত্মাই সত্য এবং "হে ষেতকেতো, সেই সংস্বরূপ আত্মাই তুমি।" সেই সৎ আত্মাই জগতের কারণ, কারণকে জানিলেই সমস্ত কার্য জানা যায়, কারণ ভিন্ন কার্যের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, কার্যকারণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে, ইহাই শ্রুতি মৃৎপিণ্ডের ও মৃৎপিণ্ড কার্য ঘটাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন। একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলে ঘট, শরা, কলস প্রভৃতি সমস্ত মৃন্ময় বস্তুকে জানা যায়, অর্থাৎ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল বিভিন্ন মৃন্ময় পদার্থ মাটি ব্যতীত আর কিছুই নহে, মাটিরই কোন আকারে তাহার নাম ঘট, কোনও আকারে উহা শরা, কোনও আকারে উহা কলস; আকার যেমন যেমন পৃথক হইতেছে, তখনই একটি ভিন্ন নাম সেখানে ব্যবহার করা হইতেছে। সমস্ত মাটির বিকার মৃন্ময়বস্তু মাটিরই বটে, মাটি বাদ দিলে মৃন্ময়বস্তুর কোনই সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জ্ঞানই শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন, মুক্তিকাই একমাত্র সত্য বস্তু, মৃদ্বিকার ঘটাদি নামেমাত্র সত্য, বস্তুতঃ সত্য নহে। ছান্দোগ্যের এই মাটির দৃষ্টান্তই ব্রহ্মবিষয়েও প্রযুক্ত। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জীব ও জগৎ নামেমাত্র সত্য, বস্তুতঃ সত্য নহে। সর্ককারণ-কারণ, ভূতযোনি ব্রহ্মই জগতের মূল নিদান। "অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্কুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত ভূতজগৎ নির্গত হয়" ২ বৃহদা ২।১।২০।

১। সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাষ্টিতীয়ম্
ঐতদাত্ম্যমিদং সর্কং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি
ষেতকেতো। ছান্দোগ্য ৫।১।১

২। যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্কুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবেব অত্মাদাত্মনঃ
সর্কং লোকাঃ সর্কং দেবাঃ সর্কানি ভূতানি ব্যুচ্চরতি।
হাঃ ২।১।২০

পরমাত্মাই সৎও হইলেন তৎও হইলেন, পুরুষও হইলেন প্রকৃতিও হইলেন, পরমেশ্বরের যখন সিসৃক্ষা বা সৃজনী বৃত্তির উদয় হইল, তখনই তিনি প্রকৃতি ও পুরুষরূপে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার সৃজনীবৃত্তিই জগদযোনি মায়ী এবং মায়াকে অঙ্গীভূত করিয়া (আশ্রয় করিয়া) জগৎ সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্পই প্রকৃতিতে পুরুষের গর্ভাধান বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্কল্পই বীজ, এবং পরমেশ্বর সেই বীজআধানকারী জগৎপিতা। ইহাই গীতারও উপদেশ। এই উপদেশ হইতেও বিকার যে মিথ্যা, তাহাই প্রতীত হয়। গীতায় আত্মাকে অবিকারী, অপরিণামী, কূটস্থ, নির্লেপ, নিরঞ্জন ও অসঙ্গ বলা হইয়াছে। "শরীরস্থোহপি কোস্তেষ্য ন করোতি ন লিপ্যতে" বলিয়া যে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই এক অষ্টীয় অবিকারী আত্মা বহু নামে বহু রূপে জগতে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। আত্মার এই ভাতি মিথ্যা আত্মার এই বহু নামরূপে প্রকাশকে যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মা অবিকারী, অপরিণামী এক অষ্টীয় থাকিবেন কিরূপে? আত্মাই জগৎকারণ, ইহা নিঃসন্দেহ। কারণই কার্যরূপে পরিণত হয়; এই পরিণামবাদ গীতার অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করিলে গীতায় জগৎকারণ আত্মাকে যে অপরিণামী অবিকারী বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। কার্যবর্গ কারণের কল্পিতরূপ এবং কারণ স্বীয়রূপে অবিকৃত থাকিয়াই ভিন্ন ভিন্ন কার্যরূপে বিবর্তিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই "বিবর্তবাদ" অঙ্গীকার করিলে অপরিণামী আত্মার বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা ব্যাখ্যা করা যায়। "হেতুনানেন কোস্তেষ্য জগদ্বিপরিবর্ততে" গী ৯।১০ বলিয়া পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় জগতের যে বিপরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা গীতায় বিবর্তবাদেই সমর্থন করা হইয়াছে। বিবর্তবাদে পরমেশ্বর কর্তা হইয়াও অকর্তা, চৈতন্তের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতি হইতে জগদ্রূপ ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্যের উদয় হইলে জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং সেই প্রকাশগুণে লোকে ভাল-মন্দ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এখানে সূর্যকে যেমন সেই সমস্ত কার্যের কর্তা বলিয়া গণ্য করা যায় না, সেইরূপ পরমাত্মার সত্তার জগৎ প্রকাশিত হইলে এবং সূর্যঃখাদি ফল নানা ক্রিয়া

সম্পাদিত হইলেও তিনি ঐ সকলের কর্তা বলিয়া গৃহীত হন না। অপরিণামী পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় যে মায়ায় জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন সুদৃঢ় যুক্তি গীতায় পাওয়া যায় না। গীতোক্ত পুরুষোত্তমই একমাত্র সত্য বস্তু, অত্র সমস্তই মায়ায় অভি-
ব্যক্তি ও মিথ্যা, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রেও এইরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে। কার্য-জগৎ ততক্ষণই সত্য বলিয়া মনে হইবে—যতক্ষণ ইহা কারণ-সত্তা (ভগবৎ-সত্তা) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে, কারণ-সত্তা বাদ দিলে কার্যবর্ণের কোনই সত্তা নাই, তাহা তখন মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই সৎ-কারণবাদ বা বিবর্ত-বাদের মূল রহস্য। এই রহস্যই উপনিষদে ‘মৃত্তিকেতোব সত্যং’ বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও আরম্ভাধি-
করণে এই রহস্যই, কার্য-জগৎ ব্রহ্ম হইতে অত্র নহে, কার্য-জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অত্র মনে করাই তুল, এই ‘অনন্তত্ব’ ব্যাখ্যায় পরিষ্ফুট হইয়াছে। জগৎ মিথ্যা বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চের মত অলীক বা অসৎ, এমন কথা উপনিষৎ, গীতা বা ব্রহ্মসূত্রে কোথাও উক্ত হয় নাই। জগতের বস্তু-সত্তা এবং ব্যবহার-জীবনে ইহার কার্যকারিতা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব মানেন নাই।

ব্যবহারিক প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎকে অলীক অসৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্ত শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে স্বীয় ভাষ্যে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কোন সুধী দার্শনিকই প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগদ্বস্তুকে অলীক বলিতে পারেন না, তবে জগদ্বস্তু শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন উৎপন্ন হইলে জগদ্দৃষ্টি তিরোহিত হয়, এই জন্ত জগৎকে আকাশকুসুমের স্তায় অলীক বা অসৎও বলা যায় না, পরমার্থ সদ্বস্তু বলিয়াও বলা যায় না। উহা সৎব্রহ্মবস্তুও নহে, অসৎ আকাশকুসুমও নহে, তবে উহা বস্তু-সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, স্তুরাং অংশতঃ সৎও বটে এবং পরিণামে বাধিত হয় বলিয়া অংশতঃ অসৎও বটে। আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় প্রপঞ্চ অনির্কচনীয়। গীতার কোথায়ও এই অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত অনিবার্য্যবাদের স্পষ্টতঃ উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে জীব ও জগৎকে ব্রহ্মবিভাব বলিয়া বর্ণনা করায় জীব ও জগৎ যে ব্রহ্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা গীতার আলোচনায়ও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। গীতার বিশ্বরূপাধ্যায়ে এই সত্যই বিবৃত করা হইয়াছে,—ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তমই একমাত্র সত্য বস্তু, এ বিষয়ে গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের সহিত এক মত।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (অধ্যাপক) এম-এ, পি-আর-এস,
পি-এইচ-ডি, কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

জীর্ণ বাস

জীর্ণ বসন পরা কি বিপদ কম ?
চাই চোরের বুদ্ধি দধীচির সংযম।
হাওদাবিহীন হস্তীতে যেন চড়া,
ক্ষীণদৃষ্টির আন্দাজে পুঁথি পড়া।
অশক্ত স্ততে খেলানো বৃহৎ রুই,
অপটু লাঙলে চষিবারে-যাওয়া ভুঁই।
লতার পুলেতে লছমনঝোলা পার,
রুগ্ন উষ্ট্রে পাড়ি দেওয়া সাহারার।
পেট্রলহীন এ যে ঠিক মথ প্লেনে,
বার্লিন যাওয়া বিমান আক্রমণে।

ইউরোপের এ সন্ধিপত্র প্রায়,
ঠিক নাই কিছু কখন ফাঁসিয়া যায়।
ঋণগ্রস্ত ধনীর এ জমিদারী,
নিলামে কখন উঠিবে বুঝিতে নারি।
নদীয়া হইতে নহে আর বেশী দূর,
ভাসে নাই ডুবু-ডুবু এ শাস্তিপুর।
চৌদিকে এর বৃটিশের দেশ রাজা,
খাড়া আছে শুধু নামেই ফরাসডাঙ্গা।
জীর্ণ বসন, জরায় জীর্ণ দেহ,
রাখা ক্লেশকর, বর্জনই তাই শ্রেয়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।



১

সুনীলচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সে স্কুল-কলেজের গৌরব, এবং আত্মীয়-বন্ধুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

সুনীলের পিতা সুনীল বাবু একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সওদাগরি আফিসে মাসিক তিন শত টাকা বেতনের চাকরি করিতেন। সুনীলের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার অতি অল্প দিন পরেই সুনীল বাবু হৃদরোগে সহসা প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যে আফিসে চাকরি করিতেন, সেই আফিসের কন্ডচারীরা পেন্সন পাইতেন। যে সকল কন্ডচারী পঁচিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল চাকরি করিয়া অবসর গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা বেতনের অর্ধেক পেন্সন পাইতেন। সুনীল বাবু চব্বিশ বৎসর সাত মাস চাকরি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। আফিসের বড় বাবু সুনীল বাবুকে ভালবাসিতেন; তিনি বড় সাহেবের নিকট দরবার করিয়া সুনীল বাবুর স্ত্রীকে মাসিক পঁচাত্তর টাকা পেন্সন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সুনীল বাবুর নিবাস শ্রীরামপুর; প্রায় দশ বৎসর চাকরি করিবার পর তিনি কলিকাতার সিমলা পল্লীতে একখানি ছোট অট্টালিকা কিনিয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। তখন হইতে শ্রীরামপুরের বাড়ীতে তাঁহার এক বিধবা মাসী একটি দৌহিত্রকে লইয়া বাস করিতে থাকেন।

সুনীল বাবু যখন কলিকাতায় বাড়ী ক্রয় করেন, তখন সুনীলের বয়স দুই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই; জ্ঞানের উন্মেষ হইতে সে জানে, কলিকাতাতেই তাহাদের বাড়ী। সুনীল বাবুর দুইটি কন্যার জন্মের পর সুনীলের জন্ম হয়। সুনীল বাবু দুই কন্যারই বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। বড় মেয়ের বিবাহ তিনি শ্রীরামপুরেই

দিয়াছিলেন; বড় জামাতা স্থানীয় আদালতে ওকালতি করেন। ছগলীতে ছোট মেয়েটির বিবাহ দিয়াছিলেন, ছোট জামাতা কলিকাতার কোন স্কুলের শিক্ষক।

সুনীলের জননী বিধবা হইবার পর বড় জামাতা অবনীমোহনের পরামর্শে কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া শ্রীরামপুরে বাস করিতে লাগিলেন; কলিকাতার বাড়ী মাসিক পঞ্চাশ টাকায় কোন ভদ্রলোককে ভাড়া দেওয়া হইল। সুনীল বাবুর মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পরে আফিস হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহার বিধবা পত্নীর যাবজ্জীবন মাসিক পঁচাত্তর টাকা পেন্সন মঞ্জুর হইয়াছে। সুনীল প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিল। বাড়ীভাড়া, পেন্সন ও সুনীলের বৃত্তিতে মাসিক দেড় শত টাকা আয় হওয়ায় সুনীলকে লেখাপড়া ছাড়িয়া চাকুরির চেষ্টা করিতে হইল না; সে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হইয়া এফ-এ পড়িতে লাগিল।

প্রকৃতপক্ষে অবনীমোহনই এখন সুনীলের অভিভাবক। তিনি প্রায় প্রত্যহই তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া সকলের সংবাদ লইতেন। সুনীল বাবু মাসিক তিন শত টাকা বেতন পাইলেও মৃত্যুকালে কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় বাটী ক্রয় ও দুইটি কন্যার বিবাহে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ সবই নিঃশেষিত হইয়া প্রায় তিন হাজার টাকা ঋণ হইয়াছিল। সেই ঋণ তিনি পরিশোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নগদ কিছু সঞ্চয় না থাকিলেও তিনি পাঁচ হাজার টাকার জীবন-বীমা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাই বিধবার সঞ্চয় হইল।

সুনীল এফ-এ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাইল। সে বি-এ পড়িবার জন্ত কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইল। সে এফ-এ

পাশ করিতেই তাহার প্রতি কন্ঠাদায়গ্রস্ত উমেদারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; কিন্তু কেহই তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারিলেন না। সে উপার্জনকম না হইলে বিবাহ করিবে না, তাহার এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সকলকেই হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। পুত্রবধুর মুখ দেখিবার জন্ত সুনীলের জননী মধ্য মধ্য ইচ্ছা হইত বটে, তবে তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন; সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, এখন সুনীলের বিবাহ দিয়া সংসারের ভার বৃদ্ধি করা সঙ্গত নহে। সুনীল কিছু উপার্জন করিতে পারিলে তাহার বিবাহের চেষ্টা করাই উচিত।

যথাসময়ে সুনীল বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিল। অবনীমোহনের ইচ্ছা হইল, সুনীল আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার মত ওকালতি করুক। কিন্তু সুনীল বলিল, —“ওকালতি করা আমার পোষাবে না, ডেপুটি বা মুনসেফ হাকিমদের ‘হজুর’ ‘ধর্ম্মাবতার’ ব’লে ডাকা আমার অসাধ্য; তার চেয়ে একটা মনোহারী কি মুদীর দোকান খুলে বসার ভাল।”—সুনীল আইন পড়িল না।

এম-এ পাশ করিবার পরও যখন সুনীল বিবাহ করিল না, তখন প্রতিবেশীরা বলাবলি করিতে লাগিল, সুনীলের মা ছেলের বিবাহ দিয়া বড়-রকম একটা দাঁও মারিবার মতলব করিয়াছেন। সে-দিন তেলিনীপাড়া হইতে অমন একটা সম্বন্ধ আসিল; তাহারা অলঙ্কার, বরাভরণ ও নগদে ছয়-সাত হাজার টাকা দিতে चाहিল, গুনিলাম, মেয়েটিও পরমা সন্দরী; কিন্তু তবু সুনীলের মায়ের মন উঠিল না! গিন্নীর মৎলবটা কি? কি চায়? এক জন হাসিয়া উত্তর দিল,—“রাজকণ্ঠে আর অর্ধেক রাজ্য।”

এম-এ পাশ করিবার প্রায় চারি মাস পরে, সুনীল এক দিন সংবাদ পাইল, উচ্চ কার্যের জন্ত ভারত-সরকারের দপ্তরে এগার জন লোক লওয়া হইবে। একটা প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা প্রথম একাদশ জন প্রার্থীকে গ্রহণ করা হইবে। যাহারা সরকারের স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহে, এবং যাহাদের বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক, তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।—বেতন দেড় শত টাকা হইতে আরম্ভ।

সুনীল এই পরীক্ষা দিবে বলিয়া আবেদন করিল। এক সপ্তাহ পরে তাহার আবেদনের উত্তরে, কোথায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে ও কোন্ কোন্ তারিখে পরীক্ষা গৃহীত হইবে, তাহা জ্ঞাপন করা হইলে সুনীল নির্দিষ্ট সময়ে কলিকাতায় গিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিল। সে এই পরীক্ষা দিয়াছে, এ সংবাদ তাহার মাতা এবং অবনীমোহন ভিন্ন আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। এই ঘটনার প্রায় আড়াই মাস পরে সে সংবাদ পাইল, সাত-শ একাত্তর জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সে আফিস হইতে পত্র পাইল, অগ্রে তাহাকে ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে হইবে, তাহার পর সে নিয়োগ-পত্র পাইবে।

বাল্যকাল হইতেই সুনীলের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, সুতরাং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাহাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হইল না। আফিস হইতে নিয়োগপত্র পাইয়া সুনীল যথাস্থানে কার্যে যোগদান করিল।

২

সুনীল বাবু দুইটি কন্ঠারই বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্ঠা নির্মলার বিবাহ দিয়া যেরূপ সুখী হইয়াছিলেন, কনিষ্ঠা কন্ঠা অমলার বিবাহ দিয়া সেরূপ সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার বড় জামাতা অবনীমোহনের অবস্থা অপেক্ষা কনিষ্ঠ জামাতা শশধরের অবস্থা ভালই ছিল। শশধর বি-এ পাশ করিলে শশধরের পিতা-মাতার সঙ্কল্প হইল, শশধরের বিবাহে একটা দাঁও মারিবেন; অর্থাৎ চারটি হাজার টাকার কমে তাঁহাদের এই বি-এ পাশ ছেলেটিকে বিক্রয় করিবেন না। শশধরের পিতা ডাক্তারি করিতেন, সূচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার হাত-যশ থাকিলেও চকুলজ্জা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অপযশ ছিল। তাঁহার অসঙ্গত অর্থলালসার জন্ত হুগলী-চুঁচড়ার জনসাধারণ কোন দিন সকালে “কশাই ডাক্তারের” নাম উচ্চারণ করিত না,—পাছে সে-দিন উপবাস করিয়া কাটাইতে হয়। শশধর এই প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার প্রথম পুত্র নীলাম্বর প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিন বার অকৃতকার্য হইয়া মা সরকারী নিকট বিদায় লইয়া বাড়ীতে বসিয়া তাস পিটিতেছিল। কশাই ডাক্তার

নিজের হাতযশের অজুহাতে সেই নীলাধরের বিবাহ দিয়া আড়াই হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং বি-এ পাশ শশধরের তিনি যে চার হাজার টাকা দর হাঁকিবেন, ইহাতে বিনয়ের কি কারণ থাকিতে পারে? সুশীল বাবু অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া এবং ঘটক মহাশয়ের বিস্তর সুপারিশে দুই হাজার টাকা নগদ, দেড় হাজার টাকার অলঙ্কার এবং আড়াই শত টাকার বরাভরণ, মোট পৌনে চারি হাজার টাকায় কন্যাদায় হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর সুশীল বাবু, অমলার স্বশুরবাড়ীতে যে সকল “তত্ত্ব” পাঠাইতেন, তাহা তাহার স্বশুর-শাশুড়ীর পছন্দ হইত না। অমলার বিবাহের পর সুশীল বাবু শীতের তত্ত্ব জামাতার জন্ত এক শত কুড়ি টাকা মূল্যের যে শাল পাঠাইয়াছিলেন, সেই শাল ডাক্তার-বৈবাহিক এই মন্তব্যসহ ফেরত দিয়াছিলেন যে, ঐরূপ শাল তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্রের ব্যবহারযোগ্য নহে, বৈবাহিক মহাশয়ের চক্ষু থাকিলে তিনি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার (কশাই ডাক্তারের) কম্পাউণ্ডারের গায়ে যে শাল আছে, তাহা উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান!

যাহার প্রবৃত্তি এইরূপ ইতর, তাহার সহিত কুটুম্বিতা করিয়া কেহই সুখী হইতে পারে না, সুশীল বাবুও সুখী হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার একটা সাঙ্ঘনার বিষয় এই ছিল যে, অমলার স্বশুর-শাশুড়ী অমলাকে ভাল-বাসিতেন, তাহার অযত্ন করিতেন না। তাঁহারা অমলাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে চাহিতেন না, কদাচিৎ দুই-এক বার পাঠাইলেও অধিক দিন রাখিতেন না। শশধরও স্বশুর-বাড়ীতে কদাচিৎ যাইতেন। তিনি কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেন, হুগলা হইতে প্রত্যহ ট্রেনে যাতায়াত করিতেন। সুশীল বাবুর সিমলার বাড়ী হইতে তাঁহার স্কুলের দূরত্ব অধিক না হইলেও শশধর স্বশুরবাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন না। সুশীল বাবুর মৃত্যুর পরে যখন সুশীল কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া শ্রীরামপুরে গিয়া বাস করিলেন, তখনও শশধর প্রত্যহ দুই বেলা শ্রীরামপুর ট্রেনের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেন, অথচ কোন দিন শ্রীরামপুরে নামিয়া অদূরে অবস্থিত স্বশুরবাড়ীতে যাইতেন না। সুশীলের মাতা জামাতার এই ব্যবহারে মর্দাহত হইলেও জামাতার

নিকট হুঃখ প্রকাশ করিতেন না। শশধরের মনের ভাব তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

অমলার যখন বিবাহ হয়, তখন সুশীলের বয়স দশ বৎসর। নির্মলা সুশীল অপেক্ষা আট বৎসরের, এবং অমলা চারি বৎসরের বড়। অমলার বিবাহের জন্ত সুশীল বাবু কিরূপ চুশ্চিত্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শশধরের পিতা শীতের তত্ত্ব ফেরত দেওয়াতে পিতা-মাতা কিরূপ মর্দাহত হইয়াছিলেন, সুশীল বালক হইলেও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। পিতার অপমান ও জননীর অশ্রুতে বালকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। শশধরের পিতা কি কারণে শীতের তত্ত্ব ফেরত দিলেন, বালক তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার পিতা একখানা দশ টাকা মূল্যের রূপার গায়ে দিয়া আফিসে যান, ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, সে জন্ত তিনি কিছুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করেন না, তবে শশধর বাবুর এক শত কুড়ি টাকা মূল্যের শাল গায়ে দিতে লজ্জা হইবে কেন? বালক সুশীল এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইত না।

বয়স এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সামাজিক সমস্তার আনুসঙ্গিক অন্ত্যস্ত সমস্তাও তাহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। সে ভাবিত, কন্যার বিবাহের সময় বরকে টাকা দেওয়া হয় কেন? যখন সুশীল শ্রীরামপুর কলেজে পড়িত, তখন তাহার প্রতিবেশী ও সতীর্থ বিনয়ের বিবাহ হয়। বিনয়দের অবস্থা ভাল ছিল না, বিনয়ের পিতা কলিকাতায় একটা সওদাগরি আফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কেরানীগিরি করিতেন। বিনয়দের বাড়ীও তাহাদের অবস্থার উপযোগী ছিল, ঘরগুলি ক্ষুদ্র, এবং স্থানও সঙ্কীর্ণ, কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকা যায়। বিনয়ের বিবাহের পূর্বে তাহার স্বশুর ও শ্যালক আসিয়া বিনয়দের বাড়ী-ঘর দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিবাহোপলক্ষে খাট-বিছানা প্রভৃতি দান-সামগ্রী, এবং ফুলশয্যা উপলক্ষে যে সকল অনাবশ্যক এবং বাঙ্গালী গৃহস্থের অব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন, বিনয়দের বাড়ীতে তাহা রাখিবার স্থান না থাকায় সেই সকল দ্রব্য পার্শ্ববর্তী এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে সাজাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সেই প্রতিবেশীর বাড়ীতে ঐ সকল দ্রব্য দেখিয়া

মাথা ঝাঁকাইয়া বলিয়াছিলেন, “হ্যাঁ, কলিকাতার কুটুম্ব দিতে-থুতে জানে বটে!” আজ-কাল এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সমাজের অবস্থা লজ্জাজনক শোচনীয় নহে কি ?

সুনীল যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িত, সেই সময় বিবাহে পণ গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্ত তাহার কয়েকটি বন্ধু একযোগে ‘পণপ্রথা-নিবারণী সমিতি’ নামক একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। সুনীলের সেই সকল বন্ধু সুনীলকে সেই সমিতির সদস্য হইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে সুনীল বলিয়াছিল,—“আমাদের মত অবিবাহিত যুবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তোমরা যে সমিতি স্থাপন করিয়াছ, কয়েক জন কন্যাদায়গ্রস্ত বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই সমিতির সদস্য হইয়াছেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইবে না; পণ-প্রথা সমাজে চলিতে থাকিবে, এবং উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিবে। যদি তোমাদের অথবা আমাদের মত বিবাহ-যোগ্য অথচ অবিবাহিত যুবকদের অভিভাবকরা এইরূপ সমিতি করেন, তাহা হইলে সেই সমিতির দ্বারা কিছু কাজ হইতে পারে। যে কয় জন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধকে তোমরা সদস্য করিয়াছ, তাঁহারা সকলেই কন্যাদায়গ্রস্ত; সুতরাং তাঁহারা ত সদস্য হইবেনই। আর আমরা বিবাহে পণ লইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও সেই প্রতিজ্ঞার মূল্য কি? আমরা অভিভাবকদের অধীন; কার্যকালে আমরা সকলেই অতিমাত্রায় পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠিব! অথবা ধনবানের একমাত্র কন্যাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিব।”

সুনীলের বন্ধুরা এই কথা শুনিয়া স্থির করিল, সুনীল বিবাহ করিয়া একটা দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছে, সেই জন্তই সে পণপ্রথা-নিবারণী-সমিতির সদস্য হইতে সম্মত হইল না। ভবনাথ নামক সুনীলের এক জন বন্ধু বলিল, “পণপ্রথার জন্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা যে কিরূপ বিপন্ন, পুত্রের বিবাহের প্রস্তাবে অনেক চামার কন্যার পিতার প্রতি কিরূপ নিশ্চয় ব্যবহার করে, তোমার, বোধ হয়, তাহা জানা নাই; যদি সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা থাকিত—”

সুনীল তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “খুব জানি। আমার দিদিদের, বিশেষতঃ, ছোট দিদির বিবাহের সময় আমরা তাহা হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছিলাম।”

ভবনাথ বলিল, “বিবাহের সময় তুমি তোমার স্বস্তরের গলায় পেন্স দেওয়ার জন্ত ছুরিতে শাগ দেবে ত?”

সুনীল বলিল, “তা এখন বলিতে পারি না। আমার বিবাহ ত আমার ইচ্ছায় হইবে না, মা আছে, তিনি যাহা ভাল মনে করিবেন, তাহাই করিবেন। তবে একটা কথা মনে রেখ, স্বস্তরের গলায় আজুল দিয়া টাকা আদায় করিতে না পারিলে স্বস্তরের মেয়েকে ভাল-বাসা যায় না।”

৩

সুনীলের ছোট ভগিনীপতি শশধর কলিকাতায় “নিউ বেঙ্গল একাডেমি” নামক স্কুলের মাষ্টারী করিতেন। তাঁহার পিতা ডাক্তারি ব্যবসায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে টাকা শেষ পর্যন্ত তাঁহার ভোগে লাগে নাই। অর্থলোভে অনেকের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ডাক্তার বাবুও বার্ককে পদার্পণ করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা কি উপায়ে লক্ষ টাকা উপার্জন করিবে, সেই চিন্তায় ক্ষেপিয়া উঠিলেন। হুগলীর এক জন স্ত্রীর্ণবণিক কলিকাতায় পাটের দালালি করিতেন, তাঁহার সহিত ডাক্তারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি প্রায়ই ডাক্তারের নিকটে আসিয়া, পাটের বাজারের “তেজি-মন্দার” গল্প করিতেন। চোটারাম বাটপাড়িয়া ত্রিশ টাকা দরে এক হাজার গাঁইট কণ্ট্রাক্ট করিয়া আঠার দিন পরে সেই পাট ছত্রিশ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিয়া ছয় হাজার টাকা লাভ করিয়াছে; সদানন্দ সাহা চার বৎসর পূর্বে কলিকাতায় খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিত, ‘ফাটকা’ কাজে হাত দিয়া এখন সে পাঁচ-সাত লাখ টাকার মালিক; হারিসন রোডে প্রকাণ্ড পাঁচতলা অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সে তাহাতে বাস করিতেছে,—এইরূপ গল্প বন্ধুর মুখে শুনিতে-শুনিতে ডাক্তার বাবুও পাটের প্রতি ধীরে ধীরে প্রীত হইয়া উঠিলেন। তিনি এই দালাল বন্ধুর হাত দিয়া কিছু কিছু পাটের কাজ আরম্ভ করিলেন। প্রথম বৎসরে হাতে-খড়ি দিয়াই তাঁহার সাড়ে তিন হাজার টাকা, ও

দ্বিতীয় বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা লাভ হইল। দুই বৎসরে আট হাজার টাকা লাভ!—লোভে পড়িয়া তিনি তৃতীয় বৎসরে চৌত্রিশ টাকা মূল্য হিসাবে পাঁচ হাজার গাঁইট পাট ক্রয় করিলেন। তাহার পর বাজার পড়িতে আরম্ভ হইল। এক মাসের মধ্যে গাঁইটের দাম চৌত্রিশ হইতে সাতাশ টাকায় নামিয়া গেল। পাছে আরও দর কমিয়া যায়, সেই ভয়ে তিনি সাতাশ টাকাতেই সমস্ত পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; ইহাতে তাঁহার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লোকসান হইল। এতগুলি টাকার শোক তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, মনঃকষ্টে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

পিতার শ্রাদ্ধের পর শশধর দেখিলেন, তাঁহাদের পিতার নামে ব্যাঙ্কে সাড়ে সতের হাজার টাকা জমা আছে। নীলাধর কাজ-কর্ম কিছুই করেন না, এ অবস্থায় বসিয়া থাকিলে ঐ টাকা শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ, নীলাধরের দুইটি কন্যার বিবাহের ব্যয় হইয়াছে; সুতরাং যেরূপে হউক, কিছু উপার্জন করিতেই হইবে। অনেক চেষ্টার পরে শশধর কলিকাতার নিউ-বেঙ্গল একাডেমিতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটা মাষ্টারী যোগাড় করিয়া লইলেন, এবং ছগলী হইতে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করিয়া চাকরি করিতে লাগিলেন।

এক দিন স্কুলের হেড মাষ্টার জগদীশ বাবু শশধরকে বলিলেন “শশধর বাবু, আপনি ত ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন, শ্রীরামপুরের কোন ভদ্রলোকের দ্বারা আমাকে একটা খবর আনা হইয়া দিতে পারেন? শ্রীরামপুরের অনেকেই ত কলিকাতায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকিতে পারে।”

শশধর বলিলেন, “শ্রীরামপুরের অনেকেই আমি জানি, আপনার কি খবর চাই, বলুন দেখি?”

হেড মাষ্টার বলিলেন, “আমার একটি ভাইয়ের বিবাহের জন্য শ্রীরামপুরে একটি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। ছেলেটির বাপ নেই, মা আছে। শুনেছি, ছেলেটি না কি এম-এ পাশ ক’রে সংপ্রতি একটা গভর্নমেন্ট আফিসে দেড়শ’ টাকায় চাকরিতে ঢুকেছে। সেই ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কেমন, তার অভিভাবক কে, তিনি

কেমন লোক, তাঁদের খাঁই কি রকম, এই সব খবর জানা দরকার।”

শশধর বলিলেন “ছেলেটির বাবার নাম জানেন?”

হেড মাষ্টার বলিলেন, “সুশীল মুখুয্যে, ছেলের নাম সুশীল মুখুয্যে। শ্রীরামপুরে গোসাইপাড়ায় বাড়ী।”

শশধর বলিলেন, “সুশীল? তাকে খুব জানি। তার বাপ সুশীল বাবু আমার স্বশুর, সুশীল আমার শ্যালক!”

হেড মাষ্টার সবিস্ময়ে বলিলেন, “বটে! তবে ত আপনিই সুশীলের অভিভাবক? আমি শুনেছি, পাত্রের ভগিনীপতি তার অভিভাবক।”

“কথাটা শুনেছেন ঠিকই, তবে তার অভিভাবক আমি নই, আমার বড় শ্যালীপতি-ভাই অবনী বাবুই তার অভিভাবক; তিনি শ্রীরামপুরের উকীল। সুশীল ছেলে খুব ভালই বটে, এণ্ট্রান্স থেকে এম-এ পর্যন্ত সব এগজামিনেই সে ফার্স্ট হ’য়ে এসেছে। আমার শান্তুড়ীও খুব ভাল লোক। সুশীলের স্বাস্থ্য খুব ভাল, দেখতেও অতি সুশ্রী; স্বভাব-চরিত্র—আমি যত দূর জানি—নির্মল। তবে তাদের খাঁই কি রকম হবে, সেটা আমি ঠিক জানি না, সে সব কথা অবনীদা’ জানেন। আমার মনে হয়, চার-পাঁচ হাজারের কম হবে না। আমার বিবাহে, আমার স্বশুর পৌনে চার হাজার টাকা দিয়েছিলেন, তখন আমি সবে বি-এ পাশ ক’রেছি। সেই জন্তই মনে হয়, সুশীলের দাম চার-পাঁচ হাজার টাকার কম হবে না।”

হেড মাষ্টার বলিলেন, “দাদা কি পাঁচ হাজার টাকা খরচ কর্তে পারবেন? তিনি পৌনে দু’শ টাকা মাইনে পান; তাঁর বড় ছেলে অমিয় এই সবে ওকালতি আরম্ভ ক’রেছে।”

শশধর বলিলেন, “আপনারা সুশীলের সন্ধান পেলেন কিরূপে?”

“অমিয়ই সন্ধান দিয়েছে। অমিয়ার সঙ্গে সুশীলের খেলাধুলো নিয়ে আলাপ পরিচয় হ’য়েছিল। দেখা যাক, দাদাকেও বলি, তার পর মেয়ের কপাল। আমার ভাইঝি সুমিত্রা বড় ভাল মেয়ে। গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম, রান্না-বাড়া, লেখাপড়া—সব বিষয়ে ভাল। রূপেও যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।”

শশধর বলিলেন, “আপনারা অবনীদা’কে গিয়ে

ধরুন, তিনি যদি মত দেন, তা হ'লে আমার শাণ্ডীর, কি সুনীলের অমত হবে না।”

“তাই হবে। আগামী রবিবারে দাদাকে শ্রীরামপুরে যেতে বলি।”

পরবর্তী রবিবারে হেড মাস্টার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর মৃত্যুঞ্জয় বাবু, পুত্র অমিয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুরে অবনী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অবনী বাবু তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলিলেন, “আমি কন্যাদায়গ্রস্ত; দায় উদ্ধারের জন্ত আপনার দ্বারস্থ।”

অবনী বাবু বলিলেন, “কন্যাদায়ে আমার দ্বারস্থ? আমার ত বিবাহযোগ্য কোন পুত্র নাই।”

“তাহা জানি। আপনার সখকী সুনীলের জন্ত আসিয়াছি। সুনীলাম, আপনি তাহার অভিভাবক, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।”

“আমি সুনীলের ঠিক অভিভাবক নই। এ বিষয়ে আমার শাণ্ডীর মতামুসারেই কার্য হইবে। আপনি বিষয় কন্ঠ কি করেন?”

“কলিকাতায় একটা বেসরকারী কলেজে প্রোফেসারি করি।”

অবনী বাবু বলিলেন, “সুনীল বি-এ পাশ করিবার পর হইতে অনেকেই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু সুনীল উপার্জনশীল না হইলে বিবাহ করিবে না বলাতে, তাঁহারা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি সুনীল একটা কাজ পাইয়াছে, সুতরাং এখন আর সে-আপত্তি চলিবে না। চলুন, তাহাদের বাড়ীতে গিয়া আমার শাণ্ডীকে জিজ্ঞাসা করি।”

অবনী বাবুর সঙ্গে সকলে সুনীলদের বাড়ীতে গিয়া গুলিলেন যে, সুনীল বাড়ীতে নাই, কলিকাতায় গিয়াছে। অবনী বাবু আগস্কেকদ্বয়কে সুনীলের বৈঠকখানায় বসাইয়া বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন, এবং প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “আমার শাণ্ডী বলিলেন, আগে মেয়েটিকে দেখিয়া পরে অন্যান্য কথাবার্তা হইবে। তাঁহার ইচ্ছা, আমি এবং আমার স্ত্রী এক দিন গিয়া দেখিয়া আসিব। কিন্তু আজ আপনারা ত সুনীলকে দেখিতে পাইলেন না; সে কখন আসিবে ঠিক নাই।”

অমিয় বলিল, “সুনীল বাবুকে আমার দেখা আছে। আমি যখন ল' পড়িতাম, তিনি তখন বি-এ পড়িতেন। আমরা দুই জনেই এরিয়াল ক্লাবের মেম্বর ছিলাম।”

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলিলেন, “আমার মেয়েকে দেখিবার জন্ত কবে আপনাদের যাইবার সুবিধা হইবে?”

“আগামী শনিবার বৈকালে বা রবিবারে যাইতে পারি। দিন স্থির করিয়া আপনাকে পত্র লিখিব।”

অবনী বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে ও অমিয়কে জলযোগ করাইয়া স্টেশন পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন।

৪

সুমিত্রাকে দেখিয়া অবনী বাবুর ও নির্মলার খুব পছন্দ হইল; না হইবার কোন কারণ নাই। তাহার রং গোলাপ ফুল বা হুখে-আলতার মত না হইলেও উজ্জল গৌর; ঘন-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপের নীচে সপ্তমীর চন্দ্রের স্নায় আয়ত কপাল, এবং অতি সুশ্রী মুখমণ্ডল। তাহার স্নন্দর চকুর এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—সে-মুখ হইতে চকু ফিরাইতে ইচ্ছা হইত না। তাহার অঙ্গসৌষ্টব্যও অনিন্দনীয়। সর্বদা পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ সুপ্রকাশ।

মৃত্যুঞ্জয় বাবুর পত্নী প্রৌঢ়া, নির্মলার মাতার সমবয়সী। তিনি নির্মলাকে বলিলেন, “মা, তোমার ভাইকে সঙ্গে ক'রে আনলে ভাল হ'ত, এখনকার ছেলে,—প্রায় সকলেই নিজেরা চোখে দেখে বিয়ে করে।”

নির্মলা বলিল, “আমার ভাই সে-কালের ছেলে, উনি তাকে সঙ্গে আসবার কথা বলেছিলেন, সে বলে, ‘বড় দিদিকে নিয়ে আপনি যাচ্ছেন, আপনারা দেখে একটা কুৎসিত কানা-খোঁড়া মেয়েকে আমার জন্ত পছন্দ করে আসবেন? আপনারা যাকে পছন্দ করবেন, তাকে আমার অপছন্দ হবে না।’”

গৃহিণী বলিলেন, “তোমরা যে পছন্দ করেছ, তাতেই আমার অর্ধেক ভয় কেটে গেল। এখন দেনা-পাওনার একটা আঁচ পেলে বুঝতে পারি।”

“তার জন্তে আপনারা ভাববেন না।”

অবনী বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে বলিলেন, “আপনার

যেয়েকে দেখিয়া আমাদের পছন্দ হইয়াছে। আপনারা আশীর্বাদ করিতে কবে যাইবেন ?”

“দেনা-পাওনার একটা মীমাংসা—”

বাধা দিয়া অবনী বাবু বলিলেন “তার জন্ত কিছু আটকাবে না ; আশীর্বাদের দিনই তার মীমাংসা হবে।”

“তবু পূর্বে একটু আভাষ পেলে আশ্বস্ত হ’তে পারি—
“সে আশ্বাস আমি দিয়েই যাচ্ছি।”

দশ দিন পরে, জন্মাষ্টমীর ছুটিতে মৃত্যুঞ্জয় বাবু তাঁহার ভ্রাতা সিদ্ধেশ্বর বাবু (হেড মাষ্টার), অমিয় এবং তাঁহাদের পুরোহিত মহাশয়কে লইয়া সুনীলদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, অবনী বাবু, শশধর বাবু, সুনীলের প্রতিবেশী তিন-চারি জন বয়স্ক ৩দ্রলোক সেখানে উপস্থিত আছেন। তাঁহারা আগন্তুকগণকে সাদর সম্বাষণের পর বৈঠকখানায় বসাইয়া নানারূপ আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

অল্প কাল পরে সুনীল সেখানে আসিলে অবনী বাবু বলিলেন, “সুনীল, ইনি মৃত্যুঞ্জয় বাবু—তোমার ভাবী স্বশুর, ইনি সিদ্ধেশ্বর বাবু—তোমার খুড়-স্বশুর, ইনি উঁহাদের পুরোহিত, আর ইনি অমিয় বাবু—মৃত্যুঞ্জয় বাবুর পুত্র ; অমিয় বাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে।”

সুনীল প্রথমোক্ত তিন জনকে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া অমিয় বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, “অমিয় বাবু আমার পুরাতন বন্ধু।” সে অমিয়কে সঙ্গে লইয়া পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রবেশ করিল।

সুনীলের পুরোহিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সেই কক্ষের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “বারবেলা কাটিয়া গিয়াছে, শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।”

অবনী বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে বলিলেন, “তবে অমুগ্রহ করে আপনারা একবার বাড়ীর ভিতরে আসুন। যাহাকে আপনি কস্তাদান করিবেন, তাহার বাড়ী-ঘর দেখা আবশ্যিক। আসুন মাষ্টার মহাশয়।”

সকলে অন্তঃপুরে দ্বিতলের একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আশীর্বাদের জন্ত ধান, দুর্কা, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। সকলে উপবেশন করিলে শশধর বাবু সুনীলকে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন,

এবং সুনীলকে তাহার জন্ত নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করাইলে অবনী বাবু বলিলেন, “আপনারা সকলে একে একে আশীর্বাদ করুন।”

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলিলেন, “আশীর্বাদ ত করব, কিন্তু আসল কথাটা—”

অবনী বাবু বলিলেন, “মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তিনি বলেন, আজ আশীর্বাদই আসল কাজ।”

অগত্যা মৃত্যুঞ্জয় বাবু সুনীলকে যথারীতি আশীর্বাদ করিয়া তাহার হাতে এক সেট সোনার বোতাম প্রদান করিলেন। যদি দেনা-পাওনার কথা মিটিয়া যায়, তাহা হইলে সেই দিনই বোতাম দিয়া আশীর্বাদ করিবেন ভাবিয়া, তিনি উহা লইয়া আসিয়াছিলেন।

আশীর্বাদের পর আগন্তুক ও প্রতিবেশীদিগের জলযোগ শেষ হইলে অবনী বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে বলিলেন, “মা এই পর্দার আড়ালে আসিয়া বসিয়াছেন। দেনা-পাওনার কথাটা তিনি নিজেই বলিবেন।”

মৃত্যুঞ্জয় বাবু তৎক্ষণাৎ সেই পর্দার নিকটে গিয়া করযোড়ে বলিলেন, “যখন আশীর্বাদ হইয়া গেল, তখন আমাকে, আপনি আপনাকে ‘বেয়ান’ বলিবার অধিকার দিয়াছেন। সেই অধিকার-বলেই আমি আপনার দয়া প্রার্থনা করিতেছি।”

অবনী বাবু পর্দার নিকটেই বসিয়াছিলেন, গৃহিণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলিলেন, “বাবা অবনী, বেয়াই মহাশয়কে বল, উনি শ্রোত্রীয়, আমরা কুলীন। কুলীনের ছেলে শ্রোত্রীয়ের বাড়ীতে বিবাহ করিলে, কোলীত্র-মর্যাদা স্বরূপ কিছু টাকা পাইবার অধিকারী। আমি আমাদের বংশের সেই অধিকার উড়াইয়া দিতে পারিব না, তাঁহার নিকট হইতে গণপণের টাকা আমাকে লইতেই হইবে ; আমি এক পয়সাও কম লইতে পারিব না। বেয়াই মহাশয় বিজ্ঞ, পণ্ডিত লোক ; উনি জানেন যে, শ্রোত্রীয়ের নিকট হইতে আমরা ষোল টাকা মর্যাদা পাইয়া থাকি। তার পর গহনার কথা। বিবাহে শাঁখা আর লোহা দিতে হয়, ইহাও সকলেই জানে ; বেয়াই মহাশয়ও নিশ্চয়ই জানেন। বরাভরণে একটা আংটি ও চলির জোড় দিতে হয়। সুনীল কখনও আংটি পরে না, পাথর-বসানো আংটি

দিবেন না, যখন ব্যবহার করিবে না, তখন অনর্থক কতক-
গুলি টাকা খরচ করিয়া দামী আংটি কিনিবার দরকার
নাই। চলির জোড় সঙ্কেও ঐ কথা। বিবাহের সময়
ছুই-এক বার পরা হয়, তাহার পর বাস-তোরঙ্গতে তোলা
থাকে, পোকায় কাটে।—হাঁ, একটা কথা। ঘড়ি—ঘড়ির
চেনও দিবার দরকার নাই। কর্তার যে ঘড়ি ছিল, সুনীল
সেইটাই ব্যবহার করে; এক জনে আর ক'টা ঘড়ি ব্যবহার
করিবে? খাট-বিছানা, দান-সামগ্রীরও প্রয়োজন নাই,
সব-ই ত বাড়ীতে আছে। যা বাড়ীতে আছে, তা' নিয়ে
আর কি হবে?”

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন, “যদি কিছু আপনার প্রয়োজন
নাই, তবে আমরা কি দিব?”

গৃহিণী বলিলেন, “প্রয়োজন আছে বই কি? আমার
ছ'টি মেয়ে, ছ'জনেই শশুরবাড়ীতে থাকে। বার মাস
আমার কাছে রাখবার জন্ত আমি একটি মেয়ে চাই।
যাকে আমি মনের মত ক'রে গ'ড়ে তুলব, আমার বুড়ো
বয়সে আমার সেবা করবে, আমাকে 'মা' ব'লে ডাকবে,
সর্বদা আমার কাছে থাকবে, এমন একটি মেয়ে আমার
দরকার। তাই বেয়াই মশায়ের কাছে স্মিত্রাকে আমি
ভিক্ষা চাচ্ছি। এই আমার দাবী, এ-ছাড়া আমার আর
কোন দাবী-দাওয়া নাই। তবে বেয়াই মশায় নিজের
ইচ্ছায় মেয়ে-জামাইকে যা দিতে চান দিবেন, সে সঙ্কে
আমার কিছু বলিবার নাই। হাঁ, আর একটা কথা;
বিবাহে ব্যয়বাহুল্য করিতে গিয়া বেয়াই মশায় যেন
দেনা না করেন; দেনাকে আমার বড় ভয়! আমার যত
দিন দেনা ছিল, তত দিন চুচিন্তায় আমি ঘুমাইতে
পারি নাই।”

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া শশধর নতমস্তকে বসিয়া
রহিলেন। তাঁহার পিতা সুনীল বাবুকে কিরূপ নির্ভর
ব্যবহারে বিপন্ন ও ঋণগ্রস্ত করিয়া কতাদায় হইতে
উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে-কথা স্মরণ হওয়ায় লজ্জায়
তিনি মুখ তুলিতে পারিলেন না।

সুনীলের জননী নীরব হইলে মৃত্যুঞ্জয় বাবু ক্ষণকাল
গভীর বিন্ময়ে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন; তাহার
পর কৃতজ্ঞতায় উবেলিত কণ্ঠে বলিলেন, “করুণাময়ী
ভগবতীকে দেখিবার সৌভাগ্য কখনও লাভ করিতে

পারি নাই; আপনার কণ্ঠে বিশ্বজননী অতমার অতমপ্রদ
কণ্ঠধর শুনিয়া আজ আমি কৃতার্থ। আপনি আমার
প্রণাম গ্রহণ করুন।”—তিনি পর্দার অন্তরালে অবস্থিত
গৃহিণীর উদ্দেশে ভূতলে মস্তক স্পর্শ করিলেন।

গৃহিণী ব্যগ্র-কণ্ঠে বলিলেন, “ও কি কথা? বয়সে,
জ্ঞানে, বিদ্যায়—সকল বিষয়ে আপনি আমার অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে এ ভাবে অপরাধিনী করিবেন না;
আমিই আপনাকে প্রণাম করি।”

৭ই অগ্রহায়ণ সুনীলের সঙ্গে স্মিত্রার বিবাহ হইয়া
গেল।

* * * *

২৭শে পৌষ বেলা ৩টার সময় শশধর বাবু ক্লাশে পড়া-
ইতেছিলেন, এমন সময় স্কুলের বেহারী আসিয়া বলিল,
“হেড মাষ্টার বাবু সেলাম দিয়া।” তিনি ছাত্রদিগকে স্থির
হইয়া বসিতে বলিয়া হেড মাষ্টারের নিকট গমন করিলে,
হেড মাষ্টার বাবু বলিলেন, “শশধর বাবু, এইমাত্র বাড়ী
হইতে সংবাদ পাইলাম, সুনীল শীতের তত্ত্ব ফিরাইয়া
দিয়াছে; কারণ ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দাদা
জিনিষ ভালই দিয়াছেন, আশুন না, একবার বাড়ীতে গিয়া
খবরটা লওয়া যাউক।”

শশধরের মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার পিতাও সুনীল
বাবুর প্রেরিত শীতের তত্ত্ব ফেরত দিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়
বাবু তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, “সুনীল বাবাজী
অমিয়র নামে একখানা চিঠি দিয়াছেন; চিঠির মর্ম্ম আগে
জানুতে পারলে আর আপনাকে তাড়াতাড়ি ডাকতে
পাঠাতেম না।”

শশধর বলিলেন, “সুনীল কি লিখেছে?”

মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, “পড়ে দেখুন।” পত্রখানি তিনি
শশধরের হাতে দিলে শশধর তাহা পাঠ করিয়া হেড
মাষ্টারকে সুনাইলেন।

“প্রিয় অমিয় বাবু

আমি যে মাসিক দেড় শত টাকা বেতনের কেরাণী,
এ কথা আপনারা ভুলিলেও আমি ভুলিতে পারি না।
আপনারা যে শীতের তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া
আমাদের প্রতিবেশীরা সকলেই যৎপরোনাস্তি প্রশংসা
করিয়াছে; আমার মা'ও খুব আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু

আমার মনে হয়, আপনাদের প্রেরিত শালখানি গায়ে দিয়া ভঙ্গমাজে যাইতে আমার ভদ্রোচিত কুণ্ডা হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের কয়েক জন বিজ্ঞ প্রতিবেশী এই শাল দেখিয়া বলিলেন, উহার মূল্য তিন শ' সাড়ে তিন শ' টাকা ত বটেই। মূল্য যদি তিন শ' টাকাও হয়, তাহা হইলে উহা আমার দুই মাসের বেতনের সমান। এক জন দেড় শত টাকা বেতনের কেরাণী তিন শত টাকা দামের শাল গায়ে দিয়া ঝাড়নে কপি-কড়াইশুটি বা বোম্বাই আম বাধিয়া কলিকাতা হইতে বাড়ীতে লইয়া যাইতেছে, ইহা কি অদ্ভুত দৃশ্য নহে? সেই ব্যক্তির বিন্দুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞান থাকিলে সে কি লজ্জায় মুখ লুকাইবে না? আমাকে যদি চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দামের একখানা শাল দিতেন, তাহা আমি অসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারিতাম। কিন্তু তিন শত টাকা দামের শাল ব্যবহার করা কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের ন্যায় লজ্জাজনক মনে করি।

আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিবেন? এই শালখানা

আপনি ব্যবহার করিবেন। আপনি উকীল, আপনার আয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা হইতে পারে, আবার পাঁচ-সাত শত টাকা হওয়াও অসম্ভব নহে; সুতরাং আপনার ঐ শাল ব্যবহার অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু আমার বর্তমান অবস্থায় ঐ শাল গায়ে দিতে বড় লজ্জা হইবে, অস্বস্তি বোধ করিব; অথচ বহুমূল্য জিনিষ ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখিলে পোকায় নষ্ট করিবে, এইজন্য ইহা রাখা সঙ্গত মনে করিলাম না; আশা করি, ইহা আমার উদ্ধত্য মনে করিবেন না।।।।”

পত্র পাঠ করিবার সময় শশধরের হাত কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার পিতা কর্তৃক তাঁহারও শীতের তত্ত্ব ফেরত দেওয়ার কথা স্মরণ হইল। তিনিও তাহা ফেরত দেওয়ার কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়ায় শশধরের মাথা লজ্জায় বৃকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মাটির প্রেম

হে বিরাট মাটি—

আঁকি তব অন্তরের সমুজ্জল ছবি,
তোমারি বন্ধের রাজ্যে হ'ব আমি কবি।
নব নব রূপে,
তোমারে গড়িব আমি নিত্য চুপে-চুপে।

কুদ্র যাহা, হেয় যাহা, সবার আঁখিতে
মহান্ সৌন্দর্য্যে তারে আঁকিব চকিতে।

বিরহ-বেদনা,

মুছিয়া ফেলিব আঁকি আশার আন্ননা।

গর্জিয়া উঠুক রোষে শ্মশান হতাশ

আমি এনে দিব সেথা মুক্তির বাতাস।

মিথ্যার সঙ্কানে,

আজীবন ফিরিব না সত্য অনুমানে।

সাজায়ে বসন্ত-প্রাতে পুষ্প-আভরণে

মাতিব তোমারি পুষ্প তোমার পূজনে।

পবিত্র সজ্জায়,

দিব না অঞ্জলি আমি উর্ধ্বশীর পায়,

মাতিয়া রহিব সদা কমল-মায়ায়
পঙ্ক রবে ঢাকা পদ্ম-পত্রের ছায়ায়।

ওগো মোর মাটি,

আঁকিব তোমারি রূপ যুগ যুগ খাটি।

স্বর্গ সে তো কল্পনার অনিশ্চিত ছবি,

সত্য তুমি তব বন্ধে মহাসত্য সবি

সেই বেশী নয়,

যাহা মাই নিত্য তারি অপচয় ভয়।

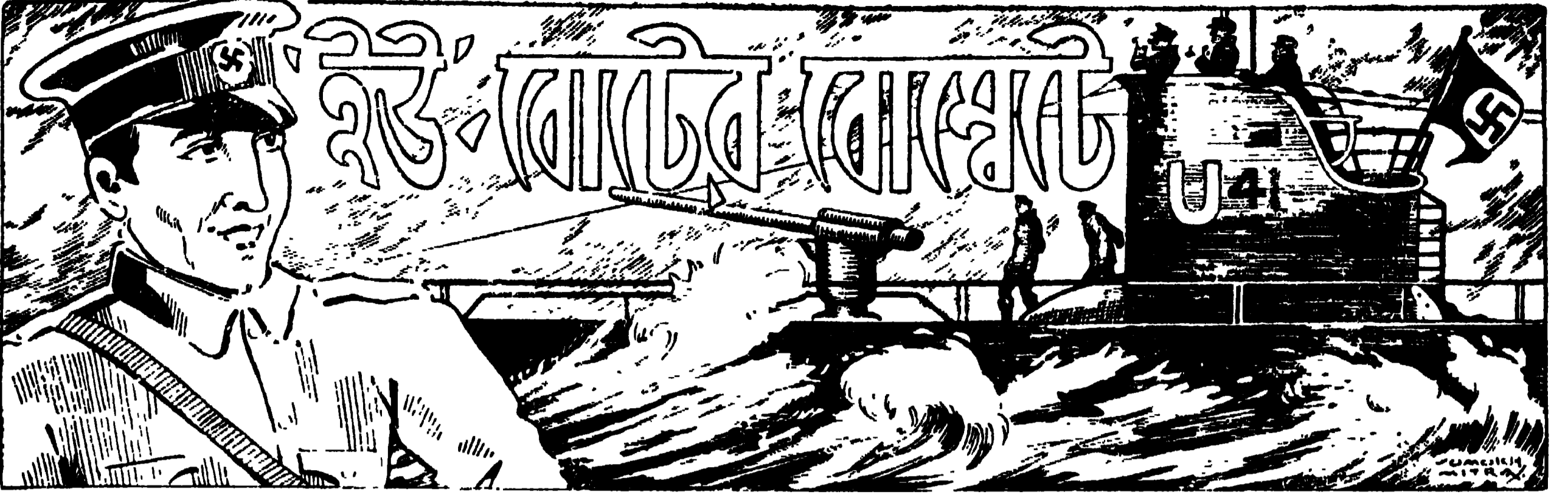
আশীর্বাদ কর মোরে দাও মোরে দাবি

আঁকিতে ক্ষমতা দাও তব রূপ-ছবি।

জীবনে মরণে,

তোমার এ মহা সত্য ছড়াইতে গানে।

শ্রীনিভা দেবী



একবিংশ পর্ব

উপকূল-রক্ষীবর্গের আবির্ভাব !

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

আমস্ সেই দিন প্রভাতে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে পাক-শালায় প্রবেশ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের অদূরবর্তী চেয়ারে উপবেশন করিলে আমি তাহাকে বলিলাম, “কাপ্তেন লড-উইগ, তন রথভেন এবং লেফ্টেনাণ্ট হ্যাগেন তাহাদের ‘ইউ’-বোটে আমাদের দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইয়াছে ; কিন্তু দিবাভাগে এখানে তাহারা উঠিয়া আসিবে—তাহার সম্ভাবনা নাই। এজন্য তাহারা সমুদ্র-গর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের প্রতীক্ষা করিতেছে।”

কিন্তু আমার কথাগুলি শুনিয়া আমস্ ভাল-মন্দ কোন কথা বলিল না ; সে যেন আমার কথা শুনিতে পায় নাই, এই ভাবে চিন্তাকুল চিন্তে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া, অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পাইপ হইতে ধূমরাশি উদগারণ করিতে লাগিল। এই ভাবে কয়েক মিনিট বসিয়া-থাকিয়া সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া আমার ও মেরীর মুখের দিকে চাহিল ; তাহার পর আমাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া নীরস স্বরে বলিল, “আমি কি সঙ্কল্প করিয়াছি—তাহা তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কি ? আমি কি ভাবিতেছি, তাহা তোমরা অনুমান করিতে পার ?”—ঝটিকার পূর্বে প্রকৃতি যেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে—তাহার মুখ সেইরূপ গম্ভীর।

তাহার মনের কথা আমরা কিরূপে বুঝিব ?—তাহার প্রশ্ন শুনিয়া আমি কোন কথা বলিলাম না ; কিন্তু মেরী আমার মুখের উপর প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমস্কে বলিল, “তুমি কি সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই ; তুমি কি ভাবিতেছ—তাহাই বা

কিরূপে অনুমান করিব ? তা তোমার সঙ্কল্পটা কি, তাহা যদি আমাদের নিকট প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বলিতে পার ; তাহা শুনিতে আমাদের আপত্তি নাই।”

আমস্ তামাকের পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আমি সঙ্কল্প করিয়াছি—জার্মানদের ‘ইউ’-বোটের খোরাকের ঐ আড্ডাটা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিব। সেই নাজী শূয়ারটা আমাকে চাব্কাইয়া দেওয়ার পর হইতেই আমি এই কথা চিন্তা করিতেছি।”

মেরী তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময় দমন করিয়া বলিল, “তুমি যে দীর্ঘকাল হইতে জার্মানদিগকে এই ভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছ—ইংরেজদের নিকট এ কথা প্রকাশ করিবার জন্ম সত্যই কি তোমার আগ্রহ হইয়াছে ?”

আমস্ মুখের একটা কদর্য্য ভঙ্গী করিয়া মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, “আগ্রহ হয় নাই ত আমি কি তোমাদিগকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্ম এ কথা বলিতেছি ? হাঁ, আমি এ কাজ করিবই। তবে এই সংবাদ জানিতে পারিলে বৃটিশ সরকার আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা জানিতে পারিলে আমার মন স্থির হইত। আমার বিশ্বাস, এ কথা শুনিলে তাহারা আমাকে গুলী করিয়া মারিবে না।”

মেরী গম্ভীর স্বরে বলিল, “এ তোমার অসঙ্গত আশা ! তোমার সাহায্যে জার্মান ‘ইউ’-বোটগুলো শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমুদ্রে-সমুদ্রে বৃটিশ জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে ; তাহাদের কত ধন-সম্পত্তি, যুদ্ধের উপকরণ নষ্ট করিয়াছে ; কত স্ত্রীর সংসারে আগুন জ্বালিয়াছে। হাঁ, তোমার সাহায্যেই এরূপ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

ইংরেজ ইহা জানিতে পারিলে তোমাকে ক্ষমা করিবে ? তাহারা ঠিক তোমাকে ক্যাপা-কুকুরের মতো গুলী করিয়া মারিবে। নৌ-সামরিক আদালতের বিচারে তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে; এবং এক জন সৈনিকের নহে—পাঁচ-সাত জন সৈনিকের রাইফেলের গুলীতে তোমার দেহ মৌচাকের মতো ঝাঁঝ হইবে। তোমার ঐ শুভ-বুদ্ধির উদয় হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।”

আমস্ কণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “কিন্তু তাহারা ত তোমার বুদ্ধিতে কাজ করিবে না, মেরী! তাহাদের আরও অনেক কথা ভাবিবার আছে। যদি আমি তাহাদের নিকট সকল কথা সরল ভাবে স্বীকার করি, জার্মান ‘ইউ’-বোটগুলো রাত্রিকালে কি ভাবে এখানে আসিয়া খোরাক সংগ্রহ করিয়া সাগরে-সাগরে বোম্বটে-গিরি করিয়া বেড়ায়, তাহা যদি প্রকাশ করি এবং কৌশল করিয়া দুই-একখান ‘ইউ’-বোট তাহাদের হাতে ধরাইয়া দিই, তাহা হইলে তাহারা আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারে।”

আমসের কথা শুনিয়া মেরী নিঃশব্দে উঠিয়া-গিয়া তাহার সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, এবং হাত দু’খানি আড়াআড়ি ভাবে বুকের উপর রাখিয়া ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তীব্র স্বরে বলিল, “যে সব কথা তুমি এখনই বলিলে, উহা সত্যই কি তোমার অন্তরের কথা?”

আমস্ মেরীর মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিল না; সে মুখ নামাইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে বলিল, “হাঁ, উহাই আমার অন্তরের কথা; আমার মনের কথা না হইলে ও-কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতাম না।”

মেরী বলিল, “কিন্তু এই রকম চালাকি—চালাকি কেন—ইহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলাই ঠিক—এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে বিন্দুমাত্রও লাভ নাই, এত দিনেও ইহা তুমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলে না?”

আমস্ গম্ভীর স্বরে বলিল, “বিশ্বাসঘাতকতা? তুমি কি বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, মেরী।”

মেরী বলিল, “বুঝিতে তুমি সবই পারিয়াছ; কেবল আমার কাছে শ্রাকামি করিতেছ বৈ ত নয়! তুমি

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তোমার আশ্রয়প্রার্থী সেই বিপন্ন জার্মান নাবিকটাকে বড়-দেশে লইয়া যাইতেছ বলিয়া নির্জন রুইস্ দ্বীপে নির্বাসিত করিয়া আসিলে! এই বিশ্বাসঘাতকতার কি ফল হইয়াছে, তাহা তুমি এত শীঘ্র নিশ্চিতই বিশ্বাস হও নাই।”

আমস্ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “সে স্বতন্ত্র কথা!”

মেরী বলিল, “না, স্বতন্ত্র কথা নয়। কাউন্ট জোলার্ন তোমাকে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? তিনি যে-সময় তোমাকে সতর্ক করিয়াছিলেন, সে-সময় আমি তাঁহার কথা শুনিতে না পাইলেও পিটার পরে আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি তোমাকে বলিয়াছিলেন—জার্মানীর দৃষ্টি সর্বত্রব্যাপী—যেখানে যাহা ঘটে, তাহা তাহারা জানিতে পারে। যদি তুমি জার্মানদের এই গুপ্ত আড্ডার সংবাদ ইংরেজদের নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে তাহার কি ফল হয়, তাহা তোমার জানিতে বিলম্ব হইবে না।”

আমস্ বলিল, “তুমি বলিতে চাও—জার্মানরা তাহা জানিতে পারিলে আমার প্রতি অত্যাচার করিবে, আমাকে নানা ভাবে বিপন্ন করিতে পারে; কিন্তু ইংরেজরা আমাকে রক্ষা করিবে।—বৃটিশের আশ্রয়ে আমি নিরাপদ হইতে পারিব।”

মেরী দৃঢ় স্বরে বলিল, “না, ইংরেজরা তোমাকে আশ্রয় দিবে না, রক্ষাও করিবে না। তোমাকে তাহারা গুলী করিয়া হত্যা করিবে। স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের যাহা প্রাপ্য, তাহাদের নিকট তাহাই পাইবে। তাহাদের অমুগ্রহ লাভ করিতে পার—এরূপ কোনও কাজ তুমি করিয়াছ কি? আর যদি তাহারা কোন কারণে তোমাকে গুলী করিয়া হত্যা না করে, তাহা হইলেও তোমার নিস্তার নাই; জার্মানরাই সে কাজ করিবে।”

আমস্ বলিল, “তোমার কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না! ইংরেজরা যদি আমাকে হত্যা না করে, তাহা হইলে জার্মানরা কিরূপে আমাকে হাতে পাইবে? আমি কি এতই নির্বোধ যে, ইচ্ছা করিয়া তাহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিব?”

মেরী বলিল, “না, তাহাদের হস্তে তোমার আত্ম-সমর্পণ করিবার প্রয়োজন হইবে না; তুমি প্রাণভয়ে



যেখানে লুকাইয়া থাকিবে, সেই স্থান হইতেই তাহারা তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। তাহারা ব্ল্যাক-গল ফাশ্বের মালিক বিশ্বাসঘাতক আমস্ ফ্রোবিকে আশ্রয়কার অবসর দান করিবে না; এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।”

আমস্ এবার অশ্রুট স্বরে বলিল, “কথাটা তুমি মিথ্যা বল নাই, মেরী! আমি ঐ ভয়ই করিতেছি—ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।”

মেরী বলিল, “না, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। আরও একটা কথা তোমার চিন্তা করা উচিত। আমি আমাদের কথা বলিতেছি। আমার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? পিটারেরই বা কি দশা হইবে? তুমি অর্থলোভে স্বদেশদ্রোহিতা করিয়াছিলে, স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিলে; যখন এই অগ্নায় কার্যে আমরা তোমাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করি, তখন আমরা কি গর্হিত কার্য করিতেছিলাম—তাহা বুঝিতে পারি নাই; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। আমরা দিগকে যখন যাহা আদেশ করিয়াছি, কর্তব্যবোধে সেই আদেশই পালন করিয়া আসিয়াছি। যে সকল কার্য আমরা দিগকে করিতে বাধ্য করিয়াছিলে, তাহা করা উচিত কি অমুচিত—ইহা কোন দিন চিন্তা করি নাই এবং আমাদের তাহা বুঝিবারও শক্তি ছিল না।”

আমস্ মেরীর কথা শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না; সে নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিল।

তাহাকে নির্বাক দেখিয়া মেরী কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, “কথা কহিতেছ না যে! কি ভাবিতেছ?”

আমস্ হতাশ ভাবে বলিল, “কি আর ভাবিব? তোমার কথা যে সত্য, ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেই জার্মান শূয়ারটার আদেশে জার্মান নাবিকগুলা যে-ভাবে আমাকে চাব্কাইয়া দিল—সেই চাবুক খাইয়া আমি এত দূর—”

মেরী তাহাকে মুখের কথা শেষ করিতে না দিয়া দুই হাতে তাহার চেয়ারের দুই হাতা চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সহায়ত্ব ভরে বলিল, “তা জানি। চাবুকের আঘাতে তোমার কি যন্ত্রণা হইয়াছে, তুমি কিরূপ কষ্ট পাইয়াছ, তাহা আমি বেশ

বুঝিতে পারিয়াছি। আমি নারী, তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছিল; আমার মনে হইয়াছিল—সেই চাবুকগুলা যেন আমারই পিঠে পড়িয়াছিল! কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, সে জ্ঞাত এখন আর আক্ষেপ করিয়া কি ফল? এখন তুমি সে সকল কথা ভুলিয়া যাও এবং পুনর্বার তোমাকে ঐ ভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হইয়া তোমার কর্তব্যপথ বাছিয়া লও।”

মেরী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আমসের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল; তাহার পর সে কোমল স্বরে বলিল, “ও-সকল কথা আর তুমি ভাবিও না; ও-সকল কথার আর আলোচনা না করাই ভাল। অপ্রীতিকর অতীত কথা ভুলিলে তুমি শান্তিলাভ করিতে পারিবে।”

আমস্ বলিল, “আমি স্বীকার করি, তোমার কথাগুলি অসঙ্গত নহে; কিন্তু ঐ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া আমার মনের ভাব যে রূপ হইয়াছিল—তাহাই তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি।”

মেরী তাহাকে সান্ত্বনাদানের জ্ঞাত বলিল, “তোমার মনের কষ্ট আমি বুঝিতে পারিয়াছি। ঐ প্রকার ব্যবহারের ফলে মনের ভাব ঐরূপ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তোমাকে বলিয়াছি ত, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। ঐ সকল কথার আলোচনা করিয়া কোন লাভই নাই, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছ। প্রহারের বেদনা শীঘ্রই সারিয়া যাইবে; তুমি সুস্থ হইয়া উঠিবে। এখন তুমি অনেকটা সুস্থ হইয়াছ; কেমন, এ কথা কি সত্য নহে?”

আমস্ অশ্রুট স্বরে বলিল, “হাঁ, তা—তা কতকটা সত্য বটে।”

মেরী হাসিয়া বলিল, “তবে আর ঐ সব কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই।”—সে আমসের পিঠে আরও কয়েকবার ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া নিজেই কাজে চলিয়া গেল।

মেরী কি কৌশলে আমসের হৃদয় সঙ্কল কাঁচাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া গেল, ইহার পরিচয় পাইয়া মনে মনে তাহার বুদ্ধির তারিফ করিলাম। মেরীর বাক-পটুতায় ও স্নেহভুক্তিতে আমসের মনের ভাব পরিবর্তিত

হইয়াছে—তাহাও অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলাম। কাপ্তেন ভন্ রথভেন ও লেফ্টেনাণ্ট হ্যাগেন রাত্রিকালে আমাদের পাকশালায় আসিতে পারে শুনিয়া, আমস্ প্রথমে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করে নাই; কিন্তু মেরী তাহাকে সাস্থনা দান করিয়া অল্প কার্যে প্রস্থান করিবার পর আমস্ আমাকে বলিল, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি যেন সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া ‘ইউ’-বোটের আরোহীদ্বয়কে সাক্ষেতিক আলো দেখাই; নতুবা তাহারা এখানে আসিতে সাহস করিবে না, এবং দীর্ঘকাল সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় থাকিয়া তাহাদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

শীতের অপরাহ্নের অবসানে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্বেই আমস্ পাকশালাস্থিত অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত চেয়ার হইতে উঠিয়া, বাহিরের দিকের বাতায়নের ভিতর দিয়া সমুদ্র-বেলায় অভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে মেরীকে সেই মুহূর্তে পাকশালায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমাদের উভয়েই লক্ষ্য করিয়া বলিল, “হাল্লো, সমুদ্রের দিক হইতে ও-কে আসিতেছে—দেখ তো তোমরা!”

সেই সময় আমাদের বাড়ীতে বাহিরের কোনও লোকের আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; এই জন্ত আমি ও মেরী উভয়েই ব্যগ্র ভাবে বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। সেই রাত্রে কাপ্তেন ভন্ রথভেন এবং লেফ্টেনাণ্ট হ্যাগেন ‘ব্ল্যাক-গল ফার্শে’ আসিবে জানিতাম; এই জন্ত বাহিরের কোন লোক না আসে—ইহাই প্রার্থনীয় ছিল। আমস্ কথায় শুনিয়া আমরা উভয়েই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম।

কিন্তু আগন্তুক এক জন নহে—চারি মূর্তি!

মেরী বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সত্যে বলিয়া উঠিল, “কি সর্বনাশ, উহারা যে উপকূল-রক্ষী! দুই-এক জন নহে, চারি জন!”

আমি ব্যাকুল চিত্তে বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলাম—সত্যই চারি মূর্তি সমুদ্রতটে হইতে আমাদেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে! সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল—তথাপি আলোকাক্ষকারের সেই মিলন-ক্ষণে তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম—

আগন্তুক-চতুষ্টয় ইংরেজ সৈনিক, এবং উপকূল-রক্ষীই বটে!

মেরীর কথা শুনিয়া আমস্ আতঙ্কে অভিভূত হইল। সে মেরীর মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ভয়-কম্পিত স্বরে বলিল, “উপকূল-রক্ষী? দুই-এক জন নয়, চার-চার জন! হঠাৎ উহারা! কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিতেছে? আমরা এখানে গোপনে জার্মান ‘ইউ’-বোট-গুলার খোরাক জোগাইতেছি—ইহা কি উহারা জানিতে পারিয়াছে? তোমার কিরূপ ধারণা, মেরী?”

মেরী বাতায়ন হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বলিল, “না না, উহারা ও-সকল কথা জানিতে পারে নাই; আমাদের সন্দেহ করিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।”

আমস্ হতাশ ভাবে বলিল, “তবে? তবে এখানে উহাদের আসিবার আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?”

মেরী বলিল, “তাহা ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; তবে অনুমান হয়—হানা ফার্নস্ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাহার সঙ্কে আমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেছে। স্ত্রীলোকটা হঠাৎ ফেরার হইল—যেন বাতাসে মিশিয়া গেল! তাহার সঙ্কে কোন কোন সংবাদ জানিবার জন্ত উহাদের আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক।”

আমস্ ভয়-স্বরে বলিল, “সে সংবাদ জানিবার জন্ত উহাদের দলের এক জন আসিলেই ত পারিত; দল বাঁধিয়া চার জনের দর্শনদানের কারণ কি?”

মেরীর কণ্ঠস্বরেও ভয় ও উদ্বেগের অভাব ছিল না; সে বিচলিত স্বরে বলিল, “সে কথা ঠিক; সেই সংবাদ জানিবার জন্ত উহাদের দলের এক জন আসিলেই চলিত। দল বাঁধিয়া উহাদের চার জনের আসিবার কারণ আমিও বুঝিতে পারিতেছি না!”

অতঃপর মেরী জানালার নিকট হইতে সরিয়া-আসিয়া আমস্কে বলিল, “উহারা আমাদের দ্বীপ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে সমুদ্রতটে যাইব না। না, আমরা কেহই সে দিকে যাইব না। আমরা যতক্ষণ আলোর সঙ্কেত না দেখাইব, ততক্ষণ কাপ্তেন ভন্ রথভেন তাহার ‘ইউ’-বোটের ডিঙ্গী লইয়া সমুদ্র-বেলায় উপস্থিত হইবে না।”

আমস্ কাতর ভাবে বলিল, “সে কথা কি করিয়া বলিতে পার? পূর্বেও ত একবার সে আমাদের

সাহিত্যিক আলোর প্রতীক্ষা না করিয়াই আমাদের পাকশালায় আসিয়াছিল।”

মেরী বলিল, “হাঁ, তা আসিয়াছিল বটে ; কিন্তু সেই রাত্রিতে কিরূপ ভীষণ দুর্ঘ্যোগ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে ত ? সেই দুর্ঘ্যোগের রাত্রিতে আমরা সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া আলোকের সন্ধেত দেখাইতে পারিব না—ইহা জানিত বলিয়াই সে আমাদের জ্ঞান প্রতীক্ষা না করিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু আজ ত সে-রকম প্রাকৃতিক দুর্ঘ্যোগ নাই। সে জানে, আজ আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব ; এই জ্ঞানই আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রদর্শিত আলোকের সন্ধেত দেখিতে না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ‘ইউ’-বোট ত্যাগ করিবে না।”

আমস্ জড়িত স্বরে বলিল, “আশা করি, তোমার এই অনুমান সত্য হইবে।”

মেরী তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “তুমি ও-রকম হতাশ হইও না। উপকূল-রক্ষীরা তোমাকে সন্দেহ করিতে পারে, এরূপ ভাব-ভঙ্গি প্রকাশ করিও না। যদি উহাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে, —তাহা হইলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। আমরা কোন উপায়েই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না। উহারা এখনই, বোধ হয়, আসিয়া পড়িবে। তুমি প্রফুল্ল ভাবে উহাদের অভ্যর্থনার জ্ঞান প্রস্তুত হও ; আমাদের পক্ষে শিষ্টাচারের কোন ক্রটি হইবে না।”

দ্বাবিংশ পর্ব

বজ্রাঘাত অনিবার্য্য !

মেরী আমস্কে সতর্ক থাকিতে বলিয়া পাকশালায় দেওয়ালে সংরক্ষিত একখান আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, এবং সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে তাহার ললাটস্থিত অসংযত কুন্তল-গুচ্ছ সুবিগ্ৰস্ত করিয়া, পরিহিত পরিচ্ছদের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিল। সেই সময় আমস্ তাহার চেয়ার হইতে উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইল। আমরা দেখিলাম, উপকূল-রক্ষী-চতুষ্টয় আমাদের ঘরের অদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি মেরীকে সেই কথা

জানাইলে মেরী দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া রুদ্ধধার খুলিয়া দিল।

মুহূর্ত্ত পরেই মেরী উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল, “হাল্লো, মিষ্টার ষ্ট্যান্ডিস্ ! আজ আমাদের কি সৌভাগ্য !”

মেরীর কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, উপকূল-রক্ষী চতুষ্টয়ের অন্ততঃ এক জনও মেরীর পরিচিত। মেরীর অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।

ষ্ট্যান্ডিস্ নামক উপকূল-রক্ষী হাস্তপ্রফুল্ল মুখে উৎসাহ-ভরে বলিল, “হাল্লো মেরী ! কেমন আছ তুমি, সুন্দরী ?” তাহার কণ্ঠস্বর প্রফুল্ল বটে, কিন্তু মনে হইল, কথাগুলো হাঁড়ার ভিতর হইতে বাহির হইল !

মেরী মধুর হাসিয়া বলিল, “খুব ভালই আছি,—ধন্যবাদ !”

মেরীর ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া কে বলিবে, ক্ষণকাল পূর্বে যে কম্পিত-হৃদয়া, বিপদ-শঙ্কিতা, উদ্বেগ-বিহ্বলা তরুণীকে দেখিয়াছিলাম—এ সেই ?

মেরী পাকশালায় মুক্তদ্বারের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলে উপকূল-রক্ষী-চতুষ্টয় যেন কুচ-কাওয়াজের তন্ত্রিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রত্যেকের কোমরবন্ধ-সন্নিবিষ্ট কোষে টোটাভরা রিভলবার সংরক্ষিত দেখিয়া ভয়ে আমার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। ইহাদের উদ্দেশ্য কি ?

উপকূল-রক্ষীরা সকলেই বলবান ; পরিপুষ্ট-দেহ, মুখের বর্ণ রৌদ্রপক। তাহারা পাকশালায় প্রবেশ করিয়া সহাস্ত মুখে আমস্কে অভিবাদন করিল—দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হইলাম। মনে হইল, উহাদের কোন গুপ্ত অভিসন্ধি নাই, আমাদের সন্দেহ অমূলক।

আগন্তুকগণের এক জন আমস্কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “হাল্লো আমস্ ! আমি তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই।”

আমস্ তখনও আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই ; সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “আমি ? না, আ—আমি অনেক দিন বড়-দেশে যাই নাই। সেখানে যাইবার তেমন কোন দরকার ছিল না কি না। তা—তা তোমরা কি মতলবে এখানে—মানে—এই দ্বীপে আসিলে ?”

উপকূল-রক্ষীটি অগ্নিকুণ্ডের নিকট সরিয়া গেল, এবং

অগ্নিরাশির উর্ধ্বে উভয় করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, “এই দ্বীপের চতুর্দিক একবার ঘুরিয়া দেখিব বলিয়া আসিলাম। সময় খারাপ, উপকূল-সন্নিহিত সকল স্থান ঘুরিয়া দেখা উচিত। তা ছাড়া, একটা খারাপ খবর আছে। হানা ফার্গস ফেরার! তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।”

আমস্ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলিল, “বটে! তা—তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই?”

উপকূল-রক্ষী উত্তপ্ত করতল ললাটে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, “হাঁ, সত্যই তাহার সন্ধান মিলে নাই! সাধারণের ধারণা, সে ডুবিয়া মরিয়াছে। বড়-দেশের উপকূলের প্রায় তিন মাইল দূরে তাহার খালি নৌকা ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। তাহার পর আরোহিহীন নৌকাখানা ধরিয়া তীরে আনা হয়।”

এ কথা শুনিয়াও আমস্ জিজ্ঞাসা করিল, “নৌকায় হানা ফার্গস ছিল না?”

রক্ষী বলিল, “না, ছিল না। সে কথা ত আগেই বলিয়াছি। ব্যাপারটা আগাগোড়া রহস্যপূর্ণ! অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—হানা তাহার নৌকা হইতে সমুদ্রে লাফাইয়া-পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। কারণ, সে দিন আকাশ পরিষ্কার ও সমুদ্র স্থির ছিল; স্ততরাং নৌকা সমুদ্রতরঙ্গে আলোড়িত হওয়ায় সে যে হঠাৎ নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গিয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। কিন্তু হানা ফার্গসের মতো মেয়েমানুষ কোন কারণে আত্মহত্যা করিবে—এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কোন্ হুঃখেই বা সে আত্মহত্যা করিবে? তবে এ কথা সত্য যে, তার ভাই হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় সে মনে বড় আঘাত পাইয়াছিল।”

এই কথা বলিয়া রক্ষীটা উভয় করতল পরস্পর ঘর্ষণ করিতে লাগিল; তাহার পর সে মেরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “মেরী, আমাদিগকে তুমি একটু চা খাওয়াইতে পারো?”

মেরী বলিল, “কেন পারিব না? এ আর এমন কঠিন কাজ কি? একটু অপেক্ষা কর, মিষ্টার ষ্ট্যান্ডিস! আমি চা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।”

অতঃপর মেরী ল্যাম্প জালিয়া তাহা টেবলের উপর

রাখিল, এবং পিরিচ, পেয়লা, প্লেট প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল।

আমস্ গভীর ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারায় বলিল, “হানা ফার্গসের যে ভাই ফেরার হইয়াছে বলিলে, সে কি এখনও ফিরিয়া আসে নাই?”

উপকূল-রক্ষী ষ্ট্যান্ডিস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, “তবে আর শুনিলে কি? এখন পর্যন্ত তাহার কোন সন্ধান নাই! আরও অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভাই-ভগিনী দুই জনেই এ-ভাবে অদৃশ্য হইয়াছে—যেন বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে! অত্যন্ত জটিল রহস্য নহে কি?”

আমস্ পকেট হইতে তামাকের পাইপটা বাহির করিয়া লইল; দেখিলাম, তাহার হাতখানা সেই সময় কাঁপিতেছিল, কিন্তু অশ্রু কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। আমস্ পাইপে তামাক পুরিতে-পুরিতে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “হানা ফার্গসের সেই ভাই নৌ-পরিচালনে স্ননিপুণ ছিল না বলিয়াই আমার ধারণা। হাঁ, এ বিষয়ে সে নিতান্তই আনাড়ি ছিল।”

ষ্ট্যান্ডিস্ চায়ের পেয়ালার দিকে চাহিয়া বলিল, “বল কি? তোমার ঐ রকম ধারণা ছিল?”

আমস্ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, “হাঁ, ছিলই ত। আমার মনে হইত, সে নৌকায় চাপিয়া সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় যদি হঠাৎ ঝড় ওঠে, তাহা হইলে সেই বেগ সামলাইয়া নৌকাখানা কায়দায় রাখা তাহার অসাধ্য হইবে; নৌকা হইতে ‘ঝপাং’ করিয়া সে সমুদ্রে পড়িবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে ডুবিয়া মরিবে। কাজেও সেইরূপই ঘটয়াছিল। সে ত মরিলই, শুনিয়াছি, তাহার সেই নৌকাখানাও রক্ষা পায় নাই! বড়ই হুঃখের বিষয়। পরমেশ্বর যে কখন কাহাকে কি বিপদে নিক্ষেপ করেন, চূর্ঘটনার আগে তা বুঝিতে পারা যায় না।”

অতঃপর সে অগ্নিকুণ্ডের আগুনের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া পাইপের তামাক ধরাইয়া লইল, এবং তখনও অল্প দিকে মুখ ফিরাইয়াই ষ্ট্যান্ডিস্কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আজ রাত্রে বড়-দেশে ফিরিয়া যাইতে তোমাদের খুব অসুবিধা হইবে না? অনেকটা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।”

ষ্ট্যান্ডিস্ বলিল, “হাঁ, তা খানিক বিলম্ব হইয়াছে বৈ

কি ! আর বড়-দেশ ত খুব নিকটেও নয় । দেখা যাক, কি হয় ।”

তাহার পর সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মেরী, তুমি কিছু দিন আগে বড়-দেশে গিয়া ডোনাডসনস পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলে । তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া তোমার দিনগুলি বেশ স্মৃতিতেই কাটিয়াছিল ত ?”

মেরী হাসিয়া বলিল, “ধন্যবাদ ।—হ্যাঁ, সেখানে সেই কয়েকটা দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল ।”

ষ্ট্যান্ডিস্ বলিল, “জোক ছোকরা ফ্রান্সে চলিয়া গিয়াছে—সে কথা শুনিয়াছ কি ?”

মেরী বলিল, “না, এ খবর ত পূর্বে জানিতে পারি নাই !—ফ্রান্সে সে কবে গিয়াছে ?”

ষ্ট্যান্ডিস্ মেরীর কথা বিশ্বাস করিল কি না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না ; সে বলিল, “গত সপ্তাহের প্রথমেই সে চলিয়া গিয়াছে ।”

মেরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সহানুভূতিভরে বলিল, “আহা, বেচারী জোক ! আশা করি, সে নির্ঝরে দেশে ফিরিতে পারিবে । ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ! কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটে, কে বলিবে ? শুনিয়াছি, ফ্রান্স এই যুদ্ধে বুটেনকে যথাশক্তি সাহায্য করিতেছে ।”

ষ্ট্যান্ডিস্ বলিল, “তা বটে । জোক নিরাপদে থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয় । খাসা ছেলে জোক । বিবি ডোনাডসন আমার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—জোক ফ্রান্স দেশে যাত্রা করিবার পূর্বেই তোমার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধটা পাকা করিয়া রাখেন—এইরূপই তাঁহার ইচ্ছা ছিল ।”

মেরী হাসিয়া বলিল, “তাঁর সে ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু আমি এখন তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া বসিব—এ ইচ্ছা আমার মনে কোনও দিন উদ্ভিত হয় নাই ; বিবাহের জন্ত আমি ব্যস্ত নহি, মিষ্টার ষ্ট্যান্ডিস্ !”

ষ্ট্যান্ডিস্ প্রশংসমান নেত্রে মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মেরী, আমার কথা শুনিয়া আমাকে চাটুকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না ; কিন্তু আমি সত্যই বলিতেছি—যে তোমাকে লাভ করিবে, সে ভাগ্যবান যুবক । কি আর বলিব ?—যদি আধবুড়ো না হইতাম,

আর ঘাড়ে একটা স্ত্রী না ঝুলিত, তাহা হইলে আমি কি তোমাকে—কিছু সে জন্ত এখন আর আক্ষেপ করিয়া ফল কি ?”—বলিয়া ষ্ট্যান্ডিস্ হতাশ ভাবে এগন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল যে, আমাদের হাত সংবরণ করা কঠিন হইল । বস্তুতঃ, তাহাদিগকে হঠাৎ এখানে আসিতে দেখিয়া আমাদের যে ভয় ও হুশিঙ্কা হইয়াছিল, তাহাদের এইরূপ সরস আলোচনায় তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলাম ।

এইরূপ নানা প্রকার প্রীতিকর গল্প করিতে করিতে চাঁয়ের পর্ব শেষ হইল । উপকূলরক্ষীরা সকলেই মেরী ও আমাকে লইয়া যে রং-তামাসা করিতে লাগিল, তাহা যথেষ্ট উপভোগ্য হইল । আমাদের নিরানন্দময়, নীরস, মরু-জীবনে তেমণ মধুর সন্ধ্যা আর কখন আসিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হইল না ।

এই ভাবে গল্প শেষ হইলে রক্ষীরা চেয়ারগুলি অগ্নি-কুণ্ডের আরও নিকটে টানিয়া লইয়া গেল ; তাহার পর পাইপ বাহির করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল ।

কয়েক মিনিট পরে ষ্ট্যান্ডিস্ হঠাৎ তাহার চেয়ার-খানা পশ্চাতে ঠেলিয়া-ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার কোমরবন্দস্থিত পিস্তলের মুঠা স্পর্শ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, “তোমাদের তিন জনের মধ্যে কে আজ রাত্রে সাক্ষেতিক আলোকের লণ্ঠন লইয়া সমুদ্রকূলে যাইবে ? মেরী—তুমি, পিটার, না আমস্ নিজেই ?”—সে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমাদের সকলেরই মুখের দিকে চাহিল ।

সর্বনাশ, তাহার কথা শুনিয়া আমার যেন মুচ্ছার উপক্রম হইল ! এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত !

আমি স্তম্ভিত হৃদয়ে আমসের মুখের দিকে চাহিলাম ।

আমস্ ষ্ট্যান্ডিসের প্রশ্ন শুনিয়া চেয়ার হইতে সবেগে লাফাইয়া উঠিল । তাহার মুখ মৃতব্যক্তির মুখের ত্রায় বিবর্ণ হইল ; আতঙ্কে তাহার আপাদমস্তক থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল । সে ভয় স্বরে ষ্ট্যান্ডিস্কে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ও-কথার অর্থ কি ? কি উদ্দেশ্যে তুমি এই অর্থহীন, অসংলগ্ন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ?”

ষ্ট্যান্ডিস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, “ও-কথা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই আমস্ ! আমরা সকলেই জানিতে পারিয়াছি । তোমার বুঝিতে পারা উচিত ছিল,

এ সকল নোংরা ব্যাপার দীর্ঘকাল লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় না।”

আমস্‌ ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “কি তোমরা জানিতে পারিয়াছ? কোন্‌ নোংরা-ব্যাপারের কথা বলিতেছ?”

ষ্ট্যান্ডিস্‌ অবিচলিত স্বরে বলিল, “এখানে যে-সব কাণ্ড চলিতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। আলেন ফার্গস সহসা নিরুদ্দেশ হইলে তাহার ভগিনী হানা শপথ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার ভাইকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু সে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেও আমরা তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই; আলেন ফার্গসের শ্রায় নির্ঝরোধ লোককে হঠাৎ হত্যা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু এই দুর্ঘটনার কিছু দিন পরে হানা আমাদের বলিল—সে তাহার নিরুদ্দিষ্ট ভাইএর সন্ধানে এখানে আসিতেছে। তাহার পর তাহারও আর কোন সন্ধান মিলিল না! সে যে নৌকায় আসিয়াছিল—সেই নৌকা আরোহিহীন অবস্থায় সমুদ্রে ভাসিতে দেখা গেল। তখন আমাদের সন্দেহ হইল, এই ব্যাপারের অন্তরালে নিবিড় রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে! এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়াই আমরা রহস্য-ভেদের আশায় এই দ্বীপের উপর দৃষ্টি রাখিলাম। আমরা সমুদ্র হইতেই পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করি। গত রাত্রে আমরা তোমাদের এই দ্বীপের কিছু দূরে আসিয়া সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই সময় আমরা এখানে হানা দেওয়ার জ্ঞপ্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারি নাই, এ জ্ঞপ্ত দূর হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল।”

এবার মেরী বলিল, “গত রাত্রে এই দ্বীপের কিছু দূরে থাকিয়া সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলে বলিলে, তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছিলে?”—মেরীর মুখ বিবর্ণ হইলেও তাহার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ অচঞ্চল।

ষ্ট্যান্ডিস্‌ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমরা কি করিতেছিলে—দূরবীণের সাহায্যে তাহা লক্ষ্য করিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। আমরা সমুদ্র-বন্ধে—তট হইতে কিছু দূরে হঠাৎ একটা লাল আলো জলিয়া উঠিতে দেখিলাম; যুহুর্ন্ত পরে

সমুদ্র-বেলা হইতে আর একটা সাক্ষেতিক আলোকে তাহার উত্তর জ্ঞাপন করা হইল! আজ সন্ধ্যাকালে আমরা এখানে আসিবার সময় ‘ডেভিল্‌স্‌ কেভে’র ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছি। মেরী, তোমরা আমাদের শত্রু জার্মানদের ‘ইউ’-বোটের খোরাক সরবরাহ করিয়া আসিতেছ! জার্মান ‘ইউ’-বোটগুলো সমুদ্রে-সমুদ্রে বোম্বটেগিরি করিয়া বেড়াইতেছে; আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল—কোন গুপ্তস্থান হইতে তাহারা খোরাক সংগ্রহ করিয়া সমুদ্র-পথ বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু বড়-দেশের একরূপ নিকটবর্তী দ্বীপ হইতে তাহারা ক্রমাগত সাহায্য পাইতেছে, এ সন্দেহ পূর্বে কোন দিন আমাদের মনে স্থান পায় নাই। এখন সকল ব্যাপার পরিষ্কার-রূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে!”

মেরী গম্ভীর স্বরে বলিল, “হাঁ, তোমরা ঠিকই বুঝিয়াছ; আমরা জার্মান ‘ইউ’-বোটগুলিকে এখান হইতেই খোরাক সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।”

মেরীর কথা শুনিয়া আমস্‌ ক্রোধে ও ভয়ে কদর্য্য মুখভঙ্গি করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, “খোরাক সরবরাহ করিয়া আসিতেছি—এ কথা তোমার বলিবার কি প্রয়োজন ছিল?—এ কথা স্বীকার করিয়া তুমি কি মনে করিয়াছ—” হঠাৎ সে থামিয়া বলিল, “দুধ-কলা দিয়া কাল-সাপ পুষিয়াছি! ও-দেহে কার—রক্ত?”

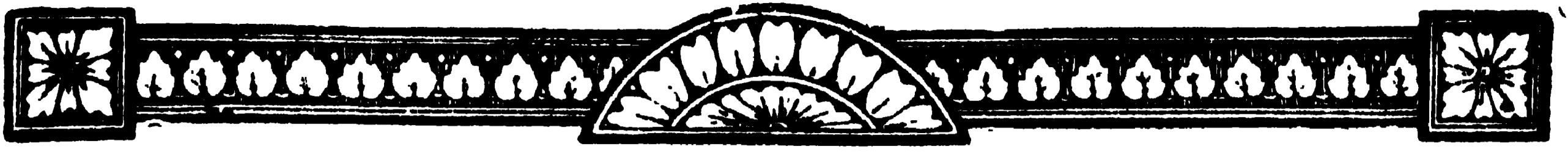
ষ্ট্যান্ডিস্‌, আমস্‌ের মস্তব্য শেষ না হইতেই হুঙ্কার দিয়া কঠোর স্বরে বলিল, “মুখ বুজিয়া তুমি বসিয়া থাকো ক্রোবি! তোমার চালাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে; মিথ্যা কথায় আর আমাদের ভুলাইবার উপায় নাই—মেরী তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।”

আমস্‌ হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল; কিন্তু তাহার ভয় দেখিয়া আমার ছঃখ হইল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার সর্বশরীর প্রাণভয়ে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে।

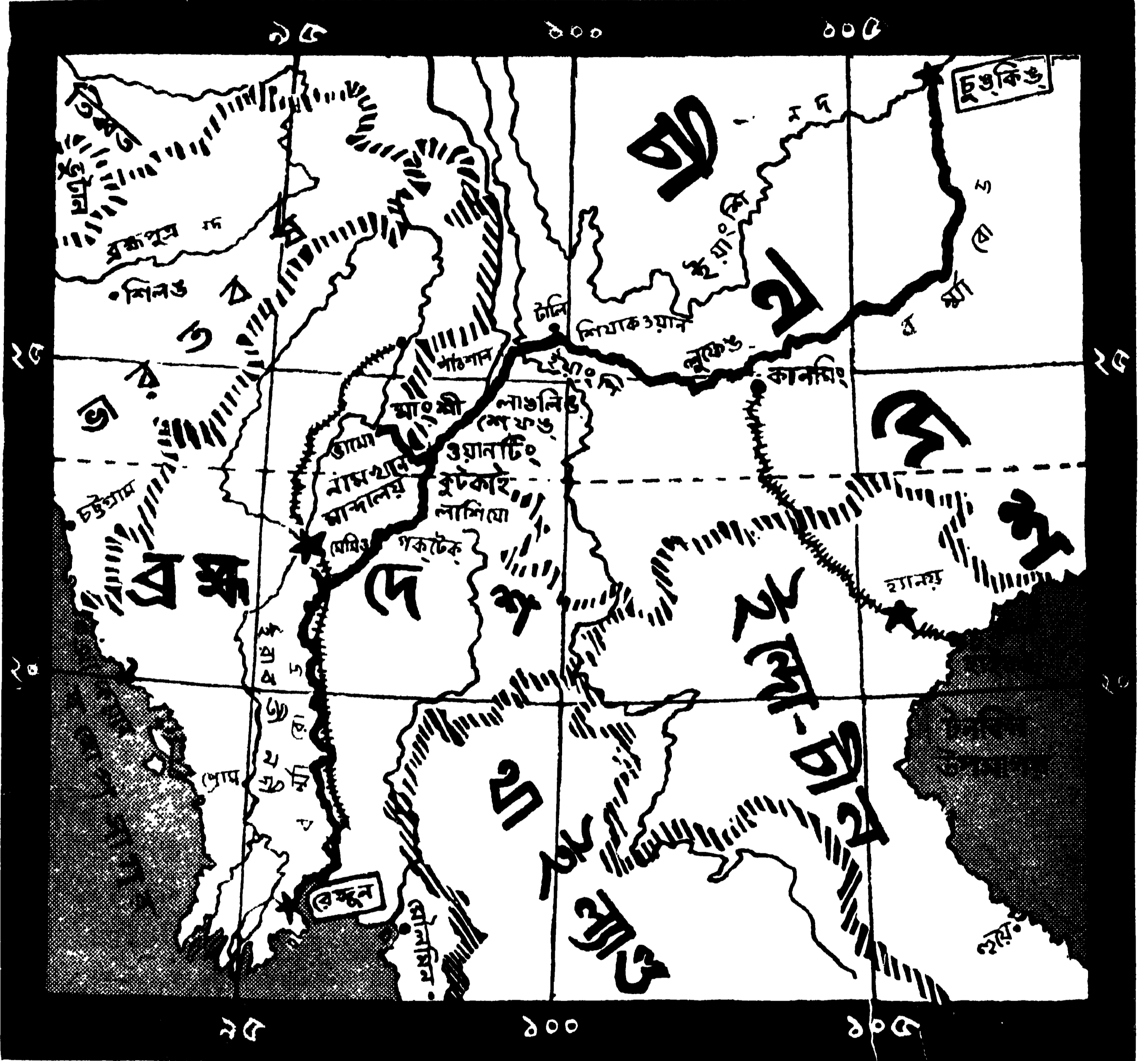
আমি মেরীর মুখের দিকে চাহিলাম,—তাহার দৃষ্টি অগ্নিকুণ্ডে সন্নিবিষ্ট। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সে তখন অত্র কথা ভাবিতেছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



বর্ষা রোড



বর্ষা রোড—ক'মাস পূর্বে এ নামে আমাদের প্রাণে অনেকখানি চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল! অথচ বর্ষা রোড আসলে কি বস্তু, সে সম্বন্ধে কতটুকুই বা আমরা জানি!

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অতি প্রাচীন যুগে চীন রচিয়াছিল গ্রেট ওয়াল বা সুদীর্ঘ প্রাচীর; এ কালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ-রোধের জন্তও তেমনি চীন আজ রচিয়াছে এই বর্ষা রোড! অতি-দুর্গম

গিরি-পর্বত ভেদ করিয়া এ পথ রচিত হইয়াছে। পাহাড়ের বুক ফুঁড়িয়া মাথা টপ্কাইয়া, নদী-নির্ঝরের বুকের উপর দিয়া এ পথ রেঙ্গুন হইতে চীনের বৃকে চুঙকিঙ বা পাশিয়েন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এমন কৌশলে এ পথ নির্মিত যে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত—কোনো কালেই এ পথে এখন লোক-জনের বা গাড়ীর চলাচল বন্ধ হইবে না!

উপরে ম্যাপখানি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এ পথ

রেঙ্গুন হইতে উত্তরে সোজা গিয়াছে মাণ্ডালে; মাণ্ডালেয় পথ বিধা-ভিন্ন হইয়াছে—এক মাথা গিয়াছে সোজা বর্ম্মার মিহঁতকিয়ানায়; আর-এক মাথা ডাহিনে বুঁকিয়া মেমিয়ো, লাশিয়ো, উত্তর-শান প্রদেশ, লাঙলিঙ পার হইয়া শিয়াক-ওয়ান, শুইয়াং স্পর্শ করিয়া চুঙকিঙে গিয়াছে।

দেখিবেন লাশিয়ো। এই লাশিয়ো বর্ম্মার সীমান্ত-রেখা,— তার পর ও-দিকে চীন-সাম্রাজ্য সুরু হইয়াছে।

এ পথের কিয়দংশ—কানমিঙ হইতে পশ্চিমে শিয়াক-ওয়ান পর্য্যন্ত—১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে তৈয়ারী হইয়াছে। তার পরে শিয়াকওয়ান হইতে বর্ম্মার সামান্তে লাশিয়ো পর্য্যন্ত

পথটুকু আজ প্রায় দু' বৎসর পূর্বে নিশ্চিত হইয়াছে। এ পথটুকু দৈর্ঘ্য ৩০৭ মাইল। কিন্তু এখানকার এই পথটুকুর নিশ্চিানে কত কঠিন পাহাড় কাটিয়া মাফ্ করিতে হইয়াছে, প্রথর বেগ-শালিনী কত বড়-বড় নদী-মহানদীর বুকের উপর সেতু রচিত হইয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই! এ পথটুকু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তৈয়ারী হইয়াছে। নিশ্চিানে ন' মাস মাত্র সময় লাগিয়াছিল। এঞ্জিনীয়ার ও মিস্ত্রী-মজুর লাগিয়াছিল দু' লক্ষ। এমন দুর্গম গিরি-নদী-বাহী পথ পৃথিবীর আর কোনো প্রদেশে নাই! অথচ সেতু-নিশ্চিানে, গিরি-উন্মোচনে সনাতন রীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল; অর্থাৎ সেই শাবল-গাঁতি ধরিয়া পাহাড়ের পাথর কাটা, ছোট ছোট বুড়িতে ভরিয়া রাবিশ সরানো—মানুষের মাথায় কিছা মহিষের গাড়ীতে তুলিয়া পাথর



পেঙ-মন্দিরে শয়ান বুদ্ধ-মূর্ত্তি

রেঙ্গুন হইতে চুঙকিঙ পর্য্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য ২১০০ মাইল। পথ প্রশস্ত এবং পাকা। মোটর-লরি এ পথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে। তার উপর পথের দু'দিকে নানা দৃশ্যবৈচিত্র্য! সে দৃশ্য কোথাও বেশ নয়নাভিরাম, আবার কোথাও এমন ভীম-ভয়ঙ্কর যে, সে-দৃশ্যে দেহ রোমাঞ্চিত হয়! ম্যাপে মেমিয়োর পরে ডাহিনের পথে

বহা,—এ-সব কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির এতটুকু সাহায্য লওয়া হয় নাই!

সম্প্রতি জাপানী-বিপ্লবের ফলে গত ১৮ জুলাই হইতে তিন মাসের জন্ত এ পথ বন্ধ ছিল; নভেম্বর মাসে পথ আবার মুক্ত হইয়াছে। এ পথটি চীনের খিড়কী-দ্বার (Back-door to China)। প্রয়োজন হইলে এ পথে

বন্দী হইতে সৈন্ত-সাহায্য পাওয়া যাইবে। সেই জন্তই এ-পথ নিশ্চয় করা হইয়াছে।

জল-পথ ভিন্ন চীনে যাইবার জন্ত আর একটি স্থল-পথ আছে, সে পথ গিয়াছে কুশিয়া হইতে। এ-পথ দুর্গম।

দু'জন ইংরেজ পর্যটক বন্দী রোড ধরিয়া চীনে গিয়াছিলেন। এ পথের যে-বৃত্তান্ত তাঁরা লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

এ পথে দু'বার তাঁরা চীনে গিয়াছিলেন। প্রথম-বারে গিয়াছিলেন

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে; তার পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। দ্বিতীয় বারে এ-পথে তাঁরা যুদ্ধো-পযোগী রশদ-পত্রাদি চীনে রীতিমত চালান হইতে দেখেন। প্রথমবারে ইহারা গিয়া ছিলেন মোটর-লরিতে চড়িয়া; দ্বিতীয়-বারে সাধারণ মোটর-গাড়ীতে।

রেঙ্গুন হইতে ইহারা মাণ্ডালের পথ ধরিয়া যাত্রা

করেন। পথের দু'দিকে বহু গ্রাম-নগর। সে সব গ্রাম-নগরে নানা জাতের নর-নারীর বাস! তাদের বহু বিচিত্র আচার-রীতি, বিচিত্র বেশ-ভূষা—এ-সবে মন এমন তন্ময় ছিল যে, দীর্ঘ পথ-যাত্রার জন্ত এতটুকু ক্লান্তি তাঁরা অনুভব করেন নাই। এখানকার লোক-জন জন্মে কখনো মোটর-গাড়ী দেখে নাই; তাই মোটর দেখিয়া তাদের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না!

এ-পথে অজস্র গোল্ডমোহর গাছ—ফুলে-ফুলে দিক একেবারে রাঙা হইয়া আছে! পথে মাণ্ডালে-প্রাসাদ—এক কালে উত্তর-ব্রহ্ম-নৃপতিদের বাসভূমি ছিল; এখন এ-প্রাসাদ মিউজিয়মে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাসাদের গায়ে ছিল রানীর উদ্ভান। এখন আর সে উদ্ভানের চিহ্ন নাই, জঙ্গল হইয়া আছে!

মাণ্ডালে হইতে ৪২ মাইল দূরে মেমিয়ো। এ জায়গাটি বন্দীর অফিসারদিগের পার্বত্য-নিবাস।



রেঙ্গুনের বাজার

মেমিয়োর পাহাড় হইতে নীচে বহু দূরে প্রসারিত মাণ্ডালের ক্ষেত-আবাদ দেখা যায়। ধানের ক্ষেত। এ ক্ষেতে অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পাঁচ মাস প্রচুর 'স্নাইপ' মেলে। সেজন্ত শিকারীদের খুব ভিড় জমে। স্নাইপ-শিকারীদের পক্ষে এমন জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না! কেহ শিকার করিতে আসিলে এক-শো' পাখী লইয়া বাড়ী ফেরা—সে খুব সহজ ব্যাপার!

মেমিয়ো পূর্বে ছিল দারুণ ঘন জঙ্গলময়। বৃটিশ অধিকারের পর বেঙ্গল ফোর্জের কর্নেল মে এখানে আসিয়া বন-জঙ্গল কাটিয়া সহরের পত্তন করেন,—তাঁহারি নামে নগরের নাম-করণ হইয়াছে। ‘মিয়ো’ কথাটি বর্ম্মাজ্— ‘মিয়ো’র অর্থ ‘স্থান’, ‘নগর’!

মেমিয়োর পরেই গকটেক-গর্জেঁর দিকে পথ একেবারে যেন আকাশ হইতে পাতালের বুকে নামিয়া গিয়াছে! এখানে একটি নদী আছে; নদীর বুকে নব-নির্ম্মিত সেতু।

গড়িয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে-লাইন বিস্তারিত হইয়াছে; এবং এই রেল-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সহরের বাহিরে বারুদখানা এবং বিমান-বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে। তা’ছাড়া এখানে বর্ম্মাজ্ ফ্রন্টীয়ার ফোর্শের আস্তানা আছে।

লাশিয়োর দুর্ব্বৃত্ত ফন্দীবাজের অভাব নাই। সহরে তাদের যেমন প্রতাপ, সহরের বাহিরে পথেও তেমনি! লুটপাট করিয়া এমন নিঃশব্দে ইহারা সরিয়া পড়ে যে,



রেস্কনের পথ; দূরে সুল পাগোডা; পথে জলের কলে স্নান-পর্ক

সেতুর উপর দিয়া মোটর চলে; মহিষের গাড়ী চলে; মাহুঘ চলে। পাশে স্নগভীর খদের উপর প্রায় ৩২০ ফুট উর্দ্ধে রেলের সুদীর্ঘ পুল। এ পুলটি ২২৬০ ফুট দীর্ঘ—পুলটি মার্কিন এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক ত্রিশ বৎসর পূর্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এ পুলের খিলানটি খদের প্রায় ৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। এ পুলের ঠিক ও-পারেই উত্তর শান প্রদেশ।

বর্ম্মার সীমানা হইতে ১২০ মাইল উত্তরে লাশিয়ো। লাশিয়ো নূতন সহর। এখানে আজ ব্যবসায়ের বিপুল কেন্দ্র

সতর্ক পুলিশ ও ফৌজ-প্রহরীরা তাদের ধরিতে হিমসিম খাইয়া যায়।

এখানে অসংখ্য চীনার বাস। এ জায়গাটি সরকারী চীনা-কর্ম্মচারীদের বিরাট আস্তানা। লাশিয়োয় যে-সব চীনার বাস, আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্কির্শেষে সকলেই তাঁরা পলিটিক্সের আলোচনায় মাতিয়া আছেন!

এখানে সরকারী সামরিক চালানী অফিস আছে। প্রকাণ্ড অফিস। নাম সাউথ-ওয়েস্ট ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি। হেড-অফিস রেস্কনে। এ অফিসের কাজ

জাহাজের খপরদারী করা ; সামরিক রসদ ও মালপত্র বুলিঙ্গা ডেলিভারী লওয়া, এবং সে সব মালপত্র লাশিয়োর এবং কানমিঙে চালান করা । তা'ছাড়া এখানে মোটরের অনেক কারখানা আছে ; লরি ও ট্রাক-কোম্পানি আছে । এ পথে বহু বাস চালাইয়া তারা ব্যবসা বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে !

এখান হইতে যে পথ শিয়াকওয়ান হইয়া শুঙকিং গিয়াছে, সে পথ পাহাড়ের গায়ে বলিয়া চালু । এ-জন্ত

হইতে যে সব নদীর সৃষ্টি, সে সব নদীর জল বেশ গরম । স্নানে আরাম মেলে বলিয়া এখানে বহু স্নানার্থীর ভিড় জমে । তা'ছাড়া এ জলের আর-এক গুণ, এ জলে স্নান করিলে বাত-ব্যাধি সারিয়া যায় । বাত-ব্যাধিগ্রস্তেরা স্নান করিতে আসিয়া প্রত্যহ তিন-চার কণ্টা ধরিয়া জলে গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকেন ।

মোটরের টানা পথ নির্মিত হইলেও লাশিয়োর হইতে কানমিঙ পর্য্যন্ত ৬৮৮ মাইলের মধ্যে কোথাও এক বিন্দু



মেমিয়োর কাছে নির্ঝর-ধারা

ছ'দিককার গাড়ী পরস্পরকে অতিক্রম করিবার সময় প্রায়ই চালু-পথে বা বিপথে গড়াইয়া পড়ে । এ বিপত্তি নিত্য ঘটে । পাহাড়ের পাথরে কিম্বা পথের পাশে মোটা গাছের গুঁড়িতে লাগিয়া বহু লরি-বাস ও ট্রাক ভাঙ্গিয়া যায় । সে-জন্য পথের মাঝখানে মোটর-মেরামতির জন্ত অনেক কারখানা আছে ।

লাশিয়োর অদূরে নদী-সঙ্গম—দু'টি নদী আসিয়া একত্র মিশিয়াছে । একটি নদীর জল গরম, অপরটির জল হিম-শীতল । শান প্রদেশে এমন বহু নদী আছে । উষ্ণ-প্রস্রবণ

পেট্রোল পাওয়া যায় না ! তার উপর বর্মা-সীমা অতিক্রম করিলে এ-দিকে বিরাম-নিবাস বা রেষ্ঠ-হাউশের অভাব ছিল ; এখন দু'-একটি করিয়া বিরাম-নিবাস নির্মিত হইতেছে ।

আমাদের পর্য্যটকেরা এ পথে গাড়ীতে যে পেট্রোল বহিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতে আশী মাইল-ব্যাপী পাহাড়-পথ অতিক্রমে তাঁদের কোন বাধা বা অসুবিধা ঘটে নাই ।

লাশিয়োর বারো মাইল পরে পথ খুব খারাপ ।

এ পথে যেমন খানাখোল্ডল, আল্গা পাথরের তেমনি স্তূপ! তা'ছাড়া পাহাড়ের গা এখানে আগাগোড়া ছুঁচের মতো স্ফন্দাগ্রমুখী।

এক জায়গায় পথ পাঁচ হাজার ফুট উঁচে উঠিয়া তার পর একেবারে পাতালে নামিয়া কুৎকাইয়ে পৌঁছিয়াছে।

পর্যটকদ্বয় এ পথে কুৎকাই পার হইয়া রাত্রি প্রায় বারোটায় সময় হো শি র রে ষ্ট-হাউশে পৌঁছিয়া-ছিলেন।

পরের দিন প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া চীনে র রাজনীতিক-সীমান্তদেশে ওয়ানচিঙে আসেন। এ জায়গায় পূর্বে কাচিন নামক এক দুর্ভিক্ষ জাতির বাস ছিল। তাদের পেশা ছিল দস্যুতা। এখন এ পথ তৈয়ারী হওয়ায় সে দস্যু-জাতি এখানে হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।



গক্টেক্-গর্জের বৃক্ণে গেলের পুল

ওয়ানটেঙে ডিউটি প্রভৃতি দিয়া যাত্রীরা মোটর চালাইয়া মধ্যাহ্নে আসিয়া পৌঁছিলেন শেফাঙে।

ম্যালেরিয়ায় শেফাঙ একেবারে শ্মশানপুরী হইয়া আছে! সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সকলেই প্রায় ছ'-সাত মাস ম্যালেরিয়ার দৌরাণ্ডে শয্যাশায়ী থাকেন! কুলি-মজুরের কথাই নাই! ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া

এখানকার লোকজনের যা চেহারা, দেখিলে প্রেতাশ্মা বলিয়া মনে হয়!

শেফাঙ হইতে পথ আবার খাড়া উঁচু। বারো মাইল সোজা খাড়াই, তার পর পথ নামিয়া মাংশীতে পৌঁছিয়াছে।

মাংশীর সামন্ত-রাজা শ্রীযুত ওয়াই ফাঙ্ ব্যাডমিণ্টন খেলিতে ছিলেন। দু'জন ইংরেজ যাত্রী আসিয়াছেন

শুনিয়া বহু সমাদরে তিনি তাঁদের নিমন্ত্রণ করিলেন। যাত্রীরা সেখানে গিয়া দেখেন, তিন জন বর্মীজ-তরুণীর সঙ্গে রাজা ব্যাডমিণ্টন খেলিতেছেন।

সামন্ত-রাজাকে চীনারা বলে শবোয়া (Sawbwa)। রাজা ফাঙ্ একটু-আধটু ইংরেজী জানেন। তিনি ভাঙা ইংরেজীতে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে আলাপ করিলেন। ইয়ায়ো নামে এক জন চিকিৎসককে ডাকিয়া

আনা হইল—ভালো করিয়া পরিচয় ঝালাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে। এ ডাক্তারটি আমেরিকা হইতে ডাক্তারী-বিদ্যা শিখিয়া এখানে আসিয়া ম্যালেরিয়া-উচ্ছেদ-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন।

ডক্টর ইয়ায়ো আসিলে কথাবার্তা সহজ ও বোধগম্য হইল। বর্ষাজ-তরুণীদের পরিচয় মিলিল। তাঁরা নামখামের আমেরিকান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন হাসপাতালে নার্শের কাজ করেন। তাঁদের তিন জনের নাম—তর্জমা করিলে সে তিন নামের অর্থ হয়—কুমারী চুণী, কুমারী রূপসী এবং

হইতে লাশিয়োয় আসিয়াছিলাম। শবোয়া সাহেব সেখান হইতে আমাকে এখানে আনিয়া চাকরি দিয়াছেন। এ জায়গা আমার ভালো লাগে। আমি মাহিনা পাই মাসে আট টাকা করিয়া। মাহিনা খুব সামান্য। তবে এখানে খরচ খুব কম।

শবোয়া বেশ অমায়িক। ইংরেজী-ভাষা জানেন না বলিয়া তাঁর মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জা নাই। দেশী পোষাক পরেন; বিলাতীয়ানার মধ্যে আমেরিকান মোটর-গাড়ী কিনিয়াছেন এবং বিলাতী বীয়ার ও ছইফির ভক্ত।



পাহাড়-পথে বিপত্তি

কুমারী শুক্রবার (Misses Ruby, Beauty and Friday)। শেফাঙ্ হইতে নামখাম বেশী দূরে নয়।

আলাপ-পরিচয়ের পর শবোয়া বীয়ার আনিবার আদেশ দিলেন। রাজার গেষ্ঠ-হাউশের বারান্দায় বসিয়া ক'জনে পানাহার করিলেন। সামনে বাগান, বাগানে ফোয়ারা। ফোয়ারায় জলধারা উৎসারিত হইতেছে। বাগানের মালী জাতে নেপালী। সে আসিয়া অতিথিদের সেলাম করিল, সেলাম করিয়া বলিল—আমি ভারতবর্ষ

ডক্টর ইয়ায়ো অনেক ভাষা জানেন। মাংশীতে হাসপাতাল নাই। এখানে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ-কল্পে আসিয়া তিনি নামখাম হাসপাতাল হইতে এই তিন জন নার্শকে সহায়-স্বরূপ চাহিয়া আনিয়াছেন।

মাংশীর ভাষা শান্টিয়ক। নার্শরা এখানকার ভাষা ঠিক বুঝিতে পারে না।

চীনের শান প্রদেশে মাংশী এবং কেংনা বেশ বড় জমিদারী। এখানকার ভূস্বামীরা আমাদের দেশের সামন্ত

রাজাদের মতো শক্তি ও অধিকার ভোগ করেন। রাজ্য-পরিচালনা সম্বন্ধে চীনা গভর্নমেন্টকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না; তবে রাজনীতিক ব্যাপারে চীনা সরকারকে মানিয়া চলিতে হয়।

এখানকার পথ-ঘাট নিরাপদ ও সুগম রাখার সম্বন্ধে রাজা ফাঙকে খবরদারী করিতে হয়। তাঁর অধিকার-ভুক্ত প্রদেশে পথচারী যাত্রীদের উপর কোনো অত্যাচার হইলে কিম্বা পথ-ঘাট ভাঙ্গিয়া গাড়ী জখম হইলে ফাঙকে তার জন্য খেদারৎ ও চীনা গভর্নমেন্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—এটুকু ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য চীনা গভর্নমেন্ট তাঁর কাছ হইতে কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারে না।

এদিককার মধ্যে মাংশীর পথ-ঘাট শুধু বিশ্রী। চারি দিকে দুর্গম পাহাড়, তার উপর এখানে কুলি-মজুর বড় একটা পাওয়া যায় না। পথ দুর্গম বলিয়া গাড়ী লইয়া দুর্ঘটনা ঘটে নিত্য। কখন কোথায় পাহাড় ধসিতেছে, তার ঠিকানা নাই। এ কারণে নিত্য-দিন এ পথের জন্ত মিস্ত্রী-মজুর মোতায়ন রাখা প্রয়োজন। কিন্তু কুলি-মজুরী করিবার মতো লোকের অভাব। এখানকার পথ-ঘাট চার-পাঁচ বছর অন্তর মেরামত করা হয়—তার বেশী মেরামতের ব্যবস্থা হুঙ্কর। কারণ, এখানকার অধিবাসীরা ক্ষেত-খামার লইয়া আছে; তারা কুলি-মজুরী করিতে চায় না। চাষবাসের রূপায় তাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল; সকলেই মাটকোঠায় বাস করে। বাঁশের বেড়া ও খড়ে-ছাওয়া কুটার এখানে কাহারো নাই।



টাক-মেরামত



পথের উপর মামুলি সাঁকো

পথে-ঘাটে কাজ করিবার জন্ত ডাকিলে তারা বলে—আমরা যে পথ-ঘাট মেরামত করিব, কে আমাদের ক্ষেত দেখিবে? বহু টাকা পারিশ্রমিকের লোভেও কেহ

কেত-খামার ছাড়িয়া যাইতে চায় না।

মাংশী ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা পাওশানে আসিলেন ; পাওশানে বিমান-পোতের আস্তানা আছে। মাংশী হইতে পাওশান পর্যন্ত আসিতে পথে সামরিক রসদ-পত্রের গাড়ী ও বহু ফৌজ-প্রহরীর সাক্ষাৎ মেলে। এ পথ দেখিলে মনে হয়, যেন রণক্ষেত্রে কিম্বা ছুর্গে গিয়া এ পথের শেষ হইয়াছে !

মোটর আসিলেও পথে খচ্চরে টানা রসদ-গাড়ীর সংখ্যা প্রচুর। খচ্চর বেচারীরা এখনো মোটর দেখিয়া শায়ন্তা হয় নাই, এ-জন্ত মোটর দেখিলে লক্ষ্মে-ঝম্পে যে কীর্তি করে, চালকদের তাহাতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ঘটে।

শুধু মাল বহিবার জন্ত বা গাড়ী টানিবার জন্ত খচ্চরের প্রয়োজন, তা নয় ! খচ্চরে চড়িয়া ভদ্র চীনা নর-নারীরা সফরে বাহির হন—তাহাতে গোরব ভিন্ন লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই।

মাংশী ত্যাগ করিয়া পাওশানের পথে যাত্রীরা নামিলেন লাঙলিঙে। এখানে চীনা কাঠমসের আস্তানা আছে। মোটর-গাড়ীর জন্য এখানে টোল দিতে হয়। ফিরিবার সময় রসিদ দেখাইলে এ টোলের টাকা ফেরত পাওয়া যায়।

লাঙলিঙ অতিক্রম করিলে উর্দ্ধা-বস্থিত এই নূতন পাহাড় পথ হইতে পুরাতন চীনের যে প্রথম-আভাস চোখে সমুদিত হয়, সে আভাসে মন বিমুগ্ধ হয়। এ আভাস দেখিলে বুঝা যায়, হাজার-হাজার বৎসর অতীত হইলেও চীনের দেহে না দেখা দিয়াছে জরার চিহ্ন, না হইয়াছে তার কোনো পরিবর্তন !



কুমারী চুপী, রূপসী-স্বাইডে ; উক্তর ইয়াসো এবং পর্যটক ফেন্



পথের পাশে পল্লী

এ পথে ছেলে-মেয়ের খুব ভিড়। মোটর দেখিতে সকলে বাড়ী ছাড়িয়া পথে ছুটিয়া আসিল। চীনা-প্রহরী পরিচয়-পত্র চাহিল। পরিচয়-পত্র দেখিয়া প্রহরী ভেঁপু বাজাইল। অমনি বাড়ী ছাড়িয়া, দোকান ছাড়িয়া,



লাড্‌লিও, পার হইলে



কান্দিও—ঘুমন্ত পুরী আজ এই পথের ডাকে জাগিয়াছে।



কুংকাই : এ পথ বর্ষার ডুবিয়া যাইত



টালি : ছ'পাশে কবর : ছুয়ে দানব-মন্দির

মাঠ ছাড়িয়া কাতারে-কাতারে
চীনারা সেখানে আসিয়া হাজির।
প্রহরী তাদের বুঝাইয়া দিল—এখানে
মোটর-গাড়ী! এ গাড়ী ঘোড়ায়
টানে না, ঘোঁসায় টানে না। এ
গাড়ী চলে বিদ্যুতের জোরে। সব
হুঁশিয়ার! পথে এ গাড়ীর সামনে
কেহ থাকিবে না। এ গাড়ী চলিতে
দেখিলে সকলে পথ ছাড়িয়া এক-
পাশে সরিয়া দাঁড়াইবে।

তার পর আধ ঘণ্টা ধরিয়া
তাদের ডাকিয়া সে গাড়ীর হর্ণ
বাজাইয়া শুনাইল; এবং সকলের
আমোদ-স্পৃহা মিটিলে প্রহরী গাড়ী
ছাড়িতে আদেশ দিল।

ছপুর বেলায় যে পথ মিলিল, সে
পথ যেন আকাশের গায়ে গিয়া
উঠিয়াছে—অর্থাৎ এ পথের খাড়াই
দশ হাজার ফুট। হিম-শীতল বাতাসে
হাড়ে কাঁপন লাগে। তেমনি আবার
প্রখর রৌদ্র! পথের দু'ধারে উঁচু-নীচু
পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের
গা তৃণ-শস্ত্রে স্তম্ভামল। বড়-বড়
দেবদারু গাছের শ্রেণী। পাহাড়ের
গায়ে থাকে-থাকে চাষের ক্ষেত—
যেন মা-লক্ষ্মী ভাঁজে-ভাঁজে সবুজ
আঁল বিছাইয়া রাখিয়াছেন!

আধ ঘণ্টা এমনি খাড়া পথে
চলিবার পর পথ আবার নামিতে শুরু
করিল—২৬ মাইল ধরিয়া উৎরাই!

পথ নামিয়া শালউইন নদীর তীরে আসিয়াছে। নদীর
বুকে পুল। পুলের পর ওপারে পথ আবার উর্কে
উঠিয়াছে। এ পথে যে অপরূপ দৃশ্য-মাধুরী, তার তুলনা
বাই! ৫৭২ পৃষ্ঠায় পুলের ছবি দেখিলে সে ভীম-কান্ত
দৃশ্য-মাধুরীর পরিচয় মিলিবে।

৫৬৯ পৃষ্ঠায় ছবি দেখিবেন, যাত্রীদের মোটর রহিয়াছে



মাণ্ডালের রাজহা



পাণ্ডানের পথে

পথের উপর এবং ও দিকে উপত্যকা-ভূমির গায়ে গ্রাম-
রেখা! এ পথ পঞ্চাশ মাইল-ব্যাপী এবং এ পথ
অতিক্রম করিতে পাকা চার ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

শালউইন নদী সাগর-সমতলতার (sea-level)
২৫০০ ফুট উর্কে অবস্থিত। নদীর বুকে ঝুলন্ত পুল। পুলটি
২৫০ ফুট দীর্ঘ। পুলের দুই তীরে সশস্ত্র চীনা-প্রহরী



দূরদেশের কুলি-মজুর



কশা-পথ সেরামত

পুল পাহারা দিতেছে। গাড়ী হইতে নামিয়া বা গাড়ী
খামাইয়া পুলটিকে দেখিবেন, সে উপায় নাই! এ পুলের
উপরে বা কাছাকাছি গাড়ী দাঁড় করাইবার নিয়ম

চায়ের ক্ষেত। যুরোপীয়ান এবং আমেরিকান ব্যবসায়ী-
দের বহু দোকান আছে, কারবার আছে। সিগারেট,
আয়না, কাঁচি, ঘড়ি, টিনের কোঁটায় ভরা মাছ ও ফল,—

নাই। গাড়ী দাঁড়
করাইলে শাস্তি র
ব্যবস্থা আছে।

পুলের কাছে
ছুঁদিকেই পথ যেমন
ভীষণ-খাড়া, সে পথে
তেমনি তীক্ষ্ণ বাক!
এ-জন্ত প্রতি বৎসর
এখানে বহু বিপত্তি
হয়। গাড়ী চালাই-
বার সময় একটু
অসতর্ক হইলেই
সর্বনাশ!

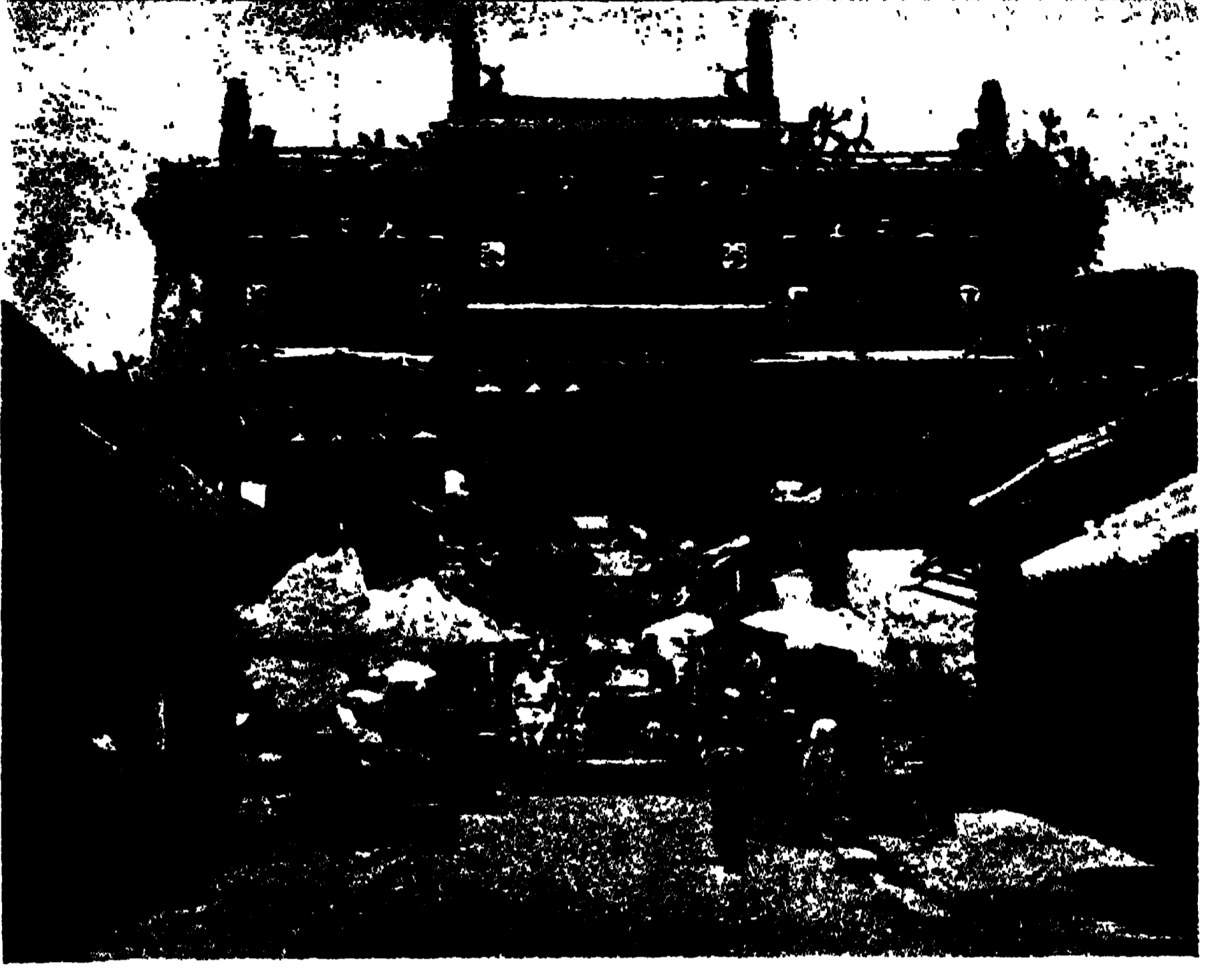
এ পুলের দেড়
শত মাইল পরে
পাওশান। পাওশান
সহরটি পরিখা-
প্রাচীরে সুরক্ষিত।
এই প্রাচীরে চারটি
ফটক আছে।
ফটকে সশস্ত্র প্রহরী।
তাদের বহু প্রশ্নের
জবাব দিয়া তবে
এই ফটক দিয়া
নগরে প্রবেশ
করিতে পাওয়া
যায়।

নগরের বাহিরে
এই যে প্রাচীর, এ
প্রাচীর বিশ ফুট
উঁচু—বিশ ফুট
চওড়া।

পাওশানে অজস্র

এ সব বিলাতী জিনিষ এখানে প্রচুর পরিমাণে কিনিতে পাওয়া যায়।

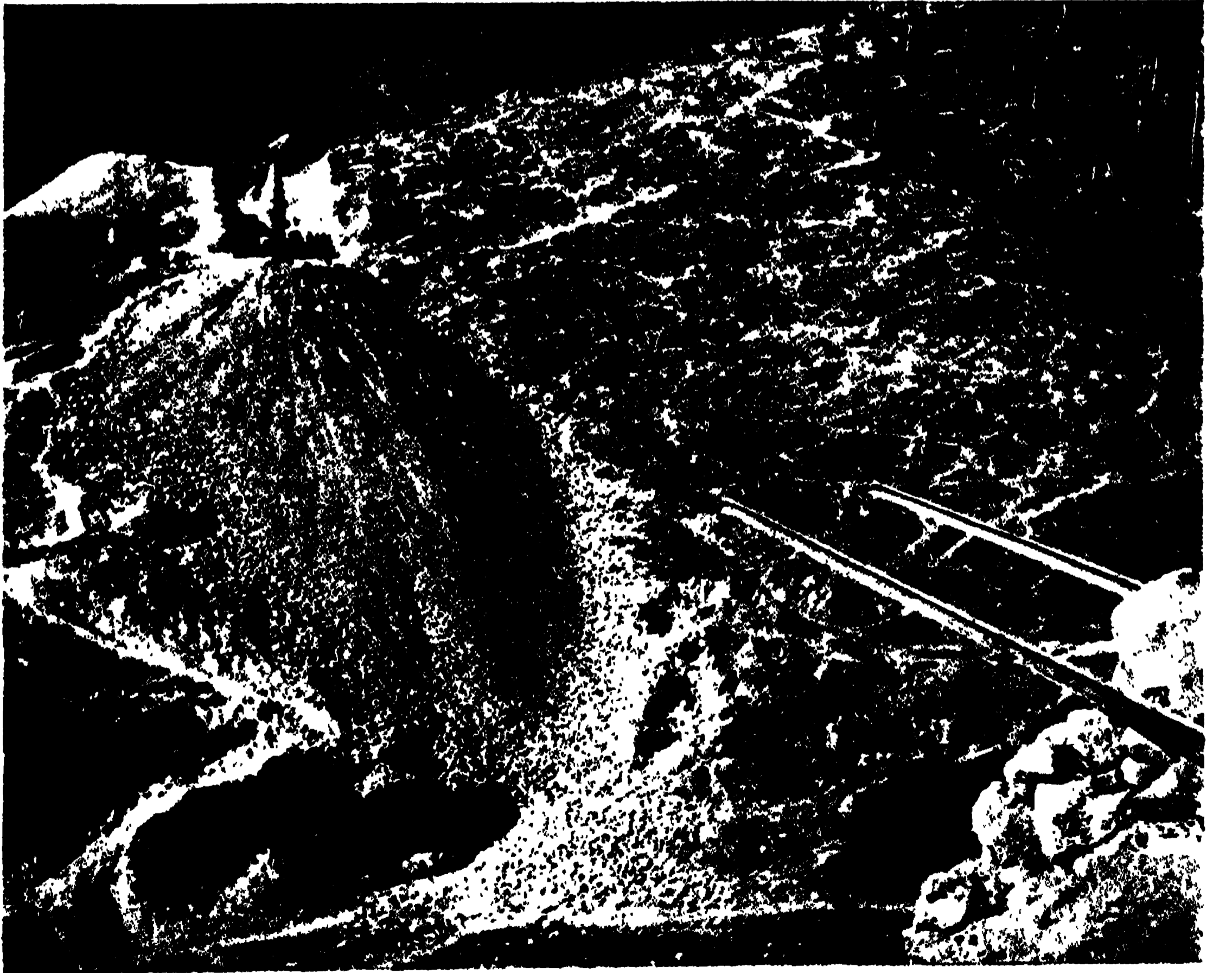
পাওশানে এক পাহাড়ের মাথায় প্রাচীন তাওইস্তু (Taoist) মন্দির আছে। মন্দিরে আছে ইউ ওয়াঙের বিগ্রহ। মন্দিরের গায়ে স্বর্ণাকরে চীনা ভাষায় লেখা আছে—“এখান হইতে ঈশ্বর খুব কাছে আছেন!” তা’ছাড়া আরো বহু কথা লেখা আছে। কোথাও লেখা আছে—“আন্তরিকতা কখনো ব্যর্থ হয় না!” কোথাও লেখা আছে, “মৃত্যু-দানব ঐ উড়িয়া পলায়, জীবন-দেবতা সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন!” আবার কোথাও লেখা,—“দেবতারা মাথার উপর আকাশে ঐ জাগিয়া আছেন!”



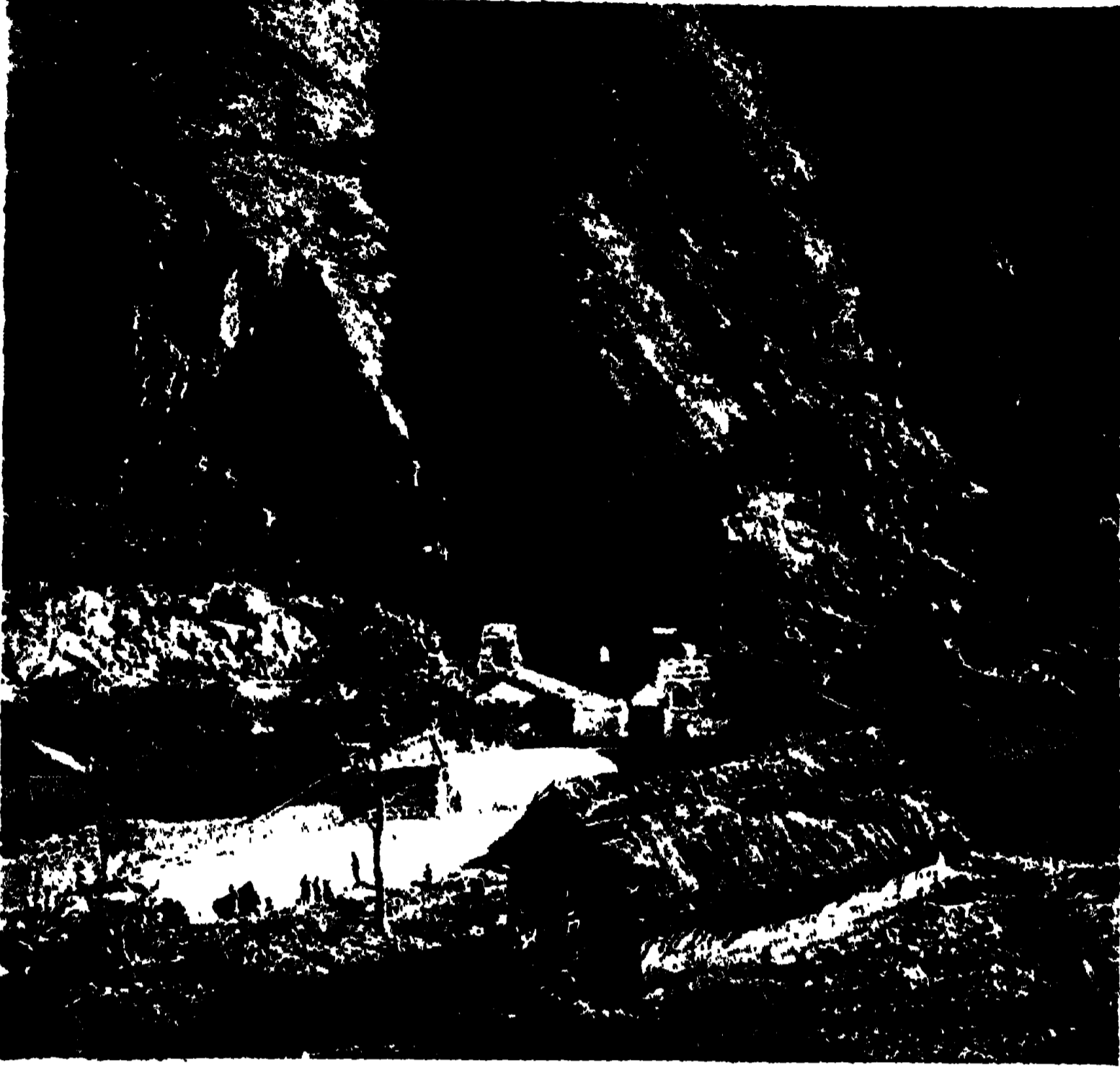
পাওশান্

বড় মন্দিরের বাহিরে কয়েকটি ছোট-ছোট মন্দির আছে। সে সব মন্দিরে গ্রহ-উপ-গ্রহের বহু বিগ্রহ। বিগ্রহগুলির কাছে বড়-বড় পাত্র আছে। এ সব পাত্রে সর্বক্ষণ ধূপ-ধূনা জালিয়া রাখা হয়।

ধান্ত পাওশানের সম্পদ-লক্ষ্মী। ধান্ত-সম্পদ প্রচুর বলিয়া এখানে দারিদ্র্য নাই। দারিদ্র্য নাই বলিয়া অভাব নাই এবং সে কারণে



কানমিঙ, হইতে রেল-পথ খুলিতেছে



শিয়াকওয়ানের পথে

চুরি-ডাকাতির উপদ্রব নাই। পাওশানে চল্লিশখানি গ্রাম আছে। সব গ্রামই কৃষিজীবীদের হাতে-গলে-আনন্দে পরিপূর্ণ। কৃষকেরা দরিদ্র নয়; বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। এমন সম্পন্ন কৃষিজীবী পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

এই পাওশানে মার্কো পোলো এক দিন আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে এই পাওশান প্রদেশের ভোচানে বা ইয়াংচাং উপত্যকা-ভূমে বারো হাজার চীনা-তাতারী অশ্বারোহী সেনার হাতে ষাট হাজার বর্মীজ সেনা ভীষণ ভাবে পরাভূত হইয়াছিল। বর্মীজরা হাতী-চড়া ফৌজ আনিয়াও জয় লাভ করিতে পারে নাই।



শালউইনের তীরে গ্রাম

তাতারী-চীনা সেনারা তীক্ষ্ণ তীর ছুড়িয়া হস্তিদের এমন ভয়ানক করিয়াছিল যে, তারা এক পা অগ্রসর হয় নাই—ফোজ পিঠে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

পাণ্ডশানের পর বারো মাইল দূরে কাংকো নদী। এ-নদীর বুকেও বুলন্ত পুল। এবং পুলের উভয়-তীরে সশস্ত্র প্রহরী।

পুলের পর পথ বহু চড়াই এবং ঝাঁক পরিপূর্ণ। তার পর পথ ভালো। কাংকো-নদী পার হইলেই

ইয়াংপি। ইয়াং-

পির পর টালি।

টালি পার্বত্য-

ময়। এ পাহা-

ড়ের নীচে যে

উপত্যকা - ভূমির

উপর দিয়া বন্দী

রোড গিয়াছে,

সে পথের উভয়

পার্শ্বে দু'মাইল

ব্যাপিয়া শুধু

কবর আর কবর!

যেন মৃত সহর

পথে - প্রান্তরে

পড়িয়া আছে

পাহাড়ের কোলে

বোল-তলা একটি

পাগোডা আছে।

এ পাগোডায়

আছে দানবের

মাথা এবং পুচ্ছ (Dragon's head and tail)! এ

দানবের পূজা করিতে হয়; না করিলে ছুর্ভিক্ষ, বজ্রা এবং

মহামারীতে দেশ উজাড় হইয়া যাইবে বলিয়া চীনাদের

বিশ্বাস।

শিয়াকওয়ানের পর লুফেঙ্। এই লুফেঙে চীনা-

রেশমের আড়ৎ। এখানকার চীনা-রেশম বা চায়না

সিল্কের খ্যাতি বিশ্ব-বিখ্যাত। তা'ছাড়া এখানে লবণ-

পাহাড় আছে। সে পাহাড় কাটির এখানকার লোক-জন

লবণ বহিয়া দেশ-বিদেশে চালান দেয়। লবণের কারবার হইতে যে আয় হয়, তার পরিমাণ সামান্য নয়।

জাপান আসিয়া বাণিজ্যের দিক দিয়া প্রতিবন্দী হইবার পূর্বে চীনের বাণিজ্য-সম্পর্ক সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। স্থল-পথে এ বাণিজ্য-সম্পর্ক রক্ষা করিবার দিকে চীনের কোনো আগ্রহ ছিল না। তার কারণ, স্থল-পথে চীন হইতে বাহিরের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক রক্ষা করা দারুণ কঠিন ছিল। রাশিয়ায় যাইবে কি,



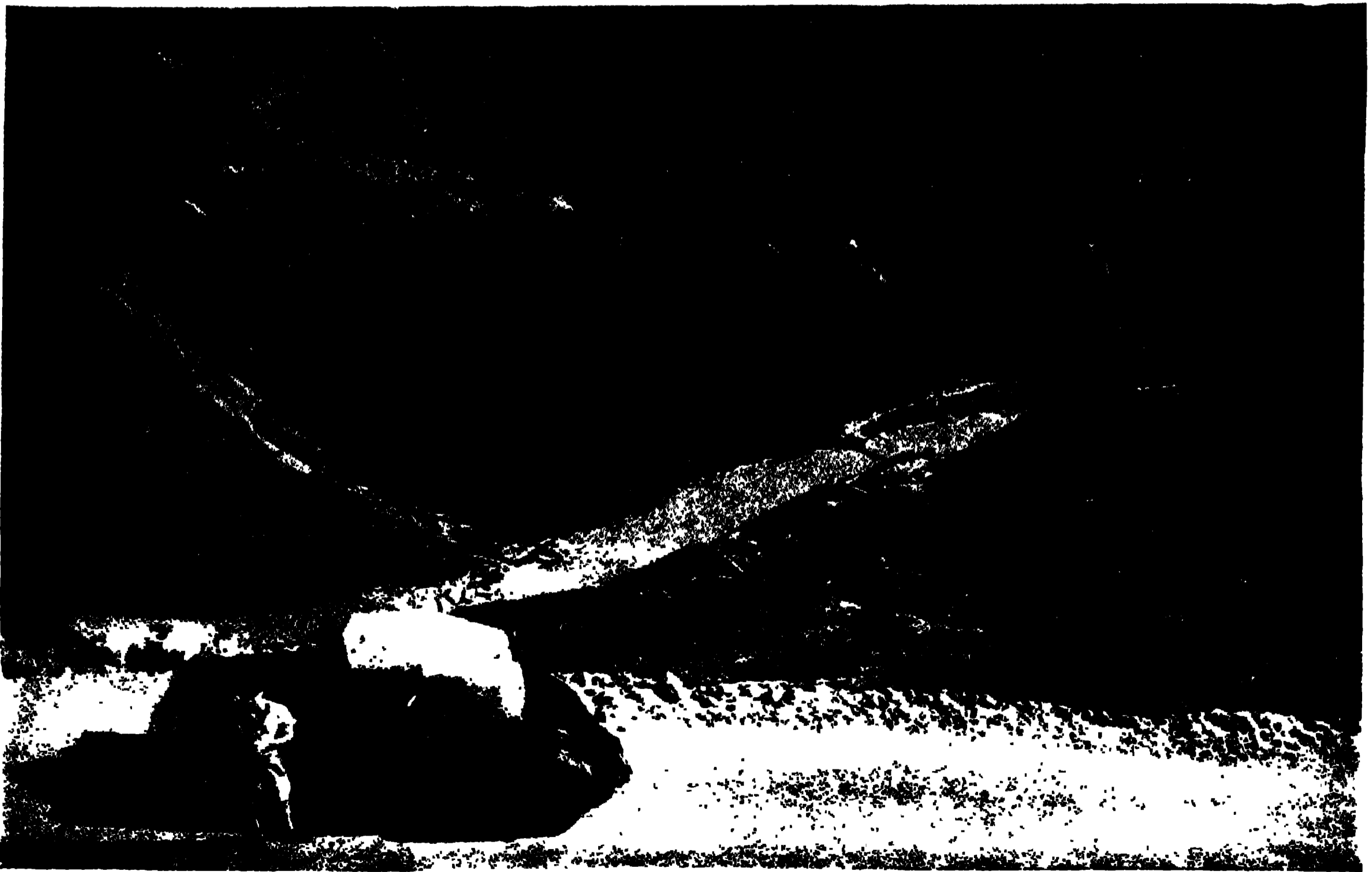
গ্রহ-বিগ্রহ

ও-দিকে যেমন বিরাট-বিশাল মরুভূমি, তেমনি তুঙ্গ গিরি-পর্বতের প্রাচীর। দক্ষিণে অসংখ্য গিরি-পর্বত এবং অসংখ্য জুর নদ-নদী! চীন ছিল নির্ভয়—বিধাতা এমন প্রাচীর দিয়া চীনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন যে, স্থল-পথে কোনো দিক দিয়া শত্রু আসিবে, সে উপায় নাই!

তার পর জাপানের অভ্যুদয় হইল। বাণিজ্য-সম্ভারে স্থল-পথকে জাপান একেবারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।



গুফেতে লবণ-বাহীর দল



শালউইন নদী : হুয়ে সেতু

জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যাপারে চীন টকর দিয়া নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না।

তখন চীনার মনে জাগিল বহু বৎসর-পূর্বে-কল্পিত বন্দী হইতে চীন পর্যন্ত পাকা সড়ক করিবার বাসনা। ৪৫

বৎসর পূর্বে এ পথ নির্মাণের পুরাতন স্বপ্ন— ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে। কিন্তু নানা বাধা হেতু এ কল্পনা কোনো দিন সত্য হইয়া দেখা দিবে, এমন আশা ছিল না। এখন মেজর ডেভিশের নির্দেশানুসারে কানমিঙ হইতে উত্তরে শিচাঙ পর্যন্ত রেল-পথ নির্মিত হইতেছে। এ রেল-পথ নির্মিত হইলে শেওয়ান প্রদেশের সহিত

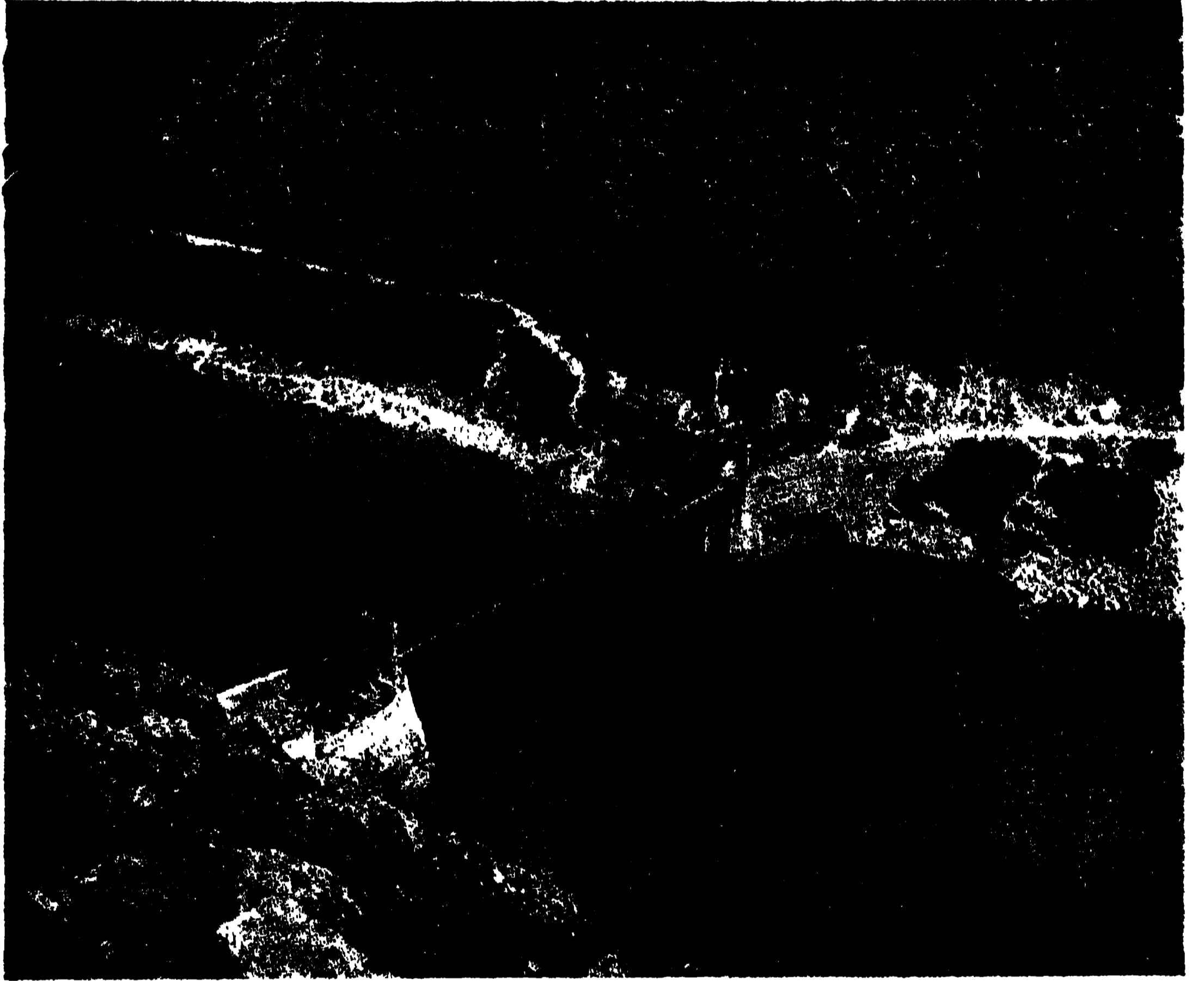
ইয়াংসি নদীর সংযোগ সংস্থাপিত হইবে।

তার উপর কানমিঙ হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত আকাশ-পথে বিমান-পোত চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। তিনটি বিমান-স্টেশন নির্মিত হইয়াছে; কিন্তু এ তিন স্টেশনের অবস্থান গোপন রাখা হইয়াছে।

পাকা-পথ, রেল-পথ ও বিমান-পথ—এই ত্রিবিধ পথে চীন আজ বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তার বিবিধ বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া বাণিজ্যকে স্ফূর্ত ও সহজ করিয়া তুলিবে, সে-আশা হুরাশা বলিয়া মনে হয় না।

জাপান-যুদ্ধের অন্ত বহু বিষয় ঘটিতেছে; তবু এ পথ-নির্মাণে চীনা-জাতির উদ্যোগ এতটুকু শিথিল হয় নাই।

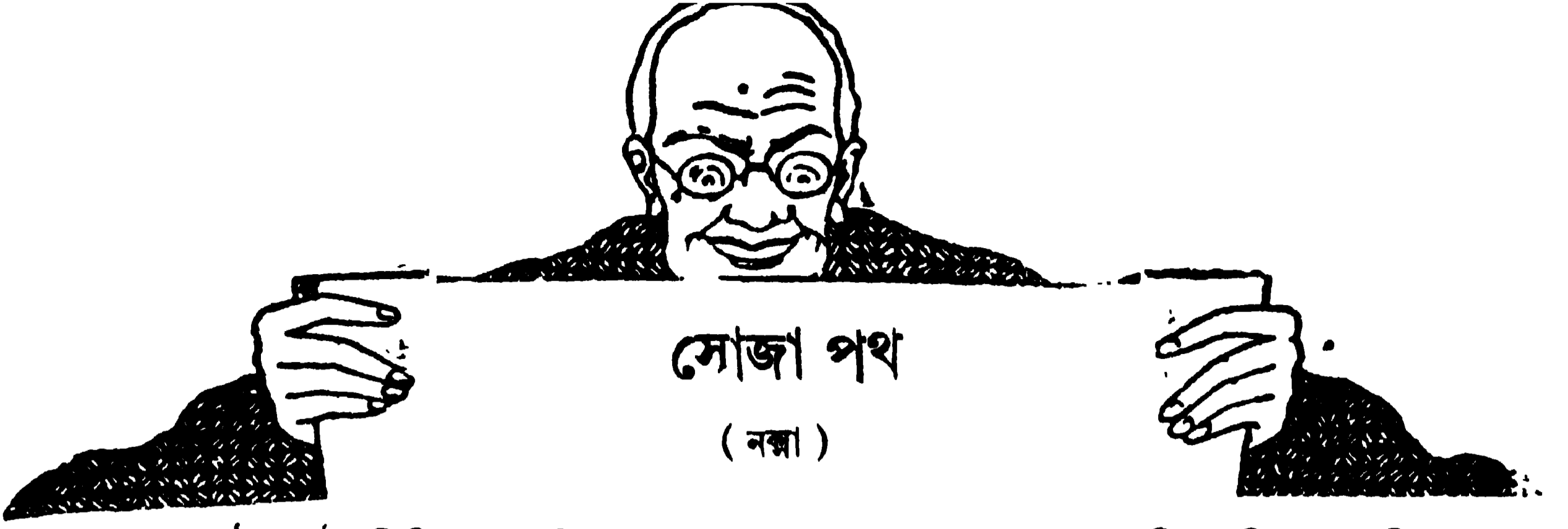
এ-দিকে যুদ্ধ, ও-দিকে পথ-নির্মাণ—কোনো দিকে চীনা জাতির উৎসাহের সীমা নাই। তার উপর ম্যালেরিয়ার ভীষণ দৌরাণ্ড। কুলি-মজুর কাজ করিবে কি, ম্যালেরিয়ার বিধে তাদের দেহ জীর্ণ হইয়া গেল। এ ম্যালেরি-



শালউইনের বৃক পুলা

রিয়ার প্রতিকার এবং প্রতিবেধ-কল্পেও চীনা জাতি আজ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে! সুতরাং আশা করা যায়, দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যে চীন যে-মুক্তিতে জাগিয়া উঠিবে, সে-মুক্তি জরাজীর্ণ থাকিবে না; সে মুক্তি হইবে শক্ত-সমর্থ, সে মুক্তি হইবে পার্শ্ব ব্যাপারে সচেতন!

পূর্বে বর্ষার সময় বন্দী রোডের কয়েক জায়গা ধসিয়া এ পথ ছুর্গম হইত। কিন্তু মামুলি যজ্ঞপাতি লইয়া সাবেকী রীতিতেই চীনা জাতি আজ যে বন্দী রোড গড়িয়া তুলিয়াছে, সে পথ যে সর্বকালে স্ফূর্ত-স্বচ্ছন্দ থাকিবে, এ পথে যে-সব মার্কিন ও ব্রিটিশ যাত্রী যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁরা তাহা স্বীকার করিতেছেন।



সোজা পথ

(নক্সা)

এত কালের পর ছুই ভাই গিরিশ ও হরিশ শের মধ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড মনোমালিন্য ঘটিয়া গেল।

গিরিশ বাগচি ও হরিশ বাগচি সহোদর ভাই। গিরিশ বড়, হরিশ ছোট। বর্ধমান জেলার ময়নাহাটিতে ইহাদের বাস। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে আজ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর হইল, ইহারা বাসগ্রাম ছাড়িয়া বর্ধমান সহরে আসিয়া বাস করিতেছে। হরিশ জমি কিনিয়া এখানেই বাড়ী করিয়াছে বটে, কিন্তু গিরিশ বরাবর ভাড়াটে বাসায় থাকিয়াই 'দিনগত পাপক্ষয়' করিতেছে। ছুই ভাই এইরূপ পৃথক্ ভাবে বাস করায়, উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটিবে—এ যাবৎ তাহার অবকাশ বা কারণের উদ্ভব হয় নাই, কিন্তু এত দিন পরে তাহা ঘটিল; উপলক্ষ—স্থানীয় 'বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়'।

এই বালিকা বিদ্যালয়টির 'ম্যানেজিং কমিটিতে' উভয় ভ্রাতা বহু দিন হইতে ছুইখানি প্রধান আসন—যেন 'মৌরসী পাট্টা' লইয়া—দখলে রাখিয়াছে। গিরিশ স্কুল-কমিটির প্রেসিডেন্ট, আর হরিশ সেক্রেটারী। মুখে ইহারা আক্ষেপ করিয়া বলে,—'ঘরের খেয়ে বনেরমোষ তাড়ানো' কাজ; কিন্তু এই দুইটি অবৈতনিক পদকে পরমপদ জ্ঞানে আঁকড়াইয়া ধরিয়া-থাকিবার জন্য উভয়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ দেখিলে মনে হয়, 'বৈতনিক' চাকরীর প্রতিও চাকরীজীবী বাঙ্গালীর অতখানি অগুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু গিরিশের এত দিনকার একচেটিয়া আসন ও অধিকার, এইবার কোন দুঃস্বপ্ন কারণে সহসা খসিয়া গেল, এবং এই স্বপ্নেই হরিশের সহিত তাহার মনোমালিন্য। গিরিশ বলে, হরিশই গোপনে শলা-পরামর্শ ও বড়বাক্ত করিয়া তাহাকে স্কুল-কমিটি হইতে তাড়াইল। হরিশ বলে, "দুঃস্বপ্ন ক্রমেই বদলাচ্ছে, এখন নতুন-পছী

লোকদের মনোভাব দিন দিন বদলিয়ে যাচ্ছে; পুরোণেকে তাঁরা আঁকড়ে ধ'রে থাকতে নারাজ, তাই তাঁরা....." ইত্যাদি।

গিরিশ সকলের কাছে হরিশের নিন্দা ও কুৎসা রটাইয়া বলিল, "ও যেখানে থাকবে, তার ত্রিসীমানার মধ্যে আর আমি বাস কোরবো না,—কোরবো না। বর্ধমানে থাকা এই আমার শেষ। তাগুগিসু, জমী কিনে এখানে বাড়ী তৈয়েরী কোরে ফেলিনি!"

কানাই ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কোথায় গিয়ে থাকবেন, দাদা?"

"খুব দূরে কোথাও,—যেখানে গেলে আর কখন ওর মুখ না দেখতে হয়।"

নারায়ণ গাঙ্গুলী বলিল, "যদি বিদেশে গিয়েই থাকতে হয় ত—ওর নাম কি, সাহেবগঞ্জ গিয়ে থাকুন; 'ফাট কেলাস' জায়গা। সামনে গঙ্গা, পেছনে পাহাড়; জিনিস-পত্তোর সবই অসম্ভব রকম সস্তা! আর জল-হাওয়া একেবারে...ওর নাম কি—"

প্রফুল্ল সাঁতরা পরামর্শ দান করিল, "হিঁচু হোয়ে সায়েব-ফায়েবে দরকার কি? কাশী—কাশী—শিবধন্য কাশী! বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ছেড়ে থাকতে হোলে, একমাত্র শ্রেষ্ঠ স্থান—কাশী। শাজ্জেই ব'লেছে—বারাণসীই বার্কক্যের আশ্রয়।"

গিরিশ বর্ধমান ত্যাগ করিয়া সত্যই চলিয়া গেল; তবে—সাহেবগঞ্জও নয়, কাশীও নয়। গিরিশ গিয়া উঠিল—পুরী। সাক্ষাৎ জগন্নাথের লীলাভূমি, সমুদ্র-তট... গৃহিণীর ইচ্ছা না হয়, রন্ধন না করিলেও উদরের জন্য কোন দুশ্চিন্তা নাই, পয়সা ফেলিলেই আহারের যোগাড় হইতে পারে। জিনিস-পত্রও.....।

গিরিশ খায়-দায়, ঘুরিয়া বেড়ায়। সকাল-বিকাল

সমুজ্জের ধারে গিয়া বসে। সন্ধ্যায় জগন্নাথের মন্দিরে সঙ্গীক আরাতি দর্শন করে।

এইরূপে পুরীতে মাস-ছই কাটিবার পর, এক দিন স্ত্রী শৈলরাণী কহিল,—“আমার বাঁ-পাখানা ক’দিন ধরে কেমন যেন ভারী-ভারী ঠেকচে; ভয় হয়, বাত-টাত কিছু হবে না কি?”

গিরিশ একটু ভয়-তরাসে লোক; কহিল,—“সে আবার কি গো! এই বেলা তা হোলে একটা কোন ব্যবস্থা করতে হয়।”

সেই দিনই গিরিশ প্রতিবেশী এক কবিরাজের নিকটে গিয়া কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ-প্রার্থী হইল। কবিরাজ নগদ এক মুদ্রার বিনিময়ে এক শিশি তৈল দিয়া কহিল,—“সকাল-বিকেল বেশ ক’রে এইটে মালিশ করাবেন। দেখবেন—খু-উ-ব সাবধান! এই রোগটাই এখানে বড় প্রবল কি না।”

“কোন্ রোগটা?”

“এই পা-ফোলা; পথে বেরিয়েই দেখতে পান না? আয়ুর্বেদে যাকে আমরা বলি—শ্লীপদ।”

“বলেন কি? গোদ!”—গিরিশের স্বর ভয় ও বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

কবিরাজ কহিল,—“ওই রোগ আর অর্শ, এ-দুটো এখানে ঘরে-ঘরে বুলেই হয়।”

গিরিশ উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত চিত্তে তেলের শিশিটা হাতে লইয়া বাসায় ফিরিল; এবং তিন দিন ধরিয়া সমস্ত মনে এই বিষয়ে ভাবিবার ফলে, ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, পুরীতে আর থাকা চলিবে না, স্থানান্তরে পলাইতে হইবে। জগন্নাথ না করুন, যদি তাহাদের স্বামিনী ছ’জনেরই শ্রীপদে এই অতি অশ্লীল শ্লীপদ রোগটা হয়, তাহা হইলে লোকসমাজে আর চলা-ফেরা করা চলিবে না; দিন-রাত ছ’জনে ঘরের মধ্যে মুখো-মুখী বসিয়া থাকিতে হইবে। আর তা ছাড়া, যদি কখনো হরিশের সঙ্গে বা বর্ধমানের আর কাহারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা মনে-মনে খুব এক চোট হাসিয়া লইবে, আর বলিবে—এখানে আসিয়া সেখানকার পদচ্যুতির লোকসানটা এইরূপ পদবৃদ্ধি দ্বারা পোষাইয়া লইল! তার উপর, অর্শ রোগটিও বড়-একটা

কেও-কেটা ন’ন; একবার তাঁহার হৃদয় ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিলে বংশাঙ্কুরে তিনি কায়েমী পাট্টা লইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, আর তার জালা-বজ্রগাও তুচ্ছ নয়।

সুতরাং ছই-এক দিনের ভিতরেই গিরিশ আবার তলুপি-তলুপা বাধিতে মনঃসংযোগ করিল।

২

“কোন সংবাদ না নিয়ে, এখানে আসাটা আপনার ঠিক কাজ হয়নি।”

“কাশী হোল পরম তীর্থস্থান, অন্নপূর্ণার রাজত্ব,—এর আর সংবাদ নোব কি বনুন?”

“কিন্তু রাজত্ব যে বেরী-বেরীতে লোপ পাওয়ার দাখিল, এ ত সকলেই জানে; আপনি কি এ খবর জানতেন না?”

“জানলে কি আর এ-মুখো হ’তাম মশায়! এ যে দেখচি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!”

কাশীর চৌবট্টি যোগিনীতে একটি বাড়ীর একখানি ঘরে বসিয়া, গিরিশ ও একটি ভদ্রলোকের এইরূপ আলাপ চলিতেছিল।

আজ পাঁচ-ছয় দিন হইল, গিরিশ কাশী আসিয়াছে; আসিয়াই দেখিল, প্রত্যেক মহল্লার প্রায় প্রতি-ঘরেই বেরী-বেরীতে আক্রান্ত! নিশাবসানের পর ঝটিকা-তাড়িত ফুলবাগানের যে অবস্থা হয়, কাশীর বর্তমান অবস্থা তদ্রূপ।

গিরিশের কথায় ভদ্রলোকটি কহিলেন—“যা’ক, অত ভয় পাবেন না; যখন এসে প’ড়েচেন, তখন বিখনাথের নাম কোরে থেকে যান, কোন বিপদ হ’বে না।”

কিন্তু গিরিশের কান এখানে থাকিলেও, মন এখানে ছিল না। তাহার মন ঘুরিতেছিল তখন—বৈষ্ণনাথ, মধুপুর, গিরিডি, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে। কোথায় পালানো যায়? কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে ও সুস্থ-দেহে জীবনের বাকী ক’টা দিন কাটানো যায়?

সেই দিনই গিরিশ আবার বিছানা-পত্র বাধিল এবং ডিহিরি-অন্-সোনের ছইখানি টিকিট কিনিয়া আনিল। মনে মনে ভাবিল,—“এ-ই সব-চেয়ে ভাল। খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। শরীরটা ভাল থাকবে। কোন ভীড় নেই,

গোলমাল নেই, ঝঙ্কি-ঝঙ্কাট নেই। আমার পক্ষে ডিহিরিই উপযুক্ত জায়গা।”

বাড়ীওয়া নন্দকিশোর বাবু বলিলেন,—আমাকে একটীবার জিজ্ঞাসা করলেন না, তাড়াতাড়ি ‘ডিহিরি’র টিকিট কিনে আনলেন ?”

গিরিশ স-ভয়ে কহিল,—“কেন, হোয়েচে কি ?”

“ডিহিরিতে গিয়ে কিছু দিন বাস করার অর্থ—অপঘাত মৃত্যু !”

“অ-অর্থাৎ ?”

“অর্থাৎ—যায়গাটি সাংঘাতিক কাঁকড়া-বিছে আর ‘করেঠি’ সাপের আড্ডা ! ঘরে-দোরে-উঠোনে, রান্না-ঘরে, বিছানা-মাছুরে সর্বত্র। আর সাংঘাতিক বিদ্যাক্ত !”

“এমন ব্যাপার ?”

“তার পর, জিনিস-পত্তর কিছুই ওখানে পাবেন না। না পাবেন—মাছ-মাংস, না পাবেন ভালো তরি-তরকারী, না পাবেন পছন্দমত কাপড়-চোপড়।”

সুতরাং ‘ডিহিরি’ও বাতিল হইল।

সে-দিন বাধ্য হইয়া গিরিশকে কাশীতেই কাটাইতে হইল। পরদিন গিরিশ মুন্সেরের টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

মুন্সেরে সুবিধামত একটি বাসা পাইয়া, এত দিন পরে গিরিশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল, এইবার ভগবান ঠিক জায়গায় এনে ফেলেচেন। সর্বাংশেই মনোরম স্থান। আহা-হা, গঙ্গার কি মনোহর দৃশ্য রে! আর কুয়োর জলই বা কি চমৎকার! যা খাও, স্নেহ-স্নেহই সব হজম! আর জিনিস-পত্তরই বা সস্তা কত! তা ছাড়া, ঐতিহাসিক স্থান; সাথে কি নবাব এখানে রাজধানী ক’রেছিলেন!—পরদিনই গিরিশ কষ্টহারিণী-ঘাটে স্নান করিয়া এত দিনের ঘোরা-ঘুরির কষ্ট ভুলিয়া গেল।

মুন্সেরে এক মাস গিরিশের মহা-আনন্দেই কাটিল। কিন্তু তাহার পর হঠাৎ এক দিন—

হঠাৎ এক দিন গিরিশ এক স্বপ্ন দেখিল।

স্বপ্ন দেখিল যে, সে এক রাজবাড়ীতে কোন উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে। রাজপ্রাসাদ আলোক-মালায় উজ্জ্বলিত; চারি দিক পত্র-পল্লব-পুষ্পগুচ্ছে সুসজ্জিত;

সুখস্পর্শ মৃদু-মধুর বায়ু-হিলোল সৌরভাকুল; সকলেই মনোহর, সুদৃশ্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া—আনন্দ-রস-পানে পরিতৃপ্ত; নৃত্য-গীত-বাত্তের শ্রুতি-সুখকর ধ্বনিতে উৎসবমগ্ন প্রতিক্ষবিত।—এমন সময় সহসা বিশাল প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিল, এবং সেই প্রবল কম্পনে, সুবর্ণ-সুত্রগ্রথিত কারুকার্যময় মকমলমণ্ডিত মহামূল্য বিচিত্র আসন হইতে গিরিশের পতন! পতনের ফলে, তাহার নিদ্রার সঙ্গে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

বোধ হয়, তখন মধ্যরাত্রি; কিন্তু সেই রাত্রিতে আর গিরিশের ঘুম হইল না। সারা-রাত ধরিয়া সে কেবল সেই স্বপ্নের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। কোথায় এই রাজপ্রাসাদ? কিসের উৎসব? হঠাৎ প্রবল কম্পনই বা কেন? ভূমিকম্প কি?—

এ কি নিছক স্বপ্নমাত্র, না সত্যের সঙ্গে কোন সঙ্ঘর্ষ আছে? কোন অমঙ্গলের পূর্বাভাস নয় ত? বিহারের সেই মারাত্মক ভূমিকম্প ত এই সব অঞ্চলকেই একেবারে... একবার যখন হোয়েছে, তখন আর যে হবে না, তার নিশ্চয়তা কি? হিমালয়ের শেকড় না কি এই অঞ্চলেরই মাটির ভেতর দিয়ে গিয়েচে। সুতরাং তা বর্তমান থাকতে...!! একটা ভয়ানক আশঙ্কায় ও উদ্বেগে বাকী রাত গিরিশ জাগিয়াই কাটাইল। খুব ভোরে সে শৈলরাণীর গা ঠেলিয়া ডাকিল—“ওগো, ওগো শুনুচো?”

শৈলরাণীর তখন অবস্থা—‘কেবা আঁখি মেলে রে!’ সে বলিল, “কি বলচ?”

“মুন্সেরে আর থাকা চলবে না; আজই-স’রে প’ড়তে হবে।”

শৈলরাণী ভয়ঙ্কর খাপ্পা হইয়া কহিল,—“তুমি যে দেখ্‌চি, বেজায় জ্বালাতন আরম্ভ ক’রলে! যেখানে যেতে হয়, যাও তুমি, আমি এখান থেকে নড়ি-নে।”

“এখানে কি আর থাকতে পারবে? ভূমিকম্পে ঘর-চাপা প’ড়ে জ্যান্ত কবর হ’য়ে যাবে যে!—ওঠ, ওঠ! এই সকালের ট্রেনেই পালাবো। কেন না, হিমালয়ের মূল-শেকড় একবার যখন ক্লেপেচে, তখন যে-কোন মুহূর্তে আবার ক্লেপে উঠতে পারে!”

“উঠুক। ভূমিকম্পে চাপা যদি পড়ি ত প্রাণটা

বাঁচে ; তা হোলে আর নিত্য এমনি কোরে চরকীর মত এ-দেশ সে-দেশ যুরে মোরতে হয় না ।”

শৈলরাণী মুদিত নেত্রে পাশ ফিরিয়া শুইল ; উঠিল না । না উঠিলেও গিরিশ উঠিল, এবং মুখ-হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইবার জন্ত বাহিরে আসিল । মনে-মনে কেবলই বলিতে লাগিল,—“বেহারে আসাটা খুবই অবিবেচনার কাজ হোয়েচে ; ভূমিকম্পের কথাটা আমার মোটেই মনে ছিল না ।”

সঙ্গে-সঙ্গে ডি, এল, রায়ের সেই গানটা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—“বিহারে বিঘোরে চড়িয়া একা”— ইত্যাদি ।

০

সেই দিনই রাত্রে গিরিশ কলিকাতায় আসিয়া-পড়িয়া ভয় ও উদ্বেগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল । অন্ত কোথাও না গিয়া, যদি সে প্রথমেই এখানে আসিত, তাহা হইলে এত এ-দেশ সে-দেশ ঘোরা-ঘুরি ও অর্থ নষ্ট হইত না । কলিকাতাই বাঙ্গালীর বাসের উপযুক্ত স্থান ; বাঙ্গালীর স্বর্গ । বাঙ্গলার হাজার হাজার পল্লীগ్రামকে উৎসন্ন দিয়া, সেই মূল্যে যে স্বর্গ—অমরার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী !’ স্মরণ্য গিরিশ তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া, মনে-মনে স্থির করিল, আর কোথাও নয়, যত দিন বাঁচিবে, কলিকাতাতেই থাকিবে ।

মাস পাঁচ-ছয় পরে এক দিন সকালে গিরিশ দৈনিক সংবাদপত্র হস্তে লইয়া বিরস-বদনে বৈঠকখানায় বসিয়া-ছিল । শৈলরাণী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, “আজ আর চা-এর তাগিদ নেই কেন গো ? চা যে জুড়িয়ে গেল !”

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিরিশ কহিল,—“চা ? ওঃ ! তা’...আচ্ছা...চা.....”

রাস্তার দিকের দরজা ঠেলিয়া পাশের বাড়ীর যোগেশ বাবু প্রবেশ করিল, এবং শৈলরাণী তৎক্ষণাৎ অদৃশ হইল । যোগেশ কহিল, “দাদা, কাগজে দেখলেন বোধ হয়—‘ব্ল্যাক-আউট’ ; সন্ধ্যা থেকে রাত ছপুর পর্যন্ত ! ব্যাপার গুরুচরণ !”—বলিয়া হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল ।

বিমর্ষ চিন্তে গিরিশ কহিল, “জান্না খোলাও ত নিবেধ !”

“নিবেধ বই কি ! এটা পরীক্ষার ব্যাপার কি না । অর্থাৎ ওপর থেকে কোন রকমে আলো দেখা যা’তে না যায় ; আর তা ছাড়া, ব্যাটারি যদি গ্যাস-বোমাই ফেলে, তা হোলে ত জানালা বন্ধ রাখতেই হবে কি না, মায় ‘ভেটিলেটার’ শুদ্ধ ।”

গিরিশের মুখখানা রক্তশূণ্য হইয়া পড়িল ; কহিল,—“গ্যাস-বোমা ফেললে ত সব দম্ আটকে মরতে হবে । জানলা বন্ধ রাখলেও কঁাকে-কোঁকে গ্যাস ঢুকে পড়বেই !”

“রাত্রে কি আর বাড়ীতে থাকা চলবে ! জায়গায়-জায়গায় ‘শেলটার’ হবে, সেইখানে গিয়ে রাত্রে সব থাকতে হবে । চিন্তার বিশেষ কিছু নেই । আগে থাকতেই এ, আর, পি, তোড়-জোড় বন্দোবস্ত স্ক্রু কোরে দিয়েছে ।”

“আচ্ছা, গ্যাস ছাড়তে পারে কি ?”

“জান্মাণ ব্যাটারি অ-মাহুষ ; ওরা সবই পারে ।—হ্যাঁ দাদা, আজ বায়োস্কোপে যাবেন বলেছিলেন, যাবেন ত ?”

সন্মুখের দেওয়ালের কোণটাতে গিরিশের দীপ্তিশূণ্য দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল । তেমনি ভাবে সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—“না ।”

“হ্যাঁ, ভাল কথা ; রবিবার দক্ষিণেশ্বর যাবার গাড়া আমি ব্যবস্থা ক’রে ফেলেচি ; ক’টায় এখান থেকে বেরোনো হবে, বলুন ?”

তখনো গিরিশের দৃষ্টি সেই দেওয়ালের কোণে ; কহিল,—“আমি যাব না ।”

“যাবেন না ?”

অনিচ্ছাস্ফূটক ঘাড় নাড়িয়া, গিরিশ উঠিয়া দাঁড়াইল ! যোগেশ কহিল—“উঠছেন না কি ?”

“হ্যাঁ ; শরীরটা আজ বড্ড খারাপ ।”—বলিয়া গিরিশ রাস্তার দিকের ছয়রে খিল লাগাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল, এবং বায়ান্দার আরাম-কেদারাখানার উপর চক্ষু বুজিয়া ঢলিয়া পড়িল ।

বৈকালের দিকে গিরিশ হঠাৎ তেজস্বী হইয়া উঠিল । শৈলরাণীর কাছে গিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিল,—“আমার হোয়েচে কি জান ? ‘ঘর থাকতে বাবুই ভেজে’—তাই ! কোন্ শা—আর এখানে থাকে ?”

হঠাৎ গিরিশের এই ভাবের কথায় শৈলরাণী চমকাইয়া উঠিল; কহিল,—“ব্যাপার কি? কি হয়েছে?”

“হয়েছে অনেক কিছুই; আরও হয় ত হবে। কিন্তু আর হ’তে দিচ্ছি নে। চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে এসে, পাপ যা করবার তা ত করেইচি, কিন্তু আর সে পাপ বাড়িচ্ছি নে! আমি কারও কথা শুনচি নে! গুরুদেব এসে বারণ ক’রলেও, না! যাবই; শম্মাকে কেউ এখানে আটকে রাখতে পারবে না।”

কথার অর্থ কিছুই শৈলরাণী বুঝিতে না পারিয়া, গিরিশের মুখের প্রতি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

৪

আবার বর্দ্ধমান জিলার সেই ময়নাহাটা গ্রাম।

সকাল বেলায় গিরিশ তাহার বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ও-পাড়ার দেবেন কুণ্ডুর সহিত কথা কহিতেছিল।

গিরিশ কহিল,—“ম্যালেরিয়াতে ভুগতে হয় ভুগবো, কিন্তু গাঁ ছেড়ে আর কোথাও যাবো না—এ একেবারে স্থির কোরে ফেলেছি।”

দেবেন কহিল,—“গা-ও ছাড়বার দরকার হবে না, আর ম্যালেরিয়াতেও ভুগতে হবে না,—সুন্দর যখন উপায় র’য়েছে। গাঁয়ের লোক কেউ কখনো আমাকে ম্যালেরিয়ায় ভুগতে দেখেছে?”

“উপায়টা কি?”

“উপায়?—উপায় একটু কোরে রোজ—” বলিয়া দেবেন মুখের উর্দ্ধে হাতের মুঠাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া ইঙ্গিত করিল।

গিরিশ কহিল,—“মদ?”

“হ্যাঁ। ম্যালেরিয়া জন্ম ওর কাছে। অর্থাৎ যে-কোন একটা নেশা করলে, ম্যালেরিয়া আর কাছে ঘেঁসতে পারবে না। আমি এই ম্যালেরিয়ার মধ্যে থেকে, শুধু ওরই জোরে বেঁচে আছি; এবং বেশ ভাল-ভাবেই বেঁচে আছি; দেখখানি আমার দেখচ ত? ময়না-হাটা যেন আমার পক্ষে দার্জিলিং! সত্যি কি না বল?”

অতঃপর চা আসিল, ছিলিমের পর ছিলিম তামাক আসিল; এবং উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চলিল।

সন্ধ্যার সময় গিরিশ ও-পাড়ার দেবেন কুণ্ডুর বাড়ী বেড়াইতে গেল। যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার চিরকালের অটল পদদ্বয় ঈষৎ টলিতেছিল, এবং চক্ষু দুইটি খুবই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শৈলরাণী সম্মুখে আসিলে, হাত নাড়িয়া গানের সুরে কহিল,—

“মরমে মরিতে সখি, যদি চিরদিন পার—
বতনে তোমারি পায়ে দিব শ্ৰেয় উপহার।”

কণ্ঠস্বরও কিঞ্চিৎ টলায়মান!

শৈলরাণী কিছুক্ষণ অবাক হইয়া গিরিশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর কহিল,—“কি বিটকেল্ গন্ধ গো! মদ গিলে এসেছ না কি?”

জড়িত কণ্ঠে গিরিশ বলিল,—“খেয়েচিই ত; আলস্যে খেয়েচি। ম্যালেরিয়াকে দেখে নোবো। ঠিক দে—খে নো-ওব। দেবেন ইজ্ মাই ফ্রেন্ড—মাই বুজুম্ ফ্রেন্ড! (সুরে) ‘স্মরণান করি নে আমি, স্মৃধা খাই মা তারা ব’লে’।”

ক্রোধ, বিষাদ এবং ভয়—একসঙ্গে শৈলরাণীর মনে উদয় হওয়ায়, তাহার মুখ অস্বাভাবিক একটা গাভীর্ষ্যে পূর্ণ হইল। আর একটিও কথা না বলিয়া শৈলরাণী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

অতি শীঘ্রই ম্যালেরিয়াকে তাড়াইবার কৌশলটি গিরিশের উত্তমরূপে আয়ত্ত হইয়া গেল।

মাস-খানেক পরে এক দিন গিরিশ পাশের গাঁয়ের রজনী মালাকারের পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে গেল। রজনী আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশ্যে পুকুর-ঘাটে গিরিশের পাশে আসিয়া বসিয়া কহিল,—“মাছ ঠাঙ্গা আছে দা’-ঠাকুর, আপনার ভাগ্যে এখন কি হয়।”

ফাত্নার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গিরিশ বলিল,—“আচ্ছা রজনী, পুকুরের পাড়গুলো বনে-জঙ্গলে এমন ভরিয়ে রেখেছ কেন? একটু সাফ-সোফ্ ক’রে রাখতে হয়।”

“পারি না দা’ঠাকুর! এঁকলা লোক, ক’দিক্ দেখি বল? বাড়ী ত হাসপাতাল; ঘুরে-ফিরে সকলেই পড়চে। আমিই যা ভাল আছি। তা, তাদের দেখবো, না পুকুর দেখবো?—ম্যালেরিয়াতেই সব মাটি করলে!”

“তোমায় বুঝি ম্যালেরিয়ার কিছু করতে পারে না ?”

“আমি চার টাইম চার ছিলিম সে জিনিষ ওড়াই দা’ঠাকুর ! ম্যালেরিয়ার চোদ্দপুরুষ আমার এলাকার মধ্যে ঘেসতে পারে না।”

“তা ঠিক বলেছ ; মদ, গাঁজা, আর আফিং—এ-তিনের কাছে ম্যালেরিয়ার প্রবেশ নিষেধ। আমি তাই, রজনী, রোজ একটু,—তোমার গিয়ে, ইয়ে ধরেছি।”—বলিয়া মুখের উপর মুষ্টিবদ্ধ হস্ত রাখিয়া ঈর্ষিতে ‘ইয়ে’র স্বরূপ জ্ঞাপন করিল।

রজনী লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, “অমন কাজটি কোরো না দা’ঠাকুর ; লিবারের মাথা খেতে ওর মতন আর কিছু নেই। আমার শালা অন্নদা ও-ই খেয়েই ত শিংএ ফুকলো।”

“অন্নদা মরে গেছে ? সে ত তোমার এইখানেই থাকত গো ! প্রায়ই তাকে বর্ধমান দেখতুম।”

“হ্যা ; আমার মামলা-মকদ্দমাগুলো সে-ই তদ্বির করত কি না। বয়েস তার বেশী হয়নি—বছর বত্রিশ। কিন্তু রোজ ওই জলপথের অভ্যাস ক’রে চুলগুলো তার অকালে গেল পেকে, মনে হ’ত ষাট বছরের বুড়ো !”

“ওতে বুঝি চুল পাকায় ?”

“চুলও পাকায়, লিবারও পাকায়, আর পরপারের যাত্রার আয়োজনটাও বেশ ভাল রকমই পাকিয়ে তোলে।”

“বল কি ?”

“তাই ত বলছি ; ও জিনিষটি দা’ঠাকুর, এই দণ্ডেই ত্যাগ কর। ক’রে—আমার এই ডাক্তাপথ ধর। এ হোল-গিয়ে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের ত্বরিতানন্দ, এর আর জোড়া নেই, দা’ঠাকুর !”

গিরিশের চক্ষুর্দ্বয় ফাত্নার দিকে থাকিলেও মন তাহার সম্ভবতঃ কৈলাসে শিবের আস্তানার চারি পাশে উঁকি-ঝুঁকি দিতেছিল। কখন যে ইতোমধ্যে চারের কাছে ভুড়-ভুড়ি তুলিয়া একটা বড় মাছ আসিয়াছিল, কখন যে সে ফাত্না ডুবাইয়াছিল, এবং কখন যে টোপটি উদরস্থ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, এ সকল বিষয়ে গিরিশের লক্ষ্য ছিল না। সে অকারণে এবং অসময়ে যখন সজোরে একটা থ্যাচ্ মারিল, তখন উঠিল—এক

দশরথ ! ছিপ্ গুটাইতে গুটাইতে গিরিশ কহিল,—
“নাঃ, লক্ষণ ভাল নয়, আজ আর কিছু হবে না।”

অতঃপর উভয়ে উঠিয়া রজনীর বৈঠকখানায় গিয়া বসিল, এবং আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। ঘণ্টা-খানেক পরেই কৈলাসের প্রসাদের স্বাদ গ্রহণ করিয়া ঘূর্ণায়মান মস্তিষ্কে গিরিশ গৃহে ফিরিবার উদ্দেশে গাত্রোথান করিল।

৩

মাসখানেক পরের কথা।

বিকালে শৈলরাণী দরজা ঠেলিয়া দালানে প্রবেশ করিবামাত্র নাক-মুখ সিঁটকাইয়া বিরক্ত চিত্তে বলিয়া উঠিল—“মা গো ! মড়া-পোড়া চাম্বে গন্ধে বাডীতে টেঁকা ভার হোল দেখ্‌চি !”

‘বড়-তামাকের’ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া দালানের বাতাসে তখনো কিছু-কিছু ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। গিরিশ তাড়াতাড়ি পাখাখানা দিয়া ধোঁয়াগুলোকে বাহির করিয়া দিতে-দিতে কহিল,—“নতুন কি না, তাই তোমার একটু ইয়ে লাগ্‌চে—ক্রমে গন্ধটা অভ্যাস হোয়ে যাবে শৈল !”

মুখ-ঝামটা দিয়া শৈল কহিল—“বেশ ছিলুম বর্ধমান। সাত দেশ ঘুরে, সাত ঘাটের জল খেয়ে, এ যেন মড়া-শ্মশানের মধ্যে বাস করতে হচ্চে ! কত পাপই ক’রে-ছিলাম, তাই ভাবি।”

“শ্মশুরবংশের ভিটে শৈল, এ তোমার তীর্থ ; মড়া-শ্মশান বলতে নেই, অকল্যাণ হয়।”

“তীর্থকে যে মড়া-শ্মশান তুমিই কোরে তুলে,—তা বোলবো না ?”

হঠাৎ গিরিশের মাথা গরম হইয়া উঠিল। এখন এই রকমই হয়। সেই মাছ ধরিবার দিনের পর হইতেই গিরিশ সামান্য একটু প্রতিবাদেই হঠাৎ এইরূপ রাগিয়া উঠে। চোখ দুইটা রক্তবর্ণ করিয়া, খানিকক্ষণ শৈলরাণীর মুখের দিকে কট-মট করিয়া চাহিয়া থাকিবার পর উচ্চ কণ্ঠে কহিল,—“বলতে পাবে না—আমার হুকুম, ব-ল-তে পা-বে—না !”

“আলবৎ বোলবো, একশোবার বোলবো !”—বলিতে বলিতে শৈলরাণী দালান হইতে বাহির হইয়া গেল।

তার পর গিরিশের বাকুদ-খানায় যেন আগুন লাগিল। সমস্ত বাড়ী কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—
“হাম্ নেহি মাংতা হায় ; নিকাল যাও পাঞ্জি কোথাকার ! দূর হোয়ে যাও !”

শৈল ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—“এইবার ঠিক গাঁজা-খোর মানিয়েচে তোমায় ! ছিঃ-ছিঃ ! তুমি এমন ইতর হোয়ে পড়লে শেষটা !”

গিরিশ আরও জ্বলিয়া উঠিল। রাগের মাথায় জলের কুঁজোটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিল, আলনার একখানা কাপড় ফালা-ফালা করিয়া ছিঁড়িল, পানের ডাবরটাকে ফুটবলের মতো দেয়ালের দিকে সজোরে ‘কিক’ করিল, হারিকেনটাকে আছাড় দিয়া চূর্ণ করিল।

বেগতিক বুঝিয়া, শৈল খিড়কী দিয়া পাশের প্রসন্ন স্বর্ণকারের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর প্রসন্ন গিরিশের উদ্দেশে উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—“দা’ঠাকুর, কোথায় গো ?”

উভয়ে দালানের মধ্যে গিয়া বসিলে, প্রসন্ন হাসিতে হাসিতে কহিল,—“আজ দা’ঠাকুর, ক্ষেপেছিলে কেন গা ?”

প্রসন্ন শৈলরাণীর কাছে বিকালের ব্যাপার সবই শুনিয়াছিল। কহিল,—“ওটা ছেড়ে দাও, দা’ঠাকুর ! একেবারে চোয়াড়ে নেশা ! ও দ্রব্যটি মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া কারো হজম ক’রবার শক্তি আছে ? ওর পরিণাম বড় ভীষণ ! ওই কালী চক্কোত্তি শেষ কালে রক্ত-বাহে করতে-করতে কাছা হাতে ক’রেই হার্টফেল কোরলে ! ও যারা খায়, তাদের ওইতেই মরতে হয়।”

এ সম্বন্ধে প্রসন্ন আরও বহু উদাহরণ দিল এবং ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিল। সমস্ত শুনিয়া গিরিশ মনে মনে বিচার করিয়া দেখিল, প্রসন্ন যাহা বলিতেছে, তাহা অসত্য নহে। দ্রব্যটির সম্বন্ধে সে এইবার বিশেষরূপে ভীত হইয়া পড়িল। সঙ্গস্ত চিন্তে প্রসন্নর দিকে চাহিয়া কহিল, “তা, ই্যা রে পেস্না, রজনী মালাকর তো খায়, কিঙ্ক সে তো দিব্যি আছে।”

“দিব্যি নেই দা’ঠাকুর ! ওর খবর আমি সব জানি। বছরের ভেতর ছ’ মাস রক্ত-আমাশায় ভোগে ; তার পর এক দিন ঐ-রোগেই ওকে ঐ শিঙের মতো কলকে-ফোঁকা ছেড়ে, সত্যিকারের শিঙেই ফুঁকতে হবে।”—খানিক

খামিয়া প্রসন্ন বলিয়া যাইতে লাগিল, “তুমি একটু ক’রে আফিং ধর দা’ঠাকুর ! এই মটর-ভর। সব চেয়ে সেরা নেশা। মজা-শুকোয় সমান মস্‌গুল ! জান ত, আমি আজ এগার বছর ঐ কালা-মাণিকের প্রেমে মোজেছি, আর এই জন্তই স্তম্ভ শরীরে আজও বেঁচে আছি। একটু বেশী বয়েসে ও-যে কত উপকার ছায়, তা আর বলবার নয়। আমি ত দা’ঠাকুর, বলতে গেলে ওরই বলে যেন নবজীবন পেয়েছি। আর তা ছাড়া, আফিংটা হোল তোমার গিয়ে আমীরি নেশা ; ও রকম ছ্যাঁচড়া, ছোটো লোকের আধ পয়সার নেশা নয়।”

গিরিশ যেন অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে-খাইতে কূল দেখিয়া কহিল,—“তা হোলে আফিংটাই ধরি ?”

“নিশ্চয়ই, তা আবার বোলতে ? তুমি সাতটা দিন খাও, তখন এর যে কত উপ্‌গার, তা বুঝতে পারবে। যৎসামান্ত খরচ, ছোট্ট একটি এক পয়সা দামের টিনের কোটোর ভেতর তোমার এক মাসের মৌতাত মজুত থাকবে ; সভায়, সমাজে কেউ জানতেও পারবে না ; মাথাটা একটু ঘুরিয়ে ‘টুক’ ক’রে মুখে ফেলে দিলে— যেন ছু’-চারটে বড় এলাচের দানা ! তার পর পা টলবে না, মাথা গরম হবে না, মনে হবে পৃথিবীটা সোনার তৈয়েরী, আর হাওয়াটা নন্দনকানন থেকেই আসচে ; এবং যে কার্যো মন দেবে, তাতেই সিদ্ধিলাভ !”

আশা এবং প্রফুল্লতায় উৎসাহিত হইয়া গিরিশ কহিল,—“বলিস্ কি রে পেস্না ?”

“ওই যে বল্লম, তুমি সাতটা দিন পরখ ক’রেই দেখ না ; তার পর বলবে যে, ই্যা, পেস্না ব’লেছিল বটে ! ম্যালেরিয়া-ফ্যালেরিয়া ত্রিসীমানায় খেঁসতে পারবে না ; শরীর তোমার একেবারে ফাটো কেলাস ব’নে যাবে। বলেছি তো, কাজ-কন্মে উৎসাহ বিশ গুণ বেড়ে যাবে। আর সবার ওপর, পরমায়ু তোমার টেনে লম্বা কোরবে। এ শুধু আমার কথা নয়, সর্বো-সাধারণেই তোমার গিয়ে এ কথাটা বলে, জানো ত ?”

অকূলে হাবুডুবু খাইতে-খাইতে গিরিশ আফিংয়েরই ‘লাইফ-বয়া’ আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং ধরিলও।

৬

প্রসন্ন স্বর্ণকারের কঠিন অসুখ; এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা। শেষ সময়ে ভিন্ গাঁ হইতে পাস-করা ভাল ডাক্তার আনা হইয়াছে।

গিরিশ ডাক্তার বাবুটিকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করিল,—
“কি রকম বুঝছেন?”

গম্ভীর মুখে ডাক্তার কহিল,—“বিশেষ কিছু আশা নেই। আফিং-খোর মানুষ, ওষুদ-বিষুদ ত ধরতে চায় না! নইলে হয় ত বাঁচাতে পারা যেত।”

“আফিংয়ে কি আপনার... ”

গিরিশের প্রশ্ন শেষ হইল না। মুখখানা বিকৃত করিয়া ডাক্তার কহিল,—“অতি জঘন্য এই নেশাটা। এর যেমন রূপ, তেমনি গুণ! লোকে ত আফিং খায় না, আফিংই লোককে খেয়ে জীর্ণ করে।”

“তবে যে সকলে বলে, চল্লিশের পর.....”

“সকলে বলে না, যারা আফিং খায়, তারাই বলে। —আপনি খান না কি?—হ্যাঁ, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, আপনিও খান। বলুন ত, কত দিন ও-বিষ খাচ্ছেন?”

“আমি? হ্যাঁ—তা—হ’ল বই কি—তবে...”

“ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, নইলে মারা পড়বেন। পরমায়ু থাকতেই অঘোরে মারা পড়বেন। সমস্ত চীন দেশটা আফিং খেয়ে মরতে বোসেছিল; আফিং ছেড়ে তবে বাঁচবার পথে আসতে আরম্ভ কোরেচে। তাই জাপানী শ্রাণ্ডেলের গুঁতোর বদলে—ওরা এখন জাপানের মাথায় চীনের পানাই ঠুকতে পারচে।”

রাত্রে আহারাঙ্কে শয্যায় শুইয়া গিরিশ ভীত মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—“ডাক্তার যা বলে, খাঁটি কথা! এখনো ছ’-মাস হয়নি ধরিচি, কিন্তু এর মধ্যেই দেহের যেখানকার যা হাড়, সব মাথা-খাড়া কোরে দেখা দিয়েচে। রাত্রে ঘুমটির মাথা খেয়েচি। দেহে আর রস-কম্বু নেই। তা’ ছাড়া কোন অসুখ-বিসুখ হোলে ত একেবারেই নিরুপায়! ওষুধ ধরবে না, স্তূতরাং নির্ধাত মৃত্যু। ডাক্তার ঠিক ধরেছে। পেসনা ব্যাটা নিজেও ম’ল, আঁমাকেও মরণের পথে ঠেলে দিয়ে গেল!”

আফিং খাওয়ার ফলে একে ত রাত্রে গিরিশের ভাল ঘুম হয় না, তাহার উপর এই চুশ্চিত্তার সংযোগ; সারা

রাত গিরিশ ছট্-ফট্ করিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল—কি করিয়া আফিং ছাড়া যায়।

কিন্তু কোন উপায়ই গিরিশ দেখিতে পাইল না। সে যা’কেই জিজ্ঞাসা করে, সে-ই তাকে বলে, ও চীজ একবার ধরলে আর কিছুতেই ছাড়া যায় না! অথচ গিরিশকে আফিং নিশ্চয়ই ছাড়িতে হইবে, ইহাতে প্রাণ তাহার যা’ক্ আর থাক্। সে ভয়-চঞ্চল অন্তরে একবার এলোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে, একবার কবিরাজের কাছে, একবার হোমিওপ্যাথের কাছে ছুটাছুটি করিল; কিন্তু আফিং সহজে ছাড়িবার হৃদিস্ সে কোথা হইতেও পাইল না। তাহার মন ও মস্তিষ্ক দুই-ই অস্থির হইয়া উঠিল। মনে করিল, যাকে ছাড়িতে এত বাধা, এত বিঘ্ন, তাকে এক দিন প্রাণ ভরিয়া বুকের সঙ্গে জড়াইয়া-ধরিয়া, অর্থাৎ ভরি-দুই এক দিন তৈল সহযোগে উদরসাৎ করিয়া—চিলের কোঠায় খিল লাগাইয়া শুইয়া পড়ে!

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন হঠাৎ এক দিন আফিং ছাড়িবার এক সোজা পথ গিরিশ দেখিতে পাইল, এবং পরদিন তাহাকে আর বাড়ীতে বা গ্রামে দেখিতে পাওয়া গেল না।

গিরিশ নিরুদ্দেশ!

দিন-চারেক পরে শৈলরাণীর নামে গিরিশের এক পত্র আসিল। গিরিশ তাহাতে লিখিয়াছে,—

—“আফিং ছাড়িবার জন্ত এলাহাবাদ এসেছি। মেজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইয়া কাল এখানে যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি করিব। ফলে জেলে যাইব; এবং তাহার ফলে সরকারী উপায়ে সহজে ও সুন্দর ভাবে আফিংয়ের হাত হইতে রেহাই পাইব। খবরের কাগজ পড়িয়া জানিয়াছি যে, কলিকাতায় এই ধ্বনি করিলে কাহাকেও ধরা হইতেছে না; নচেৎ কলিকাতাতেই যাইতাম। কলিকাতায় যখন আশা নাই, তখন কষ্ট করিয়া এত দূর আসিবার উদ্দেশ্য এই যে, জেল হইতে বাহির হইবার পর, প্রয়াগের ঘাটে মাথা মুড়াইয়া, এবং গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে ডুব দিয়া, ইহ-পরকাল উভয়েরই মঙ্গল বিধান করতঃ নিশ্চিত্ত চিন্তে গৃহে ফিরিতে পারিব। অতএব, তুমি সকল চুশ্চিত্তা ত্যাগ করহ—ইতি।”

শ্রীঅসমজ মুখোপাধ্যায়।



শ্ৰীভ্লেশ্ পুল-ওভার

এই হাত-কাটা পুল-ওভারটি করতে উল লাগবে ১২ আউন্স (৬-প্লাই) ; অবশ্য যদি নীচের নির্দেশ-অনুসারে করেন।

ছাড়া একটি বাঁকা (পোল-ধরণের) কাঠি চাই। যেখানে উল কিনবেন, সেইখানেই এ-কাঠি কিনতে পারেন। এই

কাঠিটিও সাত-নম্বরের হওয়া চাই।

নির্দিষ্ট নিয়মে করলে পুল-ওভারটির মাপ হবে :—

ঝুল—২৩ ইঞ্চি ; ছাতি—৪২ ইঞ্চি।

এই হিসাবে প্রয়োজন-মত এটি বাড়িয়ে বা কমিয়ে বুনতেও পারেন।

সংক্ষেপোক্তি সঙ্ক্ষে নতুন কিছু বলবার নেই। সেই সোঃ=সোজা, উঃ=উন্টো, সঃ সোঃ=সব সোজা, রিঃ=রিপিট, ঘঃ কঃ=ঘর কমানো।

পিঠের দিক

৭নং কাঠিতে ৯৬টি ঘর তুলুন। তার পর তিন ইঞ্চি ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বোনার পর আসল প্যাটার্ণটি আরম্ভ করুন :—

১ম লাইন—২টো সোঃ, * ২টো উঃ, ৪টে সোঃ। এখন * (চিহ্নিত) থেকে বাকী ঘরগুলো রিঃ করে যান। তবে কোণের

চারটি ঘর ২টো উঃ, ২টো সোঃ বুনবেন। ২য় লাইন—সমস্ত উঃ বুনেন যান। এখন এই ছ'লাইন আরো ছ'বার



হাত-কাটা পুল-ওভার

যে-কোন রঙের পছন্দসই উলে এটি বুনতে পারেন। এই জন্ত ৭ নম্বরের এক জোড়া বোনার কাঁটা চাই ; তা

রিঃ করুন। ৭ম লাইন—সমস্ত ঘরগুলো উঃ বুনে যান।

৮ম লাইন—সমস্ত সোঃ।

এবারে বোধ হয় বুঝতে পারছেন, ছবির প্যাটার্ণটি এই আট লাইনে সম্পূর্ণ হলো। এখন এই আট লাইনের প্যাটার্ণটি আগাগোড়া রিঃ করে যেতে হবে। যখন দেখবেন, সবশুদ্ধ (আগেকার তিন ইঞ্চি বোনা নিয়ে) ১৪ ইঞ্চি বোনা হয়েছে, তখন হাতের ফাঁদ আরম্ভ করুন :—

এখন থেকে প্রত্যেক লাইনের আরম্ভে আর শেষে একটি করে ঘর কমান। যতক্ষণ না কাঁটার ঘরের সংখ্যা ৬৬টিতে এসে দাঁড়ায়, ততক্ষণ। কিন্তু মনে রাখবেন—



বোনা ছাঁদ

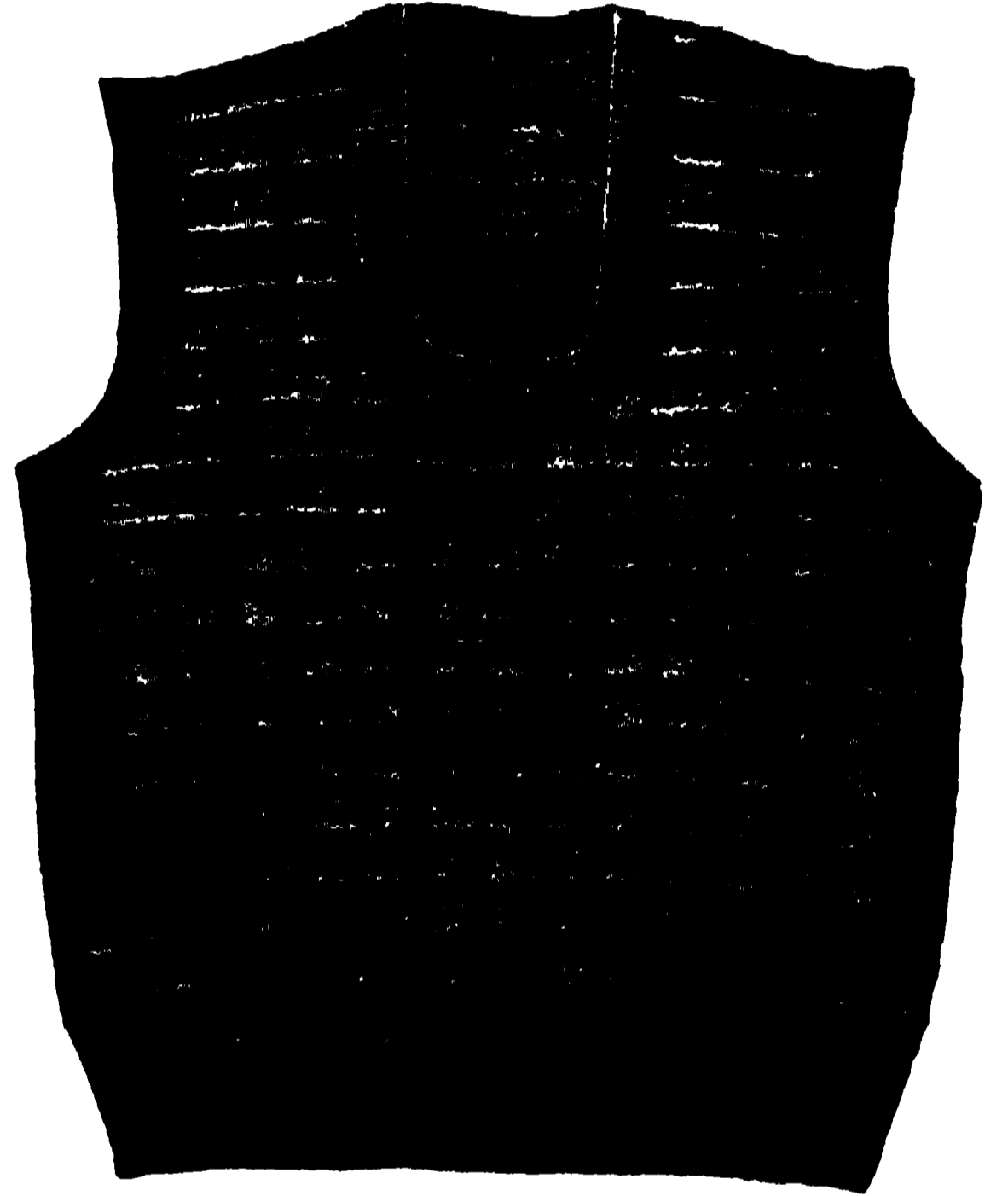
আগাগোড়া এই ভাবে ঐ আট লাইনের ঘর কমিয়ে যাবেন। প্যাটার্ণ-অনুসারে বুনে যেতে হবে। এখন আর ঘর না কমিয়ে যথানিয়মে বুনে যান। তার পর যখন দেখবেন, যেখান থেকে সব-প্রথম ঘর কমাতে আরম্ভ করেছিলেন, সেখান থেকে সর্বসমেত ন'ইঞ্চি বোনা হয়েছে অর্থাৎ পুল-ওভারটির ১১ ইঞ্চি বোনা হয়েছে—তখন কাঁধের জন্তু ঘর কমাতে আরম্ভ করুন।

এর পরের প্যাটার্ণটির প্রত্যেক লাইনের আরম্ভে ৫টি করে ঘঃ কঃ। আট লাইনের প্যাটার্ণ যখন শেষ হবে, তখন দেখবেন, কাঁঠিতে আর ২৬টি ঘর আছে। এই ২৬টি ঘর এইবার বন্ধ করে ফেলুন।

সামনের দিকে

এটি আগাগোড়া বুনে যান পিঠের দিকের নির্দেশ-অনুযায়ী; এমন কি, হাতের কাঁদের জন্তু ঘর কমাবেন ঐ একই নিয়মে। এই ভাবে বুনে গিয়ে যখন দেখবেন, কাঁটাতে ৬৬টি ঘর আছে, তখন আর এক লাইন বুনে গলা আরম্ভ করুন :—

২৪টি ঘর প্যাটার্ণের নির্দেশ-অনুযায়ী বুনে যান; তার পর ১৮টি ঘর বন্ধ করে ফেলুন। এখন বাকী ২৪টি ঘর আবার (১ম লাইন) প্যাটার্ণের নির্দেশ-অনুযায়ী বুনে



তৈরী পুল-ওভার

যান। এখন ছ'ধারের ২৪টি ঘরই এক নিয়মে বুনে যান। তবে প্রত্যেক লাইনে গলার দিকে একটি করে ঘর কমাতে হবে (ছ'দিকেই)। এই ভাবে বুনে কাঁঠিতে যখন ২০টি করে ঘর থাকবে, তখন আর ঘর না কমিয়ে প্যাটার্ণ অনুযায়ী বুনে যান। যখন দেখবেন, পিঠের দিকের পুট-হাতের ঝুলের সঙ্গে এ ঝুলটি সমান হয়েছে (অর্থাৎ সব শুদ্ধ ২১ ইঞ্চি বোনা হয়েছে) তখন কাঁধ তৈরী করুন।

প্রত্যেক লাইনের আরম্ভে হাতের দিকে পাঁচটি করে ঘর কমিয়ে যান। এই ভাবে সমস্ত ঘরগুলি বন্ধ করা হবে।

গলা

কাঁধ ছুঁটি সেলাই করে জুড়ে দিন। এখন পুল-ওভারটি সোজা করে নিন। গোল কাঁঠিটি দিয়ে গলা থেকে ১৫৬টি ঘর তুলে নিন। এখন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনে যান সাত লাইন (মানে সাত বার)। তবে প্রত্যেকবার পিঠের দিকে, ছুঁ কাঁধের কাছে আর সামনের দিকে গলার ছুঁপাশে একটি করে ঘর কমাবেন। এই ভাবে সাত বার বুনে যান ; তার পর ১টা সোঃ, ১টা উঃ বোনাতেই ঘর বন্ধ করুন।

হাত

হাতের ঘর থেকে ১৩৬টি ঘর তুলে নিন বাঁকা কাঁটাটি দিয়ে। ৬ লাইন বুনে যান ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে। তার পর ১টা সোঃ, ১টা উঃ বোনাতেই ঘর বন্ধ করুন।

এখন প্রথমত অল্প-ভিজে কাপড় পুল-ওভারটির ওপর চাপা দিন—দিয়ে ইস্ত্রী চালিয়ে নিন। তার পর পাশ ছুটো সেলাই করে দিন।

এবারে পুরো পুল-ওভারটি তৈরী হলো—গায়ে দিন।

পরিচয়

কি তোমার পরিচয় !

কোন নাম ধরে ডাকিব তোমারে

কি বলিলে ভালো হয় ?

বলিব কি যুধী, কেতকী, মালতী—

পুষ্প-ভূষণে সাজিব কি সতী ?

অথবা কথার মালা দিয়া গলে

তোমারে সাজাবো প্রিয়া !

বলো গো সজনি কি শোভিবে তোমা,—

ডাকিব কি নাম দিয়া ?

আমরা নূতন নহি !

যুগ যুগ ধরি তোমায়-আমায়

প্রেমের বারতা বহি।

আমি ছিহু তরু, তুমি সে লতিকা !

আমিই প্রেমিক, তুমি সে প্রেমিকা !

কপোত-কপোতী, আর চখা-চখী,

আমরাই ছিহু দৌছে।

বিগত দিনের প্রণয়ের কথা

ভুলিয়া গিয়াছি মোহে।

সেই এক দিন কবে

বসন তোমার নিয়েছিহু কাড়ি

মনে আর তা কি হবে ?

যমুনার জলে ডুবাইয়া কায়

চেকে দিয়েছিলে সব লজ্জায়,

আমার বাঁশীতে তোমাদি সে নাম

বেজে উঠেছিল যবে।

সেই জল-ক্লেশি, মধু উৎসব

মনে আর নাহি হবে !

তবে কেন চুপ রহ ?

বলে যাও যাহা মনে আসে তব

কথা কও, কথা কহ !

কেন আর রাখো মাঝে যবনিকা ?

প্রাণে প্রাণে আজ হোক প্রেম-লিখা,

ভোল অভিমান, কহ কথা, গান—

যামিনী বহিয়া যান্ন।

নীলিম গগনে নেহার চন্দ্র

আবেশে মলিন-প্রায়।

ডাকিব কি নাম দিয়া ?

বলো গো প্রেয়সী কি হবে তোমার

ফাঁকা নামটুকু নিয়া ?

ওগো সখি, তুমি মোর প্রিয়তমা,

বন্ধু, স্তম্ভদ, তুমি মনোরমা,

হুঃখে সহায়, স্তম্ভে সাথী মোর,

তুমি এ হিয়ান্ন হিয়া !

শয়নে-স্বপনে, দিবসে-নিশীথে

বলিব তোমারে “প্রিয়া” !

বেণু গঞ্জোপাধ্যায় (এম-এ)।



হুগলী জেলার ইতিহাস

চন্দননগর

চন্দননগরে কোন বংশের ফরাসি কর্তৃক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারা যায় না; তবে হুগলীর কালেক্টরের ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই এক টিটি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে—১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব ইম্পাতানবাসী ম্যাকাবাকে (Maccarah) প্রথম কুঠী নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। পূর্বে মোগল বাদশাহ এই জমি নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন। এম, ডুমাস (M. Dumas) বাদশাহের নিকট হইতে টাকশাল করিবাবও অনুমতি লাভ করেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে (কোলবাটের সময়) ফরাসি ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। উহার প্রায় ১০০ বংশের পূর্বে ফরাসি সরকার এই কোম্পানি বন্ধ করিয়া উত্তা গাস করিয়া লইয়াছিলেন।

ডুপ্রে (M. Duplex)—১৭৩১ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আগমন করেন। চন্দননগরের ফরাসি উপনিবেশ প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ফল। তাঁহার আগমনের পূর্বে চন্দননগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। ডুপ্দের অক্লান্ত পরিশ্রম, অসাধারণ বিচক্ষণতা, বিশাল রাজনীতিক বুদ্ধিবশতই ফরাসিদের বাণিজ্য তিব্বত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং জলপথেও পাবনা উপসাগর, এমন কি, চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ডুপ্দের সময় ফরাসি অধিবাসীরা উন্নত ও ব্রহ্মাশালী হইয়াছিল। ডুপ্রে যখন ফরাসি জাতিকে উন্নত করিবাব জ্ঞানান্য উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, সেই সময় যুরোপে ইংরেজের সহিত ফরাসিদের বিরোধ আকস্মিক হয়। এনিতে পাওয়া যায়, কুচক্রীদের পরামর্শেই ফরাসি সরকার ডুপ্দের চন্দননগর হইতে অপসারিত করেন।—এই সময় হইতেই ভারত ফরাসি-শক্তি হ্রাস হইতে আৰম্ভ হয়।

কাশীমবাজারে ফরাসিদের আর একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এম, লে ইতার পারিচালক ছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বেণো (M. Reneut de St. Germain) মাসিয়ে লেদর অধীনে চন্দননগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দননগরে ১৪৬ জন যুরোপীয় সৈন্য এবং ৬০ জন মাত্র দেশীয় সিপাহী ছিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব সির্দা উদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলে, ইংরেজ অন্তিমোপায় হইয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের ও চন্দননগরে ফরাসিদিগের

সাহায্য প্রার্থনা করেন। ওলন্দাজরা স্পষ্ট ভাবে সাহায্যদানে অস্বীকার করিল; কিন্তু ফরাসিগণ অস্বীকার না করিয়া ভদ্র ভাবে জানাইল যে, ইংরেজ চন্দননগরে আশ্রয় লইলে তাহার তাঁহাদিগকে বন্ধ করিতে পারে। ফরাসি মনল ভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিলেও ইংরেজ অপমানজনক বিবেচনা করিয়া এই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিলেন। এ-দিকে নবাব ফরাসিগণকে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলিলে, ফরাসিরা এই অনুবোধ অস্বীকার করিল। তবে ফরাসিরা ইতাও বুঝিয়াছিল যে, যদি ইংরেজকে নবাব পরাজিত করিতে না পাবেন, তবে তাঁহার ক্রোধ-বিক্ষিত হইবে, এবং তিনি চন্দননগর আক্রমণ করিবেন। যাহাই হউক, ১৭৫৬ খৃঃ অর্ধে নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজদের পরাজিত করিলেন। ইংরেজের হতাবশিষ্ট লোক ফলত হাবড়া প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিয়া প্রাণবক্ষা করিয়াছিল। ইংরেজ কলিকাতা হাবাইলেন। নবাব কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ফরাসি সহিত এই মন্থে সন্ধি করিবাব প্রস্তাব করিলেন যে, ফরাসি যেন ইংরেজের বিরুদ্ধে থাকে, কিন্তু বেণো তাহাতে সম্মত হইলেন না; অথচ ইংরেজ ভাবিলেন, ফরাসিরা ইংরেজের বিরুদ্ধে নবাবের সহিত সন্ধি করিয়াছে।

এ-দিকে এই বংশের ২য় আগষ্ট ও ২০শে নভেম্বর ক্লাইব ও ওয়ার্টমেনের অধীনে এক নৌবহর ও সৈন্য ফলতায় উপস্থিত হয়। ইংলণ্ড হইতে উহাদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল যে, কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিয়া যদি সন্নিবিধ হয়, তবে নবাবকে মুর্শিদাবাদে আক্রমণ করিবে, এবং যদি যুরোপে ফরাসিদের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাবে, তবে ফরাসিদিগকেও আক্রমণ করিবে। ক্লাইব ও ওয়ার্টমেন কলিকাতা উদ্ধার করিলেন—নবাবসৈন্য কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ক্লাইব কলিকাতা উদ্ধার করিয়া হুগলী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলেন।

ইংরেজ কর্তৃক কলিকাতার পুনরুদ্ধার ও হুগলী-লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়ায়, ক্রোপাক নবাব বহু সৈন্য সহ ইংরেজগণকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিবাব জ্ঞা খাড়া করিয়া ফরাসিদিগের অবস্থা এম, বেণোকে সদলে তাঁহার সহিত যোগদানের জ্ঞা আদেশ করিলেন।

এই আদেশে বেণো উভয় সঙ্ঘটে পাড়িলেন। তাঁহার অধীনস্থ যুরোপীয় সৈন্য সংখ্যায় ১৪৬ জন মাত্র; তন্মধ্যে ৪৬ জন বৃদ্ধ, স্তবধা অকর্মণ্য। এ অবস্থায় ইংরেজের সহিত সন্ধি করা বা নবাবকে সাহায্য করা উভয়ই সঙ্ঘটনজনক সমস্যা বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। নবাবকে সাহায্য না করিলে

তিনি হয় ত চন্দননগর আক্রমণ করিবেন এবং তাঁহার উক্তন কর্মচারী ডি, লিরিটের (De Layit) আদেশ ছিল—কোন কারণেই ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা না হয়। অবশেষে বেণে ইংরেজের সহিত নিরপেক্ষতার সন্ধি করাট সঙ্গত মনে করিলেন।

ক্লাইব ও ওয়াটসন জানিতেন, চন্দননগরে ফরাসিদের ৩০০ শত ও কাশিমবাজাবে ল' সাহেবের ১০০ শত সৈন্য আছে। একে ত নবাবের বহু সৈন্য, তাহার উপর ফরাসিদের ৩০০ সৈন্য সেই দলে যোগদান করিলে ইংরেজের কাঙ্ক্ষিতা রক্ষা করা অসাধ্য হইবে। কিন্তু এই সময়েই বেণে নিরপেক্ষতার সন্ধি বন্ধ লোক পাঠাইলেন। চন্দননগর হইতে ফরাসি-দূত কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধি সত্ত্ব লিখিত হইলে ক্লাইব ঐ সকল সত্ত্ব মানিয়া লইলেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ইংরেজদের সহিত নবাবের যুদ্ধ হইলে নবাবের সেনাপতি পরাজিত হইলেন। ইংরেজ নবাবকে চন্দননগর আক্রমণের জন্য অনুরোধ করিলে নবাব তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন ক্লাইব ঐ সন্ধিপত্রে সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেও ওয়াটসন উহাতে স্মরণ করিতে এই যুক্তিতে আপত্তি করিলেন, চন্দননগর, পশ্চিমের অধীন; অধীনস্থ কর্মচারীর সহিত সন্ধি করা চলে না। ক্লাইবও অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। এ-দিকে বেণে সন্ধি আশায় চন্দননগর বন্ধন কোন ব্যবস্থা করিলেন না। বেণেও সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

ও-দিকে নবাবের কাছে সংবাদ আসিল, আমেদশাহ আবদালি দিল্লী অধিকার করিয়া বঙ্গালয় দিকে অগ্রসর হইতেছে। নবাব ভীত হইয়া ইংরেজকে পত্র লিখিলেন, যদি ইংরেজ তাঁহাকে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, তবে তিনি মাসিক এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন। এই সময়েই সংবাদ আসিল—তিনখানি যুদ্ধ-জাহাজ, গোলন্দাজ সৈন্য ও পদাতিক সৈন্য বঙ্গোপসাগরের মোহনায় আসিয়াছে, এবং আশু একখানি জাহাজ বালেশ্বরে আসিয়াছে।

বেণে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত না হওয়ায় সংবাদে বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজ নিশ্চয়ই চন্দননগর আক্রমণ করিবে। সেই আক্রমণে বাধা দানের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ফরাসিদের ফোর্ট ডি অবলেন দুর্গ চন্দননগরে দুই প্রান্ত হইতে সমদূরবর্তী, এবং গঙ্গা নদীর তীরেই অবস্থিত। তাঁহার চারি দিকে বুরুজ তোষণা ইত্যাদি সুসজ্জিত করিলেন। এই সময় ফরাসিদের পক্ষে ১৪৬ জন যুবোপীয় সৈন্য ও ৩০০ শত মাত্র সিপাহী ছিল। কাপ্তেন ডি, ভিন (Captain de Vigne) সেনাপতি হইলেন। এই সময় গঙ্গা নদী তেমন অধিক গভীর ছিল না। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ তীরে আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে টরেনো কয়েকখানি জাহাজ নদীতীর হইতে কিছু দূরে জলে ডুবাইয়া রাখিলেন। এই নদীর দিক বন্ধন ভার ছিল—টরেনোর (Terraneau) উপর।

এ-দিকে ক্লাইব ৭ই মার্চ স্থলপথে ৭০০ যুবোপীয় সৈন্য ও ১৫০০ শত দেশী সিপাহী লইয়া হাওড়া হইতে চন্দননগর যাত্রা করিলেন। তিনি সতর্কতা সহকারে ফরাসি কামানের পাল্লা হইতে দূরে থাকিয়া, এবং গ্রামা অধিবাসীদের গৃহসমীপে আশ্রয় লইয়া কতকগুলি ঘর ভাঙ্গিয়া তোপখানা করিলেন; পরে সারা রাত্রি ফরাসি-সৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ করিলেন। এ-দিকে ওয়াটসনের

কামান স্থলপথে আসিয়া পৌঁছিলে ২১শে মার্চ পর্যন্ত স্থলযুদ্ধ চলিল; ইহাতে ইংরেজের যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

পূর্বোক্ত টরেনো বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিল। সে ইংরেজকে সন্ধান দিল, নদীগর্ভে কয়েকখানি জাহাজ ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে। সে সেই জাহাজ-গুলির স্থান নিশ্চয় করিয়া দিলে ওয়াটসন অতি সতর্ক ভাবে স্থলপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। টরেনো সেই সকল বিপদসঙ্কুল স্থানে না ঘোঁসিয়া অন্য দিক দিয়া জাহাজ চালাইতে লাগিল। বেণে জানিতেন, গঙ্গাতীরেই যুদ্ধের অবসান হইবে—স্থলপথে ইংরেজ কিছু করিতে পারিবে না। বিশ্বাসঘাতক টরেনোর জাহাজ ফরাসিদের ভাগ্যবিপর্যায় ঘটাইয়াছিল। এক-একখানি করিয়া টাইগার কেট ও মলস্বাবী যুদ্ধজাহাজ গঙ্গায় সমবেত হইতে লাগিল। উভয় দিকেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বেণেও বীরত্ব ও কৌশল ফরাসিগণকে রক্ষা করিতে পারিল না। অবশেষে তিনি শ্বেত পতাকা উড়ান করিয়া সন্ধি প্রার্থী হইলেন। ২৩শে মার্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা এইরূপ ভাগ্যবিপর্যায় ঘটিল।

সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বেই সেনাপতি পঞ্চাশ জন মাত্র সৈনিক লইয়া কাশিমবাজার হইতে ভাগলপুরে প্রস্থান করিলেন। এ-দিকে সন্ধি সত্ত্বসূত্রে উপনিবেশের অধক্ষ, তাঁহার পরিষদবর্গ এবং বেসাময়িক অধিবাসীরা তাঁহাদের ইচ্ছামত স্থান ছাড়িয়া বাইবার আদেশ পাইলেন। জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত পাদ্রীরা তাঁহাদের গির্জার অলঙ্কারাদি লইয়া বাইবার অনুমতি পাইলেন। কিন্তু সৈনিকবর্গ কাণাকঙ্ক হইল। ক্লাইব চন্দননগর লুণ্ঠন করিলেন। ১ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ডের মতো ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনাথায়ণ চৌধুরীর বাড়ী হইতেই অর্ধ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। ল' ভাগলপুরে, ইংরেজ ফরাসিদের বিবোধে মবে না থাকিয়া দেশীয় রাজার রাজ্যে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের সময় যদিও তিনি সিরাজকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহা করিতে পারেন নাই। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে গয়ার যুদ্ধে ল' বন্দী হইয়া সেই অবস্থায় জীবন শেষ করিয়াছিলেন।

চন্দননগরের পতনের সঙ্গে ফরাসিদের সকল আশা অবসান হইল। টরেনোর বিশ্বাসঘাতকতা ইহার প্রধান কারণ। টরেনোর পিতা পুত্রের নিকট হইতে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা-লক্ষ অর্থ পাইয়া আত্মহতা স্বাধীন পুত্রের পাপের প্রায়শ্চত্ত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু ফরাসি জাতি ভাবতে আর মাথা তুলিতে পারিল না। ডুপ্লের উপর যে সকল অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহার ফলেই ফরাসি জাতিকে ভাবতে নিস্তেজ হইতে হইল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এইরূপে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে ফরাসির পতনের এবং ভারতে ইংরেজের অভ্যুত্থানের পথ নিষ্কটক হইল।

গুরুতীতে ফরাসি-বাগান—

গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের জায় ফরাসির অধিকৃত গুরুতীর বাগান দেখিলেও মনে বিখাদ-স্মৃতির উদয় হয়। ডুপ্লের সময় যে স্থান লোকাকীর্ণ ছিল, শত শত যানে যে স্থান সমাকীর্ণ থাকিত, যে স্থানে চুঁচুড়ার গভর্নর, ক্লাইব, হেষ্টিংস প্রভৃতি ব্যক্তি ফরাসির অতিথি হইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন, স্থলপথে ও স্থলপথে যাহার সৌন্দর্য্য অনির্বচনীয় ছিল,

সেই স্থানে এখন জুটমিলের কর্মচারীদের বাসস্থান হইয়াছে। সে প্রাসাদ নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই—ভারতে ফরাসির সে তেজও নাই; আছে শুধু অতীতের বিবাদময় স্মৃতি।

সন্ধির পর চন্দননগরের বন্দোবস্ত —

চন্দননগরের ভিতর মুরশিদাবাদের নবাব তালডাঙ্গার ৭ বিঘা মাত্র জমি বিনা-খাজনায় কুঠীনির্মাণের জন্ত ফরাসিকে দিয়াছিলেন, এইটিই ফরাসির নিজস্ব, এবং গরুটীতে ১২৫ বিঘা জমিও তাহাদের নিজস্ব। * বাকী সমস্ত চন্দননগরের খাজনা ইংরেজ সরকার পাইয়া থাকেন। গোন্দলপাড়া জমিদার, হুগলীর ফৌজদার নবাব খানজার্থা ফরাসিদিগকে পত্তনি দিয়াছিলেন। ইহার খাজনা ঐ নবাবের বংশধরদিগকে দিবার কথা ছিল। ঐ নবাবের আর দুইখানি ভালুক সানবিনারা ও মহম্মদ আমীনপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পত্তনি দিয়াছিলেন। পরে যখন ইংরেজ বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইলেন, তখন তাহা ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইল।

ইংরেজ-সরকারে ফরাসিদিগকে যে রাজস্ব দিতে হয়, তাহার হিসাব :—

ষ্টেট নং ১৬৩ গঞ্জ সক্রাবাদ ... ১২১৯৯/৭।

" ২৪২ বাগ চন্দননগর ... ৮৮৬/৮

১৩০৮।৩। পাই

প্রথমে ঐ রাজস্ব ১৪৬৬।৩ পাই, ছিল কিন্তু ১৮৫৩ অব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে সন্ধি অনুসারে যখন চন্দননগরের সীমানা নির্দিষ্ট হইল, তখন ইংরেজ ৩৬ বিঘা জমি ছাড়িয়া দিয়া ১৯১ বিঘা জমি লইয়াছিলেন—এ জন্ত ১৫৮৮/১১। পাই কমিয়া যায়। ঐ রাজস্ব ঠিক সময়ে না দেওয়ায় হুগলীর কালেক্টরের সহিত বিরোধ হয়। বাকীপড়া খাজনার উপর সূদ ধাৰ্য্য করা হইলে পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঐ বিষয় বিচারের জন্ত ইংরেজ সরকারের হস্তে প্রদত্ত হয়। বিচারে স্থির হয়, সূদ লওয়া রাজনীতিক হিসাবে অজ্ঞায়। তাড়িগানাব দোকান লইয়া ইংরেজ ও ফরাসি প্রজার মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত, কারণ, তখনও উভয়ের সীমা নির্দিষ্ট হয় নাই। পরে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ভারসেলিস্ সন্ধি অনুসারে (১৩ দফায়) ফরাসি চন্দননগরের সীমানা চারি দিকে গাল কাটিয়া পাকা করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ফরাসির ঐ সীমামধ্যে মালিকান-স্বত্ব দাবী করেন নাই, তবে ঐ সীমামধ্যবর্তী জমি তাহার দাবী করিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল এই দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। চন্দননগরের গির্জা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীয়গণের দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল।

পূর্বে চন্দননগরে প্রচুর চন্দন কাঠ পাওয়া যাইত—ইহা হইতেই চন্দননগর নামের উৎপত্তি। নদীয়ার রাজা রুদ্র রায় মৃত্যুর পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহাকে যেন চন্দন কাঠে দাহ করা হয়, এবং সে জন্ত চন্দন কাঠের সন্ধানে চন্দননগরে লোক প্রেরিত হইয়াছিল। "দাহোপযুক্তচন্দনকাঠমানেতুং হুগলীপ্রদেশে তরণীঃ প্রস্থাপিষা ইদানীমপি নাগতা।"—ক্ষীণ বংশাবলী। এতদ্বিল, La

• Toynbee's Administrative Report of Hughly Dt. P. 22-23 Dr. Crawford's "Brief History of Hughly."

Compaigne des Indes Orientales পুস্তকেও চন্দন কাঠের উল্লেখ আছে।

সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিন গ্রাম লইয়া যেমন কলিকাতা, সেইরূপ খলসিনি, বোরো ও গোন্দলপাড়া লইয়া চন্দননগর। হুগলী জেলার বোরো পরগণা হুগলী হইতে শিবপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাণ্ডিত্যের মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—বোডো চণ্ডীর নাম অনুসারেই বোরো পরগণার নাম হইয়াছে; সুতরাং চন্দননগরই ঐ পরগণার নামের মূল। খলসিনি নাম 'দীর্ঘজয়প্রকাশ' গ্রন্থে পাওয়া যায়, যথা—“খলসিনি মহাগ্রামো যত্র রাজা চ ধীববঃ।” কলিকাতা যখন নগণ্য গ্রাম মাত্র, তাহার বহু পূর্বে হইতেই চন্দননগর সমৃদ্ধিশালী জনপদ। ডুপ্লের সময় (১৭৩১ খৃঃ) এখানে লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক ছিল (১)। ঐ সময়ে ইহার বাণিজ্য ভাবতের বাহিরে চীন, তিব্বত, পাকিস্তান, মালয়, পেঞ্চ, জড্ড পঞ্চাঙ্গ বিস্তৃত ছিল। মসলিন, রেশম, শাল, অর্থাৎ প্রভৃৎ আমদানি-প্তান হইত। ক্লাইব ইহাকে—The granary of the Islands নামে অভিহিত করেন (২)। চন্দননগর দেশীয় তত্ত্ববায়নির্মিত বস্ত্রাদিব জন্ত অত্যাধিক ও সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ—“ফবনডাঙ্গার কাপড়” নামে অভিহিত। সে-কালে লাল গিলে মসলিন নামক কোবা লংকথের বিশেষ খ্যাতি ছিল। এখান হইতে গালা, চট, আরস, চুকট, কাশ্মীরী-কাবির দ্বারা প্রস্তুত শাল, মগমলেব উপর জীবন কাজ প্রভৃতি স্থানীয় শিল্পদ্রব্য বিদেশে চালান যাইত। যে পল্লীতে দাঁড়ব বড় বড় কাবখানা ছিল, এখনও সেখানকাব একটি বাস্তার নাম বর্তমান গিয়াছে—“ক কর্দোবা।” লুই বোনো (Louis Bonnaud) এখানে নীলের চাষ ও কাবখানা করিয়াছিলেন। এখনও তাহার চিহ্ন বর্তমান আছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে “বঙ্গলক্ষ্মী” কাপড়ের কল হইয়াছে—বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কসও বহু বৎসর পূর্বে স্থাপিত; কিন্তু ইহার বহু পূর্বে চন্দননগরে বটকুঞ্চ দোষ কাপড়ের কল কাবয়াছিলেন; দীননাথ চন্দ্র “লগুন কেমিকেল এজেন্সি” নাম দিয়া টিনচাব ও ম্পিয়ার্ট প্রস্তুতের কারখানা করিয়াছিলেন। চন্দননগরেই ব্রহ্মের বাজকুমার মাইনগুন, বর্ধমানের (জাল) প্রতাপচাঁদ (৩) ও টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী আত্মদক্ষ্য জন্ত আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বঙ্গজননী স্বসস্তান—ভারতবর্ষের শ্রীঅর্বািন্দ রাজবোধে আত্মদক্ষ্য করিবার জন্ত চন্দননগরের পরিবর্তে পাণ্ডুচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আশ্রম নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, ক্ষুদ্র চন্দননগরকে তিনি নিরাপদ মনে করিতে পারেন নাই। মহারাজ নন্দকুমার, অযোধ্যার রেসিডেন্ট বুটো ও ম্যাডাম গ্রাণ্ড (যিনি পরে ফ্রান্সে প্রিন্সেস দে টালিরস্তু নামে পরিচিত হন) বাসভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একটি বৃহৎ প্রাচীন সহরে যাহা থাকা সম্ভব, এই চন্দননগরে তাহার কোনটিরও অভাব ছিল না। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসি

(১) History of the French in India.

(২) Life of Lord Clive. Vol. I.

(৩) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' কৃষ্টব্য।

সরকারের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার কেবল যে অতুল ধনসম্পত্তি ছিল, তাহাই নহে, তিনি বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। বায় গুণাকর ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর হইতে আসিয়া এই মহাছারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনিই বাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাঁহাকে পর্বচিত করেন। ভারতচন্দ্রই তাঁহাকে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ধবণী ঈশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কুতজ্ঞতা নিদর্শন। ইন্দ্রনাবায়ণ দশভূজামূর্তি প্রতিষ্ঠিত কবিয়া বৃহৎ মন্দির ও নন্দদুলালের মন্দির স্থাপন করেন; ঐ মন্দিরের গঠন-কৌশল ও কারুকার্য অতীব প্রশংসনীয়।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার হেরাসিম লেবডেক কর্তৃক এখানে প্রথম নাট্যশালা স্থাপিত হয়। Carey's "Good old days" পুস্তকে একটি ইংরেজী থিয়েটারের উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের ৭৫নং হইতে জানিতে পারা যায়, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে লাভোকা (Lawocat) নামক একখানি কনায়ী নাটক বাঙ্গালী ভাষায় অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। পরে একটি অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়—মতিলাল শেঠ তাহার অগ্রণী ছিলেন।—এখানে "প্রণয়-পবীক্ষা" অভিনীত হয়। পরে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং ষ্ট্রেজ বিক্রয় হইয়া যায়। উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে বহুনাথ পালিত কর্তৃক চন্দ্রনগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

চন্দ্রনগর কবি-গানের দলের জন্ম বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। নিক্যানন্দ দাস বৈদ্যগী, এটনি ফির্নিজ, বাস্ত ও নুসিংহ ভাস্কর্য বিখ্যাত কবিগায়ক ছিলেন; এটনি ফির্নিজর বাস প্রথমে চন্দ্রনগরের ভিতরে ছিল। পরে তিনি গৌরহাটীতে (গরুটা)—যেখানে গভর্নর ডুপ্রে'র প্রাসাদ ছিল, সেই স্থান সন্নিহিত বকুলতলায় বাস করিতেন। ফির্নিজ হইলেও তিনি এক ব্রাহ্মণ বর্মণীর পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহারই প্রভাবে ফির্নিজ এটনি হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কথিত আছে, এটনির দুই উপযুক্ত পুত্র তাঁহাকে কবিব দল ছাড়া কবিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার গানগুলি সেমন মধুর ও সরস, সেইরূপ ভক্তিবসপূর্ণ ছিল। যথা,—

'কোন্ প্রেমে হরি, তাজি ব্রজনাথী
গেল মধুপুথী—করি অনাথা ?
কোন্ প্রেম-ফলে, কালিন্দীর মূলে
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবী লতা ?'

কে বলিবে, ইহা কোন ফির্নিজ-রচিত সঙ্গীত ?

এটনি তাঁহার হিন্দু পত্নীর অন্তর্ভুক্তি কলিকাতার বৌবাজারে এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও এই কালীমূর্তির পূজা চলিতেছে। কলিকাতায় এই দেবী "ফির্নিজ-কালী" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

পাঁচালীওয়ালাদের মধ্যে চন্দ্রামণি মালা ও রাম ভট্ট; গান-রচয়িতার মধ্যে রাম দত্ত, মধু পাত্র ও কেদারনাথ চক্রবর্তী বিখ্যাত ছিলেন। প্রাচীনগণের অনেকে স-কালে মদন মাষ্টারের যাত্রা শুনিয়াছেন। মদন মাষ্টারের পূর্ণ নাম মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়। এতদ্বিধ, চন্দ্রনগরে অনেকগুলি যাত্রার দল ছিল; তন্মধ্যে বৌমাষ্টার, নবীন গুপ্ট, মহেশ চক্রবর্তীর দল সুপরিচিত ছিল।

এ দেশে "ডিগ্রী" প্রদানের ক্ষমতা প্রথমে শ্রীরামপুর কলেজ

লাভ করিয়াছিল। সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালী পুস্তক "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" পর্তুগালের লিসবন সহরে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পুনর্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ ফাদার গের্যা (Father C. F. M. Guerin) নামক ধর্মযাজক কর্তৃক শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় লেখেন—চন্দ্রনগর হইতে প্রায় ৪০খানি মাসিক, সাময়িক প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের কতকগুলির নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

- ১। প্রজাবন্ধু :—সাপ্তাহিক পত্রিকা—সম্পাদক তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৮২ খঃ প্রকাশিত হয়।
- ২। ধূমকেতু :—সাপ্তাহিক পত্রিকা—সম্পাদক শিবকৃষ্ণ মিত্র—১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।
- ৩। বঙ্গবন্ধু :—সাপ্তাহিক পত্রিকা—সম্পাদক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ৪। চন্দ্রনগর-প্রকাশ :—সাপ্তাহিক পত্রিকা—সম্পাদক এন, মুখোপাধ্যায়।
- ৫। বঙ্গপ্রভা :—মাসিকপত্র—সম্পাদক বিপিনবিহারী কোলে—১২৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৬। হিতসাধন :—নীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১২৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৭। বাহক।
- ৮। মাতৃভূমি :—মাসিকপত্র—সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ সেন।
- ৯। চন্দ্রনগর পত্রিকা :—সম্পাদক অঘোবনাথ মুখোপাধ্যায়।
- ১০। ভারত-দর্পণ :—সম্পাদক অঘোবনাথ মুখোপাধ্যায়।
- ১১। প্রবন্ধক :—প্রথমে পার্কিক পত্র ছিল, বর্তমানে মাসিক পত্রিকা হইয়াছে—সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ নায়ক ও মতিলাল রায়। এ পত্রিকা এখনও চলিতেছে।
- ১২। নবসজ্জ :—সাপ্তাহিক, পরে পার্কিক হয়।
- ১৩। ব্রহ্মণ ভাবত :—সম্পাদক বীবেকনাথ সেন।
- ১৪। Le Petit Bengali :—সাপ্তাহিক—সম্পাদক চার্লস পুমান।
- ১৫। The Bearer :—সাপ্তাহিক—সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
- ১৬। Amateur Workshop :—সাপ্তাহিক—সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বসু ও কুসুমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ১৭। Tit for Tat.
- ১৮। Standard Bearer—সাপ্তাহিক—সম্পাদক অরুণচন্দ্র দত্ত।
- ১৯। নিবন্ধ :—মাসিকপত্র—সম্পাদক বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ২০। মুকুলমালা :—সম্পাদক কেদারলাল ঘোষাল। *

| ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরঙ্গ)।

কেনোপনিষদ

(সমালোচনা)

কেনোপনিষদ—অম্ববাদক শ্রীযুক্ত চূর্ণাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কাশী-ধামেব ভেলুপুরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত উমানাথ মুখোপাধ্যায়ের অর্থব্যয়ে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা। এই গ্রন্থে মূল কেনোপনিষদ ব্যতীত নিম্নলিখিত ভাষা, টীকা প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে :—

(১) শঙ্করাচার্য্য-কৃত পদভাষ্যের মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ।

* শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির রিপোর্ট হইতে কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছি; সে স্বল্প আমার তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।—লেখক

(২) বাক্যভাষ্যের মূল ও তাঁহার বঙ্গানুবাদ। এই বাক্য-ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য কৃত বলিয়াই আনন্দগিরি গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, বাক্যভাষ্য আদি-শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত নহে, শঙ্করাচার্য্যের আসন্ন অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ অল্প পববর্তী আচার্য্য-প্রণীত। দুর্গাচরণ বাবুও এই মত গ্রহণ করিয়া এই ভাষ্যটি বিভাশঙ্কর-প্রণীত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

(৩) বিভাগ্যকৃত "কেনোপনিষদ্—অমুভূতপ্রকাশ" বা সার সংগ্রহ, মূল ও বঙ্গানুবাদ।

(৪) আনন্দগিরি-কৃত পদভাষ্য ও বাক্যভাষ্যের টীকার বঙ্গানুবাদ।

এতদ্ব্যতীত পূর্বপূর্বীচার্য্য কৃত টিপ্পনীও প্রদত্ত হইয়াছে।

কেনোপনিষদে মোট ৩৪টি শ্লোক বা বাক্য আছে। কিন্তু এতগুলি ভাষ্য টীকা প্রভৃতি দেওয়াতে গ্রন্থ প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা হইয়াছে। কেনোপনিষদে বল হইয়াছে যে, ব্রহ্মের ইচ্ছায় এবং তাঁহারই শক্তিতে আমাদের মন বিষয়চিন্তা করে, আমাদের প্রাণ-বায়ু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রবাহিত হয়, আমাদের বাক-ইন্দ্রিয় শব্দ উচ্চারণ করে, চক্ষু-ইন্দ্রিয় দর্শন করে, কর্ণ-ইন্দ্রিয় শ্রবণ করে। ব্রহ্ম অন্তর্গামিরূপে আমাদের অন্তরে বিদ্যমান আছেন। চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কর্ণ তাঁহার কথা শুনিতে পায় না। তাঁহাকে উত্তমরূপে জানা যায় না, অথচ তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতও থাকিয়া যান না। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। আমাদের প্রত্যেক চিন্তায় তিনি জ্ঞানরূপে বিরাজ করেন। ইহজন্মেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এইরূপ সংকল্প করা উচিত। কারণ, তাঁহাকে জানিলে মোক্ষলাভ করা যায়। নচেৎ যত্ন পূর্বক আবার কত বার জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহার ঠিক নাই। কেনোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবাস্তন-যুদ্ধে দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, তাঁহাদের নিজশক্তিতে তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম প্রথমে যক্ষের রূপ ধারণ করিয়া, পরে হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূত হইয়া দেবগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ব্রহ্মের ইচ্ছা ব্যতীত দেবগণের কোনও শক্তি নাই, ব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম সকল প্রাণীর পূজনীয়, এই ভাবে তাঁহার উপাসনা করা উচিত।

ব্রহ্মকে লাভ করিবার উপায়,—তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং শাস্ত্র-বিহিত কর্ম।

এই উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য, বিভাগ্য, আনন্দ-গিরি প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে জ্ঞানের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছেন, দুর্গাচরণ বাবু বাঙ্গালী পাঠককে সেই প্রস্রবণ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞানসুধা আহরণ করিয়া সংসারতাপক্লিষ্ট চিত্ত শীতল করিবার সুযোগ দিয়াছেন; এ জন্ম বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অমুবাদ বেশ সবল হইয়াছে। উপনিষদের দুই তৃত্ব সকল প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইতে পারিয়াছেন, ইহা গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্ব। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ভীর্ষের গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালী পাঠক শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত পদভাষ্যের পরিচয় পাইয়াছেন। বাক্য-ভাষ্য, আনন্দগিরি বিভাগ্যের কেনোপনিষদ্-ব্যাখ্যার সহিত বাঙ্গালী পাঠকের এই প্রথম পরিচয় হইল। এই সকল গ্রন্থের উৎকর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থকার একটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

শ্রুতিগব্যঃ পবন্যীতং শ্রীমদ্ব্যং তু শাস্ত্রম্ ।

তত্রানন্দগিরেষ্টীকা কেবলং শুদ্ধ শর্করাম্ ।

এখানে মূল উপনিষদকে গাভীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, শঙ্করভাষ্যকে দুগ্ধের সহিত, এবং আনন্দগিরির টীকাকে শর্করার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থে দুর্গাচরণ বাবু কেনোপনিষদের অদ্বৈতমতানুযায়ী প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাই সংকলন করিয়াছেন। কেনোপনিষদ্-সাহিত্য সম্পূর্ণ কবিতাে অপরমতাবলম্বী ব্যাখ্যাগুলিও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ স্থলে আমরা সেরূপ দুইটি মাত্র ব্যাখ্যার উল্লেখ করিব। রঙ্গরামানুজ এই উপনিষদের বাঙ্গালীমত অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী শ্রীবৈকুণ্ঠের তাহা অবশ্য দ্রষ্টব্য। মধ্বাচার্য্য স্বয়ং অল্প উপনিষদের সহিত কেনোপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বৈতমতাবলম্বীর তাহা আদরণীয়।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল হইয়াছে। পত্রাঙ্কগুলি আত্মস্ব একধারা হইলেই ভাল হইত। তাহা না করিয়া বিভিন্ন ভাষ্যের বিভিন্ন পত্রাঙ্ক হওয়াতে পাঠকের কিছু অসুবিধা হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।

পুতুল ও প্রতিমা

সে ত গো মানবী নয়, নামটুকু তা'র
অরুণ আলোর মত ঘুচার আঁধার !
ধরা নাহি যায়, যেন মলয়া পবন
চন্দন-বন-বাসে ভূলায় ভুবন !
জ্যোৎস্না ধরায় সে যে, ধরা নাহি যায়
আঁধারের বুক ভরে আলোর মায়ায় !

নবীর পুতুল সে যে—অবনী তা'রে
কোন্ তপোবলে লভে নবনীতারে !
ছবির মতন মুখ শেফালী-সম
মৃদুল সুবাস মাখা বালিকা মম !
আমারে ছুঁইয়া চলে ছায়ার মত
প্রতি প্রাতে প্রতি রাতে হেরি সতত !

শ্রীরামেন্দু দত্ত।



দেহে-মনে জোর

কাজ করিতে গেলে কাহারো হাঁফ ধরে, দারুণ ক্লান্তি ঘটে, আবার কাহারো তা হয় না, ইহার কারণ কি ?

এ ক্লান্তি ঘটিলে বুঝিতে হইবে, দেহ-মনের স্বাস্থ্য ভালো নয়। এ ক্লান্তি-মোচনের জন্তু চাই নির্মল বাতাস ; সূর্য্যকিরণ ; যোগ্য পুষ্টিকর খাদ্য ; নিত্য-রুটিনে ব্যায়াম-চর্চা এবং প্রচুর বিশ্রাম।

যদি মনে করেন, ঔষধ খাইলে মনের এ অস্বাস্থ্য যুচিবে, তাহা হইলে সে ধারণা ভুল !

স্বাস্থ্য ভালো, দেহে কোনো ব্যাধি নাই, অথচ কাজ করিতে গেলে হাঁফ ধরে, ক্লান্তিতে-অবসাদে জর্জরিত হইতে হয়, এমন যে ঘটে না, তা নয় ! এ ক্লান্তি-অবসাদের ফলে অনেক সময় হাঁচি-কাশি-সর্দি দেখা দেয়। তা ছাড়া দেহের এই ক্লান্তির ফলে অজীর্ণতা, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ দেহকে পাইয়া বসে। এই ক্লান্তি হইতে আরো বহু ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে।

যাঁরা জোয়ান কুস্তিগীর, তাঁরা এ ক্লান্তিকে রীতিমত ভয় করেন। আমাদের দেহ-মন বিধাতা এমন কৌশলে নির্মাণ করিয়াছেন যে, এ দেহ-মনের সহশক্তি অসাধারণ। আমাদের দেশে কথা আছে, “শরীরের নাম মহাশয়, যা সহ্যও তাই সয়”—কথাটা খুব সত্য।

কাজ যেমন করিব, তেমনি কাজের অনুপাতে দেহ-মনকে বিরাম-বিশ্রাম দেওয়া চাই। মানুষের ছুটাছুটি আজ অসম্ভব বাড়িয়াছে, এ ছুটাছুটির মধ্যে যাঁরা বিশ্রাম সম্বন্ধে সচেতন, তাঁদের দেহ-মন মজবুত থাকে ; যাঁরা বিরাম-বিশ্রাম জানেন না, তাঁদের দেহ-মন দিনে-দিনে জীর্ণ গলিত হইয়া যায় ! এ কথা কতখানি সত্য, সমাজের পানে চাহিলেই প্রমাণ মিলিবে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কাজে লাগিলাম ;

কাজের মধ্যে এক-সময় ধাঁ করিয়া বিছানায় শুইয় চক্ষু মুদিয়া একটু ঘুমাইলাম,— ইহাতে দেহ-মনের সামর্থ্য বা স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। সব বিষয়ে নিয়ম চাই— নিয়মের জগতে কোনো-কিছুতে অনিয়ম করিলে তার শাস্তি পাইতেই হইবে।

ডক্টর ইমার্শন আমেরিকার এক জন প্রাক্ত চিকিৎসক। মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কয়টি উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, সংসারের সব দায়িত্বই যখন মেয়েদের হাতে, তখন তাঁর মন একদণ্ড নিরুদ্ভিগ্ন থাকিতে পারে না। নানা কাজে তিনি যদি ব্যায়াম-বিশ্রামের তেমন অবসর না পান, তবু তাঁর উচিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া একটু বেড়ানো ; তার পর একটু-কিছু পানাহার। এটুকু সারিয়া তবে গৃহকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করুন। সকালে উঠিয়া সংসার-ঘানিতে নিজেকে জুতিয়া দিলাম, মুখে কিছু দিবার সময় মিলিল হয় তো সেই বেলা ছুপুরে— ইহাতে পাথরের মতো কঠিন মজবুত দেহও অচিরে অবসাদে ভরিয়া গলিয়া যায় !

অনেকে বলেন, কাজে মন লাগে না ! মন না লাগার কারণ দেহ-যন্ত্র ক্লান্ত হইয়াছে, তাই মনকেও কাজের মধ্যে পাওয়া যায় না। দেহ যদি সুস্থ থাকে, তাহা হইলে কোনো কাজেই মন বিরাগী থাকিতে পারে না !

দারিদ্র্য, অভাব, শোক, দুঃখ—এ সব কোন্ সংসারে নাই ? সে-জন্তু নিশ্বাস ফেলিলে চলিবে না ! সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁদের মনে মন মিলাইয়া সংসারে শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্তু সে অভাব-দুঃখ ভুলিয়া সহজ সুস্থ মন লইয়া বাঁচা ভিন্ন উপায় যখন নাই, তখন মনের দুঃখ মনে চাপিতেই হইবে। সহজ বুদ্ধিকে সচেতন করিতে পারিলে এ সব দুঃখ-বেদনা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

বাঁচিতে হইলে বাঁচার মতো বাঁচা চাই। দেহ-মন সুস্থ রাখিয়া বাঁচিতে হইবে।

তার উপর দেহ-মনকে শক্ত-সমর্থ রাখিতে হইলে নিত্য বিশেষ ব্যায়াম-বিধি পালন করা প্রয়োজন। এ ব্যায়ামে দেহের কোনো দিকে যেমন ভাঙ্গন ধরবে না, তেমনি কাজে কখনো ক্লান্তি উপলব্ধি করিবেন না।

এই ব্যায়াম-বিধির কথাই বলিতেছি। এ ব্যায়াম-চর্চার জন্য চাই একগাছি বড় লাঠি। লাঠি লইয়া নিত্য এ ব্যায়াম করিলে দেহের পেশীসমূহ কোনো কালে কোনো কাজে ক্লান্ত হইবে না—পেশী বেশ শক্ত-সমর্থ থাকিবে। এ ব্যায়ামে বিরাম-বিশ্রামও মিলিবে।

১। দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া লাঠিটি কাঁধের উপর লম্বালম্বিতাবে রাখুন। মাথার পিছনে ঘাড়ে লাঠির



১। লাঠিটি কাঁধের উপর

মধ্যভাগ ঠেকিয়া থাকিবে। কনুইয়ের কাছে দুই হাত (১নং ছবির মতো) ঝাঁকিইয়া লাঠির দুই প্রান্ত দু'হাতে ধরিবেন। তার পর এমনি ভাবে দাঁড়াইয়া মাথা, ঘাড় ও পিঠ না ঝাঁকিইয়া লাঠিটি দু'হাতে ধরিয়া উর্ধ্বে তুলুন। তুলিয়া লাঠি নামান। এই ভাবে ছয় বার লাঠি তোলা-নামা করিতে হইবে। অভ্যাস হইলে ছয়ের জায়গায়

দশ বার, বারো বার, কুড়ি বার পর্যন্ত লাঠি তোলা-নামা করিবেন।

২। এবার দাঁড়াইয়া লাঠিটা ধরুন সামনের দিকে—ধরিয়া লাঠি উর্ধ্বে তুলুন। তুলিবার সময় মাথা হেলাইয়া (২নং ছবির মতো) লাঠির পানে চাহিয়া দেখুন। তার পর লাঠি নামান; হাঁটু পর্যন্ত নামাইতে হইবে। নামাইবার সময় মাথা ও ঘাড় নীচের দিকে ঝুঁকিবে। যতখানি ঝুঁকিইতে পারিবেন, ঝুঁকিইবেন। এই ভাবে



২। লাঠির পানে চাহিয়া

এক বার লাঠি তোলা এবং পরের বার লাঠি নামানো—এ তোলা-নামা করিবেন ছ'বার। তার পর দশ বার, বারো বার, কুড়ি বার পর্যন্ত মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন। এ ব্যায়ামে বুকের গড়ন স্ঠাম থাকিবে চিরকাল।

৩। এবার দাঁড়াইয়া (৩নং ছবির মতো) মাথা পিছন-দিকে হেলাইয়া লাঠিটি সিধা-খাড়া ভাবে উর্ধ্বে তুলুন। বাঁ হাত দিয়া লাঠির এক প্রান্ত যত উর্ধ্বে হাত

পান ধরিবেন; ডান হাতে লাঠির তলার দিক ধরিবেন। লাঠির নিম্ন প্রান্ত থাকিবে ঠিক বুকের নীচে। লাঠি এমনি ভাবে তুলিয়া এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত গুণুন।



৩। লাঠি উর্দ্ধে

তার পর বিপরীত দিকে মাথা হেলাইয়া লাঠির ডগার দিক ধরুন ডান হাতে, তলার দিক ধরুন বাঁ হাতে। খুব দ্রুততালে হাত-ফেরাফেরি করিয়া লাঠি ধরিতে হইবে। এ ব্যায়াম করা চাই ষোল বার করিয়া। এ ব্যায়ামে কোমর, পিঠ এবং দুই হাত বেশ মজবুত হইবে—কোনো কাজে কোনো দিন দেহ ক্লান্তি-ভরে অবসন্ন হইবে না।

৪। এবার টুলে

বা চেয়ারে বসিয়া

(৪নং ছবির মতো) দুই হাত ফাঁক করিয়া ছ' হাতে ধরিয়া লাঠিটি উর্দ্ধে তুলুন। ছ' হাতে লাঠির দুই প্রান্ত ধরিয়া থাকিবেন। তার পর চেয়ারে বা টুলে বসিয়া মাথা ও পিঠ নোয়াইয়া লাঠিটি রাখুন পায়ের কাছে মেঝের উপর (৫নং ছবির মতো) ; তার পর আগেকার ভঙ্গীতে আবার লাঠি তুলুন। এই ভাবে লাঠি একবার উর্দ্ধে তুলিবেন, পরক্ষণে নীচে পায়ের কাছে নামাইবেন। এ ব্যায়াম করা চাই ছ' বার। এ ব্যায়ামে মেরুদণ্ড মজবুত হইবে; কোনো কাজে পিঠ টনটন করিবে না; পিঠে ব্যথা বা ক্লান্তি বোধ করিবেন না।

এ ব্যায়াম করিবার সময় যখন (৪নং ছবির মতো) লাঠি উর্দ্ধে তুলিবেন, তখন জোরে নিশ্বাস লইবেন; তার পর যখন (৫নং ছবির মতো) লাঠি নামাইবেন,

তখন জোরে শ্বাস ত্যাগ করিবেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের রীতিটুকু মানিতে তুলিবেন না।



৪। চেয়ারে বসিয়া লাঠির দুই প্রান্ত

৫। এবার ৬নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পা ছ'দিকে প্রসারিত করিয়া দাঁড়ান। কোমরের কাছ হইতে দেহ বাঁকাইয়া বাঁ-কাতে দাঁড়াইয়া লাঠিটি ধরুন ছবির ভঙ্গীতে ;



৫। পায়ের কাছে লাঠি রাখুন

ডান হাত থাকিবে উপর দিকে, বাঁ হাত নীচের দিকে। ঠিক এই ছবির মতো ছ' হাতে লাঠি ধরিয়া থাকিবেন।

তার পর ডান দিকে ডান কাতে দাঁড়াইয়া লাঠি ধরবেন
বা হাত উর্দে তুলিয়া, ডান হাত নীচের দিকে করিয়া।



৬। দেহ নাকাইয়া

এ ব্যায়ামও ছ' বার করিতে হইবে। এ ব্যায়ামে পেটে
মেদ জমিবে না ; সমস্ত দেহ মজবুত থাকিবে।

এ কয়টি ব্যায়ামে দেহ শুধু অক্লান্ত থাকিবে,
তা নয় ; দেহের স্ফূর্তাম-সুছাঁদ কখনো নষ্ট হইবে না।

এক-ঘরে ঘর করা

প্রাচীন নীতিশাস্ত্র পাড়িয়া আজ একানবর্তী সংসারের কথা
আলোচনা করিতেছি না। ভালো-মন্দ লোক সব
সংসারে আছে ; তাদের মনে ভালোবাসা আছে, ঘেঁষ-
হিংসা আছে,—এ সব কথা মানিয়া সকলের সুবিধা-
অসুবিধার কথা বুঝিয়া সামঞ্জস্য-রচনা সম্ভব হয় কি না,
সেই কথা আলোচনা করিতেছি।

এক-ঘরে ক'ভাই, খুড়া-খুড়ী, মাসি-পিসি, বিধবা-বোন,
ভাগনে, ভগিনী প্রভৃতি লইয়া বাস করা সে-কালে ছিল
আমাদের দেশে সনাতন-প্রথা।

তার কারণ ছিল। প্রধান কারণ, কাজ-কর্মের
জন্য এক-পরিবারের পাঁচ জনে তখন গৃহ-কোঠর

ছাড়িয়া দেশ-দেশান্তরে গিয়া বড় একটা বাস করিত
না,—কাজের জন্ত পুরুষমানুষকে বাহিরে থাকিতে
হইলেও তার স্ত্রী-পুত্র দেশের বাড়ীতে বাস করিত।
এখন নানা কারণে সে-রীতির পরিবর্তন ঘটয়াছে।
যেখানে এ পরিবর্তন ঘটে নাই, অর্থাৎ পাঁচ ভাই মিলিয়া
এক-সংসারে বাস করিতেছে, এমন সংসারের কথা
বলিতেছি।

এক-ঘরে পাঁচ জনে মিলিয়া-মিশিয়া শৃঙ্খলা-শাস্তি
বজায় রাখিয়া যারা বাস করিতে পারেন, আজিকার এই
স্বার্থের যুগে তাঁরা আমাদের প্রণম্য, তাহাতে সন্দেহ
নাই। এ ভাবে বাস করায় কতখানি চিন্ত-বল, কতখানি
সংযম ও সহ-ধৈর্য্য প্রয়োজন, তাহা অনুমান করা কঠিন
নয় !

ভাইয়ে-ভাইয়ে যত ভালোবাসাই থাকুক, জামে-জামে
ভালোবাসা সংসারে অতি-দুর্লভ বস্তু। ভিন্ন-ঘর হইতে
ছ' জন মেয়ে আসিয়া স্বামীর সংসারে মিলিয়া-মিশিয়া এক
হইয়া যাইবে, এ দৃশ্য সংসারে বিরল। এবং এ মিলনের
পথে মস্ত বাধা—টাকা-কড়ি ! স্বামী অনেক টাকা রোজ-
গার করেন, ছাওর রোজগার করে কম,—কাজেই
আমার শাড়ী-গহনার সঙ্গে ছোট জায়ের শাড়ী-গহনা
যদি সমান-পর্যায়ের দাঁড়ায়, তাহাতে আমার মন তৃপ্তি
পাইবে কেন ?

যদি বলেন, ভালোবাসা ? তাহা হইলে আমাদের
উত্তর, ভালোবাসার যত শক্তিই থাকুক, ভালোবাসা
অক্ষয় নয়, অমর নয় ! ভালোবাসার যে-শক্তি, সে-শক্তির
একটা সীমা আছে। তার উপর ভালোবাসার মস্ত
দোষ, সে নিজের উপর যতখানি প্রভাব মেলিয়া ধরে,
পরের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।
ভালোবাসার সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। আমি
আমার স্বামীকে ভালোবাসি, কারণ, তিনি আমায়
দেখেন তাঁর নয়ন-মণি ! আমায় যদি তিনি সবার চেয়ে বড়
করিয়া না দেখেন, সবার উপরে আমায় ঠাই না দেন,
তাহা হইলে স্বামীর উপর জাতক্রোধ হয়, এ কথা বুকে
হাত দিয়া অস্বীকার করিতে পারি কি ?

মা-বাপ নিজের কুৎসিত ছেলোটিকে দেখেন কন্দর্পের
মতো ; পরের সুন্দর ছেলেকে নিজের সে কদর্য্য কুৎসিত

ছেলের চেয়ে কালো-কুরূপ দেখেন। পরের ছেলের সহিত নিজের ছেলে কলহ-বিবাদ করিয়া আসিলে মা-বাপ পরের ছেলেরই দোষ দেখেন—তার কারণ, ছেলেমেয়েকে তিনি ভালোবাসেন, তাই! এবং এই দোষ না দেখার মূলে আছে স্বার্থ! অর্থাৎ আমি! আমার ছেলে! আমার মেয়ে! আমার যেমন দোষ নাই, তাদেরো তেমনি দোষ থাকিতে পারে না!

কিন্তু এগুলো ছোট কথা। যে-কথা বলিতেছিলাম, এক-ঘরে পাঁচ জনে মিলিয়া-মিশিয়া ঘর করার কথা।

এক-ঘরে পাঁচ জনের সঙ্গে বাস করিতে গেলে মনে সত্যকার ভালোবাসা থাকা চাই—যে-ভালোবাসা হুবুঁভ ছেলেমেয়েকেও সম্বন্ধে আঁকড়িয়া থাকে, ত্যাগ করিতে পারে না! সেই ভালোবাসা চাই! এ ভালোবাসা মনে না থাকিলে কম-রোজগারে ছাওর এবং বিধবা আশ্রিতা ননদের উপর দরদ জাগিবে কেন?

আর চাই আর পাঁচ জনের মন বুঝিয়া সে-মনকে স্বীকার করা; দরদ করা; এবং চাই মনের সহজ সরসতা।

আমরা যাদের ভালোবাসি, তাদের বিরাগে আমরা যেমন ব্যথা পাই, এমন ব্যথা তাদের আমরা দিতে পারি না। এবং প্রিয়জনকে যত চট করিয়া ব্যথা দিই, তেমন চট করিয়া তাঁদের সে-ব্যথা বিদূরিত করিতে পারি না বলিয়া সংসারে আমরা এতখানি কলহ-অশান্তি গড়িয়া তুলি!

আমি বড়-জা—আমার স্বামী অনেক টাকা রোজগার করেন,—আমি বাড়ীর কর্তা! আমার ছেলে, আমার ছাওরের ছেলে, আমার বিধবা ননদের ছেলে,—তিন জনে গাইতে বসিয়া মাছের মুড়ার জন্ত বায়না তুলিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমি বাড়ীর কর্তা, আমার স্বামীর রোজগার বেশী, অতএব ও-মুড়া পাইবে আমার ছেলে—এমন মন লইয়া যদি সংসারে আমি কর্তৃত্ব করি, তাহা হইলে সে-কর্তৃত্বে সংসার সংসার থাকে না—কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে উচিত, ছেলেদের কা'কেও মুড়া দিব না; কিম্বা পালা করিয়া তিন দিন তিন জনকেই মুড়া দিব। নহিলে আমার ছেলেকে মুড়া দিয়া আজ আমার চিত্তে তৃপ্তি ঘটিলেও ঐ মুড়া খাওয়াইয়া যে আমার ছেলের মুড়াটিও আমি জন্মের

মতো খাইয়া বসিব, এ কথা মনে রাখিবেন! এই মুড়া-দানের ব্যবস্থায় মনে উদারতা চাই,—আর চাই অপরের মন বুঝিয়া সে-মনকে স্বীকার করা, দরদ করা।

তার উপর আমাদের সকলের ব্যক্তিগত রুচি-খেয়ালে বিভিন্নতা আছে। কেহ মিষ্ট খাইতে ভালোবাসে; কারো ঝালের উপর অনুরাগ; কারো বা অন্ন-রসে। এখানে বাড়ীর কর্তার উচিত, সকলের রুচি, সকলের খেয়ালকে মানিয়া চলা।

কথায় বলে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম—মানুষের ভুল-চুক হওয়া স্বাভাবিক। দোষ-ত্রুটি ঘটিলে ক্রোধে-অভিমানের ঝঙ্কার-ছঙ্কার না তুলিয়া সরস কৌতুক-হাস্যের উৎস খুলিয়া দিলে দোষীর ত্রুটি যেমন সহজে স্থালিত হইবে, তেমনি সংসারের বুকে ঝড়ের মেঘ বাষ্পাকারেও ঠাই পাইবে না! ইহাতে শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় থাকিবে না।

আপনার ছাওর রোজ রাতে বন্ধুদের আড্ডায় তাস খেলিয়া রাত্রি এগারোটায় বাড়ী ফেরে। রাগ করিয়া যদি আপনি ঠাকুরকে বলেন,—হাঁড়ি-হেশেল তুলিয়া, ফেলিয়া রাখো ভাতের থালা ঢাকা-চাপা দিয়া রান্নাঘরে—তাহা হইলে গৃহিণীপনার কথা তুলিয়া সমাজে কথা কহিবেন না। আপনার স্বামী-পুত্র যদি দেৱী করিয়া বাড়ী আসিতেন, তাহা হইলে ঠাকুরকে এ আদেশ দিতে পারিতেন?

চাকর-দাসী, অতিথি-কুটুম্বকে যেটুকু শিষ্টাচার দেখান, রাগ হইলেও সে-রাগ দমন করিয়া যেমন ভদ্র-সৌজন্তে আপ্যায়িত করেন, এক-বাড়ীতে বাস করেন বলিয়া ছাওরকে সে শিষ্টাচার-সৌজন্ত দেখাইতে কার্পণ্য হয় কেন? ছাওরের ঐ বদ্ অভ্যাসের জন্ত বায়ুন-চাকরের কষ্ট হয় তাবেন, বেশ, ছাওরকে সহজ কথায় বলিতে পারেন তো, ঠাকুরপো, খেয়ে-দেয়ে তাস খেলতে বেরিয়ো ভাই—না হলে ঠাকুর-চাকরের কষ্ট হয়। তাহা হইলে অশান্তি-উৎপাতে ঘর ভাঙে না, শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয় না!

আগল কথা, অপরকে মানিয়া চলাতেই মনের শিক্ষা-সংস্কার পরিচয়। আমি সর্কময়ী—আমার ইচ্ছাই ইচ্ছা—এ কথা কোনো শিক্ষিতা মহিলা মনে আনিতে পারেন না।

মেয়ে-জাতের উপরেই সংসারের শান্তি নির্ভর

করিতেছে। পুরুষ-মাতৃষকে .নানা কাজে নানা চিন্তায় সংসারে বিব্রত থাকিতে হয়। ঘরে আসিলে যদি তাঁদের কাণে স্ত্রীজাতি অহরহ লাগানি-ভাঙ্গানির কথা বলিয়া চুকলি কাটেন, তাহা হইলে বেচারী পুরুষ যে নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধরিবে, সে-মূর্ত্তি শুধু হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, স্ত্রী-পুল্লের শাস্তি-সুখও বিদীর্ণ করিয়া দিবে!

অতএব স্ত্রীজাতির উচিত, ধৈর্য্যশীলা সহশীলা হইয়া স্নেহ-মমতায় বুক ভরিয়া সংসারের চার্জ লওয়া। শুধু স্বামী-পুত্র লইয়া সংসার গড়িলে বহু দুর্দিনে বহু অসুবিধা সহিতে

হইবে। ভাগ্যক্রমে যিনি ছাওর-ননদ পাইয়াছেন, তিনি যে কেন তাঁদের বহিষ্কার-করণে উত্তত হন, বুঝিতে পারি না। বাড়ীর পশুপক্ষীর উপরেও মমতা জাগে। ছাওর-ননদ কি বাড়ীর কুকুর ও কাকাতুয়ার অধম যে, তাদের আপন করিয়া লওয়া যাইবে না? নিজের ভাই-বোনের কথা যেমন ভাবেন, তেমনি করিয়া ছাওর-ননদকে স্বামীর ভাই-বোন বলিয়া মনে করিতে পারেন না? তাহা করিলে ছাওর-ননদের সমস্তা সংসারে কোনো দিন সমস্তার সৃষ্টি করিবে না; মনে শাস্তি পাইবেন; ছাওর-ননদকে লইয়া কষ্ট বোধ করিবেন না!

ভিক্ষায় অপরাধ

তুমি কি জানিতে হৃদয়ে আমার বেদনার বীণা বাজে,
তোমারি হাশ্বে, তোমারি লাশ্বে প্রতিটি সকাল-সাঁঝে?
চাহি নাই যাহা তুমি আনো তাহা ব্যথা যে তাহাতে পাই,
খুঁজে ফিরি যাহা, নাহি পাই তাহা—তুলনা তাহারো নাই!
ছেড়ে যেতে চাই যাহারে যতই, জড়াইয়া তারে দাও,
ভোগের নামেতে এই দুর্ভোগ দিয়া কি-বা সুখ পাও?
যার লাগি' ছুটি যত পাছু-পাছু তাহারে হারাও দূরে,
যত গান গাহি আপনা-পাশরি আমি যেন কাঁদি সুরে!

এ জীবন যদি লভেছি জগতে কেন গো ছুরাশা দিলে?
কেন দুখময় দীনের দিবস, সুখ যদি নাহি মিলে!
গোপনে রহিয়া হে গোপন-প্রিয়, এ কি খেলা নিরদয়!
আমি যা' কহিতে চাহি প্রাণ খুলে, তাহারে করিছ লয়!
এই কি তোমার পালন-মন্ত্র এই-কি তোমার কাজ?
আমার মাঝারে আমার করম্ আমারেই দেয় লাজ!
আমিই আমারে ঘেরিয়া-ঘেরিয়া যত বার দিই রূপ,
আমার কামনা সমূলে নাশিয়া তুমি নিশ্চল—চূপ!

ওগো অ-দেখার অ-তুল রতন, ওগো সাধকের প্রিয়,
আমার সাধনা আমার সিদ্ধি তোমাতেই হ'রে নিয়ো!
দিয়ে তুমি দিয়ে যাহা দিতে চাও মাথা পেতে তারে লবো!
যত ব্যথা পাই গোপনে বহিব কথাটিও নাহি কবো!
যদি কাঁদে প্রাণ অস্তুর-তলে হরিব চোখের জল,
সহন-অতীতে নীরবে সহিতে—এইটুকু দিয়ে বল।
এর বেশী আর ভিখু মেগে প্রভু ফিরিতে নাহিক সাধ—
এর বেশী যারা ভিখু চায় তারা করে মহা-অপরাধ!

শ্রীকালীকঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় (বিজ্ঞাবিনোদ)।



ভারতের বর্তমান শিল্প-পরিস্থিতি

বিগত মহাযুদ্ধের ত্রায়, বর্তমান মহাবিপ্লবেও বহু অর্থ-নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান শাসনতন্ত্রের পক্ষে সাম্রাজ্যের সঙ্কটোদ্ধার-চেষ্টা ব্যতীত ভারতের স্থায়ী কল্যাণপ্রদ শিল্পোন্নতি-বিধায়ক কোন অমুঠানে একান্ত ভাবে প্রবৃত্ত হইবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না; কিন্তু যুদ্ধাবসানে যে একটি সামঞ্জস্য-বিহীন পরিস্থিতি অবশ্যস্বাভাবী ও অনিবার্য, তাহার যথাসম্ভব প্রতীকারকল্পে এখন হইতে কিছু-কিছু সতর্কতামূলক এবং প্রতিষেধক বিধি-ব্যবস্থার ও নিয়ম-নিষ্ঠার প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়।

যুদ্ধের নানা প্রয়োজন সাধনে কর্তৃপক্ষ মুক্তহস্তে কোটি-কোটি মূল্য ব্যয় করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ যুদ্ধানুষ্ঙ্গিক সৌভাগ্যের আভাসমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। যুদ্ধার্থ ব্যয় যাহাতে ভারতের স্থায়ী কল্যাণ-কল্পে যথাসম্ভব নিয়োজিত হয়, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। এই ব্যয়-নির্ধারণ-নিয়ন্ত্রণে দেশবাসীর সহযোগ ও সহায়তা সর্বতোভাবে কাম্য। যুদ্ধ-পরিচালন-সৌকর্যার্থ ব্যয়ের পরিমিত পরিমাণের প্রতি সর্বদা সতর্ক-দৃষ্টি রাখা সম্ভব নহে। তথাপি যে অর্থ ব্যয় করা হইতেছে, তাহার পরিমাণ-ফল যাহাতে ভারতের স্থায়ী কল্যাণপ্রদ হয়, তৎপ্রতি অবহিত হওয়া অসম্ভব নহে। বিগত মহা-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে এ শিক্ষা আমরা যথেষ্ট পরিমাণেই অর্জন করিয়াছি। এই বাধ্যতামূলক অপরিমিত ব্যয়ই আমাদেরকে যুদ্ধের সাহায্যার্থ যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ ও সরবরাহ-ব্যপদেশে কোন-কোন শিল্পে স্থায়ী পরি-কল্পনাকে চিরকল্যাণপ্রদ রূপ-দানের সুর্যোগ ও সুবিধা উপস্থাপিত করিতেছে।

পূর্বে বহু লোকেরই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে,

সর্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণ ভারতে প্রস্তুত করিবার সুর্যোগ ও সুবিধা বিরল; কিন্তু গতবারের ও বর্তমান যুদ্ধের প্রচেষ্টার ফলে এই ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধোপযোগী গোলা, গুলী, বন্দুক, বারুদ প্রভৃতি নির্মাণ দ্বারা ভারতীয় বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের বিক্রমে আরোপিত বহু দিনের ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে উপযুক্ত কলকজা, যন্ত্রপাতি, এবং সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করিলে তাহারা অত্যন্ত সংহারাজ্ঞ নিশ্চাণেও সমর্থ হইবে। ভারতে কায়মী ভাবে যুদ্ধোপকরণ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত কাল ও সুর্যোগ আসিয়াছে—এ সুর্যোগ উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সরকারের যথাযোগ্য চেষ্টা, যত্ন ও সহায়তায় অভাব না হইলে এত দিনে ভারতে মোটর-গাড়ী ও বিমান-নির্মাণের কারখানা এবং জাহাজ নির্মাণোপযোগী বহুসংখ্যক ষাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রগতিশীল শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারে সহায়তা করিবে।

সম্প্রতি যুদ্ধের পনের মাস পরে ভারত সরকার এই তিন মূল ও মুখ্য শিল্পের (Key Industries) প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা প্রদর্শন করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বহু বর্ষ যাবৎ মহীশূরের ভূতপূর্ব দেওয়ান, পূর্ত ও স্থপতি-বিদ্যায় অভিজ্ঞ স্মার মৎস্রগাঙ্গী বিশ্বেশ্বরায় ভারতে মোটর-গাড়ী নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত সরকারের সক্রিয় সহায়তা বা আনুকূল্য লাভ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধার্থ ভারতের বাহিরে তাঁহারা এত মোটর-গাড়ী নির্মাণের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন যে, আশু এই শিল্পে সক্রিয় সাহায্য দান, কয়েকটি কারণে তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। ইহা গভীর ক্ষোভের বিষয়। পাঠক হয় ত গুনিয়া বিস্মিত হইবেন না যে, ভারত সরকার সম্প্রতি ২৪ কোটি টাকা মূল্যে ষাট হাজার মোটর-গাড়ী ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং এক

জন বিশেষজ্ঞের মত এই যে, এই ষাট হাজার গাড়ীর আবশ্যকানুযায়ী অদল-বদলের নিমিত্ত ভারতে একটি বৃহৎ মোটর-গাড়ীসংক্রান্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এই শিল্পে এত দিন সাহায্যবিমুখতার অজুহাতও বিস্ময়কর ! কুড়ি বৎসর পূর্বে ভারতীয় রাজস্ব তদন্ত বৈঠকের (Indian Fiscal Commission) সুপারিশ ছিল, কোন চলতি কারবার বিপর্য হইলে সাহায্যলাভের অধিকারী হইবে। যুদ্ধের তাগিদে বর্তমানে এ নিয়ম-নিষ্ঠার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা নাই, তাহা গড়িতে হইবে।

বিমান-শিল্প প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সরকার সক্রিয় সাহায্য দান করিয়াছেন ; কোন একটি স্বদেশী বিমান-প্রতিষ্ঠান হইতে স্ব-দ্বাপযোগী বিমান ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। যুদ্ধ বাধিবার প্রারম্ভেই সরকারের নিকট এইরূপ একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ভারত সরকার যখন নিষ্ক্রিয় ছিলেন, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা সেই সময় প্রভূত তৎপরতার সহিত এই শিল্পে অগ্রসর হইতেছিল। গত জুন মাসে যখন এই বিমান-নির্মাণ-পরিকল্পনার পুনরান্দোলন গভীর উৎসাহের সহিত সরকারের গোচর করা হয়, তাহার পরেও স্তূদীর্ঘ চারি মাস অতিবাহিত হইয়াছিল কেবল সরকারের কর্তব্য নির্ধারণের জন্ত ! ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়া দিনে দুইখানি এবং কানাডা মাসে ৩৬০ খানি বিমান নির্মাণের অগ্রগতি লাভে সমর্থ হইয়াছে ! যুদ্ধের প্রারম্ভে অবহিত হইলে এত দিনে ভারত তাহার প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-বিমান নির্মাণে সমর্থ হইত।

অর্ণবপোত নির্মাণ-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আরও বিস্ময়কর। ষোল বৎসর পূর্বে ভারতীয় বণিক্. নৌ-বাহিনী-তদন্ত সমিতি (Indian Mercantile Marine Committee) ভারতে পোত-নির্মাণের ষাঁটি প্রতিষ্ঠান জন্ত সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই সমিতি সরকার কর্তৃক সংগঠিত হইয়াছিল, এবং পোত-শিল্পে বিশেষজ্ঞ কয়েক জন বৃটিশ সদস্য ইহার নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন। এই সমিতি বিশিষ্ট সরকারী সাহায্যের জন্তও সুপারিশ করিয়াছিলেন। সমিতির প্রধান সুপারিশ ইহাই ছিল যে, ভারতের উপকূল-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে মালবাহী ভারতীয়

জাহাজ-প্রতিষ্ঠানগুলিরই অধিকারে থাকিবে। এই সুপারিশ কার্যকরী করা দূরের কথা, ভারত-শাসন আইনে ইহার প্রতিকূল ব্যবস্থাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের বিপুল চেষ্টা সত্ত্বেও সিঙ্কিয়া জাহাজ-কোম্পানী কলিকাতায় জাহাজ নির্মাণোপযোগী ষাঁটির জন্ত স্থান সংগ্রহ করিতে পারে নাই ! ফলতঃ, কলিকাতা একটি বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সুযোগ ও সুবিধায় বঞ্চিত হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ ক্ষতি কেবল মাত্র বাঙ্গালার গৌরব কলিকাতা মহানগরীরই নহে, এ ক্ষতি সমগ্র বঙ্গ-দেশের। কলিকাতায় এই শিল্পের অনুষ্ঠান হইলে বহু আনুষ্ঠানিক সহকারী ও সহযোগী শিল্পের প্রচুর উন্নতি ঘটিত, এবং বাঙ্গালার বহু শ্রমজীবী ও কারিকরের অন-সংস্থানেরও সুব্যবস্থা হইত। কলিকাতা যে সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছে—ভাইজাগা (বিশাখাপত্তন) তাহার সদ্যবহার দ্বারা সম্যক সমৃদ্ধিলাভ করিবে। পূর্ব-উপকূলে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া-তুলিতে সিঙ্কিয়া জাহাজ-কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে ও হইবে। যুক্তরাজ্য হইতে একটি চলতি পোতনির্মাণ-ঘাঁটির (Ship-yard) যন্ত্রপাতি, কলকজা, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি ভারতে স্থানান্তরিত করিয়া তন্নির্মিত পোতগুলি সবকারের যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রদান করিবার প্রস্তাবটিও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সরকারের বহুসংখ্যক জাহাজের প্রয়োজন। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিস্তর জাহাজ ক্রয় করা হইতেছে ; তথাপি ভারতে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টাকে কার্যোপযোগী করিবার উপযুক্ত সাহায্যের একান্ত অভাব ! কিছু দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসভার এক অধি-বেশনে বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী স্মার এলান লয়েড্ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহায়করূপে ভারতে পোত-শিল্প-প্রতিষ্ঠার সরকার উত্তমশীল নহেন ! যাহা হউক, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্রসভায় বে-সরকারী সদস্যগণের প্রচণ্ড আন্দোলন ও আলোচনার ফলে সরকার ভাইজাগাপটমের পোত-নির্মাণ-প্রাঙ্গণের প্রয়োজনীয় জাহাজের এঞ্জিন এবং জাহাজের কাঠামো নির্মাণোপযোগী যথাসম্ভব ইম্পাত যুক্তরাজ্য হইতে

আনয়নের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বর্তমানে সরকারের এই অনুকম্পাটুকুই লাভ করিয়া পোতনির্মাণ-শিল্পের উদ্বোধনগণকে খুসী হইতে হইবে।

এই তিনটি অত্যাশঙ্ক্য আদিম শিল্পে ভারতের বর্তমান শোচনীয় দৈন্ত, কর্তৃপক্ষের এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠাপকবর্গের অদূরদর্শিতা ও অর্থনৈতিক অনবধানতার পরিচায়ক। এত দিন ভারতে এই সকল শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে আজ ভারতীয় রাজশক্তিকে নার্কিং মুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হইতে হইত না। শুধু তাহাই নহে, শিল্পপ্রগতিসম্পন্ন ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য এবং পণ্যসম্ভার ভারতীয় রাজশক্তির যুদ্ধ-পরিচালন প্রচেষ্টাকে অধিকতর বলবতী ও ফলবতী করিত। কিন্তু ইহার ফলে প্রথম শ্রেণীর বণিক নার্কিং পনক্বেরণ সরকারের প্রতি কতখানি প্রসন্ন হইতেন, তাহা অনুমান করা কঠিন।

যাহা হউক, বর্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির ফলে ভারতে পুনরায় বহু ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ নানাবিধ সমৃদ্ধ শিল্প-পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার যে অতুল্যম সুযোগ আসিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহারার্থ আমাদিগকে আশু ঐকান্তিক ভাবে উদ্বোধনী ও উদ্বোধনীয় হইতে হইবে। যুদ্ধ-সরবরাহ বিভাগের ইস্তাহারে আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই— ভারত রাতারাতি রাষ্ট্র-রক্ষণ শিল্পে আশাতীত দক্ষতা লাভ করিয়াছে। সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। যদি বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে, উপযুক্ত সময়ে যথোচিত চেষ্টা সহকারে এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমরা মনোযোগী হইতাম, তাহা হইলে আজ আমরা কত উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতাম, তাহাই বিবেচ্য ও বিচার্য। এক বৎসর যুদ্ধ-পরিচালনাস্তেও ভারতের শিল্প-সম্ভাবনার কত ক্ষুদ্র অংশে শক্তি সম্ভাবিত হইয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে ক্ষোভে ত্রিয়মাণ হইতে হয়। এখনও আমাদের শিল্প-শৃঙ্খলার বহু পর্দা বিযুক্ত রহিয়াছে, এবং তাহাদিগকে যুক্ত করিবার উপযুক্ত বহু শিল্পে আমাদের প্রচেষ্টা সম্যক্রূপে প্রযুক্ত হয় নাই।

আমাদের বাণিজ্য-সচিব ভরসা দিয়াছেন, যুদ্ধার্থ অনুষ্ঠিত নূতন শিল্প যুদ্ধাবসানে যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তজ্জন সরকার যথাবিহিত সাহায্য প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই অভয় বাণী এবং

শিল্পোন্নতি-বিধায়ক গবেষণা-বৈঠকের (Board of Industrial Research) প্রতিষ্ঠা সরকারের সদিচ্ছার পরিচায়ক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে যেন একটু রূপা দিতরণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে। ভারতের প্রতি ইহা যেন একটু অনুগ্রহ প্রদর্শনেরই নিদর্শন মাত্র। নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা যে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে অতীব প্রয়োজন এবং অবশ্যকর্তব্য, তদ্বিষয়ে সরকারের আগ্রহশীল উৎসাহ ও সাহায্যের ইঙ্গিত মাত্রও ইহাতে পাওয়া যায় না।

সকল দেশেই রাষ্ট্র, শিল্প-প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারকল্পে অকপটে উৎসাহ এবং মুক্তহস্তে সাহায্য প্রদান করিয়াই নিরস্ত থাকেন না; প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণও করেন। আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্র যে এরূপ নীতির উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই, তাহা সত্য নহে; কিন্তু সরকারের বর্তমান গঠন-প্রণালী সেই নীতি সম্যক্রূপে অবলম্বনের অনুকূল নহে। জাতীয় শাসন-প্রণালী অকুণ্ঠিত ভাবে যে নীতি অবলম্বন করিতে পারে, এবং শিল্প-পরিচালক-বর্গকে সাহস সঞ্চয় পূর্বক যেরূপ ঝুঁকি লইতে প্ররুতি দিতে পারে, বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন বর্তমান খাদেশ-সাপেক্ষ শাসনতন্ত্রের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

যুদ্ধ পরিচালন সময়ে জাতীয় উন্নতিমূলক সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। ভারতেও ঘটনাচক্রে তাহার ব্যত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল যুদ্ধ-প্রয়োজনে নিবন্ধ-দৃষ্টি শাসনতন্ত্রের পক্ষে এখন ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিল্প-প্রসারণ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া হুঁহু; তথাপি যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহার্থ যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, তাহার সুযোগ লইয়া, কোন কোন শিল্পের স্থায়ী প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠার অনুকূলে যথাসম্ভব মনোযোগ প্রদান করা অসম্ভব নহে। বিগত মহাযুদ্ধের পর যে সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছিল, শাসনতন্ত্রের শিথিলতার জন্ত, এবং শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক নিষ্ঠার অভাব বশত: তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। সুযোগ কদাচিৎ একাধিকবার আসিয়া থাকে। ঘটনাচক্রে আমরা এই দ্বিতীয় বার সুযোগ লাভ করিয়াছি;

এ সুযোগ হেলায় হারাইলে আমাদের পুনরভ্যুদয়ের আর কোন আশা থাকিবে না।

বিগত মহাযুদ্ধাবসানে লক্ষ যে সুবর্ণ সুযোগ আমরা হারাইয়াছি, তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রী এলফ্রেড ওয়াটসন বিলাতের এক বিখ্যাত পত্রিকায় (Great Britain and the East) লিখিয়াছেন—“ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, একটি দ্বিতীয় জগৎ-জোড়া যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছে—বৃটিশ জাতিকে সমৃদ্ধ করিতে, এমন একটি বিরাট দেশের শিল্প-সম্ভাবনা সম্বন্ধে,—যে দেশ প্রায় প্রত্যেক প্রকার কাঁচা মালে সমৃদ্ধ, এবং যাহার লোকসংখ্যার অসুত অসুত ব্যক্তি উত্তরাধিকারিস্বত্রে কারিকর, এবং সামান্য শিক্ষা সহকারে যাহারা যাহাতে বিলক্ষণ পটু, সেই হাতের কাজ হইতে, আধুনিক কল-কজা ও যন্ত্র-পাতি-সাহায্যে ভূরি উৎপাদনে দক্ষতা লাভে সক্ষম।” দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অতীতের আলোচনা নিষ্ফল।

অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড বিগত মহাযুদ্ধ কালে বহির্বাণিজ্য এবং শিল্প সম্বন্ধে যেরূপ দূর-প্রসারিণী নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার তুলনায় ভারতের প্রচেষ্টা যে অতি অকিঞ্চিৎকর, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। পূর্ব-গোলার্ধের বৃটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত দেশ সমূহের দিল্লী বৈঠকে সমাগত অষ্ট্রেলীয় প্রতিনিধিগণের নামক শ্রী ওয়ালটার ম্যাসিগ্রীণ সে দিন বলিয়াছেন, বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে তাঁহার দেশে শিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং বর্তমান মহাযুদ্ধের পূর্বাভাসের সূচনা হইতেই তাঁহারা সর্বপ্রকার শিল্প-সামর্থ্য ও সম্ভাবনার পর্যাপ্ত আলোচনা করিয়া কর্তব্য অবধারণ করিয়াছেন। আমরা এখন যুদ্ধোপ-যোগী উপাদান উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহে ব্যাপ্ত। এই প্রয়োজন প্রচেষ্টাই মুখ্য। কিন্তু গোণের প্রতিও যথাসম্ভব সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন।

উদাহরণ স্বরূপ তৈলবীজ পণ্যের ছরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু বিদেশে মাল চালান বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং ভারে-ভারে তৈল-বীজ বন্দর সমূহের গুদামে স্তুপীকৃত

হইতেছিল। আমাদের দেশে যদি তৈল-নিষ্কাশন শিল্পের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে এই দ্রুত ধ্বংসশীল কাঁচা মালের সদ্যবহার দ্বারা উপকৃত ও লাভবান হইতে পারিতাম। অন্যান্য কয়েকটি পণ্য সমূহেও অল্পরূপ অবস্থার উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এই সকল কাঁচা মালকে পরিণত পণ্যে পরিবর্তিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলে আমাদের দেশের কৃষক, ধনিক, শ্রমিক ও বণিক—সকলেই উপকৃত হইতে পারিত। বিদেশী চাহিদা ও বিদেশগামী পণ্য-জাহাজে স্থানের অভাব বশতঃ তাহাদের অপচয় হইবার আশঙ্কা থাকিত না।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে আমরা রাসায়নিক শিল্পে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছি; তথাপি গুরু এবং আদিম রাসায়নিক শিল্পে আমাদের প্রয়োজনানুরূপ অগ্রগতি হয় নাই। নতুবা ঔষধ ও বণিজ-শিল্পের চাহিদা মিটাইয়া আমরা যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ও সরবরাহ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিতাম। সামান্য দূরদৃষ্টি সহকারে যদি আমরা যথাপূর্বে অধ্যবসায় অবলম্বন করিতাম, তাহা হইলে কোন কোন অত্যাবশ্যকীয় গুরু ও মধ্যম, অর্থাৎ সহযোগী, অথবা সহকারী শিল্পে আমরা শুধু কৃতিত্ব নহে, আত্ম-প্রাচুর্য্যও অর্জন করিতে পারিতাম। সুখের বিষয়, ভারত শীঘ্রই ক্লোরোফর্ম, ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট, কার্বলিক এসিড, সোডা এস, কষ্টিক সোডা, সোডিয়াম বাইকার্ব-নেট, স্লিচিং পাউডার, তরল ক্লোরিন, ব্রোমাইন্, জিঙ্ক ক্লোরাইড, ইথার, ট্যানিক এসিড, ক্রিসলস, পটাসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সাইট্রেট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও সাম্রাজ্য-স্তরগত দেশ সমূহে কিছু কিছু রপ্তানী করিতে পারিবে।

আমরা জার্মানী এবং ইটালী হইতে বহু পেটেন্ট ঔষধ ক্রয় করি—যথা টনিক, ডিস-ইন্ফেক্ট্যান্ট, মেডি-কেটেড্ ড্রাগস্, এম্পিরিন, হাইড্রোজেন্ পেরেক্সাইড এবং নানাবিধ অইন্টমেন্ট। ভারতে প্রচুর ঔষধ প্রস্তুতোপযোগী উদ্ভিদ জন্মে; বর্তমানে বহু রাসায়নিক কারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং স্বদেশ ও বিদেশে কুত্রাপি উচ্চশিক্ষিত রাসায়নিকের অভাব নাই। সুতরাং ভারতের পক্ষে এই সকল দ্রব্যজাত প্রস্তুত আদৌ কঠিন কার্য্য নহে। অনেকেই জানেন না যে,

ভারতে বহু শতাব্দী হইতে এই সকল রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য অসংস্কৃত অবস্থায় প্রস্তুত হইয়া বৈজ্ঞ এবং য়ুনানী হাকিমদের কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু বিদেশী পণ্যের আমদানী রুদ্ধ হওয়ার যে উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সদ্যবহার দ্বারা প্রাচীন রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আধুনিক গবেষণা-প্রসৃত উন্নত প্রণালী এবং উন্নত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সাহায্যে সুসংস্কৃত করিবার উপায় সুগম হইয়াছে। এই শিল্পের উন্নতি স্থায়ী হইবে। যুদ্ধাবসানেও ইহার অগ্রগতি অপ্রতিহত থাকিবে। সরকারও সাহায্য-দানে প্রতি-শ্রুত হইয়াছেন।

যুদ্ধের তাগিদে কোন কোন শিল্পে অকস্মাৎ অত্যধিক মনোযোগ ও উদ্যমের ফলে একটি সামঞ্জস্যহীন অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। যুদ্ধোপকরণ-সরবরাহ বিভাগের চাহিদা মিটাইতে লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক, বিজলী-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পে যেমন দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে, শর্করা, পাথুরিয়া কয়লা, বিলাতি মাটি, এবং কিসদংশে বুননি প্রভৃতি শিল্পে তেমনি অবনতি ঘটিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই সকল শিল্পের অবনতি হইয়াছে। শর্করা-শিল্প অদূরদর্শিতার ফলে বিপন্ন হইয়াছে। ১৯১৬-১৮ খৃষ্টাব্দে আমরা জাভার উপর নির্ভরশীল ছিলাম। ঐ সময় অতি উচ্চমূল্যে আমাদিগকে শর্করা কিনিতে হইয়াছিল। সরকারী রক্ষণ-নীতির ফলে ঐ শিল্পে ভারত দ্রুত উন্নতি লাভ করে। তার পর ঘটনাচক্রে অত্যধিক উৎপাদনবৃদ্ধি, মূল্যহ্রাস, এবং বিহার ও যুক্তপ্রদেশে সরকার কর্তৃক ইস্কুর মূল্যবৃদ্ধি হেতু এমন একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে, স্বল্প-শক্তিসম্পন্ন শর্করা কারখানার অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়াছে। পাথুরিয়া কয়লা শিল্পের দুর্গতি ঘটিয়াছে—অত্যধিক উৎপাদনবৃদ্ধির সহিত রপ্তানী-রোধের ফলে। কোন কোন আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হেতু ইমারত নির্মাণ-কার্য শিথিল হওয়ার ফলে বিলাতি মাটি-শিল্পে মন্দা ঘটিয়াছে। সমুদ্রপারের বাজার হইতে বঞ্চিত হইয়া বুননি-শিল্পের ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু সম্প্রতি এশিয়ায় কোন কোন স্থানে চাহিদা বৃদ্ধি-হেতু কিঞ্চিৎ আশার আলোক লক্ষিত হইতেছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই লক্ষ্য করিবেন যে, যুদ্ধের

প্রয়োজনের তাগিদে এক শ্রেণীর শিল্পের যেমন অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, অন্য এক শ্রেণীর শিল্পের তেমনি অবনতি অপরি-হার্য হইয়াছে। যুদ্ধাবসানে এই পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটিবে। যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হইলে, যুদ্ধোপকরণ-শিল্পে মন্দা ঘটিবে এবং এই সকল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও কারিকর, ধনিক এবং বণিকদিগের বিপদ ঘটিবে। একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং সেই সামঞ্জস্যবিহীন পরিস্থিতি হইতে যে অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহার প্রতিবিধানকল্পে এখন হইতেই চিন্তা ও চেষ্টার প্রয়োজন। ব্যাপক শিল্প-প্রসারণই ইহার একমাত্র প্রতীকার; কিন্তু সে পক্ষে কোন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না। অধিকন্তু প্রাচ্যগুচ্ছের (Eastern Group Conference) দিল্লী বৈঠকের অব্যবহিত ফলে একরূপ পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার পরিপুষ্টি সুদূরপর্যন্ত হইবার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীযুক্ত গীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম্যালেরিয়া ও সিল্কোনা উৎপাদন

বর্তমান যুদ্ধ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির প্রতি সাধারণের মন আজকাল এত অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে যে, আমাদিগের পুরাতন অথচ অত্যাবশ্যক সমস্যাগুলি এখন সহজে তাঁহাদের মনে স্থান পাইবে—তাহার সম্ভাবনা নাই। ম্যালেরিয়া দমন এইরূপ একটি সমস্যা। সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙ্গালা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া হ্রাস পাওয়া দূরের কথা, বরং তাহা বর্দ্ধিতই হইতেছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩,৭২,৯৯২; ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৪,১৬,৫২১ হইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মোট মৃত্যুসংখ্যা ১৩,১৫,৮৮৬র সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই প্রদেশে এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক লোকের মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া। সরকারী রিপোর্টে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুসংখ্যা আমরা জানিতে পারিলেও, যাহারা না মরিয়া অকস্মণ্য হইয়া জীবন, ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, সেরূপ লোকের প্রকৃত সংখ্যা জানিতে পারি

না ; তবে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড জেটল্যাণ্ড এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, “প্রতি ১০ বৎসরে বাঙ্গালায় প্রায় ১ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া অস্থি-চর্মসার হয়।”—এ অবস্থায় ম্যালেরিয়াই যে বঙ্গদেশের উন্নতির সর্বপ্রধান অন্তরায়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বলা বাহুল্য, কেবল বাঙ্গালা কেন, সমগ্র ভারতকে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্তিদানের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের। বাঙ্গালা অপেক্ষা অন্যান্য প্রদেশ প্রতীকার-পন্থা অবলম্বনে অল্প-বিস্তর অগ্রসর হইতে পারে বটে, কিন্তু মোটের উপর দেখা যায় যে, যে সকল সুপরিষ্কৃত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশের সাধারণ অবস্থার উন্নতির ফলে ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্ভবপর হয়, সে সকল ব্যবস্থার প্রতি প্রায়ই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। তন্ত্রি, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের চিকিৎসারও যথাবিহিত ব্যবস্থা না থাকায় স্থায়ীভাবে মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাসও লক্ষিত হয় না। ম্যালেরিয়ার প্রতীকারের জগৎ যত প্রকার ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সিকোনা-বকুলই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। সিকোনা-বকুলজাত উপকার সমূহ উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহারই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতের দুই-তিন স্থানে সরকারী নিয়ন্ত্রণে সিকোনার চাষ ও তাহা হইতে কুইনাইন ও অন্যান্য উপকারাদি নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত সরকার যে গতানুগতিক পন্থা ও নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা যথাযোগ্য সম্বরণ সহিত ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদের সহায়স্বরূপ না হইয়া বরং পরোক্ষ ভাবে তাহার প্রভাববৃদ্ধির আনুকূল্যই করিতেছে। বর্তমান যুদ্ধের বাজারে যুরোপোপন্ন অনেক ঔষধের আমদানি রহিত হওয়ায় এ দেশেই সেগুলি উৎপাদনের জগৎ যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে ; কিন্তু সিকোনার চাষ ও সিকোনা-বকুলের উৎপাদন সম্প্রসারণের কোন অভিনব ব্যাপক পরিকল্পনার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। অথচ ইহারই উপর ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে।

সিকোনার ইতিহাস

কুইনাইন ও সিকোনার অন্যান্য উপকার আজ-কাল সমগ্র সভ্য জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, এবং উহার চাষ ও উপকার প্রস্তুতে রত থাকিয়া অনেকেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন। কিন্তু তিন শত বৎসর পূর্বে ইহার নাম সভ্য জগতের অতি অল্প লোকেরই পরিচিত ছিল। সিকোনার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পার্শ্বত্যা অঞ্চল। ইহা কদম্ব-বর্গীয় তরু, এবং ইহা প্রায় ৪০টি জাতিতে বিভক্ত। দক্ষিণ-আমেরিকার অধিবাসিগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহার জরুর শক্তির বিষয় অবগত ছিল। স্পেনীয়গণ ঐ সকল দেশ অধিকার করিয়া সেই সকল স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে ক্রমশঃ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতে হয়, এই জগৎ অনেক অনুসন্ধানের পর তাহারা জানিতে পারে, ঐ সকল অঞ্চলে এক প্রকার গাছের ছাল পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহার করিয়া জরাক্রান্ত স্থানীয় রোগীরা ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্তি লাভ করে। ঐ সকল স্পেনীয় অতঃপর উক্ত বৃক্ষ-বকুল জর-চিকিৎসায় প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করায়, তাহাতে সুফল লাভ করে। বস্তুতঃ, Countess of Chincon-এর স্মৃতিরক্ষার্থ উক্ত বকুলের নাম দেওয়া হইয়াছিল, “Chincona”। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেনীয় সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধির পত্নীর নাম ছিল কাউন্টেস্‌ সিন্‌কোন। তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত ঐ দেশে গমন করিয়া ম্যালেরিয়া রোগে বহু দিন ভুগিয়াছিলেন ; অবশেষে সিকোনা সেবনেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এ জগৎ স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর সিকোনার গুণ-প্রচারের জগৎ স্বভাবতঃই তাঁহার আগ্রহ হয়, এবং তাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিকোনা স্পেন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিকোনা-বকুলের ব্যবহার আরম্ভ হইলেও উহা কোন্ বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়, প্রথমে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যুরোপে উহা প্রায় এক শতাব্দী ব্যবহারের পর সিকোনা-উৎপাদক উদ্ভিদের পরিচয় জানিতে পারা যায় ; এবং তাহারও প্রায় এক শতাব্দী

পরে সিকোনার জন্মস্থানের বাহিরে প্যারিস নগরের প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতাত্ত্বিক উদ্ভানে সর্বপ্রথম উহার উৎপাদনের চেষ্টা সফল হয়। ইতিমধ্যে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে Pelletier ও Caventon নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিকদ্বয় এই বন্ধলের অল্পতম বীর্ষ্য কুইনাইন আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ-আমেরিকা ভিন্ন অত্রান্ত দেশেও কুইনাইন উৎপাদন যে সম্ভবপর, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় নানা দেশে সিকোনা চাষের চেষ্টা আরম্ভ হয়। তাহার ফলে এখন ভারতে এবং যবদ্বীপ, সিংহল, সেন্ট-হেলেনা ও আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে ব্যবসায়িক হিসাবে সিকোনা উৎপন্ন করা হইতেছে।

পূর্বোক্ত স্পেনীয় রাজপ্রতিনিধির পত্নী সিকোনার প্রচার-কার্যে যেমন অগ্রণী হইয়াছিলেন, ভারত-রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিংএর সহধর্মিণীও সেইরূপ ভারতে সিকোনা প্রবর্তনের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই আগ্রহে এই অভূতপকারী উদ্ভিদ ভারতে আনয়নের চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে Sir Clements Markham সিকোনা-বীজ ও চারা সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ-আমেরিকায় প্রেরিত হন। তিনি যে বীজ আনেন, তাহা হইতে উত্তকামন্দ ও নীলগিরি অঞ্চলে সিকোনার বর্তমান বাগিচা সমূহের সৃষ্টি। পরে শিবপুর উদ্ভিদতাত্ত্বিক উদ্ভানের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডাক্তার এণ্ডারসন যবদ্বীপ হইতে Cinchona Calisaya জাতীয় চারা ও বীজ সংগ্রহ করিয়া আনেন। ঐ সকল গাছ ও বীজই দার্জিলিঙ্গে সিকোনা চাষের মূল। মংপু ও মংসুঙ্গ অবস্থিত বঙ্গদেশের বর্তমান সিকোনা-বাগিচাদ্বয় প্রায় ৭৭ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং উভ্যাদের সফলতার জন্য দেশবাসী বহু পরিমাণে শিবপুর উদ্ভানের পূর্বতন অধ্যক্ষ Sir George Kingএর অক্লান্ত অধ্যবসায়, বৈজ্ঞানিক নিপুণতা ও উৎসাহ উদ্ভূতের নিকট ঋণী।

যবদ্বীপে সিকোনা চাষ

প্রথমেই বৃটিশ সরকার সিকোনা সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড ভ্রম করিয়াছিলেন। সেই ভ্রম না করিলে সিকোনা-উৎপাদনে তাঁহাদিগেরই প্রতিষ্ঠা অগ্রগণ্য হইত। লেজার নামক কোন লোক প্রথমে পশম ব্যবসায়

ব্যপদেশে দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি Cinchona Calisayaর একটি বিশিষ্ট উপজাতির অধিকতর গুণের কথা জানিতে পারায় তাহার কতকগুলি বীজ সংগ্রহ করেন। প্রথমে বৃটিশ সরকারের নিকট উক্ত বীজ বিক্রয়ের চেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তিনি তাঁহার সংগৃহীত প্রায় সমস্ত বীজই ওলন্দাজ সরকারের নিকট তিন হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। ঐ বীজের যৎসামান্য অংশ নগি নামক জর্নৈক চা-বাগিচাওয়ালার মারফৎ ভারতে প্রেরিত হয়। তাহা হইতেই দার্জিলিঙ্গ জেলার বাগিচাগুলিতে কিছু কিছু উৎকৃষ্ট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ওলন্দাজরা তাহার পূর্ব হইতেই যবদ্বীপে সিকোনা-নার খাবাদ করাইবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এইরূপে উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজ সংগৃহীত হওয়ায় তাঁহারা স্তব্ধ-স্বযোগ লাভ করিলেন। লেজারের নাম অনুসারে লেজি-রিয়ানা (Ledgeriana) নামক এই উপজাতির বীজোৎপন্ন ২০ হাজার গাছ যবদ্বীপে সিকোনা চাষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এখন ভাগতের কুইনাইন-বাজারে ওলন্দাজগণ যে একাধিপত্য করিতেছে, এবং আমস্টার্ডাম নগরে কুইনাইন ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, এই লেজারিয়ানা উপজাতি দৈবক্রমে তাঁহাদিগের হস্তগত হওয়াই তাহার মূল কারণ।

ভারতে সিকোনা

নীলগিরিতে সিকোনার চারা রোপন করিবার অল্প দিন পরেই সিকিমে উক্ত বিষয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিঙ্গ জেলার মংপু ও মংসুঙ্গ নামক স্থানে সিকোনা-বাগিচা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। এই দুইটি বাগিচায় সিকোনা চাষের জমি ক্রিষ্টিয় ন্যূন ২,৮০০ একর। মংপু বাগিচা মংসুঙ্গ বাগিচা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; শেমোক্ত বাগিচায় কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ অল্প, এবং সেখানে রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উভয় বাগিচা হইতে ১৪,৫২,৩১১ পাউণ্ড সিকোনা-বন্ধল সংগৃহীত হয়। উক্ত বৎসর বাগিচা-সংশ্লিষ্ট কারখানায় মোট ১৪,১২,১৬৮ পাউণ্ড বন্ধল হইতে ভারত সরকারের হিসাবে ৭,৩৭৮ পাঃ কুইনাইন-সলফেট ও ৪,৫৬৮ পাঃ সিকোনা ফেলিসিউজ, এবং বাঙ্গালা

সরকারের হিসাবে উক্ত দুইটি পদার্থ যথাক্রমে ৪২,৯৩৫ পাঃ, এবং ২৭,২১৯ পাঃ প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকারের হিসাবে উৎপাদনের মাত্রা হ্রাস হওয়ায় প্রায় ৪৮,০০০ পাঃ কুইনাইন-সলফেট প্রস্তুত হয়। সিক্কোনা-বন্ধলের মূল্য ও প্রস্তুতের ব্যয় ধরিয়া প্রতি পাউণ্ড কুইনাইনের মূল্য প্রায় ছয় টাকা চারি আনা পড়িলেও ১৮ টাকা কম মূল্যে উহা বাজারে বিক্রয় হয় না। এখন বৃদ্ধের বাজারে উহার দাম নির্দিষ্ট হইয়াছে প্রতি পাউণ্ড ২৮ টাকা। নিদেশের আমদানী কুইনাইনের মূল্যের (প্রতি পাঃ ৩৪-৩৬) তুলনায় উহা কিছু অল্প হইলেও দেশের লোকের অবস্থান তুলনায়, এবং লাভের হিসাবেও উহা যে অত্যন্ত অধিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কুইনাইন বিক্রয়-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের—কিন্তু প্রায় সমান ফলপ্রদ সিক্কোনা-ফেব্রিফিউজের বিক্রয় সময় সময় রহিত করা হয়। ইহা যে কিরূপ ‘ব্যবসাদারী’, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বস্তুতঃ, কেহই এরূপ বণিকবৃত্তির সমর্থন করিতে পারে না।

বঙ্গের বাহিরে এক মাত্র মাদ্রাজ প্রদেশেই কুইনাইনের চাষ আছে। তথায় সরকারী বাগিচা ব্যতীত বেসরকারী ক্ষেত্রস্বামী কর্তৃক কিছু কিছু সিক্কোনার আবাদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যে অগ্রাগ্র ফসলের উৎপাদকগণও সিক্কোনার কিছু কিছু আবাদ করিয়াছিলেন; উক্ত প্রদেশে উতকামন্দের সন্নিহিত নাদাবত্তম বাগিচা ও কুইনাইনের কারখানাই কুইনাইন উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। মাদ্রাজ প্রদেশে কুইনাইন-চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ১২০০ একর; কিন্তু সরকারই তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেয় মালিক।

সিক্কোনার বিভিন্ন জাতি

সিক্কোনা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিতে হইলে ইহার জাতিগুলি সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। সিক্কোনা অত্যধিক শীতপ্রধান স্থান অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই যথেষ্ট পুষ্ট লাভ করে। ৩০০০—৬০০০ ফুট উচ্চতার মধ্যে সারবান হালকা মাটিই ইহার চাষের বিশেষ

উপযোগী। ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহিটের অনধিক তাপ, কিয়ৎপরিমাণ ছায়া, এবং যে-স্থানে ৭৫ হইতে ১৮০ ইঞ্চি বারিপাত হয়, এরূপ স্থানই সিক্কোনার বাগিচা নির্মাণের উপযোগী। সিক্কোনার অনেকগুলি জাতি থাকিলেও এ-পর্যন্ত যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি জাতির বৃক্ষই ভারতে বিস্তৃত ভাবে উৎপন্ন হইতেছে,—

জাতির নাম	মোট উপকার মাত্রা শতকরা হিঃ	কুইনাইন মাত্রা শতকরা হিঃ
Calisaya	৩৩৭—৫৯০	০.৫৯—১.২১
Ledgeriana	৪২৭ ৮ ৫২	২.০১—৫.৪৯
Micrantha	২.০৫ ৪ ৫৪	চিহ্নহীন
Officinalis	৫.৩৯—৬.৬৩	০.৭৭—৪.০১
Robusta		
(succirubra & officinalis)	০.৪০—১.২০	১.৪৩—৪.৪০
Anglica		
(succirubra & Calisaya)	০.৬৫—৩.১১	চিহ্নহীন
Succirubra	০.২৫—৬.১৭	১.২৪—২.০৬

Calisaya বা পীত-স্বকের উৎপাদনের জন্য শীতল স্থান, যথা—সিকিম, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানই উপযোগী, কিন্তু চান আয়াসসাধ্য; ইহার উপজাতি Ledgerianaতে কুইনাইনের মাত্রা তুলনায় অধিক বলিয়া বাঙ্গালায় সিক্কোনা চাষে ইহার প্রাধান্য লক্ষিত হয়; কিন্তু ইহার ফলন তেমন অধিক নহে। Officinalis বা পাণ্ডু-স্বক নীলগিরিতেই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালার মংসুঙ্গ বাগিচাতেও ইহার বৃক্ষ-সংখ্যা প্রচুর। ইহা অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতি। Succirubra বা রক্ত-স্বক বৃক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টসহ; প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতা লাভ করে। অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চতাতেও ইহার আবাদ হইয়া থাকে। Robusta ও Anglica উভয়েই বর্গসঙ্কর, এবং বিভিন্ন স্থানে চাষের উপযুক্ত। এতদ্ভিন্ন, দেশীয় সিক্কোনা বাগিচা সমূহে আরও দুই-চারিটি বর্গসঙ্কর জাতির অস্তিত্ব বর্তমান। বস্তুতঃ, Succirubra এবং কতিপয় বর্গসঙ্কর জাতি মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে পর্বতে প্রতিষ্ঠিত সরকারী বাগিচায়, আসামে ও সাতপুরা পার্বত্য অঞ্চলে যেরূপ স্বচ্ছন্দে জন্মাইতে দেখা যায়, তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল জাতির আবাদের বিস্তার সাধন করা তেমন কঠিন নহে।

সিক্কোনার উপকার সমূহের উপর বন্ধলের

উপকারিতা নির্ভর করে। এইরূপ অন্যান্য ২০টি উপকার উহার বন্ধলে বিদ্যমান; তন্মধ্যে যেগুলি দানা বীধে (Crystallisable) সেগুলি অধিক কার্যকর। উপকার সমূহের মধ্যে অবশ্য কুইনাইনই সর্বাধিক সুপরিচিত, এবং কিছু দিন পূর্বে পর্যন্ত চিকিৎসকগণ মনে করিতেন যে, একমাত্র কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সিকোনা-বন্ধলের কয়েকটি দানাদার উপকারের সংমিশ্রণ—অধিকতর গল্যবান কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহারে সমান উপকার পাওয়া যাইতে পারে। ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ার Totaquina এবং ভারতীয় কুইনাইন-কারখানার Cinchona febrifuge এই শ্রেণীর সংমিশ্রণ। ভারতের ঞায় দরিদ্র দেশে বহুমূল্য কুইনাইন ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে না পারিলেও জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে পর্যাপ্ত মাত্রায় Cinchona febrifugeএর প্রচলন হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা সরকারের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, সরকারের দৃষ্টি প্রদানতঃ কুইনাইন উৎপাদনের উপরেই নিবন্ধ। Cinchona febrifuge শুধু যে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা হয় না, এরূপ নহে, ইহার মানও (Standard) সব সময় ঠিক থাকে না। সেই জন্ত Extra Pharmacopociaয় বলা হইয়াছে যে,—

“Cinchona febrifuge as produced in India for last 50 years from Red bark has contained—Cinchonidine 40, Cinchonine 30 Quinine 20 & Amorphous alkaloids 10 parts * * * Some samples suggest that they have been made from Cinchona Ledgeriana after the extraction of Quinine and contain greater amounts of Amorphous alkaloids and Quinine. A definite standard is desirable.”

অনেক প্রকার ম্যালেরিয়ায় Cinchona febrifuge ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়; সুতরাং নির্দিষ্ট মান অমুযায়ী ও প্রভূত মাত্রায় প্রস্তুত হইলে ইহার দ্বারাও ম্যালেরিয়া-দমন কার্যে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

উৎপাদনের অপ্রতুলতা

কয়েক বৎসর পূর্বে অমুমান করা হয় যে, সমগ্র জগতে বৎসরে কুইনাইন উৎপাদনের মাত্রা প্রায় ছয় লক্ষ

কিলোগ্রাম (১ কিলোগ্রাম=প্রায় ১ সের); এখন পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ভারতে উৎপাদিত কুইনাইনের পরিমাণ কখনই প্রায় ৭০ হাজার পাউণ্ডের অধিক হয় না। ভারতে কুইনাইন উৎপাদন যে কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে—ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এক বঙ্গদেশেই ম্যালেরিয়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে হইলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টরের মতে সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইনের প্রয়োজন। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সেই স্থলে প্রকৃত পক্ষে মাত্র ১,১২,৩৫৩ পাঃ অর্থাৎ প্রয়োজনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং ম্যালেরিয়া হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশা কোথায়? বিস্তৃত ভাবে ধরিতে গেলে, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়াদিতে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত নিখিল ভারতে অন্যান্য ১০ কোটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর অস্তিত্ব বর্তমান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রোগ-মুক্তির জন্ত প্রত্যেক রোগীর অন্যান্য ১১০ গ্রেণ কুইনাইন আবশ্যিক। সে স্থলে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই স্বল্প মাত্রায় কুইনাইন পায়, এবং অনেকেই আদৌ কিছু পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক দিকে ভারত-বাসীরা যেমন প্রয়োজনের অনুপাতে অতি সামান্য মাত্রায় কুইনাইন পাইতেছে, অত্র দিকে তেমনই বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে সিকোনা চাষের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া অধিক মাত্রায় সিকোনা উপকার উৎপাদন দ্বারা জনসাধারণকে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্ত যে চেষ্টা হওয়া উচিত ছিল, সরকার তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। যে দুইটি প্রদেশে আপাততঃ সিকোনা চাষ হইতেছে, সেই দুই প্রদেশেই চাষের জমি অনেক পরিমাণে বর্ধিত করিতে পারা যায়। তন্মিন্ন, ভারতের অন্তর্ভুক্ত সিকোনা উৎপন্ন করা যে অসম্ভব—তাহাও নহে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সিকোনা-চাষ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং কেবল মাত্র কুইনাইন উৎপাদনই তাঁহাদিগের লক্ষ্য; কারণ, ব্যবসায় হিসাবে ইহাতেই লাভ অধিক। যে সকল সিকোনা জাতির ত্বকে কুইনাইনের মাত্রা তুলনায় অধিক, যেমন Ledgeriana সেগুলির গাছ অপেক্ষাকৃত অল্প-কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া তাহাদিগের চাষ অত্যন্ত পরিমিত। পক্ষান্তরে সিকোনা

ফেব্রিফিউজ প্রস্তুতোপযোগী বহুল পূর্বোল্লিখিত সকল জাতি হইতে পাওয়া যায়, এবং তন্মধ্যে আবার কয়েকটি জাতি নানা স্থানেই উৎপাদনের উপযোগী। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সিক্কোনার অগ্ৰাণ উপকার ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় কুইনাইন অপেক্ষা অল্প ফলপ্রদ নহে, অথচ মূল্য কুইনাইনের তুলনায় অনেক অল্প। এক্ষণে অবস্থায় টোটা কুইনা, কুইনেটাম, সিক্কোনা ফেব্রিফিউজ ও সমশ্রেণীর উপকার-সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতের দিকেই সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং তদ্ব্যতীত দৃঢ়তর জাতি সমূহের প্রসারবৃদ্ধিও প্রয়োজনীয়।

সরকারের কুইনাইন-নীতি

বর্তমান মূল্যে কুইনাইন ক্রয় যে, সাধারণ ভারত-বাসীর আর্থিক অবস্থার অনুকূল নহে, তাহা যুদ্ধের পূর্বে ভারত সরকারের অবিক্রীত সঞ্চিত কুইনাইনের পরিমাণ হইতেই প্রতিপন্ন হয়। সরকার কুইনাইন প্রস্তুতের পড়তার চতুর্গুণ মূল্যে কুইনাইন বিক্রয় করিতেছেন। তাহার মূলে খাঁটি বণিক-নীতি থাকিতে পারে, কিন্তু প্রজা-সাধারণের মঙ্গলাকাজ্জী যে কোন দেশের সরকার সেই নীতি পরিহার করাই সঙ্গত মনে করেন না কি? বস্তুতঃ, প্রচলিত কুইনাইন-নীতি দ্বারা দেশ যে কখনও ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইবে, ইহা ছরাশা বলিয়াই মনে হয়। সরকার-নিবৃত্ত Drugs Enquiry Committee'র রিপোর্টেই বলা হইয়াছে,—

“If the present policy of the Cinchona Department of growing only the species of Cinchona which are suitable for production of quinine in a limited area is continued, it will be difficult to bring the price of the alkaloid down to the point of being commensurate with the means of the masses.”

—অর্থাৎ যে সকল সিক্কোনাজাতি কুইনাইন প্রস্তুতোপ-যোগী, কেবল মাত্র সেই জাতিগুলির সীমাবদ্ধ স্থানে উৎপাদনের সিক্কোনা বিভাগের বর্তমান নীতি যদি অন্তর্হত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই উপকারের মূল্য হ্রাস করিয়া জনসাধারণের আর্থিক সামর্থ্যোপযোগী করা সুকঠিন হইবে।

কুইনাইনের অধিক মূল্য হওয়ায় আরও একটি কুফল এই যে, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল

চলিতেছে। এমন কি, এক্ষণে নমুনাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যাহাতে শতকরা ৯০ ভাগও প্রকৃত কুইনাইন পাওয়া যায় নাই। দশ গ্রেণ ‘কুইনাইনের’ নয় গ্রেণই ভেজাল, কেবল এক গ্রেণ খাঁটি মাল,—এ কিরূপ ভীষণ ব্যাপার, ভাবিলে হৃৎকম্প হয় না?

ইহা কখনও বিশ্বস্ত হওয়া উচিত নহে যে, ঔষধের মধ্যে বর্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে কুইনাইন ও অগ্ৰাণ সিক্কোনা উপকার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ, কারণ, দেশের সাধারণ উন্নতির পথে ম্যালেরিয়া যেমন প্রতিবন্ধক, এমন অগ্নি কিছুই নহে। বিদেশীয় শাসকগণ সহায়ত্বের সহিত তাহা যদি বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে ইতিপূর্বেই এই রোগের উচ্ছেদকল্পে সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইত এবং সিক্কোনার আবাদও এত দিন আশামুরূপ বর্ধিত হইত। তাঁহাদিগের নিকট ৩৩ দূর আশা করা না যাইলেও এখনও যদি তাঁহারা সিক্কোনা চাষ-নিয়ন্ত্রণ রহিত করিয়া, জনসাধারণকে উহার আবাদ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেন, তাহা হইলেও দেশের প্রভূত উপকার হয়। বর্তমান যুদ্ধের পর কুইনাইনের বাজারে সরকারের একাধিপত্য থাকিবে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ভারতে ইতিমধ্যে সিক্কোনার চাষ পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্প্রসারিত হইলে—কুইনাইন উৎপাদনে ভারতবাসী প্রতিযোগিতা করিতে পারুক বা নাই পারুক—অন্ততঃ ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্র তাহার হস্তগত হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

যুদ্ধ ও ভারতীয় খনিজ সম্পদ

বর্তমান যুরোপীয় যুদ্ধে ভারত তাহার প্রভূশক্তি বৃষ্টি সরকারকে কি পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে, বর্তমান সময়ে এই প্রশ্ন বহু লোকেরই মনে উদ্ভিত হইতেছে। যুদ্ধে সর্বপ্রকার পণ্যেরই প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন বিবিধ; প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। বর্তমান যুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের জন্ত যত প্রকার পণ্যের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে, সেসকল পূর্বে কখন হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। ইহার কারণ সুস্পষ্ট; এখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে—সুতরাং যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য প্রহরণেরও

ব্যাপকতা নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু কেবল অস্ত্র-শস্ত্র পাইলেই যুদ্ধ পরিচালিত করা সম্ভব নহে। যুদ্ধ পরিচালনের জন্য সুশিক্ষিত এবং যথাযোগ্য সাজ-সজ্জায় বিভূষিত সৈনিক চাই—তাহাদের উপযুক্ত রসদ ও যান-বাহন চাই। তন্ত্রি, আরও নানা প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন। স্বভাবোৎপন্ন উপাদান হইতেই ঐ সকল আবশ্যিক দ্রব্য নিশ্চিত হইয়া থাকে। কাজেই প্রাণিজ, বনজ, এবং খনিজ সর্বশ্রেণীর স্বভাবজাত সম্পদই যুদ্ধ পরিচালনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু প্রকৃতি দেবী একই স্থানে নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল সম্পদ সুসভ্য মানবের রণ-লালসা পরি-তৃপ্তির জন্য সঞ্চিত রাখেন নাই। ঐ সকল প্রয়োজনীয় সম্পদ নানা ভাবে এবং নানা দেশে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। যে দেশে ঐ প্রকার সম্পদ যত অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়, সে দেশ নানা ভাবে সংগ্রামে সুযোগ লাভ করে। বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত ত্রিবিধ সম্পদের মধ্যে কেবল খনিজ সম্পদের বিষয় এখানে আলোচিত হইল।

খনিজ সম্পদের প্রয়োজন অনেক। স্ত্রবর্ণ হইতে পাথুরিয়া কয়লা পর্যন্ত সর্বপ্রকার খনিজ পণ্যই যুদ্ধ উপলক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। স্ত্রবর্ণ দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র নিশ্চিত হয় না; কপি সতাই বলিয়াছেন, “পিত্তলকি কাটারী কাজে নাহি আওল, কেবল ঝকমকি সার!” স্বর্ণ সস্ত্রক্রেও এ কথা সত্য; কিন্তু মূল্যবান ধাতু বলিয়া ইহা সর্বত্র বাজার-পশার বজায় রাখিতে সমর্থ। ইহা বিভিন্ন দেশে বিনিময় কার্য-সাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কয়লা হইতে গ্যাস এবং যানবাহনের পরিচালন-কার্য সুসম্পন্ন হয়, এবং তাহার সাহায্যে আলোকেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় বিদেশী বাজার-পশার নষ্ট হইলেও স্ত্রবর্ণ দ্বারা তাহা সুরক্ষিত হইতে পারে। সেই জন্ম যুদ্ধকালে স্ত্রবর্ণের পরোক্ষ প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। এতদ্বিন্ন, বহু কামোই কয়লার প্রয়োজন অপরিহার্য। ভারতে যে সকল খনিজ সম্পদ উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্যগত একটা হিসাব প্রকাশিত হইল। মূল্যগত হিসাব গত ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড় করিয়া পাউণ্ডে প্রকাশ করা হইল। ভারতের খনিজ সম্পদ কত বিচিত্র, ইহা হইতে তাহার একটা ধারণা জন্মিবে। *

* Sir Lewis Fermor প্রদত্ত হিসাব হইতে সংগৃহীত।

ধাতুর নাম	পাঁচ বৎসরের গড় করিয়া প্রতি বৎসরের উৎপন্ন মূল্য
কয়লা	৫৬,৩১৭৬৩ পাউণ্ড ষ্টার্লিং
ম্যাঙ্গানিজ ওর	১৬,৮৮,৬৫৮ " "
স্ত্রবর্ণ	২২,৬৫,২০৮ " "
পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তৈল	১০,০০,২১৫ " "
অল্প (রপ্তানী মূল্য)	৭,৩৪,৪৭৫ " "
লবণ	৬,৫০,১৬৪ " "
লৌহ (স্বাভাবিক খনিজ অবস্থায়)	২৯১,৮৫৭ " "
তাম্র (ঐ)	২৮৫,৯৩০ " "
ইলমেনাইট (Ilmenite)	৭২,১০৯ " "
সোনা	৯১,৭১০ " "
অদ্রবনীয় পদার্থ	৩৬,৪৯৪ " "
ক্রোমাইট (Chromite)	৪৩,৭২২ " "
ম্যাগনেসাইট (Magnesite)	৯,৪০৯ " "
জিরকন (Zircon)	৪,০৬১ " "
বক্সাইট (এলুমিনিয়াম মৃত্তিকা)	১,৬৫২ " "
টাংষ্টেন ধাতুপিণ্ড	৫১২ " "
বেবিল নামক মরক্ক মণি বিশেষ	২৯১ " "
কুরুন্দম (Corundum)	১০৩ " "
ট্যান্টেনাইট বা ট্যান্টেনাম	২০ " "

এই সকল ধাতু এবং মূল্যবান প্রস্তর যে সকল রাসায়নিক বস্তুজাত নির্মাণে ব্যবহৃত হয়, যুদ্ধে তাহার প্রয়োজন আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ধাতু নতন, অর্থাৎ পূর্বে তাহাদের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল। এখানে এ কথা উল্লেখ নাহলা নহে যে, এত অধিক ধাতু অল্প কোথাও একই অঞ্চলে পাওয়া যায় না। ভারতেও ইহা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকিলেও ঐগুলির সমস্তই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একই দেশে সংগ্রহ হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় ইহা কিরূপ সুবিধাজনক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে সকল ধাতু সহজে গলে না, তাহা তাপের অত্যন্তরীণ আচ্ছাদন, বা আন্তর-রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা ম্যাগনেসাইট, তাপ সহ মাটি (fire-clay) বক্সাইট, প্রভৃতি অত্যাধিক তাপ সহ তাপ-নির্মাণেই ইহাদের উপযোগিতা লক্ষিত হয়। বিস্ফোরক পদার্থ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্ম সোনা প্রভৃতি, রাসায়নিক

পদার্থ প্রস্তুতের জন্ত গন্ধক, সালফাইড, নাইট্রেড প্রভৃতি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু হইতে টহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। অত্র প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নিৰ্মাণে ব্যবহারোপযোগী ঐ সকল সামগ্রিক বস্তু নানা ধাতু হইতে প্রস্তুত করিতে হয়। মার্কিন রাজ্যে এবং সোভিয়েট রুশিয়ায় ইহাদের মধ্যে অনেক বস্তুই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মার্কিনে নিকেল ধাতুপিণ্ড, ম্যাঙ্গেনিজ এবং টাংষ্টেন অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবার উপায় নাই। রুশিয়াতে অল্পের এবং টাংষ্টেন ধাতুপিণ্ডের অভাব। তবে ভারতে পেট্রোলিয়ম তত অধিক পরিমাণে না থাকায় বৃটিশ জাতি ইরান, ইরাক এবং দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

উল্লিখিত তালিকাভুক্ত খনিজ দ্রব্য সমূহ হইতে যুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যরাজি নিৰ্মিত হয়। বিগত যুরোপীয় মহাবুদ্ধের পর হইতে ভারতের খনিজ সম্পদ উদ্ধারের শিল্প বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের পাঁচ বৎসরে ভারতে বার্ষিক গড়ে ৯৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬ শত ৪৭ পাউণ্ড মূল্যের খনিজ পদার্থ উৎপাদিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে গত ৫ বৎসরে উহা গড়ে প্রতি বৎসরে যাত্রা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মূল্য ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৭ হাজার ৬ শত ১১ পাউণ্ড। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে ইংরেজের সামগ্রিক সামর্থ্য যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আসাম ডিগবয় অঞ্চলে খনিজ তৈল উত্তোলনের সুব্যবস্থার ফলে, এবং পঞ্জাবেও এই বিষয়ের কার্যতৎপরতা নিবন্ধন খনিজ তৈলের বা পেট্রোলিয়মের সরবরাহ বার্ষিক ৭৩ লক্ষ গ্যালন হইতে গড়ে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালনে উঠিয়াছে! সুবন্দোবস্তের গুণে অত্র ৫০ হাজার হন্ডর (cwt) হইতে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার হন্ডরে দাঁড়াইয়াছে। তামা, লোহা প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থাও এখন অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। ক্রোমাইট, বক্সাইট, ম্যাগনেসাইট প্রভৃতি যে সকল পণ্য সামগ্রিক কার্যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়, তাহাদেরও উৎপত্তি বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেবল উত্তোলিত সুবর্ণের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং ভারত ইংরেজ জাতির আয়ত্তাধীন থাকায় তাহাদের সামগ্রিক

শক্তি কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে।

পাথুরিয়া কয়লার উৎপত্তি ভারতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন, ভারতীয় কয়লার খনির কার্য আরও উন্নত ভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে ভারতোৎপন্ন কয়লাতেই তাহার সকল অভাব পূর্ণ হইবে।

ম্যানানিজ ধাতুপিণ্ড—লোহা এবং ইম্পাত-নিৰ্মাণ কার্যে ইহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। ভারতে লোহার কারখানার অল্পতা বশতঃ এই ধাতুপিণ্ডের চাহিদা ভারতে তেমন অধিক নহে। এ-কারণে ইহা ভারত হইতে গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইতেছে। এই দ্রব্য রুশিয়ায় সর্কোপেঙ্কা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহার নিম্নেই ভারতের স্থান।

খনিজ তৈল—যে পরিমাণে এখন ভারতে উত্তোলিত হইতেছে, তাহা ভারতের প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। ব্রহ্মদেশ এখন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন। এখনও ব্রহ্মদেশ, ইরান, বোর্নিয়ো, রুশিয়া এবং মার্কিন হইতে কেরোসিন আনিয়া ভারতের অভাব দূর করিতে হইতেছে। বর্তমান যুদ্ধের জন্ত রুশিয়া হইতে এ দেশে কেরোসিনের আমদানী রহিত হইয়াছে।

অত্র—ভারতেই এখন সর্কোপেঙ্কা অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হইতেছে। মার্কিনে এবং কানাডায় ইহা পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ভারতের জায় এত অধিক পরিমাণে আর কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। বিগত যুরোপীয় মহাবুদ্ধের সময় এই পণ্যের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক অনুভূত হইয়াছিল। সেই জন্ত ভারত সরকার ইহার উত্তোলন-বৃদ্ধির জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লবণ—লবণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সাংসারিক কার্যে লবণ অপরিহার্য। ইহা ভিন্ন সোডা প্রস্তুতের জন্ত এবং অগ্ন্যন্ত বহুবিধ রাসায়নিক পণ্য নিৰ্মাণের নিমিত্ত লবণের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। যুদ্ধস্থানে আহত এবং পীড়িত সৈন্যদিগের চিকিৎসার জন্ত প্রচুর পরিমাণে সোডার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অগ্ন্যন্ত রাসায়নিক বস্তু প্রস্তুতে ইহা

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধ-স্থলেও ইহার কিছু কিছু প্রয়োজন লক্ষিত হয়।

লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি—দেশে এবং বিদেশে শস্ত্র-ক্ষেত্রে এবং কৰ্ম্ম-ক্ষেত্রে অধিকতর রণ-ক্ষেত্রে এই ধাতুর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। এ পর্য্যন্ত টাটার লৌহ এবং ইস্পাত প্রস্তুতের কারখানাতেই কেবল এ দেশে ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল। বিগত যুরোপীয় যুদ্ধে এই টাটার ইস্পাতের কারখানার দেশেব এবং সরকারের কার্য্য বহু পরিমাণে সংসাধন করিয়াছিল। অতঃপর বঙ্গীয় ষ্টীল কর্পোরেশন ঐ-কার্য্যে টাটার কারখানায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ দুইটি কারবারের স্থানও যে এ দেশে নাই, ইহা মনে করা সম্ভব নহে। ইদানীং কয়েক বৎসর ধরিয়। প্রতি বৎসর ভারত হইতে প্রায় ৫ লক্ষ ২০ হাজার টন হিসাবে চৌগল (pig iron) বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। যুদ্ধের সময় অন্য দেশে লৌহ যদি তেমন অধিক পরিমাণে পাওয়া না যায়, তাহা হইলেও ভারতের বিহার এবং উড়িষ্যা অঞ্চল হইতে যে পরিমাণে লৌহ-পিণ্ড (Iron-ore) সংগৃহীত করা সম্ভব হইবে, তাহাতে বৃটিশ জাতি এখনই লৌহের অভাব অনুভব করিবে না—এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

তাম্রপিণ্ড (Copper ore)—ভারতের সিংভূমে যে ভারতীয় কপাৰ কর্পোরেশন আছে,—তাহারা প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে ৬ হাজার টন হিসাবে তাম্র প্রস্তুত করে। ইহা শাস্ত্রের সময়ের হিসাব। যুদ্ধের সময়ে তাম্র প্রয়োজন অধিক। গোলা গুলী নির্মাণে তাম্র অপরিহার্য্য।

ইলুমিনাইট। (Ilmenite)—ইহা একটা নূতন ধাতু। ত্রিবাঙ্কুরের বেলাভূমির বালুকারাশি হইতে ইহা নিষ্কাশিত হইতেছে। ইহা নানাবিধ রঞ্জন দ্রব্যের এবং অতি কঠিন ছেদনাস্ত্র নির্মাণের জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুদ্ধোপকরণ নির্মাণে ইহার ব্যবহার চলিতেছে।

সোরা বা Potassium nitrate—বারুদ প্রস্তুতের জন্ত, বাজি প্রস্তুতের জন্ত, এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। ইহা বিস্ফোরক প্রস্তুতের একটা বিশিষ্ট উপকরণ। তবে নাইট্রিক এসিড এবং বায়ব্য নাইট্রোজেন প্রস্তুতের ফলে বিস্ফোরক প্রস্তুতে সোরার ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ক্রোমাইট (Chromite)—রণতরীর আবরণের জন্ত যে দুর্ভেদ্য ইস্পাতের চাদর ব্যবহৃত হয়, তাহা এবং অকলঙ্ক ইস্পাত প্রস্তুতের জন্ত এই ধাতুর প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। বেলুচিস্থান, মহীশূর এবং সিংভূম জিলায় (অধুনা বিহারে) ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহা যে পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছিল, এখন তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। ভারতজাত সামরিক ধাতুর মধ্যে ইহাই সর্বপ্রধান এবং ভারতবর্ষই ইহার ভূরি উৎপাদক।

জিরকন (Zircon)—একটা নূতন আবিষ্কৃত ধাতু। সাগর-সৈকতের বালুকা হইতে ইলুমাইট নিষ্কাশন-কালে ইহা একটা দাউতি দ্রব্য (by-product) হিসাবে পাওয়া যায়। ইহা অদ্রবণীয় ধাতু; সুতরাং নানা ভাবে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ম্যাগনেসাইট—মালেম এবং মহীশূর অঞ্চলে অতি উচ্চ শ্রেণীর এই ধাতু পাওয়া যায়। ম্যাগনেসাইট ধাতব ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুতের অত্যন্ত উপকরণ। এতদ্বিন্ন, বিমান-নির্মাণ কার্য্যে যথেষ্ট লঘুভার ধাতু বলিয়াও ইহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। এতদ্বিন্ন ইহা হাপর নির্মাণে, উত্তাপসহ ইষ্টক প্রস্তুতের জন্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুদ্ধের অস্ত্রাদি নির্মাণের জন্ত এরূপ হাপরের প্রয়োজন অত্যধিক।

বক্সাইট (Bauxite)—ইহা হইতে এলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। কাটনি এবং মধ্যপ্রদেশে ইহা হইতে এলুমিনিয়াম নিষ্কাশন-কার্য্য উত্তমরূপেই চলিতেছে। কাশ্মীরেও অতি উৎকৃষ্ট বক্সাইট মাটা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে বাসনাদি প্রস্তুত হইতেছে। তদ্বিন্ন, বিমান নির্মাণেও ইহা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। জার্মানীতে এলুমিনিয়ামের উৎপত্তি ভূরি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই জন্তই জার্মানী আকাশ-যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই ধাতু অধুনা ভারতে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে যে, জার্মানীর ঐ প্রাধাণ আর অধিক দিন স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কুব্বন্দম—ইহা বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় আসামের খাসিয়া পাহাড় হইতে অনেক পরিমাণে

রপ্তানী হইয়াছিল। এখন ইহা ভারতে অতি অল্প পরিমাণেই মিলিতেছে। যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত ইহা ব্যবহৃত হয়।

এই সকল উপাদান হইতেই যে সামরিক কার্যের উপযোগী বহু বস্তুজাত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। ভারতে এই সকল দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়া ইংরেজ জাতির পক্ষে ভারতের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। ভারতবাসীও গ্রেট ব্রিটেনের সহিত একযোগে থাকিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু তাহার ব্রিটেনের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে উৎসুক নহে, স্বাধীন এবং সহযোগী ভাবে, অর্থাৎ তুল্যাধিকারসম্পন্ন অংশীদার ভাবেই থাকিতে আগ্রহান্বিত। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ জাতি তাহাদের সে দাবীতে কর্ণপাতও করিতেছেন না। গত ২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবারে লণ্ডনে ক্যান্সটন হলে মির্নার টি. এ. রমণ “ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং যুদ্ধ” সম্বন্ধে যে সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন,—তাহাতে তিনি ভারতের

জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর মত। স্যার ষ্ট্যানলী রীড সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, “ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন স্বাধীনতা অপেক্ষাও বড়, কারণ, সকল আভ্যন্তরিক ব্যাপারেই এবং বহু আন্তর্জাতিক ব্যাপারে উহা কেবল যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহাই নহে, পরন্তু ইহা সাম্রাজ্যমধ্যস্থ সকল রাজ্যকে রাজ্যরক্ষা বিষয়ে এবং একই লক্ষ্য রক্ষার জন্ত সংহত করে।”—এ কথা সত্য। ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিবার প্রকৃত ব্যবস্থা করিলেই সকল দুর্ঘটনারই অবসান হইতে পারে। স্বার্থের দিক দিয়া ভারতের ব্রিটেনের এবং ব্রিটেনের ভারতের সাহচর্যের প্রয়োজন, ব্রিটেন প্রবল পক্ষ বলিয়াই এই ব্যাপারে তাহাদের অগ্রণী হওয়া উচিত। ভারতবাসীকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়া সকল সুবিধা ভোগ করিবার দিন আর নাহি।

শ্রীশশিভূষণ যুগোপাধ্যায় (বিচারক) ।

বিবেকানন্দ

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নব-ভারতের মন্ত্রগুরু,
ধর্মের কর্মের জীবন-যজ্ঞ নব-হোমানলে ক'রেছো সুরু !

তজ্জ্বাল জ্ঞান নিদ্রা-নগরে হেরিল তোমাতে প্রভাত-সূর্য্য,
শুনিল তোমার পুরুষ-কণ্ঠে বঙ্গ-বাণীর বিজয়-তুর্ঘ্য !
মহা-ভারতের বেদ-উদগাতা মহা-তপস্বী আর্ধ্য ঋষি .
অ-ভেদ জ্ঞানের দিব্য-আলোকে

যুগা'লে অন্ধ-তামসী নিশি।

হে যুগ-সারণি ! পাঞ্চজন্তে যুগান্তরের ঘোষিছ বাণী,
তেজ-ভাস্বর দু'টি চোখে জ্বলে বিশ্ব-জয়ের প্রতিভাখানি ।
হিমালয় সম পুরুষপ্রদান মহান বিরাট ব্রহ্মচারী,
ভারতভূমির কৌশল মণি—ত্যাগ-গৈরিক-পতাকাধারী !

জীব-মানবের সেবায় পূজায় তুমি পুরোহিত পরম-জ্ঞানী,
হে মহা-মানব, বিশ্ব-ভুবনে তোমার তুলনা তুমিই জানি
স্বদেশ বিদেশ মস্ত্রে তোমার লভিল অমোঘ চরম-দীক্ষা—
প্রেম ক্ষেম প্রীতি দয়া ভালোবাসা

করণা শক্তি ক্ষমা তিতিক্ষা

বঙ্গ-বাণীর পূজার দেউলে আরতি জ্বলেছো অমর-জ্যোতি,
তোমার ললাটে লিখেছে বিজয় কালী মহাকালী সরস্বতী !
নমো হে ধনু চির-বরণ্য, নমো যুগ-রথ-চক্র-ধারী,
স্বদেশনিষ্ঠ জ্ঞান-গরিষ্ঠ অপাপবিদ্ধ সিদ্ধিচারী !

শ্রীকমলরাণী মিত্র

ইতিহাসের খবুসর

সহমরণ-প্রথার প্রবর্তন ও প্রচার

(আলোচনা)

পৃথিবীর কোন্ দেশে এবং কোন্ সময়ে সহমরণ-প্রথার প্রথম প্রবর্তন, তাহার সঠিক প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই। অতি প্রাচীন কালেও কোন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার জীবিতা বৈধপত্নী, উপপত্নী, ক্রীতদাস, এমন কি, তাঁহার প্রিয় অথ প্রভৃতিও তাঁহার মৃতদেহের সহিত সমাহিত করিবার প্রথা বর্তমান ছিল। ইহার অর্থ্যা হইলে পরলোকে মৃত ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইত, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। হেরোডোটাস বলেন, প্রাচীন কালে গ্রীসের অন্তর্গত থেস প্রদেশে কোন পুরুষের মৃত্যু হইলে কেবল তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকেই তাঁহার মৃতদেহের সহিত সসন্মানে ভূগর্ভে সমাধিত করা হইত; তাঁহার অন্তান্ত স্ত্রীরা এই সন্মানে বঞ্চিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন অতিশয় অপমানজনক মনে করিতেন। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে যে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে মতভেদ নাই; শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির বহু স্থানেই ইহার উল্লেখ আছে। মহারাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী মাদ্রী দেবী সহমৃত্যু হইয়াছিলেন, মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে মৃত স্বামীর সহিত চিতাগ্নিতে স্ত্রীর সহমৃত্যু হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল, ইহা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকদের লিখিত বিবরণ হইতেও জানিতে পারা যায়। সিসিরো ভারতবর্ষের এই প্রথার নৃশংসতার উল্লেখ করিয়া তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। ডিও-ডোরাস, সিকিউলাস, ৩২৭ পৃঃ-খৃষ্টাব্দে, পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়-দের মধ্যে এই নৃশংস প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এক সময় চরিত্রহীনা ক্ষত্রিয় রমণীরা বিষ-প্রয়োগে স্বামিহত্যা করিত; এই পাপা-মুষ্ঠান রহিত করিবার উদ্দেশ্যেই পঞ্জাবে সহমরণ-প্রথা প্রবর্তিত হয়। (১) ষ্ট্রাবোও তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সমর্থন

করেন। ডিওডোরাসের বিবরণ পাঠে জানিতে পারা যায়—৩১৪ পৃঃ-খৃষ্টাব্দে এক জন ভারতীয় সৈন্যধ্যক্ষ যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া হস্তচিন্তে স্বামীর চিতানলে প্রাণবিসর্জন করিয়াছিলেন। চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার পূর্বে সমগ্র সেনাদল যোদ্ধাবেশে সজ্জিত হইয়া তিন বার সসন্মানে চিতা প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। সেনাপতির প্রথমা স্ত্রী তৎকালে সন্তানসম্ভাবিতা ছিলেন বলিয়া এই সন্মানে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষুব্ধ চিন্তে সরোদনে সেই স্থান ত্যাগ করেন। গ্রীক কবি প্রপারটিয়াস ভারতীয় নারীর সহমরণ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। অন্তান্ত গ্রীক লেখকরাও বহু স্থানে সহমরণ-প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভীয় উপজাতিদের মধ্যেও প্রাচীন কালে সহমরণ অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া কথিত আছে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা পত্নীর সহমৃত্যু হইবার অধিকারই অগ্রগণ্য হইত। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, ঐ প্রথা ওড়িন, অর্থাৎ বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং সেই জন্তই ওড়িনের সহচর বন্ডারের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী মুগ্না স্বামীর চিতাগ্নিতে সহমৃত্যু হইয়াছিলেন। (২)

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সহমরণ-প্রথা সুপ্রচলিত ছিল; কিন্তু এই প্রথার প্রতি বৌদ্ধদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না; জৈনরাও এই প্রথার অনুসরণ করিতেন না। শিখদের মধ্যে ইহার অনুবর্তন নিষিদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাণীরা সহমৃত্যু হইয়াছিলেন। (৩)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সহমরণের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

with idolatry, Ghant murders and slavery in India; to which is added humane hints for the melioration of the state of Society in British India. —By J Peggs (1830) p. 1 অতঃপর এই পুস্তক "India's Cries." এই ভাবে উল্লিখিত হইবে। (খ) Travels in the Mogul Empire by Francois Bernier. pp. 310 11.

২। Asiatic Journal, October, 1827. p. 408.

৩। Encyclopaedia Britannica.

১। (ক) India's Cries to British Humanity, relative to the Suttee, Infanticide, British connection

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মেবারের মহারাণা সমর্দি, পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া সাহাবুদ্দিন ঘোরীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার ছুই মহিষীর মধ্যে রাজ্ঞী পৃথা সহমৃতা হইয়াছিলেন।

গুর্জর দেশের চালুক্যবংশীয় রাজপুত্র রাজা অবন্তিনাথ সিধরাজের অধীন যদুবংশীয় এক করদ রাজা কাথিয়াবাড় প্রদেশের অন্তর্গত জুনাগড়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে রাণিক দেবী নামী এক পরমা সুন্দরী কুম্ভকার-কণ্ঠা বাস করিত। সেই সুন্দরী যুবতীর রূপযৌবনে মুগ্ধ হইয়া সিধরাজ তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছেন জানিয়া, জুনাগড়ের রাজা অবিলম্বে তাহাকে বলপূর্বক নিজ প্রাসাদে আনয়ন করিয়া স্বয়ং বিবাহ করেন। ইহাতে সিধরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া জুনাগড় আক্রমণ ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন, এবং অবশেষে রাজাকে হত্যা করেন। তখন রাণিক দেবী বৈদ্যবাস্ত্যপক শুল্ক বস্তু পরিধান করিয়া, সিধরাজের চরণে পতিত হইয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার অন্তিমতি প্রার্থনা করেন। রাজপুত্রগণ সহমরণ অন্ত্যস্তানকে একরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে, সিধরাজ সেই সতী রমণীর প্রার্থনা যে কেবল তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন, তাহাই নহে, তাহার পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষণ-কল্পে একটি স্মৃতি-মন্দিরও নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই মন্দিরের ও তন্মধ্যস্থ রাণিক দেবীর প্রস্তরমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও গুর্জর প্রদেশে রাজপুত্র নৃপতিদের উচ্চ আদর্শের নির্ঝাঁকু মাসিকস্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের মোগল বাদশাহ আকবর সাহ সহমরণ-প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ বলিয়া বিধোষিত করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে অম্বররাজ ভগবান দাসের জয়মল নামক জাতি-পাতার মৃত্যু হইলে, মৃতদেহ তাঁহার স্বদেশে নীত হয়। মাড়বারের উদয়সিংহের এক কণ্ঠার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সেই যুবতী স্ত্রী সহমরণে অসম্মতা হইলে, তাঁহার সতীনপুত্র উদয়সিংহ কুলপুরোহিতের প্ররোচনায় তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে সহমৃতা হইতে বাধ্য করেন। এই ঘটনার সংবাদ সম্ভবতঃ কোন রাজপুতানী বেগমের দ্বারা আকবর বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং বেগবান অস্বারোহণে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ঘটনাস্থলে

উপস্থিত হইলেন, এবং চিতায় অগ্নিসংযোগের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্ত্তে সেই বিধবা নারীকে চিতা হইতে উত্তোলন করিয়া নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করিলেন।

ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি, প্রাচীন কালে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে কেবল সহমরণ-প্রথা নহে, অমুমরণ-প্রথারও প্রচলন ছিল। পতি সুদূর বিদেশে দেহত্যাগ করিলে, স্নানাঙ্কে তাঁহার পাছুকাডি গ্রহণ করিয়া জলচ্চিত্তানে প্রাণ বিসর্জন করা সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে অতি পুণ্য কার্য বলিয়া মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে; কিন্তু উক্ত পুরাণেরই বিধানে ব্রাহ্মণীর পক্ষে অমুমরণ নিষিদ্ধ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সহমরণের অন্ত্যস্তান-রীতি এক প্রকার ছিল না। উড়িষ্যার রীতির সহিত বঙ্গদেশের রীতির পার্থক্য ছিল। কোন দেশে মৃতদেহের সহিত সহমরণোচ্ছতা পত্নীকে জীবিতাবস্থায় একত্র প্রোথিত করা হইত; কোথাও একই চিতায় মৃত স্বামী ও জীবিতা স্ত্রীকে একত্র, কোথাও স্বতন্ত্র চিতায় পৃথক্ ভাবে দগ্ধ করা হইত। কোথাও কুণ্ডমধ্যে চিতা সাজাইয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত, ও মৃত ব্যক্তির শব তর্দীয় বিধবা পত্নী কর্তৃক উপর হইতে প্রজ্জ্বলিত চিতায় নিক্ষিপ্ত হইত। অনন্তর সেই স্ত্রী স্নান ও পূজাস্ত্রে ঘৃতের হাঁড়ি কক্ষে লইয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে লক্ষ্যপ্রদান করিতেন। (৪) চিতা সাধারণতঃ চারি ফুট হইতে পাঁচ ফুট দীর্ঘ, ছুই ফুট হইতে তিন ফুট প্রশস্ত, ও আড়াই ফুট হইতে তিন ফুট গভীর হইত। প্রথমে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সন্মোচিত কতকগুলি ক্রিয়াপদ্ধতি সমাপন করিলে সহমরণেচ্ছু নারী স্নানাঙ্কে বিবাহরাত্রির উপযোগী বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া, গুরুজনদের প্রণাম ও স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠদের আশীর্ব্বাদ করিয়া কয়েক বার চিতা প্রদক্ষিণ করিতেন; অনন্তর সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বহু অর্থ ও অলঙ্কারাদি বিতরণ করিবার পর চিতারোহণ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে চিতায় অগ্নিসংযোগের পূর্বে “সতী”কে চিতায় সহিত রক্তবদ্ধ করা হইত, এবং অগ্নিসংযোগ

৪। শ্রীমুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত, “সংবাদপত্রে মে কালের কথা”, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬। অতঃপর এই পুস্তককে ‘সংবাদ প্রদর্শন’ এই ভাবে উল্লেখ করা যাইবে।

করিবামাত্র উচ্চ বাগ্ধনিতে স্থানটি প্রতিধনিত হইত। সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধবাদীরা বলিতেন, অগ্নি-ভয়ে ভীতা নারীর পক্ষে চিতা হইতে লক্ষ প্রদানের সম্ভাব্যতা পরিহারের উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে ঐরূপে রজ্জুবদ্ধ করা হইত, এবং সময়ে সময়ে কাঁচা বংশদণ্ড দ্বারা তাঁহাকে চিতার সহিত চাপিয়াও ধরা হইত! অতঃপর যাহাতে তাঁহার আত্মনাশ কাহারও কর্ণগোচর না হয়, এই উদ্দেশ্যেই বাগ্ধনি করা হইত। বলা বাহুল্য, সহমরণ-প্রথার সমর্থকরা ইহার ভিন্ন বৃত্তি প্রদর্শন করিতেন। “হিন্দু-স্থানের পশ্চিমাংশে—সহমরণের পর চিহ্নার্থ গঙ্গাতীরে একটা মঞ্চ গাঁথিয়া” রাখা হইত। (৫)

উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক জিলায় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট একটি নারী সহমৃতা হইয়াছিলেন। সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে কোন্ কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়াছিল ও কত ব্যয় হইয়াছিল—তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই তালিকা হইতে সহমরণ অনুষ্ঠানের আনুমানিক দ্রব্যাদির ও আনুমানিক ব্যয়ের একটি স্থূল ধারণা হইতে পারে। (৬)

শ্রুত	...	৩২
বস্ত্র	...	১২
নারীর পরিধেয় নববস্ত্র	...	২১০
কাষ্ঠ	...	৩২
আদালতের পণ্ডিতকে দেয়	...	৩২
নারী কর্তৃক দান	...	১২
চাউল	...	১০
সুপারি	...	১০
পুস্প	...	১০
কোকো	...	১০
গাঁজা	...	১০
হরিদ্রা	...	১০
ধূপ, চন্দন, নারিকেল প্রভৃতি	...	১৫
বাহকদের দেয়	...	১০
বাদকদের দেয়	...	১০
নাপিতকে দেয় (নখ কাটার জন্ত)	...	১০
কাঠুরিয়াকে দেয়	...	১০

মোট—১৫১/১৫

সহমরণ-প্রথার প্রথম প্রবর্তন কিরূপে হয়, সে বিষয়ে মতবৈধ আছে। এ বিষয়ে ডিওডোরাস সিকিউলাস, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি গ্রাক লেখকগণের সিদ্ধান্ত পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। রামমোহন রায় কিন্তু এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎকালীন হিন্দুসমাজে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকায়, এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্নী সমূহ সহসা একরূপ অসহায় অবস্থায় পতিত হইত যে, তদবস্থায় ছুস্তর সংসার-মরু পার হইবার বিড়ম্বনা সহ করা অপেক্ষা স্বামীর চিতানলে দগ্ন হইয়া সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান করাই তাহারা কাম্য জ্ঞান করিত। সমাজও এ বিষয়ে তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া বরং উৎসাহিতই করিত; কারণ, এই সহজ পথের অনুসরণ করিয়া সমাজ নিঃসহায় বিধবার ভরণপোষণের গুরু দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইত। এইরূপে সহমরণ প্রথা সামাজিক অনুমোদন ও উৎসাহ লাভ করিয়া কালক্রমে অবশুকর্তব্য বিধি বলিয়া পরিগণিত হয়। (৭) কাহারও কাহারও মতে বিধবা যুবতী নারীর ব্যভিচারিণী হইবার “ভাবি আশকাকে দূর করিবার নিমিত্ত” সহমরণ-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। (৮)

উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে বহু নারী সহমৃতা হইতেন। ইহার কারণ নির্দেশ উপলক্ষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হুগলীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার এইচ, ওক্লি যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা কোঁতুকাবহ। তাঁহার মত এই যে, যেহেতু প্রধানতঃ কলিকাতাবাসী হিন্দুরাই “মাতাল ও তস্করদিগের উপাস্ত দেবী” (The idol of the drunkard and the thief) কালীর ভক্ত, এবং কলিকাতাতেই সহমরণ-প্রথা সম্বন্ধে প্রচলিত, অতএব কালীপূজাই কলিকাতায় সহমরণ-প্রথার ব্যাপক অনুষ্ঠানের হেতু। (৯) সে-কালে হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর যুক্তি কোম্পানীর সংগৃহীত এই বিজ্ঞ গোরা

৭। Raja Rammohan Roy's tract entitled, "Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of Females, according to the Hindu law of Inheritance."

৮। রামমোহন রায় লিখিত, "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের প্রথম সন্দ্বাদ।"

৯। Parliamentary papers, Vol. 1, p. 237.

৫। 'সংবাদ প্রথম' পৃঃ ২৮১।

৬। India's Cries p. 2. (foot note).

ম্যাজিষ্ট্রেটটির যুক্তির কাছে খেসিতে পারে ? এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা 'বড় তামাকে'র ছুই-এক সিলিমের কৰ্ম নয় !

সহমরণ-প্রথার প্রবর্তকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বিধবা নারীর পক্ষে সহমৃত্যু হওয়া কালক্রমে বিশেষ গৌরবজনক বলিয়া পরিগণিত হইত। এমন কি, সহমৃত্যু নারী দেবীর সম্মান লাভ করিতেন। সহমরণ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্বে সহমরণোচ্চতা নারীর আশীর্বাদ লাভ অতিশয় সৌভাগ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। সহমৃত্যু হইবার পর কখনও কখনও "সতীর" দক্ষাশিষ্ট অস্থি অথবা ভস্ম সংগ্রহ করিয়া তরুপরি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইত, ও আকস্মিক বিপদ-আপদ হইতে পরি-ক্রাণ লাভ অথবা ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভের জগু মৃত্যু সতীর উদ্দেশ্যে এই বিশ্বাসে মানসিক করা হইত যে, তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে তক্তের সকল কামনা পূর্ণ করিবেন। (১০)

এই সম্পর্কে মনু বলিয়াছেন, বিধবার পক্ষে সহমৃত্যু হওয়া অতি পুণ্য কার্য; কারণ, তদ্বারা ব্রহ্ম, কৃত, ও মিত্র পতিও নরক হইতে মুক্ত হন, এবং সতীর ত্রিকুল পবিত্র হয়। সে-কালে যে-বংশে যত অধিক সংখ্যক নারী সহমৃত্যু হইতেন, সেই বংশ তত অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বিবেচিত হইত। পক্ষান্তরে, স্বামীর মৃত্যুর পর পত্নী সহমৃত্যু হইতে পশ্চাৎপদ হইলে, তাঁহার নিজের এবং তাঁহার পিতৃকুলের ও স্বশুরকুলের কলঙ্কের সীমা থাকিত না। ডিওডোরাস্ সিকিউলাস বলেন, এইরূপ কলঙ্কের ধারণা বহু প্রাচীন। (১১)

হিন্দু নারীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সহমৃত্যু হইলে পর-লোকে স্বামীর আত্মার সহিত মিলন হয়। বস্তুতঃ, পুরাণেও লিখিত আছে, রুদ্রাণী মৃতপতির সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় সহমৃত্যু হইয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার "The Web of Indian Life" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"The belief in a mystic union of souls was the motive for Suttee, a sacrifice that was supposed to lift the husband's soul at once into bright places and bring his wife to enjoy beside him for thousands of years"

বস্তুতঃ, সতী নারীর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই যে হিন্দু রমণীরা বহু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, অপরের বিনা-প্ররোচনায় এবং প্রফুল্ল মুখে প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে স্বামীর সহিত সহমৃত্যু হইতেন, সহমরণ-প্রথার বিরোধী বহু ইংরেজকেও সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রের কোন ইংরেজ বিচারক (ফৌজদারী হাকিম) স্বামীয় কোন সহমরণোচ্চতা সতীর মানসিক দৃঢ়তা ও নিষ্ঠাকতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন,— "সেই বিধবা নারী সহমৃত্যু হইবার পূর্বকরণ পর্যন্ত বরাবর সম্পূর্ণ মিশ্র ও অবিচলিত ছিলেন। তিনি অতি সংযত চিত্তে সেই ভীতিপ্রদ অনুষ্ঠানের আয়োজন দর্শন করিতেছিলেন; এমন কি, স্বয়ং সেই আয়োজনে সাহায্যও করিতেছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার ঐরূপ নিষ্ঠাকতা আমি পূর্বে কল্পনাও করিতে পারিতাম না। তিনি চিতার উপর উপবিষ্টা হইয়া স্থিরচিত্তে নিজের চারি ধারে কাষ্ঠ সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐ কার্য হইতে নিরস্ত করিবার শেষ আশায় অবশেষে আমি তাঁহাকে বলিলাম, তিনি যদি উহাতে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিব। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, ঐ কার্য তাঁহার পক্ষে অতি সুখকর বলিয়াই তিনি স্বেচ্ছায় উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! অনন্তর তিনি উচ্চকণ্ঠে নিজ পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহার দেহের উপর কাষ্ঠ সাজাইয়া দিতে বলিলেন, এবং পরে সেই কাষ্ঠে স্বহস্তে অগ্নিসংযোগ করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে যে ছুই-তিন সেকেণ্ড বিলম্ব হইল, সেই স্বল্প সময়ে তাঁহার মুখভাবে বিন্দুমাত্রও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। তাহার পর অগ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে, তাঁহাকে আনন্দে করতালি দিতে দেখা গেল, এবং এক মিনিটেরও অল্প সময়ের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবসান হইল!"

১০। A description of the character, manners and customs of the people of India, and of their institutions, religious and civil, by Abbe J. A. Dubois, 2nd edition, chapter XXI. p. 175.

১১। Cassell's Illustrated History of India by James Grant, volume II, chapter VIII, p. 40.



दरदा

माघ, १७४१]

| शिर्षी—श्रीशुभनाथ मित्र

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'Asiatic Journal'এ এইরূপ একাধিক সাহসিকা সতীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ওলন্দাজ নৌসেনাপতি ষ্টাভোরিনাস ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে একটি সতীকে গঙ্গাতীরে সহমৃতা হইতে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার নির্ভীকতা দর্শনে তিনি বিশ্বাস-বিষ্ট হইয়াছিলেন। (১২) এই সম্পর্কে ভারতীয় নারীর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করিয়া ভেলেরিয়াস ম্যাক্সিমাস স্বর্ণাকরে লিখিয়া গিয়াছেন—“The boldness of the Cimbrians, the constancy of the Celtiberians, the resolute wisdom of the Thracians and the crafty prudence of the Lycians in despising

করিত; দ্বিতীয়তঃ, স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি নারীর পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি পুরুষ-আত্মীয়ের হস্তগত হইত; তৃতীয়তঃ, সহমৃতা হইবার সময়ে সতী কর্তৃক বহু ধন, রত্ন, অলঙ্কারাদি বিতরণ করিবার রীতি প্রচলিত থাকায়, সে সকলও পণ্ডিত প্রভৃতির লাভ হইত। সুতরাং প্রিয়জনের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহপরবশ হইয়া বিধবা নারীর কোন নিকট-আত্মীয় সহমরণ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা, এমন কি, তাঁহাকে সহমরণে প্রবৃত্ত করাইতে উৎসাহের বিন্দুমাত্র অভাব প্রদর্শন করিলে, পুরুষ-গঠিত সমাজের নিকট তাঁহার অপরাধ অমার্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। (১৪)



এক-চিতায় স্বামী-সহ চার সতী

sorrow, are not comparable to this Indian sacrifice, wherein the pious wife ascends the pile in the face of instant death, as if it were a nuptial couch.” (১৩)

কিন্তু সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধবাদীরা সতীর এই নির্ভীকতার ভিন্ন ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহারা এই অভিযত পোষণ ও প্রচার করিতেন যে, হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণ স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই সহমরণ-প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিল। ইহার প্রবর্তন দ্বারা প্রথমতঃ সমাজ স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার ভরণ-পোষণের গুরু দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ

এই সকল লোক পণ্ডিতের দল ও স্বার্থপর আত্মীয়-কুটুম্বরা মৃত ব্যক্তিব শোকাতুরা পত্নীর কর্ণে সেই অবস্থায় কোন সাহসনা ও আশার বাণী না শুনাইয়া, স্ব স্ব স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যেই ক্রমাগত তাঁহাকে সহমৃতা সতীর স্বামিসহ স্বর্গে চিরমিলনের প্রলোভন প্রদর্শন করিত, এবং শাস্ত্রানুশাসনের নানা লোভনীয় কদর্থ শুনাইয়া ব্রাহ্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া, এমন কি, গুণপ্রয়োগেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলিত। এতৎসত্ত্বেও, কোন নারী সহমরণে দ্বিধা প্রদর্শন করিলে তাঁহাকে ইহলোকে সমাজের ভয়, নিজের অশেষ নিগ্রহ ও কলঙ্ক, এবং পরলোকে

নিজের নরক-যজ্ঞনা ও পতির অশেষ দুর্গতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। সন্তঃ পতিহীনা, শোকবিধুরা, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়া নারীকে এইরূপে যুগপৎ পুণ্যের লোভ ও পাপের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা তাহারা এ-ভাবে সহমরণে প্ররোচিত করিত যে, তিনিও সেই অবস্থায় হিতাহিত-জ্ঞানবর্জিত ও নিরুপায় হইয়া স্বামীর চিতারোহণে বাধ্য হইতেন।...“These immolations were often not voluntary, that sometimes they were only

১২। Voyage to the East Indies.

১৩। Asiatic Journal, May, 1827.

১৪। Letter dated 24th January 1826, from 'Bengal Hurkara' and published in Asiatic Journal of July, 1826.

possible by drugging the victim, and that Suttee was consequently often only an euphemism for murder." (১৫) অর্কচেতন নারীর সেই ভাব-বিহ্বলতা সহমরণ-সমর্থকদিগের নিকট নির্ভীকতা বলিয়া প্রশংসা অর্জন করিত।

সহমরণে সম্মত না হইলে বহু ক্ষেত্রে নারীর উপর শারীরিক বলপ্রয়োগ করা হইত, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। প্রজ্বলিত চিতাগ্নির প্রথম উত্তপ্ত স্পর্শে আতঙ্কভিত্তিতা একটি নারী কোন সময়ে সকলের অগোচরে চিতা হইতে আত্মরক্ষার্থ পলায়নোচ্চতা হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনা সহসা তাঁহারই পুত্রের দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, সে ত্রস্তা ও রোদ্ধমানা জননী মিনতিপূর্ণ আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে তিরস্কার করিতে বলপূর্বক রক্ষুবদ্ধ করিয়া পুনরায় প্রজ্বলিত চিতায় নিক্ষেপ দ্বারা মাতৃভক্ত পুত্রের কর্তব্য পালন করিয়াছিল! (১৬)

আর এক সময়ে অগ্নির উত্তাপ অসহ্য বোধ হওয়ায় একটি নারী জলস্ত চিতা হইতে অর্কদগ্ধাবস্থায় অদূরবর্তী শীতল জলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদগনে, তাঁহাকে সহমৃত্যু হইতে হইবে না, এইরূপ মিথ্যা প্রবোধ দিয়া তৎক্ষণাৎ কতকগুলি ব্যক্তি (ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিই ছিল) তাঁহাকে কৌশলে রক্ষুবদ্ধ করিয়া পুনরায় চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে তিনি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ জীবন

রক্ষার্থ ধড়ফড় করিতেছেন দেখিয়া, তাহারা তৎক্ষণাৎ তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করে! (১৭)

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন কালে বহুবিবাহিত স্বামীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীরই মাত্র সহমরণের অধিকার স্বীকৃত হইত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, পরবর্তী কালে মৃতব্যক্তির সকল স্ত্রীই অথবা একাধিক স্ত্রী স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জন করিতেন। কোন ভারতীয় নৃপতির মৃত্যুর পর আটশ জন নারী সহমৃত্যু হইয়াছিলেন! (১৮)

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখের 'সমাচার-দপণে' প্রকাশ, "...রাজপুত্রদের নিত্য সহগমন হয়; গত বৎসর তদদেশীয় এক জন রাজা মরিলেন, এবং তাঁহার তেত্রিশ স্ত্রী পুড়িয়া মরিল।" (১৯) গুজ্জরের সমীপবর্তী কচ্ছপ্রদেশে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার পনেরটি উপপত্নী সহমৃত্যু হইয়াছিলেন। (যদিও তাঁহার কোনও বিবাহিতা পত্নী এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই)। (২০)

শ্রীরামপুরের মিশনারী রেভারেণ্ড কেরীর ছাপাখানায় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে গোপীনাথ নামক কোন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিল। নদীয়া-সন্নিহিত বাগনাপাড়া গ্রামে অনন্ত নামক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার শতাব্দিক স্ত্রীর মধ্যে সাঁইত্রিশ জনকে সে সহমৃত্যু হইতে দেখিয়াছিল। (২১) (মতান্তরে বাইশ জন। Vide, Buchanan's Apology for Christ in India, pp. 14—16) তন্মধ্যে প্রথম দিন তিন জন, দ্বিতীয় দিন পনের জন, এবং তৃতীয় দিন উনিশ জন চিতায় প্রাণ বিসর্জন করেন। ত্রিদিবস-ব্যাপী চিতা প্রজ্বলিত ছিল।

তৎকালে কুলীন কণ্ঠকে পাত্রস্থ করা সহজ ছিল না; সেই কারণে পাত্রের অভাবে বহু কণ্ঠকে বাধ্য হইয়া চিরকুমারী থাকিতে হইত; কাহাকেও যৌবনান্তে নামমাত্র পাত্রস্থ করিয়া তাহার কুমারী নাম খণ্ডন করা হইত। কুলীন যুবকরা উদ্ধাহ অনুষ্ঠানকে অতি লাভজনক

১৫। 'India in the Nineteenth Century' by Deme-
trious C. Bonlger.

কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন এ কথা সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, সহমরণোচ্চতা রমণীর বিষয়প্রাপ্তির লোভে তাঁহাকে সহমরণে উৎসাহিত করা দূরের কথা—নিকট-আত্মীয়েরা বধু-বান্ধব ও গুরুজনের সাহচর্য ও সেই নারীর শিশু-সন্তান সমভিব্যাহারে তাঁহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত সফাতরে অমুনয়-বিনয় করিতেন, এবং রমণী সম্ভ্রান্তবংশীয়া হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সাম্বাদান করিতেন ও ঐ কাৰ্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন। কোন রাজার রাজত্বকালে অধিক সংখ্যক সহমরণ অনুষ্ঠিত হওয়া দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হইত।

১৬। "A collection of facts and opinions relative to the burning of widows and other destructive customs prevalent in British India"—by Mr. Johns. অতঃপর এই পুস্তক 'Johns' বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

১৭। "Parliamentary papers, relative to Suttee"
Vol. II. p. 64.

১৮। Proceedings of Manchester Meeting. p. 9.

১৯। 'সংবাদ প্রথম' পৃ. ২৮১

২০। Hamilton's Hind. Vol. I. p. 638.

২১। 'Johns.'

ব্যবসায় হিসাবেই গণ্য করিতেন ও বহু অর্থ-সম্পত্তির বিনিময়ে আজীবন এইরূপ কুমারীতার-যজ্ঞে সহায়তা করিয়া বিবাহ-রাত্রি অবসানের সঙ্গেই অন্তর্দান করিতেন। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সাধারণতঃ আর কখনও সাক্ষাৎ ঘটত না। অথচ সে-কালে গৌরীদান তথা বাল্যবিবাহেরও প্রচলন ছিল। ফলে এই হইত যে, এক-এক জন কুলীন পাত্র নির্দিষ্টারে বালিকা-বৃদ্ধা-নির্নিশেষে বিভিন্ন বয়সের শতাব্দিক নারীকে বিবাহ করিত।—“One class of the Brahmans, the kulins, were at liberty, to marry wives as they chose, and if they died, the helpless girls who, in some cases, had scarcely seen their husbands, were doomed to die as Suttees.” (২২)

পরে সেই কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাহার জ্ঞান-হীনা কিশোরী পত্নী ও বিগতযৌবনা বয়সী স্ত্রী সকলকেই সহমৃত্যু হইতে হইত। বস্তুতঃ, পূর্বোক্ত কুলীন ব্রাহ্মণটির সাঁইত্রিগটি সহমৃত্যু পত্নীর মধ্যে মোড়শ বর্ষ হইতে চল্লিশ বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের নারী ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। নারীর বয়সের তারতম্যের জ্ঞান নৃশংসতার কোনরূপ প্রভেদ হইত না। পাশ্বেব তালিকায় লক্ষিত হইবে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে (Bengal-এ নচে, Bengal Presidencyতে) (২৩)—একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী সহমৃত্যু হইয়াছিল। (২৪)

২২। ‘Bengal as a field of Missions’ by Macleod Wylie, chapter XIII.

২৩। “The Bengal Presidency must not be confounded with the province of Bengal. The former comprehends the whole of the stations from the entrance of the river Hugly, north of the Bay of Bengal, to the river Indus, the Tenasserim coast, Pegu, and Prome in Burmah. The Himalayan chain, and the kingdom of Nepaul, are upon its northern and north-eastern limits. West and south it extends to the boundaries of the Bombay and Madras Governments...” Missionary Sketches in North India’ by Mrs. Weitbrecht.

২৪। Parliamentary Papers. Vol. II. p. 45

সহমৃত্যু নারীর বয়স

৮ বৎসর

১০ ”

১২ ”

১৩ ”

১৪ ”

১৫ ”

১৬ ”

সাড়ে ১৬ ”

১৭ ”

সহমৃত্যু নারীর সংখ্যা

৩ জন

১ ”

১০ ”

২ ”

২ ”

৬ ”

২২ ”

১ ”

১৪ ”

মোট— ৬১ ”

বৃদ্ধা সহমৃত্যু নারীরও একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। বহু অশীতিবর্ষ ও নবতিবর্ষ বয়স্ক নারীও সহমৃত্যু হইতেন। এক জন পঞ্চনবতি বয়সী বৃদ্ধারও সহমরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। (২৫)

যদিও সহমরণ প্রথা বঙ্গপ্রদেশে সকল জাতির হিন্দুর মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহা হইলেও বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণবংশীয়া নারীদের দ্বারাই উহা ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হইত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন বয়সের ব্রাহ্মণী ও ভিন্ন জাতীয়া সহমৃত্যু নারীর নিম্নোক্ত সংখ্যা পাঠে ইহা প্রতিপন্ন হইবে,—

	২০ বৎসরের নিম্নবয়স্ক	২০ ৪০ বৎসর বয়স্ক	৪০-৬০ বৎসর বয়স্ক	৬০ বৎসরের উর্ধ্ববয়স্ক	মোট সংখ্যা
কেবল ব্রাহ্মণ নারীর সংখ্যা	১১	১০৩	১০২	৩৫	২৫১
ব্রাহ্মণের সর্ব-জাতীয়া নারীর সংখ্যা	১৩	১১৫	১৩২	৬১	৩২১
	২৪	২১৮	২৩৪	৯৬	৫৭২

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত সহমৃত্যু নারীদের মধ্যে অসহমৃত্যু নারীদেরও গণনা করা হইয়াছে। এই সূত্রে স্বরণ রাখিতে হইবে যে, তৎকালে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ নারীদের পক্ষেই অসহমরণ নিষিদ্ধ ছিল। তাহা না হইলে, উপরি-উক্ত তালিকায় ব্রাহ্মণ নারীর সংখ্যা আরও অধিক হইত।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সমগ্র ভারতবর্ষে সহমরণের প্রচলন থাকিলেও, বিশেষ করিয়া বঙ্গপ্রদেশেই উহা

২৫। Parliamentary Papers. Vol. V.

যে, উহা কর্ণহেরিতে প্রাপ্ত শতকর্নী বশিষ্ঠের প্রদত্ত প্রশস্তির সমকালিক। বার্গেইনে ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকর্ণ মনে করেন। তিনি বলিয়াছেন, উহা ৪র্থ শতাব্দীর হইতেই পারে না। উহাতে প্রাচীন ইন্দোচীন ভাষায় এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। অক্ষরগুলি স্থানে স্থানে ক্ষয়িত ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহা এই কয়টি কথা জানিতে পারা গিয়াছে :—

শ্রীমার রাজকুমার বংশবিভূষণেন

শ্রীমার লোকনৃপতে কুলানন্দনেন। ইত্যাদি

এই বাজার নাম কি, তাহা ঠিক বুঝিতে পাবা যায় নাই। অক্ষর ক্ষয় পাঠিয়াছে। তবে এই নবপতি যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা অসঙ্কোচে বলা বাইতে পারে ইনি শ্রীমার বংশোদ্ভূত। অধ্যাপক ফিনে সই জন্ম লিখিয়াছেন— খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে দক্ষিণ-আনামে একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। * পববর্তী কালে এই দক্ষিণ-আনাম অঞ্চলের নাম হইয়াছিল কোঠাব।

কোঠাব রাজ্যের দক্ষিণেই পাণ্ডুরাজ্য অবস্থিত ছিল। দেশীয়রা পাণ্ডুরাজকে পণবাং বলিত। এখন ঐ স্থানের নাম হইয়াছে—ফণবাং। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্রায় কুড়িগানি প্রশাস্ত ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলে পো-নগর দেবীর মন্দির এবং ভোকণ-প্রস্তবেব প্রাচীনত্ব হইতেই সপ্রমাণ হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই অঞ্চলে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাহার পরই চম্পা অথবা চম্পা রাজ্যের কথা। চীনের ঐতিহাসিকরা বলেন যে, চীনের জেনান অঞ্চলটাই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে চম্পা নাম ধরিয়াছিল। চম্পা অঞ্চলের অধিবাসীরা চম নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় ১০০ অব্দে মিয়ানিং-এব নাপিতব বিদ্রোহী হয়। কিন্তু তাহাদের সেই প্রচেষ্টা প্রথম বাব বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার ৯২ বৎসর পরে পুনরায় যে বিদ্রোহানন্দ প্রকলিত হইয়াছিল, তাহার ফলে চম্পা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। চম্পার রাজধানীর নাম ছিল ইন্দ্রপুত্র। বর্তমান সময়ে ঐ অঞ্চলে ট্রিকিয়েন নামক স্থানের ধ্বংসস্থূপ হইতে যে সকল ত্রয়োদশ শতাব্দীর ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই ঐ নগরের নাম ইন্দ্রপুত্র বলিয়া জানিতে পাবা গিয়াছে। তাহারা চীনের বিদ্রোহী হইয়া চম্পা অঞ্চলে স্বাধীনতাব পতাকা উত্তোলিত করিয়াছিল, চীনা ভাষায় তাহাদিগকে নাপিত বা পরামাণিক বলিয়া উল্লেখ করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা ক্ষৌত্রিকজীবী ছিল না। তাহারা ঐ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীই ছিল। তাহাদের গ্রাম, নগর প্রভৃতি হিন্দু নামই ছিল। পাণ্ডুরাজ্য দেশের উত্তরে যে প্রদেশ ছিল, তাহার নাম ছিল অমরামতী এবং বিজয়। অমরামতী রাজ্যে ভদ্রেস্বর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। তাহা ঐ রাজ্যের সর্বপ্রধান মন্দির। ফিনে এবং পারমেটিয়ার বলেন—বর্তমান সময়ে যে স্থানে

মিশন গ্রাম অবস্থিত, তাহার ঐ ভদ্রেস্বর দেবের মন্দির অবস্থিত ছিল। মিশন গ্রাম বর্তমান টুরেণ সহরের প্রায় ১০ ক্রোশ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে অমরামতী প্রদেশে ভদ্রেস্বর নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। ইনিই ঐ রাজ্যের একটি নির্জজন অঞ্চলে ভদ্রেস্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, শিবই স্বয়ং ঐ মূর্তি নির্মাণ করিয়া উহা ভৃগু ঋষির হস্তে সমর্পণ করেন। ভৃগু সেই বিগ্রহটি যাহাকে প্রদান করেন, তাঁহার নাম উরোজ; তিনি চম্পা প্রদেশের রাজবংশের স্থাপয়িতা। কিছু দিন পরে ভদ্রেস্বর শিবলিঙ্গটি পুড়িয়া যায়। ভদ্রেস্বর বংশে গঙ্গারাজ নামক রাজা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি রাজা রুদ্ৰদমনেব পুত্র। ইনি এই দুবদেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া গঙ্গা নদী দশন করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি গঙ্গারাজ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনিই চম্পার বিখ্যাত গঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মিশন নগরে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে,—গঙ্গারাজ সিংহানন্দ ত্যাগ কবির্য গঙ্গা দশনান্তে ফিবিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যায় এবং শৌর্সো রাজগুণসম্পন্ন ছিলেন—ইত্যাদি। শিলালিপিপানির কোন কোন অক্ষর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও উহাতে গঙ্গারাজ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট আছে। চৈনিক ঐতিহাসিকগণ আগ্রহসহকাবে এই শিলালিপিপানির উল্লেখ করিয়াছেন।

গঙ্গা রাজবংশের বহু রাজা চম্পা প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের পবাক্রান্ত রাজা শত্ৰুবর্মা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই খৃষ্টীয় ৬৬০ অব্দে ভদ্রেস্বর শিবের দক্ষ মন্দিরটির পুনঃ-সংস্কার করেন, ইনি বিগ্রহের নাম পবিবর্তন করিয়া শত্ৰু ভদ্রেস্বর নামে অভিহিত করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গা রাজবংশ বিলুপ্ত হয়। পববর্তী বংশের রাজগণ ১ শত ১০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা বাও হিন্দু ছিলেন। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা সত্যবর্মা রাজত্বকালে মালয়দেশীয় জলদস্যুগণের আক্রমণে প্রজাপঞ্জ বিশেষ ভাবে উৎপীড়িত হয়। তখন ইহারা পাণ্ডুরাজ্য অস্তর্গত বীরপুত্র আপনাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মালয় দস্যুগণ কোঠাবস্থ ভগবতীর মন্দিরটি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। রাজা সত্যবর্মা ঐ মন্দিরটি ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত করেন। ইহার পর ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মালয় দস্যুবা এ দেশ পুনর্বার আক্রমণ করায় পববর্তী নূতন রাজবংশের প্রথম রাজা ইন্দ্রবর্মা তাঁহার রাজধানী অমরামতী অঞ্চলে স্থানান্তরিত করিয়া এই রাজধানীর নাম পুনাতন রাজধানীর নাম অনুসারে ইন্দ্রপুত্র রাখিয়াছিলেন।

চম্পা রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে এখন প্রায় ত্রিশ হাজার লোক দক্ষিণ-আনামে অবশিষ্ট আছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার মুসলমান আব ২০ হাজার হিন্দুধর্মাবলম্বী। কিন্তু এখানকার হিন্দুদিগের অধঃপতন ঘটয়াছে। তাহারা তাহাদের উপাস্ত দেবতাদিগের নাম পযাস্ত ভুলিয়া গিয়াছে! ১৩০০ খৃষ্টাব্দে চম্পারাজ তৃতীয় জয়সিংহ বর্মা যে শিব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা কার হিন্দুরা আজিও তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা এখন আব ঐ বিগ্রহকে শিবলিঙ্গ বলিয়া চিনিতে পারে না। তাহারা উহাকে চম্পারাজ পো রুং গরাইয়ের মূর্তি

* We may therefore safely admit that as early as the first two centuries of the Christian era there existed a Hindu kingdom in Southern Anam.—I. H. Q, vol I. p. 604

মনে করে। পূজাকালে উহার পুরোহিত মহাশয়েবা যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহাও ভাষা অপভ্রংশ সংস্কৃত। যথা—“ওঁ পবমেশ্বর পবমেশ্বরায় নমো পবমেশ্বরং মুখো নমো শিবানান (ওঁ পবমেশ্বরপরমেশ্বরায় নমো নমো পবমেশ্বরমুখো নমো শিবায় নমঃ।” অপিচ “ওম্ ওম্ শিবমে টুক সিদ শিবায় নমো স্বাহা (ওঁ ওঁ শিবোমে—শিবায় নমো স্বাহা)।” মধ্যস্থ “টুক সিদ” যে কোন্ শব্দ হইতে অপভ্রংশ হইয়া ঐরূপ রূপ ধরিয়াছে, তাহা ‘পণ্ডিতে বুঝিতে পারে মুর্খের লাগে ধন্ধ!’ ফরাসী পাণ্ডিত্য উহার পার্যোক্ত্যেব জ্ঞান বিশেষ চেষ্টা কবেন নাই। ইহা তুষ্টিদঃ হইবে অথবা তুষাতাম্ হইবে? পূজার মন্ত্রের ভাষা যে অসংস্কৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যুবোপীয়রাও স্বীকার কবিতা থাকেন যে, প্রায় খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ আমল পর্যন্ত চম্পায় সংস্কৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম-শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত। অতি প্রাচীন কাল হইতে তথায় বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যাহাতে বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, উমা, কার্তিকেয়, নন্দী প্রভৃতির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধদিগের মন্দির বুদ্ধ, লোকেশ্বর প্রভৃতির বিগ্রহ বিদ্যমান।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মীন্দ্র ভূমিশ্বর গ্রামস্বামিন্ নামক ভূস্বামীকে দেশের অভিজাতবর্গ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কবিতাছিলেন। মধ্যযুগেও ঐ দেশে হিন্দু রাজগণের মধ্যে রাজা-নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। লক্ষ্মীন্দ্র গ্রামস্বামী সেই জ্ঞান চম্পাদ সিংহাসন পাঠিয়াছিলেন। অভিষেককালে তিনি ইন্দ্রবর্মা (দ্বিতীয়) নাম গ্রহণ কবিতাছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে প্রজাবর্গ তাঁহাকে ‘পবম বুদ্ধলোক’ বলিত। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও হিন্দু ধর্মকে অশ্রদ্ধা কবিতেন না। তিনি চম্পার জাতীয় দেবতা হিসাবে ভদ্রেশ্বর দেবের পূজা কবিতেন, এবং লোকেশ্বরেরও সেবা কবিতেন। তিনি ভদ্রেশ্বর দেবের মন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মঠ, এবং লোকেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত কবিতাছিলেন। এই মঠে বহু মহত্ব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং শ্রমণ বাস কবিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের বিগ্রহ লোকেশ্বর দেব লক্ষ্মীন্দ্র লোকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এগনও দংগুয়াং গ্রামে রাজা দ্বিতীয় ইন্দ্রবর্মার প্রতিষ্ঠিত সেই বৌদ্ধ মন্দিরের এবং চৈতন্য বিশ্বীর্ণ ধর্মাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রপুর নগরীতে ইনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তৎপূর্ববর্তী যে সকল বৌদ্ধ-কীর্তি এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চীনা-দিগের প্রতিষ্ঠিত কি চমদিগের প্রতিষ্ঠিত তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ইহার পূর্ব আনামবাসীরা চীনের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে চীনের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলেও দীর্ঘকাল স্বাধীনতা ভোগ কবিতেন পাবে নাই। পাণ্ডুরঙ্গ রাজ্যের সহিত বিবাদের ফলে চম্পারাজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দে চম্পার রাজা সিংহবর্মা তাঁহার রাজধানী বিসম প্রদেশে অপসারিত কবিতেন বাধ্য হন। চীনাদের সহিত সংগ্রামে চম্পাবাসীরা আত্মরক্ষা কবিতেন পাবে নাই। তাহারা পুনঃ পুনঃ পবাজিত হইয়াছিল। ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে চম্পারাজ বা আনামের অধীশ্বর রাজা তৃতীয় রুদ্রদমন আনাম প্রদেশের উত্তর অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া চীনাদের সহিত সন্ধি কবিতেন বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব চম্পারাজ্যের বহুবার ভাগ্যবিপর্যায় ঘটে। পূর্ব-উপদ্বীপের আবও

বহু বজ্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার কবিতাছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পার্যোক্ত্যেব কোতুলোদ্ধীপক হইতে পারে।

ফুনান রাজ্য

এই অঞ্চলে অনেক নাম চীনা ভাষায় শৌচনীয়রূপে বিকৃত হইয়াছিল, সেই জ্ঞান প্রকৃত নামগুলি কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। ফুনান দেশটির প্রকৃত নাম যে কি ছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হয়। অধিকাংশ পাণ্ডিত্যের ধারণা, কম্বোজদেশীয় ভূম শব্দ হইতে ফুনান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূম শব্দটি একটু বিকৃত হইলে ভূম হইয়া পড়ে। ভূম অর্থে পাহাড়। আমাদেব মনে হয়, উহা ভূমি শব্দ। ফুনানের সহিত কম্বোডিয়া রাজ্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এক সময় ফুনান বিশ্বীর্ণ রাজ্য ছিল। মেসং নদীর পশ্চিম তীরে কম্বোডিয়া; কোচিন চীন, লেয়স, শ্যাম এবং মালয় উপদ্বীপ ইহার অধিকারভুক্ত ছিল। ইহার রাজবংশ বহু প্রাচীন। এই রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, অতি পুরাকালে ভারতবর্ষে কোণ্ডল্য নামক ব্রাহ্মণ বাস কবিতেন। সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দক্ষিণ ছিলেন। স্বপ্নে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। একদা দৈববাণী হইল,—‘ব্রাহ্মণ! তুমি ফুনানে যাওয়া ঐ রাজ্য শাসন কবিতেন থাক।’ কোণ্ডল্য দৈববাণী শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন, এবং অবিলম্বে ফুনান অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। তিনি জাহাজে মেকং নদীতীরস্থ পনপন নামক স্থানে উপস্থিত হইলে দেশবাসীরা তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর করিবার জ্ঞান বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কবে। অতঃপর কোণ্ডল্য দেশের রাজ হইলেন এবং কোণ্ডল্যের সহিত নাগী (নাগিনী?) সোমার বিবাহ হইল। তখন ঐ দেশের লোক মাতার পনিচয়েই পনিচিত হইত। সোমার গর্ভে তাঁহার যে পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনিই ফুনান রাজ্যের সোমবংশীয় রাজগণের আদি-পুরুষ। সেই জ্ঞান সোম ঐ অঞ্চলে বংশপ্ৰাপিত্বী বলিয়া সম্মানিত হন। যুবোপীয় পাণ্ডিত্যের অনুমান, দুই মহত্ব বংশ পূর্বে ঐ রাজ্যে সোমবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্যগণের এই অনুমান নির্ভরযোগ্য নহে।

যাহা হউক, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে ফুনান অর্থাৎ রাজ্য চন্দ্রবর্ম ঐ রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনিই ভারতের সহিত ফুনানের মনোমুগ্ধ সংযোগ বা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত কবিতাছিলেন। এই সাক্ষ্য সংযোগ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ঐ দেশের যে কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায়, উহা চীনা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ কবিতাছেন। রাজা চন্দ্রবর্মার (ফুনানের) রাজত্বকালে কিয়াসংলি (Kia-Sungli) নামক ভারতবাসী বৈশ্য ঐ অঞ্চলে বাণিজ্যার্থ গমন করেন। ইনি রাজা চন্দ্রবর্মাকে ভারতের স্বথ-সমৃদ্ধির কথা বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাপন করিলে রাজা চন্দ্রবর্ম ঐ সংবাদ শুনিয়া ভারতের সহিত সাক্ষ্য সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করিবার জ্ঞান অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “উহা (ভারত) এ দেশ হইতে কত দূর?” উত্তরে কিয়াসংলি বলেন, উহা অন্তত ৩০ হাজার লি দূরে অবস্থিত; অর্থাৎ চন্দ্রবর্মার রাজধানী হইতে উহা ১০ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। উহা সরলরেখায় দূরত্বজ্ঞাপক নহে। এই ভারতীয় বণিকটি জলপথে আনিয়াছিলেন। উহা জলপথের, অর্থাৎ উপকূল ঘেসিয়া যে দূরত্ব নির্ণীত হয়, সেই দূরত্বজ্ঞাপক। তাঁহাকে মালয় উপদ্বীপ

ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল, স্তত্রাং ঐ দূরত্ব বাঙ্গালা হইতে ঐ দেশে যাইবার দূরত্ব বলিয়াই মনে হয়। এই বৈশ্য বণিক কিয়াসংলিপ প্রকৃত নামটি উদ্ধার করা অসম্ভব। চব্বিসেন 'চাবিসেন' হইলেও ধরা যায়, কিন্তু 'কিয়াসংলি' কোন নামের অপভ্রংশ, কে বলিবে? তবে তিনি 'ভাবতের' যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাঁহা বাঙ্গালা দেশের বিবরণ বলিয়াই মনে হয়। তিনি তাঁহার দেশের কোন পাঠাড়া-পর্বতের নাম করেন নাই; মরুস্থলী ব উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল ভূমিব উর্বরতা এবং দেশের লোকের ধনধান্যের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তিন বংশের মধ্যে তথায় যাইয়া ফিবিয়া আসিতে পাবা যায়; যাত্রায়াতে চারি বংশেরও লাগিতে পারে। তাঁহার পদদেশটি ভূস্বর্গ। এই বিবরণ ফুনানাধিপতি চন্দ্রবর্মণ তাঁহার কোন আয়ীয়েব নেতৃত্বে জলপথে এক দল দূত ভাবতে প্রেরণ করেন। ইহা বা মালয় উপদ্বীপের নিম্ন-দেশ হইতে বনাবন উত্তর দিকে কতকটা পশ্চিম ঘেঁসিয়া, এবং নানা উপসাগর ও নদী-মোহনা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় নদীর সঙ্গ-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ভারতীয় নদীর নাম জানিতে পারা যায় নাই; তবে গঙ্গাই ভারতীয় নদীমত্ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বহু-বৈচিত্র্যময়ী; কিন্তু কিম্বদন্তীতে কথিত হইয়াছে যে, দূতবাহী তরনী নদীর মোহনা হইতে ৭ হাজার লি অগ্রসর হইয়া বাজধানীতে উপনীত হইয়াছিল। ৭ হাজার লি = ২ হাজার ৩ শত ৩৩ মাইল। এই দূতগণ জলপথে এক বংশ অস্ত্রে ভারতীয় নদীর মোহনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই তরণীর যাত্রাপথের যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, উহা গঙ্গানদীতে প্রবেশ করিয়াছিল। উহা অনেক উপসাগর এবং নদীর মোহনা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় নদীতে প্রবেশ করে। যেমন পাব হইয়া পদ্মার ভিতর দিয়া এই তরনী গিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। অসম্পূর্ণ ফনে বলেন, খৃষ্টীয় ২৪৪ হইতে ৩৫২ খৃষ্টাব্দে মধ্যে এই দূত প্রেরিত হইয়াছিল। তখন ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাজ্য ছিল। সেই সময় পশ্চিম-ভাভে অন্ধ্র এবং কুম্ণ বংশের পতন হইয়াছিল; কিন্তু অগ্ণে গুপ্তবংশের আবির্ভাব হয় নাই। একপ অবস্থায় ফুনান রাজদূতগণ কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করাও কঠিন। তবে নৌগোবাজ চন্দ্রগুপ্তের আমল হইতে পাটলিপুত্র ভারতীয় রাজধানীর গৌরবলাভ করিয়া আসিতেছিল। ইহা অব্যবহিত পদেই আবার গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই পাটলিপুত্রেই প্রথম রাজত্ব করেন। তাহার পূর্বে দুই-চারি জন অগ্ণাত-নামা রাজাও পাটলিপুত্রের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। চীন ইতিহাসে এবং স্থানীয় ইতিহাসে রাজার নাম দেওয়া হইয়াছে—মুলুন বা মুরগু। মুলুন নামটা চীনা নাম। মুরগু না ইউক, মুরগু নামটি সংস্কৃত। নর্মদা নদীর আর একটি নাম মুলন্দলা। কিন্তু এ নদীতীরে কখনও কোন প্রসিদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, নর্মদার মোহনা হইতে নদী বহিয়া ৩০ মাইলের অধিক দূর আর কোন বড় তরনী অগ্রসর হইতে পারে না। এ জন্ম অনুমান করা যাইতে পারে, এই 'দূতগণ গঙ্গাতীরস্থ পাটলিপুত্রে বা অন্ কোন রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন। ভারতবর্ষের রাজা মুরন্দ দূতদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—

"মহাসাগরের পরপারে এখনও একপ লোক আছে?" তাহার পর তিনি ঐ দূতদিগকে রাজ্যের সমস্ত ব্যাপার দেখাইবার জন্ম আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ঐ ভারতীয় রাজা ফুনানরাজ চন্দ্রবর্মণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবার জন্ম উপঢৌকন সহ কয়েক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। চারি বংশের পদে দূতগণ আবার ফুনানে ফিবিয়া আসিয়াছিলেন। এই সময়ে কং-তাট নামক জৈনিক প্রসিদ্ধ চীনাবাসীকে চীনরাজ যু ফুনানের রাজদূত করিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। কং-তাটের সহিত ভারতবর্ষের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চীনের রাজদূত ভারতবর্ষের প্রবিত দূতদিগকে ভাবতের অবস্থা এবং আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন।

চৈনিক ইতিহাস-লেখকগণ ভারতীয় নামগুলিকে চীনা-ফর্মায় চালায়া সাজিতেন বলিয়া উহা বা কোন দেশের লোক, তাহা প্রায়ই বুঝিতে পারা যাইত না। যে বৈশ্য ফুনানরাজ চন্দ্রবর্মণ নিকট ভাবতের কাহিনী কাহীন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম চনা ইতিহাসিকরা লিখিয়াছেন—বিব-সং-নিং। ইহা ভারতীয় নাম নাহে। অথচ চীন লেখকগণ লিখিয়াছেন, তিনি ভারতীয় বৈশ্য ছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমেই আন এক জন বাঙ্গা ফুনান অধিনে গমন করেন। তিনি প্রচাণ করেন য, তাঁহার নামও কোঁগুলা, এবং তিনি পত্নাদিষ্ট হইয়া ঐ রাজ্যে রাজত্ব করবার জন্ম গিয়াছিলেন। দেশের সকল লোক আসিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। লিচাং-গু নামক চীন ইতিহাসিক বলেন, তিনি ভারতীয় আচার-পদ্ধতির অনুকরণে ফুনানের বাহিনী-নীতি এবং আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, ইনি পূর্ববর্তী কোঁগুলাব নাম জাল করিয়া কোঁশলে ফুনান রাজ্যের সিংহাসন লইয়াছিলেন। এই কোঁগুলা-বংশের রাজা কোঁগুলা জয়বর্মণ খৃষ্টীয় ৪৮৪ অব্দে শাকা নাগসেন নামক জৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে চীনের রাজার দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। নাগসেন চীনরাজকে বাটালিপুত্রের ক্ষোদিত একটি স্তব্ধময় শিবমূর্তি, শ্বেতেন্দ্রন কাষ্ঠে ক্ষোদিত একটি হস্তমূর্তি, এবং গজদন্তনির্মিত দুইটি স্তূপ উপহার দিয়াছিলেন। ইনি চীনরাজকে বলিয়াছিলেন,—"ফুনানের সর্বত্রই মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে। মহাদেব পবিত্র মোটান পর্বতে দেখা দিয়াছিলেন। ঐ পর্বতে একটি তুর্কা কিম্বা কোন প্রকাণ উদ্ভিদই জন্মে না।" খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পদ্যন্ত ফুনান রাজ্যে শৈবধর্মের এবং বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য ছিল। এই দেশ হইতে অনেক ধার্মিক ব্যক্তি চীন দেশে গমন করেন। সজ্বপাল নামক এক জন বৌদ্ধ সাধু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফুনান হইতে চীন দেশে উপনীত হইয়া অনেক ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র সেন নামক জৈনিক বৌদ্ধ সাধু সজ্বপালকে ঐ কার্যে সাহায্য করিতেন। তিনি চীনা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পাবেন নাই।

কোঁগুলাবংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ফুনানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর চেনলা অর্থাৎ কম্বোডিয়া রাজ্যের রাজারা ফুনান আক্রমণ করিয়া ঐ রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিচারক) ।

বিজ্ঞান-জগৎ

অন্ধকারে যুদ্ধ চলবে

স্বাধীন কখন যুদ্ধ বাধবে, তাব কোনো ঠিক-ঠিকানা নাট। হয় তো অমাবস্যা-বাতেই মহাকালী নব-জর্নী-বেশে ডাক দিবে:—



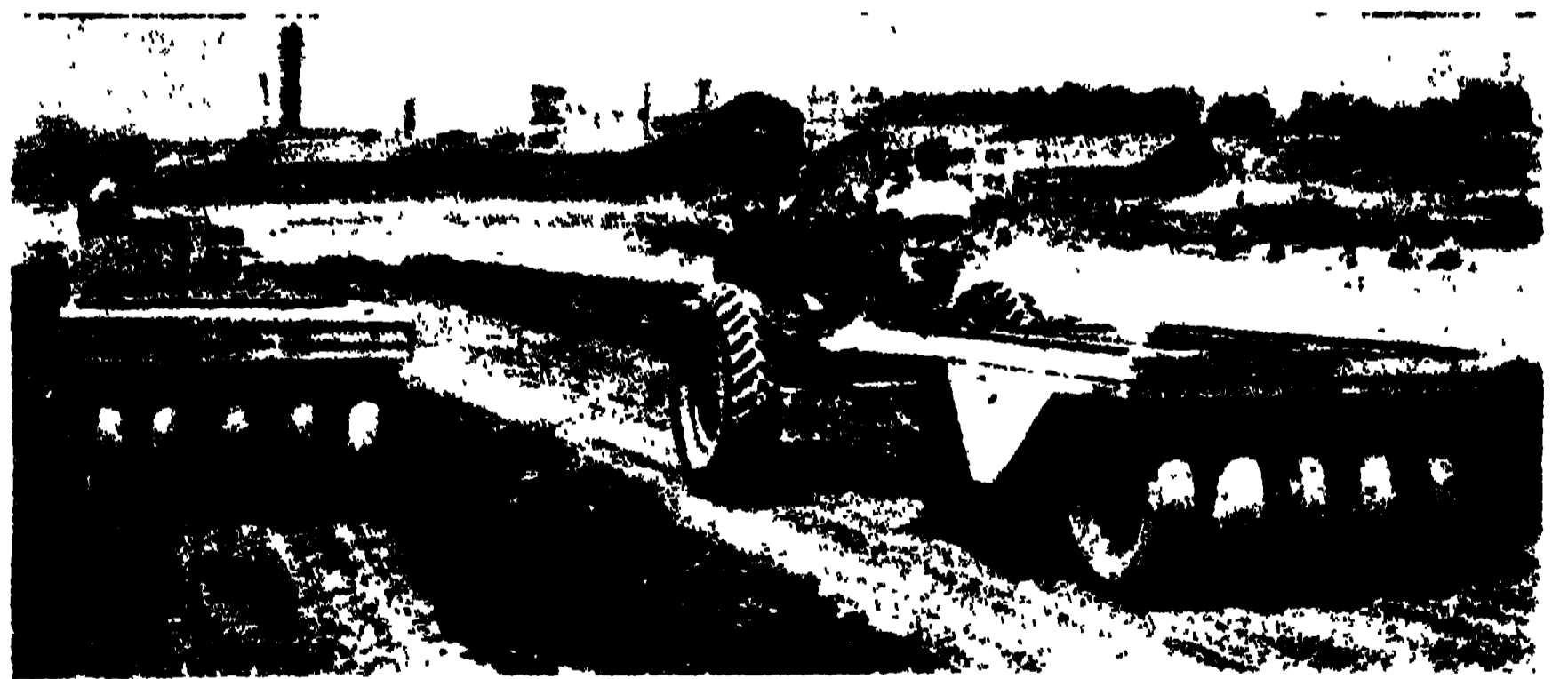
চোখে কালো চশমা

সে-অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা যায় না,— অথচ শত্রু আসিয়া জানা দিয়াছে—উপায়? এ-সমস্যা-নিবারণের জন্য ব্রিটিশ ফৌজকে আঁধারে যুদ্ধ করার বিজ্ঞা শিখানো হইতেছে। দিনের বেলায় মৈত্রদের চোখে দল-কালো কাচের চশমা আঁটিয়া নাই-বাটে ছাডিয়া দেওয়া হইতেছে—আদেশ, চোখে এই কালো তুলি আঁটিয়া বন্দুক চালাও! চশমার কালো কাচে চরাচর ছায়ায় ঢাকা অস্পষ্ট দেখায়; সে-আঁধারের আব-ছায়ায় দৃষ্টি-চালনা রপ্ত করিয়া তাহাদিগকে অস্ত্রচালনা করিতে হয়। মসৌরুক্ষ অন্ধকার-বাতে খালি-চোখে চাবি দিক যেমন দেখায়, এই কালো চশমার আবরণ চোখে আঁটা থাকিলে দিনের বেলায় চাবি দিক ঠিক তেমনি দেখায়! কাজেই এ-ভাবে অস্ত্র-চালনা অভ্যাস করার ফলে সেনারা অন্ধকার-বাত্রে সুদক্ষ ভাবে অস্ত্র-চালনা করিতে পারিবেন। উপরেব ছবি দেখিলে এ বিজ্ঞা-শিক্ষার প্রণালী বুঝিবেন।

খোয়া-পেয়া রোলার

পথ-ঘাট তৈয়ারী বা মেঝেমটির সময় যে ষ্টীম-বোলার পাঁচালনা করা হয়, সে বোলারের চাকা ভারী লোহার তৈয়ারী; এবং এ রোলার বাষ্পযোগে চলে বলিয়া গাড়ীর গতি হয় অতিশয় মন্দ। সম্প্রতি আমেরিকায় ষ্টীম-বোলারের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক বোলারের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ-গাড়ীতে

খানি ভারী ববাবের টায়ার সংলগ্ন করা হইয়াছে এবং গাড়ী চলে বৈজ্ঞানিক শক্তিতে। পাঁচখানি ববাবের টায়ারের

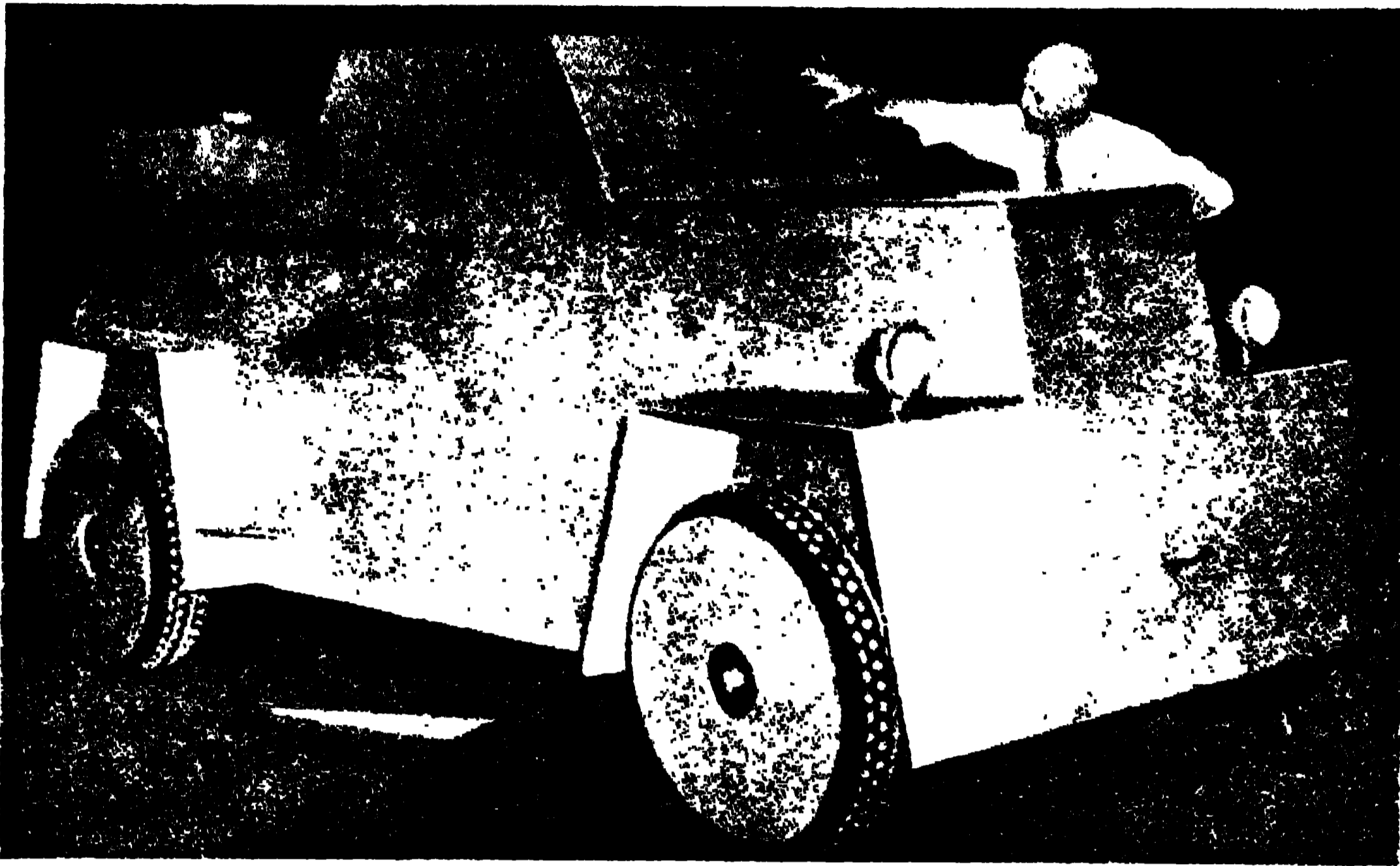


ববার-টায়ার বোলার

খোয়া-ছড়ি চূর্ণ হইয়া পথের গায়ে বসিয়া পথকে সমতল-মসৃণ করিয়া তোলে; বৈজ্ঞানিক শক্তির জগৎ কাজে বেশ দ্রুতভাবে সমাপ্ত হয়।

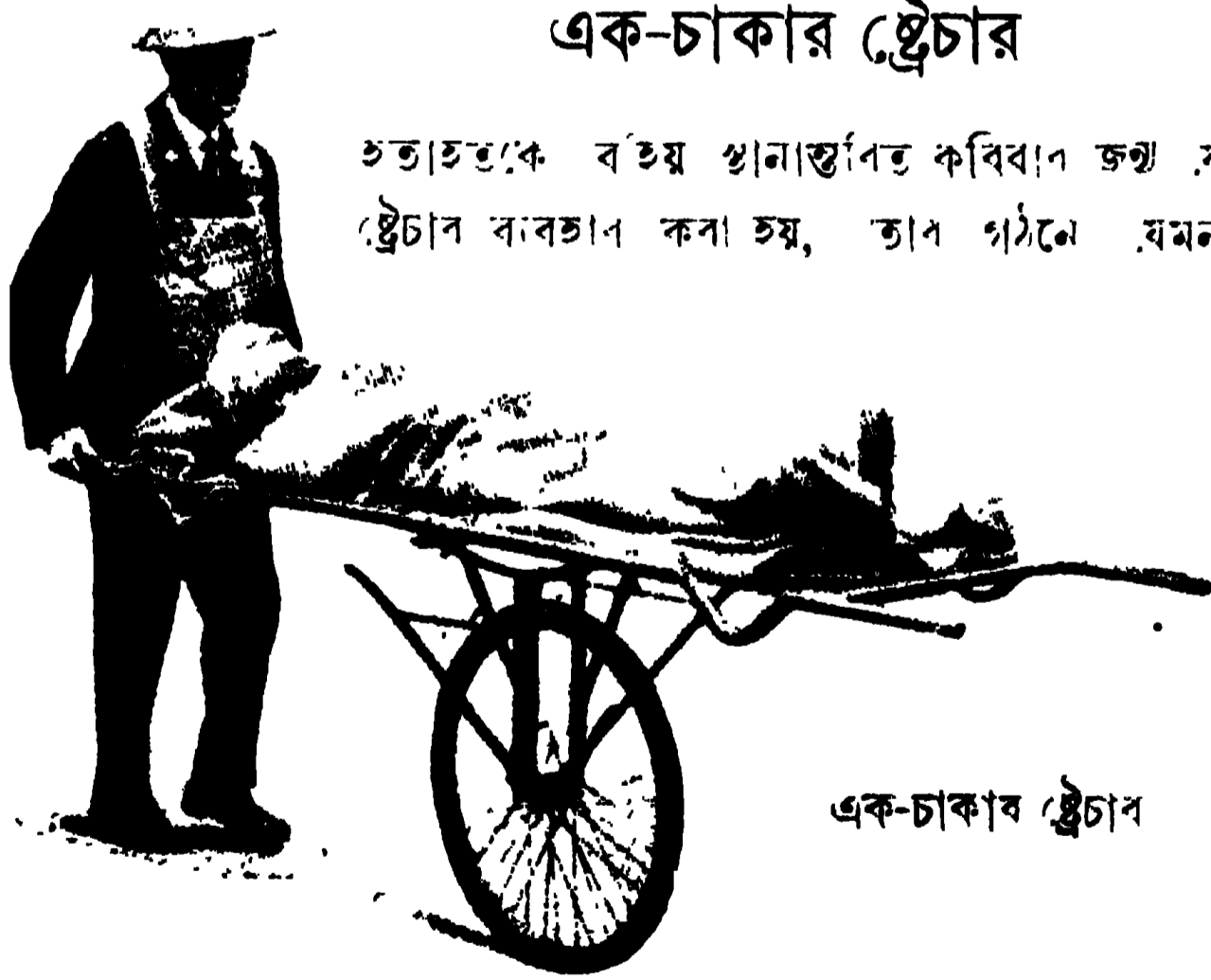
গুলী-রোধক অস্ত্র-যান

মার্কিন যুদ্ধে যোগ না দিলেও এ যুগের সমন্বয়যোগী আয়োজন-সাধনে তাব অধাবসায়ের সীমা নাট। সম্প্রতি



দুর্ভেজ গাড়ী

সেখানে যে অস্ত্র-যান (armored car) নিশ্চিত হইতেছে, তাহা আপাদমস্তক আধ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের আবরণে ঢাকা। সাধারণ মোটর-গাড়ীর এঞ্জিন ও চাশিস্ এ-গাড়ীতে ফিট করা হইতেছে। এ গাড়ীর ইস্পাতের আবরণ এমন মজবুত যে, বন্দকের গুলী বা কামানের গোলা তাহা দেখে সূচ-প্রবেশায় নির্দিষ্টে পারিবেন না। এ গাড়ী যেন দুর্ভেজ দুর্গ।



এক-চাকার ষ্ট্রচার

হতাততকে বহুয় প্রানান্তর্গত কবিবান জগৎ সা ষ্ট্রচার ব্যবহাৰ কৰা হয়, তাৰ গঠনে যমল

এক-চাকার ষ্ট্রচার

মটিলতা, সে-ষ্ট্রচার বাহিতেও তিন-চার জন লোকের প্রয়োজন। কিন্তু এ-যুদ্ধে বহু লোককে যদি এক জন-মাত্র হতাহতের বাহন-স্বরূপ নিযুক্ত রাখা হয়, তাহা হইলে লোকাভা-শতঃ অসুবিধার আর অন্ত থাকে না। এ-জগৎ এক-চাকার ষ্ট্রচার কৈশাবী হইয়াছে। বাইসিকলের একটি মাত্র চাকার

উপব সাধারণ ষ্ট্রচার ফিট করিয়া আধু-লাঞ্ছের কাজ কতখানি স্বচ্ছন্দ ও সহজ হই-য়াছে, ছবিতে ষ্ট্রচারের গডন দেখিয়া, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রমিকের স্বস্তি

বিষাক্ত বাষ্প, ধূলি প্রভৃতির মধ্যে নিত্য-ক্ষণ থাকিয়া যে-সব শ্রমিককে কাজ করিতে হয়, শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে বিষ-বাষ্প ও ধূলি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া তাদের স্বাস্থ্যস্থানি এবং বহু ক্ষেত্রে ফুশফুশ-যজ্ঞে ব্যাধি, যক্ষ্মা,—এমান নানা উপসর্গে অকাল বিয়োগেব আশঙ্কা প্রচুর। এ আশঙ্কা মোচন করিয়া তাহা বাহাতে নিকপদেব বিষ-বাষ্প প্রভৃতি উপসর্গাদিৰ মধ্যেও কাজ করিতে পারে, সে-জগৎ বিচিত্র নাসাবরণ সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা আশ্রয় যেমন চশমা আঁটি, যেমনি তাহাে এই নাসাবরণ নাক ও গািল্য কাজ করিলে



নাকে চুলি

নিশ্বাসেব সঙ্গে বিষ-বাষ্প বা ধূলি প্রভৃতি ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এ নাসাবরণে ভালভ, আঁটা আছে। ভালভটি এমন কৌশলে বিরচিত যে, নিশ্বাস-বায়ু-গ্রহণের সময় বাতাস হইতে বিষ-আবর্জনাদি এ ভালভ, ছাঁকিয়া বাহিরে নিষ্কাশিত কবে এবং বিস্তৃত বাতাসটুকু মাত্র দেহাভাস্তবে প্রবিষ্ট হয়।

নাসায় আটকাইয়া রাখিবার জন্য ইলাস্টিকের ব্যবস্থা আছে ;
তু' বানে সে ইলাস্টিক জঁজিয়া এ আবরণ নাসায় সংলগ্ন করা যায় ।

শব্দভেদী রকেট-বোমা

মার্কিন বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জে, আর, ফিশ এই যুদ্ধের বিপ্লবীকার
দিনে এক-রকম ক্ষুদ্রকার্য রকেট-প্লেন তৈয়ারী করিয়াছেন । এ
প্লেন ঘণ্টায় ৯০০ মাইল বেগে চলে । এ রকেট-প্লেন এমন
কোশলে নির্মিত যে, নীচে হইতে উর্দ্ধে চালনা করিলে এ রকেট
বিমান-পথে বিপক্ষের প্লেন লক্ষ্য করিয়া তাব সঙ্গে সবলে

টায়ারের পরমায়ু

লবি বা মোটর-ট্রাকের এক-একপার্নি মোটা টায়ারের দাম বড়
সামান্য নয় ! এ টায়ার ফাঁশিলে লবির মালিকের বিপত্তির আব অস্ত
থাকে না ! সম্প্রতি এই মোটা টায়ারের রক্ষা-
কল্পে লোহাব-তাবে-বোনা বেন্ট বা চেন

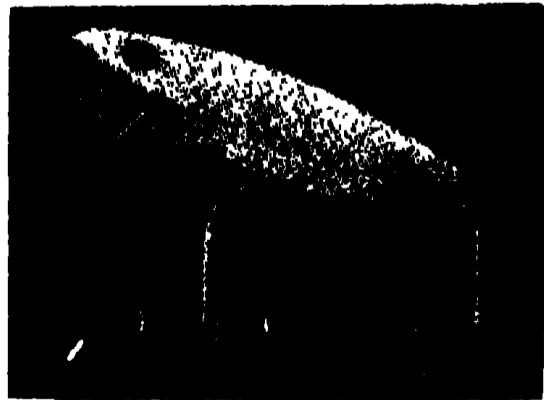


টায়ারের চেন

নির্মিত হইতেছে । মাকড়শাব জালের প্যাটার্নে এ বেন্ট বচিত
হইতেছে । টায়ারের গায়ে এই বেন্ট জড়াইয়া দিলে গাড়ীর গতিতে
কোন অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে না, অথচ টায়ারের দ্রুত ও কাঁটা-খোঁচা-
জখমের দায়ে পবিত্রাণ পাইয়া দীর্ঘজীবী হইবে । যে লবির শক্তি ৬০
অশ্ব-শক্তিব (horse-power) সমতুল্য, সে লবির টায়ারে এই বেন্ট
আটকাইয়া দিন ; দিয়া লবিতে ১৬২৫ মণ ভাব চাপাইয়া লবি
চালান, লবির টায়ার এতটুকু জখম হইবে না !

ফাৎনার জৌলুশ

ছিপ ফেলিয়া রাত্রি মাছ ধরিবার জন্য এক-বকম দীপ্তিমান
ফাৎনা তৈয়ারী হইয়াছে । ছিপের
সূতায় এ-ফাৎনা আটকাইয়া
দিনের সূর্য্য-কিবণে কিছুক্ষণ
ফেলিয়া রাখিলে কিম্বা গ্যাস-
লাইটের স্পর্শ লাগিলে এ-ফাৎনা
পাঁচ-সাত ঘণ্টা কাল জ্বলিবে ।
এ-ফাৎনা জলে দেখিলে আলোর
রশ্মিতে ভুলিয়া মাছ আনিয়া ছিপে ধরা দিবে । স্তবৎ ধরা বাত্রে
মাছ ধরিতে চান, এ ফাৎনা কাঁদের সূচায় !



ফাৎনার আলো



শব্দভেদী রকেট

গিয়া আঘাত করিবে । আঘাত-মাত্র রকেটটি ফাটিয়া বিপক্ষ-
প্লেনকে দগ্ধ ও ভস্ম করিয়া দিবে । সম্প্রতি মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের
সমর-বিভাগ কর্তৃক এ রকেটের শক্তির পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল ;
পরীক্ষায় রকেট সম্মানে উর্দ্ধীর্ণ হইয়াছে ! অতএব আশা করা
যায়, বিপক্ষের বিমান-পথে আক্রমণ এ রকেটে কক্ষ হইবে !

শূন্যমার্গে নিরাপদ বিচরণ

বহু-উর্দ্ধে শূন্যমার্গে প্লেনে বিচরণ করা বাতাসের চাপে দাকণ
গোলযোগ বশতঃ স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ নহে । সম্প্রতি এই অস্বাচ্ছন্দ্য
মোচন করিয়া শূন্যমার্গে বিচরণকে নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য
আমেরিকার নিয়ামি-নিবাসী বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসক উর্দ্ধে বাল্ফ
গ্রীন্ খেলার বেলুনের ছাঁদে এক-বকম বেলুন তৈয়ারী করিয়াছেন ।
এ-বেলুনের এক প্রান্তে একটি বোটা বা নিপল আছে । বেলুনটিকে
বাধিয়া প্লেনে বসিয়া শূন্যমার্গে চলুন—যত উর্দ্ধে উঠিতে চান,
উঠুন । অতুর্দ্ধলোকে বাতাসের ঘনতা-হেতু নিশ্বাস-গ্রহণে
অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবামাত্র বেলুনের বোটার বা নিপলটুকু এক-নাসারন্ধ্রে
লাগাইয়া আঙুলে টিপিয়া অপর নাসাবন্ধ বন্ধ করিবেন, তার পর
এক-নাকে শ্বাস-বায়ু ছাড়িয়া বেলুনটিকে ফাঁপাইয়া মাত্র
বেলুনটি পূর্ণভাবে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিবে । তখন বেলুনটিকে
তু' হাতে চাপিয়া মুখ-বিবরে প্রবিষ্ট করান ; যে নিশ্বাস-বায়ুতে



শূন্যে বাতাস লওয়া

বেলুন কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, সেই বাবু তখন মুখমধ্যে নির্গত হইবে; এবং বাতাস পাওয়ার ফলে শ্বাসকষ্ট-জনিত অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্ব ঘূটয়া যাইবে।

অক্ষয় এনামেল

নূতন এক বকম এনামেল-পেইন্ট তৈয়ারী হইয়াছে। টেবিল, চেয়ার, খাট প্রভৃতি ইহাতে পেইন্ট করিলে তাহাতে মনীচা ধরবে



এনামেল-পেইন্ট

না, বা কাঠ আঙনে পুড়িবেনা। এ পেইন্টে চেয়ার-টেবিলের পালিশ দীর্ঘকাল অক্ষয় থাকিবে। এ এনামেল পেইন্ট—নানা বর্ণের পাওয়া যায়। এক-কোট দিলেই কাজ চলে। আনাড়ি-তাহতেও এ পেইন্টের কাজে টেবিল-চেয়ারের গায়ে ব্রাশের দাগ পড়ে না, এটুকু এ-পেইন্টের বৈশিষ্ট্য।

বাসি রুটির শাঁস

ফেন্টের হাট, বেন্ট প্রভৃতি যদি ময়লা করিয়া হয়, তাহা হইলে



সেই হাট ও বেন্টের গায়ে রুটির শাঁস ঘষিয়া লইবেন; ফেন্টের তাহা রঙ ফিরিয়া আসিবে।

জুতার ব্যাক

পথ হইতে গৃহে ফিরিয়া পায়ের জুতা-জোড়া কোথায় বাগি, ইহা এক মস্ত সমস্যা! পথের ধূলা-আবজ্জনা ঘবে না ছড়ায়—তা ছাড়া

জুতা বাগি যাবেন অনেকপািন জায়গা পাছে জুড়িয়া বসি, বলুন তো, কতপািন জায়গা জুতা বজাড়া ডিয়া দিতে পাবেন? পায়ের ছবিব মতো যদি ব্যাক তৈয়া দী করিয়া লন, তাহা হইলে এ সমস্যার নিরাকরণ হয়। ব্যাকটি কোনো স্থানের পাশে



জুতা বাখা

খাটানো চলে। এ-ব্যাকে যদি কতকগুলি লোহার ক্লিপ, লাগাইয়া লন, তাহা হইলে এক জোড়া কেন, অনেক জোড়া জুতা বাগিতে পারিবেন—ঘবেব জায়গা জোড়া থাকিবে না!

গরম-জলের বোতল

রবারেব তৈয়ারী গরম-জলের বোতল বড় শীঘ্র ফাটিয়া যায়—
ফাটিয়া গেলেই আমরা তাহা ফেলিয়া দিই। কিন্তু এ অপচয় আর

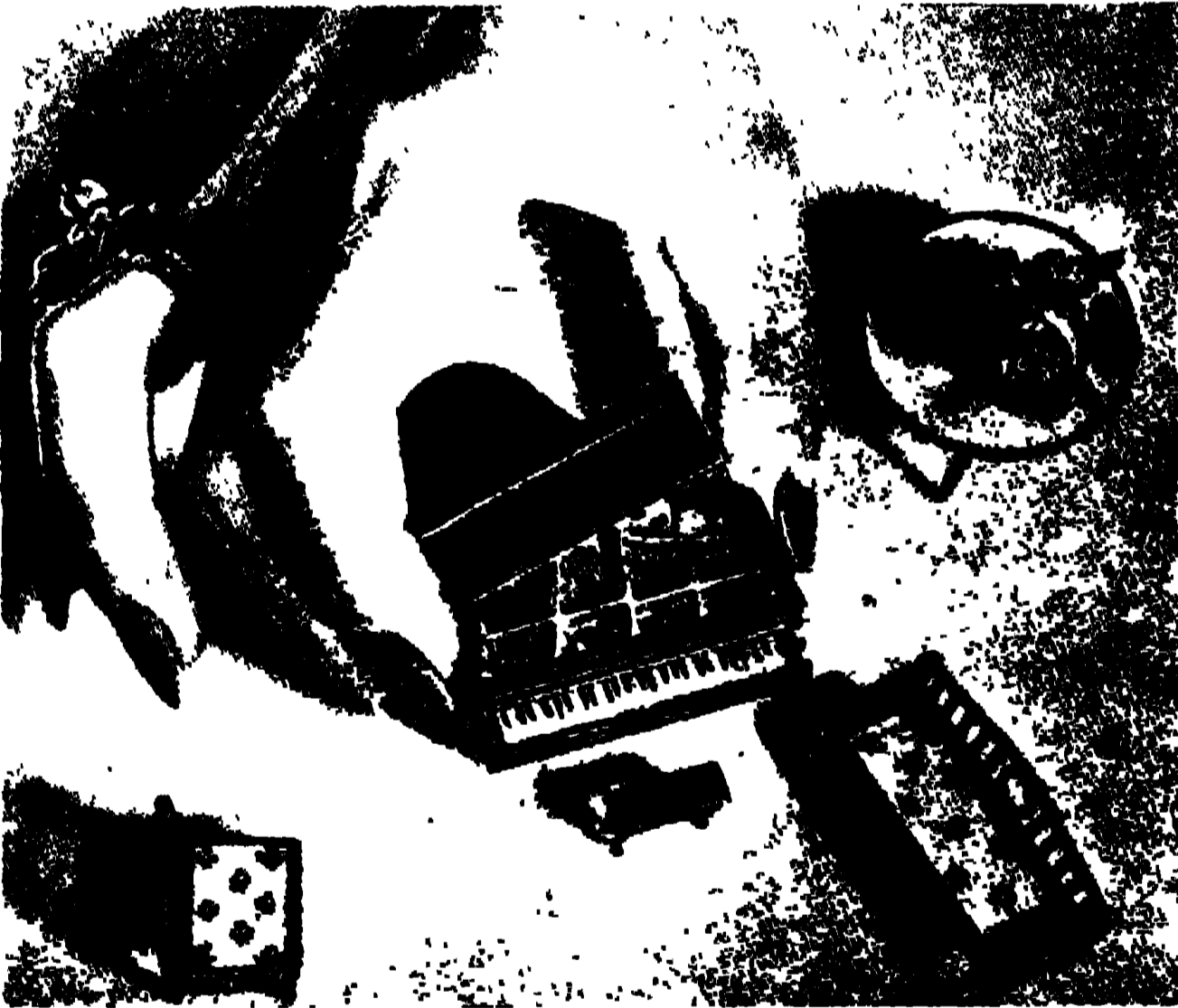


বোতলে গবম বালি

কবিবেন না। ফাটা বোতলের মধ্যে তপ্ত লবণ বা বালি পুরিয়া
সে বোতল দিয়া সেক দিবার কাজ চলিবে চমৎকার।

পকেট-সাইজ পিয়ানো

যাকে বলে গ্রাণ্ড পিয়ানো—যে পিয়ানো ঘবে রাখিতে হইলে



পকেট-পিয়ানো

ঘরের মধ্যে অনেকখানি জায়গা দরকার—সেই গ্রাণ্ড পিয়ানোর
পকেট-সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এ-পিয়ানো আকারে এত ছোট যে,
মুড়িয়া পকেটে রাখা চলে। পিয়ানোটিতে আছে গজদস্ত-নির্মিত
'কী' বা চাবি; এবং ছোট একটি কাঠির আঘাতে এ পিয়ানো
বাজানো যায়। সুর যা ওঠে, তাহা খেলা-ঘরের পিয়ানোর
ধ্বনির মতো নয়; আসল-পিয়ানোর সুর-ঝঙ্কারের মতোই এ-
পিয়ানোর সুর-ঝঙ্কার। সান্ফ্রানসিসকোর প্রদর্শনীতে সম্প্রতি
এ-পিয়ানো দেখানো হইয়াছে।

ফুল-বাহার

মোটর-গাড়ীর হেড-লাইট—তার লেন্স এবং রিফ্লেক্টর খুলিয়া
লইয়া লেন্সের দিকে তিনটা বিঁধ করিয়া সেট বিধের মধ্য দিয়া



হেড-লাইটে ফুলের টব

লোহার তার চালাইয়া লাইটের খালের মধ্যে মাটি পুরিয়া সেই
মাটিতে মগুঁমী-ফুলের বীজ বা চারা পুঁতিয়া জলসেকে লালন
করুন, গাছে ফুল ফুটিলে ঘরের বাহার খুলিবে।

নব-রূপিণী

বাজাও তোমার হাতের বীণা, কণ্ঠ আজি মুখর করো
রক্তমুগের গানটি গেয়ে এসো যদি আস্তে পারো।

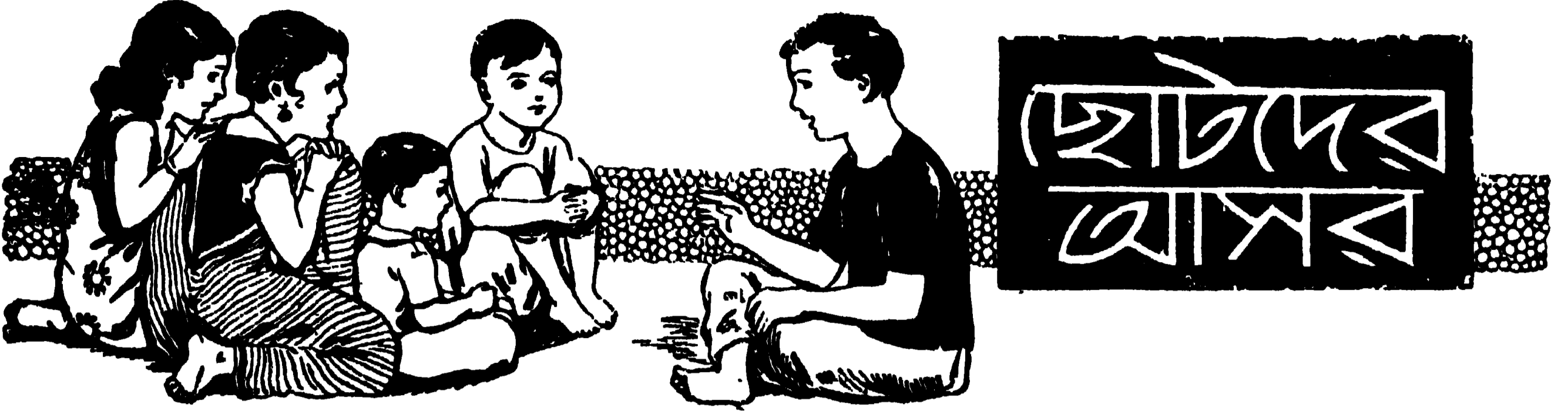
সৃষ্টি করো নূতন কবি,
দেখাও তোমার নূতন ছবি—

হোক না নূতন মজ্রে আজি স্তোত্র তোমার নূতনতর !

নাও মা তুলে খড়্গখানি
লজ্জা কি গো ! বীণাপাণি—

চরণ তোলা রক্তজবায়, পদ্মাসন বারেক ছাড়ো !

শ্রীচরণদাস ঘোষ।



শিশুর খেলার সাথী ডিংও

(হিংস্র পশুর শিশুপ্রীতি)

তোমরা অনেকেই, বোধ হয়, ডিংও নাম শুনেছ। এগুলো দেখতে খুব বড় বুনো কুকুরের মতো। এদের দাঁত যেমন বড়, তেমনি ধারালো। নেকড়ে বাঘের চেহারার সঙ্গে ডিংওর চেহারা অনেকটা মিল আছে; আর এদের স্বভাবও ঠিক নেকড়ে বাঘের স্বভাবের মত, ভয়ানক হিংস্রটে। আফ্রিকায় ও আমেরিকায় এক রকম বাছড় আছে, তারা বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত পান করে; চামচিকের সঙ্গে তাদের চেহারার যেমন কোন তফাৎ নেই, সেই রকম কোন কোন জাতের কুকুরের চেহারার সঙ্গে ডিংওর চেহারার বিশেষ কোন তফাৎ দেখা যায় না; কিন্তু স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। ডিংওগুলোকে কেবল অস্ট্রেলিয়াতেই দেখতে পাওয়া যায়। তাদের অত্যাচার এতই বেশী যে, অস্ট্রেলিয়ার সরকার কিছু দিন পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন, ডিংও শিকার ক'রে তার মাথা আনতে পারলে সরকার শিকারীকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন। ডিংওগুলো গৃহস্থের ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগীর পাল ধ্বংস করে। ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে চুরি ক'রে জঙ্গলে নিয়ে যায়। এতেই বুঝতে পারচো, ডিংও অস্ট্রেলিয়াবাসীদের কি রকম ভয়ানক শত্রু! বিড়ালকে তোমরা বল 'বাঘের মাসী', সেই রকম ডিংওগুলোকে নেকড়ে বাঘের 'মামাতো ভাই' বলা যেতে পারে।

এই রকম ভয়ানক হিংস্রটে জানোয়ার ডিংওর একটি শিশুর প্রতি ভালবাসার যে গল্প আজ তোমাদের বলছি, তা' শুনে আশা করি, তোমরা খুসী হবে, এবং খুব আশ্চর্য ব্যাপার বলেই তোমাদের মনে হবে। আমি যা বলছি—তার একটি কথাও মিথ্যা নয়; কিন্তু এমনই অদ্ভুত যে, সত্য বলে বিশ্বাস করাও কঠিন। এক জন অস্ট্রেলিয়ান ভ্রমলোক নিজের চোখে দেখে অল্প দিন পূর্বে এই ঘটনার কথা লিখেছেন। একটা বাঘিনী মেদিনীপুর অঞ্চলের একটি ছোট ছেলে ধ'রে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাকে নিজের শাবকগুলোর সঙ্গে প্রতিপালন করেছিল, ছেলেটি পরে শিকারীদের হাতে ধরা পড়ে—এ গল্প তোমরা অনেকেই শুনেছ; শিশুর প্রতি এই ডিংওটার স্নেহও অনেকটা সেই রকম।

অস্ট্রেলিয়ার একটা প্রদেশের নাম কুইন্সল্যান্ড। কুইন্সল্যান্ডের বিভিন্ন অংশে খুব বড় বড় অরণ্য আছে। এই সকল অরণ্যের একটির নাম লিটল-বাঙ্গা ক্রীকের অরণ্য। এই অরণ্যের এক ধারে মিষ্টার প্রেস্টিস নামক ভ্রমলোকের বাড়ী। মিষ্টার প্রেস্টিস একটা সাঁকো নির্মাণের ভার নিয়েছিলেন; এই কাজের জন্য তাঁকে সেই অরণ্যে ঘুরে অনেক দূর বন থেকে মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি কাটিয়ে আনতে হচ্ছিল।

কয়েক মাস পূর্বে এক দিন মিষ্টার প্রেস্টিস কাঠ সংগ্রহ ক'রতে লোকজন নিয়ে কয়েক মাইল দূরে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি শ্রান্ত দেহে বাড়ী ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে খাবার চাবেন, এজন্য তাঁর স্ত্রী বিবি-প্রেস্টিস উনানে তাওয়া চাপিয়ে পিঠে তৈয়ারী ক'রছিলেন; আর তাঁর চার বছরের ছেলে কেভিন তার ছোট ট্রাইসাইকেলখানা নিয়ে ঘরের বাইরে একা খেলা ক'রছিল। নিকটে অল্প কোন লোকের বাড়ী ছিল না; কেভিনের খেলাবও কোন সঙ্গীও ছিল না।

তখন আর বেশী বেলা ছিল না। কেভিন জানতো, তার মা উনানের কাছে ব'সে পিঠে তাজ্জছেন; এজন্য সে খেলা ছেড়ে তার মায়েব কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো, "মা, মা, খুব ভাল একটা মস্ত-বড়ো কুকুর দেখলাম, সেই কুকুরটার সঙ্গে খেলা ক'বতে আমার ভারী ইচ্ছে হ'য়েছে। তার সঙ্গে খেলা ক'রব? কি বল তুমি?"

মিসেস প্রেস্টিস জানতেন—তাঁর বাড়ীর কাছে কি, সেই অঞ্চলে একটিও কুকুর ছিল না; তবে কুকুর কোথা থেকে এলো? তিনি তাওয়ায় খুস্তি না'ড়তে না'ড়তে অস্বমনস্ক ভাবে বললেন, "কুকুর? কুকুর কোথায় দেখলি রে, পাগ'লা? আমাদের এ-গাঁয়ে তো কুকুর নেই!"

কেভিন মাথা নেড়ে হেসে বললো, "হ্যাঁ মা, আমি সত্যি বলছি, খাসা কুকুর,—মস্ত বড়ো। তুমি উঠে একবার বাইরে এসো, তা হ'লেই দেখতে পাবে।"

ছেলের কথা শুনে মায়ের বড় কৌতূহল হ'ল,—তা'ই ত, কুকুর কোথা থেকে এলো? তিনি উনানের কাছ-থেকে উঠে পড়লেন; কেভিন তাঁর হাত ধ'রে তাঁকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে চললো। তার মুখে হাসি; মনে যেমন আনন্দ, তেমনি উৎসাহ! এত দিন পরে তার খেলার একটা সঙ্গী জুটেছে!

মিষ্টার প্রেস্টিসের ঘরের বাইরে নিবিড় অরণ্য। কেভিনের মা দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন; কিন্তু চার দিকে তাকিয়ে কোনও দিকে কুকুর দেখতে পেলেন না। তিনি ভাবলেন—কেভিন তাঁর সঙ্গে চালাকি ক'রেছে! তিনি বললেন, "ঠেক রে কেভ, কুকুর কোথায়? ছুঁই ছেলে, সব তোমর নষ্টামী!"

'কুকুরটা' খানিক আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে তাকে দেখতে না পেয়ে, এবং মা তার কথা বিশ্বাস করেন-নি বুঝে কেভিনের মনে দুঃখ হ'ল। সে চার দিকে চাইতে-চাইতে শেষে একটা ঝোপের দিকে চেরেই উৎসাহভরে বলে উঠলো, "ঐ দেখ মা! ঐ বাটল গাছটার নীচে চেয়ে দেখ, ওটা—কুকুর নয়?"

কেভিনের মা ঝোপের ধারে সেই বাটল গাছের দিকে তাকিয়েই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন! কি সর্বনাশ, ওটা কি কুকুর? ওটা যে একাও ডিংও! ডিংওটা তাঁর ঘরের দরজা থেকে ত্রিশ-চল্লিশ হাত

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ-দুটো তার আঙনের ভাঁটার মত জ্বলছিল। কেভিনের মায়ের চীৎকার শুনে ডিঙটা না পালিয়ে, ধাবালো দাঁত-জ্বলো বের-ক'রে 'খ্যাৎ-খ্যাৎ' শব্দে ভয় দেখাতে লাগলো। কি বিকট চেহারা!

কেভিনের মা সহরে মেয়ে; অল্প দিন আগে এই জঙ্গলে স্বামীর কাছে এসেছিলেন। তিনি আগে কোন দিন জ্যান্ত ডিঙ দেখেন-নি; কিন্তু এগুলো কি রকম ভিঃস্ট্রেটে ও অত্যাচারী জানোয়ার—সে খবর তাঁর জানা ছিল। কেভিন সব সময় ঘবের বাইরে জঙ্গলের ধাবে খেলা কবে, ডিঙটা হঠাৎ তাকে মুখে ক'বে যদি জঙ্গলে ঢোকে, তা হ'লেই সর্বনাশ! হুশিঃস্থায়, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি তাঁর শোবার ঘরে প্রবেশ করলেন। সেই ঘবের এক কোণে তাঁর স্বামী টোটা-ভনা রাইফেলটা বেখে গিয়েছিলেন। কেভিনের মা খপ্ ক'রে সেটা তুলে নিলেন, এবং দরজাব বাইবে ফিবে এসেই ডিঙটাকে লক্ষ্য ক'বে 'হুডুম' শব্দে আওয়াজ ক'রলেন। কিন্তু ডিঙটাকে নিশানা ক'রবার সময় তাঁর হাত কাঁপছিল, আর তাঁর শিকাবের অভ্যাসও ছিল না। গুলীটা ডিঙের শবীবের পাশ দিয়ে চলে গেল; ডিঙটাও তৎক্ষণাৎ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ ক'রে অদৃশ্য হ'ল।

কেভিনের মা উনানের ওপর তাওয়ান পিঠে চাপিয়ে রেখে এসেছিলেন; তিনি তাওয়ান উনান থেকে না নামিয়েই, তাড়াতাড়ি ডিঙ শিকাব করতে আসায় পিঠে পুড়ে চর্গন্ধ বেরলো! তখন তিনি তাড়াতাড়ি উনানের কাছে ফিরে-গিয়ে দেখলেন—সেগুলো পুড়ে অখাভ হ'য়েছে! এ-দিকে তাঁর স্বামীর বাড়ী-ফিরবার সময় হ'য়ে এসেছে; বাড়ী ফিরেই তিনি খাবার দিতে ব'লবেন। কাজেই কেভিনের মা বাস্তব হ'য়ে নূতন ক'রে পিঠে ভাজতে বসলেন। কেভিনের বা সেই ডিঙটার কথা তিনি ভুলেই গেলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পবে তাঁর হাতেব কাজ শেষ হ'লে তিনি পিঠেগুলি খোবায় তুলে ঢেকে রাখলেন। তাঁর মনে হ'ল, কেভিন পিঠে ভালবাসে, এতক্ষণেও সে খেলা ছেড়ে তাঁব কাছে পিঠে খেতে এল না কেন? অন্ধকাব ক্রমেই গাঢ় হ'য়ে আসছিল। কেভিনের মা তার নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে বাইবেব দিকে এলেন।

বাইবে এসেও তিনি কেভিনকে কয়েক বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন, কিন্তু তাব সাড়া পেলেন না; কোন দিকে তাকে দেখতেও পেলেন না। দেখলেন, তাব ট্রাই-সিকলপানা বনের ধাবে কাত হ'য়ে প'ড়ে আছে, কিন্তু কেভিন কোথায়?

কেভিনকে না দেখে তার মা ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন; তার পর সন্ধ্যার আধারে বনের দিকে তাকাতেই, সেই প্রকাণ্ড ডিঙটার দাঁত বের-ক'রে মুখ-ভ্যাংচানো তাঁর মনে প'ড়লো—তবে কি নেকড়ের মতো হুঁদাস্ত সেই ডিঙটাই তাঁর চাব বৎসবের ছেলেটিকে মুখে-তুলে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে—তিনি আর ভাবতে পারলেন না, ভয়ে তিনি খর খর করে কাঁপতে লাগলেন।

"কেভ, বাবা কেভিন রে, তুই কোথায়?"—তিনি চিৎকার ক'রে তাকে ডাকতে-ডাকতে চার দিকে ছুটাছুটি ক'রতে লাগলেন। তখন পাগলের মতো তাঁর অবস্থা! তাঁর বাড়ীর অল্প দূরেই হাজার হাজার বিঘে জুড়ে নিবিড় অরণ্য; তার পর হুঁগম পাহাড়, পাহাড়ের বৃকে বড় বড় গুহা; সেখানে পালে-পালে ডিঙ, দাঁতালো বুনো শূরোর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ে-সাপ বাস করে! কেভিন সেই দিকে

গিয়ে-থাকলে আর কি তাকে পাওয়া যাবে?—এই সকল কথা ভেবে কেভিনের মা সেই বনের ধারে উপুড় হ'য়ে পড়ে, "বাপ রে, সোনা রে, কেভ রে!" ব'লে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলেন। চোখের জলে তাঁর বৃক ভেসে গেল। শেষে তিনি আর সেখানে পড়ে থাকতে না পেরে, কেভিনকে খুঁজতে সেই বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

সেই বনের ভিতর কিছু দূরে এক দল কাঠুরে টোঙ তুলে সেই সকল টোঙে বাস ক'রছিল। তারা ঠিকেদাবেব জন্তে সেই বনে পাইন কাঠ কাটতো। তাবা তখন কাজ শেষ ক'বে টোঙে ফিরে এসেছিল। সেই রাত্তিবে পনের মাইল দূরে কেনিলওয়ান্থ সহরে নাচ হবে শুনে তারা তখন সেই নাচ দেখতে যাচ্ছিল। কেভিনের মাকে তারা চিন্তো; তাঁকে তাবা পাগলের মতো জঙ্গলের মধ্যে দৌড়িয়ে যেতে দেখে, তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—"কি হ'য়েছে গিন্নি! পাগলের মতো ছুটেছ কোথায়?"—কেভিনের মা কাঁদতে কাঁদতে তাঁব বিপদেব কথা তাদের কাছে প্রকাশ ক'রলেন। সেই সময় আবও কয়েক জন কাঠুরে সেইখানে এসে প'ড়লো। তারা কেভিনের মায়ের দুঃখ দেখে স্থির থাকতে পারলো না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাবা দল-বেঁধে কেভিনের সন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করলো। কিন্তু অন্ধকার তখন গাঢ় হয়েছিল; কাঠুরের দল সেই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত কেভিনকে খুঁজে দেখলো, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিললো না। অন্ধকাবে তাবা নিবিড় অরণ্যে পথ দেখতে না পেয়ে খানিক পবে তাদের টোঙে ফিরে এলো। কেভিনকে পাওয়া গেল না শুনে তাব মায়ের মনের অবস্থা কি বকম হ'ল, তা তোমাবা বুঝতেই পারছো, অন্তে তা প্রকাশ করতে পারে না।

কৃষ্ণপক্ষেব অন্ধকার বাত্রি। প্রকৃতি দেবী সেই বিশাল অরণ্যে যেন আলকাতবা ঢেলে দিয়েছিলেন; কোন দিকে দৃষ্টি চলে না। কাজেই সেই রাত্তিবে কেভিনকে বনের ভিতর আবার খুঁজতে খাওয়া অসাধ্য হ'ল।

কেভিনের বাবা মিষ্টার প্রেক্টিস সন্ধ্যাব পর বাড়ী ফিরে এলেন। কেভিনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়-নি শুনে, তিনি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন বটে, কিন্তু তাঁব বৃকেব ভিতর কি তুফান আরম্ভ হ'ল, অন্ত কোনও লোক তা বুঝতে পারলো না। কেভিনের মা তাঁকে দেখে, "ওগো, আমার কেভি কোথায়? তাকে এনে দাও, আমার প্রাণ বাঁচাও"—ব'লে মাটিতে প'ড়ে কাঁদতে লাগলেন; তার পর হঠাৎ উঠে, "কেভি, বাপ, তুই কোথায় গেলি!" ব'লে সেই অন্ধকারে বনের ভিতর ছুটে চললেন।

সেখানে কাঠুরেদের যে-সব টোঙ ছিল, সেই সব টোঙের কাছে কাঠের আঙন ঝেলে আলো করা হ'ল। অগ্নিকুণ্ডের কাছে প্রায় কুড়ি জন লোক ব'সে, কেভিনকে কোথায় খুঁজতে যাবে—তারই পরামর্শ করতে লাগলো। তারা সকলেই শুনলো—মিষ্টার প্রেক্টিসের ঘরের কাছে একটা প্রকাণ্ড ডিঙ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। খবরটা শুনে সকলেরই মনে হ'ল—সেই ডিঙটাই কেভিনকে বনের মধ্যে টেনে নিয়ে-গিয়ে খেয়ে ফেলেছে, আর তাকে পাওয়া যাবে না; হয় ত তার হুই-একখানা হাড় ও গায়ের কাপড় কোথাও পড়ে থাকতে পারে। কিন্তু তারা তাদের মনের ভাব কেভিনের মা-বাপের কাছে প্রকাশ করলো না; তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে ব'লেই তাঁদের আশস্ত করবার চেষ্টা করলো।

সকলেই পরামর্শ ক'রে স্থির করলো—রাত্রিশেষে পূর্ব-আকাশ আলোকিত হ'তেই তারা জঙ্গলের মধ্যে কেভিনকে খুঁজতে যাবে। সেই রাতেই কোনবারা সহরে দু'জন লোককে পাঠিয়ে ব'লে দেওয়া হ'ল, তারা আরও লোক জোগাড় ক'রে আনবে; আর পুলিশের সার্জেন্ট বার্গস্কে ও এক জন কালা আদমীকে জঙ্গলের ভিতর পথ দেখাবার জন্ত ডেকে আনবে। বনের ভিতর যারা হারিয়ে যায়—তাদের খুঁজে বের করতে এই সব কালা আদমীর মত দক্ষ লোক পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

কাঠুরীদের টেঙাগুলার বাইরে অগ্নিকুণ্ডে যে আগুন জ্বলছিল, রাত্রির দারুণ শীতে সেই আগুনের নিকট থেকে উঠে যেতে ঐ সকল লোকের ইচ্ছা হচ্ছিল না; কিন্তু রাত্রি প্রায় তিনটার সময় ভয়ানক জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় লোকগুলো অগ্নিকুণ্ডের চাব পাশে আর বসে থাকতে পারলো না; তারা সকলে উঠে টেঙাগুলির মধ্যে আশ্রয় নিলো। তার আধ ঘণ্টা পরেই সার্জেন্ট বার্গস্ সেখানে উপস্থিত হ'লেন; তাঁর সঙ্গে এলো এক জন আদিম অধিবাসী, সে সকলকে বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তা'ছাড়া আরও এলো—ত্রিশ জন স্বেচ্ছাসেবক; তারা সকলেই অশ্বারোহী। এই ভাবে সেখানে পঞ্চাশ জন লোক জুটলো। কেভিনের সন্ধানে সেই দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করবার জন্তে তারা আগ্রহ ভবে প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

অবশেষে পূর্বাকাশ উষালোকে উদ্ভাসিত হ'লে, প্রধান 'খুঁজি' পিটার বললো,—“আমাদের যাত্রা ক'রবার সময় হ'য়েছে, চল—সকলে বেরিয়ে পড়ি।”

এই কথা শুনে সকলেই অরণ্যে প্রবেশ ক'রলো; তাদের প্রত্যেকের কাছেই এক একটা বন্দুক; কারণ, বনের মধ্যে বিস্তর ডিংও, বুনো শূয়ার প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ঘুরে বেড়ায়; তাদের আক্রমণের ভয় ছিল।

বনের পথে যে সকল পদচিহ্ন ছিল, রাত্রিশেষে প্রবল বেগে বৃষ্টি হওয়ায় সেগুলি ধুয়ে গিয়েছিল। গাছের পাতাগুলি ভিজে ছিল, এবং ঐ সকল পাতা থেকে টুপটাপ করে বৃষ্টির জল ঝরে-প'ড়ছিল; তাব ওপর কুয়াশায় চার দিক আচ্ছন্ন হওয়ায় বনের ভিতর দিয়ে চলতে লোকগুলির ভারী অসুবিধা হ'তে লাগলো। আদিম অধিবাসী পিটার সঙ্গীদের পথ দেখিয়ে সকলের আগে আগে চলছিল, পদচিহ্নগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে-যাওয়ায় কোন্ দিকে যেতে হবে—তা ঠিক করা তাব পক্ষে বড় কঠিন হ'ল। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর এক জন লোক কেভিনের টুপিটা দেখতে পেলো; টুপি একটা বুনো-লতায় বেধে তার মাথা থেকে খুলে প'ড়েছিল। টুপিটা দেখতে পাওয়ায় সকলেই উৎসাহিত হ'য়ে আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে চললো। কেভিনের আর কোন চিহ্ন কেউ দেখতে পেল না বটে, কিন্তু পিটার তার অদ্ভুত শক্তিতে নির্ভর ক'রে সকলকে নিয়ে গভীর হ'তে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ ক'রলো।

সকলে এই ভাবে চলতে চলতে বেলা প্রায় দুপুরের সময় একটা কাঠের গুঁড়ির পাশে চিহ্ন দেখে বৃষ্টিতে পাবলো—আগের রাত্রিতে কেভিন সেই যায়গায় গুয়ে বিশ্রাম ক'রেছিল; নরম ভিজে মাটিতে তার দেহের যে চিহ্ন ছিল, সেই চিহ্নেব পাশেই অনেকখানি যায়গা জুড়ে কোন-একটা বড় জানোয়ারের দেহের দাগ দেখা গেল। তা দেখে সকলের ধারণা হ'ল—ডিংওটা কেভিনের সঙ্গে এসে তার পাশেই গুয়ে বিশ্রাম ক'রেছিল।

পিটার মাথা নেড়ে বললো,—“এই বদমায়েস ডিংওটাই ছেলেটাকে এত দূর টেনে-এনেছিল; তার পর তাকে শেষ ক'রেছে বলেই মনে হচ্ছে। আর কি তাকে পাওয়া যাবে?”—এ কথা শুনে সকলেরই বড় হুশিচুস্তা হ'ল; কিন্তু কেউ কোন কথা বললো না।

মিষ্টার প্রেস্টিসের বাড়ী থেকে এই স্থানের দূরত্ব দু' মাইলেরও বেশী ছাড়া কম নয়; চার বছরের ছেলে কেভিন সন্ধ্যাব অন্ধকারে কি ক'রে এত দূর হেঁটে এসেছিল, কেউ তা বুঝতে পারলো না! ডিংওটা কি তাকে মুখে-ক'রে টেনে এনেছিল? অনেকেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হ'ল, কিন্তু মুখে কেউ তা প্রকাশ করলো না।

এইবার পিটার খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো। সার্জেন্ট বার্গস তাব সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললেন। দলের অনেকে বৃষ্টির মত গোল হ'য়ে চাব দিক থেকে খুঁজতে আরম্ভ করলো। কিন্তু সেই দুর্গম জঙ্গলে তাতে কোন ফল পাওয়া গেল না। স্থানে স্থানে গভীর গর্ত, তা হুর্ভেত লতা পাতায় ঢাকা; তাব মধ্যে নিদ্রিত বা পথশ্রান্ত শিশু প'ড়ে আছে কি না, তা জানাবার উপায় ছিল না। কিন্তু পিটার নিরুৎসাহ না হ'য়ে খুঁজতে খুঁজতে কতকগুলি পদচিহ্ন দেখতে পেলো; সেগুলো কেভিনেরই পদচিহ্ন; আব কেভিনের পদচিহ্ন-গুলির ঠিক পাশেই ডিংওব পদচিহ্ন! কোন কোন স্থানে পশু ও শিশুর পদচিহ্ন এক সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল। তা দেখে পিটারের অনুমান হ'ল—ডিংওটার সাহায্যেই কেভিন রাত্রিব অন্ধকারে তত দূরে এসে প'ড়েছিল।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'ল; লোকগুলি ঘুরতে ঘুরতে রাত্রিকালে একটি পার্শ্বত্যা নদীর তীরে এসে পড়লো। নদীতীরেই কেভিনের পদচিহ্ন দেখা গেল। পদচিহ্নগুলি নদীর জলের এত নিকটে ছিল যে, কেভিনের জলে ডুবে মারা-যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু পিটার নদীর কিছু দূর পর্যন্ত কেভিনের ও ডিংওব পদচিহ্ন দেখে বুঝতে পাবলো—ডিংওটা কেভিনকে জলের কিনারা থেকে নিরাপদ স্থানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

সেই রাত্রিতে গভীর অন্ধকারে আর কোন দিকে কাবও যাওয়া সম্ভব হ'ল না; এজন্ত এক দল লোক এক স্থানে আগুন জ্বলে সেই অগ্নিকুণ্ডের আগুনে শরীর গরম করতে লাগলো। যে সকল লোক খুঁজতে খুঁজতে দূরে চ'লে গিয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্ত বার-বার বন্দকের আওয়াজ করা হ'ল। সেই আওয়াজ শুনে দূর থেকে তারা অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে এলো। যারা অন্ধকারে পথ ঠিক ক'রে সেখানে আসতে পারলো না, তারা বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বলে সেই আগুনের কাছে ব'সেই রাত্রি কাটাতে লাগলো।

রাত্রি প্রায় দুপুরের সময় বড় দলের অগ্নিকুণ্ডের আগুন নিবু-নিবু হ'লে লোকগুলি হঠাৎ একটা ডিংওব গর্জন-ধ্বনি শুনে চমকে উঠলো। সে সাধারণ গর্জন নয়; মনে হ'ল ডিংওটা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্রোধে অধীর হ'য়ে কম্পিত স্বরে গর্জন করছিলো। এই শব্দ শুনে লোকগুলি ভয় পেয়ে, অগ্নিকুণ্ডে আরও কতকগুলো কাঠ চাপিয়ে আগুনের আলো উজ্জ্বল ক'রে তুললো।

মুহূর্ত পরেই ডিংওটা আবার ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠলো। লোকগুলির মনে হ'ল—নদীর অদূরে দাঁড়িয়ে সে গর্জন করছিলো। তারা চার দিকে তাকাতে লাগলো। একটু পরেই তারা একটা

প্রকাণ্ড ডিংওকে পাহাড়ের পাশে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো; অতঃপর লোককে দেখেও সে ভয় পেলো না, যেন সে পাথরের মূর্তি! তার চোখ দুটো ফল্-ফল্ করছিল।

ডিংওটাকে সেখানে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুড়ি জন লোক এক সঙ্গে বন্দুক হাত দিল; কিন্তু তারা বন্দুক তুলে নিশানা করবার আগেই হঠাৎ শিশুর বুকফাটা আর্ন্তনাদ শুনতে পেলো। এক বাব নয়, দু'তিন বার সেই আর্ন্তনাদ অনেক দূর থেকে সেই নিস্তরক বাত্রিতে তাদের কর্ণগোচর হ'ল।

শিশুর আর্ন্তনাদ! তবে কি কেভিন সেই নিবিড় অরণ্যের কোথাও প'ড়ে থেকে প্রাণভয়ে আর্ন্তনাদ ক'রছে? সকলেব দেহ মুহূর্তে অসাড় হ'য়ে গেল; তাদের হাতের বন্দুক হাতেই থাকলো। শিশুর আর্ন্তনাদ বন্ধ হ'তেই, সেই ডিংওটা পাশের জঙ্গলের মধ্যে



পাহাড়ের পার্শ্বে বৃহৎ ডিংও দাঁড়াইয়া আছে

লাফ দিলে, তাব পর সে মহাবেগে দূরে চলে গেল; আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

লোকগুলি অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে নিস্তরক ভাবে পুতুলের মতো বসে রইল; কারও মুখে একটিও কথা নেই! সেই সময় হঠাৎ কিছু দূরে বৃষ্টি জঙ্ঘব ভীষণ কোলাহলে সেই বনভূমি প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। সেই গর্জীর গর্জনে লোকগুলির মনে হ'ল—দুটো হৃদাস্ত বৃষ্টি জঙ্ঘ পবম্পর যুদ্ধ আরম্ভ ক'বেছে! সে কি ভীষণ গর্জনে, আব বনের ভিতর দাপাদাপি! যেন সমস্ত বন কঁপে উঠতে লাগলো। সেই যুদ্ধের সময় বুনো শূয়োরের আর ডিংওর গর্জনে শুনে সকলেই বুঝতে পারলো—সেই ডিংওটার সঙ্গে একটা বুনো শূয়োরের যুদ্ধ চলছে; তাদের একটা না মরলে যে সেই যুদ্ধের শেষ হবে না, এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হ'ল। যুদ্ধটা চলছিল—বেশী দূরে নয়, মনে হ'ল—সেই স্থান থেকে আধ মাইলের মধ্যেই।

সকলেই ভাবলো, অল্পকাল আগে যে শিশুর আর্ন্তনাদ শুনতে

পাওয়া গিয়েছিল, সে যদি কেভিন হয়, তা হ'লে তার ভাগ্যে কি ঘটেছে? সে কি জীবিত আছে?—তারা হতাশ ভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূগম অবণোর দিকে চেয়ে বইল। কিন্তু আর তারা জড়ের মতো বসে থাকতে পারলো না। তাদের সকলেব হাতেই বন্দুক ছিল, ভয়ের কোন কাষণ ছিল না; কিন্তু তাদের সঙ্গে মশাল ছিল না। নিবিড় অন্ধকারে কিরূপে তারা সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যে অগ্রসব হবে? সম্মুখে পাহাড়, জঙ্গল, নদী,—অন্ধকাবে তাদের কোন দিকে যাওয়ার উপায় ছিল না।

দীর্ঘকাল সেই ডিংও ও বুনো শূয়োরের যুদ্ধ চললো। নৈশ বায়ুতে তাদের ভীষণ গর্জনে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। তার পর হঠাৎ তাদের যুদ্ধ থেমে গেল; আর কোন শব্দ কেউ শুনতে পেলো না। সকলেবই মনে হ'ল—সেই বাত্রি বুঝি শেষ হবে না! তারা অধীর ভাবে প্রভাতে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

অবশেষে পূর্বাকাশ আলোকিত হ'তেই সকলে উঠে চলতে আরম্ভ করলো। ডিংওটা যে দিকে গিয়েছিল, এবার সকলে সেই দিকেই চললো। কিছু কাল পরে তারা সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হ'ল—যেখানে বুনো শূয়োরের সঙ্গে ডিংওর যুদ্ধ চলছিল। সেখানে খুব উচু পাহাড়ের পাশে দেয়ালের মতো একটা ঝাঁক ছিল; সেই ঝাঁকের নীচে যে সব লতা-গুন্ম ছিল, দুই জানোয়ারের যুদ্ধ তা ভেঙ্গে চূবমান হ'য়ে গিয়েছিল; তাদের নখের ধাপে সেই স্থানের মাটি যেন চম্বে গিয়েছিল। তাজা রক্তের গন্ধ সেই স্থানের বায়ুস্তরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারা খানিক পবিষ্কার বায়ুগায় একটা প্রকাণ্ড বুনো শূয়োরের মৃতদেহ দেখতে পেলো। তাব মুখের ড'পাশে দুটো ভয়ঙ্কর দাঁত! শূয়োরটার সর্বশক্তি ডিংওর স্তূতীক্ষ্ম দাঁত ও নখের আঘাতে বিদীর্ণ হওয়ায় তাকে নিহত হ'তে হ'য়েছিল,—তার দেহের অবস্থা দেখেই সকলে তা বুঝতে পারলো।

এইবার তারা সেই ডিংও ও কেভিনকে চার দিকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু কোন স্থানেই তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। লোকগুলিকে সেখানে রেখে পিটার কিছু দূরে চলে গিয়েছিল; হঠাৎ তার চিংকার শুনে লোকগুলি দ্রুতবেগে তাব নিকট উপস্থিত হলো। পিটার পাষণ-প্রাটীকের মতো লম্বা একখান পাথরের পাশে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তারা দেখলো, সেই স্থানে পাহাড়ের একটা গুহার মুখে প্রকাণ্ড একটা ডিংওর মৃতদেহ প'ড়ে র'য়েছে! বুনো শূয়োরের তীক্ষ্ম দাঁতে ডিংওটার সর্বশরীর বিদীর্ণ; শূয়োরটার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাব দেহ ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় তার রক্ত-স্রোতে সেই স্থানের মাটি ভিজ্জে গিয়েছিল। ডিংওর শবীর তখনও গবম, যেন কয়েক মিনিট আগেই তাব প্রাণ অসহ যন্ত্রণায় দেহ ত্যাগ ক'রেছিল। আর ঠিক তার পাশেই একখান চৌকা পাথরের উপর শুয়ে কেভিন বুয়ুচ্ছে! তাব দেহের কোথাও আঘাত-চিহ্ন নেই; কেবল তার পোষাক ছিঁড়ে টুকুরো-টুকুরো হ'য়ে তার শরীরে ঝুলছিল! ডিংওটা যেন আহত দেহে কেভিনের পাশে প'ড়ে, তার শিশু-বন্ধুকে পাহারা দিতে দিতে প্রভূভক্ত বিশ্বাসী কুকুরের মতো প্রাণত্যাগ ক'রেছে!

পিটার ডিংওর পাশে নিদ্রিত কেভিনের অক্ষত দেহ দেখে গভীর বিশ্বাসে ব'লে উঠলো, “আরে, এতো পাজী বদমায়েস ডিংও নয়, এ যে অতি ঠাণ্ডা মেজাজের উপকারী ডিংও!”

যারা কেভিনকে খুঁজতে এসেছিল, এই দীর্ঘকালে তাদের পরিশ্রম অল্প হয়নি, তার উপর সারা দু'রাত্রি অনিদ্রা; কিন্তু

কেভিনকে অক্ষত দেহে জীবিত অবস্থায় পাওয়ায় তাদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রইল না। যাবা অল্প দিকে কেভিনকে খুঁজতে গিয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য বন্দুকের আওয়াজ করা হ'ল। তার পর পরিশ্রান্ত যুগ্ম কেভিনকে কোলে নিয়ে তারা মিষ্টার প্রেস্টিসের বাড়ীতে ফিরে এলো।

কেভিনের মা তাঁর স্বামীর কোল থেকে কেভিনকে কোলে নিলেন। কেভিন জেগে-উঠে একটু হেসে 'মা' বলে ডাকলো। মা তাকে কোলে নিয়ে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে তাব মুখে চুমা দিতে লাগলেন। আনন্দে তাঁর মুখে আর কথা ফুটলো না।

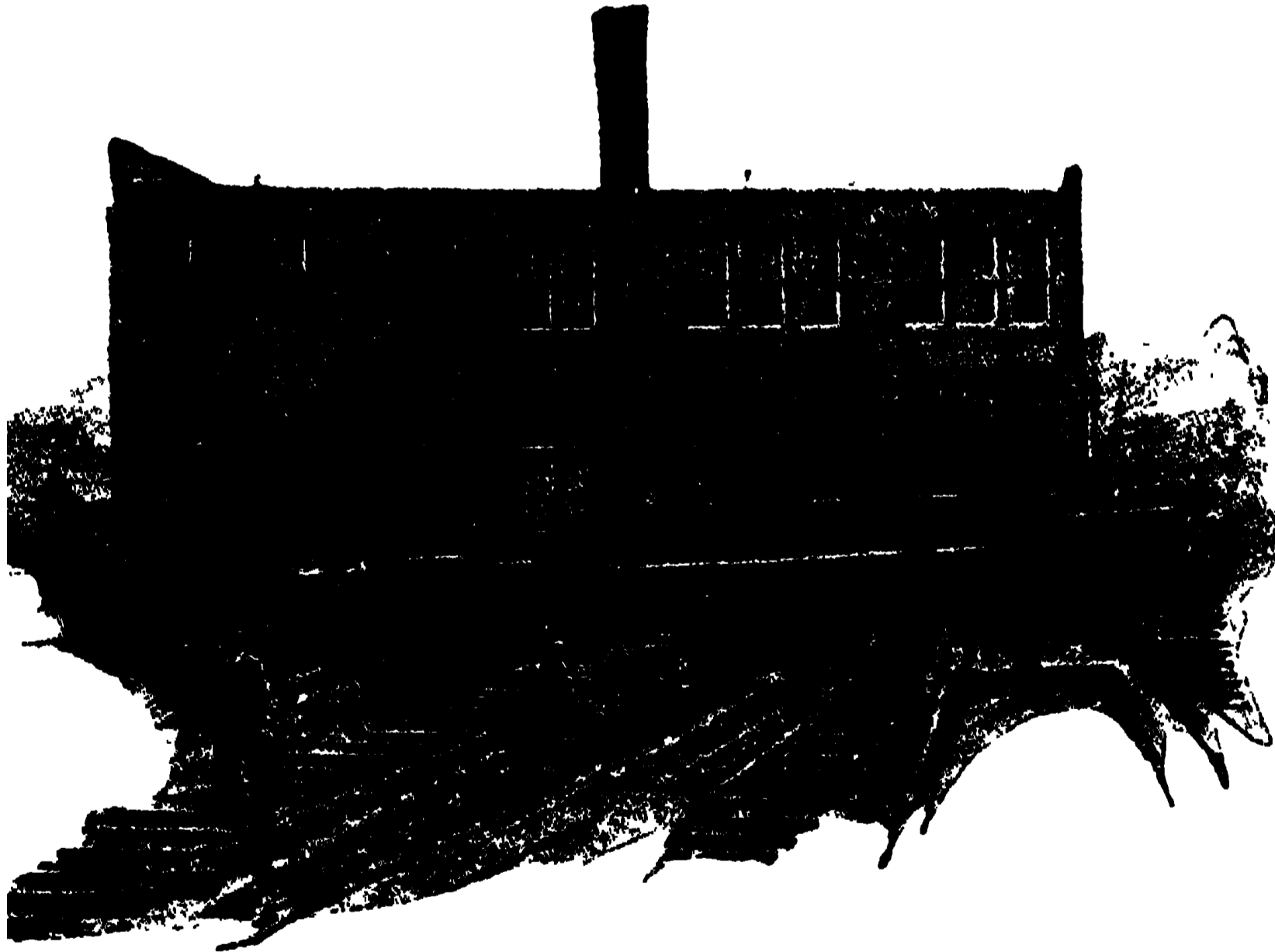
মিষ্টার প্রেস্টিস দুই হাত জোড় করে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলেন। পরমেশ্বরই সেই দুর্গম অরণ্যে এত বিপদেও কেভিনের প্রাণ বক্ষা করেছিলেন; মৃত্যুমুখ হ'তে তাকে বক্ষা করেছিলেন।

প্রেস্টিস সুদক্ষ শিকারী। কিন্তু সেই দিন থেকে তিনি আর জিও শিকার করেন না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বাড়ী চালা !

মাটির নীচে ভিদ খুঁড়িয়া পাঁচ-তলা সাত-তলা যে-সব বাড়ী তৈয়ারী করা হয়, ইচ্ছা করিলে সেই সব বাড়ী-ঘরকে এক জায়গা হইতে অক্ষত গোটা দেহে অল্প



ইটের তৈয়ারী দোকান-বাড়ী চলাইবার আয়োজন

জায়গায় নাড়িয়া বসানো, চলে—এ কথা সম্ভব মনে হয়? কিন্তু চালানু দেওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য কলিকাতার যাহুঘর বা সেনেট-হলের মতো ইটে-গাঁথা বড় বাড়ীকে ঠাই-নাড়া করার কথা বলিতেছি না। ইটে-গাঁথা বাড়ী-ঘর ঠাই-নাড়া করা একেবারে অসম্ভবও

নয়! তেমন বাড়ীও সমূলে উৎপাটিত করিয়া অক্ষত দেহে ঠাই-নাড়া করা হইয়াছে—আমেরিকায়! তবে যে-সব বাড়ী-ঘর গোটা দেহে নাড়া হইতেছে, সেগুলি ষ্টীল বা ইস্পাতের ফ্রেমে সিমেন্টকনক্রিটের ছাদ ও দেওয়াল দিয়া



বাড়ী তোলা

তৈয়ারী; এবং বাক্স-তোরঙ্গের মতোই এই সব বাড়ী-ঘর গাড়ীতে তুলিয়া আমেরিকায় নাড়াচাড়া করা হইতেছে!

আমেরিকার মনট্রিল-সহরের নিপুণ এঞ্জিনীয়ার শ্রীবৃন্দ ই, ডবলিউ, লাগ্লেট সাহেব সম্প্রতি গোটা দেহে এই সব বড়-বড় বাড়ী-ঘরকে এক জায়গা হইতে অল্প জায়গায় চালান করিতেছেন। এই চালানী-কাজ নির্কাহের জন্য তিনি যোগ্য যান-বাহনাদিও তৈয়ারী করিয়াছেন। ছোটখাট বাড়ী দূরের কথা, কিছু দিন পূর্বে ৪৮০০ টন ওজনের একখানি প্রকাণ্ড দোকান-বাড়ী তার আস্তানা হইতে তুলিয়া গোটা দেহে সেটিকে তিনি এক-মাইল দূরে অশবোর্ণ নামক গ্রামে পাকা-রকম ভিদে আঁটিয়া বসাইয়া দিয়াছেন!

এ দোকান-বাড়ীতে কামরা ছিল ৫৫২টি। স্বতন্ত্র কামরা; এবং সে-সব কামরায় রকমারি দোকান। এই দোকান-বাড়ী বহিবার পূর্বে প্রথমে

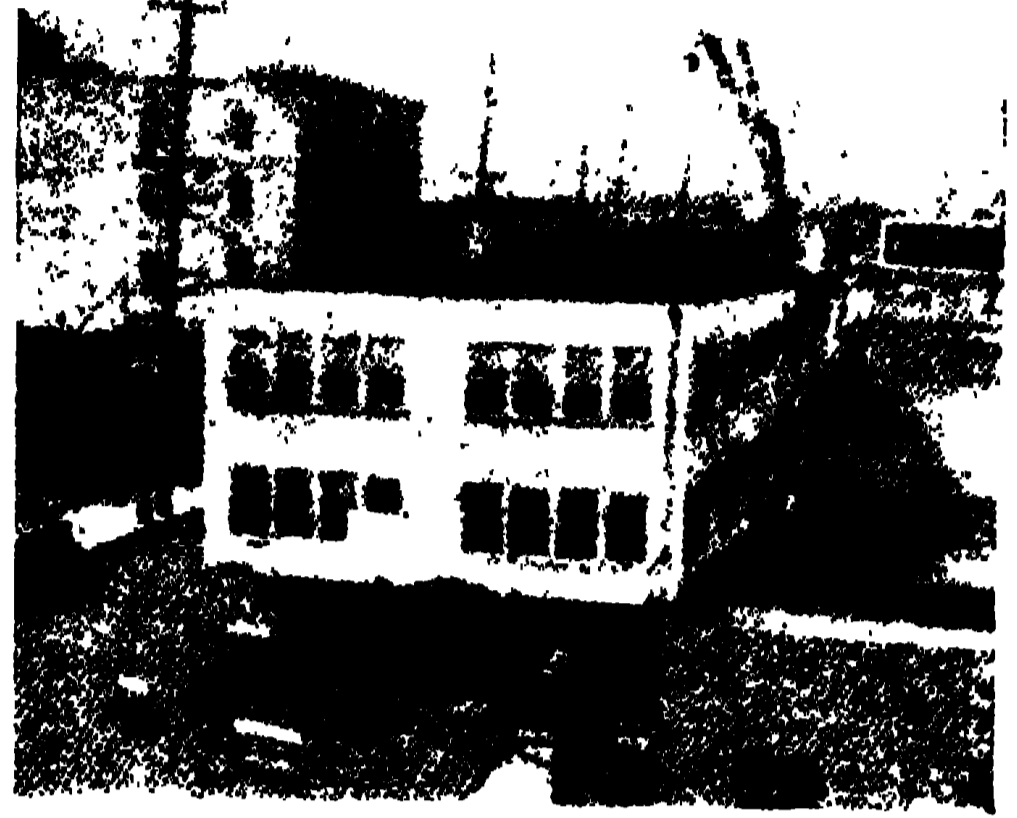
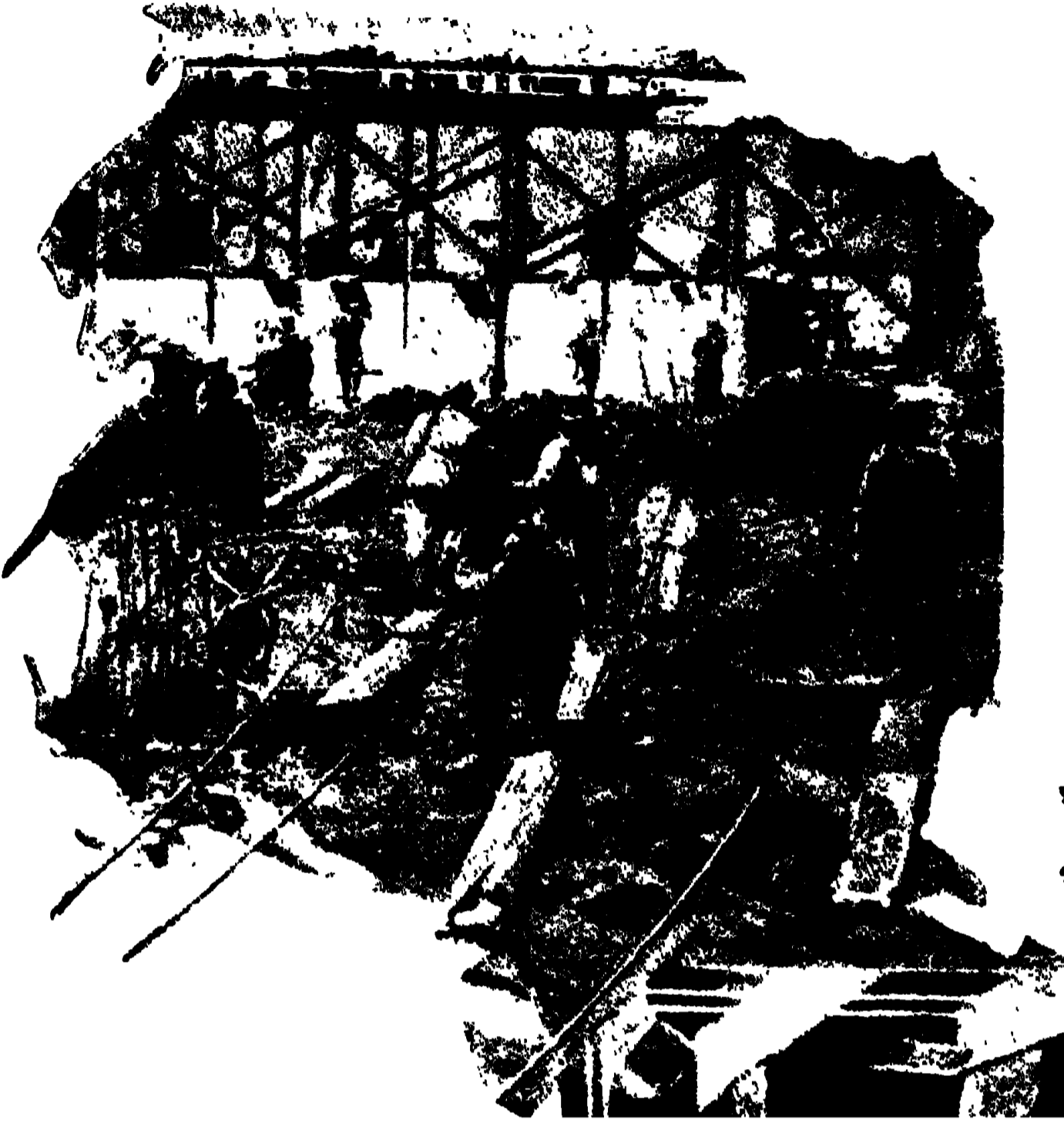
তিনি পথ হইতে ৪০০ বড় গাছ কাটিয়া পথটিকে সুগম করিয়া লইয়াছিলেন। দোকান-বাড়ীকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মতো বহিয়া অশবোর্ণ গ্রামে স্থাপনা করিবার পর আবার সেই সব গাছ—যেখানকার গাছ, সেই-খানেই—সঠিক ভাবে এমন কৌশলে পুঁতিয়া দিয়াছেন যে,

কোনো গাছ মারা যায় নাই বা তাদের ফল-ফুল ও পত্র-পল্লবের গায়ে আঁচ লাগে নাই!

ইহার পরে একখানি সাত-তলা বাড়ীকে তিনি

দেহে নৌকার উপরে চাপাইয়া তবে সেটিকে বহন করা হয়।

এই সব বাড়ী-ঘর বহিবার কালে অনেক সময় এমন



ট্রাকে চড়িয়া বাড়ী চলে

ঘটে যে, বাড়ী-ঘরকে পুল পার করাইতে হয়। সে-জন্ত পুলকে বেশ মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাপ্পান্ট

সাহেবের মনোযোগ কোনো দিন যেমন শিথিল হয় নাই, তেমনি এ উদ্যোগ-আয়োজন কোনো দিন ব্যর্থ বা নিষ্ফল হইতে পারে নাই! চার হাজার পাঁচ হাজার টন ওজনের বাড়ী-ঘর এমন স্বচ্ছন্দে বহিয়া তিনি স্থানান্তরিত করিতেছেন, সে-গুলি যেন খেলা-ঘরের বাড়ী!

অনেক সময় এমন হইয়াছে, বাড়ী খুব চওড়া এবং সে-জন্ত অপরিসরতা-বশতঃ পথে সে-বাড়ী বহা যাইবে না! একরূপ

ক্ষেত্রে তিনি বাড়ীখানির মাঝা-মাঝি কাটিয়া ছ' ভাগ করিয়া তারপর ছ'বারে সে ছ' ভাগ যথাস্থানে পৌছাইয়া আবার ছ' টুকরা বাড়ী আঁটিয়া-জুড়িয়া এক করিয়া গোটা বাড়ী বসাইয়া দিয়াছেন!

পূর্বে ৪৮০০ টন ওজনের স্কে-বাড়ী বহিবার কথা বলিয়াছি, সে বাড়ী উপড়াইয়া তুলিবার জন্ত লাপ্পান্ট সাহেবকে বিশেষ ভাবে নির্মিত এক হাজার ইম্পাতের জ্যাক ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

জ্যাকের চাড়া দিয়া
বাড়ী তোলা

স্থানান্তরে বসাইয়া দিয়া-ছেন। আর একখানি বাড়ীকে বড় নৌকার তুলিয়া নগর ছাড়িয়া তাকে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছেন সমুদ্র-তীরে। এখানি ছিল ১২০ বৎসরের পুরাতন বাড়ী। চালনার দরুণ বাড়ীখানির দেহে কোথাও এতটুকু ফাট ধরে নাই, এইটুকুই সব চেয়ে বাহাহরির কথা!

এ বাড়ী বহিবার জন্ত নৌকাখানিকে অবশ্য মজবুত ও ভার-বহনের উপযোগী করিয়া গড়া হইয়াছিল। নৌকার উপর তিনি ৩৫৯ টন ওজনের মজবুত স্টিলের বীম বা কড়ি লাগাইয়াছিলেন। রেলোয়ে-লাইনে যে রেল পাতা হয়, এ কড়ি ছিল সেই রেলের। ইম্পাতের রোলারের সাহায্যে বাড়ীখানিকে উপড়াইয়া গোটা



জ্যাক

এই সব বাড়ীকে ঠাই-নাড়া করিতে বিস্তর সময় লাগিত। তিন-চারি শত ফুট দূরে বাড়ী বহিতে সময় লাগিত প্রায় ন'ঘণ্টা। তবে এ-সব গৃহ এমন নিপুণ ভাবে তিনি বহাইয়াছেন যে, বাড়ীর কোথাও এতটুকু ফাট ধরে

বাড়ীর নীচেকার জায়গা ভরাট করাইয়া বাড়ীকে ঠিকঠাক আঁটিয়া বসানো হইল।

এই তোলায় কাজে সকলকে খুব সতর্ক থাকিতে হয়। সমভাবে সব দিক তোলা চাই—নহিলে কোনো দিক একটু হেলিয়া বা ঝুঁকিয়া পড়িলে বাড়ী-ঘর ফাটিয়া যাইতে পারে কিম্বা অল্প বহু বিপত্তি ঘটতে পারে।

অনেক সময় বাড়ী বহিবার সময় বাড়ীর ঘরে-ঘরে যে সব আসবাব-পত্র থাকে, সে সব বাহির না করিয়া ঘরে রাখিয়াই বাড়ীর সঙ্গে সে সব ঠাই-নাড়া করিয়া বাড়ী বসাইয়াছেন।

একবার তিনি এক সহরের পথ হইতে দশখানি বাড়ী তুলিয়া দেড় মাইল দূরে ভিন্ন গ্রামে এ-বাড়ী-গুলিকে গোটা দেহে বসাইয়াছিলেন। যে-গ্রামে এ-বাড়ীগুলি আনা হয়, সে গ্রামের নাম ডেটন। বর্ষার সময় বস্তার জলে ডেটন ডুবিয়া যাইত; তার ফলে বর্ষার পর তিন-চার মাস যাবৎ সমগ্র ডেটন-গ্রামের পথ-ঘাট জলা-মুত্তিতে বিরাজ করিত। লাপ্পাণ্ট সাহেব তক্তা ও পাইপ প্রভৃতির সাহায্যে গ্রামের পথ-ঘাট উঁচু করিয়া গড়িলেন; পাহাড় কাটিয়া পাথর আনিয়া সেই পাথরে জলা-ভূমিকে কঠিন করিয়া তুলিলেন; তার পর

সহরের ঘেঞ্জি-গলি হইতে দশখানি বাড়ী তুলিয়া এই গ্রামে আনিয়া বসাইলেন।

বাড়ী-ঘর বহিবার জন্য লাপ্পাণ্ট সাহেব এখন ট্রাক্টর-গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন। ট্রাক্টরের সাহায্যে বাড়ী বহিবার কাজ সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতেছে।

লাপ্পাণ্ট সাহেব লিখিয়াছেন—বাড়ী বহিবার সময় বহু পরিবার আমাকে বলিয়াছেন, আমরা বাড়ীতে থাকিব, আমাদেরও ঐ বাড়ীর সঙ্গে বহিয়া লইয়া যাইতে



পুলেব উপর দিয়া বাড়ী ঢালা



নৌকাবন্ধে ১২০ বৎসরের পুরাতন গৃহ

নাই! তার উপর এ-সব বাড়ী যে-জায়গায় আনিয়া বসানো হইবে, হয় তো বাড়ী আনিয়া পরে দেখেন, সেখানে বাড়ীখানি ছ'ফুট উঁচু করিয়া বসাইতে হইবে—নহিলে পথের সঙ্গে বাড়ীর 'লেভেলে' সমতা রক্ষা পাইবে না! তখন তিনি কি করিলেন, জানো? বাড়ীর নীচে এক হাজার জ্যাক নামাইয়া বিয়ার্লিশ জন জুমান লোক লাগাইলেন। এই সব লোক জ্যাকের চাড়া দিয়া বাড়ীর তল-দেশ উঁচু করিয়া তুলিল। বাড়ী উঁচু হইয়া রহিল, তখন

পারেন? আমি বলিলাম, পারি। এবং শুধু বাড়ীর সাহেব সম্ভব ও সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন, ভাবিলে লোক-জন কেন, পিয়ানো, টেবিল-চেয়ার, আলমারি, বিশ্বয়ের সীমা থাকে না; সেই সঙ্গে মাসুকের শক্তি-সোফাকৌচ এবং অন্যান্য ভারী আসবাব-পত্র-সমেত গোটা সামর্থ্যের অলৌকিকতা ভাবিয়াও অবাক হইতে হয়!

বাড়ী বহিরা
দিয়াছি। বহিবার
সময় আলমারি,
পিয়ানো, টেবিল
প্রভৃতি পাছে
গড়াইয়া পড়িয়া
যায়, একত্র বাড়ী
বহিবার পূর্বে ঐ
সব জিনিষপত্র



ষ্টীমার দিয়া বাড়ী-বাহী বোট টানা

শ্রাক্ড়া দিয়া বাধিয়া দিয়াছি। দেওয়ালে ছবি খাটানো থাকিলে শুধু দেখি, কোনো ছবির পেরেক নড়ে কিনা! পেরেক শক্ত থাকিলে বাড়ী বহিবার সময় দেওয়ালের ছবি দেওয়ালেই থাকে; খুলিবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের কাজ এখন এমন সুশৃঙ্খল ভাবে নির্বাহিত হইতেছে।

বাড়ীতে যে গ্যাশ বা জলের পাইপ থাকে, সেগুলির সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। টেলিফোন, ইলেকট্রিক কনেকশন সম্বন্ধেও পূর্বাঙ্কে ব্যবস্থা করা হয়। বাহিরের সঙ্গে সংযোগ-বন্ধনটুকু মাত্র খুলিয়া লইয়া বাড়ীর তার ও পাইপ যথাযথ ভাবে তিনি প্লাগ করিয়া দেন। বাড়ী বহিবার সময় লাপ্লাণ্ট সাহেবের নিপুণ কর্মচারীরা সেগুলির তত্ত্বির করেন। তার ফলে তার বা পাইপ অক্ষত দেহে বাড়ী-ঘরের সঙ্গে চালান হয়।

বহিবার যত্নপাতিও এমন নিখুঁত করিয়াছেন যে, কেহ অর্ডার দিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বড় বড় বাড়ী-ঘর স্থানান্তরিত করিতেছেন।

বাড়ী তুলিবার জন্ত তাঁর লোক-জন ভিদের নীচে সরাসরি ছ' ফুট গভীর গহ্বর খনন করেন; তার পর লোহার তার বা রড ও জাল দিয়া বাড়ীর আপাদ-মস্তক স্থরক্ষিত করিয়া রেল পুলি জ্যাক প্রভৃতির সাহায্যে সে-বাড়ী টানিয়া টাকে তোলা হয়। কত দিনের সুদীর্ঘ চিন্তা এবং উদ্ভাবনী-কৌশলে এই অসম্ভব ব্যাপারকে লাপ্লাণ্ট

নেপোলিয়ন বলিয়া গিয়াছেন, জগতে অসম্ভব বলিয়া কোনো-কিছু নাই বা থাকিতে পারে না—এ-কথা খুব সত্য!

নির্বাসিতা রাজকন্যা

[রূপকথা]

তিন

বয়স বাড়বার সঙ্গে রাজকন্যার নিষ্ঠুরতাও মাত্রা ছাড়িয়ে উঠলো। তার সেবা-পরিচর্যায় সামান্য কিছু খুঁত পেলে দাসীদের কাবও পরিভ্রাণ নেই; তাদের অতি কঠিন শাস্তি না দিলে—তার মনের ছালা নিবারণ হয় না; সে একবিদ্ শাস্তি পায় না।

মেয়েব এই রকম গরম মেজাজ দেখে মেয়েব মায়েব মনে কিন্তু আনন্দ ধবে না! আর মেয়েব দাত—সেই ঘু মঞ্জীটি তারিষপ করে হাততালি দিয়ে বলেন—এই ত চাই, এখন থেকে এমনি বোখা না হ'লে সিংহাসনে ব'সে এত বড় রাজ্য বশে রেখে শাসন করতে পারবে কেন?

কিন্তু তার এই রকম অত্যাচাবে অবিচাবে দাসী-বান্দীরা দিবা-রাত্রি প্রাণভয়ে কাঁপতো—ভাবতো, তাদের কার পিঠে কখন চাবুক পড়ে। তাই এক দিন এরা চাবুক খেয়ে প্রাণভয়ে সকলে দল-বঁধে রাজকন্যার মায়েব কাছে গিয়ে হাত-জোড় ক'বে বললে,—বাণী-মা, আমাদের সকলকে বিদায় দিন, আমরা আব এখানে টিকতে পারছি নে।

বাণী-মার বাপ মঞ্জী শ্রীগোপাল শর্মা কি একটা পরামর্শ করতে এই সময় মেয়েব কাছে আসছিলেন। ঘরের ভেতর দাসীদের জটলা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—জয়েছে কি? দাসীরা দল-বঁধে এখানে জুটেছে কেন মা?

কিন্তু বাণী কোন কথা বলবাব আগেই দাসীরা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে তাদের কষ্টের কথা, রাজকন্যার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা

বলতে লাগলো। শুধু মুখে ব'লেই তারা থামলো না ; তাদের শরীরের নানা স্থানে প্রহরের দাগ দেখিয়ে, পিঠে ছোট-বড় যে সব ক্ষত-চিহ্ন ছিল, পিঠের কাপড় তুলে সে-গুলো দেখিয়ে দিলে। শেষে তারা হাত-জোড় ক'বে কেঁদে বললে—এত চেষ্টা ক'বেও আমরা যখন রাজকণাকে খুসী করতে পারলুম না, যখন-তখন বিনা-দোষে পিটিয়ে আমাদের হাত গুঁড়ো করতেই তাঁর আনন্দ, তখন আব কি ক'রে আমরা তাঁর কাজ করব ? তাই আমাদের বিদেয় ক'রে দিন,—চাকরী ছেড়ে আমরা পালিয়ে বাঁচি।

কিন্তু দুই উপরওয়ালাকে এদের নালিশে আব রায় দিতে হ'ল না, রায় প্রকাশ করলে—রাজকণা নীলাই নিজে এসে। মুখখানা তার রাগে লাল হয়ে উঠেছে, চোখের তারা দুটো আগুনের ভাঁটা মতো ! দাসীরা ভয়ে শিউরে উঠে দেখলে—চামড়া লিকলিকে লম্বা চাবুকটা বাগিয়ে-ধবে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের সেই ক্ষুদ্রে যম ! বাবো বছরের এই একবার মনিবটিকে হঠাৎ এই ভাবে সেখানে আসতে দেখে ভয়ে তারা সবাই একবারে আড়ষ্ট ! কিন্তু রাজকণার হাতের চাবুক সপাসপ্, তাদের হাতে, পিঠে, মাথায় পড়ে তখন তাদের নাচিয়ে তুললো। চাবুকটা এমনি ধারালো যে, কারুব দেহে পড়লে সেখানকার এক-পর্দা চামড়া কেটে তোলে ! এতগুলি দাসী-বাদীকে রাজকণা তাব সেই চাবুক দিয়ে 'গো-বেড়েন' করলে। একটু আগেই মনের কষ্টে বাদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়েছিল, এখন এই নিদ্রয় প্রভাবে তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে ফিন্কে দিয়ে রক্তধারা ছুটে লাগলো। যাতনায় অস্থির হ'য়ে তারা রাজকণার দুই উপরওয়ালার পানে চেয়ে চিংকার ক'রে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু বাণীব বা তাঁব মন্ত্রী বাপের মুখ দিয়ে একটি বাবও 'আতা' শব্দ বাব হ'ল না,—এই খুনে মেয়েটিকে নিষেধ করা দূর্ব কথ্য ! বসে-বসে তাঁবা আত্মবে রাজকণার এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখতে লাগলেন।

খানিক পরে রাজকণা নিজেই থামলো।—ননীব দেহ তার ; এক পাল দাসীব দেহে বাগেব ভবে চাবুক চালিয়ে নিজেই সে ঠাঁপিয়ে উঠেছিল।

দুই অভিভাবক অর্মান দাসীদের লক্ষ্য ক'বে চীংকার ক'বে আদেশ দিলেন—বাতাস কর্ হতভাগীবা, বাতাস কর্, দেখাছিস্ না—মেয়েটা কি রকম হাঁপাচ্ছে ? চাবুক চালিয়ে ওর পবিশ্রম কি কম হ'য়েছে।—দাসী-বাদীবা কি আন চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ? গায়ের জ্বালা ভুলে, চোখের জল আঁচলে মুছতে-মুছতে সকলে রাজকণার সেবায় লেগে পড়লো। রাজকণা পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে একপানা নরম সোফায় কোমল দেহটি এলিয়ে দিলে ; দাসীবা তাকে ঘিবে দাঁড়ালো। ময়ূবপুচ্ছের পাখা দিয়ে চার-পাঁচটি দাসী তাকে বাতাস করতে লাগলো। অথবা দাসী তার পায়ের কাছে ব'সে পদসেবা করতে লাগলো ; আর অল্প সকলে জোড়-হাতে দাঁড়িয়ে বইল—রাজকণার শেষ হুকুম শোনবার জগো !

রাজকণা সামলিয়ে নিয়ে এবাব সোফায় সোজা হয়ে বসলো। সে মুখখানা বেকিয়ে বলে-উঠলো—কমন ! আব কখনো আমার নামে দাহুর কাছে লাগুতে আসবি ?—সঙ্গে সঙ্গে তাব হাতের চাবুক সামনের দাসীগুলোর সর্বাস্তে আব একবার চুম্বনের জগো মাথা নাড়া দিলে ; কিন্তু দাসীরা তখন তাব সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত-জোড় ক'বে মাপ চাইলে, রাজকণা চাবুকটি নামিয়ে নিল।

এর পর দাসীগুলোকে সে-ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে খ্রীগোপাল শর্মা রাজকণার পানে চেয়ে একটু হেসে বললেন—এবার তোমায় একটু দোসব এনে দিচ্ছি দিদি, সেটিও তোমার মত শব্দ, যেন ঈস্পাত !

রাজকণা জিজ্ঞাসা করলে—দোসব কি দাহ ?

দাহ বললেন—সাথীকে দোসব বলে। আমি দেখছি, দাসী বাদীগুলোব সঙ্গে তোমার ব'নছে না। তাই, তোমার সঙ্গে বেশ বনিবনাও হয়—এমন একটি খাসা ছেলেকে এনে তোমার কাছে হাজিব করিচি।

রাজকণা জিজ্ঞাসা করলে—সে কে ?

দাহ তাব পরিচয় দিলেন,—সে অল্প এক দেশের রাজপুত্র, তার ওপর তাঁর ছাত্র। যেমন তার রূপ, তেমনি গুণও। তাকে দেখলেই বাতবা দিতে হবে।

ছেলেটির কথা শুনে রাজকণার মনে কৌতূহল হ'ল ; সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—সে কোথায় থাকে ?

দাহ বললেন—আমার কাছে ; বললুম যে, সে আমার ছাত্র।

রাজকণা একটু চূপ ক'বে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলে—কই, এখানে তাকে কোন দিন ত আননি, দাহ ?

দাহ বললেন—আনবার ঠিক সময় এখনও হয়নি কি না ? এখন থেকে তাব আব তোমার শিক্ষা একসঙ্গে চলবে বলেই তাকে এখানে আন্চি।

একটু উৎসুক হয়েই রাজকণা জিজ্ঞাসা করলে—কবে আনছ তাকে ?

দাহ উত্তর দিলেন—আমতে সোমবাব। এই দিনটি তোমার জন্ম-তিথি, সে জগা রাজা জুড়ে উৎসব হবে কি না ; সেই শুভ দিনটিতেই তাকে রাজসভায় আনবে, তখন তোমার সঙ্গে তাব আলাপ হবে।

রাজকণার মুখে হাসি ফুটলো, সে জিজ্ঞাসা ক'রলো—তাব নাম কি দাহ ?

দাহ হেসে বললেন—নীলাচল। এই নাম শুনে রাজকণা মুখখানা গম্ভীর ক'বে বললো অচল মানে ত পাঠাড দাহ ! তা হ'লে তার নাম হচ্ছে তো—নীলপাহাড ?

দাহ বললেন—মানে তাই বটে ; তবে তোমার নামটির সঙ্গে ওর নামের কিছু মিলও আছে। নামের মত তোমাদের মন আন মেজাজেরও দিবা মিল হবে।

রাজকণা হেসে বললো—আমি কিন্তু তাকে নীলপাহাড বলেই ডাকবো, দাহ !

দাহ বললেন,—ডেকে,—সে তাতে খুসীই হবে।

—কিন্তু আমার মনে যে একটা ভারী ধোঁকা লাগছে, দাহ !

—কি রকম ধোঁকা ?

—বলে, ছেলেটি রাজপুত্র ; যে রাজপুত্র, সে তোমার বাড়ীতে বাবো মাস প'ড়ে-থেকে অল্পবয়স করে কেন ? তাব কি বাড়ী-ঘর নেই ? আমাদের মতন রাজা, রাজসভা, কি রাজসিংহাসন নেই ?

—কেন থাকবে না ? সবই আছে।

—কোথায় ?

—সিংহল দেশের নাম শুনেছ ত দিদি ! ছেলেটির বাবা সেই রাজ্যের রাজা ! তাঁর ধন-দৌলতেরও সীমা নেই।

—সিংহল ত লঙ্কার নাম। তা হ'লে সে লঙ্কার লোক ?

—ঠা; তার গায়ের রঙটিও ঠিক পাকা লঙ্কাব মতো! আর ঝালটুকুও তোমাব মতো।

—তবে রাজপুত্র এখানে থাকে কেন? তাব লঙ্কা কবে না পনের কাছে প'ড়ে থাকতে?

—আগেই ত বলেছি দিদি, বিজ্ঞাশিক্ষাব জগতই সে এ দেশে এসেছে। ছেলেটির বাপ ছিলেন তোমাব বাবার পরম বন্ধু। আমাব উপর তাঁব ভাবি বিশ্বাস; তাই তাকে শিথিয়ে-পড়িয়ে মানুষ ক'বে তুলবাব জগ্গে আমাব কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমাব যেটুকু বিজ্ঞা, সব সে শিখে নিয়েছে; এখন তাব ইচ্ছা হয়েছে—দেশে যাবাব আগে এখানে দিনকতক থেকে তোমাব কাছে কিছু শেখে।

চোখ দুটো কপালে তুলে রাজকন্যা বলে-উঠলো—আমাব কাছে আবাব কি শিখবে? আমি কি গুরুমশায়?

দাত বললেন—তুমি এই বয়সে কি নকম ভাবিষ্কি হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে, রাজবাড়ীব সকলকে শাসনে রাগো, দাসী-বান্দী-গুলোককে কি নকম নায়েস্তা ক'বে বেগেছো—এই সব সে তোমাব দাছ থেকে শিখে নেবে। তাকে তাব দেশে ফিবে গিয়ে তাব বাবাব সিংহাসনে এক দিন বসতে হবে কি না?

রাজকন্যা এবাব মুগখানা ভাব ক'বে বলে উঠলো—তোমাব মতলব আমি বুঝিছি দাছ!

—কি বলেছ দিদি?

—তোমাব ঢালা রাজপুত্র তাব সেই বিগ্গে-টিগ্গে সব আমাকেও শিখাতে চাবে। আমি কিন্তু তাকে আমাব গুরুমশায়-গনি কবতে দেব না, দাছ!

দাত হেসে বললেন—রাজপুত্রুব সব সাধ্য কি, সে তোমাব গুরুমশায় হয়? তুমিই তাকে শিখাবে।

হাতের চাবুক উঠিয়ে আব মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে রাজকন্যা বললো—কিন্তু খ'ত পেলেই আমাব এই চাবুক তাব পিঠে পড়বে সপামপ্—সপাং—বুঝলে?

দাত বললেন—চাবুক খাবাব ছেলে সে নয়। তোমাব মেজাজের সঙ্গে তার মেজাজেব এক চুলও এদিক-ওদিক হবে না দিদি! তুমি হাসলে তাব মুখে হাসি ফুটবে, তোমাব মুখে হাসিটুকু উঠলে সে অমনি লুফে নেবে; তোমাব চোখের ইসারা - আব ঐ টুকটুকে ঠে'টি-হ'খানা নড়তে দেখলেই সে বুঝে নেবে—তুমি চাও কি। এই শিক্ষাট যে আমি তাকে দিয়েছি এতদিন নিজের কাছে রেখে; নইলে যাকে-তাকে কি তোমাব দোসব করতে আনতে পারি?

দাতব মুখের দিকে আড়-চোখে চেয়ে, আব সেই সঙ্গে মুখের অদ্ভুত নকম ভঙ্গিটি ক'বে রাজকন্যা সে ঘর থেকে চ'লে গেল। শ্রীগোপালশর্মাও অমনি ঘরের দবোজাটি বন্ধ ক'বে মেয়ের সঙ্গে এই সিংহলী ছেলেটির কথাই আলোচনা করতে লাগলেন।—এই মতলবেই তিনি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কি না!

গোড়া থেকে আট-ঘাট বেঁধে কাজ করাই চতুর-চূড়ামণি শ্রীগোপাল শর্মাব চিবদিনের অভ্যাস। নিজের মেয়েটির সতীন-কাঁটা ভেঙ্গে দিয়ে, আর দৌহিত্রী নীলাকে সিংহাসনে বসিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন-নি। নীলা বড় হলেই যে তার বিয়ে দিতে হবে, আর তাকে বিয়ে কববার জগ্গে অনেক বড় বড় রাজ্যের রাজপুত্ররা স্কেপে উঠবে—সে ত তিনি ভাগই জানেন। তাই অনেক আগে থেকেই তিনি মাথা খাটিয়ে এই সিংহলী ছেলেটিকে

যোগাড় ক'রে এনে মুঠোর ভেতবঁ রেখে চুপি চুপি এমন কায়দায় শিথিয়ে-পড়িয়ে রাজকন্যার মনের মতন ক'বে গড়ে তুলছিলেন—যাতে ছেলেটিকে দেখেই সে খুসী হয়। একবার রাজকন্যার মনে ধরলে, আর মেশা-মিশি করায় হ'জনেব ভাব-সাব হ'য়ে গেলে রাজকন্যা যে তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে চাইবে না—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তিনি এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁবই হাতে-গড়া তাঁবেদার ছেলেটির সঙ্গে কোনো রকমে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে ফলতে পারলেই তাঁকে আর ভবিষ্যতের জন্যে ভাবতে হবে না। রাজকন্যা নীলার বয়স যখন সবে সাত বছর, সেই সময়েই তিনি এই সিংহলী ছেলেটিকে যোগাড় ক'রে তাঁব মতলব হাসিল কব্বাব চেষ্টায় ছিলেন। পাঁচ বছর ধরে ছেলেটিকে শিথিয়ে-পড়িয়ে গড়ে তুলে, এই দিন প্রথম তাঁর মেয়ে বাণী অঙ্গনা আব রাজকন্যা নীলাব কাছে তাব মনের কথা প্রকাশ ক'রলেন।

রাজকন্যা জানতে পারলো ছেলেটি সিংহলের রাজপুত্র। আর রাজকন্যাব অসাক্ষাতে তিনি তাঁব মেয়েকে চুপি-চুপি গুনিয়ে দিলেন—ছেলেটি সিংহলের রাজপুত্র বটে, তবে সিংহলের রাজসিংহাসনেব অনেকগুলি দাবীদার। সেই সিংহাসন দখল করতে অনেক লড়াই-হাজ্জামার দরকাব হবে। কিন্তু কি দরকার সাগর-পানের মধুপর্কেব বাটাব মতো একরকমি সেই রাজ্যটার জগ্গে তার অত হাজ্জামা কব্বাব? নীলাকে বিয়ে ক'রে এই রাজ্যটাই হ'জনে ভোগ ককক না! মাথাব ওপনে আমবা থাকবো, তা ছাড়া মেয়েও চোখের আড়ালে যাবে না। এদের ছেলেই পরে রাজা হবে।

নীলাব মা বাণী অঙ্গনাব কাছে বাপের কথাই বেদবাক্য। তিনি খুসী হ'য়ে বললেন—আপনি ভালো বুঝে যা করছেন, তার ওপর আম'র আব কি বলবাব থাকতে পার, বাব!

এব পবেই শ্রীগোপাল শর্মাব কৌশলে কথাটা এই ভাবে প্রচার হ'য়ে গেল যে, সিংহল দেশেব এক রাজপুত্র এ রাজ্যে আসছেন। তিনি কিছুকাল এখানে থাকবেন; আব দুই বাজোব মধ্যে মিতালীটা যাতে পাকা হয়ে ওঠে—তাবই ব্যবস্থা কববেন।

রাজকন্যাব জন্মোৎসবের শুভ দিনটিতে বেশ জাঁকজমকেই রাজপুত্র নীলাচল রাজসভায় এলো। সকলেই দেখলে—সতেরো আঠাবো বছরের দিবি স্ত্রী ছেলেটি, গায়ের বঙ যেন কাঁচা সোনা; আকাবে একটু বোটে, আব মুগখানা অল্প চ্যাপটা হ'লেও ছেলেটির দেহেব বাঁধুনি দেখে মনে হয়, বেশ বলবান বটে। চোখ দু'টি তাব এমন চমৎকাব যে—দেখেই মনে হয়, মুখ দিয়ে কিছু না ব'লে, তাব দৃষ্টি দিয়েই মনের কথা সকলকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারে। মাথাব চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত লতিয়ে পড়েছে, তার সোনালী আভা; মুক্তাব ঝালব-দেওয়া সোনালী রঙ্গের বেশমী পাগড়ীটির সঙ্গে চুলের রঙ্গ চমৎকাব খাপ খাচ্ছে। দুই কানে বড় বড় মুক্তা-খচিত দুটো বাঁববৌলি, গলায় মুক্তাব মালা, পোষাক-পরিচ্ছদও খুব জমকালো; কোমবে কিংগাপ-মোড়ি চামড়ার খাপে তলোয়ার ঝুলছে,—তার সোনার মুঠিটা সূর্যালোকে ঝিক্-ঝিকু করছে।

শ্রীগোপাল শর্মা আগে-থাকতেই সভার সকলকে শিথিয়ে দিয়েছিলেন—রাজপুত্র সভায় এলে কি ভাবে তাঁর অভ্যর্থনা করতে হবে। রাজকন্যা সিংহাসনেই বসেছিল—এই সিংহলী রাজপুত্রটি

সভায় এসে ঢুকলে, শ্রীগোপাল শর্মা ইঙ্গিতে রাজকণা ছাড়া আর সকলেই উঠে-দাঁড়িয়ে হাত তুলে তাকে অভিবাদন করলে। তার পর শ্রীগোপাল শর্মা এগিয়ে-গিয়ে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে ধরে, রাজপুত্রের হাতখানি আঁসে আঁসে তাকে রাজকণার সিংহাসনের সামনে নিয়ে এলেন। দাত্তর মুখে এই রাজপুত্রটির কথা শুনে-অবাধ রাজকণা তাকে দেখবাব জগে খুবই উৎসুক ছিল। ছুই চোখ মেলে ছেলেটির পানে সে চাইতেই তাদের চোখোচোখী হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে রাজকণার মুখে মুহূ মিস্ট্রি হাসি ফুটে উঠলো।

শ্রীগোপাল শর্মা বুঝলেন—ঝাঁড় কেটে গেছে, তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছে; ছেলেটিকে দেখেই রাজকণা খুসী হয়েছে।—তিনি এই সময় ছোলটিকে নিয়ে রাজকণার সিংহাসনের কাছে এগিয়ে-গিয়ে বললেন—ইনিই সিংহলের রাজকুমার নীলাচল।

তাঁর কথার সঙ্গে-সঙ্গে নীলাচল মাথাটি নীচু ক'বে, হাত দু'খানি তুলে রাজকণাকে অভিবাদন কবলো। রাজকণাও তখন সিংহাসন থেকে আঁসে আঁসে উঠে, মুকুটপরা মাথাটি একটু হুইয়ে, সুন্দর স্বভৌল হাতখানি তুলে হাসি-মুখে বললো—বন্দন আপনি!

রাজকণার সিংহাসনের এক পাশে রাজপ্রতিনিধি শ্রীগোপাল শর্মা আসন; তাব একটু নীচে কিছু তফাতে যে উত্তম আসনখানা এ-দিন স্থাপন করা হয়েছিল, সেই আসনখানিতে নীলাচলকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল।

শ্রীগোপাল শর্মা তখন সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য ক'বে বক্রুতাব ভঙ্গিতে বললেন—বাংলাব সঙ্গে সিংহলের সম্বন্ধ আজ নতুন নয়। বাংলাব রাজবংশের বক্রুই সিংহলের রাজবংশের সৃষ্টি। বাংলাব মহারাজা সিংহবাহুব ছেলে বিজয়সিংহ সিংহল জয় ক'বে সেখানে যে-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বংশই সিংহলে রাজত্ব কবছেন; আব সেই বংশেরই বংশধর—এই অশিক্ষিত গুণবান রাজপুত্র নীলাচল বাংলাব সঙ্গে সিংহলের অতীত সম্বন্ধ দৃঢ়তর করতে বাংলাব রাজসভায় এসেছেন। বাংলাব কর্তব্য—এই দবদী বিদেশী রাজপুত্রকে রাজার মত সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করা।

সভাস্থ সকল লোক 'সাধু সাধু' ধ্বনিত্তে রাজ-প্রতিনিধি শ্রীগোপাল শর্মাব উক্তির সমর্থন কবলো।

সভাস্থের পর নীলাচলকে সমুচিত আদর-মহে রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন একটা ভিন্ন মহলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অগ্ন দেশের কোন রাজা বা রাজপুত্র এ রাজ্যে কখনো বেড়াতে এলে—এই প্রাসাদেই বাস করতেন। এই মহলটি স্বতন্ত্র একটি প্রাসাদের মতই স্বগঠিত, সুদৃশ্য। ঘরগুলি নানা রকম মূল্যবান, সৌখীন আসবাবপত্র সুসজ্জিত। রাজ-অতিথিব কোন অসুবিধা না হয়, সে জগ্ন কত লোকই আদেশ-পালনের জগ্নে সাগ্রহে অপেক্ষা কবে। রাজার মত আদরে নীলাচল এই প্রাসাদে বাস করতে লাগলো। শ্রীগোপাল শর্মা ছ'বেলা এখানে এসে তার সঙ্গে কত কি পরামর্শ কবেন; নিজে সঙ্গে ক'রে তাকে রাজসভায় নিয়ে যান, সভাস্থ হ'লে এখানে পৌঁছে দেন। দাস-দাসীদের তিনি সতর্ক ক'রে দিয়েছেন—খব্দদার, রাজপুত্রের খাতির-মহে কোন ক্রটি না হয়। সকলেই এই বিদেশী রাজপুত্রটির মন-যোগাবার জগ্নে সর্বদা ভয়ঙ্কর ব্যাকুল।

প্রথমে এবা সকলে ভেবেছিল, ছেলেটি ভিন্নদেশী, তাই অত্যন্ত ভালমাহুয, আর লাজুক; তার মুখ দিয়ে কথা যেন বেরুতেই চায় না! কিন্তু দিন-কতক পরেই তাদের এ ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা

বুঝলো, ছেলেটির সম্বন্ধে যা ভেবেছিল, সে তাব উল্টো; এ যেন ঠিক একটি মিঠামিটে ডাইন—বদমায়েসেব ধাড়ী! রাজবাড়ীতে রাজকণা তার দাসী-বাদীদের এপন যে রকম কড়া-মেজাজ দেখায়, এই সিংহলী ছেলেটির মেজাজ যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়! কারুব কাজে একটু খুঁত দেখলে আব রক্ষা নেই; নীলাচলের মুখখানা তখন ভীমকলেব চাকের মতন ভীষণ দেখায়। তার মুখের কথা শুনে মনে হয়, সে যেন ধমকাচ্ছে! কাউকে কোন কথা সে একবারেব বেশী বলতে নারাজ; তার কোন কথা বুঝতে না পেরে কেউ আবার জিজ্ঞাসা ক'রলে তার দুর্দশাব আব সীমা থাকে না। নিজেই চাবুক নিয়ে সপাসপ তাব পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে দেয়। অথচ, রাজকণা নীলাব সঙ্গে এ ছেলেটি যখন আলাপ করে, তখন তার মুখের হাসি, মিস্ট্রি কথা, নয় স্বভাব ভঙ্গলোকের মত হাবভাব দেখে কে বক্রুবে যে, এই সেই লোক! আবও আশ্চর্যেব কথা, অমন যে দক্ষাল রাজকণা এ পর্য্যন্ত কেউ যাকে বাগে আনতে পারেনি, শিক্ষাদাতা গুরু থেকে গর্ভধারিনী মা ও গুণাহুধারী মাতামহকে পর্য্যন্ত যে উপেক্ষাব চোখে দেখে, এই বিদেশী ছেলেটি যেন দু দিনেই তাকে একেবাবে যাত্ত কবে ফেললো! নীলাচল বতই রাজকণার সঙ্গে হেমে-হেমে কথা কয়, তাব স্বখ্যাতি কবে, গুণগান ক'বে তাকে বাডায়,—রাজকণাব অস্তবটিও ততই গলতে থাকে; শেষে নীলাচলেব প্রভাবে সে একেবাবে অভিভূত হ'য়ে পড়ে!

এই ছেলেটির অপূর্ব চোখ-দাঁটির সুদুত দৃষ্টি রাজকণাকে যেন আড়ষ্ট ক'বে দেয়; নীলাচলেব সঙ্গে চোখোচোখী হ'লেই সে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। তাব মনেব তেজ, দর্প, দেমাক এক লহমায় যেন চূর্ণ হ'য়ে যায়! তখন নীলাচলেব মুখে তোবামোদ গুনে মুখখানা তাব লক্ষ্মায় বাঙ্গা হ'য়ে ওঠে; তার ইচ্ছা করে—সে নিজেই নীলাচলেব গুণ গায়—তাকে বাডায়। রাজকণাব অবস্থা শেষে এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে, এই সিংহলী ছেলেটির স্বখ্যাতি তাব মুখে আব ধরে না। রাজসভায় সিংহাসনের কাছেব আসনটিতে নীলাচল না বসলে তাব বসা সার্থক হয় না। পড়া-শুনা, আলাপ-আলোচনা, খেলা-ধুলা, বেদানো—সব কাজেই নীলাচলকে তাব চাই-ই।

এই ভাবে মিলামিশায় আরও দু'টো বছর কেটে গেল। নীলাচল রাজার অতিথি হ'য়ে রাজবাড়ীতেই রাজার মতন আদর-মহে বাস ক'রতে লাগলো। শ্রীগোপাল শর্মা তক্ষকেব মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদের পানে তাকিয়ে ছিলেন। সময় বুঝে ঠিক এই সময় তিনি প্রচার ক'বে দিলেন—বাণী অঙ্গনার একান্ত সাধ, রাজকুমার নীলাচলেব সঙ্গে রাজকুমারী নীলাদেবীর বিবাহ হয়। আব রাজকণারও এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে।

যেখানে বাণীর ইচ্ছা, রাজকণার ইচ্ছা, রাজপ্রতিনিধির ইচ্ছা,—অনিচ্ছা সেখানে কার হ'তে পারে? আর হ'লেই বা কে তা গ্রাহ্য ক'বে? কাজেই খুব ধুমধামেই এক দিন রাজকণাব বিয়েব দিন স্থির হ'ল, আর সারা রাজধানীব লোক কি আনন্দে এই শুভ-দিনটির প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলো, তা তোমরা সকলেই বেশ বুঝতে পারছো।

কিন্তু নিয়তির এমনি নির্বন্ধ যে, যে দিন রাজকণার বিয়েব দিনটির কথা রাজসভায় সকলেই জানতে পারলো, তার ঠিক পর-দিনই রাজধানীব সকল লোক বিষয়ে দুই চক্ষু কপালে তুলে

দেখলে—সহরের রাস্তার সকল চৌমাথাব মোড়ে ঘবেদ ঘবালে
দেয়ালে কালো তক্তা ঝুলছে, আব সেগুলোতে খড়ি দিয়ে মোটা
মোটা সাদা হরফে লেখা আছে,—

“সিংহলী বিদেশী; তাব সঙ্গে বাঙ্গালাব বাজকণাব বিবাহ
হ'তে পারে না। বাজকণা তাঁব যোগা বাঙ্গালী ববেদ গলায়
মালা দেবেন।”

সেই দিন হতেই এই কথাগুলো নিয়ে সাদা রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে
আন্দোলন-আলোচনা শুরু হল। সবাই বলতে লাগলো—“কথাগুলো
যে লোকট লিখুক, খুবই খাঁটি কথা লিখেছে বাটে; ভিন্দেবী সিংহলী
এসে বাঙ্গালীব মেয়েকে বিয়ে করবে, সে মেয়ে তো বামী-শামী
নয়, স্বয়ং বাজকণা, এই বাজ্যাব মালিক। ঐ সিংহলীটা বাজ-
কণাকে বিয়ে ক'বে শেষে আমাদেব রাজ্য হস্বে বোস্বে না কি?
সিংহলীব বংশ করবে বাঙ্গালায় বাজকণ? না কথাটা ঠিক হচ্ছে না;
ঠিক কথাট লিখেছে লোকটা—এ বিয়ে কখনই হতে পারে না।
এ সম্বন্ধ ভাঙ্গতে হবে। সিংহলী বাজা চাইনে আমবা।”

মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্মা এ খবব শুনেই বাগে ছলে উঠলেন।
তাঁব বাড়ীব সামনেব দেয়ালেই ঐ বকম একপানা কালো তক্তা
ঝুলছিল। বাবান্দায় দাঁড়িয়ে সেই খড়িব লেখাগুলো তিনি পড়লেন।
বুঝলেন, তাঁব সকল ফন্দী বিফল কববাব চেষ্টা হচ্ছে! তিনি তাঁব
সেই শত্রুকে খুঁজে বাব কববাব জগে সহবকোটালকে তখনি কড়া
ছকুম দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সেই কালো তক্তাগুলো এক যায়গায় জড়ো
ক'বে আঙুন দিয়ে পাড়িয়ে ফেলবাব ছকুম হ'ল। খড়িব লেখাগুলো
সমস্তই তক্তাগুলোব সঙ্গে বিলুপ্ত হল।

কিন্তু বাজধানীব লক্ষ লক্ষ প্রজাব মনে সেই মন্দা তবফর্গলি
এমন গভীব ভাবে অঙ্কিত হ'য়েছিল যে, সেই সব দাগ মুছে-ফেলা
মন্ত্রীব সাধা হ'ল না। মাল্লযেব মুখে-মুখে সেগুলো আবও স্পষ্ট
হয়ে রাজ্যময় ছ'ড়িয়ে পড়লো।

শ্রীগোপাল শর্মা সভায় ঘোষণা কবলেন, এ কাজ বাবা
করেছে, চোবেদ মত চুপি-চুপি রাস্তাব মোড়ে-মোড়ে তক্তা এঁটে
হ'তে এই সব কথা লিখেছে, তাবা বিদ্রোহী—বাজ্যেদোহী। সে
তাদেব ধনে দিতে বা ঠিক সন্ধান দিতে পাববে, তাকে হাজাব টাকা
পুরস্কাব দেওয়া হবে।

বাণী অঙ্গনা জানালেন—এ ভারি অন্য়! বাবা এ কাজ কবেছে,
মতিট তাবা বাজ্যবিদ্রোহী; তাদেব কঠান দণ্ড হওয়াই উচিত।

বাজকণাব বাগ মায়েব চেয়েও বেশী। সে শ্রীগোপাল শর্মা
কবললো, একটা লোক একা কখনো সহব-জুড়ে এতগুলো তক্তা
ঝোলাতে পাবে না, তাদেব বীতিমত একটা দল আছে।
সহবকোটালকে বলে দাও, দাহু, এক হস্তাব ভেতবে এই দলকে সে
যদি খুঁজে বাব করতে না পারে, তবে লোহাব শিক পুড়িয়ে,
শাজসভায় সবার সামনে, তাব কপালে লিখে দেওয়া হবে—সে 'শান্তি-
রক্ষাব অযোগ্য।’

দাহু খুসী হয়ে বললেন, বাঃ! এ তোমাব খাসা যুক্তি, দিদি!
আমি এখনি এ কথা তাকে জানিয়ে দিছি।

নীলাচল মুখখানি মলিন ক'বে বাজকণাকে বললো, বাজ্যাব
লোক আমায় যখন চায় না, তখন আমাব কি এখানে থাকা উচিত,
বাজকণা? তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি আমাব দেশে কিয়ে
যাই।

বাজকণা বাবা নিয়ে বাখাব সুরে বললো, পাগল! তুমি চলে
যাবে কিসেব ভুগে? লোকের কথায় কি আসে-যাব, আমি যখন
তোমাকে চাই। তুমি দেখ না, কি শান্তি ওদেব দিট। আমি
কি পণ কবেছি, শুনবে? যে সিংহাসনে আমি একলা বসছি, ঐ
সিংহাসনে তোমাকে বসাবই, এ কথাব অগথা হবে না, তা
জেনে বাপো।

এব পব সমস্ত বাজধানী তছ-নছ ক'বে অপবাদীব সন্ধান, আব
উৎসবেব উজান তলে বাজকণাব বিয়েব আয়োজন—এ হু'-ই এক-
সঙ্গে এমনি ঘাটা ক'বে শুরু হল সে, প্রজাবা বাতিবাস্ত হয়ে উঠলো।

* * * * *
ঠিক এই সময় নির্বাসিত বাজকণা লীনা ছেয়ে-রঙ্গেব একটি
চাটু বোড়ায় চড়ে, তর্গম পাতাড়ে পণেব ভেতব দিয়ে বাজধানী
দিকে তাঁববেগে ছুটে আসতে লাগলো। তাবও ধমুর্ভঙ্গ পণ—
আমাব বাবাব সিংহাসনে আমি বসাব আমাব তুংগিনী সর্বহার
মাকে। যাদেব অত্যাচাবে না-আমাব এত কষ্ট পেয়েছে, আমি
দেব তাব দম্বব-মতো শান্তি।

তুই বোনেব পণেব দাপটে এমন একটা ওলট-পালট কাণ্ড এব
পব ঘটে গেল, যাকে নিয়তিব নির্বন্ধ ছাড়া আব কিহুই বলা চলে
না। আস্ছে বৈঠকে তোমবা সেই সব লোনাঞ্চকব কাঠিনী
শুনবাব জগে আগ্বেদ সঙ্গে অপেক্ষা কব।

—গল্প দাহু।

সঙ্কটের আশ্রয়

দেবেব মন্দির গড় যদি কোনখানে
শয়তান গড়ে মঠ তারি সন্নিধানে।
সব চেয়ে বেশি যাত্রী যাবে সেই মঠে,
মন্দিরে তাহারা আসে পড়িলে সঙ্কটে।

শ্রীকালিদাস রায়।



২৪

ডাক্তার-পাত্রের সঙ্গে বিরজার বিবাহ চুকিতে না চুকিতে পাত্র স্বর্ণদ্যুতি রায়ের দিক হইতে তাগিদ আসিল। স্বর্ণদ্যুতিকে দিন-পনেরোর মধ্যে এলাহাবাদে যাইতে হইবে। সেইখানেই তার চাকরি নির্ধারিত হইয়াছে। কাজেই বিবাহ যদি এখনি না হয়, তাহা হইলে কত কাল পরে এ বিবাহের সুযোগ মিলিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই!

তারাচরণ রায় ভাবিয়াছিলেন, এ-বিবাহের ছুতা করিয়া সলিলার বিবাহের তারিখ আরো কিছু কাল পিছাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন! কিন্তু তাহা ঘটিল না।

তাঁকে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইল।

ঘটা করিয়া ছেলের বিবাহ দিবেন, বাসনা ছিল। কিন্তু দেওয়া দূরের কথা, সে-বিবাহ লইয়া যে-ব্যাপার ঘটয়া গেছে, তার আঘাতে বুক ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। সে-কত মিলায় নাই, ইহজন্মে মিলাইবে না! সে-বিবাহের ফলে মনে এমন আগুন জালিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সে-আগুনে তাঁর সারা পৃথিবী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। নাৎনীর্ বিবাহ দিয়া সে-বাসনাকে তাই আজ চতুর্গুণ-পরিমাণে চরিতার্থ করিবার জন্ত তিনি কোমর বাঁধিলেন। পুরানো রীতি মানিয়া সামাজিক-বিতরণ, বাঁধা রোশনাই এবং যেখানে যত আত্মীয়-বন্ধু আছে, সকলকে নিমন্ত্রণ—কোনো দিকে এতটুকু খুঁত রাখিলেন না। ভাবিলেন, ছেলে সন্তোষ আর বধু চাকরুতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া যদি দেখে, নিমেষের সে মহাত্মাতির কি সংশোধন তিনি করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁর মনের পরিচয় পাইয়া নিশ্চয় তাঁর সব অপরাধ ভুলিয়া তাঁদের আত্মা তৃপ্তি বোধ করিবে!

মহা সমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। তার পর বিবাহের আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলো। সে-সব চুকিবার সঙ্গে সঙ্গে...

স্বর্ণদ্যুতির যাত্রার আয়োজন। পরশু স্বর্ণদ্যুতি এলাহাবাদ যাত্রা করিবে। সলিলাকে সে সঙ্গে লইয়া যাইবে, স্থির হইয়াছে।

তারাচরণ রায়ের পৃথিবী তাই আবার ছুলিতে শুরু করিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্বে তিনি গভীর মুখে বসিয়াছিলেন।

কিরণ আসিয়া বলিল—সলিলাকেও পরশু পাঠাচ্ছেন, দাছ?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—উপায় কি বলো, দিদি? তোমরা নেয়ে...তোমাদের উপর আমাদের কোনো অধিকার নেই তো। অধিকার পরের।

কিরণ বলিল,—অধিকার...মানে? আমরা কুকুর, না, বেরাল? না, আসবাব-পত্র যে, অপরে আমাদের উপর অধিকার চালাবে?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—অধিকার কথাটা চলতি বলেই বলনুম, দিদি! আসলে সলিলা! আর স্বর্ণদ্যুতি—ওরা নিজেদের ঘর-সংসার গড়বে তো দু'জনে মিলে!

কিরণ বলিল,—এখানকার ঘর-সংসার ভেঙ্গে সে-ঘর গড়ার বিধান আছে, বুঝি?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এর মধ্যে ভাঙ্গা-গড়া নেই, দিদি। এখানে আমাদের কাছে তোমরা থাকো... সে শুধু নিজেদের ঘর যত দিন হয় না, তত দিন! তার পর বর এসে ঘরের সন্ধান দিলে এখানে আর কেন তোমরা থাকবে, বলো? এ ঘর হলো যেন টেশনের ওয়েটিং-রুম! বর হলো ট্রেন! তার পথ চেয়ে তোমাদের এ-ওয়েটিং-রুমে বসে থাকা বৈ নয়! ট্রেন এলে সেই ট্রেনে চড়ে তখনি বাড়ী ছুটতে হয়

মুখখানা গম্ভীর করিয়া কিরণ বলিল—বা রে, এ্যাদিন বুঝি স্বর্ণহ্যুতি সাহেবের ঘর চলছিল না? যেমন বিয়ে হওয়া, অমনি...

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—আমাকে বললে, দুজনে একসঙ্গেই এলাহাবাদ যাবো, দাছ! স্বর্ণহ্যুতির মনের তাই ইচ্ছে, বুঝলুম। বললেন, ছোটখাট কনেবৌ হলে আলাদা কথা ছিল।

কথাটা বলিয়া তারাচরণ রায় নিশ্বাস ফেলিলেন।
কিরণ বলিল,—সলিলা কি বললে?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—সে কোনো কথা বলেনি। সে শুধু জল-৩রা দু'টি চোখ মেলে আমার পানে চেয়ে ছিল।

কিরণ বলিল,—এমন হবে, তা কে জানে! জানলে ককখনো আমি এ-বিয়ের জন্ত এত তাড়া দিতুম না! আমি ভেবেছিলুম, বিয়ে হয়ে গেলে বর থাকবে এলাহাবাদে, সলিলা থাকবে এখানে...দু'জনে চিঠি-পত্র লিখবে। আমি এসে পড়বো... কেমন রোমান্স...

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাদের ডাগর করে বিয়ে দিয়ে এ-রোমান্স আমরা ভেঙ্গে দিচ্ছি দিদি, না হলে সত্যি এই চিঠি-লেখার মধ্যে যে-রোমান্স ছিল... সব হারিয়ে বসলেও সে-কথা এখনো ভুলিনি, কিরণ! ...রোজ একখানা করে চিঠি লিখতুম আমি তোমার দিদিমাকে...তিনিও রোজ আমাকে চিঠি লিখতেন। সে-সব চিঠিতে কি আবোল-তাবোল যে না লিখতুম তবু সে কি মিষ্টি ছিল। ভাবি তাই, সে ভালো ছিল? না, তোমাদের এই বড় করে বিয়ে দিয়ে একে-বারে কর্তা-গিন্নী সাজিয়ে ছেড়ে দেওয়া...এ ভালো হয়েছে?

কিরণ এ-কথার জবাব দিল না; বলিল,—সলিলা কোথায়?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাদের স্বর্ণহ্যুতি সাহেব এসে তাঁকে নিয়ে গেছেন। পছন্দ করে কি সব কেনা-কাটা করবেন...তার পর দু'জনে সিনেমায় যাবেন। ফিরবেন সেই যার নাম রাত সাড়ে আটটা-ন'টায়।

হাস্তোচ্ছ্বাসে গলিয়া কিরণ বলিল,—দু'জনে এর মধ্যে এত ভাব হয়েছে?

তারাচরণ রায় কহিলেন,—ভাবের সম্পর্ক...ভাব হবে না?

কিরণ বলিল,—তা বলে দু'দিনেই এমন সড়গড়।... স্বর্ণহ্যুতির রকম দেখে মনে হয়, সলিলার সঙ্গে যেন দু'-চার বছর ধরে ঠাঁর জানাশোনা!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তা হলে বলি শোনো, দিদি...তোমাদের জামাই বাবু এলেন...এসে আমাকে একেবারেই বললেন, সলিলাকে একটু দরকার আছে! আমি বললুম, বসো, সলিলাকে আমি ডাকিয়ে দি। দাছজী বসলেন। সলিলা এলো। আসতেই দেখি, আমার সামনে সলিলার হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার হাত-ব্যাগে রাখো। তার পর তুমি চট করে তৈরী হও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে তোমাকে নিয়ে বেরবো...বাজারে যাবো...তার পর যাবো সিনেমায়।

হাসিয়া কিরণ বলিল,—তোমার অনুমতি নেওয়া নয়, কিছু না...এ কথা বললে? আর সলিলা দিব্যি গেল?

—হ্যাঁ। আমার সামনে প্রথমে লজ্জায় মুয়ে পড়লেন! টাকা নিতে হাত পাততে পারেন না! আমি বললুম, নাও...কর্তা দিচ্ছে...গিন্নীর অমন কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? তখন নিলে...

কিরণ বলিল,—সত্যি, তোমায় দেখে স্বর্ণহ্যুতির লজ্জা হলো না এমন করে বৌকে ডেকে আশ্বীয়তা করতে?

—না। ওরা ভাবে, এ-আশ্বীয়তা by right. তা ছাড়া, স্ত্রী হলো better-half এবং স্ত্রীর জন্তই তো সব...অতএব এ-বুড়োকে আবার কিসের লজ্জা?

এই পর্যন্ত বলিয়া তারাচরণ রায় চুপ করিলেন...

কিরণ সহাস দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া রহিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—সত্যি বলছি দিদি, আমার খুব ভালো লাগলো। একালের এই forward-ভাব বড় ভালো লাগলো। আমাদের আমলে লুকোচুরি রোমান্সে যত মধুই থাকুক, একালের এই পরমাশ্বীয় সপ্রতিভ ভাব...এত চট করে দু'জনকে দু'জনের নাগালে পাওয়া...এমন সহজ নির্ভরতা...এর দাম আছে, দিদি! হাসছো কি? তোমারো এ শুভদিন এলে এই দৃশ্যই দেখবো!...আমরা পাশে থাকলে মনে হবে, এতে আবার

লজ্জা কি! স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক তো লজ্জার সম্পর্ক নয়! আমরাও এই ভেবে নিশ্চিন্ত হবো যে, দু'জনে সংসারের চার্জ নিতে সক্ষম...বুঝলে?

কিরণ বলিল,—আমি কিছু খুব ঝগড়া করবো ওরা ফিরে এলে...বুঝলে দাছ। দু'জনে যে দু'জনকে পেয়েছো, সে কার জন্ত বাবু? এই আমি ছিন্তাম বলেই তো!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—নিশ্চয়...

কিরণ বলিল,—আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে দু'জনের রোগাঙ্গের রঙ ছুটে যেতো?

দু'জনে কথা হইতেছে, এমন সময় উষাজিনী হাসিয়া দেখা দিল।

এ-বিবাহে উষাজিনী নিমজ্জনে আসিয়াছে।

উষাজিনী বলিল,—আমি আজ যাচ্ছি, জ্যাঠামশাই...

তারাচরণ রায় বলিলেন,—সেখানকার ডাক এসে গেছে? বেশী আর দু'দিন ছুটি মঞ্জুর হলো না, মা?

উষাজিনী বলিল,—আপনার জামাই একলা... খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হয়, জ্যাঠামশায়। তার উপর সন্ত অসুখ থেকে উঠেছেন...

তারাচরণ কহিলেন,—ও!...কিন্তু সে এলো না বলে মনে বড় দুঃখ রইলো, মা। তাকে বলো, চাকরি করে বলে সে-চাকরিতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে ঠিক নয়। পাওনা ছুটিগুলো মাঠে মারা উচিত হবে না। এ ছুটিগুলোর সঙ্ঘব্যহার করতে বলো...তা হলে দেহ-মন সুস্থ থাকবে। বুঝলে?

উষাজিনী বলিল,—বলবো।

—হ্যাঁ, বলো। আমার নাম করে তাকে বলো... বৃদ্ধশ্র বচন... একালের ছেলে বলে যেন উড়িয়ে না যায়।

উষাজিনী এ-কথার জবাব দিল না; মূহু হাস্য করিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—ক'টায় তোমার ট্রেন?

উষাজিনী বলিল—সাড়ে আটটায়। দিল্লী মেলে যাচ্ছি।

তারাচরণ রায় কহিলেন—তা হলে সলিলার সঙ্গে আর যাবার আগে দেখা হলো না।

উষাজিনী যেন আকাশ হইতে পড়িল কহিল,— কেন? সে খুশুর-বাড়ী গেছে?

কিরণ বলিল—না, উষা পিণি, তোমার জামাই আর

মেয়ে দু'জনে বাজার করতে বেরিয়েছেন...সেখান থেকে সিনেমায় যাবেন। দাছ সুখ্যাতি করছিল। বলছিল, বেশ ভালো লাগলো এই সপ্রতিভ ভাব! কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেছি এই বেহায়াপনা দেখে! সন্ত বিয়ে হয়েছে, আর এর মধ্যেই এমন অস্তুর্জতা...ওঁরা স্বামি-স্ত্রী ছাড়া দুনিয়ায় যেন আর মানুষ নেই!

হাসিয়া উষাজিনী বলিল—এই ভালো, কিরণ। তোমার বিয়ে হোক...তখন জামাই এসে এমনি করে তোমাকে নিয়ে বেরুবে...আমি কায়-মনে সেই প্রার্থনা করি।

কিরণ বলিল—হঁ! আমি যাবো কি না! বয়ে গেছে! ...দু'দিনে কোনো লোককে বুঝি এতখানি বিশ্বাস করা যায়? যে-সে এসে বলবে, চলো...অমনি তার সঙ্গে বেরুবে! কিরণ সে-মেয়ে নয়, উষা পিণি।

তারাচরণ রায় হাসিলেন। হাসিয়া তিনি বলিলেন,—সেই ভালো। অজানা নতুন লোককে ভূমি চট করে বিশ্বাস করো না, দিদি। তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে ভূমি এই বুড়ো দাছকে সঙ্গে নিয়ে...তোমার ব্যাগ বইবে, লিপষ্টিক বইবে, পাউডার বইবে, আয়না বইবে।

তার পর তিনি চাহিলেন উষাজিনীর পানে, বলিলেন, জামাই কেমন হয়েছে মা উষা?

উষাজিনী কহিল,—চমৎকার জ্যাঠামশায়! রূপে-গুণে যেমন হতে হয়! দুঃখ শুধু এই যে, আজ সন্ত কাকা নেই, কাকিমা নেই...

একটি নিখাস ফেলিয়া গাঢ় স্বরে তারাচরণ রায় বলিলেন,—হঁ...

উষাজিনী তখনি অল্প কথা পাড়িল, বলিল,—সলিলা এলে সলিলাকে ভূমি বলো, এলাহাবাদে থাকবে তো... আমার ওখান থেকে খুব কাছে। আমায় যেন চিঠি লেখে...তা ছাড়া আমাকে যা কথা দেছে...আমার ওখানে এক দিন ওরা দু'জনে বেড়াতে যাবে...সে কথা যেন সত্যি হয়!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাদের জামাই মত করবে তো?

উষাজিনী বলিল,—নিশ্চয়। জামাইকেও আমি বলেছি। তাতে সে আমায় কথা দেছে। বলেছে, অত কাছে থাকবেন...নিশ্চয় দু'জনে যাবো পিণিমা।

তারচরণ রায় বলিলেন,—তোমার কথা বলবো মা... নিশ্চয় বলবো! চিঠি-পত্র আমাকেও লিখো মা উমা... আমি হয় তো যাবো। এ-বয়সে আবার মাঝে-মাঝে প্রয়াগ-তীর্থে না নিয়ে গিয়ে সলিলা ছাড়লো না! এমন মায়ী হয়েছে...মাসে একবার করে ঘুরে আসতে হবে, দেখছি!

উষাজিনী বলিল,—নিশ্চয় আসবেন, জ্যাঠামশায়। মেয়ে...তাকে কাছে রাখা চলে না, তাই বিয়ে দিয়ে দূরে পাঠাতে হয়। কিন্তু দেখতে যাওয়া যায় তো। আপনি সেখানে নিশ্চয় যাবেন। আপনার জিনিষ! অমনি একবার আমাদের কুঁড়ে-ঘরেও পায়ের ধুলো দিয়ে আসতে হবে জ্যাঠামশায়, নাহলে আমার বড্ড দুঃখ হবে।

তারচরণ রায় বলিলেন,—যাবো মা। এলাহাবাদে যদি যাই, তোমার ওখানে যাবো না?

তারচরণ রায়ের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া উষাজিনী প্রণাম করিল। তারচরণ রায় তার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন,—চিরায়ুতী হও মা।...কার সঙ্গে যাচ্ছে?

-- বাবা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।

উষাজিনী বলিল,—আসি জ্যাঠামশায়...

কিরণকে আদর করিয়া উষাজিনী চলিয়া গেল।

কিরণ গুম্ হইয়া রছিল...খানিকক্ষণ। তার পর অকস্মাৎ ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল,—নাঃ, সলিলার বিয়ে হয়ে গেলে কত আমোদ-আহ্লাদ করবো, ভেবেছিলুম। তা না, বৌকে এর মধ্যে না নিয়ে গেলে বরের চাকরি থাকবে না!

হাসিয়া তারচরণ রায় বলিলেন,—তোমারো বরের চেষ্টা দেখছি দিদি...দাঁড়াও না! এই জঙ্কি-মাস পেরুতে দেবো না।

কিরণ বলিল,—হ্যাঁ, তাই না কি আমি বলছি। তোমার গলা ধরে!

২৩

বীণাকে লইয়া স্বর্ণহ্যতি ফিরিল রাত্রি তখন ন'টা বাজে—সঙ্গে একরাশ জিনিষ। রেশমী শাড়ী-রাউশ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সাবান-সেট প্রভৃতি নানা টুকিটাকি।

তারচরণ রায় বলিলেন—বাজার হলো?

স্বর্ণহ্যতি বলিল,—হ্যাঁ। ভাবছি কাল বিশ্রাম, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হবে। কাল বাজার করা সুবিধা হবে না বলেই আজ...বুঝলেন দাছ!

সলজ্জ ভঙ্গীতে বীণা চলিয়া যাইতেছিল, স্বর্ণহ্যতি বলিল—দাছকে জিনিষপত্র দেখাও...

লজ্জায় সলিলা যেন কাঠ!

তারচরণ রায় বলিলেন,—কাঠ হলে তো চলবে মা, দিদি! পড়েছো মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!

স্বর্ণহ্যতি বলিল—আমাকে মোগল বললেন, দাছ!

তারচরণ রায় বলিলেন—চলুতি ছড়া বলেই বলেছি, ভাই। তুমি সত্যিকারের মোগল হবে কেন?...তা লজ্জা কেন দিদি? ঘর-সংসার পাতছো...আমাকে দেখাও সে ঘর-সংসার কেমন হবে!

বীণার লজ্জা তবু ভাঙিতে চায় না! হাসিয়া স্বর্ণহ্যতি বলিল—বাইরে আমার সঙ্গে দিব্যি ঘুরে এলে তো...অত কথাবার্তা! আর ঘরের মধ্যে দাছর সামনে এমন লজ্জা! জানলেন দাছ...সে কি smartness...দেখলে কে বলবে, আমার সঙ্গে সস্তা বিয়ে হয়েছে!

তারচরণ রায় হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—বর কি বলছে দিদি?...আমার সঙ্গে এত দিন ঘর করলে, তবু লজ্জা! দেখি, দু'জনে কি কিনলে...কে কোন্টা পছন্দ করলে, আমায় বলো...

স্বর্ণহ্যতি বলিল,—এসো...

বীণা আসিল। তারচরণ রায় বলিলেন—বরের কথায় দিব্যি এলে তো! আর এই বুড়ো এতক্ষণ সাধ্য-সাধনা করছিল...

বীণা কোনো জবাব দিল না। নিঃশব্দে প্যাকেট খুলিল।

জিনিষ দেখিয়া তারচরণ রায় স্তম্ভিত করিলেন।

উচ্ছ্বসিত স্বরে স্বর্ণহ্যতি বলিল,—আপনার নাৎনী এর কোনোটা পছন্দ করেনি...এ-সব আমি পছন্দ করেছি। আমার টেবিলের তারিফ করুন।

তারচরণ রায় কোনো কথা বলিলেন না। আসন্ন বিদায়ের কথা স্মরণ করিয়া তাঁর বুক ব্যথা-ভারে ভরিয়া উঠিতেছিল।

জিনিষপত্র দেখা হইলে স্বর্ণহ্যতি বলিল,—আপনার

নাৎনীকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে গেলুম দাহু, অরুত দেহে-মনে ! চার্জ বুঝে নিন...

তারচরণ রায় বলিলেন,—তার মানে ? তুমি চলে যাচ্ছে না কি ?

স্বর্গদ্যুতি বলিল,—বাড়ী যাবো না ? বাঃ !

তারচরণ রায় বলিলেন,—বাড়ী তো তোমার এখন এইখানে ।

—কি-রকম ?

—গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ! তোমার গৃহিণী যেখানে, সেই-খানেই তোমার বাড়ী...

হাসিয়া স্বর্গদ্যুতি বলিল,—পরশু চলে যাবো দাহু... বাড়ীতে এ-ছ'রাত্রি না থাকলে লোকে কি বলবে ?

তারচরণ রায় বলিলেন,—লোকের কথা এত-বড় ? তোমরা একালের ছেলে...যাকে বলে modern...লোকের কথায় নিজের মনকে উপবাসী রেখে পীড়া দেবে ! মন চাইছে মোড়শী বধু... জ্যোৎস্না রাত্রি...

সলজ্জ হাস্তে স্বর্গদ্যুতি চাহিল বীণার পানে । বীণা আর এক-নিমেষ দাঁড়াইল না...স্বরিত-পায়ে বাহিরের বারান্দায় চলিয়া গেল !

স্বর্গদ্যুতি বলিল,—আপনার নাৎনী পালালো যে ! শুকে ধরে আনি ।

স্বর্গদ্যুতি বাহিরের বারান্দায় গেল এবং বীণাকে ধরিয়া ধরে ফিরিল ।

লজ্জায় বীণার জড়ো-সড়ো মূর্তি ! স্বর্গদ্যুতি ছাড়ে মা ! হেলিয়া বাঁকিয়া-চুরিয়া মুক্তির জঁত্র বীণার সে কি আকুল প্রয়াস !

হাসিয়া তারচরণ বলিলেন,—তোমায় পালাতে হবে না দিদি, আমিই না হয় সরে যাচ্ছি ! আমি বুঝি দিদি, মন চায়...সেই বে সে-দিন গান গাইছিলে...সেই মন চায় ভবু খব লজ্জা...কি গানটা ?

উচ্ছ্বসিত-আগ্রহে স্বর্গদ্যুতি বলিল—মন চায় না দাহু, প্রাণ চায় । আমি জানি...রবি বাবুর গান

প্রাণ চায় চক্ষু না চায়—
মরি এ কি তোমার হৃদয়ের লজ্জা !
সুন্দর এসে ফিরে যায়
ভবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা !

তারচরণ রায় কহিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ...তাই বটে !

প্রাণ চায়, চক্ষু না চায় ! কিছ তোমার সুন্দর এসে যে ফিরে যাচ্ছে দিদি...এ সময় লজ্জা করলে তাকে ধরে রাখবে কে ?

সলজ্জ ক্রভঙ্গি-সহকারে বীণা বলিল—যাও...ছ'...

লজ্জা-জড়িত এই মৃদু-হাস্ত তারচরণ রায়ের বুকে যেন বসন্ত-বাতাসের স্পর্শ দিল ! কি সুন্দর, সরল ঐ মিষ্ট-মধুর হাসি ! ও হাসির পিছনে কতখানি আশা...কি যে স্বপ্ন-সুখমা...

ছোট একটা নিশ্বাস তিনি রোধ করিতে পারিলেন না । নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোমার কর্তাটিকে থাকতে বলা দিদি...না হলে আমাদের সলিলা বিগলিতা হয়ে পড়বে...

বীণা এবার কথা কহিল ; বলিল—আমার হাত ছেড়ে দিতে বলা দাহু...

স্বর্গদ্যুতি বলিল—তুমি পালাবে না...কথা দাও ।

তারচরণ রায় বলিলেন—ও হলো সবল-তরুণ... তা ছাড়া তোমার উপর ওরই এখন অধিকার...আমার কি সাধ্য দিদি, ওর হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দেবো !

বীণা বলিল—না...ছাড়তে বলা !...সকলে মজা পেয়েছো আমায় নিয়ে...না ? আমি যেন মানুষ নই !

স্বর্গদ্যুতি বলিল,—তুমি মানুষ বলেই তোমাকে বন্দী করা হয়েছে । পাছে পালাত, তাই !

তারচরণ রায় বলিলেন—এ-খেলা আমার ভালো লাগছে, দিদি । এ-খেলা আজ প্রথম দেখছি...হয় তো এই প্রথম-দেখাই আমার শেষ-দেখা ভাই...

কথাগুলো শেষের দিকে বাষ্প-ভারে বিজড়িত হইল ।

তিনি চাহিলেন স্বর্গদ্যুতির পানে ; তার পর কাশিয়া গলা সাফ করিয়া লইয়া বলিলেন,—তুমি জানো না স্বর্গ, হেলায় জীবনের কতখানি আমি হারিয়ে ছিলুম ! আজ শেষ বেলায় সে-অবহেলার ক্রটি সেরে কি আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছে !

একটা বড় নিশ্বাস ! কত কালের পুঞ্জিত বেদনা যে এ-নিশ্বাসে বুকের কোটর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল !

তারচরণ রায় বলিলেন,—বাড়ী যাবে বলছো ! ধরে রাখবো না ! কাকেও ধরে রাখবার মতো শক্তি আমার নেই, ভাই...সাহসও আর নেই ! তবে তোমাদের

হুটিকে যতক্ষণ কাছে পাই!...আজ আমার সব কথা মনে পড়ছে। সন্ত ডাগর হয়ে উঠলো, মনে কত আনন্দ... অমনি তিনি চলে গেলেন। সন্ত বিয়ে দেবেন, কি-সাধই তাঁর ছিল!...তিনি চলে গেলে সন্তর বিয়ের নামে আমার বুক কি-ব্যথা ভরে উঠতো! সন্ত আসতো... কিন্তু বিয়ে দেবার কথা মনে হলেই ভাবতুম, কার বোঁ... আদর করে বোঁ নিয়ে আসবো আমি, সে-বোঁ কে দেখবে? যার ছেলে, যার বড় সাধ ছিল, তিনি নেই! মনের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ চলতো...

তারচরণের স্বর অপরূপ হইল।

এ কথায় ব্যথা বোধ করিয়া স্বর্গদ্যুতি বলিল,—আমি জানি দাছ...সে কথা আমি শুনেছি। কিন্তু যা গেছে, তা নিয়ে দুঃখ পুসে তো কোনো ফল নেই! যা আছে, তাই নিয়ে সে-দুঃখ আমাদের ভুলতে হবে, দাছ! আমি বুঝছি, সলিলা এখান থেকে চলে গেলে আপনার জীবন খালি হয়ে যাবে...তাই যদি কিছু না মনে করেন, আমার একটু নিবেদন আছে...

তারচরণ রায় কোনো জবাব দিলেন না। হুই চোখে থাকুল প্রশ্ন ভরিয়া স্বর্গদ্যুতির পানে চাহিলেন।

স্বর্গদ্যুতি বলিল,—আপনি মাঝে-মাঝে যদি আমাদের ওখানে যান, তা হলে আপনিই শুধু মনে শান্তি পাবেন, তা নয়...আমরাও অনেকখানি শান্তি পাবো। বিশেষ, সলিলা!...বায়োস্কোপে আজ এইমাত্র একটা ছবি দেখে আসছি। সে ছবির গল্প ছিল, এক জন ভদ্রলোকের একটিনাত্র মেয়ে...সেই মেয়ে একটি ছেলে রেখে মারা গেল। ছেলেটিকে বুক নিয়ে বুড়ো দাদামশায় কোনো মতে শান্তি পেলেন, শক্তি পেলেন। তার পর সে-ছেলে এক বিদেশিনীকে বিয়ে করে বিদেশে চলে গেল। বুড়ো দাদামশায়ের কথা ভাবলো না! দাদামশায়ের তখন কি-দুঃখ! সে-দুঃখ কি-পুজামুপুজা বিপ্লবের করে চবিত্তে দেখিয়েছে!.. ছবি দেখে সলিলা কেঁদে সারা। আমি যত বোঝাই, সলিলা বলে, আমি চলে গেলে দাছ কি নিয়ে থাকবে? কি করে দাছর দিন কাটবে? আমিও সে-কথা ভাবছি, দাছ...

এ কথায় তারচরণ রায় কি-স্বস্তি যে বোধ করিলেন! তাঁর দুঃখ এমন করিয়া এরা ভাবে? কিন্তু না, তাঁর এ

দুঃখ-মোচনের কোনো উপায় নাই! তাঁর জন্ত এরা এ-বয়সে মিছা কেন দুঃখ পাইবে?

তিনি বলিলেন—না দাদা, না দিদি, আমার জন্ত দুঃখ করো না। সংসারে এ-বিদায়, এ-অদর্শন নিত্যকার ঘটনা। এ-ঘটনা সকলকেই বুক নিতে হয়। আমি যাবো...নিশ্চয়। মাঝে-মাঝে ওখানে গিয়ে তোমাদের দেখে আসবো। নিত্য-দিন এখানে বসে তোমাদের মঙ্গল কামনা করবো, তোমরা সুখী হও...সুখে থাকো!... তোমাদের ছেলেমেয়ে হবে। মেয়ে হলে বিয়ে দিয়ে সে-মেয়েকেও এক দিন চোখের আড়ালে পাঠাতে হবে তো!

স্বর্গদ্যুতি বলিল—আমার এক মাসিমা বলছিলেন, সলিলাকে আজ আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে। তাতে মা বললেন, না...বুড়ো দাদামশায়ের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে...দুটো দিন সলিলা তাঁর কাছে থাকুক! ও-ছাড়া দাদামশায়ের আর কে আছে!...কাল আমি নিশ্চয় আপনার কাছে আসবো দাছ। পরশুও আসবো। আমরা বেরবো সেই পাঞ্জাব মেলে! সলিলা কাল তার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিক!...তার পর ভাবছেন কেন, দাছ? সলিলাকে দু'দিনে এমন স্মার্ট করে দেবো যে, শুধু আপনি কেন আমাদের দেখতে যাবেন...দেখবেন, সলিলা একলা হুট বলতে এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবে। আমি অবশু হুট বলতে আসতে পারবো না, হয় তো...পরের চাকরি! জানি না, সে-চাকরিতে French leave মিলবে কি না...

গল্পে ও কৌতুক-হাস্তে বিদায়-ব্যথার জমাট ভাব কাটাইয়া স্বর্গদ্যুতি বিদায় লইল...ঘড়িতে তখন দশটা বাজিতেছে।

২৬

পরের দিন।

মনের দুঃখ মনে চাপিয়া তারচরণ রায় কোমর বাধিয়া বীণার সঙ্গে মিলিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া বাঁধা-ছাঁদা করিতে লাগিলেন। ও-বাড়ী হুইতে কিরণ আসিয়া সে-কাজে যোগ দিল।

বেলা প্রায় তিনটা...ডাকে একখানা চিঠি আসিল। সলিলার নামে চিঠি। খামের উপর কদম্ব হাতের অক্ষরে নাম-ঠিকানা লেখা।

খাম হাতে লইয়া বীণার বিশ্বয়ের সীমা নাই! এমন হাতের হরফে ঠিকানা—কে চিঠি লিখিয়াছে?

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। তিন-পাতা চিঠি। হাতের অক্ষর খামে-লেখা অক্ষরের অনুরূপ। চিঠিতে সম্বোধন দেখিয়া বীণার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চিঠির তলায় যে-নাম লেখা...

দেখিবামাত্র দিনের আলো যেন দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল! কোনো মতে কিরণ এবং তারচরণের দৃষ্টি এড়াইয়া চিঠিটা লইয়া বীণা আসিল পাশের বারান্দা পার হইয়া নিরালা একটা ছোট ঘরে। এ-ঘরে রাজ্যের ছেঁড়া লেপ-তোষক-বালিশের পাহাড় ডাঁই হইয়া আছে। এ-ঘরে বড়-একটা চুকিবার প্রয়োজন কাহারো হয় না।

এ-ঘর সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবিয়া বীণা চিঠি পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে—

কল্যাণীয়াসু

বীণা

ক'দিন আগে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। ঘটর বিবাহে কনে সাজিয়া ফুল-দিয়া-সাজানো মোটরে চড়িয়া বরের পাশে বসিয়া নূতন খশুব বাড়ীতে চলিয়াছ!

গোলমালের মধ্যে তখন কোনো কথা কহি নাই। কে জানে, যদি কেহ ধবিয়া প্রহার দেয়!

তার পর কাল সন্ধ্যার সময় দেখি মোটর হইতে নামিয়া বরের সঙ্গে দিনেমায় চলিয়াছ। দিনেমাব দ্বারে ঠায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। দিনেমা দেখিয়া তোমরা বাহির হইলে। তাহার মধ্যে ডাইভাবের সঙ্গে আলাপ করিয়া সব বৃত্তান্ত জানিয়া লইয়াছি।

ডাইভাবের মুখে শুনিলাম, তুমি না কি অগাধ ঐশ্বৰ্যের মালিক তারচরণ রায়েব একমাত্র পৌত্রী! তার মনিবের ছেলে বিলাত-ফেরত, স্বর্ণভ্যাতি রায়েব সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়াছে। তোমার বব তোমাকে লইয়া কাল এলাহাবাদে যাইবে—বড় সরকারী চাকরী করিতে।

তুমি আমার মেয়ে বীণা—তাচরণ বায়েব নাংনী সলিলা সাজিয়াছ! আর এত কাল তে,মাকে আমি কোথায় না খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি!

তোমার এইবুদ্ধি আর সাহস দেখিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইতেছে। ইয়া, আমার মতন বুদ্ধি, বিজ্ঞা এবং সাহস পাইয়াছ!

একবাব মনে করিয়াছিলাম, তোমার পরিচয় দিয়া

তোমাকে কাড়িয়া আনি। তার পর মাথায় সুবুদ্ধি জাগিল! ভাবিলাম, না, একে আমার ছরবস্থা চলিয়াছে—তোমাকে লইয়া কোথায় যাইব? তার উপর যদি তুমি আমার কথা না শোনো, আমার যে-হৃদশা, সেই হৃদশা থাকিয়া যাইবে...হৃদশা কখনো ঘুচবে না। তার চেয়ে বিবাহ হইয়া যাক—বড়লোকের নাংনী, বড়লোকের বোঁ—তখন তুমি আমার হাতের মুঠায় থাকিবে। আমারো আর কোনো হৃদশা থাকিবে না। এই কথা ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

আজ চিঠি লিখিতেছি, তার কারণ তুমি এলাহাবাদে চলিয়াছ, তাই তোমাকে জানাইয়া দিলাম, আমি আছি। বাচিয়া আছি এবং তোমাকে পাইয়াছি! আমার হৃদশার একশেষ! একটা মোটরের কারখানায় তেল-কালি মাগিয়া মিস্ত্রীর কাজ করিতেছি। মাগিনা পাই মাসে পঁচিশ টাকা। কষ্টেব সীমা নাই। তুমি এত টাকার মালিক, আর আমি কি-ছঃখে তেল-কালি মাগিয়া কষ্ট সহিব, বলিতে পারো?

এখন আমি কি করিব, জানিতে চাই। তোমার সঙ্গে এলাহাবাদে যাইব? না, আমার জন্ম ভালো বকম মাসহাবাব ব্যবস্থা করিবে?

আমাব ঠিকানা ১২ নম্বর বাস্ত হালদাব লেন, কালীঘাট। এই ঠিকানায় কাল সকালে যেন তোমাব চিঠি পাই। না পাইলে ট্রেশনে যাইব। ইতি

আশীর্বাদক তোমার পিতা

শ্রীপতি চক্রবর্তী

বীণার পায়ের তলায় পৃথিবী ছলিয়া উঠিল! দিনের আলোর উপর কে যেন কালো পর্দা ঢাকিয়া দিল! চারিদিকে জমাট অন্ধকার।

বীণার মনে হইল, এ অন্ধকারে সে যেন পৃথিবী ছাড়িয়া কোন্ অন্ধ পাতালে পড়িয়া গিয়াছে! চেতনাও যেন লোপ পাইয়াছে!...

চেতনার উন্মেষ হইলে সে দেখে, অন্ধকার সরিয়া আবার দিনের আলো এবং তার হাতে চিঠি!

চিঠি তাহা হইলে সত্য! শ্রীপতি তার দেখা পাইয়াছে এবং দুর্লভ্য নিয়তির মতো আবার তাকে সে ঘিরিয়া বাধিয়া রাখিতে চায়!

হায় রে সে ভাবিতেছিল, এত দিন পরে পুরানো সব-কিছু ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিবে! এখানে আসিয়া বেশ ছিল...কিন্তু যে দিন সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শ্রীপতিকে দেখিয়াছিল

চকিতের মতো, সে-দিন হইতে অতীতকে অবলম্বন করিয়া মনে আতঙ্ক-বাষ্প আবার উদয় হইয়াছে! এত-বড় সহর...কোথায় কখন থাকিবে শ্রীপতি, যদি তাকে দেখে...দেখিয়া কি করিবে, কি যে না করিবে, এই ভয়ে সারাক্ষণ সে কাঁঠ হইয়া থাকিত। সে-ভয় এমন যে, বেচারী তারাচরণ রায়ের স্নেহের কূলে বসিয়াও সারাক্ষণ মনে হইত, এ কুলটুকু বিপদের পারাবারে যদি ডুবিয়া যায়, সে তখন কোথায় থাকিবে! শুধু ঠাকী-যাওয়ার কথা নয়...এই তারাচরণ রায় সব হারাইয়া, সব চুকাইয়া বসিয়াছিলেন! মিথ্যার জোড়া-তালি দিয়া তাঁর সেই হারানো-চুকানোর উপর বীণা তাঁর বুকখানাকে আবার যে-ভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছে... বীণার এ মিথ্যা ছলনা জানিতে পারিলে ব্যথা আরো কত-শুণ হইয়া তাঁর বুক বাজিবে! সে ব্যথায় বিধুর-চিত্ত তারাচরণ রায় যদি বলেন, তোর কাছে কোনো অপরাধ করি নাই তো, কেন তুই এত-বড় মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইয়া...আমার সঙ্গে এ-প্রতারণা কেন করিলি?

নিজের নৈরাশ্র, নিজের সর্বনাশের ব্যথার চেয়ে বৃদ্ধ তারাচরণের ব্যথা অনেকখানি তীব্র গভীর হইয়া বীণার বুক বিধিতে লাগিল—হাজার-হাজার তীক্ষ্ণ তীরের মতো...

বাহিরে পৃথিবী তার নির্বিকার গতিতে ঘুরিয়া চলিয়াছে...পত্র-পল্লবের গায়ের উপর হইতে রৌদ্র-কিরণ ঐ সরিয়া-সরিয়া চলিয়াছে...পথে লোকজনের কলরবে শ্রান্তির সুর মিশিতে সুর করিয়াছে...আকাশের বুক যে-সব পাপী এতক্ষণ নিশ্চিন্ত-মনে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তারা আবার এই মাটির পৃথিবীর পানে, পৃথিবীর গাছপালার পানে ফিরিয়া চাহিতেছে...

অপরায় ঘনাইয়া আসিলেও জীবনের স্পন্দন ঠিক আছে...সে স্পন্দন থামিবার কোন লক্ষণ কোনো দিকে নাই। সে-ই শুধু নিস্পন্দ কাঠের পুতুল! কি করিবে, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাও নাই! যে-অপরাধ করিয়াছে, এখন আর তা সংশোধন করিবার উপায় নাই, সাহসও নাই!

ওদিক হইতে কিরণের কণ্ঠে আহ্বান শুনা গেল—
সলিলা...সলিলা...

সর্বনাশ! কিরণ যদি জানিতে পারে? আর স্বর্ণহ্যতি?

এ-হুদিনে স্বর্ণহ্যতির কাছে কি স্নেহ, কি শ্রীতি সে পাইয়াছে! ইহাকেই বলে ভালোবাসা!...গল্পে-উপন্যাসে যে-ভালোবাসার কথা পড়িয়া বিশ্বয়ে বিহ্বল হইয়া থাকিত...যে-ভালোবাসা নিজেকে ভুলিয়া প্রিয়জনের তৃপ্তি চায়...

এ ছলনার কথা শুনিলে স্বর্ণহ্যতি কি বলিবে? সে কি করিবে?

বীণার দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল!

কিরণ আবার ডাকিল—সলিলা...অ সলিলা...

স্বর এই দিকে আসিতেছে...

চিঠিখানা চট করিয়া সেমিজের কাঁকের মধ্য দিয়া বুকে গুঁজিয়া বীণা আসিয়া দাঁড়াইল সামনের ছোট ছাদে।

কিরণ ছাদে আসিল। কহিল—খুব মেয়ে যা হোক! বরের জন্ত মন কেমন করছে বুঝি? তাই ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এখানে তারি প্রতীক্ষা-রত!

কণ্ঠে নিশ্বাস চাপিয়া বীণা চাহিল কিরণের পানে।

কিরণ দেখিল, বীণার দুই চোখে জল!

মমতা হইল। কাছে আসিয়া বীণাকে বুক জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল—কাদছিস?

এ প্রশ্নে বীণা একেবারে ভাবিয়া গেল!

কিরণ বলিল—এখানকার জন্তে মন কেমন করছে?

বীণা কিরণের বুক মুখ গুঁজিল।

কিরণ বলিল—আমারো কান্না পাচ্ছে সলিলা... যত দিন দেখিনি, দুঃখ ছিল না, ভাই। দেখা হয়ে জানাশুনা হয়ে এ কি যাতনা, বল তো? তোর যেমন, আমারো তেমনি!

একটা নিশ্বাস...নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণ বলিল—
তোর তবু একটা সাধনা এই যে, বরের সঙ্গে যাচ্ছিস।
নতুন বন্ধু, নতুন ভালোবাসা, নতুন জায়গা, নতুন ঘর!
সেই যে-গান আছে...সে-গানটা কাল থেকে যেন আমার মনে গেঁথে আছে!

যে যায়...চলে যায়...

যারা থাকে,—

তাদের মতন সে কি ব্যথা পায়?

যে যায়,—সে যায় নব-নব বিশ্বে

নূতন শ্রীতির কূলে...নূতন নূতন দৃশ্যে...

কিন্তু না, কাদিসনে ভাই...দাছ ওদিকে গুম্ব হয়ে আছে!

দাছকে কি বললুম, জানিস ? বললুম, চলো দাছ, আমরা তিন জনে একটু বেড়িয়ে আসি...মাঠ ঘুরে, গঙ্গার ধার ঘুরে, লেক ঘুরে একবার তোর বরের বাড়ীতেও যাবো। তার পর এখানে ফিরবো...কেমন ?

বাহিরে ? বাহিরে সেই পথ ! বীণা শিহরিয়া উঠিল ! কে জানে, বাহিরে ঐ পথের উপর হয় তো দাঁড়াইয়া আছে সেই দুর্ভাগ্য শ্রীপতি...

ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বীণা বলিল—আমার কিছু ভালো লাগছে না কিরণ। আমি কোথাও যাবো না। তার চেয়ে আমরা তিন জনে যদি চুপ করে ঘরে বসে থাকি আজ ? সে-ঘরে আর-কেউ আসবে না...শুধু আমরা তিন জনে থাকবো !

কিরণ কহিল—বেশ। দাছকে তাই বলি। এসো সলিলা, দাছর সঙ্গে গল্প করবে। দাছ ডাকছে।

বীণাকে লইয়া কিরণ আসিল তারাচরণের কাছে... বলিল—না দাছ, কোথাও যাবো না। সলিলা কঁাদছিল। সলিলা বলছে, তিন জনে শুধু এক-ঘরে চুপ করে বসে থাকবো...সে-ঘরে আজ আর-কেউ আসবে না।

এ-কথায় বীণার মনের গভীর ছুঃখের আভাস পাইয়া তারাচরণ রায় ব্যথাভুর হইলেন। তিনি বলিলেন—তাই হবে দিদি। এসো তুমি আমার কাছে...

সন্ধ্যার পর স্বর্ণহ্যতি আসিয়া দেখা দিল।

স্বর্ণহ্যতি বলিল—মনে করো না দাছ, এ-কালের ছেলে বলে আমি খুব নির্ভাজ...

এ কথার অর্থ না বুঝিয়া তারাচরণ রায় স্বর্ণহ্যতির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিরণ বলিল,—বুঝতে পারছো না দাছ, ভূমিকা করছেন ! এর পরেই প্রথম পরিচ্ছেদে হবে সলিলাকে নিয়ে একবার বেরুবো ! তার পর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঐদের বাড়ীতে সলিলাকে নিয়ে ঐর বাসর-জাগরণ !

স্বর্ণহ্যতি বলিল—এ-কালের ছেলেদের চেয়ে এ-কালের মেয়েদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ—এ-কথা ভেবে অহঙ্কার বোধ করলেও কথাটা সত্য নয়।

কিরণ বলিল,—তার মানে।

স্বর্ণহ্যতি বলিল,—তার মানে, আপনি পরিচ্ছেদ

বিপ্লবনে মস্ত ভুল করলেন ! আমি বলছিলুম, আমি নিজে যেচে এখানে আপনাদের সঙ্গে কুটুস্থিতে করতে আসিনি ! যা আমাকে পাঠিয়ে দিলে। বললে, বুড়ো দাদামশায় কত দিন তোদের ছু'জনে কাছে পাবেন না—আজ তোরা ছু'জনে অর্থাৎ আমি এবং আমার এই নবোঢ়া বধু সলিলা...আমরা এইখানে দাছর কাছে থাকবো। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে সখী সঙ্গে আমাদের সে-বাসরে বা আসরে গান গাইতে পারেন—
ছু'জনে দেখা হলো মধু-যামিনী রে।

ক্রভঙ্গী-সহকারে কিরণ বলিল,—আম্পর্কীর কথা শুনচো দাছ ! ঔরা যেন থিয়েটারের সেই হুসেন-মর্জিনা...ঔরা বসবেন সিংহাসনে আর আমি ঘাগরা-পরা বাদী নীচেয় দাঁড়িয়ে গান গাইবো, চাঁদ-চকোরে অধরে-অধরে পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে !...বয়ে গেছে আমার থাকতে ! ঔরা কাল মজা করে চলে যাবেন, আর আমরা ঔদের সে-মজাকে আরো জম্জমাট করে তুলবো ! বটে ! আমি সে বান্দা নই মশাই !

এই কৌতুক-হাস্ত-কলরবে বীণার মনের উপর হইতে পাথরের ভার যেন সরিয়া যাইতেছিল ! বীণা ভাবিল, কোনো মতে যদি কালিকার রাত্রি পর্য্যন্ত সময়টুকু নির্ঝিল্লি কাটিয়া যায়, তাহা হইলে একদিন সুবিধা করিয়া স্বর্ণহ্যতিকে সব কথা সে খুলিয়া বলিবে। এখন একদিন নয় ! সে-একদিন অনেক দিন পরে...স্বর্ণহ্যতি যখন বীণার মনের পরিচয় পাইবে...সম্পূর্ণ পরিচয়...তখন ! তার পর বলিবে দাছকে !

অনেক দিন পরে সে-একদিন কবে আসিবে ঠাকুর !

স্বর্ণহ্যতিকে পাশে পাইয়া রাত্রিটা কোনো মতে কাটিয়া গেল। চোখে ঘুম নাই। কত কথা মনে হয় ! সেই সঙ্গে ভয়-সংশয় আশা-নিরাশা...

পরের দিনটাও ভয়ে-ভয়ে কাটিল। ডাকে যদি আবার একখানা চিঠি আসে ?

কিন্তু সশরীরে শ্রীপতি আসিয়া যদি দাছর সঙ্গে দেখা করে ?

কিন্তু চিঠি আসিল না ! শ্রীপতিও আসিয়াছে বলিয়া জানা গেল না।

সন্ধ্যার পর তাড়া-হুড়া...বিষম কোলাহল। তার পর
ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করিয়া গাড়ী...

গাড়ীতে বসিয়া বীণা ভয়ে-ভয়ে সবার অলঙ্ক্যে পথের
পানে চাহিল। না, শ্রীপতি নাই!

টেশন।

সেক-গু-ক্লাশ কামরা। ছোট কুপে। ছু'খানি মাত্র
বার্ষ। সে ছু'খানির একটায় সে থাকিবে, অপরটিতে
স্বর্ণহুতি।

তারচরণ রায় বীণাকে ছাড়িতে চান না! গাড়ীতে
উঠিয়া বসিয়াছিলেন। স্বর্ণহুতি প্লাটফর্মে আশ্রয়-বন্ধুদের
সঙ্গে কথা কহিতেছিল।

বাঁশী বাজিল। এবার গাড়ী ছাড়িবে।

তারচরণ কহিলেন,—আসি দিদি।

তিনি নামিলেন। স্বর্ণহুতি গাড়ীতে উঠিল।

তারচরণ রায় বলিলেন,—পৌছেই টেলিগ্রাম করো
দাদা। সামনের হুণ্ডাতেই দেখো, তোমাদের হনি-মুনে
এই বুড়ো দাছ রাছর মতো গিয়ে দেখা দেবে!

হাসিয়া স্বর্ণহুতি বলিল,—সে-ভয় দেখাবেন না দাছ।
আপনি গেলে আমাদের হনি-মুন ষোল-কলায় পরিপূর্ণ
হবে!

গাড়ী চলিতেছে। বীণা জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া
আছে। ঐ দাছ...

কিন্তু একটু-দূরে...ঠাকুর, ঠাকুর...ও যে শ্রীপতি!
এখানে আসিয়াছে!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কন্যা-কুমারী

ত্রি-ধারা আসিয়া প্রয়াগে মিশিয়া ত্রিবেণী তীর্থ হ'লে
কন্যা-কুমারী তীর্থ নেত্রাবি বণিব কিবা ব'লে ?
অতি সামান্য বিছা এবং বৃদ্ধি ধারালো নয়,
দীনতীন স্তম্ভু কাবটুকু বই কিবা আব পাণয়ে ?

পুচ্ছ থাকিলে, উচ্চ কণ্ঠে তুচ্ছ কাবয়া সব
যে তাম গাতিয়া, গগন বাতিয়া উঠিত আত্ম বব !
সাগরের সাথে উপসাগরের ভয়েছে মিলন বটে
ভূগোলেও এই কথাটা যে তায় মধুর হইয়া বটে !
জল-পুবাণের স্তল-পুবাণের পুনানো বাস্তা ভুলে
কেমনে কন্যা-কুমারী তোমার মতিমা যাষ্ট মা' ভুলে !
তোমারে দে'গলে পু'খির পাতাব বিছা ফুরায়ে যায়
বুখা-পণ্ডিতী করি দিয়া ইতি নেত্রাবি শিশুর প্রায় !
নেত্রাবি বিরাট নীলেব সায়র দশ দিক্ জুড়ে আছে—
পূব-সাগরের উপসাগরের রূপ-সাগরিকা নাচে !
ইরাণী ওড়না উড়ায়ে আরব-সাগর এসেছে চ'লে
এই ভারতের মহাসাগরের প্রসারিত মা'র কোলে !
ভারত-মাতার ছ'টি কুল হ'তে ছ'টি ফুল যেন ভেসে
মিলিত হেথায় হিন্দু এবং মুসলমানের বেণে !
উপরের নীল আকাশ হইতে আশীষ ঝরিছে তায়
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-নীলমা দশ দিশি ভাব' ভায় :

* * * *

দশ দিশি ভাব' মতা-মতিমায় বিদ্যালতা কবে গেলা
এই কুমারিকা অন্তরীপের বালু নচে বালু-ঢেলা !

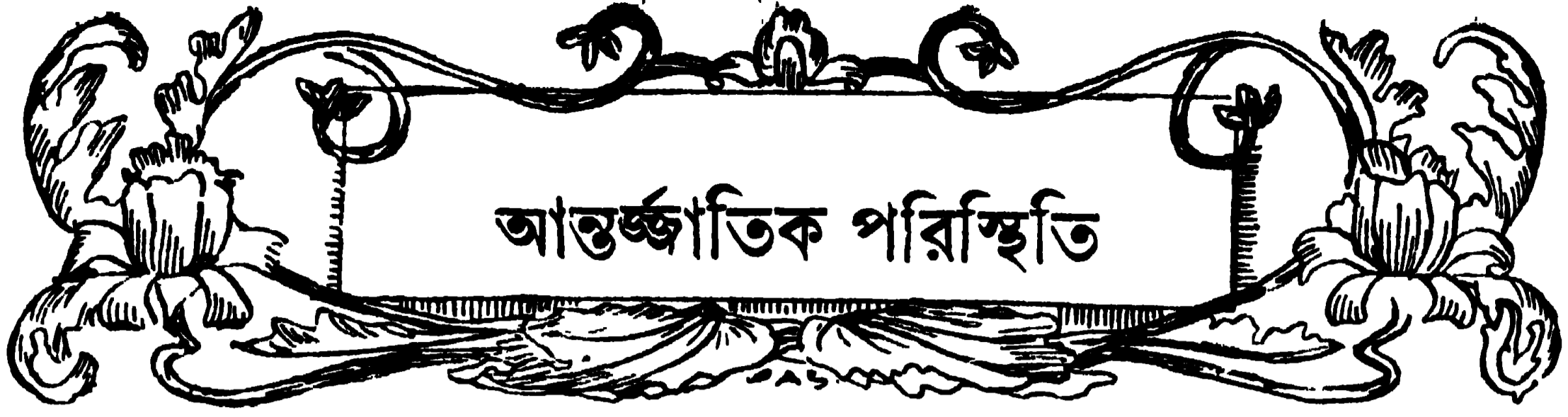
কুমারী-কন্যা উমারট সজ্জা লুটায় মিলু কুলে
কজ্জল আব মন্দ্রব বাগে চিন্দ্র মন ভুলে !
মনে ভাবে মাতা ঐ বুঝি মেয়ে লভেছে উষ্ট্রদেবে
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে উৎসুক মনে মেনকা স্তম্ভী তা' ভেবে !
বাগ আঁগির দৃষ্টি বাস্তাবে বাস্তব না হ'তে পারে
জলধি হইতে গগন অবধি অবধি রেখেছে তা বে !
অপুধি আজো কণ্ঠ-নির্নাদে শব্দে যেন ডাকে
মাজলিকের আনুসঙ্গকে আরতি সাজায়ে রাখে !
মিত বালুবেনা আতপানের পবমানের খালি
কন্যা-কুমারী তাপনী উমারট সে যেন অর্ধা-ডালি !
কলিযুগ এনে পড়েছে বলিয়া শূলী'র রুক্ষ গতি
এ কলির শেষ হবে বলি' দিন আজিও গণিছে সতী !
দিন গণা শেষ হয়েছে কি দেবি ?

বল না ক'দিন বাকি ?

সেই স্তম্ভনের তরে কত দিন আর অপেক্ষা থাকি ?
তোমার তখন শুভ-স্বলগন—মতা-তপস্যা-শেষে
শিবের অঙ্কে উঠিবে কুমারী মধবা বধুর বেণে !
সেই স্তম্ভনের তরে ছ'দিনের দুখে না দুঃখ কহি—
মানুষের ভীড়ে দেবতা তাবায়ৈ বাথ' অব্য বতি !

আমারো জীবনে ছড়ায়ে গিয়াছে মাজলিকের খালি,
আশে-পাশে জল করে চলছিল ধু-ধু কবে শুধু বালি !

শ্রীকপণ্ড বর্মা ।



আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

গত এক মাসে সংঘটিত ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে যুদ্ধের অবস্থা এখনও বৃটেনের অন্তর্কূল বলিয়া মনে হয় না। আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনী উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিলেও বৃটিশ জাতির স্বর্গে জাঙ্গাণীর আক্রমণ-আশঙ্কা এখনও পূর্বেব স্থায় প্রবল। জাঙ্গাণী কর্তৃক ফরাসী নৌবহন ও ফরাসী নৌঘাটী ব্যবহারের সুবিধা লাভে ফলে ভূমধ্যসাগর তথা আফ্রিকার সামরিক অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হইবার আশঙ্কা এখনও বিদ্যমান হইতেছে। সমুদ্রবন্ধে জাঙ্গাণী বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজের ভীষণ ক্ষতি করিতেছে; বরং সম্প্রতি পূর্বাশ্রম ইহার প্রাবল্যই লক্ষিত হইতেছে। কুটনীতিকৃত্তে বৃটেন যেরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লাভ সম্বন্ধে ক্রমেই নিঃসন্দেহ হইতেছে, সেইরূপ জাঙ্গাণীও এখন পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য-প্রাপ্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। জাঙ্গাণীর প্রভাবাধীন অঞ্চলে এখনও তাহাব প্রভুত্ব স্থল হয় না।

আফ্রিকার যুদ্ধ—

গত অক্টোবর মাসে তৎকালীন বৃটিশ সমরসচিব মিঃ এডুইন্স ইডেন আফ্রিকায় গমন করিয়া ইটালীকে কঠোর আঘাত করিবার যে বিরাট পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আশামুরূপ সাফল্য লাভ করিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে প্রথমে জেনাবেল ওয়াভেলের বাহিনী যে-দিন উত্তর-পশ্চিম মিশরে প্রতিপক্ষকে আঘাত করিয়া সর্বপ্রথম বিজয় লাভ করে, সেই দিন হইতে আফ্রিকায় যুদ্ধের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। তাহাব পূর্ব, বৃটিশ-বাহিনী ক্রমে সিন্-বারাণী, সল্লাম, কাপুজো দুর্গ, বাদিয়া, তরক এবং ডাণা অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি লিবিয়ার সর্বপ্রধান ইটালীয় নৌ ও বিমানঘাটী বেন্‌ঘাজী বৃটিশ-বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অতি অল্প সময়েই মধ্য জেনাবেল ওয়াভেলের সাফল্যের প্রধান কারণ—বৃটিশ স্থলসৈন্যের সহিত বৃটিশ নৌ ও বিমানবাহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবাহিনীর একচ্ছত্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত; বৃটিশ সৈন্য যখন সমুদ্রোপকূলবর্তী কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তখনই এই নৌবাহিনী ঐ লক্ষ্যস্থলের প্রতি অবিরাম গোলা বর্ষণ করিয়া স্থলসৈন্যের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। বৃটিশ বিমানবাহিনীর তৎপরতার ফলেও স্থলসৈন্যের কার্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন কেন্দ্রে ইটালীয় বাহিনী আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া শত্রুকে প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিয়াছে। অবশেষে যখন ঐ সকল দুর্গের পতন ঘটয়াছে, তখন বহুসংখ্যক ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে। বেন্‌ঘাজীতে ইটালীয় বাহিনী এই ভাবে শত্রুকে বাধা দিতে চেষ্টা করে নাই; অবস্থা আশঙ্ক-বহির্ভূত হইবামাত্র তাহারা পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল।

লিবিয়া অঞ্চল ব্যতীত আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলেও

বৃটিশ-বাহিনী বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। এরিট্রিয়ায় তাহারা এগরদাং এবং বেরেন্তু অধিকার করিয়াছে; এই অঞ্চলে ইটালীয় বাহিনী ক্রমেই পশ্চাদপসরণ করিতেছে। আবিসিনিয়ায় গণ্ডাবেব দিকে বৃটিশ-বাহিনী ইটালীয় সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সৈন্য ডুকানা সীমান্তে শত্রুর রাজ্যে ১০ মাইল প্রবেশ করিয়া ইটালীয়দিগের দুইটি ঘাটী অধিকার করিয়াছে। ইটালীয়ান সোমালিল্যান্ডেও বৃটিশ-বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

আফ্রিকার উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে ইটালীর পরাজয়ে ও পশ্চাদপসরণে মনে হয় যে, উত্তর-পশ্চিম মিশরে এবং লিবিয়ায়



উত্তর-আফ্রিকায় শত্রুর প্রতীক্ষায় আরব সৈন্য

ইটালীয়দিগের শোচনীয় পরাজয় সমগ্র ইটালীয় বাহিনীর প্রতি প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ-প্রভাব স্থল করিয়া আফ্রিকার সহিত ইটালী যদি অবাধ সংযোগ স্থাপনে সমর্থ না হয়, এবং উত্তর-আফ্রিকায় যুদ্ধের অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে আফ্রিকার কোথাও শত্রুর যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

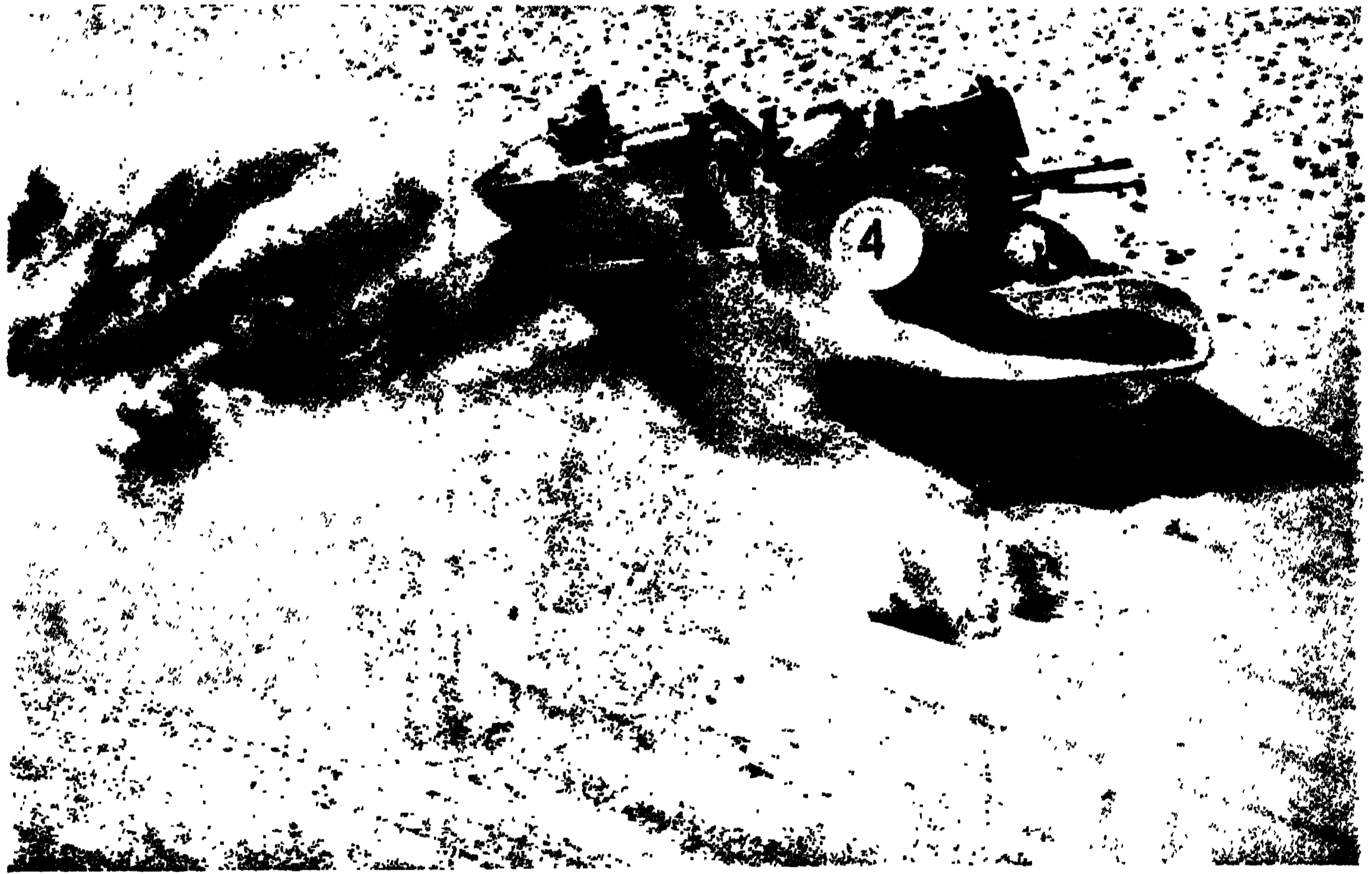
এই প্রসঙ্গে মুক্তিকামী হাবসীদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। গত পাঁচ বৎসর কাল হাবসীগণ যে শুভ

মুহূর্তের প্রতীক্য করিতেছিল, এত দিনে তাহা সমুপস্থিত; আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ের ফলে তাহাদিগের মুক্তির স্বপ্ন এখন সফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। গত বৎসর জুন মাসে ইটালী যুদ্ধে লিপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই ভূতপূর্ব হাবসী সম্রাট হাইলে-সেলাসী তাঁহার হতরাজ্যের সন্নিকটে আসিয়া পড়েন। তদবধি তাঁহার অবস্থানক্ষেত্র ও গতিবিধি-সম্পর্কে অধিক সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছিল যে, তিনি খার্টুমে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং তাঁহার অনুগত হাবসী সর্দারদিগের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজগণ রাজনীতিক ও সামরিক প্রয়োজনে ইটালীয়দিগের বিরুদ্ধে হাবসী জাতির অভ্যুত্থান ঘটাইবার জন্ত যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে; হাইলে সেলাসী তাহাদিগের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়াছেন। একটি বৃটিশ সামরিক মিশন

বাহিরে—বিশেষতঃ পার্কত্য অঞ্চলে—ইটালীর অধিকার বিস্তৃত হয় নাই।

গ্রীক-ইটালীয় যুদ্ধ—

গ্রীক-ইটালীয় যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় গ্রীক সেনাপতি জেনারেল প্যাপাগসের বাহিনী যেক্রপ ক্ষিপ্রগতি অগ্রসর হইতেছিল, তাহা এক্ষণে মন্দীভূত হইয়াছে। গত এক মাসে ক্লিম্বরা অধিকারই গ্রীক বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাফল্য। যদিও প্রতিদিন গ্রীক সৈন্তের সাফল্যের সংবাদ পরিবেশিত হয়, তবু তাহারা যে নূতন নূতন স্থান অধিকারে সমর্থ হয় নাই, তাহা মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হয়। গত জানুয়ারী মাসে ইটালী এলবেনিয়ার সৈন্ত-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছে; বিভিন্ন স্থানে



উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্ত বিশ্বয়কর বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। চিত্রে দুর্গম মরুপথে ভারতীয় সৈন্ত 'ব্রেন গান্' চালিত করিতেছে

আবিসিনিয়ার প্রবেশ করিয়া মুক্তিকামী হাবসীদিগকে শিক্ষা দান করিতেছে। গত ১৫ই জানুয়ারী হাইলে সেলাসী সুরক্ষিত বৃটিশ বিমানে আবিসিনিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন; মুক্তিকামী হাবসীগণ তাঁহার নিকট হইতে নির্দেশ গ্রহণ করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন—গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হইবার পর এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ কদাচিৎ প্রকাশিত হইলেও এই কথা গোপন নাই যে, হাবসীদিগের গরিলা যুদ্ধের ফলে ইটালীয়দিগকে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ, প্রধান প্রধান নগর ও রেলপথের

ইটালীয় বাহিনী প্রতি-আক্রমণও করিয়াছে। অবশ্য গ্রীসের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ইটালীর এই প্রতি-আক্রমণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সে যাহাই হউক, উত্তর ও মধ্য-এলবেনিয়া হইতে ইটালীয়গণ এখনও বিতাড়িত না হইলেও গ্রীক-ইটালীয় সশ্রবের অবস্থা যে এখনও গ্রীসের অল্পকূল, তাহা সত্য।

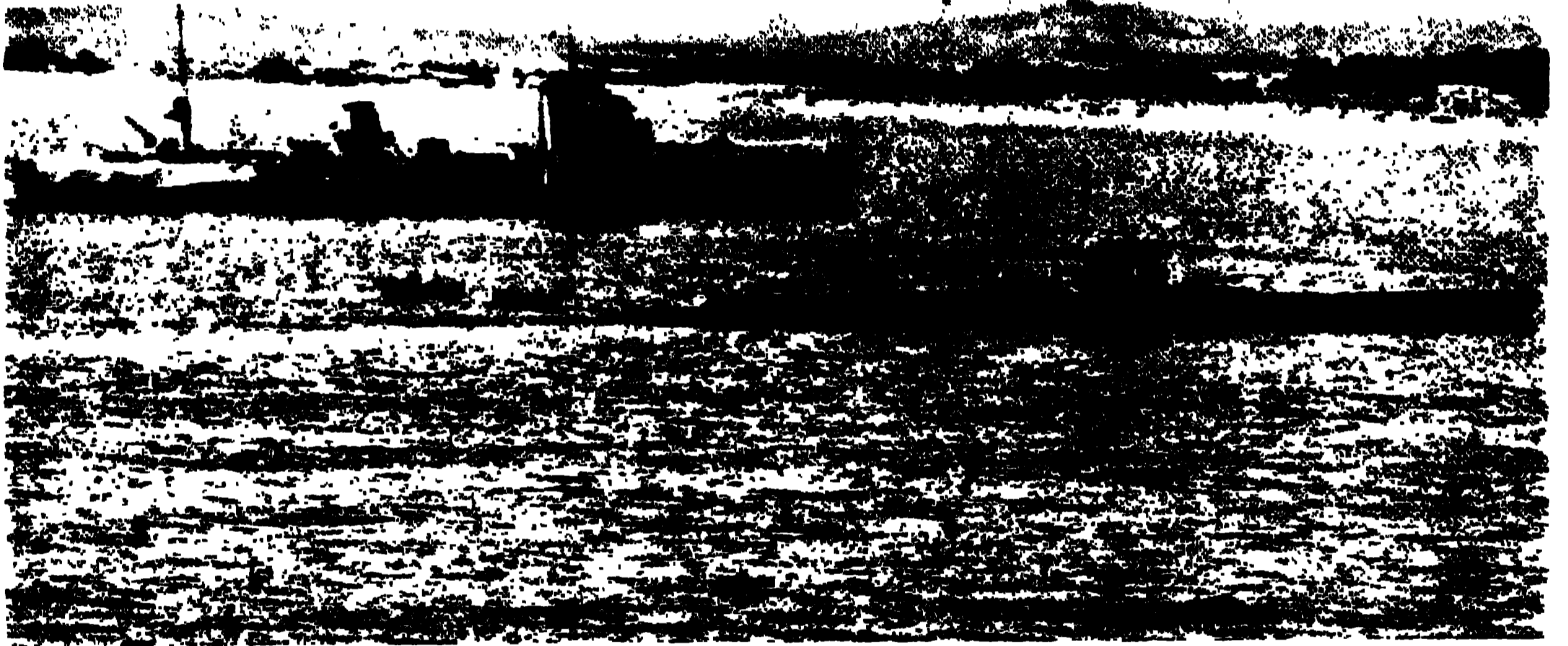
আফ্রিকা ও আলবেনিয়ার যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, ইটালীয় নৌ-বহরের অকৃতকার্যতা এবং ইটালীয় সৈন্ত ও সেনানায়কদিগের অযোগ্যতা সমগ্র জগৎবাসীকে বিস্মিত করিয়াছে। যে নৌবহরের গর্বে গর্বিত হইয়া মুসোলিনী ভূমধ্যসাগরকে 'ইটালীয় হ্রদ' পরিণত করিবার স্পর্ধা করিতেন, তাহা কার্যকালে

বৃটিশ নৌবহরকে বাধা দানে সমর্থ হওয়া দূরে থাকুক, বিনা-যুদ্ধেই পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উত্তর-আফ্রিকার অবস্থা সম্বন্ধে হয় ত বলা চলে, তথায় জেনারেল ওয়াভেন্ সৈন্য-সংখ্যা বর্ধিত করিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়াছিলেন; সেই আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি মার্শাল গ্রাংসিয়ানির ছিল না। কিন্তু ক্ষুদ্র গ্রীস? তিন মাস কাল বহু আয়োজন এবং নানারূপ বাহবাফোট করিয়া গ্রীসের বিরুদ্ধে যখন প্রকৃত আক্রমণ আরম্ভ হইল, তখন সীমান্ত অতিক্রমণের পরই ইটালীয় বাহিনী যেন ভূত দেখিয়া পলায়ন করিল! ইটালীর সামরিক আয়োজনের এই অন্তর্নিহিত দৌর্বল্য সমগ্র বিশ্বের নিরপেক্ষ দর্শকদিগকে যেরূপ বিস্মিত করিয়াছে, জার্মানীকেও সেইরূপ নিরাশ করিয়াছে। বৃটেনের সমর-শক্তির কতকাংশকে মধ্য ও অদূর প্রাচীতে আবদ্ধ রাখিবার জন্ত, এবং ভূমধ্যসাগরে নাজী-ক্ষ্যসিষ্ট প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত জার্মানী তাহার মিত্র ইটালীর প্রতি নির্ভর করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইটালীর প্রতি এই দায়িত্ব

ইটালীর সাহায্যে জার্মানী—

ইটালীর দক্ষিণে অবস্থিত সিসিলি দ্বীপে সম্প্রতি জার্মানীর বিমান-বহর উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল বিমান মান্টা হইতে আরম্ভ করিয়া সুর্যেজ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ করিতেছে। সিসিলি দ্বীপের অবস্থান-ক্ষেত্রটি সামরিক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমধ্য সাগরের ঠিক মধ্যস্থলে উহার অবস্থিতি; ইহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া বৃটিশ জাহাজগুলি যাতায়াত কবে। কেবল তাহাই নহে, সিসিলি ও টিউনিসিয়ার মধ্যবর্তী প্যাণ্টেলেরিয়া দ্বীপটিও ইটালীর; বস্তুতঃ, সিসিলি ও প্যাণ্টেলেরিয়ার মধ্য দিয়াই জাহাজ গমনাগমনের পথ। জার্মান বিমানগুলি এই দুইটি দ্বীপ ব্যবহারের অধিকার পাওয়ার ভূমধ্য-সাগরে জাহাজ গমনাগমনে তাহারা বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের মনোভাবের কথা মনে হয়। এখন ফ্রান্সে



একখানি বৃহদাকার ইটালীয় ডেপ্টয়ার ও একখানি জার্মান সাবমেরিন

অর্পণ করিয়া জার্মানী হয় ত তদনুসারে তাহার ভবিষ্যৎ সমর-পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিল। ইটালীর অযোগ্যতার জন্তই জার্মানী তাহার পরিকল্পনা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে ইটালীর উদ্ধারের জন্ত জার্মানীর সাহায্য প্রয়োজন। অথচ একাধিক রণক্ষেত্রে আপনাকে নিয়োজিত করা জার্মানীর রণনীতি-বিরুদ্ধ। গত মহাযুদ্ধে কৈশরের কৃত ভুল বাহাতে পুনরায় না হয়, সে-জন্ত হিটলার এইবার অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। পোল্যান্ড ও নরওয়ের অভিযান শেষ হইবার পর কেবল সামরিক কারণেই একসঙ্গে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গ আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার পর, ফ্রান্সের যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে মিটিবার পূর্বে হিটলার বৃটেনের প্রতি অবস্থিত হন নাই। জার্মানীর সমর-প্রচেষ্টা এইরূপ একাগ্র ভাবে এক দিকে নিয়োগ করিবার নীতি আজ ইটালীর দৌর্বল্যের জন্ত বিফল হইতেছে।

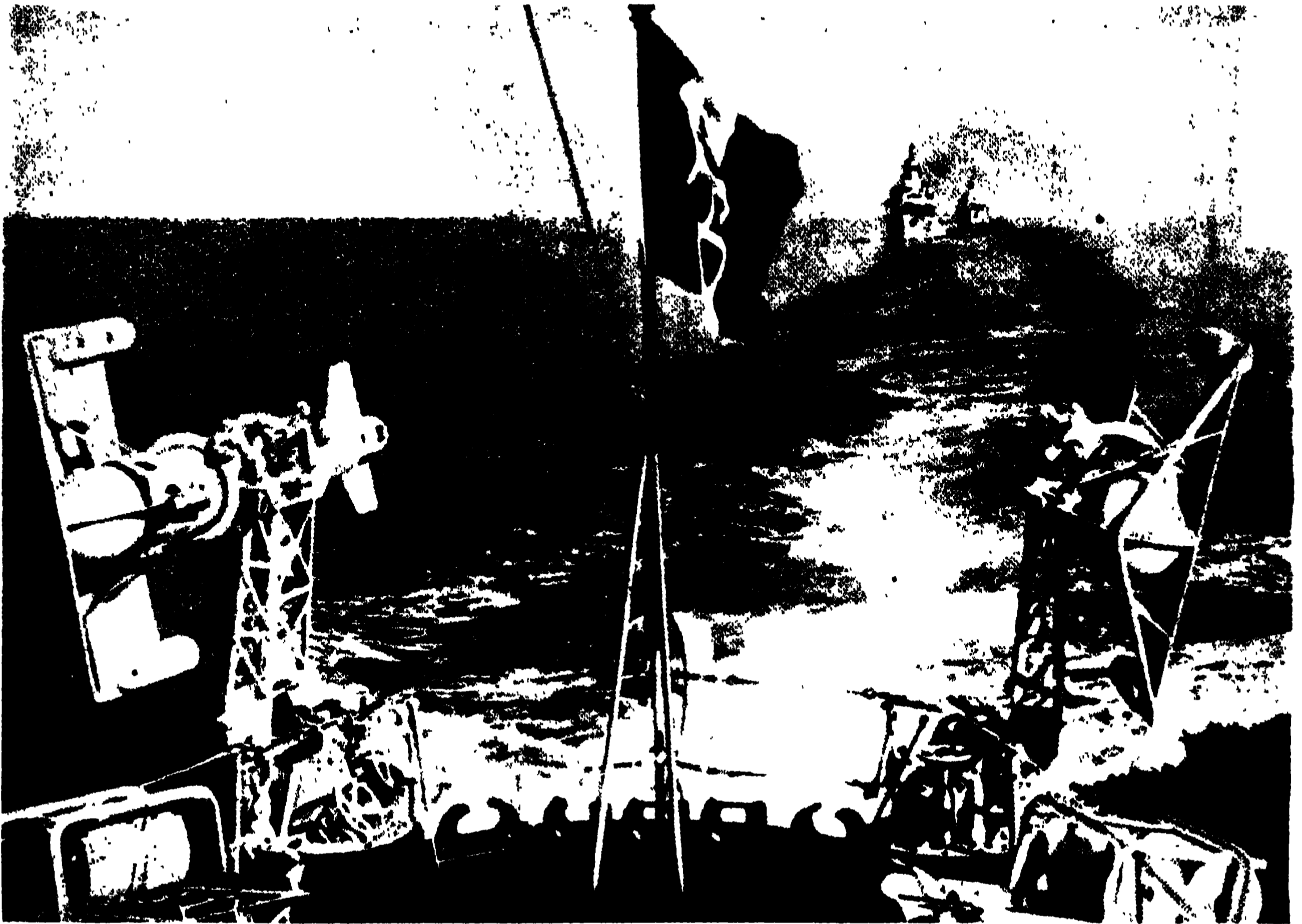
পেতা-লাভাল বিরোধের অবসান হইয়াছে। হয় ত ইহা খনিষ্ট ফ্রান্সে-জার্মান সহযোগিতার পূর্বাভাস। সম্প্রতি ফ্রান্সের নৌসচিব এডমিরাল ডারল। প্রস্তাব ও প্রতি-প্রস্তাব বহন করিয়া ভিসি ও প্যারিসের মধ্যে আনাগোনা করিতেছেন। এই সময় প্রবল জনরব প্রচারিত হয় যে, জার্মানী ফ্রান্সের নৌঘাটা ও নৌবহর ব্যবহারের জন্ত ফরাসী মন্ত্রিসভার নিকট প্রত্যক্ষ দাবী উপস্থিত করিয়াছে; এড-মিরাল ডারল।'র সহিত জার্মান কর্তৃপক্ষের নাকি এই বিষয়েই আলোচনা হইয়াছে। এই জনরব যদি সত্য হয়, এবং ফরাসী কর্তৃপক্ষ যদি জার্মানীর দাবীতে সম্মত হন, তাহা হইলে উহার ফল সূদূরপ্রসারী হইবে। প্রথমতঃ সিসিলি, প্যাণ্টেলেরিয়া ও টিউনিসিয়ার বিজাটা ঘাটা ব্যবহার করিয়া জার্মানী ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে দুর্ভাষ্য "প্রাচীর" নির্মাণে সমর্থ হইবে। ইহা ব্যতীত, সার্ডিনিয়ার ক্যাগলিয়ারি ও ম্যাডালেনা ঘাটা, ফ্রান্সের টুলো ও

মাসেলিস্ এবং এসজিরিয়ার ওরণ ব্যবহার করিয়া নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিবল পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবে।

এই ভাবে পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে নেপল্‌স্ হইতে টিউনিসিয়ায় জার্মান সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণের প্রয়াস হইতে পারে। অবশ্য বিমানযোগে লিবিয়ায় সৈন্য প্রেরণ এখন অসম্ভব নহে; কিন্তু ঐ অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনীর সম্মুখীন হইবার উপযোগী গুরুভার সমরোপকরণ বিমানে প্রেরিত হইতে পারে না। পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হইলে নেপল্‌স্ হইতে সমুদ্রপথে সৈন্য ও সমরোপকরণ টিউনিসিয়ায় প্রেরিত হইতে পারে। নেপল্‌স্ হইতে টিউনিসিয়ার

তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ করা নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিবলের অসাধ্য হইবে, এবং তাহার ফলে আফ্রিকায় যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হওয়াও অসম্ভব।

সম্প্রতি এই মর্মে জনরব উঠিয়াছে যে, বহুসংখ্যক জার্মান সৈন্য ইটালীতে প্রবেশ করিয়াছে এবং জার্মান সেনানায়কগণ ইটালীর সমর-বিভাগের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতেছে। এই জনরবের মূলে সত্য নিহিত থাকা অসম্ভব নহে। ফ্যাসিষ্ট-শাসিত ইটালীর সামরিক মর্যাদা এই ভাবে ভুলুষ্ঠিত হওয়ায় ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট দল ও তাহার নেতার প্রভাব নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই ফ্যাসিষ্ট দল যদি ক্ষমতাচ্যুত হয়, তাহা হইলে ইটালীর পক্ষে বুটেনের নিকট পৃথক্



ইটালীয় নৌবাহিনী; ইহারা বিনা-যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে

দূরত্ব সাড়ে তিন শত মাইল, এবং তথা হইতে লিবিয়ার রণক্ষেত্র প্রায় পাঁচ শত মাইল। জলে ও স্থলে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সহজ নহে।

ফরাসী নৌঘাঁটির হস্তান্তর সম্পর্কিত জনরবের প্রতিবাদ করিয়া জেনারেল ওয়েগাঁ সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, জার্মানিকে বিজাটা নৌঘাঁটি প্রদান-সম্পর্কে ফরাসী সরকারের সহিত জার্মানীর কোন আলোচনা হয় নাই। অবশ্য, জেনারেল ওয়েগাঁর এই বিবৃতি একমাত্র বিজাটা সম্পর্কে; বিজাটা ব্যতীত অল্প কোন ফরাসী ঘাঁটি হস্তান্তরিত হইবে কি না, তাহা এই বিবৃতি হইতে বুঝা যায় না। জার্মানী যদি ফরাসী নৌবহর ও ফরাসী ঘাঁটি ব্যবহারে অসমর্থ হয়,

সন্ধির প্রস্তাব উপস্থাপন করাও অসম্ভব হইবে না। কাজেই ফ্যাসিষ্ট দলের ক্ষমতা রক্ষার জন্য জার্মান সেনাবাহিনীর অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। ইহা ব্যতীত, গ্রীসে ও আফ্রিকায় যুদ্ধ-পরিচালনার ভার জার্মান সেনানায়কদিগের হস্তে অর্পণ করাও সম্ভবতঃ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

আলবেনিয়ার যুদ্ধে জার্মানী যদি অগ্রসর হইতে চাহে, তাহা হইলে কোন্ পথে জার্মানবাহিনী আলবেনিয়ায় পৌঁছিবে, সে প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, বহু জার্মান সৈন্য ত্রিস্তে বন্দরে পৌঁছিয়াছে। এই ত্রিস্তে হইতে আফ্রিকায় সাগরপথে আলবেনিয়ার জার্মান সৈন্য প্রেরণের প্রয়াস হইতে

পারে। ইহা ব্যতীত, কমানিরাহিত জার্মান সৈন্যও যুগোলোভিয়ার পথে অগ্রসর হইতে পারে।

মধ্য-প্রাচীতে জার্মানীর সমর-প্রয়াস সম্পর্কে স্পেনের মনোভাব উপেক্ষণীয় নহে। স্পেনের জার্মান-অনুরক্তি স্বরূপে ইতঃপূর্বে 'মাসিক বঙ্গমতীতে' বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। স্পেনের সেই মনোভাবের এখনও পরিবর্তন দেখা যায় নাই। অর্থনীতিক প্রয়োজনে স্পেনকে নিরপেক্ষ রাখা হিটলার যখন আর সুবিধাজনক মনে করিবেন না, তখন তাহাকে তিনি স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহার ফলে, জিভ্রল্টরের নিরাপত্তা নষ্ট হইতে পারে; আটলান্টিকে বৃটিশ জাহাজ আক্রমণ সম্পর্কেও জার্মানী অধিকতর সুবিধা পাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জার্মান-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র স্পেন এখনও বৃটেনের অবরোধ-ব্যবস্থার বহির্ভূত।

জার্মানীর সমর-প্রচেষ্টা—

সম্প্রতি বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞগণ এই প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতি সহর জার্মানী বৃটেনে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনে প্রয়াসী হইবে। মার্কিং নৌ-সচিব কর্নেল নক্স এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, জার্মানী মনোযোগ সহকারে আবহাওয়ার অবস্থা লক্ষ্য করিতেছে; আগামী দুই মাস হইতে তিন মাসের মধ্যে বর্তমান যুদ্ধের চরম পরিণতি ঘটবার সম্ভাবনা। ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেন্সী কিং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এইরূপ পরিণতি আশঙ্কা করেন। লর্ড হ্যালিফ্যাক্সও মনে করেন যে, জার্মানীর পক্ষে এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা সম্ভব নহে।

বর্তমানে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের "ইজারা ও ঋণ দান বিল" তথা বৃটেনকে সাহায্যদান-সম্পর্কিত বিল মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার বিবেচনাধীন। এই সময় জার্মানী কর্তৃক বৃটেন আক্রমণের আশঙ্কা সম্পর্কে কর্নেল নক্স স্বর ধরিবামাত্র সেই স্বর চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহাতে স্বভাবতঃ মনে হয়, ইজারা ও ঋণ দান-সম্পর্কিত বিলটি যাহাতে সহজে মার্কিনী আইন সভার বৈতরিনী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তদুদ্দেশ্যে ইচ্ছা করিয়া এই বিষয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

সে যাহাই হউক, জার্মানী কর্তৃক বৃটেন আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা এখনও প্রবল রহিয়াছে। বিশেষতঃ, হিটলার যদি ইতঃপূর্বে মধ্য-প্রাচী ও অদূর-প্রাচীতে অভিযান আরম্ভ করিবার কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইটালীর শোচনীয় পরাজয়ে তাহা বিফল হইয়াছে। কাজেই, এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত করিতে প্রয়াসী হওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, শীতের প্রচণ্ডতা এখন হ্রাস পাইয়াছে; আবহাওয়ার অবস্থা আক্রমণ-পরিচালনের অনুকূল। তাহার পর, মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার যে নীতি গ্রহণ করিতেছে, তাহা কার্যে পরিণত হইবার পক্ষেই বৃটেনকে জার্মানীর চরম আঘাত করা প্রয়োজন।

গত ৩০শে জানুয়ারী হিটলার বালিনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অতি সংযত ভাষায় তিনি শাস্তির কথা বলিয়াছেন। বৃটেনের সহিত তাঁহার যে কোন বিরোধ ছিল না এবং উপনিবেশ-সংক্রান্ত মতবৈধও অবিলম্বে মীমাংসার কথা যে তিনি বলেন নাই, তাহা এই

বক্তৃতায়ও তিনি পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই বক্তৃতায় বৃটেনের সামরিক শক্তিকে উপহাস, আমেরিকাকে ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির সমাবেশও আছে। গত জুলাই মাসে ঠিক এই সুরে হিটলারের এক বক্তৃতার পর বৃটেনে প্রবল বিমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। হিটলারের এই বক্তৃতা বৃটেনকে তাঁহার চরম আঘাতের পূর্বাভাস হওয়া অসম্ভব নহে।

বৃটিশ নৌবহর ও রক্ষিবাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া অবিলম্বে বৃটেনে সৈন্য অবতরণ করা সম্ভব হউক বা না হউক, জার্মানী বৃটেনের শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট করিবার জল্প বর্তমানে অত্যন্ত তৎপর হইয়াছে। জার্মানী এখন বৃটেনের বেসামরিক অধিবাসীর প্রতি নির্বিচারে বোমা-বর্ষণের নীতি একরূপ ত্যাগ করিয়াছে; প্রধানতঃ,



জার্মান বিমানের প্রতীক্ষায়

বৃটেনের শিল্পকেন্দ্রে তাহার বিমান আক্রমণ চালিত হইতেছে। সমুদ্রবক্ষেও জার্মানীর তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি মার্কিনী নৌসচিব কর্নেল নক্স এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—

The British has not been able to find any successful convoy method of combating the increased German submarine activity.

অর্থাৎ জার্মান সাব-মেরিনের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা প্রতিরোধের জল্প বৃটিশ এখনও সাফল্যজনকভাবে তাহার বাণিজ্যপোতগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার পর, বৃটেনের জাহাজ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ রোণাল্ড ক্রসের এক বক্তৃতায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আশঙ্কাজনক। মিঃ ক্রস বলিয়াছেন যে, শত্রুর জাহাজ আটক করার এক অল্পমিত্র শক্তির জাহাজ ব্যবহারে এত

দিন বুটেনের জাহাজের ক্ষতি পূর্ণ হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে এই ভাবে ক্ষতিপূরণ হওয়া আর সম্ভব নহে। মিঃ ক্রস্ বলিয়াছেন—

The losses are now in excess of replacements and Britain is faced for the time-being with a diminishing merchant fleet and would have a hard time.

অর্থাৎ এখন যেরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা পরিপূরণের ব্যবস্থার অতিরিক্ত। বুটেনের বাণিজ্য-পোত এখন ক্রমক্রমে, বুটেনের কঠোর সময় আসিতেছে।

ক্রান্তের ষাটটিগুলি ব্যবহারের সুবিধা পাইয়া জার্মানী এখন কিরূপে বুটেনের বাণিজ্যপোত আক্রমণ করিতেছে, তাহা গত পৌষ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে আলোচিত হইয়াছে। গত ১৪ই জুলাই হইতে ২৬শে জাভুয়ারী পর্যন্ত সময়ে জার্মানীর আক্রমণে বুটেনের ১৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টন বাণিজ্য-জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে; কোন কোন মাসে ৩ লক্ষ টনেরও অধিক জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে।

বুটেনের রক্ষা-ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে সৈন্য অবতরণ করান যে সহজসাধ্য নহে, ইহা জার্মানী বুঝে। এই জন্ত সে ঐ চরম ব্যবস্থার জন্ত প্রতীক্ষা করিতে চাহে না। ইতোমধ্যে বুটেনের শিল্পক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া এবং বুটেনের সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া সে বৃটিশ জাতিকে অর্থনীতিক বিষয়ে বিপন্ন করিতে চাহে। বিশেষতঃ, আমেরিকা হইতে প্রেরিত সাহায্য যাহাতে অবাধে বুটেনে পৌঁছিতে না পারে, তদ্বন্দেখে সে সাবামেরিগে সমুদ্রবন্ধ কর্তৃকিত করিয়া রাখিতেছে।

জার্মানী ও রুশিয়া—

গত জাভুয়ারী মাসে রুশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে এক অর্থনীতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার পর, বুটেনের অর্থনীতিক সংগ্রাম-সম্পর্কিত মন্ত্রী মিঃ হিউ-ডাল্টন বৃটিশ কমন্স সভায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, রুশিয়া তাহার নিজ দেশের পণ্য জার্মানীতে বণ্টনী করিতেছে, এবং আমেরিকা হইতে পণ্য আমদানী করিয়া ঐ সকল পণ্যের অভাব পূর্ণ করিতেছে। মিষ্টার ডাল্টন জানান যে, তুলা, গম, পিস্তল, তামা, পেট্রোল প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণে রুশিয়ায় রপ্তানী হইতেছে। নূতন অর্থনীতিক চুক্তিতে রুশিয়া না কি জার্মানীকে গম ও পেট্রোল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

বর্তমান যুদ্ধসম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার নীতি ইতঃপূর্বে একাধিক বার আলোচিত হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া জার্মানীর সমর-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বর্তমান যুদ্ধ বাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে চাহে। এই জন্ত জার্মানীর যে সকল বস্তু প্রয়োজন, তাহা সরবরাহে তাহার আপত্তি ত নাট-ই, বরং এই সুযোগে কিছু লাভ করিবার জন্তও সে আগ্রহান্বিত। বর্তমান যুদ্ধে যুযুধান পক্ষদ্বয়ের কেহই তাহার প্রিয় নহে; যুদ্ধ অধিক কাল চলিবার ফলে বিভিন্ন দেশে অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি হইয়া যদি কমুনিষ্ট মতবাদ প্রসারের সুযোগ ঘটে, তাহা হইলেই সোভিয়েট রুশিয়ার আনন্দ।

মিঃ ডাল্টন জানাইয়াছেন যে, এইরূপ পরোক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য জার্মানীতে প্রবেশ-সম্পর্কে ওয়াশিংটনে আলোচনা চলিতেছে। যত দূর মনে হয়, এই আলোচনার ফলে রুশিয়ায় মার্কিন পণ্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই। মার্কিন

বণিকগণ ব্যবসায়ের ক্ষতি কিছুতেই সহ্য করিতে চাহেন না। তাহারা যে সহজে রুশিয়ায় পণ্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণে সম্মত হইবেন, তাহা মনে হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার এই বিষয়ে উৎসাহী হইলেও বড় বড় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি রিপাবলিক্যান দলের পক্ষ হইতে হয় ত প্রবল আপত্তি উত্থিত হইবে। মার্কিনী ধনিক-দিগের প্রবল অর্থ-পিপাসার কথা জার্মানী ও রুশিয়া উত্তমরূপে জানে; কাজেই, ওয়াশিংটনের আলোচনার তাগাবা কেহই হয় ত উৎকণ্ঠিত নহে।

রুমানিয়ায় বিদ্রোহ—

জাভুয়ারী মাসের শেষভাগে রুমানিয়ার আয়রণ-গার্ড দলের বিরুদ্ধবাদিগণ বিদ্রোহী হইয়া ক্ষমতা হস্তগত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। তাহাদিগের সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে; জেনারেল এটনেস্কু রুমানিয়ার সেনাবিভাগের সহায়তায় কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে না কি বহু কমুনিষ্ট ছিল।

প্রথমেই মনে হইবে, বিরুদ্ধবাদী আয়রণ-গার্ড এবং কমুনিষ্টগণ এই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ভুল করিয়াছিল; কারণ, রুমানিয়া বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে জার্মানীর প্রভুত্বাধীন। জার্মানীর জায় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিরূপে সফল হইবে? এই সম্পর্কে বলা গাইতে পারে যে, কার্যতঃ রুমানিয়া জার্মানীর প্রভুত্বাধীন হইলেও এখনও উহা একটি স্বতন্ত্র দেশ। ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জার্মানী যদি হস্তক্ষেপে উত্তত হইত, তাহা হইলে স্বভাবতঃ ঐ বিষয়ে সোভিয়েট রুশিয়াও হস্তক্ষেপ করিতে চাহিত। বিরাট রুশবাহিনী বেসারবিয়া অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট ছিল; কাজেই, রুমানিয়ার বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক হইত না। লক্ষ্য করিবার বিষয়, রুমানিয়ায় বিদ্রোহ-দমনে জার্মান সৈন্য কোনরূপ সাহায্য করে নাই; তাহা কয়েকটি সবকারী ভবন অধিকার করিয়াছিল মাত্র। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয়, রুমানিয়ার এই বিদ্রোহ হয় ত সময়োচিতই হইয়াছিল। বর্তমান অবস্থায় বিদ্রোহীদের কেবল রুমানিয়ার সবকারের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; বেসারবিয়ার সোভিয়েট বাহিনীর দিকে চাহিয়া জার্মানী এই বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হয় নাই। বিদ্রোহীগণ যদি রুমানিয়া সরকারের সহিত সাফল্যজনক ভাবে সংগ্রাম করিতে পাবিত, তাহা হইলেই তাহাদিগের উদ্দেশ্য হয় ত সিদ্ধ হইত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব—

বুটেনকে সাহায্যদান সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সমরোপকরণ ইজারা ও ঋণদানের যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার বিষয় গত পৌষ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে আলোচনা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের জন্ত ব্যাপক ক্ষমতা দাবী করিয়া একটি বিল মার্কিনী আইন সভায় আনীত হইয়াছে। এই বিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার (নিম্নতর পরিষদ) পররাষ্ট্রীয় কমিটিতে গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে উহা সেনেটের (উচ্চতর পরিষদ) পররাষ্ট্রীয় কমিটির বিবেচনাধীন। বিলখানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় গৃহীত হইবার সম্ভাবনাই

অধিক। এই বিল অল্পমাত্রী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

জাপানের দুশ্চিন্তা—

জাপান তাহার নব-বাবস্থা সম্পর্কিত পরিকল্পনা লইয়া মহা সমস্যায় পড়িয়াছে। চীনের যুদ্ধের অবসান না হইলে জাপানের পক্ষে অল্পমাত্র মনোযোগী হওয়া অসম্ভব। অথচ, এই যুদ্ধ অবসানের কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি জাপানের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ী চীনের যুদ্ধসম্পর্কে সকল দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে লইয়া বলিয়াছেন যে, এত কাল এই যুদ্ধ চলিবার জন্ত একমাত্র তিনিই দায়ী। ইহার পর, জাপানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মাংসুয়োকো এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার নান্‌কিংএর ওয়াং-চেন-উইয়ের সরকারকে স্বীকার করিলেও চুংকিংএর সরকারকে স্বীকার করেন না। প্রিন্স কনোয়ীর ব্যক্তিগত ভাবে চীন যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ এবং মিঃ মাংসুয়োকো এই উক্তি সম্বন্ধ-বিবজ্জিত বলিয়া মনে হয় না।

জাপান এখন চীনের যুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহান্বিত নহে; পার্বত্য অঞ্চলে মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকেব পশ্চাৎদান করিয়া যে আব লাভ নাই, তাহা সে বুঝিয়াছে। উত্তর-চীনের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল পূর্বেই তাহার কৃষ্ণিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা লাভ করিলে সে সন্দেহে চুংকিং সরকারের সহিত মীমাংসা করিতে পারে। জাপানের এই মনো-ভাবের কথা স্মরণ রাখিলে প্রিন্স কনোয়ী ও মিঃ মাংসুয়োকোর উক্তির মর্মার্থ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। প্রিন্স কনোয়ী চুংকিং সরকারের উদ্দেশে বলিতে চাহেন যে, ব্যক্তিগত ভাবে একমাত্র তিনিই চীনে যুদ্ধ চলিবার জন্ত দায়ী। চুংকিংএর কর্তৃপক্ষ যদি আপোষমূলক মনোভাবের পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তিনি রাজনীতিকক্ষেত্রে হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন, এবং জাপানের অবশিষ্ট মন্ত্রিবর্গের সহিত চুংকিং কর্তৃপক্ষের আপোষ আলোচনা চলিতে পারিবে।

মিঃ মাংসুয়োকোর উক্তি আরও স্পষ্ট। জাপানের পক্ষ হইতে বহুবার নান্‌কিংএর সরকারকে চীনের একমাত্র বৈধ সরকার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহাকে স্বীকার করাইবার জন্ত বিশেষ প্রয়াস হইয়াছে। চুংকিং সরকারকে জাপান প্রকাশ্যেই স্বীকার করিয়াছে; অথচ আজ মিঃ মাংসুয়োকো চুংকিং সরকারকে স্বীকার করিলেন। জাপান আজ আমেরিকার মনোভাব দেখিয়া বুঝিয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরে প্রসার লাভের জন্ত চেষ্টা করিলে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য। কাজেই, চীনের সঙ্ঘর্ষ মিটাইবার জন্ত সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে চীন-জাপান

আপোষ মীমাংসায় মধ্যস্থতা করিবার আশাতেই জাপানের মিত্র জার্মানী ওয়াং-সরকারকে স্বীকার করে নাই—চুংকিং সরকারকেই চীনের একমাত্র বৈধ সরকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তাহার পর, আজ জাপান কোন্ উদ্দেশ্যে চুংকিং সরকারকে স্বীকার করিতেছে, তাহা বুঝিতে নিশ্চয়ই বিলম্ব হয় না।

তবে ইহা সত্য যে, জাপান আজ ব্যাপকতর স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া চীনের সহিত মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইলেও স্বাধীনতাকামী চীনারা তাহার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন না। বিশেষতঃ, প্রতীচীর দুইটি জাতি এখন বুঝিয়াছে যে, জাপানের শুন-দৃষ্টি হইতে তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে চীনের সমর-শক্তি রক্ষা করা এক উগ্র বন্ধিত করা একান্ত প্রয়োজন।

থাইল্যান্ড-ইন্দোচীন সংঘর্ষ—

থাইল্যান্ড ও ইন্দো-চীনেব সীমান্ত-বিবাদ গত জাম্বুয়ারী মাসে প্রকৃত সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই যুদ্ধের বিবৃতি হইয়াছে; জাপানের মধ্যস্থতায় মীমাংসাব চেষ্টা চলিতেছে।

গত ২৫শে ডিসেম্বর থাইল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী লং বিপুলসংগ্রাম থাইল্যান্ডের দাবী সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেই থাইল্যান্ড-ইন্দোচীনের সঙ্ঘর্ষের প্রকৃত কারণ বুঝা যাইবে। ঐ সময় লং বিপুলসংগ্রাম বলেন—

Thailand is prepared to shake hands with France to-morrow and forget the 75 year-old feud connected with territory of half a million square miles gradually annexed by France and now called Indo-China on condition that two small bits of thinly populated territory on this side of the Mekong river are retroceded thus giving Thailand a natural frontier.

অর্থাৎ মেকং নদীর এই পার্শ্বে অল্পসংখ্যক নর-নারী-অধ্যুষিত দুইটি ক্ষুদ্র অঞ্চল থাইল্যান্ডকে প্রত্যর্পণ করিয়া যদি তাহাকে স্বাভাবিক সীমান্তরেখা পাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে থাইল্যান্ড আগামী কল্যাণ ফ্রান্সের সহিত করমর্দন করিতে প্রস্তুত। ক্রমে ক্রমে থাইল্যান্ডের ৫ লক্ষ বর্গ-মাইল স্থান অধিকার করিয়া ফ্রান্স কর্তৃক ইন্দো-চীন গঠিত হওয়ায় গত ৭৫ বৎসর কাল যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহা বিস্মৃত হইতে থাইল্যান্ড প্রস্তুত।

থাইল্যান্ড-ইন্দোচীন বিরোধের কারণ যদি একমাত্র ইহাই হয়, তাহা হইলে ইহাতে গুরুত্ব আরোপ করিবার কিছুই নাই। তবে সম্প্রতি থাইল্যান্ডের প্রতি জাপানের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। এই বিরোধে যদি জাপানের প্ররোচনা থাকে, তাহা হইলে উগ্র আশঙ্কার বিষয়।

সাহিত্যের সংজ্ঞা

ভাব অল্পভূতি চিন্তা লভে যবে পূর্ণ পরিণতি ।
তখন সাহিত্য ছাড়া প্রকাশের নাহি অন্য গতি ।

স্মরণীয় প্রথম

স্মৃতিসচন্দ্র গৃহত্যাগ

শ্রীযুত স্মৃতিসচন্দ্র বসু গত ১৩ই মাঘ অমানিশায় সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে, সকলের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ গৃহত্যাগ করিয়া রোগজীর্ণ দেহে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না ! তিনি রুগ্নদেহে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আদালতে উপস্থিত হইতে অসমর্থ, অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের গোচরের জন্ত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত ৩রা মাঘ হইতে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া পরিবারস্থ সকলের সহিত বাক্যালাপ, এমন কি, দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন। দিবসে তিনি একবার কিঞ্চিৎ ফল, ও দুই ভিন্ন কিছু খাইতেন না। এলুগিন রোডস্থ ভবনে তাঁহার বাসের প্রকোষ্ঠে প্রসারিত পর্দার বাহিরে তাঁহার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রাখিয়া দেওয়া হইত। কোন জিনিষের প্রয়োজন হইলে তিনি ঘণ্টা বাজাইতেন, অথবা কাগজে সেই দ্রব্যের কথা লিখিয়া পর্দার বাহিরে তাহা রাখিয়া দিতেন। ইদানীং তিনি ধর্মসাধনায়, এবং গীতা ও চণ্ডী-পাঠে সর্বদা রত থাকিতেন। রবিবার রাত্রিতে তিনি কোন্ সময়ে গৃহত্যাগ করেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। জানিতে পারা গিয়াছে, তিনি নগ্নপদে এবং অনাবৃত দেহে কেবলমাত্র একখানি ধূতি পরিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। পরদিন প্রভাতেই তাঁহার সন্ধান আরম্ভ হয়; কলিকাতায় ও তাহার সন্নিহিত প্রত্যেক মঠে, মন্দিরে, এবং শ্মশানঘাটে অনুসন্ধান করা হইলেও সকল চেষ্টা বিফল হয়। পত্নীচেরীর অরবিন্দ-আশ্রমে তিনি গমন করেন নাই। বেলুড়ের আশ্রমেও তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার বৃদ্ধা জননী এবং পরিজনবর্গও যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষায় কালযাপন করিতেছেন।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্মৃতিসচন্দ্র কোথায় গিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসাধ্য। যাহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁহারা অবগত আছেন, তিনি রাজনীতিক-পন্থিল জলে অবগাহন করিলেও

বহু দিন হইতেই ধর্মের প্রতি তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। স্মৃতিসচন্দ্র যে ধর্মসংবেদনা ছিল, তাহা তাঁহার উক্তিহেই প্রকাশ। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রে তিনি "My strange Illness" নামক যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি এই কথাই সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—

As I tossed in my bed at Jamadoba, by day and by night, I began to ask myself, by day and night, what would become of our public



শ্রীযুত স্মৃতিসচন্দ্র বসু

life when there was so much of pettiness and vindictiveness, even in the highest circles. My thoughts naturally turned towards what was my first love of life—the eternal love of the Himalayas. * * * * At times the call of the Himalayas became insistent.

ইহার মর্মার্থ এই যে, যখন আমি জামাদোবার

রোগশয্যায় পড়িয়া যজ্ঞায় ছটফট করিতেছিলাম, তখন আমার মনে বার বার এই প্রশ্নই উদিত হইতেছিল যে, যখন আমাদের মধ্যে দেশহিতৈষণার কার্যে নিযুক্ত উচ্চতম স্তরের লোকদিগের মধ্যেও—সঙ্কীর্ণতা এবং প্রতিহিংসা-সাধনের প্রবৃত্তি এত দূর প্রবল, তখন আমাদের রাজনীতিক জীবনের পরিণাম কি? আমার চিন্তা স্বভাবতঃই আমার প্রথম জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হইত। * * * সময়ে সময়ে এই আকর্ষণ অতি প্রবল হইত।—সুতরাং বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাস-ধর্মে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরের লোকের মধ্যে যখন তিনি নক্সারজনক পঙ্কিলতা দর্শনে নিরাশ হইতেন, তখনই সংসারের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাসের পথে যাইবার জ্ঞান ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। বস্তুতঃ, সংসারের প্রতি বিরাগবশতঃই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ধর্মের প্রেরণা ভিন্ন কেহই একরূপ দুর্বল দেহে অসুস্থ অবস্থায় মাঘের প্রচণ্ড শীতে এক-বস্ত্রে নগ্নপদে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জ্ঞান নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতে পারে না। সুভাষ বাবুর রাজনীতিক মতের সহিত অনেক স্থলে আমাদের মতভেদ ছিল; কিন্তু তথাপি মামুঘ হিসাবে তিনি নির্ভীক, সরল ও অকপট বলিয়াই আমাদের ধারণা। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি বিফলমনোরথ হইলেও আশা করি, ধর্মসাধন-ক্ষেত্রে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের ধর্মসাধনার কথা অনেকেরই মনে পড়িবে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে হইতে তিনিও এই পথেই শান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন;—মুক্তির আন্দোলন পাইয়াছেন। প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিগণের চিরাকাঙ্ক্ষিত মুক্তির সহিত ইহাদের তপশ্চালক মুক্তির পার্থক্য-নির্ণয়ের শক্তি সাংসারিক লোকের আছে কি না, জানি না।

কোন কোন ব্যক্তি একরূপ ইচ্ছিত করিতেছেন যে, সুভাষ বাবু ভারত হইতে ভারতের বাহিরে কোন দেশে চলিয়া গিয়াছেন। এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কারণ, তাঁহার গৃহে পরিত্যক্ত দ্রব্য-সামগ্রী দেখিয়াই মনে হয়, তিনি দশ দিনকাল হিন্দু-বিধানবিহিত ধর্ম-সাধনকার্যে রত ছিলেন। ভারতবর্ষই ধর্মসাধনের প্রশস্ত ক্ষেত্র; সুতরাং আশা হয়, তিনি ভারতেই আছেন। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার গ্রেপ্তারের জ্ঞান পরোয়ানার

সহিত হুলিয়াও বাহির করিয়া ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন; এবং তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবারও আদেশ হইয়াছে। আর একটি মামলা-সম্পর্কে আলিপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন। কিন্তু সুভাষ বাবু সর্বপ্রকার বিপদ ও পার্শ্বিক ক্রতির জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই নূতন জীবনের কণ্টকময় সঙ্কটসঙ্কুল পথে যাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং তিনি হয় ত ভাবিয়াছেন—সমুদ্রে যাহার শয্যা, তাহার আর শিশিরপাতে ভয় কি? কিন্তু যে সকল বুদ্ধিমান বিজ্ঞ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছে—তিনি মামলায় শাস্তির ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, তাহারাই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অধিক অবিচার করিয়াছে। এই সন্দেহের বহু উর্ধ্বে তাঁহার স্থান।

আমুঘের চিকিৎসক সম্মেলন

১৪ই মাঘ সোমবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশু-তোষ হলে নিখিল বঙ্গীয় আমুঘের মহা সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ভিষকভূষণ এই সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এই উপলক্ষে ‘ধনুস্তরী পতাকা’ উত্তোলন করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্রীযুত শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় তিন শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথম দিন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুত অনাধনাথ রায় এবং মূল সভাপতি তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। উভয় অভিভাষণই সারগর্ভ হইয়াছিল। এই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান প্রস্তাব এই যে, বঙ্গীয় মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অমুযায়ী বঙ্গীয় সরকারের অনুমোদিত মেডিক্যাল কলেজগুলি হইতে উত্তীর্ণ চিকিৎসকগণ চিকিৎসকগণের প্রাপ্য সকল প্রকার অধিকার ও মর্যাদা পাইবেন, কিন্তু তাঁহারা (কবিরাজরা) পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান পারদর্শী চিকিৎসকগণের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদার দাবী করিলেও তাহা পাইতেছেন না। এই সম্মেলনের মতে ঐ প্রকার বৈষম্য দূর করা অবশ্যকর্তব্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাবের মর্ম এই যে, বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালার বর্তমান আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে বোম্বাই প্রদেশের ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনের স্থায় একটি আইন প্রণয়ন করুন। জেনারেল কাউন্সিল এবং স্টেট ফ্যাকাল্টি অফ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন, কবিরাজ মহাশয়দিগের নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া পুনর্গঠিত করা আবশ্যিক, নতুবা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা ভিন্ন তিন বৎসর অন্তর 'রিনিউয়াল ফিস' প্রদানের ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সম্মিলনের এই অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকদিগের সাধ্যাতিরিক্ত অনেক রোগই যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয়, অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু উপেক্ষায়, অনাদরে, এবং আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রসম্মত ঔষধ প্রস্তুতে আন্তরিক যত্নের অভাবে, বা অজ্ঞতা-নিবন্ধনও এই চিকিৎসার ক্রমেই অবনতি ঘটিতেছে। সেই জন্ত মনে হয়, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক-সম্মেলনের এই সকল দাবী বাঙ্গালা সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। ইহা উপেক্ষিত হইতেছে বলিয়া দেশের জনসাধারণের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে, এবং প্রকৃতই তাহা বাঙ্গালা সরকারের লজ্জার কারণ। আশা করি, সরকার এই সঙ্গত দাবীতে কর্ণপাত করিয়া শীঘ্রই এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। দ্বিতীয় দিন কাবরাজ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় কবিরাজ শ্রীযুত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ এই দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি উপসংহারে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণকে সজ্জবদ্ধ হইবার জন্ত যে পরামর্শ দান করেন, কবিরাজ মহাশয়গণ নিশ্চিতই তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না; কারণ, ইহার উপর তাঁহাদের কল্যাণও যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

মন্ত্রিসভার সংস্কার

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার রাজনীতিক্ষেত্রে বঙ্গীয় নারী-সমাজের নেত্রীস্থানীয়া, এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিশেষ

প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মহিলা সদস্য। তিনি সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকারের প্রধান সচিব মৌলবী ফজলুল হক ছায়েব-বরাবর একখানি পত্র লিখিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মর্ম এই যে, বাঙ্গালার বর্তমান মন্ত্রিসভা তাহার কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেছে না; সেই জন্ত মন্ত্রিসভার সংস্কারসাধনের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।—শ্রীযুক্তা মজুমদারের এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার বর্তমান সচিবমণ্ডলী গত চারি বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালায় শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙ্গালা প্রদেশের শাসনকার্যের যে কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে, সে শক্তি কাহারও আছে কি? পাটের মূল্য ধার্য্য হইতে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার পর্যন্ত ছোট-বড় সকল কাজেই তাঁহারা জনসাধারণকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এই কয় বৎসরেই বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ শতৈঃ শতৈঃ কি ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। স্মরণ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্তমান সচিবসভ্য তাঁহাদের কার্যে দেশের জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। কতকগুলি আইন এমন ভাবে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তাহাতে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত সুপরিষ্কৃত। কিন্তু আমরা জানিতে চাহি,—কি ভাবে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিলে এই দোষের নিরাকরণ হইতে পারে। কোন দুই-তিন জন সচিবের আসনে অত্র দুই-তিন জন সচিবকে স্থাপন করিলে এই দোষ তিরোহিত হইবে;—এরূপ মনে হয় না। কারণ, এ কথা সত্য যে, এই সচিবমণ্ডলী কোন-একটা নীতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। সে নীতি তাঁহাদের দলেরই নীতি। লোক-পরিবর্তনে যে দলের নীতি পরিবর্তিত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। অতএব মৌলবী ফজলুল হক ছায়েব যদি শ্রীযুক্তা মজুমদারের প্রস্তাবে সন্মত হন, তাহা হইলেও যে তাহাতে সুফল ফলিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? এ দোষ অপসারিত করিতে হইলে, মূলের ভুল সংশোধন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—গরুর লেজ থাকিতে লেজের ক্ষত আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারত সচিবের উক্তি

কলিকাতার 'ষ্ট্রেটস্ম্যান' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক সার আলফ্রেড ওয়াটসন সম্পাদকীয় যোগ্যতাবলে সার খেতাব অর্জন করিয়াছিলেন। সংপ্রতি তিনি ভারত সচিব মিষ্টার আমেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারত-শাসন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এই কোতুহল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কি ফরমাসেসী, তাহা অনুমান করা কঠিন ; তবে মিষ্টার আমেরী তাঁহার নিকট মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—“বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা ভারতীয় ভাবানুসারে কিন্তু বৃটিশ জাতির মতানুসারে এবং স্বার্থসম্মত ভাবে পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট শাসনপদ্ধতি ভারতে প্রবর্তিত করিতে সম্মত হইয়াছেন।”—ভাষার এমন প্যাচের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মর্ম ভেদ করা অতি দুষ্কর ব্যাপার! এই শাসনযন্ত্রটার স্বরূপ কিরূপ হইবে? উহা হইবে ভারতীয় ভাবের সহিত সম্মত, কিন্তু সঙ্কে-সঙ্কে হইবে বৃটিশ জাতির মতানুরূপ, এবং বৃটিশ জাতির স্বার্থের সহিত সম্মতিবিশিষ্ট। এই ‘সোনার পাথর-বাটি’র বা ‘কাঁঠালের আমসত্ত্বের’ কথা অনেকেই শুনিয়াছেন ; এবার তাহার অস্তিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু তাহা যে কিরূপ পদার্থ, কেহ বুঝিতে পারিলেন কি? ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিধিনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র (Constitutional monarchy) প্রতিষ্ঠিত ছিল, আবার গণতন্ত্রও বিরাজিত ছিল। তাহার নিয়মকানুন সমস্তই ভারতের স্বার্থলেশ-হীন মনীষী মুনিঋষিরাই রচনা করিতেন। সার্ব-জনীন স্বার্থই তাহার লক্ষ্য থাকিত ; এবং আধ্যাত্মিক সাধনার স্বাধীনতা রক্ষিত হইত। জনসাধারণের স্বার্থ সমঞ্জসীভূত করিয়া রক্ষা করাই ভারতের চিরানু-স্মৃত ভাবধারা। তাহার সহিত সম্মতি রাখিয়া বৃটিশ-মতানুযায়ী করিয়া এবং বৃটিশ-স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থাৎ ছুই নোকায় চরণ স্থাপন করিয়া—ভারতীয় ভাবধারা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বৃটিশ পার্লামেন্ট কি করিয়া ভারতের শাসনপদ্ধতি নির্দিষ্ট করিবেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ভারত সচিব আবার বলিয়াছেন,—“বৃটিশ সরকার অত্যন্ত

কাল হইতে উত্তরাধিকারস্বত্রে ভারতে শান্তিরক্ষা করিবার, এবং ভারতবাসীর কল্যাণসাধন করিবার দায়িত্ব লাভ করিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বৃটেনকে সেই সকল দায়িত্ব পালন করিতেই হইবে।”—উঃ, কি উদার বুলি!

তবে বর্তমান বৃটিশ সরকার কাহার নিকট হইতে এই ডবল দায়িত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিতে আগ্রহ হয়। তাঁহারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে এই রাজ্য পাইয়াছেন বা লইয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসক এবং পালক হিসাবে আদৌ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। সে দিকে তাঁহারা মনোযোগ দেন নাই, বা দিতে পারেন নাই। অন্তরে কথা ছাড়িয়া দিলেও বিখ্যাত ইংরেজ ইতিহাস-লেখক জেমস মিলই লিখিয়া গিয়াছেন,—

“Before the period they had maintained the character of mere traders and by humility and submission, endeavoured to preserve a footing in that distant country under the native powers. We shall now behold them entering the lists of war and mixing with eagerness in the contests of princes.”
অর্থ—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ‘শ্রেফ’ বণিকোচিত স্বভাব বজায় রাখিয়া দেশীয় শাসকদিগের নিকট দীনতা ও বশুতা স্বীকারের সাহায্যে সেই দূরদেশে আপনাদের দাঁড়াইবার স্থানটুকু বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, এবং রাজগণের বিরোধে আগ্রহ সহকারেই মিশিতেছেন।—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে-কালে এ দেশের শাসনকার্যে বণিকমূলভ অযোগ্যতা প্রদর্শন করায় বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কোম্পানীর অনুস্মৃত নীতির আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে, বিলাতের সকল দলের লোকই তাহা বুঝিয়াছিলেন। মিষ্টার আমেরী যদি মনে করিয়া থাকেন, এ দেশবাসীরা সে দিনের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে, এবং মিল, বার্ক প্রভৃতির রচনা এ দেশে অচল হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধি-পরিচালনায় বিরাট ভুল হইয়াছে। বৃটিশ সরকার সে সময়ে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে নিরপেক্ষ

ভাবে রাজ্যপালন করিবেন, এইমাত্র দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা রাজী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাণীতেই বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছিল। কোম্পানীর নিকট হইতে এই দায়িত্বই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্তান্ত দায়িত্ব মিঃ আমেরীর উর্কর করণাপ্রসূত।

রণক্ষেত্রে খন্দরের অ্যাদর

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, রণক্ষেত্রে সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য ভারতের সমর বিভাগের কর্তারা ধরপারওয়ার জিলায় গাঙ্গোরা আশ্রম হইতে হাতে-বোনা খন্দর, পশমী কঞ্চল প্রভৃতি ক্রয় করিবেন, স্থির করিয়াছেন। করাচীর সরদরাহ বিভাগের দ্রব্যপরীক্ষক এবং সিন্ধু প্রদেশের মার্কেট-অফিসার এ সকল দ্রব্য দেখিবার জন্য শীঘ্রই তথায় যাইবেন। এইবার কি ভারতের তাঁতিরা ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিদের খানার টেবিলে স্থান পাইবে?

বড়লাটের ঘোষণা

কেন্দ্রীয় পরিষদের যে সকল কংগ্রেসী সদস্য এক বৎসরের অধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, লর্ড লিনলিথগো তাঁহাদের আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গবর্নর জেনারেল স্বয়ং নিজের ক্ষমতাবলেই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ভারত সরকার অর্থাৎ ভারতীয় মন্ত্রি-মণ্ডলী এ সিদ্ধান্ত করেন নাই। অবশ্য, ভারত-শাসন আইনে বড়লাটের হস্তে এ-সব কর্তৃত্বের ক্ষমতাও দেওয়া আছে। আনাদের দেশেও কার্যবিধে গুড়ো কর্তা হইয়া থাকেন। উহার নবম তপশীলে বিহিত হইয়াছে যে, যদি ভারতীয় আইন-সভার কোন সদস্য একাদিক্রমে দুই মাস কাল ভারতের বাহিরে থাকেন, অথবা আইন-সভার কার্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে বড়লাট ইচ্ছা করিলে তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। ইহাতে কংগ্রেসী দলের উপর, বিশেষতঃ, আইন-অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে বড়লাটের ও ব্যুরোক্রেসীর মনোভাব কি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই? ইহার পূর্বে অনেক সদস্য ক্রমাগত কয়েক মাস ধরিয়া ব্যবস্থা পরিষদে অনুপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ চরম ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই; বরং এ-কথাও শুনা

গিয়াছে যে, ঐ সকল সদস্য যে নির্বাচক-মণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত, তাঁহারা ঐ সকল সদস্যকে অপসারিত করিতে চাহেন না বলিয়া দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সদস্য-পদ হইতে অপসারিত করা হয় নাই। এই সকল কংগ্রেসী সদস্য বাহাদের ভোটে সদস্য-পদ পাইয়াছিলেন, এই সকল সদস্যের এবং কংগ্রেসের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব কিরূপ, তাহা পরীক্ষা করাই কি বড়লাটের উদ্দেশ্য? পরীক্ষায় কংগ্রেসই জয়ী হইবে, এরূপ মনে করিলে কি ভুল হইবে?

কাপড়কলের অসুবিধা

বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতে কলজাত বস্ত্র-শিল্পের প্রসার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবার বাঙ্গালায় কয়েকটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও এবার যুদ্ধের অজুহাতে বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, তথাপি কাপড়ের পাড় প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত রঙ আর পাওয়া যাইতেছে না। এ-জন্য পাড়ওয়ালারা ধূতি, বিশেষতঃ, নক্সাদার পাড়ওয়ালারা শাড়ী প্রস্তুত করিবার বিশেষ অসুবিধা ঘটতেছে। এবার বঙ্গীয় মিলগুলির মালিক-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মিষ্টার বসু কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের হিড়িকে বিদেশ হইতে রঙ আমদানী করিবার অসুবিধা ঘটতেছে সত্য; কিন্তু এ দেশে কি ভাল পাকা রঙ প্রস্তুত করা অসাধ্য? সীমস্তিনীরা কি পাকা রঙের শাড়ী পূর্বে কখন ব্যবহার করেন নাই? যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিলে কি বাঙ্গালার সৌখিন সীমস্তিনীরা সাদা-পেড়ে শাড়ীতে সন্তুষ্ট থাকিবেন?

যুদ্ধবিরোধী ধর্ম

কংগ্রেসের কার্যসূচী অনুসারে বাহারা যুদ্ধবিরোধী ধর্ম করিতেছেন, তাঁহারা কি শাস্তি পাইবার যোগ্য? তাঁহারা যে ধর্ম করেন, তাহাতে কি সরকারের কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা আছে? এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে এত দিন জনসমাজে আলোচনা হয় নাই; অথচ, বাহারা এরূপ ধর্ম করিতেছেন, তাঁহারা আদালতে কারাদণ্ড বা অর্ধদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই ভোগ করিতেছেন। সম্রাতি মাদ্রাজের গুস্তর নামক স্থানের সিভিলিয়ান (জজেন্ট)

ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার আর গ্যানেটি এইরূপ এক মামলার বিচার করিয়া যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধবিরোধী ধ্বনিতে এমন কোন কথা নাই, যাহার জন্ত এই ধ্বনি ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। উহার দ্বারা সরকারের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উহা সরকারের বিরুদ্ধে বা যুদ্ধের প্রতিকূলে জনসাধারণকেও উত্তেজিত করিতেছে না। উহাতে সৈন্ত-সংগ্রহের এবং সমর-ভাণ্ডারে অর্থদানের বিরোধী কোন কথা নাই।—এই যুক্তিতে তিনি অভিযুক্ত আসামীকে মুক্তিদান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, যাহারা যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি করিবার অভিযোগে ফৌজদারী হাকিমের বিচারে দণ্ডিত হইতেছেন, তাঁহাদের প্রায় কেহই আদালতে আত্ম-সমর্পণ করেন না। কাজেই বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটরা বিনা-প্রতিবাদে খোস-মেজাজে এই ধ্বনিকারকদিগকে যথেষ্ট দণ্ডদান করিতেছেন। বস্তুতঃ, একই ‘অপরাধে’ দণ্ডের মাত্রাভেদ দেখিয়া বিন্মিত হইতে হয়! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবার যোগ্য না হয়, যদি উহাতে সরকার-পক্ষের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র নিজের মত প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত করার কতকগুলি লোককে কারাগারে রাখিয়া ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া সরকারের লাভ কি? জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গ্যানেটির উক্ত সিদ্ধান্ত অল্প ম্যাজিষ্ট্রেটরা গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্যও নহেন, কারণ, উহা হাইকোর্টের নজীর নহে। তবে যদি কেহ কংগ্রেস তথা গান্ধীজীর নির্দেশে নিজ মত ব্যক্ত করে, তাহা হইলে সে আদালতে আত্মসমর্পণ করিল না বলিয়া তাহাকে বেপরোয়া জেলে পুরিলে বা খোস-খেয়ালে তাহার অর্ধদণ্ড করিলে সরকারের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে কি? বস্তুতঃ, এই যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনির মধ্যে কোন দোষাবহ কথা আছে কি না, তাহার স্মরণ ও নিরপেক্ষ বিচার হওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয়। এতদ্বিন্ন, এক যাত্রার পৃথক ফল হইবারই বা কারণ কি? যাহারা দণ্ড না পাওয়ায় পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা কি সরকারের কোন অনিষ্ট

হইতেছে? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি লোককে অভিন্ন কারণে কারাগারে পুরিবার সার্থকতা কি?

দুইটিতে আপত্তি

আসামে দুইটি আইন সভা আছে; অথচ আসাম প্রদেশটি ক্ষুদ্র। তাহার আয়ও অল্প। এত অল্প আয়ে ঐ প্রদেশের পক্ষে দুইটি আইন সভার ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। অর্থাভাবে আসামে হাইকোর্ট হয় নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ও হয় নাই। সেই জন্ত আসামবাসীরা এই ডবল আইন সভার বিরোধী হইয়াছেন। আসাম ব্যবস্থা পরিষদে আসাম রাষ্ট্রীয় সভা তুলিয়া দিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আসাম রাষ্ট্রীয় সভা সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করে নাই; কারণ, কেহই নিজের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহে না। কিন্তু তাহার উপর আর একটু কথা আছে। রাষ্ট্রীয় সভার সদস্যসংখ্যা মোট ২২ জন। এই সভার বক্তব্য এই যে, একেবারে ইহার বিলোপসাধন না করিয়া অন্ততঃ দশ বৎসর ইহাকে কাজ করিতে দেওয়া হউক। কি জন্ত তথায় এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় সভাটি বজায় রাখা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি সাধারণ লোকের নাই। তবে এ কথা সত্য, আসামে অনেক শ্বেতাঙ্গ চা-কর আছেন; তাঁহারা ঐ প্রদেশবাসীদিগের সহিত আপনাদিগকে সকল বিষয়ে সমান স্বার্থবান্ বলিয়া মনে করেন না। এই উচ্চতর আইন সভায় অর্থাৎ আসাম রাষ্ট্রীয় সভায় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় দলে পুরু। এই সভার সাহায্যে তাঁহারা আপনাদের নিহিত স্বার্থ রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আসাম-বাসীরা দুইটি আইন সভার ব্যয়ভার সহ্য করিতে পারেন আর নাই পারেন, বৃটিশ সরকার যাহা বুঝিয়া আসামের ঘাড়ে দুইটি আইন সভার ভার চাপাইয়াছেন,—তাহা নাকচ করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। সুতরাং আসামবাসীদিগের চেষ্টায় কি ফল হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

কর্তব্যের নির্দেশ

এবার পাটনা সহরে মেডিকো-লিগ্যাল সমিতির যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার সভাপতি মহাশয় আদালতে

চিকিৎসক এবং ব্যবহারাজীবদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঐ দুই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়িগণের বিশেষ ভাবে পালন করাই কর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন, আদালতে কোন মোকদ্দমায় উপস্থিত হইলে যে কোন উপায়ে মামলা জিতিব, এইরূপ মনোবৃত্তি কোন সম্প্রদায়েরই পোষণ করা উচিত নহে। যাহাতে সত্যই জয়যুক্ত এবং প্রকৃত গ্রামবিচারের মর্যাদা রক্ষিত হয়, তাঁহাদের সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কথা সত্য। কিন্তু উকিলদিগের পক্ষে কোন মামলা সত্য এবং কোনটি মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তদ্বিরকারকরা অনেক সময় মামলা সাজায়, এবং উহা সাজাইয়া উকিলদিগকে মামলা বুঝাইয়া দিয়া থাকে। সে জন্ত উকিলদিগের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে মামলার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কিন্তু চিকিৎসকদিগের পক্ষে তাহা নহে। তাঁহাদের যে কাজ, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে তদ্বিরকারকদিগের কুহকে পড়িয়া ভ্রান্ত-পথে চালিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। ইদানীং কতকগুলি ক্ষেত্রে চিকিৎসক স্বার্থের অমুরোধে রোগীর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই,— আদালতে এবং আদালতের বাহিরে তাহার কিছু-কিছু দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে। ইহা অনধিকারীকে বিজ্ঞানানের ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সভাপতি মহাশয়ের এই কথা চিকিৎসক এবং ব্যবহারাজীবদিগের স্মরণ রাখা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু স্মরণ থাকিবে কি?

পাকিস্থানের পূর্বাভাস ও কংগ্রেস

জিন্না-প্রমুখ মুসলিম লীগের সদস্যগণ যে পাকিস্থান প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই প্রস্তাব যে একেবারেই বিচারসহ নহে, তাহা এ দেশের সুধীবৃন্দ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। ভারতের কোন অঞ্চলেরই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণকে ইহার সমর্থন করিতে দেখা যাইতেছে না। হিন্দুস্থানে মুসলমান-সংস্কৃতির প্রবর্তন এবং ভেদনীতি সূচু করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের পরিচালক মিষ্টার গান্ধী এইরূপ সর্বনাশকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একে-বারেই 'স্পিক্টি নট!' যেন মুক! গান্ধীজী বলিয়াছেন,

পাকিস্থান-প্রস্তাব জাতীয়তার ঘোর বিরোধী এবং জাতির অবনতিজনক ব্যবস্থা হইলেও যত দিন মুসলমানরা ভ্রান্তির ফলে তাহা উপলব্ধি না করিতেছেন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে মৌন থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। গান্ধীজীর এইরূপ অদ্ভুত উক্তি শুনিয়া কে না বিস্মিত? যিনি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্ত সত্যাগ্রহ করিতেছেন, তিনি এবং তাঁহার দলস্থ ব্যক্তির একটা প্রস্তাব জাতীয়তার দারুণ বিরোধী এবং উগ্রভাবে অবনতিজনক, ইহা স্বীকার করিয়াও তাহার বিরুদ্ধে জুজুর ভয়ে আড়ষ্ট খোকায় মত একটি কথাও বলিবেন না, এরূপ বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহাতে তাঁহাদের মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভ্রান্তির ফলে বা কুপরাশর্ষের প্রভাবে যাহারা ভুল বুঝে, তাহাদের ভ্রম হয় ত কালে সূচিত্তে পারে, কিন্তু যাহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছে, ভেদনীতি চালাইবার এবং অশ্রের প্রাচীন মৌলিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত করিবার জন্ত এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছে, তাহাদিগকে ইহা বুঝান মানুষের ত দূরের কথা, দেবতারও অসাধ্য। ডাক্তার আশ্বেদকরকে তুষ্ট করিতে যাইয়া গান্ধী বাঙ্গালার সর্বনাশ করিয়াছেন,— এখন মিষ্টার জিন্নাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টায় তিনি সকল হিন্দুবই সর্বনাশ করিতে বসিয়াছেন! যাহা মিথ্যা, যাহা অনিষ্টকর, কোন মতেই তাহার প্রশ্রয় দেওয়া কর্তব্য নহে। পাকিস্থান প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার ফল কি হইবে, তাহা পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল-বোর্ডের কার্য্য দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে। 'অমৃতবাজার' তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। গান্ধীজীর এই অদ্ভুত নীতির কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। কংগ্রেস যদি পাকিস্থান প্রস্তাব জাতীয়তা-গঠনের পরিপন্থী এবং উন্নতিসাধনের পক্ষে প্রবল বাধাস্বরূপ হইবে, ইহা বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মুক্তকণ্ঠে এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রতিবাদ করা একান্ত কর্তব্য; নতুবা তাঁহাদের এই ব্যবহার তণ্ডামি ভিন্ন আর কি মনে হইতে পারে?

মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্র

প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে যুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর হইতেই ভারতে সর্বপ্রকার আবশ্যক দ্রব্যের

মূল্য দিন-দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। চিকিৎসার জন্য অত্যাশঙ্কক ঔষধের, শিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ কলম নিব প্রভৃতির এবং জীবনধারণের প্রধান সম্বল খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিল! ধান, চাউল, গম, আটা, শাকসব্জী, কেরোসিন, তৈল, কাঠি-গণ্ঠি মূল্যের দিগ্বেশলাই, এমন কি, লবণ পর্য্যন্ত অধিক মূল্যে কিনিতে হইতেছে। সমাজের সর্বস্তরের দরিদ্রদিগের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে, লোকের আয় দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। সাহিত্যজীবীরাও দশ দিক অন্ধকার দেখিতেছেন; তাঁহাদের রুজির উপর ডাকমাণ্ডলের চাপ দফায় দফায় বাড়িয়া উঠিয়াছে! মফস্বলে দরিদ্রলোকেরই বাস, তথায় হাহাকার ইহার মধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিল। চিনির দর চড়া, কিন্তু আখের দর নামিয়া যাইতেছে। পাটের দর কম, কিন্তু চটের ও খেলের মূল্য ক্রমেই বাড়িতেছে। কলওয়ালারা পাট তেমন কিনিতেছে না। ফলে বাঙ্গালার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। এবার রোগের প্রকোপ যেমন অধিক, ঔষধের মূল্যও সেইরূপ চড়া। কাজেই যুরোপের যুদ্ধের তরঙ্গ বঙ্গের স্তূর পল্লীকেও আলোড়িত করিয়া-তুলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে—‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুগড়ের প্রাণ যায়!’

নিয়োগে অসুবিধা

ভারতরক্ষী সৈন্যদলের কয়েকটি উচ্চপদে বাঙ্গালী এবং মাদ্রাজী নিযুক্ত হইয়াছে, এই অভিযোগে পঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদে কয়েক জন সভ্য সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া মাদ্রাজী এবং বাঙ্গালীদিগের বিরুদ্ধে প্রচুর শ্লোষ-বিদ্বেষ বর্ষণে পঞ্জাবী সিংহের সম্মুখ কুণ্ড করিয়াছেন। এক জন সদস্য এমন কথাও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা এবং মাদ্রাজীরা দ্রুত ইংরেজী বলিতে পারে বলিয়াই যে তাহারা সমর বিভাগে উচ্চপদ পাইবে, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। সরকার বাঙ্গালী এবং মাদ্রাজীদিগকে অসামরিক জাতি বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করায় পঞ্জাবী সিংহেরা তাহাদিগকে ফেরুপাল মনে করিয়াই কি এ-ভাবে দস্ত-বিকাশ করিতেছে? কিন্তু বাঙ্গালীর বীরত্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোণিতের অঙ্করে লিখিত আছে—নতুন করিয়া তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

আর মাদ্রাজীদের বীরত্বের কাহিনী অল্প দিন পূর্বে মাদ্রাজ-লাটের মুখেও পরিষ্কৃত হইয়াছিল। পঞ্জাবী পরিষদের এই পরিবাদপটু বাহ্মাফোটকারী সদস্যটির স্বরণ থাকি উচিত যে, গৌরাত্মিকে শোষণ বলিয়া স্তম্ভীজনের ভ্রম হয় না। বর্তমান যুগে সমরপরিচালনায় দৈহিক বল অপেক্ষা বুদ্ধিবলেরই অধিক প্রয়োজন। পঞ্জাবীদের বীরত্বের গৌরব কেহই অস্বীকার করিবে না,—যদিও হেমচন্দ্র বড়-ছুংখেই লিখিয়া গিয়াছেন কে “মুদুকি মুলতান, করি খান-খান, শিখ-গলে দিল দঢ় নিগড়।” কিন্তু বিধাতা সে বীরত্ব তাহাদিগকেই একচেটিয়া অধিকার দান করেন নাই। অতএব পঞ্জাবী সদস্য মহাশয়ের রসনা একটু সংযত হইলেই শিষ্ট ও শোভন হইত।

হজ্জের সময়

ইংরেজী ফেব্রুয়ারী মাস উপস্থিত। এই মাসেই ভারতের কেন্দ্রী সরকারের এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের বজেট বিভিন্ন ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করা হইবে। এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধ আরও জঁকিয়া উঠিবে কি না, তাহা বুঝা কঠিন। এখন ভারতবাসীর মনে স্বতঃই আশঙ্কা জাগিতেছে, আবার বৃষ্টি আয়কর এবং অতিরিক্ত লাভকর বৃদ্ধি করা হইবে। অল্প দিন পূর্বে সার জিরেঙ্গী রেইসম্যান যখন অতিরিক্ত কর ধার্য করেন, তখন তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি এই দরিদ্র ভারতবাসীর স্বন্ধে আরও করভার চাপাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু দেশের যেকোন অবস্থা, রপ্তানি বাণিজ্য যেকোন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে,—বহু পণ্যের মূল্য যেকোন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দারিদ্র্যও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। একরূপ অবস্থায় আর ঐ সকল কর বৃদ্ধি করা কর্তব্য কি না, ভারতের রাজস্ব-সচিব কি তাহা ভাবিয়া দেখিবেন না? বাঙ্গালায় ত পাট বিক্রয়ের সময় পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়ার জনসাধারণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। চারি দিকে তপ্তশ্বাস! এদিকে রাজস্ব-বিভাগ কি মনে করিতেছেন, তাহা তাঁহারা জানেন। বাঙ্গালার লোক এই ছুঁদিনে ফুকরিয়া কাঁদিতে না পারিলেও গুমরাইয়া মরিতেছে। এখন রাজস্ব-সচিব কি করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

মীক-গ্রেগরী রিপোর্ট

গত আশাঢ় মাসের শেষ ভাগে ভারত সরকার আচম্বিতে ডক্টর টি-গ্রেগরী এবং সার ডেভিড মীককে মার্কিং মূল্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যুরোপের বহু দেশ এখন কার্যতঃ নাজি-সরকারের অধীন হওয়ায় ঐ সকল দেশে ভারতীয় পণ্য আর রপ্তানি হইতেছে না, সেই জন্ত ভারতের প্রায় ৩০ কোটি টাকা বার্ষিক ক্ষতি হইতেছে। এই ক্ষতি পূরণের জন্ত চেষ্টা করা অবশ্যকর্তব্য। মার্কিং ভারতীয় পণ্য চালান দিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভবপর কি না, তাহা নির্ধারণ করাই ভারত সরকারের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু দুই জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত সরকার এ দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন নাই, কিম্বা ইহাদের সহিত কোন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ পাঠাইবারও ব্যবস্থা করেন নাই। সেই জন্ত এ দেশের লোকের মনে একটু অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহারা উভয়ে সম্প্রতি এই বিষয়ে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত কয় দফায় প্রকাশ করা যাইতে পারে,—

(১)• এখন মার্কিং জাতি সাময়িক অস্ত্র-নির্মাণে রত, এজন্ত ইহাদের অনেক দ্রব্যেরই প্রয়োজন। ইহার ফলে মার্কিংের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই জন্ত তথায় ব্যবহার্য পণ্যের টান বৃদ্ধি পাইবে। এই হিসাবে তথায় ভারতীয় পণ্যের টান কিছু বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

(২) ছাপা কাপড় এবং চাদরের প্রতি ঐ দেশের লোকের আকর্ষণ আছে। ‘ভারতে প্রস্তুত’ এইরূপ মার্কিং থাকিলেই তথায় কতকগুলি জিনিষের কাটতি হয়। জাপানীদিগের প্রতি অসন্তোষ নিবন্ধন কতকগুলি ক্রেতার নিকট ভারতীয় পণ্যের আদর হইতে পারে। এদিকে চেষ্টা করা কর্তব্য।

(৩) ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মার্কিংে গমন করিয়া স্থানীয় লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিলে ভারতীয় পণ্য তথায় বেশী বিকায়িত্তে পারে।

(৪) যুদ্ধান্ত্র প্রস্তুতের জন্ত কতকগুলি বিশেষ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা

হইলেও যুরোপীয় বাজার বন্ধ হওয়াতে ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে, মার্কিং তাহার পূরণ করিতে সমর্থ হইবে না।

(৫) ভারত হইতে মার্কিংে পণ্য রপ্তানির অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, উহাতে জাহাজের অস্থবিধা ঘটবে, এবং পণ্য-বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, নিরিখ অনুসারে চালানী পণ্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

রিপোর্টখানি পড়িলেই বুঝা যায় যে, যুরোপের বাজার বন্ধ হওয়াতে ভারতের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, মার্কিংে পণ্য রপ্তানী করিয়া সেই ক্ষতির পূরণ হইবে না। আমেরিকার দাবী অগ্রে—হাতানা পরিমদে এই মর্মে যে মস্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহাই হইবে মার্কিংে ভারতীয় পণ্য-বিক্রয়ের পথে প্রবল অন্তরায়। তৈল, তৈল-বীজ, খইল, তুলা, শগ, কাঁচা চামড়া, গম, হাড়-অস্থিজাত সার প্রভৃতি মার্কিংে বিকায়িত্তে না। ভারত হইতে যে সকল কৃষিজ পণ্য বিদেশে চালান যায়, তাহার অনেক পণ্যই মার্কিংে অনাবশ্যক, কারণ, তাহা মার্কিংে এবং আমেরিকার অন্যান্য দেশে জন্মে। কেবল পাট, পাটজাত পণ্য, এবং নারিকেল দড়ি হইতে প্রস্তুত পণ্য ভারত হইতে তথায় অবশ্যই রপ্তানি হইবে। তবে ঐ রিপোর্টেই প্রকাশ, অন্ন, কফি, কাঁচা চামড়া, লঙ্কা, হরিতকী, বহড়া, আমলকি, এলাচি, গোলমরিচ, আদা প্রভৃতি ঐ দেশে কাটাইবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা সফল হইতেও পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে দুই-এক কোটি টাকার অধিক পাওয়া যাইবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে বাঙ্গালার সচিবরাও এই বিলখানি আইনে পরিণত করিবার জন্ত যেন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিষয়টি আলোচনা করিবার জন্ত যে সকল সভা-সমিতি হইতেছে, তাহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ব্যক্ত মত হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, বিলখানি যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাতে এক দিকে যেমন সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল, অন্য দিকে তেমনই উহা অনায়াসে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এবং শিক্ষাবিস্তারের প্রতিকূল ভাবে ব্যবহার করা যাইতে

পারে। এ কথা এখন সকলেই বিশ্বাস করিতেছেন যে, বর্তমান সচিবমণ্ডলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্ত বন্ধপরিষ্কার হইয়াছেন। অন্ততঃ মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কোন ক্ষমতা না থাকে, তাহাই তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁহারা যে ভাবে বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই ভাবে বোর্ড গঠন করিলে তাহার আর স্বাধীনতা থাকিবে না; তাহা সরকারী বোর্ডেই পরিণত হইবে। উহার অধিকাংশ সদস্যই হইবে সরকারের আজ্ঞাকারী কিংকর। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কমিটির হস্তে এই বিলখানি আলোচনা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, সেই কমিটিও ঠিক ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষা-সম্পর্কিত অতি অনাবশ্যক বিচার্য বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত কখনই সরকারের একান্ত সমর্থক-দিগের হস্তে গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে না। কমিটি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, বর্তমান বিলখানি তাহা অপেক্ষা অধিক অসন্তোষজনক এবং অপকর্ষসাধক, অতএব উহা অবিলম্বে পরিত্যাগ করা বিধেয়। এই বিলখানির বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা এবং বিক্রম করা বাঞ্ছনীয় নহে। দেশের জনসাধারণই মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন, সরকার কেবল-মাত্র ইহার শতাংশের পঞ্চদশ অংশ মাত্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপ জঘন্য এবং অস্পৃশ্য বিলখানি যে এক শ্রেণীর লোকের সমর্থন পাইতেছে, তাহার কারণ স্পষ্ট।

স্বর্গীয় অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়
রায় বাহাদুর অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায় ২০শে মাঘ রবিবার
রাত্রিশেষে মহলা পরলোকে প্রস্থান করায় আমরা

বন্ধু-বিরোগবেদনা অনুভব করিয়াছি। অমূল্যচরণ বাবু এক বৎসর মাত্র পূর্বে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আশা করিয়াছিলেন, শ্রমক্রান্ত জীবনের অবশিষ্ট কাল নানা সদগুণে অতিবাহিত করিবেন; কিন্তু ৫৬ বৎসর বয়সেই তাঁহার কাল পূর্ণ হওয়ায় সে আশা সফল হইল না। তাঁহার মাতা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র শায়রত্ন মহাশয়ের একমাত্র কন্যা, এবং পিতা ভবচরণ মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ



অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়

ছিলেন; জিলা
২৪ পরগণার
হালিসহর
তাঁহাদের আদি
বাসস্থান।
অমূল্যচরণ
বাবু সরকারের
হিসাব বিভাগে
অতি সামান্য
চাকরী গ্রহণ
করিয়া কর্ম
জীবন আরম্ভ
করিলেও অসা-

ধারণ প্রতিভাবলে নানা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; অবশেষে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের চীফ অডিটারের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় স্বধর্মপ্রবণ ছিল, এবং তিনি ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রায় উদার-প্রকৃতি, সহৃদয় ব্যক্তি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পত্নীও জীবিত আছেন। আমরা তাঁহার পরি-জনবর্গকে তাঁহাদের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

ভ্রম সংশোধন :—গত কার্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মিত্র রচিত "পদকর্তা গোবিন্দদাস" নামক প্রবন্ধে "গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ডনিবাসী দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করেন"—ইহাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই উক্তি ভ্রমাত্মক; সুনন্দা গোবিন্দদাসের মাতা; গোবিন্দদাসের পিতা শ্রীখণ্ডনিবাসী চিবঞ্জীব সেন সুনন্দাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

শ্রীশশীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বসন্তের আনন্দ-মঞ্জরা



[১৯শ বর্ষ]

ফাল্গুন, ১৩৪৭

[৫ম সংখ্যা]



পূর্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর

৪

পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ত্রায়-বৈশেষিক মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে কুমারিল কোন কোন স্থলে এরূপ কিছু কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে,



তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও জগৎকারণে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যে ভাবে ত্রায়-বৈশেষিক মতের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা অধ্যাপক কীথ অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। নিম্নে অধ্যাপক কীথের উক্তির সারাংশ উদ্ধৃত করা হইল—

‘ত্রায়-বৈশেষিক মতে এক দিকে পরমাণুবাদ ও অণু দিকে অবাস্তর (নৈমিত্তিক) সৃষ্টি-প্রলয়-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। এই দুইটি সিদ্ধান্তের সঙ্গতি দেখাইতে যাইয়া ত্রায়-বৈশেষিক-মতানুসারিগণ এক জন স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতথা পরমাণুসমূহের সাময়িক পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ ও জীবের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধের কোন সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই নৈমিত্তিক বা অবাস্তর সৃষ্টি-প্রলয়ের প্রামাণ্য একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ধারাবাহিক উৎপত্তি-লয়-প্রবাহ স্বীকার করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু এই সৃষ্টি-লয়-প্রবাহের যে

একটা নিয়ম বা ব্যবস্থা আছে, ইহা স্বীকার করিবার উপযুক্ত হেতু তাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই। আর এই কারণে সৃষ্টিকালে জীবের আবির্ভাব বা অতিব্যক্তি ও প্রলয়কালে জীবের তিরোভাব বা অনতিব্যক্তি মীমাংসক-সম্মত নহে। প্রভাকর বলেন, ভূয়োদর্শন দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সর্ববিধ প্রাণিশরীর সম্পূর্ণ স্বভাববশতঃ স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর বর্তমানে যাহা স্বভাবসিদ্ধ তথ্য বলিয়া স্বীকৃত, তাহা হইতে যুক্তিবলে আমরা তদনুরূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রক্রিয়ার অনুমান করিতে পারি—সে জগৎ অতিরিক্ত কোন বাহ্য কারণ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া, ঈশ্বর জীবকৃত স্কৃত-হৃৎকৃতির অধিষ্ঠাতা—এই সমগ্র কল্পনাটিই নিতান্ত নিশ্চয়োজন ও ভিত্তিহীন। ধর্ম ও অধর্ম অদৃষ্টস্বরূপ, অতএব ঈশ্বরকর্তৃক ধর্মাধর্মের ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। উহাদিগের মানস-প্রত্যক্ষও অসম্ভব। কারণ, মন (অন্তঃকরণ) শরীর-পরিচ্ছিন্ন—শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত; এ হেতু

শরীরের বহির্দেশে অবস্থিত ধর্মাধর্মের মানস-প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারই করা যায় যে, ঈশ্বরের পক্ষে জীবকৃত ধর্মাধর্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব, তাহা হইলেও ঈশ্বর যে উহাদিগের অধিষ্ঠাতা—ইহা প্রমাণ করা সম্ভব নহে। কারণ, ঈশ্বর জীবকৃত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা, ইহা স্বীকার করিলেই বলিতে হইবে যে, ধর্মাধর্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ বর্তমান। সে সম্বন্ধ কিরূপ? উহা সংযোগ সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কারণ, ধর্মাধর্ম গুণ-পদার্থ; আর গুণ-পদার্থের সহিত ঈশ্বররূপ দ্রব্য-পদার্থের সংযোগ সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব (১)। সমবায় সম্বন্ধও হইতে পারে না। কারণ, ধর্মাধর্ম জীবে আশ্রিত (জীব-সমবেত)—ঈশ্বরশ্রিত নহে। যদি নৈয়ায়িকগণ এই প্রসঙ্গে সূত্রধর-দৃষ্টান্তের উপস্থাপন করেন, তাহা হইলে তদুত্তরে বলা চলে যে, সূত্রধর-দৃষ্টান্তে অষ্টাকে শরীরী স্বীকার করিতে হইবে; আর অষ্টাকে একবার স্থূল-শরীর-পরিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার পক্ষে পরমাণু অথবা ধর্মাধর্মের জ্ঞান স্বল্প বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাহার পর, ইহা কল্পনাই করা যায় না যে, পরমাণুসমূহ ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে পারে। কারণ, এরূপ ক্রিয়ার অমূরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর যদিই বা ঈশ্বরেচ্ছায় পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলেও ঈশ্বরেচ্ছায় নিত্যক-নিবন্ধন পরমাণুগত ক্রিয়া ও তৎকৃত সৃষ্টি নিত্যরূপেই পরিগণিত হইত—কদাচ প্রলয়-সম্ভাবনাই হইত না? (২)।

(১) নৈয়ায়িক-মতে দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে 'সংযোগ' সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতির মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ থাকে না—থাকে 'সমবায়' সম্বন্ধ।

(২) "The Nyāya-Vaiśeṣika, accepting the doctrine of atoms on the one hand and of the periodical creation and destruction of the world on the other, had found it necessary to introduce the conception of a creator, in order to secure in some measure a mode of bringing about the renewal and destruction of the combination of the atoms and their connection with souls. But Prabhākara and Kumārila alike deny absolutely the validity of the belief in the periodic creation and dissolution of all things; they accept a constant

অধ্যাপক কীথের শেষ বাক্যটি নিশ্চয়ই শ্লোক-বার্তিকের পরমাণুবাদের খণ্ডন-প্রকরণের উপসংহারে উক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটির ভাবানুবাদ মাত্র—“তস্মান পরমাণুদেয়ারম্ভঃ জ্ঞাৎ তদিচ্ছয়া” (সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার, ৮২)—অর্থাৎ, সেই হেতু তাঁহার (ঈশ্বরের) ইচ্ছায় পরমাণু প্রভৃতির আরম্ভকৃত (কার্য্যারম্ভকৃত) হইতে পারে না (৩)।

এখন ভট্টপাদের এই উক্তিটির একটু বিশ্লেষণ করা যাউক। 'ঈশ্বরেচ্ছায় পরমাণুর আরম্ভকৃত সম্ভব নহে'—

process of becoming and passing away; but they find no ground for the systematisation of the process, so as to produce cycles of evolution and involution of souls. Experience, Prabhākara urges, shows us the bodies of all animals being produced by purely natural means; we can argue hence to the past and the future, and need invoke no extraneous aid. Moreover, the whole conception of God supervising the merits and demerits of men is idle; God cannot perceive merit or demerit by perception, since they are not perceptible, nor by the mind, which is confined to the body it occupies. Supervision also is impossible, even had God the necessary knowledge; it must take the form either of contact, which is impossible as merit and demerit being qualities are not subject to contact, or inherence, and plainly a man's qualities cannot inhere in God. If the argument is adduced of the analogy of the carpenter, it may be replied that on this basis the creator would have to be an embodied spirit, and no embodied spirit can affect such subtle things as the atoms or merit and demerit. Nor is it conceivable that the atoms should themselves act under the will of God, for no parallel to such activity is known to us, and if it were possible, it would follow from the eternity of the will of God that creation would be unceasing."

—Keith, Karmamīmāṃsā, pp. 61—62.

(৩) জ্ঞান-বৈশেষিক আরম্ভবাদী—পরমাণু জগতের আরম্ভক উপাদান। পরমাণু-সমষ্টি হইতে স্বাণুকাদিক্রমে জগৎসংপত্তি। সাংখ্য-যোগ পরিণামবাদী—প্রকৃতি জগতের পরিণামী উপাদান। (অর্থেত) বেদান্ত বিবর্তবাদী—ব্রহ্ম জগতের বিবর্তোপাদান। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে, কুমারিল যেরূপে জ্ঞান-বৈশেষিক-মতের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে জ্ঞান-বৈশেষিকের বহু বলিবার থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কুমারিল ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন কি না, তাহাই এখানে আলোচ্য।

এই বাক্যটির তাৎপর্য বিচার করিলে কি ইহা বুঝায় না যে, কুমারিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এমন কি, তাঁহার স্রষ্টৃত্বও স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু কেবল তাঁহার ইচ্ছাকে জগৎ-কারণ বলিতে সম্মত নহেন?

পরমাণু ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ জগদারম্ভক হইতে পারে না—এই বাক্যে ঈশ্বরের নিষেধ নাই—আছে মাত্র ঈশ্বরেচ্ছার নিষেধ। মোটের উপর, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরেচ্ছার স্বাতন্ত্র্য কুমারিল-সম্মত নহে। সম্বন্ধক্ষেপ-পরিহার প্রকরণের নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটিতে উক্ত মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—

“ঈশ্বরেচ্ছা যদিষ্যেত সৈব শ্রান্নোককারণম্।

ঈশ্বরেচ্ছাবশিত্তে হি নিফলা কর্মকল্পনা ॥ ৭৩ ॥

ন চার্নানিমিত্তয়া যুক্তমুৎপত্তুং হীশ্বরেচ্ছয়া।

যদ্বা তস্মা নিমিত্তং যন্তুভূতানাং ভবিষ্যতি” ॥ ৭৪ ॥

পার্থসারণি মিশ্র ঞায়রদ্ধাকরে ভট্টপাদের উক্ত শ্লোক দুইটির আশয় যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহার একটা ভাবানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—

‘যদি ঈশ্বরেচ্ছাকে কর্মের প্রবর্তক (বা প্রতিবন্ধক) বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহাই ত স্বতন্ত্র-ভাবে সৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যদি ঈশ্বরেচ্ছা সর্বাপেক্ষা বলবর্তী ও (কর্ম প্রভৃতি) অপরা সকল পদার্থই তাহার বশবর্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরেচ্ছাকেই সৃষ্টি-কারণ বলা উচিত। কারণ, তাহা হইলে বরং লাঘব হয় ; পক্ষান্তরে, ঈশ্বরেচ্ছা-প্রবর্তিত কর্মকে জগৎ-কারণ বলিলে অনর্থক গোরব হইয়া থাকে। অতএব, কর্ম ঈশ্বরেচ্ছার বশবর্তী বলিয়া স্বীকৃত হইলে কর্মের বিধান অনর্থক হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, ঈশ্বরেচ্ছাকেও নিত্য বলা চলে না। কারণ, ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য হইলে তৎপ্রবর্তিত (বা তৎপ্রতিবন্ধ) কর্মেরও নিত্যত্ব সম্ভাবনা হয় ; ফলে সৃষ্টি (অথবা) প্রলয় নিত্য হইয়া পড়ে। অতএব, নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয়ের একটা নিয়ম স্বীকার করিতে হইলে ঈশ্বরেচ্ছাকে অনিত্যই বলিতে হয়। ঈশ্বরেচ্ছা কার্য (উৎপাদ) বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহার একটা নিমিত্তেরও উল্লেখ করিতে হয়। মাত্র ঈশ্বর স্বয়ং তদীয় ইচ্ছার

নিমিত্তভূত হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহার অস্তিত্ব সত্ত্বেও তদীয় ইচ্ছা সর্বদা দৃষ্ট হয় না। তাঁহার ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্বে তিনি ত স্বয়ং বর্তমান থাকেন। তিনি তদীয় ইচ্ছার নিমিত্ত হইলে তাঁহার সত্তাসত্ত্বেও তাঁহার ইচ্ছার উৎপত্তি হয় না কেন? পক্ষান্তরে, কর্মও এই নিমিত্ত হইতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরেচ্ছার উৎপত্তির পূর্বে কর্মের প্রবৃত্তিই থাকে না—তৎকালে কর্ম প্রতিবন্ধ অবস্থায় থাকে। আবার কর্ম ঈশ্বরেচ্ছার কারণ ও ঈশ্বরেচ্ছা কর্মের প্রবর্তক বলিলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়ে। যাহা হউক, কিছু একটা ঈশ্বরেচ্ছার নিমিত্ত বলিলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—সেই ‘কিছু একটা’ পদার্থটি নিত্য বা অনিত্য? নিত্য হইলে ঈশ্বরেচ্ছারও নিত্যত্ব ও তাহার ফলে সৃষ্টির নিত্যতা-সম্ভাবনা হইয়া থাকে। আর উহা অনিত্য বলিলে তাহারও হেতু কোন কিছু থাকা প্রয়োজন। তাহারও হেতু, তাহারও হেতু—এই ভাবে অনুসন্ধান করিতে করিতে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে ; ঈশ্বরেচ্ছারও কোন কিছু নিমিত্ত (৪) স্বীকার করিলে উহাকেই ত ভূত-সৃষ্টির হেতু বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে—অস্তরালবর্তী অতিরিক্ত ঈশ্বরেচ্ছা স্বীকারের প্রয়োজন কি (৫)? উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ঈশ্বরেচ্ছার সহিত সৃষ্টির কোন সম্পর্ক নাই। ঈশ্বরেচ্ছা যে জগৎকারণ হইতে পারে না—কুমারিল মাত্র ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছার নিষেধ করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা জগৎকারণত্বের কৃত্রিম নিষেধও করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক কীথ আরও বলিতেছেন—

(৪) অদৃষ্ট বা ঐরূপ কোন পদার্থ ; উপশুপতিনাথ শাস্ত্রী—Introduction to the Pūrva Mīmāṃsā, p. 148.

(৫) “যদা হীশ্বরেচ্ছা বশিনী, তদ্বশং সর্বং, ততঃ সৈব ভূতসৃষ্টে-নিমিত্তমস্ত, কিমন্তর্গতুনা কর্মণা...অপি চেশ্বরেচ্ছাপি কার্য্যা চেন্নান-পেক্ষিতনিমিত্তান্তরা সম্ভবতি, ঈশ্বরমাত্রস্ত প্রাগপি ভাবেন ব্যভিচারাদ-হেতুত্বাৎ, কর্মণাং চেশ্বরেচ্ছাতঃ প্রাকু প্রতিবন্ধানামহেতুত্বাৎ, তদ্ব্যতীত-চেতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ...যদি স্বস্তি কিঞ্চিদিচ্ছায়া নিমিত্তমিত্যুচ্যতে তত্তর্হি নিত্যমনিত্যং বা, নিত্যত্বে প্রাগপি সৃষ্টিপ্রসঙ্গঃ, ইতরথা তস্মাপরাপরহেতুচ্ছায়ামনবস্থা ; অস্ত বা কশ্চিদিচ্ছায়া হেতুঃ, স এব তু ভূতানাং কারণঃ ভবিষ্যতীতি কিমাস্তরালিক্যেচ্ছয়া...।” ঞায়রদ্ধাকর—৬৫৮-৬৫৯ পৃষ্ঠা।

‘আবার যদি বলা যায় যে, সৃষ্টি তাঁহার ক্রীড়ার মাত্র, তাহা হইলে তিনি যে পূর্ণানন্দস্বরূপ—সেই মতের বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি পরিপূর্ণ সুখস্বরূপ হইলে অনর্থক এই প্রভূত ক্লেশ কেন স্বীকার করিবেন? (৬)

বলা বাহুল্য, কীথ সাহেবের উক্তিটি সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহারের ৫৬ সংখ্যক শ্লোকের ছায়াগ্রহণমূলক। কুমারিল বলিয়াছেন—

“প্রয়োজনমহুদ্ভিশ্চ ন মন্দোহপি প্রবর্ততে।

এবমেব প্রবৃত্তিশ্চৈতত্ত্বেনাশ্চ কিং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥

ক্রীড়ার্থীয়াং প্রবৃত্তৌ চ বিহন্তেত কৃতার্থতা।

বহব্যাপারতায়াক্ষ ক্লেশো বহুতরো ভবেৎ” ॥ ৫৬ ॥

অর্থাৎ, জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রয়োজন কিছু নাই—ইহা বলা চলে না। কারণ, অতি জড়বুদ্ধিও বিনা প্রয়োজনে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। যদি বলা হয়, ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ নিশ্চয়োজন, তাহা হইলে তাঁহার চেতনত্ব সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, চেতন বা বুদ্ধিমান প্রাণিমাত্রেরই প্রবৃত্তি সপ্রয়োজন—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যদি বলা হয়, তাঁহার এই জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি ক্রীড়ার, তাহা হইলেও তদন্তরে বলা চলে যে, ক্রীড়া ত চিত্ত-বিনোদন-সুখের নিমিত্ত; আপ্তসুখ ঈশ্বরের পক্ষে সে ক্রীড়াও সম্ভব নহে। আর ঈশ্বরকে আপ্তসুখ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাঁহার কৃতার্থতারূপ ঐশ্বর্যের হানি হয় (৭)। তিনি যদি সকল সুখই সর্বদা প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন, তবে আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইল কিরূপে? সর্বসুখ-প্রাপ্তি (সর্বসুখের আধিপত্য), সর্বকামাপ্তি (আপ্তকামত্ব) প্রভৃতি—ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের (অর্থাৎ সর্বশক্তিমত্বের) অন্ততম লক্ষণ। তাহা ছাড়া, ক্রীড়া অল্পপরিমিত হইলেই সুখের কারণ হইতে পারে। কিন্তু এই বিচিত্র বিশাল বিশ্বরচনা অতিশয় ক্লেশকর

(৬) “If, again, it is alleged that the creation was for his amusement, this contradicts the theory that he is perfectly happy, and would involve him in much wearisome toil”—Karmamīmāṃsā, p. 63.

(৭) “ক্রীড়া তি বিনোদনসুখার্থেব নরাণাং, ন চাস্বাপ্তসুখন্ত সম্ভবতি, তদনবাপ্তৌ কৃতার্থতালক্ষণমৈশ্বর্যং ন সিদ্ধেদিতি।”—স্মারতাকর, পৃ: ৬৫৩।

—চিত্তরঞ্জক নহে; এ জন্ত উহা ক্রীড়ারক হইতেই পারে না (৮)।

এই দুইটি কারিকায় ভট্টপাদ নৈয়ায়িক-মতেরই খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি বাদরায়ণ-কৃত উত্তর-মীমাংসার “লোকবত্ত্ব লীলাকৈবল্যম্” (৯) সূত্রের খণ্ডনে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক—এই উভয় সম্প্রদায় একই মতের প্রতিপাদনে যত্নবান্। সৃষ্টি ঈশ্বরের ক্রীড়া বা লীলা মাত্র—ইহা উভয় পক্ষেরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভট্টপাদ নৈয়ায়িকগণের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছেন, অথচ বৈদান্তিকগণের উপর কোনরূপ দোষ প্রদান করেন নাই। এই ব্যাপারটির মূলে একটু বিশেষ রহস্য আছে। নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এক হইলেও উভয়ের সিদ্ধান্ত স্থাপনের প্রক্রিয়া এক নহে। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্রষ্টৃত্ব কেবল যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, বৈদান্তিকগণের ঈশ্বর-স্বাক্ষরীয় সকল জ্ঞানই শ্রুতি হইতে গৃহীত। নিজ যুক্তি বা কল্পনা-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হন নাই। সমগ্র বেদাহুদর্শন (অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা-সূত্রাবলী) শ্রুতিকে ভিত্তি করিয়াই রচিত। উত্তরমীমাংসার দ্বিতীয় সূত্রের (১০) ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর-ভগবৎপাদ বলিয়াছেন—

“ব্রহ্মসূত্র-সমূহ বেদান্ত-(উপনিষদ্)-বাক্যরূপ কুম্ভম গাণ্ডিবীর জন্তই রচিত’। (১১) বস্তুতঃ বেদান্তসূত্রগুলি উপনিষদ্-বাক্যাবলীর ব্যাখ্যানার্থই রচিত হইয়াছিল—স্বতন্ত্র

(৮) “ক্রীড়া চান্দ্রীয়সী রময়তি, সমস্তভূধরাদিবিষয়ন্ত মহা-ব্যাপারোহতিক্লেশরূপঃ ক্রীড়ার্থ ইতি ন চিত্তমহুরঞ্জয়তি”—স্মারতাকর পৃ: ৬৫৩।

(৯) ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩; যেমন লৌকিক দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কোন যথেষ্ট ভোগাধিকারী পুরুষ বিনা প্রয়োজনে কেবল ক্রীড়ার জগ্গই বিহারাদিতে প্রবৃত্ত হন, অথবা যেমন বাহু কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদির স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কোন প্রয়োজন না থাকিলেও স্বভাববশেই ঈশ্বরের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে—উহা তাঁহার লীলা মাত্র।

(১০) “জন্মান্তস্ত যতঃ” (ত্র: সূ: ১।১।২)।

(১১) “এতদেবাহুমানং সংসারিব্যতিরিক্তেশ্বরাস্তিত্বাদিসাধনং মন্তস্ত ঈশ্বরকারণিনঃ। নদ্বিহাপি তদেবোপজন্তং জন্মাদিসূত্রে, ন; বেদান্ত-বাক্যকুম্ভমগ্রন্থার্থত্বাৎ সূত্রাগাম্। বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্যন্তে। বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননিবৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতির্নান্মানাদিপ্রমাণান্তরনিবৃত্তা।”—শঙ্করভাষ্য, ত্র: সূ: ১।১।২।

বুদ্ধিতর্কের অবতারণা উহাদিগের মধ্যে একেবারেই নাই। এই তথ্যগুলি স্বরণে রাখিলে মীমাংসকগণের এতদ্বিষয়ক অভিপ্রায়টি সুপরিষ্কৃত হইবে। যদি কোন বাদী স্বতন্ত্র বুদ্ধি বা স্বকীয় কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে মীমাংসকগণ কখনই তাঁহাকে অব্যাহতি দিবেন না—বিরুদ্ধ বলবস্তুর বুদ্ধি-সহায়ে তাঁহার আনুমানিক সিদ্ধান্ত খণ্ডনে নিশ্চিত অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যদি অপর কোন বাদী অপৌরুষেয় অকৃত শ্রুতিবাক্যমাত্রের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্রষ্টৃত্ব নিশ্চয়ে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে মীমাংসকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে কনিষ্ঠাঙ্গুলিও উত্তোলন করিবেন না। মানব-কল্পনামাত্রের উপর ভিত্তি করিয়া যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, সে ঈশ্বর মীমাংসা-সম্প্রদায়ে অস্বীকার্য্য; কিন্তু যে ঈশ্বর অপৌরুষেয় শ্রুতিমাত্রগম্য, সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসকগণ অস্বীকার করেন না। ইহাকে কি ‘নিরীশ্বরবাদ’ বলা চলে? সূধীগণই নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন।

শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর পূর্ণানন্দস্বরূপ। যদি তিনি স্বরূপে পূর্ণানন্দ হন, তাহা হইলে তিনি ক্রীড়ার্থ সৃষ্টি করিবেন—এ কিরূপ কথা? ক্রীড়া করা হয় সুখ পাইবার আশায়। যিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ—তাঁহার ত আর আকাঙ্ক্ষণীয় সুখ কিছুই থাকিতে পারে না। তবে তিনি ক্রীড়ার্থ (অর্থাৎ নিজের চিন্তাবিনোদনার্থ) সৃষ্টি করিবেন কিরূপে? যাহার স্বরূপই পূর্ণ আনন্দ—যিনি আপ্তকাম—আত্মকাম—অকাম, তাঁহার আবার চিন্তাবিনোদন! এ যে অতি অসম্ভব কথা! “লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্” সূত্রে বাদরায়ণ ঈশ্বরের ‘লীলা’র কথাই বলিয়াছেন—‘ক্রীড়া’র কথা তথায় নাই। ‘ক্রীড়া’ ও ‘লীলা’র মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা সচরাচর সাধারণের বুদ্ধিগোচর হয় না। এই ভেদটুকু সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র অল্পদীক্ষিত আমাদিগের চকুর সমক্ষে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন—‘লীলা’ শব্দকে ক্রীড়াবাচক ধরিলে দোষ হয়; কিন্তু ক্রিয়া-সামান্যবাচী অথবা অনায়াসসাধ্য ক্রিয়ার বাচক ধরিলে কোন দোষ হয় না। (১২)

(১২) “লীলাশব্দস্য ক্রিয়ামাত্রং বিলাসরূপক্রিয়া চেতর্থদ্বয়ং সম্ভবতি .. তত্র ক্রিয়ামাত্রার্থভ্রমাদায় যাদৃচ্ছিকানুসীচনানিক্রিয়ায়াং স্বাভাবিক-খাসনিমেবাদিক্রিয়ায়াঞ্চ প্রয়োজনরহিতায়াং বাভিচার উক্তঃ।...”

অর্থাৎ ‘ক্রীড়া’ বলিলেই বুঝায় উহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সুখকামনার ইচ্ছিত বর্ত্তমান—তা তাহা যতই সূক্ষ্মাকারে হউক না কেন। আর ‘লীলা’ বলিলে এইরূপ অতি-সূক্ষ্ম সুখের আভাসও পাওয়া যায় না। লৌকিক ব্যবহারে ‘লীলা’ শব্দে যদি বা কিছু সূক্ষ্ম প্রয়োজন উৎপ্রেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, ঈশ্বর-লীলার তাহারও অভাব; কারণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, তিনি আপ্তকাম। (১৩) এই কারণে, ঈশ্বর পূর্ণানন্দ-স্বরূপ হইয়াও কেবল লীলারূপ সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় না। পক্ষান্তরে, আপ্তকাম পূর্ণানন্দ পরমেশ্বর স্বচিন্তাবিনোদনরূপ ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়া থাকেন বলিলে তাঁহার আনন্দস্বরূপত্ব ও আপ্তকামত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির সহিত বিরোধ উৎপন্ন হয়। অতএব, বেদান্ত-পক্ষ শ্রুতির অমুকুল ও নৈয়ায়িক-পক্ষ শ্রুতির প্রতিকূল। আর এই কারণেই মীমাংসক-সম্প্রদায় প্রথমোক্তকে পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত পক্ষকেই আক্রমণ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উঠিতে পারে। মীমাংসক-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন যে, জীবকৃত কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। এই সৃষ্টির কর্ত্ত্বরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে, সৃষ্টি তাঁহার সুখভোগের নিমিত্ত কল্পিত হয় নাই। বস্তুতঃ, মীমাংসকগণ তাহাই স্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ সোজা কথায়—ঈশ্বর জীবকৃত কর্ম্মের অনুসারে কর্ম্মফল-বিভাগরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—ইহাই মীমাংসক-মত। আর তাহা হইলে ক্রীড়ার্থ সৃষ্টি বা কেবল লীলারূপ সৃষ্টি ইত্যাদি পক্ষ উঠিতে পারে না। ইহার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে যে, মীমাংসকগণের আক্ষেপ কেবল নৈয়ায়িকগণের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে—বেদান্তিগণের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, নৈয়ায়িকমতে ঈশ্বরকর্ত্তক সৃষ্টি ক্রীড়ার্থ অর্থাৎ স্বচিন্তাবিনোদনার্থ

“লীলাশব্দস্য ক্রীড়াবাচিতায়ামিদং দূষণম্, ন ক্রিয়ামাত্রবাচিতায়া-মনায়াসসাধ্যক্রিয়ালক্ষকত্যায়াং বা”—কল্পতরুপরিমল ২।১।৩৩।

(১৩) “যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম প্রয়োজনমুৎ-প্রেক্ষেত, তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেথিতুং শক্যতে; আপ্তকামশ্রুতেঃ।”—ত্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২।১।৩৩।

—উহাতে স্বার্থগন্ধ বিদ্যমান। আর মীমাংসক-মতে ঈশ্বর উদাসীন—জীবাত্মস্থিত স্কৃত-দৃকৃত অমুসারে স্ফুটাস্ফুট বিচারপূর্বক তিনি যথাযোগ্য ফল প্রদান করেন—এ ব্যাপারে তাঁহার স্বার্থ-সম্পর্ক কিছুই নাই। বেদান্তিগণ কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি লীলারূপ মনে করিয়া থাকেন। বেদান্তি-কথিত এই ‘লীলা’ নৈয়ায়িক-সম্মত ‘ক্রীড়া’ হইতে বিভিন্ন; উহা সাধারণ ক্রিয়াবাচক পদ, কখন কখন অনায়াস-সাধ্য ক্রিয়াও বুঝাইয়া থাকে—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১৪)। শুধু তাহাই নহে। মীমাংসকগণের প্রদত্ত দোষ বেদান্তিগণের উপর কেন আরোপিত হইতে পারে না—তাহার আরও গূঢ়তর কারণ আছে। আচার্য্য শঙ্কর, বাচস্পতি মিশ্র ও কল্পতরুরকার তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈত-বেদান্ত-মতে—পরমেশ্বর অদ্বিতীয় নিগুণ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যমাত্রস্বরূপ—পারমার্থিক দৃষ্টিতে প্রপঞ্চের সহিত কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ তাঁহার নাই। তবে তিনি যখন মায়াপাধি-বিশিষ্ট হইয়া সগুণ ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন, তখনই তিনি জগৎকারণ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়া থাকেন। অতএব, অদ্বৈত-বেদান্তীর দৃষ্টিতে এই সৃষ্টি পারমার্থিক নহে, ব্যবহারিক মাত্র। ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব, জীবের জীবত্ব, জীব-কৃত স্কৃত-দৃকৃত ও তাহাদিগের শুভাশুভ ফল প্রভৃতিও ব্যবহারিক। ব্যবহারিক পদার্থ মাত্রই মিথ্যা—উহাদিগের সাময়িক অস্তিত্ব আছে মাত্র, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। যদি মীমাংসক-মতও স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর জীবগণের কর্ম্মামুসারে ফলদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের

“ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরত্যন্তে ভোগার্থমিতি চাপরে। দেবশ্ৰেষ্ঠ স্বভাবোহয়মাগুণকামশ্চ কা স্পৃহা”। (গোঃ কাঃ ১।৯) ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি তাৎকালিকানন্দপ্রয়োজনলীলাত্বেমব ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরত্যন্ত ইত্যনেনানভিমতং প্রদর্শিতম্, ন তু হাসমানাদিতুল্য-প্রয়োজনোদ্দেশরহিতলীলাত্বম্। “স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথাত্তে পরিমুহমানাঃ। দেবশ্ৰেষ্ঠ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্”। (শ্বেঃ উঃ ৬।১) ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি সৃষ্টেঃ স্ফুটবস্ত-স্বভাবতৈবানভিমতত্বেন প্রদর্শিতা ন তু সৃষ্ট-স্বভাবতা। অতো লীলাস্বভাবপক্ষয়োন ‘শ্রুতিবিরোধঃ।—কল্পতরুপরিমল, ৩।১।৩৩। (দ্রষ্টব্য—অপ্নয়দীক্ষিত গৌড়পাদকারিকার এই কারিকাটিকে ‘মাণ্ডুক্যোপনিষদ্’ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে উপলভ্যমান সংস্করণে “ভোগার্থং সৃষ্টিরত্যন্তে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে” ইত্যাদিরূপ পাঠ পাওয়া যায়।)

সহিত বস্তুতঃ কোন বিরোধ হইতে পারে না। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ বলিবেন—ঈশ্বর যে জীবের কর্ম্মামুসারে ফল-প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার লীলা। কর্ম্মামুসারে ফলপ্রদানও একরূপ ক্রিয়া; অতএব উহা লীলার গণ্য হইতেই পড়ে। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, ‘লীলা’-শব্দটি সাধারণ অথবা অনায়াসসাধ্য ক্রিয়ার বাচক। আচার্য্য শঙ্কর ত লোকব্যবহারকালে ‘ভট্টনয়’ (অর্থাৎ কুমারিল-ভট্ট-প্রতিপাদিত ব্যবস্থা) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অথচ অদ্বৈতমতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঈশ্বরের লীলাও নাই—এ লীলা সম্পূর্ণ লৌকিক। কারণ, পারমার্থিক দশাতে এক নিগুণ ব্রহ্মই বর্তমান—তদবস্থায় ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, ঈশ্বরের সৃষ্টি বা ফলদাতৃত্ব কিছুই নাই (১৫)।

পক্ষান্তরে, যদি একবার নৈয়ায়িক-মত স্বীকার করা যায় যে সৃষ্টি সত্য, তাহা হইলে ঈশ্বরের ক্রীড়াও সত্য হইয়া দাঁড়ায়; যেহেতু, তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর ক্রীড়ার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মীমাংসক-মত এই মতের ঘোর বিরোধী। কারণ, মীমাংসকমতে সৃষ্টি সত্য হইলেও উহা ঈশ্বরের ক্রীড়ার্থ নহে। ঈশ্বরের সৃষ্টি বা বলিতে তাঁহার বুদ্ধি, জীব-কৃত কর্ম্মামুসারে ফলদাতৃত্ব। নৈয়ায়িক-মতে ঈশ্বর প্রয়োজনবশে পারমার্থিকী সৃষ্টি

(১৫) “ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিভাকল্পিতনামরূপ-ব্যবহারগোচরত্বাৎ, ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্ছেত্যেতদপি ন বিশ্বর্ভব্যম্”—ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ২।১।৩৩।

“তস্মাদুপপন্নং যদৃচ্ছয়া বা স্বভাবাঙ্ঘা লীলয়া বা জগৎসর্জনং ভগবতো মহেশ্বরশ্চ। অপি চ নেয়ং পারমার্থিকী সৃষ্টির্বেনামুযুজ্যেত প্রয়োজনম্, অপি ত্বনাথবিভানিবন্ধনা। অবিভা চ স্বভাবত এব কার্য্যোগুথী প্রয়োজনমপেক্ষতে। ন হি ত্বেচছালাতচক্রগন্ধর্ষনগরাদি-বিভ্রমাঃ সমুদ্ভিষ্টপ্রয়োজনা ভবন্তি। ন চ তৎকার্য্যা বিশ্বয়ভয়কম্পাদয়ঃ-স্বোৎপত্তৌ প্রয়োজনমপেক্ষন্তে। সা চ চৈতন্যচুরিতা জগৎপাদহেতু-রিতি চেতনো জগত্যানিরাখ্যায়তে...অপি চ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্তথা বিবক্ষন্ত্যাগমাঃ, অপি তু জগতি ব্রহ্মাত্মভাবম্। তথা চ সৃষ্টেরাবিবক্ষয়া তদাশ্রয়ো দোষো নির্বিষয়ঃ।”—ভামতী ২।১।৩৩।

“(ব্রহ্ম) ভবতি তু জীবাবিভাবিষয়ীকৃতজগদ্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানম্, তথা চ ন প্রয়োজনপর্য্যায়যোগঃ সৃষ্টৌ...জীবভ্রাস্ত্যা পরং ব্রহ্ম জগদ্বীজমজ্জুৎসং। বাচস্পতিঃ পরেশশ্চ লীলাসুত্রমল্লুপং”।—কল্পতরু ২।১।৩৩। এই সকল মতেই দেখা যাইতেছে—ঈশ্বরের লীলারূপ সৃষ্টিতে তাঁহার কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ স্বীকৃত হয় নাই। কারণ, ইহারা সকলেই সৃষ্টিকে মিথ্যা বলিয়াছেন।

করিয়া থাকেন। এই প্রয়োজন তাঁহার নিজ চিত্ত-
বিনোদন। ইহাই তাঁহার ক্রীড়া। মীমাংসক-মতেও
অবশ্য সৃষ্টি তথ্যরূপ। তবে এ মতে ঈশ্বর নিজ
প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন না। অপকৃপাতী
বিচারক যেমন কেবল আইন অনুযায়ী শাসনসঙ্গত
বিচার করিতে বাধ্য, ঈশ্বরও সেইরূপ পূর্ণ উদাসীন
থাকিয়া কেবল জীবগণের কৃতকর্ম্মানুসারে ফল প্রদান
করিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। উভয়
পক্ষের এই পরস্পর-বিরোধী মতের কোন সামঞ্জস্য
হয় না। তাই অদ্বৈত-বেদান্তিগণ বলিয়াছেন যে,
সৃষ্টি মিথ্যা। সৃষ্টি মিথ্যা হইলেই ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব
অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতৃত্বও মিথ্যা; আর এই সৃষ্টিক্রিয়ারূপ
লীলাও নিস্প্রয়োজন। কারণ, পরমার্থ-দৃষ্টিতে ইহা মিথ্যা।

এইরূপে অদ্বৈতচার্যগণ মীমাংসক ও নৈসর্গিকগণের
পরস্পর-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দুইটি অংশতঃ গ্রহণ ও অংশতঃ
বর্জন করিয়া উভয়ের মধ্যে এক অপকৃপ সামঞ্জস্য
বিধান করিয়াছেন। তাই মীমাংসক-সিদ্ধান্ত মহর্ষি
বাদরায়ণের “লীলাটকবল্য” সূত্রের বিরোধী নহে। (১৬)
এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনার
ইচ্ছা রহিল।

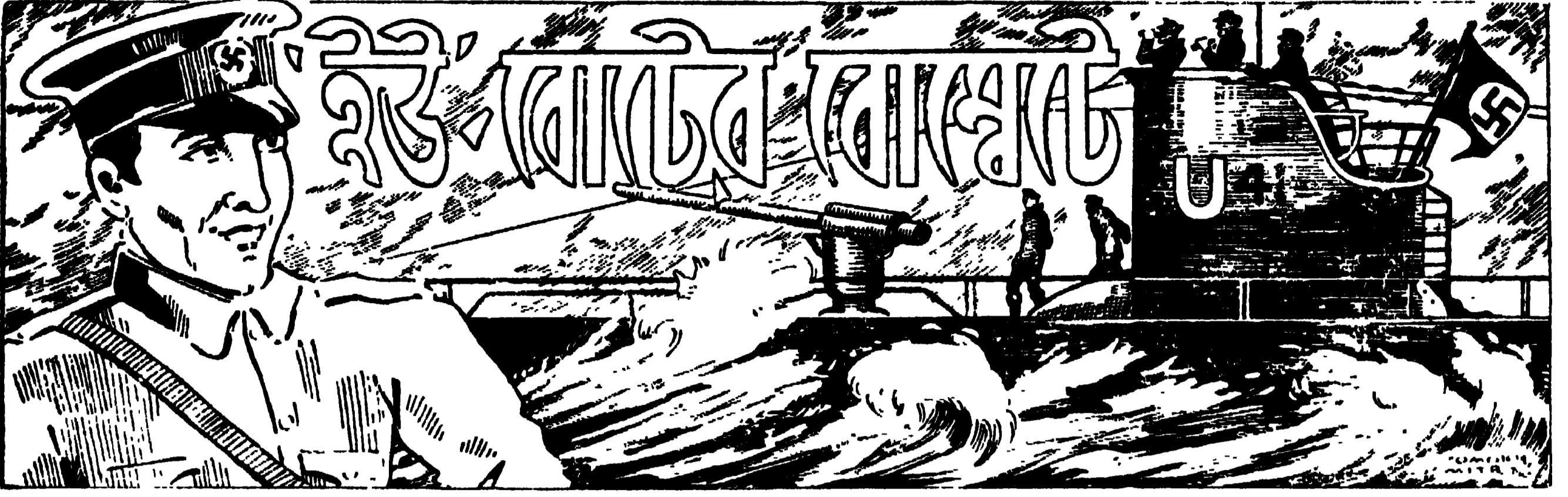
শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(১৬) এই বিরোধ-পরিহার অবশ্য একমাত্র অদ্বৈত দৃষ্টি-
ভঙ্গীতেই করা যায়। অগ্ন্যন্ত বেদান্ত-সম্প্রদায়—যাঁহারা সৃষ্টিকে
মিথ্যা মনে করেন না, অথচ উহাকে ঈশ্বরের লীলা বলেন, তাঁহারা
—মীমাংসকগণের আক্রমণের লক্ষ্য হইতে বাধ্য।

ফাল্গুন-বেদনা

হে মহেশ ! ঋণিকের রোষাগ্নিতে
একটি জীবন্ত দেহ ভস্ম ক'রে দিয়েছিলে
সে কোন্ অতীতে,
হয় তো ভুলেছ তুমি, জগৎ পারেনি তাহা
আজিও ভুলিতে।
দক্ষিণের দ্বারপথে আজিও সে ভস্মরাশি
রয়েছে অশেষ,
যুগে-যুগে বায়ু-ভরে ভরিয়া ধরণী
হয়নি নিঃশেষ।
এক আজি হইয়াছে শত, লক্ষ, কোটি,
অগুতে-রেণুতে,
ফুলে-ফুলে পাতায় লতায় বিহঙ্গের
কল-কাকলীতে !
আজিও রতির ব্যথা মূর্ত হ'য়ে ভেসে আসে
বসন্ত-প্রভাতে,
ঘনায় মিলনে আজো বিরহের হাহাকার
চকিত-সজ্বাতে !
জগতের প্রাণে-প্রাণে জেগে ওঠে
কোন্ ব্যাকুলতা,
কীর্ণ পাতা ঝ'রে যায় গাহি কোন্
নিদারুণ গাথা।

চিত্তজয়ী হে তপশ্চালীন !
সাধনার বিলকায়ী ছরস্তু বালকে,
ভস্ম ক'রে দিয়েছিলে আঁখির পলকে
মমতা-বিহীন !
জগতের শাস্ত্র জীব তোমার সে তপশ্চার
করে নাই ক্ষতি,
মদনের ভস্মছায়ে তাদেরও যাতনা
কেন পশুপতি ?
বর্ষ-শেষে ফুলে-ফুলে নির্ঝর-সঙ্গীতে
বর্ষ করে শ্রদ্ধাজলি দিতে চায় ধরা
হর্ষ-ভরা চিতে।
তার মাঝে জেগে ওঠে অতি অকরণ ব্যথা-ভরা
সে তোমার দান—
যুগ-যুগ বর্ষ ভরি আজিও হোল না
এর সমাধান !
কত যুগ পরে বেলো, বসন্তের এ উৎসব
রহিবে অটুট—
মিলনে মিলন রবে অচ্ছেদ্য বন্ধন,
বিরহের তীক্ষ্ণ তীর পশিবে না সেখা
খেমে যাবে রতির ক্রন্দন ?
শ্রীমতী নিভা দেবী



ত্রয়োবিংশ পর্ব

ব্রিটিশ রণতরীর আবির্ভাব !

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

ব্রিটিশ উপকূল-রক্ষীগণের দলপতি ষ্ট্যান্ডিস্ আমস্ ফ্রোবিকে হতাশ ভাবে জড়ের স্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তাহার পর মেরীর মুখের দিকে ফিরিয়া-চাহিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ রাত্রিতে তোমরা কি কোন জার্মান ‘ইউ’-বোটের প্রতীক্ষা করিতেছ ?”

মেরী দৃঢ় স্বরে বলিল, “না।”

মেরীকে আমি পূর্বে কোনও দিন মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই; কিন্তু আজ তাহার মুখে মিথ্যা কথা শুনিয়া আর্দৌ বিন্মিত হইলাম না। আমি ভাবিলাম, মিথ্যা কথা বলিলেই কি তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে? উপকূল-রক্ষীরা এ কথা শুনিয়া কি অবিলম্বেই এই দ্বীপ ত্যাগ করিয়া তাহাদের ঘাঁটিতে প্রস্থান করিবে? কাপ্তেন ভনু রথভেন ও লেফটেন্যান্ট হ্যাগেন নিরাপদ হইতে পারিবে? তাহা ছরাশা বলিয়াই আমার মনে হইল।

মেরীর কথা শুনিয়া ষ্ট্যান্ডিস্ বলিল, “আজ কোন ‘ইউ’-বোট খোরাক সংগ্রহ করিতে এই দ্বীপে আসিবে না? বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! তা যাহাই হউক, যদি কোন ‘ইউ’-বোট আসে, তাহাকে সাক্ষেতিক আলোক দেখাইবার জন্ত তোমাদের লর্গনটা আমরাই সমুদ্র কূলে লইয়া যাইব।”

তাহার কথা শুনিয়া মেরী উত্তেজিত স্বরে বলিল, “কোন ‘ইউ’-বোট আজ রাত্রিতে যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়াই পড়ে, তাহা হইলে তোমরা এই চারি জন রক্ষী ‘ইউ’-বোটের সশস্ত্র নাজী সৈনিকবর্গের সহিত যুদ্ধ

করিতে পারিবে? তাহারা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, এবং সংখ্যার তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক—ইহা কি তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ?”

ষ্ট্যান্ডিস্ এ কথা শুনিয়া কোতূহলভরে মেরীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর নিরীকার ভাবে বলিল, “তোমার কথা সত্য, মেরী! কিন্তু আমরা যখন আসিয়া পড়িয়াছি, তখন বিপদের আশঙ্কায় পলায়ন করিব না; আমরা আত্মরক্ষার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তাহার কি ফল হয়—যথাসময়ে জানিতে পারিবে।”

মেরী তাড়াতাড়ি তাহার কোটটি তুলিয়া-লইয়া বলিল, “বেশ, তবে তাহাই হউক; লর্গনটা আমিই লইয়া যাইতেছি, আমার সঙ্গে সমুদ্র-কূলে চল।”

অতঃপর ষ্ট্যান্ডিস্ তাহার সঙ্গীতের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, “ডেক্, তুমি ও ফঠার—তোমরা উভয়েই এখানে আমাদের বন্ধু আমসের পাহারায় থাক; এলিস্, তুমি আমার সঙ্গে চল।”

এই আদেশে এলিস্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর মেরী পাকশালার দ্বারের আড়াল হইতে সাক্ষেতিক আলোকের লর্গনটা তুলিয়া-লইয়া ষ্ট্যান্ডিস্ ও এলিসের সঙ্গে সমুদ্র-বেলার অভিমুখে ধাবিত হইল।

মেরী একা উপকূল-রক্ষীঘরের সঙ্গে যাইতেছে দেখিয়া তাহার সঙ্গে থাকিবার জন্ত আমার আগ্রহ এরূপ প্রবল হইল যে, আমি গরম কোটটা পরিয়া-লইবার জন্ত আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিতে পারিলাম না; একটা মোটা গেঞ্জী মাত্র গায়ে ছিল, সেই অবস্থাতেই মেরীর সঙ্গে চলিলাম। মেরীর দুই পাশে দুই উপকূল-রক্ষী; উভয়ের মধ্যে মেরীকে লর্গনটা হাতে লইয়া, উন্নত মস্তকে এবং অকম্পিত পদবিক্ষেপে চলিতে দেখিয়া কেহই

মুহূর্তের জন্ত মনে করিতে পারিত না—মেরী তাহার জীবনের এই সঙ্কটময় পরীক্ষায় শেষবার জাশ্মাণ ‘ইউ’-বোটকে সাঙ্কেতিক আলো দেখাইতে সমুদ্র-কূলে যাইতেছে! তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, বা বাহ্যিক ব্যবহার দেখিয়া তাহার মানসিক চাঞ্চল্য বুঝিবার উপায় না থাকিলেও আমি জানিতাম, আমার শ্রায় তাহারও বক্ষঃস্থল ছুশ্চিন্তায় ও ভয়ে ছুরু-ছুরু করিতেছিল। বিপদের মেঘ মাথার উপর ঘনীভূত হইয়া বজ্রনির্ঘোষ আরম্ভ করিলেও মেরী মুহূর্তের জন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় নাই।

আমি চলিতে চলিতে মেরীর পাশে গিয়া তাহার হাতে হাত দিলাম; সে আমার হাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। ষ্ট্যান্ডিস্ একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু সে আমার গমনে বাধা দিল না, বা আমাকে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলিল না। তাহার সঙ্গী এলিস্ও আমাকে নিষেধসূচক কোন কথা বলিল না। তাহারা উভয়েই নিস্তক্ৰ ভাবে চলিতেছিল। আমরা যতক্ষণ সমুদ্রকূলে উপস্থিত না হইলাম, ততক্ষণ তাহাদের মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। সকলেই নির্ঝাক্।

সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া ষ্ট্যান্ডিস্ মেরীকে বলিল, “ঐধারে চল, মেরী!”

মেরী তাহার আদেশে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে আমিও তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু মেরী পাহাড়ের দিকে চাহিয়াই ভয়ে বিষ্ময়ে অক্ষুট আর্তনাদ করিল! তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চাহিবামাত্র আতঙ্কে আমারও বুক কাঁপিয়া উঠিল; কারণ, পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আমরা উভয়েই গিরিশৃঙ্গের ছায়ায় বালুকা-রাশির উপর দুই সারিতে বিভক্ত, এবং শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান কালো ছায়ার মতন কতকগুলি মনুষ্য-মূর্তি দেখিতে পাইলাম। তাহারা পুত্তলিকার শ্রায় নিস্তক্ৰ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে কিছু কাল চাহিয়া-থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম—তাহারা বৃটিশ নৌ-সৈন্য! তাহাদের হাতের রাইফেলগুলির কুঁদা তাহাদের সম্মুখস্থ বালুকারাশির উপর সংস্থাপিত, এবং প্রত্যেক রাইফেলের মাথা স্পর্শাণিত সঙ্গীনে কণ্টকিত।

সেই সকল সৈনিক এরূপ অচঞ্চল ও গভীর, অন্ধকারে তাহাদের সাদা মুখগুলি এরূপ রহস্ত-সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল যে, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাদের ভয় দারুণ বিষ্ময়ে পরিণত হইল! আমি উদ্বেগ-বিচলিত চিত্তে মেরীর হাতের উপর হাতের একটু চাপ দিলাম।

মেরী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মুহূর্তে বলিল, “এখন সকলই বুঝিতে পারা গিয়াছে, পিটার!” মেরীর কণ্ঠস্বর ভয়কম্পিত।

ষ্ট্যান্ডিস্ সেই সময় মেরীকে বলিল, “লর্ডনটা আমার হাতে দাও, মেরী!”

কিন্তু মেরী তাহার আদেশে কণ্ঠপাত করিল না; তখন ষ্ট্যান্ডিস্ লর্ডনটা মেরীর হাত হইতে সবলে ছিনাইয়া লইল।

মুহূর্ত পরেই এক জন পদস্থ নৌ-কর্মচারী ষ্ট্যান্ডিসের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “আজ রাত্রিতে কোন ‘ইউ’-বোটের এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে কি?”—সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু, কিন্তু অত্যন্ত গভীর।

ষ্ট্যান্ডিস্ তাঁহাকে বলিল, “এই যুবতী বলিতেছিল—আজ কোন ‘ইউ’-বোটের আগমন-সম্ভাবনা নাই।”

নৌ-কর্মচারী পুনর্বার মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার এ কথা কি সত্য?”

মেরী দৃঢ়স্বরে বলিল, “আমার কথা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। কোন ‘ইউ’-বোটের এখানে আসিবার কথা নাই, এবং কোন ‘ইউ’-বোটের প্রতীক্ষাতেও আমরা এখানে আসি নাই। আপনাদের উপকূল-রক্ষীরা আমাকে কেন এখানে লইয়া আসিয়াছে, আপনার তাহা জানা থাকিতে পারে।”

ষ্ট্যান্ডিস্ মেরীর কথার প্রতিবাদে বলিল, “মেরী নিজের ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছে। আমি লর্ডনটা উহার নিকট চাহিয়াছিলাম।”

নৌ-কর্মচারী এবার ষ্ট্যান্ডিস্কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “হয় ত এই বালিকার কথা সত্য; কিন্তু তথাপি আমরা এখানে অপেক্ষা করিব। আমাদের এই পরিশ্রম সফল হইতেও পারে।”

বৃটিশ নৌ-কর্মচারীর এই মন্তব্য শুনিয়া আমি অত্যন্ত

বিচলিত হইলাম, এবং তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তথাপি আমার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। আমাদের অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক হইয়াছিল, তাহা আমার বুদ্ধিতে বিলম্ব হইল না। আমরা ত জানিতাম, এই রাত্রিতে আমরা যে 'ইউ'-বোটখানির প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা আসিবেই। আমি ও মেরী একান্ত আগ্রহে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম—সেই 'ইউ'-বোট যেন আজ রাত্রিকালে আমাদের দ্বীপের নিকট উপস্থিত না হয়।

কিন্তু আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাপ্তেন ভন রথভেন এবং লেফটেনাণ্ট হ্যাগেন আজ রাত্রিকালে এই দ্বীপে আসিবে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না; এবং তাহারা আসিলেই ঐ সকল বৃটিশ নৌ-সৈন্যের হস্তে বন্দী হইবে—এ বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আমার মনে হইল, ইতিমধ্যেই তাহাদের 'ইউ'-বোট এই দ্বীপের অদূরবর্তী কোন স্থানে সমুদ্রগর্ভ হইতে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া নিঃশব্দে এই দ্বীপের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ঐ বৃটিশ নৌ-সৈন্যগণ আর কিছু কাল এখানে অবস্থিতি করিলেই অদূরে ভাসমান 'ইউ'-বোটের সাক্ষেতিক আলোক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে; এবং সমুদ্র-কূল হইতে আমাদের লণ্ঠনের সাক্ষেতিক আলোক দেখিতে পাইলেই কাপ্তেন ভন রথভেন ও লেফটেনাণ্ট হ্যাগেন ডিক্রীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমুদ্রবেলায় আসিয়া পড়িবে। সাক্ষেতিক আলোকের লণ্ঠনটি উপকূলরক্ষী হস্তগত করিয়াছে। এ অবস্থায় কাপ্তেন ভন রথভেনের ও লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনের আগমনে বাধা-দানের কোনও উপায় আমরা দেখিতে পাইলাম না। আতঙ্কে, হুশ্চিন্তায় আমরা অধীর হইয়া পড়িলাম।

আমরা সত্যই কাপ্তেন ভন রথভেন ও লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনের কল্যাণ কামনা করিতেছিলাম। আমরা ইংরেজ, ইংরেজের শত্রু জার্মানদের কল্যাণ কামনা করা আমাদের পক্ষে স্বজাতিদ্রোহের নিদর্শন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু আপনাদের স্বরণ থাকিতে পারে—আমরা জ্ঞান হইবার পর হইতেই ক্রোবির এই নির্জন দ্বীপে বাস

করিতেছি। ইংলণ্ড সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের ছিল না। কি কারণে জার্মানদের সহিত আমাদের স্বজাতি ইংরেজের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কোনও দিন জানিতে পারি নাই; ইংরেজদের প্রতি জার্মান জাতির হৃদাস্ত নেতা হিটলারের আক্রোশের কারণ কি, তাহাও আমরা এ পর্যন্ত কাহারও নিকট জানিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, কাপ্তেন রথভেন এবং লেফটেনাণ্ট হ্যাগেন সর্বদাই আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে; তাহারা যে আমাদের দেশের শত্রু, ইংরেজ জাতির তাহারা ঘোর অনিষ্টকারী, আমাদের প্রতি ব্যবহাবে তাহা তাহারা কোন দিন আমাদের বুদ্ধিতে দেয় নাই; এইজন্য আমরা সর্বদাই তাহাদের নিকট উপকারের প্রত্যাশা করিতেছিলাম। মেরী লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনকে পতিত বরণ করিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয়, সকলে বুদ্ধিতে পারিয়াছেন। এ অবস্থায় তাহাদের বিপদ আমরা নিজের বিপদ মনে করিব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

আমি এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মেরীকে মৃদুস্বরে বলিলাম, “মেরী, এই সকল নৌ-সৈন্য কোথা হইতে আসিয়াছে, বলিতে পার ?”

মেরী আমার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া বলিল, “আমি তাহা জানি না, পিটার! তুমি চুপ করিয়া থাক; কথা কহিয়া কোন লাভ নাই।”

ষ্ট্যান্ডিস্ আমাদের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে মেরীকে বলিল, “মেরী, তুমি বাড়ী যাও, এখানে তোমার থাকি নিশ্চয়োজন।”

মেরী দৃঢ়স্বরে বলিল, “না, আমি এখানেই থাকিব।”

ষ্ট্যান্ডিস্ বলিল, “কিন্তু তাহার কি প্রয়োজন? তুমি—”

মেরী তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, “আমি বলিয়াছি, আমি এখানে থাকিব। আমাকে তাড়াইবার কোন অধিকারই তোমার নাই। যদি আমাকে অপরাধী মনে করিয়া থাক, আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পার। কিন্তু তোমার আদেশ পালন করিবার ইচ্ছা আমার নাই।”

এ কথার পর ষ্ট্যান্ডিস্ মেরীকে আর কোন কথা বলিল

না। আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া নিদারুণ নৈশ শীতে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, এবং রাইফেল ও সঙ্গীনধারী সেই সকল শ্রেণীবদ্ধ ও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান নৌ-সৈনিকদিগের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। তাহাদিগের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, এই সকল বৃটিশ সৈন্ত স্বদেশের গৌরব এবং স্বজাতির সম্মরক্ষার জন্ত জার্মানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে? আমি পূর্বে কোন দিন এই সকল সৈন্তের এক জনকেও দেখি নাই; এই যুদ্ধের কি ফল হইবে, তাহা কোন দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সকল বৃটিশ সৈন্ত দেখিয়া, স্বদেশের জন্ত তাহারা কি ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। স্বদেশ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা না থাকিলেও আমি হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনা অনুভব করিলাম, এবং এ সকল কিছুই আমি জানি না ভাবিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের জন্ত আমার মন ক্ষোভে-হুঃখে পূর্ণ হইল। তাই অন্ধ যেমন হঠাৎ চক্ষু পাইলে পরম আগ্রহে, ব্যাকুল হৃদয়ে সমগ্র প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ আগ্রহভরে পুনঃ পুনঃ সেই সকল সৈন্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, তাহারা সত্যই বীরপুরুষ, স্বদেশের গৌরবস্বরূপ।

এই সকল সৈন্ত ঠিক একই স্থানে পুস্তলিকার শ্রায় দণ্ডায়মান হইয়া বোধ হয়, জার্মানদের ‘ইউ’-বোটেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল; সম্ভবতঃ, তাহারা আশা করিতেছিল, কিছু কাল পরে তাহাদের আশা পূর্ণ হইবে। আমি ও মেরী—আমরা উভয়েই জানিতাম, রাত্রিশেষ হইবার পূর্বেই কাপ্তেন ভনু রথভেনের ‘ইউ’-বোটের সাস্কতিক আলোক সমুদ্র-বক্ষে রক্তচিহ্নের শ্রায় ফুটিয়া উঠিবে।

কিন্তু ঐ সকল নৌ-সৈনিকের কথাই পুনঃ পুনঃ আমার মন আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহারা কোন্ স্থান হইতে এই ধীপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা প্রেত-দেহের শ্রায় ঐ গিরিপাদমূলে আসিয়া নিশ্চল প্রেতের শ্রায়ই প্রতীক্ষা করিতেছে।

কিন্তু ঐ সকল সৈন্তের দিকে মেরীর দৃষ্টি ছিল না; সে সমুদ্র-বক্ষেই পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার দৃষ্টিতে কি গভীর আগ্রহ ও উৎকর্ষা ফুটিয়া

উঠিতেছিল! আরও কিছু কাল পরে তাহার হাত আমার হাতের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ষ্ট্যান্ডিস্ পূর্বোক্ত সামরিক কর্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “দেখুন, মহাশয়, ঐ দিকে চাহিয়া দেখুন।”—সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-অভিমুখে তাহার অঙ্গুলি প্রসারিত হইল।

আমরাও সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; সমুদ্র-বক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল! দেখিলাম, কিছু দূরে একটি স্নলোহিত আলোক-শিখা নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছে। উহা যে কাপ্তেন ভনু রথভেনের ‘ইউ’-বোটের সাস্কতিক আলোক, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমি মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চক্ষুতেও আতঙ্ক পরিষ্ফুট দেখিলাম। মেরীও বুঝিতে পারিয়াছিল, আমাদের লর্ডনের সাস্কতিক আলোক আন্দোলিত হইলেই কাপ্তেন ভনু রথভেন এবং লেফটেন্যান্ট জ্যাগেন ডিক্সীর সাহায্যে সমুদ্র-বেলায় উপস্থিত হইবে, এবং তৎক্ষণাৎ অদূরবর্তী বৃটিশ নৌ-সৈনিকবর্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বন্দী হইবে।

যে বৃটিশ নৌ-কর্মচারী উপকূল-রক্ষী ষ্ট্যান্ডিসের পাশ্বে দাঁড়াইয়া সাগর-বক্ষে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন, তিনি ‘ইউ’-বোটের সাস্কতিক আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, “উহাদিগকে সাস্কতিক আলোক দেখাও, ষ্ট্যান্ডিস্!”

তাহার আদেশানুসারে ষ্ট্যান্ডিস্ বালুকারাশিতে সংরক্ষিত হরিকেন লর্ডনের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জালিল। সে সেই জলন্ত কাঠিটা লর্ডনের পলিতায় স্পর্শ করিতে উত্তত হইতেই মেরী হাত বাড়াইয়া লর্ডনটা সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

ষ্ট্যান্ডিস্ মেরীর উদ্দেশ্য বোধ হয় পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মেরী লর্ডনটা স্পর্শ করিবা মাত্র ষ্ট্যান্ডিস্ মেরীর প্রসারিত হাতখানি সবেগে এক ধাক্কা সরাইয়া দিল, এবং তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গভীর স্বরে বলিল, “কি করিতেছ, মেরী? অত চঞ্চল হইও না, সরিয়া দাঁড়াও। তোমার ঐ চেষ্টা সফল হইবে না।”

পর-মুহূর্তেই লঠলটা জলিয়া উঠিল। ষ্ট্যান্ডিস্ লঠনটা উর্কে তুলিয়া-ধরিয়া তাহার পীতাম্বু ক্রীণ আলোকের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল; তাহার পর লঠনটা সমুদ্রের দিকে প্রসারিত করিয়া কয়েক বার আন্দোলিত করিল। বুঝিতে পারিলাম,—‘ইউ’-বোটের কাপ্তেন সেই সাক্ষেতিক আলোক দেখিতে পাইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগকে ধরিবার জন্ত কিরূপ ফাঁদ পাতা হইয়াছে, তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে অবিলম্বেই এই ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইতে হইবে।

অতঃপর ষ্ট্যান্ডিস্ লঠনের আলোক নির্কাপিত করিয়া লঠনটা বালুকারাশির উপর বসাইয়া রাখিল; তাহার পর সে মেরীর পাশে আসিয়া বলিল, “মেরী, আর কোন রকম চালাকি করিবার চেষ্টা করিও না। তুমি উহাদিগকে সতর্ক করিবার চেষ্টা করিলে তোমার সে চেষ্টা সফল হইবে না। আমরা সতর্ক আছি।”

এ কথা শুনিয়া মেরী কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না; বিপদ অপরিহার্য্য বুঝিয়া সে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হতাশ ভাব লক্ষ্য করিয়া আমার বড় হুঃখ হইল; কিন্তু আমারও তখন কিছুই করিবার ছিল না। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে নির্নিমেষ নেত্রে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পরে আমরা ‘ইউ’-বোটের ডিক্কীর দাঁড়ের রুপ-রুপ শব্দ শুনিতে পাইলাম। কাপ্তেন ভন্ রথভেন লেফটেনাণ্ট ছাগেনের সহিত সেই ডিক্কীতে আমাদের নিকট আসিতেছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

নৌ-কর্মচারী সেই শব্দ শুনিতে পাইয়া ষ্ট্যান্ডিস্কে বলিলেন, “উহারা ডিক্কী লইয়া এইখানেই আসিতেছে, ষ্ট্যান্ডিস্! তোমরা সতর্ক থাক।”

অতঃপর তিনি নৌ-সৈন্যগণকে সন্ধান করিয়া কি আদেশ করিলেন, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না; কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখিতে পাইলাম—তাহারা হাতের রাইফেল উত্তত করিয়া, সমতালে পা ফেলিয়া শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে আমাদের নিকট অগ্রসর হইল। তাহারা সকলেই নির্কাঙ্ক; অথচ তাহাদের অধিনায়কের আদেশ পালনের জন্ত সমুৎসুক, ইহা তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। সৈনিকমণ্ডলী সেনাপতির আদেশে

কি ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে খাবিত হয়, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না; সেই প্রথম আমি সৈন্য-পরিচালন দেখিতে পাইলাম।

কিন্তু মেরী তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না; তাহার মাথার ভিতর যেন আগুন জলিতেছিল! সে মুহূর্ত মধ্যে ষ্ট্যান্ডিস্কে এক ধাক্কা দূরে ঠেলিয়া-ফেলিয়া জলের ধারে উপস্থিত হইল, এবং আবেগ-কম্পিত স্বরে সমুদ্রতট প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিয়া উঠিল, “ফ্রাঁজ, ও ফ্রাঁজ! সতর্ক থাক,—শত্রু-সৈন্য সাগর-কূলে—”

কিন্তু মেরী মুখের কথা শেষ করিতে পারিল না। ষ্ট্যান্ডিস্ তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে লাফাইয়া-পড়িয়া এক হস্তে তাহার কটিদেশ বেঁটন করিল এবং অত্র হস্তে তাহার মুখ দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল।

মেরী এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া, দেহের সকল শক্তি প্রয়োগে ষ্ট্যান্ডিসের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্ত ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। কিন্তু ষ্ট্যান্ডিস্ দীর্ঘদেহ, অসাধারণ বলবান সৈনিক; মেরী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। কাপ্তেন ভন্ রথভেনের ‘ইউ’-বোটের ডিক্কীখানা তখন সমুদ্র-কূলে আসিয়া পড়িয়াছিল। ডিক্কীখানা সমুদ্রতট হইতে দৃষ্টি-গোচর হইবামাত্র সৈনিকদের অধিনায়ক তাহার অদূরে দণ্ডায়মান সৈন্যগণকে পরিচালিত করিবার জন্ত সাক্ষেতিক আদেশধ্বনি করিলেন। আদেশ শ্রবণমাত্র নীল উর্দীমণ্ডিত সেই সকল বৃটিশ সৈন্য একযোগে সমুদ্রের কিনারায় উপস্থিত হইয়া এক হাঁটু জলে নামিয়া পড়িল। ‘ইউ’-বোটের ডিক্কীর আরোহীরা ঐ সকল বৃটিশ সৈন্যকে সেখানে সমাগত দেখিয়া, তাহারা কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেও ডিক্কীখানির মাথা ঘুরাইয়া আর দূরে পলায়নের স্মরণ পাইল না; কয়েক জন সৈনিক একসঙ্গে হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ ডিক্কীখানি ধরিয়া ফেলিল।

এই সময় সৈন্যগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া সমস্বরে গর্জন করিল, এবং মুহূর্ত পরেই একবার মাত্র বন্দুক-নির্ঘোষ আমাদের কর্ণগোচর হইল; সঙ্গে সঙ্গে সার্চ-লাইটের তীব্র আলোকে জলস্থল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি মেরী ও ষ্ট্যান্ডিসের পার্শ্বে কম্পিত-বক্ষে থাকিয়াও

আতঙ্ক-বিক্ষারিত নেত্রে দেখিতে পাইলাম—সার্জলাইটের আলোকে বহু দূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইবামাত্র উল্ফ-পয়েন্টের পশ্চাৎ হইতে একখানি দ্রুতগামী স্মুহৎ মোটর-লঞ্চ সবেগে অদূরে ভাসমান জাশ্মাণ ‘ইউ’-বোটের অভি-মুখে ধাবিত হইল।

আমরা দেখিলাম, কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই মোটর-লঞ্চ ‘ইউ’-বোটখানির পাশে ভিড়িতেই মোটর-লঞ্চ হইতে দলে দলে সশস্ত্র নৌ-সৈনিক ‘ইউ’-বোটে উঠিয়া পড়িল, এবং তাহারা ‘ইউ’-বোটের নাবিকবর্গ কর্তৃক বাধা পাইবার পূর্বেই ‘ইউ’-বোটের লৌহনির্মিত ডেক হইতে সিঁড়ির সাহায্যে তাহার কোণাকৃতি টাউয়ারে আরোহণ করিল। অতঃপর ‘ইউ’-বোট অধিকার করিতে তাহাদের বিলম্ব হইল না। বৃটিশ সৈনিকগণ জাশ্মাণ নাবিকগণের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এরূপ ক্ষিপ্ততা সহকারে ‘ইউ’-বোট অধিকার করিল যে, জাশ্মাণ নাবিকগণ আত্মরক্ষার জন্ত কোন চেষ্টাই করিতে পারিল না। এই অতর্কিত বিপদে তাহারা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল; কেহই অস্ত্র ব্যবহার করিবার অবসর পাইল না। ‘ইউ’-বোটের জাশ্মাণ নাবিকগণ এত সহজে আত্মসমর্পণ করিবে—ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। আমি মেরীর মুখের দিকে চাহিলাম, তাহার মুখ মৃত ব্যক্তির মুখের স্থায় পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু ‘ইউ’-বোটের দিকে তখন তাহার দৃষ্টি ছিল না। ‘ইউ’-বোটের ডিক্রীতেই তখন তাহার দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট।

সহসা মেরীর কণ্ঠ হইতে তীব্র আর্জনাৎকার নিঃসারিত হইল। মেরী মুহূর্ত্ত মধ্যে সবলে ষ্ট্যান্ডিসের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তীরবেগে তীরের দিকে ধাবিত হইল। তখন পূর্বেস্তু ডিক্রীর আরোহিগণকে ডিক্রী হইতে নামাইয়া লইয়া এক দল সৈনিক তাহাদিগকে আমসের গৃহের দিকে পরিচালিত করিতেছিল। মেরী সবেগে সেই সকল সৈনিককে ঠেলিয়া-ফেলিয়া লেফ্টেনাণ্ট হ্যাগেনের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে সন্মোদন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, “ফ্রাঁজ, ফ্রাঁজ! হায়, কি সর্বনাশই হইল!”

মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিলাম, চন্দ্রনির্মিত বর্ণাবৃত লেফ্টেনাণ্ট হ্যাগেন উভয় হস্তে মেরীকে জড়াইয়া-ধরিয়া বুকে তুলিয়া

লইল। তাহার মুখ ব্লাটিং কাগজের মত সাদা, মুখে শোণিতের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাহার ব্যাকুল চক্ষু মেরীর মুখের উপর সংস্থাপিত; কিন্তু তাহার চক্ষুতে আমি ভয়ের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। কাপ্তেন ভন্ রথভেন লেফ্টেনাণ্ট হ্যাগেনের পাশে-পাশে চলিতেছিল; কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল—এই বিপদে সে সম্পূর্ণ উদাসীন; তাহাকেও বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখিলাম না। আমার মনে হইল—সমুদ্রে যাহাদের শয়্যা, শিশির-পাতে তাহাদের আর ভয় কি?

কিন্তু অসহায়া মেরীর এই প্রেমের পরিণাম কি?

যাহা হউক, কাপ্তেন ভন্ রথভেন এবং লেফ্টেনাণ্ট হ্যাগেন যে ডিক্রীতে তাহাদের ‘ইউ’-বোট হইতে তীরে আসিয়াছিল, দুই জন নাবিক সেই ডিক্রী পরিচালিত করিতেছিল। কাপ্তেন রথভেন ও লেফ্টেনাণ্ট হ্যাগেনের সহিত তাহারাও বৃটিশ নৌ-সৈনিকগণের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাহারা চারি জনই বৃটিশ সৈন্যবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ‘ব্ল্যাকগল ফোর্সে’ আমসের পাকশালার নীত হইল। আমসু তখন তাহার পাকশালার বসিয়া হতাশ ভাবে ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার জীবনের আর আশা নাই; কিন্তু তাহার অল্পপস্থিতিতে সমুদ্রতটে কি কাণ্ড ঘটিতেছিল, তাহা সে ধারণা করিতে পারে নাই। নীল পরিচ্ছদধারী বৃটিশ নৌ-সৈন্যদল যে যুদ্ধ-জাহাজে তাহার দ্বীপে উঠিয়া গিরিপাদমূলে অপেক্ষা করিতেছিল—ইহাও সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

সেই রাত্রিতে আমাদের স্প্রশস্ত পাকশালার যত লোকের সমাগম হইল, তত অধিক সংখ্যক লোক যে সেই কক্ষে একত্র সন্মিলিত হইতে পারে, ইহা আমি কোন দিন ধারণাও করিতে পারি নাই। অতঃপর আমাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহাই আমি ক্রমাগত চিন্তা করিতে লাগিলাম।

তবে একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম; আর কোন দিন আমাদের ‘ইউ’-বোটের কাপ্তেনদিগকে সাক্ষেতিক আলোক দেখাইবার জন্ত রাত্রি জাগিয়া সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকিতে হইবে না। আর কোন দিন

উহারা 'ইউ'-বোটের ইন্ধন-সংগ্রহের জন্ত আমাদের দ্বীপে আসিয়া আমার ও মেরীর সহিত হাসি-তামাসা করিবে না। আমাদের এই একঘেয়ে কাজ জন্মের মত শেষ হইয়াছে। এখন আমাদের নূতন পথে চলিতে হইবে, নূতন ভাবে আমাদের জীবন আরম্ভ হইবে; কিন্তু কোন্ পথ আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইবে, সেই পথ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই। হয় ত মেরীর নিকট আমাকে চির-বিদায় লইতে হইবে; জীবনে তাহার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না। এত কাল সুখ-দুঃখে তাহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি; তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে ভাবিয়া আমার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য আমসের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইলাম। তাহার পরিত্রাণ লাভের কোনও পথ আছে বলিয়া মনে হইল না। স্বদেশদ্রোহিতা, স্বজাতির সর্বনাশের জন্ত শত্রুকে সাহায্য করিয়া সে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার মার্জনা নাই; চরম দণ্ড তাহার প্রাপ্য, সেই দণ্ড তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হইল, এই অপকার্যে তাহার আদেশ পালন করিয়া আমরাও অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু আমাদের অপরাধ কিরূপ গুরু, তাহা আমাদের ধারণা করিবার শক্তি ছিল না, এবং অপরাধের গুরুত্ব কেহই কোন দিন আমাদের বুঝাইয়া দেয় নাই; তদ্বিন্ন, আমাদের প্রতিপালক আমসের অবাধ্য হইব, সেইরূপ শক্তিও আমাদের ছিল না। তথাপি আমরা অপরাধী; আমসের আদেশে যে অন্য় কার্য করিয়াছি, তাহার কিরূপ শাস্তি আমাদের কাছে হইবে, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না; তবে আর যে আমাদের কাছে এই কার্যে লিপ্ত হইতে হইবে না, ইহা বুঝিতে পারায় আনন্দিত হইলাম। কিন্তু কাপ্তেন তনু রথভেন ও লেফটেন্যান্ট হ্যাগেনের জন্ত আমার হুঁচিস্তার

সীমা রহিল না। তাহারা আমাদের দেশের শত্রু, 'ইউ'-বোটের সাহায্যে বোম্বটেগিরি করিয়া তাহারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে; অনেক বৃটিশ জাহাজ বিধ্বস্ত করিয়াছে, টর্পেডোর আঘাতে বহু ধনজন সমুদ্র-গর্ভে সমাহিত করিয়াছে; কিন্তু আমাদের প্রতি প্রথম হইতেই তাহারা বন্ধুবৎ আচরণ করিয়াছিল, আমাদের প্রতি কোন দিন তাহাদের স্নেহের অভাব বুঝিতে পারি নাই; এইজন্তই তাহাদের কল্যাণ-কামনায় আমার চিন্তা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা আমাদের জাতির শত্রু হইলেও আমার ও মেরীর হিতৈষী, ইহা ভুলিতে পারিলাম না।

কিন্তু বৃটিশ রণতরীখানি কখন কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্ত আমার প্রবল কৌতূহল হইয়াছিল। পূর্বদিন সমুদ্র-বক্ষে একখানি জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ শুনিয়া 'ইউ'-বোটের ডিক্রীর নাবিকরা কাপ্তেনকে সতর্ক করিয়াছিল, কিন্তু সেই জাহাজ আমাদের দ্বীপের নিকট না আসিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিল, উহা কি সেই জাহাজ? আমি এই সকল কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় উপকূল-রক্ষী এলিসের সহিত ষ্ট্যান্ডিসের কথাবার্তা আমার কর্ণগোচর হইল। আমি জানিতে পারিলাম—সেই দিন সায়ংকালে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে একখানি বৃটিশ রণতরী নিঃশব্দে আসিয়া দ্বীপের অগ্র ধারে নঙ্গর করিয়াছিল; সেই জাহাজ হইতে ঐ সকল বৃটিশ নৌ-সৈন্য দ্বীপে অবতরণ করিয়া পাহাড়ের আড়ালে লুকাইয়া ছিল। সেই জাহাজের কাপ্তেন তখন পর্য্যন্ত আমসের পাকশালায় গমন করেন নাই; উপকূল-রক্ষীরা কতকগুলি নাবিকসহ জাশ্মাণ বন্দীদের লইয়া পাকশালায় তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

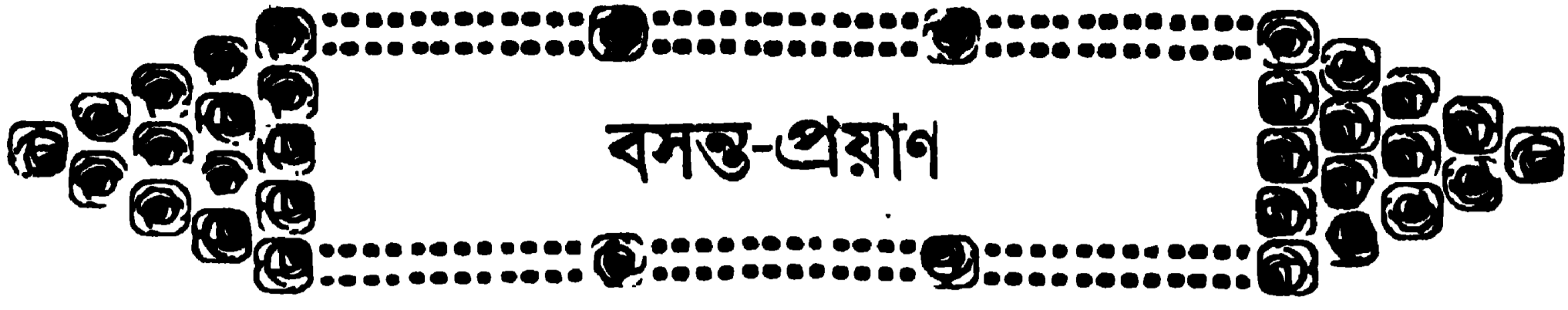
[ক্রমশঃ।]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পাখী ও ঝড়

যে শাখা একদা পাখীর ভারেও নোয়ায়ে পড়ে।

সে শাখাই পরে দারুণ ঝড়ের সঙ্গে লড়ে।



বসন্ত-প্রয়াণ

(১)

পুরুষের উক্তি :—

ছিল দিন—সে দিন সে গো
অনেক বছর আগে—
যে দিন প্রিয়া আমার পানে
চাইতো অমুরাগে !
যদি রে উশুখু মাথার কেশ এ,
মাথাতে চালিয়ে বুরুশ্
সাজিয়ে দিত বিনোদ বেশে !
গরমে আমার প্রিয়া
পাখা দিয়া
বাতাস দিত ;
ঘামলে আমি, ঝাঁচলে ঘাম
মুছিয়ে নিত !
এ-মুখে চাইতো প্রিয়া অমুরাগে !
এ-বুকে সে-সব স্মৃতি আজো জাগে !
জীবন আমার রাঙা তখন
ফাগুন-রাগে !
মোড়শী ছিল প্রিয়া—
কি মাধুরী অঙ্গে জাগে !
হু'জনে দৌহার পানে বিভল ঝাঁখি !
পল্লবিনী দেহ-লতা—
আদর-সোহাগ—ভুলবো তা কি ?
নাহি নিদ্ ঝাঁখি-পাতে
জ্যোস্না-রাতে
কত হাসি !
হু'জনে বুকে-বুকে মুখে-মুখে
কত ভালো-বাসাবাসি !
নিমেষে নয়ন-হারা হলে পরে
সারা নিখিল অঙ্ককারে যেতো ভরে' !
আজি রে শুধুই স্মৃতি,
সে-দিন যেন স্বপ্ন-কথা !

শ্রেয়সী গৃহিণী আজ—

কোথায় তমু দেহ-লতা ?
চোখের সে-বিহ্বলতা মিলিয়ে গেছে ;
বচনে নাইকো মধু—
আগুন যেন জ্বলে দেছে !
আকাশে উঠলে শশী
পাশে বসি
যদি বলি,—
“কথা কও অমুরাগে !”
বলেন, “জলি
হাজার জ্বালায় তোমার হাতে !
খেটে গা-গতর হলো পঙ্গু বাতে !”
জামাটা পকেট-ভেঁড়া
বলি, “দাও সেলাই ক’রে !”
মেজাজে ঝেঁজে বলেন,
“দাসী বেশ পেয়েছে রে !”
সে-ফাগুন তেমনি বেশে আজো আসে ;
পাখীরা তেমনি গো গায়,
বাতাসে গন্ধ ভাসে !
তিনি সেই আছেন তিনি
চিরদিনই—
আমিও আমি !
কি হলো, কখন যে হায়,
প্রাণের বাঁধা গেল খামি !
তিনি আজ অগ্নিময়ী—ঝেঁজে আছেন সবার 'পরে !
আমি ঐ কোনো মতে আছি দাদা, বেঁচে-মরে' !

(২)

নারীর উক্তি :—

সে দিন—সে কি এসেছিল সত্যই ?
না, সে মিথ্যা স্বপ্ন-সৃষ্টি ?
যে দিন আমার অঙ্গে-অঙ্গে ফাগুন—
আমার 'পরে তোমার বিভল দৃষ্টি ?

আমার মাথায় কালো কেশের রাশি
 ছুঁয়ে তুমি বলতে রেশম-কুচি !
 আমার গালে রক্ত-গোলাপ ফোটে !
 আমার হাসি চারু-চন্দ্র-কুচি !
 আমার আঁখির 'পরে রাখি আঁখি
 বিবশ হতে, বিভল হতে তুমি !
 স্বর্গ পেতে আমায় পেয়ে তুমি—
 পিপাসা সব মিটতো অধর চুমি !
 পদ্ম-অশোক আমার চরণ-পাতে—
 আমার কথায় সুরের কুমুম-ঝুরি !
 সাধ মেটে না চোখে-চোখে রেখেও—
 দেখতে আমায় ক'রে লুকোচুরি !
 নয়ন আমার হলে ছল-ছল,
 মৌনময়ী হলে বাণী-হারা—
 উতল হতে, আকুল হতে কত—
 হাজার প্রাণে হতে পাগল-পারা !
 তোমার ভুবন ছিল আমায় ঘিরে,
 আমি ছিলাম তোমার জীবন ভরি !
 আমার তখন বয়স বছর ষোল—
 আমি ছিলাম তোমার ধ্যানের পরী !
 কত বছর মাঝে এলো-গেল,
 আমার সে-রূপ বাতাসে যায় ঝরে !
 গালের গোলাপ-পাপড়ি মিলায় তাপে,
 পদ্ম-অশোক শুকায় চরণ 'পরে !
 তোমার চোখের প্রদীপ কোথা গেল—
 যার আলোতে দীপ্তি আমার রূপে ?
 তোমার আদর-সোহাগ বিভল-বাণী
 মিলালো আজ সে কোন্ আঁধার-কূপে ?
 অঙ্গ আমার যৌবনে হয় হারা,
 কেশের রেশম আজকে সে হয়, খর !
 অঙ্গে-অঙ্গে আমার কুমুম কৈ ?
 চাঁপা-বকুল রৌদ্রে জর-জর !
 তবু আমার মনে কুমুম আছে ;
 লক্ষ বাতি আজো জলে বুকে ;

শতেক-কাজে তোমার নাহি সময়
 নয়ন তুলে চাইবে আমার মুখে !
 সন্ধ্যা-বাতাস উতল বয়ে যায়,
 পূর্ণশশী ওঠে আকাশ 'পরে ;
 হিসাব-পত্র খাতা-কাগজ মেলি
 পাষণ হয়ে বসে আছো ঘরে !
 পাশে এসে আমি বলি,—“ওগো,
 একটুখানি বসো আমার কাছে” !
 বাঁকা ভুরু, কঠিন ভাষে বলো,—
 “সরো, সরো, কাজ-কর্ম আছে !”
 বুকে আমার মুণ্ডর পড়ে যেন !
 চিত্ত আমার—সে হয় বজ্রাহত !
 নয়ন-বারি— শাসনে তায় রুখি,
 উঠে আসি দারুণ লজ্জানত !
 রান্নাঘরে উনুনগোড়ায় বসি,
 না হয় সেলাই করি কাঁথা-কাণি !
 কাজের শেষে রচি নতুন কাজে,—
 এ-কাজ করি, ও-কাজ ধরে টানি !
 ভুলেও আমার কথা ভাবো না তো,
 হায় রে, আমার ফাণ্ডন গেছে চলি !
 অঙ্গে-অঙ্গে যত কুমুম ছিল,
 দিছি তোমায় প্রাণের বৃত্ত দলি !
 পেলব-তনু, দেহের নিটোল ছাঁদ,
 বিভল দিষ্টি এ ছুই নয়ন-ভরা—
 কে নিল গো ? এ-সব দিলেম কারে ?
 কারে দিয়ে হলেম সর্ব-হরা !
 বেশী দিনের কথা সে নয়, ওগো,
 সে দিনও যে সাজিয়ে নিত্য ডালি,
 আমার দেহে-মনে চূর্ণ করি
 তোমায় দিয়ে আমার পুঁজি খালি !
 মুখের গোলাপ, বুকের পদ্ম-কলি,
 বর্ণ-গন্ধ-মধু দিলেম কারে ?
 ভাবি হায় সে ভুলেও চাহে না আর
 পুষ্পবিহীন কুঞ্জ-পথের ধারে !
 শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্মা



সম্মোহিত

এক

কল্পকান্ত অবসন্ন দেহ-ভাব বহন করিয়া বিভাকর দিবা-শেষে যখন ঘরে ফিরিলেন, সন্ধ্যা সমাগমেব তখন আর অধিক বিলম্ব ছিল না। প্রতিদিনের মত সেদিনও তখন বাহিবেব বড় ঘরখানি সমাগত বন্ধুবাধবের বিচিত্র কলধ্বনিতে মুগ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। আছতি পিয়ানোর সম্মুখে মিউজিক টুলের উপর বসিয়া অল্প ধারে ফিরিয়া গম্বিত মুখে কি বলিতেছিল; হয় ত অল্পকাল পূর্বে সমাপ্ত সঙ্গীত-সংক্রান্ত আলোচনাবই কৃষ্টিত-কণ্ঠের প্রতিবাদ। একবার ভিতরের দিকে চাহিয়া-দেখিয়া বিভাকর অল্প দিনের মতই দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন; তাহা লক্ষ্য করিয়া আছতি তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, “আমরা মিষ্টাব সোমের সঙ্গে তাঁর আগড়পাড়াব বাগানে যাই, তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি এসো।”

পত্নীকথা শুনিয়া বিভাকর একটু বিস্মিত ভাবে কহিলেন, “সন্ধ্যা হয়ে এল, এই রাত্রে সেখানে যাওয়ার দরকার কি?”

আছতির স্বর্গোর মুখে বিবক্তির ছায়া ফুটিল; ইষৎ রুদ্ধকণ্ঠে স্বামীক প্রশ্নের উত্তর দিলেন, “আজ পূর্ণিমা কি না, পূর্ণিমার মধুর রাত্রিটা ‘এনজয়’ করবার জগ্গট ত সেখানে যাই।”

“তাব মানে? রাত ছপুবে দল বেঁবে পূবেব বাগানে গিয়ে তৈ-টৈ না কবলে পূর্ণিমার রাত্রির কি ‘এনজয়’ করা চলে না? সগটা নতুন ধরণের বটে!”

প্রদীপ্ত অগ্নিরাশিতে অল্প বাতাস লাগিলেই অগ্নিস্কুলগুলি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়। বিভাকরের মনে বিবক্তির বহি একটু একটু করিয়া অনেক দিন হইতেই পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। তাঁহার মস্তব্য শুনিয়া কেবল যে আছতিই বিস্মিত হইলেন, একপ নহে, সমাগত বন্ধুরা সকলেই সবিষয়ে তাঁহার দিকে চাহিলেন। বিভাকর স্বভাবতই নিতান্ত শাস্ত-প্রকৃতির লোক। তাঁহার মুখ হইতে রূঢ় বাক্য নিঃসারিত হওয়া বিষয়ের বিষয়।

আছতি রাগিয়া-ঝাঁকিয়া যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন! কয়েক মুহূর্ত বলিবার মত কোন কথা তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না; কাবণ, অত্যধিক ক্রোধ অনেক সময় মানুষকে নির্বাক্ কবে। বিভাকর তখনই কি ভাবিয়া সবিয়া পড়িতেছিলেন; কিন্তু আছতি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, “আমাদের সঙ্গে তোমার মনের মিল কোন দিনও হবে বলে মনে হয় না; তা হতেও পাবে না। কেন না, তুমি যে ভাবে যে-সব আচাৰ-ব্যবহাৰ, রীতি-নীতির ভেতর দিয়ে বড় হইয়েছ, সে-গুলোর সঙ্গে আমাদের একেবারেই পরিচয় নেই! জোর ক’বে আমাদের মধ্যে তোমায় টেনে আনা হইয়েছে বটে, কিন্তু তেলেব সঙ্গে জল কিছতেই যে মিশ খায় না, তা কে না জানে?”

পঙ্কিল জল থিতাইয়া তাহার উপরটা নির্মল হইলেও একটু আলোডনেই তাহা ঘোলাইয়া উঠে। বিভাকর স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল পত্নীক মুখেব দিকে চাহিয়া-থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “তোমার ও-কথা সত্য। তেলে আর জলে সত্যিই কোন দিন মেশে না। কথাটা অনেক সময় আমাবও মনে হয়। আব সে জগে কষ্ট পেতে হয় আমাকেই।”

আছতি আবক্তিম মুখে কি একটা কথা বলিতে উগ্গত হইতেই বিভাকর তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, “এখন ও-কথা থাক, পূবে আব এক সময় এব মীমাংসা হবে। এঁরা সকলে এখানে বাঁসে আছেন; দল-বঁধে কোথায় যাবে বলেছে—তাই যাও; আমাব অপেক্ষায় থাকবার দরকার নেই,—মানে, আমি এখন কোথাও যাব না।”

আছতি আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু অল্পতম স্বপ্নদ মিষ্টাব সোম সন্মিষ্ট একটু হাসির সঙ্গে বিভাকরের মুখেব দিকে চাহিয়া কহিলেন, “কেন আপনি যাবেন না, মিঃ দে? চলুন না, এমন স্বন্দর রাত্রির—‘নাইস্’!”

বিভাকর কিঞ্চিং বিবক্তিব ভঙ্গিতে বলিলেন, “তা বটে; কিন্তু আমি সঙ্গে না থাকলেও এই স্বন্দর রাত্রির মাধুর্য উপভোগে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না, মিঃ সোম! সারা দিন গাধা-খাটুনির পর আমাব শরীর বড় ক্লান্ত। মনও ভাল থাকবার কথা নয়। আমার এই অক্ষমতা আপনারা দয়া ক’রে ক্ষমা করবেন।”

এ-কথা শুনিয়া মিঃ সোম কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু আছতি তাহাতে বাধা দিলেন—কতকটা তাচ্ছিল্যের স্ববে একটু অবজ্ঞাভবে কহিলেন, “যে যাবে না তাকে অকাবণ অমুরোধ ক’রে ফল কি, মিঃ সোম! আপনি কি এখনই উঠতে চাইছেন? না, একটু পূবে যাবেন?”

সোমকে তাঁহার বান্ধবীর প্রশ্নের উত্তরদানের অবসব না দিয়াই অল্প ধার হইতে মিঃ মুখার্জি বলিলেন, “আর আধ ঘণ্টা পূব উঠলেও চলবে, এই ত সবে সন্ধ্যা; নৈশ শোভা উপভোগের এখনও সময় হয়নি। ততক্ষণ আর এক কাপ চা হলে সেটাও মন্দ উপভোগ্য হ’ত না, মিসেস দে! তাতে অসুবিধে তেমন বেশী হবে কি? তা যদি হয়, তবে আব কষ্ট দিতে চাইনে,—মানে।”

মিঃ মুখার্জি ‘মানে’টা খোলসা করিয়া বলিবার পূর্বেই মিসেস দে বলিলেন, “না না, এতে আর কষ্ট কি? এ ত খুসীর কথা। আচ্ছা, আমি দেখাছি।”

আছতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিলেন। বিভাকর এবার ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হইয়াছে, অথচ চল্লালোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইবারও বিলম্ব আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহকক্ষে তখনও

বিদ্যাতালোক প্রজ্জ্বলিত হয় নাই। চারি দিকে একবার চাহিয়া বিভাকর ভ্র-কৃষ্ণিত করিলেন; তাহার পর আলোর 'সুইচ'টা টিপিয়া আলো জ্বালিয়া, শাস্ত্রভাবে ইঞ্জি-চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং কিঞ্চিৎ উঠেঃস্বরে ডাকিলেন, "বয়!"

তাঁহার এই আহ্বান-ধ্বনিতে কেহই আসিয়া না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া তিনি পুনর্বার ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন; তথাপি কোন দিক হইতে সাড়া-শব্দ নাই! আরও কিছু কাল প্রতীক্ষায় থাকিয়া তিনি উঠিয়া নিজেই পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলেন; তাহার পর স্থানের ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ-হাত ধুইয়া আসিলেন। এক পেয়ালা চা এ-সময় নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া তাঁহার মনে হইলেও কাহারও নিকট তাহা চাহিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। টেবলের উপর 'ডাকে'ব চিঠিগুলি পড়িয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহাতেই মনঃসংযোগ করিলেন।

সহসা আভূতি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া বিভাকর চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াই পুনর্বার পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।

আহুতি প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া বিভাকরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমাদের ফিরতে বোধ হয় রাত্তির একটু বেশীই হবে, পাঁচ জন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যাওয়া কি না। আমার প্রতীক্ষায় ভেগে ব'সে না থেকে, খেয়ে-দেয়ে তুমি শুয়ে পোড়ো।"

বিভাকর কোন কথাই বলিলেন না। আহুতি আড়চোখে চাহিয়া মুহূর্ত্ত কাল ইতস্ততঃ করিলেন, বোধ হয়, আরও কি একটা কথা বলিবার ছিল; কিন্তু তাহা বলিতে গিয়া ক্ষণমাত্র থামিলেন, তার পর দ্বিধা ত্যাগ করিয়া সহজ স্বরে কহিলেন, "আমার কিছু টাকা চাই; এখনই তার দরকার হ'য়েছে।"

বিভাকর পত্নীর মুখের দিকে না চাহিয়াই কহিলেন, "টাকা? টাকা ত তোমার কাছেই আছে।"

"আমার কাছে কিছু ছিল বটে, কিন্তু তা সবই খরচ হ'য়ে গ্যাছে।"

বিভাকর কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "খরচ হ'য়ে গেছে? সব টাকাই? আর কিছুই তোমার হাতে নেই?"

"না; কি ক'রে থাকবে? ভারী ত ক'টা টাকা—"

"চার শ' টাকা তোমার কাছে হয় ত সামান্য ক'টা টাকা, কিন্তু—"

আহুতি স্বামীকে তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিলেন, "চার শ' টাকা তোমার কাছে যে অনেক টাকা, আমার তা বেশ জানা আছে। তা যতই হোক—"

কি ভাবিয়া আহুতি হঠাৎ নীরব হইলেন। বাহিরের ঘরে বন্ধু-বান্ধবীরা তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বাদ-প্রতিবাদে সময় নষ্ট করা হয় ত সঙ্গত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি ভাবিলেন, বাকাবাণগুলি ভবিষ্যতের জগৎ ভূণে আবদ্ধ রাখিলেও ক্ষতি নাই। যাহাকে শরাঘাতে বিদ্ধ করিতে হইবে, সে ত গৃহ-পিঞ্জরেরই বন্দী,—হাত ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারিবে না যখন, তখন আর চিন্তা কি?

বিভাকর স্থিরদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন—যেন উত্তম সড়ীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান নির্ভীক সৈনিক! ক্রমাগত সহ

করিতে করিতে অতি অসহ বস্তুটাও শেষে গা-সহা হইয়া যায়। বিভাকর দরিদ্রের সম্ভান; সাধারণ গৃহস্থের জায়ই তিনি প্রথম জীবনটা অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই অস্বচ্ছলতার কথা আহুতিরও স্মরণ ছিল। তাহার পর কঠোর পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে এখন তিনি প্রচুর ঐশ্বৰ্য্যের মালিক হইলেও, অতীতের ঐ ক্রটিটুকুকে উপলক্ষ করিয়া আহুতি প্রতি-কথায় তাঁহাকে বিদ্ধপাণে বিদ্ধ করিতে ছাড়েন না।

যাহা হউক, বিভাকর অবশেষে বলিলেন, "কি বলছিলে, বলতে-বলতে থামলে কেন? কথাটা শেষ ক'রেই যাও।"

শ্রীমতী মুগ্ধ ফিরাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রবার ফুরসুৎ এখন আমার নেই। আমার টাকার দরকার। শ'খানেক টাকা এখনই আমার চাই, আগে উঠে সেটা বার ক'রে দেবে? আমি বেশী সময় অপেক্ষা করতে পারবো না— তা তোমার বুঝতে পারা উচিত।"

বিভাকর উঠিলেন। টেবলের ডায়ার খুলিয়া খানকতক নোট বাহির করিয়া পত্নীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া আবার যথাস্থানে বসিয়া পড়িলেন।

স্বামীর সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার মিনিট-দুই পরেই আভূতি আবার সেই ঘরে আসিলেন। বিভাকর তাঁহাকে লক্ষ্য কবেন নাই। আহুতি তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, "কি অন্ডায় ঐ লোকটা! বলে, এখনই বাড়ী যাবে!"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বিভাকর জীব মুগ্ধের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কে? কার কথা বলছ? কে বাড়ী যেতে চাচ্ছে?"

আহুতি উত্তেজনা-দৃষ্ট স্বরে কহিলেন, "বেবীর মাষ্টার, আবার কোন 'ইন্ডিয়ট'! বলে, দেশ থেকে চিঠি এসেছে, বাপের বড় অসুখ।"

বিভাকর স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে যাবে বৈ কি; তার বাপের যখন অসুখ—"

আহুতির উত্তেজিত সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে বিভাকরের মূঢ় কণ্ঠধ্বনি চাপা পড়িয়া গেল। তিনি বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "যাবে? কথাটা শুনেই তুমি ব'লে ফেললে যাবে বৈ কি! তাব পব তার বদলে কবে যে লোক পাবো তার কিছু ঠিক আছে? তত দিন বেবীকে কে পড়াবে তা শুনি?"—উত্তেজনায় দে-গৃহিণীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

বিভাকর সংযত স্বরে বলিলেন, "তা হ'চার দিন পড়া বন্ধ থাকলে তাব এমন কি আর ক্ষতি হবে? এত—"

আহুতি মুখ বাঁকা করিয়া বলিলেন, "থামো গো, থামো তুমি! তোমাকে মোড়লী ক'রবার ভার দেওয়া হয়নি। সব তাতেই তোমার বাড়াবাড়ি! এই জন্মেই ত বাড়ীর লোক-জন সব বেচাল হ'য়ে উঠেছে। আমি ব'লছি, ওর যাওয়া হবে না, আমি তার ছুটি মঞ্জুর করবো না, তা তার বাড়ী-ঘরে আগুন লাগুক না কেন? এখন সামনে আমার জন্মতিথির উৎসব, কত কাজ প'ড়ে রয়েছে। পুরোন লোক, ওকে এখন ছাড়লে চলে? যেতে হয়, পরে না হয় যাবে, এখন যেতে পাবে না। তোমার আঙ্কেল থাকলে আর এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয় না।"

"কিন্তু ওর বাবার অসুখটা কি তোমার জন্মতিথির জন্মে মূলতুবি থাকবে?"—বিভাকরের কথায় প্রচ্ছন্ন বিদ্ধপ।

আছতি অবজ্ঞাভরে বলিলেন, “চাকর-বাকর ওরা, ওঃ, ওদের আবার অসুখ! অসুখ হ'য়ে থাকে, এমনই সেরে যাবে।”

বিভাকর মুহূর্ত্ত কাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নারীর মুখে এমন কদর্যা কথা তাঁহার কর্ণপীড়াদায়ক হইল; তিনি উঠিয়া দ্বারের নিকটে গিয়া কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “প্রণবকে ডেকে দে ত।”

একটু পরেই প্রায় কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সের একটি ছেলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সমস্তমুখে নমস্কার কবিল। বছর-দুই আগে তিনি ইহাকে তাঁহার কণ্ঠ্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ছেলেটিকে বিভাকর স্নেহ করিতেন, আছতিবও তাহার প্রতি দরদ ছিল। কাবণ, মেয়েকে লেগাপড়া শিখান তাহার নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম হইলেও সে বিনা প্রতিবাদে প্রত্যহ আছতিব বিশ রকম ফরমাস খাটিত! এটা তার উপরি চাকরী; সে জন্ম তাহাব কিঞ্চিৎ উপরি প্রাপ্তিও ছিল, তাহা অকারণ গালাগালি, মখন-তখন মুখ-ঝামটা—ইত্যাদি; কাবণ, সে চাকর এবং নিকপায়।

বিভাকর প্রশ্ন করিলেন, “কি হয়েছে, প্রণব? তুমি বাড়ী যেতে চাচ্ছ কেন?”

প্রণব অবনত মস্তকে বাখিত স্নেহে বলিল, “বাবাব খুব অসুখ; আমি না গেলে একা মার ভারী কষ্ট আব অসুবিধে হবে। আর ত কেউ তাঁকে দেখাব নেই, সেই জন্মেই আমার না গিয়ে উপায় নেই, সার!”

বিভাকর কোন মন্তব্য প্রকাশ কবিবাব পূর্বেই আছতি উত্তেজিত স্নেহে বলিয়া উঠিলেন, “যেতেই হবে? তা বেশ, যেতে পাব; কিন্তু এব পর আমার বাড়ীতে তোমার আব চাকরী করা চলবে না। তুমি ভেবে না যে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে।”

প্রণব বলিতে পারিত, কাকেও অভাব না হইতে পারে—কিন্তু ভাত ছড়াইলে কোকিল, পাপিয়া আসে না। কিন্তু সে কথা তাহাব মুখে আসিল না। সে গরীব,—১ড গরীব; আত্মাভিমান তাহাব শোভা পায় না। সে আছতিব মুগ্ধের দিকে কাতব দৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যাখিত স্নেহে বলিল, “মার চেয়ে, বাবাব চেয়ে আমার কাছে কিছুই বড় নেই, মা! আমায় যদি এ কাজ থেকে আপনাবা ছাড়িয়েই দেন, তা হ'লে আমার কষ্ট অসুবিধে খবই হবে জানি; কিন্তু আমি নিকপায়। তবু আমায় যেতেই হবে। না গেলে, বাবাব প্রাণ-বক্ষার জন্মে আমার কিছুই চেষ্টা কবা হবে না। সে আক্ষেপ আমি জীবনে ভুলতে পারবো না।”

চাকরের এই দৃঢ়তায় আছতি ক্রোধে বিচলিত হইয়া দুই-তিন মিনিট কোন কথা বলিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন, “বেশ, যেতে পার। তোমার মাইনে যা পাবে শোধ ক'রে নিয়ে যেও। আর যেন তোমায় এ-মুগ্ধো হ'তে না হয়।”

আর কোন কথা না শুনিয়াই আছতি সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বিভাকর প্রণবের কাতর মুগ্ধের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “যাওয়া কি তোমার একান্তই দরকার, প্রণব?”

প্রণব ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, “তা না হ'লে আমার মত গরীব চাকরীর আশা ত্যাগ ক'রে কখন যেতে চায়? বাবাব অসুখ, তিনি বিছানায় প'ড়ে আমার পথ চেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। মা আমার জন্মে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। একা তাঁর কতই কষ্ট হচ্ছে। আমি কি ক'রে এখানে থাকি বলুন। চাকরী গেল ব'লে আর কি করব?”

আজই আমায় যেতে হবে, সার। একটুও বিলম্ব করতে পারবো না।”

বিভাকর সহানুভূতিভরে বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখ। না গেলে নিতান্তই যদি না চলে, তবে যেতেই হবে। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেও।”

প্রণব নীরবে প্রস্থান করিল। বিভাকর অন্তমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আজিকার এই ঘটনা যেন তাঁহার অতীত স্মৃতির রুদ্ধদ্বারে সজোবে আঘাত করিয়া অনেক দিনের পুরাতন কথা মনেব কোণে জাগাইয়া তুলিল। সেই দিন বিভাকর ছিলেন এই ছেলেটির মতনই দরিদ্র তরুণ যুবক। প্রণবের মত গৃহ-শিক্ষকের চাকরী লইয়া তিনিও কোন এক সম্ভ্রান্ত পবিত্রবে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহাবও ছিল স্নেহময় জনক-জননী! বিভাকর তাঁহাদেরই নয়ন-পুত্রলি একমাত্র সম্ভ্রান্ত।

বাহিরে বন্ধু-বাধবের কলবোল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল। বিভাকর উন্মুক্ত বাতায়নপথে দেখিতে পাইলেন, আছতি সদলে মোটেবে চড়িয়াছেন। গাড়ী বংশীধ্বনি করিয়া বাড়ীৰ বাহিরে চলিয়া গেল। বোধ হয়, বিনা কাণেই একটা স্বস্তিব নিশ্বাস বিভাকরের বক্ষ-পঞ্জব ভেদ করিয়া নিঃসারিত হইল। ইজিচেসারটা কাছে টানিয়া-আনিয়া তিনি বাহিরেব দিকে চাহিয়া স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। মনেব অসীম চাঞ্চল্য তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। দুই অতীতে কত কথা, কত স্মৃতি আজ তাহার চঞ্চল চিত্ত আলোড়িত করিতে লাগিল। সে গভীর বেদনার পুঞ্জীভূত স্মৃতি বিভাকর জোর করিয়াই তুলিয়া ছিলেন; আজ কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাহা উজ্জ্বল হইয়া তাঁহাব দৃষ্টিব সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইল। চিত্রপটের শ্রেণীবন্ধ ছবির মত একটাব পব একটা তাঁহাব মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

দুই

পূর্বেই বলিয়াছি, বিভাকর দরিদ্র গৃহস্থের সম্ভ্রান্ত। বাঙ্গালার এক অখ্যাত পল্লীতে সামান্য কয়েকখানি মুংকুটাব, আম, কাঁটাল, নারিকেল প্রভৃতি ফলেব একটি বাগান, এবং কয়েক বিঘা উর্বর লাখরাজ জমি মাত্র তাঁহাব পিতার সম্বল ছিল। পল্লীগ্রামে তাহার আয় হইতে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইলেও ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দিবেন তাঁহার পিতা প্রিয়নাথের সেরূপ সম্বল ছিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকা স্বল্পাংশিপ পাইয়াছিলেন—সেই টাকা কয়টির উপব নির্ভর কবিয়া বিভাকর ‘আই-এ’ পড়িবার জন্ম কলিকাতায় যাইতে চাহিলে তাহাব পিতা ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, “আমার অবস্থা ত জান, বিভূ! আমি তোমায় কিছুই সাহায্য করতে পারব ব'লে আশা করিনে। শুধু ঐ ক'টি টাকার ভরসায় কলিকাতায় গিয়ে বিপদে পড়বে? ও-চেষ্টা ছেড়ে দাও বাবা!”

বিভাকর হতাশ ভাবে জননীর মুগ্ধের দিকে চাহিলেন। ছেলের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্নেহচেনা স্বামীকে কহিলেন, “ও ত আমাদের কাছে কিছু চাচ্ছে না। নিজের চেষ্টায় নিজের ভাল ও যদি করতে পারে, তাতে আপত্তি করা কি উচিত? কত গরীবের ছেলে যে নিজের চেষ্টায় মানুষ হ'য়েছে, ওর ভাগ্যে থাকে—ওরও ভাল হবে।”

প্রিয়নাথ অনেক চিন্তার পব পুস্তকে কলিকাতায় যাইবার অনুমতি দিলেন।

বাবি-কবোজল এক গ্রীষ্ম-প্রভাতে পিতা-মাতার আশীর্বাদ সঞ্চল করিয়া বিভাকর কলিকাতা স্বাত্রার জগৎ প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলেন। ছেলেব মাথায় হাত রাখিয়া বাস্পরূপ কণ্ঠে স্নলোচনা তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

মায়েব মাস্তুত তাই দেবেন্দ্রনাথের বাসায় বিভাকরের আশ্রয় লইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া শ্রান্ত-দেহে বিভাকর যখন দেবেন্দ্রনাথের বাসায় আসিলেন, তখন বাক্তি হইয়াছিল। নিজের ক্ষুদ্র সংসারে এই অনাহৃত গল-গ্রহেণ আবির্ভাবে মামা-মামী কেহই প্রশন্ন মনে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ, কলিকাতায় নিঃস্বার্থ ভাবে কাহাকেও দার্বিকাল আশ্রয় দেওয়া সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সহজও নহে। তথাপি মাতুল বলিলেন, “এসেছিস, বিভু। বেশ, ব’স, মুখে-হাতে জল দে। ওগো, বিভুকে কিছু খেতে দাও, সেই সকালে কখন খেয়ে বেনিয়েছে, খেয়ে-দেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ’ক। যা বে বিভু, ও-ঘবে তোব মামীমা আছেন, তাঁর কাছে যা।”

নবাগত বালকটিকে দেখিতেই হয় ত মামীমা তখনই বাহির হইয়া আসিলেন। বিভাকরকে নতমস্তকে প্রণামে উদ্ভত দেখিয়া তিনি বিকৃত গবে করিলেন, “থাক, থাক, হ’য়েছে, ছত্তিক জাতকে ছোঁয়া বেলের কাপড়ে আন আমাকে ছুঁতে হবে না বাছা!” বিভাকর সন্তুষ্ট হাতখানা সবাইয়া লইলেন। ভীকৃদৃষ্টিতে তাঁহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইয়া নাবস স্ববে মামীমা প্রশ্ন করিলেন, “কলিকাতায় ত পড়তে এলে; তা তোমার খবর যোগাতে পারবে তোমার বাবা? কলিকাতার কলেজে পড়া ত আন ঘবের খেয়ে পাড়াগাব পাঠশালায় নেকাপড়া করা নয়।—এমন সাহস ক’বে কি ভাল ক’বেছ বাপু?”

বিভাকর সতস্বা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না; তিনি একটু খামিয়া ধীবে-ধীরে মৃদুগবে করিলেন, “আমি জলপানি পেয়েছি, মামীমা! কলেজের মাইনে লাগবে না।”

“তবেই যেন বাজা হ’লে! অল্প খরচও আছে তো? থাকবে কোথায়, তা ঠিক ক’বেছ? আমাদের এখানে না হয় ত’চাপ দিন কোন রকমে মাথা গুঁজে কাটালে; তার পর?”

মামীমাব জিজ্ঞাস্ব-দৃষ্টি লক্ষ্য না করিয়াই বিভাকর করিলেন, “হু-একটা ‘টিউশনি’ খুঁজে নেব, ঠিক ক’বেছি। তাব পর কোন ‘মেসে’ গিয়ে থাকব; তা ছাড়া যেখানে পড়াব—তঁাবা যদি তাঁদের বাড়ীতে—”

মামীমা আশ্চর্য ভাবে বলিলেন, “হ্যা, সে মন্দ কথা নয়; যদি তা জুটতে পার, তবে একটা উপায় হ’তে পারে।”

মামীমা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিস্তরু ভাবে এ সকল কথা শুনিতেছিলেন; এবাব তিনি বলিলেন, “হা, উপায় হ’তে পারে বটে, কিন্তু কাজে তা ক’রে তোলাই শক্ত। টিউশনি মিলানোও আজকাল খুবই তরুত ব্যাপাব কি না; মাষ্টারকে ঘবে রেখে আজকাল আন কেউ ছেলে-মেয়েদের পড়াতে চায় না। দেখি, তবে তুই খুব ভাল সময়ট এসে পড়েছিস, বিভু! তোর একটা ছিলে আমি হয় ত ক’রে দিতে পারব; তোকে আর কষ্ট ক’বে কাজেব খোঁজে বেশী ঘুবে বেড়াতে হবে না;—সেখানে কাজ হ’লে তোর আর কোন ভাবনা থাকবে না, পরম সুখে রাজার হালেই থাকতে পারবি।”

মামীমার কথা শুনিয়াই তাঁহার বাড়ী হইতে সরিয়া-পড়িবার জগৎ বিভাকর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “কোথায় সে কাজ, মামাবাবু? কাল থেকেই সে ব্যবস্থা হয় না?”

এজগৎ মামাবাবুর নিজের আশ্রয়ও কম ছিল না। গলগ্রহটাকে তাড়াতাড়ি বিনায় করিবার চেষ্টায় তাঁহাকে যদি কিছু কষ্ট করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না; তাই তিনি করিলেন, “আমার সাহেব সে-দিন ব’লছিলেন, ‘বেবীকে পড়াবাব জগৎ একটা মাষ্টার খুঁজে দিও, দেবেন!’ তা তোমায় যদি নিয়ে গিয়ে দিই, তা হ’লে তিনি বাখতেও পারেন।”

দেবেন্দ্রনাথ এক বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের ক্লার্ক, বিভাকর তাহা জানিতেন। তথাপি তিনি কোতূহলভবে করিলেন, “সাহেবটি কে মামা? আপনি যার কাজ করেন, তিনিই কি?”

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার এই অশিষ্ট প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হইয়া করিলেন, “হ্যা হ্যা; তিনিই, হাইকোর্টের অত-বড নামজাদা ব্যারিষ্টার, তিনি বাঙ্গালী হ’লেও তাঁকে সাহেব না ব’লে কি ‘সাহেব’ বলবো ফকুবে ছুতোবকে? তাঁকেই ‘সাহেব’ বলে। সাহেব তোমায় দেখে পাছন্দ ক’বে হয়! একে নেহাং ছেলেমাষ্টার তুমি, তাহে অজ্ঞ পাড়াগেয়ে; তোমাকে কি ওঁদের নজবে ধবে? তা দেখা যাক ত চেষ্টা ক’বে।”

মামীমা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; মামীমার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “তা তুমি বলে তোমার কথা সায়েব কখন এড়াতে পারবে না। তাঁব কাছে তোমাব খাতিব ত আন কম নয়, তুমিই ত তাঁব ডান হাত। তা যেমন ক’বেই হোক, ওকে তুমি সেখানে লাগিয়ে দাও। তাহাব হোক, আপন জন—এসে পড়েছ তোমাবই ভবসায়; ওব একটা ছিলে আমবাও যদি না করব, তা হ’লে বেচারা যায় কোথায়? আন লোকেই বা বলবে কি?”

যাহা হউক, বিভাকরের সৌভাগ্যক্রমে দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক চেষ্টা বিফল হইল না। পরদিন হইতেই ব্যাবিষ্টার বি, সি, গুপ্তর ছোট ছেলেটির ‘প্রাইভেট টিউটার’ নিযুক্ত হইয়া বিভাকর তাঁহারই গৃহে আশ্রয় পাইলেন। ব্যাবিষ্টার গুপ্ত সাহেব লোক চিনিতেন এই প্রিয়দর্শন স্কুমাব কিশোরের মুখে-চোখে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ্য করিলেন, যে-জগৎ বিনা প্রশ্নে এবং দিবাগীন চিত্তেই তাঁহাকে তিনি কাজে নিযুক্ত করিলেন। আছতি গুপ্ত সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সেও বিভাকরের নিকট নিয়মিত ভাবে পড়িতে লাগিল।

মাসখানেক পরের কথা। মা চিঠি দিয়াছেন; বিভাকরকে দুবে পাঠাইয়া কতখানি ব্যথা লইয়া তাঁহার দিন কাটিতেছে, চিঠির প্রতি ছত্রে তাহা পরিষ্কৃত হইতেছিল। মায়েব পত্র পড়িতে-পড়িতে বিভাকরের উন্ননা চিত্ত সেই সুদূর পল্লীর এক ভগ্নপ্রায়, খড়ের কুটারের মধ্যে হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার অজ্ঞাতসাবে হুই বিন্দু অক্ষ তাঁহার নয়ন-প্রাস্ত হইতে সরিয়া পড়িল।

“এ কি, আপনি কাঁদছেন? পুরুষমানুষেব চোখে জল? সেম্!”—আছতির এই শ্লেষপূর্ণ উক্তিহে লজ্জিত হইয়া বিভাকর তাড়াতাড়ি উদগত অক্ষরাশি মুছিয়া ফেলিলেন। ছাত্রী হইলেও দীপ্ত অগ্নিশিখা তুল্য তেজস্বিনী এই মেয়েটিকে বিভাকর ভয় না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সদা-কুণ্ঠিত ভীকৃ নম্র স্বভাবের জগৎ বিভাকরকে সর্বদাই তাহাব বিদ্রুপ সহ্য করিতে হইত। অন্তের

কথা এক রকম সহ্য হইলেও কোন অজ্ঞাত কারণে এই মেয়েটির বিদ্রূপপূর্ণ হাসি ও স্তম্ভীক বাণী কঠোর শেলের জায় বিভাকরের মর্মান্তিক করিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিত, এবং আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত। আত্মতির কথা শুনিয়া বিভাকর কুণ্ঠিত ভাবে চোখের জল মুছিয়া তাহাকে কহিলেন, “আমার চোখে জল কোথায়? তোমায় কে বলে, আমি কাঁদছি?”

আত্মতি দৃঢ়স্বরে বলিল, “আমি বলছি, আর আমিই তা দেখেছি, সত্যি আপনি কাঁদছিলেন; কিন্তু আমার কাছে তা লুকোবার দশকাল কি?”

বিভাকর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “তোমার ভুল হ’তে পারে ত? তুমি ঠিক দেখতে পাওনি।”

আত্মতি মুগ্ধ নাকাইয়া অবজ্ঞাভবে বলিল, “ইউ আপ এ সেম্লেস্ লায়াব! আপনার সঙ্গে আব কথা বলতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।”

আত্মতি ফিণিতৈছিল; বিভাকর ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া অত্যন্ত মিনতি সহকারে কক্ষণ স্ববে কহিলেন, “বাগ ক’ব না, আত্মতি। দাঁড়াও তুমি; আমি তোমায় সত্যি কথাই বলছি এবার। আমি কাঁদছিলুম—এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আমি তা সত্যিই বুঝতে পারিনি; ভাবতে ভাবতে আপনিই হয় ত আমার চোখে জল এসেছিল।”

বিভাকরের কাতবতায় আত্মতির বিবাহ দূর হইল। এবার মে টেনেলের সম্মুখস্থ একপানা চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া বলিল, “কেন কাঁদছিলেন বলুন ত, কি হ’য়েছে শুনি।”

কিন্তু বোদনের কাণে ব্যস্ত করিতে বিভাকরের সঙ্কোচ হইল; একজ্ঞ তিনি ইতস্ততঃ কবিত্তে লাগিলেন। তখন আত্মতি কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, “একবারে চূপ ক’বে গেলেন যে? এমন কি লজ্জার কথা যে, বলতে পারছেন না? বলুন আপনি, আমি শুন্তে চাই।”

বিভাকর এবার অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন, “আজ মায়ের একপানা চিঠি পেলুম; তা পড়ে আমার মনটা বড়ই—”

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া আত্মতি বলিয়া উঠিল, “জাষ্ট লাইক এ বেবী! মায়ের জন্তে মন কেমন করছে? হাসালেন দেখছি। তা হ’লে দেশ ছেড়ে কলকাতায় না এসে ঘবের কোণে মায়ের আঁচলের নীচে প’ড়ে থাকলেই ত পারতেন। এই বকম দুর্বল মন নিয়ে এখানে এসেছেন কেন? মনের এই বকম দুর্বলতা শিশুদেরই শোভা পায়।”

এই বকম মন্তব্য করিতে করিতে বিদ্রূপপূর্ণ হাসিতে আত্মতি মুগ্ধকান্তি লাল হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তর্কর্ষনা আত্মতির হাসির উপাদান হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারায় বিভাকর ক্ষুব্ধ চিত্তে নতমুখে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। আত্মতিও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিল, “পূজোর ছুটিতে কলেজ বন্ধ হ’লে বাড়ী যাবেন ত?”

বিভাকর মনের ভাব গোপন না করিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, বাড়ী যাব বৈ কি! মা-বাবা আমার জন্তে কত ব্যাকুল হ’য়েছেন, তা আমিই জানি।”

আত্মতি মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, “স্বত্বাং আপনাকে বাড়ী

যেতেই হবে; কিন্তু আমি জানতে চাই, আপনার কি তখন না গেলো চলবেই না?”

আত্মতির প্রশ্নে বিভাকর বিস্মিত ভাবে কহিলেন, “না গেলো কি চলে? কত দিন হ’ল বাড়ী ছেড়ে এখানে এসেছি। পূজোর ছুটিতে যাওয়া না হ’লে হয় ত বহু দিন আব যাওয়াই ঘটবে না।”

আত্মতি তাঁহার অধীরতা লক্ষ্য করিয়া বলিল, “এই ত এক মাস মাত্র এখানে এসেছেন; এব মধোই মা-বাপকে না দেখে অস্থির হ’য়ে উঠেছেন! আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি?”

বিভাকর বুঝিলেন না—জনক-জননীকে দর্শনাব জন্ম ব্যাকুল-তার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কতখানি আছে! তাঁহার গ্রাম্য প্রকৃতিসুলভ শত-সহস্র দোষের মধ্যে ইহাও একটি কি না, তাহা তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

আত্মতি তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কি ভাবিয়া দৃঢ়স্ববে কহিল, “এখন আপনার বাড়ী যাওয়া-টাওয়া হচ্ছে না। এবাব পূজোর সময় আমরা বাড়ীর সকলেই মূদোদী যাচ্ছি, আপনাকেও সেখানে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে; কারণ, ফিরে এসেই আমাদের এক-জামিন কি না। সেখানে গিয়ে না পড়লে ত একজামিনের জন্তে ‘বেডি’ হ’তে পারবে না; কিন্তু আপনি সঙ্গে না থাকলে আমাকে সেখানে পড়াবে কে? আপনাকে তাই আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে!”

বিভাকর স্তব্ধ ভাবে ভাবিতে লাগিলেন। আত্মতির কোনও কথার প্রতিবাদ করিতে তাঁহার শক্তি বা মাহন হইল না। ছাত্রী হইলেও এই মেয়েটি খল্প দিনেই তাঁহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা তাঁহার অসাধ্য ছিল। বস্তুতঃ, সে তাঁহাকে যেন সম্মোহিত করিয়াছিল; দীর্ঘশ্বাস আকৃষ্ট পুঞ্জের মতন তুচ্ছগ মোহপাশে তিনি শৃঙ্খলিত হইয়াছিলেন! তাহার চক্ষু ছ’টি দৃষ্টি বিভাকরের পক্ষে যেন ঐজ্জ্বালিকের কুহক-মন্ত্রবৎ মোহকর, তাহার ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিচালক, এই সত্য তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন অকূল সমুদ্রে স্থির-জ্যোতিঃ ধ্রুবতারা যেমন দিক্‌ভ্রান্ত নাবিককে তাহার গন্তব্য পথে পরিচালিত করে, এই তরুণীও সেই ভাবে তাঁহাকে পরিচালিত করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। তাহার সংস্পর্শে আসিলে বিভাকর আত্মবিস্মৃত হইতেন। তাহাদের মধ্যে ব্যবধান যে সূতসূত্র, তাহাও তাঁহার মনে পড়িত না।

আত্মতি জিজ্ঞাসা করিল, “তা হ’লে আপনি যাচ্ছেন ত আমাদের সঙ্গে? কি ছালা! কথা বলছেন না কেন? উত্তর দিন শীগ্গীর।”

বিভাকর কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, “তাই হবে। তোমাদের সঙ্গেই যাব আমি। বাড়ী যাব না।” কথাটা বলিয়াই পিতামাতার কাতব মুখ মনে পড়ায় তিনি বিমনা হইয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার ব্যথিত বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া নিঃসারিত হইল।

আত্মতি তখন পড়িতে বসিয়াছিল; বই হইতে হঠাৎ মুগ্ধ তুলিয়া বলিল, “আপনি এর পর কি করবেন ঠিক ক’রেছেন?”

বিভাকর তাহার এই অনাধিকারচর্চায় একটু বিব্রত হইলেও বলিলেন, “বি-এ পাশ ক’রে একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে হবে, আর কি কোরবো!”

আত্মতি নাসিকা কুণ্ঠিত করিয়া অবজ্ঞাভবে বলিল, “চাকরী ত দাসত্ব? কি হীন প্রবৃত্তি! কেন, চাকরী ছাড়া আব কি কোন

পথ নেই? লেখাপড়া শিখে সকলেরই মুখে ঐ এক কথা! চাকরী! আবার কেউ-কেউ এমন বেহায়া বে, সগর্বে বলে 'যেমন-তেমন চাকরী ছুধ-ভাত!' ছুধ-ভাতের চেষ্ঠা ছেড়ে বিলেতে যান না ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসুন। জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই?"

তড়িং-স্পর্শের জায় বিভাকব হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার পক্ষে এ স্পর্ধা আশাতীত হইলেও আছতির প্রস্তাব তাঁহার মনে এমন একটা বিকোভ সঞ্চার করিল যে, মন সংযত করা কঠিন হইল। ভবিষ্যতেও একটা মধুর কল্পনা তাঁহাকে কেমন উন্মনা, অধীর করিয়া তুলিল। বিভাকরের তরুণ চিত্ত এক দুর্লভ আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হওয়া যে কত দূর অসম্ভব, তাহাও মনে হইল না।

আছতি একটুখানি পড়িয়া আবার চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার কথা শুনুন, কোন রকমে একবার বেবিয় প'ড়ে, বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসুন। চাকরী ক'সি গলায় জড়াবেন না। তা হ'লে কিছু সত্যি বলছি—আপনাকে একটুও শ্রদ্ধা কবতে পারব না আমি"—বলিয়াই আছতি জ্বরে হাসিয়া উঠিল। বিভাকর বিহ্বল ভাবে তাহাব দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরে তিনি জানিতে পারিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান পাওয়ায় গুপ্ত সাহেবেরও ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি বিলাতে যান। মিঃ গুপ্ত তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিলেন।

প্রায় বছর-দুই তাঁহার বাড়ী যাওয়া হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় বছরেই যা একবার করিয়া তিনি দেশে গিয়াছিলেন; তাব পর নানা বাধায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এবার পিতাব অসুখেব খবর দিয়া মা বার বার করিয়া বাইতে লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়া বিভাকরের নিজেও কিছু প্রয়োজন ছিল। গ্রীষ্মেব ছুটি আবস্ত হইতেই তিনি বাড়ী যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। গুপ্ত সাহেব তাঁহারই সন্ধানে আসিতেছিলেন। কয়েকট জিনিষ লইয়া বিভাকবকে নিজের ঘরের দিকে বাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি কি আজ রাত্রেব ট্রেনেই বাড়ী যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, আজই যাব ভাবছি; বাবার অসুখ, খবর পেয়েছি।"

গুপ্ত সাহেব কি ভাবিতে লাগিলেন, তার পর বলিলেন, "বেশ যাও, সে কথাটাও তা হ'লে জেনে তাব ব্যবস্থা করে আসছ ত? ব্যারিষ্টারী পড়তে যদি যেতে চাও, তা হ'লে আর দেবী করা ঠিক নয়। তোমার বাবার মত নিয়ে, আর কিছু টাকা সংগ্রহ করে, তা হ'লে যত শীগ্গীর পার চ'লে আসবে।"

বিভাকবকে কিছু চিন্তিত দেখাইল। এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করা যে কিরূপ কঠিন, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে; তথাপি ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নেশার মত তাঁহার মন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই প্রতিভাবান্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা ছেলেটির উপর গুপ্ত সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার অধীর কামনাকে তিনিই উদগ্র করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বিভাকবকে নীরব দেখিয়া গুপ্ত সাহেব কহিলেন, "কি ভাবছ, বিভাকব! তোমার মত বদলে গেল না কি?"

বিভাকব চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "না, মত বদলায়নি, কিন্তু ভাবছি, ধনা-সর্বস্ব ঘুচিয়েও যে টাকা সংগ্রহ হবে, তাতে

আমার বাবার খরচই হরত কুলিয়ে উঠবে না! তখন কি উপায় হবে?"

মিষ্টার গুপ্ত মুহু হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা ত একবার হ'য়ে গেছে আমার সঙ্গে। সে সব ভাব আমার, তা ত তোমায় বলেছি।"

বিভাকব উত্তর দিলেন না। তেমনই চিন্তাকুল চিত্তে নিজের ঘরের দিকে চলিলেন। গুপ্ত সাহেবের নিকট সাহায্যগ্রহণ করা যে উচিত নহে, ইহা বুঝতে পারিলেও, তীব্র কামনার প্রবাহে প্রথর স্রোতে ভাসমান শৈবালদলের জায় তাঁহাব সকল সঙ্কোচ ভাসিয়া গেল। বিভাকরের মনে পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই উদ্ভিত হইতেছিল যে, তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে আছতি তাঁহাব পক্ষে দুর্লভ না হইতেও পারে। সে তখন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করবে। উভয়ের ব্যবধানটাও অনেকখানি কমিয়া যাইবে, কারণ, তখন তিনি তাহাদের সমাজেরই এক জন হইতে পারিবেন; স্মরণ্য বিলাতে তাঁহার যাওয়াই চাই।

মিনেস্ গুপ্ত অদূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের সকল কথাই শুনিয়াছিলেন। বিভাকর সেই স্থান ত্যাগ করিলে তিনি ঈষৎ ব্যঙ্গভরে স্বামীকে কহিলেন, "তোমার টাকা আব ব্যাঙ্কে ধবচে না বোধ হচ্ছে!"

একটু হাসিয়া স্ত্রীব মুখেব দিকে চাহিয়া মিষ্টাব গুপ্ত বলিলেন, "টাকার বাতলোর কি লক্ষণ দেখলে তুমি বল ত শুনি।"

গুপ্তগৃহিণী মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "তা দেখছি বই কি! নাই দিয়ে মাথায় তুলচো কেন, তাই আগে শুনি।"

গুপ্ত সাহেব সরিয়া গিয়া স্ত্রীব গা ঘেসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং এদিকে-ওদিকে চাহিয়া মুগ্ধ স্ববে বলিলেন, "আমায় কি তুমি এতই বোকা ঠাওরিয়েছ? সত্যিই টাকা আমার এত বেশী হয়নি যে, যাকে-তাকে দু'হাতে বিলিয়ে দিতে পারি। ওকে যে অত দবদ দেখাচ্ছি, তাব কাবণ—এতে আমার স্বার্থ বড় কম নয়।"

মিনেস্ গুপ্ত কথাটা ঠিক বুঝিলেন না, বিক্ষুবিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গুপ্ত সাহেব আগের মতন মুহু স্ববেই কহিলেন, "যা দিন-কাল প'ড়েছে, তৈয়েবী একটা ব্যারিষ্টার-কি আউ-সি এস কিম্বা ঐ ধরণের যাই হ'ক জামাই ক'র্তে বিস্তর টাকার দরকার, তা জান ত? তার চেয়ে অনেক কম খরচ হবে—একে তৈয়েবী ক'রে আনতে। সব ত আব আমায় দিতে হচ্ছে না। ও বাড়ী থেকেও আনবে কিছু।"

আতঙ্কে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গুপ্ত-গৃহিণী হুঙ্কার দিলেন, "তুমি কি ওরই সঙ্গে আছতির বিয়ে দিতে চাও? কি সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কি দেখলে এতে? ওর 'কলেজ-কেরিয়ার' যে রকম 'সল্লাইম,' ও যদি ব্যারিষ্টার হ'য়ে ফিরতে পারে, তখন ওর দাম কত হবে, তা ভেবে দেখেছ তুমি?"

"কিন্তু তোমার মেয়ে কি ঐ পাড়াগেয়ে মেঠো ভূতকে পছন্দ কববে?"

"ওর যদি উপার্জনের ক্ষমতা হয়, তখন ওকে ভিন্ন চোখে দেখবেই! আমার রূপের প্রশংসা কেউ কোন দিন করেনি, তবু ত তুমি—"

পুল্লীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি থামিলেন। বিভাকব তখনও বেশী দূর যান নাই, কি একটা প্রয়োজনে তাঁহাকে পাশের ঘবে বাইতে হইয়াছিল; গুপ্ত-দম্পতির কথা তাঁহাব অগোচর বহিল না।

মিঃ গুপ্তর গভীর সহৃদয়তার ভিতর হইতে তাঁহার 'ব্যবসায়ী' বুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িলেও, তাঁহার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া উচ্চাভিলাষী বিভাকরের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক, তাঁহাকে সাগর-পারে যাইতেই হইবে। চঞ্চল মনকে সুস্থির করিয়া বিভাকর বাড়ী বাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

নির্দিষ্ট দিন গুপ্ত সাহেবের আদেশে আছতিই বাড়ীর মোঁবে তাঁহাকে স্টেশনে বাগিতে আসিল। বিভাকরকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া সে কহিল, "যত শীগ্গীর পারেন, যিবে আসবেন। কটি খোকাটির মতন মা'র আদরে ভুলে সেখানেই থেকে যাবেন না যেন।"

বিভাকর ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "তোমাদের ছেড়ে দরে থাকা আমার পক্ষে কঠিন, আছতি।"

"সত্যি না কি? এত টান আবার কবে থেকে হ'য়েছে শুনি?"—বলিয়াই আছতি হাসিয়া উঠিল। ব্যাকুল আগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া বিভাকর কহিলেন, "সে কি তুমি জান না? কিছুই জান না, আছতি! তুমি কি কিছুই বুঝতেও পার না?"

আছতি এবার গম্ভীর ভাবে কহিল, "আমি বুঝতে অনেক-কিছুই পারি, কিন্তু এখন বুঝে কোন লাভ নেই। যদি কোন দিন যোগা হয়ে আসতে পারেন, তা হ'লেই—" তাহার কথা সে শেষ করিতে পারিল না।

বিভাকর ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "আমি সেই চেষ্টাই করব আছতি! প্রাণপণে তোমার যোগা হগাই চেষ্টা করব। তাই আশার সাধনা।"

"বেশ, তখনই তা হ'লে এ-সব কথা হবে, এখন নয়।"

তাহার কথা শেষ হইতেই ট্রেণ প্রাটেক্স তাগ করিল। বিভাকর নির্নিমেষ নেত্রে অদবদ্বিনী আছতিকে দেখিতে লাগিলেন।

পিতামাতার সহিত মিলনানন্দে কয়েক দিন কাটাবার পূর্বে বিভাকর এক দিন সন্ধ্যায় বুঝিয়া তাঁহার মনের কথা মায়েব নিকট প্রকাশ করিলেন; অগাঢ় কথার পূর্বে মুখ তুলিয়া মা'র মুখেব দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি বিলেত যাব ঠিক কবেছি, মা। ভেবে দেখলুম, এখানে এম-এ পাশ কবেও তখন কোন ভাল চাকরী পাবার আশা নেই। তাব চেয়ে যদি ওখানে থেকে ব্যাবিষ্ঠাব হয়ে আসতে পারি—"

প্রিয়নাথ সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন। উদ্বেজনাতিশয়ো যোগ-ক্লিষ্ট দেহ লইয়াই তিনি দ্রবের বাহিরে আসিলেন। সলোচনা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া স্বামীর কাছে গিয়া কহিলেন, "তুমি আবার এই শরীর নিয়ে এখানে এলে কেন?"

সে কথার উত্তর না দিয়া বিভাকরের মুখেব দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "কি বলছ, খোকা? তুমি বিলেত যেতে চাও?"

পিতার মুখেব দিকে চাহিয়া বিভাকর দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "হ্যাঁ। এখানে উন্নতির আশা খুব কম। ওখানে গেলে তবু কতকটা উপায় হ'তে পারে, তাই—"

পিতা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু তার খরচ তুমি কোথায় পাবে? এই ত আমাদের অবস্থা! তোমার কলকাতার খরচই চালাতে পারিনি।"

কথাটা বলিতে বিভাকরের মুখে ঝাঞ্ঝিতেছিল; কিন্তু ক্ষণিক

ধিধার পর তিনি উত্তর দিলেন, "লেমন ক'বে হোক, কিছু টাকা আমরা দিতেই হবে।"

পিতা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু কেমন ক'রে টাকার যোগাড় হবে, সেইটাই ত আমি ভেবে পাচ্ছি না, খোকা! তোমার ত অজানা কিছু নেই। আমাদের সম্বলের মধ্যে ত ঐ জমিটুকু। আব কি আছে বল? আমি ও-কথা শুনে—"

পিতার কথা শেষ হইবার পূর্বেই বিভাকর কহিলেন, "নাথরাজ জমি, ওটা আব বাগানটা বেচলেই তো কিছু টাকা পাওয়া যায়। বাকি টাকাটা লেমন ক'বে হোক, জোগাড় হ'য়ে যাবে, বাবা।"

পিতা-মাতা উভয়েই বিহ্বল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখেব দিকে চাহিয়া বহিলেন। মুহূর্ত্ত পূর্বে সলোচনা আর্ন্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুই বলছিস্ কি খোকা? ঐ শেষ সম্বলটুকু ঘুটিয়ে আমরা পথে দাঁড়াব? ওটুকু গেলে খাব কি?"

বিভাকর অবচলিত স্বরে কহিলেন, "এই কটা বছর কষ্ট ক'রে কাটিয়ে দাও, মা! তার পূর্বে আমি যিবে এলে আর ভাবনা থাকবে না। ক'টা বছরই ত—"

কিন্তু সেই কয়টা বৎসর যে কি ভাবে এই দুই জনের কাটিবে, তাহার সম্ভব-অসম্ভব কোন উপায়ই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না।

বিনতি-কাতর কণ্ঠে বিভাকর কহিলেন, "তোমরা এতে আর আপত্তি কোর না। যদি জীবনে উন্নতি কিছু হয় ত এতেই হবে। এ-ছাড়া অল্প কোন উপায়ই আমি দেখছি না।"

প্রিয়নাথ একবার বলিতে চাহিলেন, এ দেশে থাকিয়াও উন্নতি লাভ করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয় নাই; বিভাকরের পক্ষেই বা কেন হইবে? কিন্তু কি ভাবিয়া সে কথা না বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কি একান্ত ইচ্ছা বিলেত যাওয়া?"

"হ্যাঁ, বাবা, আমি যাবই স্থির করেছি।"—পিতার মুখেব দিকে না চাহিয়াই বিভাকর এই উত্তর দিলেন।

নৈশ অন্ধকার-সমালম্বন গৃহপ্রসঙ্গের দিকে বহুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া-থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, "তবে আব তোমায় বাধা দিতে চাই না। বেশ, তাই হবে। ঐ বাগান আব জমিটুকু বিক্রী ক'রে বা পাওয়া যাবে, তাই তোমায় দেব—তোমার কাননাই পূর্ণ হোক, বাবা।"

ব্যাকুল ভাবে সলোচনা বলিয়া উঠিলেন, "কি বলছ তুমি? যথাসর্বস্ব খুয়িয়ে আমরা কি শেষে পথে দাঁড়াব?"

অতি স্নান হাসির সঙ্গে প্রিয়নাথ কহিলেন, "আমার দেহে এখনও কিঞ্চিৎ সামর্থ্য আছে, ছোট বৌ! খাটতে পারব। ভিটেটুকু রইল ত; বা আনতে পারি, তাতেই আমাদের হু'টি প্রাণীর কোন রকমে চলে যাবে। ওব যদি ভাল হয়, উন্নতি হয়, তাতে বাধা দেব না।"

ছেলের মুখেব দিকে চাহিয়া সলোচনা কি বলিতে গিয়া থাকিলেন। কথা যেখানে থাকিবে না, সেখানে কিছু না বলাই ভাল; কিন্তু গভীর অভিমানে মা-হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের দিকে একবারও যে চাহিল না, তাহাকে দুঃখ জানাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। স্বামীর রোগশীর্ণ অপটু দেহের দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু দু'টি সজল হইয়া উঠিলেও, পুত্রকে তিনি আর একটা কথাও বলিলেন না। তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন সম্ভানই যখন অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকে চিবদারিদ্র্যের গাঁতায় নিক্ষেপ করিয়া নিজের সুখেব সন্ধানে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে, তখন স্বামীর অস্বস্থ্যতাব

যুক্তিতে তাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে তাঁহার মন সবিল না। বেদনাবিদ্ধ সজল চক্ষুর ঝাপসা দৃষ্টি অজ্ঞ দিকে ফিরাইয়া তিনি স্বল্প ভাবে বসিয়া রহিলেন।

বিভাকরের মন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিল। এ অবস্থায় পিতা মাতাকে যে অনেকগানিষ্ট কষ্ট সহ করিতে হইবে, ইহাও তিনি বুঝিলেন। তবুও নিজের ইচ্ছাকে তিনি খর্ব করিবেন, সে শক্তি তাঁহার ছিল না। নিজের স্বার্থচিন্তায় পিতা-মাতার দুঃখ-কষ্ট ও অভাবের চিন্তা ঝঙ্কা-তাড়িত শুষ্ক বৃক্ষপত্রের জায় কোথায় উড়িয়া গেল! কিছু কাল নীরব থাকিয়া তিনি মাতাকে লক্ষ্য করিয়া পাশ্বনা-দানের অভিপ্রায়ে বলিলেন, “ক’টা বছর একটু কষ্ট ক’রে কাটিয়ে দাও, মা! তাব পর—”

প্রিয়নাথ বাধা দিয়া কহিলেন, “সে পরের কথা পরে হবে, খোকা! উপস্থিত কবে তোমার টাকা চাই?”

“একটু তাড়াতাড়ি দরকাব, বাবা, যত শীগগীর হয়।”

“আচ্ছা, সেই ব্যবস্থাটী করব এখন।”

প্রিয়নাথ উঠিয়া যাঠিতেছিলেন। বিভাকব বলিলেন, “তুমি রাগ করলে না ত বাবা? মা, তুমি?”

অত্যন্ত ম্লান, অত্যন্ত ক্ষীণ একটু হাসির সঙ্গে প্রিয়নাথ কহিলেন, “রাগ? সম্বানের উপর রাগ কববার ক্ষমতা ভগবান্ মানুষকে দেননি, পোকা! যত অজ্ঞায়, যত অত্যাচার সে করুক, মা-বাপকে হাসিমুখে সব সহ কবতে হবে, তা ছাড়া কোন উপায় নেই, বাবা! ভগবান্ এইখানে মানুষকে বড় বেশী ঢকল ক’বেছেন। স্নেহের কাছে তাকে হার মানতেই হবে! কিন্তু না বাবা, তোমার উপর রাগ আমবা করিনি। তুমি যদি তোমার উন্নতির পথ খুঁজে নাও, আমরা কেন তার জন্তে যথাসাধ্য চেষ্টা না করব?”

সুলোচনা মুগ্ধ ফিরাইয়া উদ্গত অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। প্রিয়নাথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কি বলিতে গিয়া আবার তাহা বলিলেন না। প্রিয়নাথ কম্পিত পদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করিলেন। স্নেহাতুর পিতৃ-মাতৃচিন্তের গভীর ব্যথা সে-দিন বিভাকব অনুভব করিতে পারেন নাই। সে দিন বুঝেন নাই, সম্বানের জন্ম হাসিমুখে তাঁহারা কতগানি দিয়া যাঠিতে পারেন।

তিন

স্বদীর্ঘ পাচ বৎসর পবে বিভাকব নাবড় মেঘমালা-সমাস্ক্রম শ্রাবণের এক বিহঙ্গ মধ্যাহ্নে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্যারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমন, আছতির সাহিত্য বিবাহ, বিদেশী অনুকরণে স্বদ্র প্রবাসে মধুচন্দ্রমা যাপন—ইত্যাদি কারণে এ কয় বৎসর তাঁহার বাড়ীতে আসা যেমন ঘটয়া উঠে নাই, জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সেখানকার সংবাদও তেমনই সময়মত লইবারও স্রযোগ হয় নাই। বাড়ীতে প্রতি পূর্ববৎ আকর্ষণ থাকিলে হয় ত স্রযোগের অভাব হইত না; তবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বাড়ীতে পিতামাতা ভালই আছেন। কোন দুঃসংবাদ থাকিলে তিনি অবশ্যই তাহা জানিতে পারিতেন। সুতরাং বিভাকব এই দীর্ঘকাল পরে নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ী আসিলেন।

পথের ধার হইতে গৃহের দিকে চোখ পড়িতেই বিভাকব চমকিয়া উঠিলেন। কয় বৎসবে এ কি গভীর পরিবর্তন! পত্রহীন

বজ্রাহত তরুর মত শুষ্ক জীর্ণ মূর্তিতে অতীতের কঙ্কালের জায় খান-দুই মাটির ঘর কোন মতে যেন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! খড়ের চালগুলি প্রায় খসিয়া পড়িয়াছে। বাঁশের বেড়ার গা হইতে মৃত্তিকার আবরণ বহু দিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ঘরের বাঁশের খুঁটিগুলি ঘুণে জীর্ণ ও ফোপ্বা করিয়া ফেলিয়াছে—সহস্র ছিদ্রে পূর্ণ হইয়া তাহার কোন রকমে দাঁড়াইয়া আছে। পথের ধারে দাঁড়াইয়া বিভাকব চোখ দুটো ভাল করিয়া মুছিয়া আবার চাহিলেন। বাড়ীতে কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। বিকম্পিত বক্ষে এই পথটুকু আসিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া বিভাকব ডাকিলেন, “মা, মা, আমি এসেছি!—বাবা!”

ঘরের ভিতর হইতে আধময়লা খান-পরা একটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। বিভাকব বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বহিলেন। ইহাকে খুব বেশী পরিচিত বলিয়া মনে হইলেও চিনিতে বাধিল। মেয়েটি সহজ ভাবেই তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, “ঘরের মধ্যে এস, বিভূদা! মামীমার বড় অস্ত্রপ।”

এইবার বিভাকব চিনিলেন। অক্ষুট কণ্ঠে বলিলেন, “বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ!—” বিদ্যুৎ প্রতিবেশী-কণ্ঠা, তাঁহার বাল্যসখী!

বিদ্যুৎ ম্লান হাসিয়া বলিল, “চিনতে পারনি বুঝি এতক্ষণ? এস, ভিতবে এস।”

বিভাকব কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, মধুমুগ্ধের মত তাহার অনুসরণ করিয়া ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঘরের মাঝখানে শয্যায় সতিত মিশিয়া পড়িয়াছিল এক নারী-দেহ। ঈষৎ অক্ষকবামুগ্ন কক্ষে বিভাকব তাঁহাকে দেখিয়া ঠিক চিনিয়া উঠিতে না পারিলেও সেই পীড়িতা নারীর ক্ষীণ-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, “খোকা এসেছি, বাবা! আঃ, সত্যই হবে দেখতে পেলাম তোকে।”

বিভাকব আর্ত কণ্ঠে অক্ষুট টীংকাব করিয়া উঠিলেন, “মা, মা, এ তোমায় আমি কি দেখছি! কি দেখছি?”

বিদ্যুৎ বন্ধ জানালা ত’টা খুলিয়া দিতেই ঘবখানা আলোকিত হইয়া উঠিল। জননীরা শুভ্রবাস নিবাতবণ দেহেপ দিকে চাহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিভাকব সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন।

অতি কষ্টে সুলোচনা শয্যায় উঠিয়া-বসিয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, “একটা বছরও আগে যদি আসতিস্ পোকা! শেষ সময় পর্যন্ত তোকে দেখবার আশা তাঁব যায়নি। পথের দিকে চেয়েই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে গিয়েছে রে! বড় দেবী কবে এল বাপ!”

বিভাকবের চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা নামিল। মাতাপুত্রের অশ্রু একত্র মিশিল। বিভাকব শুনিলেন, সর্দস্ব-বিনিময়ে পুত্রের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া কি দারুণ কষ্টে অভাবে তাঁহার পিতাকে শেষ কয়টা বৎসর কাটাইতে হইয়াছিল! এ ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামে তাঁহার কোন চাকরী মেলে নাই। অনাহারে, অর্ধাহারে, দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে। শেষ সময়ে ঔষধ দূরে থাক, পথ-টুকুও মিলে নাই।

প্রস্তরমূর্তিব জায় বিভাকব স্বল্প ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরে কথ্য জানিতেছিলেন শুধু অন্তর্যামী।

বিদ্যুৎ বলিল, “ওঠ বিভূদা, কত দূর থেকে এলে! মুখে-চোখে জল দাও।”

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুলোচনা বলিলেন, “এ বিদ্যুৎ, ওরই

জগতে এখনও আমার দোষে প্রাণটা কোন রকমে টেকে আছে। ওর ঋণ জন্মজন্মান্তর ধরেও শোধ দিতে পারব না আমি।”

“বিদ্যুৎ কি এখানেই থাকে? ওর বিয়ে হ'ল কোথায়, মা?”

বিদ্যুৎ এ-কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া অন্ধ দিকে চাহিল। সুলোচনা ললাটে একটা করাঘাত করিয়া বলিলেন, “ও-মেয়েটারও পোড়া ভাগা। টাকা ত ছিল না বাপ-মায়েব। বিনি পয়সায় আর কি হবে? ও-পাড়ার কেশবের কাকা—”

বাধা দিয়া বিভাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ কেশব? যাকে আমরা মামা বলতুম?—তারই কাকা?”

“হী, সে-ই। এক ঘর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, গিন্নী মরতেই আবার তিনি বিয়ে করলেন। তাঁর হাতেই দেওয়া হ'ল বিদ্যুৎকে। তার পব তিন মাসের মধ্যেই ওর হাতেব নোয়া ঘুটলো।”

বিভাকর বহুক্ষণ ধবিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তিনি শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার বালাসগীর মুখেব দিকে চাহিয়া বহিলেন।

সুলোচনার উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল না। তিনি ধীবে-ধীবে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিভাকরকে মৃদুস্বরে কহিলেন, “শরীর বেশ ভাল ছিল ত, খোকা? বড় রোগা দেখাচ্ছে তোকে।”

অমুযোগের একটা বাণীও জননীৰ মুখে উচ্চারিত হইল না। তাঁহার অগাধ অসীম স্নেহ একবিন্দুও হ্রাস হয় নাই।

বিভাকর চাবিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দরিদ্র সংসারের সামান্য জিনিষপত্র বাহ্য কিছু ছিল, তাহার চিহ্নমাত্র নাই! সুলোচনার পবিত্রিত বস্ত্র মলিন ও শতচিন্ন। দেহেও মৃত্যুর করাল ছায়া পবিস্ফুট; মহাযাত্রার গেন আর অতি অল্পই বিলম্ব! বিভাকরের চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা বহিল। পুত্রের পাংশু মুখের পানে চাহিয়া মায়ের ক্ষুদ্র চিত্ত বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, “অমন ক'রে বসে থাকিস না, বাবা, ওঠ! তোব চোখে জল দেখলে কি আমি স্থির থাকতে পারি?”

তুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিভাকর বহুক্ষণ নিঃশব্দে রোদন করিলেন। মা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “কেন কাঁদছিস, খোকা! কেন কাঁদছিস? অমন ক'রে কেঁদে আমায় কষ্ট দিসনি; তোর কান্না সহ করতে পারছি নে।”

বিভাকর চোখ মুছিলেন। সুলোচনা স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, “আজ আর আমার কোন দুঃখ নেই, বাবা! তোকে দেখে আমার সব কষ্ট আজ দূবে গিয়েছে; এবার শান্তিতে মরতে পারব। শেষ সময় তোকে বে দেখতে পাব—এ আশা আমার ছিল না।”

তৃপ্তর আনন্দে সুলোচনার নিশ্চিন্ত চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পলকহারা চোখে বিভাকর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন।

পরদিন সকালে বিভাকর কহিলেন, “মা, তোমায় নিয়ে আজ আমি কলকাতায় যাব। গঙ্গার ধাৰে রাখব তোমায়। দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাটও দেখবে চল।”

সুলোচনার শীর্ণ মুখ ঋণেকের জঞ্জ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রবল চেষ্টায় বড় একটা প্রলোভন সংযত করিয়া তিনি কহিলেন,—“না, খোকা, শেষ সময়ে এখানেই আমি থাকতে চাই। সকল তাঁর্থের বড় আমার স্বামীৰ এই ভিটাটুকু; এ ছেড়ে অল্প কোথাও যেতে পারব না।”

“বেশ ত মা, চিকিৎসায় তোমায় সুস্থ ক'রে তুলে আবার

এখানে রেখে যাব। এখন চল, এখানে এ অবস্থায় তোমায় রেখে যেতে পারব না, মা!”

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া মা বলিলেন, “এখানে আমি বেশ থাকব, খোকা! তুই কিছু ভাবিস্ নে।”

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিভাকর আব তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না; হতাশ ভাবে কহিলেন, “তবে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসি?”

সুলোচনার শীর্ণ মুখে বেদনার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন, “পাগল হয়েছিস, খোকা? ডাক্তার আমার কি চিকিৎসে ক'বে?”

বিভাকর বলিলেন, “চিকিৎসা ক'রে তোমাকে সাবিয়ে তুলবে।”

সুলোচনা তেমনি ভাবে হাসিতে লাগিলেন। বিভাকর তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, “আজকের দিনটা একাই থাক, মা! ডাক্তার নিয়ে কালই আমি ফিবে আসব। তোমায় ছেড়ে আর কোথাও যাব না।”

“শেষ ক'টা দিন যদি কাছে থাকতে পারিস, ভালই; কিন্তু ডাক্তারে দরকাব নেই, খোকা! তিনি যে ভাবে গেছেন, তেমনি ভাবেই আমাকেও তাঁব কাছে যেতে দে! তাকে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারিনি, অন্যভাবে, বিনি চিকিৎসায় তাঁকে বিদায় দিয়েছি বে! বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। আমি ওষুধ খাব কি ক'রে? তুই দুঃখ করিসনি, খোকা!”

ছোট ছেলেটির মত জননীৰ বুক মুখ পুকাইয়া বিভাকর কাঁদিলেন। অভিমানভবে বলিলেন, “মা, আমার কাছ থেকে কিছুই তুমি নেবে না?”

“নেব বৈ কি, বাবা! তোমার হাতে জল পাব, আশ্বিন পাব, সেই যে আমার চরম পাওয়া, খোকা! এব বেশী আশাও ত আমার নেই। তোকে রেখে যেতে পারছি, এই আমার ভাগ্য। এব বেশী আর কি চাইবার আছে আমার?”

আশীর্বাদপূর্ণ হাতখানা ছেলের মাথায় রাখিয়া মা বলিলেন, “ওঠ খোকা, এমন ক'রে কেঁদে আমায় কষ্ট দিসনি!”

সপ্তাহ শেষে গ্রামের আশানে জননীৰ শেষ কাজটুকু শেষ করিয়া বিভাকর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আছতির ধারণা, এই ঘটনার পব হইতে বিভাকর কেমন যেন বদলাইয়া গিয়াছেন।

চার

রাত্রি বাড়িতেছিল। বিভাকর কেমন স্তব্ধ, অতিভূতের মত বসিয়া বহিলেন। ভূত্য কয় বার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি খাইতে যাউবেন কি না? বিভাকর উত্তর দিলেন না। সে কথা যে তাহার কানে গিয়াছে—এমনও মনে হইল না।

নৈশ শোভা উপভোগ করিয়া আছতির ফিরিতে বিলম্ব হইবে—ইহা তিনি বলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত দাস-দাসীদের বসিয়া থাকিতে হইবে। তাই বিভাকরের আহায়ে বিলম্বের জঞ্জ তাহাবা বাস্তব হইল না; তাঁহাকেও আব কেহ বিরক্ত করিতে আসিল না।

প্রণব বাড়ী যাইবার জঞ্জ প্রস্তুত হইল। আছতির আদেশে সরকার তাহার প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিলেন। সামান্য জিনিষ-পত্রগুলি ষ্টীল-ট্রাকটার মধ্যে রাখিয়া প্রণব বিভাকরের গৃহে আসিল।

বিভাকর তাকে লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহার মন কোন্ সুদূর অতীতের কোন্ স্থানে গিয়া আজ আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে! প্রণব তাহা বুঝিল না। কিছু আশ্চর্য্য হইয়াই সে বিভাকরের দিকে চাহিয়া কহিল, “আমি তা হ’লে যাচ্ছি, সার!”

বিভাকর কথা কহিলেন না। তাহার কথা শুনিয়াছেন, এমনও মনে হইল না। আরও খানিকটা নীবব থাকিয়া প্রণব বলিল, “আমাকে এখনই যেতে হবে, সার!”

তবুও বিভাকর নির্বাক! তাঁহার আরও কাছে আসিয়া প্রণব কহিল, “আমি তা হ’লে যাচ্ছি, সার! আর সময় নেই।”

এবার বিভাকর সম্মুখের দিকে চাহিলেন। প্রণব যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিল, “আমি চলুম, সার! ট্রেনের সময় হ’য়েছে।”

“যাচ্ছ? যাওয়াই তা হ’লে তুমি স্থিব ক’রলে? কাজ তবে ছেড়েই দেবে?”

বিষাদাপন্ন কণ্ঠে প্রণব কহিল, “তা ছাড়া উপায় কি? বাবার অসুখ, মা সেখানে একা, যেতে আমাকে হবেই। এ চাকরীটুকু গেলে কষ্ট আমার খুবই হবে, সার! আপনার স্নেহে এখানে খুব সুখেই ছিলাম; কিন্তু—”

দুঃখে ক্ষোভে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; কথা সে শেষ করিতে পারিল না। বিভাকর নীরবে কি ভাবিতেছিলেন। টেবলের ঘড়ির দিকে চাহিয়া প্রণব চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাস্তবাবে আর একবার নমস্কার করিয়া কহিল, “আপনার স্নেহ আমার চিরদিন মনে থাকবে।—তা হ’লে যাই?”

“যাবে? ও, হ্যাঁ, একটু দাঁড়াও, একটুখানি।”

“আমার ট্রেনের সময় হয়ে এল, সার! অনেকটা পথ।”

“ট্যান্কি ক’রে যেও; একটু দাঁড়াও—একটু—”

বিস্মিত ভাবে প্রণব বিভাকরের দিকে চাহিল। এত চঞ্চল, এমন অপ্রকৃতিস্থ তাঁহাকে সে কোন দিনও দেখে নাই!

বিভাকর উঠিয়া ঘরের এক প্রান্তে চলিলেন। এক খণ্ড কাগজে কি লিখিয়া কাগজখানি তিনি প্রণবের হাতে দিয়া কহিলেন, “যেতে পার তুমি এবার। ভগবান তোমার বাবাকে শীঘ্র সুস্থ করুন।”

হস্তস্থিত কাগজখানির দিকে চাহিয়া প্রণব বিস্ময়াতিভূত কণ্ঠে কহিল, “এ কি সার! এ যে দু’হাজার টাকার চেক!”

“হ্যাঁ, তোমায় দিলুম আমি; তোমার সংসার-পথের পাথর, ওটা তুমি নিয়ে যাও, প্রণব।”

অবাক হইয়া কয় মুহূর্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রণব কহিল, “এত টাকা! এ আমি কি কব? দিচ্ছেনই বা কেন?”

চঞ্চল চরণে বিভাকর ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। প্রণবের বিস্ময়-বিহ্বল মুখে দিকে চাহিয়া কহিলেন, “ভারী খসী হয়েছি আমি তোমার উপর। কোন প্রলোভনেই তুমি তোমার কর্তব্য ভুলে যাওনি। চাকরীর মোহ তোমায় আটকে রাখতে পারলে না, সংসারের সব জিনিষের চেয়ে তোমার কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছেন তোমার মা, তোমার বাবা। তাই তোমায় দিলুম ঐ টাকাটা। তোমাকে এব পর এখানে রাখতে পাব না; কারণ, সে শক্তি সত্যিই আমার নেই; হয় ত এ আমার দুর্বলতা, কিন্তু তোমায় মনে রাখব চিরদিন। সময় হয়েছে, যাও, আব দেবী কোর না।”

প্রণব কথা বলিবার আগেই বিভাকর সেট কক্ষ তাগ করিলেন।

জ্যোৎস্না ঘোষ।

এস পুনঃ চিন্ত-বন্দাবনে

স্বর্গের দেবতা অ, চাহি না কো পূজিবার

মন্দিরে মুরতি গড়ি’ হেমে,

ছাড়ি’ দেবতার বেশ নর-রূপে, হনীকেশ!

এস তুমি ধরণীতে নেমে।

রাজবেশ দ্বারকার চাহি না দেখিতে আর,

অসি ও কিরীটে নাহি কাজ;

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন মথুরার সিংহাসন

ভ্যজি’ তুমি এস ব্রজরাজ!

বালগোপালের বেশে পুত্ররূপে হেসে হেসে

এস তুমি কোলে যশোদার,

আতীর পল্লীতে ঘুরি’ কীর সর ননী চুরি

করিয়া বাড়াও জালা মা’র।

পাঁচনী লইয়া হাতে শিখিচূড়া বাঁধি’ মাথে

সখা-রূপে রাখালের সনে,

গোকুল করিয়া আলো সবারে বাসিয়া ভালো

এস পুনঃ চিন্ত-বন্দাবনে।

হে দরদী রসরাজ! প্রিয়রূপে আসি’ আজ

শ্রীরাধারে দাও দরশন,

বসা’য়ে প্রেমের মেলা গোপীসনে রসখেলা

কর রচি’ নব কুঞ্জবন।

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)।



দশম অধ্যায়

শ্রীল মদনমোহনের মন্দিরনির্মাণ

যখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশাদিত্য টীলায় শ্রীল মদনমোহনের সেবা স্থাপন করিলেন, তখন কোনও মন্দির নির্মিত হইতে পারে নাই। নিষ্কিঞ্চন সনাতন গোপমূর্ছন জলে সিদ্ধ করিয়া তদ্বারা কুটির মত যে পদার্থ প্রস্তুত করিতেন, তাহার নাম “আঙ্গাকড়ি”। ইহাতে তিনি লবণ মিশাইতেন না। এই আঙ্গাকড়ির সহিত বহু শাকসিদ্ধ একমাত্র উপকরণ, তদ্বারা ঠাকুরের ভোগ হইত। কিন্তু রাজা বজ্রনাভের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন তাহাতে তৃপ্তিলাভ না করিয়া স্বপ্নে সনাতনকে জানাইলেন, ভোগের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ না থাকিলে তিনি উহা ভোজন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ঠাকুরকে সনাতনের নিকট এই অমুযোগ করিয়া হতাশ হইতে হইল! সনাতন স্বপ্নের সুযোগ না লইয়াই আশ্চর্যক ভক্তিতরে নিবেদন করিলেন, “ঠাকুর, আমার ত কিছুই সম্বল নাই; আমি কি উপায়ে তোমার জন্ম সুস্বাদু ভোগ সংগ্রহ করিব? তাহা যদি নিজেই যোগাড় করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে আর আমাকে ভাবিয়া মরিতে হয় না, ঠাকুর!” প্রস্তাবটি অসঙ্গত নহে বুঝিয়া সুবিবেচক শ্রীল মদনমোহন সনাতনকে এই দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া স্বাবলম্বী হইলেন; অর্থাৎ নিজের অবস্থানের জন্ম মন্দির এবং সেবার জন্ম রাজোচিত ভোগেরও ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। মূলতানের বণিক কৃষ্ণদাস কাপুর অনেকগুলি বাণিজ্য-তরনী বহুবিধ পণ্যে পূর্ণ করিয়া বাণিজ্য-যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার তরনীগুলি শ্রীবৃন্দাবনের নিকট আসিয়া বালুকাপূর্ণ চড়ায় বাধিয়া গেল, বহু চেষ্টাতেও তাহা মুক্ত করা সম্ভব হইল না। কৃষ্ণদাস নিরুপায় হইয়া নদীতীরে অবতরণ করিলেন, এবং কি উপায়ে তরনীগুলি বালুচর হইতে জলে ভাসাইবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া

একটি বালক তাঁহার নিকট আসিয়া “তাঁহাকে বলিল— “ঐ যে উঁচু টীলার উপর একটি সাধু বসিয়া আছেন, উনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন; তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যদি তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পার, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় তুমি সকল বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে।” কৃষ্ণদাস কাপুর নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সনাতন গোস্বামী একখানি পর্ণ-কুটীরে উপবিষ্ট, এবং শ্রীমদনমোহন দেব তাঁহার সম্মুখে সমাসীন। কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীমদনমোহনের অপূর্ব জ্যোতির্শয়, মাধুর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর নিকট তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিলে নিষ্কিঞ্চন সনাতন শ্রীল মদনমোহনের নিকট কৃষ্ণদাসকে তাঁহার প্রার্থনা নিবেদন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণদাস তখন মদনমোহনের নিকট এই মর্মে ‘মানসিক’ করিলেন যে, যদি তাঁহার বাণিজ্য-তরনীগুলি নিরাপদে অভীষ্ট স্থানে উপনীত হয়, তাহা হইলে পণ্য বিক্রয় করিয়া তিনি যাহা-কিছু লাভ করিতে পারিবেন, তাহা তিনি শ্রীল মদনমোহনের সেবায় ও শ্রীমন্দির-নির্মাণে অর্পণ করিবেন। এই প্রার্থনার কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার বাণিজ্য-তরনীগুলি চড়া হইতে মুক্ত হইয়া জলে ভাসিল। সেবার তিনি তরনীপূর্ণ পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমদনমোহনের জন্ম সেখানে একটি ক্ষুদ্র সুদৃশ্য মন্দির ও ভোগশালা বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করাইলেন, এবং মদনমোহনের নিয়মিত ভোগেরও সুব্যবস্থা করিলেন। কথিত আছে, কৃষ্ণদাসও সনাতনের কৃপায় ভক্তিলাভ করেন, এবং মূলতানে ফিরিয়া স্বগৃহেও শ্রীমদনমোহনের প্রতিষ্ঠা করেন। যাহা হউক, কৃষ্ণদাসের প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র মন্দিরেই শ্রীল মদনমোহনের রাজবৎ সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; কারণ, মথুরা তখন একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং মথুরার বাণিজ্যজীবী শ্রেষ্ঠগণ মদনমোহনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সেবায় যথেষ্ট

অর্থ ও সম্পত্তি দান করিতেন। আনুমানিক ১৪৬০ শকে কৃষ্ণদাস কাপুর শ্রীবন্দাবনে শ্রীল মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির কালক্রমে জীর্ণ হইলে কি প্রকারে যশোহরের রাজবংশোদ্ভূত রাজা বসন্তরাওয়ের পিতা গুণানন্দ গুপ্ত (আনুমানিক ১৫০০ শকে) শ্রীল মদনমোহনের স্মৃষ্ক মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং বর্ষীয়ান শ্রীজীবগোস্বামীর তত্ত্বাবধানে নির্মিত ঐ মন্দির কি প্রকারে শ্রীবন্দাবনের সর্কশ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া গণ্য হইয়াছিল—এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিন্তু তৎপূর্বে গুণানন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যিক।

মহারাজা আদিশূর কনৌজ হইতে বঙ্গদেশে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও তৎসহ যে পাঁচ জন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন, বিরাট গুহ এই পঞ্চ কায়স্থেরই অন্ততম। বিরাটের অধস্তন নবম পুরুষ অশ্বপতি গুহ (বা আশু গুহ) বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। অশ্বপতি গুহের প্রপৌত্র রামচন্দ্র গুহ বাঙ্গালার নবাব সুলেমান কররাণীর পরম স্নহদ ছিলেন। রামচন্দ্র গুহের তিন পুত্র— ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দের মধ্যে তাঁহার মধ্যম পুত্র গুণানন্দ শৈশব হইতেই নিষ্ঠাবান ভক্ত ও সাধনপরায়ণ থাকায় সরকারের কোন কার্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবানন্দ ও কনিষ্ঠ শিবানন্দ গোড়ে নবাব সুলেমান কররাণীর হিসাব ও রাজস্ব বিভাগে প্রবেশ করিয়া যোগ্যতাবলে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি, এবং গুণানন্দের পুত্র (?) জানকীবল্লভ নবাবপুত্র দায়ুদের সহিত একত্র শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীহরির সহিতই দায়ুদের অতিশয় সম্প্রীতি হইয়াছিল। গুণানন্দ কিছু কাল পরে শ্রীবন্দাবনধামে প্রস্থান করেন। তখনও শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয়েই নবাব সরকারের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৪৯৫ শকে (১৫৭০ খৃষ্টাব্দে) দায়ুদ বাঙ্গালার নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহার প্রিয় স্নহৎ শ্রীহরিকে ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভকে “বসন্তরায়” উপাধি দান করেন। এই গুহবংশ প্রাচীন বৈষ্ণববংশ, এবং শ্রীচৈতন্যদেবের

শ্রীচরণাশ্রিত বহু বৈষ্ণবের সহিত ইহাদের সৌহৃদ্য ছিল। বিক্রমাদিত্যের পুত্র ‘গোপীনাথ’ পরবর্তীকালে ‘প্রতাপাদিত্য’ উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীন যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

দায়ুদ বঙ্গসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিক্রমাদিত্যকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, এবং বসন্তরায়কে কোষাধ্যক্ষ ও খানিসা বিভাগের সর্কোচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। নবাব অতঃপর স্বেযোগ বুঝিয়া সম্রাটের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দূরদর্শী ভবানন্দ তখন বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের সাহায্যে নিম্নবঙ্গের সুলতান অঞ্চলে, যমুনা নদীর পূর্বপারে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সংগ্রহ করেন, এবং বসন্তরায়কে তথায় প্রেরণ করিয়া যশোহর নগরের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করেন। অনন্তর তিনি দায়ুদের সিংহাসন-ছায়ায় স্বপুত্র বিক্রমাদিত্যকে ও ভ্রাতৃপুত্র বসন্তরায়কে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া প্রচুর ধন ও পরিবারবর্গসহ যশোহরে গমন করেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় দায়ুদের সহিত অবস্থান করিয়া দায়ুদকে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনায় সর্কপ্রকারে সাহায্য করিতে থাকেন। যুদ্ধের সময় দায়ুদ রাজ্যের প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র ও বিপুল ধনসম্পত্তি পর্যন্ত বিখস্ত বন্ধ বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। নবাবের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহার অনুগত ওমরাহ ও আমীরগণও স্ব স্ব ধনসম্পত্তি তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত রাখিতে কুঠাবোধ করেন নাই। দুই ভ্রাতা এই সকল ধন-সম্পত্তি নিরাপদে রাখিয়া রাজকার্যে নিয়মিত ভাবে দায়ুদকে সাহায্য করিতেছিলেন। প্রয়োজন হইলেই দায়ুদ ইহাদের নিকট হইতে আবশ্যিক অর্থ গ্রহণ করিয়া রাজকার্য সম্পাদন করিতেন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৭ শকে) মোগলের আক্রমণে গোড় বিধ্বস্ত হইলে পরাজিত দায়ুদ শাহ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। পুনরায় যুদ্ধে প্রস্তুত হইবার পূর্বে দায়ুদ বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন যে, যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত তাঁহার ও তাঁহার ওমরাহগণের

ধনরত্নের এক কপর্দকও যাহাতে মোগলের হস্তগত না হয়, সে বিষয়ে তাঁহার সতর্ক থাকিবেন ও সেইরূপই ব্যবস্থা করিবেন। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৮ শকে) আক্‌মহলের যুদ্ধে দায়ুদ মোগল কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে বিক্রমাদিত্যের ও বসন্তরায়ের নিকট গচ্ছিত তাঁহার বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকাংশই যশোহর রাজ্যে প্রেরিত হয়। তাহার কিয়দংশ শ্রীবৃন্দাবনে গুণানন্দের নিকটেও প্রেরিত হইয়াছিল। গুণানন্দ নিষ্ঠাবানও সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই অবস্থান করিতেন, এবং শ্রীরূপ সনাতনের যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে পুত্র “বসন্তরায়”-প্রেরিত এই অর্থরাশি প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীজীবের নিকটে তাঁহার অভিলাষ নিবেদন করেন; এবং তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহেই শ্রীজীবের তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীমদনমোহনের প্রকাণ্ড মন্দির নির্মিত হয়। সম্ভবতঃ ১৫০০ শকে এই মন্দিরের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়, এবং ২।৩ বৎসরের মধ্যেই মন্দির সম্পূর্ণ হইলে সেই শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীমদনমোহন দেব স্মৃতিপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানিতে পারা যায়,—

হর ইব গুহবংশো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুণী মণিরিব পুলো যস্য রায়ো বসন্তঃ ।
স্বকৃতস্বকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
বিদধে বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দস্থনোঃ ॥

অনুবাদ—গুহবংশীয় শিবতুল্য রামচন্দ্র গুহ যাহার পিতা, গুণীগণের মুকুটমণির অনুরূপ রায় বসন্ত যাহার পুত্র, শ্রীগুণানন্দ নামক সেই স্বকৃতিশালী ব্যক্তি নন্দ-নন্দনের এই মন্দির যথাবিধি নির্মাণ করিয়া দিলেন।

এই লিপি দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে বাঙ্গালা অক্ষরেও উৎকীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশের গৌরব প্রচার করিতেছে।

শ্রীশ্রীমদনমোহনের এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট, ইহার উত্তর দিকের নাটমন্দিরের দ্বারে “সম্বৎ ১৬৮৪ বর্ষ শ্রাবণ”* এই কয়টি শব্দ লিখিত আছে।

* রায়বসন্তের দ্বিতীয় পুত্র রাঘবরায় যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর যশোহরের জমিদার ছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার কনিষ্ঠভাতা চাঁদরায় এই জমিদারী লাভ করেন। সম্ভবতঃ, ১৬৮৪ সম্বতে বা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে ঈনিষ্ট তাঁহার পিতামহ গুণানন্দ

আরও ২।১টি স্থানে যে সকল অক্ষর উৎকীর্ণ আছে, তাহা কিছু অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; এজন্য ঐ অংশের পাঠোদ্ধার করা অসাধ্য। যমুনা-গর্ভ হইতে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ ‘আদিত্যটীলা’ স্তূপটির উপর মদনমোহন দেবের এই মন্দির নির্মিত।

যমুনার তীর হইতে এই মন্দিরের পোস্তাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, প্রথমে তাহা যেন কেবল আকারে নির্মিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। একটি বুরুজ মাত্র বিদ্যমান থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

উত্তর দিকের মন্দিরটিকেই অনেকে কৃষ্ণদাস কাপুরের নির্মিত পুরাতন মন্দির বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে স্থানীয় বৈষ্ণবগণ এখানে বন্দনাদির পরিবর্তে রন্ধনাদি করেন। তবে গুণানন্দ-নির্মিত দক্ষিণ দিকস্থ মন্দিরে নিতাই-গৌর বিগ্রহের সেবা চলিতেছে।

শ্রীবৃন্দাবনের ইহাই সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ মন্দির। বঙ্গদেশের যশোহরের বসন্তরায়ের পিতা গুণানন্দ গুহ মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া, এই স্মদুর প্রবাসে বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫০০ শকাবে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ইহার ঠিক ৯২ বৎসর পরে ১৫৯২ শকাবে (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এই মন্দির, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দের প্রমুখ মন্দিরগুলি, এবং মথুরার শ্রীকেশবদেবের মন্দিরও ধ্বংস করেন। এই সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইবার পূর্বেই হিন্দুরা পূজারিগণকে গোপনে বাদসাহের ছরভিসন্ধির সংবাদ জ্ঞাপন করেন। জয়পুরের মহারাজা মির্জা রামসিংহের রাজত্বকালে পূজারিগণ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ গোপনে জয়পুরে স্থানান্তরিত করেন। পরে মির্জা রামসিংহের জামাতা করৌলির যদুবংশীয় রাজা শ্রীমদনমোহনকে করৌলিতে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন এখন করৌলিতে বিরাজিত থাকিয়া বাদসাহ

কর্তৃক নির্মিত মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন; এই জন্তই সংস্কারের সম্বন্ধে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

আওরঙ্গজেবের উৎকট হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। তিনি এখনও সগৌরবে বিরাজিত; কিন্তু কোথায় আজ সেই ধর্মধ্বজী বাদসাহ, আর কোথায় বা আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী মোগল সাম্রাজ্য?

শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির-নির্মাণ

শ্রীল মদনমোহনের মন্দির-নির্মাণের দ্বাদশ বৎসর পরে শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই মন্দির জয়পুররাজ মহারাজা মানসিংহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। * মহারাজ মানসিংহ পরমবৈষ্ণব ছিলেন; মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে প্রকাশ,—

“ধন্যরাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাঙ্ক-ভূঙ্গ, গোড়বঙ্গ উৎকলাধিপ।”—মানসিংহ কাবুল জয় করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মানসিংহকে কাবুলের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। লালদাস বাবাজীর বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায়, মাধোসিংহের পত্নীও অত্যন্ত ভক্তিমতী নারী ছিলেন। তাঁহার আদর্শেই মাধোসিংহের হৃদয়ে ভক্তিসঞ্চার হয়। মহারাজ মানসিংহ সম্ভবতঃ শ্রীজীবের অপূর্ণ ভক্তিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও প্রভাবে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীগোবিন্দমন্দির নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজা প্রতাপসিংহ-রচিত হিন্দী ‘ভক্তকল্পদ্রুম’ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, এক সময় আকবর বাদশাহের অধীনস্থ গঙ্গা ও যমুনাভীরবর্তী রাজ-গণের মধ্যে, গঙ্গা ও যমুনা এই উভয়ের কে শ্রেষ্ঠ, তাহা নির্ণয়ের জন্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, আকবরের রাজসভা উভয় দলের সম্মতিক্রমে এই সমস্যার বিচারের স্থান নির্দিষ্ট হয়। অবশেষে ইহার মীমাংসার জন্ত উভয় পক্ষই শ্রীজীব গোস্বামীকে মনোনীত করেন। কিন্তু শ্রীজীব বলিলেন—“শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অত্

কোথাও আমি রাজিয়াপন করিব না। যদি তোমরা এক দিনের মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগ্রায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পার, তবেই আমি আগ্রায় রাজসভায় গমনে সম্মত হইতে পারি।”—রাজগণ অতঃপর ঘোড়ায় ডাক বসাইয়া এক দিনের মধ্যেই শ্রীজীবের যাতায়াতের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী আগ্রায় সম্রাট আকবরের সভায় উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—“গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণোদ্ভবা, এবং যমুনা তাঁহার প্রিয়া, সুতরাং যমুনাই শ্রেষ্ঠ।” বাদসাহ ও রাজগণ উভয়েই শ্রীজীবের এই মীমাংসায় পরিতুষ্ট হইলেন। * পূর্বোক্ত ‘ভক্তকল্পদ্রুম’ গ্রন্থে লিখিত আছে, সম্রাট আকবর তখন আগ্রায় কেলা নির্মাণ করাইতেছিলেন; এজন্ত ঐ সময়ে জয়পুরী লাল পাথর আর কাহারও পাইবার অধিকার ছিল না। কিন্তু মানসিংহের অহুরোধে আকবর তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করিবার জন্ত বিনামূল্যে জয়পুরী লাল পাথর দিয়াছিলেন। প্রস্তর বিনামূল্যে সংগৃহীত হইলেও, কেবল মসলা ও কারি-গরদিগের বেতনের জন্তই এই মন্দির-নির্মাণে মহারাজা মানসিংহের ত্রয়োদশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এই মন্দিরটি উত্তর-ভারতীয় স্থাপত্য-কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া যুরোপীয় শিল্পকলাতত্ত্ববিদগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। মথুরার ভূতপূর্ব কালেক্টর ও মথুরার ইতিহাস লেখক মিঃ গ্রাউসের মতে “এই মন্দিরের তুল্য সুন্দর সুদৃশ্য দেবালয় উত্তর-ভারতে দ্বিতীয় নাই।” যুরোপীয় কলাতত্ত্ববিদগণের মতে এই মন্দিরটি মোগল ও হিন্দু-ভাস্কর্যের মিলনের ফলে নির্মিত। তাঁহাদিগের মতে ইহার নিম্নভাগ হিন্দু-প্রথায়, এবং উর্দ্ধভাগ মোগল-প্রথায়

* মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে দেবনাগরী অক্ষরে এই কথাগুলি ক্ষোদিত আছে,—“সংবৎ ৩৪ শ্রীশকাব্দ আকবর শাহ রাজকীর্ত্তিকুল শ্রীপৃথ্বী-রাজাধিরাজ-বংশ মহারাজ শ্রীভগবতদাসস্ত ত্রীমহাবাজাধিরাজ শ্রীমান্ সিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠ স্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দদেবকে কাম উপরি শ্রীকল্যাণদাস আজাকারী মার্গকচাঁদ চোপাও শিল্পকারি গোবিন্দদাস দিলবলী কারিগর দিঃ গণেশদাস বিমবল।”—আকবর শাহের রাজ্যের ৩৪ বৎসর অর্থাৎ ১৫০০ খৃষ্টাব্দে বা ১৫১২ শকাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়। কল্যাণদাস, আজাকারী, মার্গকচাঁদ চোপাও ভাস্কর, বা শিল্পকারী, এবং গোবিন্দদাস কারিগর বা রাজশিল্পী।

* বাদসাহ ও রাজগণ শ্রীজীবের উত্তরে প্রীত হইয়া তাঁহাকে নানা-বিধ উপঢৌকন দিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীজীব কিছুই লইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে বিশেষরূপে অহুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আমি একরূপ বন মধ্যেই থাকি, তথায় শান্তপ্রস্থ মিলান ভার, অতএব আপনারা যদি বারণসীধাম হইতে বেদপুরাণাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র আনাষ্টয়া দেন, তবে আমার কিছু উপকার হইতে পারে। আমি আর কিছুই চাহি না।”—বলা বাহুল্য, রাজগণ অবিলম্বে শ্রীজীবকে বারণসী হইতে শান্তপ্রস্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন।

নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু আওরঙ্গজেব যখন ইহার উর্দ্ধ-ভাগের অধিকাংশই ধ্বংস করিয়াছেন, তখন ইহার চূড়া এবং উর্দ্ধভাগ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কোনও কোনও যুরোপীয় গ্রন্থকার ইহার ভিত্তিবিত্তাসে ক্রশ চিহ্নের আবিষ্কার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, মন্দিরের ভিত্তিবিত্তাস ব্যাপারে খৃষ্টিয়ান জেমস্‌হট পাত্রিগণের পরামর্শ গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার ভিত্তিবিত্তাসে ক্রশের সহিত কোন সম্পর্কই নাই। অতি সুপ্রাচীন স্বস্তিক-যন্ত্রের সহিত ইহার ভিত্তিবিত্তাসের রীতির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, এবং তাহা অসম্ভবও নহে।

এখন ভগ্ন মন্দিরটির তিনটি বর্তমান আছে। ইহার ত্রিতলের ছাদ হইতে সমগ্র বৃন্দাবন সহর দৃষ্টিগোচর হয়। কথিত আছে, ইহার উপরের আরও তিনটি তলা ভগ্ন করা হইয়াছিল। সেই ছয় তলার উর্দ্ধস্থিত উচ্চ চূড়ায় এক মণ স্বতের যে উজ্জ্বল দীপ প্রজ্জ্বলিত হইল—আগ্নী হইতে তাহার আলোক দৃষ্টিগোচর হইত; হিন্দুর দেবমন্দিরের এত দূর স্পর্শা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলিয়া প্রতীতি হওয়ায় এই মন্দির ধ্বংস করিবার জন্ত আওরঙ্গজেবের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল—এইরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি নানা কারুকার্যে ভূষিত ছিল। নানা অংশে এখন শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় নানাবিধ মূর্তি অঙ্কিত আছে। জগমোহনের দ্বারের তিন দিকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেকগুলি সুন্দর মূর্তি এখনও সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নাট-মন্দিরের বারান্দার উপর ও বহু স্থানে প্রস্তর-নির্মিত নারীমূর্তি আছে। মন্দির-ধ্বংসী বাদসাহের আদেশে সেগুলির মুণ্ড চূর্ণ করা হইয়াছিল।

শ্রীগোবিন্দের মন্দিরই শ্রীবৃন্দাবনের গোড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সর্বপ্রধান আশ্রয়স্থল। শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন মঠাদির প্রতিষ্ঠাকে নিষ্কিঞ্চন ভক্তিপথের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন। প্রকৃত নিকাম বৈষ্ণব-ভক্ত যে ভাবে বৃন্দাবনে রজনী যাপন করিয়া মাধুকরী ভিক্ষায় পরিতৃপ্ত—অনন্ত-চিন্ত হইয়া শ্রীভগবৎ সেবায় কালযাপন করেন, শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনকে

একটি সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারের মূলকেন্দ্র করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদনমোহনের ও শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাই করিয়াছিলেন। পরম বুদ্ধিমান শ্রীজীবের দূরদর্শিতার ফলে শ্রীবৃন্দাবন নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত বৈষ্ণবগণের একটি উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল। মথুরাধামেও বহু দিন হইতে মুসলমানগণের অত্যাচার না থাকায় মথুরা নগরী শিল্প-বাণিজ্যের একটি সুসমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মথুরার শেঠগণ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোপাল-প্রমুখ দেববিগ্রহের সেবায় মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া ধন্য হইতেন। আবার দক্ষিণাপথ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে দলে দলে যাত্রী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়া নানাবিধ উপহার প্রদানে দেবসেবার পরিচালনে সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ, বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ভূস্বামি-গণের ও ভক্ত যাত্রিগণের অযাচিত উপহারে শ্রীবৃন্দাবনের দেব-বিগ্রহগণের রাজবৎ সেবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এক মাস্ক সম্প্রদায় ব্যতীত আর সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই শ্রীবৃন্দাবনকে মহাতীর্থ মনে করিয়া, নানা ভাবে মঠ ও মন্দিরাদি স্থাপনে শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরাকে নব নব শোভায় সুশোভিত করেন। রাজপুতানায়, জয়পুরের, যোধপুরের, উদয়পুরের ও বৃন্দেলখণ্ডের স্বধর্ম-নিষ্ঠ হিন্দু নৃপতিগণ শ্রীমথুরাধামে ও শ্রীবৃন্দাবনে নূতন নূতন মন্দির স্থাপন ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনকে অপূর্ব সুবন্দায় মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসীর বা ব্রজবাসী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ভক্তগণের শ্রীজীবই একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রবেশ-পথে শ্রীগোবিন্দের সুবৃহৎ মন্দিরে শ্রীগোবিন্দের রাজবৎ সেবার ও ভক্তজনের পালনের ব্যবস্থা করিয়া, এবং অপর দিকে শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চাৎঘাটীতে শ্রীল মদনমোহন দেবের মন্দির, ও শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যস্থলে শ্রীরাধা-দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনকে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের ভজন-কেন্দ্রে ও শাস্ত্রপ্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে পরিণত করিয়াছিলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

ইতিহাসের খণ্ডস্বরূপ

সহমরণ-প্রথা উচ্ছেদের সূচনা

সহমরণ-প্রথা উচ্ছেদের ইতিহাস লিখিতে হইলে খৃষ্টান মিশনারী রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা কর্তব্য। রেভারেন্ড কেরী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে দিনেমার জাহাজে বঙ্গদেশে আগমন করেন। জাহাজে অবস্থান কালেই তিনি ভারতবর্ষে প্রচলিত নানা কুসংস্কার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতবা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে শ্রীরামপুরে প্রথম অবস্থানের সময় তিনি কয়েকটি সতীদাহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া এই নৃশংস প্রথা উচ্ছেদের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই প্রথা হিন্দুধর্মের অমুমোদিত ও হিন্দুশাস্ত্র কর্তৃক সমর্থিত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলন করা হিন্দু সমাজের সেই সজীব অবস্থায় কাহারও পক্ষে নিরাপদ ছিল না। খৃষ্টীয় ধর্মের প্রচার তদূরের কথা উক্ত ধর্মের প্রচারকরা এদেশের লোকের ধর্মবিশ্বাসের সামান্য প্রতিকূলতা করিলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিরস্কৃত হইতেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে খৃষ্টীয় ধর্মসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়; সপা বিদ্য গবর্নর জেনারেলের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহারা সেই পুস্তিকার প্রকাশিত সংখ্যালিপি সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে ধর্মসংক্রমণের জরুরি আদেশ প্রচার করেন, ও ভবিষ্যতে শ্রীরামপুরে ঐকম্প কোন পুস্তিকা প্রকাশ বা প্রচার, এবং প্রকাশ্য স্থানে দেশীয়দিগের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারের সকলপ্রকার প্রচেষ্টা রহিত করিবার আদেশ জারী করেন। বস্তুতঃ, এই বর্ণক কোম্পানী কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপন ও প্রভাববিস্তারের প্রারম্ভকালে এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। বিশেষতঃ, ভারতপ্রবাসী যুরোপীয়দিগেরও নৈতিক চরিত্র তৎকালে বিশেষ উন্নত ছিল না; এবং স্বধর্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাবও বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যাইত না। মিশনারীদিগের প্রতি তাঁহাদের সহায়ভূতি ত ছিলই না, অধিকন্তু স্বদেশীয় মিশনারীদিগকে তাঁহারা উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সেইজগৎ সেই সময় এক জন খ্রীষ্টান মিশনারী ভারতে পদার্পণ করিবার পথ ক্ষুণ্ণচিত্তে লিখিয়াছিলেন,—

“Our position is a painful and humiliating one. Europeans everywhere laugh at us, and God seems to cover Himself with impenetrable clouds.” (১)

এমন কি, পরবর্তী সময়ে লর্ড মিন্টোর শাসনকালেও ধর্মপ্রচারের শাস্তিস্বরূপ সাত জন খৃষ্টান মিশনারী নির্যাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহাবও পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ড হইতে এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর কোন কর্মচারী খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদিগকে কোন প্রকার সমর্থন অথবা আর্থিক সাহায্য করিলে দণ্ডনীয় হইবে। ইংরেজ মিশনারীদের যে কোন কার্য বা আন্দোলনকেই

সেকালে সকলে সম্মত করিতেন। বেভারেণ্ড কেরীর ধারণা হইল, দেশীয় জনসাধারণের এই মনোভাবের পরিবর্তনসাধনই তাঁহাদের প্রথম কর্তব্য। অথচ তাহাদের সেই সন্ধিগ্ধ ভাব দূর করিতে হইলে প্রথমতঃ, পরস্পরকে পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম, লোকাচার প্রভৃতি সম্বন্ধেও পরস্পরের জ্ঞান থাকি প্রয়োজন। তিনি তৎপূর্বকই স্বয়ং চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন; এগন স্বয়ং মহৎ উদ্দেশ্যে সফল করিবার জন্য অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং অতি অল্পকালে মধ্যে তিনি শুধু যে একাধিক ভাবতীয় ভাষা আয়ত্ত করিলেন, তাহাই নহে, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, মারাঠি, আসামী ও ওড়িয়া ভাষায় তিনি বাইবেলের অনুবাদ, বাঙ্গালা ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের (New Testament) অনুবাদ, একখানি বাঙ্গালা ও একখানি সংস্কৃত বাকবর্ণণও প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলেন; ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি শাসনকালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (Fort William College) স্থাপিত হইলে, পরবৎসরই রেভারেন্ড কেরী সেই কলেজের সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও মারাঠি ভাষায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অর্থাৎ এক সময়েই তিনি খৃষ্টীয় ধর্মের সহিত এদেশীয়দিগের পরিচয় সহজ করিতে সচেষ্ট হইলেন, এবং নিজেও এদেশীয় ধর্মপুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে নিযুক্ত পণ্ডিত প্রভৃতির নিকট হইতে তিনি সহমরণের সমর্থক শাস্ত্রোক্তি সমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই নৃশংসপ্রথা ভারতবর্ষে যে কিরূপ ব্যাপক ভাবে অমুণ্ডিত হয়, ও প্রতি বৎসর কত নারীকে যে সহমৃতা হইতে হয়, সে বিষয়ে সরকারের সম্যক জ্ঞান না থাকায়, তাঁহারা ইহাকে “জেন্টু” (২) সনাজের এক বিশেষ লোকাচার জ্ঞান করিয়া ইহার উচ্ছেদ সাধনে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করিতেন। কিন্তু সহমৃতা নারীর সংখ্যা গণনা করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলে, শুধু ইংলণ্ডবাসীরাই নহে, সংস্কার-মুক্ত প্রগতিশীল বহু ভারতবাসীও যে বিস্মিত ও বিচলিত হইবেন, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাকেই তাঁহার কাম্বুজেন্দ্র নিবাসন করিলেন, ও ত্রিবিংশ মাইল ব্যাসার্ধ লইয়া এই কেন্দ্রের পরিবেষ্টক যে একটি কাল্পনিক বৃত্তের সৃষ্টি হইল, তাহার অন্তর্ভুক্ত স্থানে অমুণ্ডিত সহমৃতা নারীর সংখ্যা গণনার জন্য এদেশের অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করা হইল। তাঁহাদের প্রস্তুত তালিকা হইতে দেখা গেল, সে বৎসর কিঞ্চিদধিক চারি শত নারী সহমৃত হইয়াছিলেন। সংখ্যা-গণনায় ভ্রমের সম্ভাবনা ভ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে পরবৎসর উক্ত কাল্পনিক বৃত্তান্তগত নদীতীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে দশ জন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করা হইল। তাঁহারা একাদিক্রমে ছয় মাস যাবৎ উক্ত কার্যে নিরত থাকিয়া তিন শত নারীকে সহমৃতা হইতে দেখিলেন। রেভারেন্ড কেরী এই সকল তালিকাও পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত সহমরণ-বিষয়ক শাস্ত্রোক্তি সমূহ কাউন্সিলের তৎকালীন জনহিতৈষী

(১) “Missionary Sketches in North India” by Mrs. Weittbrecht, 2nd edition.

(২) হিন্দুরা তৎকালে ‘জেন্টু’ নামে আখ্যাত হইতেন।

সত্য মিঃ উড্‌নির হস্তে অর্পণ করেন। তিনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ কেবী কর্তৃক সংগৃহীত এই সকল তালিকা অবলম্বন করিয়া সহমরণ বিষয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লির নিকট ও সুপ্রীম কাউন্সিলে একটি আবেদন প্রেরণ করেন, এবং সেই আবেদন-পত্রে উক্ত প্রথা নৃশংসতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা সম্বন্ধে সরকারের সঙ্কোচ দূর করিবার জন্ত তিনি পণ্ডিতগণের সম্মিলিত সহমরণ-বিষয়ক শাস্ত্রোক্তির উল্লেখ করিয়া ইহাও প্রতিপন্ন করেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও হিন্দুনারীর প্রতি সহমৃত্যু হইবার অঙ্গজনীয় অনুশাসন নাই, অনুমোদন আছে মাত্র। তৎপূর্বেও সরকার যে আইন প্রণয়ন দ্বারা হিন্দুধর্মীয়মুদিত অথচ মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ নিষ্ঠুর লোকাচার নিষিদ্ধ করেন নাই, তাহা নহে; সুতরাং তাঁহার সচিব একমত হইয়া গভর্নর জেনারেল ও সার জর্জ বারলো বাহাতে আইন প্রণয়ন করিয়া সহমরণের আয় নৃশংস প্রথা উচ্ছেদে তৎপর হন, তজ্জন্ম অতি করুণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অনুনয় করিয়া মিঃ উড্‌নি সেই আবেদনের উপসংহা করবেন। ইহার পূর্বে লিখিত আবেদন প্রেরণ করিয়া কেহ এই প্রথার প্রতি সবকারের দৃষ্টি আকর্ষণে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্লির কর্মকালের তখন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট ছিল। হিন্দুধর্মীয়মুদিত ও বহুকালানুসৃত একটি প্রথার নিষেধক আইন প্রণয়নের পূর্বে উক্ত প্রথার বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয় ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রভৃতির জন্ত সেইটুকু সময় সত্যি যথেষ্ট নহে। ঐ বৎসরেই ৫ই ফেব্রুয়ারী সপারদিসদ গভর্নর জেনারেল (লর্ড ওয়েলেস্লি, লর্ড লেক, সার জর্জ বারলো, ও মিঃ উড্‌নি তখন কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন) একটি পত্রে সহমরণ-প্রথা উচ্ছেদ বিষয়ে নিজামত আদালতের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্মমত বাহাতে আহত না হয়, তজ্জন্ম আদালতকে এ বিষয়ে খুব ধীর ভাবে বিবেচনা পূর্বক অগ্রসর হইবার নির্দেশ দান করেন, ও এ বিষয়ে নিজামত আদালতের বিচার-বিভাগের অভিমত জানিতে চাহেন। তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয় বিভাগের ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ বহু পণ্ডিতের নিকট হইতে তাঁহাদের মত সংগ্রহ করিয়া সপারদিসদ গভর্নর জেনারেলকে ঐ বৎসর ৫ই জুন একটি পত্রের সহিত প্রেরণ করেন, ও সেই পত্রে তাঁহারা নিজেদের এই মত প্রকাশ করেন যে, ব্রিটিশ সরকার এ-যাবৎ পবধর্ম-সাহসুতার যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও সেই উদারনীতির অনুসরণ করাই কর্তব্য। যে নৃশংস প্রথা উচ্ছেদের জন্ত সরকার আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, উহা ক্রমে ক্রমে অদূর ভবিষ্যতে আপনিই লুপ্ত হইবে; সুতরাং নিজামত আদালতের মতানুসারে লর্ড ওয়েলেস্লি সহমরণ প্রথায় তখন হস্তক্ষেপ করা সমীচীন জ্ঞান করিলেন না।

ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার কার্যকাল শেষ হইলে, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দ্বিতীয়বার গভর্নর-জেনারেলরূপে আগমন করেন। কিন্তু অতি অল্প কাল ঐ পদে নিযুক্ত থাকায় তিনিও ঐ বিষয়ে তাঁহার পূর্বগামী গভর্নর-জেনারেলেরই পন্থানুসরণ করেন। তাঁহার পর সার জর্জ বারলো গভর্নর-জেনারেল হইলেন; কিন্তু তিনিও নিজামত আদালতের মতানুসরণ করাই সুবিবেচনাকারী বলিয়া মনে করিলেন।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গভর্নর-জেনারেলের পদাভিষিক্ত

হইলেন। তাঁহার কার্যকালের শেষ ভাগে এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট সতীদাহ সম্বন্ধে স্বকর্তব্য-নির্ধারণের জন্ত নিজামত আদালতের নির্দেশ প্রার্থনা করেন। নিজামত আদালত ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর সুপ্রিম গভর্নমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সেই পত্রখানি প্রেরণ করিলেন, ও তৎসহ প্রেরিত নিজেদের একখানি পত্রে লর্ড ওয়েলেস্লির শাসনকাল হইতে তদবধি সহমরণ প্রথার নিষেধক যে সকল আইন প্রণয়নের ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে, তাহারও একটি বিবরণ প্রদান করিলেন। ৫ই ডিসেম্বর লর্ড মিণ্টো ইহার উত্তরে লিখিলেন, ".....It is a fundamental principle of the British Government, to allow the most complete toleration in matters of religion to all classes of its native subjects....." কিন্তু তৎসহ তিনি ইহাও লিখিলেন যে, হিন্দু-ধর্মীয়মুদিত যে সকল ক্ষেত্রে নারীর সহমৃত্যু হওয়ার নিষেধ আছে, সে সকল ক্ষেত্রে সহমরণে বাধা প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য। অনন্তর নিজামত আদালত এ বিষয় পণ্ডিতদিগের নিকট উল্লেখ করিলে তাঁহারা বিধান দিলেন, নিম্নলিখিত চারি ক্ষেত্রে সহমরণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ,—

(১) যে ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগাদি দ্বারা সহমরণে বাধ্য করা হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে ঔষধাদি প্রয়োগের দ্বারা অভিভূত করিয়া নারীকে সহমরণে সম্মত করা হয়।

(৩) যে ক্ষেত্রে নারী অল্পবয়স্ক অর্থাৎ সোড়শবৎসের নিম্ন-বয়স্ক।

(৪) যে ক্ষেত্রে নারী সন্তানসম্ভবা।

সুতরাং উপরোক্ত চারি ক্ষেত্রেই মাত্র পুলিশকে অতি সতর্কতার সহিত সহমরণ নিবারণে সাধ্যমত চেষ্টা করিবার জন্ত উপদেশ দান করা হইল। লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর ম্যাজিষ্ট্রেটের দাবোগার উপর নিম্নলিখিত মত একখানি লিখিত নির্দেশ জারী করিলেন,—

"Whereas it appears that during the ceremony denominated "Sutte", certain acts have been occasionally committed in direct opposition to the rules laid down in the religious institutes of the Hindoos, by which that practice is authorised, and forbidden in particular cases; as for instance, at several places pregnant women, and girls not yet arrived at their full age, have been burnt alive; and people, after having intoxicated women by administering intoxicating substances, have burnt them without their assent whilst insensible; and, in as much as this conduct is contrary to the Shastras, and perfectly inconsistent with every principal of humanity..... the police daroghas are hereby accordingly, under the sanction of Government, strictly enjoined to use the utmost care, and make every effort to prevent the forbidden practice above mentioned

from taking place within the limits of their thannabs.....and at the same time, to let them know that it is not the intention of the Government to check or forbid any act authorised by the tenets of the religion of the inhabitants of these dominions, or even to require that any express leave or permission, be obtained previously to the performance of the act of Suttee, and the police officers are not to interfere or prevent any such act from taking place.....”

কিন্তু এই নির্দেশ জারির ফলে প্রকারান্তরে ভিন্ন ক্ষেত্রে সহমরণে সরকারের অনুমোদন আছে, ইহাই সূচিত হইল।

ঠিক ঐ সময়েই (১৮১৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) বর্ধমানে একটি নারী মাত্র আড়াই বৎসরের একটি সন্তান রাখিয়া সহমৃত্যু হন। ইহাতে তত্রতা ম্যাজিস্ট্রেট নিজামত আদালতে পত্র লিখিয়া অন্তকপ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জগ্ন তাঁহার কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিতে বলেন। নিজামত আদালত পত্রোত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন, একপ ক্ষেত্রে পুলিশ যাহাতে সহমরণে কোনরূপ বাধাদান না করে, তজ্জগ্ন কঠোর আদেশ দান করা কর্তব্য। ইহাতে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট পুনরায় ১৮ই ডিসেম্বর নিজামত আদালতকে এ বিষয় পুনর্বিবেচনার জগ্ন সান্নয়ন অনুরোধ করায় তাঁহার যথাবিধি পশ্চিদ্দিগের মত গ্রহণ করিলেন। পশ্চিমেরা বলিলেন, রঘুনন্দনের মতানুসারে কোন নারীর যদি তিন বৎসরের ন্যূন বয়স্ক সন্তান থাকে ও যদি কেহ সেই সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত না হয়, তাহা হইলে সেকপ ক্ষেত্রে সেই বালাপত্যা নারীকে সহমরণে বাধা প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং ঐ বৎসরই পূর্বোক্ত চারিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন একপ ক্ষেত্রেও সহমৃত্যু হওয়ার বিষয়ে এক নিষেধক আইন প্রণয়ন করা হইল ও যে ব্যক্তি ঐ সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, সে ভবিষ্যতে কখনও সেই দায়িত্ব পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করিলে, তাহাকেও জরিমানা দিতে আইনতঃ বাধা করা হইল। (৩)

লর্ড মিণ্টোর পূর্বগামী গভর্নর জেনারেলরা কেহ দেশীয় শাস্ত্র-সম্মত অথবা শাস্ত্রবিগর্হিত কোন অনুষ্ঠানেই হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। তিনিই সর্বপ্রথম অন্ততঃপক্ষে শাস্ত্রবিগর্হিত সহমরণে বাধাপ্রদানের সংস্কার প্রদর্শন করেন। অবশ্য, তাঁহার এই সাহসের কারণও ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির সময় ইহাতেই ভারতবর্ষের ইংরেজদিগের কার্যক্রম লক্ষ্য করিলে প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা দেশীয়দিগের ধর্মে হস্তক্ষেপে অথবা প্রচলিত কোন লোকাচারের পরিবর্তন বা উচ্ছেদ-সাধনে কিরূপ কুণ্ঠিত ও সতর্ক ছিলেন। বলা বাহুল্য, কালক্রমে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি যতই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল, তাঁহাদের এই সঙ্কোচও ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। স্বদেশেও যেমন এক শ্রেণীর প্রগতিপন্থী ইংরেজ ভারতবর্ষের বহুবিধ

(৩) Human sacrifices in India or substance of the speech of John Poynder Esq. at the Courts of proprietors of East India Stock, held on the 21st and 28th days of March, 1827. p.p 21-24.

কুসংস্কারের বিলোপ-সাধনের জগ্ন কর্তৃপক্ষে উপর চাপ দিতে লাগিলেন, এ দেশেও রামমোহন রায় প্রমুখ অল্পসংখ্যক নব্যতন্ত্রী পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ নানা বিষয়েই তাঁহাদের মতের সমর্থন করিতে লাগিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের রংপুরে অবস্থান কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সহমৃত্যু হইয়াছিলেন। নৃশংস কুসংস্কারের যুগকাষ্ঠে পূজনীয় ভ্রাতৃবধূর এই আত্মাহুতির আকস্মিক সংবাদে তাঁহার চিত্ত একপ বিচলিত হয় যে—এইরূপ প্রকাশ, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, ঐ নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদের জগ্ন অবিরাম চেষ্টা করা, সেই দিন হইতেই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। বস্তুতঃ, প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় দেশে ধীরে



রামমোহন রায়

ধীরে রক্ষণশীল দলের বিপক্ষে একটি প্রগতিকামী দলের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হইতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে প্রধানতঃ এই বঙ্গদেশেই যুরোপীয়দিগের প্রভাবের ফলে বাঙ্গালীদের চিন্তাধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইতেছিল, এবং প্রচলিত সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতির সংস্কার-সাধনের জগ্ন তাঁহাদের অন্তরে একটি প্রেরণা বিকাশ লাভ করিতেছিল। সংস্কারকামী এই নব্য দলের ক্রমশঃ যতই বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ইংরেজ কর্তৃপক্ষও এ দেশবাসিগণের সহায়ত, সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিয়া এ দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহারের সংস্কার সাধনে ততই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে উইলিয়ম কেরী-প্রমুখ খেতাব মিশনরীদিগের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ক্রমশঃ সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল।

বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে ইংরেজ সরকারেব আত্মকুলো

ও প্রধানতঃ রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম কেবী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট প্রভৃতির আন্তরিক চেষ্টার ফলে ১৮১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতি দেশহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় বঙ্গদেশেই প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের পথ সুগম হয়। এখানে এ কথা উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এক সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারে সাহায্য করা দূরে থাক, এ দেশবাসিগণের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে তাহাতে বাধা প্রদানই করিয়াছিলেন। তথাপি কলিকাতার উদারনীতিক দল হিন্দুর কলঙ্কস্বরূপ সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ-সাধনের জন্ত



রাধাকান্ত দেব

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে লর্ড হেষ্টিংসের নিকট লিখিত আবেদন প্রেরণ করিলে, লর্ড হেষ্টিংস বিবেচনা করিলেন, তখনও এ দেশের জনসাধারণের মন একরূপ সংস্কারমুক্ত হয় নাই যে, আইন প্রণয়ন দ্বারা সহমরণের জায় বহুকালের প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান বহিত করিলে তাহার। বিনা আপত্তিতে ও বিনা আন্দোলনে উহার সমর্থন করিবে। সুতরাং সহসা ওরূপ কিছু করা তিনি তখন সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। বিশেষতঃ, তিনি উহার ফলে বঙ্গীয় ফৌজের (Bengal Army) বিদ্রোহেরও আশঙ্কা করিলেন। এই অবস্থায় তিনি তৎকাল অর্ধ সতীদাহ-বিষয়ক যতগুলি নিয়ম সংকলিত হইয়াছিল, সেইগুলিই একত্র সংগৃহীত করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন।

রামমোহন রায় ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন, ও অবিরত আন্দোলন

চালাইতে লাগিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বহু শাস্ত্রোক্তিসম্বলিত “প্রবর্তক ও নিবর্তকের সঙ্গী” নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিলেন। উহাতে সহমরণ প্রথার সমর্থক ও বিরোধী দুই ব্যক্তির প্রস্তোত্তরের মধ্য দিয়া তিনি ইহাই প্রচাৰ করিলেন যে, “শাস্ত্রের সর্বপ্রকার অসম্মত একরূপ স্ত্রীবধ হয়” এবং “পক্ষপাত পবিত্র্যাগ কবিত্যা শাস্ত্র বিবেচনা করিলে...একরূপ স্ত্রীবধ জন্ম পাপ হইতে দেশেব অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না।” পরবৎসর কালাচাদ বসু নামক (৪) সহমরণ প্রথার সমর্থক এক ব্যক্তি “বিধায়ক নিবেদকের সঙ্গী” নামক বহু পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি সম্বলিত একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া অল্পকাল প্রস্তোত্তরের সাহায্যে বিপত্তীত মতবাদ প্রচার করিয়া গিগিলেন,— “বিধবার রক্ষণ্য অপেক্ষায় স্ত্রীর সহমরণ অনুমুখে অতিশয় ফল, যেহেতু ইহাতে রক্ষণ্য কিম্বা কৃতঘ্ন কিম্বা মিত্রঘ্ন যে পতি সেও নিম্পাপ হয়, এবং নবক হইতে মুক্ত হয় এবং ত্রিকূল পবিত্র হয় এবং স্ত্রী শরীর হইতে মুক্ত হয়...” এই মত খণ্ডন করিয়া রামমোহন ঐ বৎসরই “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সঙ্গী” রচনা করিয়া কুম স্বাববন্ধ দেশবাসীকে বুঝাইলেন,—“... বলাৎকাবে কোন স্ত্রীকে বন্ধন করিয়া, পবে অগ্নি দিয়া দাহ করা, এ সর্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং অতিশয় পাপের কারণ হয় একরূপ স্ত্রীবধেতে এক দেশীয় লোকের কি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক ঐক্য হইয়া বধ করে, তথাপি বধকর্তারা পাতকা হইবেক, অনেকে ঐক্য হইয়া বধ করিয়াছি, এই কথাই চলে ঐশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাঠিতে পারে না... তৎপ এই, যে...নানা ভংগে ভংগিনী, গাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, বাহাতে বন্ধন পূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।” রামমোহন কেবল বঙ্গভাষায় পুস্তিকা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; এই সকল পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য, রামমোহন তাহার সমাজ-সংস্কার কার্যে অনেকগুলি অকপট বন্ধুর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরই অস্বতম। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করার যে কৃতিত্ব, তাহা প্রধানতঃ উইলিয়াম কেবী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি মিশনারীগণেরই প্রাপ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু পরবর্তীকালে রামমোহন ও দ্বারকানাথের জায় এদেশীয় উদ্যোগী সমাজসংস্কারকের সহায়তা লাভ না করিলে, তৎকালে ইংরেজ সরকারের পক্ষে কেবল ইংরেজ মিশনারীদের সহযোগিতা সম্ভব করিয়া ঐ প্রথা শীঘ্র উচ্ছেদ করা কখনই সম্ভব হইত না। কারণ,—

“...it was impossible for the English to take up the position adopted by the native reformers Dwarkanath Tagore and Rammohun Roy, viz., that Suttee was an innovation not sanctioned by or in accordance with the true teaching of Hinduism.” (৫)

(৪) ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কাশীনাথ তর্কবাগীশ। ব্রজেন বাবুর “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অতঃপর এই গ্রন্থ “সংবাদপত্র”, এই নামে উল্লিখিত হইবে।

(৫) “India in the nineteenth Century” by Demetrius C. Bonlger.

বামমোহন কেবল পুস্তকাদি রচনার দ্বারা আন্দোলন চালাইতেন, তাহা নহে, কোথাও কোন নাবী সহমরণে উচ্চতা হইয়াছেন সংবাদ পাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে নানা সত্ৰপদেশ, সুপারামর্শ ও অভয়দান করিতেন; কিন্তু তৎসঙ্গেও যদি তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে ঐ অস্থানে আইনের কোন বিধান লঙ্ঘিত হইতেছে কি না, সে বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার এইরূপ কার্যের একটি উল্লেখ আমরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের এশিয়াটিক জার্নালে দেখিতে পাই।

বলা বাহুল্য, সহমরণ উচ্ছেদ বিষয়ে লর্ড হেষ্টিংসের উদাসীন্ম দর্শনে রক্ষণশীল দল তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার কার্যকাল শেষ হইলে, বিদায়ের প্রাকালে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের “২১শে দিসেম্বর শনিবার খ্রীষ্টিয়ত মার্কিন্স আফ হেষ্টিংস বাহাদুরের বিদায় ও স্থগাতিপত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বাঙ্গালি ভাগাবান একত্র হইয়াছিলেন।” রক্ষণশীল দলের অন্ততম বক্তা “খ্রীষ্টিয়ত বাবু রাধাকান্ত দেবও...ঐ পত্রের মধ্যে আর এই কথা বিজ্ঞাস করিতে চাছিলেন যে খ্রীষ্টিয়ত অম্মদাদির ধর্মঘেষ করিলেন না ও সহমরণের কোন বাধা জন্মাইলেন না এই বিষয়ে আমরা যে তাঁহার প্রশংসা করি সেও অবশ্য কর্তব্য। খ্রীষ্টিয়ত রামকমল সেনও সেই কথাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তৎ কথার প্রামাণ্যের জন্তে যখন সভার সম্মুখে কথা গেল তখন প্রায় সকলেই স্ব স্ব সম্মতি জানাইলেন।...খ্রীষ্টিয়ত জীবন্তী দাহেব বাধা যে না জন্মাইয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থগাতি লিপন স্থির হইয়াছিল তাহাতে খ্রীষ্টিয়ত বাবু রসময় দত্ত ও খ্রীষ্টিয়ত বাবু রামকমল সেন করিলেন যে এই ক্রিয়া আমাদের দেশের নিন্দনীয়। অতএব সে কথা ইহাতে বিজ্ঞাস করা কর্তব্য নহে এই নিমিত্তে ঐ সভা খ্রীষ্টিয়তের প্রশংসা পত্রে এতাবশ্য লিখিলেন যে খ্রীষ্টিয়ত আমাদের ধর্মঘেষ করিলেন না এই সামাজ্যতো লিখিলেন কিন্তু বিশেষ ২ করিয়া কিছু লিখিলেন না...।” (৬)

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স সপারিসিড গভর্নর জেনারেলকে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, এ পর্যন্ত দেশীয় ব্যক্তিদিগকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত সরকার কর্তৃক যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন পরোক্ষে ঐ প্রথায় সরকারেব অনুমোদন আছে, দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা হওয়ার জন্ত সহমৃত্যু নারীর সংখ্যা হ্রাস না হইয়া বরং আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স এ বিষয়ের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সুবিবেচনার উপরই এই সম্পর্কে যথাবিহিত কার্যভার অর্পণ

করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্ট এই পত্রের উত্তরে লিখিলেন, কোর্টের পূর্বনির্দেশ মত তাঁহার দেশীয় ধর্মগ্রন্থানে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিলেন,—

“.....the most acceptable form of success would be, that which would be brought about by such an increase of intelligence among the people, as should show them the wickedness and absurdity of the practice; next to this, we should rejoice to see the abolition effected by influence and co-operation of the higher order of Natives. It is hardly necessary to add, that measures



ধারকানাথ ঠাকুর

for protecting the females from violence and punishing those who administer intoxicating drugs, will have our approbation.....”

সুতরাং লর্ড আমহার্টও এ বিষয়ে নিজের দায়িত্বে নূতন কিছুই করিলেন না। কেবল কোন নারীকে তাঁহার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ দ্বারা সহমরণে বাধ্য করা হইতেছে কি না, তৎপ্রতি যাহাতে অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। কারণ, যদিও সহমরণ প্রথার কুফলের বিষয়ে তিনিও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার আশঙ্কা ছিল, আইনের সাহায্যে ঐ প্রথার উচ্ছেদে সচেষ্ট হইলে, তদপেক্ষা অধিকতর কুফলের সম্ভাব্যতা আছে।

(৬) “সংবাদপত্র” প্রথম খণ্ড, ২৩৩-৩৪ পৃঃ। ৬রামকমল সেনের এইরূপ বিপরীত ব্যবহার হইতে ইহাট অনুমান হয় যে, তিনি সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ প্রচেষ্টার উচিত্য অনৌচিত্য বিষয়ে প্রথমে কোন স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পন্থাবর্তী আচরণও এই অনুমানকে সমর্থন করে।

আইনেব কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, লর্ড হেষ্টিংসের সময় হইতে কেবল সরকারের দেশীয় কর্মচারীরাই নহে, বহু সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরাও মৃত ব্যক্তির বিধবাব নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে নানা সত্বপদেশ ও সুপারামণ দান করিতেন। অবশ্য, এইরূপে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা তৎপূর্বেও যে কেহ করেন নাই, তাহা নহে। এই সম্পর্কে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের নাম উল্লেখ করা কষ্টবা। তিনি গঙ্গাতীরে সহমরণোত্তর একটি হিন্দু রমণীকে ঐ কার্য হইতে নিবৃত্ত করেন, এবং কথিত আছে, পবে তাহাকে বিবাহ করেন।

যাহা হউক, লর্ড আমহারেষ্টের এই সতর্কতা দশনে সহমরণ প্রথার আশু উচ্ছেদকামী মিশনারীরা অধীক হইলেন, এবং সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বহু পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল উদ্দেশ্যমূলক পুস্তক বহু অত্যাচার ও সত্যের বিকৃতিতে পূর্ণ থাকিত। ঐ প্রথার উচ্ছেদে বিশেষ দেখিয়া কোন কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীরও সচিবতা সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অসহিষ্ণু হইয়া অসংযত ভাষায় সহমরণ প্রথার আশু উচ্ছেদের জগ্ন বহু কৌতুককর উপায় অবলম্বনের পবামর্শ দিতে লাগিলেন। এই সকল অভিনব উপায়েব একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দাক্ষিণাত্যেব কমিশনার মঃ চাপ্লিন তাঁহাব রিপোর্টে এক সময়ে যাহা লিগিয়াছিলেন, তাহাব কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

“The exposure of the naked bodies of the Mileman virgins, it is recorded, put a stop to their propensity to suicide; and if we could so far trample upon inveterate prejudices, as to collect and scatter the ashes of the Brahminee victims of fanaticism in the quarters belonging to the polluted and degraded castes, we too might check the practice without resorting to an absolute prohibition of it.” (৭)

সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধবাদীদিগের মধ্যে মিঃ জন্ পয়গারের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টক কোর্ট অফ প্রোপ্রিয়েটার্সের (Court of Proprietors of the East India Stock) অল্পতম সদস্য ছিলেন। ১৮২৭ সনের ২১শে মার্চ ও ২৮শে মার্চ ঐ কোর্টের সম্মুখে তিনি সহমরণ প্রথার নৃশংসতা, ভারতবর্ষে উহার ব্যাপকতা ও ঐ প্রথা সম্পর্কে ভারতীয় নাবীর অসহায়তা প্রভৃতিব উল্লেখ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় দীর্ঘকাল ধরিয়৷ এক বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতার৷ বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়েন বটে। তথাপি সহসা ঐ প্রথার উচ্ছেদসাধন দ্বারা ভারতীয়দের বিরাগভাজন হওয়ার যৌক্তিকতা কেহই স্বীকার করেন নাই। ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার ও ভারতীয়দের বিদ্যালয়ভের সহিত ক্রমশঃ এই কুসংস্কার ধীরে ধীরে লুপ্ত হইবে, এইরূপ অভিমতই তাঁহা৷ প্রকাশ করেন। যাহা হউক, বক্তৃতাব শেষে মিঃ পয়গারের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি মাত্র পাঁচ জন প্রোপ্রিয়েটার বাতীত আব সকলেব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়,—

“That this Court, taking into consideration the continuation of Human sacrifices in India, is of opinion that, in the case of all rites, or ceremonies, involving the destruction of life, it is the duty of a Paternal Government to interpose for their prevention; and therefore recommends to the Honourable Court of Directors to transmit such instructions to India, as that Court may deem most expedient for accomplishing this object, consistently with all practicable attention to the feelings of the Nations.”

অর্থাৎ, দেশীয় ব্যক্তিদিগের মনে কোন আঘাত না দিয়া ঐ প্রথা উচ্ছেদের জগ্ন কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স যাহা কবা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিবেন, তাহাই যেন করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোর্ট অফ প্রোপ্রিয়েটার্স হইতে আরম্ভ করিয়া সপাবিষদ গভর্নর জেনারেল পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই সহমরণ প্রথা উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও ভবিষ্যৎ কুফলেব আশঙ্কায় কেহই সহসা ঐ প্রথায় হস্তক্ষেপে সাহস করেন নাই। দেশেব যখন এইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক নূতন গভর্নর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দেড় বৎসরের মধ্যেই সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে কৃতকার্য হইলেন। সে বক্তৃতায় যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি লর্ড বেণ্টিঙ্কেব সাহসিকতাব পবিচায়ক। বারাস্তবে সে বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশব্দিন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইন্দোচীনে ভারতীয় প্রভাব

কাম্বোডিয়া রাজ্য

বর্তমান প্রবন্ধে কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া, দ্বাবাবতী বা শ্বাম এবং ঐ বিজয় রাজ্যে হিন্দু এবং বৌদ্ধ প্রভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এ বিষয়ে ফরাসী এবং চীনাভাষায় অনেক বিবরণ বিবৃত থাকিলেও ইংরেজী ভাষায় উহার বিস্তৃত বিবরণের অভাব। অধ্যাপক কোয়েডেস্ (Coedes) পেলিও (Pelliof) এবং কোন কোন চীনা লেখকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অন্তর্সন্ধিৎস পাঠকগণের প্রীতিকর হইতে পারে।

আমাদের দেশের লোক কাম্বোডিয়া রাজ্যকে কাম্বোজ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ফরাসীদিগের মতে উহার নাম কাম্বোজ রাজ্য। এই দেশের পৌরাণিক কিম্বদন্তিতে প্রকাশ—কম্বু স্বর্ষি কর্তৃক মেবা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে এই দেশের রাজবংশের আদি পুরুষের উৎপত্তি; সেই জগ্ন বাজোর এবং রাজবংশের নাম কাম্বোজ। সংস্কৃত কম্বু শব্দে জল, কম্বুজ অর্থে জল হইতে আবির্ভূত। ভারতের কোন স্বর্ষি জলপথে ঐ দেশে গমন করায় তাঁহাব নাম অনুসারে দেশের নাম কাম্বোজ হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। মেবা নাম্নী অপ্সরীর নামানুসারে ঐ দেশেব লোকবা ক্ষের বা খমের (khmer) নামে অভিহিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দেশের বংশদাবা মাতৃনাম গ্রহণ করিত, তাহাব অনেক পমাণ পাওয়া যায়।

এই দেশের নাম কঙ্কুজও হইতে পারে। কারণ কঙ্কু বা শঙ্কু হইতে যাহার উদ্ভব, তাহাকে কঙ্কুজ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোয়েডেস্, পেলিও প্রভৃতি ঐতিহাসিক উহার নাম কঙ্কুজ বলিয়াছেন, তাহাই গ্রহণযোগ্য।

কঙ্কু ঋষি কত দিন পূর্বে এই দেশের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—প্রকৃতপক্ষে তাহার অস্তিত্ব ছিল কিনা,—তাহা নির্ণীত হয় নাই। চীনেরা এই রাজ্যটিকে চেনলা (Chenla) রাজ্য বলিত। এ দেশের শাসকগণ ফুনান রাজ্যের রাজগণের অপেক্ষা দুর্বল ছিলেন। চীন দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্ত্রফিও বলেন, চেনলা লিনরির দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। প্রথমে এই রাজ্যটি ফুনানের সামন্তরাজ্য ছিল। চেনলার রাজা চিত্রসেন ফুনান রাজ্য জয় করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। চীনের ইতিহাসে প্রকাশ, কঙ্কুজ রাজবংশের রাজা চিত্রসেন ৫৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৪৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সর্বপ্রথমে ফুনান অধিকার করিয়াছিলেন। চিত্রসেন সম্পূর্ণ ভাবতীয় নাম। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই বিস্তীর্ণ উপদ্বীপের যে সকল স্থপ্রতিষ্ঠা ও স্থপ্রসিদ্ধ রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের সকল বংশের প্রতিষ্ঠাতাই ভারত হইতে ঐ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথাকার নারীদিগের সহিত উদ্ভাট বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাহাদেরই বংশধরগণ তথায় বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। এখনও সেই বংশের কতকগুলি লোক তথায় ভূস্বামী ও নবপতিরূপে বিরাজিত; এই সকল লোক ভারতের কোন্ প্রদেশের অধিবাসী, তাহা অজ্ঞাত।

ঞ্ঠবর্ষগণ এবং ঞ্ঠবর্ষগণ হইতেই কাছোড়িয়ার রাজবংশের প্রথম পুরুষ গণিত হইয়া থাকে। ঞ্ঠবর্ষগণের রাজধানীর নাম ছিল ঞ্ঠপুত্র। ইহা অবস্থিত ছিল লায়স (L'ys) পর্বতগণের সান্নিধ্যে। কোয়েডেস্ স্থির করিয়াছেন—১৫ উত্তর দিকমায় ইহা অবস্থিত ছিল। এখন তথায় ভগ্নস্তূপের কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কঙ্কুজ-রাজলক্ষ্মী নামী রাজ্ঞী এক সময় কঙ্কুজ রাজ্য শাসন করিতেন। তাহার রাজত্বকালে ঐ রাজ্যে এক প্রবল বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহীরা জয়লাভ করিয়া কঙ্কুজ-রাজলক্ষ্মীকে সিংহাসনচ্যুত করে। তাহার ফুনান রাজবংশের অর্থাৎ কোঁগুল্য এবং সোমার বংশধর প্রথম ভববর্ষগণকে কাছোড়িয়ার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ অঞ্চলের ইতিহাস-লেখকরা বলেন যে, এই ব্যাপারের ফলে কাছোড়িয়ার রাজ্যের পক্ষে ফুনান জয় করা সহজ হইয়াছিল। ভববর্ষগণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিত্রসেন সহজেই ফুনান জয় করিয়াছিলেন। চিত্রসেন পরে সিংহাসন লাভ করিয়া মহেন্দ্রবর্ষগণ নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। মেকং নদতীরে মাকু নামক স্থানে এক প্রস্তর-গাত্রে এইরূপ একটি প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে—“স্থাপিতম্ চিত্রসেনেন লিঙ্গং জয়তি শাস্তবম্।” কাছোড়িয়ার মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত। চিত্রসেন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেনাপতিরূপে কাছোড়িয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এই ধারণা সত্য হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ, তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নামেই নগরের নাম ভবপুর রাখিয়াছিলেন। চম্পার এক প্রশস্তিতে “পুরম যদভবসাহবয়ম্” এই বাক্য পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা স্থির করিয়াছেন, ঐ প্রশস্তি খৃষ্টীয় ৬৫৭ অব্দে উৎকর্ণ। ভবপুর এই নামটি খৃষ্টীয় ষাটশ শতাব্দীর প্রশস্তিতেও পাওয়া যায়।

ভববর্ষগণ পর তাহার ভ্রাতা চিত্রসেন মহেন্দ্রবর্ষগণ নাম ধারণ

করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহেন্দ্রবর্ষগণের পুত্র ঈশানবর্ষাই পিতৃ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি তাহার রাজধানী ঈশানপুরে পরিবর্তিত করেন। রাজধানীর স্থান পরিবর্তনের কারণ প্রকাশ নাই। এই ঈশানপুর নগরের অস্তিত্ব এখন বর্তমান নাই। কোম্পা থোমের উত্তরে এখন যে বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয় শাছোর ঐপ্রকুক নামক স্থানে এই ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই স্থানে ঈশানবর্ষগণের অনেকগুলি প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। এই ঈশানবর্ষগণই ৬১৬ খৃষ্টাব্দে চীনরাজের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহাদের পরবর্তীকালে কঙ্কুজ রাজ্য যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহাদের এক ভাগের নাম জলপ্রায় বা বাবিবহুল কঙ্কুজ, অন্য ভাগের নাম ভূময় কঙ্কুজ। জলপ্রায় কঙ্কুজ সাগর-সৈকত হইতে ডানরেক গিরি পর্য্যন্ত, এবং ভূময় কঙ্কুজ ইহার উত্তরে বহু দূর বিস্তৃত ছিল। ভববর্ষগণের পিতার নাম ছিল বীরবর্ষগণ। উক্ত কঙ্কুজ বহুদিন যাবৎ স্বতন্ত্র ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমেই রাজা দ্বিতীয় জয়বর্ষগণ কঙ্কুজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি মালয় উপদ্বীপের জলা নামক স্থান হইতে আসিয়া এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় জয়বর্ষগণই বারিময় এবং ভূমিময় কঙ্কুজকে সম্মিলিত করিয়াছিলেন—এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ নাই। ইহার রাজত্বকালে কঙ্কুজ রাজ্যে পাবণ শিল্পের বহুল বিস্তার ঘটে। তাহার প্রতিষ্ঠিত রাজধানী উত্তরকালে যশোধরপুর নামে অভিহিত হয়। এখন উহা এক্ষব থোম বা ওঙ্কার ধাম নামে পরিচিত। প্রত্নতত্ত্বজগণের মতে এই স্থানের বহু পাবণমন্দির লোকেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত। প্রতীচ্য পণ্ডিতরা সেই ভগ্ন অল্পমান করেন, দ্বিতীয় জয়বর্ষগণ প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে শৈব ধর্মের অমুরাগী হইয়াছিলেন। তিনি কঙ্কুজের জাতীয় দেবতা দেবরাজ নামে বিখ্যাত শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। তিনি ঐ দেববাজের পূজা ত্যাগ করিয়া অগত্যা বাটতেন না। এই দেবরাজের মন্দির রাজধানীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তাহার রাজত্বকালের পূর্বে হইতে ঐ অঞ্চলে শৈব ধর্ম প্রচলিত ছিল, এবং শিবই ঐ রাজ্যের জাতীয় দেবতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ জয়বর্ষগণই ঐ দেশে দার্বদ স্থাপত্যের ভূম্য-প্রচলন করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে বেলে পাথরের অনেক দুর্গাদি নির্মিত হইয়াছিল। ইনি ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

জয়বর্ষগণ মৃত্যুর পর তাহার পুত্র পিতুরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি অধিক বয়সে সিংহাসন পাঠাইয়াছিলেন, এবং স্বল্পকাল জীবিত ছিলেন। জয়বর্ষগণের পৌত্র ইন্দ্রবর্ষা তাহার পিতামহের আদর্শে রাজ্যমধ্যে প্রস্তর-শিল্পের বিশেষ বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। যশোবর্ষা প্রায় ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যশোবর্ষগণ-প্রতিষ্ঠিত ওঙ্কার ধামের নাম তাহার নামানুসারে যশোধরপুর হইয়াছিল। ইনি জয়বর্ষগণের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ওঙ্কার ধামের উন্নতি সাধন করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করেন। এই বংশে দ্বিতীয় সূর্যবর্ষ দেব নামক রাজা ১১১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইনিই ওঙ্কার বাট বা ওঙ্কার বাট নামক স্থানে সুন্দর বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির একালেও দর্শকবৃন্দের বিষয় উৎপাদন করিতেছে। অনেক দেবদেবীর মূর্তি এখন পর্য্যন্ত এই

বিষ্ণু নগরে বর্তমান থাকিয়া ইহার অতীত গৌরব বিধেয়িত করিতেছে।

ফরাসী পণ্ডিতরা বলেন, অঙ্কর শব্দ নগর শব্দের অপভ্রংশ। অঙ্কর শব্দ বে ওঙ্কার শব্দের অপভ্রংশ একপ অন্মানও কেত কেত করিয়া থাকেন। ওঙ্কার শব্দ মাজলিক। ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের বাঁজময় নিহিত আছে; সুতরাং উহা ঐ তিন দেবতা বিষয়ে প্রযুক্ত। ওঙ্কার বাট বিষ্ণুর বাটা। ওঙ্কার ধাম শিবের নগর। এই অর্থই সমীচীন মনে হয়।

১১৮১ খৃষ্টাব্দে সপ্তম জয়বর্মান কাঞ্চোড়িয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর ইতাকে লোক পরমশ্রোগত বলিত। ইহা হইতে বুঝা যায়, ইনি বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি ১২০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। ইনি অনেক চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়া ঐ সকল চিকিৎসাগার বা হাসপাতাল বুদ্ধ ভৈষজ্যগুরুব নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সকল চিকিৎসাগারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঔষধ বিতরণ এবং চিকিৎসা করা হইত। এই সকল হাসপাতালে রাজাদেশে অভিন্ন নিয়ম প্রবর্তিত ছিল। কটিং কোথাও কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। তিনি মনে করিতেন, প্রজার দুঃখে রাজাবই দুঃখ। তাঁহার যে প্রশাস্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে লিপিত আছে,—

“দেহীদিগের দেহের রোগ শেষে মনের রোগ হইয়া দাঁড়ায়—
উহা রোগের শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গীয় লোকের দুঃখ রাজাবই দুঃখ, প্রজা-
দিগের নিজেই দুঃখ নহে।”

এই বংশের অষ্টম জয়বর্মান জামাতা শ্রীইন্দ্র বর্মান ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে কণ্ডুজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি প্রায় ১২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি ঈশ্বরপুর্বে ত্রিভুবন মতেশ্বরের একটি বিগ্রহ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরটি ক্ষয় স্থাপত্যশিল্পের সুন্দর নিদর্শন। এখন ঐ মন্দিরটি বন্টেই শৈ নামে অভিহিত। ওঙ্কার বাট হইতে উহা প্রায় সাড়ে ১৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই অঞ্চলে ইন্দোনীং অনেকগুলি শিলালিপি ও প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চলের বিশিষ্ট স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যশিল্প অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পূর্ব শ্যাম রাজ্য কর্তৃক এই রাজ্য বিজিত হওয়ায় ইহার নিজস্ব শিল্পাদির অবনতি ঘটে। কোন সময়ে শ্যামবাস এই রাজ্য জয় করিয়া এই রাজবংশের লোকদিগকে ওঙ্কার বাট পণ্ডিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন—তাহার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহার পূর্ব এই রাজবংশের বংশধরগণ নিতান্ত অনিশ্চিতভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া আসিতেছে।

শ্যাম রাজ্য

শ্যাম রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। চীনারা এই রাজ্যকে চিটু রাজ্য বলিত। চিটু অর্থে লোহিত ভূমি। ইহা প্রাচীনকাল হইতে কতকটা ফুনান রাজ্যেরই অধীন ছিল; কিন্তু তাহা হইলেও এই রাজ্য সর্বতোভাবে পরাধীন ছিল না। ইহার রাজগণ অনেকটা স্বাধীন ছিলেন। ইহা মেনাম নদের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। ১০৭ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের রাজা এই রাজ্যে কয়েক জন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে এই রাজ্যের কথা সকলে জানিতে

পারেন। চীন-দূতগণ কর্তৃক এই রাজ্যের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অবস্থার কথা বিবৃত হইয়াছিল।

এই রাজ্যটি প্রথমে যে হিন্দুরাজ্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, ইহার নাম ও অঙ্গাঙ্গ বৈশিষ্ট্য হইতে এই রাজ্যে হিন্দু-প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্যের নাম ছিল দ্বাবাবতী। ইহার রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা। চীনেব কিউ তাং শু (Kiou Tang Shu) বলেন, ইহা বারিবহুল কাঞ্চোড়িয়ার পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত চৈনিক পবিত্রাজক হুয়েন সাং এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই দ্বাবাবতী রাজ্যটি ক্রীক্ষেত্র হইতে কাঞ্চোড়িয়ার ঈশানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান প্রোম জিলাই ক্রীক্ষেত্র নামে অভিহিত হইত। ইহা দক্ষিণ ত্রক্ষে অবস্থিত। অযোধ্যা নামও এই সঙ্গে পাওয়া যায়। তবে যুবোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ইহার অযোধ্যা নামা রাজনগরী ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীনতর রাজনগরীর ইতিহাস আনুমান্য কবিবার জগুই পববতী রাজধানী অযোধ্যা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। প্রাচীনতর রাজধানীকে চানারা লভো বলিতেন। লভো বর্তমান লপচুড়ি। উহা পববতী অযোধ্যার ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এই রাজ্যের ইতিহাস পাওয়া যায় না বটে, তবে এ কথা সত্য যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মেনামের বিস্তারিত অবস্থাতিক ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণস্থ অর্থাৎ সাগরতীর-সম্বন্ধিত দেশের নাম ছিল লভো বা লপচুড়ি (লোপচুড়ি) এবং উত্তর অঞ্চলের নাম ছিল শ্যাম বা সুখোদয়। উত্তর রাজ্যই কাঞ্চোড়িয়ার অধীন ছিল। ওঙ্কার বাটে একটি প্রস্তর-গাত্রে উৎকর্ণ চিত্রে পবম বিষ্ণুলোকের সেনাগণ মধো লভো এবং শ্যামকূট হইতে আগত সৈনিকদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই ঐরূপ অনুমান করা হইয়াছে। এই সকল নাম এবং প্রাচীন চিত্রাদিতে লোকদিগের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মনে হয়, ঐ দেশের লোক বঙ্গদেশ হইতে তথায় গিয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। অথচ উহার প্রকৃত প্রমাণ এখনও কিছুই পাওয়া যায় নাই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন থাই (Thai) রাজ্য সুখোদয় রাজ্য অধিকার করিয়া শ্রীইন্দ্রাদিত্য নামে আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া নিযোজিত করেন। ইহার পূর্বে আব কখনও কেত স্বাধীন ভাবে যে এই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্যাম দেশের সাধারণ লোক তাহাকে ফ্রু রুয়াং (Phro ruang) বলিয়া থাকেন।

ইহার পুত্র নাম থংহে (Rama Khamheng) ১২৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার রাজত্বকালের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ কাহিনীই শ্যামদেশের ভাষায় লিখিত। এই ভাষা কতকটা বাঙ্গালী, কতকটা চীনা, এবং অধিকাংশ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন। তখন সুখোদয় বা শ্যামবাজ্যের লোক বৌদ্ধ চানয়ান ধর্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু কাঞ্চোড়িয়ার অধিবাসীরা প্রধানতঃ হিন্দু এবং মহাবান সৌন্দ ছিল। রাম থংহে শ্যাম বা সুখোদয় রাজ্যের পরিচিত অমবাবতীর অঙ্গাঙ্গ অংশ এবং মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহার কোন বংশধর

১৩৫০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যানগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্যামরাজ্য স্বাধীন বলিয়া যুরোপীয়রা এই রাজ্যের প্রভুত্ব ও ইতিহাস জানিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার স্রবিধাও পান নাই। এখন ফরাসীরা শ্যাম দেশের কিয়দংশ অধিকৃত করিয়া লইয়াছে। প্রাচীন শ্যামরাজবংশ-ধরণ এখন সামন্ত নরপতি। লভো বা লপচুড়ির রাজবংশই প্রকৃতপক্ষে শ্যাম দেশে রাজত্ব করিতেছেন। শ্যামদেশবাসীরা অধুনা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তথাকার জাতীয় আচার অনুষ্ঠানের সহিত বাঙ্গালার আচার অনুষ্ঠানের কতকটা সাদৃশ্য এখনও লক্ষিত হয়। এখন ইহাব রাজধানী ব্যাঙ্কক। ইহাব রাজ্য নাম আনন্দ মন্ডল। বর্তমান রাজধানী ব্যাঙ্কক প্রাচীন অযোধ্যা নগরীর দক্ষিণে অবস্থিত।

শ্রীবিজয়

এই দেশের ইতিহাস এত দিন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। ইহা শ্রীভোজ রাজা নামে জনসমাজে পরিচিত ছিল। কিন্তু বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক এবং প্রভুত্ব বিশারদ কোয়েডেস্ (Coëdes) সম্প্রতি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই রাজ্যের প্রকৃত নাম শ্রীবিজয়। এই সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক চীনা গ্রন্থ ও স্থানীয় কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া বাজ্যেব অনেক লুপ্তপ্রায় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা হইলেও ইহাব অনেক তথ্য এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রভুত্ববিদ কোয়েডেস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীবিজয় রাজা পলেমব (palemban:) বাজ্যেব শৈলেন্দ্র রাজপরিবার কর্তৃক শাসিত হইত। পলেমব রাজা সুমাত্রা। দ্বীপের মধ্য অংশ এবং দক্ষিণ অঞ্চলের রাজা ছিলেন এই শৈলেন্দ্র রাজপরিবার। ইহা ভিন্ন ইহার সম্বন্ধিত কতকগুলি দ্বীপও শৈলেন্দ্র রাজগণের অধিকারে ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে জাভা দ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র রাজগণ রাজত্ব করিতেন। জাভা দ্বীপের কগ্জকাটার নিকট শ্রীবিজয়ের জর্নৈক রাজা চণ্ডী কলসং নামক একটী মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহা বৌদ্ধ তাবাদেবীর পীঠস্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। এই মন্দির ৭৭১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়ের অধীশ্বর এই শৈলেন্দ্ররাজ আরও অনেকগুলি বৌদ্ধ কাস্তির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সম্মানিত। ৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইনিই যে মঞ্জুশ্রীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ক্লোয়েবকেব (Kloérak) শিলালিপি হইতে ইরূপ আভাস পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান, মালয় উপদ্বীপের বন্দন উপসাগরের (?) দক্ষিণ তীরে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ই রাজাই বুদ্ধ, লোকেশ্বর এবং বজ্রপাণি এই তিন জনের প্রতি ভক্তি-নিদর্শন স্বরূপ তিনটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার নামটি জানিতে পাবা যায় নাই; তবে ইহার কোর্তিমালা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ইনি মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ধার্মিক বৌদ্ধ ছিলেন। এই শৈলেন্দ্র রাজগণই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে সুমাত্রা, জাভা মধ্যভাগ এবং মালয় উপদ্বীপের কিয়দংশ আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। হল্যাণ্ডের লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে এই অঞ্চলের কতকগুলি তাম্রশাসন বক্ষিত আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে

সংরক্ষিত ২১খানি তাম্রলিপি হইতে শ্রীবিজয় রাজগণের ধর্ম-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্রাজ করমগুল উপকূলের চোল রাজবংশের প্রথম রাজা রাজরাজ-প্রদত্ত কতকগুলি প্রশস্তিও পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, করমগুল উপকূলের চোল রাজগণের সহিত শৈলেন্দ্ররাজগণের বিশেষ বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রথম রাজরাজের পরবর্তী রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্ররাজ সংগ্রাম বিজয়োপোতুঙ্গ বর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি শৈলেন্দ্ররাজের কতকগুলি রাজ্যও অধিকার করিয়াছিলেন।

এই অঞ্চলের সমস্ত ইতিহাস জানা যায় নাই। ই দেশগুলির ধাবাত্তিক ইতিহাস আজিও পাওয়া যায় নাই। ফুনান বাজ্যেব পতনের পর শ্রীবিজয় রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ দেশের রাজাদিগের নাম সমস্তই ভারতীয় নাম। ইহাতে মনে হয়, এই দেশে ভারতীয় সভ্যতাই বিস্তার লাভ করিয়া দেশটিকে সংগঠিত করিয়াছিল। ইহাব মধ্যে সাগরতীরস্থ দেশগুলিতে ভারতের অনাগা স্থানের লোক যাইয়া সভ্যতা বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল, একপাশে মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গাল দেশ হইতে ই দেশে তাত্ত্বিক বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারলাভ করিয়াছিল, এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। সিংহমহাযান বৌদ্ধমত বাঙ্গালা হইতেই তিব্বতে ও চীনে প্রবেশ করিয়াছিল এবং দক্ষিণাত্যেব বহু স্থানে হীনযান বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। সিংহলে এখনও হীনযান বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত। তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গালায় এক সময় অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। সেই জন্য মনে হয়, পূর্ব-উপদ্বীপে বঙ্গদেশ হইতে আয়া সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। তবে ইহাব নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই; শ্যামদেশের অতীত ইতিহাস আজিও জানিতে পাবা যায় নাই; তবে চম্পা দেশের সম্বন্ধে অনেক গল্প বাঙ্গাল দেশে পূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন তাহার অনেকগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাজা ও রাজপুত্রদিগের যে নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহা অনেকটা বাঙ্গাল-ধরণের। প্রাচীন বঙ্গদেশে শৈব ধর্মও এক সময়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চণ্ডী ও তারাব পূজা বাঙ্গালায় বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। শাস্ত্র ধর্মও বঙ্গদেশে ও আসামে বহু দিন ধরিয়া প্রবল ছিল। স্ত্রীরা: ধর্মের দিক দিয়া বাঙ্গাল দেশের সহিত পূর্ব-উপদ্বীপের বিশেষতঃ শ্যাম, পাণ্ডুরং, শ্রীক্ষেত্র, অমরাবতী, কল্লুজ, চম্পা প্রভৃতি অঞ্চলের উপাস্য দেবতার মিল ছিল। যথা—চণ্ডী, ভগবতী, নগবস্বামিনী, তারা, ভদ্রেশ্বর, মতেশ্বর, ঈশান প্রভৃতি নাম ঠিক বাঙ্গালী দেবদেবীর নামের অনুরূপ। স্থানের নামগুলিও ঠিক বাঙ্গালী নামের অনুরূপ। যথা—ঈশ্বরপুর, শ্রেষ্ঠপুর, ঈশানপুর, শ্রীক্ষেত্র (আধুনিক প্রোম) দ্বাবাবতী, সখোদয়, ভবপুর প্রভৃতি। মাত্রাজী নাম ঠিক এইরূপ হয় না। লোকের নামেও দেখা যায়—সিংহবর্ম্মা, রুদ্রবর্ম্মা, ভৃগু, শম্ভু, সত্যবর্ম্মা, সিংহপাল প্রভৃতি নামগুলি বাঙ্গালীর এবং বিহাবীর নামের অনুরূপ। ফরাসীরা পূর্ব-উপদ্বীপের যে সকল প্রভুত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, সমাক্রমে তাহা প্রকাশ কর উচিত।

শীশশিভমণ মুখোপাধ্যায় (বিচারক)।



গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য'

দশ বৎসর পূর্বে ১৩৩৭ সালে সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদগ্রন্থমালায় ভট্ট গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য প্রকাশিত হয়। আমার উপর এই গ্রন্থের সম্পাদনভার শুল্ক হইয়াছিল। ছান্দোগ্য অর্থাৎ সামবেদীয় গৃহস্থের জাতকর্ম হইতে শ্রদ্ধ পর্যন্ত বিবিধ ধর্মাত্মানে যে সকল বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, উহাদিগের ব্যাখ্যাই ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য

গুণবিষ্ণু অতি প্রাচীন ভাষ্যকার, বঙ্গ ও বিহাব প্রদেশে চির-সমাদৃত। ইহার ভাষ্য বিচারে রাজকীয় সংস্কৃত পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে স্মার্ত রঘুনন্দন স্মৃতিতত্ত্বসমূহে বারংবার ইহার মন্ত্রব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ তাঁহার 'ষট্‌কর্মব্যাখ্যানচিন্তামণি' গ্রন্থে এই ব্যাখ্যাকে 'ভাষ্যাক্ষি' বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন। শক্রয় তাঁহার 'মন্ত্রার্থদীপিকায়' গুণবিষ্ণুকৃত ভাষ্যের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। শক্রয় ত্রিগর্তাধিপতি ধর্মচন্দ্রের অহুরোধে মন্ত্রার্থদীপিকা প্রণয়ন করেন। ধর্মচন্দ্র ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে পঞ্জাবের জলন্ধর প্রদেশ শাসন করিতেন। স্মৃতরাং জানা যাইতেছে যে, চারি শত বৎসর পূর্বে গুণবিষ্ণুর বেদব্যাখ্যার খ্যাতি পঞ্চনদের তীর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাত্যেও গুণবিষ্ণুর নাম অজ্ঞাত ছিল না। বরোদার রাজপুথিশালায় গ্রন্থাকারে লিখিত গুণবিষ্ণুটীকার পুথি আছে।

কালক্রমে অল্পজ্ঞ লিপিকারগণের অনবধানতাহেতু এবং সাহসিক পণ্ডিতগণের অমূলক পাঠকল্পনার ফলে গুণবিষ্ণুর ভাষ্যে নানারূপ পাঠবিকার দেখা দিয়াছে। তিন শত বৎসর পূর্বে রামনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি তাঁহার 'সামগমন্ত্রব্যাখ্যান' গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যায় প্রক্ষিপ্ত পাঠ ও লেখকপ্রমাদ লক্ষিত হইত (সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদের পুথি, বেদ ৩২, ৪ক পত্র— "কচিৎ গুণবিষ্ণুপুস্তকেহপ্যেবং পাঠঃ প্রক্ষিপ্তো দৃশ্যতে।" ১৯খ পত্র— "পাঠোহয়মেব সাধুঃ। কচিৎ পুস্তকে তু লেখকপ্রমাদাদেব তদভাবঃ")।

এই ভাষ্য সংস্কার করিবার সময় বহু আদর্শ পুথি এবং নানারূপ উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকায় ঐ সকল সহায়ক উপকরণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীমাচরণ কবিরত্ন লিঙ্গাবারিধি মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ভবদেবপদ্ধতিরও নাম আছে। ভবদেবের এই পদ্ধতি-গ্রন্থে সামবেদীয় উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের প্রয়োগবিধি বর্ণিত হইয়াছে। কবিরত্ন মহাশয় ঐ সকল অস্থানে পঠনীয় মন্ত্রগুলির সহিত গুণবিষ্ণুর টীকা যোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের প্রায় অর্ধাংশ তাঁহার ভবদেবপদ্ধতির সহিত

মুদ্রিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য সম্পাদনের সময় পাঠনির্ণয়ে আহুকুল্যের আশায় আমি কবিরত্ন মহাশয়ের ভবদেবপদ্ধতির মন্ত্রাংশ আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহার যে পাঠ গুণবিষ্ণুসম্মত নয় বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা পাদটীকায় প্রদর্শন করিয়াছি।

গত কার্তিক মাসে 'মাসিক বসুমতী'র গ্রন্থ-সমালোচনায় কবিরত্ন মহাশয় মৎসম্পাদিত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম, এ মহাশয় সম্পাদিত গোভিলগৃহস্থতন্ত্রের আলোচনার সহিত স্বীয় পুস্তক ভবদেবপদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে তাঁহার ভবদেবপদ্ধতির বহুতর ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি কিন্তু গুণবিষ্ণুভাষ্যের প্রকৃত পাঠনির্ণয় এবং বিভিন্ন আদর্শের পাঠভেদ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহার গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার গ্রন্থের পাদটীকায় 'ক' এই সংক্ষিপ্ত নাম দিয়া যে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলি সব অশুদ্ধ, আমি এরূপ মনে করি নাই। তবে আমার সংগৃহীত এতগুলি আদর্শ পুথিতে এরূপ পাঠ না পাওয়ায় বুঝিয়াছিলাম যে, উহা গুণবিষ্ণুসম্মত পাঠ নহে। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের কোন সংশোধক যদি রাঘবভট্টের ব্যাখ্যানুসারে মূলে 'মনস্ত তস্তাবদর্শনাস্বাসি' পাঠ গ্রহণ করিয়া পাদটীকায় 'তস্তাবদর্শনাস্বাসি' এই পাঠান্তর প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে, উক্ত সংশোধক পাঠান্তরটি অশুদ্ধ মনে করিয়াছেন, এরূপ অভিযোগ করা চলে না; উহা রাঘবভট্টসম্মত পাঠ নহে, এইমাত্র বুঝা যায়।

যাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয় 'ছ' এই সংক্ষিপ্ত নাম দিয়া আমার পুস্তক সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমি তাঁহারই নির্দেশিত (ক), (খ), (১), (২) ইত্যাদি ক্রম অহুসরণ করিয়া সে সকলের আলোচনা করিব।

(ক) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের ইংরাজী ভূমিকায় ক-পুস্তকের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম যে, উহাতে গুণবিষ্ণু-ভাষ্যের প্রায় অর্ধাংশ স্থান পাইলেও কবিরত্ন মহাশয়ের সংশোধনের ফলে গুণবিষ্ণু-সংস্করণরূপে উহার উপযোগিতা হ্রাস পাইয়াছে— "The numerous emendations freely made by the editor without the support of any manuscript, and the equally unwarranted rejection of passages have detracted very much from the value of the edition."

কবিরত্ন মহাশয় প্রারম্ভে লিখিয়াছেন— "বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ কর্মকাণ্ডপদ্ধতির ভট্ট গুণবিষ্ণুর টীকারই সম্পূর্ণ পক্ষপাতী জানিয়া

মৎস্পাদিত ভবদেবপদ্ধতির প্রথম সংস্করণে আমি ঐ টীকাই দিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই দেখিলাম, উহাতে অনেক গোলযোগ। তখন কতকগুলি ফর্ম ছাপা হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িতেও পারিলাম না। যেন তেন প্রকারে গৌজা-মিল দিয়া পুস্তক বাহির করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ অতি ক্ষিপ্ততার সহিত বাহির করিতে হইয়াছিল এবং তখন শরীরও নিতান্ত অসুস্থ ছিল বলিয়া তাহাতেও ঐরূপ থাকিয়া গিয়াছে।”

এইরূপ উক্তির উত্তরে আমার অপর কিছু বক্তব্য নাই। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে কবিরত্ন মহাশয়ের ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিনি ঐ গ্রন্থের (১১-১৫ পৃষ্ঠা) গুণবিষ্ণুপাঠের বিস্তৃত প্রমাণের জন্ত অনেক কথা বলিয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে ১৩২৩ সালে ভবদেবপদ্ধতির প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়, তখনও উহার গুণবিষ্ণু-টীকা সম্বন্ধে উপদেশ বোধ ছিল; “ঐ টীকার বিস্তৃত সংস্করণও আবশ্যিক বোধ করিয়া” তাহাই ছাপিয়াছিলেন। ইহার এগার বৎসর পরে অর্থাৎ ত্রিবেদীয়-ক্রিয়া-কাণ্ডপদ্ধতির প্রথম খণ্ড প্রকাশের একুশ বৎসর গত হইলে ১৩৩৪ সালে ভবদেব পদ্ধতির দ্বিতীয় সংস্করণেও কবিরত্ন মহাশয় গুণবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন নাই। অথচ এখন বলিতেছেন—ভবদেবপদ্ধতির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় “কতকগুলি ফর্ম ছাপা হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িতেও পারিলাম না।”

(খ) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের প্রাসঙ্গিক নিবেদনে (xi পৃঃ) লিখিয়াছিলাম যে, লেখকগণের অনবধানতায় গুণবিষ্ণুভাষ্যের হস্ত-লিখিত পুথিতে বহুতর অন্তর্ভুক্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে। একটি মন্ত্রে কিরূপ ভ্রমাত্মক পাঠান্তর ঘটিয়াছে, তাহা উদাহরণস্বরূপ পাদ-টীকায় উল্লেখ করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম—“অন্নং প্রাণশ্চ পড়িংশস্তেন বধ্যমি স্বাসৌ” এই মন্ত্রের পড়িংশ পদটি কবিরত্ন মহাশয়ের ভবদেবপদ্ধতিতে (১ম সংস্করণ ৭৯ পৃঃ, ২য় সংঃ ১১২ পৃঃ) এবং রত্নপ্রভা নামে তৎকৃত মন্ত্রব্যাক্যায় (২৫১ পৃঃ) ‘বড়্, বিংশ’রূপে পরিণত হইয়াছে, ‘পঞ্চবিংশতস্বাতিরিক্ত’ বলিয়া উহার যথেষ্ট ব্যাখ্যাও তিনি করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে (১৩) চিহ্নিত বক্তব্যে কবিরত্ন মহাশয় ‘বসুমতী’তে লিখিয়াছেন,—“একটি মন্ত্রে পড়িংশ স্থলে বড়্, বিংশ করিয়াছি।... ঐরূপ করিবার কারণ এই যে, ভাষ্যকারেরা ঐ অদ্ভুত পদের অর্থ বন্ধন লিখিয়াছেন, কিন্তু ব্যুৎপত্তি লেখেন নাই বলিয়া আমার সংশয় হইয়াছিল যে, আমার আদর্শ মন্ত্রব্রাহ্মণ পুস্তকে বহু মুদ্রাকর প্রমাদের জ্ঞান এখানেও ‘ব’ স্থানে ‘প’ হইয়াছে। কেবল আমার নহে, অনেকেরই সংশয় হইয়াছে, তাহা সম্পাদক মহাশয় উপক্রমণিকায় দেখাইয়াছেন। তজ্জন্ত ঐস্থানে কেহ ‘পড়ি, ক্তংশ’ কেহ ‘পড়, বিংশ’ করিয়া যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিও করিয়াছেন। আমি ঐরূপ করিয়াও নিশ্চিত ছিলাম না। উহার প্রকৃত পাঠ ও ব্যুৎপত্তি জানিবার জন্ত বহু অনুসন্ধান করিয়া উভয়ই অবগত হইয়া দুর্গামোহন বাবুর ‘ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য’ বাহির হইবার বহু পূর্বেই সারণভাষ্য সহ ভবদেবপদ্ধতির তৃতীয় সংস্করণের জন্ত কপি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সম্প্রতি উহা ছাপা হইতেছে।”

মুদ্রাপ্রমাণ তৃতীয় সংস্করণে মন্ত্রটি শুদ্ধরূপে ছাপা হইবে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। মন্ত্রব্রাহ্মণের পড়িংশ পাঠটি মুদ্রাকরপ্রমাদ বলিয়া কবিরত্ন মহাশয়ের সংশয় হইয়াছিল। গোভিলীয়গৃহকর্মপ্রকাশিকায়

(৬১ পৃঃ) মন্ত্রটি শুদ্ধরূপে ছাপা আছে। মূল বৈদিক গ্রন্থেও পড়িংশ এবং উহারই রূপান্তর পড়ীশ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ পাওয়া যায়।

কবিরত্ন মহাশয় আমাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন (১৩)—“সম্পাদক মহাশয় যে পুনঃ পুনঃ ‘পড়িংশ’ অকারান্ত লিখিয়াছেন, তাহা নহে; উহা অসূভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ।”

মানাই ব্যক্তির উক্তিও অপ্রমাণ হইলে কিরূপে মানিয়া লইব? সামবেদের হইখানি শ্রৌতসূত্রে দ্রুত একটি মন্ত্রে পড়িংশ শব্দের নিঃসংশয় অকারান্ত প্রয়োগ পাওয়া যায়। জাহ্নবিশ্রৌতসূত্রে (২, ৪, ২) উক্ত মন্ত্রের পাঠ এইরূপ—

নির্মা মুঞ্চামি শপথান্নির্মা বরণাতত।

নির্মা যমশ্চ পড়িংশাৎ সর্কস্মাদেবকিষ্ণিবাৎ।

জাহ্নবিশ্রৌতসূত্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। লাটায়নশ্রৌতসূত্রেও (২, ২, ১১) ঐ মন্ত্রে ‘পড়িংশাৎ’ই পাঠ। চৌখম্বা সংস্কৃতগ্রন্থমালায় মঃ মঃ শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বা মহাশয়ের সম্পাদিত লাটায়ন-শ্রৌতসূত্র (৭০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। বা মহাশয় শব্দটির ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন,—“পশ বন্ধন ইত্যস্মাৎ কিপি রূপম্, বিশতেঃ প্রবেশনার্থাদিশুপধলক্ষণঃ কঃ, মুমাগমচ্ছান্দসঃ”।

আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে (৭, ২১, ৬) ঐ মন্ত্রটিতে পড়িংশাৎ স্থলে পড়ীশাৎ পাঠ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ (১০, ৯৭, ১৬), মাধ্যমিনীর সাহিত্য (১২, ৯০) এবং অথর্ববেদে (৬, ৯৬, ২। ৭, ১১২, ২) ও ‘পড়ীশাৎ’ই পাঠ। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পড়ীশ শব্দ পড়িংশেবই রূপান্তর।

অথর্ববেদেও অপর একটি মন্ত্রে (৮, ১, ৪) শব্দর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত মহাশয় পড়ীশ স্থলে পড়িংশ পাঠান্তর ধরিয়াছেন। হুইটনি সাহেবও ঐ বেদেরই অপর দুইটি মন্ত্রে (১২, ৫, ১৫। ১৬, ৮, ২৭) যথাক্রমে পড়িংশেও পড়িংশাৎ পাঠান্তর ধরিয়াছেন (Atharvaveda Translated into English—Harvard Oriental Series, vol. VIII)।

ঋগ্বেদের আরও দুইটি স্থলে (১, ১৬২, ১৪ এবং ১৬), মাধ্যমিনীর সাহিত্যের আরও দুইটি মন্ত্রে (২৫, ৩৮ ও ৩৯) কৃষ্ণযজুর্বেদেব কাঠকসংহিতায় (৬, ৫), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১, ৬, ১০, ৩), শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৪, ৯, ২, ১৩), ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫, ১, ১২) এবং বোধায়নশ্রৌতসূত্রে (১৫, ১৫) পড়ীশ শব্দের প্রয়োগ আছে। ভটভাঙ্কর, সায়ণ, মহীধর, উবট, দ্বিবেদগঙ্গ, শঙ্কর, আনন্দগিরি প্রভৃতি টীকাকারদিগের অনেকেই পদশব্দ ও বিশদাত্তুর যোগে অকারান্ত ‘পড়ীশ’ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কেহই পড়ীশস্ শব্দের কথা বলেন নাই।

যাদবপ্রকাশের বৈজয়ন্তী অভিধানে পড়ীশ শব্দের অর্থ আছে “পশ্চাচ্ছরণশক্ণৌ তু পড়ীশো ঘূটিকোহপি চ”। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের একখানি হস্তলিখিত পুথিতে পাইয়াছিলাম—“পড়িংশো বন্ধনে শ্রোক্তঃ শুক্ণগোময়মণ্ডয়োঃ ইত্যভিধানকাণ্ডে”। ইহা আমি উক্ত ভাষ্যের পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি। বাচস্পত্য অভিধানে অকারান্ত পড়ীশ শব্দ ধরা আছে। সেন্টপিটার্সবার্গ ডিক্শনারী নামে খ্যাত সুবৃহৎ সংস্কৃত-জামান শব্দকোষে এবং মনিয়ার উইলিয়ামস্‌এর সংস্কৃত-ইংরাজী শব্দকোষ প্রভৃতি আধুনিক অভিধানেও পড়িংশ ও পড়ীশ এই উভয় শব্দই অকারান্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পড়িংশ ও উহার রূপান্তর পড়ীশ শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। তাহার কারণ এই যে, বিবাহের ভোজন-হোমে পাঠ্য এই বৈদিক পদটি ক্রিয়াকাণ্ডের গ্রন্থে দীর্ঘকাল অন্তর্ভুক্তরূপে পঠিত হইতেছে, এবং এখনও শব্দটি অস্তাগাস্ত্র মনে করিয়া কবিরত্ন মহাশয় আমার অকাবাস্ত প্রয়োগে ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের মতে—“ভাষ্যকাবেরা উভাব অর্থ বন্ধঃ না লিখিয়া বন্ধনং লিখিয়াছেন” বলিয়া পড়িংশ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। তাঁহাব মত সুধীব্যক্তি একরূপ যুক্তি দেখাইলেন কিরূপে বুঝিলাম না। পত্নী কলত্রম্, মোক্ষঃ নির্বাণম্, ঐতিহ্যম্ উত্তোগঃ এইরূপ ভিন্ন ভিন্নেব প্রতিশব্দ প্রয়োগ সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয়।

(১) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে তপশ্চ ইত্যাদি (১,১৭) এবং বিকপাকোহসি ইত্যাদি (১,১৮) দুইটি মন্ত্র একসঙ্গে র্তত হইয়াছে। গুণবিষ্ণু একসঙ্গে উভাদের দেবতা ধরিয়াছেন। প্রথম মন্ত্রটির নাম প্রপদ এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটির নাম বৈকপাক্ষ। কবিরত্ন মহাশয়ের ভবদেবপদ্ধতিতে মন্ত্র দুইটি পৃথক্ উল্লিখিত আছে এবং প্রপদ মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত “ভূভূবঃস্বরো! মহাস্তমাস্থানং প্রপত্তে” এই অংশটুকু বৈকপাক্ষ মন্ত্রের আদিকপে গৃহীত হইয়াছে। সমালোচনায় কবিরত্ন মহাশয় তাঁহাব গৃহীত পার্শ্বের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গোভিলগৃহসূত্রের প্রাচীন ভাষ্যকার ভট্টনাথায়ণের মতে ‘ভূভূবঃস্বরোম্’ ইত্যাদি অংশ বৈকপাক্ষ মন্ত্রের আদি নহে, ‘বিকপাকোহসি’ দিয়া ঐ মন্ত্রের আদ্য। তিনি বলিয়াছেন—“বিকপাক্ষ-শব্দোহস্মিন্ বিদ্যত ইতি বৈকপাক্ষো মন্ত্রঃ বিকপাকোহসীত্যোবমাদিকঃ”—(গোভিলভাষ্য ৪,৫,৬)। ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত (৪,৫,৮) তিনি লিখিয়াছেন, “বিকপাকোহসীত্যোবমাদিকং বৈকপাক্ষমারভা”। কল্পস্কন্দ খাদিবগৃহসূত্রের (১, ২, ২২) বাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ‘তপশ্চ তেজশ্চ’ ইত্যাদি মন্ত্র জপের সঙ্গে ঋষি বন্ধ রাগিয়াই ‘ভূভূবঃ স্বরোম্’ ইত্যাদি অংশ ধ্যান করিবে, তাহাব পব বৈকপাক্ষমন্ত্র জপ কালে ঋষি ত্যাগ করিবে। গোভিলগৃহসূত্র-প্রকাশিকায় (১৭৮ পৃষ্ঠা) পরিষ্কাররূপে গোভিলসূত্রের তাৎপর্ষ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও প্রপদ ও বৈকপাক্ষ মন্ত্র এক সঙ্গে ধরা আছে, এখানেও উভয় মন্ত্রের দেবতা রুদ্ররূপ অগ্নি, এবং “ভূভূবঃ স্বরো! মহাস্তমাস্থানং প্রপত্তে” এই অংশ প্রপদ মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি “তপশ্চ তেজশ্চৈত্যাভ্য মহাস্তমাস্থানং প্রপত্ত ইত্যোতদন্তমন্ত্রচ্ছ সন্নর্থমনস্কো জপিষ্য বিকপাকোহসীত্যোবমাদিকোহস্মিন্গদশেবং জপেৎ। অত্র নিগদে প্রাণানায়ম্য জপঃ প্রপদজপস্তদ্বিতিতো বৈকপাক্ষজপ ইতি বিবেকঃ। অস্ত মন্ত্রস্ত প্রজাপতিঞ্চ বিনিগদো রুদ্ররূপোহগ্নিদেবতা জপে বিনিয়োগঃ”।

মন্ত্রভাষ্যে (২য় প্রঃ, ৪ ও ৫) এই দুইটি মন্ত্র একত্র ধৃত হইয়াছে এবং ৮মতাব্রত সামশ্রমী ও স্থানস্ জোরগেন্‌সেন্ এই উভয়ের সম্পাদিত সংস্করণ দুইটিতেই ‘ভূভূবঃস্বরোম্’ ইত্যাদি অংশ প্রপদ মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। গুণবিষ্ণুর মত সারণভাষ্যেও এক মন্ত্ররূপে উভয়ের বাখ্যা করিয়াছেন এবং মন্ত্রের স্বরূপ ও দেবতা এক সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়ের মতেই ‘রুদ্ররূপোহগ্নিদেবতা’। অথচ কবিরত্ন মহাশয় বলিতেছেন—“তপশ্চ মন্ত্রে রুদ্ররূপ অগ্নি ত দুয়ের কথা, কোনও অগ্নিই দেবতা নহেন।” রুদ্রস্কন্দ-বাখ্যা, ভট্টভাষ্য,

সারণভাষ্য এবং গোভিলগৃহসূত্র-প্রকাশিকা—সর্বত্র হু-পুস্তকের পাঠ সমর্থিত হইয়াছে, ক-পুস্তকের নহে।

(২) বৈকপাক্ষমন্ত্রের ভাষ্যে গুণবিষ্ণু গৃহাসংগ্রহের একটি বচন তুলিয়াছেন—“তথা চ স্মৃতিঃ—সর্বতঃপাণিপাদান্তঃ” ইত্যাদি। কবিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকে উহা ‘তথা চ স্মৃতিঃ’ স্মৃতিত হইয়াছিল। আমি পাদটীকায় ক-পুস্তকের পাঠ ধরিয়াছিলাম। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা করিতেছেন—“গুণবিষ্ণুটীকার প্রকৃত পাঠ ‘তথা চ স্মৃতিঃ’, সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং সংশোধন করিয়া ‘স্মৃতি’ লিখিয়াছেন”।

আমি আদর্শ পুথির প্রমাণ পাইয়া ‘তথা চ স্মৃতিঃ’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কবিরত্ন মহাশয় এ বিষয়ে আমার সপ্রমাণ উক্তি উপেক্ষা বা অবিশ্বাস করিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। আমি পাঠটিব গুরুত্ব বুঝিয়া ইংবাজী ভূমিকায় (xxvi) লিখিয়াছিলাম—রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ‘সামগমন্ত্রবাখ্যানে’ উল্লেখ করিয়াছেন যে, বঘুনন্দনের সময় গুণবিষ্ণুটীকার অপপাঠ দেখা দিয়াছিল। বঘুনন্দন যে স্মৃতিতন্ত্রে বলিয়াছেন “গুণবিষ্ণুনা তু স্মৃতিরিত্তি কৃষা ‘সর্বতঃপাণিপাদান্তঃ’ ইতি লিখিতম্” তাহাতে বামনাথের উক্তি সমর্থিত হয়। বঘুনন্দনদৃষ্ট ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের পুথিতে স্মৃতিতন্ত্রে স্মৃতি লেখা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আদর্শ পুথিতে স্মৃতি পাঠও পাইয়াছি (ভূমিকা, xxvi—Gunavishnu's work had undergone modifications as stated by Vidyavachaspati even at the time of Raghunandana who is said to have based his readings of a Mantra on a particular version of the Chhandogyamantrabhashya. পাদটীকা—ইতি কচিদগুণবিষ্ণুপুস্তকে পাঠঃ স্মাতস্মৃতঃ। It may also be mentioned that the verse সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ which Raghunandana points out in his Smrititattvas to have been wrongly quoted by Gunavishnu as Sruti, has been found by me in a Ms. of the Chhandogyamantrabhashya correctly given as Smriti, lending support to the testimony of Vidyavachaspati that at the time of Raghunandana, the Ms. of Gunavishnu's work had undergone modifications).

বিকপাক্ষমন্ত্রপ্রসঙ্গে কবিরত্ন মহাশয় আমার দুইটি ক্রটি প্রদর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। টিপ্পনীতে ‘মন্ত্রভাগো অনন্তরপঠিতস্ত’ আছে, উহা ‘মন্ত্রভাগোহনন্তরপঠিতস্ত’ হইবে। ‘সর্বতঃপাণিপাদান্তঃ’ আছে, উহা ‘সর্বতঃপাণিপাদান্তঃ’ হইবে, দুই পদের মধ্যে ব্যবধান থাকিবে না।

(৩) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে প্রারম্ভিক হোমের ৯টি মন্ত্রের বাখ্যা আছে। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা করিতেছেন—“১ম হইতে ৮ম পর্যন্ত প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা অগ্নি, সারণভাষ্যেও তাহাই আছে। হু-পুস্তকে ১ম হইতে ৮ম পর্যন্ত প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা ভিন্ন ভিন্ন।”

প্রকৃতপক্ষে হু-পুস্তকে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মন্ত্রের দেবতা যথাক্রমে বিশ্বদেব, বিভাবসু ও শতক্রতু; অপর মন্ত্রগুলিতে অগ্নি ভিন্ন অন্য দেবতার উল্লেখ নাই। ক-পুস্তকে অর্থাৎ কবিরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত ভবদেবপদ্ধতিতে প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা একেবারে হু-পুস্তকের

অনুরূপ; কেবল বিশ্বদেব স্থলে বিশ্ববেদাঃ আছে। ক-পুস্তকে যাহা শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই হু-পুস্তকে থাকিলে অশুদ্ধ হইয়া যায়, এইরূপ বুঝিতে হইবে কি? (ক-পুস্তকের ১ম সং ২৮-৩০ পৃঃ, ২য় সং ৩৭-৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

গুণবিষ্ণুর ভাষ্যে আছে—‘বৈশ্বদেবাঃ যজুঃ।’ কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—‘দেবতা অর্থে ‘বৈশ্বদেব’ হয়, ‘বৈশ্বদেবা’ হয় না। আমি বাঙ্কের নিকট (৭, ২৩) পাঠিয়াছি—“সূক্তানি...বৈশ্বদেব্যানি।” সূক্ত শব্দের বিশেষণরূপে বৈশ্বদেবা পদ শুদ্ধ হইলে যজুঃ শব্দের বিশেষণরূপেও অবশ্যই শুদ্ধ।

গুণবিষ্ণু ‘বিদ বেদনাখাননিবাসেবু’ এই চুরাদিগণীয় বিন্দধাতু অক্ষন্ প্রত্যয়ে বেদস্ পদ সাধিয়াছেন, এবং উহার অর্থ দিয়াছেন ‘বেদনা’। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা করিয়াছেন—“পাণিনীয় ধাতুপাঠে ‘বিদ চেতনাখাননিবাসেবু’ আছে; ‘বেদনা’ কোথা হইতে পাইলেন?” গুণবিষ্ণু কোথায় পাইলেন জানি না, আমি বহু গ্রন্থে পাইয়াছি। পাণিনীয়, চান্দ্র, কাতন্ত্র, মুকুবোধ এবং সংক্ষিপ্তসারের ধাতুপাঠ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উক্ত ব্যাকরণগুলির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে চুরাদিগণীয় বিদ ধাতুর বেদনা অর্থ সুপরিজ্ঞাত।

জ্ঞানসামে প্রসিদ্ধ কাশিকাবিবরণপঞ্জিকায় ‘অনুপসর্গাল্পি’ ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের (৩, ১, ১৩৮) ব্যাখ্যায় জিনেন্দ্রবৃদ্ধি ‘বিদ বেদনাখাননিবাসেবু’ এই ধাতুপাঠই ধরিয়াছেন। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর বাসমনোরমাণ্ড ঐ সূত্রের টীকায় ‘বিদ বেদনাখাদিবু’ এইরূপ পাঠ আছে। পাণিনীয় ধাতুপাঠেব বৃত্তিগ্রন্থ ধাতুপ্রদীপে (১৩৯ পৃঃ) মৈত্রেয় রক্ষিতের পাঠ বেদনা, চেতনা নহে। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতেও (চুরাদি ১৬৭) ‘বিদ বেদনাখাননিবাসেবু’ এইরূপ পাঠান্তর ধরা আছে। কাশীনাথকৃত ধাতুমঞ্জরীর পাঠও বেদনা (চার্লস্ উইলকিন্স্-এর সংস্করণ, ১৩২ পৃঃ)। চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণেও ধাতুপাঠ ‘বিদ বেদনাম্’ (চুরাদি ৩৮)। কাতন্ত্র-গণমালায় (চুরাদি ১২৯) পাঠও ‘বিদ বেদনাখাননিবাসেবু’। বোপদেবকৃত কবিকল্পদ্রুমের টীকাকার হর্গাদাস বেদনা পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—“কেচিৎস্বাদঃ ন পঠন্তি চেতনাস্থানে চ বেদনেতি পঠন্তি বেদয়েতে বিদ্ধঃ বাথতে ইত্যর্থ ইত্যাদাহরন্তি” (দাস্তবর্গ ৬২)। স্বয়ং কবিরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ‘সাহাদেরপ্রসাদেঃ’ এই সূত্রের টীকায় গোয়ীচন্দ্র লিখিয়াছেন “বিদ বেদনাখাননিবাসেবু ইতি চুরাদিগণ্ডন্তঃ।” এতগুলি গ্রন্থে বেদনা পাঠ থাকিলেও কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—“বেদনা কোথা হইতে পাইলেন?”

(৪) ‘সবাং পাহি শতক্রতো’ ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের পাঠ। ভাষ্য—‘সবাম্ সবো যাগঃ তত্র ভবঃ ফলম্’। কবিরত্ন মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—“সবাং পাঠ কোন্ বেদে আছে?”

গুণবিষ্ণু স্বয়ং উত্তর দিতে পারিতেন। আমি আকরসঙ্কেতিকায় দেখাইয়াছি যে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং শাখায়নগৃহসূত্রে সবাং স্থলে সবাং পাঠ আছে। যে স্থলে গুণবিষ্ণুর পাঠ আকরসঙ্কেতিকায় পাঠ হইতে অল্প প্রকার দেখিয়াছি, সে রূপ স্থলে আমি মূলে গুণবিষ্ণুর পাঠ রাখিয়া পাদটীকায় কিংবা আকরসঙ্কেতিকায় আকর গ্রন্থের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি। অল্প গ্রন্থে একটি মনের মত পাঠ পাইলেই গুণবিষ্ণুকে সংশোধন করি নাই। গ্রন্থসম্পাদকের পক্ষে ঐরূপ

করা উচিত নয় বলিয়া আমার ধারণা। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত এম, উইন্টারনিজ্, আপস্তম্বমন্ত্রপাঠের ভূমিকায় (xv) ঐরূপ গ্রন্থের সম্পাদকের কর্তব্য স্বাক্ষরে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

“he will remember that he has to edit, and not to correct his text, and that even a grammatically impossible reading has to be retained, if it is warranted by the best authority.”

আমার ইংরাজী ভূমিকায় (p. iii) পরিষ্কারভাবে এ সকল কথা বলিয়াছি। প্রাস্তাবিক নিবেদনে (p. xl) ও বলিয়াছিলাম—“মূলে যথোপলব্ধ আদর্শধ্বতাঃ পাঠা এবং সংরক্ষিতাঃ পরং তত্র পাদটীকায়ামাকরসঙ্কেতিকায়ং বা আকরদৃষ্টাঃ পাঠা আপ প্রদর্শিতা যেন কমানুষ্ঠায়িনো বিদ্বাসো যথাকৃতি তত্তমন্ত্রপাঠানুপাদাতুঃ পরিহাতুঃ বা প্রভবেয়ুঃ”।

এই প্রায়শ্চিত্ত হোমেরই কোন কোন মন্ত্রের পাঠে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সহিত কেবল গুণবিষ্ণুর নহে, শাখায়নগৃহসূত্রেরও মিল নাই। আরণ্যকের (১০, ৫, ১) ‘অগ্ন এনসে’ এবং ‘বিশ্ব-বেদসে’ স্থলে গৃহসূত্রে (৫, ১, ৮) আছে ‘অগ্ন এধসে’ এবং ‘বিশ্ব-বেধসে’। ইহার মধ্যে একটি পাঠ অশুদ্ধ এমন কথা কেহ বলিবেন কি? বেদভেদে ও শাখাভেদে পাঠভেদ হইতে পারে, তাহা সকলেই জানেন। গুণবিষ্ণুর অর্থসঙ্গতিযুক্ত সবাং পাঠ যে বেদভেদে নিবন্ধন হয় নাট, তাহা কে বলিতে পারে? কোন পাঠ মুদ্রিত গ্রন্থে না পাইলেই অমূলক মনে করা উচিত নহে। ঐরূপ মনে করিয়া কবিরত্ন মহাশয় কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা আমার ১৭ সংখ্যক উক্তিতে শল্লোদেবী মন্ত্রের আলোচনায় প্রদর্শিত হইবে। মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠকেই একমাত্র বিদ্বৎ পাঠ স্থির করাও যে বিবেচনার কার্য নহে, তাহাও ২০ সংখ্যক উক্তিতে প্রমাণিত হইবে।

(৫) কবিরত্ন মহাশয় বলিতেছেন,—“হু-পুস্তকে ও ন-পুস্তকের পাদটীকায় ৫ম মন্ত্রের সম্পূর্ণ পাঠ সামবেদের”। রুদ্রস্বন্দরামী খাদিরগৃহসূত্রের ‘প্রায়শ্চিত্তঃ জুহুয়াৎ’ (১, ৩, ১৫) এই সূত্রের বৃত্তিতে ৫ম মন্ত্রটির সম্পূর্ণ সামবেদীয় পাঠই ধরিয়াছেন। সূত্রবাং গুণবিষ্ণু কিছু দোষ করেন নাই। কবিরত্ন মহাশয়ই মন্ত্রটির ভিন্ন-বেদীয় পাঠ গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায়বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন। যাহা স্ববেদে নাই, কেবল তাহাই অপর বেদ হইতে গ্রহণ করা চলে।

(৬) ও (৭) এই সমালোচনার উত্তর আমার ৪-সংখ্যক উক্তির মধ্যেই আছে। উভয় স্থলেই আমি আকর-পাঠ দেখাইয়াছি।

(৮) হু-পুস্তকে ‘অদিতে অহমংস্থাঃ। অহুমতে অহমংস্থাঃ।’ এইরূপ ছাপা আছে। উহা সন্ধি করিয়া ‘অদিতেহহমংস্থাঃ। অহুমতে-হহমংস্থাঃ।’ হইবে। কবিরত্ন মহাশয়ের বিত্ত্বীকৃত পাঠ কিন্তু অত্যন্ত অশুদ্ধরূপে সমালোচনায় ছাপা হইয়াছে—‘অদিতেহহমংস্থাঃ, অহুমতেহহমংস্থাঃ’। এরূপ ভুল কেন হয়, তাহা সকল গ্রন্থপ্রকাশকেরই জানা আছে।

(৯) হু-পুস্তকে কয়ানঃ, কয়া, অভীষুণঃ, স্বস্তিনঃ এই ৪টি শাস্তিমন্ত্রের পর এইরূপ ভাষ্য আছে—“গায়ত্র্যস্তিষঃ [ত্রিষ্ট্বেকা] ইন্দ্রদেবতাকাঃ শাস্তকর্মণি বিনিযুক্তা মহাবামদেবদৃষ্টাঃ”। বন্ধনী চিহ্নের মধ্যস্থ [ত্রিষ্ট্বেকা] অংশ যে আমার লিখিত, তাহা সুস্পষ্ট।

গুণবিষ্ণু ৩টি মন্ত্রের ঋষ্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন, 'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রের কথা কিছু বলেন নাই। ভবদেবও "ঋষ্যাদির উল্লেখ না করিয়াই 'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রটি ধরিয়াছেন" সেকথা কবিরত্ন মহাশয় জানেন।

এখানে আমি টিপ্পনীতে লিখিয়াছিলাম—“ভ-মৈ—গায়ত্র্য-শ্চতস্রঃ”। ইহাতে সকলেই বুঝিবেন যে, 'ভ' ও 'মৈ' এই দুইখানি পুথি ব্যতীত আমার অল্প আদর্শ পুথিতে 'গায়ত্র্যাস্তিস্রঃ' আছে। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা করিয়াছেন—“কেবল ভ মৈ কেন? গুণবিষ্ণু-টাকার সমস্ত পুস্তকেই, স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের সংগৃহীত সমস্ত আদর্শ পুস্তকেও 'গায়ত্র্যশ্চতস্রঃ' আছে; সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া যে ঐরূপ পাঠ করিয়াছেন, তাহা 'ক্রচেট' চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে”। কবিরত্ন মহাশয় কেন ঐরূপ বুঝিলেন, জানি না। 'ক্রচেট' চিহ্নের মধ্যস্থিত [ত্রিষ্টুবেকা] এই অংশটুকু মাত্র সম্পাদকলিখিত এই সাধারণ কথা কি তিনি বুঝেন নাই? ক্রচেট চিহ্নের মধ্যস্থ অংশ ছাড়া আর সবই মূল গ্রন্থকাবের লেখা বলিয়া বুঝিতে হয়, ইহাই শিষ্ট-ব্যবহার।

কবিরত্ন মহাশয় এখানে ভবদেবপদ্ধতির একটা বিকৃত পাঠ তুলিয়া বেশ বড় সমালোচনা করিয়াছেন; বামদেব পদ কিরূপে হইল, উহার প্রকৃত অর্থ কি—তাহা বলিয়াছেন; “উক্ত মন্ত্রত্রয়ের কোনওটারই বিরাট গায়ত্রী ছন্দঃ নহে”—সে কথাও জানাইয়াছেন। পাঠকের মনে হইতে পারে যে, কবিরত্ন মহাশয়ের আলোচ্য গ্রন্থে ঐ সকল পাঠ আছে। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে কিন্তু 'বামদেব' পদ কিংবা 'বিরাট গায়ত্রী ছন্দঃ' কিছুই নাই। যে সকল কথা ভবদেব-পদ্ধতির বিভিন্ন সংস্করণে (১ম সং ৩৯ পৃ., ২য় সং ৫৩ পৃ.) পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সেই পূর্ব-প্রকাশিত কথাগুলিই কবিরত্ন মহাশয় আব একবার বসুমতী পৃষ্ঠায় অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে সমালোচনার কলেবর বৃদ্ধি

হইয়াছে। প্রকৃত বক্তব্য এই যে, মন্ত্রত্রয়ের ঋষি বামদেব, কিন্তু গুণবিষ্ণু লিখিয়াছেন “মহাবামদেবদৃষ্টাঃ”।

'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রের দেবতা একা ইন্দ্র নহে, অথচ গুণবিষ্ণু ভুল করিয়া সেইরূপ বুঝিয়াছেন, ইহা কবিরত্ন মহাশয়ের আব একটি অভিযোগ। প্রকৃতপক্ষে গুণবিষ্ণু তাঁহার ভাষ্যে ইন্দ্র, পৃষা, তাক্ষ্য এবং বৃহস্পতি—এই চারিটি নাম পৃথক দেবতারূপেই উল্লেখ করিয়াছেন; বৃহস্পতি ইন্দ্রের বিশেষণ, বিশ্ববেদাঃ পৃষার বিশেষণ এবং অরিষ্টনেমি তাক্ষ্যের বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ইন্দ্রঃ, তথা পৃষা, তথা তাক্ষ্যঃ, তথা বৃহস্পতিঃ'—ইহার অর্থ সকলেই বুঝিবেন 'ইন্দ্র এবং পৃষা এবং তাক্ষ্য এবং বৃহস্পতি'। বিকৃত সমালোচনা কবাব উদ্দেশ্যেই যেন কবিরত্ন মহাশয় গুণবিষ্ণু-ভাষ্যের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকাব জানিতেন, 'গরুডস্তাক্ষ্যঃ'। তিনি দেবতানামগুলিব কোনটিবই ব্যাপ্তি দেন নাই, ইন্দ্র, পৃষা ও বৃহস্পতিপদের জায় তাক্ষ্যপদেরও অর্থ লেখা আবশ্যক মনে করেন নাই, কাবণ, পৃষা অপেক্ষা তাক্ষ্য অধিক অপ্রসিদ্ধ নয়।

কবিরত্ন মহাশয় আবও লিখিয়াছেন—“'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রের ঋষি বাহুগণ গৌতম মহাবামদেবা, মহাবামদেব বা বামদেব নহেন); ছন্দঃ বিরাটস্থানা ত্রিষ্টুপ্, (গায়ত্রী নহে); দেবতা বিশ্বদেবাঃ (ইন্দ্র নহেন); বিনিয়োগ স্বস্তিবাচনে (শাস্তি কর্মে নহে)।” এ সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক, কাবণ, ভবদেবের জায় গুণবিষ্ণুও 'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রের ঋষ্যাদিব উল্লেখই করেন নাই। কিন্তু কবিরত্ন মহাশয় যে লিখিলেন “বিনিয়োগ স্বস্তিবাচনে (শাস্তিকর্মে নহে)”, তাঁহার ভবদেবপদ্ধতিতে ত 'স্বস্তিনঃ' মন্ত্রের ঠিক পাবেই লেখা আছে “এতা ঋচো গীত্বা শাস্তিঃ কৃষ্যাং”।

[ক্রমশঃ ।

শ্রীভূর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ।

মঞ্জুরাণী

মঞ্জুরাণী চলছে এখন আস্তে,
উর্ধ্বশী কি শিখছে প্রথম নাচতে ?
টলছে চরণ ঢলছে তাহার গা'টি,
বুঝি শিবের বুকুই পড়ে পা'টি ।

তাহার কথার অর্থ নাহি পাই রে,
একেবারে অভিধানের বাইরে ।
ভঙ্গী তাহার ভাবকে টেনে আনছে
তরল ভাষা প্রথম দানা বাঁধছে ।
ভালে আবার সিন্দুরেরি বিন্দু
ফালি হয়ে ফুটেবে বুঝি ইন্দু ।

ঘামছে দেহ, কাঁপছে যে তার হস্তে
ভাবটা কতক ন ঘরো ন তন্তে ।
ভয় মেখে বেশ তাহারে সাজবে
বলদ তারে পৃষ্ঠে নিয়ে নাচবে ।
পঞ্চতপের সাধন সে যে করবে
বরবে নীলকণ্ঠকে সে বরবে ।

হতে আমি পারব না ত সিন্ধি
হব নেহাৎ নন্দী না হয় ভূঙ্গি ।

শ্রীকুমদরঞ্জন মল্লিক ।



অবাঞ্ছিত অতিথি

আমিন-গাঁয়ের পুলিশ কর্মচারী ভূপতি চৌধুরীর স্ত্রী শৈলবালা সে দিন তুলসীতলায় সবে-মাত্র প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে তাহাদেরই আঙ্গিনার পিছনের বেড়া ডিঙাইয়া সতের-আঠার বছরের একটি যুবক উর্দ্ধ্বাসে দৌড়াইয়া-আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া আর্ন্তকণ্ঠে কহিল, “আমায় বাঁচান,—ওদের হাত থেকে আমায় বাঁচান! ওদের হাতে পড়লে আমার ফাঁসী হ’য়ে যাবে। ঠাঁ, আমার নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড হবে।”

বাহিরের একটা অস্পষ্ট কোলাহলে শৈল সচকিত হইবার পূর্বেই অকস্মাৎ এই অভাবনীয় ব্যাপারে সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া জড়পদার্থের মত চলৎশক্তিহীন অবস্থায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই ফাঁসীর কথাটি তাহার অবসাদগ্রস্ত মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া মর্মস্থলে প্রবেশ করিতেই সেখানে এমন অচিন্ত্যপূর্ব্ব, অদ্ভুত সাড়া পড়িয়া গেল যে, তাহার দেহের শোণিতরাশি মুহূর্ত্তে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে পুলিশ কর্মচারীর স্ত্রী; স্মতরাং এ জিনিষটাকে সে ভাল-করিয়াই চিনিত। ইহার কঠোর নির্ভুরতা ও অসীম বর্করতা তাহাকে অনেক সময় আকুল করিয়া তুলিত। কাহারও ফাঁসী হইয়াছে বা ফাঁসীর আদেশ হইয়াছে—এ কথা শুনিতে পাইলেই সে শরবিদ্ধা কুরঙ্গিনীর ভায় অস্থির ভাবে বাড়ীর আঙ্গিনায় দাপাইয়া বেড়াইত; আহার-নিদ্রা সে ভুলিয়া যাইত, এবং মনের কষ্ট দমন করিতে না পারায়, অবিরল অশ্রধারাপাতে সে সিক্ত হইত।

এ ছেন নির্ভুরতম, দারুণ বিভীষিকাপূর্ণ ফাঁসীর ভয়ে এই হতভাগ্য যুবক সহসা তাহারই আশ্রয়প্রার্থী; তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া করুণ কণ্ঠে তাহারই কৃপা ভিক্ষা

করিতেছে। এখন তাহার কর্তব্য কি? কিন্তু নিমিষেই তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভাবিয়া কিছু স্থির করিবার পূর্বেই, সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া ছ’ হাত বাড়াইয়া, ছেলেটিকে মাটি হইতে টানিয়া তুলিয়া কহিল, —“ভয় নেই, আমি তোমায় বাঁচাবার চেষ্টা ক’রবো। আমার সঙ্গে এসো এখনি।”—সে তাহার হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং ঘরের এক কোণে যে সিন্দুকটা স্থাপিত ছিল, তাহারই আড়ালে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া ঘরের শিকল আঁটিয়া দিল।

বাহিরে বহু কণ্ঠের কোলাহল ক্রমশঃই স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। অদূরবর্তী আমবাগানের চতুর্দিক হইতে বহু লোকের কণ্ঠস্বর শৈলের কর্ণগোচর হইল। শৈল তাহার শয়ন-কক্ষের ঘরের শিকল বন্ধ করিয়া ঘরের উঠানের যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই স্থান হইতে সে আর পদমাত্র সরিয়া যাইতে পারিল না। সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে অলক্ষণ পরেই অবসর দেহে মাটিতে বসিয়া পড়িল। কাজটা সে ভাল করিল কি মন্দ করিল—এটুকুও ভাবিবার অবসর পাইল না। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় যখন তাহার জদয়ে তুমুল ঝড় বহিতেছিল, সেই সময়ে তাহার স্বামী দ্রুতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে সেখানে আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “একটা ছোড়াকে তোমার সমুখ দিয়ে দৌড়িয়ে যেতে দেখেছ? মানে, সে আমাদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এই দিকেই এসেছিল। চেহারা ভদ্রলোকের ছেলের মতনই ফর্সা, লম্বা, দোহার চোখেরা?”

মিথ্যাকে শৈল চিরদিনই আন্তরিক স্বপ্না করিত;

কিন্তু আজ কোন দ্বিধাই তাহার মনে স্থান পাইল না। কথাটা অস্বীকার করিবার জন্ত সে মাথা নাড়িল মাত্র। কথা কহিলে কণ্ঠস্বরে বিচলিত ভাব ধরা পড়িবার আশঙ্কা ত ছিলই—তাহার উপর মিথ্যা কথাটা হঠাৎ মুখে বাহির হইল না।

তাহার স্বামী কহিল,—“ছোড়াটা পুলিশের একটা লোককে গুলী মেরে পালাচ্ছে। আমাদের আমবাগানে ঢুকেছে বলেই মনে হয়েছিল; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে অস্ত্র দিকে স’রে পড়েছে। তা ওখানে তুমি ও-ভাবে ব’সে রয়েছ কেন? তোমার কি হয়েছে বল তো শুনি।”—ভূপতি শৈলর ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীকে সম্মুখে সরিয়া আসিতে দেখিয়া শৈল উঠিয়া-দাঁড়াইয়া ঘরের দরজার নিকট চলিয়া গেল, এবং দরজায় ঠেস দিয়া আত্মসংবরণের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু সে যখন গুলিল, ছেলেটি এক জন পুলিশকে গুলী করিয়াছে, সে নরহস্তা,—তখন আত্মসংবরণ করা তাহার দুঃসাধ্য হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, দারুণ আতঙ্কে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, এবং সে হতাশ ভাবে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল।

ভূপতি স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া কোমল স্বরে কহিল,—“ভয় পেয়েছ শৈল? ভয় কি? সে খুনী হ’লেও তাকে তোমার ভয় করবার কারণ নেই। সে নিশ্চয়ই এ-দিকে আসেনি। যাও, তুমি ঘরের ভিতর যাও।”

শৈলর মনের মধ্যে তুফান বহিতেছিল। না জানিয়া নরহস্তাকে গৃহে সে আশ্রয় দিয়াছে!

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে ছেলেটির স্কুমার করুণ মুখখানি তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহার আতঙ্ক-বিহ্বল চক্ষুর মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি স্বরণ হওয়ার শৈল মুহূর্ত্ত মধ্যে মনকে দৃঢ় করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। যুবক নরহস্তা হইলেও শৈল তাহাকে অভয় দিয়াছে,—আশ্রয়ও দিয়াছে। তাহাকে সে ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহার অভয়-বাণীও প্রত্যাহার করিবে না। শৈল দরজা ধরিয়া উঠিয়া-দাঁড়াইয়া স্বামীকে কহিল,—“তুমি যাও। আমার ভয় দূর হয়েছে। আমার জন্তে তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না।”

ভূপতি প্রস্থান করিলেও শৈল কিছুকাল সেখানে যেন

কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রছিল। সে ভাবিতে লাগিল—কি করিয়া সে ছেলেটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে? তাহার মুখের দিকে চাহিবে? স্বেচ্ছায় যে নরহস্তা করিয়াছে, তাহাকে লইয়া সে এখন কি করিবে?

স্বামীকে সে প্রতারণিত করিয়াছে, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাদের মহাশত্রুকে তাহারই গৃহে আশ্রয়দান করিয়াছে! শৈল ভয়ে চুশ্চিত্তায় অধীর হইয়া কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু এই নরহস্তার অপরাধের কথা শুনিয়াও এখন তো তাহার পিছাইবার উপায় নাই; অথচ তাহার সকল কর্তব্যই এখনও অসম্পন্ন রহিয়াছে।

শৈল আর অপেক্ষা করিতে পারিল না; শঙ্কিত বক্ষে, কম্পিত হস্তে দ্বার খুলিয়া সেই সিন্দূকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক পদশব্দ শুনিয়া সতয়ে মুখ তুলিতেই শৈলকে দেখিতে পাইল, এবং অকস্মাৎ ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া ফেলিয়া কাতর স্বরে কহিল, “আমায় বাঁচান দিদি! আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবেন না, দোহাই আপনার।”

যেটুকু ভয় ও দুর্ভাবনা শৈলর মনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, এই ‘দিদি’ সম্বোধনে সে সমস্তই যেন কোথায় চলিয়া গেল এবং অননুভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি ও স্নিগ্ধতায় তাহার ব্যাকুল চিত্ত ভরিয়া উঠিল। শৈল অপুত্রক, কোন ভাইও তাহার ছিল না। তাই নারীস্বের যত কিছু স্নেহ, ভালবাসা সমস্তই আজ সহসা বাঁধযুক্ত নদীপ্রান্তের স্নায় এই ছেলেটিকে অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া চলিল, এবং তাহাকে যেন শত ধারায় অভিষিক্ত করিল। শৈল স্নিগ্ধ কণ্ঠে তাহাকে অভয় দিয়া কহিল, “তোমায় বাঁচাব বই কি ভাই! যতক্ষণ আমি আছি, তোমার কোন ভয় নেই।”

শৈল হাত ধরিয়া তাহাকে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে আনিল; কিন্তু সেই সময় তাহার দৃষ্টি ছেলেটির উপর পড়িতেই সে সতয়ে বলিয়া উঠিল,—“এত রক্ত এল কোথা থেকে? রক্তের যে চেউ ব’য়ে যাচ্ছে! এত কাটল কি ক’রে? কোথাও প’ড়ে গিয়েছিলে বুঝি?”—কিন্তু যখনই তাহার মনে পড়িল, পুলিশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্ত তাহাকে বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছিল, তখন তাহার আর কিছুই বুঝিতে

বাকী রহিল না। শৈল কিছুকাল শুকভাবে কি চিন্তা করিয়া পাশের ঘর হইতে স্বামীর কাপড়-জামা আনিয়া তাহার হাতে দিল এবং রক্তসিক্ত জামা-কাপড় খুলিয়া ফেলিতে অমরোধ করিল। যুবকটি এতক্ষণ নতমুখে নির্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে 'দিদি' বলিয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া-পড়িয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

শৈলর চক্ষুও শুক রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া তাহার স্বক্ স্পর্শ করিয়া কহিল,—“কেঁদ না ভাই। তোমার জন্মে আমার যা সাধ্য, তা করবই আমি। তুমি ততক্ষণ কাপড়-জামা ছেড়ে ফেল, আমি জলটুকু গরম কোরে আনি। কাটা যায়গাগুলো ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেধে দিতে হবে কি না।” শৈল পুনর্বার বাহিরে চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরে শৈল এক হাতে ব্যাণ্ডেজের সরঞ্জাম, এবং অত্র হাতে এক বাটি গরম দুধ লইয়া সেই কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিল। দুধের বাটিটা ছেলেটির সম্মুখে ধরিয়া কহিল,—“দুধটুকু আগে খেয়ে নাও। সারা সকালটা তোমার পেটে কিছুই যে পড়েনি, তা তো মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।”

সেই অবস্থায় যুবকটির কিছু খাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও শৈলর আগ্রহপূর্ণ অমরোধ সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, নিঃশব্দে দুধটুকু পান করিয়া বাটিটা মাটিতে রাখিয়া দিলে শৈল সযত্নে অপটু-হস্তে তাহার ক্ষতস্থলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বসিল।

পরম যত্নে ক্ষতগুলি গরম জলে ধুইয়া দিতে দিতে শৈল প্রশ্ন করিল, “তোমার নামটি কি ভাই?”

ছেলেটি মুহূর্ত্ত কাল ইঁতস্ততঃ করিয়া আঁর্ত চক্ষু-দুটি শৈলর মুখের উপর রাখিয়া কহিল,—“অমিয়কুমার বাঁড়ুয়ে।”

শৈল আবার প্রশ্ন করিল,—“তোমাদের বাড়ী কোথায়?”

“বনগাঁয়ে।”

“বনগাঁয়ে?”—বনগাঁয়ের নাম শৈলর সুপরিচিত। বনগাঁ তাহার বাপের বাড়ী হইতে দুই-এক ক্রোশ মাত্র

দূরবর্তী। শৈল কৌতূহলভরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—“সেখানে তোমার কে কে আছেন?”

অমিয় নতমুখে উত্তর দিল,—“বেশী কেউ নেই দিদি! শুধু এক দাদা আর বৌদি’ আছেন; কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর থেকে তাঁরা আমার কোন খোঁজ-খবর নেন না। আমি এক রকম অনাথ—অসহায়।”

“আহা!” সহানুভূতিতে শৈলর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে আঁচলে চক্ষু মুছিয়া কহিল,—“তোমার বৌদি’র কি একটুও দয়া-মায়্যা নেই! তুমি নিরাশ্রয়—তা জেনেও তোমার খোঁজ নেন না? আশ্চর্য্য!”

অমিয় লজ্জিত ভাবে নতমুখেই বসিয়া রহিল।

শৈল দুই-এক মিনিট কি চিন্তা করিয়া তাহার ক্ষতস্থান-গুলিতে পটা বাঁধিয়া দিয়া কহিল,—“দুর্ভোগ তো অনেক হ’ল। পাশের ঘরে বিছানা পাতা আছে, এখন শুয়ে একটু বিশ্রাম করবে চল।” তাহার পর তাহাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া, খাটিয়ার উপর প্রসারিত বিছানাটি দেখাইয়া বলিল,—“এখানে তোমার কোন ভয় নেই, চুপটি ক’রে শুয়ে একটু জিরোও; আমি ততক্ষণ বাইরের কাজগুলো সেরে আসি।”

শৈল বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া অত্র দিকে চলিয়া গেল।

অমিয় অবিলম্বে বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু একটা অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতে লাগিল। শুইবার সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ কম্প দিয়া শীত করিয়া জ্বর আসিল, কিন্তু হাতের কাছে কোন আচ্ছাদন না থাকায় সে সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া-থাকিয়া শীতে ধর-ধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অল্পকাল পরে শৈল তাহাকে দেখিতে আসিল। অমিয় তখন প্রবল জরে বেহঁস। শৈল মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে তাহার ললাটে হাত ঠেকাইয়াই চমকিয়া উঠিল। দারুণ উদ্ভাপ, সে স্থানটা যেন পুড়িয়া যাইতেছিল।

ঠাণ্ডা করস্পর্শে অমিয় চোখ মেলিয়া চাহিয়া ‘আঃ! দিদি!’ বলিয়া ব্যাকুল ভাবে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

এই নূতন দৃষ্টিনায় শৈল যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

তাহার মুখ হইতে হঠাৎ কোন কথাই বাহির হইল না। কয়েক মিনিট পরে সে মূহুর্তে কহিল,—“জরটা এল কখন তোমার ?”

অমিয় অক্ষুট স্বরে কহিল,—“তুমি চ’লে যাবার পরেই, দিদি !”

শৈল করুণ কণ্ঠে কহিল,—“বড্ড কষ্ট হচ্ছে, অমিয় ? কি কষ্ট হচ্ছে—আমায় বল ? শীত কোরছে খুব ?”

অমিয় কথা কহিল না। একটু ঘাড় নাড়িয়া তাহার শেষ কথাটির সমর্থন করিল মাত্র। শৈল আলমারী খুলিয়া পুরু চাদর বাহির করিয়া তদ্বারা সযত্নে অমিয়র সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল, এবং স্তরুভাবে তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

হায় নারী ! তোমার স্নেহ-যত্নে যে বঞ্চিত, সংসারে তাহার ঞায় হতভাগ্য আর কে আছে ?

মিনিট পনের ছটফট করিবার পর অমিয় আপনা-হইতেই একটু ঘুমাইয়া পড়িল। শৈল তখনও নিঃশব্দে সেইখানে বসিয়া রহিল।

ভূপতি তখনও ফিরে নাই। শৈল জানিত, আজ তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইবে ; তাই সে ভাবিয়াছিল, এই অবসরে বুদ্ধি খাটাইয়া যা হ’ক কোন একটা ব্যবস্থা সে করিয়া ফেলিতে পারিবে। তার পর সময় বুঝিয়া স্বামীকে বলিয়া তাহার ক্ষমা চাহিলে সব গোল হয় তো মিটিয়া যাইবে। নারী সে, স্বামীর শক্তিতে তাহার বিশ্বাস ছিল অগাধ ; এই জন্তই সে ভাবিয়াছিল—পুলিশের দারোগার চেষ্টায় নরহত্যাও হত্যাপরাধ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। অভুক্ত অমিয়কে খাওয়াইয়া বিদায় দিবার সঙ্কল্পও তাহার ছিল। কিন্তু সব জট পাকাইয়া উঠিল। এখন জরাক্রান্ত এই উখানশক্তিহীন ছেলেটিকে সে কিরূপে বিদায় দিবে ? এ অবস্থায় তাহাকে বিদায় দিলে, সে টলিতে টলিতে কোন মতে পথে গিয়া এক গাছতলায় আশ্রয় লইবে, সেখান হইতে আর উঠিতে পারিবে না। হয় তো তাহার শেষ সময়—আর কোন কথা ভাবিতে না পারিয়া অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া সে স্তরুভাবে বসিয়া রহিল।

বাহিরে জুতার শব্দ হইল। পরমূহুর্তে ভূপতি দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া ধমকাইয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল,—“শৈল !”

তাহার আছান-ধ্বনিতে শৈল চমকাইয়া উঠিয়া ব্যগ্র ভাবে দরজার নিকটে আসিয়া কহিল,—“আস্তে কথা-বল। এতক্ষণে ওর একটু ঘুম এসেছে ; গোলমালে ঘুমটা ভেঙ্গে যাবে হয় তো।”

ভূপতি সবিস্ময়ে কহিল,—“ব্যাপার কি ? ওখানে ও শুয়ে কে ?”

“সে অনেক কথা। বাইরে গিয়ে বলছি সব।”—শৈল এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল ; দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া শৈল উঠানে আসিতেই ভূপতি ব্যগ্র স্বরে বলিল,—“কি বলছিলে, বল শুনি।”

শৈল ঘামিয়া উঠিল। স্বামীর মুখের দিকে সাহস করিয়া সে চাহিতে পারিল না। নতমুখে বাধ-বাধ স্বরে কহিল,—“ও আম—আমার ভাই।”

“তোমার ভাই ?”—গভীর বিস্ময়ে ভূপতির হৃই চক্ষু কপালে উঠিল। একটু খামিয়া সে বলিল, “তোমার কোন ভাই আছে, এ কথা তো কোন দিন শুনিনি ?”

শৈল এবার অবিচলিত স্বরে কহিল,—“তখন ছিল না, তাই শোননি। এখন হ’য়েছে, কাজেই শুন্তে পেলো।”

ভূপতির বিস্ময় উন্মায় পরিণত হইল। স্ত্রীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—“আমার সঙ্গে তামাসা কোরছ মেজ ?”

শৈল এই পরিবারের মেজ-বোঁ। বিরক্তি বা রাগ হইলে ভূপতি কখন কখন তাহাকে ‘মেজ’, কখন বা ‘মেজ-বোঁ’ বলিয়া সম্বোধন করিত। শৈলও ইহা জানিত ; কিন্তু আজ সে দমিল না, ধীর ভাবে কহিল,—“কোন দিন এ ভাবে কি তোমার সঙ্গে তামাসা কোরেছি ? আজ তামাসা করছি—এ কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন ?”

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। ভূপতি তাহার এই মন্তব্যে একটু লজ্জিত হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, “তামাসা কোন দিন করনি স্বীকার করি ; কিন্তু তোমার কথার মর্ম্ম তো কিছু বুঝতে পারছি নে। কথাটা খুলে বলতে বাধা আছে কি ?”

শৈল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল,—“অমিয় সত্যই আমার ভাই ; আমি তার বোন। এ বিষয়ে তুমি এক বিন্দুও সন্দেহ কোর না।”

এই পর্য্যন্ত বলিবার পর স্বামীর সহিত দৃষ্টি-বিনিময়

হইতেই হঠাৎ তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে সেই-
খানেই বসিয়া-পড়িয়া ছু'হাতে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া
বাপ্পরুদ্ধ কর্তে কঠিল,—“আমায় তুমি কমা কর ; তোমার
সঙ্গে আমি প্রতারণা ক'রেছি।”

এ কথা শুনিয়া ভূপতি যেন হতবুদ্ধি হইল ! কণকাল
পরে সে শৈলকে মাটি হইতে টানিয়া তুলিয়া সন্দিগ্ধ স্বরে
কহিল, “আমার সঙ্গে প্রতারণা কোরেছ শৈল ? এ যে
বড়ই অসম্ভব কথা !”

শৈল কাতর কর্তে কহিল,—“অসম্ভব নয়, আমার এ
কথা বিশ্বাস কর। তখন তোমরা যাকে খুঁজতে এসে-
ছিলে, ঐ ছেলেটিই তোমাদের সেই আসামী। আমি
তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। সে আমায় ‘দিদি’ ব'লে
কাতর ভাবে আমার আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল। তাই
আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শৈল হঠাৎ ধামিয়া গেল। সে
সভয়ে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি হঠাৎ বজ্রাহতের গ্রাম
মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে ! তাহার চক্ষু দু'টি ঠিকরাইয়া
যেন বাহির হইবার উপক্রম করিতাছিল। কয়েক মুহূর্ত
উভয়েরই বাকশক্তি যেন বিলুপ্ত হইল ! তাহার পর
ভূপতি ভগ্নস্বরে ডাকিল,—“শৈল !” তাহার কর্তস্বরে
ভয়, বেদনা, এবং নিরাশা ধ্বনিত হইল। শৈল চমকিয়া
তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু উত্তর দিতে পারিল না।

ভূপতি কহিল,—“তুমি আমাদের সর্বনাশ করলে
শৈল ! হাতে দড়ি পড়বার সব ব্যবস্থাই শেষ ক'রে
রেখেছ ? হায়, হায়, আমি যে হতবুদ্ধি হয়েছি !”

শৈল মূহু কর্তে কহিল, “সে আমার পা দু'খানা জড়িয়ে
ধ'রে আশ্রয় চাইলে। নারী আমি, আমি তার প্রতি
বিশ্বাস হ'তে পারিনি। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া অশ্রম
নয় মনে ক'রে তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন তার মুখের
দিকে তাকালে তুমিও নিষ্ঠুর হ'তে পারতে না।”

“কিন্তু খুনীকে আমি আশ্রয় দিতাম না ; সে শক্তি
আমার নেই। আমি সরকারের চাকর, মনিবের আদেশ
পালনের জগ্গই আমাকে চাকরীতে নিযুক্ত করা
হ'য়েছে।”—ভূপতির কর্তস্বর তীব্র, কিন্তু বেদনাপূর্ণ।

“সে যে খুনী, তা তো আমি জানতাম না।”

ভূপতি উঠিয়া-দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, “বেশ,

এখন তো জানলে, সে খুনী। তাকে বাড়ী থেকে বিদায়
ক'রে দাও, আমি পুলিশে চালান দিয়ে আসি।”

শৈল চমকিয়া উঠিল। সে সত্রাসে কহিল, “অমন
কথা মুখে এনো না। সে আমার ভাই। তার অপরাধের
কোন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া, সে রুগ্ন, পীড়িত ; তাকে
আমি বিদায় দিতে পারব না।”

ভূপতি বিস্মিত হইয়া কহিল, “সে কি ? বিদায়
কোরবে না, তবে খুনীকে লুকিয়ে রেখে জেল খাটতে
চাও না কি ? পাগলামি কোর না,—যা বলি শোন।”

শৈল বলিল,—“পাগলামি আমি করিনি। দেখ,
তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সে যে আমাদের বাড়ীতে আছে,
কেউ জানতে পারবে না। মা দুর্গা অসুখ ভাল ক'রে
দিলেই, ওকে আমি চুপি-চুপি দূরদেশে পাঠিয়ে দেবো,
কেউ টেরও পাবে না।”

ভূপতি এবার শব্দ হইয়া কহিল—“তোমার ছেলে-
মানুষির প্রশ্রয় দিলে তো চলবে না, শৈল ! আমার কর্তব্য
আমাকে পালন করতেই হবে। এটা ছেলে-খেলা নয়।
তোমার খেলার জগ্গে, জেনে-গুনে নিজেদের সর্বনাশ
তো ডেকে আনতে পারি না।”

শৈলও কঠিন হইয়া উঠিল ; দৃঢ়স্বরে বলিল,—“তোমার
কর্তব্যে আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমার কর্তব্যও
আমি পালন কোরবো। কোনও বোন তার ছোট
ভাইকে যমের হাতে ঠেলে দিতে পারে না। আমিও
পারব না। এতে আমার কপালে যা থাকে, তাই হবে।”

ভূপতি এবার সত্যই রাগিয়া উঠিল। সক্রোধে
কহিল,—“আস্কারা পেয়ে তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ
করেছ মেজবো ! অত আস্পর্দা ভাল নয়।”—একটু
ধামিয়া কহিল,—“তুমি যদি না পার, এর ব্যবস্থা আমাকেই
করতে হবে। দেখি, আমি নিজেই কত দূর কি করতে
পারি !”—সে ফিরিবার উপক্রম করিল।

শৈল স্বামীকে কোন দিন কটু কথা বলিতে শুনে নাই ;
সুতরাং এই তিরস্কার তাহার মর্মান্তিক হইল। কিন্তু সে
দৃষ্টকর্তে কহিল,—“বেশ, তাই কর ; কিন্তু আমার চোখের
ওপর এ আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না।”

শৈল হঠাৎ অধীর ভাবে কাঁদিয়া উঠিল ; কিন্তু
কণকাল পরে সে অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কহিল,—

“বেশ, তুমি যাও। কিন্তু তার আগে একটু অপেক্ষা কর, অমিয়কে নিয়ে আগেই আমি বিদায় হই। আশ্রয় যখন দিয়েছি, তখন ফেলতে পারব না ওকে। কখন যদি ওকে নিরাপদ করতে পারি, ভগবান্ কোন দিন যদি আশ্রয় জুটিয়ে দেন, তখনই আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব; তার আগে নয়।”—বলিয়া সে সেখান হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া হঠাৎ চেতনা হারাইয়া ভূপতির পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

এই আকস্মিক বিপৎপাতে ভূপতি বিহ্বল হইয়া পড়িল। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার মেহ-ভালবাসার সীমা ছিল না। তাহার এই বিপদে সে পাগলের মত হইয়া উঠিল। কিন্তু শৈলর ফিট হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া সে তাহার গুণ্ণবায় প্রবৃত্ত হইল।

দীর্ঘকাল পরে শৈলর চেতনা-সঞ্চার হইল। এই যুদ্ধে সে-ই জয়লাভ করিল।

এক সপ্তাহ পরের কথা।

অমিয় সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু দুর্বলতা দূর হইল না। সে বিছানায় শুইয়া একখানা বই পড়িতেছিল। অদূরে মেঝেতে বসিয়া শৈল বালিশে নূতন ‘ওয়াড’ পরাইতে ব্যস্ত। শৈল সেই সময় অমিয়র অতীত জীবনের ঘটনাগুলি গুণিত্তেছিল; হঠাৎ মুখ তুলিয়া হাসিয়া শৈল কহিল, “ধন্য ছেলে তুমি ভাই! কি ক’রে এমন সব কাজ করতে—বল তো? প্রাণের ওপর তোমাদের কি দয়ামায়া একটুও নেই?”

অমিয় মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, “তখন ছিল না দিদি; কিন্তু এখন হ’য়েছে। কি ক’রে যে অমন কাজ করেছি—এখন আশ্চর্য্য হ’য়ে সেই কথাই ভাবি।”

শৈল মাথা নাড়িয়া আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, “আমায় বল না ভাই, কি ক’রে তুমি অমন দলে গিয়ে মিশলে? আমার গুণ্ণতে বড় ইচ্ছে করছে।”

অমিয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তার পর কহিল, “তোমায় বলতে কোন বাধা নেই, দিদি! তাই সব কথাই বলব। ছ’বছর আগে এক দিন দাদা-বৌদির সঙ্গে ঝগড়া ক’রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি। আশ্রয় দেবার মত কেউ ছিল না, তাই জুটলও না কোথাও।

ছ’দিন শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু পেটে কিছুই প’ড়ল না। শুধু জল আর বাতাস খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ হ’য়ে উঠলাম। বোধ হয়, সে-দিন মৃত্যুকে আন্তরিক ভাবেই কামনা ক’রেছিলাম ব’লে ভগবান্ দিলেন না ম’রতে, দিলেন আশ্রয়। সেখানে খেতে পেলাম, থাকতে পেলাম; আর একটা জিনিষ ভাবতে শিখলাম, সেটা আমাদের এই দেশ। দেশকে ভালবাসার মধ্যে সে এতখানি মধু ছিল, এতখানি নেশা ছিল, স্বপ্নেও কোন দিন ভাবতে পারিনি।”—এই সকল কথা শেষ করিয়া সে কিরূপে কি উদ্দেশ্যে বন্দুকের ব্যবহার শিখিয়াছিল, তাহাও তাহার নিকট প্রকাশ করিল। সেই সকল কথা বিস্তারিতরূপে প্রকাশের স্থান আমাদের নাই, তাহার প্রয়োজনও নাই।

শৈল সকল কথা গুণিয়া অমিয়র মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, “অমিয়! আমার একটা কথা রাখবে, ভাই? সত্যি ক’রে বল?”

অমিয় শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, “ওকি কথা দিদি! এমন ক’রে বলে আমায় লজ্জা দেবেন না? আপনার আদেশ আমি প্রাণ দিয়েও পালন করব।”

—তা’ হলে আমার কাছে শপথ কর ভাই, যে ও-জিনিষ আজ থেকে ছোঁবে না? আগায় ছুঁয়ে দিব্যি কর।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে অমিয়র মুগের গাব পরিবর্তিত হইয়া গেল; কয়েক মুহূর্ত্ত সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। তার পর ধীরে ধীরে কহিল, “তোমার আদেশের চেয়ে বড় আমার কাছে আর কিছুই নেই। এই তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, দিদি, এর পর স্বেচ্ছায় ও-জিনিষ আমি কোন দিনই আর স্পর্শ ক’রব না।”—বলিয়া নীচু হইয়া সে শৈলর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

শৈলর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিল, “বঁচে থাক ভাই!”

অমিয় হাসিল, বলিল, “এ আশীর্বাদ তোমার খাটবে না, দিদি! ওরা কাঁসী-কাঠ আমার জন্তে তৈয়েরী ক’রে রেখেছে। এক দিন না এক দিন আমাকে তাতে লটকাবেই।”

‘ওরা’ যে কাহারা,—সে খবরটুকু শৈলর অবিদিত ছিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শৈল মুখ ফিরাইয়া বলিল, “শুনতে পাই, তোমরা পড়াশোনা অনেক করেছ; জানো-শোনও অনেক। বলতে পার ভাই, এমন কোন দূরদেশ নেই, সেখানে গেলে কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না?”

শৈলর মনের অভিপ্রায় বুঝিতে অমিয়র বাকী রহিল না; সে হাসিয়া কহিল, “আছে বই কি, দিদি! কিন্তু তা যে অসম্ভব।”

শৈল আশায় উদ্গীৰ্ব হইয়া কহিল, “অসম্ভব কেন?”

অমিয় বলিল, “সে সব দেশে যেতে হ’লে অনেক টাকার দরকার। অত টাকা তো আমার নেই, দিদি! পাব বা কোথায়, আর দেবেই বা কে? কেনই বা দেবে?”

শৈল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “টাকা যদি আমি দিই, তুমি যাবে?”

অমিয় বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে কহিল— “তুমি দেবে! অত টাকা?”

শৈলর মুখ অস্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। দৃষ্ট কর্তে কহিল, “হ্যাঁ, দেবো। আমার সর্বস্ব দেবো। তুমি কবে যাবে, আমায় বল?”

অমিয় শুধু বলিল, “ভেবে দেখি দিদি!”

শৈল উঠিয়া-পড়িয়া কহিল, “তোমায় অনেকক্ষণ বকালাম ভাই! যাই, তোমার ছুটা নিয়ে আসি।”—সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

শৈল ঘরের বাহিরে আসিয়াই দরজার পাশে ভূপতিকে দাঁড়াইয়া-থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। স্বামি-স্ত্রীর চোখোচোখি হইবামাত্র ভূপতি ঈষৎ লজ্জিত হইল; কিন্তু পরমুহূর্তে কি ভাবিয়া কহিল, “শোন!”

শৈল নিকটে আসিয়া, বলিল, “কি বলবে?”

“একটা কথা বলব, রাগ কোরবে না?”

“রাগের কথা না হ’লে নিশ্চয়ই কোরব না।”—শৈল একটু হাসিল।

ভূপতি বলিল, “বলছিলাম, ও ছোড়াটাকে আর

কত কাল রাখবে এখানে? আপদ এবার বিদায় কর না। অসুখ-বিসুখ ত দিব্যি সেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত কি একটা ফ্যালাদ না ঘটিয়ে ছাড়বে না?”

শৈলর মুখের হাসি মুহূর্তে মিলাইয়া গেল। সে শুধু কহিল, “অমন কথা বোলো না। অমিয় আমাদের আপদ নয়।”

ভূপতি বিক্রপের সুরে বলিল, “খুনে কাঁসুড়ে আপদ যদি না হয়, তবে আপদ হয়েছে বুঝি আমি? কথাটা এখনও পাঁচ কানে যায়নি; কিন্তু একবার গেলে আর বাঁচবার পথ থাকবে না। আমি ভাল কথাই বলছি, শৈল! এবার পাপ বিদায় করো।”

শৈল কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, “বেশ, ‘পাপ’ আমি বিদায় কোরব; কিন্তু আর দুটো দিন সবুর করো।”

স্ত্রীকে নরম হইতে দেখিয়া ভূপতির সাহস আরও বাড়িয়া গেল। সে কহিল, “তুমি না কি ওকে দূরদেশে যাবার খরচ দিচ্ছ? এ-সব কি তোমার ছেলে-মানুষী নয়, শৈল? সে আমার শালাও নয় সখন্ধিও নয় যে, তার জন্তে তোমার এত মাথা-ব্যথা! তা ছাড়া, সে যখন খুনে, ধরা পড়লেই তার ফাঁসী হবে, তখন তাকে এত দরদই বা করা কেন?”

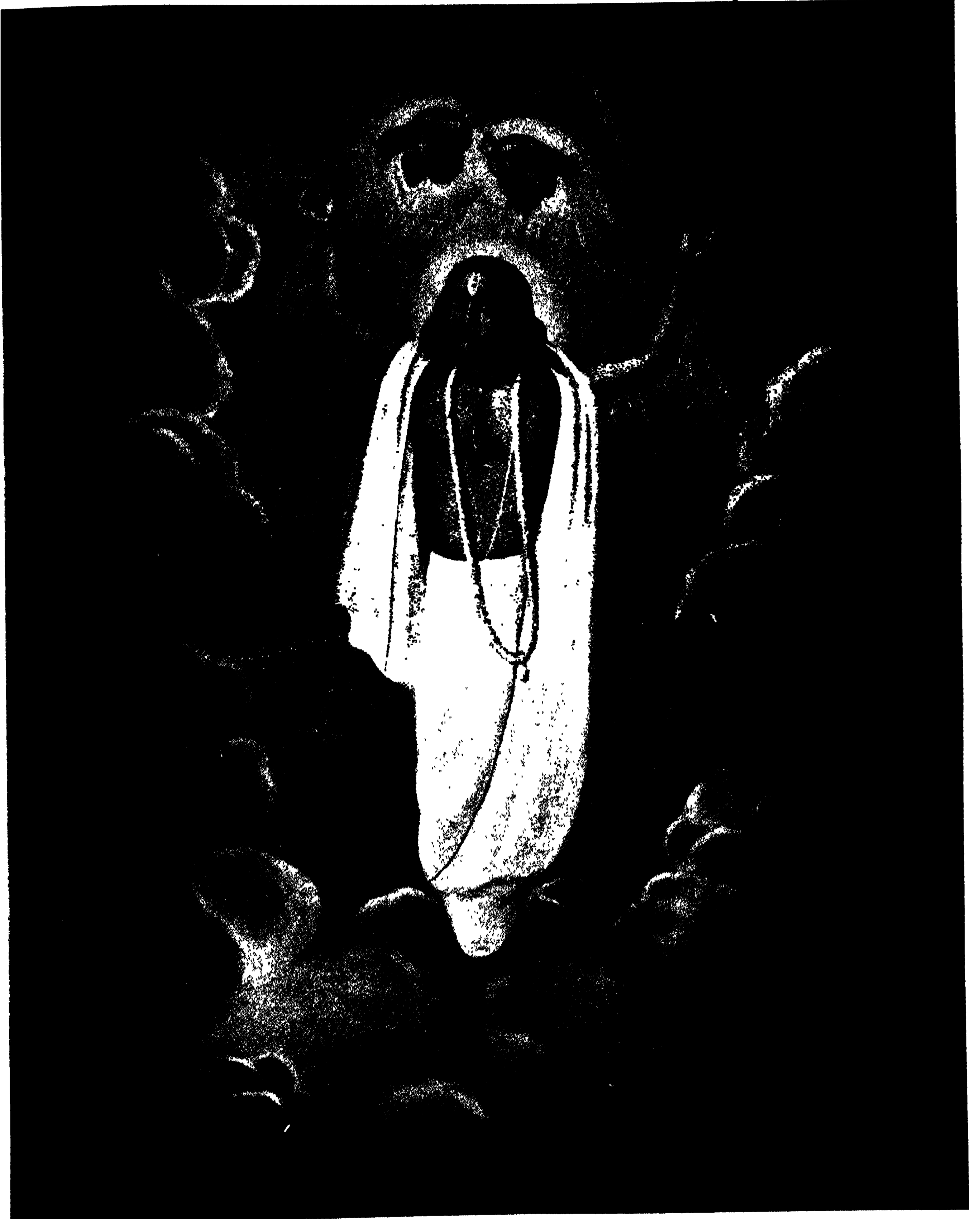
শৈল মিনতিভরা সুরে কহিল, “তোমার দু’টি পায়ে পড়ি, তুমি চুপ করো। পুলিশে কাজ করো, হৃদয় ব’লে কোন বালাই কি তোমার নেই? তোমায় ত বলেছি, অমিয় আমার ভাই।”

ভূপতি বিক্রপ করিয়া কহিল, “হ্যাঁ, ভাই! এমন রূপসী বোনের লোভে সব শালাই তার ভাই হ’তে চায়!”

তীব্র অপমানে শৈলর মুখ একবারে কালো হইয়া গেল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে গর্জিয়া উঠিল, “চুপ কর! অপদার্থ, ইতর! ভদ্রলোকের মত কথা বলতে জান না?”—শরবিদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত ব্যাকুল ভাবে সে সেই স্থান ত্যাগ করিল।

অনেক বিলম্বে শৈল ছুধ লইয়া অমিয়র কাছে আসিলে সে তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল, স্বামীর অনেক কথাই তাহার কানে গিয়াছে।

অমিয় মুখ তুলিয়া শৈলর মুখের দিকে চাহিয়া হাত-জোড় করিয়া কহিল, “এবার আমার বিদায় দাও, দিদি!



শ্রীগোরাঙ্গ

ফাল্গুন, ১৩৪৭]

[শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

আর তোমাদের বিপদের ভার বাড়িয়ে তুলতে চাই না। যেখানেই থাকি আর যে ভাবেই থাকি না কেন, তোমার ঋণ—” সে আর কথা বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শৈল ছল-ছল নেত্রে চাহিয়া কহিল, “আমার দয়ার ঋণ তুমি না হয় নাই শুধলে,—সে জন্তে তাড়া নেই, ভাই! কিন্তু এখন দুখটা চট কোরে খেয়ে নাও।”

অমিয় একটু খামিয়া কহিল, “আমি খুনে, কাঁসির আসামী; আমার কাঁসি আজ-কাল না হয়—এক দিন হবেই—”

শৈল তাহার কথায় বাধা দিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, “অমিয়, জানো—এ কথায় আমি কত দুঃখ, কত ব্যথা পাই?”

“আমার অপরাধ হয়েছে, দিদি! আমায় তুমি ক্ষমা করো।” অমিয় বুঁকিয়া-পড়িয়া শৈলের পা স্পর্শ করিল।

শৈল তাড়াতাড়ি অমিয়র মাথায় হাত রাখিয়া কহিল, “এবার তোমায় ক্ষমা ক’রলাম, অমিয়! কিন্তু বিদেশে যাবার একটা বন্দোবস্ত শীঘ্রই তুমি কোরে ফেলো। তোমায় এখানে লুকিয়ে রাখতে আর আমার সাহস হচ্ছে না।”

তার পর অনেক কথাই হইল, তাহাতে উভয়েরই মনের ভার লঘু হইল।

পরের দিন সকাল বেলা অমিয়কে দুখ খাওয়াইয়া বাটিটা লইতে শৈল সেখানে আসিয়া-দাঁড়াইতেই ভূপতি ব্যস্ত ভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ-চোখ শুষ্ক, চুল পারিপাট্যহীন, কাঁধের চাদরখানা মাটিতে লুটাইতেছে, এবং সর্বশরীর উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। সে তীব্র স্বরে শৈলকে কহিল, “তখনি বলেছিলাম, ও-পাপ বিদায় করো; কিন্তু গরীবের কথা কানে তুললে না। এখন তার ফলভোগ কর।”

এই আকস্মিক আক্রমণে শৈল এবং অমিয় দু’জনেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। বিবর্ণ মুখে তাহারা অর্থহীন দৃষ্টিতে ভূপতির দিকে চাহিয়া রহিল।

ভূপতি রসনার তীব্র বিষ ঢালিয়া বলিল, “তখন সোহাগ কোরে বলা হ’ল, ও আমার ভাই! এখন

ভাইয়ের কীৰ্ত্তি দেখো। ও হতভাগাগুলোকে কি বিশ্বাস কোরতে আছে? এখন যাও, ভাইয়ের হাত ধ’রে দোরে দোরে ভিক্ষে কর গে।”

এতক্ষণে শৈল আত্মসংবরণ করিয়া অমিয়র দিকে চকিতে তাকাইল; দেখিল—লজ্জায়, অপমানে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। শৈল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “হয়েছে কি? তুমি ও-ভাবে তর্জন-গর্জন কোরছ কেন?”

“করছি কি আর সাথে? এটা পড়লেই সব বুঝতে পারবে।”—একখণ্ড কাগজ সে শৈলের দিকে তখনই ছুড়িয়া দিল। শৈল কাগজখানি কুড়াইয়া লইলেও তৎক্ষণাৎ পড়িতে পারিল না। কোন একটা গুণ্ণোল হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারায় আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় তাহার বুক দুক-দুক করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সেই কাগজ-খানির উপর চোখ-বুলাইতেই তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল; কিন্তু সে দৈর্ঘ্য হারাইল না।

চিঠিখানি ছোট, কিন্তু মৃত্যুর পরোয়ানা বহন করিয়া আনিয়াছে দেখিয়া তাহা ভীষণ বলিয়া তাহার মনে হইল। ভূপতিকে শত্রুরা শাসাইয়াছে, তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা হইতে বিরত হইবার জন্ত আদেশ করিয়াছে; এবং দিন-তিনেকের ভিতর পুলিশের কার্যে ইস্তফা না দিলে তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়াছে।

শৈল কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ঝাক্ রহিল; তার পর মনকে সংযত করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে স্বামীকে কহিল,—“এ তো মিথ্যা ভয়-দেখানও হ’তে পারে। এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ কি?”

ভূপতি এই প্রশ্নে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিয়া কহিল, “প্রমাণ চাও?—আমি খুন হ’লেই এ কথার প্রমাণ পাবে। সেবার বামাপদ গোয়েন্দাকে ওরা মিথ্যে ভয় দেখিয়েছিল, কেমন?”

কথাটা এত বড় সত্য না হইলে শৈল চূপ করিয়া যাইতে পারিত না। এই তো সে-দিনও সে বামাপদ বাবুর অসহায়্য বিধবাকে দেখিয়া নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিয়াছে। সে কথা মনে হইতেই সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এবং স্বামীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কাতর স্বরে কহিল, “দেখ, এ চাকরীতে আর আমাদের দয়কার নেই,

তুমি এ চাকরী ছেড়ে দাও—কাজে আজই জবাব দিয়ে এস, তা হ'লে সব গোলমাল মিটে যাবে।”

পত্নীর কথায় ভূপতি ক্রোধে জলিয়া-উঠিয়া তিস্ত কণ্ঠে কহিল, “চাকরী ছেড়ে দিয়ে খাবো কি? এক-মুঠো ভাতের জন্ত শেষে কি তোমায় নিয়ে লোকের দোরে-দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াব?”

স্বামীর ক্রোধে শৈল বিচলিত হইল না; সে ধীর ভাবে কহিল, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি থাকতে কোন দিন তোমাকে ভিক্ষে কোরতেও হবে না। আমাদের যা আছে—দুটো পেটের জন্তে তাই যথেষ্ট। তুমি নিশ্চিত থাক।”

ভূপতি বিক্রম করিয়া বলিয়া উঠিল, “সে আমি জানি। আমার সর্বনাশ না কোরে তুমি ছাডবে না। বুঝলাম, ঘরে-বাইরে আমার শত্রুর। তারা আমার মরণই চায়। আচ্ছা, বেশ, আমি মরব।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে যে ভাবে ঘরে ঢুকিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই বাহিরে চলিয়া গেল। শৈল সেইখানে দাঁড়াইয়া অশ্রুমনস্ক ভাবে পত্রখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর শৈল অমিয়র নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, “এ কি সত্যি ভাই অমিয়, তুমি দেখ তো?” কাগজখানি সে অমিয়র হাতে দিল। অমিয় নিঃশব্দে তাহা পাঠ করিয়া সভয়ে কহিল, “এ বোধ হয়, মিথ্যে ভয় দেখান নয়, দিদি! কিন্তু তোমার দিবি কোরে বলছি, এর কিছুই আমি জানি না; এর জন্তে আমি এক বিন্দুও দায়ী নই।”

শৈল স্নান মুখে কহিল, “তা আমি জানি ভাই! তোমায় আশ্রয় না দিলেও এ বিপদ থেকে আমাদের পরিত্রাণ ছিল না। কিন্তু এখন উপায় কি, তাই বল।”

অমিয় স্নান মুখে কহিল, “আমার প্রাণ দিলেও যদি কোন উপায় হয় দিদি, আমি তার চেষ্টা কোরব। তোমাদের কোন অনিষ্টই হ'তে দেব না।” কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তুমি নিশ্চিত থাকো, দিদি! এর বিহিত আমি কোরবই।”

তাহার কথা শুনিয়া শৈল আশ্বস্ত হইল। এ তো তাহাদেরই দলের ঘুবকদের কাজ; তাহারা কি অমিয়র অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবে?

তার পর সপ্তাহখানেক কাটিয়া গিয়াছে। গোল-যোগের চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পায় নাই। বাড়ীতে শৈল ও ভূপতি উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছে, যাহা লইয়া তাহাদের এত উবেগ ও আশঙ্কা, তাহা ভিত্তিহীন। ভূপতি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত হইয়া সতর্ক ভাবে কাজকর্ম করিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু অমিয় শান্তি পাইল না; সে ইহাকে ফাঁকা ভীতি প্রদর্শন বলিয়া মনে করিতে পারিল না। স্মৃতবাং এক পক্ষ যখন ক্রমশঃই নিশ্চিত হইতে নিশ্চিততর হইতে লাগিল, তাহার অন্তর তখন ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় বার-বার শিহরিয়া উঠিল; তাই শৈল যখন তাহাকে বিদেশে যাত্রা করিবার জন্ত তাগাদার পর তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিল, তখন সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে সম্মত হইল; কিন্তু কেন যে তাহার এই অনিচ্ছা, ইহা ভূপতি বা শৈল বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না।

অমিয়র যাত্রার পূর্বদিন।

সারা দিন শৈল অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এবং আঁচল দিয়া ঘন-ঘন চক্ষু মুছিয়াছে। অনেক রাত থাকিতেই অমিয়কে বাহির হইতে হইবে, স্মৃতবাং জিনিষ-পত্র গুছাইবার উদ্যোগ-আয়োজন সকাল হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

শৈলর অধিকাংশ সময়ই আজ রন্ধনশালায় কাটিয়া গিয়াছে; মনের সাধ মিটাইয়া অমিয়কে খাওয়াইতে হইবে, তাই তাহার এত আকিঞ্চন ও আয়োজন।

আহারান্তে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিয়া অমিয় যখন শৈলর নিকট বিদায় লইয়া উঠিতেছিল, তখন এই স্বল্প দিনের পরিচিতা অসীম স্নেহশালিনী নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর দিকে কিছুকাল তাকাইয়া থাকিয়া গভীর বেদনায় তাহার বুকের ভিতরটা টন-টন করিয়া উঠিল, এবং অনাহুত অশ্রু ছুঁচোখে ছাপাইয়া উঠিতেই সে দ্রুতপদে আপনার ঘরটিতে আসিয়া একেবারে বালিশে মুখ গুঁজিয়া গুইয়া পড়িল। কেন যে এক অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহাকে প্রতি-দিন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে, কি কারণে মৃত্যুর করাল ছায়া বিভীষিকার মত তাহার চারি পাশে জমাট বাধিয়া

উঠিতেছে—তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। দিন কয়েক পূর্বেও যাহা তাহার নিকট শাস্তির নিভৃত নীড় ছিল, তাহাই আজ মহা অশাস্তির আলায় বলিয়া তাহার প্রতীতি হইল; এবং রাত্রির গভীরতা ও নিস্তরতা রুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই অমিয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ যেন মহা-প্রলয়ের রাত্রি, ইহার যেন অবসান নাই! ঘন-বিজ্ঞপ্ত বৃক্ষপত্রের ফাঁকে-ফাঁকে চাঁদের যে ক্ষীণ আলোক ঘরের ভিতর প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা যেন মানুষের সুখ-দুঃখে উদাসীন,—তাহা এতই শ্লান, এমনি করুণ এবং গভীর রহস্যবিজড়িত। গাছের পাতাগুলি নিষ্পন্দ;—নিষ্কম্প।

অতঃপর যখন সে আপনার দেহ-মনের সমস্ত জড়তা সবলে ঠেলিয়া-ফেলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময় বাহিরের দিক হইতে একটা আতঙ্জনক শব্দ আসিয়া নিমেষে তাহার সমস্ত চিন্তা অপসারিত করিল। সে ক্ষিপ্ত হস্তে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে সে সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে মুহূর্তের জন্ম সে বিশ্বাসে, ভয়ে এবং উত্তেজনায় হতজ্ঞান হইয়া পড়িল।

মুহূর্তমাত্র। তার পর অমিয় উন্নত আবেগে সুবিস্তীর্ণ আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া সেই দিকে দৌড়াইয়া গেল। ঠিক এই ভাবেই এক দিন সে বাহিরের ঐ বেড়া ডিঙ্গাইয়া এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, আর আজ! এই নিস্তর রজনীর অন্তরালে গা ঢাকিয়া তাহারই সহকর্মীরা ঠিক সেই ভাবেই এ গৃহে প্রবেশ করিতেছে। প্রভেদ এই যে, আজ তাহারা আশ্রয়প্রার্থী নয়, মৃত্যুর পরোয়ানা বহন করিয়া তাহারা এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

ততক্ষণে নিঃশব্দে বেড়া-ডিঙ্গানো শেষ হইয়া গিয়াছে। যে তিন জন যুবক আঙ্গিনায় নামিয়াছিল, তাহারা অমিয়র পরিচিত। সে কোনরূপ ভূমিকা করিল না। সম্মুখের যুবকটিকে লক্ষ্য করিয়া অন্তরের সমস্ত মিনতি ঢালিয়া দিয়া কহিল, “সত্যেন, আমার দিদির সর্বনাশ তোমরা কোরো না। আমি জানি, আজ তোমরা কেন এখানে এসেছ। কিন্তু আমার এ-মিনতি রাখ ভাই!” আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

সত্যেন আগাইয়া আসিল। তাহার গনে কোনরূপ

চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। তাহার ঋজু বলিষ্ঠ দেহের ভিতর হইতে দৃঢ়তা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। উজ্জল চক্ষু দুইটি অমিয়র মুখের উপর রাখিয়া সে অচঞ্চল স্বরে কহিল, “অমিয়, তুমি যে এখানে আছ—তা জানতাম না। বেশ ভালই হ’ল, এস, আমাদের সাহায্য কর। নিৰ্কিরে আমরা কাজ উদ্ধার কোরে যাই।”

অমিয় কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে তাহার চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। দৃষ্ট কর্ণে সে ডাকিল, “সত্যেন!”

সত্যেন অবিচলিত কর্ণে কহিল, “আমাদের দলের কোন নিয়ম-কানুনই বোধ হয়, তোমার অজানা নেই, অমিয়! এ ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘন কোরে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড যে কি, এ কথা তোমার স্বরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই বোধ করি।”

অমিয় অন্তরের তীব্র আলা গোপন করিয়া অচঞ্চল স্বরে কহিল, “স্বরণশক্তি আজও আমার হ্রাস হয়নি সত্যেন, এবং সে জন্ম আমিও প্রস্তুত। কিন্তু অতীতের আমার সমস্ত সাধনার বিনিময়ে আমি এইটুকু ভিক্ষা আজ তোমাদের কাছে চাচ্ছি সত্যেন, যে সঙ্কল্প নিয়ে তোমরা এখানে এসেছ, তা ত্যাগ কোরে ফিরে যাও; আমার এ অমুরোধটুকুর মৰ্যাদা তোমরা রাখ, ভাই! কর্তব্যসাধনে কোন দিন আমি ক্রটি করিনি—তা তোমাদের অজ্ঞাত নয়।”

কিন্তু সত্যেনের সঙ্কল্প টলিল না। সে গভীর স্বরে কহিল, “অসম্ভব। এ আমাদের কর্তব্য।”—পরমুহূর্তে সে সঙ্গীদ্বয়কে ডাকিল, “অজয়, বতীন!”—কিন্তু অমিয় সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল; সে সত্যেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “আমিও প্রস্তুত। তোমরা আগে—” কিন্তু কথা সে শেষ করিতে পারিল না। সেই প্রলয়ঙ্করী রাত্রির সমস্ত নিস্তরতা বিদীর্ণ করিয়া একটা তীব্র মর্ম্মভেদী স্বর সকলকে চকিত স্তম্ভিত করিয়া দিগন্তে বিলীন হইল।

পিছন হইতে শৈল ডাকিল, “অমিয়!”

বিহ্যৎস্পৃষ্টের মত অমিয় ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভীত, সন্ত্রস্ত, বিবর্ণ মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, দিদি!”

শৈল এক পা আগাইয়া আসিল, তীব্র স্বরে কহিল, “এত রাত্রে তুমি এখানে কেন, অমিয়? এরাই বা কে?”

কোন অধিকারে তুমি আমার বাড়ীতে এদের ডেকে এনেছ ? কৃতজ্ঞতা বলে কোন পদার্থ কি তোমার মধ্যে নেই ? ফাঁসের দড়ি যখন তোমার মাথার উপর ঝুলছিল, সেই সময় সেই দড়ি দূরে সরিয়ে-ফেলে বুক দিয়ে তোমার রক্ষা কোরেছিল যে, তারই সর্বনাশ করবার সুযোগ পাবে বলেই কি আমি তোমাকে মৃত্যু-কবল থেকে রক্ষা করে-ছিলাম ? এত হীন, এত নীচ, এত কৃতল্প তুমি অমিয় ? আমি যে ধারণাই কোরতে পারছি না—আমার এত বড় সর্বনাশ, সব জেনে-শুনেও কি কোরে তুমি কোরতে উদ্বৃত হ'য়েছ ?

অমিয় আর সহ্য করিতে পারিল না। আর্ন্ত কণ্ঠে ডাকিল,—“দিদি !” অপমানে, বেদনায়, অন্তর তাহার শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাহার আর কোন কথা বলিবার ক্ষমতা রহিল না।

তাহার আর্ন্ত রব শৈলর কাণে প্রবেশ করিল না। সে কঠোর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “বিদেশ যাবার অত অনিচ্ছা তোমার কেন হচ্ছিল, এখন তা বেশ বুঝতে পেরেছি। তোমার জন্তে আমার কত যে দুঃখ, কত যে ভাবনা, তা কোন দিনই তুমি জানবে না, অমিয় ! আমার সুখের সংসারে কোন অশান্তিই ছিল না। শুধু তোমার জন্তে—” দুঃখে-কণ্ঠে তাহার কণ্ঠ রোধ হইল।

কিন্তু অমিয়র দুর্ভাগ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, এই সময়ে সশস্ত্র ভূপতির আগমনে তাহা চরমে উঠিল। তাহার অতর্কিত আগমনে সেখানে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। শুধু যে শৈলর ভয়-বিহ্বল মুখ হইতেই একটা অক্ষুট আর্ন্তনাদ বাহির হইয়া আসিল, তাহা নহে, সত্যেন,

যতীন এবং অজয়ের চক্ষু হইতেও একটা ভাবাহীন গুচ ইঙ্গিত প্রকাশিত হইল। অমিয় তাহা বুঝিতে পারিয়া বিহ্যৎবেগে ভূপতির নিকট দৌড়াইয়া গিয়া নিজের দেহ দ্বারা তাহাকে আবৃত করিল, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আপনি এখানে কেন ? ফিরে যান, ফিরে যান এই মুহূর্তে ! নতুবা—”

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই যুগপৎ দুই বিভিন্ন দিক হইতে অনলশ্রাবী আগ্নেয়াস্ত্রের স্তম্ভীর শব্দে সেই নিস্তব্ধ পল্লী-ভবন দুইবার কাঁপিয়া উঠিল, এবং মুহূর্তমধ্যে অমিয়র রক্তাক্ত দেহ সেখানে লুটাইয়া পড়িল।

সেই মৃত্যুবর্তাবাহী প্রলয়ঙ্কর শব্দে চকিত হইয়া নিদাক্রম ভয়ে শৈল চক্ষু মুদিত করিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সঙ্কিত পাইয়া সে উন্মত্তের মত সবেগে ধাবিত হইল ; কিন্তু জ্যোৎস্নালোকে মুহূর্ত মধ্যে অমিয়কে চিনিতে পারিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্বামাকে সবলে দূরে ঠেলিয়া দিয়া অমিয়র ধরালুষ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া বুকফাটা স্বরে ডাকিল, “অমিয়, ভাই আমার !”

অমিয় চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মৃত্যু তখন তাহার নয়নে অন্ধকার-ছায়া প্রসারিত করিয়াছে। শৈলর মুখের দিকে তাকাইয়া পরিপূর্ণ শাস্তির সহিত কহিল, “না, দিদি, আমি অকৃতজ্ঞ বা বিশ্বাসঘাতক নই।”

শৈল আর্ন্তনাদ করিয়া বলিল, “হতভাগিনী দিদি তোকে আশ্রয় দিতে পারল না বলে, অভিমান কোরে চলে গেলি রে ভাই !” মূর্ছিতা শৈল তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়।

সুরের বাঁণ

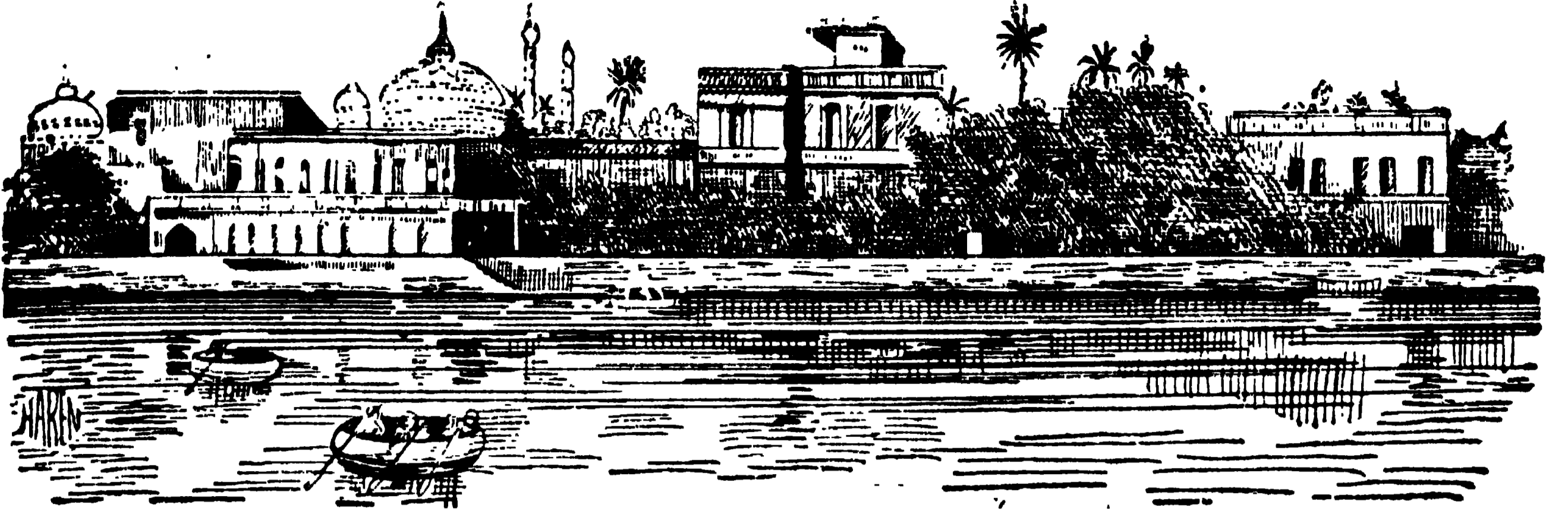
থেকে-থেকে কার সুর বেজে ওঠে প্রাণে ?

ফিরে-ফিরে চাই সেই অতীতের পানে।

খুঁজে-খুঁজে সারা হই নাহি পাই খুঁজি,
কখনও বা একমনে ভাবি আঁখি বুজি।
কার কথা, কার গান জাগে হৃদিমাঝে,
কার সুর ঘরে মরে স্নকম্পিত লাজে ?

কত গান গেয়েছে সে মম মন-বনে,
কত তান তুলেছে সে হৃদয়ঙ্গম সনে।
কোথা সে গিয়াছে চলি বাঁণটি ফেলিয়া,
তাই বুঝি নানা সুর উঠিছে ধনিয়া।

শ্রীউমানাথ সিংহ



মোটর-অভিযান

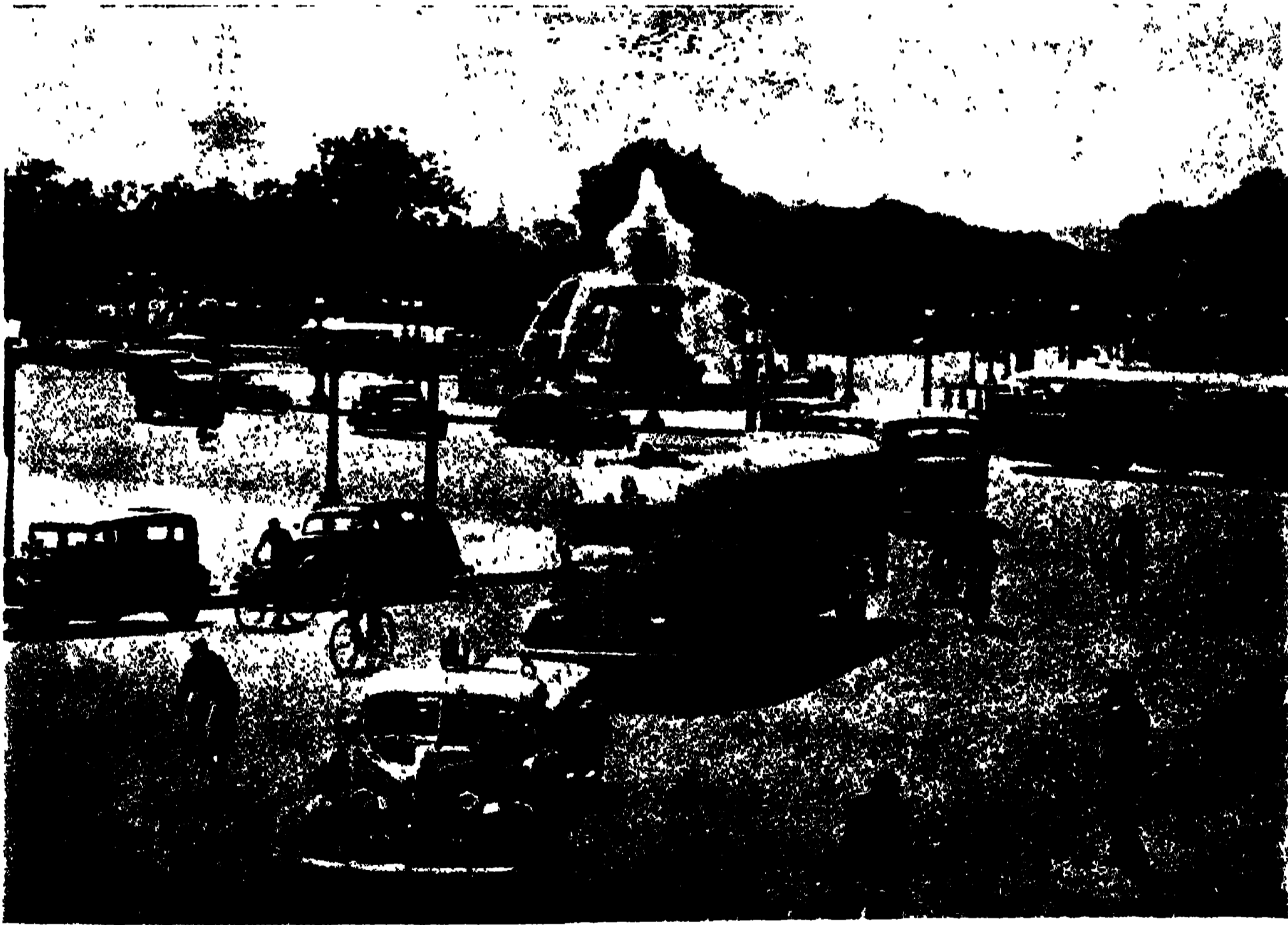
দেড় বৎসর পূর্বের কথা !

যে-পথে এক দিন দারামুস, 'সেকন্দর শা ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যে-পথে এক দিন গ্রীক বণিকের দল আনটিকের মধ্য দিয়া মেশোপটামিয়ার মরু-প্রান্তর পার হইয়া বাগদাদ, তিহিরান, ইরান অতিক্রম করিয়া

করাইয়াছিলেন। সেই ট্রাক ছ'খানিতে ছিল নানা রসদ-পত্র,—ফটোর ফিল্ম হইতে শুরু করিয়া মোটরের টায়ার-টিউব, মেরামতীর যন্ত্রপাতি, খাণ্ডসজ্জার, কাপড়চোপড়—কোনো-কিছুর অভাব ছিল না !

ট্রাক ছ'খানিকে জাহাজে তুলিয়া প্রথমে আটলান্টিকের

পারে পারিসে পাঠাইয়া দেন ; তার পর স্ত্রী ও বন্ধুদের লইয়া তিনি আসেন পারিসে। মির্জাদের জন্ত আনিয়াছিলেন একখানি বুইক্-কার। এই গাড়ীতে ছোট টেলার আঁটিয়া লইয়া, ছিলেন। টেলারে ছিল ক্যামেরার সরঞ্জাম-পত্র। পারিসে আসিয়া তিনি ছ' জন ভারতীয় অমুচর আনাইয়া লন—তিন জন ড্রাইভার, এক জন পাচক এবং ছ' জন খানসামা। অমুচরগুলিকে তিনি বোম্বাই হইতে লইয়া



পারিস হইতে যাত্রা

হিন্দুকুশ পর্বত লঙ্ঘন করিয়া খাইবার-বস্ত্র ধরিয়া ভারতে আসিতেম, সেই পথে মোটর চালাইয়া এক জন মার্কিন তদ্রলোক ত্রীযুত লরেন্স থ সঙ্গীক এবং সবার্দ্ধ ভারতে আসিয়াছিলেন।

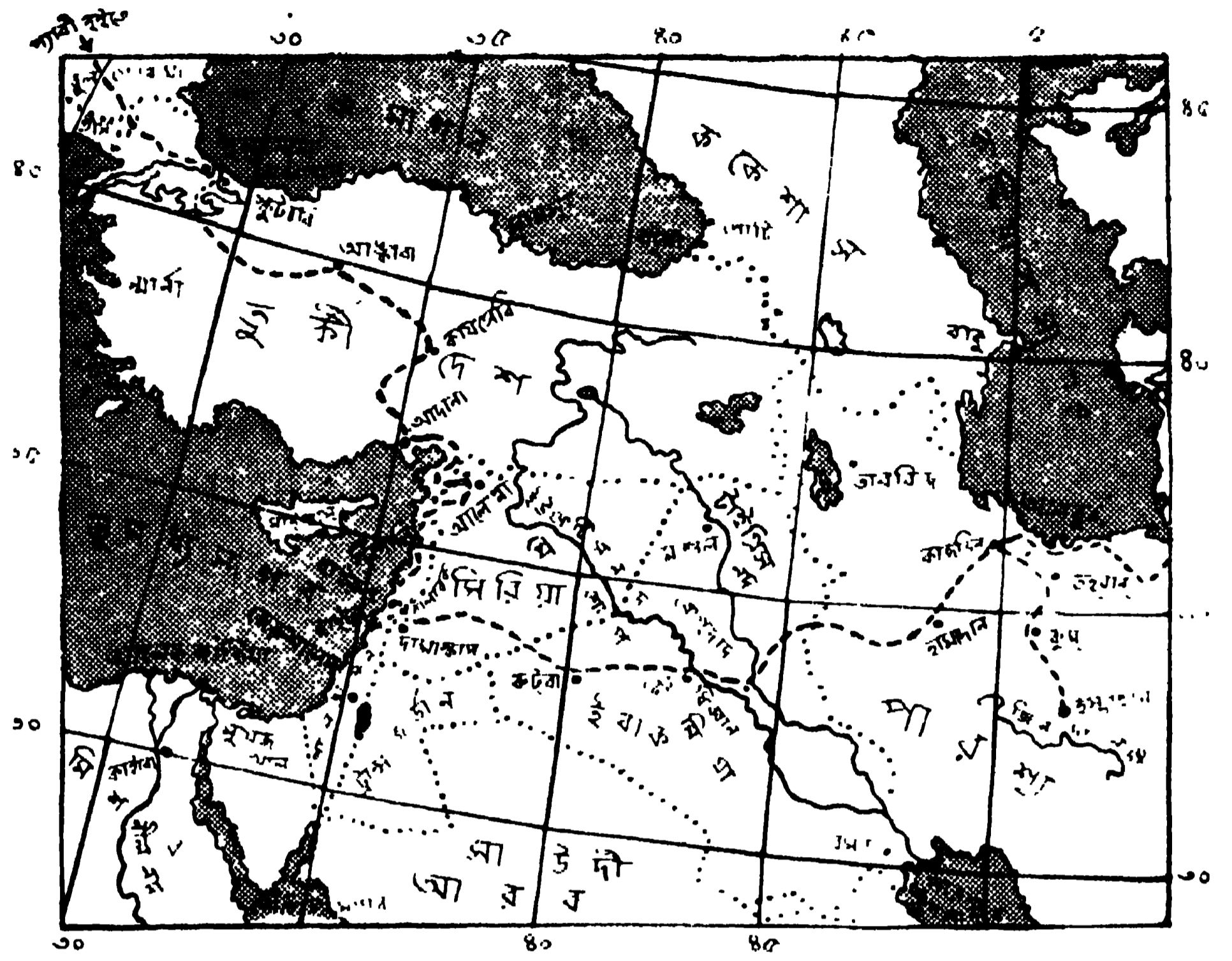
এজন্ত তিনি ছ'খানি শেত্রোলে-ট্রাক তৈয়ারী

গিয়াছিলেন। এই ট্রাকের মধ্যে ছিল রন্ধন ও ভোজন-শালা। কাজেই আহাঙ্গাদির জন্ত পথে কোথাও নামিবার প্রয়োজন হয় নাই। তার উপর গরম-জলে স্নানের ব্যবস্থা, রাত্রে জন্ত শয়ন-কক্ষ, রেডিও-সেট—এ-সবের কোথাও এতটুকু জট ছিল না।

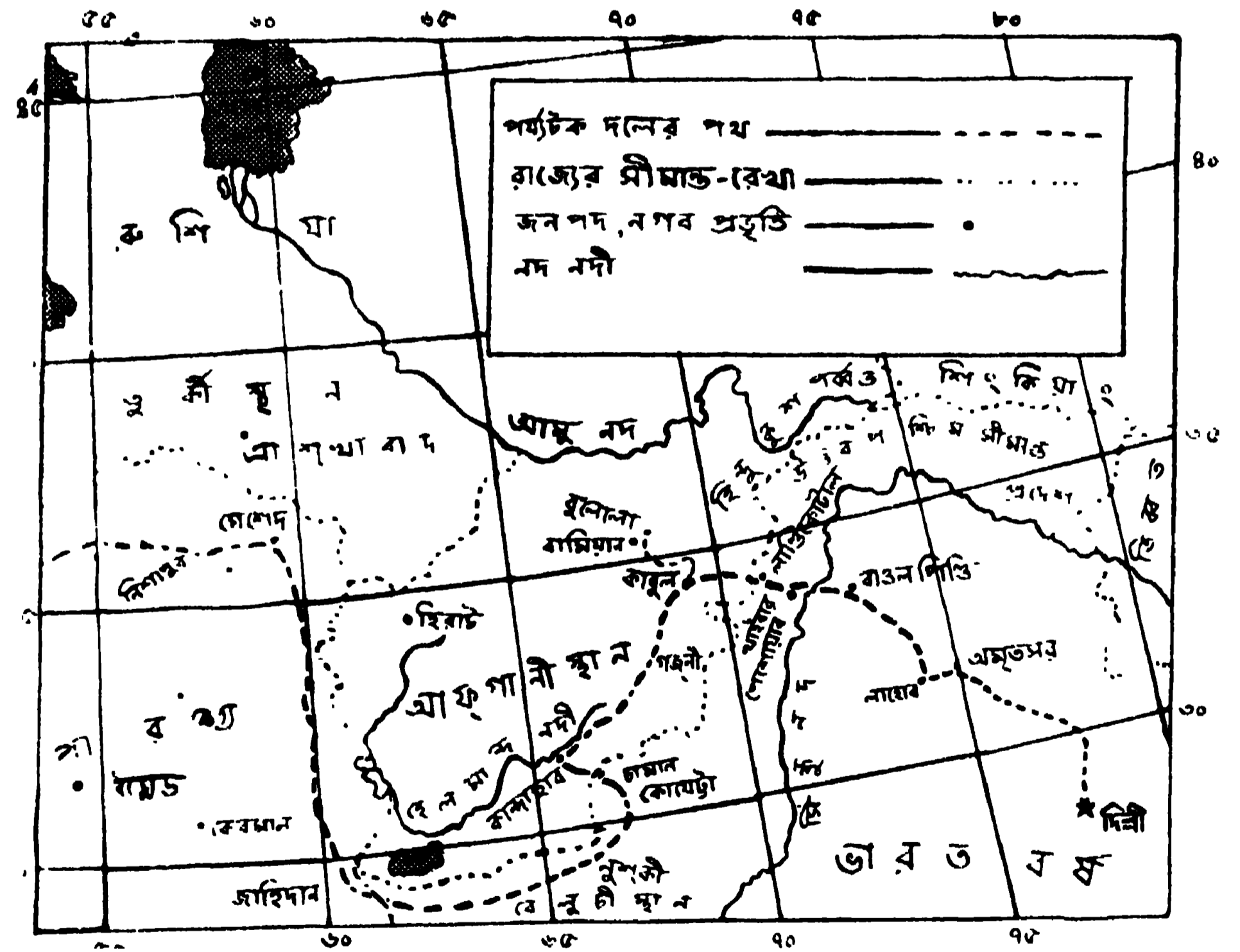
পারিসে বসিয়া উত্তোগ-
আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া
তাঁরা (১৯৩৯) ৬ই জুলাই
তারিখে যাত্রা শুরু করি-
লেন। প্রথম রাতে বিশ্রাম
নালির কাছে ছোট একখানি
গ্রামে। গ্রামের যত লোক
অতিকায় ট্রাক দেখিয়া
আসিয়া হাজির। তারা
ভাবিল, বুঝি সার্কাসের দল
আসিয়াছে! প্রশ্ন করিল,
এ গ্রামে সার্কাসের তাঁবু
পড়িবে বুঝি ?

পরের দিন প্রাতে গ্রাম
ছাড়িয়া আবার পাড়ি শুরু।
একেবারে জার্মানিতে আসি-
লেন। এখানে কড়া সার্চ
এলিল। পুলিশ বলিল,
গাড়ীর মধ্যে 'বন্দার' আছে।
থ সাহেব বুঝাইয়া দিলেন,
ভারত-ভ্রমণ তাঁর উদ্দেশ্য;
যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে কোন
সম্পর্ক নাই। তার পর পুলিশ
গাড়ী দেখিয়া নিঃসংশয় ও
নিঃশঙ্ক হইলে জার্মানির
পদস্থ কর্মচারী ব্যারন ভন্
বেহর বলিলেন—এত বড়
গাড়ী লইয়া পথে বিভ্রাট
ঘটিবে! জনারণ্য ঠেলিয়া
অগ্রসর হওয়া দায় হইবে।
সেজন্য তিনি সুব্যবস্থা করিয়া
দিলেন। এমন ব্যবস্থা যে,

যে-সব গ্রাম-নগরের মধ্য দিয়া
থ সাহেবের গাড়ী চলিবে,
সে-সব জায়গায় পুলিশকে
পূর্বাঙ্কে থপর দেওয়া হইল
—পথে যেন ভিড় না থাকে;
ভিড় হঠাইবে। মোটর-
যাত্রীদের বিঘ্ন বা বিলম্ব না
ঘটে।



পারিস হইতে তিহরান-ইম্পাহান



তিহরান হইতে মেশেদ-কবুল-লাণ্ডিকোটাল

এ আদেশ জার্মানিতে অকরে-অকরে পালিত হইয়া-
ছিল। ব্যারন নিজে ভিয়েনা পর্যন্ত থ সাহেবের সঙ্গে
আসিয়াছিলেন।

• ভিয়েনার পর বুডাপেস্ট। এখানে ড্যানিউবের বুকে টেছা



যুগোশ্লাভিয়া-রূপসী—চিকণের কাজ

বুডাপেস্ট ছাড়িয়া সকলে আসিলেন যুগোশ্লাভিয়া। এখানে আসিয়া ঐ সাহেবের মাথায় আইডিয়া জাগিল, ফটো তুলিবার জন্ত এত সচল-ফিল্ম আনিয়াছেন—সে ফিল্মের সদ্যবহার করিয়া তিনি শিক্ষা ও আনন্দমূলক চিত্র রচনা করিবেন।

যুগোশ্লাভিয়ায় সকলে এক সপ্তাহ রহিয়া গেলেন। যুগোশ্লাভিয়ায় ফুলের ফশল প্রচুর। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফুলের ফশলে সেখানে কত বৈচিত্র্য সম্পাদিত হই-

তেছে। ঐ সাহেব এখানকার লোক-জনের আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ পরিচয় তাঁর ছবির মালায় সূচক্ৰ ভাবে গাঁথিতে উদ্যত করেন নাই। পে টু নিয়া, ক্ল ক্ল, লার্কম্পার—এ সব ফুলে এমন রকমারি রঙের বাহার যে ঐ সাহেব বলেন, এমন আর কোথাও দেখেন নাই!

যুগো শ্লা ভি য়া
ছাড়িয়া ড্যানিউবের



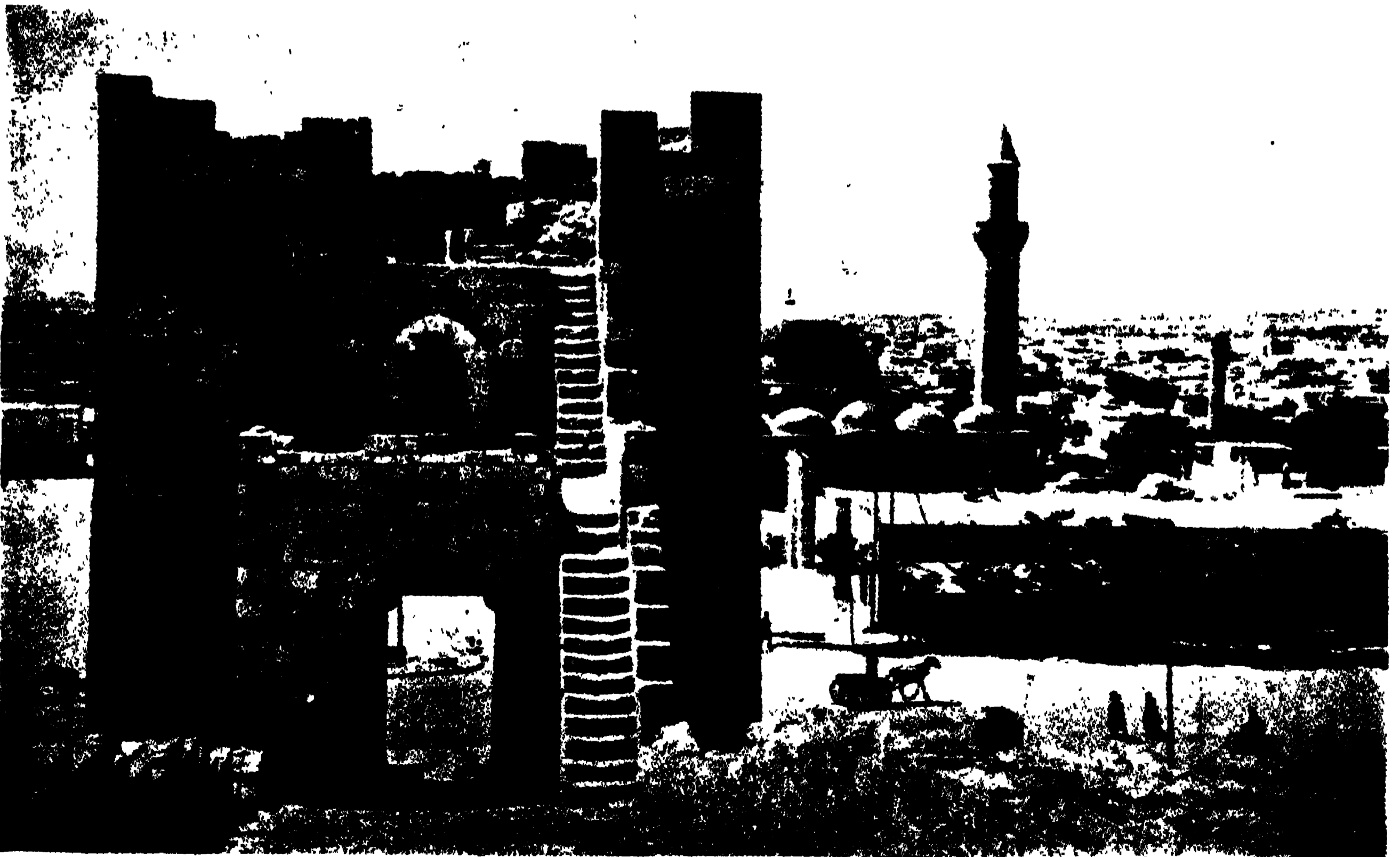
গ্যাঙ্কিয়াটিকের মাছ

একটি দ্বীপ—সেন্ট মার্গারেট। সেই দ্বীপের বুকে চমৎকার হোটেল। সেই হোটেলের কর্তৃপক্ষ সকলকে পরম-সমাদরে আনিয়া আতিথেয় তৃপ্ত করিলেন। হোটেলের নাচ-গানের বিরাট জল্লা—আদর-আপ্যায়নে প্রচুর সমারোহ ঘটিল।

তীরে বেলেগ্রেডে আবার বিশ্রাম। এই ড্যানিউব-নদীটি ৭২০ মাইল দীর্ঘ। নদীর তীরে বড় বড় বাড়ী-ঘর। মেরিয়া খেরেসার গৃহ আজিও সর্গোরবে বিজয়মান আছে। এই ড্যানিউবের তীর যেন এখানকার পাণিপথ! এখানে যত



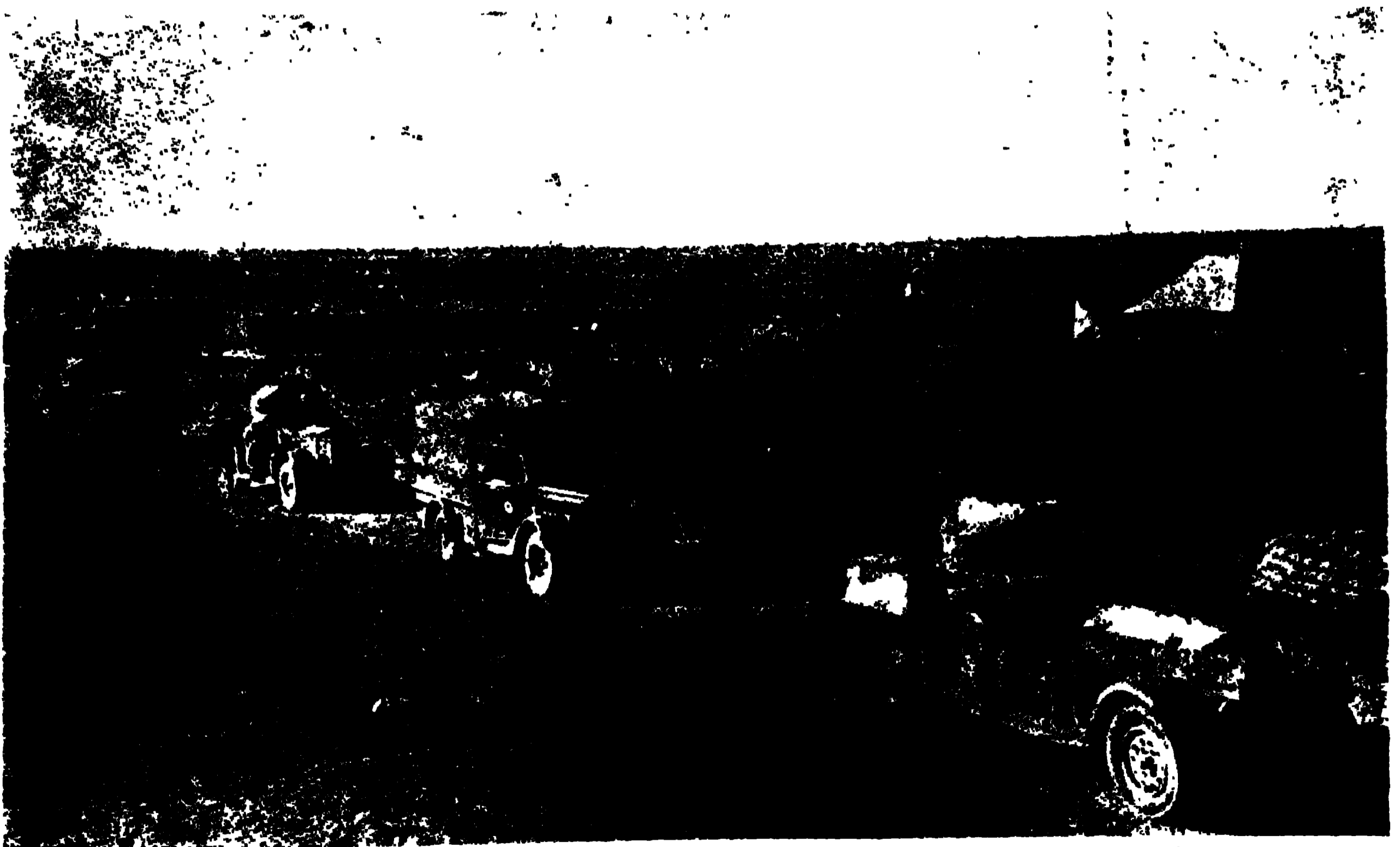
বুড়াপেস্ত—ব্লু-ড্যানিয়ার-নদীর বৃকে সেতু



আলেপো



গ্যালাটা-পুলের উপরে



বাগদাদের যুখে মর-পথ



বাগদাদের কাছে—সেখ-সর্দারের সওয়ার-রক্ষী

যুদ্ধে কত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত
হইয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই !

বালকান-প্রদেশে পথ-ঘাট
ভালো নয়—ওদিককার মতো
কন্ক্রিট বা ম্যাকাডাম-করা পথের
নাম-গন্ধ নাই ! রৌদ্রে যেমন আশু-
নের হলুকা, পথে তেমনি ধূলা !

বেলগ্রেডের পর আসিলেন
বুলগেরিয়ায় ।

বালিন হইতে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত
সামরিক ব্যবস্থা বুঝিয়া কন্ক্রিট ও
ম্যাকাডাম-করা পাকা পথ তৈয়ারী
হইতেছে । এখনো পথ-নির্মাণের
কাজ শেষ হয় নাই । বুলগেরিয়ায়
ও যুগোস্লাভিয়ায় হাজার হাজার
লোক দিবারাত্র খাটিয়া এ পথ
তৈয়ারী করিতেছে । পাঁচ মাইল
অন্তর এক একটি ছাউনি পড়ি-
য়াছে । এ-সব ছাউনিতে অফিস
আছে ; লোকজনের বাসের ব্যবস্থা
আছে ।

থ সাহেব লিখিতেছেন—

বুলগেরিয়ায় সহরের বাহিরে
পল্লীর বুকে আমরা ছাউনি ফেলিয়া-
ছিলাম । প্রথম দিন সন্ধ্যায় প্রায়

একশো তরুণ-তরুণী আসিয়া নাচে-গানে আমাদের আনন্দ
দান করিল । নানা রঙে রঙীন তাদের পোষাক । সে



সোফিয়ার নৃত্য-শীলা বালিকা

পোষাকে কি বাহার ! ছ' বছরের একটি বালিকা যে
অপরূপ নৃত্যকলা দেখাইল, তার তুলনা নাই !



জেরুশালেমের পথে



ইরান—এলবুর্জের বৃক পথ

কিন্তু অতীত যুগে তুর্কির আক্রমণ ও বিজয়-লাভের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সদর রাস্তায় প্রকাণ্ড এক মসজিদ বিদ্যমান আছে।

বালকান প্রদেশের মধ্য দিয়া আমরা চলিলাম সোজা দক্ষিণ-দিকে। পলভডিভের পর পথ খুব খারাপ। এখানকার লোক-জন খুব অতিথি-বৎসল।

পথ পরে আরো খারাপ দেখিলাম। আড্রিয়ানোপলে মধ্য দিয়া তুর্কি পর্যন্ত নব্বই মাইল পথ রীতিমত দুর্গম। প্রতি-পদে ভয় হইতেছিল, বুঝি টায়ার ফাটে! কল-কজা জখম হয়!

কিন্তু ভারতীয় ড্রাইভাররা বেশ নিপুণ। তারা নির্বিক্রে গাড়ী চালাইয়া ইস্তাভুলে (কনস্তান্তিনোপল) পৌছাইয়া দিল। আমরা পণ করিলাম, ফিরিবার সময় এ পথ আর মাড়াইব না।

তার পর গোল্ডেন হর্নের উপর গ্যালাটা বা নূতন পুল। সেই পুল পার হইয়া আমরা ইস্তাভুলে পৌছিলাম অগষ্ট মাসের সন্ধ্যা। অসংখ্য মসজিদের

এইখানে আমরা মুসলিম আবহাওয়ার প্রথম পরিচয় পাইলাম। এখন এখানকার অধিবাসীরা খৃষ্টান হইয়াছে;

চূড়ার পিছনে লোহিত সূর্য অস্তাচলগামী, ছোট ছোট অসংখ্য নৌকার চড়িয়া হাজার হাজার লোক বসুন্ধরায়

নদী পার হইতেছে ! ও-পারে যুরোপ ছাড়িয়া এ-পারে
আমরা এশিয়ার মাটিতে পদার্পণ করিলাম ।

আগে হইতেই আমাদের ছাউনির ব্যবস্থা করা ছিল ।

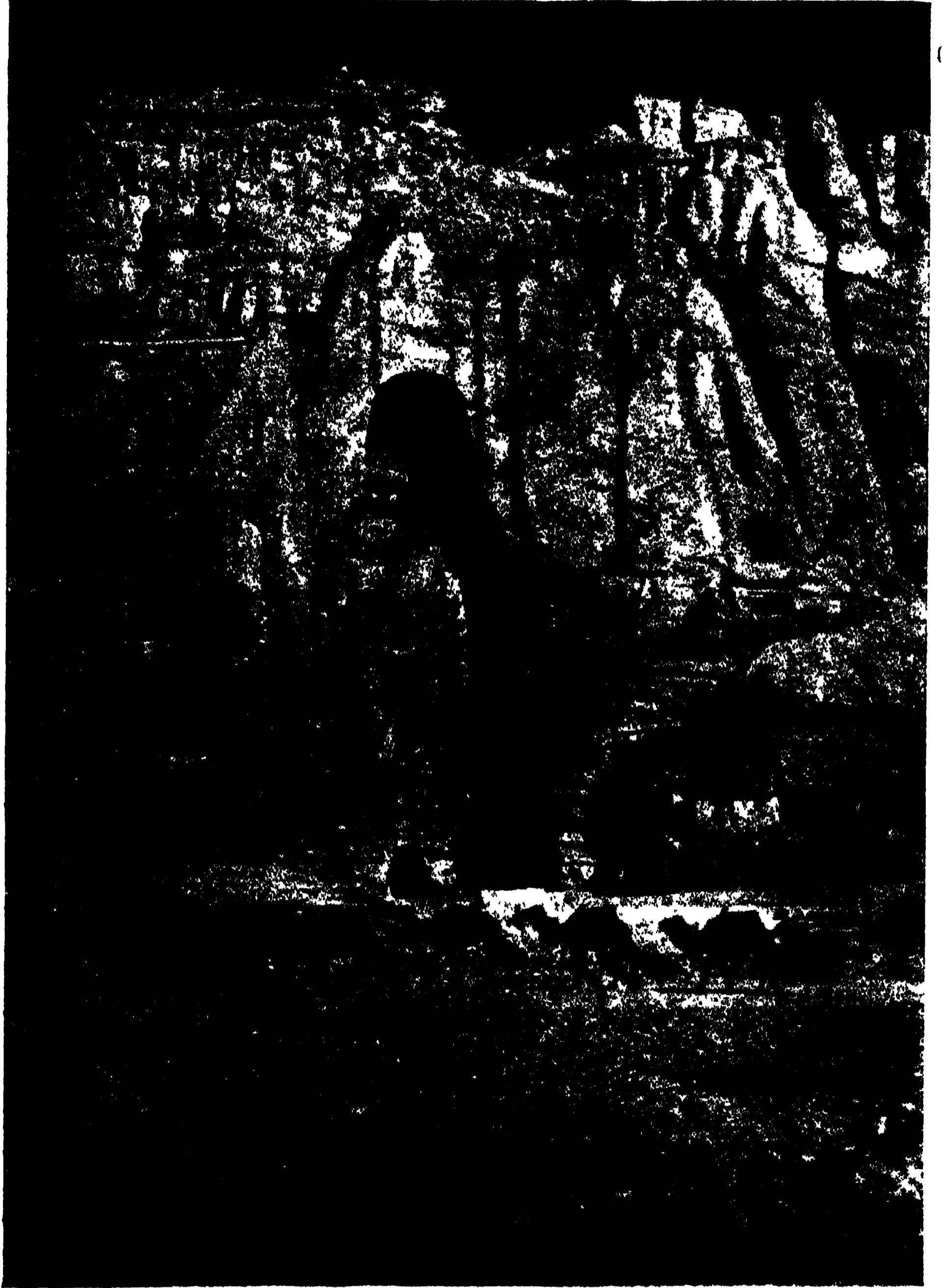
এ-পারে আসিবামাত্র ফরেন
অফিসের কর্মচারীরা আমা-
দের ছাউনির ঠিকানা ও
পথের নির্দেশ করিয়া দিলেন ।

এ পথে আসিতে কিন্তু
দারুণ বিলাট ! সহরের
তোরণ-দ্বার এমন যে, দ্বার-
পথে আমাদের অতিকায়
ট্রাক প্রবেশ করিতে পারে
না ! পথে গাধা-টানা গাড়ীর
ভিড় ! আমাদের ট্রাক ফটক
আটকাইয়া রাখিয়াছে ।
গাড়ীর গাধাগুলোর কি সে
অধীর চীৎকার ! পুলিশ
আসিয়া সাহায্য করিল ।
ছ' ঘণ্টা পরে ফটকের মধ্যে
গাড়ী প্রবেশ করিল । এত-
ক্ষণ গাড়ী ও লোকের ভিড়ে
পথ একেবারে বন্ধ ছিল ।
আমাদের জন্ত কত লোকের
যে কত অসুবিধা হইল, বলি-
বার নয় ! করজোড়ে তাদের
কাছে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করা
ভিন্ন আমাদের আর-কোনো
উপায় ছিল না ।

ইস্তাশুলে আমরা সাত-
দিন ছিলাম ।

এখান হইতে স্কটারি যাইব, স্থির ছিল । কিন্তু
শুনিলাম, পথ এমন, পথে ট্রাক চলিবে না ।' তুর্কি
গবর্নমেন্ট দয়া করিয়া বড় ফেরিবোটের ব্যবস্থা
করিয়া দিলেন । সেই বোটে ট্রাক এবং গাড়ী
ভুলিয়া আমরা মর্শোরা-সাগর পার হইয়া মুদানিয়ায়
পৌছিলাম ।

পুরানো তুর্কিকে ভাঙ্গিয়া কমল পাশা যে নব-রূপে
গড়িয়াছেন, সে গঠনের চারুতার চমৎকৃত হইতে হয় !
নব-তুরস্কের নূতন রাজধানী আঙ্কারা যেন ইজ্রপূরী ! মোটর



বামিয়ানে বৃক্ষ-মূর্তি

গাড়ী এখানকার রেল-গাড়ীর সঙ্গে গতিবেগে পাল্লা দিয়া
জিতিতে পারিবে, সে আশা নাই ।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে এখানে যুর্গীর লড়াই,
কুকুরের লড়াই, উষ্ট্রযুদ্ধ প্রভৃতিতে পূর্বে মহা-সমারোহ
সংঘটিত হইত । এ-সব নিষ্ঠুর খেলা আইনের ধারে
এখন ছিন্ন করা হইয়াছে ।



ইবাকব বালিক রাজ' ফকরুল



ইরান-পুলিশ—পাশপোট-পরীক্ষা

আকারায় বাইসিকেলের খুব ধুম! পাকা রাস্তায় তরুণ-তরুণীর দ্বিচক্রযানে বিচরণ দেখিবার জিনিষ! এখানে থিয়েটার নাই, শুধু সিনেমা-হাউস আছে।

ছিল, সেটি ভাসিয়া গিয়াছে; ও-পথে যাওয়া চলিবে না। সরকারী প্রাইভেট-ট্রেনে গাড়ী-সমেত আমাদের আলেকজান্দ্রেতায় পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল।

সিনেমা-হাউসে সপ্তাহে ছ'দিন করিয়া অর্কেষ্ট্রার ব্যবস্থা হয়। তা' ছাড়া গান-বাজনার তেমন চর্চা দেখি নাই।

এদিককার পথ-ঘাট প্রাচীন গ্রীক-জাতির তৈয়ারী। পরে সে পথ-ঘাটের নানা সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে। তুর্কীর প্রাচীন রাজধানী বরশার পল্লী-পথে সে-কালের রথচক্র-চিহ্ন এখনো মিলায় নাই!

এখানে শুনিলাম, তারশ পর্বতের দিক দিয়া যে-পথ ভারতে গিয়াছে, সে-পথে এ সময়ে মোটর চলিবে না! তুর্ক-গণগমেন্টের ব্যবস্থায় আমাদের গাড়ীগুলি রেলোয়ে-ট্রাকে তুলিয়া কায়েশর হইতে দুই শত মাইল দূরে আদানায় পাঠানো হইল। আদানা ঠিক সমুদ্রকূলে অবস্থিত।

আদানা মস্ত সহর। ইশ্লামী-আবহাওয়া নাই বলিলে অত্যাঙ্কি হইবে না। এখানকার তুলা বিশ্ব-বিখ্যাত।

আদানা হইতে একটি ব্রাঞ্চ-রেল-লাইন গিয়াছে তারশ পর্বত ঘুরিয়া সিডনস্ নদীর তীর পর্যন্ত। সিডনস্ ভূমধ্য-সাগরের সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গম-স্থলেই প্রাচীন যুগে রাণী ক্রিওপেট্রা থাকিয়াছিলেন এণ্টনির সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

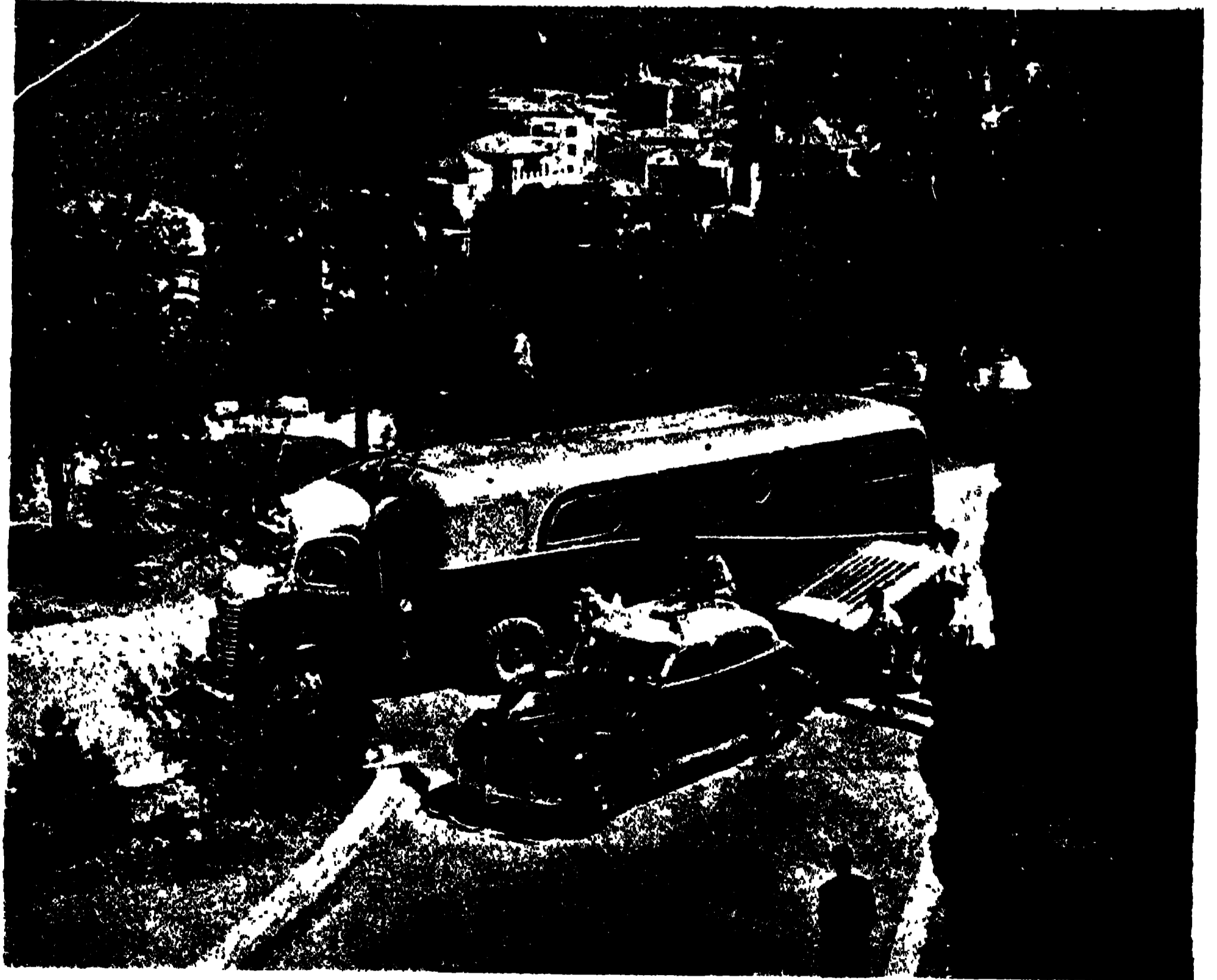
ট্রেনে চড়িয়া আমরা তারশ পর্বতের পথ অতিক্রম করিলাম। আদানায় আমাদের অল্প বহু অহুচর মিলিল। আদানায় আসিয়া শুনিলাম, বর্ষার জলে সামনের পথে যে-সেতু

গত মহাযুদ্ধের শেষে ফরাশীদের হাত হইতে আলেকজান্দ্রেতা আবার তুর্কির হাতে আসিয়াছে। এখান হইতে সোজা সিরিয়ার বাইব, ইহাই আমাদের সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু এখানকার বন্ধুরা ধরিলেন, কাছে আছে হাতাই গ্রাম; তার পরেই সিরিয়ার সীমান্ত-রেখা। বন্ধুরা বলিলেন, সীমান্ত-প্রদেশের ছবি গ্রহণ করিতে হইবে! রেডিয়ো-মারফৎ আসন্ন সময়ের সংবাদ ইতিমধ্যে আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এ সময় সকলের মনে প্রতিক্রমণ আশঙ্কা, ইতালী কখন সময় ঘোষণা করিবে! সময় ঘোষিত হইলে আমাদের এ অতিকায় ট্রাক হইবে বোমার লক্ষ্য! বিরাট বপুলইয়া এ ট্রাক শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবে, সে আশা আদৌ ছিল না! এমন আশঙ্কা সত্ত্বেও দু'দিন ধরিয়া আমরা ছবি তুলিলাম। বন্ধুর পাছাড়ের গায়ে কি করিয়া এ ছবি তোলা হইয়াছিল, মনে করিলে এখনো হৃৎকম্প হয়!

এখানে একটি



দামাঙ্কালে আতিথ্য



বেইকথ



বাগদাদে মাছির ভয়ে আত্ম-রক্ষা



হাভাই গ্রামে বিবাহ-উৎসব

বি বা হো ২-ব
দেখিবার সৌভাগ্য
হইয়া ছিল। সে
উৎসবেরও ছবি
তুলিলাম।

সিরিয়ার সীমান্ত-
দেশে মা কি গ
রা জ-দু তে র
অফিসে সংবাদ
পা ই লা ম,—যুদ্ধ
বাধিয়াছে। বেই-
রুথ্ সহরে কখন
সে আশুন জলিয়া
উঠিবে, ঠিক নাই।
ইহাতে আমরা
দ মি লা ম না।
ভাগ্যের উপর
নির্ভর করিয়া
আলেপোর পথে
পাড়ি দিলাম;
এ বং অ চি রে
আ লে পো য়
আসিয়া এক ভুল
গিরির শি খ রে
ছাউনি ফেলিলাম।

কিন্তু বি প দ
ঘটিল। পেট্রোল
হু রা ই য়া ছে।
আমাদের ট্যাঙ্কে
সর্বসমেত ৬০০
গ্যালন পেট্রোল
থরে। ভুক্তিতে
এ ক গ্যা ল ন
পেট্রোলের দাম
তখন সাত সিকা ;
অথচ সিরিয়ার

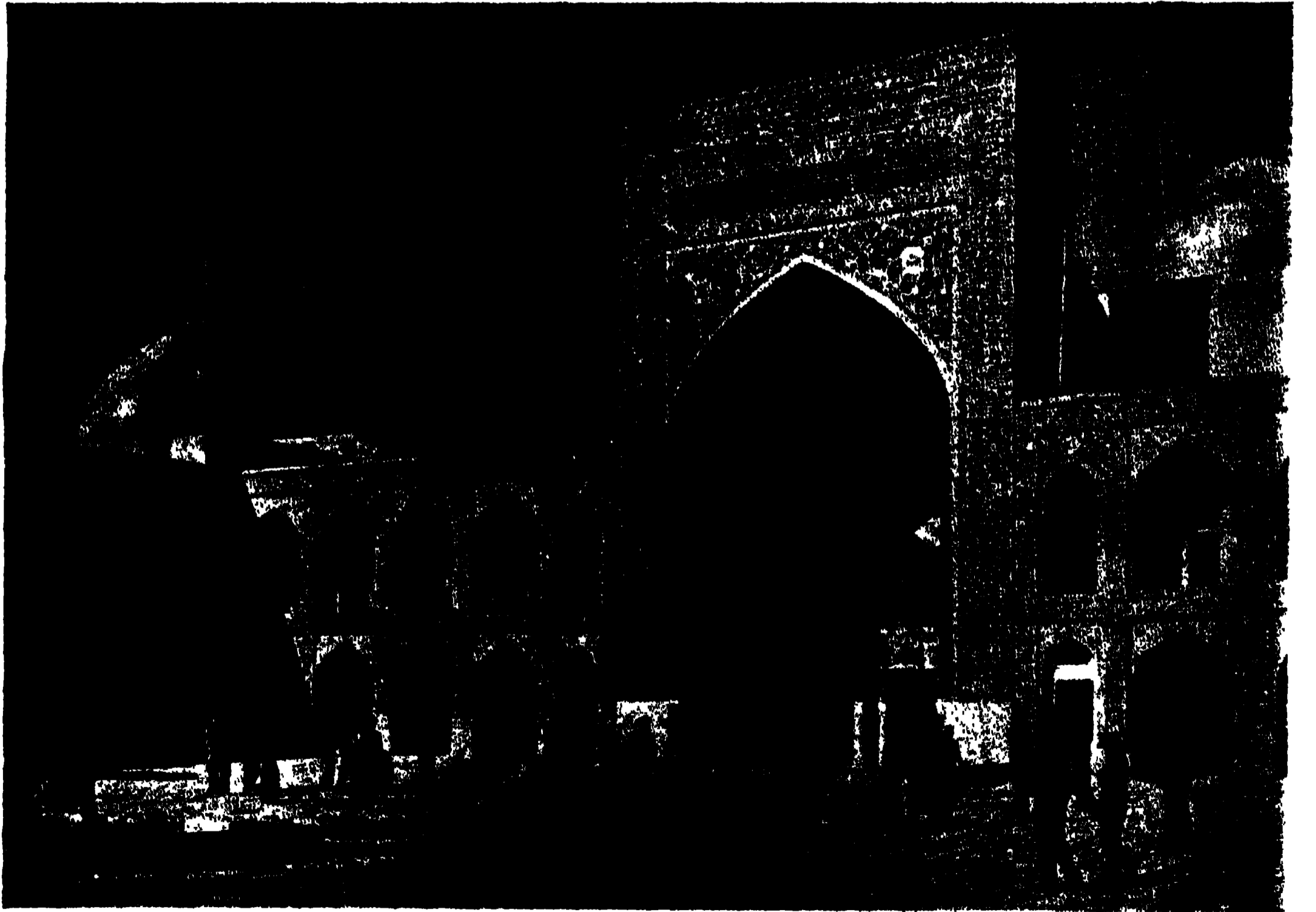
এক গ্যালনে র
দাম সাড়ে তিন
আনা! ভাবিয়া-
ছিলাম, সিরিয়ায়
৬০০ গ্যালন
পেট্রোল লইয়া
ট্রাক ভরতি করিব।
কিনিতে গিয়া
দেখি, আমাদের
মার্কিন-মুদ্রা
এখানে কেহ
লইতে চাহে না!
উপায়? পেট্রোল
না পাইলে গাড়ী
চলিবে না! তা
যদি বা চলে, কিন্তু
দলে আছি দশ
জন! এ মুদ্রা না
বিকাইলে কি দিয়া
খাওয়া কিনিব?

সমস্ত-সমা-
ধানের উদ্দেশ্যে
বন্ধু ল্যারি বাহির
হইলেন। কিছু
টাকা ধার করিয়া
ফিরিলেন। এ
টাকা ধার মিলিল
এখানকার জেনা-
রেল মোটর এ্যাণ্ড
ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পা-
নির এজেন্টের
কাছ হইতে।
যে-টাকা মিলিল,
সে-টাকায় খাবার

মিলিবে! কিন্তু পেট্রোল? সাময়িক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে
গিয়া দেখা করিলাম। তাঁদের বলিলাম--জানি, যুদ্ধের



বাগদাদ--টাইগ্রিসের বৃক্কে সেতু



মেশেদ--ইরানী মসজিদ

অসুখ সব দিকে ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইতেছে। আমাদের
এত গ্যালন পেট্রোল দিতে তাই এমন নিবেদ! কিন্তু



বুলগেরিয়া—পথ

ভিন্ন লোক সান
হইবে না !

বেইরুথে র
মার্কিন কনশাল্কে
বারে-বারে টেলি-
ফোন করিলাম,—
কোথায় কি করিয়া
পেট্রোল পাইব ?
২৬৫ গ্যালন
পেট্রোল পাইলে
এ দেশ ত্যাগ
করিয়া যাইতে
পারি !

অনুমতি মিলিল।
কিন্তু পেট্রোলের
জন্ম নগদ দাম
দিতে হইবে। এ
টাকা কোথায়
পাই ? ব্যাঙ্কে
গেলাম। ব্যাঙ্ক
বলিল, ১৩২
গ্যালনের মাত্র
দাম দিতে পারি।
১৩২ গ্যালন
পেট্রোল নাও ;
বাকী পেট্রোল
লাটাভিয়ায় গিয়া
লইবে !

তাই করিলাম।
ওরা সে পেন্টে স্ব র
তারিখে যাত্রা
করিয়া নিবিঘ্নে



এলবুর্জের বৃকে পথ

আমাদের এই দশটি প্রাণীকে এখানে বসাইয়া খাওয়ানিতে
আপনাদের কত ব্যয় হইবে, ভাবুন তো ! তার
চেয়ে প্রয়োজন-মার্কিন পেট্রোল দিয়া আমাদের
এ-দেশ হইতে বিদায় করিলে আপনাদের লাভ

কোনো মতে লাটাভিয়ায় আসিলাম। এখানে মার্কিন
মুদ্রার বিনিময়ে পেট্রোল লইলাম। ১৩২ গ্যালন
লইয়া আমরা চলিলাম বেইরুথের অভিমুখে। চারি-
দিকে দেখি, 'সাজ-সাজ' রব উঠিয়াছে ! দেখিলাম,



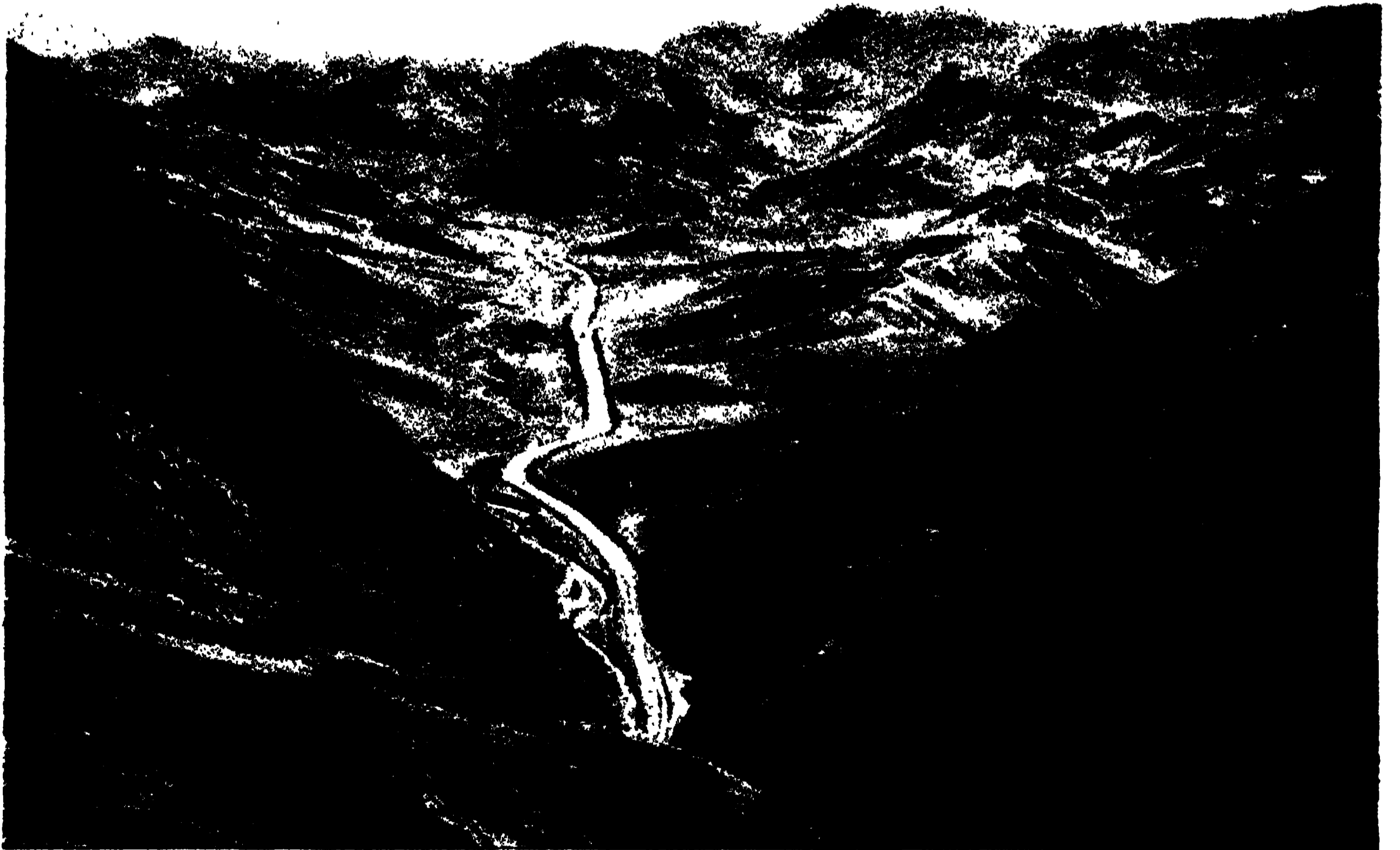
আফগানিস্তান—বামিয়ান-উপত্যকা

দলে-দলে সকলে ফৌজে যোগ দিতেছে! বেইকুথে আসিয়া ছ' ঘণ্টা ঘুরিয়া সেখানকার মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে পৌঁছিলাম।

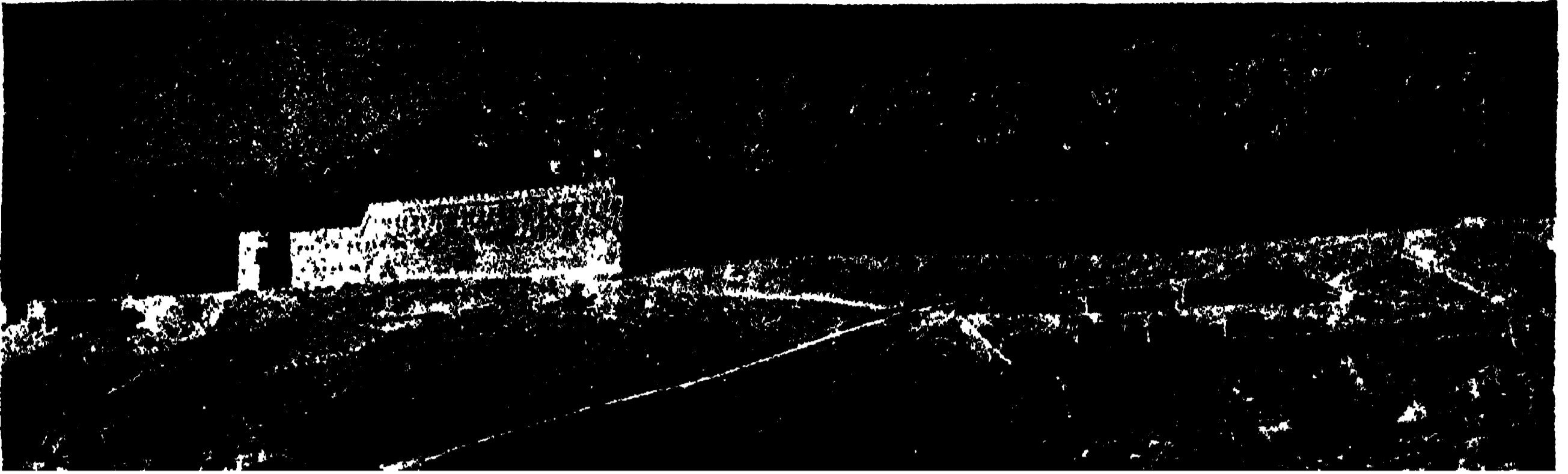
প্রেসিডেন্ট বেয়ার্ড ডজ আমাদের আশ্রয় দিলেন। এখানেও যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে! মাঠে-বাটে শুধু ফৌজের কুচ-কাওয়াজ! জাহাজ আসিতেছে, জাহাজ ছাড়িতেছে। সে-সব জাহাজ একেবারে লোকে

লোকারণ্য! টমাশ কুকের অফিসে লোকের ভিড়,— রেলোয়ে ষ্টেশনে ভিড়—ডকে ভিড়! ভয়ার্ত প্রমত্ত লোক-জন যে যে-দিকে পারে, পলাইতেছে! কেহ চলিয়াছে কায়রোয়, কেহ চলিয়াছে হাইফায়; কেহ বা বলবেকে! আত্মানং সততং রক্ষেৎ—আকাশে-বাতাসে এ রব ছাড়া আর কোন রব নাই!

এখানকার রণাতঙ্ক দেখিয়া আমাদের ভয় হইল, ইতালী



মেশেদ হইতে মোটরের পাকা পথ

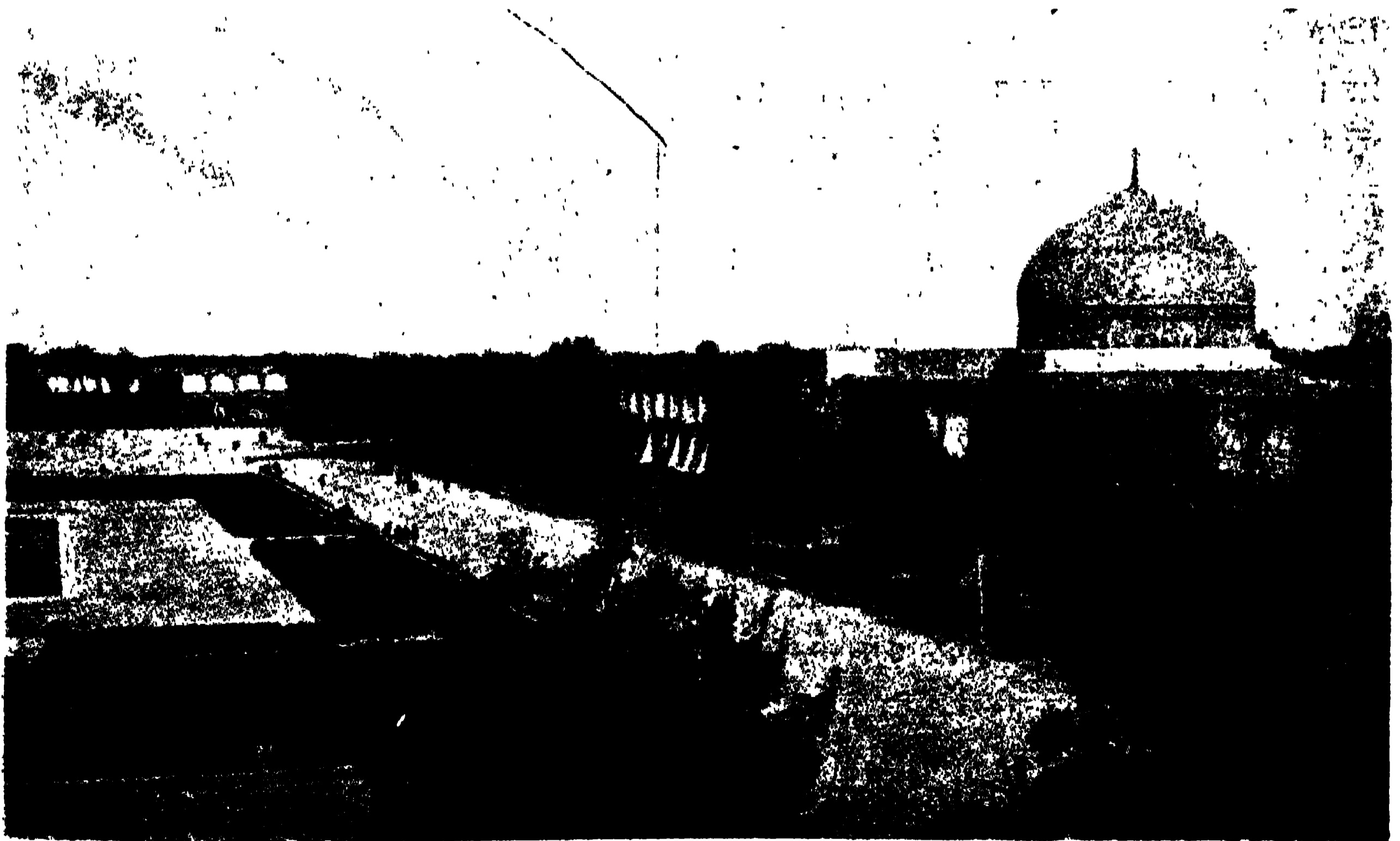


জামরুদ ফোর্ট

কখন আসিয়া আকাশ-পথে অকস্মাৎ আক্রমণ করিবে! আমরা আমাদের গাড়ী-ক'খানির ছাদে বড় বড় ছাঁদে মার্কিং-পতাকার ছবি আঁকাইয়া লইলাম। তার পর পূর্ব দিকে পাহাড়-পথ ধরিয়া দামাস্কাস অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এ-পথে সৈন্ত-সামন্ত সব জাগিয়া উঠিয়াছে। সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে এখানে আমরা ৬০০ গ্যালন পেট্রোল পাইলাম। পেট্রোল লইয়া ৬০০ মাইল-ব্যাপী মরু-পথ ধরিয়া বাগদাদের দিকে চলিলাম।

বালুময় এ-মরুপ্রান্তর অকূল, অসীম! পূর্বমুখে চলিয়াছি

—এ মরুর বুকে বিমান-আক্রমণ সম্বন্ধে অনেকখানি নিশ্চিত ছিলাম। দামাস্কাস হইতে বাহির হইবার দু'দিন পরে আমরা আসিলাম রাতবা মরুস্থানে সামরিক ঘাঁটির সামনে। এখানে একটি দুর্গ আছে। এ দুর্গে চার জন ইরাক-কর্মচারী আমাদের সাদর-অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁরা বাগদাদ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন এবং এখানে আমরা যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারি, তাহারি সুব্যবস্থা সম্পাদন-কল্পে আসিয়াছিলেন। তাঁরা বলিলেন, পথে এক দল বেহুইন



ইস্পাহান—ও-দিকে সেখ লুফে আরা মসজিদ



কাবুল—নারানবেশে পুরুষের নৃত্য-লাল।

বিদ্রোহী হইয়াছে। তাদের মধ্যে দু'জন এমন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল যে, পিস্তলের গুলীতে তাদের নিহত করা হইয়াছে। ও-পথ খুব নিরাপদ নয় বলিয়া রাৎবা হইতে আমাদের পাহারাদারীর জন্ত তাঁরা এক দল পেট্রোল-ফোজ সঙ্গে দিলেন। ফোজ-প্রহরী-রক্ষিত অবস্থায় আমরা টাইগ্রিসের তীরে বাগদাদের রেশকোর্শের সামনে আসিয়া নিরাপদে পৌঁছিলাম।

এবার আমাদের লক্ষ্য কাবুল। শুনিলাম, ও-পথে কলেরার প্রাধুর্ভাব। আমরা কলেরা-প্রতিষেধক টীকা লইলাম। তার পর যাত্রা।

ইরান-আফগান সীমান্তে এক বেহুইন সেখের সঙ্গে আলাপ হইল। ভদ্রলোক ভারী অমায়িক। তিনি কথা কহেন আরবী-ভাষায়। কথাবার্তা না বুঝিলেও তাঁর সমাদর-গৌরবে তৃপ্তি পাইলাম। তিনি বলিলেন, বেহুইন জাতির জীবন-কথার পরিচয় ফটোগ্রাফে গাঁথিয়া তুলিয়া দিতে হইবে! ছবি তুলিলাম।

আমাদের মোটর-অভিযানের কথা শুনিয়া



ইরান-নারী কুট তৈয়ারী করিতেছে



গজ্‌নৌ-সহর

কৌতূহল বশে ইরাকের বালক-রাজা ফয়জল আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। রাজার বয়স চার বৎসর মাত্র।

তার কাকা তার প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন। ইংরেজ নার্স রাজার পালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।



চাবার মেয়ে—যুগোশ্লাভিয়া

বাগদাদ ছাড়িয়া ৯০ মাইল দূরে ইরান-সীমান্তভাগে খানাকিনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইরান-রাজ রেজা শাহ পহ্লবীর স্বেশাসনে ইরান আজ অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। আধুনিক ইরান সর্ব-জড়তা হইতে মুক্ত। সুদৃশ্য সহর। চারি দিকে বড় বড় পাকা রাস্তা, চমৎকার ছাঁদে রচা সব বাড়ী-ঘর। মৌলবী-শেখের সে দাপট নাই—চুরি-ডাকাতি-লুঠপাট অন্তর্হিত হইয়াছে। পনেরো বৎসরে ইরান নূতন বেশে নূতন গৌরব-মহিমায় সমুজ্জল হইয়াছে। ইরান-রমণীর সে কারাবরোধ চূর্ণ হইয়াছে। তাঁরা আজ পুরুষের মতোই মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা-সম্মান পাইয়াছেন।

এখানকার পেট্রোলের উৎস লক্ষ ধারায় উৎসারিত হওয়ার ফলে ইরানে আজ লক্ষীর কৃপা অজস্বধারে বর্ষিত হইতেছে। নবনির্মিত রেল-পথ কাস্পিয়ান্ হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে এবং হাজার

হাজার মাইল প্রশস্ত পথে মোটর-চ লা চ ল দিব্য-স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস হইয়া উঠিয়াছে। শিকার দিকে নর-নারীর চেতনা পূর্ণ-আগ্রত দেখিলাম।

মাটির তৈয়ারী সেই প্রাচীন তিহিরান আজ ঐশ্বৰ্য্যে বলমল করিতেছে।

তিহিরান হইতে আমরা আসিলাম ইম্পা-হানে। জিন্দা নদীর ভীরে ছুঁদিন ছিলাম।

এখানে চাহার বাগে

মুতন মাদ্রাশা দেখিবার জিনিষ! তিহিরান হইতে এলবুর্জ গিরি-বন্ধ বহিয়া শাহ যে প্রকাণ্ড পাকা পথ নির্মাণ করাইয়াছেন, সে পথ গিয়াছে চালাশ পর্য্যন্ত। এ পথের নির্মাণে পূর্ত-শিল্পী যে কলা-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তার তুলনা নাই! এ পথে বহু টানেল। টানেলগুলি যেমন স্নগভীর, তেমনি সুন্দর।

দারুণ বারিপাত মাথায় বহিয়া মেশেদে আসিলাম। বৃষ্টির জন্ত আর বেশী অগ্রসর হওয়া গেল না। নিশাপুরে ছাউনি ফেলিলাম। এখানে ওমর খৈয়মের উদ্দেশে আমরা নতি জানাইলাম।

মেশেদের ইমাম রেজার মসজিদ দেখিবার মতো। এত বড় মসজিদ পৃথিবীর আর কোথাও নাই! মসজিদের মধ্যে চারটি স্নদৃশ প্রাঙ্গণ আছে। মসজিদের বড় চূড়াটি আগাগোড়া স্বর্ণমণ্ডিত।

এখানে ছুঃসংবাদ মিলিল, ফারা এবং কান্দাহারের মধ্যে দেলমন্দ নদীর উপরে যে-সেতু, সে-সেতু বর্ষায় বারিধারায় ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।, কাজেই আমাদের পক্ষে হিরাটে পৌঁছিবার আশা নাই।

দায়ে পড়িয়া তখন বাকা পথ ধরিতে হইল। এ-পথ জামিদান হইয়া বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া কোয়েটায় গিয়াছে। কোয়েটা হইতে উত্তর-পশ্চিমে এক হাজার



চালাশ —এলবুর্জ-গিরিপথ



চালাশ, রোডে টানেল

মাইল গেলে তবে কান্দাহারে পৌঁছানো যাইবে! এই পথই গ্রহণ করিলাম।

বেলুচিস্তানের পথ বালুময়। ৪৮ মাইল পথ চলিতে সময় লাগিল তিন দিন। কোয়েটার পর পথ আগাগোড়া ভালো, ম্যাকাডাম-করা।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে যে মাসে দারুণ ভূমিকম্পে কোয়েটা সহর ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। এখন কাঁচা আস্তানা নির্মাণ করিয়া লোক-জন বহু কষ্টে কোনো মতে সেই সব আস্তানায় মাথা গুঁজিয়া বাস করিতেছে।

কোয়েটা হইতে আফগান সীমান্তের উত্তর-দিককার পথ চমৎকার পাকা। এ-পথ চামানে শেষ হইয়াছে। চামানে আফগান-সরকারের প্রতিনিধি আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা কান্দাহারে আসিলাম।

কান্দাহার হইতে গজনীর মধ্য দিয়া আসিয়া আমরা কাবুল নদী পার হইলাম। আমীরের অতিথি-নিবাসে রাজার আদরে সাত দিন বাস। এখানে নাচ-গানের রেওয়াজ নাই। নাচ বলিতে আছে শুধু পুরুষ মানুষের নাচ। মেয়েলি চঙে পুরুষরা এমন নাচ নাচে যে, তাহাতে যত আঁট থাকুক, হাত সঞ্চরণ করা দায়!

সাত দিন পরে আবার আমরা পথের যাত্রী হইলাম।

এ-পথে বহু জাতের নর-নারীর সঙ্গে দেখা হইল। রাশিয়ান, চীনা, তাতার, তিব্বতী—সর্ব জাতির এমন সমন্বয় আর কোনোখানে দেখি নাই।

কাবুলের উত্তর-পশ্চিমে ২০০০ ফুট উচ্চ শিবার গিরিবন্ধু। এ-পথ এক দিকে সোজা গিয়াছে রাশিয়ান; আর এক দিকে নামিয়াছে গিয়া ভারতের বৃকে। হুলোলা-গিরিবন্ধু পার হইয়া বহু গিরি-পথ ঘুরিয়া আমরা ৮৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত বামিয়ান উপভ্যকার আসিলাম। এই বামিয়ানের এক দিকে তুবার-কিরীট হিন্দুকুশ-পর্বত। হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দুকুশ ছিল বৌদ্ধ-ভীর্ণ। এখানে অসংখ্য গিরি-গুহার বহু বৌদ্ধ মঠ, বুদ্ধের বহু মূর্তি

আজো গরিমাময় বেশে বিরাজ করিতেছে। হুঁটি বুদ্ধ মূর্তি আছে—বিশাল বিরাট মূর্তি; একটি প্রায় ১৭৫ ফুট, অপরটি ১১৬ ফুট। একখানি করিয়া গোটা পাথর কাটিয়া এ-হুঁটি মূর্তি বিরচিত হইয়াছে।

যে মহাপুরুষের বাণী এক দিন ভারত-গগন ছাড়িয়া স্বদূর নেপাল, চীন, আফগানিস্তান, জাপান ও সিংহলকে বিমুগ্ধ উন্মোচিত করিয়াছিল, তাঁর কথা স্মরণ করিয়া আমাদের চিত্ত প্রত্যয় ভরিয়া উঠিল।



বুলগেরিয়ায় নৃত্য-লীলা

গিরি-বন্ধে দাঁড়াইয়া আমরা তাঁর উদ্দেশে নতি জ্ঞাপন করিলাম।

কাবুল হইতে ২০০ মাইল দূরে খাইবার-গিরিবন্ধু। খাইবার-বন্ধু দিয়া আমরা আসিলাম ভারতের মৃত্তিকা-পীঠে। পাহাড়ের গায়ে সরু পথ। এখানে উটের পিঠে চড়িয়া বহু যাত্রী চলিয়াছে—সে জন্ত প্রতিপদে আমাদের গতি মন্থর হইতেছিল। খাইবার-গিরিবন্ধু ২৬ মাইল দীর্ঘ। তিন ঘণ্টায় এ-পথ অতিক্রম করিয়া আমরা লাণ্ডিকোটাল পৌঁছিলাম। তার পর মিলিল জামরুদ ফোর্ট। সেখান হইতে আসিলাম পেশোয়ার।

এখানে ব্রিটিশ ফৌজের সতর্ক পাহারা-বাঁটি আছে অসংখ্য। পাহাড়ের ও-ধারে আফ্রিদিদের আস্তানা!

পারিস হইতে পেশোয়ারে আসিলাম—১১০৬৩ মাইল। আসিতে আমাদের পাঁচ মাস সময় লাগিয়াছিল।



ভারতে ঔষধ-শিল্প

বর্তমান যুদ্ধের ফলে যে সমুদয় ভারতীয় শিল্প সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ঔষধ-শিল্প তাহাদের অন্ততম। এখানে বলা আবশ্যিক, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীসম্মত ঔষধাদিই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ভারতের বিশাল জনসমষ্টির শতকরা ১৫ ভাগের অধিক লোক অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ও চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করিতে সমর্থ কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এই প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসাই ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, এবং সরকারী সমর্থনে ও সাহায্যে ইহার প্রসারও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। দেড় শত বৎসরাধিক কাল হইতে এই চিকিৎসা-প্রণালী এ দেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া, উহার কোডেক্স, একট্রা ফার্মাকোপিয়া প্রভৃতি সরকারী ও আধা-সরকারী গ্রন্থাদির অনুমোদিত ঔষধাবলীই এই প্রণালীসম্মত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্বে সেগুলি প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ্বে এইরূপ ঔষধ প্রস্তুতের জন্ম হই-একটি কারখানা ভারতের কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশেও স্থাপিত হয়; তন্মধ্যে কলিকাতা ও তৎ-সন্নিকটবর্তী কাশীপুর এবং কোন্নগরস্থ ডি, ওয়াল্ডির কারখানা এই বিষয়ে অগ্রগণ্য বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

সে যাহাই হউক, সেই সময় হইতেই অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের চাহিদার বৃদ্ধির জন্ম কোন কোন প্রকার ঔষধ এ দেশের কারখানা সমূহে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে। বিলাতী ঔষধের আমদানির পরিমাণও সেই সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও এ দেশে ঔষধ-সরবরাহে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় কৃতকগুলি ঔষধ এ দেশে প্রস্তুতের চেষ্টাও সরকারপক্ষ হইতে করা হইয়াছিল; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই

সরকারী প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গতবার মহাযুদ্ধের অবসানের পর, সরকার এবং শিল্প-পরিচালকবর্গ আর ঐ সকল শিল্পের উন্নতি-সাধনে আদৌ কোন চেষ্টাই করেন নাই। বিশেষতঃ, বিলাতী ঔষধাদি পুনর্বার এ দেশে অবাধে আমদানি হইতে থাকায় এ দেশের উদীয়মান নূতন ঔষধ-শিল্পগুলি তাহা-দিগের সহিত কঠোর প্রতিযোগিতায় অধিক দিন স্ব স্ব অস্তিত্বরক্ষায় সমর্থ হয় নাই। সেই সময় হইতে দেশকে ধারাবাহিকরূপে ঔষধ সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা চলিলে উপস্থিত সঙ্কট হইতে যে কতক পরিমাণে মুক্তি-লাভ করা সম্ভব হইত—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সুবর্ণ-সুযোগ উপেক্ষিত হইলেও, বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে ভারতীয় ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্প নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সম্মুখে কিছু কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছে; আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামসম্বিত কয়েকটি বড় বড় ঔষধের কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি সমশ্রেণীয় বিদেশীয় শিল্পের তুলনায় এ দেশের ঔষধ-শিল্প এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই বলিলে অত্যাঙ্গি হয় না।

বারাণসীতে সম্মেলন

এই সমুদয় বিষয় সম্যক্রূপে আলোচনা করিয়া ভবিষ্যত উন্নতির পন্থা স্থির করিবার জন্ম গত জানুয়ারী মাসে বারাণসীতে একটি 'ঔষধ-বিজ্ঞান সম্মেলনে'র অধিবেশন হইয়াছিল। কাশী-হিন্দু-বিদ্যালয়ের ঔষধ-বিজ্ঞান বিভাগ ও তৎসংশ্লিষ্ট Indian Pharmaceutical Societyর উদ্যোগেই ইহা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মিউজিয়ামের শিল্পবিভাগের অধ্যক্ষ, মিঃ এস, এন, বল এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের

সহিত ভারতীয় রাসায়নিক ও ঔষধ-প্রস্তুতবিজ্ঞাবিদগণকে (Pharmacists) সম্বন্ধ করিবার জন্ত যে সভার অধিবেশন হয়, বাঙ্গালোর সায়েন্স-ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর জে, সি, ঘোষ তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সম্মেলনে ও সভায় যোগদান করেন। এরূপ অনুষ্ঠান ভারতে এই প্রথম; এবং ইহার সাফল্য দ্বারা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, রাসায়নিক ও ঔষধ-শিল্প সংগঠনের জন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এ দেশে একটি নব-প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সভাপতি তাহার অভিভাষণে ভারতের বিশাল ভেষজ-ভাণ্ডারের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং ভেষজ-উদ্ভিদাদির গুণাগুণ ও ভেষজলক্ষণতত্ত্ব (Pharmacognosy) সম্বন্ধে গবেষণা যে এ দেশে এ পর্যন্ত অতি সামান্যই হইয়াছে, তাহাও প্রতিপন্ন করেন। সম্মেলনে গৃহীত ১৪টি প্রস্তাবে ঔষধ-বিজ্ঞান শিক্ষা, ঔষধ-প্রস্তুতবিজ্ঞাবিদগণের ঔষধ-শিল্প ও তৎসম্পর্কীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদিতে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

সরকারী সাহায্য

সকল সুসভ্য দেশেই শিল্প-সংগঠনে সরকার পর্যাপ্তরূপে সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতের ত্রায় দরিদ্র দেশে এবং রাসায়নিক ও ঔষধ-শিল্পের ত্রায় জটিল শিল্পে এইরূপ সাহায্যের প্রয়োজন আরও অধিক। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, এ পর্যন্ত এ দেশে সরকার সেরূপ কোন সাহায্য প্রদান করেন নাই; বরং নানা অজুহাতে মূল-শিল্পাদি (Key-industries) প্রতিষ্ঠায় বাধারই সৃষ্টি করা হইয়াছে। পূর্বেই সভায় ডক্টর ঘোষের ত্রায় অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গভীর ক্ষোভের সহিত যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—আমরা স্থানাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না বটে, তবে তাহার মর্ম এই যে—যখনই জনসাধারণ ব্যাপক ভাবে শিল্প-পরিপুষ্টির দাবি করিয়াছে, তখনই তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞের অভাবে তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। আবার, ভারতে উপযুক্ত শিক্ষাদানের সাহায্যে তৎপ

বিশেষজ্ঞগণকে কার্যোপযোগী করিয়া লইবার প্রস্তাবেও এই বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছে যে, দেশীয় শিল্পে সে সকল বিশেষজ্ঞের স্থান হইবার সম্ভাবনা অল্প।—এই কুচক্র নষ্ট করিবার জন্ত এখন সঙ্কল্প দৃঢ় করিতে হইবে। সাধারণের ধনরক্ষকগণের নিকট জনগণকে সম্মিলিত ভাবে এই দাবী উত্থাপন করিতে হইবে যে, আমাদের শিল্পের পরিপুষ্টি ও বিস্তারের জন্ত আবশ্যকীয় শিল্পতত্ত্ব-বিদগণকে দেশমধ্যেই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইবার ব্যয়ভার বহনের জন্ত তাঁহাদিগের ধনভাণ্ডার যেন সকল সময়েই উন্মুক্ত রাখা হয়।

প্রকৃত শিল্পোন্নতি বিষয়ে সরকারের মনোভাব আমাদের এইরূপ প্রতিকূল হইলেও বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কয়েকটি বৃহৎ শিল্পে দ্রুত অগ্রসর হওয়া ভারতের পক্ষে অপরিহার্য্য বুঝিয়া ভারত সরকার গত এপ্রিল মাসে এই সকল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্ত একটি Board of Scientific and Industrial Research সংগঠন করেন। এই বোর্ডকে কতিপয় শিল্পের উন্নতি-বিধানে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। এ স্থলে ইহা বলা অপ্ৰাসঙ্গিক নহে যে, অনেক সময় সরকারী প্রচেষ্টায় শিল্পাদির যে বাস্তবিকই কোন উপকার হয় না—তাহার অন্ততম কারণ এই যে, বিশেষ বিশেষ কার্য-সম্পাদনের জন্ত তদনুরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে নির্বাচন করা হয় না। অনুপযুক্ত ব্যক্তির পরিচালনায় শিল্পের অগ্রগতি যে ব্যাহত হয়, ঔষধ-শিল্পই তাহার একটি দৃষ্টান্ত। ভেষজ-বিষয়ক অনুসন্ধান ও ভেষজ-প্রস্তুতে এ কাল যাবৎ ডাক্তারগণেরই প্রাধান্য বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক ঔষধশিল্প পরিচালনায় ঔষধ-রাসায়ন-সংক্রান্ত (Pharmaceutical chemistry) অভিজ্ঞতাই সমধিক পরিমাণে কার্যোপযোগী। ডাক্তারগণ ঔষধ-প্রয়োগে পারদর্শী হইলেও বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত উহা প্রস্তুতে প্রয়োজনানুযায়ী দক্ষতা প্রদর্শন করিবেন, এরূপ আশা করাই অসম্ভব। তবে আশার কথা এই যে, সরকার এখন ঐ প্রকার ত্রাস্ত সংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। পূর্বেই শিল্প ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গবেষণা পরিচালনের ভার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যে বৈজ্ঞানিক ও ফলিত রাসায়ন-শাস্ত্রে বিশিষ্ট কর্মীর হস্তে হস্ত হইয়াছে—তিনি আমাদের

দেশের গৌরব সার শানিধরুপ ভাটনগর। বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে কার্য করিবার জন্ত যে কয়েকটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভেষজ দ্রব্যাদি বিষয়ক কমিটীই এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর জে, এন, রায় Director of Production (Drugs & Dressings) নিযুক্ত হইয়াছেন; এতদ্বির পূর্বোক্ত কমিটির পরিচালন-ভারও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই নির্বাচনে যে সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভেষজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণায় ডক্টর রায় ইতিপূর্বেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার সুনিপুণ পরিচালনায় কমিটি যে দেশমধ্যেই অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিদেশীয় পণ্য পরিহারে সমর্থ হইবে, ইহা দুরাশা নহে। আপাততঃ ইকনাইন, কেফিন প্রভৃতি উপকার এবং থাইমল, কৃত্রিম কর্পুর প্রভৃতি প্রস্তুতের প্রচেষ্টা হইবে, এবং গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। এই কমিটির কার্যকেন্দ্র আলিপুরে স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্ত কতক টাকাও কমিটি পাইয়াছেন।

ঔষধ-শিল্পের শাখা-প্রশাখা

পূর্বে সকল দেশেই ঔষধার্থ উদ্ভিজ্জ দ্রব্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং ইহাদিগের প্রয়োগ-রূপের (preparations) মধ্যে চূর্ণ, বাটকা, পাচন কাথ প্রভৃতিই প্রধান ছিল। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় এখনও এগুলির প্রাধান্য বর্তমান। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীতে অনেক উদ্ভিজ্জ-ভেষজের কার্যকর সারাংশ বা বীর্ষ্য (Active principle) নিষ্কাশন করিয়া প্রয়োগ করা হইতেছে; তাহাতে ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়ার নানাবিধ যন্ত্রাদির প্রয়োজন বলিয়া ঔষধের মূল্যও বাড়াইতে হইয়াছে। আবার বর্তমান যুগে উদ্ভিজ্জাত ঔষধের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া খনিজ, ধাতু, ও জৈব পদার্থ ষটিত এবং জীবাণুজ (Biological) পদার্থ দ্বারা উহাদের স্থান পূরণ করা হইতেছে। এই সকল শ্রেণীর ঔষধ নির্দোষরূপে

প্রস্তুত করিতে হইলে এক দিকে যেমন বিভিন্ন প্রকার কলকল্লা ও সাজসরঞ্জাম-সম্বিত কারখানা ও পরীক্ষাগারের প্রয়োজন, অন্য দিকে তেমনিই ভেষজ, রসায়ন, ভেষজ-ক্রিয়াতত্ত্ব (Pharmacology) ও জীবাণু-তত্ত্বে পারদর্শী কর্মীও অপরিহার্য। আধুনিক ঔষধ-শিল্প-সংগঠন সেই জন্ত যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃত ঔষধ ব্যতীত অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি, হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি, কতাদি চিকিৎসার ড্রেসিং, সংক্রামকধ্বংসী (Disinfectants) প্রভৃতি আরও কয়েক শ্রেণীর দ্রব্য ঔষধশিল্পের অন্তর্গত। পেটেন্ট ঔষধ, রোগী ও শিশুখাণ্ড এবং প্রসাধন দ্রব্যাদিও স্থানে স্থানে ঔষধের কারখানায় প্রস্তুত হয়। বস্তুতঃ, ঔষধ-শিল্প কতকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পেরই সমষ্টি। এ দেশে দুই-চারিটি বৃহৎ কারখানায় উক্ত প্রকারের একাধিক শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু যুরোপ বা আমেরিকার বিরাট কারখানা সমূহ বহু প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত দুই-এক প্রকার দ্রব্যের ভূরি পরিমাণে উৎপাদনেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। এক কারখানায় উৎপাদিত মাল বা উহার পরিত্যক্তাংশ (waste product) লইয়া অন্য কারখানা কার্য আরম্ভ করে। তাহাতে কার্য বিভক্ত হইয়া উৎপাদনের যেমন সুবিধা হয়, তেমনিই দ্রুত শিল্প-প্রসারেরও সহায়তা লাভ করা যায়।

ফলতঃ, ঔষধ-শিল্পের সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি অত্র কতক-গুলি রাসায়নিক শিল্প-পরিপুষ্টির উপর নির্ভর করে। এ দেশীয় ঔষধ-কারখানা সমূহে কিছু দিন পূর্বে পর্যন্ত পেটেন্ট ঔষধ ব্যতীত প্রধানতঃ টিংচার, লিকুইড একট্রাক্ট ও তৎশ্রেণীয় দ্রব্যাদিই প্রস্তুত হইত। তৎপরে কয়েকটি প্রধান এসিড যথা সাল্ফিউরিক, নাইট্রিক ইত্যাদি প্রস্তুতে মনোনিবেশ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ গুরু ও সূক্ষ্ম রাসায়নিক দ্রব্যাদি—যে সমুদয় ঔষধ ভিন্ন অন্যান্য শিল্পেও অত্যাবশ্যক, সেগুলি কিছু এখনও প্রস্তুত হইতেছে না। বর্তমান যুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে সরকার ও দেশীয় শিল্প-পরিচালকগণের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে, এবং ঔষধ-সংক্রান্ত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতের প্রচেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে পূর্বে বিদেশ

হইতে আমদানি করিতে হইত, এরূপ কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদন দেশমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। কার্বলিক, ত্রেসিলিক, ও ট্যানিক এসিড, ক্লোরোফর্ম, সংজ্ঞাপহারক ইথার, ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট ইত্যাদি ইহার উদাহরণস্থল। এতদ্ভিন্ন, ক্ষতাদি চিকিৎসায় তুলা ও ড্রেসিং, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার-যোগ্য বিশেষ প্রকার ড্রেসিং; কর্ক, বোতল, ব্যাগ প্রভৃতি রবারনির্মিত দ্রব্য; উন্নত প্রকারের স্ক্রু কাচের দ্রব্য; পোর্সিলেন ও মাটির জিনিষ ইত্যাদি যে সকল দেশী দ্রব্য এখন প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি পূর্ব-ব্যবহৃত যুরোপ হইতে আমদানি দ্রব্য সমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু কয়েকটি মূল রাসায়নিক শিল্প দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে ঔষধ-শিল্পের স্থায়ী উন্নতি সম্ভব হইবে না। এই-রূপ বৃহদায়তন মূল শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধনের বিনিয়োগ অপরিহার্য; তাহা সংগ্রহ করা তেমন সহজসাধ্য নহে। এ বিষয়ে আশার কথা এই যে, প্রভূত বিত্তশালী টাটা কোম্পানীর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা অচিরেই সোডা এস, কষ্টিক সোডা, অ্যামোনিয়া পটাশ ও সোডাঘটিত অশ্রান্ত লবণ এবং সমপ্রকারের গুরু রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্ত আধুনিক সর্বপ্রকার কল-কল্লা-সমন্বিত একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিতে-ছেন। বরোদা রাজ্য কোম্পানীকে বিশেষ সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সকল গুরু রাসায়নিক দ্রব্য ঔষধ ব্যতীত অশ্রান্ত শিল্পেও যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। বিগত কয়েক বৎসরে এইরূপ দ্রব্যের বাৎসরিক আমদানির পরিমাণ গড়ে ৭৪ হাজার টনের কম হইবে না। সুতরাং এই প্রকার দ্রব্য কাটতির ক্ষেত্রে বিস্তৃত বলিতে হইবে।

ভারতীয় ঔষধ-শিল্প আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সংপ্রতি উপযুক্ত সময় উপস্থিত; কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণে বণিকগণ যে ইতস্ততঃ করিতে-ছেন, তাহার কারণ আছে। বিলাতী দ্রব্যাদি আমদানি-বন্ধের অবসরে যে সকল দ্রব্য এ দেশে প্রস্তুত হইবে, যুদ্ধাবসানে আবার বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানি হইলে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় সেগুলি টিকিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। সরকার অবশ্য আশ্বাস দিতেছেন যে, যুদ্ধবিরতির পরও তাঁহারা এইরূপ শিল্পকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন। গত

যুদ্ধের সময়েও এইভাবেই সরকারী উৎসাহের অভাব হয় নাই; কিন্তু সকলেই জানেন, সেই উৎসাহ পরে স্থায়ী হইতে পারে না। তৎসঙ্গেও সে সময়ে প্রায় কোন কোন শিল্প টিকিয়া গিয়াছে। বিদেশী সরকারের নিকট সম্পূর্ণ সাহায্যের আশা করা যায় না। এবারেও যদি দেশীয় বণিকগণ অধ্যবসায় সহকারে নূতন শিল্প পরিচালনা করেন, এবং দেশের জন্ত কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করিয়া কম লাভে সম্মুখ থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অধুনা প্রতিষ্ঠিত শিল্প সমূহের মধ্যে কতকগুলি পরে স্থায়ী হইতেও পারে। সরকারও দেশীয় ঔষধ-শিল্পের নিকট অসময়ে যে সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা যদি তাহাদের স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ইহার উন্নতিকল্পে অন্ততঃ কিছু কিছু সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না বলিয়াই আশা করা যায়। দেশীয় ঔষধ-শিল্প ইহার অসমর্থ অবস্থাতেও সরকারকে যে সাহায্য করিতেছে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। বর্তমান যুদ্ধেই ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্যন্ত এক বৎসরে Director General, Indian Medical Service এবং Indian Stores Department ঔষধ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত যে সকল দ্রব্য কিনিয়াছেন, তাহার মোট মূল্য ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ভারতোৎপন্ন দ্রব্যাদির অংশ কিঞ্চিৎ ন্যূন সাড়ে ৫৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ অর্ধেকেরও অধিক। পূর্ব হইতে সরকারী সাহায্য পাইলে এই সাহায্যের মাত্রা যে আরও অধিক হইতে পারিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

অগ্রগতির অন্তরায়

এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীসম্বন্ধে ঔষধ-প্রস্তুত শিল্পের কথা বলা হইল। কিন্তু জাতীয় স্বাস্থ্য সংরক্ষণ-কল্পে কিরূপ ঔষধ ভারতে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাও বিবেচনার যোগ্য। সার রামনাথ চোপরার শ্রম ঔষধ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও স্বীকার করেন যে, অ্যালো-প্যাথিক ঔষধাদি, বিশেষতঃ, আধুনিক কল-কারখানাজাত ঔষধ কখনই এরূপ সুলভ হওয়া সম্ভবপর নয় যে, তৎসমুদয় জনসাধারণের (Masses) আর্থিক অবস্থার উপযোগী হইবে। তাহাদিগের জন্ত অপেক্ষাকৃত সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত দেশান্তর্জাত উদ্ভিজ্জ, খনিজ ও প্রাণিজ

ভেষজ দ্রব্যের বিস্তৃত ব্যবহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সম্প্রতি সরকার অবশ্য মুনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রচারের জন্ত কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু এই সকল প্রণালী-সম্বন্ধে ঔষধ সরকারের পূর্ণ অনুমোদন লাভ করে নাই।

এই প্রসঙ্গে ফার্মাকোপিয়ার কথা স্বভাবতঃই উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে এ দেশে ব্যবহারোপযোগী ঔষধাদি লইয়া ফার্মাকোপিয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল, যথা— O'spanghnessyর Bengal Dispensatory এবং Waringএর Pharmacopoeia of India। কিন্তু বহু-কাল হইল, সেগুলির প্রচলন বিনুপ্ত হইয়াছে। এখন বৃটিশ ফার্মাকোপিয়াই এ দেশের সরকারী ফার্মাকোপিয়া। এই বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া ভারতের জনগণের স্বার্থের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সঙ্কলিত হয় নাই; ইহা প্রধানতঃ বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণের চিকিৎসার সৌকর্যার্থে প্রস্তুত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্বে বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় কোন সুপরিচিত ভারতীয় ভেষজ ছিল না। এই বিষয়ে আন্দোলনের ফলে বহু শতাব্দী-প্রচলিত কয়েকটি ভেষজ—যথা বেল, কুরচি, চিরেতা ইত্যাদি প্রথমতঃ Indian & Colonial Addendumএ এবং পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় স্থান লাভ করে। কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফার্মাকোপিয়ায় সেগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সেগুলি মাত্র স্থানীয় ব্যবহারের উপযোগী। অথচ অপর দেশের স্থানীয় ভেষজ পূর্বাপর বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় সমান ভাবে বিরাজ করিতেছে। কোন কোন স্থানে ভারতীয় ভেষজের সাক্ষাৎভাবে ক্রটি করা হইয়াছে—যেমন চন্দন ও ইউক্যালিপ্টাস তৈল। চন্দন-তৈল ভারত ব্যতীত অন্য স্থানে অতি সামান্যই উৎপন্ন হয়, এবং ইহা বহু প্রাচীন কাল হইতে দেশ-বিদেশে চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়ার চন্দন-তৈল বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা প্রকৃত চন্দনবৃক্ষজাত নহে। চন্দনের সমবর্গীয় ছু'-একটি গাছের তৈলের বিশেষ বিশেষ অংশের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। চিকিৎসায়ও ইহা প্রকৃত চন্দন-তৈলের

স্থায় গুণশালী বলিয়া সকল চিকিৎসক স্বীকার করেন না। তথাপি অষ্ট্রেলিয়ার সুবিধার্থে ইহা অনুমোদিত হইয়াছে। ভারতে ইউক্যালিপ্টাস তৈল এখন যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ইহা চিকিৎসায় ব্যবহারের উপযোগী, এবং Phellandrine প্রমুখ অবাঞ্ছনীয় উপাদান ইহাতে নাই, কিন্তু ইহার Cineol মাত্রা কিছু কম; যদিও বিশেষজ্ঞগণের মতে তাহাতে গুণের কোন হানি হয় না। সম্প্রতি বৃটিশ ফার্মাকোপিয়াতে Cineol মাপ (standard) এরূপ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ভারতীয় তৈল অনুমোদিত হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া ওঠে।

আবার ইহাও দ্রষ্টব্য যে, বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় অনেক ঔষধ এতদেশে পাওয়া যায়; যেগুলি পাওয়া যায় না, সেগুলিও চাষ করিয়া উৎপাদন করা অসম্ভব নয়। সিকোনা, ইপিকাকু, জ্যালাপ প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল। এরূপ অবস্থায় ভারতে বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় প্রচলন কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। ভারতের জন্ত ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় এবং অ্যালো-প্যাথিক, আয়ুর্বেদীয় ও মুনানী চিকিৎসা-প্রণালীসম্বন্ধে সমস্ত পরীক্ষিত ঔষধই স্থান পাইতে পারে। এরূপ ফার্মাকোপিয়া প্রণয়ন সময় ও প্রভূত অনুসন্ধান-সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু অসাধ্য নহে। নব্য চীনের ফার্মাকোপিয়া এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে পারে। ইহাতে যেমন পাশ্চাত্য প্রণালীর কোন বিশিষ্ট ঔষধ পরিত্যক্ত হয় নাই, তেমনই বহুকাল-প্রচলিত দেশান্তরজাত ভেষজ সমূহও যথাযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে।

ভারত সরকার ভেষজ-দ্রব্য প্রস্তুত, বিতরণ ও মজুদ রাখা ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্ত সম্প্রতি Drugs Act বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ঔষধালয় ও কারখানা পরিচালনা সম্বন্ধেও Pharmacy Bill কেন্দ্রীয় পরিষদে অনধিক-কালের মধ্যে উপস্থাপিত করিবার কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু ঔষধ-শিল্প সংগঠনের যাহা প্রধান পরিপন্থী অর্থাৎ আধুনিক ঔষধ-প্রস্তুতবিজ্ঞান শিক্ষার অভাব, তাহা দূরী-করণের জন্ত কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। উচ্চশিক্ষিত ঔষধপ্রস্তুতবিজ্ঞানিৎ ব্যতীত যে ঔষধ-শিল্পের উন্নতি অসম্ভব, তাহা সরকার সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না,

বা করিলেও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করিতেছেন না। বহুদেশে ডাক্তার আঙ্কেল মারিয়ার প্রস্তাবিত দুই লক্ষ টাকা দানের সাহায্যে একটি ঔষধ-প্রস্তুত বিজ্ঞান শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিকল্পনা হইয়াছিল। সে সম্বন্ধেও আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। ভারতের ঔষধ-শিল্প উপযুক্ত ভাবে সংগঠিত হইলে

এতদ্বারা দেশ যে ঔষধ বিষয়ে শুধু স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহা নহে, ভারতের ভেদ্য অল্প দেশের বাজারেও স্থান পাইতে পারে। আশা করা যায় যে, এই বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী মহলে যে নব উদ্যম দেখা দিয়াছে, তাহা উপযুক্ত পন্থায় পরিচালিত হইয়া ভবিষ্যৎ ভারতীয় ভেদ্য-শিল্পের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

খুকীর মাতৃহ

খুকী দিবা-বাতি এক মনে শুধু সাজাইছে খেলা-ঘর,
সংসারে তার এত বেশী কাজ নাহি মিলে অসব।
নিকানো গোছানো শুধু সাদাগণ,
তবু স্থির কভু নাহি রহে মন ;
হাঁড়ি-ভাতা-বেড়ি বাব বাব ধুয়ে জড় কপে ভূমি পূর্ণ।
খুকী দিবা বাতি সাজাইছে খেলা-ঘর।
ইটের সাবিত্তে খবের সীমানা ভাঙে গড়ে বাব বাব,
উদ্দেশ্যে করে বকা-ঝকা কবে—যেন সে পারে না আর !
মাটির পুতুল খোকা তার কাঁদে,
ভূলাতে ভূলাতে কোলে লয়ে বাঁধে।
বলে, যাতুর্মাণি কেঁদো না লক্ষ্মী দেবি নেই বেশী আর।
ছোট ছেলেটিকে ভূলাইছে বাব বাব।
মা ডাকেন, খুকী ভাত খাব আর, বেলা হোল দু'পহর,
যা হোক, ধরা ! তোব একসানট আছে শুধু খেলা-ঘর ?
নাওয়া-পাওয়া গেল, শুধু খেলা খেলা,
খেলা-ঘর নিসে কাটে মারা বেলা,
মন দিয়ে আগে লেখাপড়া কর, হবে খেলা তার পূর্ণ,
উঠে এস, খুকী, বেলা হোল দু'পহর।
খুকী কথায় বলে, বোঝ না কিছ, পায়নি এখনো ছেলে ;
কত অন্য় হবে বল দেখি আমি গিয়ে আগে খেলে ?
আজকে হারুর জন্মোৎসব,
বিকলে তোমরা ঠিক এস সব ;
অনেক কাজ, মা, এখন আমাব, চলবে না গেতে গেলে ;
দেখছ না চেয়ে পায়নি এখনো ছেলে ?
মা শুনে হাসেন—ও খুকী, তুই যে ঘরনী আমার চেয়ে !
এই তো সে দিন জন্মালি মোটে, এইটুকু ছোট মেয়ে !
বুড়ো গিন্নি যে ছেলে-মেয়ে নিয়ে।
কষ্ট হবে না হোলে পবে বিয়ে,
আমাদের কথা ভুলে যাবি তুই স্বপ্নের ঘর পেয়ে,
এখনি যে তুই ঘরনী আমাব চেয়ে !
খুকী দিন-রাত করে আপনাব ঘরকর্নারই কাজ—
ঝাড়া-মোছা-ধোয়া-নিকানো-গোছানো-পরানো ছেলের সাজ।
কাদার বড়িতে রাঁধে ঝোল ঝাল,
ফুলের রেণুতে অম্বল ডাল,
চণ গুলে রাখে, স্রুধাইলে বলে, পায়ের হায়েছে আজ,
বাস্ত সে নিসে ঘরকর্নারই কাজ।

সমবয়সীরা হাসিতবা মুখে পেতে বসে সারি গেথে,
গবেব গৃহিনী খুকী তাহাদের পাওয়ায় কত কি বেঁধে।
ডাল-ভাত তারা মিছামিছি পায়,
যেন কত স্বাদ পেয়েছে দেগায়।
আসিয়াছে যেন কঠিন ধবাব ভাব-বোঝা পিঠে বেধে।
সমবয়সীরা গেতে বসে সারি গেথে।
সে দিন সহসা খুকীর বোদনে সাবা বাড়ী খতমত !
মনে হোল যেন শোণিত ঝরানো হায়েছে গভীর ক্ষত।
সে ক্ষত বুঝি বা থাকবে না আর,—
লেগেছে মবনে সে সে গো তাহার !
মা আসেন ছুটে, ঠাকুমা, কাকিমা, বুঝান খুকীরে কত !
খুকীর বোদনে সাবা বাড়ী খতমত !
কত আদবেব মাটির পোকাটি ভেঙেছে খুকীর ভাই,
আন্তর্কণে ককণ নয়নে কাতর বোদন তাই।
মা বলেন, খুকু কেঁদো না মাণিক !
আবার পুতুল কিনে দেব ঠিক,
ওপ চেয়ে ভাল, বেশী দাম দিয়ে,—যেমন তোমার চাই ;
আব ভাঙবে না তোমার ছুঁই ভাই।
খুকী বলে কেঁদে, চাই না পুতুল, সেই ছেলে এনে দাও ;
আমরা কি তবে পুতুল তোমার, ভেঙে গেলে কিনে নাও ?
চাও না তখন আমাদের আর ?
বেশী দাম দিয়ে খুঁজে কি বাজার
আবো ভাল দেখে ছেলে-মেয়ে সব কিনে নিতে বুঝি চাও ?
চাই না পুতুল, সেই ছেলে এনে দাও।
অবাক হইয়া মা থাকেন চেয়ে ! একি কথা খুকী কয় ?
সহসা তাঁতাব দু'নয়ন বেয়ে শাকের অক্ষয় বয়।
নব যৌবনে যে শিশুটি তাঁর
হেনেছিল শেল হৃদয়ে সবার,
সে যে গেছে রেখে স্মৃতির স্রবাস মানস-কানন-ময় !
মা ভাবেন তাই, এ কি কথা খুকু কয় !
এ ভুবনে যাহা কঠিন কঠোর শিখালো কে তোরে হায়।
জীবন-প্রভাতে রবির আলোক কেন এ আঁধার-ছায় ?
যে স্নেহ জড়ানো খেলাব পুতুলে
পারিবি কি যেতে এ জীবনে ভুলে ?
জননী-হৃদয় বিকশিয়া উঠে কেন দুখ-বেদনায় ?
শৈশবে তোবে স্নেহ কে শিখালো, হায় ?
শ্রীইলারাগী মুখোপাধিকায়।



৪

বার দিন পরে সুনীলের ছুটি শেষ হইল। বীরেন বাবুর স্ত্রী অনেকটা সুস্থ হইলেও তাঁহার চিকিৎসকগণ আরও এক মাস তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব মনে করিলেন না। সকলের অমুরোধ উপেক্ষা করিয়া সুনীল আজই সন্ধ্যায় কর্মস্থানে যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইল।

অপরাত্নে বীরেন বাবুকে সঙ্গে লইয়া রমাপ্রসাদ বাবু বাহিরে গিয়াছেন। বাগানে যুবক-যুবতীদের কোন দল ব্যাডমিণ্টন খেলিতেছে, কেহ কেহ চৌতারায় বসিয়া চা পান করিতেছে। তখন প্রতিমা, সুনীল, নিনা ও শেফালী খেলায় রত; নিনা ও দীপ্তেন চৌতারায় বসিয়া আলাপ করিতেছে। সুনীল যেন কাহার সন্ধানে আসিয়া চারি দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল।

সুনীল অন্তমনস্ক ভাবে তাহার মাতার শয়নকক্ষের দিকে চলিল। তাহাকে দেখিয়া রমাপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। দত্ত-গৃহিণী পুত্রকে বলিলেন, “তুমি খেলতে যাওনি বাবা?”

সুনীল বলিল, “না মা; আজই রাত্রির ট্রেনে চলে যাব কি না, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।”

সুনীলের মা স্নেহে বলিলেন, “বোস্ বাবা! তা আজই হঠাৎ যাচ্ছিস্ যে? কাল গেলেও তো চলতো। তোকে যেতে দিতে আমার একটুও মন সরছে না। তোরা চেহারা দেখলে মনে হয়—যেন কত দিনের রোগী! কি হয়েছে, বলতো! সদাই বিমর্ষ, উন্মনা ভাব! হাসতে যেন ভুলেই গেছিস্।”

সুনীল একটু হাসিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিল; কিন্তু তাহার চক্ষুতে মনের কোন গুপ্ত বেদনা যেন ফুটিয়া উঠিল। মাতার চক্ষুতে কি তাহা অলক্ষিত

ধাকে? তিনি আবার বলিলেন, “আমার কাছে লুকোস্-নি, বাবা, আমার সব খুলে বল। আমি ক’দিন ধরেই তোরা এ ভাব লক্ষ্য করেছি; কিন্তু আমার বেশী কথা বলা নিষেধ ছিল তাই জিজ্ঞাসা ক’রতে পারিনি।”

সুনীল অবহেলার ভঙ্গিতে বলিল, “কি আবার হবে? তুমি যে কাণ্ড ক’রে ব’সেছিলে, তা’তে কি আর মন ভাল থাকে, না ক্ষুণ্ণি করতে ইচ্ছা হয়?”

মা বলিলেন, “যত ভাবনা বুঝি তোরই হ’য়েছে? ডাক্তাররা আমাকে অভয় দিয়ে গেছেন, আমি প্রায় সেরে উঠেছি; কিন্তু তোর বিমর্ষ ভাব তো সে জন্তে কমছে না, বরং বেড়েই গেছে। সকলে হাসছে, খেলছে, ক্ষুণ্ণি করছে; কেবল তুই কেমন মন-মরা হ’য়ে দিনরাত কি যে ভাবছিস্—তা তুই-ই জানিস্ বাবা!”

সুনীল মাথা নাড়িয়া বলিল, “আমার জন্তে তোমাকে এখন আর অত মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি শিগ্গির ভাল হ’য়ে উঠে, দিন-কয়েক আমার ওখানেই থাকবে। যদি-বা কিছু দিনের জন্ত এই বিদেশে ছেলের কাছে এলে, তা হঠাৎ অসুখ বাধিয়ে পরের বাড়ীতেই পড়ে রইলে। আমি তোমাকে নিজের বাসায় রেখে তোমার পরিচর্যা করতে পারলাম না মা, এমনি আমার দুর্ভাগ্য!”

এই পর্যন্ত বলিয়াই সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, বোধ হয় মনের ভাব গোপন করিবার জন্তই বলিল, “কিন্তু মা, তোমার অসুখে আমাদের এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হ’য়েছে। পৃথিবীতে যে এমন সদাশয়, পরোপকারী লোক আছেন, তা পূর্বে ধারণাই ক’রতে পারিনি। আজ কাল তো শিক্ষিত লোকরাও আত্মীয়-স্বজনের জন্ত কিছু করেন না বা করতে পারেন না; আর এঁরা অপরিচিত বিদেশী

আমরা, আমাদের জন্তে কি না করছেন? রমাশ্রমাদ বাবুর এ ঋণ জীবনেও বোধ হয় শোধ করতে পারব না।”

মা বলিলেন, “সে সত্যি; কিন্তু এই অশুখে প’ড়ে আমার মস্ত একটা লাভ হ’য়েছে, বাবা!”

সুনীল বিস্মিত ভাবে বলিল, “লাভ! অশুখে ভুগে সব দিক দিয়ে মানুষের ক্ষতিই তো হয়,—তোমার আবার কি লাভ হ’ল শুনি?”

মা হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, লাভ হ’য়েছে বৈ কি! অশুখে পড়ায় আমি একটি রত্ন লাভ ক’রেছি—একটি মেয়ে! বুঝি বহু তপস্যার ফলেই এমন মেয়ে কারো ভাগ্যে জুটতে দেখা যায়! আমার নিজের মেয়েদের যদি শেলীর মত ক’রে গ’ড়ে-তুলতে পারতুম তো নিজেকে পরম ভাগ্যবতী ব’লে মনে করতুম। ইচ্ছা হয়, শেলীকে দেশে নিয়ে গিয়ে সর্বদা কাছে রাখি। তা’কে এক মুহূর্তও কাছ-ছাড়া করতে ইচ্ছে হয় না রে!”

মায়ের এই কথার পর সুনীলের মনের ভাব গোপন করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; তাহার মনের কপাট যেন আচম্বিতে খুলিয়া গেল! সে আশ্চর্য চিত্তে ভাব-গদগদ কণ্ঠে বলিল, “সত্যি মা! তুমি যা বললে, তা’ সত্যিই কি তোমার মনের কথা? চিরদিনের জন্ত তা’কে তুমি কাছে রাখতে চাও?”

পুত্রের আবেগপূর্ণ উক্তি শুনিয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ উজ্জল চক্ষু দু’টির দিকে চাহিয়া দত্ত-গৃহিণী বিস্মিত হইলেন; কিন্তু মুহূর্তমধ্যেই তাঁহার চোখে-মুখে আতঙ্কের চিহ্ন পারফুট হইল। সুনীল তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ বিক্রমপূর্ণ স্বরে বলিল, “ওকি মা! মুখে যা’ বললে, কাজে যদি তা কোন দিন ঘটে, এই ভেবে কি হঠাৎ ভয় পেলো?”

মাতা-পুত্র উভয়েই কিয়ৎকাল নীরব! উভয়েই বোধ হয় পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। অল্প কাল নিস্তর থাকিয়া সুনীল সংযত স্বরে বলিল, “আচ্ছা মা, তুমি যে মিস্ মিত্রকে নিজের মেয়ের মত সর্বদা কাছে রাখতে চাইছ, ভেবে দেখেছ কি যে—তাঁকে সে ভাবে পেতে হ’লে কি রকম ব্যবস্থা ক’রে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে? তিনি তো আর অগ্নি গিয়ে মেয়ের মতো তোমার কাছে থাকতে পারেন না।”

মা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “কেন পারবে না? সে

যে আমায় “মা” ব’লেছে রে! মেয়ে মায়ের কাছে থাকবে, তা’তে আশ্চর্য হবার কিছু আছে না কি?”

সুনীল কুণ্ঠিত ভাবেই বলিল, “হাঁ,—ইয়ে—তা অল্প দিনের জন্ত হ’লে তা’তে হয় তো কোন আপত্তি কি অশুবিধে হয় না; কিন্তু চিরদিনের জন্ত কি তা সম্ভব মা! তোমরা কি সত্যিই গৃহস্থঘরের মেয়েকে কণ্ঠ্যরূপে বরণ করতে পারবে? তোমাদের কি তাতে মান-সম্মতের হানি হবে না? সমাজে বাস ক’রে মানুষের সকল কামনাই কি পূর্ণ হয়?”

মা বলিলেন, “তোমার ও-সব বাজে কথা রাখ। শেলীকে আমার মেয়ে ব’লে পরিচয় দিতে আমার আনন্দই হবে। তাতে মান-সম্মত নষ্ট হবে কেন—তা বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার ঘটে নেই, বাবা!”

সুনীল সঙ্কোতকে হাসিয়া বলিল, “মা, তোমার বুদ্ধি নেই, এ সন্দেহ কে ক’রবে? কিন্তু কথা এই যে, মিস্ মিত্র কোন্ অভাবে পরের ঘরে গিয়ে পালিতা কণ্ঠ্য মতো সেখানে থাকবেন? তবে যদি তোমার বৌ ক’রে তাঁকে ঘরে নিয়ে যেতে পার, তা হ’লে তোমার ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হ’তেও পারে। কিন্তু সে কাজ কি তোমরা করতে পারবে?”

পুত্রের স্পষ্ট কথা শুনিয়া সুনীলের মাতা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; তাঁহার মাথায় মুহূর্তে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! কিন্তু তিনি আর কিছু বলিবার পূর্বেই সুনীল বলিল, “আমি বেশ জানি, তা’ তোমরা পারবে না মা! অশুকম্পা ও স্নেহের পাত্রী হ’য়ে তোমার ঘরে তাঁর স্থান হ’তে পারে, কিন্তু বরণীয়া বধুরূপে তিনি গ্রহণের যোগ্য ন’ন। তোমাদের ধারণা, মিস্ মিত্র সামাজিক মান-সম্মতে তোমাদের সমকক্ষ ন’ন, বা হ’তে পারবেন না। কেমন, এই তো তোমার মনের কথা?”

এ কথায় মা নির্বাক রহিলেন। শেলীকে বিবাহ করিবার জন্ত সুনীলের যে আগ্রহ হইতে পারে, রোগশয্যায় পড়িয়া-থাকিয়া তাহা কোনও দিন তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি ক্রমকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “ঘরের বৌ আনতে হ’লে অনেক দেখে-শুনে আনা দরকার; ছ’দিনের পরিচয়ে, কি চিরদিনের জন্ত ঐ রকম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত? বংশ-পরিচয়-

ভাল ক'রে জানা চাই। রূপে বা গুণে যুক্ত হ'য়ে কি অজানা ঘরের মেয়েকে বৌ ক'রে ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়? শেলী সত্যই রূপে-গুণে অল্পপমা, কিন্তু সে জন্তু রমাপ্রসাদ বাবুর আশ্রিতা বা পালিতা কন্তাকে কি আমরা ঘরের বৌ করতে পারি? তাঁর নিজের মেয়ে হ'লেও বা ও-কথা এক দিন ভেবে দেখা চ'লতো।”

সুনীল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, “মিস্ মিত্র তো রমাপ্রসাদ বাবুর আশ্রিতা ন'ন। তাঁর বাবাও ডাক্তার ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁর এই মেয়েটিকে তিনি অসহায়া অবস্থাতেও রেখে যাননি।”

মা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “শেলীর বাবা হয় তো একটা ছোট-খাট ডাক্তার ছিলেন; তা' ছাড়া, ওদের পরিচয় দেবার মত কিছু আছে ব'লেও মনে হয় না। রমাপ্রসাদ বাবু তো ওর বাপের দাদা ন'ন, তাঁর বন্ধুর মেয়ে; বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন, তাই শেলী তাঁকে জ্যাঠা ব'লে ডাকে। এত বয়স পর্য্যন্ত শেলীর বিয়ে না হওয়ার কারণও হয় তো তাই; কেউ ওদের চেনে না, জানে না। কোন্ সজ্জাত ভদ্রলোক অজ্ঞাত-কুলশীল মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন?”

সুনীল এবার আবেগভরে বলিল, “মিস্ মিত্র কখনই যে-সে ঘরের মেয়ে ন'ন, বংশগৌরব না থাকলে কি ঐ রকম স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন হওয়া সম্ভব? যাক সে কথা; রমাপ্রসাদ বাবু তো তোমাদের বিবেচনায় অচল ন'ন। দীপ্তেন সব দিক দিয়েই চমৎকার ছেলে,—তার সঙ্গে কি প্রতিমার বিয়ে দিতে তোমরা রাজী হবে?”

মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না বাবা! প্রতিমা আমার কোলের মেয়ে; আমি এত দূরে ওর বিয়ে দিতে পারুব না। দীপ্তেনকে হয় তো পূর্ব-বাংলার কোন ম্যালেরিয়া-ভরা ডুবো মহকুমায় থাকতে হবে! সেখানে না আছে কলের জল, না আছে বিজলীর আলো, পাখা; সেখানে প্রতিমা বাস করতে পারবে কেন? আর প্রথমে সামান্য মাইনেতেই ছেলেটিকে সংসার চালাতে হবে। তোর দিদিদের তেমন অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে হয়নি, ওঁর ইচ্ছা—প্রতিমার খুব ধনবানের ঘরে বিয়ে হয়।”

সুনীল অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, “আমিও তো তাই বলছিলাম, তোমরা চিনেছ শুধু টাকা; যার টাকা আছে

—তোমাদের কাছে তারই বনেদী ঘর, উচু বংশ। আশা করি, মিষ্টার সিংহের দৃষ্টি-ভঙ্গি একটু অল্প রকম। দীপ্তেনের সঙ্গে নিনার বিয়ে হ'লে ওরা সুখী হ'তে পারবে।”

মা এবার যেন আকাশ হইতে পড়িয়া কাতর ভাবে বলিলেন, “অমন কথা মুখে আনিসুনি বাছা! আমাদের চিরদিনের সাধ, নিনার সঙ্গে তোর বিয়ে দিই। সে সাধ কি আমাদের মিটবে না? এই বুঝি তোর মায়ের ওপর খুব ভালবাসা?”

সুনীল এবার একটু উত্তেজিত স্বরেই বলিল, “তোমরা কি কিছুতে বুঝতে পারবে না যে, আমি নিনাকে বিয়ে ক'রতে পারিনে। ছোট বোনের মতোই আমি ওকে ভালবাসি; সে ভালবাসা মুছে-ফেলে সেখানে অল্প কোন ভাবের স্থান নেই মা! এ গুণধ নয় যে, ঘাড় ধ'রে জোর কোরে গিলিয়ে দেবে। আর আমি যত দূর জানি, নিনাও আমাকে বড় ভাইয়ের মতোই দেখে।”

সুনীলের মা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, “তোদের যত অনাস্থি কথা! নিনাকে বিয়ে করবি না তো কি চিরজীবন এই রকম লক্ষীছাড়ার মতো কাটাবি?”

সুনীল বলিল, “না মা! এইবার আমি ভগবানের কাছে ও মানুষের কাছে আমার যা কর্তব্য, তা পালন ক'রব। তোমাদের মনে কষ্ট দিতে চাই নে ব'লেই এত দিন তা' ক'রতে পারিনি; কিন্তু মনে একবিন্দু শাস্তি পাইনি।”

সুনীলের মা এবার ঝর-ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিলেন; আর্তস্বরে বলিলেন, “তবে কি তুই আমাদের ত্যাগ করবি? তুই তো জানিস, উনি কখনই সে বৌ ঘরে তুলবেন না।”

সুনীল ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “আমি নিরুপায়। কিন্তু তোমাদের আমি ত্যাগ ক'রব না; তোমরাই আমাকে ত্যাগ ক'রবে, তা আমি জানি।”

মাতাকে বিচলিত দেখিয়া সুনীল আর কোন কথা বলিল না। সে তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া উঠিবে, এমন সময় শেলী জলখাবার ও চা লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতেই সুনীল আর উঠিবার চেষ্টা করিল না।

শেফালী বলিল, “মিষ্টার দত্ত, আপনি চা না খেয়েই চ'লে এলেন যে? সেই কোন্ সকালে খেয়েছেন; কিদে পায় না বুঝি?”

সুনীল হাসিয়া বলিল, “কে বললে, আমি চা খাইনি? আপনি তো খেলায় মেতে ছিলেন; কিছু খবর রাখেন?”

শেফালী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিল, “আর দেয়ী করবেন না, শীগ্গির চা-টা খেয়ে নিনু।”

তাহার পর সে সুনীলের মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই বলিল, “এ কি মা! আপনি কাঁদছিলেন বুঝি?” তার পর সুনীলকে বলিল, “মিষ্টার দত্ত! এ আপনার ভারী অত্যাচার। মা আপনার কাছে আছেন জেনে আমি বেশ নিশ্চিত ছিলাম, আর আপনি এসে কি না মা’কে কাঁদাচ্ছেন। উদ্ভেজনা কোনও সময়েই যে গুঁর পক্ষে ভাল নয়, তা’ তো আপনি জানেন।”

সুনীলের মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, “ওর কোন দোষ নেই মা! আজ রাত্রেই ও চলে যাচ্ছে কি না, তাই আমার মনটা ভাল নেই।”

শেফালী বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল, “মিষ্টার দত্ত! এ কথা তো আমাদের আগে বলেননি। আজই আপনার না গেলেই কি নয়? না হয় আরও কিছু দিনের ছুটি নিনু।”

সুনীল নিরুৎসাহ চিন্তে বলিল, “আমরা পনের চাকর, ইচ্ছা করলেই কি আমাদের ছুটি মেলে? মাকে সুস্থ ক’রে বাড়ী পাঠিয়ে-দিয়ে যেতে পারলে তো ভালই হোত।”

শেফালী আর তাহাকে থাকিবার জন্ত প্ররোধ না করিয়া তাঁহার মাকে বলিল, “আমি গুঁর খাবারের ব্যবস্থা ক’রতে যাচ্ছি। আজ রাত্রেই উনি চ’লে যাবেন, তা আমি আগে তো জানতে পারিনি।”

সুনীল শেফালীকে বলিল, “আপনি সে জন্ত ব্যস্ত হবেন না, খাবারের কথা আমি আগেই বলে দিয়েছি।”

শেফালী উঠিয়া বলিল, “আমি দেখি, কি ব্যবস্থা হ’য়েছে; কি জানি, সময়ে. যদি সব জোগাড় না হ’য়ে থাকে।”

শেফালী প্রশ্ন করিলে সুনীলও অগ্রমনস্ক ভাবে বাতায়নের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বাতায়ন-পথে সুনীল দেখিল, শেফালী ‘সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা’র মতো উদ্ভান-পথে রজনশালার দিকে চলিয়াছে। সুনীল সতৃষ্ণ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

সহসা মায়ের আছানে সুনীলের চমক ভাঙ্গিল। মা বলিলেন, “চা যে ঠাণ্ডা হ’য়ে গেল বাবা!” তিনি সকল দেখিয়াছিলেন, পুত্রের মনোভাব স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলেন। শেলীকে তিনি যতই ঈর্ষনাজরে দেখুন, তাহাকে পুলকিত করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং এ অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহা বুঝিতে না পারায় তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। অবশেষে তিনি ভাবিলেন, সুনীল যে চলিয়া যাইতেছে, সে বরং ভালই; দূরে থাকিলে তাহার এই মোহ কাটিয়া-যাইতেও পারে। এইরূপ ভবিষ্য সুনীলের চিন্তাস্রোত অগ্র দিকে ফিরাইবার জন্ত তিনি তাহাকে বলিলেন, “আমাকে আব কত দিন এখানে থাকতে হবে বলতে পারিস, বাবা? প’ড়ে থাকতে আর যে ভাল লাগছে না।”

সুনীল বলিল, “আর বেশী দিন তোমাকে এখানে থাকতে হবে না মা, তুমি আর একটু সুস্থ হ’লেই তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাব। কিছু দিন তোমাকে কাছে রেখে বড়দিনের ছুটির সময় তোমাকে বাড়ী রেখে আসব। এর পর আর আমাদের একত্র থাকা সম্ভব হবে কি না, কে জানে?”

এই কথা বলিয়াই সুনীল উঠিয়া গেল, বলিয়া গেল, “আমি বাগানে একটু ঘুরে আসি মা! সুনীল ও প্রতিমাকে তোনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

প্রতিমা ও সুনীলকে মা’র কাছে পাঠাইয়া দিয়া সুনীল শেলীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। ভবিষ্যতে আর তাহার সঙ্গে মিশিবার, আলাপ করিবার সুবিধা হইবে কি না, কে জানে? সেই জন্ত সে ভাবিল, আজ শেলীর মনোভাব তাহাকে জানিতেই হইবে; নিভূতে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সে তাহাকে জানাইবে।

সুনীল বৃহৎ উদ্ভানের ও বাড়ীর চারি দিকেই খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও শেলীকে দেখিতে পাইল না। অবশেষে মঞ্জুলেখার কাছে সে ধরা পড়িয়া গেল। ব্যাড্‌মিণ্টন পেলার পর সে একাকী বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, সুনীল উৎকণ্ঠিত ভাবে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া সে তাহার গতিরোধ করিয়া বলিল, “আপনার ভারি অত্যাচার সুনীল বাবু!”

সুনীল বিস্মিত ভাবে বলিল, “কেন ? কি অগ্রায় বসুন তো ! আমি তো জেনে-শুনে কোন অপরাধ করিনি ; আমারই বরং অভিযোগ করবার কারণ আছে ।”

মঞ্জু হাসিয়া বলিল, “বটে ? উল্টো চাপ ! তা আপনার অভিযোগটা কি শুনি ।”

সুনীল গম্ভীর হইয়া বলিল, “আমার অভিযোগ এই যে, আপনারা আমাকেই কেবল পর ভাবেন ; কিন্তু অল্প সকলের সঙ্গে আত্মীয়ের মতো সহজ ব্যবহার করেন, তা’ আমি বরাবর লক্ষ্য ক’রেছি । আমার এ অভিযোগ কি মিথ্যা ?”

মঞ্জুও গাভীর্ঘ্য প্রকাশ করিয়া বলিল, “নিজেই বা আপনি কি ক’রেছেন ? আপনি সব সময় যে রকম গম্ভীর হ’য়ে থাকেন,—আদব-কায়দা বজায় রেখে চলেন, তা’তে আমাদের সহজ ব্যবহার আসতে পারে কি ? আপনার সঙ্গে কথা কইতেই ভয় হয়, আজ সাহস ক’রে আপনাকে দুই-একটা কথা ব’লছি । আমার কথা এই যে, এখন তো আপনার আরও দু’দিন ছুটা আছে, তবে আজই হঠাৎ চ’লে যাচ্ছেন কেন ? আপনার এই কাজটি আমাদের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ, তা জানেন ? মা এত দিনে কতকটা সুস্থ হ’য়ে উঠেছেন ; আমরা তাই একটু নিশ্চিত হ’য়ে ভাবছি, সকলে মিলে দু’দিন আমোদ-আহ্লাদ ক’রবো ; কিন্তু আমাদের হতাশ ক’রে আপনি হঠাৎ চলেন জোয়াল কাঁধে নিতে । এ কি অল্প বিড়ম্বনা ?”

সুনীল ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “আমার সঙ্গে আপনাদের কথা কইতেও যখন ভয় হয়, তখন আপনাদের আমোদ-প্রমোদ থেকে আমার দূরে থাকাই ভাল নয় কি ? আর আমার থাকা না থাকায় কি যায় আসে ? আপনাদের মায়ী যখন কাটাতেই হবে, তখন দু’দিন আগে কাটানই ভাল নয় কি ?”

মঞ্জু মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, “আপনার সব বাজে ওজর ! ও-সব আপত্তি আমি শুনতে চাই-নে । তবে নিতান্তই যখন যাচ্ছেন, তখন যদি আশা দেন যে, সুযোগ পেলে মাঝে-মাঝে এখানে আসবেন, তা হ’লে আমরা একটু আশ্বস্ত হ’তে পারি ।”

সুনীল বলিল, “মা যত দিন আছেন, এখানে তত দিন

আসবো নিশ্চয়ই । আর তার পরেও জ্যাঠামশায় আর জ্যাঠাইমাকে দেখতে মাঝে-মাঝে আসতেই হবে ।”

এই সময় নিনা সেখানে আসিয়াই মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা মঞ্জুদি’ ! শেলীদি’ হঠাৎ কোথায় গ’রে প’ড়েছে বলতে পার ? তাঁকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি ।”

সুনীল বিক্রপভরে বলিল, “গল্পে অত মসৃণ হ’য়ে থাকলে কি আর অল্পের সন্ধান পাওয়া যায় ? মিসু মিত্র গেছেন আমার খাবারের বন্দোবস্ত ক’রতে, পরের সেবার তার তাঁর নিজের হাতেই রাখা চাই কি না ।”

নিনা সুনীলের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাকে খাওয়ানোর জন্তে এখনি এত তাড়া প’ড়ল কেন ?”

সুনীল বলিল, “যেহেতু ট্রেন আমার সুবিধার জন্তে অনির্দিষ্ট কাল টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে না ।”

নিনা বিস্ময়িত নেত্রে সুনীলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “কি ! তুমি আজই চলে যাচ্ছ ?—কাউকে ও-খবর বলতেও নেই বুঝি ?”

সুনীল বলিল, “বাবাকে আর মা’কে দুপুরবেলাতেই ব’লেছি ! তবে তোমাদের অনুমতি নেওয়া হয়নি বটে !”

নিনা মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, আজ কিছুতেই তোমার যাওয়া হ’তে পারে না । কাল আমাদের সকলেরই একসঙ্গে বায়স্কোপে যাওয়ার কথা আছে ; আর তুমি আজই হঠাৎ খসে-প’ড়বে—এ হ’তেই পারে না । আমি এখনি মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করছি,—তাঁকে ব’লে তোমার যাওয়া বন্ধ ক’রে দিচ্ছি ।”

সুনীল মৃদু স্বরে বলিল, “সে কি ক’রে হবে ? যে পরের চাকর, তার এ বিষয়ে স্বাধীনতা কোথায় ?”

নিনা বলিল, “এ তোমার ইচ্ছা ক’রে গলায় শিকল পরা । মেসোমশায় তোমাকে তো স্বাধীন ব্যবসাই করতে ব’লেছিলেন ; তা করলেই পারতে,—এখনও পার ।”

সুনীল ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “এক দিন জানতে পারবে—পরের গোলামী কেন ক’রছি ।”

এমন সময় শেলীকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া নিনা বলিল, “শেলীদি’ তাই এস না । সুনীলদি’ কেন যে শুধু-শুধু দু’দিন আগেই চ’লে যেতে চায়, তা জানি না । তুমি বল তাই, অন্ততঃ কালকের দিনটা থেকে যাক ।”

শেলী হাসিয়া বলিল, “তোমার অনুরোধ যখন মাঠে মারা গেল, তখন কি আর আমি বলিই উনি থাকবেন? আমার তো মনে হয়, উপায় থাকলে উনি মা’কে ছেড়ে দু’দিন আগে চ’লে যেতেন না। চাকরীর একটা দায়িত্ব আছে তো।”

নিনা অভিমানভরে বলিল, “তুমি একদম অকণ্ঠা শেলীদি! এই সামান্য কেসটা হাতে নিতে সাহস ক’রলে না? ভারী তো ডাক্তার!”

শেলী বলিল, “কিন্তু আমি তো আইনের ডাক্তার নই: কাজেই আমার অসাধ্য। ও-কথা যাক; যে খবর তোমাকে দিতে এলুম, তাই শোন এখন। এইমাত্র তোমার বাবার এক টেলিগ্রাম পাওয়া গেল, কাল তিনি ‘তুফান মেলে’ এখানে আসছেন।”

নিনা মুখ ভার করিয়া বলিল, “বাবার মতলব বুঝে-ওঠা ভার! আমি এত ক’রে লিখলাম—এখন আমার যাওয়া ঘটে উঠবে না, সকলের সঙ্গে যাব; তা’সে কথা তিনি গ্রাহ্য করলেন না। বেশ, যেমন আসছেন তেমনই একা-একা ফিরে যান, আমি তাঁর সঙ্গে এখন যাচ্ছি নে।”

আরও দুই-একটি কথার আলোচনার পর মঞ্জু উঠিয়া নিনার হাত ধরিয়া বলিল, “চ’ল ভাই! আমাকে যে গানটা শিখিয়ে দেবে ব’লেছিলে, সেটা তোমার কাছে শিখে নোব।”

উভয়ে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল দেখিয়া দীপ্তেনও তাহাদের অনুসরণ করিল। নিনাকে ছাড়িয়া থাকা তাহার যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সুনীল যে সুষোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এতক্ষণ পরে তাহার ভাগ্যে তাহা জুটিয়া গেল। সুনীল ও শেফালিকা উভয়েই কিছুকাল নির্ঝক্ ভাবে বসিয়া রহিল। অবশেষে সুনীল একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “মা’কে আমি আপনারই হাতে রেখে যাচ্ছি; অত্ৰু কারও হাতে তাঁর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। মা তেমন অধীরতা প্রকাশ করলে আমাকে জানাবেন।” তাহার পর সে বহু চেষ্টায় অশ্রুট স্বরে বলিল, “এখন আমি বিদায় চাচ্ছি।”

শেলী জানিত, তাহার যাওয়াই স্থির, প্রতিবাদ নিফল,

তথাপি নতমুখে মূহু স্বরে বলিল, “দু’দিন আগে কেন যাচ্ছেন? এখানে আপনার বোধ হয় অনুবিধা হচ্ছিল?”

সুনীল এ কথায় যেন বিস্মিত হইয়া বলিল, “অনুবিধা হচ্ছিল আমার? এত বড় আমাকে এখানে আর কে কোরত—ব’লতে পারেন? আপনি তা জানেন মিস্ মিড্র! কিন্তু তথাপি এখানে আর আমার থাকা উচিত নয়। এখানে বেশী দিন থাকলে হয়তো আমাকে শেষে কর্তব্যব্রষ্ট হ’তে হবে। আমার হৃদয় বড় দুর্বল, কিন্তু পরীক্ষা অত্যন্ত কঠোর; প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক’রে আমার জয়লাভের আশা কোথায়? তাতে আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হবে মাত্র। সংঘমের বাধ ভাঙলে তার আর প্রতিরোধের উপায় নেই, তাই কর্তব্যের অনুরোধেই আমাকে দূরে চ’লে যেতে হচ্ছে। আমার স্মৃশাস্তিহীন অন্ধকারপূর্ণ জীবন নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এর বেশী আমার কিছুই ব’লবার নেই।”

সুনীল উঠিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুনীলের মুখভাব শেলী দেখিতে পাইল না, এবং নিজের কর্তব্য বলিতে সুনীল কি বুঝাইতে চাহিয়াছিল—তাহাও সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। তাহার বহু দিনের সুপ্ত আশা আবার যেন জাগিয়া উঠিল। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্লাস্ত হইয়া শেফালী সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকী স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল; তাহার বাহুজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দীপ্তেনের কর্ণস্বরে তাহার বাহুজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দীপ্তেন তাহাকে দেখিয়া বলিল, “এই হিমে অন্ধকারে বসে আছ কে? শেফালী?”

পর-মূহূর্ত্তেই দীপ্তেনের বৈহু্যতিফ টর্চের আলো তাহার মুখে প্রতিবিম্বিত হইল। সেই আলোকে দীপ্তেন দেখিল—শেফালীর মুখে বেদনা পরিস্ফুট, চক্ষু অশ্রুসজল। তাহা দেখিয়া দীপ্তেন বিস্মিত হইল; তাহার হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইল। সে শেফালীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, “শেফালী, আর কত দিন গোপনে এই দুঃসহ ব্যথা সহ করবে, বোন! তুমি আত্মগোপন ক’রে যে ভাবে কর্তব্য সম্পাদন ক’রছ, সুনীল কি তাতে কম কষ্ট পাচ্ছে? তুমি অনুমতি দাও তো আমি সুনীলকে তোমার স্বরূপ জানিয়ে দিই।”

শেফালী সহসা আশ্চর্যসংবরণ করিয়া বলিল, “কি বলছ, দীপুদা? তুমি আমার কি কষ্ট দেখলে? যদি কিছু দেখে থাক, সে আমার ক্ষণিকের দৌর্ভাগ্যের চিহ্ন মাত্র; এ নিয়ে তুমি কোন রকম আলোচনা কোর না। আমার প্রকৃত পরিচয় এখন হঠাৎ প্রকাশ হ’য়ে প’ড়লে এত দিনের সকল সতর্কতাই বিফল হবে। যত দিন কনকপুরের জমিদার অভয়াচরণ মিত্রের অপমানের প্রতীকার না হয়, তত দিন ধনগর্ভিত, সামাজিক সম্মানের দস্তে স্কীত ঐ দম্ভদের পরিবারে আমরা স্থান নেই। কারণ, আমার প্রকৃত পরিচয় না জেনে মিষ্টার দস্ত আমাকে গ্রহণ কবলে সেই অপমানের প্রতিবিধান হবে না, এবং হ’তে পারে না, এ কথা তোমার বুঝতে পারা উচিত।”

দীপ্তেন বলিল, “কিন্তু সুনীলের মনের ভাব, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কি তোমার বুঝতে বাকি আছে?”

শেলী গম্ভীর হইয়া বলিল, “তা বুঝে ফল কি? মানুষের কর্তব্যই সর্বাগ্রে অবশ্যপালনীয়। তাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব।”

দীপ্তেন বলিল, “প্রেমের বলে মানুষ সব কর্তব্যই পালন করতে পারে। এই বলেই রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর বনবাস-ক্লেশ সহ্য ক’রেছিলেন; রাক্ষসের কবল থেকে সীতাকে উদ্ধার ক’রতে পেরেছিলেন।”

তাহার কথা শুনিয়া শেলী বুঝিতে পারিল, দীপ্তেন সত্যই প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে; সে তাই বলিল, “নিজের নিভৃত চিন্তার ব্যাঘাত হ’ল ব’লে বুঝি আমাকে হিমে ব’সে থাকার জন্ত অনুরোধ ক’রছিলে?”

দীপ্তেন কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, “সময়ে সময়ে একা থাকতেই ভাল লাগে বটে।”

শেলী মৃদু স্বরে বলিল, “তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি; দেখি, অপর পক্ষের ব্যাধির অবস্থা কি রকম। তোমার অবস্থা এমন জটিল হবে বুঝতে পারলে নিজের মোহিনী শক্তি সঙ্ক্ষে পূর্বেই তোমাকে সতর্ক করতুম। এখন যদি অভিভাবকদের মত না হয়, তবে এক বিপদ! মিঃ দস্তর এবং মিঃ সিংহর যদি সম্মতি না থাকে বা সঙ্কল্প অটুট থাকে, তা’ হ’লে তোমরা দু’জনে কত কষ্ট পাবে, তা’ ভাবতে দুঃখ হয়।”

দীপ্তেন উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, “তাদের কোন সঙ্কল্প আছে না কি?”

শেলী বলিল, “নির্না দস্ত-পরিবারের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কোন কারণ বুঝতে পারিনি কি? আমার তো মনে হয়, মিঃ সিংহ একটা বুঝা-পড়া করতেই এখানে আসছেন।”

দীপ্তেন কথাটা বুঝিতে পারিয়া বলিল, “বল কি শেলী? দস্ত সাহেব বুঝি নিজেকে বো করবার সঙ্কল্প ক’রেছেন? কিন্তু সুনীলের সঙ্গে নিজের মানাবে কেন?”

শেলী বিদ্রুপের স্বরে বলিল, “তোমার যেমন বুদ্ধি! এই বুদ্ধি নিয়ে কি ক’রে তুমি আই-সি-এস-এ টুকলে? তাজ্জবের কথা বটে! নিজেকে বো করবার জন্তে সুনীলেরই সঙ্গে তায় বিয়ে দিতে হবে—তোমার এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণ কি?”

দীপ্তেন বলিল, “সিদ্ধান্তটা কি অসঙ্গত? সুনীলের সঙ্গে যখন বিয়ে হ’তে পারে না, তখন সুনীল ছাড়া আর কার জন্তে তিনি চেষ্টা ক’রবেন?”

শেলী মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, “মিষ্টার দস্ত বিবাহিত; নিজের বাপ এ কথা জানেন না। তাই তাঁরই সঙ্গে নিজের বিয়ে দেবার জন্ত তাঁদের পক্ষ থেকে খুব উৎসাহের সঙ্গেই চেষ্টা চ’লছে।”

দীপ্তেন বিস্মিত ভাবে বলিল, “তা’ হ’লে তাঁদের কাছে সত্য গোপন ক’রে, কাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা হ’চ্ছে বল?”

শেলী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, মিঃ দস্ত ও তাঁর স্ত্রীর মতলব হয় তো সেই রকমই। তবে তাঁদের ছেলেটির কি মত, তা’ আমার অজ্ঞাত। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, তিনি বহু দিন থেকে এ ফাঁদ এড়িয়ে চ’লছেন।”

দীপ্তেন কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গেই বলিল, “তাঁর মনের ভাব যেমনই হোক, তুমি সব জেনেও এ রকম অত্যাচার প্রশ্রয় দেবে?”

শেলী বিচলিত স্বরে বলিল, “কিন্তু আমি কি করতে পারি বল? মিষ্টার দস্ত পল্লীবাসিনী শেফালীকে পুত্রবধূ-রূপে যত দিন গ্রহণ না করেন, তত দিন আমি নিরুপায়! পরমেশ্বর কি পরীক্ষানলে আমাকে দগ্ন ক’রছেন? এত দিন আমি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই

মন থেকে নির্বাসিত হ'য়েছিল, কিন্তু সেই নিম্পৃহ নিরাময় জীবনে আমি এখন বঞ্চিত। মনে হয়, ব্যথার আগুনে আমার হৃদয় দগ্ধ ক'রে, তার সব মলা-মাটি নষ্ট করাই বিধাতার ইচ্ছা।—ও সব কথা এখন থাক; নিনার প্রতি তোমার মনের ভাবটা খুলে বল তো; আর তারই বা কি ইচ্ছে? তোমাদের কি এ সম্বন্ধে কোনও কথা হ'য়েছে?”

দীপ্তেন প্রশ্নহৃৎক দৃষ্টিতে শেলীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আমি কি এ সময় ও-সম্বন্ধে নিনাকে কিছু ব'লতে পারি? বাধ্য হ'য়ে সে দত্তপরিবারের সঙ্গে আমাদের অতিথি হ'য়েছে; এ অবস্থায় ও-রকম কোনও প্রশঙ্গ উত্থাপন করা উচিত হ'ত কি? নিনাকে পত্নীরূপে লাভ ক'রতে পেলো আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে ক'রবো। কিন্তু তার মা-বাপের অমুকুল মত জানতে না পারলে তাঁকে ও-কথা বলা ঠিক হবে না। মিষ্টার সিংহ এলে তাঁকে ব'লে দেখতে পারি।”

শেলী একটু ভাবিয়া বলিল, “তুমি খাঁটি হিন্দুর ছেলের মতনই কথা ব'লেছ; শুনে ভারী খুসী হ'য়েছি। কিন্তু তুমি হতাশ হ'য়ে না। নিনার নিজের মত না হ'লে কারো সঙ্গে বিয়েতে তার বাপ-মাও তাকে রাজী করাতে পারবেন না—এ আমি ঠিক জানি। যদি তার সম্মতি পাও, তা'হলেই তোমার প্রাণের কামনা পূর্ণ হবে। এ কথা আমি নিঃসন্দেহে ব'লতে পারি।”

দীপ্তেন বলিল, “মিষ্টার সিংহ এখানে আসুন তো, তাঁর ভাবগতিক বুঝে যা কর্তব্য হয় করা যাবে। মনে হয়, নিনা আমাকে ঘসা পয়সার মতো অচল মনে করে না। এ অবস্থায় নিজের দিক থেকে তুমি একটু চেষ্টা ক'রলে সুনীল আর কাউকেই যে বিয়ে করবে না—এ কথা আমি জোর ক'রেই ব'লতে পারি।”

শেলী দৃঢ়স্বরে বলিল, “তোমার ঐ অমুরোধ রক্ষা করা আমার অসাধ্য; আমি পূর্বেই তো ব'লেছি, আমি কোনও চেষ্টাই করব না। আমাকে পেতে হ'লে আমার স্বামীকে তাঁর বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্তব্য পালন ক'রতে হবে।”

দীপ্তেন নিরুপায় হ'য়ে বলিল, “আচ্ছা তো তোমার ধর্মভঙ্গ পণ! সুনীল তোমার উপযুক্ত হ'তে পারে,

এটাই আমার আন্তরিক কামনা। ও-সব কথা এখন থাক, সুনীলের টেণের সময় হ'য়ে এল যে!”

শেলী ব্যস্ত ভাবে বলিল, “তাই তো, কথায় কথায় বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে।”—সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, এবং দীপ্তেনকে পুনর্বার বলিল, “মনে রেখো—আমার জীবনের কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপন ক'রবার প্রয়োজন নেই। কারো কাছে কোন কারণেই আমার সত্য পরিচয় প্রকাশ ক'রো না।”

৩

এক সপ্তাহ পূর্বে মিষ্টার সিংহ (বিনয় বাবু) আগ্রায় আসিয়াছেন; রমাপ্রসাদ বাবু ও বীরেন বাবু উভয়েরই পীড়াপীড়িতে তিনি সেই স্থানেই বাস করিতে রাজী হইয়াছেন। দীপ্তেন প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে তাঁহাকে ফতেপুর-শিক্রি, সেকান্দ্রা, কেলা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান দেখাইয়া আনিয়াছে। সেই সুযোগে সুনীল ও প্রতিমারও ঐ সকল স্থান দেখা হইয়াছে। মায়ের অমুখের জগ্ন এত দিন তাহারা বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা পিতার নিকট প্রকাশ করিতে পারে নাই; কিন্তু বিনয় বাবু স্বয়ং তাহাদিগকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করায় মিঃ দত্ত তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

এই কয় দিনেই রমাপ্রসাদ বাবুর সহিত বিনয় বাবুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। বিনয় বাবু বীরেন বাবুর শ্রদ্ধ দান্তিক নহেন; তিনি গুণগ্রাহী ও উদারপ্রকৃতি, এ জগ্ন রমাপ্রসাদ বাবুর সৌজগ্ন ও অতিথিপরায়ণতায় তিনি মুগ্ধ হইলেন। বেশ আনন্দেই সকলের দিন কাটিতে লাগিল, কেবল নিনাকেই বিমর্ষ দেখা গেল। পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া নিনা তাঁহাকে সকলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবার পরই বলিয়াছিল, “তুমি হঠাৎ কেমন এলে বাবা? আমি তো তোমাকে লিখেছিলাম, আমি মেসোমশায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি, তাঁরই সঙ্গে দেশে ফিরব। মাসিমা বেশ ভাল রকম সেরে না উঠলে আমি যাই কেমন ক'রে বল তো? বড্ড স্বার্থপরের মতো দেখাবে না কি?”—সেই অবধি নিনার ভ্রমণেও যেন তেমন স্মৃতি বা উৎসাহ নাই।

নিনার প্রকৃত মনের ভাব কি, বিনয় বাবু তাহা বুঝিতে

পারিলেন না ; কিন্তু তাহাকে আর সেখানে রাখিয়া যাওয়া তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না । সপ্তাহ খানেকের জন্ত দিল্লীতে ঘুরিয়া-আসিয়া তিনি স্থির করিলেন, নিনাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিবেন, এবং নিনার বিবাহ সম্বন্ধেও যাহা হউক একটা-কিছু স্থির করিয়া যাইবেন । এই উদ্দেশ্যেই তিনি আগ্রা হইতে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করিলেন ।

রবিবারে ছুটি থাকায় সুনীল বিনয় বাবুর অমুরোধে আগ্রায় আসিল । বিনয় বাবু তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার পিতা-মাতার সম্মুখেই তাহাকে বলিলেন, “বাবা সুনীল, তুমি তো জান, তোমারই মুখের দিকে চেয়ে আমি সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর নিনার জন্ত অজ্ঞ কোন পাত্রের খোঁজ করিনি । তোমার বাপের এবং মায়েরও একান্ত ইচ্ছা—তাকেই তাঁরা পুত্রবধু করেন ; আর আমরাও তাকে তোমার হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিত হ’তে পারি । এত দিন পর্যন্ত তো তুমি ধরা-ছোঁওয়া দাও-নি ; কিন্তু অবশুই বুঝতে পারছো, বয়স্হা মেয়েকে এ রকম করে আর রাখা যায় না, এবং তা ভালোও দেখায় না । তোমার অভিপ্রায় কি, তা খুলে বলো বাবা ! এত দিন তো দূরে-দূরেই কাটালে ।”

অকস্মাৎ নিনা সেই কক্ষের অজ্ঞ দিকের একটা দরজা খুলিয়া নিঃশব্দে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, “এ সব তোমাদের কি পরামর্শ হচ্ছে ? মা গো ! ভাইকে না কি কেউ বিয়ে করে ?” ছোটবেলা থেকে আমি সুনীলদাকে নিজের ভাই ব’লেই জানি, ওকে আমি বিয়ে করুব ? তা কি পারি ? আমার প্রবৃত্তি কি এতই হীন ?”

সুনীল হঠাৎ কি উত্তর দিবে, তাহা স্থির করিতে পারে নাই ; নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতেছিল । এইবার নিনার সমর্থন পাইয়া বলিল, “আমিও তো অনেক বারই ব’লেছি—নিনাকে বিয়ে করা আমার অসাধ্য ; কিন্তু আমার সে কথায় আপনারা কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেননি ।”

বীরেন বাবু নিনার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন । সে তাঁহাদের অলক্ষ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ; তাহাদের উত্তরের প্রতিবাদে মিঃ দস্ত উত্তেজিত হইয়া

নীরস স্বরে বলিলেন, “বিনয়, তুমি ওদের কোনও কথায় কান দিও না । যত ছেলেমী কাণ্ড ! আমরা যা’ ঠিক ক’রেছি, সেই ভাবেই কাজ হবে । ছেলে-মেয়েদের সকল আবদার রাখা চলে না । হিন্দুর ঘরের মেয়েরা নিজের বায়ে সম্বন্ধে কবে মত প্রকাশ করেছে ? এমন অনাস্থি কথো কখনো শুনিনি । তুমি এই মাঘ মাসেই বিয়ের আয়োজন ক’রে ফেল ।”

মিঃ সিংহ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, তা’ আমি পারব না । মেয়েকে এত বয়স পর্যন্ত যখন আইবুড়ো ক’রে রেখেছি, তখন তার অমতে বিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না । সে কাল আর নেই ; এখন নূতন যুগ—এ কথা ভুললে চলবে কেন ? আর তা’ ছাড়া—এ ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে দু’জনেরই যখন অমত, তখন জোর ক’রে এ বিয়ে দিলে দুঃখ আর অশান্তি ডেকে আনা হবে । সুতরাং এ কাজ যুক্তিসঙ্গত হবে না । যাদের আনন্দ ও তৃপ্তির জন্ত এ কাজ, তারাই যদি তাতে বিমুখ হয়, তবে তা নিশ্চয়োজন ।”

নিনা মিষ্টার দস্তর শেষ প্রস্তাব শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল ; সে প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়া বলিল, “মেসো-মশায়, এই কি আপনাদের আধুনিক শিক্ষার গৌরব ? আপনার কি ধারণা—মেয়েরা পণ্যদ্রব্য, বাপ-মা ইচ্ছা-মতো বেচাকেনা ক’রবেন ? শুনেছি, ঠাকুর-দাদাদের আমোলে ঐ রকমই ছিল । আমার নিজের অমতে কে আমার বিয়ে দেয়, তা দেখা যাবে ।”

কর্ণকাল নীরব থাকিয়া আবার সে বলিল, “আপনাদের একটা সমাজ গড়ে’উঠেছে, সেই সমাজের মোড়লের সম্বন্ধে লোকের এই রকম একটা ধারণা বহুমূল হ’য়েছে যে, কলকাতার ব্যারিষ্টোকেসি এরিষ্টোকেসির গর্বে অজ্ঞ সকলকে কীট জ্ঞান করায় বাইরের ভঙ্গলোকের সঙ্গে কুটুস্থিতা করিতে নারাজ ! আপনারা বোধ হয় বিশ্বাস করেন না যে, মানুষ হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ লোক আপনাদের দলের বাইরে আছেন ?”

বীরেন বাবু ক্রোধে অধীর হইলেন ; কিন্তু তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই নিনা বলিতে লাগিল, “এখন বুঝছি, আপনাদের জন্তেই সুনীলদা-বেচারী সংসারী হ’তে পারেনি । ওর মনের মতন মেয়ে না পেলে কেন ও বিয়ে

করবে? আর আপনারা থাকতে সে রকম মেয়ের সঙ্গে ওর দেখা পর্যন্ত হয় কি না সন্দেহ, আর দেখা হ'লেই বা কি হবে?”

মিঃ দত্ত আর সস্থ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, “দিনকতক বিলেতে থেকে তুমি তো ভারী ডেপো হ'য়ে গেছ দেখছি। আমাদের দোষ ধরা তো বড় কম খুঁটতা নয়; মেয়েমানুষের এত বড় ভাল নয়।”

নিনা অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, “সত্যি কথাগুলো অনেক সময় বড়ই অপ্রিয় ব'লে মনে হয়, কিন্তু তাই ব'লে কি সবাই চূপ ক'রে থাকলে চলে?”

বিনয় বাবুর আশঙ্কা হইল, নিনা ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিলে শেষে হয় তো বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে। এ জ্ঞান তিনি সংযত ভাবেই নিনাকে বলিলেন, “নিনা, তুমি পূজনীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করছো, তা ভুলো না। জ্যেষ্ঠদের সম্মান করতে হয়, এ কথা, বাঙ্গালীর মেয়ে তুমি, তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তোমার মেসো-মশায়ের কাছে এ জ্ঞান কমা চাও।”

নিনা তাহার পিতার অনুরাগ এবং স্বভাবতঃই শিষ্ট, কিন্তু আজ আর সে স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না; তথাপি পিতার আদেশ পালনের জ্ঞান বলিল, “আমি কোন অন্তায় কথা ব'লেছি ব'লে তো মনে হয় না। তবু যদি আমার কোনও কথায় আপনার প্রতি অসম্মান প্রকাশ হ'য়ে থাকে তো সে জ্ঞান কমা চাচ্ছি। অভদ্র ব্যবহার করবার ইচ্ছা আমার ছিল না—নেইও, আপনার অমর্যাদাও করতে চাইনি।”

সুনীল বুঝিল, অতঃপর আর সেখানে থাকা সম্ভব হইবে না; সে নিনার হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল। বিনয় বাবু তখন বীরেন বাবুকে বলিলেন, “ভাই, ছেলেমানুষের কথায় রাগ করো না; উত্তেজিত হ'লে ওদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, কালের গতি এই রকমই হ'য়েছে কি না। উদ্ধতাকে ওরা তেজস্বিতা ব'লে মনে করে।”

বীরেন বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, “তুমিই আদর দিয়ে-দিয়েই ওর মস্তকটি চর্কণ ক'রেছ। তখনই ব'লেছিলুম, মেয়েকে বেশী শিক্ষা বা স্বাধীনতা দিও না। তোমার স্ত্রী কেন যে ওকে বিয়ের আগেই বিলেতে নিয়ে যাবার মতলব

ক'রেছিলেন বুঝি না। বিয়ের পর বিলেতে গেলে বিগ্‌ডোতে পারে না; তখন শাসনে থাকে। কণ্ঠফলে তোমাকে বিলক্ষণ ভুগতে হবে দেখতে পাচ্ছি।”

নিনা বাহিরে গিয়াই সুনীলকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি আগে থেকে জানতে—ওঁরা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান?”

সুনীল কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “হ্যাঁ, তা—তা কি বলি—জানতুম অনেক দিন থেকেই। কিন্তু আমি বরাবরই ব'লেছি, তোমাকে আমি ছোট বোনের মতন ভালবাসি, বিয়ে ক'রতে পারব না। কিন্তু উভয় দিক থেকেই আমার উপর খুব চাপ দেওয়া হচ্ছিল।”

নিনা মুখ ঝাপটা দিয়া বলিল, “দাদা, তুমি এত দুর্বল-প্রকৃতি? অনেক দিন আগেই ওঁদের এ স্বপ্ন ভেঙ্গে দেওয়া তোমার উচিত ছিল; আমায় বড়ই নিরাশ ক'রলে তুমি!”

সুনীল কি উত্তর দিবে, স্থির করিবার পূর্বেই নিনা আরও বলিল, “তুমি এখনও শেলীদি'কে বিয়ে ক'রছ না কেন? অমন মেয়ে আর পাবে না কিন্তু! না, মেসো-মশায়ের ভয়ে তাও করিতে পারবে না।”

সুনীল কিঞ্চিৎ ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিল, “না রে!—কাউকে আমার বিয়ে করা হবে না। অনেক দিন আগে নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এক জনকে জীবন-সঙ্গিনী ক'রব ব'লে শপথ ক'রেছিলুম; সে থাকতে আর কাউকে আমি বিয়ে ক'রতে পারব না।”

নিনা সবিস্ময়ে বলিল, “সত্যি না কি? এঁ্যা, বল কি? কে সে? তাকে কেন এত দিন লুকিয়ে রেখেছ? আর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তা'কে নিয়ে সংসারী হবে ব'লে শপথই বা করলে কেন?”

নিনার সংশয়াকুল কাতর ভাব দেখিয়া সুনীল বলিল, “সে সব কিছু নয়। সে উচ্চ বংশেরই মেয়ে,—বৌ ক'রে তাকে ঘরে আনতে কোন বাধাই থাকতে পারে না; কিন্তু সে সময় আমি বধু-বরণ ক'রবার জ্ঞান প্রস্তুত ছিলাম না।”

নিনা বলিল, “তবে এত দিন তা'কে বিয়ে ক'রোনি কেন? নিজের কাছেই বা আননি কেন?”

সুনীল ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “সংসাহসের অভাবে নিজের

কর্তব্য পালন করিনি। মা-বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা রাখবার মত মনুষ্য আমার ছিল না; কিন্তু কর্তব্য ত্যাগ ক'রবার মত স্বর্ণিত প্রবৃত্তিও আমার নেই। উভয় সঙ্কটে প'ড়েই এত দিন আমি উপায় স্থির ক'রতে পারিনি।”

নিনা উত্তেজিত স্বরে বলিল, “ছি ছি! প্রতিজ্ঞা ক'রে তা' রাখতে দেবী ক'রেছ কি ব'লে? কথা দিলে সব স'য়েও তা রাখা উচিত; আর তা' রাখতে দেবী করা উচিত নয়।”

সুনীল মৃদু স্বরে বলিল, “তা' জানি, নিনা! আর সে পাপের শাস্তি আমি যথেষ্টই পেয়েছি। মনে যে দিক্কার সে অন্তে পেয়েছি—তা' জীবনেও ভুলতে পারব কি না, কে জানে? এত দিনে আমার মনের স্থিতি কেটে গেছে, কর্তব্য পালন আমি ক'রবই। এখন তা'র বিষয় বেশী কিছু তোমায় বলতে পারব না, নিনা! তা'কে ঘরে এনে সব আগে তোমার কাছেই নিয়ে যাব,—সে কেমন মেয়ে, তুমি নিজেও দেখে নিও। মনে হয়, খুসী হবে।”

অতঃপর উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। কিছু কাল পরে সুনীল বলিল, “নিনা, তোমার বিয়ের কিন্তু যত দিন একটা কিছু ক'রতে না পারি, তত দিন মনে একবিন্দুও শাস্তি পাব না। একটা ভাল লোকের হাতে না পড়লে তোমাকে সামলে রাখা যাবে না।”

নিনা বলিল, “এই মাত্র তো শুনলে—আমার মত না নিয়ে কোন কাজই হবে না।”

সুনীল হাসিয়া বলিল, “তবে তুমি স্বয়ংঘরা হোয়ো।”

নিনা বলিল, “বেশ, তাই হবে; কিন্তু তোমরা আগে আমার পাণিপ্রার্থীদের খুঁজে আনো, তার পর না হয় বেছে নোব।”

এই কথা বলিয়া নিনা আর কোন কথাই বলিতে পারিল না, লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল; তাহার কণ্ঠরোধ হইল। সে উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

ফাগুন

আজি, ফুলে ভরা ফাগুন আসিল সখি!
তবু, কোকিল, ভোমরা চোখে নাহি নিরখি।
নাই, পাখীর কুজন,
গুধু, গুনি ভন্ ভন্—
মশা, আর মাছি ওড়ে সমুখে পিছে,
অশথের কোলে কালো ছায়া নামিছে।

ভেয়, মেঠোপথ বেয়ে ঐ রাখাল ছোটে,
তার, পায়ে পায়ে ঘাস-ফুল যেন বা ফোটে।
বনে, সাঁওতালি বউ,
খেয়ে মহুয়ারি মউ।

নাচে, সাঁওতালি নাচ,—আর ঝুমুর ঝুমুর,
বাজে, নুপুরেরি সম তার পায়েরি ঘুড়ুর।

হার! মধুময় ফাগুন আসিল বনে,
নাই, পুলকের লেশ তবু মোদেরি মনে,
হেথা, নাই দখিণা,
হেথা, বাজে না বীণা,

গুধু, গীলু বারোয়ার সুরে হৃদয়-বাঁশী
ফুঁপায় ব্যথায়,—ঠোটে ফোটে না হাসি।

কোথা, রয়েছে বন্ধু “নবু” তোমাতে জানাই।
এই, বাংলা দেশেতে এল ফাগুন বুধাই।
হেথা, আগুন ব্যথার
দহে, হৃদয় সবার
গুধু, স্বর্ণ-মৃগের সম ‘মারীচ’ রাজে।
এই, বাংলা দেশের বুকে, মোদেরি মাঝে।

সখা, ডাল-ভাত দিতে হেথা নাই কারো সখ,
দেখ, বৈঠকে বই নাই, আছে গুধু ঠক।
পেটে, ভাত নাহি তার,
তবু, ‘মিঠু’ মিয়ার—
চলে ধর্মের নাম করি মিথ্যা বড়াই,
তার জ্ঞানে, অজ্ঞানে গুরু, মোরগ-লড়াই।

আমি, কেমনে বরিব সখা, হেথা ফাগুন,
যেথা, অলির বদলে, করে মশা গুণ গুণ।
গুন বন্ধু “নবু”!
ভুলে যেও না কভু,

এই বাংলার ফুলে ভরা বিষ মাখা তুণ,
হেথা ফাগুন বনেতে গুধু,—মনেতে আগুন।

কাদের নওয়াজ।

সংগ্রাম ও আর্থিক পরিস্থিতি

(বার্তানীতি-প্রসঙ্গ)

একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধিলেই অনেক দিকে ওলট-পালট হইয়া যায় ; তন্মধ্যে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন অতীব বিস্ময়কর ও অপ্ৰত্যাশিত ভাবেই সংঘটিত হয়। ব্যাপক ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জিনিষপত্রের মূল্য ভয়ঙ্কর বর্দ্ধিত হয়, পশারের বাজার (credit) যথেষ্ট ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং ব্যক্তিগত ভাবেও লোকের সঞ্চয়ের পথ রুদ্ধ হয়। বর্তমান যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিভিন্ন মনুষ্য-সমাজের মধ্যে একটা নিবিড় সঙ্কট স্থাপিত হইয়াছে ; উহার এক স্থানে টান পড়িলে, অত্র সকল দেশেই সেই আকর্ষণের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সকল দেশ নিরপেক্ষ ছিল, সেই সকল দেশেও যুদ্ধের প্রভাব—যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির ঠায় অল্পই হউক বা অধিকই হউক, স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়াছিল। বিগত যুদ্ধের সময় কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেনে, ফ্রান্সে ও ইটালীতে, এবং অত্র দিকে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়াতেই যে দুর্শ্লল্যতা দেখা গিয়াছিল একরূপ নহে, যে সকল দেশ যুদ্ধ হইতে আপনাদিগকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই সকল দেশেও দুর্শ্লল্যতা তীব্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সকল দেশেই 'কারেন্সি নোট' বা কাগজের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে চালাইতে হইয়াছিল,—এবং ধাতু-মুদ্রার সংখ্যা যত দূর সম্ভব হইতে পারে, তত দূর হ্রাস করা হইয়াছিল। যে নরওয়ে সে-বার যুদ্ধ এড়াইয়া চলিতে পারিয়াছিল, সেই নরওয়েতেও পণ্যের মূল্য অল্প হিসাবে ২৩শ ছাড়াইয়া ৩৭৭এর অঙ্কে (Index number) উঠিয়াছিল। জাপান গতবার যুদ্ধে বিশেষ ভাবে যোগদান করে নাই, এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাহার অবস্থান-ভূমি বহু দূরে থাকিলেও, জাপানী পণ্যের মূল্য অগ্নিবৎ হইয়াছিল। সর্বত্রই প্রচলিত মুদ্রার ক্ষীতিসাধন করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ, অত্র দেশেও একরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না।

কোন একটা বিরাট যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই আন্তর্জাতিক

বাজার পশারের পরিচালনা (Internal credit economy) ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে। শান্তির সময় এক দেশের বণিক এবং ব্যবসায়ীরা অত্র দেশের বণিক ও ব্যবসায়ীদিগকে যেরূপ বিশ্বাস করে এবং পরস্পরের অঙ্গীকারে নির্ভর করে,—যুদ্ধের সময় তাহারা ততটা করে না বা করিতে পারে না। যুদ্ধের সময় জলের ও স্থলেরও বাণিজ্যপথ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে। এই জন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যাপারে ঘোর বাধা উপস্থিত হয়। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক আমদানী-রপ্তানীর কার্যে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। সেই জন্ত বিদেশী পণ্যের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। এক দেশের পণ্য অত্র দেশে রপ্তানী হয় না বলিয়া যুদ্ধে নির্লিপ্ত দেশকেও তাহার প্রভাবাধীন হইতে হয়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দে যুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যুদ্ধের প্রথম আমলে ধান, গম প্রভৃতি ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের মূল্য আমাদের দেশে অনেক কম ছিল। উহাতে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের এবং জনসাধারণের কিছু কষ্ট হইলেও কাহারও খাইবার-পরিবার অভাব হয় নাই। দেশীয় বস্ত্র প্রভৃতির অধিক কাটুতি হওয়ায় কলের শ্রমিকদিগের প্রায় সকলেই কাজ পাইয়াছিল। সাধারণ গৃহস্থের সাংসারিক ব্যয় হ্রাস হওয়ায় পল্লী অঞ্চলের মজুর প্রভৃতির সহজে যথেষ্ট কাজ পাইতেছিল। তবে কতকগুলি নিত্য-ব্যবহার্য এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় আমদানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এই সুবিধা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। সে-বার সংগ্রামের জন্ত সরকার কর্তার বৃদ্ধি করিলেও এবারকার মত সে-বার এই দরিদ্র দেশের উপর কর্তার চাপিয়া বসে নাই। কাজেই অবস্থার ভিন্নতা হেতু গত যুদ্ধের ফল হইতে বর্তমান যুদ্ধের ফলের ভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে। এবার যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্য-মূল্য—এমন কি, দেশজাত কৃষিজ খাদ্য-শস্যের মূল্যও—বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কেবল পাটের মূল্য ইক্ষুর মূল্যই কমিয়াছে। লোকের সঞ্চয়ের উপায় যথেষ্ট

পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এবার প্রথম হইতেই অতিরিক্ত আয়ের উপর উচ্চ হারে কর স্থাপিত হইয়াছে, রেলের ভাড়া, ডাক মাণ্ডলের হার এবং টেলিগ্রামের ব্যয়ের হার বৃদ্ধিত হইয়াছে; ট্রান্স টেলিফোনের হার বাড়িয়াছে এবং আয়করের উপর সারচার্জ সর্ব ক্ষেত্রেই সমান ভাবে শতকরা ২৫ ভাগ ধার্য করা হইয়াছে। কাজেই লোকের যে বিশেষ কষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। পূর্ববারের অপেক্ষা এবার জলপথ অধিকতর বিলসঙ্কুল হইয়াছে—টর্পেডো প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রহরণের প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তি ছর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা সত্য যে, আমরা প্রকারান্তরে এই যুদ্ধে লিপ্ত; অগত্যা এই যুদ্ধের ব্যয়ভার যথাসাধ্য বহন করা আমাদের দেশের লোকেরও কর্তব্য;—কিন্তু এই দরিদ্র দেশের লোকের যতটুকু ব্যয়ভার বহন করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া কর ধার্য করা যুক্তি-বহির্ভূত এবং সমর্থনের অযোগ্য। বাঙ্গালায় পাটের এবং ইক্ষুর মূল্য হ্রাস হওয়ায় সর্বসাধারণের অর্থ-কষ্ট প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালায় এবার কোন কোন স্থলে অজন্মা হওয়ায় তাহাও লোকের কষ্ট-বৃদ্ধির কারণ।

বর্তমান যুগে যুদ্ধের ব্যয় দিন দিন যেমন বিস্ময়কর ভাবে বৃদ্ধিত হইতেছে,—যুদ্ধের হুদাও ক্রমশঃ সেইরূপ বিস্তৃত হইতেছে। ফ্রান্সে-জার্মান যুদ্ধের সময় যে সকল বহুব্যয়সাধ্য অস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার ফলে এক দিকে যেমন যুদ্ধে ব্যবহার্য অস্ত্র-নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অত্র দিকে সেইরূপ তাহার ধ্বংসশক্তিও বৃদ্ধিত হইয়াছিল। সেই সময় সাধারণ তোতেদার বন্দুকের স্থান মার্টিনী-হেনরী, বার্ডান, গ্রাম এবং ওবের্ডার রাইফেল অধিকার করিল। ইহার পর কামান, রণতরী প্রভৃতি ক্রমশঃ নির্মাণের ব্যয় ও জটিলতা বাড়িতে লাগিল। মেরিমা ক এবং মণিটরের স্থায় একখানা রণতরী ডুবিলে যত টাকা ক্ষতি এবং যত পরিশ্রমের অপচয় ঘটিত, এখনকার এক একখানা ভাল ক্রুজার, ড্রেডনট, বা সুপারড্রেডনট ডুবিলে তাহার শত শত গুণ-অধিক অর্থ নষ্ট হয়, সবই জলে যায়। আজকাল বর্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডকে দৈনিক ১ কোটি ২২ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং ব্যয় করিতে হইতেছে, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় উহার পরিমাণ ১৬ কোটি ২২ লক্ষ টাকারও অধিক। বিগত যুদ্ধে এত অধিক হারে অর্থ

ব্যয় হয় নাই। বৃটিশ অর্থ-সচিব সার কিংসলি উড সম্প্রতি কমন্স সভায় বলিয়াছেন—এক বৎসরের মধ্যে যুদ্ধের ব্যয় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। এখন এই বিপুল ব্যয় নির্বাহার্থ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সকল দেশেরই একটা দায়িত্ব আছে। আবার বৃটিশ সরকার যদি স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন ভারতের মত লইয়া এই যুদ্ধে নামিতেন, তাহা হইলে এই দায়িত্বের নৈতিক গুরুত্ব যত হইত, পরাধীন ভারতের নৈতিক গুরুত্ব তত অধিক না হইলেও উহার যেটুকু নৈতিক গুরুত্ব আছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। ভারত সে দায়িত্বের গুরুত্ব স্বীকার করিতেছে না, বরং কার্য-ক্ষেত্রে স্বীকারই করিতেছে। তবে যাহার যে দায়িত্বভার বহনের শক্তি নাই, তাহার ঘাড়ে সে দায়িত্ব চাপাইলে যেরূপ ফল হইয়া থাকে, সেইরূপই হইতেছে; এই করভারে ভারতবাসী অত্যন্ত প্রীড়িত হইয়া উঠিতেছে। কর্তৃপক্ষ যদি ভারতবাসীকে শ্রমশিল্প গঠনকার্যে সহায়তা করিতেন, শ্রমশিল্প-ক্ষেত্রে ভারতবাসীর শ্রায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার সর্ববিধ সুবিধার পথ মুক্ত করিতেন, তাহা হইলে এই দুঃসময়ে তাহারা সরকারের কার্যে অধিকতর সঙ্কষ্ট চিন্তে অধিক পরিমাণে অর্থদান করিতে পারিত। কিন্তু যে দেশের কৃষিকার্য আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত উপায়ে পরিচালিত হইবার পথ রুদ্ধ, যে দেশের শিল্প বৈদেশিক শিল্পীর যান্ত্রিক শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষায় অসমর্থ, এবং যে দেশের লোক প্রতিকারের উপায় জানিয়াও অর্থাভাবে প্রতিকার করিতে না পারিয়া—নানা রোগের আক্রমণে অকর্মণ্য, অস্থিচর্শসার, মৃত্যুপথের যাত্রী—সে দেশের লোক যুদ্ধের এই গুরুভার বহন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতার অভাবে তাহাতে অসমর্থ; সুতরাং সে জন্ত তাহাদিগকে নিন্দা করা বিবেচকের কার্য নহে।

যুদ্ধের সময় সোনা-রূপাও মহার্ঘ হইয়া থাকে। বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধেও বৃটিশ সরকার তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত মার্কিণের স্থায় ভারত সরকার ভূরি পরিমাণে রজত কিনিয়া রাখিলে বিজ্ঞোচিত কাজ হইত; কিন্তু তাহারা তাহা করেন নাই। বিগত যুরোপীয় মহা-যুদ্ধের সময় প্রথম কিছু দিন রূপার দর ছিল প্রতি তোলা

সাড়ে দশ আনা। তাহার পর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে উহার দর চড়িতে থাকে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যে রূপার দর প্রতি আউন্স ২৭ পেন্স ছিল, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রতি আউন্স ৩৭ পেন্স, এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মূল্য প্রতি আউন্স ৫৫ পেন্স হইয়াছিল। পুনরায় যুদ্ধ বাধিলে আবার যে ঐরূপ হইবে, তাহা সরকারের পদস্থ রাজপুরুষদিগের ধারণা করা কঠিন ছিল না। যুদ্ধের পর রূপার দর কমিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রতি-আউন্স ১৩ পেন্স বা প্রতি তোলা পাঁচ আনার পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও সরকারের হুঁস হইল না যে, আপৎ কালের জন্ত এই রূপার টাকা ব্যবহারের দেশে সরকারী কোষে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য আমানত রাখা একান্ত আবশ্যিক। সেই সময়ে ভারত সরকার রূপা কিনিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সেই সময়ে মার্কিং, কানাডা, মেক্সিকো, পেরু এবং অষ্ট্রেলিয়া সাড়ে তিন কোটি আউন্স রৌপ্য ক্রয় করিবার চুক্তি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে চারি বৎসরের জন্ত এই চুক্তি হয়। মার্কিং সরকার ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রৌপ্য ক্রয়-আইন করিয়া এই ব্যবস্থা করেন যে, তাঁহাদের সরকারী কোষে যত দিন রূপার পরিমাণ সমস্ত ধাতব সঞ্চয়ের সিকি পরিমাণ না হইবে, এবং রূপার মূল্য প্রতি-আউন্স ৬৪ পেন্স পর্য্যন্ত না উঠিবে, তত দিন তাঁহারা রৌপ্য ক্রয় করিতে থাকিবেন। ইহাতে টাকার মূল্য লইয়া ভারত সরকারকে একটু বিত্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। রূপার মূল্য প্রতি আউন্স ৬৪ পেন্স হইলে রূপার ভরি দাঁড়ায় প্রায় দেড় টাকা। কিন্তু রূপার মূল্য অত অধিক না হইলেও রূপার মূল্য প্রতি আউন্স সওয়া ৩৬ পেন্স পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তখন টাকার প্রচলিত মূল্য এবং আসল মূল্য প্রায় সমান হইয়া উঠিল। ইহাতে ভারত সরকারের মুদ্রা বিভাগ প্রমাদ গণিয়াছিল। তখন পাছে রূপার মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়, সেই ভয়ে ভারত সরকার কতকগুলি এক টাকার নোট ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সঙ্কট দেখিয়া মার্কিং যুক্তরাজ্য রৌপ্য ক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রূপার মূল্য আরও কমিয়া প্রতি আউন্স ২০ পেন্স এবং তাহার কমেও নামিয়া গিয়াছিল।

এদিকে ভারত সরকার ভারতীয় মুদ্রার রূপায় ভাগ কম করিবার চেষ্টা গত যুদ্ধের সময় হইতেই করিয়া

আসিতেছিলেন। গত যুদ্ধের সময়েই রূপার দো-আনি এবং সিকির পরিবর্তে নিকেলের দো-আনি এবং সিকি বাজারে বাহির করা হয়। রূপার দো-আনি ছোট বলিয়াই নিকেলের দো-আনি লোকের পছন্দ হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সরকার টাকার বা আধুলির রূপার ভাগের কোনরূপ ব্যতিক্রম করেন নাই। আজ শতাধিক বৎসর ধরিয়া টাকায় এবং আধুলিতে রূপার পরিমাণ বারো ভাগের এগার ভাগই চলিয়া আসিতেছে। ১৮০ গ্রেণ ওজনের টাকার মধ্যে ১৬৫ ভাগ খাঁটি রূপা (টাঁদি) থাকিত। আধুলিতে থাকিত ঠিক তাহার অর্ধেক; এ পর্য্যন্ত সরকার ইহার কোন পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এইবার যুদ্ধারম্ভ হওয়ায় রূপার দর পুনর্বার বাড়িতে লক্ষ করিলে সরকার প্রথমে সিকির রূপা এই ভাগ হইতে একেবারে অর্ধেক করিয়া দিলেন। অবশ্য ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ইহার অনুমোদন করেন। “শনৈঃ কস্থা শনৈঃ পস্থা” নীতিতে ভারত সরকার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৬ষ্ঠ অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া আদেশ করিলেন—আধুলিতে অর্ধেক রূপা থাকিবে। তাহার পর গত অক্টোবর মাসে সরকার ১১নং অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া ‘রাণী মার্ক’ টাকা আগামী ৩১শে মার্চের পর আর চলিবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভারত সরকারের আদেশে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টাকা ভারতে অচল হইল! তবে সরকারী ট্রেজারীতে এবং পোস্টাফিসে উহা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত সচল থাকিবে। উহার উদ্দেশ্য ইহাই মনে হয় যে, ঐ টাকায় যে অধিক রূপা আছে, তাহা সরকারের হাতে পড়িলে প্রতি টাকায় ৭৫ গ্রেণ রূপা সরকার লাভ করিবেন। ইহার পরই সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, এখন হইতে টাকায় ১৬৫ গ্রেণ খাঁটি রূপা আর থাকিবে না; উহাতে কেবল মাত্র ৯০ গ্রেণ বা আধ ভরি খাঁটি রূপা থাকিবে; অর্থাৎ রূপার হিসাবে টাকার আসল মূল্য যাহা ছিল, তাহা আর রহিল না। উহা রূপার মূল্য হিসাবেও ১২ ভাগের ৫ ভাগ কমিয়া গেল।

সরকার অবশ্য বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের আতঙ্কে লোক রূপার টাকা সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা এই কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সকল

দেশেই যুদ্ধের সময় লোক আতঙ্কে এইরূপ কাণ্ড করে। বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ৫ দিনের মধ্যে ইংলণ্ডের লোক ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নোট, কাগজ প্রভৃতি ভাঙাইয়া লইয়াছিল, এ কথা ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড তথাকার সরকারী কোষাধ্যক্ষকে (Chancellor of Exchequer) জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও সরকার পাউণ্ডের আসল স্তব্ধমানের কোন পরিবর্তন করেন নাই। এবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর গত জুন মাসেই সরকারকে ১৩ কোটি টাকার রৌপ্যমুদ্রা বাজারে বাহির করিতে হইয়াছিল। আর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতে যত টাকার নোট চলিত ছিল, তাহা অপেক্ষা ৪৭ কোটি টাকার নোট অধিক প্রচারিত হইয়াছিল। ভারত সরকারকে যদি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কিছুকাল পর্যন্ত রূপা বিক্রয় করিতে না হইত, তাহা হইলে তাঁহা-দিগকে কখনই এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত না। এখন নোটের প্রচলন আরও বাড়িয়া গিয়াছে,—রূপার টাকারও ধাতব মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কি আছে? সত্য বটে, টাকার মূল্য পাউণ্ডের মূল্যের সহিত গাঁথা আছে; কিন্তু টাকা দিলেই ত আর অবাধে স্তব্ধের পাউণ্ড পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় সাধারণ নিয়ম অনুসারে টাকার মূল্য হ্রাসের দিকে যাইবেই। বর্তমান যুগে সকল যুদ্ধের সময় তাহা নানা কারণে ঘটয়াই থাকে।

বৃটিশ দ্বীপের চলিত মুদ্রা এখন কাগজের সত্য, কিন্তু তাহার পশ্চাতে স্তব্ধমান ধরিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট স্তব্ধ সঞ্চিত আছে। আর ভারতের টাকা ভাস্কর টাকা (token coin) উহার পাউণ্ডের মূল্যের সহিত গাঁথা আছে। নামতঃ কার্যতঃ লোক ইচ্ছা করিলেই টাকার বদলে ধাতুর পাউণ্ড পায় না। যুদ্ধের সময় যুদ্ধে সাক্ষাৎ ভাবে নিবৃত্ত দেশে সরকার অনিয়ন্ত্রিত ভাবে টাকা ধার করিয়া, আর জাতীয় ধনসম্পত্তি (সঞ্চিত স্তব্ধাদি) গলাইয়া তাহা যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যয় করেন বলিয়া তাহার ফলে মুদ্রার বাহুল্য এবং মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস ঘটয়াই থাকে। যে দেশের মুদ্রা ঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা দ্বারা সূত্রপ্ৰতিষ্ঠিত, সে

দেশেও তাহা ঘটে। সেই অল্প তথায় সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের মূল্যই বৃদ্ধি পায়। ইহার ফল নিরপেক্ষ দেশেও অনুভূত হইয়া থাকে। এই মূল্য-বৃদ্ধির কারণ—মুদ্রা বৃদ্ধি। অধিকতর যে সকল দেশের মৌদ্রিক ব্যবস্থার মূলে দোষ বা ত্রুটি আছে, সেই সকল দেশে উহার বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—অর্থাৎ সেই সকল দেশের সরকার অগ্রে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রার ক্ষীণতা সাধন করেন, এবং তাহার পরেই তাহার ফলস্বরূপ দুর্শূল্যতা দেখা দেয়। আমাদের দেশের মুদ্রার ব্যবস্থা ত্রুটিযুক্ত কি না, সে কথা এখানে না তোলাই ভাল। তবে এ কথা সত্য যে, এইবারকার এই যুদ্ধে সরকার প্রথম হইতে নোট এবং ঋণের বৃদ্ধি করিয়া প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতে ১ শত ৮০ কোটি টাকার নোট প্রচলিত ছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রচলিত নোটের মূল্য পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৭ কোটি টাকা। একেবারে প্রথম ৬ মাসেই শতকরা ২৬ ভাগ বৃদ্ধি! ব্যাঙ্কের মারফতে গৃহীত ঋণের পরিমাণও শতকরা ৪৪ ভাগ হারে বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন সবে কলির সন্ধ্যা বই ত নয়। তাহার পর গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-নর্মদার খাত বাহিয়া অনেক জল গড়াইয়া গিয়াছে। অনেক বার ভারত-গগনে রবিশশীর উদয় হইয়াছে। এখন নোটের প্রচলন এবং ঋণের সম্প্রসারণ অধিক ঘটিয়াছে। ইহাতে দেশের দুর্শূল্যতা যে দেখা দিবে, তাহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কি আছে? ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমের সাধারণ পণ্য-মূল্যের খুঁট অঙ্ক যদি ১০০ ধরা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, গত বৎসরের ডিসেম্বর মাস নাগাইদ সেই মূল্য পরিমাণক অঙ্ক ১৩৭এ দাঁড়াইয়াছে, ইহার সমস্ত কারণ মুদ্রাজনিত নহে,—কতক কারণ বহির্কাণ্ডের বিঘ্নজনিত আমদানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিও বটে। কারণ, দেখা যায় যে, ইহার পরবর্তী কয়েক মাস পণ্য আমদানীর কিছু সুবিধা হইয়াই ভারতে পণ্য-মূল্যের হার কিছু কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু কখনই পূর্বভাব পায় নাই।

যুদ্ধ বাধিলে সরকারের অনেক টাকা যুদ্ধের উপকরণ অল্প প্রভৃতি নিষ্কাণের অল্প ব্যয় করিতে হয়, ইহার মধ্যে গোলা, বারুদ, বোমা, টর্পেডো প্রভৃতি যাহ

নির্মিত হয়, তাহা সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যায়। উহা নির্মাণে মানব জাতির কোন উপকার ঘটে না। জাহাজ ও অনেক খাণ্ডদ্রব্যও জলে যায়; কিন্তু উহা প্রস্তুতের জন্য অনেক টাকা লোকের হাতে আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে প্রচলিত মুদ্রায় অনেক ক্ষীণতা সাধন ঘটে; সে জন্যও মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস হয় বলিয়া পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

এইরূপ অবস্থায় পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশের লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য বজেট করিবার সময় যাহাতে লোকের উপর অনাবশ্যক ভাবে কর ধার্য না হয়, সে দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা অবশ্যকর্তব্য। যুদ্ধের জন্য লোকের কষ্ট-বৃদ্ধি অপরিহার্য। সেই কষ্ট-বৃদ্ধি যাহাতে অকারণ না ঘটে, সে দিকে রাজস্ব বিভাগের কর্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; তাহা না রাখিলে তাঁহাদের অকর্মণ্যতা এবং অদূরদর্শিতা স্মৃতি হইয়া থাকে। ইহার ফলে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে। লাতিন ভাষায় একটি প্রাচীন প্রচলন আছে যে, জনসাধারণের মতই ভগবানের মত। কথাটি সত্য। কেবল বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া ঐ উক্তি উপেক্ষা করা সুবিবেচনার কার্য নহে।

যুদ্ধ যত অধিক দিন চলে, ততই লোকের কষ্ট অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সে জন্য পূর্ক হইতেই সকল দেশের সকল সরকারের সাবধান হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বর্তমান সময়ে যুরোপে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে,—তাহার স্থায়িত্ব কত দিন হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না; সুতরাং লোকের এই অর্ধকষ্ট দিন-দিন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় রাজস্ব বিভাগের কর্তাদিগের সাবধান হওয়া আবশ্যক। এই যুদ্ধের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তাহার ফলে যুদ্ধের ব্যয় এবং দুর্শূল্যতা বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপই আশঙ্কা হইতেছে। অতএব যাহা অত্যাশঙ্ক, তাহা ব্যতীত অন্য দিকে প্রজার উপর অধিক কর ধার্য করা সম্ভব হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের এই দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। সাধারণ অবস্থায় এ দেশে অত্যন্ত অধিক গংখাক লোক বেকার অবস্থায় থাকে; অনেকেরই অন্নসংস্থান হয় না। তাহার উপর যদি দুর্শূল্যতা এবং করভার অত্যন্ত অধিক চাপিয়া বসে, তাহা হইলে লোকের মনে তীব্র অসন্তোষের আবির্ভাব হওয়া অপরিহার্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন) ।

প্রেম ও পূজা

ভালোবেসে তুমি মোরে যে আসন দিলে দেবতার,
প্রিয়তমা, আমি যেন চিরদিন সুখে-দুখে তা'র
সম্মান রাখিতে পারি প্রাণপণে দেহ-মন দিয়া-।
দেবের আসনখানি তুমি মোরে দিয়েছো যে প্রিয়া,

তোমারি গৌরব সে তো; জানি, জানি, হে মোর কল্যাণি।
মাটির প্রতিমা গড়ি' ভক্ত তা'রে দেয় যবে আনি'
হৃদয়ের অর্ঘ্যখালি, পূজারতি; করে যবে তা'র
দেবী ও দেবতা রূপে, সে গৌরব নহে প্রতিমার।

নর-নারী আপনার উদারতা, ভক্তি, প্রেম দিয়া
অটুট বিশ্বাস-ভরে মনে-প্রাণে তোলে সঞ্চারিয়া
মাটির প্রতিমা-মাঝে দেবী আর দেবতার প্রাণ!
এ গৌরব সাধকের; দেব-দেবী ভক্তের সে দান!

তুমি মোরে ভালোবাসো; তাই আমি দেবতা তোমার!
তুমি মোরে শক্তি দিয়ো বহিবারে এই গুরু ভার!

শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (এম-এ) ।

বিজ্ঞান-জগৎ

বিষ-বাষ্প ভয় নাই

এ যুদ্ধে বিষ-বাষ্প ছিটাইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা-নিবিশেষে শত্রু-নিপাতে কোনো পক্ষে উত্তোগ-আয়োজনের সময় সীমা নাই, তেমনি এ বিষ-বাষ্পকে ঠেকাইয়া জীবন-রক্ষার জন্য মানুষের সাধনাও অপরি-সীম! বিষ-বাষ্প-বোধক এক-রকম মুখোশ তৈয়ারী হইয়াছে, কটি ছেলেমেয়েদের জন্য এ মুখোশ অমোঘ নিরাপদ। এই মুখোশ-বস্ত্রের সঙ্গে একটি ব্যাগ আঁটা আছে। ব্যাগটির কোথাও এমন রক্ষা নাই,



মাথের কোলে শিশু

যাহা দিয়া বিষ-বাষ্প ভিতরে প্রবেশ করিবে। এই ব্যাগের মধ্যে শিশুকে শোয়াইয়া শিশুর মাতা যদি মুখে-মাথায় মুখোশ আঁটেন, তাহা হইলে দু'জনেই সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবেন। মুখোশ আঁটিয়া মা বিস্তৃত নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করিবেন; সে-বাতাসে মা ও শিশু উভয়েরই জীবন রক্ষা পাইবে। যে-শিশু ভালো করিয়া নিশ্বাস-বায়ু-গ্রহণে অভ্যস্ত হয় নাই, সে-শিশুও এ মুখোশ-বস্ত্র-মারফৎ বিস্তৃত নিশ্বাস বাতাস অনায়াসে পাইবে।

লেঙ্গের পোষাক

কালিকোনিয়ার লর্শ-এঞ্জেলেশ সহরেব এক জন চশমাওয়ালার কাছে লেন্স দিয়া নারীর পরিচ্ছদ গোটাভাবে তৈয়ারী করিয়াছেন।

মাথার টুপি-ঝাড় হইতে গ উন, কশেট, মায় পা-জামা, কোমরবধ— সমস্তই কাচের লেন্সে নিশ্চিত। পোষাকটি তৈয়ারী করিতে

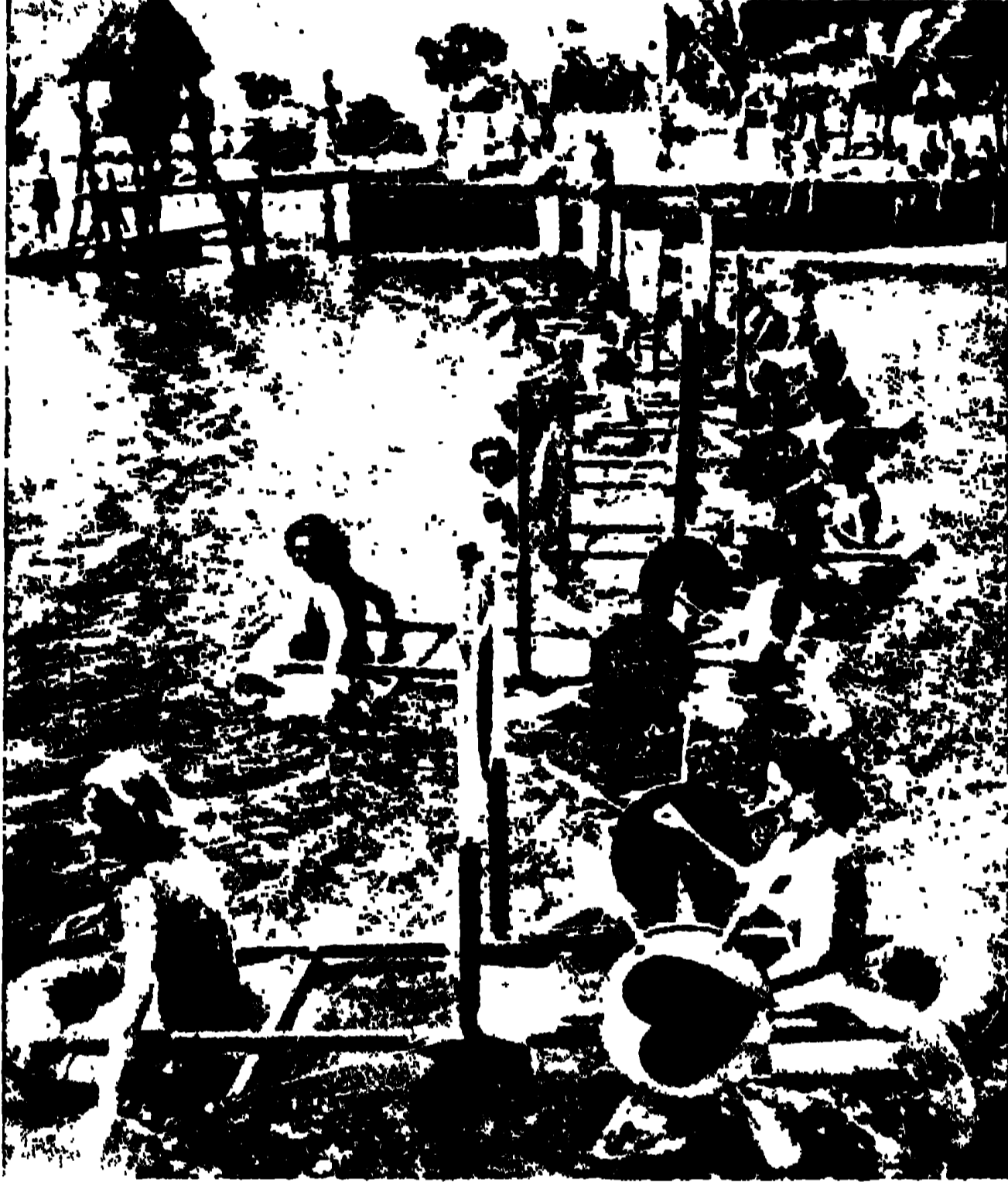


লেঙ্গের পোষাক

যে বছ শত লেন্স লাগিয়াছে, তার মোট দাম প্রায় তিন হাজার টাকা!

জলখেলা

আমেরিকার মিয়ামি প্রদেশে জলের বুকে খেলায় সঙ্গে বায়ামের এক লীলা-মধুর প্রথা প্রবর্তন হইয়াছে। এ-খেলা যেমন নিরাপদ, তেমনি এ-খেলায় ব্যায়াম-সাধনা সম্পাদিত হয়। মোটরবৈদ্যুতিক টায়ারের ছুঁটি টিউব ফুলাইয়া পাশের ছবিব দ্বিত্তে জল-বান তৈয়ারী করিয়া মেয়েবা সেই জল-বানে বসিয়া দুই বাছ দিয়া জল কাটিয়া নিরাপদে জলের বুকে যেমন-খশী বিচরণ করিতে পাবেন। কৌশলে টিউবের মাঝে



ভেসে চলে! বঙ্গে

একখানি তক্তা আঁটিয়া বসিবার আসন নির্মিত হইয়াছে। এক-একখানি টায়ার-বানে দু'জন বসেন,—এক জন বসেন সামনের আসনে, আর এক জন পিছনে!

জলাশয়ের স্বাস্থ্য-রক্ষা

দীঘিতে, পুকুরে, বিলে বা ছোটখাট নদীর বুকে বিবিধ গুণ্ডা জমিয়া গমন হয় যে, দীঘি-পুকুর নদী-বিল মজিয়া যায়; সে দীঘি-বিল-নদী



জল-গুণ্ডা-কাটা বোট

কোনো দিক দিয়া আর ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। সহজে এবং দ্রুত এ জল-গুণ্ডাটির উচ্ছেদকল্পে আমেরিকার টেক্সাস-নিবাসী এক জন বৈজ্ঞানিক গুণ্ডা-কাটা বোট তৈয়ারী করিয়াছেন। হালকা মোটর-এঞ্জিনে এ-বোট চলে। বোটখানি আগাগোড়া ইস্পাতের তৈয়ারী বলিয়া বেশ মজবুত। বোটের সামনে ধারালো গাছ-কাটা 'মোয়ার' যন্ত্র (mower) লাগানো আছে; হাল আছে, সে হালের সাহায্যে বোটখানিকে চারি দিকে যেমন-খশী চালানো যায়। সামনে ধারালো ব্রেডের মোয়ার থাকার জন্ত যত ঘন গুণ্ডাই জলে জমিয়া থাকুক, বোটের গতি রুদ্ধ হইবার এতটুকু আশঙ্কা নাই।

প্রান্তর-আসন

বেশের বা খেলার মাঠে দর্শকের দল স্বচ্ছন্দে বসিয়া বেশ ও

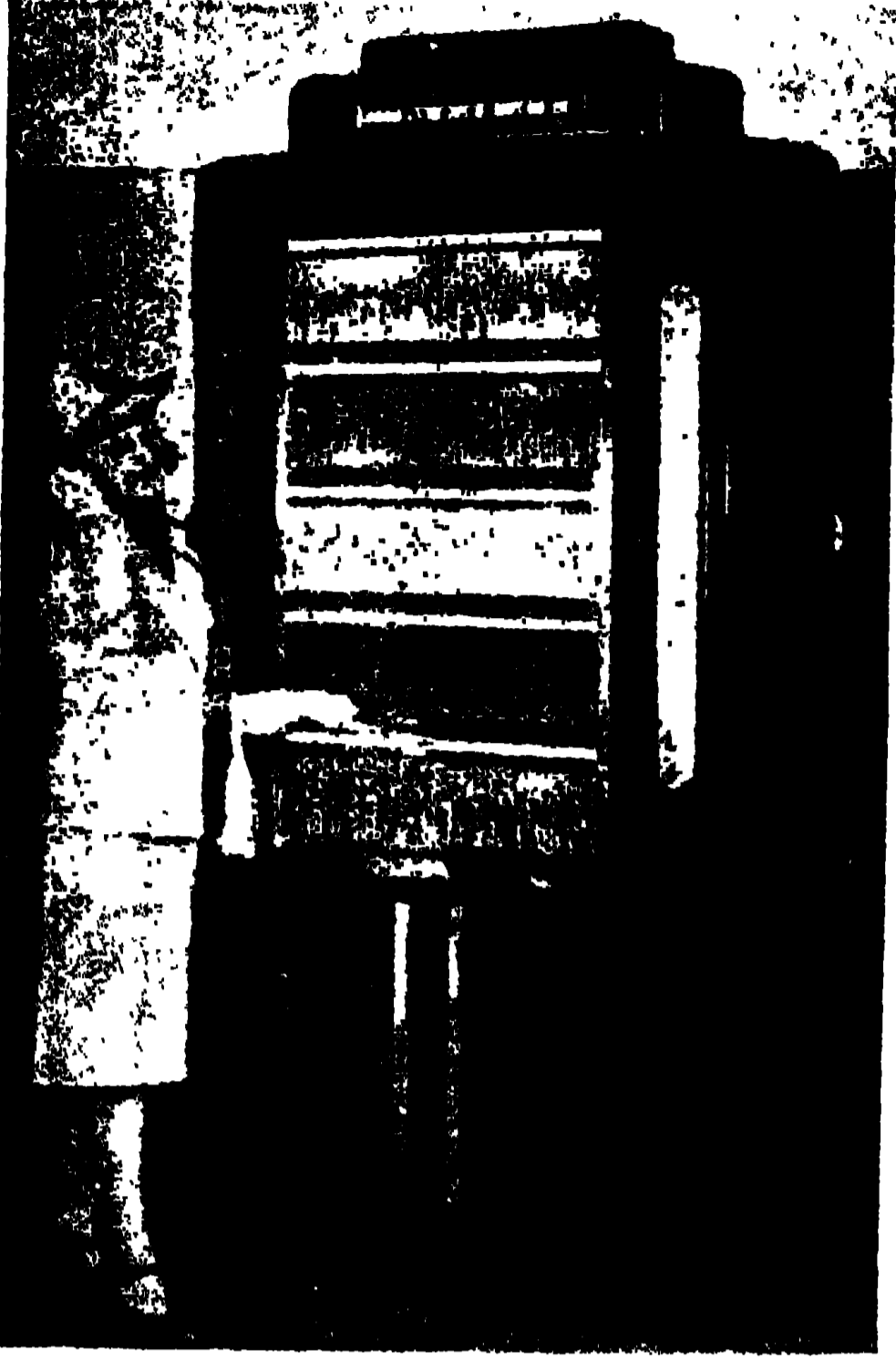


চাক্ৰি খুলে বসুন

খেল দেখিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার মাঠে দর্শকের জন্ত চমৎকার আসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাব-সার খুঁটি পুঁতিয়া সেই খুঁটিতে সকেট আঁটিয়া পুর কাঠের নিবেট ও স্তম্বগুল চক্র সংলগ্ন করা হইয়াছে; খুঁটির গায়ে এই চক্র সিধাভাবে আঁটা থাকে। বসিবার সময় বোতাম টিপিলে খুঁটির মাথায় এ-চক্র আসন বিছাইয়া দেয়, তখন আনামে বসিয়া খেলা দেখুন, ঘোড়-দৌড় দেখুন।

যন্ত্র-খবরদার

কোন সহরের কোথায় কোন বড় হোটেল, থিয়েটার, সিনেমা-হাউস, স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং বা ক্লাব আছে, সে খবর জানিতে হইলে আমাদের অতিকায় ডাইরেক্টরি খুলিতে হয়। সম্প্রতি আমেরিকায় এক-রকম যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে; যন্ত্রের গায়ে বড়-বড় পাঁচ শো সহর ও গ্রামের নাম ছাপা আছে। এই যন্ত্রের মণি-কোটেবে নির্দিষ্ট মুদ্রা ফেলিয়া যে সহরের হোটেল বা থিয়েটার প্রভৃতির ঠিকানা বা সংবাদ জানিতে চান, সহরের নাম দেখিয়া তার গায়ে যে-বোতাম আছে,

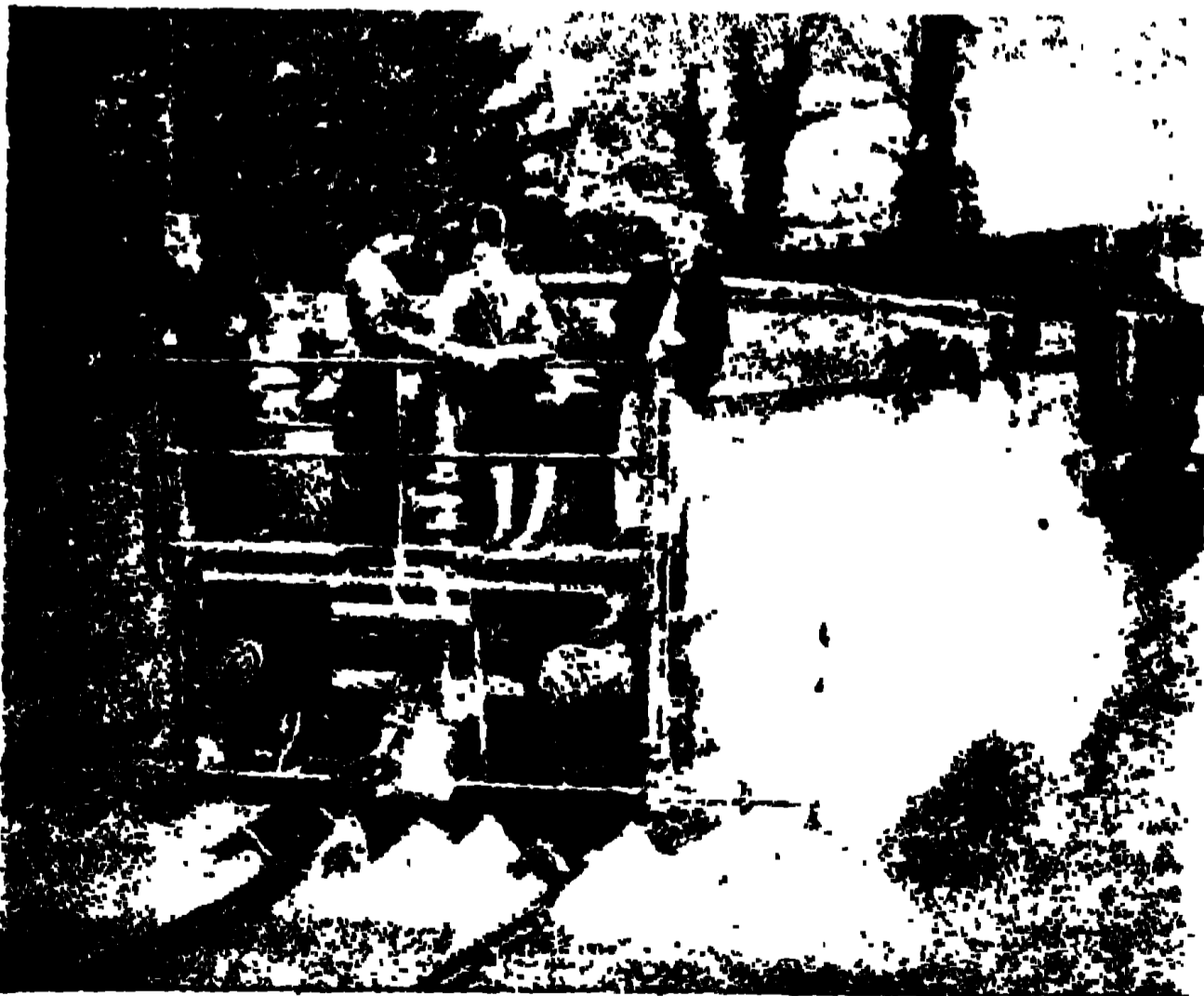


ডাইপেক্টার-যন্ত্র

সেই বোতাম টিপিয়া যন্ত্র-সংলগ্ন টেলিফোন-রিসিভার লইয়া প্রশ্ন করুন—অমুক সহবে অমুক থিয়েটার কোন্ রাস্তার উপরে? যন্ত্র-টেলিফোনে এ-প্রশ্নের সঠিক জবাব পাইবেন।

বালির নিচে উর্বর-জমি

আমেরিকায় বহু জমি দীর্ঘকাল জলে ডুবিয়া থাকিবার ফলে রুক্ষ বালুচরে ঢাকিয়া অমুর্কব হয়। এখন সে বালি সরাইয়া সেট



বালুকার নিচে উর্বর-জমি

সব জমির বুকে মাটি বাহির করিয়া সেই মাটিকে উদ্ধার ও উর্বর করিয়া তোলা হইতেছে।

এ মাটির উদ্ধারকল্পে এক জন মার্কিন এঞ্জিনিয়ার অতিকায় যন্ত্র-লাঙ্গল নির্মাণ করিয়াছেন। বালির বুকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে এই যন্ত্র-লাঙ্গল চালাইলে প্রায় ছ'ফুট গভীর বালুকাবাশি উৎক্ষিপ্ত হয়—বালির নীচেকার উর্বর কালো মাটি উপরে ওঠে। লাঙ্গল-সংলগ্ন পাত্রে এ বালুকাবাশি তুলিয়া আনর্জনার মতো সহজে ফেলিয়া দেওয়া চলে।

টুথ-ব্রাশ

দাঁত মাজিবার জন্ত সাধারণতঃ আমরা যে টুথ-ব্রাশ ব্যবহার করি, তাহাতে দাঁত-মাজায় বহু গলদ থাকিয়া যায়। এজন্ত বিলাতে

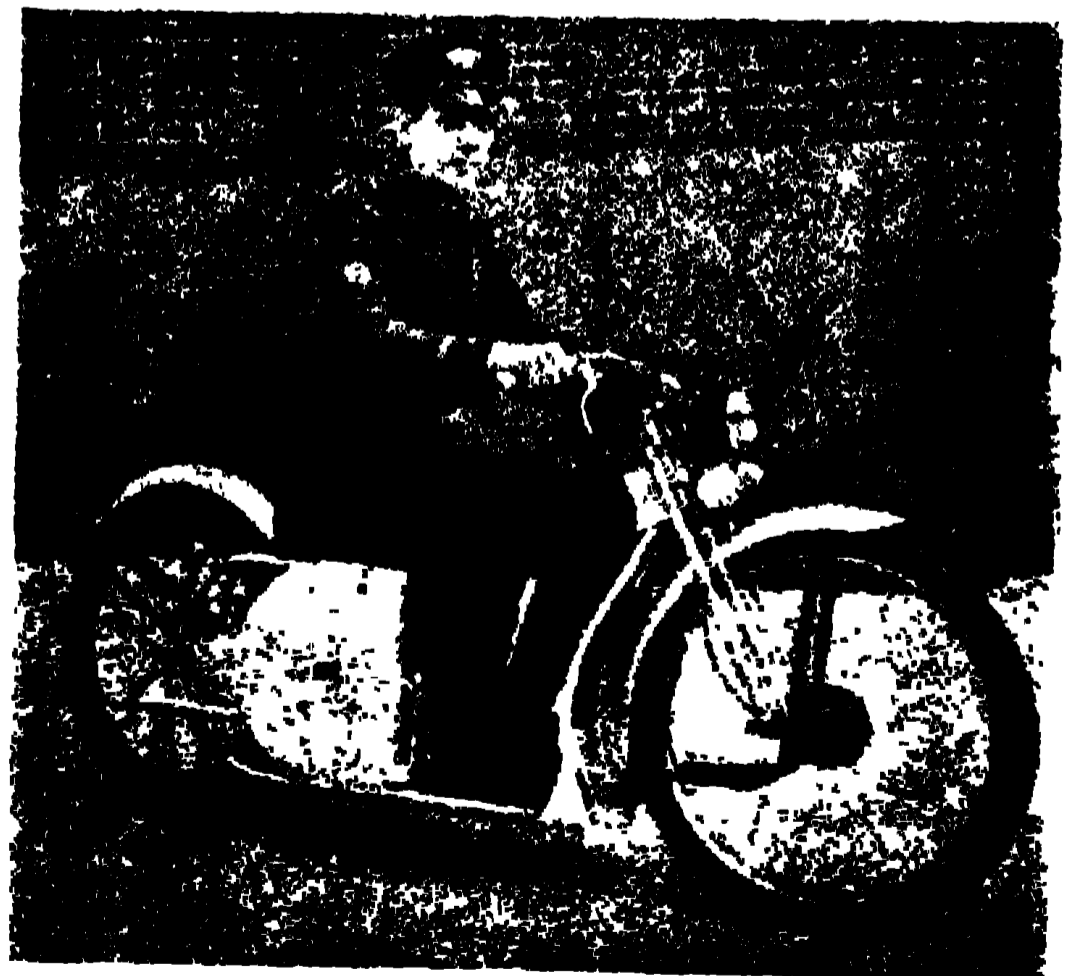


সুদর্শনা

ইংরেজী ইউ-অক্ষরের ছাঁচে টুথ ব্রাশ তৈয়ারী হইতেছে। এ টুথ-ব্রাশের সাহায্যে দাঁতের ভূঁপঠ সমান ভাবে পরিষ্কার করা যায় এ-টুথ-ব্রাশে দাঁত মাজিতে যেমন কম সময় লাগে, তেমনি দাঁতের স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে এ-ব্রাশ খুব অনুকূল।

মোটর-বাইকে প্যাডল্ নাই

আমেরিকায় টেলিগ্রাফ-পিয়নদিগের জন্ত মোটর-বাইক তৈয়ারী হইয়াছে। এ-বাইকে প্যাডল্ নাই। কাজেই চালাইতে পরিশ্রম



প্যাডল্ নাই

করিতে হয় না। এ-বাইক ঝড়ের গতিতে চলে এবং দীর্ঘ-চালনাতেও চালকের ক্লান্তি ধরে না।

বিছানার চাদর

বিছানার চাদর পাতিয়া শয্যা-প্রসাধনে একটু কারিগরির প্রয়োজন। তোষকের নীচে চাদর এমন ভাবে গোঁজা চাই, ছাঁদ যেন বেয়াড়া না

সর্বস্ব ফ্যান

গীম্ব আসন্ন,—ইলেক্ট্রিক ফ্যানের স্ববান্ধা না হইলে অস্বাচ্ছন্দ্যেব সীমা থাকবে না। নিখিতে বসিতে গবনে প্রাণ যায়, ফ্যান চাই! শয়নের সময় ফ্যান না চলিলে স্ননিদ্রা হইবে না,—তাব পর আত্মীয়-বন্ধুব সঙ্গে বসিয়া ছুঁটা গল্প করিব, স্বথ হুঃখের কথা কহিব, তখনো ফ্যান চাই! অথচ প্রতি ঘবে একমাত্র ফ্যান রাখিতে অনেক খবচ! এক বিলাতী কোম্পানি বিশেষ-বকম পায়। জুড়িয়া এমন ফ্যান তৈয়ারী করিয়াছেন যে, সেই পায়ের বৈশিষ্ট্যে এ ফ্যানকে টেবিলে রাখিলে, দেওয়ালে ব্রাকেট-সংলগ্ন করিলে, খাটে আটকাইয়া দিন—সকলত্র



এমনি ভাবে চাদর বিছান



এ ফ্যান সর্বত্র চল

এ ফ্যান সহজ ভাবে সেবা-পরিচর্যা করিবে। ফ্যানটি আকারে ছোট; এজন্য বৈজ্যতিক প্রবাহের বায় যে কম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হয়! অর্থাৎ ঝাঁকটোরা ভাবে চাদর পাতিলে চলিবে না। সব দিকে সমান মাপ বজায় রাখা সহজ হইবে—যদি চাদরের চাপ-প্রাপ্তে বড়ান সূতা দিয়া টানা-ধারি-লাইন বুনিয়া রাখেন। রঙের দক্ষণ চাদরখানি ভালো দেখাইবে। এবং চাদর শুষ্কিবার সময় কোন দিকে ঝাঁকিয়া চুবিয়া থাকিবে না।

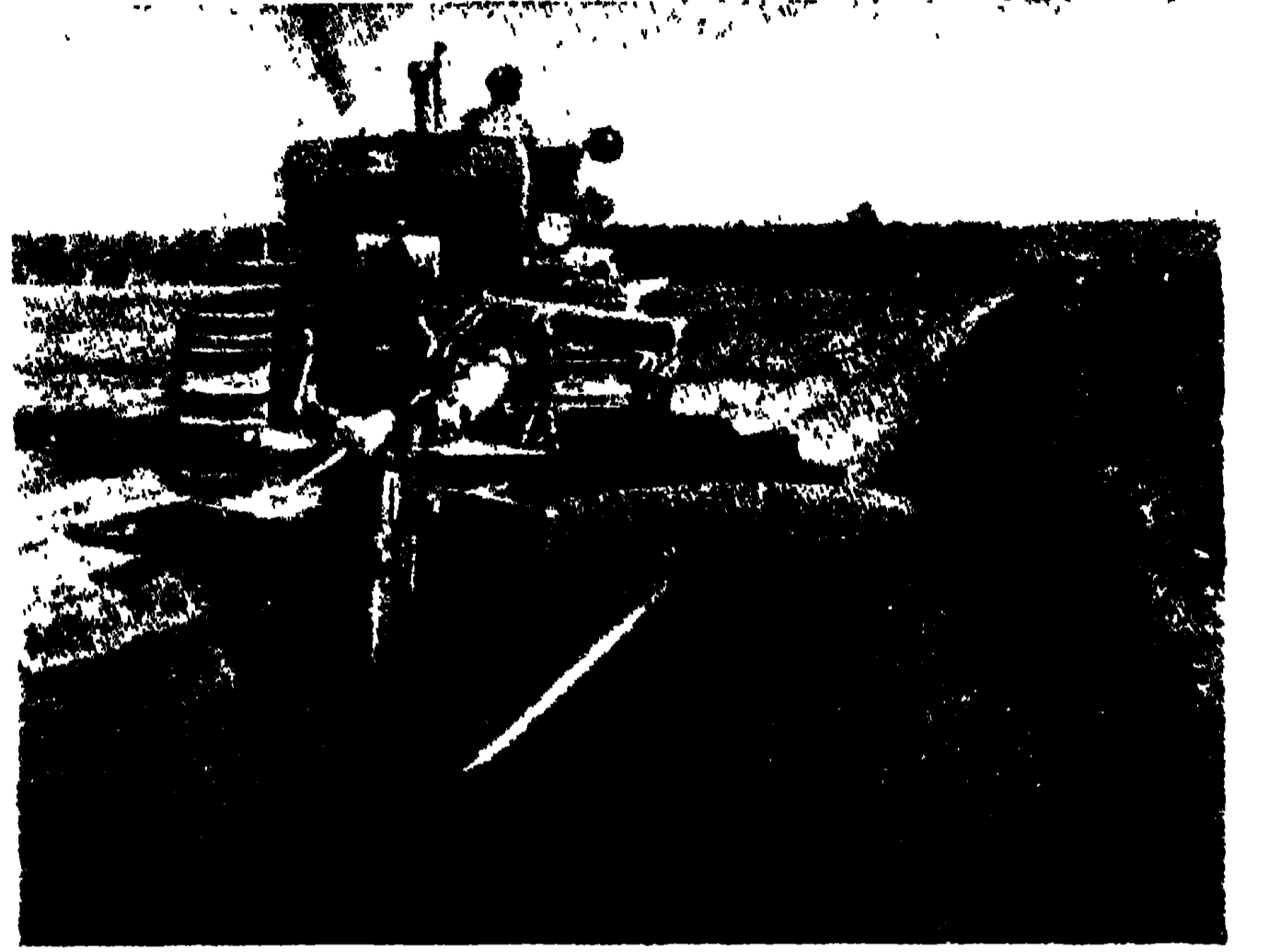
মুখের খোল-বদল

খাঁদা নাক, কোঁচা নাক, বড়ি নাক, চিপ্পি গলা, ঝাঁক কপাল—এ সব সাবাইয়া মুখখানিকে নিটোল সুছাঁদে গাড়িয়া কননায় করিয়া তুলিবাব জন্ত আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা এক বিচিত্র লোশন তৈয়ারী করিয়াছেন। শিকের মুখোস এ-লোশনে ভিজাইয়া সেই মুখোস নির্দেশ-মতো মুখে আঁটিতে হইবে; নাক-কপাল-গাল—যেখানকার

যে-খুঁৎ সারানো প্রয়োজন, ঠিক তার অল্পরূপ মুখোস মেলে। সে মুখোশ মুখে আঁটিয়া রাখুন—মাসগানেক—শুধু রাত্রে শয়ন করিবার সময়। ভোল বদলাইয়া মুখশ্রী যা হইবে, আয়নার সে-মুখ দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।



লোশনে মুগের চাট-বদল



আবকে অগাছা-সফ

আগাছার ঘম

রেলোয়ে-লাইনের বা পথেব ধানে-ধারে যে আগাছা জন্মিয়া দারুণ
জঙ্গল গড়িয়া তোলে, সে আগাছা মরিয়া পথ পবিষ্কার রাখিবাব
উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকের দল এক-বকম আবক তৈয়ারী

এমন গুণ সে, আগাছার মূল পর্যন্ত দধ—ভঙ্গ করিয়া দেয়। ১১৫০০
গ্যালন জলে এ আবক ৪০০ গ্যালন মেশানো প্রয়োজন। এক
মাইল-ব্যাপী ঘন আগাছা সফ করিতে এ মিকশচার লাগে চারি
শত গ্যালন।

উন্মুখ

আমি—ফাগুন বনের গন্ধ-মুকুল
মুগ্ধ বিহ্বল সুবাসে ব্যাকুল ধরণী
সবুজ প্রাণের গানের ছন্দে
অরুণ আলোকে ভাসাই জীবন-তরণী।
পাখীর পাখায় দিগ্বলয়ের কক্ষে ছুটি
যোগ ক'রে দেই অসীম নভের প্রান্ত ছুটি ;
ধরার মানুষ কেমন ক'রেই
বুঝবে আমার যোজনব্যাপী সরণি ?

আমি আলোপা দেবকুমারের
নন্দন রচি মরু-মরতের বক্ষে
রোশনাই জালি বন্ধা নিশীথে
মানুষ জাতির হাজার সুনীল লক্ষ্যে ;
হাস্তে লাস্তে মণি মুক্তার মাল্য ঝরে
নিয়ে আসি খোঁজ দূর-নেবুলার মাটির ঘরে,—
বাথা বেদনার কণ্টক শাখে
গোলাপ ফোটাই শত মানুষের চক্ষে।

কল্পনা দিয়ে আলনা রচি
স্বর্ণ করি যে মলিন ধরার পক্ষে
প্ৰীতি সরলতা ত্যাগের কুসুম
ফোটে থরে থরে হৃদয়-বাগিচা-অন্ধে ;
কে কান্দে কোথায় আর্ন্ত আতুর সহায়হীন
তারি পাশে পাশে বেজে ওঠে মোর মোহন বীণ
বিপদ বেদনা তুচ্ছ মানি যে
বাজাই নিয়ত জয়-গৌরব শঙ্খে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান তপস্তা মোর—
আভালাঁশ ডাকে, ডাকে বারে বারে সিদ্ধ
নিত্য নবীন বাসনা সাধনা
মৃত্যুরে জিনি খেলনা অরুণ ইন্দু।
চালুবো আমি চালুবো আমি হর্ষ স্মখে
শান্তিপিয়ুষ দীন ছনিয়ার গুফ মুখে
জান কি তোমরা মস্তকে মোর
বধিত হয় দেবের আশিস-বিন্দু ?

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ।



অন্ধ ভিখারী

(গল্প)

কৃষ্ণগোপাল রাগিয়া আশুন !

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক কৃষ্ণগোপাল...ঘরে বসিয়া উপন্যাস লিখিতেছে, হঠাৎ বাড়ীর দ্বারে বাহিরে এক ভিখারী বেহালা বাজাইয়া গান শুরু করিল। অনেক ভাবিয়া, অনেক মাথা খাটাইয়া নূতন উপন্যাসের নায়িকা কুঞ্জলতার মনের স্বন্দর একটা আদরা মাথায় আনিয়াছে, সে-স্বন্দর কথা কাগজে লিখিবে, এমন সময় ঐ ভিখারীর গান !

ভিখারী গাহিতেছিল,—

বঁধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনাইছু
সকলি বিফল ভেল মোব বে!

ভালো আপদ !

এ যুগে বঁধুর সঙ্কেতে নায়িকা বেশ বানায় না এবং বঁধু না আসিলে সে-বেশ বিফল হয় না। এ-যুগের নায়িকা হেলার স্পর্শে কাঁদিয়া অমন ধূলায় লুটায় না ! এ-যুগে...

এই কথাটাই তার উপন্যাসের নায়িকা কুঞ্জলতার মনকে অবলম্বন করিয়া সে ভানায় প্রকাশ করিতে চায় !

ভিখারীর গানে কুঞ্জলতার মন, কুঞ্জলতার মনের স্বন্দ কোথায় যে ভাসিয়া গেল !

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া ঘরের সার্শি বন্ধ করিয়া কৃষ্ণগোপাল আবার কুঞ্জলতার মনকে ফিরিয়া পাইবার জন্ত ধ্যানস্থ হইল...

কোনো মতে কুঞ্জলতার মনের সে-কথার ছ'চারিটা টুকরা...

সে-টুকরাগুলোকে খাড়া করিয়া দানা পাকাইবে, আবার ও-দিকে ভিখারী চড়া গলায় গান ধরিল—

না জানি বঁধুরে মোব কেবা লৈয়া গেল গো
এ বাদ সাধিল জানি কোয় বে!

বেচারী কুঞ্জলতা সহিতে পারিল না, ত্রুশ্বে সে কৃষ্ণগোপালের মন হইতে পিছলাইয়া সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল ! রাগে জ্বলিয়া কলম রাখিয়া কৃষ্ণগোপাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, উঠিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে ঘরের পাশে রোয়াক। সেই রোয়াকে বসিয়া শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভিখারী গান গাহিতেছে...

কৃষ্ণগোপাল সরোষে ধমক দিল—এই...

রুদ স্বরে ভিখারীর বেহালা থামিল, সঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠ নীরব হইল।

ভিখারী কহিল,—আমায় বলছেন, বাবু ?

—হ্যাঁ।

—বলুন...

—গান গাইবার আর জায়গা পাওনি ! আমার রোয়াক থেকে সরে পড়ো। এখানে গান চলবে না।

ভিখারী চমকিয়া উঠিল ! কহিল,—বাড়ীতে কারো অসুখ করেছে বুঝি ?

অসুখ ! কৃষ্ণগোপালের শিল্পী-মনের অসুখ...

তর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল না ! তাই কৃষ্ণগোপাল বলিল,—হ্যাঁ, অসুখ !

ভিখারী একেবারে এতটুকু হইয়া গেল ! কহিল,—আমি জানতুম না, বাবু। এখন আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি...

বেহালাটি বুকে তুলিয়া ভিখারী উঠিয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল...

কৃষ্ণগোপাল দেখিল, ভিখারী অন্ধ !

মনের কোণে ছোট একটু আঘাত ! পকেটে ছিল পার্শ। পার্শ খুলিয়া একটা ছ'আনি বাহির করিয়া ভিখারীর হাতে দিল ; কহিল,—এই নাও।

ভিখারী ছ'আনি লইল, লইয়া গাঢ় কণ্ঠে কহিল—
ভগবান ভালো করুন বাবা... তোমার বড় দয়া! আমি
আর এখানে গান গাইবো না। বাড়ীতে অসুখ...

ভিখারী সতর্ক ভঙ্গীতে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণগোপাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রছিল।

তার মন বলিল, কল্পনা লইয়া আনন্দ পাও বাপু!
বাস্তবকে উপেক্ষা করো...বাস্তবকে আজ মিথ্যা দিয়া
সরাইয়া দিলে...কল্পনার খোরাকের জন্ত!

হাতড়াইতে হাতড়াইতে ভিখারী অদূরে গিয়া পার্কের
রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইল; তার পর সেইখানে দাঁড়াইয়াই
বেহালায় ছড়ি বুলাইল। বেহালায় করুণ সুর জাগিল।

ফিরিয়া কৃষ্ণগোপাল দেখে, রোয়াকের উপর একটা
টিন পড়িয়া আছে...সিগারেটের খালি টিন! টিনের
মধ্যে ক'টা পয়সা। বুঝিল...

ভিখারীর টিন...এ-টিনে আছে তার সঞ্চয়।

কি মনে হইল, টিনটি লইয়া কৃষ্ণগোপাল ভিখারীর
কাছে আসিল। বলিল—তোমার টিন ফেলে এসেছিলে
...নাও...

ভিখারী বলিল,—ও...

সে হাত বাড়াইল। কৃষ্ণগোপাল তার হাতে টিন
দিল। ভিখারী কহিল—ভুলে গেছলুম বাবু...চোখে
দেখতে পাই না তো...

কৃষ্ণগোপাল বাড়ী ফিরিল...একেবারে নিজের ঘরে
—ঘরে আসিয়া ফাউন্টেন-পেন হাতে লইল...

পথে ভিখারী তখন গান গাহিতেছে—

আমার বঁধুয়া আন-ঘরে যায়

আমারই আঙিনা দিয়া।

গলাটি বেশ—গায় ভালো...

কৃষ্ণগোপাল ভাবিল, মেজাজও ভালো...অত
ভিখারীর মতো নয়...বিনয়ী, ভদ্র!

মনের দ্বারে কুঞ্জলতা স্মার দেখা দিল না। কৃষ্ণ-
গোপালের শত ধ্যান-ধারণাতেও না...

এক দিন ছ'দিন কাটিয়া গেল। উপজ্ঞাসের পঞ্চম
পরিচ্ছেদ যেন ঝাঁকিয়া বসিয়াছে...কিছুতেই সে-পরিচ্ছেদ

কলমে ধরা দিবে না। কৃষ্ণগোপালের মনে পড়িতেছিল,
ছেলেবেলায় কথামালায়-পড়া সেই শৃগাল ও ড্রাকফলের
গল্প! লতায় লতায় পাকা-পাকা ফল ঝুলিতেছে...শৃগাল
চোখে দেখিতেছে, কিন্তু নাগাল পায় না! কুঞ্জলতার
মনকেও তেমনি সে স্পষ্ট দেখিতেছে...কিন্তু সে-মনের
নাগাল পাইতেছে না...কিছুতে না!

তার কল্পনার যেমি ব্যাধি হইয়াছে! যে-কল্পনা
ইঙ্গিতমাত্রে আসিয়া উদয় হইত, সে-কল্পনার আজ এ কি
হইল?

কৃষ্ণগোপালের মনে দারুণ চাঞ্চল্য...সুখ নাই, শান্তি
নাই! বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ ভালো লাগে না! সন্ধ্যার সময়
সিনেমা দেখিতে গেল। ছবির একটা দৃশ্যও মনে দোলা
দিল না...চোখের সামনে খালি কতকগুলো ঘটনার
হিজিবিজি...

সিনেমা হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণগোপাল মাঠে খুব
খানিকটা পায়চারি করিয়া বেড়াইল। কার্জন গার্ডনসে
আসিল। সবুজ গভীরেখার মধ্যে রাশি-রাশি মণ্ডমণ্ড
ফুল ফুটিয়া আছে...এ্যাণ্টারহিনাম, লার্কস্পার, প্যান্সি,
ফ্লক্স...কৃষ্ণগোপাল কুঞ্জলতার কথা ভাবিতে লাগিল!
পুরাণের সাধকেরা যেমন নিষ্ঠাভরে উপাস্ত-দেবতার ধ্যান
করিতেন, তেমনি করিয়া কুঞ্জলতার ধ্যানে কৃষ্ণগোপাল
তন্ময়!

কিন্তু পাষাণী কুঞ্জলতা তার মনের দ্বারে চরণপাত
করিল না।

হোয়াইটাওয়ার বড় ঘড়ির পানে নজর পড়িল। রাত
দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পথে গাড়ী-ঘোড়া লোক-জনের
কোলাহল ক্লাস্তি-মহুর হইয়া নিশ্চিহ্ন হইবার জো!

কৃষ্ণগোপাল আসিয়া একটা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া
বসিল এবং একেবারে নিজের গৃহে আসিল।

পরের দিন।

বেলা তখন দশটা। কৃষ্ণগোপাল কোথায় বাহির
হইয়াছিল, এখন বাড়ী ফিরিতেছে...

একটা দোকানের সামনে দেখে সেই ভিখারী।
দোকানী তাকে ধমক দিতেছে, বলিতেছে—

কেনা-বেচার সময় ভারী জ্বালাতন শুরু করলে তো! এখান থেকে যাও দিকিনি...গান গাইতে হয়, অন্তত যাও...

বেচারী!

কৃষ্ণগোপালের মনে হইল, সে-দিন এ-ভিখারীকে সে গৃহদ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল! হয় তো সেই পাপে কুঞ্জলতা অভিমান করিয়া তার মনের দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছে! কৃষ্ণগোপাল আসিল ভিখারীর কাছে; বলিল—শুনছো?

ভিখারী বলিল—আমায় বলছেন?

—হ্যাঁ।

—এই যে আমি সরে যাচ্ছি, বাবা। অন্ধ-মানুষ...

কৃষ্ণগোপাল বলিল—সরে যেতে বলিনি। সে-দিন আমার রোয়াকে বসে তুমি গান গাইছিলে। বাড়ীতে অন্ধ বলে আমি সে-দিন চলে যেতে বলেছিলুম... আমার বাড়ীতে অন্ধ আর নেই।—তুমি আমার রোয়াকে বসে গান গাইবে, এসো...

ভিখারীর মুখে আনন্দের জ্যোতি।...ভিখারী বলিল—অন্ধ সরে গেছে? আঃ!

ভিখারীর স্বরে কি আশ্চর্য!

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আমি হাত ধরছি, এসো আমার সঙ্গে।

ভিখারী বলিল—তোমার জয় হোক বাবা! তোমার রোয়াক মোড়ের উপর কি না...পাঁচ-জন ভালো লোক যায় ও-পথে—হু'-চার পয়সা দয়া করে তাঁরা এই অন্ধকে দিয়ে যান কি না...

কৃষ্ণগোপাল লিখিতে বসিল—গেই পরিচ্ছেদ... ঝোলা খড়খড়ি দিয়া ভিখারীকে দেখা যায়। বাহিরে রোয়াকে বসিয়া ভিখারী বেহালা বাজাইয়া গান গাহিতেছে,—

আজু রজনী হয় লাগে পোহায়
পেখলু পিয়ামুখ-চন্দা

কৃষ্ণগোপাল ভাবিল, বাঃ! গরীব ভিখারী...গান গাহিয়া ভিক্ষা করে! বৈষ্ণব-পদাবলীর উপর তার এমন অমুরাগ! এত পদাবলী মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে! শুধু

মুখস্থ নয়—গাহিতেছে! বেশ গায়! যেমন গলা, তেমনি গানে যেন একেবারে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া গায়।

কৃষ্ণগোপালের মনের দ্বার হইতে কুঞ্জলতা সরিয়া গেল...মনের দ্বারে ভিখারী আসিয়া বসিল।

মমতার মন পূর্ণ হইল। কৃষ্ণগোপাল ভাবিল, সৌখীন সমাজের সখের সুখ-দুঃখের কথা লিখিয়া বাহবা আদায় করি। সে সৌখীন সুখ-দুঃখের সহিত মানুষের সত্যকার প্রাণের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সত্যকার ফুলে-পাতায় যে শোভা, যে গন্ধ-বর্ণ, যে মাধুরী—কাগজের ফুলে কোথায় তা! এই ভিখারী...কোথা হইতে সে এ-সব গান শিখিল? ভিক্ষা পেশা...তবু যা-তা গান গাহিয়া ভিক্ষা চায় না! যে-গান শুনায়, সে-গান শুনিলে মতো! পথে বসিয়া গান না গাহিয়া ও যদি রেডিয়ার আসরে বসিয়া গাহিত, গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান গাহিত, তাহা হইলে অনেক বেশী পয়সা পাইত! ভিক্ষার পয়সা নয়—আনন্দ দিয়া তার দাম আদায় করিতে পারিত! রেডিয়ার যারা গায়, গ্রামোফোনের রেকর্ডে যারা গায়, তাদের কারো চেয়ে খারাপ নয় এই পথের ভিখারীর গান!

কৃষ্ণগোপালের মনে হইল, সৌখীন সমাজের হীরক-নীরা, রেবা-দীপকের মিথ্যা গল্প না লিখিয়া যদি এই ভিখারীর সত্যকার দুঃখের কথা, তার কঠিন নির্ভর অভাব-অভিযোগের কথা লেখার অঙ্করে গাঁথিয়া তুলিতে পারিত, বেচারার চারি দিকে কি সুখ-ঐশ্বর্য...কতখানি বেদরদ...

বেলা তখন প্রায় এগারোটা...স্নান করিবার জন্য কৃষ্ণগোপাল উঠিল। চোখ পড়িল ভিখারীর উপর...

এক জন নারী...ভিখারীর পাশে আসিয়া বসিয়াছে। একটা থালায় অন্ন বাড়িয়া আনিয়াছে...লাল-লাল মোটা চাল, একটু তরকারী...

বোধ হয়, ভিখারীর স্ত্রী। ভিখারীর ঘরে বাস করিলেও নারীর মুখে মহিমার ছায়া লাগিয়া আছে।

পরের দিন কুঞ্জলতার দয়া হইল...সে আসিয়া কৃষ্ণগোপালের মনের দ্বারে দাঁড়াইল। কৃষ্ণগোপাল হুঁটো পরিচ্ছেদ লিখিয়া ফেলিল...

এবার সপ্তম পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদে উপন্যাসের
প্লটে মস্ত মোচড় দিতে হইবে...একটা জটিলতার জাল
কাঁদিয়া বসিবে!

পথের দিক চাহিল।

কি একটা যোগ আছে! এ পথ দিয়া মেয়েরা
চলিয়াছে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে। ভিখারীর গান
শুনিয়া অনেকে দাঁড়াইয়া তার গান শুনিতোছে, তার
পাশের সেই টিনটিতে পয়সা দিতেছে, চাদরের ঝুলিতে
চাল দিতেছে, আনাঙ্গ-তরকারী দিতেছে। কৃষ্ণগোপাল
ভাবিল, মাহুধকে বিধাতা তৈয়ারী করিয়া সংসারে
ছাড়িয়া দিয়াছেন...কি উপায়ে, কি সাধ্য-সাধনায় যে
তাকে অন্ন সংগ্রহ করিতে হয়—পয়সার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া
এ-কথা কোনো দিন ভাবিয়া দেখে নাই! দেখিবার
অবসর পায় নাই..অবসর ছিল না! আজ একেবারে
চোখের সামনে মনের উপরে সে-দৃশ্য...

কুঞ্জলতার উপর রাগ হইল। তোমরাই শুধু ভিড়
করিয়া মনের উপরে আসিয়া দাঁড়াও..তোমাদের চুড়ির
শিজিনী-রব, শাডী-ব্লাউশ...ও-সবে এমন আড়াল তুলিয়া
ধরো যে, তোমাদের পিছনে যে-সব গরীব-হুঃখা...তারা
চোখে পড়ে না!

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। মাথায় একটা নূতন
প্লট উঁকি দিতেছে! এই ভিখারীকে কেন্দ্র করিয়া এক
হৃদয়ভেদী কাহিনী...এ ভিখারী যেন এক দিন সুখের
মুখ দেখিয়াছিল...গান-বাজনায়, বিলাস-সীলায় দিন
কাটিয়াছিল! এক দিন উহার সভায় চাটুকার-দলের মস্ত
ভিড় জমিত! তার পর তাদের পরিচর্যা করিতেই সব
বিভব উবিয়া গেছে...

রোয়াকে প্রথর রৌদ্র। ফাল্গুনের তপ্ত রৌদ্র..সে-
রৌদ্রে বসিয়া আছে ভিখারী...চুপ-চাপ। পথে তেমন
লোক নাই। কার জন্ত গান গাহিবে? কিথা হয় তো
দারুণ গ্রাঞ্জে...

আকলু বেয়ারা চায়ের পেয়ালা দিয়া গেল। কৃষ্ণ-
গোপালের কি খেয়াল হইল...পেয়ালা হাতে সে আসিল
বাছিরের রোয়াকে। ভিখারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—
বউ রোদ্দুর! খুব কষ্ট হচ্ছে...না?

ভিখারী বলিল,—সয়ে গেছে বাবা...রোদে আর
কষ্ট হয় না...

কৃষ্ণগোপাল বলিল,—চা খাবে?

ভিখারী হাসিল...কহিল,—চা?

—হ্যা...খাও না।

—আপনার দয়া...

কৃষ্ণগোপাল আকলুকে ডাকিল। আকলু আসিল।
কৃষ্ণগোপাল বলিল,—একে এক-পেয়ালা চা এনে দে...
আর কিছু খাবার...বুঝলি...

মাথা নাড়িয়া আকলু চলিয়া গেল।

ভিখারী বলিল,—আপনার বাড়ীতে বাগান আছে...

কৃষ্ণগোপাল বলিল,—সদরের উঠোনে কতকগুলো
ফুলের গাছ আছে...

ভিখারী বলিল,—গন্ধ পাচ্ছি কি না!

কৃষ্ণগোপাল বলিল,—তুমি কোথায় থাকো?

ভিখারী বলিল,—অনেক দূরে...সেই পাতি-পাড়ায়।

—বেহালা বাজাচ্ছে অনেক দিন...না?

ভিখারীর মুখে স্নান একটু হাসি! ভিখারী বলিল—
আমার যখন সাত বছর বয়স, সেই তখন থেকে...

কৃষ্ণগোপাল বলিল—তোমার গান শুনে মনে হয়,
সাধা গলা...ভিখারীর গলা নয়।...চিরদিন ভিন্কা করে
তোমার দিন কাটছে?

ভিখারী বলিল,—না বাবা। এক দিন এ-গলার দাম
ছিল...মস্ত ধনী ছিলেন জীবন চৌধুরী...সাতঘড়ার
জমিদার। আমরা বাড়ী ঐ সাতঘড়ায়। তাঁর সঙ্গে
এক-ক্লাশে পড়তুম ছেলেবেলায়। তার পর তিনি বসলেন
জমিদারী-গদিতে..আমার লেখাপড়া গেল ছুটে। জীবন
চৌধুরী মশায় সংসারের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর
ওখানে থাকতুম...গান গাইতুম...বেহালা বাজাতুম।
তিনিও এই গান-বাজনা নিয়ে থাকতেন।...বিষয়-
আশয়ের দিকে দেখতেন না। তাঁর ছই সখী তাঁর
ওখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে-
ছিলেন...এক জনকে করেছিলেন উকিল, আর-এক জনকে
ব্যবসা করে দিয়েছিলেন। সেই ছ'জনে মিলে তলে-তলে
ফাট ধরিয়ে জমিদারী বিষয়-সম্পত্তি সব লুটিয়ে বেনামী
করে নিলে। জীবন চৌধুরী মামলা-মকদ্দমা করলেন স্ত্রীর

কথায়। কিন্তু সে মকদ্দমা আর দাঁড়ালো না। আমায় নিয়ে এক দিন রাত্রে উকিল-বাড়ী থেকে ফিরছিলেন, অন্ধকারে মেঠো পথে ছ'জনের মাথায় পড়লো লাঠি। সে-লাঠি খেয়ে ছ'মাস পরে আমি উঠে দাঁড়ানুম...ছ'টি চক্ষু অন্ধ হলো...আর জীবন চৌধুরী মশায় মাথায় সে লাঠির ঘায়ে ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন! তার পর গ্রামে থাকা গেল না। সহরে এলুম...স্বীর হাত ধরে ভিক্ষা করতে। আমার বাঁচবার কথা নয়...আমার স্ত্রী বুকে বল দিলেন...তঁার জন্তাই প্রাণটা রয়ে গেছে...

কৃষ্ণগোপাল শুনিল। ক'টা কথা...কিন্তু এ-কথার পিছনে মানুষের ভীষণ অকৃতজ্ঞতা, কৃতবৃত্ততা...নৃশংস লালসা...লোভের কি বিপুল ইঙ্গিত! এই অকৃতজ্ঞতা আর নৃশংস লোভের জন্ত পৃথিবীতে ঘটিয়া গিয়াছে কত মহাযুদ্ধ...সে সব যুদ্ধের কাহিনী লইয়া অষ্টাদশ-পর্ক কত মহাভারত না রচিত হইয়াছে! মনে হইল, নর-নারীর প্রেম আর যৌবন, লালসা ও বীভৎসতার ছবি লইয়া আমরা মাতিয়া আছি...মানুষ হইয়া মানুষকে ভালো-বাসিবার এক-কড়া শক্তি নাই...জানি শুধু হিংসা আর ঘেন্ন করিতে!

ভিখারী বলিল,—অন্ধ হয়ে যেন আর-এক-রকমের দৃষ্টি পেয়েছি, বাবা! মনে হয়, যেন মস্ত সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আছি...এ সাগরের পার দেখা যায় না। এই সাগর যেন আমাদের এক-একটা জীবন...সে-জীবনে শুধু চেউ আর চেউ...

ভিখারী একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কৃষ্ণগোপাল বলিল,—তোমার স্ত্রী?

ভিখারী বলিল—হাত ধরে আমায় এনে এইখানে বসিয়ে দিয়ে যান রোজ। বলেন, রোজাকের উপর থাকলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। না হ'লে সহরের পথে গাড়ী-ঘোড়ার যে ভিড়...যদি চাপা পড়ি! পথের ভিড়ে কেউ যদি মাড়িয়ে ঠোকর মারে...তার পর পুলিশ আছে! পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করলে ধরে নিয়ে যাবে! তিনি এক ভদ্রলোকের বাড়ী রান্না-বান্না করেন...পাঁচ টাকা করে পান। একটি বিধবা মেয়ে আছে...সে কাগজের ঠোঙা তৈরী করে!...

ভিখারী চুপ করিল...

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভগবান সব নিয়ে দেহখানা কেন যে রেখে গান্...তাবি! ভেবে কোনো অর্থ খুঁজে পাই না।...হ্যাঁ, তোমার এমন ভালো মন...গরীবের উপর এত দয়া...তোমার নামটি কি, বাবা?

কৃষ্ণগোপাল নাম বলিল।

ভিখারী বলিল—জমিদার?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—না। গেরস্থ মানুষ...

—কি কাজ করো বাবা? ওকালতি?

—না। আমি গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি। তা থেকে কিছু পয়সা আসে।

ভিখারী বলিল—আটিষ্ট! তাই বলো...আটিষ্ট না হ'লে গরীবের ছুঃখ কে আর বুঝবে?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—রোদে না থেকে আমার বাড়ীর মধ্যে এসো না...

ভিখারী বলিল—কারো বাড়ীতে যেতে ভয় করে, বাবা! আমার যা বরাত, মনে হয়...

ভিখারী কথাটা শেষ করিল না।

কৃষ্ণগোপাল বলিল—তোমার নাম জানতে পারি?

ভিখারী বলিল—আমার নাম কুঞ্জলাল দত্ত।

কৃষ্ণগোপাল কি চিন্তা করিল। তার পর বলিল—যে কুঞ্জ দত্তর 'বেহালা-শিক্ষা' বই আছে...

যুঁহু হাশ্বে ভিখারী বলিল—তাই। পনেরো বছর আগে জীবন চৌধুরী ছাপিয়ে দিয়েছিলেন ঐ বই। তাঁর ছেলেমেয়ে হয়নি...সম্বন্ধীরা গান-বাজনা শিখবে, তাঁর বড্ড সখ ছিল...

কৃষ্ণগোপাল বলিল—সে বই বিক্রী হয় দেখি, তার পয়সা পান না?

কুঞ্জ দত্ত বলিল—কিন্তু ছাপা-বই তো সব দশ বছর আগে বিক্রী হয়ে ফুরিয়ে গেছে...

কৃষ্ণগোপাল বলিল—না, না...সে বই আবার ছেপে বিক্রী হচ্ছে।

কুঞ্জ দত্ত বলিল—হবে! আমি জানি না...

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আমি দেখবোঁখন। দোকান থেকে সে বই একখানা কিনে আনবো।...

ছ'দিনের জন্ত কৃষ্ণগোপাল কি-একটা কাজে বাহিরে গিয়াছিল...কলিকাতার বাহিরে...

যে-দিন ফিরিল, দেখে, ভিখারী নাই। ভিখারী আসিল না।

পরের দিন ভিখারী আসিল না...তার পরের দিনও না...

মনটা ধক্ করিয়া উঠিল! কি হইয়াছে? অসুখ? একখানা 'বেহালা-শিক্ষা' বই কিনিয়া আনিয়াছে... দেড় টাকা দাম দিয়া কিনিয়াছে। ভানিয়াছিল, ভিখারী আসিলে দিবে...

কিন্তু ভিখারীর দেখা নাই!

মনে পড়িল, ভিখারী বলিয়াছিল পাতিপাড়ায় থাকে।

বৈকালের দিকে খোঁজ করিয়া কৃষ্ণগোপাল পাতিপাড়ায় চলিল। সন্ধান করিয়া বস্তীতে তার আস্তানা পাইল।

একখানা খোলার ঘরের সামনে আসিয়া কৃষ্ণগোপাল ডাকিল—কুঞ্জ বাবু...

ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠে উত্তর—কে গা?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—কুঞ্জ বাবু আছেন?

এক জন প্রৌঢ়া রমণী বাহিরে আসিল...

কৃষ্ণগোপাল চিনিল। ইহাকে দেখিয়াছে...ভিখারীর জন্ত অল্পের খালা লইয়া যাইতেন...

কৃষ্ণগোপাল বলিল—কুঞ্জ বাবু কেমন আছেন?

—ভালো আছেন।

কৃষ্ণগোপাল বলিল—মানে, আমার বাড়ীর রোয়াকে বসে তিনি গান গাইতেন। ক'দিন যাননি কি না...

প্রৌঢ়া বলিল—আপনার নাম কেঁট বাবু?

—হ্যাঁ।

প্রৌঢ়া কহিল—সে-দিন বেরুতে যাবার সময় পড়ে গিয়েছিলেন এই বস্তীর কলতলায়...পড়ে বেহালাখানি ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে...পা কেটে গেছে...

—আমি একবার তাঁকে দেখতে পারি?

—এসো বাবা...

কৃষ্ণগোপালকে লইয়া প্রৌঢ়া ভিতরে আসিল।

দেওয়ালে ঠেঁশ দিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছে অন্ধ ভিখারী। প্রৌঢ়া কহিল—কেঁট বাবু এসেছেন।

ভিখারী বলিল—আটিষ্ট-বাবু?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—হ্যাঁ, আটিষ্ট-বাবু। আপনাকে ক'দিন দেখতে পাইনি বলে খপর নিতে এলাম...

ভিখারী কহিল—এত দয়া! আঃ...ওগো এঁর কথাই তোমায় বলতুম। এ-কালেও মাহুঘের মনে এমন দয়দ আছে...এত মায়া! অথচ গুঁর গলা শুনে মনে হয়, কতই বা বদস!

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আপনার বিপদের কথা শুনলাম।

গাঢ় কণ্ঠে কুঞ্জ দত্ত বলিল—বেহালাখানি গেছে বাবা। আমার কত কালের সঙ্গী...জীবন চৌধুরী মশায় কিনে দিয়েছিলেন। দাম লেগেছিল পঁচাত্তর টাকা...কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী দাম ছিল ও-বেহালার...কত দুঃখে ও আমার সুরে সুর মিলিয়েছে...

একটা মস্ত নিশ্বাস! ভিখারী চুপ করিল।

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আপনাকে আমি একখানি বেহালা এনে দেবো কুঞ্জ বাবু...

—কি হবে বাবা? অন্ধ মাহুঘ...

কৃষ্ণগোপাল বলিল—শুধু তাই নয়! আপনার গান পাঁচ জনে যাতে শোনে পয়সা দিয়ে শোনে...ভিক্ষা দিয়ে নয়, মর্যাদার দাম দিয়ে...সে-ব্যবস্থা আমি করেছি কুঞ্জ বাবু। মানে, রেডিয়োর আসরে আপনি গাইবেন... গ্রামোফোনে রেকর্ড দেবেন। এমন লোককে আমি পাকড়াও করেছি...ও-সব জায়গায় যে-লোকের প্রতিপত্তি! আটিষ্ট হ'লেই হয় না এ-দেশে—মুকুন্ডির জোর চাই সেই সঙ্গে!...মানে, আমাদের দেশে গুণের ঠিক আদর হয় না কুঞ্জ বাবু, তাই আপনার মতো গুণীকে এ প্রতিভা নিয়ে উদরানের জন্ত হাত পেতে ভিক্ষা করতে হয়! আর যত এইটুখ্ ক্লাশ, টেনুখ্ ক্লাশ গাইয়ে-বাজিয়ে মুকুন্ডির জোরে বিকুচ্ছে! দম দিয়ে দাম নিয়ে আমাদের কাণ আর প্রাণ ছ'টোকে জালিয়ে মারছে...

কুঞ্জ দত্ত কোনো কথা বলিল না...

প্রৌঢ়ার ছ'চোখে বাষ্পের তরঙ্গ ঠেলিয়া আসিল।

কৃষ্ণগোপাল বলিল—আর সেই বই একখানা নিয়ে

ସାମିକ ବାସୁନ୍ତୀ



এসেছি কুঞ্জ বাবু...আপনার ছাপানো 'বেহালা-শিকা'।
ষষ্ঠ সংস্করণের বই...এ-বছরের ছাপা...

কুঞ্জ দত্ত বলিল—কিন্তু সেই একটা সংস্করণ ছাড়া ও-
বইয়ের আর কোনো সংস্করণ তো ছাপা হয়নি, বাবা!...
এত সংস্করণ ছাপালে...ও-বই কার এত ভালো লেগেছে?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—ছেপে যে বই বিক্রী করলে
রীতিমত পয়সা আসে, ভালোবেসে সে বই কে না
ছাপাবে, বলুন? এই যে প্রকাশকের নাম রয়েছে—
শ্রীগোকুলচাঁদ রায়...

ভিখারী চমকিয়া উঠিল! কহিল—কি...কি...
কি নাম?

কৃষ্ণগোপাল বলিল—গোকুলচাঁদ রায়।

ভিখারী বলিল—গোকুল রায়...জীবন চৌধুরীর ছোট
সম্বন্ধী...চৌধুরী মশায় যাকে গাঁটের টাকা দিয়ে ব্যবসাতে
বসিয়েছিলেন...

কৃষ্ণগোপাল বলিল—ও...তাই এ-বই ছাপিয়ে সে
ভগ্নীপতির বন্ধুর গাঁট কাটছে!...বটে!

প্রৌঢ়া বলিলেন—গোকুল বাবু যে বই ছাপিয়েছেন,
তোমায় জানায়নি সে-কথা?

ভিখারী বলিল—না...

কৃষ্ণগোপাল বলিল—ভেবেছে, অন্ধ মানুষ—টের পাবে
না! কিন্তু আমি তাকে টের পাওয়ানো...চুরি করে এ-বই
ছাপাবার মজাখানা!...আপনি শুধু দয়া করে সে অমুমতি-
টুকু দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করবেন, কুঞ্জ বাবু।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ফাল্গুন

কোন তুণ ফাল্গুন লয়ে' গুণ টান্‌লো,
ছুঁকার কুয়াসার আঁধিয়ার চূর্ণ;
এ কি মায়ী ধূপ-ছায়া, রূপ-ছায়া আনলো,
টলমল নদী-জল নিশ্চল তুর্ণ!
বনে বনে অকারণে জাগে মনে হর্ষ,
বীথিকায় এ কি হায় এল নব-বর্ষ!

নিল প্রাণ অবদান অঙ্কুর গন্ধে,
নন্দন চন্দন বন্দনে অঙ্গ;
রাঙা-চাঁদ ভাঙে বাঁধ জাগে মধু-ছন্দে,
নিখিলের কোকিলের জাগে ফের সঙ্গ!
পলাশের আবীরের রঙে রাজা তজ্রা,
ফোটে ফুল যেন ছল, লতা কৈ বক্ষ্যা?

শাল-বন হারা কোন গুঞ্জন ভ্রমরের?
মঞ্জরী ওঠে ভরি সুন্দরী অলকায়,
আত্মের মুকুলের গন্ধ যে জাগে ফের,
ব্রজবালা দেয় মালা সুধা-ঢালা মধু-বায়!
মহয়ার ঝর্ণার আলো-ছাঁর লাশ্র!
হিম-কণা গলা সোণা—অচলে কি হাশ্র!

কোন তুণ ফাল্গুন লয়ে' গুণ টান্‌লো,
ছুঁকার কুয়াসার আঁধিয়ার চূর্ণ;
চক্কর বক্কর কি তিয়াস আনলো,
শোভনার নিরাধার হ'ল প্রেমপূর্ণ!
গৌরবে সৌরভে উথলিছে হর্ষ;
প্রকৃতি ও প্রেমে না কি এল নব-বর্ষ!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



ছোটদের আসব

মধুকৈটভ সার্কাস পার্টি

(নক্সা)

ভূতি আর গদা ওরফে বিভূতিভূষণ পাকড়াশী আর—
গদাধর সামন্ত সেই ফাষ্ট ইয়ার থেকে একসঙ্গে পড়ছে।
খুব ভাল না হ'লেও পড়া-শুনায় ছু'জনের কেউ মন্দ
নয়। উভয়েই সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হয়েছে। তার পর যেমন হয়, চার বছর পরে দুই বছর
ছাড়াছাড়ি। পরস্পরকে মনে রাখবার এবং পত্র-বিনিময়
করবার প্রতিজ্ঞা-পর্ক সাঙ্গ হ'য়েছে। সংসার-সমুদ্রে
ছু'জনেই সাঁতার কাটবার জন্ত বন্ধপরিষ্কার। “আমরা
ডুবব না, শ্বোতেও ভাসব না” এই রকম একটা দৃঢ়
মনোভাব।

* * * *

“মধুকৈটভ” সার্কাস পার্টির সহরে খুব নাম। অনেক
রকম নতুন খেলা এবং মনোমুগ্ধকর ম্যাজিক ও নাচ
আছে। লোকে লোকারণ্য। কিন্তু সব চেয়ে নাম হ'য়েছে
বাঘ আর বনমাতুষের জন্ত। বাঘটি না কি ঠিক যোগ
করতে পারে, এবং পাঁচটা জিনিস মিশিয়ে রাখলে যেটি
বলা যায়, ঠিক সেইটি বেছে বার করতে পারে। আর বন-
মাতুষ—সে তো আরও অদ্ভুত! মাতুষের মত তব্লা
বাজাতে পারে, ইংরেজী এবং বাঙলা ভাষায় নিজের
নাম দস্তখৎ করতে পারে, এবং সব চেয়ে জমাটে ব্যাপার—
একটু প্রাচ্য নৃত্যও করতে পারে। চারি দিকে একেবারে
হৈ-ঠে পড়ে গেছে। এমনটি আর কখনও দেখা
যায়নি, যাবে কি না কে বলতে পারে?

এই ছু'টি প্রাণীই “মধুকৈটভ” সার্কাস পার্টির ম্যানেজার
কসরতানন্দ চৌধুরীর বিশেষ প্রিয়পাত্র। অবশ্য নামটা
তিনি নিজেরই রেখেছেন। ব্যবসার জন্ত অনেক সময়ই
পৈত্রিক নাম অচল। যেমন পাঁচী সিনেমা-ষ্টার হ'লে,

অথবা গোবরা সাহিত্যিক হ'তে গেলে বিজ্রাট ঘটতে
পারে। ঘোরতর সংসারী নফর কুণ্ডু ভাইকে ঠকিয়ে—
বেশ ছু'পয়সা মেরে ব্যবসা ফেঁদে, পরে আরও পাঁচ জনের
ভরা ডুবিয়ে, লালবাতি জেলে বেমানুম যোগীবর
পরমানন্দ স্বামীতে রূপান্তরিত হয়, তেমনি রোগা-পটকা
লিভার-পিলেযুক্ত পটল অবশেষে সার্কাস-পার্টির বাঘের
খেলা দেখাবার জন্ত কসরতানন্দ নাম গ্রহণ ক'রেছেন।
সেই সঙ্গে খাওয়ার বাচবিচারও গেছে, পরিমাণও বেড়েছে,
এবং মধ্যে মধ্যে লেবেল-আঁটা স্তম্ভাণযুক্ত লোহিতবর্ণ
জীবন-রসায়নেরও দরকার হ'য়ে পড়েছে। সেটা না কি
সাহস বজায় রাখবার পক্ষে অপরিহার্য।

বাঘ এবং বনমাতুষের শ্রীযুক্ত কসরতানন্দ চৌধুরী
মহাশয় নামকরণ করেছেন ভোম্বল এবং ভল্টু। তিনি
ছু'জনের খাঁচার গিয়ে নিজের হাতে খাবার খাইয়ে
আসেন। খুব গোপনে ভোজন-পর্ক সমাধা হয়। পার্টির
কোন লোক সে সময় কাছে থাকতে পার না। ঘেরা
জায়গার এক কোণে থাকে ভোম্বল, আর এক কোণে
থাকে ভল্টু।

সে-দিন সার্কাস ভাঙ্গবার পর চৌধুরী মহাশয় অত্যধিক
সঞ্জীবনী সূখা পান ক'রে নিজের তাঁবুতে অচেতন হ'য়ে
প'ড়েছিলেন। রাত্রি দেড়টা অবধি ভোম্বল এবং ভল্টু
খাবার জন্ত স্থির ভাবে অপেক্ষা ক'রে শেষটা ভীষণ অস্থির
হ'য়ে উঠল। চারি দিক নিস্তরু, সকলে সুষুপ্ত। উভয়েই
খুট ক'রে খাঁচার দরজা খুলে ধীরে ধীরে রান্নার তাঁবুর
দিকে অগ্রসর হ'ল। ছু'দিককার ফ্ল্যাপ্ তুলে ভেতরে
চুকে ছু'জনেই স্তম্ভিত। গভীর নিশীথে বাঘ ও বনমাতুষে
সাক্ষাৎ। কিছুক্ষণের জন্ত উভয়েই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে
রইল। কিন্তু তা অস্বাভাবিক। স্মতরাং ছু'জন ছু'জনের
ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রীতিমত কুস্তি আরম্ভ হ'য়ে
গেল।

হঠাৎ ভোম্বল বলে উঠল,—“এই মাইরী, ছাড়, লাগে।”
ভলুট চমকে ছেড়ে দিয়ে বললে—“আরে, কে, গদা না?”
ভোম্বল বললে,—“হ্যাঁ ভাই ভূতি, আমি।”

* * * *

হু'জনেই নিজ নিজ কাহিনী ব্যক্ত করলে। প্রায় একই রকম। কোন স্থানে চাকরী না পেয়ে, দোরে দোরে অনাহারে ঘুরে শেষে “মধুকৈটভ” সার্কাস পার্টিতে তারা চাকরীর উমেদারী করতে আসে। ম্যানেজার কসরতানন্দ বলেন—“দেখ হে ছোকরা, আমাদের এখানে কোন লোক নেওয়া হবে না। তবে একটা বাঘ দরকার। হু'দিন হ'ল মারা গেছে। তুমি যদি বাঘ সাজতে পার—”

ভূতির ব্যাপারটাও অনুরূপ, তবে এ ক্ষেত্রে বনমাসুঘ সাজবার চাকরী।

উভয়েরই স্ব স্ব জীবনে ধিকার এসে গেছিল। হু'জনে এক সঙ্গে হ'তে মনে অনেকটা সাহস হ'ল। তারা ঠিক করলে, “আর না। নতুন ভাবে চেষ্টা করতে হবে। যা থাকে বরাতে, আর যা করেন মাদার কালী।”

পরদিন সকালে দেখা গেল, রান্নাঘরে বাঘ আর বনমাসুঘের বাহিরের আভরণটুকু পড়ে আছে, কিন্তু বাঘ আর বনমাসুঘ গায়েব। “মধুকৈটভ সার্কাস”ও বোধ হয় লীলা সম্বরণ ক'রেছে।

শ্রীযামিনীমোহন কর (অধ্যাপক এম্-এ)।

সাত খুন মাফ

(গুণামীর প্রতিফল)

১

আমাদের দেশে ‘সাত খুন মাফ’ বলিয়া একটা কথা বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সকালে মুসলমান নবাব বাদসাহদের আমোলে যে সকল লোক নবাব বাদসাহগণের প্রিয়পাত্র ছিল, তাহারা কোন অজ্ঞায় কাজ করিয়া শাস্তি না পাইলে লোকে বলিত, “উহার শাস্তি হইবে কেন? উহার ত সাত খুন মাফ!” অর্থাৎ যদি সে সাতজন লোককে হত্যা করে, তাহা হইলেও তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। এই ভাবে সকালে কোন অপরাধীর ‘সাত খুন মাফ’ হইত কি না, আমরা তাহার কোন প্রমাণ না পাইলেও একালে মার্কিন-মুলুকের কোন ভঙ্গলোক বিভিন্ন দফায় উপস্থাপিত সাত জন লোককে খুন করিলেও তাহাকে কোন রকম শাস্তি দেওয়া হয় নাই;

আদালতের বিচারেই তাহার ‘সাত খুন মাফ’ হইয়াছিল। আজ তোমাদিগকে সেই কথা শুনাইব। এই ঘটনার বিবরণ অত্যন্ত অল্প হইলেও সম্পূর্ণ সত্য। জন রোসন নামক মার্কিন লেখক এই সকল ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণ লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাজ্যে আরকানসান্ প্রদেশ। এই প্রদেশে টেম্পারকানা নামক নগরের কুড়ি মাইল উত্তরে ওয়াল্টার রিজলে নামক যে কৃষিজীবী ভঙ্গলোক বাস করিতেন, ধনবান্ বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। হুই লক্ষ ডলার তাহার সম্পত্তির মূল্য ছিল। এই বিপুল সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি তাহার পিতা কর্ণেল জন রিজলের নিকট পাইয়াছিলেন। কর্ণেল জন রিজলে সামরিক কর্মচারী ছিলেন। তাহার পুত্র ওয়াল্টার রিজলে কৃষিজীবী হইলেও সাধারণ কৃষকগণের জ্ঞায় অশিক্ষিত ছিলেন না; তিনি প্রিন্সটনে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া মার্কিন যুক্তরাজ্যের সৈন্যদলে কিছু দিন স্বাউটের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ওয়াল্টার রিজলে স্ববৃহৎ অটালিকায় বাস করিতেন। তাহার বাসভবনের প্রত্যেক কক্ষ মূল্যবান সূদৃশ আসবাব-পত্র সুসজ্জিত ছিল; তাহার স্বপ্রশস্ত লাইব্রেরীতে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ও দুর্লভ গ্রন্থ সঞ্চিত ছিল; এতদ্বিিন্ন, তিনি যে সকল চিত্র দ্বারা তাহার গৃহকক্ষগুলি সজ্জিত করিয়াছিলেন, সেসকল বহুমূল্য সুনির্বাচিত চিত্র শিল্পিত ও সৌখীন সকল মার্কিন লক্ষপতির গৃহেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, ওয়াল্টার রিজলে সাধারণ কৃষিজীবী ছিলেন না। সমাজে তাহার স্থান অতি উচ্চ ছিল, এবং সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত।

ওয়াল্টার রিজলে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাহার দেহ সেইরূপ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিল। তিনি নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিতেন; বন্দকে লক্ষ্যভেদ করিতে ঐ অঞ্চলেব অতি অল্প লোকই তাহার সমকক্ষ ছিল। তিনি তেজস্বী ও নির্ভীক হইলেও মিষ্টভাবী ও শান্ত-প্রকৃতির লোক ছিলেন; কিন্তু কেহ কোন অজ্ঞায় কাজ করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি আশ্রিতবৎসল ছিলেন, এবং দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জুলুমবাজ প্রবল অত্যাচারীকেও শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

রিজলের খামার-বাড়ী হইতে প্রায় আট মাইল দূরে রোপনেয়ার নামক কোন ব্যবসায়ীর একটি আড়ত ছিল। বসন্ত কালের এক দিন তিনি কার্যোপলক্ষে সেই আড়তে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে কয়েক জন প্রতিবেশীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ার তিনি কাজ শেষ করিয়া তাহাদের সঙ্গে নানা রকম গল্প করিতেছিলেন। সেই সময় স্থানীয় পার-ঘাটার খেয়া-নৌকার হুই জন মাঝি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের এক জনের নাম জো মরফি, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম রবার্ট মরফি; তাহারা পরস্পরের সহোদর ভাই। আর এক জন অপরিচিত লোকও তাহাদের সঙ্গে আসিল। সেই লোকটি আসিয়াই তাহাদের নিকট সেই মাঝি-দু'টোর বিরুদ্ধে নালিশ করিল। রিজলে ও তাহার বন্ধুরা গল্প বন্ধ করিয়া তাহার অভিযোগ শুনিতে লাগিলেন।

মাঝি-দু'টোর সঙ্গে যে লোকটি আসিয়াছিল, সে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—সে বস্তা-বোঝাই জিনিষপত্র পিঠে লইয়া বিভিন্ন গ্রামে ফেরি করিয়া বেড়ায়। এখন সে সেট লুই হইতে আসিতেছে।

সে ঐ দুই জন মাঝির নৌকায় নদী পার হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা অসঙ্গত বেশী পারাণীর দাবী করায় সে তাহা দিতে সম্মত হয় নাই; এজন্য তাহারা তাহাদের পণ্যদ্রব্যপূর্ণ মোটটি কাড়িয়া-লইয়া তাহাকে ভাড়াইয়া দিয়াছে। সে নিরুপায় হইয়া সুবিচার প্রার্থনায় তাঁহাদের নিকট আসিয়াছে। সে স্ত্রীয়া পারাণী দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু মাঝিরা তাহা লয় নাই, তাহাদের জিনিসপত্রগুলি ফেরত দিতেও রাজী হয় নাই। তাহাদের জুলুম অসহ্য।

রিজলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পারাণী বাবদ উহাদিগকে কত দিতে চাহিয়াছিলে?”

ফেরিওয়ালা বলিল, “উহারা কাল আমাকে উহাদের নৌকায় নদী পার করিয়া পঞ্চাশ সেন্ট পারাণী চাহিয়াছিল; অনেক বেশী হইলেও আমি তাহাই দিয়াছিলাম। আজ সকালে আমি উহাদের নৌকায় ও-পার হইতে এ-পারে ফিরিয়া আসিলে এবার আমার কাছে পাঁচ ডলার পারাণী দাবী করিল! পঞ্চাশ সেন্টের স্থানে আমি পাঁচ ডলার কেন দিব? আমি তাহা দিতে রাজী না হওয়ায় আমার মোটটি কাড়িয়া লইয়াছে, আর তাহা আমাকে ফেরত দিবে না বলিয়াছে।”

ওয়ালটার রিজলে মাঝি দু’জনের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই লোকটি যাহা বলিতেছে—তাহা কি সত্য?”

এক জন মাঝি মাথা-ঝাঁকাইয়া সক্রোধে বলিল, “সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তাতে তোমার বাবার কি?”

রিজলে এই অশিষ্ট উক্তি শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সহজ স্বরেই বলিলেন, “ও বিদেশী লোক, উহার নিকট ঐ রকম অসঙ্গত পারাণীর দাবী করা তোমাদের উচিত হয় নাই। উহাকে নদীর ও-পার হইতে এ-পারে আনিয়াছ—এ জন্ম পাঁচ ডলার পারাণী? এ যে ডাকাতি। তোমাদের যে ‘রেট’ ঝাধা আছে—তাহাই লইয়া উহার মাল-পত্র ফেরত দেও।”

মাঝি-দু’টো তাঁহার এই সঙ্গত কথায় রাগিয়া আগুন হইল; কর্কশ স্বরে বলিল, “কে তোমাকে মোড়লী করিতে ডাকিয়াছে? তুমি নিজের চরকায় তেল দাও।”

রিজলে এবার উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “বিদেশী লোককে কায়দায় পাইয়া তোমরা তাহার গলায় ছুরি দিবে, আর তাহাতে কেহ কোন কথা বলিবে না—এইরূপই কি তোমরা আশা কর? ষাও, আর গোলমাল না করিয়া উহার জিনিস-পত্র ফেরত দাও। গুণ্যমী করিয়া উহার জিনিস কাড়িয়া লইবার কোন অধিকার তোমাদের নাই।”

এই কথা শুনিয়া মাঝি জো মরফি এক লাফে রিজলের সম্মুখে আসিল, এবং ছুঁকার দিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঘূসি চালাইল। কিন্তু রিজলে সতর্ক ছিলেন, আততায়ীর ঘূসি তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিতে পারিল না; তবে সেই মুহূর্তেই তাঁহার মৃষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত তাঁহার কাঁধের কাছে উঠিয়াই বিদ্যুৎবেগে বজ্রবৎ জোয়ের নাকের উপর পড়িল। তাহার নাক ফাটিয়া শোণিতের স্রোত বহিল। জো যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া দুই হাতে মুখ চাকিয়া বসিয়া পড়িল, এবং নাকি-সুরে অশ্লীল ভাষায় রিজলেকে গালি দিতে লাগিল।

ভাইএর অবস্থা দেখিয়া রবার্ট মরফি দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারাইল; এক মুহূর্তমধ্যে বৃকের পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, রিজলের ললাট লক্ষ্য করিয়া তাহা বাগাইয়া ধরিল। কিন্তু

রিজলে তাহাকে পকেটে হাত পুরিতে দেখিয়াই তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রবার্ট মরফি তাহার হাতের পিস্তল উত্তত না করিতেই তিনি তাঁহার পিস্তল তুলিয়া ঘোড়া টিপিলেন। রবার্টের পিস্তলের আওয়াজ হইবার এক সেকেন্ড পূর্বেই তাঁহার পিস্তলের গুলী রবার্টের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণহীন দেহ ধরাশায়ী হইল।

আতাকে এই ভাবে নিহত হইতে দেখিয়া জো রক্তাক্ত মুখ হইতে হাত সরাইয়া-লইয়া বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল; কিন্তু তদ্বারা রিজলের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিবার পূর্বেই রিজলের হাতের পিস্তল পুনর্বীর গর্জিয়া উঠিল। জো আর্তনাদ করিয়া তাহার ভ্রাতার মৃত-দেহের পার্শ্বে ধরাশায়ী হইল। রিজলের লক্ষ্য অব্যর্থ। তাঁহার পিস্তলের গুলীতে সেই মুহূর্তেই জো’র প্রাণবিয়োগ না হইলেও আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল। সে নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার প্রাণরক্ষার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। পরদিন তাহার মৃত্যু হইল।

এই দুই জন আততায়ীকে হত্যার অভিযোগে অবিলম্বেই রিজলেকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করা হইল। যে সকল লোক এই দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, আদালতে তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইল। তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন হইল—নিহত মাঝিদ্বয়ই পিস্তল দ্বারা প্রথমে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল; আত্মরক্ষার জন্মই তাঁহাকে পিস্তল ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। যদি তিনি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চিতই নিহত হইতে হইত। মাঝিদ্বয় তাহাদের স্বকর্মের ফলভোগ করিয়াছে।—এই দুই জন মাঝি যে গুণ্য, এবং সর্বদাই লোকের প্রতি অত্যাচার করিত, কিন্তু তাহাদের ভয়ে কেহই প্রতিকারের চেষ্টা করিত না,—আদালতে ইহাও প্রতিপন্ন হইল। বিচার-শেষে রিজলে সম্মানে মুক্তিলাভ করিলেন। গুণ্যদ্বয়ের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতে লাগিল।

২

কিন্তু এখানেই গোলমালের নিবৃত্তি হইল না। জো মরফি ও রবার্ট মরফি ওয়ালটার রিজলের গুলীতে নিহত হইয়াছে, এবং আদালতের বিচারে রিজলে নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন শুনিয়া জো ও রবার্টের অন্ত এক ভাই জন মরফি এবং তাহাদের কাকা টমাস মরফি প্রতিজ্ঞা করিল—তাহারা যত শীঘ্র সম্ভব রিজলেকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবে। তাহারা উভয়েই কোন দূরবর্তী গ্রামে বাস করিত। তাহারা তাহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্ম অবিলম্বে টেম্পারকানা অভিযুখে ধাবিত হইল। তাহারা অনেককে শুনাইয়া বলিল, “রিজলের বৃকের রক্তে আমরা পিপাসা নিবারণ করিব। তাহাকে দেখিবামাত্র গুলী করিয়া মারিব। বিচারে আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে?—হয় হউক, সে জন্ম আমরা প্রস্তুত আছি।”

রিজলের বন্ধুরা তাহাদের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে সতর্ক

থাকিতে অস্বস্তি করিলেন। এ সকল কথা শুনিয়া রিজলে তাঁহাদিগকে জানাইলেন—এ সকল লোকের তর্জন-গর্জনে তাঁহার মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই, তবে তাহারা তাঁহাকে হত্যা চেষ্টা করিবে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই। তাহারা ঐরূপ চেষ্টা করিলে আবার একটা খুনোখুনি কাণ্ড হইবে; কিন্তু আর রক্তপাত করিতে আগ্রহ নাই, তাহাতে বিরত থাকিবার জন্ম তিনি যথাসম্ভব সতর্কই থাকিবেন, এবং নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন তাঁহার খামার-বাড়ী বাহিরে যাইবেন না। তাঁহার পবিচিত সকলেই জানিতেন, মনুষ্য-জীবন তিনি মূল্যবান বলিয়াই মনে করিতেন এবং নরহত্যার প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিরাগ ছিল। কিন্তু তিনি সতর্ক থাকিলেও তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না।

কিছু দিন পবে এক দিন তাঁহাকে কোন জরুরি কার্যে তাঁহার বাড়ী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী একটি খামার-বাড়ীতে গমন করিতে হইল। কাজ শেষ করিয়া তিনি অখাবোহণে সেই স্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া অরণ্যেব তিতর আসিয়া পড়িলেন; সেই সময় পথপ্রান্তবর্তী বৃক্ষের আড়াল হইতে উপযু্যপবি দুইবার পিস্তলের গম্ভীর নিগোষ শুনিতে পাইলেন। পিস্তলের নল-নিঃসৃত অগ্নিশিখাও তাঁহার নয়ন-গোচর হইল।

শুলী আঘাতে বিজলের অঞ্চল মূহুর্তমধ্যে ধরাশায়ী হইল; সঙ্গে-সঙ্গে রিজলেও তাহার পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি মাটিতে অসাড়াভাবে পড়িয়া রহিলেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বা চেতন বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহাকে সেই অবস্থায় পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া দুই জন লোক বৃক্ষের আড়াল হইতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। তাহারা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া স্থির করিল—যদি তাহাদের নিক্ষিপ্ত শুলীর আঘাতে তাঁহার মৃত্যু না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাঁহার আঘাত সংঘাতিক হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যে প্রতারণিত হইয়াছে, রিজলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিয়া স্বযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,—ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না।

রিজলের আততায়িত্ব উৎসাহভরে তাঁহার ধরাশায়ী দেহেব অদূরে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বিদ্রোহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্বেই টোটাভরা দুইটি পিস্তল দুই হাতে বাগাইয়া ধরিয়াছিলেন। আততায়িত্ব তাঁহাকে এই ভাবে আক্রমণোত্তর দেখিয়া এতই ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল যে, তাড়াতাড়ি তাঁহাকে গুলী করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতে পারিল না; তাহারা বন্দুক তুলিবার পূর্বেই রিজলে তাঁহার উভয় পিস্তলেরই ঘোড়া টিপিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। তাঁহার গুলীর আঘাতে উভয় আততায়ীর বক্ষঃস্থল বিদৌর্ণ হইল; উভয়েবই প্রাণহীন দেহ পথের উপর প্রসারিত হইল। কেহ আর্তনাদ করিবারও অবসর পাইল না।

অতঃপর যখন নিহত ব্যক্তিদেহেব মৃতদেহ সনাক্ত করা হইল, তখন জানিতে পারা গেল, আততায়িত্বের এক জন পূর্বোক্ত নিহত মাঝিদের ভ্রাতা জন মরফি, এবং অল্প ব্যক্তি তাহাদের পিতৃব্য টমাস মরফি। মরফি-পরিবারের চারি জন এই ভাবে রিজলেব গুলীতে নিহত হইল।

এবারও রিজলে যথানিয়মে বিচারালয়ে নীত হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে আবেদিত অভিযোগের বিচার আরম্ভ হইল। ওয়ালটার রিজলে আততায়িত্বের জন্মই আততায়িত্বকে গুলী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে অগ্রে আক্রমণ করেন নাই, বিচারালয়ে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইল; এবং প্রথম বারের জায় এবারও তিনি সম্মানে মুক্তলাভ করিলেন।

মরফি পরিবারেব চারি জন লোক এইভাবে নিহত হইলে সকলেই মনে করিলেন, গোলমাল মিটিয়া গেল, রিজলেকে ভবিষ্যতে আর বিপন্ন হইতে হইবে না; কিন্তু শীঘ্রই জানিতে পারা গেল, জন-সাধারণের এই ধারণা সত্য নহে। এই সময় রিজলের বাসস্থান হইতে অনেক দূরে—ভিন্ন এলাকায় মরফি-পরিবারের আরও তিন জন লোক বাস করিত। তাহাদের দুই জন নিহত মাঝিদের ভ্রাতা, এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের আব একটি পিতৃব্য। এই তিন জন জানিতে পারিল—তাহাদের বংশের চারি জন রিজলের বন্দকের গুলীতে নিহত হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তাহারা ক্রোধে ঝলিয়া উঠিল, এবং অনেককে গুনাইয়া প্রতিজ্ঞা করিল—তাহারা এই অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করিবে; রিজলের সন্মানে তাহারা তাঁহার বাসস্থানেব নিকট গমন করিবে, এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই গুলী কবিতা হত্যা করিবে। তাহাদের এক জনের চেষ্টা বিফল হইতেও পারে, কিন্তু তিন জনেবই চেষ্টা কখন বিফল হইবে না। এবার আর ওয়ালটার রিজলেব নিস্তার নাই; তাঁহার বৃক্ষের রক্তে তাহাদের প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইবে।—তাহারা তিন জনেই সঙ্কল্পসিদ্ধি জন্ম সশস্ত্র টেক্সারকানা অভিযুখে যাত্রা করিল।

৩

ওয়ালটার রিজলের আত্মীয়-বন্ধুবা একথা জানিতে পারায় ভীত হইয়া তাঁহাকে কয়েক দিন অল্প স্থানে পলায়ন করিয়া লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দিলেন; বলিলেন,—উহারা বিদেশী লোক, কয়েক দিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে স্বদেশে চলিয়া যাইবে; তখন তিনি ফিরিয়া আসিলে বিপদের ভয় থাকিবে না। এখন কয়েক দিন দূরে থাকাই উচিত। এই লোকগুলি অত্যন্ত দুর্দান্ত, ভীষণ প্রকৃতি; তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই হত্যা করিবে। তাহারা তিন জন, তিনি একা; তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি কি উপায়ে আত্মরক্ষা কবিবেন?

এই পরামর্শ শুনিয়া রিজলে তাঁহাদিগকে বলিলেন, গুণাগুণের ভয়ে তিনি স্থানান্তরে পলায়ন করিবেন না, তিনি বাড়ীতেই থাকিবেন; তবে হঠাৎ কোন বিপদে না-পড়েন—এজন্ম সতর্ক থাকিবেন। তিনি কাপুরুষ নহেন, তাঁহার আত্মরক্ষার শক্তি আছে; কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে আর তাঁহার ইচ্ছা নাই। তিনি অনিচ্ছায় চারি জন লোককে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এজন্ম তিনি আন্তরিক হুঃখিত। কিন্তু প্রাণভয়ে তিনি পলায়ন করিতে পারিবেন না, তাঁহার হিতৈষীবা একথা যেন স্মরণ রাখেন। ভদ্রসমাজে লজ্জিত হইতে হয়, এরূপ কোন কাজ তিনি করেন নাই, পরেও করিবেন না। চারি জন গুণ্ডার আক্রমণে তাঁহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল; এখন যদি আরও তিন জন আততায়ী ভিন্ন-এলাকা হইতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলেও তাঁহাকে অগত্যা আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

এই সকল কথাবার্তার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু তাঁহাকে কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল না। রিজলে বাড়ীতেই থাকিলেন, তবে চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক থাকিলেন। রাত্রিকালে তিনি বাড়ীর বাহিরে যাইতেন না; দিবসে যেখানেই যাইতেন—এক-জোড়া পিস্তল তাঁহার পকেটে থাকিত। মরফি পরিবাহক যে তিন জন লোক তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্ত দূরদেশ হইতে আসিয়াছিল, তিনি বা তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুরা তাহাদের কোন সংবাদ জানিতে পারিলেন না। অবশেষে রিজলের প্রতিবেশীরাও নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই তিন জন গুণ্ডার প্রতিজ্ঞা সকলেই বিস্মৃত হইলেন। পুলিশ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

সকলে নিশ্চিন্ত হইলে এক দিন গভীর রাত্রে হঠাৎ অদূরে ভীষণ গগুগোল শুনিয়া ওয়াশটনের রিজলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার আশ্রয়স্থলে আবদ্ধ ঘোড়াগুলি প্রাণভয়ে ‘চি-হি’ চি-হি শব্দ ও দাপাদাপি করিতে লাগিল; তাঁহাব খামার-বাড়ীর ভেড়ার গোয়ালে যেন আগুন লাগিল!

এই সকল শব্দে রিজলেব নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি শয্যাভ্যাগ করিয়া, তাঁহাব শয়ন-কক্ষের জানালা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু বাহিরে তখন অমাবস্যার রাত্রির মতন গাঢ় অন্ধকার; প্রকৃতিদেবী যেন কালো চাদবে সর্বত্র আবৃত করিয়া কালো কেশের খোঁপায় কতকগুলি সীবাব ফুল গুজিয়া বসিয়া ছিলেন!—রিজলে কয়েক মিনিট কান-পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বৃষ্টিতে পারিলেন—তাঁহার খামার-বাড়ীতে কোন বিপদ ঘটয়াছে। খামারের খোঁয়ড়ে যে সকল পশু আবদ্ধ ছিল, তাহারা খোঁয়ড়ে হইতে বাহির হইবাব জন্ত আর্দ্রনাদ ও ছুটাছুটি করিতেছিল।

রিজলে তৎক্ষণাৎ দিয়াশলাই জালিয়া ঘড়িবে দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিলেন—রাত্রি তখন দুইটা বাজিয়াছে। তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাহিরে আসিয়া ডাকাডাকি করিয়া কয়েক জন অনুচরের ঘুম ভাঙাইলেন; তাব পর তাহাদিগকে পোষাক পরিয়া তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্ত আদেশ করিয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার কোটের পকেটে একজোড়া টোটাভবা পিস্তল লইতে ভুলিলেন না। এই পিস্তল দুইটি তিনি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া ঘুমাইতেছিলেন; উহা তিনি এক মুহূর্তের জন্তও কাছ-ছাড়া করিতেন না।

রিজলে দ্রুতবেগে খামার-বাড়ীর দিকে ধাবিত হইলেন। খামার-বাড়ীর প্রবেশ-দ্বারের অদূরে একখানি গাড়ী ছিল। রিজলে সেই গাড়ীবে উপস্থিত হইবামাত্র এক জন লোক গাড়ীখানার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার সম্মুখে লাফাইয়া-পড়িয়াই পিস্তল তুলিয়া তাঁহাকে গুলী করিল। গুলীটা রিজলের মাথার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল। রিজলে তৎক্ষণাৎ এক হাঁটুতে ভর দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন, এবং একটি পিস্তল উচু করিয়া তুলিয়া ডুর্ম শব্দে গুলী বর্ষণ করিলেন।

তাঁহার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। তাঁহার আততায়ী আর্দ্রনাদ করিয়া তাঁহার অদূরে চিং হইয়া পড়িয়া গেল। রিজলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া-দাঁড়াইয়া সেই গাড়ী লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐ ভাবে দৌড়াইতে দেখিয়া আর দুই জন

লোক আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িল।

মুহূর্ত মধ্যে রিজলের বাঁ হাত জখম হইল; সেই হাতে তিনি তাঁত্র যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। তাঁহাব আহত বাঁ-হাতের মুঠা হইতে পিস্তলটা খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল; কিন্তু অল্প হাতের পিস্তল দিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখস্থ আততায়ীকে গুলী করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে ধরাশায়ী হইল। কিছুকাল সে আর উঠিল না।

কিন্তু রিজলের গুলীতে সে নিহত হয় নাই; অল্পকাল পরে সে উঠিয়া বসিল, এবং রিজলেকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিল। রিজলেব দৃষ্টি তখন তৃতীয় আততায়ীবে মুখেব উপর সন্নিবিষ্ট ছিল। আহত শত্রু রিজলেকে লক্ষ্য করিয়া যে গুলী বর্ষণ করিল, তাহা তাঁহার কাঁধে বিদ্ধ হইতেই তিনি ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল না; তিনি অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া শুইয়া তৃতীয় আততায়ীর বক্ষঃস্থলে গুলী করিলেন।

এই সময় রিজলেব অনুচরবা তাঁহাব নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল। তাঁহাব তিন জন আততায়ীবে দুই জন নিহত হইয়াছিল; তৃতীয় আততায়ীবে তখন মুমূর্ষু অবস্থা! বলা বাহুল্য, এই তিন জনই তাঁহার পূর্বোক্ত শত্রু, মরফি পরিবারেব লোক।

রিজলেকে এবং তাঁহার মরণোন্মুখ শত্রুকে তাঁহাব বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তাঁহাদের পরিচর্য্যার কোন ক্রটি হইল না; কিন্তু আহত মরফি এক ঘণ্টাব মধ্যেই পরলোকে প্রস্থান করিল। রিজলেব আঘাত সংঘাতিক হইলেও বহু চেষ্টায় তাঁহাব প্রাণবক্ষা হইল। তিনি ধীবে ধীবে আবেগ্য লাভ করিয়া কিছু দিন পবে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন।

এই তৃতীয় বাব যুদ্ধেব পর রিজলেব মাগন ও বীরত্বের খ্যাতি দেশের সর্বত্র প্রচারিত হইল; সেই প্রদেশের সকল লোক মুক্তকণ্ঠে তাঁহাব প্রশংসা করিতে লাগিল। তিনি যে সাত জন গুণ্ডাকে হত্যা করিলেন—এতদ্বারা কেহই দর্শিত হইল না; এবং বিচারকের বিচারে শেষবারও তিনি নিবপরাধ প্রতিপন্ন হইলেন—এইভাবে তাঁহার ‘সাত খন মার’ হইল। তিনি ঐ সকল গুণ্ডাব কবল হইতে বহু নিরীহ ব্যক্তির ধন-প্রাণ ও মান-সম্মান বক্ষা করিয়াছেন বলিয়া নিউ ইয়র্কেব প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে তাঁহাব প্রশংসা প্রকাশিত হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

—

নির্বাসিতা রাজকন্যা

[রূপকথা]

চার

বারো বছর বয়স পূর্ণ হ’তেই নির্বাসিতা রাজকন্যা লীনা অতীতের সব কথা শুনে যদিও সাধুকে ব’লেছিল—‘আমি এ অপমানের প্রতিফল দেব, দাছ!’ আর সাধুও তখন তাকে ব’লেছিলেন বটে—‘তোমার মা এখন

বনবাসিনী হ'লেও তুমি রাজকন্যা। তোমাদের ঐশ্বর্য অস্ত্রে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে ভোগ করছে। তাদের শাস্তি দেবে তুমি তোমার মায়ের রাজ্য উদ্ধার ক'রে। তার জন্তে প্রস্তুত হও, দিদি!' কিন্তু সে জন্তে লীনাকে আরো ছ'টি বছর অপেক্ষা করতে হ'য়েছে, দাছ তাকে হাতে-কলমে শিখিয়ে-পড়িয়ে এই সময়ের মধ্যে এমনি উপযুক্ত ক'রে তুললেন যে—লীনা নিজের শক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হ'য়ে গেল।

যে পাঠগুলো লীনাকে শিখতে হ'ল, সে সব এমনি শক্ত আর অদ্ভুত যে, রাজবংশের যে ছেলের ললাটে বিধাতাপুরুষ রাজতিলক এঁকে দিতেন—সেই ছেলে বেশী বয়স রাজ্য-পরিচালন আর সকলের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ ক'রবার জন্ত যে সব শিক্ষা পেতেন, সেই সকল শিক্ষা দানের জন্ত রাজ্যের ভেতরে বা রাজ্যের বাইরে যিনি যে-বিদ্যায় স্ননিপুণ, বেছে বেছে তাঁকেই নিযুক্ত করা হতো। তাই, সে-কালে যিনি রাজা হ'য়ে সিংহাসনে ব'সতেন, সকল বিদ্যাতেই তিনি পারদর্শী হ'তেন। তলোয়ার চালানো, লক্ষ্যভেদ, ঘোড়ায় চড়া, যুদ্ধ করা, হঠাৎ বিপদে প'ড়লে বুদ্ধিবলে মুক্তি লাভ, ঘটনাচক্রে একা শত্রুহস্তে ধরা-প'ড়লে কৌশলে আপনাকে নিরাপদ করা, কুটবুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিমান শত্রুর চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করা, অগ্নি রাজ্যের বন্ধু রাজা, শত্রু রাজা, রাজদূত, বিদেশী, স্বদেশী, কর্মচারী, প্রজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্য, এদের সকলের সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম ব্যবহার করা উচিত—এ সমস্তই প্রত্যেক রাজ্যের সুবরাজকে সযত্নে শিখতে হ'ত।

তেরো বছরে প'ড়তেই লীনারও এই সব শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। এত দিন পর্যন্ত দেশের সাধারণ মেয়ের মতোই সে অস্বাভাবিক মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে, খেলাধুলো ক'রেছে, হাটে-বাজারে গিয়ে কেনা-বেচা ক'রেছে, দেশের যারা মেরুদণ্ড—সেই সকল দীন-দরিদ্র গৃহস্থ, শিল্পী, চাষী, মুটে-মজুর, সকলের সঙ্গে অবাধে মিশেছে; তাদের মনের খবর নিয়েছে। কিন্তু তেরো বছরে যে-দিন সে প্রবেশ ক'রলে, সেই দিনই তার অভিভাবক দাছ তাকে জানিয়ে দিলেন—আজ থেকে তোমার চাল বদলাতে হবে, দিদি, পৃথিবীর একটা সেরা দেশের রাজ-সিংহাসনে

তুমি ব'সবে। সেই ভাবেই তোমাকে চ'লতে শিখতে হবে।

লীনা জিজ্ঞাসা করলো—তা' হলে এত কাল যাদের সঙ্গে মিশেছি, যে ভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছি, সে সব কি ভুলে যাবো, দাছ? তাদের কথা আর ভাববো না?

দাছ ব'ললেন—নতুন পড়া শুরু ক'রলে পুরোনো পড়া কি ভুলতে আছে, দিদি! দেশের যে ছবি তোমার মনের ভিতর আঁকা আছে, সেইটিই যে তোমার শিক্ষার বড় পরিচয়। তবে আপাততঃ তোমাকে সে-পরিচয়ের বড় পটখানা মনের এক পাশে গুটিয়ে রেখে, সেখানে প্রসারিত করতে হবে আর একখানা পট; তুলি ধ'রে তারই রঙ এখন উজ্জ্বল ক'রে তুলতে হবে।

কাজেই দাছর সাহায্যে মনের পটে যে-সব নতুন ছবি তা'কে আঁকতে হ'ল—তারা সকলেই তার অপরিচিত; যেন একটা নতুন জগতের দরজা তার চোখের সামনে খুলে গেল! কত নতুন নতুন নাম সে শুনলে, কত রকমের কত শত ছবি তাকে মনের পটে ছ'কে নিতে হ'ল। শুধু কি তাই? ওঠবার, বসবার, দাঁড়াবার, ঘুরে-ফিরে বেড়াবার কত ভঙ্গীই দাছ তাকে শিখালেন। রাণীরা ত আর পাহাড়ী মেয়েদের মতন দৌড়-ঝাঁপ ক'রে বেড়ান না। তাই রাণীগিরিও তাকে হাতে-কলমে শিখতে হ'ল; আর এ-সব শিক্ষা এতই গোপনে চ'ললো যে, বাইরের কেউ ঘূণাক্ষরেও সে কথা জানতে পারলো না।

এই শিক্ষার ভেতরে হঠাৎ এক দিন আর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেলো! সাধু-দাছ সে দিন খুব ভোরে উঠে লীনাকে নিয়ে অনেক দূরের একটা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই পাহাড়টির পথগুলি এমনি ছুর্গম আর আঁকা-বাঁকা যে, একবার ঢুকলে হঠাৎ বেরিয়ে আসা শক্ত! পাহাড়ের পথ এবং গুহাগুলো গোলক-ধাঁধার মতন লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিত। সাধু-দাছ এখানে তাঁর এই শিষ্যাটিকে পাহাড়ে-পথে চলবার নানা রকম কৌশল শিখাতেন। বিপদে প'ড়লে কেমন ক'রে পাহাড়ের সঙ্গে মিশে শত্রুর চোখে ধুলো দিতে হয়, পাহাড়ের গোলক-ধাঁধা কি ভাবে পার হ'য়ে পাহাড়ীদেঁর

বোকা বানাতে পারা যায়—সেই সব কৌশল তাকে শিখাতেন।

কয়েক দিন ধরে নানা রকম পরীক্ষা করে সাধু-দাহু প্রসন্ন মনে লীনাকে বললেন—আমি খুসী হ'য়েছি, দিদি! ছুর্গম পাহাড়কেও তুমি যেন মুঠোয় পুরেছ! পাহাড় ভেঙেই এক দিন তোমাকে বাঙলায় যেতে হবে। পাহাড়ের পথে যদি বিপদে পড়, তা থেকে তুমি যে উদ্ধার হ'তে পারবে, এখন তা ভরসা ক'রতে পারছি।

লীনা মুখখানা উঁচু ক'রে তাঁকে ব'ললো—বাঙলায় যাবার জন্তে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছে, দাহু! যাত্রার সময় কি এখনো হয়নি? কবে আমি রওনা হবো?

সাধু-দাহু কোন উত্তর না দিয়ে, তাঁর হাতখানি একদিকে প্রসারিত ক'রে ব'ললেন—মেঘের মতন ওটা কি এদিকে দৌড়িয়ে আসছে, ব'লতে পার?

লীনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো—পাহাড়ের সেই অংশটা ঢালু হ'য়ে নীচে যে ছোট নদীটির সঙ্গে মিশেছে, সেই নদীর তীর দিয়ে কালো রঞ্জের একটা জানোয়ার যেন তীরবেগে ছুটে আসছে! লীনা সামনের দিকে ঝুঁকে, গলার স্বরে জোর দিয়ে উৎসাহ ভরে ব'ললো—ও ত মেঘ নয় দাহু, কি একটা জানোয়ার যে!

দাহু ব'ললেন—ধোয়ার মতো কি না, দেখে ঠিক বুঝতে পারিনি। তোমার কথাই ঠিক দিদি! ওটা জানোয়ারই বটে; কিন্তু বলতে পার, কি জানোয়ার?

লীনা চোখ দু'টি না ফিরিয়েই উত্তর দিল—বাঘ ভালুক কি, হাতী গণ্ডার—সে সব ত নয়, তারা ত সবই আমার চেনা। ওটা নতুন জানোয়ার ব'লেই মনে হচ্ছে, দাহু! আমি ওটাকে ধোরবো—

দাহু ব'ললেন—পাগল! কি জন্তু না জেনে কি ওর সামনে যেতে আছে? দেখছ না, যেন পবন-বেগে ছুটে আসছে! আগে ওটাকে চেনবার চেষ্টা কর; তার পর ধরা উচিত মনে হ'লে ধোর।

লীনা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে, খুসী হ'য়ে বলে উঠলো—চিনিছি দাহু, ওটা ঘোড়া। দেখুন, কেমন কুচকুচে কালো রঙ, আর কি সুন্দর জোরালো চেহারা, বা, চমৎকার!

দাহু ব'ললেন,—ঘোড়া ত তুমি কোন দিন দেখনি, এ অঞ্চলে ঘোড়া নেই কি না।

লীনা হাসিমুখে ব'ললে—এ-অঞ্চলে নাই বা থাকলো, কিন্তু আপনি ঘোড়ার ছবি এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন—মনে নেই? আমি ঠিক চিনি। মনে হচ্ছে, ভগবান্ ওকে আমার জন্তেই পাঠিয়েছেন। আমি ওটাকে ধরে আনি।

দাহু ব'ললেন—বেশ, যদি গায়ের জোরে ধরতে পারো, তাতে আর আপত্তি কি?

দাহুর কথাগুলো বুঝি লীনার কানে পৌঁছায়নি, সে তখন দ্রুতবেগে পাহাড় থেকে নদীর তীরে নেমে যাচ্ছিল।

কালো মেঘের মতন গাঢ় রঙের এই অদ্ভুত তেজী ঘোড়াটি কি ক'রে যে এই ঘোড়া-বর্জিত দেশে পাহাড়ে' পথ ভেঙে হঠাৎ দেখা দিল—সেইটিই তাজ্জবের কথা! কিন্তু এর চেয়েও বেশী তাজ্জবের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো—সাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে এই দুঃসাহসী মেয়েটি যখন সবেগে ধাবমান ছরস্তু জানোয়ারটিকে চোখের পলকে পোষমানা পশুটির মত ধরে ফেললো!

ঘোড়াটির পিঠের ওপর বাঘের ছাল দিয়ে মোড়া একটি ছোট গদী দিবি পাট ক'রে বাঁধা, ঘোড়ার মুখোস আর লাগাম হরিণের চামড়ার; গদীর সঙ্গেই লাগামটি বাঁধা ছিল। ঘোড়াকে বাগে এনে, লীনা লাগামটি গদীর আঁচল থেকে খুলেই তুড়ুক ক'রে তার পিঠে উঠে চেপে ব'সলো। ঘোড়া এতক্ষণ ঘাড়টি বাঁকিয়ে এই বে-পরোয়া মেয়েটির পানে চেয়েছিল। লীনাকে তার পিঠে চেপে বসতে দেখে তার মনটাও যেন নেচে উঠলো; সে যেন বুঝলো—ঠিক সওয়ারই তাকে ধরেছে। মুখের লাগামে টান পড়তেই সে সওয়ারের ইঞ্জিত বুঝে নাচতে-নাচতে পাহাড়ের গায়ে গা'মিশিয়ে বায়ুবেগে ছুটলো।

সাধু গিরিচূড়ার কাছে দাঁড়িয়ে লীনার কাজ দেখছিলেন, আর মুখ টিপে হাসছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি সেই স্থান থেকে নামতে লাগলেন।

নীচে রাস্তার কাছে আসতেই সাধু দেখতে পেলেন—ঘোড়াটিকে একটা চক্র ঘুরিয়ে লীনা তাঁরই কাছে আসছে। দাহুকে দেখতে পেয়েই সে ঘোড়াটাকে ধামিয়ে দিলো, সঙ্গে-সঙ্গে অবলীলাক্রমে ঘোড়াটির পিঠ থেকে নেমে পড়লো।

সাধু হেসে ব'ললেন,—ঘোড়া ত পূর্বে কোন দিন দেখনি দিদি, অথচ ওটা এগিয়ে আসবামাত্রই ওকে ধ'রে ওর পিঠে চেপে ব'সলে!

লীনা হেসে উত্তর দিল—ভগবান্কেও ত আমরা কোন দিন দেখিনি, দাছ! অথচ তাঁকে কতই আপনার ক'রে নিয়েছি। এ ত বনের পশু; কতক্ষণই বা একে ধ'রেছি? কিন্তু এরই মধ্যে এ আমার পোষ মেনেছে। আমি ভাবছি—কোথা থেকে এ ঘোড়া এলো, দাছ! কার এ ঘোড়া?

দাছ ব'ললেন—সাজ-পোষাক দেখে মনে হচ্ছে—কোনও পাহাড়ী রাজার আস্তাবলের ঘোড়া—হঠাৎ বিগড়ে বেরিয়ে এসেছে। সে যাই হোক, তোমার এই শিক্ষাটাই বাকি ছিল। রাণী হ'তে হ'লে ঘোড়ায় চড়াটাও শেখা দরকার। ঘোড়ায় চড়া ভারি শক্ত কাজ; অভ্যাস চাই, শিক্ষা চাই।

লীনা বললো—ভগবান্ সেই জগেই ঘোড়াটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, দাছ! ওর নাম একটা আছেই; সে নাম যাই হোক, আমি এর নাম রাখলাম বিজলী।

দাছ ব'ললেন—খাসা নাম দিদি!

লীনা মুখখানা তুলে জিজ্ঞাসা ক'রলো—এখন কি এই ঘোড়া নিয়েই আবার শিক্ষা চলবে, দাছ?

দাছ ব'ললেন—হ্যাঁ দিদি, এই শিক্ষাটা শেষ হ'লেই তোমার ছুটি; আর তোমাকে ধ'রে রাখবো না। এরই পিঠে চেপে তুমি যাবে তোমার পিতৃ-সিংহাসন অধিকার কোরতে।

কথাগুলি ব'লতে ব'লতে দাছ ঘোড়ার পাশে সরে গেলেন; তার পিঠে গদীর মত পুরু বাঘছালের আস্তরণটি তুলতেই ভেতর থেকে কিংখাপের একটি পুরু খলে বেরিয়ে এলো। তার মুখটি খুলে ভেতরের জিনিষগুলি দেখে তাঁর মুখ প্রফুল্ল হ'ল।

লীনা জিজ্ঞাসা ক'রলো—ওটা কি, দাছ! কি আছে ওর ভেতরে?

দাছ উত্তর দিলেন—এ দয়াময় বিধাতার দান, দিদি! ঘোড়ার সঙ্গে এসেছে রাণীর ব্যবহারযোগ্য দামী সাজ-সজ্জা। এখন বুঝতে পারছি, এ ঘোড়া এসেছে জয়ন্তী রাজ্য থেকে—

লীনা বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো—যে রাজ্য মেয়েরা শাসন করে, যেখানে পুরুষ নেই, মেয়েই রাজা?

দাছ ব'ললেন—হ্যাঁ। রাজ্যে রাণীর অভাব হ'লে মেয়ে-মন্ত্রীরা শুভ দিন দেখে রাণীর ঘোড়া ছেড়ে দেয়। ঘোড়া যে মেয়ের কাছে ধরা দিয়ে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে যায়, সেই হয় রাজ্যের রাণী। এ-ঘোড়া তোমাকেই বেছে নিয়েছে, দিদি!

লীনা ভুরু দু'টি কুঁচকিয়ে ব'লে উঠলো—নারী-রাজ্যের আমি রাণী হ'তে চাইনে, দাছ! বাঙলা আমার দেশ, আমার জন্মভূমি। আমি যাব সেইখানে—সেই আমার কামনার ধন।

দাছ ব'ললেন—আমারও তাই ইচ্ছা, দিদি! যাই হোক, ঘোড়া আর পোষাকগুলো কাজে লাগবে। এখন ত ঘোড়ার কাজ চলুক।

তখন থেকেই এই তেজী ঘোড়াটিকে নিয়ে লীনার শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। সাধুকে ঘোড়ার পিঠে উঠে নানা ভাবে তাকে চালাবার কৌশল দেখে লীনার মন আনন্দে, উৎসাহে ও উত্তেজনায় নেচে উঠলো; সে বুঝলো—আসল শিক্ষাটি তার সতিাই বাকি ছিল। এই জগেই দাছ এত দিন তাকে বেরুতে দেননি। সাধু ঘোড়ায় চ'ড়ে আর ঘোড়াকে নানা ভাবে চালিয়ে দেখিয়ে দিলেন—তেজী ঘোড়া যদি আরোহীর বশে থাকে, আর আরোহী খুব সাহসী ও কৌশলী হয়, তা হ'লে আত-তায়ীরা সহজে তাকে কায়দা ক'রতে পারে না।

মাসের পর মাস ধ'রে চেষ্টার পর লীনার এই শিক্ষাও সম্পূর্ণ হ'ল।

লীনা এবার হাত দু'টি ষোড় ক'রে ব'ললো—তা হ'লে আমাকে জয়-যাত্রার অমুমতি দিন, দাছ!

দাছ ব'ললেন—উত্তম; আজই তোমার যাত্রার অমুমতি দিচ্ছি। রাত বারোটোর পর সময় খুব ভালো; সেই সময় তুমি মা-দুর্গার নাম স্মরণ ক'রে ঘোড়ায় চ'ড়ে শুভ-যাত্রা করবে।

সাধু মুখে যা বলেন, কাজেও তাই করেন; একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। লীনার যাত্রার সকল ব্যবস্থাই ঠিক হ'য়ে গেল। লীনার মা অঞ্জনা দেবী সমস্ত দিনের বেশী ভাগই পূজা-পাঠ নিয়ে কাটাতে।

তাঁর রূপসী ঘোড়নী মেয়ে একা বেরুবে শক্রপুরীতে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করতে—এ কথা শুনেও তিনি বিচলিত হ'লেন না। সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে, আধ্যাত্মিক শিক্ষা পেয়ে তিনিও মনকে এমনি নির্লিপ্ত ক'রে তুলেছিলেন যে, মেয়ের সঙ্কল্পে বাধা ত দিলেনই না, বরং প্রসন্ন মনেই আশীর্বাদ ক'রলেন—তোমার আশা পূর্ণ হোক মা!

ওদিকে, বাঙলার রাজধানী গোড় নগরে রাজকন্ঠা রাজ্যেশ্বরী লীলা দেবীর বিয়ের আয়োজন যখন খুব ঘটার সঙ্গেই চ'লছিল, ঠিক সেই সময় দুর্গম পাহাড়ের বিপদ-সঙ্কুল পথের ভেতর দিয়ে বিজলীর পিঠে সওয়ার হ'য়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছিল লীলাদেবী বাঙলার রাজধানীর অভিমুখে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল—চিরচঞ্চল বিদ্যুৎ মেঘের পিঠে যেন স্থির হ'য়ে ব'সে র'য়েছে। গভীর রাত্রিতে শুভক্ষণে বিদায় দেবার আগে সাধু লীলাকে নিজের হাতে মনের মতো ক'রেই সাজিয়ে দিয়েছিলেন। ঘোড়ার পিঠে গদীর মোড়কের ভেতরে কিংখাপের খলিতে রাণীর ব্যবহারযোগ্য যে পোষাক-পরিচ্ছদ, মণিমুক্তোর যে সব আভরণ সঞ্চিত ছিল, দাছ সেগুলি দিয়ে এমনি পরিপাটি ক'রে তাঁর আদরিণী শিষ্যাকে সাজিয়েছিলেন যে, দেখলে কেউ বলতে পারতো না—এ মেয়ে কোন রাজ্যের রাণী নয়! ধূপছায়া রঙের সাড়ীর ভেতর দিয়ে সোনার জরীর আভা বিদ্যুতের মতো ফুটে বেরুচ্ছে, গলায় মুক্তোর মালা, দুই কানে উজ্জল হীরের এক জোড়া হুল; দীপ্তিমান মণিরত্নের চুড়িগুলি স্নগোল করপল্লবের শোভা যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছে। স্নগঠিত স্নদীর্ঘ বেণীটি মাথা থেকে নেমে সাপের মতো পিঠে আন্দোলিত হচ্ছে। বাঁকা ভরু দু'টির মাঝখানে স্নলোহিত একটি সিন্দূরবিন্দু টক-টক ক'রছে; তারই ওপরে চিক্-চিক্ ক'রছে—স্নদৃশ স্বর্ণ-মুকুট। তার সামনের হীরেখানির পেছন দিয়ে স্নদীর্ঘ সাদা পালক উচু হ'য়ে উঠেছে, তাদের প্রত্যেকের মাথায় এক-একটি মুক্তো শোভা পাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে গদীর গায়ে দু-তিন রকমের হাতিয়ার দু' পাশে তীক্ষ্ণ 'তীরে ভরা দু'টি তুণ, দু'খানা মজবুত ধনুক। এই তেজস্বিনী অশারোহিণীকে দেখলেই মনে হয়, মা-দুর্গা বৃষ্টি রণরঞ্জিণী মূর্তিতে কৈলাস থেকে পার্বত্য পথে বাঙলার চ'লেছেন শারদীয়া বসন্তে তাঁর ভক্তদের পূজা গ্রহণ ক'রতে।

রাত্রি গভীর হ'লেও পাহাড়ের ওপর তাঁদের উজ্জল আলো প'ড়ে চার দিক হাশুময়ী; কোন দিকে জন-মানবের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু একঘেয়ে ঝিল্লীরব; আর স্নদূর অরণ্য থেকে হিংস্র পশুর এক-একটা বিকট শব্দ নৈশ নিস্তরতা ভঙ্গ ক'রছে। লীনার বাহন বিজলী এই অন্ন দিনেই লীনার এত বাধ্য হ'য়েছে যে, তার মনের ইচ্ছাটি যেন চোখের ইসারাতেই বুঝতে পারে! এই নবীনা মনিবটির আদেশ পালন ক'রতে তার কি আগ্রহ!

সাধু লীলাকে বাঙলার পথের একটা নক্সা এঁকে দিয়েছিলেন। সেই নক্সাটি লীনার নখদর্পণে যেন প্রতিফলিত হচ্ছিল। তার অরণশক্তি এমনি প্রখর যে, কোন কথা একবার শুনে সে কখনো তা ভুলতো না। যাকে একবার দেখবে, তার মুখ সে কোন দিন ভুলবে না। লীলা ঠিক পথেই বিজলীকে বিদ্যুৎবেগে চালাচ্ছিল।

একটা বাঁকের মোড়ে এসে বিজলী হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। লীলা দেখলো—তার ঘাড়ের লোমগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া হ'য়ে উঠেছে, পেছনের পা দু'টোর ওপর ভর দিয়ে সমুখের দুই পা তুলে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রছে। বুদ্ধিমতী লীলা বুঝলো, কাছেই কোন হিংস্র জানোয়ার আছে, বিজলী তারই গন্ধ পেয়েছে। একটা বিশ্রী গন্ধ লীনার নাকে প্রবেশ করলো; সে জানতো, এ বাঘেরই গায়ের গন্ধ! বাঘটা আশে-পাশে কোথাও ওৎ পেতে ব'সে আছে। তাড়াতাড়ি সে বিজলীর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে তাকে ছ'কথায় ঠাণ্ডা ক'রলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বাঘছালের গদীর সঙ্গে আটকানো হাতিয়ারগুলো নিয়ে দাঁড়াল। পাহাড়ের কোলে তাঁদের আলোয় কালো ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াতেই লীলাকে কি চমৎকারই দেখাচ্ছিল! তার হাতে ছিল-পরানো দীর্ঘ ধনুক, কাঁধের দু'পাশে তীরপূর্ণ তুণে তীরের তীক্ষ্ণ ফলাগুলি তাঁদের আলোতে চিক্-চিক্ করছে। দীর্ঘ বেণীটি পিঠের ওপর ছলছে; আর তারার মত উজ্জল চোখ উত্তেজনায় জল-জল ক'রছে! এই অবস্থায় সে ধনুকখানি বাঁ-হাতে বাগিয়ে ধ'রে, ডান হাতের দুটো আঙ্গুল জিতে চাপিয়ে এমন একটা বিকট শব্দ করলো যে, রাত্রির গভীর নিস্তরতা ভঙ্গ ক'রে পাহাড়ের চতুর্দিকে তা প্রতিধ্বনিত হ'লো। সঙ্গে-সঙ্গে সামনের ঝোপ থেকে

একটা প্রকাণ্ড বাঘ বেরিয়ে ভয়ে আর্জনাদ ক'রে পাহা-
ড়ের পাশ দিয়ে দূরে পলায়ন করলো। লীনাও সঙ্গে-সঙ্গে
সেই ভাবে আর একবার শঙ্ক ক'রে বিজলীকে বিদ্যুৎবেগে
চালাতে লাগলো।

বাঘের সামনে পড়লে কি কৌশলে তাকে ভয়
দেখিয়ে তাড়াতে হয়, লীনার তা ভালই জানা ছিল।
ঘোড়ার পীঠে লীনাকে দাঁড়াতে দেখে, আর তার মুখের
বিকট আওয়াজ শুনে বাঘটা বুঝেছিল, সেখানে থাকলে
তার আর নিস্তার নেই; তাই সে পালিয়ে প্রাণরক্ষা
ক'রলো।

এমনি কত রকমের কত বিপদই এই ছুর্গম দীর্ঘ পথে
লীনার সামনে এসে প'ড়লো; আর লীনা কোথাও বুদ্ধি-
বলে, কোথাও বা হাতিয়ারের সাহায্যে সকল বিপদ
এড়িয়ে দিনের পর দিন নির্ভয়ে এগিয়ে চললো।

সব চেয়ে ভাবনার বিষয়—ভয়ঙ্কর জয়ন্তীয়া পাহাড়-
অঞ্চলটা নিরাপদে পার হ'য়ে যাওয়া। সাধু লীনাকে
ব'লেছিলেন—সব চেয়ে বেশী ভয় জয়ন্তীয়ার পাহাড়ে'
পথে। এখানকার প্রত্যেক জন্তু-জানোয়ার, এমন কি,
গাছ-পালা, পথ-ঘাট, সকলই সাংঘাতিক বিপজ্জনক।
সেখানে এক রকম রাক্সেসে গাছ আছে, রাক্সেসের মতোই
তার কাঁচা মাংস খায়। যত বড় জানোয়ারই হোক,
এই গাছের কাছে এলে তার আর নিস্তার নেই! কোন
জন্তু-জানোয়ারকে কাছে পেলেই এই রাক্সেসে গাছ
তার ডাল-পালায় এমনি কৌশলে তাকে আটক করে যে,
প্রাণপণ চেষ্টাতেও তার শিকার মুক্তিলাভ করতে পারে
না। তার পর গাছ তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে সেই জানো-
য়ারটির রক্ত-মাংস এমন ক'রে শুষে নেয় যে, শুধু হাড়-
গুলো আর চামড়াখানা গাছের তলায় প'ড়ে থাকে।
বাঘ, গণ্ডার, বড় বড় অজগর, এমন কি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড
দাঁতাল বুনো হাতীকেও এই ভাবে কায়দায় এনে তাদের
রক্ত-মাংস চুষে নিয়ে হাড়-চামড়াগুলো ছোবড়ার মত
ফেলে দেয়। জন্তুদের রক্ত-মাংসই হচ্ছে এই রাক্সেসে
গাছের একমাত্র সার বা খোরাক। এই মাংসভুক
গাছের ছবি এঁকে দেখিয়ে সাধু লীনাকে সাবধান ক'রে
দিয়েছিলেন।

রাক্সেসে গাছের মতো লাগুংরা এই অঞ্চলের রাক্সেসে

মামুষ; তাদের স্বভাবও ভয়ঙ্কর! ছুর্গম পাহাড়ের
ওপর এদের যে দুর্ভেদ্য ছুর্গ আছে, সেই ছুর্গে এরা খুব
নির্ভয়ে বাস করে। এমনি এদের দাপট যে, কাছাকাছি
সভ্য রাজ্যগুলির প্রজারা এদের ভয়ে কেঁপে মরে!
স্বযোগ পেলেই এরা দল-বেঁধে রাতের আঁধারে হঠাৎ
ঝড়ের মত বেগে সেই সব রাজ্যে প্রবেশ করে; আর
এমনি তাড়াতাড়ি লুঠপাট ক'রে উধাও হয় যে, রাজ্যের
শিপাই শাস্ত্রীরা বাধা দেবারও ফুরসদ পায় না। সোনা
আর আইবুড়ো মেয়েদের ওপরেই এদের লোভ। বিভিন্ন
রাজ্যে এদের গুপ্তচরগুলো নানা রকম ছদ্মবেশে ঘুরে
বেড়ায়; কোন্ বাড়ীতে সোনা আর আইবুড়ো মেয়ে
আছে, তার সন্ধান নিয়ে এদের রাজার কাছে সেই
খবর পাঠিয়ে দিলে স্বযোগ বুঝে রাজা তার শিকারীদের
নিয়ে সেখানে হানা দেয়, এবং লুঠপাট ক'রে পালায়।
লুঠের সোনা রাক্সেসে রাজার ভোগে লাগে; আর
এদের জাতের অবিবাহিত ছেলেদের সঙ্গে সেই আইবুড়ো
মেয়েদের বিয়ে দেয়। কিন্তু দীর্ঘকালেও এই অত্যাচারের
কোন প্রতিকার হয়নি।

দাহুর মুখে এই রকম অত্যাচারের কথা শুনে রাগে
লীনার চোক দুটো ধব্ধব্ধ ক'রে জলে উঠেছিল।
জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে সে তার সাধু দাহুকে জিজ্ঞাসা
ক'রেছিল—‘সভ্যদেশের মানুষগুলো কি গরু না ভেড়া?
তাদের রাজার কি মনুষ্যত্ব নেই? এর কোন প্রতিকার
করতে পারে না?’ দাহু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—
‘রাজবাড়ীর সোনা বা রাজকন্যা ত কোনও দিন লুঠ হয়নি,
দিদি। কাজেই প্রজাদের কষ্টটা রাজা ঠিক বুঝতে পারেন-
নি। আর, সারা দেশের যিনি রাজা—এ সব অনাচার
ধার দমন করবার কথা, পরের ঝক্কি নিয়ে বিব্রত হবার
মতো বোকা তিনি নন।’ লীনা তখন মুখখানা ভার ক'রে
ব'লেছিল—‘আমি কিন্তু বাঙলায় গিয়েই এর বিহিত করব,
দাহু! আমার দেশের—আমার জাতের অসহায়া বিপন্ন
মেয়েদের করুণ রোদন যেন আমি শুনতে পাচ্ছি,—আর
সেই সব মেয়ের অশ্রু-সজল মুখগুলো আমার চোখের
ওপর যেন ভাসছে?’ দাহু তখন ব'লেছিলেন—
‘মেয়েদের কষ্ট মেয়েরাই বোঝে; ওদের কষ্ট তুমিই দূর
ক'রবে, দিদি!’

রাক্ষসে গাছ আর রাক্ষসে মানুষ ছাড়া আর একটা ভয়ের কথাও লীনা দাছুর কাছে শু'নেছিল। সেটি হচ্ছে—মেয়ে-রাজ্যের ফাঁদ! মেয়ে-রাজ্যের কেলাটি কোন্‌খানে, কেউ তা জানে না। অথচ সকলেই জানে আর বিশ্বাসও করে যে, কেউ যদি কোন দিন সেখানে গিয়ে পড়ে, তা হ'লে আর সে বেরিয়ে আসতে পারে না। এমন কি, ঐ যে দুর্ধর্ষ রাক্ষসে লালুং জাত—এরাও মেয়ে-রাজ্যের কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না। এদের ধারণা—এ রাজ্যের মেয়েরা! যাছ জানে; যাছুর বলে পুরুষকে ভেড়া বা পাথর বানিয়ে রাখতে পারে। দাছ ব'লেছিলেন—‘আমার পক্ষে ভাববার কথা এই যে, তোমার পাছে মাঝ-নদীতে তরা ডুবিয়ে দেয়!’ লীনা এক-মুখ হেসে উত্তর দিয়েছিল—‘কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি, দাছ! বিজলী বেরিয়েছিল রাণী খুঁজে আনতে। মাঝ-পথে স্ত্রযোগ বুঝে যদি রাণীকে পিঠে ক'রে তার নিজের দেশে মেয়ে-রাজ্যের গোলক-ধাঁধায় প্রবেশ করে—এই ত ভয়? কিন্তু তা হবে না, দাছ? বিজলী বেশ বুঝেছে—এমন মেয়ে তার সোয়ার হয়েছে, যে তাকে কায়দায় রাখতে জানে। তবে আশা করি, বিজলীর সেই কাজও বাকি থাকবে না,—তারই পিঠে চ'ড়েই এক দিন আমি মেয়ে-রাজ্যের সিংহাসনেও বসতে যাব; কিন্তু সে পরের কথা।’

সুদীর্ঘ দুর্গম পথটি অতিক্রম ক'রবার সময় এই তিনটি চিন্তাই লীনার মন অধিকার ক'রেছিল। ডালপালা-ওয়াল কোন বড় গাছ সামনে পড়লেই সে সতর্ক ভাবে তা এড়িয়ে চলে। কিন্তু এই মাংসভুক গাছের ছবি তার মনের ভেতর এমনি সুস্পষ্টরূপে আঁকা ছিল যে, তার ভুলভ্রান্তির কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর পরেই সেই নররাক্ষসগুলার চিন্তা! তার মতো অবিবাহিতা তরুণী এই নির্জন পথে সেই পিশাচদের সম্মুখে প'ড়লে তার পরিণাম কি? এর ওপর শেষ চিন্তা,—বিজলী যদি তাকে নিয়ে নিজের দেশে মেয়ে-রাজ্যের গোলক-ধাঁধায় ভেতরে প্রবেশ করে?

লীনা নিজের মনেই এই সকল সমস্তার সমাধান ক'রতে ক'রতে, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে গন্তব্য পথে চলতে লাগলো।

এই ভাবে চ'লতে চ'লতে লীনা এক দিন সন্ধ্যার সময় সব-চেয়ে বিপদসঙ্কুল দুর্গম অঞ্চলটির সন্ধিস্থলে এসে প'ড়লো। কিন্তু এইখানেই রহস্যময়ী নিয়তি তাঁর রহস্যময় চাকাটি অদ্ভুত ভাবে ঘুরিয়ে, এই নির্বাসিতা রাজকন্ঠার জীবনযাত্রার গতি নূতন পথে ফিরিয়ে দেশশুদ্ধ সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিলেন।

আগামী চৈত্র সংখ্যায় সেই বিস্ময়কর কাহিনী শুনবার জন্য তোমরা সকলে প্রস্তুত থাক।

—গল্পদাহ।

স্বর্গের সিঁড়ি

আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি—কলকাতার গ্রামবাজারে যেখানে আজ ট্রামের ডিপো, তার সামনে এক জন সাহেব এসে আস্তানা বেঁধে সেখান থেকে বেলুনে চড়তেন! বেলুনে চড়ে মানুষ আকাশে উঠছে, সে দৃশ্য দেখে আমাদের মনে তখন কি ভাব জেগেছিল, আজ এত কাল পরেও তা ভুলিনি! বিস্ময়-শ্রদ্ধা-ভয়—অর্থাৎ ছোট মনের কোথাও আর এতটুকু ফাঁক ছিল না!

বেলুনে চড়ে সাহেবের আকাশে ওঠার কাহিনী মুখে শুনে পাড়ার ছ'-চার জন বন্ধ বলেছিলেন, এ আর আশ্চর্য্য কি, বাপু! রামায়ণ-মহাভারত পড়োনি? পড়লে দেখবে, সত্য-ত্রেতা যুগে রাজা-রাজড়ারা পুষ্পক রথে চড়ে স্বর্গে যেতেন দিগ্বিজয় করতে—নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ দেবতারা পুষ্পক-রথে চড়ে মর্ত্যে বেড়াতে আসতেন!

এ-সব গল্পে তাঁরা আমাদের এমন দমিয়ে দিতেন যে, বেলুনে চড়ে মানুষ আকাশে উঠছে—এত-বড় ব্যাপার চোখে দেখে যে-আনন্দে মন ভরে উঠতো, সে-আনন্দ যেন চূর্ণ হয়ে যেতো! গভীর দুঃখে আমরা সত্য-ত্রেতা যুগের কথা স্মরণ করে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতুম, আর ভাবতুম, হায়, কেন দেবতারা এ যুগে আর পুষ্পক-রথে চড়ে মর্ত্যে আসেন না এবং মর্ত্যলোকের মানুষের স্বর্গে নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গেল! রাবণ রাজার সব অপরাধ ক্ষমা করে আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাতুম, হে ঠাকুর, করুক অত্যাচার, রাবণ রাজাকে একবার মর্ত্যে

পাঠাও ! সে-তদ্রলোক এসে তাঁর কল্পিত স্বর্গের সিঁড়িটা তৈরী করে দিয়ে যান !

তার পর বহু যুগ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং এর মধ্যে অবশ্য আকাশ-মার্গের বহু তথ্য জানতে পারলেও স্বর্গ কোথায়, তার কোনো হৃদিশ আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি। সে জন্ত সশরীরে স্বর্গ ঘুরে আসবার কল্পনা আর আমাদের মনে স্থান পায় না।

কিন্তু এ-সব কথা থাক্ !

সম্প্রতি এক জন মার্কিন বৈজ্ঞানিক আমাদের রামায়ণের রাবণ-রাজার কল্পনার তারিফ করে তার বহু সাধুবাদ জামিয়ে লিখেছেন, রাবণ-রাজার কল্পিত স্বর্গের সিঁড়ি আজিকার মানুষ স্বর্গের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে যেতে না



সর্প-গতিতে পথ উঠিয়াছে

পারলেও তুঙ্গ গিরির বুক বেয়ে যে দীর্ঘ পথ তৈরী করে তুলছে, তাতে মনে হয়, স্বর্গ কোথায় সন্ধান জানতে পারলে মানুষের পক্ষে স্বর্গের ফটক পর্যন্ত পথ তৈরী করা আদৌ অসম্ভব নয় ! অর্থাৎ তিনি বলছেন, আমেরিকার কলরাডো প্রদেশে ন'-দশ হাজার ফুট উঁচু গিরি-শিখর পর্যন্ত এঞ্জিনিয়ারের দল যে পাকা প্রশস্ত পথ তৈরী করেছেন, সে পথে নিত্য কত শত মোটর-গাড়ীতে চড়ে কত লোক-জন যাতায়াত করছেন, দেখলে তাক লাগে !

আমাদের ভারতবর্ষেও কাশ্মীর-পেশোয়ার, খাইবার-গিরিবন্দ প্রভৃতি স্থানে ধারা গেছেন, পাহাড় কেটে

পাহাড়ের বুক বাকেটের মতো এমনি পাকা পথ তাঁরা দেখে এসেছেন নিশ্চয়। এ আবার দোতলা পথ। অর্থাৎ এক-তলায় রেল-লাইন পাতা। সে-পথে চলে রেল-গাড়ী ; আর এক-তলা পথে চলে মোটর-গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, বয়েল গাড়ী। পথ এমন প্রশস্ত ও মসৃণ যে, গাড়ীতে চড়ে এ-পথে যাতায়াত করতে এতটুকু গা কাঁপে না বা হাঁচকা-টান-লাগে না ! যাত্রাটুকু বেশ স্বচ্ছন্দ আরামে নির্বাহিত হয়।

পাহাড়ের গা থেকে পাহাড়ের বুক বেয়ে তার শিখর-দেশ পর্যন্ত এ পথ অবশ্য সিধা-খাড়াভাবে তৈরী করা চলে না। করলে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অমোঘ এবং হুলস্থল্য বিধানে পতন ও মৃত্যু অবশ্যস্বাভাবী। এ-জন্ত চক্রাকারে বা সর্পিল-ভঙ্গীতে পাহাড়ের গা ঘুরিয়ে এ-পথকে ক্রমিক উর্ধ্ব রেখায় উপরে তোলা হয়। এ-জন্ত কোথাও বাঁকের পর বাঁক—কোথাও বা চক্রের পর চক্র—এ-সবের আর সংখ্যা থাকে না। বহু জায়গায় এত ঘুরিয়ে পথ তৈরী না করে ডিনা-মাইট ও বাকুদের সাহায্যে পাহাড়ের কিন্নদংশ উড়িয়ে সাফ করে সুবিধা-মতো পথ নির্মাণ করা হয়।

দারুণ শীতে বা বর্ষায় পাহাড়ের গায়ে পথ-নির্মাণের কাজ চলে না, চলতে পারে না। তা ছাড়া কাজ

যা হয়, তা দিনের আলোয়। কলরাডোর ব্রডমুর-চেইন পাহাড়ের পথ পাহাড়ের কোল থেকে ৯২০০ ফুট উর্ধ্বে উঠেছে ! এ পথের মাঝে-মাঝে বাঁক আছে। মেয়েরা মাথার খোঁপায় যেমন কাটা গোঁজেন, তেমনি কাটার মতো বাঁক। এ বাঁককে বলে hair-pin ber.ds.

চওড়ায় এ-পথ ৩০।৪০ ফুট। পথ এমন প্রশস্ত যে, পাশাপাশি দু'খানা মোটর চালাতে বিপদের কোনো ভয় নেই ! যে-সব জায়গা বেশী-রকম ঢালু, সে-সব জায়গায় ছ'ফুট চওড়া পাথরের মজবুত পাঁচিল তোলা হয়েছে। এ পাঁচিল তিন ফুট উঁচু ; তা ছাড়া পাঁচিলের গায়ে মোটা তারের বেড়া আছে। বারো ফুট অন্তর

লোহার পোষ্ট পুঁতে তারের বেড়া তাতে সংলগ্ন করা হয়েছে। ছ'দিক থেকে ছ'খানি মোটর অনায়াসে এবং



পাহাড়-পথে মোটর নামে নিরাপদে এ-পথে যাতায়াত করতে পারে; গড়িয়ে পড়বে, সে ভয় নেই।

পথের ঢালু এমন যুঁহু-মাত্রায় উঁচু-নীচু করা হয়েছে যে, দাঁড়িয়ে সোজা এ-পথের পানে চাইলে মনে হবে, পথ গড়ানে বা ঢালু নয়, বেশ সমতল!

এ-পথ তৈরী করতে পাহাড়ের দেহ থেকে যে-পাথর উড়িয়ে মাফ করা হয়েছে, তার পরিমাণ এক লক্ষ ঘন-গজ (কিউবিক-ইয়ার্ড)। সরাতে ত্রিশ টন ডিনামাইট এবং বিশ টন বারুদ খরচ হয়েছে। এ-পথ তৈরী করতে সময় লেগেছে ছ'বছর এবং এই দুঃসহ কার্যে একটি লোকেরও প্রাণ-বিয়েগ ঘটেনি! ছোটখাট ছ'চারটে দুর্ঘটনা ঘটেছিল; কিন্তু সে এত তুচ্ছ যে, ধর্তব্যের মধ্যে নয়!

এ-পথ তৈরী করবার সময় প্রাকৃতিক দৃশ্য-মাধুরীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ১নং এবং ২নং ছবি দেখলে পথের আভাস পাবে। এক-নম্বর ছবিতে ঞাখো, নীচেকার পথ এঁকে-বঁেকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কি-ভাবে ঘুরে-ঘুরে সর্পগতিতে পাহাড়ের মাথায় উঠেছে! ২নং ছবিতে ঞাখো, কি স্বচ্ছন্দ গতিতে পাহাড় থেকে মোটর-গাড়ী নেমে আসছে! এ পাহাড়-পথের নাম হয়েছে স্বর্গের সিঁড়ি (Ladder to the Sky)!

সর্দি লাগা

এবারে স্বাস্থ্য-তত্ত্বের কথা বলতে চাই। কথাটা খুব সাধারণ—এ কথা মেনে আমরা চলি না বলে অনেক সময় মহা-অনর্থ ঘটে!

কথাটা হচ্ছে সর্দি লাগা নিয়ে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা—সব সময়েই সর্দি লাগার আশঙ্কা আছে। ঠাণ্ডা লাগলেই সর্দি হবে আর রোদ লাগলে হবে না, এমন কোনো আইন নেই! রোদে ঘুরেও সর্দি হয়।

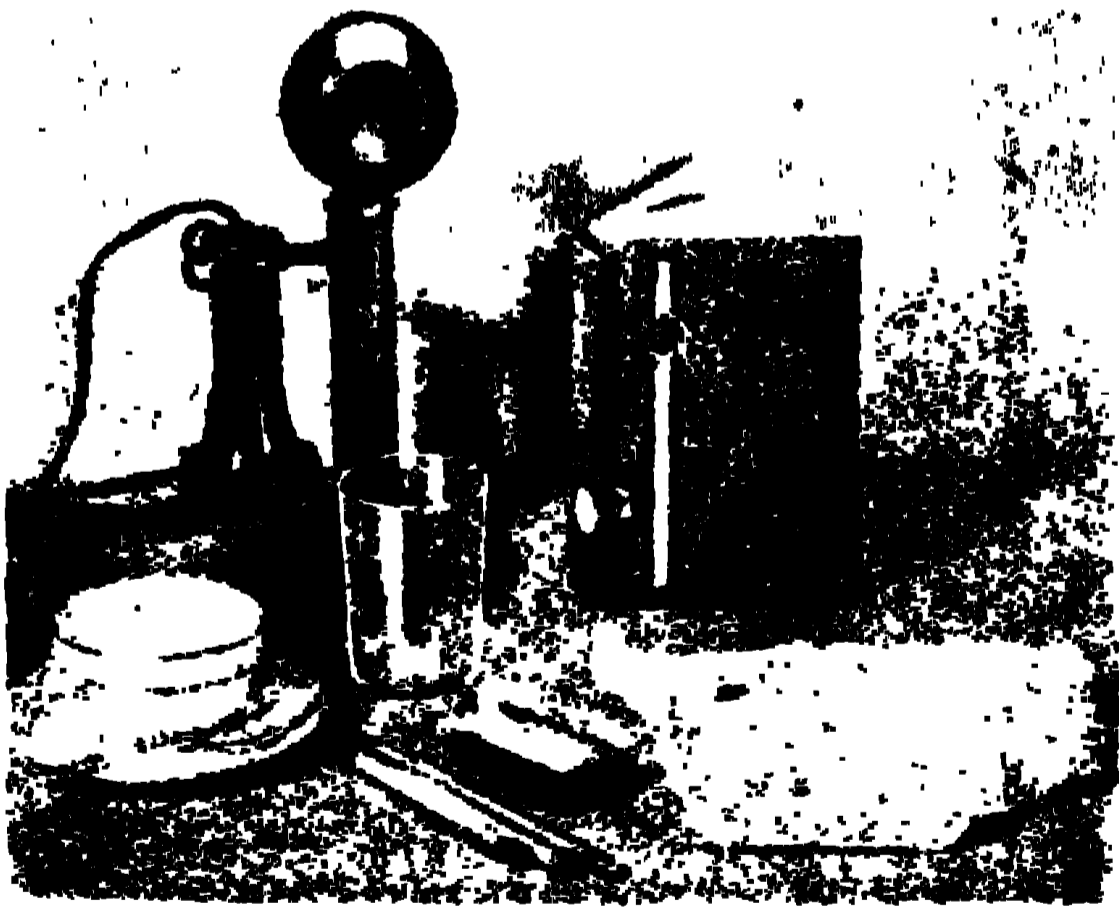
আসলে, সর্দির উৎপত্তি বীজাণু থেকে। এ বীজাণুর আক্রমণ রোধ করবার শক্তি আমাদের অনেকের থাকে না। এ শক্তি কার আছে, তা যখন জানি না, তখন কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে সর্দির আক্রমণ থেকে আমরা নিরাময় থাকতে পারি। বর্ষা নামলে অনেক সময় দায়ে পড়ে আমাদের বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। ভেজার ফলে সর্দি লাগে। দারুণ শীতে বা ঠাণ্ডা বাতাসেও সর্দি লাগবার আশঙ্কা আছে প্রচুর। যদি বৃষ্টিতে ভিজতে হয়, তা হলে

গলা, মাথা এবং পায়ের তলা—এগুলিকে না ভিজিয়ে যদি গরম বা সুরক্ষিত রাখতে পারি, তা হ'লে সর্দি লাগবার আশঙ্কা থাকবে না। বর্ষার দিনে পথে ভিজে বাড়ী ফিরে



সদরে নোটিশ আঁটা

আসবামাত্র শুকনো গামছা-তোয়ালে বা কাপড়ে ভিজে পা-গলা-মাথা ঘষে বেশ করে মুছতে হবে; তার পর যদি গরম কাপড়ে গা ঢেকে বসে থাকি, তা হ'লে সর্দি লাগবার ভয় থাকবে না।



এই সব থেকে ছোঁয়াচ লাগে

রোদে ঘোরবার সময় গলা বা টাকুরা জ্বালা করলে বুঝতে হবে সর্দির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এ সময়ে ঠাণ্ডা জল বিষবৎ পরিত্যাগ করা চাই। রোদে ঘুরে পিপাসায়

গলা শুকিয়ে গেলেও কদাচ ঠাণ্ডা জল খাবে না; পানের জল এ সময় চাই গরম জল বা গরম চা। ঠাণ্ডা-গরমে চট করে সর্দি হয়। বাইরে যদি ঠাণ্ডা পড়ে, তা হ'লে গায়ের কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে হাঁশিয়ার হাতে হবে। অর্থাৎ ফিন্ফিনে পাতলা জামা পরে বাইরে বেরুনো তখন উচিত হবে না!



ছোঁয়াচ থেকেও অনেক সময় সর্দি লাগে অর্থাৎ আর-কারো সর্দি হ'লে সে যত প্রিয়

এক-জায়গায় ডাঁই টুথব্রাশ

আত্মীয় হোক, তার হাঁচি-কাশি বাঁচিয়ে চলতে হবে! সর্দি-কাশির ছোঁয়াচে সূস্থ ব্যক্তির সর্দি-কাশি হওয়া খুব স্বাভাবিক। একজন নিউ-ইয়র্কে এক বাড়ীর গৃহিণী বাড়ীর ফটকে কাগজ এঁটে রাখতেন। তাতে লেখা থাকতো, “যদি আপনার সর্দি হয়ে থাকে, দয়া করে বাইরে থাকবেন অর্থাৎ এ-বাড়ীতে আসবেন না।”



মুখে আঙুল দেবে না।

কথাটা হাসি-তামাসায় উড়িয়ে দেবার নয়! এ নিয়ম সকলে যদি পালন করে চলি, তা হ'লে সর্দির

ছোয়াচ বাঁচে ; সে ছোয়াচ-বাঁচায় বহু লোক সুস্থ-নিরাময় থাকতে পারেন ।

সর্দি-কাশির ছোয়াচ কি করে লাগে, এবার সে সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা বলি । এ কথাগুলি বেদ-বাক্যের মতো যদি মেনে চলো, তা হ'লে সর্দি-কাশির হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে ।

কারো উচ্ছিষ্ট ; অথবা এঁটো প্লেটে, পেয়ালায় গ্লাশে বাটিতে খবর্দার কোনো-কিছু খাবে না । কিছু খাওয়ার আগে হাত ভালো করে ধুতে হবে । পথ থেকে বা



এত খেলে সর্দি হবেই !

থিয়েটার-সার্কাস ও বাস-ট্রাম থেকে ভিড় ঠেলে ঘুরে এসে হাত না ধুয়ে কদাচ কোনো-কিছু মুখে দেবে না । ভালো করে হাত ধুয়ে তবে সে-হাতে খাবার খাবে ! টেলিফোনের রিশিভার—সর্দি চালাবার একটি মস্ত সহায় । অপরের রুমাল-গামছা-তোয়ালে কদাচ ব্যবহার করা উচিত নয় । সারা দিনে আট-দশ গ্লাশ জল খাওয়া যদি অভ্যাস করতে পারো, তা হ'লে সর্দি লাগার আশঙ্কা থাকবে না ।

মুখের মধ্যে আঙুল পুরবে না—কখনো না ! পেন্সিল কামড়ানো ; কলমের ডগা কামড়ানো ; আঙুলে থুতু লাগিয়ে বইয়ের পাতা খোলা ; টাকা-পয়সা মুখে দেওয়া বা টাকা-পয়সার হাত না ধুয়ে সেই হাতে খাওয়া—এগুলো খুব অশুভ । এ অভ্যাসে

শুধু সর্দি-কাশি কেন, দেহে নানা রোগের আক্রমণ অনিবার্য ।

আজ-কাল অনেক বাড়ীতেই টুথ-ব্রাশে দাঁত-মাজার ব্যবস্থা হয়েছে । এ ব্যবস্থা ভালো । কিন্তু দাঁত মেজে সকলের উচিত টুথ-ব্রাশ সাফ করে ধুয়ে তবে তুলে রাখা ; এবং তুলে রাখবার সময় এক-জায়গায় জড়ো করে কিম্বা একটি পাত্রে জল দিয়ে সেই পাত্রে সকলের টুথ-ব্রাশ রাখা খুব অশুভ । টুথ-ব্রাশ এমন ভাবে রাখবে, যেন এ-ব্রাশের সঙ্গে ও-ব্রাশ না ঠেকে থাকে !

অতি-ভোজননের ফলে হজমের গোলযোগ ঘটে । হজমের গোলযোগ হ'লে সর্দি-জ্বর হয় ; সুতরাং অতি-ভোজননের ফলে সর্দি-কাশির উৎপত্তি বিচিত্র নয় !

সর্দি-কাশির সঠিক উৎসের সম্বন্ধে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এখনো পাননি ! সর্দি হ'লে ঠিক কোন্ ওষুধ দিলে তা সারবে, সে সম্বন্ধে চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন্স এখনো অব্যর্থ হয়নি ! তাঁরা বলেন, সর্দি যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকলের খুব হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ।

কি সে ব্যবস্থা ? ডাক্তাররা বলেন, লোকের ভিড় যথাসম্ভব পরিহার করে চলবে ; খোলা বাতাসে যত থাকো ভালো ; নিত্য ব্যায়াম করো ; স্নিড্রার যেন ব্যাঘাত না হয়, দেখো ; অতি-ভোজন করবে না ; প্রচুর জলপান করবে ; হাত-পা না ধুয়ে অর্থাৎ আধোয়া-হাতে কদাচ খাবে না ; কারো সর্দি হ'লে তার হাঁচি, তার নিশ্বাস বাঁচিয়ে চলবে । সর্দি হবামাত্র দু'-এক ডোজ বাই-কার্ব-নেট-অফ-সোডা সেবন করলে সর্দিকে অল্পে বিনষ্ট করতে পারবে, জেনো ।

সিনেমার সৃষ্টি

ফিল্মের ফাঁকির সম্বন্ধে পূর্বে তোমাদের অনেক কথা বলিয়াছি । এ ফাঁকি তেলকি-বাজীর ফাঁকি নয় ! এ ফাঁকিতে সৃষ্টির যে কৌশল আছে, তা অনুশীলনযোগ্য ।

বিজ্ঞানে প্রচুর জ্ঞান এবং গভীর অভিনিবেশ—এ দু'টি না থাকিলে ফিল্মের এ-ফাঁকি রচিবের সাধ্য হইবে না ! এ-ফাঁকির কারবারে কতখানি শক্তির প্রয়োজন, আজ সে সম্বন্ধে হুঁচারিটা কথা বলিতেছি ।

সিনেমার প্রায় সব দৃশ্যই এখন ষ্টুডিয়ার মধ্যে বিশেষ ভাবে রচিত 'শেটে' তোলা হইতেছে। তুঙ্গ পাহাড়ের যে দৃশ্য দেখি, সে পাহাড় সত্যকার পাহাড় নয়; সত্যকার পাহাড়ের আদর্শে ষ্টুডিয়ার মধ্যে নকল পাহাড় গড়িয়া সেই নকল পাহাড় লইয়া সিনেমা-ছবির কাজ চলে।

প্রয়োজনে আকাশের মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করিবে না নিশ্চয়! অগত্যা সিনেমা-রচয়িতাকে নকল-বৃষ্টিধারা তৈয়ারী করিতে হইবে। সত্যকার বর্ষা যেমন হয়, তার সঙ্গে এই নকল বর্ষার এক-চুল তফাৎ হইলে চলিবে না।

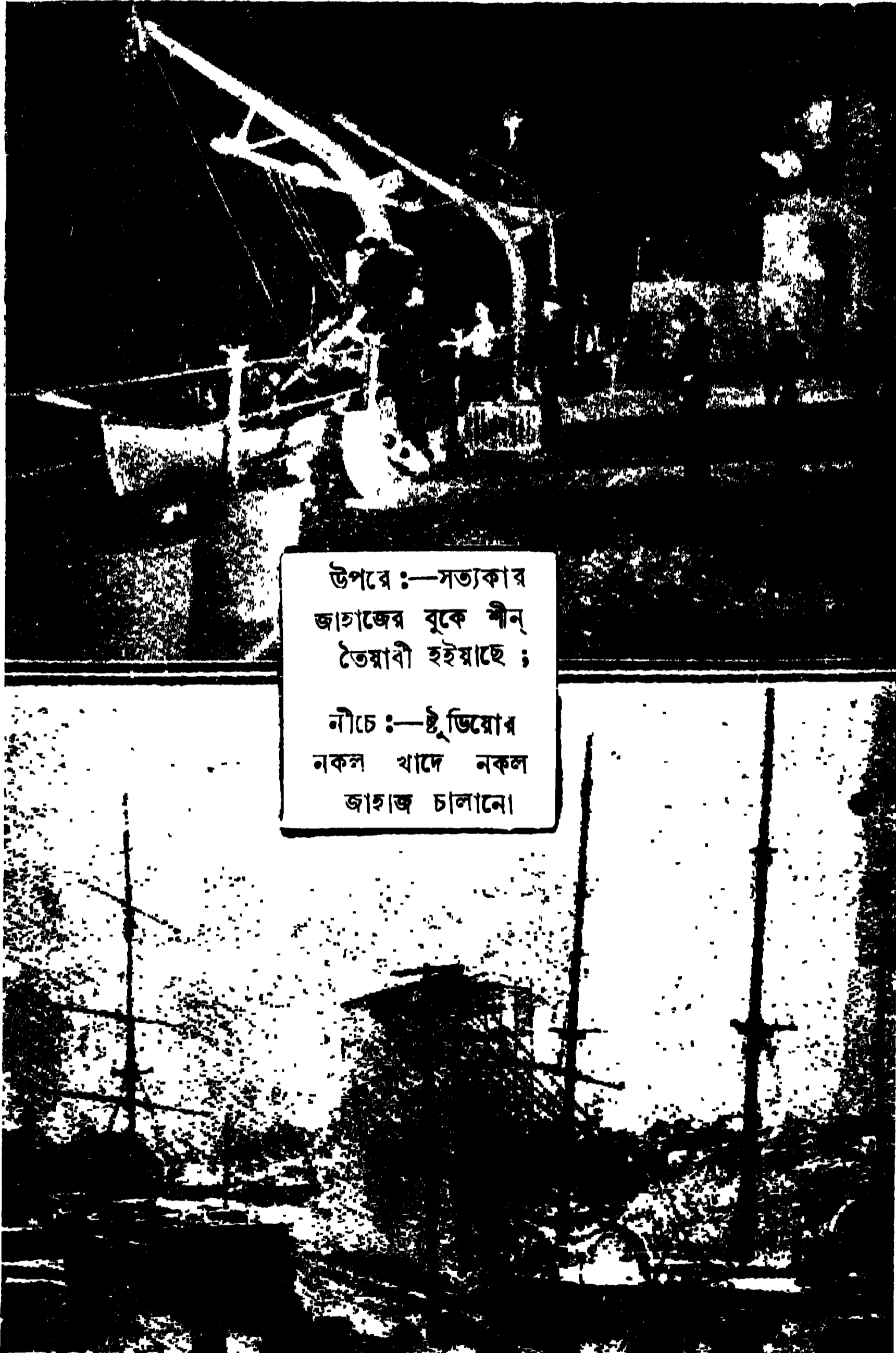
যিনি সিনেমার ছবি রচনা করেন, তাঁকে বলে ডাই-

রেঞ্জার বা পরিচালক। তিনি বলিলেন—এ দৃশ্যে খুব বরফ-পড়া দেখাইতে চাই; ব্যবস্থা করিয়া দিন। অমনি সিনেমার যিনি কারু-শিল্পী, তিনি লাগিলেন নকল তুষার-বর্ষণ ও ঝড় তৈয়ারী করিতে। এ-দৃশ্যের জন্ম তিনি বরফ তৈয়ারী করিলেন, তার পর পাখা লাগাইয়া বৈজ্যতিক শক্তিতে সে-পাখা ঘুরাইয়া ঝড় বহাইয়া দিলেন। নকল বরফ রচিয়া সেই বরফের ঝর্ণা ঝরাইয়া এই করকা-ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এই ঝড় ও করকা-বর্ষণ এমন নিখুঁত হয় যে, তার ফটো দেখিলে কে বলিবে, এ ঝড় সত্য নয়! হোজ-পাইপের সাহায্যে নকল তুষার বর্ষণ করিয়া সারা 'শেট' অর্থাৎ দৃশ্যের ঘর-বাড়ী, পথ-নদী-পাহাড়—সব বরফে ঢাকিয়া ছবি তোলা হয়। কারু-শিল্পীর সৃষ্টি-কুশলতায় নকলের এ ফাঁকি কোনো মতে ধরা যায় না।

বর্ষার ধারা-পাতও পাইপের সাহায্যে নিখুঁত সুন্দর ভাবে রচনা করা হয়। তার পর চোখের জল—

দারুণ বর্ষার জলে ফিল্ম-নাটকের যে-ক্রিয়া দেখানো হয়, সে ক্রিয়া আগল-বর্ষায় তোলা নয়। সত্যকার বর্ষা-বাদলে স্পষ্ট ভাবে ছবি ক্যামেরায় উঠিবে কেন? তা ছাড়া শীতকালে ছবি তোলা হইতেছে—সে-ছবিতে শ্রাবণের ঘন-বর্ষার দৃশ্য চাই; শীতকালে সিনেমার

গ্লিশিরিনের ফোঁটা চোখের পাতায় বা কোণে ঢালিয়া দিলেই সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীর চোখে তাহা সত্যকার অশ্রু-রূপে ফুটিয়া ওঠে! ঘাম...দরদর-ধারে গায়ে ঘাম ঝরিতেছে—ঘামের এ ব্যাপারও নকল! অভিনেতার গায়ে-মুখে পিচকারী-ধারায় এক রকম তৈল



উপরে :—সত্যকার জাহাজের বুকে শীত তৈয়ারী হইয়াছে ;

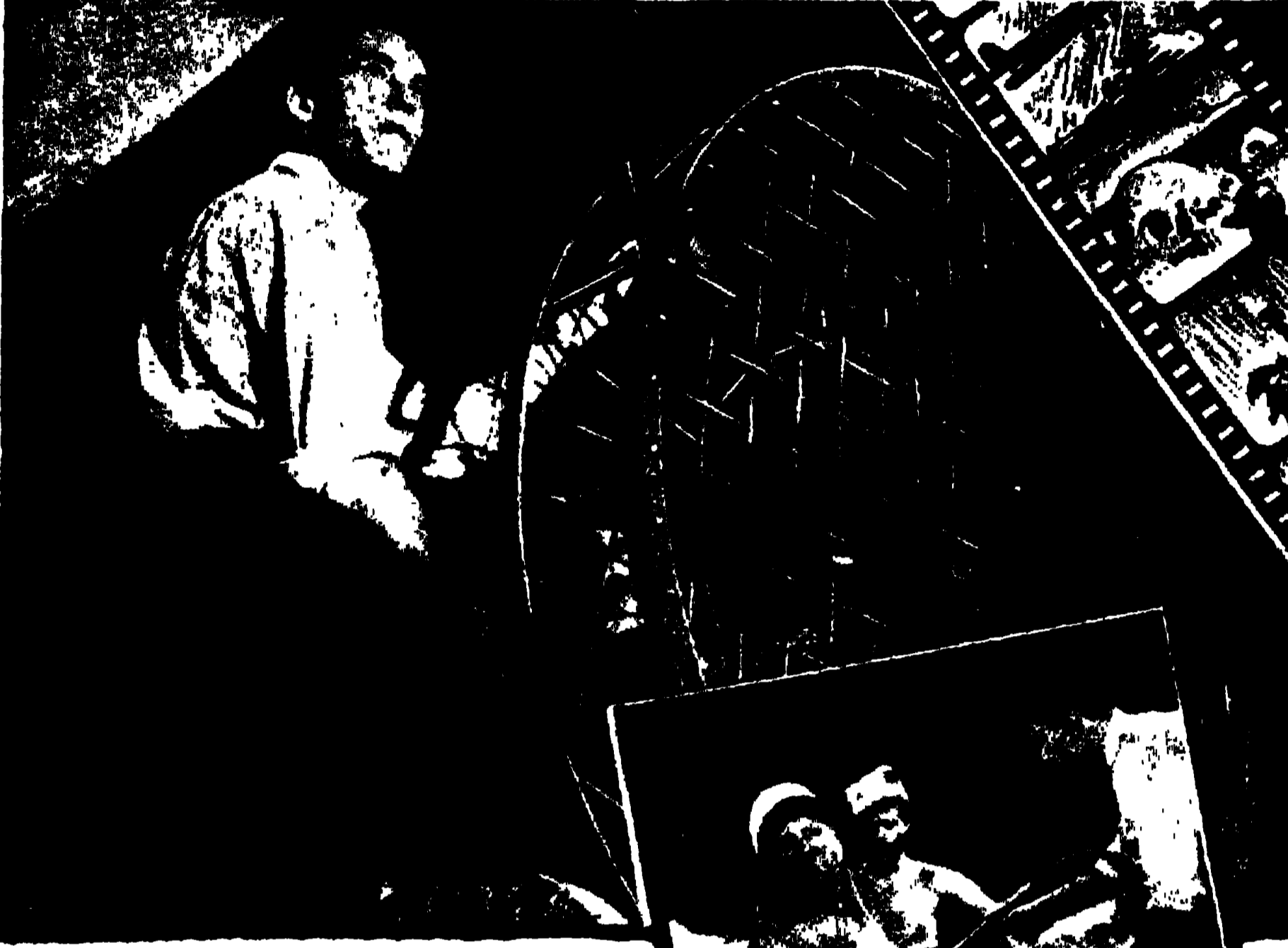
নীচে :—ষ্টুডিয়ার নকল খাদে নকল জাহাজ চালানো

অভিসিদ্ধি করা হয় ; সে তৈল ঘর্ম-বিন্দুর মতো গায়ে মুখে লাগিয়া থাকে । ক্যামেরায়-তোলা এ-তৈল দেখায় ঠিক ঘামের মতো !

উদ্দাম-ঝড়ে সাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গ—কি করিয়া

বরফ বর্ষণ করা হয় । খুব মিহি কাগজের কুচিও ক্যামেরায় মারফৎ বৃষ্টির রূপ ধারণ করে ।

ধূলাবালি-ওড়ানো ঝড়ের সৃষ্টি করিতে হইলে দ্রুত বেগে ফ্যান চালাইয়া সেই ফ্যানের হাওয়ায় বালুকারাশি সঞ্চালিত করা হয় ।



পাখা চালাইয়া ঝড়-সৃষ্টি

নকল সাগর, নকল ঝড়, নকল তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, জানো ? প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা গড়িয়া সে-চৌবাচ্চাটি জলে পরিপূর্ণ করা হয় । তার পর সে-জলে চেউ-তোলা-যন্ত্র ঘুরাইলে চৌবাচ্চার জলে চেউ ওঠে ! এ-যন্ত্রটি বেশ বড় । পাঁচ-ছ'জন লোক মিলিয়া সবলে ও সম্মিলিত বেগে এ-যন্ত্র কৌশলে চালনা করে ; ক্যামেরায় লেন্সে এই চেউ দেখায় সাগরের চেউয়ের মতো উত্তাল উদ্দাম ! বিশেষ ভাবে রচিত বৈদ্যুতিক ফ্যান ঘুরাইয়া ঝড়ের রাতে উত্তরোল বেগ ও গতির সৃষ্টি করা হয় ।

বৃষ্টি সৃষ্টি করিতে সব সময়ে জল ছুড়িয়া বহু পিচকারির ধারায় জল বর্ষণ করা হয় না ; ময়দার গুঁড়া, মার্কেল-পাথর-চূর্ণ, লবণ—এই সব লইয়া নকল বৃষ্টিধারা ও নকল



পিচকারী করিয়া ঘাম-তৈল ছিটানো

তৈয়ারী হয় । “মিউটিনি অন দি বাউন্টা”, “ক্লিওপেট্রা” প্রভৃতি ছবিতে বড়-বড় যে জাহাজ দেখিয়াছ, সে সব নকল-জাহাজ ! আসল সাগরের বুকে এ-সব জাহাজ কোনো কালে পাড়ি দেয় নাই !

এই সব নকল সামগ্রী লইয়া মর্শ্শর্শী নাটকে ছুড়িয়া

যাঁরা আসলের আবহাওয়া গড়িয়া তোলেন, তাঁদের সৃষ্টি-কুশলতায় মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না ; এ-সব সৃষ্টি-কার্যে যাদের নৈপুণ্য আছে, সে সব কারু-শিল্পী হলিউডে

সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে কারু-শিল্পে দক্ষতা-লাভ করিলে এ দেশের কারু-শিল্পীও যে তাঁর প্রতিভার পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হইবেন না, তাহা অনিশ্চিত ; এবং সেই জন্ত



হোজ-পাইপ দিয়ে নকল বরফ লাগানো



“গ্রান্ড প্যাশ, চাস” ফিল্মে নকল বৃষ্টিধারা

আজ তাঁদের অপূর্ণ প্রতিভার মূল্য পাইতেছেন, এটা সব চেয়ে আনন্দ ও গৌরবের কথা ।

আমাদের দেশেও আজ সিনেমায় আসন যেরূপ

ছেলে-বয়স হইতে এ-দিকে যাদের রুচি দেখা যাইবে, সে সব ছেলেমেয়ের শিল্প-প্রতিভা যাহাতে বিকশিত হয়, সে-সম্বন্ধে সযত্ন-সাহায্য প্রয়োজন !

উত্তম ও মধ্যম

মধ্যমেরে সমাদর করি বহু উত্তমের চেয়ে—

যে মধ্যম মধ্যপথে চলে ধীর মধ্য-গতি বেয়ে ।

যে মধ্যম গৃহ-দীপ শাস্ত শিখা জ্বলে অকল্পিত

খধুপেরে কে না জানে অবিলম্বে ধূলায় লুপ্তিত !

যে মধ্যম উত্তমেরে শ্রদ্ধাভরে করে বহু মান—

যে মধ্যম অধমেরে টানে ক্রোড়ে, নাহি অভিমান !

সেই সে মধ্যম ভালো, নাহি বহু-প্লাবন—শুধুতা—

সুস্থির সরসী-সম গুঞ্জে অলি অরবিন্দে যথা ।

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত



কাঁধ-গলা-ঘাড়

মেয়েদের মধ্যে দেখি যৌবন-রাগে দেহখানি বিভূষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেরই কাঁধ ও গলা এমন বেছাঁদে ভরে ওঠে যে, তার ফলে তাঁরা কোল-কুঁজো হয়ে পড়েন! অর্থাৎ চলেন ফেরেন বসেন দাঁড়ান—দেহখানি থাকে যেন ধমুকের মত বঁকে! এই কোল-কুঁজো ভাবের জন্ত অতি-বড় রূপসীকেও কতখানি বিক্রী দেখায়, যারা দেখেছেন, তাঁরা জানেন!

ছেলে-বয়স থেকেই বসা-দাঁড়ানো চলা-ফেরার সম্বন্ধে মেয়েদের খুব ছঁশিয়ার থাকতে হবে। গলা যেন হাঁসের গলার মতো সিধা-খাড়া থাকে,—কাঁধ বঁকে-চুরে কোনো মতে দেহের উপরে আশ্রয় পাচ্ছে ভেবে চুপ-চাপ থাকা চলে না! সিধা ঘাড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। যার কাঁধ ঝুঁকে আছে, গলা মুয়ে আছে, তাকে দেখলে মনে হয়, মনের বেদনা-ভারে সে যেন ভেঙ্গে পড়েছে! এবং গলা ও কাঁধের এই বিকৃত ভঙ্গীর জন্ত বহু রূপসী যৌবনেই কুশ্রী হন—যাকে ইংরেজীতে বলে unattractive অর্থাৎ দৃষ্টি-কটু! এই কোল-কুঁজো ভাবে অর্থাৎ মচকানো ঘাড় এবং গলার জন্ত জীবনী-শক্তিও কমে যায়। এ আমাদের কথা নয়! বিশেষজ্ঞেরা বলছেন—Low vitality is often the result of bad posture.

ঘাড়ের পেশীগুলি আছে আমাদের হাতের উর্দ্ধাংশে। কাঁধ ঝুঁকিয়ে থাকবার অভ্যাসে বুকের পেশী মচকে যায়, মুয়ে যায়। তার ফলে বুকের গড়ন কদর্য হয়। আমাদের গলার হাড় (collar-bone) যেখানে বুকের প্রধান হাড়ের সঙ্গে মিশেছে—সেই সংযোগ-স্থলের উপরেই কাঁধের অবস্থান। এইখানেই ঘাড় কাঁধ আর গলার সম্পর্ক—পরস্পরের সাহায্যে নিজেদের সঠিক ভাবে সম্পূর্ণ হাঁদে গড়ে তোলা। যে ভাবে ঘাড় রাখি, তার উপর

গলায় টোল পড়া ও তাঁজ পড়া বা গলা নিতাঁজ হওয়া এবং গলায় ঝাঁক ওঠা—এ-সব নির্ভর করে। কাজেই গলা, ঘাড় ও কাঁধের অবস্থান-সম্পর্কে এতটুকু ঔদাস্য করা চলে না। ঔদাস্য করলে দেহের চাকু-ছাঁদ ভেঙ্গে বিক্রী হয়ে যাবে! যোগ্য ব্যায়ামে কাঁধ, ঘাড় ও গলার দোষ কেটে গলা, কাঁধ ও ঘাড় সুছাঁদে গড়ে ওঠে।

আমাদের পিঠের মেরুদণ্ড ও পেশীর শক্তি-সামর্থ্যই কাঁধ ও গলার ছন্দ-সহায়; এবং এই শক্তি-সামর্থ্যের উপরেই দেহের শক্তি-সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

দেহচর্চায় দিকে মেয়েদের মনোযোগ এখন দেখা যাচ্ছে। প্রাচীন আদর্শে কয়েকটি টাইট-জামা গায়ে এঁটে দেহকে সঙ্কুচিত করার প্রয়াস বিলেতেও আজ দেখা যায় না। আমাদের দেশে যে সনাতন প্রথা নারী-সমাজে বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ কর্শেট বা টাইট-বন্ধনীতে দেহকে বেঁধে-ছেঁদে রাখার প্রতি গভীর বিরাগ, সে প্রথা আজ বিলিভী নারী-সমাজও মানছেন। এ প্রথায় নারীদেহের কমনীয়তা ও নমনীয়তা লোপ পায় না, নারীর দেহে শ্রী বিরাজিত থাকে।

দেহখানিকে ছিপ্-ছিপে রাখা চাই। তা হলে যৌবন-রাগ কোনো দিন দেহ ছেড়ে পলায়ন করবে না! মেদ-মাংসে দেহ যদি পিণ্ড হয়ে ওঠে, তা হলে শত-প্রয়াসেও নারী তাঁর দেহে যৌবনকে ধরে রাখতে পারবেন না। সুতরাং দেহকে ধারা যৌবন-নিটোল-ছন্দে কায়েমি ভাবে বাঁধতে চান, তাঁদের উচিত শ্বাসগ্রহণে নিয়ম-পালন এবং নিষ্ঠাভরে প্রত্যহ যোগ্য ব্যায়াম-সাধন করা।

দিনে খানিকক্ষণ করে নিষ্ঠাভরে গভীর ভাবে শ্বাসগ্রহণ (deep breathing) অভ্যাস করুন। তা হলে দেহের কাঠামোখানি পরিপূর্ণ নিটোল থাকবে; সে ছাঁদ কোনো দিন ভেঙ্গে ধ্বশে নষ্ট হবে না।

সংসারের নানা কাজে হাত ছুঁখানিকে আমাদের ব্যবহার করতে হয়, সত্য। অনেকে বলবেন, তাতেই



১। মাথার পিছনে হাত

২। গামনে অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত

তো ব্যায়াম-সাধনা হচ্ছে! এ-কথার উত্তরে আমরা বলবো, এ ব্যায়াম এক-তরফা রকমের। লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া—যা-কিছু কাজ করি, আমরা ডান হাতে করি; বাঁ হাত চুপচাপ থাকে। কাজেই এতে ব্যায়াম যা হয়, তা ঐ ডান হাতখানির—তাতে ব্যায়ামের সুফল লাভ হয় না। অনেক খেলা-ধুলায় দেহের অংশ-বিশেষের মাত্র ব্যায়াম-সাধনা হয়; সে ব্যায়ামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ ব্যায়ামের ফল পায় না বলে উপকার ঘটে না। আমাদের কাঁধ, খাড় ও গলার সৌন্দর্য্য বিধান করতে হ'লে এমন ব্যায়াম করা চাই, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যার তরঙ্গ লাগবে!

সাঁতার কাটা, দাঁড় টানা, বল ছুড়ে লোফালুফি করা, দোল খাওয়া—এ সব সমস্ত দেহের ব্যায়াম-সাধন হয়। এগুলি ছাড়া যে বিশেষ ব্যায়াম-বিধি-পালনে কাঁধ, গলা আর ঘাড়ের ছাঁচ ভালো হয় এবং তার ফলে সমস্ত দেহে সৌন্দর্য্য উথলে উঠবে, সে সৌন্দর্য্য ভাঁটার টানে মিলিয়ে যাবে না, এমন ব্যায়াম-বিধির কথা এবার বলি।

সুগোল সুগঠিত কাঁধ—তার জন্তু গভীর ভাবে শ্বাস-গ্রহণ কর্তব্য। ১নং ছবির ভঙ্গীতে মাথার পিছনে

হ'হাত রেখে সিধা খাড়া দাঁড়িয়ে ছ'মিনিট কাল-জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন্।

তার পর ২নং ছবির ভঙ্গীতে সামনের দিকে গলার ঠিক নাচে বুকের উপরে হ'হাত আঙুলে-আঙুলে কাঁচির মতো আবদ্ধ করে ছ'মিনিট কাল জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন্। এ ছ'টি ব্যায়ামে গলার ঘাড়ের টোল-খাঁজ সব সেরে ভরাট হয়ে উঠবে—নিটোল হবে।

তার পর হ'হাতের বন্ধন মুক্ত করে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে হ'হাত এবং ডান পায়ের উপর দেহের ভর রেখে বাঁ পা উর্কে তুলুন। এই ভাবে থেকে এক দুই করে দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত গুণুন! তার পর

সহজ ভাবে সিধা খাড়া দাঁড়ান। এর পর হ'হাত এবং বাঁ পায়ের উপর দেহের ভর রেখে ডান পা উর্কে তুলে পূর্ণ-ব্যায়ামের ভঙ্গীতে এক থেকে দশ পর্য্যন্ত গোণা এবং গোণার পর সহজ ভাবে অবস্থান!

চার নম্বরে ৪নং ছবির মতো কাঁধের সঙ্গে সমরেখায় রেখে ছবির ভঙ্গীতে হ'হাত বাঁকিয়ে কব্জী ঘোরান্। বেশ জোরে জোরে হাত (কব্জী-ভাগ) ঘোরাতে হবে। দশ বারো বার ঘোরাবেন।

পাঁচ নম্বরের ব্যায়ামে ৫নং ছবির ভঙ্গীতে এক-বার ডান হাত তুলুন উর্কে—বাঁ হাত মুড়ে বাঁ দিককার বুকের উপর রাখুন। এই ভাবে হ'হাত রেখে জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন তিন মিনিট; তার পর বাঁ হাত

৩। দুই হাত ও এক পায়ের উপর ভর

উর্কে তুলে ডান হাত মুড়ে ডান দিককার বুকের উপর রেখে তিন মিনিট জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ।

ছয়ের পরে ৬নং ছবির ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে

উর্কে চেয়ে সিধা হয়ে দাঁড়ান। হুঁহাত ঐ ছবির মতো পিছন দিকে বিলম্বিত ও পুটবন্ধ থাকবে। এই ভাবে দাঁড়িয়ে ছ' মিনিটকাল বেশ জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন।

এই ক'টি ব্যায়াম-বিধি নিত্য পালন করলে দেখবেন, দেহ মজবুত থাকবে, গলা, কাঁধ বা ঘাড়ের কোথাও টোল বা খাঁজ থাকবে না। দেহের ছাঁদ নিটোল থাকবে চিরদিন।

মেয়েরা কি চায় ?

আমরা অর্থাৎ মেয়ে-জাত কি চাই, কিসে আমাদের খুঁৎ-খুঁতুনির বিরাম হয়ে আমরা সুখে থাকি, পুরুষ-সমাজ তা জানতে চান। আমাদের মধ্যে নীদের ambition খুব উঁচু বা মনের গড়ন অসাধারণ-রকমের, তাঁরা কি চান, জানি না। তবে আমাদের মতো সাধারণ-অবস্থার এবং সাধারণ-শিক্ষার মেয়েরা কি চায়, একবার হাতে-কলমে তা বোঝবার চেষ্টা করছি।

কথাটা গোপন করবো না—আমাদের চেতনা-বুদ্ধি জাগ্রত হবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের সংসার এবং সমাজ দেখে-গুনে আমাদের মনে স্বপ্ন জাগে! স্বামি-পুত্র, ঘর-সংসারের স্বপ্ন! এ স্বপ্নে, এ কল্পনায় আমাদের কিশোর মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে! লেখাপড়ায় ডিগ্রী-পদক পেয়ে বা কোনো শিল্পকলায় শক্তি দেখিয়ে যারা যশ-মান চান, তাঁদের মনে এ স্বপ্ন জাগে কি না, জানি না!

তবে এ-কথা যদি বলি যে, শুধু আমাদের দেশেই নয়,

সকল দেশেই মেয়েদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের মন এই স্বামি-পুত্র-সংসারের স্বপ্নে বিভোর থাকে, তা হ'লে সে-কথা বোধ হয় মিথ্যা হবে না!



৪। এমনি ভাবে হাত রেখে



৫। এক হাত বৃকে আর হাত তুলে

৬। হুঁহাত পিছনে এবং ঘাড় তুলে

কিন্তু এ স্বপ্ন ঠিক সফল হয় কৈ? কাজেই নৈরাশ্র, ক্লোভ, ব্যথা-অভিমানের ভারে মন ভরে থাকে, সংসারে সুখ-শান্তির অভাব ঘটে।

কিন্তু যা পাইনি, যা পাবার নয়,—তার জন্ত এ দুঃখ, এ অভিমান লালন করে জীবনকে ক্লোভানলে পুড়িয়ে ছাই করায় লাভ আছে কি?

আমার মনে হয়, মনের সঙ্গে যদি বোঝাপড়া করে নিতে পারি যে, যা পেয়েছি, তা' থেকেই শান্তি ও সাধনা গড়ে মনকে তৃপ্ত রাখতে হবে, তা হ'লে বোধ হয় এ দুঃখ-নৈরাশ্র আমাদের মনকে প্রণীড়িত করতে পারবে না!

পুরুষরা প্রায় বলেন,—মেয়েরা বড় অবুঝ ! There is no understanding woman ! অর্থাৎ মেয়েরা বুদ্ধি-সঙ্গতি বোঝে না ; বুঝতে চায় না ! এ কথাটাকেও সত্য বলে মেনে নিতে রাজী নই।

দাম্পত্য-সুখ কি শুধু টাকা-কড়ির স্বচ্ছন্দতার উপরেই নির্ভর করে ? না ! তা যদি করতো, তা হ'লে বাঙলার পল্লী-কুটারে থামরা স্বামি-স্ত্রীর ত্যাগ-ভালোবাসার চিহ্ন দেখতে পেতুম না এবং সে সব সংসারের কোনো অস্তিত্ব আজ থাকতো না।

এই দাম্পত্য সুখ-শান্তির কথায় স্ত্রী-পুরুষের মনের আলোচনা করতে হয়। পুরুষের ভালোবাসা বা মোহ প্রথমে চায় আয়তৃপ্তি। স্বামীর প্রথম প্রেম—চুম্বনে-আলিঙ্গনে সোহাগে-আদরে সার্থক পরিপূর্ণতায় নিজেকে পরিতৃপ্ত করতে চায়। মেয়েদেব প্রথম প্রেমে কিন্তু দৈহিক ক্ষুধা-তৃপ্তির নামগন্ধ থাকে না। তার চোখে স্বামী তখন করুণায়-গড়া রাজপুত্র ! শুধু রোমান্স ! এজন্ম মেয়েদের দিক থেকে প্রেমে এ-সময়ে অত্যাচ্ছাদ জাগে না ; পুরুষের প্রেম অত্যাচ্ছাদে উগ্র হয়ে ওঠে !

এবং এই উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের জগুই মেয়ে-জাতকে পুরুষ ঠিক বুঝতে পারে না। প্রথম-পরিচয়ে হ'জনে কিছু-কাল ছোটখাট মান-অভিমান চলে। সে মান-অভিমান-আঘাতের মধ্য দিয়ে কোনো দাম্পত্য যদি পরস্পরের মনের পরিচয় পেয়ে যান, তা হ'লে তাঁদের জীবনে অশান্তির উৎপাত বড়-একটা ঘটে না !

সংসারে প্রবেশ করবার পর পুরুষকে নানা কাজে নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। সে মেলা-মেশায় পুরুষ কখনো আঘাত পায়, ব্যথা পায়, নৈরাশ্রে অধীর হয় ; সে নৈরাশ্র-ব্যথার ফলে জগতের উপর তার বিরাগ জন্মায়, ঘেঁষ জন্মায়। বেচারী স্ত্রীর উপরেও বিরক্তির বিরাম থাকে না ! কাজেই বাড়ী ফিরে বহু পুরুষ বেচারী-স্ত্রীর উপর মনের সে বিরাগ-রুদ্ধ-রশ্মি-ফুলিঙ্গ বর্ষণ করেন।

মেয়েদের মন কিন্তু এ-ধাতের নয়। সংসারে নানা ঝক্কি, জালা-যাতনা সয়েও স্বামীর আদরে মেয়ে-জাত নিজেকে নিমেষে স্থস্থির করে তোলে। আদরে সে জালা

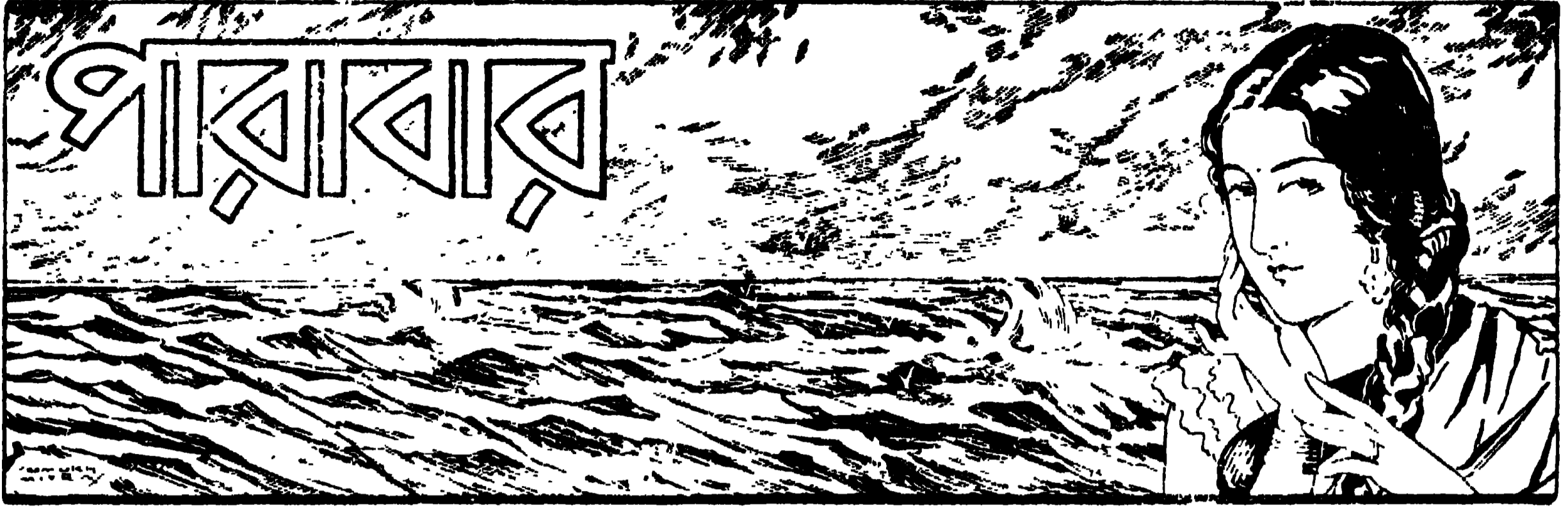
যাতনা মেয়েরা অনায়াসে ভুলতে পারে ! সংসারের জালা-যাতনায় স্বামীর শান্তি-সুখ যাতে এতটুকু আহত না হয়, সে-বিষয়ে প্রাণপণে নিজেকে তারা সঙ্কত রাখে। অর্থাৎ মেয়ে-জাত যেমন নিঃশেষে নিজেকে দান করতে পারে, পুরুষ তেমন পারে না। সংসারের জালা-যাতনা বা অভাবের রিপোর্ট স্বামীর মন বুঝে যথাসময়ে এমন মিনতি-ভরা কণ্ঠে মেয়েরা বিবৃত করেন, এতখানি দরদে সে রিপোর্ট পেশ করেন যে, মন থাকলে পুরুষ অনায়াসে বুঝবে, এ দরদে স্ত্রীর কতখানি ভালোবাসা, কতখানি মায়া-মমতা উৎসারিত হয়।

স্ত্রী সম্ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করবার আসবাব বা যন্ত্রমাত্র নয় ! স্ত্রীর মন আছে, এ-কথা স্বামীরা যেন ভুলে না যান !

স্ত্রীর আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, বাসনা আছে, কামনা আছে,—তার সুখ আছে, দুঃখ আছে। স্ত্রীর মনের সঙ্গে মন মেলাতে হবে ! দেহ নিয়েই শুধু স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়।

সে-স্বামী বলেন, স্ত্রী আমার পানে তাকান না, আমাকে অবহেলা করেন, অর্থাৎ তাঁর বাসনা-কামনার ইন্ধন জুগিরে জন্ম সার্থক মনে করেন না,—সে স্বামী যেন মনে রাখেন, তাঁর যেমন বাসনা-কামনার বা বিরাগ-অমুরাগের সময়-অসময় আছে, স্ত্রীরও তেমনি ! এ কথা ভুলে গেলে স্বামীনা মস্ত অবিচার করবেন ! অফিসের কাজ-কন্ঠে স্বামী নাটাবানটা খাচ্ছেন, তার মধ্যে বিনোদ-বেশে সেজে স্ত্রী এসে যদি বলেন, আমায় একটু আদর করো গো—তা হ'লে স্বামী বলবেন, সরো, সরো, কাজের সময় কাব্য ভালো লাগে না ! তেমনি স্ত্রীর আবেগ-ভালোবাসা-বিকাশেরও সময়-অসময় আছে, স্বামী-জাত সে কথাটুকু যেন মনে রাখেন।

অর্থাৎ মেয়ে-জাত রাজ্য-বিভব চায় না। মেয়ে-জাত চায়, স্বামী যেন তার মন বোঝেন, তার সুখ-দুঃখ বোঝেন, তাকে মানুষ বলে বোঝেন। এর বেশী প্রত্যাশা সাধারণ-মেয়ে-জাতের মনে নেই। দরদ পেলেই মেয়ে-জাত তা বুঝতে পারে ! এবং স্বামীর কাছে এই দরদটুকু পেলেই তার চাইবার আর-কিছু থাকে না !



২৭

বীণার এত আশায়-রচা স্বপ্ন-প্রাসাদ যেন ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া গেল! কি না সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল ..

ভাবিয়াছিল, গোপনতা ছাড়িয়া ছলনার এ-কথা সে প্রকাশ করিয়া বলিবে। বলিবার ফলে তার ভাগ্যে যা ঘটে, যত কঠিন দণ্ডই হোক, সে-দণ্ড সে মাথা পাতিয়া লইবে! এজ্ঞ তাকে যদি সব ত্যাগ করিয়া নির্মাসনে যাইতে হয়, তবু সে মনের মধ্যে এ বিষ আর চাপিয়া রাখিবে না!...

এখন ভাবিতেছিল, নিমেষের এ খেয়াল তার কেন হইয়াছিল? বেচারী! বোঝে নাই, পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে কত জটিলতা, সে-সম্পর্ক রক্ষা করিতে কত দিকে কত শৃঙ্খল ব'ছে!

ট্রেন চলিয়াছে।

বার্ধের গদি-মোড়া আসনে ঠেঁশ দিয়া বীণা বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে। ছ'চোখের উপর অর্ধ বাষ্প প্রতিফলে পুঞ্জিত হইতেছে! সে ভাবিতেছে, ট্রেন তো চলিয়া আসিল, কিন্তু শ্রীপতি?

নিশ্চয় সে দাহুর কাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। তার মতো লোকের যে কিছু বাধে না, বীণা তা বোঝে! তার এ-বলায় সেখানে কি যে এখন ঘটতেছে ...হয় তো বৃদ্ধ তারাচরণ রায় এত বড় মিথ্যার আঘাত সহিতে না পরিয়া...

বুকের মধ্যে রাজ্যের নিশ্বাস ফুলিয়া-ফুঁশিয়া এমন হইল যে, প্রাণটা বুঝি সে-নিশ্বাসের চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে!

স্বর্ণহ্যতি ও-দিকে জিনিষপত্র গুছাইয়া বেডিং খুলিয়া বলিল,—একবার ওঠো, তোমার বিছানাটা পেতে দি।

তার পর শুয়ে পড়ো! জানি, তোমার মন বাথায় ভরে আছে! শুয়ে-শুয়ে দাহুর কথা ভাবো। ভাবতে ভাবতে ঘুম আসবে'খন...

এ স্বরে কতখানি আদর...কি গভীর স্নেহ! ক'দিনে স্বর্ণহ্যতির যে-পরিচয় বীণা পাইয়াছে...

স্বর্ণহ্যতির কথায় বীণা উঠিল।

স্বর্ণহ্যতি বলিল,—দাঁড়িয়ে থাকে না! তুমি এ বার্ধে বসো...

বীণা নিঃশব্দে এ আদেশ পালন করিল; বার্ধে বসিল। বুঝিল, স্বর্ণহ্যতি তার জ্ঞান এ শয্যা বিছাইতেছে। মনে হইল, তার উচিত, নিজের হাতে শুধু তার শয্যা নয়, স্বর্ণহ্যতির শয্যাও রচনা করা...

কিন্তু নিজের হীনতার লজ্জায়, অনধিকারিত্বের গ্লানিতে তার হাত-পা যেন নিষ্পন্দ অসাড়! কথা কহিবে, সে শক্তিও যেন অহুঁত হইয়া গিয়াছে! চুপচাপ সে সামনের বার্ধে বসিয়া রহিল; এবং স্বর্ণহ্যতি তার জ্ঞান শয্যা রচনা করিতে লাগিল।

শয্যা বিছানো হইলে স্বর্ণহ্যতি বলিল,—শুয়ে পড়ো ...বুঝলে!

ছ'চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি...বীণা আবার উঠিয়া দাঁড়াইল...

স্বর্ণহ্যতি নিজের বিছানার ঝুঁপ খুলিতে লাগিল। বীণা কোনো মতে কথা কহিল, বলিল—আমি বিছানা পেতে দি...

হাসিয়া স্বর্ণহ্যতি বলিল,—না। কাল থেকে তুমি সংসারের চার্জ নিয়ো। আজ তোমার অভ্যর্থনার ভার আমার থাক। তোমাকে এত দিনকার স্নেহ-শৃঙ্খল ছিঁড়ে দূরে নিয়ে যাচ্ছি নিজের স্বার্থে—এ তুমি যেমন বুঝছো, আমিও তেমনি বুঝছি, সলিলা...

এ-কথায় বীণার মনের ভিতরে যে-জায়গাটা ঘানির বেদনায় একেবারে আর্ন্ত-আতুর হইয়াছিল, সে-জায়গাটা যেন মচকাইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। বীণা কোনো কথা বলিতে পারিল না। বার্ধের বিছানায় নিষ্পন্দ বসিয়া কামরার খোলা জানলা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

বাহিরে ঘন-ঘোর অন্ধকার। মাঝে-মাঝে আলোর চমক! আলোর ও-চমক দেখিয়া বীণা ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে! মনে হয়, ও-আলো যেন শ্রীপতির উল্লাসের হাশ্বদীপ্তি!

গাড়ী বর্ধমান ছাড়িল।

স্বর্ণহ্যতির হাতে ছিল একখানা বই, বইখানা বাখিয়া সে বলিল—শুয়ে পড়া যাক...কি বলো?

স্বর্ণহ্যতি শুইয়া পড়িল। বীণা তেমনি বসিয়া আছে। স্বর্ণহ্যতি বলিল—শোও, সলিলা।

বীণা বলিল—আমি পরে শোবো...

স্বর্ণহ্যতি বলিল—আমি কামরা লক্ করে দিয়েছি। রাত হয়েছে...মিথ্যে কেন জেগে বসে থাকবে? অন্ধকারে কি-বা দেখবে?

স্বর্ণহ্যতি উঠিল, বীণার পাশে আসিয়া বসিল। বলিল, —বড় মন কেমন করছে...না?

বীণা কোনো কথা কহিল না—চোখে জল একেবারে ছাপাইয়া উঠিল!

স্বর্ণহ্যতি বলিল,—এ ঘটনা সব মেয়ের জীবনে ঘটে, সলিলা। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করেছিলেন...সে তবু তপোবন থেকে রাজাধিরাজের অস্ত্রপুরে মহারাণী হতে যাচ্ছিলেন! তিনিও দুঃখে-বেদনায় অভিভূত হয়ে-ছিলেন! এর উপায় যে নেই!...শুয়ে পড়া, লক্ষ্মীটি। বলো তো, গল্প করি...কি বলো?

গল্প? বীণার পৃথিবীতে কিছু কি আর আছে...কিসের গল্প শুনিবে সে? তার পৃথিবী জুড়িয়া এখন শুধু ঐ এক দারুণ বিভীষিকা!

বাষ্প-জড়িত কর্ণে বীণা কহিল—না, আমি শুছি। ভূমিও শোও...

স্বর্ণহ্যতি বলিল—খুব ভালো কথা! কাল সকাল থেকে আমাদের নব-জীবন নব-জাগরণ। কাল থেকে

আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় শুরু! সে-অভিনয় শুভ হোক, শিব হোক...

মনে মনে বীণা বলিল, তা কি হইবে? তার জীবনের সব বুদ্ধি শেষ হইয়া গেল!

এলাহাবাদে নিজের নীড়ে আসিয়াও বীণা প্রাণপণে মনের সঙ্গে যুক্তিতে লাগিল...কোনো দিন যদি তার এ গৃহে বজ্রপাত হয়, সে-দিন যা হয় করিবে...তাই বলিয়া তার আগে বজ্রপাতের আশঙ্কা লইয়া চারি দিকে এমন অশান্তি, এতখানি দুঃখ কেন রচনা করে!

অফিসের কাজে-কস্মে স্বর্ণহ্যতিকে প্রথম প্রথম অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। তরুণ উৎসাহী লোক পাইয়া অফিসের সাহেব নানা কাজে স্বর্ণহ্যতিকে খাটাইয়া লয়। মফঃস্বলের দু'চারিটা অফিসের হিসাবের গরমিল মিলাইয়া পরখ করিবার জন্ত পাঠায়, বলে—মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ইউ উইল বী প্লীজ্ ড টু...এ্যাণ্ড আই উড বী সো গ্রেটফুল...

মুহু হাসিবা স্বর্ণহ্যতি বলে,—অল্ রাইট...

স্বর্ণহ্যতি বাহিরে যায়, বীণা নিখাস ফেলিয়া ভাবে, এবারে মনের সঙ্গে ঠিক বোঝাপড়া করিয়া লইবে।

স্বর্ণহ্যতি ফিরিয়া আসে, বীণার বুক কাঁপে! স্বর্ণহ্যতি আসিবামাত্র মনের আগ্রহ লইয়া ছুটিয়া তার সঙ্গে গিয়া সে দেখা করিতে পারে না। ভয় হয়, কি জানি, বাহিরে কোথাও ইতিমধ্যে যদি শ্রীপতির সঙ্গে দেখা হইয়া থাকে? যদি সে-সাক্ষাতে উঁহার কাছে বীণার সব কথা সে বলিয়া থাকে? স্বর্ণহ্যতি গৃহে ফিরিলে বীণা নেপথ্যাস্তরালে থাকিয়া ভয়ে-ভয়ে তাকে লক্ষ্য করে! দেখে, স্বর্ণহ্যতির মনে কোনো ভাবাস্তর? মুখ গম্ভীর...মূর্ত্তি রুদ্ধ?

যখন দেখে, তা নাই, তখন মলিন-হাসি মুখে লইয়া সে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে—আমি ও-দিকে ছিলাম...

স্বর্ণহ্যতি তার পানে তাকায়, তাকাইয়া বলে—বিরহ-তপঃক্রিষ্টা মলিন তোমার মূর্ত্তি...

এং কথার সঙ্গে-সঙ্গে স্বর্ণহ্যতির আদর-উচ্ছ্বাসের সমারোহ।

সে-আদরে বীণার দুই চোখ মুদিয়া আসে...জগৎ-সংসার, শ্রীপতি-বীণা...সব ভুলিয়া মন কোন্ অদৃশ্য-লোকে উধাও হইয়া যায়।

তার পর ছু'জনে ফিরিয়া আসে আবার এই কঠিন মর্ত্যালোকে ! তখন এই মর্ত্যালোক লইয়া ছু'জনে নানা কথা...

স্বর্ণহ্যতি বলে,—দাহুর চিঠি পেয়েছো ?

বীণা জবাব দেয়,—পেয়েছি...

স্বর্ণহ্যতি বলে—কি লিখেছেন ? কবে আসবেন, তার কোনো আভাস ?

বীণা বলে—না । লিখেছেন, নানা কাজে সময় হচ্ছে না...যেমন একটু সময় পাবেন, অমনি এখানে আসবেন... একেবারে কোন খপর না দিয়ে !

স্বর্ণহ্যতি বলে—হুঁ !...বিদেশে বসে তোমার কথাই ভাবতুম, সলিলা...

সলিলা-নামে বীণার বুকখানা ধড়াশ করিয়া ওঠে ! মুখ আপনা হইতে আনত হয়...সে-মুখে কথা ফোটে না ! মনের মধ্যে আতঙ্ক...ভয়...দ্বিধা...সংশয় !

স্বর্ণহ্যতি বলে—কি কথা ভাবতুম, জানো ?

বীণা মুখ তুলিতে পারে না...বুকের মধ্যে ফোজে-টানা কামানের গাড়ী চলিতে থাকে !

স্বর্ণহ্যতি বলে—মুখ তুলে আমার পানে চাও...তবে তো কথা বলবো !

বীণা মুখ তোলেন...

স্বর্ণহ্যতি বলে,—আমাকে তোমার এখনো এত লজ্জা, ওগো মৌনবতী নববধু...

বীণা কষ্টে নিশ্বাস চাপে ।

স্বর্ণহ্যতি বলে,—বলো দিকিনি কি কথা ?

কোনো মতে বীণা বলে,—কি ?

নিজের কর্ণের এই অতি-ক্ষীণ কম্পিত স্বর শুনিয়া বীণা চমকিয়া ওঠে ! এ তারি কথা না কি ?

স্বর্ণহ্যতি বলে—নিরীহ বেচারী বৃদ্ধ তারাচরণ রায় ! সারা জীবন কত ব্যথা সঙ্গে তোমাকে পেয়ে সে-ব্যথা একটু ভুলেছিলেন...আর আমি ছু'জনে দস্যুর মতো তোমাকে তাঁর বুক থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এলাম ! ভাবি, তাঁকে যে এ-দুঃখ দিলুম, সে-জন্তু আমাকে এক দিন কঠিন প্রায়শ্চিত্ত না ভোগ করতে হয় !

এ কি কথা ! এ-কথা বীণার বুক তীরের মতো বিঁধে !

স্বর্ণহ্যতি বলে—তোমার এই মলিন মুখ...তোমার চোখের পিছনে সব-সময়ে আমি যেন জমাট অশ্রু ছায়া দেখি ।...সত্যি সলিলা, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে. দাহুর অদর্শনে...না ? যাবে তুমি দাহুর কাছে ?

বীণার ছুই চোখ জলে ভরিয়া ওঠে । বীণা বলে,—না, না, তা নয় !

স্বর্ণহ্যতি বলে—তবে কেন তুমি এমন মলিন-মুখে থাকো ?...আমি মাঝে-মাঝে চলে যাই বলে ?

এ কথায় বীণা যেন অকূল সমুদ্রে কূল পায় । তাড়া-তাড়ি এই কথার কুলটুকুকে আশ্রয় করিয়া বীণা বলে—
হ্যাঁ ..

কথার সঙ্গে-সঙ্গে তার দেহ ছলিয়া ওঠে...

স্বর্ণহ্যতি তাকে ছুই বাহুর বাধনে আবদ্ধ করিয়া বুক চাপিয়া ধরে । স্বর্ণহ্যতির বুক মুখ রাখিয়া বীণা ছু'চোখে অশ্রু উৎস একেবারে খুলিয়া দেয়...

প্রায় এমন ঘটে...

সে-বার স্বর্ণহ্যতি বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, - চलो, আমরা চুনার ঘরে আসি...তোমার পিশিমার ওখানে যাই । তিনি অত করে লিখেছেন...আমরাও তাঁকে কথা দিয়েছি যখন...যাবে ?

বীণা বলিল—চলো...

ছু'জনে আসিল উমাজিনীর কাছে ।

রেলওয়ে-কোয়ার্টার্স । পাশাপাশি ক' ঘর বাঙালী-পরিবারের বাস । সকলে মিলিয়া-মিশিয়া যেন অখণ্ড একটি স্বেচ্ছা পরিবার গড়িয়া তুলিয়াছে । এক জনের গৃহে উৎসবের আয়োজন হইলে যেমন সে-উৎসবে সকলের ডাক পড়ে, তেমনি এক-পরিবারের ব্যথা-বেদনাও সকল-পরিবার সমান ভাবে বুক তুলিয়া লয় !

ছু'দিন চুনারে হাশু-কলরবে কাটাইয়া আবার এলাহাবাদে প্রত্যাগমন ।

যে-দিন চলিয়া আসিবে, উমাজিনী বলিল,—বাবা আসছেন ছু-এক দিনের মধ্যে...তাঁর কি কাজ আছে এ-দিকে । আজ চিঠি পেলুম ।

বীণা বলিল—চুনারে আসছেন ?

—হ্যাঁ ।

—একা ?

—চিঠিতে তাই লিখেছেন।

বীণার মনে হইল, একবার তিনকড়িকে পাইলে যেন ভালো হয়। ঐ তিনকড়ি গাঙ্গুলির হাত ধরিয়া সে এ-সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। যদি এখন তিমু দাহুকে পায়, তাহা হইলে মন খুলিয়া নিজের এ-দুঃসাহসের কথা, এ-অনধিকারের কথা, বুকে এই যে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে—সে-সব কথা সে খুলিয়া বলে বলিয়া পরামর্শ চায়, বীণা এখন কি করিবে ?

আর সে পারে না ! এত স্নেহ, এত প্রীতি-ভালো-বাসা...নিজের হীনতার প্রতিফলনে মন যা হইয়া আছে... না পারে কিছু দিতে ! না পারে কারো কাছ হইতে কিছু লইতে ! স্নেহ-পারাবারের তীরে বসিয়াও তার মন যেন দুঃখী-কাঙালের অধম হইয়া আছে...

মনে হইতেছে, যাকে তার এ দুঃসাহসিকতা এতটুকু আঘাত দেয় নাই, এমন দরদী বন্ধু পাইলে তার কাছে সব কথা বলিয়া আশ্রয় চাহিবে...তার কাছে কাঁদিতে পাইলে বীণা যেন বাঁচিয়া যাইবে !

যে চরম দুর্দিনের আশঙ্কা সর্বক্ষণ সমুদ্রত রহিয়াছে, সে দুর্দিন সমাগত হইলে কোথায় কার মুখ চাহিয়া সে দাঁড়াইবে ? কে বুঝিবে, ঐশ্বৰ্য্যের লোভে, বিলাসের লালসায় বীণা এত-বড় পাপ করে নাই ?

২৮

আরো দু'তিন মাস পরের কথা।

মনকে বীণা অনেকখানি শাস্ত করিয়া আনিয়াছে। এত দিনেও যখন তার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের বিন্দু উদয় হয় নাই, তখন মনে হয়, শ্রীপতি হয় তো ভয় পাইয়া সরিয়া গিয়াছে...হয় তো তার মনে করুণার সঞ্চার হইয়াছে...হয় তো শ্রীপতি ভাবিয়াছে, নূতন-জীবনে যদি বীণা সুখী হইয়া থাকে, তার সে-সুখে নাই বা বাদ সাধিলাম !

শয়নে-স্বপনে সে ঠাকুর-দেবতার পায়ে মিনতি জানায়—ঠাকুর, শ্রীপতির মনে দয়া-মায়া সঞ্চারিত করো...তাকে সুবুদ্ধি দাও, ঠাকুর !

কিন্তু এমন করিয়া বাঁচাও যায় না ! ইহার চেয়ে সত্য

প্রকাশ হোক, এবং তার ফলে দণ্ডমুগ্ধ বা মার্জনা...যা হয় একটা ফয়সালা হোক ! তাহাতে যেন ঢের শান্তি, অনেকখানি স্বস্তি !

দাহু চিঠি লেখেন। সে-চিঠিতে বীণার জন্ত তেমনি অধীর আবেগ...‘সলিলা-দিদিকে দেখিবার জন্ত মনে কতখানি ব্যাকুলতা’...তার পর নানা কারণে আসিতে গিয়াও আসা হইতেছে না বলিয়া দুঃখ-প্রকাশ !

বীণা ভাবে, সে যেন সেই কবিতায়-পড়া পন্নপত্রে জলের বিন্দু ! কখন ঝরিয়া পড়িবে, ঠিক নাই !

এ-জন্ত কতবার তার মনে হইয়াছে, আজ নয়...কাল...কাল নিশ্চয় স্বর্ণদ্যুতির কাছে সব কথা খুলিয়া বলিবে ! এত ভালোবাসা...সে-ভালোবাসা গড়িয়া উঠিয়াছে কি তারাচরণ রায়ের দৌহিত্রীকে লইয়া ? তার নিজের কিছু নাই...যা দিয়া স্বর্ণদ্যুতির এ-ভালোবাসাকে সে ধরিয়া রাখিতে পারে ? স্বর্ণদ্যুতি কি তাকে ভালোবাসে তার এই তারাচরণের দৌহিত্রী-পরিচয়ে ? যদি তাই হয়, তাহা হইলে ছদ্মাবরণে এ-ভালোবাসা নাই বা রহিল ! সে বীণা...বীণা বলিয়া স্বর্ণদ্যুতি যদি তাকে ভালো না বাসে, তাহা হইলে এ-ভালোবাসার কোন দাম নাই ! চোর সাজিয়া এ-ভালোবাসা সে আর চায় না !

দিনের আলোয় স্নান সারিয়া মনে-মনে কত দিন সঙ্কল্প করিয়া সে নিজের কথা বলিবে বলিয়া স্বর্ণদ্যুতির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ! স্নান করিতে করিতে মনে-মনে কতবার ঠিক করিয়া লইয়াছে, কোন্‌খান হইতে সুরু করিয়া এ কাহিনী কি করিয়া খুলিয়া বলিবে...কিন্তু বলিতে আসিয়া বলিতে পারে নাই ! নানা কারণে বলা হয় নাই...

কোনো দিন দেখিয়াছে, স্বর্ণদ্যুতির আদরের অতুল্যক্লাস...কোনো দিন বা স্বর্ণদ্যুতি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছে !

বীণার মনে হইয়াছে, বাঁচিয়া গিয়াছে ! একটা দিন আরো প্রাণটা তবে রহিয়া গেল !

সে-দিন অফিস হইতে ছুটো-বেলায় বাড়ী ফিরিয়া স্বর্ণদ্যুতি ডাকিল—সলিলা...

• নিজের ঘরে বীণা চুপ করিয়া বসিয়াছিল...

স্বর্ণহ্যতির আহ্বানে চমকিয়া উঠিল। এ সময়ে তো
উনি বাড়ী আসেন না! হঠাৎ আজ...

শ্রীপতি আসিয়াছে না কি?

বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল! উঠিতে গিয়া
উঠিতে পারিল না।

স্বর্ণহ্যতি এ-ঘরে আসিল, বলিল,—বসে আছো যে।
অনুখ করেছে না কি?

মলিন হাস্তে বীণা কহিল,—না...

—তবে?

বীণা কোনো জবাব দিল না।

স্বর্ণহ্যতি বলিল,—হঠাৎ এ সময় বাড়ী এলুম, তুমি
আশ্চর্য হচ্ছো...না?...

বীণা এ-কথারো জবাব দিল না... মলিন দৃষ্টিতে
স্বর্ণহ্যতির পানে চাহিয়া রহিল।

স্বর্ণহ্যতি বলিল,—দুঃসংবাদ আছে...

দুঃসংবাদ! বীণার বুকে যেন বাজ পড়িল! মনে
হইল, আমি জানি...জানি...এ দুঃসংবাদের ভয়ে আজ
ক'মাস কি করিয়া আমার রাত্রি-দিন কাটিতেছে!

স্বর্ণহ্যতি বলিল—কিন্তু জানো তো, যে-মেধ বস্তু
আনে, সেই মেধট আবার পৃথিবীকে শত্রুশ্রামল করে!
তেমনি এ দুঃসংবাদের পিছনে আছে মনোহর ইঙ্গিত!

বীণার মুক মৌন দৃষ্টি...

স্বর্ণহ্যতি বলিল—আজই আমাকে একটা স্পেশাল
এনুগেজমেন্টে দিল্লী যেতে হবে, এনকোয়ারির জন্ত। তার
পর এ কাজে যদি এফিসিয়েন্সি দেখাতে পারি, তা হ'লে
দিল্লীতে বদলি হবো...ভালো গ্রেড পাবো!...যাকে বলে,
stepping stone to success...

এ কথার কি জবাব দিবে, বীণা খুঁজিয়া পাইল না।
বোঝে...স্বামীর উন্নতিতে, স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর কতখানি
সম্পদ-সৌভাগ্য...

কিন্তু মনে-প্রাণে এ কথাটা আজো সে গ্রহণ করিতে
পারিল না। কি করিয়া পারিবে? মজ পড়িয়া বিবাহ...
আগে মনে হইত, বিবাহ হইয়া গেলে কোনো দুর্ভাগ্যের
ভয় থাকিবে না! মনে হইত, স্বামীর ভালোবাসা
পাইয়াছি, স্ত্রী...শ্রীপতিকে কিসের ভয়? বিবাহ তো
মিথ্যা হইবে না! এখন মনে হয়, এ ভালোবাসা

যদি নিজের দাবীতে পাইত তবেই শুধু...নহিলে, এ যেন
সেই সলিলার উপর ভালোবাসা...সে বীণা বলিয়া
লোকে তাকে ভালোবাসে না! যে-দিন সকলে
জানিবে, সে সলিলা নয়, বীণা,—সে-দিন এ ভালোবাসা
আকাশ-কুসুমের মালার মতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া
যাইবে!

স্বর্ণহ্যতি বলিল—অফিসের সাহেব কি বললে,
জানো? বললে, তোমাদের দেশে কথা আছে, স্ত্রী-
ভাগ্যে সম্পদ! তোমার নূতন স্ত্রীর ভাগ্যে তোমার উপর
কর্তৃপক্ষের এমন স্নেহের পড়িয়াছে...এই স্ত্রীর ভাগ্যে
তুমি এক দিন বড় অফিসার হইবে!

কথাটা বলিয়া স্বর্ণহ্যতি আবেগাতিশয্যে বীণাকে
বক্ষ-লগ্ন করিয়া তার সলজ্জ অধরে...

স্বর্ণহ্যতি বলিল—তুমি বলবে, আমি স্বার্থপর...
তোমাকে এখানে এনে একা রেখে দিব্যি মজা করে
বেড়াছি! আমাদের কষ্ট হচ্ছে, সত্যি! একবার ভাবছি,
তোমায় যদি সঙ্গে নিয়ে যাই! আবার মনে হয়, আমি
যুরে বেডাবো, সেখানেও তুমি সেই একা থাকবে! তার
চেয়ে এখানে তোমার ঘর, তোমার সংসার...এইখানেই
থাকো! এখানে দু'জনের সুখের মধুময় স্মৃতি...এ স্মৃতি-
কুঞ্জে তবু একটু আরাম পাবে তুমি! রোজ একখানা করে
চিঠি লিখবো...সত্যি। তুমিও লিখবে। যা মনে আসে,
লিখবে...বুঝলে! যদি ছাপো, সামনের ঐ গাছের পাতা
ঝরে যাচ্ছে, তাও লিখো। তোমার সে-লেখায় তোমাকে
আমি কাছে-কাছে পাবো, বুঝলে!

মাথা নাড়িয়া মৃদু হাস্তে বীণা জানাইল, বুঝিয়াছে!

তার পর বাঁধা-হাঁদা যাত্রার আয়োজন। অফিসের
আদালী আসিয়াছিল...

বীণা বলিল—এখান থেকে মংরুকে তুমি নিয়ে যাও...
তোমার কাজকর্ম করবে।

স্বর্ণহ্যতি বলিল—না, না...মংরু এখানে তোমার
মস্ত সহায় থাকবে। ওকে নিয়ে গেলে তোমার অসুবিধা
হবে।

বীণা বলিল—আমার কিসের অসুবিধা?

স্বর্ণহ্যতি বলিল—আমার কি ভাবনা হয়, জানো?

যদি তোমার অসুখ-বিসুখ হয়? সত্যি সলিলা, ঐটেই আমার একমাত্র হুঁচিন্তা...

বীণা বলিল—এত দিন আছি, কোনো দিন আমার মাথা ধরেছে দেখেছো?

স্বর্ণহৃতি বলিল—তা ধরেনি...কিন্তু কোনো দিন মাথা ধরেনি বলে দু'দিন পরে মাথা ধরবে না, এ সম্বন্ধে কোনো গ্যারাণ্টি আছে? বিশেষ যখন জানি, মাথা থাকলে সে-মাথা ধরে...

বীণা বলিল—ভয় নেই! আমার এ মাথা খুব শক্ত... এ মাথা ধরবে না...কোনো দিন না...

স্বর্ণহৃতি বলিল—না ধরলেই মঙ্গল! যদি বেশ স্বস্থ থাকো...তা হ'লে তোমার জন্ম এমন উপহার নিয়ে আসবো যে, সে-উপহার পেয়ে খুব খুশী হবে...

বীণা এ কথা শুনে দিল না। এ প্রীতি, এ ভালো-বাসা সে মর্মে-মর্মে অনুভব করিতেছিল...

স্বর্ণহৃতি বলিল—কি উপহার...সুমনতে চাইছো না যে? বীণা কহিল,—না...

স্বর্ণহৃতি বলিল,—আগে থেকে না শোনাই ভালো। শোনা থাকলে আগ্রহ থাকে না এবং আগ্রহ না থাকলে পাবার অনেকখানি আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।... চলো, আমায় কিছু খেতে দেবে।...তোমায় বিদায়-সম্ভাষণ করে একবার অফিস যেতে হবে...তার পর সেখান থেকে উপদেশ নিয়ে স্টেশন-যাত্রা!...তুমিও এ-দিক থেকে স্টেশনে যাবে...আমায় বিদায় দিতে...

বীণা বলিল,—চলো...তুমি থাকবে...

সামান্য লাঞ্চ খাইয়া স্বর্ণহৃতি বাহির হইয়া গেল। মংরুকে বলিয়া গেল,—অফিস থেকে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো...সে-গাড়ীতে তোর বৌমাকে নিয়ে তুই স্টেশনে যাবি...বুঝলি, পাঁচটায় আমার ট্রেন...

পাশের বাঙলোয় থাকেন সরকারী উকিল আলম সাহেব। আলম সাহেবের স্ত্রী রাবেয়া সঙ্গ বীণার আলাপ হইয়াছে। বীণাকে রাবেয়া বলিয়াছিল, সেতার শিখাইতে হইবে। বীণা বলিয়াছিল, শিখাইব।

তার পর দু'জনের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।

রাবেয়াকে ধরিয়া আলম নিত্য ছুপুরবেলায় পাঠায়

ইশলামিয়া গার্লস স্কুলে টীচারী করিতে। আলম সাহেব বলেন—আমাদের মেয়েরা বড় পিছাইয়া আছে। তাদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করার কাজে সহায়তা করা প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলার কর্তব্য!

স্কুলে দু'চার জন পুরুষ-শিক্ষক ছিল বলিয়া অনেকে আবরু ভাঙ্গিবার ভয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠাইত না—অথচ টীচারী করিবার মতো মুসলমান-মহিলার অভাব। এ অভাব পূরণ করিবার বাসনায় আলম সাহেবের মতো ক'জন ভদ্রলোক কোমর বাঁধিয়াছেন?

সে-দিন স্কুলে হাফ-হলিডে হইয়া গেল। রাবেয়া বিবি ছুটির পর বাড়ী না গিয়া একেবারে বীণার গৃহে আসিল। বীণা একা বসিয়া দাহুকে চিঠি লিখিতেছিল। লিখিতেছিল,—

শ্রীচরণেবু

দাহু

ক'মাস হইয়া গেল আপনি একটবারও এখানে আসিলেন না। আমার জন্ম মন কেমন করে না বুঝি? মনে হয়, আপন বিদায় হইয়াছে! আমি নাই বলিয়া খুব আরামে আছো—না?

ম'ঝে ম'ঝে চিঠি লিখিয়া আমার খপর লইয়া ভাবো, ইহার বেশী আর কি চাই? না?

আমার কিন্তু আপনার জন্ম মন সর্বদা আকুল হইয়া আছে। রোজ সকালে মনে হয় আত্র দাহু আনিবেন। কিন্তু আসেন না। ক'বার লিখিলেন, শীঘ্র এবার এলাহাবাদে যাইব। সে শীঘ্র ক' বছর পরে.....

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছে, এমন সময় মনের উপরে সেই শ্রীপতি! কে জানে, হয় তো শ্রীপতির মুখে তার পরিচয় শুনিয়া দাহু এখানে আসিবার কল্পনা ত্যাগ করিয়াছেন! দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন, বিবাহ দিয়াছেন! সে জন্ম ম'ঝে-ম'ঝে চিঠি না লিখিলে হুঃখ পাইবে, তাই হয় তো চিঠি-লেখা বন্ধ করেন নাই!

মনে পড়িল, এক দিন সেই মনের ঝোঁকে বীণা বলিয়াছিল, যদি আমি সলিলা না হয়ে আর কেউ হই, তা হ'লেও আমাকে ভালোবাসবে, দাহু?

ভয়ে-ভয়ে এ প্রশ্ন করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, উত্তরে হয় তো বুকের উপর বজ্রাঘাত...কিষ্কা...

কি কারণে এ প্রশ্নের উত্তর দিবার মতো অবসর দাহুর মিলে নাই! তার পর এ প্রশ্ন-করিবার সাহসও বীণার মনে আর কখনো জাগে নাই।

কোনো দিন হয় তো আর জাগিত না ! শ্রীপতির চিঠি পাইবার পর ক'দিন কি ভয়ে দিন কাটিয়াছে...তার পর এ প্রেম মনের উপর হইতে মিলাইয়া যাইতেছিল ! হয় তো আর উঠিত না—যদি না সে-দিন ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে ..

এমনি চিন্তার মধ্যে রাবেয়ার কণ্ঠ শুনা গেল,—মেম-সাহেব বাড়ী আছেন, দাই ?

দাসীকে ডাকিয়া প্রেম ..

বীণা উঠিয়া পর্দা ঠেলিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিল । কহিল—আপনি ! আসুন...

রাবেয়া বলিল—ক'দিন আসবো-আসবো মনে করছি, কিছুতেই সময় হয় না ।...মিষ্টার রায় এখানে নেই ?

বীণা বলিল—না । দিল্লী গেছেন ।

রাবেয়া বলিল,—এলুম...সেতার নিয়ে আপনার বসবার একটু সুবিধা হবে ?

—হবে ।

বীণা যেন বাঁচিয়া গেল ! এক জন সঙ্গিনী ! একটা কাজ ! নহিলে একা থাকিয়া-থাকিয়া ভয়ে-ভাবনায় তার মন যেন মরিতে বসিয়াছে !

বীণা সেতার বাহির করিল...

একটা, দুটা, বহু রাগিণীর আলাপে অতিথিকে তৃপ্ত করিল !

বেলা প্রায় পাঁচটা...রাবেয়া বলিল,—চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি ছ'জনে।...সেই যমুনার ধার অবধি । চমৎকার জায়গা ! গেছেন কখনো ?

বীণা কহিল—ছ'-চারবার গেছি...

রাবেয়া বলিল—চলুন, আজ টাদ উঠবে...দিব্যি জ্যোৎস্না-রাত্রি !

বীণা বলিল—বেশ...

রাবেয়া কহিল—তৈরী হয়ে নিন । আমি বাড়ী গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে আসি । আপনার এখানে খাওয়া-দাওয়া তো হলো বেশ !

হাসিয়া রাবেয়া বাড়ী গেল...

তার পর যমুনার ধার ঘুরিয়া ছ'জনে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি ন'টা বাজিয়াছে ।

বীণাকে গৃহে নামাইয়া দিয়া রাবেয়া গৃহে ফিরিল ; বলিয়া গেল—সামনের রবিবারে আবার আসবো...খুব

আলাতন করবো । সে-দিন আমাকে সেতারের বিজ্ঞান দীক্ষা দিতে হবে...

হাসিয়া বীণা বলিল—সেতারে আমার যা বিজ্ঞে !

রাবেয়া বলিল—ভয় নেই ! আমাকে সে-বিজ্ঞা শিখিয়ে দিলে গুরুমারা বিজ্ঞা আমার হবে না !

রাবেয়ার গাড়ী চলিয়া গেল ।

বীণা দোতলায় আসিল ।

দেউকী-দাই আসিয়া বলিল,—কলকাতা থেকে তোমার মামাবাবু এসেছেন, বৌদিদি...

দেউকী বেশ বাংলা বলে ।

দেউকীর কথায় বীণা চমকিয়া উঠিল ! মামাবাবু ? মামাবাবু আবার কে ?

বীণা বলিল,—কে মামাবাবু রে ? নাম বলেছে ?

দেউকী বলিল,—না...বাঙালী বাবু । বললেন, তোমাদের বৌমার মামাবাবু হই । বললেন, জামাইবাবু কোথায় ? হামি বনু—দেহাতে গেছেন ।...বললেন, তোমার বৌদিদি ? হামি বনু—বেড়াতে গেছেন ! বললেন, কখন আসবেন ? বনু—সাত-আট বাজলে । তা বললেন, বেশ, আমি ঠাকুর-দর্শন করে রাত্রে আসবো । এখানে থাকবেন, থাকবেন, বলে গেছেন ।—একটা ছোট টাক রেখে গেছেন...

বীণার চোখের সামনে আবার এক-রাশ অন্ধকার ! মামাবাবু ! কে মামাবাবু ?

রাবেয়ার সঙ্গে গল্পে-স্বপ্নে মনটা বেশ স্বচ্ছ হালুকা হইয়াছিল...এ-কথায় সে-মনে আবার সেই পাহাড়ের বোঝা ! ভাবিল, কে জানে, হয় তো সলিলার মামা... কাছে কোথাও ছিলেন ! সে-মামা পশ্চিমে আজ এই জামাতার সংবাদ পাইয়া আত্মীয়তা করিতে আসিয়াছেন ! যদি তাই হয় ?

ভাবিল, এ আবার কি নূতন বিপদ, ঠাকুর !

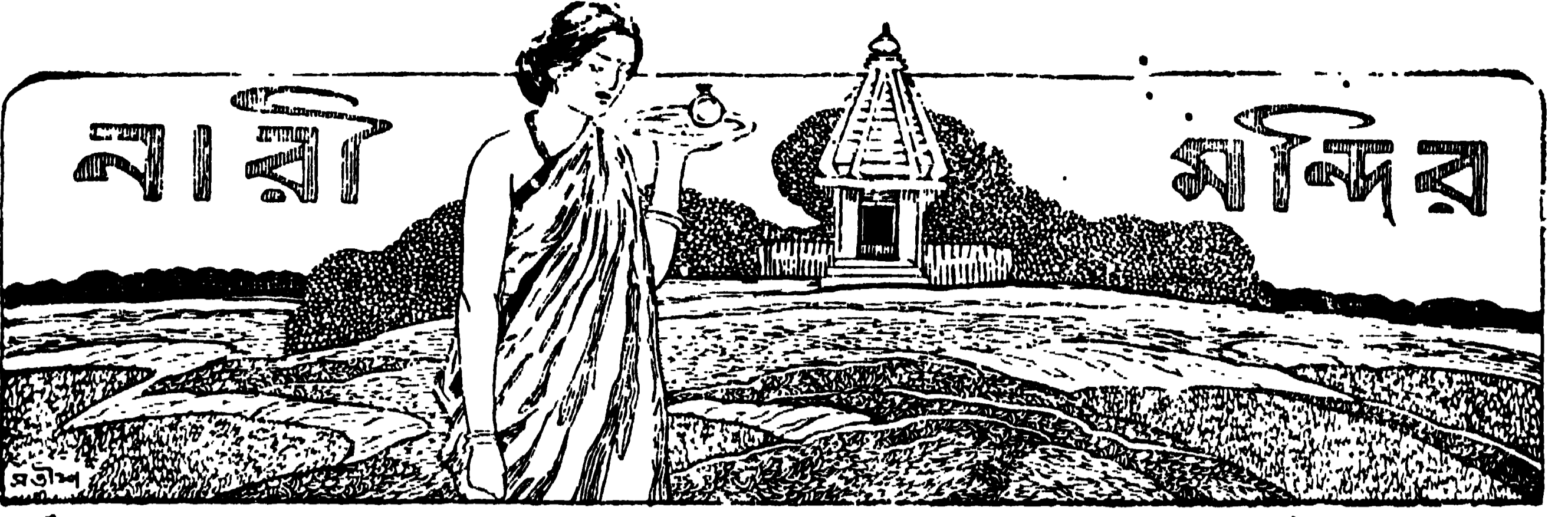
দেউকী বলিল—তোমার খাবার দিতে বলি, বৌদিদি ? অগ্রমনস্ক ভাবে বীণা বলিল,—বলো...

দেউকী গেল তেওয়ারীকে খাবারের কথা বলিতে...

বীণা নিজের ঘরে প্রবেশ করিল...আতঙ্কে মন ভরিয়া উঠিল ।

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ।



ক্রশ-টিচ

ক্রশ-টিচ (অর্থাৎ যে সেলাই দিয়ে আমরা কার্পেট বিছানা-ঢাকা পর্দা ইত্যাদির জন্ত বেশ একটু মোটা-রকম বুনি) সেলাইটি আমরা খুব সোজা ভেবে প্রায় অবজ্ঞা ধরচের ইঙ্গিত থাকে । অথচ এখনকার দিনে এগুলোকে করি । কিন্তু এই সোজা সেলাই-টির সাহায্যে কত সহজে কত প্রয়োজনীয় জিনিস যে কি রকম সুশ্রী করে তোলা যায়, তা বলবার নয় ! এবারে তাই বিশেষ করে ক্রশ-টিচের উপ-যোগিতা সম্বন্ধে কিছু আলো-চনা করা যাক ।

গৃহস্থের ব্যয়ের তালিকায়



বিছানা-ঢাকা

একেবারে বাদ দিতে ক্রচিসম্পন্ন কোনো গৃহস্থেরই মন উঠবে না । এ সমস্তার সমাধান অতি-সহজেই করা যায়—যদি সাদা লংক্রথ বা অল্প ধান কিনে খাটের মাপে এবং জানলা-দরজার মাপে কাপড় কেটে তাতে ক্রচিসম্মত চিত্র-বিচিত্র নক্সা তুলে নেওয়া যায় । অল্প আয়ালে করা যাবে, এমন সুশ্রী সেলাই

নানা রঙের টেবল-ঢাকা ।

যত আছে, তার মধ্যে ক্রশ-ষ্ট্রিচের প্রতিপত্তি বড় কম নয়।

ক্রশ-ষ্ট্রিচ দিয়ে কত অল্প-আয়োগে কত সুন্দর করে তোলা যায় সাদা কাপড়ের টুকরো, তা এই সঙ্কের ছবিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন।

আগের পৃষ্ঠায় যে বিছানা-ঢাকাটি দেখেছেন, এর উপরকার সমস্ত নক্সাটুকুই ক্রশ-ষ্ট্রিচে করা হয়েছে। এমন নয় যে, আপনার বিছানার ঢাকার ওপরে ঠিক এই নক্সাটিই করতে হবে! এতগুলি যে-কোন কার্পেট-বইয়ের পছন্দসই নক্সা ব্যবহার করতে পারেন।

কিন্তু নক্সাটি কাপড়ে তোলবার আগে—যেখানে নক্সা তুলবেন, সেইখানে এক-টুকরো কার্পেট বা ক্যানভাস আটকে নেবেন; চার-ধার সেলাই করে তার পর সেই কার্পেটের টুকরোর ওপর পছন্দ-মত নক্সাটি করে যাবেন ঘর গুণে গুণে—যেমন-ভাবে কার্পেট বোনে। সমস্ত নক্সাটি তোলা হ'লে কার্পেটের টুকরোর চার-পাশে যে-সেলাই দিয়েছিলেন, সেটাকে কাপড়ে আটকে রাখবার তত্ত্ব—সেই সেলাইটা কেটে ফেলবেন। এখন একটি-একটি করে কার্পেটের স্ততোগুলি (অর্থাৎ যা-দিয়ে কার্পেটটি তৈরী) টেনে নিন—বোনা নক্সার স্ততোগুলো হয় তো এ-টানাটানিতে অল্প চিলে হয়ে যেতে পারে—কিন্তু কার্পেটের সমস্ত স্ততো খোলা হয়ে গেলে যদি নক্সাটির ওপর অল্প-গরম ইক্সী চালিয়ে দেন, তা হ'লেই স্ততো আবার যথাস্থানে চেপে বসবে।

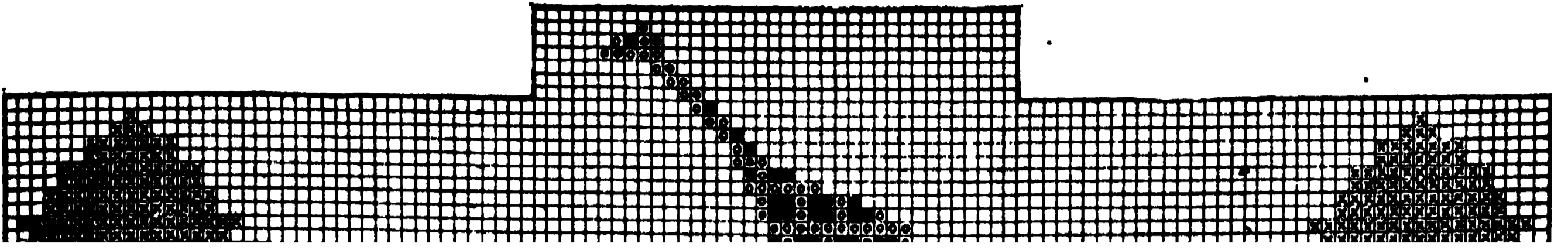
বিছানা-ঢাকার পাশে যে টুকরো-টুকরো নক্সা-কাটা কাপড় রয়েছে, সে-গুলো ড্রেসিং-টেবলের ঢাকা। গৃহিণীরা সাধারণতঃ সর্বদা সশক্তিত থাকেন ড্রেসিং-টেবলের ওপরকার বা ছোট আলমারির মাথার পালিশ চটে যাবার ভয়ে। একটু কষ্ট করে যদি তাঁরা সিরিয়ান ক্যানভাস বা ঐ রকম মোটা-ধরণের কোন কাপড়ের

টুকরোর ওপর (ছবির মতো) সহজসাধ্য নক্সা তুলে নেন—চমৎকার টেবল-ঢাকা, আলমারীর ঢাকা তৈরী হবে। যে-কোন রঙের কাপড়ের ওপর যে-কোন রঙের স্ততো দিয়ে পছন্দসই নক্সা তুলতে পারেন। এ নক্সা তোলায় কোন হান্দামা বা বালাই নেই! ঘর গুণে গুণে যে-কোন নক্সা তুলে নিতে পারেন। আঁকতে-না-জানার জগু অনেক অনেক অসুবিধা ভোগ করেন—এ-ক্ষেত্রে সে-অসুবিধা ঘটার কোন কারণ নেই। তা ছাড়া পর্দার ওপরে করার জগুও দুটো নক্সা দেওয়া হলো।

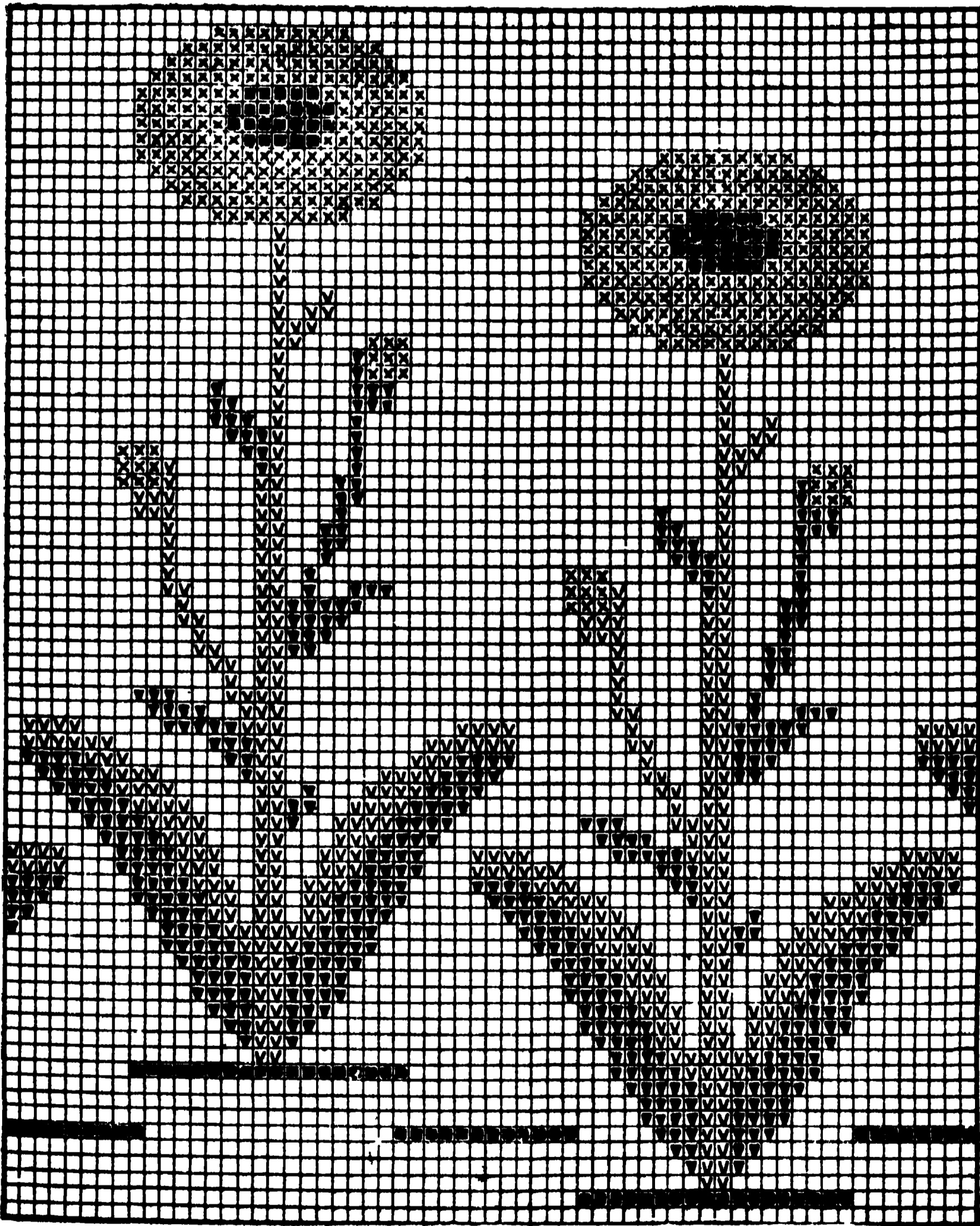


নক্সাদার পর্দা ও কুশন

প্রথম নক্সাটি অর্থাৎ জঙ্ক-জানোয়ারের সারি-দেওয়াটি বেশ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করবে। পর্দাটি করার পক্ষে সব চাইতে উপযোগী কাপড় হবে এমব্রয়ডারী-ক্যানভাস। ডুনডোনিয়া (Dundonia) এমব্রয়ডারী-ক্যানভাস বলে এক-রকম মোটা ধরণের কাপড় পাওয়া যায়—তার রঙ বিস্কুটের মত; এই রঙের কার্পেটে ঘরের পর ঘর গুণে গুণে নক্সাটি তুলতে পারলে দেখতে ভালোই হবে।



পর্দার প্যাটার্নের ব্যাখ্যা



ফুল-পাতার প্যাটার্ণ

হাতের না-করে যদি চার-খেই (4 ply) উলে ফিকে সবুজ উল ব্যবহার করবেন । . বলা বাহুল্য, মনস্ত কাজটি করেন, তা হ'লে দেখতে আরো ভালো হবে । রঙের নক্সাটি ক্রশ-ষ্ট্রিচে করতে হবে । তবে আপনি যে-পরিমাণ

নির্দেশ এইখানে দেওয়া হলো :—
জিরাফটি করবেন গাঢ় (সোণালী) হলুদে উলে আর মাঝে-মাঝে নক্সার যে-সব ঘর কালো রঙে চিহ্নিত, সেই সব জায়গা ফিকে ব্রাউন রঙের ক্রশ-ষ্ট্রিচ দেবেন । চিতা-বাঘটি, অর্থাৎ জিরাফের পিছনের জানোয়ারটি (গোম্বেন ব্রাউন অর্থাৎ) সোণালী ধরণের বাদামী রঙে করবেন ; আর গায়ের ছাপগুলো (যেখানটা কালো রঙে চিহ্নিত) বোজাতে গাঢ় বাদামী-রঙের উল ব্যবহার করবেন । জিরাফের সামনের বাঘটি গাঢ় বাদামী আর বিস্কুট রঙের উলে করবেন । কালো-চিহ্নিত ঘরগুলি বাদামী রঙে করবেন আর বাকীটা ফিকে রঙে । গাছগুলির পাতার জন্ত সবুজ (ফিকে কিম্বা গাঢ়) উল, আর ডালটির জন্তে বাদামী রঙ ব্যবহার করবেন । জানোয়ারদের পায়ের কাছের লাইনটি যে ঘাস-জমি, তা বোকাবার জন্ত

বড় করতে চান, তার ওপর নির্ভর করবে আপনার ষ্টিচের আয়তন। সেই হিসেবে আপনি প্লেন ক্রশ-ষ্ট্রিচ, ডবল ক্রশ-ষ্ট্রিচ, বা ট্রেবল-ক্রশ-ষ্ট্রিচ দিয়ে নক্সাটি বাড়াতে পারেন। (এ সম্পর্কে পুরোনো বসুমতী দেখে নিতে পারেন)। কুশনটি করবার জন্য ১৯×১৪ ইঞ্চির এক-টুকরো এমব্রয়ডারী কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে। একই নিয়মে নক্সাটি বুনতে হবে— কেবল কুশনটি হয়ে গেলে ঝলমলে সবুজ রঙের একটি 'ব্রেড' (পাকানো দড়ির মতো; যেখানে উল কিনবেন, সেইখানেই পাবেন) কুশনের চারি ধারে, ঠিক জোড়ের মুখে, সেলাই করে দেবেন।

পর্দার ওপর করার জন্য যে দ্বিতীয় নক্সাটি দেওয়া হয়েছে, তার রঙের নির্দেশ দিয়ে দিলেই আপনাদের সব অসুবিধা দূর হবে এটি করার পক্ষে। কেন না, কাপড়ের মাপ, নক্সাটির আয়তন সবকিছু সঠিক কোন নির্দেশ দিয়ে কোনো লাভ নেই! নিজেদের প্রয়োজনানুসারে আপনারা তার মাপ ঠিক করবেন।

রঙের নির্দেশ

X = ফিকে কমলালেবু

+ = গাঢ় লালচে ধরণের কমলালেবু

V = ফিকে সবুজ

♥ = গাঢ় সবুজ

ইতিহ আমার

হে মহা আকাশ, হে বিরাট ব্যোম,

আমারে কি গেছ ভুলে ?

তুমি লিখিয়াছ মোর ইতিহাস

মরণ-মোহানা-কূলে।

লক্ষ তারার বন্ধ-ব্যথায় লিখেছো সে ইতিহাস
যুগান্তরের রক্ত-আখর দাঁড়িয়ে রুদ্ধ শ্বাস।
ম্যারাধন আর ধার্মপলির বীর্য্য-দৃপ্ত হিয়া,
মোর প্রাণে আজো নবীন ছন্দে উঠেছে হুকারিয়া।

আমার রক্তে সিঁদু নদীতে লাল হয়ে গেছে জল।

তবু উঠেছিল বিজয়ের কোলাহল।

সে দিন আর্ধ্য জিনিল ভারত শক হুণেদের দলি,
হে মহা আকাশ, সে কাহিনী আজ সকলি গিয়াছ ভুলি ?

লক্ষ বছর উঠাও তোমার মস্তুর যবনিকা,
নয়ন মেলিয়া দেখিবারে চাই কি আছে উহাতে লিখা,

মোর ধমনীতে বহে কি রুধির

মৈত্রেরী, ধনা, অরুন্ধতীর ?

আমার ললাটে আজো কি রাজিছে জ্ঞান-রাজনুয়-টীকা।

হে মহা আকাশ, মোর ইতিহাস

চির-আমি দিয়া ভরা।

চির-কৈশোর, চির-যৌবন,

জন্ম, মৃত্যু, জরা।

সাম-মুখরিত তপোবন 'পরে পর্ণকুটীর মাঝে,
আমি কি রচিনি প্রেমের অর্ঘ্য জড়িত সরম লাজে ?
ঋষিবাল্য যবে তরু আলবালে জল সেচিবার ফাঁকে,
আঁচল জড়িয়ে আত্মশাখার প্রিয় সখীজনে ডাকে—
“খুলে দে সজ্জনী আঁচল আমার পায়ে কুশ গেছে ফুটি”
ছলে বার বার নেহারে রাজারে উৎসুক আঁখি দু'টি !

আমি ছিঁছু তারি পাশে,

আজো সে কাহিনী প্রোজ্জল মোর স্পৃহ চিত্তাকাশে।
জ্যোৎস্না নিশীথে যমুনার তীরে ক্ষীণ বালুরেখা আঁকা,
দিগন্ত-পারে শ্রামল বনানী আবছায়া যায় দেখা।
তারি মাঝে আমি বাজিয়েছি বসি স্মরণ-মৃত্তিকা বেণু !

যুধি চম্পক রেণু ;

অধীর গন্ধে অন্ধ আবেগে লুটিয়াছে সঙ্গীতে,
বসুধা-বন্ধে লভেছে বিরাম অপূর্ব ভঙ্গীতে।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)।



আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

গত এক মাসে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিক ঘটনা সংঘটিত হইলেও সামরিক ঘটনার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প। আফ্রিকার রণক্ষেত্রে বৃটিশ বাহিনীর সাফল্য এবং আলবেনিয়ায় গ্রীকদিগের ইটালীয় বাহিনীর প্রতিরোধ-প্রয়াস—ইহাতেই সামরিক ঘটনাবলী নিবন্ধ। সম্প্রতি কূটনীতিক চাঞ্চল্যের জন্ম সুদূর প্রাচীকে কেন্দ্র করিয়া গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছিল; উহা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইবার পর বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব যুরোপের কূটনীতিক-গগন ঝঞ্জালোড়িত হইতেছে। আজ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি ঐ অঞ্চলের ত্রিকোণ ভূমিতে নিবন্ধ।

বল্কানে চাঞ্চল্য—

গত সেপ্টেম্বর মাসে রুম্যানিয়ায় রাজনীতিক বিপর্যয় ঘটবার পর হইতে ঐ রাজ্যে জার্মান প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর, অক্টোবর মাসে জার্মান সৈন্য রুম্যানিয়ায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। তখনই বল্কান অঞ্চলে জার্মানীর অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়াছে। সেই সময় রুম্যানিয়ান সরকারের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, আধুনিক যুদ্ধবিজ্ঞান সম্পর্কে রুম্যানিয়ান বাহিনীকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ঐ সকল জার্মান সৈন্য তথায় গমন করিয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মান সৈন্যের গতিবিধি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় বৃটিশ সরকার রুম্যানিয়ার সহিত কূটনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বুকারেষ্টস্থিত বৃটিশ দূত সার রেজিন্যান্ড হোর ঐ সম্পর্কে রুম্যানিয়ান সরকারকে যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি জানান যে, জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ রুম্যানিয়ায় অভিযাত্রী সেনাদল গঠন করিতেছে এবং রুম্যানিয়াকে আক্রমণ-ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের আয়োজন করিতেছে।

ইহার পর ঘটনাস্রোতের গতি দ্রুত; রুম্যানিয়ার আয়োজন শেষ করিয়া জার্মানী বুলগেরিয়ার প্রতি অবহিত হয়। এই সময়, সম্ভবতঃ জার্মানীর ইচ্ছিতে, বুলগেরিয়ার সহিত তুরস্কের এক অনাক্রমণাত্মক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার পরই বুলগার সরকারের ত্রিশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর দান এবং দলে দলে জার্মান সৈন্যের বুলগেরিয়া-প্রবেশ।

বুলগেরিয়ায় জার্মানীর প্রভাব-বিস্তৃতি আকস্মিক ঘটনা নহে; ইহার জন্য বহু পূর্ব হইতেই আয়োজন চলিতেছিল। নাজি-ফ্যাসিষ্ট শক্তিস্বয়ের কৃপায় দোবরুজা প্রাপ্ত হইয়া যে বুলগেরিয়া কুতর্থাৎ হইয়াছে এবং এখনও ঐ শক্তিস্বয়ের অল্পগ্রহে ইজিয়ান সাগরে প্রবেশপথ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে জার্মানীর দাবীতে সম্মত হওয়ার বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ইটালী কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হওয়ার বল্কান অঞ্চলের এই রাষ্ট্রটি উৎকণ্ঠিত হয় নাই; ঐ সময় তাহার পক্ষ হইতে সরকারী ভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশিত না হইলেও বুলগেরিয়ার সংবাদপত্রগুলি ইটালীর দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতেই প্রয়াস পাইয়াছিল।

এ হেন বুলগেরিয়ার পক্ষে বহু পূর্বেই জার্মানীর তথাকথিত “নব-ব্যবস্থার” অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জার্মানী বিশেষ উদ্দেশ্যেই এত দিন ঐ রাষ্ট্রের স্বাভাবিক রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে ত্রিশক্তির চুক্তি সম্পাদিত হইবার অল্পকাল পরেই জার্মানী যখন হাঙ্গেরি, রুম্যানিয়া ও প্লোভাকিয়াকে ঐ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে, তখন সম্ভবতঃ সে ইচ্ছা করিয়াই বুলগেরিয়াকে উহার বাহিরে রাখিয়াছিল। জার্মানী তখনও তুরস্ককে স্বদলে আনয়নের জন্য কূটনীতিক প্রয়াস করিতেছিল; সেই সময় জার্মানীর প্রভাবের ক্ষেত্র তুর্কি সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইলে এই কূটনীতিক তৎপরতায় বিঘ্ন উপস্থিত হইত। এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, তুরস্কের সুনির্দিষ্ট মনোভাব প্রকাশিত হওয়ায় তাহার নিকট হইতে জার্মানীর আর আশা করিবার কিছুই নাই। কাজেই, এখন প্রকাশ্যে বুলগেরিয়াকে স্বদলে গ্রহণে জার্মানীর আর ইতস্ততঃ করিবার কোন



জার্মানীর যান্ত্রিক বাহিনী,—ইহাদের সহিত ক্ষুদ্রকায় বিমান-বিক্ষংসী কামানও রহিয়াছে

কারণও নাই। গ্রীক যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে নাজী-ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস অনির্দিষ্ট কাল স্থগিত থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ বসন্তকাল সমাগত, জার্মানীর সমর-প্রচেষ্টার প্রাবল্যবৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। অবশ্য, তুরস্ক বাহাতে জার্মানীর এই তৎপরতায় উৎকণ্ঠিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়, সে দিকে জার্মানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট; কারণ, তুরস্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তীক্ষ্ণ কূটনীতিক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নিশ্চিত।

মুখ্যতঃ গ্রীক-যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই জার্মান সৈন্য বুলগেরিয়ার প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, তুরস্ক সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনও জার্মানীর প্রয়োজন। বত দূর মনে হয়,

বুলগার-গ্রীক সীমান্তে সর্বিবিষ্ট জাৰ্মান সৈন্য অবিসম্ভে গ্রীসকে পশ্চাদিক হইতে আক্রমণ করিবে না; ঐ সীমান্তে ব্যাপক সমরায়োজন করিয়া গ্রীসকে ভীতি-প্রদর্শন করিবে, এবং এই ভাবে তাহাকে ইটালীর সহিত সন্ধি করাইতে প্রয়াসী হইবে। এই "স্বাস্থ-যুদ্ধ" প্রবলতর করিবার উদ্দেশ্যে জাৰ্মানী অতি সঙ্ঘর যুগো-স্লাভিয়াকেও স্বীয় প্রভুত্বাধীন করিতে প্রয়াসী হইবে; তিন দিকে নাজী-বাহিনী পরিবেষ্টিত এই অসহায় রাষ্ট্রটি জাৰ্মানীর দাবী প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইবে না। বর্তমানে যুগোস্লাভিয়ার স্বাভাব্য ও নিরপেক্ষতা রক্ষা সম্পর্কে ঐ রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে, উহা গুরুত্বহীন; ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজনীতিজ্ঞদিগের এইরূপ উক্তি কত ভুল, তাহা গত বৎসরাদিক কালে সম্পূর্ণরূপে প্রতাপন্ন হইয়াছে। অল্পকাল পূর্বেও (৩০শে ডিসেম্বর) বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মঃ পপফ্, আইন সভায় বাজেট আলোচনা কালে ঘোষণা করেন—Bulgaria will not depart from her avowed policy of strict neutrality. এই সত্যই হয় ত



এই সকল বীর গ্রীক সৈন্য ইটালীর সামরিক মর্যাদা ভুলুপ্তি করিয়াছে

গত ১লা মার্চ ত্রিশকির চুক্তিতে স্বাক্ষরদান-অমুঠানে যোগ দিবার জন্ত মঃ পপফ্, ভিয়েনায় উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন।

জাৰ্মানী সেনাবাহিনী তুর্কি-বুলগার সীমান্তে সর্বিবিষ্ট হইলেও তুরস্ক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়; কারণ, জাৰ্মান-বাহিনী ঐ দিকে অগ্রসর হইতে প্রয়াস করিলে সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে হয় ত উদাসীন থাকা সম্ভব হইবে না। জাৰ্মান-বাহিনী বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পর সোভিয়েট রুশিয়া বুলগার সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে; তাহার বক্তব্য—বুলগার সরকারের এই কার্য সে সমর্থন করে না, জাৰ্মান-বাহিনী ঐ রাজ্যে প্রবেশে বুলকান্ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দূরে থাকুক, তথায় যুদ্ধ-বিস্তৃতির সম্ভাবনাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-জাৰ্মান অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর এই সর্বপ্রথম সোভিয়েট রুশিয়া জাৰ্মানীর কার্যে আপত্তি জানাইল। এই আপত্তিও, জাৰ্মানীর দাবীতে বুলগার

সরকার সম্মত হওয়ার, এই শেবোক্ত সরকারের নীতির বিরুদ্ধেই উদ্ভিত হইয়াছে—জাৰ্মানীর নামোন্মুখ পর্য্যস্ত করা হয় নাই। অথচ, বুলগার সরকার যদি কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া নিজ দায়িত্বে জাৰ্মানীর দাবীতে সম্মত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বুলকান্ অঞ্চলে যুদ্ধ-বিস্তৃতিতে জাৰ্মানীর দায়িত্ব অল্প নহে। ইহা ব্যতীত, জাৰ্মান সৈন্য বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পূর্বে পর্য্যস্ত সোভিয়েট রুশিয়া কোন আপত্তি করে নাই। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী মিঃ চার্চিল এক বক্তৃতায় বলেন—“...its (German army and air force) forward tentacles have already penetrated Bulgaria” তখন যে সংবাদ মিঃ চার্চিলের নিকট পৌঁছিয়াছিল, উহা যে ১লা মার্চের পূর্বে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। সোভিয়েট সরকার যদি পূর্বে বুলকান অঞ্চলে



গ্রীসের রাজা জর্জ রণক্ষেত্রে পদাতিক গ্রীক সৈন্যের সহিত কথা বলিতেছেন

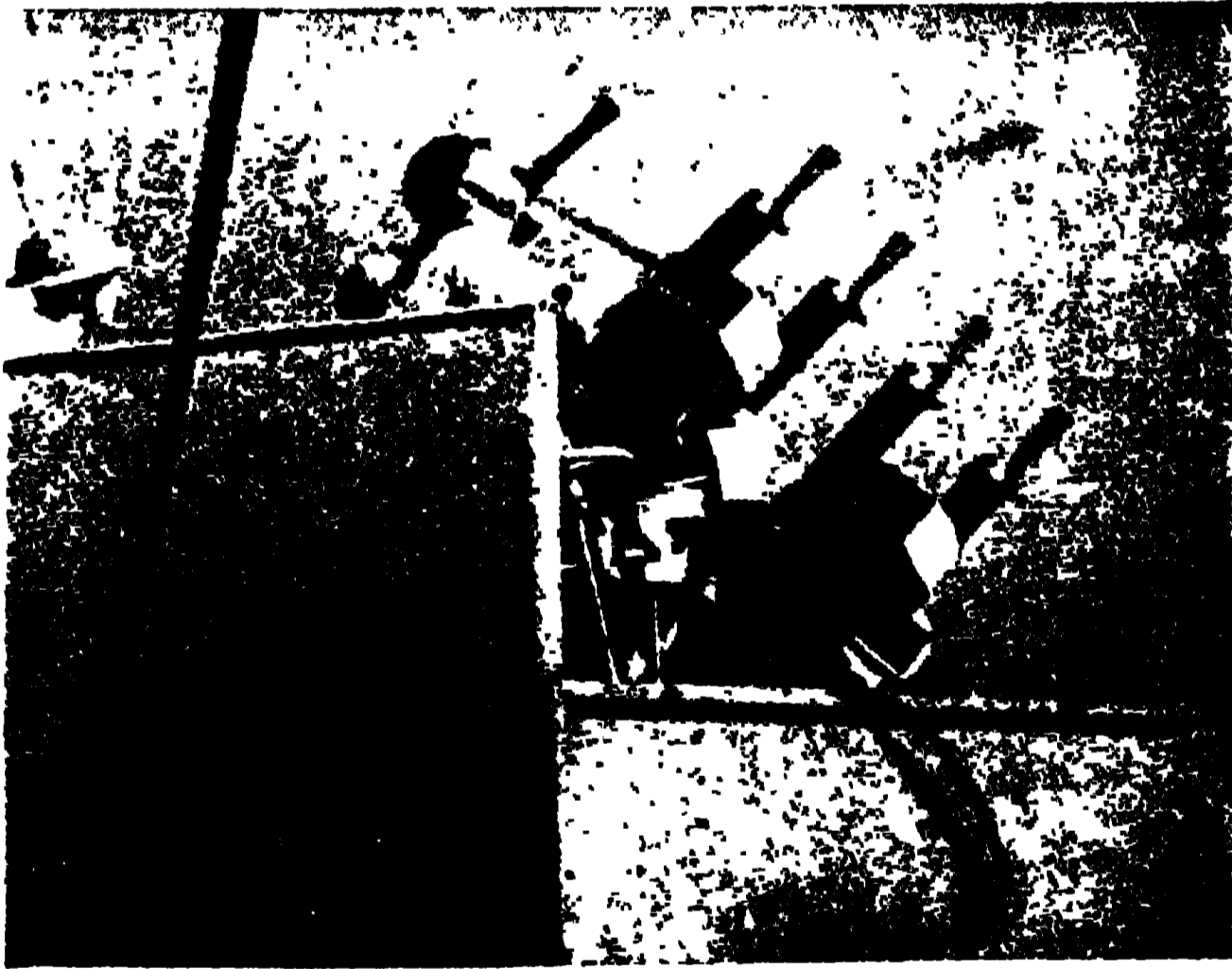
যুদ্ধ-বিস্তৃতির এই নিশ্চিত আশঙ্কার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেন, তাহা হইলে জাৰ্মানী ও বুলগেরিয়া উভয়েই তাহাদিগের নীতি সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার বিবেচনা করিতে বাধ্য হইত। পূর্বে সোভিয়েট রুশিয়ার ইচ্ছাকৃত নীরবতা এবং জাৰ্মান-বাহিনীর বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পর তাহার মনোভাব জ্ঞাপনের সময় নির্বাচনে ইহাই অমুমান হয় যে, বুলগেরিয়ার জাৰ্মান প্রভুত্ব বিস্তৃতিতে তাহার কোন আপত্তি নাই; তবে সে দার্দানেলিঞ্জের দিকে জাৰ্মান-বাহিনীর অগ্রগতির বিরোধী। ইহা ব্যতীত, এই প্রতিবাদের দ্বারা সোভিয়েট সরকার হয় ত বুলগেরিয়ার সোভিয়েট অমুস্কৃত অধিবাসীদিগকে জানাইয়া রাখিলেন যে, ঐ রাজ্যে যুদ্ধ-বিস্তৃতিতে তাহাদিগের কোন দায়িত্ব নাই।

দার্দানেলিঞ্জ ও দার্দানেলিঞ্জের বন্ধক তুরস্কের নিরপেক্ষতার উপর কৃষ্ণসাগর-পথে সোভিয়েট বাণিজ্য পরিচালনের নির্বাহিতা

সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সোভিয়েট সরকার বুলগেরিয়ায় জার্মান সৈন্যের অবস্থিতি ও গ্রীক যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্ত তাহাদিগের প্রয়াস সহ্য করিতে পারেন; কিন্তু তুরস্ককে জার্মান প্রভুত্বের বাহিরে রাখাই তাহাদিগের স্বার্থ। তুরস্কের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার এই স্বার্থ-সম্বন্ধের কথা জার্মানীর অজ্ঞাত নহে বলিয়াই জার্মান বাহিনী বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পরই হিটলার তুর্কী রাষ্ট্রপতি ইনেউমুকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়া ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছেন। ঠিক এই কারণেই ত্রিশক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পূর্বে বুলগেরিয়া জার্মানীর পরামর্শে তুরস্কের সহিত অনাক্রমণাত্মক চুক্তি করিয়াছিল। তুরস্কের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আশ্বাস প্রদানের পরও জার্মানী নিশ্চিত হইতে পারে নাই; সেই জন্ত তুর্কি-বুলগার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়া সে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে। জার্মানী জানে যে, তুরস্ক যদি বুটেনের ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলে সে বিশেষ অস্ত্রবিধায় পড়িতে পারে।

গ্রীক-ইটালীয় সংঘর্ষ—

জার্মান-সৈন্য বুলগেরিয়ায় প্রবেশের পর হইতে গ্রীক-বাহিনী ইটালীয়দিগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিতে প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছে। তাহারা শত্রুর প্রতিরোধে ব্যাপৃত না থাকিয়া এখন প্রবল প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। বৃটিশ বিমান-বাহিনীও আফ্রিকাতিকের উপকূল-বন্দরগুলিতে প্রচণ্ডবেগে বোমা বর্ষণে প্রবৃত্ত।



ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ রণপোত হইতে ইটালীয় বিমান লক্ষ্য করিয়া বিমান-বিক্ষেপী কামান চলিতেছে

আলবেনিয়ার সহিত ইটালীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া রণক্ষেত্রে নূতন ইটালীয় সৈন্যের প্রবেশ বন্ধ করাই এই সকল আক্রমণের উদ্দেশ্য। এই জন্ত আলবেনিয়ায় ইটালীয় সৈন্যের অবতরণ-ঘাঁটি ভেলোনা অধিকারের জন্ত গ্রীক-বাহিনী বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছে! বৃটিশ বিমান বাহিনীও ভেলোনা ও ডুরাজোর প্রবল বোমা-বর্ষণ করিতেছে। আলবেনিয়ায় নূতন ইটালীয় সৈন্যের আগমন বন্ধ করিতে পারিলে পূর্বদিকে জার্মানদিগের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হইবে—ইহাই সম্ভবতঃ গ্রীকদিগের ধারণা।

আফ্রিকায় যুদ্ধ—

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনী ক্রমেই নূতন নূতন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতেছে। লিবিয়ায় বেন্‌ঘাজীর পতনের পর ইটালীয় সোমালিল্যান্ডের রাজধানী মগাদিশো অধিকার তাহাদিগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। কেনীয় সীমান্তে ময়ালে পুনরায় বৃটিশ সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় আফ্রিকার কোথাও বৃটিশ-ভূমিতে আর ইটালীয় সৈন্য নাই। আরিত্রিয়ায় বৃটিশ বাহিনী বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে; তাহারা বিভিন্ন পথে আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিতেছে, ঐ রাজ্যেব অভ্যন্তরে স্বাধীনতাকামী হাবসীদিগের তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশবাহিনীর যে আক্রমণে ইটালীয়রা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়, তৎসম্পর্কে ইটালীয় সেনাপতি মার্শাল গ্রাংসিয়ানি বলিয়াছেন—The Italian forces were first paralyzed by a massacringly bomb attack, then



আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্যদিগের মধ্যে মিঃ ইডেন

routed by crushing superiority of the enemy's armoured units. উত্তর-আফ্রিকায় যুদ্ধে যান্ত্রিক বাহিনীর সহিত বৃটিশ বিমান বহুবল এই সহযোগিতা ব্যতীত ভূমধ্যসাগরের বৃটিশ নৌবহরও বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিল। আফ্রিকায় অস্ত্র রণক্ষেত্রে নৌবাহিনীর সহযোগিতার সুযোগ নাই; ঐ সকল স্থানে বিমানবহর ও যান্ত্রিক বাহিনী একযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া শত্রুকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিতেছে।

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর ক্রমবর্ধমান সাফল্যের প্রধান কারণ—ভূমধ্য ও লোহিতসাগরে বৃটিশ নৌবহরের প্রভুত্ব। সম্প্রতি মুসোলিনি ইটালীয় বাহিনীর পরাজয়ের কৈফিয়ৎ প্রদানে প্রয়াসী হইয়া বলিয়াছেন—The soldiers who are fighting in the Empire without hope of reinforcements are those furthest away but the nearest to our hearts. ইটালীয় বাহিনী যে তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধিত হইবার আশা ত্যাগ করিয়া (without hope of reinforcements) আফ্রিকায় যুদ্ধ করিতেছে, ইহাই তাহাদিগের চরম দৌর্ভাগ্য। ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় আফ্রিকায় রণক্ষেত্রে

সহিত ইটালীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; আফ্রিকায়ও ইটালীর অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ নাই। এই জন্ত ইটালী হইতে আফ্রিকায় অবাধে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ যেমন অসম্ভব, তেমনই আফ্রিকায় অবস্থিত সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রয়োজনানুযায়ী স্থানান্তরিত হওয়াও সম্ভব নহে।

বৃটেনের সমর-সচিব মিঃ এম্ব্রী ইডেন (এক্ষণে পররাষ্ট্র সচিব) ইটালীর এই দৌর্বল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। গত অক্টোবর মাসে মধ্য ও অদূর প্রাচী ভ্রমণ করিয়া তিনি যে পরিকল্পনা রচনা করেন, তদনুসারে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌশক্তি বৃদ্ধি করিয়া আফ্রিকার সহিত ইটালীর সংযোগপথ আরও বিঘ্নসঙ্কুল করা হয়, এবং এদিকে আফ্রিকার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে বৃটিশ যান্ত্রিক বাহিনী ও বিমানের সংখ্যা বহুগুণ বর্দ্ধিত করা হয়। ইহার পর, ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতে বৃটিশ বাহিনীর প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হইলে ইটালীয়দিগের পক্ষে তাহা প্রতিবোধ করা সম্ভব হয় নাই।

আফ্রিকার যুদ্ধ-পরিচালনা সম্পর্কে ইটালীর অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সিসিলি দ্বীপে জার্মান বিমান প্রেরিত হইয়াছে; এই সকল বিমানের সাহায্যে উত্তর-আফ্রিকায় সহিত ইটালীর অবাধ-সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস চলিতেছে। জার্মান বিমানগুলি লিবিয়ার উপকূলে



লিবিয়ার এই সকল অধিবাসী বৃটিশের পক্ষে যোগ দিয়াছে

বৃটিশ নৌবহরকে আক্রমণ করিতেছে; লিবিয়ার রণক্ষেত্রেও কিছু জার্মান সৈন্য পৌঁছিয়াছে। এদিকে গ্রীক যুদ্ধে অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বলকান অঞ্চলে জার্মানীর যে প্রয়াস, উহাতেও আফ্রিকার যুদ্ধের পরোক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। গ্রীসে ইটালীর প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে; ইহাতে আফ্রিকার যুদ্ধ-পরিচালনা ইটালীর সুবিধা হইতে পারে। তখন জার্মান বিমানের পক্ষে সুয়েজ অঞ্চলে বায়পক বোমা-বর্ষণের সুযোগ উপস্থিত হওয়াও সম্ভব।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও জার্মানীর সমর-প্রচেষ্টা—

আফ্রিকায় ইটালীয় বাহিনীর পরাজয়ে অথবা বলকান অঞ্চলে জার্মানীর তৎপরতায় বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃত জয়পরাজয়ের মুহূর্ত অদূরবর্তী হয় নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আঘাত করিয়া বর্তমান যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্ত জার্মানী দিন গণিতেছে। এই সম্পর্কে গত এক মাসে নূতন কোন অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হিটলার মিউনিকে এক

বক্তৃতায় পুনরায় সাবমেরিন আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন :—We have been waiting for our new U-boats and in March and April a naval warfare will start such as the enemy never expected. মার্চ মাসের সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইলেও এই নৌযুদ্ধে কোন সংবাদ এগনও পাওয়া যায় নাই।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে জার্মানীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের প্রয়াস অপেক্ষা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বিকল্পে অর্থনীতিক অবরোধ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনাই যে অধিকতর, ইহা গত মাস মাসের ‘মাসিক বসুমতী’তে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমাদেরিগেব ঐ দারণ পবিতর্কনের কোন কারণ এগনও ঘটে নাই।

সুদূর প্রাচীতে চাঞ্চল্য—

সম্প্রতি জাপানের অভিসন্ধি সম্পর্কে সুদূর প্রাচীতে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানীর বসন্তকালীন অভিযান আরম্ভ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে জাপানও তাহার তথাকথিত নব-ব্যবস্থার প্রসঙ্গে উদ্যোগী হইয়া বৃটিশ নৌবহরকে সুদূর প্রাচীতে অবস্থিত হইতে বাধ্য করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী জাপানের চব্বত সমর-পরিষদের সদস্য এডমির্যাল ওসামি দক্ষিণ সমুদ্রের নৌবহরের সেনাপতিত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিমানবোলে হাইনানে যাইবার সময় পথিমধ্যে বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। চীনা সূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এডমির্যাল ওসামির বিমানে জাপানের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রসার সম্পর্কিত কাম্বুচী পাওয়া যায়। সুদূর প্রাচীতে অকস্মাৎ নেরুপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মনে হয়, এডমির্যাল ওসামির বিমান হইতে প্রাপ্ত কাগজপত্র হইতেই হয় ত এই চাঞ্চল্যের উৎপত্তি।

ইতোমধ্যে হাইনান দ্বীপে জাপান ব্যাপক সমরায়োজন করিয়াছে; ফুকিয়েনেও বহু জাপানী রণপোত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। সম্প্রতি জাপান দক্ষিণ-কোরাঙ্গী প্রদেশের অন্তর্গত পাখই পুনরধিকার করিয়াছে, এবং তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে বহু জাপানী সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম পাখই জাপ-বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। গত নভেম্বর মাসে দক্ষিণ-চীন হইতে জাপানী সৈন্য প্রত্যাহৃত হইবার সময় পাখইও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইহার পর, ঐ পথে চুংকিং সরকার সমরোপকরণ প্রাপ্ত হইতেছিলেন বলিয়াই না কি পাখই পুনরধিকার করা প্রয়োজন হইয়াছে।

থাইল্যান্ড ও ইন্দোচীনের বিরোধ সম্পর্কে টোকিওয় যে মীমাংসা আলোচনা চলিতেছে, সম্প্রতি তাহাতে সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। জাপানের দাবীতে থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিগণ সম্মত হইলেও ইন্দোচীনের কর্তৃপক্ষ সহজে উহা মানিয়া লইতে চাহেন নাই। ইহাতে জাপানী সংবাদপত্রগুলির স্বর অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, ফরাসী সরকার না কি অবশেষে জাপানের দাবীতে সম্মত হইয়াছেন। থাইল্যান্ড ও ইন্দোচীনের মীমাংসা না কি অদূরবর্তী।

জাপান যে যুরোপীয় যুদ্ধকে তাহার অভিসন্ধি সিদ্ধির ‘স্বল্প-সুযোগ’ মনে করে, তাহা সে প্রকাশ্যেই স্বীকার করিয়াছে। জার্মানীর বসন্তকালীন অভিযান আরম্ভ হইবার সময় সুদূর প্রাচীতে জাপানের

পক্ষে তৎপর হওয়া স্বাভাবিক। জাপান যদি সত্যি তাহার দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রসার লাভের আকাঙ্ক্ষা বাহুবলে পূরণ করিতে চাহে, তাহা হইলে সে আর বিলম্ব করিবে কেন? চীন যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্ত জাপান যথাসক্তি চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। এখন হয় ত ঐ যুদ্ধে রত থাকিয়াই সে দক্ষিণ অভিযুখে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী হইবে। জাপান দক্ষিণ দিকে অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্বে সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে চাহে। সোভিয়েট রুশিয়াকে কতকগুলি সুবিধা প্রদান করিয়া তাহার সহিত মামাংসা করিবার জন্ত জাপান আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। জাপানী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাংসুয়োকো সত্বন বালিনে বাইবেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; ঐ সময় তিনি বোম ও মস্কো পরিদর্শন করিবেন। মস্কোএ সোভিয়েট-জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সম্ভব। জাপানের সহিত মৈত্রী স্থাপনে সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তির কোন কারণ নাই; মাঞ্চুকো-সীমান্ত সম্পর্কিত বিরোধ, সাখালিন্ অঞ্চলে মংসু-সংগ্রহ সম্পর্কিত বিতর্ক, মাঞ্চুকো-বেঙ্গপথ সম্পর্কিত বাদামুবাদ প্রভৃতির অবসান হইবার পূর্বে সোভিয়েট-জাপান আক্রমণাত্মক চুক্তি সম্পাদিত হওয়াও অসম্ভব নহে। অবশ্য, সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে চীন যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহা ইহাতে বন্ধ হইবে না; সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত চীনের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ, উহা রুশিয়ার নিরপেক্ষতার স্বাভাবিক অধিকারেই স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েট রুশিয়ার প্রেরিত সাহায্যে চীনের কমুনিষ্টগণ স্বতন্ত্র ভাবে উপকৃত হয় না। রুশিয়া হইতে প্রেরিত দ্রব্যাদি সরাসরি চুংকিং সরকারে গ্রহণ করেন; পরে উহা প্রয়োজনানুযায়ী সর্বত্র বিতৃত হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মামাংসা হইলে জাপান হয় ত সোভিয়েট সরকারের সাহায্যে চীন যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্ত শেষ চেষ্টা করিবে। এই প্রয়াস বিফল হইলেও তাহার দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অভিযুখী অভিযান হয় ত আর স্থগিত থাকিবে না। হাইনান্ দ্বীপকে ঘাঁটীরাপে ব্যবহার করিয়া জাপান এই অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে পারে। পাগই পুনরধিকার সম্পর্কে জাপানের কৈফিয়ৎ বিশ্বাসযোগ্য নহে; ঐ পথে প্রাপ্ত সমরোপকরণে চুংকিং সরকারের উপকৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তিন মাস পূর্বে জাপানী সৈন্য ঐ অঞ্চল হইতে প্রত্যাহত হইত না। সম্ভবতঃ চীনের দক্ষিণ উপকূলের কতকগুলি স্থান সববরাহ-কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই জাপান ঐ অঞ্চলে আয়োজন আরম্ভ করিয়াছে। পাগই পুনরধিকার এই আয়োজনেরই অঙ্গ।

দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্বে জাপান ইন্দো-চীনকে স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইতে পারে। ইন্দোচীন সম্পর্কে ফরাসী কর্তৃপক্ষ জাপানের বিরুদ্ধে দাবীতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই; তবে তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় জাপানের দাবী মানিয়া লন নাই, তাহা বুঝা গিয়াছে।

সম্প্রতি থাইল্যান্ডের ভূতপূর্ব রাজা প্রজাধিপক এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—If the Japanese want to use the land route to Singapore, they must occupy Indo-China and then invade Siam. দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে সমর-প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে জাপানের পক্ষে সিঙ্গাপুরের প্রতি অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; সিঙ্গাপুর ঘাঁটীতে প্রবল ভাবে

আঘাত করিতে পারিলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের কার্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। কাজেই, স্থলপথে এই দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত জাপানের পক্ষে ইন্দোচীনকে স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে প্রয়াসী হওয়া স্বাভাবিক। থাইল্যান্ডে (শাম) জাপানের প্রভাব পূর্ক হইতেই পতিত হইয়াছে; কাজেই থাই-সরকার জাপানী বাহিনীর অগ্রগতির জন্ত স্বেচ্ছায় পথ ছাড়িয়া দিতে পারেন। সিঙ্গাপুর আক্রমণের সুবিধা ব্যতীতও ইন্দোচীনের আরও সামরিক গুরুত্ব আছে। উত্তরাঞ্চলে এই দেশের সীমান্ত ব্রহ্মদেশের সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের তৈল ও চাউল জাপানের প্রলোভনের বশত বটেই; ইহা ব্যতীত, ব্রহ্মচীন পথ বন্ধ করিয়া চীনকে সম্পূর্ণরূপে অববোধ করিবার জন্ত ব্রহ্মদেশ কৃষ্ণগত করিতে আগ্রহান্বিত হওয়াও জাপানের পক্ষে অসম্ভব নহে। ইন্দোচীন ও থাইল্যান্ডকে জাপান যদি ঘাঁটীরাপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী নৌবহরের তৎপরতারও বিশেষ সুবিধা হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “ইজারা ও ঋণদান” বিল—

বুটেন্কে আর্থিক ঋণ প্রদান না করিয়া তাহাকে সমরোপকরণের দ্বারা সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে বিল বিচিত্র হইয়াছিল, দীর্ঘকাল আলোচনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে উহা গৃহীত হইয়াছে। সেনেটে ঐ বিলের যে সামান্য সংশোধন হইয়াছে, সেই সম্পর্কে প্রতিনিধি-সভায় পুনরায় সামান্য আলোচনা হইবে। এই বিল গৃহীত হইবার ফলে বুটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রেরণের পথে কতকগুলি বিঘ্ন অবিলম্বে অপসারিত হইবে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, বুটেন্কে সাহায্য দান সম্পর্কিত এই বিল পাস হইতে যদি আবণ্ড বিলম্ব হয়, তাহা হইলে মার্চ মাসেব মধ্যভাগ হইতে বুটেন্কে সাহায্য প্রদানে অসুবিধা ঘটবে। বিলটি সেনেটে গৃহীত হওয়ায় এই অসুবিধার আশঙ্কা রহিল না।

এই বিলে প্রেসিডেন্টকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণের জন্ত প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি যে কোন বাষ্ট্রকে সমরোপকরণ বিক্রয় করিতে, হস্তান্তর করিতে, এবং ঋণ ও ইজারা প্রদান করিতে পারিবেন। প্রতিনিধি সভায় প্রেসিডেন্টের এই ক্ষমতা সম্বোধনের কাল ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত নির্ধারিত হইয়াছে। সেনেটে এই মর্মে বিলটির সংশোধন হইয়াছে যে, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সমরোপকরণ আছে, উহা হইতে ৩২ কোটি ৫১ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের উপকরণ হস্তান্তরিত হইতে পারিবে না।

এই বিলের বিধান কার্যে পবিত্র হইলে কেবল সামরিক বিষয়েই নহে—কূটনীতিক বিষয়েও বুটেন কত দূর উপকৃত হইবে, তাহা ইতঃপূর্বে ‘মাসিক বসুমতী’তে আলোচিত হইয়াছে।

ইজারা ও ঋণদান বিলে বুটেন্কে সাহায্য দানের যে ব্যাপক আয়োজন হইয়াছে, উহা ব্যর্থ করিবার জন্ত জাৰ্মানী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেই। কিছু দিন পূর্বে এই বিল সম্পর্কে জাপানী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাংসুয়োকো মন্তব্য করিয়াছিলেন—Its passage will have no important bearing on German action against England, for it will be months before the measure will be effective.

শ্রীঅতুল দত্ত।

সামান্যিক প্রসঙ্গ

বাংলা সরকারের বাজেট

গত ৩রা ফাল্গুন শনিবার (বারবেলায়?) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিষ্টার এইচ, এস, সুরাবর্দী বাঙ্গালা সরকারের ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের বাজেট উপস্থিত করেন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাজেট-ব্যবস্থায় সরকারী নীতির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুরাবর্দীর বাজেটে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাতে জনসাধারণের উন্নতিমূলক কোন কার্যের জন্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই;—হইয়াছে কেবল সাম্প্রদায়িক বিধেব-বৃদ্ধির এবং সচিবদলের ভোটসংগ্রহের জন্ত হীন প্রচেষ্টা। এই জন্ত অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অর্থব্যয় করা, এবং জনসাধারণের উপর অসঙ্গত ভাবে কর-ধারণের আশঙ্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা মজুদ ছিল,—রাজস্ব-সচিবের ভেঙ্কি-বাজীতে তাহা ৩৩ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে, ঠিক হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে সরকারী তহবিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা অধিক হইবে, আবার আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে আয় অপেক্ষা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার ঘাটতি ঘটিবে। এখন কথা হইতেছে—কেবল মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকারের তহবিলে থাকা কোন মতেই বিধিসঙ্গত নহে; আইন মতে ইহার অধিক টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত রাখা কর্তব্য। কাজেই এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—দেশের জনসাধারণের উপর অধিক কর-ধারণের ব্যবস্থা করা; 'নাশ পশা বিঘতে'। বাঙ্গালার সচিবসভা যে কিরূপ অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অর্থের অপব্যবহার করিতেছেন, তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সকলে তাহা সুস্পষ্ট-রূপেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

বর্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে পাটের মূল্য না নামিয়া যায়, তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্ত বাঙ্গালার সচিবদল এই দরিদ্র দেশের গলায় ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাটের কাঁস পরাইয়া খুব স্বল্প পাটোয়ারি

বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। রাজস্ব-সচিব কি ভাবে এই অর্থের ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়াছেন,—তাহা তাঁহার কৈফিয়ৎপূর্ণ বক্তৃতা, বা বক্তৃতাপূর্ণ কৈফিয়ৎ হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার উপায় নাই। এই পাট-সঙ্কটের জন্ত অনেকেই এই সচিবদলকে দায়ী করিতেছেন। কেন দায়ী করিতেছেন, তাহা এই সচিবরা বিলক্ষণ জানেন,—সুতরাং এখানে এই অপ্রীতিকর প্রশ্নের আলোচনা নিশ্চয়োজন। তাঁহারা পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা করেন নাই। তাহার পর তাঁহারা উঁচু দরে (৬০ টাকা হইতে ৯০ টাকা গাঁইট) পাট বেচিবার ব্যবস্থায়, এবং পরে ৬০ টাকা গাঁইট দরে ভাল পাট তাঁহারা কিনিবেন বলিয়া অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন। কিন্তু কার্যতঃ পাটের দর বাড়িল না, নামিতেই থাকিল। তাহার পর পাটের দর চড়াইবার অজুহাতে এই ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইল। কিন্তু এত টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহারা কি ফল দেখাইলেন? ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যে পাটের গাঁইট ৬০ টাকা ১২ আনায় বিকাইয়াছিল, সেই পাট—রাজস্ব-সচিব যে দিন বাজেট উপস্থিত করিয়াছিলেন,—সে দিন ৩২ টাকা দরে বেচিতে চাহিলেও কোন ক্রেতা সে দিকে ভিড়িতে চাহিল না! সাধারণ পাটের দর আড়জে ৬ টাকা হইলেও তাঁহাদের অগতির গতি কলওয়ালারা পাট স্পর্শও করে নাই। সুতরাং টাকাটা যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। এই টাকাগুলি পচা পাটের সৌরভপূর্ণ জলেই ঢালা হয় নাই কি?—আমাদের মধু নাপিত কামাইতে বসিলে, ভিন্ন পাড়ায় ক্রন্দনের রোল গুনিয়া মুখ্যে মশায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মধু, ও-পাড়ায় কান্নাকাটি হচ্ছে কেন?'—মধু বলিল, 'কি জানি কর্তা, আমার ভাই—কেন্দ্রর তো গোটা-কতক মাথা ঝুড়বে বলে ও-পাড়ায় গিয়েছে; সে নোতন সুর চালাচ্ছে কি না।'—এও কি সেই রকম পরের মাথায় সুর চালাইয়া কামাইতে শেখা?

শিক্ষা বিভাগেও দেখা যাইতেছে, সচিবপুত্রবেরা সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভোর হইয়া নিতান্ত দুঃসাহসের সহিত অর্থব্যয় করিতেছেন। শিক্ষা বিভাগে আগামী বৎসরের জন্য ১৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা বিলক্ষণ শ্রবণসুখকর বটে! কিন্তু ইহার অর্ধেক টাকা জিলা-স্কুলবোর্ডগুলিকে দেওয়া হইবে। ইহা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার-সাধনকল্পে গঠিত; কিন্তু ইহার গঠন-ভঙ্গী যেমন আপত্তিজনক এবং সাম্প্রদায়িকতা-বর্ধক,—তেমনই অত্র দিকে এ টাকা অপরিয়াপ্ত। তফশীলভুক্ত জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেড় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে তফশীলভুক্ত হিন্দু জাতির মধ্যে যে গভী টানা হইতেছে,—তাহা পূর্ণমাত্রায় ভেদবুদ্ধি-বর্ধক। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিভেদ-সাধক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জাতীয়তার বিরোধী; উহাতে অকারণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দান করা হয় না কি? তবে অমূল্য জাতিদিগের মধ্যে যাহাতে দ্রুত শিক্ষার বিস্তার হয়, এই উদ্দেশ্যে দরিদ্র এবং প্রতিভাশালী ছাত্রদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করাই সঙ্গত; কিন্তু পরিণামে যাহাতে অমঙ্গল হয়, ঘোড়ার সন্মুখে গাড়ী-যোতার মতন এইরূপ বিপরীত ব্যবস্থা কখনই সাধারণের সমর্থন লাভ কবিত্তে পারিবে না। বর্তমান বৎসর সচিবদল শিক্ষা বাবদ ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এবং আগামী ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার ব্যয় মঞ্জুর করিতেছেন। অবশ্য এইরূপ দুঃসময়েও এক বৎসরে ১৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয় বৃদ্ধি নৈরাশ্রজনক হইত না, যদি ঐ টাকাটা প্রকৃত শিক্ষা-বর্ধনে এবং শিক্ষার বিস্তার-সাধনে ব্যয় করা হইত; কিন্তু তাহা করা হয় নাই। তালিকাভুক্ত জাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাতে এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশে তালিকাভুক্ত কয়েকটি জাতিরই জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে ভোট-সংগ্রহের জন্য অশিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোককে ধাপ্পায় ভুলাইবার সুবিধা হইলেও, ইহাতে ঐ সকল জাতির উল্লেখযোগ্য উপকারের আশা নাই। আর মাধ্যমিক শিক্ষা

সম্বন্ধে এই 'স্বথী পরিবারের' ব্যবস্থা কিরূপ হইতেছে, তাহা নিখিল বাঙ্গালার উহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনেই সুপ্রকাশ।

তাহার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়মিত মুন্সিম-হল আরও দেড় লক্ষ টাকা পাইল। পাটকলের খেতাজ মালিকরাও কি ইহাকে অসাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা বলিতে গাহস করিবেন? ফজলুল হক কলেজের জন্য ৬৭ হাজার টাকা, লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজের জন্য ৭১ হাজার টাকা দানের দৃষ্টান্তও—সচিবমণ্ডলী কর্তৃক কিরূপ নিরপেক্ষ ভাবে শাসননীতি পরিচালিত হইতেছে, তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত নহে কি? অত্র দিকে ব্যয়ের বরাদ্দ আরও দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। নোয়াখালি জিলার সদর সহর স্থানান্তরিত করিবার জন্য এক আঁচড়ে ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর! মৎস্য ধরিবার বিভাগের জন্য ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দের পাশেই বিশ্বভারতীর পল্লীসংস্কার কার্যের জন্য ২০ হাজার টাকার বরাদ্দ দেখিলে মনে হয়, মৎস্যজীবীর গ্রামাদেব পার্শ্বস্থ পল্লীলক্ষ্মীর পর্ণকুটীরে কিঞ্চিৎ নেকনজর পড়িয়াছে! কৃষিক্ষণ বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা দানের বরাদ্দের উদ্দেশ্যে বুঝিতে কাহারও কি কষ্ট হইবে? ঐ ষাট লক্ষের মধ্যে কতগুলি টাকা ওয়াশীল হইবে?

মেট্রনী ব্যবস্থা এবং ভারত সরকারের ঋণ পরিশোধ না করিবার ব্যবস্থা, বিশেষতঃ, তাহার উপর পাট-শুল্ক বাবদ প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটি টাকা হস্তগত হইবার পরও বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে অর্থাভাব, এবং তাহা নিরাকরণের জন্য নূতন নূতন করভার চাপাইয়া বাঙ্গালার দরিদ্র জনসাধারণকে বিব্রত করা কি বিচারমূর্ত্তারই নিদর্শন নহে? তথাপি নূতন দুইটি ট্যাক্স বাবদ আয়ের অঙ্ক বাজেটে ধরা হয় নাই। সচিবমণ্ডলীর মতের সমর্থক স্টেটসম্যান লিখিয়াছেন,—And Bengal is a potentially rich land of some 50 million people. অর্থাৎ পাঁচ কোটি লোকের বাসভূমি এই বাঙ্গালা দেশের ধনী দেশ হইবার সম্ভাব্যতা বিদ্যমান। সেই সম্ভাব্যতাকে বাস্তব ব্যাপারে পরিণত করিবার চেষ্টা এ পর্যন্ত সরকার করিয়াছেন কি? তাহা করেন নাই। অধিক কথা বলিতে কি, এই ম্যালেরিয়া-বিড়ম্বিত দেশ হইতে ম্যালেরিয়া-বিতাড়নের কোন ব্যাপক চেষ্টাই বাঙ্গালার

শাসনকর্তার পরামর্শদাতারা করিতেছেন না। ইহাতে সর্বসম্প্রদায়েরই অপকার হইতেছে। সেই জন্তু অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে—বঙ্গলা সরকারের রাজস্ব-সচিবের এই বাজেট কেবল অর্থের অপব্যয়ে পূর্ণ। সচিবের দল দেশের হিতসাধনের জন্তু কোন প্রয়োজনীয় স্থায়ী ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা যেন তাঁহাদের আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিবার বাহ্যুর্গী প্রকাশের জন্তু বন্ধপরিকর। অতঃপর কোন সভ্য দেশেই এরূপ অব্যবস্থাপূর্ণ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

রেলওয়ে বাজেট

গত ৭ই ফাল্গুন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে সার এণ্ডরু ক্লো ভারতীয় রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়াছেন। ঐ দিনই ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতীয় রেলওয়েগুলির চীফ-কমিশনার মিষ্টার এল উইলসন উহা দাখিল করিয়াছেন। এবার রেল সমূহের যথেষ্ট আয়-বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দেশের লোকের সুবিধার জন্তু বিশেষ কিছুই ব্যয়ের বরাদ্দ করা হয় নাই। এবার অর্থাৎ বর্তমান ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের সংশোধিত হিসাবে রেলওয়ে বাবদ সরকারের ১০৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয় এবং ক্ষয়াদি পূরণ বাবদ ব্যয় ধরিয়া ৯৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং বৎসরান্তে ১৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা রেলওয়ের আয় বাবদ তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকিবে, আশা করা হইয়াছে। মাল প্রভৃতি বহনের অতিরিক্ত ভাড়া বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ বাবদ মালের আমদানী-রপ্তানী বৃদ্ধির জন্তু আয়ের এই আধিক্য ঘটিয়াছে। আগামী বৎসরে রেলওয়ে বাবদ সরকারের আয় হইবে ১০৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, এবং ব্যয় হইবে মায় অপচয় পূরণের খরচা ধরিয়া ৯৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। অতএব রেলওয়ে বাবদ সরকারের হাতে উদ্বৃত্ত থাকিবে ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অবশ্য খুব সাবধানতার সহিত আগামী বৎসরের বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন। এবার জানুয়ারী মাসে রেলওয়ের খাতে যে অধিক আয় হইয়াছে, আগামী বৎসর তত অধিক আয় হইবে কি না, ইহা চিন্তা করিয়া তাঁহারা বাজেটে আয়ের অঙ্ক আগামী বৎসর রেলওয়ে খাতে

১ কোটি টাকা কম হইবে ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ, রেলওয়ের আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু যে সকল ভারতবাসী রেলের তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীতে যাতায়াত করে এবং যাহারা রেলওয়ে বিভাগের নিম্নপদে কাজ করে, তাহাদের সুবিধার এবং অভাব-মোচনের জন্তু বিশেষ কিছুই করিবার ব্যবস্থা লক্ষিত হইল না।

এবার যে টাকা রেলওয়ে খাতে উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা হইতে ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের রাজস্ব খাতে দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা বিগত বৎসরের বাকী হিসাবে দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট যে ৭ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা থাকিবে, তাহা রেলওয়ে রিজার্ভ তহবিলে দেওয়া উচিত। কিন্তু উহা হইতে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের দেয় বাবদ সরকারী রাজস্ব খাতে অগ্রিম দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকাও সরকারী রাজস্ব খাতে দিতে হইবে। সুতরাং আগামী বৎসরে ভারত সরকারের তহবিলে সর্ব-সাকল্যে ৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা (৭১৫ + ২৮১ লক্ষ) পাইবেন। আগামী বৎসরে রেলওয়ে যে টাকাটা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা হইতে ১০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের তহবিলে, আর ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে দেওয়া হইবে। এখানে বলা আবশ্যিক যে, রেলওয়ে আয় বাবদ এই টাকা হইতে কোন প্রাদেশিক সরকারকে কিছুই দেওয়া হইবে না। ভারতীয় রেলগুলির আয় হইতে যত অল্প টাকা রেলওয়ের কর্মচারী এবং যাত্রীদিগের সুবিধা বাবদ ব্যয় করা হয়, তত অল্প টাকা আর কোন দেশের রেলওয়েতে সে জন্তু ব্যয় করা হয় না। ভারতের রেলওয়ের ৫৩ অংশ মাত্র—পশ্চিমবঙ্গে এমালগ্যামেন্টেড্, ব্রিটিশ রেলওয়েতে আয়ের শতকরা প্রায় ৮৬ অংশ ব্যয়িত হইতেছে। জার্মান ট্রেট রেলওয়েতেও ঐ বাবদ শতকরা পৌনে ৯৩ অংশ ব্যয়িত হয়। এবার ভারতের কয়েকটি শাখা-রেলপথের ৩০৫ মাইল দীর্ঘ রেলপথ উঠাইয়া দিয়া উহা অগ্ৰত লইয়া যাওয়া হইবে। ঐ সকল রেলপথে না কি আয় অধিক হয় না; কিন্তু জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধাও কি উপেক্ষণীয়?

ভারত সরকারের বাজেট

এবার যুদ্ধ চলিতেছে, এবং শত্রুদল কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইতেও পারে—এই আশঙ্কায় ব্যয়বৃদ্ধি হেতু ভারত সরকারের তহবিলে টাকার ঘাটতি পড়িবে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই ঘাটতির পরিমাণ কত হইবে, এবং কি প্রকারে তাহার পূরণ হইবে, তাহাই ছিল চিন্তার বিষয়। গত ১লা মার্চ ১৭ই ফাল্গুন ভারত সরকারের রাজস্বসচিব সার জিরেমী রেইসম্যান যে বাজেটের হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, আগামী সরকারী বৎসর ভারত সরকারের তহবিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় ২০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা অধিক হইবে। বর্তমান বৎসরে অর্থাৎ আগামী ১৭ই চৈত্র যে সরকারী বৎসর শেষ হইবে, সেই বৎসরে ভারত সরকারের তহবিলে ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। চলতি বৎসরে সাময়িক কার্যে অর্থাৎ ভারত-রক্ষার জন্ত ৭২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে, আর আগামী বৎসরে উহার পরিমাণ ৮৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা হইবে। এখন যুদ্ধের গতি কিরূপ হইবে, তাহা না জানিতে পারিলে ভারত-রক্ষা বাবদ ব্যয় এই বরাদ্দ পরিমাণকে অতিক্রম করিবে কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই; ইহার মধ্যে ভারত সরকারের মূল এবং নিয়মিত সাময়িক খাতে ৩৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, যুদ্ধের সময় মূল্যবৃদ্ধি বাবদ ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ, ভারতের জন্ত সাময়িক ব্যবস্থা বাবদ ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ, এবং অফলপ্রদ কার্যের জন্ত (non-effective charges) ব্যয় ৮ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই সাময়িক ব্যয়-বৃদ্ধিই ভারত সরকারের বাজেটে ঘাটতি ঘটিবার প্রধান কারণ। বর্তমান এবং আগামী বৎসরের সালতামামী ও বাজেটের হিসাব প্রথমে দেওয়া হইল। এক বৎসর পূর্বে যখন বর্তমান বৎসরের বাজেট প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন রাজস্ব-সচিব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন—এই বৎসর সরকারী তহবিলে ৯২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা আয়, এবং ৯২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; ফলে সরকারী তহবিলে সঞ্চিত হইবে ২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সমস্ত বিপর্যস্ত হইয়া গেল। সরকারী তহবিলে

আয় বাড়িয়া দাঁড়াইল ১০৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা, ব্যয় পড়িবে বোধ হয় ১১২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। অতএব বৎসরান্তে ফাজিল ব্যয় হইবে ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। আগামী বর্ষে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে যদি কোনরূপ অতিরিক্ত কর ধার্য না করা হইত, তাহা হইলে আয় হইত আনুমানিক ১০৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, আর ব্যয় হইত ১২৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা! অতএব ফাজিল ব্যয় অর্থাৎ আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইত ২০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু নূতন টেক্স ধরিয়া আয় দাঁড়াইবে ১১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

এখন এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্ত সরকারকে অন্ততঃ কতক টাকা নূতন টেক্স বসাইয়া তুলিতেই হইবে। রাজস্ব-সচিব সার জিরেমী রেইসম্যান সেই জন্ত প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তিনি এই ভাবে নূতন কর ধার্য করিবেন—

- (১) অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৬৬ $\frac{2}{3}$ টাকা হারে কর ধার্য করা হইবে। এইরূপ করবৃদ্ধিতে আড়াই কোটি টাকার সংস্থান হইবে।
- (২) আয়কর এবং সুপার-টেক্সের উপর কেন্দ্রী অতিরিক্ত কর (central surcharge) শতকরা ২০ টাকার স্থলে ৩৩ $\frac{1}{3}$ টাকা হারে ধার্য করা হইল। ইহাতে ভারত সরকার ২ কোটি ৯ লক্ষ টাকা পাইবেন।
- (৩) দিয়াশলাইয়ের উপর যে কর ধার্য হইয়াছিল, তাহার হার ডবল করা হইল। রাজস্ব-সচিব মনে করেন যে, ইহাতে দেড় কোটি টাকা অধিক পাওয়া যাইবে।
- (৪) কৃত্রিম রেশমের এবং হুতার উপর প্রতি-পাউণ্ডে ৫ আনা কর ধার্য করিয়া ৩৬ লক্ষ টাকা আয় হইবে; এবং (৫) টায়ার ও টিউবের উপর নূতন কর ধার্য করিয়া ২৫ লক্ষ টাকা উঠিবে। এই সকল দফায় আশামুরূপ রাজস্ব আদায় হইলে মোট রাজস্বের পরিমাণ ৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১৩ কোটি টাকা রাজস্ব দাঁড়াইবে। তাহা হইলেও ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। এই টাকাটা ত সংগ্রহ করিতেই হইবে; তাই রাজস্ব-সচিব অন্তোগোপায় হইয়া এই টাকাটা ধণ করিয়া তুলিবেন।

এই বাজেট ভারতবাসীর পক্ষে নৈরাশ্রপূর্ণ। যুদ্ধের সময় করবৃদ্ধির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। তখন সরকার কর ধার্য করিবার সাধারণ নিয়ম মানিয়া

চলিতে পারেন না ; কিন্তু নানা কারণে যুদ্ধের সময় প্রজা-
সাধারণের ব্যয়সঙ্কোচ সঙ্কে অবহিত হওয়া অবশ্য-
কর্তব্য। দিয়াশলাইয়ের উপর করভার হ্রাস হওয়ায়
গরিব লোকের যে কিরূপ কষ্ট হইবে, তাহা হয় ত
সার জিরেমী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যেখানে
এক পয়সা কাজ চলিত, সেখানে এই দুর্ন্যূন্যতার দিনে
তিন পয়সা ব্যয় করা বহু লোকের পক্ষেই অসাধ্য।
অতিরিক্ত আয়করের এবং সুপার-টেক্সের হার-বৃদ্ধিতে
ব্যবসায়ের প্রসারসাধনে বাধা ঘটবে। ইহা এত
অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই। কৃত্রিম
রেশমের উপর কর-ধারণের কতকটা সমর্থন করা যায়।
আমাদের বিশ্বাস, যদি সরকার তাঁহাদের সমরবিভাগে
ভারতবাসী হইতে অধিক সংখ্যায় অখারোহী এবং
পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সমর-বিভাগের
ব্যয় বিশেষ হ্রাস পাইতে পারে। এ কথা সকলেই
জানেন, এক রেজিমেন্ট গোরা-অখারোহী সৈন্য রাখিতে
ব্যয় হয় প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা,—কিন্তু এক রেজিমেন্ট কালা
তুরুকসোয়ারের খরচ ৭ লক্ষ টাকার কিছু অধিক।
এক পর্টন গোরা পদাতিক সৈন্যের জন্ম ব্যয় হয় সাড়ে
১২ লক্ষ টাকা ; কিন্তু এক পর্টন কালা সিপাহীর জন্ম ব্যয়
মাত্র সওয়া ৫ লক্ষ টাকা। এই অবস্থায় সমর বিভাগে
ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করিলে সামরিক ব্যয় যে
অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয়
না ; কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহা করিতে অসম্মত
কেন ? মানুষের মনের অগোচর পাপ নাই ;
conscience does make cowards of us all—
ইহা গ্রেট বৃটেনেরই শ্রেষ্ঠ কবির উক্তি। ভারতের যেরূপ
জনবল আছে, এবং যেরূপ সম্ভাবিত সম্পদ (potential
wealth) আছে, তাহাতে বৃটিশজাতি ভারতবাসীকে যদি
বিশ্বাস করিয়া সহযোগী করিয়া লইতে পারিতেন,—তাহা
হইলে আজ শত জার্মানীও ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের
কেশ স্পর্শ করিতে পারিত না। রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
মার্কিণের নিকট সমর-সম্ভার কিনিতে হইত না।
বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ কালেই ভারতের তদানীন্তন জর্জী-
লাট সার রবার্ট কাসেল রেডিওযোগে ঘোষণা প্রচার
করিয়া বলিয়াছিলেন—

India's greatest asset is a large supply of
the finest types of fighting men. India's
weaknesses are a low national income and to
the present a limited industrial development,
incapable of supplying all the technical
equipment of a modern army.—ইহার মর্মার্থ,
“ভারতের খুব ভাল সৈনিক যোগাইবার উপযুক্ত জনসম্পদ
আছে, কিন্তু ইহার শ্রমশিল্পের বিকাশ-সাধন অল্প হইয়াছে
বলিয়া জাতীয় আয় অত্যন্ত অল্প ; সেই জন্ত ভারত
বর্তমান কালের উপযোগী ভাবে সৈনিকদিগকে সুসজ্জিত
করিবার উপযুক্ত মাজ-সরঞ্জাম যোগাইতে পারে না।”
কিন্তু এ জন্ত দায়ী কে ? বৃটিশ সরকার নহেন কি ? তাঁহারা
আনুকূল্য করিলে ভারত শ্রমশিল্পের বিকাশ-সাধনে সমর্থ
হইত। বৃটিশ জাতিকেও এত বিব্রত হইতে হইত না।
এখন দরিদ্র ভারতবাসীর সঙ্কে অসম্মত অধিক করভার
চাপাইলে তাহা প্রদান করিতে তাহাদের দারুণ কষ্ট
হইবে সন্দেহ কি ? করবৃদ্ধির পূর্বে সার জিরেমী
রেইসম্যান সে কথা ভাবিয়া দেখিতে পারিতেন ; কিন্তু
কলমের খোঁচায় পরাধীন জাতিকে করভারে পিষ্ট করা
যত সহজ, মাথা খাটাইয়া, সকল দিক বজায় রাখিয়া
ঐ সকল সমস্যার সমাধান করা তত সহজ নহে ;
এবং সে জন্ত যে বুদ্ধি ও শক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজন, তাহা
বহু অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও দায়িত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করে ;
সরকারের উচ্চপদস্থ সকল কর্মচারীর নিকট তাহা প্রত্যাশা
করা যায় কি ?

আজমুহুরে প্রহেলিকা

সমগ্র ভারতের জায় বাঙ্গালাতেও এবার লোক-গণনা
শেষ হইয়াছে। কিন্তু এই গণনা-কার্যে যেরূপ
সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির বিকাশ লক্ষিত হইয়াছে—
তাহাতে এই গণনা যে অসম্মত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস
করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার একমাত্র সংখ্যাধিক্যের
অজুহাতে, অর্থাৎ প্রজনন-দক্ষতার নিদর্শনস্বরূপ সাম্প্র-
দায়িক মুসলমান-শাসনপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে।
যোগ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া যদি সংখ্যাধিক্যকেই বরণ
করা হয়,—তাহা হইলে অযোগ্য হইলেও সংখ্যায় অধিক

বলিয়া সমাদৃত সম্প্রদায়ের পক্ষে 'যেন তেন উপায়েন' সেই সংখ্যার আধিক্য প্রতিপন্ন করাই অপরিহার্য হইয়া উঠে। যাহা হউক, বাঙ্গালা প্রদেশে লোক-গণনায় যে ভুল হইয়াছে, ইহা হাতে-কলমে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই ভুল কিরূপ অকাট্য, তাহা দেখাইতেছি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গণনার হিসাবে দেখা যায়,—এই বাঙ্গালা প্রদেশে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বয়সের মুসলমান বালকের সংখ্যা ছিল—১৭ লক্ষ ২৫ হাজার ১ শত ২৬। দশ বৎসর পরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পুনরীকৃত গণনাকালে ঐ সকল বালকের বয়স ত নিঃসন্দেহে ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত হইয়াছিল; সুতরাং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ঐ শিশুগণের সকলেরই যদি জীবিত থাকা সম্ভব হইত, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইত ঐ পর্যন্ত,—যেহেতু আসমান হইতে কোন নূতন শিশু পয়দা হইতে পারে নাই। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস-রিপোর্টে আমরা বিভিন্ন বয়সের মুসলমান পুরুষের হিসাবে দেখিতে পাই, উহাদের সংখ্যা ১৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৫ শত ৪১টি হইয়াছে। কি করিয়া ইহা হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? ব্রিটিশ ভারতে এই সময় প্রতি-বৎসর হাজারকরা পৌনে-দুই শতেরও অনেক অধিক শিশু মরিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় শিশু-মৃত্যুর হার, হাজার-করা দুই শতেরও অধিক হইয়াছিল; কিন্তু বিশ্বয়ের বিষয়, এই দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় মুসলমান পুরুষের মধ্যে একটিও শিশু মরিল না, অধিকন্তু তাহাদের সংখ্যা দশ বৎসরে ৯১ হাজার ৪ শত ১৪টি বাড়িয়া গেল! ছাপ্পর ফাড়িয়া পয়দা না হইলে ইহা কি সম্ভব?

তাহার পর মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য কেবল নাবালক এবং নারীর সংখ্যাধিক্যবশতঃ—এই কথাই বলা হইয়াছিল। সে জন্ত মুসলমানদিগের সমাজে সাবালক পুরুষের সংখ্যা অধিক দেখাইবার চেষ্টা অসম্ভব নহে। ইহা কত দূর সত্য, তাহাও দেখা আবশ্যিক। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালায় সেন্সাস-রিপোর্টে প্রকাশ,—ঐ বৎসর মুসলমান পুরুষদিগের মধ্যে ১৫-২০ বৎসরের লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯ শত ৯৬। ইহার দশ বৎসর পরে উহাদেরই বয়স ত ২৫-৩০ বৎসর হইবারই কথা; কিন্তু ঐ বৎসরের আদম-সুমারের রিপোর্টে দেখা গেল,

উহাদের সংখ্যা লিখা হইয়াছে '১২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬ শত ৬১। অর্থাৎ সংখ্যায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬ শত ৬৫ জন বাড়িয়া গেল! অথচ ঐ সময়ে ভারতে মৃত্যুর হার ছিল হাজার-করা গড়ে ২৫ হইতে ২৬ জন। কিন্তু হিসাবে দেখা যাইতেছে, ঐ বয়সের মুসলমান যুবক ১ জনও মরে নাই, অধিকন্তু তাহারা সংখ্যায় পুরুষের ঋণ লক্ষাধিক বাড়িয়া গিয়াছিল! আবার ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস-রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর ২৫-২৬ বৎসরের মুসলমান পুরুষ-সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭ শত ৭৪ জন ছিল। আর দশ বৎসরের পরবর্তী সেন্সাস-রিপোর্টে দেখা যায়, ৩০-৩৫ বৎসরের মুসলমান যুবকদিগের সংখ্যা লিখিত হইয়াছে, ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬ শত ৩০। অর্থাৎ ঐ বয়সের মুসলমান পুরুষ-সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮ শত ৫৬ জন বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ভাবে গৌজামিল দিয়াও মুসলমানদিগের মধ্যে নাবালকের সংখ্যা হ্রাস পায় নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান পুরুষ-দিগের মধ্যে প্রতি দশ হাজারে নাবালকের সংখ্যা ৫৫৯ জন ছিল, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাহা ঐ অনুপাতে ৬ শত ৮০ জন হইয়াছে। মুসলমান-সমাজে নারীর আনুপাতিক সংখ্যা হিন্দু-সমাজের নারীর আনুপাতিক সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দত্ত হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে হিন্দু-সমাজে নারীর আনুপাতিক সংখ্যা অপেক্ষা মুসলমান-সমাজে নারীর আনুপাতিক সংখ্যা অনেক অধিক। ইদানীং উহা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

প্রতি হাজারে পুরুষের তুলনায় হিন্দু-সমাজে নারীর আনুপাতিক সংখ্যা যত, মুসলমান-সমাজে তাহা অপেক্ষা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হাজার-প্রতি ২৯ জন হিসাবে; এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ২৮ জন হিসাবে অধিক। পূর্বে কিন্তু এত অধিক ছিল না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১৭ জন, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১৮ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেন্সাস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁহার রিপোর্টে (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের) মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৪০এর অধিক বয়স্ক হিন্দুরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ ইহা সত্য, তবে উহা ঐ বয়সের জীলোকের সংখ্যাধিক্য হেতুই হইয়াছে। এইরূপ ইঙ্গিত সঙ্গত হয় নাই। এখন প্রশ্ন, এরূপ অবস্থায় এবার আদম-সুমারের

হিসাব অত্রান্ত করিবার চেষ্টা করাই কি সরকারের কর্তব্য নহে ?

উজীরি কুফ্রি

কিন্তু বাঙ্গালায় যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে,—তাহাতে ইহার প্রতিকার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। বাঙ্গালায় ঐহারা এই গণনা-কার্য পরিচালনা করিয়াছেন,—ঐহারা এতই সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রভাবিত যে, ঐহারা আসল কথাটা ধামা-চাপা দেওয়ারই চেষ্টা করিয়াছেন,—কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে গণনার কার্য পরিচালনার জন্ত বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। বাঙ্গালা সরকারের প্রধান উজীর মোলভী ফজলুল হক ছায়েব আসল কথাই ধামা-চাপা দিয়া বলিয়াছেন—১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গোল-টেবিলের সাব-কমিটিতে তিনি সদস্যরূপে হাজির ছিলেন। সেই বৈঠকে হিন্দু প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন,—কিন্তু ঐহারা ঐ বৎসরের সেন্সাস-রিপোর্টে ভুল আছে, এমন কোন কথাই বলেন নাই। অতএব হিন্দুদিগের এই উজিরি বে-বনিয়াদ। মুর্খের ঞ্চায় এইরূপ অপ-সিদ্ধান্ত কেহ করিতে পারে, ইহা দেখিয়া কে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে ? ইহাতে বড় জোর সপ্রমাণ হয়, সরকার কর্তৃক ঐহাদিগকে গোল-টেবিল সাব-কমিটিতে উপস্থিত করা হইয়াছিল, ঐহারা আদম-সুমারের হিসাবগুলি ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই, অথবা আলস্য ত্যাগ করিয়া তাহা দেখেন নাই; সে জন্ত পাঁচ ও পাঁচ যোগ করিয়া বারো হইতে পারে না। সেন্সাস-রিপোর্টের হিসাবগুলি ত লুকাইবার উপায় নাই। উহার হিসাবে ভুল যখনই ধরা পড়িবে, তখনই লোক উহাতে আপত্তি করিতে পারিবে। প্রধান সচিব যে ভাবে এই ব্যাপার-সম্পর্কে কথা কহিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি যুক্তিযুক্ত বিচারের মূলনীতিগুলি অবগত আছেন, তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। ঐহার এই অজ্ঞতা কত দূর নিম্নজ্ঞতার নিদর্শন, তাহা লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি ক্রমাগতই বলিয়াছেন যে, হিন্দু গণনাকারীরা ইচ্ছা করিয়া গণনায় ভুল করিয়াছে; কিন্তু সে জন্ত তিনি কোন হিন্দু গণনাকারীকে ফৌজদারী-সোপর্দ করিতে সাহস করেন নাই। তিনি ঐহাদের প্রসাদে ও আনুকূল্যে

এখনও প্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, ঐহারা হিন্দুরও বন্ধু নহেন, মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। ঐহারা আপনাদেরই বন্ধু। প্রধান সচিব বারংবার বলিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে যদি হিন্দুর সংখ্যাধিক্য ঘটে, তাহা হইলে মুসলমানদিগের সর্বনাশ। তিনি ইহার সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

শিক্ষা-কর ধার্য বিষয়ে নোয়াখালিতে, যশোহরে যে সকল তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তিনি এবং ঐহার অধীনস্থ কর্মচারীরা কিরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রভাবিত, তাহা বুঝিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না। বাঙ্গালার যে সকল জাতি হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছে, সেন্সাসের কর্মচারীরা তাহাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া লিখিয়াছেন। ব্রাহ্ম, জৈন প্রভৃতি ঐহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক, ঐহাদিগকে তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই; তবে কেহ কেহ হিন্দুসভার নির্দেশক্রমে আপনাদিগের জাতি লিখাইতে চাহেন নাই। কিন্তু জাতির উল্লেখ থাকা উচিত। কারণ, উহার দ্বারা কোন জাতি ক্ষয়িষ্ণু, এবং কোন্ জাতি বর্দ্ধিষ্ণু, তাহা বুঝিবার সুবিধা হয়। বিশেষতঃ, হিন্দুর জাতি-নির্ণয়ে সেন্সাসের গণক, পরিদর্শক প্রভৃতির কি পরিমাণ যোগ্যতা ছিল? বস্তুতঃ, ব্যাপার যেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে, হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস করিয়া মুসলমানদিগকে এবার অনেক বর্দ্ধিত সংখ্যায় দেখাইবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। আদম-সুমারের হিসাবে বিশ্বাস করিবার উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। সরকারী রিপোর্টে এবার ত্রাস্তির মালা ভিন্ন আর কি দেখিবার আশা আছে? কিন্তু তাহার প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি? বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা জানিবার জন্ত সকলেই আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ভারত সচিবের বক্তৃতা

বচনপটু ভারত সচিব পুনর্বার বক্তৃতা-ধারা উদ্দীর্ণন করিয়া বোধ হয় আশা করিয়াছেন, বাক্যকোশলে তিনি অল্প সকলকেই ঐহার মতাবলম্বী করিতে পারিবেন। ঐহার বৃদ্ধা উচিত—“Words are men's daughters but

God's sons are things.” বুদ্ধিমান লোক কথায় ভুলে না, পরন্তু সম্পাদিত কর্তব্য দেখিয়াই উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করে। তিনি বলিয়াছেন, “গ্রেট ব্রিটেন আত্মরক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিতেছে।” আত্মরক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। ইংবেজ জাতি কতকটা বাহুবলে এবং কতকটা ভাগ্যবলেও এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য অর্জন করিয়াছেন,—সুতরাং তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা তাঁহাদের অবশ্যকর্তব্য। ব্রিটেনের এই অধিকার স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, “ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিকাশ-সাধনের জন্ত কার্যকরী মূলনীতি (living principle) হইতেছে গ্রায়বিচার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এবং স্বায়ত্ত-শাসন,—উহাই রক্ষা করিবার জন্ত আমরা যুদ্ধ করিতেছি।”—এ দেশের লোক এই বচনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে একটু ধাঁধায় পড়িবে। এ দেশের লোকের মনে স্বতঃই এই সংশয়ের উদ্ভব হইবে—যে সাম্রাজ্যে সম্প্রদায়ভেদে অধিকার ভেদ করিবার ব্যবস্থা কার্যক্রেত্রে প্রবর্তিত, সে সাম্রাজ্যে কি গ্রায়বিচার তিষ্ঠিতে পারে? সাম্প্রদায়িকতার সহিত গ্রায়নিষ্ঠার সামঞ্জস্য-সাধন কি সম্ভবপর? ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সত্যগ্রহীদিগকে কারাগারে প্রেরণ-নীতির সামঞ্জস্য কোথায়? সত্যগ্রহীদিগের কার্য্য সকলে সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের উক্তিতে এমন কিছু আছে কি—যে জন্ত তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে?

তাহার পর স্বায়ত্ত-শাসনই না কি বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিকাশ-সাধনের সক্রিয় মূল নীতি। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ সরকার সকল দলের ভারতবাসীকে একযোগে তাহাদের শাসন-যন্ত্রের পরিকল্পনা করিবার অধিকার প্রদানে অসম্মত হইতেন না। তিনি কি মনে করেন—ভারতবাসীরা এতই নিরক্ষর যে, তাহারা তাঁহার বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া পাকা মাকালকে স্পন্দ রসাল বলিয়া ভ্রম করিবে? তিনি বলিয়াছেন, ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান, বা তাঁহাদের গ্রায় স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ব্রিটিশের সমকক্ষ করাই তাঁহাদের ভারত-শাসনের মূল নীতি।—বাক্সালায় একটা প্রবচন আছে, বিশ্বকর্মা যে কত বড় ওস্তাদ মিস্ত্রী, তাহা

জগন্নাথের মূর্তি নিষ্কাণেই সুপ্রকাশ। কাজ দেখিয়াই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। ভারতবাসীকে সত্যই যদি তাঁহাদের স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানের সঙ্কল্প থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনকে ঐ ভাবে বিধিবদ্ধ করিতেন না। যাহা হউক, ভারত সচিব এখন কিছু দিন মোন থাকিলেই শোভন হয়; কিন্তু যিনি মনে করেন, বাচালতাই রাজনীতির অঙ্গ, তিনি কি মোন থাকিতে পারিবেন? বরং অল্প সকলে এই ভাবিয়া মোন থাকিতে পারেন যে, “দন্দুরা যত্র বক্তারঃ স্তত্র মোনং হি শোভনম্।”

—

সিংহলে ভারতবাসী

সিংহলের অধিবাসীরা ভারতবাসীদিগকে লঙ্কা-ছাড়া করিবার জন্ত আদা-জল খাইয়া লাগিয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসীরা সিংহলে যাইয়া উহার উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, সিংহলবাসীদের তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভারতবাসীদিগকে এখন তাহারা বিষদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের অনেকেই এখন ভারতবাসীদিগকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করে। সম্প্রতি সিংহলের মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতবাসীর প্রতিকূলে কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তথাকার বোর্ড অব মিনিষ্টারস্ বা মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতবাসীর প্রতিকূলে যে সকল আইন প্রস্তত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সিংহলের বর্তমান শাসন-কর্তা সার এণ্ডরু কাল্ডেকাট তাহাতে সম্মতি দিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন; তাহার ফলে মন্ত্রিবর্গের মধ্যে ভীষণ কলবর আরম্ভ হইয়াছে। গবর্নর মন্ত্রি-পরিষদকে জানাইয়াছেন—যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইতেছে, তাহাদের অনেকগুলি বিষয়ই ব্রিটিশ সরকার এবং সিংহলী সরকার ভারত সরকারকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেই বিষয়ের তালিকাভুক্ত; সুতরাং ঐ বিষয়-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, এ অবস্থায় ঐ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্ত সিংহলী সরকার ভারত সরকারের নিকট দায়ী;—অতএব সিংহলের শাসনকর্তারূপে সার এণ্ডরু ঐ সকল

আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে, অথবা উহাকে আমল দিতে পারেন না।

সিংহলের শাসনকর্তার এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সঙ্গত, তাহা বলাই বাহুল্য। সিংহল সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার ব্যারণ জয়তিলক, সার এণ্ডরু কালুডেকাটের এই মন্তব্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সার এণ্ডরু ঐ উক্তি অত্যন্ত অসময়ে করা হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা ক্ষিপ্ততার সহিত ঐ বিষয়ে আইন করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। সিংহলে ভারতবাসীদিগের সহিত সিংহলবাসীদিগের এই বিবাদ কিছু দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সিংহল-প্রবাসী ভারতবাসীরা সিংহলবাসীদিগের তুল্য নাগরিক অধিকার লাভ করিতে চাহে। সিংহলবাসীরা তাহাদিগকে সেই অধিকার দিতে সম্মত নহে। গত নবেম্বর মাসে এই বিষয়ে দিল্লী সহরে সিংহলী ও ভারতবাসী সদস্য লইয়া এক পরিষদ বসিয়াছিল। সে পরিষদ ভাঙ্গিয়া যায়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্ত সিংহলে গিয়াছিলেন, এবং তথায় এক সপ্তাহ ছিলেন। তিনি লঙ্কাসীদিগকে এই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যাহারা বুঝিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। এখন সিংহলের দুই জন মন্ত্রী মিষ্টার সেনানাথক এবং মিষ্টার বন্দরনাথক ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনে লঙ্কাদগ্ন ও মধুবন ভঙ্গ স্বরণ করাইবার উপক্রম করিয়াছেন! ইহারা উভয়েই দিল্লী পরিষদের সদস্য হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহারা যে ভাবে এই আন্দোলন চালাইতেছেন, তাহাতে অনেকেরই মনে এই আশঙ্কা জাগিতেছে যে, ইহাদের কথায় অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সিংহলবাসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া প্রবাসী ভারতবাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, এবং তাহার ফলে সিংহলে ঘোর অশান্তির আগুন জলিয়া উঠিবে; কিন্তু ইহার প্রতিরোধের কোন পন্থাই লক্ষিত হইতেছে না।

দুর্ঘটনা উক্তি

ভারতের বর্তমান অঙ্গীলাট এ দেশে নূতন আসিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের দিল্লীস্থিত

বৈঠকে বলিয়াছেন, “ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির বে-সরকারী সদস্যদিগকে ভারত-রক্ষায় যেরূপ আগ্রহান্বিত দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি প্রীতি অনুভব করিতেছি। যে সমস্ত সামরিক তথ্য প্রকাশ করিলে অনিষ্ট ঘটবার আশঙ্কা নাই, আমি অতঃপর সেই সকল তথ্য সদস্যদিগকে জানাইয়া দিব, এবং সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বিবেচনা করিয়া দেখিব।” কথাগুলি সরল এবং সহৃদয়তা-প্রকাশক। ভারতের এই নূতন সেনাপতি সার ক্লড অচিনলেক অতঃপর কখন কখন ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন, তবে এই যুদ্ধের সময় তাঁহার কাজের যেরূপ ভীড়, তাহাতে তিনি সভার সকল অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিবেন না। তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সঙ্গত। তিনি ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলে ভারতবাসীও তাঁহাকে প্রকৃত হিতৈশী বলিয়াই মনে করিবে সন্দেহ নাই।

মোহাম্মদীয় স্মরণীয়

অন্যচার

বাক্সালার বর্তমান মুসলমান-প্রধান সচিব-সভ্য সাম্প্রদায়িকতা প্রভাবে কিরূপ কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত হইয়া কার্য পরিচালন করিতেছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বহু স্থানের লোক মর্শ্বপীড়া অনুভব করিলেও অনেকেই সাহস করিয়া অভিযোগ করিতে পারিতেছে না, অথবা অর্থাভাবে, কিম্বা পরিণামে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে—এই আশঙ্কায় নীরবে তাহা সহ্য করিতেছে; এবং নিরুপায় হইয়া ভগবানের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছে। সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুত শ্রীমাংসাদ মুখোপাধ্যায় বাক্সালার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন, তাহার কিছু-কিছু তিনি সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসাধারণের গোচর করিয়াছেন; তবে যে সকল কথা তিনি প্রকাশ করেন নাই, সেগুলির নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; যদি প্রয়োজন হয়, তখন তাহা প্রকাশ করিবেন। শিক্ষাবিস্তারের অজুহাতে কর বসাইয়া এই সচিবের দল মুসলমান-প্রধান স্থানগুলিতে অত্যন্ত দারুণ ভাবে হিন্দু-নিপীড়ন কার্যে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহাদের

অধীন হিন্দু সচিবগণ নিরীক হইয়া স্বধর্মীর প্রতি এই হুঃসহ অত্যাচার উপভোগ করিতেছেন। চাকরীর প্রতি দরদ থাকিলে অত্যাচারের প্রতিবাদ করা চলে কি? তাঁহাদের পক্ষ হইতে সর্বজনবিদিত প্রবচনটি একটু পরিবর্তিত করিয়া বলা যাইতে পারে, “কাজ কি আমার কথাতে, রামের ঘাড় রহিম ভাঙ্গুক, দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে।”

ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিবৃতিতে হিন্দুদিগকে নিপীড়িত করিবার ১৭ দফা উপায় বা কৌশলের উল্লেখ করিয়াছেন। নারী-নির্ধ্যাতন হইতে আইনী এবং বে-আইনী ভাবে লোকের সর্বস্ব লুণ্ঠনের প্রয়াস পর্যাস্ত অনেক কৌশলের কথাই বিবৃত হইয়াছে। নোয়াখালি জিলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সংখ্যার ৪ গুণ অধিক বলিয়াই প্রচারিত। কিন্তু ঐ জিলার সমস্ত হিন্দুকে শিক্ষাকর বাবদ যত টাকা দিতে হইবে ধার্য করা হইয়াছে, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ করও মুসলমানদিগকে দিতে হইবে বলিয়া ধার্য হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ একটা ব্যাপারের উল্লেখই যথেষ্ট। নোয়াখালি-কুমিল্লার অন্তঃপাতী রাইপুর থানা। ৪নং বোর্ড কর্তৃক ঐ থানার অধিবাসীদিগের উপর শিক্ষাকর ধার্য করা হয়। ধার্য করের পরিমাণ ৮ শত ৯০ টাকা; তন্মধ্যে হিন্দুদিগকে দিতে হইবে ৮ শত ১২ টাকা, আর মুসলমানদিগকে দিতে হইবে কেবলমাত্র ৭৮ টাকা! অথচ বলা হয়—ঐ অঞ্চলের হিন্দুদিগের সংখ্যা মুসলমানদিগের সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানদিগের আর্থিক অবস্থা হিন্দুর অবস্থা অপেক্ষা হীনও নহে। কতকগুলি স্থানীয় লোক অসহ বোধে এই অত্যাচার-অসঙ্গত করধার্যের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার-প্রার্থী হইলে, দেওয়ানী আদালতের বিচারক এক জনের উপর ধার্য কর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিয়াছেন; আর এক জনের উপর ধার্য কর ১০০ টাকা স্থানে ১৮ টাকা, এবং আর এক জনের উপর ধার্য কর ১০০ টাকার স্থানে ২০ টাকা করা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বোর্ড কর্তৃক ধার্য কর হিন্দুদিগের উপর কিরূপ নামঞ্জরিত ও কঠোর হইয়াছে। সকলে অর্থব্যয়ের ভয়ে এবং অবসরের অভাবেও আদালতে প্রতিকার-প্রার্থী হইতে পারে না। তাহার উপর এই রকম

খামখেয়ালীর পরিচয় পাইয়া অনেকে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ভিন্ন নারী-নিপীড়ন, মুসলমান পুলিশ-দারোগা কর্তৃক হিন্দু-গৃহস্থের বাড়ী অবরোধ প্রভৃতি অভিযোগ আছেই,—তাহারও নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করা অবশ্যকর্তব্য। বাঙ্গালার গবর্নর সার জন হার্কোর্টকে আমাদের অনুরোধ—তিনি অবিলম্বে এই বিষয়টি নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য জানিবার চেষ্টা করুন। সচিববৃন্দ সরকার নছেন,—তিনিই সরকার, ইহাই হাইকোর্টের রায়। তিনি যদি কুমন্ত্রী কর্তৃক চালিত হন, তাহা হইলে সে দায়িত্ব তাঁহারই। এই প্রদেশের শাসনকার্যের নৈতিক-দায়িত্ব এবং বৈধ-দায়িত্ব তাঁহারই। সাম্প্রদায়িকতা-প্রভাবে দেশে যে অশান্তির অনলশিখা পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তৎপ্রতি অবিলম্বে তাঁহার অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার লইয়াছিলেন; তাহার কারণ, উক্ত কোম্পানী যোগ্যতার সহিত শাসন-কার্য পরিচালিত করিতে পারেন নাই। আজ বেসরকারী কতকগুলি ইংরেজ বণিকের সহায়তায় এবং সমর্থনে যে সচিবসভ্য পদস্থ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিড়ম্বিত শাসনের ফল কিরূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহা সার জন হার্কোর্ট নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিবেন, দেশের হিন্দু অধিবাসিগণ তাঁহার নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সার এণ্ডরু ইউলের ঞায় ঞায়নিষ্ঠ ইংরেজ বণিক এ কালে এ দেশে অল্পই আসিতেছেন; সেই জন্ত বাঙ্গালার ভাগ্যে আজ এইরূপ দুর্দশা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতার মুসলমান জমতদার জাঙ্গা

গত ২৬শে মাঘ শনিবার মধ্যাহ্নে মরমের একটি তাজিয়ার শোভাযাত্রা পরিচালন কালে তাজিয়া রাজাবাজার ট্রাম-ডিপোর নিকট উপস্থিত হইলে কতকগুলি মুসলমান সেই পথের উচ্ছৃঙ্খিত ট্রাম-লাইনের বৈদ্যুতিক তার অপসারিত করে। গত ২৮শে মাঘ সোমবার কলিকাতার পুলিশ এই সম্পর্কে রাজাবাজার অঞ্চলে সাহেব-বাগান বস্তি হইতে প্রায় ৭০ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করায়

রাজাবাজার, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান-দিগের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা লক্ষিত হয়। তাহারা ধৃত ব্যক্তিগণের মুক্তির দাবী করে। ক্রমশঃ জনতা বর্দ্ধিত হয়। প্রকাশ, জনতার ভিতর হইতে অনেকে পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল প্রভৃতি নিক্ষেপ করায় কয়েক জন পুলিশ কন্ঠেবল ও সার্কেজন্ট আহত হয়, এবং ১২ জনকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পুলিশও লাঠি চালাইয়াছিল; এবং প্রধান সচিব মৌলবী ফজলুল হক ও পররাষ্ট্র-সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীন উত্তেজিত জনতাকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন, প্রধান সচিবকে আক্রান্ত হইবার ভয়ে স্থানত্যাগ করিতে হয়, এবং পররাষ্ট্র-সচিব খাজা সাহেব না কি কিঞ্চিং আশ্বাদন-গুরুত্বে অস্থস্থ হওয়ায় এক মাস ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, জনতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রাজাবাজারের ষোল জন টাম-কর্মচারী অন্ন-বিস্তর আহত হইবার সংবাদ পাওয়া যায়। জনতার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরে ৫ জন পুলিশ সার্কেজন্ট, ১৪ জন কন্ঠেবল, টামের এক-জন ফিদিঙ্গী ইন্স্পেক্টর ও আরও কয়েক জন আহত হয়। রাজাবাজার টামডিপোও জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজাবাজার অঞ্চলে টাম-চলাচল স্থগিত ছিল। অবশেষে পুলিশ গ্যাস-কার্তুজের গুলী বর্ষণ ও লাঠি-চালনা দ্বারা জনতা ছত্রভঙ্গ করে। ৯৬ জনকে আততায়ী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু অবশেষে সকলকেই জামিনে মুক্তিদান করা হয়। দাঙ্গা করিবার অভিযোগে কতকগুলি মুসলমানকে ফৌজদারী-সোপবন্দ করা হয়, কিন্তু কি কারণে নলা যায় না, এই মামলা সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই! এ কিল খাইয়া কিল চুরি কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে প্রধান সচিব মৌলবী ফজলুল হককে জিজ্ঞাসা করা হয়—যাহাদের ফৌজদারী-সোপবন্দ করা হইয়াছে, তাহাদের মামলা সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহার কারণ কি? কিন্তু প্রধান সচিব সম্পূর্ণ তুষ্টিস্তাব অবলম্বন করিয়াছেন, এবং খাজা নাজিমুদ্দীন ছুটি লইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া স্থস্থ হইতেছেন। পুলিশকে যাহারা আক্রমণ করিয়া আহত করিল, তাহাদের

কিরূপ দণ্ড হয়, তাহা জানিবার জন্ত জনসাধারণ উৎসুক রহিয়াছে, কিন্তু ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়িল কি না, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। যদি এই দাঙ্গার আসামীরা হিন্দু হইত, তাহা হইলে মামলার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত?

টাউন হলে বিরূট সভা

বাক্সালা সরকারের প্রধান সচিব মিষ্টার ফজলুল হক বাক্সালার হিন্দুদিগকে যেরূপ বে-পরোয়া ভাবে আক্রমণ করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদজ্ঞাপনের জন্ত গত ২২শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ঋপরাহ্নে কলিকাতার টাউন হলে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদিগের অমুষ্টিত এক বিরূট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সার নূপেন্দ্রনাথ সরকার এই সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সার নূপেন্দ্রনাথ তাহার বক্তৃতায় অগ্ৰাণু কথার পর বলেন, “... আপনাদের মনোভাব প্রকাশের ভার আমার উপর পড়িয়াছে। এই অপ্রীতিকর কিন্তু অনিবার্য আলোচনায় যোগদান আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় নহে। এই সভার বিবেচা বিষয় খুব সঙ্গীর্ণ। আদম-সুমারী সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবহার, বাক্সালার সচিব-সম্বন্ধে অমুযোগ অথবা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল বিষয়ের জন্ত বাদ-প্রতিবাদ হইতেছে, এ সকল বিষয় আমি আলোচনা করিব না। আপাততঃ আমরা কেবল মিঃ ফজলুল হকের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

“প্রধান সচিব অন্যান্য ৯টি বিবৃতি দিয়াছেন। গত ২রা মার্চ তিনি যে বিবৃতি দেন, তাহার এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, ‘যাহাতে হিন্দুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া দেখান যায়, সে জন্ত যখন ব্যবহারাজীবরা, বৈজ্ঞানিকগণ, অধ্যাপকবৃন্দ, জমিদারগণ, ব্যবসায়ীরা, ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণ-গণ, এবং নানা সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়গুলি মিথ্যা কথা বলিবার ও মিথ্যা বিবৃতি দিবার জন্ত একত্র মিলিত হইয়াছে, তখন আর কি হইতে পারে?’—যে ভাবে এই কথাগুলি তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে আদম-সুমারীর সহিত সংসৃষ্ট সকল ব্যক্তিকেই সমান ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে।

“এই বিবৃতি আমি যখন পাঠ করি, তখন দায়িত্বপূর্ণ

পদের কোন সরকারী কর্মচারী যে এইরূপ বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন—সে বিশ্বাস আমি করিতে পারি নাই। ঐ সকল কথা পরই ঐ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, ঠাহারা যুব সমাজের শিক্ষাপ্রদান কার্যে ঠাহাদিগের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, ঠাহারা বিবেকের তিলমাত্র তাড়না অনুভব না করিয়া মিথ্যা বিবৃতি দিতেছেন, মুসলমানদিগের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কম দেখাইবার জ্ঞ প্রবঞ্চনা, মিথ্যা উক্তি প্রভৃতির সাহায্য লইতেছেন—



সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

এ সকল আমি যখন দেখিতেছি, তখন ইহা অপেক্ষা ভাল কিছুর আশা আমি আর কি করিয়া করিতে পারি?'

সার নৃপেন্দ্রনাথ প্রধান সচিবের দয়িত্বজনীন বিবৃতির দীর্ঘ আলোচনা করিয়া বলেন, “আজাদে মৌলবী ফজলুল হকের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি মুসলমানদিগকে এই কথা স্বরণ রাখিতে বলিয়াছেন যে, আদম-সুমারীর মধ্য দিয়া ঠাহারা ঠাহাদিগের সম্প্রদায়কে যেরূপ কার্যকরী ভাবে সাহায্য করিতে পারেন, সেরূপ করিবার সুযোগ আর না আসিতে পারে। হিন্দুরা কোন প্রতারণামূলক কার্য

বা জাল করিলে ঠাহারা যেন তাহা চর্চা রাউতলা রোডে জানান, কিন্তু লক্ষ্য করিবেন—তিনি মুসলমান-দিগকে বলিয়াছেন, ঠাহারা যেন নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার জ্ঞ হৃদয়ের রক্ত দেন, ফলাফলের জ্ঞ ভীত না হন।

“শিক্ষিত মৌলবীগণ হয় ত ইহা ভাষার অলঙ্কার প্রয়োগ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু অজ্ঞ ও বিবেচনা-বুদ্ধি-হীন ব্যক্তিগণের মনে অনায়াসে এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইতে পারে। তাহারা ভাবিতে পারে যে, ইহার হয় ত ভীষণতর কোন অর্থ আছে।...এ পর্যন্ত যদি রক্তপাত না হইয়া থাকে—তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের সুবুদ্ধির জ্ঞই তাহা হয় নাই। মিঃ হকের বিবৃতির ফলে এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি হইতে পারে না—ইহা মনে করা ভুল।

“মিঃ ফজলুল হক ঠাহার প্রলাপোক্তির কারণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, ‘আমার বিশ্বাস বাঙ্গালার মুসলমান-দিগের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩০ জন এবং হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৬০ জনের কিছু অধিক হইবে।’

“...মুসলমানরা তাহাদিগের সংখ্যা অযথা বৃদ্ধি করিয়া-ছেন বলিয়া হিন্দুগণও অভিযোগ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু দায়িত্বসম্পন্ন কোন হিন্দুই সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই। কেহই এমন কথা বলেন নাই যে, ঠাহাদিগের উকীল, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, জমীদার ও ব্যবসায়ীরা সাধুতা বিসর্জন দিয়া প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় লইয়াছেন।

“...মিঃ ফজলুল হক মানহানি আইন হইতে সযত্নে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতেছেন। শ্রেণীবিধে প্রচার সম্পর্কেও তিনি ইহা ভাল করিরাই জানেন যে, ঠাহার নিজ সরকারের অনুমতি ব্যতীত ঠাহার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হইতে পারে না।—সুতরাং এই সভায় যে মনো ভাব ব্যক্ত হইবে, তাহার প্রতি কতটুকু দৃষ্টিদান করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

“হয় ত তিনি আপনাদিগের বক্তব্যে কর্ণপাত করিবেন না, কিম্বা হয় ত যে সরল অর্থে কথাগুলি প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, নহে ত গুরুতর আকারে সেগুলি পুনরাবৃত্তি করিবেন।

“...মিঃ ফজলুল হকের আচরণের নিন্দা ব্যতীত আমরা আর কি করিতে পারি ? অবশ্য এই কথা ভাবিয়া আমরা দুঃখিত হইতে পারি যে, গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া মিঃ হকের চাপরাসীদিগের মধ্যেও এমন এক জন লোক নাই যে, তাঁহাকে ফলপ্রদ উপদেশ দান করিতে পারে। একান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন অনাবশ্যক ভাবে বিরক্তি উৎপাদনকারী এক ব্যক্তি যে দায়িত্ব-সম্পন্ন সরকারের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাও আমাদের দুঃখের আর একটি কারণ।”

“...তিনি গভর্ণরের অনুগ্রহে সচিবত্ব করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার কার্যভার হইতে নিষ্কৃতি দান করাই উচিত হইবে এবং তাহাতে বাঙ্গালা প্রদেশের শান্তির অন্তরায়ও দূর হইবে।”

এই সভার পর বাঙ্গালার গভর্ণর ব্যবস্থাপক পরিষদ ও সভার নেতৃবর্গকে একটি বৈঠকে আহ্বান করিয়াছেন।

ভূমিকুমার দত্ত

পরলোকে

ভূমিকুমার দত্ত (বি, দত্ত) সুপ্রতিষ্ঠিত কে, পি, রেশোরার স্থাপয়িতা, এতদ্বিত্ত তিনি বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাপন ফটোগ্রাফারগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। গত ১লা মার্চ শনিবার রাত্ৰিকালে তিনি ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার ডায়মণ্ডহারবার রোডস্থ ভবনে প্রাণত্যাগ করায় আমরা মর্শ্বাস্তিক দুঃখ অনুভব করিয়াছি। তিনি উদার-প্রকৃতি, স্বাবলম্বী এবং সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বিধবা পত্নী, ছয় পুত্র, দুই কন্যা ও বহু পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।



ভূমিকুমার দত্ত



রাজা জানকীনাথ রায়

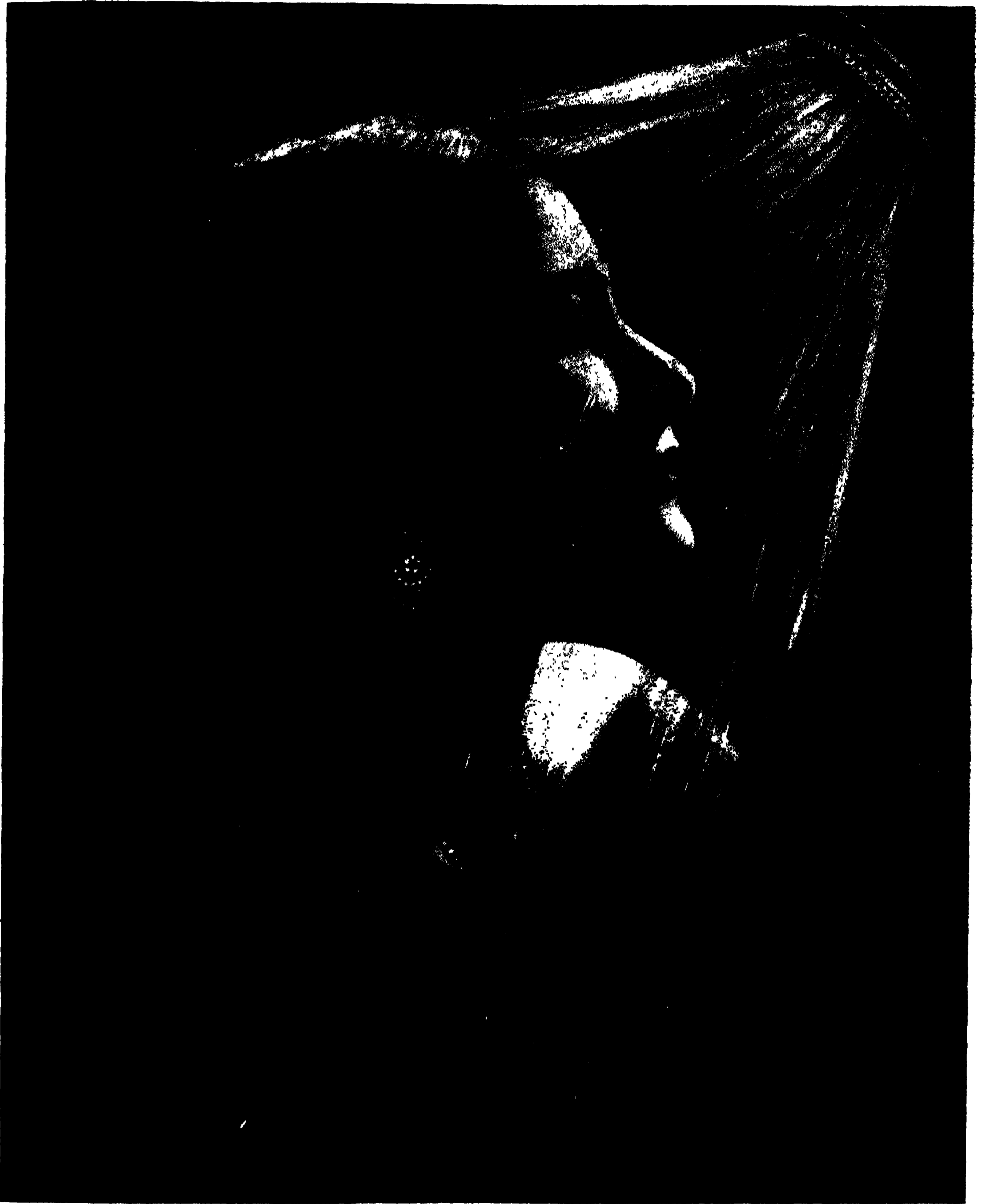
২৫:১ জ্ঞানকোষার্থ হার

ঢাকা-ভাগ্যকুলের সুপ্রসিদ্ধ রায় পরিবার বাঙ্গালার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বহু দিন হইতেই শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ের তাঁহারা বিপুল সম্পদের অধিকারী। রাজা শ্রীনাথ রায়, রাজা জানকীনাথ ও রায় বাহাদুর সীতানাথ রায় তিন ভ্রাতা দীর্ঘকাল হইতেই তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন। রাজা শ্রীনাথ ও রায় বাহাদুর সীতানাথ পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; সংপ্রতি ইহাদের মধ্যম সহোদর রাজা জানকীনাথ ৯৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। রাজা জানকীনাথ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে ব্যবসায়-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই সুদীর্ঘকাল সাফল্যের সহিত তাঁহাদের বিস্তীর্ণ ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি

সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ‘ইষ্টবেঙ্গল রিভার ষ্টীম সার্ভিস লিমিটেড’ বাঙ্গালীর অনুষ্ঠিত জাহাজের ব্যবসায়ের অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইহারা ‘প্রেমচাঁদ জুটমিল’ নামক পাটের কল প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সংপ্রতি ‘ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক’ নামক একটি ব্যাঙ্কও খুলিয়াছেন। বাঙ্গালার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অগ্রণী রাজা জানকীনাথের অভাব দীর্ঘকালেও পূর্ণ হইবে না। তাঁহার দুই যোগ্য পুত্র পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার একমাত্র যোগ্য পুত্র বর্তমান। আমরা তাঁহার পরিবার-বর্গকে এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ‘বসুমতী’ রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বাণী-ধারায়



১৯শ বর্ষ]

চৈত্র, ১৩৪৭

[৬ষ্ঠ সংখ্যা]

পূর্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর

পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে—কুমারিল-মতে জগৎ-সৃষ্টি ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যে করিত হয় নাই, এমন কি উহা তাঁহার ক্রীড়ার্থও নহে। অপক্ষ-পাতী বিচারক যেরূপ কেবল আইন অনুসারে ঞায়সঙ্গত

বিচার করিতে বাধ্য, ঈশ্বরও সেইরূপ পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কেবল জীবগণের কৃত কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া।

কিন্তু অধ্যাপক কীথ ও মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা উভয়েই বলিয়াছেন, ঈশ্বরের পক্ষে এবংবিধ অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভবপর নহে। অধ্যাপক কীথের উক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ঝা মহোদয়ের উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

‘নৈসর্গিকগণ সাধারণতঃ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন—আমাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের এক জন অধিষ্ঠাতা থাকার বিশেষ প্রয়োজন; আর সেই অধিষ্ঠাতা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান—ইহাও অবশ্য স্বীকার্য। এই যুক্তির কোন বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। নিয়ে ইহার অমূল্য যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্যভূত শরীরই ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় স্থল; অতএব শরীর যাহার, ধর্ম্মাধর্ম্মও সেই চেতন শরীরী। এই কারণে

কোন এক চেতনের পক্ষে (তা তিনি যতই বুদ্ধিমান হউন না কেন) অত্র কোন চেতন শরীরী-কৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে। অতএব, লোকাভীত (সৃষ্ট জগৎ হইতে ব্যতিরিক্ত) ঈশ্বরের পক্ষে মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদিরূপে উৎপত্তমান জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান থাকা অসম্ভব; আর এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে জীবের উপর ঈশ্বরের বুদ্ধিপূর্বক অধিষ্ঠাতৃত্ব বা নিয়ামকত্বও সম্ভব হইতে পারে না। ঈশ্বর তাঁহার ইঞ্জিয়গুলির সাহায্যে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না; কারণ, ধর্ম্মের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম—উহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ। আবার ঈশ্বরের পক্ষে ধর্ম্মের কেবল মানস-প্রত্যক্ষও অসম্ভব; কারণ, ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, কেবল মনের দ্বারা মনের আধারভূত দেহের বহির্ভাগে অবস্থিত পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। জীবগণ বিশ্বমধ্যে উৎপত্তিলাভ করিতেছে বলিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম সৃষ্ট জগতেই সমাপ্ত। আর ঈশ্বর লোকাভীত বলিয়া তাঁহার দেহও লোকবহির্ভূত—আর সেই হেতু

ঐহার দেহ-পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণও লোকবাহ। অতএব পূর্নকথিত সিদ্ধান্তানুসারে লোকবাহ ঈশ্বরান্তঃকরণ লোকান্তর্গত জীব-ধর্মাধর্মের প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া ধর্মাধর্মের উপর ঈশ্বরের যে অধিষ্ঠাত্ব (নৈমায়িকগণ-কর্তৃক) স্বীকৃত হইয়াছে, সেই অধিষ্ঠাত্বের স্বরূপও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। এ অধিষ্ঠাত্ব 'সংযোগ'-রূপ হইতে পারে না। কারণ, সংযোগ-সম্বন্ধ কেবল দ্রব্য-পদার্থ-সমূহের মধ্যেই থাকা সম্ভব; কিন্তু ধর্মাধর্ম গুণ-স্বরূপ হওয়ায় ঐহাদিগের সহিত সংযোগ-সম্বন্ধের কথাই উঠে না। পক্ষান্তরে, এই অধিষ্ঠাত্ব 'সমবায়'-স্বরূপ হওয়াও অসম্ভব। কারণ, জীব-গণের ধর্মাধর্ম জীব-সমবেত—ঈশ্বরে সমবেত নহে। (১)

(১) "Nor is there any force in the Logician's arguments that our Dharma-Adharma must have for a supervisor a being possessed of intelligence higher than our own. Because the Dharma-Adharma of the body that is the product of these must always belong to the same intelligent being to whom the body belongs; any being, howsoever intelligent, can never have any knowledge of the Dharma-Adharma of any other being; hence the ultra-mundane 'God' can have no knowledge of the Dharma or Adharma of the beings born as men, animals, etc., and without such knowledge he could not exercise any intelligent control over them; 'God' could not perceive Dharma by his senses, as Dharma is absolutely imperceptible; nor could he perceive it by his mind alone, as the mind by itself cannot perceive things outside the body, and the Dharma of all beings born in the world would always be outside the body occupied by the mind of the perceiving person, 'God.'"

Then, again, it becomes necessary to examine the character of the 'supervision' that 'God' is said to exercise over Dharma and Adharma. (a) This supervision cannot be of the nature of contact or conjunction, because Dharma and Adharma being qualities are not capable of conjunction, which is possible for substances only. (b) Nor could it be in the form of Samavāya or inherence, as the Dharma-Adharma inhering in other souls could not inhere in the God."—Indian Thought, Vol II, pp. 259-60.

'পূর্ন প্রবন্ধে (ফাল্গুন ১৩৪৭) বলা হইয়াছে যে—নৈমায়িক-মতে কেবল দ্রব্যসমূহের মধ্যেই 'সংযোগ' সম্বন্ধ থাকিতে পারে;

কিন্তু আমাদিগের মনে হয় না যে, অধ্যাপক কীথ বা মহামহোপাধ্যায় বা মহোদয় যে ভাবে মীমাংসক-মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহাই যথার্থ মীমাংসা সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরের অধিষ্ঠাত্ব বলিতে বুঝায় জীব-কৃত ধর্মাধর্ম-স্থানের পর্যবেক্ষণ। এ স্থলে 'ধর্ম' ও 'অধর্ম' শব্দদ্বয় মীমাংসক-মতে 'অপূর্ন' (২) বুঝাইতেছে না; এক্ষেত্রে 'ধর্ম' ও 'অধর্ম' শব্দের অর্থ—লোক-বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের ও নিষিদ্ধ পাপকর্মের অনুষ্ঠান। এইরূপ ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পুরুষবিশেষের দ্বারা সাধিত হইলেও অত্র পুরুষের প্রত্যক্ষ গোচর হইতে পারে,—অর্থাৎ ধর্মাধর্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ হইলেও ধর্ম ও অধর্ম কার্যের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষযোগ্য। অতএব, একথা বলা অসুচিত যে, ধর্মাধর্ম ঈশ্বরের প্রত্যক্ষযোগ্য নহে।

যদি ধর্ম ও অধর্ম বলিতে 'অপূর্ন' না বুঝায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠাত্বের স্বরূপ আরও একটু বিশ্লেষিত করিয়া দেখা প্রয়োজন। ঈশ্বর জীব-কৃত ধর্ম ও অধর্ম কার্যের প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। একবার ধর্মাধর্মের প্রত্যক্ষ হইলে ঐহার সংস্কার ঐহার চিন্তে চিরদিন বর্তমান থাকে। যথাকালে তিনি সেই সংস্কার-জনিত স্মৃতির সাহায্যে প্রত্যেক জীবের ধর্মাধর্ম বিচার করিয়া যথা-যোগ্য ফলদানরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। (৩) গাগাভট্ট (বিশ্বেশ্বর স্মৃতি) ঐহার 'ভাট্টচিন্তামণি'তে এই বিষয়ের বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে নৈমায়িক মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—'সমগ্র বস্তুজাত তিন শ্রেণীতে

কিন্তু অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতির মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ থাকে না—থাকে 'সমবায়' সম্বন্ধ।

(২) কর্ম অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ সকল সময়ে কর্মানুষ্ঠানের অব্যবহিত পরক্ষণেই ফল উৎপন্ন হয় না। এ কারণে মীমাংসকগণ কর্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে 'অপূর্ন' স্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে কর্মের পর-বর্তী স্মৃতিবস্থা, অথবা ফলের পূর্নাবস্থা বলা হইয়াছে। "ন চানুৎপাত্ত কিমপ্যপূর্নং কর্ম বিনশ্যং কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্যোত্যতঃ কর্মণো বা স্মৃতি কাচিৎপূর্নাবস্থা ফলশ্চ বা পূর্নাবস্থাপূর্নং নামাস্তীতি তর্ক্যতে"—ত্রক্ষসূত্র শঙ্করভাষ্য ৩।২।৪০। এই 'অপূর্ন' অতীন্দ্রিয়—প্রত্যক্ষের অযোগ্য; কিন্তু অনুষ্ঠের কর্ম তদ্রূপ নহে।

(৩) মীমাংসক-সিদ্ধান্তে এক সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি বা প্রলয় স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু খণ্ড খণ্ড রূপে প্রতিক্রমেই সৃষ্টি-প্রলয় চলিতেছে—ইহাই মীমাংসা-মত। পূর্নকৃত কর্মানুসারে জীবগণ য বিচিত্র ফললোগ করে, ইহাই মীমাংসক-সম্মত সৃষ্টির রূপ।

বিভক্ত—(১) যাহাদিগের কর্তা কোন চেতন—এ সম্বন্ধে কোন মতবৈধ নাহি, যেমন ঘট প্রভৃতি; (২) যাহাদিগের চেতন কর্তা দৃষ্টগোচর হয় না, যেমন আকাশ প্রভৃতি (৪); ও (৩) যাহাদিগের কর্তা চেতন কি না—সে বিষয়ে মতভেদ আছে, যথা বৃক্ষাদি। এই তৃতীয় শ্রেণীর বস্তু সাবয়ব, অতএব অবয়ব-সংযোগে উৎপাদ্য—কার্য দ্রব্য। কার্য দ্রব্যমাত্রেরই কর্তা ও হেতু (কারণ) থাকা একান্ত প্রয়োজন। [দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যায় যে, ঘট সাবয়ব কার্য দ্রব্য, এ হেতু উহার একটি স্বতন্ত্র কর্তা ও বিভিন্ন প্রকার কারণ আছে। স্বতন্ত্র কুস্তকার উহার কর্তা, মৃত্তিকা উহার উপাদান কারণ, কুস্তকারের ইচ্ছা উহার নিমিত্ত কারণ (৫), কপাল-কপালিকা (ঘটের অবয়ববিশেষ) উহার সমবায়ি-কারণ ও কপাল-কপালিকার সংযোগ উহার অসমবায়ি-কারণ।] এই দৃষ্টান্ত-বলে অনুমান করা সম্ভব যে, পূর্বোক্ত তৃতীয়-শ্রেণীর বস্তুজাতের কর্তা ঈশ্বর। উহাদিগের সমবায়ি-কারণ পরমাণুপুঞ্জ, তাহাদিগের সংযোগ অসমবায়ি-কারণ, স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব ঈশ্বরের ইচ্ছা, ক্ষেত্রজপদবাচ্য জীবাণু ও ধর্মাধর্ম (৬) নিমিত্ত কারণ। সৃষ্টিকালে ঈশ্বরেচ্ছা ও অদৃষ্টকে নিমিত্তরূপে লাভ করিয়া পরমাণুতে প্রথম কর্ম উৎপন্ন হয়। তাহার পর পরমাণুঘরের সংযোগে দ্ব্যণুক, দ্ব্যনুক-সমূহের সংযোগে ত্র্যণুক—ইত্যাদিক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারিটি সাবয়ব ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। [একটি পরমাণুর সহিত অল্প একটি পরমাণুর অবশ্য দেশাবচ্ছেদে বা দিগবচ্ছেদে সংযোগ হয়—উহা বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক।] নিমিত্তস্বরূপ অদৃষ্টের বৈচিত্র্যবশে ও ঈশ্বরেচ্ছা-জনিত ক্রিয়ার বৈচিত্র্য-হেতু সৃষ্টির বৈচিত্র্যও সম্ভব হইয়া থাকে।

গাগাতট পূর্বোক্তরূপে শ্রায়মতামুসারিণী সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—‘এই প্রকার মত যুক্তিসম্মত ও মীমাংসকগণ ইহার সমর্থন করেন। তবে

(৪) নৈয়ায়িক মতে আকাশ নিরবয়ব—উহার পরমাণু নাই। এই মতই সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। মতান্তরে, আকাশেরও পরমাণু কল্পিত হইয়া থাকে; কিন্তু সে মত তত প্রচলিত নহে।

(৫) বেদান্তাদি সম্প্রদায়ে কর্তাই নিমিত্ত-কারণরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। কুস্তকার ঘটের নিমিত্ত ও মৃত্তিকা উপাদান। এ মতে নিমিত্ত অচেতন হইতেই পারে না।

(৬) ধর্মাধর্মই ‘অদৃষ্ট’ নামে কথিত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে একটু আধটু পার্থক্য আছে। যেমন—ইচ্ছা যে কার্যের জনক হইতে পারে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। ইচ্ছা আত্মাতে প্রযত্ন (বা কৃতি) উৎপন্ন করে মাত্র—এতদ্ব্যতীত ইচ্ছা অল্প কার্য উৎপাদন করে না। ইচ্ছা ও অচেতন পদার্থ। অতএব উহা স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না। কারণ, অচেতনের স্বতঃ ক্রিয়াহেতু অল্পভবসিদ্ধ নহে। এইরূপ মত স্বীকার করিলে অত্যন্ত কল্পনাগোরব হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অচেতনকে ক্রিয়াজনক যদি স্বীকার করিতেই হয়, তবে ঈশ্বরেচ্ছার পরিবর্তে অদৃষ্টকেই নিমিত্ত বলা উচিত। কারণ, অদৃষ্টকে হেতু স্বীকার করা ছাড়া যখন নৈয়ায়িকগণও গতাস্তর খুঁজিয়া পান না, তখন ঈশ্বরেচ্ছা ও অদৃষ্ট—উভয়কে নিমিত্ত স্বীকার না করিয়া কেবল অদৃষ্টকে নিমিত্ত স্বীকার করিলেই উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধিত হইয়া থাকে। অতএব, ধর্মাধর্মই ক্রিয়াজনক—ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি নহে।’ অবশ্য এ প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন—‘স ঐক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েয়’ (তিনি ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন—‘বহু হইব’) (৭) ইত্যাদি প্রতিবাক্য ঈশ্বরেচ্ছার অস্তিত্ব ও তাহার কার্যজনকত্বের প্রতি প্রমাণ। ইহার উত্তরে বলা চলে যে, পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক যেমন ‘আত্মনঃ আকাশঃ সমুতঃ’ (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।১—‘আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল’) ইত্যাদি প্রতিবাক্যে আকাশের উৎপত্তি-কথা শ্রুত থাকিলেও উহাদিগের যথাস্থত অর্থ স্বীকার না করিয়া ‘লক্ষণা’ স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ মীমাংসকমতেও ‘ঈক্ষণ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘ইচ্ছা’ বা ‘সঙ্কল্প’ স্বীকৃত না হইয়া উহার লাক্ষণিক অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে। আর ঈক্ষণের সে লাক্ষণিক অর্থ ‘অদৃষ্ট’।

বলা বাহুল্য, এ স্থলে গাগাতট দেখাইয়াছেন যে, মীমাংসকমতে ঈশ্বরেচ্ছা সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি ত অস্বীকার করেন নাই। কারণ, তিনি নিজ মুখেই স্বীকার

(৭) ‘স ঐক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েয়’—ঠিক এইরূপ প্রতিবাক্য পাওয়া যায় না। ছান্দোগ্যে (৬।২।৩) পাওয়া যায়—‘তদৈক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েয়।’ তৈত্তিরীয়ে (২।৬) পাওয়া যায়—‘সেই-কাময়ত বহু শ্রাং প্রজায়েয়’ ইত্যাদি।

করিয়াছেন যে, অচেতনের ক্রিয়াজনকত্ব কদাপি অল্প-
ভবসিদ্ধ নহে। অতএব, ধর্মাধর্ম সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ
বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বরোধিত ধর্মাধর্মই সৃষ্টি-
নিমিত্ত—কেবল ধর্মাধর্ম নহে বা স্বতন্ত্র ঈশ্বরেচ্ছাও নহে।
এ কারণে শ্রুতিতে বর্ণিত ঈশ্বরের 'ঈক্ষণ' বা 'কামনা'
প্রভৃতি শব্দ ঈশ্বরেচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বুঝায় না, পরন্তু
ঐ সকল শব্দ ধর্মাধর্মসূত্রে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বেরই
ইঙ্গিত করিয়া থাকে।

যদি এ কথা বলা যায়—মীমাংসকগণ যখন ধর্মাধর্মকেই
সৃষ্টির নিমিত্ত বলিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের মতে যে
অধিকন্তু ঈশ্বরও স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার অমুকুল স্পষ্ট
কোনও প্রমাণ আছে কি? উত্তরে বলা চলে, গাগা-
ভট্টের উক্তিই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেন
—উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহে 'ঈক্ষণ' বা তৎসজাতীয় শব্দবচন
পদগুলির 'অদৃষ্ট'-রূপ লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করিতে হইবে।
কিন্তু তিনি কুত্রাপি বলেন নাই যে, ঈশ্বরবচক 'তৎ'
বা 'স' (তিনি) পদগুলিতেও লক্ষণা প্রযোজ্য। অতএব
দাঁড়াইতেছে এই যে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসক-সম্প্রদায়ের
অস্বীকার্য্য নহে; তবে একটা কথা—নৈয়ায়িক-মতে
যেমন ঈশ্বরের স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই সৃষ্টিনিমিত্ত, তাহা
মীমাংসকগণ মানিতেছেন না। ঈশ্বর স্বেচ্ছাবশে ও
অদৃষ্টসহায়ে জগৎ সৃষ্টি করেন—নৈয়ায়িকগণের এই
সিদ্ধান্তের খণ্ডনোদ্দেশ্যে মীমাংসকগণ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত
স্থাপন করিয়াছেন যে, ঈশ্বরেচ্ছা সৃষ্টির নিমিত্ত নহে;
কেবল ধর্মাধর্মসূত্রেই ঈশ্বর ফলদান করিয়া থাকেন,
এ কারণে ধর্মাধর্মই সৃষ্টির নিমিত্ত। গাগাভট্টের এই
অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে শ্লোকবাক্তিকের
(৮) উক্তিও স্পষ্ট বোধগম্য হইবে—

“ঈশ্বরেচ্ছা যদিহ্যেত সৈব স্যাম্লোককারণম্।

ঈশ্বরেচ্ছাবশিষ্টে হি নিষ্ফলা কর্মকল্পনা ॥ ৭৩ ॥

ন চানিমিত্তয়া যুক্তমুৎপত্তুং হীশ্বরেচ্ছয়া।

যদ্বা তস্মা নিমিত্তং যত্তদুতানাং ভবিষ্যতি” ॥ ৭৪ ॥

—সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার

ঈশ্বরের সত্তা যে মীমাংসক-সম্প্রদায়ের অস্বীকার্য্য নহে

—তাহা গাগাভট্টের অত্র উক্তি হইতেও বেশ বুঝা যায়।

(৮) মাসিক বসুমতী—ফাল্গুন, ১৩৪৭, মদীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রলয় সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে,
“সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ” (বিধাতা সূর্য্য
ও চন্দ্রকে যথাপূর্ব্ব কল্পনা অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন)
ইত্যাদি শ্রোত মন্ত্র হইতে অবাস্তর প্রলয় সিদ্ধ হইলেও
মহাপ্রলয়ের সিদ্ধি হয় না। বরং নৈয়ায়িকগণ যে অল্প-
মানবলে মহাপ্রলয়ের অস্তিত্ব সাধন করিতে চাহিয়াছেন,
উক্ত মন্ত্রাংশটি তাহার বাধক। এই সকল উক্তি হইতে
স্পষ্টই অমুমিত হয় যে, মীমাংসা-সিদ্ধান্তে ধাতা অর্থাৎ
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাকৃত হয় নাই, বরং ধাতা যে বিশ্বস্রষ্টা
ইহাই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তবে সে সৃষ্টির নিমিত্ত স্রষ্টার
স্বতন্ত্র ইচ্ছা নহে, অদৃষ্ট মাত্র—ইহাই বিশেষ। (৯)

এই প্রসঙ্গে আর একবার পুনরুক্তি করা হয়ত
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অধ্যাপক কীথ ও মহামহো-
পাধ্যায় বা মহোদয় যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া-
ছেন, সেই যুক্তিগুলি তটপাদ ত্রায়-বৈশেষিক-সিদ্ধান্ত-সম্মত
ঈশ্বরেচ্ছার নিমিত্তবাদ-খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ

(৯) “ত্রিবিধং বস্তুজাতং সম্প্রতিপন্নচেতনকর্তৃকং যথা ঘটাদি,
সম্প্রতিপন্নচেতনাকর্তৃকং ব্যোমাদি, বিপ্রতিপন্নচেতনকর্তৃকং মর্গীকুহা-
কুরাদি। তত্র তৃতীয়ং সাবয়বভেদে সিদ্ধকার্য্যত্বকং পক্ষীকৃত্য
বুদ্ধিমৎকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ পটবিদিত্তি ঈশ্বরং কর্তারমমুমাপয়তি।
তস্ম চ পরমাণবঃ সমবায়িকারণম্। তৎসংযোগশ্চাসমবায়িকারণম্।
ক্ষেত্রজপদবাচ্যা জীবাওয়ানো ধর্মাধর্মো চ নিমিত্তকাবণম্। সর্গকালে
পুনরীশ্বরেচ্ছামদৃষ্টং চ নিমিত্তমাসাত্ত পরমাণুযু কস্মাণ্যুৎপত্তস্তে।...
নিমিত্তভূতাদৃষ্টবৈচিত্র্যাদীশ্বরেচ্ছাজ্ঞাক্রিয়াবৈচিত্র্যবশাচ্চ জয়াযুজাণ্ড-
জোস্তিচ্ছবেদজভেদং শরীরমারভস্ত ইত্যুচ্যুতঃ (নৈয়ায়িকবৈশেষিকৌ
ইতি পূর্ব্বপরামর্শঃ)।

ইদমেব যুক্তমস্মদ্ব্যতঞ্চ। পরং হেতবান্ বিশেষঃ। ইচ্ছায়াঃ
কার্য্যমাত্রজনকত্বে ন কিঞ্চিৎমানমস্তি। ন চাস্মনিষ্ঠপ্রযত্নোৎপাদনং
বিনেচ্ছায়াঃ কার্য্যজনকত্বম্। অচেতননিষ্ঠক্রিয়াদিজনকত্বঞ্চ নাসুভূত-
পূর্ব্বম্।.....অতস্তাদৃশহেতুহেতুমস্তাবকল্পনেনাত্যন্তগৌরবাপত্তিঃ।
আবশ্যকাদৃষ্টহেতুকতস্মাত্তথাসিদ্ধিশ্চ। অতো ধর্মাধর্ময়োরেব
বিজাতীয়ক্রিয়াজনকত্বং, নেশ্বরেচ্ছাপ্রযত্নাদীনামিতি। তেনেশ্বরেচ্ছা-
য়াস্তত্তাঃ কার্য্যজনকত্বে চ 'স ঐক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েরে'তি শ্রুতিরেব
মানম্। তত্র 'চাস্মান আকাশঃ সত্ত্বতঃ' ইত্যাদাবিবেক্তিরদৃষ্টে
লাক্ষণিক ইত্যলং পল্লবিতেন।

নহু প্রলয়ে কিং মানমিতি চেৎ, ন।.....

অত্র জৈমিনীয়াঃ। উক্তানুমানেন 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়তি'-
ত্যাতিমন্ত্রলিঙ্গেনাবাস্তরপ্রলয়সিদ্ধাবপি মহাপ্রলয়ে নাস্তি প্রমাণম্।...
আচার্য্যানুমানন্ত 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়তি' শ্রুতিবিরোধঃ.....
অনাচার্য্যানুমানমেব।—ভাটচিন্তামণি, চৌখাষা সংস্করণ,
পৃঃ ৪৫-৪৮।

করিয়াছেন, কিন্তু অষ্টার অস্তিত্ব-প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে তাঁহার যুক্তিপরিষ্কার প্রযুক্ত হয় নাই।

এই কথাটি মনে রাখিয়া রাখিলে সৃষ্টি-প্রলয়-সমস্তার সমাধান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। মীমাংসকমতে আদি সৃষ্টি বা মহাপ্রলয় স্বীকৃত হয় না; কিন্তু তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহ অবিরত ধারাকারে চলিতেছে। এ সম্বন্ধে কুমারিলের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারে অতি স্পষ্টভাষায় উক্ত হইয়াছে—

“তস্মাদস্তবদেবাত্র সর্গপ্রলয়কল্পনা।

সমস্তক্ষয়জন্মাভ্যাং ন সিধ্যত্যপ্রমাণিকা ॥” (শ্লো-বা

সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার ১১১৩ শ্লোক)

অর্থাৎ এই মতে সর্গ ও প্রলয়ের কল্পনা অস্বকার্য মত (আজও যেরূপ খণ্ডভাবে সৃষ্টি ও প্রলয় চলিতেছে, সেই ভাবে বরাবরই সৃষ্টি ও প্রলয় সজ্যটিত হইয়া থাকে।) সমগ্র জগৎ যে এককালে সৃষ্ট হয় বা সমগ্র জগতের যে এককালে ধ্বংস সম্ভব—এ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ; কারণ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। তবে ভট্টপাদ ঈশ্বর-কর্তৃক সমগ্র বিশ্বের এককালীন সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার করিতেও সম্মত আছেন, যদি বেদকে অনাদি, অকৃত, অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। বেদকে ঈশ্বর-রচিত বলিয়া

ধরিতে বিশেষ আপত্তির কারণ এই যে, তাহা হইলে বেদে ঈশ্বরসম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল বিবরণে আর আস্থা স্থাপন করা চলে না (১০)। অতএব, তখন বেদোক্ত ঈশ্বর-বিবরণের সত্যত্ব-নির্ণয়ের জন্য অনুমান প্রমাণের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমরাদিগের অভিজ্ঞতালব্ধ কোন দৃষ্টান্ত নাই, সে স্থলে অনুমানের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এই কারণে কেবল অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। এই সকল কারণে কুমারিল বলিয়াছেন—বেদকে নিত্য স্বতন্ত্র অকৃত অপৌরুষেয় স্বীকার করিলে আর এই সকল দোষ ঘটিতে পারে না। যে হেতু, তখন ঈশ্বরবিষয়ে বেদের উক্তি নিঃসন্দেহ প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে। তখন শ্রুতির প্রামাণ্য-নির্ণয়ের জন্য আর অনুমানাদি প্রমাণাস্তরের সাহায্য লইতে হয় না।

এ সম্বন্ধে বারাস্তরে আরও আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

(১০) ঈশ্বর-রচিত বেদ যদি ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তবে তুল্য যুক্তিবলে সর্বজ্ঞ-বুদ্ধাদি-রচিত আগম কেন সর্বজ্ঞের সিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না?—এ আপত্তি উঠা খুবই স্বাভাবিক।

টিলার দেশের লীলাবতী

টিলার দেশের লীলাবতীর দীঘল কালো কেশ—
 তাঁদের মতন মুখে কেবল নেইক হাসির লেশ!
 আলতা-হৃথের সঙ্গে সুধার তরঙ্গিনী ছোটে
 সেই অপরূপ রূপের স্রোতে পদ্মকলি ফোটে!
 উছলে পড়ে তরুর তটে কোন্ অতরুর দিঠি
 চপল আঁখির আঁখর লেখে মিষ্টি ভাষার চিঠি!
 ভঙ্গিটি এর রঙ্গময়ী, কুরঙ্গী এর পায়ে—
 অশোক ফোটে এমনি মেয়ের চটুল চরণ ঘায়ে!
 এমনি মেয়ে স্বর্গলোকে হয় পারিজাত ফুল!
 টিলার দেশের লীলাবতী—দীঘল কালো চুল!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।



পুনর্মিলন

১

বড় রাস্তাটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে একটি প্রশস্ত গলি বাহির হইয়াছে। এই গলির মাথায় সাম্না-সাম্নি ছ'খানা বাড়ী। বাঁ-দিকেরটি দ্বিতল; ডান-দিকেরটি খামওয়ালা, গেটযুক্ত বড় তিন-তলা বাড়ী। বাড়ীর মালিকটি জমিদার। দেশে বড়-বেশী ম্যালেরিয়া বলিয়াই হোক অথবা নাগরিক জীবন স্পৃহণীয় বলিয়াই হোক, জমিদারটি সপরিবার কলিকাতাতেই বাস করেন। আর দো-তলা বাড়ীখানির মালিক সরকারের কোন আফিসে ভাল চাকুরী করেন, এ জন্ত দূরস্থ পল্লীগ্রামের পৈতৃক ভিটার সহিত তাঁহারও কোন সম্বন্ধ নাই।

শুনা যায়, অনেক দিন পূর্বে এই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল; কিন্তু হঠাৎ এক দিন কি একটা উপলক্ষে বিবোধ ঘটায় উভয় পরিবারে পরস্পরের মুখ-দেখাদেখি পর্যাপ্ত বন্ধ হইয়া যায়। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিবার পর হঠাৎ এক দিন অত্যন্ত অভাবনীয় ভাবে এক সামান্য ঘটনায় উভয় পরিবারের সখ্যতা পুনঃস্থাপিত হইবার উপক্রম হইল। সেই ঘটনাটিই বর্তমান আখ্যায়িকার আলোচ্য বিষয়। সে দিন জমিদার সুপ্রসন্ন বাবুর পুত্র জীমান সুব্রত কলেজ হইতে অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে গৃহে ফিরিতেছিল। সেই দিন সকালে কয়েকটি সতীর্থের সহিত তাহার তুমুল তর্ক হইয়াছিল; বাড়ী ফিরিবার সময়েও তর্কের বিষয় মাঝে-মাঝে তাহার মনে উদয় হইয়া তাহার মনকে উত্যক্ত করিতেছিল। কিছু দূর আসিয়া সে বড় রাস্তাটা অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল; রাস্তা পার হইয়া সে ফুটপাথের প্রায় নিকটে গিয়াছে, এমন সময় কয়েক ব্যক্তির 'গেল গেল' চীৎকাবে সে সচকিত হইয়া বাপারটা কি জানিবার জন্ত পিছনে চাহিতেই একটি তরুণী—তাহারও হস্তে পুস্তক ছিল—ক্রতপদে তাহার সম্মুখ হইয়াই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া মুহূর্তে তাহাকে ফুটপাথের উপর আনিয়া ফেলিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একখান সুবৃহৎ দো-তলা বাস তাহার পাশ ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। ব্যাপারটা মুহূর্তমধ্যেই ঘটিয়া গেল। তরুণী ঈষৎ ভৎসনার স্বরে বলিল, “এ রকম অশ্রমশ্রম হ'য়ে কি লোকে পথে চলে?”

সুব্রত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু মুহূর্তেই সমগ্র ঘটনাটি তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল; সে ক্রতজ্ঞতাপূর্ণ চক্ষুহুঁটি তরুণীর মুখের স্থাপিত করিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, “আপনি আমার আজ যে ভাবে বাঁচালেন, তা আমি জীবনে কখনো ভুলবো না। আমি যে কি বলে আপনার নিকট ক্রতজ্ঞতা প্রকাশ করবো, তা ভেবে পাচ্ছি নে; আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!”

তরুণী মুহূ হাসিয়া বলিল, “না, না, আপনি ও-কথা বলবেন না। আমি এমন আর কি ক'রেছি? এ'তো প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্য-কর্তব্য; ধরুন, আমিই যদি ঐ অবস্থায় পড়তুম, আপনি কি আমার রক্ষা করতেন না?”

“হয় তো করতুম; কিন্তু তা যখন এখনো ঘটেনি, তখন তা নিশ্চয় আর আলোচনা ক'রে ফল কি? তবে আপনি বা প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য-কর্তব্য বলে উল্লেখ ক'রলেন, সেইটেই যে অনেকে

করে না, অথবা ক'রতে পারে না। প্রত্যেক লোকই যদি তার কর্তব্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করে, আর সেই কর্তব্যজ্ঞান যদি ঠিক সময়ে তাদের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তা হ'লে চাইবার আর কিছু থাকে কি? জানেন কি, বীরবর নেলসন মৃত্যুকালে কেবল এই একটি কথাই বলেছিলেন—“England expects every man to do his duty?”

তরুণী উত্তর করিল, “নেলসন যে কর্তব্যের ইঙ্গিত ক'রেছিলেন, সেই মহান কর্তব্যের সঙ্গে আপনি কি এই তুচ্ছ কর্তব্যের তুলনা ক'রছেন?”

সুব্রত এবার ঈষৎ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, “দেখুন, আপনি এইমাত্র এক ভীষণ দুর্ঘটনায় আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছেন, আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করা উচিত নয়; কিন্তু তথাপি সত্যের খাতিরে বলতে হয়, আপনি ভুল বলছেন। কোন কর্তব্যই ছোট বা উপেক্ষার যোগ্য নয়। আমার মনে আছে, ছোট বেলায় আমি 'কোন কাষই ছোট নয়' বলে একটি গল্প প'ড়েছিলুম; তাতে জানতে পারি, বিভাগাগর মশায় একটি ফুল-বাবুকে রীতিমত শিক্ষা দিয়েছিলেন। যে কাষটির উপলক্ষে তিনি তাকে শিক্ষা দেন, সেটি খুব সামান্য কাষ; কিন্তু তবুও পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ কাষের সঙ্গে তা তুলনীয় বলেই মনে হয়।”

তরুণী এবার মুহূ হাসিয়া বলিল, “এখন আর তর্ক করবো না, কারণ, কে জানে, তর্কের নেশায় হয় তো আবার একটা Accident ঘটতেও পারে।”

সুব্রত মুহূ হাস্তে গায় দিয়া বলিল, “ঠিক বলেছেন; আজ সকালে আমার ক্লাশ-ক্রেণ্ডের সঙ্গে এইরূপই একটা বিষয় সম্বন্ধে তর্ক হ'য়ে গেছে; আর সেই কথাটার চিন্তায় অশ্রমশ্রম থাকায় আমার জীবন এই ভাবে বিপন্ন হ'য়েছিল।”

তরুণী হাসিয়া কহিল, “বুঝেছি, এই জন্তই বুঝি আপনি অত অশ্রমশ্রম হ'য়ে চলছিলেন? যাক, আশা করি, এবার থেকে সাবধান হবেন।”

সুব্রত তাহার সহিত হাস্তে যোগ দিয়া বলিল, “হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন; এবার থেকে চিন্তাচিন্তাগুলো পার্কেই শেষ ক'রে ফেলতে হবে।”

তরুণী দুই হাতে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, “আচ্ছা, তা' হ'লে আসুন, নমস্কার! আমার বাড়ী বেশী দূর নয়, মানে—ঐ গলির মোড়েই।”

সুব্রত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, “আপনার বাড়ী কোন্টা বললেন? মোড়ের ওই দোতলা বাড়ীটা? কিন্তু আমিও যে ওরই সামনের বাড়ীতে থাকি।”

তরুণী ততোধিক বিস্মিত হইয়া প্রশস্তবন্ধ যুবকের সুগঠিত, ব্যায়ামপুষ্ট দেহের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, “কি বললেন? আপনি কি তা হ'লে সুপ্রসন্ন বাবুর—?”

সুব্রত সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “হ্যাঁ, তাঁরই ছেলে।” যদি সেই মুহূর্তে হঠাৎ সেখানে বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও হয়

তো উভয়ে এত আশ্চর্য্য বোধ করিত না! কিছুকাল তাহাদের বাক্যস্কৃতি হইল না; উভয়ে মৌনভাবেই চলিতে লাগিল। খানিক পরে উভয়েই যখন গলির মোড়ে উপস্থিত হইল, তখন স্ত্রুত নিস্তরুতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, “আপনার নিকট আজ আমি যে ঋণে আবদ্ধ হইয়াছি, তা পরিশোধ করবার শক্তি আমার নেই। আমি ভাবছিলাম, ভবিষ্যতে ঋণ আপনার দেখা পাবো না, এবং এত বড় ঋণ উপকার করলেন, তা কোন দিন ব্যস্তও করিতে পারবো না। কিন্তু এখন আমার আশা হচ্ছে, যখন সাম্না-সাম্নি বাড়ীতে থাকি, তখন মাঝে-মাঝে হয় তো আমাদের দেখা হবে।” স্ত্রুত তাহার আনন্দ-স্বপ্নের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল।

তরুণী হাসিয়া বলিল, “মাঝে-মাঝে কেন বলছেন? এখন থেকে রোজই দেখা হবে। আচ্ছা, তা হলে আসি, নমস্কার!”

“নমস্কার” বলিয়া স্ত্রুত বাড়ীর ভিতর অদৃশ্য হইল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রুত মাতার নিকট উপস্থিত হইল। মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া সে বলিল, “জান মা, আজ আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি?”

মাতা ভয়-বিহ্বল নেত্রে তাহার মুখে দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কেন? কি হইয়াছিল বাবা!”

স্ত্রুত সকল বিবরণ তাহার নিকট প্রকাশ করিলে, মাতা তাহার যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “ভগবান রক্ষা করছেন। রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে? ঐ মেয়েটি কেবল উপলক্ষ মাত্র। যাক, একটি কথা এই সময় তোমায় বলে রাখি, স্ত্রুত! ও-মেয়েটির সঙ্গে তুমি আর মেশামেশি কোরো না। ওরা লোক ভাল নয়, আর কতটা গুলে রাগও করতে পাবেন।”

স্ত্রুত যারপরনাই বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, “কেন মা?”

পুত্রের প্রশ্নে মাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “অত আমি জানিনে বাপু। বারণ করলুম, শোনো ভাল, নইলে পরে বুঝবে।”—তিনি অল্প দিকে প্রস্থান করিলেন। স্ত্রুত বিস্মিত নেত্রে তাহার গমন-পথে চাহিয়া রহিল।

২

এখন এখানে তরুণীর পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। তরুণী উক্ত দো-তালা বাড়ীর অধিকারী সরকারী আফিসের পদস্থ কর্মচারী অমলেশ বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং বেথুন কলেজে ছাত্রী শ্রীমতী সুকৃতি দেবী।

উল্লিখিত ঘটনার কিছু দিন পরে স্ত্রুত কলেজ যাওয়ার জন্ত সবেমাত্র বাড়ীর বাহিরে আসিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, সেই সময় তাহার সহিত সুকৃতির সাক্ষাৎ। সে-ও কলেজে যাওয়ার জন্ত বাহির হইয়াছিল। উভয়ের চোখা-চোখি হইতেই স্ত্রুত নমস্কার করিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইল; হাসিয়া বলিল, “চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।” সুকৃতি প্রতি-নমস্কার করিয়া, কি ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; পরে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “বেশ, চলুন।” গলির মোড় পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া সুকৃতি একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার মেশা তো দূরের কথা—কথা কইবারও অধিকার নেই!”

স্ত্রুত মায়ের নিকট পূর্বেই এরূপ একটু আভাস পাইয়াছিল; এখন সুকৃতির মুখেও এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। সে বলিল, “না, তা তো জানিনে, কেন বলতে পারেন?”

সুকৃতি তাহার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া মুহূর্ত্তে বলিল, “কেন

বলতে পারবো না? কিন্তু জানলেও সব বলবো না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, আপনাদের সঙ্গে আমাদের ভয়ানক বিরোধ, এবং এই বিরোধের জন্তই আপনার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ পর্যাঙ্ক নিষিদ্ধ।”

স্ত্রুত ব্যথিত হইয়া বলিল, “আপনার নিষেধ থাকতে পারে, কিন্তু আমার তো নেই।”

সুকৃতি এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল; বলিল, “কেন, আপনাকে কি কেউ ঐ-ভাবে নিষেধ করেননি?”

স্ত্রুত উত্তর করিল, “নিষেধ করেননি বললে অবশ্য মিথ্যা বলা হবে। তবে আমার তাঁরা নিষেধের কারণ কিছু জানাননি।”

সুকৃতি বলিল, “গুরুজন যখন নিষেধ করেছেন, তখন আপনার তা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।”

স্ত্রুত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “আর আপনার?”

“আমার কথা ছেড়ে দিন, বাবা ছাড়া আর সকলেই আমাকে অবাধ্য বলে জানেন।”

স্ত্রুত মুহূর্ত্ত হাসিয়া বলিল, “আমারও কি সে বিষয়ে খুব সুনাম আছে মনে করেন?” পরে মুহূর্ত্তেক ধামিয়া বলিল, “আপনার সাহচর্য্য লাভের আশায় না হয় একটু অবাধ্যই হওয়া যাবে।”

সুকৃতি গম্ভীর হইয়া বলিল, “না, আপনার অবাধ্য হওয়া চলবে না।”

“তার কারণ?”

“তার কারণ কি আপনাকে বলতে হবে? জানেন, আপনার বাবা, মা জানতে পারলে আপনাকে তাঁরা কিরূপ ভৎসনা করবেন?”

“তা করবেন। কিন্তু আপনারও তো সে দিক দিয়ে আশঙ্কা কিছু কম নয়?”

“আমি তো বলেছি, আমার জন্ত ভাববেন না।”

স্ত্রুত এবার বলিল, “আর আপনিই বা কেন আমার জন্ত ভাববেন?”

এবার সুকৃতির চক্ষুহুঁটি যেন ব্যথায় টনটন করিয়া উঠিল; সে ধীরে ধীরে বলিল, “আপনি শুধু-শুধু আমার জন্ত অপমানিত হলে আমার মনে কষ্ট হবে।”

স্ত্রুতকে কে যেন সহসা কশাঘাত করিল; তাহার সমগ্র বক্ষ এক তুমুল ভাবাবেগে আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে বলিল, “কিন্তু আমার যে তা সাধ্য নয়।”

তাহার কথা শুনিয়া সুকৃতি চমকিয়া উঠিল, শাস্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন নয়?”

“সে কথা আপনাকে বলতে পারবো না।”—সহসা সুকৃতিকে যেন কি এক উগ্র নেশায় পাইয়া বসিল; সে তাহার হস্ত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “আপনাকে বলতেই হবে।” স্ত্রুত কি যেন বলিতে গিয়া সহসা সংযত ভাবে বলিল, “আপনার কাছে আমি উপকৃত।”

“মিথ্যে কথা; যা সত্য কথা তাই বলুন”—বলিয়া সুকৃতি তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। এবার স্ত্রুত হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “সত্য কথাই বোলব, কিন্তু এখন নয়।” শেষের দিকের কথাটার সুকৃতির যেন বাহুজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখ নিম্নে বিবর্ণ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই গভীর লজ্জা আসিয়া তাহার সুর্গোর মুখ আরক্ত করিয়া তুলিল; সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া খুলিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে বলিল, “আমার অজ্ঞান হয়ে গেছে, মাফ করবেন। এ কথা জানবার কি রকম ভয়ানক আশ্রয় আমার পেয়ে বসেছিল। দেখুন তো, রাস্তার মাঝখানে কি রকম বিলী কাণ্ডটা করে বসলাম!” বলিয়া সে লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। স্ত্রুত

নির্ঝাক্ রহিল। সুকৃতি আপনাকে আর একবার সুসংবৃত করিয়া লইয়া বলিল, “ঐ যে ট্রাম আসছে, ওতেই তো আপনি যাবেন?”

“আর আপনি?”

“আমার তো আর বেশী দূর নেই, এটুকু হেঁটেই যাবো।” কথা কহিতে কহিতে ট্রাম আসিয়া পড়িল। সুত্রত আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিয়া বসিল। ট্রাম ছাড়িয়া দিতেই সুকৃতি যেমন অপর পারে যাইবে, এমন সময় সে দেখিল, একটি খদ্দেরের সাদা রুমাল—তাহার মধ্যস্থলে একটি বিকশিত পদ্ম আঁকা, এক কোণে কেবল বাংলায় “সুত্রত” নামটি লেখা—ট্রাম-লাইনের উপর পড়িয়া আছে,—সে তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইল। সে তাহা মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন বলিয়াই মনে করিল।

○

ইহার পর সুকৃতির সহিত সুত্রতর প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত, এবং তাহার গল্প করিতে-কবিত্তে ট্রাম-খামিবার স্থান পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইত; সেই স্থানে সুত্রত সুকৃতির নিকট বিদায় লইয়া ট্রামে উঠিত। এইরূপ দিনগুলি তাহাদের নিরবিচ্ছিন্নেই কাটিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ এক দিনের একটি ঘটনায় সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল।

প্রতিদিনের মত সে-দিনও সুকৃতি বাড়ীর বাহিরে আসিতেই সুত্রতর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ে গল্প করিতে করিতে বড় রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু খানিক-দূর যাইতেই সুকৃতির ছোট মামার সহিত হঠাৎ তাহাদের দেখা হইল। সুকৃতি তাহার এই মামাটিকে যেমন ভয় করিত, তেমনই ঘৃণা করিত, কারণ, তাহার মনটি যেরূপ সঙ্কীর্ণ, কুটিল, বুদ্ধিও সেইরূপ বাঁকা। তিনি সুকৃতিকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ এত দেরী যে!”

সুকৃতি বলিল, “কৈ, দেরী তো হয়নি মামা! এখন তো সবে সাড়ে-দশটা। আমাদের ক্লাস তো সেই এগারোটায়।”

“ওঃ” বলিয়া তিনি একবার সুত্রতর দিকে বক্র-কটাক্ষ হানিয়া হন-হন করিয়া তাহাদের পাশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

* * * *

সে-দিন কলেজ হইতে সুকৃতি গৃহে ফিরিতেই তাহার মা প্রিয়ম্বদা দেবী তাহাকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া বলিলেন, “সুকৃতি, তোমার এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি!” সুকৃতি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি মা?” প্রিয়ম্বদা দেবী কুপিত হইয়া তাহারই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, “কি মা?”—তুমি ঐ সামনের বাড়ীর ছোড়াটার সঙ্গে কি জন্তে মেশো, তা বল তো শুনি? এক দিন তোমায় বারণ করে দিয়েছি, মনে নেই? ফের যদি কোন দিনও ওর সঙ্গে তোমায় মিশতে দেখি, তা হ'লে আমি তোমার মুখদর্শন কোরবো না, তা ব'লে দিলুম। আজ আসুন উনি, ওঁর সোহাগে মেয়ে কি রকম বেচাল হ'য়েছে, তা ব'লে দিচ্ছি; দেখি, উনি তোমায় কত সোহাগ করেন!” সুকৃতি প্রথমে অত্যন্ত ভয় পাটয়াছিল; কিন্তু যখন প্রিয়ম্বদা দেবী তাহার বাপকে বলিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইলেন, তখন সে ক্রোধে জলিয়া-উঠিয়া বলিল, “বেশ, দিয়ে বাবাকে ব'লে, বাবা শুনে আমার মাথাটা কেটে ছুঁটুকরো কোরবেন—দেখে খুব স্মৃতি কোরো।” প্রিয়ম্বদা দেবী কণ্ঠের স্বেচ্ছাক্রমে ক্রোধপ্রায় হইলেন; বলিলেন, “মাথা কেটে ছুঁখানা করেন কি ক'খানা করেন, দেখতেই পাবে। বেহায়া মেয়ে, কাণ্ডজ্ঞান দিন-দিন লোপ পাচ্ছে!”

“বেশ” বলিয়া সুকৃতি নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

* * * *

প্রিয়ম্বদা দেবী কণ্ঠকে পিতার নিকট যতটা অপদস্থ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, ততটা করিতে তাঁহার সাহস হইল না; কারণ অমলেশ বাবু তাঁহার কণ্ঠকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং প্রিয়ম্বদা দেবী গম্ভীরপ্রকৃতি, সংযতবাক্ স্বামীটিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। তথাপি সন্ধ্যার সময় যখন অমলেশ বাবু ইজিচেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র দেখিতেছিলেন, তখন তাঁহারই অনতিদূরে প্রিয়ম্বদা দেবীর উত্তোগে একটি বৈঠক বসিল, এবং প্রিয়ম্বদা দেবী স্বয়ং ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেন সেই বৈঠকে বক্তৃতাদানের ভার গ্রহণ করিলেন; সুকৃতিকেও সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে আদেশ করা হইয়াছিল। তদনুসারে সুকৃতি আসিয়া পিতার পার্শ্বেই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। বহু বাক্যবিতণ্ডার পর স্থির হইল, সুকৃতির অবাধ-স্বাধীনতা রহিত করা হইবে; সে একাকী কোথাও যাইবার অম্মতি পাইবে না। অতঃপর বাসে চড়িয়া সে কলেজে যাতায়াত করিবে। এইরূপ ব্যবস্থার পর তাহাব মামা সুকৃতিকে এ-সন্ধক্ষে তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিল। সুকৃতি এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই; কিন্তু মামার প্রশ্ন শুনিয়া তাহার ধৈর্য ও সংযমের বাঁধ এক নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া তাহার মাকে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও উত্তেজিত স্বরে শুনাইয়া দিল, “মা, তোমরা আমার উপর যে সব কঠিন ও অসঙ্গত নিয়ম জারী ক'রলে, তার একটাও আমি মানতে পারবো না। আর আমি এটাও বলতে চাই, আমাকে তোমরা যে রকম দোষী ব'লে সিদ্ধান্ত ক'রেছো, আমি সে রকম দোষীও নই। আর আমি এও স্পষ্ট ভাষায় বলছি, তোমরা যাকে চ্যাংড়া-চোঁড়া, ফোচকে, বদমাইস্ প্রভৃতি ব'লে তার অপমান ক'রলে, প্রকৃতপক্ষে সে তা নয়; সে সুশিক্ষিত, বিনীত, উদার-হৃদয়, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সুসভ্য যুৱক। আর সেইজন্যই তার সঙ্গে কথা বন্ধ করা আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে ক'রছি।”

প্রিয়ম্বদা দেবী ও তাঁহার ভাই হরেন বাবু তাহার নির্ভীক প্রতিবাদে বিস্মিত হইলেন। হরেন বাবু কিছুকাল নির্ঝাক্ থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, “শোন সু, বেশী—” তিনি আর কিছু বলিবার পূর্বেই সুকৃতি দৃষ্টা সিংহীর জায় গর্জন করিয়া বলিল, “চুপ করুন! আপনার মত নির্লজ্জের সঙ্গে আমি কোন কথার আলোচনা ক'রতে চাইনে।” হরেন বাবুর মুখে আর কথা ফুটিল না। প্রিয়ম্বদা দেবী ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইলেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি আত্মসংযম করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “শুনছো তোমার মেয়ের কথা? হরাকে ও কি রকম অপমান করলে!” অমলেশ বাবু তখন বোধ হয় সংবাদপত্রেই তন্ময়; কোন কথাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। প্রিয়ম্বদা দেবী উত্তেজিত স্বরে পুনর্বার বলিলেন, “খবরের কাগজেই মসৃণল! বলি, শুনলে, তোমার মেয়ে তার মামাকে কি রকম অপমানটা করলে?”

অমলেশ বাবু কেবল “হু” বলিয়া আবার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। স্বামীর এই প্রকার উদাসীণ্যে প্রিয়ম্বদা দেবী ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন; এবং অধিকতর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “বলি, আমার কথাটা শুনবে, না, খবরের কাগজই পড়বে?”

অমলেশ বাবু এবার কাগজের পাতা উন্টাইয়া বলিলেন, “হু, শুনবে কৈ কি!”

“তোমার মেয়েকে শাসন করো।”

অমলেশ বাবু সেই পাতাটির উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলিলেন, “হঁ, এই যে ক’রছি।”

“ছাই করুছো! আমার কথাগুলো তোমার কানে গেছে?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো না, কি বলবে?” বলিয়াই তিনি পুনরায় কাগজের মধ্যে একেবারে তলাইয়া গেলেন।

প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া অত্যন্ত নিরাশ ভাবে মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। স্কুতি ছোট ভাই কান্নাকে কোলে বসাইয়া তাহার সঁহিত গল্প করিতে-করিতে পিতার নিকট মায়ের অভিযোগ শুনিতেছিল। প্রিয়ম্বদা দেবীর সকল চেষ্টা বিফল হইলে তিনি নিতান্ত হতাশ ভাবে চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলেন। স্কুতি তাঁহার ভ বর্ত্ত দেখিয়া কান্নার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে বৃকে চাপিয়া ধরিল, এবং আদর করিতে-করিতে হাশ্বদমনেব চেষ্টা করিল।

স্কুতিব হাসি দেখিয়া প্রিয়ম্বদা দেবী ঘৃণায় ও ক্রোধে মুখ বিবর্ণ করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “দেখ, স্কুতি! তোমার এই বেহায়াপনায় আমি বড়ই মগ্ন হইয়াছি। মনে হচ্ছে, জন্ম-জন্মান্তরের বিস্তর পাপের ফলেই তোমার মত মেয়ে গর্ভে ধ’রেছিলুম। কিন্তু তোমায় ব’লে দিচ্ছি, এণ্ড এন্টো হেস্তুনেস্ত না ক’রে আমি ছাড়ছি নে।”—এইরূপ সিংহনাদ করিয়া তিনি সর্বোশেষে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

হরেন বাবুও অবনতমস্তকে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

* * * *

প্রিয়ম্বদা দেবী অতঃপর তাঁহার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন, এবং উপায়েরও অভাব হইল না।

অমলেশ বাবু সে দিন আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া জানাইলেন, তাঁহাকে পরদিন প্রত্যুষে কোন জরুরী কার্যে দু’তিন দিনের জঙ্ক ‘টুরে’ যাইতে হইবে।

যথাসময়ে তিনি যাত্রা করিলেন, এবং গৃহত্যাগের পূর্বে স্ত্রীকে জানাইলেন, তিনি ‘টুর’ হইতে ফিবিবার পূর্বে স্কুতির প্রতি যেন কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করা না হয়।

প্রিয়ম্বদা দেবী স্বামীকে তখন কোন কথা বলিলেন না বটে, কিন্তু স্থির করিলেন যে, কন্টার অবাধ্যতা দূর করিবার পক্ষে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ।

অমলেশ বাবু গৃহত্যাগ করিলে, প্রিয়ম্বদা দেবী কন্টার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্কুতি তখন টেবিলের সম্মুখে বসিয়া পাঠ্য বিষয়ের ‘নোট’ লিখিতেছিল। প্রিয়ম্বদা দেবীকে সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া পুনরায় আরক্ত কার্যে মনোনিবেশ করিল। প্রিয়ম্বদা দেবী তাহার টেবিলের গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “তোমার সঙ্গে আমার দু’-একটা বিশেষ কথা আছে।”

স্কুতি মাথা না তুলিয়া লিখিতে-লিখিতে বলিল, “না মা, এখন আমার কোন কথা শুনবার সময় নেই; এই নোটটা আজই আমাকে শেষ করতে হবে।”

“কিন্তু আমারও যে বড় বেশী দরকার স্কু—” বলিয়া মা কোমল দৃষ্টিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। স্কুতি তখন করযোড়ে সবিনয়ে বলিল, “মাফ করো মা। আমার এখন একবিন্দুও অবসর নেই।

প্রিয়ম্বদা দেবী এ কথায় গরম হইয়া উঠিয়া বিক্রপভরে বলিলেন, কিন্তু ইয়ারকি দেওয়ার সময়ের তো অভাব হয় না!”

স্কুতি এবার অধীর ভাবে বলিল, “তোমার দু’টি পায়ে পড়ি মা, এখন তুমি আমাকে রেহাই দাও।” কন্টার প্রতিবাদে দারুণ ক্রোধে প্রিয়ম্বদা দেবীর কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল; তিনি জ্ঞান হারাইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, “তোমার যে ভারী অহঙ্কার দেখছি! মাকে ঘর থেকে তাড়াতে চাও? কিন্তু এত স্পর্ধা ভালো নয়। তা বেশ, আমি যাচ্ছি; কিন্তু তার আগে তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি—আমার হুকুম ছাড়া তুমি বাড়ী থেকে কোথাও বেরোতে পাবে না। কলেজে যাওয়া-আসার জন্তে বাসের ব্যবস্থা তো করাই হ’য়েছে; সেই বাসে আজ থেকে তুমি কলেজে যাবে, বাসেই বাড়ী ফিরবে।”—তিনি আব মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে না দাঁড়াইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

৪

প্রিয়ম্বদা দেবী উপযুক্তপরি দুই দিন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও স্কুতিকে ভাত খাওয়াইতে পারিলেন না। কন্টার অবাধ্যতায় ক্রোধে-ক্রোধে বিচলিত হইয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে বলিল, “ম’, এইমাত্র আফিসে তার এসেছে, বাবু আজই বিকেলে ফিরে আসবেন; পেয়াদা এসে খবর দিয়ে গেল।”

কন্টার আগমনের সংবাদ পাইয়া প্রিয়ম্বদা দেবী বিবর্ণ মুখে বলিলেন, “এই আর এক ফ্যাসাদ! বাড়ী ফিরে যদি তিনি শোনেন, মেয়েটা দু’দিন কিছুই না-থেকে প’ড়ে আছে, অনাহারে শুকোচ্ছে, তা হ’লে কি আর রক্ষে থাকবে? আর একবার চেষ্টা করে দেখি।” তিনি উঠিয়া যাইতেই অদূরে কান্নাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিলেন, “ওরে কান্না, আমার একটা কথা শোন, দেখে আয় তো বাবা, তোর দিদি এখন কি ক’রছে।”

“ঘুমুচ্ছে মা!” বলিয়া কান্না তাহার দিদির নিকট হইতে অল্পকালপূর্বে-প্রাপ্ত ছবি বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

“ফাজিল ছোঁড়া! তুই এখানে বসে-থেকেই সব বুঝি জানতে পেরেছিস? দিদির কাছে থেকে-থেকে তুইও দিন-দিন ফাজিল হ’য়ে উঠাচ্ছিস!”

“হঁস, দিদির কাছে থাকলে বুঝি ফাজিল হ’তে হয়? দিদি কত ভাল-ভাল গল্প শোনায় আমাকে তা জানো?”

“আবার আমার কথার ওপর কথা?” প্রিয়ম্বদা দেবী তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিলেন। বালক উচ্চৈশ্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

সংসারে পুত্র-কন্যা বিদ্রোহী, স্বামী মৃগের বাহিরে! তিনি চারি দিক অন্ধকার দেখিলেন।

“ও স্কু, স্কু, ওঠ মা লক্ষ্মীটি! এই মিছরীর জলটুকুতে শুকনো গলা ভিজিয়ে খেতে চল, আর আশীসনি মা!”

“আঃ, আবার কেন জালাতে এলে মা! আমি কেমন একটা মজার স্বপ্ন দেখছিলুম।”

“আচ্ছা, তুমি ঘুমুলে এবার থেকে আর তোমায় জাগাবো না, চলো মা এখন, খাবে দু’টি, চলো।”

“কেন মিছে আমার বিরক্ত করতে এলে মা! কিছু খাবো

না আমি। আমি তো ব'লেই দিয়েছি, যতক্ষণ তুমি সমস্ত নিবেদন প্রত্যাহার না করবে—ততক্ষণ।”

প্রিয়দেবী দেবী আরও অধিক কোমল স্বরে বলিলেন, “দেখ মা, তুমি লেখাপড়া শিখছো, তোমার কি অতো অবুঝের মতো কথা বলা উচিত? ওদের সঙ্গে আমাদের কত দিনের, আর কত বেশী বিরোধ, তা যদি তোমার জানা থাকতো, তা হ'লে এমন অবুঝের মতো কথা বলতে না। তা ছাড়া ওর সঙ্গে তোমার ঐ রকম মেলামেশাও যে লোকের চোখে ভাল দেখায় না মা? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, তা কি সহ্য হয়? কর্তাই বা কি মনে ক'রবেন? কানাঘুসাও চলছে?”

মায়ের এই সকল কথায় স্কৃতি ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, বেশ, বাবা এলে যা বুঝবেন তাই হবে।—স্কৃতি পাশ ফিরিবার উপক্রম করিল।

প্রিয়দেবী তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিবস্ত্রিত্বেরে বলিলেন, “ভারী বাপ-সোহাগিনী মেয়ে! লজ্জা করে না ধাড়ী মেয়ের এ সব কথা ব'লে বাপকে বিরক্ত করতে?”

“বাবাকে বিরক্ত করার কথা তো হচ্ছে না মা! তিনি এসে যা ব্যবস্থা করবেন, তাই হবে। তুমি এখন যাও তো মা, আমি একটু ঘুমোই”—বলিয়া স্কৃতি মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইবার উত্তোগ করার প্রিয়দেবী নিস্তব্ধ ভাবে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

সেই দিন অপরাহ্ন ৫টার অমলেশ বাবু গৃহে পদার্পণ করিতেই ছোট ছেলে কালুর নিকট তাহার দ্বিদির প্রায়োপবেশনের সংবাদ পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আফিসের পোষাকেই কন্ডার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এক কক্ষদ্বারে করাঘাত করিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, “স্কৃতি, খোল তো মা দরজাটা একবার।”

“কে, বাবা?” বলিয়া স্কৃতি উৎসাহভরে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, এবং সাগ্রহে পিতার হাত ধরিয়া বলিল, “এইমাত্র আসছ বুঝি বাবা?”

“হ্যাঁ মা!” বলিয়া অমলেশ বাবু সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, “কিন্তু এ সব কি শুন্দি মা? আমি চলে যাবার পর থেকেই তুমি না কি উপোস ক'রছ? কিছুই খাচ্ছ না?”

স্কৃতি নীরব রহিল। অমলেশ বাবু তখন তাহার হাত ধরিয়া তাকে পাশের চেয়ারে বসাইয়া দিলেন, এবং স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, “কি হ'য়েছে, সব কথা আমায় খুলে বলো তো মা!”

স্কৃতি পিতার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, “সব কথাই তোমাকে ব'লবো বাবা। কিন্তু পরিশ্রান্ত হ'য়ে এসেছ তুমি আগে জিরিয়ে নাও; তার পর সব শুনো। দেখি, তোমার জুতো-জোড়াটা খুলে দিই।” স্কৃতি নতমস্তকে পিতার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। অমলেশ বাবু মৃদু হাসিয়া কন্ডার হাত ধরিয়া উঠাইয়া, তাহার ললাটের কুন্তলগুচ্ছ সুবিস্তৃত করিতে-করিতে বলিলেন, “তা তো হয় না মা! আমার স্নেহের ধন পুরো দু'দিন উপবাসী র'য়েছে, তা শুনেও কি ক'রে বিশ্রাম ক'রবো তা' বলো তো! আহা, ফুলের মতো মুখখানা দু'দিনে শুকিয়ে উঠেছে। বলো মা, লস্কীটি, ব্যাপারখানা কি, লজ্জা কোর না।”

স্কৃতি সকল বিবরণ সবিস্তারে পিতার নিকট বিবৃত করিলে অমলেশ বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, “না, আর বিলম্ব নয়; এ বিরোধের নিষ্পত্তি যেক্ষণেই হোক, আজই

হওয়া দরকার; আমি এখনই সুপ্রসন্ন বাবুর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এত দিনের মনোমালিন্য দূর ক'রে আসছি।”

স্কৃতি বাধা দিয়া বলিল, “না বাবা, ও কাজ তুমি করতে পাবে না। তুমি কি জন্তে আমার মুখের দিকে চেয়ে অকারণে পরের কাছে হীনতা স্বীকার ক'রতে যাবে? তোমার পক্ষে তা কি রকম অপমানজনক, সেটা ভেবে দেখবে না, বাবা? আমি জীবন থাকতে তোমাকে ও-ভাবে অপমানিত হ'তে দেব না।”

পিতা হাসিয়া বলিলেন, “কথাটা তুমিই কি ভেবে দেখেছ, মা! আমাকেই বা ছোট হ'তে হবে কেন? বিরোধটা প্রথমে যখন আরম্ভ হয়, তখন দোষের জন্ত কেবল তারাই তো দায়ী ছিল না, কতক দোষ আমাদেরও নিশ্চয়ই ছিল। জানিস তো মা, কথায় বলে, এক হাতে তালি বাজে না? আর অপমানের কথা কি ব'লছিস, মা! আমার কাছে আমার মেয়ের জীবন বড়, না, তুচ্ছ মানই বড়? যে সকলের সম্মানের পাত্র, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সে নতিস্বীকার করলে তাব সম্মান নষ্ট হয় না, মা! জ্বিদের বশীভূত হয়ে পরকে ছোট মনে করলে কখনও কোন বিবাদের মীমাংসা হতে পারে না। আর মান-টাই বা কি বস্তু? সেটা তো তুচ্ছ ‘অহং ভাব’ ছাড়া আর কিছু নয়।”

স্কৃতি পিতার কথার আর প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, “তা সেখানে যেতে চাও, যেয়ো, কিন্তু এই মুহূর্তেই তার প্রয়োজন নেই বাবা! তুমি আফিসের পোষাক ছাড়োগে, আমি ততক্ষণ চা ক'রে আনি।”

স্কৃতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই পিতা তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “জানিস মা, রাবণ মৃত্যুকালে শ্রীরাম-চন্দ্রকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন, ‘শুভশ্রী শীঘ্রম্, অশুভশ্রী বিলম্বম্’—কাষেই এই শুভ কাজটা যত শীঘ্র শেষ করা যায়, ততই ভাল। আর তা ছাড়া তোকে উপোসী রেখে আমি কিছুই মুখে দিতে পারব না মা! তুই একটু বস, আমি এখনই আসছি।” তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

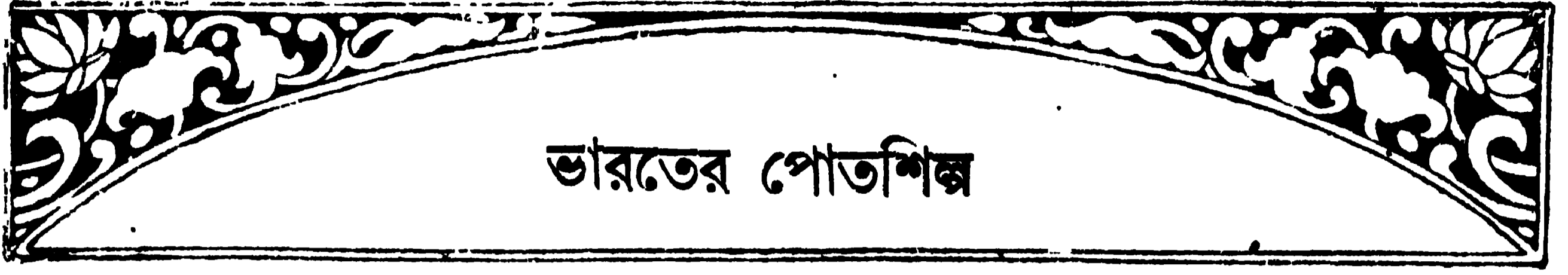
ঘণ্টাখানেক পরে অমলেশ বাবু স্ত্রতকে সঙ্গে লইয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিলেন, এবং স্কৃতিকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ স্কৃতি, কাকে ধবে এনেছি।”—অতঃপর উভয়ে স্কৃতির ঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্কৃতি চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল—পিতা ও স্ত্রত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

স্ত্রতকে দেখিয়াই তাহার ধর্মী-প্রবাহিত রক্তশ্রোত সহসা যেন রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল; কোনরূপে মন সংযত করিয়া সে বিস্ফারিত নেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিতেই অমলেশ বাবু স্কৃতি ও স্ত্রতের হাত দু'খানি ধরিয়া, পরস্পর সঙ্গিলিত করিয়া বলিলেন, ‘আজ আমাদের সকল বিবাদের মীমাংসা হ'ল। বাবা স্ত্রত, আমি আমার বড় আদরের মেয়েকে আজ এই শুভকণ্ঠে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম এই ভরসায় যে, তুমি ওকে ভবিষ্যতে ঠেলতে পারবে না। আর পরমেশ্বরের কাছে আজ এই শুভ মুহূর্তে প্রার্থনা করি—’ তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিলেন, এবং তাহার কণ্ঠস্বর অধিকতর গাঢ় ও আবেগময় হইয়া আসিল,—“তিনি তোমাদের উভয়ের জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠু করিয়া প্রতিদিন নব নব আনন্দে ভরিয়া তুলুন।”

এই সময় জমিদার-বাড়ী হইতে মিলন-শব্দ ধ্বনিত হইল।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মিত্র।



ভারতের পোতশিল্প

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।” বিস্তীর্ণ বহির্বাণিজ্যের প্রধান বাহন অর্ণবপোত। অর্ণবযান ব্যতীত সামুদ্রিক বাণিজ্য অসম্ভব। সমুদ্রই পৃথিবীব্যাপী বিশাল বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ বস্তু—“একামেবাদ্বিতীয়ং” বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাণিজ্যের নিমিত্ত যেমন মালবাহী-জাহাজের আবশ্যক, জলপথে দেশ-দেশান্তরে যাতায়াতের জন্তও তেমনি যাত্রীবাহী-জাহাজের প্রয়োজন। এই মাল ও যাত্রীবাহী-পোতগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত বণতরীর প্রয়োজন। জলদস্যু-দমন ব্যতীত, জলযুদ্ধের নিমিত্তও বণতরীর আবশ্যক। যাত্রী ও মালবহনে এবং জলযুদ্ধে স্থলযান অপেক্ষা জলযানেই প্রয়োজন সমধিক। জল অপেক্ষা আকাশ আরও ব্যাপক। কালে হয় ত খপোতই জল-যানের বর্তমান মর্যাদা খর্ব করিবে; কিন্তু যত দিন বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র সেনাবাহিনী-বহনকারী বিমানের আবিষ্কার না হইতেছে, তত দিন জলযানেরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বিগত মহাযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাণিজ্য ও বণতরীর ক্ষতি-পূরণে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল; কারণ, এক একখানি বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ করিতে অন্ততঃ এক বৎসর সময় লাগে; বাধা-বিঘ্নও বিস্তর। বিগত মহাযুদ্ধে অপেক্ষা বর্তমান মহাবিপ্লব অধিকতর ব্যাপক ও অনিষ্ট-কর। বিগত মহাযুদ্ধে জার্মানীর আয়ত্তাধীন সমুদ্রাংশে মাত্র তাহাদের ডুবো-জাহাজের দৌরাণ্য দেখা দিয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধে পশ্চিম-য়ুরোপের প্রত্যেক বন্দরই তাহার করায়ত্ত। বিগত মহাযুদ্ধে মিত্র ও মিলিত শক্তিপুঞ্জের বশীভূত ছিল—বৃটিশ, আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান এবং জাপানী বণতরী-বহর; এবং আয়ার (আইরিশ) বন্দর-গুলিতে অবস্থিত পশ্চিম ষাঁটিগুলি। বর্তমান যুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান—একমাত্র বৃটিশ-রাজশক্তি। সুতরাং বিগত মহাযুদ্ধে জাহাজ-ধ্বংসের ক্ষতি অপেক্ষা বর্তমান যুদ্ধে জাহাজ-ধ্বংসের ক্ষতি অনেক অধিক ও ব্যাপক। এই ক্ষতির মাত্রা কি পরিমাণ হইবে

এবং কত দিনেই বা তাহার শেষ হইবে, তাহা নির্ভর করিতেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ও সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহের উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্যের উপর। এবার ক্ষতির পরিমাণ যে রূপ বিপুল, তাহার পূরণের প্রচেষ্টাও সেইরূপ বিপুল হওয়া প্রয়োজন।

শত্রুপক্ষীয় ত্রয়ীশক্তি এ বিষয়ে বহু পূর্বেই সতর্ক ও প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্তমানে সমস্ত যুযুধান ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছে। ইংরেজ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে পঞ্চাশখানি বাণিজ্যপোত ক্রয় করিয়াছে। যুক্তরাজ্যের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্স যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আরও বাণিজ্য-বণতরী এবং বিমান-সাহায্যের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র দুই শত বাণিজ্যতরী প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়াছে। কানাডার সহিতও আঠার-খানি বাণিজ্যতরীর জন্ত চুক্তি হইয়াছে।

জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত নিরপেক্ষ এবং মিত্রশক্তির জাহাজ ব্যতীত বৃটিশ রাজশক্তির তিন কোটি টন মালবাহী-জাহাজ বিধ্বস্ত, অথবা নিমজ্জিত হইয়াছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক জাহাজ-নির্মাণ-প্রাঙ্গণ অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া, নিত্য-ক্ষয়িত্ত বাণিজ্য ও বণতরীর ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত সচেষ্ট। ভারতবর্ষ ব্যতীত সাম্রাজ্যান্তর্গত অত্রান্ত প্রধান দেশগুলিও যথাসাধ্য করিতেছে। কানাডাতে পঞ্চাশ কোটি ডলার পরিমিত জাহাজ-নির্মাণ-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূলদ্বয়ে ষোলটি জাহাজনির্মাণ-প্রাঙ্গণ বড় বড় বণতরী, এবং আটটি প্রাঙ্গণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পোত-নির্মাণে ব্যাপ্ত। চৌদ্দ হাজার শ্রমিক এই কার্যে লিপ্ত ছিল; এখন তাহাদের সংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটি বৃটিশ-রাষ্ট্র প্রেরিত সভ্য-সম্ম (Commission) বাণিজ্য-তরী নির্মাণার্থ কানাডায় গমন করিয়াছিলেন এবং আঠারখানি বাণিজ্য-তরী নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

কানাডার গ্রাম অষ্ট্রেলিয়াও পোত-শিল্পের পুষ্টিসাধন করিতেছে এবং রাজকীয় রণতরী-বহরের নিমিত্ত তের-খানি প্রহরী-পোত নির্মাণে নিযুক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে যাহাতে যুক্তরাজ্যের মুখাপেক্ষী না হইতে হয়, তদ্বিষয়ে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য যত্ন করিতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে যুক্তরাজ্যে পোতশিল্পে বিশেষ সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু ভারতে পোতশিল্প-প্রতিষ্ঠাকল্পে কোন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয় নাই! বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, এবং বর্তমান যুদ্ধ-সূচনার বহু পূর্বেই এই কার্যে ব্রতী হওয়া অতীব কর্তব্য ছিল। তাহা কার্যে পরিণত হইলে যুক্তরাজ্য আজ অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারিত।

স্বদেশীয় পোত-শিল্পকে যথাযোগ্য সাহায্য ও সহায়ত প্রদানে, স্বজাতীয় নৌ-বহরকে শক্তিশালী করা স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাষ্ট্রমাত্রেরই মুখ্য কর্তব্য। একমাত্র মন্দভাগ্য নিয়মন-নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষ ব্যতীত পোত-শিল্পে মাত্র কয়েকটি বন্দর-বন্ধিত খণ্ডরাজ্য ব্যতিরেকে, সর্বদেশই অগ্রগামী ও উত্তরোত্তর বর্ধনশীল।

ভারতের এ দুর্ভাগ্য বহুদিনের নহে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল, তখন এ দেশে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত নির্মিত হইত। বাস্পীয় পোত আবিষ্কারের বহু পূর্বে এ দেশের সাহসী ও সুদক্ষ নাবিকগণ একরূপ স্কুশলে পাল খাটাইতে জানিত যে, বায়ুর গতি যে দিকেই প্রবাহিত হউক, তাহারা পালের সাহায্যে প্রয়োজনানুসারে যে কোন দিকে জাহাজ পরিচালিত করিতে পারিত। কালের কুটিল চক্রে এই নাবিকগণের উত্তরবংশীয়রা “লস্কার” (Lascars) আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিল। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ এই অবজ্ঞাসূচক নাম বর্জন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন।

এমন এক দিন ছিল—এবং সে বহু দিন পূর্কেরও কথা নয়—যখন ভারত-নির্মিত জাহাজের সাহায্যেই ভারত-বাসী আরব, ইরাণ (পারস্ত), পূর্ব-আফ্রিকা, চীন, মালয়-উপদ্বীপ প্রভৃতি অতি দূর এবং অনতিদূরদেশে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য করিত। তাহারা ভারতীয় রণপোত সাহায্যে যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রাজ্যবিস্তার ও

উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই যুগেই বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়সিংহ ভারতীয় জাহাজে আরোহণ করিয়া তাঁহারই নামানুসারে আখ্যাত সিংহল (Ceylon) দ্বীপে গমন করিয়া তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখনও তথাকার বহু অধিবাসী ভারতীয় নাম ও উপাধিতে পরিচিত হইয়া আর্ধ্যত্বের অভিমান করিয়া থাকেন।

“আইন-ই-আকবরী” পাঠে জানা যায়, মোগল-সম্রাট আকবরের বিস্তর রণতরী ছিল। সেই সকল রণতরী বালেশ্বর, ঢাকা ও চট্টগ্রামের পোতাশ্রয়ে সুরক্ষিত হইত। আকবর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর (১৫৫৬-১৬০৫) রাজত্ব করেন। তাঁহারই আমলে ইংরেজ বণিকরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া সুরাতে কুঠীস্থাপন করেন। মহীশূর রাজ্যের হায়দার আলি খাঁর (১৭৭২-১৭৮২) নৌবাহিনী ছিল, এবং সে নৌ-বাহিনী নিতান্ত হীনবল ছিল না। তাঁহার ত্রিশখানি রণতরী এবং বহুসংখ্যক সৈন্য-সমন্বিত মালবাহী-জাহাজ ছিল। (Low's History of the Indian Navy, Vol. I.) তিনি দক্ষিণ উপকূলে বহু রণতরী প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন মাস্তুলযুক্ত যুদ্ধ-জাহাজ (Grab) ছিল, এবং প্রত্যেক জাহাজে ২৮টি হইতে ৪০টি করিয়া কামান থাকিত। ইহা ভিন্ন সাগরগামী ক্ষুদ্র তরীও (Palas) ছিল। এই সকল জাহাজে ১০টি বা ১২টি কামান থাকিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে ইংরেজের ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ হায়দার আলির নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত করেন। এ সকল কথা বর্তমান মাসিকে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

তখনও ভারতে পোত-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ছিল। চট্টগ্রামের নৌ-শিল্পিগণ জাহাজ নির্মাণে একরূপ সুদক্ষ ছিল যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আগ্রহের সহিত তাহাদের দ্বারাই অর্ণব-যান নির্মাণ করাইতেন। এখনও ভারতের বহু স্থানে স্বল্পাকারে নৌ-শিল্পের প্রচলন আছে।

এখন অবশ্য বাস্পীয় পোতের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাস্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত জলযানের প্রচলন হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে হেনরী বেলের নির্মিত “কমেট” বিলাতের ক্লাইড নদীতে নিরাপদে চালিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে “সাতানা” আমেরিকা হইতে যাত্রা করিয়া সর্বপ্রথম আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া ২৭ দিনে

লিভারপুলে উপস্থিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন জনসন্ "এণ্টারপ্রাইজ" নামে একখানি বাষ্পীয় পোতে আটলান্টিক মহাসাগরের পথে লণ্ডন হইতে ১১৩ দিনে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ দেশে বাষ্পীয় পোতের ইহাই সর্বপ্রথম আগমন।

এখন প্রায় সর্বত্রই নদীবক্ষে ক্ষুদ্র-বৃহৎ "ষ্টীমার", এবং বাষ্পচালিত জলযান সমুদ্রপথে যাতায়াত করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য সুগম করিয়াছে। জলযুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী ড্রেডনট, ক্রুইজার, সাবমেরিন, টর্পেডো-বোট প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ রণতরী অধুনা আবিষ্কৃত হইয়া জগতে ভয়াবহ ধ্বংসের যুগ প্রবর্তিত করিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের জয়-পরাজয় বিমান দ্বারা সংঘটিত হইবে বলিয়া মনে হয় না; এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় সমুদ্রবক্ষে নির্ণীত হওয়াই সম্ভব।

বিগত মহাযুদ্ধের রণপাণ্ডিত্য ছিল স্থলে—পরিখা-যুদ্ধে নিবদ্ধ। এবারকার রণকৌশল অবরোধ (Blockade) ও প্রতি-অবরোধে নির্ভরশীল। রণতরী-বহরের ঞায় বণিজ্ নৌ-বহরও যুদ্ধজয়ের প্রধান অবলম্বন। রণতরী বাহিনী প্রথম, এবং বাণিজ্যতরী-বহর দ্বিতীয় সহায়। বারিধি-বক্ষে অথবা প্রতাপ সংরক্ষণার্থ প্রত্যেক প্রবল জাতির এই উভয়বিধ পোত প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন। রাজশক্তিকে বিপদে সাহায্যদান ব্যতীত, আত্মরক্ষার্থ ভারতের প্রভূত নৌ-শক্তির প্রয়োজন। স্বদেশে পোত-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত, বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া রণতরী ও বাণিজ্যপোতের অভাব কখনই বিদূরিত হইতে পারে না।

পূর্ব-পশ্চিমে সুদীর্ঘ উপকূল, বিশাল বৈদেশিক ও প্রভূত উপকূল-বাণিজ্য, বহু পোতাশ্রয়, বন্দর, এবং পোতাধিষ্ঠান-(জাহাজ নঙ্গর করিয়া থাকিবার স্থান) সম্পন্ন ভারতের ঞায় বিস্তৃত ভূখণ্ডের পক্ষে পোতশিল্প ও পোত-বাণিজ্য জীবনধারণার্থ অত্যাৱশ্যক। পোত-বাণিজ্য প্রত্যেক সমুদ্রতীরবর্তী দেশের জাতীয় অভ্যুত্থান ও অভ্যুদয় নীতির অন্তর্ভুক্ত। দূর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ তাহার বহির্বাণিজ্যের নিমিত্ত বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ফলে যুদ্ধারম্ভের পরে মালবাহী জাহাজের সংখ্যান্ততা বশত: তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য

বিপর্যস্ত হইয়াছে। বহু মালবাহী ও যাত্রীবাহী-জাহাজ যুদ্ধ-প্রয়োজনে গৃহীত হইয়াছে, এবং বহু জাহাজ সমুদ্র-পথে শত্রুপক্ষের রণবিমান, রণতরী—অগ্নিগর্ভ-ডুবোজাহাজ, এবং সমুদ্রগর্ভে প্রচ্ছিন্ন চলমান বিস্ফোরক মাইন দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া অতলে বিলুপ্ত হইয়াছে। মালবাহী-জাহাজের সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে, এবং ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যও সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া বিধম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। রক্ষী-জাহাজের আশ্রয়ে দীর্ঘতর সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে মালবাহী-জাহাজের অত্যধিক সময় লাগে। এই বিলম্বে ব্যবসায়ের প্রভূত অনিষ্ট ঘটিতেছে।

নিমজ্জিত জাহাজের অভাব পূরণ এবং শত্রুর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের সংস্কার-সাধন দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। ফলে জাহাজের অভাব-অনাটনই এখন, যেমন যুদ্ধের, তেমনি বাণিজ্যের পক্ষে বিধম অন্তরায় ঘটাইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের বহু বর্ষ পূর্ব হইতে ভারতবাসী ভারতে পোত-শিল্প প্রতিষ্ঠা, এবং পোত-বাণিজ্য বিস্তার জন্ত, আবেদন-নিবেদন এবং আন্দোলন পরিচালনা করিতেছে, তাহা কার্যকরী করিবার নিমিত্ত ভারত সরকার যদি উদার ভাবে সাহায্য দান করিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের অবস্থা একরূপ অসহায় হইত না। আজ তাহা হইলে সরকারী সাহায্যে নিশ্চিত প্রত্যেক জাহাজ ভারতের উপকূল-রক্ষায় সহায়তা ব্যতীত, ভারতের কৃষক ও রপ্তানী ব্যবসায়ীর প্রভূত উপকার সাধনে সমর্থ হইত।

এই উভয় প্রচেষ্টায় ভারতবাসীর অত্যাগ্র উন্মেষের নিষ্ফল প্রযত্নের শোচনীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ষোল বৎসর পূর্বে ভারতীয় বণিজ্-নৌ-তদন্ত-সমিতি (Indian Mercantile Marine Committee) ভারতে পোত-শিল্প প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কয়েকটি বিশিষ্ট সরকারী সাহায্যের বিধান দিয়াছিলেন। এই তদন্ত-সমিতি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল, এবং ইহাতে কয়েক জন বৃটিশ নৌ-শিল্প-বিশারদ বিজ্ঞ সভ্য ছিলেন। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞ সমিতির বিবৃতি (Report) এ কাল যাবৎ বেওয়ারিস চিঠির ঞায় নিষ্ফল হইয়া রহিয়াছে। পোত-শিল্পের সৃষ্টি ও পুষ্টি

ব্যতীত ইহার আর একটি প্রধান সুপারিশ ছিল যে, ভারতীয় জাহাজের তত্ত্বই ভারতের উপকূল-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হইবে। এই সুপারিশও গ্রাহ্য করা হয় নাই; অধিকন্তু এই বিধানের বিপর্যয়কল্পে ভারত-শাসন আইনে ইহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং এই ক্রটি যে ভ্রমের ফল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

গত পাঁচ বৎসর হইতে সিঙ্ক্রিয়াস্টীম নেভিগেশন কোম্পানী কলিকাতায় একটি পোত-নির্মাণ-প্রাঙ্গণ (Ship-yard) প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কলিকাতার বন্দর-তত্ত্বাবধায়কদিগের (Port Commissioners) হৃদয়হীন কঠোর নীতির ফলে যে প্রতিষ্ঠান কলিকাতা তথা বাঙ্গালার বেকার-সমস্তার যথেষ্ট সমাধান করিয়া, বহু সংশ্লিষ্ট, সহকারী ও সহযোগী শিল্পের উন্নতিবিধান করিতে পারিত, তাহাতে শোচনীয়রূপে বঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অধুনা পূর্ব-উপকূলে ভাইজাগাপটম (বিশাখাপত্তন) বন্দরে এই পোত-নির্মাণ-প্রাঙ্গণের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সিঙ্ক্রিয়া কোম্পানী এই উদ্দেশ্যে অংশীদারদের নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাঙ্গণ-নির্মাণের কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আজ যুদ্ধের প্রয়োজনে, যখন বহু পোতেরই প্রয়োজন, তখন একটি মাত্র পোত-নির্মাণ-প্রাঙ্গণের প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টা দেশের অথবা রাজশক্তির কল্যাণকল্পে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, যদি সরকার কর্তব্য বোধে সক্রিয় সাহায্য অথবা সহৃদয় আশ্বাসদানে কয়েকটি পোত-নির্মাণ-প্রাঙ্গণ এই সুদীর্ঘ ব্যবধানকাল মধ্যে সংগঠিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সাম্রাজ্যান্তর্গত স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশগুলির ত্রায় ভারতবর্ষও যথাযোগ্য সাহায্য দানে সমর্থ হইত।

গতীর পরিতাপের বিষয় এই যে, রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর নিমিত্ত আবশ্যিকায়ামী পোত আজ যুক্তরাজ্য এবং অষ্ট্রেলিয়ার পোত-নির্মাণ-প্রাঙ্গণে নির্মিত হইতেছে। রাজকীয় ভারতীয়-নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ এডামরাল ফিজ হারবার্ট সম্প্রতি তাঁহার বেতার-বক্তৃতায়

ভারতে পোত-নির্মাণ-শিল্পের সহিত ভারতের নৌ-বাহিনীর প্রয়োজনের যে নিকট সম্বন্ধ, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। আটটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি। জাহাজের এঞ্জিন এবং কাঠামো প্রস্তুতোপযোগী ইম্পাত ব্যতীত পোত-শিল্প-পরিচালন উপযোগী সকল প্রকার কাঁচা মালই ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে এই শিল্প মনোযোগী হইলে, ভারতে নির্মিত পোত আজ অনায়াসেই সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিতে পারিত।

যুদ্ধের বিষম পরিস্থিতি হেতু পোত-শিল্পের স্বরিত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। এই নিমিত্ত সিঙ্ক্রিয়া কোম্পানী বিলাত হইতে একটি পোত-নির্মাণ-প্রাঙ্গণ সরাসরি ভারতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রাঙ্গণে নির্মিত পোত সরকারের প্রয়োজনে সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহারা ভারত সরকারের সক্রিয় সহানুভূতিও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ এ-প্রস্তাবে রাজী হন নাই। ফলে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-সভার গত অধিবেশনে বাণিজ্য বিভাগের সম্পাদক সার এলান লয়েড ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধের প্রচেষ্টাকল্পে ভারতে বাণিজ্য-পোত নির্মাণ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সরকার এখন কোন সক্রিয় উৎসাহ দিতে প্রস্তুত নহেন। সুখের বিষয়, সম্প্রতি এই নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এবং ভাইজাগাপটমের প্রতিষ্ঠানকে সরকার যথাসম্ভব পরোক সাহায্যদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; কিন্তু যুদ্ধ-সঙ্কট হেতু এই বিলম্ব-বহুল প্রতিষ্ঠান-প্রচেষ্টা অতি মন্থরগতিতে অগ্রসর হইবে।

বর্তমান যুদ্ধ-প্রণালীতে, যুদ্ধের ক্ষতি এবং স্বাভাবিক দুর্ঘটনা-প্রসূত অপচয়ের দ্রুত পূরণার্থ সতেজ, সক্রিয়, ও বলিষ্ঠ পোত-নির্মাণ-শিল্প অত্যাাবশ্যিক। বর্তমান যুদ্ধ-প্রয়োজনের সুযোগ লইয়া ভারত যদি এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তাহা হইলে কালে নিজের চাহিদা মিটাইয়া, স্ময়ের পূর্ববর্তী দেশসমূহে পোত সরবরাহ করিতে পারিবে,—এ আশা ছরাশা নহে।

ভারতের সামুদ্রিক পোত-বাণিজ্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মেডোজ টেলারের ভারতের ইতিহাসও ('History of India) এ-বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে।

কিন্তু লণ্ডন বন্দরে ভারতে প্রস্তুত ও ভারতবাসী-পরিচালিত জাহাজের উপস্থিতি বিষম চাঞ্চল্য এবং ভবিষ্যৎ ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের (Directors) বিবৃতিতে ভারত ও বিলাতের মধ্যে বাণিজ্যে ভারতে প্রস্তুত জাহাজের গতিবিধির তীব্র প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল :—“No British heart would wish that any of the brave men who have merited so much of their country should be without bread whilst natives of the East brought the ships belonging to our own subjects into our own ports.”

এইরূপ তীব্র প্রতিকূল আচরণের ফলে পোত-শিল্প ও তদনুসঙ্গে পোত-বাণিজ্যের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। ভারতের পোত-শিল্প ও পোতবাণিজ্যের অধঃপতন, অনাচারের ইতিহাস—লজ্জার কাহিনী। আমরা অতীতের আখ্যায়িকা ত্যাগ করিয়া বর্তমানে মনোভিনিবেশ করিতেছি।

গত আগষ্ট মাসে বৃটিশ পোত-সচিব মিঃ রোনাল্ড ক্রস সাম্রাজ্যান্তর্গত স্বায়ত্তশাসনশীল দেশ ও অত্র পোত-নির্মাণ-শিল্পের প্রতিষ্ঠার সমর্থনে বলিয়াছিলেন,—“Our resources are great, but they cannot be too great to meet the needs of the future, and we should frankly welcome all means of increasing our shipping by the aid of the ship yards of the Dominions and elsewhere.” ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই এই elsewhere অর্থাৎ “অত্র” শব্দটির অন্তর্ভুক্ত; তথাপি বৃটিশ-কর্তৃপক্ষের মনোভাব ভারতে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠার অমুকুল নহে, বরং প্রতিকূল মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সক্রিয়কতা পৃষ্ঠপোষণ ব্যতীত মৌখিক সহায়তের কোন মূল্য নাই।

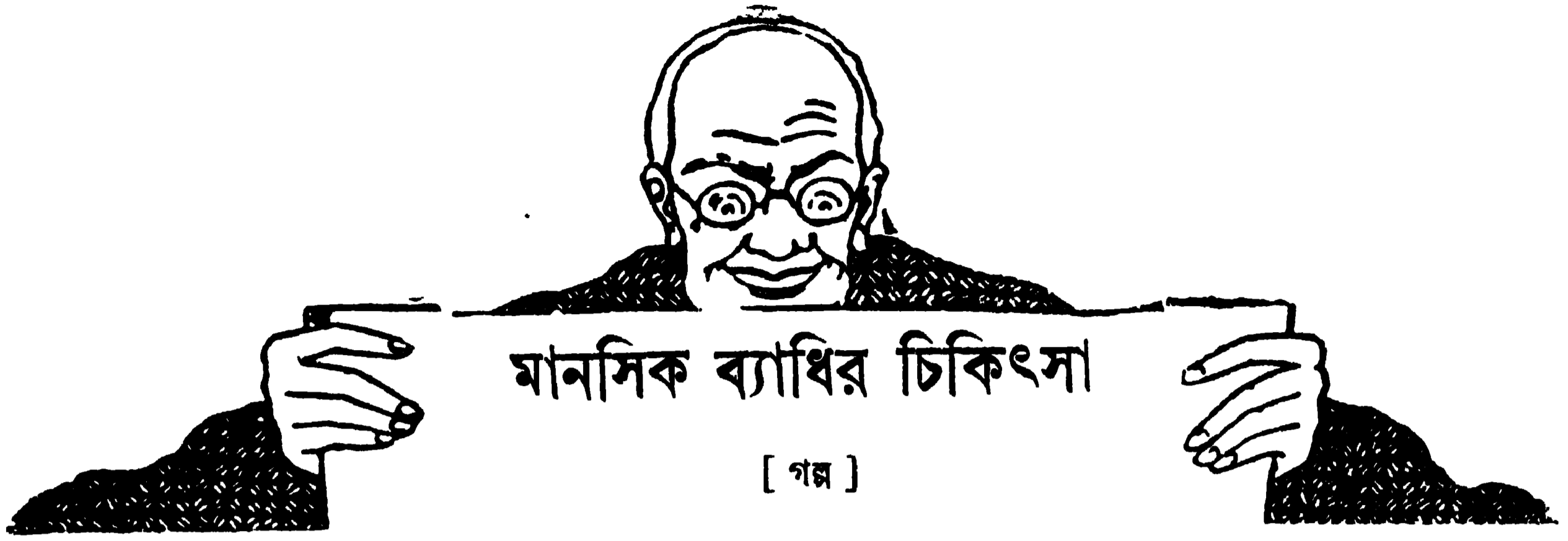
সম্প্রতি রাজকীয় ভারতীয়-নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ এডমিরাল ফিজ্‌হাৰ্ভাট বলিয়াছেন :—“It is obvious to me and I think, to a great many other

people that the sooner a ship-building industry is started, the better for India. Such an industry, to be successful, needs courage, enterprise and forthought. That all these are present in India is a fact that cannot be denied.” সুতরাং সরকারের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত, ভারতে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠার আর কোন অভাব নাই। বৃটিশ রাজশক্তি আমেরিকা ও কানাডা হইতে জাহাজ ক্রয় করিতেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার পোতশিল্প রাষ্ট্র-সাহায্যে অভ্যুদয়শীল। অষ্ট্রেলিয়া সম্প্রতি বৃটেনের নিমিত্ত যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিলাতের কর্তৃপক্ষ অর্থানুকূলে তুরস্কে পোত-নির্মাণ-প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠা প্রযত্নে ব্যাপৃত। একমাত্র মন্দভাগ্য ভারতের প্রতি সেরূপ সযত্ন ও সাগ্রহ দৃষ্টি নাই। কিন্তু পোতশিল্পের সহিত ভারতের উপকূল-রক্ষার প্রশ্ন বিজড়িত। রণতরীবহর প্রথম রক্ষিবাহিনী; বাণিজ্যতরীবহর দ্বিতীয় রক্ষিশ্রেণী। সুতরাং একের সহিত অপরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উভয়েরই একত্র এবং একান্ত প্রয়োজন।

প্রাচ্য-গুচ্ছের দিল্লী বৈঠক উপলক্ষে ভারত-সচিব সে দিন বলিয়াছিলেন,—“The Delhi conference has been laying for India the foundation of increased industrial and defensive power which are essential conditions to-day of true self-government.”

ভারতকে যদি স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইতে হয়, তাহা হইলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাষ্ট্ররক্ষা—উভয়কল্পেই পোত-নির্মাণ-শিল্পের আশু প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। পরবশতায় কল্যাণ নাই; সুতরাং আত্মনির্ভরশীল আত্ম-প্রচেষ্টাই আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র মুখ্য উপায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সিঙ্ক্রিয়া কোম্পানীর পূর্ব-উপকূলের পোত-প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টা কল্যাণকর। অচিরে ভারতের একটি নিজস্ব বলিষ্ঠ বাণিজ্যতরী-বহর অত্যাৱশ্যক। জাতীয় বাণিজ্য-বিস্তারের ইহাই মুখ্য উপায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।



১

ডাক্তার হৃদয়বিহারী মুখ্যে ভবানীপুরের এক জন নাম-জাদা ডাক্তার। ডাক্তার বাবু দরিদ্রের সন্তান; অসচ্ছল অবস্থা হইতে অধ্যবসায়, প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে এখন ভবানীপুরে 'দশ জনের এক জন' হইয়াছেন। তাঁহার পিতা বন্ধিমবিহারী কলিকাতার একটা মার্চেন্ট আফিসে অল্প বেতনে কেরাণীগিরি করিয়া অতি কষ্টে সংসার পালন করিতেন। তিনটি কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। ছোট মেয়ের বিবাহের ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাকে বাড়ীখানি বন্ধক দিতে হইয়াছিল। হৃদয়-বিহারী সেই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার কলেজে পড়িবার সুযোগ হইয়াছিল।

হৃদয়বিহারী এফ-এ পরীক্ষাতেও বৃত্তি পাইয়া ডাক্তারী পড়িবার জন্য মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি মেডিকেল কলেজের প্রত্যেক পরীক্ষাতে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি ও পদক পাইতেন। এজন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার পর বন্ধিম বাবুকে পুত্রের শিক্ষার জন্য কিছুই ব্যয় করিতে হয় নাই। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিবার পূর্বেই শোভাবাজারের কোন খ্যাতনামা চিকিৎসকের কন্যা সত্যভামার সহিত হৃদয়বিহারীর বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহে বন্ধিম বাবু বৈবাহিকের নিকট প্রায় তিন হাজার টাকা পাইয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

হৃদয়বিহারী যথাসময়ে মেডিকেল কলেজের শেষ এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভবানীপুরেই চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

বন্ধিমবিহারী পুত্রকে উপার্জনশীল এবং উন্নতি-পথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন।

ইহার পর প্রায় পঁচিশ-ছাশ্বিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালে হৃদয় বাবুর সাংসারিক এবং পারিবারিক পরিবর্তন বড় অল্প হয় নাই। দরিদ্র কেরাণী বন্ধিমবিহারীর ক্ষুদ্র জীর্ণ ইষ্টকালয়ের পরিবর্তে সেখানে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক হৃদয়বিহারীর অতি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা গর্ভোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়াছে। বন্ধিমবিহারী প্রতি দিন আফিসের কার্য শেষ করিয়া অবসন্নদেহে শ্রান্ত-পদে ধীরে ধীরে যে গলির ভিতর দিয়া জীর্ণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন, এখন সেই গলিতে হৃদয় ডাক্তারের মোটরগাড়ী তাহার বংশীধ্বনিতে পল্লীবাগী-দিগকে সচকিত করিয়া দিবারাত্রি যাতায়াত করিতেছে। বন্ধিম বাবু এক দিন যে পুত্রের স্কুলের বেতন এবং পাঠ্য-পুস্তক সংগ্রহের জন্য চিন্তায়, অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিতেন, এখন বন্ধিমবিহারীর সেই পুত্র দশ-বারটি দরিদ্র ছাত্রের স্কুলের মাসিক বেতন যোগাইয়া আসিতেছেন, এবং কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রকে নিজের গৃহে রাখিয়া প্রতিপালনও করিতেছেন।

বলিয়াছি, হৃদয় বাবুর পারিবারিক পরিবর্তনও বড় অল্প হয় নাই। ডাক্তার হৃদয় বাবুর পিতার মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাঁহার জননীও মৃত্যু হয়। প্রোঢ়া সত্যভামাই এখন সংসারের কর্তা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায় চব্বিশ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন সুবক বিজ্ঞবিহারী মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। বিজ্ঞবিহারীর পর দুইটি কন্যা চাকলতা ও পুপলতা; তাহারা উভয়েই বিবাহিতা। চাকলতার একটি পুত্রসন্তান; পুপলতার এখনও সন্তান হয় নাই। পুপলতার পর

বার বৎসর বয়স্ক বিমানবিহারীর এখনও উপনয়ন হয় নাই। হৃদয় ডাক্তারের পরিবারে এই কয় জন লোক হইলেও দুঃস্থ, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-আত্মীয়ারও অভাব নাই; দূর-সম্পর্কীয় একটি মাতুলও সস্ত্রীক ও সকন্তা তাঁহার সংসারে প্রতিপালিত হইতেছেন। ইহা ছাড়া ডাক্তার বাবুর দুই জন কম্পাউণ্ডার, মোটর-ড্রাইভার, এবং বাজার-সরকারও তাঁহার পোষ্য। বিমানের গৃহশিক্ষক নিবারণ বাবুও তাঁহার বাড়ীতেই বাস করিয়া একটা আফিসে চাকরী করেন। এই সকল কর্মচারী ব্যতীত দ্বারবান, বেহারী, খানসামাও অনেকগুলি।

বিজ্ঞান মেডিকেল কলেজে পড়ে, পিতা কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক, স্ত্রীরাং কন্তাদায়গ্রস্ত অনেক ভদ্র-লোক হৃদয় বাবুর দ্বারস্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ, ডাক্তার বাবুর সঙ্কল্প, পুত্র উপার্জনক্ষম না হইলে তিনি তাহার বিবাহ দিবেন না।

২

শ্রামপুকুরের কুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার একটা সওদাগরী আফিসে মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে চাকরী করেন। শ্রামপুকুরের বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের অবস্থা এক সময় বিলক্ষণ সমৃদ্ধ ছিল। জনরবে প্রকাশ, বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের আদিপুরুষ বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর চাকরী করিয়া প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কালে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কলহ-বিবাদ এবং মামলা-মোকদ্দমা প্রবেশ করায় অনেককেই নিঃস্ব হইতে হইয়াছিল; কেহ কেহ পৈতৃক-বাড়ীর অংশ বিক্রয় করিতেও বাধ্য হইয়া-ছিলেন। কুমারনাথ বাবুর প্রপিতামহ, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন বংশধরের বাড়ীর অংশ ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তিনি যে অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রাসাদাস্তঃপুরের খিড়কীর দ্বারের এক পাশ্বে অবস্থিত। তিনি ক্রীত অংশের জীর্ণ-সংস্কার করাইয়া, প্রাচীন অট্টালিকার খিড়কীর দ্বারকে নিজের অংশের সদর দ্বারে পরিণত করেন। প্রাচীন অট্টালিকার সদর দ্বার বড় রাস্তার উপরে অবস্থিত; পশ্চাতে খিড়কীর দ্বার একটা গলি-পথের উপরে ছিল।

শ্রামপুকুরের বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের সহিত কুমারনাথ বাবুদের কোনওরূপ জ্ঞাতিত্ব সঙ্ঘর্ষ বা শোণিত-সংশ্রব না থাকিলেও, কুমারনাথের পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়-বাড়ীর এক অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত-পালিত হওয়ায়, বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রাচীন বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের কোন কোন পরিবারের “ঘরের ছেলে” হইয়া-ছিলেন। তিনি পিতার নির্দেশক্রমে ঐ সকল পরিবারের বয়োবৃদ্ধ লোকদের মধ্যে কাহাকেও “জ্যাঠামশায়,” কাহাকেও “কাকা”, কাহাকেও “দাদা” বলিয়া সম্বোধন করিতেন; মহিলাদিগকেও “জ্যাঠাইমা” “কাকীমা” “পিশিমা” বা “দিদি” বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহারাও এই নবাগত পরিবারের প্রিয়দর্শন বালকটিকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

কুমারনাথও বাল্যকালে পিতার শ্রায় বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইয়া আপনাকে সেই সুপ্রাচীন পরিবারের অন্ততম বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ যে ছগলী জেলার নালিকুল গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন—এ কথা তাঁহার জানা থাকিলেও তিনি আপনাকে খ্যাতনামা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিলেন।

কুমারনাথ এইরূপে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধর হইলেন বটে, কিন্তু সেজন্ত তাঁহাকে মধ্যে-মধ্যে একটু বিপদেও পড়িতে হইত। বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের কর্তৃস্থানীয় বৃদ্ধ রামলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুমারনাথ “জ্যাঠামশাই” বলিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের মধ্যে রামলোচন বাবুর অবস্থাই ভাল ছিল। এক দিন কুমারনাথ আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া গুনিলেন, রামলোচন বাবু মধ্যাহ্ন-কালে সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার মৃতদেহ সংকারের জন্ত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কুমারনাথ বিশ্রামান্তে জলযোগ সারিয়া ধূমপানের পর নগ্নপদে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন, এবং গভীর রাত্রিতে শ্মশান-বন্ধুদের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলেন। পরদিন হইতে তিনি অশৌচ গ্রহণ করিয়া পাছকা ত্যাগ করিলেন। আফিসের বাবুরা তাঁহাকে নগ্নপদ দেখিয়া

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কুমারনাথ বলিলেন, “জ্যাঠামশায়ের গঙ্গালাভ হইয়াছে।”

মৃত রামলোচন বাবুর পুত্র সুলোচন, তিন-চারি দিন পরে কুমারনাথের নগ্নপদ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমার দাদা, ব্যাপার কি? আপনার খালি পা কেন?”

কুমারনাথ বলিলেন, “আর কেন? যে দিন এখানে জ্যাঠামশায় মারা যান, সেই দিনই আমার এক দাদামশায়—অর্থাৎ আমার পিতামহের জ্যাঠাতুত ভাই মারা গেছেন। তাঁর বয়স ছিয়ানব্বই বছর হ’য়েছিল। নালিকুলের একটি বাবু আমাদের আফিসে কাজ করেন, পরশু দিন তাঁরই মুখে এই খবর পেলাম।”

যে দিন রামলোচন বাবুর পুত্রদের ও জ্ঞাতিবর্গের অশৌচান্ত হইল, সেই দিন কুমারনাথ বাবুও গঙ্গার ঘাটে গিয়া গৌফ কামাইয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য, “জ্যাঠামশায়” বা “দাদামশায়ের” মৃত্যুতে কুমারনাথ বাবু কেবল পাছুকা ত্যাগ করিয়াই অশৌচ পালন করিয়াছিলেন, মৎস্য-মাংসাদি ভোজন বন্ধ রাখিবার অঙ্গবিধা সঙ্ঘ করেন নাই।

কুমারনাথ বাবু আর এক দিক দিয়াও “বনিয়াদী” বনিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাহিরের ঘরে কয়েকটা পুরাতন আস্‌বাব ছিল। তাঁহার পিতা ঐ সকল আস্‌বাব বহুবাজারের পুরাতন আস্‌বাবের দোকান বা চোরাবাজার হইতে সুলভ মূল্যে কিনিয়া-আনিয়া বৈঠকখানা সাজাইয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কুমারনাথ গৃহস্থামী হইয়া আবিষ্কার করিলেন যে, ঐ সকল আস্‌বাবের পশ্চাতে এক-একটি প্রাচীন ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। বৈঠকখানার এক পার্শ্বে মার্কল-পাথরের একখানা ছোট টেবিল ছিল, সেই টেবিল কুমারনাথের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে না কি উপহার পাইয়াছিলেন। বৈঠকখানার কাচের দেওয়ালগিরি কুমারনাথের পিতামহ লঙ্কোএর নবাব ওয়াজিদ আলি সাহের সহিত দাবা-খেলায় বাজি জিতিয়া লাভ করিয়াছিলেন। বৈঠকখানার তক্তাপোশের উপর যে ছিন্ন গালিচাখানা প্রসারিত ছিল, সেখানা না কি এক সময় পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবার-কক্ষের শোভাবর্ধন করিত; মহারাজের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার অস্থাবর

সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হয়, সেই সময় কুমারনাথের পিতামহ ঐ গালিচাখানা ক্রয় করেন। বৈঠকখানার অধিকাংশ আস্‌বাবেরই এইরূপ এক-একটা ইতিহাস কুমারনাথ বাবুর মুখে যখন-তখনই শুনিতে পাওয়া যাইত।

কুমারনাথ বাবুর পক্ষে “বনিয়াদী” হইবার আর একটা সুবিধা এই ছিল যে, তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার পিতা-পিতামহ সকলেই অতি উজ্জল গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে সহজেই মনে হইত, সাধারণ দরিদ্রের বংশে তাঁহার জন্ম নহে। তাঁহার কেশের পারিপাট্য, বেশভূষার বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে যেন জনসাধারণ হইতে অনেকটা পৃথক করিয়া রাখিত।

কুমারনাথের পরিজনবর্গের মধ্যে তাঁহার পত্নী হেমাজিনী, কন্যা সুলোচনা ও সুষমা, এবং তিনি স্বয়ং। সংসারে এই চারি জন মাত্র লোক, বাড়ীটা নিজের, ভাড়া দিতে হয় না; তথাপি মাসিক দেড় শত টাকা বেতনের চাকুরী করিলেও তিনি বেতন হইতে একটি পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারেন না। সংসারে কাজ করিবার জন্ত এক জন বেহারা আছে, এক জন দাসী আছে, রন্ধনের জন্ত জগন্নাথ-মার্কী এক “ঠাকুর” আছে। দুই বৎসর হইল, সুলোচনার বিবাহ হইয়াছে; সুলোচনার স্বস্তর পুত্রের বিবাহের সময় টাকাকড়ি দাবী করেন নাই। সুলোচনার প্রায় এক হাজার টাকার গহনা ছিল, বিবাহের জন্ত নূতন কোনও গহনা তৈয়ারী করাইতেও হয় নাই, তথাপি কুমারনাথ কন্যার বিবাহের জন্ত হেমাজিনীর সমস্ত অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া বার শত টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরে সুদে-আসলে ঋণের পরিমাণ প্রায় দেড় হাজার টাকা হইয়াছিল। এই অবস্থাতেও কুমারনাথ বার আনা সের পটল, আট আনা জোড়া ফুলকপি কিনিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেন না। বনিয়াদী চাল কি করিয়া ত্যাগ করেন?

কর্তৃপতির এই অপব্যয় নিবারণের জন্ত হেমাজিনী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। সুষমার বয়স প্রায় বোল বৎসর, শীঘ্রই তাঁহার বিবাহ দিতে হইবে; তথাপি কুমারনাথ পূর্ববৎ মুক্তহস্তে বিলাসিতার ইচ্ছন যোগাইতে লাগিলেন।

৩

হৃদয় বাবু ভবানীপুরে চিকিৎসা করিলেও অনেক সময় কলিকাতাতেও তাঁহার 'ডাক' হইত ; এই উপলক্ষে তাঁহাকে বাগবাজার ও শ্রামবাজারেও যাইতে হইত। সে সময় তিনি স্নযোগ পাইলেই একবার শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া সকলের কুশল সংবাদ লইতেন। তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত ছিলেন না ; সত্যভামার কনিষ্ঠ সহোদর উমাচরণই এখন বাড়ীর কর্তা। উমাচরণ তেমন কোন কাজকর্ম করিতেন না ; তাঁহার পিতার আমলের ডিম্পেন্সারির আয় এবং পিতার অর্জিত কোম্পানীর কাগজের সুদ হইতেই তাঁহার সংসার চলিত। উমাচরণের স্ত্রী এই সংসারের গৃহিণী হইলেও প্রকৃত কর্তৃত্ব করিতেন উমাচরণের মামাত-ভগিনী ভগবতী দেবী। ভগবতী দেবী বিধবা ; তাঁহার একমাত্র কন্যা যশোর জেলায় শ্বশুরালয়ে থাকেন, জামাতা যশোরে মোক্তারি করেন। ভগবতী দেবীর শ্বশুরবাড়ী চোরবাগানে, সে বাড়ী ভাড়া দেওয়া আছে, উমাচরণই এখন তাঁহার অভিভাবক। ভগবতী হৃদয় বাবু অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের বড়।

বিজ্ঞানবিহারী ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চারি-পাঁচ দিন পরে এক দিন অপরাহ্নকালে হৃদয় বাবু বাগবাজারে রোগী দেখিতে গিয়া ফিরিবার সময় শ্রাম-বাজারে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। ভগবতী তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া বাড়ীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“হৃদয়, বিজ্ঞান পাশ দিয়েছে শুনে বড় আনন্দ হ'ল। সন্দেহ খাওয়াবে কবে ?”

হৃদয় বাবু বলিলেন, “আপনার বোনপো পাশ ক'রেছে, আপনারই উচিত আমাকে খাওয়ান।”

“পাশের দোহাই দিয়ে এত দিন তো ছেলের বিয়ে দিলে না, এখন তো আর সে আপত্তি নেই, এইবার ছেলের বিয়ের চেষ্টা কর।”

হৃদয় ডাক্তার বলিলেন, “কাল সত্যভামাও আমাকে বিজ্ঞানের বিয়ের কথা ব'লছিল। এইবার একটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধান করা যাক।”

“আমি তোমাকে একটি মেয়ের সন্ধান দিতে পারি ; তেমন সুন্দরী লাখে একটা মেলে না! তাকে

যদি বো ক'রতে পার, তবে তোমার ঘর-আলোকরা বো হবে।”

ডাক্তার বলিলেন, “কার মেয়ে ? আপনার কেউ হয় না কি ?”

ভগবতী বলিলেন, “তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকলেও তারা অনেক দিন থেকে আমাদের ঘরের লোক ব'ললেই হয়। তুমি বোধ হয় জান, আমার মা শ্রামপুকুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর মেয়ে ; রামলোচন বাঁড়ুয্যে আমার মায়ের কাকা ছিলেন। এই বাঁড়ুয্যে-গুপ্তি এখন অনেক যায়গায় ছড়িয়ে প'ড়েছে। আমরা গল্প শুনেছি, সে-কালে এই বাঁড়ুয্যে-গুপ্তির এক জন, তাঁর বাড়ীর অংশ বেচে ফেলেছিলেন। সেই সময় নীলমণি বাঁড়ুয্যে ব'লে এক ব্রাহ্মণ ঐ পাড়াতে বাড়ী ভাড়া ক'রে বাস ক'রতেন। হুগলী জেলায় নালিকুল না কি এক গাঁয়ে তাঁর বাড়ী ; তিনি বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর সেই অংশটা কিনে বাস করেন। সেই নীলমণি বাঁড়ুয্যের নাতি খনশ্রাম বাঁড়ুয্যে আমার দাদামশায়কে “দাদা” ব'লে ডাকতেন। ঘনশ্রামের ছেলে কুমারনাথ বাঁড়ুয্যের দু'টি মেয়ে আছে। বড় মেয়ের আজ বছর-দুই হ'ল বিয়ে হ'য়ে গেছে, ছোট মেয়ে স্নষমার বয়সও বছর পনের-ষোল হ'ল। মেয়েটি যেমন ধীর, ঠাণ্ডা, তেমনি তার রূপ। দুই বোন যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী। মেয়েটি ইঞ্চলে পড়ে, ইংরেজী জানে : ছাঁট, কাট, সেলাই, উলের কাজ সব শিখে ফেলেছে।”

হৃদয় বাবু বলিলেন, “দিদি, আপনি যখন ব'লছেন, তখন সে মেয়ে বোধ করি ভালই হবে। এই কুমারনাথ বাবু কি করেন ? তাঁরা লোক কেমন ?”

“কুমারনাথ শুনেছি কোন্ সাহেবের আফিসে কাজ করে, শ' দেড়েক টাকা মাইনে পায়। বোটি যেন স্বয়ং লক্ষ্মী, গোবেচারী ; কেউ তার মুখে কখনও একটা উচু কথা শোনেনি। কুমারনাথও নিরীহ লোক, কাকু সঙ্গে এক দিনের জ্ঞাও ঝগড়া-বিবাদ নেই। দোষের মধ্যে লোকটা ঘোর বাবু। তামাক ছাড়া আর কোন রকম নেশা-টেশা করে না। পাড়া-সম্পর্কে কুমার আমার মামা হয়, কিন্তু আমি বয়সে তার অনেক বড় কি না, তাই সে আমাকে “পিসিমা” ব'লে ডাকে। বাবুগিরির জন্তে হাতে

একটা পয়সাও সে রাখতে পারলে না। যা রোজগার করে, ছ'হাতে উড়ায়! বার'শ টাকায় বৌর গয়না বাঁধা দিয়ে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। সংসারে খেতে তো মোট তিনটে লোক, বাড়ীভাড়াও দিতে হয় না; মনে করলে মাসে মাসে পঞ্চাশটা টাকাও তো ডাকঘরে ফেলে রাখতে পা'রত, তা হবার যো নেই! তার আর একটা বেয়াড়া খেয়াল আছে,—সকলকে সে জানাতে চায়, সে ঐ বাঁড়ুঘোবাড়ীরই সন্নিক, রামচন্দ্র বাঁড়ুঘো তারই পূর্বপুরুষ। তার চালচলন দেখে, কথাবার্তা শুনে লোকে কথাটা সত্যি মনে করে। আমরা ঘরের খবর জানি কি না, যারা জানে না, তারা কুমারকে বাঁড়ুঘো-বংশেরই ছেলে বলে মনে করে।”

হৃদয়বিহারী হাসিয়া বলিলেন, “দিদি, মাছুষমাত্রেয়ই কোন না কোন বিষয়ে দুর্বলতা থাকে; কুমার বাবুরও দেখছি, ঐ রকম দুর্বলতা আছে। থাকুক, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। দেখি, যদি মেয়েটি আমাদের পছন্দ হয়, তা' হলে তাকে নিতে আপত্তি কি?”

“মেয়ে দেখলে তোমার কোন আপত্তিই হবে না; তবে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে তোমাকে একটু বিবেচনা ক'রতে হবে। শুনলেই তো, বৌর গয়না বাঁধা দিয়ে বড় মেয়েটি পার ক'রেছে, ছোট মেয়ের বিয়েতে বাড়ীখানাও হয় তো বাঁধা পড়বে।”

“সে কথা আমার বেশ জানা আছে। আমার ভগিনীদের বিবাহের জন্ত আমার বাবাকেও বাড়ী বাঁধা দিতে হ'য়েছিল। কতাদায় যে কি বিষম দায়, তা আমি জানি তো, আমার ছেলের বিয়েতে আমি কতটা-কর্তার কাছ থেকে একটা পয়সাও দাবী ক'রবো না।”

“তোমার অভাব কি ভাই যে, কুটুমের কাছে হাত পাততে যাবে? আশীর্বাদ করি, মা-লক্ষ্মী তোমার ঘরে চিরদিন অচলা থাকুন।”

৩

শনিবার বেলা দুইটার সময় অফিস বন্ধ হইলে কুমারনাথ বাবু বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৈঠকখানাতে বসিয়া সিগারেট টানিতেছেন! কুমারনাথ তাঁহাকে পূর্বে কখনও দেখেন নাই। কুমারনাথকে দেখিবামাত্র আগন্তুক মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলে কুমার বাবু বলিলেন, “কাকে চান? আপনার নিবাস?”

“আমি কালীঘাট থেকে আসছি; কুমারনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।”

“আমারই নাম কুমারনাথ বাঁড়ুঘো। আমার কাছে মহাশয়ের প্রয়োজন?”

আগন্তুক সসম্মানে ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “প্রণাম,—আপনি বোধ করি, অফিস থেকেই বাড়ী ফিরছেন? আপনার সঙ্গে কথা আছে; আপনি মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন, আমি অপেক্ষা ক'রছি।”

“আচ্ছা বসুন, আমি আসছি।”—কুমার বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে আগন্তুক উপবেশন করিয়া পুনরায় ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। কুমার বাবু বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া প্রায় দশ মিনিট পরে বৈঠকখানায় আসিলেন ও আসন গ্রহণ করিয়া আগন্তুককে বলিলেন, “মহাশয়ের নাম?”

“আমার নাম উমাপদ মিত্র। আপনি বোধ হয়, ভবানীপুরের ডাক্তার বাবুর হৃদয় নাম শুনে থাকবেন—হৃদয়বিহারী মুখুযো খুব নামজাদা ডাক্তার। আমি তাঁর কালীঘাট-ডিসপেনসারির ম্যানেজার। ডাক্তার বাবু তাঁর পুত্রের জন্ত একটি সুন্দরী পাত্রী খুঁজছেন। তিনি শু'নেছেন, আপনার একটি বিবাহযোগ্য সুন্দরী মেয়ে আছে। আপনি এখন সেই মেয়েটির বিবাহ দিতে ইচ্ছুক কি না, তিনি আমাকে তাই জানতে পাঠিয়েছেন। যদি আপনার বিবাহ দিতে আপত্তি না থাকে, তা' হলে আমি একবার মা-লক্ষ্মীকে দেখে যেতে ইচ্ছা করি।”

কুমারনাথ বলিলেন, “মেয়ে পনের-ষোল বৎসরের হ'ল; যত শীঘ্র পারি, তাকে পার করতেই হবে। ডাক্তার বাবুর নাম অনেক দিন থেকেই জানি; কলকাতার কে হৃদয় ডাক্তারের নাম না জানে? কিন্তু আমি গরীব কেরাণী, আমি কি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রতে পারব? কর্তাদের আমলের সাতকুকুরে ঠাকুর-দালান, আর প্রকাণ্ড চকমিলান বাড়ী দেখে আমাকে বড়মাছুষ মনে ক'রলে ভুল ক'রবেন। অবশ্য, সন্নিকদের মতো ছ'-এক ঘরের অবস্থা এখনও ভাল আছে বটে, তবে অধিকাংশেরই অবস্থা আমার মতন—চাকরি না ক'রলে

উনানে হাঁড়ি চড়ে না।—ডাক্তার বাবুর ছেলেটি কি করেন ?”

“এইবার এম-বি পাশ করেছেন।”

কুমারনাথ বাবু বেহারাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমার আর এই বাবুটির জন্মে দু’ কাপ চা তোমার দিদিমণিকে এখানে দিয়ে যেতে বল, আর এই বাবুর জন্ম কিছু জলখাবার নিয়ে আস।”

উমাপদ বাবু বলিলেন, “আবার জলখাবার কেন ? চা-ই যথেষ্ট।”

কুমারনাথ হাসিয়া বলিলেন, “তা কি হয় ? সকল শুভ-কাজের প্রস্তাব মিষ্টিমুখেই আরম্ভ করতে হয়।”

সুসমা চা লইয়া আসিলে উমাপদ তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। একাধারে এত রূপ তিনি আর কখনও দেখেন নাই। মুখ, নাক, চক্ষু, হাত-পায়ের গড়ন, দেহের বর্ণ, মাথার চুল, সমস্তই নিখুঁত ; বিধাতার অপূর্ণ দান !

উমাপদ বাবু সুসমার হাত হইতে চা লইয়া বলিলেন, “কুমার বাবু, আপনি যথার্থই ভাগ্যবান। এমন সর্ব-স্বলক্ষণা মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি।—তোমার নাম কি মা-লক্ষ্মী ?”

সুসমা বীণা-নিন্দিত স্বরে বলিল, “শ্রীমতী সুসমা দেবী।”

উমাপদ বাবু বলিলেন, “দেবীই বটে। সাক্ষাৎ সরস্বতী। এমন দেবীর নামের শেষে যারা বাঁড়ুষ্যে, চাটুষ্যে, মুখুষ্যে বসাতে চায়, তারা আহাশ্বখ ভিন্ন আর কি ? দেবীর মর্যাদা তারা বোঝে না।”

জলযোগান্তে উমাপদ বাবু বিদায় লইবার সময় বলিলেন, “কাল সকালে আমি ডাক্তার বাবুকে নিয়ে আসব। খুব সকাল না হ’লে তাঁর সময় হবে না, সারা দিনে তাঁর তো অবকাশ নেই। তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে আসতে পারেন।”

পরদিন রবিবার প্রভাতে ডাক্তার বাবু সঙ্গীক উমাপদ বাবুর সঙ্গে কল্যা দেখিতে আসিলেন। তিনি যে অত সকালে আসিবেন, কুমার বাবু তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ডাক্তার বাবু সাড়ে-আটটা কি নয়টার সময় আসিবেন, তাই তিনি নিশ্চিন্ত চিন্তে

বেহারাকে দিয়া বৈঠকখানা ঘরটি পরিষ্কার করাইতে ছিলেন। এমন সময় মোটরের হর্ণের শব্দে বিস্মিত হইয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, পূর্বদিনের সেই বাবুটির সঙ্গে ডাক্তার বাবু সঙ্গীক আসিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে যাইবার পূর্বেই হৃদয় বাবু সত্যভামাকে লইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। হর্ণের শব্দ শুনিয়া কুমারনাথের স্ত্রী হেমাঙ্গিনীও অস্তঃপুর হইতে বৈঠকখানার দিকে আসিতেছিলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া কুমারনাথ বলিলেন, “ডাক্তার বাবুর স্ত্রী এসেছেন, এঁকে আগে উপরে নিয়ে যাও।”

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে সত্যভামা উপরে চলিয়া গেলে কুমার বাবু বলিলেন, “আপনার মত লোককে বসাই এমন স্থান আমার নাই। আমি সামান্য লোক, কেরাণীগিরি করি। অবশ্য, কর্তাদের আমলের কথা আলাদা। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই—হা-হা, হি-হি।”

কুমারনাথের কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বোধ হয় মনে করিলেন, সে অযোধ্যা বা সে রামচন্দ্র না থাকিলেও হনুমান আছে ; প্রকাশে বলিলেন, “আপনি তো দেড় শত টাকা বেতন পান। আমার বাবা আশী টাকা বেতনের কেরাণী ছিলেন। শুনেছি, আমার পিতামহ ত্রিশ টাকা বেতনে স্কুলে পণ্ডিত ক’রতেন। আপনি তো তার পাঁচ গুণ বেতন পান।”

বলা বাহুল্য, ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার সময়, দিল্লীর বাদশাহের প্রদত্ত টেবিল, ওয়াজিদ আলি সাহেব প্রদত্ত দেওয়ালগিরি, রণজিৎ সিংহের দরবারের গালিচা প্রভৃতি দেখাইয়া কুমার বাবু ডাক্তার বাবুকে বিস্মিত করিতে ভুলেন নাই।

হেমাঙ্গিনী সত্যভামাকে লইয়া উপরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন সুসমা কল-ঘরে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। সত্যভামাকে বসাইয়া হেমাঙ্গিনী, বোধ হয় সুসমাকে সাবধান করিবার জন্মেই কক্ষান্তরে গিয়াছিলেন। মাঘ মাস, শীতকাল, সুসমা কল-ঘর হইতে শুধু একটা ফ্রানেলের সেমিজ পরিয়া বাহির হইল, এবং কোন্ কাপড়খানা পরিবে, জননীকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্মে “মা” বলিয়া যেমন হেমাঙ্গিনীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল, সত্যভামা তখনই “কেন মা”

বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। হেমাদ্রিনী সত্যভামার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি তথায় আসিয়া দেখিলেন, সত্যভামা এক হাতে সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, অত্র হাতে তাহার অর্ধপ্রস্থটিত গোলাপের মত মুখখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

সুষমাকে দেখিয়া ডাক্তার বাবুরও খুব পছন্দ হইল। তিনি কুমার বাবুকে বলিলেন, “আমি এই মা-লক্ষ্মীকেই আমার পুত্রবধু ক’রব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এত শীতে স্ত্রীবিধা হবে না, ফাল্গুন মাসের শেষে একটা শুভদিনে মাকে বরণ করে ঘরে তুলব। আমি পণ-প্রথার দারুণ বিরোধী। আপনি আমার পুত্রকে মাত্র একটি আংটি দেবেন, তার বেশী আর কিছুই আপনাকে দিতে হবে না। আপনি স্ত্রীবিধামত এক দিন আগার ছেলেকে দেখে আসবেন। বিজ্ঞকে দেখলে আপনি তাকে সুষমার অযোগ্য বলে মনে করবেন না।”

কথাবার্তা শেষ করিয়া বেলা নয়টার সময় ডাক্তার বাবু সপত্নী প্রস্থান করিলেন।

৫

১৮ই ফাল্গুন বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। বিবাহের সাত দিন পূর্বে, কুমারনাথ বাঁড়ুঘো-পরিবার হইতে সংগৃহীত কুড়ি-পঁচিশ জন “জ্ঞাতি” সঙ্গে লইয়া পাত্র-আশীর্বাদ করিয়া আসিলেন। এই আশীর্বাদ বা “পাকা-দেখা” উপলক্ষে ডাক্তার বাবু ভোজ্যদ্রব্যের কোনরূপ আড়ম্বর করেন নাই। কলিকাতার আধুনিক প্রথায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ রকম আমিষ ও নিরামিষ ব্যঞ্জন, আট-দশ প্রকার মিষ্টান্ন, এবং সময়ের ও অসময়ের নানা প্রকার দুর্ন্যূন ফলে খালা সাজাইয়া ভোক্তাদিগকে বিম্বিত করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। দুই-তিন রকম নিরামিষ, এক রকম আমিষ ব্যঞ্জন, একটা চাটনি, দধি, ক্ষীর এবং দুই প্রকার মিষ্টান্ন—সন্দেশ ও রসগোল্লা, ইহারই তিনি আয়োজন করিয়াছিলেন; তবে প্রত্যেক দ্রব্যই অত্যন্ত উপাদেয় ও মুখরোচক হইয়াছিল। আশীর্বাদ এবং ভোজনাদির পর ডাক্তার বাবু ভাবী বৈবাহিককে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরের কক্ষগুলি দেখাইয়া আনিলেন। তিনি কুমার বাবুকে বলিলেন,—“আপনার কন্যা যে বাড়ীতে

এসে আজীবন বাস করবে, সে বাড়ীর সকল খুঁটিনাটি স্ত্রীবিধা-অস্ত্রবিধা আপনাকে দেখিয়ে রাখাই আমি সঙ্গত মনে করি।”

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে স্নলোচন বাবু অত্রাণ কথার পর বলিলেন, “ডাক্তার বাবু লোক মন্দ ন’ন, তবে মনে হ’ল, ভদ্রলোক একটু দৃষ্টি-রূপণ।—ভোজনের ব্যবস্থাটা সেই মায়ুলি ধরণের।”

কুমারনাথ বলিলেন, “টাকা রোজগার ক’রলেই নজর দরাজ হয় না। বনেদি ঘরের নজরই আলাদা। আমার বাড়ীতে আশীর্বাদ ক’রতে গিয়ে বেয়াই দেখে আসবেন—পাকা-দেখার খাওয়ানোর আয়োজন কি রকম হওয়া উচিত।”

কুমারনাথ হাল-ফ্যাশানের ব্যবস্থাসুযায়ী পাকা-দেখার ভোজ্যের আয়োজন করিয়া তাহা দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার বাবু তাহা দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন।

হৃদয় বাবু বলিয়াছিলেন, বরযাত্রীর সংখ্যা কুড়ি-পঁচিশ জন হইবে। তাহা শুনিয়া কুমার বাবু সবিম্বয়ে বলিয়াছিলেন, “মোট কুড়ি-পঁচিশ জন? আমি আশা ক’রেছিলেম, খুব কম হ’লেও শ-দেড়েক তো হবেই।”

এ কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিয়াছিলেন,—“কন্যাদায়-গ্রন্থ ভদ্রলোকের বাড়ীতে বরযাত্রীর পাল লইয়া যাওয়া আমি অত্যাচার বলিয়া মনে করি। আমার আত্মীয় পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াইতে হয়, আমার বাড়ীতেই খাওয়াইব।”

বিবাহের লগ্ন রাত্রি এগারটার পর। রাত্রি নয়টার মধ্যেই বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের ভোজন শেষ হইল। কুমার বাবু ডাক্তার বাবুকে ভোজন করিতে অমুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, “বিবাহ শেষ হোক, তার পর দুই বেয়াই একসঙ্গে ব’সে খাওয়া যাবে।”

বাঁড়ুঘোদের ঠাকুর-দালানে কন্যা-সম্প্রদানের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। দালানের এক পার্শ্বে পিতল কাঁসার দানসামগ্রী, এবং বহুমূল্য খাট, বিছানা আলমারী, ড্রেসিং-টেবল, স্প্রিংএর গদীওয়াল চেষ্টার, কোঁচ প্রভৃতি সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী-দিগকে বসাইবার ও খাওয়াইবার ব্যবস্থা বাঁড়ুঘোদের বহির্কাটাতেই হইয়াছিল। বহির্কাটাতে পুরুষের সংখ্যা

দুই শত হইয়াছিল; অষ্টপুত্র স্ত্রীলোকের সংখ্যাও প্রায় দেড় শত।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ডাক্তার বাবু কুমার বাবুকে বলিলেন, “ওদিককার খাওয়ানর ব্যাপার তো শেব হ’ল; এখন নিজেই আপনাকে দুই-একটা কথা ব’লতে চাই।”

বৈবাহিকের অনুরোধ শুনিয়া কুমারনাথ তাঁহাকে নিজের বৈঠকখানায় লইয়া আসিলে ডাক্তার বাবু বলিলেন, “বেয়ানকেও দয়া ক’রে একবার এই ঘরে আসতে বলুন। আপনাদের দু’জনেরই সম্মুখে আমি কথাটা বলতে চাই।”

কুমার বাবু অষ্টপুত্র প্রবেশ করিয়া প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পত্নীসহ সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিলে ডাক্তার বাবু বেয়ানকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “বেয়াই মশায়, বেয়ান ঠাকুরগণ, আপনারা দু’জনেই জানেন, আমি ডাক্তার মালুম; চিকিৎসার জন্ত রোগীকে তো পরীক্ষা করতেই হয়, তা ছাড়া অগ্ন্যন্ত সংবাদও আমাকে নিতে হয়। রোগী অনেক কথা ডাক্তারের কাছে গোপন করবারই চেষ্টা করে, গোপনে কুপথ্য ক’রে কোন রোগী কি ডাক্তারের কাছে সে কথা স্বীকার করে? অথচ চিকিৎসক জানতে না পারলে রীতিমত চিকিৎসার ক্রটি থেকে যায়। আমরা নাড়ী দেখেই রোগীর হাঁড়ির খবর পর্যন্ত বলতে পারি। বেয়াই মশায়, আমি আপনার একটা কঠিন ব্যাধির সন্ধান পেয়েছি। আমার কথা শুনে চম্কাবেন না; সেটা আপনার শারীরিক ব্যাধি নয়, ব্যাধিটা মানসিক। আমি আপনার সেই ব্যাধি আবোগ্য করবার চেষ্টা করব; ঈশ্বরের দয়ায় আশা করি, আপনাকে রোগমুক্ত করতে পারব।”

কুমারনাথ সহাস্তে বলিলেন, “মানসিক ব্যাধি? আমার? ব্যাধিটা কি, শুনেতে পাইনে? আশা করি, রোগীর নিকট তা প্রকাশ করতে বাধা নেই।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন, “রোগটি আত্ম-গোপনের চেষ্টা; আপনি যা নন, তাই ব’লে জনসমাজে আপনাকে জাহির করবার চেষ্টা! শুনেছি, পূর্বে জনাই গ্রামে আমাদের বাস ছিল। জনাইয়ের জমিদার মুখ্যো-বংশ অতি প্রাচীন এবং বিখ্যাত বংশ। আমিও মুখ্যো, কিন্তু আমি জনাইয়ের জমিদারদের বংশধর নই, আমি

দরিদ্র কেরাণীর পুত্র, এবং তদপেক্ষাও দরিদ্র এক জন স্কল-পণ্ডিতের পৌত্র। আমি জানি, আপনার প্রপিতামহ নালিকুল গ্রাম থেকে কলিকাতায় এসে এই বাঁড়ুঘো-বাড়ীর একটা অংশ কিনে নিয়ে এখানে বাস করতে থাকেন। আপনার পিতামহ, আপনার পিতা, এবং আপনি স্বয়ং এই বাড়ীতেই জন্মগ্রহণ ক’রেছেন; স্মরণ্য এটাই আপনার পৈতৃক ভিটা, তীর্থের স্মরণ পবিত্র। এই পবিত্র স্থান থাকতে আপনি বাঁড়ুঘোদের ঠাকুর-দালানে কত্তা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা করলেন কেন? নিজের বাড়ীতে স্থানাভাব হ’লে লোকে প্রতিবেশীর বাড়ীতে লোকজনকে বসাবার ও খাওয়ানার ব্যবস্থা করে, আপনিও স্থানাভাবে তা করিতে বাধ্য হয়েছেন; কিন্তু কত্তা-সম্প্রদান আপনাকে পরের বাড়ীতে করতে দিচ্চিনে, এই শুভকার্য্য আপনাকে আপনার এই ঘরেই করতে হবে। তার পর দ্বিতীয় কথা, আপনার বড় মেয়ের বিবাহের পূর্বে আপনি বেয়ানের প্রায় সমস্ত গহনা বার শ’ টাকায় বাঁধা দিয়েছিলেন, সে ঋণ স্মৃতি-আসলে প্রায় দেড় হাজার টাকা হয়েছে। স্মলোচন বাবুর কাছে সে গহনা বাঁধা আছে। এ সকল সংবাদ আমার অজ্ঞাত নয়। সংপ্রতি আপনি ছোট মেয়ের বিবাহের ব্যয়নির্কাহের জন্তে স্মলোচন বাবুর নিকট দেড় হাজার টাকায় আপনার বাড়ী বন্ধক রেখেছেন। এই তিন হাজার টাকা আপনি অনর্থক ঋণ ক’রেছেন। আপনি যদি প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা ক’রেও কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখতেন, তা’ হ’লে পাঁচ বৎসরে তিন হাজারেরও অধিক টাকা আপনি সঞ্চয় করতে পারতেন। কেবল ঐ বনিয়াদি বাঁড়ুঘো-বাবুদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে সমান চালে চলতে গিয়েই আপনি নিজের পায়ে কুড়ল মেরেছেন! ঈশ্বর না করুন, কাল যদি আপনার চাকরি যায়, তা’ হলে আপনি দাঁড়াবেন কোথায়? খাবেনই বা কি?”

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া কুমার বাবু লজ্জায় অবনত-মস্তকে বলিলেন, “আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে; ওটা আমার মানসিক ব্যাধিই বটে; কিন্তু বুঝছি, ব্যাধি কঠিন হয়ে উঠেছে! কি করব তা তেবে তো কুল-কিনারা পাচ্চিনে।”

ডাক্তার বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, “কিন্তু আর তো

ভাববার সময় নেই; আর এক ঘণ্টা পরেই যে বিবাহের লগ্ন!”

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে তিনখানা হাজার টাকার ও পাঁচখানা এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া কুমারনাথের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, “এই সাড়ে তিন হাজার টাকার নোট নিন, এখনি স্নলোচন বাবুর কাছে গিয়ে বন্দকী-দলীল ও বেয়ানের গহনা খালাস করে আনুন। আমার পুত্রকে বরণ করবার সময় বেয়ান নিরাভরণা থাকতে পাবেন না। এই সকল বিষয়, বিশেষতঃ টাকার কথা, কেহ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে, কেবল আপনারা দু’জনেই জানলেন; আর জানেন আমার স্ত্রী। বিজন এর কিছুই জানে না। আমরা এই চারি জন ব্যতীত আর কেউ যেন এ-কথা

জানতে না পারে—এই আমার একান্ত অমুরোধ। আর এক কথা, খাটবিছানা, আলমারী, টেবিল, কোচ, চেয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্র আপনি দান করবেন না। বিজনের জন্ত কিনেছেন, বিজন ও আপনার বড় জামাই এই বাড়ীতে ঐগুলি ব্যবহার করবে। আমার বাড়ীতে তো দেখেছেন, প্রত্যেক ঘরই আসবাবে পূর্ণ; আমার বাড়ীতে আর নূতন কোন আসবাব রাখবার স্থান নেই।”

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া কুমারনাথ ও হেমাস্নিনা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তিনি কুমারনাথের হাত ধরিয়া বলিলেন, “করেন কি? আর আধ ঘণ্টা পরে বিবাহের লগ্ন, এখন ও-সব মাথা-গোঁড়া-খুঁড়ি মূলতুবি রেখে এই ঘরেই বিবাহের আয়োজনটা তাড়াতাড়ি ক’রে ফেলুন।”

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিত্ত-বিকাশ

নটরাজ, ওগো নটরাজ,

রৌদ্র-দীপ্ত দিবসের পীতাম্বর পরিমাছ আজ

পৃথিবীর প্রান্ত হ’তে—

সপ্ত সিদ্ধ নীলাত্র-পরিধি

অধঃ-উর্ধ্বে করিছ বিরাজ।

তথাপিও সৃষ্টি খুঁজে মরি,

নিদাঘ সূর্যের রশ্মি

বলসিয়া দৃষ্টি নিল হরি,—

কুটালে কুটিল গন্ধ

নিগূঢ় সৌরভে অন্ধ

ব্রাস্ত দিক—

চঞ্চরীক—

ঘুরে মরি—শুধু ঘুরে মরি।

ছায়াজ্বর বনবীথি

অস্তরীক নিতি নিতি

কল্পনার পক্ষে ভয় করি—

যুগ্ম-হারা পারাবত আশ্বহারা দিবস-শর্করী।

আস্রার আত্মীয়তম

অস্তরের আন্তরিকতম—

অবিতৃপ্ত হৃদয়ের নন্দ-সগা মম

বাজায়ে আশার বাঁশী

হাতছানি দিয়া হাসি হাসি

ওগো মোর বাঞ্ছিত পরম

হে শ্রাম-সুন্দর বন্ধু!

অধর-চুম্বিত সিদ্ধ—

নভোনীলে অবলীন—সিদ্ধনীলে রূপ নিলে মিতা—

পথ চাওয়া শর্করীর প্রতীক্ষিত উদয় সবিতা।

বেদনা-দহনদগ্ধ চিত্ত মোর আজি গুচিম্বিত!

আরক্ত কুঞ্চিত দল—এ কমল হ’লো বিকশিত।

শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত (এম-এ, এম-বি, ডি-টি-এম)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রহস্য

গীতোক্ত সাধন-পথ

গীতোক্ত ব্রহ্মবাদ আলোচনা করা গেল এবং দেখা গেল যে, গীতার মতে একই ব্রহ্মবস্তুর নিঃশূর্ণ ও সগুণ দ্বিবিধ বিভাব মাত্র। নিঃশূর্ণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্ব নহে। যিনি নিঃশূর্ণ তিনিই সগুণ। নিঃশূর্ণ সাধনা ও সগুণ সাধনার মধ্যেও ফলের কোন তারতম্য নাই, তবে মানুষের মনের গঠন এইরূপ যে, উহা নিঃশূর্ণ, নির্বিশেষ, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিরূপাধি ব্রহ্মকে সহজে ভাবনা করিতে পারে না। নিঃশূর্ণ ব্রহ্মের সাধনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, গুণবাদের ভিত্তিতে সগুণের সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই জগত্ই গীতায় এই সগুণ ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদের প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসক এবং নিঃশূর্ণ ব্রহ্মের উপাসক এই উভয়বিধ উপাসকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যাহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমাতে মনোনিবেশ করিয়া আমার (সগুণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের) উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী, আর যাহারা অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তবে সেই পথে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, কেন না, দেহধারী জীবের পক্ষে অব্যক্তের ধারণা করা অত্যন্তই কষ্টসাধ্য (১)।

এখানে দেখা যায় যে, গীতায় সগুণ ব্রহ্মবাদকে নিঃশূর্ণ ব্রহ্মের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ, গীতার ঈশ্বরবাদ। ঈশ্বরবাদই গীতার ভিত্তি; এই জগত্ই ঈশ্বরোপাসনাকে নির্বিশেষ উপাসনা অপেক্ষা প্রশস্ত বলা হইয়াছে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের সাধনার কথাও গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, “হে পার্থ, যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট

থাকে, তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ, বিবেকী বা বিদ্বান্ বলা হইয়া থাকে। শ্রুতিও এই কথা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন জীবের মনোগত সমস্ত কামনা নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখনই জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, অমৃতময় ব্রহ্ম-পদ লাভ করে (১)। জীব শ্রুতির ভাষায় তখন হয় আত্মানন্দ, আত্মারাম ও আত্মক्रीড়। পুত্রৈষণা, বিষ্টৈষণা ও লোকৈষণা এই ত্রিবিধ এষণার (কামনার) নাগপাশ তখন আর শিবরূপী জীবকে বন্ধন করিতে পারে না। তত্ত্ব-জ্ঞানের অমৃতসেকে এষণার বহির্শিখা নিঃশেষ হইয়া যায়। জাগতিক সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ঘেব প্রভৃতির অতীত এক পরম আনন্দময় লোকে জীব তখন উপনীত হয়। ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন যে, “দুঃখে তাঁহার চিন্ত অমুদ্বিগ্ন, সুখে তিনি স্পৃহাহীন, তাঁহার রাগ নাই, ভয় নাই, ক্রোধ নাই, এইরূপ মুনি বা মননশীল পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞ।” তিনি আত্মারাম, সুতরাং স্বীয় দেহ বা পুত্র-কলত্র প্রভৃতিতে তাঁহার কোন মমতা-বোধ নাই, দেহের জন্ম-মরণে, কল্যাণ-অকল্যাণে হর্ষ বিষাদের কোন সম্ভাবনা নাই। সমস্ত কাম্য বস্তুতে স্পৃহাহীন, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, আত্মানন্দ এই সাধকই শান্তি প্রাপ্ত হন। গীতার ভাষায় ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি; এই স্থিতি লাভ করিলে সংসার-মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। যাহাদের মন ব্রহ্মভাবে অবস্থিত, তাঁহারা সর্বত্র সমদর্শী, তাঁহারাই প্রকৃত বিদ্বান্, তাঁহাদের ব্রাহ্মণে, কুকুরে, চণ্ডালে কোন ভেদ-বুদ্ধি নাই, কারণ, সর্বত্রই তাঁহারা ব্রহ্মই দর্শন করেন এবং ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন (২)। এইরূপে গীতা নিঃশূর্ণ ব্রহ্ম-উপাসকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায় সগুণ ব্রহ্মোপাসনারও বিস্তৃত উপদেশ

(১) যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা বেহন্ত হৃদি স্থিতাঃ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমপ্নুতে।

(২) গীতা ২।৫৫-৫৭, ১১, ১২, গীতা ৫।১৭, ১৮, ২৪, ২৫।

প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে (২৯ শ্লোক) ভগবান্ বলিয়াছেন যে, “যে সাধক আমাকে (সগুণ ব্রহ্মকে) যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর, সমস্ত ভূত-জগতের স্রষ্টা বলিয়া জানে, সেই শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে পার্থ, অনন্তচিত্তে যে আমাকে ধ্যান করে, সেই সাধকই পুরুষোত্তমকে লাভ করে (গীতা ৮।৮), সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষেই আমি সুলভ (৮।১৪), যে সাধক আমাতে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরস্পরকে আমারই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, আমারই কথা কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ ও মুখ লাভ করেন, প্রীতিপূর্বক একাগ্রচিত্তে আমার ভজনাকারী সেই সাধকগণকে আমি নির্মল বুদ্ধি (বুদ্ধিযোগ) প্রদান করি, তদ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করে (গীতা ১০।২-১০)। এইরূপে গীতা সগুণ ও নিগুণ উভয়বিধ সাধনারই উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মনির্বাণ বা শাস্ত শান্তিই যে জীবের চরম লক্ষ্য, ইহাও গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, ঐ শাস্ত শান্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভের উপায় কি? ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে মোক্ষনগরে পৌছিবার জ্ঞানমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এই তিনটি মার্গ বা পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতায়ও উল্লিখিত মার্গত্রয়ই সাধন-সোপান বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিবাদের সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধনই গীতার সাধন উপদেশের বৈশিষ্ট্য। গীতার মতে এই মার্গত্রয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত ইহারা যে যে পথে চলেন, তিনিই মনে করেন যে, সাধনরাজ্যে তাঁহার পথই একমাত্র পথ, এতদ্-ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নাই। এইরূপে সাধনপথে একটা বিবাদ অধ্যাত্মরাজ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। গীতায় ভগবান্ ঐ বিবাদ ভঞ্জন করিলেন এবং দেখাইলেন যে, আলোচিত পথত্রয় পরস্পর বিযুক্ত নহে। প্রমাণে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পতিত-পাবনী গঙ্গা তরঙ্গায়িত ধারায় ভারতভূমি প্লাবিত করিয়া সমুদ্র অভিযানে ছুটিয়া চলিয়াছে। গীতায়ও সেইরূপ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিধারা সাধক জনগণের মানস-লোক প্লাবিত করিয়া ব্রহ্ম-সাগরের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। বিভিন্ন মার্গের এই সমন্বয়-দৃষ্টি গীতার নিজস্ব। অন্য কোনও অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহা এমন

পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে নাই। এইজন্যই অধ্যাত্ম চিন্তারাজ্যে গীতার আসন অনেক উর্ধ্বে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঐ সকল বিভিন্ন সাধনপথের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, কেহ কেহ ধ্যানযোগের সাহায্যে অর্থাৎ ধ্যান-সংস্কৃত অন্তঃকরণ দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেহ বা সাংখ্যযোগ বা জ্ঞান-যোগের সাহায্যে, অপরে কর্মযোগ দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আর, যাহারা এই কোন পথেই অগ্রসর হইতে পারেন না, তাঁহারা সঙ্গুর আশ্রয় লাভ করতঃ শ্রদ্ধাপূত চিত্তে গুরুপদেশ শুনিত্তে শুনিত্তে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুশোক-সঙ্কুল এই সংসারের পরপারে চলিয়া যান (গীতা ১৩।২৪-২৫)। উক্ত গীতাপ্রস্তাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখানে কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ এবং ভক্তিবাদ এই বাদত্রয়কেই আত্মদর্শনে তুল্য ভাবে হেতু বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এই বাদত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ এবং এই বিষয়ে গীতার অভিমত কি, তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। কর্মবাদ ও জ্ঞানবাদের মধ্যে গীতার মতে যে কোন বিরোধ নাই, তাহা স্পষ্টতঃই গীতায় বলা হইয়াছে। অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জ্ঞানযোগ (সাংখ্যযোগ) ও কর্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন, পণ্ডিতেরা তাহা করেন না। পণ্ডিতদিগের মতে এই উভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে আশ্রয় করিলেই উভয়ের ফল—মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স্ লাভ করা যায়। জ্ঞানিগণ যে পদ লাভ করেন, কর্মযোগীরাও সেই পদই লাভ করেন। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে যাহারা এক (অভিন্ন) দেখেন, তাঁহারাই যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা (১) এবং সাংখ্যক যোগক যঃ পশ্চতি স পশ্চতি (গীতা ৫।৫)। উক্ত গীতা-শ্লোকে “সাংখ্য” শব্দে জ্ঞানবাদী কর্মসন্ন্যাসীকে বুঝায়, আর যোগ শব্দে নিকাম কর্মযোগীকে বুঝায়। নিকাম কর্মযোগী ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন পূর্বক ঈশ্বরে কর্ম ও

(১) সাংখ্যযোগী পৃথগ্ বাল্যঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাহিতঃ সম্যগ্ভরোবিন্দতে ফলম্। গীতা ৫।৪
যং সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্বোদৈগরপি গম্যতে।
সাংখ্যযোগী—জ্ঞানযোগ কর্মযোগী, রামানুজভাষ্য।
সাংখ্যঃ জ্ঞাননিষ্ঠঃ, শঙ্করভাষ্য।

কর্মফল অর্পণ বুদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান করেন, কর্মসন্ন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক আত্মারাম, আত্মানন্দ হইয়া অবস্থান করেন। যথার্থ কর্মসন্ন্যাসী কে ? ইহার উত্তরে গীতা বলিয়াছেন যে—“যে কাহাকেও দ্বেষ করে না, যাহার কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহার রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব নাই, সকল কামনার যাহার অবসান হইয়াছে, এইরূপ মহাপুরুষই প্রকৃত কর্মসন্ন্যাসী। ইনি অনার্সাসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।” (গীতা ৫।৩) এইরূপ কর্মসন্ন্যাসই জ্ঞানযোগ বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে। এই কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কর্মযোগীর নিষ্কাম কর্মও তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় না, মুক্তিরই কারণ হয়। ফলতঃ নিষ্কাম কর্ম-সাধন ও কর্মসন্ন্যাস একই কথা, ইহাদের ফলেও কোন পার্থক্য নাই। তবে গীতার মতে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কর্মের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। কর্মত্যাগ গীতার অভিপ্রেত নহে, কর্মফল ত্যাগই গীতার অভিপ্রেত। স্বভাবের বশে সকলকেই কর্ম করিতে হয় এবং আমরণান্ত করিতেই হইবে; তবে ঐ কর্ম যদি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন পূর্বক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। ইহাই গীতায় কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস, ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ (গীতা ৫।২) অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বৃথাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যিনি (আত্মানাত্ম বিবেক দ্বারা) আত্মাকে রাগ-দ্বেষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছেন, যিনি নিষ্কাম, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বেশভূষা, আশ্রম বা আশ্রমোক্ত কর্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস হয় না। আত্মা অহং মম, ‘আমি’ ‘আমার’ এইরূপ আমিত্ব বোধের আবরণে আবৃত আছে, আত্মার সেই মলিন আবরণ পরিত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। অতি উত্তম অধিকারীর পক্ষেই এই সন্ন্যাস বিহিত, কেন না, অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ না হইলে কর্মসন্ন্যাস কিছুমাত্র ফল দান করিতে পারে না, অধিকন্তু অনিষ্টই সাধন করে। এই জন্যই কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ হইলেও সর্বসাধারণের উপযোগী নিষ্কাম কর্মযোগই, হে অর্জুন! তোমার পক্ষে বিশেষ অমুকুল। এইরূপে গীতায় কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ

বা কর্মানুষ্ঠানকে শ্রেয়ঙ্কর বলা হইয়াছে। গীতোক্ত কর্মযোগ কাহাকে বলে, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য। কর্ম অনুষ্ঠান করিলেই জীবকে কর্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়, এমন কি, শ্রুতি-প্রতিপাদিত যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম করিলেও সংসার-বারিধি উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। ইহার উত্তরে কর্মবাদীরা বলেন—জৈমিনির কর্মমীমাংসায় বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক, যাগ-যজ্ঞাদি কর্মই স্বর্গের সোপান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, বেদোক্ত জ্ঞান-কাণ্ড এই মতে (দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া) জীবকে স্বর্গসাধন যাগযজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্তির সহায়তা করে মাত্র। কর্মই বেদের মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য, যে সকল বেদবাক্যে কোনরূপ কর্মের উপদেশ নাই, তাহা অর্থবাদ মাত্র—আন্নায়ত্ত্ব ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য-মতদর্শনাম্। (মীঃ সূ ১।২।১) স্বর্গের সোপান যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে শাস্বত সুখদাম স্বর্গ লাভ হয়। যাহারা “চতুর্মাশ্র” যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়—‘অক্ষয়াং হ বৈ চতুর্মাশ্র যাজিনঃ স্কৃতং ভবতি।’ যেই যজমান অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমস্ত লোক জয় করেন, মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, পাপ, ব্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ হন—“সর্বান লোকান্ জয়তি, মৃত্যুং তরতি, পাপ্যানং তরতি, ব্রহ্মহত্যাং তরতি যোঃশ্বমেধেন যজতি”। কর্মীর জরামৃত্যু নাই, কর্মীরা সোম পান করিয়া অমর হইয়া থাকেন—অপাম সোমমমৃততা অভূম। কর্মই স্বর্গসোপান, স্বর্গ কি ? শাস্বত সুখই স্বর্গ। “যে স্নুখে ছুঃখের মিশ্রণ নাই, যে স্নুখ পরেও ছুঃখরূপে পরিণত হয় না, যে স্নুখ ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয়, সেই স্নুখই স্বর্গ (১)। বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মই ঐ নিরাবিল স্নুখের মূল।

জ্ঞানবাদীরা এই কর্মবাদ অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়—কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ বিজয়া চ প্রমুচ্যতে (মহাভাঃ শান্তিপর্ব) শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কর্ম, পুত্র, বা বিত্ত অমৃতত্ব লাভের সোপান নহে, একমাত্র ত্যাগ বা বৈরাগ্য দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়—ন কর্মনা ন প্রজয়া ধনেন

(১) যন্ন হুঃখেন সংভিন্নং ন চ প্রমুচ্যমানস্তবম্।

অভিলাষোপনীতকং তৎ স্নুখং স্বঃপদাংগদম্।

ত্যাগে নৈকেনামৃতম্ মানসুঃ। কৰ্ম স্বয়ং ভঙ্গুর, স্ততরাং তাহার ফল কোনমতেই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ যদি অনিত্য হয়, তবে সেই অনিত্য কারণ নিত্য ফল প্রসব করিতে পারে না। অনিত্য কৰ্ম হইতে নিত্য মুক্তি আসিতে পারে না। এই জন্তই উপনিষদে যজ্ঞাদি কৰ্মকে সংসার-সাগর তরণের পক্ষে ভঙ্গুর ভেলা বলা হইয়াছে। যে সকল মোহাঙ্ক ব্যক্তিগণ এই কৰ্মকেই মিশ্রেশ্বরস্ সাধন বলিয়া মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা-মৃত্যুর কবলে পতিত হয় (১)।

নানারূপে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অস্ত ব্যক্তিগণ কৰ্মানুষ্ঠান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা-নিবন্ধন তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইয়া কৰ্মক্লয় হইবার পর তাহাদিগকে দুঃখার্জ হইয়া স্বর্গচ্যুত হইতে হয় (২)। কৰ্মক্লয় হইলে কৰ্মীর পতন অবশ্যজ্ঞাবী, কৰ্মের দ্বারা যে অমৃতম্ লাভের কথা বলা হইয়াছে সেই অমৃতম্ চিরস্থায়ী শাস্ত্রত অমৃতম্ নহে, সেই অমৃতম্ আপেক্ষিক মাত্র। প্রলয় পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থানকে অমৃতম্ বলা হইয়া থাকে—আভূত সংপ্লবং স্থানং অমৃতম্ হি ভাষ্যতে। বিষ্ণুপুরাণ। কৰ্মক্লয়ে কৰ্মীর পতন যে অবশ্যজ্ঞাবী, তাহা উপনিষদের জ্ঞান গীতাও স্পষ্ট বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। “কৰ্মকাণ্ডী সোমপায়ী যাজ্ঞিকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করে, এবং তাহারা তাহার (যজ্ঞাদির) ফলে পুণ্য ইন্দ্র-লোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করে” “সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, পুণ্যক্লয় হইলে তাহারা আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এইরূপ সকাম সাধক কৰ্মকাণ্ডের অহুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে থাকে (৩)। এইরূপে কৰ্মবাদী মীমাংসক ও

জ্ঞানবাদী বৈদান্তিকের মধ্যে বিরোধ স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, গীতা জ্ঞান ও কৰ্মের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র উদ্ভাবন করিয়া ঐ বিরোধের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কৰ্মের ফলে যে বন্ধন হয়, সেখানে গীতা বলেন যে, কৰ্মীর ফলাসক্তিই তাহার বন্ধের কারণ। অযুক্তঃ কামকারণে ফলে সজ্ঞো নিবধ্যতে। (গীতা ৫।১১) যে কৰ্মে ব্যক্তিগত ফলের আসক্তি নাই, সেই কৰ্ম বন্ধনের কারণ হয় না, বরং অনাসক্ত মনীষিগণ কৰ্মজ্ঞান ফল পরি-ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন-বিমুক্ত হইয়া অনাময় মোক্ষপদ লাভ করেন (গী: ২।৫)। মীমাংসাক্ত যাগযজ্ঞাদি কৰ্মও যেখানে পুত্র, বিত্ত, পশু প্রভৃতি ব্যক্তিগত ফল লাভের আশায় অহুষ্ঠিত হয়, সেখানে তাহা সকাম কৰ্ম, স্ততরাং ঐরূপ সকাম যজ্ঞাদি দ্বারা মুক্তির কোন আশা নাই। স্বর্গকামনায় বেদে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের যে বিধান আছে, তাহা দ্বারা সুখদাম স্বর্গ লাভ হয় বটে, কিন্তু ঐ স্বর্গসুখও শাস্ত্রত সুখ নহে, তাহাও ভঙ্গুর, কালে তাহাও ক্লয় হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় মীমাংসাক্ত যজ্ঞাদি কৰ্মকেও শাস্ত্রত সুখ-নিদান বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? গীতায় যে পুনঃ পুনঃ যজ্ঞের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং যজ্ঞীয় কৰ্ম ব্যতীত অন্য কৰ্মকে বন্ধের কারণ ও যজ্ঞাদি কৰ্মকে মুক্তির হেতু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—যজ্ঞার্থং কৰ্মগোহৃত্ত্বত্র লোকোহয়ং কৰ্ম-বন্ধনঃ। (গীতা ৪।৯) এই গীতাক্ত যজ্ঞ মীমাংসাক্ত সকাম যজ্ঞ নহে। ইহা নিকাম যজ্ঞ, নিকাম যজ্ঞই যথার্থ যজ্ঞ। বেদে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ”। যে কৰ্ম বিষ্ণুর প্রীতি সাধন করিবার জন্ত অহুষ্ঠিত হয়, অহুষ্ঠাতার কোন ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহাই প্রকৃত যজ্ঞ। বিষ্ণু শব্দের অর্থ সর্ব-ব্যাপী, যিনি সর্বব্যাপী সর্বভূতে বিরাজিত, তাহার প্রীতি সম্পাদন করিতে হইলে সর্বভূতেরই প্রীতি সম্পাদন করিতে হয়। কাজেই সর্বভূত-প্রীত্যর্থ যজ্ঞের অহুষ্ঠান করাই বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ যজ্ঞের অহুষ্ঠান করার

(১) প্রবাহেতে হৃদ্য যজ্ঞরূপাঃ অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কৰ্ম। এতচ্ছ্রয়ো যেহভিনন্দন্তি মুচ্য জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি। মুণ্ডক ১।২।৭

(২) অবিজ্ঞায়ং বহুধা বর্তমানাঃ বয়ং
কৃতার্থা ইত্যভিনন্দন্তি বালাঃ।
যৎ কশ্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাং তেনাতুরাঃ
ক্ষীণলোকাস্চবস্তে। মুণ্ডক ১।২।৯

(৩) ত্রৈবিজ্ঞা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যতৈর্জারষ্ট। স্বর্গাতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাস্তান্ত সুরেন্দ্রলোক-
মঙ্গন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।

তে তং ভূক্ত। স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্মমহুপ্রপন্ন
গতাগতিং কামকামা লভন্তে গী:। ৯।২০-২১।

রহস্য। সর্বভূত-প্রীত্যর্থৈ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে এক দিকে যেমন আত্মার প্রসারতা আবশ্যিক, ব্যক্তিগত ফললাভের ছুরাশা পরিত্যাগ করা আবশ্যিক। অপর দিকে তেমন সর্বভূতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির হওয়া আবশ্যিক, সর্বভূতের তৃপ্তিই পরব্রহ্মের পূজা, এই বিশ্বাস স্থির হইলেই সেই যজ্ঞ সার্থক হয়। ঐ যজ্ঞ সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহা বন্ধনের তো কারণ হইতেই পারে না, বরং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তিরই কারণ হয়। ত্যাগই যজ্ঞের মূল কথা, জগতের পোষণের জন্ত ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যে ত্যাগ করা হইয়া থাকে, তাহাই শাস্ত্রে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। গীতাও দেবতাদিগের পরিপোষণের জন্ত এবং সংসারচক্র প্রবর্তনের জন্ত যজ্ঞ জীবের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। “প্রজাপতি যখন জীবসৃষ্টি করিলেন, তখনই তিনি যজ্ঞেরও সৃষ্টি করিলেন এবং জীবদিগকে উপদেশ দিলেন যে, এই যজ্ঞের দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, যজ্ঞই তোমাদের কামধেনুস্বরূপ হইবে, তোমাদের বাঞ্ছিত ফল দান করিবে। তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে পোষণ কর, দেবতাগণও তোমাদিগকে পালন করিবেন। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের সন্তোষ সাধন করিয়া তোমরা পরম কল্যাণ লাভ কর। দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ দান করিবেন। এই দেবদত্ত ভোগ দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে অর্পণ না করিয়া যে স্বয়ং সন্তোষ করে, সে চোরের স্থায় কাজ করে” (১)। যিনি যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন অর্থাৎ দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ ভোজন করেন, তিনি সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন, আর যাহারা কেবল স্বীয় উদরপূরণার্থই ভোজনের আয়োজন করে, তাহারা পাপই ভোজন করে। ইহার অর্থ এই যে, হে জীব, তুমি দেবতার জন্ত, সর্বভূতের জন্ত বলি প্রদত্ত। অতএব তোমার স্বীয় উদর পূরণের জন্ত, মুখ-সন্তোষের জন্ত, ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্ত কোন কর্ম করিবার অধিকার নাই, জগতের হিতের জন্ত, সর্বভূতের প্রীতির জন্ত জগৎপিতা পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থৈ বহুবিধ আয়াসসাধ্য কর্মের অনুষ্ঠান কর। অভিমান ত্যাগ কর, তোমার

সমস্ত জীবনই এক বিরাট যজ্ঞ পরিণত হইবে। কামনা-পিপাসী তোমার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না। ত্যাগের সৌরকরস্পর্শে তোমার জ্ঞানকমল ফুটিয়া উঠিবে, তুমি শাশ্বত শান্তি, অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবে। ত্যাগই যজ্ঞের মূল উপাদান। এই ত্যাগই ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ প্রভৃতি জীবের প্রতিদিন অবশ্যকরীয় মহাযজ্ঞ দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে প্রজাপতির বিশ্বসৃষ্টিকে যে বিরাট যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার অর্থ—জীবের হিতার্থে প্রজাপতির আত্মবলিদান, নতুবা নিষ্কল, নিঃশূণ, নিরঞ্জন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ গুণময়ী মায়াকে আলিঙ্গন করিয়া জগৎসৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইলেন কেন? তিনি তো আশুকাম, সদাপূর্ণ, তাহার তো কোন কামনা নাই, কোন অপূর্ণতা নাই? জীবের হিতই তাঁহার সেই সৃষ্টি-মহাযজ্ঞের একমাত্র কাম্য। বিশ্বসৃষ্টি যেমন এক বিরাট যজ্ঞ, মানব-জীবনও সেইরূপ এক মহা-যজ্ঞ। কর্মময় সংসার সেই যজ্ঞবেদী এবং লোকহিত সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য, আত্মত্যাগ তাহার দক্ষিণা, আর যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং শ্রীভগবান্। এইরূপে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা গীতার মতে কর্মবন্ধন তো নহেই পক্ষান্তরে উহা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসূ। এইরূপ যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়াই গীতায় বলা হইয়াছে যে—“যজ্ঞের জন্ত কর্ম অনুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম ফলের সহিতই বিলয়প্রাপ্ত হয়—যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে। (গী ৪।২৩) ঐ যজ্ঞাঙ্গ কর্ম ফল প্রসব না করিয়া লয় হইয়া যায় কেন? ইহার উত্তরে গীতা বলেন যে, ঐরূপ যজ্ঞ সাধারণ কর্মযজ্ঞ নহে, ইহা ব্রহ্মযজ্ঞ। ঐ যজ্ঞের সকল অঙ্গেই ব্রহ্মদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, যজ্ঞাঙ্গ দৃষ্টি থাকে না, যজ্ঞকর্তা, যজ্ঞীয় হবিঃ ও আহবনীয় অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। ঐরূপ ব্রহ্মযজ্ঞের ফলে শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, ভঙ্গুর কর্মফল বা ভোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। সেই যজ্ঞের আহুতি ও ব্রহ্ম, যজ্ঞীয় হবিঃ ও ব্রহ্ম, হোম ও ব্রহ্ম, হোমায়িও ব্রহ্ম, হোতাও ব্রহ্ম, এইরূপ সমস্ত যজ্ঞাঙ্গে যাহার ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির হয়, সে ব্রহ্মকেই লাভ করে” (১)।

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির যজ্ঞ যে কর্মপাশ নহে, কর্মপাশ ছেদন করিবার জ্ঞান-অসি, তাহাতে কোন তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরই সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহাই জ্ঞানযজ্ঞ বলিয়া গীতায় এবং অশ্রুত অধ্যাত্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞীয় বাহ্য উপকরণ ব্যতীত মানস উপচারেও এই জ্ঞান-যজ্ঞ সম্পন্ন করা যায়। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে এইরূপ জ্ঞানযজ্ঞের উৎকর্ষতা উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতাও বলিয়াছেন যে, দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানযজ্ঞের ভূমিতে পৌঁছিলে সেই যাজ্ঞিকের সমস্ত কর্ম ও কর্মফল আত্মজ্ঞানেই পর্যাবসিত হয়। সুলভম দ্রব্যযজ্ঞের স্তর হইতে জ্ঞানযজ্ঞের উন্নততম ভূমিতে উপস্থিত হইতে হইলে আরও অনেক যজ্ঞ-স্তর অতিক্রম করিতে হয়। গীতা ঐ সকল যজ্ঞ-স্তরের বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়া যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর সর্বতোমুখ বিরাট রূপের বিভিন্ন মুখ আনাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতোক্ত দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ প্রভৃতি ঐ একই যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর মূর্তিতে। সমস্ত যজ্ঞই ব্রহ্মযজ্ঞে সমাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করে। ব্রহ্মযজ্ঞে পল্লভিতে হইলে ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি বহিঃসাধন এবং ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন, অভিমান ত্যাগ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধনের প্রয়োজন হয়, তাহাই তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ বিভিন্ন যজ্ঞে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল বিভিন্ন যজ্ঞ-স্তরের রহস্য অবগত হইয়া যে তত্ত্বজ্ঞানী সাধক ব্রহ্মযজ্ঞ-ভূমিতে গিয়া পৌঁছায় অর্থাৎ সর্বত্র যজ্ঞাঙ্গে ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করে, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়—যজ্ঞ-শিষ্টামৃতভূজো যাতি ব্রহ্ম সনাতনন্। (৪।৩০)

মোট কথা, কর্মে ব্রহ্ম-দৃষ্টি লাভ করা চাই, কর্মে ব্রহ্ম-দৃষ্টি স্থির হইলে কর্মে ও ব্রহ্মে কোন বিরোধ থাকিবে না। ইহাই যজ্ঞের ব্রহ্মরূপতা ব্যাখ্যা করিয়া গীতায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্মসন্ন্যাস, বা কর্মত্যাগ গীতার অভিপ্রেত নহে। কর্মফলত্যাগ, কর্তৃত্বাভিমান বর্জনও ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণের কথাই স্নীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। “তন্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর” ইহাই গীতার উপদেশ। কর্ম ত্যাগ করিও না, কর্মফলের চুরাশা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম কর—এবং কর্মফল ভগবানের অন্তর চরণে সমর্পণ কর, ইহাই গীতোক্ত কর্মযোগরহস্য।

কর্মফল ত্যাগ, কর্তৃত্বাভিমান বর্জন ও ঈশ্বরার্পণ এই তিন থাকিলেই কর্ম কর্মযোগে পরিণত হয়, এবং এই কর্ম-যোগের দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরহিত অনাময় মোক্ষপদই লাভ করা যায়—কর্মজং বুদ্ধিবৃত্তা হি ফলং তক্ত্ৰা মনীষিনঃ। জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্। (গীতা ২।১৫) এই জ্ঞানই গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে যোগস্থ হইয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ম করিবার পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কর্মযোগীর ফলে আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। এইরূপ সম-মনোবৃত্তিকেই কর্মযোগ বলে। সম-মনোবৃত্তি লাভ করিলে কর্মী হন কর্মযোগী। এই কর্মযোগীই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, স্মতরাং গীতার মতে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কর্মসন্ন্যাসী চিত্তবিশুদ্ধি হওয়া পর্যন্তই কর্মের আবশ্যিকতা স্বীকার করেন এবং তাহার পরে তাহার মতে কর্মত্যাগই বিধেয়। এখানে গীতোক্ত কর্মযোগী বলেন যে, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেও ফলাশা পরিত্যাগ পূর্বক অনাসক্ত ভাবে কর্ম করিতেই হইবে। কেন না, কর্ম ছাড়িব বলিলেই কর্ম ছাড়া যায় না, কর্ম কাহাকেও ছাড়ে না, যতক্ষণ দেহ থাকিবে, ততক্ষণ কর্ম ছাড়া চলিবে না।* নিষ্কাম বুদ্ধিতে শাস্ত্র চিত্তে কর্ম করিয়া যাও, তাহা হইলেই জ্ঞান লাভ হইবে। এই জ্ঞান কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে গীতা বলেন—“ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীটামুকীট পর্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণের আত্মাকে নিজ আত্মার সহিত অভিন্ন দেখাই যথার্থ জ্ঞান।” ভগবান্ বলিয়াছেন যে, হে অর্জুন, এই জ্ঞান লাভ হইলে তুমি সমস্ত প্রাণিজগৎকে তোমার মধ্যে এবং তোমাকে আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে। যেন ভূতাত্মশেষেন দ্রক্ষ্যশ্রাশ্রুত্থো ময়ি (১।৫৫), এই জ্ঞান অতি পবিত্র ইহার শ্রায় পবিত্র বস্তু আর জগতে কিছুই নাই। ইহাই যথার্থ

* গীতার মতে কর্মত্যাগ কর্মসন্ন্যাস নহে। কাম্য কর্মের ত্যাগই যথার্থ কর্মসন্ন্যাস, কর্মফল ত্যাগই ত্যাগ। যিনি কর্মফল ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী পুরুষ। কর্মপাশ তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না—কর্ম যতই কঠোর হউক না কেন, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সেই কর্ম কর্মবন্ধন হয় না। সেই জ্ঞানই ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া, কামনা ও মমতাপূত্র হইয়া আত্মনিষ্ঠ হইয়া যুদ্ধ কর; এই যুদ্ধ তোমার অশান্তির কারণ হইবে না।

আত্মদর্শন। শ্রদ্ধা ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ করা যায় না—
 শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। শ্রদ্ধাবান্ সাধক গুরুসেবা
 প্রভৃতি দ্বারা সৎগুরুর উপদেশে এই জ্ঞান লাভ করিয়া
 থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, হে অর্জুন, এ কথা
 মনে রাখিও যে, প্রণিপাতের দ্বারা, প্রশ্নের দ্বারা এবং
 সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানী তোমাকে ঐ
 জ্ঞানের উপদেশ করিবেন (১)। স্মতরাং দেখা যাইতেছে
 যে, জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্বন্ধও দূর নহে। উপনিষদে
 তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধার কথা এবং শ্রদ্ধাপূর্বক
 জ্ঞান আহরণের কথা বলা হইয়াছে। গুরুবাক্যে ও
 অধ্যাত্মশাস্ত্রে অবিচলিত বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। গীতা এবং উপ-
 নিষদের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা জ্ঞানের আবশ্যিকীয় পূর্বসঙ্গ, স্মতরাং
 শ্রদ্ধা বা ভক্তিবাদের সহিত জ্ঞানের কোন বিরোধ নাই
 বা থাকিতে পারে না। গীতা স্পষ্টবাক্যে এই অবিরোধ
 ঘোষণা করিয়াছেন। গীতার মতে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ
 ভক্ত। যদিও ভক্তিবাদীরা পরবর্তীকালে ভাবপ্রধান অন্ধ
 ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে বিরোধ-
 সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং জ্ঞানগন্ধহীন ভাবপ্রধান
 ভক্তিকেই উত্তম ভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অণু
 কামনাশূন্য জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অসংবৃত, অমুকুল ভাবে
 শ্রীকৃষ্ণভজনই পরম ভক্তি (২)। গীতা এই মত অনুমোদন
 করেন নাই। গীতা বলেন যে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত
 হইতে হইলে তাহাকে জ্ঞানীও হইতে হইবে। ভগবান্
 বলিয়াছেন যে, আমার চারি শ্রেণীর ভক্ত আছে। (১) আর্ত,
 (২) জিজ্ঞাসু, (৩) অর্থার্থী এবং (৪) জ্ঞানী। ইহাদের
 মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। কারণ, তিনি ভগবানে
 একান্ত ভক্তিযুক্ত এবং তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবান্কেই
 পরমগতি জানিয়া ভগবান্কে আশ্রয় করিয়াছেন। এইরূপ
 জ্ঞানী ভগবানের যেন আত্মা। ভগবান্ তাহার অত্যন্ত প্রিয়
 বস্তু এবং তিনিও ভগবানের প্রিয় (৩)। গীতার এই উক্তি
 আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভগবান্ যে চারি প্রকার

ভক্তের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী
 এই ত্রিবিধ ভক্ত সকাম ভক্ত। আর জ্ঞানী ভক্ত নিকাম
 ভক্ত। তন্মধ্যে তীত হইয়া, বিপদে পড়িয়া, রোগ-শোকের
 জ্বালায় জ্বলিয়া পরিত্রাণ লাভের জন্ত যে ব্যক্তি ভগবানের
 আরাধনা করেন, সে আর্ত ভক্ত। কৌরব-রাজসভায়
 বজ্রাকর্ষণভীতা দ্রৌপদী আর্ত ভক্ত। ধনলাভের জন্ত,
 সুখভোগের আশায় ষাঁহার ভগবদারাধনা করেন, তাঁহার
 অর্থার্থী ভক্ত—ঋব, সুগ্রীব, বিভীষণ ইহারা অর্থার্থী ভক্ত।
 আত্মজ্ঞানলাভের জন্ত, ভগবদ্বিভূতি জানিবার জন্ত যিনি
 ভগবানের সেবা করেন, তিনি জিজ্ঞাসু ভক্ত। মিথিলাপতি
 জনক, উদ্ধব প্রভৃতি জিজ্ঞাসু ভক্ত। এই সকল জিজ্ঞাসু ভক্ত
 সকাম ভক্ত হইলেও ইহাদের কামনা ভগবন্থী; স্মতরাং
 ইহারা সহজে মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভে
 সমর্থ হন। আর্ত এবং অর্থার্থী ভক্ত ভগবানের অপার
 মহিমা উপলব্ধি করিয়া ভগবদ্বিভূতি জানিবার জন্ত যখন
 ব্যাকুল হন, তখনই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী
 হন, স্মতরাং দেখা যাইতেছে যে, আর্ত ও অর্থার্থী ভক্তকেও
 জিজ্ঞাসু হইতে হইবে, তবেই আর্ত ও অর্থার্থী ভক্ত জ্ঞান-
 মন্দিরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন। জিজ্ঞাসু ভক্ত
 জ্ঞানরাজ্যের সীমার মধ্যে অবস্থান করিলেও তিনি জ্ঞানাক্রম
 বলিয়া জ্ঞানীর সমপর্যায়ে নহেন। তাঁহার জিজ্ঞাসা
 পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই তিনি স্বাত্মানন্দ, জ্ঞানী হইবেন।
 তাঁহার জিজ্ঞাসার মূলে বাসনার বীজ নিহিত আছে বলিয়া
 জিজ্ঞাসু ভক্তও সকাম ভক্তের পর্যায়ের পতিত হন।
 ফলাভিসন্ধি-বর্জিত নিকাম ভক্তই যথার্থ জ্ঞানী। তিনিই
 স্বাত্মানন্দ মহাপুরুষ। তিনি সর্বত্র সর্বভূতে পরমাত্মাকে
 দর্শন করেন, সর্বদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত থাকেন। এইরূপ
 পরমাত্মাহরক্ত ভক্ত ভগবান্ ভিন্ন কিছুই দেখেন না,
 কিছুই জানেন না, কিছুই ভাবেন না। তাহার সমস্ত ভাবনা,
 সমস্ত জানা, না-জানা ভগবানে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে,
 এইরূপ ভক্তই ভগবানের পরম প্রীতির পাত্র। এইরূপ
 ভক্তকে উদ্দেশ করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন—প্রিয়ো হি
 জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ (গী: ৭।১৭)। ভগবানে
 সদা সমাহিত, জ্ঞানী ভক্ত ভগবানেরই আত্মস্বরূপ—জ্ঞানী

(১) তর্ষিষ্ণু প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। গী: ৪।৩৫

(২) অজ্ঞাভিলষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাসংবৃতম্।

আমুকুল্যেন কৃষ্ণাত্মভজনং ভক্তিরন্তমা।

(৩) চতুর্বিধা ভক্তস্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুনঃ।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভবতর্ষভ। ৭।১৭

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। ৭।১৭

দ্বাষ্ট্রৈব মে মতম্। (গীতা ৭।১৮)। এইরূপ ভগবৎ-
 প্রেমে বিহ্বল জ্ঞানী ভক্তই ভগবান্কে প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন। জ্ঞানী ভক্তের সমস্ত জগৎই বাসুদেবস্বরূপ,
 —বাসুদেবঃ সর্বমিতি (গীঃ ৭।১৯)। এইরূপে সর্বত্র
 ভগবদর্শন উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ যে
 দিকে দৃষ্টি করেন, তাঁহার আরাধ্য ভগবান্ ব্যতীত
 আর কিছুই দেখিতে পান না। ইহাই ব্রহ্মদর্শন এবং
 জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। যে ব্যক্তি যে ভাবে যে মূর্তিরই সেবা,
 পূজা করুক না কেন, সকলই সেই বাসুদেবেরই পূজা।
 বাসুদেবই সর্বাস্তর্যামী পরমাত্মা। এইরূপে গীতায়
 যে ভক্তিবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদান্তবেদে জ্ঞানবাদের
 সহিত তাহার কোনই বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।
 ভগবান্ গীতায় তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের যে লক্ষণ নির্দেশ
 করিয়াছেন, তাহা বিচার করিলেও গীতোক্ত ভক্তিবাদ যে
 জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, তাহাই বুঝা যায়। ভগবান্

বলিয়াছেন যে, “আমার ভক্ত সর্বভূতে দ্বৈশশূন্য, কমা-
 শীল, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, সতত সন্তুষ্ট এবং সংযতচিত্ত
 যোগী, আমাতেই তাহার মন ও বুদ্ধি সমর্পিত, এইরূপ
 বিশ্ববন্ধু নিরহঙ্কার ভক্তই আমার প্রিয়। তাহার পক্ষে
 শত্রু-মিত্র সমান, মান-অপমান, মিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ
 তুল্যরূপ, সেই নির্বন্দ সदा সন্তুষ্ট, স্থির চিত্ত ভক্তই আমার
 প্রিয়।” এইরূপ ভগবান্ প্রিয় ভক্তের যে সংজ্ঞা নির্দেশ
 করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানীরই সংজ্ঞা, তত্ত্বজ্ঞানীরই লক্ষণ,
 স্মৃতরাং জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কোন ভেদ নাই, প্রকৃত
 ভগবদভক্ত হইতে হইলে তাহাকে জ্ঞানীও হইতে হইবে।
 ভক্তির চরম ফল সর্বভূতে, সর্বত্র জগতে ভগবদর্শন বা
 ব্রহ্মদর্শন। এই ব্রহ্মদর্শনই জ্ঞানের চরমাবস্থা। গীতার মতে
 ভগবদভক্তিই ব্রহ্মদর্শনের মূলে বিরাজ করিতেছে।

[ক্রমশঃ ।

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (এম-এ, পি-আর-এস,
 পি-এইচ-ডি, কাব্য-ব্যাকরণ শাস্ত্র-বেদান্ততীর্থ)

যাতায়াত

করি সৃষ্টির আদি হ'তে যাওয়া আসা,
 কত রূপ আর কত বেশ কত ভাষা।
 মরুর অনল মেরুর তুহিন সহি
 জীবনের পর জীবন এনেছি বহি
 স্থলে জলে আছা কতই বেঁধেছি বাসা।

এই দেহ মন ভাব ও ভাবনাময়
 তাঁহারি পাঞ্জা বহে, দেয় পরিচয়।
 তাঁহারি দস্ত পাট্টার জোরে
 এ চরণযুগ নির্ভয়ে ঘোরে,
 মানিতে চাহে না কোনক্রমে পরাজয়।
 এই সমীরণ এখনো চিনিতে পারি,
 মোর নিঃশ্বাসে যুগে যুগে হ'ল ভারী।
 এই যে সলিল আমি পাই টের—
 পরশ ব'য়েছে শত জনমের,
 পরিচিত ক্রিতি পাসরিতে এর নারি।

শত জনমের ঘন অমৃতভূতি ছায়—
 করে স্নিবিড় আনন্দ বেদনায়।
 মাঝে বিশ্বাসি বহিতেছে তবু—
 মধুর লগনে কোন দিন কতু—
 ও-পারের সাড়া এ-পারেতে পঁহুছায়।
 সব ছেড়ে আসে তবু নিয়ে আসে কিছু,
 অতি উর্ধ্বের ছায়া পড়ে এসে নীচু।
 কাল-সাগরের রসাজনের
 দাগ পাকা রঙ মানব-মনের
 স্মৃতির রেণু ভ্রমে ভ্রমের পিছু।

কত ঘাটে জাঁট দিয়াছি ছপুয়ে সাঁজে,
 রাঙা জল আছা কত দাগ রাখিয়াছে।
 হ'ক যত সাদা সাতরঙা মন
 কখন কি রঙে রাঙায় ভুবন,
 কথা ভুলে গেছি—চেনা স্মরণ প্রাণে বঁজি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ।



চতুর্বিংশ পর্বে

পূর্ব-পরিচয়

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

নৌ-বিভাগের যে কর্মচারী আমাদের দ্বীপে অবতরণ করিয়া বৃটিশ নৌ-সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতেছিলেন, তাঁহাকে তখন পর্যন্ত আমসের পাকশালায় প্রবেশ করিতে দেখি নাই। সমুদ্রতট হইতে আমরা পাকশালায় প্রত্যাগমন করিবার অল্পকাল পরেই তিনি সেখানে আসিলেন; কিন্তু তিনি একাকী আসেন নাই, তাঁহার সঙ্গে আর এক জন গভীরপ্রকৃতি, দীর্ঘকায়, বলবান্ নৌ-কর্মচারী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া টেবলের নিকট উপবেশন করিলেন। তাঁহার আকার-প্রকার ও পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া আমার ধারণা হইল, তিনি বৃটিশ নৌ-বিভাগের উচ্চতর কর্মচারী। পরে তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—আমার এই ধারণা সত্য।

এই কর্মচারী আসন গ্রহণ করিয়া গভীর স্বরে বলিলেন, “ইউ-বোটের কাপ্তেনকে আমি কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।”

তাঁহার কথা শুনিয়া কাপ্তেন তন্ রথভেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার চিহ্নমাত্র ছিল না।

বৃটিশ নৌ-কর্মচারী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, তিনি কোন্ স্থান হইতে ‘ইউ-বোট’ লইয়া সেখানে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কিরূপ কার্যের ভার অর্পিত হইয়াছে—ইত্যাদি সংবাদ জানিতে চাহিলে কাপ্তেন তাঁহার কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন, এবং কোন কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে নিরুত্তর রাখিলেন। তিনি যে সকল প্রশ্নের

উত্তর না দিয়া নীরব রাখিলেন, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্ত তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করা হইল না।

কাপ্তেন ভন রথভেনের কথা শেষ হইলে লেফটেন্যান্ট হ্যাগেন আহূত হইলেন। তিনিও কাপ্তেন রথভেনের স্থায় কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন, এবং কোন কোন প্রশ্ন শুনিয়া নির্বাক রাখিলেন।

তাঁহাদের উভয়ের কথা শেষ হইলে উক্ত নৌ-সামরিক কর্মচারী বলিলেন, “জোয়াবি কাহার নাম? আমস জোয়াবি? তাহাকে আমার কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবাব আছে।”

কিন্তু তাঁহার এ কথা শুনিতে পাইলেও আমস তাহার চেয়ার হইতে উঠিল না; সে তখন যেন বাহুজ্ঞানশূন্য, সম্পূর্ণ অভিভূত! তাহাকে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া উপকূলরক্ষী ষ্ট্যানডিস্ তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তথাপি সে উঠিল না, বা উঠিতে পারিল না। প্রাণতয়ে তাহার সর্কাস্ কাপিতেছিল; তাহার মুখ শ্লান, এবং চক্ষু নিশ্চিত। তাহার সর্কাস্ অবসন্ন। আমার মনে হইল, মানসিক অবসাদে আমসের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সহসা রহিত হইতে পারে।

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ষ্ট্যানডিস্ তাহার পিঠে ধাক্কা দিয়া বলিল, “কর্তা কি বলিতেছেন, শোন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দাও।”

আমস্ এবার কম্পিত হস্ত উর্ধ্বে তুলিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, “মিষ্টার! আপনি মিষ্টার—” তাঁহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ষ্ট্যানডিস্ তাহার সহযোগী এলিস্কে ইঙ্গিতে জানাইল, উহার গলায় খানিক ব্যাণ্ডি না ঢালিলে উহার মুখে কথা সরিবে না।—এলিস্ একটা গ্যাসে খানিক ব্যাণ্ডি ঢালিয়া আমস্কে পান করাইল

এবার তাহার দেহে ও মনে নব বলের সঞ্চার হইল। সে ষ্ট্যানডিসের সাহায্যে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া টলিতে-টলিতে টেবলের নিকট উপস্থিত হইল।

নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক আমসের মুখের দিকে চাহিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, “আমি বৃটিশ নৌ-ঘাট সমূহের অগ্রতম অধিনায়ক এডমিরাল সার প্যাট্রিক মিল্ডেন। জার্মান ‘ইউ’-বোট সমূহকে খোরাক দিয়া সাহায্য করিবার জন্ত এই দ্বীপে যে গুপ্ত আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে, আমি তাহা ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। এ কথা তোমাকে জ্ঞাপন করা আমার কর্তব্য যে, আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। তুমি স্বদেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক; শত্রুপক্ষের বোম্বটেগিরিতে তুমি অনেক দিন হইতে সাহায্য করিয়া আসিতেছ; এই অপরাধে তোমাকে বড়-দেশে লইয়া গিয়া সামরিক বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা হইবে। বিচারে তোমার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। সে পরের কথা—এখন তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দাও।—তোমার জাতি কি?”

আমস্ জড়িত স্বরে বলিল, “আমি কোন্ দেশের লোক, তাহাই জানিতে চাহেন?—আমি বৃটিশ।”

সার প্যাট্রিক বলিলেন, “তোমার সম্বন্ধে আমি কোন কোন কথা জানিতে চাই। কত দিন হইতে তুমি এই দ্বীপে বাস করিতেছ?”

“পনের বৎসর।”

“তুমি বিবাহ করিয়াছ?”

আমসের মুখ হইতে হঠাৎ এই প্রশ্নের উত্তর বাহির হইল না; সে জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, “না।”

সার প্যাট্রিক কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া আমার ও মেরীর মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর তাহাকে বলিলেন, “তুমি বিবাহ কর নাই, তবে এই ছেলেমেয়ে দু’টি কাহার?”

আমস্ আবার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “ঐ ছেলেটি?—জাহাজডুবির পর এক দিন রাত্রিকালে ও ভাসিয়া-আসিয়া সমুদ্র-তটে বালুকারাশির উপর পড়িয়াছিল; সেই অবস্থায় উহাকে দেখিতে পাইয়া আমি—”

সার প্যাট্রিক তাহার কথায় বাধা দিয়া অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ জাহাজ-ডুবির কথা বলিতেছ?”

আমস্ মাথা চুলকাইয়া বলিল, “আরবুটাস্ জাহাজ।”

সার প্যাট্রিক ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “কি? জাহাজ-খানার কি নাম বলিলে?”

তাঁহার কণ্ঠস্বরে একরূপ উদ্বেগ-কম্পিত, এতই অস্বাভাবিক যে, সেই কক্ষস্থিত সকল লোক বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু তিনি কি কারণে ঐরূপ বিচলিত হইয়াছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। সার প্যাট্রিক বিস্ফারিত নেত্রে আমসের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আমস্ নিস্তব্ধ, নির্বিকার! সে দুই হাত একত্র করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

এবার সার প্যাট্রিক চেয়ার হইতে লাফাইয়া-উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “আমি সেই জাহাজখানার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহার কি নাম বলিলে—আবার বল।”

আমস্ জড়িত স্বরে বলিল, “বলিলাম ত, জাহাজখানার নাম আরবুটাস্। আ-র—বুটাস্। আজ ঠিক দশ বৎসর হইল, সেই জাহাজখানা উল্ফ-পয়েন্টে জলমগ্ন হইয়াছিল। জাহাজ-ডুবির পরদিন প্রভাতে তাহার কোন চিহ্ন কোন দিকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই; কেবল ঐ বালকটি—ও তখন ক্ষুদ্র শিশু—জাহাজের মাস্তুলের একটা ভাঙ্গা অংশে বাধিয়া বালুকারাশির উপর পড়িয়া ছিল। বোধ হয়, সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া ঐ স্থানে বাধিয়া গিয়াছিল। হাঁ, ও তখন নিতান্ত শিশু।”—এই কথা বলিয়া সে তাহার কম্পিত হস্ত আমার দিকে প্রসারিত করিল।

এডমিরাল সার প্যাট্রিক ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, “তুমি কি—তুমি কি একরূপ কোন সূত্র পাইয়াছিলে—যাহার সাহায্যে এই বালকের কোন পরিচয় জানিতে পারা যায়? উহার নাম-ধাম—অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারিয়াছিলে?”

আমস্ অবনত মস্তকে ক্ষীণস্বরে বলিল, “না।”

সার প্যাট্রিক উভয় হস্তে একরূপ জোরে তাঁহার সম্মুখস্থিত টেবলের কিনারা চাপিয়া ধরিলেন যে, তাঁহার হাতের শিরাগুলি দড়ার মতন ফুলিয়া উঠিল!

তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন, “মাথা তুলিয়া আমার মুখের দিকে তাকাও।”

তাঁহার আদেশে আমস্ ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিল। তাহার চক্ষুতে ভয় ও উদ্বেগ পরিস্ফুট। সেই কক্ষস্থিত সকল লোক নির্নিমেষ-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাহারও মুখে কোন শব্দ নাই; সেই কক্ষে গভীর নিস্তরতা বিরাজিত।

এডমিরাল সার প্যাট্রিক সেই নিস্তরতা ভঙ্গ করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “আমস্ ফ্রাভি, আমি তোমাকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই বালকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়—এরূপ কোন সূত্র কি তুমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলে? নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ?”

আমস্ এবার দুই কাঁধ সোজা করিয়া মাথা তুলিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে সার প্যাট্রিকের মুখের দিকে চাহিল, এবং স্পর্ধাভরে অবিচলিত স্বরে বলিল, “হাঁ, তা পাইয়াছিলাম; এবং তাহা হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম উহার নাম—উহার প্রকৃত নাম পিটার মিলভেন!”

পুনর্বার চতুর্দিকে গভীর নিস্তরতা বিরাজিত! কণ-কাল পরে সেই নিস্তরতা ভঙ্গ করিয়া সার প্যাট্রিক মিলভেন গভীর স্বরে বলিলেন, “তোমার এ কথা কি সত্য? এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ?”

আমস্ অকুঞ্জিত স্বরে বলিল, “হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য; আমি যে প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, এবং সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ ছিল না।”

প্রশ্ন হইল, “সকল কথা তুমি খুলিয়া বলিবে?—যাহা সত্য, তাহাই আমি জানিতে চাই।”

আমস্ বলিল, “দোতলায় আমার শয়ন-কক্ষের মেঝেতে কাঠের আস্তরের (floor-boards) নীচে একখানি পত্র আছে। সেই পত্র এক-টুকরা ত্রিপলের ভিতর শিলাই করিয়া, পালের যে ছেঁড়া অংশটুকুর মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ঐ বালকের অবলম্বন ভাঙ্গা মাস্তলের সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়াছিল।”

সার প্যাট্রিক রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই পত্র এখনও সেখানে আছে কি?”

আমস্ বলিল, “হাঁ আছে; আমিই তাহা সেখানে

রাখিয়াছিলাম। পরে আর তাহা স্থানান্তরিত করি নাই।”

এবার সার প্যাট্রিক ষ্ট্যানডিস্কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “ফ্রাভিকে সঙ্গে লইয়া দোতলায় উহার শয়ন-কক্ষে যাও; সেই পত্রখানি লইয়া এসো।”

ষ্ট্যান্ডিস্ আমস্কে সঙ্গে লইয়া পাকশালা ত্যাগ করিল; অল্প সকলে নিস্তরতা ভাবে পাকশালায় বসিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন মেরী ও লেফটেনান্ট হ্যাগেনের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম। সার প্যাট্রিক মিলভেন নির্নিমেষ নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। আমি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অভিভূত হইয়া অত্যন্ত অসচ্ছন্দ বোধ করিতেছিলাম। কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমার বুকের ভিতর কাঁপিতেছিল। কয়েক মিনিট পরে ষ্ট্যান্ডিস্ আমস্কে সঙ্গে লইয়া পাকশালায় ফিরিয়া আসিলে আমার বুকের উপর হইতে যেন পামাণ-ভার নামিয়া গেল।

ষ্ট্যান্ডিস্ সার প্যাট্রিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক-টুকরা ত্রিপল তাঁহার হস্তে প্রদান করিল; মুহূ স্বরে বলিল, “কাঠের আস্তরের নীচে ইহাই পাইয়াছি।”

সার প্যাট্রিক তৎক্ষণাৎ ত্রিপলের সেই চাদরটুকুর শিলাই খুলিয়া-ফেলিয়া যে পত্রখানি বাহির করিলেন, তাহা তিনি মনে মনে পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখের উপর আমার দৃষ্টি ছিল; দেখিলাম, পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, এবং চক্ষুর দৃষ্টি যেন ঝাপসা হইয়া গেল! কি বিপুল চেষ্টায় তিনি আত্ম-সংবরণে সমর্থ হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। পত্রখানির পাঠ শেষ করিয়া যখন তিনি তাহা মুঠায় পুরিলেন, তখন তাঁহার হাত ধর-ধর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

দুই-এক মিনিট তিনি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন; তাহার পর যখন তিনি কথা বলিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর আবেগ-কম্পিত, অস্বাভাবিক ভারী! তিনি সেই কক্ষে সমাগত অমুচরবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোমরা একটি অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ কর, ইহা অবিখ্যাত মনে হইলেও সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু সত্য ঘটনা অনেক সময় ঔপন্যাসিক ঘটনা অপেক্ষাও অদ্ভুত হইয়া থাকে। আমি

যাহা তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা আমার ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু স্বদেশের—আমার মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিতে আসিয়াও আমি ইহা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; আশা করি, পরমেশ্বর আমার এই দুর্বলতা মার্জনা করিবেন।

“দশ বৎসর পূর্বে আমি আমার একমাত্র পুত্র পিটারকে তাহার ধাত্রী মেরী সেলার্শের সহিত কাইলেস্কুতে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কথা ছিল, ঋষ্টোৎসবের সময় তাহারা সেখানে আমার বন্ধুগণের অতিথি-রূপে কিছু দিন কাটাইয়া আসিবে। এই উদ্দেশ্যে আমি তাহাদিগকে ব্লাইথের বন্দর হইতে আরবুটাস্ জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিলাম। এই জাহাজখানি সেই বন্দর হইতে সমুদ্রযাত্রা করিবার পর আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বহু অমুসন্ধানও তাহার খোঁজ-খবর না পাওয়ায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা সমুদ্রের কোন অংশে জলমগ্ন হইয়াছে, এবং জাহাজের আরোহী, কন্ঠচারী ও নাবিকগণের কাহারও প্রাণরক্ষা হয় নাই। আজ রাত্রিকালে—হাঁ, আমার জীবনের পক্ষে এই স্মরণীয় রাত্রিতে এই পাকশালায় আসিয়া দৈবক্রমে যে পত্রখানি আমার হস্তগত হইল, তাহা পাঠ করিয়া তোমাদিগকে শুনাইতেছি। তোমরা তাহা শ্রবণ কর।”

সার প্যাট্রিক পত্রখানি খুলিয়া ধীরে ধীরে স্থলিত স্বরে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন,—

“আমাদের জাহাজখানি চূর্ণ হইয়াছে। যদিও কাপ্তেন বলিতেছেন—জাহাজের এক প্রাণীরও প্রাণরক্ষার আশা নাই, তথাপি সর্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বরের করুণায় নির্ভর করিয়া এই ক্ষুদ্র শিশু পিটার মিলভেনকে উত্তাল-তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র-বক্ষে ছাড়িয়া দিলাম; তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—
মেরী সেলার্শ।”

সার প্যাট্রিক পত্রখানি ধীরে ধীরে রাখিয়া পুনর্বার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলাম, অশ্রুশিশিতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ। তিনি উঠিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার উভয় হস্ত আমার হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আবেগভরে বলিলেন, “পিটার, বৎস, পুত্র-আমার, এত দিন পরে সত্যই কি তোমাকে ফিরিয়া পাইলাম!”

আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না; তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমারও অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইল। তিনি আমাকে দুই হাতে জড়াইয়া-ধরিয়া বৃকে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার স্নেহপূর্ণ বক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়া আমি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিলাম। আনন্দে আমার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল।

কিন্তু ইহা যে সত্য, এ কথা বিশ্বাস করিতে তখনও যেন আমার প্রবৃত্তি হইল না। জ্ঞান হইবার পর হইতে আমাকে এতই কষ্ট ও নির্যাতন সহ করিতে হইয়াছে, বহির্জগত সম্বন্ধে আমাকে এতই অনভিজ্ঞ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, এই মহাসম্রাজ্য উচ্চপদস্থ ‘বৃটিশ অফিসার’ যে আমারই স্নেহময় পিতা—চাক্ষুষ প্রমাণ সত্ত্বেও ইহা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হইল।

যাহা হউক, অবশেষে তিনি আমাকে তাঁহার আবেগ-স্পন্দিত বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া দিয়া, তাঁহার উভয় হস্ত পূর্ববৎ আমার কাঁধে রাখিয়াই আমসের মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; এবং নীরস স্বরে তাহাকে বলিলেন, “ইংলণ্ডে আমি নিতান্ত অপরিচিত লোক নহি, তুমি একটু চেষ্টা করিলেই আমার সন্ধান পাইতে; কিন্তু তুমি সে জন্ত কোন চেষ্টা না করিয়া কেন এই স্মর্দীর্ষ কাল আমার পুত্রকে এই নিভৃত দ্বীপে অনাথের গ্নায় আটক করিয়া রাখিয়াছ?”

যে কারণেই হউক, এতক্ষণ পরে আমসের ভয় ও কুঞ্জিত ভাব দূর হইয়াছিল। এবার সে অসঙ্কোচে—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরেই বলিল, “এই কার্য্য কেন আমি করিয়াছিলাম তাহা বলিতেছি; কোন কথা আর আপনার নিকট গোপন করিব না। ঐ যে ও-ধারে মেয়েটিকে দেখিতেছেন—মেরী উহার নাম,—উহারই জন্ত এ কাজ আমাকে করিতে হইয়াছিল। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার নিকট একাকী বাস করিতে উহার কষ্ট হইবে—এ জন্ত উহার প্রায় সমবয়স্ক এক জন সঙ্গী রাখা প্রয়োজন—ইহা বুঝিতে পারিয়াই পিটারকে আমি হাতছাড়া করিতে চাহি নাই। পিটারকে সহচররূপে পাইলে উহার দিনগুলি আনন্দে কাটিবে, এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল। আমার গ্নায় বৃদ্ধ ঐ বালিকার সঙ্গী

হইবার উপযুক্ত নহে। আমার কণ্ঠা বলিয়াই এতকাল ঐ বালিকার পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি প্রথমেই বলিয়াছি, বালিকাটি আমার কণ্ঠা নহে; আমার শোণিত উহার দেহে প্রবাহিত হইতেছে না, ও আমার আত্মীয়াও নহে।”

এই পর্যন্ত বলিয়াই আমসু নীরব হইল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, “কিন্তু এই বালিকার জীবনের সকল কাহিনী বলিতে হইলে অনেক কথা বলা প্রয়োজন; সে সকলই আপনাকে বলিতেছি। আমার যৌবন কালের একটি করুণ কাহিনীর সহিত তাহা বিজড়িত। তাহা নাটকীয় ঘটনা বলিলেও অত্যাঙ্কি হইবে না। সেই সকল কাহিনী শুনিয়া আপনার গায় গম্ভীর প্রকৃতির লোকও হস্তসংবরণ করিতে পারিবেন কি না, জানি না।—বহু দিন পূর্বে একবার আমি হাঙ্গারের এক সঙ্গীতশালায় গমন করিয়াছিলাম। সেই সঙ্গীতশালায় এক জন নর্তকী ছিল; তাহাকে আমি লা পার্লি নামে আপনার নিকট পরিচিত করিব। লা পার্লি তাহার প্রকৃত নাম না হইলেও তাহাতে কিছু যায়-আসে না। সে ছিল জাতিতে জার্মান; জার্মান নর্তকীগণের মধ্যে তাহার খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত জার্মান-যুবক তাহার রূপাপ্রার্থী ছিল; তাহারা নিত্য তাহার স্তুতিবাদ করিত। তাহার রূপাকটাকের জন্ত তাহারা তাহার চরণমূলে সর্বস্ব বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিল। আমি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু আমার গায় নগণ্য নাবিককে সে তাহার চরণ-স্পর্শেরও যোগ্য মনে করিত না। তথাপি আমি তাহাকে ভুলিতে পারি নাই—কোন দিন তাহাকে ভুলিতে পারিব না। তাহার মুখের দিকে চাহিলে আমি যে কত ক্ষুদ্র, কত হীন—তাহা ভুলিয়া যাইতাম।”

আমসু কি ভাবিয়া বলিতে পারি না—হী-হী শব্দে হাসিয়া উঠিল। বোধ হয়, নিজের ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা শ্রবণ করিয়াই সে ঐ ভাবে হাসিয়াছিল। সে বলিতে লাগিল, “লা পার্লির মনোরঞ্জন করা আমার অসাধ্য হইয়াছিল। তাহার অবজ্ঞা ও ঘৃণায় আমি মর্মান্বিত হইয়া দূরে প্রস্থান করিলাম; তাহার পর বহু দিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই।

“কিন্তু দীর্ঘকাল পরে পুনর্বার তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে সাক্ষাৎ কোন সঙ্গীতশালায় নহে, জার্মানিতেও নহে। এবার তাহার দেখা পাইলাম—সুদূর আফ্রিকার কেপটাউনের একটা সাধারণ হোটেলে। সে তখন নানা দুশ্চিকিৎস কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া ছিল। নর্তকীদিগের ইহাই বোধ হয় পরিণাম! তখন তাহার অপরূপ রূপরাশির কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। রোগে ভুগিয়া তাহার আকার পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়াছিল। তাহার দেহ বিকৃত হইয়াছিল। সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল; বড় কষ্ট পাইয়াই সে মরিয়াছিল। দীর্ঘকাল কুৎসিত রোগে ভুগিয়া তাহার সর্বস্ব ক্ষত-বিক্ষত ও দুর্গন্ধময় হইয়াছিল বলিয়া ঘৃণায় কেহ তাহাকে স্পর্শও করিত না; কিন্তু আমি তাহার সেবাশুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলাম। তাহাকে বাঁচাইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। এক দিন যে আমাকে পদস্পর্শেরও যোগ্য মনে করে নাই, সে আমারই কোড়ে মাথা রাখিয়া অস্তিমশ্বাস ত্যাগ করিল।—পৃথিবীতে রূপ-যৌবন, দম্ভ-মাৎসর্যের ইহাই বোধ হয় পরিণাম!

“যাহা হউক, তাহার পরিচর্যার জন্ত আমি আমার জাহাজের চাকরী ত্যাগ করিয়াছিলাম; সেই চাকরীতে আর যোগদান করি নাই। লা পার্লির মৃত্যুকালে তাহার একটি শিশুকণ্ঠা ছিল।—ঐ মেরীই তাহার সেই কণ্ঠা।

“মায়ের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে মেরীর আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না। মেরীর সকল ভার আমার উপরেই পড়িল। অল্প কেহ হয় ত সেই অবস্থায় মেরীকে কোন অনাথাশ্রমে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইত; কিন্তু আমি তাহা করি নাই। অনাথা মেরীকে ত্যাগ না করিয়া তাহার সকল ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলাম; এজন্য যদি আপনি মনে করেন, আমি প্রশংসার পাত্র, তাহা হইলে বলিব—উহা আপনার বুঝিবার ভুল! আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিব ভাবিয়াই ঐ কার্য করিয়াছিলাম। যে দাঙ্কিকা নারী তাহার স্নসময়ে রূপ-যৌবন ও সম্পদের গর্ভে আমাকে ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের গায় তুচ্ছ মনে করিয়াছিল, তাহার অনাথা কণ্ঠাকে আমার নিজের কণ্ঠা-পরিচয়ে তাহার প্রতি-পালনের ভার গ্রহণ করিব—ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত

গৌরব ও গর্কের বিষয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যগর্কে যে কোন দিন আমার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, তাহার অনাথা কণ্ঠকে আশ্রয়দান করিয়াছি ভাবিয়া আমি আনন্দ ও গর্ক অনুভব করিয়াছিলাম। তাহার কণ্ঠ—যাহার দেহে জার্মাণের রক্ত-মাংস বর্তমান, আমার আশ্রিত,—আমার অহুগ্রহে সে জীবনধারণ করিতেছে ভাবিয়া আমি এই দীর্ঘকাল গর্ক অনুভব করিয়া আসিয়াছি। মেরীকে প্রতিপালন করিবার জন্তই আমি জাহাজের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া এই নির্জন দ্বীপে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলাম।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমস্ মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে বলিল, “গত পনের বৎসর তুমি আমার কণ্ঠরূপে আমারই আশ্রয়ে বাস করিয়াছ। তুমি যে জার্মাণের মেয়ে—এ কথা কোন দিন তোমার জানিবার সুযোগ হয় নাই। তোমার মায়ের স্বভাবের অনেক বৈশিষ্ট্য তুমি লাভ করিয়াছ। জার্মাণের মেয়ে তুমি, কোন ইংরেজ যুবককে বিবাহ করিতে সম্মত হও নাই, অবশেষে তোমার স্বজাতি লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছ; ইহা তোমার অযোগ্য হয় নাই।”

অতঃপর আমস্ হঠাৎ লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “হ্যাগেন, তুমি সত্যই কি মেরীকে বিবাহ করিবে? তুমি ত শুনিলে, মেরী তোমারই স্বজাতি—জার্মাণ; জার্মাণের শোণিত উহারও দেহে প্রবাহিত।”

হ্যাগেন দৃঢ়স্বরে বলিল, “হাঁ, মেরীকে বিবাহ করিব, —ইহাই আমার সঙ্কল্প। মেরী আমাকে প্রাণ চালিয়া ভালোবাসিয়াছে।”—মেরীর কটিদেশ সে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিল।

আমস্ হুই-এক মিনিট নির্ঝাঁকু ভাবে হ্যাগেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “মেরী উহার মায়ের মতোই একশুঁয়ে, এবং তেজস্বিনী; সহজে উহার মন পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহার হৃদয় খাঁটি সোনার মতো নিষ্কলুষ। এমন মেয়ে লকের মধ্যেও একটি মেলে না। হ্যাগেন, তুমি ভাগ্যবান!”

হ্যাগেন আর কোন কথা বলিল না, অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। সে তখন শত্রুবর্গে পরিবেষ্টিত; কি কথাই বা তাহার বলিবার ছিল?

পঞ্চবিংশ পর্ব

নিরাপদ আশ্রয়

পরদিন প্রত্যুষে আমরা সকলেই ইংলগুগামী ডেইলারের আরোহণ করিলাম। বন্দী কাপ্তেন তন রথভেন এবং লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনকেও সেই জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইল; তাহাদের প্রতি অত্র কোন দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইল না। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—উহাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া কিরূপ শাস্তি প্রদান করা হইবে? পিতা বুকিতে পারিলেন—আমি তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি; এ জন্ত তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, যুদ্ধের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে ইংলণ্ডের কোন বন্দী-নিবাসে আশ্রয় রাখা হইবে। উহারা ‘ইউ’-বোট সহ ধরা পড়িলেও উহাদিগকে অত্র কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে না।

মেরী জাহাজের ডেকে আমার পাশে দাঁড়াইয়া অত্র-মনস্ক ভাবে মুক্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়াছিল। আমাদের এই সুদীর্ঘ কালের বাসস্থান ‘ব্ল্যাক গলের’ পাহাড় আমাদের নয়নের সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। আমি মেরীর হাতখানি নিজের হাতের ভিতর লইয়া মৃদু স্বরে বলিলাম, “বাবার নিকট শুনিয়াছি, কাপ্তেন তন রথভেন ও লেফটেনাণ্ট হ্যাগেনকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া কোন বন্দী-নিবাসে আটক রাখা হইবে; যুদ্ধের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে বন্দী-শিবিরেই বাস করিতে হইবে। মিঃ হ্যাগেন ‘ইউ’-বোটের আরোহী হইয়া সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কখন কোন্ বিপদ ঘটে, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না; এ অবস্থায় ইংলণ্ডে কোন বন্দী-শিবিরে বাস—তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক নিরাপদ। যুদ্ধটা যত দিন শেষ না হয়—তত দিন তুমি বাবার অতিথিরূপে আমাদের বাড়ীতেই থাকিবে। নানা নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া, সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের

সঙ্গে মিশিয়া আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিবে, কি বল, মেরী ?”

মেরী আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মুখে স্নান হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে হাসি যেন শরতের মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রালোক। মেরী মৃদু স্বরে বলিল, “তোমার কথা সত্য হইলে ভালই হইত পিটার, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা ত হইবার নয়।”

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, “হইবার নয় ? এ তুমি কি বলিতেছ, মেরী ! উহা হইবার নয়—এ কথা অর্থ কি ?”

মেরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “অর্থ অতি পরিষ্কার, পিটার ! বাবা—অর্থাৎ আমসু কি বলিয়াছিল—তাহা কি তোমার স্মরণ নাই ? আমি জার্মানের মেয়ে, এবং জার্মানীর পক্ষ লইয়া ইংরেজের শত্রুতা-সাধনে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছি। এ জন্ত আমাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই ডেপুটির ইংলণ্ডে পৌঁছিলে আমি প্রহরীবেষ্টিত হইয়া কোন বন্দী-শিবিরে নীত হইব, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ আছে কি ?”

এ কথা আমি পূর্বে ভাবিয়া দেখি নাই; কিন্তু কথাটা সত্য। এজন্ত মেরীর কথার প্রতিবাদ করিতে না পারায় আমি নীরব রহিলাম।

তাহার কথা শুনিয়া আমি হতাশ হইয়াছি—ইহা বুঝিতে পারিয়া মেরী মৃদু হাসিয়া বলিল, “তুমি দুঃখ করিও না, পিটার ! আমার জন্ত তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই; আমি শারীরিক ভালই থাকিব, আমার প্রতি যত্নেরও অভাব হইবে না। শত্রু-দেশের নারীর প্রতি ইংরেজ সদাচরণে কৃপণতা করে না। বিশেষতঃ, যুদ্ধটা শীঘ্র শেষ হইবে বলিয়াই আশা করিতেছি।”

আমাদের আর কোন কথা হইল না। আমরা উভয়েই সেই দ্বীপের চির-পরিচিত পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমশঃই তাহা দূর হইতে আরও

দূরে সরিয়া গেল এবং অবশেষে তাহা ক্রমবর্দ্ধমান কুঞ্জাটিকারাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। আমাদের এত দিনের পুরাতন জীবন-ধারার উপর যবনিকাপাত হইল। এবার নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

* * * *

আমসু জেবি স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহাকে তাহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। তাহার সাহায্যে জার্মান ‘ইউ’-বোটের বোম্বটেরা বহু লোকের সর্বনাশ করিয়াছিল, বিপুল ধন-সম্পত্তি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তাহার এই গুরু অপরাধের যে প্রায়শ্চিত্ত হইল, তাহা অনেক দিন পূর্বেই স্বাই-দ্বীপবাসিনী ডাইনী-বুড়ীর ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী এত দিনে সফল হইল।

নূতন অবস্থায় আসিয়া আমি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলাম—আমাদের প্রতি যে দণ্ড প্রযুক্ত হইল, তাহা আদৌ অত্যাচার হয় নাই। অর্থের প্রতি অতিরিক্ত লোভই তাহার সর্বনাশের কারণ। অর্থলোভে সে সকল রকম অত্যাচার কার্যই করিতে পারিত। তথাপি তাহার শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে আমি ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারি নাই।

আমার পিতা তাহার শাস্তির প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “তাহার মৃত্যুতে পৃথিবীর ভার লাঘব হইয়াছে। তাহার ত্যাগ নরপিশাচ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়; তবে সে শাস্তির সহিত মৃত্যু বরণ করিয়াছে।”

তাহার প্রাণদণ্ডের সংবাদ শুনিয়া আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। আমার প্রতি তাহার সকল দুর্ক্যবহারই আমি ক্ষমা করিয়াছিলাম।

শ্রীদীনেঞ্জকুমার রায়।

সমাপ্ত

দুষ্কৃতি ও সুকৃতি

লোকের দুষ্কৃতিগুলি লিখি মোরা পিতল-ফলকে
সুকৃতির কথা লিখি তরঙ্গিত জলের ছলকে।

বিজ্ঞান-জগৎ

গ্রামোফোন রেকর্ডে শিক্ষাদান

ইতিহাস, সাহিত্য—এ-সব বিষয়ে আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে গ্রামোফোন-রেকর্ডের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে।



রেকর্ডে সাহিত্য ও ইতিহাস-শিক্ষা



রেকর্ডে ঘুম-ভাঙ্গানো

প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সাল-তারিখ-সমেত, সাহিত্যের বিশিষ্ট ভাবসম্পদ, ভাষা-বিশ্বাস প্রভৃতি নাটকীয় রূপে গ্রামোফোন

রেকর্ডে তুলিয়া বিদ্যালয়সমূহে সেই রেকর্ড বাজানো হয়। ক্লাশে বই লইয়া এ-সব বিষয় গিলাইবার বা মুখস্থ করাইবার বালাই আর নাই! ছেলেমেয়েবা সাগ্রহে এ-সব রেকর্ড শোনে। গ্রামোফোনের জন্ত যে-সব রেকর্ড লওয়া হইতেছে, সেগুলি ওখানকার কলাবিদ, কথাশিল্পীরা বিশেষ ভাবে রচনা করিতেছেন!

গ্রামোফোন-রেকর্ড দিয়া শুধু শিক্ষাদানের কাজ করানো হইতেছে না—তার কাজের ক্ষেত্র বাড়িয়াছে! রাতে ঘুম হইতেছে না, কি দারুণ অস্বস্তি! এ-অনিদ্রা দূর করিয়া আপনার চোখে ঘুম আনিয়া দিবে, সে জন্ত রেকর্ড তৈয়ারী হইয়াছে। এ-রেকর্ডে মিষ্ট-সরস কণ্ঠে আপনি শুনিবেন ঘুমপাড়ানি বিবিধ বিধি, ঘুম-পাড়ানিয়া সুরে সুমধুর গান ও বাজনা। আপনি ভোরে উঠিতে চান, ঘড়িতে কর্কশ এলার্ম-ধ্বনিব প্রয়োজন নাই! বেকর্ড হইয়াছে, সে রেকর্ড মধুর আহ্বানে আপনার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবে। এলার্ম-পদ্ধতির ধরণে

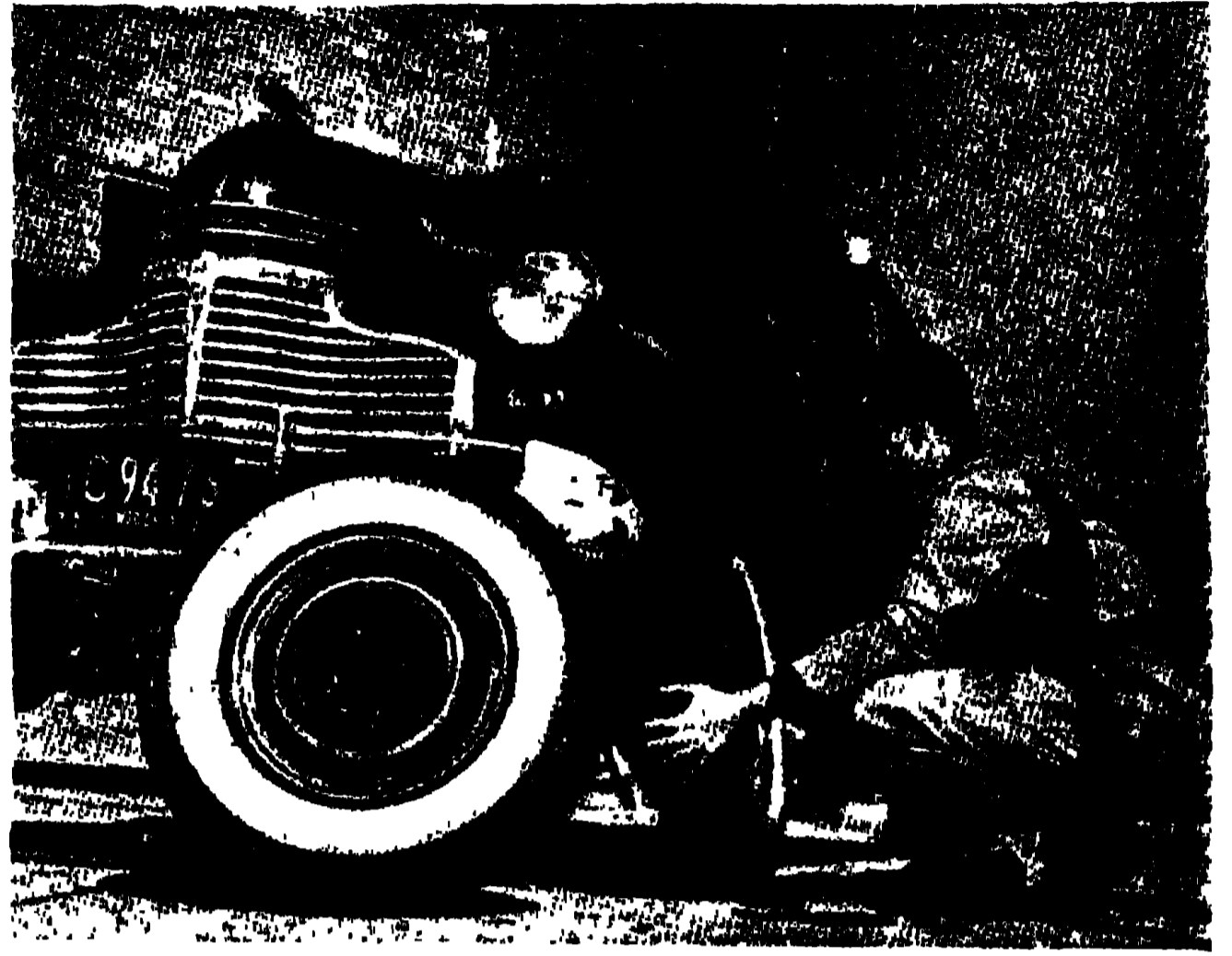
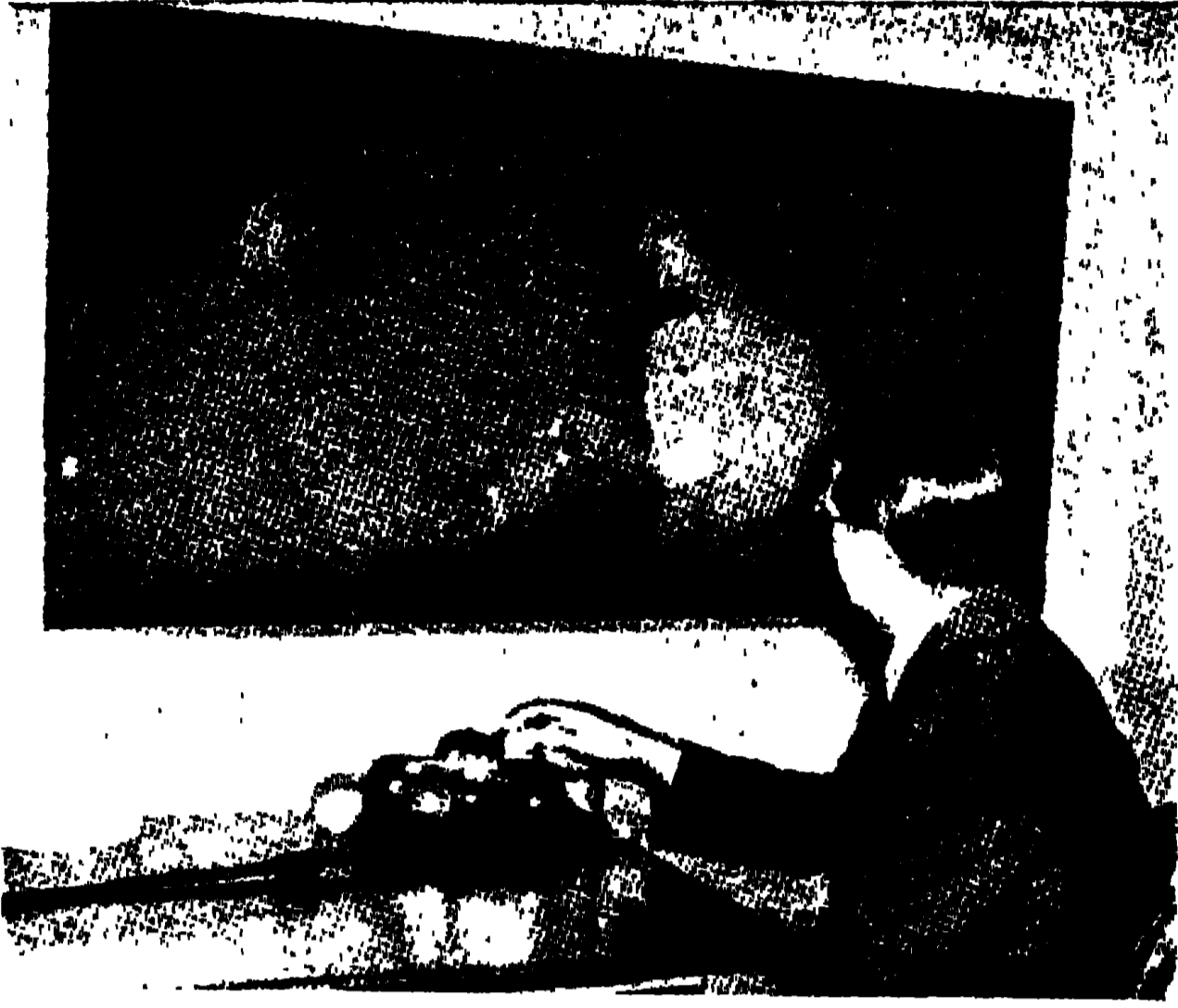
গ্রামোফোন-যন্ত্রে শুধু সময়ের ঘরে চাবি দিয়া রাখুন, যথাসময়ে ঘুম-ভাঙ্গানি রেকর্ড বাজিবে। ঘুম-ভাঙ্গানি রেকর্ড আছে নানা রকমের। ধমক না দিলে গার ঘুম ভাঙ্গে না, তাঁর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্ত, ধমকের রেকর্ড মজুত পাইবেন। তা ছাড়া ভাস-খেলার হৃদিশ, টোটকা ঔষধাদি রচনার হৃদিশ, এ-সবের রেকর্ডও মার্কিং বাজারে প্রচুর ভাবে বিক্রয় হইতেছে। এ-সব রেকর্ডের সৃষ্টি হইয়াছে আমেরিকার বেতার-আদরে।

হৃদয়-পরীক্ষা

বিবাহের পূর্বে বর ও কন্যার রাশি-নক্ষত্র লইয়া আমরা করি কোণ্ঠী-বিচার! অর্থাৎ হৃৎকনের আয়ু-যোগ কেমন, এইটুকু দেখিয়াই আমরা বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করি না; সেই সঙ্গে দেখি, এ-মিল রাজঘোটক হইবে কি না? হৃৎকনে বনিবে কি না। বর-বধু কোথায় রহিল, তাদের না দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা শুধু বর-বধুর কোণ্ঠী দেখিয়া রাশি-নক্ষত্রের অবস্থান মাপিয়া মিলনের শুভাশুভ নির্ণয় করেন। এ-বিচার কতখানি অভ্রান্ত,—সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহি না। তবে সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের

মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর আর্নেস্ট চ্যাপল সম্প্রতি বক্তৃত্ব-পরীক্ষার জন্ত এক অভিনব বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। পাণিপ্রার্থী

টায়ার মেলে। বাতাসের 'প্রেশার' সঙ্কে মেকার-দত্ত বিধি শিরোধার্য করিয়া চলিবেন। নূতন টায়ার বা সঙ্ক-নেত্রামত-করা



ওদিকে বর-কন্ডা ; এদিকে প্রোফেশর

চাকা-বদল

বর ও কন্ডাকে ঘবে বসাইয়া তিনি বলেন,—‘তোমরা যেমন খুশী গল্প করো, প্রেম সাধনা করো।’ বর ও কন্ডাকে কথা কহিতে দিয়া তিনি বসেন মোটা পদ্মের আড়ালে। এই আড়ালের জন্ত বর ও কন্ডা তাঁকে দেখিতে পায় না। পদ্মের ওদিকে বর ও কন্ডা বসিয়া হৃদয় মুক্ত করিয়া কথা কয়, আর পদ্মের এদিকে ডক্টর আর্নেস্ট চ্যাপল বসেন তাঁর নব-নির্মিত বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র লইয়া। যন্ত্রসংলগ্ন কাগজের সুদীর্ঘ সচল ফিতায় বর ও কন্ডার কণ্ঠস্বর পর-পর চিহ্ন রাখিয়া যায়—গ্রামোফোন রেকর্ডের মতে! ছ’জনের কথায় কাহার মনে কি ভাবের উদয় হয়—বিরক্ত না অমুভক্তি,—ফিতার রেখায় তদনুরূপ দাগ পড়ে। সেই দাগ দেখিয়া প্রোফেশর বলিয়া দিতে পারেন, কার মন কি-ধাতুতে গড়া; এবং মনের এ ধাতু-পরিচয়ের পর তিনি বলিয়া দেন, ছ’জনের মনে-মনে মিল কত কাল থাকিবে!



মোটর-গাড়ীর টায়ার

অনেকেই আজ মোটর-গাড়ী কিনিতেছেন,—মোটরে চড়েন; কিন্তু টায়ারের যত জানেন না বলিয়া টায়ার লইয়া প্রায় নাকাল হন। টায়ারের যত করিলে গাড়ীর কল-কজা ভালো থাকিবে। গাড়ীর জান বাঁচিবে, একথা তাঁরা জানিয়া রাখুন। বিশেষজ্ঞেরা টায়ার-রক্ষার সঙ্কে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন—সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিলে বহু অনর্থ, এবং অকারণ অর্থব্যয় বাঁচিবে! নানা মেকারের তৈয়ারী

ষ্ট্রেপ্পনি ঢাকিয়া রাখুন

টায়ার গাড়ীতে লাগাইয়া গাড়ী চালাইবার সময় প্রতি দশ-পনেরো মাইল চলার পর পরখ করিবেন, টায়ার কতখানি ফুলিয়া

আছে। নূতন ও সজ্জ-মেরামত-করা টায়ারের বাতাস প্রথম ছ'চার দিন চট করিয়া বাহির হইয়া যায়। একই দিকে একখানি চাকা দীর্ঘ দিন না লাগাইয়া মাঝে-মাঝে ঠাই-বদল করিয়া লইবেন; অর্থাৎ সামনের টায়ার পিছনে লাগাইবেন, পিছনের টায়ার সামনে; তাহাতে টায়ারের পরমাণু বাড়িবে—টায়ারের জ্বান্ চট করিয়া 'হায়রাণ' হইবে না! পিছন-দিকে পুরানো চাকা লাগাইবেন না। টায়ারের গায়ে হুড়ি-পাথর-পেরেক প্রভৃতি বিধিযামাত্র তাহা ফেলিয়া দিবেন। ঐশ্বের দিনে শুষ্ক-তপ্ত পথে বেশী জোরে গাড়ী চলাইবেন না—তাহাতে টায়ারের জ্বান্ যায়। ফুটপাথ বা খানা-খোন্দল টপকানো—কড়াচ করিবেন না। ষ্টেপনি-টায়ার ঢাকিয়া রাখিবেন। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে সহসা চলন্ত গাড়ীর ব্রেক কবিবেন না!



গৃহস্থালী

রুমালে, কাপড়ের কোণে, বিছানার চাদরে, বালিশের ওয়াড়ে নাম লিখিতে চান? কাপড়ে রুমালে কি ভাবে ভালো-ছাঁদের হরফে নাম লিখিবেন? চিন্তা নাই! সোলার একটা বড় ছিপি লইয়া সেই ছিপির গায়ে রুমালের ও কাপড়ের কোণ পাশের ছবির ভঙ্গীতে চাপিয়া তার দিয়া ছিপির গায়ে রুমাল বা কাপড় আটকাইয়া লউন। কাপড় ও রুমাল টাইট থাকিবে। এবারে নাম লিখুন। অক্ষরের ছাঁদ খারাপ হইবে না, কাপড় বা রুমাল সরিয়া যাইবে না।



সোলা ও তারের কৌশল

মৃত্যুঞ্জয় মুখোশ

এবারকার এ শৈশাচিক যুদ্ধে মানুষ মারিবার স্তম্ভ বিষ-বাস্পের দারুণ সমারোহ! সে বাস্প বাঁচাইয়া শত্রুর গতিবিধি-পর্যবেক্ষণ,

এই মুখোশ

শত্রু-নিপাত,—এ সব ব্যাপারে আমেরিকা ও বৃটেনের সাধনার আদ্য অস্ত নাই! সম্প্রতি মার্কিন ফৌজ-বিভাগ এক-রকম অক্সিজেন-মুখোশ নির্মাণ করিয়াছে; সে মুখোশ একেবারে মৃত্যুঞ্জয়! এ মুখোশ আঁটিলে মুখবিবর মুক্ত থাকে; কাজেই কথা কহিতে অস্ববিধা ঘটে না এবং এ মুখোশে বিষবাস্প যেমন নিশ্বাস-বাতাসে মিশিবে না, তেমনি বহু উর্ধ্বে শূন্যমার্গে উঠিলে নিশ্বাস-বায়ুতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন-বাস্প অনায়াসে মিলিবে।

অক্ষুর-রক্ষা

মাটিতে তৃণ-শস্যাদির বীজ পুঁতিলে সে বীজ স্পষ্ট অক্ষুরিত হইয়া কচি কিশলয়-পত্রবের মূর্তিতে দেখা দেয়। তখন অতি-রৌদ্র বা বর্ষার জল-ধারা লাগিলে অক্ষুরের প্রাণ-সংশয় ঘটে! সে-বিপদে অক্ষুরকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন কৃষি-বিভাগ অক্ষুর-রক্ষক জাল রচনা করিয়াছেন। এ-জাল কাগজের টোয়াইন সূতায়



কাগজী-সূতাৰ জাল

নির্মিত। এ-সূতা সিকি ইঞ্চি মোটা। কাগজ-সূতার এ-জাল সুদীর্ঘ-প্রসারে অঙ্কুরের উপর মেলিয়া দিন,—সূর্যকিরণ এবং বাতাস অবরুদ্ধ থাকিবে না ; বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভাসিয়া বা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অঙ্কুরের কোনো অনিষ্ট ঘটবে না। চারাগুলি মাথায় আড়াই-ইঞ্চি বাড়িবার পৰ এ-জালের আবরণে অঙ্কুর ঢাকিয়া রক্ষা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

শয্যা-বুককেশ

পাশেব ছবিতে বুক-কেশটি দেখিতেছেন।



বুক-কেশে শয্যা

এমন কৌশলে নির্মিত যে, একধারে এ-বুককেশে বই-কাগজ-পত্র, জামা-কাপড় রাখা চলে, আবার প্রয়োজন হইলে তলা খুলিয়া

কাগজ-মাফিক পিছাইয়া দিন—কোমল শয্যা মিলিবে। শুইয়া আবারে নিজ-সুখ উপভোগ করুন।

কৌকড়া-চুলের বাহার

'কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশনী'! কুঞ্চিত কেশদামে নারীর শ্রী



কেশ-কুঞ্চন

খোলে অপরূপ কিন্তু সবার কেশ কি কুঞ্চিত করা সম্ভব? এ সমস্যার আজ সমাধান হইয়াছে। মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা কেশ-কুঞ্চন-যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। সে যন্ত্র চলে বৈদ্যুতিক প্রবাহযোগে। এ যন্ত্রের সাহায্যে

পাংলা কেশ, ঘন কেশ, শুষ্ক কেশ, তেলা কেশ অর্থাৎ সকল রকমের কেশ সুকুঞ্চিত করা চলে। এ-কুঞ্চন-প্রণালীতে কোনো রকম তৈল, ক্রীম বা মাথা-ঘষা প্রভৃতির কোনো প্রয়োজন নাই। এ-যন্ত্রে একবার কেশ প্রসাধন করিয়া দ্বি-ত্রৈকাল কেশদাম সাত দিন আঙুরের খোলার মতো কৌকড়া থাকে।

মরীচা তোলা

বাটালি, উকা, ছুবি প্রভৃতিতে মরীচা ধরিলে সে-মরীচা তুলিবার সহজ উপায়—প্যারাক্সিনে তুলা বা নরম গ্ৰাকডা ভিজাইয়া সেই

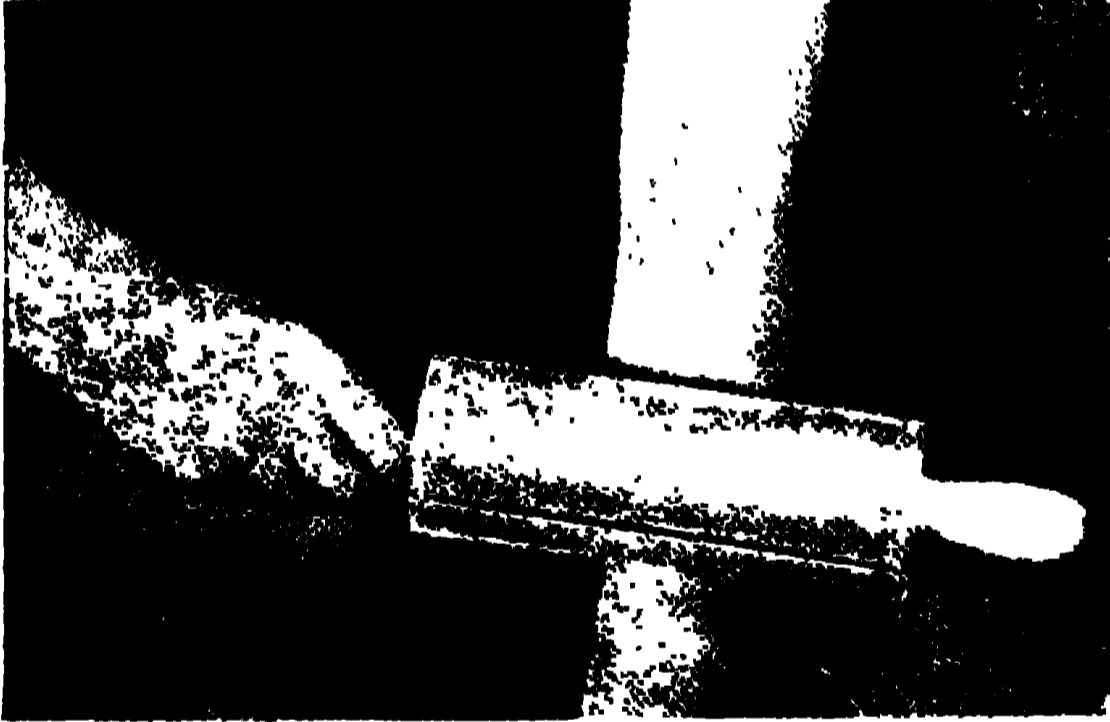


মরীচা তোলা

ভিজা তুলা বা গ্ৰাকডা দিয়া ছুরি, বাটালি, উকা ও ক্ষুরের গা মাজা মরীচা সাফ এবং লোহা বা ইস্পাত রূপার মতো উজ্জল হইবে।

রোলার-সাবান

অনেকে স্পঞ্জ বা রবার-কেসের সাহায্যে গায়ে সাবান মাখেন। সম্প্রতি বেলুন-রোলারের ছাঁদে সাবান তৈয়ারী হইয়াছে। এ-সাবানের এক-একটির ওজন আধ সেব। সাবানের দু'প্রান্তে বেলুনের মতো দু'টি হাতল আছে। কাঠের হাতল। সাবান



পায়ে রোলাব-সাবান মাখা

মাখিবার সময় এই হাতল ধরিয়া গায়ে-হাতে-পায়ে সাবান মাখিলে খুব ফেনা হইবে এবং গায়েব ময়লা কাটিবে। এ-সাবান আপাততঃ তৈয়ারী হইয়াছে তিন রঙে! সাদা, গোলাপী এবং সবুজ। সাদা

সাবান গার্ডেনিয়ার বাসে সুবাসিত; গোলাপী সাবানে পাইবেন জেরানিয়ামের সুবাস; এবং সবুজে পাইবেন পাইনের গন্ধ।

জলে জীবন রক্ষা

ব্রিটিশ নেভি-বিভাগ সম্প্রতি ধাতু-নির্মিত এক রকম লাইফ-বেন্ট তৈয়ারী করিয়াছেন। সে-বেন্টের একটির সাহায্যে তরঙ্গোচ্ছ্বিত সাগরের



লাইফ-বেন্ট

বুকে ছ'জন লোক অনায়াসে নিরাপদ-আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এ-বেন্টের পকেটে নির্মল পানীয় জল ও খাদ্যাদি রক্ষা করা যায়। সে পানীয় জলে এবং খাদ্যে ছ'জন লোক তিন-চার দিন জীবনধারণ করিতে পারেন। তার পর এ-বেন্টে ধূম ও আলোর সংকেত ব্যবস্থা আছে। সে-সংকেতিকার সাহায্যে দিনের বেলায় বেন্ট হইতে যেমন প্রচুর কৃষ্ণ ধূম নিঃসারিত হয়, রাত্রে তেমনি প্রদীপ্ত আলোর বিকাশ ঘটে। এই আলো ও ধূম দেখিয়া দূরবর্তী জাহাজ বা তীরদেশ হইতে সাহায্য মিলিবার সম্ভবনা যে সুনিশ্চিত, সে সন্দেহে নাই।

গোরু-বাছুর

কহেন ছাত্রের পিতা, “কি তফাৎ শিক্ষকে রাখলে?
উভয়ে চরায় গোরু বেত্র হাতে ঘুরে পালে-পালে।”
শিক্ষক কহেন, “গোরু চরানোরও করি না বড়াই।
গোরু ত গোয়ালে থাকে, তাহাদের বাছুর চরাই।”

উপগুপ্ত।



অপচয়

একদা যে রূপলাবণ্যবতী তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে পাঠনিরত ছাত্রদিগকে হিন-উঁচু জুতার শব্দে সচকিত ও বিস্মিত করিয়া সঞ্চারিণী লতিকার সঞ্চরণচ্ছন্দে তরুণের দলকে উন্মনা করিত, এবং ক্ষণিকের জগু তাহাদের দৃষ্টিতে স্বপ্নের মোহ ঢালিয়া-দিয়া ঘুরাফেরা করিত, তাহারই সহিত এক দিন কল্যাণপুরের জমিদারের একমাত্র বংশধর প্রশান্তের বিবাহ হইয়া গেল। প্রশান্তের পিতামাতা বিহীন বধুকে সাদরেই গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কারণ, তাঁহারাও আধুনিক রুচিসম্পন্ন, এবং প্রশান্তকেই তাহার বধু-নির্বাচনের সকল ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পিতা বলিয়াছিলেন,—“মেয়েরা ত আর মণিহারী দোকানের পণ্য নয় যে, তার পছন্দ অপছন্দ বলে একটা কিছু আছে; এ মানুষের হৃদয় নিয়ে খেল’, প্রশান্ত যাকে উপযুক্ত মনে করবে, তাকেই বিয়ে করবে।”—তিনি হয় ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, জগতে মানুষকে চেনাই সব চেয়ে কঠিন, এবং উদার যৌবনেই মানুষ সব চেয়ে অস্তুতঃ এই ব্যাপারে বেশী ভুল করে।

বিবাহের পর একটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে—

প্রশান্তের আজ কয়েক দিন অসুখ। হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় কিছু বৈকল্য দেখা দিয়াছে—ডাক্তাররা এক বাক্যে তাহাকে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন। তাই, প্রশান্ত পূর্বের দিকের দোতলার খোলা ধরটায় দিবারাত্রি শুইয়াই কাটায়। জানালার নীচে সরু একটি গলি, তাহার ও-পারে মধ্যবিত্ত কয়েক ঘর লোক বাস করে, কেহ কেরাণী, কেহ মাষ্টার, কেহ বা অল্প কিছু। তাহার পরে অদূরে দেখা যায়, একটি শীর্ণ নারিকেল গাছের ঝাঁকড়া মাথা, সেখানে এক জোড়া শঙ্খ-চিলের বাসা—দিবারাত্রি এই বিহগ-দম্পতি খড়-কুটা সংগ্রহ

করিয়া নীড় রচনা করিতেছে। তাহার পরে খানিকটা আকাশ; কখনও নীল, কখনও মেঘে ধূসর, কখনও বা শুভ্র পালকের মতো লঘু মেঘের স্তূপে আকাশের স্বচ্ছ নীলিমাতুকু ঢাকিয়া যায়। প্রশান্ত শুইয়া শুইয়া তাহাই দেখে।

ঠিক জানালার সামনে যে বাড়ীখানি, তাহার ছাদে ছোট্ট টিনের চালায় একটি রান্নাঘর,—একটি বধু সেখানে নিত্য দু’বেলা রান্না করে, ছাদে কাপড়-বিছানা শুকাইতে দেয়, ছেলেকে খেলনা দিয়া বসাইয়া রাখে,—দেখিয়া দেখিয়া বধুটির দৈনিক কাজের তালিকা প্রশান্তের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। আজ প্রায় পনের দিন সে নিয়মিত ভাবে একই দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে।

তাহার পরিচর্যার জন্তে একটি ফিরিজি নার্স আছে, ডাক্তারের আদেশ মতো সমস্ত কর্তব্য সে যথানিয়মে পালন করে, মাঝে মাঝে প্রশান্তের সহিত গল্পও করে। স্ত্রী রমলা মাঝে-মাঝে আসে; মা, বাবাও আসেন, কুশল প্রশ্ন করেন।

প্রশান্ত আজও অগাঢ় দিনের মতো আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল—পড়ন্ত রৌদ্র নারিকেল গাছের মাথায় ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে। সহসা কে যেন ঘরে প্রবেশ করিল,—প্রশান্ত ফিরিয়া দেখিল—রমলা।

রমলা প্রশ্ন করিল,—আজ কেমন আছ?

প্রশান্ত বিছানায় তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল,—আমার ত মনে হয় ভালই; কিন্তু এমনি ক’রে শুয়ে থেকে আর ত পারি নে। তুমিও ত এসে হুঁদণ্ড বসতে পারো—

রমলা হাসিয়া বলিল,—বেশ ছুঁনিমটা দিলে ত। আমি তোমাকে দেখিই নে। ডাক্তার বলেছে, তোমার কথা বলা বারণ, তাই আসি নে,—আমি এলেই কথা বলবে ত!

প্রশান্ত হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—আমি নয় কেবল শুনব, তুমিই গল্প করো—

—তা, আমি পারি নে, একা একা কি গল্প করা চলে ?

প্রশান্ত চাহিয়া দেখিল, রমলার বেশের আজ একটু নূতনত্ব আছে। প্রশ্ন করিল—আজ অকস্মাৎ বেশ-পরি-বর্তন কেন ?

রমলা বলিল,—ওঃ, একটু বাইরে যাচ্ছি কি না। আজ আমাদের ক্লাবে একটা বিশেষ জন্স আছে, আমাদের যেতেই হবে। ছবিদি' এসে বার-বার বলে গেছে—

—ওঃ, তাই !

রমলা ঘড়ি দেখিয়া বলিল,—ওঃ, পাঁচটা বাজে যে ! দেৱী হয়ে গেল। যাক, কিছু মনে করো না, নার্শ ত রইল, তুমি ত আর একা নও। আসি তা হ'লে, কেমন ?

প্রশান্ত ক্ষুদ্র একটু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—হঁ, এসো। ক'টায় ফিরবে ?

—ন'টা নাগাদ আর কি !

রোগ-শয্যায় কয়েকটি দিন প্রশান্ত আপনাকে যেমন নিঃসঙ্গ মনে করিয়াছে, এমন সারা জীবনেও কোন দিন তাহার মনে হয় নাই। সে ক্লাস্ত চক্ষু দু'টি আবার বাহিরের দিকে নিবদ্ধ করিল। ও-পারে দ্বিতলের সেই বধুটি তখনও রান্নাঘরে আসে নাই—

তাহার দিগম্বর শিশু পুত্রটি কোথায় যেন এক-টুকরা সাবান পাইয়াছে, এক বালুতি রান্নার জল ছিল,—সেই জলে সাবানটুকু গুলিয়া সে সমস্ত পেটে মাখিয়াছে, যতই সাবানের ফেনা হইতেছে, ততই সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপন মনে হাসিতেছে, উল্লাসে মাঝে-মাঝে কিছু ফেনা মাথাতেও তুলিয়া দিতেছে। আনন্দের আতিশয্যে অবশেষে সে বালুতির মধ্যে বসিয়াই সাবান সহ জলক্রীড়া আরম্ভ করিল। যেমন করিয়াই হোক, সাবানের ফেনা বোধ হয়, কিছু চোখে গিয়াছে,—জ্বালা করার তারস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অভিমুহুর মত বালুতি-বৃহের প্রবেশ-পথ তাহার জানা ছিল ; কিন্তু বাহির হইবার পথ তাহার জানা ছিল না।...প্রশান্ত আপন মনেই হাসিতেছিল।

বধুটি হস্তদস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের এই দুর্গতি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। সম্ভবত বলিল,—যেমন দুষ্ট। কোভও একটু হইবার কথা,—রান্নার জলটুকু সে নষ্ট করিয়াছে।

পুত্রকে বালুতি-মুক্ত করিতে না করিতেই বাজার-হস্তে পুত্রের পিতার রক্তমঞ্চে আবির্ভাব ! গৃহিণীর নালিশ শুনিয়া পুত্রের কান দুইটি স্তম্ভপর্ণে মর্দন করিয়া সম্ভবত কিঞ্চিৎ শাসন করিলেন।

বাজারের থলি হইতে বেশাতি বাহির করিয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিতেছেন। কথাও মাঝে-মাঝে শোনা যাইতেছে। চারটি কই মাছ আসিয়াছে—

স্ত্রী প্রশ্ন করিলেন,—মাছের কি হবে ?

স্বামী ক্ষণিক চিন্তা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—মাথার মুড়িঘণ্ট, ঞাজার অঙ্কল, আর পেটির কালিয়া—

দুই জনেই হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্র এতক্ষণে একটি ধাবনরত কইএর ঞাজা ধরিয়া মায়ের কোলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। মা তাহার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া বলিলেন,—কাপড়খানা ঞাঁশ ক'রে দিলি, গম্ভীছাড়া—

স্বামী হাসিয়া বলিলেন,—মাছটা চ'লে যাচ্ছিল, ও ত ভাল যায়গায় আটক ক'রে রেখেছে মাত্র !

স্ত্রী কৃত্রিম রোষভরে বলিলেন,—যাও, তোমার সব তাতেই হ'য়ে—

'হিয়ে'টা কি, তাহা শুনিবার পূর্বেই পিতা পুত্রকে লইয়া প্রশ্রয় করিলেন। প্রশান্ত চোখ ফিরাইয়া দেখে, শঙ্খ-চিল আপন মনে নীড়-রচনায় রত—আকাশটুকু অসুমান তপনের লোহিতালোকে রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে

রমলা আসিয়া জানাইল,—আমাদের ক্লাবে আজ কি ঠিক হ'ল, জানো ?

প্রশান্ত বলিল,—কি ? তা জানবো কি ক'রে ? গণনা-শক্তি ত নেই আমার।

—তা বটে, ওটা স্মরণ ছিল না ; তবে শোনো—ঠিক হ'য়েছে, আমরা কেবল মেয়েদের জন্মেই একটা মাসিক পত্রিকা বের ক'রবো,—তাতে সব 'সেক্সন' থাকবে,—যেমন রান্নাঘর, গৃহস্থালী, ভাঁড়ার ধর, রোগ-সেবা—

এই সব। গৃহস্থ বহুদের কি কি কর্তব্য তাই বলা হবে, যেমন রান্নাঘর 'সেক্সনে' কোন্ খাদ্য কিরূপে তৈয়েরী ক'রতে হয়, কিসে কত 'ভাইটামিন' থাকে—ইত্যাদি। রোগ-সেবায় থাকবে, কি রোগে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; আর গৃহস্থালীতে থাকবে আসবাব-পত্র, বিছানা, ঘর-সাজানো, শিল্পকার্য—এই সব আলোচনা।

—তুমি কোন্ বিষয়ে লিখবে ?

—আমাকে ত তারা সাধারণ সম্পাদক ক'রেছে, আর রোগ-সেবা 'সেক্সনে' লিখতে ব'লেছে, আমিও রাজি হ'য়েছি, কারণ মেডিকেল সায়েন্সে আমার একটু—কি বলি—'ইনটারেস্ট' আছে।

প্রশান্ত হাসিয়া ফেলিল।

রমলা প্রশ্ন করিল,—হাসলে যে বড়ো ? ভেবেছ—আমি বুঝি লিখতে পারিনে ?

প্রশান্ত আবার একটু হাসিয়া বলিল,—লিখতে তুমি পারবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই, তবে রোগীর সেবা সম্বন্ধে তোমার যে আগ্রহ, এতে—

রমলা বাধা দিয়া বলিল,—তুমি কি বলতে চাও, তোমাকে আমি অবহেলা করি ? তোমার রোগ-শযায় আমি সেবা করিনে ?

প্রশান্ত জবাব দিল না। তর্কে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না।

রমলা বলিল,—পাছে তোমার সেবার কোন ক্রটি হয়, এই ভেবেই না আমি ফিরিঙ্গি নার্শের বন্দোবস্ত ক'রেছি—আমি যদি কোন ভুল ক'রে ফেলি। এ সব ত কোন দিন করিনি, জানিও না।

—রোগীর শুশ্রুষায় যা জানা দরকার, সেটা যৎসামান্য ; যা লাগে সেটা খুব কঠিন—সেই জগুই—

—সেটা কি শুনি—

—সেটা দরদ,—দরদটাই রোগীকে বেশী আরোগ্য করে, অবশু নয়—

রমলা বাহিরের দিকে কণিক তাকাইয়া-থাকিয়া বলিল,—কি ক'রতে হবে বল, তাই ক'রবো—

প্রশান্ত বলিল,—তুমি যদি সর্বদা কাছে থাকতে, তবে সত্যিই আনন্দ পেতাম,—আমার বিশ্বাস, আমি

যদি আনন্দে সময় কাটাতে পারি, তবে রোগটাও তাড়া-তাড়ি সেরে যাবে—

রমলা ক্রটি স্বরে বলিল,—বেশ, এখন থেকে তাই হবে; সমস্ত কাজ-কর্ম ফেলে-রেখে তোমার এখানেই এসে জগন্নাথ দেবের মত ব'সে থাকবো।

প্রশান্ত আবার একটু হাসিয়া বলিল,—কাজকর্ম ফেলে আসতে হবে কেন ? এখানে এসেই ত কাজকর্ম ক'রতে পারবে।

রমলা বলিল,—ডাক্তার বারণ ক'রেছে, সে কথা শুনেছ ?—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রশান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। যে আজ গৃহবধূর কর্তব্য সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করিতে যাইতেছে, সে কেমন করিয়া তাহার নিজের গৃহকে ভুলিয়া গেল ? সে ত স্বামী, তাহার যেমন রমলার সাহচর্য্য এত আনন্দের, রমলার পক্ষে কি স্বামীর সাহচর্য্য আনন্দের নয় ? অতাব তাহার কিছুই নাই,—ফিরিঙ্গি নার্শের দেওয়া ঔষধ-পথ্য তাহার কেন ভাল লাগে না ! তাহার অন্তরের এই নিঃসঙ্গতাকে রমলা কেন বুঝিতে পারে না ?—তাহার শিক্ষা আছে, বুদ্ধি আছে, সবই ত আছে !

আজ রবিবার—

সামনের ওই বাড়ীটায় আজ উৎসব চলিয়াছে। স্বামী বাজার হইতে মাংস আনিয়াছে,—স্বামি-স্ত্রী দুই জনে মিলিয়া তাহাদের রান্না হইতেছে। স্ত্রী পিঠের উপর ভিজা চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া বঁটিতে কুটনো কুটিতে-ছেন, আর স্বামী কোমরে গামছা জড়াইয়া রাধিবার সরঞ্জামগুলি শুছাইয়া লইতেছেন। পুত্রটি অদূরে এক-হাতে নিজের ঞ্জলিত ইজের ধরিয়া ও অপর হস্তে একটা লাঠী লইয়া বিশেষ কি কাজে ব্যাপৃত। পিতা-মাতার দিকে তাহার ফিরিয়া চাহিবারও অবসর নাই।

প্রশান্ত ভাবে—মাংস খাওয়াটা এই দরিদ্র দম্পতির বিলাস। নিত্য মাংস কিনিবার সামর্থ্য নাই, তাই আজ এই দুর্লভ মাংসটুকুকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের অন্তর উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। কত অল্পে তাহারা সন্তুষ্ট! প্রশান্ত লুক্ক-নেত্রে তাহাই দেখে—

তোলা-ডগুন আজ বাহিরে আসিয়াছে, ছোট্ট একটা জলচৌকি আমদানী করা হইয়াছে—বসিবার জন্ত। স্ত্রী কুটনো কুটিয়া বাটনা বাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বামী সদন্তে বলিলেন,—কি ঠুক-ঠুক করে বাটনা বাটচো? ও কি সন্ধ্যার আগে শেষ করতে পারবে? দাও, আমার হাতে।

স্ত্রী বলিলেন,—তুমি পারবে না গো! যার যে কাজ! তুমি মাংস মাখো—

স্বামী বলিলেন—না, পারবো না! কি যে বলো! নোড়ার দুই ডলনে সব বেটে শেষ করে দিচ্ছি, দেখ—

স্বামী শিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বীরবিক্রমে বাটনা বাটিতে লাগিয়া গেলেন; দেখিতে দেখিতে নোড়াটা হাত ফস্কাইয়া শিল হইতে তিন হাত দূরে আশ্রয় গ্রহণ করিল—

স্ত্রী বলিলেন,—কেমন হ'য়েছে? যার কন্ম তারে সাজে—

স্বামীর হাতেও সম্ভবতঃ একটু বেদনা লাগিয়াছে; নিজের পৌরুষ অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি সেটা গোপন করিতে চান—কিন্তু স্ত্রী যুহুর্ভে তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

এই সব দেখিয়া প্রশান্ত আপন মনেই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নার্শ অমুখ দিতে আসিয়া প্রশ্ন করিল,—হাসছেন যে?

প্রশান্ত ইংরেজি ভাষায় জবাব দিল,—ওরা কি সুখী! ওদের কাণ্ড দেখে হাসছি।

নার্শ কৃপা-মিশ্রিত স্বরে বলিল,—ওঃ, তাই।

ঔষধ সেবনান্তে প্রশান্ত আবার দেখে,—কড়াইতে তৈল দেওয়া হইয়াছে, তৈলের উষ্ণতা মসলা দেওয়ার উপযুক্ত হইয়াছে কি না, এই লইয়া উভয়ের বচসা চলিতেছে। অকস্মাৎ বিচক্ষণ পুল সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়া তপ্ত তৈলের কটাছে কি একটা জিনিস ছাড়িয়া দিয়াছে! কটাছের তৈল ছিটকাইয়া গায়ে পড়িবার ভয়ে স্বামী এক লম্ফে পলায়নোদ্ভূত!

প্রশান্ত ভাবে—দারিদ্র্যের নির্ভরতায় এই দম্পতির অন্তর অন্তর্মুখী আর পরিপূর্ণ প্রাচুর্যের মধ্যেও রমলার অন্তর বহিমুখী, ওঁদের ওই দরিদ্র গৃহস্থালী ভিন্ন আনন্দের

অন্ত উপলক্ষ নাই,—এই দারিদ্র্যের আশীর্বাদ, আর রমলা আজ নিজের গৃহধর্ম উপেক্ষা করিয়া অত্নের গৃহের উপদেষ্টা, এই তাহার জীবনে প্রাচুর্যের অভিসম্পাত। প্রশান্ত দুঃখিত হয়, তাহার জীবনের দুঃখকে আজ যেন সে হাতে-হাতে ধরিয়া ফেলিয়া তাহার সম্ভাপ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে!

পরদিন ডাক্তার আসিয়া প্রশান্তের হৃদয়ঙ্গম পরীক্ষা করিয়া যেন একটু শঙ্কিত হইয়াছেন বোধ হইল।

প্রশান্তও বলিল,—মাঝে-মাঝে আজ যেন প্যাল-পিটেস্‌ন্‌ হ'চ্ছে বলে মনে হয়, ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, তাই দেখলুম। এর আগে ত বেশ ভাল হ'য়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলুম, দু'-চার দিনেই সমস্ত সেরে যাবে; কিন্তু হঠাৎ আবার এমন 'টার্ন' নিল কেন, বুঝতে পারছি নে!

প্রশান্ত ম্লান হাসিয়া বলিল,—যাই হোক, এমনি ক'রে একা-একা আর শুয়ে থাকতে পারিনে।

ডাক্তার বাবু প্রশ্ন করিলেন,—মনের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম,—কেবল হৃদয়ঙ্গম কেন, সমস্ত শরীরেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; আপনি মানসিক দিক দিয়ে বেশ আনন্দে না থাকলে রোগ ক্রমশঃ বেড়েই যাবে। মানসিক অশান্তি কিছু ঘটেছে কি? কিছু মনে ক'রবেন না আপনি, চিকিৎসার দিক থেকে এ কথা জানতে চাচ্ছি।

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল,—না, তেমন কিছু ত দেখি না; তবে এই একা-একা তেমন ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, 'চেঞ্জ' গেলে হয় ত ভাল হ'য়ে যেতে পারে।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—তা হ'তে পারে বটে; কিন্তু যাওয়ার পরিশ্রমটা—আচ্ছা, কর্তার সঙ্গে যুক্তি ক'রে যা হয় ক'রবো। আপনি বেশ 'চিয়ারফুল' থাকবেন সব সময়, দুঃখের কথা ভাববেন না, তাতে অসুখ বাড়বে—

প্রশান্ত ডাক্তারের অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিল,—মানুষ কি নিজের চেষ্টায় মনকে সুস্থ করিতে পারে? সুখ-দুঃখ কি নির্ভর করে কেবল নিজেরই উপর?

প্রশান্ত ভাবে,—রোগশয্যায় আনন্দ দানের জন্ত যদি কাহারও নিকট তাহাকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হয়, তবে সে

ওই শিশুটি ও তাহার পিতামাতা ; আর যদি কেহ দুঃখ দিয়া থাকে, তবে সে রমলা ; হয় ত সেই জন্তই অসুখ বাড়িয়াছে, কে বলিতে পারে ? ওদের মত তাদের জীবনও এমন নিবিড় আনন্দে ভরিয়া উঠে না কেন ? এই বিপুল প্রাচুর্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও কোথা হইতে কি যেন অভাব আসিয়া অহরহ তাহার বৃকের ভিতর কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিধিতেছে !

কয়েক দিন হইল ঠিক হইয়াছে যে, প্রশান্ত তাহার মাতার সহিত ঘাটশিলা যাইবে। প্রয়োজন হইলে রমলা ও তাহার পিতা পরে যাইবেন।

প্রতিদিনের মতোই প্রশান্ত আজও কর্মনিরত ওই বধুটিকে দেখিতেছিল। অগাধ দিনের মত পিঠে ভিজা চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া আজও সে উনানে আফিসের ভাত চাপাইয়া দিয়াছে। পরন্তু প্রশান্ত ঘাটশিলায় যাত্রা করিবে—

রমলা একটু ব্যস্ততার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,—তুমি না কি পরন্তু ঘাটশিলায় চ'লে যাচ্ছে ?

প্রশান্ত ম্লান হাসিয়া বলিল,—কেন, তুমি কি তা জানো না ?

—আমাকে জানাবার প্রয়োজন তোমার হয়নি ; আমি ত তোমাদের কাছে পর—আমাকে বলবে কেন ? —কণ্ঠস্বর শ্লেষ ও অভিমানবিজড়িত।

—আমার কথা যদি বল, আমি রোগী, আর তোমার সঙ্গে কদাচিৎ ছুই-একবার যা দেখা হয়, তার মাঝে এ প্রসঙ্গ ওঠেনি। তবে তুমি এ বাড়ীর বোঁ, আর তোমার স্বামীরই অসুখ ; এ ক্ষেত্রে যদি তুমি তার চেঞ্জের যাওয়ার সংবাদ না পেয়ে থাকো, তবে সে জন্তে তোমাকেই দোষ দিতে হয়—

রমলা একটু চূপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—দোষ আমার—এ কথা স্বীকার ক'রতেই হবে, যেহেতু তোমার ঘরে এসে দিবারাত্রি পাহারায় থাকতে পারিনি। কদাচিৎ আমি দেখতে আসি—সেটাও আমারই দোষ। সে যাই হোক, তুমি সব জেনে-শুনেই ত বিয়ে ক'রেছিলে ; এখন বিদায় দিলে তোমারই...

রমলা কথা শেষ না করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

প্রশান্ত বলিল,—এ জগতে সেই বেশী দুঃখী, যে বেশী ভালবাসে,—যারা ভালবাসে না, তাদের দুঃখ আশ্বাদন ক'রবার সুযোগই নেই।

—তুমি কি বলতে চাও—আমি তোমায় ভালবাসি নে ?

—না, তা বলতে চাই নে।—প্রশান্ত মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া এ কথা বলিল।

—তবে এ কথা তোমার মনে হয় কেন ?

—তোমার ভালবাসার আদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের তফাৎ আছে, সম্ভবতঃ সেই জন্তেই আমি দুঃখ পাই ; এ জন্তে আমি কোন দিনই তোমাকে অপরাধী করিনি। যাক সে কথা, তোমাদের সেই কাগজ ক'বে বেরুচ্ছে ?

রমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—বেকাবে এক হপ্তা দেড় হপ্তার মধ্যেই, তার জন্তে যদি আমি কাজ করে থাকি, তবে সেইটাই কি অপরাধ হ'য়েছে,—শিক্ষিত জীবনের গণ্ডী যে আপনা-হ'তেই বৃহত্তর হ'য়ে যায়, এ কথা ত তুমি জানো—

—জানি এবং সেই জন্তেই ত কোনও দিন তোমাকে বাধা দেই নি,—তা' ছাড়া, আমার অভাবও ত কিছু নেই।

প্রশান্ত অকারণেই একবার বাহিরের দিকে দৃষ্টি-নিষ্কেন্দ্র করিল।

শঙ্খচিলের নীড় রচনা কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, ডালে বসিয়া সে চীৎকার করিতেছে ; হয় ত তাহার সঙ্গীকে ডাকিতেছে। ও-বাড়ীর সেই ছুট্টু ছেলেটি আবার বালতি-বুহে প্রবেশ করিয়া জল ছিটাইতেছে, শীতলই কাঁদিয়া উঠিবে। কিন্তু আজ ঘটনা বিপরীত ;—বালতিশুদ্ধ অতি-মন্থ্য ধরাশায়ী হইয়া চীৎকার শুরু করিয়াছে—মা আসিয়া তাহাকে একটা চড় মারিতেই বিদ্রোহী শিশু মাতাকে আঁচড়াইয়া-কামড়াইয়া চুল টানিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল। গামছা-স্বন্ধে পিতা রক্তভূমিতে প্রবেশ করিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে কহিলেন, “হে ভার্গব, কর বধ জননীয়ে আজ, পিতৃআজ্ঞা অলঙ্ঘ্য তোমার !”

প্রশান্ত ও রমলা উভয়েই হাসিয়া উঠিল। প্রশান্ত বলিল,—আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ, রোগশয্যায় দিন-গুলিকে ওরা খানিকটা আনন্দময় ক'রে রেখেছে—

রমলা রুট স্বরে জবাব দিল,—তুমি বার-বার ঠেস

দিয়ে ওই একটি কথাই ব'লছে কেন ? তুমি কি মনে কর, আমার শিক্ষা-দীক্ষা, বন্ধু-বান্ধব, সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়ে তোমার সামনে বসে থাকলেই ভালবাসার চরম দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ত ? তোমার ভালবাসার কনসেপ্‌সন্ যদি তাই হয়—তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসতে পারিনি—

প্রশান্ত আবার একটু হাসিয়া বলিল,—সে কথা ত আমি বলিনি ।

—মেয়েরা আজ শিক্ষিত হয়ে যদি নিজেদের সুখ-দুঃখ আনন্দকে চিনেই নিয়ে থাকে, তবে তাতে তাদের অপরাধ কিছু হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না । মুক পশুর মত ঘরের কোণে সে বন্দী হ'য়ে যদি বাস ক'রতে না পারে, তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না—

প্রশান্ত প্রশান্ত স্বরেই বলিল,—নিজের সুখ-দুঃখ চিনে নেওয়াটাই চরম শিক্ষা নয় ; অন্নের জন্তে নিজের সুখ, আনন্দকে ত্যাগ করাটাই শিক্ষা, তাই আজ মনে হয়, তোমাদের শিক্ষাটা অপচয়ই হ'য়ে গেছে—

রমলা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—তোমার এই মন নিয়ে শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে ক'রে তুমি ভাল করনি, তোমাকে এ-দুঃখ পেতেই হবে । তুমি যার কাছে কৃতজ্ঞ, তার মতো মেয়ে বিয়ে ক'রলে সুখী হ'তে পারতে—

রমলা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল । প্রশান্ত চাহিয়া দেখিল মাত্র, ডাকিয়া ফিরাইতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল ।

পরদিন প্রশান্তের অবস্থা আর একটু খারাপ হইল । ডাক্তার বাবু অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ঘাটশিলা

যাইবারই অনুমতি দিয়া গেলেন,—বিশেষতঃ রোগী নিজেই যখন বায়ুপরিবর্তনে যাইতে কৃতসঙ্কল্প ।

যথাসময়ে সকলেই হাওড়া-স্টেশনে সমবেত হইলেন । পিতা ডাক্তার, নার্শ ও প্রশান্তের মাতাকে যথাবিহিত উপদেশ দিলেন । নিত্য পত্র দিতে এবং জটিল কিছু ঘটিলেই টেলিগ্রাম করিতে বার-বার বলিয়া দিলেন ।

ট্রেন ছাড়িবার সময়-জ্ঞাপন করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইল ।

রমলা বাহিরে প্রশান্তের সামনের জানালাটার আসিয়া দাঁড়াইল । প্রশান্ত বলিল,—তোমার কাগজ বেরুলে আমাকে একখানা পাঠিয়ে দিও—

রমলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে যথা-সময়েই তাহা পাঠাইবে ।

প্রশান্ত প্রশ্ন করিল,—তোমার কি যাওয়ার ইচ্ছা ছিল ?

—কাগজ বেরুলেই আমি যাবো,—একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি কি না !

প্রশান্ত ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিল,—জানি না, আর ফিরে আসবো কি না, তবে মনে রেখো—

তীব্র বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল । রমলা প্রশান্তের কথার শেষটুকু শুনিতো পায় নাই । চলন্ত গাড়ীর দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বুকের মাঝে কাঁপিয়া উঠিল—প্রশান্ত সত্যিই যদি আর না ফেরে ! তবে তার শিক্ষা-দীক্ষা, সমগ্র জীবনটাই ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে !

অজানিত আশঙ্কায় তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল । প্রশান্তের পিতা বলিলেন,—তুমি যাবে, মা ?

রমলা চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উজ্জ্বলিত কণ্ঠে বলিল,—আমি যাবো বাবা—আমি যাবো—

শ্রীপৃথ্বীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

বাসনা

বাসনার শ্রোতে ভাসা তাই মর্ত্যলোক,
বাসনায় ডুবে মরা তাহাই নরক ।
বাসনা যেখানে শুক, পায় যেথা ক্ষয় ।
সেইখানে স্বরগের সূত্রপাত হয় ।



সচক্র শনি গ্রহ

(বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ)

সৌরজগতের গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি বৃহত্তম; কিন্তু শনি গ্রহই সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে গাঁহারা চক্রবেষ্টিত শনি গ্রহকে অক্ষকালের ভিতর লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার সেই শোভায় নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছেন; সেই শোভা চন্দ্রেরই জায় মনোহর।

অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল সৌরগ্রহের বিষয় পৃথিবীর লোকের সুবিদিত, তাহাদের মধ্যে শনি গ্রহই সর্বাধিক হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো নামক যে তিনটি গ্রহ আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা বাতীত পৃথিবী হইতে শনি গ্রহেরই দূরত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। সূর্য হইতে শনিব দূরত্বের পরিমাণ মোটামুটি ৮৮ কোটি ৫৯ লক্ষ মাইল। সূর্যকে নয় ফুট ব্যাসের একটি গোলক বলিয়া ধরিলে তাহার তুলনায় সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৩২২ গজ, এবং শনি গ্রহের দূরত্ব ৩০৬৭ গজ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। এত বেশী দূরে আছে বলিয়াই পৃথিবী হইতে উহা একটি নক্ষত্রের মতো দেখায়; কিন্তু উহা কোন দিন পৃথিবী হইতে সাড়ে ৭৪ কোটি মাইল অপেক্ষা অধিক নিকটে আসে না। আবার যখন পৃথিবী হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরে গিয়া পড়ে, তখন সেই দূরত্বের পরিমাণ ১০০ কোটি মাইলেরও অধিক হইয়া থাকে। শনি গ্রহ আকাশে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিয়া এক রাশিতেই দুই তিন বৎসর অবস্থিতি করে; এবং সাড়ে ২৯ বৎসর সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া লইয়া থাকে। গগনমার্গের এক ডিগ্রী অতিক্রম করিতে শনি গ্রহের এক মাস অতিবাহিত হয়।

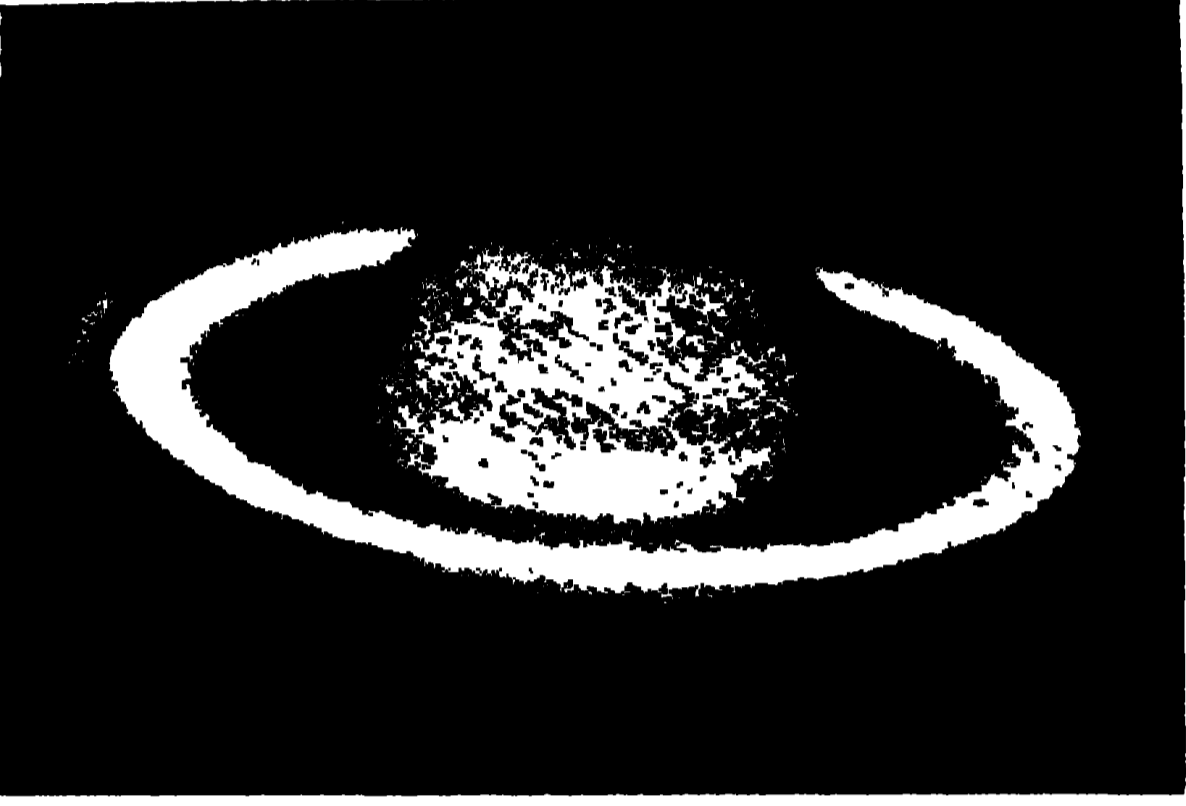
শনি গ্রহ আয়তনে পৃথিবীর ৭৩৪ গুণ বড়; কিন্তু উহার ভার এই অনুপাতে অধিক নহে। ঘনত্বের স্বল্পতা বশতঃ শনির ভার পৃথিবীর ভারের ৯৫ গুণ মাত্র। এই গ্রহ জল অপেক্ষাও লঘুভার। সৌরজগৎসমূহ মধ্যে কেবল শনিই এইরূপ লঘুভার। অল্প গ্রহগুলি সম আয়তনের জল অপেক্ষা গুরুভার। জলের ঘনত্ব 'এক' ধরিলে তুলনায় শনির ঘনত্ব দশমিক বিন্দু সাত। সহজ কথায় বৃহস্পতির ভার জল অপেক্ষা যত অধিক, অনুপাতিক হিসাবে শনির লঘুত্ব জল অপেক্ষা প্রায় ততখানিই কম! স্বরণ থাকা উচিত যে, পৃথিবী জল অপেক্ষা সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী।

অতীব বিশাল কোন জলাশয়ে যদি পৃথিবী ও শনি এই উভয়

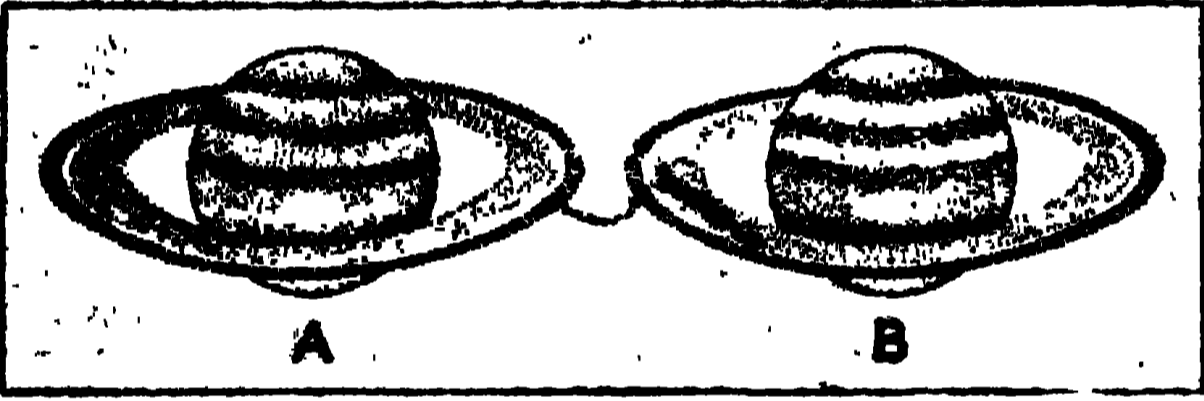
গ্রহকে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী কোন ভারী ধাতু-পিণ্ডের জায় উহার ভিতর ডুবিয়া যাইবে, এবং শনি গ্রহ শুষ্ক কাঠ-খণ্ডবৎ সেই জলে ভাসমান থাকিবে।

বৃহস্পতি গ্রহের সহিত কোন কোন বিষয়ে শনির সাদৃশ্য আছে। বৃহস্পতির জায় উহা মেরুর অভিমুখে বিশেষ রকম চেপ্টা, এবং এই বিষয়ে শনি গ্রহ বৃহস্পতিকেও হারাইয়া দিয়াছে। বিষুবরেখার উপর মাপ করিলে শনি গ্রহের ব্যাস ৭৫ হাজার মাইল; কিন্তু মেরুর দিকে উহার ব্যাস ৬৭ হাজার মাইল। শনি স্বকীয় মেরুদণ্ডের উপর বৃহস্পতির জায় অতি দ্রুতবেগে আবর্তিত হইতেছে। দ্রুত আবর্তনই উহার আকার গোল না হইবার একটি কারণ। শনির পৃষ্ঠদেশে যে সকল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি বৃহস্পতি-দেহের কলঙ্ক ও আবেষ্টনীক জায় স্পষ্ট নহে। তবে বিষুবরেখার উপর শনি গ্রহের উজ্জ্বল আবেষ্টনী আছে; এবং মেরুর দিকেও কক্ষবর্ণ স্থান সমূহ লক্ষিত হয়। স্পষ্ট কলঙ্ক শনির দেহে কদাচিৎ আবিভূত হইয়া থাকে। কিছু দিন পূর্বে উহার দেহে যে বিশাল কলঙ্ক লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার দৈর্ঘ্য নয় হাজার মাইল, এবং প্রস্থ সাড়ে চার হাজার মাইল। অত্যাগ জ্যোতিঃপিণ্ডের জায় কলঙ্কের গতি হইতে শনির আবর্তনবেগ নিরূপণ করা যায়। কলঙ্কের গতি নিরূপিত হইবার পূর্বে মেরুর দিক চেপ্টা দেখিয়াই শনি গ্রহের আবর্তনবেগ খুবই বেশী বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে হাশেল স্মির করেন—ঐ বেগের পরিমাণ ১০ ঘণ্টা ১৬ মিনিট। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটা উজ্জ্বল কলঙ্ক শনির মধ্যরেখায় হঠাৎ আবিভূত হয়। ওয়ার্মিংটনের মানমন্দির হইতে আসাফ হল এক মাসেরও অধিককাল যাবৎ উহা লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে, শনি গ্রহের একবার আবর্তনে ১০ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড সময় লাগে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বার্ণার্ড বিষুবরেখার বাহিরে ৩৬ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে উহার আর একটি কলঙ্ক দেখিতে পান। এই কলঙ্কের আবর্তনকাল ১০ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। উভয় কলঙ্কই কয়েক মাসের মধ্যে অস্তিত্বিত হয়। কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, বৃহস্পতির জায় শনির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রকার গতিবেগ উহার পৃষ্ঠদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বর্তমান, এবং ঐ বেগ বিষুবরেখার উপরেই অধিক; স্পষ্টতঃ বলা যায়, সাওয়া দশ ঘণ্টার মধ্যেই শনির দিবারাত্রি শেষ হয়।

ইহার অর্ধেক সময় দিবাভাগ বলিয়া ধরিয়া লইলে বলিতে হয়, পৃথিবীর হিসাবে শনি গ্রহের দিন অত্যন্ত অল্পকাল স্থায়ী। চিত্রে শনির পৃষ্ঠদেশের দুইটি আবেষ্টনীর মধ্যে এক কলঙ্ক চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। দশ মিনিট সময়ের মধ্যে কলঙ্কবিশেষ যে ভাবে স্থান পরিবর্তন করে, পাশাপাশি দুইটি চিত্র লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।



সচক্র শনি গ্রহ



শনির উপরের কলঙ্ক

শনি গ্রহের কঠিন দেহ আমরা দেখিতে পাই না; উহার মেঘাবরণ বা বাষ্পীয় পদার্থই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। শনির দেহ প্রধানতঃ বাষ্পীয় পদার্থে নির্মিত, এবং তাহার অধিকাংশ বস্তু কেন্দ্রদেশে অবস্থিত। অত্যন্ত প্রচণ্ড বাত্যা শনির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর বাতাস সূর্যের তেজ হইতে তাহার গতিশক্তি সঞ্চয় করে; বৃহস্পতির তুলনায় শনি অধিক শীতল। রেডিওমেট্রিক পরীক্ষাতেও ইহা প্রতিপন্ন হয়। এ সকল ক্ষেত্রে তাপমাত্রা নিতুল ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না হইলেও শনির পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা বিয়ুক্ত ২০০ ডিগ্রী ফার্নহাইট, অর্থাৎ ফার্নহাইট স্কেলে শূন্য হইতে নীচের দিকে ২০০ ডিগ্রীর কাছাকাছি ধরিয়া লইলে বেশী ভুল না হইবারই কথা। কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শনির উপরিভাগেব ক্রিয়াশীলতার উৎপত্তির হেতু সূর্য হইতে সংগৃহীত তাপ নহে। শনির উপরিভাগে যে কলঙ্ক লক্ষিত হয়, তাহা মেঘ ভিন্ন অল্প কিছুই নহে।

স্পেকট্রাম বা রশ্মি-বিশ্লেষণের পরীক্ষায় শনির গঠনোপাদানের আভাস পাওয়া যায়। ঐ রশ্মিলেখা বাহির মৌর-জগতের গ্রহ-গুলির অর্থাৎ বৃহস্পতি, নেপচুনাতির স্পেকট্রামের জায়। দেখা যায়, শনির এমোনিয়া-রেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। শৈত্যের প্রাবল্য হেতু উহা জমাট-বাঁধা অবস্থায় থাকা অসম্ভব নহে।

মিথেন বা মার্শগ্যাস শনি গ্রহে প্রচুর পরিমাণে আছে, এরূপ ধারণা অসম্ভব নহে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বা কার্বনিক এসিড গ্যাসের যে রেখা শুক্র গ্রহে পরিলক্ষিত হয়, শনির 'স্পেকট্রামে' তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্সিজেনেরও কোন সন্ধান শনি গ্রহের রশ্মিরেখায় পাওয়া যায় না। মার্শ-গ্যাসের জায় দাহ পদার্থের সহিত অক্সিজেনের অবস্থিতি সম্ভব নহে। আর্গন, নাইট্রোজেন, নিয়ন, হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন শনি গ্রহে যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও স্পেকট্রাম-পরীক্ষায় ঐ সকল গ্যাসের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না। প্রচুর হাইড্রোজেন ঐ গ্রহে বর্তমান আছে বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্বে এক মত প্রকাশ করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা লঘু এই গ্যাস সূর্যের দেহে প্রচুর পরিমাণে আছে। শনির আকর্ষণ-শক্তি এরূপ যে, উহাও হাইড্রোজেন গ্যাসকে আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ।

শনির মধ্যরেখা ঐ গ্রহের কক্ষের সমতলের সহিত ২৭ ডিগ্রী কোণে অবস্থিত। এই কারণে শনি-জগতে ঋতুব পরিবর্তন ঘটয় থাকে। প্রতি ঋতু সাত বৎসর উহাতে প্রভাব বিস্তার করে।

গ্রহজগতে একমাত্র শনিরই উজ্জ্বল আলোক-বেষ্টনী আছে। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণের সাহায্যে সর্বপ্রথম শনির চক্র লক্ষ্য করেন। তাঁহার যজ্ঞ তেমন শক্তিশালী ছিল না, এজন্য শনির দুই পাশে দুইটি বস্তু-পিণ্ড আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মে। কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি দ্বিতীয়বার ঐ গ্রহের পরীক্ষা করেন, চক্রটি তখন লক্ষ্যপথেব বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় তিনি তাহা দেখিতে পান নাই, এজন্য মনে করেন—পূর্বে তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ চক্র পুনর্বার দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিয়া-পড়িলে বহু পর্যবেক্ষক উহা লক্ষ্য করিলেও কেহই প্রকৃত রহস্য নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হুগ্গিন্স ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরও কিছু দিন পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার উদ্দেশ্যে হুগ্গিন্স তাঁহার আবিষ্কারের তথ্য স্পষ্ট ভাবে প্রকাশের পরিবর্তে প্রাচীন প্রণালীতে অক্ষর সমূহের বিকৃত বিজ্ঞানের দ্বারা কৌশলে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সঙ্ক্ষেতে তিনি এইরূপ প্রকাশ করেন,—সূক্ষ্ম গঠনে এক চক্রে শনি গ্রহ পরিবেষ্টিত। চক্রটি শনি গ্রহকে কোন স্থানেই স্পর্শ করে নাই। ক্রান্তি-বৃত্তের সমতলে অবস্থিত না হইয়া উহা তাহার সহিত কোণ উৎপাদন করিয়াছে।

দূরবীক্ষণের উন্নতি ও শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধিত হইলে, শনির চক্র যে পাশাপাশি বিরাজমান তিনটি পৃথক সমকেন্দ্রীয় চক্রের সমষ্টি, ইহা স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হইল। ইহাও লক্ষিত হইল যে, বাহিরের দিকের দুই চক্রের ব্যবধান দুই হাজার মাইল। আবিষ্কারকের নামানুসারে চক্রের এই বিভাগের নাম হইল ক্যাসিনির বিভাগ। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে চক্র দুইটির মধ্যে কাঁক দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ভিতরের দিকের তৃতীয় চক্রটি শনির দেহ হইতে ৬ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। মধ্যের চক্রই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। তৃতীয় চক্রটি যেন নিঃশব্দ। বাহিরের চক্র ১০ হাজার মাইল প্রশস্ত, মধ্য চক্র ১৬১৭ হাজার মাইল, এবং তৃতীয় চক্র ১১ হাজার মাইল উহাদের বহির্দিকের ব্যাস যথাক্রমে ১ লক্ষ ৭০ হাজার, ১ লক্ষ ৪৫ হাজার, এবং ১ লক্ষ ১৩ হাজার মাইল। ভিতরের চক্রটি অনেক বিলম্বে—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চক্রগুলি ক্ষীণ এবং

কোনটিরই উচ্চতা ৫০।৬০ মাইলের অধিক নহে। সেই জন্ত সকল সময়ে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। শনি গ্রহের বিশেষ অবস্থান-বশতঃই কেবল পৃথিবী হইতে উহা নয়নগোচর হওয়া সম্ভব। প্রতি ১৫ বৎসরে শনিব চক্রের সমতল পৃথিবীর সমতলের মধ্য দিয়া চলিয়া থাকে। এই জন্ত তখন পাশের দিক হইতে উহাকে লক্ষ্য করিতে হয়। চক্রটি সেই সময়ে প্রায় অদৃশ্য হইয়া ৪০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণে একটি আলোক-বেগা মাত্র পর্য্যবসিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একবার অদৃশ্য হইবার পর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উহা পূর্ণ আকারে আবির্ভূত হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পুনর্বার উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে শনিব চক্রের সুসম্পূর্ণ পবিস্মৃত মন্দি পৃথিবী হইতে নয়ন-গোচর হইবে। চক্রসমষ্টি মুক্ত অবস্থায় থাকিলে উহাদের উজ্জল পৃষ্ঠে শনি গ্রহের রক্ষণ ছায়া পতিত হয়। এই ছায়াব উৎপত্তি হইতে ইহাষ্টে প্রতিপন্ন হয় যে, শনি গ্রহেব বোলাটে হবিদ্রাভা উহাব পৃষ্ঠে প্রতিফলিত সূর্যালোক মাত্র; শনি নিজেব আলোকে উজ্জল নহে।

গঠন ব্যাপাবে সৌরজগতে শনিব চক্র অতুলনীয়। ঐ চক্র নিববচ্ছিন্ন কঠিন বা তরল পদার্থে গঠিত নহে, অসংখ্য বস্তুকণায় সৃষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাসিনি এই মত প্রকাশ করেন। চক্রটি গোটা-বস্তু হইলে শনিব দেহের উপর ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া এক অবস্থায় স্থায়িত্বে বর্তমান থাকিলে, ইহা সম্ভব নহে। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক লাপলাস গবেষণাব ছায়া এ কথা সপ্রমাণ করিলেও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাসিনিব মত গৃহীত হয় নাই। ৬ বৎসর ক্লার্ক মাক্সওয়েল গভীর গবেষণাব ফলে প্রতিপন্ন করেন যে, শনিব চক্র বস্তুপুঞ্জ সংগঠিত হইলেই উহা স্থায়ী হইবে। অধ্যাপক কীসাব ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উহাব এই প্রকার গঠনই যে সত্য, স্পেকট্রোস্কোপেব পরীক্ষায় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। আলোক-মল কাছে আসিতেছে কি দূবে সরিয়া যাইতেছে, স্পেকট্রোস্কোপে শুধু ইহাষ্টে যে জানিতে পারা যায় এমন নহে, আপেক্ষিক গতিও উহাব সাহায্যে নিরূপণ করা সম্ভব। শনিব প্রত্যেক চক্রেব ক্ষেত্রে কীসাব দেখাইলেন, উহাব ভিত্তবেব অংশ বাহিবের ভাগ অপেক্ষা বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। গোটা বস্তু ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাপাব সংঘটিত হইবার কথা। শনিব চক্রেব ভিত্তবেব দিকের বস্তুকণা সন্থের বেগ জানা গিয়াছে—সেকেণ্ডে ১৫ মাইল এবং বহির্ভাগেব কণিকা সকলের বেগ ১১ মাইল। কোন দূরবীক্ষণেরই এ শক্তি নাই যে, শনিচক্রের বস্তুপুঞ্জের সূর্যালোক-দীপ্ত এক-একটি কণা পৃথকভাবে দেখাইবে। তবে তৃতীয় চক্রের মধ্য দিয়া যে শনি গ্রহ পরিলাক্ষিত হয়, তাহাতে স্পেকট্রোস্কোপের পরীক্ষার তত্ত্ব সমর্থিত হয়। অধুনা-গৃহীত কয়েকটা ফটোগ্রাফে বাহিবের চক্রের মধ্য দিয়াও শনি গ্রহ দেখা যাইতেছে।

শনিব চক্র উহাব কোন উপগ্রহ ভাঙ্গিয়া গিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। যে উপগ্রহ এক দিন শনিব চাবিপাশে চক্রাকারে ঘূর্ণিয়া বেড়াইত, কোন সময়ে তাহা ঐ অতিকায় গ্রহের অতি নিকটে আসিয়া পড়ায় তাহার প্রবল আকর্ষণে ক্রমে চূর্ণ হইয়া যায়। শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত উপগ্রহটিই এখন শনিকে চক্রাকারে পরিবেষ্টিত করিয়া গগন-পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। এখনও পর্য্যন্ত অল্প কোন সৌরগ্রহের শনিব জায় বেটনী গড়িয়া উঠে নাই বটে, তবে ভবিষ্যতে যে সেরূপ চক্র গঠিত হইবে না, এমন কথা মনে করিবার কারণ

নাই। পৃথিবী এবং আরও দুই-একটি গ্রহেব উপগ্রহ ভাঙ্গিয়া চক্র উৎপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

শনিব নয়টি উপগ্রহের কথা সুবিদিত। নবম উপগ্রহ আবিষ্কার করিবার পর পিকারিং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শনিব দশম উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্প্রতি নর্দম কর্তৃক এই উপগ্রহ-টির অস্তিত্বের বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। শনিব উপগ্রহ দশটির নাম, —মিমা, এনসিলেডাস, টেথিস, ডায়োন, রী, টাইটান, হাইপারিয়ন, ইপেটাস, ফী ও থেমিস; সর্বাধিক দূরবর্তী নবম উপগ্রহটি শনি হইতে ৮০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। কাজেই শনি-জগতের ব্যাস ৮০ লক্ষ মাইল ধরিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, পার্থিব জগতের তুলনায় শনিব জগৎ অতি বৃহৎ; চন্দ্র পর্য্যন্ত নিষ্কৃত পার্থিব জগতের ব্যাস মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল। শনিব উপগ্রহগুলিব ব্যাস ২০০।৩০০ মাইল হইবে। কিন্তু সাধারণ দূরবীক্ষণে উহাদের সকলগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। শনি হইতে বৃহত্তম টাইটানের দূরত্ব ৭ লক্ষ ২১ হাজার মাইল, সকলের ক্ষুদ্র উপগ্রহটি দূরত্বে ১ লক্ষ ১৭ হাজার মাইল। শনিব নিকটবর্তী পাঁচটি উপগ্রহ এক শ্রেণীতে পড়ে। উহারা সকলেই শনিব চক্রের সহিত এক সমতলে ভ্রমণ করে। দূরবে উপগ্রহগুলিব স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য আছে। টাইটান সর্বাধিক উজ্জল। হাইপারিয়ন এত ক্ষুদ্র যে, তাহা প্রায় অদৃশ্য। ইপেটাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, শনিব পূর্বপ্রান্তে থাকিলে উহাকে যেরূপ উজ্জল দেখায়, পূর্বভাগে তাহা অপেক্ষা তিন-চার গুণ বেশী উজ্জল বলিয়া মনে হয়। উহাব উজ্জল্যের তাবতম্য এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়—চন্দ্র যেমন সকল সময়ে পৃথিবীর দিকে এক পিঠ ফিরাইয়া রাখে, ইপেটাসও তেমনি সর্বদা শনিব দিকে এক-অর্দ্ধাংশ ফিরাইয়া বিচরমান থাকে। ঐ উপগ্রহের অর্দ্ধেক ভাগের সূর্যালোক প্রতিফলিত করিবার শক্তি অধিক। শনিব পশ্চিম দিকে থাকিলে সেই অংশটা আনবা দেখিতে পাই, এ জন্ত উহা অধিক উজ্জল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। টাইটান বোল দিনে, এবং রী সাড়ে চার দিনে শনিকে একবার প্রদক্ষিণ করে। নবম উপগ্রহ ফী অপব সকল উপগ্রহ যে দিকে ঘূর্ণিত হইবে, তাহার বিপরীত মুখে শনি গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এইরূপ বিপরীত গতি সৌরজগতে বিরল। শনিব চারি দিকে নবম উপগ্রহের একবার ঘূর্ণিবার জন্ত ১৮ মাস সময়ের প্রয়োজন। এই জন্তই মনে হয়, দেড় বৎসবে একবার মাত্র উহা শনিজগতে পূর্ণচন্দ্রের শোভা বিকাশ করে। মঙ্গল গ্রহেব ক্ষুদ্র উপগ্রহটি এক রাত্রিতে দেড় বার পূর্ণচন্দ্রের আকার ধারণ করে; সে কথা স্মরণ করিলে উভয়ের মধ্যে বৈষম্য কত অধিক, তাহা অনুভব করা কঠিন নহে।

শনি গ্রহ হইতে পৃথিবীকে কিরূপ দেখা যায়?—এ প্রশ্ন মনে উদ্ভিত হওয়া স্বাভাবিক। তুলনায় পৃথিবী আকারে অনেক ছোট বলিয়া শনি গ্রহকে পৃথিবী হইতে যেরূপ আকারবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়, শনিব নিকট পৃথিবী তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রাকার প্রতীয়মান হইবে। অর্থাৎ প্রায় ৮২ ভাগের এক ভাগ বোধ হইবে। সূর্য হইতে বহু দূরে আছে বলিয়া ঐ গ্রহ হইতে সূর্যও ক্ষুদ্রাকার লক্ষিত হইবে। পৃথিবীর অতি নিকটে না থাকিলে শনি হইতে আমাদের আকাশের চক্রকেও খালি চোখে দেখা যাইত।



গুণবিষ্ণুর 'ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য'

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।

(১০) পতিগৃহে যাত্রাব পূর্বে বধূর পাঠ্য 'প্র মে' ইত্যাদি মন্ত্রটির অর্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে কবিরত্ন মহাশয় গুণবিষ্ণুর তীর্থ সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি যাত্রা ক্রটি বলিয়া প্তিব ক'বয়াছেন, সেকপ 'ক্রটি' সায়েণেব ব্যাখ্যায় অনেক পাওয়া যায়। সায়েণ শত শত ছান্দস ব্যত্যয়েব উল্লেখ কবিয়াছেন। কবিরত্ন মহাশয় এই প্রসঙ্গে সায়েণেব নামে যে ব্যাখ্যাট উদ্ধৃত কবিয়াছেন, তাহাতেও শিবা ও অবিষ্ট! এই দুইটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ পদ্যঃ পদেব বিশেষণ করিতে হইয়াছে।

কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—“কুপ্ ধাতু অকর্মক, উহাব অর্থ 'কবোতু' কিরূপে হইল ?” কুপ্ ধাতুব সাকর্মক কবোতার্থ প্রয়োগ লৌকিক সংস্কৃতেও পাওয়া যায়, বৈদিক সংস্কৃতে ত থাকিতেই পাবে। শ্রীমদ্ভাগবতেব (৩, ৭, ১৫) “প্রজ্ঞাপতীনাঃ স পতিশ্চক্-পে কান্ প্রজ্ঞাপতীন্” এবং ভট্টিকাব্যেব (১১, ১১) “নাকল্প-শ্চং সন্নিনি স্থাণুঃ” ও (১৪, ৮৯) “চক্-পে চাশ্বকুঞ্জবম্” এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জয়মঙ্গল 'অকল্প-শ্চং' পদেব প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'কৃতবান্ শ্চাং'।

গুণবিষ্ণু 'শিবা' অর্থ 'সুখাবহা' লিখিয়াছেন। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা কবিতেনে—“শিব শব্দেব অর্থ কি সুখ ?” শিব শব্দেব অর্থ যে সুখ এবং সুখজনক হয়, তাহা সুপ্রসিদ্ধ। কবিরত্ন মহাশয়েব সমালোচনায় (৯) চিহ্নিত বক্তব্যে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত মেদিনীকোমেও শিব শব্দেব অর্থ আছে সুখ, ক্ষেম, জল ইত্যাদি। স্বয়ং কবিরত্ন মহাশয়ও ক-পুস্তকে (৬১ পৃঃ) টীকা দিয়াছেন—“শিবাঃ (শিবঃ) সুখকবঃ”। ঋগ্বেদেব (১০, ৩৪, ২) “শিবা সখিতা উত মহমাসীং” এই মন্ত্রে সায়েণও অ। করিয়াছেন—“শিবা সুখকরী”। অথচ গুণবিষ্ণু 'শিবা সুখাবহা' এইকপ ব্যাখ্যা করায় নিন্দাতাজন হইলেন !

গুণবিষ্ণুর ভাষানুসারে এই মন্ত্রে বধূ পতিগৃহযাত্রাকালে বলিতেছেন, 'পতি আমার পথ কবিয়া দিন'। ইহার তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, পতি আমাকে উত্তম পথে লইয়া চলুন। এই প্রকার অর্থ করার জন্ত প্রবীণ কবিরত্ন মহাশয় তরল ভাষায় গুণবিষ্ণুকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—“বরের বাড়ী যাতায়াতের কি পথ থাকে না ? তাহাকে কি উড়ো-জাহাজে বিবাহ করিতে বাইতে হয় ? আহা ! সে বেচারাকে যধু লইয়া বাড়ী যাইবার জন্ত কোদাল, কুড়ুল, ঝুড়ি লইয়া পথ প্রস্তুত করিতে বাইতে হইবে।”

এই প্রসঙ্গে যে সকল মন্ত্র পাঠ বিহিত আছে, তাহা লক্ষ্য করিলে কি একটা উপহাস কব! চলে ? একটি মন্ত্র এইরূপ—“মা বিদন্ পরিপস্থিনো য আসীদস্তি দম্পতী। সৃগেভির্হুর্গমতীতামপ দ্রাহ্বরাতয়ঃ।” ইহার অর্থ—‘পথে দম্পাদল যেন দম্পতীকে না জানিতে পারে। ইহারা সুরপথ দিয়া দুর্গম স্থান অতিক্রম কখন। শক্রবা দুবে পলায়ন ককক’। পথ দুর্গম হইত বলিয়াই পথে ব্যাঘ্র, তন্দব, ঋশান, দীর্ঘাবণা, নির্জন প্রদেশ, গভীর নদী প্রভৃতি শঙ্কাস্থানের উল্লেখ আছে; ‘পরিপস্থনাশনী’ ঋক্ পাঠেব ব্যবস্থা আছে (শাঙ্খায়নগৃহসূত্র, ১, ১৫-১৭; আপস্তম্বগৃহসূত্র ২৩ ৫-৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

কবিরত্ন মহাশয়, নিজে বিভিন্ন সময় মন্ত্রটির বিভিন্নরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। কোন্ অর্থটি তাহার অভিপ্রত, তাহা তিনিই জানেন। তিনি ভবদেবপদ্ধতিব ১ম সংস্করণে (৬১ পৃঃ) মন্ত্রটির একরূপ টীকা করিয়াছিলেন; ২য় সংস্করণে (৮৬ পৃঃ) উহা পরিবর্তন করিয়া অগুরূপ করিয়াছেন; এবং এখন গুণবিষ্ণুর সমালোচনা করিতে বাইয়া আবার এক প্রকার অর্থ দিয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যাতে ছিল ‘শিবাঃ’ পুংলিঙ্গ বহুবচনাস্ত, অথচ ‘পস্থাঃ’ এই একবচনাস্ত পদেব বিশেষণ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে উহা বধূ পদেব বিশেষণরূপে শিবা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া গেল। তৃতীয়বারের ব্যাখ্যায় ‘শিবা’ পদটিকে স্ত্রীলিঙ্গরূপেই ‘পস্থাঃ’ পদেব বিশেষণ করা হইল। ‘অবিষ্টা’ এত দিন বধূব বিশেষণ ছিল, এবারে উহাকেও পুংলিঙ্গ ‘পস্থাঃ’ পদেব বিশেষণ করা হইয়াছে। এইরূপে কবিরত্ন মহাশয়ের হাতে মন্ত্রটির অর্থ বারবার পরিবর্তিত হইয়াছে। তৃতীয় বারের ব্যাখ্যা সায়েণের নামে ছাপা হইয়াছে। এই মন্ত্রের সায়েণভাষ্য কবিরত্ন মহাশয় কোথায় পাইলেন, তাহা বলিলে ভাল হইত।

গৃহ্যসংগ্রহে আছে—“পদা প্রপথ্য পস্থানং পতিযানং জপেধধুঃ”। এখানে পতিযানং পদ দেখিয়া কবিরত্ন মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, গুণবিষ্ণুর ‘পতি যানঃ’ পাঠ গৃহ্যসংগ্রহ-বিরুদ্ধ। কিন্তু এরূপ স্থলে ‘পতিযান’ পদটি মন্ত্রবোধক প্রতীক মাত্র। অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া এরূপ প্রতীক সৃষ্টি করা হইত। অপোশান, মানস্তোক, শম্বোদেবী ও মধুবাতা ঈদৃশ মন্ত্র-প্রতীক। শম্বোদেব্যা পয়ঃ ক্ষিপ্তা, অপোশানাদনস্তরম্, মানস্তোকেন গায়ত্র্যা, মধুবাতাং তথা জপ্তা ইত্যাদি বচন স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রগুলির প্রকৃত রূপ শম্বো দেবীঃ, অপোশান, মানস্তোকে, মধু বাতাঃ। কবিরত্ন মহাশয় নিজেও ‘অভীষুণঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রের প্রতীক করিয়াছেন ‘অভীষুণ’ (ভবদেবপদ্ধতি ২য় সং ৫৩ পৃঃ)। ‘সুতবাং পতিযানং’ পদ দেখিয়া বুঝবার উপায়

নাই—মন্ত্রটির 'পতিমানঃ' পাঠ না 'পতি যা নঃ' পাঠ গৃহ্যসংগ্রহ-সম্মত।

(১১) এই স্থানে পত্নীর জন্তু নির্দিষ্ট মন্ত্র পতি পাঠ করেন। একরূপ স্থলে স্ত্রীমাংসা শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে কখন কখন অর্থের অসঙ্গতি উপেক্ষা করিয়া মন্ত্র পাঠ কবিত্তে হয়। ছাগপশু বলির সময়ে মন্ত্রস্থ মেঘ পদ পরিবর্তন কবিত্তে হয় না। পাড়কাস্ত অনু-মরণস্থলেও পত্নীপাঠা মন্ত্রে 'সহভর্ষণরীবেন' বলা কবিত্তে হয়। পতি-পত্নী উভয়ে কার্য করিলেও 'পত্নীং সন্নহা' মন্ত্র অপরিবর্তিতই থাকে, তাহাতে পতি বাদ পড়িয়া যান।

(১২) কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—“উর্গামোহন বাবু ২য় সংস্করণও দেখিয়াছেন, তথাপি তিনি ১ম সংস্করণের ভুলটি প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হন নাই”। উল্লিখিত ভুলটি ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের প্রথম দিকে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ অংশ বগন ছাপা হয়, তখন ক-পুস্তকের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানি না। আমি ভূমিকা লেখার সময় ২য় সংস্করণ দেখিয়াছিলাম।

(১৩) এ সম্বন্ধে (প)-চিহ্নিত উক্তিতে সকল কথা বলিয়াছি।

(১৪ ও ১৫) আমার (৪)-চিহ্নিত উক্তিতে উহার উক্তন আছে।

(১৬) গুণবিষ্ণুর ভাষা যে যে স্থলে আকব গ্রন্থের বিরুদ্ধ, আমি তত্বেস্থলে টিপ্পনীতে আকব গ্রন্থের পাঠ তুলিয়া লিখিয়াছি—‘আকবগ্রন্থে মুদ্রাপিতঃ পাঠঃ’। কবিরত্ন মহাশয় উহার ভাবার্থ কবিত্তেছেন যে, আমার মতে আকবগ্রন্থে ছাপা পাঠগুলি সবই ভুল। আকবণ আমার টিপ্পণীর কদর্থ করা হইয়াছে। গ্রন্থের কোন স্থলেই আকবদৃষ্ট পাঠের বিরুদ্ধে কিছু বলি নাই। গুণবিষ্ণু অত্রাস্ত ঋষি ছিলেন বলিয়া মনে করি নাই। ভূমিকায় (p. iii) বলিয়াছিলাম—“...there are still some Mantras, the readings of which do not agree with those found in available Vedic texts...I have however pointed out the better readings either in the foot-notes or in the Akarasanketika.”

কবিরত্ন মহাশয় সংখ্যাচিহ্ন না দিয়া গুণবিষ্ণু-টীকার কতকগুলি অপপাঠের তালিকা দিয়াছেন। উহার চারি স্থলে মাত্র তাঁহার ‘বক্তব্য’ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি উক্ত চারিটি স্থলেই আলোচনা করিব। আমার বক্তব্যগুলি সংখ্যাচিহ্ন দিয়াই বলিব, কারণ, ভবিষ্যতে প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যিক হইলে উহাতে উল্লেখ করার পক্ষে সুবিধা হইবে।

(১৭) ষিঙ্গণের পক্ষে প্রতিদিন স্বাধায় বা ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। ব্রহ্মযজ্ঞে চারি বেদ হইতে অন্ততঃ প্রথম চারিটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ‘শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে’ ইত্যাদি অথর্ববেদের আদি মন্ত্র। গুণবিষ্ণু বলিয়াছেন—“অথর্ববেদাদিমন্ত্রোঃ ২য় পিঙ্গলাদ-দৃষ্টঃ বরুণদৈবতঃ”। কবিরত্ন মহাশয়ের বক্তব্য—“ঐ মন্ত্রটি অথর্ব-বেদের আদি মন্ত্র নহে। উহার পিঙ্গলাদ ঋষি নহেন, বরুণও দেবতা নহেন।”

অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণে (১, ২৯) স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়—“শন্নো দেবীরভিষ্টয় ইত্যেবমাদিঃ কৃতা অথর্ববেদমধীরীত।” এই সঙ্গে ঋক্, সাম এবং যজুঃ সাহিত্যের আদি মন্ত্রও গোপথ-

ব্রাহ্মণে ধরা আছে। ‘শন্নোদেবী’ যে অথর্ববেদের আদি মন্ত্র সে বিষয়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাক্ষ্য অপেক্ষা সোগাতব প্রমাণ কি হইতে পারে? আরও প্রমাণ দিব।

ভারতবর্ষগৃহস্থত্রে (৩, ১৫) আছে—“বেদাদীন্ জপেং .. অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যেদেদেত্তেষে যোজ্যে ত্বেতি যজুর্বেদস্তাগ্ন আয়াহি বীতয় ইতি সামবেদস্ত শন্নো দেবীরভিষ্টয় ইত্যথর্ববেদস্ত।” অল্পরূপ উক্তি বোধায়নীয় গৃহস্থত্রে (২, ৯, ৫) ও পাওয়া যায়। বৈখানসগৃহস্থত্রে (৬, ১৬) ব্রহ্মযজ্ঞের এইরূপ একটি লক্ষণ দেওয়া আছে—“সাবিত্রীপূর্বের্ষাদশমুর্কৈবগ্নিমীড়ে পুরোহিতমিসে যোজ্যে যাগ্ন আয়াহি শন্নো দেবীরিতি চতুর্বেদাদিমন্ত্রৈর্বা স্বাধায়ো ব্রহ্মযজ্ঞঃ।”

অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁহার পিতৃদয়িতায় (২০ পৃষ্ঠা) ব্রহ্মযজ্ঞে শন্নোদেবী মন্ত্রের বিনিয়োগ নির্দেশ কবিত্তেছেন এবং গুণবিষ্ণুর মতই পিঙ্গলাদ ঋষি ও বরুণ দেবতাব উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন তাঁহার আঙ্কিকতত্ত্বে ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণে অনিরুদ্ধ ভট্টের উক্তি প্রমাণ দিয়াছেন—“অনিরুদ্ধভট্টেন প্রণববাস্তিগায়ত্রীপাঠানন্তবং চতুর্বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয়ং লিখিতম্।”

পতঞ্জলি তাঁহার ব্যাকরণমহাভাষ্যের পশ্চাৎশ্লোকিক গুণবিষ্ণুত চারিটি মন্ত্র একত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপর তিনটি যখন তিন বেদের আদি মন্ত্র, তখন সাতর্ষবশতঃ শন্নোদেবীও আর এক বেদের প্রথম মন্ত্রই হইবে—ইহা সাধারণ বুদ্ধি হইতেও মনে হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সম্পদায়বিদগণ আজ পর্যন্ত ব্রহ্মযজ্ঞে অথর্ববেদের প্রতীকরূপে শন্নোদেবী মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, সে কথা বামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্যবর মহাশয় ‘ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারী’ পত্রিকায় (৩য় খণ্ড, ১৩২ পৃঃ) প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। ব্রহ্মযজ্ঞে যে বেদাদিমন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহা পূর্বে দেখিয়াছি।

শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও লোকব্যবহার হইতে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শন্নোদেবী অথর্ববেদের আদি মন্ত্র। কবিরত্ন মহাশয় দীর্ঘকাল যাবৎ আঙ্কিককৃত্যাদি গ্রন্থে প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, শন্নোদেবী অথর্ববেদের আদি মন্ত্র নহে। ইহার কারণ এই যে, শৌনকশাখীয় অথর্ববেদে ‘যে ত্রিসপ্তাঃ’ ইত্যাদি আদি মন্ত্র; ‘শন্নো দেবীঃ’ ঐ শাখার ১ম কাণ্ডের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ১ম মন্ত্র। উহাই কবিরত্ন মহাশয় দেখিয়াছেন।

পৈঙ্গলাদ শাখার অথর্বসংহিতাও ছাপা হইয়াছে, উহার প্রথম পাতাটি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু শৌনক শাখার যাহা আদি, সেই ‘যে ত্রিসপ্তাঃ’ মন্ত্রটি পৈঙ্গলাদ শাখায় ২য় অনুবাকের ১ম মন্ত্ররূপে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, শন্নোদেবী মন্ত্রটি ঐ শাখার মুদ্রিত অংশে কোথাও নাই। এই সকল কারণে এম, ব্রুমফিল্ড, (কৌশিক-গ্রন্থের ভূমিকা, xxviii) সি, আর, ল্যানম্যান (অথর্ববেদের হুইট্‌নিকৃত অনুবাদের ভূমিকা, cxvi) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অসম্মত করিয়াছিলেন যে, শন্নোদেবী পৈঙ্গলাদ শাখার প্রথম মন্ত্র। অনিরুদ্ধ ভট্টও বলিয়া দিয়াছেন (পিতৃদয়িতা, ২০ পৃঃ) এই মন্ত্রের ঋষি পিঙ্গলাদ। এখন গুণবিষ্ণুর উক্তি হইতে নির্ণীত হইয়া গেল যে, মন্ত্রটি পৈঙ্গলাদ অথর্ববেদের আদি মন্ত্র, কারণ গুণবিষ্ণু বলিয়াছেন “অথর্ববেদাদিমন্ত্রোঃ ২য় পিঙ্গলাদদৃষ্টঃ”। পণ্ডিতেরা এতদিন যাহা অসম্মত করিতেছিলেন, গুণবিষ্ণুর উক্তিতে তাহা সত্য প্রমাণিত

হইল। কবিরত্ন মহাশয়কে নিবেদন করি—‘এট অর্থাবেদের আদিমগ্ন নহে’ এমন কথা আর প্রচার করা সম্ভব হইবে না। বহু সম্মানিত সুপ্রাচীন ভাষাকার গুণবিষ্ণুর যথার্থ উক্তিই প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার কাহারও গোঁরব বাড়িবে না, বরং খণ্ডিতই হইবে।

(১৮) যখন শল্লোদেবী মন্ত্রটিকে অর্থাবেদের আদিরূপে পাঠ করিতে হয়, তখন গুণবিষ্ণু বলিয়াছেন—“শল্লো ভবন্তু ইত্যত্র ‘আপো ভবন্তু’ ইতি পঠাতে”। কবিরত্ন মহাশয় সমালোচনা করিতেছেন, কেবল “শল্লো ভবন্তু” স্থলে ‘আপো ভবন্তু’ পাঠ করিলে ‘শল্লো দেবীভিত্তয়ে ‘আপো ভবন্তু’ হয়, তাহাট হইবে কি ?” তাহা হইবে কেন ? যিনি গুণবিষ্ণুর ভাষা বুঝিবেন, তিনি ‘শল্লো দেবী-রভিত্তয়ে আপো ভবন্তু’ এই সন্ধিটিও কবিতা লইতে পারিবেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সে স্থলে কিছুই বক্তব্য নাই, সেকপ স্থলেও কবিরত্ন মহাশয় তাহা হটক কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(১৯) কবিরত্ন মহাশয় ‘অক্ষয়মী’ মন্ত্রের একটা অশুদ্ধ পাঠ তুলিয়া উহাট প্রকৃত গুণবিষ্ণু-পাঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, “সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া বেদোক্ত পাঠট ধরিয়াছেন”।

আমি স্বয়ং সংশোধন করিয়া বেদোক্ত পাঠ ধরি নাই। উহা যে গুণবিষ্ণুরই পাঠ, তাহা কবিরত্ন মহাশয়ও বিনক্ষণ জানেন। তিনি হয় ত তুলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্বে গুণবিষ্ণু-পাঠের শুদ্ধতা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি এই মন্ত্রটির ভাষাট উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেন। “ত্রিবেদীয়-ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতির” প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (১৩-১৪ পৃষ্ঠা) মন্ত্রটির গুণবিষ্ণু-পাঠ বিস্তৃত পাঠ প্রদর্শিত হইয়াছিল, এবং কবিরত্ন মহাশয় লিপিকর-প্রমাদেব দোষ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন (১৪ পৃঃ) “অতএব দেখুন, গুণবিষ্ণুর টীকায় কিরূপ কারিগরি ঘটিয়াছে, এবং অণ্ডেব দোষে তাহার পবিত্র গ্রন্থ কিরূপ কলুষিত হইয়াছে”। ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতির দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাবেদের পদ্ধতির ১ম সংস্করণের ভূমিকায়ও আলোচ্য মন্ত্রটির ভাষা তুলিয়া কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন—“দেখুন, মূল বেদেব পাঠের সহিত হস্তলিখিত গুণবিষ্ণু-টীকায় পাঠ সর্বাংশে একরূপ (কেবল ‘অবপ্রিয়া’ স্থলে এক পদ, এই মাত্র প্রভেদ ; সাধারণার্থ ও মন্তীধর অবটিকে উপসর্গ করিয়া ‘অধুষত’ ক্রিয়াব সহিত উহার অর্থ করিয়াছেন)”।

উহা বড়ই বহুমুখ্য যে, যিনি স্বয়ং হস্তলিখিত পুথি আলোচনা করিয়া ‘অক্ষয়মী’ মন্ত্রের গুণবিষ্ণু-পাঠ বিস্তৃত পাঠ অবগত হইয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া পূর্বে একাধিক গ্রন্থে গুণবিষ্ণুর প্রশংসা করিয়াছেন, তিনিই আজ ঐ মন্ত্রেরই লিপিকরকৃত অশুদ্ধ পাঠ তুলিয়া গুণবিষ্ণুকে দোষ দিতেছেন। এই সকল লক্ষ্য করিয়া মনে হয় না কি যে, কবিরত্ন মহাশয় যে কোনও উপায়ে গুণবিষ্ণুকে হয় প্রতিপন্ন করিবার জগুট লেখনী ধারণ করিয়াছেন ?

কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন “সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া বেদোক্ত পাঠট ধরিয়াছেন, কিন্তু অনবধানতাবশতঃ ভাষ্যের ভুল স্থলে সংশোধন করিতে তুলিয়া গিয়াছেন”। ‘অবপ্রিয়া’ স্থলে কিছু তুলিয়া যাউ নাই। গুণবিষ্ণু এক পদ রূপেই ‘অবপ্রিয়া’ বাখ্যা করিয়াছেন। গুণবিষ্ণুমতে মূলেও ‘অবপ্রিয়া’ পৃথক পদ হইবে না, উহা ভুল। ভাষ্যের ‘যঃ যে’ অংশ সত্যই আমার অনবধানতার

ফলে ছাপা হইয়াছিল। সে পুথিখানি হইতে আমার ‘কপি প্রস্তুত হয়, উহা অশুদ্ধিহীন ছিল। পবে আমি অনেকগুলি আদর্শ পুথি পাইয়া তদনুসাবে বিচারপূর্বক যথাযোগ্য পাঠ গ্রহণ করিয়াছি’। এই স্থলে অশুদ্ধ পুথির ‘যঃ যে’টুকু থাকিয়া গিয়াছিল। ‘যঃ যে’ স্থলে শুদ্ধ পুথিতে ‘কিছুতাঃ’ আছে। পরে উহা লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে সংশোধন করিয়া দিয়াছি। কবিরত্ন মহাশয়ের সংগৃহীত গুণবিষ্ণু-পুস্তকে ‘কিছুতাঃ’ আছে, সে কথা তিনি পূর্বে লিখিয়াছিলেন।

(২০) ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে একটা মন্ত্রের পাঠ “আ মা গস্তাঃ পিতবামাতরা যুবমা মা সোমোহমৃতত্বায় গমাং”। কবিরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে, ‘আ মা গত’ পিতবামাতরা যুবম্’ কাণ্ডশাখার পাঠ। “দুর্গামোহন বাবু ‘আ মা গস্তাঃ’ই বাগিয়াছেন।” কবিরত্ন মহাশয়ের বক্তব্য বোধ হয় এই যে, আমি যখন কাণ্ডশাখার ‘যুবম্’ এবং ‘অমৃতত্বায়’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছি, তখন ঐ শাখারই সম্পূর্ণ পাঠ লইয়া ‘গস্তাঃ’ স্থলে ‘গতঃ’ করা উচিত ছিল। কিন্তু এই মন্ত্রের ‘যুবঃ’ এবং ‘গস্তাঃ’ উভয় পদই অনিরুদ্ধ ভট্ট পিতৃদয়িতায় ধরিয়াছেন। গুণবিষ্ণুর পুথিতেও ‘গস্তাঃ’ই পাইয়াছি। উহাতে অর্থের সঙ্গতিও ক্ষুদ্র হয় নাই। সতরাং আমি উহা পরিবর্তন করি নাই। হলায়ুধেব ব্রাহ্মণসম্বন্ধে এবং বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণে ‘গস্তাঃ’ স্থলে ‘গস্তঃ’ পাঠ আছে, কিন্তু ‘গতঃ’ নাই।

আলোচ্য মন্ত্রটির উত্তরার্ধের পাঠ “পিতবামাতরা যুবমা মা সোমো” স্থলে মাধ্যন্দিনীয়সংহিতা (৯, ১৯), তৈত্তিরীয়সংহিতা (১, ৭, ৮, ৩), মৈত্রায়ণী সংহিতা (১, ১১, ৩) এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে (৫, ১, ৫, ২৬) ‘পিতবামাতরা চা মা সোমো’ আছে। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে সম্পাদকের সময় উহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু আকরগ্রন্থের এইরূপ পাঠ দেখিয়াও গুণবিষ্ণু ‘যুবঃ’ পদটি ভুল মনে কবি নাই। পিতৃদয়িতায়, ব্রাহ্মণসম্বন্ধে এবং শ্রীকৃষ্ণে ‘যুবঃ’ পাঠ পাইয়াছিলাম। তখনই মনে হইয়াছিল যে, এই পাঠ অবশ্য কোন মূল বেদে আছে। পবে সত্যই কাণ্ডশাখায় (১, ১০, ২২) ‘যুবঃ’ পাঠ পাইয়াছি। পূর্বে চাবিগানি মুদ্রিত আকরগ্রন্থে বাহা পাই নাই, এখন তাহা পঞ্চম গ্রন্থে পাইলাম। ইহাতে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছে যে, মন্ত্রার্থে অসঙ্গতি না ঘটিলে এবং বিশিষ্ট নিশ্চায়ক প্রমাণ না পাইলে কোন শিষ্টগৃহীত পাঠ অবৈদিক বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা যে, তিনিও যেন এ বিষয়ে বিবেচনা করেন।

আমি কবিরত্ন মহাশয়ের শিষ্যস্থানীয় ; দু-পুস্তকে তাহার ক-পুস্তকের ভ্রম অনুসন্ধান করি নাই। তিনি প্রাচীন টীকাকার গুণবিষ্ণুর ভাষ্যে বহু স্থলে অবধা দোষারোপ করিয়াছেন দেখিয়া উত্তর দিতে হইল। অপরের সহিত বাদপ্রতিবাদ প্রসঙ্গে কবিরত্ন মহাশয় একবার লিখিয়াছিলেন যে, তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে ‘অসঙ্কোচে তাহা স্বীকার’ করেন। এইজন্য আমি আশা করিতেছি যে, পড়িংশ শব্দ, বৈশ্বদেব্য পদ, বিদ ধাতু, শিব শব্দ, কৃপ ধাতু এবং শল্লোদেবী মন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল কথা নিবেদন করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিবেন।

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য।

হুগলী জিলার ইতিহাস

(বাঁশবেড়িয়া)

বাঁশবেড়িয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ দেবাদিত্য দত্ত উত্তরবাটী কায়স্থ । রাজা আদিশুর যখন কাঞ্চকুজ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এ দেশে আনয়ন করেন, তখন পাঁচ জন কায়স্থও তাঁহাদের সহিত আসিয়াছিলেন । যখন কৌলিষ্ঠ প্রথা প্রবর্তিত হয়, তখন দেবাদিত্য দত্ত সগর্বে বলিয়াছিলেন,—“দত্ত কারও ভৃত্য নয়, সঙ্গে আগমন, দ্বিজ সঙ্গে থাকি করি তীর্থ-পর্যটন।” কথিত আছে, রাজা অমুসকানে দেবাদিত্যের উক্তি মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারায় তাঁহাকে কৌলিষ্ঠে বঞ্চিত করেন । বাজার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাঁহাব রাজ্যে বাস করা অস্বীকারিক বিবেচনায় দেবাদিত্য আধুনিক মুশিদাবাদের নিকট মায়াপুর গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন । পরে মুসলমানের ভয়ে তিনি মায়াপুর ত্যাগ করিয়া দত্তবাটী গ্রামের পত্তন করিয়া সেট স্থানে বাস করিতে লাগিলেন । দেবাদিত্য বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন । তাঁহাব মৃত্যুর পূর্ব তাঁহার পুত্র বিনায়ক দত্ত পিতৃ-সম্পত্তি লাভ করেন । বিনায়কের পুত্র তপন, তপনের পুত্র মণ্ডল, মণ্ডলের পুত্র বরুণ, বরুণের পুত্র মধুসূদন, মধুসূদনের পুত্র যাবব, যাববের পুত্র মাধব । মাধব স্বকায় ক্ষমতায় বহু সম্পত্তি অর্জন করেন ; কিন্তু মাধবের সন্তান রাজা বল্লালসেনের বিরোধ হইলে বল্লালসেন মাধবের বংশ ধ্বংস করেন । তাঁহার পুত্র মহেশ্বরও আয়বক্ষা করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার গর্ভবতী পত্নী পলাইয়া প্রাণবক্ষা করিয়াছিলেন । যথাসময়ে কোন অজ্ঞাত স্থানে তিনি এক পুত্র প্রসব করেন । তাঁহার নাম উবক । উবক আত্মীয়-স্বজন বিহীন অবস্থায় উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই । মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র কুলপতিককে বাঁধিয়া যান । কুলপতির নয়টি পুত্র-কন্তা ছিল ।

কুলপতির এক পুত্রের নাম কবি দত্ত । কবি দত্ত পিতৃভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া বিশিষ্ট ধনশালী ও প্রতাপশালী হওয়ায় ‘খাঁ’ খেতাব পাইয়াছিলেন । * তাঁহাকে দত্তবাড়ী ‘খাঁ’ বলা হইত । তাঁহার ছয় পুত্র ; তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র দত্তই খ্যাতি লাভ করেন । ঈশ্বরচন্দ্রের আট পুত্র ও নয় কন্তা । তাঁহাদের মধ্যে কেশব ও বিষ্ণু প্রসিদ্ধ ছিলেন । এই কেশব দত্ত হইতেই পাটুলী-রাজবংশের উদ্ভব ।

বিষ্ণুর এক পুত্র শ্রীমন্ত এবং এক কন্তা ছিল । শ্রীমন্ত পিতার জীবিতকালে নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন । দিনাজপুরের রাজবংশে তাঁহার কন্তার বিবাহ হইয়াছিল । বিষ্ণু মুসলমান সরকারে উচ্চপদ লাভ করেন, এবং তিনি দিনাজপুরে বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন । তিনি “ঠাকুর মহাশয়” উপাধি পাইয়াছিলেন । তাঁহা হইতেই দিনাজপুর রাজবংশের উদ্ভব । খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু, নবাব সরকারে কাননগোর পদ লাভ করেন । তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার পুত্রের

মৃত্যু হওয়ায়, তিনি তাঁহার জামাতা হরিরাম ঘোষকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করেন । হরিরাম ঘোষের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শুকদেব “রাজা” খেতাব পাইয়াছিলেন । ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে বাজার শাসনকর্তা সা মুজা তাঁহাকে এক সনন্দ প্রদান করেন । ১৬৬৭ খৃঃ শুকদেব শুকমাগর নামক সুবৃহৎ জলশিয় খনন কবাইয়াছিলেন । তাঁহাব ঐ কাঙ্ক্ষি এখনও বর্তমান । শুকদেবের তিন পুত্র—রামদেব, জয়দেব ও প্রাণনাথ । তিন জনেই নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন । প্রাণনাথ রামনাথ নামক এক পোষাপুত্র গ্রহণ করেন । রামনাথ তাঁহাব জমিদারির পরিমাণ বর্ধিত করেন । কথিত আছে, তাঁহাব জমিদারির জন্ম বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইত । রামনাথের পুত্র তারকনাথ রাজা হইয়া নিঃসন্তান ছিলেন, এজন্য একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । *

কেশবের মৃত্যুর পূর্ব তাঁহার পুত্র ঝারিকানাথ মুশিদাবাদের নবাব কর্তৃক উংপীড়নের ভয়ে বর্তমান জেলার কাটোয়া-সন্নিক্ত গঙ্গাতীর-বর্তী পাটুলী গ্রামে উঠিয়া আসিয়া স্থবিশীর্ণ অটালিকা নিষ্কাশন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । ঝারিকানাথের সেই বাসভবন কালক্রমে ভাগিনথী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে । ঝারিকানাথের পুত্র শ্রীমুখ । শ্রীমুখের পুত্র মহাস্বাক্ষকে বাদশাহ আকবর ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এক সনন্দ প্রদান করিয়া নদায়া জিলাব ফৈজুল্লাপুর পরগণার জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত করেন । মহাস্বাক্ষের পুত্র উদয় প্রতিভাবান, কর্মপটু ও সুপণ্ডিত ছিলেন । আকবর শাহ তাঁহাকে “সভাপতি রায়” খেতাবে ভূষিত করেন । উদয়ের চারি পুত্রের মধ্যে জয়ানন্দ সম্রাট সাজাহানের নিকট “মজুমদার” উপাধি লাভ করেন । এই সময় বাজার নবাব কাশিম খাঁ জয়ানন্দকে কাননগোর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।

জয়ানন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রাঘব প্রতিভাবান, বুদ্ধিমান ও কাব্যদক্ষ ছিলেন । রাঘব সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে “চৌধুরী” ও “মজুমদার” উপাধি লাভ করেন । রাঘবের জমিদারি ২১টি পরগণায় বিভক্ত ছিল । এই পরগণাগুলির সমস্তই হুগলী-ঢাকলাব অন্তর্গত ছিল ; তাহাদের পরিমাণ প্রায় সাত শত বর্গমাঠল । এই সকল পরগণার স্ববন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে রাঘব অতঃপর বাঁশবেড়িয়ায় বাস করিতে লাগিলেন ; তবে তিনি মধ্যে মধ্যে পাটুলিতে গমন করিতেন । বাঁশবেড়িয়া তখন বাঁশবন ও বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল । এই জঙ্গলই বাঁশবেড়িয়া নামের উৎপত্তি । রাঘব এই সকল বনজঙ্গল নিমূল করিয়া সুপ্রশস্ত গ্রামেব প্রতিষ্ঠা করেন ।

রাঘবের মৃত্যুর পূর্ব তাঁহার দুই পুত্র, নামেশ্বর ও বাসুদেব পিতৃ-পরিভ্রান্ত বিপুল সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন । জ্যেষ্ঠ নামেশ্বর তৎকাল-প্রচলিত প্রথা অনুসারে সমগ্র সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের এবং বাসুদেব এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়াছিলেন । নামেশ্বর ভ্রাতার সহিত বিরোধেব আশঙ্কায় পাটুলিব সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাঁশবেড়িয়ায় বাস করিতে লাগিলেন । তিনি এই স্থানে আসিবার সময় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নিম্নশ্রেণীর লোক সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এমন কি, কয়েক জন মুসলমানও পরিজনবর্গসহ তাঁহার সঙ্গে হইয়াছিলেন । তিনি তাহাদিগকে ভূমিদান করিয়া সেখানে

* সেকালে পারসী “খাঁ” উপাধি হিন্দুরাও পাইতেন । হোসেন সাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসুর উপাধি ছিল “পুবন্দর খাঁ” । এখনও ‘খাঁ’ উপাধিধারী হিন্দুর অভাব নাই । উল্লার খাঁ-বাবুবা ইহার দৃষ্টান্ত ।

স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি বারাণসী হইতে অনেকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আনাইয়া বাঁশবেড়িয়ায় তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। রামশরণ তর্কবাগীশ তাঁহাদের অন্যতম, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। রামেশ্বর ভঁঃপর 'রাজা' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বাঁশবেড়িয়ায় সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া সুরক্ষিত করিবার জন্ত খাদ খনন করিয়া তদ্বারা তাহা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন। এই সময় মারাঠা দস্যু বর্মগীর উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় লোকে সর্বত্র লুণ্ঠনের আশঙ্কায় ঐ গড়খাতের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিত। বর্গীবা হুগলী জেলার মধ্যে কেবল বাঁশবেড়িয়াই লুণ্ঠন করিতে পারে নাট। মারাঠা দস্যুরা অধী-
রোহণে 'বর্গ'-ভাবে দলবদ্ধ হইয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন কবিত্তে আসিত, এক্ষণ 'বর্গী' নামে অভিহিত হইত।

এই সময় আরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট। হিন্দুকুল-স্বর্ঘ্য ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা অত্যন্ত উচ্ছ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। যে সকল জমিদারের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় না হইত, রামেশ্বর তাহাদের নিকট হইতে ঐকপ রাজস্ব আদায় করিয়া বাদশাহ-সরকারে প্রেরণ করিতেন; এক্ষণ সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁহার রাজ-
ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ ১০২০ হিজিরায় একখানি সনন্দ দ্বারা বারটি পরগণার জমিদারি-স্বত্ব ও বাসভূমির জন্ত ৪০১ বিঘা জমি তাঁহাকে দান করেন। ঐ বারটি পরগণার নাম— কলিকাতা, ধাড়া, আমিরপুর, বালান্দা (মেদিনীপুর জেলায়), খালোড় (বাগনানের নিকট) মানকুব, সুলতানপুর, হাতিয়াগড়, মেদমোলশা, কুজপুর, কাউনিয়া ও মাগুরা। ইহাব পূর্বেও বাদশাহ একখানি সনন্দ দ্বারা তাঁহাকে খেলাত ও পাঁচ প্রকার সম্মানসূচক পরিচ্ছদসহ বংশানুক্রমিক 'রাজা মহাশয়' খেতাব দান করেন। আসল সনন্দখানি পরে নষ্ট হইলেও ঐতিহাসিক মিষ্টার হেনরী বিভারিজ সেই সনদের ইংরেজি অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

To Raja Rameswar Rai Mahasay
Pargana Arsha of Satgaon
(Government of Satgaon)

As you have promoted the great interest of the government in getting possession of Parganas and making assessment thereof, and as you have performed with care whatever services were entrusted to you, you are entitled to reward. The Khilat of Panja Percha (five cloths i. e. dresses of honour) and title of "Raja Mohasay" are therefore given to you in recognition thereof, to be inherited by the eldest children of your family, generation after generation without being objected to by any one.
10 Safar 1090 Hijir.

রাজা রামেশ্বর কেবল যে প্রতাপশালী, বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ ছিলেন, এমন নহে, তিনি নিষ্ঠাবান ধার্মিক ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ১৬০১ শকাব্দায় (১৬৭৯ খৃঃ) অনন্তদেবের (বিষ্ণু) বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। ঐরূপ মন্দির গঙ্গার পশ্চিমকূলে অল্প কোথাও ছিল না বলিয়াই প্রকাশ মন্দির-গাড়ে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল,—

"মহী স্যোমাজ শীতাংশু গণিতে শক বৎসরে।
শ্রীবামেশ্বর দত্তেন নিঃস্বমে বিষ্ণু-মন্দিরে।"

রাজা রামেশ্বর সম্ভবতঃ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রঘুদেব, মুকুন্দ ও রামকৃষ্ণ নামক তাঁহার তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই তিন পুত্র বিষয় ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। বংশের প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ রঘুদেব পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক, এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সমান অংশে গ্রহণ করেন। এই সম্পত্তির বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের অভিমত আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে চাই না।

রামেশ্বর তাঁহার সম্পত্তি যেমন পুত্রদিগকে দিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাগিনেয় মনোহর ও গঙ্গাধরকেও বোরো পরগণা দিয়াছিলেন; এমন কি, আশ্রিত ব্রাহ্মণ-সন্তান সন্তোষকেও জমিদারিতে বঞ্চিত করেন নাট।

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে রঘুদেবের কর্ম-
জীবনের আরম্ভ। ঐ সময়ে জমিদারির খাজনা আদায়ের অত্যন্ত বেবন্দোবস্ত ছিল। মুসলমান নবাবগণও জমিদারদিগকে নানাকপ নির্ঘাতন করিয়া ঐ খাজনা আদায় করিতেন। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুদেবের কর্তব্যনিষ্ঠায় তাঁহাকে "শুভ্রমণি" উপাধি প্রদান করেন।

রঘুদেবের একমাত্র পুত্র গোবিন্দদেবের সময় রঘুরাম (কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা) নদীয়ার রাজা ছিলেন। তিনি চার্তুর্ঘ্যবলে গোবিন্দদেবের জমিদারি অগ্রস্বীপ অধিকার করেন। রাজা গোবিন্দদেবেরও দানশীলতার খ্যাতি ছিল। তিনি অল্প বয়সে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা গোবিন্দদেবের পর হইতেই বাঁশবেড়িয়া-রাজবংশের দুর্দিন উপস্থিত হয়। গোবিন্দের মৃত্যুকালে তাঁহার রাণী গর্ভবত ছিলেন। গোবিন্দদেব নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সম্পত্তি গ্রাসের জন্ত অনেকেরই লোভ হইল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের রাজা গঙ্গা নদীব পশ্চিম কূলের সমস্ত জমিদারি, এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গার পূর্ব দিকের সমস্ত জমিদারি অধিকার করেন। কিন্তু হুগলীর ফৌজদার পীর খাঁ প্রতাপে বর্দ্ধমানাধিপতি কুলীহাণ্ডা তালুক দখল করিতে পারিলেন না। নৃসিংহদেবের এই একমাত্র জমিদারি রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু নবাব সবকার হইতে এই অত্যাচারের প্রতিকার হইল না।

রাজা নৃসিংহদেবের স্মারকলিপিতে যাহা লিখিত হইয়াছিল, এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—"সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয়, সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম, বর্দ্ধমানের জমিদারের পেকার মাণিকচন্দ্র নবাব আলীবর্দী খাঁর নিকট আমার পিতা অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্তপুস্তামের জর খরিদা জমিদারি আপন মালিকে জমিদারি সামিল করিয়া লয়। সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখ খামকা দখল করে ও হালদা কিশমতের মালজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল। তিনিও ঐ সন কিশমত-মজকু আপন পুত্র শ্রীশঙ্কর রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মোজা কুলীহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী-চাকলার সামিল ছিল। পীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না, অতএ

তালুক মজকুর আমার দখলে আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার ও তালুকদার এমন বেটনসাজী ও বেদায়ত হয় নাই।”

ইংরেজ সরকারের সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টে বাঁশবেড়িয়ার জমিদারি রাজা গোবিন্দদেবের সম্পত্তি বলিয়া উল্লেখ ছিল। সব-গুলিই হুগলী-চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নৃসিংহদেব একে নাবালক তাতার উপন সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি পরহস্তগত হইল—শুধু কুলীহাণ্ডার জমিদারি তাঁহার রহিল। ঐ সামান্য আয়ে নিজের সংসার খরচ ও দেবসেবা অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। এই সময় বাঙ্গালার ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হইলেন। হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনভার লইলেন; পরে গভর্নর হেনাবেল হইলেন। বিচারকার্যের জগ্ন স্তম্ভিম কোর্ট স্থাপিত হইল। এই সময়ে নৃসিংহদেব হেষ্টিংসের দরবাবে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের দরখাস্ত করিলেন। হেষ্টিংস অস্ত্র-সন্ধানের আদেশ দিলেন, কিন্তু এই সময়ে ইংরেজের হাতে শুধু দেওয়ানির স্বত্বমাত্র ছিল। হেষ্টিংস ২৪ পরগণার জমিদারির জমিদার স্বরূপে “সেটুকু ২৪ পরগণার অন্তর্গত তাঁহাকে প্রত্যাপণ করিলেন।” *

রাজা নৃসিংহদেব আবদী, পাবসী, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রও জানিতেন। সঙ্গীত-বিদ্যা ও অঙ্কন-কার্যেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি ওয়াবেণ হেষ্টিংসকে বাঙ্গালা দেশের এক মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে হেষ্টিংস তাঁহাকে বিশেষ পুরস্কার দেন, কিন্তু দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধানকাটা পরগণা দিয়াছিলেন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস স্বদেশে প্রস্থান করেন, এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজা নৃসিংহদেব, লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে তিনি বিলাতে কোর্ট অফ-ডাটরেকটবগণের নিকট দরখাস্ত করিবার জগ্ন তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, এবং এ বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই কার্যে বহু অর্থব্যয় হইবে বুঝিয়া নৃসিংহদেব এক জন বিশ্বাসী কর্মচারীর উপর জমিদারির ভার অপণ করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। সেখানে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক সাধনা, শাস্ত্র-চর্চা ও যোগাভ্যাস কবিত্তে লাগিলেন। এই সময় ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীতে থাকিতেন। দুই জনে বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। জয়নারায়ণ অনেক দিন হইতে সংস্কৃত কাশীখণ্ডের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বঙ্গানুবাদ বা পণ্ডে অনুবাদের তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। তিনি নৃসিংহদেবকে পাঠিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। নৃসিংহদেবের সহিত জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক জন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। জয়নারায়ণ ও নৃসিংহ কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ করেন, এবং জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় তাহা পণ্ডে রূপান্তরিত করেন; কিন্তু নৃসিংহ তাহা সংশোধন করিতেন।

“তাঁর সহ জগন্নাথ মুখ্য! আইলা।

প্রথম ফালগুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা।

তাঁহার করেন রায় তর্জমা খসড়া।

মুখ্য! করেন সদা কবিতা পাতড়া।

রায় পুনর্বার সেই পাতড়া লইয়া।

লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত গুনিয়া।”

নৃসিংহদেব উড্ডীশ তন্ত্রের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন।

এই সময়ে নৃসিংহদেবের উক্ত বিশ্বাসী কর্মচারী তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন, বিলাতে মামলা চালাইবার উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। নৃসিংহদেব সেই অর্থ কাশীতে পাঠাইতে বলিলেন। এই সময় তাঁহার আর বিষয়াসক্তি ছিল না। তিনি হংসেশ্বরী-মন্দির নির্মাণ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। ঐ টাকায় উপযুক্ত ভূব্যসন্ধান ক্রয় করিয়া আট বৎসর পরে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঁশবেড়িয়ার প্রত্যাগমন করেন, এবং হংসেশ্বরী-মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন; কিন্তু উহার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ইহা ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। মৃত্যুকালে তাঁহার সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী রাণী শঙ্করীকে উহা সম্পূর্ণ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির ষট্চক্র অমুখ্যায়ী নির্মিত। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রাণী শঙ্করী প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ১৫ বৎসরে ঐ মন্দির-নির্মাণকার্য শেষ করেন, এবং পবে উহা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির-দ্বারের উপর লেখা আছে :—

শকাব্দে রসবহু মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।

মোকদ্দার চতুর্দশেশ্বর সমং হংসেশ্বরী রাজিতং।

ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতিনারকং তদাজ্জামুগা।

তৎপত্নী গুণপাদপদ্মনিবতা শ্রীশঙ্করী নির্মমে। শকাব্দ ১৭৩৬

এই হংসেশ্বরী-মন্দিরের তুল্য মন্দির বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই। বর্তমান সময়ে মন্দিরের আর সে শোভা নাই।

রাজা নৃসিংহদেবের পরলোক-গমনের পর বিধবা রাণী শঙ্করী নাবালক পুত্র কৈলাসদেবের অভিভাবিকা হইয়া বৈষয়িক কার্য পরিচালন করিতেন। কৈলাসদেব অমিতব্যয়ী ছিলেন। মাতার নিকট হইতে বিষয়-সম্পত্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চাহিতেন। রাণী এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। কৈলাসদেব মাতার বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য লইলেন। মাতাপুত্র বহু দিন বহু অর্থব্যয় করিয়া উভয়েই যখন শান্ত হইলেন, তখন আপোষ মীমাংসা হইল। স্থির হইল, রাণীমাতা ৩হংসেশ্বরী দেবীর সেবায় জগ্ন ২৪ পরগণার ১৫খানি ও হুগলী জেলার কুলীহাণ্ডা গ্রাম রাখিবেন। ইহার ৭ বৎসর পরেই ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কৈলাসদেব নাবালক পুত্র দেবেন্দ্র ও তিন কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ঐ কন্যাদিগের মধ্যে করুণাময়ীর বিবাহ হয় পাটকপাড়ায় লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র) পুত্র শ্রীনারায়ণচন্দ্রের সহিত।

দেবেন্দ্রদেব সুশিক্ষিত, এবং সংস্কৃত, পারসী ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাত্‌কালীক সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাঠিয়াছিলেন। ছোটলাট হালিডে (তখন ম্যাজিষ্ট্রেট) অনেক সময় বাঁশবেড়িয়ায় যাইতেন। বড়লাট ডালহৌসী রাজা দেবেন্দ্রদেবকে হুগলী জেলার সর্বোচ্চ জমিদার বলিয়া স্বীকার করিতেন। দেবেন্দ্রদেব ১৮৫২ খৃঃ এপ্রিল মাসে প্রাণত্যাগ করেন। রাণী শঙ্করী, পুত্র হারাইয়া পৌত্রকে লইয়া কোনরূপে শোক সংবরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পৌত্র-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। কালীঘাটে রাণী শঙ্করী লেন এখনও তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

দেবেন্দ্রদেব তিন নাবালক পুত্র রাখিয়া যান। তন্মধ্যে পূর্ণেন্দ্রদেব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। উহারা সকলেই নাবালক হওয়ায় রাণী কালীশরী (দেবেন্দ্রদেবের বিধবা পত্নী) অছি নিযুক্ত হন, এবং তিনি পাঠকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সহিত মিলিত ভাবে নাবালকদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিতেন। পূর্ণেন্দ্রদেব বাঁশবেড়িয়া-বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গাল, সংস্কৃত, পারসী, আরবী ও ইংবেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী অথচ দানশীল ছিলেন।

রাজা পূর্ণেন্দ্র সঙ্গীতাত্মুরাগী ছিলেন। তিনি সেতার ও এসরাজ ভালরূপে বাজাইতে পারিতেন। তিনি সাধারণের কার্যে সর্বদা যোগদান করিতেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের হুগলী-শাখার ও হুগলী ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার চারি পুত্র কলিকাতায় কালীঘাটে রাণী শঙ্করী লেনে বাস করেন।

বাঁশবেড়িয়ায় সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ

বাঁশবেড়িয়ায় নীল কুঠা ছিল।—অনেকেরই ধারণা, স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণের” আখ্যানবস্তুর উপাদান বাঁশবেড়িয়া হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। “নীলদর্পণ” বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সুপরিচিত, সুতরাং এখানে তাহার নূতন পরিচয় প্রদান নিম্নপ্রয়োজন। পাত্রী লং “নীলদর্পণের” ইংবেজী অনুবাদ প্রকাশ করার ফৌজদারী মোপর্দ হইলে, বিচারক তাঁহাকে “নীলদর্পণের” গ্রন্থকারের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু বেভারেণ্ড লং দীনবন্ধুর নাম প্রকাশ করেন নাই। বিচারে তাঁহাব ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইলে মহাত্মা কান্দিপ্রসন্ন সিংহ সেই টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার নীল-বিদ্রোহের পর নীলকরের অত্যাচার প্রশমিত হয়, এবং বাঙ্গাল হইতে নীলের ব্যবসায় ক্রমে বিলুপ্ত হয়।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবার “তত্ত্ববোধিনী-মঠা” স্থাপন করেন, এবং স্কুলও প্রতিষ্ঠিত করেন; সেই স্কুলে প্রায় শত ছাত্র ছিল; কিন্তু উগা ব্রাহ্মদের পরিচালিত স্কুল বলিয়া ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়। এই সময়েই স্বাধিকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ইংবেজ সেনাপতি জেনারেল আউটরাম সিন্ধু যুদ্ধে জয়লাভ করায় ইংবেজ সরকার তাঁহাকে ৩ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু জেনারেল আউটরাম ঐ টাকা Blood-money (শোণিত-মিশ্রিত অর্থ) বলিয়া তাহা স্পর্শ করেন নাই। * তিনি সমস্ত টাকাই

* Outram had received £ 3000 as his share of the prize-money obtained in the conquest of Sindh. He had protested against the annexation as an act of “rascality” and regarded his share as “blood-money.” —Hooghly District Gazeeter P. 123.

সংকার্যে দান করেন; উহার ছয় হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকিতে পাদরী ডক তাহা চাহিয়া লইয়া তদ্বারা বাঁশবেড়িয়ায় চিরস্থায়ী পাঠ্য এক খণ্ড জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং সেই জমিতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উগা বিশ বৎসর চলিয়া পরে উঠিয়া যায়। রাজা পূর্ণেন্দ্রদেব ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী বাঁশবেড়িয়ায় উচ্চশ্রেণীর ইংবেজী স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় স্কুলটি কিছু দিন বন্ধ ছিল; পরে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন পর্যন্ত বর্তমান আছে।

বাঁশবেড়িয়ায় একটি খৃষ্টীয় ভজনালয় আছে; তারাতাদ নামক খ্যাতনামা বাঙ্গালী খৃষ্টান ইহাব প্রথম পাদরী। পাদরী তারাতাদ সুপণ্ডিত ও বহুভাষাজ্ঞ ছিলেন, ইংবেজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

পুরাতন সংবাদপত্রে বাঁশবেড়িয়া

(১২১ বৎসর পূর্বের সংবাদ)

“চুরি।—মোং বাঁশবেড়িয়াতে নৃসিংহদেব বায় হংসেশ্বনী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাব অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণরূপ্যাদ ঘটত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্ত্যার রাত্রিতে তাঁহাব পূজা হইয়া থাকে সংপ্রতি গত অমাবস্ত্যার রাত্রিতে পূজাবসান কলে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অঞ্জ ২ ব্যাবহারিক জব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক হইতেছে।”—‘সমাচারদর্পণ’ ১৮২০—১৯শে ফেব্রুয়ারী। বাং ১২২৬। ৮ ফাল্গুন।

“গঙ্গাতীরবর্তী চতুষ্পাটীগুলির মধ্যে এককালে বংশবাটী ও ত্রিবেণী টোলগুলি সমধিক প্রতীষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই বংশবাটীর টোলের সংখ্যা ছিল ষাটটি। এই সকল টোলে শ্রায়, স্মৃতি, সাহিত্য ও ব্যাকরণ চর্চায় গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দু’ একটি টোলের ছাত্র-সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। এক দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্তের টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০০। সুন্দর ক্রীড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানের অনেক ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিত।...বংশবাটী পণ্ডিত-সমাজের গৌরবের দিনে ভট্টপল্লী পণ্ডিত-সমাজ বিজ্ঞমান ছিল না। তখনও ভট্টপল্লীতে পণ্ডিত-বংশের বাস হয় নাই। ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ নারায়ণ ঠাকুর আলীবর্দীর সমসাময়িক। বংশবাটী ও ত্রিবেণীতে এক সময়ে দুই জন পণ্ডিত বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করেন—“বংশবাটীয়াং রাসরাম ত্রিবেণীয়াং রঘুনাথবঃ” বংশবাটীয়াং রাসরাম ও ত্রিবেণীয়াং রঘুনাথবঃ। সার উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষাগুরু খ্যাতনামা পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বংশবাটীর টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।”—‘সমাচার’ দ্বিতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা—লেখক যুনাঙ্গদেব রায়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন) ।



জীবন্ত মৎস্য

মৎস্য-ক্ষেত্র সমূহের ব্যাপকতা, পরিপুষ্টি ও উন্নতির উপর সকল দেশেরই আর্থিক উন্নতি যে প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষির পরেই মৎস্য-চাষের স্থান, এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। নানাবিধ শস্য, ফলমূল ও ব্যবহারোপযোগী বৃক্ষাদি যেমন স্থলজ ফসল, বিভিন্ন জাতীয় মৎস্য, শুষ্ক, শবুক, মুক্তা, এবং নানাবিধ জলজ উদ্ভিদাদিও সেইরূপ জলজাত ফসল। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে পুষ্টির আহাৰ্য্যরূপে তা বটেই, তন্নির্ভর নানাবিধ মৎস্যমূলক শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও মৎস্যক্ষেত্র-গুলিকে অর্থকরী কার্যের উপযোগী করিয়া লইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বঙ্গদেশের নদী, দীঘি, পুকুরিণী, খাল, বিল, ডোবা, নালা, ডামস, দহ, নদী-মোহনায়, উপকূল-সন্নিহিত বিভিন্ন সমুদ্রে, এবং সমুদ্রের ফাঁড়িতেও যে বিপুল মৎস্য-ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহার উন্নতি ও সদ্যবহার হইলে বাঙ্গালীর আর্থিক ও শারীরিক ছরবস্থা অপনোদনের যথেষ্ট সুব্যবস্থা হইতে পারিত, এবং এখনও হইতে পারে; কিন্তু সে দিকে দেশের লোকের তেমন লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না; এবং ছুঃখের বিষয়, সরকারও এ সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। কিন্তু সম্প্রতি এ-দিকে আশার একটু ক্ষীণ আলোক লক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালা সরকারের আগামী বৎসরের বাজেটে মৎস্য বিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। 'দিও কিঞ্চিৎ, ক'রো না বঞ্চিত'—এ-নীতি মন্দের ভাল।

কিছু কাল চালাইবার পর, প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা সরকারের মৎস্য বিভাগ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যখন উক্ত বিভাগের দায়িত্ব ছিল, তখন কিয়ৎ পরিমাণে তথ্য-সংগ্রহ ব্যতীত এই প্রদেশে মৎস্য-উৎপাদন ব্যবস্থার, বা উক্ত শিল্পের উন্নয়নযোগ্য, উন্নতি সাধিত হয় নাই। বর্তমানেও যে সামান্য অর্থ অর্থাৎ

কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহাও হয় ত কর্মচারীবর্গের বেতন ও আফিসের সরঞ্জামী ব্যয়েই নিঃশেষিত হইবে; সমারোহ সহকারে মন্দিরই নির্মিত হইবে, মন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইবে না। তবুও দীর্ঘ কালের পর এ বিষয়ে যে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও আমরা মঙ্গলের বিষয় বলিয়াই মনে করিব। এই অকিঞ্চিৎকর প্রারম্ভ যদি ভবিষ্যতে বঙ্গদেশের স্বাছলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যের প্রচলন, পালন, ও প্রসারবৃদ্ধি-চেষ্টার সূচনা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে দেশের প্রভূত উপকারের আশা থাকিবে।

বাঙ্গালার পুষ্টির খাণ্ড মৎস্য, এবং প্রচলিত মৎস্য-শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক কথা বর্তমান পত্রিকায় একাধিক-বার আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে একটি বিশেষ বিভাগ অর্থাৎ 'জ্যাস্ত' বা জীৱন্ত মৎস্যের কথা আলোচিত হইতেছে। নানা জাতীয় মৎস্য সহযোগে মৎস্য-ব্যবসায় পরিচালিত হয়; তন্মধ্যে রুই ও সোলবর্গীয় মৎস্যাদি, ভেটুকি, ইলিশ প্রভৃতি মৎস্য, প্রথম শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত। অগ্ৰাণ্ড মৎস্য অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ভুক্ত। 'জীৱন্ত মাছ' শেবোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে ইছাদিগকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে স্থাপন করিতে পারা যায়। অগ্ৰাণ্ড মাছের সহিত এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মাছের যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। জীৱন্ত থাকে বলিয়াই এই সকল মাছের মূল্য তুলনায় বিলক্ষণ অধিক; এবং এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কেবল বঙ্গদেশেই এইরূপ কোন কোন জাতীয় মৎস্য সমধিক সমাদৃত হইয়া থাকে; কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে অগ্ৰাণ্ড প্রদেশে ইছাদের তেমন অধিক কাটতি নাই এই 'জ্যাস্ত' মৎস্যের ব্যবসায় কলিকাতার মৎস্য ব্যবসায়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালা সরকারের

রিপোর্টে বিবৃত করা হইয়াছিল, প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় দুই লক্ষ মণ মাছ নানা স্থান হইতে কলিকাতায় আমদানি হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে লিখিত একটি প্রবন্ধে ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের কর্মী ডক্টর সুনন্দর লাল হোরা অঙ্কাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করেন, কলিকাতার বাজারে বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার মণ জীবন্ত মাছ বিক্রয় হয়। বর্তমান সময়ে উহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে, জীবন মৎস্য দ্বারা কলিকাতার মৎস্য-ব্যবসায়ের ন্যূনাধিক এক-চতুর্থাংশ অধিকৃত। মফস্বলের মৎস্য-ব্যবসায় সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, শিল্পশ্রেণীর বহু সংখ্যক পল্লীবাসী যে সকল মৎস্য ভোজন করে, সেই সকল মৎস্যের মধ্যে এই প্রকার মৎস্যই পরিমাণে অধিক, এবং মেছোহাটার তাহাদের প্রাধান্যও অধিক। এ অবস্থায় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, এই শ্রেণীর মৎস্য উৎপাদন ও আহাৰ্য্য-রূপে তাহাদের প্রসারবৃদ্ধির ব্যবস্থা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বিশিষ্ট লক্ষণ

নানা প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য জীবন্ত মৎস্যশ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাদিগেরই কাটতি অধিক। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এগুলি চারিটি বর্গে বিভক্ত, যথা—

কই বর্গ—Anabantidae.

কই—Anabas Scandens.

খলিশা—Trichogaster fasciatus.

চূণা, লাল ও সাদা খলিশা নামে খলিশার আরও তিনটি জাতি আছে।

মাগুর বর্গ—Siluridae.

মাগুর—Clarius batrachus.

শিঙ্গি—Saccobranthus fossilis.

শোল বর্গ—Ophiocephalidae.

শোল—Ophiocephalus striatus.

শাল—O. marulius.

চ্যাং বা গড়ই—O. gachus.

লাঠা—O. punctatus.

কুঁচে বর্গ—Symbranchidae

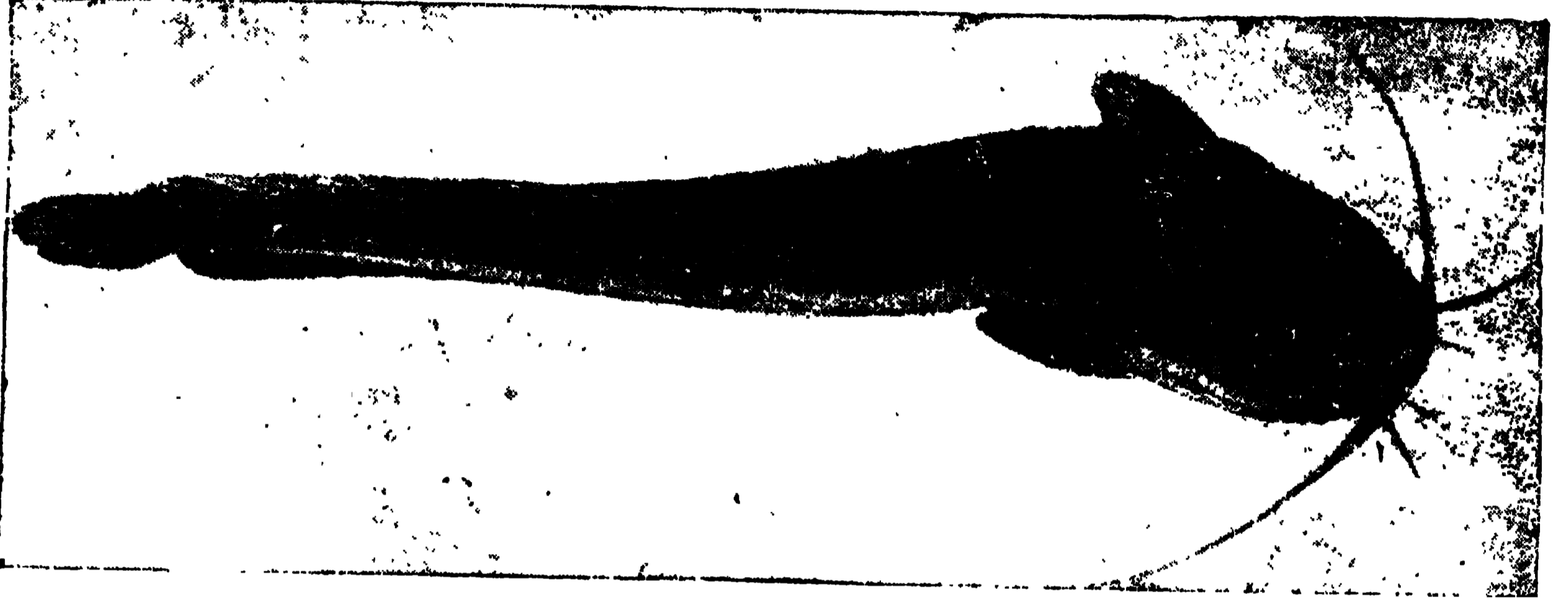
কুঁচে—Amphionus cuchia.

এই সমুদয় মৎস্যের জীবনেতিহাস সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন গবেষণা হয় নাই। সাধারণতঃ, এই সকল মাছের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। কই জীবন মাছের অন্ততম। কই জাতি ভারতের সর্বত্রই বর্তমান; ভারতের বাহিরে এবং আফ্রিকাতেও কই মাগুর মাছ পাওয়া যায়। পুকুরিণীর জল শুকাইলে এবং বর্ষার প্রবল বর্ষণের সময়েও কই মাছ জলাশয়ের তীরে উঠিয়া কানকোর সাহায্যে স্থানান্তরে গমনের চেষ্টা করে। এই সুযোগে গ্রাম্যালোকেরা সে সময়ে রাশি রাশি কই মাছ সংগ্রহ করে। সুপ্রসিদ্ধ যুরোপীয় মৎস্য, Gourami, খলিশে জাতীয়; এক সময়ে এই মৎস্য এ দেশে প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। ইহারা এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ভাল হইলেও তাঁহারা বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই যে, বড় খলিশা ও গৌরামীর মধ্যে বিশেষ কোন পাথক্য নাই, এবং গৌরামী প্রবর্তন অপেক্ষা দেশীয় খলিশার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ হইত।

শোলবর্গের বৈজ্ঞানিক নাম Ophiocephalidae অর্থাৎ সর্প সদৃশ মস্তক-বিশিষ্ট। এই বর্গীয় মৎস্যের মস্তক লক্ষ্য করিলে এই নাম সঙ্গত বলিয়াই মনে হইবে। বস্তুতঃ, বড় শাল মাছ ও এক জাতীয় বৃহদাকার জল-টোড়া সাপ দেখিতে অনেকটা একই রকম। শোলবর্গীয় মাছ গ্রীষ্মমণ্ডলে বাস করে; বঙ্গদেশে ইহাদের সংখ্যা অধিক। বাজারে শোলমাছের কাটতি নিতান্ত অল্প নহে। অস্ত্রাত্মক অনেক মাছের ত্রায় পুরুষ-শোল বহু দারপরিগ্রহ করে না; একটি সঙ্গিনীতেই সন্তুষ্ট থাকে। মৎস্যজাতি সাধারণতঃ সন্তানের প্রতি মমতা প্রকাশ করে না। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহারা অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। এক-একটি গর্ভবতী ইলিসের উদরে প্রায় ৫ লক্ষ ডিম্ব থাকে। স্তুরাং বিনা-যত্নেই ইহাদের বহু সন্তান বাঁচিয়া থাকিয়া বংশরক্ষা করিতে পারে। স্ত্রী-শোল অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে ডিম্ব প্রসব করে, এবং সেই জন্তাই বোধ হয়, সন্তান-রক্ষণাবেক্ষণে উহাদের অধিক যত্ন। পুকুরে শোল মাছের ঝাঁক অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সন্তান-পালনের ভার পুং-শোলই গ্রহণ করে, এবং সে সর্বদাই ঝাঁক পাহারা দিয়া

থাকে। অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে তাহারা সেই ঝাঁক সহ অত্র সরিয়া পড়ে; কখন কখন বা শত্রুকে আক্রমণ করে। পোনাগুলি বড় হইলে ঝাঁক ছাড়িয়া চলিয়া যায়; যেগুলি অধিক মমতা বশতঃ পিতৃসান্নিধ্য ত্যাগ করিতে চাহে না, তাহাদিগের পরিণাম শোচনীয় হইয়া থাকে।

প্রায়ই এক প্রকার ক্ষুদ্র গুটিকা বাহির হয়। এই সময়টা বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবকাল। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, এগুলি ইহাদের বসন্তের গুটিকা। এই জন্ত এই সময় লোকে এ সকল মাছ খাইলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করিয়া থাকে। সেই জন্ত অনেকেই এই



মাগুর মাছ

পিতা তাহাদিগকে গলাধঃকরণ পূর্বক আপনাকে দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে থাকে।

জীবন মৎস্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মৎস্যগুলি সচরাচর পুকুরিণী, ডোবা, নালা, খাল, বিল ইত্যাদি বহুজলেই বাস করে। ইহাদের দু'-একটি নদীচর জাতিও আছে। এই শ্রেণীতে বহু বিভিন্ন মৎস্য থাকিলেও ইহাদের দুইটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। প্রথমটি এই যে, জলের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্ত কান্ধা ব্যতীত জলের বাহিরেও সমকার্য সাধনের উদ্দেশ্যে ইহাদের শরীরে বিশেষ যন্ত্র বা ইঞ্জিন বর্তমান। হিংস্রপ্রকৃতি ইহাদের দ্বিতীয় লক্ষণ। মশা ও অত্রাণ কীট-পতঙ্গ ব্যতীত ইহারা ক্ষুদ্রতর মৎস্যও ভক্ষণ করে, এবং এই ভাবে কই কাতলা প্রভৃতি মৎস্যের ছোট পোনা বহু পরিমাণে নষ্ট করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে বাস করে বলিয়া এই শ্রেণীর মাছেরও প্রথর গ্রীষ্মে জলাভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা ঘটিলে ইহাদের অনেকগুলি জাতিই কর্দমের ভিতর প্রবেশ করিয়া ও নির্জীব ভাবে পড়িয়া থাকিয়া (aestivation) অনাবৃষ্টির সময়টা কাটাইয়া দেয়। মাগুর ও সিঙ্গি সম্বন্ধে আর একটি কথাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহাদের গাত্র

সময় সিঙ্গি, মাগুর মাছ আহাণ করেন না। কিন্তু ঐ সকল গুটিকা বসন্তঃ বসন্তরোগজ নহে; দুই-এক প্রকার কীটাক্রমণের জন্ত এগুলির উদ্ভব হয়। কিন্তু সাধারণের



কই মাছ

এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা উক্ত উভয় জাতীয় মৎস্যের বংশবৃদ্ধির অনুকূল; কারণ এই সময়েই ইহাদের সন্তান প্রজনন হয় বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

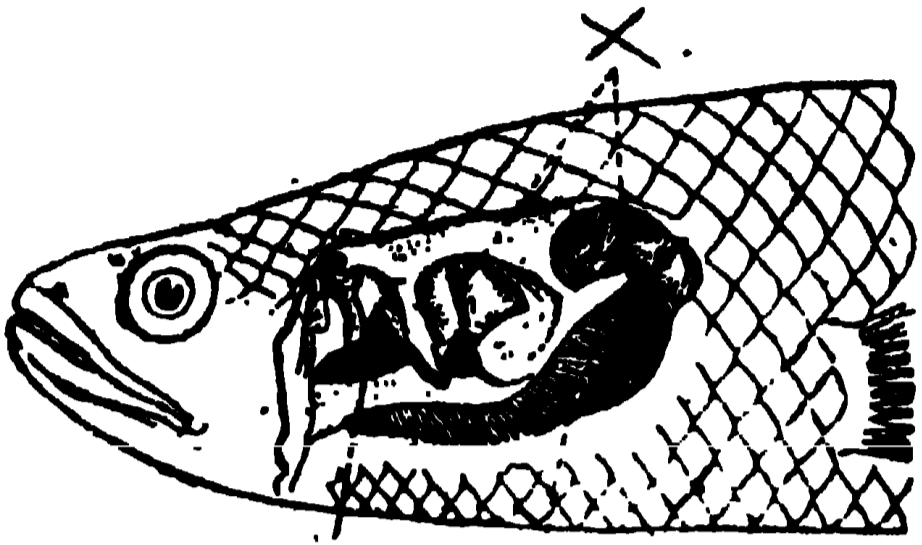
সাক্ষাৎভাবে বায়ুগ্রহণের যন্ত্রাদি

মৎস্য জলচর প্রাণী। ইহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া কান্ধা কোর (gill) সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ দ্বারা সংসাধিত হয়। গ্রীষ্মকালে প্রথর রৌদ্রতাপে জল উত্তপ্ত হইলে যখন উহাতে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস হয়, তখন মাছের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। অল্প জলবিশিষ্ট

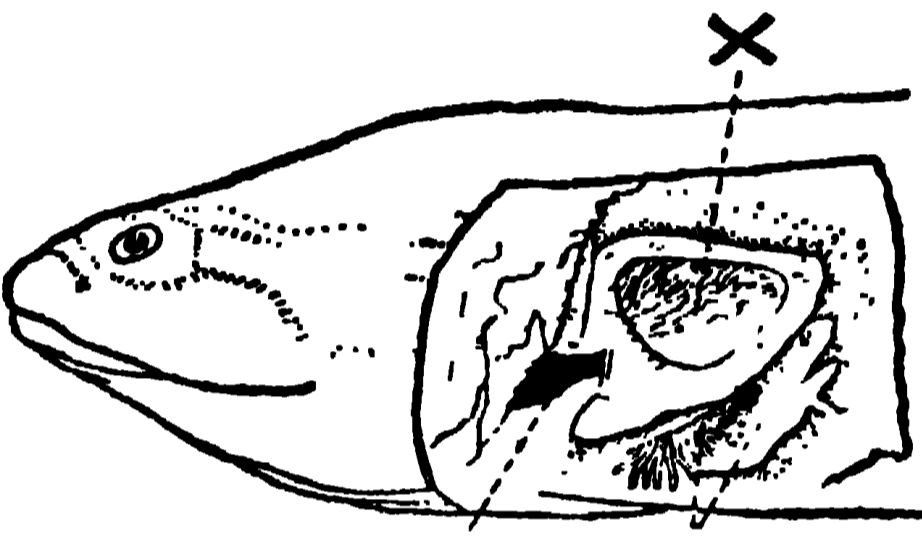
এবং জলজ উদ্ভিদাচ্ছন্ন পুকুরে এই সময় মাছগুলিকে 'খাবি' খাইতে দেখা যায়। এই ভাবে অনেক জাতীয় মাছ মরিয়াই যায়। কিন্তু কই মাগুর প্রভৃতি মাছ একরূপ সঙ্কটকালও যে অতিক্রম করে, তাহার কারণ, কান্‌কোর সাহায্যেই সে

সময় নির্ভর না করিয়া ইহার আঁর এ ক টি অ তি রি ক্ত যন্ত্রের সাহায্যে সা ক্ষাৎ তা বে বায়ুম গুল হইতে অ ক্সি জেন সংগ্রহ করিয়া থাকে। এইরূপ অতিরিক্ত যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় ইহাদের মুখ বা অ ধো গ গু-

গহ্বরে বর্তমান। জাতিবিশেষে এইরূপ যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় বিভিন্ন ভাবে গঠিত, কিন্তু উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক, অর্থাৎ জলাভাবের সময় উক্ত জাতিগুলির প্রাণ রক্ষা করা।



লেঠা মাছের মাথার এক পার্শ্ব; X চিহ্নিত অংশ বায়ু-প্রকোষ্ঠ



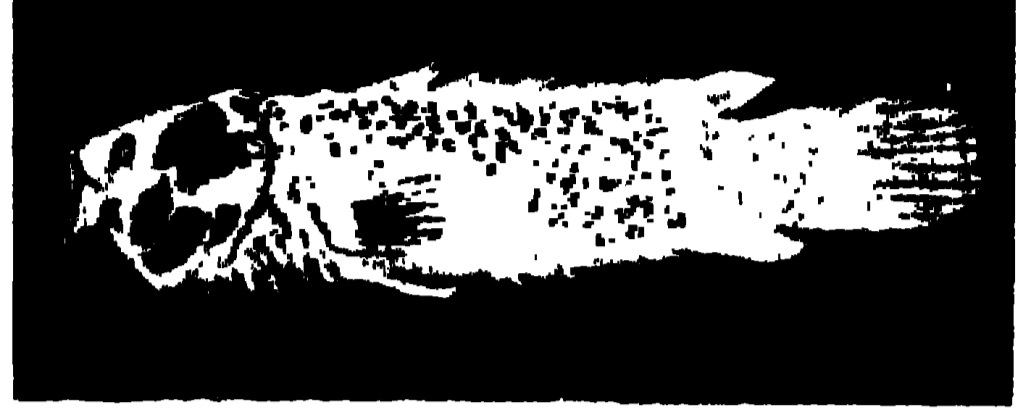
কুঁচ মাছের মাথার এক পার্শ্ব; X চিহ্নিত অংশ বায়ু-প্রকোষ্ঠ



মাগুর মাছের মাথার এক পার্শ্ব; উপরের চর্ম অপসারিত করিয়া বায়ুগ্রহণ ইন্দ্রিয় দেখান হইয়াছে

বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি মৎস্যের বায়ুগ্রহণ-যন্ত্রের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল। ঐগুলিতে দেখা যাইবে যে, কতিপয় স্থলে এইরূপ যন্ত্র অধোগণ্ডের উর্দ্ধদেশে

অবস্থিত। মাগুর মাছে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার প্রান্তদেশে কালবের তায় বিভক্ত ও কঠিনীভূত



কই মাছ; মস্তকেব পার্শ্বের চর্ম অপসারিত করিয়া বায়ু-গহ্বর দেখান হইয়াছে

সিজি মাছে উহা নলাকৃতি ও লম্বা ভাবে মেরুদণ্ডের নিকট বিস্তৃত। বস্তুতঃ, সরাসরি বায়ু গ্রহণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনের শক্তি থাকায় এই সকল



সিজি মাছ; শিরদাডার পার্শ্ব বেগার তায় অংশ বায়ু-নলী

মাছ জল হইতে তুলিয়া ৪৫ সপ্তাহ পর্যন্ত জীবিত রাখা সম্ভব। ভূপৃষ্ঠে যথেষ্ট প্রসারলাভের পক্ষেও এইরূপ যন্ত্রের উপযোগিতা অল্প নহে। সর্পের মস্তকবিশিষ্ট



শোল মাছ

মৎস্যসমূহ ভারতের বাহিরে এক দিকে চীন ও অল্প দিকে আফগানিস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কই, মাগুর জাতীয় মৎস্য আফ্রিকা মহাদেশেও বিরল নহে।

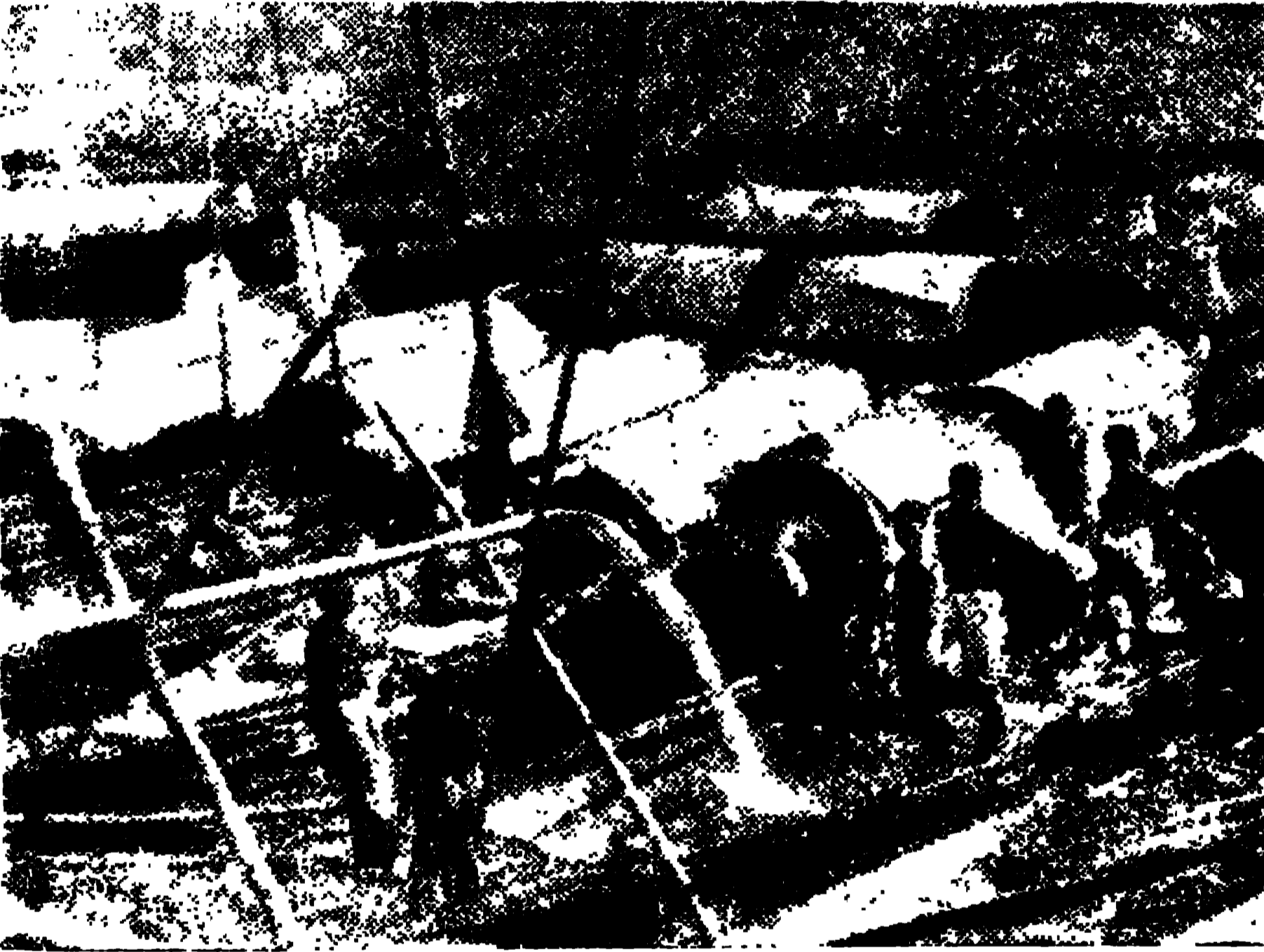
ব্যবসায়

জীবন্ত মৎস্যের ব্যবসায় অল্পবিস্তর সকল জিলাতেই বর্তমান। চৈত্র বৈশাখ মাসে পুকুর-ডোবা প্রভৃতির পঙ্কোদ্ধার করা হইলে সেই সময় এই সকল মাছ স্থানীয় হাটে-বাজারে প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে; কিন্তু সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া প্রায়ই স্থানান্তরে চালান দেওয়া হয় না; স্থানীয় ব্যবহারেই তাহা নিঃশেষিত হয়। পূর্বেই

বলা হইয়াছে, কলিকাতার বাজারে এইরূপ মাছের বাৎসরিক আমদানীর পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার মণ। সহরের উপকণ্ঠ ব্যতীত ঢাকা, ফরিদপুর, বাথরগঞ্জ, যশোহর, ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জিলা এই সকল মাছের উৎপত্তিস্থল। শত শত স্ত্রী-পুরুষ জীবন মাছের ব্যবসায় জীবিকার্জন করে। বৎসরের সকল সময় এই সকল মাছ ব্যবসায়ের জন্ত চালান দেওয়া সম্ভব নহে। বর্ষাকালে জলাশয়গুলি, পুকুরিণী, নদী, নালা জলে পূর্ণ থাকে; তখন এই সকল মাছ ছাপ্রাপ্য। তবে মাঠে

প্রধান কেন্দ্র। অনেক মেছো নৌকাই এই ঘাটে বাধা থাকে। নৌকার খোলে সংরক্ষিত মাছগুলিকে জীবিত রাখিতে হইলে মধ্যে মধ্যে জল-পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নলের সাহায্যে নূতন জল খোলার ভিতর সঞ্চয় করা হয়। উন্টাডাঙ্গা কেন্দ্র ব্যতীত জীবন মাছ পাইকারী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত কলিকাতায় আরও দুইটি বাজার আছে। একটি ধাপা-লকের অদূরবর্তী চিংড়িহাটায়, এবং অত্রটি খিদিরপুরে অবস্থিত।

সংগৃহীত মৎস্যগুলিকে দিবসে একাধিকবার নাড়াচাড়া করা উহাদিগকে জীবিত রাখিবার পক্ষে অমুকূল নহে, বিশেষতঃ, ঠাণ্ডার সময় ঐ ভাবে নাড়াচাড়া করাই সম্ভব। সে কারণে এবং যথা-সময়ে বাজারে যোগান দেওয়ার জন্ত প্রত্যাষেই জীবন মাছের ক্রয়বিক্রয় কার্য চলিয়া থাকে। বিক্রয়ের জন্ত ওজনের পরিবর্তে মাপেরই ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং বিভিন্ন আকারের খালুই ও ঝুড়িতেই মাপ করা হয়। এই সকল বাজার হইতে যাহারা মৎস্য ক্রয় করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে খুচরা বিক্রয় করে, তাহারা অবশ্য ওজনে কিম্বা সংখ্যা হিসাবে তাহা করিয়া থাকে। আজকাল ফিরি করিয়া



উন্টাডাঙ্গা মেছো-ঘাট; নল দ্বারা নৌকার খোলে নূতন জল দেওয়া হইতেছে

এই সময় 'ঘুনি' (খাঁচা) পাতিয়া এই শ্রেণীর বাচ্চা মাছ কিছু কিছু ধরা হইয়া থাকে; কিন্তু সেগুলি অত্র মাছের সঙ্গে বিক্রয় হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ মাছ ধরা সম্ভব নহে। জীবন মৎস্যের আমদানী শীতকালেই সর্বাধিক অধিক হইয়া থাকে, এবং বর্ষাগমের কিছু পূর্বেই উহা ছাপ্রাপ্য হইয়া উঠে। নৌকার খোলে ফেলিয়া জীবন মাছ সাধারণতঃ চালান দেওয়া হয়। কলিকাতার নিকটস্থ কৃষ্ণপুর খালে জীবন মাছের বহুসংখ্যক নৌকা গুণ টানিয়া আনিতে দেখা যায়—শীতকালে এই দৃশ্য বিরল নহে। উত্তর-কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কের সন্নিহিত উন্টাডাঙ্গা খালের মেছো-ঘাটই জীবন মাছ ব্যবসায়ের

জীবন মাছ বিক্রয়ের কায বিহারবাসীরাই প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। ইহারা মাছ মাপে কিনিয়া ও ওজনে বিক্রয় করিয়া নিতান্ত অল্প উপার্জন করে না। আদত ব্যবসায়িগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। দালালের সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকার মাছেরই কারবার করা মুকঠিন। জীবন্ত মাছের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। বস্তুতঃ, মূল্য-নির্ধারণ অনেকটা দালালের উপরেই নির্ভর করে। এ স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, কলিকাতায় যে জীবন মাছ আমদানী হয়, তাহা স্থানীয় ব্যবহারেই নিঃশেষিত হয় না। ব্যবসায়িগণ কলিকাতার বাজারে এইরূপ মাছ ক্রয় করিয়া, অল্প

জলসহ কেনেস্ভারায় প্যাক করিয়া দূরবর্তী স্থানেও প্রেরণ করে। জেমসেদপুরের ত্রায় বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রেও কলিকাতার চালানী জীয়েন মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, জীবন্ত অবস্থাতেই জীয়েন মাছের আদর ও মূল্য অধিক। সেরূপ অবস্থায় উৎকৃষ্ট জাতীয় জীয়েন মাছ অনেক সময় পোনা মাছের অপেক্ষাও অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু মরা কই মাগুর নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হয়। কলিকাতার বাজারে গামলার মাছ মরিয়া গেলে অনেক সময় তাহা নিতান্ত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে হয়।

খাদ্যমূল্য

জীয়েন মাছের মধ্যে কই মাগুর ও সিঙ্গি পুষ্টিকর খাদ্যরূপে পরিচিত। এগুলি সহজপাচ্য শিশু ও রোগীর খাদ্যরূপে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সাধারণের একরূপ ধারণা অহেতুক নহে, ইহা উক্ত মৎস্যাদির গঠনোপাদানের প্রকৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি মাছে আমাদিগের খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদান শতকরা মাত্রা হিসাবে প্রদত্ত হইল,—

	প্রতীদ	মেদ	লবণ
কই	২৩.৬	২.৮৪	১.২২
মাগুর	১৮.২	৫	১.৮০
সিঙ্গি	২৪.৫৬	৪.২৬	২.৭৩
রুই	১৭.৫	১৬.৪	২.৩৬

প্রতীদ প্রধানতঃ মাংসপেশী ও লবণ অস্থি সংগঠনে সহায়তা করে। মেদ বলদায়ক। উপরোক্ত অঙ্কাদি হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, রোহিতের সহিত তুলনায় সত্বরে দেহ সংগঠনের ক্ষমতা ইহাদেরই অধিক। অল্প দিকে অধিক মেদযুক্ত রুইমাছের ত্রায় ইহারা গুরুপাক নহে। সম্প্রতি এই সমুদয় মাছে খাদ্যপ্রাণের (Vitamin) মাত্রা সন্ধেও গবেষণা হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই সকল মাছের খাদ্য-মূল্য অল্প নহে। এই শ্রেণীর কতিপয় মাছে প্রতি ১০০ গ্রামে কত unit খাদ্য-প্রাণ আছে, তাহা পার্শ্ববর্তী তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

	খাদ্যপ্রাণ ক	খ(১)	খ(২)
খলশে	৩৩	৩৩	২৫
কই	২০	১০	২
মাগুর	১০	৮	৩৩
সিঙ্গি	২০	০	২০
শোল	২০	০	২
রোহিত	৮৩	১৮	৫০

রোহিতের সহিত তুলনায় জীয়েন মাছে খাদ্যপ্রাণ কম হইলেও যে পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ এই শ্রেণীর মাছে আছে, তাহাও নিতান্ত অল্প নহে; এবং সে দিক হইতে বিচার করিলে পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ভদ্রলোকের মধ্যে এ সকল মাছের আরও অধিক প্রচলন হওয়া উচিত, সাধারণ দরিদ্রদের ত কথাই নাই। তাহারা খুব কম দিনই মাছ পায়, এবং যখন পায়, তখন অধিকাংশ সময় এই সকল মাছই পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহার পরিমাণও অল্প। তাহাদিগের পক্ষে একরূপ মাছ সুলভ ও সহজলভ্য হইলে সাধারণ স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হওয়াই সম্ভব।

উন্নতি-সাধন

জীবন্ত মৎস্যের খাদ্যমূল্য সন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা অবশ্য স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম মৎস্য সন্ধেই প্রযুক্ত। কিন্তু সাধারণতঃ, বাজারে এই শ্রেণীর যে সকল মৎস্য আমদানী হয়, তাহাদিগের অবস্থা প্রায়ই সন্তোষজনক নহে; এবং কার্যতঃ তাহা হইতেও পারে না। কারণ, ধরিবার সময় হইতে ব্যবহারের সময় পর্যন্ত অনেক সময় ১০।১৫ দিন অতীত হয়। এই দীর্ঘকাল মাছগুলি অনাহারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অল্প মূল্যের কিছু কিছু মৎস্য-খাদ্য যদি এই আবদ্ধ মৎস্যগুলিকে প্রদান করা হয়, এবং রাখিবার স্থানের পরিসর কিঞ্চিৎ বর্ধিত করিয়া মাছগুলিকে নড়া-চড়া করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে খাদ্যহিসাবে জীয়েন মৎস্যের উৎকর্ষতা বহু পরিমাণে বর্ধিত হইতে পারে। অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অপচয় ঘটিতেছে।

জীবন্ত মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাদের চাষ স্বতন্ত্র ভাবেই হওয়া উচিত। ইহাদের হিংস্র

প্রকৃতির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেই কারণেও ইহাদিগকে রুই-কাতলা প্রভৃতি হইতে পৃথক রাখাই সম্ভব। ডোবা ও ছোট পুকুরে একরূপ মাছের চাষ সহজেই হইতে পারে। জলাশয় পরিষ্কার রাখা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। এ দেশে মৎস্যাদির জীবনবৃত্তান্ত এখন পর্য্যন্ত তেমন ভাবে সংগৃহীত হয় নাই; জীবন্ত মাছ সম্বন্ধেও তাহাই বলা চলে। অথচ এই প্রকার তথ্যের উপরেই মৎস্যজাতির উন্নতি

নির্ভর করিতেছে। কই মাংসের প্রভৃতি মাছ বৎসরের কোন সময় এবং কিরূপ অবস্থায় সন্তান প্রজনন করে, পোনা হইতে পরিণত অবস্থায় আসিতে কত সময় লাগে, জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইহাদের আহার্য্য কি, ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণার ফলে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগৃহীত হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহাদের প্রজনন সংরক্ষণ ও প্রসার বৃদ্ধি সংসাধিত হইতে পারিবে। আশা করি, অদূর-ভবিষ্যতে এই চেষ্টা সফল হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

কুহুধ্বনি

কুহুধ্বনি তব ঋতুরাজ,

আমার উদাস-চিত্তে জাতিস্মর করে দিল আজ।
মনে পড়ে এক দিন করি বনে হরিণ শিকার
গুহায় ফিরিতেছি, শুনি কুহুধ্বনিটি তোমার
হারামু গুহার পথ দিশেহারা! পড়িতেছে মনে,
আর এক দিন তব কুহুধ্বনি পশিয়া শ্রবণে

অগ্নিমন্ত-মপোচ্চারে হলো ভুল কবে যজ্ঞস্থলে,
ঋত্বিক রুধিল তায়। বসি ঋষি-শিষ্যের মণ্ডলে
কবে সে গুরুর প্রশ্নে অবাস্তুর দিলাম উত্তর,
লভিলাম তিরস্কার! দায়ী কে? তোমারি কুহুর
আজি মনে পড়িতেছে। বিদিশা কি অবস্টীনগরে
মনে নাই, ছুটিলাম আত্মহারা তব কুহুর
রহিতে নারিহু গৃহে জুটিলাম বসন্ত উৎসবে
পুর-নর-নারী-দলে। মনে পড়ে পুনঃ সেই কবে
নালন্দার আত্রকুঞ্জ হতে এসে ও-ধ্বনি তরল
কাষায়গুঞ্জিত মোর ভিক্রমিত করিল চঞ্চল।
আগ্রা হতে চিতোরের পথে স্মরি কবে এক দিন
ছুটিতেছিলাম দৌত্যে অশ্বপৃষ্ঠে হয়ে সমাসীন
শুনিয়া কুহুর ধ্বনি, ধমকিয়া চেয়েছিহু ফিরে
খুঁজিতে ধ্বনির উৎস। নদীয়ার সুরধুনীতীরে
ওই সুর শুনি মোর বিগলিত হলো কবে প্রাণ
লিখিলাম রাখিকার বিরহের বারমাশ্রা গান।

নগরের উপকণ্ঠে পুনঃ আজি শুনি সেই রব,
বসন্ত এসেছ নামি মর্শ্বে মর্শ্বে করি অমুভব,
একই সেই রসাবেশ অমুভূত জন্ম-জন্মান্তরে,
যুগ-জনতারে ঠেলি জেগে ওঠে ওই কুহুরে!
যে পৃথিবী আর নাই, ভাঙা-গড়া রূপ-রূপান্তর
তাহারে ভূলায়ে দেছে—সে-সৃষ্টিরে চেনাই হুঙ্কর!
যুগে যুগে সুরে সুরে বিবর্তিত মানব-সভ্যতা
রূপান্তর লভিয়াছে জীব-যাত্রা, তার রীতি-প্রথা
এ যেন নূতন গ্রহ! এক শুধু তব কুহুধ্বনি
অব্যয় বিবর্তহীন অবিকৃত নিত্য সনাতনী।
যে দিন বর্ষের ছিহু শুনেছিহু বনগুহা-মাঝে
যে ধ্বনি, এ সভ্য কর্ণে সেই ধ্বনি তেমনিই বাজে।
মম জন্মগুলি যেন তব কুহুধ্বনির সূতায়,
মাল্য হয়ে আজি বন্ধু মহাকাল-কণ্ঠে শোভা পায়
ছন্দে ছন্দে তালে তালে। জাগে আজ মনশ্চক্রে মম
সহস্র জন্ম মোর স্বপ্নময় ছায়াচিত্র সম।

আদিম জনমভূমি গিরিদরী হইতে উদগীত
একখানি গীতি যেন শত যুগ করি বিমণ্ডিত,
বিংশ শতাব্দীর এই নগরের উপকণ্ঠ-বনে
স্পর্শ করে অস্তরাশ্রা। তব কুহু কণ্ঠের বাহনে।

শ্রীহালিদাস রায়।



২৯

টেবিলের উপর স্বর্ণছাতির চিঠি। বীণা চিঠি পড়িতেছিল
...স্বর্ণছাতি লিখিয়াছে—

তুমি এখন কি করছো, বলবো? আমার কথা
ভাবছো! তোমার মনে হচ্ছে বায়ু বহে পূর্ববৈয়া—নিদ্
নহি কিছু সেইয়া!

আমি thought-reading জানি, না সলিলা?

বীণার ছ'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সকলের কত-
খানি সরল-বিশ্বাসে বীণা কি নির্ভুর আঘাত দিয়াছে!
অথচ কেহ তার কাছে এতটুকু অপরাধ করে নাই!

মন বলিয়া উঠিল, এ ছলনা আর নয়! এ ছলনা শেষ
করিয়া ফ্যাল...

চিঠি রাখিয়া বীণা কাগজের প্যাড্ টানিয়া লিখিতে
বসিল। লিখিল,

প্রিয়তম

কখনো তোমার এ-নামে ডাকিনি। আজ প্রথম-
বার আর শেষ-বারের মতো ডাকছি—প্রিয়তম...আমাব
প্রিয়তম!

তুমি জানো না, কাকে তুমি তোমার বৃকের আসনে
রাজ-রাণী করে বসিয়েছো! আমি সলিলা নই। আমি
বীণা।

বিশ্বাস করো! ওগো, আমি একবিন্দু মিথ্যা বলছি
না। তোমরা বলবে, আমি যদি বীণা, তাহলে সলিলা হয়ে
তোমাদের মাঝখানে এগে কেন বসলুম?

সেই কথাই তোমাকে আজ খুলে বলবো! আমার
সব কথা শুনে তবে বিচার করো। ছলনার কথা শুনেই
রাগে অন্ধ হয়ে আমাকে দণ্ড দিয়ো না।

আমার নাম বীণা। আমার বাবার নাম ছিল
তারক হালদার। বাবা ছিলেন হুগলীর এক স্কুলে মাষ্টার।
আমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। আমার খুব ছোট-বয়সে
বাবা মারা যান। বাবার কথা মনে পড়ে না। বাবা
মারা গেলে আমাকে নিয়ে আমার মা খুব বিপদে
পড়লেন। তাঁর এক জ্যাকি-ভাই ছিলেন—আশু

যোবাল। তিনি ছিলেন সাহেবগঞ্জের ষ্টেশন-মাষ্টার।
সেই আশু-মামার ওখানে মা আমাকে নিয়ে আশ্রয়
পেলেন। মা রান্নাবান্না করতেন, বাসন মাজতেন,
কাপড় কাচতেন! অর্থাৎ মাকে পেয়ে বিনা-মা হনায়
তাঁরা পেলেন বাঁদীকে-বাঁদা, রাধুনিকে-রাধুনি!

সেই আশু মামাব আশ্রয়ে বাস করতো তাঁর এক
সম্বন্ধী। দেকার হতভাগা শয়তান! তার নাম শ্রীপতি.....

এই পর্য্যন্ত লিখিবার পর লেখা ধামিয়া গেল। কলম
আর চলিতে চায় না! চলিলে যে-সব কথা কলমে বাহির
হইবে, সে-কথার বাতাসে পৃথিবী বুঝি জলিয়া পুড়িয়া
ছাই হইয়া যাইবে। তার বেচারী দুঃখিনী মা! সেই
মার কলঙ্কের কথা...মেয়ে হইয়া কি করিয়া মায়ের
নামে কালির ছোপ্ লেপিয়া দিবে!

ছ'চোখে জল...উদাস নেত্রে বীণা চাহিয়া রছিল
বাহিরের পানে।

সামনে ছোটো ঝাউ গাছ। বাতাসে ঝাউয়ের পাতা
ছলিতেছে...চামর ছলাইয়া জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রিকে
যেন অভিনন্দিত করিতেছে!

দূরে কে গান গাহিতেছিল। হিন্দী গান। গানের
মগ্ন, তুমি আসিয়া কেন আমায় ডাকিলে না? কেন
তোমার অভিমান হইল? নীরবে কেন চলিয়া গেলে?

দেউকী আসিয়া ডাকিল—বহুদি...

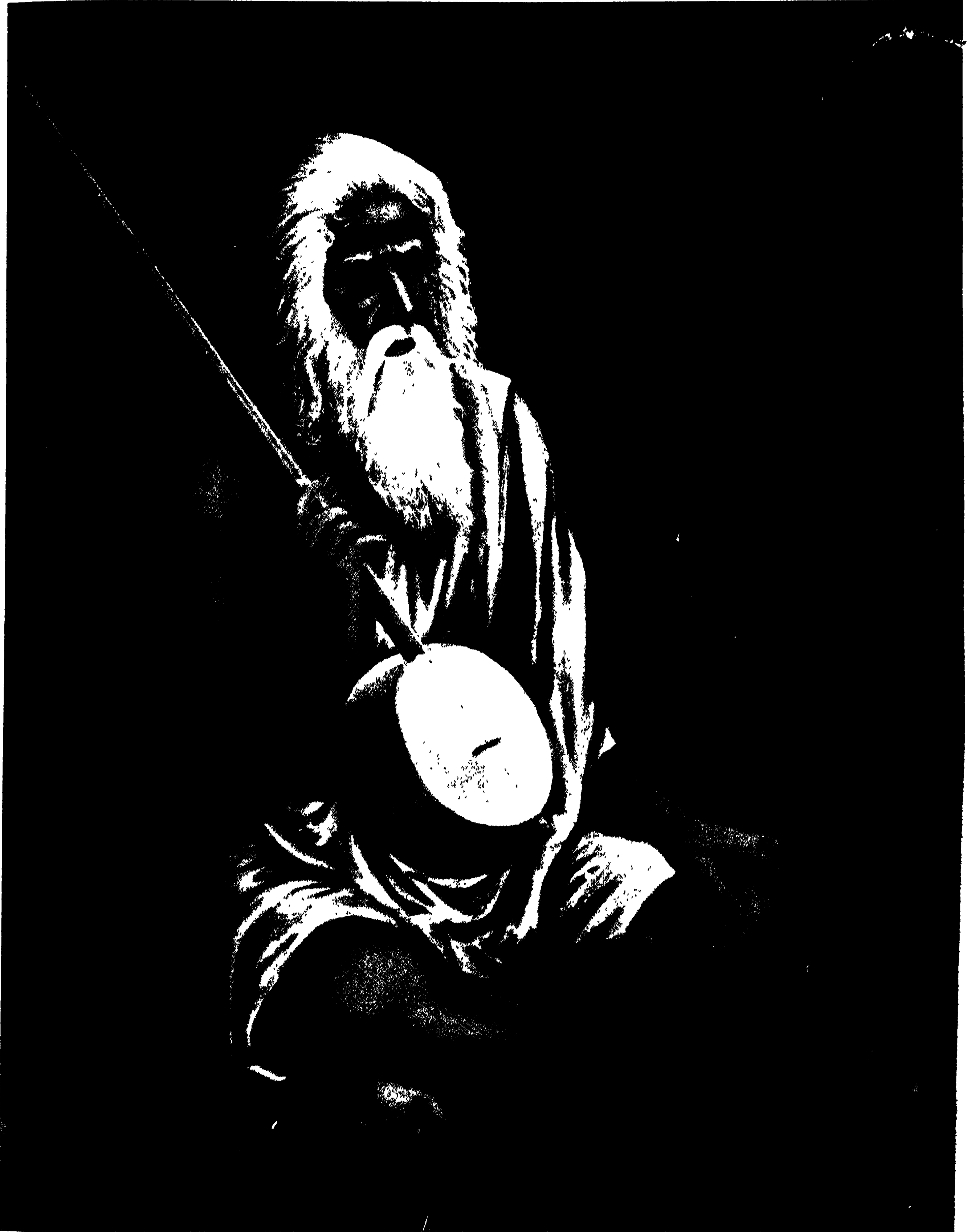
বীণা তার পানে চাহিল...তার চোখ যেন পুতুলের
চিত্র-করা চোখের মতো...

দেউকী বলিল—তেওয়ারী খাবার দেছে।

বীণা বলিল—আমি খাবো না দেউকী...

দেউকী বলিল,—তুমি যে বললে খাবার দিতে...

একটা উত্তম নিশ্বাস রোধ করিয়া বীণা বলিল,—
তখন বলেছিলুম। কিন্তু খিদে নেই, মনে হচ্ছে! খেয়ে
যদি অস্বস্তি করে?



প্রভাতী-বন্দনা

চৈত্র, ১৩৪৭]

[শিল্পী—শ্রীব্রজেননাথ আচার্য্য

অশুধ! দেউকী বলিল—তবে থাক...

বীণা আরাম বোধ করিল, বলিল—হ্যাঁ। তোরা খেয়ে নিগে যা...আমার জন্ত বসে থাকিসনে।

দেউকী বলিল,—তোমার মামাবাবু বলে গেলেন, ফিরে আসবেন...

বীণার বুকখানা ধক করিয়া উঠিল! বীণা বলিল,— তা হোক। কখন কে আসবে বলে বসে থাকিসনে! তিনি এলে তেওয়ারী তাঁর খাবার দেবে'খন! যা, বুঝলি?

দেউকীর সান্নিধ্যও বীণার সহ হইতেছিল না! তাকে বিদায় করিতে পারিলে বীণা যেন বাঁচে!

বীণার কথা দেউকী মানে। এ-কথায় সে চলিয়া গেল।

বীণা ভাবিল, মামাবাবু শ্রীপতি নয় তো?

এ চিন্তা মনে জাগিবামাত্র বাহিরে চাঁদের আলো চকিতে নিবিয়া গেল!

বীণা ভাবিতে বসিল...

যদি শ্রীপতিই হয়? এই রাত্রে আসিয়া যদি গোল-মাল করে? দাসী-চাকরদের সামনে? স্বর্ণহ্যুতি থাকিলে হয় তো সাহস হইত না! স্বর্ণহ্যুতি নাই...সলিলা-বেশে এখানকার কত্রী সাজিয়া থাকিলেও শ্রীপতি জানে, সে সলিলা নয়, বীণা! কাজেই বীণার মান-সম্মানের পানে বা নিজের বিপদের পানে সে চাহিয়া দেখিবে না!

বীণা ভাবিল, আর নয়! এ-চিঠি লিখিয়া শেষ করা চাই! মা তার কি সর্সনাশ যে করিয়া গিয়াছে! শয়তান শ্রীপতি মা'কে কি-মোহে ভুলাইয়াছিল যে, সে-মোহে নিজের কথা ভুলিলেও নিরপরাধ মেয়ের কথা মা'র মনে জাগে নাই?

মাস্তুষের এক-নিমেঘের ভুল! সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কত জনকে কত ভাবে না করিতে হয়!

বুকের মধ্যে অশ্রুর পাথর একেবারে উথলিয়া উঠিল! কি ছুরাশায় ভর করিয়া বীণা নিজেকে আজ কোথায় আনিয়াছে? এখানে তার ঠাই হইতে পারে না। এখন কোন্ রসাতলে যে গিয়া পড়িবে...

বীণার পায়ের নীচে হইতে বিশ্ব-সংসার যেন কোথায় সরিয়া চলিয়াছে...

চেতনা ফিরিতে মনে হইল, মা'র উপর তার

মিথ্যা অভিমান! মা'র কি দোষ? মা তো বলে নাই... সলিলা সাজিয়া তুই পরের ভাগ্য চুরি কর!

বেচারী তারাচরণ রায়! বেচারী মা'র!

চোখের সামনে জাগিল দিনের প্রখর আলো...কাণের কাছে মস্ত গর্জনে হুকার তুলিল সংসারের অটুহাসি... যে-কাজ করিয়াছিস, কার কাছে মার্জনার প্রত্যাশা করিস? কার কাছে আশ্রয় চাহিবি? কে তোকে বিশ্বাস করিবে? ওরে অবিশ্বাসিনী...ওরে...ওরে...

বীণা স্থির করিল, যে-কাজ করিয়াছে, তার চেয়ে কি বড় পাপ হইবে নিজের সত্য পরিচয় দিতে অকপটে যদি সে মায়ের কথা আজ প্রকাশ করে?...আর কারো কাছে নয়! তারাচরণ রায়ের কাছে...স্বর্ণহ্যুতির কাছে! পৃথিবী তাকে না বুঝিয়া অবিচারে যত-বড় কঠিন দণ্ড দিক, সে গ্রাহ্য করিবে না! কিন্তু তারাচরণ রায় আর স্বর্ণহ্যুতি?... তাদের কাছে সব কথা সে খুলিয়া বলিবে! আর কেহ বীণাকে না বুঝুক, এ'রা দু'জনে যদি বুঝিতে পারেন...

এ'রা বুঝিলে রোরব-নরকে গিয়াও বীণা আরাম পাইবে!

বীণা আবার চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল নিজের জীবনের পরিচয়...যা-যা ঘটয়াছিল! এবং নিমেঘের যে-খেয়ালে তারাচরণ রায়কে সে চিঠি লিখিয়াছিল...

মস্ত চিঠি! চিঠি লিখিয়া সে-চিঠি খামে পুরিয়া লেফাফার উপরে লিখিল...

শ্রীযুক্ত স্বর্ণহ্যুতি রায়
পরম-পূজনােষু—

তার পর টেবিলের ডায়ার খুলিয়া খামখানি সে তার মধ্যে রাখিল।

ডায়ার বন্ধ করিয়া মনে হইল, তার জীবনে যেন পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে! এ-জগতের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক শেষ!

এখন...?

দেহে-মনে প্রচণ্ড শিহরণ! না...মন্দিতে প্রারিবে না! মৃত্যু নয়! সে বাঁচিতে চায়...বাঁচিবে!...তবে এখানে নয়! এখানে সমাজ-সংসার! সে সমাজে, সে

সংসারে মান-সম্মত...তারাচরণ রায়ের পানে চাহিয়া,
/সংসারে পানে চাহিয়া লোকে হাসিবে...

না...

দূর হইতে সে দেখিতে চায়, তার এ সত্য পরিচয়
জানিয়া বীণার বিচার ঠাণ্ডা কি করেন! ঠাণ্ডা কি
বুঝিবেন না, রাজৈজ্যশ্রী ও সম্পদের লোভে বীণা এ
প্রতারণার আশ্রয় লয় নাই?

সেইটুকু...শুধু সেইটুকু যদি বীণা জানিতে পারে...

তার পর মৃত্যু আসিয়া যদি ডাকিয়া বলে, এসো
বীণা...বীণা হাসি-মুখে খুশী-মনে মৃত্যুকে বরণ করিবে।

সে-মৃত্যুর আগে যেমন করিয়া পারে, তাকে বাঁচিতেই
হইবে!

কিন্তু কোথায়? কোথায়? কেমন করিয়া বাঁচিবে?
নিজের সব অসুখ-বিসর্জন দিয়া বাঁচা কি সম্ভব? মনে
পড়িল ক্ষীরোদাময়ীর কথা...তার পর তিনকড়ি-দাছ...
উষাঙ্গিনী...কিরণ...

বুক চিরিয়া প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস!

—ভগবান...বলিয়া বীণা টেবিলের উপরে মাথা
ধুটাইয়া দিল...

যখন মাথা তুলিল, তখন নিরুদয়-রাত্রি। চারিদিক
নিস্তরতায় ভরিয়া আছে! আকাশের আসন ছাড়িয়া চাঁদ
বিদায় লইয়াছে। আকাশের বুক শুধু একরাশ নক্ষত্র!
সুস্তিত দৃষ্টিতে নক্ষত্রগুলো তার পানে চাহিয়া আছে!

বীণা উঠিল। উঠিয়া গেল। খড়খড়ির সামনে
আসিল। গাছ-পালার ফাঁক দিয়া ও-দিকে রাবেয়ার
দোতলার ঘর ঐ দেখা যায়...ঘরে আলো জ্বলিতেছে!
আলোর এতটুকু রশ্মি!

বীণার মনে হইল, ভাগ্যবতী রাবেয়া! ও যেন
বিজলীবাতির আলো নয়...রাবেয়ার সৌভাগ্যের দীপ্তি!

বিগলিত মনে বীণা বলিল, তুমি ভাগ্যবতী...মায়ের
স্নেহে মানুষ হইয়াছ বোন...স্বামীর স্নেহে তোমার জন্মগত
অধিকার! তোমার এ সুখ-সৌভাগ্য অক্ষয় হোক, অনন্ত
হোক! আদর করিয়া বীণাকে তুমি সখী বলিয়া ডাকিয়া-
ছিলে...কাল যখন শুনিবে, বীণা কে...কত বড় ছলনায়
কার সৌভাগ্য সে চূড়ি করিয়া ভোগ করিতেছিল...

বীণার ব্যথা কত বড়, বীণা কতখানি ভাগ্যহীন...
কি নিরুপায় অসহায়তায় পড়িয়া সে...তার জন্ত একটু
সৌভাগ্য কামনা করিয়া বোন...তার দুঃখ শ্রবণ করিয়া
তোমার চোখে শুধু দু'টি ফোঁটা অশ্রু! তোমাদের
ভালোবাসার স্মৃতি ছাড়া বীণার আজ কিছু নাই!
ওই স্মৃতি ছাড়া বীণার আর কোনো সম্বল নাই!

কিন্তু এখন? এখন সে কি করিবে?

এই নিস্তর রাত্রির অন্ধকারে নিজেকে ভাসাইয়া
দিবে?

এ-অন্ধকারের ও-দিকে কি যে আছে!

পা সরিতে চায় না! মন বলিল, তার চেয়ে স্বামীর
পায়ে পড়িয়া বলা, তোমার স্ত্রী নই...দাসী করিয়া
এইখানে ফেলিয়া রাখো! পারিবে না...ওগো?

মন আবার বলিল,—উষাঙ্গিনীর কাছে যাইবে?

ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসা...তার পর ট্রেন গিয়া
চূনারে থামিবে!

কিন্তু সেখানে গিয়া কি করিয়া...?

ভগবান...ভগবান...ক'ঘণ্টার মধ্যে এ তুমি কি
করিলে প্রভু! পৃথিবীতে এমন একটু ঠাই রাখিলে
না যেখানে গিয়া বীণা ক্ষণেকের জন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া
দাঁড়াইতে পারে!

চিন্তার তীক্ষ্ণ শরে জর্জরিত বুক লইয়া বীণার রাত্রি
কাটিল!

৩০

ভোরের আলো, ভোরের বাতাস কি সম্ভাবনা যে
বহিয়া আনিল! বীণা ভাবিল, রাত্রে ভাগ্যে বাড়ী
ছাড়িয়া বাহির হয় নাই!...এ-বাড়ী ছাড়িয়া কোথায়
যাইবে? অপরাধ করিয়াছে! সে-অপরাধের শাস্তি সে
লইবে...স্বামীর হাতে...সে শাস্তি যত কঠোর হয়, হোক!
চোরের মতো আসিয়াছে...কিন্তু যে আদর-ভালোবাসা
পাইয়াছে...চোরের মতো চলিয়া গিয়া সে-আদর, সে-
ভালোবাসার অপমান সে করিবে না!

চূড়ি করিয়া বীণা নিজের ঘরে বসিয়াছিল, দেউকী
আসিয়া বলিল—উঠেছো বহুদি...

বীণা চাহিল দেউকীর পানে। তার মুক্তি দেখিয়া
দেউকী শিহরিয়া উঠিল। এ যেন তার সে বহুদি নয়...
বহুদির কঙ্কাল যেন শ্মশান ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেউকী বলিল—সারা রাত ঘুমোওনি বুঝি ?

বীণা কহিল—না। সারা রাত কাল ভয়ঙ্কর মাথার
যাতনা গেছে দেউকী।

দেউকী বলিল—মোহনলালকে বলি, ডাংদার-সাবকে
ডেকে আনুক !

মুখে মলিন হাসি...বীণা বলিল—না রে, ডাংদার-
সাবের দরকার নেই। মাথা ধরা ছেড়েছে...চান করে
ঘুমোলেই শরীর ঠিক হবে।

দেউকী বলিল—তা হলে চান করো। আমি তোমার
দুধ আর হালুয়া নিয়ে আসি।

বীণা বলিল—হবে'খন। ব্যস্ত হোসনে।

দেউকী ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর
বলিল—তোমার মামাবাবু কাল রাত্রে ফিরেছেন। তখন
বারোটা বেজে গেছিলো। আমি এসে দেখি, তুমি টেবিলে
মাথা রেখে ঘুমোচ্ছ...তাই আর ডাকিনি। তেওয়ারী
গুঁকে খাইয়েছে। নীচে দক্ষিণের ঘরে বিছানা হয়েছিল...
ঘুমিয়েছেন।

একাগ্র মনে বীণা কথাগুলো শুনিল—কোনো জবাব
দিল না।

দেউকী বলিল—এখন চা খেয়েছেন। বললেন,
তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। আজ আবার উনি নাকি
কাশী যাবেন...কি কাজ আছে।

বীণার বুকের মধ্যে আবার সেই সাগরের উত্তাল
তরঙ্গ। এ-তরঙ্গ থামিয়াছিল, দেউকীর কথায় আবার...

বীণা বলিল—কোথায় সে-লোক ?

দেউকী বলিল,—নীচে আছে। বসবার ঘরে।

বীণা বলিল—আচ্ছা, তুই যা। আমি গিয়ে দেখা
করবো'খন।

দেউকী চলিয়া গেল।

বীণা বিলম্ব করিল না...ধীর-পায়ে নীচে নামিয়া
আসিল। একেবারে স্বর্ণদ্যতির বসিবার ঘরে আসিল।

দেখে...বা ভাবিয়াছিল...শ্রীপতিই।

বুক কাঁপিল। চকিতের জ্ঞান। বীণা বুক বাধিল
এখনো ভয় ? কেন ? কিসের জ্ঞান ?

স্পষ্ট কক্ষ স্বরে বীণা বলিল,—এখানে এসেছো তুমি !
এর মানে ?

দাঁত বাহির করিয়া হাসির দগ্ধ বহাইয়া শ্রীপতি
বলিল আসবো না ? মেয়ে কেমন সুখে বাস করছে,
দেখবার সাধ হয় না ?

বীণা বলিল,—তোমার মেয়ে এখানে কেউ নেই তো
যে, তার সুখ দেখবার জ্ঞান তোমার সাধ হবে।

শ্রীপতি বলিল—আমার ভুল হয়েছে, বটে ! তুমি
এখন বড়-মানুষের নাতনী...তুমি বীণা নও...সলিলা !

বীণা বলিল,—আমি সলিলা নই। আমি বীণা।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া শ্রীপতি বলিল—তা হলে
আমার আসা অত্যাশ হলে কোন্‌খানটায় ?

বীণা বলিল—সে-কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলবার
মতো সময় বা দৈর্ঘ্য আমার নেই।...আমি তোমায় স্পষ্ট
কথা বলতে এসেছি...শোনো, এ-বাড়ীতে এক দাঁড়
তোমার থাকি হবে না। এখন তুমি চলে যাও...

বীণার কঠিন ভঙ্গী দেখিয়া শ্রীপতি বিস্মিত হইয়াছিল।
এমন ভঙ্গী শ্রীপতি জন্মে কখনো দেখে নাই ! বীণার
এ-কথায় তার সে-বিস্ময় বাড়িল। শ্রীপতি বলিল,—এক-
কথায় চলে যাবার মতো লোক আমি নই, তা বোধ হয়
তুমি জানো বীণা !

বীণা বলিল—আমি কি জানি, না জানি, সে-কথা
তোমার মুখে আমি শুনতে আসিনি !...তুমি এখন
এখান থেকে চলে যাবে কি না, আমি শুধু তাই
জানতে চাই।

শ্রীপতি ক্রকুটি করিল ; বলিল—আমি যাবো না।

বীণা বলিল—হু...তা হলে তোমার হাত ধরে বাড়ীর
বার করে দেবার জ্ঞান আমার লোক-জনকে হুকুম দিতে
হবে, দেখছি !

রাগে শ্রীপতি ফোঁস করিয়া উঠিল ! কহিল—সে
সাহস তোমার হবে ?

—সাহস।

—হ্যাঁ। সে-সাহসের ফলে কি হতে পারে, জানো ?
অবিচল কণ্ঠে বীণা কহিল—আমি জানি, আমার

কিছুই হবে না। তুমি আমার কোনো অনিষ্ট করতে
নাবে না, এটা তুমি জেনে রেখো !

ক্রুদ্ধিত কন্ঠ্য বিজ্ঞপের সুরে শ্রীপতি কহিল—এমন
গভীর প্রেম ! বটে !

বীণা হস্ত প্রসারিত করিয়া তর্জনী-নির্দেশে বলিল—
যাও...ও-চেয়ারে বসেছো...এত-বড় তোমার আস্পর্শ !
যাও, এখনি বেরিয়ে যাও .

শ্রীপতি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল...বীণার পানে
চাহিয়া...তার ছ' চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ।

বীণার চোখেও অগ্নি-শিখা ! বীণা ডাকিল—দেউকী...
দেউকী আসিল। বীণা বলিল—দরোয়ানকে ডাক...
এ এক জন বদমায়েস ! এর ঘাড় ধরে দরোয়ান একে
এখনি বাড়ীর বার করে দেবে। যা...

বীণার সর্ষ-শরীর কাপিতেছে...বাতাসের দোলায়
কিশলয়-পল্লবের মতো ! বীণার এমন মূর্ত্তি দেউকী
কখনো চোখে দেখে নাই !...সে কেমন বিমূঢ়ের মতো
দাঁড়াইয়া রহিল !

বীণা কহিল—যা...দাঁড়িয়ে রইলি যে ! এখনি
দরোয়ানকে ডেকে নিয়ে আয়...

দেউকী চলিয়া গেল।

বীণা কহিল—ভেবেছো, চোখ রাঙিয়ে চিরদিন চলবে?
...তোমার ও চোখ-রাঙানির ভয় আমি করি না ! পথের
কুকুর কোথাকার...নাই পেয়ে আস্পর্শ তোমার...

শ্রীপতি এবার চটিল। বলিল—এই পথের কুকুরের
পায়েই তোমার গর্ভধারিণী-মা এক দিন...

অভাগিনী মায়ের নামে বীণার বুকে যেন নৃশূণ্ডমালিনী
মহা-কালী নাচিয়া উঠিলেন ! বীণার পায়ে ছিল শ্রীপার।
পা হইতে সেই শ্রীপার খুলিয়া সে-শ্রীপার সবেগে
বীণা নিক্ষেপ করিল শ্রীপতির মুখ লক্ষ্য করিয়া।
শ্রীপার আসিয়া পড়িল শ্রীপতির কপালের উপর...

শ্রীপতি গর্জন করিল—জুতো মারা ! তবে রে মেয়ের
নিকুচি করেছে ! অতসীর মেয়ে বীণা...সেই বীণা...

কথাটা বলিয়া শ্রীপতি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সজোরে
বীণার হাত চাপিয়া ধরিল...

সেই মুহূর্ত্তে দেউকীর সঙ্গে দরোয়ান আসিয়া
দাঁড়াইল ঘরের দ্বারে...

বীণা কহিল,—ডাকু...

এ-দৃশ্য দেখিয়া নেপালী দরোয়ান বাহাদুর একেবারে
বাঘের মতো শ্রীপতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার
গলা টিপিয়া হাঁটুর গুঁতায় তাকে মেঝের ফেলিল, তার
পর মারিল লাথি-ঘুষি-গাঁট্রা। শ্রীপতিকে বাহাদুর যেন
পিষিয়া মারিবে...শ্রীপতির মুখে কথা সরিল না...
শ্রীপতির ছ' চোখ কপালে উঠিল !

বীণা বলিল—আর মেরো না বাহাদুর। ওকে বাড়ীর
বার করে দাও।

দেউকী বলিল—পুলিশে দাও বাহাদুর...

বীণা কহিল,—না...শুধু বার করে দাও। তার পর
ছাখো, ওর কি জিনিষ-পত্র আছে...সেগুলো ফেলে দাও।
আর ওকে চিনে রাখো, এ-বাড়ীর ফটকে ও আর কখনো
যেন মাথা গলাতে না পারে !

শ্রীপতির ঘাড় ধরিয়া তাকে ধাক্কা দিতে দিতে
বাহাদুর ঘরের বাহির করিল...শ্রীপতি একবার
শুধু ছ' চোখে আগুন জালিয়া গর্জন তুলিল,—
—আচ্ছা, অতসীর মেয়ে বীণার এর জন্ত কি হাল হয়...

বীণা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল...কোনো জবাব
দিল না !

শ্রীপতিকে বাহাদুর দরোয়ান ফটকের বাহির করিয়া
দিল।

গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া শ্রীপতি বলিল—আমার ব্যাগ
আর ছাতা ?

দেউকী ব্যাগ ও ছাতা লইয়া আসিয়াছিল। বাহাদুর
সে-ব্যাগ ও ছাতা ফটকের বাহিরে ছুড়িয়া দিল।

শ্রীপতি কহিল,—যদি বনবাসে না পাঠাতে পারি তো
আমার নাম শ্রীপতি চক্রবর্তী নয় ..

বীণার ভয় নাই...ঈশা নাই...যেন মস্ত বিপদের মেঘ
কাটিয়া তার জীবনে সূর্য উঠিয়াছে !

শ্রীপতি সেই যে গিয়াছে, তার আর সাড়া-শব্দ
নাই।

তার কথা বীণা জোর করিয়া মন হইতে দূর করিয়া
দেয় ! স্বর্ণহাতীর চিঠি আসে। সে লেখে, লক্ষ্মীছাড়া
অফিস...অনুপাশ ! লেখে, সে আর পারে না !

এলাহাবাদে আসিবে...আসিয়া বীণাকে দিল্লী লইয়া
যাইবে।

ছ'দিনের জন্ত বেড়াতে যাচ্ছি...সেখানে থাকতে
যাচ্ছি না তো!

তিন দিন পরে স্বর্ণহ্যতি টেলিগ্রাম করিল,—আসি-
তেছি।

টেলিগ্রাম পড়িয়া বীণা চূপ কবিয়া বসিয়া রছিল।
তার পর স্নান করিয়া দেউকীকে ডাকিল, বলিল,—
আজ আমি একটু বাইরে যাবো দেউকী...

—কোথায় বহুদি?

—চূণার। সেখানে আমার এক পিশিমা আছে,
জানিস তো! সেই যে একবার তোর সাহেবের সঙ্গে
গিয়েছিলুম।

দেউকী বলিল,—হ্যাঁ...

বীণা বলিল,—কাল রাত্রে আমার সেই পিশিমাকে
স্বপ্ন দেখেছি...তার জন্তে মন ভারী অস্থির হয়ে আছে।
হয় তো ছ' একদিন সেখানে থাকবো। তোর সাহেব
তো এখানে নেই...তোরা ঘর চৌকি দিতে পারবি না?

দেউকী কোনো জবাব দিল না। তার মনে মেঘের
মতো অনেক প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল...ঐ যে লোকটি
মামা-পরিচয়ে আসিয়াছিল, সে এমন ছবু...তাকে
দেখিয়া অবধি দেউকীর মনে অশান্তি...লোকটা যেন
কেমন-এক ধাতের...

বীণা বলিল,—ও-লোকটা বাড়ীতে যেন না ঢোকে,
খব্দার! ও সর্বস্ব নিয়ে যেতে পারে। কলকাতায়
একবার গিয়েছিল...ওকে খুব সাবধান!

ষ্টেশনে আসিয়া চূণারের টিকিট কিনিয়া বীণা ট্রেনে
উঠিয়া বসিল। দেউকী বার-বার বলিল,—বাহাছুর সঙ্গে
যাক, নাহ'লে সাহেব রাগ করিবেন। হাসিয়া বীণা জবাব
দিল,—না রে না, তোর সাহেবকে আমার চেয়ে তুই
বেশী জানিস?

দেউকী বলিল,—এক-কাপড়ে চললে বহুদি! গায়ে
গয়না নেই...কাপড়চোপড় সঙ্গে নিলে না?

হাসিয়া বীণা বলিল,—গয়না গায়ে ট্রেনে চড়ে শেষে
চোরের হাতে প্রাণ দোবো! আর কাপড়-চোপড়?
আমার পিশিমার কি কাপড়চোপড় নেই? তাছাড়া

ট্রেন চলিয়াছে। কামরায় বসিয়া বীণা ভাবিতেছিল
আর-এক দিনের কথা। সেদিনও ট্রেনে চড়িয়া চূণারে
যাইতেছিল...সঙ্গে ছিল স্বামী স্বর্ণহ্যতি...তার আগে
আর-এক দিন...যে-দিন ট্রেনে চড়িয়া কলিকাতা ছাড়িয়া
এলাহাবাদে আসে। সে-দিনের সে-যাত্রায় বৈশ্বচন দেখা
দিয়াছিল। কে জানিত, বজ্রের মতো তা তার
জীবনকে এত-শীঘ্র দগ্ধ ভাঙ্গ করিয়া দিবে!

স্বামী...স্বামীর ঘর...স্বামীর আদর...

হায় রে, একান্তে বসিয়া বিধাতা তার ভাগ্যে যে-লেখা
লিখিয়া দিয়াছেন, কোমর বাধিয়া সে গিয়াছিল
ভাগ্যের সে-লেখা উন্টাইয়া দিতে! এখন...

যেমন মানুষ, সে যদি তেমনি থাকিত...

কিছু রাজ-সিংহাসনের লোভ বীণা করে নাই! সিংহা-
সনের লোভ কোনো দিন মনে জাগে নাই! সকলের
পিছনে...সকলের পায়ের কাছে শুধু নিরাপদ একটু ঠাই!
তার বেশী সে প্রত্যাশা করে নাই—কোনো দিন না!

এখন চূণারে চলিয়াছে...তার পর?

পরের কথা বীণা আর ভাবিতে পারে না! ভাবিবার
মতো শক্তি বা বুদ্ধি তার নাই।

৩১

চূণার।

টিকিট দিয়া প্লাটফর্ম হইতে বীণা বাহির হইবে,
সামনে তারাচরণ রায়।

তারাচরণ রায় চমকিয়া উঠিলেন, ডাকিলেন,—
দিদি...

বীণার মনে হইল, ভূমিকম্প হইয়া পৃথিবীখানা ফাটিয়া
গিয়াছে এবং সেই ফাটা-মাটির নীচে যেন তার পাতাল-
প্রবেশ!

তারাচরণ রায় বলিলেন—এখানে?

কোনো মতে বীণা মুখ তুলিল। ছ' চোখে অপরাধীর
কুণ্ঠিত দৃষ্টি!

তারাচরণ রায় বলিলেন—একা!...স্বর্ণ?

বীণার সর্বাঙ্গ বহিরা কাঁপনের স্রোত... সে-স্রোতে
নিজেকে খাড়া রাখা যায় না !

তারচরণ রইল ছুঁতে বীণাকে ধরিয়া ওয়েটিং-রুমে
আনিয়া বসাইলেন ।

বীণা যন্ত্র-চালিতের মতো বসিল ।

একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া তারচরণ
রায় সেই চেয়ারে বসিলেন ; বসিয়া বীণার পানে
চাহিলেন ।

বীণার পৃথিবী তখন কোথায় কত দূরে সরিয়া
গিয়াছে ! বীণা যেন পৃথিবীর বাহিরে পড়িয়া আছে ..
সামনে তারচরণ রায় ! তাঁর ছুঁ চোখে এখনো সেই
স্নেহের দৃষ্টি...মনে হইতেছিল, ও-দৃষ্টি যেন সত্য নয়
—আগেকার সে-দৃষ্টির স্বপ্ন-স্মৃতি !

তারচরণ রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার
পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমি বুঝেছি,
দিদি...সে-লক্ষীছাড়াটা তোমার ওখানে নিশ্চয় গিয়েছিল ।
কলকাতায় আমাকে সেই ভয় দেখিয়েই এসেছিল...

এ-কথায় সরিয়া-যাওয়া-পৃথিবী আবার যেন বীণার
বুকের কাছে আগাইয়া আসিল ! সে পৃথিবীর সঙ্গে
সেই প্রীতি-ভালোবাসা...সেই দ্বিধা-সংশয়...সেই দারুণ
বিভীষিকা...

বীণা কোনো কথা বলিল না...ভয়াতুর দৃষ্টিতে তারা-
চরণ রায়ের পানে চাহিয়া রহিল ।

তারচরণ রায় বলিলেন—স্বর্ণ এখন দিল্লীতে - না ?

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা বলিল,—হ্যাঁ...

তারচরণ রায় বলিলেন,— বুঝেছি ।

তার পর বীণার মুখে-চোখে স্নেহে হাত বুলাইলেন ;
বুলাইয়া তিনি বলিলেন—তুমি চলে এসেছো...আমার
ভয় করছে দিদি !

ট্রেনের কামরায় বসিয়া বীণা নিজের সম্বন্ধে সব কথা
ভাবিয়া শেষ করিয়াছে ! ভাবিয়া ঠিক করিয়াছে,
উষাজিনীকে কাছে মুখের কথায় সে সব বলিবে । চিঠির
লেখায় নয় ! সব কথার শেষে উষাজিনীকে এ-কথাও
বলিবে, কোনো দিক দিয়া তার নিজের কোনো অপরাধ
নাই ! মায়ের ভুল...সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যদি তাকে
করিতে হয়...

ইহার বেশী আর সে ভাবিতে পারে নাই !
উষাজিনীকে জিজ্ঞাসা করিবে, বীণা কি প্রায়শ্চিত্ত
করিবে, তুমি বলিয়া দাও পিশিমা...

তারচরণ রায়ের প্রশ্নে তার বুকের খানা একবার ছলিয়া
উঠিল । তার পর সে-বুক চাপিয়া মাড়াইয়া বীণা বলিল—
আমায় কমা করো, দাছ । আমি তোমার সলিলা নই ।
বীণা । সলিলা স্বর্গে । সন্তোষ মামা আর চাকুলতা-
মামীমা আমাকে সলিলার মতো ভালো বাসতেন ।
আর আমি...

বলিতে বলিতে অশ্রুর বন্যায় বীণা একেবারে ফাটিয়া
পড়িল !

তাকে বুকে টানিয়া তারচরণ রায় বলিলেন—তুমি
বীণা নও, তুমি সলিলা নও, তুমি কেউ নও...আজ তুমি
শুধু আমার দিদি...তুমি আমার সব !...জানো, আমার
বুক একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল ! বুক পাথর এঁটে
মানুষ বাঁচে না...বাঁচতে পারে না । আমিও বাঁচতে চাইনি
...কিন্তু না চাইলেও মানুষকে বাঁচতে হয় ! সে বাঁচা
কত-বড় দুর্ভোগ...আমার সে-দুর্ভোগ তুমি কি করে
মোচন করেছো দিদি, তুমি জানো না, কিন্তু আমি
জানি !

বীণা এ-কথার জবাব দিল না ; বিমূঢ়ের মতো তারা-
চরণ রায়ের পানে চাহিয়া রহিল

তারচরণ রায় বলিলেন—আমি সব জানি, দিদি ।
তোমার বিয়ের পর যে-দিন তোমায় এলাহাবাদে পাঠাই,
তোমাদের গাড়ী ছেড়ে যাবার পর প্লাটফর্মে একটা
লোক আমার সঙ্গে এসে আলাপ করে । সে আমাকে সব
কথা বলেছিল । টাকা দিয়ে আমি তার মুখ বন্ধ করি ।
একবার নয় ..তিন-চার বার । ..ভয় হয়েছিল, এ-কথা
শুনে স্বর্ণ যদি...

বীণার সর্কশরীরে রোমাঞ্চ-রেখা ..

তারচরণ রায় বলিলেন,—তাই আমি টাকা দিয়ে
লোকটাকে আটকে রেখেছিলুম । তার পর লোকনাথকে
কাশীতে পাঠাই...যাঁর কাছে সেখানে তুমি থাকতে,
কীরোদা দেবী...তাঁর কাছে সব খপর নিতে । লোকনাথ
খপর নিয়ে ফিরলে লোকটাকে আমি বলি, কাগজে-কলমে
সব কথা লিখে থোক একেবারে কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়ে

...নগদ পাঁচশো টাকা দেবো! সে রাজী হলো। লিখে দিলে,তোমার জন্ম পবিত্র, ভূমি পবিত্র...তখনি তাকে দিলুম দিদি, পাঁচশো টাকা! তার পরে তার লোভ বাড়লো। সে আবার এলো। বললে, আবার টাকা চাই! তখন তাড়িয়ে দিলুম। বললুম, ফের এলে পুলিশে দেবো। সে চলে গেল। বলে গেল, এবার স্বর্ণহ্যতির পালা! স্বর্ণহ্যতি দেবে টাকা!...এ-কথা শুনে তখনি আমি বেরিয়ে পড়লুম। লোকনাথ কাশী গেছে ঊঁদের আনতে...স্কীরোদাময়ী দেবীকে। স্কীরোদাময়ী দেবীকে নিয়ে এলাহাবাদে গিয়ে আমি এ-ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে চাই!

বীণা যেন কাঠ! তার চেতনা নাই...প্রাণের স্পন্দন যেন থামিয়া গিয়াছে!

তারচরণ রায় বলিলেন,—এই পার্শেল-এক্সপ্রেসে ওরা এসে পৌঁছুবে। এখানে ওরা নামবে না। আমিও সেই ট্রেনে উঠবো। উঠে এক সঙ্গে সকলে যাবো এলাহাবাদ। উষাও আমাদের সঙ্গে যাবে।

বীণার মুখে কথা নাই! পাংশু, বিবর্ণ মুখ! পৃথিবীতে যেন মহাপ্রলয় ঘটিতেছে...এ প্রলয়ের পরে কি...আলো, না অন্ধকার, কে জানে!

এলাহাবাদে ট্রেন থামিলে বীণাকে লইয়া সকলে আসিলেন স্বর্ণহ্যতির গৃহে।

গৃহে বিপর্যয় কাণ্ড!

দিল্লী হইতে স্বর্ণহ্যতি আসিয়াছে। আসিয়া বীণার লেখা সেই চিঠি পড়িয়া এবং বাড়ীতে বীণাকে না দেখিয়া দাসী-চাকরকে ভৎসনা করিতেছে, বেইমান! মা-জীর খবর রাখো না! এমন সময় শ্রীপতির আবির্ভাব..

নাম বলিয়া পরিচয় দিবা মাত্র স্বর্ণহ্যতি নিঃশব্দে টেলিফোন করিয়া পুলিশ ডাকিয়া পুলিশের হাতে তাকে সমর্পণ করিয়াছে। চার্জ দিয়াছে, ভয় দেখাইয়া টাকা-আদায়ের প্রয়াস!

বীণা আসিয়া চোরের মতো সেই যে নিজের ঘরে ঢুকিয়াছে, কাহারো সঙ্গে দেখা নাই, কথা নাই, কিছু না!

ওদিকে এক-তলার ড্রয়িং-রুমে তারচরণ রায়ের সঙ্গে স্বর্ণহ্যতির কথা হইতেছিল।

স্বর্ণহ্যতি বলিল—দিল্লীতে আমার ঠিকানা...চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, কুলটার বস্ত্রাঙ্ক রিবার্হ করেছেন ও-মেয়ের নাম সলিলা নয়; বীণা। তারচরণ রায়ের পৌত্রী নয়! এ-কথা প্রকাশ পেলো কি হবে, ভাবো,—এমনি সব কথা লিখেছিল। পোস্টকার্ডে। পোস্ট-মার্ক দেখলুম এলাহাবাদ। ভয় হলো! অবলুম, ও এখানে একা...ছুঁচোটা বাড়ীতে এসে যদি উৎপাত করে! তাই ফার্ট ট্রেনে চলে এলুম।

তারচরণ রায় হতভম্বের মতো বসিয়াছিলেন। কহিলেন—মিথ্যা কথা! সলিলা না হ'লেও ও-মেয়ের কোথাও এতটুকু গ্লানি নেই, কলঙ্ক নেই! সলিলা বলে আমার কাছে এগেছিল...আসবার পরেই ওর খুব অসুখ হয়। বিকার। সেই বিকারের ঘোরে অনেক কথা বলতো। বীণার নাম সেই সময়ে ওর মুখেই শুনি। তার পর তোমাদের বিয়ের আগে উড়ো-চিঠিতে আমি ওর দুঃখের কাহিনী জেনেছিলুম, দাদা। ...ওর অমন মন! সে-কথা তাই গ্রাহ্য করিনি। করলে হয় তো এ-বিয়ে হতো না! ...যদি বলো, ঐ দুঃসাহস? বয়স কচি হ'লেও শ্রীপতির হাত থেকে, শ্রীপতির অপমান থেকে মুক্তি পাবার জন্তু কতখানি আকুল হয়ে আমার কাছে এসেছে, আমি তা বুঝেছিলুম! বেচারী!

তারচরণ রায় চুপ করিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—যে-মেয়েকে যে-মাকে সন্তু আশ্রয় দিয়েছিল, আমার কাছে সে আত্ম কত আদরের ...কত স্নেহের ধন! স্কীরোদা দেবীও বলেছেন, তখন কি-বা ওর বয়স, সন্তুর আর বৌমার কি সেবাই করেছিল এই বীণা!...তার উপরে দাছ, মানুষের দাম মানুষের পরিচয় তার নিজের আচারে, তার ব্যবহারে... তার স্বভাবে-সংঘমে। ওর অসহায় অভাগিনী মা...হয় তো তাঁর এ ভুলের মূলে ছিল অনেকখানি নিরুপায়তা, অনেকখানি নিগ্রহ-লাঞ্ছনা! পরের আশ্রয়ে যে হতভাগিনীকে বাস করতে হয়, তার দুর্ভাগ্য কতখানি, আমরা তা ঠিক বুঝতে পারি না দাছ!

স্বর্ণহ্যতি একাগ্র-মনে এ কথা শুনি। শুনিয়া হাসিল; হাসিয়া সে বলিল—কিন্তু হঠাৎ আপনি এত সব কথা কেন বলছেন, বলুন তো দাছ?

তারারচরণ রায় বলিলেন,—তুমি ওকে বিবাহ করেছো, সে কি শুধু আমার পৌত্রী জেনে ? ওর নিজের দাম নেই ?

স্বর্গহ্যতি বলিল,—বিয়ের সময় মানুষ হয় তো বংশ-নামকে অবলম্বন করেই এ-ব্যাপারে নামে। কিন্তু পরে নামে-গোত্রে খুব যে রাজঘোটক মিল হয় দাছ, তা তো দেখি না!...একত্রে ওঁর যে পরিচয় পেয়েছি... ওঁকে চিনেছি। নামকে আমি বিয়ে করিনি...বংশকেও বিয়ে করিনি, দাছ। ও বীণা নয়, সলিলা নয়, ও আজ শুধু আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রীকে আমি চিনি।...শ্রীপতি যা বলেছে, তাতে বীণার কি অপরাধ?...কিন্তু গেল কোথায় বীণা? ভয়ে লুকিয়ে আছে? এই সে আমাদের চিনেছে? জেনেছে? পথের একটা ছন্দু'গ এসে ছ'কথা বলবে, আর মনে-জ্ঞানে নিরপরাধ জেনে আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করবো! কাব্য-নাটক-উপন্যাসের জ্বরদস্ত নামক আমি নই! কিন্তু না, বীণাকে দেখি...কি করছে? সে কোথায়?

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বর্গহ্যতি দোতলার চলিল...

দোতলার বারান্দায় আসিয়া দেখে, উষাজিনী ও স্কীরোদাময়ী দেবী বসিয়া কথা কহিতেছেন।

স্বর্গহ্যতি বলিল—বীণা কোথায় পিশিমা?

উষাজিনী বলিল,—ঘরে।...আমি ডাকলুম। আমাকে বললে, আমার একটু একলা থাকতে দাও, পিশিমা।

স্বর্গহ্যতি কোনো জবাব দিল না; ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘর ভরিয়া আছে। স্নাইট্ টিপিয়া আলো জালিয়া স্বর্গহ্যতি দেখে, খাটের পাশে বীণা চুপ করিয়া বসিয়া আছে...মলিন মুখা...ছ'চোখ বাস্পোচ্ছাসে আর্দ্র!

বীণার হাত ধরিয়া স্বর্গহ্যতি তাকে তুলিল, বলিল—আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবে না, বীণা? আমাদের অপরাধ?

বীণার স্তম্ভিত অশ্রু বাধা মানিল না...উচ্ছ্বসিত স্বরে বীণা কহিল—আমাকে তাড়িয়ে দাও...তাড়িয়ে দাও... সলিলা সেজে তার সব অধিকার যে চুরি করতে পারে...

স্বর্গহ্যতি বলিল—কেউ কারো অধিকার চুরি করতে পারে না বীণা...তুমিও কারো অধিকার চুরি করোনি! এক রাজা মারা গেলে তাঁর সিংহাসনে যেমন অন্য রাজা বসেন, রাজত্ব করেন...দাছর বৃকের রাজ্যে তেমনি...

—না...না...আমাকে কোনো কথা বলে তোমরা বোঝাবার চেষ্টা করো না।...আমি চোর! এখানে থাকবো না...থাকতে আমি পারবো না। অপরাধের ভারে, মানির ভারে...

স্বর্গহ্যতি বলিল,—ওগুলো নাটক-নভেলের কথা, বীণা। সত্যকারের সংসারে মানুষকে মানি, অপরাধ, মায়্যা-মমতা, মহত্ত্ব সব নিয়ে বাস করতে হয়! যে-অপরাধের মানি কল্পনা করে তুমি এমন কুঞ্জিত হচ্ছেো, তোমার সে-অপরাধে এক জন নিরুপায় বৃদ্ধ কতখানি প্রাণ পেয়েছেন...তোমার সে-ছলনায় কি মমতা-মায়্যা তাঁর সে-প্রাণ ভরে উঠেছে, নিজের চোখে তুমি দেখবে এসো বীণা!

বীণা কুণ্ঠাভরে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্গহ্যতি বলিল—আর আমি? তুমি আমার স্ত্রী... তুমি পুতুল নও...নিজের ভাগ্য যে-সাহসে গড়ে তুলেছো, তোমার সে-সাহসকে আমি শ্রদ্ধা করি। লাঞ্ছনা-অপমানের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্ত তোমার এ-সাহস...কথায় আমি বোঝাতে পারবো না বীণা। সে-কথা নাটকের মতো শোনাবে! শুধু জেনে রাখো, তোমার এ জয়-গৌরবে চির দিন আমি গৌরব বোধ করবো!

বীণাকে স্বর্গহ্যতি বাহুল্য করিল।

তারারচরণ রায় ঘরে আসিলেন, বলিলেন—কপোত-কপোতী গুঞ্জন-গান করছো! বাঃ! বুড়ো দাছ ওদিকে দিদিমণির মুখের একটি কথা শোনবার জন্ত আকুল...

বীণা নিজেকে সত্বরণ করিতে পারিল না; তারারচরণ রায়ের পায়ে উপরে লুটাইয়া পড়িল। তার চোখে ঝর-ঝর-ধারে অশ্রুর বর্ণা...

তারারচরণ বলিলেন,—ওঠো দিদি। কাঁদে না! কান্না কিসের! আমার বুক যে-ভাবে তুমি ভরে তুলেছো, আশীর্বাদ করি, এমনি স্থখে তোমার বুক ভরে থাকুক! তোমাদের স্থখ চির দিন অটুট হোক, অক্ষয় হোক!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় :



মা হওয়া

মেয়েদের মনে সবচেয়ে বড় কামন মাতৃহ বা মা হওয়া !

কিন্তু মা হওয়ার আগে শরীরকে মাতৃ-গ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়া চাই। দেহ গড়িবার কথা পূর্বে উঠিত না ; এখন উঠিয়াছে। তার কারণ, নানা কৃত্রিম আচার-বিচারের ফলে মেয়েদের দেহ বেশ সুস্থ স্বচ্ছভাবে আজ আর গঠিত হইতেছে না। সেজন্য প্রসবের বেদনা সহিতে না পারিয়া কত কিশোরী-জননী যে ইহলোকের সব সাধ দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হইতেছে, তার আর সংখ্যা নাই ! অথচ সন্তান-প্রসবের ব্যাপারটুকু মেয়েদের সহজাত বলিলে অত্যাঙ্কি হইবে না। এ সম্বন্ধে এক জন পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন—Child-bearing is at once both miraculous and commonplace. It is as common as rain. অথচ নারী-জীবনের এই অতি-স্বাভাবিক ঘটনা আজ দারুণ শঙ্কাকুল হইয়াছে !

সন্তান-প্রসবের জন্ম চাই মায়ের অম্লান অকলুষ স্বাস্থ্য। প্রসব-ব্যাপার খুবই জটিল। আমাদের দেশে মেয়েলি প্রবাদ আছে, প্রসবে বত্রিশ নাড়ীতে টান পড়ে। প্রসব-কালে প্রসূতির প্রাণ লইয়া মহা-সঙ্কটের আবির্ভাব হয় ! কিন্তু যে-সব নারী সত্যতার আবহাওয়ায় 'মানুষ' হইয়া প্রকৃতি-দত্ত বিধি বিসর্জন দেন, প্রসবের সময় এ বিপদ তাঁদেরই ঘটে ! যে সব নারী খাটিয়া খায়, মোট বহে, অর্থাৎ দেহখানিকে পরিশ্রম-বিমুখ করিয়া রাখে না, তাদের বেলায় দেখা যায়, প্রসবে কষ্ট নাই ; প্রসবের পরে রোগশয্যায় পড়িয়া কোনো দিন তারা টনিক ঔষধাদি সেবন করে না ; প্রসবের দু'তিন দিন পরেই শক্ত-সমর্থ দেহ লইয়া সংসারের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

এখানে সংসারের কাজে আত্মনিয়োগ করার কথাটাই বড় কথা নয়, বড় কথা নারীর সু-প্রসব ও স্বাস্থ্য।

কায়িক পরিশ্রমে অথবা ব্যায়ামে নারী-দেহে বস্তি-কোটর ও কুক্ষির অস্থি প্রভৃতি যথারীতি গড়িয়া ওঠে এবং তাহারি জন্ম প্রসব-কালে তাঁদের প্রাণ লইয়া টানাটানি ঘটে না !

যে-সব নারীর pelvic region অর্থাৎ বস্তি-কোটর পরিপূর্ণ সুস্থভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রসবে তাঁদের বিন্দু-মাত্র দুশ্চিন্তা বা শঙ্কা নাই।

বেদিয়া, চাষাভূষা ও শ্রমিক-ঘরের মেয়েরা প্রসবে কষ্টভোগ করে না এবং প্রসবের পরে ক্লমরোগে তাদের দেহের অবসান ঘটে না। বিলাস-লীলায় মাতিয়া সোফা-কোচে শুইয়া থাকিব, বড়-জোর সিনেমা-পার্টিতে ঘুরিয়া দেহ নাড়িব,—ইহাতে মাতৃত্বের সাধ মিটিতে পারে না ! পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন, Back to work is the clue to the ease with which the child is born. যে-সব নারী শুইয়া-বসিয়া না থাকিয়া পাঁচটা কাজ করিয়া গতির নাড়েন, প্রসবে তাঁদের ভয় নাই।

যারা মনে করেন, জল তোলা বা রান্নাবান্নার কাজ পোষাইবে না, তাঁরা বিশেষ ব্যায়াম বিধি মানিয়া চলুন। আলস্য ছাড়িয়া কাজেকর্মে পটু হইতে না পারিলে মাতৃত্বের আশা সাংঘাতিক-পরিণামে অবসিত হইবে ! যারা বলেন, অন্তর্কর্ষী-থাকা-কালে খাটাখাটুনি করিলে বিপদ ঘটিবে, তাঁরা ভ্রান্ত ! খাটাখাটুনির অর্থে দেহ-খানিকে কর্ম-বিমুখ বা অলস না রাখা—কাঁপ খাওয়া নয় !

মাতৃত্বের পক্ষে দেহকে উপযোগী করিয়া গড়া কঠিন নয়। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন—মাতৃত্বের জন্ম নারীর চাই শক্ত-সমর্থ এবং সুস্থ দেহ ; শক্ত-সমর্থ তলপেট (abdomen) ; এবং সবল (pelvic organs) বস্তি-কোটর। ঋতু-সম্বন্ধীয় গোলযোগ—বিশেষ ব্যায়াম-বিধিতে ঘুচিয়া যায়। এই ব্যায়ামের কথাই আজ বলিতেছি।

ব্যায়ামের পূর্বে নিত্য খানিকক্ষণ করিয়া মুক্ত বাতাসে বিচরণ করা চাই। এ বিচরণকে ব্যায়াম বলিয়া জানিবেন। আসন্ন-প্রসব নারীর পক্ষেও এ বিচরণ-ব্যায়াম সম্পূর্ণ নিরাপদ। কাজেই এ-ব্যায়ামে এতটুকু অবহেলা কদাচ উচিত হইবে না।

বিলাতী সভ্যতার ফলে আজ আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে অনেকে হাই-হীল জুতা পায়ে আঁটিতেছেন। হাই-হীল জুতা পায়ে দিয়া হাঁট-বার অভ্যাঙ্গে মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে pelvis এর গঠনে ও pelvic পেশীগুলি বিকৃত হয়। এজন্ত সন্তান-প্রসবের সময় সঙ্কটের সীমা থাকে না! সুতরাং ধারা মাতৃস্ব কামনা করেন, হাই-হীল জুতা যেন তাঁরা আদৌ ব্যবহার না করেন।

তার পর চাই ব্যায়াম। ব্যায়াম না করিয়া দেহকে যদি আলস্তে বিজড়িত রাখি, তাহা হইলে শরীরে প্রচুর মেদ জন্মিবেই। মেদে দেহের শক্তি লোপ পায়। আলস্তের ফলে pelvis এর চারি দিকে যে পেশী সমূহ আছে, সেগুলি মেদ-ভারে ভরিয়া সম্পূর্ণ অকর্মণ্য বেকার হয়; প্রসবে তাই অনর্থ-মৃষ্টি।

জঘনদেশ উর্দ্ধে তুলুন। এ সময় দেহকে যথাসম্ভব কঠিন (rigid) রাখিতে হইবে। মাথা পিছন দিকে হেলাইয়া দিবেন। দেহের ভর হু'পায়ের গোড়ালির এবং দুই হাতের উপর রাখিতে হইবে। (১নং ছবি দেখুন) তার পর ধীরে ধীরে আবার বসুন। এ-সময় জোরে-জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিবেন। প্রথমে এ-ব্যায়াম চারবার করিয়া নিত্য করিবেন; তার পর বাড়াইয়া



২। দু'হাত এবং এক পায়ের উপর

দশ-বার। জঘনদেশ যখন উর্দ্ধে তুলিবেন, তখন নৃত্য ভঙ্গীতে আড়া-আড়িভাবে মৃদু তালে ছুলাইবেন।

২। প্রথম ব্যায়ামের পর ২নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পা জুড়িয়া কাৎ হইবেন। এ সময় দেহের ভার থাকিবে দুই হাত এবং একখানি মাত্র পায়ের উপর।

এ ব্যায়ামে একবার ডান পায়ের উপর পরক্ষণে বাঁ পায়ের উপর দেহভার রাখা করিয়া যথাক্রমে ডান-কাতে এবং বাঁ-কাতে দেহ ছুলাইয়া চারবার ব্যায়াম করিবেন। অভ্যাস হইলে ব্যায়ামের মাত্রা বাড়াইয়া দশবার করিবেন।

৩। এবার ৩নং ছবির ভঙ্গীতে মেঝের দিকে মুখ করিয়া উপুড় হইয়া শুইবেন। কমুই হইতে



১। হু'পায়ের গোড়ালি এবং দু'হাতের উপরে দেহের ভর

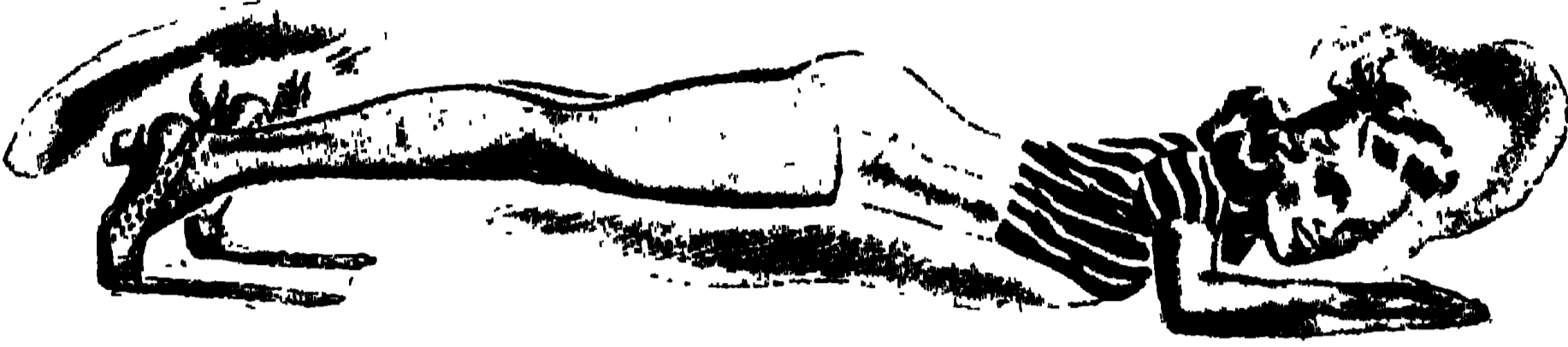
Pelvis এবং pelvic প্রদেশ-সমূহ স্বস্থ স্বচ্ছন্দ রাখা চাই। তার জন্ত নিম্নলিখিত ব্যায়াম-বিধির উপকারিতা অপরিণীম।

১। মেঝের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া দু'হাতে ভর দিয়া

করতল পর্যন্ত দুই হাত মেঝের উপর ছবির মতো লেপিয়া থাকিবে। তার পর হু'পায়ের আঙুলের উপর এবং দুই বাহুর অগ্রভাগের উপর ভর রাখিয়া দেহকে উর্দ্ধে তুলুন। জঘন-দেশকে যতখানি উর্দ্ধে তুলিতে পারেন,

তুলিবেন। এই ভাবে দেহকে ছুলাইবেন। শ্বাসপ্রশ্বাস জোরে জোরে লইতে হইবে। যতক্ষণ না শ্রান্তিবোধ করেন, ততক্ষণ এ ব্যায়াম করিবেন।

৪। চিং হইয়া মেঝের শুইয়া পড়ুন। দুই পা



৩। দু'পায়ের আঙুল ও দুই হাত

এবং দুই হাত উর্দে তুলুন। দেহ হইবে ৪নং ছবির ভঙ্গীতে ধমুকের মতো। এই ভাবে দুই পা ও দুই হাত



৪। বাকিয়া পা ছোঁওয়া

তুলিয়া দুই হাতের আঙুল দিয়া দুই পা স্পর্শ করিবেন। এ ব্যায়াম নিত্য দু'বার চারবার মাত্র করিবেন।

ব্যায়ামে pelvic region বেশ সুস্থ-সবল থাকিবে এবং সন্তান-প্রসবে এতটুকু ক্লেশ বোধ করিবেন না। কিশোর-কাল হইতেই এ-ব্যায়াম করা প্রয়োজন। যারা এক বা একাধিক সন্তানের জননী, তাঁরাও এ-ব্যায়ামে বহু উপকার লাভ করিবেন।

আহার

আজ আমাদের দেশে তরুণ-তরুণীর মনের স্বাস্থ্য শিক্ষায়-দীক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করিলেও তাঁদের দেহের স্বাস্থ্য দেখিয়া হতাশ হইতে হয়! কোথায় গেল তরুণের সে

বলিষ্ঠ পেশী, প্রদীপ্ত পৌরুষ! কোথায় বা তরুণীর সে রূপ-লাবণ্য, যৌবনের সে পরিপুষ্ট নিটোল ছাদ! তরুণ-মহলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া; এবং তরুণী-সমাজে আহারে অরুচি! চেহারায় তাই শ্রী নাই!

এই অস্বাস্থ্য-মোচনের জন্ত সকলের একাগ্র-নিষ্ঠা চাই স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞেরা বলেন, Enjoyment of food indicates enjoyment of life. আহারে যার রুচি আছে, তার

রোগের ভয় নাই! সে জীবন্ত মানুষ!

আজকালকার তরুণ-সমাজকে দেখি, খাইতে হয় বলিয়াই যেন তাঁরা আহার করেন! সে-আহারে রুচি কৈ? ভালো-মন্দ পাঁচটা খাবার মুখে যদি ভালো না লাগে, তবে বুঝিবেন, জীবনে ঘুণ ধরিতে শুরু করিয়াছে!

খাওয়ায় কি আনন্দ—যিনি জানেন, তিনি ভাগ্যবান! রুচি করিয়া আহার না করিলে দেহ মজবুত থাকিবে না; মনও দুর্বল দেহের সংস্পর্শে ঝিমাইয়া দুর্বল হইবে।

বাঁধা-ধরা টাইমে রুটিন মানিয়া আহার—সত্যযুগের দারুণ অভিশাপ! ক্ষুধা থাক, না থাক, দশটার আগে মুখে ভাত গুঁজিয়া স্কল-কলেজে কিম্বা আপিসে-আদালতে ছুটিতে হইবে—এ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য অনেকখানি জখম হইতেছে। খাওয়া-সম্বন্ধে এ-বিধি পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। ক্ষুধা পাইলে আহার করিব, নচেৎ আহার করিব না, এই নিয়ম মানিয়া চলিলে শরীর কোনো দিন ব্যাধি-মন্দির হইবে না! যাহা খাইয়াছি সম্পূর্ণভাবে তাহা হজম হইবার পূর্বে খাওয়া অমুচিত; হজম হইলে ক্ষুধার উদ্বেক হইবে, তখন খাওয়া গ্রহণ করুন। খাওয়া-গ্রহণে মন যদি বিক্লপ হয়—কোনো মতে খাওয়া গলাধঃকরণ করিয়া দায়ে খালাশ হইতে যদি চান,—তাহা হইলে এ খাওয়া পুষ্টির পরিবর্তে দেহে অস্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিবে।

আহারের নামে মন যার সরস হয়, অমুরাগে উচ্ছ্বসিত হয়, তারই আহার-করা সার্থক জানিবেন!

ঐ খাওয়ার ডাক আসিল—ইহা ভাবিয়া যিনি মনে করেন, মাথায় যেন বজ্রপাত হইবে, তাঁর জীবন দুর্বল!

আহারের সময় যে লালা রস সঞ্চারিত হয়, তাহা আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে গিয়া খাণ্ড-পরিপাকে সহায়তা করে।

এই যে দেখি, কাহারো জীবন আনন্দে-উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল—কেহ বা মুখ সিঁটকাইয়া মলিন হইয়া আছেন, এ প্রভেদ কেন হয়? এ পার্থক্যের কারণ, একের জীবনী-শক্তি আছে; অপরের সে-শক্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবার জো!

খাণ্ডে যার রুচি নাই, দু'দিনে তার বুদ্ধি জড়বৎ হইয়া যায়!—He is liable to be stupid.

আহারে অরুচি সারাইবার একমাত্র বিধি—ক্ষুধা পাইলে খাইবেন, নচেৎ নয়! অনাহারে মানুষ মারা যায় না, ইহা স্থনিশ্চিত। এক-বেলা আহার বাদ দিলে স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না। ক্ষতি হয় অক্ষুধার উপর কিম্বা অরুচির উপর খাণ্ড-গ্রহণে।

খাণ্ড যতক্ষণ ভালো লাগিবে, খাইবেন। অনিচ্ছায় কখনো কোনো খাণ্ড গ্রহণ করিবেন না। অতি-ভোজনে প্রাণ-সংশয় ঘটে। অতি-ভোজনে পরিপাক-শক্তি বিনষ্ট

হয়; এবং তার ফলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রতিভা রীতিমত আহত হয়।

আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি, আমাদের মস্তিষ্কও এই পাকস্থলীর স্বচ্ছন্দ-ক্রিয়ার মুখাপেক্ষী। পাকস্থলীকে যদি পীড়নে ব্যতিব্যস্ত ও জীর্ণ করি, তাহা হইলে তার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিব জ্ঞান-বুদ্ধির বিনাশে—মস্তিষ্কের জড়তায়।

অতি-ভোজন করিলে আমাদের মন কোনো আনন্দে সাড়া দেয় না; আবেগ-উচ্ছ্বাসে মনের সামর্থ্য থাকে না—সে সময় মানুষ যেন ভেঁ হইয়া থাকে! কারণ, দেহের সমস্ত রক্ত তখন ঐ খাণ্ডের বোঝা পরিপাকে পাকস্থলীর সাহায্য করিতে ছুটিয়া যায়। দিনে একবার খান বা তিন-বার খান, তাহাতে আসিয়া যাইবে না। আসল কথা, ক্ষুধা পাইলে খাইবেন, নচেৎ খাইবেন না। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ এ বিধি যদি বরাবর মানিয়া চলেন, দেখিবেন, দেহে কোনো দিন অজীর্ণতা বা জরার ছোঁয়াচ লাগিবে না; পর-মায়ু দীর্ঘ হইবে; এবং আশী-বৎসর বয়সেও দেহ থাকিবে ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর-বয়সী জোয়ানের মতো শক্ত-সমর্থ।

বসুমতী

অতি-পুরাতন, জরাজীর্ণ বহু শতাব্দীর—

ভরেছে সকল অঙ্গ দুষ্ট বর্ণে এই ধরণীর।

শত ক্ষত-মুখে বরে জলা-রক্ত পৃতিগন্ধ-ভরা:

পক্ষাধাতে শিথিল শরীর—কদর্য্য কুৎসিত এই ধরা!

ঝাপসা চোখের দৃষ্টি! অশ্রু নয়, ক্রন্দ বরে পড়ে;

কুষ্ঠগ্রস্ত মুমূর্ষুর মত যন্ত্রণায় করে আর্তনাদ;

লোমহীন কুকুরের অতি-শুক হকের মতন

নগ্ন লোল-বন্ধে তার থেমে গেছে

প্রাণের স্পন্দন!

স্রষ্টার মানস-কন্ঠা স্কুল্যাণী ধরা

অপূর্ব সৌন্দর্য্যময়ী সর্ব-বিভূষণা;

সর্বস্বতা—মহাব্যাধি ক্ষয়-রোগে অস্থিচর্ম্মসার!

সুগ-বট-বৃক্ষ-তলে নির্ঘাতিতা মুহূর্ত্ত করে হাহাকার!

পাশব প্রবৃত্তি তবু তীক্ষ্ণ দস্তে ধরে তারে করে টানাটানি;

প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে হিংসা-হেষে পরস্পরে চলে হানাহানি:

জলেছে মরণ-যজ্ঞ! দিকে দিকে গন্ধে তার বিষাক্ত ধোঁয়ায়

বিত্রাস্ত পিশাচ সব করে অটু-কলরব গলিত শবের গন্ধে

অতৃপ্ত কুধায়!



১

মালতীর মা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—আমি তো তখনই বলেছিলুম, মেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়িও না। তখন আমার কথা কানে তুললে না, এখন মজা বুঝবে।

প্রত্যুত্তরে মালতীর বাবা ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—হঁ, এতটা যে গড়াবে তা তো আগে ভাবিনি! এখন দেখ্‌চি, তোমার কথা শুনাই ভালো ছিল। কিন্তু ...

মালতীর মা নিস্তারিণী দেবী স্বামীর নিরুদ্ভিতা এবং অবাধ্যতার জন্ত আর একবার তাঁহার উপর ঝাল ঝাড়িবার লোভে বলিতেছিলেন,—আমি ওসব কথার মধ্যে নেই, তা কিন্তু ব'লে রাখ্‌চি। আদার ব্যাপারী যে, জাহাজের খবরে তার দরকার কি? হেঁসেলে ছুঁবেলা হাঁড়ি ঠেলি, সংসার সামলাই,—এতেই আমার ম'রবার ফুরসৎ নেই; দরকার কি বাপু, আমার বড় বড় কথার মধ্যে থা'কবার! তুমি শোন, তুমিই বোঝ।

অল্পক্ষণ ধামিয়া, বোধ হয় ইঞ্জিনে ষ্টীম করিবার জন্ত দম লইয়া—আবার তিনি কি উদ্‌গিরণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সদর দরজায় মোটর বাস আসিয়া ধামিবার সাড়া পাওয়া গেল; তিনি জানালা দিয়া দেখিলেন, কলেজের বাস আসিয়া ধামিয়াছে, এবং তাঁহার মেয়ে তাহা হইতে নামিয়া আসিতেছে। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া পাশের দরজা দিয়া নিঃশব্দে অন্তর্দ্বান করিলেন। বাসও চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই চুড়ির রিনিঝিনি ও হিল-উঁচু জুতার খুঁট খুঁট শব্দের সহিত মুহূর্ণে মুহূর্ণে, “মম চিন্তে, নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা-ধৈঁধৈ তাতা-ধৈঁধৈ”...গান করিতে

করিতে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী মালতী তাহার “ষ্টাডি”তে প্রবেশ করিল। কিন্তু পাশের ঘরে গডগড়ার নলে ওষ্ঠসংলগ্ন করিয়া মালতীর পিতা নিবারণ বাবু গভীর সমস্তায় আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার এই চিন্তার কারণ উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। আজ সকালে পাড়ার লাইব্রেরী হইতে আনীত “প্রিয় সহচরী” নামক উপন্যাসখানি একবার তিনি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে উন্টাইয়া-পাণ্টাইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার বহুকালের এটি অভ্যাস। আজ কালকার এই অর্ধাচীন তরুণগুলার লেখা ভালোও লাগে না, আর মাঝে মাঝে রাগে চোখ-মুখ বাঁ বাঁ-ও করে বটে, কিন্তু তথাপি নতুন উপন্যাসে নবীনের দল কি সব লিখিতেছে, সেগুলো এক-নজর না দেখিলেও মন খুঁৎ খুঁৎ করে। তাই বইখানি পড়িতে পড়িতে যখন তিনি রীতিমত উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সময় তাহার ভিতর হইতে ঠুক করিয়া একখানি চিঠির মত কি পড়িল। পুরু নীলাভ খাম, খামখানি হইতে মুহূর্ণে মুহূর্ণে উখিত হইতেছে। খোলা খাম, এবং তাহার উপরে তাঁহারই মেয়ে শ্রীমতী মালতীর নামটি দেখিয়া তিনি আর কৌতুহল সংবরণ করিতে পারিলেন না। ভিতর হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িলেন,—

প্রিয় মালতী দেবী,

আমাদের আজিকার সভা আপনার বহু-বাহিত উপস্থিতিতে ধন্য হইবে কি? ভ্রমর যেমন করিয়া মূর্ছিত পদ্মের কাছে অবিশ্রান্ত গুন্ গুন্ শব্দে গুঞ্জন করে, তেমনই আপনার অপরিসীম গুণের কথা আপনার কানের কাছে সর্বদাই গুঞ্জন করিয়া বলিতে আমার উৎকট কামনা উদগ্ৰ। চান কি আপন সৌন্দর্যের কথা নিজে জানে? না জানে না, মনে হয়, সে যেন আশ্চর্যবিশ্বত। আপনিও বোধ করি, তাই। যাক্ এ সব কথা। আপনার দর্শনে

ধন্য হইবার আশা কি আমাদের মীটি রাখে? দয়া
করিয়া খবর দেবেন একটু।—ইতি আপনার ভক্ত

কোরকুমার দাস।

চিঠি পড়িয়া নিবারণ বাবুর পেয়ালার চা পেয়ালাতেই
ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। তিনি বিহ্বলের মত বসিয়া
রহিলেন। কোরকুমার কে, তাহা তিনি জানেন না।
পদবী দেখিয়া মনে হয়, সে কায়স্থ; কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণ।
নিবারণ বাবুর মুখে চা তিক্ত লাগিল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে
ডাকিলেন,—ওগো, একবার শুনে যাও।

গৃহান্তরে তাঁহার স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী তখন গৃহকাৰ্য্যে
রত ছিলেন; স্বামীর আহ্বানে দ্বারের কাছে আসিয়া
মাড়া দিয়া বলিলেন,—তোমাকে আর এক পেয়লা চা
দেখ কি?

নিবারণের তখন কথা বলিবার শক্তিও যেন লোপ
পাইয়াছে; হাত নাড়িয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে
চিঠিখানা তুলিয়া দিয়া কহিলেন,—প'ড়ে দেখ।

নিস্তারিণী চিঠিখানা পড়িয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন,
—সেইকালেই বলেছিলুম, মেয়েকে ইস্কুল-কলেজে অত
পড়িয়ে কাজ কি বাপু? কেন, আমরা ক'টা পাশ
দিয়েছি? ঘর-সংসার কি ক'রছিনে? তা ছাড়া মাসে
এই যে, এক কাঁড়ি ক'রে টাকা গুণতে হ'চ্ছে,—এ কেন,
তা শুনি? মেয়ে কি রোজগার ক'রে খাওয়াবে? না,
তার বিয়ের সময় আর এক কাঁড়ি টাকা লাগবে না?
শুধু শুধু টাকাগুলোর না'হক শ্রদ্ধ।

নিবারণ বাবু কহিলেন,—আমি যে সখ ক'রে মেয়েকে
কলেজে পড়াচ্ছি, এমন কথা ব'লতে পারো না। মনে
নেই, আগে তোমার মতেই মত দিয়েছি? বারো তেরো
ষছর থেকেই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের জন্তে ছুটোছুটি
ক'রেছি। ভবানীপুর থেকে চক্রবর্তীরা দেখতে এ'লো।
এসে তো হেসেই খুন!—বলেন কি, আমার ছেলের
সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রছেন—অথচ আপনার মেয়ে, ম্যাট্রিকুলে-
টেডও নয়! এতো কচি শিশু বয়েই হয় মশায়! গাল
টিপলে ছুধ বার হবে। আরও দিনকতক শিক্ষা দিন।'
মত জায়গায় সম্বন্ধ করি, সবারই মুখে ঐ একই ধরণের
কথা।—মেয়ে 'পিয়ানো জানে কি? মণিপুরী নাচ
শিখেছে? ম্যাট্রিক পাশ, না আই-এ পাশ, না সিনিয়র

কেম্‌ব্রিজ?' ব্যাপার দেখে আমার চোখ ফুটলো।
বুঝতে পারলাম, শ্রোত গেছে বদলে। কালের হাওয়ার
গতিরোধ করতে বা ফিরিয়ে দিতে পারব না। বরঞ্চ
সেই হাওয়ার অমুকুলে না চলতে শিখলে জীবন-যাত্রা
অচল হবে। তাই মেয়েকে দিলাম স্কুলে ভর্তি ক'রে।
যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেটেড হ'লো, নাচ এবং গান শিখলে,
তথাপি জুংসই পাত্র জুটলো না। শুধু শুধু বাড়ীতে
বসে থাকবে, কাজেই ভর্তি হ'লো কলেজে। এখনো
তেমন পাত্র পাওয়া যায়নি, কাজেই কলেজ চ'লছে।

নিস্তারিণী বিরক্তির সুরে বলিলেন,—অত-শত আমি
জানিনে, অত চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণও আমাকে দিয়ে
হবে না। আর এসব অসৈরণও আমি সহিতে পারব না,
তা ব'লে দিচ্ছি। যেমন পাও, খুঁজে-পেতে শীগ'গীর
মেয়ের বিয়ে চুকিয়ে ফেল। আর তা যদি না করবে,
নিজে যা ভালো বোঝ কর। আমি কিছু জানিনে।

নিবারণ মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—আজকাল তা আর
হয় না। ছু'পক্ষেই পছন্দ করবে, বিচার করবে। যাই
হোক, মালতীকে আমি সব কথা জিজ্ঞেস করুব।
কোন একটা উপায় স্থির করছি। আগে তো এতটা
জানতেম না।

নিস্তারিণী সেকালের মেয়ে। স্বামী কলিকাতার
কোন বেসরকারি কলেজের প্রফেসর হইলেও নিস্তারিণী
কলিকাতার আধুনিক সমাজের বাইরের মানুষ ছিলেন।
যে পাড়াগাঁয়ে তাঁহার বাপের বাড়ী সেখানকার ধরণ-
ধারণ এত দিন কলিকাতায় বাস করিয়াও তিনি ছাড়িতে
পারেন নাই। আজও তাই দিনের অধিকাংশ সময়ই
কাটে তাঁহার রান্নাঘরে। মাইনে-করা পাচকের হাতে
ধাইতে বা স্বামী পরিজনকে ধাইতে দিতে তিনি মনের
ভিতর অতৃপ্তি অনুভব করেন। জীবনটা মোটামুটি সচল
এবং গুটিকতক ধরা-বাঁধা নিয়মের উপর তাহার ভিত্তি,
এইটুকু জ্ঞান তাঁহার মজাগত ছিল। আর ইহাই
আশ্রয় করিয়া দিনগুলিও নির্বিবাদেই কাটিতেছিল।
এই ব্যাপারটার মেয়েটার অপরিসীম বেহায়াপনা ছাড়া
আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না। মেয়ের উপর
রাগে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধু অবধি জলিতে লাগিল।

নিবারণ বাবু স্থির করিয়াছিলেন, ধীরে-সুস্থে মালতীকে

ডাকিবেন, ততোধিক শাস্ত্র ভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন যে, মেয়েমানুষের পক্ষে সংখ্যম বস্তুটার কতখানি প্রয়োজন। বাহিরের ছজুগে এমন বিপজ্জনক ভাবে মাতামাতি করাটা অশোভন। কিন্তু তাঁহার 'প্ল্যান' পর্য্যদন্ত করিয়া কক্ষান্তরে নিস্তারিণীর তীব্র কণ্ঠ ঝঙ্কত হইয়া উঠিল,—হ্যাঁ লা, তোর কাণ্ডকারখানা দেখে দিন দিন যে পেটের ভিতর হাত-পা চুকে যাচ্ছে! বাপ আরও আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি একেবারে খেয়েছে, নহিলে মেয়েমানুষের এত সাহস, এত বাড়। ওরে আমার বাপ-সোহাগী মেয়ে!

মালতী মায়ের তিরস্কারে বিব্রত হইয়া বলিতেছে,—মা, দোহাই তোমার, একটু চুপ কর। এখনই পাঁচটা চুম্বাশিশে কোরক বাবুর আসবার কথা আছে, পাঁচটা চল্লিশ হ'য়েছে; যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি এসে প'ড়তে পারেন। তখন কি যে ভাববেন তিনি, বলো দিকি!

অগ্নিতে ঘুতাহুতি পড়িলে যেমন দুর্কীর হইয়া উঠে, তেমনি প্রজ্বলিত কণ্ঠে নিস্তারিণী কহিলেন,—রেখে দে ওসব বক্তিমের! কোরক বাবুই বা কে, আর কুসুম বাবুই বা কে? হিঁদু-ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মেচিস, চাল-চলন শিখলিনে? শুধু ছ'পাতা পড়তে-শিখলেই সব শেখা হয় না। এটুকু মনে রাখিস।

মালতী অহুনের কণ্ঠে কহিল,—দোহাই তোমার, অমন করে চঁচিও না, মা! কোরক বাবু বাড়ী চুকে যদি শুনতে পান, ব্যথা পাবেন।

কিন্তু নিস্তারিণীর খামিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। নিবারণ বাবু যে ঘরে বসিয়া ছিলেন, মালতী সেই ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার কাছে গিয়া কহিল,—বাবা মাধ্যমিক-শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে সভা হবে। আমার বন্ধু কোরক দাস অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। আমাকে যাবার জন্তে এবং কিছু বলবার জন্তে তিনি সনির্বন্ধ অহুরোধ ক'রেছেন। সভাটা আমরা ক'জনে মিলেই এক রকম অরগ্যানাইজ করেছি। কিন্তু মায়ের এ কি রকম হীন সন্দেহ বহুন তো!

নিবারণ বাবু কহিলেন,—কই এ বিষয়ে আমাদের আগে কিছু বলোনি তো? যাবে বলে আমাদের অহুমতিও নাও-নি। তোমার মায়ের অবশ্য মেজাজটা

তেমন ঠাণ্ডা নয়, এবং বক্তব্য বিষয়টাও বেশ সভ্য ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে ব'লতে পারেন না। কিন্তু তিনি যা ব'লতে চাইছেন, মোটের উপর তা ঠিক। তা'ছাড়া, তোমরা এখন ছাত্র-ছাত্রী, একান্ত নির্ভার সঙ্গে জ্ঞানের তপস্শায় নিযুক্ত থাকবে। তোমাদের এ সব পলিটিক্যাল এজিটেশনে যাবার দরকার? সভা-সমিতি এবং এ-ধরনের অনর্থক ছজুক ছেড়ে দাও।

—বাঃ, আপনি যে কথা বলেন বাবা, তার মানে খুঁজে পাইনে! লেখাপড়া মানে কি শুধু ডিগ্রী নেওয়া? লাইফটা একটু দেখবো না? সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনে, যেখানে যা কিছু অবিচার এবং অত্যাচার হচ্ছে—আমরা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে তার প্রতীকার চেষ্টা করবো না?

নিবারণ বাবু মেয়ের উত্তেজিত উক্তি শুনিয়া কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, বাহিরের বারান্দায় দুই জন বাবু আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা দিদিমণির দর্শনপ্রার্থী।

এলো খোঁপাটার হাত দিয়া একটু ঠিক করিয়া লইয়া মালতী অহুযোগের সুরে কহিল,—নিশ্চয় কোরক বাবুরাই এসে প'ড়েছেন। মা যে কি রকম গোলমাল সুরু ক'রলেন, না হলো আমার চুল বাঁধা, না হলো তৈয়েরী হ'য়ে নেওয়া। ওঁদের সঙ্গেই আমার মিটিংয়ে যাবার কথা। কে জানে ওঁরা কি ভাববেন!

নিবারণ বাবু গড়গড়ায় দুই একটা টান দিয়া কহিলেন,—আচ্ছা যাও, তুমি তৈয়েরী হ'য়ে নাও গে। আমি ততক্ষণ ওঁদের সঙ্গে আলাপ করছি।—অতঃপর তিনি চাকরটাকে আদেশ দিলেন,—যা, বাবু ছ'টিকে এই ঘরে নিয়ে আয়।

তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার বন্ধুদের অভ্যর্থনার ভার পিতার উপর সমর্পণ করিয়াই মালতী সভাস্থলে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে দুই জন আগন্তুক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এক জনের শ্রামবর্ণ রঙ, চোখে চশমা, রোগা ছিপ্‌ছিপে গড়ন। অপর ব্যক্তি উজ্জল গৌরবর্ণ, বেশ মোটা-সোটা। উভয়েরই বেশভূষা—পায়ের শ্লিপারটি হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ের চাদর জড়াইবার ভঙ্গিটুকু অবধি নিখুঁত,—অত্যন্ত আধুনিক।

—নমস্কার! মালতী দেবীর পিতার সঙ্গে আলাপ

করবার সৌভাগ্যলাভে আমরা ধন্ত হলেম। এ ভাগ্য তো আগে হয়নি।—শ্রামবর্ণের ভঙ্গলোকটি মিহি ও মিষ্ট সুরে এ-কথা কহিলেন। একটু কাশিয়া পুনরায় বলিলেন,—আমাদের সভার কথা বোধ হয়, মালতী দেবীর কাছে শুনে থাকবেন। আমারই নাম কোরক দাস। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হবার শুরু দায়িত্ব-ভার আমারই অযোগ্য স্বন্ধে পড়েছে। এ ভার নিতে আমি সাহসী হতেম না—যদি না আমার এই পরম বন্ধু শ্রীযুত স্মৃজিত চক্রবর্তী এফ, আর, সি, এস (লণ্ডন), এল, এম, এফ, (এডিনবারা) আর মালতী দেবী—এঁরা দু'জনে আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেন। শুধু সাহায্য নয়, সর্ব্বরকমে সহযোগিতা করতেও।

স্মৃজিত চক্রবর্তী পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া ঈষৎ বিনয় সহকারে হাসিয়া বলিলেন,—না না, কি সব যে বাড়িয়ে বলো তার ঠিক নেই। এই নিন না আমার কার্ড।—তিনি সোনালী হরফে ছাপা একখানা দামী পুরু কার্ড বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। নিবারণ বাবু কার্ডখানা তুলিয়া দেখিলেন, নামের পশ্চাতে বিস্তর উপাধির হরফ গাঁথা আছে! কোনটা লণ্ডন, কোনটা গ্লাসগো, কোনটা এডিনবারা, কোনটা ক্যান্টাব।—দেখিয়া বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তাঁহার মনটা ভরিয়া উঠিল।

কোরক দাস বলিলেন,—শুঁর এত ডিগ্রী যে, সব ক'টা আমার মনেও থাকে না ছাই! যে কয়েকটা মনে থাকে, তাও আমার উল্টো-পাল্টা হয়ে যায়, ব'লবার সময়।

চক্রবর্তী পদবী ঠিক তাঁহাদেরই পাল্টা ঘর। তাহার উপর ছেলেটির রূপ, গুণ এবং বিদ্যার বহর দেখিয়া নিবারণ বাবু মনে মনে একটা অসম্ভব আশা করিয়া অবহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সবিনয়ে নিবারণ বাবু কহিলেন,—আপনার কি করা হয়। নিবাস বোধ করি, এই ক'লকাতা সহরেই?

প্রত্যুত্তরে মুকুন্ডিয়ানার 'হাসি হাসিয়া স্মৃজিত বাবু কহিলেন,—কি করি, সেটা এক কথাতেই অবশ্য বলা যায় না। অনেক কিছু করছি; একটা বিরাট ব্যবসায়ের পরিকল্পনা চলছে। মেয়েদের জন্ত একটা মেটারনিটি-হোম খুলব ভাবছি। পোলট্রির একটা সায়েনটিফিক্

গঠনও মগজের মধ্যে আনাগোনা করছে।—হ্যাঁ, কলকাতাতেই থাকি।

কোরক কহিল,—বুঝছেন না কাণ্ডটা? বাপ রেখে গেছেন অগাধ টাকা। ক'রবার কোন প্রয়োজন তো কিছুই নেই। তবে আমাদের এই পরাধীন দেশ; যাদের শিক্ষা এবং মন আছে, তারা তো কিছু না কিছু না ক'রে থাকতে পারবে না।

কথাবার্তার এই অংশে মালতী ঘরে ঢুকিল। তাহার এলো খোঁপাটা গর্কোদ্ধত বিদ্রোহী নিশানের মত উঁচু হইয়া রহিয়াছে; লাল রেশমের জামা-কাপড়ের নীচে পরাধীনতার বহিঃপ্রাভা গুমরাইয়া মরিতেছে।

—চলুন চলুন, কোরকবাবু, আর সময় নেই। আমার জন্তে এতখানি সময় নষ্ট হ'লো আপনাদের, এতে আমার লজ্জার অবধি নেই, স্মৃজিত বাবু! আসি তাহ'লে বাবা! ফিরতে এই আটটা সাড়ে আটটা হবে আর কি!

মোটরের ষ্টার্টের আওয়াজ পাওয়া গেল, এবং যুহুর্ন্তের মধ্যে ঝড়ের বেগে যেমন করিয়া খড়কুটা উড়িয়া যায়, তেমনই করিয়া তিন জনে উধাও হইয়া গেল।

নিবারণ বাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খানিকটা বিমুচের মত বসিয়া রহিলেন।

২

এখন আর বেশী তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয় না, নিস্তারিণী কোন কথা বলিতে গেলেই মালতী সদর্পে বলে,—কেন, দেশের কাজে নেমেছি, কিছু অগ্রায় করেছি না কি? বাবা মত দিয়েছেন, তিনি আনন্দের সঙ্গে আমাদের সমর্থন করেন, জানো?

সেদিন প্রকাণ্ড এক অভিনন্দন-পত্রে স্মৃজিত ও মালতীর নাম একত্রে প্রকাশিত হইয়া ছাপা হইল এবং বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরিত হইল। নিবারণ বাবুও এক কাপি পাইলেন। মাতৃমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্মৃজিত চক্রবর্তীর অর্থ, হৃদয়, এবং উদারতার সহিত মালতী দেবীর কৰ্ম্মপ্রেরণা যুক্ত না হইলে এত বড় একটা বিরাট কল্পনা বাস্তবে রূপ পাইত কি না সন্দেহ। নারীর প্রেরণা যে যুগে যুগে পুরুষকে শক্তি দিয়াছে এবং পথ দেখাইয়াছে, তাহারই কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া-দিয়া মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন-দিবসে তাঁহাদের উপস্থিতি একান্ত

প্রার্থনীয় এই কথাটি ঘোষিত করিয়া অভিনন্দন ধামিয়াছে। কিন্তু নিবারণ বাবুর চিন্ততলে যে লোভ এবং চুশ্চিস্তার মন্বন একই সঙ্গে চলিয়াছিল, তাহা খামিল না, বরঞ্চ আরও বাড়িয়া গেল। স্মৃজিতের সঙ্গে মেলা-মেশা করা তিনি খুব জোরের সঙ্গে বারণও করিতে পারেন না। যদি স্মৃজিতের পছন্দ হইয়া যায়, তবে মেয়ের জন্ত এত বড় সুপাত্র পণ দিয়া কিনিবার চুরাশা তাঁহার বিনা আয়াসেই পূর্ণ হইয়া যায়। কারণ, স্মৃজিত অবিবাহিত এবং ঠিক তাঁহাদেরই করণীয় ঘর। অথচ এই অব্যাহিত মেলামেশার নিদারুণ ভীতিও তাঁহার মনে সময় সময় খুব প্রবল হইয়া দাঁড়ায়।

‘মাতৃমঙ্গল সমিতি’র উদ্বোধন সারিয়া সেদিন রাত্রি প্রায় ন’টার সময় মালতী গৃহে ফিরিল, স্মৃজিত সঙ্গে আসিয়া-ছিলেন পৌছাইয়া দিতে। নিবারণ বাবু অন্ধকার বারান্দায় উদ্ভিন্নভাবে পায়চারি করিতেছিলেন। মোটর আসিয়া খামিল, স্মৃজিতসহ মালতী নামিয়া গেট ও কম্পাউণ্ড পার হইয়া বারান্দায় উঠিল। নমস্কার ও বিদায় সম্ভাষণাদি সারিয়া মালতী গৃহে প্রবেশ করিল। স্মৃজিত ফিরিয়া যাইতেছিলেন; নিবারণ বাবু ডাকিলেন,—স্মৃজিত বাবু, যদি বিশেষ তাড়া না থাকে, তবে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

স্মৃজিত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া নিবারণ বাবু সুস্পষ্ট স্বরে কহিলেন,—মালতী আপনার সঙ্গে যে পরিমাণে মেশামেশি করছে, এতে আমাদের সমাজে কথা উঠেছে; জানেন তো আমাদের হিন্দু সমাজ। আপনার কি এটা অনুচিত বোধ হয় না?

স্মৃজিত গাঢ়স্বরে কহিলেন,—আমি জানতেম না, মালতী দেবী আমার জন্তে ক্লেশ সহ করছেন, এ কল্পনাও অসহ! কিন্তু তবু এইটুকু বিশ্বাস আমার উপর রাখবেন, আমার দ্বারা তাঁর প্রতি কখনো অশ্রায় হবে না। আমাকে আপনি বলবেন না, লজ্জা লাগে ভারী। আমি তো আপনার ছেলের মতো।

স্মৃজিত বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেও নিবারণ বাবু আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া সেই অন্ধকার বারান্দায় অনেকক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিলেন। আজই সকাল বেলায় মালতীর জন্ত একটা সঙ্কল লইয়া তাঁহার এক আত্মীয় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ছেলেটি

কাঞ্চনপুরের ওদিককার ছোটখাট জমীদার। অল্প সব দিকেই ভালো, তবে পাড়ারগায়ে বাড়ী। নিবারণ বাবু শুনিয়া তখনই তখনই হাঁ, না কিছুই বলেন নাই। এখন স্থির করিলেন, কাল সকালেই স্পষ্টাকরে না বলিয়া দিবেন। স্মৃজিত আজ তো ভাবে-ভঙ্গীতে এক রকম বলিয়াই ফেলিল। যখন অন্তঃপুরে ঢুকিয়া মালতীকে সঙ্গে লইয়া একত্রে খাইতে বসিলেন, দীপের আলোয় কণ্ঠার মুখের দিকে চাহিয়া অনেক দিন পর স্নেহে তাঁহার মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এক সময়ে বলিয়াও ফেলিলেন,—স্মৃজিত তোকে কিছু বলছে না কি মা?

মালতী অকস্মাৎ লজ্জায় রাজিয়া উঠিল। তাঁহার দৃষ্ট্য তেজস্বিনী সভানেত্রী মেয়ের মুখের এই সলজ্জ আভাটুকু নিবারণ বাবুর যৎপরোনাস্তি ভালো লাগিল। মালতী অর্ধক্ষুণ্ট কণ্ঠে কোন মতে কহিল,—তিনি বলেন, এত দিন পড়লাম, পরীক্ষার আর তো বেশী দেবী নেই... বাকীটা আর সে বলিতে পারিল না; কিন্তু বলিবার দরকারও হইল না। নিবারণ বাবু ইচ্ছিতেই বুঝিলেন, বুঝিয়া মনে মনে উদার হাস্য করিয়া বলিলেন,—তাই বটে! তাই সে আজ নিন্দার কথা শুনে অমন ক’রে ভেঙ্গে পড়বার মতো হ’লো। সেই জন্তেই সভাসমিতির নাম ক’রে এত মেলামেশা করে। আজকাল মন জানা জানি, ছ’পক্ষের পছন্দ—এগুলো হ’বার একটা উপলক্ষ তো চাই-ই। তাতে দোষ ধ’রলে চলবে কেন? কোরক দাসের সঙ্গে এতটা মেশামেশি করিলে অবশ্যই তিনি মুন্সিলে পড়িতেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা নয়।

সেদিন রাত্রিতে নিস্তারিণী যখন রান্নাঘরের যাবতীয় কাজ সারিয়া অধিক রাত্রিতে শয়ন-কক্ষে আসিলেন, তখন নিবারণ বাবু সগর্বে স্ত্রীকে কহিলেন,—এই দেখ, আমার কাজের এত যে সমালোচনা করতে, আজ তার ফল দেখ। নিজেদের অবস্থার মধ্যে স্মৃজিতের মত ছেলেকে জামাই করবার চুরাশা কখনো পূর্ণ হতো কি? এখন সেই স্মৃজিত নিজেই প্রস্তাব ক’রেছে—সামনের মাসে বি, এ পরীক্ষাটা চুকে গেলেই...বিলেত থেকে ক’টা পাশ করে এসেছে জানো? তা ছাড়া চৌরঙ্গীতে ছ’খানা, বালীগঞ্জ পঁচখানা, এসপ্লেনেডেও তিনখানা বাড়ী। টাকার কথা না বললেও বুঝতে পারবে। মাথার উপর বাপ অভিভাবক

নেই যে, রক্ত চক্ষু ক'রে বলবে, দশ হাজার চাই, বিশ হাজার চাই। নিজে দেখে মেয়ে পছন্দ ক'রচে কি না!

নিস্তারিণীকে স্তম্ভিত এবং বিশ্বয়ে হতবাক করিয়া-
দিয়া নিবারণ বাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। পাশের
ঘরে মালতীর 'ষ্টাডি'তে তখনও আলো জলিতেছিল।
বি, এ পরীক্ষার পড়া, তা'ছাড়াও কত কল্পনা, কত মধুর
স্বপ্ন, রোমান্স...যুম যেন চোখে আসিতেই চায় না।

৩

প্রায় দিন পনেরো হইল মালতীর পরীক্ষা শেষ হইয়া
গেছে। আজকাল সে অধিকাংশ সময় ঘরেই থাকে,
সভাসমিতির হুজুগে মাতিবার ততটা যেন আর আগ্রহ
নাই। স্তম্ভিতের দামী মোটরখানাও যখন তখন আর
ছুরারে আসিয়া দাঁড়ায় না। নিবারণ বাবু তাহার সহিত
দেখা করিয়া কথাটা পাকাপাকি করিবার জন্ত ভিতরে
ভিতরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিন হঠাৎ
তাঁহার মনে হইল,—তাই তো, তাঁহাকেই তো কথাটা
পাড়িতে হইবে! স্তম্ভিত কি নিজে নির্লজ্জের মত
আগে প্রস্তাব তুলিতে পারে? আর হাজার আধুনিক
হোক, এই লজ্জাতেই বোধ করি, এখানে আজ কাল বড়
আসা-যাওয়া করে না।

স্তম্ভিতের বাড়ীর নম্বরটা তাঁহার মনেই ছিল। কিছু-
ক্ষণ পরে প্রাসাদতুল্য এক বাড়ীর স্তম্ভিতের দাঁড়াইয়া সজ্জমে
আনন্দে যখন তাঁহার মনটা ভরিয়া উঠিয়াছে, সেই
সময় একখানা মোটর সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।
স্তম্ভিত নামিলেন; গাড়ীর ভিতর আরও জন-দুই স্তম্ভিতের
তরুণী মহিলা ছিলেন। তাঁহাদের স্তম্ভিতের হাতে বিদায়-
সম্ভাষণ করিয়া গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতেই,
মোটর চলিয়া গেল। তখন এই দিকে ফিরিয়া নিবারণ
বাবুর সহিত চোখোচোখি হইতে স্তম্ভিত যেন একটু
বিস্মত, একটু অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন। নমস্কার করিয়া
খাপছাড়া ভাবে কহিলেন,—ঔঁরা আমার বান্ধবী।—
আপনি এদিকে বিশেষ কোন কাজে এসেছিলেন বুঝি?

—না বাবা, তোমার কাছেই এসেছিলাম। একটা
কথা ছিল।

আচ্ছা তা'হলে ভিতরে আসুন—স্তম্ভিত নীরস স্বরে
কহিলেন।

বৈঠকখানা-ঘরের পাশে ছোট একটা ঘরে নিবারণ
বাবুকে বসাইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ
মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—আঃ, যা গরম প'ড়েচে।
সারা দিন-রাত্রি মাথার উপর পাখা ঘুরচে তবু টিকতে
পারচিনে। মনে করচি, কাল পরশুর মধ্যেই দার্জিলিং
চ'লে যাব। আর দেবী নয়।

নিবারণ বাবু কহিলেন,—মালতী মায়ের তো পরীক্ষা
শেষ হ'য়ে গেল। তবে কি দার্জিলিং থেকে ফিরে
এসেই শুভ কাজটা হবে বাবা?

স্তম্ভিত কহিলেন,—আপনি দেখুচি বরাবরই ভুল
বুঝছেন। মালতী দেবী আমার বান্ধবী। বান্ধবীর পবিত্র
সম্বন্ধকে আপনি বিকৃত ক'রে দেখছেন। অবশ্য সাময়িক
মানসিক আবেগে আমি মাঝখানে অল্প রকম একটু ভেবে-
ছিলুম; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' বইটি সম্প্রতি
আর একবার যত্ন ক'রে পড়ে ও-ভুল আমার ভেঙ্গেচে।
মালতী দেবী চির দিনই আমার বান্ধবী থাকুন। তিনি যেন
ঐ উদার অসীম আকাশ! গভীর মধ্যে টেনে এনে তাঁর
আমি অপমান করতে চাইনে। সত্যি, আইডিয়াটি কত
চমৎকার! মার্ভেলাস!!—হাতের কব্জি-ঘড়ির দিকে
চাহিয়া স্তম্ভিত একটুখানি ধামিয়া পুনশ্চ কহিলেন,—প্রায়
সাড়ে সাতটা বাজে। আমাকে আবার একবার মার্কেটে
বেকতে হবে—কয়েকটা অতি দরকারী জিনিষপত্র কিনতে।
মনে করচি, কালই দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি।
কলকাতায় এই গরমে আর একটা দিনও বাস করতে
হ'লে মরে যাব। মালতী দেবী কিছুতেই ভুল বুঝবেন
না। বন্ধুর দরদ, বন্ধুর প্রীতির পরে তাঁর করুণ দৃষ্টি
আছে। এই যে আমাদের কোরকেরও তিনি বান্ধবী।
তাঁরই প্রেরণাতে কত মহৎ কাজ, কত মহত্তর আইডিয়া
বাস্তবে পেয়েছে রূপ। বান্ধবীকে আমার প্রাণের অকৃত্রিম
শ্রদ্ধা জানাবেন। হয় তো দেখা হবে না আর বহু দিন।
দার্জিলিং থেকে এসে আর একবার ঘুরোপ অঞ্চলে
পাড়ি জমাব ভাবচি। আচ্ছা, উঠি তা'হলে নমস্কার!

স্তম্ভিত ড্রাইভারকে গাড়ী বাহির করিতে আদেশ
দিবেন বলিয়া কলিং বেল টিপিলেন। নিবারণ বাবু ছাতিটি
বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীমতী আশালতা সিংহ।

ঐতিহ্যের খণ্ডসংগ্রহ

সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধন

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ ভারতের বড়লাট হইলেন; কিন্তু ভারতে তিনি নূতন নহেন, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে আর্কটের অদূরবর্তী ভেলোর নামক স্থানে মাদ্রাজী ফৌজের চিরাচরিত আচরণে বাধা দান করায় ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেশীয় চতুর্দশ পদাতিক ফৌজের দুই নম্বর পল্টন বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই অবিস্মৃতিকারিতার জন্ত তাহার পব বৎসর (১৮০৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) তিনি মাদ্রাজের গভর্নর পদ হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। কাম্বজীবনের প্রথমার্ধে তাঁহার এইরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়া সহমরণের জায় বহুকালের প্রচলিত ধর্ম-সংক্রান্ত দেশীয় প্রথায় নিজ-দায়িত্বে হস্তক্ষেপ না করাই সঙ্গত মনে করিতে পারিতেন; বিশেষতঃ, 'কোর্ট অফ ডাইরেক্টস' এ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে কড়ব্য-সম্পাদনের নির্দেশ দান করায়, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী বড়লাটগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণে ইহার দায়িত্বভার গ্রহণ না করিলেও পারিতেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এরূপ দৃঢ়তা ছিল যে, তিনি বড়লাট হইয়া এদেশে আসিবার পূর্বেই ষত শীঘ্র সম্ভব সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বড়লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি কোর্ট অফ ডাইরেক্টসের সভাপতি মিঃ অষ্টেলকে বে-সরকারী চিঠি লিখিয়া ঐ প্রথা রহিত করিবার অনুরোধ স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন। সেই পত্রে তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন যে, তিনি এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্ত প্রথমে এ সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অভিমত সংগ্রহ করিবেন; তৎপরে সেই অভিমতগুলি স্বয়ং ধীরভাবে আলোচনা করিয়া স্বীয় কর্তব্য স্থির করিবেন। কিন্তু, সেজন্ত কিঞ্চিৎ বিলম্ব অনিবার্য; এজন্য ইংলণ্ডে ঐ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখিবার জন্ত যেন চেষ্টা করা হয়; নতুবা তাঁহার সঙ্কল্প-সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে।

অনন্তর বহু সামরিক ও অসামরিক রাজকর্মচারীর নিকট তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত সাকুলার প্রেরিত হইল। উহাতে প্রধান জিজ্ঞাস্য এই ছিল যে, আইন-প্রণয়ন দ্বারা সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধন করিলে, সিপাহীদের বিদ্রোহী হইবার আশঙ্কা আছে কি না, এবং অবিলম্বে ঐ প্রথা রহিত করা তাঁহাদের বিবেচনায় সঙ্গত কি না? এই সকল অভিমত সংগ্রহের ও তৎসংক্রান্ত পত্র-ব্যবহার প্রভৃতি কার্যের ভার তিনি তাঁহার সামরিক সেক্রেটারী কাণ্টন বেনসনের হস্তে অপণ করেন। পনের মাসব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে সকলের অভিমত সংগৃহীত হইলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল যে, অধিকাংশ কর্মচারীই সহমরণ-প্রথার আশু ও আমূল বিলোপ-সাধন একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং ইহাতে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়াও তাঁহাদের ধারণা হয় নাই। কোন কোন রাজকর্মচারী তৎপূর্বেই তাঁহাদের যে এলাকার মধ্যে ঐ প্রথার

বিলোপ-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারও দৃষ্টান্ত মিলিল। বিশেষতঃ, অঘোধ্যা-রাজ স্বরাজ্যে সহমরণ-প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। তাছাড়াও রাজা এবং পেশোয়ার স্ব স্ব রাজ্যে এই নৃশংস প্রথার বিলোপ-সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গের বাহিরের দৃষ্টান্ত দ্বারা বঙ্গের, বিশেষতঃ কলিকাতার, অবস্থা বিচার্য্য নহে; কারণ, নানা বিষয়ে কলিকাতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই সকল বিষয়ের প্রসঙ্গে নিম্নপ্রদেশের (Lower Province) পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ওয়ালটার ইউয়ার লিখিলেন, অগ্ন্যস্ত স্থানের হিন্দুরা সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধনে বিচলিত হইবে না বটে, কিন্তু বাবতায় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-সমূহ যে স্থানে অবস্থিত, সেই বাজধানী কলিকাতার অধিবাসী হিন্দুরাই, কেবল ইহারই নহে, যে-কোন প্রকার জনহিতকর কার্যের বিরোধিতা করিবে। কাবুলের বৃটিশ দূত সার উইলিয়াম ম্যাকনটেন তাঁহার 'মিনিটে' লিখিলেন, ভারতীয় হিন্দুদের পূর্বকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, তাহারা সহমরণকে যেরূপ বিরাট ধর্ম্মমুগ্ধতা বলিয়াই মনে করুক, উহার বিলোপ-সাধনে বিপদের যৎকিঞ্চিৎ আশঙ্কাও নাই; কারণ, বর্তমান কালের পূর্বে অত্যাচারী মুসলমান নবপতিগণ তাহাদের দেবমন্দির কলুষিত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে, বলপ্রয়োগে হিন্দুদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে, এবং নিশ্চয়মভাবে তাহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছে; কিন্তু হিন্দুরা তাহাদের এই সকল কঠোর অত্যাচার চিরকালই অতি ধীরভাবে সহ্য করিয়াছে। বিশেষতঃ, "...by whom is this barbarous rite chiefly respected? Not by the hardy and warlike Hindoo of the western provinces, but by the sleek and timid inhabitant of Bengal, by the fat and greasy citizen of Calcutta, whose very existence depends on the prosperity of the British Government; by the wealthy native, who will invite Europeans to an entertainment, and sit by with pride and satisfaction while they are feasting on the subject of his worship, the mother of his pantheon..." সুতরাং সরকার নিশ্চয়ই তাহাদের অতীর্ণিত কার্য আরম্ভ করিতে পারেন।

সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধনের সঙ্কল্পে অধিকাংশ পদস্থ রাজকর্মচারীর এইরূপ সমর্থন লাভ করিয়া লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গ মথেষ্ট উৎসাহিত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, এ সম্বন্ধে আর কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া অবিলম্বে এবং প্রয়োজন হইলে দেশবাসিগণের মতের বিরুদ্ধেও, আইন প্রণয়ন দ্বারা এই প্রথা রহিত করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ও তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখের সমাচার-দর্পণ পত্রিকায় "সমাচার-চক্রিকা পত্র হইতে নীত" সংবাদে দেখিতে পাওয়া যায়, "২৭ জুলাই ইণ্ডিএ গেজেট নামক সমাচার পত্রিতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে, গবর্নরমেন্ট

এইক্ষেপে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অসুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন।...” (১) বলা বাহুল্য, উক্ত “এতদেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি”ই রাজা রামমোহন রায়।

যাহা হউক, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেটিক্‌স ‘কোর্ট অফ ডাইরেক্টসের’ চেয়ারম্যানকে লিখিত একখানি ব্যক্তিগত পত্রে গোপনে সকল বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন, তিনি সহমরণ-প্রথার বিলোপ-সাধন সম্বন্ধে সেনাবিভাগের এক জন পদস্থ কর্মচারীর (Adjutant General of the Army) নিকট হইতেও আশ্বাস-বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে সহমরণ-প্রথার নিষেধক আইন-প্রণয়নের বিষয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের তদানিন্তন প্রধান বিচারপতি সার চার্লস এড্‌ওয়ার্ড গ্রেগও পরামর্শ গ্রহণ করা হইল। তিনি এই প্রস্তাবে ব্যক্তিগত ভাবে পূর্ণ সহমুভূতি ও উৎসাহ জ্ঞাপন করিলেন বটে, কিন্তু পূর্বপ্রবর্তিত আইনানুসারে (Act 37, Geo III, Ch 142, Sect 12.) অপরের ধর্মসংস্কারে আঘাত করা যে নিষিদ্ধ, সে বিষয়েও বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সার চার্লস মেটকাল্‌ফ ও মিঃ বাটারওয়ার্থ বেলি তৎকালে গভর্নর জেনারেলের সভায় পারিষদ ছিলেন। ইহারা প্রথমাবধি সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে থাকায় এক্ষণে লর্ড বেটিক্‌সের সহিত এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতে লাগিলেন।

সহমরণ-প্রথার নিষেধক-আইনের মূল মুসাবিদা করিলেন সার চার্লস গ্রে; লর্ড উইলিয়াম বেটিক্‌স কর্তৃক উহা বহুলাংশে সংশোধিত হইবার পর উক্ত আইনানুসারে সমগ্র বঙ্গ প্রদেশে সহমরণ সম্পূর্ণ আইন-বিগর্হিত ও দণ্ডনীয় বলিয়া বিধিবদ্ধ হইল, এবং যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঐ কার্যে কোন প্রকার সহায়তা করিবে, তাহারাও নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া লিখিত হইল। নূতন আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অর্থের অপবোধপ্রযুক্ত প্রদেশের জনসমাজে যাহাতে কোন প্রকার বিক্ষোভের উৎপত্তি না হয়, তজ্জন্য স্থির হইল যে, আইনের মূলধারাটি ইংরেজী ভাষাতেই প্রণয়ন করা হইবে বটে, তথাপি তৎসহ উহার একটি বাঙ্গালা অনুবাদও সংযোজিত করা বিধেয়। সুতরাং ভারত সরকারের তদানিন্তন সেক্রেটারী মিঃ হেনরী শেক্সপীয়ার আইনের খসড়াটি এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত খ্যাতনামা খৃষ্টান মিশনারী রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরীর নিকট প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাশ্রয় কেরী উহা প্রাপ্তিমাত্রই তাঁহার পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার উভয়েই ঐ কার্যে প্রবৃত্ত রহিলেন। এইরূপে উভয়েরই সম্মিলিত চেষ্টায় সেই দিনই আইনটি বঙ্গভাষায় অনুদিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত অজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত “সংবাদ-পত্রে সে কালের কথা,” দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৪ অর্থাৎ পর এই গ্রন্থ “সংবাদপত্র” নামে উল্লিখিত হইবে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর বঙ্গপ্রদেশে সহমরণ নিষেধক আইনের স্বরণীয় ধারা বিধিবদ্ধ হইলে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেটিক্‌স কোর্ট অফ ডাইরেক্টসকে সকল বিষয় অবিলম্বেই জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপে উইলিয়াম কেরী-প্রমুখ সহায় মিশনারীদিগের প্রথম প্রচেষ্টা, লর্ড হেষ্টিংস, লর্ড আমহার্ট প্রভৃতি বড়লাটদিগের সদিচ্ছা, রাজা রামমোহন রায়, কলিকাতার অভিজাতবর্গের শীর্ষস্থানীয় ষারকানাথ ঠাকুর (কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের পিতামহ) প্রভৃতি বাঙ্গালী সমাজ-সংস্কারকদিগের সহযোগিতা ও লর্ড বেটিক্‌সের সংসাহসের ফলে বহুকালের প্রচলিত নৃশংস সহমরণ-প্রথা বঙ্গ প্রদেশে আইন-বিগর্হিত বলিয়া ঘোষিত হইল।

বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার রক্ষণশীল সম্প্রদায় ইহাতে ভাষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি সমাজপতির রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্র ‘সমাচার-চন্দ্রিকার’ মধ্যবর্তিতায় ও সভাসমিতির সাহায্যে নব প্রবর্তিত আইন বাতিল কারবার উদ্দেশ্যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া মহা উৎসাহে তাহা পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এবং সহমরণ-প্রথার সমর্থনসূচক দুইখানি আরজী ও তৎসহ উহার অসুস্থ শাস্ত্রোক্ত-সম্বলিত দুইখানি ব্যবস্থাপত্র অবিলম্বে বড়লাট লর্ড বেটিক্‌সের নিকট প্রেরণ করিলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখের ‘সমাচার-দর্পণ’ পাঠে জানিতে পারা যায়, “গবর্নমেন্টে যে দুই আরজী ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে ১১৪৬ জন স্বাক্ষর করিয়াছেন তন্মধ্যে কলিকাতাদিগের এক আরজীতে ৬৫২ জন বিষয়ি ভ্রাতৃলোক স্বাক্ষর করেন এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে ১২০ জন পণ্ডিত অধ্যাপক স্বাক্ষর করেন কলিকাতার নিকট বেলঘারিয়া আড়িয়াদহ প্রভৃতি গ্রামবাসিদিগের এক আরজী তাহাতে ৩৪৬ জন বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষর আছে এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র তাহাতে ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর হয়।” (২) এই সকল স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রামকমল সেন, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবকৃষ্ণ মহারাজ, বাহাদুর, রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ মহারাজা বাহাদুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র মহারাজা বাহাদুর, (নদীয়া) মতিলাল শীল প্রভৃতির নাম ছিল। দেওয়ান রামকমল সেন (কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ) কয়েক বৎসর পূর্বে সহমরণ প্রথার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি স্বয়ং কেবল রাধাকান্ত দেবের দলে যোগদান করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, হিন্দু কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় ও সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব থাকায় তিনি ঐ কলেজের পণ্ডিতদিগকেও নিজেদের দলভুক্ত করিয়াছিলেন। “ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ মহাশয়-দিগের অনুমত্যানুসারে কলিকাতা নগরে সমাচার-চন্দ্রিকা যন্ত্রে” শকাব্দা ১৭৫২ সন ১২৩৭এ বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত এই আরজী, ব্যবস্থাপত্র ও লর্ড বেটিক্‌সের উত্তর সম্বলিত একটি পুস্তিকা রাজা রাধাকান্ত দেবের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত থাকায় পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত সেই পুস্তিকা হইতে ঐ দীর্ঘ আরজী ও তাহার উত্তর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

১। “সংবাদপত্র,” প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩

শ্রীশ্রীহুর্গা

জয়তি ।

মহামহিম শ্রীযুক্ত লর্ড কেবিনেটস বেটিক গবরনর

জেনাবেল বাহাদুর সমীপেষু ।

আমরা শুনিয়াছি যে, কলিকাতানিবাসি কএকজন লোক হিন্দুরদিগের ব্যবস্থা ও বোধ নিবেদন করিবার ভাব লইয়া ঐ সকল ব্যবস্থা ও বোধের বিপরীত নিবেদন করিয়াছেন এবং আপনি কোন সালের বৈঠকে এমত মিথ্যা কথায় সতী হওনের ব্যবস্থা নিবারণ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতে উত্তত আছেন এ নিমিত্তে আমরা স্বাক্ষর করিয়া সন্ত্রমপূর্বক এই নিবেদন পত্র প্রদান করিতেছি হিন্দু ধর্মকর্মের উপর হস্ত নিক্ষেপকরণে আমরা তন্নিবারণে ব্যগ্রতা করিতেছি এবং অতিশয় ভীত হইয়াছি।..... এ বিধি সেই সকল হিন্দুর দ্বারা প্রচার হইয়াছে যাহারা তাহারদিগের পূর্বপুরুষের ধর্ম হইতে বিমুগ্ধ হইয়া ইউরোপীয় লোকের সমভিব্যাহারে নিষিদ্ধ আচরণ পান দ্বারা আপনারদিগকে নষ্ট করিয়াছে এবং সতী ব্যবহারের বিষয়ে কোন শাস্ত্র নাই ইহা কহিয়া তোমাকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিতেছে.....আমরা আরো নিবেদন করি যে, পূর্বে ইহাব অনু-সন্ধান কোন ২ অতিপণ্ডিত ও ধর্মিষ্ঠ কোম্পানির কর্মকারী সাহেবেরা করিয়াছেন যাহারদিগকে তাহারদিগের অধীন হিন্দুরা অত্যাধি মর্ষাদাপূর্বক স্মরণ করিতেছেন.....উপযুক্ত ধাৰা যাহা প্রচলিত হইতেছে ইহাতে মানস সিদ্ধ হয় নাই এবং এই প্রমাণ হইয়াছে যে ধর্ম বিষয়ে কোন ক্রমে হাত দেওয়া অতি অনীতি।... পূর্বোক্ত জনেরদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অতি জ্ঞানবান রাজ-কার্যের ভার নির্বাহ করিয়াছেন তাহারদিগের দ্বারা আমরাদিগের ধর্ম কখন অতিক্রম হয় নাই এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যৎ-কালে ভূতকালের স্থায় তাহা অলঙ্ঘ্যরূপে রক্ষা পাইবেক যেহেতু সে সকল ভারি জামিন ও গনদের স্থায় আমরা আপন হাকিম হইতে পাইয়াছি যাহার উপর আমরাদিগের ধন প্রাণাপেক্ষা আমরাদিগের অতি পবিত্র ধর্মের নির্ভর। আর আমরা সত্য কহিতেছি যে আপনি কোনসালের বৈঠকে এই আবশ্যিক বিষয় মনোযোগ পূর্বক বিবেচনা করিলে ভাবনা ও ভয়ের সহিত যে চিন্তা আমরাদিগের ও কোম্পানি বাহাদুরের সমস্ত শিষ্ট ধর্মিষ্ঠ হিন্দু প্রজাবর্গের মনে হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ হইবেক আর আপনকার সঙ্ঘবিবেচনা দ্বারা এই মত আর কোন বিষয়ে আক্রমণ হইতে আমরা চিরকাল রক্ষা পাইব ইতি।—আরজী সমাপ্ত।

আরজীর উত্তর।

শ্রীযুত এই উত্তর করিলেন যে আমার নিকটে যে দবখাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিয়াছি হিন্দুর-দিগের ধর্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবারদিগের আত্মঘাত বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই কিন্তু স্বামির মরণানন্তর তাহারদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কালযাপন করা সর্বশাস্ত্র সিদ্ধ বটে...অতএব হিন্দুর-দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির এমত জুরবস্থা হয় নাই যে গবরনমেণ্টের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয় কি আপনারদিগের শাস্ত্রের ব্যবস্থালঙ্ঘন করিতে হয় যেহেতুক বিধবারদিগের ব্রহ্মচর্য্যত্রত গ্রহণ করাতে এককালে গবরনমেণ্টের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় এবং স্বধর্মের মুখ্য কল ও প্রতিপালন করা হয়...ধর্মের বিষয়ে হিন্দুরদিগের বাদচ্ছিকায়সারে কর্মানুষ্ঠানে ব্রিটিস গবরনমেণ্টে কিছু ব্যাঘাত জন্মাইবেন

না। এবং যুক্তি ও যথার্থের সহিত যে সকল অনুষ্ঠান অবিরুদ্ধ হয় এমত পৌর্কোপার্থ্য ব্যবস্থানুষ্ঠানে তাহারদিগের কিছু প্রতিবন্ধকতা হইবে না ইহা প্রাধিকারিকদিগের স্থানে পুনরুক্তি করণের কোন আবশ্যক নাই কিন্তু সেই সকল ব্যবহারের মধ্যে কতিপয় ব্যবহার শ্রীশ্রীযুতের পূর্বপদস্থেরা মনুষ্যেরদিগের জীবন সংরক্ষণার্থে এবং সম্বন্ধের পারিপাট্য করণার্থে সমন্বয়ক্রমে তাহা রহিত করণের আবশ্যক বুঝিয়াছেন...

...শ্রীশ্রীযুত অতি সম্মানিত বহুসংখ্যক প্রার্থনাকারিকদিগের প্রার্থনা অতিশয় মনোযোগপূর্বক অবধান করিয়াছেন এবং প্রার্থিত ব্যবহার ব্রিটিস গবরনমেণ্ট যে ২ বিবেচনাপূর্বক রহিত করণের আবশ্যক দেখিয়াছেন, তদতিরিক্তে শ্রীশ্রীযুত আপনার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছেন কিন্তু যদি প্রাধিকারিকরা তথাচ এমত বোধ করেন যে শেষ প্রকাশিত আইন পার্লামেন্টের ব্যবস্থা বিরুদ্ধ তবে তাহার শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ড রাজ্যে কোনসালে আপীল করুন এবং শ্রীশ্রীযুত তাহা তথা প্রেরণ করিতে অতিশয় সঙ্কট হইবেন।

১৪ জানেওয়ারি

১৮৩০ সাল

ডবলিউ. সি. বেটিক।

(signed) W. C. Bentinck.

রামমোহন রায়ও কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতিব সহযোগিতায় সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির সাহায্যে সহমরণ-নিষেধক আইনের সম্মত করিতে লাগিলেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায়েব আন্দোলন দর্শনে দেশীয় জনসাধারণের মনোভাবের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া সরকার যাহাতে ভীত না হন এবং উক্ত আইন প্রণয়ন বিষয়ে বঙ্গীয় উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের যে পূর্ণ সমর্থন আছে, তাহার প্রমাণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দুই দিন পরেই ১৬ই জানুয়ারী তারিখে রামমোহনের উৎসাহে ও আগ্রহে “কলিকাতা নগরস্থায়ি এবং তন্নিবাসি গ্রামনিবাসিরা...হিন্দু স্ত্রী পত্নীর জীবন রক্ষার নিমিত্ত... মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড উলিএম কেবিনেটস বেটিক গবরনর জনরেল বাহাদুর ইন কোনসেল... ইদানীন্তন যে উপায়ে নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্বক স্ত্রী-বধ কলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারী রূপ ও হুর্গাম হইতে চিরকাল জন্ত এ শরণাগত প্রজারদিগকে মোচন করিতে যে ককণায়ুক্ত হইয়া যে স্মৃতিস্তম্ভ করিয়াছেন সেই পরমোপকারের পুনঃ ২ স্বীকার নম্রতাপূর্বক” (৩) বঙ্গভাষায় লিখিত একখানি মানপত্র প্রদান করিলেন। বহু স্বাক্ষরিত এই মানপত্রটি গবরনমেণ্ট হাউসে বড়লাট লড বেটিকিংয়ের সম্মুখে টাকীব জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী কর্তৃক পঠিত হয়; পরে হরিহর দত্ত উহার ইংরেজী অনুবাদও পাঠ করেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা দুইটি মানপত্রই রামমোহনের রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত মানপত্র পাঠের সময়ে রামমোহন রায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু অনিবার্য কারণে দ্বারকানাথ ঠাকুর উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উক্ত দুইখানি মানপত্রই ১৮ই জানুয়ারী তারিখের গবরনমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হয়।

পরদিনই অর্থাৎ “৫ মাঘ ১৭ জানুয়ারি রবিবার সংস্কৃত কলেজে কলিকাতাস্থ হিন্দু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরদিগের এক সভা হইয়াছিল।” রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণই অবশ্য এই ‘ধর্মসভা

৩। “সংবাদপত্র,” প্রথম পৃষ্ঠা, পৃ: ২২০

আহ্বানে অগ্রণী ছিলেন। “এই ধর্মসভার তাৎপর্য হিন্দুশাস্ত্র বিহিত ধর্ম কৰ্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদনপত্রাদি রাজ-সম্মিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন-ইত্যাদি।” (৭) লর্ড বেঙ্টিঙ্কের ১৪ই জানুয়ারী তাবিখের আরজীব উত্তর রাধাকান্ত দেব কর্তৃক সভামধ্যে পঠিত হইলে স্থির হইল “সতী বিষয়ে বিলাতে আপীল করা কর্তব্য।” “বিলাতে যে আরজী দেওয়া বাইবেক” উহা “কি রীতক্রম প্রস্তুত করিতে হইবেক” তাহা স্থির করিবার জগ্ন রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, বাপাকান্ত দেব, তাবিনীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ সরকার, গোকুলনাথ মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও নীলমণি দে, এই বার জন “বিবেচক” ও ভবানীচরণ কৰ্ম-নির্বাহক মনোনীত হইলেন। অনন্তর ধর্মসভার অধিবেশনের জগ্ন একটি নিজস্ব বাটা নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব হইলে সভারা তত্ক্ষণে সেই দিনই ১১,২৩০০ টাকা চাঁদা দানেব লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন। (৫) এইরূপে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দুরা রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণের নেতৃত্বে সম্ভব হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎপূর্বেই একেশ্বরবাদী রামমোহন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়া সহকর্মীদের স্বেচ্ছায় দলপৃষ্টি করিতেছিলেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁহার উদার মতবাদ, বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও সর্বোপরি তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া জনসাধারণ দলে দলে তাঁহাকে নেতৃত্ব-পদে বরণ করিতেছিল। বিশেষতঃ, ডিরোজির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু যুবক তখন সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া উদার দৃষ্টিতে সকলই দেখিতে শিখিয়াছে; যুক্তির নিরিখে যাচাই না করিয়া কোন বিষয় মানিয়া লইতে আর তাহারা সম্মত নহে; বস্তু তখন নব যুগ আসিয়াছে। রামমোহনের উদার মতবাদ স্বভাবতই সেই সকল নব্য যুবকদিগের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহারাও অনেকে রামমোহনের নেতৃত্বে সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আবিস্কার করিল। বস্তুতঃ, ডিরোজির শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী রামমোহনের অগ্ৰতম ভক্ত হইলেন, ও ব্রহ্মসভা স্থাপিত হইলে তিনি উহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

এ যাবৎ রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রহ্ম সমাজের কোন স্থায়ী গৃহ ছিল না। ধর্মসভা স্থাপিত হইবার মাত্র ছয় দিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে চিংপুং রোডের নবকীর্ত বাটাতে ব্রহ্মসমাজের দ্বারোদ্ঘাটন হইল। দুই বিরুদ্ধ দল তুমুল আন্দোলনে যোগদান করিল। জনসাধারণের মধ্যেও এই উদ্দীপনা পরিব্যাপ্ত হইল। “সম্বাদ-কৌমুদী” নামক পত্রিকা-সম্পাদনে ভবানীচরণ এক সময়ে রামমোহনের সহযোগী ছিলেন। কিন্তু রামমোহন এই সংবাদপত্রের মধ্যবর্তিতায় সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিতেই ভবানীচরণ উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বয়ং “সমাচার-চন্দ্রিকা” সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ‘সমাচার-চন্দ্রিকা’ নিষ্ঠাবান হিন্দুদের সপ্রশংস সহায়ত্বভূতি অর্জন করিয়াছিল। এখন এই দুই সংবাদপত্র দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মুখপত্ররূপে পরস্পরের প্রতি অসংযত ভাষায়

গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতিকূলে লিখিত শার্ণিত বিদ্রূপ, ছড়া, গান ও কটুক্তি পাঠে পাঠক সাধারণ কৌতুক বোধ করিতে লাগিলেন। (৬) বাজারে, হাটে, স্নানের ঘাটে, চণ্ডীমণ্ডপে, সাধারণের যে কোন মিলনস্থানে, আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা, তর্ক ও বাক্যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ‘সমাচার-দর্পণ’ও এই আন্দোলনে রামমোহনের পক্ষ গ্রহণ করিল। কলিকাতার স্থানীয় এই আন্দোলন দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিল। এই আন্দোলন কেবল সংবাদপত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না, উভয় পক্ষ কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গালায় একাধিক পুস্তিকাও প্রকাশিত হইল।

ভবানীচরণের উত্তোগে অতি অল্প দিনের মধ্যে, কাশীপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্মসভার একাধিক শাখা স্থাপিত হইল ও “ইহাও ধর্ম্য হইল, যাহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীব হেয়ী তাঁহাদেরিগেব সহিত কাহার আচার ব্যবহার থাকিবেক না।” (৭) এমন কি, সহমরণ প্রথাও সনাতন হিন্দুধর্মের নিন্দাসূচক কোন সংবাদপত্র অথবা পুস্তিকা পাঠ কবাও ধর্মসভার সভাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। বলা বাহুল্য, রামমোহনের উপন্যস্ত সনাতনপন্থী হিন্দুরা প্রচণ্ড বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন, এবং তজ্জগ্ন রামমোহন, নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। তাঁহার বহু মিঃ মোন্টেগোয়ারি মাটিনের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রামমোহন এই সময়ে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্মসভার কার্যকাণ্ডকেবা সহমরণ-প্রথা আইনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রতি কাউন্সিলে আপীল দাখিল করিবার জগ্ন কলিকাতার তৎকালীন ডেপুটী শে’বফ মিঃ বেথীকে তাঁহাদের পক্ষে এটর্নীর নিযুক্ত করিলেন। বলা বাহুল্য, তজ্জগ্ন সংগৃহীত চাঁদা হইতে তাঁহাকে দর্শনী বাবদ বহু অর্থ দিতে হইল। ধর্মসভার পক্ষে এই কার্যভার গ্রহণ কবায় মিঃ বেথী স্বজাতীয়দের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইলেন।

কিন্তু হিন্দুদিগেব চিবাচবিত এই সহমরণ প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পক্ষে মিঃ চার্লস উইলকিন্স, বিচারক মিঃ জোনাথন ডানকান প্রভৃতি কোন কোন ইংরেজ, এমন কি, বিশপ হেবার পর্যন্ত প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ সহায়ত্ব সম্পন্ন ছিলেন না, এতরূপই জানিতে পারা গিয়াছে।

৬। “সতী” সমর্থকদিগের দ্বারা রামমোহনকে লক্ষ্য করিয়া রচিত ও তৎকাল প্রচলিত একটি ছড়া নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—
ভ্রমসমাজে একটি একালে অচল।

“মাদ্রী পাণ্ডুর সহমরণ” আঘ্য ঋষিরা লেখেন নি।
এই সিদ্ধান্ত জাহির করে ধর্মশাস্ত্র-চূড়ামণি।
ব্যাস মনু যা’পারেনি তা’ জাহির হ’ল আইন বলে।
মাছের মায়েব পুঞ্জশোকে সতী ধর্ম গেল চলে।
নেড়ের দলেব রাম রাজা বিলেতে তা’তেই গেল।
হিন্দুর আর্জি বিলাত গিয়ে তাই ফাঁস হ’য়ে গেল।
মূর্খ বাদশা পাঠালে তায় ভিক্ষা করে “রাজা” হ’তে।
কোম্পানি হ’লো দেশের রাজা সেই তার দাসখতে।
মাসহারা শুধু বেড়ে গেল আরজি করার ফলে।
সতীর শাঁপে স্নেহের দেশে তাই বাজে পচে ম’লে।
। “সংবাদপত্র”, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৫৭

৫। “সংবাদপত্র,” তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৯৬

৬। “সংবাদপত্র,” প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩০০০১

শোভাজ্বালিত বাধাকাস্ত দেব আপীলের দরখাস্ত ও তৎসহ প্রেবিত বাবস্থাপত্রখানি ইংবেজী ভাষায় রচনা করেন; সাধারণের নিকট ইহার অর্থ সহজবোধ্য কবিবাব উদ্দেশ্যে শ্রীযুত তাবিনীচরণ মিত্র হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অনুবাদিত কবিয়াছিলেন। লর্ড বেটিকের নিকট আরজীর সহিত যে বাবস্থাপত্র প্রেবিত হইয়াছিল, আপীলের দরখাস্তের সহিতও উহা প্রেবিত হয়। বহু পণ্ডিতের সাহচর্য্যে ও সম্মতিতে শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উহা লিখিত হয়। “আবজ্ঞাতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে স্থান দিয়া (রাধাকাস্ত দেব) তাহার প্রত্যেক কথাই সত্বস্তর করিয়াছেন ও তাহার নিকটে প্রথম যে প্রার্থনা-পত্র দেওয়া গিয়াছিল তাহা যে উক্ত তিন দিয়াছিলেন তৎপ্রত্যুত্তর এই আরজ্ঞাতে বিলক্ষণরূপে লিখিত হইয়াছে এবং সহমরণসম্বন্ধে ও ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে যে গ্রন্থে বহু বচন আছে, তাহা তাবৎ সংগ্রহ পূর্বক তরজমা করিয়া আরজীমধ্যে বিন্যাস করিয়াছেন; এই আবজ্ঞা সংশোধনার কোন বিজ্ঞ ইংবেজেব নিকট প্রেবিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি করিয়া মন্তব্যপূর্বক বাবকে বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন এবং উকীল ফেলিস বেথী সাহেব এই আরজী দেখিয়া সাহস কবিয়াছেন যে, আমারদিগের প্রাণ পূর্ণ হইবেক।” “...সতাপক্ষায় যে আরজী বিলাতে গিয়াছে, যাঁহা পাঠ করিয়া শ্রীযুত ডাক্তর লামিণ্টন সাহেব যুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত কবিয়াছেন যে, *that the petition is one of the cleverest thing I ever hear*! অর্থাৎ এমত বিজ্ঞতা প্রকাশক আবেদনত্র যদি আমি কখন শুনিয়া থাকি।” (৮)

যাহা হউক, লর্ড বেটিক কর্তৃক সহমরণ-প্রথা নিষিদ্ধ হইবার প্রায় আট মাস পরে মিঃ বেথী স্বয়ং এই দরখাস্তসহ ইংলণ্ডগামী জাহাজে অপিবোধন কবিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিয়দূর গমন কবিবার পর সেই জাহাজের গলদেশ ছিদ্র হওয়ায় জাহাজ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণতানি ঘটে নাই। মিঃ বেথী এই ঘটনার পর দরখাস্তসহ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলে, এই বিষয় লইয়া পুনরায় দুই বিরুদ্ধ পক্ষে কৌতুককর আলোচনার সত্রপাত হয়। এক পক্ষ প্রচার করিলেন, নিপীড়িতা বননীদিগের অভিশাপেই এই দুর্ঘটনা ঘটয়াছে; অপরপক্ষীয়েরা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, কেবল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহিমা ও সতী নারীদের শুভেচ্ছাই জলমগ্নোন্মুগ্ন জাহাজকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে; না হইলে সমস্ত আরোহিসহ জাহাজ অবশ্যই সলিল-সমাধি লাভ করিত। এই ঘটনার কিছু দিন পরে, মিঃ বেথী পুনরায় ঐ দরখাস্তসহ ইংলণ্ড গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য, রামমোহনও নিশ্চেষ্টভাবে কালক্ষেপ করেন নাই। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই তিনি বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জ্ঞান ইংলণ্ড গমনের মনস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাহার এই আশা পূর্ণ হয় নাই। কিছু কাল পূর্ব হইতেই দ্বিতীয় শাহ আলমের পুত্র দিল্লীর তদানীন্তন সাক্ষীগোপাল বাদশাহ আবু-নাসার-মুইন-উদ-দীন আকবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে পূর্ব-সন্ধির চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য বহু অর্থের দাবী করিতেছিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে তাহার প্রতিনিধি স্ব-প কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবার জ্ঞান রামমোহনকেই তিনি

যোগাতন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন ও তাহাকে ‘রাজা’ খেতাব দান করিয়া তাহার দূত নিযুক্ত করিলেন। এই ভাবে রামমোহনের বহুদিনের অভিলাষ সিদ্ধ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পুনরায় সনন্দ দানের প্রস্তাব হয়। এই ঘটনার সহিত ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্ট জড়িত থাকায় কোম্পানীকে সনন্দদান-সংক্রান্ত আলোচনার সময়ে রামমোহন পালিয়ামেন্টের কমন্স সভায় স্বয়ং উপস্থিত থাকা কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু সহমরণ-প্রথার বিলোপ সাধন ব্যাপারের শেষ মীমাংসা না করিয়া স্বদেশ ত্যাগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বঙ্গশীল হিন্দু নেতৃবৃন্দ আপীলের ব্যবস্থা করিতে উদ্বৃত হইলে রামমোহনও “The Honourable the Commons of the United Kingdom of Great Britain and Ireland in Parliament Assembled”কে তাহার প্রতিকূলে একটি আবেদন করিয়া লর্ড বেটিক কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন যাহাতে কায়েম থাকে, সে জ্ঞান অনুরোধ করিলেন। এই আবেদন-পত্র বহু খ্যাতনামা ভারতবাসী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এতদ্বিল, ইহাও স্থির হয় যে, লর্ড বেটিককে প্রদত্ত মানপত্রের একখানি অনুলিপিও ঐ আবেদন-পত্রসহ রামমোহন ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর প্রধানতঃ পূর্বোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যে রামমোহন লিবারপুলগামী ‘আলবিয়ন’ নামক জাহাজে চাপিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল পদার্পণ করেন। যথাকালে তিনি ‘হাউস অফ কমন্স’ সেই আবেদনপত্র দাখিল করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অন্যান্য নানা কস্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও রামমোহন সহমরণ-প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে ও তৎসম্পর্কে লর্ড ল্যান্ডাউন প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রামমোহন কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে আনীত “এক দরখাস্ত শ্রীযুত বাদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী মারকুইস ল্যান্ডাউন কুলীনবদের সভায় দ্ব্যপেশ করেন।” (৯)

মিঃ বেথী ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবার পর সতীদাহের সমর্থক আবেদনপত্র যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন সেই আপীলের প্রথম শুনারী ও ১১ই জুলাই রামমোহনের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় শুনারী হইবার পর ঐ দরখাস্ত প্রিন্সিপাল কর্তৃক নামঞ্জুর হয়, ও সহমরণ-নিষেধক আইন বলবৎ বহিল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সেই দিন ‘হোয়াইট হলের’ পবিত্র-ক্ষেত্র এই আপীলের বিচারকদগেব মধ্যে প্রিন্সিপালিসের সভ্য হিসাবে লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড ল্যান্ডাউন, লর্ড আমহার্ট, লর্ড জন রাসেল, মিঃ চার্লস গ্রাণ্ট প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর লামিণ্টন বাদীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্স প্রতিবাদী হিসাবে সওয়াল জবাব করিয়াছিলেন। রামমোহনকে বিচারকদগের অতি সন্মিকটেই সম্মানজনক আসন প্রদান করা হয়।

আপীল না-মঞ্জুরের সংবাদ নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিবামাত্র রামমোহনের দলস্থ ব্যক্তির বিজয়োৎসব হইয়া উঠিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রমানাথ ঠাকুর ও রাধাপ্রসাদ রায় (রামমোহনের পুত্র)

ব্রহ্মসভার এই তিনজন অছি (Trustees) বাহাতে “স্বীদাহ-নিবারণের অমুরাগিরা শ্রীল শ্রীযুতের উপকার স্বীকারের কি কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনার জন্ত ভবিষ্যৎ শনিবার ২৬শে কার্তিক ১০ নবেম্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দিবার সময়ে ঘোড়াসাঁকোর ব্র্যাক্স-সমাজ গৃহে একত্র” হইলেন তজ্জন্ত এক “আহ্বানলিপি” প্রকাশ করিলেন। (১০) উক্ত দিবসে এই সভায় স্বীদাহ-নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা “অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম নিবারণ প্রযুক্ত” হর্ষ প্রকাশ করিলেন। “শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ডাধিপতি ও প্রবিকোজেনকে ...অপর কোর্ট আব ডিরেকটসকে” ও “এই মহোদয়সের আদি কারণ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লর্ড উলিয়াম বেন্টনকে গবরনর বাহাদুরকে ধন্যবাদ দেওয়া অতি কর্তব্য বলিয়া সভায় স্থির হইল। “শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা ঐ ধন্যবাদপত্র বিলাতে পূর্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিত হওনের বিষয়ে...সভ্যগণেরা এই অভি-প্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্যা নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রাম-মোহন রায়ের যে পর্যাপ্ত পরিশ্রম ও নির্যয় স্ত্রীবধিরদের কটুক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালীর মধ্যে অত্র কাহারও এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাগতক।” (১১)

উক্ত আইন প্রণয়ন হইবার পূর্বে চারি মাসের মধ্যে পঁচিশ জন নারীকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করা হয় ও পঁচ বৎসরের মধ্যে সহমরণ প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

গুরুগোবিন্দের জীবন-ধারা

শিখ সম্প্রদায়ের গুরু গোবিন্দ সিংজীর বাল্যজীবন রহস্য-সমাকুল। উহাতে অনেক অলৌকিক কাহিনী বর্তমান। সেই জন্ত যুরোপীয় পণ্ডিত-সমাজ সেই সকল বিবরণে আস্থা স্থাপন করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে এই সকল কাহিনী অলৌকিক বলিয়া অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বোধে উড়াইয়া দিতে চাহেন, ঐ ভাবে তাহা উড়াইয়া দিতে হইলে প্রকৃত ইতিহাসের অনেক অংশই বাদ পড়িয়া যায়। গুরু গোবিন্দের ভক্তগণ সরল বিশ্বাসে এবং গুরুর প্রতি অচলা ভক্তিবিবন্ধন যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা খাঁটি বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও তাহার ভিতর যে কিছু কিছু সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্মধ্বজী বাদ-সাহ ঔরঙ্গজেব ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের বসন্ত পঞ্চমীর দিন দিল্লীর চাঁদনী-চকের বাজারে শিখগুরু তেগ বাহাদুরকে নিতান্ত কাপুরুষের স্তায় সর্বজন-সমক্ষে হত্যা করিয়াছিলেন। ঐ দিন বেলা এগারটার সময় বাজারের বৃক্ষতলে তেগ বাহাদুর রপজী পাঠ করিয়া যখন প্রণাম করিতেছিলেন, সেই সময় ঘাতক তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদনের জন্ত অসি-হস্তে যেমন অগ্রসর হইল সেই মুহূর্তেই আঁধি বা ঘূর্ণি বায়ুর একটা ঝাপটা আসিয়া দর্শকগণের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিল। ঘাতক সবিম্বয়ে দেখিল তেগ বাহাদুরের স্বন্ধের উপর মস্তক নাই। এক জন ভক্ত

শিখা তাঁহার ছিন্ন মুণ্ডটি লইয়া যাইবার জন্ত তথায় অপেক্ষা করিতে-ছিল। আঁধিতে সকলে যখন অন্ধপ্রায়, ঠিক সেই সময় আচম্বিতে তাঁহার মস্তক তাহার কোলের উপর আসিয়া পড়িল। উহা লইয়া শিখাটি তাঁহার পুত্র গোবিন্দ সিংজীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। গোবিন্দ সিং যথারীতি মুখান্নি করিয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই কাহিনী অতি-প্রকৃত, এই জন্ত ইহা বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষেই কঠিন বটে; কিন্তু ইহার আগাগোড়া সবই মিথ্যা, এরূপ মনে করাও কি সম্ভব? যে সময় ঘটক কর্তৃক তেগ বাহাদুরের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল,—সেই সময় আচম্বিতে ঘূর্ণি বায়ু ও আঁধির আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে; এক জন ভক্ত শিখা দেহচ্যুত মুণ্ডটি লইয়া গিয়া তাঁহার পুত্রকে প্রদান করিয়াছিল এই ঘটনা অতি-প্রকৃত নহে; বরং ইহাতে প্রতিপন্ন হয়—তেগ বাহাদুর সর্বসাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন যে, বাজারের জনসাধারণ তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড অপসারণের কথা জানিতে পারিলেও তাহাদের কেহই সে কথা প্রকাশ করে নাই। জনসাধারণের উপর তেগ বাহাদুরের প্রভাব বুঝিতে হইলে ভক্ত শিখ-গণের এই কাহিনী উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। এই জন্তই ঐ সকল কাহিনী সম্পূর্ণ বর্জনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

দশম গুরুগোবিন্দ সিং গুরু তেগ বাহাদুরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল গুজরী (গুজরী ?)। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নিদারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িত তেগ বাহাদুর তীর্থ-ভ্রমণের উপলক্ষে পঞ্জাব হইতে সপরিবারে পাটনায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। গোবিন্দ সিং ১৭২২ সন্থতে অর্থাৎ ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গুরুর সপ্তমী তিথিতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে পাটনা নগরীতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিং তাঁহার লিখিত “দশম বাদশাহ-কা-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিচিত্র নাটকে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি লিখিয়াছেন—“আমার পিতা পূর্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি নানা তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে যাইতে-ছিলেন। প্রয়াগধামে উপনীত হইয়া তিনি দীনদরিত্রগণকে দানাদ দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিবার পর আমার উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে আমি পাটনা নগরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। ইহার কিছু দিন পূর্বে আমাকে মদ্রদেশে (পঞ্জাবে) লইয়া যাওয়া হয়।”

এই বিবরণ হইতে বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই; তবে অগাধ সূত্রে যে সকল কথা জানিতে পারা যায়, তাহাতে নানা জনো-নানা মত লক্ষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ উক্তির বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকাশ, গুরু-গোবিন্দের পিতামহী নানকী বলিয়াছিলেন,—এই বালক কালো হরগোবিন্দ রায়ের স্তায় সুদক্ষ যোদ্ধা হইবে। ইহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে; প্রভাত দেখিয়া দিনটি কিরূপ হইবে, তাহা যেমন বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ অনেকের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হইবে, তাহা বোধগম্য হইতে পারে। বালক গোবিন্দ রায় খেলা করিবার সময় তাঁহার খেলার সঙ্গিগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন; এক ভাগ মুসলমানের ভূমিকা গ্রহণ করিত, অত্র ভাগ শিখ হইত। অতঃপর উভয় দলের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সেই ক্রীড়া-যুদ্ধের অবসানে প্রায়ই মুসলমান দলকে পরাজিত হইতে হইত। গোবিন্দ স্বয়ং শিশু সৈন্যগণের

১০। “সংবাদপত্র”, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৮১

১১। “সংবাদপত্র”, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৪৭-৪৮

নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিতেন। বালক গোবিন্দ রায় প্রতিদিনই অস্ত্রচালনা-কৌশলে অভ্যস্ত হইতেন। শৈশবেই গোবিন্দ রায়ের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতিবেশীরা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শিখরা তাঁহার সম্বন্ধে বলেন,—বাল্যকালে তিনি যখন পাটনা ত্যাগ করেন, সেই সময় রাম-নির্বাসনে শোকসন্তপ্ত অযোধ্যা নগরীর জনসাধারণ যেরূপ বিলাপ করিয়াছিল, পাটনা নগরীর জনসাধারণের অনেকেই সেইরূপ বিলাপ করিয়াছিল।

শিখদিগের একখানি গ্রন্থের নাম 'সূর্যপ্রকাশ'। গ্রন্থখানি বৃহৎ এবং গুরুগোবিন্দের পবলোক-গমনের অব্যবহিত পরে সন্তোষ সিং (সন্তোষ সিং ?) নামক ভক্ত শিখ কর্তৃক উহা রচিত হইয়াছিল। 'সূর্যপ্রকাশে' বর্ণিত হইয়াছে—গোবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইলে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দর্শকশ্রেণীর মধ্যে এক জন মুসলমান ফকির ছিলেন, তাঁহার নাম সৈয়দ ভিকুসা। শিশু পিতা তেগ বাহাদুর তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিলেন। নবজাত শিশুর মাতুল কুপাল তখন সেই বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিতেন। বাদশাহ ঔবঙ্গজেব পূর্ব হইতেই শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের প্রতি নিরতিশয় কঠোর ব্যবহার কবায় তাঁহার পরিজনবর্গের সন্দেহ হইল—এই ফকিরটি সম্ভবতঃ ঔবঙ্গজেবেরই গুপ্তচর। এই জ্ঞাত তাঁহারা ফকিরকে শিশু দেখাইলেন না। ফকির তিন দিন তেগ বাহাদুরের বাড়ীর সম্মুখে অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। ফকিরের এইরূপ ব্যবহারে অনেকের ধারণা হইল, তিনি নিশ্চিতই প্রচ্ছন্ন ভক্ত। অতঃপর তেগ বাহাদুরের জননী নানকীব অনুমতিক্রমে ফকিরকে শিশু দেখান হয়। উক্তকালে ফকির ভিকুসার সহিত গুরুগোবিন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই ফকির ঔবঙ্গজেব বাদশাহের চর ছিলেন না।

গুরুগোবিন্দ কত বয়স পর্য্যন্ত পাটনায় ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এ কথা সত্য যে, তাঁহার জন্মের কিছু দিন পরেই তেগ বাহাদুর পাটনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কথিত আছে—কামরূপের রাজা এবং জয়পুরের রাজা পাটনা পর্য্যন্ত তেগ বাহাদুরের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। কামরূপের রাজা শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তাহার পরেই তেগ বাহাদুর পঞ্জাব গমনের ইচ্ছা করেন। বালক গোবিন্দও পিতার সহিত পঞ্জাব গমনের বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তেগ বাহাদুর তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইতে সম্মতি প্রকাশ কবেন নাই। অতঃপর গুরু তেজবাহাদুর স্বগ্রামে গমন করেন। তিনি তথায় গমন করার ঔবঙ্গজেবের ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ আরও প্রবল হইয়াছিল।

পঞ্জাবে পৌঁছবার অল্প দিন পরে তেগ বাহাদুর তাঁহার পরিজনবর্গকে পঞ্জাবে যাইবার জ্ঞাত আদেশ করিয়া লোক মারফৎ পত্র পাঠাইলেন। গুরুগোবিন্দ তখন মঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই সময় বালক গোবিন্দ রায় উৎকৃষ্ট অস্ত্র সম্বন্ধে সংগ্রহ করিতেন এবং সেগুলি কোন উচ্চ স্থানে রাখিয়া ও চন্দনচর্চিত করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা তাহাদের পূজা করিতেন। শক্রনিপাতই এই সময় হইতে বালকের এক মাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। খালসা-শিখদিগের প্রবর্তকের জীবনের ইহাই ছিল

মূল মন্ত্র। নারীদিগকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন। 'সূর্য প্রকাশে' লিখিত আছে পাটনার যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, সেই বাড়ীতে একটি কূপ ছিল। কূপটির জল অত্যন্ত সুপেয় বলিয়া পল্লীবাসীদের অনেকে সেই কূপ হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিত। গোবিন্দ তখন গুলুতি-বাটুল লইয়া খেলা করিতেন। বালক ক্রীড়াচ্ছলে বাটুল নিক্ষেপে কোন কোন নারীর কলসী ভাঙ্গিয়া দিতেন। গোবিন্দের মাতা এবং পিতামহী এছত্ত গোবিন্দকে ভৎসনা করিতেন। এক দিন একটি মুসলমান রমণী সেই কূপ হইতে



গুরুগোবিন্দ সিং

জল লইতে আসিলে গোবিন্দ তাহার কলসী লক্ষ্য করিয়া যে বাটুল নিক্ষেপ করেন, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকটির কপালে লাগায় কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল। পুত্রের এই ব্যবহারে মর্মাহত মাতা তাঁহাকে প্রহারোত্তত হইলে গোবিন্দ পলায়ন করেন; কিন্তু পরে তিনি তাঁহার দোষের অল্প লজ্জিত হইয়া সেই রমণীর নিকট

ক্রটিস্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি নারীজাতিকে সম্মান করিতে আরম্ভ করেন।

বালক গোবিন্দ রায় পাটনা হইতে যাত্রা করিয়া যে যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার উপহার দান করা হইয়াছিল। তিনি বারাণসী এবং অযোধ্যা হইয়া লক্ষৌ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষৌ নগরে রাজা ফতেচাঁদ তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে পরম যত্নে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। অতঃপর গোবিন্দ রায় অল্প একটি লক্ষৌ নগরে গমন করেন। এই লক্ষৌ পঞ্জাবের আঞ্চলিক মহর হইতে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে বালক গোবিন্দ রায় তাঁহার বাল্যসঙ্গীগণের সহিত যুদ্ধ-ক্রীড়া কবিতেন।

অতঃপর গোবিন্দ আনন্দপুরে পৌঁছিবার পূর্বেই ঔরঙ্গজেব তাঁহার পিতা তেগ বাহাদুরকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্ত দূত প্রেরণ কবিলেন। তেগ বাহাদুর পরে যাইবেন বলিয়া দূতকে ফেরত দিলেন। পরে আষাঢ় মাসের প্রবল বর্ষার মধ্যে তিনি দিল্লী যাত্রা কবিলেন; কিন্তু দিল্লী যাইবার সময় নানা কারণে পথে তাঁহার বিলম্ব হয়। ঔরঙ্গজেব এজ্ঞা অধীর হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূত আনন্দপুরে তাঁহাকে না পাওয়ায় দিল্লী প্রত্যাগমন করিলে ঔরঙ্গজেব অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে পুনর্বার দূত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার তেগ বাহাদুরের সন্ধান পায় নাট শুনিয়া ঔরঙ্গজেব ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইলেন। তেগ বাহাদুর দিল্লী যাইবার পথে সরফাবাদের প্রতিষ্ঠাতা সরফুদ্দীনের ভবনে কিছু দিন আশ্রিত্য গ্রহণ করেন। তাহার ভগ্নো কি আছে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, এজ্ঞা তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সংকোচভাবে তাঁহার দেহ বেন পথিপ্ৰান্তে শূন্য-কুণ্ডে ছিড়িয়া না যায়। পিতার ছিন্ন মস্তক গোবিন্দের হস্তগত হইয়াছিল, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গুরু মস্তকহীন দেহ রক্তপথে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া জনসাধারণের মনে ঘোর অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। শিষ্যগণ দেহটির সংকার করিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু দাস্তিক ও বলদপ্ত ঔরঙ্গজেবের ভয়ে কেহ সেই দেহ সরাইতে সাহস পাইল না। এই সময় এক জন লবনা (বলুদে) শিখ অনেকগুলি বলদ লইয়া ঐ চাঁদনী চকের বাজারের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। যে সময়ে জেরে বাতাস বজিতেছিল এবং বহু সংখ্যক ভাববাহী বলদের চরোণক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে কেহ কিছুই দেখিতে পাইল না। শিখ বণিকটি অলক্ষ্যে সেই মুণ্ডহান দেহটি লইয়া সহরের বাহিরে যায়। তথায় তাহার একখানি ছোট ঢালাঘর ছিল। সে সেই ঘরের ভিতর দাঙ্গ কাঠ প্রভৃতির মধ্যে গুরুর দেহ লুকাইয়া রাখিয়া গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিল। এই ভাবে নির্ভীক শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের দেহ ভগ্নীভূত হইয়াছিল। *

* ক্যানিংহাম বলেন, অত্যন্ত নিকট ঝাড়ুদার জাতীয় জন কয়েক শিখকে দিল্লী হইতে তেগ বাহাদুরের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্ত প্রেরণ করা হইয়াছিল। মুখুন শাহ নামক জনৈক শিখের চেষ্টায় ঐ অস্থিগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। শিখদিগের গ্রন্থে যাহা বর্ণিত আছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

তেগ বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দ রায়ই গোবিন্দ সিং নামে শিখদিগের দশম গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তেগ বাহাদুরের মৃত্যুকালে গোবিন্দ সিংজীর বয়স সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। শিখরা বলেন, তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর মাত্র; আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহকালে তাঁহার বয়স ১১ বর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি দশম বর্ষেই গুরুর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্যানিংহাম লিখিয়াছেন, তেগ বাহাদুরের প্রাণদণ্ডকালে গোবিন্দ সিংএর বয়স ১৫ বৎসর ছিল। শিখরা গুরুগোবিন্দ সিংজীর প্রধান পত্নীকে মাতা জিতোজী বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ সিং কোন দরিদ্র শিখের কন্যা সুন্দরীজীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ভাঙ্গানীর যুদ্ধ

শিখগুরু গোবিন্দ সিং তাঁহার বিচিত্র নাটকে লিখিয়াছেন, গুরুপদ প্রাপ্তির পর তিনি ধর্মের উন্নতি-সাধনের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পাণ্ডতা নগরে গমন করেন। তথায় তিনি কালিন্দী (কালিন্দী ?) নদীতীরে ভ্রমণ করেন, এবং নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে বৃত থাকেন। ঐ অঞ্চলের রাজা ফতেশাহ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অকারণে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। ‘সূর্য্যপ্রকাশ’ প্রভৃতি শিখদিগের অসংখ্য গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকাশ, পিতার মৃত্যুর পর গোবিন্দ সিংজী কিছুকাল মালঘোয়ালে বাস করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া বল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার ফলে বিলাসপুরের রাজা ভীমচাঁদের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। জনৈক ধনাঢ্য শিখ গুরুগোবিন্দকে একটি অতি সুশিক্ষিত হস্তী, একটি সুন্দর তা, এবং অসংখ্য দ্রব্য উপহার দান করেন। ঐ হস্তী এবং তা টির প্রতি ভীমচাঁদের অত্যন্ত লোভ হয়। গোবিন্দজী বলেন, তিনি তাঁহার ভক্তের প্রদত্ত উপহার কাগকেও দান করিতে পারিবেন না। এই ব্যাপারেই উভয় পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়াছিল। এই সময়ে নাহন রাজ্যের মহীপাল রাজা প্রকাশমেদিনী প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারায় গুরুগোবিন্দকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন। গুরুগোবিন্দর পার্শ্বচর মসন্দগণ এই সময়ে যুদ্ধে পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার গুরুজীর জননী গুরুজীকে এবং পিতামতা নান্দীকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ঐ সময়ে বিলাসপুরপতি ভীমচাঁদের সহিত যুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না। অতঃপর গুরুগোবিন্দ রাজা প্রকাশমেদিনীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মাথোয়ালে গমন করিয়াছিলেন। *

বস্তুতঃ, কেবল হাতী আর তাঁবুর লোভেই যে এই বিবাদের উদ্ভব, এরূপ মনে হয় না। গোবিন্দ সিংএর প্রতি বিলাসপুরপতি ভীমচাঁদের ঈর্ষ্যা এবং সন্দেহই ইহার প্রকৃত কারণ। গুরুগোবিন্দ চক্কানিনাদ করিতেন। উহাতে কেবল রাজাদেরই অধিকার আছে বলিয়া বিবেচিত হইত। কেহ কেহ বলেন, গুরুগোবিন্দ সিং ভীমচাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন অংশ লুণ্ঠন করায়

ভীমচাঁদ ভীত হইয়া কেটের রাজ্য প্রভৃতির সহিত কড়বা সহজে পরামর্শ করেন। এই সময় ভীমচাঁদের পুত্রের সহিত শ্রীনগররাজ্যে ফতে শার কন্টার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। তাঁহার ভীমচাঁদকে বলেন, এই বিবাহের পর যুদ্ধ আরম্ভ করাই সঙ্গত। এই সময় গোবিন্দ সিংহী পাঁওটা গ্রামে ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি নেহানের রাজ্যের সহিত শ্রীনগররাজ্যে ফতে শার বিরোধের মীমাংসা কবায় ফতে শার প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ফতে শার কন্টার বিবাহ উপলক্ষে গুরুগোবিন্দ বহুমূল্য উপহারদি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে বিলাসপুত্রপতি ভীমচাঁদ ফতে শাকে এই সকল উপহার দ্রব্য ফেরত দিতে অনুরোধ করেন। ফতে শাকে প্রথমে তাহাতে সম্মত না হইলেও পরে ভীমচাঁদের জিদে, বিশেষতঃ, শ্রীনগরে সমবেত রাজগণের পরামর্শে উহা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গুরুগোবিন্দজীব দেওয়ান নন্দ চন্দ শ্রীনগরে অবস্থানকালেই বসিয়াছিলেন, অবস্থা যেকল্প প্রতিকূল, তাহাতে যুদ্ধ অনিবার্য। নান্নন অঞ্চল যমুনাভীবে অবস্থিত। তথাকার রাজা প্রকাশ-মেদিনা গুরুকে সম্মানে সেখানে বাস করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নান্নন রাজ্যমধ্যে যমুনাভীবে একটি উচ্চ স্থান দেওয়ান গুরুজী তথায় বাসেব অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রাজা প্রকাশ-মেদিনী সেই গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করাইয়া সেখানে তাঁহাকে বাস করিতে দিয়াছিলেন। এই গ্রামটির নাম প্রথমে পাঁওটা না থাকিলেও শিখগুরু এই স্থানে প্রথমে পা (পাঁও) বাসিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা পাঁওটা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। 'সিবম্বর গেজেটয়ারে' প্রকাশ, গুরুগোবিন্দজী এইস্থানে অন্যান্য পাঁচ বৎসর ছিলেন। যখন বিলাসপুত্রপতি রাজা ভীমচাঁদের পুত্রের সহিত শ্রীনগররাজ্যের রাজা ফতে শার কন্টার বিবাহ-প্রস্তাব পাকা হইয়াছিল—গুরুগোবিন্দ সিংহী তখন পাঁওটায় ছিলেন; কিন্তু ভাঙ্গানীর যুদ্ধের পরেই তিনি আনন্দপুরে প্রত্যাগমন করেন। এই বিবাহের অল্প দিন পরেই ভাঙ্গানীর যুদ্ধ হইয়াছিল। গুরুগোবিন্দের এই সময়ের জীবনের বাপাব অনেকটা রহস্য-বিজড়িত। ক্যানিংহাম বলেন, পিতার অস্তিত্বক্রিয়ার পর তিনি সম্ভবতঃ কুড়ি বৎসর যমুনা-সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরেষ্টার বলেন, তিনি কিছু দিন পার্টনায় থাকিয়া পরে শ্রীনগর অঞ্চলে গমন করেন। এই সময়ে তিনি হিন্দুর শাস্ত্র, পুণ্য, এবং মুসলমানদিগের কোবাণ প্রভৃতির আলোচনা করেন। যাহা হউক, এই সময়ে তিনি যে ভবিষ্যতের জগৎ শান্তিসম্বন্ধে করিতেছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়তে পারে।

নন্দ চন্দ শ্রীনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া, যুদ্ধ যে অত্যাসন্ন—এ কথা গোবিন্দ সিংহীকে জ্ঞাপন করেন।

এই সময়ে গোবিন্দ সিংহীর কতকগুলি শুভযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে পাঁওটার সন্নিহিত সস্তোরা গ্রামে বুদ্ধুসা নামক এক জন মুসলমান সাধু (ফকির) বাস করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উদার ছিল; তিনি মজ্জনের সাক্ষাৎ পাইলেই তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। শিখদিগের ধর্ম্মগুরু গোবিন্দ সিংহী পাঁওটার বাস করিতেছেন শুনিয়া বুদ্ধুসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং আলাপে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। ক্রমশঃ উভয়ের বন্ধুত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় হয়। বুদ্ধুসাকে যে সকল মুসলমান শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তাহার শিখগুরুকেও শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধুসার চেষ্টায় অনেক মুসলমান গুরুগোবিন্দ সিংহীর সঙ্গে যোগদান

করিয়াছিলেন। পাঁওটার নিকটেই রাম রায় বাস করিতেন। ইনি অষ্টম গুরু হরকিশনের, এবং সপ্তম গুরু হর রায়েরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; কিন্তু তিনি শিখগুরুর পদে বঞ্চিত হওয়ায় ঔরঙ্গজেবের সরকারে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, তিনিই তাহার খল-পিতামহ নবম গুরুর প্রাণদণ্ড দানে বাদশাহকে পবোক্ষভাবে প্রবোচিত করিয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ পাঁওটায় আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি প্রাণভয়ে এই স্থান ত্যাগ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মসন্দদিগের পরামর্শে তিনি দশম গুরুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

ভাঙ্গানীর যুদ্ধের পাঁওটা হইতে ৬ মাইল দূরে মুরী গমনের বাজপথে বজ্রপুত্র নগরের সন্নিকটে অবস্থিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গুরু হরগোবিন্দের একমাত্র কন্যা ৫ পুত্র,—সঙ্গুশা, জিতমল, গোপালচাঁদ, গঙ্গারাম, এবং মেহেবীচাঁদ বিপক্ষগণকে প্রচণ্ড তেজে আক্রমণ করেন। গুরুগোবিন্দের বাল্যবন্ধু ব্রাহ্মণ দয়্যাম এবং দেওয়ান নন্দচাঁদ প্রভৃতি তাঁহাদের সহায়তা করেন। দার্কাল যাবৎ কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় স্থির হয় নাই; এবং গুরুগোবিন্দই পরাজিত হইবেন—অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, জিতমলের বর্শার আঘাতে হরিচাঁদ আহত ও মুর্ছিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সস্তোরের গতি পরিবর্তিত হয়। এই যুদ্ধে গুরুগোবিন্দের পক্ষে সঙ্গুশা, মেহেবীচাঁদ, বুদ্ধুসার দুইটি পুত্র, এবং ভীমচাঁদের পক্ষে হরিচন্দ, চন্দোলের রাজা গোপাল, হায়াং খাঁ, নিজামত খাঁ প্রভৃতি প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে গিরিপতি ভীমচাঁদের পক্ষে বহু পার্বত্য হিন্দু রাজা ও মুসলমান নবপতি যোগদান করেন। সঙ্গুশা এই যুদ্ধে যেকল্প রণকৌশল প্রদর্শন করেন, তাহার পরিচয় পাইয়া গুরুগোবিন্দও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষভাগে গুরুজী স্বয়ং সৈন্য পরিচালন করিয়াছিলেন। ভীমচাঁদ এবং ফতে শার পক্ষ প্রবল হইলেও যুদ্ধে তাঁহাদেরই পরাজয় হয়। স্বয়ং গুরুগোবিন্দ এই যুদ্ধের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন; তাহাতে তিনি বিকল্প পক্ষের বোধ-বুদ্ধেব বর্জনের প্রশংসা করেন। কোন কোন ঐ তর্কাতর্কিক বলেন, গুরুগোবিন্দ পার্বত্য রাজাদিগের কার্যে অত্যধিক পরিমাণে হস্তক্ষেপ করিতেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গানীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিখগুরু গোবিন্দ সিংহী আনন্দপুরে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২১ বৎসর; কাহারও কাহারও মতে ২৬ বৎসর। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব গুরুগোবিন্দের পিতা তেগ বাহাদুরের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ সে কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; এজগৎ তাঁহার মনে প্রতিহিংসা-বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। বলদেব ঔরঙ্গজেব জনসাধারণের অসন্তোষের প্রতি ক্ষেপণ করিতেন না। বর্দও সাজাহান ঔরঙ্গজেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

হিন্দু-ধর্ম্মকে নাহি বিগাও

একে হুন্সোকে প্রতিপালো

অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মকে (হিন্দুসম্প্রদায়কে) বিগড়াইয়া দিও না, তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিও না; উভয় সম্প্রদায়কে একই ভাবে প্রতিপালন করিও।—কিন্তু দার্শনিক ঔরঙ্গজেব সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই; ইতিহাসে তাহা সুপ্রকাশ, স্তব্ধতা তাঁহার চর্কিত-চর্কণ

নিঃসয়োজন। বিশেষতঃ, বর্তমান প্রবন্ধে গুরুগোবিন্দের প্রসঙ্গই আলোচ্য।

বস্তুতঃ, তেগ বাহাদুরের হত্যাকাণ্ডে নিরীহ শিখদিগের যে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তরকালে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার অগ্রতম উপলক্ষ হইয়াছিল। গোবিন্দজী হিন্দু-মুসলমানকে সম্মিলিত করিয়া প্রথমে তাঁহার কার্যোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি যখন রণহর্মদ খালসা বাহিনী সংগঠন করেন, তখন হিন্দুদিগের জাতিভেদ অগ্রাহ্য

করেন; পূর্বে করেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার পিতা তেগ বাহাদুর ধর্মের জন্তই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়িয়াই গুরুগোবিন্দ খালসা সৈন্যদল সংগঠিত করিয়াছিলেন। জাতি ভেদ অমান্য করাতেই শিখরা হিন্দুধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। কেহ কেহ বলেন, গুরুগোবিন্দ প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; খালসাধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে তিনি নয়না দেবীর আরাধন করিয়াছিলেন, এ সকল কথা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিজ্ঞানতত্ত্ব)।

প্রগতিশীল

যেথা রজনীগন্ধা গন্ধ বিলায় মুখরা গোলাপ হাসে,
প্রণয়ের কথা কণ্ঠে লইয়া কাজলা ভ্রমর আসে।
সেথায় একটা বাঙলো থাকিবে ছোট নদীর তীরে,
মেহেদী-বিতান; বিলিতি-ঘাসের বেড়া হবে তারে ঘিরে।

সুদূরে শোভিবে ধূম্র পাহাড় আকাশের গায় লেখা;
শয়ন-ঘরের বাতায়ন হ'তে সেটা যেন যায় দেখা।
মোটের উপর কাব্যোপযোগী 'সিনারিটা' চাই ঠিক।
কল্পনাবনে মন-হরিণীটি ছুটে যাবে নির্ভীক।
সমুখে একটা গাড়ী-বারান্দা থাকা চাই নিশ্চয়।
'সিডান'-কারটা তারি নীচে হবে করিতে বিশ্বজয়।
সময়-মতন পাড়ি দেওয়া যাবে সিনেমায়-থিয়েটারে।
'সোফার' চাই যে বিকেলেতে যেতে ডায়মণ্ড হারবারে।
রোজ টি-পাটি দেওয়া চাই যত তরুণ বন্ধুজনে।
ডিনার একটা জমকালো-গোছ চাই যে জন্মদিনে।
উপহার দেয় কেহ নেকলেস, কেহ ব্রোচ,

বই, আনে।

ভেমনি তাদের ভুবিতে হইবে মধুময় মন্ডানে।
ড্রইং-রুমটা তারি আয়োজনে সজ্জিত হ'য়ে হবে।
সোফা-কোচ আর পিয়ানো একটা রহিবে সগৌরবে।
মেহগনির ঐ আলমারীটাও থাকিবে আরেক ধারে।
টিপয় তিনটে পাশাপাশি রেখে ফুলদানী তারি 'পরে।

পনের টাকায় চলিবে কেমনে ভেবে 'অমু' হয় সারা।

আধ-পেটা খেয়ে দিন কাটে হয় এই নিয়তির ধারা।

কোথা বসরার গোলাপ-বাগিচা কে বা সে তরুণী সাকী ?

অভাবের চাপে দেহ-মন কাঁপে অশ্রুসিক্ত আঁধি।

পুষ্পস্তবক স্নান ছড়িয়ে শোভিবে তাহার মাঝে।
'বয়'-দুটো হবে প্রয়োজন মত যুরিতে নানান কাজে।
স্নো, ক্রীম, আর পাউডার, ক্রজ, এগুলো না হ'লে নয়।
ড্রেসটা এমন হওয়া চাই যাতে লোকে মানে বিশ্বয়।
স্বামী হইবেন বিলেত-ফেরত নবীন ব্যারিষ্টার।
টাকার কুমীর, ষ্টাইল-মেকার, প্রতীক সভ্যতার।
প্রিয়েরে করিয়া ওমার-কবি সে তরুণী সাকীটি হবে।
স্বপনের দেখা বসরার বাগ্ সত্য স্বরূপে লবে।
এমনি একটা কল্পনা মনে ছিল যেন তার আঁকা
বাস্তব পানে চেয়ে দেখে ছায় সমস্তটাই কাঁকা।

... ..

স্বামী জজকোর্টে কেরাণী মাত্র দশটায় ভাত গুঁজে,
পাঁচটা অবধি গাধার খাটুনি খেটে যান চোখ বুজে।
মাসান্তে পান চল্লিশ টাকা, বাজার দেনাটি শুধে,
দুই টাকা দিয়ে খোকার বেতন, তিন টাকা দিয়ে ছুধে।
বাকী পনেরটি হাতে দিয়ে কন্ মুখখানি ক'রে নীচু।
সব দিয়ে খুয়ে এই ছাড়া 'অমু' রইল না আর কিছু।

রাণু গঙ্গোপাধ্যায়।



বৈষ্ণবমত-বিবেক



দশম অধ্যায়

শ্রীল রাধাদামোদর ও শ্রীরাধাকুণ্ড

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাধাদামোদরের সেবা স্থাপন করিয়া যমুনাতীরবর্তী শূঙ্গারবটের নিকটে বাস করিতেন। শ্রীল মদনমোহনের ও শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির-নির্মাণের ব্যাপার যেক্রমে তাঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ হইয়াছিল— শ্রীল রাধাদামোদরের মন্দির-নির্মাণ সেইক্রমে হয় নাই। মন্দিরের পরিবর্তে তিনি সাধারণ ইষ্টক দ্বারা একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া সেই গৃহে শ্রীল দামোদরকে স্থাপন করেন, এবং আর একটি গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের রচিত ও সংগৃহীত, তন্ত্র, তাঁহার নিজের রচিত ও সংগৃহীত পুস্তকাবলী রক্ষা করেন। ফলতঃ, তিনি রাজপুতানা, বারাণসীধাম, শ্রীরঙ্গনাথ, কাঞ্চীপুরী ও অত্রাত্ত নানা স্থান হইতে নানাবিধ আর্ষগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থ আনয়ন করিয়া শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে সুরক্ষিত করেন। তিনি যেমন শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ও শ্রীল শ্রামানন্দ ঠাকুরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীসনাতনের, শ্রীল গোপাল ভট্টের, শ্রীল রঘুনাথ দাসের, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নিজকৃত অসংখ্য গ্রন্থ গোড়, বঙ্গ ও উৎকলে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তেমনই অত্রাত্ত শিষ্যের দ্বারা রাজপুতানায়, সূদূর সিন্ধুপ্রদেশে, আফগানিস্থান ও মধ্য-প্রদেশের বহু স্থলে তাঁহাদের বহু গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও আফগানিস্থানে পুস্তক ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুবাদ পাওয়া যায়। সূদূর সলিমাবাদে * জয়পুরের গোবিন্দজীর মন্দিরে, জয়পুরের পলতা, করোঁরীপ্রমুখ স্থানে এখনও—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ পাওয়া

* সলিমাবাদ শ্রীনিহার্ক সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান গাদী, উহা কৃষ্ণগড় বা কিষণগড় রাজ্যে অবস্থিত। জয়পুর হইতে ট্রেণে কিষণগড় বাইয়া তথা হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্তী সলিমাবাদে টোঙ্গায় বা গো-শকটে বাইতে হয়। এখানে নিহার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীরাধাধামের সূবৃহৎ মন্দির ও সেবা বর্তমান।

যায়। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর মথুরা-মাহাত্ম্য-প্রমুখ গ্রন্থগুলি সম্প্রদায়-নির্কিশেষে শ্রীবৃন্দাবন-পরায়ণ সকল বৈষ্ণবের নিকটেই আদরণীয় হইয়াছিল।

শ্রীভক্তিরত্নাকর-পরিশিষ্টে শ্রীজীব গোস্বামীর যে চারিখানি পত্র পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধ, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীগোপালচম্পূর উত্তরচম্পূ, হরিনামামৃতব্যাকরণ, বৈষ্ণবতোষণী, দুর্গম-সঙ্গমণী (ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর টীকা) বৃহৎ ভাগবতামৃত, শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের ভাষ্যাদির পুনঃ পুনঃ প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোড়ে প্রেরিত হইতেছে। এই সকল কার্য্য শ্রীজীব স্বয়ং এবং তাঁহার শিষ্য ও ছাত্রবর্গ নির্বাহ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে এই সময়ে শ্রীজীবের চেষ্টায় শাস্ত্রগ্রন্থের ও কাগজের অভাব ছিল না। সেই সময়ের লিখিত বহু পুঁথি এখনও বহু গ্রন্থশালায় পাওয়া যায়। শ্রীল রাধাদামোদরে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি যে গৃহে বর্তমান, ঐ গৃহের ত্রায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির তখনও রাধাদামোদরে বর্তমান ছিল। ভজনপরায়ণ ও শাস্ত্রসেবী বৈষ্ণবগণ তখন ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া দিবারাত্রি ভজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শাস্ত্রালোচনা, সঙ্কীর্্তন ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন। শ্রীজীব স্বয়ং এই সকল ব্যাপারের, এবং শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীল গোপীনাথপ্রমুখ শ্রীবিগ্রহগণের নিত্যসেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতেই অগণিত যাত্রী দলে দলে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীজীব কখনও কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না, কিছুই আকাঙ্ক্ষাও করিতেন না,—তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত্বয়ের ত্রায় তিনিও নিম্পৃহ ও নিষ্কিঞ্চন ছিলেন; তথাপি সেবার কার্য্য নির্কিঞ্চেই চলিত। মহামতি সম্রাট আকবর পর্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের মহিমায় কথা শুনিয়া শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে গমন করেন। ১৪৯৫ শকাব্দে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, এ

কথা মিষ্টার গ্রাউস তাঁহার রচিত মথুরার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। * এই সময় শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর বিরোধ হইয়াছিল, সুতরাং তখন গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতাক্রমে শ্রীজীবই শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছিলেন। তখনও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবল্লভ সম্প্রদায় ও শ্রীনিহারু সম্প্রদায়ের সহিত গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; সুতরাং শ্রীজীবই তখন শ্রীবৃন্দাবনের সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথিত আছে, সম্রাট আকবর শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ও ইহার মহাত্যাগী বৈষ্ণবগণের ভজন-রীতি দর্শন শ্রীবৃন্দাবনকে “ফকিরাবাদ” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই শ্রীরাধাদামোদরের জন্ত সুবৃহৎ মন্দির নিৰ্মাণ করাইতে—এবং শ্রীল গোবিন্দদেব, শ্রীল গোপীনাথ, শ্রীল মদনমোহন, ও শ্রীরাধাদামোদরের সেবায় সৌষ্ঠববর্দ্ধনের জন্ত বহু জমিদার, রাজা ও সম্রাটের নিকট হইতে সংগৃহীত বহু অর্থও প্রচুর ভূসম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা করা তিনি নিতান্তই অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জায় নিষ্ঠাবান্ ত্যাগী বৈষ্ণবের ইহাই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

শ্রীল রাধাকুণ্ডের সংস্কার

শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবৃন্দাবনের অধিবাসিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডের কোনও সন্ধান না পায় তীর্থ লুপ্ত জানিয়া স্বকীয় সৰ্বস্বরূপা ভগবচ্ছক্তির বলে সেই লুপ্ত তীর্থ আবিষ্কার করেন; যথা—

“তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সৰ্বস্ব ভগবান্।

তুই ধাতুক্রেত্রে অরজলে কৈল স্নান ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য। ১৮শ পরিচ্ছেদ

তদবধি শ্রীবৃন্দাবনের সৰ্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই তীর্থরাজের সেবা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে এই তীর্থরাজের সেবায় অত্যন্ত অবহিত দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের জনগণ এই

মহাতীর্থের উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ইহাতেই এই তীর্থ খনিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড নামে দুইটি সরোবরে পরিণত হয়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই তীর্থতীরে স্থায়িতাবে বসতি করিতে আরম্ভ করেন—এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রমুখ ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গী হইয়া এই স্থানে ভজনকুটীর নিৰ্মাণ পুরঃসর অবস্থিতি করিতেছিলেন; কিন্তু কুণ্ড দুইটি যথোচিতরূপে সংস্কৃত না হওয়ায় সৰ্বসম্পদত্যাগী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনে তাহাদের সুসংস্কারের বাসনা বলবতী হইয়াছিল। শ্রীল দাস গোস্বামীর মনে কুণ্ড-সংস্কারের বাসনা জাগরুক হওয়ায় তিনি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; যেহেতু—

“অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায়।

এত বিচারিয়া হইলেন স্তব্ধ প্রায় ॥

আপনাকে ধিক্কার করয়ে বার বার।

কেনে এ বাসনা মনে হইল আমার ॥

বিবিধ প্রকারে নিজ মন বুঝাইয়া।

রহয়ে নিৰ্জনে অতি সাবধান হইয়া ॥”

ভক্তিরত্নাকর, পঞ্চম তরঙ্গ।

যিনি চৌদ্দ লক্ষ টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তি ও অপ্সরাতুল্যা রূপবতী পরমা সাধ্বী পত্নী ত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্যের আদর্শাবলম্বনে অল্পের পরিবর্তে কেবল “মাঠা” ভরণে শ্রীকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন,—তাঁহার হৃদয়ে এই প্রকার বৈষয়িক কার্যের বাসনার সঞ্চার হওয়ায় তিনি আন্তরিক লজ্জিত হইলেন। কিন্তু লীলাময় শ্রীভগবান্ নিষ্কিঞ্চন ভক্তের এই সাধু বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত এক উপায় অবলম্বন করিলেন। কোনও বিপুল সম্পত্তিশালী বিষয়ী ব্যক্তি শ্রীবদরিকাশ্রমে গমন করিয়া শ্রীনারায়ণকে বহু ধন উপহারদানের ইচ্ছা করিলে শ্রীনারায়ণ তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে গমন করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাহা প্রদানের জন্ত স্বপ্নাদেশ করিলেন। স্বপ্নে তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন যে, শ্রীল দাস গোস্বামী ঐ অর্থগ্রহণে সম্মত না হইলে তাঁহাকে স্বরণ করাইয়া দিতে হইবে—শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড সংস্কারের জন্ত তিনি যে মানস করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার জন্তই যেন এই অর্থ গ্রহণ

করেন। স্বপ্নে শ্রীশ্রীবদরিকানাথের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ধনী শ্রীবন্দাবনের আরিটগ্রামের শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে আগমন করিলেন এবং শ্রীল দাস গোস্বামীর পদপ্রান্তে এই অর্ধরাশি স্থাপন করিয়া প্রণামান্তে তাঁহাকে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রামকুণ্ড সংস্কারের যাবতীয় ভার অর্পণ করিলেন।

যে স্থানে কুণ্ডস্থ অবস্থিত, কুণ্ড লোপ পাওয়ায় ঐ স্থান ধাতুক্লেত্রে পরিণত হইয়াছিল—কেবল পূর্বের প্রবাদ অনুসারে ঐ কুণ্ডের ধাতুক্লেত্র “কালী” ও “গৌরী” আখ্যায় অভিহিত হইত। আরিটগ্রামের ছয় জন কৃষক সেই ধাতুক্লেত্রের অধিকারী থাকায়—শ্রীজীব স্বয়ং তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ ধাতুক্লেত্রের স্বত্ব ক্রয় করিলেন। * দলিলগুলি প্রধানতঃ শ্রীজীবের নামেই সম্পাদিত হইল এবং দলিল সম্পাদিত হইবার পর কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার ও খননকার্য আরম্ভ হইল। কুণ্ডস্থ স্তম্ভরূপে সংস্কৃত হইলে, কুণ্ডের নানা দিকে তীর্থযাত্রীদিগের স্নানের ও জলপানের জন্ত প্রাচীন ঘাটগুলিও প্রস্তর দ্বারা স্তম্ভরূপে বাঁধাইয়া দেওয়া হইল। শ্রীকুণ্ডস্থ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানগুলি এই ভাবে সংস্কৃত হওয়ায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রামকুণ্ড অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হইল। ইহার পরে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীল দাসগোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামি-প্রমুখ নিক্কিঞ্চন ভক্তগণ অবস্থান করিয়া পরমানন্দে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকটি দেবালয় এই কুণ্ডের তীরে ও তৎ-সন্নিহিত স্থানে স্থাপিত হইল। কুণ্ডসংস্কারের সময়ে একটি ব্যাপার ঘটয়াছিল। শ্রীচৈতন্য দেব যে ভাবে শ্রীকুণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ স্থানই প্রকৃত রাধাকুণ্ড কি না, তর্কনিষ্ঠ কোনও কোনও ব্যক্তির তৎ-সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হয় নাই। গোড়ীয় বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এই সন্দেহের পোষকতা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল শ্রামকুণ্ড খনন করিবার সময় উহার মধ্যে পুরাণবর্ণিত বজ্রনাভযুক্ত অবস্থিত দেখিয়া সকলেরই সকল সন্দেহের নিরসন হয়।*

* উহার দলিলগুলি পাওয়া গিয়াছে; তাহা উর্দু ভাষায় লিখিত; সুযোগ হইলে উহাদের ফটো প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

* শ্রীল জীবগোস্বামীর নামে শ্রীল রাধাকুণ্ডের ও ব্যাসকুণ্ডের ছুমির দলিল ছিল; উহা পূর্বে অনেকে অবগত ছিলেন না। প্রায়

শ্রীনাথজীর সেবার বন্দোবস্ত

শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিকটে গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই গোবর্দ্ধন গিরিকে বাম হস্তে ধারণ করিয়া ইন্দ্র কর্তৃক অশ্রান্ত বারিধারা-বর্ষণজনিত বিপদ হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই বর্ষণের পর শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ব্রজবাসিগণ যখন শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গিরিগোবর্দ্ধনে আবিষ্ট হইয়া পূজার ভোজ্যাদি উপভোগ করিয়াছিলেন। এই জন্ত ভক্তজনের নিকট গিরিরাজ গোবর্দ্ধন শ্রীহরির দেহ বলিয়া পরিগণিত। এই জন্তই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবন্দাবনে আগমন করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনে আরোহণ করেন নাই। অথচ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী এই গোবর্দ্ধনের উপরেই বিরাজ করিতেন, এবং শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী বা সংক্ষেপে শ্রীনাথজী নামে অভিহিত হইতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরম গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী তীর্থ-ভ্রমণোপলক্ষে শ্রীবন্দাবনে গমন করিয়া গোবর্দ্ধন পর্বতে পাঁচ বৎসর পূর্বে আরিট গ্রামের ভূস্বামী আভার রাজা ঐ স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত বলিয়া দাবী করেন। ইহা দেখিয়া রাধাকুণ্ডের নিত্যধামগত শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী (ইনি পূর্বাশ্রমে সাব-ডেপুটি ছিলেন) শ্রীকুণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভূস্বামীর দাবীতে বাধা প্রদান করেন এবং বলেন, উহা গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি। এই হেতু মথুরার দেওয়ানী আদালতে ইহা লইয়া মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে শ্রীল কৃষ্ণ বৈষ্ণবদাস বাবাজী বৃন্দারণ্য-বাসী সুপ্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ বি-এ (নিত্যধাম-গত রাজর্ষী বনমালী রায় বাহাদুরের ভূতপূর্ব ম্যানেজার), নিত্যধাম-গত পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ ভক্তপ্রবর বায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রামাণিক দলিল আদালতে দাখিল করেন। পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস মহাশয় বিনা বায়ে এই মোকদ্দমা পরিচালন করেন, এবং তাহার ফলে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রামকুণ্ড বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে শ্রীকুণ্ড সংস্কৃত হইবার পর আরও কয়েকবার গোড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের চেষ্টায় শ্রীকুণ্ডস্থ সংস্কৃত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে পূর্ববঙ্গের কোনও একজন ভক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডের জল নিষ্কাশন করিয়া শ্রীকুণ্ড পুনরায় খনন করিয়া দিয়াছেন। পূর্বে শ্রীকুণ্ডের গভীরতা ১৫ ফুট ছিল, এবার আরও ৮ ফুট অধিক গভীর করা হইয়াছে। এবার এই খনন ব্যাপারে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যবর্তী কঙ্কণকুণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কুণ্ডের আবিষ্কারে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঐতিহাসিক সংস্থান সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিপন্ন হইল।

অবস্থান করেন, এবং স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একটি কুঞ্জের মধ্যস্থিত
মৃত্তিকাস্তূপের নিম্নদেশ হইতে শ্রীগোপালের শ্রীবিগ্রহ
আবিষ্কার করেন। কি প্রকারে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী এই
বিগ্রহ উদ্ধার করেন ও ব্রজবাসিগণের সাহায্যে গোবর্দ্ধন



গোপালজী বা শ্রীনাথজী

পর্বতের শিরোদেশে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিবৃত
হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আনুমানিক
১৪০৭ শকে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোপালদেবকে আবিষ্কার ও
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন
সংসর্গে ও পুনঃ পুনঃ যবনের অত্যাচারে পশ্চিমের লোক
“মূঢ়-অনাচার” * হওয়ায় দুই জন বৈরাগী ব্রাহ্মণ গোড়
হইতে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে, পুরী গোস্বামী তাঁহা-
দিগকে ত্যাগী ও সদাচারী দেখিয়া দৃষ্টিদানে শিষ্য করিয়া
তাঁহাদেরই হস্তে শ্রীগোপালের সেবা সমর্পণ করেন, এবং
তিনি চন্দন আনয়নের জন্ত স্বয়ং গোড়দেশের পথে উড়িয়ায়
গমন করেন। ঐ সময়েই বঙ্গদেশের অষ্টৈতাচার্য্য-প্রমুখ

ভক্তগণ পুরী গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।
গোবর্দ্ধনে এই সেবা প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক বৎসর পরে
বল্লভ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল বল্লভাচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনে
গমন করিয়া শ্রীগোপালজী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এবং ভক্তিবশে
শ্রীগোবর্দ্ধনেই অবস্থান এবং শিষ্যবর্গের সহিত শ্রীনাথজীর
সেবায় যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে থাকেন। † কিন্তু ঐ
সময়ে শ্রীগোপালদেব আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তখন
বল্লভাচার্য্যের বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর নহে; কারণ
তাঁহার জন্ম ১৪০০ শকে। আর শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী
বল্লভাচার্য্যের মত কুলীন, যাজ্ঞিক ও সদাচারী ব্রাহ্মণ
পাইলে তিনি যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে সেবাধিকারী
করিতেন, এরূপ মনে হয় না।

কোনও গোড়ীয় বৈষ্ণব গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিতে
সম্মত না হওয়ায় শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবায়
ভার কাহার হস্তে গ্ৰস্ত করিবেন, শ্রীজীব গোস্বামী তাহা
স্থির করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে শ্রীবল্লভাচার্য্য
পরলোক গমন করায় তাঁহার পুত্র বিট্ঠলনাথ গোস্বামী
ও বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ গোপালের সেবা করিতে-
ছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী বল্লভাচার্য্যের কথায়
তাঁহার স্বকৃত সুবিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিদ্ধি
মূলপাঠ অবিচারে পরিবর্তন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণই ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিগ্রন্থে—পূর্বের দ্বিতীয় লহরীতে—

“পুষ্টিমার্গতয়া কৈশিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে ॥” অর্থাৎ “এই
রাগানুগাকে কেহ কেহ পুষ্টিমার্গ নামে অভিহিত

* ‘মাধুর-কথার’ গ্রন্থকার ৮পুলিনবিহারী দত্ত মাধবেন্দ্রপুরীর
শ্রীবৃন্দাবন আগমনের সময় ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ নির্দেশ করিয়াছেন।
যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, উহার ২১৩ বৎসর পরে তিনি গোড়দেশে
প্রত্যাগমন করেন, তবে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৩১ শকাদে তিনি
গোড়দেশে অষ্টৈতাচার্য্যাদি শিষ্যগণকে দীক্ষাদান করেন। কিন্তু
ঐ সময়ে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন
বলিয়া ধরা হইয়াছে। উহার কয়েক বৎসর পরে ১৪৮৯ শকে
সেকেন্দর লোদীর রাজত্বের আরম্ভ।

† প্রাচীন হিন্দী ভাষায় গোস্বামী গোকুলনাথজীকৃত “শ্রীআচার্য্যজী-
শ্রীমহাপ্রভুজী নিম্ববার্তা বরুবার্তা তথা চৌরাশী বৈঠকনকে চরিত্রাদি
ও চৌরাশী বৈষ্ণবনুকীবার্তা গ্রন্থ বল্লভ সম্প্রদায়ের একখানি বিশেষ
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনেকে মনে করেন।

* পশ্চিমের লোক সব “মূঢ় অনাচার।” চৈঃ চঃ—আদি,
১০ম পরিচ্ছেদ।

করিয়াছেন” বলিয়া প্রকারান্তরে বলভ সম্প্রদায়ের পুষ্টিমার্গকে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ফলতঃ, শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায় ও বলভ সম্প্রদায় তৎকালে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচিত হইতেন না। এই সময়ের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতি ছিল। এই জন্মই শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী ও অন্যান্য বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ পরামর্শ করিয়া শ্রীবিট্ঠলনাথের উপরেই গোপালের সেবার ভার অর্পণ করেন।

এই ব্যাপারের পূর্বেই শ্রীচরিতা-মৃতের মতে এক মহা ধনী ক্ষত্রিয় শ্রীল গোবর্দ্ধননাথের সেবার জন্ম এক মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীবলভ সম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থে আছে যে, শ্রীবলভাচার্যের পূর্ণমঙ্গল নামক একজন ক্ষত্রিয় শিষ্য শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালজীউর এক মন্দির নির্মাণ করেন।

মথুরার বহু ধনী শ্রেষ্ঠী ও অন্যান্য ব্রজবাসীর দানে গোপালের গোধান ও অন্যান্য সম্পত্তি প্রচুররূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীল দাস গোস্বামীর শ্রীগোপালরাজস্বব নামক একটি সুন্দর স্তোত্র আছে। উহাতেও শ্রীবিট্ঠলেখর যে অতি প্রেমভরে শ্রীগোপালের সেবা করিতেন ও তাঁহারই উপর শ্রীল নাথজীর সেবা ভার অর্পিত হইয়াছিল, ইহা জানিতে পারা যায়। ঐ স্তবের যে শ্লোক দুইটিতে এই ব্যাপার জানিতে পারা যায়, আমরা তাহার মূল শ্লোক ও অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

কলিত বপুরিব শ্রীবিট্ঠল প্রেমপুঞ্জঃ
পরিজন-পরিচর্যা-ধৈর্য্য-পীযুষপুষ্টিঃ।
হ্যুতি-ভর-জিত-মাগ্ধন্ মন্থধোস্তৎসমাজঃ
প্রতপতি গিরিপটে স্তুর্ন গোপালরাজঃ ॥

বিবিধভজনপুষ্পৈরিষ্টনামানি গুহুন্
পুলকিততমুরিহ শ্রীবিট্ঠলস্তোকসম্বৈঃ।
প্রণয়-মণি-সরং স্বং হস্ত ! তমৈ দদানঃ
প্রতপতি গিরিপটে স্তুর্ন গোপালরাজঃ ॥

যিনি বিট্ঠলনাথের প্রেমপুঞ্জ মূর্ত্তিমান্ হইয়া শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া লোকে বিদিত, যিনি নিজ পরিজনগণের প্রেমপূর্ণ সুধীর পরিচর্য্যামতে পরিপুষ্ট এবং যিনি উত্তমাত্ম কন্দর্পকুলকে নিজ শরীর-সৌন্দর্য্যে জয় করতঃ মুগ্ধ করেন—সেই শ্রীগোপালরাজ গিরিপীঠে সুন্দররূপে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন ॥

যিনি বিবিধ ভক্তজনের ভজন-পুষ্পের দ্বারা শোভিত



বলভাচার্য, পুত্র পঙ্কেশ বিট্ঠলনাথ ও তাঁহার সাত পুত্র

হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্ট নাম সমূহ গ্রহণ করিয়াছেন, বিট্ঠলেশের অতি গুরুতর সখ্যতাবের দ্বারা ষাঁহার শরীর পুলকিত, এবং কি আশ্চর্য্য! যিনি নিজের প্রতি প্রণয়ের সার ধন নিজে তাঁহাকে দান করিয়াছেন, সেই শ্রীগোপালরাজ গিরিপুষ্ঠে সুন্দররূপে বিরাজ করিতেছেন ॥

পরবর্ত্তীকালে মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাঁহার কৃত শ্রীগোপালাষ্টকে শ্রীবলভাচার্যের গোপালের প্রতি ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ঐ স্তবেই শ্রীগোপালদেব যে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর দ্বারা আবিষ্কৃত, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্বেই শ্রীজীবের অধিনায়কত্বে বঙ্গদেশীয়

যশোহরের রাজা জানকীবল্লভ বা বসন্তরায়ের পিতা পরম ভক্ত গুণানন্দ গুহের অর্থে শ্রীল মদনমোহনের স্মৃৎ মন্দির নির্মাণের কথা বিবৃত করিয়াছি। শ্রীবন্দাবনের স্থানীয় প্রবাদমূলে জানা যায় যে, শ্রীবন্দাবনে কেশীঘাটের পার্শ্বস্থ একটি টীলার উপর গুণানন্দ গুহ এই মন্দিরটিও নির্মাণ করেন, এবং এই মন্দিরে ষুগল-কিশোরজী বিগ্রহ স্থাপন করেন। পরে আওরঙ্গজেবের অত্যাচারের সময় এই মন্দিরের বিগ্রহ রাজপুতানার ঝাঙ্গাপান্না রাজ্যে অপসৃত হন। মন্দিরটিতে এখন আর কোনও বিগ্রহ নাই। এই মন্দিরটি যদি গুণানন্দ কর্তৃক নির্মিত হইয়া থাকে, তবে শ্রীজীবের তত্ত্বাবধানেই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। এই মন্দিরটি শ্রীমদনমোহনজীর মন্দিরের অন্তর্করণে নির্মিত। মন্দিরটির জগমোহনের পার্শ্বে যে শিলালেখটি আছে, তাহাতে “সংবৎ ১৬৮৪ বর্ষে শ্রাবণ বদি দশমী” এই কথাগুলি ক্ষোদিত আছে। ১৬৮৪ সংবৎ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ।

যাহা হউক, শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবন্দাবনে মন্দির নির্মাণ ও শ্রীবিগ্রহসেবার বন্দোবস্ত করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৌরব সর্বতোভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে * এই গৌরব-চিহ্ন বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইলেও সেই চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বর্তমানের ঐতিহাসিক অন্বেষণের ফলে জানিতে পারা যাইতেছে। ফলতঃ, শ্রীজীবের কর্ম-শক্তি, শুদ্ধা শাস্ত্রচর্চা ও ভক্তিগ্রন্থ রচনাতেই পর্যাবসিত হয় নাই—শ্রীবন্দাবনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতেও তাহা যে স্পষ্টভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

* আওরঙ্গজেব ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আবেদন নবীকে মথুরার ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ইহার অত্যাচারে গোকুল নামক এক জন জাঠ-সর্দার বিদ্রোহী হইয়া ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আবেদন নবীকে হত্যা করেন। এই বিদ্রোহদমনের জগ্ন কয়েক জন সেনানীকে প্রেরণ করিয়া যখন বিদ্রোহদমনে কৃতকার্য হইলেন না, তখন ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব স্বয়ং বিপুল বাহিনীসহ আগমন পূর্বক মথুরার ও বন্দাবনের অনেক দেবমন্দির ভগ্ন করেন। এই অত্যাচারের সঙ্কল্প পূর্বাভূত জানিতে পাবায় শ্রীল মদনমোহন, শ্রীল গোবিন্দদেব ও শ্রীল গোপীনাথ জয়পুরে নীত হন। শ্রীল গোবিন্দনাথ গোপালকে উদয়পুরের সিহাড গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। উদয়পুরের বাণা রাজসিংহ ঐ গ্রাম গোপালকে দান করেন। ঐ গ্রামের নাম পরে ‘নাথদার’ হয়, এবং শ্রীনাথজী ঐ স্থানে অত্যাচার অবস্থান করিতেছেন। বল্লভ সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীনাথজী এখন ঐ স্থানে রাজবৎ সেবা লাভ করিতেছেন।

কেরাণী-জগৎ

গালি আর গঞ্জনা যাদের ধাতস্থ

সস্তা নিজের বলে' নেইক' সে কিচ্ছু,

নকল করিতে যারা ওস্তাদ মস্ত

কেরাণী-জগৎ মাঝে তারাই তো বিচ্ছু !

চাকরী তাদের বল কেবা পারে মাবুতে ?

সামনে তোমার মিতা—বাইরে লাগাচ্ছে !

অয়েলিফাইং আর্টে চায়নাক' হারুতে,

দেঁতো-হাসি হেসে বেশ কাজ তো বাগাচ্ছে !

হাওড়ার পুল আর ক্লাইভ ষ্ট্রীটেতে

গুনেছ কি শুধু ভাই আফিসের নিন্দা ?

পৃথিবীর এক কোণে, একই এই পীঠেতে

উড়িয়া কি এল শেষে সেই কিঙ্কিন্দা !

বিচার আর কোথা আছে আমারি তো জাত-ভাই,

ছুর্ল বলি কিসে, বাড়ীতে তো যোদ্ধা !

যতো দাও—নাহি দাও—তবু তার ছাঁদা চাই,

পন্নীরে নিয়ে কেউ লুখী নয় মোদা !

গালি আর গঞ্জনা হক' সে বরাদ্দ,

আফিস সে গুলুজার তবু পর-নিন্দায়,

বড় বাবু করে চায়—কার বাড়ী শ্রাদ্দ...

নাহি ভেবে সত্যি কি কাহারো সে দিন যায় ?

এক-একটি টুল নিয়ে—থুড়ি সে কাউণ্টার

বসে' আছে এক-একটি দিল্লীকা লাড্ডু ;

ঈশ্বরই জানে—জ্ঞানে কতো সে দৌড় কার,

মেরেছেন হলে গিয়ে কেবা কটা গাড্ডু !

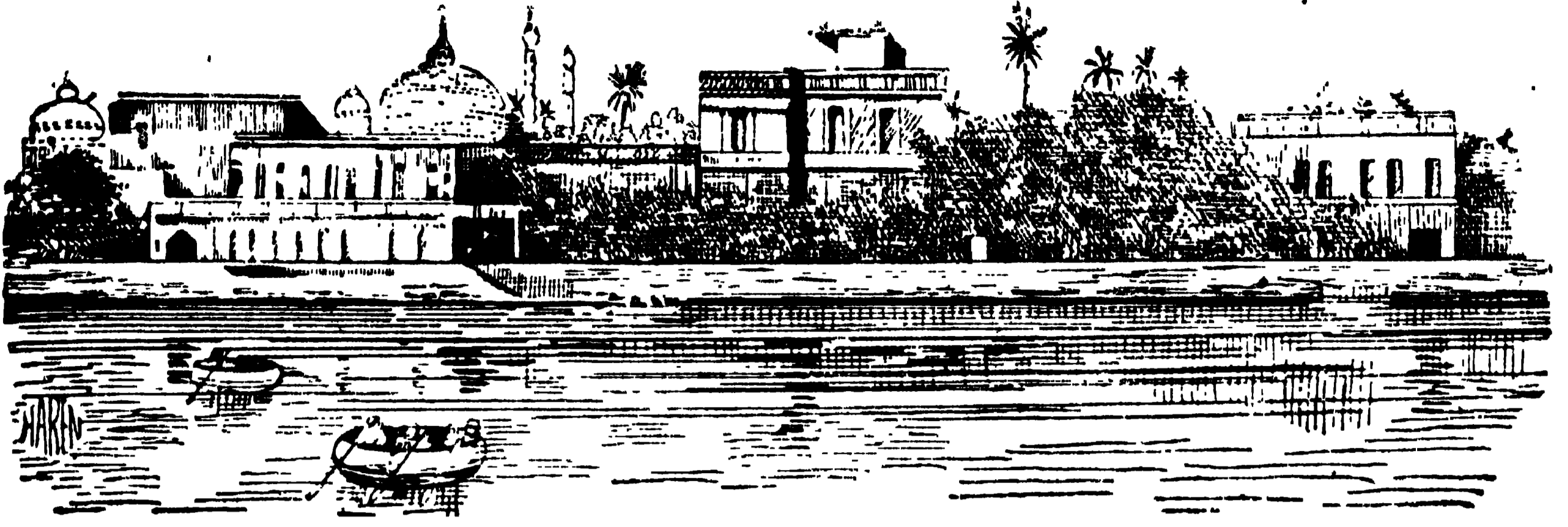
ভিখারী-জগৎ আর কেরাণী-জগৎ এই—

তফাৎ কি এ ছুয়ের মাঝে আছে কিচ্ছু ?

চাকরী পাওয়ার চেয়ে শক্ত তো করা সেই ;—

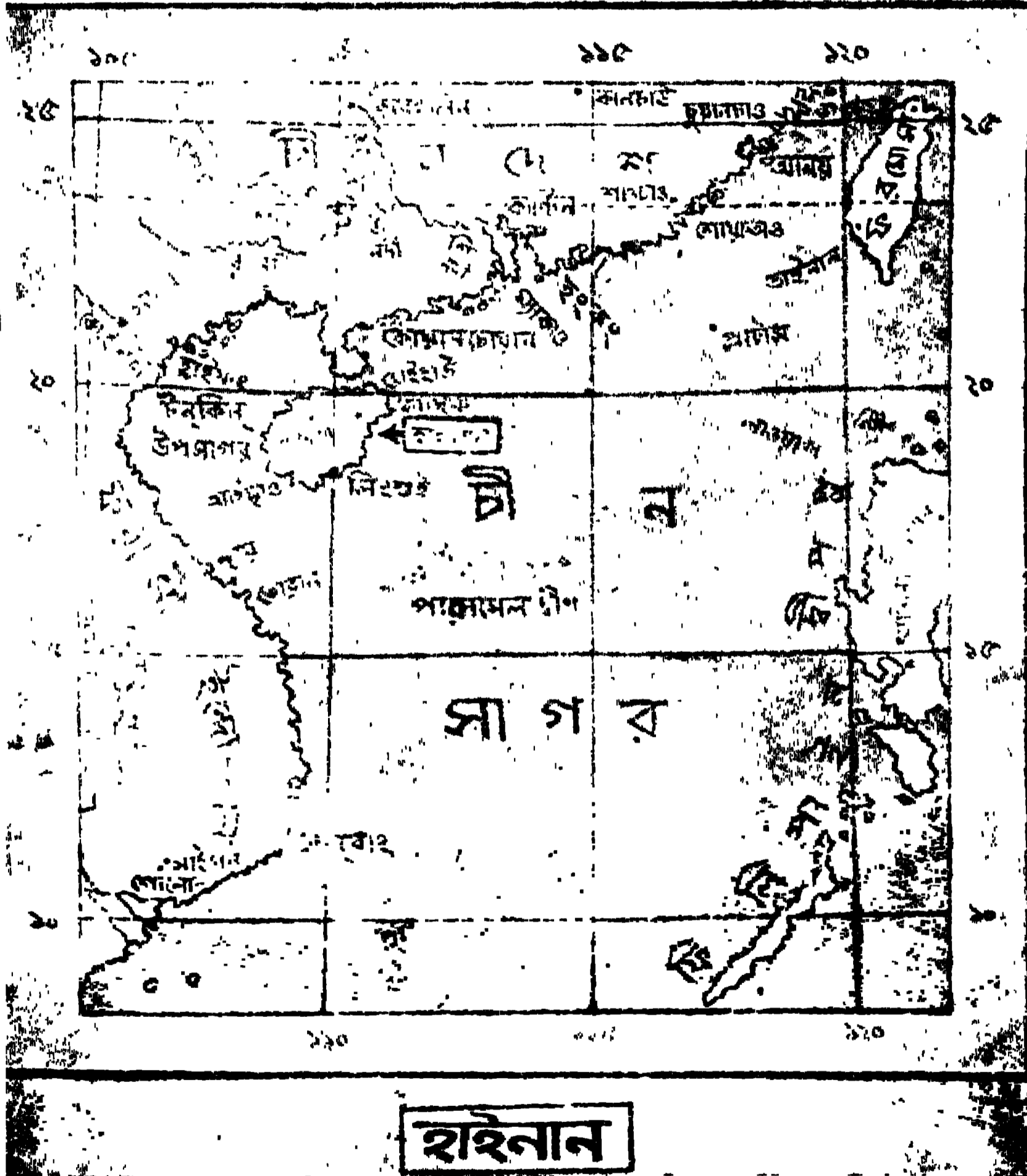
কেরাণী মানেই বুঝি ঘাগী আর বিচ্ছু !

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।



হাইনান

সে দিনের কথা! ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে থপরের প্রদেশের অনেক জায়গা জাপান অধিকার করিয়াছে, এবং কাগজে টেলিগ্রাম ছাপিয়া বাহির হইল, হাইনানে এবং হানয়ের জাপানীদের প্রতি আদেশ জারি হইয়াছে, ক্যান্টনে জাপান নাকি মহা-সমারোহে সমর-আয়োজন অচিরে সকলে হানয় ত্যাগ করিয়া যাও।



হাইনান

মানচিত্র

করিয়াছে! এদিককার প্রাচী-বৃহৎ হাইনান হইবে সংখ্যক আমেরিকান ও যুরোপীয়ান।
 জাপানের প্রধানতম সমর-ধাঁটা! তার পর চোখের এখানকার পাহাড়ে-জঙ্গলে যে সব লোহী বাস করে,
 পলক-পাতে আবার সংবাদ আসিল, দক্ষিণ-কোয়াংশোয়ান তাদের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ।

এই হাইনান, হানয় প্রভৃতি প্রদেশ সম্বন্ধে এত কাল কোনো সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন ছিল না! ছেলে-বেলায় জিওগ্রাফি পড়িবার সময়ে হাইনানের কথা পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না!

চীন-উপসাগরের বুকে হাইনান একটি ছোট দ্বীপ। দক্ষিণ-চীন এবং ফরাশী-অধিকৃত ইন্দো-চীনের মাঝখানে দুর্গের মতো এ দ্বীপটি অবস্থিত।

দ্বীপটি আয়তনে চৌদ্দ হাজার বর্গ-মাইল মাত্র। খৃষ্ট-জন্মের দু' হাজার বৎসর পূর্ব হইতে এ-দ্বীপটি চীনের অধিকারে আছে। কিন্তু কাগজে-কলমে চীনের অধিকারে থাকিলে কি হইবে, এ-দ্বীপে সেকালের প্রাচীন বুনো লোহী জাতির বাস; খাঁটা চীনার সংখ্যা এ-দ্বীপে খুব কম।

এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা এখন প্রায় পঁচিশ লক্ষ; তার মধ্যে আছে লোহী, চীনা, এবং মুষ্টিমেয়-

‘হাইনান্’ চীনা কথা। এ-কথার অর্থ দু’টি। এক অর্থ, সমুদ্রের দক্ষিণ দিক; অপর অর্থ, ‘দৈত্যের পুচ্ছ’ (Tail of the Dragon)। কেন এ নাম, কেহ বলিতে পারে না! এখানকার লোকজনের আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতিও আগাগোড়া রহস্যময়।

১১১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে চীনারা হাইনান্ আক্রমণ করিলে লোই-রাজা উউ-তি বিপুল বিক্রমে সে-আক্রমণ রোধ করিয়াছিল। তার ফলে এ-দ্বীপে চীনারা প্রবেশ করিয়া

বসতি-স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। তার প্রায় দু’শো বৎসর পরে হাইনান্ হয় চীনের অধিকার-ভুক্ত; তবু লোইদের দেশে চীনারা বসবাসের সুব্যবস্থা করিতে পারে নাই!

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৬ জুন তারিখে নিকল স্মিথ এবং লিয়োনার্ড ক্লার্ক নামে দু’জন মার্কিন ভ্রমণলোক

হাইনান্ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। অনেকে বহু নিষেধ করিয়াছিল; তাঁরা সে নিষেধ মানেন নাই। তার পর হাইনান্ হইতে ফিরিয়া শ্রীযুত লিওনার্ড ক্লার্ক সে ভ্রমণের যে কাহিনী লিখিয়া প্রকাশ করেন, আমরা তাহা সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

হঙকঙ হইতে যাত্রা করিয়া হাইনানের হোইহো-বন্দরে তাঁরা জাহাজ হইতে নামেন। হোইহোর মার্কিন পাদরী রেভারেণ্ড জন ষ্টীলারের গৃহে তাঁরা আতিথ্য গ্রহণ করেন।

হোইহোতে তখন কলেরার প্রাদুর্ভাব। নামিয়া তাঁরা গুনিলেন, সহরে প্রত্যহ প্রায় একশো-দেড়শো লোক

মরিতেছে। সেজন্য সহরে কোয়ারান্টাইন্-বিধির ভারী কড়াকড়! সহর হইতে কাহারও কোথাও যাইবার উপায় নাই। শবদেহ রাত্রে কবরিত করা হয়; দিনের বেলায় পথে-ঘাটে লোকের ভিড় বলিয়া সে সময় ‘মড়া’ বাহির করা নিষেধ! পথে-ঘাটে বড় বড় পতাকা উড়িতেছে; সে সব পতাকায় কলেরা-প্রতিষেধ ও প্রতিকারের বিধি লেখা। লেখা আছে—কাটা ফল কদাচ খাইবে না; মাছি তাড়াও। কলেরার এ-মড়কে শেষে এমন



হোইহো-বন্দর

হইল যে, কফিন তৈয়ারী করিবার জন্ত কাঠ মেলে না! তখন ব্যবস্থা হইল, কবলে জড়াইয়া ‘মড়া’ বাহির করো!

ক্লার্ক সাহেব বলেন, এ অঞ্চলে কোনো ব্যাধি একবার দেখা দিলে তাহা প্রায় মহামারী-রূপে নিজেকে প্রচণ্ড-বিক্রমশালী করিয়া তোলে; এবং এ-সব ব্যাধির মধ্যে কলেরার প্রতাপ এখানে সবচেয়ে বেশী।

এই কলেরার প্রাদুর্ভাবের জন্ত হোইহো-সহরে দু’চার দিন থাকিতে তাঁদের সাহস হইল না,—মোট-মোট বাধিয়া মোটরে চড়িয়া ধূলা-পায়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবর্তী চীনা সহর নোদোয়ার বাহির হইয়া পড়িলেন। নোদোয়ার কাছেই প্রাচীন অধিবাসী লোইদের বাস।

নোদোয়ায় রেভারেণ্ড মোলেশের গৃহে তাঁরা অতিথি হইলেন। মোলেশ বলিলেন,—এখানে আসি-
য়াছ, কিছু সাবধান! এখানকার ম্যালেরিয়া একে-
বারে সাংঘাতিক টাইপের। যাকে বলে, malignant
malaria। তার উপর বিউবনিক প্লেগ ওদিক হইতে
তাড়া খাইয়া এ-দ্বীপে যে-দাঁটা বাঁধিয়াছে, সে-দাঁটা
ছাড়িবার তার নাম নাই।

এ কথা শুনিয়া ক্লার্ক সাহেব চমকিয়া উঠিলেন।



দোভাষী উয়োগ

বলিলেন, ভালো দেশে আসিয়াছি তো! অবস্থা যেন
সেই রামায়ণের মারীচ-কুরঙ্গের মতো! হোইহোতে
কলেরা—কলেরা ছাড়িয়া এখানে আসিলাম! এখানে
আবার করাল-ম্যালেরিয়া এবং বিউবনিক প্লেগ!

রোগের নাম শুনিয়া তাঁরা নোদোয়ায় বাস করা
সমীচীন মনে করিলেন না। পরের দিন অর্থাৎ ২০ জুলাই
তারিখে প্রাতে নোদোয়া ত্যাগ করিলেন। এ-যাত্রায়
একখানি ফোর্ড-কার মিলিল। প্রসিদ্ধ ফিল্ম-অভিনেতা
ওয়ালেশ বীরী এককালে এ-গাড়ীর মালিক ছিলেন।
তাঁরা এ-গাড়ীতে চড়িয়া চষা-মাঠ এবং জঙ্গল
ভেদ করিয়া সোজা কয়েক-মাইল-দূরবর্তী নন-ফঙের

বাজারে আসিলেন। এ বাজারটি চীনা লোই আতির
বাণিজ্যকেন্দ্র।

নন-ফঙে এক স্কুলের কম্পাউণ্ডে ছাউনি ফেলিলেন।
এখানকার টোল-কর্মচারী চীনা চিয়া জী হঙ্ তাঁদের
খাওয়াদি রাঁধিয়া দিল।

লোকের মুখে সংবাদ শুনিয়া বৈকালে প্রায় একশো
লোই আসিয়া কম্পাউণ্ডে জমায়েৎ হইল। বলিল, কলের
গান-বাজনা আনিয়াছ। সে-গান-বাজনা শুনাও।

রেকর্ড বাজা-
টতে হইল।
তাঁদের আমোদ
একেবারে সীমা-
হীন হইয়া উঠিল!
কৃতজ্ঞ লোক-জন
সেবা-পরিচর্যা র
জন্ত লা লা য়ি ত
হইল।

পরের দিন
সকালে সাড়ে
পাঁচটায় ক্লার্ক
সাহেব বহু স হ
হাইনানের নিবিড়
অভ্যন্তর-ভাগে
যাইবার জন্ত
প্রস্তুত হইলেন।

এ-পথে গাড়ী চলিবে না; হাঁটা পাড়ি ভিন্ন উপায়
নাই! সেজন্ত দড়ির ক'জোড়া শাণ্ডাল-জুতা সংগ্রহ
করিলেন। মোট বহিবার জন্ত লোই-কুলি সংগ্রহ করা
হইল। তার পর যাত্রা।

পথে লোই নর-নারীর কি ভিড়! একা এরা কখনো
পথে চলে না; দশ জন বারো জন করিয়া দল বাঁধিয়া পথে
চলে। পুরুষদের পরণে খাটো পা-জামা বা কোঁপীন,
মেয়েদের পরণে খাটো ঘাগরা; সকলের পিঠে আছে
বড় বড় ছুরি এবং ঝুড়ি। এই ঝুড়ি যেন এক-একটা
সংসার! ঝুড়ির মধ্যে আছে তীর, ধনু, খাণ্ড, পানীয়
এবং ধূমসেবার ছঁকা-নল। সকলের মাথায় দীর্ঘ কেশ;

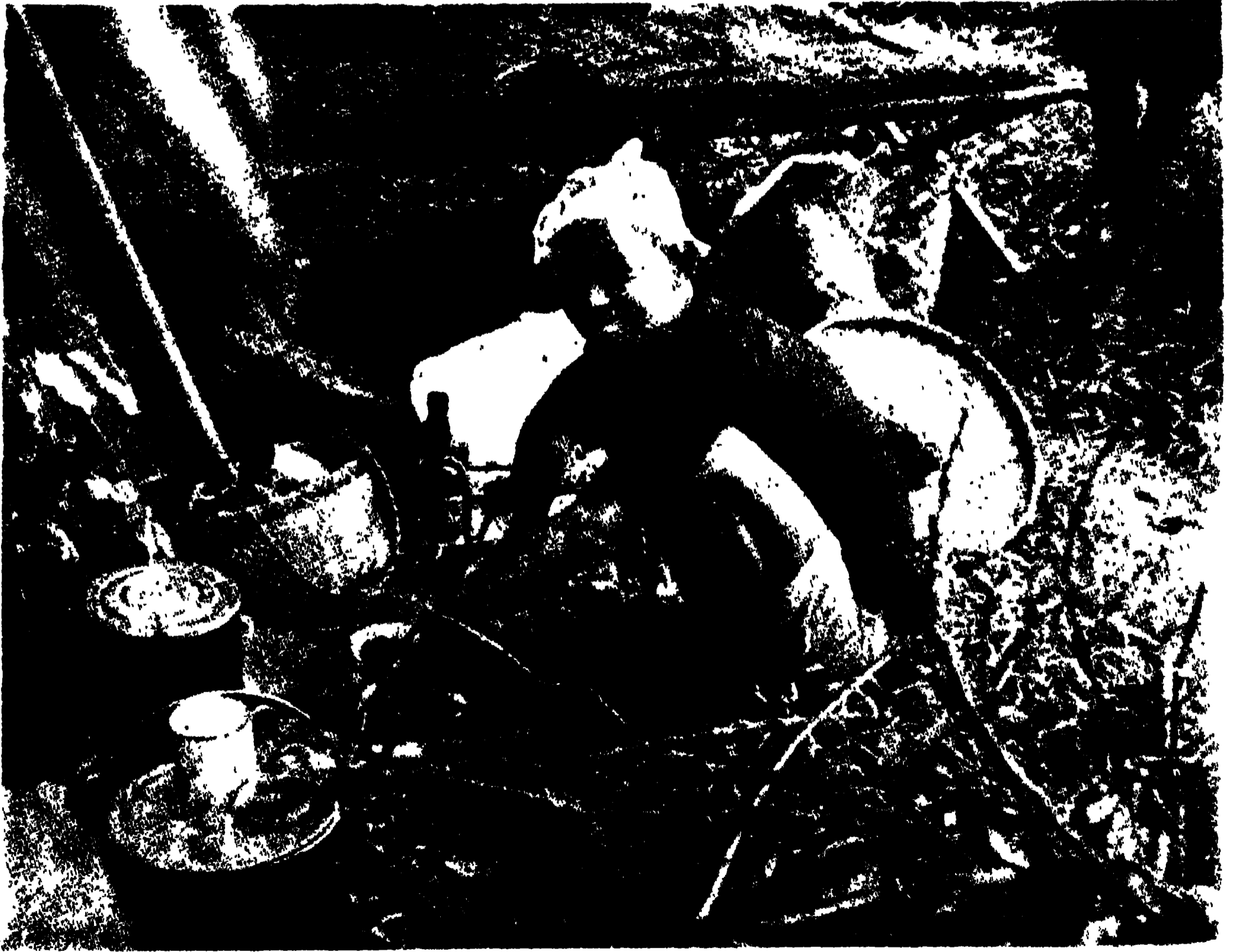
কপালের উপর
ঝুঁটি বাঁধা। এ
ঝুঁটি সামনের
দিকে তিন-চার
ইঞ্চি ঝুঁকিয়া
আছে। মাথার
এই ঝুঁটি এ-জাতির
বিশেষত্ব।

লোই জাতি
ছাড়া এ-স্বীপে
আরো কয়েকটি
উপজাতির বাস
আছে। উপজাতি-
গুলির মধ্যে প্রধান
দু'টি :—বা - সা -
ডাং ; এবং হা।
হা-জাতের লোক
চিকিৎসা করিয়া
বেড়ায়। সকল
সময়ে তা দে র
সঙ্গে আছে গাছ-
গাছড়া, শিকড়,
বানরের শুষ্ক
চামড়া, সাপের
চামড়া, ব্যাঙের
চামড়া প্রভৃতি।
তারা শুধু ঔষধ
দেয় না, মন্ত্র পড়ে ;
ঝাড়-ফুক করে।

অঙ্গলের পথে
ইঁহারা আসিয়া
এক পাহাড়ের
কোলে পৌঁছি-
লেন। এ পাহা-
ড়ের নাম “লাল-
কুমাশা পাহাড়”।



কুমারীর খোঁপায় কাঁটা



চিয়া জী হও

পাহাড়ের গায়ে
দীর্ঘ তৃণপল্লব;
এখানে বহু চন্দনা
পাখীর বাস।

পাহাড়ের নাম
'লাল-কুয়াশা'
কেন হইল, বহু
সন্ধানও জানা
গেল না। এখানে
প্রচুর বৃষ্টি হয়।
পাহাড়ের কোলে
ছাউনি ফেলিয়া
ক্লার্ক ঠিক করি-
লেন, দু'দিন
এখানে বাস
করিবেন।



সন্ধানের মাথায় বৃষ্টি

সন্ধানের দিকে
মেঘ করিয়া প্রচণ্ড
ঝড় উঠিল। সঙ্গে
সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের
সমারোহ তুলিয়া
শুষ্কধারে বৃষ্টি।
সে ঝড়ে-জলে
কানাতের ছাউনির
প্রাণ-সংশয় ঘটিল।
কানাত ফুঁড়িয়া
ভিতরে জল
পড়িতে লাগিল।
দু'ঘণ্টা পরে ঝড়-
বৃষ্টি থামিল।
বাহিরে নিশ্চল
আকাশ। আকাশে
চাঁদ উঠিল।



ক্লার্ক ও নিকল
ছাউনির বাহিরে
আসিলেন।

পাহাড়ী লোই

চারিদিক জলে জলময়। সহসা শুনিলেন, মোটরের হর্ন বাজিতেছে। এ-বনে মোটর! বিস্ময়ে ছ'জনে অভিভূত হইলেন। বিস্ময়ের চমক ভাঙিলে দেখেন, মোটর নয়—ছ'টা বুনো মহিষ তাঁদের ছাউনি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। আক্রমণের মতো ভঙ্গী! ক্লার্ক তাঁর লোক-জনকে ডাকিলেন। লোক-জন আসিল। মহিষ দেখিয়া তারা বলিল,—ভয় নাই সাহেব। উহারা আশ্রয় চায়!

মহিষকে আশ্রয়টুকু ছাড়িয়া দিয়া ছ'জনে ছ'খানা

চেয়ার লইয়া ছাউনির বাহিরে বসিলেন। কি মশা! যেন দশ-বারো দল ব্যাঙ-ওয়াল বাজনার কশরতি লাগাইয়াছে—ঝাঁ কে-ঝাঁ কে মশা উড়িতেছে! তাঁদের আলোয় মশার ঝাঁককে দেখাইতে ছিল যেন সাদা কাগজের উপর কে কালি লেপিয়া দিয়াছে! ছ'হাতে সেই মশক-অকৌহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাত্রি

কাটিল। শেষ রাত্রে আকাশের বর্ণ হইল জবার মতো রাঙা। সে রক্ত-রাঙা বর্ণোচ্ছ্বাস দেখিয়া ছ'জনে অভিভূত-প্রায়, এমন সময় উয়োঙ নামে চীনা দোভাষী আসিয়া সত্রাসে জানাইল—ভয়ের কথা, ছ'জনে।

ক্লার্ক বলিলেন,—কিসের ভয়?

সে বলিল,—লোই ভূতের দল আকাশের ও-দিক হইতে এ-দিকে আসিতেছে—মহা-অনিষ্ট করিবার মতলব!

হাসিয়া ক্লার্ক বলিলেন,—কুসংস্কার! তুমি লেখাপড়া শিখিয়া দোভাষীর কাজ করিতেছ। এ কুসংস্কার তুমি কি বলিয়া মানো?

উয়োঙ বলিল,—আমরা চীনা-জাত। জানি ছ'জনে ও-রঙে কত বিপদ! এ নূতন কথা নয়। এমন আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া কোনো লোই যদি কাহাকেও অভিশাপ দেয়, তাহা হইলে সে অভিশাপ ফলিবেই! লোই ভূতের দল সে-অভিশাপকে না ফলাইয়া ছাড়িবে



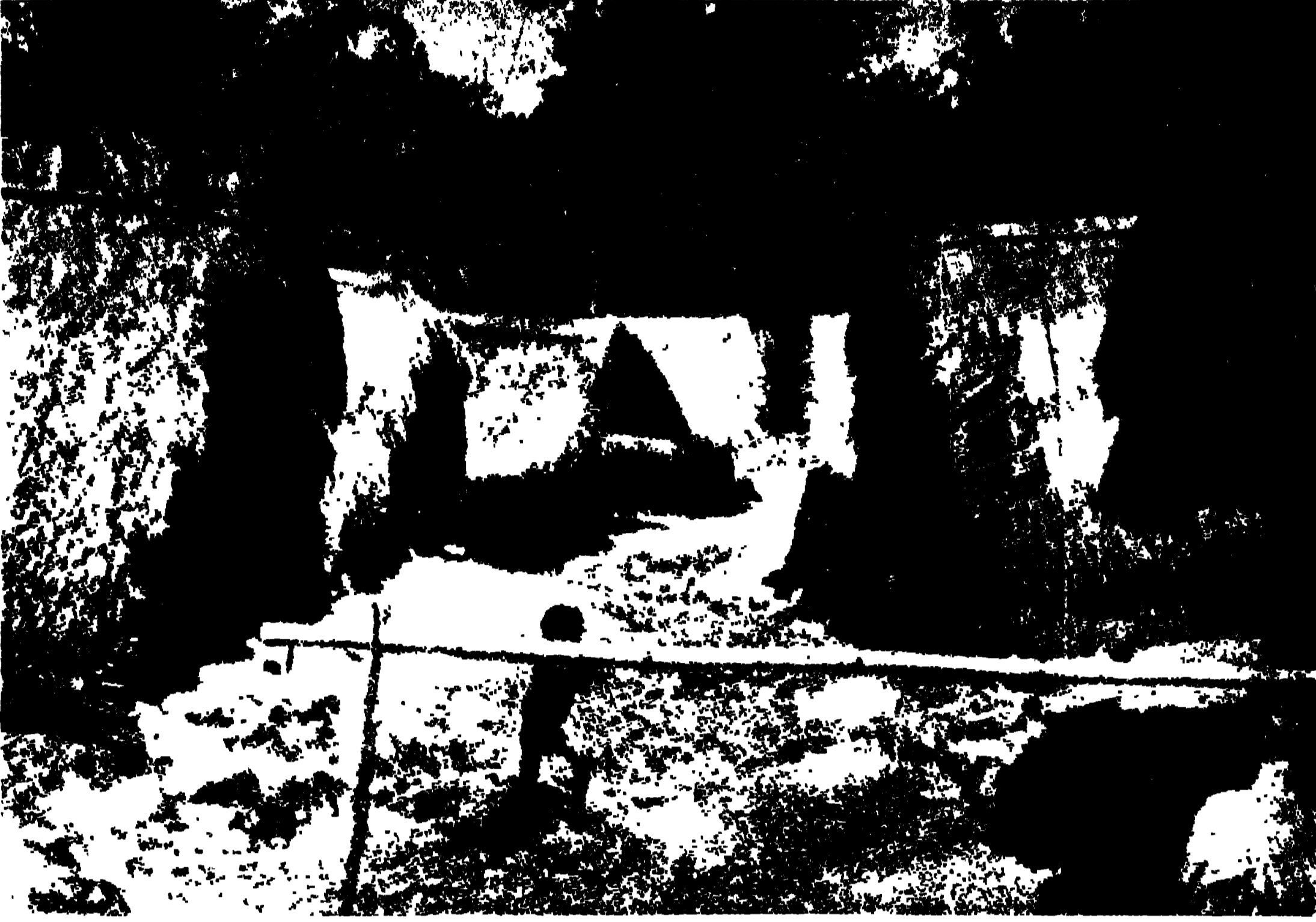
মহিষে ক্ষেত চরে

না! ছ'-পাঁচ হাজার বছর ধরিয়া তারা এমনি কাজ করিতেছে।

সকালে ছাউনি তুলিয়া সাহেব পাড়ি স্ক্রু করিয়া উত্তোগ করিয়াছেন, উয়োঙ আসিয়া বলিল, ছ'জন কুলি ম্যালেরিয়া হইয়াছে। তারা কাজ করিবে না; বাড়ী বাইবে।

তাঁদের ধরিয়া রাখা গেল না। অবশিষ্ট কুলিদের সাহায্যে মালপত্র বাহির করিয়া ছ' মাইল দূরে পাকশা

অভিযুখে সকলে যাত্রা করিলেন। পথে এখানে আর পিতলের গহনার সমৃদ্ধি-প্রচারে তাদের উৎসাহের সীমা এক দল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। এ-দলটি আসিয়াছে নাই! যে মেয়ের গায়ে যত পিতলের বোকা, সমাজে



বসত-বাড়ী

এখানকার চীনা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে এক তদারকীর কাজে।

ক্লার্ক এবং নিকলকে ক্লান্ত দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিলেন,—আমরা পায়ে হাঁটিয়া চলিব। আপনারা ক্লান্ত আমাদের ঘোড়ায় চড়ুন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা লঙ্ঘন করা গেল না। ক্লার্ক এবং নিকল ঘোড়ায় চড়িলেন এবং সকলে পাকশায় পৌঁছিলেন। পাছে ম্যালেরিয়া ধরে, এ জন্ত সকলে প্রচুর কুইনিন্ সেবন করিলেন।

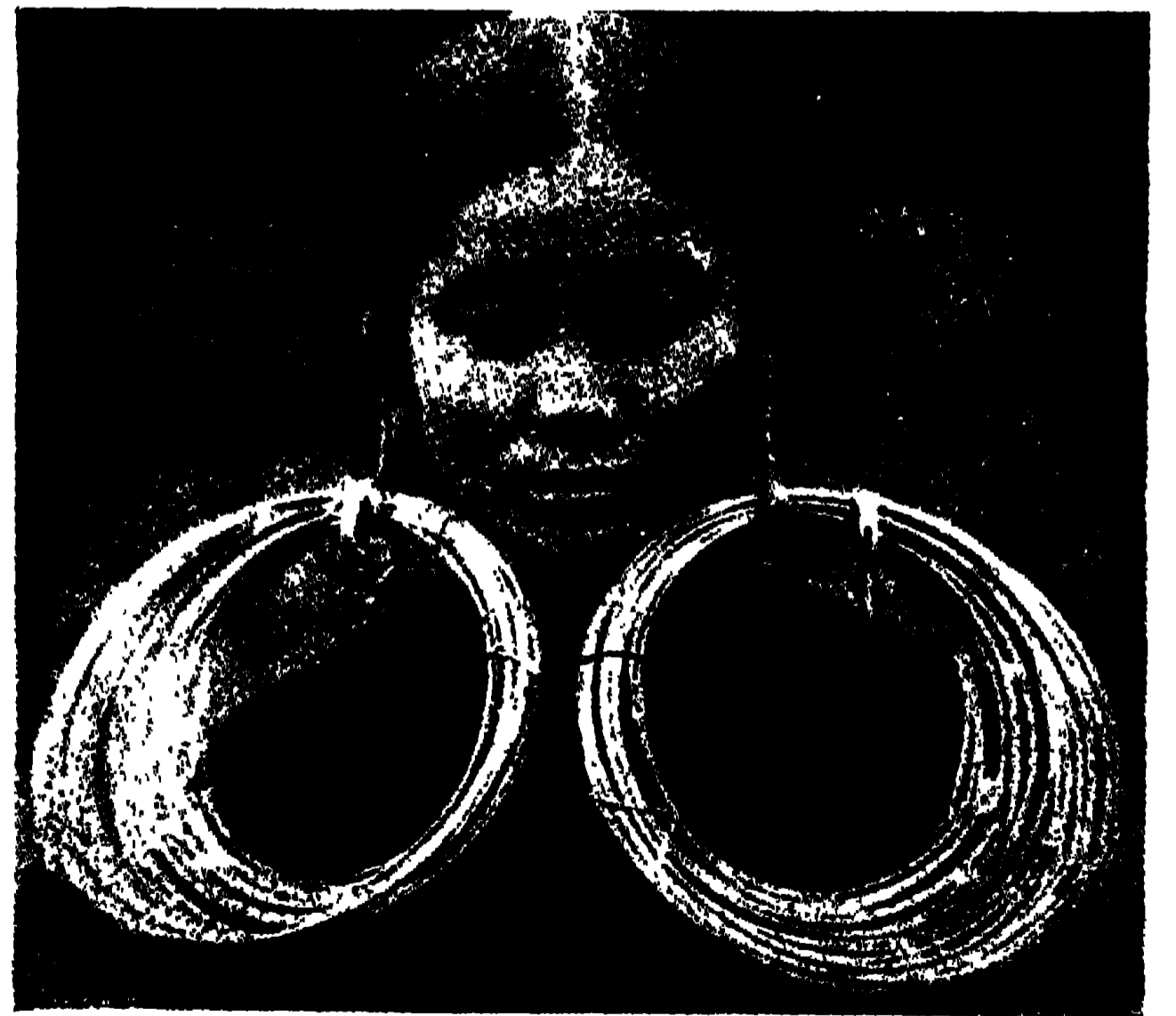
পরের দিন পাকশা ত্যাগ করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আবার পাড়ি স্ক্রু।

এ-পথে ছোট-খাট অসংখ্য নদী-নালা ও বাজার-হাট। জঙ্গলে সাপের খুব পশার! ছুঁ-তিনটা লাউডগা সাপ পায়ের নীচে দিয়া সরিয়া গেল!

এখানকার হা-জাতের মেয়েরা মুখে, হাতে, পায়ে কালো কালি দিয়া নক্সা রচিয়া দেহভূষা/সম্পাদিত করে।

তত বেশী তার প্রতিপত্তি! হা-জাতের মেয়েরা শুধু কোপীন-আবরণে লজ্জা রক্ষা করে। তাদের সঙ্গে আর কোনো আ ব র ণ নাই। কোনো কোনো পরিবারের মেয়েরা খাটো ঘাগরা পরে, ফতুয়া গায়ে দেয়। কিছু বজ্রা বরণ থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না— পিতলের দশ-বারো পাক

ইয়ারিং কাণে লাগাইতে পারিলে এ-জাতের মেয়েরা ভাবে, ইহজন্মে কামনা করিবার আর-কিছু নাই।



বড়-ঘরের মেয়ে—মাকড়ির সঙ্গে ৫৬টি রিং গাঁথা! উৎসবের সময় এ মাকড়ি কাণে আঁটিলে পদমৰ্যাদা জাহির হয়

মান-সভ্রম ঐ ইয়াবিংয়ে ! জঙ্গল-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে ২৮ মাইল দূরে এক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। এ গ্রামের সচল ছবি লইয়া দেখাইতেছিলেন, এমন সময় গ্রামের বা-সা-ডাং সর্দার ফু কুই হেইক আসিয়া দোভাষী উয়োঙকে ডাকিয়া বলিল, সে ৭৬খানি গ্রামের মোড়ল। গ্রামের লোক আসিয়া তার কাছে নালিশ করিয়াছে, সাহেবরা তাদের ঘর-বাড়ী ও মেয়ে-লোকের ছবি তুলিতেছে। ইহাতে তারা খুব রাগিয়াছে ! ছবি তোলা বন্ধ করিতে হইবে, নচেৎ হাঙ্গামা বাধিবে।

ক্রাক ছবি তুলিতে চাহিলে তখন কেহ কিছু আপত্তি



গালে-ঘাড়ে নক্সা তাঁকিয়া রূপ-সজ্জা

করে নাই। তার পর সে-ছবি দেখাইবার সময়ে এ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে !

উয়োঙ লোকটি খুব চতুর। ফু কুই হেইককে সে বলিল, এ ছবি তুলিবার উদ্দেশ্য জানো ? সাহেবরা ব্রিটিশ মলয়ের হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁরা ছবি তুলিয়া দেখিতে চান, দেশের লোকদের স্বাস্থ্য কেমন। অসুস্থদের চেহারা দেখিয়া বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া তাদের আরোগ্য করিয়া তুলিতে চান। এ কথায় সর্দারের ও সকলের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়।

এখানে স্ত্রী-পুরুষ গায়ে নীল কালির নক্সা রচে। নানা ছাঁদের নক্সা। পুরুষের গায়ের নক্সা, আর মেয়েদের গায়ের নক্সা—হু' নক্সার ছাঁদে পার্থক্য আছে। নক্সা

আঁকার রীতি চলিয়া আসিতেছে সেই মাকাতার আমোল হইতে। নক্সা কেন আঁকে, তার কারণ কেহ জানে না।

বা-সা-ডাং-জাতের মেয়েরা হু' কাণের ডগায় ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে গোঁজে রূপার প্লাগ। এ প্লাগের সঙ্গে চার ইঞ্চি দীর্ঘ রূপালি চেন বাঁধা থাকে। বিবাহিত নারীরা মাথার খোঁপায় রূপার ও চ্যাচারির চিকুণ গোঁজে। কুমারী-মেয়েদের এ চিকুণী গুঁজিতে নাই; গোঁজা নিষেধ। তারা মাথার চূড়ায় গোঁজে গোকর



মিয়ায়ো-মাকডির ভারী আঁকড়ি

পাঁজরার হাড় ! এখানকার লোক ভয়ঙ্কর কুসংস্কার মানিয়া চলে। তারা যেমন লাজুক, তেমনি অহঙ্কারী। এখানে মানুষ-মারার রীতি আদৌ নাই !

হাইনানের ঠিক মাঝখানে হারানো উপত্যকা (Lost Valley) যে সব লোকের বাস, তারা লোহী নয়—জাতে তারা মিয়ায়ো। এই মিয়ায়ো জাতি দক্ষিণ-চীন হইতে প্রায় সাত-আট শত বৎসর পূর্বে আসিয়া বাসা বাধিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা তিনশো পঞ্চাশ। এ জাতের সঙ্গে লোহী-জাতের বিবাহাদি চলে না।

মিয়ায়ো-জাতের মেয়েরা বিলাতী-মঠধারীদের (Monks) মতো লম্বা কুর্টা পরে, কাণে দেয় লম্বা রূপার মাকড়ি। এ মাকড়ি খুব ভারী। মাকড়ির আঁকড়ির মাপ প্রায় বারো ইঞ্চি! এক-এক জনের কাণের মাকড়ি এত ভারী হয় যে, সে-মাকড়ি মাথায় বাঁধিয়া রাখিতে হয়—কাণে ঝুলাইলে কাণ ছিড়িয়া যাইবে!

ছু'খানি মাত্র গ্রামে এই মিয়ায়োদের বাস। খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর। মাটিতে গোময় লেপিয়া দেওয়াল তৈয়ারী করে এবং দেওয়ালে ছু-তিনটা ফোকর রাখে।



মিয়ায়ো সর্দার

আলো-বাতাস আসিবে বলিয়া এ ফোকর রাখা নয়; এ ফোকর ভূতপ্রেতের জন্ত—ঘর ছাড়িয়া এই ফোকর গলিয়া তারা ঘর ছাড়িয়া বিদায় হইয়া যাইবে!

সমগ্র হাইনান্ দ্বীপে এই মিয়ায়ো জাতিই শুধু লিখিতে-পড়িতে জানে। ভাষা চীনা। ইহারা বাহিরের জগতের কোনো সংবাদ রাখে না। দোভাষী উয়োঙের মুখে যখন শুনি, চীন আর সে-চীন নাই, গণতান্ত্রিক (Republic) সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন তারা বিশ্বয়ে অভিতূত হইয়াছিল।

৭ই অগষ্ট তারিখে ক্লার্ক আসিলেন হাইন্যানের সবচেয়ে

দীর্ঘ নদী সুবর্ণ-নদীর তীরে। এ নদীটি চওড়ায় ২০০ ফুট মাত্র। পঞ্চাঙ্গুলি পাহাড়ের গা হইতে এ নদীর সৃষ্টি! এখানে ঘুঘু ও পায়াবতের সংখ্যা প্রচুর। বানরেরও তেমনি উপদ্রব। এ-বনে গিবন আছে। তারা মানুষের সহিত শক্রতা করে না—মানুষের সঙ্গ-সাহায্য ভালো-বাসে।

এই নদীর তীর ধরিয়া কি লম্বা আসিয়া ক্লার্ক সাহেব সদলে দেখেন, এক তুঙ্গ পর্বতের বুক হইতে ঝর-ঝর-ধারে প্রপাত-ধারা ঝরিতেছে। পাহাড়টি ২৫৭০ ফুট

উঁচু। এই জল-প্রপাতকে এখানকার লোকেরা ভৌতিক উপদ্রব বলিয়া ভয় করে! প্রপাতের ত্রিগী-মায় কেহ আসিতে চায় না! ছু'মাইল দূর বর্তী গ্রাম হইতে এ-প্রপাতের জলধারা-বর্ষণ দেখা যায়।

এই প্রপাতের পর পঞ্চ আগা-গোড়া পর্বতময়। সেই সব পাহাড়ের কোলে-কোলে

ছোট ছোট বহু গ্রাম। পাঁচ-সাতখানা গ্রামের উপর এক জন করিয়া লোক সর্দারী করে। অল্প লোকদের সঙ্গে এখানকার স্ত্রী-পুরুষের আচার-রীতিতে ও বেশভূষায় অস্বাভাবিক পার্থক্য থাকিলেও সে পার্থক্য সাধারণতঃ কাহারো চোখে পড়ে না।

কি-লম্বা হইতে পাঁচু দিনের পথে লিয়া-মুই। এখানিকে গ্রাম না বলিয়া সহর বলিলে অত্যাঙ্গি হইবে না। এখানে সভ্যতার দীপ্তি ঝলমল করিতেছে। পঞ্চ-ঘাট ভালো; ঘর-বাড়ীর শ্রীহাদ আছে। বহু ধনী বণিক এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে। সিপাহী-শাস্ত্রী আছে।

ফোজ আছে। কুল আছে, অফিস-আদালত আছে; ফোর্ট আছে; এবং এ-যুগের বিলাস-উপকরণাদিরও অভাব নাই।

এখানে কাচেক নদীর তীরে ছাউনি ফেলিয়া ক্লার্ক ও নিকল তিন দিন রহিলেন। বর্ষায় নদীতে জল কুল ছাপিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সে জলে প্রথর শ্রোত।

এই কাচেকের তীরে বহু চীনা ফোজ ছাউনি ফেলিয়াছে। এখানে তখন জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বহু মোটর জমায়েত করা হইতেছিল। চারিদিকে অজস্র সমর-সরঞ্জাম চলিয়াছে। এখানে এমন সমর-উল্লোগে ছোট দ্বীপের সর্বত্র আতঙ্কের ভাব—জাপানী আসিয়া কখন হানা দেয়। রাজনীতির সংবাদ না রাখিলেও জাপানের উপর এখানকার বুনো-জাতির বিবেকের সীমা নাই।

এখানকার দৃশ্য-সৌন্দর্য চমৎকার। এ উপত্যকা-

ভূমিটি লম্বে আট মাইল, প্রস্থে দুই মাইল। এখানকার পুরুষদের দেহ দীর্ঘ—লম্বে প্রায় সাত ফুট। পুরুষদের মধ্যে অনেকে চূড়া-বাধা কেশের উপর লাল, নীল ও সাদা রঙের পাগড়ী আঁটে। সকলের কাছে একখানি করিয়া 'টাঙ্গি' আছে! জঙ্গলে বাস এবং সে-জঙ্গলে হিংস্র পশু আছে, সাপ আছে, কাজেই বিনা-টাঙ্গিতে জঙ্গল-পথে বাহির হওয়া নিরাপদ নয়। তার উপর এই অল্প-সাহায্যে

কাঁটার জঙ্গল সাফ করিয়া পথ চলিতে হয়। পাহাড়ে উঠিতে এই টাঙ্গি মস্ত সহায়। এখানকার জঙ্গলে বাঁশ-ঝাড় প্রচুর। এ বাঁশ-ঝাড়ে এক-জাতের সাপ আছে—তাদের গায়ের রঙ অবিকল কচি লাউডগা সাপের মতো; কিন্তু লাউডগা-সাপের মতো রঙ হইলেও এ সাপগুলার দেহ আরো দীর্ঘ, আরো কুল।

ক্লার্ক সাহেব বলেন—এখানকার অধিবাসীরা অসভ্য হইলেও হ্রস্ব বা অসামাজিক নয়। তারা অতিথি-বৎসল।



বর্ণা-ধারা

অজাতকুলশীল আমরা সব গ্রামেই সর্দারদের সাদা অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি। আমাদের কুলি ও অনুচরদের ভাগ্যেও আতিথ্যের অসম্ভাব ঘটে নাই। যেখানে গিয়াছি, সাদরে সকলে এক পেয়ালা করিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে। এখানে ধানের চাষ আছে। সকলেরই ধান ক্ষেত আছে। বহু গ্রামে আমরা চাল কিনিয়াছি—মূল দিয়াছি রৌপ্যমুদ্রায় বা তামাকে! রৌপ্যমুদ্রা দিয়া



কাচেক নদী

এখানকার লোক মেয়েদের অলঙ্কার তৈয়ারী করে। তামাকের নেশাও উহাদের প্রবল। চাল প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া লম্বা হাইনানে কোথাও অন্নকষ্ট পাই নাই। মুর্গা, বরাহ ও মৃগমাংস, তরী-তরকারী, ফল-মূল প্রতি গ্রাম হইতে কিনিয়াছি—স্বল্প-মূল্যের রৌপ্যমুদ্রা কিনা তামাকের বিনিময়ে।

এখানকার বনে পাঁচ ফুট দীর্ঘ 'মুঞ্জাক'-মৃগ মিলে। এ মৃগকে ইহারী বলে পাহাড়ী-ঘোড়া। সজারু, খ্যাক-শিয়াল, উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, বানর এবং ময়াল সাপ—বনে-জঙ্গলে প্রচুর। কাঁদ পাতিয়া এই সব জানোয়ার ধরিয়া সেগুলোকে অনেকে চীনে চালান দেয়। পাখীর মধ্যে কাকাতুয়া, চন্দনা, ময়না, পায়রা, ঘুঘু এবং ময়ূর অজস্র।

এখানকার বন হইতে গিবন ও ভল্লুক ধরিয়া বহু চীনা-ব্যবসায়ী তাদের যুরোপে, আমেরিকায় চালান দেয়।

লোহীদের দেবতা 'পা থুং' বা 'মস্ত ভগবান' (Big God)। তিনি কোথায় কোন্ অজানা প্রদেশে বাস করেন, কেহ তাঁর সন্ধান জানে না বলিয়া লোহিদিগের ধারণা, ভগবানের বহু চর-অনুচর আছে। এই চরেরা গ্রামে-গ্রামে বাতাসে মিশিয়া লোকলোচনের



মাথার পাগড়ী হা-সর্দার

অদৃশ্যান্তরালবর্তী থাকিয়া কে কি করিতেছে দেখিয়া বেড়ায়। চর্জনকে সাজা দেয়। গুণীকে স্তম্ভী করে। এ সব চর

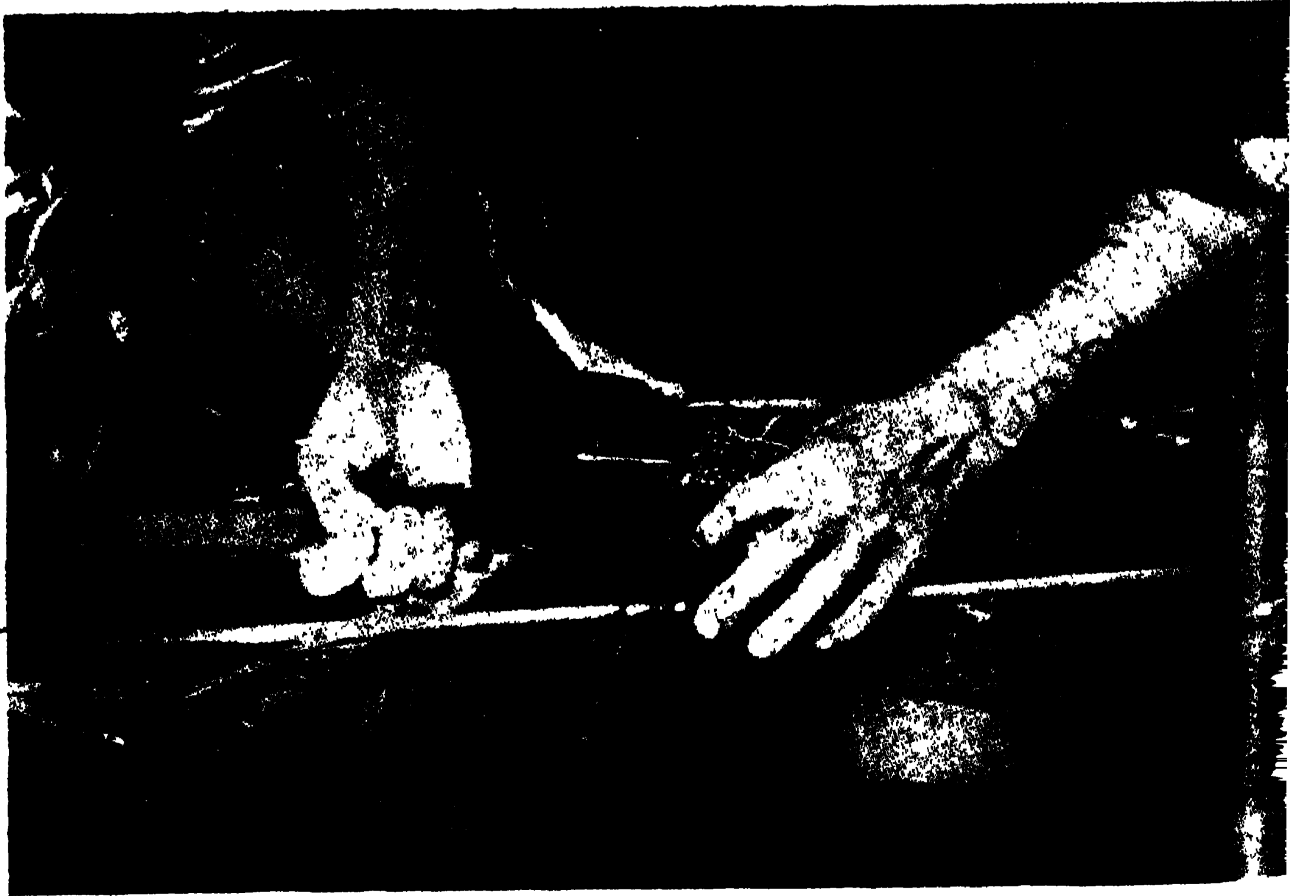
থাকে পাহাড়ের
গুহায়, গহ্বরে,
নদীর বুকে এবং
জঙ্গলে!

দেবতার এই
চরদিগকে তুচ্ছ
করিবার উদ্দেশ্যে
বলি হয়। গৃহে
অমুখ-বিস্মুখ হইলে
অগ্নি-উৎসবে
দেবতার তুষ্টি
সাধনে সমারোহ
ঘটে। প্রতি গ্রামে
মাহিনা-করা
পুরোহিত আছে।
অমুখ-বিস্মুখের
খবর তাকে দিলে
সে দেবতার কাছে
প্রার্থনা করে
মানত করে
রোগীর রোগের
ঝাড়ফুক করে।
ঝড়-বৃষ্টি ও
বিছাৎকে ইহাদের
বড় ভয়!— ঝড়-
বৃষ্টি-বিছাৎকে
ইহারা বলে ভগ-
বানের রোষাঘি-
পাত।

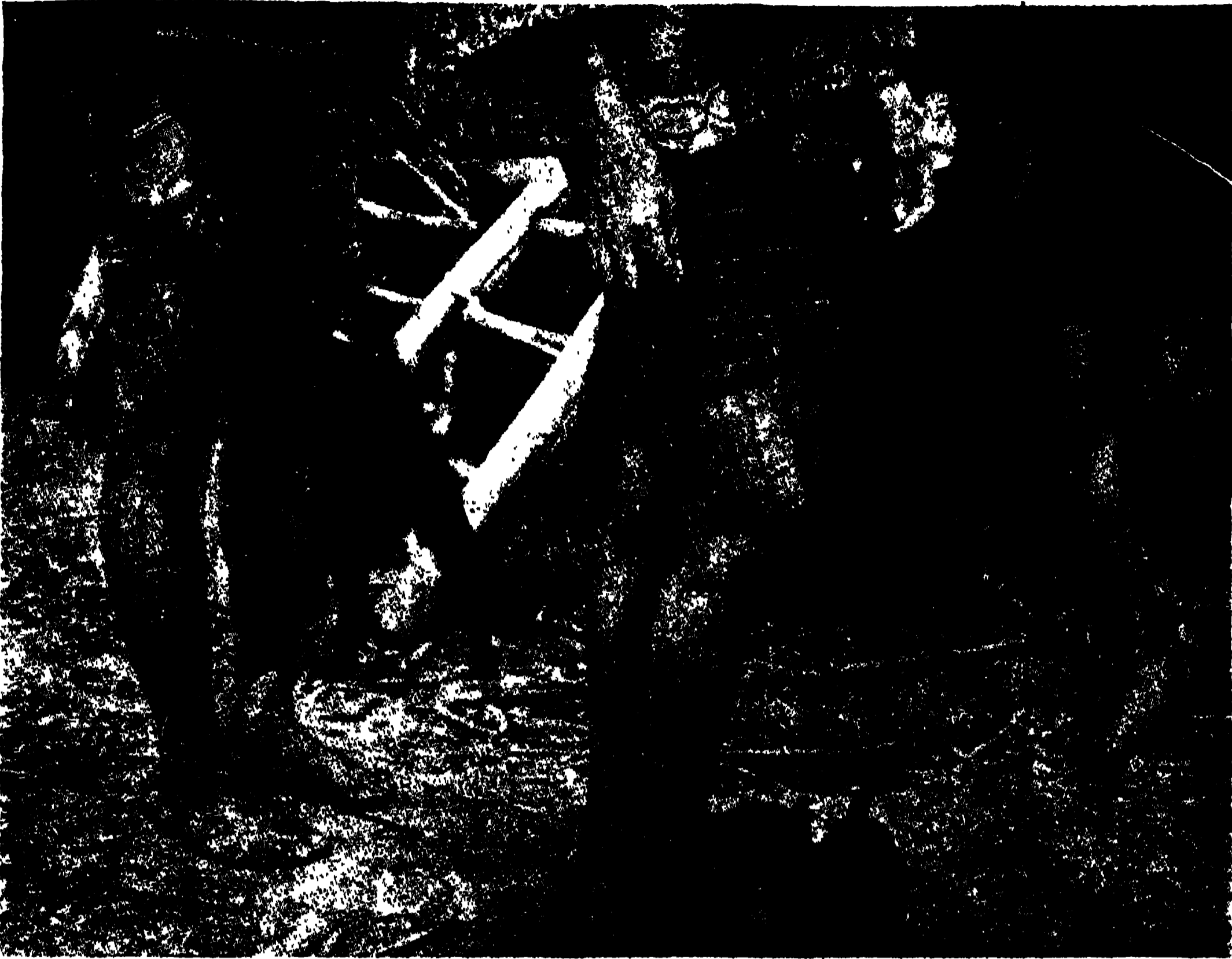
এখানকার
লোকদের মাহ
ধরিবার রীতি
অদ্ভুত! জাল বা
ছিপ ফেলিয়া মাহ
ধরে না। নদীর
জলে বিষ ঢালিয়া



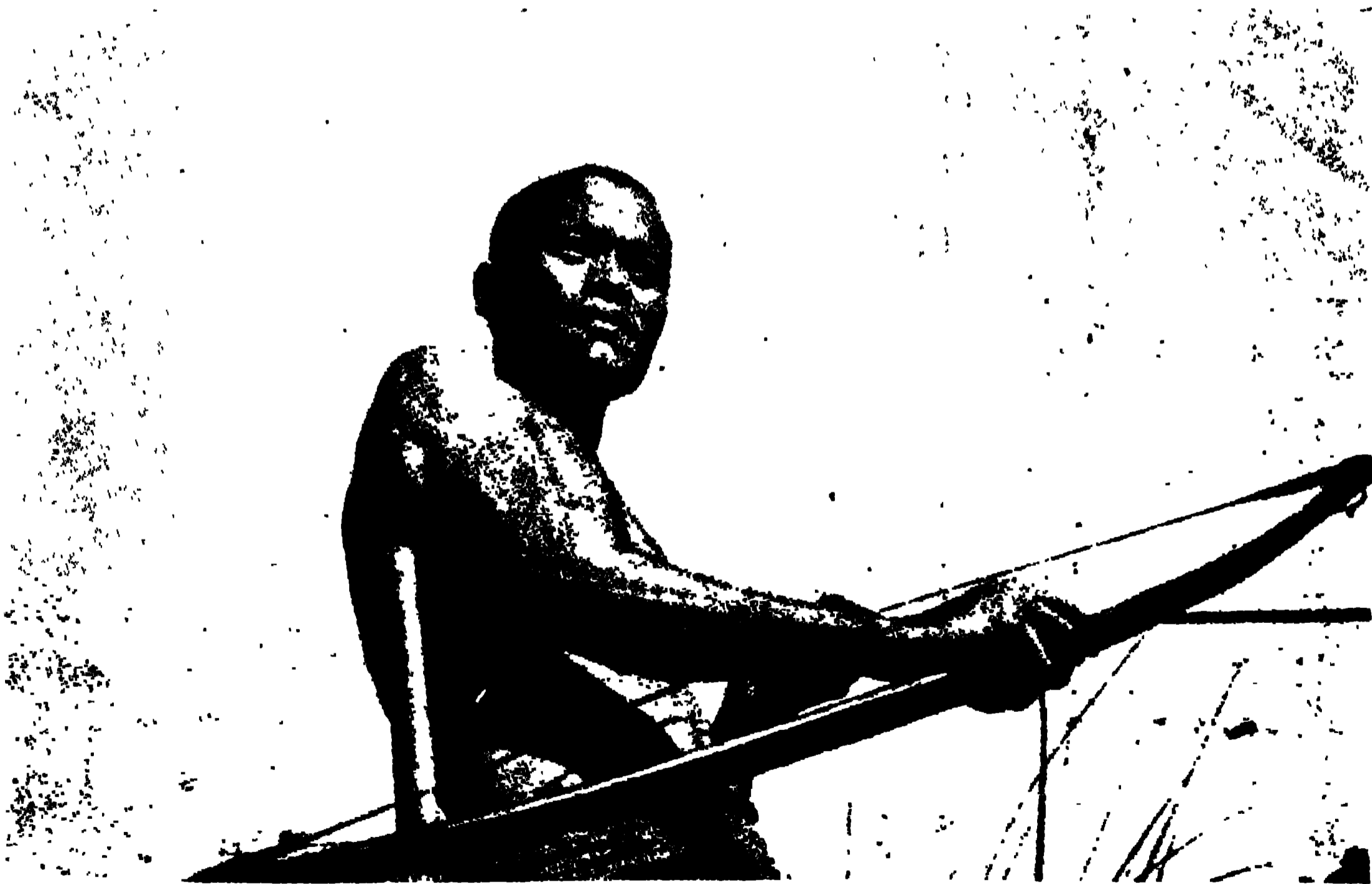
এ টালি সাথের সাধী



যবে তাঁত বোনা



এ-নক্সার রূপ-সজ্জা । হাতের বলয় এয়োতির চিহ্ন



বা-সা-ডাঙা জাহাজের শিকারী

মাছ গাঁথিয়া তীরে
তোলে ।

সব গৃহেই ছাগল
আছে । কালো
ছাগল । মিষ্টি
কালো রঙের
ছাগল ! তার উপর
ইহারা পোষে
মহিষ, শূকর
আর কুকুর ।
কুকুরের মাংস
এখানকার
লোকের কাছে
যেন স্বর্গস্থান !

লোহী-জাত
যে কাপড়-চোপড়
পরে, সে কাপড়-
চোপড় সকলে
বাড়ীতে বোনে ।
সব-ঘরেই এজন্ত
তীত আছে ।
যে যেরা তীত
চালায় ।

এখানকার
বিবাহ-প্রথায়
রোমান্স আছে
এবং সে প্রথা খুব
মডার্ন ! কোনো
তরুণ যদি কোনো
গ্রামের কোনো
জলকে বিবাস্ত
করিয়া দেয় ; সে
বিষে আচ্ছন্নবৎ
মাছ জলের বুকে
ভাসিয়া ওঠে,
তখন বর্ষা যারিয়া

তরুণীকে দেখিয়া
মনে-মনে তাকে
কামনা করে—এ
দেখা অবশ্য ঘটে
মেয়েদের গাঙ্গরী
ভরিতে যাওয়ার
স ম ং য—তা হা
হইলে সেই তরুণীর
পিছনে ছায়ার
মতো সে ফিরিতে
থাকে। মুখে কথা
কহিবে না! শুধু
ছায়ার মতো অনু-
গামী হইবে!
পাঁচ-সাত দিন
ধরিয়া সকলে
দেখে, তরুণীর
পিছনে তরুণ
চলিয়াছে ছায়ার



জল বহিবার বাঁশের বালাতি।

মতো। তার পর রাত্রে তরুণ
গান গাহিয়া মনের কামনা প্রকাশ
করিয়া বেড়ায়; গ্রামের লোক সে
গান শোনে। সে গান শুনিয়া
তরুণী যদি বনের পথে তরুণের
সন্ধানে বাহির হয়, তাহা হইলে
সকলে বুঝিয়া লয় ছুঁজনের মনে-
মনে টান ধরিয়াছে! তরুণী বনের
পথে আসিয়া পাঁচটা জবাবের গান
গায়। তরুণ-তরুণীর দেখা-সাক্ষা-
তের বা কথা কহিয়া আলাপ বা
প্রণয়-চর্চার বিধি নাই! শুধু ঐ
গানে-গানে মনে মন মিলানোর
ব্যাপার! গানে-গানে দশ-বারো
দিন এই প্রণয়-সাধনা চলে। এ
সাধনায় সকলে বুঝিতে পারে,
তরুণ যেমন তরুণীকে চাহিতেছে,



মনের ভারী

তরুণীও ঠিক তেমনি ভাবে তরুণকে চায়। তার পর দিন-কণ দেখিয়া তরুণ আসিয়া গ্রামের 'মিলন-মন্দিরে' (Love house) আশ্রয় লয়। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া 'মিলন-মন্দির' আছে। বন-পথে তরুণের কণ-স্বর তখন নীরব হয়। তরুণী তরুণের গান আর শুনিতে পায় না। সে তখন তরুণের সন্ধানে 'মিলন-মন্দিরে' আসিয়া হাজির হয়। দু'জনে এই মন্দিরে পাঁচ-সাত দিন বাস করে। এ পাঁচ-সাত দিনের পরেও যদি দু'জনে



মেয়ে নয়—পুরুষ!

দু'জনকে ছাড়িতে না চায়, তখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া অভিভাবকের দল দু'জনের 'বিবাহ-অনুষ্ঠান' সম্পাদন করে। এ বিবাহে কন্তাপক্ষ কর্তা কিন্তু কন্তার বাপ নয়; কন্তার বড় ভাই। এ-দেশে কুমারী-কন্তার legal গার্জেন তার বড় ভাই!

বিবাহে ভোজের খুব ধুমধাম হয়। যেখানে যত আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব আছে, সকলের নিমন্ত্রণ হয়। শূকর-মুগ-কুকুট-মাংস; ধাত্তেশ্বরী মদ—কে কত চাও, খাও! খাওয়ানোর ভার কন্তাপক্ষকে লইতে হয়। বরকে

কন্তাপক্ষ যৌতুক দেয় দু'টি মহিষ, দু'-চার মণ ধান-চাল এবং একটি মোটা শূকর।

ভোজের পর বধু লইয়া বর নিজের গৃহে আসে। পনেরো বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় কন্তার পায়ে ও মুখে উষ্ণির নক্সা আঁকিতে হয়। বিবাহের পর বধু আসিয়া বরের ঘর-সংসারের চার্জ লইয়া সেখানকার কর্তী হইয়া বসে।

এক-এক জন পুরুষ চারটি করিয়া পত্নী গ্রহণ করে। তার বেশী পত্নী পুষ্টিবার সামর্থ্য যার থাকে, সে অধিকস্তু ন দোষায় বলিয়া আরো কতকগুলো পত্নী সংগ্রহ করে। বহুপত্নীত্ব এ-দেশের বিধি!

ছেলে-মেয়ে মারা গেলে চার দিন তার দেহ গৃহে রাখিয়া তার পর তাহা কবরিত করা হয়। এ-চার দিন বাড়ীতে অহর্নিশি কাঁশর ও চাক পিটিয়া প্রচণ্ড শব্দ তুলিয়া ভূত-প্রেত তাড়াইতে হয়। বাড়ীর লোক-জন পাড়া-পড়শী সকলে ভয়ানক কান্নার রোল তোলে। বয়স্ক লোক মরিলে আট-দশ দিন তার দেহ গৃহে রাখিয়া তবে তাহা কবরিত করার বিধি। সারা গ্রামের লোক বছরে এক দিন কবরে গিয়া মৃতের উদ্দেশে পূজার্থ্য নিবেদন করিয়া আসে।

বিধবা হইলে মেয়েদের পিত্রালয়ে ফিরিবার পথ জন্মের মতো বন্ধ হইয়া যায়। বিধবার সম্বন্ধে ব্যবস্থা, পুনর্বিবাহ; না হয় নির্জ্বন কোনো ঘরে বাস।

অসত্য বুনো জাত হইলেও ইহাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সাম্যভাব দেখা যায়। স্ত্রীজাতি পুরুষের দাসী নয় এবং এ-দেশে কোন মেয়ের কুমারী থাকিবার বিধি নাই। লোই সমাজে ডিভোর্স-প্রথা আদৌ নাই।

শিশু-সন্তানের জন্ম হইলে সারা গ্রামের লোক মিলিয়া ভূতপ্রেতকে পূজা-নিবেদন করিয়া প্রার্থনা জানায়,—এটির উপর নজর দিয়ো না বাপু! দয়া করিয়া এটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়ো।

বিশ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়ে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। ছেলেমেয়ে সাবালক হওয়ার সময় ভোজ্য-উৎসব হয়। এ উৎসবে ভূতপ্রেতের উদ্দেশে দু'টি করিয়া মুর্গা বলি দেওয়া হয়।

খুন-খারাপীতে এ জাতির বড় স্বপ্ন।



প্রগতি

(গল্প)

ঘরে পা দিতে না দিতেই আমাদের অধ্যাপকটি কহিলেন, “কি গো, এরি ভিতর তোমাদের মজলিস ভাঙ্গলো? সবে যে সক্ষ্যে; এখনো ত রাত হয়নি।”

মনটা ভাল ছিল না, ঝাঁজিয়া উত্তর দিলাম, “তুমি যে প্রশ্ন করলে, আমিও তা করতে পারি। তোমারি বা এই অসময়ে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় হলো কেন?”

কর্তাটি ঝৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, “তা বলতে পার বটে। গঙ্গাধর আজ ক্লাবে আসেনি ব’লে এখনি চলে এলাম। থাকতে ভাল লাগলো না। কিন্তু আমার বন্ধু গঙ্গাধরের সঙ্গে তোমার বন্ধু সুলোচনা দেবীর তো কোন যোগাযোগ নেই। কাজেই সন্ধ্যাবেলা শুকতারার আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করা, বোধ করি, অসঙ্গত নয়।”

—“কারণ আবার কি? তোমার মত আমারও ভাল লাগলো না ব’লেই চলে এলাম।”

—“আশ্চর্য। অমূতে অরুচি, এ কি সম্ভব? আঁধার রাতে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় হওয়া যদি বা সম্ভব হয়, তা’ হ’লেও সুলোচনা দেবীর সঙ্গে তোমার ভাল লাগেনি, এটা সত্যিই যে অসম্ভব ব্যাপার! তোমার সখিপ্ৰীতির সাক্ষীর তো অভাব নেই। তাই ভাবছি, এতখানি নিবিড় অমুরাগের ভিতরে বিরাগের মেঘ দেখা দিল কি জন্তে?”

বলে রাখা ভাল, আমার স্বামীটি সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। সাধারণ অধ্যাপকশ্রেণীর মতোই তাঁহার মধ্যে ‘আপনভোলা’ ভাব থাকিলেও প্রাণের ভিতর রসের অভাব ছিল না।

কেতাব খুলিয়া তিনি কাব্যরস-সিঁজুতে তলাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাঁহার সহিত আমার নানা সুখ-হুঃখের, সাংসারিক অভিযোগের আলোচনা চলিত। কিন্তু একবার বই খুলিয়া তিনি তাহাতে মনঃসংযোগ করিলে

আমার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে গিয়া পড়িতেন, আর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইত না।

সুলোচনার ব্যবহারে সত্যিই মনে ব্যথা পাইয়া ছিলাম। মেয়েরা স্বামীর নিকটে বেদনার ভার মোচন না করিলে করিবেই বা আর কাহার কাছে? তাই আমি মনের খেদে বলিলাম, “তুমি রাত দশটা অবধি ক্লাবে থাকো ব’লেই তো আমিও সুলোচনার কাছে গিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিই। খালি-বাড়ীতে তো একা মন টেকে না। তুমি গঙ্গাধর বাবুর সঙ্গে কালক্ষেপণের পরিমাণটা একটু কম ক’রলে সুলোচনাকেও আমি ছাড়তে পারি—তা তার ওপরে আমার ভালবাসার মাত্রাটা যতই বেশী হোক। তবে এটাও দেখছি বটে, আজকাল সে কেমন যেন হ’য়ে যাচ্ছে! আগের মতো তার না আছে আগ্রহ, না আছে আমার জন্তে তেমন আকুলি-ব্যাকুলি ভাব! এখন ভাল ক’রে কথাই বলতে চায় না। এখন তার যত কিছু হাসিখুসী, গল্পগুজব, রঙ্গরস, সবই শুধু ছেলেদের সঙ্গে। বন্ধুও জুটেছে তা এক-আধ জন নয়, চার-চারটি।

—“তাই না কি? আর একটি জুটলেই ত পক্ষ পাণ্ডবের সীমস্তিনী হ’য়ে উঠবেন। মেয়েদের এতখানি অধঃপতন! ওঃ, এ কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারা যায় না। যাক গে, তুমি আর ওখানে যেয়ো-টেমো না। তোমার ঘরে যে রসের সমুদ্র উছলে পড়ছে, এরই ভিতরে বানচাল হ’য়ে ডুবে যাও না। কি বলো!”

—বলিতে বলিতে কর্তাটি সেলুফ হইতে ‘কাদম্বরী’খা-লইয়া খুলিয়া বসিলেন।

আমি প্রমাদ গণিয়া কহিলাম, “কি করবো বল? আমি যে তোমার মত ডুবুরী নই, ডুব দিতে, গেলে ভেসে উঠি। গঙ্গাধর বাবুর সাথে তুমি যে] দাবার নেশায় মসৃণ, সেটা একটু কমিয়ে আনলে

আমাকে আর সুলোচনা, কুলোচনার খোঁজে বেরতে হয় না।”

অধ্যাপকপ্রবর কেতাব হইতে চক্ষু না তুলিয়াই জবাব দিলেন, “সুলোচনার অন্তঃস্ব-অনাচারে তুমি যেন দায়ে ঠেকে তাকে পরিহার করতে চাচ্ছ; কিন্তু গঙ্গাধর তো তেমন কিছু দোষ করেনি? যে মেয়ের চার-চারটা পুরুষ-বন্ধু,—কেবল বন্ধু নয়, যে তাদের সঙ্গে অসঙ্কোচে চাপ্ত পরিহাস চালাচ্ছে,—তার কাছে যাওয়া তোমার উচিত নয়। একটা দুর্নাম রটতে কতক্ষণ?”

আমি সায় দিলাম, “যথার্থ কথাই বলে। সুলোচনার মত অমন কাঁচা বয়সের মেয়ের অতগুলো সুন্দর সুন্দর ছেলের সাথে এত মেলা-মেশার পরিণাম ভাল হ’তে পারে না। আঙুনে হাত দিলে হাত পুড়বে—এ কথা না জানে কে?”

তিনি কেতাবের পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে অশ্রমস্ব ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ, ছেলেগুলির নাম কি? দেখতে-শুনতে কেমন? আমাদের তো পেশাই হচ্ছে—এ রকম গাধা ঠেঙিয়ে খোড়া করা। নাম বলে হয় তো চিনতে পারবো। আর এর একটা প্রতিবিধানেরও চেষ্টা ক’রবো। এত বড় দুর্নীতিতে কখনও প্রশ্রয় দেওয়া চ’লবে না। একটা মেয়ে চার-চারটে ছেলের সঙ্গে প্রেমলালা ক’রছে; এর প্রতীকার হওয়া খুবই দরকার।”

—“তুমি কি প্রতীকার করবে? সুলোচনা তো তোমার ছাত্রী নয়। আর ছেলেগুলোও তোমার পাঠশালার পোড়ো নয়; নাম বলে চিনবে কি? তাদের নাম শঙ্কর, অনিরুদ্ধ, হীরক, আর একটি হচ্ছে পিক।”

—“পিক কি? কোকিল না পাপিয়া? তা তোমার কথা ঠিক বটে, এরা আমার ছাত্র নয়। আমি কারকে চিনিও না। আর চিনবোই বা কি ক’রে? আজকাল সংস্কৃত সাহিত্যের কি আদর আছে? শিক্ষার্থীদের যত কোঁক—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আর ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের ওপরে। বেচারারা জানে না, সংস্কৃত সাহিত্যে কি বিপুল সম্পদ সঞ্চিত আছে। ঘরের মাণিক ফেলে বাইরের কাচের জগ্গে তারা ব্যাকুল!”

বলিতে বলিতে স্বামী কোণের সহিত নিঃশ্বাস

ফেলিলেন। অরণ্যে রোদন করিয়া লাভ নাই বুঝিয়া আমি ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলাম।

* * * * *

এবার সুলোচনার কথা বলি।

সুলোচনা আমার বাল্যসখী; আমরা একই গ্রামের মেয়ে। খেলাঘরে এক সঙ্গে পুতুল খেলিয়া বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পাঠশালায় এক দিনে হাতেখড়ি দিয়া আমরা উভয়ে ধীরে ধীরে জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমাদের ভালবাসার প্রগাঢ়তা পল্লীবাসিনীদের উদাহরণ-স্বরূপ হইয়াছিল। একটা বেলাও আমরা পরস্পরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না।

নদীশ্রোতে ভাসমান পুষ্পের মতোই নারীর জীবন। বৃষ্টিচ্যুত কুমুমের মতো তাহারা খসিয়া পড়ে, ভাসিয়া যায়। এক কুল হইতে অল্প কূলে তাহাদের স্থিতি। তাই দুই পরিবারের দুই বালিকার নিবিড় প্রীতির বন্ধনের পরিণামের ভয়ে অভিভাবকরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কে জানিত, শ্রোতের টানে কে কোথায় চালিত হয়? কিন্তু বিধাতা আমাদের প্রতি অহুকুল ছিলেন। তাই বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত থাকিলেও ভাগ্য আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। পাশাপাশি না হইলেও এক-পাড়াতেই আমরা দুই সখা নীড় বাধিয়াছিলাম।

সহরের বাহিরে বেশ কাঁকার ভিতর সুলোচনার বাড়ী। বাড়ীর পশ্চাতে প্রাচীর-ঘেরা জায়গায় সে ‘ব্যাডমিন্টন্’ খেলার ‘লন্’ তৈয়ারী করিয়াছিল। সেই স্থানে খেলায়, গলে আমাদের মধুর সন্ধ্যাগুলি অতিবাহিত হইত। কর্তাটি ‘ইউনিভার্সিটি’ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দাবার আড্ডায় আটকাইয়া যাইতেন; রাত্রি দশটার পূর্বে তাহার দাবা-খেলার নেশা ছুটিত না।

যে গৃহের কর্তার এইরূপ নিস্পরোয়া নিশাচর-বৃত্তি, সে গৃহের গৃহিণীর সাক্ষ্য-সম্মিলন, সখী-সম্মিলন প্রভৃতিতে তন্ময় হওয়া অপরাধের নয়। কর্তাটিও তাহা অপরাধ মনে করিতেন না; কিন্তু প্রথম অপরাধের সূচনা হইল সুলোচনার ব্যবহারে। অকস্মাৎ আবির্ভাব হইল সুলোচনার পুরুষ-বন্ধুর দল। সেই বিচিত্র প্রজাপতিদের সমাগমে আমি ধীরে ধীরে সুলোচনার হৃদয়ের প্রান্ত হইতে সরিয়া পড়িলাম,—আড়ালে আশ্রয় লইলাম।

আমার প্রতীক্ষায় সুলোচনার স্ননয়ন আর আকুল হইয়া পথের পানে চাহিয়া থাকে না। দূর হইতে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার আরক্ত অধরে আনন্দের হাসি মুষ্টিয়া উঠে না। কলকণ্ঠের সেই সাদর সম্ভাষণ ধামিয়া গিয়াছে। ব্যগ্র বাহুগলের বন্ধনে আবদ্ধ করা বন্ধ হইয়াছে।

এখন সুলোচনার কত কাজ! চটুল নয়নের ক্রভঙ্গিতে কত জনকে শাসন করিতে হয়! অমিয় মধুর বচনে কত প্রিয়জনকে মুগ্ধ করিতে হয়! বস্ত্র বিহঙ্গ-গুলিকে মোহিত ও বশীভূত করিয়া জালে আবদ্ধ রাখিতে হয়। তাহার ক্রীড়া-কৌতুক সকলই তাহাদের সঙ্গে; তাহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার হাসি-গল্প চলে। আমার সঙ্গসুখের নিমিত্ত সে আর উন্মুখ নহে; সে জন্ত তাহার আগ্রহও নাই—তাহা স্পর্শরূপে উপলব্ধি করিয়াই আজ আমি ক্লম্ব মনে গৃহে ফিরিয়াছি; এবং ভাবিতেছি, আর ও-পথে যাইব না। উহার সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ? এমন ভালবাসা কত জনের সহিত কত জনের হইয়া থাকে, আবার তাহা শেষ হইয়া যায়। ভালবাসা চলিয়া যায়, এ কথা ভাবিতে মনটা বেদনায় টন-টন করিয়া উঠিল, চক্ষুতে জল আসিল।

পরদিন প্রভাতেই সংকল্প করিলাম—আর সুলোচনার কাছে যাইব না; তাহার ছায়াও মাড়াইব না। তাহার নিকটে না যাইলেও আমার দিন পড়িয়া থাকিবে না। স্থির করিলাম, সংসারের কাজ ও পড়াশুনার ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিব।

কিন্তু দিব্যবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই সঙ্কল্প-শিথিল হইতে এবং মনের তেজ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে সেই স্মৃতি সঙ্কল্পের কণামাত্রও আর ধুঁজিয়া পাইলাম না! নিজের অবস্থা আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া সহানুভূতির সহিত স্বামীর দাবার নেশার বিচার করিতে লাগিলাম,—না, সত্যই তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না। তাহা সঙ্গত নয়! মাহুমমাত্রেরই অভ্যাসের দাস। একবার অভ্যাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে সহজে ফিরিতে পারা যায় না; সেই কাঁদ হইতে বাহির হওয়া বড় কঠিন। পুরুষের টান বহিষ্কৃত, আর মেয়েদের—গৃহাভিমুখে। অভ্যাসের দোষে যে মেয়ে স্তম্ভ:পুরের

পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারে, তাহার রাগ-অভিমান সাজে না। কাজেই অভিমান সম্বল করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তখনো সন্ধ্যার বিলম্ব আছে; গোখুলির স্নান লোহিতালোকে তখনও মুক্ত প্রকৃতি সুরঞ্জিত। সুলোচনা কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়াইয়া ‘ব্যাট’ হস্তে মহানন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহার ভালবাসায় আকৃষ্ট সেই দ্বিপদ পঙ্গপাল! কেত তাহাকে বল কুড়াইয়া দিতেছে, কাহারো হাতে ব্যাট, কাহারো করে প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক, কাহারো চোখ-মুখ হইতে হাসির ঝরণা ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

খেলার মাঝখানে সুলোচনা একবার অপাঙ্গে আমার প্রতি দৃষ্টি হানিয়া হাসি-মুখে ডাকিল, “মিলন, এসেছিস, আয়।”

আমি উত্তর দিবার জন্ত মুখ তুলিয়া নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম; আমার ঠোঁটের কাছে আসিয়া কথা বাধিয়া গেল।

সুলোচনার প্রথম বন্ধু শঙ্কর তাহার কর্ণমূলে অধরোষ্ঠ স্থাপন করিয়া চুপে-চুপে কি যেন বলিতে লাগিল। ছেলেটি দোহার গঠন, বলিষ্ঠ, উজ্জল শ্রামবর্ণ। চক্ষু টানা-টানা, বাঁশীর মতো নাক, রক্তিম অধরোষ্ঠ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব প্রভা মুখে পরিস্ফুট।

শঙ্করের কথা শেষ হইতে না হইতেই সুলোচনার দ্বিতীয় স্তাবক অনিরুদ্ধ তাহার হস্তস্থিত সুলোহিত প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলটি পরম আগ্রহে সুলোচনার খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শ্মিত হাশ্বে অভিনেতার ভঙ্গীতে তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

অনিরুদ্ধ লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, অল্প ফরসা, মাথায় কোঁকড়া চুল, দীর্ঘ কেশে ললাট আবৃত। বাঁকা চোখে বঙ্কিম অধরে কৌতুক-হাশ্বে বিজলীচ্ছটা, কতকটা কবিত্ব-মাখান ভাব।

অনিরুদ্ধের পরেই হীরক বলটা কুড়াইয়া সুলোচনার নিকটে আনিল। হীরকের দীর্ঘ দেহ, উজ্জল বর্ণ, দেহভঙ্গি তেজোদীপ্ত, গর্ভিত। তাহার রূপের প্রাথমিক দৃষ্টি অতিক্রম করে না।

হীরকের পশ্চাৎ হইতে পিক উঁকি দিতেছিল। বয়স

বেশী নহে, সে অল্প তিন জনের ছোট; সুকুমার দেহ, কমণীয় মূর্তি। কবির ভাষায় বলা যায়, তাহার—“সৌম্য মহাস তরুণ বয়ান, করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান; পুত্র ললাটে হিন্দু সমান—ভাতিছে স্নিগ্ধ শাস্তি !”

আমি নির্নিমেবে সকলের আচরণ লক্ষ্য করিয়া প্রগতির পরিণাম ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। হৃদয়-বিদারক ট্র্যাজেডির আশঙ্কায়, হুঃখে, কোণ্ডে আমার কোমল চিত্ত ভরিয়া উঠিল। না, আর নয়, এইখানেই “ববনিকা পড়ে যাক বন্ধুসে আমার !”

* * * *

রাত্রিকাল।

স্বামী ‘ক্লাব’ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিলেন, “ওগো শুন্চো? এ কি! এক্ষনি শুয়ে পড়েছ যে! শরীর ভাল নেই?”

ঔদাস্ত ভরে বলিলাম, “শরীর ভালই আছে। কাজের মধ্যে ছুই, খাই আর শুই। তাই শুয়ে রয়েছি।”

প্রশ্ন হইল, “আজ স্কলোচনার ওখানে যাওনি?”

—“গিয়েছিলাম, এবং এ জন্মের মত যাওয়া আজ শেষ করে দিয়ে এসেছি।”

—“বেশ করেছ, উত্তম করেছ। যে মেয়েকে পুরুষের দল চারি দিক থেকে ছেকে ধরেছে, তার কাছে কোন ভদ্রমহিলার একদম না যাওয়াই উচিত। কিন্তু আমি ভাবছি, তোমার সময় কাটবে কি করে? ‘ক্লাবটা’ ওখান থেকে উঠিয়ে এনে আমাদের বাইরের ঘরে স্থাপন করলে, বোধ করি, মন্দ হয় না!”

—“মন্দ হবে কেন? সে খুবই ভাল হয়। আমার স্বর্গে যাবার অন্ধকার পথে তিন-শো বাতির বিজলী দীপ জলে ওঠে! দেখ, আমার জন্মে তোমাকে অতো ভাবতে হবে না। তোমাদের আড্ডা অন্তরীক্ষেই থাকুক। আমার স্বপ্নের চেয়ে শাস্তি ভাল।”

স্বামী মহাচিন্তায় আকর্ণ-প্রসারিত টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, “আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? তোমাকে যদি দাবা-খেলা শেখাই, তুমি তা হলে রোজ গঙ্গাধরের সামনে বোসে দাবা টেপো; আর আমি নির্নিমেবে নেত্রে তোমাদের খেলা নিরীক্ষণ করি।

নাই বা গেলাম ক্লাবে। গঙ্গাধর বাড়ীতে এলে ক্লাবে যাবার দরকারই বা কি?”

—“নিশ্চয়ই দরকার নেই। স্কলোচনারই শোভন সংস্করণ ঘরে বিরাজ করবে; গঙ্গাধর-ক্লাব না হলে তোমার সঙ্গ্য তো কাটবে না। ধন্য তোমার বন্ধুশ্রীতি! তা গঙ্গাধর বাবুর কাছে প্রস্তাবটা করে ফেলোনি তো?”

স্বামী অপ্রতিভ হইয়া ঘাড় নাড়িলেন, বলিলেন, “না, তা করিনি; রাস্তায় আসতে আসতে কথাটা মনে হলো কি না। আমি তাকে বলেছিলাম অল্প কথা; অর্থাৎ সে যদি তার স্ত্রীকে দাবা-খেলা শেখায়, আর আমিও তোমাকে শিখিয়ে দেই, তা হলে বাইরে আমরা খেলবো, ভেতরে তোমরা ছুটিতে দিব্যি জমিয়ে তুলতে পারবে। তা—সে-দিক দিয়ে স্তবিধা হলো না। গঙ্গাধর বলে—এক পাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে বোয়ের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।”

আমি বলিলাম, “তার সময় না থাক, তাতে আমার কি? আমার সময়ের সদ্যবহার আমি করতে জানি, তার জন্মে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এখন মুখ-হাত ধুয়ে খেতে চল, রাত্রি কিছু কম হয়নি।”

তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

* * * *

কয়েক দিন হইল, স্কলোচনার কাছে যাই নাই। মনে হয়, মাঝখানে এক যুগ চলিয়া গিয়াছে। হৃদয় আকুল উন্মুখ হইয়া ছুটিতে চাহিলেও আমি তাহাকে শাসনে রাখিয়াছি। স্কলোচনা যদি আমাকে না চায়, আমার সঙ্গ কামনা না করে, তবে আমারই বা কিসের দায়? কিসের টান?

যথানিয়মে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতেছিল; কিন্তু হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। সংবাদ পাইলাম, স্কলোচনা পীড়িত। আমাকে আহ্বান করিয়াছে। কোথায় গেল আমার অভিমানের অত্রভেদী বিরাত চূড়া, সঙ্কল্পের সেই দৃঢ়তা? মানুষের প্রতি মানুষের মেহ ঘুমাইয়া থাকে, মরে না। কোন অতর্কিত মুহূর্তে স্তপির ঘোর ভাঙিলে আবার সে জাগিয়া উঠে।

আমাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া কর্তাটি কহিলেন,

“সকাল বেলা উঠেই চ’লেছ কোথায় ? চা-ও তো খেলে না, এত তাড়া কিসের ?”

উত্তর দিলাম, “সুলোচনার অস্থখ, সে আমাকে দেখতে চেয়েছে... ক্রি না, তাই যাচ্ছি। এ বেলা আর ফিরবো না। সে ভাল থাকলে রাতে ফিরে আসবো।”

“তাই ফিরো, কিন্তু অত অনাচারের ভিতরে কি সারাটা দিন থাকতে পারবে ? একটি নারীর চার-চারটি প্রেমাস্পদ, সকলের সঙ্গেই অবাধে সে প্রেমলীলা চালাচ্ছে—এ আমি কল্পনা ক’রতেও পারিনে। অথচ তার স্বামী আছে, সংসার আছে, ছেলে আছে।”

“হ্যা গো, হ্যা, তার ছ’টি ছেলে আছে ব’লেই না

চারটি পুরুষ-বন্ধু পাবার সুযোগ হ’য়েছে। আমার মত সে তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ী আলো কবে-নি। সুলোচনার ভাগ্য ভাল ; তার ছ’টি ছেলের চারটি ছেলে।”

স্বামী চকিত ভাবে কহিলেন, “তুমি বলো কি ? তারা তবে সুলোচনার পুরুষ-বন্ধু নয় ? তাদের বয়স কত ?”

“তা মন্দ হবে না। শঙ্কু, অক্ষু—পাঁচ বছরের, হীরক পিকু ছ’টি বছরের। তারা সত্যি-সত্যিই সুলোচনার বন্ধু, আর তারা পুরুষ তো বটেই !”

শ্রীগিরিবাল্য দেবী :

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়

চিত্তের ক্রন্দন

ছিঁড়িতে বন্ধন।

জাগ্রত শ্মশানবুকে,

উত্তপ্ত সাগর-ধারা বহে ছ’টি চোখে।

অর্থহীন ব্যগ্র কোলাহল,

পশে এসে দিবানিশি অস্তরের তল।

কুমুম সুবাস,

বসন্ত বাতাস,

প্রভাতের বিহঙ্গের গান,

ঝরণার মৃদু কলতান,

চাঁদের এ আলোক-নির্ঝর,

যৌবন-শিহরতরা প্রিয়তার অধর—

তুচ্ছ ব’লে মনে হয়,

আজি এ সময়।

কতটুকু মূল্য তার আছে

আজি মোর কাছে ?

ছিন্নবাস পাছ-বেশে সে যে আজ আমি,

ছুটিতেছি যাত্রাপথে এ দিবস-যামি’

উন্নত সে পাগলের রূপে,

কভু ওরে অটুহাস্তে কভু চূপে চূপে।

পুষ্প-গন্ধ ?

বাসু মৃদুমন্দ ?

চন্দ্র-কর ?

প্রিয়তার কুমুমাধর ?

মোর যাত্রাপথে,

সাজে না সাজে না কোনো মতে।

ষুগ-যুগান্তর

চলিতে হইবে পথ সর্কশূন্য একা নিরন্তর।

হায় ওরে, নীড় ছেড়ে পাখা ওই কোথা উড়ে যার,

আজি এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় ?

শ্রীঅধিনীকুমার পাল



৬

নিনা কলিকাতায় চলিয়া যাইবে বলিয়া মঞ্জুলেখা ও শেফালী তাহাকে বিদায়দান উপলক্ষে একটি ছোট-খাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছে। তাহাদের পরিচিত সমবয়স্কা সুবতীরা সেই উৎসবে যোগদানের জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছে। উৎসব-মণ্ডপে নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে; আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু তাহার বিদায়ভিনয়-নন্দনের জন্ত উৎসবের এইরূপ আয়োজন, তাহার প্রাণ যেন সেই উৎসবের আনন্দে সাড়া দিতে পারিতেছে না। নিনা তাহার স্নিগ্ধমাণ চিত্তকে প্রফুল্ল করিবার জন্ত যথা-সাধ্য চেষ্টা করিলেও সেই সদানন্দময়ী তরুণীর আনন্দের উৎস আজ যেন নৈরাশ্রের খরতাপে শুকাইয়া গিয়াছে।

দীপ্তেনের সঙ্গসুখ তাহার কিরূপ প্রার্থনীয়, এতদিনে সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। দীপ্তেন যে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ের কতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, সে তাহা সেই দিন বুঝিতে পারিয়াছে—যে দিন সে তাহার পিতার স্পষ্ট অভিমত অবগত হইয়াছে। 'স্বয়ম্বর' হইবার কথা লইয়া সুনীলের সহিত কৌতুক করিতে গিয়া সেই যে সে প্রাণের সাড়া পাইল, তাহার পর হইতে তাহার কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না—কোন-কিছুতেই সে তৃপ্তি পাইতেছে না।

মধুর সন্ধ্যা সমাগত; গুরা অষ্টমীর চন্দ্রের সুধাময় কিরণ-সম্পাতে সমগ্র উদ্যানটি যেন হাসিতেছিল। উৎসবের নৃত্যগীতাদি নিনার প্রীতিকর না হওয়ায় সে নৈশ-প্রকৃতির শোভা দর্শনে ক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত ও সংযত করিবার আশায় চৌভারায় গিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। নব-বিকশিত শেফালিকা ও হাস্নাহানার স্নিগ্ধ সৌরভে তখন চারি দিক যেন আকুল; কিন্তু তাহা নিনাকে প্রফুল্ল করিতে পারিল না। তাহার উদাস আকুল হৃদয়, অতৃপ্ত

চিন্তাধারা লইয়া যেন কোন অনির্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু অল্পকাল পরে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন নিনা কাহার মুহূর্ণ করস্পর্শে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দীপ্তেন্দ্র কুণ্ঠিত ভাবে তাহার প্রসারিত হাত-খানি নিজের হাতের ভিতর লইয়াছে। দীপ্তেন্দ্র সেই নিভৃত উদ্যানে তাহাকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছে।

দীপ্তেন্দ্রই প্রথমে আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "বিদায়-গ্রহণের এ সুযোগ ঘটে উঠবে, এ আশা আমি ত্যাগই ক'রেছিলাম; কিন্তু বিধাতার দয়ায় আজ এ সময় এই নির্জন স্থানে তোমার দেখা পাওয়া সম্ভব হ'ল।"

নিনার সমগ্র দেহ তখনও দীপ্তেনের স্পর্শের আনন্দে ধর-ধর করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহার মনে হইল, "এ কি স্বপ্ন, না মায়ী-মরীচিকা?"—তাহার আশঙ্কা হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যেই এ সব হয় তো শূন্যে বিলীন হইবে!

নিনাকে নীরব দেখিয়া দীপ্তেন বলিতে লাগিল, "নিনা, তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে; আমি শুধু তোমার অনুমতিরই প্রতীক্ষা ক'রছি। তোমার সন্মতি পেলে তোমার বাবার কাছে আমি একটি রত্ন ভিক্ষা চাইব। সে রত্ন অমূল্য; সে রত্ন—তুমি। আমি আগে জানুতে চাই—তুমি কি আমার হবে নিনা? আমার হাতে তোমার ভবিষ্যতের সকল ভার অর্পণ ক'রে, আমার ওপর তুমি কি নির্ভর ক'রে থাকতে পারবে? তুমি সন্মতি দিলে এখনই আমার বাবার আর মায়ের মত নিয়ে, আজই রাত্রে সে কথা তোমার বাবাকে বলব। আমি বেশ জানি, এ প্রস্তাবে আমার মা-বাপের কোনও আপত্তি হবে না, বরং এই ক'দিনে তোমার প্রতি গুঁদের যে স্নেহ জন্মেছে, তা'কে মনে রাখ. এ প্রস্তাবে গুরা স্তব্ধ হ'বেন।"

নিনার মন-প্রাণ, তাহার চিত্ত যাহার প্রাণের আশার ব্যাকুল, সেই দীপ্তেন আজ তাহার প্রেমপ্রার্থী। এ যে তাহার আশার অতীত কামনা! এ কথা ভাবিয়া নিনা আনন্দে নিতোর হইল, লজ্জায় ও অনির্কচনীয় আনন্দে তাহার কণ্ঠরোধ হইল; কি বলিয়া সে আত্মনিবেদন করিবে, তাহা ভাবিয়া হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না।

নিনাকে মৌন দেখিয়া দীপ্তেন শঙ্কিত হইল; সে ব্যাকুল স্বরে বলিল, “আমার প্রেমের উত্তর দাও, নিনা! ধৈর্য ধারণ করা আমার যে অসাধ্য হ’য়ে উঠেছে। আমার প্রাণ-মন তোমাকে লাভ ক’রবার জন্ত ব্যাকুল; প্রাণপণ সেবায় তোমাকে স্তুতি ক’রবার জন্ত হৃদয় আমার কিরূপ অধীর হ’য়ে উঠেছে, তা প্রকাশ করি, সে শক্তি আমার নেই।—বল, তোমার ইচ্ছা কি?”

নিনা লজ্জাবিজড়িত কম্পিত স্বরে বলিল, “আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ ক’রলে সত্যই কি তোমরা সকলে স্তুতি হ’তে পারবে?”

দীপ্তেন পূর্ববৎ কুণ্ঠিত স্বরেই বলিল, “আমি যে তার চেয়ে বেশী স্ত্রের অস্তিত্ব ধারণাই ক’রতে পারিনে, নিনা। আমার হৃদয়ে তুমি ছাড়া অত্র কোন নারীর স্থান হ’তে পারে, এ চিন্তাও আমার করনাতীত।”

নিনা গাঢ়স্বরে বলিল, “বাবাকে তুমি কথায় কথায় এ আভাসটুকু দিতে পারো যে, এ-বাড়ীতে আমার মাথা রাখবার একটু স্থান জুটলে আমি সেটা পরম সৌভাগ্য ব’লেই মনে ক’রব; আর তাতে আমার এক বিন্দুও স্ত্রের অভাব হবে না।”

একরোখা বাঘা ব্যারিষ্টার মিষ্টার দত্তকে যে তাঁহার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া তুলো-খুনা করিয়া ছাড়িয়াছিল, সে কি এই মধুরহৃদয়া প্রেমিকা তরুণী?

দীপ্তেন এবার পরিতৃপ্তিভরে মৃদুস্বরে বলিল, “আমি যেন তোমার যোগ্য হ’তে পারি নিনা, বিধাতার কাছে এইটুকুই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।”

দীপ্তেন গমনোত্তম হইলে নিনা হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া ছই হাতে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

দীপ্তেন ব্যগ্র ভাবে তাহাকে ধরিয়া টানিয়া-তুলিয়া

বলিল, “হাঁ, হাঁ, কর কি, কর কি? ভক্তি-প্রকাশটা এখন মূলত্ববি রাখলে ক্ষতি নেই। এখন যাই, আমার বাবার মতটা আগে জানতে হ’ছে। তুমি ধরে যাও। এখন ধরা দিও না, নিনা! জাতও গেল, পেটও ভরলো না, এ রকম সঙ্কটে যেন তোমায় পড়তে না হয়!”

নব অমুরাগ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিনা সোৎসাহে উৎসবে যোগদান করিতে চলিল।

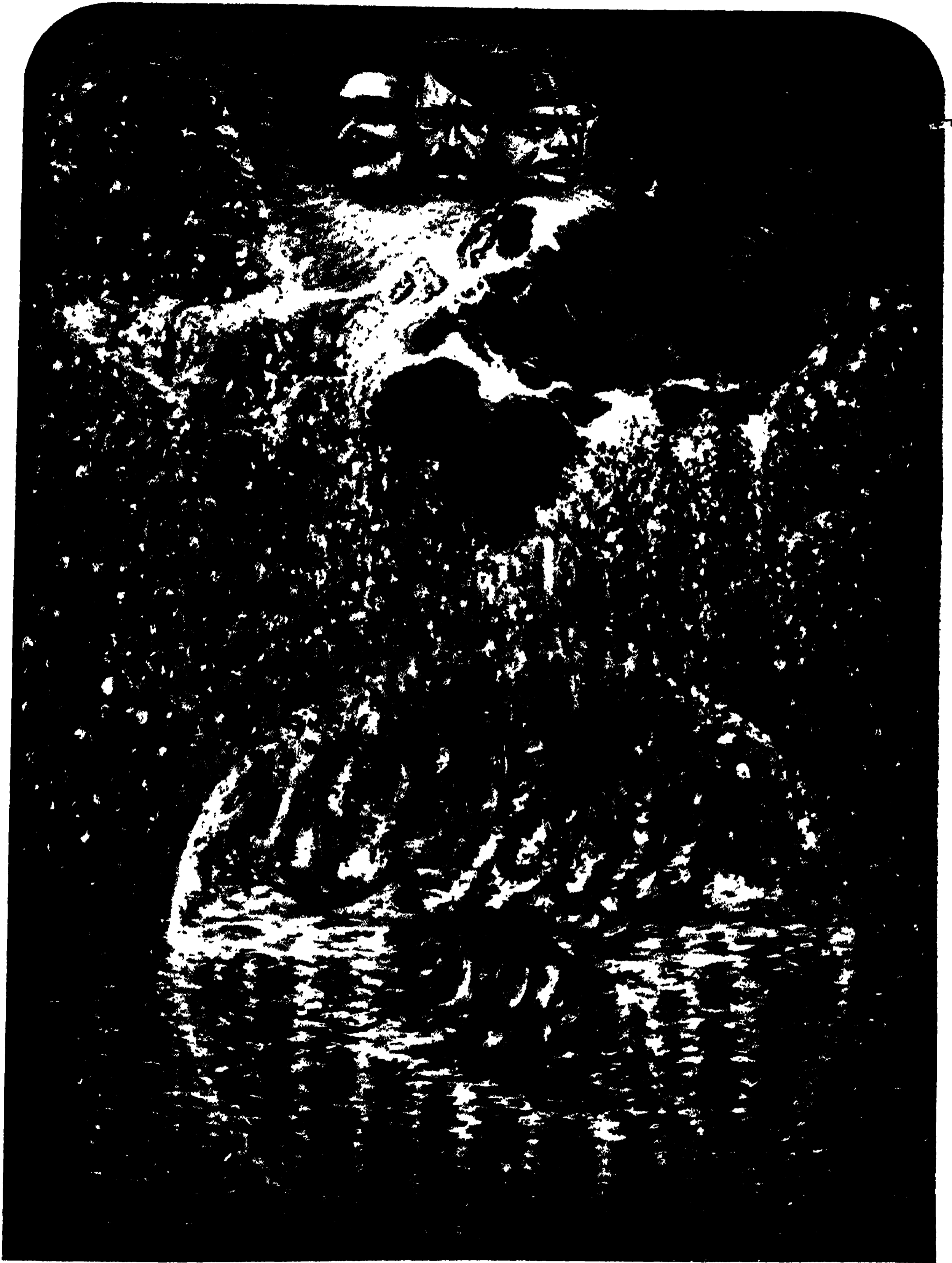
দীপ্তেন অতঃপর পিতামাতার অমৃত লইয়া মিষ্টার সিংহের বাস-কক্ষে প্রবেশ করিল। বিনয় বাবু তখন একখানি পুস্তকে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। দীপ্তেন তাঁহার অদূরে বসিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পরে পুস্তক বন্ধ করিয়া সিংহ মহাশয় মুখ তুলিতেই দীপ্তেনকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন: ঔৎসুক্যভরে বলিলেন, “কি হে! তুমি হঠাৎ এখানে? আমার সঙ্গে কোন কথা আছে?”

দীপ্তেন নতমুখে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “আজ্ঞে আ—আমি আজ আপনার কাছে একটা বিষয়ের প্রা—প্রার্থী।”

বিনয় বাবু কোতূহলভরে বলিলেন, “তোমার আবার কি প্রার্থনা আমার কাছে? তা’ কি ব’লবে বল: ব’লতে কুণ্ঠিত হ’ছে কেন?”

দীপ্তেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “আজ্ঞে, আমাকে নিনার যো—যোগ্য ব’লে আপনি মনে করবেন কি না—তাই জানতে আগ্রহ হ’য়েছে; কারণ আ—আমি তাকে পত্নীত্ব বরণ ক’রবার জন্ত উৎসুক।”

বিনয় বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। প্রস্তাবটা এই দিক হইতে আসিতে পারে, ইহা তাঁহার মনে হয় নাই; কাজেই তিনি হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, “তোমাকে নিনার যোগ্য মনে না ক’রবার কোন কারণ আছে ব’লে তো মনে হয় না; কিন্তু কস্তাদান তো আর এক কথার কাজ নয়। আমাকে সব দিক ভেবে দেখতে হবে তো। নিনার মা কলকাতায়: তাঁর মত জানা চাই। নিনারও নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে পারবার বয়স হ’য়েছে; তার সঙ্গেও এ সম্বন্ধে কথা কইতে হবে। তোমার মা-বাপের মত নিয়েই হয় তো এ প্রস্তাব ক’রতে এসেছ; তবুও আমাকে তাঁদের সঙ্গে ধী-ভাবে পরামর্শ ক’রতে হবে। তাই মনে ক’রছি, তেবে-চিন্তে পরে তোমাকে আমার মতটা জানাব।”



চৈত্র. ১৩৪৭ |

প্রায়-ধুমকেতু

১ : : : : : ✕

| শিল্প—এম, মজুমদার

দীপ্তেন এই সকল কথা পর উঠিয়া যাইতেছিল, বিনয় বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার ছুটি শেষ হ’তে আর কত দেরী?”

দীপ্তেন বলিল, “এখনও দিন-পনের বাকি আছে।”

বিনয় বাবু বলিলেন, “তুমি চাকরীতে ‘জয়েন’ ক’রবার আগে একবার যদি কল্কাতা হ’য়ে যাও তো ভাল হয়। ইতিমধ্যে নিনার মায়ের সঙ্গে আমি পরামর্শ ক’রে রাখব। এ কথা কিছু এগন বাইরে প্রকাশ না করাই ভাল।”

সেই রাত্রিতে শয়নের পূর্বে নিনা শেলীকে চুপি-চুপি যে সব কথা বলিল, তাহা শুনিয়া শেলী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহে চুষন করিল, এবং স্নেহোচ্ছ্বাসিত স্বরে বলিল, “আমি কিন্তু তোমাকে ভাই ‘বৌদি’ বলতে পারব না। তুমি আমার সেই স্নেহের ‘নিনা’; এ স্নেহের কোন ব্যতিক্রম হবে না।”

নিনা আবদারের স্বরে বলিল, “একটি বার বৌদি’ ব’লে ডেকো, খাসা মিষ্টি লাগবে। আমার বড় সাধ, তোমাকে ‘বৌদি’ ব’লে ডাকি, কিন্তু হয়, বিধাতা বিমুখ!—সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

৭

বীরেন বাবুর স্ত্রী এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই; তাঁহার বামাজ যেন পক্ষাঘাতে পক্ষু-প্রায় হইয়াছিল। চিকিৎসকেরা আশ্বাস দিয়াছেন—ক্রমে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন, ও কোনও অঙ্গহানি হইবে না। তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে দিতে আগ্রার ডাক্তারদের মত নাই; কিন্তু আদালত খুলিবে, বীরেন বাবুকে যাইতেই হইবে। তিনি কিছুতেই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইবেন না। এদিকে মিষ্টার দত্তের বৃদ্ধা জননী বারংবার পত্র দিতেছেন, তাঁহাকে সঙ্গীক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার অন্ত পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিতেছেন; স্মতরাং সুনীলের মাতা তাহার আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন না। স্থির হইল, বীরেন বাবুরা পরদিন রাত্রির ট্রেনে কলিকাতায় যাত্রা করিবেন। সারা দিন ধরিয়া বীরেন বাবু তাগিদের চোটে সকলকে পাগল করিতে শুধু বাকী রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অস্থিরতার আতিশয্যে সকলে আয়োজন সম্পূর্ণ

করিবে কি, গোলমাল আরও বাড়িয়া যাইতেছিল! তাঁহার ব্যবহার ক্রমে সকলেরই অসহ হইয়া উঠিল। বৈকালে শেলী তাঁহাকে একটু দৃঢ় ভাবেই বলিল, “আপনি একটু বেড়িয়ে আসুন তো। আপনি কিরে এসে দেখবেন—সব আয়োজন ঠিক হ’য়ে গেছে। সকল ভার আমিই নিচ্ছি।”

বীরেন বাবু অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন, “যে যা ক’রবে, তা আমার জানা আছে। এই বুড়ো যেটা না দেখবে, সেইটাই প’ড়ে থাকবে।”

শেলী মুহূ হাসিয়া বলিল, “হয় কি না, আপনি কিরে এসে দেখবেন। চা তৈয়েরী, মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে নিন। জ্যোঠামশায়ও তৈয়েরী হচ্ছেন; আর আমি মোটর আনতে আগেই ব’লে দিয়েছি।”

বীরেন বাবু চা খাইতে বসিবার পরই রমাপ্রসাদ বাবু সেখানে আসিয়া পড়িলেন; তিনি কথায় কথায় বীরেন বাবুকে বলিলেন, “কাল আর আপনারা রাঁধা-বাড়ার হাজিমা করবেন না; তিন বেলাই আমার ওখানে সকলের নেমস্তন্ন রইল। এত দিন রইলেন, এক দিনও তো সকলে একসঙ্গে ব’সে আনন্দ ক’রে খাওয়া হ’ল না।”

বীরেন বাবু লুক্কিত করিয়া বলিলেন, “তা সেজন্য এক বেলাই ত যথেষ্ট, তিন বেলা কেন মশায়?”

রমাপ্রসাদ বাবু কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা-প্রকাশের ভঙ্গীতে বলিলেন, “আজ বাদে কাল আপনি বেয়াই হবেন তো? সেই খাতিরে এক দিন আমার বাড়ীতে খেলেনই বা?”

বীরেন বাবু রমাপ্রসাদ বাবুর স্নায়ু কুদ্র ব্যক্তির ধৃষ্টতায় যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া প্রসন্নচক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বেয়াই! তার মানে?”

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার মনের গরম ভাবটিকে আমোল না দিয়া বলিলেন,—“মানে, আজ সকালে বিনয় বাবুর চিঠি পেয়েছি; তিনি দীপ্তেনের সঙ্গে নিনার বিষে দিতে চেয়েছেন।”

দীপ্তেনের সঙ্গে নিনার বিষে! তাঁহার মুখের গ্রীষ্ম অন্তে কাড়িয়া খাইবে! মিষ্টার দত্ত বিশ্বয় ও বিরক্তিতে বিচলিত হইয়া নীরস স্বরে বলিলেন, “ভেতর ভেতর কুঁবি এই সব বড়—ব্যাপার চলছিল? আমরা তো যুগাক্ষরে জানতে পারিনি!” তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে নীরস হাস্য কৃষ্ণ

উঠিল। শাঁক আলু চর্কণকালে ভালুকের মুখভঙ্গি কিরূপ হয়, কে জানে ?

রমাশ্রসাদ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আমি এ গবেষণায় কিছুই জানি না, মশায় ! আমি কি বামন হ’য়ে চাঁদ ধরবার সাহস ক’রতে পারি ? বর-কনে নিজেরাই ঐ সব বড়বড়ের মূল। তবে দীপ্তেন বিনয় বাবুকে বলবার আগে আমার সম্মতি চেষ্টা করুন।”

বীয়েন বাবু মানসিক উত্তা দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন, “এ সংবাদে যে আমি খুব খুসী হ’য়েছি, তা’ বলতে পারছি, তবে আপনার মত লোককে বেয়াইরূপে পাওয়ার আনন্দ আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।—আসল কথাটা কি, জানেন ? আজ ৮৯ বৎসর ধ’রে বিনয় ও আমি স্থির ক’রে রেখেছিলাম, সুনীলের সঙ্গেই নিনার বিয়ে দোব, তার মেয়েটি চমৎকার ; আর—থাক সে কথা। সবকটা ভেঙে যাওয়ার বড়ই ক্লম হ’য়েছি ; কাজেই এ সংবাদে ঠিক সুখী হ’তে পারলাম না। বিনয় মেয়েটাকে বেশী রকম আদর দিয়ে বড় একগুঁয়ে ক’রে তুলেছে ; তাই সে আজ-কালের মেয়ের মতো বাপ-মা’র কথা অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিলে ! তবু নিনাকে আমি বড় স্নেহ করি ; আশা করি, সে দীপ্তেনের সংসারে সুখী হবে ও তাকে সুখী ক’রতে পারবে। আমার স্ত্রীরও বড় সাধ ছিল, নিনাকেই তিনি পূত্রবধু ক’রবেন ; কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না।”

রমাশ্রসাদ বাবু সহানুভূতিভরে বলিলেন, “আপনারা খুবই ব্যথিত হবেন, তা’ বুঝেছি ; কিন্তু আপনি সত্যই বলেছেন—মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। স্তুরাং ভগবানের বিধান মাথা পেতে নেওয়া ভিন্ন আর উপায় কি ? যা’ক, চলুন এখন একবার আমাদের ক্লাবে, ক্লাবের সকল সভ্য আপনার সঙ্গে দেখা ক’রতে চান।”

অন্দর-মহলে বীয়েন বাবুর স্ত্রীকেও এই সংবাদ দিলেন দীপ্তেনের মা। সেই সংবাদ শুনিয়া সুনীলের মা বলিলেন, “তা হ’লে আপনার ছেলের বিয়েতে ঘটক-বিদায়টা আমারই প্রাপ্য হ’ল বলুন। আমি অসুস্থ হ’য়ে আপনারদের অতিথি না হ’লে তো আর এমন বউটি আপনি পেতেন না। আর নিনার মাকেও ছাড়ুছিনে ;

এমন সোণারচাঁদ জামাই, আর এমন চমৎকার বেয়াই-বেয়ান তো পেলেন তিনি আমারই দৌলতে।”

রমাশ্রসাদ বাবুর স্ত্রী সলজ্জ ভাবে বলিলেন, “আমার মত লোকের আপনাকে দেবার মত কিছু আছে কি ?”

দত্ত-গৃহিণী মুকুটিনানা ভঙ্গিতে বলিলেন, “আপনার ঘরে যে রত্ন আছে, তা’ যে অনেক রাজার ঘরেও নেই, সেই রত্নটি আমাকে দিন না।”

ঘোষজায়া কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, “কি সেই রত্ন ? খুলে বলুন দেখি। আমার সাধা হ’লে আপনাকে তা দেব—এ আর বেশী কথা কি ?”

দত্ত-গৃহিণী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “আপনার শেলীটিকে আমার কাছে রাখতে ইচ্ছা ; দেবেন ওকে ? রূপে-গুণে এমন লক্ষ্মী মেয়ে কখনো দেখিনি। যদি একেবারে ছেড়ে না দেন, অন্ততঃ তিন-চার মাসের জন্মও আমি ওকে কাছে রাখতে চাই।”

দত্ত-গৃহিণীর অদ্ভুত আবদারে রমাশ্রসাদ বাবুর স্ত্রী স্তম্ভিত হইলেন ! ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে কি মানুষের বুদ্ধি এতই লোপ পায় যে, ভদ্রবংশের শিক্ষিতা মেয়ে নিঃসম্পর্কীয় লোকের ঘরে বাস করিয়া গৃহিণীর শ্রীচরণে তৈলমর্দন করিবে, ইহা দোষাবহ মনে হয় না ? কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, “শেলীকে কোথাও পাঠানোর অধিকার তো আমার নেই। অনেক তপস্কার ফলে ওর মতন মেয়েকে নিজের ঘরে আনতে পারি। মনে করবেন না, ও যে-সে ঘরের মেয়ে ! ওকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে হ’লে ওর বংশোচিত সম্মান দিয়ে তবে নিয়ে যাওয়া চ’লতে পারে।”

দত্ত-গৃহিণী কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, “রাগ করবেন না চাই ! ওর অসম্মান ক’রবার ইচ্ছে আমার নেই। ওকে বড়ই ভালবেসেছি কি না। ও আমাকে মা বলে ডাকে। আর ও আমার যে সেবাটা ক’রেছে, কারও পেটের মেয়ে, কি ছেলের বউ তা’ পারে না, ক’রে না ; তাই ওকে নিজের মেয়ের মতন কিছু দিন কাছে রাখতে ইচ্ছে হয়।”

ঘোষজায়া মুহূ হাসিয়া বলিলেন, “তার চেয়ে গৃহ-লক্ষ্মীরূপে নিয়ে গেলেই তো পারেন। ছেলের বৌ তো একটি চাই।”

এই কথা বলিয়াই তাঁহার মনে হইল, কথাটা তাঁহার বলা উচিত হয় নাই। দত্তজায়া যে প্রকৃতির লোক, হয় তো মনে করিবে, তিনি মেয়ের বিয়ের অল্প কায়দা করিয়াই এ কথা তুলিলেন; এই জন্ত সজে সজে বলিলেন, “কথাটা বলা হয় তো ঠিক হ’লো না; কারণ, আমি তো বলছি, কিন্তু মেয়েটার যে কি খেয়াল, কিছুতেই সে বিয়ে ক’রতে রাজী নয়।”

কথা শেষ হইবার পূর্বেই সুনীল ধূলি-ধূসরিত দেহে ও শুকমুখে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া গৃহিনীষয় সম্বয়ে বলিলেন, “এমন চেহারা নিয়ে কোথেকে এলে?”

সুনীল শ্রান্ত দেহে অদূরবর্তী আরামকেদারায় বসিয়া-পড়িয়া বলিল, “একটা তদারকের কাজ সেরে মোটরে সোজা চ’লে এসেছি।—পশ্চিমের রাস্তায় কি ভীষণ ধুলো, সে ধুলো তো নয়, ব্রজের রজ!”—সে হাসিতে লাগিল।

সুনীলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া শেফালী ও প্রতিমা উভয়েই সেই ঘরে আসিল।—সুনীলকে দেখিয়া শেলীর মুখে উদ্বেগের ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল; সব কথা বিস্মৃত হইয়া সে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনাকে কি এমনি ক’রে রাত জেগে প্রায়ই কাজ ক’রতে হয়?”

সুনীল মুহূর্ত্তে বলিল, “তা মাঝে মাঝে হয় বই কি।”

শেলী আবার বলিল, “নিজের শরীরের ওপর এত অবহেলা ক’রছেন; শেষে অস্থখে পড়লে কি হবে?”

কথাটা বলিয়াই শেফালীর মনে পড়িয়া গেল যে, অত্যধিক উৎকণ্ঠা দেখান তাহার পক্ষে সুশোভন হয় নাই।—কাজেই সে তাহার মনের ভাব যথাসাধ্য চেষ্টায় গোপন করিল।

পরদিন বিপ্রহরে আহারান্তে রমাপ্রসাদ বাবুর বসিবার ঘরে তিনি ও বীরেন বাবু বিশ্রাম করিতেছিলেন। নানা প্রশ্নের পর বীরেন বাবু বলিলেন, “মশায়, এ সুযোগে কাজের কথা ছ’-একটা ব’লে নিই, পরে আর হয় তো সুযোগ হবে না।”

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না; বলিলেন, “বলুন।”

বীরেন বাবু কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন, “আপনার বাড়ীতে এত দিন

রইলুম, তার জন্ত কত দেওয়া উচিত? আর আপনার দক্ষিণা-হিসেবেই বা কি দিতে হবে বলুন। টাকা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ করা যাবে না, তা’ জানি; তবু আপনার কত প্রাপ্য, তা’ জানতে আগ্রহ হ’লো।”

রমাপ্রসাদ বাবু এই প্রস্তাবে মনে কিঞ্চিৎ আঘাত পাইলেও সংযত স্বরে বলিলেন, “আমি তো আমার বাসের বাড়ী ভাড়া দিয়ে অর্ধোপার্জন করি নে। আর আপনাকে আমি আমার বাড়ী ভাড়া দিয়েছি কি? তবে কিরূপে আপনার কাছে আমার ভাড়া পাওনা হবে? আর ডাক্তারীর দক্ষিণার কথা ব’ললেন; তাও তো আমি নিতে পারিনে। কারণ, আপনি আমাকে চিকিৎসা ক’রতে ডাকেননি। আর তা’ ছাড়া, আমি যত দূর জানি—বাঙলা দেশে বৈবাহিকের কাছে পুরিশ্রমিক নেওয়া আজও চলন হয়নি, এবং এ দেশেও আমি তা চালাতে ব্যাকুল হইনি, তাই তার কোন হিসেব রাখিনি।”

বীরেন বাবু মুখের মত জবাব পাইয়াও নীরব হইলেন না; কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, “এটা কিন্তু কি ঠিক হবে?”

রমাপ্রসাদ এবার কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গেই বলিলেন, “মশায়, পৃথিবীতে অর্থই ভদ্রলোকমাত্রেই সর্ব্বম্ব নয়; প্রাণ পেতে হয় প্রাণ ঢেলে দিয়ে, অর্থের বিনিময়ে নয়। সেই ভাবেই আমি শেলীর মত মেয়েকে আপনার ক’রতে পেরেছি। ওর বাপের সঙ্গে আমার রক্তের বা অস্ত্র-কোনও রকম সম্বন্ধ ছিল না; তবু সে আমার সহোদর-ধিক প্রিয় স্বজন হ’য়েছিল। যৌবনকালে সে যখন স্বদেশ—আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে এ দেশে আসে, তখন আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। প্রবাসী বাঙ্গালী ব’লেই আমি তা’কে তাইএর মতন নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলাম। পরে যখন তার প্রকৃত গুণের পরিচয় পেলাম,—তার উদারতা, তেজস্বিতা, সত্যপরায়ণতার প্রমাণ পেলাম,—তখন তাকে তাই ব’লে গ্রহণ ক’রে নিজেকে ধন্য মনে ক’রলাম। আমি আমার সেই তাইকে দুর্ভাগ্যক্রমে হারিয়েছি বটে, কিন্তু সে যে ছেলে-মেয়ে দু’টি আমাকে দিয়ে গেছে, তা’ অনেক পুণ্যে পাওয়া যায়।”

বীরেন বাবু কণ্ঠকাল নিস্তরু থাকিয়া বলিলেন, “সে তো

সবই বুঝলাম ; কিন্তু আপনার আতিথ্যের প্রতিদানে কি দেওয়া যায় ? চিরদিন কি আমাকে আপনার কাছে ধনী হ'য়ে থাকতে হবে ?”

রমাপ্রসাদ বাবু বিনীত ভাবে বলিলেন, “আমার কাছে আপনাকে ধনী মনে ক'রে অকারণে কৃত্তিত হ'চ্ছেন। আমি আপনার বন্ধুত্ব লাভ ক'রেছি। আপনি আমার বৈবাহিক হ'য়েছেন :: তার ওপর আর কি প্রতিদান আমি আশা ক'রতে পারি ? আপনাদের জন্তেই তো নিজের মত বউ আমার ঘরে আসছে, বরং আমরাই আপনাদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।”

মিষ্টার দৃষ্টিতে এ কথায় নির্ঝক হইতে হইল। জীবনে তিনি বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত বৈবাহিক ব্যক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন ; কিন্তু পূর্বে কোনও দিন এরূপ আপনা-ভোলা, উদারচেতা নিঃস্বার্থ-হিতৈষী ব্যক্তির সংস্রবে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হইল না। তিনি কণকাল নিস্তরু থাকিয়া বলিলেন, “ও কথার পর আর আপনাকে কিছু বলা চলে না। তবে শেলীকে একবার ডাকান।”

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার অমুরোধে শেলীকে ডাকাইয়া আনিলেন। সে আসিলে বীরেন বাবু মখমল-মণ্ডিত একটি সুদৃশ্য বাক্স তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, “শেলী, দেখ তো, জিনিষটা কেমন, পছন্দ হয় কি না ?” বাক্স খুলিয়া শেলী দেখিল, মূল্যবান হীরকখচিত সুন্দর এক-জোড়া ব্রেসলেট !—সে বলিল, “হাঁ, সুন্দর জিনিষ, বেশ সৌখীনও বটে।”

বীরেন বাবু এবার মুহূর্ত্তে বলিলেন, “গিন্নীর ও আমার ছ'জনেরই ইচ্ছা—এই ব্রেসলেট-জোড়াটা তুমি ব্যবহার কর।”

তাঁহার কথা শুনিয়া শেফালী সেই রত্নভূষণ বীরেন্দ্র বাবুর পদপ্রান্তে রাখিয়া কম্পিত কলেবরে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া আবেগ-চঞ্চল স্বরে বলিল, “আমায় কমা করুন ; এ সামগ্রী লওয়া আমার অসাধ্য।”

বীরেন বাবুকে প্রণাম করিয়া শেলী যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি দেখিলেন, তাহার মুখমণ্ডল আয়ত্ৰিম, চক্ষু অশ্রুসিক্ত ; তাহার সর্কাদ তখনও কাঁপিতেছিল। মিষ্টার দস্ত হইতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া

বলিলেন, “কেন মা, তুমি অত বিচলিত হ'য়েছ ; এটা নিতে তোমার আপত্তিরই বা কারণ কি ? মেয়েকে কি আমরা কোন স্নেহের উপহার দিইনে ? না, দেওয়া অমুচিত ? আমি একবারও ভাবতে পারিনি যে, এই উপহার তুমি প্রত্যাখ্যান কোরবে।”

শেলী নতমুখে মুহূর্ত্তে বলিল, “প্রকৃত স্নেহের দান নিতে নিশ্চয়ই আমার আপত্তি হোত না ; কিন্তু এ তো আর তা' নয়। এ দানের উদ্দেশ্য বুঝতে পা'রবার মতো বুদ্ধি আমার আছে বোধ হয়। মায়ের সেবা ক'রেছে ব'লে মেয়েকে উপহার দেওয়া হ'ল—এমন অশোভন কথা কেউ কোন দিন শুনেছে কি ? আপনারা কেন আমাকে এমন ক'রে অপমান ক'রলেন ? বার-বার এত অপমান সহ করা যায় না।”

শেলীর কথায় বীরেন বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন পূর্বে তাঁহার কোন ব্যবহার শেলী অপমানজনক মনে করিয়া মর্মান্বিত হইয়াছে, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণ হইল, তাজমহলে তাঁহার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় শেলী তাঁহার প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহাকে কিঞ্চিৎ রুচ কথায় বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে সে অপমান বোধ করিয়াছিল বলিয়া মনে হইল না। শেলীর এই উক্তির কারণ স্থির করিতে না পারিয়া বীরেন বাবু তাহাকে বলিলেন, “সে কি ? আবার কবে আমি কি ভাবে তোমার অপমান ক'রেছি, তা তো মনে প'ড়ছে না ! আমি তোমার অপমান ক'রব—এও কি সম্ভব ?”

শেফালী এতকণে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। আত্ম-পরিচয় দিবার ইচ্ছা আদৌ তাহার ছিল না ; কিন্তু অসতর্ক মুহূর্ত্তে হঠাৎ যখন এত দূর বলিয়া ফেলিয়াছে, তখন সে আর আত্মগোপন করিবার পথ দেখিতে পাইল না। তাই সে অবিলম্বে ঘরের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া সতর্ক ভাবে একবার চারি দিক দেখিয়া আসিল। তাহার পর বীরেন বাবুকে অমুচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল, “আপনাকে এ সব কথা বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কথাটা যখন উঠেছে—তখন সবই জেনে যান। এ রকম সুবিধা পরে আর হয় তো হবে না। আমি কে, তা না-জেনেই আপনারা আমাকে মায়ের সেবা করবার অধিকার দিয়েছেন, এবং

স্নেহদানেও কার্পণ্য করেননি,—এতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে ক'রেছিলাম। এটুকু আনন্দও যে জীবনে পাব, এ আশা কোনও দিন আমি অন্তরে পোষণ ক'রতে পারিনি। আপনাদের নিজের কাছে পাব, আপনাদের স্নেহলাভ ক'রবো, এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর!—আমার প্রকৃত পরিচয় পেলে আপনারা আমার ছায়াও মাড়াতেন না! আর এত বিপদে প'ড়েও এ-বাড়ীতে আসতেন না।”—আবেগভরে শেফালীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

বীরেন বাবু তাহার কথায় স্তম্ভিত হইলেন। ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারায় একবার শেফালীর আর একবার রমা প্রসাদ বাবুর মুখের দিকে প্রশ্নস্থচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; অবশেষে কৌতূহলী হইয়া তিনি বলিলেন, “তোমার অল্প পরিচয় আছে না কি? কে তুমি?”

শেলী রুদ্ধনিশ্বাসে অকম্পিত স্বরে বলিল? “আমি? আমি কনকপুরের অভয়াচরণ মিত্রের পৌত্রী, বিমলাচরণ মিত্রের কন্যা, এবং সন্তোষকুমার মিত্রের ভগিনী, আর কাহার পুত্রবধু, আপনার তাহা স্মরণ না থাকাই সম্ভব।”

অকস্মাৎ বারুদে আগুন দিলে বারুদস্তূপের অবস্থা যেরূপ হয়, মিষ্টার দত্ত শেফালীর প্রকৃত পরিচয় শুনিয়া সেই ভাবে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া ছুঁকার করিয়া বলিলেন, “শঠ, চক্রাস্তকারী প্রতারকের দল, তোমাদের পরোপকারের—সাধুগিরির মর্শ্ব এখন বুঝতে পারছি! সুনীলকে ধ'রবার জন্তে ফাঁদ পেতে এই সব কাণ্ড করা হ'য়েছে। আর তোমারই মোহিনীশক্তির মোহে নির্ঝোষ ছেলেটার মাথা ঐ ভাবে বিগ'ড়ে গেছে। তাই হঠাৎ তার মনে কর্তব্যনিষ্ঠা চেগে উঠেছে, আমার অবাধ্য হ'তে তার সাহস হ'য়েছে! তাতেও সাধ মেটেনি, নিজের সত্য পরিচয় গোপন ক'রে শেষে আমাদেরও বশীভূত করবার চেষ্টা! কি ভয়ানক ব্যাপার! ও:—”

ধীরপ্রকৃতি, উদারহৃদয় রমা প্রসাদ বাবু গৃহাগত অতিথির মুখে অশ্রাব্য কটুক্তি শুনিয়াও বিচলিত হইলেন না; তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “মন সংযত করুন মশায়! জানহারা হ'য়ে কতকগুলো অসঙ্গত প্রমাণ-বাক্য আপনার মুখে শোভা পায় না। আপনি বিচক্ষণ, প্রবীণ লোক, কিঞ্চিৎ বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রলেই বুঝতে পারবেন,

আপনি অযথা কটুক্তি ক'রছেন, ক্রোধে বিহ্বল হ'য়ে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রছেন।”

বীরেন্দ্র বাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “খামুন মশায়! আপনার কাছে আমি কর্তব্য শিখতে আসিনি।”

রমা প্রসাদ বাবু ধীর ভাবেই বলিলেন, “সে সাধ্য আমার নেই, তা আমি জানি; কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি—মশায় কি আমাদের কৃত্যগণ্ড গ্রহণ ক'রে তাজমহল দেখতে আশ্রয় এসেছিলেন? না, আমরাই ষড়যন্ত্র ক'রে আপনার স্ত্রীর ঘাড়ে আকস্মিক অস্ত্র চাপিয়ে দিয়েছিলাম? শেলী কি সব জেনে-শুনে নিজের সুবিধার লোভে আপনার স্ত্রীকে প্রাথমিক সাহায্য দেওয়ার জন্তে প্রস্তুত হ'য়ে সেখানে গিয়েছিল? আর যখন আপনার বিপন্ন, সঙ্কটশঙ্কাকূলা স্ত্রীর আশ্রয়স্থল জন্তে ব্যাকুল হ'য়ে সে তাঁকে বুকে তুলে নিয়েছিল, তখন কি সে তাঁর পরিচয় জানতে পেরেছিল?—এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর আপনি দিতে পারেন?”

শেলী এবার মাথা তুলিয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, “আর অ্যাঠামশায় যখন আপনাদের এখানে নিয়ে আসেন, তখন কি তিনি আপনাদের পরিচয় জেনে আনতে চেয়েছিলেন, না, তাঁর পূর্বেই? আমরা কোন অহুগ্রহেরই প্রার্থী নই; আর আত্মগোপন শেষ পর্যন্ত ক'রবার সঙ্কল্পও আমার ছিল।”

তাহার পর কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া শেলী লজ্জাবনত নয়নে ম্লান মুখে বলিল, “আপনার পুত্র—মিষ্টার দত্ত এখন পর্যন্ত আমার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেননি। তাঁকে তা জানাবার চেষ্টা আমি কোনও দিন করিনি, এবং করবও না; বরং অতীতেও এ চেষ্টায় নিবৃত্ত ক'রেছি। পিতা-পুত্র বিচ্ছেদ ঘটাবার হীন প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার পরিচয় জানতে পারলে পাছে আপনারা বুদ্ধিহারা হ'য়ে মায়ের কোন অনিষ্ট করেন, এই আশঙ্কাতেই আমি পরিচয় দিইনি, প্রবঞ্চনা করবার ছরভিসন্ধি আমার ছিল না। আমার এখন এই অহুরোধ যে, আপনার স্ত্রী-পুত্রাদি কাটকে আমার পরিচয়টা জানাবেন না,—বিশেষতঃ আমার স্বামীকে; তাঁকে আমি আমার পরিচয় জানাতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

শেফালী তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

বীরেন্দ্র বাবু হতবুদ্ধির ভ্রায় বসিয়া রহিলেন। ক্রোধে তিনি কিরূপ অন্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, তাঁহার অহঙ্কার-দর্প চূর্ণ হইল। অবশেষে তিনি বিনীত স্বরে রমাপ্রসাদকে বলিলেন, “আমাকে ক্ষমা ক’রতে পারবেন কি? আপনাদের প্রসি যে অন্ময় করেছি, তার প্রতীকার নেই, তবু নিজগুণে ক্ষমা করবেন কি?”

শান্ত স্বরে রমাপ্রসাদ বাবু বলিলেন, “আমার প্রতি অন্ময় বিশেষ কিছু করেননি তো। শেলীর ভাগ্যালিপি কে খণ্ডন করবে বলুন? যা হোক, আপনি মনে কোনও ক্ষোভ রাখবেন না।”

শেফালীর শেষ অনুরোধ বীরেন্দ্র বাবু অগ্রাহ্য করিলেন না, তিনি তাহার প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও জানাইলেন না।

৮

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরবর্তী একটি বাড়ীর সম্মুখস্থ উদ্যানের চৌতারায় বসিয়া একটি যুবক ও একটি যুবতী চা খাইতেছে। বহু দিন পরে ভাই-ভগিনীর সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাদের কথা যেন আর শেষ হইতেছে না! উভয়ের নানা কথা চলিতেছে, এমন সময় ভৃত্য ডাকের চিঠি লইয়া আসিল। একখানি পত্র খুলিয়া সন্তোষকুমার সর্বপ্রমে লেখকের নামটি দেখিল। সুনীলই এতকাল পরে সেই পত্র লিখিয়াছে দেখিয়া সে আগ্রহভরে তাহা পাঠ করিল,—

“প্রিয় সন্তোষ,

আমার প্রতি বিমুগ্ধ হইও না, এই চিঠি পড়িয়া নিজগুণে আমার সকল ত্রুটি ক্ষমা করিও। কর্তব্য-সাধনের সংসাহসের অভাবে আমি গত নয় বৎসর কি নিদারুণ মনঃকষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহা আশা করি, তোমাদিগকে কখনও জানিতে হইবে না। স্বাধীনতা লাভের আশায় দাসত্ব বরণ করিয়াছি; চাকরী করিতেছি। কতবার মনে হইয়াছে, বিবাহিতা পত্নীকে গৃহে আনিয়া সংসারী হইব; কিন্তু বাবার ভয়ে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। না হইলেও এত দিনে আমার মোহ দূর হইয়াছে। কর্তব্য-সম্পাদন করিয়া অন্ততঃ ধর্ম রক্ষা করিব। আমার বিবাহিতা পত্নীকে স্মৃতি করাই অতঃপর আমার জীবনের ব্রত হইবে। এজ্ঞা তোমার ভগিনীর অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি

তোমার অমৃতপ্ত স্বহৃদ—

সুনীল।”

সন্তোষ চিঠিখানা পড়িয়া-দেখিয়া তাহা শেফালীর হাতে দিয়া বলিল, “সুনীল তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবার অনুমতি চেয়েছে। যা’ক, এত দিন পরেও যে তার কর্তব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হ’য়েছে, এ বড়ই আনন্দের বিষয়। তা’র সম্বন্ধে আমার বড়ই উচ্চ ধারণা ছিল, তাই ভেবেছিলাম, সে কখনও ভ্রায়পথ ত্যাগ করবে না। এত দিন তার অব্যবস্থিতচিত্ত দেখে নিরাশ হ’য়েছিলাম। যা হোক, এখন তোমার মত পেলেই তা’কে আহ্বান করি।”

শেফালী অনেকক্ষণ তাহাকে উত্তর দিতে পারিল না। কেন পারিল না, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহা বুঝাইবার জ্ঞান আর নূতন করিয়া শেফালীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই।

শেফালীকে নীরব দেখিয়া সন্তোষ বলিল, “এত কি ভাবছ বোন?...”

শেফালী নতমুখে বলিল, “এখন আমার কি যে কর্তব্য, তা’ স্থির করতে পারছি নে। শুধু আমার নিজের স্পৃহের কথা ভাবলেই তো চলবে না।”

সন্তোষ এই উত্তরে যেন একটু ক্ষণ হইয়া বলিল, “সুনীল তো তোমাকেই চায়। তার সেই পত্নীবাসিনী পত্নীই যে শেলী মিত্র, তা’ জানলে সে কি কম খুসী হবে?”

শেফালী চিন্তিতভাবে বলিল, “কিন্তু বাপ-মা ভাই-বোনের সংস্রব ত্যাগ ক’রেই কি তিনি স্মৃতি হ’তে পারবেন?”

সন্তোষ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, “সে জ্ঞে কি তোমার ও তার সারা জীবনটাই ব্যর্থ করবে? সুনীল আর কাউকে কোন কারণেই যে বিয়ে করবে না, তা’ বোধ করি, এখন বুঝতে পেরেছ। তখন বাপ-মা’র সঙ্গে তার সম্বন্ধ বজায় রাখতে গিয়ে কি তাকে চিরজীবন কষ্ট দেওয়া সম্ভব হবে?”

শেফালী তথাপি বলিল, “মা-বাপের প্রতিও তো তাঁর কর্তব্য আছে; আর তাঁর বাবার প্রকৃতি কিরূপ কঠোর, তা তো তোমার অজ্ঞাত নয়।”

সন্তোষ এবার দৃঢ়স্বরে বলিল, “আমি তোমার ও-সব আপত্তি আর শুনি নে। তোমাদের দু’জনের জীবনের অনেকগুলি বৎসর বৃথা নষ্ট হ’য়েছে। সুনীলের বাবার অহঙ্কার আর খেয়ালের খাতিরে কি ছোটো জীবন সম্পূর্ণ

ব্যর্থ ক'রতে হবে ? বীরেন বাবুর যদি এতটুকু সুবুদ্ধি বা মনুষ্যত্ব থাকতো তো তিনি নিজেই চেষ্টা ক'রে ছেলেকে কনকপুর পাঠিয়ে ঘরের বউ ঘরে নিয়ে যেতেন। কিন্তু অহঙ্কারে তাঁর বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আর সুনীলের মা নিতান্ত নিরীহ স্ত্রীলোক ; ব্যথা পেলে হয় তো তাঁর জিদ বাড়বে, তখন পারিবারিক শান্তিরক্ষার জন্তে দস্তজার চক্র খুলে যাবে ব'লেই মনে হয়।”

শেফালী আর কোনও কথা বলিল না। সস্তোষ সেই দিনই পত্রের উত্তরে লিখিল—

“প্রিয় সুনীল,

তোমার অপ্রত্যাশিত পত্রখানি পেয়ে আমার কি আনন্দ হয়েছে, তা ভাবায় আমার প্রকাশ করার শক্তি নেই। এ আনন্দ শুধু আমার ভগিনীর ভবিষ্যৎ ভেবে নয়, আমার পুরানো সখাকে ফিরে পাওয়ার জন্তেও বটে। কতব্যপথে তুমি অসুখী হবে না ভাই ! যে দিন আমার বোনটিকে ঠিক চিন্বে, সেই দিনই বুঝতে পাববে, সে তোমাকে সুখী করবে।

তুমি তোমার স্ত্রীর অমুমতি চেয়েছ। সে হিন্দু মেয়ে, বাংলার মেয়ে, তাব কাছে স্বামীর ইচ্ছা দেবতার আদেশের সমান ; সাতা সার্বভৌম আদর্শে সে শিক্ষিত। কেবল তা'কে নিয়ে পাছে তুমি সুখী হ'তে না পাব, এইটুকুই তাব ভয়,—হিন্দুধর্মের পতিপবায়ণা মন তাহাকে নিজের কথা ভুলিয়েছে।

বড়দিনের ছুটিতে কনকপুরে তোমার প্রতীক্ষায় থাকব, সেই পিতৃভিটা থেকেই বরবধুরূপে তোমাদের শুভ-যাত্রা দেখতে চাই। জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এত কাল পরে তিনি যেন দম্পতীকে সুখী করেন ; ইতি।

তোমার সুখ-স্বস্তির বন্ধু—
সস্তোষ।”

* * * *

শীতের সন্ধ্যায় কলিকাতার বাসভবনের আরাম-কক্ষে বীরেন বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা সুনীলের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া আছেন—সুনীল ও প্রতীমা তাহাকে আনিতে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছে। সুনীলের আগমনে আজ তাহার মাতার মনে আনন্দ নাই, আসন্ন বিচ্ছেদের ভয়ে তিনি ব্যাকুল। তিনি স্বামীকে বলিলেন,—“তোমাকে মিনতি করছি, আমার একটি কথা রাখ। সুনীল যদি বউ ঘরে আনতে চায় তো আনতে দাও। তার চিরবিচ্ছেদ যে আমি সহ করতে পারব না।”

বীরেন বাবু মুখ ভার করিয়া বলিলেন, “তুমিই তো

ছেলেবেলা থেকে আদর দিয়ে-দিয়ে তাকে ঐ রকম একান্ত ক'রে তুলেছ। আমি কিছুতেই ঐ রকম জেদের প্রশ্রয় দেব না। শত অভাবের মধ্যে সংসার সে চালাক, দেখি তার ধর্মজ্ঞান, কর্তব্যজ্ঞান কেশবায় গিয়ে দাঁড়ায়।”

দত্ত-গৃহিণী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন,—“কিন্তু সুনীল যা' বলছে, তা' তো অন্ডায় বলতে পার না। আর তার বয়স হয়েছে, সে সংসারী হ'বে না?”

বীরেন বাবু বলিলেন,—“সংসারী হ'তে কে তা'কে বারণ ক'রেছিল ? নিজের জেদেই তো এত দিন বিয়ে করেনি, নয় তো কোন যুগে নিনার সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারত। শুধু জেদের জন্তে নিবু'দ্ধির মতন নিনার বাপের অত টাকা হাতছাড়া ক'রে ফেললে। নিনাকে বিয়ে করলে সব দিক রক্ষা হ'তো ; তা করলে না—নিজেও উপযুক্ত স্ত্রী বরণ করলে না। এখন ওর একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।”

দত্ত-গৃহিণী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “চিরদিনই ওকে শিক্ষা দেবে ? আমি কিন্তু আর চূপ ক'রে সহ করতে পারছি নে। সারাটা জীবন তোমার ভয়ে, আর আমার শান্তিপ্রিয় দুর্বল স্বভাবের জন্তে মুখ বুজে সব সহ ক'রে এসেছি। আমার ছেলেকে আমি কিন্তু কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি যদি তাদের এ বাড়ীতে না আসতে দাও তো আমি তাদের কাছে গিয়ে থাকব ; কোনও বাধা মানব না।”

এ দিকে বীরেন বাবুর মাতাও পুত্রের সহিত খুব গোলযোগ আরম্ভ করিলেন। তিনি এত দিন সুনীলের বিবাহের কথা জানিতেন না, হঠাৎ শুনিতো পাওয়ার বলিলেন, “কি অলুক্ষণে কথা ! আগুনের সামনে যখন তার মাথায় সুনীল সিঁদূর দিয়েছে, সেই তো ঘরের লক্ষী ; তা'কে ঘরে না আনলে অমঙ্গল হবে না তো কি ? সেই পাপেই এত অশান্তি ; তারই জন্তে বৌমার এ রকম শক্ত অসুখ হ'য়েছিল। বউ এখুনি ঘরে আন।”

হামবড়া বীরেন দত্ত কাহারও কথাই রাখিলেন না ; নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন না। কিন্তু সংসারে অশান্তির সীমা রহিল না ; তাঁহার প্রাণে ব্যথা বাজিল।

সুনীল যে দুই দিন কলিকাতায় থাকিল, যত দূর সম্ভব,

মাতা ও পিতামহীর কাছেই রহিল। বাল্যকাল হইতে সে ইহাদের অমুরক্ত; আসন্ন বিচ্ছেদ জানিয়া সে যেন দুই দিনেই তাঁহাদের স্নেহ ও আদর পূর্ণমাত্রায় আদায় করিবার প্রয়াস পাইল।

বিদায়কালে সুনীল তাঁহাদের চরণধূলি লইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “এ বাড়ীর সঙ্গে আজ থেকে আমার সকল সম্বন্ধই তো ঘুচলো। কিন্তু তোমরা যেন আমাকে ভুলে যেনো না। যে দিন বউ নিয়ে টুঙলায় ফিরে যাব, সে দিন এই পথেই যাব, তোমরা একবার কি সেই সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াবে? তা’ হ’লে দূর থেকে আমরা তোমাদের আশীর্বাদ নিয়ে যেতে পারব।”—মা ও ঠাকুরমা তাহার কথা শুনিয়া অশ্রু সঞ্চার করিতে পারিলেন না।

সুনীল চলিয়া গেল; সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াই প্রস্থান করিল। মিষ্টার দত্ত নিজের পরাজয়ে ব্যথিত হইলেও পুত্রের সংসাহসে খুব অসুখী হইলেন না। আগ্রা হইতে দেশে ফিরিয়াই তিনি গোপনে সন্তোষদের কুলের বিশেষ পরিচয় লইয়া জানিতে পারিয়াছেন, সেই কুলের কণ্ঠা তাঁহার বংশগৌরব বর্দ্ধিতই করিবে। তাহার মাতৃকুলের পরিচয় তাঁহার বহু দিন হইতেই জানা ছিল। আর বধুর পরিচয় তিনি আগ্রাতেই পাইয়াছেন। সুনীল বিদায় গ্রহণ করিলে তাহার ঘণ্টা তিন-চার পরে দত্তজা হঠাৎ তাঁহার জীকে বলিলেন, “বিশেষ দরকারী কাজে আমাকে এখনই কলকাতার বাইরে যেতে হবে; একটা স্ট্রটকেশে কিছু কাপড়-জামা ও বিছানার ব্যবস্থা ক’রে দাও। আমার সব চেয়ে দামী সম্পত্তি হাতছাড়া হবার যোগাড়! আমি মোটরেই যাব, আজই ফেরবার চেষ্টা ক’রব।”

* * * *

কনকপুর গ্রাম হইতে রেলপথ পর্যন্ত আজ মহা সমারোহে সজ্জিত; ক্ষুদ্র ষ্টেশনটির একরূপ সাজ-সজ্জা কখনো কেহ দেখে নাই। কৌতূহলপরবশ হইয়া সন্নিহিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নর-নারী ষ্টেশনে, পথের ধারে, এবং কনকপুরে সমাগত হইয়াছে। সন্তোষকুমার সুনীলের অভ্যর্থনার সকল আয়োজন শেষ করিয়া ট্রেনের সময়ের পূর্বেই ষ্টেশনে আসিয়াছে।

ক্রমে দূরে ট্রেনের ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল। ট্রেন ষ্টেশনে থামিলে বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্র বাবু সুন্দর কুলের মালা লইয়া

সুনীলের গলায় দিয়া প্রথমে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। সন্তোষ বলিল, “সুনীল, ভাই! কাকাবাবুকে প্রণাম কর, ঠুর মত শুভাকাজী আমাদের আর এক জন ছাড়া কেউ নেই,—তাঁর নাম পরে জানবে। ইনি কাঞ্চনপুরের জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ঠুর সব কথাও পরে বলবো।”

জনতা ভেদ করিয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবু আগে আগে চলিলেন, তাহার পরে চলিল সুনীল ও সন্তোষ। ষ্টেশন হইতে তাহাদের গাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। চলিতে-চলিতে সন্তোষ সুনীলকে বলিল, “এ কি মূর্ত্তি হয়েছে তোমার? মনে যদি ব্যথা পেয়ে থাক, তবে না এলেই পারতে। শেফালীর বাকি জীবনটা কোন রকমে কেটে যেতই।”

শেফালী নাম শুনিয়া সুনীল শিহরিয়া উঠিল। নিয়তির এ কি পরিহাস? সে কাতর কণ্ঠে কহিল, “ভাই, আমার এই সাময়িক বিহ্বলতা ক্ষমা কর। কয়েক ঘণ্টা আগে বাড়ীর সকলের কাছে চিরবিদায় গ্রহণ ক’রতে হ’য়েছে; মনের সে বেদনা সহজে ভুলে যাব, সে শক্তি আমার নেই। আশা করি, শীঘ্র মন স্থির করতে পারবো, কর্তব্য সম্পাদনেও আমার ক্রটি হবে না।”

গাড়ী বাটার সম্মুখে থামিলে, প্রতুল বাবু জামাতাকে সমাদরে সুসজ্জিত শকট হইতে নামাইয়া লইয়া বৈঠক-খানার দিকে অগ্রসর হইলেন। পুরনারীগণের হুলুধ্বনিতে সেই বিস্তার্ত্ত ভবন মুখরিত; নহবতে সুমিষ্ট আবাহন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর সন্তোষ আসিয়া সুনীলকে বলিল, “পাড়ারগায়ে এসেছ ভাই, পাড়ারগায়ের প্রথা মেনে চলতে হবে। বাড়ীর ভিতর কি সব মাসুলিক আয়োজন হ’য়েছে শুনিছ, তা’ থেকে তোমার পরিভ্রাণ নেই। এ অত্যাচার সহ করতেই হবে।”

সুনীল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “আচ্ছা চল, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।” সন্তোষ তাহার উদাসীন ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিল। সে মঞ্জুলেশ্বর কাছের সকল কথাই শুনিয়াছে।

অন্দরমহলে গিয়া সুনীল দেখিল, নূতন বরকে বরণ করিবার মত সব আয়োজনই হইয়াছে, কেবল চিত্রকরা পিঁড়ি একখানা নহে, দুইখানা। এক প্রৌঢ়া তাহাদকে

অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া একখানি পিঁড়িতে দাঁড় করাইলেন। তাহার পর পট্টবস্ত্রপরিহিতা অবগুষ্ঠনবতী লজ্জাবনতা বধুকে আনিয়া অত্র পিঁড়িতে দাঁড় করান হইল। নিয়মিত ভাবে বরণ শেষ হইলে পুরনারীরা সুনীলকে বলিলেন, “এই বার হাত ধ’রে কনেকে ঘরে নিয়ে যেতে হবে।”

সুনীল অগত্যা স্ত্রীর হাত ধরিল। ঘরের ভিতর আশীর্বাদ প্রভৃতি আচার সূসম্পন্ন হইলে সন্তোষ ভগিনী-পতির ছরবস্থা দেখিয়া বলিল, “পিসিমা, আর এ সব থাক, এখন আমি ওকে তুলে নিয়ে যাই। বরং ওর জন্ম কিছু জলখাবার আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও।”

সন্তোষের ঘরে পালঙ্কের উপর বসিয়া কিছুকাল গল্প করিয়া সন্তোষ সুনীলকে জিজ্ঞাসা করিল, “শেফালীর সঙ্গে এখনি দেখা করবে, না খাওয়া-দাওয়ার পর? তুমি বোধ হয়, বিয়ের সময় তার মুখও দেখনি, তাকে দেখবার জন্ম যদি ব্যস্ত হয়ে থাক তো বল?”

সুনীল কোন প্রকার কুণ্ডা প্রকাশ না করিয়া বলিল, “তা’ দেখা হওয়া মন্দ কি? যা’র সঙ্গে সংসার ক’রতে হবে, তা’র সঙ্গে পরিচয় ক’রতে চাই বই কি? তবে আমি যে সেজ্ঞা খুব ব্যস্ত হ’য়েছি, তা মনে কোর না। তার চেয়ে বরং তোমার স্ত্রীর সঙ্গেই প্রথমে আলাপটা করা যা’ক। আশা করি, তোমাদের বংশে অবরোধ-প্রথা এত প্রবল নয় যে, আমার সামনে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে। গৃহকর্ত্রী এখনও আমাকে দেখাই দিলেন না, তা’তে কি তাঁর আতিথ্যের ক্রটি হচ্ছে না?”

সন্তোষ হাসিয়া বলিল, “তিনি যে কনকপুরে নেই। তিনি থাকলে কি আর তুমি এত সহজে নিস্তার পেতে?”

সুনীল বিস্মিত ভাবে বলিল, “এ কি রকম কথা! এই উৎসবে তিনি অমুপস্থিত, তার কারণ?”

সন্তোষ বলিল, “বাড়ী থাকবার উপায় থাকলে কি আর তিনি এই আনন্দের দিনে দূরে থাকতেন? তিনি একটি নবীন আগন্তকের প্রতীক্ষায় পিত্রালয়ে আছেন। তা তোমাকে খুব শীগ্গিরই তাঁর কাছে নিয়ে যাব, তোমাকে আর শেফালীকে একসঙ্গে দেখবার জন্মে তিনিও উদ্গ্রীব হ’য়ে আছেন। সে পরের কথা পরে হবে।

এখন শেফালীকে ডেকে আনি; তোমার অভ্যর্থনার ভার তার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিত হ’তে চাই।”

অলক্ষণ পরেই সন্তোষকুমার তাহার ভগিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। “পট্টবস্ত্রের অবগুষ্ঠনে মুখ চাকিয়া, লাজজড়িত ধীর পদবিক্ষেপে শেফালিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে তাহার দিকে চাহিয়া সুনীলের মনে হইল—এই পল্লীবধুর সহযোগিতায় তাহার দাম্পত্য জীবনে সুখের আশা কোথায়? শেফালী তো নববধু নহে, অপ্রাপ্তবয়স্কাও নহে, সে না কি আধুনিক ভাবে শিক্ষিতা; তথাপি সে ঘোমটা-ঢাকা লাজুক পল্লীবধুর মতন তাহার সম্মুখে আসিল, সে কি করিয়া উচ্চশিক্ষিত সুনীলের সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী হইবে? কিন্তু উপায় কি? সকল অসুবিধাই তাহাকে সহ্য করিতে হইবে।—এই সকল কথা ভাবিয়া সুনীল উঠিয়া দাঁড়াইল ও পূর্ব-নির্দেশমত সন্তোষ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিল। সে এখন কি করিবে, তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না; সে ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া ঈষৎ বিরক্তিতে বলিল, “কাপড়ে ঢাকা মাংসের একটা পুঁটুলী দেখবার জন্মেই কি আমি এত দূর এসেছি?”

অবগুষ্ঠিতা মৃদু হাসিয়া কোমল স্বরে বলিল, “বাক-চাতুর্যে অনভ্যস্তা অশিক্ষিতা পল্লীবধুর কাছে আপনি এর বেশী আর কি প্রত্যাশা ক’রেছিলেন?”—সে নতমস্তকে সুনীলের পদধূলি গ্রহণ করিল।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুনীল ব্যাকুল হইল। তাড়াতাড়ি বধুর হুইটি হাত ধরিয়া তাহার অবগুষ্ঠন উন্মোচনের চেষ্টা করিল; বিস্মিত ভাবে বলিল, “কে তুমি মায়াবিনী? তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার স্পর্শ যে পরিচিত ব’লেই আমার মনে হচ্ছে!”—শেফালী হাসিয়া মুখের ঘোমটা আরও বেশী নামাইয়া দিল।

সুনীল এবার উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আর আমি তোমার আপত্তি শুনছি নে, দেখি তোমার মুখ!”—সে শেফালীর ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।

সুনীল আবেগ-কম্পিত বক্ষে তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল, “শেফালী—তুমি শেলী! তুমি এত নির্ভর! এমনই ক’রে কি প্রতিফল দিতে হয়? তুমি তো

জানতে যে, তোমাকে পাবার জন্তে আমি পাগল হ'য়ে-
ছিলাম, জাহাজে দেখা হওয়া অবধি তুমিই যে আমার
হৃদয় অধিকার ক'রে ছিলে।”

শেফালী স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া গদগদ স্বরে
বলিল, “তা জানি। আপনি তো চেয়েছিলেন শেলীকে,
পল্লীবধু শেফালীকে তো চান্নি? তখন ধরা দিলে
আপনি যে এই প্লাজাগেয়ে সরলা বালিকার অস্তিত্ব
পর্যন্ত ভুলে যেতেন।”

সুনীল বলিল, “এখনও তুমি ‘আপনি’ ব'লে কেন
আমাকে তোমার হৃদয় থেকে দূরে রাখছো?”

শেফালী মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, “অভ্যাস কি
সহজে ছাড়া যায়? যাই হোক, শেলী চেয়েছিল তার
স্বামী সংয়মী, কর্তব্যে অটল, দেব-চরিত্রের মানুষ হবেন।
সে কি নিজের আশা পূর্ণ ক'রবার লোভে স্বামীকে সেই
উচ্চ আদর্শ থেকে নামিয়ে আনতে পারে?”

সুনীল কৃত্রিম গাঙ্গুীর্ঘ্য প্রকাশ করিয়া বলিল, “তোমায়
শান্তি দেওয়া দরকার।”—বলিয়া সে শেফালীর মুখখানি
তুলিয়া-ধরিয়া চুষনে চুষনে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

১০

আহারান্তে দুই বন্ধু বাহিরের ঘরে বিশ্রাম ও আলাপ
করিতেছিল। সুনীলের সকল আশঙ্কা দূর হইয়াছে;
এইমাত্র ক্ষোভ যে, তাহার স্নেহময়ী মাতা তাহার সুখের
অংশভাগিনী হইতে পাইবেন না। সন্তোষ তাহার মনের
ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, “ভাই, এত আনন্দের দিনেও
শেফালী ও আমি এ মুখ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ ক'রতে
পারছি। তোমার মা-বাপের আপত্তি যত দিন না
দূর ক'রতে পারব, তত দিন আমরা শান্তি পাব না।
যে দিন তাঁদের সঙ্গে তোমাদের মিলন হবে, সেই দিনই
আমাদের সকল মনঃকষ্টের অবসান হবে; আমরা পূর্ণ
আনন্দের আন্বাদন লাভ করবো।”

সুনীল বলিল, “আমি ভগবানের নিকট অন্তরের
সঙ্গে তো সেই প্রার্থনাই করছি ভাই!”

সন্তোষ সহাসুভূতিতরে বলিল, “আশা করি, শীঘ্রই
ভগবান তোমার মনোবেদনা দূর করবেন। এখন
আপাততঃ তুমি কি করবে? ছুটির ক'টা দিন এখানেই
থাকবে, না, সঙ্গীক অস্ত্র কোথাও বেড়াতে যাবে?”

সুনীল বলিল, “এখানে থাকব মনে ক'রেই তো এসেছি;
তবে তোমার যদি কোন রকম অন্ত্রবিধে হয় তো
শেফালীকে নিয়ে টুঙলায় চলে যাব। তুমি যদি আগ্রা
যাবার জন্তে অধীর না হ'য়ে থাক তো শেফালী যে পল্লী-
গ্রাম এত ভালবাসে, কয়েক দিন এখানে থেকে তার
সেই পল্লীজীবনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাই। তার
পর হু'জনে একত্র আগ্রায় যাওয়া যাবে।”

সন্তোষ মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, তা হয় না। কত
দিন পরে দেশে এসেছি, হু'দিন থাকতে ইচ্ছে হয় না?
আর তা' ছাড়া, এই মিলনোৎসব তো স্থানীয় লোকেরও
বটে। তুমি থাকতে পারবে জেনে ভারী আনন্দ হ'ল।
কাল গ্রামের সকলকে প্রীতিভোজনে যোগদানের জন্ত
নিমন্ত্রণ ক'রেছি।”

এই সময় দ্বারবান আসিয়া সংবাদ দিল—কলিকাতা
হইতে এক বাঙ্গালী-সাহেব মোটরযোগে বাহিরে
উপস্থিত।

“তাঁকে এখানে নিয়ে এস,—বলিয়া সন্তোষ সুনীলকে
বলিল, “এখন আবার এখানে সাহেব কে এল—দেখি।”

সে বাহিরে যাইবার জন্ত উঠিতেই সেই সাহেব-
বেশধারী বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া সন্তোষকে দেখিয়া
বলিলেন, “সন্তোষ! আমাকে চিন্তে পেরেছ কি?”

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুনীলও ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া
দাঁড়াইল।

উভয়েই নির্ঝাক! কি অভিপ্রায়ে মিষ্টার দত্ত হঠাৎ
এই পল্লীগ্রামে উপস্থিত, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সন্তোষ
শঙ্কাকুল চিন্তে তাঁহাকে বলিল, “আপনাকে চিন্তে পারব
না সার? কিন্তু এ যে আমার আশাতীত সৌভাগ্য!”

সুনীল পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, “বাবা, তুমি
কি ক'রে এখানে এসে প'ড়লে? আর কেনই বা এলে,
তা তো বুঝতে পারছি।”

মিষ্টার দত্ত চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি?
আমি আমার শেলী মাকে বাড়ী নিয়ে যাব ব'লে এখানে
এসেছি। তুমি অবাক হ'য়ে বোকার মতন দাঁড়িয়ে
রইলে যে? আমি অসঙ্গত কিছু করিনি বোধ হয়?”

সুনীল ও সন্তোষ পুত্তলিকাবৎ নির্ঝাক, নিশ্চল,
উভয়ে স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বীরেন বাবু তখন একখানি চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া বলিলেন, “অবাক হ’য়ে সব হাঁ ক’রে দাঁড়িয়ে রইলে যে ? ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে তাঁকে বসতে বলতে হয়, সেটুকু ভদ্রতা জ্ঞানও কি লোপ পেয়েছে ?”

এই তিরস্কারে সন্তোষের বাহুজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং ক্রটির জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, “এ যে আমাদের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য সার! সত্যই চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারিনি, এই জন্তই কর্তব্যপালনে ক্রটি হ’য়েছে।”

সন্তোষ তাঁহার আদর-আপ্যায়নের আয়োজন করিতে উদ্যত হইলে, বীরেন বাবু বলিলেন, “আমার জন্ত তোমাদের ব্যস্ত হ’তে হবে না; এগনই আমাকে আমার শেলী মায়ের কাছে নিয়ে চল, ছেলের সে যত্ন করতে জানে। দেখি, সে আমার সব ক্রটি ক্ষমা ক’রতে পারবে কি না। তোমরা বরং আমার ড্রাইভার ও বেয়ারার দেখাশুনার ব্যবস্থা কর।”

শেফালীর অনুরোধ এড়াইতে না পারায় বীরেন বাবুকে কনকপুরেই রাত্রিখাস করিতে হইল। পরদিনের উৎসবে তিনি যোগদান করায় জ্ঞানেজ্ঞ বাবু ও প্রতুল বাবুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তৃতীয় দিন প্রভাতে তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

* * * *

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বীরেন বাবু উৎসবের বিপুল আয়োজনে রত হইলেন। নিজের আত্মীয়-বন্ধুদের টেলিফোনে আহ্বান করিলেন; স্ত্রী ও মাতাকে ছুই বেলা ভোজের আয়োজন করিতে বলিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “যে কাজে মফঃস্বলে গেছলুম, তা সফল হ’য়েছে। জীবনে এমন আনন্দের দিন আর আমার হয়নি; আয়োজনও সেই রকম ক’রতে হবে।”

সুনীল নাই, অথচ উৎসবের এত আয়োজন। শাপুড়ী ও বধু উভয়েই নীরবে অশ্রুধর্ষণ করিতে লাগিলেন। বহির্দ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপন করিতে হইবে শুনিয়া তাঁহার

রূপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কি উপলক্ষে এই উৎসব? মঙ্গলিকেরই বা আয়োজন কেন? এমন সময় বীরেন বাবু অন্তঃপুরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, “এখনও তোমরা যে যোগাড়-যত্ন কিছুই করনি! বউ ঘরে আসছে—তার বরণের আয়োজন কোথায়?”—এ কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা ও স্ত্রী আনন্দে বিহ্বল হইলেন; মা বলিলেন, “আগে বলতে হয়; সুনীলকে বিদায় দিয়ে আমরা চোখের জলে ভাসছি!”

দত্ত সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “মেয়েদের তো কাণ্ডই ঐ রকম! এমন আনন্দের দিনেও চোখের জল! তা আমি বলছি, এ বউ তোমাদের পছন্দ হবে।”

অল্পকাল পরেই বধুসহ সুনীল বাড়ী আসিল। বীরেন বাবুর নির্দেশ অনুসারে বধুর মুখমণ্ডল দীর্ঘ অবগুষ্ঠনে আবৃত। যথানিয়মে বধুবরণ হইলে দত্ত-গৃহিণী অবগুষ্ঠন মোচন করিয়া বধুর মুখ দেখিবামাত্র শেফালীকে ছুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, “এ কি কাণ্ড, তা তো আমি বুঝতে পারছিলাম না! সকলে মিলে বুঝি আমাকে কাঁদাবার ষড়যন্ত্র ক’রেছিলে? এ যে না চাইতেই আকাশের চাঁদ কোলে পেলাম। ভগবান আমাকে এত সুখা করবেন, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! তাঁর এ দয়ার বুঝি তুলনা নেই। নারায়ণ! তুমি মঙ্গলময়, —অসীম তোমার দয়া!”

সুনীল বলিল, “সব দোষ তোমার ঐ বউয়ের মা! ছদ্মবেশী শেলীই যে পল্লীবালা শেফালিকা, তা কি আমরা কোন দিন জানতে পেরেছি? আমরা কেউ ওকে চিনতে পারিনি।”

শেফালিকা পিতৃবংশের গৌরবরক্ষার জন্ত যে ধর্মুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিল, তাহার কঠোর সাধনায় এত দিনে তাহা সফল হইল। এই প্রগতির যুগে বঙ্গবালারা শিক্ষায়, চরিত্রে, সেবায়, নৈতিক বলে শেফালিকার চরিত্রের অনুসরণ করিয়া হিন্দুর গৃহ সুখময়, শান্তিপূর্ণ করুক—এই শুভ কামনার সহিত আমরা এই উপাখ্যান শেষ করিলাম।

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

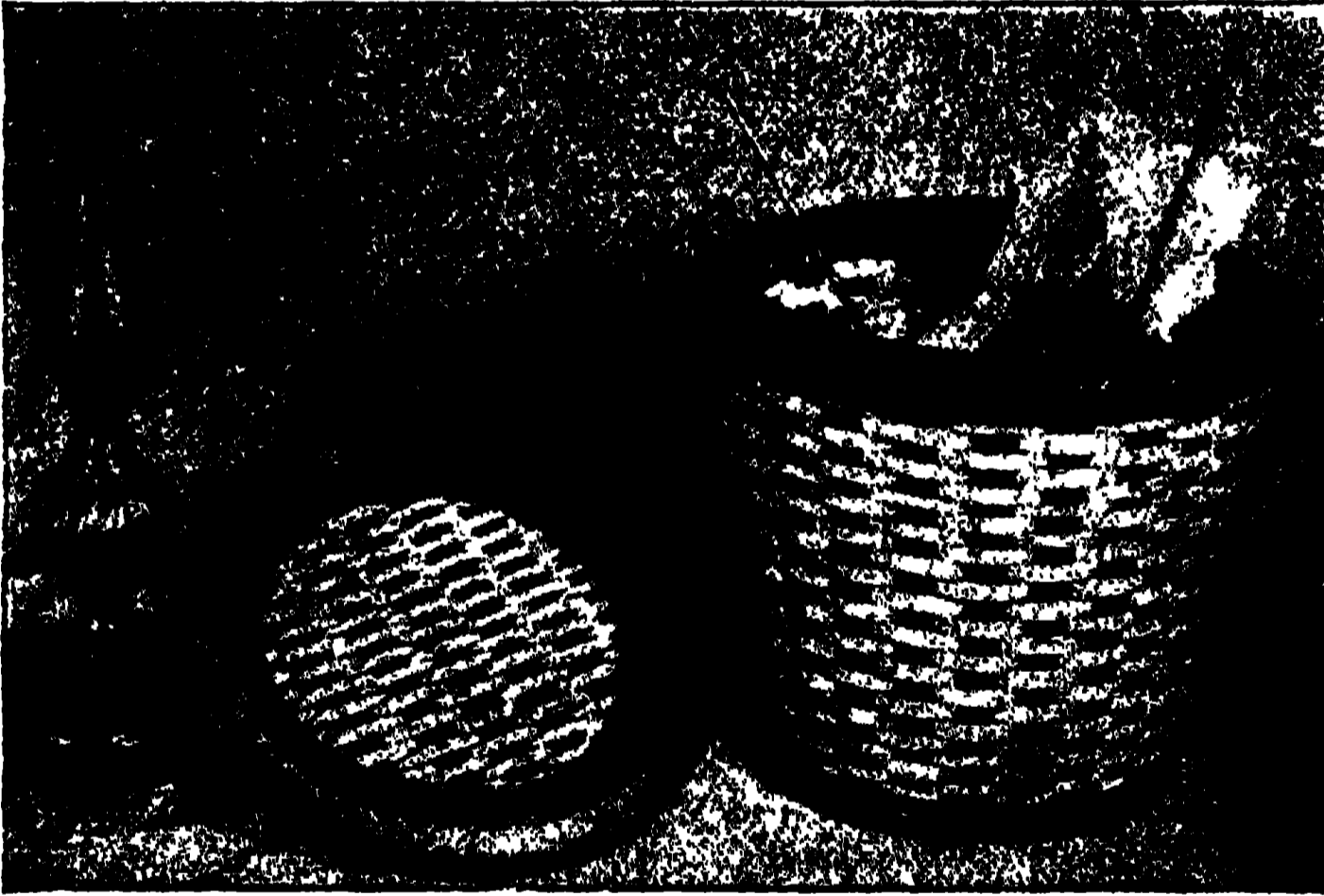


সাজি ও টুকরি

পাংলা কাঠ আর চ্যাচারি—তা দিয়ে ঘরে বসে রকমারি ছাঁদের সাজি এবং টুকরি তৈরী করা মোটেই শক্ত নয়। এ-সাজিতে এবং টুকরিতে চমৎকার বাহার আছে।

এর জন্তু চাই টুকরো পাংলা কাঠ আর চ্যাচারি। তলার জন্তু খানিকটা শক্ত কাঠ চাই। দরকার-মতো ছাঁচে

সময় ছুঁদিকেই টানা এবং সমান-মাপের ফোকর রাখবেন এই ফোকর বা grooves-এর মধ্যে মজবুত চ্যাচারি বা পাংলা-কাঠের চোকলা গুঁজে নীচেকার আঃ উপরকার দিকগুলো শিরীষ-আঠা লাগিয়ে এঁটে নেবেন ফোকরে বা grooveএ আঠা দিয়ে ধারের লম্বা-খাড়া চ্যাচারিগুলি বেশ টাইট করে আঁটা চাই। আঁটা হলে এই খাড়া চ্যাচারির বা খাড়া পাংলা-কাঠের গায়ের মধ



১। কাঠের চোকলার টুকরি



২। এমনি করে বুনন

বা ছাঁদে ছুতোরকে দিয়ে তলার কাঠটুকু কাটিয়ে নিতে পারেন। কাঠ দিয়ে তৈরী করলে তলা বেশ মজবুত হবে। দেবদারু-কাঠে কাজ হবে। যদি ভেনেস্টা-কাঠ ব্যবহার করেন, আরো ভালো। কাঠ দিয়ে যেমন তলা তৈরী করবেন, তেমনি উপর-দিক্কারু রিংটাও এই কাঠে তৈরী করা চাই; নাহলে গায়ের চ্যাচারির বুনন টাইট বা ঠাশ্ থাকবে না—সাজি-টুকরি আলাগা হয়ে তাদের বাধন খুলে যাবে।

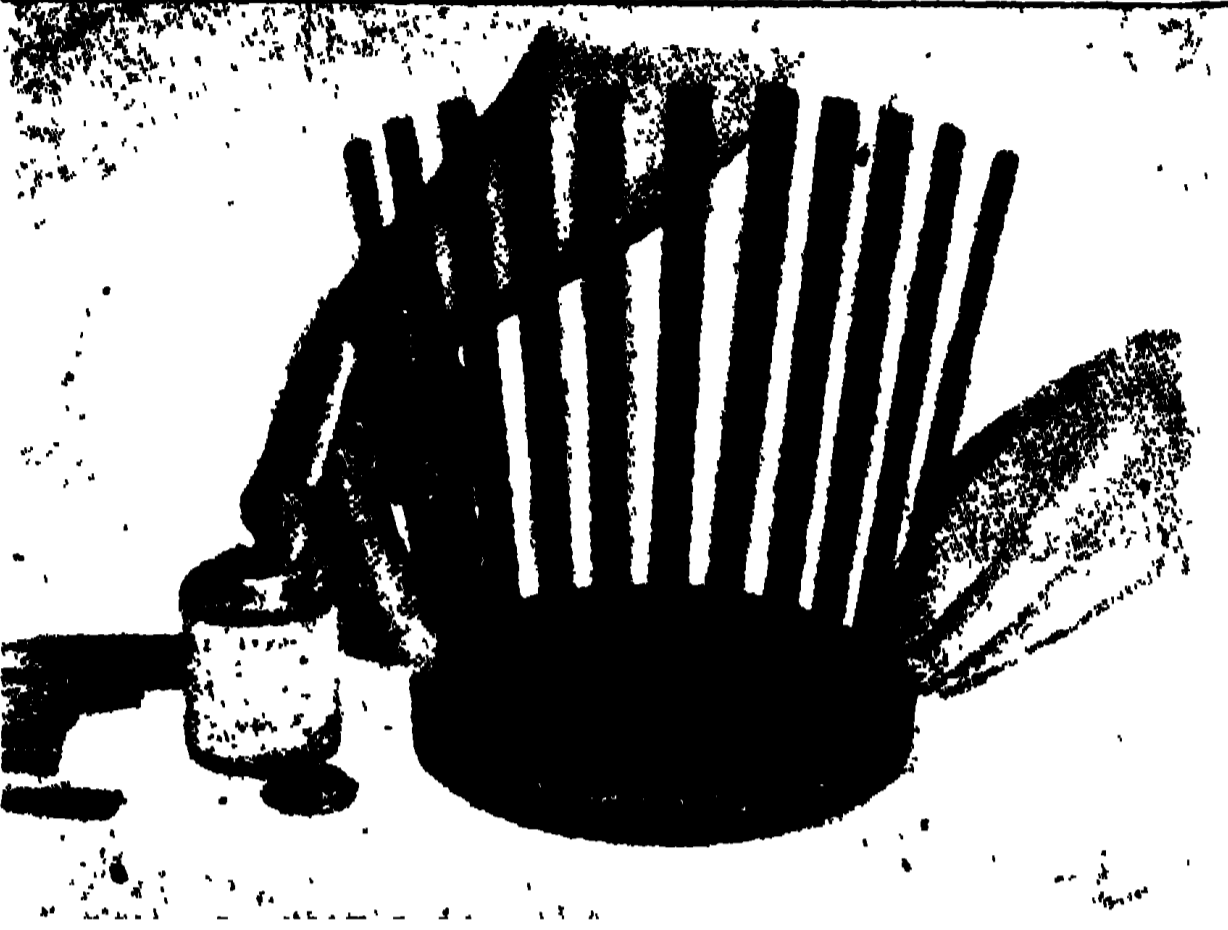
ছুতোর দিয়ে তলার এবং রিংয়ের কাঠ কাটিয়ে নেবার

দিয়ে চ্যাটাইবোনার ভঙ্গীতে গোল করে চ্যাচারি বুনেনেবেন। ২ নম্বরের ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন, কি করে এ-চ্যাচারি গোল করে পর-পর বুনতে হবে।

খাড়াই চ্যাচারি বা কাঠের পাংলা চোকলা হা নেবেন, সেগুলি চওড়ায় হবে ৫ ইঞ্চি; গোল করে যে-চ্যাচারি বা কাঠের চোকলা বুনবেন, সেগুলির মাপ হবে চওড়ায় ১৬ বা ১৬ ইঞ্চি। অর্থাৎ এগুলি খাড়াই-চোকলার চেয়ে সরু হওয়া চাই। গোল করে যে-চ্যাচারি বা চোকলা বুনবেন, সেগুলি যেন সমান্তরাল-রেখায় অর্থাৎ parallel

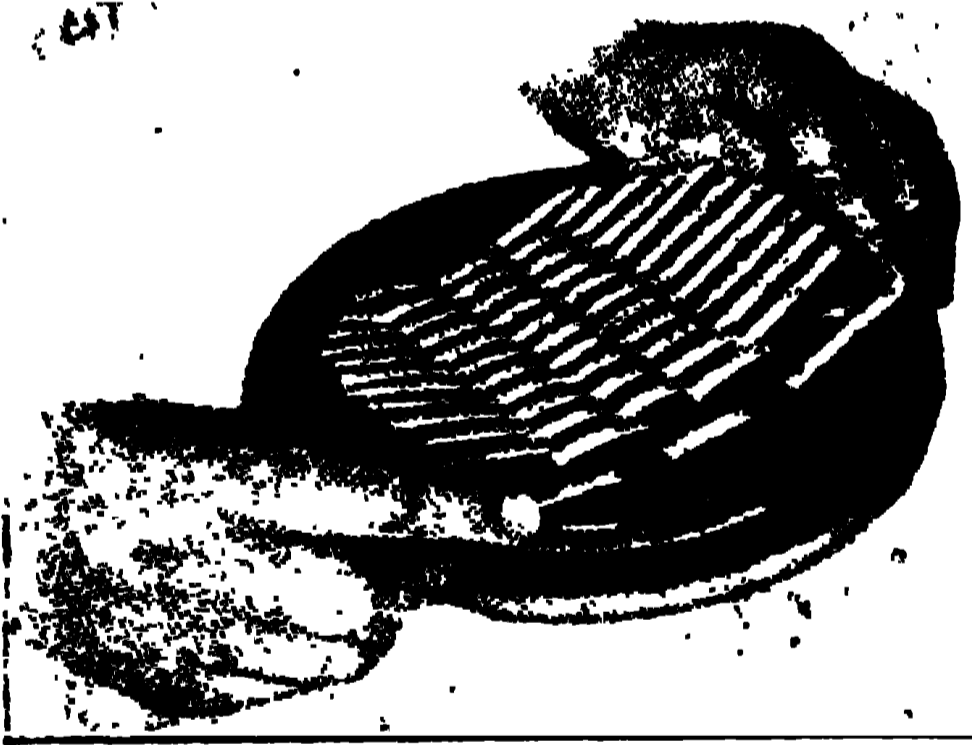
করে বোনা হয়। খাড়াই চোকলাগুলির মাঝে সিকি-ইঞ্চি জায়গা যেন ফাঁক থাকে।

এই খাড়াই চ্যাচারি বা চোকলা যাতে হুয়ে বেঁকে না পড়ে, সে-জন্ত কাঠের খোল করিয়ে যদি কাজ শুরু



৩। শিরীষের আঠায় খাড়াই আঁটা

করেন, তাহলে ভালো হয়। ৫নং ছবির টুকরির পাশে যে দোতলা কাঠের খোল দেখছেন,—ছুতোরকে দিয়ে এই রকম খোল তৈরী করে নেবেন। খোল তৈরী করে

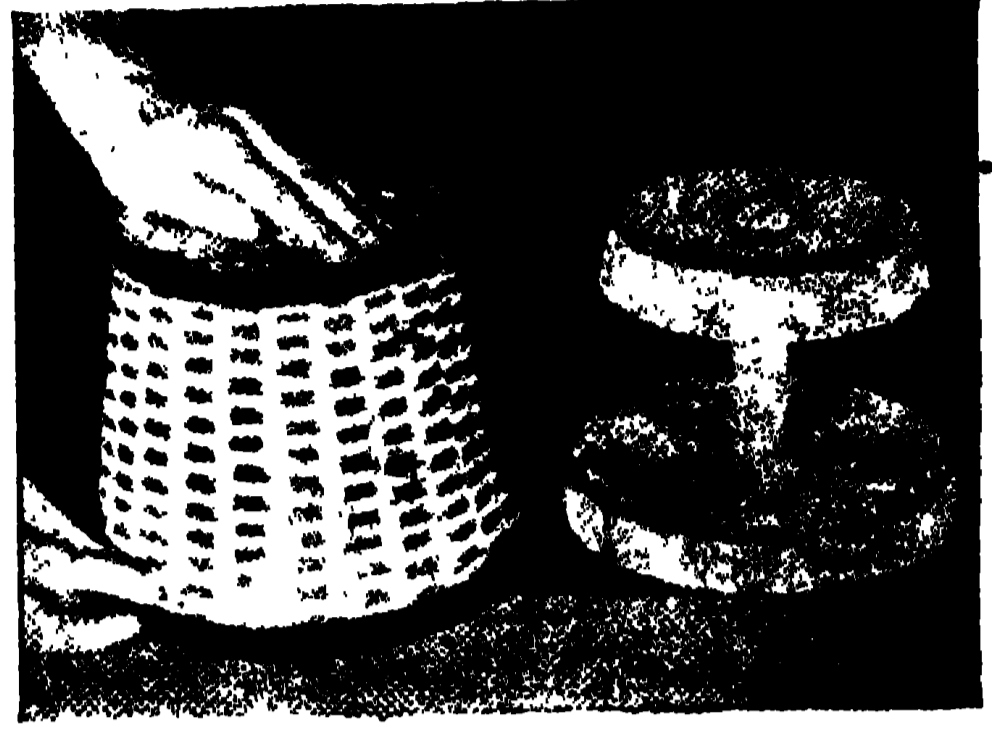


৪। ধারি বোনা

এ কাজ করতে নামলে সাজি বা টুকরিগুলির আকার হুয়ে বেঁকে বিক্রী বেমানান হবার ভয় থাকবে না। চ্যাচারির প্রান্তভাগ যদি বেড়ে থাকে, তাহলে সে বাড়তি ডগাটুকু কাঁচি চালিয়ে সাবধানে ৬নং ছবির ভঙ্গীতে কেটে দেবেন।

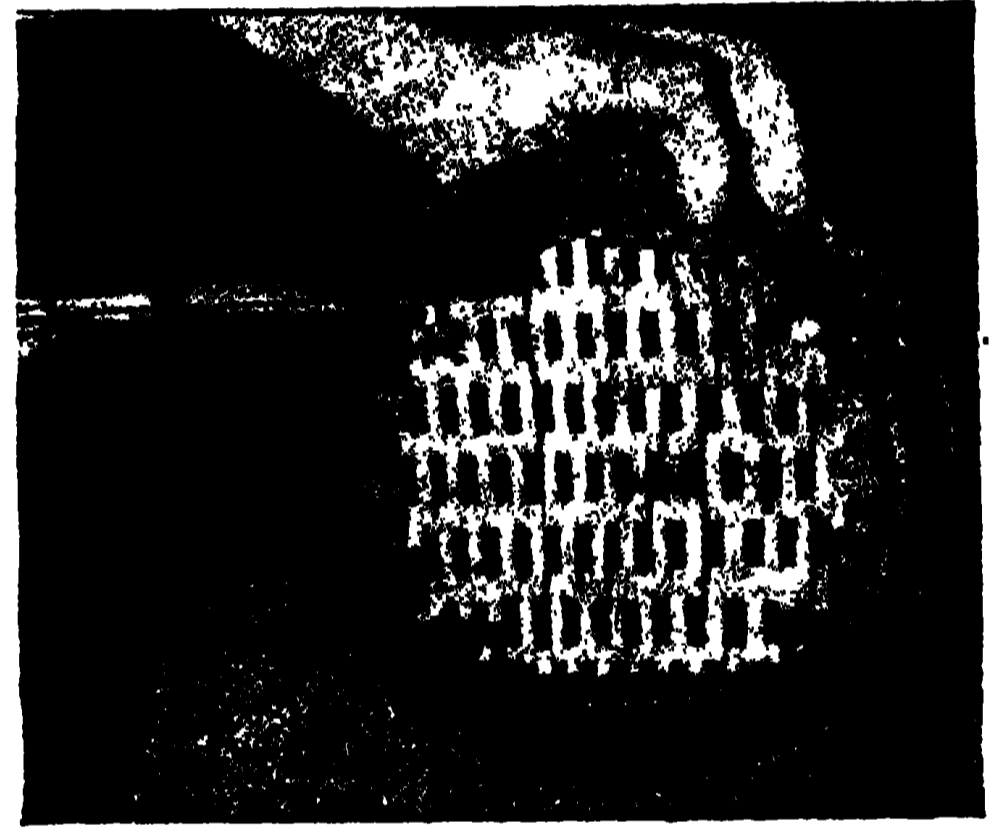
বোনবার আগে এই কাঠের চোকলা বা চ্যাচারি বালতির জলে এক-রাত্রি বেশ করে ভিজিয়ে রাখবেন। ভিজিয়ে রাখলে কাজ সহজ হবে।

আর একটি কথা, প্রত্যেকটি চ্যাচারি বা কাঠের চোকলা যেখানে শেষ হবে, সেখানে সতর্ক ভাবে ছোট



৫। কাঠের খোলে বুনন ভালো হয়

হাতুড়ির মৃৎ-আঘাতে কাঁটা-পেরেক এঁটে দেবেন— তাহলে বোনা কোনোখানে খুলে যাবে না বা আলাগা হবে না। প্রথম-প্রথম হাতের কাজ হয়তো ভেমন



৬। কাঁচি দিয়ে ডগা কাটা

ভালো হবে না। সে জন্ত হুঃখ নেই! অভ্যাসে রপ্ত হলে হাতে-বোনা এই সাজি আর টুকরির বাহার যা খুলবে, দেখে নিজেরাও চমৎকৃত হবেন।

প্রজাপতি-ক্টে

প্রজাপতির পাখায় যে রকমারি বাহার, সে বাহারে কার না মন তোলে। মরা-প্রজাপতি পিনে গোঁথে অনেকে ছবির ফ্রেমে ঘরের রূপসজ্জা সম্পাদন করেন। প্রজাপতি এঁটে ঘরের বাহার কর্ত রকমে করা চলে, সে সম্বন্ধে আজ ছ'-চারটে কথা বলছি।

এর জন্ত প্রজাপতি ধরে তাদের মেয়ে ফেলতে বলি না। জীব-হত্যা ভালো নয়। প্রজাপতি ধরে মারতে

হবে না। মরা-প্রজাপতি নিয়েই কাজ চলবে। তবে মরা-প্রজাপতি সংগ্রহ করা সহজ নয়। জীবন্ত প্রজাপতি ধরে ধরে তাদের লালন-পালন করুন। সে-প্রজাপতির যখন মৃত্যু হবে, তখন সেই মরা-প্রজাপতি নিয়ে গৃহ-সজ্জায় সামগ্রী তৈরী করতে পারবেন।

ছোট ছাঁকনি-জাল তৈরী করে সে-জালের সাহায্যে প্রজাপতি ধরবেন। হাতে চেপে ধরতে গেলে খেঁৎলে প্রজাপতির পাখা, দেহ—সব চূরমার হয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। গৃহ-সজ্জায় জন্তু চাই আস্ত প্রজাপতি। সে-প্রজাপতির পাখা যেন অটুট থাকে,—নাহলে কাজ হবে না।

প্রজাপতি নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় তাদের



উপরে—ছবিতে প্রজাপতি ; নীচে—ট্রে বুক প্রজাপতি

পাখায় কখনো হাত দেবেন না। কারণ, হাত লেগে পাখা ছিঁড়ে যেতে পারে; তাছাড়া হাত লাগলে প্রজাপতির পাখায় যে নানা রঙের রেখা আছে, সে রঙ ঝরে যাবে। রঙ ঝরে গেলে প্রজাপতির সে বিবর্ণ কঙ্কালে ঘরের বাহার খুলবে না।

এবারে প্রজাপতির পাখা নিয়ে সাজাবার কৌশল। পিঠের মাঝামাঝি স্তম্ভপর্শে আলপিন চালিয়ে গাঁথতে হবে। গাঁথবার সময় লক্ষ্য রাখবেন, পাখা দুটি যেন বেশ খোলা থাকে। পাশের ছবির ফ্রেমে পাখা-মেলানো প্রজাপতি দেখছেন তো! অমনি করে প্রজাপতিগুলিকে মোটা পেট-বোর্ডের গায়ে সাজাতে হবে। সাজিয়ে তার পর তাদের পিঠে আলপিন গুঁজে বোর্ডের গায়ে গেঁথে আটকে নিন্।

বোর্ডে যেমন আঁটবেন, তেমনি পাংলা এবং হালুকা কাঠের ট্রে গায়েও প্রজাপতি এঁটে নিতে পারেন। আলপিন খুব মিহি দেখে নেবেন কিন্তু।

বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্তু মাঝে মাঝে ডানা-মোড়া প্রজাপতি দু'-তিনটি গাঁথতে পারেন। সব সময়ে কিন্তু মনে রাখবেন, পাখায় হাতের ছোঁয়া না লাগে!

মাঝে-মাঝে এই ফ্রেমে বা ছবির বোর্ডে ত্রাপথিলিন দেবেন। নাহলে পোকাকার জালায় প্রজাপতির চিহ্ন থাকবে না!

ট্রে জন্তু হালুকা ভেনেস্টা-কাঠ বা সিকি-ইঞ্চি পুরু প্লাই-উড কিনে আনবেন। যদি বেশী প্রজাপতি গাঁথতে চান, তাহলে আর-একটু পুরু কাঠের দরকার। ছবি সাজাতে হলে বোর্ডের গায়ে তুলোর প্যাড আঁটতে পারেন। তুলোর প্যাডের নীচে আগে থেকে ত্রাপথিলিনের গুঁড়ো প্রচুর ভাবে ছড়িয়ে দেবেন।

মরা-প্রজাপতিগুলিকে আঁটবার আগে একটি



প্রজাপতির পাখা মেলানো

বোতলে জল ঢেলে সেই জলে প্রজাপতিগুলিকে দু'-এক দিন ভিজিয়ে রাখবেন। ভিজিয়ে রাখবার জন্তু তাদের দেহ নরম থাকবে—শক্ত হবে না। নরম না থাকলে পিন গুঁজতে প্রজাপতির পাখা বা দেহ গুঁড়িয়ে যাবার ভয় আছে।

ট্রে বা ছবির বাহার যদি আরো বেশী খোলতাই করতে চান, তাহলে প্রজাপতির সঙ্গে মাঝে-মাঝে শ্রাওলা বা নানা রঙের ফুলের পাপড়ি পিনে এঁটে ঐ সঙ্গে সাজিয়ে নিতে পারেন। এ সাজানোয় শিল্পীর কৌশল থাকা প্রয়োজন। নাহলে এলোমেলো রকমে শ্রাওলা বা পাপড়ি আঁটলে দেখতে বিস্ত্রী হবে। ট্রে গায়ে শিরিষের আঠা দিয়ে খুব পাংলা কাগজ (ফুলের দোকানে ফুল কিনতে গেলে ফুলওয়ালারা যে-কাগজে ফুল জড়িয়ে ছানু, সেই রকম পাংলা কাগজ) এঁটে তার উপর প্রজাপতি গাঁথলে সে-গাঁথা মজবুত হবে।



ছাত্রদের আসব

মেক-আপ

সিনেমার ছবিতে তোমরা দেখেছো, তরুণ-বয়স্ক অভিনেতারা বয়স্কের সাজে নিজদের এমন নিখুঁত গড়ে তোলেন যে, তাঁদের দেখলে বয়স বা স্ব-রূপ নির্ধারণ করা দায়! বিশ-বাইশ বৎসর বয়সের তরুণ-অভিনেতা কি করে ষাট-সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ সাজেন—নিরেট গাল ভুবে ফেলেন—এ-ব্যাপার খুব রহস্যময় মনে হয় না কি?

কিন্তু এ-রহস্য অতি-সহজে রচনা করা যায় এবং

এবং গাল আশ্চর্য-নব-রূপে ছবিতে ফোটে। অর্থাৎ লাল রঙের ক্র আঁর মাথার কেশ ছবিতে দেখায় বৃদ্ধের পুরু-শুভ্রতার রূপান্তরিত; সবুজের রেখায় মুখের কোঁচ দেখায় বৃদ্ধের সত্যকার কুঞ্চিত লোল চর্মের মতো।

যে-সব রূপ-সজ্জাকর নট-নটীকে তুলির লেখায় নানা বয়সে রূপান্তরিত করে তোলেন, তাঁদের শক্তি অসামান্য সন্দেহ নেই। তরুণ নট-নটীকে রূপ-সজ্জার কৌশলে যেমন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় করা হয়, তেমনি আবার প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীকেও ঐ রূপ-সজ্জা বা

মেক-আপের জোরে তরুণ করে তোলা হচ্ছে। বৃদ্ধকে তরুণ-রূপে ফুটিয়ে তোলবার জন্তু মাছের ছালের আবরণ ব্যবহার করা হয়। এ-ছাল দুই কাণের উপরে আঠা দিয়ে এঁটে নিতে হয়। সে ছালের দুই প্রান্ত একটু উঁচু করে রাখলে বয়স্কদের মুখের মতো মুখ বেশ পূরন্ত দেখায়। তার উপর ব্রাউন-গ্রীজ পেইণ্টের ঘন শেড টেনে দিলে তরুণের কপোলের দীপ্তি, তরুণের গায়ের মন্থণতা, বর্ণরাগ আশ্চর্য-নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠবে।

বুড়ো সাজাবার জন্তু পরচুল-ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। এ-চুল পাট বা শণের ছুড়ি দিয়ে তৈরী নয়। এ জন্তু জীবন্ত বৃদ্ধ-



নকল দাড়ি

আসল দাড়ি

যায় শুধু রঙ মাখবার কৌশলে! সিনেমার ছবিতে তরুণের এই রূপান্তরের কথা আজ বলছি।

তরুণের ক্র, মাথার কেশ আঁর ঠোঁট—এ-গুলিতে লাল রঙ লাগানো হয়। বৃদ্ধের লোল চামড়া এবং সে-চামড়ায় বার্কক্যাছেতু যে-কোঁচ, সেগুলি সৃষ্টি করা হয় সবুজের লাইন টেনে। ক্যামেরার লাল ফিলটারের সাহায্যে এই রঙে-রাঙানো মাথার কেশ, ক্র, ঠোঁট

বৃদ্ধদের সত্যকার শুভ্র কেশ ভারে-ভারে কেনা হয়। জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী থেকে বহু সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মাথার কেশ ছোঁটে বস্তাবন্দী করে ব্যবসায়ীর দল সে-কেশ আমেরিকার ফিল্ম-ইন্ডিয়োগুলিতে নিত্য চালান দিচ্ছে।

ভালো মিহি যে-চুল, তা করা হয় লেশ বা ক্রেপ শিক থেকে। মার্কিং-ফিল্মের বড় অভিনেত্রীরা বেশী-বয়সের ভূমিকায় নামবার সময় এই লেশের চুল ব্যবহার



ষ্টুডিয়ার সাজ-ঘর

করেন। হলিউডে মেক-আপ-শিল্পীর কাজে সবচেয়ে কৃতী হচ্ছেন আর্গ এবং পার্সি ওয়েটমোর। লেশ থেকে এই মিহি কেশ-রচনার রীতি তাঁরাই সর্বপ্রথম বার করেছেন। তাঁদের এ-আবিষ্কারের পূর্বে আমাদের দেশের যাত্রার নারদের দাড়ি আর মেয়েদের পাটের কেশের ছাঁদে বিক্রী ভারী পরচুল দিয়ে রূপসজ্জার একাজটুকু সমাধা করা হতো।

এই ক্রেপ লেশ হাতে বুনে তৈরী করা হয়। এক বাণ্ডিল ক্রেপ-শিফ লেশ—তা থেকে বিশ-পঁচিশ জোড়া দীর্ঘ কেশ বা দীর্ঘ গৌফ-দাড়ি তৈরী করা চলে। আমাদের দেশের ষ্টেজে এবং ফিল্মের অ্যুগুরে এই লেশ বা ক্রেপের দাড়ি-গৌফ এবং চুলের ব্যবহার আজ সুপ্রচলিত হয়েছে। ক্রেপ ও লেশের এ-চুল সত্যকারের চুলের মতো দেখায়।

যে-সব ভঙ্গলোকের মাথায় আগাগোড়া টাক—অথবা



চোখের নীচে রেখা টানিয়া বুড়া সাজানো

মাথায় খানিকটা কেশহীন, খানিকটায় কেশ আছে, বয়সে প্রৌঢ়, এই ক্রেপ বা লেশের পরচুল মাথায় এঁটে তাঁরা চমৎকার-নিখুঁত তরুণের মূর্তি ধারণ করেন।

এ পরচুলে মুখের ভোল কি করে এমন বদলায় যে,



উপরে বাঁয়ে অভিনেতার আসল মূর্তি ; নীচে পর-পর ঐ অভিনেতারই সাতটি রূপান্তর
 প্রৌঢ়কে তরুণ বলে মনে হয় ? রূপ-সজ্জাকর শ্রীবৃত্ত সাজানো যায় না। সে কেশ-বিত্তাসে অনেকখানি
 আণ ওয়েষ্টমোর বলেন, মাথায় ও মুখে ক্রেপের কৌশল চাই। এই কৌশলের জোরেই তরুণকে
 পন্নচুল বা দাড়ি-গোফ স্তবিত্ত করলেই প্রৌঢ়কে তরুণ, বৃদ্ধ সাজানো যেমন নিখুঁত সহজ হয়েছে, তেমনি

নিখুঁত সহজ হয়েছে প্রোট বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তরুণ সাজানো।

মাছের ছাল স্বচ্ছ। মুখে আঁটলে ক্যামেরার লেন্সে তার অস্তিত্ব ধরা যায় না। গায়ে আঁটলে সে মাছের ছাল চামড়ায় এমন বেমানাম লেগে থাকে যে, তা মানুষের গায়ের চামড়া বলেই মনে হয়। এ ছাল আঁটবার জন্ত বিশেষ এক-রকম তরল আঁঠা আছে,—মাছের ছালে এই তরল আঁঠা লাগিয়ে মুখে-হাতে এঁটে নাও—তার উপর পাউডার, গ্রীজ-পেইন্ট, ওয়াক্স প্রভৃতি মাখো, এমন বুড়ো সাজবে যে, ক্যামেরার শক্তিমানে লেন্সেও সে ফাঁকি ধরা পড়বে না!

তরুণকে বৃদ্ধ সাজাতে ওয়েষ্টমোর-ব্রাতৃযুগল কি কৌশল অবলম্বন করেন, সে সম্বন্ধে তাঁদের উক্তি উদ্ধৃত করছি। তাঁরা বলেন—প্রথমে তরুণের মুখে বিশেষ-রকম কালো রঙ মাখিয়ে নিতে হয়। এ কালোর উপরে দিই সাদা ট্যালুকাম্ পাউডার। কালোর উপর পাউডারের প্রলেপ দিলে মুখ বেশ নিরেট (hard surface) হয়ে ওঠে। তার পর অভিনেতার কপালে রেখা একে কোঁচ তৈরী করি। রেখায় কোঁচ তৈরী করে তার উপরে গ্রীজ-পেইন্টের প্রলেপ দিই। এখন অভিনেতা যেমন করেই থাকুন না কেন, এ কোঁচের রেখায় তাঁর মুখের ভোল একদম বদলে যায়। তার পর হাতে-গায়ে খাবড়ে-খাবড়ে গ্রীজ-পেইন্ট দিলে চামড়া লোল দেখাবে—তরুণের গায়ের চামড়ার মসৃণতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে। তার পর চোখের উপরকারের পাতায় মাছের ছাল আঁটি—এ ছাল সামনে চিবুকের নীচে পর্যন্ত আঁটা হয়। এই ছালের জন্ত বিশ-বৎসর বয়সের মুখ একেবারে পঞ্চাশ-বৎসর বয়সের মুখে রূপান্তরিত হয়।

এবার পেশীর রূপান্তর। সে-কাজ সংসাধিত হয় তুলির লেখায় শেড-রেখা টেনে।

দাড়ি বা চুল—এগুলি তৈরী করা হয় প্রায় বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ শেডের ক্রেপ মিশিয়ে সে-ক্রেপ আঁচড়ে দীর্ঘ বা ধর্ষ করে! তার পর এই চুল আর দাড়ি ষথারীতি কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হয়। এ-কৌশলে তরুণ পুরুষকে বৃদ্ধ সাজানো মোটেই শক্ত নয়। তরুণকে বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া সাজানো কিন্তু কঠিন। মেয়েদের বেলায় নকল চক্ষুপন্ন

তৈরী করতে হয়। মেয়েদের গায়ের মুখের চামড়া তৈরী করতে খানিকটা ধীরতা এবং সতর্কতার প্রয়োজন।

সমাজে আজ এই মেক-আপ-বিজ্ঞান প্রচুর আদর। তোমরা যদি এ বিজ্ঞান সাধনা করো, তাহলে জেনো, সে চেষ্টা নিফল হবে না। জ্ঞানাৎ পরতরো নহি। সেই কারণেই আজ মেক-আপ সম্বন্ধে এই আলোচনা করলাম।

ফুলের ফশল

কে না ফুল ভালোবাসে? আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফুলের অজস্র ফশল হয়! আমাদের ছেলেবেলায়



১। জানলার ধারে একদিকে আলো-বাতাস লাগে

মনে পড়ে, এ সময় মর্গিং-স্কুলের ব্যবস্থা হইত, আর ক্লাশে-ক্লাশে ছেলেদের মধ্যে রেশারেশি চলিত, কে কত ফুল লইয়া সকালে স্কুলে আসিতে পারে! জানি না, এখন তোমাদের মর্গিং-স্কুলে ফুলের এ প্রতিযোগিতা চলে কি না!

না চলিলেও এ-কথা সত্য, তোমরা ফুল ভালোবাসো! ফুলের বর্ণে-গন্ধে এমন মোহ যে, তাহাতে দেহে-মনে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত হয়!

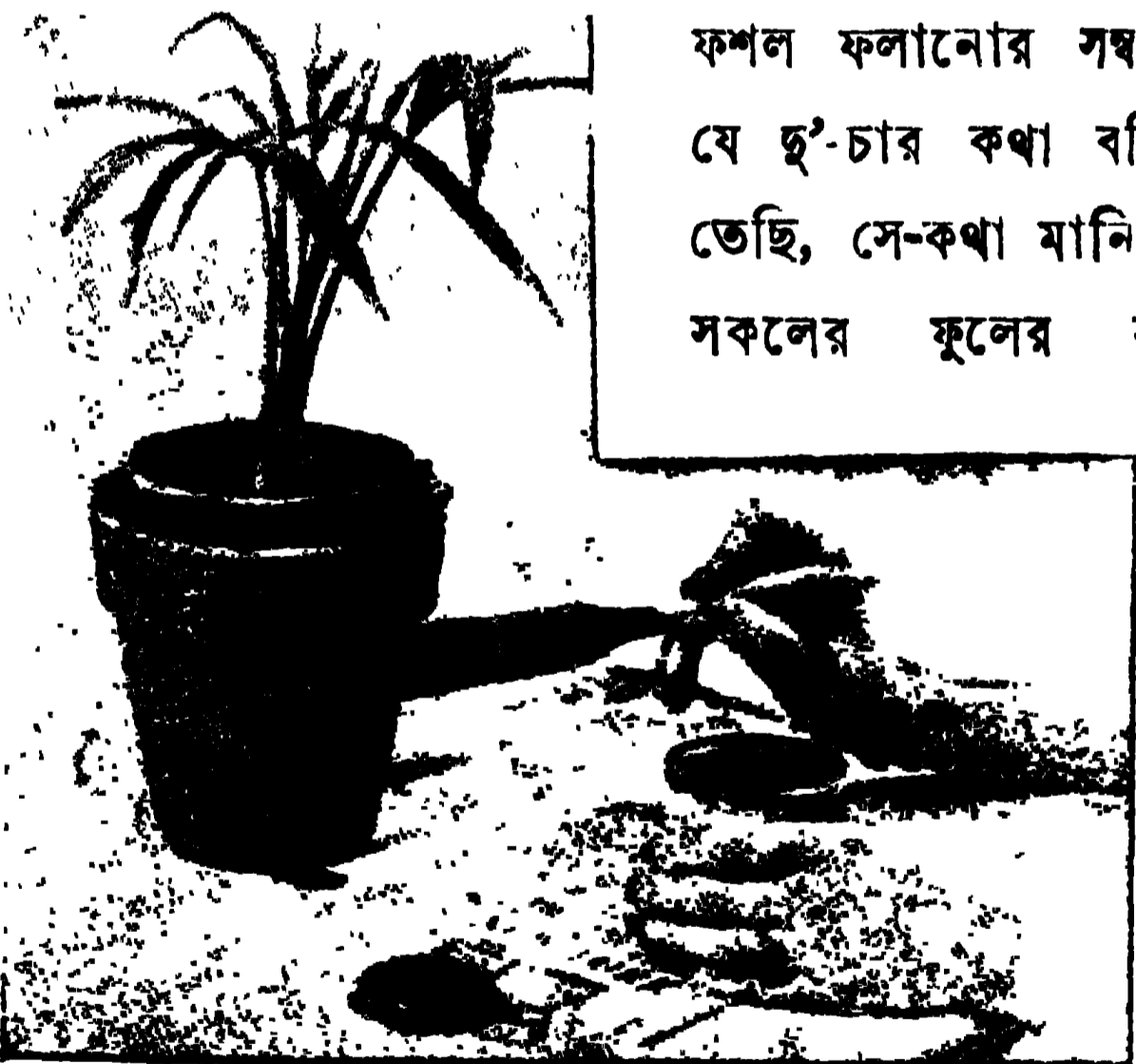
ছোট-বয়সে অনেকের আবার এই ফুল-প্রীতি এত বেশী যে, স্নবিধা পাইলে টব কিনিয়া সে-টবে নানা জাতের পাতা-বাহার গাছ, ফুলের গাছ পুঁতিয়া ছাদে বারান্দায়



২। টবের মধ্যে টব

সেই সব টব রাখিয়া বাড়ী সাজায়। কলিকাতা সহরে ফুলের সাধ মিটাইবার সুযোগ বড় অল্প। অনেকের বাড়ীতে তেমন জায়গা নাই! সখ থাকিলেও অনেকে আবার গাছপালার সেবা-যত্ন করিবার অবসর পায় না।

আজ আমরা ফুলের ফসল ফলানোর সম্বন্ধে যে ছ'-চার কথা বলিতেছি, সে-কথা মানিলে সকলের ফুলের সখ



৩। টবের গায়ে রঙ লাগ

সহজে মিটিতে পারিবে। বাড়ীতে বাগান করিবার মতো জায়গা যদি না থাকে, ছাদ, বারান্দা, উঠানের কোণ বা ঘরের মধ্যে টব রাখিয়া সে-ইবে

মনের মতো গাছ পুঁতিতে পারো। ছোট পাম্ব বা ফার্ণ টবে পুঁতিলে কোনো অসুবিধা ঘটবে না। ঘরে যদি রাখিতে চাও, তাহা হইলে ছোট টবে গাছ পুঁতিয়া সে-টবটি তার চেয়ে বড় টবে রাখিয়া। বড় টবের গায়ে রঙ করিয়া লইয়ো—বাহার খুলিবে। টবের মধ্যে টব রাখিতে বলার কারণ, ছোট টবের মাঝখানে যে-ফাঁক থাকিবে, সে-ফাঁকটুকু শ্রাওলা দিয়া ভরাট করিয়া দিবে। যে-টবে গাছ থাকিবে, সে-টবে যখন জল দিবে, তখন সেই সঙ্গে শ্রাওলাগুলিতে জল দিয়ো। ইহাতে গাছ দীর্ঘ দিন বাঁচিকে এবং ঐ শ্রাওলার আওতায় তার জীবন এবং সবুজ-শ্রী জলিয়া যাইবে না। টবের গায়ে রঙ দিলে গাছের জল চট করিয়া উবিয়া বা শুকাইয়া যাইবে না। সে জলে গাছ অনেকখানি সরসতা লাভ করিবে। রঙ-করা টবে জল রাখিলে ঐ



স্পঞ্জ দিয়া পাতা সাক

রঙের গুণে সে-গাছে সপ্তাহে একবার জল দিলেই চলিবে; গাছের স্বাস্থ্য তাহাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইবে না।

খোলা খড়খড়ির বা জানলার ধারে গাছ রাখিলে সে-গাছের এক-

দিকে মাত্র যদি বাহিরের রৌদ্র-আলো-বাতাস লাগে জ্বাখো, তাহা হইলে সে-গাছের বাড় হয় 'একপেশে' বা অসমান। গাছের যে-দিকটা এই রৌদ্র-বাতাস-আলো হইতে বঞ্চিত থাকে, সে-দিকটা অস্বাস্থ্যে ভরিয়া মলিন হয়, জীর্ণ হয়। এজন্য খড়খড়ি-জানলার ধারে টবে গাছ রাখিলে সে-টব প্রত্যহ নাড়িয়া এমন ভাবে বসানো প্রয়োজন, যেন গাছের সর্বদিকে এবং সব-দিকে সমান ভাবে বাহিরের আলো-বাতাস লাগে।

যদি জ্বাখো, গাছের পাতার মাঝে-মাঝে কাঁজরা-রঙ হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিবে, গাছে পোকা ধরিয়াছে। এই পোকা মারিয়া গাছকে সুস্থ রাখিবার সহজ উপায়,

সাবান-জলে স্পঞ্জ বা তুলা ডুবাইয়া গাছের পাতায় প্রত্যহ সেই স্পঞ্জ বা তুলা ঘষিয়া পাতা সাফ করা। সাবান-জল দিয়া পাতা মাজিবার পর পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে আর-এক দফা পাতার ঘষা-মাজা পরিমার্জনা প্রয়োজন।

বাড়ীতে যারা ক্রীশানধীমাম্ ফুলের ফশল ফলাইতে চাও, একটি বিষয়ে তারা সতর্ক থাকিয়ো। দিনের আলো ক্রীশানধীমাম্ যত-কম লাগে, ফুল তত শীঘ্র ফুটিবে এবং



৫। ঘরের মধ্যে গাছ রাখো

ফুল ভত ভালো হইবে, জানিয়ো। বৈকালে চারিটা-বেলা হইতে পরের দিন সকালে বেলা নটা পর্যন্ত ক্রীশান-ধীমাম্ গাছগুলিকে যদি ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে রাখিয়া দাও, তাহা হইলে এ-গাছে চট করিয়া ফুল ফুটিবে।

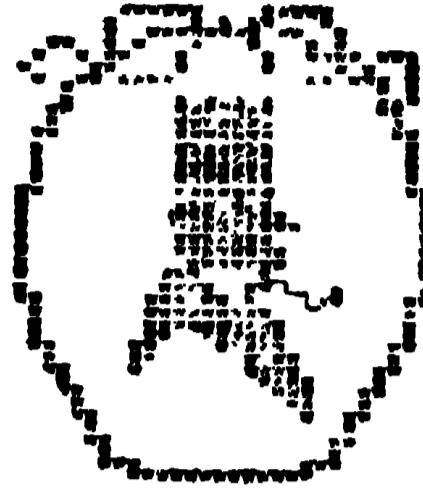
সব ফুলের সম্বন্ধে অবশ্য এ নিয়ম খাটেনা। বেশীর ভাগ ফুল কিন্তু দিনের আলো যত পায়, ততই তারা রমণীয় কান্ডি-গন্ধ লইয়া অজস্র ভাবে ফুটিয়া ওঠে।

টাইপ-রাইটারের খেলা

পাশের ছবিখানি দেখছো? পাল-তোলা একখানি জাহাজ।

এ-জাহাজের ছবি কি করে আঁকা হয়েছে, জানো? কোশলে কাগজের উপর টাইপ-রাইটারের অক্ষর ছেপে।

টাইপ-রাইটারের অক্ষরে এ ছবি যদি আঁকতে চাও, তাহলে যে-ছবি আঁকবে, কাগজের উপর পেন্সিলের

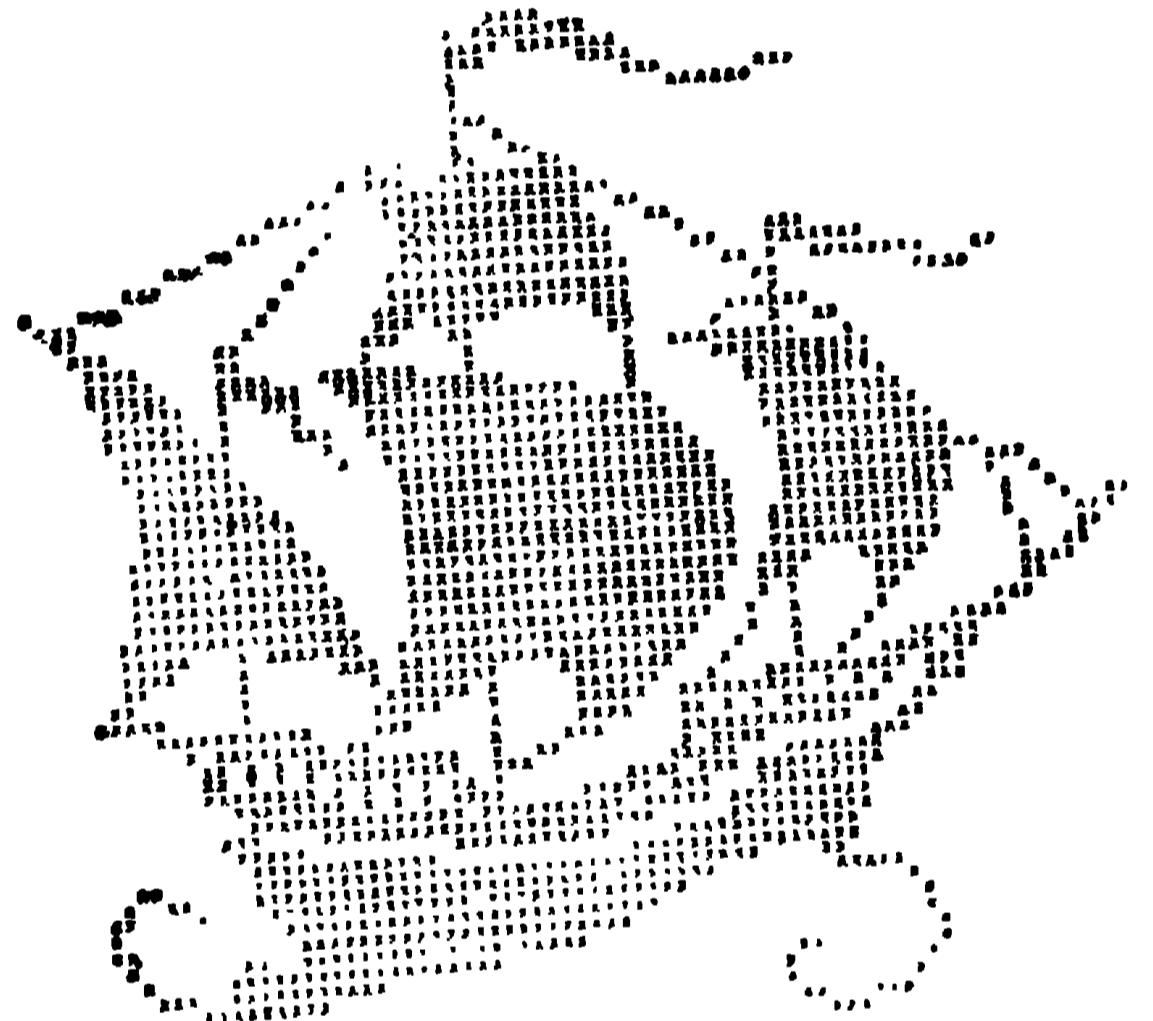


সাহেবের মুখ



কুকুর

অতি-সূক্ষ্ম রেখায় আগে থেকে তার আদ্রা বা ডিজাইন ছকে নাও। তার পর টাইপ-রাইটার-যন্ত্রে কাগজখানি সংলগ্ন করে ঐ ডিজাইনের রেখায়-রেখায়—যেখানে কঁক থাকবে, সেখানে কঁক রেখে অক্ষর ছাপো! কাজটুকু মনোযোগ দিয়ে করা চাই। কাগজে যেন কালির দাগ না লাগে! তুল-অক্ষর ছেপে ছবির সৌন্দর্য যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।



পাল-তোলা জাহাজ



মেম-সাহেবদের চা-পান

এই সঙ্গে আরো দু'খানি ছবি ছাপা হলো। একখানি চিত্রে দেখছো, দু'জন মেম-সাহেব টেবিলে বসে চা খাচ্ছেন

—কেটলি থেকে পোয়ার রেখা উঠেছে! আর-একখানি ছবি রেল-গাড়ীর। পোয়া উড়িয়ে এঞ্জিন চলেছে; আর



রেলগাড়ী

এঞ্জিনের পিছনে দু'খানি গাড়ী আঁটা! এ দু'খানি ছবিও টাইপ-রাইটারের অক্ষর ছেপে রচনা করা হয়েছে।

নির্বাসিতা রাজকন্যা

পাঁচ

লীলাকে পাঠাডের পথে রেখে আমবা এবাব রাজধানীতে নীলাব সন্ধানে এসেছি। কেন না, সিংহলী নীলাচলের সঙ্গে তার বিয়ের কথাটা নিয়ে সহরে ভারী আন্দোলন চলছে। সেই যে কালো রঙের এক-এক ফালি তক্তা রাস্তার মোড়ে-মোড়ে আর বড়-বড় বাড়ীগুলোর গায়ে আগে ঝুলতে দেখা গিয়েছিল—তার গায়ের লেখাগুলোই হচ্ছে যত গণ্ডগোলার কারণ।

রাণী-মা, রাজকন্যা, মহামন্ত্রী, এমন কি—সিংহলী নীলাচল পর্যন্ত বেগে আগুন! এত বড় আন্দোলন—চুপি-চুপি রাতারাতি রাজধানীর বিশাল বুক-জুড়ে তক্তা টাঙিয়ে তারা কি না ছমকী দিতে সাহস করলে! আর এমনি অকস্মিক ধাড়ী সহরকোটালটা আর তার পাহারাওয়ালারা যে, তক্তাওয়ালারা বদমায়েসদের একটাকেও তারা পাকড়াতে পারলে না! এ রাগ কি সামলানো যায়! তক্তাগুলোকে তুলে চৌরাস্তার মোড়ে-মোড়ে টাচরের মেড়া-পোড়ার উৎসব করেও মন্ত্রীর রাগ কমেনি। চোর ধরবার জন্ত তিনি যে কড়া হুকুম দিলেন—পুরস্কার ঘোষণা করে দলে-দলে গোয়েন্দা ছাড়লেন, তার ফলে বাড়ী-বাড়ী খানাতল্লাস শুরু হলো—যার বাড়ীতে এক টুকরো সাদা খড়ি কিম্বা এক ফালি কালো তক্তা পাওয়া গেল, এমনি তার বাড়ীগুলো সকলের হাতে হাতকড়ি পড়লো! তখন তাদের লাঞ্ছনা দেখে কে?

এই ধর-পাকড়ের ভেতরেও লোকের মুখে এখন নীলা আর নীলাচলের কথা ছাড়া যেন আর কোন কথা নেই! এমন কি, তক্তায় যে ক'টা কথা লেখা ছিল, সেগুলোও ওপর আরও অনেক আজগুবি কথা লোকের মুখে-মুখে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মাকে পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। কত লোকের মুখ তিনি বন্ধ করবেন, কত লোককে বন্দীশালায় আটক রাখবেন? তক্তার ব্যাপারে গোয়েন্দাদের কারসাজিতে যারা ধরা পড়েছিল, তাদের এক জনও রেহাই পায়নি—সকলকেই লম্বা মিয়াদে কারাগারে বাস করতে হচ্ছে। হাজার-হাজার বন্দীর ভীড়ে রাজ্যের কারাগারগুলো সব ভরে উঠেছে। এর ওপর—যারা এই সব কথা নিয়ে আলোচনা করত,

তাদেরও ধরে কয়েদখানায় পুতে হলে সমস্ত রাজ্যটাই কারাগার হয়ে ওঠে। তাই ইদানীং মন্ত্রী মশায় ধরপাকড়ের তোড়টা অগত্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু নীলা তাতে খুসী নয়, তার ইচ্ছা, যারা তাদের কথা নিয়ে কোন রকম আলোচনা করবে, তাদের সবাইকে ধরে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

এই নিয়ে এক দিন দাত্তর সঙ্গে নাতনীর বেশ কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। নীলা বললে—তুমি কোন কাজের নও, দাত্ত! রাজ্যের লোকগুলোকে জব্দ করতে পারলে না, এমনি অপদার্থ তুমি।

কথাটা গায়ে না মেখে একটু ভেঙ্গে দাত্ত বললেন—রাজ্যের লোক ত আর গোণাগুণতির মধ্যে নয়, দিদি!—কোটি-কোটি লোক নিয়ে রাজ্য, তাদের সকলকেই জব্দ করা কি মুগের কথা! কিন্তু চর্চা এ কথা বোলছ কেন?

নীলা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—চর্চা? জ্ঞান কি? তুমি কি জ্ঞান? কিছুই জান না? শুনেতে পাচ্ছ না—লোকের কথা?

দাত্ত বললেন—লোকের সব কথায় কান দিতে নেই, তাতে কাজ বাড়ে আর রাগে মনটা বিগড়ে যায়।

নীলা জিজ্ঞাসা করলে—তবে সেই তক্তাগুলো নিয়ে অত কাণ্ড কবলে কেন? চোখ না দিলেই ত জ্ঞানটা চুকে যেত?

দাত্ত উত্তর দিলেন—চোখের সামনে যেটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, অজ্ঞান হলে তাকে দাবাতেই হয়। নইলে, রাজ্যে শৃঙ্খলা থাকে না। কিন্তু আড়ালে কে কি বলছে, সেই সব নিয়ে গোল করলে ঝঙ্কারই বাড়ে, নিন্দে চাব দিকে আরো ছড়িয়ে পড়ে।

নীলা মুখখানা বেকিয়ে বলে উঠলো—বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতি ধরেছে, দাত্ত, তাই এ কথা বললে! নিন্দে ছড়াতে বাকি আছে না কি? শোননি, আমাদের নিয়ে কত লোক কত কথা বলছে?

দাত্ত হেসে বললেন—তাতে কি হয়েছে, লোকের কথা গায়ে না মেখে হেসে উড়িয়ে দিলেই হল। লোকের কথায় ত আর আমরা বিয়ে বন্ধ করছি না। তুমি বরং এক কাজ কর দিদি—রাণীর মত জাঁকজমকে সহরের পথে-পথে টহল দিয়ে বেড়াও, তোমার সঙ্গে থাকুক নীলাচল; এক শো রক্ষী নিশান উড়িয়ে তোমাদের নামে জয়ধ্বনি তুলুক,—লোকের খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাক।

দাত্তর এ যুক্তিটি নীলার মনে ধরলো, সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দর মুখখানি তার হাসিতে ভরে উঠলো। দাত্তর পানে সে ঝাঁক দৃষ্টিতে একটীবার তাকিয়ে বললে—নাঃ, আমাবই ভুল হয়েছিল দাত্ত, সত্যিই তুমি কাজের লোক; তোমার ঘটের বুদ্ধি এখনো লোপ পায়নি।

সেই দিনই বিকেলে রাজপ্রাসাদ থেকে খুব ঘটা করে এক মিছিল বেরল। পাশাপাশি দু'টি সুসজ্জিত হাতী, তাদের পিঠে মণি-মুক্তোর ঝালোর দেওয়া সোনার হাওদা,—একটিতে বসেছে তরুণী রাণী নীলা, তার রপের সঙ্গে জমকালো বসন-ভূষণের ছটা মিশে হাতীব পিঠে অপূর্ব শ্রী ফুটে উঠেছে। পাণের হাতীতে বসেছে নীলাচল। তারও সাজ-সজ্জা রাজার মতন, পোষাকের বাঁহার দেখেই চোখ যেন ঝলসে যায়! হাতী দুটোর পিঠে সোনার কাজ-করা কিংখাপের ঝুল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত

রঙ বেরঙের সাজ। সোনালী রঙের পোষাক পরে মাছত ব'সেছে মাথার দিকে। সজ্জিত হাওদার পিছনে বসে চামর দিয়ে বাতাস করছে হুই কিঙ্করী; তারাও যেমন সুন্দরী তেমনি তাদের সাজ-পোষাকের বাহার। হাতী দুটোকে ঘিরে চ'লেছে এক পাল আসা-সেঁটাধারী বরকন্দাজ, তাদের আগে পিছনে জন পঞ্চাশ সশস্ত্র সৈনিক।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে মিছিল রাজধানীর বড়-বড় বাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে চললো। এব আগে আর কোন দিন এভাবে নীলা দেবী নগরের পথে মিছিল ক'রে বেরোয়নি। কাজেই কুমারী রাণীকে দেখবার জন্ম রাজ্যের লোক যেন ভেঙ্গে পড়লো। নীলার কিন্তু কোন দিকে ক্রক্ষেপ নেই, নিজের হাতীতে বসে হেসে-হেসে পাশের হাতীর আরোহী নীলাচলের সঙ্গে তার আলাপ করবার কি ঘটা? রাস্তার হুঁধারে কাতাবে-কাতারে দাঁড়িয়ে তারা রাণীর উদ্দেশে হাতবোড় করে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল—তাদের দিকে রাণীর দৃষ্টিও পড়ল না। রাস্তার ধারে যে সব বাড়ী, তাদের ছাদে, অলিন্দে উঠে নগরের মেয়েরা কুমারী রাণীর এই নিলজ্জ আচরণ দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো—মাগো, এ কি কাণ্ড! হুব্বরের সঙ্গে বিয়ের আগে এমন ক'রে রাস্তায় কেউ বেরোয় না কি মিছিল ক'রে! 'য'ত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড!

নীলাচলকে হঠাৎ গম্ভীর হ'তে দেখে নীলাও মুখের হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলে—হ'ল কি তোমার? মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল কেন গো!

নীলাচল বললে—দেখছ না, আমাদের দেখে লোকেরা সব হাসছে, টিটকিরি দিচ্ছে! আমি ফিরে ঘাই, রাণী।

নীলার মুখখানা অমনি রাগে লাল হ'য়ে উঠলো; তই চোখ পাকিয়ে সামনের একটা বাড়ীর দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেলো—জনকতক ছেলে একটা বাড়ীর দেউড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে নীলাচলেব দিকে আঙ্গুল তুলে মুখ টিপে হাসছে। নীলার মনে হ'ল, সে হাসি যেন ছুরির ফলার মতন তার বুকে বিঁধছে। ঘাড় বঁকিয়ে অমনি সে নীলাচলের পানে চেয়ে বললে—আর ত'দিন পরে এ-রাজ্যের রাজা হবে তুমি—এ কথা জেনেও যারা তোমাকে দেখে হাসতে পারে, তাবা তোমার শত্রু। তুমি ওদের সায়েস্তা করতে পারো না?

নীলাচল উত্তর দিলে—খুব পারি। এক দিনেই আমি সমস্ত পাজীর মুখ বন্ধ করবার ওষুধ জানি। কিন্তু ভয় তোমার দাড়কে।

নীলা কক্ষস্থরে বললে—রাজ্য আমার, আমি রাণী। দাড় ত আমার চাকর। তাকে তোমার কি ভয়? তুমি ঐ পাজীগুলোকে জানিয়ে দাও—তোমাকে ঠাটা করার কি শাস্তি!

নীলাচল এই স্বযোগই খুঁজছিল। তার চোখ দুটো উৎসাহে জ্বলে উঠলো। মাছতের দিকে চেয়ে হুকুম দিলে—হাতীকে বসাও।

মাছতের ইঙ্গিতে চোখের পলকে নীলাচলের হাতী হাঁটু-গেড়ে রাস্তার ওপর বসে পড়লো। রাস্তার জনতা তাতে চঞ্চল হয়ে উঠলো,—রক্ষীরা ব্যস্ত হয়ে নীলাচলের হাওদার সামনে এসে দাঁড়ালো। রক্ষীদের সরদারটি নীলাচলের অতি পরিচিত এবং অল্পগত ব্যক্তি। নীলাচল তাকে 'সরদার' বলে ডাকে। লোকটা সিংহলবাসী—মুখখানা তার যেমন চ্যাপ্টা, দেহটাও সেই অল্পপাতে একখানা তস্তার মত বেয়াড়া। সারা মুখে যেন নিষ্ঠুরতা মাখানো। সরদারকে ইসারার ক'ছ ভেবে নীলাচল

চুপি-চুপি তার হুকুমটা জানিয়ে দিলে। তখনই সে রক্ষীদল নিয়ে সবগে ছুটলো সামনের সেই বাড়ী লক্ষ্য ক'রে। হুঁহাতে পথের লোকগুলোকে সজোরে ঠেলে পথ করে নিয়ে তারা সামনের দিকে ছুটে চললো। ফলের মত ফুটফুটে তিনটি ছেলে বাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়েছিল। এতগুলো সশস্ত্র সিপাইকে সামনে দেখে ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনটি ছেলেই বাড়ীর ভেতরে পালানোর জন্তে যেমন মুখ ফিরিয়েছে, অমনি পিছন থেকে সিপাইদের হাতগুলো সাঁড়াশীর মতো তাদের গলায় চেপে ব'সল। কাকর মুখে আর কথা নেই। তিনটি ছেলেকেই শৃঙ্খলে তুলে তাবা নীলাচলের সামনে এনে নামিয়ে দিলে। ছেলে তিনটি তখন ভয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল।

নীলাচল ছেলে তিনটিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কবলে না, একবার শুধু তাদের পানে তাকিয়ে সরদারকে বললে—এবা আমাদের দিকে চেয়ে হাসছিল, ঠাটা করছিল। আচ্ছা করে এদের চাবুক-পেটা কর,—এক-এক জনকে কুড়ি ঘা লাগাও।

বাস্—হুকুমের সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ শুরু হয়ে গেল। এক সঙ্গেই অভাগা ছেলে তিনটির পিঠে সরদারের হাতের চামড়া চাবুক সপাসপ পড়তে লাগলো। তাদের কাতর আন্তিনাদে সারা পথ প্রতিধ্বনিত হ'ল। রাস্তার লোকগুলি এই নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখে ছেলে তিনটিকে ছেড়ে দেবার জন্তে কত অমুনয়-বিনয় কবলে লাগলো—কিন্তু রক্ষীরা তাদের শাস্তি দিয়ে ত'ট্টে দিলে।

ছেলেদের অভিভাবকরা তফাতে থেকে রাণীর দোহাই দিয়ে তাদের রেহাই দেবার জন্তে কত প্রার্থনাই কবলে, কিন্তু রাণী তার উত্তরে মুখখানা বঁকিয়ে শুধু হাসলে। রাণীর সেই তীক্ষ্ণ হাসি পথের সকল লোকের কানে যেন সূচের মত বিঁধতে লাগলো।

এই নিষ্ঠুর দণ্ডের পর তিনটি ছেলেই রক্তাক্ত দেহে পথের উপর লুটিয়ে পড়লো। নীলাচল মাছতকে হুকুম দিল—হাতী উঠাও, সামনে চালাও!

সঙ্গে-সঙ্গে হাতী উঠে দাঁড়ালো,—হাতা দুটোকে ঘিরে মিছিল এগিয়ে চললো,—পথের ওপর প'ড়ে রইলো চাবুকের আঘাতের ক্ষত-বিক্ষত মৃতকল্প তিনটি ছেলে!

ছেলেদের অভিভাবকেরা হাহাকার ক'রে তাদের পাশে প'ড়ে ছটফট ক'রতে লাগলো। জল, পাখা, ওষুধ নিয়ে দরদী লোকেরা ছুটে এসে ছেলে তিনটির শুশ্রূষা করতে লাগলো; কিন্তু কিছুতেই তাদের তখন চেতনা হ'ল না।

মিছিলের কোলাহলের ধ্বনি দূব থেকে তখনও বাতাসে ভেসে আসছিলো; সূর্য্য আগেই পশ্চিম গগনপ্রান্তে অদৃশ্য হ'য়েছেন, গোধূলির ধূসর ছায়া ক্রমশঃ কালো হ'য়ে নেমে আসছিল; রাস্তা ধারে সংজ্ঞাহীন ছেলে তিনটিকে ঘিরে যারা বসেছিল, চোখের জপে তাদের দৃষ্টি কন্ধ হয়েছিল।

এই সময় এক দীর্ঘাকার লোক কাছের কোন বাড়ী থেকে বেরিয়ে অতি সম্ভরণে এদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। লোকগুলি ছেলে তিনটিকে ঘিরে তাদের মুখের দিকেই চেয়ে বসেছিল। নতুন এই লোকটিকে কেউ লক্ষ্য করেনি। তিনি একটু দাঁড়িয়ে লোকগুলির দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন—ছেলেকটাকে ঘিরে এমনি করে বসে থাকলেই কি ওরা সেরে উঠবে? সেরে যাও সকলে, এদের গায়ে বাতাস লাগতে দাও।

সকলে চমকে-উঠে চেয়ে দেখলো—তাদের সামনে অপূর্ব রূপবান এক যুবক! মাহুঘের এমন আশ্চর্য্য রূপ আর এমন দীর্ঘ আকৃতি এর আগে তারা কেউ দেখেনি। যেমন চমৎকার মুখশ্রী, তেমনি টানা-টানা বড় বড় চোখ। মাথার কালো-কালো কৌকড়ানো চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত লতিয়ে পড়েছে। পরণে তাঁর গেকরা রঙ্গের কাপড়। গায়েও ঐ রঙ্গের একখানা চাদর। তপ্ত কাঞ্চনের মত রঙ যেন তার ভেতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। খালি পা। হাতে একটা কমণ্ডলু—লোকগুলি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, তাদের মাথাগুলো আপনাই যেন এই তরুণ সাধুটির উদ্দেশে মুহুয়ে পড়লো। সাধুর কোমল মুখ আর কচিকচি গৌফ দেখে মনে হচ্ছিল, সবেমাত্র তিনি যৌবনের সীমায় পা দিয়েছেন।

সাধু আর কোন কথা না বলে সেই সংজ্ঞাহীন ছেলে তিনটির শিয়রে বসে পড়লেন। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাদের পানে চেয়ে আপনমনেই বলে উঠলেন—মনে তোমাদের পাপ নেই, নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাতের কমণ্ডলু থেকে দধির মত তরল পদার্থ দিয়ে ছেলেদের দেহেব স্তম্ভগুলো সব ঢেকে দিলেন। সকলে স্তব্ধ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। সাধু এবার নিজের গায়ের চাদরখানি খুলে ছেলে তিনটির গায়ের ওপর চাপা দিয়ে জনতার দিকে ফিবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন—এ ছেলে তিনটির অভিব্যক্ত কারা?

তিনটি লোক এগিয়ে এসে জানালো—তারাও অভিভাবক। তিন ভাই তারা এক বাড়ীতেই থাকে, তাদেরই ছেলে। পাশের পাড়াতেই তাদের বাড়ী। বাণী মিছিল করে বেরিয়েছেন শুনে ছেলে তিনটিকে নিয়ে তারা তিন ভাই এই বাস্তায় এসেছিল।

মুখখানা গম্ভীর করে সাধু বললেন—অভিব্যক্তরা যে সব কথা মনের ভেতর চেপে বাখে, ছেলেদের মন খুলে তা বলে ফেলে। একটা হা-ঘরে বিদেশী রাণীকে বিয়ে করে তোমাদের রাজা হয়—তোমরা সেটা চাও না, এই নিয়ে বাড়ীতে ঘোঁট পাকাও, অথচ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করবার সাহস তোমাদের নেই। তোমাদের মনের কথা ছেলেদের জানে। তাই বাস্তায় বাণীর সঙ্গে সেই বিদেশীকে দেখে তারা হেসেছিল। বিদেশীর সাহস আছে, তোমাদের মতন কাপুরুষ নয়—ছেলেগুলোকে চাবুক মেবে এই দলেব সকলকে শিক্ষা দিয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখছি—ঐ চাবুক তোমাদেরই পিঠে পড়েছে।

লোকগুলি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলো; তাদের মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। সাধু বললেন—আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানো? তোমাদেরও পিঠে সবেগে চাবুক লাগাই। অজ্ঞায়ের প্রতিবাদ করবার শক্তি যখন তোমাদের নেই, তখন পরের কথা নিয়ে লুকিয়ে চর্চা কর কোন্ সাহসে? জান—না বলে পরের জিনিস নিয়ে ব্যবহার করা, আর—পরের কথা নিয়ে লুকিয়ে আলোচনা করা সমান অজ্ঞায়?

কথাগুলো বৃষ্টি কাঁটার মতন প্রত্যেক লোকের বুকে বিঁধছিল। তারা চঞ্চল হয়ে উঠলো, কিন্তু সাধুর কথার প্রতিবাদ করতে কারও সাহস হ'ল না।

সাধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতগুলি লোকের মুখের ভাবভঙ্গি চেয়ে-চেয়ে দেখছিলেন। বুঝলেন, তাঁর কথাগুলো মগ্ন এরা বুঝতে পেরেছে। এবার তিনি গলার স্বর বীতিমত তীক্ষ্ণ করে বললেন—ছোট একটি বাছুরের গায়ে হাত দিলে তার মা সিং নেড়ে আঘাত করতে ছুটে আসে। সম্ভানেব লাঞ্ছনা তুচ্ছ পশুও সহিতে পারে না, আর—তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সম্ভানের ওপর এই নিষ্ঠুর নির্যাতন দেখলে? পশুর সঙ্গে তোমাদের এই প্রভেদ লজ্জাজনক বটে!

এরই মধ্যে কথাটা চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধুকে দেখবার জন্তে তখন আবার এই পথে জনসমাগম হচ্ছিল। যারা মিছিল দেখবার লোভকেও দমন করেছিল, তারাও দল-বঁধে এসে কান খাড়া করে সাধুর কথা শুনছিল। দলের ভেতর থেকে এবার সাড়া এলো—ঠিক কথা, আমরা পশুরও অধম।

সাধুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবার শায়িত ছেলে তিনটির দিকে পড়লো। অমনি তিনি চাদরখানি তাদের গায়ের ওপর থেকে তুলে আন্তে আন্তে ছেলে তিনটির মখে-চোখে বুকে-পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। তাঁর হাতের পবন পেয়েই যেন একসঙ্গে তিনটি ছেলেই চোপ মেলে চাইলো; বিবর্ণ মুখগুলির ওপর ক্ষণ আভা ফুটে উঠলো। কাছে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, উল্লাসে তারা চীংকার করে উঠলো—চক্ষু মেলেছে, জ্ঞান হয়েছে, আর চিন্তা নেই—জয় জগদীশ!

জনতার জয়োল্লাসের ভিতরে সাধু ছেলে তিনটিকে হাত ধরে আন্তে-আন্তে তুলে বসালেন। সকলে সম্মুখে আবার জয়ধ্বনি করে উঠলো। এক জন এগিয়ে এসে সমস্তম্ভে বললো—শুভ্রত আপনাব ওষুধের গুণ!

সাধু বললেন—ওষুধ ত আমার নয়, আমি প্রয়োগ করেছি মাত্র। যিনি এই আশ্চর্য্য ওষুধটি সৃষ্টি কবেছেন, তিনি এক দিন তোমাদেরই ছিলেন, কিন্তু তোমরা সেই মহাপুরুষকে তাড়িয়ে দিয়েছ!

বিশ্ময়ের সুরে একসঙ্গে অনেকেই বলে উঠলো—আমরা?

জোব গলায় সাধু বললেন—হ্যাঁ, তোমরাই। তিনি ছিলেন এই বাস্তায় ও রাজবংশের সত্যকার বন্ধু। মানব-দেহের আর মানব-সমাজের ব্যাধি দূর করবার ওষুধ এ-রাজ্যে তিনিই শুধু জানতেন। কিন্তু তাতে রাজ্যেব বাবা চাই—তাদের স্বার্থে আঘাত পড়ে। তাই চক্রান্ত করে তাঁকে জাতিচ্যুত করা হয়, তাতে যে সমাজের সমাজ-পতির বাবস্থা দেয়—তোমরাই সেই সমাজের অঙ্গ। কিন্তু সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করবার প্রত্ন নিয়ে তিনি জনসমাজেব বাইরে চলে যান। তিনি—বৈজ্ঞানিক সুসেন।

সাধুর কথার সঙ্গে-সঙ্গে চার দিক থেকে প্রশ্ন উঠলো—তিনি এখন কোথায়? বলুন—বলুন—

আকাশের দিকে সুদীর্ঘ হাতখানি তুলে সাধু বললেন—তিনি আছেন এখানে। তাঁকে পাবার আর সম্ভাবনা নেই। তবে সারা জীবনের সাধনায় যে তলভ অমৃত তিনি সঞ্চয় করে বেখে গেছেন, মনে-প্রাণে সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করবার ইচ্ছা যদি তোমাদের থাকে, তবে তোমরা তা পেতে পারো।

আবার সম্মুখে সকলে বলে উঠলো—আমরা চাই, আমরা চাই।

সাধুর মুখে এতক্ষণ পরে প্রথম হাসি দেখা দিল; তিনি বললেন—তা হ'লে তাঁর মতন সাধনা কর লাগে। এ সাধনা আর

কিছু নয়—মনে-প্রাণে সত্যনিষ্ঠ হও। সাহসে বুক বেঁধে খুঁজে দেখ—ব্যাধি কোন্‌খানে। ব্যাধির সন্ধান পেলে মুক্তিরও উপায় হবে।

অনেক লোক তখন সেখানে এসে জুটোঁছিল। তারা সকলে কান খাড়া কুঁবে সাধুর কথাগুলো শুনছিল। কথাগুলো যেন কানের ভেতর দিয়ে চুকে তাদের অন্তরে একটা নতুন শক্তির সঞ্চার করলো। জনতার ভেতর থেকে জোর গলায় এক জন লোক বলে উঠলো—
ব্যাধির সন্ধান আমরা পেয়েছি। ব্যাধি আমাদের মনে; ভয়-সঙ্কোচ-জড়তা ব্যাধির জট গাটিকেছে, সাহস আর সত্যের ছুরি দিয়ে এ জট কাটতে হবে।

অমনি সমস্ত লোক এক সঙ্গে বলে উঠলো—ঠিক কথা, এতে যদি মরতে হয়, সেও ভালো।

এই সময় সাধুর খোঁজ পড়লো, কিন্তু তাঁকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। জনতা যখন উত্তেজিত হয়ে চোঁটোচ্ছিল, সেই সময় সকলের অগোচরে তিনি চুপি-চুপি অদৃশ্য হ'য়েছিলেন। কিন্তু লোকেব মুখে-মুখে রটে/গেল—সাধু সবাব সামনে বাতাসে মিশে গেছেন।

রাস্তার এই ঘটনাটা অতিরঞ্জিত হ'য়ে লোকেব মুখে-মুখে বিহ্যতের গতিতে সহস্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। যারা ঘটনার ত্রিসীমাতোও আসেনি, তারা অবাক হয়ে শুনলো—এক মহাপুরুষের অলৌকিক কাহিনী। রাজার সিপাইরা চাবুক-পেটা করে যে তিনটি ছেলেকে মেরে ফেলেছিল, তিনি ঠাৎ এসে গায়ে হাত বুলায়ে তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। নগরবাসীকে বলেছেন—তোমরা এর প্রতিশোধ নাও, যে লোক এমন ক'রে ছেলে খুন করতে পারে, রাণীর সঙ্গে তার কখন বিয়ে হ'তে পারে না। কালে তন্ত্রায় লেখা কথাগুলো তোমরা মুখ দিয়ে বাব ক'রে বলা—এ বিয়ে হবে না, কিছুতেই আমরা বিয়ে হ'তে দেব না। মহাপুরুষ বলেছেন—এতে যদি কোন হাঙ্গামা বাধে, তোমাদের কোন বিপদ আসে—আমি আছি, ভয় কি!—এই আশ্বাস দিয়েই মহাপুরুষ বাতাসে মিশে গেছেন।

লোকের মুখে-মুখে এই সব কথা এমন ভাবে দিকে-দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, কেউ তাতে কোন রকম সন্দেহ করলো না, সবাই বিশ্বাস ক'রে মেনে নিলে। তার ফলে লোকের মনে ভয় ও সঙ্কোচ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, সবাই বুক ঠুকে দাঁড়ালো, জোর গলায় প্রতিবাদ তুললো—ঠিক কথা, আমরা ঐ খুঁনে বিদেশীটাকে মানবো না; এ-বিয়ে কিছুতেই হ'তে দেব না। ভয় কি, মাথার ও পরে আছেন সেই মহাপুরুষ।

মিছিল প্রাসাদে ফেরবার আগেই পথের দুর্ঘটনার খবর মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মার কানে এসে পৌঁছেছিল। সহরের সর্বত্র তাঁর গোয়েন্দা ঘোরাফেরা করে, প্রত্যেক লোকের নাড়ীর খবর তাঁর নখ-দর্পণে থাকে। এককাল পরে তাঁর মহাশয় স্রসেনের প্রসঙ্গ শুনেই তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। 'সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখের পর্দা খুলে গেল। তিনি যেন দেখতে পেলেন—অনেক দিন আগে যে লোকটাকে সমাজপতিদের সাহায্যে তিনি দেশত্যাগী করেছিলেন, সেই লোকটাই কোথাও আস্তানা পেতে গোপনে অস্ত্র শানাচ্ছিলো, আর এখন স্বযোগ পেয়ে সেই অস্ত্র সে প্রয়োগ ক'রেছে। সহরের

পথে-পথে ঐ যে কালো রঙের তন্ত্রা রাতারাতি বুলেছিল—সে সব ঐ ধড়িওয়াজ লোকটারই কীর্তি! সহরময় তার সব চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি তাঁর শাসনের ঢাকাটা এবার আর একটু নতুন কায়দায় ঘুরিয়ে দিতে হাত বাড়ালেন।

মিছিল থেকে প্রাসাদে ফিবেই নীলা মুখখানা শক্ত ক'রে বললো—পথে কি কাণ্ড বাঁধিয়ে এসেছি, শুনেছ ত দাদ! যেমন সব কুকুরের রা, তেমনি দিয়েছি মুগুরের ঘা। কাকুর মুখে আর কথাটি নেই। পারতে তুমি এমন ক'রে এক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যের নচ্ছারগুলোকে সায়ের্ত্তা ক'রতে?

দাদু গম্ভীর মুখখানা তুলে বললেন—আমি সব শুনেছি; কিন্তু কাজটি ভালো হয়নি, দিদি!

নীলা তার চোখের বড়-বড় কালো-কালো তারাতুটো ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো—এ কথার মানে? চাবুকের চোটে বাড়ীর বজ্জাত দাসী-বান্দীগুলোকে দুর্বল ক'রেছি, সে ত তুমি জান; আর আজ পথে বেবিয়ে তিনটে ছেলেকে চাবুক মেবে সহরসুদ্ধ সবাইকে সায়ের্ত্তা করে দিয়েছি। কাজটা কি মন্দ হ'য়েছে?

দাদু বললেন—চাবুক ত তুমি নিজের হাতে মারোনি দিদি, হুকুম দিয়েছে নীলাচল। কিন্তু কাজটা কি ঠিক হ'য়েছে? জানো ত, রাজ্যসুদ্ধ লোক তাকে মানতে চায় না, যেহেতু সে বিদেশী। কৌশল ক'রে আমাকে কাজ গুছতে হচ্ছে। এ-সময় রাজপথে ও রকম হুকুম দেওয়াটা তার পক্ষে খুবই অগায় হয়েছে।

নীলা তার বেণীটা হুলিয়ে বললো—অগায় হয়নি, ঠিক হ'য়েছে। তুমি কি সেখানে ছিলে, নিজের চোখে কিছু দেখেছিলে যে, এ কথা বলছ? আমি নিজে দেখেছি—ছোঁড়াগুলোর শাস্তি দেখে খাড়ীগুলোর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এর পর আর কেউ আমাদের কথা নিয়ে আলোচনা করবে না—তা ঠিক জেনো।

কথাগুলো শেষ করেই নীলা গম্ভীরভাবে সেখান থেকে চলে গেলো—দাদু আর কিছু বলবার ফুরসৎ পেলেন না। তিনি দুই চক্ষু কপালে তুলে হাঁ-করে রাণী-নাতনীর দিকে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু পরদিনই প্রজাদের পক্ষ থেকে রাজসভায় এক আবেদন এসে সভাসুদ্ধ সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিল। আবেদনে পাঁচ হাজার প্রজা তাদের নাম স্বাক্ষর ক'রে জানিয়েছে—তন্ত্রা-ঝোলানের ব্যাপারে যারা কারাগারে আটক আছে, তাদের মুক্তিদান করা হোক। তন্ত্রায় যে-সব কথা লেখা হ'য়েছিল, সে-সবই তাদের প্রাণের কথা। তখন স্পষ্ট ক'রে জানাতে ভরসা করেনি, কিন্তু এখন তারা সেই লেখাটাই আরো স্পষ্ট ক'রে লিখে জানাচ্ছে—সিংহলী নীলাচলের সঙ্গে বাঙ্গলার রাণীব বিয়ে হ'তে পারে না,—যেহেতু সে বিদেশী, আর অত্যন্ত নিষ্ঠুর। রাজধানীর রাজপথে তিনটি বালকের ওপর নির্কিঁচারে সে যে অত্যাচার করেছে—আমরা তার বিচার চাই। রাণী নিজে সে অনাচারের সাক্ষী।

এ পর্য্যন্ত রাজসভায় প্রজার তরফ থেকে এ-ধরনের আবেদন আর কখনো আসেনি। মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মা বুঝলেন, তাঁর আঁত পেয়ারের নীলাচল মেজাজ দেখাতে কিছা রাণীকে খুশী করতে একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে। কিন্তু সভায় সকলের সামনে তিনি চোখ-মুখ রাঙিয়ে রায় দিলেন—এদের দেখাছি, মরণ-বাড় বেড়েছে; ভেবেছে—তেজ দেখিয়ে রেগাই পাবে। সব কটাকে ধরে এনে জেলে পুঁকে, এর উত্তর দেব।

কিন্তু মুখের কথাটা আর তিনি কাজে লাগালেন না। তিনি জানতেন, গোড়াতেই নানা গলদ রয়েছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে পাছে সাপ ফণা তুলে ছোবল মারে, এট ভয়ে প্রজ্ঞাদেব আবেদনটি তিনি তখন চেপে রাখলেন। পাঁচ হাজার প্রজ্ঞাকে ধরে-এনে কয়েদ করা ত আর সহজ নয়।

নীলা সে দিন রাজসভায় আসেনি,—দাড়র সঙ্গে কথা-কাটা কাটির পর সে মনে-মনে ঠিক করেছিল—দাড়কে না-বলেই সে এবাব এমন একটা কাণ্ড কিছু বাধাবে, যার ফলে কোন লোক বাজবাড়ীর কথা মুখে আনতেও সাহস করবে না; তাই সে নীলাচলের সঙ্গে খুব গোপনে সেই পরামর্শই আঁটছিল।

নীলা জানালো—অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি, বাজারা যেমন খটা ক'বে দিগ্ভ্রমে যেতেন, আমরাও তেমনি মস্ত মিছিল করে দিক্-ভ্রমণে বেরবো। সহবের বৃকেব ওপর দিয়ে রাজ্যের অনেক দূর পর্যন্ত যাবো। তাতে কি হবে জান? বেশ-ভ্রমণও চলবে, আব সকলে জানবে—দেশের রাণী বিয়ের আগেই ভাবী বাজার সঙ্গে রাজ্য দেখতে বেরিয়েছে। দেখি, কার সাধ্য এতে কোন কথা বলে। কেউ কিছু বললে কিছা টিটকিবি দিলে—কালকেব মতন সপাসপ চাবুক!

নীলাচল বললো—কাল চাবুক পেয়ে সবাই টিট করে গেছে, আব কেউ কিছু বলবে না জেনো।

নীলা দেবী তখন তাব দাড়কে সঙ্গরটা জানাতে চললো।

দাড় তখন রাজসভা থেকে সরাসরি প্রাসাদে ফিরে মেয়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে বসেছিলেন। তাঁর মুখে রাজ্যের সেবা-সেরা প্রজ্ঞাদের আশ্পর্কিত কথা শুনে নীলা দেবীর মা বিধবা মহারাণী অঙ্গনা দেবী সত্যে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তা হ'লে এখন উপায় কি বাবা? শুভকর্মেব সময় যদি একটা গোলমাল বাধায়, তা হ'লে বিয়ের আমোদ যে সবই মাটা হয়ে যাবে।

মন্ত্রী বললেন—গোল আমি কিছুতেই হ'তে দেব না, যারা গোল তুলেছে, তাদের পোকা বানিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে চাই।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তা হ'লে কি করতে চান আপনি?

মন্ত্রী বললেন—আমাব ইচ্ছা এই যে, নীলা আব নীলাচলকে চুপি-চুপি আমাদের রাজ্যের সীমান্তে দেবকোট প্রাসাদে পাঠিয়ে দিই। সেইখানেই এদের বিয়ে হ'য়ে যাক। বিয়ের পর মিছিল ক'রে বর-ক'নে—রাজ্যের রাজা-রাণী রাজধানীতে আসবে। বিয়ে হ'য়ে গেছে শুনে, আর কেউ গোল বাধাবে না।

নীলা এই সময় দাড়র খোজেই মায়ের মহল্লায় আসছিল। আড়াল থেকে দাড়র কথা শুনে সে ফস্ ক'রে সামনে এসে বললো—দাড়, আমরাও ঠিক এই রকমেব একটা পরামর্শ এঁটেছি; কিন্তু তার গোড়াটার সঙ্গে তোমার যুক্তির মিল হচ্ছে না।

এক-গাল হেসে দাড় বললেন—তাই বুঝি আজ রাজসভায় যাওয়া হয়নি—হুঁটিতে ব'সে ঝালি গাঁটছড়া বাধাবাই মতলব ভাঁজছিলে? কিন্তু এখন আমাব বুদ্ধি নিয়েই চলতে হবে।

নীলা বললো—বুদ্ধি তোমাব দিন-দিন ভোঁতা হ'য়ে যাচ্ছে দাড়, ও বুদ্ধি এখন অচল।

দাড় হেসে উত্তর দিলেন—মিছিল ক'রে বেরবাব ফন্দী কিন্তু এই বুনো-মাথা থেকেই বেরিয়েছিল, দিদি!

নীলা মুখ টিপে হেসে বললো—সে কথা সত্যি, কিন্তু তার পরেই দেবকোট থেকে ফিরে এ'লেই রাজধানীতে বিয়ের উৎসব চলবে।

যে খেই হারিয়ে ফেলেছ, দাড়! তুমিই বল ত, রাজ্যের রাণী কি চোর, যে চুপি চুপি এক-বাড়ী থেকে আব এক-বাড়ীতে পাড়ি দেবে? এখন আমি কি ঠিক করেছি শোন—

একটু আগে মিছিল করে বেরবাব যে ফন্দী নীলা ঠিক ক'রোছিল, দাড়কে শুনিয়া দিয়ে মুচকি হেসে বললো—তোমাব শেষের-যুক্তিটি কিন্তু বেশ! আমাব মনে ধবেছে। মিছিল ক'রে দেশগুলো ঘুরে শেষকালে তোমাব দেবকোটেই যাওয়া যাবে। তাব পর—তুমি যা বলেছ, তাই হবে।

মেয়ের কথা শুনে মা হাসিমুখে বাপের গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকালেন। নাতনীর মিছিল করে বেরবাব প্রস্তাবটি দাড়র সত্যই মনে ধরেনি। তাই মুখখানা ভার ক'রে তিনি বললেন—মাবা জীবন মাথা খেলিয়ে মাথার চুলগুলো পর্যন্ত পাকিয়ে ফেলেছি, দিদি! কত বাধা-বিঘ্ন সরিয়ে তোমাকে যে তোমাব বাবাব আসনে বসিয়েছি—তুমি তার কিছুই জানো না, জানে তোমাব মা। এখনো একবারে যে তুমি নিশ্চয়ক, সে কথা ভোর করে বলা যায় না, পিছনে শত্রু এখনো ঘুরছে। মিছিলের ব্যবস্থা দিয়ে আমিই ভুল ক'রেছিলুম। এ-ভুলেব রাস্তায় পা বাড়ালেই পস্তাতে হবে। তাই আমাব ইচ্ছা নয়—মিছিল ক'বে তোমাব প্রকাশে রাস্তায় বেরোও।

মুখখানা লাল ক'বে নীলা বললো—এইখানেই তোমাব বুদ্ধি ফেসে গেছে, দাড়। আমাব যদি এর পর গা-ঢাকা দিই, সবাই ভাববে—আমরা ভয় পেয়ে গেছি। না দাড়, তা হবে না। দেবকোটে যেতে যদি হয়, মিছিল ক'রেই যাবো। আর এত র্তাবনারই বা কি আছে? আমরা ত সেজেগুজেই যাবো, শিক্ষিত সেনাদল সঙ্গে থাকবে, বাছা-বাছা সেনাপতি তাদের চালাবে। সবার ওপরে থাকবে আপনার পেয়াবের শিষ্যটি। দেখবে তখন কেমন মজা হয়, রাজ্যশুদ্ধ সবাই একবারে হক্চকিয়ে যাবে।

মা অনেক বুঝালেন, বললেন—দাড় যা বলছেন, তাই কর মা, নিজের জিদ নিয়ে মেতো না।

কিন্তু নীলা কোন কথাতেই কান দিল না। তার সেই এক কথা—চোরের মত আমি দেবকোটে যাব না—কিছুতেই না। দাড় যদি তাঁর জিদই বজায় রাখতে চান, তা হ'লে তিনিই রাজ্য হয়ে সিংহাসনে বসুন, চোখছটো আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চায়—আমি সেই দিকেই চলে যাই।

কাজেই নীলাব ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল; দাড় তার কথায় সায় না দিয়ে পারলেন না।

এর পর অনেক মাথা ঘামিয়ে তিনি রাজ্যের সবত্র প্রচার ক'রে দিলেন—রাণী নীলা দেবী রাজ্য পরিদর্শন করতে বেরুচ্ছেন। তিনি যেখানে-যেখানে যাবেন, সেখানকার শাসনকর্তা যেন রাণীর যথাযোগ্য সম্বন্ধনার জগ্গ তৎপর থাকেন, নবীনা রাণী যেন তাঁর রাজ্যের প্রজ্ঞাদের ভক্তি-শ্রদ্ধায় তুষ্ট হ'য়েই রাজধানীতে ফিরে আসেন।

এই ঘোষণায় নীলাচলের নাম-গন্ধও রটল না বটে, কিন্তু মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মন্ত্রী তলে-তলে ঠিক দিয়ে রাখলেন যে, দেবকোটের প্রাসাদে পৌছলেই সেখানে নীলাচলের সঙ্গে নীলাব বিয়ের পর্বটা কোন রকমে সেরে ফেলা হবে। বিয়ের পর বর-ক'নে

স্বয়ং রাণী চলেছেন দেশভ্রমণ করতে। সুতরাং তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি শাস্ত্র-সম্পদ-শৃঙ্খলা সব কিছুই জাঁকজমক করে দেখিয়ে রাজ্যের প্রজাদের চোখগুলো বলসে দেবার সীতামত ব্যবস্থাই হয়েছে। হাতী-ঘোড়া-উট; গাড়ী-পালকী-চতুর্দোলা; নানা রকম সাজ-সজ্জাম আসবাব-পত্র; হাজার-হাজার সুসজ্জিত সেনা; বড়-বড় পদস্থ সেনানী, সেনাপতি; নানা দেশের দুর্লভ বিচিত্র সামগ্রী; নানা বয়সের দাস-দাসী-প্রহরী; বহু রূপসী কিশোরী নর্তকী; বিবিধ রসদ; বহু প্রকাণ্ড ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্র—এই বিরাট মিছিলেবু শোভাবর্ধন করেছে। রাণী যেন সমৃদ্ধ রাজধানীটিকে সাজিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছে।

কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য, এমন অপূর্ণ মিছিল দেখতে এ-দিন আর রাস্তায় মানুষ ভেঙ্গে পড়লো না। হুঁধারের দোকান-পাট প্রায় সবই বন্ধ, রাস্তায় লোক নেই বললেই চলে! রাজধানীর সকল লোক আগে থাকতেই স্থির করে রেখেছে—কোন লোক এ-দিন রাস্তায় বেরুবে না, তার দোকান কোন দোকানী খুলবে না, রাণীর নামে একটি রূপ থেকেও জয়ধ্বনি উঠবে না। সেইজন্মই রাজধানীর রাস্তাঘাটগুলির এই অবস্থা। যে হুঁ-একখানা দোকান খোলা ছিল বা রাস্তায় হুঁ-চার জন লোককে বাণীর জয়ধ্বনি তুলতে দেখা গিয়েছিল—তাবা রাজসরকারের বেতনভোগী কর্মচারীদের কেউ, অথবা মন্ত্রী শ্রীগোপাল শর্ম্মার দলের লোক।

নীলা দেবী এ-দিন চতুর্দোলায় বসে মিছিলেব রূপশ্রী ফুটিয়ে তুলেছিল। তারই ঠিক পিছু-পিছু চলেছিল—তাঁর প্রিয় সঙ্গীর সুসজ্জিত হাতী। তাব পিঠের বিচিত্র হাওদাভ ভিতরে রাজবেশে বসেছিল নীলাচল। রাজ্যের রাণী আর ভাবী রাজাটির আশে-পাশে দাঁড়িয়ে পুতুলের মতন সুন্দরী কিশোরীরা সসম্মানে চামর চুলাচ্ছিল। এই ভাবে যেতে-যেতেও এদের আলাপের বিবাম ছিল না। প্রথমে হুঁ-জনেব মুখেই হাসির বলক ছুটছিল, কিন্তু পথের অবস্থা দেখে হাসি ক্রমে মুখেই মিলিয়ে গেল—চাঁদ যেন মেঘের ভেতর অদৃশ্য হ'ল!

নীলাচল মুখখানা ভার করে হঠাৎ বলে উঠলো—দেখছ রাণী, পাজিগুলোর কাণ্ড! পথে কেউ নেই, বাড়ী-ঘর দোকান-পাট সব বন্ধ!

জোরে একটা নিশ্বাস ফেল নীলা উত্তর দিল—ওরা বোধ হয়, আমাদের মুখ দেখবে না ঠিক করেছে।

নীলাচল জ্রুকুটি করে বললো—তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে—এবা জলে বাস করে, কুমীরকে তফাতে রাখতে চায়! যার জায়গায় বাস করে, তার সঙ্গেই বিরোধ! তুমি কি ঐ পাজিগুলোব আশ্পর্কী সহ্য করবে, রাণী!

নীলা তার বড়-বড় চোখদুটো মেলে বললো—ওরা যদি না বার হয়—আমরা কি করতে পারি? আমাদের ত কিছু বলনি!

নীলাচল বললো—এ যে বলার চেয়ে অনেক বেশী! তোমার দাছ ত স্পষ্ট করেই প্রচার করেছিলেন—প্রজারা রাণীর সম্বর্ধনা করবে।—তবে? একে অবাধ্য হওয়া বলে না?

নীলা বললো—কিন্তু মুঞ্চিল এই, কেউ যে বেরোয় না! আমরা এ-অবস্থায় কি করতে পারি?

নীলাচল এ-কথায় উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো—যারা বেরোয়নি তারা আর যাতে বেরুতে না পারে—আমরা যদি তার ব্যবস্থা

করি, তা হ'লে এক দণ্ডেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে; কেউ আর ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকবে না।

কথাটা শুনেই নীলার মনে কোতূহল জাগলো; সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলো—ব্যবস্থাটা কি?

নীলাচল গলার স্বর একটু নীচু করে জানালো—বহু-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। হুঁ-একখানা বাড়ী যেই জলে উঠবে, অমনি দেখবে—পিপু পিপু করে সবাই প্রাণের দায়ে বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে।

আনন্দে নীলার মুখখানা উজ্জল হয়ে উঠলো, কথাটার সমর্থন করতে উৎসাহের সুরে সে কলকণ্ঠে বললো—খাসা মতলব ত তুমি বাব কবেছ দেখছি! বাছাধনরা এবাব বুকু—জলে বাস করতে হ'লে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না,—সরদাবকে ডেকে এখনি চুপি-চুপি বলে দাও,—মোড়ের ঐ ঘরখানা দেখছ, পরদা ফেলে যেন ঘোমটা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ইচ্ছে, আগে ঐখানাতেই—বুরোছ—

মুখের ও চোখের ভিজিতে শেষের কথাটা সে তার সঙ্গীকে বুঝিয়ে দিল। কালো রঙের একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে নীলাচলেব হাতী ঠিক পিছনে 'সরদাব' নামে নিষ্ঠুর লোকটি তার জায়গা করে নিয়েছিল। নীলাচলের সঙ্গে ছায়াব মতই সর্বদা সে যুরে বেড়ায়। দেখতে বেখাপা আব বেঁটে-সেঁটে হ'লেও গায়ে তার অস্তরের মত জোব, আর নিষ্ঠুরতায় তার জুড়ী নেই বললেই হয়! এহ লোকটাই সে-দিন ছেলে তিনটিকে চাবুক-পেটা করেছিল। আজও এরই ওপরে এই চরম নিষ্ঠুর কাণ্ডটি বাধাবাবও ভার পড়লো। নীলাচল এমন কৌশলে তাকে হুকুমটা জানিয়ে দিল যে, সরদাবেব অধীন রক্ষাদলটি ছাড়া মিছিলের আব কেউ এ-সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না।

হঠাৎ চৌমাথার মোড়ে হুঁ-পাশের হুঁখানা বাড়ী এক-দুই দাউ-দাউ করে জলে উঠলো। আগুন দেখেই মিছিলের সমস্ত লোক জোব গলায় চাঁংকাব তুললো—আগুন লেগেছে—আগুন!

জলন্ত ঘর-দুখানার ভেতর থেকেও ভয়ানক স্বর বেরিয়ে এলো—আগুন! আগুন!

সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর লোকগুলো দিশেহারা হয়ে চাঁংকার করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগলো। তারা তখন আগুনের মুখ থেকে প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত, বাড়ীর জিনিষপত্রগুলো রক্ষা করবার কোন উপায়ই তখন ছিল না। তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার-স্বরে চেঁচাতে লাগলো। তখন সব বাড়ীর দরজাগুলোই খুলে গেল, লোকজন সব বেরিয়ে এসে জল ঢেলে আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগলো। জনশৃঙ্খলা রাস্তা তখন বহু লোকে পরিপূর্ণ। আগুন লেগেছে শুনে চার দিক থেকে লোক-জন সাহায্যের জন্ত দলে-দলে ছুটে আসছে। রাণীর মিছিলও তখন শুরু হয়ে থেমে গেছে; কিন্তু এত বড় দুর্ঘটনায় এই বিরাট মিছিলের একটি প্রাণীও সাহায্যের জন্ত হাত বাড়ালো না—সংগ্রহ মত দাঁড়িয়ে এই তামাসা দেখতে লাগলো।

নীলাচল মুচকি হেসে বলে উঠলো—দেখ, কেমন মজা! রাস্তায় লোকের নাম-গন্ধ ছিল না, এখন আর লোক ধরছে না। মানীদেব মাল হ'লে ভেঙ্গে গেলো। অগ্নি-দেবতার জয় হোক!

অগ্নি-দেবতার প্রত্যয়ে নীলাদেবীর মনেও তখন ক্ষুধিত ছোয়াট লেগেছে, সেও এবার উল্লাসের স্বরে উত্তর দিল—ঠিক কথা। অগ্নি-দেবতাই আমাদের মুখ রেখেছেন, আর পাজীগুলোর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছেন

নীলা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এই সময় ভীড়ের ভেতর থেকে একগানা অপূর্ণ মুখ উঁচু হয়ে উঠে অদ্ভুত দৃষ্টিব ছটায় তার মুখের কথা পলকে স্তব্ধ করে দিল! মুখখানা তরুণ সাধুব—

আগের মিছিলে বত্রাহঁত তিনটি ছেলেকে যিনি তাঁর আশ্চর্য চিকিৎসায় আরোগ্য করেছিলেন, আর নগরবাসীকে দিয়েছিলেন পথের সন্ধান।

এই সাধু সহসা কেন এলেন, আর এসে কি কবলেন, তার পর একই আকৃতির দুই বাজকণ্ডার দুই রকমের তঃসাহসিক অভিযানের পরিণাম কি পাড়ালো—‘মাসিক বসুমতী’র নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে সে সব প’ডবার জন্ম তোমরা প্রস্তুত থাকো।

—গল্পদাতা।

চৈত্র

ভরা চৈত্রের চিত্র-লেখা এ বন,

রূপে-রসে আর রঙে-রঙে মোর ভরিয়া রহিল মন।

ভালবেসেছিছু এই ধরনীতে সে এক চৈত্র মাসে,

পল্লব-দলে ফুলের ফসলে মধুর দখিন-স্বাসে,

কুঞ্জ ভরিয়া বাসক ফুটেছে কুরচি ভরেছে ডালে,

কনকচাঁপায় নিম-বাবলায় ফুলে ভরে এককালে;

অশথ শিরিম সৌদালি ছুলিছে গ্রামছায়ে সারা বেলা,

দূর বন-পথে শিমূল পলাশে চলে গুলালের খেলা!

কুমুদিত কাঞ্চন,

গোছা-গোছা রাঙা অশোক করবী হরিল আমার মন!

আলোয় কালোয় ঝিলি-ঝিলি করে উদার আকাশগানি,
হাওয়া বহে যায় কোণায় কোণায় কি করিয়া কাণাকাণি,
শুকের প্রলাপে ঘুঘু পারাবতে ময়নার নিকণে,
পূর্ণ আকাশ কোকিল-কুহরে ছুলি উঠে ক্ষণে ক্ষণে;

কি যেন চলিছে কথা,

বুঝিতে পারি না কাণ পেতে থাকি বেড়ে চলে আকুলতা!
মনে হয় যেন ওই স্বরে সুর মোরও মিলাবার আছে,
কি কথা যেন এ অন্তরে ভরা বলিবারে কারো কাছে;
যত বুঝি না কো তত ভাল লাগে অবুঝ একাকী থাকি,
এই সে চৈত্বে বেদনানন্দ মনে দিয়ে গেল আঁকি!

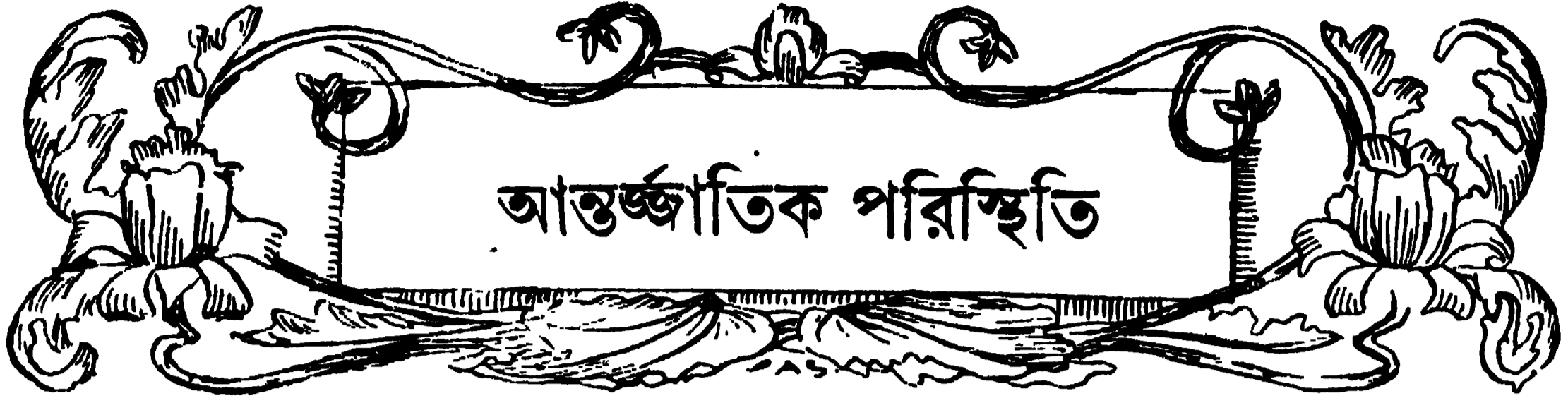
ভালবাসি এই চিন্ময় অবকাশ,

বারো মাস ভরি যে আশা পোষিয়া ফেলিষ্ঠ যে নিশ্বাস;
যে গান গাহিতে করিছু প্রয়াস বাণী এল নাকো মনে,
যে হাসি হাসিতে আধেক বিকশি ঝরিল নয়ন-কোণে;
ফুটাইতে ফুল ঝরাই মুকুল তাই দিয়ে গাধি মালা,
কে কোথা মিশালো একটুকু হাসি তাই দিয়ে ভরি ডালা;
আজি অবকাশ হিসাব-নিকাশ তারি গাধি ক্ষণে-ক্ষণে,
সুর বেধে রাখে একটি ভ্রমর স্নগভীর গুঞ্জে।

হৃল্লভ অবকাশ,

গানে ও গন্ধে চির চেতা হোল এই চৈত্রের মাস!

শ্রীগোপাললাল দে।



আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

জার্মানীর বসন্তকালীন অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্বত্র একই সময় সে তৎপর হইয়াছে। এদিকে বৃটিশ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে পূর্ব-আফ্রিকায় ইটালী সাম্রাজ্য-সৌধের ভিত্তি প্রকম্পিত হইয়াছে; এই নাতিবৃহৎ সৌধটি হয় ত পতনোন্মুখ। বৃটেনের আটলাণ্টিক-পাবেব জাতিরাজ্যটি ফার্স্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদকে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া বৃটেনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছে; তাহাকে এখন ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলাও অত্যুক্তি নহে। প্রতীটার বিরাট নরমেধ-যজ্ঞের ধূম প্রাচীর রাজনীতিক গগন ক্রমেই আচ্ছন্ন করিতেছে, তথায় অগ্নিকোণে একখানি কৃষ্ণমেঘ ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া উঠিতেছে; হয় ত প্রাচীরেও ঝঞ্ঝা আসন্ন।

আটলাণ্টিকে যুদ্ধ—

হিটলার পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বসন্তকালে জার্মানীর সাবমেরিনগুলি বিশেষ ভাবে তৎপর হইবে; তাহার এই ঘোষণা অমুখ্যাত্মী আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে জার্মানী প্রাণপণ শক্তিতে বৃটিশের 'কঠোর'োধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। স্থলভাগে এখনও জার্মানী বৃটিশের নাগাল পায় নাই; ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করিয়া বৃটেনে বণক্ষেত্র বিস্তারের সুযোগ তাহারা কিছুতেই পাইতেছে না। তাই, এক সময় জার্মান-সম্রাট কৈসার যেমন বলিয়াছিলেন,—We will starve the British people till they kneel and plead for peace (নতজাহ্নু হইয়া সন্ধিপ্রার্থী না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বৃটিশ জাতিকে উপবাসে রাখিব), সেইরূপ হিটলারও আজ বৃটিশ জাতিকে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিবার আশায় সমুদ্রবক্ষে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, বৃটেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে বঞ্চিত করাও জার্মানীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। হিটলার বুঝিয়াছেন, আর বিলম্ব করিবার সময় নাই—Now or never. যে কোন উপায়ে হউক, এই বৎসরের মধ্যেই যদি বৃটেনকে পর্য্যুদস্ত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তাহা আর সম্ভব হইবে না; মার্কিনী সমরোপকরণ তখন বৃটেনকে অজেয় করিবে। তাই, কেবল জার্মানীর বহুসংখ্যক সাবমেরিন নহে,—'স্টার্ব ইষ্ট' এবং 'নীসেনউ' নামক তাহার দুইখানি ২৬ হাজার টনের ব্যাটল-ক্রুজারও আটলাণ্টিকে বিচরণ করিতেছে। এই সকল সাবমেরিন ও বণতরীর ক্রিয়াকলাপ সত্বে নিয়মিত সংবাদ আমরা পাই না। তবে বৃটিশ-জাহাজের ক্ষতির যে ষ্টিস্টাতিক বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। ১লা এপ্রিল বৃটিশ নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ৫৯ হাজার ১ শত ৪৬ টনের ১৭খানি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জার্মানরা ঐ সপ্তাহে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টনের জাহাজ ডুবাইয়াছে বলিয়া দাবী

করে; ইটালী ঐ সপ্তাহে ১০ হাজার টনের জাহাজ নিমজ্ঞনের দাবী করিয়াছে।

বর্তমানে আটলাণ্টিকে যুদ্ধ-পরিচালন সম্পর্কে জার্মানী যে ভৌগোলিক ও সামরিক সুবিধা সম্বোগ করিতেছে, তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আটলাণ্টিক-সিধৌত নরওয়ে ও ফ্রান্সের উপকূল এখন জার্মানীর অধিকারভুক্ত। উত্তর অঞ্চলে বৃটেন তাহার ফারো দ্বীপপুঞ্জ ও আইসল্যান্ডস্থিত ঘাঁটি হইতে জার্মানীর আক্রমণ প্রতিরোধে কিছু সুবিধা পাইতেছে। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে তাহা এইরূপ কোন সুবিধা নাই। প্রথমে বিমান হইতে বৃটিশ-জাহাজের গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া পবে সাবমেরিনের আক্রমণে জার্মানী জাহাজ ধ্বংস করিতে পারিতেছে। উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটেন যেমন প্রধানতঃ স্থলসৈন্য ও নৌবাহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগে আশান্তীত সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তেমনই আটলাণ্টিকের যুদ্ধে জার্মানীর বিমান ও সাবমেরিনের সহযোগই তাহার সাফল্যের প্রধান কাবণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—বৃটেনের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের বন্দরগুলিতে জাহাজ প্রবেশ একপ্রকার অসম্ভব। এই সকল অঞ্চল প্রায় প্রতি দিন জার্মানীর বোমাবর্ষণ-বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছে। এই জগ্ন আয়র্লণ্ডের উত্তর দিক হইতে বৃটেনের পশ্চিম অঞ্চলের বন্দরগুলিতে প্রবেশ করিবার জগ্ন বৃটিশ জাহাজ গুলি ভিড় করিতেছে। এখানে ক্লাইড, নার্সি অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে জার্মানীর প্রবল বিমান আক্রমণ চলিতেছে; তাহার সাবমেরিন-গুলিও ঐ অঞ্চলে তৎপর। আয়ারের নিরপেক্ষতার জগ্ন বৃটেন এখানে জার্মানীর আক্রমণ প্রতিবোধের প্রয়োজনাত্মকপ সুবিধা পাইতেছে না।

অন্তরীক্ষে আক্রমণ—

আটলাণ্টিকে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী বিমান-যোগেও বৃটেনে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। শ্রমশিল্পকে, জাহাজ-নির্মাণের ইয়ার্ড, বন্দর প্রভৃতি ব্যতীত রাজধানী লণ্ডনেও বথেষ্ট বোমা-বর্ষণ চলিতেছে। বৃটেনের অর্থনীতিক সর্বনাশ-সাধনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রবক্ষে জার্মানীর যে বিরাট উদ্ভম দেখা দিয়াছে, প্রথমোক্ত স্থানসমূহে বোমা-বর্ষণ সেই উদ্ভমেরই অঙ্গবিশেষ। রাজধানী লণ্ডন ধ্বংস করিয়া জার্মানী বৃটিশ জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড চূর্ণ করিতে চাহে। সংক্ষেপে, অনাহারে ও উৎপীড়নে এবং আতঙ্কসৃষ্টির দ্বারা বৃটিশ জাতিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার স্বপ্নই জার্মানী দেখিতেছে। সে হয় ত মনে করে, জলে ও অন্তরীক্ষে তাহার আক্রমণের ফলে যেসকল অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে বৃটিশ জাতি উদরপূষ্টির উপযোগী আহার পাইবে না। এব' এই অপৰ্য্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রীও শান্তিতে উদরস্থ করিবার সুযোগ তাহার মিলিবে না। যে বৃটিশ জাতির বহু শতাব্দী চরম সুখস্বচ্ছন্দ্যে কাটিয়াছে, ভূনিয়ন্ত্র অন্ধকার-গহবরে তাহারা যদি কিছুকাল গুহু হইয়া পড়িত তাহা হইলে তাহারা যে আত্মসমর্পণে

বাধ্য হইবেই, ইহাই হয় ত জার্মান সেনানায়কদিগের নিশ্চিত বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আবহাওয়ার অবস্থা জার্মানীকে আশানুরূপ বিমান-আক্রমণ চালাইতে দিতেছে না। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সে একে প্রবল ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার বেগ কেবল প্রশমিত হয় নাই; সময় সময় সপ্তাহাধিক কাল জার্মান বিমানগুলিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় দেখা যাইতেছে।

বুটেনকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য—

গত ১৫ই মার্চ জেনারেল স্মাটস্ কেপ্টাউনে এক বেতার-বক্তৃতায় বলেন, হিটলার কেবল বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিতই যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিতও তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধ যথার্থি ঘোষিত ন' হইলেও উহার বাস্তবতা ও ভীষণতা অল্প নহে—*an undeclared war but a no less real and grim war*. এই দিনই সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বেতার-বক্তৃতায় জেনারেল স্মাটসের উক্তির সত্যতা সম্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। ইহাব পক্ষে বর্তমান যুদ্ধসম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতে এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ ন' বলিয়া বুটেনের অল্পকালে যুদ্ধ-বিবর্ত বল' চলিত। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এই বক্তৃতা শ্রবণের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলাও হয় ত অসঙ্গত নহে। নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে বর্ণস্বত্রে সৈন্য-প্রেরণের কথাই কেবল এই বক্তৃতায় নাই; মার্কিণী সৈন্য ব্যতীত যুদ্ধ-পরিচালনায় অণ্য সাহা-কিছু প্রয়োজন, তাহা পক্ষ-গোলাদে নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার প্রতিশ্রুতিও এই বক্তৃতায় আছে। এই বক্তৃতা হইতে ইহাও বুঝা গিয়াছে যে, মার্কিণী সবকারের বর্তমান নীতি এবং নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে যথার্থি যুদ্ধ-ঘোষণা—এতদ্বারা যে সামান্য পার্থক্য প্রয়োজন হইলে, তাহা মুহূর্ত্তেই মধোই দূরীভূত হইতে পারে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বুটেন এবং অগ্নাণ ফ্যাসিষ্টবিরোধী শক্তির সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে ইজারা ও ঋণদান বিল গৃহীত হইয়াছিল, সেই দিলের বিধান অবিলম্বে কাণ্ডে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে মার্কিণী বাজকোষ হইতে ৭ শত কোটি ডলার ব্যয় করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই অর্থের দ্বারা সাহায্যের উপকরণগুলি প্রস্তুতের ব্যবস্থাও ইতো-মধো করা হইয়াছে।

ইজারা ও ঋণদান বিলের বিধান অনুযায়ী পণ্যাপ্ত সাহায্য বুটেনে পৌঁছিতে এখনও সাত-আট মাস বিলম্ব হইবে। এই কয়েক মাসে যদি বুটেন জার্মানীর আক্রমণে বিধ্বস্ত না হয়, অর্থনীতিক অবরোধ যদি তাহাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য না করে, তাহা হইলে আগামী শীতকালে বুটেন অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। এই ভয়ই জার্মানী আগামী শীতের পক্ষে যুদ্ধের চরম জয়-পবাজয় নির্ধারণে প্রয়াসী হইয়াছে।

গত ১৮ই মার্চ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল লণ্ডনে এক ভোক্তসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "The Battle of Atlantic must be won in a decisive manner if the declared policies of the Government and the people of the

United States are not to be forcibly frustrated. অর্থাৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সবকারের এবং এই দেশের অধিবাসীর বিঘোষিত নীতির সাফল্যের জগৎ আটলান্টিকের যুদ্ধে সুনিশ্চিত বিজয়লাভ একান্ত প্রয়োজন। এই ভোক্তসভায় লণ্ডনে নব-নিযুক্ত মার্কিণী দূত মিঃ উইলগাম্ট উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে মিঃ চার্চিলের উল্লিখিত উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি আটলান্টিকের যুদ্ধে সাহায্য করিবার জগৎ মার্কিণ সরকার ও মার্কিণী জনসাধারণের নিকট প্রকারান্তরে আবেদন জানাইতেছিলেন। তাঁহার এই আবেদনে অবিলম্বে কর্ণপাত করা হইয়াছে বলিয়াও মনে হয়। ইতোমধ্যে বুটেনকে প্রদত্ত সাহায্য মার্কিণ নৌবহরের রক্ষণাধীনে প্রেরণের কথা হইতেছে; বুটেনকে অবিলম্বে ৫০খানি বাণিজ্য-জাহাজ প্রদানের ব্যবস্থাও হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, ইজারা ও ঋণদান বিলের বিধান অনুযায়ী বুটেনে প্রচুর সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হইবার পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব সমরোপকরণ হইতে বুটেনকে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মার্চ মাসের শেষে মার্কিণী সরকার তাহাদিগের বিভিন্ন বন্দরে অবস্থিত জার্মানী ও ইটালীর ৫৯খানি বাণিজ্য-জাহাজ আটক করিয়াছেন। কোন দেশের বন্দরে অবস্থিত বৈদেশিক জাহাজ যদি আত্মনিরক্ষনে উদ্ধৃত হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে এই সকল জাহাজ আটক করা যাইতে পারে। মার্কিণী সরকার অক্ষয় এই আইন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হইয়াছেন; এই আইনের বলেই এই সকল জাহাজ আটক করা হইয়াছে। এই জাহাজ আটকের আইনগত কারণ বাতাই হউক না কেন, এই বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ সম্পর্কিত চাঞ্চল্য প্রশমিত হইলে এই সকল জাহাজের দ্বারা বুটেনের উপকৃত হওয়া অসম্ভব নহে।

জার্মানীর ব্লকান্ অভ্যয়ান—

গত ৩রা মার্চ বুল্গেরিয়া জিহাতির চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পর স্বভাবতঃ জার্মানীর দৃষ্টি যুগোস্লাভিয়ার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। তিন সপ্তাহ আলোচনার পর ২৫শে মার্চ যুগোস্লাভিয়ার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ স্বেংকোভিচ, ভিয়েনায় আগমন করিয়া জিহাতির চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর জার্মানী পররাষ্ট্র-মন্ত্রি ভন রিবেন্ট্রপ এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, যুগোস্লাভিয়ার সার্বভৌমত্ব অথবা তাহার রাজ্যগত অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করিবার কোন চরিত্সন্ধি জার্মানীর নাই; যুদ্ধকালে যুগোস্লাভিয়ার মধ্য দিয়া সৈন্য পরিচালনের দাবীও সে করিবে না।

স্বেংকোভিচ-মন্ত্রিসভা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পূর্বে হইতেই জার্মানীর আশ্রয়াদান হওয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র যুগোস্লাভিয়ার প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। ২৭শে মার্চ প্রত্যবে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে; এই সময় সামরিক নেতৃবৃন্দ কোশলে ক্ষমতা লাভ করিয়া পূর্ববর্তী মন্ত্রিগণকে গ্রেপ্তার করেন। বালক রাজা পিটারের অভিভাবক—প্রতিনিধিনূপ প্রিন্স পল রাজ্য ত্যাগ করেন; রাজা পিটারকে সিংহাসনে বসাইয়া সামরিক নেতা জেনারেল সিমোভিচের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়।

সিমোভিচ-মন্ত্রিসভা যে জার্মান-বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন, ইহা জানিয়াও জার্মানী তাহাদিগের সহিত আলোচনার ১০ দিন অতিবাহিত করিয়াছিল। এই সময় সে যুগোস্লাভিয়াকে আক্রমণের

প্রাথমিক আয়োজন সমাপ্ত কবে। তাহার পর, ৬ই এপ্রিল প্রাতে সে একই সময় গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করিয়াছে। যুগোস্লাভিয়া ও জার্মানীর সম্ভাবিত আক্রমণের জগৎ দ্রুত প্রস্তুত হইয়াছিল। বুটেন্ সর্বতোভাবে যুগোস্লাভিয়াকে সাহায্য করিবার জগৎ-প্রতিশ্রুতি দেয়; স্তরতঃ দক্ষিণ-পূর্ব যুরোপে এক পক্ষে গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া ও বুটেন এবং অন্যপক্ষে জার্মানী ও ইটালী ব্যাপক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইটালী এই সম্পর্কে মনস্তিব করিতে বিলম্ব করিয়াছিল; কারণ, আলবেনিয়ার, উত্তর ও পূর্ব ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইটালীর অস্ববিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ইটালীও যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে।

এই যুদ্ধেব ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিবার সময় হয় নাই। যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের জায় পার্বত্য দেশে তড়িৎগতি



প্রফুল্লচিত্তে এই সকল গ্রীক সৈন্য বণক্ষেত্রে গমন করিতেছে

অভিযান (blitzkrieg) সম্ভব নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু গত বৎসর নবওয়ের জায় পার্বত্য দেশেও জার্মানী দ্রুত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। জার্মান-বাহিনী ইতোমধ্যে যুগোস্লাভিয়ার সর্বপ্রধান বহির্গমন-পথ গ্রীসের বন্দর শ্যালোনিকা এবং মধ্য-যুগোস্লাভিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নলজ্জ, অধিকার করিয়াছে। আলবেনিয়াতে বিমানের সাহায্যে জার্মান বাহিনী অবতরণ করিয়াছে। যুগোস্লাভিয়ার বুটেনের সাহায্য পৌঁছিবার সম্ভাবনা এখন বিদূরিত হইল—বলা যাইতে পারে; গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়ার সংযোগও বিচ্ছিন্ন। কাজেই, যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অমুকুল নহে। অদূর-ভবিষ্যতে চরম দুঃসংবাদ কর্ণগোচর হইতেও পারে।

যুগোস্লাভিয়া আক্রান্ত হইবার পূর্বে সোভিয়েট-রুশিয়ার সহিত তাহার অনাক্রমণাত্মক-চুক্তি হইয়াছিল। এই চুক্তির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আৰোপ করা হইয়াছে। যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েট-রুশিয়ার কোন বিবেচনাই, তাহার বিপদের সময় কখনোই রাষ্ট্রটি তাহাকে

আঘাত করিবে না—এই প্রতিশ্রুতি ব্যতীত এই চুক্তির আর কি গুরুত্ব থাকিতে পারে? সোভিয়েট-রুশিয়া জার্মানীর সহিত একযোগে যুগোস্লাভিয়াকে আক্রমণ করিবে—এইরূপ সম্ভাবনা কখনও ঘটে নাই; কাজেই, এই চুক্তির দ্বারা যুগোস্লাভিয়া এমন কি অপ্রত্যাশিত কল্যাণ সাধিত হইল? তবে, যুগোস্লাভিয়ার সিমোভিচ-মন্ত্রিসভাকে ঐ দেশের বৈধ-সরকার বলিয়া স্বীকার করিয়া এবং তাহাদিগের সহিত অনাক্রমণাত্মক-চুক্তি করিয়া সোভিয়েট-রুশিয়া যুগোস্লাভিয়ার জার্মান-বিরোধী নীতিতে ও জার্মানীর সহিত তাহার যুদ্ধে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করিল। ইহা হইতে সোভিয়েট-রুশিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে এই অনুমানই দৃঢ় হয় যে, বলকানে জার্মানীর অবাধ প্রসারে সে সম্বন্ধে নহে। দাদানেলিজ ও বস্ফোরাস্ প্রণালীর দিকে জার্মানীর অগ্রগতিতে সে অসম্বন্ধ হইবে। ইতঃপূর্বে তুংস্কে অনাক্রমণ সম্পন্নিত আশ্বাস দিয়া সে তুর্কি সোভিয়েট-অনাক্রমণাত্মক-চুক্তি ঝালাইয়া লইয়াছে। তাহার এই সকল কার্য হয় ত বস্ফোরাস্-দাদানেলিজ সম্পর্কে তাহাব উৎকণ্ঠা জ্যোতক! যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রান্ত হওয়ার তুবস্কে যে উৎকণ্ঠিত হইয়া অস্ত্র ধারণ কবে নাই, ইহা জার্মানীর পক্ষে স্বস্তিকর, কারণ তুবস্কে জার্মানীর পক্ষে প্রবল ভাবে আঘাত করাও ত্বর; জার্মান-বাহিনী মধ্য-সাগরের তীবে পৌঁছিলেই উহাতে সোভিয়েট-রুশিয়ার আপত্তি হইবে।

তুবস্কে নিরপত্ত থাকিলে এম জার্মানী সম্ভাবিত আক্রমণ প্রতিবেদে তাহার দৃঢ়তায় আনাটোলিয়ার পথে অগ্রসর হইয়া ইরাক-মসুলেব তৈলখনিতে জার্মানীর প্রভুত্ব বিস্তারের সম্ভাবনা আপাততঃ আন নাই কিন্তু ইজিয়ান সাগরের তীবে অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইলে জার্মানী ঐ সাগর অতিক্রম করিয়া সিরিয়ায় পৌঁছিতে প্রয়াস করিবে কি না, তাহা বলা যায় না। অবশ্য

বুটেনের প্রবল নোশক্তি উপেক্ষা করিয়া সাইপ্রাসের বৃটিশ ঘাঁটি পার্শ্ব দিয়া জার্মানীর পক্ষে সিরিয়ায় সৈন্য অবতরণ কবাইবার প্রয়াস, তাহার ইংলিস প্রণালী অতিক্রমণেব জায়ই অত্যন্ত দুরূহ—হয় ত অসম্ভব।

বেজ্বাজী ত্যাগ—

গত ৪ঠা এপ্রিল অকস্মাৎ ঘোষিত হয় যে, ইটালীয়-জার্মান-বাহিনীর প্রবল আক্রমণে বৃটিশ বাহিনী লিবিয়ার সর্বপ্রধান ঘাঁটি ও সাইরেণেইকা প্রদেশের রাজধানী বেজ্বাজী ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে। কিছু দিন পূর্বে সিসিলি দ্বীপে জার্মানীর বিমানবহন আগমন করিয়াছিল; তাহার বৃটিশ নৌ-বাহিনী-কর্তৃকিত ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করিয়া লিবিয়ায় সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণে সহায়তা করিতেছিল। তাহাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ লিবিয়ায় পৌঁছিয়াছে। উত্তর

আফ্রিকায় যুদ্ধ-পরিচালনার ভারও জাৰ্মান সেনানায়কগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে নাশাল গ্রাংসিয়ানি বাহিনী আলেক্-জান্দ্রিয়া ও স্বেজ লক্ষ্য করিয়া লিবিয়া হইতে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর

হস্তচ্যুত হইয়াছে; এরিট্রিয়ার রাজধানী আসমায়া বৃটিশ-বাহিনী অধিকার করিয়াছে, তাহারা উত্তর দিক হইতে আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিয়া আডোয়া অধিকার করিয়াছে, ডায়ারডাওয়া হইতে একটি বৃটিশ-বাহিনী আওয়াস নদী অতিক্রম করিয়া আবিসিনিয়ার রাজধানী



দুই মাস পূর্বে এই সকল অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য গুরুভার-ট্যাঙ্কের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া উত্তর-আফ্রিকায় অগ্রসর হইয়াছিল

হইতেছিল। একই সময় পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ ও উত্তর উপ-কূলে ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্বনিষ্ঠা বৎকালীন নাজী-ফ্যাসিষ্ট সমন্বয়-পরি-কল্পনা প্রধান অঙ্গ ছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারেই অক্টোবর মাসের শেষে ইটালী গ্রীস আক্রমণ করে। গত ডিসেম্বর মাসের পরে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বার্থ হইয়াছে। এখন একই সময় উত্তর-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব যুরোপে গৃহযুদ্ধ হইয়া জাৰ্মানী সেই ছিন্ন সূত্র যোজনা করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

আপাততঃ বেঞ্জাজী অধিকারে নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিশ্রয় উত্তর আফ্রিকায় একটি সর্বত্র ঘাঁটি লাভ করিল। বেঞ্জাজীর ভৌগোলিক অবস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বেঞ্জাজীর বিমান-ঘাঁটি হইতে জাৰ্মানী সমগ্র গ্রাসে ও তাহার অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জে বিমান-আক্রমণ চালাইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত, উত্তর-আফ্রিকায় জাৰ্মানীর এই তৎপরতা পরোক্ষে তাহার দক্ষিণ-পূর্ব যুরোপ-সম্পর্কিত অভিসন্ধি সিদ্ধির সহায়ক হইতে পারে। লিবিয়ায় যদি সুসজ্জিত ইটালীয়-জাৰ্মান বাহিনীর পূর্বাভিমুখী প্রবল অভিযানের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আফ্রিকা হইতে বৃটিশের সমরায়োজন প্রত্যাহার করিয়া উত্তর দক্ষিণ-পূর্ব যুরোপে নিযুক্ত করা সম্ভব হইবে না।

পূর্ব-আফ্রিকা—

পূর্ব-আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনীর নিকট ইটালীয়গণ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইতেছে। বৃটিশ সোমালিল্যান্ড ইটালীয়দিগের

আদিস-আবাব নিকটবর্তী হয়। ৭ই এপ্রিল বৃটিশ-বাহিনীর আদিস-আবাব অধিকারের সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এরিট্রিয়ার লোহিত সাগরস্থিত মাসোয়া বন্দর বৃটিশের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।



এরিট্রিয়ায় বনমধ্যে এই সকল ভারতীয় সৈন্য পর্যবেক্ষণে বহির্গত হইয়াছে

আফ্রিকায় ইটালীয়দিগের পুনরাজয়ের প্রধান কারণ—তাহারা তথায় মাতৃভূমির সহিত বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। জল-পথে অথবা স্থলপথে এই সকল সেনাবাহিনীর সহিত ইটালীর সংযোগ নাই। প্রয়োজনানুসারে বৃটিশ-বাহিনীর সংখ্যা বর্ধিত হইতেছে, তাহাদিগের সমরোপকরণের পরিমাণও বাড়িতেছে। কিন্তু ইটালীয়-বাহিনী এই সকল সুবিধায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

উত্তর-আফ্রিকায় জার্মান-বাহিনী প্রচুর সমরোপকরণ লইয়া প্রবল আক্রমণ করিতেছে, তাহার ফলে পূর্ব-আফ্রিকার কিছু বৃটিশ সৈন্য উত্তরে নিয়োজিত হওয়ায় এই অঞ্চলে ইটালীয়দিগের কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছা হইতে পারে। আফ্রিকায় প্রধানতঃ বৃটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সৈন্য যুদ্ধে রত। প্রাচ্যে বৈরুপ রাজনীতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এখন প্রাচ্য হইতে প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ আফ্রিকায় প্রেরণের যৌক্তিকতা সন্দেহ

সর্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাদিগের মধ্যে বৃটেন এখন অত্যন্ত বিব্রত। আগামী শীতকালে প্রচুর মার্কিনী সাহায্যপ্রাপ্তির পূর্বে তাহা অবস্থা উৎসাহজনক হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর রক্ষার উপযোগী নৌবহর গঠনের যে বিরাট পবি কল্পনা রচনা করিয়াছে, তাহা কার্যকরী হইতে এখনও বিলম্ব আছে কাজেই জার্মানীর জায় জাপানের অবস্থাও low or n ver!

অনেক সময় চীনা-যুদ্ধে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ কর

হইয়া থাকে; কেহ কেহ মনে করেন যে, চীনা-দিগের দ্বারা জাপান এতদূর বিব্রত যে, তাহা পক্ষে অশুভ মনোযোগী হওয়া অসম্ভব। চীন-যুদ্ধে যে জাপানে সাম্রাজ্যবাদী হুরাকাজ্জা পূরণের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, ইহা সত্য; কিন্তু সে বিঘ্ন অনতিক্রমণীয় নহে। সে রাজ্যের সমুদ্রতীরবর্তী প্রদেশগুলি অধিকৃত হইয়াছে, যে দেশের বিঘ্নসঙ্কুল দুর্গম পার্বত্য পৃথক বহিঃজগতের সহিত তাহা একমাত্র সংযোগস্থল, তাহা জন্ম জাপানের জায় প্রথম শ্রেণী শক্তির বিশেষ দুর্ভাবনার কারণ নাই। শুধু তাহাই নহে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন চীনের বিশেষ সমর্থক; দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগর ও মালয় উপদ্বীপে প্রভুত্ব-বিস্তারিত প্রয়াসে জাপানের



সুদান সামান্তে পর্যবেক্ষণরত উষ্ট্রবাহী সৈন্য

উপস্থিত হইতে পারে। তবে ইতোমধ্যে পূর্ব-আফ্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অঞ্চলগুলি বৃটেনের হস্তগত হওয়ায় ইটালীর পক্ষে স্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধন আর সম্ভব হইবে কি না, বলা যায় না। উত্তর-আফ্রিকা অথবা ভূমধ্যসাগর ও স্তয়েজে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে পূর্ব-আফ্রিকায় ইটালীয় বাহিনীর সহিত যুরোপের সংযোগ যদি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে এই অঞ্চলে ইটালীর হয় ত আর কোন আশাই নাই।

সুদূর প্রাচ্যে আসন্ন সঙ্কট—

জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকো যুরোপ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি মস্কো, বার্লিন ও রোম পরিদর্শন শেষ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। মিঃ মাৎসুয়োকোর যুরোপ-গমন গভীর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। যুরোপীয় যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সন্দেহে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই তাহার যুরোপ-গমনের প্রকৃত কারণ; তাহার এই অভিজ্ঞতা অনুযায়ীই জাপানের ভবিষ্যৎ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারিত হইবে।

জাপান যদি সত্যই বাহুবলে স্বীয় রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আধিপত্য বিস্তারের কল্পনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে ও মালয় উপদ্বীপে জাপানের প্রভুত্ববিস্তারে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তাহার

এই দুইটি শক্তিরই সম্মুখীন হইবে হইবে। জাপান মনে করিতে পারে যে, তাহার সাম্রাজ্যগত ভূভিত্তিক সিদ্ধি জন্ম এই দুইটি শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিলেই তাহাদিগের নিকট হইতে চীনের সাহায্যপ্রাপ্তি বন্ধ করা সহজ হইবে। জাপানের সাম্রাজ্যিকাজ্জা প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃটেন জাপানের শত্রু-বাপ্ত্রে পাবিত হইলে জাপান অবিলম্বে ব্রহ্মদেশে অধিকার-বিস্তারের প্রয়াস করিবে ইহার কারণ, ব্রহ্ম-চীন পথ অবরুদ্ধ হইলে চুংকিং সরকার অত্যন্ত বিপন্ন হইবেন। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মদেশের চাউল, তৈল ও অগাধ অশোষিত খনিজ পদার্থ জাপানের প্রলোভনের বস্তু।

জাপান যদি সত্যই এই স্বেচ্ছা-তাহার সাম্রাজ্যিকাজ্জা পূরণের উদ্দেশ্যে জার্মানী ও ইটালীর মিত্রশক্তিবে যুদ্ধে ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে প্রাচ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে বৃটেনের সমরোপকরণ লাভে বিঘ্ন ঘটাইতে যথাসক্তি প্রয়াস করিবে। তাহার নৌবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে তৎপর হইবে; বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্ম ঐ সকল দেশের সমরোপকরণের কারখানা, বন্দর, রেলস্টেশন প্রভৃতিতে জাপানী বিমান বোমা-বর্ষণ করিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ইন্দো-চীনের উত্তরে জাপান যে বিমান-ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে, সেখান হইতে ব্রহ্মদেশ, আসাম—এমন কি, বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানেও বোমা-বর্ষণ সম্ভব। বৃটেন ইতোমধ্যে জাপানের সম্ভাবিত আক্রমণ-প্রচেষ্টা প্রতিরোধের জন্ম

মালয় উপদ্বীপে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, সিঙ্গাপুর ঘাঁটি অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। স্থলপথে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইলে জাপানকে দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইবে; সিঙ্গাপুর আক্রমণ-পরিচালনের জগ্ন ইন্দো-চীন ও গ্যামের মধ্য দিয়া স্থলপথ ব্যবহার, এবং এই দুইটি দেশের উপকূলে কোথাও ঘাঁটি স্থাপন জাপানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কত দূর সহায়ক হইবে, তাহা বলিবার সময় ইহা নহে। জাপানের সমর-প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ ফলাফল বাহাই হউক না কেন, যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবামাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমরায়োজন পঙ্গু করিবার জগ্ন সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, সেনাবাহী বিমানের সাহায্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবক্ষিত অঞ্চলে সৈন্য অবতরণ কবাইয়া আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা হওয়াও অসম্ভব নহে।

অবশ্য মিঃ মাংসুয়োকো যুবোপ হইতে যে অভিজ্ঞতা লইয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন, তাহাব উপবেই জাপানের ভবিষ্যৎ গতিবিধি বিশেষ ভাবে নিঃস্ব কবিত্তেছে। তিনি যদি বুঝেন যে, আগামী শীতের পর্বে জার্মানী বৃটেনকে প্রবল আঘাত কবিত্তে সমর্থ হইবে এবং তিনি যদি নতুনগেয়ে সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে জাপানের নিরাপত্তার আশ্বাস পান, তাহা হইলেই জাপানের পক্ষে আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব।

গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণাত্মক চুক্তি যেমন যুরোপে সমবাগ্নি প্রজ্জালিত কবিয়াছিল, তেমনই সোভিয়েট-জাপান অনাক্রমণাত্মক চুক্তি সূদূর প্রাচীতে ভীষণ সমর-বহি প্রজ্জালিত কবিত্তে পাবে। সোভিয়েট রুশিয়া জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে ব্যাপৃত দেখিলে সন্তুষ্ট হইবে; বিশ্বের সমস্ত প্রধান ধনিক-শাসিত রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেই তাহাব আনন্দ। ইহাদিগের আত্মঘাতী সংগ্রামের স্বযোগে সর্বত্র কম্যুনিজমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার স্বপ্নই সে দেখিত্তেছে। কাজেই, জাপানের সহিত অনাক্রমণাত্মক চুক্তি কবিয়া তাহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইবার স্বযোগ দেওয়া সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—চুং কিং সরকার কম্যুনিষ্টদিগের সহিত বিশেষ সদ্ভাবসম্পন্ন নহেন। কিছু দিন পূর্বে যখন “চতুর্থ কট আর্মি” নামক কম্যুনিষ্ট-বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তখন উহা স্থানবিশেষের একট বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু ৯ই মার্চ চীনের ‘গ্যাশাল পিপল্‌স্ কাউন্সিলে’ মার্শাল চিয়াং কাই-সেক্ যে বক্তৃতা কবিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বৃদ্ধা যায় যে,

সমগ্র কম্যুনিষ্ট-বাহিনীর সহিত চুং কিং সরকারের সদ্ভাব চলিত্তেছে না। এই বক্তৃতায় মার্শাল চিয়াং অভিযোগ কবিয়াছেন যে, জাতীয় হৃদ্বিনেব স্বযোগে কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্র-ক্ষমতা লাভেব প্রয়াস কবিত্তেছে—*Marshall Chiang Kai-shek accuses the Communists of using national crisis for establishing a private army with the object of threatening the Government for fighting Japan and of attempting political control of the country.*

এক পক্ষের উক্তি শ্রবণ কবিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝা দুষ্কর; কম্যুনিষ্টরা শেষ পর্যন্ত যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকারে প্রয়াসী হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বৈদেশিক শত্রু পরাভূত হইবার পূর্বে তাহাবা যে এইরূপ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইবে—ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সে যত হউক, কম্যুনিষ্টদিগের সহিত চুং কিং সরকারের যে অসদ্ভাব চলিত্তেছে, ইহা স্পষ্ট। চীনের আভ্যন্তরীণ বিরোধে কোন ধনিকশাসিত রাষ্ট্রের গোপন হস্ত কার্য কবিত্তেছে কি না, তাহা বল' যায় না; যে সকল ধনিক-শাসিত রাষ্ট্র চীনকে বিজয়ী দেখিতে চায়, তাহাবা চীনে কম্যুনিষ্ট-প্রভাবে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে না। কম্যুনিষ্ট-শাসিত চীন, ‘আব জাপানের’ অধিকাভুক্ত চীন কার্যতঃ তাহাদিগের নিকট অভিন্ন; কারণ, এতদূর্ভয়ের যে কোন অবস্থাতেই তাহাদিগের সূদূর প্রাচীর স্থায় বিপন্ন হইবে। যে কারণেই হউক, কম্যুনিষ্টদিগের সহিত চুং কিং সরকারের এই যে বিরোধ, ইহার ফলে সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে চীনের সাহায্য-প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটতে পাবে। চীনকে সোভিয়েট রুশিয়া স্বাভাবিক ‘অ-নীতিক আদান-প্রদানের’ নীতি অনুযায়ীই সাহায্য কবিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সাহায্য প্রদানে যদি চীনে কম্যুনিষ্ট-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অদূর সম্ভাবনাও না থাকে, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়া সাহায্যদান সম্পর্কে ইতস্ততঃ কবিত্তে পারে।

অবশ্য তাহাব সাহায্যে বঞ্চিত হইলে চীনের যদি অবিলম্বে জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ কবিবার অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে সে এই বিষয়ে উত্তমরূপে বিবেচনা কবাবে। কারণ, চীনে কম্যুনিষ্ট-প্রাধান্য যদি স্থাপিত না-ও হয়, তাহা হইলেও সমগ্র চীনে জাপানের প্রতিপত্তি স্থাপিত হওয়া সোভিয়েট রুশিয়ার আনন্দের কথা নহে। জাপানের সহিত অনাক্রমণাত্মক চুক্তি কবিত্তে সম্মত হইলেও সোভিয়েট রুশিয়া তাহাকে শীঘ্র গৃহদ্বারে আত্মান কবিয়া আনিত্তে পারে না।

শ্রীঅতুল দত্ত।

মাধুরী ও আনন্দ

মাধুরী হইয়া যাহা

জাগে এই বিশ্ব-প্রকৃতিতে,

আবেশ হইয়া তাহা

চায় রূপ কবিদের চিত্তে।

আবেগ জাগিয়া উঠে

রূপে, রসে, বর্ণে, ভনে, গানে,

আনন্দ হইয়া তাই

উচ্ছলিত নিখিলের প্রাণে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধ

‘দৈনিক বঙ্গমতী’ কণ্ঠরোধ

বঙ্গালার গভর্নর হোম-সেক্রেটারীর মারফতে সহসা ১৪ই চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যায়, ‘দৈনিক বঙ্গমতী’ সুপ্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নামে ৯ই চৈত্র—২৩শে মার্চের ‘দৈনিক বঙ্গমতীতে’ প্রকাশিত কোন রিপোর্টের জন্য “ভারত-রক্ষা বিধান” অনুসারে এক আদেশ-জারি করিয়া পরদিন হইতে তিন সপ্তাহ ‘দৈনিক বঙ্গমতী’ প্রকাশ—প্রচার—বিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন। ঐ আদেশ অনুসারে ২৩শে মার্চের ‘দৈনিক বঙ্গমতী’ এবং তৎসংক্রান্ত কপি প্রভৃতিও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। ২৩শে মার্চ অপরাহ্নে সরকার খুলনা ও ঢাকার হাজামা-সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের যে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়া-ছিলেন—২৪শে মার্চ বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আর ২৩শে মার্চ প্রাতে ‘দৈনিক বঙ্গমতী’ প্রকাশিত হইয়াছিল—সুতরাং ঐ সংখ্যায় প্রকটিত প্রবন্ধ বা সংবাদ ঐ নিষেধাজ্ঞার আমলে আসে না।

‘দৈনিক বঙ্গমতী’র সহিত আমাদের স্বার্থ অভিন্ন—এজন্য সরকারী আদেশের প্রতিবাদ-প্রয়াসে বিড়ম্বনা ভোগ না করিয়া—যে সকল সহৃদয় বন্ধু স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সংরক্ষণ কামনায় যথাসক্তি প্রয়াস পাইয়া, আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ অর্জন করিয়া-ছেন—তাহাদের অভিমত সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতেছি।

‘দৈনিক বঙ্গমতী’ প্রচার বন্ধের আদেশ-জারির অব্যবহিত পরেই—১৪ই চৈত্র সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মৃগালকান্তি বঙ্গুর উদ্বোধনে ও সভাপতিত্বে ‘ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সমিতির’ জরুরী অধিবেশনে নিম্নের প্রস্তাব তিনটি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) “সাম্প্রদায়িক হাজামা সম্পর্কিত সংবাদ—মন্তব্য প্রভৃতি প্রকাশ নিষেধ করিয়া ২৩শে মার্চ বাঙ্গালা সরকার ‘ভারত-রক্ষা আইনে’ যে নির্দেশ জারি করিয়াছেন—তাহার সীমা সুদূরপ্রসারী; কিন্তু ইহার প্রয়োগে প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিবেচনের প্রসার

প্রতিহত করাই ইহার উদ্দেশ্য; কিন্তু সঠিক সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলে—শাসক-কর্মচারীদিগের ক্ষমতা অপ-ব্যবহারে বাধা দিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় অপসারিত হইবে; দুর্কৃত্তদিগের পক্ষে অপরাধ করিবার সুযোগ হইবে—ভিত্তিহীন গুজব ও আতঙ্ক প্রচারে সাহায্য হইবে।”

(২) “বাঙ্গালা সরকার ‘দৈনিক বঙ্গমতী’র উপর তিন সপ্তাহ প্রচার বন্ধের যে আদেশ দিয়াছেন, এই অধিবেশন তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। সরকারের এই নির্দেশ অসঙ্গত—কঠোর—অগ্রায়। সমিতি সত্ত্বর এই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবী করিতেছেন। এই নির্দেশ-জারির পূর্বে সরকার প্রাদেশিক ‘প্রেস এডভাইসরী কমিটির’ পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং সমিতি মনে করেন—‘প্রেস এডভাইসরী কমিটির’ সদস্যগণের প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করাই কর্তব্য।”

(৩) “জিলাগুলিতে রাজনীতির সহিত সম্পর্কশূন্য—অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানগুলি—শিক্ষক-সমিতি—শিক্ষা-সম্মেলন প্রভৃতির এবং অগ্রান্ত্র বিষয় সম্পর্কে সভা—সম্মেলন—শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বর্তমান শাসক-সম্প্রদায় ‘ভারত-রক্ষা আইনে’ যে সকল নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, এই সমিতি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। কিন্তু ২২শে মার্চ বিজ্ঞাপিত বাঙ্গালা সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ‘পাকিস্থান’-দিবস কলিকাতা এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার কয়েকখানি সংবাদপত্র বাঙ্গালা সরকারের নির্দেশ অমান্য করিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে—অথচ তাহাদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহাতে অনায়াসে বুঝা যায় যে, সংবাদপত্রের সহিত আচরণে পক্ষপাতিত্ব হইতেছে। সংশয়—বিষেধ—আশঙ্কার কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সমিতি সরকারকে অনুরোধ করেন।”

সংবাদপত্র-দমনের এই অভিনব অভিযানে বিক্ষুব্ধ হইয়া লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার—দেশপ্রাণ নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র

বহু তর্কযুক্তিপূর্ণ যে সুদীর্ঘ অভিমত প্রকাশ করেন—১৫ই চৈত্র জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন দৈনিক পত্রে তাহা প্রকাশিত হয়। তাহার সংক্ষেপ মর্ম এইরূপ,—

“সরকার তিন সপ্তাহের জন্ত ‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সরকার ‘ভারতরক্ষা আইনের’ অপব্যবহারে যে কতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা তাহারই আধুনিকতম প্রমাণ। আমার ধারণা ছিল—‘ভারত-রক্ষা আইন’ ও নিয়মাবলী ভারতের রক্ষা—নিরাপত্তাবিধান, এবং সাফল্যের সহিত সুদ্ধকার্য পরিচালনার পক্ষে আশঙ্কা ঘটিলেই প্রয়োগ করা বিধেয়। ইহা ব্যতীত, অগ্নাগ্ন ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ আইনটির প্রকৃত উদ্দেশ্যের—লক্ষ্যের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়াই বিবেচিত হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা সরকার সর্বব্যাপারে দেশবাসীর চিন্তা ও অভিমতের স্বাধীনতা—রাষ্ট্রীয় আকাজ্ঞা—বিধিসম্মত রাজনীতিক আন্দোলন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব—দমিত করিবার জন্তই এই আইন প্রবর্ত্ত করিতেছেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বর্ত্তমান সচিবসভ্যের—ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত উক্ত আইন ও নিয়মাবলীকে অগ্রায়ভাবে নিয়োজিত করা হইয়াছে।”

ইহার পর শরৎ বাবু ‘ভারত-রক্ষা আইনে’ দণ্ডিত মধ্য-প্রদেশের শ্রীবুদ্ধ আর, এস, রুইকরের আপীলের বিচারে নাগপুরের দায়রা জজ মিষ্টার টি, ডি, উইকেগেন রায়ে যে ঊদ্যোগপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। রায়ে মিঃ উইকেগেন বলিয়াছেন,—“বুদ্ধ-কালে প্রবর্ত্তিত জরুরী আইনগুলিতে বিপদের ব্যাপার এই থাকে যে, তাহাকে সাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহারের একটা মনোভাব হইয়া থাকে।” * * *

“দুর্ভাগ্যক্রমে ‘ভারত-রক্ষা আইনের’ সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যবস্থা—যাঁহারা ইহার কবলে পড়েন, আদালতে তাঁহাদের বিচারের সাহায্য পাইবার অধিকার নিষিদ্ধ। যে প্রবন্ধটির জন্ত ‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ উপর অভূতপূর্ব উপায়ে শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছে ** আমি নিশ্চয় বলিব, এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর কোন নিরপেক্ষ বা সংস্কারবর্জিত ব্যক্তি কখনই বলিবেন না যে, প্রবন্ধটি সঙ্গত সমালোচনার

সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে—কিন্তু ইংরেজের ভারতীয় বা বাঙ্গালার প্রজামণ্ডলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের বা শত্রুতার প্ররোচনা প্রচার করিয়াছে। কঠোর সমালোচনার অর্থ, অগ্নায় সমালোচনা নহে—যদিও স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সরকার তাঁহাদের ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতা উপভোগে এই ধরণের সমালোচনায় বিরক্ত—বিরত হইতে পারেন। এই কারণেই তাঁহারা অর্থাৎ কঠোর শাস্তিবিধান করিয়া এই ধরণের সমালোচনা দমন করিবার প্রয়াসী হন।”

‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ স্কঠোর সমালোচনায় বিরত হইয়া—পাঁচ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশের সুব্যবস্থা দিয়া—সম্পাদক ও প্রকাশককে কয়েকবার অভিবৃক্ত করিয়াও উজীরমণ্ডলীর প্রতিশোধম্পৃহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। হাইকোর্টের সুবিচারে ‘দৈনিক বঙ্গমতী’ প্রতি বারই অব্যাহতি লাভ করায় তাঁহারা ব্যর্থ প্রয়াসে—নিষ্ফল ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছিলেন মাত্র।

এই ‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ মামলার বিচারে মহামান্ত হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়াছেন,—সচিবসভ্য বাঙ্গালার সরকার নহেন—গভর্নরের পরামর্শদাতা মাত্র। সেই জন্তই যে তাঁহারা আদালতের সীমা অতিক্রম করিয়া ‘ভারত-রক্ষা বিধি’ অনুসারে অমোঘ দণ্ডবিধানের সুপরামর্শ দিয়া তাঁহাদের প্রতাপ ও প্রভাবের মহিমা সমুচ্ছল করিয়াছেন—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। ইহা উপলব্ধি করিয়াই—কেবল কলিকাতার—বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহে তীব্র প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ‘অমৃতবাজার’—‘আনন্দবাজার’—‘হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড’—‘যুগান্তর’—‘ভারত’—‘ট্রিউন’—‘বোধে ক্রনিকেল’—‘হিন্দুস্থান টাইমস্’—‘হিতবাদ’—‘সার্চলাইট’—‘কৃষক’—‘বরিশালহিতৈশী’ প্রভৃতি ‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ সহযোগি-গণ ৪ই চৈত্র হইতে দিনের পর দিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে—মস্তব্যে সংবাদপত্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই নিশ্চয় নির্দেশ প্রদান জন্ত নিপুণভাবে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, সে সকল যেমন অবিস্মাদিত—তেমনই যে কোনো দেশের শাসক-সাম্প্রদায়ের পক্ষে লজ্জাকর। আত্মপ্রসাদদেহে—ক্ষমতার মদগর্ভে বিভ্রান্ত না হইলে বাঙ্গালার উজীরসভ্য

কখনই তাঁহাদের সমবেত অস্বরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। মাতৃমন্ত্রের সাধক সহযোগীগণের প্রবন্ধ—মস্তব্যরাশির সার সঙ্কলনেরও স্থানাভাব—একত্র তাঁহাদের অজস্র ধন্ববাদ জানাইয়া সে প্রয়াসে নিবৃত্ত হইলাম।

প্রয়োজনবোধে 'দৈনিক বঙ্গমতী' অভিব্যক্ত সংখ্যা সম্বন্ধে কেবল ১৫ই চৈত্রের 'অমৃতবাজার পত্রিকার' অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। অর্ন্তান্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রেরও এই অভিমত অনুরণিত হইয়াছে।—

"The order says that the issue of that paper dated the 23rd March last contains 'prejudicial reports' of the nature described in certain rules of the Defence of India Rules. We have searched from page to page and column by column for the alleged objectionable reports in the issue of the paper in question in order to understand the action of the Government and the reasons underlying it and we must state at once that we have searched for them in vain. The first leading article which was on the Dacca riots does not certainly come within the mischief of the Defence of India Rules, nor do any other comments or news contained in that issue. We have grave doubts also as to whether they are hit by any ordinary law of the land and those doubts are strengthened by the fact that the Government have refrained from invoking the ordinary law for the purpose. Apart from the suspicion of discriminatory treatment which this hasty action of the Ministry seems to have given rise to, it gives cause for apprehension that the Defence Rules are being applied, by the Ministry in cases where they are not intended to be applied. It is indeed a grave situation with which the Press in Bengal is confronted, particularly that section of the Press that does not approve indiscriminately of the personnel of the present Ministry and their activities. Not only that, The manner in which the Ministry appear to be bent on using the Defence of India Rules for their party purposes constitutes a grave menace to the civil liberties of the people. We venture

to submit that His Excellency has not been properly advised in this matter."

'অমৃতবাজার পত্রিকা' শ্রীযুক্ত তুবারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত—পরিচালিত হইলেও মনীষী সাহিত্যিক—দেশের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিকগণের সাধনায়—প্রবন্ধে—নিবন্ধে যে নিত্য সমৃদ্ধ, তাহা সর্বজনবিদিত। তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি—বাক্যলা ভাষাজ্ঞান যে বাঙ্গালার উজীরমণ্ডলী অপেক্ষা বহুগুণ প্রকৃষ্ট, তাহা সচিবগণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

'দৈনিক বঙ্গমতী' তিন সপ্তাহ বন্ধের সরকারী নিষেধাজ্ঞার আলোচনার জন্ত কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল ১৪ই চৈত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মূলত্বী প্রস্তাবের নোটিশ দেন। পরিষদের সভাপতি সার আজিজুল হক শ্রীযুক্ত সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে ১৫ই চৈত্র ঘোষণা করেন—যদি তিনি ১৭ই চৈত্র সোমবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তবে ১৮ই চৈত্র মঙ্গলবার পরিষদে শ্রীযুক্ত সান্যালের ও বিরোধীদের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রদত্ত মূলত্বী প্রস্তাব হুইটের আলোচনা হইবে। কিন্তু সোম বা মঙ্গলবার ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে মূলত্বী প্রস্তাবের আলোচনা না হইয়া, ১৯শে চৈত্র বুধবার পরিষদ-রঙ্গমঞ্চে এই প্রহেলিকার চূড়ান্ত অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি প্রস্তাব আলোচনার অনুমতি দিয়া অন্ততঃ ৫০ জন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন কি না, জানিতে চাহিলে ৫৫ জন সদস্য দাঁড়াইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবের সমর্থক এই ৫৫ জন সদস্যের মধ্যে মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী—মহারাজ-কুমার উদয়চাঁদ মহাতাব—ভূতপূর্ব অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং কংগ্রেস—কৃষক-প্রজা-দল—স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়—হিন্দু জাতীয় দলের সদস্যগণ ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী-বিষেব জন্ত খ্যাতনামা বিহারী-নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের টেলিগ্রামের আদেশ অনুসারে 'এডহকী দলের' সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন না। এই প্রস্তাব সমর্থন জন্ত অনুমতি-লাভের আশায় বাঙ্গালার 'এডহকী

দল' শ্রীযুক্ত গান্ধীকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর দেন নাই। তাঁহার অনুচর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ "না" বলিয়া তার করিয়া অসম্মতি জানাইয়া দাস-মূলভ মনোরুতি প্রকট করিয়াছেন।

গান্ধীজীর অবশ্যই স্বরণ আছে যে, অল্প বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র আবির্ভাবের পূর্বে 'দৈনিক বসুমতীর' একনিষ্ঠ সহায়তায়—প্রাত্যহিক গুবে শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এক দিন 'গুরুগান্ধী'রূপে বাঙ্গালীর হৃদয়-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার পর 'দৈনিক বসুমতীর' অক্ষয় প্রতিবাদ অগ্রাহ করিয়া তিনি পূণ্য-প্যাণ্ডে এবং লোকগণনা-বয়কট নির্দেশে বাঙ্গালার সর্বনাশ সংসাধন করেন। তাঁহার দেব-মন্দির অপবিত্র করিবার প্রবল উত্তম—গুরুবায়ুর মন্দির-অভিযান—প্রধানতঃ 'দৈনিক বসুমতীর' জীবনপণ সাধনায়—প্রচারের ফলে ব্যর্থ—প্রহত হয়। দলগত-স্বার্থসিদ্ধি—প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার মোহে উদ্ভ্রান্ত হইয়া তিনি মহাত্মা-গিরির মুখোস খুলিয়া ফেলেন। তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্তগণ সোম্লাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রবর্তমান ইনকাম-ট্যাক্স বিলের সমর্থন করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনিষ্টসাধনে যথাসক্তি সাহায্য করেন। রাজকোটের প্রায়োপবেশনে তাঁহার আত্মিক-বলের পরীক্ষা হইয়া যায়—বড়লাট স্বয়ং তাঁহার অনশন ভঙ্গ করেন। মত-বিরোধী বাঙ্গালীকে দ্বিতীয় বার কংগ্রেসে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া ক্ষুব্ধ-স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হইবার আশঙ্কায়—ডাক্তারের উপদেশ শিরোধার্য্য করিবার অজুহাতে তিনি সুভাষচন্দ্রের জীবন-সঙ্কট অবস্থায় শত অমুনয়েও ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগদানে বিরত হইয়া 'দৈনিক বসুমতীর' পরিহাস—বিদ্রূপ উপভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জয়যাত্রা-পথের বিঘ্ন 'দৈনিক বসুমতীর' কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা—তীব্র প্রতিবাদ যদি তাঁহার দ্রুত-গতির বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাতে যে তিনি রুট—বিদ্রূপ হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

'দৈনিক বসুমতী' তিন সপ্তাহ বন্ধের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সরকারী নির্মম আদেশের—'ভারত-রক্ষা আইনের' অপ-প্রয়োগের প্রকৃষ্ট নিদর্শনের তীব্র প্রতিবাদ—নিন্দা করিয়া ১৯শে চৈত্র বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদের বুধবারের

অধিবেশনে দুই ঘণ্টা-ব্যাপী যে তুমুল তর্ক-ত্রোত চলিয়াছিল, তাহা সকলন নিম্নয়োজন—সংক্ষেপে বিবরণ প্রদান করিতেছি।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন,—
“গত বৎসর প্রায় এই সময়ে একটি মূলত্বী প্রস্তাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম, 'ভারত-রক্ষা আইন' ও নিয়মগুলি ভারতের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্ত রচিত হয় নাই, পরন্তু ভারতের দাসত্ব স্থায়ী করিবার জন্তই



শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

কল্পিত হইয়াছে। তখন আমি করনাও করিতে পারি নাই, সংবাদপত্রের—বিশেষ কতকগুলি সংবাদপত্রের সম্বন্ধে সরকারের ব্যবস্থায়—গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচার বন্ধ করায় আমার কথার যথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।”

“দৈনিক বসুমতীর' প্রচার তিন সপ্তাহের জন্ত বন্ধ রাখার যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—তাহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা-নাশের সম্প্রতি-সংঘটিত নিদর্শন। * * * আমি নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া সময় ব্যয় করিব না; কেবল বলিব, 'দৈনিক

বঙ্গমতীর' বিরুদ্ধে অভিযোগ—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ঘৃণা উৎপাদন। যে তারিখের 'দৈনিক বঙ্গমতী' লইয়া এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেই সংখ্যা 'দৈনিক বঙ্গমতী'-খানি পাঠ করিয়াছি।"

"যদি প্রধান সচিবের বিরুদ্ধে সমালোচনায় লিখিত হয়—মিষ্টার সাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে আলোচনায় লিখিত হয় হুজু এবং 'দৈনিক বঙ্গমতী' ঠাংহাদিগকে 'স্ববোধ বালক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ঠাংহাদিগের বিরুদ্ধে সমালোচনায় লিখিত হয় হুজু, রাজার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে আমি সচিবসজ্জের বুদ্ধির এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালা-জ্ঞানের জ্ঞান ঠাংহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে পারি না। ঐ সংখ্যা-তেই প্রধান-সচিবের পরিচিত ভোলা নামক স্থান হইতে প্রেরিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যদি কোনো সম্প্রদায়ের জনকয়েক লোকের কার্যবিবরণ প্রকাশ 'ভারত-রক্ষা আইনের' নিয়মে পড়ে, তবে আমি কেবল বলিব, 'ভারত-রক্ষা আইনের' নিয়মের বলে কেবল দেশের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট করা হইতেছে। কয় দিন পূর্বে এই আদেশ-সম্পর্কে আমি বলিয়াছি—

It was the latest example of the gross misuse of the Defence of India Rules to which this Government seems to have become a confirmed addict."

বিলাতে সরকার—কোন সংবাদপত্রে ধারাবাহিক ভাবে বৃটেনের ঘৃণা-প্রচেষ্টায় বিরোধী ভাবের উদ্ভবকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, তাহা বন্ধ করিবার অধিকার গ্রহণ করিতে চাহিলে পার্লামেন্টে ঐ প্রস্তাবে কিরূপ আপত্তি হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া শরৎ বাবু বলেন,—“বিচ্ছিন্ন ভাবে অথবা সতর্ক করিবার পরেও প্রকাশিত কোনো সংবাদ প্রকাশের জ্ঞান নহে—ধারাবাহিকরূপে ঘৃণা-বিরোধী ভাব প্রচারের জ্ঞান ঐ ক্ষমতা চাহিলেও তাহাতে আপত্তি করা হয় ;—বলা হয়, ইহাতে লোকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হইবে। তখন আয়ারল্যান্ডে 'ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যানের' ও বাঙ্গালার সেই সার জন এণ্ডারসন বলেন—বিলাতের সরকার যে ভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সকল প্রকার প্রতিনিধিরাই সরকারে আছেন—সুতরাং সরকার,

যথেষ্ট কাজ করিবেন, তাহার পর পার্লামেন্ট আছে। বিলাতে যথেষ্ট ব্যবহারের বিরোধী যে সকল সুবিধার উল্লেখ করা হইয়াছিল, এ দেশে সে সকল নাই।"

শরৎ বাবু শ্রীযুত ক্রইকরের মামলার বিচারে নাগপুরের জজ মিষ্টার উইকেগেনের রায়ের উক্তি উল্লেখ করেন—“ঘৃণার সঙ্কটকালীন আইনের বিশেষ ক্রটি এই যে, তাহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাশের জ্ঞান প্রয়োগের ইচ্ছা হয়।"

ইহার পর শরৎ বাবু বলেন,—“সচিবসজ্জ 'দৈনিক বঙ্গমতী' সম্পর্কে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা নিদারুণ। সচিবসজ্জ পুনঃ পুনঃ 'দৈনিক বঙ্গমতীর' বিরুদ্ধে মামলা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। অতীতে এই সচিবসজ্জেরই আমলে একবার 'প্রেস আইনে' 'দৈনিক বঙ্গমতীর' বহু টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু হাইকোর্ট সে আদেশ নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর 'ভারতীয় দণ্ডবিধি' আইনে 'দৈনিক বঙ্গমতীকে' অভিযুক্ত করা হইয়াছিল—সে সময়ও হাইকোর্ট 'দৈনিক বঙ্গমতীর' পক্ষে ও সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করেন। সম্ভবতঃ, সেই তিক্ত—মর্শাস্তিক অভিজ্ঞতাই সচিবসজ্জকে নূতন ভাবে আক্রমণের জ্ঞান প্রেরিত করিয়াছে— তাহাতে আইনের দ্বারা অব্যাগতিলাভের পথ নাই। দেশে বর্তমানে যে সকল আইন প্রবর্তিত—'ভারতীয় দণ্ড-বিধির' যে ৫০০ ধারা আছে,—'প্রেস আইনের' যে সকল কঠোর ধারা আছে—সেই সকল ধারার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া এই ব্যাপারে সচিবসজ্জের 'ভারত-রক্ষা আইনের' সাহায্য গ্রহণের কোন যৌক্তিকতাই নাই। 'ভারত-রক্ষা আইন' বৃদ্ধ চালাইবার জ্ঞান জারি হইয়াছে—সাধারণ ব্যাপারে প্রয়োগজ্ঞান রচিত হয় নাই। সচিবসজ্জ এইরূপে প্রেসের কঠরোধের আদেশ জারি করিয়া সঠিক সংবাদ-প্রকাশের পথ-রোধ করিতেছেন।"

সিপাহী-বিদ্রোহের পর সংবাদপত্রের কঠরোধ জ্ঞান যে আইন হয়, তাহার সম্বন্ধে জন ক্রস নর্টনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শরৎ বাবু বলেন—“বর্তমান সচিবসজ্জ সত্য-প্রকাশের পরিবর্তে সত্য-গোপনেই লাভবান হন।" তিনি বলেন, তিনি ২৩শে মার্চের 'দৈনিক বঙ্গমতী' আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়াছেন এবং তাহাতে

প্রকৃতপক্ষে আপত্তিকর কিছুই পান নাই। উপ-সংহারে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—“সরকার কবে একটা ভুল হইতে অপর ভ্রমাত্মক কাণ্ড করিতে বিরত হইবেন?”

কংগ্রেস দলের শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—শরৎ বাবুর বক্তৃতার সমর্থনে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহার শেষাংশের সংক্ষেপ বিবৃতি উদ্ধৃত করিতেছি।

“সম্রাটের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্ট হইতে পারে, ইহাই ২৩শে মার্চের ‘দৈনিক বন্ধুত্ব’ বিক্রমে অভিযোগ; আমি ঐ দিন প্রকাশিত বিষয়গুলি—বিশেষতঃ ‘সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা’ শীর্ষক প্রবন্ধটি

পুনঃ পুনঃ যত্ন-সহকারে পাঠ করিয়াছি। আমি ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, তাহার কল্পনাশক্তি যত দূর সম্ভব প্রসারিত করিয়াও এইরূপ সিদ্ধান্তে



শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনীত হইতে পারিবেন না যে, পূর্বোক্ত অভিযোগের বিষয় সত্যই ঐ প্রবন্ধে ছিল। একে দিন পূর্বে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ৪ঠা মার্চ ‘টার অব ইন্ডিয়ায়’ প্রকাশিত যে প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ও শান্তিভঙ্গের প্ররোচনা দান করা হইয়াছিল, তাহার জন্ত ঐ পত্রের বিক্রমে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে কি না? আমার প্রশ্নের উত্তরে মিষ্টার ফজলুল হক দৃঢ়তা সহকারে বলেন, কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না। আমি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ বৃদ্ধি করিবার জন্ত মিঃ ফজলুল হকের বিক্রমে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে কি না? কিন্তু সভাপতি

এই প্রশ্ন উত্থাপনের অনুমতি দেন নাই। কোনো উত্তেজিত প্রণোদিত সরকারের হস্তেও জরুরী ব্যবস্থাসম্বৃত বর্ধিত ক্ষমতা প্রদান কত দূর ভয়াবহ, তাহা ইহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইবে। বাঙ্গালার বর্তমান সাম্প্রদায়িক মনো-ভাবসম্পন্ন সরকারের সম্বন্ধে ত’ কথাই নাই। ‘দৈনিক বন্ধুত্ব’ যদি সত্যই কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেশের সাধারণ আইন এবং সংবাদপত্র-সম্পর্কিত আইন কি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না? এই কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন কি? জরুরী প্রয়োজনে গণ-নিরাপত্তা ও গণ-স্বার্থ রক্ষার জন্ত ভারতবর্ষের রক্ষণ এবং যোগ্যতার সহিত যুদ্ধ-পরিচালনের জন্ত সৃষ্ট ‘ভারত-রক্ষা বিধির’ শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন কোথায়? সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় এই কঠোর ও অদ্যোক্তিক, অত্যাচার ও অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ কেন? ইহা কি রাষ্ট্রগত প্রয়োজন হেতু? * * * না, ইহা রাষ্ট্রগত প্রয়োজন নহে; মুখোস খুলিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে, শ্রায়-বিচারের জমকাল ছদ্মাবরণে প্রতিহিংসাবৃত্তি ও পাতিয়া রহিয়াছে। ইহা প্রতিহিংসা—ভুল ও ইতর প্রতিহিংসা, পূর্বের কোনো অসঙ্গতিতেই ইহার পুষ্টি; ইহা অবিমিশ্র ও নয় প্রতিশোধ। শ্রায়বিচার, বিবেক সবই ইহা দলিত—মথিত করিয়া চলিয়াছে। * * *

“সরকারের সেই চিরন্তন সত্য স্বরণ রাখা উচিত—মানুষকে মানুষের সম্পত্তিরূপে সৃষ্টি করা হয় নাই, মানুষের স্বেচ্ছাচার সহ করিবার সীমা আছে, লক্ষ্যমতা মানুষ গণ-কল্যাণের গ্যারান্টি মাত্র; তাহার দায়িত্বের যদি অমর্যাদা ঘটে, তাহা হইলে নিপীড়িত মানুষের পক্ষে ইহা কর্তব্য হউক আর না হউক, তখন প্রতিহিংসাই শ্রায়বিচারের স্থান গ্রহণ করে।”

স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের দলে শ্রীযুক্ত প্রেমহরি বর্মাণ বলেন,—‘বন্ধুত্ব’ বিক্রমে ‘ভারত-রক্ষা আইনের’ বলে প্রদত্ত এই আদেশ ভুলপথে পরিচালিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার যদি এই আদেশ দিয়া থাকেন, তবে প্রধান সচিব মিঃ ফজলুল হকের বিক্রমে এই আদেশ জারি করিলেই সরকার ভাল করিতেন। কারণ, বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধার জন্ত প্রধান সচিবের অসংযত

ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতিসমূহই বিশেষভাবে দায়ী। সরকারের এই আদেশ অসঙ্গত।

স্বতন্ত্র হিন্দু সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস বলেন,— ‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ ২৩শে মার্চ সংখ্যায় ভোলার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, বরিশালের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট-প্রদত্ত বিবরণের সহিত তাহার কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং ঐ রিপোর্টের জন্ত যদি সরকারী আদেশ জারি হইয়া থাকে—উহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবে তাহা অজ্ঞান ও অসঙ্গত হইয়াছে। এ পর্যন্ত সচিবসভ্য সংবাদপত্রাদির বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, অত্রায়ের তুলনায় ‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ উপর প্রদত্ত এই আদেশ তাহাদের সকলগুলিকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মূলত্ববী প্রস্তাব সমর্থন করিয়া, বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সরকারী আদেশ জারির নিন্দা

করিয়া বলেন, তিনি ‘দৈনিক বঙ্গমতী’ যে সংখ্যার জন্ত উক্ত আদেশ জারি হইয়াছে, সেই সংখ্যা-খানি বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু উহার কোথা-য়ও—কি দাঙ্গা সম্পর্কে তাহা সংবাদে, কি সম্পাদকীয়



ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধে এমন একটি কথাও পান নাই যে, তাহা জন-নিরাপত্তার বিঘ্নকর বা ‘সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্ররোচনা’কর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আর ‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ উক্ত সংখ্যায় যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা যদি সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যসৃষ্টিকর বলিয়া বিবেচিত

হয়, তবে ঐ দিনের ‘ষ্টার অব ইণ্ডিয়া’ ও ‘আজাদ’ পত্র দুইখানিতে যে সব সংবাদ বাহির হইয়াছিল, সে সব আরও অপরাধজনক হইলেও কেন ঐ দুইখানি সংবাদপত্রের সম্বন্ধে সচিবসভ্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই? ঐ দুইখানি সংবাদপত্র সম্বন্ধে এইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা কেন তাঁহারা অবলম্বন করিলেন? ইহাই সচিবসভ্যের নীতি। জন-নিরাপত্তা রক্ষাই যদি প্রকৃত কারণ হইয়া থাকে, তবে ‘আজাদ’ ও ‘ষ্টার অব ইণ্ডিয়া’ সম্বন্ধে কেন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করার জন্ত ‘ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার’ উপর কেন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না—এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান সচিব কিছু দিন পূর্বে বলিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্ত গভর্নরের আহ্বানে এখন বৈঠক চলিতেছে, এ সময় তিনি আর কোনরূপ অশান্তি ডাকিয়া আনিতে চাহেন না। ঐ একই কারণে ত প্রধান উজীর ‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ উপরও আদেশ জারি না করিলে পারিতেন। ঐ তারিখে ‘ষ্টার অব ইণ্ডিয়ায়’ প্রকাশিত একখানি পত্রে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, হাসপাতালে হিন্দু ডাক্তারের সংখ্যা অধিক এবং সে সব প্রতিষ্ঠানে আহত মুসলমানরা যথেষ্ট মনোযোগ পাইতেছে না। এই সব হাসপাতাল কি সরকারের অধীন নহে? হাসপাতালে যদি হিন্দু ডাক্তাররা থাকেন, তবে এই সঙ্কট কালে তাঁহাদিগের সাধুতা ও যোগ্যতার বিরুদ্ধে কেন এইরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে দেওয়া হইল?

তিনি বলেন, ‘দৈনিক বঙ্গমতীর’ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি কোথাও কোনরূপে সাম্প্রদায়িক ঘৃণাপ্ররোচক কোন উক্তি পান নাই। প্রধান সচিব যদি এখনও পরিষদে ঘোষণা করেন যে, ‘দৈনিক বঙ্গমতী’ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করা হইবে, তাহা হইলে ঐ আদেশ জারির ফলে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে, তাহা প্রশমিত হইতে পারে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন বলেন, “মিষ্টার হক যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা “Gangster Method.” তাঁহাকে যথাকালে সাবধান করিয়া না দিলে

হয় ত এক দিন তিনি একটি দল সহ হাতুড়ী হাতে
ঝাইয়া যে সকল পত্রে তাঁহার ও তাঁহার 'সরকারের'
প্রশংসা প্রকাশিত হয় না, সে সকল সংবাদপত্রের
ছাপাখানা ভাঙ্গিয়া দিবেন।”

সচিবসমর্থক দলের মিষ্টার সিদ্ধিকী এবং কোয়ালিশনী
দলের অগ্রতম সদস্য মিঃ গোলাম সারোয়ার হোসেন
সরকারী আদেশের সমর্থন করেন। তখন কোনো কোনো
সদস্য “হাঃ রে মেয়র! সাবাস হাফ নোটের খেলু!
এততেও তোমার ফাণ্ডে টাকা হইল না”—ইত্যাদি
ধ্বনিতে পরিষদে হাসির রোল তুলেন।

অতঃপর লজ্জাবিজয়ী বীর—উজীরশ্রেষ্ঠ মিঃ ফজলুল
হক সরকার পক্ষ হইতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে,
সরকার হঠাৎ কোন কোঁকের বশে বা প্রতিহিংসার
মনোরত্তি লইয়া 'দৈনিক বসুমতীর' উপর ঐ আদেশ
জারি করেন নাই।—তিনি এইরূপ অভিযোগ করেন
যে, 'দৈনিক বসুমতীতে' মাসের পর মাস—বৎসরের
পর বৎসর ধরিয়া এমন সব অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা
হইতেছে, যাহা তিনি পরিষদে উপস্থিত মহিলাগণের
সমক্ষে পাঠ করিতে পারিবেন না। এই সংবাদপত্রের
অতীত ইতিহাস সম্ভাবজনক নহে এবং সরকার অস্তুতঃ
৫৩ বার 'দৈনিক বসুমতীকে' সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।
'দৈনিক বসুমতীর' ২৩শে মার্চের প্রবন্ধ সম্বন্ধে সরকার
আইনজ্ঞের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকার এইরূপ
মত পাইয়াছেন যে, উক্ত প্রবন্ধের জন্ত 'দৈনিক বসুমতীর'
উপর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। স্থানীয়
'প্রেস এডভাইসরী কমিটিও' প্রথমে মত প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন যে, 'দৈনিক বসুমতীর' ২৩শে মার্চের প্রবন্ধ
আপত্তিজনক। পরে অবশু 'প্রেস এডভাইসরী কমিটি' সর-
কারের নিকট এইরূপ মত জানাইয়াছিলেন যে, 'দৈনিক
বসুমতীর' উপর যে আদেশ জারি হইয়াছে, তাহা দোষের
তুলনায় অত্যন্ত কঠোর, এবং সরকার যেন আদেশ
প্রত্যাহার করেন বা সংশোধন করেন। প্রেস এডভাই-
সরী কমিটি এই বলিয়া চুঃখ ও বিশ্বয় প্রকাশ করেন যে,
“কমিটির অভিমত অগ্রাহ—সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই 'দৈনিক
বসুমতীর' বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।
এ বিষয়ে বিশদ ভাবে বিবেচনা করার জন্ত কমিটিকে সময়

দেওয়া উচিত ছিল। পরের এক সভায় কমিটি এইরূপ মন্তব্য
করিয়াছেন যে, 'দৈনিক বসুমতীর' বিরুদ্ধে অবিলম্বেই যে
একটা দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে
সরকারী প্রেস অফিসার কমিটিকে কিছুই জানান নাই।”

প্রধান সচিব অতঃপর বলেন যে, “দৈনিক বসুমতীর'
২৩শে মার্চের প্রবন্ধ যে গৃহীত ব্যবস্থা অবলম্বন করার
উপযোগী, তাহা স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং সরকার ঐ
সম্বন্ধে 'প্রেস এডভাইসরী কমিটির' জন্ত বসিয়া না থাকিয়া
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রদেশের শাস্তি ও
শৃঙ্খলা রক্ষার ভার সরকারেরই—'প্রেস এডভাইসরী
কমিটির' নহে। 'দৈনিক বসুমতী' 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' বা
'আজাদ'—কাহারও ঐরূপ ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রচার সরকার সহ্য করিবেন না।
'দৈনিক বসুমতীর' বিরুদ্ধে এই আদেশ জারি করিয়া
সংবাদপত্রগুলিকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।”

মিষ্টার ফজলুল হক সরকারের আদেশ সমর্থন করিতে
উঠিয়া যখন 'দৈনিক বসুমতীর' পূর্বকৃত কার্যের উল্লেখ
করেন, তখন শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ তাহাতে আপত্তি
করিলে সভাপতি বলেন, সরকারী আদেশ এই প্রবন্ধের
জন্ত কি অল্প প্রবন্ধের জন্ত, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।
যদি সরকার বলেন, তাঁহারা কেবল এই প্রবন্ধের জন্ত
আদেশ দেন নাই, তবে তিনি কিরূপে প্রধান উজীরের
উক্তিভে বাধা দিতে পারেন? উত্তরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র
বসু বলেন, যে আদেশ পরিষদের আলোচ্য তাহার
অতিরিক্ত কিছু বলা রীতিবিরুদ্ধ। খাজা সাহাবুদ্দীন—
তাহা রীতিবিরুদ্ধ নহে—বলিলে শরৎবাবু বলেন, তিনি
মিষ্টার সাহাবুদ্দীনের মত শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত
নহেন। ইহার পর মিষ্টার হক ভারতীয় সাক্ষ্য-আইনের
দোহাই দিলে শরৎ বাবু বলেন—

“The order was based on certain specific
grounds and no court would permit him to
go beyond the order.”

অতঃপর বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে মূলত্ববী প্রস্তাবটি
বিনা ভোট গণনায় অগ্রাহ হইলে—যবনিকা পতন হয়।

নূতন ডিক্লারেশনে হাজার টাকা জমা দিয়া, ২১শে
চৈত্র শুক্রবার হইতে “বসুমতী টেলিগ্রাম” প্রত্যহ প্রাতে

প্রকাশিত হইতেছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের উপায় নাই বলিয়া ইহা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—মন্তব্য বর্জিত।

উজীরশ্রেষ্ঠ স্বয়ং যখন 'প্রেস এডভাইসরী কমিটির' অভিমতের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিচ্ছিলেন—তখন তাঁহাদের মতের মূল্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসের কারণ নাই। 'দৈনিক বঙ্গমতীর' উপর ভারত-রক্ষা আইন জারির পূর্বে সরকার 'প্রেস এডভাইসরী কমিটির' পরামর্শ—অভিমতের জ্ঞাত অপেক্ষা করা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই; সাংবাদিকসম্বন্ধ—জাতীয় সংবাদপত্রনিচয় একজ্ঞ 'প্রেস এডভাইসরী কমিটির' সদস্যগণের পদত্যাগের দাবী জানাইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে 'প্রেস পরামর্শদাতা সমিতির' আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ১৯শে চৈত্র যে ফতোয়া দিয়াছেন, তাহার শেবাংশ এইরূপ—* * "ইহাতে প্রেসের স্বাধীনতার মূলনীতি ক্ষুণ্ণ করা হইবে এবং 'বঙ্গীয় প্রেস পরামর্শ কমিটি' প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য উহার দ্বারা ব্যাহত হইবে।" শ্রীযুক্ত তুষার বাবুকে আমরা কি সমস্তই জিজ্ঞাসা করিতে পারি—অতঃপর প্রেসের—সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আর কতটুকু অক্ষুণ্ণ—অবশিষ্ট আছে? বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে 'প্রেস পরামর্শ সমিতি'র পরামর্শের মূল্য নির্ধারিত হইবার পরও ত' তাঁহাদের অভিমতের বাজার-চলিত মূল্য অব্যাহত—বজায় আছে?

'দৈনিক বঙ্গমতীর' প্রবন্ধের সমালোচনার কোন্ কোন্ অংশ বা শব্দ অশ্লীল—শিক্ষিতা মহিলা-সমাজে অপাঠ্য—অশ্রাব্য, তাহা সচিবশ্রেষ্ঠ মেহেরবাণী করিয়া জানাইবেন কি? একজ্ঞ কোন্ কোন্ তারিখে তিনি যে অস্ততঃ ৫৩ বার 'দৈনিক বঙ্গমতীকে' সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার দপ্তরে নিশ্চয়ই তাহার তালিকা আছে—তাহা প্রকাশযোগ্য কি? "গরু, ছাগল, ভেড়া ও মুরগীর গোস্ত আমরা কখনও কখনও খাই"—প্রভৃতি নীতি-কথাপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের পূর্বে নিশ্চয়ই প্রধান সচিবকে হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত 'কথামালা' পাঠ করিয়া বিজ্ঞাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। "ছুরাওয়ার ছলের অসর্ভাব নাই"—'কথামালার' সহুপদেশটি আজও কি তাঁহার স্মরণ আছে?

বাঙ্গালায় আমলা-তান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে যে নবাব-তান্ত্রিক সরকার বা বাদসাহী-আমল পুনঃ-প্রবর্তিত

হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা ইংরেজের রাজভক্ত প্রজা, মুসলের মান বাড়াইবার প্রবল প্রয়াসে হিন্দু-সম্প্রদায়ের সর্বস্তরে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে দেখিয়া শঙ্কিত—ব্যথিত হইতেছি। কিন্তু নিরুপায়—প্রতিবিধান সম্ভব নহে।

বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক অশান্তি

বাঙ্গালায় কিছু দিন হইতে যে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের আভাস পাওয়া যাইতেছিল, তাহা প্রথমে খুলনা জিলায় বাগেরহাট মহকুমায় ও পরে ঢাকায় অশান্তিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ঢাকার হাজামার আজ এক মাস কাল পূর্ণ হইল।

বাঙ্গালা সরকার স্থির করিয়াছেন—সংবাদ-প্রচার নিয়ন্ত্রিত করিলে বর্তমান অবস্থায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা-কার্যের সুবিধা হইবে। সেই জ্ঞাত তাঁহারা 'ভারত-রক্ষা-আইনের' প্রয়োগও করিয়াছেন। কোন সংবাদ—সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া স্পেশাল প্রেস এডভাইসারের মঞ্জুরী ব্যতীত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলিবে না—কোনরূপ মন্তব্যও চলিবে না। কেবল এসোসিয়েটেড প্রেস ও ইউনাইটেড প্রেস—দুইটি সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত সংবাদ প্রকাশ করা যাইবে। অবশ্য ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয় যে সংবাদ পরিবেশন করেন, তাহা ঐরূপে মঞ্জুর হইবার পর। বাঙ্গালা সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা বলা দুষ্কর; কারণ, ঢাকার হাজামা যে সহর হইতে গ্রামে গ্রামে ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে, (সত্য বা মিথ্যা) সংবাদ প্রচারই তাহার কারণ বলিয়া মিষ্টার ফজলুল হক স্বীকার করিয়াছেন। প্রাপ্ত সংবাদগুলি মঞ্জুরীর জ্ঞাত স্পেশাল প্রেস এডভাইসারের নিকট প্রেরিত হইলে কিরূপে—“ছাপা চলিবে না” বলিয়া বা কিরূপ পরিবর্জিত আকারে পাঠান হয়, তাহার পরিচয় হয়ত পাঠকগণ পরে পাইবেন। এ বিষয়ে সরকার এত সতর্ক যে, সর্বজন-সমাদৃত ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীমানপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইতে দেওয়া হয় নাই; এমন কি, তাহা যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় পঠিত হইতে

না পারে, সে চেষ্টাও সচিবপক্ষ হইতে করা হইয়াছিল—
সভাপতির নির্দেশ হেতু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।
আর ঐ বিবৃতি বাঙ্গালার বাহিরে নানা সংবাদপত্রে
প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে।

যে রঙ্গমঞ্চে হাজামার নারকীয় নাটকের অভিনয়
হইতেছে, তাহার একটু পরিচয় দিয়া আমরা—প্রধানতঃ
ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশিত বিবরণে
নির্ভর করিয়া ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

নূতন শাসন-পদ্ধতিতে নির্বাচনের পর প্রধান সচিব
হইয়া মিষ্টার ফজলুল হক বহুবার হিন্দুদিগের সম্বন্ধে অযথা
আক্রমণ করিয়াছেন। সে সকল আক্রমণের প্রতিবাদ
হইলে তিনি ক্রটি স্বীকার করিয়া অব্যাহতি লাভের
চেষ্টারও ক্রটি করেন নাই। তিনি অধিকাংশ হিন্দু রাজ-
কর্মচারীকে disloyal বলিয়া কোন বন্ধুকে পত্র লিখিয়া-
ছিলেন এবং সে পত্র ধরা পড়িলে সেজন্ত ক্রটি স্বীকার
করিয়াছিলেন। জব্বলপুরে এক বক্তৃতায় তিনি হিন্দুদিগকে
আক্রমণ করিয়া পরে ঐ জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন,
তিনি ভাবপ্রবণ, স্মতরাং ক্ষমার্হ! অল্প দিন পূর্বে—লোক-
গণনার ফল কিরূপ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা না
করিয়া খাজা সার নাজিমুদ্দীন মুসলমানদিগকে বলিয়া-
ছিলেন, ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি যেমনই কেন হউক না—
মুসলমানদিগকেই উত্তরোত্তর অধিক ক্ষমতা ব্যবহার
করিতে হইবে। নানা স্থানে হিন্দুর দেবস্থান অপবিত্র
হইলেও এই সচিবরা সে কার্যের নিন্দাও করেন নাই,
এবং গত মহরমের সময় কলিকাতা রাজাবাজারে যে
সকল মুসলমান হাজামা করিয়াছিল—এক জন সচিবকে
এমন ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তাহার ফলে তিনি
ষাষাধিক কাল ছুটি লইয়া নষ্ট-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার-লাভ
চেষ্টা করিয়াছেন—সেই দাঙ্গাকারীদিগের বিরুদ্ধে উপ-
স্থাপিত মামলা সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

এ দিকে লোকগণনা উপলক্ষ করিয়া মিষ্টার ফজলুল
হক যে সকল বিবৃতি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সে
সকলে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে কটুক্তি চরমে উপনীত
হইয়াছিল এবং কানসাটে সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন-
সমস্তার সমাধান এখনও হয় নাই। মিষ্টার ফজলুল হক
বলিয়াছেন বটে—দাঙ্গাহাজামা অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত

ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়াই তাহা এক মাসেও
দমিত করা যাইতেছে না—কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্তা ১৫
দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বুঝিয়াই বাঙ্গালার
গভর্নর টাউন হলে সভার পরই ব্যবস্থা পরিষদের ও
ব্যবস্থাপক সভার নানাদেশের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি-
দিগকে এক বৈঠকে আহ্বান করেন।

মিষ্টার ফজলুল হক গুঁ ২রা মার্চ যে বিবৃতি প্রচার
করেন, তাহাতে তিনি বলেন, লোকগণনার বাঙ্গালার
হিন্দুদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে; কারণ,
ব্যবহারাজীব, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, জমিদার, ব্যবসায়ী
ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণাতিরিক্ত সকল শ্রেণীর হিন্দু হিন্দুর সংখ্যা
অধিক দেখাইবার জন্ত একযোগে মিথ্যা উক্তি করিতে
ও মিথ্যা হিসাব দাখিল করিতে বন্ধপরিষ্কর হইয়াছে।
এই হীন উক্তির প্রতিবাদে ৬ই মার্চ কলিকাতার টাউন
হলে যে সভাধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি সার
নূপেজনাথ সরকার বলেন—মিষ্টার হকের মানসিক অবস্থা
বিকৃত হইয়াছে—স্মতরাং প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্যন্ত
এবং লোকগণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অবসর
গ্রহণ করুন—আর তিনি যদি তাহা না করেন, তবে
গভর্নর তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করুন।

যে দিন ঐ সভা হয়, সেই দিনই মিষ্টার হক সার
নূপেজনাথকে পত্র লিখেন—তাঁহাকে সকলে ভুল বুঝি-
তেছেন! ৭ই মার্চ সচিবদিগের সমর্থক 'ষ্টার অব
ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত হয়, মিষ্টার হক বলিয়াছেন—তাঁহার
পত্র সার নূপেজনাথ কর্তৃক তাঁহাকে লিখিত এক পত্রের
উত্তর—তিনি উপযাচক হইয়া পত্র লিখেন নাই। কিন্তু
যখন সার নূপেজনাথ বলেন, ঐ উক্তি মিথ্যা, তখন
'ষ্টার' সার নূপেজনাথের প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশ না করিয়া
বলেন—সার নূপেজনাথ মিষ্টার হককে কোন পত্র
লিখেন নাই বটে, কিন্তু উভয়ে আলোচনা হইয়াছিল।
এ ক্ষেত্রে মিষ্টার হক ও 'ষ্টার'—কে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া-
ছিলেন এবং উভয়েই তাহা করিয়াছিলেন কি না, তাহা
বিবেচনার স্থান এ নহে।

যে দিন জানা যায়, সার নূপেজনাথের নেতৃত্বে টাউন
হলে সভা হইবে, সেই দিনই (৪ঠা মার্চ) 'ষ্টারে' একটি
প্রবন্ধে যাহা লিখিত হয়, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ :—

“বাঙ্গালার সর্বত্র মুসলমানদিগের ধৈর্য্য শেবসীয়ার উর্গনীত হইয়াছে। ক্ষুদ্র মুষিকদিগকে দেখাইয়া দিবার সময় হইয়াছে—সিংহ মরে নাই—কেবল ঘুমাইয়া আছে। * * * * হিন্দুদিগের মধ্যে তথা-কথিত বড় লোকরাও মানসিক শৈথিল্য হারাইয়াছে এবং সর্বকার্য্যক্রম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহারা উপযুক্ত উত্তর পাইবে। বাঙ্গালা কাহাদিগের, তাহা তাহারা দেখিবে। তাহাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, তাহারা সেই শিক্ষা পাইবে।—ইত্যাদি।”

ইহা কি সমরান্বিত নহে? ঐ প্রবন্ধের শেষ এইরূপ—“The challenge is accepted. The fight is on.”

ইহার পর ১২ই মার্চ খুলনায় ও ১৪ই মার্চ ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। খুলনায় এক জন নমঃশূদ্র কোন মুসলমানের নিকট টাকা পাইত—উত্তমণ অধমণের নিকট টাকা চাহিলে অধমণের কতকগুলি সমধর্ম্মী উত্তমণকে ও তাহার সহকারীদিগকে প্রহার করে এবং তাহার পর গ্রামে গ্রামে হাঙ্গামা হয়। ১৪ই মার্চ হোলী খেলার সময় হিন্দুদিগের খেলার জল ঢাকায় কোন মুসলমানের গাত্রে পতিত হয় এবং তাহা হইতেই ঢাকার দাঙ্গার উদ্ভব। এক কালে দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি যে হিন্দুদিগের হোলীর শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন, সে কথার আলোচনা আর করিব না। কিন্তু খুলনায় ও ঢাকায় যে রূপে তুচ্ছ ঘটনা হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে কি মনে করিতে হয় না—বাকুদের স্তূপ সঙ্কিত ছিল—ফুলিঙ্গপাতে বিস্ফোরণ হইয়াছে? ঢাকায় ইতঃপূর্বে যে দুই বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

এ বার হাঙ্গামার ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহার আভাস গত ৭ই এপ্রিল ব্যবস্থাপক সভায় সচিব সার বিজয়প্রসাদ সিং রায়ের প্রদত্ত হিসাব হইতে বুঝা যায়—

নিহত	৩৫ জন
হিন্দু	১০ ”
মুসলমান	২৪ ”
অন্ত	১ ”

আহত	১৬৩ জন
হিন্দু	৫৮ ”
মুসলমান	১০২ ”
অন্ত	৩ ”
গ্রেপ্তার	৪১৯ জন
হিন্দু	১৪৯ ”
মুসলমান	১৭০ ”

আহতদিগের মধ্যেই, বোধ হয়, ঢাকার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ নাগ ও অতিরিক্ত জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার হ্যাচ বার্নওয়েল ছিলেন।

পুলিশের গুলীতে ৪ জন নিহত ও ২ জন আহত হয়। যদিও ৭ই এপ্রিল সচিব বিজয়প্রসাদ বলেন,—দাঙ্গার কারণ নির্ণীত হয় নাই; তথাপি ৯ই এপ্রিল মিষ্টার ফজলুল হক বলেন,—১৪ই মার্চ এক জন মুসলমানের গাত্রে হোলী খেলার জল পড়ায় যে মনোমালিন্যের উদ্ভব হয়, তাহা ছোরা-মারায় আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে এবং ১৭ই মার্চ একটি মসজিদ অপবিত্র করা হইয়াছে, এই সংবাদ প্রচারিত হয়। দুই দিনেই তবে হাঙ্গামার প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিজয়প্রসাদ বলেন, যে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল্য কত, তাহা তিনি বলিতে পারেন না—সে সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ পান নাই। লোকের দুঃখ-মোচনের কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে, সে প্রশ্নের উত্তরও তিনি তখন দিতে পারেন নাই। তবে ঢাকা সহরে যে অনেক গৃহ ও দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে, তাহা হয়ত তিনি অস্বীকার করিবেন না।

গত ৯ই এপ্রিল ব্যবস্থা পরিষদে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতাকালে সচিব-সমর্থক দলের কতকগুলি সদস্যের হাশ্বে বিরক্ত হইয়া যাহা বলিয়াছেন এবং যে উক্তি প্রধান-সচিব অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়—প্রায় ২৫ হাজার হিন্দু আজ গৃহহীন। ২৫ হাজারের অধিক সংখ্যক লোক আজ আশ্রয় ও সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ঘুরিতেছে।

তিনি বলিয়াছেন—

প্রায় ৫০ খানি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে

এবং অন্ততঃ ১০ হাজার লোক ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

আলোচনার শেষে মিষ্টার ফজলুল হক স্বীকার করেন, বহু লোক ত্রিপুরা রাজ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া ত্রিপুরার মহারাজা যে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, (ব্যবস্থা পরিষদে অমুযোগের পর) সেজন্য তিনি তাঁহাকে সরকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

মনে রাখিতে হইবে, কতকগুলি বাঙ্গালী আসাম হইতে ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া এই মিষ্টার ফজলুল হকই এক দিন আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিগণের নিন্দা-কীর্তন করিয়াছিলেন। আজ তিনিই স্বীকার করিতেছেন, প্রায় ১০ হাজার গৃহহীন সর্ব্বশাস্ত বাঙ্গালী বৃটিশ-শাসনাধীন যে বাঙ্গালায় তিনি প্রধান সচিব, সেই বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া দেশীয় রাজ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই ঘটনা আমরা কেবল বিবৃত করিতে পারি—ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

পরিষদে আলোচনা কালে ডক্টর শ্রামাপ্রসাদ ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সকলের গুরুত্ব অসাধারণ—কিন্তু আমরা সে সকলের উল্লেখমাত্র করিব।

শরৎ বাবু বলেন—

“আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, ঢাকার স্থানীয় রাজকর্মচারীরা বিশেষ ভাবে কর্তব্য অবহেলার অপরাধে এবং সরকারের আইনানুযায়ী কাজ না করায় অপরাধী; তাঁহাদিগের কর্তব্যে অবহেলার জন্যই ঢাকায় দাঙ্গা ভীষণ হইতে পারিয়াছে। আমি তাঁহাদিগের অল্পপস্থিতির সুযোগে এই অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছি না—ঢাকায় আমি তাঁহাদিগের সম্মুখেই এই সব অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলাম—আজও সে সকলের উত্তর পাওয়া যায় নাই।”

শরৎ বাবু বলেন, তিনি ঢাকায় গুণ্ডাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কমিশনারকে ফোন করেন—উত্তরে তাঁহাকে কেবল বলা হয়—এক জন গুণ্ডা ঢাকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! গত ২৮শে মার্চ শরৎ বাবু শ্রীযুক্ত অধিবসু গুহের নিকট হইতে পত্র পান—“লুণ্ঠিত হুয়াদির কতকাংশ কোথায় আছে, তাহার সংবাদ আমরা

পাইরাছি। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সে বিষয় জানান হইয়াছিল; কিন্তু তিনি যে সে সকল উদ্ধার জন্য সক্রিয় হইয়াছেন, এমন মনে হয় না।” যে মোটরবাসে লুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া যাওয়া হয়, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন স্বয়ং তাহার নম্বর ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট একখানি কাগজে নম্বর লিখিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পর দিন তিনি ঐ বাস ধরিবার কি চেষ্টা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন—“আমি কাগজখানি হারাইয়া ফেলিয়াছি!” ইহার পর শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ দাস ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখেন, তাঁহারা যে সব অমুরোধ করিয়াছেন, সে সব পালিত হয় নাই—পালিত হইলে লোকের ধনপ্রাণ-নাশ নিবারিত হইত—চুক্তকারীরা ধৃত হইত।

তিনি আরও বলেন—“পুলিসের সমক্ষেই হত্যা ও গৃহে অগ্নিযোগ হইয়াছে।” শরৎ বাবু বলেন—চার বা পাঁচ দিন পূর্বে তিনি গভর্নরকে ও প্রধান সচিবকে জানান—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য মিষ্টার সাহাবুদ্দীন, মিষ্টার নশরুদ্দীন ও মিষ্টার সালিমকে ঢাকা ত্যাগ করিতে আদেশ করা প্রয়োজন।

শরৎ বাবু তাহার পর ২রা এপ্রিল উপক্রমত অঞ্চল হইতে অতিরিক্ত জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার হ্যাচ-বার্ণওয়েল ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে তার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করেন :—নরসিংদীর ৩ মাইল পূর্বে ও তৈরবের ২ মাইল পশ্চিমের অঞ্চল উপক্রমত। মেধিকাণ্ডা স্টেশন দাঙ্গাকারীরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—মুরেশ বাবুর গৃহ পুড়াইয়া দিয়াছে।—ইত্যাদি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এই তার পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কি করিয়াছিলেন? মিষ্টার হ্যাচ-বার্ণওয়েল স্বয়ং আহত হইয়াছেন।

শরৎ বাবু বলেন—

“এখন আমি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জর্জের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছি। তিনি মিষ্টার সালিম ও মিষ্টার নশরুদ্দীনের সঙ্গী করিয়া উপক্রমত স্থান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন; কিন্তু যে সকল অঞ্চলে হিন্দুরা অত্যাচারিত হইয়াছিল, সে সকল পরিদর্শন কালে তিনি কোন হিন্দু নেতাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। এইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট আজ ঢাকার ভাগ্যবিধাতা।”

এই প্রসঙ্গে পাঠকদিগের অবশ্যই স্মরণ হইবে— ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের দাঙ্গার সময় রাজকর্মচারীরা নবাব খাজা হবিবুল্লাহকে সঙ্গে লওয়ায় যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহা এডামী-শ্রাকসী কমিটির রিপোর্টে আছে। কমিটি বলিয়াছিলেন, নবাবের নামে জুর্জন হইয়াছিল, বলিয়া রাজকর্মচারীদিগের তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া সমর্থন করা যায় না।

শরৎ বাবু মিষ্টার হ্যাচ-বার্ণওয়েল কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরিত আর একখানি তার পাঠ করেন এবং বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ এই যে, তাঁহারা অল্পপুঙ্ক্ত রাজকর্মচারীদিগকে—অক্ষয় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টদিগকে ঢাকার ও নারায়ণগঞ্জের ভাগ্যবিধাতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সকল লোক স্বাধীনচেতা ও নিরপেক্ষ নহে।

তিনি আরও বলেন—খাজা শ্রার নাজিমুদ্দীন এখন (রাজাবাজারে আহত হইবার পর) জুজু হইয়াছেন। তিনি কেন ঢাকায় গমন করেন নাই? “But he is fiddling at Hazaribagh while Dacca is burning.”

শরৎ বাবুর উপস্থাপিত অভিযোগের জায় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যতীত কি এ সকলের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত করা সম্ভব?

মিষ্টার ফজলুল হক বলেন, শরৎ বাবু অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের যে তার পাঠ করিয়াছেন, সরকার তাহার বিষয় অবগত ছিলেন না! ইহা কি সরকারের পক্ষে প্রশংসার কথা?

মিষ্টার ফজলুল হক তাঁহার উত্তরে ডক্টর শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ও সচিব-বিরোধী দলকে সকল অনর্থের জন্ত দায়ী করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার দায়িত্ব লোপ পাইবে? তাহাই কি শরৎ বাবুর সরকারের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের উত্তর? তিনি বলিয়াছেন, তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁহার এক জন সতীর্থ সব অন্তায় কাজ করিয়া চীৎকার করিয়া দেখাইতে চাহিত—আর সকলে দোষী, সে নিরপরাধ। আজ কি ডক্টর শ্রামাপ্রসাদ প্রভৃতি তাঁহার ব্যবহারে সেই ছাত্রের পরিচয় পাইলেন—বলিতে পারেন না?

শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী যে সহস্র সহস্র লোকের ত্রিপুরায় গমনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—উহাতেই বুঝা যায়—“an unworkable constitution was being worked by worthless and inefficient hands.” তাহার উত্তরে কি বলা হইবে?

যে সকল নরনারী আজ হতসর্কণ, তাহারা কি আশা করে নাই—বৃটিশ সরকারের শাসনে তাহাদিগের ধনপ্রাণ নিরাপদ থাকিবে? তাহাদিগের সেই আশা কি আজ নিরাশায় নির্ধাপিত হইবে? তাহারা নিহত, তাহাদিগের মুক্ত আত্মা আজ কাহাকে অভিসম্পাত করিতেছে?

এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান ভেদ নাই এবং বাঙ্গালার বর্তমান সচিবরা (লজ্জার বিষয়, ইহাদিগের মধ্যে ৪ জন হিন্দুসন্তানও আছেন) কখনো হিন্দুর দেবস্থান কলুষিত করায় ও হিন্দু ধর্ম্মাচ্যুতানের অধিকার-সঙ্কোচে কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই—প্রকাশ্য ভাবে সে সব কার্যের নিন্দা করেন নাই বটে, কিন্তু ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে বলিয়াছেন—

যদিও গত ৪ বৎসর বহু স্থানে হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করা হইয়াছে, তথাপি মসজিদ অপবিত্র হওয়ায় তিনি লজ্জিত। “কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মস্থান যে কলুষিত করা হয়, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ঐক্য-প্রয়াসী।”

আমরা এই প্রসঙ্গে পূর্বে সচিব বিজয়প্রসাদের প্রদত্ত হতাহতের সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছি। ডক্টর শ্রামাপ্রসাদ বলিয়াছেন, নিহতের ঐ সংখ্যা নির্ভরযোগ্য নহে। তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, দুই সম্প্রদায়ে নিহতের সংখ্যা প্রায় সমান হইয়াছে।

ডক্টর শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আরও বলেন,—খাকশাররা ঢাকা জিলায় গিয়াছিল এবং হিন্দুদিগের গৃহ আক্রমণে সহায় হইয়াছিল। তিনি যখন এই কথা বলেন, তখন সচিব-সমর্থক দল হইতে জিজ্ঞাসা করা হয়—“বাঙ্গালায় কি খাকশার আছে?” উত্তরে তিনি বলেন, যে কেহ রাত্রি ১১টার পর কলিকাতা মেছুয়াবাজারে যাইলেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেন। সচিব-সমর্থক দল হইতে এইরূপ প্রশ্নের কারণ কি হইতে পারে? কিছু দিন পূর্বে ব্যবস্থা পরিবর্তনই খাজা সায় নাজিমুদ্দীন

স্বীকার করিয়াছিলেন,—বাক্সালার খাকশার-বাহিনী আছে এবং তিনি তাহাদিগের কার্যে বাধা প্রদান প্রয়োজন মনে করেন না।

সময়াভাবে উক্তের মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার বক্তৃতাকালে সচিব-সমর্থকদল যে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অসুমান করিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

শ্রীমা প্রসাদ বাবু বলিয়াছেন, ঢাকা হইতে যে অগ্নি গ্রামে ব্যাপ্ত হইতে পারে, সে সম্ভাবনার কথাও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নিবারণের জন্ত আবশ্যিক ব্যবস্থা করা হয় নাই।

মুসলমান সচিবদিগের মধ্যে কেহ কেহ একাধিক বার ঢাকায় গমন করিয়াছেন। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয়, এক মাসেও তথায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমরা হাজামার সংবাদ প্রচারের পর হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—অবস্থা আনন্দাধীন হইয়াছে। কিন্তু নিবেদন-নিরুদ্ধ অবস্থায়ও যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাহা মনে হয় না। সচিবরা যদি মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, তবে আজ তাঁহারা লোকের এই ধনপ্রাণ নাশের সম্বন্ধে কি বলিবেন?

পরিষদে শ্রীযুত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিয়াছেন, ২৪শে মার্চ বাক্সালা সরকার সংবাদপত্রের সংবাদ-প্রকাশাদিকার সঙ্কুচিত করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—ঢাকার গ্রামে গ্রামে অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার করিয়া হাজামার উদ্ভব করা হইয়াছে। সে জন্ত দায়ী কে?

আমরা বলিতে পারি, সংবাদপত্রের যদি সংবাদ-প্রচারের স্বাধীনতা থাকিত, তবে প্রকৃত সংবাদ পাইয়া এবং সংবাদপত্রের মস্তব্যের ফলে লোক অতিরঞ্জিত জনরবে বিশ্বাস স্থাপনে বিরত হইত। কিন্তু সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ফলেই তাহা হইতে পারে নাই।

ভারত সরকার ও সাময়িক বাজেট

গত মাসে আমরা ভারত সরকারের বাজেট সম্বন্ধে স্থূল ভাবে কয়েকটি কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম—উহা মুখ্যতঃ সাময়িক বাজেট। আমাদের দেশে এই সাময়িক ব্যয় দিন দিন দ্রুতবেগে বর্ধিত হইতেছে। ভারতের প্রাদেশিক রাজস্ব ধরিয়া যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়, তাহার শতকরা ৩০ ভাগ সাময়িক কার্যে ব্যয় হয়। কেবলমাত্র ভারত সরকারের জন্ত যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহার অর্ধেক রাজস্বই রণচণ্ডীর পূজায় উৎসর্গ হইয়া থাকে। ভারতবাসীরা যেকোন দরিদ্র, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায় যেকোন সঙ্কীর্ণ, এবং বর্তমান কালে তাহাদের পক্ষে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যেকোন কঠিন হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও, এত অধিক সাময়িক ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য দেশের সাময়িক ব্যয়ের তুলনায় সাধারণ সময়েও ভারতের সাময়িক ব্যয়ের হার যে অত্যন্ত অধিক, তাহা স্বীকার করিবার উপায় নাই। শান্তির সময় গ্রেটব্রিটেনের জায় সমুদ্র দেশেও সমগ্র রাজস্বের শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ মাত্র দেশরক্ষার জন্ত ব্যয় করা হয়; আর ভারতের ব্যয় হয়—শতকরা ৩০ ভাগ বা তাহারও কিঞ্চিৎ অধিক! এখন যে ভাবে ভারতের সাময়িক ব্যয় বর্ধিত হইতেছে,—তাহা লক্ষ্য করিলে ভারতবাসীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইবে সন্দেহ কি? গত বৎসর ভারতীয় সাময়িক ব্যয় ৭২ কোটি টাকার কিছু অধিক হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়;—কিন্তু গত ১৮ই চৈত্র হইতে যে সরকারী বৎসর আরম্ভ হইয়াছে, এই বৎসরে ঐ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ৮৪ কোটি টাকারও অধিক হইবে। সুতরাং এই এক বৎসরে দরিদ্র ভারতের ১২ কোটি টাকার অধিক ব্যয় বৃদ্ধি,—এ কথা চিন্তা করিলে আতঙ্ক না হয় কাহার? কিন্তু এই অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধির সমস্ত টাকাটাই কি খাস ভারতের রক্ষাকল্পে ব্যয়িত হইবে? যদি ভারতবর্ষ বা তাহার কোন অংশ বৈদেশিক শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে হয় ত ঐ অতিরিক্ত

টাকাটা ভারতরক্ষার্থ ব্যয়িত হইবে; কিন্তু সে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হইবে বলিয়া মনে হয় কি? দ্বিতীয় কথা, এই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হইলে তাহার ফলে ভারতীয় শ্রমশিল্পের পরিপুষ্টি সাধিত হইবে কি? এই দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, এই বিষয়ে সরকারের কার্য দেখিয়া সাধারণের মনে যে নৈরাশ্রের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের কাহারও কাহারও উক্তিভেদেই সুপ্রকাশ। সম্মিলিত ভারতীয় বণিক-সমিতি (Federation of Indian Chamber of Commerce) এই সামরিক ব্যয়-বৃদ্ধির প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এই বণিক-সমিতির প্রধান কথা এই যে, যে সামরিক ব্যয় বার্ষিক ৪৫ কোটি টাকা হইতে ৮৪ কোটি টাকায় ফাঁপিয়া উঠিল, তাহা যে কেবল ভারতের এবং ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্ত ব্যয় করা হইবে; সরকার-পক্ষ হইতে তাহার একটা সুনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া কর্তব্য। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় সদস্যের সংখ্যা অধিক নহে। সেই হেতু জনসাধারণের এইরূপ একটা ধারণাই জন্মিয়াছে যে, ব্যবস্থা পরিষদে এই বিষয়টি সাধারণের পক্ষে তেমন যোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই।

কথাটা কি অসঙ্গত বা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না? যুদ্ধের সময় সকল দেশেই স্থূল ও মূল শিল্পের (Key-industries) প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। সম্মিলিত বণিক-সমিতির কমিটি বলিয়াছেন,—ভারত সরকার ঐ সামরিক ব্যয়-সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারতে কোনওরূপ গঠনমূলক ব্যবস্থা করিতেছেন না। দেড় বৎসরের অধিক কাল হইল, ভারতবাসী সরকারের নির্দেশেই এই মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালে ভারতবাসীকে সামরিক ব্যয়-বাবদ বিস্তর টাকা দিতে হইয়াছে। কিন্তু সরকার ত এইরূপ মূল এবং স্থূল শ্রমশিল্প গঠনের জন্ত কোন প্রকার আশ্রয়ই প্রকাশ করেন নাই—পরন্তু এ পর্যন্ত তাহার কোন লক্ষণই ত দেখা গিয়াছে না! কত যুগ-যুগান্ত কাটিয়া গেল, কিন্তু

ভারতে পাকাপোক্ত ভাবে শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইলই না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যুদ্ধকালে সমরাজ্ঞ এবং সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্ত অনেক টাকা দেশের লোকের হস্তগত হয়; সেই টাকা নানা হাত ঘুরিয়া, শ্রমশিল্পের ভিতর দিয়া দেশবাসীর ধনবৃদ্ধি করে,—লোক তাহা হইতেই সামরিক করভার বহন করে। কিন্তু ভারতে সেরূপ কিছুই হইতেছে না। এখন কত কাল যুদ্ধ চলিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সামরিক ব্যয় বিষয়ে ভারত-বাসীর বাক্যব্যয়ের অধিকার নাই,—কিন্তু অর্থদানের অধিকার সুস্পষ্ট। টাকা দেওয়া কর্তব্য সত্য—কিন্তু কথা কহিবার অধিকারটাও থাকি উচিত, এবং সেই কথা অরণ্যে রোদন না হয়, তাহারও ব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য। ভারতে প্রবর্তিত বৃটিশ ডেমক্রেসীর নমুনা দেখিয়া আমরা আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতেছি, এবং এই ভারত-ছাড়া ডেমক্রেসী রক্ষা করিবার জন্ত বৃটিশ জাতি আজ সর্বস্ব পণ করিয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ! সুতরাং আজুর টক হইলেও কর্তার ইচ্ছায় আমরা কণ্ঠ করিব।

কর বৃদ্ধি

বর্তমান যুগে সমর-রক্ষণীর জঠরে যখন কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন জীর্ণ হয়, তখন এই যুদ্ধে যে প্রভূত অর্থের অপচয় হইবে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং এই যুদ্ধে আকৃষ্ট ভারতবাসীকে যুদ্ধের কিয়দংশ ব্যয়ভার বহন করিতেই হইবে। এজন্ত ভারতের রাজস্ব-সচিব সার জে. রেইসম্যান গুরু করভার-প্রদীপিত ভারত-বাসীর স্বন্ধে নূতন কতকগুলি করের বোঝা বাড়াইয়া ৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই কার্যারম্ভ; কলভরুর শাখা আন্দোলিত করিতেই যে কিছু বিলম্ব! আমরা পূর্ববার এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছি। ব্যবস্থা পরিষদে স্বাধীন মতাবলম্বী প্রত্যেক বক্তাই আমাদের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন।

আসন্ন-সুমারের হিসাব

লোকগণনা যথাসময়ে শেষ হইলেও বাঙ্গালার লোকগণনার ফল এখনও সরকারিভাবে প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু নিম্ন-সরকারিভাবে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে,

তাছাড়াও অন্যান্য গণনা—গত দশ বৎসর পূর্বের লোকগণনার কুলনার এবার জনসংখ্যা শতকরা ২০ জন হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে বিশ্বয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। একে ত ১০ বৎসরে শতকরা ২০ হিসাবে বৃদ্ধি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বলা যায় না, তাছাড়াও আবার—

(১) গত বার লোকগণনা হিন্দুরা অনেক ক্ষেত্রেই বর্জন করায় হিন্দুর সংখ্যা অল্প দেখা গিয়াছিল;

(২) এবার বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই লোকগণনায় অবহিত ছিলেন।

কলিকাতায় বৃদ্ধি শতকরা ৮৫ জন। যাহারা গত ১০ বৎসরে কলিকাতায় আয়তন-বিস্তার লক্ষ্য করিয়াছেন—পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক অবস্থার জ্ঞাত হিন্দু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং কলিকাতায় সিন্ধী, গুজরাতি, মাড়বারী প্রভৃতি বণিক সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়াছেন, তাহারা এই গণনাকালে বিন্মিত হইবেন না।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন

বর্তমান সময়ে ভারতে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার ফলাফল এখন চূড়ান্ত ভাবেই টের পাওয়া যাইতেছে। বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের রাজনীতিকক্ষেত্রে যাহারা নেতৃত্ব করেন, কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁহাদের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন যে ভেদ-সাধনে উর্ধ্বের রাজনীতিক ক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তাহা কংগ্রেসের পূর্ববর্তী পরিচালকগণ এবং পরবর্তী গান্ধীপন্থিগণ একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু সে-কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছিলাম। একমাত্র শ্রীযুত বিজয়রামব আচারিয়ার তাহা স্বরে উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রের, বোধ হয়, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজীর প্রভাবে চালিত কংগ্রেসী-রাজনীতিকগণ সে-কথা একেবারেই গ্রাহ্য করেন নাই। এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, পরাধীন রাজ্যে স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বৈদেশিক রাজশক্তি-পরিচালকগণের পক্ষে ভেদ-নীতি একটা অমোঘ উপায়। ঐকিক-শাসনের পরিবর্তে,

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের ফলে যে প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি গড়াইয়া তুলিবার যথেষ্ট সুযোগের উদ্ভব হয়, ইহা সাধারণ-বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে কি প্রকারে বৃটিশ-অধিকার স্থায়িত্বকে অটল রাখা সম্ভব হইবে, তৎসম্বন্ধে শাসক-জাতির মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। মোরাদাবাদের সেনাপতি কর্ণেল জন কোক এই সময়েই লিখিয়াছিলেন,— "ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান আছে, তাহা আমাদের পক্ষে (অর্থাৎ শাসকদিগের পক্ষে) সৌভাগ্যজনক; উহা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। উহাদের মিলন-সাধন করা সম্ভব (অর্থাৎ আমাদের স্বার্থের অক্ষুণ্ণ) নহে। সিপাহী-যুদ্ধের সময় ইনি ১৪টি বুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতে উপনিবেশ স্থাপন, এবং বৃটিশ জাতির বসবাস সম্পর্কে যে পার্লামেন্টারী কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্যদানের জ্ঞাত বোম্বাইয়ের এঞ্জিনিয়ার মেজর সার জর্জ উইল্কেট আহূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছিলেন, "বিদেশী শাসকের পক্ষে ঐকিক-শাসন বিপজ্জনক, প্রাদেশিক-শাসনই ভাল; কারণ, উহাতে একটা ব্যাপার লইয়া দেশের সমস্ত লোক আন্দোলন করে না,—ঐ আন্দোলন প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।" সমগ্র দেশে ঐকিক-শাসনের প্রতিষ্ঠা হইলে বিস্তীর্ণ দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে স্বার্থ-বোধের এবং লক্ষ্যবস্তুর সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মিষ্টার উইল্কেটের জবানবন্দী মেজর বি. ডি. বসুর 'Consolidation of British Power in India' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং গত মার্চ মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রের আলোচিত হইয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পরেই উক্ত পার্লামেন্টারী কমিটির অধিবেশন হয়। তাহার পর জগতে কতই বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু আসল ব্যবস্থা ঠিকই আছে,—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে যে একতা স্থাপনের ব্যাঘাত ঘটে, এ সত্য কেহই অস্বীকার করেন নাই। শাসন-সংস্কার সম্পর্কে জয়েন্ট-কমিটির রিপোর্টেও সে কথা স্বীকৃত হইয়াছে। উহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে,—"স্বায়ত্ত-শাসন

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্রিটিশ-শাসনের ফলে ভারতবর্ষ যাহা পাইয়াছে,—তাহার মধ্যে একতাই সম্ভবতঃ সর্বপ্রধান; কিন্তু প্রদেশগুলিকে এত অধিক ক্ষমতা দিবার এবং তাহা-দিগকে সতেজ ও স্বাধীন ভাবে রাজনীতিক জীবন গঠন করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহার অবশুস্বাভাবিক ফল এই হইবে যে, সেই একতা ক্ষীণ হইয়া যাইবে এবং উহা বিনষ্ট হইবে।—সুতরাং ইহার যে ফল অপরিহার্য, এখন তাহাই লক্ষিত হইতেছে,—এবং সেই ফলের সুমধুর রসধারায় আমরা পুরুষানুক্রমে পরিতৃপ্ত হইতেছি। এখন কংগ্রেস এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-নীতি মানিয়া লইয়া মজ্জিত গ্রহণ দ্বারা উহাতে সম্মতি জানাইয়াছেন; কাজেই ব্রিটিশ রাজনীতিকদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। উহাতে যে কংগ্রেসের সম্মতি আছে, তাহা তাঁহারা সমগ্র জগতে বিঘোষিত করিতেছেন। ব্রিটিশ জাতি কংগ্রেসের সম্মতি দেখাইয়া সকল জাতিকে বুঝাইয়া দিতেছেন—তাঁহারা ভারতবাসীকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্ত-শাসনের পথে আগাইয়া দিতেছেন; তাই যাহারা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের স্বর্ণখচিত পালকী কাঁধে লইয়া ‘হিঁরো জোয়ান জোরে! সাবাস জোয়ান ছঁসিয়ার!’ শব্দে সিদ্ধির পথে ধাবিত হইয়াছিলেন—এখন তাঁহারা এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভুল হইয়াছে—ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেছেন, এবং অনেকে কারাগারে প্রবেশ করিয়া বিনাপ্রমে শাস্তিদূর করিতেছেন; তাহার উপর অনেকে কুড়ি ত্রিশ হইতে সহস্রাধিক টাকা আক্কেল-সেলামি দানেও পরিতৃপ্ত! ইতিমধ্যে প্রাদেশিকতা (Provincialism) এবং সাম্প্রদায়িকতা দাবানলের স্রাব সহস্র লোলজিহ্বা প্রসারিত করিয়া ভারতে অনৈক্যের এবং ধর্মগত স্বার্থের আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। তাই ইঞ্জিয়ান সোস্যাল রিফর্মার সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা প্রভৃতি এখন ইহার বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। ‘ভূতে পশুস্তি বর্করা:!’—এ-সত্য অস্বীকার করিবার উপায় কোথায়?

হাঙ্গেরিয়ার অস্বাভাবিক অর্থ

যে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী-মজ্জিগণ কিছু দিন প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালিত করিতেছিলেন, সেই সকল

প্রদেশের অধিকাংশই আবগারীর আয় যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, দেশের নেশা-স্বয়-দিগের সংখ্যা বা নেশার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বর্তমান সচিবসভ্যের শাসনাধীনে বা আবগারী-বিভাগের আয় গুরুপক্ষের শশিকলার স্রাব ক্রমশঃই পুষ্টলাভ করিতেছে! গত চারি বৎসর ধরিয়া এ প্রদেশে আবগারীর আয় কি হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নিম্নের উদ্ধৃত হিসাবেই প্রকাশ,—

খৃষ্টাব্দ	আবগারীর আয়
১৯৩৭-৩৮	১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা
১৯৩৮-৩৯	১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা
১৯৩৯-৪০	১ কোটি ৬৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা
১৯৪০-৪১	১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা

ইহাতে পাঠক বর্তমান সচিবসভ্যের শাসন-নীতির স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। সে-কালের আমলাতন্ত্রকে কি তাঁহারা পরাজিত করিতে পারেন নাই?

বিনা-টিকিটে রেলওয়ে ভ্রমণ

এ দেশের কতকগুলি লোক বিনা-টিকিটে রেল-ট্রেনে ভ্রমণ করে। কাষটি যে অত্যন্ত গর্হিত, কে তাহা অস্বীকার করিবে? এবং ইহা রহিত করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ইহা বন্ধ করা উচিত হইলেও যাহারা বিনা-টিকিটে রেল-ট্রেনে ভ্রমণ করে, তাহাদিগের প্রতি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা কোন-ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে।

কুইনাইন এবং জ্বরকর

ম্যালেরিয়াই বাঙ্গালার সর্বাধিক অধিক সাংঘাতিক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে বহু লক্ষ লোক প্রতি বৎসর অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, এবং ততোধিক ব্যক্তি জীবন্মৃত অবস্থায় দেহভার বহন করিতেছে। বাঙ্গালা প্রদেশেই ম্যালেরিয়ার প্রভাব ও ব্যাপকতা অত্যন্ত অধিক। কুইনাইনই এই রোগের প্রধান ঔষধ। কিন্তু বাঙ্গালা সরকার কুইনাইন-বিক্রয় সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে সাধারণের পক্ষে এই প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন করা কি কারণে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে সিন্ধোনার আবাদ-সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধে

ত হইয়াছে; তথাপি বিষয়টি অন্ত দিক্ দিয়াও তাহা হইবে আলোচনাযোগ্য।

তুল্য র পূর্বে বাঙ্গালা সরকার প্রতি পাউণ্ড কুইনাইন ১ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। যুদ্ধারম্ভের পর তাঁহারা মূল্য প্রতি পাউণ্ড সাড়ে ২৮ টাকা ধাৰ্য্য করেন। তাহার পর গত ডিসেম্বর মাস হইতে বাঙ্গালা তাহার মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৩৪ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া-
১। বাঙ্গালায় কুইনাইন প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের অধিকার কারেরই একচেটিয়া বলা যাইতে পারে। সরকার কান্ যুক্তিতে কুইনাইনের মূল্য দ্বিগুণ করিলেন, ধারণের তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যুদ্ধের হাজামায় ইনাইন প্রস্তুতের ব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া নে করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার মুসলমান-প্রধান চিবমণ্ডলীর প্রভাবে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ বাঙ্গালী কি ইনাইন খাইয়া জীবনরক্ষার সুযোগেও বঞ্চিত হইবে ?

ভারতের নৈতিক-বিদ্রোহ

বলাতে 'নিউ স্টেটসম্যান এবং নেশন' পত্র গত ডিসেম্বর মাসে লিখিয়াছেন, "ভারতে নৈতিক-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাহার উত্তরে বৃটিশ সরকার দমন-নীতির প্রয়োগ করিতেছেন।" কথাটা এক হিসাবে সত্য। এ কথা সত্য যে, কেবল কংগ্রেসীদলই যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি উত্থাপন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই মায় এমন প্রতিকূল কথা কিছুই নাই, যাহা বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারতে যুদ্ধের আয়োজন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ করিবে। আর কংগ্রেস দলভুক্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কোন দলের লোককে এই ধূয়া ধরিতে দেখা যাইতেছে না।

তবে এ কথা সত্য যে, ভারত-সচিব এবং ভারতের ডিপ্লোম্যাট বিগত আগষ্ট ও নভেম্বর মাসে যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন,—তাহা ভারতের কোন রাজনীতিক লোককেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। এমন কি, ভূতপূর্ব ভারত-সচিব লর্ড মর্লি যে মডারেট দলকে সম্বন্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই মডারেটগণও ঐ উক্তির সমর্থন করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও প্রতিকূল ভাষা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; ইহাই যদি 'নৈতিক বিদ্রোহ' (moral revolt) নামে অভিহিত হয়, তাহা

হইলে ভারতে নৈতিক-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। "বিদ্রোহ" শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং ইহা দ্বারা শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন চেষ্টাও বুঝাইতে পারে। এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমান প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনের ইচ্ছাই সার্বজনীন। এক্ষেত্রে সকলের চেষ্টা নাই। এ দেশের অধিবাসিগণের অধিকাংশের পক্ষে সেই ইচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল হইলেও তাহা নিষ্ক্রিয় (passive); সুতরাং উহাকে ঠিক বিদ্রোহ বলা যায় কি না সন্দেহ। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার রাজাগোপাল আচারিয়া একবার বলিয়াছিলেন,—ভারতবাসীকে 'যদি জাতীয় শাসন-পদ্ধতি দান করা হয়, তাহা হইলে ফ্রান্সের দলত্যাগের ক্ষতি আমরা পূর্ণমাত্রায় পূরণ করিতে পারি। আজ সেই রাজাগোপালকেও কারাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সুতরাং মুড়ি-মিছরীর মূল্যের কোন পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে না।

হাস্যাত্মক ক্ষয়-রোগ

শুনা যায়, বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর এক লক্ষ লোক ক্ষয়-রোগে প্রাণত্যাগ করে। যাহাদের দেহ অত্যন্ত দুর্বল এবং যাহাদের রোগ-বিতাড়ন শক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহারাই সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। সহরের এবং ঘনবসতিপূর্ণ স্থানের অধিবাসীরা এই রোগের বীজাণু কর্তৃক প্রায়ই আক্রান্ত হয়; কিন্তু যাহাদের দেহ সতেজ এবং রোগ-বিতাড়নের শক্তি স্বভাবতঃই প্রবল, তাহারা এই রোগে প্রায়ই আক্রান্ত হয় না। ইদানীং এই রোগ বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে দ্রুত প্রবেশ করিতেছে। ম্যালেরিয়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণবশতঃ যাহাদের দেহ জীর্ণ, এবং পরিপাক-শক্তির অভাবে যাহাদের দেহ দুর্বল, তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের হৃদরোগ বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার এ, সি, উকিল বলেন, সহরে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ১৫ জন এই রোগে মরে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই রোগের প্রতিকারকমে বাঙ্গালা সরকার এ পর্যন্ত কিছুই করেন নাই বলিলেও

• মাসিক বসুমতী

অত্যাঙ্কি হয় না। এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পত্রিকায় তাঞ্জিমুদ্দীন খাঁ চিকিৎসা-বিভাগের জন্য ৫১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করিবার এক প্রস্তাব মঞ্জুর করেইয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে কেবল যাদবপুর যক্ষ্মা-চিকিৎসাগারের ভূমিক্রয়ের জন্য কতক টাকা দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে। আর যদি উক্ত হাসপাতালে মফঃস্বলের রোগীদিগের জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে কথা হইয়াছে। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে মফঃস্বলের রোগীও স্থান পায়; তবে মফঃস্বলের রোগীদের জন্য আরও কতকগুলি শয্যার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বটে।

শ্যামচন্দ্র কবিরত্নের মহাপ্রয়াণ

বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজের গৌরব শ্রামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় গত ৭ই চৈত্র কাশীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল, বাঙালীর পরমায়ু হিসাবে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। তাঁহার ঋায় সাধু-পুরুষের এইরূপ পরিণত বয়সে কাশীলাভ—হিন্দুর বাঞ্ছিত মৃত্যু। বর্তমান যুগে তাঁহার মত স্বধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিতের অভাব—তাঁহার স্নেহ-প্ৰীতির কথা আমরা দীর্ঘকাল ভুলিতে পারিব না। তিনি ১২৬০ সালের পৌষ মাসে হাওড়া জিলার কোন ক্ষুদ্র গ্রামে নিষ্ঠাবান পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা-লাভের পর, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের প্রধান পণ্ডিতের কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ক্রমে সেগুলি মুদ্রণ—প্রকাশ জন্য ভিক্টোরিয়া প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীধামে বাস করিয়া, স্বগৃহে অধ্যাপনা করিতেন। ব্যাকরণে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল, তাঁহার রচিত “আঙ্কিককৃত্যম্” সদাচারনিষ্ঠ গৃহস্থগণের এবং “ভবদেব-পদ্ধতি” পণ্ডিত সমাজের বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। “ভবদেব-পদ্ধতি”-তে বিস্তৃত মন্ত্র সঙ্কলন করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ সাধনায় বেদ অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি ‘সরল কাদম্বরী’, ‘প্রবেশিকা-দর্পণ’ প্রভৃতি গ্রন্থ

রচনা করিয়া বশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু প্রবন্ধ সমৃদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি আজীবন সজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিবেদন করিয়া তিনি একান্তকাম্য মুক্তির অধিকার

ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ

ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ করিয়াছেন। বহু সদৃশের জন্য ব্যক্তিমানেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত



ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ

বোর্ডে দীর্ঘকাল সসম্মানে চাকরী করি বঙ্গুগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাট্যকার ঠ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সার গুরু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, নরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সার সুরেন্দ্রনাথ বাঃ কুমার ঘোষ প্রভৃতি বঙ্গবিখ্যাত ব্যক্তি যোগ্য। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি চাঃ গ্রহণ করেন। দানে তিনি মুক্তহস্তের তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা ও বহু পৌত্র গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতী-রোটারী মোসানে শ্রীশশিত্রবণ দত্ত যন্ত্রিত ও

